ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্ণে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক লাগিবে।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২·৫০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পায়ে চলার পথ ২৲

প্রথম প্রণয় ২৲

হাসিরাশি দেবী

ভোরের ভৈরবী ২৲

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

মিলনের পথে ২·৫০ মায়ের ডাক ২৲

রামনাথ (চিত্রোপন্যাস) ২·৫০

সনৎকুমার ঘোষ

উত্তরাধিকারী ৩·৫০

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲ পরের ছেলে ৩৲

যুগান্তরের কথা ২৲

পুষ্পলতা দেবী

মরু-তৃষা ৩·৫০

নীলিমার অশ্রু ৩·৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ২·৫০

পাঁচকড়ি দে

হত্যাকারী কে? ১৲

ভাস্কর

রুল্ অফ থ্রি ২·৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

উদাসীর মাঠ ২৲ পরাজয় ২৲

গোপালদাস চৌধুরী

অন্নপূর্ণা ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২·৫০

কানাই বসু

পাগলা প্রিন্স ২৲

রঙছুট ১·৭৫

শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কাক-বন্ধ্যা ৩৲

ননীমাধব চৌধুরী

দেবানন্দ [illegible]

শৈলবালা ঘোষজায়া

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

তেজস্বতী ১·৫০

শিশিরবালা দেবী

[illegible] ২৲

পঞ্চানন ঘোষাল

দুই পাক ২·৫০

মুণ্ডহীন দেহ ৩৲

[illegible] দেশে ৩·৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২·৫০

অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲

[illegible] (মোপাসাঁর অনুবাদ) ২·৫০

মুস্কিল আসান ২·৫০ অধিকার ২৲

রাঙামাটির পথ ৩৲ আঁখি ৩৲

এই পৃথিবী ৩৲ নববসন্ত ২৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ১ম—৩৲ ২য়—৪·৫০

ভুলের মাশুল ১·৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৪৲ কার্টুন ২৲

নিরুদ্দেশ ৪৲ দেহ ও দেহাতীত ৪৲

পতঙ্গ ১ম—২·৫০, ২য়—২·৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

আশাপূর্ণা দেবী

পূর্ণপাত্র ৩৲

আশালতা সিংহ

কলেজের মেয়ে ২৲

মধুচন্দ্রিকা ২·৫০ ক্রন্দসী ১·৫০

স্বয়ম্বরা ২৲ লগন ব'য়ে যায় ১·৭৫

অনুরূপা দেবী

মন্ত্রশক্তি ৪·৫০ পোষ্যপুত্র ৪·৫০

পথের সাথী ৩৲ বাগ্‌দত্তা ৫৲

হারানো খাতা ৩৲ পূর্বাপর ৪৲

গরীবের মেয়ে ৪·৫০ বিবর্তন ৪৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২·৫০

সীতা দেবী

[illegible] [illegible]

[illegible] ঘোষ

[illegible] [illegible]

দক্ষিণের বিল ১ম [illegible]

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২·৫০ কলরব ২৲

প্রিয় বান্ধবী ৩৲ তরুণী-সঙ্ঘ ২৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

দুই আর দু'য়ে চার ২·৫০

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

সত্য গুপ্ত

ফোমা গরদিয়েফ ৫৲

গোর্কীর অনুবাদ।

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪·৫০

জলধর সেন

প্রবাসচিত্র ১৲ ষোল আনি ১·৫০

মায়ের নাম ১·৫০ ঈশানী ১·৫০

ভবিতব্য ১·৫০ পথিক ১৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible] ৩৲

পদসঞ্চার ৫৲ লাল মাটি ৪·৫০

উপনিবেশ

১ম—২·৫০ ২য়—২৲ ৩য়—২·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বহ্ন্যুৎসব ১·৫০ [illegible]-বসন্ত ১·৫০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২·৫০

বনফুল

পিতামহ ৬৲ নবমঞ্জরী ২·৫০

নঞ্‌তৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩·৫০

শান্তিসুধা ঘোষ

১৯৩০ সাল ২·৫০ গোলকধাঁধা ২৲

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

অন্ত্যেষ্টি ২৲

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গহনার বাক্স ১·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আষাঢ়—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

নিখিল শরণেষু

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন

হে ভগবান—শুনিয়াছি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে আপনি বলিয়াছিলেন, যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং সাধুগণের পরিত্রাণ-সাধন আপনার কার্য্য। অনেকবার আসিয়াছিলেন, আবারও আসিবেন প্রতিশ্রুত আছেন। আসেন, ভালই; কিন্তু শীঘ্র প্রতিশ্রুতি পালনের কোন আভাস তো পাইতেছি না। এখন আশাভঙ্গের উপক্রম য়াছে বলিয়া বড় দুঃখেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছা হয় সত্যই আসিবেন তো?

অপরাধ লইবেন না প্রভু। ধরিয়া লইলাম, কথা যখন য়াছেন, আসিবেন সত্যই, কিন্তু কবে? আর কত দেরি? হে লীলাময়, ধরাধামে আপনার আগমন শুধু বৃন্দাবনলীলার জন্যই নয়। হিরণ্যকশিপু, নরক, কেশী, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি বহু দুষ্কৃতিকারীকে নিধন করিয়া আপনি কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর, সে যে সবই সে কালের কথা। দ্বাপর যুগের পরে আপনার সুদর্শন চক্র একেবারেই নিষ্ক্রিয়। অথচ এ অধম কলিযুগের জন্য যে একপাদ মাত্র পুণ্য অবশিষ্ট ছিল তাহাও ক্ষয় হইয়া যায়। আর কত দুষ্কৃতি দেখিতে চান? এখনও কি আপনার সময় হয় নাই?

দোহাই আপনার, একবার চোখ মেলিয়া চান—দেখুন দৈত্যামিতে—এই কলির দৈত্যগণ সেকালের দৈত্যগণ-অপেক্ষা কতদূর অগ্রসর, সংখ্যায় কতগুণ গরিষ্ঠ। রকম

দেখিয়া সন্দেহ হয়, কি জানি সকল ব্যাপার যথাযথ আপনার কানে পৌঁছে কিনা, তাই এই আবেদনপত্রযোগে দুই চারিটি কথা আপনার গোচর করিতে চাই।

দৈত্যামিতে এ যুগের দৈত্যদল শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি—কেমন করিয়া, তাহা বলি। প্রথমতঃ ধরুন, দুর্বল অথবা বলহীনের প্রতি প্রবলের অত্যাচার। মানি, ছিল সেকালেও—কিন্তু একালের মত ছিল কি? সেকালের দৈত্যগণ আর যাহাই হউক, নিশ্চয়ই জাতিকে জাতি নিষ্কাম—কষাই-বৃত্ত ছিল না। একালের দৈত্যগোষ্ঠী সভ্যতায় সেরা, যে সভ্যতার আদর্শ কষাই বৃত্তির চরম উৎকর্ষ- অহেতুক নরহত্যার অনাবিল আনন্দে নরহত্যা—সে খবর রাখেন কি?

সেকালের কোনও এক দৈত্য আপনারই সমাজের কোন দেবতার বরে হঠাৎ বাড়িয়া উঠিত, তারপর গলাধাক্কা দিয়া দেবগোষ্ঠিকে স্বর্গচ্যুত করিয়া নির্যাতন করিত। তখন দেবতারা মিলিয়া আপনাকে ধরিয়া পড়িতেন, আর আপনার সুদর্শন চক্রে দৈত্যবরের শিরশ্ছেদ, অথবা আপনার ততোধিক তীক্ষ্ণধার কুটবুদ্ধিতে তাহার নিপাত ঘটিত। শত্রু হোক মিত্র হোক, তাহারা আপনাদিগকে চিনিত, কঠোর তপস্যায় বর আদায় করিয়া লইতেও জানিত।

আর এ যুগের উচ্চাঙ্গের কষাযবৃত্ত দানব দল পাপিষ্ঠেরা আপনাকে ছাটিয়া ফেলিয়া—অহর্নিশ মারণ মন্ত্রের সাধনায় নিমগ্ন। পাঠশালার শিশু যেমন মাটীতে দাগা বুলান ছাড়িয়া ক্রমশঃ তালপাত, কলাপাতা, শ্লেট, কাগজ—একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যায়, মানব জাতি তেমনি মারণ-যন্ত্রের স্বরূপ সাধনায় লোষ্ট্র, লাঠি, তীর, খড়্গ, বল্লম, বন্দুক, শতঘ্নী-কামান—একটির পর একটি ধরিতে ধরিতে অযুতঘ্নী বোমায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আপনার যুগের ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র, গান্ধর্ববাণ এমন ভোঁতা। সমবল দুইপক্ষ হাতিয়ার বাঁধিয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়া—শক্তি পরীক্ষায় নামিবার মত বর্ব্বরতার দিন এখন নাই। এ বিজ্ঞানের যুগে, মনে রাখিবেন, ধর্ম্মযুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ প্রভৃতি কাপুরুষতা অচল। আপনার দুর্দ্ধর্ষ ভাগিনেয়টিকে কোন মতে রুখিতে না পারিয়া নিরুপায় কৌরবপক্ষের সপ্তরথী মিলিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের অপযশ ঘোষণা সেই যুগেই শোভা পাইত। এ যুগের যন্ত্রনীতি যদি একটু খেয়াল রাখিয়া থাকেন তবে হয়ত আপনার তাক লাগিয়া গিয়াছে—কত সরল অথচ কত প্রবল। পরম আরামে বিমান-বিহারী এক ঝাঁক আকাশ-ডিঙ্গা হইতে ক্রীড়াকন্দুকের মত কয়েকটি বোমা বর্ষণ? এই দ্বিধা-শূন্য অকৃপণ কুণ্ঠাহীন সভ্য বীরপনার সম্মুখে সৈনিক অসৈনিক, শিল্পী, বণিক, কৃষক, গৃহস্থ, পথিক, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রুগ্ন, পঙ্গু, হাসপাতাল শয্যায় মরণোন্মুখ অথবা আরোগ্যোন্মুখ রোগী, ক্রীড়াশীল বালক, স্তন্যপায়ী শিশু, স্তন্যধাত্রী মাতা, অসহায় পশুপক্ষী শতে শতে সহস্রে সহস্রে নিমেষ মধ্যে আকার অবয়ববিহীন কর্দ্দম পিণ্ডে পরিণত হইতেছে। ধনীর সৌধ, কাঙ্গালের কুটীর, দেবমন্দির, বিলাসীর প্রমোদভবন, বণিকের বিপনী—শত শত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে মানুষ যাহা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছিল, চক্ষুপালটিতে সব ধূলিসাৎ।

কিন্তু জানিয়া রাখুন, এও তো এখন শিশুর ক্রীড়া—ইহার পরে চরম পরিণতি এটম বোমা ডিঙ্গাইয়া হাইড্রোজেন বোমা—যাহার এক ফুৎকারে যোজনের পর যোজন ধরিয়া নগর গ্রাম, দ্বীপ পাহাড়, এক কথায় অর্দ্ধ পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনাদের অষ্টবজ্র ইহার কাছে অস্ত্রশিশু।

কালীয়নাগের নিঃশ্বাস-বিষে একটি হ্রদ বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল, আপনি তাহাকে দমন করিলেন, পশ্চিমসাগরে তাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পশ্চিমসাগরের ওপার হইতে প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ইহারা যে বায়বীয় বিষ বাহির করিয়াছে তাহার ফুৎকারে একটা গোটা দেশের আকাশ বাতাস, মায় ধুলিকণা-আকাশের মেঘ বিন্দু মুহূর্ত্তে ব্যাপকভাবে radio active হইয়া প্রাণ-ঘাতী হইয়া উঠে। জ্ঞান সাগর মন্থন করিয়া ইহারা বিষ তুলিতেছে—নিজের কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ সাজিবার জন্য নয়, প্রতিবেশী স্বল্পবল যে ধৃষ্টগণ পৈতৃক স্বাধীনতা বাঁচাইয়া সাতপুরুষের ভিটামাটি আঁকড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাদিগকে সহবৎ শিক্ষা দিবার জন্য এই আয়োজন! আত্মরক্ষায় অসমর্থ নির্ব্বিরোধ নরনারীর এমন প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কা মুক্ত নির্ম্মমহত্যা সেকালের দৈত্যগণের কল্পনায় আসিত?

তাই বলিয়া ইহার মূলনীতিটুকু যেন ভুল বুঝিবেন না—লোভ নয়, হিংসা নয়, নিছক শান্তিকামনা—উপচিকীর্ষা, জীবের অহেতুক মঙ্গল সাধন, পরহিত নিষ্কাম আর্থিক ও

নৈতিক সাধন। বিদুরের খুদে আপনার তৃপ্তি, সওয়া পাঁচ আনার বাতাসায় আপনার হরির লুট ভোগ বরাদ্দ—উচ্চতর জীবনমান হয়ত আপনার বোধগম্য হইবে না। ব্যাপকভাবে এমন পরহিত আকাশ ডিঙ্গাইয়া পরের জন্য আত্মনিয়োগ। ইহার পরেও কি আপনার আসিবার সময় হয় নাই।

(২)

প্রভু, বৃন্দাবনে নিরজনে গোচারণে আপনি অপ্সরা কণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীত—শুনিতে পাইতেন। গাহিত—

অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার
পশে নাকি শ্রবণে তোমার?

সাম্রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে কোথাও না পাই শান্তি
জগৎ করিছে হাহাকার

* * *

নিবারিতে বাড়বে না কর?

শুনিয়া শেষ পর্য্যন্ত কর বাড়াইলেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর শোণিতে সিক্ত ধরণীর বুকে ধর্ম্মের ধ্বজা প্রোথিত করিয়া কর উঠাইয়া লইলেন।

কিন্তু সেই বা কয় দিনের জন্য? দ্বাপরের বিদায় বেলা তখন পোহাইয়া আসিয়াছে। আপনি লীলা সংবরণ করিলেন, বেগতিক বুঝিয়া ধর্ম্মরাজও ভ্রাতাগণ সহ সরিয়া পড়িলেন। হয়ত ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা ছিল না। এদিকে কলিযুগের আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের আয়ুকাল যাচাই করিতে যাওয়া হয়ত সুবুদ্ধির কার্য্য মনে হয় নাই।

(৩)

তাহার পরে এক শুভ মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবার হইল কলিযুগোৎপত্তি—একক্রমে ৪৩২০০০ বৎসর পরমায়ু লইয়া। মঙ্গল ডালা সাজাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ধরণী তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন কিনা, পাঁজিতে লেখা নাই। তবে একথা স্পষ্ট লেখা আছে যে এ যুগের এখন কেবল শৈশব-মাত্র ৫০০০ বৎসর বয়স।

কিন্তু রকম দেখিয়া সংশয় জাগে—হিসাবে কোন ভুল আছে কিনা। দেখুন, তন্ত্রে "যদা যদা" বলিয়া প্রবলা কলির যতগুলি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটিও কি দেখা দিতে বাকি আছে? বাকি একটিও নাই বরং, অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শৈশবেই কি কলির এত প্রাবল্য। আরও ৪২৭০০০ বৎসর পড়িয়া রহিয়াছে। অতঃপর?

এখন জিজ্ঞাসা করি, আজিকার কলির জগৎ কি সেকালের দ্বাপরের জগৎ অপেক্ষা বহুগুণ অশান্তিতে পূর্ণ নয়? ইহাদের হাহাকার কি এক তিলও কম? হায় ঠাকুর, যখন "আবাতিতে পরস্পরে" সক্ষম ছিল—তখন নিবারণ করিতে কর বাড়াইয়াছিলেন—আর এখন যাহারা ক্ষমতা মদে অক্ষম মনুষ্যত্বকে পিসিয়া হত্যা করিতে চায়—তাহাকে নিবারণ করিবার প্রয়োজন নাই?

(৪)

আপনার কথা মতই ধরুন—সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে।

সম্রাট হৈহয়, মান্ধাতা, যযাতি, হরিশচন্দ্র, ভরত প্রভৃতি, যিনি যত বড় অপ্রতিরথ রাজচক্রবর্ত্তী থাকুন, বেলা বপ্রবলয়া, অনন্যশাসনা উর্ব্বী, চতুরন্ত মহী প্রভৃতি যতবড় গালভরা সাম্রাজ্য থাকুক—মোট কথা এই ভারতভূমি বৈ নয়। সীমানা আরও কিছু বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কলি যুগের ছয়টি কন্টিনেণ্টব্যাপী সাম্রাজ্য নিশ্চয়ই ছিল না। কোন যুগের সাম্রাজ্য বড়?

বড়, তাই বলিয়া যেন মনে করিবেন না—একালে "প্রজানামেব ভূত্যর্থং" ইত্যাদি। লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে, একালের রাজলক্ষ্মীর বাস রাজবাণিজ্যে। এই রাজ-বণিক জাতির শাসনের মূলমন্ত্র—ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। বসুমতীর ভাণ্ডারে, রত্নাকরের গর্ভে যেখানে যত ঐশ্বর্য্য আছে সব আসুক, আমার ঘরে আসিয়া উঠুক। যত আছে অসহায় দুর্ব্বল, যত আছে অশ্বেতকায়, সকলকে দলিয়া পিসিয়া চলুক আমার বাণিজ্যের জয়রথ, সেই রথে চড়িয়া, সকলকে রিক্ত পঙ্গু

করিয়া আমার ঘরে চলিয়া আসুক দেশবিদেশের অন্নপূর্ণা।

একথা প্রকাশ থাকে, সম্রাট বলিতে আপনারা যাহা বুঝেন "যেনেহ রাজসূয়েন" ইত্যাদি তাহার কিন্তু অস্তিত্ব নাই। বিশ্বজিৎ যজ্ঞশেষে মৃৎপাত্র মাত্র অবশিষ্ট "শরীর মাত্রেণ তিষ্ঠন্" নরেন্দ্র কাব্যের নায়ক রূপেই শোভা পায়। অথবা কাব্যের কথা বাদ দিলেও, ইতিহাসের কথায়, মাত্র সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বের কথা গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে পাঁচ বৎসর অন্তর দানযজ্ঞশেষে সম্রাট ভগিনীর নিকট ভিক্ষালব্ধ সাধারণ বস্ত্রে সম্রাটের লজ্জা নিবারণ—এ সমস্তই প্রাচ্য লক্ষ্মীর লীলাভূমিতে সম্ভব হইয়াছিল—এখন তো জগতে পাশ্চাত্য লক্ষ্মীর পূর্ণাধিকার।

আরও একটি কথা, এযুগে ভূগোলের পৃষ্ঠায় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নাই। বাঁচিয়া আছে কেবল সাম্রাজ্যবাদ। ওদেশের Chestere Cat এর মত, বিড়ালটি অন্তর্হিত, রাখিয়া গিয়াছে তাহার Grin। সেই মুখ ভেংচানিতেই ছয়টি মহাদেশ তটস্থ।

(৫)

তারপরে সমাজ ও ধর্ম্ম—শুনিতে বেশ, যেন মণি ও কাঞ্চন বলয়। বিপুলা পৃথিবীর অন্য দেশের কথা বাদ দিয়া কেবল আপনার ভূতপূর্ব লীলাভূমির কথাই শুনুন। একটু গোড়া হইতে বলা দরকার।

কুক্ষণে সীতাদেবী লঙ্কায় রাক্ষসী ত্রিজটাকে বর দিয়াছিলেন, যাহার ফলে "বানর ঔরসে জন্ম রাক্ষসী উদরে" রাজকুল প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া শ্রীরামের রাজ্যে বণিক রাজের সাম্রাজ্যলীলা দেখাইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্য সম্বল করিয়া তাহারা আপনার কৌস্তুভ মণির অধিক রত্নরাজির ভরা গোছাইয়া সাগর পারে লইয়া গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে চর্ব্বণ শেষে ইক্ষু খণ্ডের মত এই দেশ এবং দিয়া গিয়াছে এই দেশকে কালো-বাজারী ও বেদের অগোচর ফেরঙ্গ ব্যাধি এবং massage clinic.

ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিল—কত মানুষের ধারা—তাহারা সব "এক দেহে হ'ল লীন"। কিন্তু এই ত্রিজটার উত্তরবংশীয়গণ—ইহারা "রাজ্য প্রকৃতি বঞ্চনাং" এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছে। দেশের চক্ষে পরাইয়া দিয়া গিয়াছে পশ্চিমের মোহাঞ্জন, যাহার ফলে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম আজ বিধ্বস্ত। বেশভূষায়, কার্য্যে চিন্তায়, ধ্যান ধারণায় তাহারই আদর্শ আজ প্রবল অনুস্বার বিসর্গের ছিটাফোঁটালাঞ্ছিত সনাতন আদর্শ আজ কীটভুক্ত আমের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

আপনার জানা আছে, মানুষের ঘাড় হইতে নামিয়া সরিয়া যাইবার সময় ভূত তাহার ঘরের মটকা অথবা তেঁতুল গাছের ডাল ভাঙিয়া রাখিয়া যায়। দেশের ভূতও বিদায় লইবার সময় আপনাদিগের পদরজপূত ধর্ম্মভূমিকে এক পদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছে। একবার আসিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ৩৫০ সালের মন্বন্তর ও ১৩৫৩ সালের রক্তস্নানের পরে ধ্বংসাবশেষ এই দেশের অবস্থাটা কি।

আপনার বৈকুণ্ঠে কচুগাছ নিশ্চয়ই নাই—কিন্তু বৃন্দাবনে কচুগাছ দেখিয়াছেন। গরু চরাতে গিয়া বৃষ্টি নামিলে আপনারা কচুর পাতা ছিঁড়িয়া মাথা আড়াল করিতেন—"রৈবতক" কাব্যে আপনার জবানী লেখা আছে। কচুকাটা করা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নয়। দেশ ভঙ্গের ফল—বিভীষিকাগ্রস্ত পলায়মান নিরস্ত্র অসহায় সহস্র নরনারীকে কচু কর্ত্তন এবং পাইকারী হিসাবে নারী পরিবর্ত্তন।

১৩৫০ সালের মন্বন্তর কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি—আপনার পরম ভক্ত বঙ্কিমবাবুর বর্ণনায় ১১৭৬ সালের মন্বন্তর শুনিয়া থাকিবেন, ১৩৫০ সালের কাছে ১১৭৬ সালের ব্যাপার ফিকে। তাহা ভিন্ন ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে লক্ষ গরিবের মুখের অন্ন ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র লইয়া কালোবাজারীর ভানুমতীর খেলা হইতে ইহার উদ্ভব। এই খেলোয়াড়গণ আজিও সজীব ও সক্রিয়, ল্যাম্প পোষ্টে লটকাইয়া কেহ ইহাদিগকে ফাঁসী দেয় নাই। "দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ" এই সমস্ত আপৎ ইহার প্রতিহর্ত্তা কেহ নাই—এই সমস্ত আপৎ পোহাইয়া সমাজ ও ধর্ম্মের অবশেষ কি থাকা সম্ভব মনে করেন? ভিখারীর মান নাই বলিয় অপমানও নাই, তেমনি রিফিউজির আবার সমাজ ও ধর্ম্ম কি!

সেকিউলার রাষ্ট্রে আইন রোধ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ

বাঁচাইবার হাত কাহার আছে ? দেখুন, ধর্ম্ম ও সমাজের মূল বন্ধন আমাদিগের প্রধান সংস্কার বিবাহ। সকল ধর্ম্মের সহায় সহধর্ম্মিণী হাল আইনে অপাংক্তেয় হইতে চলিয়াছেন। বিবাহ বন্ধনকে ঢালিয়া সাজিয়া সাগর পারের আদর্শে দেহ আদান প্রদানের অ-চিরস্থায়ী ইচ্ছাধীন দাম্পত্য চুক্তিবন্ধনে অর্থাৎ সেয়ানে সেয়ানে কোলা-কুলিতে নামাইবার ষড়যন্ত্রে আইন আজ বদ্ধকটি। সেকুলার রাষ্ট্রের বেদীমূলে মনুপরাশরের বলিদান ভিন্ন এমন শুভ সিদ্ধি নাই। ভোট যার আইন তার। মূক জনমতের মূল্য কি ?

আরও আছে। সাগর পারের আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার আরও আয়োজন চলিতেছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ? বাজে কথা! দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে—মা বসুমতী আর কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অতঃপর আইন বাঁচাইয়া পূর্ব্বকথিত চুক্তি বন্ধনকে নিষ্ফলা করাই বিধেয়। অনাগত সন্তান সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে ফয়সালা করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে—পশ্চিমের গুরুমন্ত্রে ব্যাপকভাবে এদেশে দীক্ষা দিবার শুভ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইতেছে। অবাঞ্ছিতকে আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে পুরিয়া হত্যায় পাপ ও গুরু অপরাধ—তাহাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করিয়া আমন্ত্রণ করায় আইনের নিষেধ নাই।

এত ব্যাপারেও যদি আপনার যথেষ্ট বিবেচনা না হয়—তবে আর একটি মাত্র কথা শুনুন। সাধারণ কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ নাই, মায়ের অগোচর বাপ নাই। এই প্রবচনের শেষ ভাগ পশ্চিমের বিজ্ঞানে আজ সম্ভব হইয়া গিয়াছে। এদেশের আট প্রকার বিবাহ ও দশ প্রকার পুত্র, কিন্তু Test tube baby অনুস্বর বিসর্গের বিধানে ছিল না। বৈধ সঙ্গমকে নিষ্ফলা করিবার জন্য যাহারা অনাগত সন্তানের অঙ্কুর ধ্বংস করিতে পারে, বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণের বৈচিত্র্য বিলাসও তাহাদেরই সাজে। আইনের বিস্তার কতদূরে শেষ হইবে—কে জানে, অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি ?

হে প্রভু! আপনার দমনের যোগ্য দুষ্কৃত সংখ্যাতীত জমিয়া আছে—এখনও দ্রুত বৃদ্ধিমুখী—এদিকে পালন করিবার যোগ্য শিষ্ট দল ম্যাডাগাস্কারের ডো ডো পক্ষীর মত লোপ পাইতে বসিয়াছে—আরও বিলম্ব করিলে আপনার আগমন পর্য্যন্ত একটিও থাকিবে না—আসিয়া আপনাকে নিরাশ হইতে হইবে। অলমিতি বিস্তারেণ—এখন ভবন্ত প্রমাণম্।

বিজলীলতা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

এ ক্ষণ জীবনে ক্ষণিক মিলন
সজল জলদে ক্ষণিকার!
উদ্ভাসি উঠি ধরণী-নয়ন
পুন আঁধারিল মণি তার।
বিজলী আলোয় চমকিত বুক,
আঁধার ভেদিয়া খোঁজে ক্ষণ সুখ,
পথিকের প্রাণ পরশিয়া চায়
যতদূর তার চাহিবার!

তিমির বিদারি আলোর লহমা
ক্ষণিকের হোক তাও ভালো,
পিছনে তাহার হয় তো অশনি
নয় তো সে ঘনতম কালো।
ক্ষণিকের এই আলোকের লাগি,
পথিকের প্রাণে প্রেম ওঠে জাগি,
ও বিজলীলতা এ নয়নতারা
ঝলকিয়া দিক অনিবার।

—নয়—

তিনখানা ডিক্‌শনারী, টেবিলভর্তি রেফান্সের বই, একরাশ নোট বই। তারই মধ্যে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বনশ্রী লিখে চলেছিল। "বার্ডস্‌ আই ভিউ।" অনেকখানি ওপর থেকে পাখি যেমন চারদিকের সব দেখতে পায়—আপাতত বনশ্রী যে বইটি লিখছে সেটি ছাত্রছাত্রীরাও পাখির মতো ওই রকম অবলীলাক্রমে স্কুল-ফাইন্যালের সমস্ত প্রশ্নোত্তরমালা দেখতে পাবে। হীরেন বইয়ের বিজ্ঞাপনে দিয়েছে "বাই এ গোল্‌ড্‌ মেডালিস্ট্‌।" এই গোল্‌ড্‌ মেডালিস্টটি যে কে—হীরেন তা নিজেই জানে না, বনশ্রীর তো কথাই নেই। তবু আপাতত এই লোকটির বকলমেই বনশ্রীকে লিখে যেতে হচ্ছে।

লেখাপড়া সেখানো নয়—ফাঁকির রাস্তা। প্রথম প্রথম বিবেকে বাধত বই কি। ক্লাসে নীতি উপদেশ শুনিয়ে আড়াল থেকে ফাঁকি শেখানো—ভারী গ্লানি বোধ হত মনের মধ্যে। কিন্তু ক্রমেই বনশ্রী বুঝতে পেরেছে, ফাঁকি দেবার জন্যে সমস্ত দেশটাই যখন তৈরী হয়ে আছে—তখন সে না থাকলেও সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। "বার্ডস্‌ আই ভিউ" যারা পড়ে তারা পড়বেই—বনশ্রী না লিখলেও গোল্‌ড্‌ মেডালিস্টের জন্যে ভাড়াটে লেখক এসে জুটবে দলে দলে। মাঝখান থেকে ফাঁকি ঠেকাতে গিয়ে সে নিজেই ফাঁকি-পড়বে। আরো বিশেষ করে যেখানে নিজের হাতে তাকে সংসার চালাতে হয়—জি-কে রায়ের সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে দু'বেলা দু'মুঠোর নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হয়, চাকরের মাইনে দিতে হয়—রীতেনের খরচ চালাতে হয়।

এখন সব সহজ হয়ে গেছে। কে নোট লেখে না? স্কুলের নগণ্য নিম্নবিত্ত শিক্ষক থেকে নামের পেছনে তিনটে ডিগ্রিওয়ালা দিক্‌পালেরা পর্যন্ত ব্যবসাতে নেমে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই তো পাঁচ সাতখানা বিলিতি বই সামনে খুলে "মৌলিক" গ্রন্থ রচনা করে থাকেন—কুলীন প্রকাশকেরা ছাপেন—অনেক দামে ছাত্রদের তা কিনতে হয়—তারা জানে সেগুলোই 'ভবার্ণব তরণে নৌকা।' "আমার বইটা পড়লেই সব পাবে"—অনেক ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণই সে-কথা ক্লাসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকেন।

সুতরাং বার্ডস্‌ আই ভিউতে কোনো দোষ নেই। বরং দিকপালদের কীর্তির চাইতে এ ঢের ভালো। কখনো কখনো তাঁরা নিজেরা একছত্রও লেখেন না—মোটা কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে "নেম্‌ লেণ্ড্‌" করেন। বই লেখে আট দশ-জন "নেমলেস্‌"—তারা পায় খুদ কুঁড়ো—নামী ব্যক্তিটি বিনা পরিশ্রমে আদায় করেন সিংহ ভাগ। শিক্ষা বিভাগের কোনো কোনো বিচক্ষণ কর্মচারীও সম্প্রতি রাস্তা চিনে নিয়েছেন—অথবা হিসেবী প্রকাশকেরা রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছে তাঁদের। জেলার ইন্‌স্‌পেক্‌টার অব্‌ স্কুলস্‌ যদি কোনো টেক্‌স্‌ট বই তৈরি করেন—এমন কোন্‌ দুঃসাহসী হেড-মাস্টার আছেন যে সে বই তিনি তাঁর স্কুলে পাঠ্য হিসেবে মনোনীত করবেন না?

অতএব বনশ্রীর চিন্তা করবার কিছু নেই। যে-পথে মহাজনেরা চলেন তাকেই 'শিবপথ' বলে। বনশ্রীও সেই পথ ধরেই চলেছে। প্রত্যেকেরই বাঁচা দরকার।

টিউশন। নোট লেখা। বই চালানো। প্রকাশকের

দুয়ারে টাকার জন্যে ধর্ণা দেওয়া। আর বাঁচবার চেষ্টা করা। সবই হয়। হয়না পড়া আর পড়ানো।

কিন্তু কী আসে যায় তাতে? এই তো নিয়ম। একেবারে নিচের ক্লাস থেকে ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত। বনশ্রী ছেলেমানুষি বিবেকের দংশন অনুভব করতে যায় কোন্ দুঃখে? 'বার্ড্স্ আই ভিউ।' 'সিয়োরেস্ট্ সাক্সেস্ হন্—

বনশ্রী লেখবার জন্যে আবার কলম তুলে নিলে। সকাল থেকে একটানা লিখে আঙুল টনটন করছে। কিন্তু উপায় নেই। আজকে অন্তত দু ফর্মা ম্যাটার তাকে তৈরি করে দিতেই হবে।

অযোধ্যা এসে হাজির হল। হাতে একটুক্রো ছোট কাগজ।

—দেখা করতে এসেছে।

বনশ্রী ভ্রূকুটি করল।

—তোকে বলিনি, এখন ব্যস্ত আছি? পাঁচটার আগে দেখা করতে পারব না কারুর সঙ্গে?

অযোধ্যা মুখ নিচু করল।

—বলেছিলাম। কান্নাকাটি করছেন। দেখা না করে যেতে চাইছেন না।

কান্নাকাটি করছেন! কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে দেখল বনশ্রী। যা অনুমান করেছিল তাই। মিনতি দে।

বনশ্রীর কপালে ভ্রূকুটিটা আরো ঘন হয়ে এল। হাতের কলমটা একবার হিংস্রভাবে কামড়ে ধরল দাঁতে। তারপর অসহায় গলায় বললে, আচ্ছা, নিয়ে আয় এখানে।

টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বনশ্রীর মন একরাশ বিস্বাদ চিন্তায় ভরে উঠল। আবার খানিকটা অপ্রীতি—কতগুলো নিষ্ঠুর কথা বলবার দায়। তার যে কিছুই করবার নেই—সে কথা কোনো মতেই বোঝানো যাবে না। শুধু অভিশাপ কুড়ানো—দীর্ঘশ্বাসের বিষ সঞ্চয় করা। ইচ্ছে করে চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপর?

ঘরের বাইরে ভীরু পায়ের শব্দ শোনা গেল। মাথা ঘুরিয়ে বনশ্রী দেখল পর্দার ওপাশে মিনতি দে এসে দাঁড়িয়েছে। বকের মতো শীর্ণ এক জোড়া পা—তাতে মলিন জুতো।

—আসতে পারি?—কাঁপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

—এসো।

মিনতি দে ঘরে ঢুকল।

বনশ্রী টেবিলের ওপর মাথা নামালো। শক্ত হতে হবে—অপ্রীতিকর কথা বলতে হবে। আর্ত মানুষের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সেগুলো বলা যায় না—এখনো চক্ষুলজ্জায় বাধে।

—কী চাই তোমার?—ব্লটিং প্যাডের ওপর হিজিবিজি কালির রেখাগুলো দেখতে দেখতে বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল।

—আমার সেই ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা—

—হবে না।—একটা লাল পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁচড় টানতে টানতে বনশ্রী বললে, আর একদিনও তোমাকে এক্সটেন্শান দেওয়া সম্ভব নয়। হয় পয়লা তারিখ থেকে কাজে জয়েন করো, নইলে রেজিগনেশন দাও।

মিনতির গলায় কান্না ঝরে পড়ল: বড়দি—

না, কিছুতেই চোখ তুলে তাকাবে না বনশ্রী। কিছুতেই সে সইতে পারবে না মিনতির দৃষ্টিকে। এখনো তার চক্ষু লজ্জা আছে। মানুষের দুঃখের শেষ নেই—সমস্যার অন্ত নেই। সে দুঃখ কতখানি মোচন করতে পারে বনশ্রী—কতটা সমাধান করতে পারে সংখ্যাতীত সমস্যার? তার চাইতে চোখ বুজে থাকা ভালো। শেয়ালদা ষ্টেশনে পড়ে থাকা উদ্বাস্তদের মধ্য দিয়ে যেমন করে নিজেকে অন্ধ বানিয়ে চলে আসতে হয়—একটা অতলান্ত অন্ধকার গর্তের মধ্যে পা দিয়ে আছড়ে পড়বার আগে যেমন ভাবতে চেষ্টা করতে হয়—কী সুন্দর পৃথিবী, কী আশ্চর্য আকাশ, অপরাজিতার মতো নীল সন্ধ্যায় কী অপরূপ চন্দ্রমল্লিকা রঙের আলো!

ব্লটিং প্যাডের ওপর পেন্সিল দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা বৃত্ত আঁকতে চেষ্টা করতে করতে বনশ্রী বললে, আমার কোনো হাত নেই মিনতি। ছ'মাস সিক্লীভ নিয়েছো। আরো ছ' মাস এক্সটেন্শন অসম্ভব। গত বছরও পাঁচ মাস তুমি মেটার্ণিটিতে ছিলে। এ ভাবে স্কুল চলতে পারে না।

—কিন্তু আমার যে উপায় নেই বড়দি।

মিনতি কাঁদছে। চোখ না তুলেও টের পেল বনশ্রী। কিন্তু চারিদিকে কান্না দেখতে দেখতে এখন চোখের জলের ওপরে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ও আর নয়। সামথিং নিউ। দুঃখ প্রকাশ করবার যন্ত্রণাকে জানাবার ওই পুরোনো পদ্ধতিটা মানুষ ছেড়ে দিক এবার। আর কিছু না পারে বুক থাবড়ে হাহাকার করুক অন্তত। চারদিকে কান্না—সকলের কান্না—যুগের কান্না। এই অগণিত চাপা কান্না যেন এখন পাথরের ভার হয়ে হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরে—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

বনশ্রী পেন্‌সিলটাকে টেবিলের ওপর দিয়ে অনেকখানি গড়িয়ে দিলে। তারপর বললে, তুমি বরং সেক্রেটারির কাছে যাও মিনতি। কিছু করবার থাকলে তিনিই করতে পারবেন। আমি দুঃখিত।

—একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন বড় দি—

ভেবেছিল চোখ তুলে চাইবে না, কিন্তু চাইতেই হল এবার। আর তৎক্ষণাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো কী একটা এসে আছড়ে পড়ল তার গলা থেকে।

—একি, আবার!

এবারে মিনতি মাথা নামালো। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল তার।

—আমি কী করতে পারি বড়দি?

—তুমি কী পারো?—বনশ্রী বিকৃত মুখে বললে, আর কিছু না পারো—সুইসাইড করতে পারো অন্তত। এমন তিল তিল করে স্লো-পয়জনে মরবার কোনো অর্থ হয়না!

স্লো পয়জন। তা ছাড়া কী। আবার মা হতে চলেছে মিনতি। কিন্তু শীর্ণ নিরন্ন শরীরে সে মাতৃত্ব মহিমায় ভরে ওঠেনি। অর্থহীন, সঙ্গতিহীন এমন একটা অসহ্য কুশ্রীতার রূপ তা ধরেছে যে সেদিকে চোখ মেলে থাকা যায় না বেশিক্ষণ—গা বমি বমি করে ওঠে।

—প্রত্যেক বছর এই কাণ্ড করছ! অথচ গত বছর মরতে মরতে বেঁচে উঠেছিলে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠলে পনেরো মিনিট ধরে তোমাকে হাঁপাতে হয়!

মিনতি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। জবাব দিলে না।

সেই চাপা কান্না। যে কান্নায় দম আটকে যায়। যে কান্না চারদিক থেকে মৃত্যু বলয়ের মতো ঘিরে আসছে।

—কলেজে পড়েছো তুমি। তোমার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। একটু সাধারণ মনুষ্যত্ব নেই তোমাদের? নিজে যদি বা মরতে মরতে বেঁচে থাকো, কী খাওয়াবে তোমার ছেলে-মেয়েদের?—বনশ্রীর গলা চড়তে লাগল: দুধ দিতে পারবে এক ফোঁটা। প্রপার এডুকেশন দিতে পারবে? বলতে পারো এমন করে একরাশ কুকুর বেড়াল বাড়িয়ে কী লাভ?

মিনতি মাথা তুলল। অপমানে লজ্জায় একবারের জন্যে চকচক করে উঠল তার চোখ। হয়তো প্রতিবাদও করতে চাইল। কিন্তু বিদ্রোহটা মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই সে নিভে গেল।

আর সেই মুহূর্তে বনশ্রীও লজ্জিত হল। তার এ-সব নৈতিক উপদেশ দেবার কী দরকার? মিনতি তার ছেলে-মেয়েদের কি ভাবে মানুষ করবে সে নিয়ে তার কেন অনধিকার চর্চা? তা ছাড়া ওই কটু কথাগুলো উচ্চারণ করবার রুচিহীনতা তার নিজের কাছেই এখন অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হতে লাগল।

বনশ্রী আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমি চেষ্টা করে দেখব।

মিনতি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পর্দার ওপারে বকের মতো দুটো শীর্ণ পা আর একজোড়া বিবর্ণ জুতো অদৃশ্য হল।

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসহায়। কলেজে লেখাপড়া শিখলেই কি মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয়? মিনতি আই-এ পাশ করেছে, তার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। অথচ, তবু এক বিন্দু বিচার নেই, এতটুকু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা নেই। শুধু নিজেরা আত্মহত্যা করছে তাই নয়, সেই সঙ্গে এমন একদল মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে—যারা শিক্ষা-দীক্ষা হয়তো পাবে না—হয়তো ক্রিমিন্যাল হবে, হয়তো নিজেদের অসুস্থ অস্তিত্ব নিয়ে আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলবে।

পৃথিবী ভারাক্রান্ত। পৃথিবীতে ভিড়! মানুষের নয়। কতগুলো বিকৃত বিকলাঙ্গ জীবসত্তা।

বনশ্রী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। রাশিয়াতে যে

যত সন্তানের মা, তার তত সম্মান। সে মাদার হিরোয়িন। তাকে রাষ্ট্র থেকে পদক দিয়ে তার সার্থক মাতৃত্বকে সম্বর্ধনা জানানো হয়—বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। পৃথিবীতে অনেক মাটি পড়ে আছে—সে মাটি আবাদ করবার জন্য এখনো কোটি কোটি মানুষ চাই; খনির তলায় এখনো অনেক ঐশ্বর্য লুকিয়ে—কত কয়লা, কত ইস্পাত, কত পেট্রোলিয়াম—তা উদ্ধার করবার জন্যে দলে দলে শ্রমিক চাই। জগতের প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্যে আরো কোটি কোটি কর্মীর সহায়তা চাই। মাদার্স অব্ দি ওয়ার্লড্—গিভ্ আস্ চিলড্রেন্! গিভ্ আস্ মেন!—রাশিয়া পারে। ওরা অনেক কিছুই করতে পারে যা পৃথিবীর আর কেউ পারে না। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু এদেশে মিনতিকে অতবড় আশ্বাস দেবার শক্তি কার আছে? কে বলতে পারে: আরো সন্তান চাই, আরো মানুষ চাই—আরো কর্মী চাই; যারা মাটিকে দেবে ঐশ্বর্য, জীবনকে দেবে গৌরব, ভবিষ্যৎকে দেবে উত্তরাধিকার?

ক্যাট্‌স্ অ্যাণ্ড্ ডগস্।

আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বনশ্রী লেখায় মন দেবে ভাবছিল, এমন সময় সশব্দে রীতেন এসে হাজির। রীতেন দি গ্রেটার।

—ত্রিশটা টাকা দিবি দিদি? বিশেষ দরকার।

—এখন টাকা একদম হাতে নেই রীতেন।

—ওয়েল—ওয়েল। রীতেনের চোয়াল ঝুলে পড়ল: হোয়াট্ য়্যাম্ আই টু ডু উইথ্ মাই হিপ?

—হিপ? তার মানে?

—মানে, আমার গাড়িটা। মোটর সাইকেলটা। রিপেয়ার করতে দিয়েছি—আজকেই ডেলিভারি পাওয়ার কথা।

প্লীজ ডিয়ার মিস্—একটা ব্যবস্থা করে দে।

বনশ্রী বিষণ্ণভাবে চুপ করে রইল। রীতেনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই ওকে শাসন করতে পারে না। হিতেন চলে গেছে। রীতেনও যদি ওর মতো—

—গোটা কুড়িক দিতে পারি বোধ হয়?

—কুড়ি? ওয়েল—তাই দে। দেখি, বাকীটা ম্যানেজ করতে পারি কিনা।

—এক্ষুণি চাই? বিকেলে হলে ভালো হত।

—অল্‌ওয়েজ কণ্ডিশন্যাল?—রীতেনের চোয়াল আবার ঝুলে পড়ল: না—হোপলেস্! আচ্ছা, বিকেলেই হবে এখন। একটা সিগারেট ধরিয়ে রীতেন উঠে পড়ল: আমি একটু বেরুচ্ছি শ্যামবাজারের দিকে।

—তুই কি চাকরি-বাকরি কিছুই করবি না রীতেন? অত্যন্ত সাবধানে জিজ্ঞাসা করল বনশ্রী।

—চাকরি? পেলেই করব। কিন্তু আমার যোগ্য চাকরি হওয়া চাইতো; আমি চেষ্টায় আছি—বুঝলি দিদি? বাট্ ইউ নো—আই অ্যাম এ টাফ্ গাই! যা-তা একটা হলে আমার চলবে না।

রীতেন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল, বনশ্রী ডাকল।

—শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিস?

—ইয়া!

—আমার একটা চিঠি এক জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারবি?

—শ্যুট্।

—মুখার্জি ভিলা চিনিস্ তো? সেই যে দু তিনবার গিয়েছিলি—মনে আছে?

—অফকোর্স—হোয়াই নট্?—রীতেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: সেই সত্যজিৎ মুখার্জির বাড়ি তো! ইয়োর ওল্ড কম্প্যানিয়ান?

—তোকে বেশি বখামো করতে হবে না।—বনশ্রীর মুখে লালের আভাস লাগল: একটা চিঠি দেব—পারিস তো দিয়ে দেখা করে আসবি—।

—ও-কে সিস্!—বলে রীতেন একটা শিস্ টানলো।

বনশ্রী সামনে লেখবার প্যাড্ আর কলম টেনে নিলে। আর রীতেন ক্লার্ক গেব্‌লের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ড্যানীকে-র মতো শিস্ দিতে দিতে চার্লস্ বয়ারের মতো উদাস হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ বি-এ, এল-এল-বি,. ব্যারিষ্টার-এট ল

নবপর্য্যায়ে গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় তদানীন্তন উপাচার্য্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যখন আমাদের জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ১৯৫৭এর জানুয়ারিমাসে অনুষ্ঠিত হবে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা, উহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত থাকা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। ১৯৫৫এর মে মাসে ডাঃ ঘোষ প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হয়ে দিল্লী চলে যান এবং বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মল কুমার সিদ্ধান্ত আগষ্টমাসে যোগদান করেন। নানাবিধ প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর ২৮শে এপ্রিল ১৯৫৬ সিণ্ডিকেট সভায় শতবার্ষিক উৎসব পালনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি ক্ষুদ্র ষ্টিয়ারিং বা কার্য্যকরী কমিটি-নিযুক্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এই কমিটির চেয়ারম্যান হন। লেখক ষ্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন, পরে এই ষ্টিয়ারিং কমিটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শতবার্ষিক উৎসবের নানাবিধ কার্য্যাবলীর কথা বিবেচনা করে নিম্ন লিখিত কমিটিগুলির উপর বিভিন্ন কার্য্যের ভার দেওয়া হয়—অর্থসংক্রান্ত কমিটি, শতবার্ষিক পুস্তক এবং প্রকাশ কমিটি, জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ, প্রদর্শনী বিভাগ, ক্রীড়া সংস্থা, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব উৎসব বিভাগ, বিতর্ক সংক্রান্ত কমিটি, উদ্বোধন কমিটি, কলেজের অধ্যক্ষগণের কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনকমিটি। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এই সকল কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয় এবং অনেকেই সক্রিয় সাহায্য দান করেছিলেন। ১৯৫৬র জুলাইমাস হতে বিভিন্ন কমিটি পুরোদমে কাজে মনোযোগী হন। ক্রীড়াসংস্থার চেয়ারম্যানরূপে লেখকের উপর শতবার্ষিক ক্রীড়া সমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ইহার পূর্ব্বেও শতবার্ষিক পুস্তকের তথ্যাদি সংগ্রহ ও উহার প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ এবং সিণ্ডিকেটের প্রাচীনতম সদস্য ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি এক সময় যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সুদূর প্রসারিত ছিল, তেমন তার একশত বৎসরের কর্ম্মদীপ্ত গৌরবময় ইতিহাসও স্মরণ যোগ্য। শতবার্ষিক পুস্তকের প্রথমখণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশত বৎসরের ইতিহাস এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারে যথা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তার অবদানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত একশত বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার একশত বৎসরের ইতিহাস এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসও বটে, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভারতের সর্ব্বত্র যেভাবে স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমন ব্যাপক ভাবে আর কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। বহু মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই পুস্তকখানি শতবার্ষিক উৎসবের ঠিক পূর্ব্বেই প্রকাশ করে উহার সম্পাদকগণ যথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

শতবার্ষিক উপলক্ষে বিভিন্ন কমিটি নিজ নিজ কার্য্যসূচী প্রস্তুত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক তদুপযুক্ত অর্থেরও সংস্থান করা হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্লান্তকর্ম্মা রেজিষ্ট্রার ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী সহস্র সহস্র ব্যক্তিগত চিঠিদ্বারা শতবার্ষিক উপলক্ষে সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করবার আবেদন জানান। মোট দানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও একেবারে অগ্রাহ্যকরার মতও নয়। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতসরকার শতবার্ষিক উপলক্ষে নানাবিধ গঠনমূলক কার্য্যের সম্প্রসারণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক কোটি টাকা দান করেন, অবশ্য এইটাকা শতবার্ষিক উৎসবে ব্যয় হবে না এইরূপ সর্ত্ত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে পৃথিবীর যাবতীয় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তাগণকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল এবং শুভকামনাবাণী পাঠাতে অনুরোধ জানান হয়েছিল। পৃথিবীর আটচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ও আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুভকামনাবাণী ও মূল্যবান উপহারসমূহ পাঠান হয়েছিল। এই সকল শুভকামনাবাণী হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরাজি, জার্ম্মান, ডাচ, সংস্কৃত, চীন ও জাপানী ভাষায় রচিত হয়েছিল। বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দন বাণীটিও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান উল্লেখ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে শুভ-কামনাবাণী পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন করিতেছেন। ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও প্রসা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বাংলাভা ও সাহিত্যের উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের সহযোগি

করিতেছেন এই জন্যও পরিষদ কৃতজ্ঞ। এই দুইসত্তার প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জয়ন্তী উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইহাই আন্তরিক বাসনা ও প্রার্থনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জয়যুক্ত হউক

যদিও শতবার্ষিক উৎসবের কার্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৫৭ হতে আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি ইহাও ঠিক যে ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৫৭ ইডেন উদ্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কর্তৃক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসএর উদ্বোধনের সঙ্গেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়। শতবার্ষিক স্পোর্টস কমিটি ৪ঠা হইতে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত যে সকল ক্রীড়া অনুষ্ঠান করেন তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪ঠা হইতে ৬ই জানুয়ারি ইডেন উদ্যানে পঞ্চদশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে ভারত ও সিংহলের ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় চারশত ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছিলেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসএর ইহা রেকর্ড। ৯ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ১৯৫৬র আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলদলের সঙ্গে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টিমের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ১২ই জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফুটবল "ব্লু" দলের সঙ্গে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলদলের খেলায় অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীশৈলেন মান্না প্রাক্তন "ব্লু" দলের অধিনায়কত্ব করেন এবং ১৯৪৮র ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল টিমের অধিনায়ক শ্রীসমর ব্যানার্জি ও অন্যতম খেলোয়াড় শ্রীপ্রদীপ ব্যানার্জি যোগদান করেছিলেন। রেঙ্গুন দল চার গোলে পরাজিত হয়। কলিকাতার স্পোর্টস সাংবাদিকগণের সঙ্গে অধ্যাপকগণের ক্রিকেট খেলা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একাদশের সঙ্গে স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যানের একাদশের খেলা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল—শেষোক্ত খেলাতে স্কটিশচার্চের অধ্যক্ষ ডাঃ টেলর, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ পি, কে, বসু, চারুচন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ রায় প্রভৃতি যোগদান করেন। ৩১শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ক্রিকেট "ব্লু" কেবলমাত্র অধিনায়কগণ লইয়া গঠিত এক টিমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ক্রিকেট টিমের ইডেন উদ্যানে একটি আকর্ষণীয় খেলা হয়েছিল, এবং তাতে কয়েকজন টেষ্ট ক্রিকেটারসহ শ্রীপঙ্কজ রায়, শ্রীসুঁটে ব্যানার্জি যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকুরিয়া হ্রদে রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলগুলির বার্ষিক রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ে একটি সিম্পোসিয়াম বা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪ সংখ্যক অধিবেশন এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জস্থ বিজ্ঞান কলেজে শতবার্ষিকী প্যাণ্ডেলে ১৪ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখছি। ১৪ই জানুয়ারি অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আশুতোষ ভবনের সম্মুখে কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বহু প্রাচীন মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল প্রভৃতি জনসাধারণ দেখবার সুযোগ পান। সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু তথ্যাদিও পরিবেশন করা হয় এবং নানাবিধ ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মূর্তিসমূহও এবং চিত্রাদি দেখান হয়।

১৮ই জানুয়ারি অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ভবনের ভিত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ প্রসাদ কর্তৃক তাহার অভিভাষণ পাঠ

স্থাপন করেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন কলেজের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ রায় একটি সময়োচিত সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

১৯শে জানুয়ারি অপরাহ্নে ২টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত শতবার্ষিক প্যাণ্ডেলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন সভা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাররূপে এই তাঁহার প্রথম সমাবর্তন উৎসবে যোগদান। স্নাতকগণকে পদক ও ডিগ্রি দেওয়া হলে পর ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামণ দেশমুখ (বর্তমানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি) একটি সুচিন্তিত অভিভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ঐতিহ্য ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় শতবার্ষিক প্যাণ্ডেলে

বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংস্থার সভ্যগণ—যাঁহারা নয়া দিল্লীতে গত অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যুব উৎসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন তাঁহারা, একটি সুন্দর বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

২০শে জানুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারভাঙ্গা ভবনে সিণ্ডিকেটের ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সভা হয়, উহাতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য্যগণ যোগদান করেছিলেন।

ঐদিন অপরাহ্নে কলিকাতা ময়দানে ব্রিগেড প্যারেড মাঠে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ব্রিগেড প্যারেড মাঠে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হয়েছিল। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ছাত্রীরা বেদ হইতে গান করেন। তারপর উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং সমবেত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া এক আবেগময়ী অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"পরাধীন ভারতবর্ষ যখন কেবল স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; আর, আজ যখন আমরা শতবর্ষপূর্তির উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন আমাদের দেশ স্বাধীন ও স্ব-প্রতিষ্ঠ, আমাদের দেশের মানুষ নূতন জীবন রচনার কল্পনায় উদ্দীপ্ত···একদিকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণের তৃপ্তি ও আনন্দ, অন্যদিকে নূতন যাত্রাপথে দিগন্তের ইঙ্গিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যবিধাতার সুগভীর আহ্বান। এই ইঙ্গিত ও আহ্বান দুইই নূতন উদ্দীপনার, নূতন জাগরণের। আজিকার উৎসব এই সন্ধিক্ষণের সমগ্র অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ; একদিকে আনন্দের উৎসব, অন্যদিকে নবসংকল্পে দীক্ষা গ্রহণের উৎসব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপনাদের সকলকে সেই উৎসবে সাগ্রহ আমন্ত্রণে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে; এই উৎসবক্ষেত্রে আপনারা সকলে আমাদের পরম সম্মানিত অতিথি। এই মহাবিদ্যাবিহারের নামে আজ আপনাদের সকলকে আমাদের বিনীত অভিবাদন জানাইতেছি। আয়ন্ত সবে। সকলে আসুন আপনারা, এই উৎসবক্ষেত্রে আপনাদের সকলের আনন্দকণ্ঠ ধ্বনিত হউক। আপনাদের সকলের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে আমাদের উৎসব যাত্রা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠুক।" অতঃপর চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু দেশ বিদেশ থেকে আগত অতিথিগণকে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ একে একে মঞ্চের উপর উঠিয়া নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভকামনাবাণী পাঠ করেন। ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পঠিত এই সকল বাণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা যে এক মূল সূত্রে গাঁথা তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উহাদের প্রীতির সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তোলে। অতঃপর রাষ্ট্রপতি ডাক্তার প্রসাদ তাঁহার উদ্বোধনী অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহা বাংলাতে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে ডাঃ প্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াতে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্বভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস। ইংরাজভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা ভারতে প্রবর্তনের জন্য ইংরাজীমতবাদীদের প্রচেষ্টা ও জয়লাভের কথা এবং এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রমাণ। রাষ্ট্রপতির এই মূল্যবান অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। তিনি বলেন "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ছাত্রদের মাধ্যমে ভারতের নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহিত বিশেষ জড়িত ছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব কম করিয়া দেখা সম্ভব না হইলেও একথা বলিতে পারি যে প্রধানতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ছিল এই জাতীয়তাবাদের উৎস স্বরূপ।······এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করার জন্য আমায় মার্জনা করিবেন। সেই সময় দেখিয়াছি একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণা সংগঠনের অধিকার দিয়া ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হইল। অন্যদিকে অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের সক্রিয় প্রকাশ ঘটিল। বঙ্গভঙ্গ সমগ্র দেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রসার লাভ করার সাথে শিক্ষিত সমাজের কাছে স্বদেশী একটি ব্রত হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহারা স্বদেশীমন্ত্র গ্রামবাসীদের নিকট লইয়া যান। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকারের বিনা অনুমোদনে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়িয়া উঠে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রগণ শিক্ষক বা ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। ইহার স্বাধীন মতবাদের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বেশ কিছুকাল সঙ্গীণ হইয়াছিল। এই সকল অসুবিধা ও সাময়িক সঙ্কট সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং শীঘ্রই ইহা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।"

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ" "জনগণের প্রসার" এবং আমি মনে করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ এই আদর্শকে ঠিকমত অনুসরণ করার জন্য জ্ঞানের সর্বমুখী প্রসার করিয়াছেন। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হইয়াছে এবং এই একশত বৎসরে সারা দেশে বহু প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে"······"শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য ব্যক্তিত্বের ফলে স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে গবেষণার ব্যবস্থা হয়। আজকাল কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারদিকে

একটি ঝোঁক দেখা দিয়াছে। স্নাতকোত্তরবিভাগে শিক্ষাও গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের কাজ করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বকীয় দান কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সারা দেশে কারিগরী ও কারিগরী সম্পর্কীয় শিক্ষার সহিত যুক্ত আছে। স্বীয় কৃতিত্বের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় অভিনন্দনের যোগ্য। অভিভাষণের শেষ অংশে রাষ্ট্রপতি বলেন "পরিশেষে আমি আশাপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে চাই আমাদের জীবনের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক সক্রিয় শক্তির উন্মেষ ঘটাইয়াছিল। আজ ব্যাপকভাবে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা স্বাধীন ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রতী থাকিবে।"

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আনন্দময় শতবার্ষিক উৎসব আমাদিগকে একত্র হইবার এক সুযোগ দিয়াছে। এখানে আমরা ভারতের উচ্চশিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পর্য্যায়ে কি অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আলোচনার সুবিধা পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি এই কয়টি কথা বলিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিতে চাই যে, শিক্ষার উন্নতিতে এবং আমাদের স্বপনের ভারত গঠনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অধিকতর উল্লেখ যোগ্য হইবে।"

জাতীয় সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

এইভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য নেতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিশিষ্ট কৃতীছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করেন, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাহার মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে আমরাও গৌরবান্বিত হইলাম।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে চিলড্রেনস্ লিটল্ থিয়েটার সম্প্রদায়কৃত "মিঠুয়া" নৃত্যনাট্য অভিনয় হয়। ছোটছোট ছেলেমেয়েরা রংবেরংএর বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে যে সুন্দর অভিনয় করেছিল তাহা বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারি সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ ইন্‌ষ্টিটিউট টেকনলজি কলেজের হলে ভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকর্ত্তৃক সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানানর পর চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উদ্বোধনী ভাষণ দেন। অতঃপর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সভাপতি বরোদার মহারাজা সন্তয়াজি রাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীমতী ইস মেহটা একটি সুচিন্তিত বক্তৃতায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করেন। এই সভায় দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ হয়। পুনরায় বেলা সাড়ে এগারটার সময় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডের সভা এবং বেলা আড়াইটায় বোর্ডের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে সিণ্ডিকেট ঘরে হয়।

বৈকাল সাড়ে চারটায় রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের অতিথিগণকে এক টি পার্টিতে আমন্ত্রণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে সমাবর্ত্তন সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী সংস্থার সভাপতি ডাঃ দেশমুখ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

ঐদিন সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে "বহুরূপী" সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটকটি অভিনয় করিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করেন।

২২শে জানুয়ারি সকাল দশটায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা বা সিম্পোসিয়ম হয়, ইহাতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অংশ গ্রহণ করেন।

ঐদিন অপরাহ্ণে আলিপুর হেষ্টিংস হাউসের উদ্যানে স্বর্গত বিহারীলাল মিত্রের নামে স্ত্রী শিক্ষা সদন বা ইনসটিটিউটের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন উপাচার্য্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিসাধনে স্বর্গত বিহারীলাল মিত্রের দান এতদ্বারা স্বীকৃত হইল।

সন্ধ্যা ৬ টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিতর্কে প্রথম স্থান অধিকার করেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ছাত্র।

এই উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুন্দর শতবার্ষিক ট্রফি দান করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে উপাচার্য শ্রী নির্ম্মল-কুমার সিদ্ধান্তের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মিগণ রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয় করেন। অতঃপর রাত ৯টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাটকের অভিনয় হয়।

২৩শে জানুয়ারি অপরাহ্নে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে চ্যান্সেলর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সমাবর্ত্তন সভা হয়েছিল। এই উপলক্ষে দেশ ও বিদেশের ১৯ জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে অনারারী ডক্টরেট উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা হয়। অতঃপর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন একটি সুন্দর সময়োচিত অভিভাষণ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর বহুবর্ষব্যাপী ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণান উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান অবদান সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। সমবেত সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে দেশবিখ্যাত কয়েকজন আর্টিষ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় নৃত্যগীতের বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়েছিল।

২৪শে জানুয়ারি সকাল ৯টায় আই, টি, এফ, প্যাভিলিয়নের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের এক রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে চ্যান্সেলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অভিবাদন গ্রহণ করেন। সময়োপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রায় তিন সহস্র ছাত্র ও ছাত্রী রুট মার্চ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন।

ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ প্যাণ্ডালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষসম"এর অভিনয় হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর শেষ পর্ব্ব, যদিও ইহার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নানাবিধ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শতবার্ষিক উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁহার অভিভাষণের শেষে যাহা বলেছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্ত করিতেছি—"শতবর্ষ আমরা অতিক্রম করিলাম। মানুষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাংলা ভাষাভাষী জনপদের ইতিহাস শতপদ অতিক্রম করিল। এই পদচিহ্ন সুচিরকালের জন্য মহাকালের বুকে অঙ্কিত হইয়া রহিল কিনা, সে বিচার করিবেন মহাকাল স্বয়ং। নিয়ত আবর্ত্তমান ইতিহাসের মানুষ আমরা, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন আমাদের নাই। অন্তত আজ সে প্রয়োজনের কথা স্মরণ আমরা করিব না। আর এক শতবর্ষকে সম্মুখে রাখিয়া নূতন সংকল্প লইয়া আজ আমরা নূতন পদক্ষেপ করিতেছি। পিতৃপুরুষেরা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, পৃথিবীর মানুষের শুভকামনা আমাদের উপর বর্ষিত হউক, দেবতাদের আশীর্ব্বাদ নামুক আমাদের শিরে, আপনারা সকলে জয়ধ্বনি করুন, দিকে দিকে শুভশংখ নিনাদিত হউক।"

কেন ভারতীয় চটশিল্পের অবনতি হচ্ছে

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

সাধারণতঃ দেখা যায়, শিল্পে উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফার পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। ফলে একদিকে যে-রকম শিল্পের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হয়ে উঠে সেরকম অন্যদিকে শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অথচ ভারতীয় চটশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও উদ্বেগজনক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে গুরুতর কারণ রয়েছে। চটশিল্পের মালিকদের অভিমত হল এই যে, যেহেতু পাটের দাম খুব চড়া সেহেতু চটশিল্প এই অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। শ্রীডি, পি, গোয়েঙ্কাও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির বার্ষিক বৈঠকে এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, চট শিল্পের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে সে সমস্যার সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল কাঁচা মালের আংশিক চাহিদা পুরণের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। অর্থাৎ তাঁর অভিমত হল, আজ যেহেতু পাটের চাহিদা পুরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় চটশিল্পকে কিছুটা পরিমাণে পূর্ব্বপাকিস্থানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে সেহেতু উদ্বেগজনক অবস্থা দূর করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। কাজেই চটশিল্পের উন্নতির দিক থেকে একটী জিনিষ খুবই প্রয়োজনীয়। সে জিনিষটি হল পাটের ফলন বৃদ্ধি করা। অবশ্য কেবলমাত্র ফলন বৃদ্ধি করলে চলবেনা। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় যার ফলে আমাদের

দেশে সরেস পাট ফলন সম্ভবপর হবে। আনন্দের কথা হল, ভারত সরকার এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, পাটের ফলন বৃদ্ধি করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। প্রথমতঃ ঠিক সময়ে ভারত সরকার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেননি। যখন দেখা গেল, পূর্ব্বপাকিস্থান থেকে পাট আমদানী করার পথে বাধাবিঘ্ন আছে এবং এই আমদানীর ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা পর্য্যন্ত নেই কেবলমাত্র তখন থেকে ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেটুকু চেষ্টা করা হয়েছে সেটুকু চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কেন এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল সে সম্পর্কে এখনও পর্য্যন্ত কোন নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়নি। এটা সত্যি দুঃখের বিষয়।

চটশিল্প সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বছরখানেক ধরে এই শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর অভাব দেখা যাচ্ছে। কাজেই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অভাবের কারণ কি। যাঁরা চটকলের মালিক এই ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এঁরা কালোবাজারে প্রচুর মুনাফা অর্জ্জন করেছেন। এই মুনাফা দ্বারাই এঁরা ইউরোপীয় পরিচালিত চটকলগুলো কিনে নিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এঁরা চয় সাতগুণ চড়া দাম দিতেও রাজী হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ভারতীয় মালিকরা ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে কি ধরণের চটকল কিনেছেন। দেখা গিয়েছে, বেশীর ভাগ চটকলে এমন সব যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলো খুব পুরাতন এবং আজকের দিনে অচল। কাজেই সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসান দরকার। যদি পুরাতন এবং অচল যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে ফেলা না হয় তাহলে বিদেশী চটশিল্পের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় চটশিল্প পরাজিত হয়ে যাবে, কারণ বিদেশী চটকলগুলো নূতন ডিজাইনের বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। এখানে পূর্ব্বপাকিস্থানে স্থাপিত চটকলগুলোর দু একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চটকলগুলোর উৎপাদন মোটেই কম নয়। তাছাড়া পড়তা খরচের পরিমাণও অল্প। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ব্বপাকিস্থানের চটকলগুলোর এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণ কি! প্রধানতঃ তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হল সেখানে সরেস কাঁচা মাল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ কম মজুরী দিয়ে শ্রমিকের সাহায্য পেতে অসুবিধা হয় না। তৃতীয়তঃ সেখানকার চটকলগুলোতে অচল এবং পুরাতন যন্ত্রপাতির সংখ্যা কম এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য চেষ্টা চলছে।

আমরা আগেই বলেছি, মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীডি. পি. গোয়েঙ্কা চটশিল্প সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য করেছেন যেগুলো থেকে মনে হয়, যদি ইতিমধ্যে কোন পরিবর্ত্তন না হয় তাহলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার সঙ্গত কারণ নেই। শ্রীগোয়েঙ্কা বলেছেন, বিগত ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশের চটশিল্পে একদিকে যেরকম উৎপাদন বেড়েছিল সেরকম অন্যদিকে বিক্রয় বেড়ে গিয়েছিল। তবুও নাকি মন্দা রোধ করা হয়নি। তাঁর মতানুসারে গোটা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চটশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুতর আর্থিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তাছাড়া শ্রীগোয়েঙ্কা বুঝাতে চেয়েছেন, ঐ সালে মুনাফা একেবারে উপে যাবার আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। যেক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রয় ও বেড়েছে সেক্ষেত্রে কেন এই রকম সমস্যার উদ্ভব হল সেটা সত্যি চিন্তার বিষয়। তাছাড়া ১৯৫৬ সালে পূর্ব্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাটের চাষ বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল, এর পিছনে কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ দুটো। প্রথম কারণ হল সরকারী প্রচারকার্য্য। দ্বিতীয়তঃ চাষীরা আশা করেছিলেন, তাঁদের পক্ষে ন্যায্য দামে পাট বিক্রয় করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ফাটকাবাজদের কারসাজির ফলে এঁদের আশা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। মরসুমের সময় ফাটকাবাজরা পাট ক্রয় কমিয়ে দিলেন। ফলে চাষীদের পক্ষে খুব কম দামে ফলন বিক্রয় করা ছাড়া উপায় ছিল না। চাষীরা এত কম দামে ফলন বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন যার ফলে তাঁদের পক্ষে পাট চাষের খরচ উশুল করা পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। এখানে বলে রাখা দরকার, ফাটকাবাজদের এই কারসাজির পিছনে চটকলের মালিকদের সমর্থন ছিল, কারণ তা না হলে এই কারসাজি সফল হত না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ফাটকাবাজদের কারসাজির ফলে একদিকে যেরকম দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সরেস পাটের ফলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেরকম অন্যদিকে গোটা চটশিল্পে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

চটকলে কাজ করে যে সব শ্রমিককে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয় সে সব শ্রমিক আগে কিরকম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত কিছু কিছু—ধারণা আছে। আজকাল অবশ্য এঁদের মজুরী কিছুটা বেড়েছে। মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এদের মজুরী আরো বর্দ্ধিত হবে। শ্রমিক ট্রাইব্যুনাল কর্ত্তৃক সুপারিশগুলোই হল এই মজুরীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আগে চটকলের মালিকেরা যে মুনাফা লুটেছেন শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ফলে সে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা কমেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত আরো কমে যাবে। বাইরের চটকলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চটকলগুলো পরাজিত হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে—মজুরী বৃদ্ধিজনিত সমস্যার উদ্ভব সন্দেহ নেই। তাই বলে মজুরীবৃদ্ধিকে মৌলিক কারণ বলা যেতে পারেনা। মৌলিক কারণ হল দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে চটকলগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির—অভাব। দ্বিতীয় কারণ হল, যে কোন কারণেই হোক মালিকরা পড়তা খরচ কমাতে পাচ্ছেন না। জানা গেছে, বিগত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তিন বছরে চট এবং বস্তা বিক্রয় করে যথেষ্ট আয় হয়েছে। দুটো কারণ বশতঃ চট এবং বস্তার দাম খুব চড়া ছিল। প্রথম কারণ হল মুদ্রাহ্রাস। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তখন কোরিয়ায় যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যথেষ্ট আয় সত্ত্বেও চটশিল্পের অবস্থা কেন ভাল হতে পারেনি। এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। চড়াদামে চট এবং বস্তা বিক্রয় করে যা আয় হচ্ছিল তার বেশীর ভাগই আড়তদার, ফাটকাবাজ, মজুতদার এবং ম্যানেজিং এজেন্ট আত্মসাৎ করেছেন। ফলে ভারতীয় মালিকরা যে সব ইউরোপীয় চালিত চটকল কিনেছেন সে সব চটকলে অচল এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলান সম্ভবপর হয়নি। আজ এই সমস্ত চটকলে যদি—আধুনিক এবং নূতন ডিজাইনের বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি বসাতে হয় তাহলে সরকারের কাছ থেকে ঋণ না নিয়ে উপায় নেই। অবশ্য কেবলমাত্র ঋণ নিলেই হবে না। ঋণের মেয়াদটা দীর্ঘ হওয়া চাই। তাছাড়া সুদের হারও চড়া হলে চলবেনা।

গরল

প্রশান্ত চৌধুরী

বুড়ো গণপৎ ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে মালতী রোজই সন্ধ্যায় লেকের ধারে গিয়ে বসে আজ ক'দিন হল। সারাদিনের সঙ্গীহীন একঘেয়েমীর পর ফাঁকা আকাশের তলায় ব'সে একটুখানি নিঃশ্বাস নেওয়া বুক ভরে।

সেইখানেই আলাপ হল একটি তরুণীর সঙ্গে। নাম তার অপর্ণা। বড় মিশুকে মহিলাটি। সাত দিনেই লাজুক মালতীর সঙ্গে একেবারে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললে। মালতীর মনে হল, এতদিনে সে এমন একটি মানুষ পেয়েছে, যাকে প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়।

শীতের সন্ধ্যা। গল্প করছিল দুজনে জলের কিনারে বসে, বুড়ো গণপৎ ড্রাইভার গাড়ী থেকে আলোয়ানটা নিয়ে এল—মাঈজী, হিম পড়ছে।

আলোয়ানটা মালতীকে দিয়ে চলে গেল গণপৎ।

অপর্ণা বললে, তুমি ভাগ্যবতী।

ম্লান হাসল মালতী, কেন? আমার ঐ গাড়ীটা দেখে মনে হচ্ছে?

—না।

—তবে? আমার এই দামী শাড়ী আর গয়না দেখে?

—না। ঐ বুড়ো ড্রাইভারকে দেখে।

—কিন্তু কে চেয়েছে ওদের যত্ন?

—ও কি চেয়ে পাওয়া যায় ভাই? ও না চাইতেই আসে। তোমার স্বামীর ভালবাসা, হয়তো তুমি আসার আগে কত মেয়ে হাজার চেয়েও পায়নি। আর তুমি? কোথা থেকে এসে না চাইতেই পেলে।

—পেলাম?

ম্লান হাসল মালতী—হ্যাঁ পেয়েছি বৈকি। স্বামী আমাকে গাড়ী দিয়েছেন, শাড়ী দিয়েছেন। সব পেয়েছি, শুধু আজ এই এক বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামার মনটুকু পেলাম না এক মুহূর্তের জন্যেও। লোকে কত ছবি আঁকে, কত স্বপ্ন ভাখে। আর আমার? ফুলশয্যার রাতে স্বামী প্রথম কথা বললেন—

* * * *

—তোমাকে মাটির ঘর থেকে প্রাসাদে এনেছি। কেন জান?

বললুম—না।

স্বামী বললেন—শুধু 'তাকে' দেখাবার জন্যে। দেখাবার জন্যে যে 'তার' অভাবে আমার কিছুই এসে যায় না; আমি নিতান্তই সহজে আর একটা বিয়ে করতে পারি।

প্রশ্ন করলুম—কাকে দেখাবার জন্যে?

স্বামী বললেন—তার নাম···তার নাম সুমিত্রা।

শুনেছিলুম আব্‌ছা কিছু কথা বিয়ের আগে। তাই অবলম্বন করে বললুম,—সুমিত্রা? মানে আপনার প্রথম-পক্ষের স্ত্রী?

বললেন,—এরই মধ্যে তার পরিচয় জেনেছ?

বললুম,—হ্যাঁ। মাস ছয়েক আগে আপনাদের কার্মাটারের বাংলোয়···

চম্‌কে উঠলেন যেন তিনি। চীৎকার করে বললেন, কী···কী···কী হয়েছিল কার্মাটারের বাংলোয়? কি জান তুমি?

যা শুনেছিলুম তাই বললুম,—তিনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান?

ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্রের পারদের মত তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে এক মুহূর্তে নীচে নেমে গেল। বললেন, ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল সে—হঠাৎ চলে গেল, ভাবল বুঝি···কিন্তু থাক্ সে কথা। শোনো তোমার মা নেই, বাপ নেই, দরিদ্র মামার কুঁড়ের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় মানুষ হচ্ছিলে; আমি তোমায় তুলে নিয়ে এসেছি সেখান থেকে। তার জন্যে কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই তুমি?

বললুম—আপনার দয়ার কথা…

বললেন—হ্যাঁ, ভুলো না কোনদিন। আর, হ্যাঁ শোন, তোমার অসামান্য রূপ দেখেই তোমাকে আমি এনেছি তুলে। কিন্তু ভেব না ও-রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এনেছি শুধু 'তাকে' জানাবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে।

একটু থামলেন। তারপর উত্তেজিত হয়ে বললেন নিজের মনেই—জানুক সে, এবার যে আমার ঘরণী হয়ে এল, সে 'তার' চেয়েও সুন্দরী, 'তার' চেয়েও ·

হঠাৎ থামলেন।

বললুম, সুমিত্রা দেবীর একটাও ছবি দেখলাম না তো এ বাড়ীতে?

বললেন, না, নেই। একটাও নেই। একটাও রাখিনি। সে জানুক, তার ছবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস আমি ফেলি না, কোনদিন তার কথা ভাবি না, কোনদিন তার ছবি দেখি না—কোনদিন তার জন্যে জীবনে আমার এতটুকু অভাব হয়নি কোথাও।…

* * * *

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতী বললে, জানেন অপর্ণা দেবী—ফুলশয্যার রাত্রি আমার ভোর হল এমনি কোরে।

অপর্ণা সহানুভূতির সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—ফুলশয্যার দিন, প্রথমা স্ত্রীর কথা তোমার স্বামীর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

—কিন্তু শুধু তো ঐ একদিনই নয়, আজ এক বছর ধরে দেখছি, ঐ একই কথা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঐ একই কথা আমার মনের সমস্ত কথাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেই সুমিত্রাই আছে ওঁর মন জুড়ে।

—সত্যি! সত্যি বলছো?

—কী?

—ওঃ, না, না। মানে, আমি বলছি, তিনি তোমায় কদিন এমন করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন ভাই? যে নেই—তার স্মৃতি কতদিন রাখতে পারবে তোমাকে সরিয়ে?

—কি জানি, আমি তো কল্পনাও করতে পারি না, এ জীবনে কোনদিন পাব আমার সত্যিকার অধিকার। আমার না-দেখা সেই সুমিত্রা আজো আমার সমস্ত অধিকার…

বাধা দিয়ে অপর্ণা বললে, তাও কি হয়?

—তাই যে হচ্ছে অপর্ণা দেবী।

—হবে না। রাজা দশরথের ছিল তিন স্ত্রী।

মালতী ম্লান হেসে বললে, হ্যাঁ, তাঁর সুয়োরাণীর নাম সুমিত্রা।

না ভাই, সান্ত্বনার সুরে বললে অপর্ণা—ছোট রাণীর নাম সুমিত্রা। সুয়োরাণীর নাম কৈকেয়ী। সুমিত্রার সাধ্য কি, কৈকেয়ীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তাঁর রাজাকে? তুমি হবে সেই কৈকেয়ী।

—বুঝলুম না।

—কাল বলবো। কালও তো আসছ এখানে।

—নিশ্চয়ই আসবো। আপনিই আমার প্রথম বন্ধু এবং একমাত্র। এই কদিনের আলাপেই আপনাকে যেন কতদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এতদিনে মনের কথা বলবার ঠিক মানুষ পেলাম।

পরদিন লেকের জলের ধারে আবার বসল এসে অপর্ণা মালতীর পাশে। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চোখ দুটো ফুলো ফুলো কেন?

মালতী বললে—সুমিত্রা মরেও মরেনি অপর্ণা দেবী, সুমিত্রা আজো বেঁচে আছে ওঁর বুকের মধ্যে।

—কি করে জানলে?

অপর্ণা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

মালতী বললে—কাল এখান থেকে বাড়ী ফিরে শুনতে পেলুম, চাকর-বাকরদের নাম কোরে ভীষণ চেঁচাচ্ছেন উনি। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললুম—কি হয়েছে?

বললেন—কে? কে? কে আমাকে এ-কৌটায় পান দিয়েছে আজ?

সভয়ে বললুম—আমি।—না জেনে কোন অপরাধ করেছি কি?

বললেন—করেছ। ও কৌটো কোথা থেকে পেলে?

বললুম—পাথরের আলমারীতে।

বললেন—কৌটাটা রাস্তায় ফেলে দাও।

বললুম—কেন?

—কি হয়েছে তোমার মালতী ?

—কি জানি !

—তোমার হাতে যেখানে কামড়েছে, সেখানে কোন রকম সেনসেশন্ হচ্ছে না তো।

—সে কিছুই না। কিন্তু আর্তনাদ শোনবার পর আমি কি করব ?

—তাও বলে দিতে হবে ? কৈকেয়ীর মত স্বামীর ক্ষত স্থানের···

—আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি আমি।

অনেকক্ষণ পর। যথাসময়ে অপর্ণার উপদেশ মতো সাপের ঝুড়িটাকে রেখে এসেছে মালতী স্বামীর ঘরের খাটের তলায়। তারপর, স্বামী ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর থেকেই একটা অজানা অনুভূতিতে কাঁপতে সুরু করে দিয়েছে মালতীর সব শরীর। এমন সময় ফোনটা আবার উঠল বেজে। মালতী তাড়াতাড়ি ফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিলে— হ্যালো ?

ওধার থেকে অপর্ণার ব্যস্তকণ্ঠ ভেসে এল, মালতী ? আমি অপর্ণা। শোনো···

—এখনও আর্তনাদের কোন শব্দ···

—ও কথা থাক। শোনো, শোনো মালতী—তুমি যেখান থেকে সাপ কিনে এনেছ, আমার সেই চেনা ভদ্রলোকটি এই মাত্র ফোনে আমায় খবর দিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, বোধ হয় তিনি ভুল করে তোমাকে একটা বিষাক্ত সাপ দিয়ে ফেলেছেন। ও সাপ কামড়ালে তখুনি কিছু হয় না। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত দেহে বিষ ছড়িয়ে গিয়ে···মালতী ? মালতী ? হ্যালো—হ্যালো— মালতী ?

ফোনটাকে আছড়ে ফেলে মালতী তখন প্রাণপণে স্বামীর ঘরের বন্ধ দরজায় উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছে, দরজা খোলো···দরজা খোল··· ওগো দরজা খোল···দরজা খোল···ওর বিষ আছে, ওর বিষ আছে, ওগো দরজা খোল !

দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন স্বামী প্রফুল্লবাবু। বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, কি হয়েছে ?

আর্তনাদ করে ওঠে মালতী, ওগো, তোমায় কামড়ায় নি তো ? আমি জানতুম না, আমি জানতুম না যে ওর বিষ আছে।

—পাগলের মত কি বক্‌ছ ? কার বিষ আছে ? কি হয়েছে তোমার ?

—আগে বলো, আগে বলো, তোমাকে কামড়ায় নি তো ঐ কালনাগিনী ? যদি কামড়ে থাকে, বলো বলো, আমি সব বিষ শুষে নেব, আমি তোমার সব বিষ শুষে নেব।

—মালতী ! মালতী !

—ওগো, আমি এ চাইনি, আমি এ চাইনি।

—মালতী, কি হয়েছে তোমার ? কী আবোল-তাবোল বকছ ? স্থির হও।

—ওগো, আবোল-তাবোল নয়; এইমাত্র খবর দিলেন অপর্ণা দেবী, ওর বিষ আছে।

—কার ? কার বিষ আছে।

—সাপের। নির্বিষ বলে যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, সে যে এতখানি গরলে ভরা, ওগো আমি তা' জানতুম না। আমার হাতে এই ছাখো সে কামড়েছে। তা হোক্; আমার বাঁচবার কোন সাধ নেই। কিন্তু আগে বলো, সে তোমাকে কামড়ায় নি তো ?

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন যেন এবার প্রফুল্লবাবু, সাপ ! তোমাকে কামড়েছে ? কৈ ? এ কী ! কখন্ কামড়ালো ? কোথা থেকে এল সাপ ? গণপৎ ? গণপৎ, জল্‌দি, জল্‌দি ডক্টর সাব্‌কো বোলাও। হাতটা আগে বেঁধে দিই তোমার !

নিজের কোলের ওপর মালতীর হাতটাকে টেনে নিয়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে কষে বাঁধন দেন প্রফুল্লবাবু, বিষটা যাতে না ছড়াতে পারে। বাঁধন দিতে দিতে অস্থির কণ্ঠে বলেন, শান্ত হও, কষ্ট হচ্ছে ? লাগছে ? আঃ, কথা বলছো না কেন ?

তারপরেই প্রফুল্লবাবু মালতীর হাতখানাকে আচমকা তুলে ক্ষতস্থানে মুখ দিতেই তীব্র চীৎকার করে ওঠে মালতী, ও কি করছো ! ও কি করছো তুমি !

—অস্থির হয়ো না, মুখ দিয়ে চুষে বিষ বের করে দিতে পারলে······

প্রাণপণ শক্তিতে আর্তনাদ করে ওঠে এবার মালতী,

ওগো না, না, না !! ও যে আমার করবার কথা ছিল। আমার করবার কথা ছিল।

—আঃ! অস্থির হয়ো না। কী হচ্ছে কী ছেলেমানুষী। নাড়িও না হাতটা।

প্রফুল্লবাবু আবার তাঁর মুখ নিয়ে যান ক্ষতস্থানের কাছে।

হাতটা ছিনিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে মালতী। তীব্র আর্ত্তনাদে ভরিয়ে তোলে বাতাস, না,-আ-আ-আ! এ আমি দেব না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না! না-না-না……

চরমতম তীব্রতায় বেজে উঠে মালতীর কণ্ঠের সমস্ত তার হঠাৎ ছিঁড়ে যায় যেন। নীরব হয়ে যায় কণ্ঠস্বর, থেমে যায় হৃৎস্পন্দন, সব শেষ হয়ে যায়!

এই দুর্ঘটনার পর বোধ করি পনেরো কুড়িদিন কেটে গেছে। এ-কদিন বাড়ী থেকে একবারো বেরোন নি প্রফুল্লবাবু। সেদিনও চুপচাপ বসেছিলেন নিচের ঘরে একা, এমন সময় প্রবেশ করলেন ক্লাবের বিলিয়ার্ডের পার্টনার সুধীরবাবু।

সামনের চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বোসে সুধীরবাবু কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, কেমন আছেন?

ম্লানকণ্ঠে প্রফুল্লবাবু শুধু বললেন, শুনেছেন তো সব?

—শুনেছি। আশ্চর্য! এমন বাড়ীতে বিষাক্ত সাপ এল কী করে?

—সাপটা মোটেই বিষাক্ত ছিল না মিঃ বসু। করুণ-কণ্ঠে বললেন প্রফুল্লবাবু, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখু, বিনা বিষে সে প্রাণ দিলে!

—বিনা বিষে!

—হ্যাঁ। পরে সাপটাকে খুঁজে পাওয়া যায় আমার ঘরেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তার বিষ ছিল না। আমার স্বর্গতা স্ত্রীর পাকস্থলীতেও বিষের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

চেয়ারের উপর সিধে হয়ে বসলেন সুধীরবাবু,—আশ্চর্য! তবে তিনি মারা গেলেন কী কোরে?

—ভয়ে। উত্তেজনায়। বিষাক্ত সাপে কামড়েছে, এই মিথ্যা ধারণাতেই সে হার্টফেল্ করল শেষ পর্য্যন্ত। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে প্রাণপণে বাধা দিয়েছে আমাকে, পাছে তার ক্ষতস্থান চুষে বিষ বের কোরে দিতে গিয়ে আমার কোন বিপদ ঘটে। তার নিজের হাতে সাপে কামড়েছে, কিন্তু সেদিকে হুঁশই নেই তার, আমাকেও সাপে কামড়েছে কি না, তারই জন্য তার যত কিছু ভয়, যা কিছু ব্যাকুলতা! অথচ জানেন মিঃ বসু, আমি একটি দিনের জন্যেও তাকে আমার স্ত্রীর মর্য্যাদা দিইনি।

আর্দ্রকণ্ঠে সুধীরবাবু বলেন, আপনি বড় উতলা হয়েছেন।

—না। উতলা নয় মিঃ বসু, আজ পনেরো দিন ধরে কেবলি ভাবছি, কী বিচিত্র আমার জীবন! জীবনে প্রথম যাকে ভালবেসেছিলুম, একমাত্র যাকে দিয়েছিলুম স্ত্রীর মর্য্যাদা, যার মুখের হাসিটুকুর জন্যে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতুম, মঞ্চের অভিনেত্রী আমার সেই প্রথমা পত্নী কামাটারের বাংলো থেকে হঠাৎ একদিন রাত্রে উধাও হয়ে গেলেন একখানি চিঠি লিখে, 'আমাকে মুক্তি দাও।' অথচ, শুধু ঐ প্রথমা স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করায় আমার যে এতটুকু কষ্ট হয়নি, এইটুকু প্রমাণ করবার খেয়ালে যাকে ঘরে আনলুম, যাকে একদিনও ভালবাসলুম না, স্ত্রীর মর্য্যাদা দিলুম না, সেই…

—চলুন ক্লাবে। মনটাকে হাল্কা করে ফেলবার চেষ্টা করুন। জীবনে এসব তো আছেই।

—ক্ষমা করুন। আজ নয়। আর দু-চারদিন বাদে আমি নিশ্চয়ই যাব।

—ঠিক যাবেন কিন্তু। না গেলে আমি কিন্তু আবার আসবো। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্কার।

সুধীরবাবু চলে গেলেন। চুপচাপ একা বসে রইলেন প্রফুল্লবাবু। ঘরের আলোটাও জ্বেলে দিতে সাহস হল না কোন চাকার-বাকরের। হঠাৎ সেই অন্ধকারে ছায়ার মতো একটি রমণীমূর্ত্তি এসে দাঁড়াল।

—কে? কে দরজার কাছে? প্রফুল্লবাবু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করেন।

—আমি।

কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ওঠেন যেন প্রফুল্লবাবু, সুমিত্রা! তুমি !!

রমণীমূর্ত্তি বলে, সুমিত্রা নয়—অপর্ণা। অপর্ণা আমার নতুন ছদ্ম নাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার লোভেই সুমিত্রা অপর্ণা হয়েছিল।

—আমাকে!

—জানি। এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার সব কথা শুনে বুঝেছি—পাওয়ার কোন আশাই নেই। একদিন আমি গেছলাম চলে, অথচ আমার স্মৃতি মালতীকে তার আসন দেয়নি। আজ মালতী গেছে চলে, তার স্মৃতি আমাকেও আসন দেবে না।

—হঠাৎ এ-বাড়ীতে?

—চলে যাচ্ছি এখনি। ভয় নেই, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না। শুধু একবার বলে দেবে কি, মালতী কোন্ ঘরে থাকতো?

—উত্তরের মাঝের ঘরে।

—আচ্ছা, চললাম।

স্বর্গতা মালতীর ঘরে ঢুকে মালতীর বাঁধানো ফোটোর সামনে এসে দাঁড়ালো অপর্ণা,—কিংবা সুমিত্রাই বলি এখন। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কোরে দিয়ে মালতীর ছবির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা চাপা কণ্ঠে বলতে লাগল,—মালতী, তোমার এই ঘর আমি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছিলুম। আমাকে বিশ্বাস করে তুমি ভয়ানক ভুল করেছিলে। তুমি তো জানতে না যে, আমিই সুমিত্রা! তোমাকে সরিয়ে দিয়ে আমার নিজের জায়গায় আবার এসে বসবার জন্যে ঐ সাপের খেলা ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম তোমার মনে। সাপটা যে নির্বিষ, তা' আমি জানতুম মালতী,—তবু তোমাকে বলেছি, ওর বিষ আছে। কেন বলেছি, তা কি তুমি এখনো টের পাওনি? যা চেয়েছিলাম, তা সবই হল। কিন্তু যাবার আগের মুহূর্ত্তে এ তুমি কী করে দিয়ে গেলে মালতী? তোমার স্বামীর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে চলে গেলে যে তুমি! আমার জন্যে এতটুকু জায়গা রেখে গেলে না!

ব্লাউজের ভিতর থেকে ছোট্ট একটি কাঁচের শিশি বের করল এবার সুমিত্রা। একটি করুণ হাসির ক্ষীণ রেখা খেলে গেল তার মুখে। মালতীর ছবির দিকে চেয়ে বললে,—এই যে ছোট্ট শিশিটা দেখছো মালতী, এতে আছে তীব্র বিষ। তোমার সেই সাপের মতন মিথ্যে বিষ নয়! আসল বিষ! স্পর্শেই মৃত্যু! মালতী, আমি তোমাকে কৌশলে মেরেছি,—তুমি আমাকে বাধ্য করলে মরতে। শোধ-বোধ হয়ে গেল; কি বল?

সুমিত্রা শিশির মধ্যকার পদার্থটা ঢেলে দিলে নিজের মুখে।

বাইরের বন্ধ দরজায় তখন প্রফুল্লবাবু করাঘাত করে চলেছেন!

জীবনানন্দ দাশ

শ্রীইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি, তোমার সহিত আমার চিন্তাধারার মিল যে খুব আছে তাহা নয়, তবু তোমার সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া যে পারি না।

এইতো টেবিলে তোমার নামের স্মৃতি-সংখ্যা খানা রহিয়াছে। তোমার বিষয়ের যত রচনা তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি। রচনাগুলি চমৎকার। কিন্তু কবি তোমার নয়ন। তোমার নয়ন, তোমার মুখমণ্ডল, সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার।

তোমার সম্বন্ধে তো কিছুই জানিতাম না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমার শান্ত, সমাহিত, স্তব্ধ বেদনার্ত্ত মূর্ত্তিটি দেখিলাম, সে মুহূর্ত্তেই তোমায় চিনিতে পারিলাম।

আজ তুমি নাই। এ পৃথিবীতে একক জীবন কাটাইয়া তুমি তোমার দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। কে জানে, হয়ত ধানসিড়ি নদী কিনারে শুইয়া আছ—পউষের রাতে—আর জাগিবেনা জানিয়া।

কিন্তু কবি, যাহারা তুচ্ছ, যাহারা সাহিত্য জগতে পতিত, তাহাদিগকে পাঠকদিগের নিকট পুনরায় তুলিয়া ধরিবে কে? কাক, পেঁচা, চিল, শকুণ আর কোন কবির লেখনীতে স্থান পাইয়া ধন্য দিবে? ... সাপের-খোলশ, ভাঙ্গা-ডিম, কবির লেখনীতে স্থান পাইয়া ধন্য হইবে—এমন কবি তো দেখি না।

কবি, ঐ দেখ, কচি লেবুপাতার মত নরম ঘাসগুলি, ঘাস-ফড়িংএর দেহের মত কোমল নীল আকাশ, আজ তোমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে। ঐ শোন, কাঁচা বাতাবির মত সবুজ ঘাস-মাতা অবরে

বন্ধন ঘুচাইয়া মুক্ত হইবার জন্য বিলাপ করিতেছে। ঐ ঘাস-মাতার কোলে নিবিড় পুলকে শুইয়া থাকিবে নাকি? ঐ যে বেতের ফল, আরও কত পতিতের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছে। তোমার লেখনী তো মূক, তবে কাহার লেখনীতে উহাদের বেদনা ভাষা পাইবে?

আমার সন্দেহ হয়, বরিশালের মাঠে যখন টলমল করিতে করিতে হাঁটিতে যখন দৈত্যে-ভরা এই বসুন্ধরায় নিতান্ত অসহায় ছিলে, তখন হইতেই বোধহয় ঐ পতিতদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে যে একদিন তাহাদের অব্যক্ত বেদনা জন সমাজকে জানাইবে। কবি, তোমার প্রতিশ্রুতি তুমি পালন করিয়াছ। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াই স্তব্ধ হইলে কেন? থামিয়া গেলে কেন? অঝর অন্ধকারের ঘুম হইতে নদীর ছল ছল শব্দে আর কি জাগিয়া উঠিবেনা? কীর্ত্তিনাশার দিকে যে বিমিশ্র চাঁদ ছায়া গুটাইয়া লইতেছে তাহা কি আর নয়ন মেলিয়া দেখিবে না? আর কোনদিন—কোনদিন কি আর তুমি জাগিবে না?

কবি এই ধরিত্রীতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত তোমায় শান্তি দিয়াছিল, যে সমস্ত কোমল ধ্বনি তোমার কর্ণে সুধা ঢালিয়াছিল, যে সমস্ত সুঘ্রাণ তোমার মনে পুলক পরিবেশন করিয়াছিল, স্বল্পক্ষণ স্থায়ী যে সমস্ত রঙিণ চিত্র তোমার নিষ্পাপ, আনন্দ আহরণকারী বক্ষে মায়ার অঞ্জন পরাইয়াছিল, তাহাদিগকে কি আর কখনও স্মরণে আনিবে? "হলুদ নদী পার হইয়া সন্ধ্যার কাক যখন ঘরে ফিরিবে, পাখীর নীড় হইতে খড় পড়িবে, মাঠে হামাগুড়ি দিয়া পেঁচা নামিবে, চোখের পাতার মত সোনালি চিল তাহার ডানা থামাইবে, বনহংস-বনহংসীরা জলসিড়ি নদীর ধারে শরের ভিতর সাঁতার কাটিবে, পেঁচার ধূসর পাখা নক্ষত্রের পানে উড়িবে, পায়রা একা জামিরের বনে ডাকিবে, ময়ূরের সবুজ নীল ডানা ঝিলমিল করিবে, ঘুঘুর পালক ঝরিবে"—তখন ইহাদের প্রতি আর কখনও কি দৃষ্টি রাখিবে? "হরিণেরা দাঁত দিয়া যখন ঘাস ছিঁড়িবে—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে খেলা করিবে—পল্লবের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো তাহাদের চক্ষে পড়িয়া হীরা ঝরিবে, বিড়াল শাদা থাবা বুলাইয়া খেলা করিবে, বিকেলের নরম মুহূর্ত্তে নীলগাইএর ছায়া পড়িবে নাচ পোকা ঘুমাইবে"—তখন তাহাদিগকে কি আর কখনও ভাবিবে?

"ধানের ক্ষেতে যখন আর ব্যস্ততা থাকিবে না, আম-নিম্ লইয়া সমস্ত উপস্থিত হইবে, আকাশ—নক্ষত্র-ঘাস-চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি আসিবে, অনেক কমলা রঙের রৌদ্র হইবে, আকাশ নীল হইবে, মিষ্টি পৃথিবী রৌদ্রে ভাসিবে, শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা নামিবে, পদ্মপত্র জল লইয়া নড়িবে"—তখন কি আর কখনও তাহা হৃদয় দিয়া অনুভব করিবে? "বিকেলের শিশুসূর্য্যকে ঘিরিয়া মায়ের আবেগে ঝাউবন যখন করুণ হইবে, সুপুরিবন জলে স্থির ছায়া ফেলিবে, বালির উপর জ্যোৎস্না আসিবে-জ্যোৎস্নায় দেবদারুর ছায়া ইতস্ততঃ পড়িবে, জামের শাখা, ক্লান্ত হইবে, পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ হইবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের দিকে নয়ন মেলিবে? "ট্রাম-বাস চলিয়া শ্রান্ত হইয়া যখন ঘুমের জগতে চলিয়া যাইবে সারারাত গ্যাসলাইট আপন কাজ ভুলিয়া জ্বলিবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের শ্রান্তি অনুভব করিবে?

"ঢেঁকিতে যখন পাড় পড়িবে, খর-রৌদ্রে পা ছড়াইয়া বর্ষীয়সীরা গান গাহিতে গাহিতে ধান ভানিবে, হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখিবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত আগুন জ্বালিবে"—তখন কি আর কখনও তাহাদের চিত্র কাব্যে গাঁথিবে? শেফালিকা বোসের হাসি ও অরুণিমা সান্যালের মুখের কথা আর কখনও মনে পড়িবে নাকি কবি? বনলতা সেনের সহিত মুখোমুখী বসিয়া অন্ধকারের কথা আর কখনও কি ভাবিবে?

কিন্তু এ কথা থাক্। ইহাদের বিষয় বলিতে গিয়া সব হারাইলে দুঃখ এই। এ পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবার জন্য যা' মূলধন দরকার তা' আর সঞ্চয় করিলে না। যা কিছু মূলধন করিতে পারিতে তাহা পথে দুই হাতে ফেলিয়া দিলে। ভয়, শোক দুইই ত্যাগ করিলে। পথের আনন্দে অবাধে পাথেয় ক্ষয় করিলে।

ঐ দেখ, পুনরায় তোমার নয়ন আর মুখমণ্ডলের কথা মনে আসিতেছে। যে অন্তঃকরণ ব্যথা পাইয়া মুখে কিছু প্রকাশ করেনা তাহাই কি তোমার চোখকে অত সুন্দর করিয়াছিল? সে মুখ অনেক বলিতে পারিত, কিন্তু বলে নাই, তাহাই কি তোমার মুখমণ্ডলে এমন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছিল?

আমার বিশ্বাস তোমার বক্ষে বোধহয় নখরাঘাতের চিহ্ন আছে। পতিতদের ভাল বাসিয়াছিলে, তাই জন সমাজ ভালবাসার ক্ষতে তোমার বক্ষ ভরাইয়া দিয়াছে! বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে তাহাদিগকে কি ক্ষমা করিয়াছে?............

একদিন ১৩০৫ সালের ফাল্গুনে যে চুক্তিতে এই ধরিত্রীতে স্থানলাভ করিয়াছিলে তাহা ১৩৬১ সালের কার্ত্তিকে মিটাইয়া দিয়াছ। আজ তোমার 'সেই তুমি'—কে জানে সে আজ কোথায়? আর তোমার এই তুমি—সে তোমার আত্মীয় বন্ধুর স্মৃতির সহিত জড়াইয়া থাকুক, সে তোমার প্রিয় ধানসিড়ি নদীর কিনারে শুইয়া থাকুক।

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য্য, হে মাঘ-নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া, তোমাদিগকে মিনতি করি, কবিকে ঘুমাইতে দাও। গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমাদের কবির আত্মা লালিত ছিল। অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থাকো কবি। প্রতি মুহূর্ত্তের টুকরো টুকরো মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

আর আসিও না কবি, আর আসিও না। এ পৃথিবী তোমার মত মানুষের জন্য নয়। এ পৃথিবীতে যুঝিবার জন্য যে যুক্তি দরকার তাহা যদি না থাকে তবে মিথ্যা ক্ষত বিক্ষত হইয়া লাভ কি? আমি বলি কি তোমার 'এই তুমি' সে এখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুক। আর তোমার 'সেই তুমি'—সে বরঞ্চ রাত্রির আহ্বানে মহাশূন্যাকাশে আলোকের গতিতে লোক হইতে লোকান্তরে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ধাবিত হোক্। ঐ দেখ, মহাব্যোমে থরে থরে দীপ জ্বলিতেছে, তমিস্রা দূর করিবার জন্য ঐ দেখ সর্ব্বত্র জ্যোতির বন্যা ছুটিয়াছে। কত অজানা লোকে কত অজ্ঞাত লীলা, কত খেলা, তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঐ সমস্ত স্থানে অজানা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তন, পরিক্রমণে রত কোন এক গ্রহের নিভৃত, নিরিবিলি কোন এক স্থানে আশ্রয় লও। শীতের কোন এক রাতে, পরিচিত এক মুমূর্ষুর শয্যার কিনারে, একটা হিম কমলা-লেবুর করুণ মাংস লইয়া আর আসিও না।

দেওঘরে সৎসঙ্গ উৎসব

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তি বা ভাগবতী শক্তির প্রভাবে বহু লোককে তাঁহাদের নিকটে সমবেত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই আমরা 'অবতার' বলিয়া থাকি। পুরাণকার বলিয়াছেন—অবতার অসংখ্য—তাহার সংখ্যা নাই। কাজেই সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্টদের বিনাশের জন্য অবতার প্রায়ই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ধর্মের গ্লানি হইলে, অধর্মের অভ্যুত্থান হইলেই তিনি আসিয়া থাকেন—ইহা গীতায় তাঁহারই উক্তি। হতভাগা পাপী জীব চক্ষু থাকিতে ও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে পায় না—কাজেই মনে করে, তিনি আসেন নাই। চরিতামৃতকার সে জন্য বলিয়াছেন—

অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

তাঁহার নিত্যলীলা ভাগ্যবান ছাড়া দেখিতে পায় না। আমাদের মধ্যে ও "বহুরূপে সম্মুখে তোমার" তিনি আছেন, দেখার শক্তি আমাদের অর্জন করিতে হইবে। সে জন্য নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সাধনার প্রয়োজন। যাহা হউক, কোন মহাপুরুষের কথা শুনিলেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করা স্বভাব। সাধু সন্তের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে দেখিবার সাধ হয়—ভগবৎকৃপা লাভ হইলে তাঁহাদের দেখার সৌভাগ্য হয়—নচেৎ "দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লীন হয়।" গত ১৯৪৪ সালে পাবনা হিমায়েৎপুরে যাইয়া সৎসঙ্গ আশ্রমের সাধু শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। তিনি ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে কর্মব্রতে ও দীক্ষা দিতেছিলেন। কয়েক হাজার ভক্ত নূতন সহর পত্তন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইলে অনুকূল ঠাকুর মহাশয় সদলে পাবনা ত্যাগ করিয়া সাঁওতাল পরগণার দেওঘরে আগমন করেন ও তথায় রোহিনী পল্লীতে 'বড়াল বাংলো' ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। তাহার পর গত কয় বৎসরে সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দেওঘরের রোহিনী পল্লীতে বড়াল বাংলো প্রভৃতি কয়েকটি বাড়ী ও বহু খালি জমী ক্রয় করা হইয়াছে এবং প্রায় ১০০ বাড়ী ভাড়া লইয়া পূর্ববঙ্গাগত ৫শত সৎসঙ্গী পরিবার তথায় বাস করিতেছেন, ঐ স্থানে যাইবার জন্য কয়েকবার আহ্বান আসিয়াছিল, কিন্তু সুযোগও সময়ের অভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। গত ৫ বৎসর কাল যে কর্তব্যের ভার এই অক্ষমের উপর ন্যস্ত ছিল, ভগবৎ কৃপায় সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি—কাজেই দেওঘরে বার্ষিক উৎসবে যাইবার নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া সানন্দে যাইতে সম্মত হইলাম। দেওঘর আমার অপরিচিত স্থান নহে—জীবনে বহুবার গিয়াছি—তবে গত কয়েক বৎসর যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জামাতা ও ভক্ত শ্রীমান সুধাংশুসুন্দর মৈত্র আমার বহুদিনের পরিচিত। তিনি এক বৎসর পূর্বে উদ্গাতা নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সময় হইতে আমাকে সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি করিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় আমার নাম ছাপাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে উদ্গাতা-সম্পাদক শ্রীমধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের সহিত ও পরিচিত হইয়াছি। ঐ পত্রের মাধ্যমে বহু সৎসঙ্গী বন্ধুর সহিত আলাপ ও পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ না হইলে ও পরোক্ষভাবে তাঁহারা অনেকে আমাকে চেনেন। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় সৎসঙ্গের কলিকাতাস্থ প্রধানকেন্দ্রের কর্মী শ্রীযুত কিরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার এলাকায় সকল সৎসঙ্গীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন সকলে আমাকে সমর্থন করে। সে সূত্রে বহু সৎসঙ্গী বন্ধুর আমার সহিত পরিচয় ঘটে। কাজেই সকলের সহিত দেখার সুযোগলাভ হইবে, সে ইচ্ছা ও আমাকে দেওঘরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১২ই এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ১০টায় শিয়ালদহ হইতে স্পেশাল ট্রেণে দেওঘর যাত্রা করিলাম। তরুণ কবি-বন্ধু সৎসঙ্গী শ্রীমান সুশান্ত পাঠকের আমার সঙ্গী হওয়ায় কথা ছিল—তিনি সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিলেন না—মধুবাবু ও গেলেন না—তিনি অবশ্য পরদিন দেওঘর যান ও রবিবার তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সৎসঙ্গী কর্মী বীরেন মিত্র মহাশয় ও কিরণবাবু ষ্টেশনে ছিলেন—আমার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ট্রেণ বারাকপুর, নৈহাটি, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান হইয়া সকালে যাইয়া জসিদি পৌছিল। জসিদিতে আমাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটরে করিয়া দেওঘরে লইয়া যাওয়া হইল। দেওঘর রোহিনীতে শ্রীযুত সরজিৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম—ঐ বাড়ীটি শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর বাড়ী—সম্প্রতি সৎসঙ্গ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে—সরজিৎবাবু সৎসঙ্গী ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী। তিনি ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়া কয়েক বৎসর সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন—স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তথায় থাকেন। ৫।৬ খানি বড় বড় ঘরওয়ালা চমৎকার বাড়ী—বারান্দাগুলি সাময়িকভাবে ঘিরিয়া ঘরে পরিণত করা হইয়াছে—তাহা ছাড়া উঠানে এক মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছে—তথায় টেবিল চেয়ারে এক সঙ্গে ৫০ জনের বসিয়া খাবার ব্যবস্থা দেখিলাম। আমি যাওয়ার পর হইতে সরজিৎবাবুর ভ্রাতা শ্রীমান দিলীপকুমার ঘোষ আমার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিলেন—তিনিও ট্রান্সপোর্ট-ব্যবসায়ী—বর্দ্ধমানে থাকেন- সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন—উৎসবের জন্যই দেওঘরে তাঁহার আগমন। তিনি ২ দিন ধরিয়া এই বৃদ্ধের সেবার কোন ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার

মত শান্ত, শিষ্ট, সেবাপরায়ণ যুবকের দল দেশে বৃদ্ধি পাইলে দেশের বহু অসুবিধা ও কষ্ট দূরীভূত হইবে। আমি সনাতনী হিন্দু—কাজেই পৌঁছিয়াই নির্দেশ দিলাম—স্নানের পর শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ জীউর মন্দিরে পূজা করিতে যাইব—সে দিন চৈত্র সংক্রান্তি—বাবা বৈদ্যনাথের কাছে আসিয়া এ সুযোগ ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। সরজিৎ বাবু তখনই আমার জন্য সৎসঙ্গের গাড়ী আনাইলেন। স্নানাদির পর শ্রীমান দিলীপকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেলাম ও ভিড় থাকা সত্ত্বেও বিনা অসুবিধায় পূজা সম্পন্ন করিলাম। সকল দেবস্থানের মত বৈদ্যনাথধামেও সকগলি, অন্ধকার মন্দির—মন্দিরে পূজার জল জমিয়া আছে—যাত্রীর ভিড়, পাণ্ডাদের টানাটানি—সবই আছে। যাহা হউক, পূজা করিয়া ফিরিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল—সকালে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হইল না। বাড়ীতে ফিরিয়া জলযোগাদি সারিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম।

বেলা ১টা নাগাদ দিলীপের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যাইতে হইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি পৃথক ঘরে স্বতন্ত্রভাবে আহারের ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষ ব্যবস্থা—সৎসঙ্গে কেহই মাছ খান না। রাজসিক অতিথি-সৎকার, ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন, উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বহুবিধ ব্যঞ্জন, পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার সম্পন্ন হইল। সরজিৎবাবুর বাড়ীতে প্রতি বেলায় প্রায় ৫০ জন অতিথির আহারের ব্যবস্থা ছিল—পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভাটিয়া, পার্শী, বিহারী প্রভৃতি নানারাজ্যের ভক্ত আসিয়াছেন—সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের জন্য এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচয় হইল। আমার সঙ্গে মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম হইতে নির্বাচিত কম্যুনিষ্ট এম-এল-এ শ্রীগোপাল পাণ্ডা মহাশয়ও ঐ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পরে জেমসেদপুর হইতে শ্রীযুত প্রসাদ (রাষ্ট্রপতির ভ্রাতুষ্পুত্র) ঐ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। শ্রীযুত জনার্দন মুখোপাধ্যায় (পূর্বে কম্যুনিষ্ট ছিলেন—এখন সৎসঙ্গের কর্মী) প্রত্যহ ২ বেলা আমাদের সহিত আহার করিতে আসিতেন।

বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত দেওঘরে দারুণ রৌদ্র—বাহিরে যাওয়া কষ্টকর। বেলা ৪টায় চা-পান করিয়া বাহির হইলাম। লোকে লোকারণ্য—১০।১৫ হাজার লোক সৎসঙ্গ আশ্রম ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলিতে সমবেত হইয়াছে। বিরাট বিরাট সামিয়ানার নীচে তাহাদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এক বিরাট রন্ধনশালায় এক সঙ্গে ৪০টি চুলায় ভাত, ডাল, তরকারী ও অম্বল রান্না হইতেছে ও প্রতিবারে এক সঙ্গে দুই হাজার করিয়া লোক অন্নাহার করিতেছে—ঐ স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে—আনন্দমেলা। ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকলে তথায় যাইয়া আহার্য্য গ্রহণ করিতে-ছেন। কয়েকটি বড় বড় মণ্ডপে সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা—ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র একটি মণ্ডপের মধ্যে বসিয়া দর্শন দান করিতেছেন। বেলা ৫টায় সভা—যথাসময়ে আমার পূর্ব-পরিচিত শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিয়া আমাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডাঃ শ্রীমতিলাল দাস, বাঁকুড়ার হিন্দু-নেতা শ্রীরাধহরি চট্টোপাধ্যায়, বসিরহাটের নেতা শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল এম-এল্-এ প্রভৃতিকে দেখিলাম; আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইল। ২।৩ জন বক্তা, তন্মধ্যে শ্রীজে-পি-শ্রীবাস্তব হিন্দীভাষী—বর্তমান সমস্যা ও ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। রাত্রি ৭টায় সভা শেষ হইল—তাহার পর সেই মণ্ডপেই মহিলা-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। তৎপরে আমাকে অনুকুলচন্দ্রের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি একখানি তক্তাপোষের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন—অতি নিকটে একখানি চেয়ারে আমাকে বসিতে দেওয়া হইল। ৫৫ মিনিট কাল সেখানে বসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী—নিজে যে একজন মহান ব্যক্তি—তাহা প্রকাশ করেন না—নিজকে সেবক বলিয়া প্রচার করেন। যাহাতে ভারতের লোক অধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম পথ ও সদাচার গ্রহণ করে, সে বিষয়ে সর্বদা তাঁহার আগ্রহ। নিজে উদ্বাস্তু—কাজেই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য আগ্রহশীল। তাঁহার অনুগ্রহে দেওঘরে ৫শত উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় তিন হাজার লোক বাস করিতেছে। সকলেই সৎসঙ্গী—তাঁহাদের তিনি একই পরিবারের লোক বলিয়া মনে করেন এবং তাহারা সকলে প্রত্যেকের সুখ দুঃখের অংশভাগী হইয়া আছেন। সকলেই সংসারী এবং সংসার প্রতিপালনের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, কোন ভাল কাজের জন্য টাকার অভাব হয় না—তিনি ঐ কাজের জন্য এই উৎসবে বহু লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন—উৎসব উপলক্ষে ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে—অর্থের জন্য তিনি আদৌ চিন্তিত নহেন। কি করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুঃখের পীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন, সে জন্য চিন্তিত। ভাল জমী পাইলে তিনি আরও বহু পরিবারকে পুনর্বাসন দান করিবেন। রোহিনী অঞ্চলে তিনি কয়েকটি বাড়ী ও বহু জমী ক্রয় করিয়াছেন। সেখানে বহু নূতন গৃহ নির্মিত হইতেছে। ৪৫ মিনিটকাল অনুকুলচন্দ্রের সহিত আলোচনার পর বাস-স্থানে ফিরিয়া গেলাম। আমি সাধক নহি—কাজেই তাঁহার সাধন-ভজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও ছিলাম না। দেখিলাম, তিনি সেবাপরায়ণ, দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী, আর্তের জন্য চিন্তিত—ইহাই মানবতা। সৎসঙ্গীর দলে যদি এইরূপ কয়েক সহস্র দরদী মানুষ তৈয়ার হয়, তাহা দ্বারাই দেশ উপকৃত হইবে। শুনিলাম, তাঁহার ধনী ভক্তের দল প্রতি মাসে তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি পাঠাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অন্য বাবদে ও প্রচুর অর্থ আসে। তিনি সকলকে খাটাইয়া শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জনের পক্ষপাতী।

তাহার পর বন্ধুবর শ্রীমান দিলীপ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া চাঁদনী রাত্রিতে পদব্রজে কয়েক মাইল (৫।৬ মাইল হইবে) দেওঘরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পরদিন প্রভাতে স্নানাদির পরই ৭টায় নববর্ষ আহ্বান উৎসব ছিল। অনুকুলচন্দ্রকে ঘিরিয়া কয়েক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় যাইতে একটু বিলম্ব হওয়ায় ভিড় ঠেলিয়া আর ঠাকুরের কাছে যাই নাই—দূরে জনার্দন বাবুর নিকট বসিয়া মাইকে সব শুনিলাম। কয়েকটি সঙ্গীত গীত হইল—বৈদিক ও পৌরাণিক প্রার্থনা-মন্ত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইল, ঠাকুরের বাণী পঠিত হইল। ভাব-গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে সভা

বৈশাখের প্রাতঃকাল কাটিল। আমরা সনাতনী হিন্দু—বেদ ও পুরাণের প্রার্থনা-মন্ত্রই আমাদের নিত্যকার প্রার্থনা—কাজেই যেখানে সে সকল মন্ত্র শুনি, তাহাই ভারতভূমি বলিয়া মনে করি। তবে দেশের সর্বত্র মানুষ এইভাবে আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবে জানি না—সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। সর্বনিয়ন্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার অপার করুণায় বিশ্বাসই পাপী তাপী জনগণকে সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করে—সেজন্য যে তাঁহাকে যাহা বলিয়াই ডাকুক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, সে আহ্বান বা আকুতি একই স্থানে যায়। বাল্যকালের শিক্ষা—

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতা কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথ হরিঃ॥

সর্বদা ইহাই স্মরণ করিয়া থাকি।

আশ্রমের গাড়ীতে আবার আমার সহায়ক বন্ধু শ্রীমান দিলীপকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কুণ্ডায় কুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতির মন্দির দেখিলাম। বহু দিন পরে যাইয়া শ্রীজালান কর্তৃক নির্মিত এক নূতন মন্দির দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার পর বালানন্দ আশ্রম—নূতন বিরাট মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামীজি পূর্বে যে গৃহে বাস করিতেন, তথায় কিছুক্ষণ বসিয়া মনে বহু নূতন ভাবের উদয় হইল। ঐ স্থানে যাইলে মানুষের সংসারের কথা আর মনে থাকে না। সেখান হইতে আদালতের নিকটস্থ বন্ধুবর শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় উকীলের গৃহে যাইলাম। বন্ধুবর গৃহে ছিলে না, তাঁহার মাতা ও সহধর্মিণী অতিথির সেবা করিলেন। ফিরিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। রাত্রিতে আনন্দ মেলা দেখিয়া তৃপ্তি হ নাই। সেজন্য বেলা ১২টায় যাইয়া ভাল করিয়া ঘুরিয়া আনন্দ মেলা দেখিলাম। বহু পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিল।

বিশ্রামের পর আবার একবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম—তিনি পুনরায় যাইবার জন্য বার বার বলিয়া দিলেন। উৎসবের ভিড়ে বেশী কথাবার্তা হইল না। শান্ত পরিবেশে ২।১ দিন থাকিয়া তিনি বেশীক্ষণ কথা বলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যা ৭টায় আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সাড়ে ৭টায় জেসিদিতে প্যাসেঞ্জার ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কয় বেলা ঘোষ পরিবারের সকলে মিলিয়া যে আদর-যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন মনে রাখিবার জিনিষ। বিদায়ের ক্ষণে তাঁহাদের সকলের কল্যাণের জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা জানাইয়া আসিলাম।

এবার উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমান তরুণকান্তি ঘোষ, খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট নেতা বন্ধুবর শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাইয়া বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান ধর্মহীন জগতে মানুষ নূতন করিয়া ধর্মের কথা চিন্তা করিতেছে; দেশে দেশে, স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে তাহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে॥ সকল বিপদের মধ্যে ইহাই আশার কথা।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অদ্বৈত বেদান্ত—গৌড়পাদ

অদ্বৈত বেদান্তের সুশৃঙ্খল দর্শনাকারে প্রথম ব্যাখ্যাতা গৌড়পাদ। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন। গৌড়পাদের কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সাংখ্যকারিকার গৌড়পাদ-রচিত এক ভাষ্য আছে। এই গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবাদী গৌড়পাদ এক ব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী শঙ্করের আবির্ভাব কাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মত ঠিক হইলে শঙ্করের পরম গুরুর আবির্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ অথবা সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্ববর্তী হইতে পারে না। কিন্তু ওয়ালেসার (Wallesur) বলেন যে ভব-বিবেক-রচিত তর্কজ্বালা গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদে গৌড়পাদের কারিকার উল্লেখ আছে। ভব-বিবেক য়ুয়ান্ চোয়াং-এর পূর্ব্ববর্তী। সুতরাং গৌড়পাদের কাল ৫৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী হওয়া সম্ভবপর নহে। জ্যেকোবির মতে গৌড়পাদের কারিকা ব্রহ্ম-সূত্রের পরবর্তী। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ নাই, কিন্তু গৌড়পাদের উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু তাহা দ্বারা ব্রহ্মসূত্র যে বৌদ্ধশাস্ত্রের পরবর্তী তাহা প্রমাণিত হয় না। কেননা বৌদ্ধ দর্শনের সমর্থনের জন্য বাদরায়ণের বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু গৌড়পাদের দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের এত সাদৃশ্য আছে, যে তাহা উপেক্ষা করা বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জৈন দার্শনিকগণও বাদরায়ণের উল্লেখ করেন নাই। সে যাহা হউক গৌড়পাদ যে অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর পরবর্তী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়পাদের কারিকার নাম মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণরূপ কারিকা।" ইহাকে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য বলা যায়। এই গ্রন্থ চারি প্রকরণে বিভক্ত—আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাতশান্তি। এই কারিকার শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য আছে। কারিকার প্রথম প্রকরণে—মাণ্ডুক্যোপনিষদে বর্ণিত আত্মার চতুর্ব্বিধ বিভাগের বর্ণনা আছে।

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো অন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ, ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্মৃতঃ।

বহিঃপ্রজ্ঞ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস এবং ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ পুরুষ—এক আত্মাই এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন।

বৈশ্বানর জাগরণস্থানীয়, তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্তি স্থানীয়। কিন্তু—

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানাম্ ঈশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবঃতুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥

ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তির প্রভু, তিনি অদ্বৈত। তিনিই তুরীয় (তুর্য্য) বা চতুর্থ পাদ। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মেরই দেহে অধিষ্ঠিত। বৈশ্বানর আত্মা স্থূলভুক, তৈজস প্রবিবিক্তভুক, প্রাজ্ঞ আনন্দভুক। অর্থাৎ বৈশ্বানরের তৃপ্তি বিষয়ভোগে, তৈজসের তৃপ্তি বাসনাভোগে, এবং প্রাজ্ঞের তৃপ্তি আনন্দভোগে। "কার্য্যকারণ বদ্ধৌ তৌ ইষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধতঃ"। বৈশ্বানর ও তৈজস কার্য্য-কারণ ভাবে আবদ্ধ; প্রাজ্ঞও কারণরূপে বদ্ধ। কিন্তু তুরীয় পরমাত্মা কার্য্যকারণ ভাববিহীন। (ক্রিয়তে ইতি কার্য্যং=ফলভাবঃ। করোতি ইতি কারণং=বীজভাবঃ) যিনি বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞঃ আত্মাকে এক বলিয়া জানেন, তিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইহার পরে সৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি মতের উল্লেখ আছে। কাহারও মতে প্রাণ হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে এই জগৎ স্রষ্টার বিভূতি মাত্র, কাহারও মতে সৃষ্টি স্বপ্ন বা মায়া মাত্র। কাহারও মতে প্রভুর ইচ্ছা হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে কাল হইতেই ভূতগণ প্রসূত হইয়াছে। কাহারও মতে স্রষ্টার ভোগের জন্য, কাহারও মতে তাঁহার ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিই ঈশ্বরের স্বভাব। কিন্তু তিনি আপ্তকাম সুতরাং তাঁহার কোনও কামনা পূরণার্থে সৃষ্টি হয় নাই। গৌড়পাদ এই সকল মতের কোনটি তাঁহার মনঃপূত তাহা বলেন নাই। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, কেননা তাঁহার মতে সৃষ্টির—জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্বই নাই। ইহা মায়ামাত্র। "স্বপ্ন—নিদ্রা-যুতৌ আদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্নং নিদ্রয়া ন নিদ্রাং, নৈবচ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ" স্বপ্ন= অন্যথা-গ্রহণ, যেমন রজ্জুতে সর্পবোধ। নিদ্রা=তত্ত্বাতিপ্রতিবোধ লক্ষণংতমঃ, তত্ত্ববোধের অভাবস্বরূপ তম। বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার স্বপ্নও নিদ্রা। সুতরাং তাঁহারা কার্য্য-কারণবদ্ধ। প্রাজ্ঞ স্বপ্নবর্জ্জিত, কেবল নিদ্রাযুক্ত (তমঃ যুক্ত), সুতরাং কেবল কারণবদ্ধ। যাঁহারা নিশ্চিত (ব্রহ্মবিৎ), তাঁহারা তুরীয়ে স্বপ্ন ও নিদ্রার কোনটিই দেখিতে পান না। সুতরাং তুরীয় কার্য্যবদ্ধও নহে, কারণবদ্ধও নহে। স্বপ্নও নিদ্রা ক্ষীণ হইলে তুরীয়পদ প্রাপ্তি হয়। "অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে অজমনিদ্রং অস্বপ্নং অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।" অনাদি মায়ার দ্বারা সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখনই অজ অনিদ্র, অস্বপ্ন তুরীয়কে জানিতে পারে। "প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ, মায়ামাত্রং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ" "জগৎ প্রপঞ্চের অস্তিত্বই নাই, তাহা কল্পিত। অস্তিত্ব থাকিলেও রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় তাহার নিবৃত্তি হইত। কিন্তু সকল দ্বৈতই মায়া মাত্র, পরমার্থ হইতেছে অদ্বৈত।

দ্বিতীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্য। "বৈতথ্য" শব্দের অর্থ অসত্যত্ব। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকল ভাবই বিতথ অর্থাৎ অসত্য। সকল ভাবই (পর্বত হস্তী প্রভৃতি) শরীরের মধ্যস্থ। কিন্তু শরীরের মধ্যে পর্বত হস্তী আদি থাকা অসম্ভব। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল মিথ্যা, কেননা রথাদি যাহা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে সামান্য সময়ের মধ্যে বহু দূরে যাওয়া বোধ হয়। অথচ স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায় যেখানে সুপ্ত ব্যক্তি শায়িত ছিল, সেইখানেই আছে। জাগরিত অবস্থাতেও যাহা দেখা যায়, তাহাও মিথ্যা যাহা আদিতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, বর্তমানকালেও তাহা নাই। স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই দৃষ্ট বস্তু সকল আত্মার কল্পনা মাত্র। মায়া মাত্র। আত্মা মায়া দ্বারা জগৎ নির্মাণ করেন, তিনিই জ্ঞান ও স্মৃতির আশ্রয়, অন্য কেহ নহে। আত্মা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক পদার্থ কল্পনা করে। যে সকল বস্তু মনঃকল্পিত ও যে সকল বস্তু বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, উভয়ই মিথ্যা। আত্মা স্বীয় মায়াবলে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা করিবার ইচ্ছায় জীবের সৃষ্টি করেন, পরে সেই জীব দ্বারা পৃথগ্বিধ নানা ভাব (পদার্থ) সৃষ্টি করেন (কল্পনা)। রজ্জুর স্বরূপ অন্ধকারে পরিজ্ঞাত না হওয়ায় যেমন তাহা সর্প, জলধারা অথবা দণ্ডরূপ কল্পিত হয়, তেমনি অবিদ্যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকায়, তাহা বিবিধ-রূপে কল্পিত হয়। এই মায়া আত্মারই। নিজের মায়া দ্বারাই তিনি মোহিত হন। এই আত্মাকে প্রাণ, ভূত, গুণ, তত্ত্ব প্রভৃতি বহুরূপে ধারণা করা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মাকে এই সকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। প্রাণাদি যে যে রূপে আত্মার কল্পনা করা হয়, তাহারা সকলেই আত্মার অপৃথকভূত ভাব। কোনটি আত্মার অতিরিক্ত নহে। বেদান্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই জগৎকে স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো, গন্ধর্ব নগরের মতো গণ্য করিয়া থাকেন। উৎপত্তি, নিরোধ (বিনাশ), বদ্ধ, মুক্তিকামী সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই পরম সত্য। কিন্তু এই সকল কল্পনার আধার অদ্বয় আত্মা। এসকল আত্মারই কল্পনা।

তৃতীয়প্রকরণের নাম অদ্বৈত। ইহাতে তর্কদ্বারা কিরূপে অদ্বৈত জ্ঞান হয়, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রকরণের প্রথম কারিকাতেই আছে যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াও, তাহাকে উপাস্য এবং আপনাকে উপাসক মনে করেন তিনি কৃপণ (দীন)। আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশ তুল্য। ঘটের ধ্বংস হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীবও তেমনি প্রলয়ে আত্মাতে লীন হয়। এক ঘটের আকাশ যেমন ধূলি ইত্যাদি দ্বারা মলিন হইলে অন্যান্য ঘটাকাশ মলিন হয় না, তেমনি এক জীবের সুখাদি দ্বারা অন্য জীব মলিন হয় না। ঘটাকাশ আকাশের বিকারও নহে, অবয়বও নহে। জীবও পরমাত্মা বিকার বা অবয়ব নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় রূপ যে পঞ্চ কোষের

কথা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা। তিনি আকাশের দ্বারা প্রকাশিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণে (পঞ্চম ব্রাহ্মণ) পরব্রহ্মই প্রকাশিত, যেমন পৃথিবীর উদরে আকাশ। জীব ও আত্মার অভেদ ব্যাস পরাশরাদি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভেদ নিন্দিত হইয়াছে। উপনিষদে জীব ও আত্মার পৃথকত্বের যে সকল কথা আছে, সেখানে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। মৃৎ, লৌহ, স্ফুলিঙ্গাদির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে অদ্বৈত অবতারণাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জগতে কেহ উৎকৃষ্ট, কেহ মধ্যম, কেহ হীন অধিকারী। মধ্যম ও হীন অধিকারীর প্রতি অনুকম্পাবশতঃই তাহাদের উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তম অধিকারীর উপাসনার প্রয়োজন নাই। মায়া কর্ত্তৃক অদ্বৈতে ভেদের উদ্ভব হয়। অজাত আত্মা কখনও মর্ত্ত্যভাব পাইতে পারেন না। শ্রুতিতে নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপোঈয়তে," ইহাদ্বারা এই জগৎ যে মায়িক তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহার জন্ম নাই (অজায়মান) তিনি বহুরূপে জাত হন মায়া দ্বারা। কিছুই যে পরমার্থতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা "যিনি অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তিনি গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করেন," উপনিষদের এই অসম্ভূতির উপাসনার প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। (সম্ভূতি—উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ) আত্মার বর্ণনায় নেতি নেতি বলিয়া শ্রুতি তাহাকে অজরূপেই প্রকাশিত করিয়াছেন।

সংকল্পবর্জ্জিত অজ (নিত্য) জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন। ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনি অজ। অজ কর্ত্তৃকই অজ জ্ঞাত হন। জগতের দ্বৈতরূপ মনেরই গ্রাহ্য, মন যখন "অমনী ভাব" প্রাপ্ত হয়, (যখন তাহার মননকার্য্য লুপ্ত হয়) তখন দ্বৈত থাকে না। বিবেকবান ব্যক্তির নিরুদ্ধ নির্বিকল্প মনের প্রচরণ সুষুপ্ত মনের প্রচরণ হইতে ভিন্ন। সুষুপ্ত মন লয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিরুদ্ধমন লয়প্রাপ্ত হয় না, তখন গ্রাহ্য গ্রাহকরূপ মল বর্জিত হইয়া নির্ভয় জ্ঞানালোকে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তিনি অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন নামহীন রূপহীন, সদা প্রকাশমান, সর্ব্বজ্ঞ। তাহাকে কোনও বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, তিনি অন্তঃকরণ-বর্জিত সুপ্রশান্ত নিত্য জ্যোতির্ময় অচল অভয় ও সমাধিগম্য। তিনি "অস্পর্শযোগ" বলিয়া উপনিষদে উল্লিখিত। চিত্ত নিগ্রহের জন্য জগতে সকলই দুঃখময় ইহা স্মরণ করিবে, কাম ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এবং সর্বদা ব্রহ্মকে স্মরণ করিবে। তাহা হইলে দ্বৈত দর্শন হইবে না। যখন চিত্ত সুষুপ্তিতে লীন হয়না, বিষয়েতেও বিক্ষিপ্ত হয়না, তখন অচল নিবাত প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল থাকে, অন্য কোনও কল্পিত বিষয়ে অনুরক্ত হয়না। সেই স্বস্থ (আপনাতে স্থিত), শান্ত (সকল অনর্থের উপসম রূপ) সনির্ব্বাণ (কৈবল্য সহ বর্ত্তমান) অবর্ণনীয় উত্তম নিত্য, অজ কর্ত্তৃক জ্ঞেয় অজ সুখকে সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জানেন। "ন কশ্চিৎ জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে। এতৎতদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে"। জীবের উৎপত্তি নাই, স্বভাবতঃ অজ তাহার কারণ নাই। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিছুই তাহাতে জন্মে না।

চতুর্থ প্রকরণের নাম অলাতশান্তি। গৌড়পাদ বলিয়াছেন সকল পদার্থই (ধর্ম্ম) জন্ম ও মরণহীন। যাহারা কারণকে কার্য্য (শক্য অবস্থায়) মনে করেন তাহারা কারণকে অজ বলিতে পারেন না। কেননা ইহার পরিণাম হয়। যাহার পরিণাম হয় তাহা নিত্য হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এরূপ কোনও দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতেও কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। আপনা হইতে কিছুরই উৎপত্তি হয় না আবার অন্য কিছু হইতেও কিছুর উৎপত্তি হয় না। কোনও বস্তুরই উৎপত্তি নাই, তা সে সৎ হউক, অথবা অসৎ হউক অথবা সদসৎ হউক। সুতরাং অনাদি কোনও বস্তু হইতে কিছুর উৎপত্তি অসম্ভব। সকল প্রজ্ঞাপ্তিই (অভিজ্ঞতা Experience) সনিমিত্ত, অর্থাৎ তাহার কারণ আছে। বিষয়হীন প্রজ্ঞাপ্ত হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শব্দ-স্পর্শাদি-ইন্দ্রিয় বিষয়ের অভাবে ক্লেশেরও অভাব হইত। যুক্তিতে প্রজ্ঞাপ্তি বাহ্য নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে (ভূত দর্শনাৎ) তাহাদের নিমিত্তই নাই। চিত্তের সহিত অর্থের সংস্পর্শই হয়না। অর্থের আভাসও চিত্তে উৎপন্ন হয় না। কেন না অর্থের অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহার আভাসও নাই। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে (ত্রিষু অধ্বসু) চিত্ত কখনও নিমিত্তের সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং নিমিত্তহীন চিত্তের বিপর্য্যাস হইতে পারে না। চিত্ত অথবা চিত্ত দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, উভয়েরই উৎপত্তি নাই। জন্মরাহিত্যই যাহার প্রকৃতি, সে সে প্রকৃতি বর্জন করিতে পারে না। সংসারের আদি নাই, সুতরাং তাহার অন্তও থাকিতে পারে না। সুতরাং আদিমৎ মোক্ষের (যে মোক্ষের আদি আছে, তাহারও) অনন্ততা সিদ্ধ নহে। আদিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্তে যাহার অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমানেও তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, মিথ্যার সদৃশ হইয়াও তাহা সত্যের মতো প্রতীত হয়। স্বপ্নে শরীর নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকে। যে শরীর দ্বারা স্বপ্নে অন্য স্থানে গমন হয়, তাহা মিথ্যা। স্বপ্নের শরীর যেমন অবস্তু; তেমনি জাগ্রৎকালে চিত্ত কর্ত্তৃক দৃশ্যমান জড় সংসারও অবস্তু। জাগরিত অবস্থায় বস্তু সকল যেমন গৃহীত হয়, স্বপ্নেও সেইরূপ। স্বপ্ন জাগরণের কার্য্য। কিন্তু সেই জন্য জাগরিতকালের বস্তু সৎ নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সাধারণের গ্রাহ্য নহে। জাগরিতকালে দৃষ্ট বস্তুও কেবল যাহার নিকট অবস্থিত, তাহার নিকটই সত্য, অন্যের নিকট নহে। সুতরাং তাহারাও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা, কোনও বস্তুরই উৎপত্তি হয় না। কখনও অ-ভূত হইতে ভূতের উৎপত্তি হয়না। জাগরিত অবস্থায় দৃষ্ট বস্তু অবিদ্যাকল্পিত। স্বপ্নেও অবিদ্যাগ্রস্ত জীব বস্তু সকল দর্শন করে। কিন্তু জাগরিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। স্বপ্নের হেতু হইলেও জাগরিত অবস্থার বস্তু সৎ নহে। অসৎ হইতে অসৎ বস্তুরও উৎপত্তি হয়না, সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি হয়না। সৎ হইতে সতেরও উৎপত্তি হয়না। অসৎ কিরূপে সৎ হইতে উৎপন্ন হইবে?

উপলব্ধ (Experience অনুভব) ও সমাচার (বর্ণাশ্রমোক্ত

প্রত্যক্ষ বস্তু) কে বস্তুর অস্তিত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে মায়াহস্তীর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। জাত্যাভাস (জন্মের প্রতীতি), চলাভাস (গতির প্রতীতি), বস্তাভাস (বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি) সকলই আভাস মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান অজ, অচল, অবস্তু শান্ত ও অদ্বয়। অলাতের (জ্বলন্ত যষ্টি) স্পন্দন কখনও ঋজু, কখনও বক্র প্রতীত হয়, তেমনি বিজ্ঞানের স্পন্দন গ্রাহক এবং গ্রাহ্যরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তবিক স্পন্দন নাই, তাহা অবিচল। অবিদ্যার অপগমে বিজ্ঞান যখন অস্পন্দিত হয়, তখন আর তাহার জন্মাদির বোধ হয় না। অলাত যেমন অস্পন্দমান ও আভাসহীন, বিজ্ঞান তেমনি অস্পন্দমান ও অনাভাস, নিত্য। অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন সে স্পন্দন অন্য বস্তু হইতে আসে না, অলাতের আপনার স্পন্দন শুরু হইলে, সে স্পন্দন অন্যত্র গমন করে না। অলাতের ন্যায় বিজ্ঞানও নিশ্চল। বিজ্ঞানও তাহার আভাসের মধ্যে কার্য্যকারণতা ভাব কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞানের আভাস অচিন্ত্য। দ্রব্যের কারণ দ্রব্য, দ্রব্য ভিন্ন বস্তু দ্রব্য ভিন্ন বস্তুর কারণ হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম সকল (আভাস) দ্রব্যও নহে, দ্রব্য ভিন্ন বস্তুও নহে। সুতরাং তাহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, চিত্তও তাহাদের হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

যতদিন হেতু ফলাবেশ (কার্য্য-কারণতায় বিশ্বাস) থাকে (পাপের ফল ও পুণ্যের ফলে বিশ্বাস থাকে), ততদিন কারণ ও কার্য্যেরও উদ্ভব হয়, কিন্তু হেতু ফলাবেশ যখন ক্ষীণ হয়, তখন সংসারেরও সমাপ্তি হয়। সংবৃত্তি (মায়া) হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, বাস্তবিক শাশ্বত কিছু নাই। পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলই অজ, আত্মা, অন্য কিছুই নাই। মায়া হইতেই সকলের উৎপত্তি, প্রকৃতপক্ষে কিছুই উৎপন্ন হয় না। কেননা যে মায়া হইতে তাহাদের উৎপত্তি, সেই মায়ারও অস্তিত্ব নাই। ঐন্দ্রজালিকের মায়াময় বীজ হইতে যেমন মায়াময় অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, সে অঙ্কুর নিত্যও নহে, তেমনি জাগতিক পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু।

মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরিউক্ত বর্ণনার সহিত বৌদ্ধদিগের কোনও কোনও মতের সাদৃশ্য স্পষ্ট। অধ্যাপক দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন যে সম্ভবতঃ গৌড়পাদ নিজেই বৌদ্ধ ছিলেন। মাণ্ডুক্য-কারিকার চতুর্থ প্রকরণের প্রথমেই আচার্য-স্তুতি আছে, ডাঃ দাসগুপ্তের মতে তাহা বুদ্ধের; স্তুতি কারিকাটি এই—

> জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান যো গগনোপমান্
> জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধঃ তংবন্দে দ্বিপাদং বরং।

যিনি আকাশকল্প জ্ঞেয়-ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা গগনোপম ধর্ম্ম (বস্তু) দিগকে জ্ঞাত হইতেছেন, সেই মানবশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করি। কারিকার—"দ্বিপদাং বর" শব্দ নিশ্চয়ই কোনও মানুষকে বুঝাইতেছে। সংবুদ্ধ শব্দও গৌতমবুদ্ধের বাচক হইতে পারে। কিন্তু "দ্বিপদাংবর" শব্দ ও নরোত্তম শব্দ একই অর্থ বহন করে, এবং শাস্ত্রপাঠের প্রারম্ভে নারায়ণ ও নরোত্তমকে নমস্কার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। "বুদ্ধ" শব্দ মাণ্ডুক্য কারিকায় তাহার ধাতুগত অর্থে বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শঙ্করের মতে 'দ্বিপদাংবর' 'পুরুষোত্তম নারায়ণকে লক্ষ্য করিতেছে।

পরবর্ত্তী কারিকা—

> অস্পর্শ-যোগো বৈনাম সর্ব্বসত্বসুখো হিতঃ
> অবিবাদোঽ বিরোধশ্চ দেশিত স্তং নমাম্যহং"

সর্ব্ব প্রাণীর সুখকর ও হিতকর অবিবাদ অবিরোধ অস্পর্শযোগকে আমি নমস্কার করি।

ডাঃ দাসগুপ্তের মতে এই কারিকায় গৌড়পাদ অস্পর্শযোগের উপদেষ্টাকে নমস্কার করিয়াছেন। তাহার মতে অস্পর্শযোগের অর্থ নির্ব্বাণ। কিন্তু শংকরের মতে এই কারিকা "অদ্বৈতদর্শন যোগের" স্তুতি। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যাই অস্পর্শযোগ নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ নির্ব্বাণকে সুখময় অবস্থা বলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধদর্শনে অস্বীকৃত। নির্ব্বাণে সংস্কারসহ চৈতন্যেরও বিলোপ হয়। সুখ হইবে কাহার?

উক্ত প্রকরণের ১৯ কারিকা—

> অশক্তি অপরিজ্ঞানং ক্রম-কোপোঽথবা-পুনঃ।
> এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈঃ অজাতিঃ পরিদীপিতা॥

হেতু ও ফল ইহাদের মধ্যে কে অগ্রে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই জন্য অজাতি (সকল বস্তুর অনুৎপত্তি) "বুদ্ধগণ" কর্তৃক প্রকাশিত। ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন এখানে "বুদ্ধৈঃ" শব্দের অর্থ বুদ্ধদিগের কর্তৃক। শংকরের মতে এখানে বুদ্ধ শব্দের অর্থ-পণ্ডিত। গৌতম-বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত, সুতরাং বুদ্ধ শব্দ এখানে পণ্ডিত অর্থে গ্রহণ করাই সমীচিন বলিয়া মনে হয়। "গৌরবে বহুবচন" নিয়মের প্রয়োগ এখানে বলা যায় কিনা সন্দেহ।

উক্ত প্রকরণের ৪২ কারিকা—

> উপলম্ভাৎ সমা-চারাৎ অস্তি বস্তুত্ববাদিনাম্
> জাতিস্তু দেশিতা বুদ্ধৈঃ অজাতেঃ ত্রসতাং সদা॥

বস্তুর অনুভব হয় সেইজন্য এবং "সমাচার" দেখিয়া বুদ্ধগণ জন্মরাহিত্য স্বীকারের ফল যে আত্মনাশ, তাহা হইতে ভীত বস্তুর অস্তিত্ববাদিগণের (ভয়নাশের) জন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন। এখানেও দাশ-গুপ্ত 'বুদ্ধৈ,' শব্দে বুদ্ধগণ এবং শঙ্কর পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন। ইহার পরে ৯০ কারিকার আছে—

> হেয়—জ্ঞেয়াপ্য-পাক্যানি বিজ্ঞেয়া-ন্যগ্রযানতঃ
> তেষাং অন্যত্র বিজ্ঞেয়াৎ উপলম্ভ স্ত্রিষু স্মৃতঃ॥

ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন কারিকায় ব্যবহৃত অগ্রযান শব্দ "মহাযানের"ই নামান্তর। কারিকার অর্থ এই—

হেয় অর্থ বর্জনীয় জাগরিত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভাব, কেননা আত্মাতে বাস্তবিক ঐ ত্রিবিধ ভাবের অস্তিত্ব নাই। জ্ঞেয়-অর্থ পরমার্থ তত্ত্ব। আপ্য অর্থ পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌনাখ্য ত্রিবিধ সাধন। পাক্য অর্থ রাগদ্বেষ ও মোহরূপ ত্রিবিধ কষায় যাহা পরিপাক করিতে হইবে। এই হেয়, জ্ঞেয়, আপ্য ও পাক্য প্রথমেই ('অগ্রয়াণতঃ') জানিতে হইবে। বিজ্ঞেয় ব্রহ্মকে বর্জন করিয়া উহারা (হেয় আপ্য ও পাক্য) উপলব্ধ বা অবিদ্যা কল্পনামাত্র। এখানে মহাযানের উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

অপক্ষাবরণাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রকৃতি-নির্ম্মলাঃ।
আদৌ বুদ্ধাঃ তথা মুক্তা বুদ্ধ্যন্তে ইতিনায়কাঃ॥

যে সকল ধর্ম্মের আবরণ নাই, তাহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ। যাঁহারা বুঝিতে সমর্থ সেই সকল বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগণ ইহা জানিতে পারেন। এখানেও 'বুদ্ধ' শব্দে গৌতম বুদ্ধকে বুঝাইতেছে না। ইহার পরে আছে—বুদ্ধ ইহা বলেন নাই যে যিনি বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্য) বিষয়ে গমন করে না।

ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষুতাপিনঃ
সর্ব্বে ধর্ম্মা তথা জ্ঞানং, নৈতৎ বুদ্ধেন ভাষিতম্।

এখানে "বুদ্ধ" শব্দ গৌতম বুদ্ধকে বুঝাইতে পারে। যিনি বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞান বিষয়ান্তরে যায় না, ইহা বুদ্ধ বলেন নাই। কিন্তু এই জ্ঞান বেদান্তে লভ্য, ইহাই উক্ত কারিকার অর্থ। সুতরাং ইহা হইতে গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হয় না। গৌড়পাদ কার্য্য কারণতাই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কার্য্যকারণতার উপর বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রতিষ্ঠিত। তাহার মায়াবাদের সঙ্গে মাধ্যমিক শূন্যবাদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তিনি শূন্যবাদী নহেন কেননা মায়িক জগতের নিম্নে তিনি নিত্যশুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে মায়াবাদ যে গৌড়পাদই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যায় না। উপনিষদে মায়া শব্দ এবং নানাত্ব প্রতিষেধক বচনও অনেক আছে। গৌড়পাদের পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্যকারের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইতে তাহার পূর্ব্বে মায়াবাদ ছিল না, উহা বলা যায় না।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আত্মার চতুষ্পাদ হইতে গৌড়পাদের দর্শনের আরম্ভ। তাঁহার মতে জাগ্রৎদৃষ্ট বস্তু ও স্বপ্ন বস্তু উভয়ই কল্পিত ও অসত্য। যাহাই মনের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাই অসত্য। কেবল মাত্র সাক্ষী আত্মাই সত্য। যাহা সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, সহজ, অকৃত, যাহা নিজের ভাব কখনও ত্যাগ করে না, তাহাই বস্তুর প্রকৃতি। কিন্তু বাহ্য বা আভ্যন্তর কোনও বস্তুরই (আত্মা ভিন্ন) এই প্রকৃতি নাই। সুতরাং আত্মা ভিন্ন সকলই মিথ্যা। কোনও বস্তুই আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না, অথবা অন্য কিছুর উৎপত্তি করে না। বস্তুতঃ উৎপত্তিই নাই। কোনও বস্তুই অন্য কিছুর কারণ নহে। কার্য্য-কারণ বাদ স্বীকার করিলে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সকলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে বিজ্ঞান-স্পন্দনের ফলেই গ্রহণ (প্রতীতি) এবং গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশ হয়, এবং আমরা নানাত্বের কল্পনা করি। কিন্তু বাহ্য জগতের অস্তিত্ব মনের বাহিরে নাই। মনে তাহাদের আবির্ভাবেরও কোনও কারণ নাই। চিত্তের মধ্যে বাহ্য কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। শঙ্কর বলেন যে বাহ্যার্থবাদীদিগের মত খণ্ডন করিতে গৌড়পাদ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়পাদ চিত্তের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে এক আত্মা ভিন্ন বাহ্য ও অন্তর কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনও ভেদই তাহার মতে নাই। সুষুপ্তির অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার অনুভব চরম সত্য নহে। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহা সত্য। যতক্ষণ জাগ্রৎ অবস্থা থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব সত্য। সুষুপ্তির অনুভব স্থায়ী নহে। সুতরাং তাহাও সত্য নহে।

গৌড়পাদের মতে যাহার আদিতে অস্তিত্ব নাই, অন্তেও অস্তিত্ব নাই। মধ্যেও তাহার অস্তিত্ব নাই। আত্মস্তবৎ সকল বস্তুই অসৎ। যাহা শাশ্বত ও যাহার অন্যের অপেক্ষা নাই, তাহাই একমাত্র সত্য।

গৌড়পাদের মতে সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। যাহা সৎ, তাহার পরিণাম নাই; কোনও বস্তুই তাহা লইতে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইতে পারে না। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। জ্ঞানময় আত্মার জ্ঞান আত্মাতেই সীমাবদ্ধ; অন্য কিছুর জ্ঞান তাহাতে নাই (কেননা অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই)। কিন্তু স্থানে স্থানে জগতের অস্তিত্বের কথা আছে। কেহ কেহ জগৎকে ঈশ্বরের বিভূতি বলেন, কেহ বলেন স্বপ্ন মায়া, কেহ বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা। কেহ বলেন ঈশ্বরের ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি, কেহ বলেন তাহার ক্রীড়ার জন্য। কিন্তু সৃষ্টি করা ঈশ্বরের স্বভাব। যিনি আপ্তকাম। তাঁহার আবার স্পৃহা কিসের। ঈশ্বরের এই স্বভাব তাহার মায়া। "কল্পয়তি আত্মনাত্মানং আত্মদেবঃ স্ব মায়য়া।" আপনার মায়া বলে, আত্মা আপনাকে আপনি কল্পনা করেন। তিনিই সকল ভেদ (বিভিন্ন বস্তু) জানেন, ইহাই বেদান্তের মত। (২।১২) অন্যত্র গৌড়পাদ বলিয়াছেন "আত্মা এই মায়া দ্বারা নিজে সম্মোহিত।" (মায়ৈষ তস্যদেবস্য যয়া সম্মোহিতঃ স্বয়ং) এই মায়া অনাদি, মায়াদ্বারা সুপ্তজীব যখন জাগরিত হয়, তখন অজ, অনিদ্র অস্বপ্ন অদ্বৈত জানিতে পারে—ইহাই গৌড়পাদের স্থির মত। আত্মা ভিন্ন অন্য যাহা কিছুর প্রতীতি হয়, তাহা মায়া, তাহার অস্তিত্ব নাই।

গৌড়পাদের মতে জীব ও আত্মার মধ্যে ভেদ নাই (২।১৩)। জীব ও আত্মার পৃথকত্ব, যাহা বেদের কর্ম্ম কাণ্ডে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। (২।১৪) আত্মা আকাশতুল্য, জীব ঘটাকাশতুল্য। ঘটের বিনাশ হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে বিলীন হয়, জীবও তেমনি পরমাত্মাতে লীন হবে। ঘটাকাশ যেমন আকাশের বিকারও

নহে, অবয়বও নহে, তেমনি জীব ও আত্মার বিকার অথবা অবয়ব নহে। উভয়ে এক।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুক্তি। মুক্ত আত্মার জন্ম নাই। তিনি সকল লৌকিক ব্যবহারের অতীত। স্তুতি, নমস্কার বা দেব ও পিতৃকার্য্য কিছুই তাহার থাকে না।

অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবল সত্য জ্ঞান নহে সৎ আচার এবং ঈশ্বরে ভক্তিরও প্রয়োজন। আত্মাকে যে যে ভাবেই গ্রহণ করে, সেই ভাবে উপাসনা করিলে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়পাদ তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপে যোগের বিধি দিয়াছেন। মনের নিরোধের ফলে আত্মতত্ত্বের বোধহয় এবং গ্রাহ্যাভাবে মন শূন্যে পরিণত হয়। এই অবস্থাও সুষুপ্তির অবস্থা এক নহে। কেননা এ অবস্থায় ব্রহ্মের জ্ঞান হয়।

গৌড়পাদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গৌড়পাদ যে বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ না হইলেও তাঁহার দর্শন যে বৌদ্ধ দর্শন কর্ত্তৃক প্রভাবিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিতে যে যে যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন, গৌড়পাদও সেই সেই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বাহ্যজগৎকে মানসিক প্রত্যয়ে পরিণত করিয়া, তিনি শেষে মানসিক জগতের অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন, এবং মনেরই (চিত্তের) অস্তিত্ব নাই বলিয়াছেন। শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে বৌদ্ধ-বাহ্যার্থ-বাদিপক্ষ-প্রতিষেধপর বচন আচার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন যেমন কার্য্যকারণতা স্বীকার নাই, গৌড়পাদও তেমনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে "না নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষু না বৈ মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা। বিনাশ উৎপত্তি, বদ্ধ, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত কিছুই নাই। ইহাই পরম সত্য। নাগার্জ্জুন যাহাকে সদ্‌বৃত্তি বলিয়াছেন, সেই মায়াই জগতের অনুভূতির কারণ। "মায়াময়বীজ হইতে মায়ার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা নিত্যও নহে নশ্বরও নহে। ধর্ম্ম সকল (বস্তুত) সেইরূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত অবস্থা—বর্ণনাতীত। ইহাই "প্রপঞ্চোপশম।" নাগার্জ্জুনও ইহাকে "সর্ব্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ" বলিয়াছেন। গৌড়পাদ ধর্ম্ম (বস্তু অর্থে), সংবৃতি (মায়া বা আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থে) এবং সংঘাত (বাহ্যবস্তু অর্থে) বৌদ্ধ দর্শনে গৃহীত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অলাতের উপমাও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে মনে মনে হয় গৌড়পাদ উপনিষদের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভর্ত্তৃহরি ও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ

কবি ও বৈয়াকরণিক ভর্ত্তৃহরি শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাহার ভট্টিকাব্য ও বৈরাগ্যশতক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মোক্ষমূলারের মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈরাগ্যশতক ভর্ত্তৃহরির রচিত অথবা তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত সুভাষিতাবলী, সে সম্বন্ধে মোক্ষমূলার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক গ্রন্থের নাম বাক্যপদী। ইৎসিং বলেন ভর্ত্তৃহরি একাধিক বার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একাধিক বার তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার বাক্যপদী বৌদ্ধমতের অনুকূল। জগৎ তাহার মতে প্রতিভাস মাত্র। "সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং-ভুবিনৃণাং বৈরাগ্যমেব অভয়ম্।" পৃথিবীতে সকল বস্তুই ভয়ের আকর, বৈরাগ্যই কেবল অভয়। কিন্তু তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—ব্রহ্ম শব্দাত্মক।

> অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দাত্মকং যদক্ষরম্
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন, প্রক্রিয়া জগতো যথা॥

শব্দরূপ ব্রহ্ম হইতেই জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিরবয়ব স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দই ব্রহ্ম।

ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর তাহার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে ব্রহ্মে ভেদ যেমন আছে, তেমনি তিনি ভেদরহিত। শংকর বলেন যে দুইটিবিভিন্ন গুণ এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ বলেন—কারণ ব্রহ্ম কার্য্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু প্রলয়ে কার্য্য ব্রহ্ম কারণে বিলীন হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮-৮২০)

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। থিব লিখিয়াছেন "শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন যে সকল বৈদান্তিক মত অথবা অবৈদান্তিক অন্যান্য যে সকল মত প্রচলিত আছে, গম্ভীরতায় অথবা সূক্ষ্মতায় শঙ্করের দর্শনের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। "শঙ্করের দর্শন পড়িবার সময় পাঠকের মনে হয় তিনি এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইলেও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার বুদ্ধি কোন ধর্ম্মবিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রতিহত হয় নাই। যুক্তির সাহায্যে তিনি তাহাদের উপর যে অপূর্ব্ব দার্শনিক সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন যুগ যুগ ধরিয়া তাহা সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে।"

শঙ্করের শিষ্যগণ রচিত তাঁহার কয়েকখানি জীবনচরিত আছে। তাহাদের মধ্যে মাধবরচিত শঙ্করদিগ্‌বিজয় এবং আনন্দগিরিরচিত শঙ্কর-বিজয় প্রধান। মোক্ষমূলার ও ম্যাকডনেলের মতে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসরে তাহার মৃত্যু হয়। দাক্ষিণাত্যে মালাবারে কালদিগ্রামে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শিবগুরু এবং মাতার নাম সতী—তিনি পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। কথিত আছে শিবপূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। তিনি যে বেদ বিদ্যালয়ে বেদ শিক্ষা করেন, তাহার অধ্যাপকের নাম ছিল গোবিন্দ। গোবিন্দ ছিলেন গৌড়পাদের শিষ্য। শঙ্করের সকল গ্রন্থেই তিনি

আপনাকে গোবিন্দ শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটই তিনি অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং অষ্টম বর্ষেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই সময়ে কুমারিল ভট্টের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মণ্ডনমিশ্র তাঁহার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিচারের সময় মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী মধ্যস্থ ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্র একই ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতে একটি প্রবাদ আছে যে শঙ্কর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। শঙ্কর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের মধ্যে মহীশূর প্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠ প্রধান। অপর তিনটি পুরী, দ্বারকা, এবং বদরিকাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত। মাতার মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রচলিত মত উপেক্ষা করিয়া শঙ্কর মাতার শ্রাদ্ধ করেন। তাহার ফলে অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ বিষম রুষ্ট হন। ৩২ বৎসর বয়সে হিমালয়ের উপরিস্থ কেদারনাথে শঙ্কর মানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন জৈন ধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব ছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছিল। শৈব আদিয়ার ও বৈষ্ণব আলোয়ারগণ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। মীমাংসকগণ বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কুমারিল ও মণ্ডন মিশ্র জ্ঞানকাণ্ড ও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ড ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। শঙ্কর আবির্ভূত হইয়া উপনিষদের জ্ঞান মার্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি প্রাচীন দশখানা উপনিষদের ও ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। তিনি এক সার্বিক দর্শনের সাহায্যে সমগ্র ভারতকে এক ধর্ম্মসূত্রে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে বহুল পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশী জন্ম গ্রহণ করে নাই।

শংকর রচিত গ্রন্থাবলী

শঙ্কর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকখানা প্রাচীন উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও গীতা ভাষ্যই প্রধান। যে সকল উপনিষদের ভাষ্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের নাম: (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন, (৫) মুণ্ডক, (৬) মাণ্ডুক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) ছান্দোগ্য, (৯) বৃহৎ আরণ্যক, (১০) শ্বেতাশ্বতর ও (১১) ঐতরেয়। কথিত আছে তিনি অথর্বশির ও নৃসিংহ তাপনী উপনিষদের ভাষ্য ও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম (১) আপ্তবজ্রশুচি (২) আত্মবোধ, (৩) মোহমুদ্গর (৪) দশশ্লোকী (৫) অপরোক্ষানুভূতি (৬) বিষ্ণু সহস্র নামের টীকা ও (৭) সনৎ সুজাতীয়ের ভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কয়েকটি স্তোত্রও আছে। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র, হরিমীড়ে স্তোত্র, আনন্দলহরী, সৌন্দর্য্যলহরী ও গঙ্গা স্তোত্র ইহাদের অন্তর্গত। এই সকল স্তোত্রে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির ও সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রণতি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম বন্ধুর পথে ক্লান্ত যবে দূরযাত্রী দল
ক্ষণে ক্ষণে আসে নেমে নিরাশার নীরন্ধ্র-আঁধার,
করে গ্রাস মানবতা অরণ্যের হিংসা আর ছল
তখন তোমার কণ্ঠে অভী-মন্ত্র শুনি বার বার।
মানুষে বাসিলে ভালো—ব্রত তাই মানব-কল্যাণ
অতীন্দ্রিয় লাগি' তব নহে পূজা অর্ঘ্য-উপহার।
কর্ম জ্ঞান ভক্তিযোগ বিতর্কের করি' অবসান
দাও নর-নারায়ণে জয়মাল্য প্রেম-উপচার।

এ পল্লীর পথে পথে আছে তব স্নেহ-প্রেম-কণা
তোমার কল্যাণদ্যুতি করে তারে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।
কত স্মৃতি কত কথা কালগর্ভে হবে চিরলীনা
তব পদ-পথ-চিহ্ন ভুলিবে না অভিযাত্রী দল।
'বিজ্ঞান-আনন্দ' তুমি! বিজ্ঞানেই তব অনুরতি,
তোমার চরণে রাখে পল্লীকবি প্রাণের প্রণতি।*

---

* ডুমুরদহ-উত্তমাশ্রমাচার্য শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের উদ্দেশে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়াকস্‌

মোগল হারেম

ফটো : রমেন চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

নীড়

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
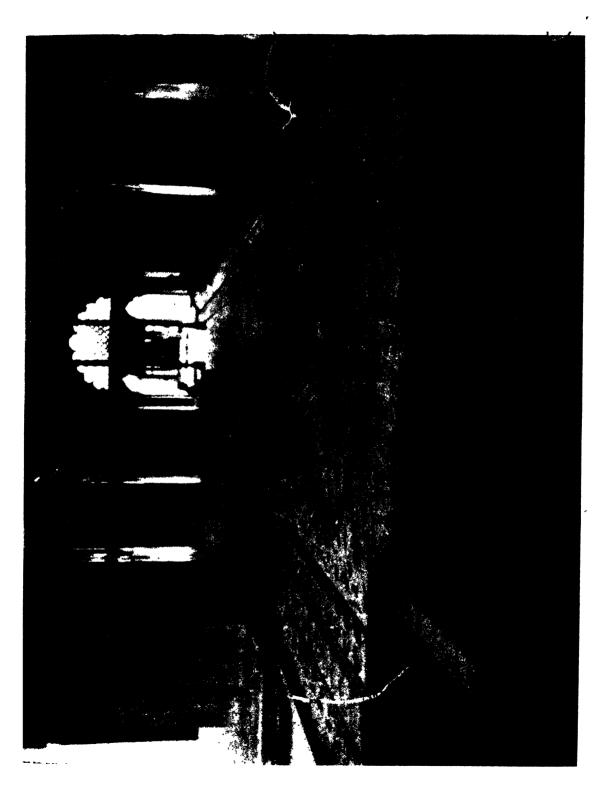
ফেড্ ইন।

খৃষ্টপূর্ব যুগের পাটলিপুত্র। কাল প্রভাত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। দুই স্তম্ভের শীর্ষে ত্রি-সিংহ মূর্তি। একটি স্তম্ভের মূলে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি বিরাট হস্তী দাঁড়াইয়া শুণ্ড আন্দোলিত করিতেছে। অপর স্তম্ভের নিকট একটি বৃহদাকার দুন্দুভি; মুষলহস্ত একজন রাজপুরুষ মুষল উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান।

সিংহদ্বারের ভিতর দিয়া রাজপুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভবনগুলি দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার আশে পাশে অস্ত্রাগার মন্ত্রভবন কোষাগার প্রভৃতি। প্রতীহার-ভূমিতে দুইজন ভীমকায় প্রতীহার পরশু স্কন্ধে লইয়া পরিক্রমণ করিতেছে।

যে রাজপুরুষ দুন্দুভির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল সে উদ্যত মুষল দিয়া দুন্দুভির উপর বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। দুন্দুভি হইতে গম্ভীর নির্ঘোষ নির্গত হইল।

সিংহদ্বারের সম্মুখে তিন দিকে পথ গিয়াছে। দুইটি পথ গিয়াছে প্রাকারের সমান্তরালে, তৃতীয় পথ সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া সিধা সম্মুখ দিকে গিয়াছে। দেখা গেল, দুন্দুভির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহু জনগণ সিংহদ্বারের দিকে আসিতেছে। পুরুষই অধিক, দুই চারিটি স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা আসিয়া দুন্দুভি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

জনতার মধ্যে একটি লোক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, নাসিকার অস্থি ভগ্ন। নাম নাগবন্ধু। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে একাগ্র দৃষ্টিতে রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছে।

রাজপুরুষ যখন দেখিল বহু জনগণ সমবেত হইয়াছে তখন দুন্দুভি বাদ্য স্থগিত করিল। দুই হস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া জনতাকে নীরব থাকিবার অনুজ্ঞা জানাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—

রাজপুরুষ: পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ, শোনো··· পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ চণ্ড যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন শোনো।···মন্ত্রী শিবমিশ্র মহারাজ চণ্ডের আদেশ উপেক্ষা করেছিল—

জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল, বিশেষত নাগবন্ধু যে শিবমিশ্রের নামোল্লেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল। তাহার অধরোষ্ঠ নড়িতে লাগিল, যেন সে অস্ফুটস্বরে শিবমিশ্রের নাম উচ্চারণ করিতেছে।

ঘোষক রাজপুরুষ ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

রাজপুরুষ: তাই মহারাজ চণ্ড তাকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন —পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে বালুর মধ্যে শিবমিশ্রকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রোথিত করে রাখা হবে···রাত্রে শ্মশানের শিবাদল এসে শিবমিশ্রকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে···

জনতার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়িয়াছে। নাগবন্ধু শুষ্ক অধর লেহন করিয়া জ্বলন্ত চক্ষে ঘোষকের পানে চাহিয়া আছে।

রাজপুরুষ: নাগরিকবৃন্দ, স্মরণ রেখো, অমিতবিক্রম মগধেশ্বর চণ্ডের আজ্ঞা যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে তার কী ভয়ঙ্কর শাস্তি। সাবধান—সাবধান।···আরও জেনে রাখো, আজ দিবারাত্র মহাশ্মশান ঘিরে সতর্ক রাজপ্রহরী পাহারায় থাকবে···যদি কেউ শিবমিশ্রকে শ্মশান থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে তবে তার শূলদণ্ড হবে। সাবধান—সাবধান!

পুনরায় দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়া রাজপুরুষ ঘোষণা শেষ করিল। জনতা স্থির হইয়া রহিল।

তারপর জনতার অগ্রভাগে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সিংহদ্বারের ভিতর হইতে প্রহরী পরিবেষ্টিত শিবমিশ্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি শুষ্ক, দুই চক্ষু নীরবে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত। নগ্ন স্কন্ধে উপবীত। আকৃতি দেখিয়া বয়স অনুমান পঞ্চাশ বছর মনে হয়।

জনতা নীরবে দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, শিবমিশ্র ও প্রহরীগণ অগ্রসর হইলেন। নাগবন্ধুর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শিবমিশ্র একবার তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলেন। নাগবন্ধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, আবার মুখ বন্ধ করিল।

শিবমিশ্র জনব্যূহে অদৃশ্য হইলেন, কেবল তাঁহার পদক্ষেপের তালে তালে শৃঙ্খল বাজিতে লাগিল—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন—

ডিজল্ভ্।

বহু স্তম্ভ যুক্ত রাজসভার অভ্যন্তর।

মহিমাকৃতি মহারাজ চণ্ড সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনটি ভূমির উপর স্থাপিত নয়, চারিটি স্বর্ণ-শৃঙ্খল দ্বারা শূন্যে দোদুল্যমান; মহারাজ তাহার উপর পদ্মাসনে বসিয়া মৃদু দোল খাইতেছেন। সিংহাসনের দুই পাশে দুইজন যুবতী কিঙ্করী, একজন ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া মহারাজকে বীজন করিতেছে, অন্যটি মণিমুক্তাখচিত সুরাভৃঙ্গার হস্তে মহারাজের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজ সিংহাসনের সম্মুখে দশ হস্ত ব্যবধানে সভাসদ্‌গণের আসন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট; তাহাদের মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা চাটুকার বয়স্য। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ সভা-জ্যোতিষী পুঁথিপত্র সম্মুখে লইয়া নিমীলিত নেত্রে বোধকরি গ্রহ-নক্ষত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

এক ঝাঁক নর্তকী সভার এক প্রান্ত হইতে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া রাজা ও সভাসদ্‌গণের মধ্যবর্তী ব্যবধান স্থল দিয়া বসন্তের প্রজাপতির মত অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল। রাজা প্রত্যেকটি নর্তকীকে ব্যাঘ্র-চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিলেন; তাহারা অন্তর্হিত হইলে ভৃঙ্গারধারিণী কিঙ্করীর দিকে হাত বাড়াইলেন। কিঙ্করী ত্বরিতে পাত্র ভরিয়া রাজার হাতে দিল।

এই সময় রাজ-অবরোধের কঞ্চুকী স্বস্তি-বাচ্য করিয়া সিংহাসনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ড সুরাপাত্র মুখে তুলিতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া ভ্রূভঙ্গ করিলেন

চণ্ড: কঞ্চুকি। কি চাও?

কঞ্চুকী: আয়ুষ্মন্—

কঞ্চুকী নত হইয়া চণ্ডের কানে কানে কিছু বলিল। চণ্ডের ক্ষুদ্র গজচক্ষু দুষ্ট কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল

চণ্ড: মোরিকার কন্যা জন্মেছে! হো হো—

সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া চণ্ড সভাসদমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। জ্যোতিষীর ধ্যানস্থ মূর্ত্তির উপর তাহার চক্ষু নিবদ্ধ হইল

চণ্ড: গ্রহাচার্য পণ্ডিত—

গ্রহাচার্য চমকিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গ্রহাচার্য: শুভমস্তু—শুভমস্তু। আদেশ করুন মহারাজ।

চণ্ড: শোনো। কাল মধ্যরাত্রে রাজ অবরোধের এক দাসী এক কন্যা প্রসব করেছে। তার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত কর।

গ্রহাচার্য আসন গ্রহণ করিয়া পুঁথি তুলিয়া লইলেন

গ্রহাচার্য: শুভমস্তু। কন্যার পিতা কে মহারাজ?

এই সময় রাজ-বয়স্য বটুক-ভট্টের তীক্ষ্ণোচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল। সিংহাসনের উর্দ্ধে শিকল অবলম্বন করিয়া বটুক ভট্ট মর্কটের মত ঝুলিতেছিলেন, তিনি মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বটুক: গ্রহাচার্য মশায়, এটুকু বুঝতে পারলেন না। কন্যার পিতা আমি—

চণ্ড ভ্রূকুটি করিয়া উর্দ্ধে চাহিলেন।

চণ্ড: বটুক—নেমে আয়!

বটুক শিকল ধরিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি ক্ষীণ ও খর্ব, মাথার উপর কেশগুচ্ছ চূড়ার আকারে বাঁধা। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। তিনি গ্রহাচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বটুক: শুনুন। মহারাজের অন্তঃপুরের দাসী মোরিকা কন্যার জন্ম দান করেছে—অন্তঃপুরে মহারাজ ছাড়া আর কোনও পুরুষের গতিবিধি নেই—সুতরাং কন্যার পিতা আমি। ইতি বটুকভট্টঃ। কেমন, বুঝেছেন তো?

গ্রহাচার্য: [অপ্রতিভ হইয়া] শুভমস্তু—এবার বুঝেছি—মহারাজের কন্যা—তা শুভমস্তু শুভমস্তু—

বটুক ভট্ট আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিলেন।

বটুক: আপনার মস্তকের বুদ্ধিও শুভমস্তু। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড: এইবার কন্যার ভাগ্য গণনা কর।

গ্রহাচার্য: এই যে মহারাজ—

তিনি দারুপট্ট লইয়া খড়ি দিয়া আঁক কষিতে আরম্ভ করিলেন।

ওয়াইপ্।

রাজ অবরোধের একটি কক্ষ।

রাজপ্রাসাদের তুলনায় কক্ষটি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সজ্জিত। কক্ষের এক কোণে ভূমির উপর শয্যা রচিত হইয়াছে। শয্যার উপর একটি যুবতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; তাহার বুকের কাছে, বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশু। যুবতী অসামান্যা সুন্দরী; কিন্তু বর্তমানে তাহার দেহ শীর্ণ, মুখ রক্তহীন।

মোরিকার বুকের কাছে বস্ত্রপিণ্ড ঈষৎ নাড়িয়া উঠিল; তারপর তাহার ভিতর হইতে ক্ষীণ কাকুতি বাহির হইল। মোরিকা বস্ত্রাচ্ছাদন তুলিয়া শিশুকে দেখিল, আরও গাঢ় ভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

ওয়াইপ্।

রাজসভা।

গ্রহাচার্য জন্মকুণ্ডলী রচনা শেষ করিয়াছেন, অস্বস্তিপূর্ণ চক্ষে কুণ্ডলীর পানে চাহিয়া আছেন।

চণ্ড : কি দেখলে ? কন্যা ভাগ্যবতী ?

গ্রহাচার্য কুণ্ডলী হইতে শঙ্কিত চক্ষু তুলিলেন

গ্রহাচার্য : আয়ুষ্মন্, এই কন্যা—এহুম্—বড়ই কুলক্ষণা, স্বজনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা—

চণ্ডের চক্ষু ঘূর্ণিত হইল

চণ্ড : বিষকন্যা !

গ্রহাচার্য : হাঁ মহারাজ, গ্রহনক্ষত্র গণনায় তাই পাওয়া যাচ্ছে। আপনি একে বর্জন করুন—শুভমস্তু শুভমস্তু।

চণ্ডের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখা দিল

চণ্ড : বটে—বিষকন্যা ! প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—কোন্ প্রিয়জনের অনিষ্ট করবে ?

গ্রহাচার্য আবার জন্মপত্রিকা দেখিলেন

গ্রহাচার্য : মাতা-পিতা দু'জনেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে—শুভমস্তু—মঙ্গল আর শনি পিতৃস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে। তাই বলছি মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্য এই বিষকন্যাকে ত্যাগ করুন।

বটুক ভট্ট এক চক্ষু মুদিত করিয়া এই বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন

বটুক : বয়স্য, গ্রহবিগ্রহের কথা শুনবেন না, বটুক ভট্টের কথা শুনুন। বিষকন্যা জন্মেছে ভালই হয়েছে। এই দাসী কন্যাটাকে সযত্নে পালন করুন ; সে যখন বড়-সড় হবে তখন তাকে নগর-নটীর পদে বসিয়ে দেবেন। ব্যস্, আপনার দুষ্ট প্রজারা সব একে একে যমালয়ে চলে যাবে। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সক্রোধে বটুকভট্টের দিকে ফিরিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার চূড়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন ; বটুকভট্টের ঘাড় লটপট করিতে লাগিল

চণ্ড : বটুক, তোর জিভ্ উপ্ড়ে ফেলব।

বটুক : এই যে মহারাজ—

বটুক দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন। চণ্ডের ক্রুদ্ধ মুখে ক্রমশ হাসি ফুটিল। তিনি বটুকভট্টের চূড়া ছাড়িয়া দিয়া এক চষক সুরা পান করিলেন

ইতিমধ্যে গণদেব নামে একজন সভাসদ সভায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং একটি শূন্য আসনে বসিয়া পার্শ্ববর্তী সভাসদের সহিত মৃদু বাক্যালাপ করিতেছিল। চণ্ড সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে সভাসদগণের পানে চাহিলেন

চণ্ড : এখন এই বিষকন্যাটাকে নিয়ে কি করা যায় ?

গণদেব নিজ আসনে উঁচু হইয়া হাত জোড় করিল

গণদেব : মহারাজ, আমি বলি, মন্ত্রী শিবমিশ্রকে যে-পথে পাঠিয়েছেন এই বিষকন্যাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দিন, রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।

ক্রূর হাসিয়া চণ্ড গণদেবের পানে চাহিলেন

চণ্ড : মহামন্ত্রী শিবমিশ্র এখন কি করছেন কেউ বলতে পারো ?

গণদেব : এইমাত্র দেখে আসছি তিনি মহাশ্মশানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে শ্মশানশোভা নিরীক্ষণ করছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করাবো বলে কিছু মোদক নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নেই।

চণ্ড অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সভাসদ্গণও দেখাদেখি হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কাহারও মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। চণ্ডের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি গূঢ় গর্জনে বলিলেন—

চণ্ড : শিবমিশ্র আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল তাই তার এই দশা—আজ রাত্রে শিবাদল তাকে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা স্মরণ রেখো।

সভাসদগণ হেঁটমুণ্ডে নীরব রহিলেন। বটুকভট্ট হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন

বটুক : আজ তবে সভা ভঙ্গ হোক—ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভট্ট অমনি সিংহাসনে গুটিসুটি পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চণ্ড গ্রহাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

চণ্ড : গ্রহাচার্য, তুমি যা বলেছ তাই হবে। কন্যা আর তার মা দু'জনকেই আজ রাত্রে মহাশ্মশানে পাঠাব, সেখানে মা তার মেয়েকে স্বহস্তে শ্মশানে সমাধি দেবে। তাহলে গ্রহদোষ দূর হবে তো ?

গ্রহাচার্য কাঁপিয়া উঠিলেন

গ্রহাচার্য : মহারাজ ! এত কঠোরতার প্রয়োজন নেই—শুভমস্তু—কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিন, কন্যার মাতার কোনও অপরাধ নেই—তাকে দিয়ে এখন—

চণ্ড : [গর্জন করিয়া] অপরাধ নেই। সে এমন কুলক্ষণা কন্যার জন্ম দিয়েছে কেন ?

গ্রহাচার্য আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিলে চণ্ড উদ্ধত ভাবে হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন—

চণ্ড : থাক, তোমার বাক্‌-বিস্তার শুনতে চাইনা। যা করবার আমি স্বহস্তে করব।

চণ্ডের মুখ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি। রাজ-অবরোধে দাসী মোরিকার শয়নকক্ষ। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে।

দাসী মোরিকা শয্যার উপর নতজানু হইয়া ব্যাকুল উর্দ্ধমুখে মহারাজ চণ্ডের পানে চাহিয়া আছে। তাহার পাশে বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু। মহারাজ চণ্ডের মুখে কঠিন ক্রোধ, হস্তে একটি লৌহ খনিত্র।

মোরিকা : মহারাজ, দয়া করুন—

চণ্ড : দয়া! বিষকন্যা প্রসব করে দয়া চাও! তোমাকে হত্যা করব না এই দয়া কি যথেষ্ট নয়?

মোরিকা : (গলদশ্রুনেত্রে) আমাকেই হত্যা করুন মহারাজ। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশু—আপনার কন্যা—দয়া করুন—দয়া করুন—

মোরিকা চণ্ডের পদতলে পড়িল

চণ্ড : যা আদেশ করেছি পালন করতে হবে—নিজের হাতে একে মহাশ্মশানের বালুতে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে।

পদতল হইতে মুখ তুলিয়া মোরিকা হাত জোড় করিল

মোরিকা : ক্ষমা করুন—দয়া করুন! নিজের সন্তানকে নিজের হাতে—না না, আমি পারব না।

চণ্ড : (ভয়ঙ্কর স্বরে) পারবে না!

চণ্ড হেঁট হইয়া বস্ত্রপিণ্ডসুদ্ধ শিশুকে বাম হস্তে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন—

চণ্ড : পারবে না! তবে তোমার চোখের সামনে এই সর্পশিশুকে মাটিতে আছড়ে মারব—

বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মোরিকা দুই বাহু তুলিয়া আর্তব্যাকুল স্বরে বলিল—

মোরিকা : না না, দিন আমাকে দিন—আমি—আপনার আদেশ পালন করব—

চণ্ড শিশুর বস্ত্রপিণ্ড নামাইলেন, মোরিকা তাহা নিজ বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিল। চণ্ড দ্বারের দিকে হস্তপ্রসারিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—

চণ্ড : যাও—এই নাও খনিত্র।

মোরিকা খনিত্র লইল। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নির্গত হইল। সে স্খলিতপদে দ্বারের দিকে চলিল। সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে চণ্ড বলিলেন—

চণ্ড : মহাশ্মশান থেকে তুমি ফিরে আসতে পার, কিন্তু বিষকন্যা যেন ফিরে না আসে।

মোরিকা দ্বারের কাছে একবার দাঁড়াইল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি। চন্দ্রালোকিত মহাশ্মশান।

যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ বালুকা; কেবল উত্তরদিক ফিরিয়া ভাগীরথীর ধারা কলঙ্করেখার মত দেখা যাইতেছে। বালুকার উপর অসংখ্য নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; মাঝে মাঝে লৌহশূল উচ্চ হইয়া আছে। শূলশীর্ষে কোথাও বীভৎস উল মনুষ্যদেহ নিচু হইয়া আছে, কোথাও বা শূল-মূলে মাংসহীন কঙ্কাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বহু দূরে গঙ্গার তীরে অনির্বাণ চুল্লীতে রক্তবর্ণ অঙ্গার জ্বলিতেছে।

এই মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মোরিকা চলিয়াছে। ডান হাতে বুকের কাছে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিশুকে ধরিয়া আছে। বাঁ হাতে খনিত্র। সে ত্রাস-বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে আর ক্লান্ত পদ-যুগল টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। একটা নিশাচর পাখী কর্কশ ডাক দিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

মোরিকা ভয় পাইয়া বালুর উপর পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণকণ্ঠে একবার কাঁদিল। মোরিকা তাহাকে বুকে চাপিয়া দ্রুত পলায়ন করিবার জন্য একদিকে ছুটিল।

একটি শূলের অর্ধপথে একটা নরদেহ বীভৎস ভঙ্গীতে বিদ্ধ হইয়া আছে, দুইটা শৃগাল উর্দ্ধমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য খাদ্যের দিকে তাকাইয়া আছে; চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। মোরিকা এই দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ শূল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর বিপরীত দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শৃগালের মিলিত ঐক্যনাদ শুনা যাইতেছে। দূর হইতে দেখা গেল, একপাল শৃগাল বালুর উপর চক্রাকারে বসিয়া উর্দ্ধমুখে ডাকিতেছে। মোরিকা সেই দিকে ছুটিতে ছুটিতে আবার পড়িয়া গেল। বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু তাহার বাহুবন্ধন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোরিকা উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষে অর্ধোন্মাদ দৃষ্টি। সে সহসা

খনিত্র লইয়া বালু খনন আরম্ভ করিল। অনতি-গভীর একটি গর্ত হইলে মোরিকা দুই হস্তে বস্ত্রপিণ্ড লইয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। শিশুর কণ্ঠে আবার ক্ষীণ আকুতি শুনা গেল।

কিন্তু গর্ত পূর্ণ হইবার পূর্বেই মোরিকা আবার শিশুকে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি পড়িল দূরে গঙ্গার শ্যাম রেখার উপর। সে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল

মোরিকা: গঙ্গা!—মা জাহ্নবী, তুমি আমাদের কোলে স্থান দাও—

এক হাতে খনিত্র, অন্য হাতে শিশুকে বুকে চাপিয়া মোরিকা গঙ্গার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

গঙ্গার নিকটে অনির্বাণ চুল্লী। চুল্লীর পশ্চাৎপটে দেখা গেল, একদল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। শৃগাল চক্রের মধ্য হইতে হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন ফুঁসিয়া উঠিল, কিন্তু মনুষ্য দেখা গেল না।

মোরিকা মুহ্যমান চেতনা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ সজাগ হইল, পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন শুনা গেল; শৃগালেরা পিছু ছুটিল। তখন মোরিকা ভয়ার্ত চক্ষে দেখিল, শৃগালচক্রের মাঝখানে বালুর উপর একটি নরমুণ্ড। দেহ নাই—কেবল মুণ্ড।

মোরিকার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল; সে কোন্ দিকে পালাইবে ভাবিয়া পাইল না, অবশ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা সেই নরমুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিল—

মুণ্ড: কে তুমি? প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও আমাকে রক্ষা কর—

মোরিকা অবশে সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল; শৃগালেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ অনিচ্ছায় আরও দূরে সরিয়া গেল।

মোরিকা: (কম্পিতকণ্ঠে) কে তুমি?

আকণ্ঠ প্রোথিত শিবমিশ্রের দুই গণ্ড শৃগালদষ্ট, রক্ত ঝরিতেছে। তিনি তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—

শিবমিশ্র: ভয় নাই—আমি মানুষ। আমার নাম শিবমিশ্র। তুমি যে হও আমাকে বাঁচাও—

মোরিকা: মন্ত্রী শিবমিশ্র!

মোরিকা ছুটিয়া আসিয়া শিবমিশ্রের নিকট নতজানু হইল; শিশুকে মাটিতে রাখিয়া প্রাণপণে খনিত্র দিয়া বালু খুঁড়িতে লাগিল।

দ্রুত ডিজল্ভ।

মোরিকা বালু খুঁড়িয়া শিবমিশ্রকে বাহির করিয়াছে; তিনি বালুর উপর শুইয়া অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। মোরিকার ক্লান্ত দেহও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে শিবমিশ্র কথা বলিলেন—

শিবমিশ্র: তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমার পরিচয় জানতে চাই। কে তুমি? এত রাত্রে এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে কি জন্য এসেছ?

মোরিকা উত্তর দিল না, কেবল অঙ্গুলিনির্দেশে বস্ত্রাবৃত শিশুকে দেখাইল। শিশু এই সময় ক্ষীণ শব্দ করিল!

শিবমিশ্র উঠিয়া বসিলেন, গণ্ডের রক্ত মুছিয়া বলিলেন—

শিবমিশ্র: শিশু! শিশু নিয়ে এত রাত্রে শ্মশানে এসেছ! কে তুমি? তোমার নাম কি?

মোরিকা নিমীলিত কণ্ঠে বলিল—

মোরিকা: আমার নাম—মোরিকা। আমি রাজপুরীর দাসী—

শিবমিশ্রের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

শিবমিশ্র: রাজপুরীর দাসী—ময়ূরিকা!—বুঝেছি—তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করলে?

মোরিকা: কাল রাত্রে—

কিছুক্ষণ নীরব। মোরিকা কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস টানিল, যেন তাহার শ্বাস-কষ্ট হইতেছে।

শিবমিশ্র: হতভাগিনি। মহারাজ চণ্ডের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ তাই তোমার এই দণ্ড?

মোরিকা: মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন কন্যাকে নিজের হাতে শ্মশানে সমাধি দিতে হবে—

শিবমিশ্র: কিন্তু কেন? কী তোমার কন্যার অপরাধ?

মোরিকা: সভাপণ্ডিত গণনা করে বলেছেন আমার কন্যা বিষকন্যা—পিতার অনিষ্টকারিণী—তাই—

শিবমিশ্রের চক্ষু ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল

শিবমিশ্র: বিষকন্যা! পিতার অনিষ্টকারিণী! দেখি—আমি বিষকন্যার লক্ষণ চিনি—

শিবমিশ্র উঠিয়া শিশুকে তুলিয়া লইলেন; সন্তর্পণে বস্ত্রাবরণ সরাইয়া দেখিলেন। কিন্তু চন্দ্রালোকে ভাল দেখা গেল না। শিবমিশ্র তখন শিশুকে লইয়া অনির্বাণ চিতার নিকট গেলেন! চিতার নিকট অনেক ইন্ধন কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, একটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া জ্বলন্ত চিতায়

নিক্ষেপ করিলেন ; দপ্ করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই আলোকে শিবমিশ্র নগ্ন শিশুর দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে পৈশাচিক উল্লাসে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি শিশুকে বুকে লইয়া দ্রুত মোরিকার কাছে ফিরিয়া গেলেন

শিবমিশ্র : তোমার কন্যা বিষকন্যাই বটে—

মোরিকা উত্তর দিল না, ভূমিশয্যায় পড়িয়া শেষবার অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবমিশ্র জানিতে পারিলেন না, মোরিকার পাশে নতজানু হইয়া আগ্রহ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

শিবমিশ্র : বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, কেউ জানবে না। তুমি রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে বোলো যে রাজাজ্ঞা পালন করেছ—

মোরিকার নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া শিবমিশ্র থামিলেন, নত হইয়া মোরিকার মুখ দেখিলেন ; তারপর তাহার শীর্ণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি হইতে মোরিকার মৃত হস্ত মাটিতে পড়িল। শিবমিশ্র শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন

শিবমিশ্র : এই ভাল। এ কন্যা এখন আমার !

এই সময় আকাশের অঙ্গে আগুনের রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে শিবমিশ্র শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন

শিবমিশ্র : এ প্রকৃতির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখলাম—উল্কা ! উল্কা !

মোরিকার মৃতদেহ পশ্চাতে ফেলিয়া শিবমিশ্র গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। শিবাদল দূরে সরিয়া গিয়াছিল এখন আবার মোরিকার দেহ ঘিরিয়া ধরিল।

গঙ্গার জলে একটি ক্ষুদ্র ডিঙা দেখা গেল। ডিঙার আরোহী মাত্র একজন ; সে দাঁড় টানিয়া শ্মশানের দিকেই আসিতেছে। শিবমিশ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

ডিঙার আরোহী তীরে ডিঙা ভিড়াইয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। শিবমিশ্র চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন।

শিবমিশ্র : কে তুমি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়িয়া কাছে আসিল এবং শিবমিশ্রের পদতলে পতিত হইল

ব্যক্তি : আর্য শিবমিশ্র—

সে যখন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল শিবমিশ্র তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন—ভগ্ননাসিক নাগবন্ধু।

শিবমিশ্র : নাগবন্ধু ! তুমি ?

নাগবন্ধু : প্রভু, অতি কষ্টে নৌকায় করে শ্মশানে এসেছি। আপনি কি করে বালু সমাধি থেকে মুক্তি পেলেন জানি না। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, চলুন, রাত্রি শেষ হবার আগেই আপনাকে গঙ্গার পারে লিচ্ছবি দেশে পৌঁছে দেব।

শিবমিশ্র : নাগবন্ধু তুমি আমার দুর্দিনের বন্ধু। চল লিচ্ছবি দেশেই যাব—সেখানে রাজা নেই—

শিবমিশ্র শিশুকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। নাগবন্ধু দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ।

দিবাকাল। বৈশালীর মন্ত্রভবনে উচ্চ বেদীর উপর তিনজন বয়স্থ কুলপতি পাশাপাশি বসিয়া আছেন। শিবমিশ্র তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার গণ্ডে এখনও রক্ত শুকাইয়া আছে, ক্রোড়ে বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে শিশু। পশ্চাতে নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনেরই আকৃতি শুষ্ক ক্লান্ত ধূলিধূসর !

শিবমিশ্র শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

শিবমিশ্র : লিচ্ছবির মহামান্য কুলপতিগণ, আমি মগধ থেকে আসছি। আমার নাম হয়তো আপনাদের অপরিচিত নয়, আমি মগধের ভূতপূর্ব মহাসচিব শিবমিশ্র।

১ কুলপতি : শিবমিশ্র ! চণ্ডের মহাসচিব শিবমিশ্র !

শিবমিশ্র : হাঁ। মহারাজ চণ্ড আমাকে শ্মশানে আকণ্ঠ প্রোথিত করে রেখেছিলেন ; তাঁর ইচ্ছা ছিল রাত্রে শিবাদল এসে আমার দেহ ছিঁড়ে খাবে। মহারাজের অভিলাষ কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি (নিজ গণ্ড স্পর্শ করিলেন), দৈববশে আমি রক্ষা পেয়েছি। মগধে আমার স্থান নেই, তাই আমি বৈশালীতে এসেছি—

২ কুলপতি : আর্য শিবমিশ্র, শত্রু হলেও আপনি মহামান্য ব্যক্তি—আমাদের অতিথি। আসন গ্রহণ করুণ আর্য।

শিবমিশ্র : আগে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন, তবে আসন গ্রহণ করব।

৩ কুলপতি : কী আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।

শিবমিশ্র : আমি যতদিন মগধের মহামন্ত্রী ছিলাম ততদিন বৈশালীর শত্রুতা করেছি—মগধের শত্রু তখন আমার শত্রু ছিল। কিন্তু আজ মগধ আমাকে ত্যাগ

করেছে।—কুলপতিগণ, শুনুন, আমি শপথ করছি—চণ্ডকে উচ্ছেদ করব, মগধ থেকে শিশুনাগ বংশের নাম লুপ্ত করব। শিশুনাগ বংশ বিষধর সর্পের বংশ, ও বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না—

২ কুলপতি : সাধু সাধু! আমরাও তাই চাই!

শিবমিশ্র : আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা গোপনে আমাকে আশ্রয় দিন; আমি যে বৈশালীতে এসেছি বা জীবিত আছি একথা যেন কেউ না জানতে পারে। আজ থেকে আমার নাম শিবমিশ্র নয় —শিবামিশ্র।

গণ্ডুস্পর্শ করিলেন।

কুলপতি তিনজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

১ কুলপতি : আমরা আপনার প্রার্থনা সানন্দে পূর্ণ করব। যদি আর কিছু অভিলাষ থাকে বলুন।

শিবামিশ্র : আর কিছু না। শিশুনাগ বংশকে আমি নিজে ধ্বংস করতে চাই, কারুর সাহায্য চাই না। আপনারা শুধু আমাকে একটি পর্ণকুটির দান করুন।

২ কুলপতি : পর্ণকুটির! আপনাকে অট্টালিকায় বাস করতে হবে। শিবামিশ্র মহাশয়, বৈশালী রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে বৈশালীতে গুণীর আদর নেই এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

শিবামিশ্র আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এক হাত তুলিলেন

শিবামিশ্র : ধন্য—আপনারা ধন্য।

এই সময় বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণ শব্দ করিল। কুলপতিরা চমকিয়া চাহিলেন।

১ কুলপতি : এ কি! শিশুর কান্না!

শিবামিশ্র : হাঁ—একটি কন্যা।

২ কুলপতি : আপনার কন্যা?

শিবামিশ্র : এখন আমারই কন্যা। মহাশ্মশানে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি, মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লী থেকে এই অগ্নিকণা তুলে এনেছি···একদিন এই অগ্নিকণা দাবানলের মত শিশুনাগ বংশকে ভস্ম করে দেবে—

শিবামিশ্র নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন

শিবামিশ্র :—নাগবন্ধু, তুমি মগধে ফিরে যাও বৎস। গোপনে গোপনে চণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলো। এক দিনের কাজ নয়, এ সর্পবংশ নির্মূল করতে অনেক দিন লাগবে; ধৈর্য হারিও না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। মগধের সঙ্গে তুমিই আমার একমাত্র যোগসূত্র।—এসো বৎস।

নাগবন্ধু নতজানু হইয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল, শিবামিশ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দিবাকাল। বৈশালী নগরীর সুরম্য রাজপথ। পথের দুই পাশে উচ্চ অট্টালিকা। পথ দিয়া জনস্রোত চলিয়াছে, দুই চারিটি রথ শিবিকাও যাতায়াত করিতেছে।

একজন পাণ্ডা জাতীয় লোক একটি নবাগত বিদেশীকে নগর দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাণ্ডা লোকটি চতুর বাক্‌পটু; বিদেশীর চেহারা বোকাটে ধরণের কিন্তু মুখের ভাব সন্দিগ্ধ। তাহারা বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছে।

নির্দেশক : আপনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, বৈশালীর মত এমন নগর আর্যাবর্তে আর পাবেন না। মর্তে অমরাবতী —সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী!

দর্শক : হুঁ হুঁ, আমাকে আর বোকা বুঝিও না— আমি কাশী কাঞ্চি অবন্তী সব দেখেছি।

নির্দেশক : আরে মশায়, তা তো দেখেছেন। কিন্তু বৈশালীর মত এমন বড় বড় অট্টালিকা দেখেছেন? এখানে দ্বিভূমক ত্রিভূমক সপ্তভূমক অট্টালিকা আছে। আপনার কাশী কাঞ্চিতে আছে?

দর্শক : কি বলছ হে তুমি? অবন্তীতে এমন উঁচু অট্টালিকা আছে যে আকাশকে ফুটো করে দিয়েছে— সেই ফুটো দিয়ে অপ্সরাদের দেখা যায়!

এই সময় পাশের পথ দিয়া একটি চতুরশ্ব রথ সবেগে বাহির হইয়া আসিল। আর একটু হইলে দর্শকমহাশয় চাপা পড়িতেন, কিন্তু নির্দেশক ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইল। রথ চলিয়া গেল।

নির্দেশক : আরে মশায়, শেষে কি রথ চাপা পড়ে মারা যাবেন?

দর্শকের দৃষ্টি কিন্তু রথের দিকে

দর্শক : কার রথ? রাজার রথ বুঝি!

নির্দেশক : কতবার বলব মশায়, আমাদের দেশে রাজা নেই। প্রজাতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র! বুঝলেন?

দর্শক : রাজা নেই—কিন্তু—তাহলে তো রাণীও নেই।

নির্দেশক : না। চলুন ঐ দিকটা দেখবেন—

দর্শক। রাজকন্যাও নেই?

নির্দেশক : কি বিপদ! রাজাই নেই তো রাজকন্যে আসবে কোত্থেকে!

দর্শক : ভারি অদ্ভুত দেশ।

নির্দেশক দৃঢ়ভাবে দর্শকের বাহু ধরিয়া একদিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

ঐ দিন। নগরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ। বাড়িগুলি ছোট ছোট, উদ্যান দিয়া ঘেরা।

দর্শক ও নির্দেশক প্রবেশ করিল

দর্শক : এ॰ যায়গাটা মন্দ নয়, বেশ নিরিবিল। (একটি সুন্দর বাটিকার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) ওটা কার বাড়ী? রাজার প্রমোদ ভবন বুঝি!

নির্দেশক। কি বিড়ম্বনা। বললাম না আমাদের রাজা নেই। ওটা শিবামিশ্রের বাড়ী।

দর্শক : শিবা মিশ্র! সে আবার কে? রাজার মন্ত্রী বুঝি!

নির্দেশক : (ক্লান্ত ভাবে) শিবামিশ্র কে তা জানিনা। দশ বছর বৈশালীতে আছেন কিন্তু কেউ তাঁর পরিচয় জানে না।

দর্শক : অদ্ভুত নাম—শিবামিশ্র!

নির্দেশক : তাঁর মুখটা শেয়ালের মত কিনা তাই শিবামিশ্র নাম।

দর্শক : শেয়ালের মত মুখ হলেই শিবামিশ্র নাম হবে?

নির্দেশক : কেন হবে না? এদেশের এই নিয়ম।

দর্শক : যদি বাঁদরের মত মুখ হয়?

নির্দেশক : তাহলে তার নাম হবে মর্কট মিশ্র।

দর্শক। আর যদি চাঁদের মত মুখ হয়?

নির্দেশক : তাহলে নাম হবে চন্দ্রবদন বর্মা। আমার নাম জানেন না?—চন্দ্রবদন বর্মা। আসুন।

দর্শককে টানিয়া লইয়া নির্দেশক নিষ্ক্রান্ত হইল

ওয়াইপ্।

শিবামিশ্রের উদ্যান-বাটিকার পিছনের অঙ্গন। অঙ্গনের এক প্রান্তে কাষ্ঠ বেদিকার উপর একটি মৃত্তিকার ময়ূর উৎকণ্ঠ হইয়া যেন আকাশের মেঘদর্শন করিতেছে। অঙ্গনের অপর প্রান্তে ময়ূর হইতে অনুমান ত্রিশ হস্ত দূরে উল্কা ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিছনে শিবামিশ্র। উল্কার বয়স এখন দশ বৎসর; যৌবন এখনও দূরে, কিন্তু বেত্রবৎ ঋজু নমনীয় দেহে অনাগত বসন্তের প্রতিশ্রুতি। শিবামিশ্র এই দশ বৎসরে একটু বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার গণ্ডে শৃগাল-ক্ষত এখনও মিলায় নাই। ক্ষত সারিয়াছে, দাগ আছে।

উল্কা ধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া মৃন্ময়ূরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিল। তারপর বাণ মোচন করিল। বাণ গিয়া ময়ূরের কাষ্ঠ বেদিকায় বিদ্ধ হইল।

উল্কা লজ্জিত হইয়া পিছনে শিবামিশ্রের পানে চাহিল। শিবামিশ্র তাহার পিছনে আসিয়া দুই স্কন্ধে হাত রাখিলেন।

শিবামিশ্র : কন্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়োনা। এ সংসারে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সে কোনও সিদ্ধিই লাভ করতে পারে না। (উল্কা নতমুখা হইল)—নাও, আবার তীর নাও, মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির কর—

উল্কা আবার ধনুকে তীর পরাইয়া ধনুক তুলিল এবং নির্নিমেষ চক্ষে মৃন্ময়ূরের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবামিশ্র : হাঁ—একদৃষ্টে চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাচ্ছ?

উল্কা : পাখী।

শিবামিশ্র : আরও একাগ্র মনে লক্ষ্য কর।—এবার কী দেখছ?

উল্কা। পাখীর মাথা।

শিবামিশ্র : বেশ। আরও দৃষ্টি কর। যখন কেবল পাখীর চক্ষু দেখতে পাবে—

উল্কার ধনু হইতে তীর নির্গত হইয়া ময়ূরের দেহে বিদ্ধ হইল উল্কার ক্রুদ্ধ আক্ষেপে ধনু ফেলিয়া দিল। শিবামিশ্র সস্নেহে তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

শিবামিশ্র। উল্কা—ছি, ধৈর্য হারাতে নেই। ধনুর্বিদ্যা এক দিনে আয়ত্ত হয় না। ক্রমে শিখবে।

ওয়াইপ্।

দিবাকাল। শিবামিশ্রের গৃহে একটি কক্ষ। দশমবর্ষীয়া উল্কা যন্ত্রবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। তাহার দুই সখী বাসবী ও

বীরসেনা মৃদঙ্গ ও মন্দীরা বাজাইতেছে। কক্ষের এক কোণে বেদীর উপর বসিয়া শিবামিশ্র বিচারকের দৃষ্টিতে নৃত্য দেখিতেছেন।

উল্কার গীত : শঙ্কর শশাঙ্ক মৌলি
শিব সুন্দর হর শম্ভু দিগম্বর
করধৃত ডমরু জয়জয় শশাঙ্ক মৌলি।
শিরে সুর-শৈবলিনী
নৃত্য-উচ্ছল জলভঙ্গ—
টলমল তরল-তরঙ্গ—
—জয় জয় শশাঙ্ক মৌলি।

নৃত্যগীত শেষ হইলে উল্কা শিবামিশ্রের পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

উল্কা : পিতা, আজ আমাদের নৃত্যগীত আপনার ভাল লেগেছে ?

শিবামিশ্র : হাঁ বৎসে, ভাল লেগেছে। এখন যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।

উল্কা সখীদের লইয়া প্রস্থান করিল। শিবামিশ্র উঠিয়া চিন্তান্বিত মুখে গণ্ডের ক্ষতচিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে গবাক্ষ পথে দেখা গেল। একটি লোক তোরণ পথে প্রবেশ করিতেছে।

শিবামিশ্র : নাগবন্ধু ! এস বৎস।—

নাগবন্ধু কক্ষে প্রবেশ করিয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল।

শিবামিশ্র : জয়োস্তু। অনেকদূর পথ এসেছ, আসন গ্রহণ কর। পাটলিপুত্রের সংবাদ কি ?

নাগবন্ধু মাটিতে বসিল, শিবামিশ্রও সম্মুখে বসিলেন।

নাগবন্ধু : প্রভু, চণ্ডের অত্যাচার আর তো সহ্য হয় না—প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

শিবামিশ্র : ভাল ভাল।—তারপর ?

নাগবন্ধু : চণ্ডের যথেচ্ছাচারের কোনও বল্গা নেই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সকলের ওপর উৎপীড়ন করছে। উচ্চ-নীচ নেই, ধনী-নির্ধন নেই—

শিবামিশ্র : ভাল ভাল।

নাগবন্ধু : প্রভু, এবার এর প্রতিকার করুন। অসহায় প্রজাপুঞ্জের শক্তি নেই, তারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে। তাদের দুর্গতি চরমে উঠেছে—

শিবামিশ্র : না নাগবন্ধু, এখনও চরমে ওঠেনি। প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি যেদিন চরমে উঠবে, সেদিন কাউকে কিছু করতে হবে না, তাদের সম্মিলিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠে চণ্ডকে গ্রাস করে ফেলবে। আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করছি।

নাগবন্ধু : কিন্তু—যতদিন তা না হয় ততদিন আমরা কী করব ?

শিবামিশ্র : সমিধ সংগ্রহ কর, সমিধ সংগ্রহ কর, প্রজাপুঞ্জের মনে যে বিদ্বেষ ধোঁয়াচ্ছে তাকে নিভ্‌তে দিও না। আর বেশী দিন নয়, চণ্ডের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিশুনাগ বংশের চির নির্বাণ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—

তাঁহার নির্নিমেষ দূরদর্শী চক্ষু ভবিষ্যের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিজ্‌লভ্‌।

দিবাকাল। পাটলিপুত্রে চণ্ডের রাজসভা

চণ্ড সিংহাসনে আসীন। এই দশ বৎসরে চণ্ডের আকৃতি আরও বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; সুরার প্রভাবে দুই চক্ষু কষায়বর্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। দুইজন কিঙ্করী সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া চণ্ডকে আসব যোগাইতেছে।

সভায় সভাসদের সংখ্যা অল্প। পূর্বতন সভাসদ কেহই নাই, গ্রহাচার্যও অন্তর্হিত হইয়াছেন, বটুক ভট্টেরও দেখা নাই। যে কয়জন নবীন সভাসদ আছে তাহারা বিবিষ্ট মনে বসিয়া সুরাপান করিতেছে।

বাহিরে শৃঙ্খল-ঝণৎকার শুনা গেল। দুইজন যমদূতাকৃতি রক্ষী একটি শৃঙ্খলিত যুবককে মধ্যে লইয়া প্রবেশ করিল এবং চণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকের নাম সেনজিৎ, বয়স অনুমান কুড়ি বছর। তাঁহার আকৃতি সুশ্রী, দৃষ্টি নির্ভীক।

সেনজিৎ : মহারাজের জয় হোক !

চণ্ড কিছুক্ষণ গরল-ভরা চোখে সেনজিতের পানে চাহিয়া রহিলেন

চণ্ড : সেনজিৎ !

সেনজিৎ : আজ্ঞা করুন আর্য। রক্ষীরা বিনা অপরাধে আমাকে ধরে এনেছে।

চণ্ড : আমার আজ্ঞায় ওরা তোমাকে ধরে এনেছে।—সেনজিৎ, তুমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। শুনেছি তুমি পাটলিপুত্রের অধম নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা কর—এ-কথা সত্য ?

সেনজিৎ : (সরল হাসিয়া) সত্য মহারাজ। পাটলিপুত্রের নাগরিকরা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি—

চণ্ডের দৃষ্টি আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিল

চণ্ড : বটে ! এই অপরাধেই তোমাকে শূলে দিতে পারি। তুমি রাজা হতে চাও, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বস্‌তে চাও—তাই প্রজাদের মনোরঞ্জন করছ !

সেনজিৎ স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : মহারাজ ! আমি স্বপ্নেও সিংহাসনে বসবার দুরভিসন্ধি করিনি। প্রজারা আমাকে ভালবাসে—

চণ্ড : তোমাকে শূলে দেব। যাও—নিয়ে যাও।

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে সেনজিৎ দৃঢ় শান্ত স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : মহারাজ, আপনি আমার রাজা, আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাকে যদি হত্যা করতে চান সহস্তে হত্যা করুন—আমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। চণ্ডালের হাতে আমার লাঞ্ছনা করবেন না।

চণ্ড টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কটি হইতে শাণিত খর্ব কৃপাণ বাহির হইয়া আসিল। সেনজিৎ নিজ বক্ষের বস্ত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন।

অস্ত্র উদ্যত করিয়া চণ্ড থামিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিকৃত স্খলিত হাস্য নির্গত হইল।

চণ্ড : তোমাকে হত্যা করব না—তুমি শিশুনাগ বংশের শেষ পুরুষ।—কিন্তু পাটলিপুত্রে আর তোমার স্থান নেই, তোমাকে নির্বাসন দিলাম। যাও, নিজ দুর্গে বাস কর গিয়ে। যদি কখনও পাটলিপুত্রে পদার্পণ কর—তোমার শূলদণ্ড হবে।

সেনজিতের অঙ্গ হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

সেনজিৎ যুক্ত করে বলিলেন—

সেনজিৎ : ধন্য মহারাজ।

ডিজল্‌ভ।

দিবাকাল। বিগত ঘটনার পর আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। বৈশালিতে শিবামিশ্রের গৃহে একটি বতায়নের সম্মুখে শিবামিশ্র ও নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন। শিবামিশ্রের ভ্রূযুগল পলিত হইয়াছে।

শিবামিশ্র : ভাল ভাল—আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল এবার ফলবে। চণ্ড চণ্ড—! আমি ভুলিনি (গণ্ডে অঙ্গুলি বুলাইলেন) যেদিন তোমার ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে ফেলে ক্ষিপ্ত প্রজারা পদাঘাত করবে, তোমার রক্ত কুকুরে লেহন করবে—সেদিন, আমার হৃদয় শীতল হবে—

নাগবন্ধু : সেদিন আসতে দেরী নেই—প্রজারা মনে মনে আগুন হয়ে উঠেছে, একটা সূত্র পেলেই ফেটে পড়বে।

শিবামিশ্র : সেই সূত্র শীঘ্রই পাবে। সামান্য কারণ থেকে বৃহৎ কার্যের উৎপত্তি হয়, একটি ক্ষুদ্র দীপশিক্ষা সুযোগ এবং অবকাশ পেলে একটা নগর ভস্মীভূত করতে পারে। জনগণ সামান্য নয়, তাদের ক্রোধ ক্ষুদ্র নয়—চণ্ড তা বুঝবে।

নাগবন্ধু : হাঁ প্রভু।

শিবামিশ্র : কিন্তু শুধু চণ্ড নয়, অভিশপ্ত শিশুনাগ বংশের সকলকেই এই বিদ্রোহের আগুনে আহুতি দিতে হবে। এ কথা যেন মনে থাকে, মগধেও বৈশালীর মত প্রজা-তন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

নাগবন্ধু : হাঁ প্রভু।

এই সময় বাহিরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা গেল। উভয়ে চকিতে গবাক্ষের বাহিরে চাহিলেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে উল্কা আসিতেছে। অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী ; অঙ্গে পুরুষের বেশ, হস্তে ধনুর্বাণ। বলগা-মুক্ত অশ্ব নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

অঙ্গনের প্রান্তে ময়ূর এখনও উৎকণ্ঠ হইয়া আছে। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উল্কা ময়ূর লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর ময়ূরের চক্ষু বিদ্ধ করিল।

উল্কা বিজয়োৎফুল্লমুখে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। তারপর অশ্বের বেগ সংযত করিয়া বাতায়ন তলে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবামিশ্র স্নেহ-স্মিত মুখে বলিলেন—

শিবামিশ্র : ধন্য !

উল্কা : পিতা ! দেখলেন ?

শিবামিশ্র : দেখেছি বৎসে। আজ তোমার ধনুর্বিদ্যা সার্থক হল।

উল্কা মহানন্দে ধনুক শূন্যে লুফিতে লুফিতে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নাগবন্ধু : সেই উল্কা—শ্মশান কন্যা—গুরুদেব, উল্কা যে আপনার কন্যা নয় তা সে জানে ?

শিবামিশ্র এতক্ষণ স্মিত-মুখে বাহিরে চাহিয়াছিলেন। গম্ভীর মুখে নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন।

শিবামিশ্র : না-বলিনি। মহাকাল করুণ যেন বলবার প্রয়োজন না হয়।

শিবামিশ্রের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

শিবামিশ্র: নাগবন্ধু, তুমি পাটলিপুত্রে ফিরে যাও—সুযোগের প্রতীক্ষা করবে; সুযোগ যত ক্ষুদ্রই হোক তাকে অবহেলা করবে না। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জনতা যখন একবার ক্ষেপে উঠ্‌বে তখন আর তোমাদের কিছু করতে হবে না, জনতা নিজের কাজ নিজেই করবে।—জয়ী হও বৎস, এবার যখন আসবে তোমার মুখে যেন চণ্ডের মৃত্যু সংবাদ পাই—স্বস্তি!

নতজানু নাগবন্ধুর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শিবামিশ্র আশীর্বাদ করিলেন।

ফেড্‌ আউট। ফেড্‌ ইন্‌

দিবাকাল। পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজকীয় মৃগয়া-কানন। কাননে নানা জাতীয় বৃক্ষ—আম্র কণ্টকী জম্বু; নানা জাতীয় পশু পক্ষী—হরিণ, ময়ূর, শশক। কাননের স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে সারস মরাল ক্রীড়া করিতেছে। দ্বিপ্রহরে স্থানটি নির্জন।

মৃগয়া কাননের ভিতর দিয়া সেনজিৎ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। অশ্বের গতি অত্বরিত। সেনজিৎ ইতস্তত বৃক্ষশাখায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু পক্ষাসন্ধানী। আশে পাশে নিশ্চিন্ত হরিণের দল বিচরণ করিতেছে কিন্তু সেদিকে তাঁহার আগ্রহ নাই। তিনি পক্ষী প্রেমিক।

লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেনজিতের দৃষ্টি পড়িল এক বৃক্ষশাখায় একটি পাখীর বাসার উপর। বাসার কিনারায় দুইটি অর্ধোদ্‌গত পক্ষ শাবক বসিয়া আছে। সেনজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বল্গার আকর্ষণে অশ্ব স্থগিত হইল। নূতন পাখী সেনজিৎ পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

পাখীর বাসার উপর কুতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া সেনজিৎ অশ্ব হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িলেন। অশ্ব নিশ্চিন্তভাবে শষ্পাহরণ করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। সেনজিৎ পা টিপিয়া টিপিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মৃগয়া কাননের প্রধান রক্ষী কুম্ভ দূর হইতে সেনজিৎকে দেখিতে পাইয়াছিল। কুম্ভ কৃষ্ণকায় অনার্য; আকৃতি যেমন ভয়ঙ্কর প্রকৃতি তেমনি রূঢ়। তাহার মাথায় কঙ্কপত্রের চূড়া। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, কটি হইতে শৃঙ্গ ঝুলিতেছে। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেনজিতের দিকে অগ্রসর হইল।

সেনজিৎ অতি সন্তর্পণে গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পিছনে কুম্ভের কটু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন

কুম্ভ: দাঁড়াও।—কে তুমি?

সেনজিৎ চকিতে ফিরিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিলেন

সেনজিৎ: চুপ—শব্দ কোরো না। পাখীর বাসায় ছানা আছে, এখনি উড়ে যাবে।

কুম্ভ কাছে আসিয়া ধৃষ্টতা-ভরা চক্ষে সেনজিৎকে পরিদর্শন করিল, রূঢ় স্বরে বলিল—

কুম্ভ: কে হে তুমি? এটা রাজার মৃগয়া-কানন তা জাননা!

সেনজিৎ পাখীর বাসার দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন পাখীর ছানা দুটি ভয় পাইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইল। কুম্ভের দিকে চোখ নামাইয়া তিনি বলিলেন—

সেনজিৎ: মৃগয়া কানন তা জানি। তুমি কে?

কুম্ভ: (সদম্ভে) আমি কুম্ভ—এই কাননের প্রধান রক্ষী। তুমি কার হুকুমে রাজার মৃগয়া-কাননে পাখী ধরে বেড়াচ্ছ? রাজার অনুমতি পত্র আছে?

সেনজিৎ: (বিরক্ত স্বরে) অনুমতিপত্র আমার দরকার নেই।

কুম্ভ: বটে! তুমি কি রাজবংশের ছেলে নাকি!

সেনজিৎ: হাঁ।

তিনি গমনোদ্যত হইয়া কুম্ভের দিকে পিছন ফিরিলেন; অমনি কুম্ভ হাত বাড়াইয়া তাঁহার স্কন্ধ ধরিল

কুম্ভ: রাজবংশের ছেলে! আমার সঙ্গে বাক্‌-চাতুরী! তোমার নাম কি?

সেনজিৎ সবলে নিজ স্কন্ধ হইতে কুম্ভের হাত সরাইয়া দিলেন

সেনজিৎ: আমার নাম সেনজিৎ।

কুম্ভের চোখে উত্তেজনা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে ক্ষণেক সেনজিৎকে সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করিয়া সহসা কটি হইতে শৃঙ্গ তুলিয়া তাহাতে ফুৎকার দিল। শিঙার শব্দ কাননের চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। তারপর কুম্ভ শিঙা নামাইয়া দন্তবিকাশ করিল

কুম্ভ: তুমি সেনজিৎ! মহারাজ চণ্ড তোমাকে পাটলিপুত্র থেকে নির্বাসন করেছিলেন—তুমি সেই!

শৃঙ্গ নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে কয়েকজন রক্ষী ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদেরও হাতে ভল্ল বেশবাস কুম্ভেরই মতন। সেনজিৎ বিপদ বুঝিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

সেনজিৎ: হাঁ, আমি সেই সেনজিৎ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অন্য রক্ষীরা আসিয়া সেনজিৎকে ঘিরিয়া ধরিল। কুম্ভ সেনজিতের মুখের উপর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল

কুম্ভ: তুমি রাজার আদেশ অমান্য করেছ—এখন রাজসভায় চল। ভাই সব একে রাজার কাছে নিয়ে চল।

রক্ষীরা সেনজিৎকে ধরিল। সেনজিৎ তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—

সেনজিৎ: কিন্তু আমি তো পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিনি—

কুম্ভ: সে কথা রাজাকে বোলো—

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিল

ডিজল্‌ভ। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(২)

সন্দেহ গেল। পাণ্ডব পরিচয় পেলেন সখার। তিনি নিজের মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে মনুষ্য-দেহধারণ করেন। যখন মায়ায় অবহিত তখন মানবের মতই ব্যবহার। যুদ্ধেও যোগদান করেছেন। বন্ধুর সারথি হয়েছেন। কিন্তু কেন?

পৃথিবীর জনগণের এবং জীবজন্তুর আচরণে কেন, প্রাকৃতিক লীলাতেও দৃষ্ট হয়—দুটা স্রোত। একটি জীবন-স্রোত সাধু অন্যটি অসাধু। একই জীব কভু সাধু কভু পাষণ্ড। ক্ষত্রিয় রাজা প্রজা পালন করে, গোচর্য্যা করে আবার মৃগয়া করে। ব্যাঘ্রী নিজের শিশুকে অতি স্নেহে লালন করে পালন করে, অন্য জীবকে হত্যা ক'রে তার শোণিত পানে তৃপ্ত করে নিজের শাবককে। সাধু মুনি অকস্মাৎ ক্রোধের দাপটে নিরীহ বককে হত্যা করে, আবার ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকে মানুষ হয় কবিগুরু। এর কোন্‌টা পথ? কোন্ কর্ম ধার্মিক? নদীর প্লাবনে গ্রাম ভাসে, কৃষি-ভূমি লাভ করে উর্বরতা। ঝঞ্ঝা ভাঙে শুকনো ডাল, বৃক্ষ পায় নবজীবন, নবীনপ্রকাশে।

এই বিরুদ্ধ ভঙ্গীর মধ্যে চরিত্রের প্রকৃত আদর্শ কী হবে সেই পথ দেখানোর উদ্দেশ্যেই তো অবতার, মহা-পুরুষ এবং মহামানবদের আবির্ভাব। সাধু ও অসাধু উভয়ই জীব-প্রকৃতি। মানুষকে জন্ম জন্মান্তর দ্বন্দ্ব করতে হয় নির্ণয় করবার জন্য, কোন পথে চল্‌লে দুঃখ কষ্টের শিকল কাটতে পারা যায়। সে দেখে কোনো কর্মে ক্ষণিক সুখ তখনই তার পিছনে আসে বিষাদ। দেহ উল্লসিত হয় সুরাপানে কিন্তু পরক্ষণেই আসে প্রমত্ত আবিলতা বা উন্মাদ পশুবৃত্তি। ভগবানের পূজার শেষে আসে কোনো দিন অশুভ অভিসম্পাৎ। অথচ ধর্ম পথ কোন্ মার্গ সে সম্বন্ধে নানা মুনি দিয়েছেন নানা মত।

মানুষ উন্মার্গ হয় তবু মনে বোঝে প্রকৃত আনন্দের একটা মার্গ আছে। মৃত্যুর তাণ্ডবের মাঝেও তার চিত্তে জাগে ধারণা যে নিশ্চয় আছে কোথাও এক অমৃত লোক। এক একবার বিদ্যুতের আলোর মত চঞ্চল আগন্তুক জ্ঞান দেয় তার সন্ধান। নিমেষে সে চিত্র দেখে মন। নিমিষে আঁধার আনে অজ্ঞানের ঘন মেঘ। এক ঋষির বাক্য শুনে নির্ণয় করে জীব জীবনের আদর্শ—ধর্ম। আবার ভিন্ন মত তাকে বিদ্রূপ করে, মন দোলে সংশয় দোলায়। বিভিন্ন মতের হয়তো একটা মত—সত্য। সে মতকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে চলে জীব। কিন্তু নিজেরই সহজাত আসুরীভাব গ্লানি আনে। মানুষ হয় পথ-ভ্রান্ত।

নিজের আবির্ভাবের কারণ বিবৃত ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন —যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি যুগে যুগে মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ করি। সাধুদের রক্ষা, দুষ্কৃতদের বিনাশ আমার দেহ ধারণের কারণ।

অনেক কথা। প্রত্যেকটি বোঝবার। গীতার শ্লোক দুটি প্রসিদ্ধ।

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
> ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্মের গ্লানি হয়। তাহ'লে বিরুদ্ধমুখ মানব প্রকৃতির একটা স্পষ্ট স্রোত আছে যেটা ধর্মের স্রোত। তার গ্লানি হয়—মানুষেরই কাজ, বাক্যে, চিন্তায়। সে কী? কী বা প্রকৃত ধর্ম? কোন্ অপকর্মে তার গ্লানি?

মানুষ এখানে পথ হারায়। নানা মুনির নানা মত। তাই আবশ্যক নির্ণয় করা মুনি। কার মত প্রকৃত মত। কোন্ পথ শুভ পথ। কে দেখায় মঙ্গল বীথি—যার শান্ত ছায়ায় পৌঁছুতে পারা যায় আনন্দ ধামে, অমৃত লোকে?

এখন আমরা বুঝি আত্ম-পরিচয়ের সার্থকতা। যদি মানি কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—তাহ'লে পথানুসন্ধানের ব্যগ্রমে শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। যদি তিনি হন গুরু তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ ধর্ম। সত্যই তো নিত্য

দেখে মানুষ—কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির মিশ্রণে বহু জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়। যদি সেগুলি হয় নির্বিরোধ।

তা'হলে মানুষকে যেমন সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা ত্রিগুণময়ী মায়ার আবরণে ঢেকে তার প্রকৃত সত্বাকে, তেমনি তিনি মানুষের শুভ যাত্রা পথও গড়ে দিয়েছেন সে আবরণে অপসারণ করবার উদ্দেশে। এই ভ্রান্তি ও তার অপনোদন জীবন-লীলা।

এই অবতরণের অন্তরালে বিদ্যমান আশাবাদ। তাঁর মায়ায় মানুষ দুঃখানয়মশাশ্বত জগতে বিচরণ করে সত্য। কিন্তু সেই স্রষ্টারই সৃজন-লীলার একটা রূপ—মানুষের চরম মুক্তি। করম দোষে মানুষ মরমে জ্বালা পায়, নরক যন্ত্রণা। আবার নিজের শুভকর্মে ভোগ করে মানুষ ক্ষণিক স্বর্গসুখ। যোগ ভ্রষ্টও বহুদিন স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্য-লোকে। সে ভোগ শাশ্বত নয়। পরে সুকৃত বা শ্রীমতের গৃহে যোগ-ভ্রষ্ট জন্মলাভ করে। চির-নরক, চির-স্বর্গ আর্য্য-ধর্মের ব্যবস্থা নয়। সবারই প্রাপ্য চরম মুক্তি নিজ কর্মগুণে। সে মোক্ষের উপাধি অসীম মনে ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু এই অবতারবাদে বোঝা যায় যে মানবমনে বিদ্যমান আবরিত জ্ঞান ও আশা সেই একই ধামের যার বিভিন্ন নাম—মোক্ষ, কৈবল্য, নির্বাণ, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রভৃতি। মায়ার আবরণ উন্মোচনই জীবের উদ্দেশ্য। তাই আবির্ভাব হয় অবতার মহামানব মহাপুরুষের। আবরণ উন্মোচনের কর্মই ধর্ম। সে নিত্যকর্ম। তার গ্লানি হয় সে পথকে কণ্টকাবৃত করলে। গ্লানি হয় চিত্তকে আবিল করলে। সংস্কার বিদ্যমান প্রত্যেক চিত্তে। প্রাণ-শক্তির এ এক ধারা।

সেই আবিলতা দূর হয় মহামানবের চিহ্নিত প্রকৃত পথ অনুসরণে। মহাজন চেনাই প্রথম কথা। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মহাজন যে পথে চলে সেই পথ কল্যাণময়। কিন্তু মহাজন কে। তাই আত্ম-পরিচয়। অবতার ছদ্মবেশী মহাপুরুষ নন। কাজে কর্মে কথায় ভাবে শিক্ষায় দীক্ষায় তিনি আত্ম-পরিচয় দেন। এবং সেই অবতরণ হ'তে বোঝা যায় ভগবানের চরম ও পরম উদ্দেশ্য—জীবের মুক্তি সাধন।

তাই উদ্দেশ্যে শুনি—সাধুদিগের পরিত্রাণ।

সাধু রক্ষা কি তোজ্যদানে, আশ্রয় দানে, তাদের, যারা সাধু? সাধু ভাব মানব মনে অজ্ঞাত নিভৃতে বিদ্যমান। সে ভাবের পরিত্রাণ—মুক্তি, বন্ধন-মোচন। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিবরণ করলেন। তার অনুধাবনে, অনুসরণে বিপথ-গামী সাধুভাব পরিত্রাণ পায়। যখন দৃঢ় প্রত্যয় হয় মনে শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ সত্বায় তখন আপনি আসে তাঁর শিক্ষায় প্রতীতি। তাতে হয়—সাধুর পরিত্রাণ। মানব-মনের সাধু ভাবের মোহ-মুক্তি অবতরণের উদ্দেশ্য। অবতারের উপদেশ বাণী বিদ্যমান থাকে সমাজে।

আর এক উদ্দেশ্য—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।

দুষ্কৃতির বিনাশ। কোনো কর্মকে দুষ্কৃতি বলে জানলে তাকে বিনষ্ট করা সহজ হয় গুরুর বাক্যে আস্থা থাকলে। সঙ্কীর্ণ অর্থ নিলেও সেই একই সত্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে! অন্যায় আচরণে আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্যে বোধ আসে কর্মের অসাধুতার কষ্ট এড়াবার জন্য যখন মন প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। বিনাশ পায় দুষ্কৃত—তাতে মেঘমুক্ত চন্দ্রের মতো হয় চিত্ত উজ্জ্বল। দুষ্কৃতের বিনাশ নিষ্ঠুরতা নয় হিংসা নয়। মন্দ ভাবকে পুষে রাখা হিংসা আপনার শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রতি।

আর উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন।

ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় আপনা আপনি—সাধুভাবের পরিত্রাণে দুষ্কৃতের দমনে। কারণ সকলের হৃদ্দেশে বিদ্যমান আত্মারূপে পরমাত্মা। সাধু ভাব মুক্ত হলে, অসাধুভাব লোপ পেলে আপনি জেগে ওঠে শুভ সংস্কার যে বিদ্যমান অন্তরাত্মায়।

বোঝালেন কেন পাপপুণ্যের লীলাভূমি এ সংসারে অবতীর্ণ হন মানবদেহে ভগবান। ধর্ম মানুষের হোমাগ্নি। হোমের মলিনতা যেমন দূর করে অগ্নি, মানুষের সুবর্ণ সংস্কারকে তেমনি শুদ্ধ করে ধর্ম-প্রবৃত্তি। ধর্ম কর্ত্তব্য-বুদ্ধি। সে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় জগদ্গুরুর শিক্ষায়। মানুষের মন সমর ক্ষেত্র। অধর্ম সদাই রণোন্মত্ত অধর্মের সাথে। ভোগ-স্পৃহা ও ইন্দ্রিয়-সুখের লালসা জগৎ জুড়ে। তাই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের গ্লানি অনুভূত হয় যুগে যুগে। ব্যষ্টি মনের বিভিন্ন ক্ষণ এক এক যুগ। মাত্র কি সমাজে অধর্মের প্রাবল্য হয় বিভিন্ন যুগে? প্রত্যেকের চিত্ত-জগতে যুগে যুগে ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাবের পরিবর্ত্তন। মানুষের হৃদ্দেশে শুভ চেতনারূপে ভগবান অধিষ্ঠিত। কিন্তু আঁধারের

ঘনঘটা মুহূর্ত্তে ঢাকে শুদ্ধ চেতনা। সত্যের দর্শন পেতে গেলে আঁধার-ঘেরা মনের মাঝে প্রয়োজন হয় জ্ঞান। জ্ঞান আলোক। অন্ধকার কক্ষে আলো জ্বললে কক্ষের স্বরূপ ফুটে ওঠে। শুভ্র জ্যোতির ঝরণা ধারা দেখিয়ে দেয় সুন্দরকে। সত্য-সুন্দর আনন্দ। কিন্তু সাধককে থাকতে হয় সদা সতর্ক তিমির নাশের আয়োজনে।

প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যখন শুদ্ধ চেতনা আসে, তখনই আসে সে অবতার রূপে। শুদ্ধ জ্যোতির উদ্দেশ্য মনের সাধু ভাবের পরিত্রাণ পাপের ধ্বংস। উদ্বোধন-কালই যুগ।

ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোনোটির জীবনে পরিত্রাণ নাই মন্দের অভিযান হতে। গুরুর মুখে শোনে মানব গোষ্ঠী অব্যয় অনন্ত সত্যের বাণী। অসত্য দানব যখন মনের দেবতার সিংহাসন অধিকার করে, মনের মাঝে ওঠেন দেবী—নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্তি। শ্রদ্ধা মানব মনের বৃত্তি। শ্রদ্ধা কার প্রাপ্য সে মানুষ বা দেবতাকে চেনা বুদ্ধির কাজ। তাই সমাজ যাঁকে মহাপুরুষ মহামানব ব'লে মেনে নেয়, তিনি মহাজন। তেমন মহাজন যে পথে যান সেইটিই পন্থা। এই ধারণায় যুধিষ্ঠিরের বাণীর সম্যক উপলব্ধির সম্ভব। নানা মত নানা পথ, নানা মুনির নানা মত। বেদ বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন। বড় আশ্চর্যের বিষয়, যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

অর্জ্জুনকে যে বাণী শুনিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি বাণী শুনিয়েছিলেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহামুনি নারদকে।

"হে নারদ তুমি (মানব নেত্রে) আমাকে যেমনটি দেখেছ সে আমারই গড়া মায়ার রূপ। প্রকৃতির তিনগুণ যুক্ত আমি এখন। তুমি মানব নেত্রে আমার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হবে না।*

এই মায়ায় দেহ সৃষ্টির কথা কইলেন শ্রীভগবান। হে ভারত যে যে সময় ধর্মের হানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।†

জগতের ধারা ভগবানের লীলা। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান বা যুক্তির বাহিরে। অথচ আগে যাওয়ার সম্ভাবনা অনুভূত হয় সকল দিনে। মানব জীবন সুখদুঃখের অভিধান, শান্তি ও সংস্কারের অভিযান। বাহিরের ও অন্তরের শান্তিতে দুষ্কৃতের বিনাশ। মনে শুভ যুগে অবতীর্ণ হয় কল্যাণকর প্রেরণা—সেই তো অবতার ব্যষ্টি মনে। তাকে চিনলেই দুষ্কৃতের বিনাশ সম্ভব অল্প আয়াসে। পিতামাতা সহজ স্নেহকে রূপ দেন পুত্রের পবিত্র জীবন গড়বার একনিষ্ঠ প্রয়াসে। সে কর্মের মাঝে থাকে আদরের গোপালের শাস্তি। সে তো নয় জনকজননীর নিষ্ঠুরতা। মঙ্গলের আবাহন এ শাস্তি। শাস্তি শুদ্ধির ব্রত। পাপ বিনষ্ট হয় পুণ্যময় শিক্ষায়। তার ধ্বংস সুকৃতির অনুষ্ঠানে। জগদীশ্বরের এ বিধিতো নিত্য হয় উপলব্ধি।

আমার মনে হয় মাত্র একবার ত্রেতায় বা দাপরে মানুষের দেহে জন্মগ্রহণ করে ভগবান সেই যুগের নিজের সমসাময়িক সাধুর পরিত্রাণ বা দুষ্টের বিনাশের উদ্দেশে অবতরণ করেছিলেন, এ কথা শুচিত হয়নি অবতারের, প্রসঙ্গে। অবতার বিশুদ্ধ নীতি পরিবেশন করেন। বাক্য শেষ হয় নীতি থাকে। সে নীতিকে ভগবদ্বাক্য রূপে মানা জীবনে সাধনার প্রধান সোপান। তারপর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণকে মানলে তাঁকে জানা যায়। তিনি অব্যয় মৃত্যুহীন। অনন্ত তিনি যেমন অর্জ্জুনের রথের সারথী হয়েছিলেম, তিনি আমাদেরও প্রত্যেকের মনের রথের নিত্য-সারথী। অর্জ্জুন সেদিন যেমন তাঁর কথা শুনেছিলেন, তেমনি নিত্য আমরা তাঁর বাণী শুনতে পারি তাঁর সাথে নিত্য বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতালে। তখন তাঁর পরিবেশিত সকল কল্যাণের বাণী শুনতে পাই। মনে যুগে যুগে পলে পলে আবির্ভাব হল শুদ্ধ বুদ্ধি রূপে ভগবান। উদ্দেশ্য সাধুভাবের পরিত্রাণ ধর্মের সংস্থাপন। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপ পেয়েছিল শাশ্বত সত্যের। সে সত্য বিবৃত হয়েছে উপনিষদে।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মন প্রগ্রহমেব চ। ১।৩।৩। কঠ।

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম জানবে। তার পরিণাম কি?

বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম।

কঠ ১।৩।৯।

* মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নতু মাং দ্রষ্টুমর্হসি। শান্তিপর্ব। ৩৩৯।৪৫।

† গীতা ৪।৭

বিবেক-বুদ্ধি যার সারথি, যে ব্যক্তি মনকে সংযম রজ্জুরূপে ব্যবহার করে, সে ভবকাণ্ডারী সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ বেগবান অশ্ব মনোরথের।

নর যেমন সংযমের দ্বারা উন্মার্গগামী বাসনার গতিকে সংযত করতে পারে তেমনি আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মোহের পথে হয় ধাবিত। ইন্দ্রিয় জয়ের চঞ্চলতায় তাই আবশ্যক সেই সময় অবতারের সন্দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ জীবের জন্য পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তেই অবতরণ করতে পারেন আমাদের শুভ বুদ্ধিরূপে দেহ রথের ইন্দ্রিয় অশ্বদের পরিচালনার জন্য বুদ্ধি যদি সংযত করে মনরূপ লাগাম টেনে।

আত্ম-পরিচয়ের পথ শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—আমার জন্ম কর্ম প্রকৃতপক্ষে যথার্থরূপে যখন মানুষ দেখে, তখন আর তার পুনর্জন্ম হয় না। সে পায় আমাকেই।*

কঠোপনিষদের কথা রূপায়িত হ'ল—ভবকাণ্ডারী সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদলাভ করে সে বিজ্ঞান যার সারথি। সে বিজ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপনিষদ গাভীকে দোহন ক'রে সে তত্ত্ব বিবৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং, এ ধারণা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হলে আর সন্দেহ থাকবে না—বিজ্ঞান সারথির রূপ। তাঁর নির্দিষ্ট শিক্ষাই মনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হবে।

এ কথার সত্য উপলব্ধি সহজ হয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধায়। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। যদি সংশয় উপস্থিত হয় কোনো গুরুর উপদেশ হয় না গ্রাহ্য। যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই আমরা মহতের বাক্য স্বীকার করি। সেই মহাজনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে অজ্ঞানের মোহ উন্মোচন করে জ্ঞান। জগতের প্রতিকর্মে এ সত্য মেনেছে নর, তাই পদার্থ বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে হয়েছে তার অগ্রগতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবৃত করেছে জীবনের বহু রহস্য কথা, একের পর এক জীবনের মূলগত রহস্য সমাধান করেছে। যদি সেই সব সত্যের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষভাবে বিচার করবার আগ্রহ থাকে মনে, সমাধান সম্ভবপর হয় না কোনোদিন। কারণ জীবনের অতি অল্প রহস্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানে। তাদের অনুভূতি উজ্জল ক'রে মনকে। আত্মা অনিত্য কি নিত্য, মৃত্যুর পরপারে জীবন আছে কিনা এ সব সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণে মীমাংসা হয় না।

* জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।৪।৯

আপ্তবাক্য তাই প্রমাণ। যদি শ্রীকৃষ্ণকে মানা যায়, তাঁর বাক্যকে জানা যায় সত্য। তখন অন্তরাত্মা প্রমাণ পায় জীবন রহস্যের। তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—আমার জন্ম কর্ম প্রকৃতপক্ষে যথার্থরূপে যখন দেখে মানুষ, তার আর পুনর্জন্ম হয় না। সে আমাকে পায়।

মায়া ও সচ্চিদানন্দের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোজা কথায় বুঝিয়েছেন।

"মহামায়ার মায়া যে কি তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোটো জ্যোতি এসে ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। আর জগৎকে টেনে ফেলতে লাগলো। আবার দেখালে যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা। হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিককার পানা নাচতে নাচতে এসে, জলকে ঢেকে ফেললে, দেখালে ঐ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না। যদি এক একবার চকিতে দেখা যায় তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে।"

এ চিত্র জীবনে নিত্য দেখে লোক। কিন্তু পানার নাচনই রাখে তার মন প্রাণ পূর্ণ করে।

আমার মনে হয় গীতায় শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-পরিচয়ের এই কারণ। তাঁকে মানলে মানা হবে তাঁর বিবৃত সত্যকে তর্ক বা সংশয়ের ঝঞ্ঝাটে না পড়ে। প্রতি শ্লোকের কি অর্থ প্রত্যেক বিষয়ের মূলতত্ত্ব কি সে সব কথা আমরা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে বুঝব। তার পর চেষ্টা করব সেই শিক্ষানুসারে দৈনিক জীবনযাপন করতে।

এতে ভুল ভ্রান্তি হবে। কিন্তু যদি তাঁর উপর পূর্ণ-বিশ্বাস থাকে, তিনিই হৃদয় মন্দিরে অবতীর্ণ হয়ে যুগে যুগে সাধুভাবকে পরিত্রাণ করবেন অন্যায় বাসনারাশিকে ধ্বংস করবেন।

তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেবেন, মানুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করলে, তাঁর অমোঘ উপদেশ জীবনের পরম লক্ষ্য করলে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তস্তলে উঠবে চেতনা—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

"তুমি অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, অনাদিপুরুষ তুমি এই বিশ্বের পরম আধার। তুমিই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়। পরম-পদও তুমি। তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব"।

যাত্রাগান

শ্রীজয়দেব রায়

...ন্য কলায় 'ক্রমবিকাশের' ইতিহাসে যাত্রার মূল্য যথেষ্ট। প্রাচীন-... হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যাত্রাগানের রীতি-...াদর ছিল। যাত্রার প্রাচীন নাম ছিল 'নাটগীত'।

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহো বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে॥

(কৃত্তিবাস)

...র বাংলায় নাট্যকলার রীতিমত চর্চ্চা হইত। 'তুম্বরু' নাটক ...—একটি নাট্যসম্পর্কীয় গ্রন্থ ছিল। চর্য্যাপদে 'বুদ্ধ নাটকের' ...তের উল্লেখ আছে। 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থটি বাংলার সঙ্গীত-... প্রাচীনতম আলোচনা পুস্তক, তাহাতেও নাট্যগীতের উল্লেখ ...।

...াপ্রভু ছিলেন যাত্রার বিশেষ অনুরাগী; চন্দ্রশেখর ও শ্রীবাসের ...ার তিনি নিজে যাত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন।—

বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্ত হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি, ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধবশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেগ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বারবার॥
এইমতো রামযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥

(চৈতন্ত চরিতামৃত)

থিয়েটারের বহিরঙ্গীয় রূপসজ্জা বিলাতী কায়দায় হইলেও ক্রমোন্মেষ এদেশে যাত্রাভিনয় হইতেই হইয়াছে। থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার নাটকের পার্থক্য যথেষ্ট, তবে তাহার আঙ্গিকের ...র পালার আঙ্গিকের তফাৎ প্রধানতঃ পরিবেশণ প্রণালীতে। ...টারের নাট্যাভিনয়ের আয়োজন অনেক, তাহার রঙ্গমঞ্চ চাই, ... চাই, পটবৈচিত্র্য চাই, নানা বাজনা, সেদিক দিয়া যাত্রার ...নেক। যে আসরে কীর্ত্তন গাওয়া হইত, কবির গানের ...তা চলিত, সেখানে যাত্রাও অনায়াসে বসিত। পাঁচালীর ...ার পার্থক্য অল্পই; যাত্রাভিনয়ের জন্ত একাধিক লোকের পাঁচালীতে একজনই নানা রঙ্গভঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা ...তে পারিত।

পাঁচালীকাররাই পরবর্ত্তী যুগের যাত্রার আসরের পূর্ব্বাভাস সৃষ্টি করিতেন। বিখ্যাত যাত্রাধিকারী ব্রজমোহন রায়; মতিলাল রায় প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বে পাঁচালীগায়ক ছিলেন। পাঁচালীর আসর হইতেই উদ্ভব হয় যাত্রার পালাগানের। আবার আধুনিক যুগের থিয়েটারও সেই যাত্রার আসরের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক আর আসরের যাত্রার পালার মধ্যে আর একটি স্তর আছে, তাহা 'গীতাভিনয়ের'। সুরুচিসম্পন্ন নাগরিক আসরে যাত্রার পুরাতন পালাগুলিকে একটু নবযুগের ভাবে অভিরঞ্জিত করিয়া অভিনয় করা হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এগুলিকে তখন বলা হইত 'গীতাভিনয় বা গীতিনাট্য'।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী কায়দায় নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে বহু নাট্যকার গীতাভিনয়ের পালা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি।

ঠিক ইংরেজী অপেরা ঢঙে রচনা এগুলির নয়, সে ধরণের গীতিনাট্য অভিনীত হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে। সেকালে হরিমোহন রায় নামে একজন নাট্যকার প্রথম অপেরা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী জানাইয়া গিয়াছেন—

"অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ণ করে নাই। বহু দিবস হইল, আমি 'জানকীবিলাপ' নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত অপেরার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকীবিলাপখানি কথঞ্চিত অপেরার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালে আশ্বিন মাসে প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও 'জানকীবিলাপের, কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ।"

যাত্রার মূল উপজীব্য কিন্তু নাটক নয়, সঙ্গীতই! এককালে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র অংশই তো ছিল সুরে নিবদ্ধ। তাহার কারণ কেবল বাঙ্গালীর সুর প্রবণতাই নয়; প্রচারের সুবিধার জন্তই কবিদের রচনা গায়কদের কণ্ঠের উপর নির্ভর করিত। একটা পুঁথি হয়তো থাকিত যাত্রার অধিকারীর কাছে, আর তাহার অধিকারের বলেই তিনি হইতেন দলের অধিপতি। দূরদূরান্তর গ্রামগ্রামান্তর হইতে অভিনয় বিলাসীর তরুণদল হাজির হইত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্ত, গুণী বাদ্যকরর। তাঁবেদারী করিত তাঁহার দয়ার আসরে ঠাঁই পাইবার লোভে। পাঁচালী, খেউড়, কীর্ত্তন কোন গানেই বেশী লোকের প্রয়োজন হইত না, কিন্তু

্রার অভিনয়ের জন্য চাই নানাশ্রেণীর নানাবয়সের অভিনেতাদের, সেই যাত্রার দলে ভীড় করিত অনেকেই।

যাত্রার সুবিধা ছিল অনেক। আসর সজ্জা, রঙ্গমঞ্চ কিছুই লাগিত । একই রামায়ণের কোন কোন কাহিনী, যেমন—হনুমানের প্রভুভক্তি, ভারতের কোন কোন কাহিনী, যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিংবা কৃষ্ণের লীলারঙ্গ লইয়াই রাশি রাশি পালা রচিত হইয়াছিল। তাহার র ছিল বিদ্যাসুন্দরের পালা, ঐ আন্তঃপ্রাদেশিক (Inter ovincial) প্রেমকাহিনী সে যুগের লোকের কি ভালোই না গিত।

যাত্রাগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য মূলতঃ চারটি :—প্রথমত যাত্রা আগা-ড়া সুরের সূত্রে গ্রথিত। কেবল যাত্রাই নয়, আমাদের পাঁচালী, বর গান, গাথাকাহিনী এমন কি চৈতন্যমঙ্গল গানও ছিল এইপ্রকার রর সূত্রে গ্রথিত। যাত্রায় সবাই গান করে, রাজা বিচারের ধিবিধানে, যোদ্ধারা যুদ্ধোদ্যমে, দেবতারা বরাভয় দানে, এমন কি নবরা স্বর্গবিজয়ের জল্পনাতেও গান ধরিত। কাহিনীর আখ্যান ধারার ধিকাংশই গানের মাধ্যমে প্রকাশ পাইত।

থিয়েটারের পরিপূরকরূপে যাত্রার চলন কিছুকাল রহিয়া যায়। নেক সময়ে থিয়েটারের নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গানের সমাবেশ রিয়া তাহাকে যাত্রার পালায় পরিণত করা হইত। মধু-নের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি গ্রীক আদর্শে গঠিত নাটকও ভাবে যাত্রার আসরে অভিনীত হইত। গিরিশচন্দ্রও যাত্রার লা রচনা করিতে গিয়া তাঁহার নট ও নাট্যকারের জীবন শুরু রেন।

যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বড়ো বড়ো বক্তৃতা। যাত্রার আসরে বসর পাইলেই অভিনেতারা দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। এই সকল কৃতাতেই সুযোগমত তত্ত্বকথা, হৃদয়োচ্ছ্বাস, ধর্মোপদেশ, এমনকি সাময়িক ঘটনাবলীর কথাও বিবৃত করিয়া লইতেন।

অনেক সময়ে বক্তৃতা আবার পদ্যে গ্রথিত হইত। গিরিশচন্দ্রের টকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে অনেক পালায় বক্তৃতা চলিত। কথায় সুরু করিলে অভিনেতারা অন্তরের উদ্দীপনাতেই ছন্দ রাখিয়া লতেন। এ ভাবে যাত্রায় কথা বলায় বিচিত্র ঢঙই গড়িয়া ঠিয়াছিল। থিয়েটারের যুগে নানা প্রকার ভাবাবেগের সাহায্যে এ কার দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন আর ছিল না।

যাত্রার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহাতে আর্ট ও আঙ্গিকের অপেক্ষা শ্রোতাদের রুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত। কিন্তু যাত্রাগানের কাহিনীর বচিত্র্য ছিল না। যাত্রার নাটকীয় উপাদান ছিল যেমন অল্প, তেমনই আসরের অভিনয়কালে ঔৎসুক্য বা Suspense সঞ্চারের কোন চেষ্টাই ছিলনা।

শ্রোতাদের রুচির পরিবর্তনের চেষ্টা হইত না। তাহাতে কৃত্রিমতা পেক্ষা অবশ্য স্বাভাবিকতারই সঞ্চার হয়। যাত্রার আঙ্গিক নির্ভর রিত স্থান কাল পাত্রের উপর। অভিনেতারাও তাহাদের আর্টের পারদর্শিতা দেখানো অপেক্ষা বক্তৃতা শোনানোই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। চারিপাশের সবাইকে তাহারা দর্শক বলিয়া ধরিত না, শ্রোতা বলিয়াই গণ্য করিত।

চতুর্থতঃ, যাত্রাগানের প্রধান রস ছিল ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মঙ্গলকাব্যে যেমন মানুষের অপেক্ষা দেবতার লীলাকে প্রাধান্য দিয়া তাহাকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইত, সেইরূপ যাত্রার পালায় সব সময়ে 'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় দেখাইতে গিয়া দেবমহিমার গুণগানেই ভরিয়া উঠিত।

সে আমলে নাট্যকারদের পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই হাতে ছিল না। পরবর্তী' কালে সামাজিক পালা লইয়াও যাত্রা রচিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসুন্দর ও নলদময়ন্তীর কাহিনীকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া নূতন যাত্রাগানকে প্রথম স্বধর্মচ্যুত করিয়া যাত্রার পালা রচিত হইল।

ক্রমে পরিবেশন প্রণালীতে আধুনিকতা আসিল, সঙ্গীতকে বাদ দিলেও যাত্রার বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই সে চেষ্টা না করিয়াও আভনয়কলার প্রাধান্য দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা হইল। রসেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল—করুণরসের স্থান লইল ক্রমে বীররস। দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও ইতিহাসের ছায়া পড়িল যাত্রার উপর; স্বাধীনতা-সংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, সমাজসংস্কার, আইন-লঙ্ঘন প্রভৃতির প্রভাব যাত্রার আসর এড়াইতে পারে নাই।

বিদেশী শাসন ও দেশের অবস্থার জন্য সে প্রভাব নাট্যাভিনয়ে স্পষ্টভাবে সক্রিয় হইতে পারে নাই, তবে করুণরসের পালার স্থানে বীররসের যুদ্ধবহুল পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পালা খুব সত্বরই দখল করিয়া লইল। কর্ণবধ, মেঘনাদবধ, যদুবংশধ্বংস প্রভৃতি পৌরাণিক এবং ধর্মপরীক্ষা, বনবীর, প্রতাপসিংহ, কালাপাহাড়, কেদার রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালার সমাদর হইল।

অভিনেতাদের ব্যক্তিগত কলাকুশলতায়ও আদর হইল। ব্যক্তিগত কলাচার্যের প্রাধান্য দেওয়া হইল—এক একটি বিশেষ ভূমিকার জন্য এক একজন অভিনেতা সুনাম অর্জন করিল।

পূর্বে স্ত্রী ভূমিকায় মেয়েরা অভিনয় করিত না। বালকরাই যুবতী নারীর এবং যুবকেরা গোঁফ কামাইয়া প্রৌঢ়া রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। কেবলমাত্র এই কারণেই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় যাত্রায় কোনদিন সাফল্য অর্জন করে নাই। মেয়েরা অংশ গ্রহণ করিলে রক্ষণশীল জনগণ নিশ্চয় যাত্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু প্রথম তাঁহার যাত্রাদলে স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় করাইলেন।

যাত্রার জমজমাটের শেষ যুগে কয়েকজন স্ত্রীলোক নিজেরাই যাত্রার দল পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের মধ্যে চন্দননগরের মদন মাষ্টারের পুত্রবধূ দল চালাইতেন। সে দলের নাম ছিল 'বৌ-মাষ্টারের দল'। নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডুর যাত্রার দলও তাঁহার পত্নী চালাইতেন —সে দলের নাম ছিল 'বৌ-কুণ্ডুর দল'। থিয়েটারের প্রথম যুগে

গণিকারাই তাহাতে অংশ গ্রহণ করিত, অনেক যাত্রার দলেও গণিকাদের লইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

ক্রমে আর একটি দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেখা গেল, একই গল্পের এক একটি বিশেষ দল সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে। অভিনয় সঙ্গীত সব কিছুই ভাল হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন পালা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে কেবল কবিত্বময় রচনা ও সংলাপের অভাবেই, তাহা অধিকারীরা বুঝিলেন। তখন ডাক পড়িল কবিদের, সুন্দর সুন্দর পালা রচনার আমন্ত্রণ পাঠানো হইল।

সুরের বৈশিষ্ট্যের দিকেও লক্ষ্য করা হইল। উচ্চাঙ্গের কৌশলের গান—নিধুবাবুর টপ্পা, মধুকানের ঢপ রীতিমত আসর মাতাইয়া রাখিতেছে দেখিয়া সেইপ্রকার গানেরই আয়োজন করা হইল। অভিনেতাদের গান ছাড়া নেপথ্যে গেয় গানের ব্যবস্থা হইল। যাত্রার আসরের এই নেপথ্য গায়কের নাম ছিল 'বিবেক'। 'বিবেক' গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো।

অর্কেষ্ট্রার উন্নতি হইল, আসরে নূতন বিলাতী বাজনা হারমোনিয়াম ও ক্ল্যারিওনেটের চলন হইল।

গান ছাড়া জনমনোরঞ্জনের জন্য যাত্রার আর দুইটি অনুষঙ্গ ছিল—নৃত্য ও রঙ্গরসিকতা। যাত্রাদলের প্রায় সকলকেই অল্পবিস্তর নাচিতে হইত। পাত্র পাত্রী তো অভিনয়ের সময় নাচিতই, তাহা ছাড়া একদল ছোটছেলেকে মাঝে মাঝে আসরে নাচিতে পাঠানো হইত। তাহাদের পায়ে নুপুর ও মলের ঝুমুর আওয়াজ হইত বলিয়া সে সব নাচের গানের নাম 'ঝুমুর'। পরবর্ত্তী কালে ঝুমুরের জন্য পৃথকদলের সৃষ্টি হয়।

তাহার সঙ্গে ছিল রঙ্গরসিকতার ছড়াছড়ি। সার্কাসের ক্লাউনের মত একদল অভিনেতা মধ্যে মধ্যে আসরে আসিয়া চূড়ান্ত ভাঁড়ামী করিয়া যাইত।

বলাবাহুল্য এ সকল রঙ্গরসিকতা প্রায়ই সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিত। পাত্রপাত্রী রূপসজ্জা না করিলেও এ সব সংদাররা রঙচঙ মাখিয়া কাতুকুতু দিয়া দর্শকদের হাসাইবার চেষ্টার কসুর করিত না।

যাত্রায় আর একটি গায়কদল থাকিত, তাহার নাম জুড়ী, এই দলে গায়করা নেপথ্যে পাত্রপাত্রীর সঙ্গে ধুয়া ধরিত, আর দরকারমত মধ্যে মধ্যে যাত্রার মূল গল্পটাকে গান গাহিয়া শুনাইয়া দিত। চন্দননগরের মদন মাষ্টার এই জুড়ী গানের প্রবর্ত্তক। তাহারা আদালতের মোক্তারদের মত পোষাক পরিত। তাহাদের গানের সুর ছিল উচ্চাঙ্গের। সাধারণতঃ চারজন জুড়ী আসরের চারকোণে দাঁড়াইয়া গান ধরিত। মাঝে মাঝে একজন বাকী তিনজনকে থামাইয়া সুরের খেলা দেখাইত, গিটকিরি চালাইত।

তিন প্রকার যাত্রা প্রচলিত ছিল—কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয় দমন, রাম-যাত্রা ও শিবযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রার সুনাম অর্জ্জন করেন শিশুরাম অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলার ভাজনঘাট। তিনি ঢাকায় থাকিতেন। তিনি এই কালীয়দমন পালায় বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেন, তাঁহার 'রাই-উন্মাদিনী' সুপ্রসিদ্ধ গীতাভিনয়। তাহা ব্যতীত তাঁহার স্বপ্নবিলাস, নন্দহরণ, সুরথ-সংবাদ, ভরত মিলন, নিমাইসন্ন্যাস প্রভৃতিও যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করে। তাঁহার যাত্রার একটি বিখ্যাত গান এই—

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন চিরদিনের জন্য, নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। যশোদা জননী ঘরে ঘরে তাঁর নীলমণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সখা সুবলকে ব্যাকুল হয়ে শুধাচ্ছেন—

ও সুবলরে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী।
এখন আমার চিন্‌বিনে বাপ ;
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারায়ে সে ধন, হলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস্ নে সুবল।
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্ত মণি॥"

যাত্রায় কোন কোন অংশ গাহিয়া বক্তৃতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইত এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইত। কীর্ত্তনের আসরের সঙ্গে তাহার কতকটা মিল ছিল। যাত্রার ভাষায় এই অঙ্গের নাম 'ঘটকালি'। এই ঘটকালির দ্বারা যাত্রার এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশ গ্রথিত হইত, তাহার নিদর্শন—কৃষ্ণযাত্রার পূর্ব্বোল্লিখিত গানের ভূমিকার কথনটুকু।

রামযাত্রায় সুনাম অর্জ্জন করেন প্রেমচাঁদ অধিকারী, বেণীমাধব ময়রা বর্দ্ধমানের মতিলাল রায়, বিষ্ণুপুরের রামেশ্বর শর্মা। রামযাত্রায় প্রধানতঃ সীতাহরণ, রাবণবধ, ভরতমিলন, মায়ামৃগ প্রভৃতি অভিনীত হইত।

শিবযাত্রায় সর্বাপেক্ষা সমাদৃত পালা ছিল 'দক্ষযজ্ঞ'। চন্দননগরের মদনমাষ্টার, ভূষণ দাস, যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারায় নাম করিয়াছিলেন। এছাড়া পটলডাঙ্গার নীলকমল সিংহের 'প্রহ্লাদ চরিত্র', বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়ালের 'মনসার ভাসান', ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের 'চণ্ডীযাত্রা' এবং কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারীর 'অভিমন্যু বধ' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ গীতাভিনয়।

বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় লৌকিক কাহিনীর পালাই যাত্রার শহর অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী আসর জমাইয়াছিল। এই পালায় গোপাল উড়ে এবং ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সুনাম ছিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার খেমটা নাচের ব্যবস্থা থাকিত। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"গোপাল উড়ে এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব বিলাসে ও সুমধুর কণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে' ছিলেন জোড়াসাঁকোর মল্লিক মহাশয়ের যুগপৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য। স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইহার দলের নামডাক খুব রটিয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে

উমেশ ও ভুলো গান করিত। প্রথমে রূপো, তারপর কাশী মালিনী' সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা, উমেশ সাজিত সুন্দর।"

ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারকাসুর-বধ, সাবিত্রী সত্যবান, লক্ষ্মণ বর্জ্জন। মতিলাল রায়ের যাত্রাদলের নাম ছিল "নবদ্বীপ" বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়"। তাঁহার প্রসিদ্ধ পালা ছিল ভীষ্মের শরশয্যা ও ব্রজলীলা। তাঁহার পালা গানের অংশ বিশেষ—

অমরের সনে তোরা হলি যে সমরে জয়,
তা'ওত অমরের বলে বুঝ নাকি দুরাশয়।
আর না সয়, শত্রুনাশ না হয় ন সংশয় ন সংশয় ;
আজ বর্ম্ম-চর্ম্ম-ধরা দেহ করিবে না ধরা স্পর্শন ॥

বিশ্বনাথ মাল নামক এক সাপুড়ে কবিও যাত্রাগানে নাম করিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলায় জামালপুর থানার অন্তর্গত উত্তর শুঁড়ে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি বেশ ভালই লেখা-পড়া শিখেন, তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য বদন অধিকারী তাঁহার যাত্রাদলে বিশ্বনাথকে স্থান দেন। তারপরে তিনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে যোগ দিয়াছিলেন এবং শেষপর্য্যন্ত নিজেও একটি যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁহারই রচিত কোন কোন গান রাজা রামমোহন ও প্যারীমোহন কবিরত্নের নামে চলিয়া আসিতেছে ; ইহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির পরকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। তাঁহার এইরূপ একটি সুপ্রসিদ্ধ গান—

চিরদিন কথনো সমান না যায় ;
সুখ দুঃখ দেখ উভয়ই প্রত্যক্ষ জলবিম্ব সমপ্রায়।
কভু বনে বনে রাখালেরি সনে কভু রাজত্ব পায়।
অদৃষ্টেরি ফল, কে খণ্ডিবে বল,
তার সাক্ষী দেখ মহারাজ নল,
দময়ন্তী হারালো ; রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল,
গ্রহদুঃখে কত কষ্ট পায় ॥

কোম্পানীর আমলের শেষ দিকে প্রাচীন পাঁচালী ও কবির গানের দলগুলিও যাত্রাদলে পরিণত হয়, তাহাদের নাম ছিল 'সখের যাত্রা।' হাড়কাটার গলির দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, কাঁসারীপাড়ার রামকুমার কাঁসারী ও নীলকমল সিংহের সখের যাত্রার সুনাম ছিল। দুর্গাচরণ ও রামকুমারের যাত্রাদলে পালা রচনা করিয়া দিতেন পাঁচালীকার ঠাকুর-দাস দত্ত। তাঁহাদের যাত্রাদলের লোকনাথ দাস এবং কালী হালদার পরবর্ত্তীকালে নিজেরাই যাত্রাদল খুলিয়াছিলেন।

লোকনাথ দাস বা লোকা ধোপা বাংলাদেশের একমাত্র ধোপ কবি। তিনি এবং কবিওয়ালা কেষ্ট মুচি নিরক্ষর অন্ত্যজ হইলেও কবিত্বশক্তির বলে সেকালে রক্ষণশীল অভিজাত সমাজেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকাধোপার একটি দুর্গাসঙ্গীতের কিয়দংশ উৎকলন করা হইল—

করুণা কুরু মে করুণা !
করুণা দানে করুণা কৃপণতা ক'র না !
যাত্রা করলেন দুর্গা বলে, সুযাত্রায় কুযাত্রাফলে,
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ তারা আর ডাকবে না ॥

থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রায় আদর কমিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা'তে আবার সেই ধারার অনুবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই শ্রেণীর গীতিনাট্যে নাটকীয়তার অংশ অতি সামান্যই।

ভারতের জীবন বাণী

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বিচিত্রদেশ ভারতবর্ষ—উত্তরে তুষার-কিরীটি দেবতাত্মা হিমালয়, দক্ষিণে তমাল-তালী-বনরাজী-নীলা বেলা ভূমি নীল জলধির উত্তাল-তরঙ্গ চুম্বনে চুম্বিত—মাঝে কত নদনদী—কত পর্বত-গিরি, কত মরু, কত শান্ত জনপদ, কত নরনারী আর এই বর্ণসুন্দর দেশের ইতিহাস ও কত ভাব-সুন্দর। এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে মানবের চলেছে কত বিচিত্র অভিযান।

কিন্তু সমস্ত যুগের বিবর্তনের মাঝে ভারতের জীবনে বেজেছে এক ঐক্যতান সুর—সমস্ত ছন্দের মাঝে, সমস্ত ভেদের মাঝে সেই তার পরম সুসঙ্গতি। তাকেই আমরা বলতে পারি ভারত-জননীর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা—সেই শাশ্বতী পুরাণী প্রজ্ঞার চরণে জানাই ভক্তি-নত প্রণতি। সেই জীবন বাণীরই প্রশস্তি পাঠ করব।

ভরদ্বাজ ঋষি বলেছেন :—

যঃ পাবমানীরধ্যেতি ঋষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
সর্ব্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥
পাবমানী যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পিমধূদকম্ ॥ ঋ ৯-৬৭-৩১-২

ঋষিরা সঞ্চয় করেছেন গভীর সাধনায় অমৃতরস, সেই পবিত্র পুণ্যরস যে পান করে, সে সবই পবিত্র আহার করে—মাতরিশ্বা তার জন্য সকলই সুরভিত ও স্বাদু করেন।

যে ঋষিদের সম্ভৃত পাবমানী বেদস্তুতি অধ্যয়ন করে, সেই বেদ পাঠকের জন্য সরস্বতী আনেন পুণ্যক্ষীরধারা, পবিত্র ঘৃত, স্নিগ্ধ উদক ও অতিসুমিষ্ট মধু।

সেই পবিত্র মধুবিদ্যা আমাদিগকে কি জানায় ? কি শিখায় !

সে শিখায় মানুষকে তার সত্য পরিচয়—

অকাম ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো—
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্॥

মানুষ—সত্য মানুষ—কামনার নাগপাশে জর্জরিত নয়, সে যে কামহীন—সে চঞ্চল নয়। লক্ষ বাসনার লক্ষ ধাঁধায় সে ব্যতিব্যস্ত নয়—সে ধীর, মৃত্যু তার চরম ও পরম নয়—সে যে মৃত্যুহীন—সে যে অমৃত—সে যে স্বয়ং জাত—অজ হয়েও আপন ইচ্ছায় তার রূপ অভিসার—সে যে পরম সত্তার মধুরতম রসে পরিতৃপ্ত, সে ত হীন নয়, সে ত দীন নয়, পূর্ণতার জন্য তার আদৌ ন্যূনতা নেই। মানুষ যখন জানে তার এই স্বরূপ-বৃত্তান্ত, তখন সে আর মৃত্যুকে ভয় করে না, সে তখন বোঝে আত্মা চিরযুবা—চির-জয়ী; জরায় সে জীর্ণ নয়, চির তারুণ্যের দক্ষিণ সমীরণে সে চির-স্নিগ্ধ—বসন্তের মদিরতায় সে চির-মদির। সে যুবা—সে অজর, অমর, ধীর ও শান্ত।

বৈদিক-সংস্কৃতি বাজিয়েছে এই অভয়—শঙ্খ। মানুষের মহত্ত্বের এই মর্য্যাদা যদি আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তবে নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতবর্ষে জাগবে প্রাণের বন্যা—হবে অমৃতের সঞ্জীবন—নব জীবনের মহা মহোৎসব। ভারতের সাধনা—বাঁচার ও বাড়ার সাধনা—বিবর্দ্ধনের সেই বার্ত্তা আজ দেশে দেশে মানুষের মাঝে বিঘোষিত হোক।

আমাদের চলার মন্ত্র পার্থিব—আমাদের অভ্যুদয় পার্থিব—পৃথিবীকে অস্বীকার করে যে ধর্ম, সে ধর্ম আমাদের নয়, বিরাগ নয় অনুরাগই আমাদের সেতু। কারণ যিনি পরম ইন্দ্র, তিনি ত বিশ্বের আদর্শ, তারই জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময় কারণ তিনিই—

যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব—

ভগবৎ বিভূতির প্রকাশই বিশ্বজগৎ—সকল বস্তুর প্রতিমানই তিনি।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

তারই দ্যুতির অনুসরণে জগতের দ্যুতি—তারই আলোকে সকলই আলোকিত। তাই আমাদের বৈদিক পিতামহেরা পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন—এই পৃথিবীর হাসি কান্না ও সুখদুঃখকে গ্রহণ করেছিলেন—এই পৃথিবীর যুদ্ধ ও বিগ্রহকে তারা জেনেছিলেন—জেনেও তারা কাতর হন নি—পরম বিশ্বাসে ও পরম উৎসাহে একে উন্নত করতে চেয়েছেন—মর্ত্ত্যকে অমর্ত্ত্য করতে তপস্যা করেছেন। ভুয়া বৈরাগ্যকে যারা আমাদের দেশে ধর্ম্ম বলেন, তাদের এই পার্থিব প্রীতির কথা উদাত্ত স্বরে বলতে চাই—

গিরয়স্তে পর্ব্বতা হিমবন্তো
হরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং
ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্॥

তোমার গিরি, তোমার তুষার-মৌলি পর্ব্বত, তোমার বিরাট অরণ্য, হে পৃথিবী হোক সুন্দর প্রীতিকর। তোমার মাটির কত রং, ধূসর কৃষ্ণ, রক্ত—বিশ্ব রূপই যে তার—সেই অচলা পৃথ্বী দেবতার প্রসাদে প্রসন্না—দেবরক্ষিত সেই পৃথিবীতে আমি করব পাদচারণ—হব না পরাজিত, হব না হত, অক্ষত হয়ে অপরাজেয় আমি করব আনন্দে অধিষ্ঠান।

এই ধূলির মৃত্তিকায়, যেখানে প্রতিদিন সূর্য্য এসে দেয় অমৃত-আলোক, তার জ্যোতিশ্ছটায় বিশ্বভুবনকে করে প্রদীপ্ত ও প্রতৃপ্ত—সেখানেই আমরা চাইব আনন্দের অমৃত-ভোজ—চাইব উল্লাসে উদ্দীপন—

জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসম্
নানা ধর্ম্মাণম্ পৃথিবীং যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং
ধ্রুবেব ধেনুরনপস্ফুরন্তী॥

কত বিচিত্র মানুষের কলধ্বনি মুখর এই বসুন্ধরা—কত তাদের রীতি, কত তাদের ধর্ম্ম, সেই মানবধাত্রী পৃথিবী সহস্র ধারায় আনুক আমার উপায়ন, স্বস্ত্যয়নী উপচার, আমার ভোগ সামগ্রী—কামধেনুর মত হোক তার পীযূষধারা চিরবহমান।

পৃথিবীর প্রতি এই সুগভীর ভালবাসা ছিল বলেই ভারতবর্ষের মানুষ দিক্‌দিগন্তে একদিন আপন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াতে পেরেছিল। ধর্ম্ম ঐহিককে বিসর্জ্জন করে নয়—তাকে গ্রহণ করেই লাভ করব—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স।

সেই অভ্যুদয়ের পথ—কর্ম্ম। কর্ম্ম করব না—অথচ শ্রী লাভ করবে এ হয় না। কর্ম্মহীনতা ও জাড্য আমাদের মজ্জাগত—আমরা শুতে পেলে বসতে চাই না—বসতে পেলে দাঁড়াতে চাই না—দাঁড়াতে পেলে চলতে চাই না। এটাই আমাদের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ।

কিন্তু আমাদের বৈদিক পিতামহেরা আমাদের কেবলই কাজ করতে বলেছেন—স্বধ্যাম কর্ম্মাপমানবেন—নব নব কৌশলে প্রাত্যহিক কর্ম্মকে আমরা স্বচ্ছ করব।—কর্ম্মই তপস্যা—কর্ম্মই যজ্ঞ।

এই কাজ করতে হবে অতন্দ্র হয়ে। বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে অতন্দ্র বলে। তারা স্বপ্ন দেখেন না, তারা দ্রুত কাজ করেন—তারা ঘুমান না—তারা শ্রমকাতর নন। আমাদেরও তাই হতে হবে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে অনুন্নত—আমাদের খাদ্য নেই, শক্তি নেই—সামর্থ্যহীন আমরা চোখ থাকতে ও অন্ধ। আমরা নিজের প্রতি একান্ত আস্থাহীন—তাই চাইতে ও জানি না—ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসে আমরা একান্ত দুর্ব্বল।

ভারতবর্ষকে জগৎ-সভায় দাঁড় করাতে হলে দেশে আজ কর্ম্মের প্লাবন ছোটাতে হবে—কিন্তু কর্ম্ম বন্যা না এসে আসছে কথার বন্যা—দিস্তা দিস্তা কাগজে আমাদের বিজয় প্রশস্তি আমরা লিখছি—বক্তৃতার

বক্তৃতায় আমরা উচ্চ ধ্বনি তুলছি—টাকায় অঙ্কে আমরা হিসাব করছি—কিন্তু কাজের পরিমাণ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

আমাদের দেশে যারা চলার গান করেছিলেন—তারা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন সূর্য্যদেবের। সূর্য্যঠাকুর কখনও ঘুমান না—চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে তার কর্ম্ম—মানুষকে তেমন ভাবে নিরলস হয়ে কাজ করতে হবে, প্রমাদকে দেবতারা আদৌ পছন্দ করেন না।—অপ্রমত্ত হয়ে অতন্দ্র হয়ে দেশের মানুষ যদি কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দেয়, তবেই মূঢ় ম্লান মুখে ফুটবে ভাষা—তবেই ক্লিষ্ট ও নিপীড়িতের জুটবে অন্ন—তবেই জাগবে আনন্দ ও আমোদ।

ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং
ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।

দেবতারা অতন্দ্র, তাই তারা ভালবাসেন তাদের যারা নিরলস কর্ম্ম-করে, তারা অলসকে, জড়কে, প্রমত্তকে ক্ষমা করেন না—শাস্তি দেন।

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।

যদি তোমার কর্ম্ম করতে করতে ঘর্ম্ম না ঝরে, তবে দেবতারা তোমার বন্ধু হন না।

এই কর্ম্মোত্তম-ফিরুক ভারতবর্ষে। পুরাণে ভারতবর্ষের বিশেষণ কর্ম্ম ভূমি—সেই বিশেষণ আজ আমাদের সেবায় ও প্রযত্নে সার্থক হোক।

বেদ মানুষকে ভিখারী হতে বলেন নি—মানুষের জন্য তারা প্রার্থনা করেছেন সম্পদ। সমৃদ্ধ হয়েই মানুষ জীবনে করছে সাধনা—তবে সে সমৃদ্ধি যেন আসে সত্যের পথে—আসে ঋতের পরম্পরায়—নীতি ও প্রীতি দুটি যেন পরিপূর্ণ হয় মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টায়।

পরি চিন্ মর্ত্ত্যো দ্রবিণং মমন্যাদ্
ঋতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ।
উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত
শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ॥

মানুষ—মর্ত্ত্য মানুষ পৃথিবীতে পাক ধনসম্পৎ—কিন্তু তার অর্জ্জন হয় যেন উপাসনার মাঝে—সত্যের আশ্রয়ে, ঋতের বিধিতে। মানুষ প্রতিদিন তার বিবেকের কাছে নেবে পরামর্শ—তার মননশক্তি ও ধী প্রোজ্জ্বল হোক।—তার মেধা নব নব অধ্যবসায়ে দিন দিন উচ্চতর দক্ষতা লাভ করুক।

কর্ম্মোজ্জ্বল এই জীবন নিবেদিত হবে যজ্ঞে। যজ্ঞ মানুষের সংবর্দ্ধন—মানুষের সেবা। যে আপনাকে নিয়ে বিব্রত—তার জীবন বিশৃঙ্খল—সে পায়না কল্যাণের ও ক্ষেমের সাক্ষাৎ—শিব ও সুন্দরকে সেইই অধিগম করে, যে অন্ন বিলিয়ে দেয় বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্য্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী॥

বৃথাই সে অন্ন আহরণ করে যে দেয়না দেবতাকে—দেয়না বন্ধুকে—আত্ম সর্ব্বস্ব সেই অবিবেকী নিশ্চয়ই মৃত্যুলাভ করবে—সত্য সত্য বলছি এটা জেনো—যে একা খায়, সে কেবলই পাপ ভক্ষণ করে। অর্থনৈতিক যে স্বার্থপর জীবন আজ আমাদের আদর্শ—তা নিয়ে চলেছে আমাদের প্রাত্যহিক গ্লানি ও শাশ্বত অতৃপ্তির গুহাগহ্বরে। মানুষ যখন দেয়, তখনই সে সহৃদয়। বিশ্বনাথ যিনি—তিনি ত রয়েছেন সবার ভিতরে—তিনি যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—তাইত ক্ষুধিতকে দিলে অন্ন—তাকেই করি পরিতৃপ্ত।

আমিত্বের প্রসার করতে হবে—বাড়িয়ে দিতে হবে হৃদয়—সকলের প্রতি হবে অভেদাত্মভাব—তবেই আমাদের, অধ্যাত্মজগতে হবে প্রগতি—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হোক—আমরা যেন ভাবতে শিখি—সকলকে আপন, সকলের জন্য খুলতে পারি হৃদয়-দ্বার—খুলতে পারি অন্নভাণ্ডার।

কর্ম্মমুখর যজ্ঞ নিবেদিত এই জীবন হবে অভয় জীবন—সত্য সাধক ভয় পায় না মৃত্যুর ভয় নেই তার—সে জানে সে অমৃতপুরুষ তাই সে তেজস্বী হয়ে বীর্য্যবান হয়ে বসে। দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা, কাপুরুষের পরিচয়—যে বীর সে সত্যকে মানে ও তার জন্য লড়াই করে।

মন্যুরসি মন্যু ময়ি ধেহি

হে ভগবান্ তুমি পাপীকে ক্ষমা করো না—হে রুদ্র, যে অন্যায় করে তুমি তাকে শাস্তি দাও—তোমার সেই শাসন ভার তুমি দিয়েছ সমস্ত মানুষকে। ভারতবর্ষ আজ গণতন্ত্র, গণতন্ত্র সফল হয় জাগ্রত জনমতে। যেখানে মানুষ অন্যায় সহে সেখানে অন্যায় অপ্রতিহত।

আমাদের দেশের চারিদিকে আজ দেখছি এই অধঃপতন—সর্ব্বত্র দম্ভ ও দর্প—নিষ্ঠুরতা অত্যাচার—গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেশে হয়নি, হয়েছে লোভীর ও দুরাচারের—তাকে দমন করতে পারে কেবল ধৃত বীর্য্য জাগ্রত গণ-চেতনা। অন্যায়-অসহিষ্ণু সেই জন-শক্তি জাগ্রত হোক।

ভারতবর্ষ চেয়েছলি ঐক্য—সকল মানুষের ঐক্য। সকল মানুষের জন্যই তার মধু-বিদ্যা। সেই মধুবিদ্যা আজ জগতের সকল মানুষের ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে—।

কৃণ্বন্তঃ বিশ্বমার্য্যম্।

বিশ্বমানুষকে আর্য্য ও গরীয়ান করে তুলতে হবে—সংস্কৃতির আবেগে উদ্দীপ্ত করতে হবে—।

ভারতের জীবনবাণী এই জাগরণের জয়-শঙ্খ—এই উদ্দীপনায় উপাসনা আসুক সেই পুণ্য পাবনী শিক্ষা—আবার আমরা প্রার্থনা করি :—

পরিমাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্ব
মা সুচরিতে ভজ।
উদ্ আয়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতামনু॥

হে পরমাত্মা—জ্যোতির্দীপ্ত হে দেবতা! আমার দুশ্চরিত্র দূর হোক—আমি যেন সুচরিত ভজনা করি—অমৃতের পথে যাত্রা করে আমি যেন জাগি জীবনে—পরিপূর্ণ শিবত্বময় জীবনে উদ্বুদ্ধ হই।

ভারত যদি আজ সুচরিত্রকে, সুনীতিকে, সুব্রতকে গ্রহণ করে—তবেই হবে অগ্রগতি, হবে তার নবজীবন—তার অভ্যুদয়।

সম্পাদকীয়

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

আমি সম্পাদক—তরুণ সম্পাদক। প্রতিটি বাঙালী ছেলের মত আমিও ইস্কুলের খাল থেকে কলেজের নদীতে এসে পড়ার স্বর্ণ-সন্ধিক্ষণে অনুভব করেছিলুম আমার সাহিত্য সম্ভাবনা প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমানই এবং দীর্ঘ চার বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলুম যে নিজেদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত পড়ার ভয়ে সম্পাদকেরা যখন আমার প্রতিভাকে স্বীকার করবে না বলেই ষড়যন্ত্র করেছে তখন বঙ্গভারতীর সেবা করতে হলে নিজের সম্পাদক না হয়ে উপায় নেই। বাঙালী ট্রাডিশনের নিয়মরক্ষা করতে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, ট্রাডিশন বজায় রাখার জন্যেই তিন মাস পরে তার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য সংঘটিত হ'ল—সে মরল না। সে বেঁচে গেল আমাদের পাড়ার দাদুর জন্যে। দাদুও ছেলেবেলায় একবার মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন এবং তার জন্ম ও মৃত্যু থেকে বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা দাদুর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল। আমার সাধু সঙ্কল্প শুনে তিনি আমাকে জনান্তিকে বলেছিলেন—"ভায়া হে কাগজ যদি বাঁচাতে চাও, তবে আগে বন্ধুদের ভুলে যাও।"

আমি আকাশ থেকে প'ড়ে প্রশ্ন করেছিলুম, "তাহলে লেখা পাব কোত্থেকে?"

দাদু জবাব দিয়েছিলেন, "লেখা না হলেও কাগজ চলবে কিন্তু বন্ধুদের আর তাদের বোনেদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে স্বয়ং ব্রহ্মারও সাধ্যি নেই তোমার কাগজখানাকে রক্ষা করে।"

তারপর তাঁর বক্তব্যটা সংক্ষেপ করে বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলেছিলেন—

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।
বন্ধু বন্ধুভগ্নী-সঙ্গ পরিহারম।
অপরিচিতস্য রচনা সংগ্রহম্।"

দাদুর উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি এবং করেছি বলেই এই সাত বছরে একবারের জন্যেও আমার কাগজের "যুক্ত সংখ্যা" প্রকাশ করতে হয়নি অথবা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিদ্রা দেবার পর অকস্মাৎ কোনো সুপ্রভাতে তার "নব-পর্যায়" শুরু হয়ে যায়নি।

আমার বাঙলা পত্রিকার এই ইংরেজ সুলভ সাফল্যের ট্রেড সিক্রেটটা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করতে এখন আমার কাগজ বর্তমানে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মাসের প্রথমে কয়েক হাজার পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আসে এবং অন্ততঃ পঞ্চাশজন লেখক লেখিকার সঙ্গে আমি দৃঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ (দাদু শুধু বন্ধুদের লেখক বানাতে নিষেধ করেছিলেন, লেখকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে মানা করেন নি)।

লেখক সংগ্রহ করার আমি একটা অতি সহজ পন্থা উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছিলুম। মাসের প্রথমে চলে যেতুম কলকাতার সবচেয়ে বড় খোলা বইয়ের দোকান—ধর্মতলা ট্রাম গুমটির মোতিরামের বুকস্টলে। এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে লক্ষ্য করতুম স্টলের সমবেত জনতাকে। যার পরিধানে রিপুকরা ধুতি, গায়ে তালিমারা পাঞ্জাবী, পায়ে ছেঁড়া চটি, চোখে বিবর্ণ ফ্রেমের চশমা, যার দেহ বংশখণ্ড সদৃশ, কপাল ময়দান প্রায়, নাসিকা খড়্গাকৃতি, চক্ষু কোটরগত, গণ্ড দগ্ধবেগুনতুল্য, পৃষ্ঠ প্রশ্নবোধক চিহ্নসম, যে একটার পর একটা কাগজ তুলে নিয়ে অধৈর্য আঙুলে শুধু সূচীপত্রটা খুলে দ্রুতবেগে চোখ বুলিয়ে যায়, যে দেখে সব কাগজগুলোই কিন্তু কেনে না কোনোটাই, হে পাঠক, আমি সন্দেহ করতুম সে-ই বাঙালী লেখক। সন্দেহটা আরো দৃঢ় হ'ত যখন দেখতুম

চীপত্র দেখতে দেখতে সে চমকে উঠত আর পাতার সংখ্যা নুযায়ী তাড়াতাড়ি একটা জায়গা খুলে পড়তে আরম্ভ রত। সন্দেহটা একেবারে নিরসন হ'ত যখন দেখতুম য়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার তোবড়ানো মুখখানা প্রসন্ন াস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই অবসরে আমি তার াশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আড়চোখে দেখে নিতুম লেখাটার ার লেখকের নাম। ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল ক'রে নের নোট বইতে টুকে নিয়ে বাড়ি ফিরতুম।

তারপর সেই কাগজখানা জোগাড় ক'রে লেখাটা াড়তুম। যদি বুঝতুম লেখকের মধ্যে কিছু আছে তাহলে রদিন বা পরের মাসে আবার যখন তাঁকে দেখতুম সেই টলে, বলে উঠতুম, "আরে শশীবাবু যে! নমস্কার মস্কার। ভাল আছেন তো? আপনার অমুক গল্পটা কন্তু অপূর্ব হয়েছিল।"

শশীবাবু হয়ত একটু অবাক হয়ে বলতেন, "আপনি— য়ে কিছু মনে করবেন না, আপনাকে তো ঠিক…"

"চিনতে পারেন নি, এই তো? তাতে লজ্জার কিছু নই। আপনারা স্রষ্টা মানুষ, শিল্পী—সাধারণ লোকেদের াপকাঠি দিয়ে আপনাদের বিচার করা যায় না। আমি কন্তু আপনাকে অনেকদিন থেকেই চিনি। চিনব না? লখকদের নিয়েই তো আমাদের জীবন।"

অতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে শশীবাবুকে একটা রেস্তোরায় নিয়ে যেতুম। সাহিত্য ছাড়া দুনিয়ার ার সব বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতুম যাতে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনিই প্রথমে আমার কাগজে লেখা াঠাবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমি তখন একটু াম্ভীর হয়ে যেতুম। টেনে টেনে বলতুম, "তা মন্দ কি। বেশ তো পাঠাবেন। অতি সন্তর্পণে টোপ ফেলতুম।"

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আমার কাগজের সম্পর্কে মোতিরামের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা অনেক দিনের। আমাকে ও রকম ভাবে এর স্টলে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে মোতিরাম একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কারণটা। আমি সত্যি কথাই বলেছিলুম ার সে জবাব শুনে ও হা হা করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, "আরে তোবা তোবা। একবার মেহেরবাণী ক'রে আমাকে বলবেন তো। যারা কোনো কালেই বই কেনে না কিন্তু মাস পয়লায় এসে সব বই নাড়াচাড়া করে তারাই যে লেখক, এ তো স্টলওয়ালাদের বাচ্চারাও জানে। এই আবিষ্কারের পর থেকে আমার পরিশ্রম অর্ধেক কমে গিয়েছিল।

সে যাই হ'ক, একটা লেখা বের করার পরেই আমি শশীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতুম। বয়েসের প্রকাণ্ড তফাৎ না থাকলে প্রথমে 'তুমি' এবং পরে 'তুই'য়ে এসে নামতুম। অর্থাৎ শশীবাবুকে আমি এত ভালবেসে ফেলতুম যে তিনি কিছুতেই মুখ ফুটে লেখার জন্যে দক্ষিণা চাইতে পারতেন না। লেখক নূতন থাকতে থাকতেই আমি তাঁকে বধ করতুম।

এ তো গেল, শুধু লেখকদের কথা। লেখিকারা ছিলেন আমার কাছে মালক্ষ্মী-স্বরূপা। লেখকদের মত একই উপায়ে লেখিকা সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না—তবে কোনো মহিলার লেখা এলে আমি গোপনে খোঁজ নিতে চেষ্টা করতুম তিনি সুন্দরী কিনা, যুবতী কিনা এবং কলেজের ছাত্রী কিনা। অন্য সব সম্পাদকের মত এ তথ্যটা আমারও অজানা ছিল না যে সহশিক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত কোনো কলেজের একটি সুন্দরী ছাত্রীর একটি লেখা ছাপানো মানে অন্তত পাঁচ-শ' খানা কপি বেশি বিক্রির ইনশিওর করে রাখা। লেখকদের আমার সাধারণত টাকা দিতে হয় না কিন্তু লেখিকাদের প্রায়ই দিয়ে থাকি, যেমন আগে দিতুম। এক কুড়ি টাকা খরচ করে দশ কুড়ি টাকা ঘরে আনতে পারলে কোন মূর্খ না দেয়।

অবশ্য এসব আমার সম্পাদক-জীবনের প্রথম দিককার কথা। বর্তমানে আমার কাগজ চলছে বহুলাংশে স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিতে এবং অনেক নির্ভাবনায়। তা সত্ত্বেও আমার কাগজকে আমি প্রথম শ্রেণীর ব'লে দাবী করি না, যদিও সে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। মধ্যম শ্রেণীর—হ্যাঁ মধ্যম শ্রেণীর ব'লে স্বীকার করতে আমার সঙ্কোচ নেই। সাত বছরের মধ্যে সহায়সম্বলহীন একটি কাগজকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করতে পেরেছি এতে আমি একটু গর্বই অনুভব করি। আর আমার নিয়মিত লেখক-লেখিকারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর—তৃতীয় বা প্রথম শ্রেণীর কেউই নন। খ্যাতি জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা ছেপে কাগজখানাকে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার

বাসনা আমার নেই এমন নয় কিন্তু সেটা অনেক অর্থের ব্যাপার। তাছাড়া সেজন্যে আমি খুব ব্যস্তও নই। আমার নিয়মিত লেখক-লেখিকারা কেউই বৃদ্ধ নন। সুতরাং অনিবার্য কারণে আগামী পাঁচ কি দশ বছরের মধ্যে এঁরাই হবেন যুগের সাহিত্যিক। আর যেহেতু আমি তাঁদের প্রিয়তম শুভার্থী, আমার দাবী তখনো থাকবে সকলের আগে, যেমন এখন আছে। অদূর ভবিষ্যতে আমার ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের অবশ্যম্ভাবী স্ফীত আকৃতিটার কল্পনা করে, আমি তার বর্তমান শীর্ণ কলেবর অনায়াসেই ভুলে থাকতে পারি।

কিন্তু সম্প্রতি আমার কাগজখানাকে জাতে তুলবার অভাবিত সুযোগ এসে পড়েছে। সুশোভনের কাছে গিয়েছিলুম আমার কাগজের নতুন বছরের প্রচ্ছদপট আঁকাবার জন্যে। সুশোভন উদীয়মান তরুণ আর্টিস্ট এবং বলা বাহুল্য আমার প্রাণের বন্ধু। ওর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় শ্রীমতী রাঙা দেবী এসে উপস্থিত। সুশোভনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝলুম তিনি সুশোভনকে তাঁর কোনো একটা বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকতে দিয়েছিলেন এবং সেটা এখনো শেষ হয়নি। কথা বলতে বলতে সুশোভন একবার আমার দিকে তাকাল। মনে হ'ল ও বোধহয় আমাকে রাঙা দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছি। ইশারায় নিষেধ করলুম। সুশোভন বিস্মিত হ'ল।

রাঙা দেবী বিদায় নেবার পর বললুম, "বেশ শাঁসালো মক্কেল পাকড়েছিস যা হ'ক। কত টাকায় রফা করেছিস ?"

সুশোভনের চোখ মুখ ধিক্কারে ভ'রে উঠল : "টাকা! কী বলছিস তুই শিবু! রাঙা দেবীর বইয়ের কভার আঁকার সুযোগ পেয়েছি এইটেই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এতে আমার সম্মান কতখানি বেড়ে যাবে জানিস ? টাকা নিলে বইতে আমার নাম থাকবে দপ্তরীর নিচে, আর না নিলে থাকবে ভূমিকার মধ্যে—সুশোভন চৌধুরী দয়া ক'রে প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করেছেন, ইত্যাদি। কত বড় সৌভাগ্য ভেবে দেখ। উনি অবিশ্যি টাকার কথা তোলেন নি কিন্তু দিতে চাইলেই বা আমি নেব কেন ?

না : সুশোভন একেবারে বোকা নয় দেখছি। আমারই বন্ধু তো।

সুশোভন তারপর বলল, "কিন্তু তুই এত বড় সুযোগটা হাত ছাড়া করলি যে বড়? লোকে মাথা কপাল কুটে ওঁর দেখা পায় না আর তুই সম্পাদক হয়ে চুপ ক'রে গেলি? কে জানে এতে হয়ত তোর কাগজেরও সুবিধা হ'ত।"

একটু হেসে জবাব দিলুম, "জানি বন্ধু জানি। শিবনাথ চাটুর্য্যেকে অত কাঁচা ছেলে মনে ক'রো না। সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে চাই বলেই আজকের দিনটা যেতে দিলুম। হাতের একটা পাখির চেয়ে গাছের দুটো পাখির দাম হয়ত বেশি নয়, কিন্তু যার একটা পাখি কোনো কাজে আসবে না তার পক্ষে একটু ঝুঁকি নিলে ক্ষতি কি ?"

তারপর চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে কয়েকটা কথা বললুম।

রাঙা দেবী সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা। তিনি শুধু বাঙলার লেখিকাদের মধ্যেই নন লেখকদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সাত আট বছর আগে তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সমাজের উচ্চতম মহলে—ধনী ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু আজ রাঙা দেবীর নাম জানে না এমন সাক্ষর ব্যক্তি বঙ্গদেশে নেই। রাঙা দেবী গাদা গাদা লেখেন না কিন্তু যেটুকু লেখেন তার প্রতিটি লাইন একেবারে হীরের টুকরো। তাঁর বই বেরুতে না বেরুতে দশ বার ছাপা হয়, যে দুটি কি তিনটি সাময়িক পত্রে তিনি মাঝে মাঝে লেখা দেন তাদের সম্পাদকেরা গর্ব্বে মাটীতে পা ফেলেন না।

রাঙা দেবীর প্রতিভার এককথায় পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় তিনি হাইলি ইন্‌টালেক্‌চুয়াল। সম্পাদক হিসেবে আমার এটা লক্ষ্য করতে ভুল হয় নি যে পাঠকদের জাতীয় সাহিত্যের ক্ষুধা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়েছে এবং তারপর এই কয়েক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সুধা পান ক'রে তাদের আধুনিক অর্থাৎ প্রগতিশীল লেখার তৃষ্ণাও প্রায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছে। এ যুগের পাঠকেরা চায় ইন্‌টালেক্‌চুয়াল লেখা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রখরতায় উজ্জল ঝল-মলে রচনা। বাঙলা-সাহিত্যাকাশে ইন্‌টালেক্‌চুয়াল

জ্যোতিষ্ক-বিশেষের আবির্ভাব খুব বিরল ঘটনা নয়, কিন্তু তাঁরা সকলেই প্যারাবোলা কক্ষপথে উদিত হন বলে মন্দভাগ্য পাঠক-জগত বেশিদিন তাঁদের আলোকচ্ছটা উপভোগ করতে পারে না। রাঙা দেবী মোটেই সে জাতের ইন্‌টালেক্‌চুয়াল নন—এই দীর্ঘ আট বছর পরেও তাঁর তিরোভাবের এতটুকু লক্ষণ দেখা যায় নি এবং বিশ্বাসযোগ্য সমালোচক-জ্যোতির্বিদরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন—বাঙলার সাহিত্যাকাশে তিনি চিরদিনই ভাস্কর হয়ে রইবেন। এর একমাত্র কারণ তিনি ঝুটা ইন্‌টালেক্‌চুয়াল নন। তাঁর জ্ঞানের সীমা সত্যিই দিগন্ত-প্রসারী। লনার্দো দ্য ভিঞ্চির একাধারে কবি, শিল্পী, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও ভাবুক হবার কারণ তিনি অবগত আছেন এবং তিনি মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভার সঙ্গে ভিঞ্চির প্রতিভার তুলনা করতে পারেন। ভাগনার বিঠোফেন নন কেন তাও রাঙা দেবী জানেন এবং জোহান স্ট্রাউসের ওঅল্‌জ্‌। 'দি ব্লু দানিয়ুব' কোটি কোটি নরনারীর বুকে এমন ক'রে দোলা লাগায় কেন তা সবাইকে বোঝাতে পারেন জলের মত ক'রে। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের বার্ষিক নৌ-বাহন প্রতিযোগিতায় কোন্ পক্ষ কী কী ঐতিহ্যগত কলাকৌশল অবলম্বন করে তা তিনি জানেন, সিলভার ফক্সের দাম কত হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে জানেন এবং এই মুহূর্ত্তে প্যারিসের অভিজাত মহিলারা কোন্ সেণ্টটা ব্যবহার করছে জানেন। কিন্তু এ ধরণের ইন্‌টালেক্‌টে মোটামুটি অভ্যস্ত না হয়ে কোনো সম্পাদক-নন্দনও তো আজকাল সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে সাহস পায় না। রাঙা দেবীর আসল বৈশিষ্ট্য তিনি ইন্‌টালেক্‌চুয়ালিজমের সর্ব্বাধুনিক এবং সর্ব্বসম্মত ভাষ্যে—রেফারেন্স পরিবেশনে সত্যি সত্যিই অদ্বিতীয়া প্রমাণিত হয়েছেন। এককালে যখন কোটেশন উদ্ধরণই ইন্‌টালেক্‌চুয়ালিজমের চরম লক্ষণ ছিল তখন অনেক মুর্খও একখানা কোটেশনের বই কিনে নাম ক'রে গিয়েছে। ভাগ্যের বিষয় কোটেশনের ছেলেখেলায় আজ-কালকার পাঠকের মন ভরে না। এখনকার লেখককে প্রতি পদে পদে টেনে আনতে হয় রেফারেন্স, আর এই রেফারেন্সের এখনো কোনো সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নি। রাঙা দেবী হচ্ছেন এই রেফারেন্সের সম্রাজ্ঞী। ল্যাটিন সংস্কৃত ইংরেজি-ফরাসি এবং বাঙলা (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ) থেকে রাঙা দেবী হাজারো নিখুঁত রেফারেন্স ছড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর উপন্যাস গল্প কবিতা প্রবন্ধের প্রারম্ভে, প্রতি পরিচ্ছেদের শীর্ষে, মধ্যে এবং অন্তে। পাঠকের চাহিদাই সম্পাদকের চাহিদা হবার দরুণ এই ধরণের লেখাই এখন আমার পছন্দ বেশি। কিন্তু তাই বলে রাঙা দেবীর লেখা পাবার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখি নি, কেননা সম্পাদক মহলে এটা অজানা নয় যে টাকা দিলেই রাঙা দেবীর লেখা পাওয়া যায় না।

কিন্তু সুশোভনের ষ্টুডিয়োতে অমন দুর্লভ সুযোগটা হাতছাড়া না করেও আমার উপায় ছিল না, কেননা রাঙা দেবীর মাত্র একখানা বই-ই আমার তখন পর্য্যন্ত পড়া ছিল। ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিধে বংশীর কাছে গেলুম। বংশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বর্তমানে প্রফেসারির সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে গবেষণা চালাচ্ছে। ও আমার ঠিক বন্ধু নয়, ভায়া এবং আমার অনারারি অ্যাডভাইজার। অমনোনীত লেখাগুলোর সদ্গতি করার আগে আমি লেখকের নাম-গুলো একবার বংশীকে শুনিয়ে নিই। মাঝে মাঝে এক একটা নাম শুনে বংশী চোখ কপালে তুলে বলে—"আরে সর্বনাশ! করছিলেন কী! এঁকে চেনেন না।" আমি তাড়াতাড়ি সেই লেখাটা ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে নিয়ে চোখ বুঁজে কম্পোজিটারের কাছে পাঠিয়ে দিই। বাঙলা দেশে সাহিত্য বিষয়ক যে-কয়েক হাজার বিখ্যাত পণ্ডিত স্পেশি-য়েলিষ্ট অর্থাৎ অধ্যাপক আছেন তাঁদের একজনের হৃদয়েও যেন কোনোপ্রকার বেদনা না দিতে হয় এই হ'ল আমার বংশীর প্রতি নির্দেশ।

রাঙা দেবীর কথাটা খুলে বললুম বংশীকে। ও আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল—"এজন্যে আপনি ভাবছেন! এ সব সমস্যা তো আমাদের কাছে নস্যি। একদিন সময় দিন।"

সময় আর উপযুক্ত অর্থ দিয়ে এলুম। পরদিন বংশী রাঙা দেবীর সব ক'খানা বই জোগাড় ক'রে আনল। আর আনল রাশি রাশি সাময়িকপত্র—গত দু'বছরে রাঙা দেবীর যে সব গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, চিঠি, বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর সংগ্রহ। তারপর শুরু হ'ল ওর স্কলারশিপ। সের খানেক গন্ধকে আগুন ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন করা হ'ল। ভাল ক'রে ধূম্রস্নান করানোর

পর কালচে হয়ে এল বইগুলোর ধবধবে সাদা পাতা। নতুন কাগজের গন্ধও চ'লে গেল তবে ধোঁয়ার গন্ধটা লেগে রইল সে জায়গায়। বংশী বইগুলোর ভেতরে বাইরে ভাল ক'রে ডি, ডি, টি স্প্রে ক'রে দিল। বলল—"ধোঁয়ার গন্ধও যাবে আর আপনি যে বইগুলোকে যত্ন করেন তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে।" তারপর ও দুমদাম ক'রে বইগুলোকে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলতে লাগল নির্দয়-ভাবে। পাতাগুলো হাজার বার খুলল আর বন্ধ করল। মলাটের কোণাগুলো একটু একটু ছিঁড়ে গেল, ভেতরের সেলাই আলগা হয়ে এল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাতা বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ব্যাগ থেকে একটা ছাই রঙের পাউডার বের ক'রে বংশী পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মলাটে আর তিন পাশে মাখিয়ে বইগুলো আগাগোড়া কালো ক'রে ফেলল। তারপর বইগুলোকে ফেলা হ'ল মাটির গাদায় আর কয়লার গাদায়। কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে মুছে নেওয়া হ'ল অতিরিক্ত ময়লাটা। নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বংশী একটা প্যারাফিনের টুকরো আলতো ভাবে ঘষে দিল ওপরে নিচে—যাতে হাতে কোনো কাঁচা ময়লা ওঠে না আসে। এরপর এখানে ওখানে লাগানো হ'ল মাথার তেল। চোখের কাজল, হলুদের ছোপ। বাচ্চাদের বই থেকে খুঁজে খুঁজে সরস্বতী পুজোর শুকনো ফুলের পাপড়ি রাখা হ'ল দু' একটা বইয়ের পাতায়। এক বছরের ভাইঝিকে দিয়ে একটা বইয়ের মলাটে পেন্সিল দিয়ে যথেচ্ছ দাগ কাটানো হ'ল। পাঁচ বছরের ভাইপোকে দিয়ে আর একটার মলাটে কাঁচা অক্ষরে লিখিয়ে নেওয়া হ'ল তার নামের অর্ধেকটা—যাতে মনে হয় বড়দের চোখে প'ড়ে যাওয়ায় নামটা সে আর শেষ করতে পারে নি। সংক্ষেপে বংশী যখন বইগুলোকে নিস্তার দিল তখন কার সাধ্য যে বলে সেগুলো পাঁচ বছরের পুরনো নয় আর অন্তত তিন শ' জন পাঠক-পাঠিকার হাতে তারা ঘোরে নি। যাবার সময় বংশী একটা শিশিতে কয়েক ফোঁটা কালি দিয়ে বলল, "বইতে মন্তব্য-টন্তব্য লিখতে হলে এই কালি দিয়ে লিখবেন। শুকিয়ে যাবার মিনিট পনেরো পরে রোদ্দুরে দেবেন—লেখাটাকে দশ বছরের পুরনো মনে হবে। তবে খুব সাবধান, অন্য কোথাও কালিটাকে কাজে লাগাতে যাবেন না যেন, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে ধরা পড়ে যাবেন। যেটুকু বাঁচবে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন কিন্তু।"

বংশী তো ওর স্কলারশিপ কয়েক ঘণ্টায় শেষ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল, কিন্তু বইগুলো পড়তে আমার কেটে গেল পুরো সাত সাতটা দিন।

সুশোভনের ড্রয়িং রুম। সুশোভনকে বালিগঞ্জে পিসির বাড়ি পাঠিয়েছি। যথাসময়ে রাঙা দেবী এলে তাঁকে উপযুক্ত সংবর্ধনা ক'রে বসালুম। হাত কচলে বললুম, "আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি সুশোভন বাবুর অনুরোধেই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। সুশোভন হঠাৎ ট্রাঙ্ককল পেয়ে বর্ধমানে চলে গেছেন—মামার অসুখ। অবশ্য কালকেই আবার ফিরে আসছেন। আপনার প্রচ্ছদপট হয়ে গেছে কিন্তু ওঁর এতে মন উঠছে না। সাধারণ লেখকের পক্ষে অবিশ্যি ওই-ই যথেষ্ট কিন্তু আপনার বই…! উনি বলছিলেন যদি আপনি দয়া ক'রে আর কিছুদিন সময় দেন তাহলে আর একটা আঁকতে পারেন ভাল ক'রে।…একটা চিঠিও রেখে গেছেন, এই যে…

অতি বিনীত চিঠি। রাঙা দেবী প্রসন্ন হয়েছেন বোঝা গেল। সুশোভনের বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বললেন, "আচ্ছা আমি বোধ হয় আগের দিনও আপনাকে দেখেছি। আপনিও নিশ্চয়ই আর্টিস্ট?"

লজ্জিত হয়ে বললুম, "আজ্ঞে সে গৌরব ভোগ করার সুযোগ ভগবান আমাকে দিলেন কই? আমি সুশোভনের অগণিত ভক্তের মধ্যে অতি সামান্য একজন। এখানে প্রায়ই আসি। আমার জীবনে নেশা মাত্র দুটি—চিত্র আর সাহিত্য। সৃজন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাই ব'লে রসাস্বাদন করতে বাধা কি?"

ক্রীম সহযোগে কফি আর মশলা মাখানো কাজু বাদাম এল। খোঁজ ক'রে জেনেছিলুম এ দুটিই রাঙা দেবীর অতি প্রিয়। ভৃত্যের দিকে চেয়ে বললুম। "বাঃ চমৎকার জিনিস এনেছ তো?" রাঙা দেবীকে বললুম, "তাহলে আর একটা সত্যি কথা বলি রাঙা দেবী। আমার তৃতীয় নেশা হ'ল কাজু বাদাম আর ক্রীম দিয়ে কফি। সময় পেলেই আমি ছুটে যাই কফি হাউসে।"

রাঙা দেবী খুশী হয়ে বললেন, "সত্যি নাকি? আমারও জিনিসটা খুব ভাল লাগে।"

তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্য প্রসঙ্গে এলুম। বলা বাহুল্য রাঙা দেবীর সাহিত্যেই। অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ সহযোগে তাঁর নিজের সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা ক'রে যখন তাকে বিস্ময়ে নির্বাক ক'রে তুলেছি রাত তখন ন'টা।

পরের রবিবার। সুশোভন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। আরো একখানা ছবি সে এঁকেছে কিন্তু এখনও তার মন খুঁত খুঁত করছে। একজন উদীয়মান শিল্পী যে তাঁর জন্যে এতখানি আন্তরিকতা সহকারে পরিশ্রম করছে এতে রাঙা দেবীও কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কফি ও বাদাম এল। রাত দশটা পর্যন্ত সাহিত্যালোচনা চলল সেদিন।

তৃতীয় বারে সুশোভন বিনা বাধায় প্রচ্ছদপট রাঙা দেবীর হাতে তুলে দিতে পারল। কফি, বাদাম ও সাহিত্য সেদিনও বাদ গেল না। রাঙা দেবী আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আমার মত সাহিত্যরসিক লোক তিনি নাকি একটিও দেখেন নি। রবিবারে তাঁর বাড়িতে আমাদের চায়ের আমন্ত্রণ করলেন। আমি জনান্তিকে রাঙা দেবীকে জানিয়ে দিলুম—পার্টিতে যেন চতুর্থ ব্যক্তি না থাকে। অপরিচিতের সান্নিধ্যে শিল্পী সুশোভন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

রাঙা দেবীর বাড়ির পেছন দিককার বাগানে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। প্ল্যান মাফিক সুশোভন ঠিক সময়েই উপস্থিত, কিন্তু আধ ঘণ্টা চলে যাওয়া সত্ত্বেও আমার চিহ্ন নেই। রাঙা দেবী বেশ বিচলিত, তাঁর কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে কিনা তাই ভাবছেন। সুশোভন একটু উদ্বিগ্ন, একটু যেন বিরক্ত।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময় সুশোভন বলল, "খামখেয়ালী মানুষদের ধরণই এই রকম। হয়ত মাঝপথেই নেমে প'ড়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লেগে গেছে। সাহিত্যিক হলেই কি এমন আপনভোলা হতে হয়!"

রাঙা দেবী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সাহিত্যিক? আপনার বন্ধু সাহিত্যিক নাকি?"

সুশোভন ততোধিক বিস্মিত: "কেন আপনি জানতেন না? শুধু সাহিত্যিক নয়, সম্পাদকও।"

রাঙা দেবীর কণ্ঠে ক্ষোভ: "কী করে জানব? আপনারা বলেছেন কোনোদিন?"

"সেকি! এদিকে আমার ধারণা আপনারা পরস্পরের পরিচয় জানেন বলেই অত উৎসাহ নিয়ে সাহিত্য আলোচনা করেন।"

"আশ্চর্য, উনি তো কিছুই বলেন নি আমাকে। শুধু বলেছিলেন উনি আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত।" একটু থেমে রাঙা দেবী বললেন, "আচ্ছা আমিইবা কী রকম। ওঁর নাম যে শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় তা তো আমি জানতুম। তবুও তো একবারের জন্যেও মনে হয়নি উনি 'ক্ষণিকার' সম্পাদক হতে পারেন।"

অবহেলার সুরে সুশোভন বলল, "সম্পাদক না ছাই। সম্পাদক হবার যোগ্যতা ওর আদপেই নেই। এত লাজুক হলে সাহিত্যিক হওয়া যায়, না সম্পাদক হওয়া যায়?"

এমন সময়ে আমার আবির্ভাব।

রাঙা দেবী কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আশ্চর্য মানুষ তো আপনি, আশ্চর্য! এতদিনের পরিচয় আমাদের অথচ নিজেকে এমনি করে লুকিয়ে রেখেছিলেন! আমি তাই ভাবি এমন রসজ্ঞান এত বিশ্লেষণ ক্ষমতা কি অসাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব? তার ওপর আপনি সম্পাদক—"

আমি হাতজোড় করে বললুম—"ও কথা বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। আমার কাগজখানা অতি সাধারণ। এ কাগজের সম্পাদনায় আমি কিছুমাত্র গৌরবের দাবী করি না।"

"এ আপনার বিনয়ের কথা। ক্ষণিকার নাম বেশ আছে, আমার তো অনেক মোটা মোটা কাগজের চাইতে ভালই লাগে। তা ছাড়া ক্ষণিকার সম্বন্ধে আগে যা জানতুম না, আজ তা জানলুম। আপনার মত লোক যখন এর পেছনে আছে তখন এর ভবিষ্যৎ যে অত্যুজ্জ্বল তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।"

একটু যেন ফল ধরেছে। ভক্তের প্রশংসায় এখন দেবী পঞ্চমুখ।

সুশোভন বলল, "আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। ওর কাগজে লিখে লিখে কত লোক বিখ্যাত হয়ে গেল কিন্তু তাদের ও ধ'রে রাখতে পারল কই? লেখকেরা একটু নাম করলেই অন্য কাগজগুলো তাদের ভাঙিয়ে নিয়ে যায়;

আর ও চেয়ে চেয়ে দেখে। অথচ ওর কাগজের আয়ও বেশ ভাল, লেখকদের ও ভাল টাকাও দেয়। এমনি ধারা আর কিছুদিন চলতে থাকলে ওর কাগজই উঠে যাবে।"

রাঙা দেবী ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "উঠে যাবে বললেই হ'ল? কত লেখক-লেখিকা চাই বলুন—আমি ভার নিচ্ছি লেখা জোগাবার। আপাতত আমার লেখা নিন, তারপর দেখা যাবে—"

অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন। বুঝলুম কারণটা। নির্দিষ্ট কয়েকটি কাগজ ছাড়া অন্য কাগজের সম্পাদকেরা যাঁর লেখা তপস্যা করেও পান না, সেই রাঙা দেবী কিনা নিজে যেচে এক অর্বাচীন কাগজকে লেখা জোগাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন।

মনে মনে একটু হাসলুম। তারপর অতি বিনীতভাবে বললুম, "আপনার এই দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলব না রাঙা দেবী। কিন্তু এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াই আমার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্য মনে করেছি, আপনার লেখা পাবার কথা আমি বাস্তবিকই কোনোদিন চিন্তা করিনি। আমি যেমন সামান্য ব্যক্তি আমার কাগজখানাও তেমনি সামান্য এবং সেটা আমি কারু কাছে কোনোদিন গোপন করি না।"

রাঙা দেবী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "না না, অমন কথা বলবেন না। কাগজ ভাল কি মন্দ তা কি বিক্রির ওপর নির্ভর করে? আর আপনারা কি মনে করেন আমি কাগজের বিক্রি দেখেই লেখা দিই? মোটেই তা নয়। আমি দেখি কাগজের আর তার পাঠক সম্প্রদায়ের রুচি। ক্ষণিকার সম্পাদককে দেখে আমার আর কোনো সংশয় নেই—এ রকম পণ্ডিত অথচ রসিক এবং নিরভিমানী ব্যক্তি যে পত্রিকার সম্পাদক তার যতদিন পর্যন্ত একটি পাঠকও থাকবে ততদিন আমি লেখা দেবো।"

শেষের দিকে তাঁর গলাটা কেমন নিস্তেজ হয়ে এল। একটু যেন দ্বিধা। বললেন, "আচ্ছা ক্ষণিকার অফিসটা যেন কোথায়? আপনার বাড়িতেই?"

"আজ্ঞে না। বাড়িতে অফিস রাখার আমি পক্ষপাতী নই। ওতে কাজকর্ম কিছুই হয় না। আপনি একদিন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিন না আমাদের অফিসে? শুধু সম্পাদককে দেখলেই তো হবে না—প্রতিষ্ঠানটাকেও আপনার দেখা উচিত।"

একটু ভাবলেন রাঙা দেবী। কথাটা বোধহয় মন্দ লাগল না। আর যাই হ'ক এতে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যাবে একটু। বললেন, কোনো দরকার নেই। তবে আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই যাব। অবশ্য দেখতে নয়—বেড়াতে।"

আমার অলেখক বন্ধু বিমল তাদের বাড়ির একতলার একটা ঘরে ক্ষণিকাকে স্থান দিয়েছে জন্মাবধি। বিমলের কাছে একদিনের জন্যে তার বাবার কয়েকটা বইয়ের আলমারি ধার চাইলুম। নানা বইয়ে ঠাসা আলমারি এল। সুন্দর কয়েকটা শেলফ আর টেবিলও এল। সেগুলো ধুইয়ে মুছিয়ে তকতকে করালুম। চারজন বন্ধুকে চারটে টেবিলে বসাব। নিজে বসব বড় সেক্রেটারিয়েটে। ছিমছাম পরিবেশ—যেন আধুনিক মার্কেণ্টাইল ফার্মের অফিস।

সকাল আটটা। একটু অসময়েই অফিসে এসেছি। সব কিছু আর একবার চেক করে নিলুম। রাঙা দেবীর বইগুলোর পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলুম শেষবারের মত। বেশ উপযুক্ত জায়গাতেই দাগ দেওয়া হয়েছে। আর মন্তব্য-গুলোও বেশ ভাল হয়েছে। আর কিছু কি করণীয় আছে?···

···হ্যাঁ, ঠিক, বইতে মালিকের নাম বসানো যেতে পারে। এখনও ঘণ্টা তিনেক সময় আছে হাতে। বংশীর কালি এর মধ্যেই কাজ করবে।

ঘড়ি ধরে রাঙা দেবী এলেন। চারদিকে চেয়ে বিস্মিত হলেন। পুলকিত হয়ে বললেন, "যেমনটি আশা করে-ছিলুম ঠিক তেমনটি দেখতে পাচ্ছি। সওয়ারীকে দেখলেই কি তার বাহন সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায় না?"

রাঙা দেবীকে বিভিন্ন টেবিলের কাজ দেখালুম। এক ফাঁকে ডেসপ্যাচ রেজিস্টারখানা খুলে ধরলুম। বিক্রির মোট সংখ্যাটাও শুনিয়ে দিলুম।

আলমারিগুলোর কাছে গিয়ে রাঙা দেবী বললেন, "বাবাঃ অনেক বই জমিয়েছেন তো দেখি!"

আমি এক একটা আলমারি থেকে দু' একটা বই বের

করে তাঁকে দেখাতে দেখাতে রাঙা দেবীর বই যে আলমারিতে ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

একটা বই নামিয়ে বললুম, "এই দেখুন রাঙা দেবী, আমি কত ভাগ্যবান লোক। শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে নাম লেখা বইটা সেদিন পেয়ে গেলুম জলের দামে।"

বইখানা দেখলেন। শরৎচন্দ্রের সেট্‌টার দিকে নজর পড়তেই ব'লে উঠলেন, "এ কি করেছেন শিবনাথবাবু। ওঁর বইয়ের পাশে আমার বই। এখুনি সরিয়ে ফেলুন।"

তিনি নিজেই বইগুলো নামিয়ে শেলফে রাখলেন। কয়েকবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে দেখেও নিলেন বই-গুলোর অবস্থা। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, "আপনি এত কাণ্ডজ্ঞানহীন জানলে এখানে আসতুমই না। ছি ছি আমাকে কী দেখতে হ'ল।"

নিজের বইগুলোর দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "লোকেরা যে আমার প্রথম উপন্যাসগুলোর অত প্রশংসা করে কেন বুঝতে পারিনে। আমার তো নিজেরই এখন লজ্জা করে ওগুলো পড়তে। কী সব কাঁচা হাতের লেখা।"

একটা বই তুলে নিলেন—'মেঘলা দিনে।' তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। মাত্র দু'মাস হ'ল বেরিয়েছে। ভেতরের কয়েকটা পাতা ওলটালেন। বইটার জীর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করলেন। সেটা রেখে দিয়ে আর একটা তুললেন—'ধূসর পৃথিবী।' রাঙা দেবীর বিখ্যাততম উপন্যাস। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমার এই বইখানাই পড়া ছিল শুধু। কবে প্রথম পড়েছিলুম মনে নেই—বোধহয় আট দশ বছর আগে। নিজের দুর্বল স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা না রেখে বইটা আবার পড়েছি সম্প্রতি। রাঙা দেবী মলাটটা ওলটাতেই চমকে উঠলেন। বইয়ের নামের ঠিক নিচেই লেখা রয়েছে, "প্রিয় বন্ধু শিবুর জন্মদিনে—উৎপল। ১০ই আগস্ট, ১৯৪৮।"

বিস্ময়ে রাঙা দেবীর ভ্রূ জোড়া অর্ধবৃত্তাকারে নেমে এসে মাঝখানে মিশে গেল। বইখানা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন। ভেতরের পাতাগুলো খুললেন আর একবার। ধীরে ধীরে তাঁর কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ তুলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন বইটার দিকে। কী যেন বলতে গেলেন, পারলেন না, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। শুধু ঠোঁট নয়, তাঁর দুটি হাত, এমন কি সারা দেহ কাঁপতে লাগল থর থর করে। ধপ করে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

ছুটে জল এনে দিলুম। রাঙা দেবীর এই ভাব-পরিবর্তনে আমিও কম বিস্মিত হইনি। নিজের বইগুলোর অবস্থা দেখে তাঁকে বিচলিত হতে হবে জানতুম, কিন্তু তিনি যে এতটা অভিভূত হবেন তা আশা করতে পারিনি। মনে মনে বংশীকে হাজারো ধন্যবাদ দিলুম।

জল খেয়ে রাঙা দেবী একটু সুস্থ হলেন। আর একটা বই হাতে নিলেন—'সন্ধ্যালগ্ন!' এটাতে লেখা শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫০। সে বইটাও ভাল করে দেখলেন। বইটা রেখে আমার দিকে ফিরলেন। অপলক নয়নে, শুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। সেই শব্দে তিনি যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে ফিরে এলেন। একটু-খানি হাসলেন। হাসিটা যেন কেমন মনে হ'ল। মৃদুস্বরে ডাকলেন, "শুনুন।"

আমি কাছে গিয়ে বললুম, "আজ্ঞে?"

রাঙা দেবী স্মিত মুখেই বললেন, "এত বুদ্ধিমান হয়ে শেষে এমন কাঁচা কাজ করলেন! আপনার এই দুটো বইয়ের কোনোটাই প্রথম সংস্করণের নয়—মাত্র তিন বছর আগেকার ছাপা। তাছাড়া দুটো বইই প্রথম বের হয়েছিল একান্ন সালে—আপনার লেখা তারিখের অনেক পরে।"

কথাকলির ইতিবৃত্ত

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

এদেশে প্রচলিত চাররকম নৃত্যধারার মধ্যে কথাকলিই বোধ হয় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময়, সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। শাস্ত্রমতে নৃত্যকলার তিনটি রূপ—নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য। নাট্যে অভিনয়ের প্রাধান্য, নৃত্তে কেবলমাত্র তাল সহযোগে পদসঞ্চালনাদি ক্রিয়া এবং নৃত্যে আঙ্গিক কুশলতার অতিরিক্ত হাবভাবের আবশ্যকতা। কথাকলিতে এই তিনটি রূপই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

মণিপুরে মণিপুরী, জয়পুরে কথক, তাঞ্জোরে ভরতনাট্যম—কথাকলির কেন্দ্র মালাবার। দুই রাজার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে এই নৃত্যধারার উদ্ভব হয়েছে বলে শোনা যায়। কালিকটের রাজা জামোরিনের সভায় একবার জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য দেখান হয়। নাটকের নাম ছিল "কৃষ্ণনত্ব"। রাজদরবারের চার-দেয়ালের মধ্যে অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিবেশী কোট্টার ককারার রাজা জামোরিনকে অনুরোধ জানান যে তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে জামোরিনের সভার শিল্পীরা যেন বিবাহানুষ্ঠানে গিয়ে নাচ দেখিয়ে আসেন। জামোরিন এ অনুরোধ রাখেন নি। এর ফল উভয়ের মনোমালিন্য এবং তারই ফলে কথাকলি নৃত্যের সৃষ্টি।

"কৃষ্ণনত্ব"—এর প্রতিদ্বন্দ্বী কথাকলির আসল নাম ছিল "রামনত্ব"। এই নৃত্যধারা সমগ্র কেরলে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। কল্পনা ও ভাবপ্রকাশের যে অপূর্ব সুযোগ এই নৃত্যে পাওয়া গেল,তাতে কেরলের কবিরা উৎসাহিত না হয়ে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেরলের কোন কবির পক্ষে অন্ততঃ একখানা কথাকলির কাহিনী রচনা করলে প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব। কথাকলির কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে কবি ভল্লাথলের নাম উল্লেখযোগ্য। কেরলের কথাকলির ভাণ্ডারে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৪০টি কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। "কৃষ্ণনত্ব" সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু কথাকলির ভাষা সংস্কৃত ও মালয়ালম মিশ্রিত।

নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই আটটি রসের ব্যবহার পাওয়া যায়। এই রসের ভিত্তিতে সমগ্র দেশে প্রচলিত নৃত্যধারা তাণ্ডব ও লাস্য মোটামুটি এই দুটি শৈলীতে বিভক্ত। কথাকলি নৃত্য এই দুটি শৈলীরই একত্রিত রূপ। এজন্য কথাকলি-শিল্পীর পক্ষে এই দুই শৈলীতেই পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। কথাকলির অভিনয় কথাবর্জিত, মুদ্রা ও অঙ্গ-সঞ্চালন ভাব-প্রকাশের বাহন। ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার খুবই প্রাচীন। মুদ্রা মোটামুটি ২৪ রকম; ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যে মূল কয়েকটি মুদ্রার উল্লেখ করা হয়েছে কথাকলিতে ব্যবহৃত মুদ্রা তারই নামান্তর।

সাজসজ্জা—কথাকলির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অভিনেতাদের বিচিত্র রূপসজ্জা, আভূষণ ইত্যাদি। দৃশ্যবাহুল্যবর্জিত উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে এই নৃত্য—এরই জন্য কখনও একঘেয়ে মনে হয় না। কিন্তু এই রূপসজ্জা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মঞ্চে অবতরণের অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে শিল্পীরা সাজঘরে প্রবেশ করেন। শিল্পী নিজে মুখ পরিষ্কার করে কপোল ঘিরে একটি রেখা আঁকেন। এই রেখার উপর আর একজন বিশেষজ্ঞ সযত্নে প্রায় দুঘণ্টা ধরে 'চুট্টি' (চাল, ময়দা ও চুন সহযোগে প্রস্তুত) লাগান। এইটি হয়ে গেলে বাকী কাজ শিল্পী নিজেই করে থাকেন।

কথাকলি নৃত্যে মানবচরিত্র কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীভেদে রূপসজ্জা নিম্নরূপ :

(১) পচ্চা (সবুজ)। দেবতা সৎসদ্ভাবসম্পন্ন মানুষ, রাজা বীর যেমন অর্জুন, ইন্দ্র, প্রভৃতি এই চরিত্রান্তর্গত। এদের মুখের রং সবুজ এবং এই রং ঘিরে সাদা 'চুট্টি'। এই ধরণের চরিত্রাভিনয় নির্বাক হয়ে থাকে।

(২) কাতি (ছুরিকাকৃতি)। খল, দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ এই চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, যেমন রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি। এদেরও মুখের রং সবুজ—কেবল "পচ্চার" সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্য এদের নাকের নীচ থেকে কপোল পর্যন্ত লাল রং দিয়ে ছুরির ফলার মত একটি চিহ্ন অঙ্কন করা হয়। এ ছাড়া প্রায় সারা মুখে সাদা রঙের ফোঁটা দেওয়া হয়। এই ধরণের চরিত্র একপ্রকার অবোধ্য অনুনাসিক শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।

(৩) লাল দাড়ি বা শ্মশ্রু। এই শ্রেণী দুঃশাসন জাতীয় নিরতিশয় খল চরিত্রের প্রতীক।

(৪) শ্বেত দাড়ি। দয়া এবং পরাক্রমের আধার হনুমান জাতীয় চরিত্রের প্রতীক।

(৫) কাড়ি। রাক্ষস প্রভৃতি আদিম বর্বর প্রকৃতির প্রতীক। এ জাতীয় চরিত্রের মুখের রং এবং পোশাক পরিচ্ছদ কালো।

(৬) মিনক্কু। এই চরিত্র আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। স্ত্রী ব্রাহ্মণ এবং সাধু (মুক্তি)। এদের চুট্টি অনাবশ্যক। শুধু মুখে উজ্জ্বল হলদে রং মাখানো হয়। "মুক্তি" শ্রেণীর চরিত্রে আবার শ্রীকৃষ্ণে রূপসজ্জার বিশেষত্ব—প্রধানত মুখের সবুজ রং এবং শিরস্ত্রাণে গোঁজা ময়ূরের পালকে।

দূত, রথচালক, ভৃত্য প্রভৃতি চরিত্রের বিশেষ কোন রূপসজ্জা নেই হনুমান জাতীয় চরিত্রের জন্য কখনও কখনও মুখোস ব্যবহৃত হয়।

কথাকলিতে রূপসজ্জা ও বেশবিন্যাসের উপর সকলেই তাঁ

বৈচিত্র বেশের মধ্যে একট ছোট আয়না লুকিয়ে রাখেন, কাঁচের ফাঁকে ফাঁকে একবার মুখ দেখার জন্য।

গান কথাকলির অপরিহার্য অঙ্গ। গায়ক সাধারণত দুজন। একজন মূল গায়ক এবং অপরজন দোঁহারের কাজ করেন। প্রত্যেকটি পদ দুবার গাওয়া হয়। ফলে শিল্পী তাঁর ভাব ফুটিয়ে তোলার যথেষ্ট সময় পান। অভিনয়কালে শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে গায়কও যে-পরিমাণ উৎসাহ দেখান তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কথাকলিতে চার রকম্ বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। চেন্দা (ঢাক), চালিঙ্গা (ঘণ্টা), ইলাথলম (কাঁসি) এবং মাদলম্ (বড় মৃদঙ্গ)। তাল রাখ-বার জন্য ও চালিঙ্গা ও ইলাথালম গায়কগণ নিজেরাই বাজান। পরিবেশ সৃষ্টি এবং ছন্দের সূক্ষ্ম কাজের জন্য মূলত চেন্দার ব্যবহার। মাদলম্ সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করে নৃত্যকে নিখুঁত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মধ্যে "কথাকলি প্রদীপ" উল্লেখনীয়। অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের বাইরে একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপটি যাতে না নিভে যায় সেজন্য মাঝে মাঝে তেল ঢালতে হয়। এই প্রদীপের আলোর এমনই জাদু যে, দর্শকেরা নাচ দেখতে দেখতে মোহাবিষ্ট না হয়ে পারেন না। অবশ্য আজকাল বৈদ্যুতিক আলো-ঝলমল মঞ্চে এই প্রদীপের ব্যবহার ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসছে।

বিষয়বস্তু

রামায়ণ, মহাভারত, ও পুরাণের কাহিনী প্রায় ক্ষেত্রে কথাকলির উপজীব্য। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে মূল সুরটি হচ্ছে অশুভের বিরুদ্ধে শুভের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের জয়লাভ। সমগ্র নাটক পদ ও শ্লোকে লেখা।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার বেশ কিছু পূর্বে বাজিয়েরা মঞ্চের বাইরে এসে ঘোষনা ও আমন্ত্রণ সূচক বাজনা বাজান। এই প্রাকঅনুষ্ঠান্ বাজনাকে বলা হয় "কেলি-কেট্"। এই অবসরে মঞ্চ প্রস্তুত করে প্রদীপটি জ্বালান হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র ঢাকী কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চে এসে বাজাতে থাকেন। একে বলা হয় "কেলি কাই" অর্থাৎ দর্শককে জানিয়ে দেওয়া যে, অনুষ্ঠান শুরু হতে আর বিলম্ব নেই। "কেলিকাই"—এর অত্যল্প কালের মধ্যেই দুজন লোক মঞ্চের উপর একটা ছোট পর্দা তুলে ধরেন, এবং গায়করা মাঙ্গলিকী গাইতে থাকেন। সাধারণত ঐ সময় একটি বালক মেয়ের বেশে পর্দার পিছনে নাচতে থাকে। এর নাম "পুরপ্পদ"। দুটি চরিত্র—পুরুষ ও নারী—পেচ্চা ও মিনক্কু—(পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রতীক) পর্দার পিছনে উপস্থিত হন এবং একটু একটু করে দর্শকদের "দর্শন" দেন। অর্থাৎ পর্দাটিকে আস্তে আস্তে নিচু করা হয়। দর্শকরা এক মুহূর্তের জন্য তাদের দর্শন পাবার পরই পর্দা আবার তুলে ধরা হয়। এ-রকম "দেখা দেওয়া" এবং অদৃশ্য হওয়া" দু তিনবার করার পর পর্দাটিকে একেবারে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একটি চাঁদোয়া তুলে ধরেন দুজন লোক এবং অভিনেতারা এর নীচে এসে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকেন। একটু বাদে চাঁদোয়াটিও সরিয়ে নেওয়া হয় এবং শুরু হয় আসিল নৃত্যাভিনয়।

শিক্ষা

আপাতদৃষ্টিতে কথাকলি-নৃত্যে জটিলতা বিশেষ কিছু বোধ হয় না। অনেককে বলতে শুনেছি, এ আর কী, কতগুলো মুখোশ পরে নাচলেই হল। অজ্ঞতা থেকেই এ রকম উক্তি সম্ভব। কথাকলি নৃত্যের উদ্দেশ্য দৈহিক বা পেশীগত কুশলতা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংযম লাভ। শিক্ষাকাল সাধারণত বার বছর। শিক্ষাকালেই ছাত্রদের সামান্য চরিত্রে নামিয়ে মঞ্চযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

কথাকলি যারা জীবনের ব্রত ও বৃত্তি বলে গ্রহণ করবে, সেই রকম ছেলেদের দশ থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে গুরুকুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সব ছাত্র গুরু পরিবারের একজন হয়ে বাস করেন। রাত্রি তিনটে থেকে এদের শিক্ষা শুরু হয়। ঘুম ভেঙে প্রাতঃকৃত্য সেরে চোখে একটু মাখন লাগিয়ে প্রথমে চোখের ব্যায়াম শুরু হয়। উপর-নীচ, পাশাপাশি, দুটি তারা একসঙ্গে দুদিকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানাভাবে চোখ ঘোরাতে শেখানো হয় তাদের। এই প্রাথমিক ব্যায়াম প্রায় দুঘণ্টা ধরা চলে। এর পর ছাত্ররা শরীরে তেল মেখে—সামান্য ব্যায়াম করে স্নান করেন। স্নানান্তে প্রাতরাশ শেষ করে তাদের শিখতে হয় বিভিন্ন মুদ্রা ও ছন্দ। সকালের চর্চা এই পর্যন্ত। দুপুরে বিভিন্ন ভাষা, এবং রামায়ণ মহাভারত পাঠ। এর উদ্দেশ্য এই দুই মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন, কারণ আজ পর্যন্ত রচিত তাবৎ কথাকলি-কাহিনীর উপজীব্য এই দুখানি মহাকাব্য। বিকেলে আবার দেহচর্চা। শিক্ষার্থী একপ্রকার বিশেষভাবে প্রস্তুত তেল সর্বাঙ্গে লেপন করে মেঝের উপর শুয়ে পড়েন এবং গুরু তার আপাদমস্তক এমনভাবে সংবাহন করেন যাতে দেহের প্রত্যেকটি গ্রন্থির জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। মুখের গড়নও নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়।

এভাবে বার বছর ধরে সাধনায় যে কী পরিমাণ ধৈর্য ও একাগ্র-চিত্ততার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। এই কঠোর সাধনার আগুনে পুড়ে পুড়ে শিল্পী যখন খাঁটি সোনা হয়ে মঞ্চে অবতরণ করেন, তখন যে দর্শক তার নিখুঁত, অনিন্দ্য নৃত্যপ্রদর্শনীতে মুগ্ধ হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পরিচালক—উপানন্দ

আবার এসেছে আষাঢ়

গ্রীষ্মের উষ্ণ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়েছে, চেরাপুঞ্জীর পথে শুরু হয়েছে বর্ষার বর্ষণ ধারা। সমুদ্র থেকে যে জলভরা মৌসুমী বায়ু উঠে ছুটেছিল হিমালয়ের দিকে, সে পেয়েছে বাধা শৈল-শিখরে—ফিরে এসেছে আজ আমাদের পথে প্রান্তরে। বর্ষার নবীন মেঘ দেখা দিয়েছে সুনীল আকাশে—তার নীলাঞ্জন ঘন ছায়া দুলছে দিকে দিকে। ধরিত্রী আর আকাশের মাঝ থেকে গ্রীষ্মদাহ আর সূর্য্যের প্রখরতা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। ঐ চেয়ে দেখ মেঘের পিছু পিছু ছুটেছে মেঘ, নিকষের মত কালো। পেখম তুলে নৃত্য করছে কেকা, বর্ষার বোধনের গান শুরু করেছে দাদুরী, অজ্ঞাত ভাব লোকের মধ্যে মন একক হয়ে থাকতে চায়।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘোৎসব চলেছে মৌসুমী অঞ্চলে—পুষ্পপত্রবিহীন বিশীর্ণ পরিম্লান তরু বীথিকার অন্তরে উদ্ভব হয়েছে আনন্দের নবচেতনা। সূর্য্য করোজ্জ্বল আকাশ আজ আর নেই, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার,—দিক্ চিহ্নহীন অন্ধকারে রাত্রি ডুবে যাচ্ছে—বাদল ধারায় মুখর হয়ে উঠ্ছে রাতের কুটীর-প্রান্তর—কখন ঝড়ের গর্জ্জনে, কখন বা বিদ্যুৎ স্ফুরণে আকাশব্যাপী মেঘের ঘনঘটায় অপূর্ব্বরূপ আমাদের নয়নে মায়ার অঞ্জন বুলিয়ে যাবে, তোমাদের কাছে রূপ কথার গল্প হয়ে উঠ্‌বে মধুর। অন্ধকারে বর্ষার বর্ষণ ক্ষণে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের যে বিচিত্র প্রবাহ চারিদিকে শত ধারায় উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ে, তা'তে অবগাহন করবার সময় হোলো। আকাশের প্রাঙ্গণে একটি একটি করে যে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠে, আর অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জে অনন্ত আকাশ ঝলমল করে উঠে, এমনদিনে সে শোভা দেখ্‌তে আর পাবে না, পাবে বিদ্যুতের লীলা-লহরী, মেঘবালাদের সাঁওতালী নাচ আর কেয়া যূথীর সৌরভ। বর্ষা রাজসমারোহে আজ বাংলায় প্রবেশ করছে, নদনদীর শুষ্কবুক নবোল্লাসে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে—দিগ্ দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন। নদীমাতৃক বাংলার শোভা বর্ষার দিনে অপূর্ব্ব হয়ে উঠে। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী সঙ্গীত আর গীতিকাব্যে বর্ষা নামে মেঘের মৃদঙ্গ বাজিয়ে। মেঘ আপনার নিত্য নূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে গর্জ্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর ওপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়ে তুলছে—ঘনিয়ে তুলছে যেন বহুদূর কালের আর বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া—দূ'রের মানুষকে পড়ছে মনে। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুল বাসনা আজ যেন অন্তরে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। প্রবাসী পথিক এলোনা ঘরে ফিরে, তাই পথচেয়ে বসে আছে ঘরের মানুষ। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' নববর্ষাকে অবলম্বন করে তার সকল ঐশ্বর্য্য অবারিত করেছে, মানব-হৃদয়ের নানা অনুভূতি ও আবেগ ফুটে উঠেছে কতনা কবির কাব্যে! যে কবি লিখে গেলেন—

> 'গোকুল জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র আকর্ষণ,
> বহুক হাওয়া খুরের ধারে—হবে সুবর্ষণ।'

আজ তিনি আমাদের মধ্যে থেকে চিরদিনের মত চলে গেছেন, এমন দিনেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোভাব। তরুণ কবির মহাপ্রস্থানের পথে নেমেছিল বর্ষা এমনই দিনে। এই কবির উদ্দেশ্যে কবিগুরু বলেছিলেন—

> বর্ষার নবীন মেঘ ধরণীর এলো পূর্ব্বদ্বারে
> বাজাইয়া বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে,
> তোমার নবীন ছন্দে?.........

সেদিন দেখেছি আমরা রামমোহন লাইব্রেরীতে শোক সভায় কবি গুরুর নয়নে বর্ষা নামতে কবিতাপাঠের সময়। আজ ছন্দের যাদুকর ও বাণীর বরপুত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথের অভাব গভীর ভাবেই অনুভূত হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাংলার খাঁটি মরমী কবি—প্রকৃতির স্নেহের দুলাল, তাঁর কত কবিতাই না 'ভারতবর্ষ' বুকে করে নিয়ে রয়েছে! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্ষার আবির্ভাবে বলেছেন—

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।

বর্ষার প্রভাবে হৃদয়ে যে বিচিত্র অনুভূতি আলোড়িত হয়ে ওঠে, তা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রূপ পরিগ্রহ হয়নি বটে, তবে স্থানে স্থানে বর্ষার রূপ বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন তা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার আলেখ্য। বর্ষা রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই ভাবাবিষ্ট করে রেখেছিল, তাই এর ওপরে তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন, যা বিশ্বকাব্যক্ষেত্রে অতুলনীয়। কবিগুরু বলেছেন—

'সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে
বুকভরে সে দিয়ে গেল বিফল অভিসার।'

এরূপ প্রেমের অভিব্যক্তি খুব কম কবির লেখনী থেকে বেরিয়েছে। প্রেম যে কত গভীর, সে তা নিজেই জানে না—বিচ্ছেদের দিনে সে উপলব্ধি করে তার স্বরূপ। বর্ষা আমাদের মনে প্রিয়জনের অভাব জনিত বেদনাকেই ঘনীভূত করে তোলে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

'ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

তাই বর্ষা আমাদের কাছে দেহের ভিতর আত্মার মত গভীরতম। বৈষ্ণব কাব্যেও বর্ষার মধ্যে প্রকৃতি ও মানব জীবনের পর্যালোচনা ভাগবতছন্দে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। এই বর্ষার মাঝেই আমরা কবিগুরুকে হারিয়েছি—শ্রাবণের বর্ষণ ক্ষণে বিরাট বনস্পতির হলো তিরোধান। আজ মনে পড়ে এঁদের কথা। সংসারের নানাধ্বনি মেঘ মল্লারের সুরে সুরে 'বিপুলধারায় একাকার হয়ে উঠছে, বর্হিজগৎ ঝাপসা হ'য়ে আসছে :—ধানের ক্ষেতে উঠ্‌ছে ঢেউ—সব নদী, সব জলধারা এক হয়ে ছুট্‌তে সুরু করেছে সাগরের আহ্বানে অন্তরের ভেতর ঘনিয়ে উঠ্‌বার অবকাশ তোলো একটি নিভৃত জগতের—তোমরা যারা ভাবুক, এই জগতের ভেতর এসে কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করো। বাংলার নাম্‌ছে বর্ষা—এস আমরা তার আবাহন করি—বর্ষামঙ্গলের উৎসব ধ্বনি ঐ শোনো অরণ্যবীথিকায়, ঐ শোনো কিশলয় সুরু করেছে নূতন গান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনি আসে, তখনি নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সঙ্গে সে সংকুচিত হয় না, মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক, আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা নৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

শতশতাব্দীর স্মৃতিজড়িত মেঘের 'বলাকাশ্রেণী' উড়ে আস্‌ছে আমাদের দিকে—কোন্‌ তীর্থাভিমুখে আমাদের আকর্ষণ করছে চির-বিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, তা কে জানে!

আলো-ছায়া

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন দুপুরবেলা সুমিত্রা তার চার বছরের ছেলে সুনীলকে নিজের পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। দুষ্টু ছেলের চোখের পাতায় 'ঘুমের মাসি' এসে কিছুতেই বস্‌ছিল না। মা ঘুমের মাসিকে' বাটা ভরে পান খাওয়ার লোভ দেখালে সে কিন্তু তাতে রাজী হলো না।

সুনীল আধ' আধ' ভাষায় নানা প্রশ্ন করে মাকে বিব্রত করে তুল্‌ছিল। ছেলে ঘুমোলো না, কিন্তু তার মা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। বেচারার আর দোষ কি? সকাল থেকে এত খাটুনীর পর একটু বিশ্রাম পেয়েছে কাজেই খুব সহজেই নিদ্রিত হয়ে পড়েছে।

সুনীল কিছুক্ষণ নিমগ্ন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কয়েকবার 'মা' 'মা' বলে ডেকেও যখন কোন সাড়া পেলে না, সে ধীরে ধীরে তখন বিছানা থেকে উঠে পড়্‌ল।

উঠানে একটা জবাফুলের গাছ ছিল, তার নীচে বসে কিছুক্ষণ খেলা করল সে। আপন মনে সে লাল জবা ফুলের সঙ্গে কত কথা বল্‌লে। গাছের ডালে কয়েকটা চড়াই পাখী বসে কিচিরমিচির করে ডাক্‌ছিল সুনীল হাততালি দিয়ে তাদের তারিফ্‌ কর্‌ছিল। তারপর এক সময়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল তারা।

সুনীল কিছুক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে থেকে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে গেল। উঠানের এক প্রান্তে ছিল একটা কুয়ো; সেখানে গিয়ে সে কয়েকবার উঁকিঝুঁকি মার্‌ল। কুয়োর পাড় উঁচু তাই সে জল দেখ্‌তে পেলে না। দড়ি-বাঁধা বাল্‌তিটা নিয়ে সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া কর্‌লে। পরণের ইজেরটা হঠাৎ খুলে সেখানে পড়ে গেল।

সুনীল ধীরে ধীরে আবার তাদের শোয়ার ঘরে

ফিরে এলো। তার মা তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একটা কৌটোয় চিনি ছিল, সে সেটা খোলার জন্য অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। তার জেদ চেপে বসল—সে ওটা না খুলে ছাড়বে না। মাটিতে ঠোকাঠুকি করতে হঠাৎ ঢাকনাটা খুলে মেঝেতে চিনি ছড়িয়ে পড়ল। সে মনের আনন্দে ছোট দুটি মুঠি ভ'রে চিনি নিয়ে খেতে লাগল।

ঘরের এক কোণায় একটা পাটি দাঁড় করানো ছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো—সে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই পাটির গর্ত্তের ভেতর ঢুকে পড়ল।

•

তখন বেলা পড়ে এসেছে।

সুমিত্রার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসল। খোকাকে তার পাশে দেখতে না পেয়ে তার মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। সে আকুল স্বরে 'খোকন' 'খোকন' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু তার কোন সাড়া পেলে না।

সামনে চিনির কৌটো পড়ে আছে, সে দস্যি ছেলের কাজ দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চিনি তুলে রেখে সে বাইরে চলে গেল ছেলের খোঁজে।

সুনীলকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সে চীৎকার করে তাকে ডাকলে কিন্তু কোন সাড়া পেলে না। কুয়ো তলায় তার ইজের পড়ে রয়েছে দেখে তার মাথাটা হঠাৎ কেমন করে উঠল! হায় হায়, তবে কি সে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে! দারুণ দুর্ভাবনায় তার বুক ফেটে কান্না এলো। সে এখন কি করবে? কুয়োর ভেতরটা চেয়ে দেখলে—অথৈ নীল জল স্থির হয়ে রয়েছে!

সুমিত্রা সেখানে আর দাঁড়াতে পারলে না। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। আসবার সময় দেখলে—সদর দরজা খিল্ দেওয়াই আছে, তবে তো বাইরেও সে যায় নি।

সে ঘরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বার বার তার মনে হতে লাগল—কি কাল ঘুম তাকে পেয়েছিল! কেন সে এমন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল? সুনীলের ঢল ঢল মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠে অশ্রুতে সমস্ত মেঝেটা ভিজে গেল। সে মাটিতে জোরে জোরে মাথা খুঁড়তে লাগল।

হঠাৎ দরজার কড়া বেজে উঠল। বাড়ী ঢুকে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে। পরেশ বাড়ী ঢুকে সুমিত্রার অশ্রুমাখা মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল। সুমিত্রা ডুকরে কেঁদে উঠল—আমাদের খোকন আর নেই গো, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

পরেশ ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে বিমূঢ় ভাবে চেয়ে রইল।

সুমিত্রা ধরা গলায় বলতে লাগল—'আমি হতভাগিনী বাছাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর ঘুম থেকে উঠে তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কুয়ো তলায় তার ইজেরটা পড়েছিল।' সঙ্গে সঙ্গে সে আবার কেঁদে উঠল।

পরেশ আর মুহূর্ত্ত দেরী করলে না। তার কাপড় জামা খুলে রেখে গামছা পরে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

•

কুয়োয় খুব বেশী জল ছিল না। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ছেলের মৃতদেহ কোথাও পেলো না।

উপরে উঠে এসে সে বললে—'না, কুয়োয় নেই তো, কিন্তু গেল কোথা সে? তুমি ভাল করে সব দেখেছ তো?'

সুমিত্রা বললে—'কোথাও পেলুম না। বাইরের কপাট ঠিক্ ভাবেই বন্ধ ছিল।'

পরেশও চারদিক্ একবার ভাল করে দেখে নিলে। সুনীলের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

সুমিত্রা ঘরে এসে 'খোকন, বাবা আমার কোথা গেলি রে?' বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

হঠাৎ পাটির ভেতর থেকে খোকন বলে উঠল—'এই তো, আমি এখানে!'

স্বরটা সুমিত্রার কাছে দৈব-বাণীর মতই শোনাল। সে ছুটে গিয়ে পাটিটা তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে খোকন বাইরে এল। তার কচি হাত দু'খানি তখনো চিনিতে চট্ চট্ করছে।

স্বামী-স্ত্রীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। হারানিধি ফিরে পেয়ে তারা তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমায় চুমায় খোকনের কোমল মুখখানি একেবারে আবীর রাঙা করে দিলে। কান্না বন্ধ হয়ে তখন হাসির খেলা সুরু হয়েছে।

—

রোগ মুক্তি

নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

ভজহরি সরকার, দেহে খুব
বল তার,
অল্প আঘাতে দেহ বাঁকে না।
কোল-কুঁজো গুড়িসুড়ি,
যৌবনে বুড়ো-বুড়ি
সেজে কভু থাকে না।
কারো বাঁকা চলাফেরা,
দেখ্‌লে সে চুল চেরা
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধরে রাতদিন নিত্য
স্বাস্থ্য নিটোল-পারা
শির-দাঁড়া কারো খাড়া
দেখ্‌লে খুশীতে তার
ভরে উঠে চিত্ত।

২

সেদিন বছর পরে, এসে সে মামার ঘরে
শুল তার পাশে গিয়ে রাত্রে।
গোঙানির সাড়া পেয়ে, উঠে পড়ে দেখে চেয়ে
বিহ্বল গাত্রে:
ধনুক বাঁকার মত, মামা বাঁকে অবিরত
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে নাসা প্রান্তে।
এ যে ধনুষ্টঙ্কার
রোগ বড় শঙ্কার
তায় ভেবে ডাক্তার পাঠাইল আন্‌তে।

৩

এ হেন নিশুতি রাতে, ডাক্তার ব্যাগ হাতে
হুড় মুড় করে ঘ'রে ঢুক্‌ল।
ভজহরি ভীতস্বরে, পাদুটি জড়ায়ে ধরে
মাথা তার ঠুক্‌ল।
কহে তাঁকে বার বার, রোগ এই কদাকার,
সারান মামাকে আজ ঔষধ দানিয়া
রোগীটার গিয়ে পাশে
ডাক্তার দেখে হাসে
যত পারে পড়্‌পড়্‌ ধরে কান টানিয়া।

৪

কানমলা খেয়ে পর,
ভোগে রোগী ধড়্‌ফড়্‌
'কাণ কেন টানে',—
তাকে শুধালো।
ডাক্তার ক'ন রোষে,
"কাণ যদি টানি কষে
মাথাখুলে"—বুঝালো
ভেবে ভেবে শতবার,
বুঝলে গলদ তার

ছাড়ব কদভ্যাস মামা তার জানালো
ভজহরি বলে শুনে—
'ডাক্তার নিজ গুণে
মামাকে নিমিষে আজ রোগহীন বানালো।'

হরধনুভঙ্গ

শ্রীযামিনীমোহন কর

তৃতীয় দৃশ্য

রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ

জনক ও মন্ত্রী

জনক। মন্ত্রীবর, সীতার বিবাহের তো কোন উপায়ই করা যাচ্ছে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! মা আমাদের স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা। যার তার সঙ্গে তো তাঁর বিবাহ হতে পারে না।

জনক। তা তো জানি। কিন্তু একটা কোন উপায়ও তো করতে হবে। হরধনুভঙ্গ কি কেউই করতে পারবে না?

মন্ত্রী। উপায় একটা নিশ্চয়ই হবে মহারাজ! ভগবানের কৃপায় তাঁর যোগ্য স্বামী অবশ্যই আসবেন। তিনি ব্যতীত আর কেউ-ই সীতার যোগ্য হতে পারেন না।

জনক। সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু মন মানে না।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। (অভিবাদনান্তে) মহারাজ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন করেছেন।

জনক। যাও, তাঁকে সসম্মানে এইখানে নিয়ে এস।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা।

অভিবাদনান্তে প্রস্থান

মন্ত্রী। হঠাৎ মহর্ষি এলেন কেন? আশ্রমের কোন অসুবিধা হয়েছে কি?

জনক। বুঝতে পারছি না। রাক্ষসদের আক্রমণে আশ্রমবাসীরা সর্বদাই তটস্থ হয়ে আছেন—

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

জনক। (এগিয়ে গিয়ে) আসুন, আসুন মহর্ষি। আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ করলুম অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

জনক ও মন্ত্রী বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন।

বিশ্বামিত্র। শুভমস্তু। (রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া) এরা রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। (ওদের প্রতি) তোমরা রাজর্ষিকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনককে প্রণাম করলেন।

জনক। বেঁচে থাক। কল্যাণ হোক। তারপ মহর্ষি, আপনার খবর ভাল তো? আশ্রমবাসীরা কুশলে আছেন তো?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ রাজর্ষি। আমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল আশ্রমে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

জনক। রাক্ষসদের উপদ্রব—

বিশ্বামিত্র। সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। এই বালক রাম এবং লক্ষ্মণ তাদের বধ করেছে। যে কয়েকজন মরে তারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর ফিরবে বলে ম হয় না।

মন্ত্রী। এই বালকেরা রাক্ষসদের পরাভূত করেছে আশ্চর্য্য, মহাশ্চর্য্য!

বিশ্বামিত্র। এর চেয়ে অধিকতর আশ্চর্য্য আ আপনারা দেখতে পাবেন। রাজর্ষি জনক, আমি এদে এখানে কেন এনেছি জানেন?

জনক। না মহর্ষি।

বিশ্বামিত্র। রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতার পাণিগ্রহ করবে।

জনক। কি বলছেন প্রভু? বলীশ্রেষ্ঠ রাবণ পর্য্য এ ধনু তুলতে পারে নি—

বিশ্বামিত্র। জানি রাজন্। কিন্তু একবার চেষ্টা ক দেখতে দোষ কি? পরশুরাম জানেন যে, এই মহা তিনি ছাড়া আর কেউ তুলতে পারবেন না। তপ ে করে তিনি এসে মা জানকীকে বিবাহ করবেন। বুড়ে হাতে বালিকা কন্যাকে তুলে দিতে পারবেন কি?

জনক। নিরুপায় মহর্ষি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবে, তারই হাতে আ কন্যা সমর্পণ করতে বাধ্য।

বিশ্বামিত্র। বেশ। তবে ধনু নিয়ে আসুন। রাম শুধু জ্যা রোপনই করবে না, গুণ টেনে হরধনু ভঙ্গ করবে।

মন্ত্রী। এ যে অসম্ভব কথা প্রভু।

বিশ্বামিত্র। ভগবানের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

জনক। তা হলে মহর্ষি, আপনি রাম-লক্ষ্মণসহ অস্ত্র-গৃহে চলুন। হরধনু সেইখানেই আছে।

বিশ্বামিত্র। বেশ, চলুন।

সকলের প্রস্থান

পট পরিবর্তন

অস্ত্রগৃহ

জনক, মন্ত্রী, বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও পাত্র অমাত্য প্রভৃতি

জনক। মহর্ষি, এই সেই বিখ্যাত হরধনু।

(ধনু দেখালেন।)

বিশ্বামিত্র। বৎস রাম, ধনু উত্তোলন কর।

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ দাদা, সকলেই দেখতে এসেছেন।

রাম। বেশ, তাই হোক।

(ধনু উত্তোলন।)

জনক। ধন্য!

মন্ত্রী। এ যে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে গেল।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, এ ধনু যে ভেঙ্গে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্বামিত্র। রাম, ধনুতে গুণ পরাও।

রাম। মহর্ষি, ভয় হচ্ছে টান দিলে ভেঙ্গে যাবে।

বিশ্বামিত্র। বেশ তো। সবাই কৌতুক দেখতে এসেছেন। ধনুভঙ্গ করে এঁদের মনোরথ পূর্ণ কর।

রাম। যথা আজ্ঞা প্রভু।

(ধনুতে গুণ পরিয়ে টান দিতেই ধনু ভেঙ্গে গেল।)

জনক। ধন্য, ধন্য। বাজাও, বাদ্যি বাজাও, শাঁখ বাজাও। আমি আজ প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার মা জানকীর ভাবীপতির দেখা পেয়েছি।

(নেপথ্যে শঙ্খ-ঘণ্টাবাদ্যধ্বনি। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিশ্বামিত্র। তবে রাজর্ষি, এইবার মহারাজ দশরথকে আনতে লোক পাঠান। আর তাঁর অন্য পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকেও নিমন্ত্রণ করুন। আপনার বংশের চারি কন্যার এক সঙ্গেই বিবাহ হয়ে যাক্।

জনক। অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। মহর্ষি চলুন, রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এইবার একটু বিশ্রাম করে নিন।

বিশ্বামিত্র। তা তো করতেই হবে। এর পর কয়েক-দিন ধরেই হৈ চৈ চলবে। চলুন তবে।

সকলের প্রস্থান

বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জনকের প্রাসাদের বাহিরে পথ

আহার শেষ করে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে তিনজন মুনি বালকের প্রবেশ।

১ম। কি বলিস্! রাজর্ষি জনক খাইয়েছেন ভালো।

২য়। (ঢেঁকুর তুলে) সে কথা আর বলতে। আহা, মালপোগুলোর কি চেহারা—

৩য়। (বসে পড়ে) যেন বারকোস। যেমন বড় দেখতে, তেমনই রসে ডগমগ। পাতে যখন মালপো দিল, মনে হ'ল যেন আকাশে চাঁদ উঠেছে।

১ম। তা তুই হঠাৎ পথের মাঝে বসে পড়লি কেন?

২য়। চল্, ওঠ্। আশ্রমে ফিরে যেতে হবে না?

৩য়। নিরুপায়। ওঠবার ক্ষমতা নেই। পেট হাঁস-ফাঁস করছে।

১ম। অত গিলতেই বা গেলি কেন?

২য়। ওর খেতে বসলে আর কোন হুঁশ থাকে না। গুরুদেব তাই তো বকাবকি করেন। আহারে সংযমের প্রয়োজন।

৩য়। আহা আমি যদি রাক্ষস হতুম—

১ম। এ আবার কি কথা—

২য়। এতদিন রাক্ষসদের উপদ্রব সহ্য করেও সখ মিটল না।

৩য়। (কোন কথায় কান না দিয়ে) তা হলে আমার কত বড় পেট হ'ত। আহা, কত জিনিষই যে পাতে পড়ে রইল—উহুহু—(ক্রন্দন)

১ম। তা কাঁদছিস্ কেন?

২য়। আর এখন কেঁদেই বা কি হবে। একটু বসে খেলি না কেন?

৩য়। (কান্নার সুরে) পেটে যে জায়গা ছিল না।

১ম। বেশ, আর এক দিন না হয় গুরুদেবকে বলে কোথাও সাধু সেবার আয়োজন করানো যাবে।

২য়। এখন আর কাঁদিস নে। চল, আশ্রমে যাওয়া যাক। এখনই হয়ত' গুরুদেব এসে পড়বেন—

১ম। ঠিক বলেছিস্। হ্যাঁরে খাওয়া হ'ল—একবার জয়ধ্বনি কর।

২য়। বটেই তো। জয় জনক মহারাজের জয়।

১ম। জয় রামসীতার জয়।

৩য়। জয় তাড়কা রাক্ষুসীর জয়।

২য়। ও আবার কি?

৩য়। ভাগ্যিস তাড়কা রাক্ষুসী ছিল, তাই রামলক্ষ্মণ এলেন, তাই হরধনু ভঙ্গ হ'ল, তাই সীতার বিয়ে হ'ল, আর তাই আমাদের ভুরিভোজ হ'ল। এর নাম হ'ল মল সন্ধান।

১ম। তা যাই হোক, এরকম কথা বলা ঠিক নয়।

২য়। তুই যা বললি, তা মল নয় মূলো।

৩য়। তোরা জিনিষটা তলিয়ে বুঝতে চাস না। যদি আমরা না জন্মাতুম, তা হলে কি খেতে পেতুম?

১ম। তা হলে আর কি করে খেতুম।

৩য়। তবেই বল্ আমাদের জয়।

২য়। নাঃ, তুই দেখছি আমাদের ডোবাবি। আশ্রমে ফিরে গিয়ে যত ইচ্ছে জয়ধ্বনি করিস্। এখন চল।

৩য়। আর যদি মালপো সৃষ্টি না হ'ত, তবে—ওঃ, ভাবতেই ভয় হচ্ছে। তোরা সবাই বল, জয় মালপো মহারাজ কী জয়।

১ম। আঃ, একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি। চল, দু'জনে মিলে ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাই।

২য়। সেই ভাল। নে, ধর—

দু'জনে মিলে তাকে টানতে টানতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

জনকের প্রাসাদের দালান

জনক, বিশ্বামিত্র, দশরথ, বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী।

দশরথ। তা হলে রাজর্ষি জনক, অনুমতি করুন। এখনই যাত্রা করতে হবে।

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ এখন লগ্নটা শুভ। ওঁদের সব তৈরী হতে বলুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, আপনিই তো এই শুভ বিবাহের ঘটক। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে অযোধ্যা যেতে হবে।

দশরথ। নিশ্চয়ই। আমার গৃহে আপনার পদধূলি পড়লে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করব।

বিশ্বামিত্র। বেশ যাব। কিন্তু একদিনের বেশী থাকতে পারব না। অনেকদিন আশ্রম থেকে দূরে রয়েছি।

জনক। মন্ত্রীবর, একবার তবে ভেতরে খবর পাঠান। এঁদের যাত্রার সময় হয়েছে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

প্রস্থান।

দশরথ। গুরুদেব, একি!

বশিষ্ঠ। কি বলছেন মহারাজ?

দশরথ। চারিদিকে এত অলক্ষণ দেখছি কেন?

জনক। হ্যাঁ, তাই তো আকাশে ঘন মেঘ, শকুনির দল—

বিশ্বামিত্র। অলক্ষণ তো আমিও দেখছি। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই।

জনক। ঠিক বলছেন মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমাদের আশ্রমে এর চেয়ে অনেক বেশি অমঙ্গল ছিল। শুধু লক্ষণ নয়, প্রকৃত বিপদ। কিন্তু সবই তো দূর হ'ল। কি করে, তা বলেছি। সুতরাং যেখানে রাম আছে সেখানে বিপদ থাকতে পারে না। তার ইচ্ছা হলেই বিপদ কেটে যাবে।

দশরথ। ঐ দেখুন, ভীমকায় অপার দর্শন এক মহাপুরুষ বেগে ধাবিত হচ্ছেন।

জনক। কি ভয়ানক। উনিই তো পরশুরাম।

পরশুরামের প্রবেশ

জনক। হে ঋষিবর, প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণাম করলেন

পরশুরাম। মঙ্গল হোক। রাজর্ষি জনক, লোক মুখে শুনলুম হরধনুভঙ্গ ও সীতার বিবাহের কথা। এ কি সত্য?

জনক। হ্যাঁ, প্রভু। রাম ধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেছে। আপনি তো এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে রক্ষা করতে বলেছিলেন। আপনার কথা মতই কাজ করেছি।

পরশুরাম। রাম! কি আশ্চর্য্য! শুধু আমার প্রদত্ত ধনুই ভঙ্গ করে নি, আমার নামটা পর্য্যন্ত চুরি করেছে। রাম আমি। জগৎ শুদ্ধ লোক তা জানে। একবিংশতি বার পৃথিবী ক্ষত্রশূন্য করেছি। প্রয়োজন হ'লে আবার করব। কে সেই মূর্খ যে নিজেকে আমার নামে পরিচয় দেয়।

দশরথ। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

পরশুরাম। ডাকুন তাকে।

দশরথ। কিন্তু—

বিশ্বামিত্র। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন মহারাজ। দশরথ। রামকে, তার পরিচয় ঋষি জামদগ্ন্যের পাওয়া প্রয়োজন।

পরশুরাম। ঠিক বলেছেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। আমি রামকে দেখতে চাই! রাম! কোথা রাম!

রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাম। এই যে আমি। আজ্ঞা করুন।

পরশুরাম। হা হা হা—বালক! এ যে নেহাৎ শিশু। না, না, ভুল হচ্ছে। বৎস, তুমিই রাম? তুমিই হরধনু ভঙ্গ করে সীতার পাণিগ্রহণ করেছ?

রাম। হ্যাঁ প্রভু।

লক্ষ্মণ। শুধু তাই নয়, তাড়কারাক্ষসীকেও বধ করেছে।

পরশুরাম। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিই রাম?

রাম। হ্যাঁ, আমিই রাম। হাতে পরশু নেই, তাই শুধু রাম। এতে বিস্মিত হবার কারণ আছে ঋষিবর?

পরশুরাম। না, বিস্মিত হই নি। সন্দেহ ভঞ্জন করতে চাইছি। তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ? হতে পারে। রুদ্র ও বিষ্ণুর যুদ্ধের সময় বিষ্ণুর ভয়াবহ হুঙ্কারে শিবধনু শিথিল হয়ে পড়ে। সেই ত্রুটিযুক্ত ধনু—তাই হয়ত' কোনক্রমে ভেঙ্গে গেছে। তাতে তোমার শক্তির পরিচয় মেলে না।

রাম। আমি তো শক্তির গৌরব করি নি।

পরশুরাম। তুমি কর নি, কিন্তু জগৎ করবে। রাম নামে খ্যাত আমি। তোমার নামে আমি তলিয়ে যাব। না, না, তা হতে পারে না। শক্তির পরিচয় দাও। তবেই হার স্বীকার করব। নয়ত' তোমাকে রাম নাম ত্যাগ করতে হবে।

রাম। পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করতে পারব না। কাজেই বাধ্য হয়ে শক্তির পরিচয় দিতে হবে। পরীক্ষা করুন।

দশরথ। রাম, এখনও শান্ত হও। ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

জনক। বৎস রাম, পরশুরাম জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা, অসাধারণ শক্তিশালী—

রাম। জানি, কিন্তু আমিও যে ক্ষত্রিয়সন্তান। ঋষিবর, কি পরীক্ষা দিতে হবে বলুন।

পরশুরাম। আমার এই বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবে?

রাম। চেষ্টা করব। ধনু দিন।

পরশুরাম ধনু দিলেন। রাম তাতে গুণ পরালেন।

পরশুরাম। অসম্ভব এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

রাম। কিন্তু দেখেতো অবিশ্বাস করতে পারবেন না। ধনুকে গুণ পরিয়েছি। এইবার ব্রহ্মাস্ত্র দিন।

পরশুরাম। ব্রহ্মাস্ত্র! কেন?

রাম। ধনুতে গুণ পরিয়ে শর নিক্ষেপ না করে গুণ খুলে রাখলে ধনুর অপমান করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে আপনি সুপণ্ডিত। আপনার ধনুর অপমান নিশ্চয়ই আপনি চান না।

পরশুরাম। (বাণ দিয়ে) এই নাও ব্রহ্মাস্ত্র।

রাম। (ধনুতে বাণ জুড়ে) এইবার বলুন ঋষিবর, এই তীর কোথায় ছুড়ব। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, যেথানে নিক্ষেপ করব, সেই পথ আপনার কাছে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আপনার উপর নিক্ষেপ করি, তবে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আমি তা করতে পারব না।

পরশুরাম। না, আর ভুল নেই। তুমিই রাম, তুমিই নারায়ণ। তোমাকে নির্ভুলভাবে চেনবার জন্যই আমি এই পরীক্ষা করেছিলুম। তুমি আমার ভগবান। আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। কি হবে স্বর্গে গিয়ে? তুমি তো মর্ত্ত্যেই থাকবে। হে আরাধ্য দেব, আমার স্বর্গের পথ রুদ্ধ কর। তুমি যখন মর্ত্ত্যে, তখন মর্ত্ত্যই আমার স্বর্গ।

রাম। (বাণ নিক্ষেপ করে) ঋষি, আপনার স্বর্গের পথ রুদ্ধ হ'ল। কিন্তু আমার মনের পথ আপনার জন্য খোলা রইল। —

পরশুরাম। আমি ধন্য হলুম প্রভু।

পরশুরাম নতজানু হয়ে জোড় হস্তে মাথা হেঁট করলেন। রাম তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।

যবনিকা

মালিনী

(ঝুমুর নাচের গান)

উদাসিনী মালিনী কেঁদে আকুল !
বলে, তুলবো-না তুলবো-না তুলবো-না ফুল ;
ফুলে সাজাবো না ডালা, (হায়রে !)
গাঁথবো-না গাঁথবো-না গাঁথবো-না মালা,
আর পরবো-না রাঙাসাড়ী, বাঁধবো-না চুল,
আমি বাঁধবো-না চুল ॥

বলে, মায়াকাজল-আঁকা নয়নবাণে
হানবো-না দিশাহারা পথিক-প্রাণে ;
কনকচাঁপায় কানে দুলাবো-না দুল-গো,
দুলাবো-না দুল ।

বলে, আমার মালী আমায়
তুলবে কনকচাঁপায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥
মোহনমধু-মাখা মুখে হেসে
কথা বোলবো-না ছল কোরে ভালোবেসে ;
হাতে মাখবো-না কুঙ্কুম, (হায়রে !)
বাজাবো-না পায়ে নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুম ;
নেচে নাচাবো-না লালজবা কালো কেশে,
আমার কালো কেশে ॥

বলে, ঘরের শোভা ঘরণীতে, বনের শোভা ফুলে,
এতদিন ভুলেছি তা ফুল তুলে তুলে !
ব্যথার কাঁটায় ফুটে ভাঙে আমার ভুলগো,
ভাঙে আমার ভুল ।

বলে, আমার মালী—আমায়
তুলবে রাঙাজবায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥
কখন পাবো আমার মালীর ঘরে আমায়,
কবে জানাবো অনুরাগের তনুলতায় !
বলে, আর যাবো না যে (হায়রে !)
রূপের সাথে ফুল বিকাতে কোনো হাটের মাঝে ;
যদি ঘরের বাগান পাই যাবো কোথায় ?
বাগান পাবো কোথায় ॥
কবে গোলাপ-টগর-বেলী-চামেলীতে
দুলবো মালীর মনে দোলা দিতে ;
কখন মালীর মালায় হবো মালিনী মুকুলগো,
মালিনী মুকুল ।

বলে, আমার মালী আমায়
তুলবে ফুলের মালায়,
আমি আর তুলবো-না ফুল ॥

কথা :—নিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি :—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা সা গা গা | গা মা পধা -পম I মা -া পধপা মা | গা -া পা পা I
উ দা সি নী মা লি নী০ ০০ কেঁ ০ দে০০ আ কুল্ ০ ব লে

I পা -ধা ধণধা পমা | মা -পা পধপা মগা I গা -পা পমা গা | রসা -া না না I
তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো না ফুল্ ০ ফু লে

I না -া র্সা সা | র্সা -া -া -না I ধনা -র্সনা ধা -পা | পা -ধা ধণা -পা I
সা ০ জা ব না ০ ০ ০ ডা০ ০০ লা ০ হা য়্ রে০ ০

I পা -ধা ধণধা পমা | মা -পা পধপা মগা I গা পা পমা গা | রসা সা সা -না I
গাঁ থ্ বো০০ না গাঁ থ্ বো০০ না গাঁ থ্ বো না মা লা আ র্

I সা -া গা গা | গা গা গা গা I গা মা া পমা | গা -া গা গা I
পর্ ০ বো না রা ঙা সা ড়ী বাঁধ্ বো ০ না চুল্ ০ আ মি

I গা মা -পা পমা | গা -া পা পা I পা -ধা ধণধা পমা | মা -পা পধপা মগা I
বাঁধ্ বো ০ না চুল্ ০ ব লে তু ল্ বো০০ না তু ল্ বো০০ না

I গা পা পমা গা | রসা -া পা পা I পা ধা -া মা | পা -া পা পা I
তু ল বো না ফুল্ ০ ব লে মা য়া ০ কা জ ল্ আঁ কা

I ধা র্সা -া না | র্সা -া -া -া I র্সা র্রা -া র্রা | র্রা র্মা র্গা র্রা I
ন য় ন্ বা নে ০ ০ ০ হান্ বো ০ না দি শা হা রা

I র্রর্গা র্গর্রা -া র্সনা | র্সা -া -া -া I না র্সা -া র্রা | না -র্সনা ধা পা I
প০ থি ক্ প্রা০ ণে ০ ০ ০ ক ন ক্ চাঁ পা ০য় কা নে

I পা ধা ণা ধা | পা -া ধপা -মা I মা পা ধপা মা | গা -া সা সা I
দু লা বো না দু ল্ গো০ ০ দু লা বো০ না দুল্ ০ ব লে

I সা -া গা গরা | সা -া সা ণ্া I সা -গা গা -া | গা -া মা রা I
আ ০মায় মা লী ০ আ মায় তু ল্ বে ০ ক ০ নক্ চাঁ

I গা -া গা মা | মা -পা -া -া I গা -পা পমা গা | রসা -া -া -া I
পা য়্ আ মি আ ০ ০ র্ তু ল্ ব না ফু ০ ০ ল্

"উদাসিনী..................তুলবো না ফুল" II

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

II সা গা -া গা | গা -া গা গা I গা মা -পা পমা | গা -া পা পা I
মো হ ন্ ম ধু ০ মা খা মু খে ০ হে সে ০ ক থা

I পা ধা -গা ধা | পা -া পা ধপমা I মা -া পধপা মা | গা -া না না I
বোল্ বো ০ না ছ ল্ কো রে০০ ভা ০ লো০০ বে সে ০ হা তে

I না র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা না I ধনা -র্সনা ধা -পা | -া -া -া -া I
মাথ্ বো ০ না কু ম্ কু ম্ হা০ ০য়্ রে ০ ০ ০ ০ ০

I না র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা না I ধনা -র্সনা ধা -পা | পা ধা -া মা I
বা জা ০ বো না ০ পা য়ে নূ০ ০০ পু র্ ঝু ম্ র্ ঝু

I পা -া গা -া | -া -া সা ন্া I সা গা -া গা | গা -া -া -া I
মু র্ ঝু ম্ ০ ০ নে চে না চা ০ বো না ০ ০ ০

I গা -মা পা -া | পা -া পা মা I মা -পা পা -গা | -া -া গা গা I
লা ল্ জ ০ বা ০ কা লো কে ০ শে ০ ০ ০ আ মায়্

I গা মা -পা মা | গা -া পা পা I পা ধা -ণা ধা | পা -া পা ধপমা I
কা লো ০ কে শে ০ ক থা বোল্ বো ০ না ছ ল্ কো রে০০

I মা -া পধপা মা | গা -া পা পা I পা ধা -া মা | পা -া -া -া I
ভা ০ লো০০ বে সে ০ ব লে ঘ রে র্ শো ভা ০ ০ ০

I ধা -া র্সা না | র্সা -া -া -া I ধা -া না র্সা | র্সা -া র্সনা -ধনা I
ধ ০ র ণী তে ০ ০ ০ ব ০ নের্ শো ভা ০ ফু০ ০

I র্সা -া -া -া | র্সা -া র্রা র্রা I র্রা র্মা -া র্গা | র্রা -া র্রা -া I
লে ০ ০ ০ এ ০ তো দিন ভু লে ০ ছি ভা ০ ফু ল্

I র্রা -া র্গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া I না -া র্সা র্রা | -না -র্সনা ধা পা I
ভু ০ লে০ ভু০ লে ০ ০ ০ ব্য ০ থার্ কাঁ টা ০য়্ ফু টে

I পা ধা ণা ধা | পা -া ধপা -মা I মা পা ধপা মা | গা -া সা সা I
ভা ঙে আ মার্ ভু ল্ গো০ ০ ভা ঙে আ০ মার্ ভুল্ ০ ব লে

I সা -া গা গরা | সা -া সা ণ্া I সা -গা গা -া | গা -া মা রা I
আ ০ মার্ মা লী ০ আ মীর্ ভু ল্ বে ০ রা ০ ভা জ

I গা -া গা মা | মা -পা -া -া I গা -া পমা গা | রসা -া -া -া I
বা য়্ আ মি আ ০ ০ য়্ তু ল্ ব না ফু ০ ০ ল্

"উদাসিনী..............তুলবো না ফুল" II

II সা -া গা গরা | সা -ণ্া -া -া I সা -া গা গা | গা -া -া -া I
ক ০ থন্ পা বো ০ ০ ০ আ ০ মার্ মা লী ০ ০ র্

I গা মা -পা পমা | গা -া পা পা I পা -া ধণা ধা | পা -া পা ধপমা I
ঘ রে ০ আ মায়্ ০ ক বে জাগ্ ০ বো০ অ নু ০ রা গে০র্

I মা -া পধপা মা | গা -া না না I না -র্সা র্সা -া | র্সা না ধনা -র্সনা I
ত ০ মু০০ ল তায়্ ০ ব লে আ য়্ যা ০ বো ০ না০ ০০

I ধপা -া পা -ধা | ধা -ণা -পা -া I পা -া ধা ধা | ধা -া -া -ণা I
যে ০ হা য়্ রে ০ ০ ০ রূ ০ পের্ সা থে ০ ০ ০

I পা -া ধণধা ধা | পা -া পা ধা I মা পধা -পা মা | গা -া সা ন্া I
ফুল্ ০ বি০০ কা তে ০ কো নো হা টে০ য়্ মা ঝে ০ য দি

I সা -া গা গা | গা -া গা -া I গা -া মপা মা | গা -া গা গা I
ঘ ০ রের বা গা ন্ পা ই যা ০ বো০ কো থায়্ ০ বা গান্

I গা -া মপা মা | গা -া পা পা I পা -া ধণা ধা | পা -া পা ধপমা I
পা ০ বো০ কো থায়্ ০ ক বে জাগ ০ বো০ অ নু ০ রা গে০র

I মা -া পধপা মা | গা -া পা পা I পা -া ধা মা | পা -া পা পা I
ত ০ মু০০ ল তায়্ ০ ক বে গো ০ লাপ্ ট গ র্ বে লী

I ধা -া র্সা না | র্সা -া -া -া I র্সা র্রা -া র্রা | র্রা -র্মা র্গা র্রা I
চা ০ মে লী তে ০ ০ ০ তুল্ বো ০ মা লী র্ ম নে

I র্রা -া র্গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া I {না -া র্সা র্সা | র্সর্রা -র্সা -না -া I
দো ০ লা০ দি০ তে ০ ০ ০ ক ০ থন্ মা লী০ ০ ০ র্

I না -া র্সনা ধপা | পা -ধা -মা -পা } I পা ধা র্সণা ধা | পা -া ধপা -মা I
মা ০ লায়্ হ বো ০ ০ ০ মা লি নী মু কুল্ ০ গো০ ০

I মা পা ধপা মা | গা -া সা সা I র্সা -া গা গরা | সা -া সা ণ্া I
মা লি নী০ মু কুল্ ০ ব লে আ .০ মায় মা লী ০ আ মায়্

I সা -গা গা -া | গা -া মা রা I গা -া গা মা | মা -পা -া -া I
তু ল্ বে ০ ফু ০ লের মা লা য়্ আ মি আ ০ ০ য়্

I গা -পা পমা গা | রসা -া -া -া I
তু ল্ ব না ফু ০ ০ ল

"উদাসিনী..........তুল্‌বো না ফুল" III

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পড়িল।

বলিলেন, "সূয্যি গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে" মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু দেখ তো সূয্যি কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু না কি"

ছিরু বাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "সূয্যি ওই যে নেবুতলার পিছন থেকে উঁকি মারছে। এদিকে আয়—"

আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

"দেখেছ, ছেলের কাণ্ড"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর মেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে না কি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্ত তিনি একখানি লাল পাড় শাড়ি, দিদিমার জন্ত একজোড়া থান এবং আমার জন্ত একটি ছিটের দোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা যেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেইখানেই আস্তানা গাড়িলেন। ছিরু চৌকির উপর শতরঞ্জি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাছেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল, কিন্তু ইহাও বুঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা"

"আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—"

"আমি এবার চান করব। তেল নিয়ে আয়"

ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া আসিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিলেন। কানের গর্ত্তে দিলেন, নস্থের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি দুই চোখেও এক ফোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া তেল মাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করিয়াছিলাম

বাবার গায়ের রং কত ফরসা, বুকের মাঝখানটায় কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা খানিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনকার কার্য্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্যায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে' দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। সুয্যি, যা পঞ্চাননকে নিয়ে আয়"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার লইল। সেই পঞ্চানন যে পটলকর্ত্তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। সইমা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁধিতে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার খোঁপায় একটি বেল-ফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। দুই-ভ্রূর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট্ট একটি কাঁচ-পোকার টিপ। মায়ের কোনও আপত্তি তিনি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি খড়কে-ডুরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজ হস্তে মায়ের পা ঝামা দিয়া ঘসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রূপ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না, তাঁহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন—বাসন মাজিতেন, ঘুটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমন কি দুধ পর্য্যন্ত দুহিতেন—তাই তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সইমা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পালঙ্কের উপর ফরসা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, তুই আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি সন্তোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সইমার কাছে সন্ধ্যার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা একটু নূতন ধরণের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে। সইমা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলায় কখনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সন্তোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকখানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং আলাপের পর আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তন্ময় হইয়া বসিয়া-ছিলাম। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। সহসা সইমার কণ্ঠস্বরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সইমা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখে মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন. "আমি পালাবার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না"

বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অনুমতি দিন, ভাত বাড়ব ?"

"বাড়ুন"

পালা-ঘটিত কথা-বার্ত্তা তখন বুঝি নাই, কথাটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সইমাই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সইমা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সইমাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়। রান্না করা সার্থক হ'ল!"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। আমি সইমার বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। সইমা গল্প শুরু করিলেন। সেদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মানুষের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়ন্তী নামটাও কম অদ্ভুত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহ[illegible]াসিয়া আমাকে বলিতেছে, 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল! উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্তোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সইমা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জ্বলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। স্বপ্ন সত্য হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল যে কিছু একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠকখানার ঘরটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আম গাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা খোলা। সইমার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী দূর নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্য সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দরজা খোলা। লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট ঠেসানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নিনিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতো বয়স আমার নয়, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সইমার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সইমা আর মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সইমা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সইমা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। উঠে এলি কেন রে—"

"ঘুম ভেঙে গেল"

"খিদে পায় নি তো, সন্ধ্যেবেলা খেলি না তো ভাল করে'। পায়েস খাবি একটু ?"

"না"

"তাহলে শুবি চল"

সইমার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দ্বার খোলা, প্রদীপের মৃদু আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বসিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরণে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা

আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তন্ময় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গম্ভীর মাধুর্য্য তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম মা দুঃখ পাইয়াছেন। দুঃখটা কেন এবং কিসের তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুতে আসে নি কেন সইমা"

"পুজো করছেন"

"এত রাত্রে কিসের পুজো"

"কালী পুজো"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সইমা আর আমি জাম-তলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু দুই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজন জামতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার আসর বেশ জমকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পাইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র আসিয়া জুটিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতে এবং যন্ত্র-সঙ্গীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অন্য পাড়ার ছেলে মেয়েরাও দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। দুই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, তথাকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল। মায়ের মুখেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে। সইমা বাবাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রান্নার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য বাড়ীর রন্ধন-পারদর্শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চাননও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিমা আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত করাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্ম্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ব্ববিধ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি নিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। আনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাঁধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভাল করিয়া মাংস আহার করিলাম। বাবা চমৎকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবার তাঁহার হাতের রান্নাই খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহা-প্রসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন দুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন, "এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই"

"কোথা যাবে, দেশে?"

"না। নৈহাটিতে যেতে হবে একবার। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব"

LUX
TOILET SOAP
LUX
LUX
TOILET SOAP

"তাহলে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছি না—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বাল্যজীবনের আর একটা অধ্যায় শুরু হইল।

"একবার শোন—"

কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল উর্ম্মিলা তাহাকে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"কি—"

"পেচ্ছাপ করে' বাবা বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি"

চাদর বদলাইয়া কুমার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি প্রকাণ্ড দুর্দ্দান্ত ঘোড়ার পিঠে অনায়াসে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণও প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্ত অসহায়। কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক করিয়া লইতে পারেন না। ক্রমশঃ

চিরবৃন্দাবন

(কীর্ত্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!
সেদিন সুখের ছিল জলধনু, আজ-জলধর কালো ব্যথার।
সেদিন ধরায় নামিত স্বর্গ শুভ্র বৃন্দাবনধামে,
বসন্ত-ঋতু হাসিত লুপ্ত মধুবনে বরি' ঘনশ্যামে,
ঝরিত বরষা-করুণা, প্রণয়-যমুনা বহিত চির উজান,
আজ শোক কাল ভয়—নয় নয়: ছিল আনন্দ নিরবসান।
আজ মায়া-ভ্রমে সুখ বলি' দুখ বরি' চলে হায় এ-সংসার:
একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!
মনে পড়ে:
ভোর না হ'তেই জল ভরিবার ছলে ঘাটে যাওয়া,
বঁধুমিলনের আশে গাগরিতে কাঁকনের ঠুনু ঠুনু গাওয়া,
শুনে—রুনু ঝুনু বাজায়ে নূপুর দেখা দিত শ্যাম অঙ্গনে,
হৃদয় ভরিয়া দিতে প্রেমে তার, নয়ন—মোহন দরশনে।
প্রতি উষা উছলিত লো আশায়, আজ এ-জীবন অন্ধকার:
একদিন গেছে সে আর সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!

কোথায় সেদিন আজ সখী?
কোথা সে-পুলক-উচ্ছ্বাস মধুর!
আমি-ও-আমার-জালে বাঁধা
প্রাণ গেছে ভুলে সেই প্রেমের সুর।
আছে আজো সেই গোকুল, যমুনা,
সেই শ্যামরায়, সে-মধুরম।
শুধু আমি আর নই সেই আমি, নেই আর সেই হৃদয় মম।
আজ চিন্তার সিন্ধুর চরে বালুকার গেহ রচি মায়ার:
একদিন গেছে সে আমার সখী,
আজ সেদিনের স্মৃতিই সার!
এ কী: শোন সখী:
কদম্বতলে আবার যে ওঠে বাঁশি বেজে!
আবার যে ডাকে শিখিচূড়া বনমালী মনচোর নেচে নেচে!
চল্ চল্ মীরা সে-বৃন্দাবনে হরিদরশন তরে ফিরে,
চল্ প্রেমলীলা সাধিতে,
বসাতে আলোর হাট এ-কালোতীরে।
এল নাথ মীরা ফিরে শ্রীচরণে বরি কীর্ত্তনে প্রেমাভিসার:
ছিল স্মৃতিসার যে-অতীত—ফিরে এল করুণায় বঁধু তোমার!

(ইন্দিরা দেবীর সমাধি-শ্রুত হিন্দী ভজনের অনুবাদ)

১৯৫৭-৫৮-খ্রীষ্টাব্দের কেন্দ্রীয় বাজেটে কর-বাহুল্য

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেই জানেন, ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে প্রথমে ২০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২,৩৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী-খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৪,৮০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল, জিনিষপত্রের বর্দ্ধিত মূল্যের জন্য এখনই মনে হইতেছে প্রস্তাবিত সব কাজ করিতে হইলে ব্যয়বরাদ্দ আরও প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা বাড়াইতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ অর্থাভাবে আটকায় নাই সত্য, তবে পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থানের অগ্রাধিকার দেশের সাধারণ মুদ্রাসংকোচন ও পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রয়াসে নিঃসন্দেহে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। লোকের হাতের বাড়তি টাকা বহুলাংশে সরকারী ঋণপত্রে লগ্নী হইয়াছে, সরকার ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। পরিকল্পনা অবশ্য নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই, অন্ততঃ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির অগ্রগতি লক্ষণীয় হইয়াছে; কিন্তু তবু দেশের অর্থব্যবস্থা যে স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সমগ্রভাবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পনার নিজস্ব গৌরব বাস্তব দৈন্যের আপেক্ষিক কঠোরতায় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপের সময় আসিলে পরিকল্পনার অর্থসংস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতের খরচ ৪,৮০০ কোটি টাকা ধরিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন যে, এই টাকার মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত করসংস্থাপন দ্বারা, ১,২০০ কোটি টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ দ্বারা এবং ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। এ ছাড়াও সংগ্রহের সূত্র স্থির হয় নাই এমন যে ৪০০ কোটি টাকা আছে, তাহাও নূতন কর বসাইয়াই সংগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। যদিও পুরাতন করের বৃদ্ধি ও নূতন কর স্থাপন, ঘাটতি ব্যয় এবং ঋণপত্র বিক্রয়ই ব্যয়বহুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপদানরত দেশের অর্থসংগ্রহের প্রধান উপায়, তথাপি ভারতে বর্ত্তমান অবস্থায় এই তিন খাতে ৩,২৫০ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরে সংগ্রহ করিবার সংকল্পকে অনেকেই অবিমৃষ্যকারিতা মনে করিতেছেন।

বাস্তবক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহের উপরোক্ত তিনটি সূত্রই বিপজ্জনক। নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া পাঁচ বৎসরে ১২০০ কোটি টাকা সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। এইভাবে লোকের হাতের নগদ টাকা টানিয়া লইলে দেশে বেসরকারী খাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি আহত হইতে বাধ্য। অথচ বেসরকারী খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২,৪০০ কোটি টাকা লগ্নী হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছেন। তাছাড়া ঋণ গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সুবিধা হইলেও ঋণ পরিশোধের একটা দায়িত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ ইতিমধ্যেই সরকারী অর্থনীতির হিসাবে বিপুল পরিমাণ হইয়াছে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৩৭ কোটি টাকা, বর্ত্তমানে ইহা ৩,৭০০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। বহির্দেশীয় (External) ঋণের পরিমাণ এই সময়ের মধ্যে ৪৬৯ কোটি টাকা হইতে ১৭৬ কোটি টাকায় নামিয়াছে একথা স্মরণ রাখিয়াও ভারতের আভ্যন্তরীণ ঋণে স্বস্তি প্রকাশ চলে না।

ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কেও একই কথা। কেহ কেহ ভারতের ন্যায় বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত ব্যাপারে ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বড় কথা বলেন না সত্য, তবু ভারতের মুদ্রা-নীতিতে স্বর্ণ সম্পর্কহীন নিকেল মুদ্রা ও কাগজী ঋণপত্রের প্রভাব এত বেশি যে আরও ঘাটতি ব্যয় নীতি মুদ্রাব্যবস্থার সম্ভ্রম বিপন্ন করিতে পারে। উন্নত (স্বর্ণ) জামিনহীন নোট ছাপার ফলে দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিরূপ হয়, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে এইভাবে মুদ্রিত নোট বাজারের পণ্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে বহুলাংশে দায়ী।

বাকী রহিল কর সংস্থাপন। এই হিসাবেও ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় মোটেই আশাবাদী হওয়া চলে না। কর-সংস্থাপনের নীতির মূলকথা হইল, এই সংস্থাপন শুধু সরকারের আর্থিক সচ্ছলতাই সৃষ্টি করিবে না, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত হইবে এবং ধনী দরিদ্রের আর্থিক অসাম্য যথাসম্ভব বিদূরিত করিবে। সে হিসাবে নূতন কর যাহাতে দরিদ্র দেশবাসীকে স্পর্শ না করে, তাহা দেখা এদেশে সর্ব্বাগ্রে দরকার। ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর সংস্থাপনের সময়ও পুঁথিগত নীতিবাদ ছাড়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর তাহার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্মরণ রাখিতে হইবে। বলিতে গেলে, এই অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতিতে ভারত সরকার শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের নীতি একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছেন।

কর-সংস্থাপন দ্বারা ভারতের সরকারী অর্থনীতির কিরূপ উন্নতিসাধন সম্ভব, এ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য বিশিষ্ট ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ডাঃ ক্যালডার করনীতির পরিবর্ত্তন সাধনের ব্যাপক সুপারিশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ইহা দ্বারা

সরকারের লক্ষণীয় আর্থিক সাচ্ছল্য ঘটিবে। তিনি আয়কর খাতে হার কিছুটা কমাইবার কথা বলেন, কিন্তু সম্পত্তির উপর এবং ব্যয়ের উপর যে করপ্রবর্তনের সুপারিশ করেন এদেশে তাহা নূতন এবং বিপ্লবাত্মক। অধ্যাপক ক্যালডারের সুপারিশ অনুযায়ী বৎসরে ভারতের সরকারী রাজস্ব খাতে নিম্নরূপ উন্নতি অনুমতি হয় :—

আয় কর ও সুপার ট্যাক্স	—১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা
মূলধন কর (Capital Gains Tax & Annual Capital Tax)—	+৪০ কোটি টাকা হইতে +৬৫ কোটি টাকা
ব্যয় কর (Expenditure Tax)—	+১০ হইতে ১৫ কোটি টাকা
দান কর (Gifts Tax)—	+৩০ কোটি টাকা
মোট	+৬১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইতে ৯১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা

অধ্যাপক ক্যালডারের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা সুরু হয়। এই করনীতির সমাজবাদী মূলসূত্র স্বীকার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এদেশের পটভূমিকায় এরূপ কর ব্যবস্থা পুনর্গঠনে সাহায্যের পরিবর্ত্তে সম্ভাবনাময় বেসরকারী অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব-বিস্তার করিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। ব্রিটেনের মত ধনীদেশের অর্থনীতি আলোচনায় অভ্যস্ত অধ্যাপক ক্যালডার ভারতের বিচিত্র আর্থিক কাঠামো ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াও কাহারও কাহারও সন্দেহ হয়।

ক্যালডার সাহেব বিদায় লইবার পর এ সম্পর্কে আলোচনা অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে, বহু-সমালোচিত ক্যালডার প্রস্তাবসমূহ ভারতসরকার পুঁথিগত ভাবে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু গত ১৫ই মে লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭ ৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট পেশ প্রসঙ্গে বৎসরে ৭৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয়যোগ্য যে করব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে শুধু ক্যালডার-প্রস্তাবই স্বীকৃত হয় নাই, করসংস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী আরও কিছুটা আগাইয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক ক্যালডার সমাজবাদী অর্থনীতিবিদরূপে প্রখ্যাত, তাঁহার প্রস্তাবসমূহে ধনীদের উপর সংস্থাপনযোগ্য করের কথা বড় করিয়া ছিল, অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবে ধনীদের উপর নির্দ্ধারণযোগ্য কর-ছাড়াও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে বহন করিতে হইবে এমন বহুসংখ্যক জিনিষের উপর কর বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলভাড়ার হার বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং আয়করযোগ্য নিম্নতম আয়ের পরিমাণ বাৎসরিক ৪,২০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনিয়া অধিকতর সংখ্যক লোককে করদানে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক ও তারের মাশুল বাড়িতেছে, চিনি, চা, কফি, তামাক, দেশলাই, পেট্রোল, বনস্পতি, সিমেণ্ট, ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি হইতেছে। আমদানীকৃত প্রায় ৯০টি জিনিষের উপর আমদানী শুল্ক বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্পত্তি ও ব্যয়ের উপর কর বসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত কর-নীতি এমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে যখন তিনি লোকসভায় এই তালিকা পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় লোকসভার কংগ্রেস সদস্যদের অধিকাংশও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। ব্যয় কর ও সম্পত্তি কর এদেশে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ, অধ্যাপক ক্যালডারের সুপারিশের পর এই দুই কর বসা একান্ত অপ্রত্যাশিত না হইলেও জাতীয় অর্থনীতিতে এই নগদ টাকা শোষণকারী করের প্রতিক্রিয়া-সম্পর্কে অনেকেই অস্বস্তিবোধ করিতেছেন।

বাজেটে প্রস্তাবিত কর বৃদ্ধির কতকগুলি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল, ইহা হইতেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে :—

উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি :—

চিনি—পাউণ্ড পিছু ৫ নয়া পয়সা হইতে ১০ নয়া পয়সা ; পেট্রোল—গ্যালন ৯৮ নয়া পয়সা হইতে ১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা ; বনস্পতি—পাউণ্ড পিছু ৩ নয়া পয়সা হইতে ৫ নয়া পয়সা ; সিমেণ্ট—টনে পাঁচ টাকা হইতে ২০ টাকা ; ইস্পাত—টনে ৪ টাকা হইতে ৪০ টাকা ; পরিশোধিত ডিসেল তৈল—প্রতি গ্যালনে ২২ নয়া পয়সা হইতে ৪০ নয়া পয়সা ; অপরিশোধিত ডিসেল তৈল—প্রতি টনে ৩০ টাকা হতে ৪০ টাকা ; কেরোসিন তৈল—প্রতি গ্যালনে ১৮·৭৫ নয়া পয়সা হইতে ২০ নয়া পয়সা ; চিনি—প্রতি হন্দরে ৫ টাকা ৬ নয়া পয়সা হইতে ১১ টাকা ২৫ নয়া পয়সা ; অত্যাবশ্যকীয় নয় (Non-essential) এমন উদ্ভিদ তৈল—প্রতি টনে ৭০ টাকা হইতে ১১২ টাকা ; চা—গুঁড়ার পাউণ্ডে ৬·২৫ নয়া পয়সা হইতে ·১০ নয়া পয়সার এবং প্যাকেটে প্রতি পাউণ্ডে ২৫ নয়া পয়সা হইতে ৪৫ নয়া পয়সা ; কফি—পাউণ্ডে ১৮·৭৫ হইতে ৩৫ নয়া পয়সা ; সিগারেট ও পাইপের জন্য তামাক—প্রতি পাউণ্ডে ৫৬ নয়া পয়সা হইতে ৭৫ নয়া পয়সা ; দেশলাই—বর্ত্তমান করহার এমনভাবে বাড়ান হইবে যাহাতে প্রতি ৬০ কাঠির ও ৪০ কাঠির দেশলাই যথাক্রমে ৬ নয়া পয়সা ও ৪ নয়া পয়সায় বিক্রিত হইতে পারে। এ ছাড়া অর্থমন্ত্রী বৎসরে অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির মত কাগজের শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব আনিয়াছেন।

বাজেটে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, আয়করযোগ্য সর্ব্বনিম্ন আয়ের স্তর ৪,২০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনা হইবে। (অবশ্য আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ্জ জড়াইয়া অনুপার্জ্জিত আয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্তরে দেয় হার শতকরা ৯১·৮ ভাগ হইতে শতকরা ৮৪ ভাগে এবং উপস্থিত আয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্তরে দেয় হার শতকরা ৯১·৮ ভাগের স্থলে শতকরা ৭৭ ভাগে নামাইয়া আবার প্রস্তাব হইয়াছে।)*

---

* যৌথ প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফার উপর করের হার কিছু কমান হইয়াছে। ভারতীয় ও বিদেশী যৌথ কোম্পানীসমূহের উপর বর্ত্তমানে সুপার ট্যাক্সের হার আছে যথাক্রমে শতকরা ১৭ ভাগ ও শতকরা ২০ ভাগ, ইহা কমাইয়া উভয়ক্ষেত্রেই শতকরা ১০ ভাগ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

দেখুন! অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটা সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটা ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়করের হার টাকায় ৪ আনা হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৩০ ভাগ এবং প্রতিষ্ঠানগত কর্পোরেশন ট্যাক্স টাকায় এগারো পয়সার স্থলে শতকরা ২০ ভাগে বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত লভ্যাংশের উপর কর হিসাবে শতকরা ৬ ভাগ হইতে ১০ ভাগ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ, শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৮ ভাগ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ এবং আরও বেশ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ ভাগ কর ধার্য্য হইয়াছে।

বোনাস শেয়ারের উপর করের পরিমাণ শতকরা ১১½ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৩০ ভাগ করার কথা হইয়াছে।

সম্পত্তি করের হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগতক্ষেত্রে প্রথম ২ লক্ষ টাকা ও হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রথম তিন লক্ষ টাকা কর হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং অতঃপর পরবর্ত্তী ১০ লক্ষ টাকার শতকরা ½ ভাগ, তৎপরবর্ত্তী ১০ লক্ষ টাকার শতকরা ১ ভাগ এবং অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ১½ ভাগ কর বসিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষি-সম্পত্ত এই কর হইতে বাদ যাইবে এবং যৌথ-কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকা কর হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট টাকার উপর শতকরা ½ ভাগ হিসাবে কর ধার্য্য হইবে।

ব্যয়-কর প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত বা হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বৎসরে ৬০,০০০ টাকার অধিক আয়ের সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য হইবে। এই কর ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চালু হইবে বটে, তবে বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়ও এই করের আওতায় আসিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

রেলভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ১ হইতে ৩০ মাইলের উপর শতকরা ৫ ভাগ, ৩১ হইতে ৫০০ মাইলের উপর ১০ ভাগ এবং অতিরিক্ত দূরত্বের উপর শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

প্রতি পোষ্ট কার্ড ৫ নয়া পয়সা হইতে ৬ নয়া পয়সায় এবং প্রতি জোড়া পোষ্ট কার্ড বা রিপ্লাই কার্ড ১০ নয়া পয়সা হইতে ১২ নয়া পয়সায় বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছিল, পোষ্টকার্ডের উপর কর অবশ্য প্রত্যাহৃত হইয়াছে। টেলিগ্রাফে প্রথম আটটি শব্দের উপরে প্রতি শব্দের জন্য সাধারণ তারে ৭ নয়াপয়সার স্থলে ৮ নয়া পয়সা এবং জরুরী (Express) তারে ১৪ নয়া পয়সার স্থলে ১৬ নয়া পয়সার প্রস্তাব হইয়াছে। পার্শেলের ভাড়া বর্ত্তমানের প্রথম ৪০ তোলার হিসাবে ৫০ হইতে ৬০ নয়া পয়সায় এবং পরবর্ত্তী প্রতি ৪০ তোলার হিসাবে ৫০ নয়া পয়সা করিবার কথা বলা হইয়াছে।

এইভাবে করনীতির সংস্কার দ্বারা অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আশা করিয়াছেন যে বর্ত্তমান ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাকী ১০ মাসে (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ আর্থিক বৎসর শেষ হইবে) ভারত সরকারের অতিরিক্ত আয় হইবে ৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা।*

কর-বাহুল্য কণ্টকিত আলোচ্য কেন্দ্রীয় বাজেটকে পরিকল্পনা-রক্ষাকারী বাজেট (Save-Plan-Budget) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই আখ্যা অর্থপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন অভাবের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে রূপ দান এক জিনিষ নয়। পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করিতে অর্থ যোগাইতে হইবে অর্থমন্ত্রীকে। কাজেই এই অর্থযোগানের দায়িত্ব সাপেক্ষে অর্থসংগ্রহের সূত্র সন্ধানে তাঁহার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পরিকল্পনার আপেক্ষক মৌলিক মূল্য যাহাই থাকুক, টাকার অভাব ঘটিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অর্থমন্ত্রীর গদিতে যিনি বসিবেন, সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনার এই ব্যর্থতা ঘটিতে না দিবার জন্য তাঁহার পক্ষে জনপ্রিয়তা হারাইবার ঝুঁকি লওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য একথার মানে এই নয় যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারীর করনীতি সংস্কারের যৌক্তিকতা আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছি। তাঁহার অসুবিধা ও সেই অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়াসের গুরুত্ব স্বীকৃতিই এরূপ উক্তির কারণ। নতুবা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরও মনে হয়, তাঁহার করনীতি অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়াছে। আমাদের দেশে জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ মূলধন হিসাবে বিনিয়োগের উপর পরিকল্পনা কমিশন যথেষ্ট ভরসা করিয়াছেন, তাঁহারাই আশা করিয়াছেন যে প্রথম পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-৫৬) যেখানে ৩,১০০ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ হইয়াছে, সেখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৫৬-৬১) মূলধন বিনিয়োগ হইবে ৬,২০০ কোটি টাকা বা দ্বিগুণ পরিমাণ। করবাহুল্যে লোকের হাতের টাকা নিঃশেষ হইলে এই মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি কি সম্ভব হইবে? সম্পত্তি করের আওতা হইতে অর্থমন্ত্রী যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই, শিল্পপ্রগতির হিসাবে এই করনীতি সত্যকার সহায়ক হইবে কি না বলা কঠিন। ব্যয়-কর লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি বাড়ায়; কিন্তু দেশের অভ্যন্তরভাগে অর্থব্যয়ের ফলে অর্থের প্রচলন গতি বৃদ্ধি পাইয়া যে নূতন অর্থসৃষ্টি সম্ভব হয়, এই ব্যবস্থায় সে সম্ভাবনা কি কমিবে না? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত সুদের প্রলোভন দেখাইয়া ঋণপত্র বিক্রয় বাড়াইবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্যও লোকের হাতের নগদ টাকা কমিয়া গিয়া নূতন

---

* এই ৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ কোটি টাকা, উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৪৯ কোটি টাকা, আয়কর বাবদ ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, ও সম্পত্তি কর বাবদ ১৫ কোটি টাকা আছে। উৎপাদন শুল্ক বাবদ টাকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে পেট্রোল, সিমেণ্ট, ইস্পাত, ডিসেল তৈল, চিনি, চা, তামাক, দেশলাই ও কাগজের উপর শুল্ক। প্রতি পূর্ণ বৎসরের হিসাবে এই সব খাতে যথাক্রমে ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, ৬ কোটি ২০ লক্ষ ও ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় আশা করা হইয়াছে।

শিল্পবাণিজ্য· সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হইলে পণ্যাভাবগ্রস্ত ও বেকার সমস্যা অধ্যুষিত এই দেশের পক্ষে তাহাতে কি মঙ্গল হইবে?

তবু ধনীদের হাতের টাকা কমাইবার কিছুটা যৌক্তিকতা আছে এবং আবাদী কংগ্রেসের (জানুয়ারী, ১৯৫৫) প্রস্তাবানুযায়ী যদি এদেশে সত্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে ধনী-দরিদ্রের অসাম্য কমাইবার চেষ্টাই দরকার। তবে আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় প্রথম শ্রেণীর ধনীদের বাদ দিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনীদের পর্য্যায়ে দেশের সাধারণ লোকের অর্থ-নৈতিক মান তুলিবার চেষ্টাইতো ভারতকে আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টার অনুপূরক। সে হিসাবে ইহাদের গরীব করিয়া গরীবকে আরও গরীব করিবার নীতি কি সমাজতান্ত্রিকতার সহিত সুসমঞ্জস হইবে?

দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তদের বিপন্ন করিবার মত যে বিপুল করভার অর্থমন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে আমরা সত্যই উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন বটে, তাঁহার অতিরিক্ত কর ধার্য্যের ফলে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের খরচ শতকরা· ০·৭২ ভাগ এবং সহরাঞ্চলে বাসিন্দাদের খরচ শতকরা ১·৩৮ ভাগ মাত্র বাড়িবে, কিন্তু বর্দ্ধিত-কর পণ্যতালিকার বিবেচনায় আমাদের মনে হয়, তাঁহার এই হিসাব কম করিয়াই ধরা হইয়াছে। এদেশে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত এমনিই অর্দ্ধমৃত, বেকারী ও অর্দ্ধবেকারীর চাপে তাহাদের বর্ত্তমান অন্ধকার এবং ভবিষ্যৎ সংশয়সঙ্কুল, এঅবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া বৃদ্ধিসমেত নূতন করের বোঝা তাহাদের উপর চাপিলে তাহারা সে ভার বহন করিবে কি করিয়া? পরিকল্পনার যুগে (Plan period) দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য সহনীয় কষ্ট অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সাধারণ দেশবাসীকে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে আহ্বান করা কোন কাজের কথা নয়। এই অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর মন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি বিরূপ হইলে সে ক্ষতিতো অপূরণীয়। বামপন্থীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, রাজকুমারী অমৃত কাউর, শ্রীফিরোজ গান্ধী, শ্রীবালকৃষ্ণ শর্ম্মা, শ্রীমান নারায়ণ অগ্রবাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন। কলিকাতা পৌরসভা বা ন্যাসনাল চেম্বার অফ কমার্সের মত জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের এ সম্পর্কে বিরূপ অভিমতও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা বাঁচাইবার জন্য করনির্দ্ধারণের নীতিতে দৃঢ় থাকিবার কথা ঘোষণা করিলেও জনমতের চাপে পোষ্টকার্ড ও কেরোসিনের উপর প্রস্তাবিত শুল্কবৃদ্ধি মকুব করিতে রাজী হইয়াছেন।* লোকসভায় ও দেশের অন্যত্র জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইলে আমরা আশা করি, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে বিপজ্জনক অন্যান্য অতিরিক্ত করের ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রী সহানুভূতিশীল হইবেন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বপ্নে মানবিকতার প্রাথমিক আবেদন অনুপূরক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অবশ্য অর্থমন্ত্রীর সহিত সম্পূর্ণ এক মত না হইলেও আমরাও মনে করি যে, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিয়া যদি খাদ্য মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুটা করবৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যেই থাকিতে পারে। এই সূত্রে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী খাদ্য যোগানে শৃঙ্খলারক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ কোটি টাকার যে বিশেষ তহবিল গঠনের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করি।

মোটের উপর করের দিকে দৃষ্টিতো দিতেই হবে, তাছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীরা যাহাতে করবৃদ্ধি উপলক্ষকে বাড়তি মুনাফালাভের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে না পারে, সরকারের তজ্জন্যও কঠোরতা দেখান দরকার। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃত্তি লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিগত ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে এদেশের প্রতিটি দুর্ভিক্ষগ্রস্তের জীবনের বিনিময়ে মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের এক হাজার টাকা হিসাবে লাভ হইয়াছিল বলিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশনই ঘোষণা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য লোকের কষ্ট হইবে,—দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহের নিরিখে ইহা অপ্রত্যাশিত নয় এবং পরিকল্পনা কমিশনও একথা বলিয়াছেন। † তবে এই সঙ্গে দেশবাসীর প্রকৃত বহনশক্তি পরিমাপ করার দায়িত্বও নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এই হিসাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অর্থসংস্থানের আশু আবশ্যকতার উপর যতই জোর দিন ("the exigencies of the situation demand nothing less"), দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের আর্থিক সঙ্গতির কথা পূর্ব্বাহ্নে বিবেচনা করিতে হইবে। এদেশে যাহারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় (করতদন্ত কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডারের মতে শুধু আয়কর ফাঁকির পরিমাণই বৎসরে ১৫।২০ কোটি টাকা, এছাড়া বিক্রয় কর, আবগারী কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি কত করই ফাঁকি পড়িতেছে) তাহাদের নিকট হইতে কর আদায়ের উন্নততর ব্যবস্থাও নূতন করসংস্থাপনের পূর্ব্বেই হওয়া দরকার।

---

* সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজও (News Print) প্রস্তাবিত বর্দ্ধিত আমদানী শুল্কের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

† পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন :—

It is obvious that the second five year Plan will strain the financial resources of the country· A measure of strain is implicit in any development plan for, by definition, a plan is an attempt to raise the rate of investment above what it would otherwise have been. It follows that correspondingly larger effort is necessary to secure the resources needed. It is from this point of view and in the light of the continuing requirements of the economy over a number of years that the tax of mobilising resources has to be approached.

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(১)

আগে শিকল দিয়ে বাঁধা হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া হবে।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সবাই এগিয়ে এল কাছে। ছেলে বুড়োর ধাক্কাধাক্কি, মেয়েদের ঠেলাঠেলি। সবাই কাছে আসতে চায়।

লাঠি উচিয়ে এল একজন।—আঃ, বারণ করছি, শুনছ না কেন তোমরা। সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও। একটা অঘটন ঘটলে পরে আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে। কিন্তু সরতে কি চায় লোকে। আরো ঠেলে আসে। সারা মেলা উজাড় করে এসেছে সবাই। কত দূর দুরান্ত থেকে আসছে মানুষ, শুধু সন্ধ্যাবেলার এই উৎসবটুকুর জন্য।

এক মণ বারুদের তুবড়ি। লোকে বলে, একমণি তুবড়ি। শিকল দিয়ে না বাঁধলে তার তেজ রুখবে কে। এমনিতেই শিকল ছিঁড়ে তুবড়ি আকাশে উঠতে চায়। শুধু শিকল বাঁধা নয়, মাটি কেটে বসানো হয়েছে একমণি খোল্। তবু আড়-মাতলার মতো এদিক ওদিক করে আগুনের ফোয়ারায়। কোনো গতিকে যদি একবার ফাটে, এই বারোয়ারীতলা শুদ্ধ লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়বে।

উৎসবের উপলক্ষ নবমদোল। বারোয়ারীতলার দক্ষিণে আছেন শ্যামরায়। বড় দীঘির ধারে তাঁর মন্দির। নবমদোল ওই শ্যামরায়ের। কিন্তু বাজী পোড়ানো উৎসবটা চিরকাল এখানেই হয়ে আসছে। এখানে, পুকুরের ধারে। এই পুকুরের তিনদিকে শিবমন্দির আর বুড়ো বট অশথের ভিড়। একদিকে দেবী চণ্ডিকার মন্দির। দেখে বোঝা যায়, ঘোর শাক্ত ভূমি। শ্যামরায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন যেন। আগে পাঁঠাবলিও হত নবমদোল উপলক্ষে। আজকাল বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। কিন্তু বাজী পোড়ানোর মধ্যে সেই মত্ততাটা টের পাওয়া যায় এখনো।

তুবড়ি পোঁতা হয়েছে পুকুরের ধারে। দোলপূর্ণিমার পর নবমী তিথিতে নবমদোল। আকাশে এখনো চাঁদ দেখা দেয়নি। পুকুরের পাড়ে ভিড় করে এসেছে সবাই। এক-মণের পর, ধাড়ির পিছনে ছাঁয়ের মত পাঁচ সেরি দশ সেরি আছে কয়েক গণ্ডা।

মেলার আসরটা আর একটু দূরে। সে আসরে আজ ভাঙন ধরেছে বিকেল থেকেই। বেচা-কেনা ঘুচিয়ে সবাই মেতে উঠেছে এদিকে। মেলার হ্যাজাক লণ্ঠন এখন সব এখানেই সকলের হাতে হাতে, গাছের ডালে ডালে।

এর পরে আছে কেষ্টযাত্রা। বড় দীঘির পারে, শ্যামরায়ের মাঠে যাত্রার আসরও তৈরী হয়ে গেছে। সাজঘর হয়েছে শ্যামরায়ের মন্দিরের পাশে,পরিত্যক্ত ভোগ-রান্নাঘরে! রান্নাভোগ আর জোটেনা শ্যামের কপালে। একটু চিনি বাতাসা কলা, ফুল চন্দনই অনেকখানি। এর পরেও থাকা না থাকা শ্যামরায়ের মর্জি।

শেষ ফাল্গুনের বাতাসে চৈত্রের পাগলামি টের পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পাক খায়, চক্র দিতে চায় ঘূর্ণি বানের মতো।

বাতাসের চেয়ে মানুষের নেশাটাও কম নয়। তুবড়ি পোড়ানো দেখার ঠেলাঠেলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন জলে ডুবে উঠেছে। তা' নিয়ে হাসাহাসি গালাগালির অন্ত নেই। সেয়ানা মানুষ পড়েছে তাই। নইলে কান্নাকাটি পড়ে যেতো।

সুরীন দেখছিল সব দাঁড়িয়ে। ও গাঁয়ের ছেলে সে। বয়স পঞ্চাশ ধরেছে। পঁচিশ বছর গ্রামছাড়া। বছরে এই দুটি দিনের জন্যে না এসে পারে না। আসে, দুদিন থাকে, তারপর বিদেশীর মতো ফিরে যায়। বাগ্দীপাড়ার মানুষ। আগেকার লোকেরা চিনতে পারে। হালের মেয়ে পুরুষেরা কেউ চেনেনা তাকে। যারা চেনে, আর যারা চেনেনা, তাদের সকলের কাছেই সুরীন, অর্থাৎ সুরেন দিগর যেন এক বিচিত্র সংসারের মানুষ। সবাই

তাকে হাঁ ক'রে দেখে। সে দেখার মধ্যে শুধু অপরিচয়ের ভয় ও বিস্ময়।

ঠাণ্ডারায় দিগরের ছেলে সুরীন দিগর। পায়ে তার ইংরেজী বুট জুতো, বাবুদের মত সার্ট গায়ে, কোঁচানো ধুতি। মাথায় তেল চকচক করে। গোঁফজোড়ায় চাকনচিকনও কম নয়।

নিজের ভিটেমাটি কিছু নেই। পাড়ায় এসে ওঠে পরের ভিটেতে। জায়গা দেওয়ার লোকের অভাব নেই পাড়ায়। সুরীন যার ঘরে ওঠে, যে কদিন থাকে তার ঘরে সেই কদিন দুঃখ থাকে না। গোটা পাড়ায় ভোজ লেগে যায়। হাঁড়ি অতি ছোট, তাড়ির জালা নিয়ে বসে সুরীন সকলের সঙ্গে। মেয়েরাও খাতির করে। দরকার হলে, এক আধখানা শাড়ি দিয়ে খাতিরটুকু গাঢ় করে নেয়।

ফুর্তি মস্করাতে খুবই সিদ্ধহস্ত সুরীন। কিন্তু এমনি মানুষ হিসেবে বেশ রাশভারী। চেহারায় আর কথায়, ধার আছে যথেষ্ট। বলে, মিস্তিরির কাজ করি।

—কোথায় ?

—চটকলে।

—কোথাকার চটকলে ?

—চাঁপদানি।

গাঁয়ের লোকেরা জানে। প্রতিবছর একই কথা জিজ্ঞাসাবাদ হয়।

তবু নতুন করে বিস্মিত হবার জন্যেই যেন সবাই জিজ্ঞেস করে, কত টাকা কামাও ?

সুরীন বলে, হপ্তায় ছাব্বিশ টাকা।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে হিসাব কষে। সপ্তাহে যদি ছাব্বিশ টাকা হয়, তবে মাস গেলে একশো চার টাকা। বাবা! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস করবার সাহস নেই। অমনি হয় তো কেউ ঘনিয়ে আসে। বলে, বুইলে গো সুরীনদাদা, বউটা মেয়েমানুষ।

সুরীন গোঁফের ফাঁকে হেসে বলে, মাটির 'পরে দাঁড়িয়ে বলছিস্ ?

—হ্যাঁ, আকাশের তলায় দেঁড়িয়ে বলছি, মেয়েমানুষ বউটা। কিন্তুক, এট্টা কাপড় দিতে পারিনা।

—পারিস্ না ?

—না।

সুরীন পকেট থেকে টাকা বের করে দেয়!—যা, একটা কাপড় কিনে দি গে যা বউকে।

টাকা যেন খোলামকুচি। সুরীন দিগরের অমন অনায়াস টাকাগুলি টাকা কিনা. সেটাও যেন খটকা লেগে যায় মনে। বুড়িরা এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করে, বে' থা করেছ ?

—না।

—করতে লাগবে না ? ব্যাটাছেলে মানুষ, বউ ছেলেপুলে না হলে চলে ?

সুরীন বলে, না মাসী, ওটা হলনা আর এ জন্মে। একটা মেয়েছেলে আছে···।

সোজা কথা, সোজা করেই বলে। কোনো রাখ ঢাক নেই। বুড়িদের স্নেহ দিয়ে মন কাড়বার হাঁসফাসানি থিতিয়ে আসে একটু। বলে, অ। তা গাঁয়ের মেয়েছেলেই এট্টা নিয়ে গেলে পারতে।

সুরীন বলে, শহরে বড় ছড়াছড়ি মাসী। এখন তো আরো। দু সন হল তোমার লড়াই শেষ হয়েছে। দেশের সরকারও দেশের লোক হয়েছে। আর কলবাজারে একবার মেয়েমানুষের ভিড়টা দেখে এসো। এক ছিটে গুড়ে যেন পিঁপড়ের গাদি। তবে মেয়েছেলে মেয়েছেলে, শহরে গাঁয়ে তার তফাৎ কিছু নেই।

অ।

একটু মুষড়ে পড়ে সবাই। সাধ করে তো কেউ বলেনা। দায়ে পড়ে বলে। যদি একটু সুখের মুখ কেউ দেখতে পায়। যে মেয়েমানুষের স্বামীপুত্র নেই, তার কোন বাঁধন নেই। সে যেতে চায়।

সুরীন বলে, আর মন বলে কথা। যেখানে সে বসে, সেখানেই ভাল। তাকে নিয়ে ছুটোছুটি করলে, সে ছুটিয়ে মারে চিরকাল!

তা' বটে।

এই হল সুরীন। গাঁয়ে নবম দোলের উৎসব। বাগদিপাড়ায় উৎসব সুরীনকে নিয়ে। তাড়ি মাংস, মায় কাপড়চোপড়, নানানকিছুতে অনেক খরচা করে যায়। দাগ রেখে যায় সকলের মনে। আগামীবছরের তৃষ্ণা রেখে যায় সকলের প্রাণে।

তারপরে এরা ভুলে যায়, সুরীন ভুলে যায়। এরা থাকে গাঁয়ের বাগ্‌দি পাড়ায় বাগ্‌দি হয়ে। সুরীন চাঁপদানির উইভিংএর মিস্তিরি, চন্দননগরের মালিপাড়ার সুরীন মিস্তিরি। সুরীনদাদা।

বছরের এই সময়টা, অভ্যাসবশত যেন চলে আসে সুরীন। সেখানে তার মেয়েমানুষ ভামিনী প্রতি বছরই ঝগড়া করে। আসতে চায় সঙ্গে।

সুরীন বলে, না, তিনশো তেষট্টি দিন তোর ঘর করি। দুটো দিন তুই ছেড়ে দে বাপু, শুধু শুধু আমার সঙ্গ নিস্‌নি।

পেট থেকে পড়ে, এ গাঁয়ে মানুষ হয়েছে। উৎসব বলতে আর কিছু জানেনা, নবমদোল ছাড়া। শহরে তো রোজই উৎসব। নবমদোলে এসে, নিজের জীবনটাকে একবার পিছু ফিরে দেখে যাওয়া ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই সুরীনের।

এক মনি তুবড়ি জ্বলেছে। দশটা স্টীমের মত কান ফাটা শব্দ তার। আগুনের উঁচু ফোয়ারা ঠেকেছে গিয়ে আকাশে। বহু দূর-ব্যাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বড় বড় ফুলকি। যেন গলানো আগুন, জলের ফোয়ারার মতো। বাতাসটা সুবিধের নয়। আগুন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে উত্তরে, একেবারে উপরে গিয়ে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

কয়েকজন একসঙ্গে চীৎকার ক'রে সবাইকে বলছে দূরে থাকতে। মনে হয়, পুকুরের জলও আগুন হয়ে উঠেছে। আলোর ধারায় মাটির পোকামাকড়টিও দেখা যায়।

সুরীনের সঙ্গে রয়েছে পাড়ারই কয়েকজন।

সমস্বরে সবাই শ্যামরায়ের জয় জয়কার করছে।

সুরীন ভিড় থেকে বেরিয়ে, শ্যামরায়ের মন্দিরের দিকে চলল। সঙ্গে মদন আর জগা বাগ্‌দি। জেলের পিছে কেলে হাঁড়ির মতো। আজকে রাতে সুরীন শেষবার ফুর্তি করবে। তার প্রসাদ না নিয়ে ফিরবেনা ছুটিতে।

সুরীন ভাবছিল অভয়ের কথা।

বিশ বছরের অভয়। তার মায়ের নাম প্রমীলা।

তিনবছর আগে প্রথম চোখে পড়েছিল অভয়কে।

যেদিন পড়ল, সেদিন জিজ্ঞেস করল সুরীন এটি কে?

—পোমিলার ছেলে, যে পোমিলা মরে গেছে।

মনে পড়ল সুরীনের। সিংভূমে কাজ করতে গিয়ে, পটলা দিগর নিয়ে এসেছিল প্রমীলাকে। সেও অনেক-দিনের কথা। প্রমীলা এসেছিল পটলার সঙ্গে। কিন্তু পটলার সঙ্গে ঘর করতে পারেনি। রূপ ছিল কিনা বোঝা যায়নি, যৌবনটা ছিল দিশেহারা বানের জলের মতো। অন্তরে অন্তরে তাকে বাঁধ দিতে পারেনি পটলা। বানের জল, যেদিকে পেরেছে, সেদিকেই গেছে। বারোবছর আগে, নবমদোলে এসে, প্রমীলার ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে সুরীন। ছেলেটাকে লক্ষ্যই পড়েনি। এখানে আসার পর, এ গাঁয়ে অভয় জন্মেছে। কার ছেলে, বলা মুশকিল। প্রমীলার গর্ভজাত, একমাত্র সেইটিই সত্য।

তিনবছর আগে চোখে পড়ল। চোখে পড়েনি, কানে শুনল প্রথম অভয়ের গান। আতি গয়লানির উঠোনে দাঁড়িয়ে গান ধরেছে অভয়।

তুমি আমার গাঁয়ের শ্যামরায়,
তোমার কথা কেমনে ভোলা যায়।

গানের কথাবার্তা তেমন পাকা নয়, কেমন যেন আপনি আপনি বানানো। সুরীন বলল, বাঃ, বেশ গলাখানি তো। আতি গয়লানীর যেন ভর হয় অভয়ের গলা শুনলে। অভয় গাইছে।

যদি পাপ করে থাকো কেউ,
একবার শ্যামরায়ের কাছে যেও
তানারে না বলে কভু পার নাহি পাওয়া যায়।

কথা বড় অর্বাচীন। অভয় নাকি নিজেই তৈরী করে গায়। সবসময় ছাঁদ ছন্দ মিল থাকেনা। কিন্তু গলার গাওয়ার ভঙ্গির গুণে বড় মিষ্টি লাগে। কিন্তু গানের সঙ্গে মানুষটির মিল নেই।

বয়স নাকি আঠারো। কিন্তু অমন বিশাল চেহারার পুরুষ বোধহয় গাঁয়ে আর একটিও নেই। রংটি কালো, চোখ দুটি টানা-টানা। মাথার চুলগুলি কদম ছাঁট। চলতে ফিরতে গায়ের পেশী ঢেউ দিয়ে ওঠে। যেন কালো গাঙে ঢেউ লেগেছে। চাউনিটি কেমন যেন খ্যাপা খ্যাপা, রাগত ভাব। চোখ দেখলে অন্তরের মিঠে নরম ভাবটুকু আন্দাজ করা যায়।

সুরীন বলল, এটি কে?

—পোমিলার ছেলে।

—কি করে?

—কি আবার করবে। বারো সাঙার ছেলে, কেউ কারুর নয়। কখনো হাল চাষ, হাঁপর টানে কখনো কামারের ঘরে।

সুরীন তাকিয়ে রইল অভয়ের দিকে। ভাল লাগল ছেলেটিকে। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখল আঠারো বছরের একটি বেজন্মা পুরুষকে। আর মনে পড়ে গেল তার শহরে, মালীপাড়ায় তার প্রতিবেশিনী শৈলীর কথা। প্রৌঢ়া শৈলী, আর তার মেয়ে নিমির কথা। ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই ধারাবাহিক উপন্যাসটির নামকরণ লেখক পূর্বে 'রাণীর বাজার' করেছিলেন উপস্থিত পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞাপিত 'রাণীর বাজার' উপন্যাসই এই 'ছিন্নবাধা'। ভাঃ সঃ

(১০)

রামজীর মন্দির

রুচি আর শালীনতা নিয়ে নাকি এ কথা বলা চলে না। সাহিত্যে রুচির কথা বাদ দিতেও পারা যায় না। সব প্রকট প্রকাশ করতে গেলে উৎকট হয়ে যায়।

কিন্তু জীবন থেকে যে খণ্ড আহরণ করে ভ্রমণের কথা লেখা হয় তার মধ্যে নিছক সাহিত্যের সংজ্ঞা—ধারা—ক্রম—অনুশীলন করতে গেলে কেবল যে সত্যাবরোধের পাপই জন্মায় তা নয়, বিভ্রান্ত করে দেওয়ার অপকর্ম গুপ্ত থাকে।

বহুজন সঙ্গে করে বেড়াতে যাবার দুর্ভাগ্য যারা ব্রত বা ধর্ম হিসাবে পালন করেন এই ব্যাপারটীতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়ে পারছি না। এর আগেও ক্যাম্প নিয়ে হিমালয়েরই এক দুর্গম দেশে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকের চরম দুর্দশা হয়েছিল জৈবিক এবং অনস্বীকার্য্য এই ব্যাপারটীর তদ্বির করতে।

চিনার বাগে আমাদের অফিস তাবুতে এটা দ্বীপ। চারধারে জলে আমাদের নৌকাবাড়ি ভাসছে

সেই অভিজ্ঞতা ছিল বলেই কুর্দেই ভগবানদাসজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এই দিকে। তিনি বলেছিলেন ব্যবস্থা আছে। পুরুষরা এ বিষয়ে যথেচ্ছাচারী। তাদের খানিক বিব্রত হতে হলেও নারীদের তুলনায় কিছুই নয়। তাই চিনার বাগে এসেই প্রথম এই ব্যাপারটার দিকে মনঃসংযোগ করি।

চীনার বাগের একটা ধারে খানকয় কানাত ঘেরা একটা জায়গা। একদিকে লেখা 'মহিলা'; অন্যদিকে লেখা 'পুরুষ'। সর্বসমেত বারো জনার ব্যবস্থা। এবং তা-ও পাকাপাকি নয়। একটা দিক একেবারে উন্মুক্ত। আমরা ন'শো জন। কাশ্মীরে হাউস্-বোটের ভিতরেই স্নানঘর এবং আনুসঙ্গিক ঘর আছে। পাত্রগুলি নদীর জলেই পরিষ্কার করা হয়। এই নোংরা ব্যবস্থার জন্য ডালের জল আর ঝিলামের জল অপেয় কেন অব্যবহার্য্য হয়ে আছে।

আমাদের হাউস্-বোটে এক একটায় ত্রিশজনের কাছাকাছি লোক। সুতরাং ও ব্যবস্থা হাউস্-বোটে ছিল না। যা হয় ঐ 'মহিলা' ও 'পুরুষ' লেখা ঘেরা জায়গা।

আমি পতিরামকে বল্লাম—"কি কাণ্ড করেছিস্ বল্‌তো। মেয়েগুলো কাল সেই পাঠানকোটে নেমেছে। ষ্টেশনে তো কিছু সুবিধা হয়নি। পরশু বাড়ী থেকে বেরিয়েছে এই আড়াই দিনের পর এখানে এসে এ সব ব্যবস্থা না পেলে যে খণ্ড প্রলয় বেধে যাবে!"

পতিরাম দুহাত ওপরে ছুঁড়ে বললে—"ওরে সহরের ইঁদুর, তোর কি আমায় না কামড়ালে দাঁত সির্ সির্ করে? এ সব ব্যবস্থা করার জন্যে প্রথমেই গুরুপ্রসাদকে পাঠানো হয়েছিলো। ব্যেটা নেমে এসেছিল ব্যবস্থা করতে। এসে মাল টেনে কোন হোটেলে পড়েছিলো। আমিও তো এসে এই কাণ্ড দেখে বুদ্ধ হয়ে গিয়েছি।"

প্রথম প্রথম মেয়েরা দল করে করে কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো। ওদের যত রকম টেকনীক্ জানা আছে এই দ্বীপের মধ্যে শত শত দৃষ্টির সম্মুখে সে সব টেকনীক্ কাজে লাগবে না। তারপর মেয়েদের নাম করে শিক্ষয়িত্রীরা এলেন তদারক করতে। ছেলেদের দিকে ততক্ষণ লম্বা "কিউ" দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা অতটা পারছিল না ;—অবশ্যই বোঝা যায়।

এদিকে মেথরের ব্যবস্থা নেই। ফলে সন্ধ্যার খাবার অনেকে খেলোনা! এ দিকে রাতে উঠলো ঝড়, খানিক বৃষ্টি। পতিরাম আমার বোটের কাছে এসে ডাক দিলো। দেখি লালসিং আর জনার্দন, আর জন ছয় ছেলে। আমিও লাগলাম কাজে। সেই শেষ রাত্রে কোদাল গাঁইতি নিয়ে এ ধারে আরো গোটা বারো, আর ও ধারে গোটা কুড়ি গর্ত্ত খুঁড়ে, কানাত লাগিয়ে, বেডশীট্ ইত্যাদি সংগ্রহ করে পর্দা ঝুলিয়ে সেকালের মতো ব্যবস্থা করে যখন হাত পা ধুয়ে আবার বোটে ঢুকলাম তখন ভোর হয় হয়।

পতিরামের এই নিষ্ঠা আর ঐকান্তিকতা ছিল বলেই সে সকালটায় বিপর্য্যয়ের মাত্রা অনেক লঘু হয়ে গেল।

অবশ্য দিন দুয়ের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে গেল এর চেয়ে একটু ভালো। আমি কিন্তু বেণুর জন্য এ ব্যবস্থা স্বীকার করতে পারলাম না। আমি জানি ও বড় কষ্ট পাবে। পেলেও মুখে বলবেনা। অবশেষে সেই বিদেশের বন্ধু অসিত।

"যা বলেছেন দাদা। এখানে চান টান করা কাজের কথা নয়। চলুন একখানা শিকারা করে ওধারে একটা দেবালয় আছে দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাওয়া যাক্।

চিনার বাগের স্থির জলের তলায় রাশি রাশি উদ্ভিদের শ্যাওলা দোলা। চিনার বাগের জলের ওপর দীর্ঘকায় বনস্পতির ত নিবিড় ছায়ার আবেশ। আর সেই রোমাঞ্চ জাগানো পরি একটেরে বড় বড় পপ্‌লারের দীর্ঘ ইঙ্গিতের সঙ্গে ওজন রেখে উ ঝক্‌ঝকে রূপালী পাতে মোড়া এক দেবালয়ের চূড়া। প্রভাতী আ রঙে সে রূপা ঝলমল্। ওইটাই লক্ষ্য। যদি বিগ্রহ, তবে পুজারী ; পুজারী ; তবে জীবন ; যদি জীবন, তবে জীবনের ছন্দও পাবো ওখা

শিকারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তিনজনা।

সবাই বলে, "কোথায় ; কোথায় ?"

"ঝিলম্" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তিনপ্রাণী শিকারা ছেড়ে দিলাম।

খালই তো। বেশী বড় নয়। ওপারে গিয়ে মন্দিরে প্র করে দেখি চমৎকার ফল লাগানো। চেরি আর দ্রাক্ষা দিয়ে ঢ ফলতলা। একধারে ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার পর পর তি গাছ। ফুলের গন্ধে মাথা ঝিম ঝিম করে। কিন্তু—

হঠাৎ অসিত বলে "রাধে রাধে !!"

তরুণ সন্ন্যাসী একজন। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বলেন—"রা রাধে !!"

তারপর স্রেফ বাংলায় কথা চলতে লাগলো অসিতে আর বা নন্দজীর সঙ্গে।

অসিত বৃন্দাবনের বাসিন্দা।

বালানন্দজীও বৃন্দাবনে ছিলেন বহুদিন। সেখানকার আলা কাশ্মীরে দেখা। দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠলো।

চিনার বাগে রামমন্দির

"সর্বনাশ, এই নালার জলে স্না করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে অসু পড়বেন। যতো এই নৌকা বাসিন্দা দেখছেন এদের কল পায়খানা সব এই জলে। জলে তলায় দেখছেন না, নানা রক গাছে ভর্ত্তি। এর দরুণ জলস্রো খুব ধীর। দিদি ঠাকরুণ এসেছে যখন, এই কলে স্নান করবে রোজ। এই ধারে একটা দরজা লাগানো স্নানঘর আছে। এটা ওকে ব্যবহারের জন্য দেবেন। আপনারা এখানে সেরে নেবেন।"

কাজেই আমরা যতদিন শ্রীনগরে ছিলাম এই ব্যবস্থা সানন্দে মেনে নিলাম। ম্যাগনোলিয়া তলায় সেই স্নান ভোলবার নয়। চারিধারে নানারকম সুগন্ধ ফুলের মেলা। সকালের রৌদ্রের গায়ে-পড়া আবেশ। স্নানের পর এই রোদের মধ্যে বসে বালানন্দজীর সঙ্গে গল্প করতাম। কতো গল্প…

এই দেবালয়ে শ্রীরামলক্ষ্মণের বিগ্রহ। মধ্যে সীতা। রামানুজ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আখড়া। হিমালয়ে পরিভ্রমণশীল সন্ন্যাসীদের এমন আস্তানা মাঝে মাঝেই আছে। মন্দিরের বৃদ্ধ সেবায়তের সঙ্গে বালানন্দজী আলাপ করিয়ে দিলেন। দীর্ঘজটাসমন্বিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। পরণে মাত্র কৌপীন। সেই কৌপীনবস্ত ভাগ্যবন্তের পুজা লক্ষ্য করেছি অনেকদিন। সে পুজায় মন্ত্র নেই, ধ্যান নেই। কেবল সেবা—আর সেবা। সমস্ত সকালটা পরম আদরে বিগ্রহটিকে তৃপ্তির সঙ্গে খোয়ানো, মোছানো, চন্দন পরানো, ফুল দিয়ে সাজানো। এই-ই পুজা। মন ভরে উঠতো সন্ন্যাসীর সংসার ভোগের এই ইন্দ্রিয়োত্তর রূপে। কবে সেই প্রাক্ কৈশোর জীবনে রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে এই মন্দিরে প্রবেশ করে দীর্ঘ আশীবৎসর এই বিগ্রহকে দিনের পর দিন সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছেন। এ বিগ্রহ যে নড়েনি, কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি, এ যেন মন স্বীকার করতে চায়না। যদি এতখানি সমাদর আর ব্যাকুলতার প্রতিদানই রামানন্দ-শিষ্য রামরূপ না পেতেন, তবে এই নিষ্ঠা কিসের আশ্রয়ে এর কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বকে এমন মনোরম সৌখ্যে ভরে রেখেছে? জীবন সম্বন্ধে রামরূপ নির্বিঘ্ন নন্। তাঁর রামচন্দ্রের ভোগ রাজসিক; বেশ রাজোচিত। তাঁর সম্পত্তি আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ আছে। রামরূপ দরজার কব্জা ভেঙ্গে গেলে লোক লাগিয়ে মেরামত করান, মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ির ধাপগুলো সিমেন্ট করান, মুসলমান চাষীর ক্ষেতের ভাগ হিসেব করেন, রান্নাঘরের তদ্বির করেন, অন্যান্য সাধুদের বকাঝকা করেন। মাঝে মাঝে বিষয় বিরাগী সাধুকে ধমক লাগান উপবাস করতে দেখলে। "অল্প বয়স, ছেলে মানুষ, খাবে, কাজ করবে, খাটবে, জনগণের জন্য আত্ম নিয়োগ করবে। সংযম দেখাতে হয় স্পৃহাহীন কর্মে দেখাবে। নিষেধরুদ্ধ জীবনকে বেড়া দিয়ে কণ্টকিত করলে রামজীকে পাবে কি করে? এটা ত্যাগ করেছি, ওটা খাইনা, এ তিথিতে চারবার স্নান করি, অমুক দিন দশ হাজার জপ করেছি এই কি সাধুগিরি নাকি? বাবা, সত্যের বড় ধর্ম নেই, সত্যের বড় কর্ম নেই, সত্য জপ, সত্য তপস্যা। জীবনে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলোনা, প্রয়োজন ছাড়া গ্রহণ কোরোনা, সঞ্চয় প্রবৃত্তি আর অহংবোধকে স্বীকার কোরোনা। বাকী সব ভণ্ডামী। রামজী চান্ সত্যাশ্রয়ী হও। জপ, ধ্যান, ধারণা এসব পাপ বোধ থেকে পুণ্য সঞ্চয়ের তৃষ্ণা। পুণ্য সঞ্চয়ও সঞ্চয়। সত্য বোলো, সত্য।" এই সব কথা প্রায়ই গরুর বিচিলি কাটতে কাটতে, কুটনো কুটতে কুটতে, মন্দির ঝাড়ু দিতে দিতে বলতেন। মনে একটা সুর জেগে ওঠে। সন্ন্যাসের, বৈরাগ্যের, সর্বস্ব-সমর্পণের একটা আবেদন আছে যা ভরাভোগের আকাশে তারার মতো জ্বলতে থাকে আর তৃষ্ণার্ত মনকে হাতছানি দেয়।

ফিরে এসে মোটামুটি জিনিষপত্র গোছগাছ করে আমরা তিনজন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম প্রথম মোলাকাৎ করতে শ্রীনগরীর সঙ্গে।

হেঁটে চল্লাম বাজারের দিকে। ঠিক কোথায় যাবো জানিনা। কেবল "পথ চলাতেই আনন্দ।"

(১১)

ঝিলম

প্রথম দিনের শ্রীনগর দীর্ঘপথশ্রান্তের চোখে ধূলিধূসর শ্রীনগর। সেদিনকার মলিনতা মনের দাক্ষিণ্যে মুছে নিয়েছিলাম সেই শ্রীহীনতা। আজ সেই ক্ষমার কোনও কারণ নেই। সকাল বেলায় ভাল করে স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট্ জামা কাপড়, অর্থাৎ লম্বা চোস্ত্ পাজামা, শাদা ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, তার ওপর চকোলেট সার্জের আচকান পরেছি। অসিত গ্যাবার্ডিনের একটা সুটের তলায় শাদা কলারের শার্ট পরেছে। হাল্কা ফল্সা রংয়ের ব্যাঙ্গালোর পরেছে বেণু, মাথায় একটা মানানসই টীপ, খোঁপায় গোঁজা মন্দিরের প্রসাদী ম্যাগনোলিয়া। খুশী মনে বেণু আমায় একটিন গোল্ড ফ্লেক কিনে দিলো। অসিত পান-সম্রাট্। পান দিলো। রাস্তা দিয়ে যখন চলেছি উঁচু উঁচু উইলোর তলা দিয়ে, মনে হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে আমার মতো সুসম্পূর্ণ মানুষ আর নেই।

সামনে লালবাগ। কাশ্মীরের শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। যত রাজনৈতিক বক্তৃতা এই পার্কটীতে। পপলার আর চিনারে সাজানো পার্কের দুপাশ দিয়ে বড় রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এক ধারটায় যতো স্কুল, কলেজ, হাস-পাতাল, গির্জা, ক্লাব, মায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী। অন্য রাস্তার দুপাশে দামী কুলীন-দোকান, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস। একটু এগিয়ে গেলে বাঁধ। শ্রীনগরের কুলীনতম পাড়া। এ পাড়ার নিচেই স্ফীতবক্ষা ঝিলম। ঝিলমের ওপারে কাশ্মীর ম্যুজিয়ম।

আমরা এসে গেছি বড় একটা বাজারে। বাজারটার প্রখ্যাত নাম মীরাকদল্। শ্রীনগরের ভীড় প্রধান বাজারে। বাঙ্গালী মিষ্টির দোকান, মোগলাই গোস্তের দোকান, শাল আলোয়ান, পেপার ম্যেশী, কাঠের খেলনা-সব কিছু এই মীরা কদলে।

মনে হোলো শ্রীনগর সত্যিই নোংরা, সত্যিই ধূলিধূসর। কাশ্মীরীদের কথা পশ্চিমী শাদারা যখনই বলে গেছে তখনই এই নোংরামীর উল্লেখ করে গেছে। প্রায় প্রত্যেক কাশ্মীরী মুসলমানের একজিমা আছে। কিশোর বয়সের ছেলে দেখলেই আমি তার খুলি ঢাকা টুপীটা তুলে দেখতাম। প্রায় একটা বাতিক হয়ে গিয়েছিল। সেই টুপীর তলায় বিশ্রী একজিমা। কাপড় জামার মধ্যে এতটুকু পরিচ্ছন্নতা নেই। শ্রেষ্ঠ নোংরামীর সাধারণ প্রকাশ করতে ওদের পরমহংস সুলভ সরল কৃতিত্ব আছে। ওরা অমায়িকভাবে নোংরা। নির্জলা অসভ্যতা ওরা সবিনয়ে ঘটায়। দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলেও নাক মাঝে মাঝে বাদ সাধতো।

অল্পদিন আগেও পর্যটকরা ইওরোপের শহর সম্বন্ধে কি বলে গেছে? অনেকখানি পথ অতিক্রম করে শ্রান্ত পথিক যখন খোঁজ চাইছে নগরীর আর কতদূর, তখন নাক তাকে নগরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়েছে। সমগ্র নগরের মধ্যে থেকে একটা 'মিষ্টালু' নোংরা গন্ধ বায়ুকুণ্ডলীর মধ্যে মোচড় দিতো। কোনও সহরেই ড্রেন ছিলনা। সবই তোলা-ব্যবস্থা। অথচ ময়লা এক জায়গায় জড়ো করে নষ্ট করার ব্যবস্থা থাকতো না। ফলে

দুপার বাড়ীর মাঝের জায়গা ভরে উঠতো আবর্জনায়। তা থেকে একটা বিশেষ গন্ধ বেরুত যার নাম ছিল 'সহুরে গন্ধ'। সে হিসাবে শ্রীনগর তো পদে।

সেলাম করে লোকটা বললে "শিকারা, সাতপুল পার করে ঘুরিয়ে আনবো। চলবেন বাবু?"

"হ্যাঁ, চলোনা!"

"এই রোদে!" বললে অসিত।

"সে যখন দলের সঙ্গে যাবে, যাবে। এখন চলোনা, একা একা। কত নিবি?"

"সাত পুল, সাতটাকা!

ওরা কথা বলতে লাগলো! আমি সোজা হেঁটে চলে এলাম মোড়ের কনেষ্টবলটার কাছে। ওকে নিজের বাসনা নিবেদন করে জিজ্ঞাসা করলাম শিকারার দক্ষিণা। ও বল্লে—"আট আনা দেবেন। পরে আনা দুই বখশিস্ দেবেন।

সাত টাকা; আর আট আনা। পরে কাশ্মীরে থেকে থেকে দেখেছি—সাতটাকা আট আনা হয়, সতেরো টাকা সাত টাকা হয়। একশো চল্লিশ টাকা দামের শাল মাত্র বত্রিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কাশ্মীরে দর না করে জিনিষ অনেকে কেনে বলেই কাশ্মীরে দর কমাবার দিকে স্পৃহা কম। ওরা ধরেই রেখেছে যে এই দেশে যারা এসেছে তারা একবারই মাথা মোড়াতে আসবে, দুবার নয়। আর যারা দুবার চারবার আসবার মতো যোগ্যতা রাখে তারা চল্লিশের জিনিষ একশো ষাটে কেনার বুদ্ধিও রাখে। ফলে একশো ষাট ওরা বিনা দ্বিধায় হাঁকতে পারে। পরে যে 'বাবু' যত 'নীচু' স্তরের, দামটাকে সেই অনুপাতে কমাতে কমাতে আসলেই হোলো।

শিকারাওয়ালা পরম খাতির করে শিকারায় নিয়ে বসালো। মীরা কদলের ওপারের ঘাটে সারি সারি শিকারার ভীড়। প্রত্যেকটার নাম ইংরাজী। কেউ 'সিল্‌ভার মুন', কেউ 'গ্লোরী', কেউ 'অল্-ইন্-লভ্', কেউ 'মুন শাইন'। চাঁদ নিয়েই নাম বেশী, তারপরে 'প্রেম'। সুতরাং কাশ্মীরের শিকারাকে এরা ভিনিসের গণ্ডোলা, বা দাম্যুবের 'ইয়াট্' করে রেখে ছিলো। শিকারার মতো শিকারাওলাদেরও চোখে মুখে, সমস্ত ব্যবহারে একটা অদ্ভুত স্থূল রুচির প্রকাশ আছে যা মাংসল, জৈব, নিতান্ত নাগরিক। এদের এখানে এলেই এরা বুঝে নেয় আগন্তুক ইন্দ্রিয় বিলাসী; ভোগবাদের তীর্থ পরিক্রমা করতে এসে ভোগের আঙ্গিকের রসদ যোগানদার এরা! সেই দালালী মন এবং দাম্ভিক সেবাপরায়ণতা। ঝিলমের বনেদী শিকারাওলাদের মতো। 'সর্টিফিকেটেড্ প্রিমিটিভ্' আমার চক্ষে আজও পড়েনি। ঝিলম ছেড়ে একটু ভেতরের দিকে গেলেই এবং নাবিক ছেড়ে একটু গ্রামিকদের মধ্যে মিশলেই এ ভাবটা কেটে যায়। শিকারায় চড়ে আরাম পাইনি। মনে অনেকটা সেই ধরণের অস্বস্তি, ঠাকুর ঘরে গীতা আর লক্ষ্মীর পাঁচালীর সঙ্গে 'গ্রামোফন সঙ্গীত' একত্রে থাকতে দেখলে যে আপত্তি, হোয়াইটহর্সের বোতল গঙ্গাজল ভরে আনায় যে কাব্যিকে স্বীকৃতি আছে, যে মনোবিলসনের ধ্বনি আছে, যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে, জানিনা কেন একটা স্থূল আঘাতে সেটা যেন খান্ খান্ হয়ে গেল!

হয়তো বা স্নায়ু যন্ত্র বিশেষভাবে স্পর্শসহ হয়ে ছিল, হয়তো দুরাত্রি জাগরণও দুদিনের বাস যন্ত্রণা ভোগের দরুণ চিত্ত সমুদ্রে চঞ্চলতা ছিল; হয়তো বা বেলা দশটার সূর্য্যালোকে ব্যস্ত-কোলাহল-মুখর দৈনন্দিনতার মধ্যে প্রথম দর্শন লাঞ্ছারুণ হতে পেলোনা; হয়তো বা আর কিছু;—কি জানিনা। খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ারী ছবি আমার মনে এলোনা।

শিকারা চলছে। মীরা কদল ছেড়ে এগিয়ে গেলাম।

অনেকে বলে আমীরা কদল। মুসলমানী নাম; মীরা-র চেয়ে আমীরা বললে শোনায় ভালো, তাই হয়তো বলে। আসলে কিন্তু এই সাতটী পুল শ্রীনগরের সাতটী স্মৃতি বক্ষে করে আছে। ব্যক্তির প্রতি জাতির শ্রদ্ধার স্বাক্ষর রয়েছে এই পুলগুলিতে। শ্রীনগরের লোকেরা যে দরিদ্র ও শ্রমসহিষ্ণু একথা বার বার বলেছি। এই দারিদ্র্যের জীবনেও ওরা পুণ্যশ্লোকের স্মৃতি বুকে ধরে রেখেছে;—বৃথা কোনও স্তম্ভ, বা খিলান, বা বাট-বাগান করে নয়। নিত্যকার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে তাদের নাম।

'ক্যান্টিলিভার' প্রথায় গঠিত পুল ঝিলমের এপার ওপার এক করেছে। কাঠের পরে কাঠ সাজিয়ে, পিচনের ভারের ওপর সামনের ঝোঁককে সমর্পণ করে, একটু একটু স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পুল। সবটাই কাঠের। চমৎকার লাগে দেখতে। আজকের পুল নয় এরা। ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে অবন্তীবর্মনের সময় থেকে এরা এই ভাবে আছে। সারা কাশ্মীরে এই ক্যান্টিলিভার-প্রথা এনে দিয়েছিলো শকেরা। তা থেকে ক্ষতির-পথে শিখে শিখে এখন এই সাত-পুল শ্রীনগরের বৈচিত্র্যের অন্যতম।

"মীর-হমদানী! তাই মীরা-কদল! তাই না?" জিজ্ঞাসা করলাম শিকারার মাঝিকে।

মাঝি বলে-"না—মীর হমদানীর নামে মসজিদ আছে। এটা পাঠান আমীর খাঁর নামে। তিনি ভারী ভালো বাদশা ছিলেন!"

এরা মাঝি বলে না। বলে হাঁজি। জাতটারই নাম হাঁজি। এরাই আসল কৈবর্ত্ত। এখন শ্রীনগরে শিকারা চালায় যে-সে। শ্রীনগরে শিকারার মাঝিদের দেখে এই হাঁজি জাতটাকে চেনা যাবেনা। আসল হাঁজিদের দেখা যায় ঝিলমের খাঁড়িতে, উলারের বিস্তৃতিতে, সুপার, আখনোর, রিয়াসীর বন্দরে, বিরাট বিরাট নৌকায় মাল চলাচল করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের নাম মুসলমানী, এরা আদমশুমারীর সময় নিজেদের মুসলমান বলে লেখে। কিন্তু নমাজ পড়েনা, বা মুসলমানী কোনও নিয়ম মানেনা। 'সুন্নৎ' করে কিনা এ বিষয়ে দু রকম খবর জেনেছি। এদের বক্তব্য যে এককালে আত্মরক্ষার জন্ত এদের মুসলমান বলে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল বটে। তা বলে শান্তির সময় এরা পূজা-পাঠ ছাড়বে কেন? এরা মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ বা পানাহার

হাঁজি জীবনের আরম্ভ ও শেষ

আমার শিকারার মাঝি এই হাঁজি জাতের ছিলনা। সে আসল মুসলমান। সে হঠাৎ প্রশ্ন করে—"মীর হমদানীকে আপনি জানেন?"

অসিত বললো—"কে এই শা মীর হামদানী?"

মীর হমদানীর পুরো নাম মীর সৈয়দ আলি হমদানী। হমদান পারস্যের একটা জায়গা, তা থেকে হমদানী। যেমন আবদুল গফফার 'দেহলভী' মানে দিল্লীর আবদুল গফফার; আকবর 'ইলাহাবাদী' মানে এলাহাবাদের আকবর। ইনি কে, কবে, কি ভাবে কাশ্মীরে এসেছিলেন সত্যি কেউ জানেনা, জানার কথা নয়। সাধু সন্ন্যাসীরা প্রথম প্রথম অপরিচিত থাকে, যেমন থাকে মৃগনাভি। তার পরিপক্ব অবস্থায় মৃগনাভির মতই তার সুবাস পরিব্যাপ্ত হয়। আবার উপযুক্ত শিষ্যের প্রেমের শিখার সংযোগে তার ধূমগন্ধ সত্তাকে প্রলুব্ধ করে তোলে। আসল কথা তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে বসে একজন বিরাট পুরুষ, মহাপ্রাণ। ১৪১১ থেকে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীরে জয়নাল আবেদীনের রাজত্ব। মানব দেহে তাকে দয়া, ক্ষমা, শান্তির অবতার বলে গেছে সবাই। এই জয়নাল আবেদিন তারুণ্যে ছিলেন প্রমত্ত, স্বেচ্ছাচারী,—মূর্তিমান হিন্দুদ্রোহী। কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো এই সন্ন্যাসীর। সর্বত্যাগী, সার্বভৌম, সন্ন্যাসী। চিত্তে শান্তি চক্ষে করুণা, ব্যবহারে অমৃত—এই শিবং সুন্দরং লোকটী কে? জয়নাল আবেদীন দিন দিন মুগ্ধ হতে লাগলেন এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের প্রেমপুলকিত বাণীতে।

বয়স জিজ্ঞাসা করেন জয়নাল। সন্ন্যাসী বলে "সে কি হবে জেনে? শত শত বর্ষ এমনি কেটেছে, শত শত বর্ষ এমনি কাটবে। এ অশান্তি মিটবে কবে? মানুষ ভালবাসতে পেলনা কেন? কার পাপে? এতো সহজ উপায় থাকতে মানুষ অ-ভালবাসে ভালবাসা হারায় কেন? কাঞ্চন ফেলে কাঁচ কেন চায়? কে এই অন্ধকার ঢোকালে জ্যোতির মন্দির এই মনে?"

কেউ বলে উড়ে এসেছিলেন আকাশ পথে উনি, কেউ বলে হিমালয়ের কন্দরেই সাধন করে উনি জ্ঞানী। তৈমুরলঙ্গের হাতে বাঁধা তাবিজ ছিল হামদানীর পায়ের ধুলো। দেশে ফিরে তৈমুর সে তাবিজ রাগ করে ফেলে দেয়। মরে গেলেন দেখতে দেখতে।

হামদানীকে নিয়ে কিম্বদন্তীর শেষ নেই। হিন্দুকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন নি, মুসলমানকে মুসলমান বলে মানেননি। মানুষ মাত্রের বন্ধু, গুরু ছিলেন যেমন পয়গম্বর, তেমনি অবতার। "সাধু সন্ন্যাসী যুগে যুগে দেশে দেশে জন্মায়, সবাইকে ভালবাসবে বলে। যে সাধু বাসেন না তিনি অসাধু। যে ধর্ম বাসেনা সে ধর্ম অধর্ম। প্রকৃত মুসলমান প্রকৃত হিন্দুকে শ্রদ্ধা করবে সম্মান করবে। হিন্দু যে পাথর পূজা করে সে পাথরে দেবতা নেই কি? কোথায় নেই দেবতার স্পর্শ? এ পাপ দেহে যদি তাঁর বাস হোলো, পাথর তো ঢের ভালো।"

জয়নাল এই ফকিরের পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিলেন। তাঁর অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে রাজত্বের মধ্যে হিন্দু-মোস্লেম ভেদ একেবারে মুছে ফেললেন। কাশ্মীরের স্বর্ণযুগ সেটা। সংস্কৃতের প্রসার হোলো। উত্তসোম এবং যুদ্ধভট্ট 'জয়নাবিলাস' কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন জয়নালের জীবনী দিয়ে। আবার মুসলমান কবি নুরুদ্দীন নন্দঋষির বাণী সংগ্রহ করলেন 'ঋষিনামা' নাম দিয়ে। নন্দ ঋষির গল্প আর একদিন হবে। সেও এক মহাত্মার কথা।

এই জয়নাল আবেদীন শেষ পর্যন্ত বেদান্ত শাস্ত্রের তত্ত্বে একেবারে পাগল হয়ে প্রায় সর্বত্যাগী হয়ে রইলেন। শেষ বয়সে যোগবাশিষ্ঠ শুনতে শুনতে চিরনিদ্রায় সমাহিত হন্।

তাঁর নামে জয়না কদল—চতুর্থ পুল। আর দ্বিতীয় পুল হব্বা কদল।

ক্রমশঃ

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ফ্রান্সের মলে-মন্ত্রিমণ্ডল আলজেরিয়া সমস্যার সমাধানে সমর্থ হন নাই, সুয়েজ অভিযানের ব্যর্থতায় ফরাসী জাতির অবমাননা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তবুও তাঁহারা টিকিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ, গত বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে মলে-মন্ত্রিমণ্ডলের আয়ুই দীর্ঘতম; একাদিক্রমে ষোল মাস ফ্রান্সের শাসনকার্য্য চালাইবার সৌভাগ্য গত দশ বৎসরে কোনও মন্ত্রিমণ্ডলের ঘটে নাই।

ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন—

ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা আলজেরিয়া; এই সমস্যার চিরতরে সমাধান হইয়া যাইবে,—প্রধানতঃ এই আশাতেই ফ্রান্স সুয়েজের ব্যাপারে অত্যধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিল; ফরাসী রাজনীতিকরা মনে করিয়াছিলেন যে, নাসেরকে সায়েস্তা করিতে পারিলে সমগ্র আরব-জগতের পাশ্চাত্য-বিরোধী শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবে। সুয়েজের ব্যাপার লইয়া যখন উৎকট জঙ্গ জিগির চলিতেছিল, তখন লণ্ডনের "নিউ ষ্টেটসম্যান্" পত্রিকার প্যারিসস্থিত সংবাদদাতা লেখেন, "মঃ মলে ও মঃ পিনো ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের ব্যাপারকে আরব জগতের সহিত ঐক্যবদ্ধ পাশ্চাত্য জগতের চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষা বলিয়া ফরাসী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর, আলজেরিয়ায় লা কোস্তে তাঁহার শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে আরবদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আমেরিকার সমর্থনে বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত তৎপরতায় তাহাদের অতি প্রিয় রক্ষক নাসের এবার খতম হইবে।" কিন্তু আমেরিকা পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, নাসেরও খতম হন নাই; ফ্রান্সকেই দন্তে তৃণ লইয়া সুয়েজ হইতে অপসরণ করিতে হইয়াছে। এই গোয়ারতুমির ফলে ফরাসী জনসাধারণের স্কন্ধে অধিকতর আর্থিক বোঝা চাপিয়াছে। সুয়েজ খাল "বয়কট" করিবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় বৃটেন শেষ পর্য্যন্ত তাহার জাহাজগুলিকে এই জলপথ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছে; কিন্তু মলে-মন্ত্রিসভা মিথ্যা মর্য্যাদাজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সে অনুমতি দেন নাই। ইহাতে ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; জনসাধারণের আর্থিক বোঝাও বেশী হইয়াছে। তাহার পর, আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য ব্যয় তো আছেই। এখানে চার লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছে; এই ঔপনিবেশিক যুদ্ধে বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ কোটী পাউণ্ডেরও বেশী। সুয়েজ অভিযান বা আলজেরিয়ার যুদ্ধ মলে মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ নয়, পরোক্ষ কারণ। এই মন্ত্রিমণ্ডলের দক্ষিণপন্থী সমর্থকরা আলজেরিয়া নীতির বিরোধিতা করেন নাই, সুয়েজ অভিযানও তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নীতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থায় তাঁহারা আপত্তি করেন। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা তাঁহাদের নিজেদের ও তাঁহাদের নির্ব্বাচকদের পকেট বাঁচাইয়া মলে-মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্ধত নীতি সমর্থন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কপটতার জন্য গত ২২শে মে মলে-মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পর প্রায় দুই সপ্তাহ হইতে চলিল নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ফ্রান্সে গঠিত হয় নাই।

সুয়েজ খাল ও ইস্রাইলী জাহাজ—

মলে-মন্ত্রিমণ্ডল যতদিন টিকিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের নীতি ছিল—"ভাঙ্গি তবু মচ্‌কাই না।" সুয়েজ অভিযান ব্যর্থ হইলেও মিশরের নিকট নৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে মলে-মন্ত্রিমণ্ডল কিছুতেই রাজী হন নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সুয়েজ "বয়কটের" নীতি ত্যাগ করিলেও তাঁহারা জিদ্ ছাড়েন না; মিশরকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহারা অন্য ফন্দী আঁটিয়াছিলেন।

মিশর প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, সুয়েজ সম্পর্কে ১৮৮৮ সালের কন্‌স্তান্তিনোপোল কন্‌ভেন্‌শন সে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবে। এই কন্‌ভেনশনের প্রধান কথা,—কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধের সময় সর্ব্বদাই সুয়েজ খাল সকল শক্তির জাহাজের পক্ষে উন্মুক্ত থাকিবে। এই সূত্র ধরিয়া মলে-মন্ত্রিমণ্ডল মিশরকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইস্রাইলকে তাঁহারা গোপনে উস্কানি দিয়াছিলেন। মলে-মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিলেও এই সংক্রান্ত ফরাসী নীতি এখন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত আছে মনে করাই সঙ্গত। ১৮৮৮ সালের কনস্তান্তিনোপোল কন্‌ভেনশনের মর্য্যাদা পরবর্ত্তীকালে কার্য্যতঃ রক্ষিত হয় নাই; বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল রক্ষার এবং উহা পরিচালনার ভার বৃটেনের উপর অর্পিত হয় এবং মিত্রপক্ষের শত্রু দেশগুলির কোনও জাহাজ সুয়েজ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই নজীর অনুসারে ১৯৫১ সাল হইতে মিশর ইস্রাইলী জাহাজকে সুয়েজ ব্যবহার করিতে দিতেছে না; তাহার যুক্তি—১৯৪৮ সালে ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিরতি হইয়াছে বটে; কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত ইস্রাইলের সন্ধি চুক্তি হয় নাই, সুতরাং, ইস্রাইল এখনও শত্রু-রাষ্ট্র; তাহার জাহাজ সুয়েজ অতিক্রম করিতে পারিবে না। মিশর সম্প্রতি সুয়েজ সম্পর্কে যে নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাতে সে ১৮৮৮ সালের কন্‌ভেন্‌শন্ মানিয়া চলিবার, অর্থাৎ সকল দেশের জাহাজকে অবাধে সুয়েজ ব্যবহার করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল "সকল দেশের" অন্তর্ভুক্ত

কিনা, তাহা সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলে নাই। সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখের এই অভাবকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা—ইস্রাইল আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, জাতি-সঙ্ঘের সে সভ্য; সুতরাং ১৮৮৮ সালের কনভেনশন অনুসারে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সে-ও সুয়েজ ব্যবহারের পূর্ণ অধিকারী। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মিশর তাহা করে নাই। অন্য ব্যাখ্যা—ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই। ইহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর। এই রাষ্ট্রের আইনগত অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করে না; সুতরাং, মিশরীয় প্রস্তাবের "সকল দেশের" মধ্যে ইস্রাইল নিশ্চয়ই নাই। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই যুক্তিসঙ্গত ধরিয়া লইয়া প্রচার করা হইতেছে যে, ১৮৮৮ সালের কনভেনশনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার আন্তরিক আগ্রহ মিশরের নাই। এখন ফ্রান্সের উস্কানিতে ইস্রাইল এই আন্তরিকতা পরীক্ষা করিতে উদ্যোগী হইতেছে; সুয়েজের মধ্য দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। একবার সম্মিলিত আরব বাহিনীকে পরাস্ত করায় এবং আর একবার মিশরীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করায় (অবশ্য বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সামরিক অভিযানে পরোক্ষে বিশেষ উপকৃত হইয়া) ইস্রাইল তাহার সামরিক শক্তি সম্পর্কে এখন অত্যন্ত গর্ব্বিত। মিশর যদি সুয়েজ খালের মধ্যে ইস্রাইলী জাহাজের উপর গুলী ছোঁড়ে, অথবা উহা আটক করে, তাহা হইলে মিশরকে সে দেখিয়া লইবে—ইহাই ইস্রাইলের অভিসন্ধি। এই ব্যাপারে তাহার প্রধান উৎসাহদাতা ফ্রান্সের মলে-গভর্ণমেণ্ট; প্রচুর ফরাসী সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও ইস্রাইল লাভ করিয়াছে।

সুয়েজের মধ্য দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ যাইতে দিতে মিশর বাধ্য কিনা, ইস্রাইলের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধরত অবস্থায় চুক্তিটি সঙ্গত, কি অসঙ্গত, ইহার বিচার আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে হইতে পারে। বস্তুতঃ, প্রেসিডেণ্ট আইসেন্‌হাওয়ার এক সময় বলিয়াছিলেন যে, এই প্রশ্ন আন্তর্জ্জাতিক আদালতে উপস্থাপনে তাঁহাদের আপত্তি নাই। সে যাহা হউক, সুয়েজের পথে ইস্রাইলী জাহাজের যাতায়াত ১৯৫১ সাল হইতেই বন্ধ; গত বৎসর জুলাই মাসে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়াতে এই সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। ইহা তখন হইতে নূতন গুরুত্বও লাভ করে নাই। এই প্রশ্ন সমগ্র প্যালেষ্টাইন সমস্যার সহিত জড়িত বলিয়া বরাবর মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং এখনও ইহা সেই সমস্যার সহিত জড়িত। এখন যদি মনে করা হয় যে, গত অক্টোবর মাসে বৃটেন ও ফ্রান্সের পরোক্ষ সহযোগে ইস্রাইলের সামরিক অভিযান আকাব উপসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়াতে এই উপসাগর ও সুয়েজ খাল ব্যবহারের অবাধ অধিকার তাহার জন্মিয়াছে, তাহা হইলে সামরিক তৎপরতার দ্বারা অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি মানিয়া লওয়া হয়। গত বৎসর শরৎকালে জাতি-সঙ্ঘের নির্দ্দেশে বৃটেন্ ও ফ্রান্স মিশরের ভূমি ত্যাগ করিবার পরও ইস্রাইল তাহার অধিকৃত গাজ্যা ও আকাবা উপকূল ত্যাগ করিতে চাহে নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার চেষ্টায় সে যখন সম্মত হয়, তখন তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহার জাহাজগুলির নিরুপদ্রব গতিবিধি যাহাতে বাধামুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু সামরিক অভিযানের ফলে এই সম্পর্কে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কেহ স্বীকার করে নাই। ইস্রাইল এখন সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইতেছে। সুয়েজের পথে ইস্রাইলের জাহাজ প্রেরণ সম্পর্কে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ বলিয়াছেন যে, আমেরিকা ইহার বিরোধিতা করিবে না, এবং ইস্রাইলী জাহাজের গতি শুদ্ধ করিবার জন্য মিশরীয় তৎপরতা আমেরিকায় অনুমোদন লাভ করিবে না। এই সম্পর্কে আমেরিকার সক্রিয় নীতি কি হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। মার্কিণ নীতি সম্পর্কে এই অস্পষ্ট উক্তিতে ইস্রাইল উৎসাহ লাভ করিতে পারে, এবং অতি সত্বর মধ্যপ্রাচ্যে আর একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। গত অক্টোবর মাসের মিশর-বিরোধী সামরিক অভিযানের সফলতার দাবীতে ইস্রাইলী জাহাজকে মিশর অবাধে সুয়েজ অতিক্রম করিতে নিশ্চয় দিবে না।

জর্ডানে গোলযোগের শিক্ষা—

জর্ডান এখন শান্ত। রাজা হুসেন অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। আরব জগতে তাঁহার নূতন মিত্র জুটিবার ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে। তবে, জর্ডানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে যে শিক্ষা লাভ হইল, তাহা আশঙ্কাজনক। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের মিথ্যা ধুয়া তুলিয়া জনসমর্থিত প্রগতিশীল গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য জর্ডানে যে কূটনৈতিক কৌশলের প্রয়োগ দেখা গেল, তাহা অদূর ভবিষ্যতে অন্যত্র প্রযুক্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। সিরিয়া ও মিশরের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে কতকগুলি শক্তির চক্ষুশূল। সিরীয়াকে তো আধা-কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ গোলযোগের মূল যে প্রেসিডেণ্ট নাসের, ইহা প্রকাশ্যেই বলা হয়। কম্যুনিষ্টদের সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে। অতঃপর, সিরিয়া ও মিশরে যে কোনও সময় বাহিরের শক্তির গোপন সাহায্যপুষ্ট বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। সে বিদ্রোহ সম্ভবতঃ কম্যুনিজম্-বিরোধী ধর্ম্ম যুদ্ধের মর্য্যাদা লাভ করিবে, এবং বিদেশ হইতে অকাতরে সমর্থন ও সাহায্যও আসিবে। আইসেন্‌হাওয়ার নীতিকে তখন আর একবার মোচড় দিয়া হয়ত আরও একটু বাঁকাইয়া লওয়া হইবে, এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রযুক্ত হইবার জন্য প্যারাসুটধারী মার্কিণ সৈন্য ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বিদ্রোহীদের অর্থের প্রয়োজন, অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন পুরাপুরি মিটানো হইবে।

জর্ডানের ঘটনায় আর একটী বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সৌদী আরবের ধীরে ধীরে সিরিয়া ও মিশরের পক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার যে লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল, জর্ডানের ব্যাপারে তাহা আরও স্পষ্ট হইল। জর্ডানের সাম্প্রতিক গোলযোগে রাজা সৌদ নাকি রাজা হুসেনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শোনা যায়,তাঁহার প্রেরিত অর্থেই হুসেন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজভক্ত বেদুইন্ সৈন্যদের সকল অসন্তোষ

দূর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বাগদাদ্ পরিদর্শন করিয়াছেন, এবং ইরাক-সৌদী আরবের ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এত দিন বাগদাদ্-চুক্তি-বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা ছিলেন রাজা সৌদ। আমেরিকা এই চুক্তির অর্থনৈতিক ও সামরিক কমিটীতে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করায় তিনি এখন এই সম্পর্কে তাঁহার পূর্ব্বের মনোভাব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, অথবা তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের আভাস পাইয়াই আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তিতে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করে। জর্ডানের গোলযোগে আমেরিকার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রাজা হুসেনের প্রতি। কিন্তু দেশের বিরুদ্ধ জনমত এতই প্রবল যে প্রকাশ্যে আমেরিকা হুসেনের পক্ষে আসিতে পারিতেছে না। হুসেনকেও বলিতে হইতেছে যে, আরব রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্য তিনি লইবেন না। সৌদী আরব মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমেরিকার ও হুসেনের এই সমস্যা মিটাইয়া দিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমেরিকার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য যদি রিয়াদ্ (সৌদী আরবের রাজধানী) হইতে আরব ষ্ট্যাম্প গায়ে লাগাইয়া আম্মানে আসে, তাহা হইলে সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম্ আরব রাজতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া নূতন জিগির উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। প্রগতিশীল আরব জাতীয়তাবাদ স্বভাবতঃ সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে চায়। কম্যুনিজমের অপবাদ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মার্কিনী সাহায্য ও সমর্থন লাভের যে কৌশল জর্ডানে দেখা গেল, ইহা সেই কৌশলেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। জাতীয়তাবাদী আরবদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবদিগকে ক্ষেপাইবারও ইহা একটি কৌশল।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক—

বর্ত্তমানে লণ্ডনে জাতি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটীর বৈঠক চলিতেছে। এই বৈঠকে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ষ্ট্যাসেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তৈয়ারী হাইড্রোজেন বোমাগুলি মজুত রাখিয়া এখন অতিরিক্ত উৎপাদন স্থগিত রাখা হউক। রুশিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার ফলে সে আণবিক অস্ত্রে আমেরিকার পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছে। গত ১৯৫৫ সালে জুলাই মাসে জেনেভায় রাষ্ট্র-প্রধান সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণের আয়োজন বিমানযোগে পর্য্যবেক্ষণের প্রস্তাব করেন। রুশিয়া প্রথমে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে; পরে সে এই প্রস্তাবে কতক পরিমাণে সম্মত হইয়াছে। স্থলে ও অন্তরীক্ষে পারস্পরিক পর্য্যবেক্ষণের অঞ্চল নির্দ্ধারণ বর্ত্তমান বৈঠকের একটি প্রধান কাজ। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ স্থগিত রাখিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে আমেরিকা জানাইয়াছে যে, পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা চলিতে পারে না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপিত হওয়ায় এই মহাদেশ যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার প্রতি সোভিয়েট রুশিয়া বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। জার্ম্মাণীতে একটি মধ্যবর্ত্তী নিরপেক্ষ অঞ্চল সৃষ্টির প্রস্তাবও সে করিয়াছে। এই ধরণের একটি প্রস্তাব প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যর এন্থনী ইডেন্ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনার ইহাতে সম্মত নন।

বৃটেনের হাইড্রোজেন বোমা—

সমগ্র প্রাচ্যের এবং বৃটেনের প্রগতিশীল জনমতের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া গত মে মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের কৃষ্টমাস্ দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছেন। বিস্ফোরণ সাফল্যজনক হইয়াছে বলিয়া যথারীতি প্রচারকরা হইয়াছে। আমেরিকার দুই হাজার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার নোবেললরিয়েট্ বিজ্ঞানী ডাঃ পলিং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ বন্ধ না হইলে দশ লক্ষ লোকের আয়ু পাঁচ হইতে দশ বৎসর কমিয়া যাইবে: আগামী বিশ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষে দুই লক্ষ শিশুর শারীরিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটিবে। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ পলিং বলিয়াছিলেন যে, বৃটেনের হাইড্রোজেন্ বোমার বিস্ফোরণে এক লক্ষ লোক লিউকেমিয়া ব্যাধিতে মারা যাইবে। পশুর দেহে পরীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়া এবং হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্ব হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন। ৩।৬।৫৭
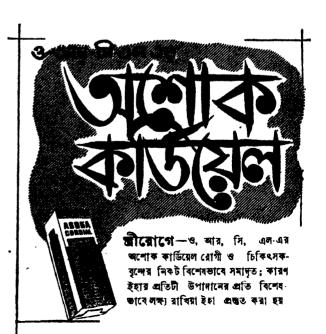
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা ভাষার প্রথম স্তরে দেখা যায়, তৎসম শব্দের তুলনায় দেশজ ও তদ্ভব শব্দাবলীর সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষ অঞ্চলে জাত ঐ সব শব্দের ব্যবহারের আধিক্য বাংলা ভাষাকে প্রতিবেশী ভাষাগুলি থেকে পার্থক্য দান করেছে।

অষ্টম-নবম শতকে যখন বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম-লাভ করে তখন এই ভাষায় অস্ট্রো-এশিয়াটিক উপাদানের আধিক্য দেখা যায়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ঐ উপাদানের আধিক্য প্রধানত স্থানের নামগুলিতে পরিস্ফুট। বাংলা দেশে আর্য বসতি স্থাপনের বহুপূর্বে অনার্য অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আর্য সভ্যতা এদেশে বিস্তার লাভ করার পরও ঐ কোল জাতীয় নরগোষ্ঠী ও তাদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। তাদের স্মৃতিচিহ্ন র'য়ে গেল অন্য নানা ব্যাপারের মতো জায়গার নামেও। পুরাতন অনুশাসন ও গ্রন্থাবলীতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ঐ সব জায়গার কোল-ভাষাগোষ্ঠী-প্রদত্ত নামাবলী পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত "রামচরিত" গ্রন্থে অনুরূপ নাম সব পাওয়া যায়। "গোধগ্রাম", বালুহিট্‌ঠি", "মুড়ুন্দী" এই সব নাম, যাদের দেখা মেলে পাল ও সেন রাজাদের দেওয়া অনুশাসন গুলোতে, যদিও সংস্কৃত প্রভাবে প্রভাবিত, তবুও ঐ অনার্য উপাদান নির্দেশ করে। "অমরকোষ"-এর "টীকাসর্বস্ব" গ্রন্থে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ যে-সব বাংলা শব্দ সঙ্কলন করেছেন, তাদের মধ্যেও অনার্য প্রভাব বর্তমান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংগৃহীত চর্যা-গীতিকোষের ভাষাতেও তদ্ভব ও দেশি শব্দের বাহুল্য। সুতরাং আদিযুগে প্রথম উদ্ভবের সময় বাংলা ভাষার মূলধারা নির্ধারিত হয়েছিল এই ভাষার অন্তর্গত দেশি ও তদ্ভব শব্দ সমূহের দ্বারা।

কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। দশম একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমলে রাজাদের উদার শাসননীতির প্রভাবে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম, তেমনি একদিকে বাঙালির রচিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় রীতির সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদিকে বাঙালির সদ্যসৃষ্ট মাতৃভাষার লৌকিক সাহিত্য পাশাপাশিভাবে বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে লাগ্‌ল। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ ব'লেই তাঁদের আমলে বাংলা ভাষার সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত বিকাশ সহজ-সাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতকে সেন-বংশীয় রাজারা নির্দয়ভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টা যে কি ভয়াবহ সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করে তা যারা জানতে চায় তারা আচার্য নীহাররঞ্জনের "বাঙালির ইতিহাস" গ্রন্থের "রাজবৃত্ত" অধ্যায়টি পড়্‌লে বুঝতে পারবে যে সেন রাজারা বাংলা ভাষার উপরও সংস্কৃত প্রভাব চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় অসাধারণ যত্নবান্ হয়েছিলেন এবং স্থানের নাম-গুলির রূপান্তর দেখেই বোঝা যায় যে, সে প্রয়াসে তাঁরা অনেকদূর কৃতকার্যও হয়েছিলেন। বাংলা দেশের স্থানসমূহের নাম-পরিবর্তনের ইতিহাস ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়; বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সে-আলোচনা গভীরতর মনো-যোগের অপেক্ষায় আছে। আপাতত আমাদের সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, এটুকু বললেই চলবে যে, সেন রাজাদেরও উৎকট সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-প্রীতির তাড়নায় নানা কুফল ফললেও বাংলা ভাষার মোড় হঠাৎ ফিরে গেল এবং প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গে আর এক বিষয়ে তার স্বাতন্ত্র্য স্থাপিত হল।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব'লে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, "সেন রাজাদের রাজনৈতিক প্রভাব যে ভাষার উপাদানের একটা বৈপ্লবিক সংস্কার করে, তাঁরা যে জোর ক'রে বাংলা সাহিত্যের উপর তৎসম শব্দের আধিক্য চাপিয়ে দেন, এর ইতিহাস-সমর্থিত কোন প্রমাণ নাই এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় এটা সাহিত্য প্রকৃতি বিরোধী ব'লে মনে হয়। ইংরাজি সাহিত্যে সম্পূর্ণ বিদেশি নর্মানরা স্যাক্সন ভাষাকে সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে দূরীভূত করবার চেষ্টা ক'রেও এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন করতে পারে নি। সে তুলনায় সেন রাজাদের প্রভাবও সামান্য ও অভিপ্রায়ও ক্ষীণতর ছিল।"

এ কথার উত্তর এই যে, সেন রাজাদের প্রভাবও প্রচেষ্টার প্রাবল্য ও সাফল্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন-প্রদত্ত প্রমাণসমূহই যথেষ্ট; তিনি লিখেছেন, "সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার জয় জয়কার;......এ যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী।......এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধরূপ কিছুতেই দেখা যাইত না...সেন আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়া কর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম ও সমাজগত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাংলাদেশে ইহার আগে বা পরে আর কখনো হয় নাই। এই যুগের সর্বপ্রধান চেষ্টাই যেন হইতেছে, বাংলার সমাজকে একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা, নূতন করিয়া গড়া এবং তাহা একান্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শানু-যায়ী; সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন;

উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও তাহার পোষক ও সমর্থক।...তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধিতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে—কিন্তু কোনো বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই।" তা'ছাড়া, ইংরেজি ভাষার উপরও নর্মান প্রভাব সুস্পষ্ট। নর্মানরা ইংরাজি ভাষায় ফরাসি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ঢোকাতে পেরেছে। সেন রাজারাও বাংলা ভাষার উপাদান গত পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে যান, মাত্র এটুকুই আমাদের বক্তব্য। সেনদের প্রভাব যে কতখানি ছিল তার ধারণা এযুগে করা অসম্ভব বললেই হয় ; নর্মান-প্রভাবের সঙ্গে তার কোন তুলনা করা সঙ্গত নয়, সুতরাং শ্রীকুমারবাবুর এই সংশয় যুক্তিসহ নয় যে, "দেড় শত বৎসর ইংরাজি শিক্ষার পর প্রকৃত জনসাধারণের ভাষা কতটুকু বদলেছে!" ইংরেজি শিক্ষায় জনসাধারণ মোটেই শিক্ষিত হয়নি এবং ইংরেজি প্রভাব দেশে সর্বগ্রাসী ও ছিল না। তাছাড়া, শিক্ষিতজনের ভাষায় ইংরেজি প্রভাব বেশ কিছু দেখা যায়। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বাংলা ও ইংরেজি একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের ভাষা'; কিন্তু বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষা ; এমন অবস্থায় বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব যত সহজে পড়ার কথা, বাংলার উপর ইংরেজির প্রভাব তত সহজে পড়বার কথা ওঠে না। অনুরূপভাবে, ইংরেজির উপর ফরাসির প্রভাবও তত প্রবল হতে পারে না। তাছাড়াও, বাংলার উপর ইংরেজি ভাষার উপাদানগত প্রভাব চাপিয়ে দেবার কোন প্রয়াস ছিল না বললেই হয় ;-কিন্তু বাংলাদেশের নানা জায়গায় দেশজ নামগুলি পর্যন্ত সেনরাজারা বদলে দিয়েছিলেন! নর্মানরাও ইংল্যাণ্ডে এমন উৎকট প্রয়াস সদা-সর্বদা করার কথা ভাবে নি। এ ব্যাপারে সেন বংশ অতুলনীয়।

নতুন যে ব্যাপারে বাংলার সঙ্গে তার প্রতিবেশী ভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য দেখা গেল তা এই যে, এতদিন প্রতিবেশী ভাষাগুলিতেও দেশি ও তদ্ভব শব্দের প্রচলন বেড়ে বেড়ে সেগুলিকে ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ ভাষায় পরিণত করছিল। বাংলা ভাষা সহসা সংস্কৃত ভাষার দ্বারা বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হতে আরম্ভ করায় বাংলা ভাষায় তাদের তুলনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেল। বিশেষত সেনবংশীয় নৃপতিদের রাজধানী বঙ্গদেশে স্থাপিত হওয়ায় বাংলা দেশেই সংস্কৃত প্রভাবের প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। দূর মগধের তুলনায় বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অনেক বেশি হল। তার ফল রাজধানীর চার পাশের বঙ্গদেশে প্রচলিত ভাষাতেও দেখা গেল। সকল প্রদেশেই তখন পণ্ডিতজন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। সেন রাজাদের অধিকারভুক্ত এলাকায় তাঁরা এই প্রচেষ্টায় আরো উৎসাহ পেলেন। সেজন্যে মিথিলাতেও সংস্কৃত ভাষার প্রবল আধিপত্য দেখা যায়। শ্রীকুমারবাবু বলেছেন, "সেন রাজাদের সাম্রাজ্য মগধ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সুতরাং তাঁদের প্রভাবে যদি ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে, তবে শুধু বাংলায় তা সীমাবদ্ধ কেন থাকবে, বিহার পর্যন্ত প্রসারিত হ'ল না কেন?" বস্তুত উত্তর বিহার বা মিথিলা পর্যন্তও ঐ পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। বিদ্যাপতির রচনায় সংস্কৃত প্রভাবই তার প্রমাণ। তবে মিথিলার তুলনায় দ্বাদশ শতকে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি হবারই কথা যেহেতু রাজধানী ছিল বাংলাদেশে।

তখন পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে গ্রন্থরচনা করলেও লৌকিক ভাষার প্রতি দরদ সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিছক লোকমুখের ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-সাহিত্যগুলি গঠন করেছিলেন। সেন রাজাদের আমলে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধগণ অবহেলিত হওয়ায় ঐ সব বাঙালি ও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যিকেরা অনেকেই উপেক্ষিত হয়ে থাকতে বাধ্য হন ; কেন-না, লৌকিক সাহিত্যের সেবকেরা প্রায়ই বৌদ্ধ ছিলেন।

দ্বাদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রভাব আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে যাওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রতিবেশী ভাষাগুলির তুলনায় বেশি তৎসম শব্দবহুল হয়ে উঠ্‌ল। আজও বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দাবলীর ব্যবহার প্রতিবেশী মাগধী প্রাকৃত তথা অপভ্রংশ থেকে জাত অন্য ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশি। জয়দেবের রচনায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ প্রভাব দেখা যায় সামান্য পরিমাণে ; কিন্তু সেন রাজাদের প্রভাবের ফল যখন বাংলাদেশে ভালোক'রে ছড়িয়ে যাবার কথা, সেই সময়ে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের পুঁথিতে জয়দেবের সংস্কৃতের প্রভাব প্রবলতর। সেন রাজাদের প্রভাব ত্রয়োদশ শতকের বাংলা ভাষায় আরও বেশি পড়ার কথা ; কারণ, দ্বাদশ শতকের শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের ফল ঐ সময় কার্যকরী হওয়ার কথা। আর তা হয়েছিল ব'লেই বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন"—এর পুঁথির ভাষা সংস্কৃত-অনুসারী। চর্যাকার ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া অব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রতিনিধি। কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" রচয়িতা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সন্তান, যে-সংস্কৃতি অস্টিক প্রধান বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেন ত্রবির সেন রাজবৃন্দ—যাঁরা বাংলায় বিদেশি এবং বাংলার "আপনার লোক" ছিলেন না। ফলে, চতুর্দশ শতকের মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় শাব্দিক উপাদানের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। সহজেই বোঝা যায়, সেই পরিবর্তনের প্রভাব কম-বেশি তখনকার বাংলা গদ্যেও দেখা যাবার কথা।

চর্যাকারদের ভাষা জন-সাধারণকে লক্ষ্য ক'রে রচিত, এক হিসাবে এ-কথাও সত্য। যদিও তাঁরা চান নি যে, অদীক্ষিত কেউ তাঁদের সাধন-রহস্য ভেদ করুক, তবুও সব দিক বিচার করলে মনে হয় যে, তাঁরা চেয়েছিলেন অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস-আস্বাদন ও বহিরঙ্গ-জনের সঙ্গে নাম-সঙ্কীর্তন গোছের কিছু ; জন-সাধারণ তাঁদের রচনার বাহ্য অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, এটা চেয়ে ছিলেন ব'লেই তাঁরা লৌকিক প্রাকৃত জীবনকে তাঁদের কাব্যের পটভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন। সে যুগের জন-সাধারণের জীবনও কাব্যে বর্ণিত লৌকিক জীবনের অনুরূপ ছিল ব'লে জন-সাধারণ চর্যাগীতিকায় যথেষ্ট সমাদর করেছিল। মণীন্দ্রমোহন বসুর "চর্যাপদ" গ্রন্থে দেখাযায়, সে যুগে এক বিরাট চর্যাগীতি সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল যা জন-সমাদর ব্যতীত সম্ভবপর ছিল না।

চর্যাকারদের যুগে বাংলা গদ্য জন-সাধারণের অর্থাৎ খেয়া নৌকার মাঝি, কুমোর, শুঁড়ি, ধুনুরী, ব্যাধ, ডোম, শবর, কাপালিক, সহজিয়া সাধক প্রভৃতির মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে যারা নিরক্ষর ছিল না তাদের পারস্পরিক সংযোগ-সাধনের ভাষা ছিল ঐ গদ্য।

আরও বলা যায় যে, তারা শিক্ষিত পণ্ডিতকে ঐ গদ্যভাষায় চিঠিপত্র লিখ্‌ত এবং পণ্ডিতেরাও দরকার হলে তাদের বাংলা ভাষাতেই লিখতে বাধ্য হতেন যেহেতু তারা সংস্কৃতে চিঠি-লিখতে পড়তে পার্‌ত না। এখনকার কালে অল্পশিক্ষিত বা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ লোক যেমন সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত বাঙালি ভদ্রলোককে দরকার হলে বাংলাতেই চিঠি লিখে থাকে এবং বাঙালি সাহেবও তাকে গরজ বুঝলে অনভ্যস্ত মাতৃভাষাতেই লিখে থাকেন, তেমনি সে-যুগেও এইভাবে বাংলা গদ্যের সীমাবদ্ধ ব্যবহার বরাবরই কিছু-কিঞ্চিৎ বজায় ছিল; না হলে, ষোড়শ শতকের বাংলা চিঠির যে-নমুনা আমরা পাই তার গদ্যভাষা অমন অত্যন্ত সজীবতায় পরিপূর্ণ হত না। নিতান্ত সাধারণ লোকের ব্যবহার্য ভাষা হওয়ায় চর্যাপদের সমকালীন গদ্যে দেশজ ও তদ্ভব শব্দের বাহুল্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন গ্রন্থ রচনার কালে সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা গদ্য যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ব্যবহৃত হত তা অনুমান করা যায় এই মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারাও বাংলা সাহিত্য রচিত হচ্ছে, এটা দেখে। চর্যাপদের যুগে ব্রাহ্মণরা সম্ভবত অবজ্ঞাভরে পারতপক্ষে বাংলায় কিছুই লিখতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন তো ব্রাহ্মণের রচনা। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ, সংস্কৃত ভাষা ইতিমধ্যে রাজানুগ্রহ-বঞ্চিত হয়েছে। তখন বাংলা ও সংস্কৃতের মর্যাদা রাজার চোখে তুল্য মূল্য; বরং রাজশক্তি তখন সংস্কৃতের উপর অপ্রসন্ন। ইতিমধ্যে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার-প্রয়াসে বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বেড়ে গেছে বটে কিন্তু তুর্কি যুগে সংস্কৃত আর রাজদরবারের ভাষা নয়। ভাষার শব্দে উপাদান-বিশেষ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে-কমে না। সেন রাজাদের চেষ্টায় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপের ফলে একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলা ভাষায় ক্রমশ তৎসম শব্দ বেড়েছে; ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে তুর্কিরা রাজ্য স্থাপন করলেও পূর্ববঙ্গে সেনদের প্রাধান্যই ছিল। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে সেইজন্যে রাজসরকার সংস্কৃত মর্যাদাবিহীন হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রভাব পাল-যুগের তুলনায় প্রবলতর। বিশেষত তৎসম শব্দের বাহুল্য বিস্তারের দিক থেকে।

সংস্কৃতের সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক প্রভাব তুর্কি যুগেও থাকল বটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষা বাংলার শরণাপন্ন হলেন এমন কি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও। লোকের মুখের ভাষা এত তাড়াতাড়ি সংস্কৃত বহুল হয়ে না উঠলেও ব্রাহ্মণের লেখা পদ্য যেমন, গদ্যও তেমনি অল্পাধিক তৎসম বহুল হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল এবং অসঙ্কোচে ধরা যায় যে, তা হয়েছিল। অর্থাৎ, চর্যাপদের যুগে তখনকার গদ্য ভাষা যেমন নিতান্তই অব্রাহ্মণ জনসাধারণের মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যুগের গদ্য ভাষা আর তেমন সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না। বরং এই সময় লিখিত ভাষায় লেখক ব্রাহ্মণের শিক্ষা ও সংস্কার সুলভ কিছু কিছু সাধারণ্যে অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হবার কথা। পদ্যে যে তা হয়েছিল, তার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথি। গদ্যেও এর অন্যথা হবার কোন কারণ দেখা যায় না। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদ্য ভাষা থেকেই সেকালের গদ্যভাষাও খানিকটা আঁচ করা যাবে।

এই সময় বাংলা ভাষা সর্ব শ্রেণীর বাঙালি লেখকের হাতেই সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হতে লাগ্‌ল। বস্তুত চর্যাপদের যুগের তুলনায় এই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তথা গদ্যেরও প্রসার অনেক বেড়ে গেল। এই সময় থেকে সংস্কৃত ভাষায় কুশলী পণ্ডিতদের সহায়তায় দেবভাষার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে নবজাত বাংলাভাষার এক অভিনব শ্রী ধারণ করল। অন্য নবীন ভারতীয় আর্যভাষা বিশেষত পূর্ব ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সান্নিধ্যজাত ক্লেদ ধুয়ে ফেলে বাংলা নিজ বৈশিষ্ট্য গঠনে বেশি মনোযোগ দিতে পারল। যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার বন্ধনে সমস্ত পূর্বভারতীয় আর্য উপভাষা আবদ্ধ ছিল, সেই ভাষার গর্ভকোষ থেকে বেরিয়ে এসে নিজ আঞ্চলিক শব্দ সমূহের সদ্ব্যবহার ও তৎসম শব্দাবলীর সুমিশ্রণের সাহায্যে বাংলা ভাষা সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে আধুনিক ভারতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য গ'ড়ে নিল। আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে সারা ভারতে প্রগতিশীলতায় এর তুলনা রইল না। তার প্রধান কারণ, নিজস্ব শব্দাবলীর সঙ্গে সুগম্ভীর, সুমধুর ও সুললিত তৎসম শব্দগুলির ব্যবহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রথম বাংলা ভাষাই গ'ড়ে তুলল, যে-বিশেষত্ব সংস্কৃতোৎপন্ন অন্য কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার আজও আয়ত্ত হয় নি। সে-যুগে তো বটেই, এই বিংশ শতকেও এমন কি পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের লেখা বাংলা ভাষাতেও তৎসম যে-সুনির্বাচিত ব্যবহার দেখা যায়, তা হিন্দি, ভোজপুরি, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষাগুলিতে দেখা যায় না। সেন রাজত্বের সময় বাংলা ভাষায় ভোজপুরি, মগহি প্রভৃতির তুলনায় সহসা সংস্কৃত শব্দের উপাদান বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা আরও বেশি ক'রে প্রতিবেশী ভাষাগুলি থেকে পৃথক্ হয়ে যায়। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় আজও অন্য সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশি। এই তৎসম-প্রাচুর্য বাংলা ভাষার ধ্বনি-গাম্ভীর্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে। সেন-রাজত্বের এই প্রভাবের খানিকটা সুফল ফলেছে বৈকি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথি বিশেষভাবে এক পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার রচনা। কিন্তু তাতেও সংস্কৃত ভাষা ও তৎসম, অর্ধ-তৎসম শব্দসমূহের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। মৈথিল ভাষাতেও বিদ্যাপতির রচনায় কাব্যোৎকর্ষের মূলে সংস্কৃত প্রভাব বেশ খানিকটা কাজ করেছিল। কিন্তু বিদ্যাপতির মতো শক্তিমান্ কবি মৈথিলে আর দেখা গেল না। বাংলা ভাষাও মৈথিলকে সর্বপ্রকার উৎকর্ষে শ্রীচৈতন্যের যুগেই অতিক্রম ক'রে গেল। আর, তার আগেও যে সব রকম যোগ্যতায় বিচারে বাংলা ভাষা মৈথিলের পশ্চাতে ছিল, তা নয়। মৈথিলে একা বিদ্যাপতি; কিন্তু পঞ্চদশ শতকেই বাংলায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মালাধর, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি জন্মে গেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে সাহিত্যের কাজে গদ্য মোটেই ব্যবহার করা হত না এবং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যসাহিত্য ও গদ্যভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন মনোযোগই দেন নি। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কড়্‌চা গ্রন্থের মতো

সূত্রকার গদ্য রচনা যদি লেখা হয়েও থাকে তবে এই সময়ে তা সাহিত্য সৃষ্টি-নিরপেক্ষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচিত হয়েছে; কিন্তু নিশ্চয়ই তা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র এবং তার পরিমাণও খুব কম হবার কথা। বাংলা গদ্যের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার যুগেও চিঠিপত্র প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মনে রাখা দরকার যে, সাহিত্য সৃষ্টি তখন পদ্যভাষায় হত ব'লে সংস্কৃত সাহিত্য, ভাষা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব বাংলা পদ্যের উপর যতখানি পড়ত, বাংলা গদ্যের উপর ঠিক ততখানি পড়ত না। বাংলা গদ্য কেবল মাতৃভাষায় পারঙ্গম, স্বভাষানুরাগী লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হত; ফলে, স্বভাবতই তাতে তৎসম শব্দের ব্যবহার কিছু কম হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ভাষার চেয়ে সমকালীন গদ্যে তৎসম শব্দের পরিমাণ সামান্য কিছু কম হওয়া স্বাভাবিক। রচনা-রীতিতেও সংস্কৃত প্রভাব বেশ একটু কম হতে পারে। তবে মোটের উপর শব্দ উপাদানের আনুপাতিক হারের বিশেষ তারতম্য হওয়ার কথা নয়।

চৈতন্যোত্তর যুগের সংস্কৃত প্রভাব-বহুল কোন বাংলা কাব্যের ভাষা থেকে সে যুগের গদ্যভাষা ঠিক ঠিক আন্দাজ করা শক্ত। তার উপর রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বহুপ্রচলিত বইগুলোর ভাষা পরবর্তীকালের লিপিকরদের হাতে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-শ্রেণীর সম্পাদকদের অভিরুচি অনুসারে বহু পরিমাণে রূপান্তরিত হওয়ায় ঐ সব বইএর কাব্যময় ভাষা থেকে তখনকার কালের সাদা-মোটা গদ্যের রূপ-কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুথিতে বহু প্রাচীন ও মূল রচনার ভাষা অনেকটা অবিকৃত থাকায় ঐ দুটি গ্রন্থের ভাষা আমাদের সেকালের গদ্যভাষার স্বরূপ-নির্ণয় প্রয়াসে অনেকটা সহায়ক। তা ছাড়া, ঐ দুই বাংলা কাব্য-নিদর্শনে সংস্কৃতের প্রভাবও পরবর্তীকালের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং আনুমানিক চতুর্দশ শতকের বাংলা গদ্যভাষার রূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ভাষার সাহায্য নেওয়া চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিশেষভাবে লৌকিক এবং পশ্চিমবঙ্গীয় গ্রাম্য উপভাষা হওয়ায় তৎকালীন গদ্যভাষার স্বরূপ উপলব্ধিতে অনেক সাহায্য করতে পারে।

প্রথমে "রাধা-বিরহ" খণ্ডের একটি গীত নিয়ে মূল পদের ভাষা দেখা যাক :—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরেঁা মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব যম মন ঝুরে কাহ্নাঞি দেখিতেঁ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে॥
মোঞ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত॥
বড় পতি আশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুল গন্ধ বহু দূর জাএ;
এবেঁ ঘাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

এই পদে চর্যা গীতিকার তুলনায় আভাঙা তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি, এর যথাযথ গদ্যরূপ এই রকম হবে :—

"মেঘ আন্ধারী; নিশী অতি ভয়ঙ্কর। কদমতলে বসী একসরী মো ঝুরোঁ। (মো) চতুর্দিশ চাহোঁ, কৃষ্ণ দেখিতে পাওঁ না। বড়ায়ি! যৌবন রাখিতে নারিব। (তো) মেদনী বিদার দেউ, (মো) পসিআঁ লুকাওঁ। কাহ্নাঞি দেখিতেঁ সব যম মন ঝুরে। ভ্রমরা ভ্রমরী সনে কোলাহল করে, কোকিল সহকার ডালে বসী কুহলে। মোঞ তাক যেহ্ন যমদূত মানো। বড়ায়ি! যশোদার পুত এ দুখ কবেঁ খণ্ডিব? (মো) বড় পতি আশে বনের ভিতর আইলোঁ, তভোঁ মোরে নান্দের সুন্দর মেলিল না। মোর উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ, এ বিশেষ কাহ্নাঞি দৈবেঁ বুঝে না। বসন্ত সমএ মলয় পবন বহে, বিকসিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ। বড়ায়ি! এবেঁ নান্দের নন্দন ঘাঁট আন। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস গাইল।"

একে আমরা পাঁচশো বছর আগের বাংলা গদ্যের আনুমানিক রূপ বলতে পারি। চর্যাপদের সময়ের আনুমানিক গদ্যভাষার তুলনায় সংস্কৃত শব্দ সহযোগে এর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য অনেক বেড়ে গেছে, এটা ধরা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটি গদ্য রূপান্তরের মধ্যে এতটা প্রভেদের অন্যতম কারণ, বড়ু চণ্ডীদাস ভাষাশিল্পী ও কবি হিসাবে ডোম্বীপাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর কাব্যের গদ্যরূপ তো বেশি উৎকৃষ্ট হবেই। চর্যাপদ থেকে এই ভাষা প্রায় পাঁচশো বছর পরে রচিত; কিন্তু এই পাঁচশো বছরের উন্নতি আরও অনেক বেশি; এখনকার সময়ের গদ্যে এর রূপ হবে এই রকম :—

"মেঘে অন্ধকার নিশি অতি ভয়ঙ্কর। কদমতলে ব'সে একা আমি ঝুরি। আমি চারিদিকে চাই, কৃষ্ণকে দেখতে পাই না। বড়াই! যৌবন রাখতে পারব না। তুমি মেদিনী বিদীর্ণ কর, আমি প্রবেশ ক'রে লুকাই। কানাইকে দেখতে সমস্তক্ষণ মন ঝুরে। ভ্রমরা ভ্রমরীর সঙ্গে কোলাহল করে, কোকিল সহকার-ডালে ব'সে কুহরণ করে। আমার যেন তাদেরকে যমদূত ব'লে মনে হয়। বড়াই! যশোদার পুত্র এ-দুঃখ কবে দূর করবে? আমি বড় প্রত্যাশায় বনের ভিতর এলাম, তবু আমার নন্দের সুন্দর মিলল না। আমার উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ, এ বিশেষ ব্যাপার কানাই দৈববশে বোঝে না। বসন্ত সময়ে মলয় পবন বহে, বিকসিত ফুল গন্ধ বহুদূর যায়। বড়াই! এখন নন্দনন্দনকে ঝটিতি আনো। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস গাইল।"　　ক্রমশঃ

তাসের বাড়ী

লেখক : ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ার

অনুবাদিকা ঃ মণিকা সিংহ

ক্রিসমাসের আগের দিন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। উজ্জ্বল পরিষ্কার সে সন্ধ্যা। এমন সময় কাঠকয়লাওয়ালা তার দিনের কাজ সেরে ফিরে এল নিজের কুঁড়েয়। সন্ধ্যার রাঙা আলোয় গা মেলে বড় বড় পাহাড়গুলো অলসভাবে যেখানে শুয়ে আছে—নীচে যার মস্ত সবুজ উপত্যকা, বিরাট গামলার মত ঢালু হয়ে সেটা ভেতরে নেমে গেছে—সেই উপত্যকার গভীর বনের মাঝে এক টুক্‌রো ফাঁকা জায়গা—সেইখানে কাঠকয়লাওয়ালা তৈরী করেছে তার ছোট্ট কুঁড়ে।

বিকেলের দিকেই সেদিন ও কুড়িয়ে আনা কাঠের টুকরোগুলো মৌচাকের মত সাজিয়ে, তার ওপর ঘাসপাতা চাপা দিয়ে ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখন আগুনটা একটু একটু করে ধরে উঠছে। ও এবার রাতের খাওয়া সেরে নেয়। একটুকরো রুটি আর পেঁয়াজ। এই হল তার সান্ধ্যভোজন। তারপর আবহাওয়া কিরকম যাবে সেটা একবার দেখে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই ও দেখে বরফ পড়েছে। দরজার কাছে এসে ও এই স্বপ্নের মত সুন্দর জগতের দিকে চেয়ে থাকে। বরফের ওপর প্রতিফলিত আলো এসে পড়ে ওর শীর্ণ বিবর্ণ মুখে। ধাঁধিয়ে দেয় ওর চোখ দুটো। এই অপরূপ সৌন্দর্য তার দেখা হয়না। ওর চারপাশে নরম তুলোর মত বরফ পড়ে রয়েছে। যে সব ভোরের পাখী আর পশু এর মধ্যেই বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে তাদের পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে বরফের ওপর। বরফ ঢাকা ওর পোড়া চেস্‌নাট কাঠের স্তূপটা—তার ওপরের একটা ছোট্ট গর্ত দিয়ে এখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটাকে এক অদ্ভুত জিনিষের মত দেখাচ্ছে। সেই উজ্জ্বল নিস্তব্ধতার মাঝখানে আর সবই আছে নিথর নিস্পন্দ হয়ে।

একগোছ ফারশাখা দিয়ে দরজার সামনের বরফ ঝাঁটিয়ে ফেলে ও। তারপর রান্নার জন্য আগুন জ্বালায়। এইখানে ধোঁয়া বেরোবার জন্য কুঁড়ের ছাদে গর্ত করা আছে। আগুন ধরতে ধরতে সে রান্নার পাত্রটায় স্যুপ করবার জন্য কিছু মাংস, কিছু আনাজ-পত্তর দিয়ে ঠিক করে রাখে। আগুনে চড়িয়ে দিতেই কিছুক্ষণ পরে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে ফুটতে থাকে সেটা। ও এখন চুপটি করে বসে অলসচোখে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ দূরের ঐ বনের দিকে—নীল আকাশের ছায়ায় যেখানে পাহাড়-গুলো পড়ে ঝিমোচ্ছে—এ পর্যন্ত যেখানে কারোও পায়ের ছাপ পড়েনি—সেইদিকে।

বেলা গড়াল। স্যুপটা হয়ে এসেছে। পাত্রটার ঢাক্‌না খুলতে খুলতে ওর মনে হয় যেন মানুষের সাড়া পাচ্ছে। মাথা তুলে ধোঁয়ার মধ্যে থেকেই দেখতে পায় বনের ভেতরের সরু বরফঢাকা পথটা ধরে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসছেন এই দিকেই। আরো কাছে যখন এলেন ওঁরা তখন কাঠকয়লাওয়ালা ওঁদের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে। দেখে আর দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। কারণ তার মনে হয় যে লোকটি একটু আগে আস্‌ছেন তাঁকে সে কখনো না দেখলেও যেন চেনে তাঁকে। ছোটবেলা থেকেই চেনে।

এবার অপরিচিত দুটি ওর কুঁড়ের সামনে এসে পড়েন। নমস্কার বিনিময়ের পর কাঠকয়লাওয়ালা ওঁদের ঘরে এনে আগুনের ধারে বসায়। বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করে ওঁদের যে, ওর এই সামান্য স্যুপ খেয়ে ওঁরা আজকের দিনে ওকে

কৃতার্থ করে যাবেন কি ? আরও জানায় যে, এর চেয়ে ভাল জিনিষ ওর আর নেই। তারী দুঃখিত ও সেজন্য। ওর অতিথিরা ওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই কখন ভোর না হতেই তাঁদের চলা সুরু হয়েছে। এখন একটু বিশ্রামের ঠাঁই আর ক্ষুধার আহার স্বর্গসুখ বলে মনে হবে।

কুঁড়ের ভেতর এসে বসেন ওঁরা। কথাবার্তা কইতে কইতে কাঠকয়লাওয়ালা উনানে আরও কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিল। তার পর ভাবতে লাগল, মাংস আর শাক-সব্জী বাকী আছে। সে সবটুকু সুপে দিয়ে দিলেও তিনজনের কুলোবে কি করে ? যাই হোক্ সুপটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এবার। ওটাকে উনুন থেকে নামাতে যাবে, এমন সময় ও দেখলে আর একজন লোক আসছে ওর কুঁড়ের দিকে। একটা পশমী টুপি তার লাল চুলের ওপর দিয়ে কপাল অবধি নামানো। এ লোকটি আসছে একা। কাঠকয়লাওয়ালার ইচ্ছে হল ওকেও ডাকে এখানে খেয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু কী খাওয়াবে ? আছে আর কিছু ? ভ্রূ কুঁচকে একথা ভাবতে ভাবতে ও আগেকার লোক দুটির দিকে চাইল। প্রথম পথিকের চোখ পড়ল ওর ওপর। হেসে বললেন তিনি, 'ও একজন বন্ধু।'

এই কথা শুনে ওর মনে যে দ্বিধাটুকু ছিল, তাও চলে গেল। তক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে সেই পথিকটিকেও ডেকে আনল। তার পর একে একে দুয়ে দুয়ে এল আরো অনেকে। কাঠকয়লাওয়ালা সাদর অভ্যর্থনা করে সকলকে ঘরে নিয়ে এল। খাবার সময় তার মনে হল সবাইকার যাতে কুলোয় এইজন্য সে সুপটাতে অনেক জল মিশিয়েছে বটে, কিন্তু তার সোয়াদ ত' খারাপ লাগছে না। গন্ধও বেরোচ্ছে বেশ সুন্দর, সবাই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। কাঠকয়লাওয়ালার সেই সামান্য কালো রুটিই সবাই আনন্দ করে খেলে।

শীতকালের দিন ছোট। সূর্য শীগ্রই নেমে পড়ে পাহাড়ের পেছনদিকে। পূবের বন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। আকাশের গায়ে দুটি একটি তারা ফুটে ওঠে। কাঠকয়লাওয়ালা দেখে ওর ঘরে সব শুদ্ধ তের জন লোক হয়েছে। ওর মতন সজী সৌভাগ্য আজকের দিনে আর কারও হয়নি। ওর কুঁড়েঘরের আশ্রয় যতই সামান্য হোক্ শীতে যে কেউ কষ্ট পাচ্ছে এমন মনে হচ্ছে না। সকলেই পরিতৃপ্ত, আনন্দিত। ওর সব কিছুই ও বন্ধুদের দিয়েছে। এখন ও সুখী, প্রায় রাজার মতই।

গল্প করতে করতে কাঠকয়লাওয়ালা যতবারই চেয়েছে সেই প্রথম পথিকটির দিকে, ততবারই ও আশ্চর্য্য হয়েছে। যখনই তাঁর সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয় তখনই ওর মনে হয় যেন ওর মনের গোপনতম কথাটাও তাঁর অজানা নেই। চোখাচোখি হতেই উনি হেসেছেন মৃদু মৃদু। সে-ও জবাব দিয়েছে হাসি দিয়ে।

রাতের আঁধার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসে। চন্দ্রহীন আকাশ কালপুরুষমণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম তারাটিকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তার নীচে জ্বলজ্বলে লুব্ধক নক্ষত্রটিকে, উজ্জ্বল এক টুকরো হীরে যেন ? এক সময় অতিথিদের মধ্যে একজন—যাকে আর সকলে পিটার বলে ডাকছিল—সে কাঠকয়লাওয়ালাকে ইঙ্গিত করল বাইরে আসতে। পিটারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে ও বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। চুপিচুপি পিটার বলে, 'দেখ, তোমার ঘরে একজন আছেন যিনি তোমার অতিথি-সেবায় খুসি হয়েছেন! তোমাকে কিছু দিতে চান উনি। কি ইচ্ছে তোমার জানাও দেখি। সে ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

অবাক হয়ে ও চেয়ে থাকে পিটারের মুখের দিকে। তারপর বলে 'কিন্তু তিনি যে গরীবের দেওয়া খাবার মুখে তুলেছেন এতেই যে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আর কিছুই আমার চাইনা।'

কিন্তু তবু পিটার পীড়াপীড়ি করে ওর প্রার্থিত বস্তুটির নাম জানবার জন্য। বলে 'দেখ বাপু, আমার প্রভুর আদেশ পালন করছি আমি। আচ্ছা, ভদ্রতার খাতিরেই না হয় একটা কিছুর নাম কর। রাত বাড়ছে, আমাদের আবার যেতে হবে ত'।'

ভ্রূ কুঁচকে মাথা চুলকে ভাবতে লাগল ও। পশ্চিমের বরফ ঢাকা বন আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ, কিন্তু ওর পুরোনো মলিন হয়ে আসা তাস জোড়াটা ছাড়া কিছুই মনে করতে পারল না। কোথা থেকে যে ওর মনের মধ্যে এসে হাজির হল ওটা, যাবার আর নামটি নেই। এই তাস জোড়াটা নিয়ে ও ছোট-

বেলা থেকেই খেলে আসছে। কত একঘেয়ে দীর্ঘ দিন ও একলাই একহাত 'ডামি' রেখে খেলে কাটিয়েছে। যখনই কোন অতিথি এসেছে ওর ঘরে, তার সঙ্গে সমানে খেলে গেছে ও সেই রাত্তিরে শোবার সময় না হওয়া অবধি। তাস জোড়াটা হচ্ছে পৃথিবীতে ওর একমাত্র প্রিয় জিনিষ।

কাঠকয়লাওয়ালা ভাবতেই থাকে। কিন্তু অন্য কিছুই মনে করতে পারে না। হঠাৎ ও এক সময় মুখ তুলে বলে ফেলে, 'আমার একটা মাত্র ইচ্ছে আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, যখনই আমি তাস খেল্‌ব তখনই যেন আমি জিতি।'

পিটার বেশ হতভম্ব হয়ে যায়। এমন ইচ্ছে যে কেউ প্রকাশ করতে পারে এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। হাঁ করে সে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। যাই হোক, তার প্রভু ত' তাকে বলে দিয়েছেন যে কাঠকয়লাওয়ালা যা ইচ্ছে করবে সে যেন তাই দিয়ে দেয়। এখন সে কি করবে? তাই হবে বলে জানিয়ে দেবে না কি? অস্বস্তিতে খানিকক্ষণ মাথা চুলকে শেষে পিটার কুঁড়ের দরজার দিকে ফিরে চায়। ওর প্রভু আর সবাইকে ছেড়ে দরজার কাছে একটু সরে চুপ্‌চাপ্‌ বসেছিলেন। অন্যরা গল্প করছিল। পিটার এদিকে চোখ ফেরাতেই উনিও চাইলেন তার দিকে। তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে সম্মতির ভাবে মাথা নাড়লেন। পিটার এবার বলল কাঠকয়লা-ওয়ালাকে 'তোমার ইচ্ছে পূরণ করা হবে যখন একবার বলা হয়েছে তখন তোমার এই ইচ্ছেটাই পূরণ করা হল। আমার প্রভু এই কথা বললেন।'

শুনেই কাঠকয়লাওয়ালা একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মাথা ফিরিয়ে নিয়ে ও পোড়া কাঠের স্তূপটা দেখতে ব্যস্ত হয়। এদিকে ওর অতিথিরা যাবার জন্য প্রস্তুত হন। ও যেখানে হেঁট হয়ে কাঠকয়লাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে সেখানে এসে ওর অতিথিবৎসলতার জন্য ধন্যবাদ দেন। তারপর বিদায় জানিয়ে একে একে চলে যান। যিনি এসেছিলেন সব আগে, যাঁকে ওর চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, তিনি যান সকলের শেষে। ঘর থেকে ওর তাস-জোড়াটা হাতে করে এনে ওর হাতে দেন উনি। দিয়ে হাসেন একটু। সে ওঁর মুখের দিকে চাইতেই দেখে ওঁর মাথা আর কাঁধের মধ্যে একটা বড় তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আর মাথার ওপরেই দেখা যাচ্ছে কালপুরুষের কোমরবন্ধের তিনটে তারা। অপরিচিত ব্যক্তি আবার একটু হাসেন। তারপরেই ও দেখে একা পড়ে আছে। উনি নেই, মিলিয়ে গেছেন।

ওর শিশু বয়স পেরিয়েছে অনেক দিন। কিন্তু আজ নিজেকে যেমন নিঃসঙ্গ একাকী বোধ হল, এমনটি আর কোনদিন হয়নি। পথিকদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে কত যে আনন্দ! ওরা সবাই এখন চলে গেছে। এখন কান পাত্‌লেও ওদের গলার আওয়াজটুকু শোনা যাবে না। ঘরের অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের আভা বাইরের বরফের উপর পড়ে রাঙিয়ে দিয়েছে সেখানটা। ও পড়ে আছে একা, একেবারে একা।

ঘরের ভেতর গিয়ে বসে ও। তারপর কম্পিত হৃদয়ে দুজনের মত তাস ভাগ করে। আকাশের দিকে মুখ তুলে এবার ও বলে, 'এই বাজী যেন আমি জিতি।' একহাত ডামি রেখে ও খেলে যায়, আর ডামিকে হারিয়ে দেয়। আবার তাস ভাগ করে বলে 'এই দান ডামি জিতুক আমায় হয়ে।' তাই হয়। সেবার ডামিই জেতে। এরকম চলতেই থাকে। পিটার যা বলে গিছ্‌ল, যখনই সে এই মলিন বিবর্ণ তাস জোড়াটা নিয়ে খেল্‌বে তখনই সে জিতবে। মাঝে মাঝে ও কাছের কোন গ্রামে গিয়ে ওর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে খেলত, আর জিত্‌ত। তাস খেলায় ও প্রচুর আনন্দ পেত, তাই বার বার খেলেও একঘেয়ে লাগ্‌ত না। ওর এই প্রতিবার জেতাকে কিন্তু ভাগ্য বলেই মনে করত লোকে।

কিছুদিন পরে ও করত কি, খেলার আগেই বলে রাখত যে ও জিত্‌বে। বলাই বাহুল্য যে এ কথা বিশ্বাস করবে এমন লোক পাওয়া যেত না বেশী। ও ত' জান্‌ত জিত্‌বেই তাই কখনও মোটা টাকা বাজী ধরতে চাইত না। ছেলে-বৌ কেউ নেই ওর সংসারে, সুতরাং টাকা বা অন্যান্য জিনিষ বেশী দরকার ছিল না। তাছাড়া ওকে যিনি এই বরটা দিয়েছিলেন, তাঁর চোখে যে দৃষ্টি ও দেখেছিল, তাই মনে করেও সে বেশী বাজী রাখত না।

আবার যখন ওর নাম শুনে কোন বড়লোক ওর সঙ্গে

খেলতে বসতেন তখন ও খুব বেশী বাজী রাখত। জিততও প্রতি বার। সেই তিনি যখন দয়া করে ওকে এই বরটা দিয়ে গেছেন তখন মাঝে মাঝে কিছু মোটা টাকা জেতা কি অন্যায়? কিন্তু ওর চেয়ে গরীব কোন লোকের সঙ্গে খেলতে বসলে ও তাস-জোড়াকে বলে দিত—'দেখ বাপু, এই যে লোকটি খেলতে এসেছে, এ শুধু এইবারের মত আমি হ'ল। বুঝলে। সেই দান ওর হারবার পালা। তবে হারাটা এমন কিছু বেশী হত না।

এইরকম করে দিন যায়। এমন সময় একদিন কাঠ-কয়লাওয়ালা বুঝতে পারল যে ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। এক রাতে একলা তাস খেলতে খেলতে ও অনেকদিন আগের সেই ক্রিস্‌মাসের দিনটি স্মরণ করল। অনেকদিন সে আশা করেছে যে এবারের ক্রিস্‌মাসে বুঝি ওঁরা আসবেন। তাই প্রতিবার ক্রিস্‌মাসের সময় ঘরে ও কিছু খাবারের আয়োজন করে রাখে, যাতে সেবারের মত অসুবিধায় পড়তে না হয়। কিন্তু তাঁরা আর এপথে আসেন না। বলতে গেলে কি ওঁরা এক পথে দু'বার হাঁটেন না। যে একবার দেখা পেয়েছে তাঁদের—সেই তাঁদের সঙ্গ নিয়েছে। আর ছাড়েনি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

একটি ছায়ার্দ্র প্রার্থনা

সুনীল বসু

আমার মৃত্যু হয় যেন কোনো শিশির সিক্ত রাতে
নম্র নদীর বালুচরে যেথা পরীরা আঁচল পাতে।
আমার দেহের শেষ উত্তাপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাক ঘাস :
জীবনের যতো ব্যথাকে জুড়াক হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষুধিত শৃগাল মধ্যরাত্রে ক্ষুধায় যদি সে জ্বলে
মোর মৃতদেহে আহার তাহার কিছুদিন যেন চলে।
আমার দেহের ভাঙা ছাদে যেন জন্মায় উই ঢিপি
আমার দুঃখে কাঁদে যেন মেঘ বৃষ্টিতে টিপি টিপি।
আমার মৃত্যু হয় যেন প্রিয়, ঘুমের মতন চুপে
চেতনার চরে নামে যেন ছেদ, নেশার মহুয়া-ধূপে॥

মেয়েদের কথা

গীতি কাব্যে নারী

শ্রীমতী কণা দেবী ভারতী

"কানু ছাড়া গীত নাই"—এ কোন্ বিস্মৃত যুগের ভাবুক মনের অভিব্যক্তি, জানি না। 'গীত-কাব্যে নারী'র কথা আলোচনায় গীতি-কাব্যের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধের প্রাণ-স্বরূপা শ্রীমতী রাধার নাম বাদ দিলে ঐ কাব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যুগে-যুগে কত ভাবুক, কত সাধক-কবি ঐ নামকে আশ্রয় ক'রে সাধনায় লাভ করেছেন অমরত্ব। এই মহাভাব বা প্রেম-বিরহ শ্রীমতী রাধাকে কেন্দ্র ক'রে। গীতি-কাব্যের মূল সুরটি মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে হলে 'রাধা ছাড়া ভাব নেই'। প্রেম এবং বিরহ এই দুটি চিত্তবৃত্তি সংসারী মানব-জীবনে আনে নিত্য-নব বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য-কেন্দ্রিক ভাব-প্রবাহকে সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মানস-ক্ষেত্রে বহিয়ে দেওয়া সহজ নয়; কিন্তু বহিয়ে দিতে পারলে রচয়িতা অন্তরে পান অপার আনন্দ, যা তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে অন্তরে অন্তরে ছড়িয়ে দিতে থাকে প্রেম-বিরহের মোহময়, হাসি-অশ্রু ভরা স্বকীয়তায়। এই সাধনা সার্থক হয়েছে বাঙালীর নিজের গীতি-কবিতায়।

ষোড়শ-শতাব্দী হ'তে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলার লোক-সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখা যায় পূর্ববঙ্গের পল্লী-গীতি-কাব্য বা 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্য দিয়ে। এই সব কাহিনী সাধারণতঃ প্রেমধর্মী এবং সেগুলি অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর পল্লী-কবিদের রচনা; তবু এই কাহিনী-গুলি খুবই সহজ-সুন্দর।—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' এ যেন এক-এক অভিনব সুর সৃষ্টি! গান শেষ হয়ে গেলেও তার সুরের রেশ যেমন মনো-বীণার গোপন তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়; তেমনি বাঙালীর মনের মণি-কোঠায় এই গীতি-কাব্যগুলির ছন্দ-ঝংকার বিশেষ ভাবে দোলা খায়, কৃত্রিমতা এবং সামাজিক ও নাগরিক সভ্যতার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে। রক্ত-মাংসের দেহ-বিশিষ্ট মানুষ-মানুষীর ভালবাসার কথা এ। এই ভালবাসার জয়-গান রচনা করেছেন—বাংলার নিজস্ব জল—হাওয়া—আলোয় পুষ্ট, পল্লী-জীবন-দরদী মানুষই। সমালোচকদের সতর্ক মন বলে—"এই সব গীতিকার ভাবে যথেষ্ট কবিত্ব আছে। তাদের ভাষায়, কল্পনায় বা রচনা-রীতিতে সাহিত্যিক-লক্ষণ নাই; তবু তাদের কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না" (মোহিতলাল)। তবে এ কথাই আমরা মনে রাখবো যে—"এই গীতগুলি বাঙালী-জাতির চির-গৌরব। ইহাতে বাঙলা দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুতে নাই" (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য)।

বাংলার অপরাজেয় গীতি-কাব্যের অজস্র পল্লী-গাথার মধ্যে কবি চন্দ্রাবতী ও মহুয়ার কাহিনীর সহিত অধিকাংশ বাঙালী পরিচিত। মলুয়া, ধোপার পাট; (কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা) দিওয়ান মদিনা, লীলা-কঙ্ক প্রভৃতির সকল কাহিনীর মূল সুরই ঐ প্রেম-বিরহকে কেন্দ্র করে।

সংসারী মানব-জীবনের প্রেম হ'ল সহজাত সম্পদ—যাকে অবলম্বন করে দুঃসহ-জীবনযাত্রা সহনীয় হয়, কঠোর কাল হ'য়ে ওঠে মধুর। সাধনায় এই প্রেম জাগাতে হয় না, বলপ্রয়োগেও এই প্রেম ঘটানো অসম্ভব। এ যে মানব-জীবনের সঞ্জীবনী-সুধা। তবে, অন্ধকার না থাকলে আলো যেমন মনোরম হয় না, বাঞ্ছিত হয় না, তেমনি প্রেমকে মধুরতর করতে করতে তাকে মহনীয় বিরহের অভ্যুদয় হয় মাঝে-মাঝে। কিন্তু এই বিরহ যেমন পরম মিত্র, তেমনি চরম শত্রুও। বিরহের অমানিশা কখনো আর শেষ হতেই চায় না এবং মানব-জীবনের সকল লালিত্য, সকল প্রাণশক্তি ধ্বংসকারী সেই কাল-বিরহ প্রায়ই এসে থাকে সংসারের অকল্যাণ-কামী মানুষের চেষ্টায়। যে প্রেম মরুতে উদ্যান রচনা করে, যে প্রেম পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, সেই প্রেমই

অকালে, করুণ পথের যাত্রী হ'য়ে নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। গীতি-কাব্যে এমনি ব্যর্থতার মর্মান্তিক সুরই ধ্বনিত হয়েছে; প্রেম-কলিকা বিকশিত হবার আগেই ঝ'রে পড়েছে ধুলায়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই দীর্ঘশ্বাস আজও যেন শোনা যায়। অদুরদর্শী প্রেমহীন মানুষের পাষাণ প্রাণের সৃষ্টি—সমাজের অনুশাসন সুন্দরের সমাধি রচনা করেছে, আজও করছে! সংসার শিউরে ওঠে, মানবতা আর্ত; তবু অঘটন ঘটে যায়। দুর্ভাগ্য!—

গীতি-কাব্যগুলির কয়েকটি নারী-চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবার।—প্রথমে প্রাচীন বাংলার মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। ইনিই একমাত্র মহিলা কবি, যিনি সুললিত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর দুঃখময় জীবনের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। এই বিদুষী ব্রাহ্মণ-কুমারী তাঁর সুনির্মল প্রেমের প্রতিদানে পেয়েছিলেন বাঞ্ছিতের কাছ থেকে দারুণ উপেক্ষা। সেই বিচ্ছেদ ব্যথাই তাঁর কবিত্ব শক্তিকে কৈশোর থেকে তারুণ্যে এনে ফেললো। তখনি, ব্যথিতা মেয়ের মুখ স্নেহময় পিতার বুকে দিল নিদারুণ আঘাত। জীবন-ধ্বংসী দুঃখ ভুলিয়ে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দ্বিজ বংশীদাস চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ রচনা করতে বললেন, চন্দ্রাবতীরও পিতৃভক্তি ছিল প্রবল। তিনি পিতার আদেশ স্বীকার করে নেন। নিচের এই দু'টি ছত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে—

"বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়,
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।"

কিন্তু চন্দ্রাবতী তাঁর এই রচনা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। কালের চরম নির্দেশে কবির লেখনী চিরতরে শুব্ধ হ'য়ে গেল। রামায়ণ ছাড়াও চন্দ্রার কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত বিকাশের পরিচয় মেলে—মনসা মঙ্গল, মলুয়া ও কেনারামের পালায়। কেনারামের পালার সুর স্বতন্ত্র। ভক্তিকে আশ্রয় করে। দুর্দান্ত দস্যু কি ক'রে সাধুতে রূপান্তরিত হয়েছিল, কবি অপূর্ব দক্ষতার সহিত সেই চিত্রই এঁকেছেন। মলুয়া-কাব্যে আছে পল্লীবধূর সরল প্রেম ও সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা; সীতার মতই মলুয়াকে নিতে হয় পৃথিবী থেকে বিদায়। করুণ-রসের প্রস্রবণ এই গাথাটি পল্লী-গীতিকার একটি মূল্যবান সম্পদ। নয়নানন্দ নামে এক কবি চন্দ্রাবতী-পালার রচয়িতা। মনসা ভক্ত দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা এই মহিলা কবি। বংশীদাস সমাজের কঠিন বাঁধনে বদ্ধ—বড়ই দরিদ্র। বংশ-পরিচয় দেবার সময় কবির অন্তরের গভীর দুঃখ ব্যক্ত হয়েছে।

"বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী—
তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী।

সর্বগুণান্বিতা চন্দ্রা জীবনে সুখী হতে পারেন নি; তার প্রধান কারণই ভালবাসা, আর সংকীর্ণচেতা সমাজ। জয়চন্দ্রের সঙ্গে শৈশবে পরিচয় ঘটে চন্দ্রার। জয়চন্দ্রও কবি। কবিত্বই হয়তো সেই মিলনের সূত্র রচনা করে; দৃঢ় করে সূত্রটি। পাঠশালায় উভয়ে এক সঙ্গে পড়তেন। দু'জনের মধ্যে কবিতা-রচনার প্রতিযোগিতা হতো। বাল্য-প্রেম বয়সের নির্দেশে অনুরাগে পরিণত হল। এই পবিত্র সংযোগের কথা গোপন থাকার নয়। বংশীদাসও জয়চন্দ্রকে ভাবী-জামাতা বলেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু জয়চন্দ্র এক মুসলমান-রমণীর প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ ক'রে বসেন। এই মোহ স্থায়ী হয়নি। অনুতপ্ত জয়চন্দ্র চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এলেন শিব-মন্দিরে। এই মন্দিরেই চন্দ্রা অধিকাংশ সময় কাটাতেন। কিন্তু দেখা মিলল না। কবির আচরণ এখানে সাধারণ নারীর মতই কুণ্ঠা জড়িত।—সমাজের নিন্দা ও ভয়কে অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি চন্দ্রার ছিলা না। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো এ থেকে। চন্দ্রার দেখা না পেয়ে মর্মাহত, কক্ষচ্যুত জয়চন্দ্র তাঁর আর্ত প্রেমের অনাহত স্বাক্ষর রেখে গেলেন মন্দিরের গায়ে—ফুলের রস দিয়ে চন্দ্রার উদ্দেশ্যে বিদায়-কবিতা লিখে। তারপর ফুলেশ্বরী নদীতে আত্ম-বিসর্জন করলেন জয়চন্দ্র। চন্দ্রার ধৈর্যের বাঁধ তখনও ভাঙল না। প্রাণপণে চিত্ত-সমাহিত ক'রে ইস্ট আরাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করে চললেন। কিন্তু সার্থক হ'ল না সেই চেষ্টা। চন্দ্রা প্রেমেরপথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন; আবার প্রেমাস্পদের উপেক্ষা তাঁর প্রাণশক্তিকেও ভেঙে চুরে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাঁকে দিল চির-সান্ত্বনা।

পল্লী-গীতিকার ভাবে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট; তবু তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পল্লী নর-নারীর

প্রেম মর্তের সীমা ছাড়িয়ে স্বর্গ-লোকের বস্তু হতে চায়নি। প্রিয়কে দেবতা করবার প্রয়াস এতে নেই। গীতি-কাব্যের নারী বা নায়িকারা চেয়েছেন তাঁদের প্রিয় কেবল 'প্রিয়' হয়েই থাক—প্রিয়র ভালবাসার গৌরবে ধন্য হোক নারী-জীবন। বেদের পালিতা মহুয়াকে নিয়ে লেখা কাব্যের নারী-চরিত্রটি কোমল-কঠোরে মিশ্রিত এক অপূর্ব সৃষ্টি! সরলা "বনবিহঙ্গিনী" নদেরচাঁদের প্রেমকে প্রথম ভুল বুঝেছিলেন; সমাজ-জীবনের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত নদেরচাঁদকে তিনি ভাব-বিলাসী ব'লে ভাবেন প্রথম। কিন্তু পরে যখন সত্যকে বুঝতে পারলেন, তখন নদেরচাঁদ হলেন তাঁর জীবন-সর্বস্ব। তাঁকে শত-সহস্র-রূপে ভালবেসেও তৃপ্তি পায়নি মন। মনে বড় আক্ষেপ জেগে ওঠে—

"ফুল যদি হৈতারে বন্ধু—ফুল হৈতা তুমি,
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম—ঝাইরা বানতাম বেণী!"

শেষ পর্যন্ত এঁদের মিলনেও বাদ সাধলে অকল্যাণব্রতী অনুশাসন। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে প'ড়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুপথের যাত্রী হ'ল দু'টি নিষ্পাপ জীবন। 'মহুয়া' পালায় অন্য একটি সুন্দর নারীচরিত্র—মহুয়ার দরদী-সখী পালঙ্ক। মহুয়ার শেষ স্মৃতিটুকুকে আপন বুকের ব্যথায় রাঙিয়ে নিয়ে স্বর্গতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি পালঙ্ককে সাহিত্য-জগতে অনন্যা করে রেখেছে।

'দিওয়ান মদিনা' কাব্যের মদিনা মুসলমান-নারী। স্বামী-ভক্তি, দুঃখকে হাসিমুখে সহ্য ক'রে নেবার মত মানসিক ধৈর্য প্রভৃতি গুণের জন্য কৃষক-বধূ মদিনার চরিত্রটি আমাদের সীতা-সাবিত্রীর মতই পবিত্র আদর্শ-মণ্ডিত। এই কাব্যের নায়ক—দুলাল, চন্দ্রাবতীর কাব্যের নায়ক জয়চন্দ্রের মতই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁর উপেক্ষিতা প্রিয়ার কাছে। কিন্তু হায়! তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে!

"দুলাল জিজ্ঞাসে সুরজ (পুত্র) মদিনা কোথায়?
চোখে হাত দিয়া সুরজ কবর দেখায়!"

বড়ই মর্মান্তিক এই দৃশ্য! চোখের জলে দুলাল তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেলেন পরবর্তী দিনগুলি জীবনের!

'ধোপার পাটের' ভাবে-ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ-লালিত্য দেখা যায়। মনে হয় এই কাহিনী চণ্ডীদাসের সময়ে, না হয় পরে রচিত। নায়িকা-চরিত্র—কাঞ্চনমালা ধোপার মেয়ে। বালিকা বয়সেই রাজকুমারের প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে পড়েন। সমাজ ও সংসারের রক্তচক্ষু তাঁর পবিত্র প্রেমের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-বন্ধন কাটিয়ে উঠতে কাঞ্চন মর্ম-বেদনায় আপন অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছেন। জগতে তাঁর একমাত্র আশ্রয় রাজপুত্রের প্রেম; তাঁর পরম আনন্দ রাজপুত্রকে ভালবাসায়। কিন্তু তাঁর সেই ভাল-বাসার বস্তুকেই যখন অপরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন সেই বিচ্ছেদ-ব্যথার ভারে ভেঙে পড়লেন অভাগিনী কাঞ্চনমালা। তবু প্রিয়তমের অকল্যাণ কামনা করতে পারেন নি। কাঞ্চন যে তাঁকে ভালবাসতেন। রাজপুত্রকে রাজকন্যার সহিত মিলিত হ'তে দেখে কাঞ্চন প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রিয়তম সুখী হোক।—আর তাঁর চাহিবার কী আছে?

"মনের দুঃখ মিটিয়াছে, মিটিয়াছে আশা,
দেখিলাম বন্ধুর মুখ মনে ছিল আশা।
সুখেতে থাক বন্ধু সুন্দর নারী লৈয়া,
সুখে কর গির-বাস জনম ভরিয়া।
না লইয়ো না লইয়ো বন্ধু, কাঞ্চনমালার নাম,
তোমার চরণে আমার শতেক পরনাম!"

অতীতকে মনে করলে গার্হস্থ্য-জীবনে, দাম্পত্য-জীবনে ব্যথার আঁচড় লাগবে; তাই জীবন-দেবতাকে তাঁর নাম নিতেও নিষেধ করলেন এবং তাঁর চরণে শতেক প্রণাম জানিয়ে কাঞ্চন জীবনের অসহ্য জ্বালা জুড়ুলেন তটিনীর শীতল বুকে আশ্রয় নিয়ে।

"গীতি-কাব্যের রাজ্যে" 'স্বর্গের নন্দন'-স্বরূপ—লীলা-কঙ্ক নামক গীতি-কাব্যখানির নায়ক কঙ্ক কবি, ভেদাভেদ-জ্ঞানহীন উদারচেতা নিষ্কলঙ্ক পুরুষ। চণ্ডাল-গৃহে পালিত ব্রাহ্মণ-সন্তান কঙ্ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি—শ্রীগর্গের কন্যা লীলার সঙ্গে তাঁর প্রেম সত্য-শিব-সুন্দর। কত কবি সেই প্রেমের বিচিত্র কথা লিখে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। "বংশীরব-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় লীলা, সে সরলতার খনি—প্রেম-সরসীর একটি নিষ্কলঙ্ক পদ্ম। ভ্রাতৃ প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য লীলা-চরিত্রে এক হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের ভাবকে স্নেহ প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহা একান্ত পক্ষে নিষ্কলুষ—ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কিন্তু অনুদার, অহংকারী হিন্দু সমাজ এ-দৃশ্য কী ক'রে সহ্য করবে ? আকাশের মত উদার চরিত্রের কঙ্ককেও তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরুদেব গর্গকে দিয়ে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হ'ল। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে মৈমনসিংহবাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণরা কঙ্কের লেখা সরল, মধুর ও নির্দোষ কাব্য বিদ্যাসুন্দরকে অবলম্বন করে তাঁর ওপর চালালেন অমানুষিক অত্যাচার। প্রপীড়িত কঙ্ক শেষ-পর্যন্ত তাঁর প্রাণ-স্বরূপা লীলাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন—প্রাণ রইলো ছায়া গেল। লীলাও সেই সঙ্গে হারিয়ে ফেললেন জীবনের প্রতি সংসারের প্রতি সকল মায়া-মমতা। নিশ্চিহ্ন হবার পথে দ্রুত ছুটে চললেন সর্বস্ব-হারা লীলা। আদরিণী কন্যাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখে বৃদ্ধ গর্গের ভুল ভাঙালো। তিনি তখন কঙ্ককে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু উদাসী পথিককে পাওয়া গেল না। লীলা শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁর কঙ্ককে দেখতে পেলেন না। ঘুমুলেন ; আর তখনই 'ব্যথার ঝড়ে ওড়া' পাখী এসে হঠাৎ দাঁড়ালো তাঁর পাশে। প্রাণ-প্রিয়া সাথীর স্মৃতিকে নীরবে অশ্রুর অর্ঘ দিয়ে পাখা আবার গেল উড়ে।

উপসংহারে আমি বলবো যে, অপরাজেয় ভক্ত-প্রেমিক নিত্যকালের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-কবি শ্রীচণ্ডীদাসের 'রজকিনী রামী'কে নিয়ে লেখা চণ্ডীদাসেরই গীতিকা সংখ্যায় সামান্য হলেও তাদের সংগ্রহকে একখানি প্রথম শ্রেণীর গীতি-কাব্য অনায়াসে বলা চলে। শ্রীমতী রামীকে আমরা যদি "গীতি-নারী" না বলতে পাই তা হ'লে আমাদের ক্ষোভের তথা লজ্জার সীমা থাকবে না। রামী-চণ্ডীদাসের প্রেম "কাম গন্ধ নাহি তায়।" দেহকে দূরে দূরে রেখে ভালবাসার শুভ্র-শুচি পথে মন-প্রাণ-দৃষ্টিকে পাঠিয়ে তাঁরা নির্দোষ প্রেমোৎসবের এক মহান্ আদর্শ প্রচার করলেন। ঐ দৈহিক-পার্থক্যের মূলে সে-ই সমাজের, সংসারের অন্ধ অনুশাসন কম-প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে, চণ্ডীদাস এবং রামী উভয়েই ছিলেন উচ্চ আদর্শের কবি ; সমাজকে উপেক্ষা ক'রে অপূর্ব প্রেমের খেলা খেলে তাঁরাও চললেন। শ্রীমতী রামীর বিরহ এলো ভিন্ন পথে। বিরহ সে বিরহই ; একই আঘাত সে হানে বিরহিণীর বুকে। শ্রীমতী 'প্রাণের দোসর' দয়িতের বিরহে কী ব্যথা পেয়েছিলেন, তা তাঁরই কবিতায় ফুটে উঠেছে—

"শুন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করিলেই।" আর জীবনের শেষ মুহূর্তেও চণ্ডীদাস তাঁর রামীকে ভোলেন নি। হাতীর পিঠে তাঁকে বেঁধে দুঃশীল নবাবের সৈন্যরা চলেছে। চণ্ডীদাস তখন মুখ ঘুরিয়ে দেখছেন রামীকে—অশ্রু-সজল চক্ষু ; দৃষ্টি বলছে—"চির বিদায়, বন্ধু !"

বাংলার গীতি-কাব্যের আরো কত নারী আছেন, কিন্তু সবার কথা বলার শক্তি কই ? স্থানেরও যে অভাব।

—

পুরাতন সমাজ, বনাম—নূতন হিন্দু সংহিতা

শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো যে, তারও মধ্যে ভালো এবং মন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে। মানুষের সৃষ্ট মত ও পথ যে অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি শূন্য হবে, এ কথা কল্পনা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। যে নদী মানুষের জীবন রক্ষা করতে একদিকে দেশকে শস্য শ্যামলিম রূপ দিচ্ছে, সেই নদীই আবার দুকুল প্লাবী বন্যার রূপ ধরে, করছে প্রাণ-সংহার। তবুও নদীকে আমরা বলবো প্রাণ দায়িনী, সে শুধু ধ্বংসই আনছে না, ধ্বংসের অন্তরালে আনছে—জীবনের নূতন ইংগিত। মানুষের জীবন-বেদ সম্বন্ধেও, এই কথা বলা চলে। আপাত দৃষ্টিতে যাকে শুধু, নিষ্ফল, বন্ধ্যা সংহারের রূপ বলে মনে হয়, তারও মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে প্রাণের নূতন স্পন্দন।

মানুষ, সমাজবদ্ধ জীব। তারই প্রয়োজনে একদিন সমাজ গড়ে উঠেছিল। সমাজ এবং মানুষ, উভয়েই, উভয়ের পরিপূরক। সমাজ ছাড়া, মানুষ থাকতে পারে না, আবার মানুষকে বাদ দিয়ে, সমাজের অস্তিত্ব, কল্পনাতীত। মানুষের দৃষ্টিভংগীর, যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে ; তার সঙ্গে সংগতি রেখেই, পরিবর্তন এসেছে,—তার সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মমতে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক মতবাদে। নূতন রূপ-বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ;—জীবনের পূজা বেদীতে।

স্রোতহীন, মৃত নদীতেই জমে আবর্জনার বোঝা ; বেগবতী নদী সজীব প্রাণ চাঞ্চল্যের ধারায়, তাকে—ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, আপনাকে নির্মল করে রাখে, জমতে দেয়না পাঁক আর কাদার বোঝা। প্রাণের লক্ষণই হলো গতি। গতি হীনতা মৃত্যুরই নামান্তর। মানুষের জীবন-পুঁথিতে, তার সৃষ্ট—সমাজে, ধর্মমতে, প্রথায়, সংস্কারে, আচারে, ব্যবহারে, সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই ; প্রাণের লক্ষণ

যেখানে আছে, সেখানে জমেনি পঙ্কিলতা ; চলার পথের দুপাশ থেকে, দুহাতে সে সঞ্চয় করেছে, ভালোমন্দ সব কিছু, আবার ভাসিয়েও দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর জড়তা এসে, যাকে গ্রাস করেছে, কিংবা গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে, নির্জীব করে দিয়েছে, তার প্রাণ সত্বার স্পন্দনটি, তার গতিবেগ, এত শক্তি কোথায় সে পাবে, যা তাকে, আপন আবর্তের সংকীর্ণ-ঘুর্ণীর রুদ্ধ স্রোত থেকে মুক্তি দিয়ে, প্রাণ-জাহ্নবীর ভাগীরথী প্রবাহ এনে দেবে।

নূতনকে, স্বীকৃতি দিতে গেলে চাই, মনের গ্রহণ ক্ষমতা, প্রসারতা, এবং সজীবতা। পুরাতন প্রথা, পুরাতন রীতি নীতির মধ্যে, যেমন, কিছু ভালো, কিছুবা মন্দও আছে, তেমনি নূতন প্রথা, বা সংস্কারও আসে ভালোমন্দর হাত ধরাধরি করে। প্রচলিত ধারাবাহিকতার মধ্যে নেই কোন অপরিচয়ের রহস্য, তার সুস্পষ্ট রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাই আমাদের মন, অজানিতেই ভয়ে সংশয়িত হয়ে ওঠেনা, কিন্তু, নূতন আসে, অপরিচিত-রহস্যের ঘোমটা টেনে। শংকা ও সংশয়ের দোলায়, দুলতে থাকে আমাদের মন। তার বরণ লগ্নে, আমরা শুধু দ্বিধাগ্রস্থই হই না, বিব্রত হয়ে পড়ি। তাই সহজে আমরা, নূতনকে স্বীকৃতি দিতে চাইনা। নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে, ভালোমন্দ বিচারের যে স্থৈর্য, তাও বুঝি আমাদের সাময়িক ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। তাই, যা কিছু নূতন, প্রথমেই তার বিরুদ্ধে মন আমাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে আপন সহনশীলতা এবং স্থির বিচার বুদ্ধিতে বিবেচনা করে, তাকেই আবার স্বীকৃতি দিই, গ্রহণ করি। নূতন, তখন আর, রহস্যের মায়াজালে আবৃত নয়, আমাদের পরিচিত হয়ে উঠেছে। আমাদের সত্বার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে।

ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে, আলোর হাত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় সত্য, কিন্তু, সূর্য্যের উদয় অস্তের প্রাকৃতিক নিয়মকে বাধা দেওয়া যায় না। শত বাধা বিপত্তি, বিরুদ্ধতা সত্বেও, তেমনিতর করেই, পুরাতনকে পরাজিত করে, তারই মৃত কংকালের উপর যুগে যুগে উড়েছে নূতনের বিজয় বৈজয়ন্তী। কি জগৎ, কি জীবন, কি সমাজ, কি ধর্ম, বা যা কিছুই হোক না কেন, নূতন যদি আপনাকে না প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো, তবে আজও মানুষ, জীবন সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, এবং জগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রভাতটিতেই আবদ্ধিত হোতো। আবর্তন ও বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের মধ্যে দিয়ে আসার ফলেই, জগতের এবং জীবনের বর্ত্তমান রূপটি এসেছে। পরিবর্তন সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির অমোঘ নীতি। ব্যতিক্রম এখানে সেই—ব্যবধান আছে—কালের, এবং গতি পার্থক্যে।

সমাজে বা জীবনে, পরিবর্তন আসে, অলস মন্থর গতিতে। নিত্য নূতন স্রোতে যদি মত ও পথ পরিবর্ত্তনের অবিরত আলোড়ন এখানে ঘটতো, তবে তা কোনদিনই দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পেত না। নদীতে চর পড়তে না পড়তেই যেমন ঘর বাঁধা যায় না, প্রতীক্ষা করতে হয় মাটির দৃঢ়তার জন্যে, তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে, মানুষও তেমনি, সমাজ-মাটির দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস করে, কিছু দিনে স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, তবেই ঘর বেঁধেছে। অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না সত্য, তবুও প্রতিমুহূর্ত্তে তার ভিৎ ধ্বসে যাবার প্রতীক্ষায় সে সদা শংকিত নয়। কালের যাত্রা পথে, পরিবর্ত্ত অনস্বীকার্য। এই অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য, পরিবর্তন সম্বন্ধে, সদা সচেতন থাকা সত্বেও, বর্ত্তমানে, হিন্দু-সংহিতা বিল, তথা হিন্দু বিবা ও হিন্দু-উত্তরাধিকার বিল, যেদিন আইনে পাস হোলো, তখন সকলে যে তাকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, একথা স্বীকার করা যায় না স্ত্রী এবং পুরুষের, যুগ্ম জীবনের মিলিত ধারাতেই সৃষ্টি বিধৃত। নর এবং নারী, সৃষ্টির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ। একক ভাবে উভয়েই অর্ধবৃত্ত এবং অসম্পূর্ণ। সমাজের কল্যাণ অর্থে, একপক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, অন্য পক্ষের ভালো বা মন্দ কিছুই করা সম্ভবপর নয়। সমাজে নর ও নারী উভয়েরই আছেন। তাই এখানে যা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটে, তার ফলে, উভয় পক্ষই সমান ভাবে প্রভাবিত হন। তাই সমাজের কল্যানে ; বা তার ধ্বংসের মূলে, উভয় পক্ষই যে সমান ভাবে দায়ী, এবং অংশীদার একথা মেনে নিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, অনেক সময়ই দেখা যায়, যে, মানদণ্ড দিয়ে নারী ও পুরুষের ন্যায়, নীতির বিচার হচ্ছে, সেই তুলাদণ্ডের একটা দিক, বারবারই প্রায় একদিকেই যাচ্ছে, বেশী ঝুলে। (ক্রমশঃ)

ছবি এম্‌ব্রইডারী

বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা নানা রকম সরঞ্জাম দিয়ে ছবি আঁকেন, বা তৈরী করেন। কেউ বা তুলি আর রঙ দিয়ে প্রকাশ করেন নিজের মনের সুন্দর ভাবটিকে, কেউ বা হয়ত রঙিন সুতোর সেলাই দিয়ে নিজের শিল্প-কলার পরিচয় দেন একটি মনোরম ছবিতে। সাধারণত সব দেশেই ভাল ছবির সমাদর যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আর

আসবেও। আপন গৃহ মানুষ নিজের রুচি অনুযায়ী সাজিয়ে তুলে তার সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দেয়। আর সেই গৃহ-সজ্জার একটি অঙ্গ হচ্ছে সুন্দর, মনোরম ছবি। সূচী-শিল্পের দ্বারা নিজের পছন্দ মত ছবি মেয়েরা রঙ-রঙে ভরিয়ে তুলতে কার না ইচ্ছে করে? একটি ছবির নক্সা এই সঙ্গে দেওয়া হল। এটি এম্‌ব্রইডারী করতে হলে সুচে একটি সুতো পরিয়ে হরিণগুলি ডাল সেলাই দিয়ে ভরাট করবেন। গাছের পাতা ও ডাল করবার সময় সুচে

নক্সা

বেরঙের সুতো দিয়ে ভরিয়ে তুলে গৃহের শোভা বৃদ্ধি করেন। সবার হয়ত নিজে আঁকবার নিপুণতা নাও থাকতে পারে, কিন্তু সুন্দর এক ঝুড়ি ফুল, নানা রকমের পাখী বা কোনো সুদৃশ্য নিজের পছন্দ মত ছবিকে রঙিন সুতোয় তিনটি সুতো পরিয়ে নেবেন। Clark's Anchor stranded cotton এই নামের সুতো সুবিধে হলে ব্যবহার করবেন। গাছের পাতাগুলি সবুজ রঙে ভরাট হবে। নিচের দিকের মধ্যে ইচ্ছে করলে ডাল সেলাই

ছবি তৈরীর পর

অথবা বড় বড় ে
দিয়ে ভরিয়ে ি
পারেন। ছবিটি :
বা ফিকে নীল র
কাপড়ের ওপর ক
ভাল দেখাবে।

—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়,
বি

শ্রী'শ'—
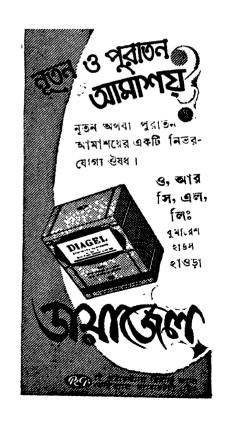
সিনেমা জগৎ এগিয়ে চলেছে দুর্ব্বার গতিতে। সারা পৃথিবী ব্যাপি তার বিজয় অভিযান। সে অভিযানের সামনে অন্য কোনও কিছু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, পারবেও না বোধ হয়—শুধু বর্ত্তমানেই নয়, অদূর ভবিষ্যতেও। এর কারণ হিসাবে দেখা যায় সিনেমা বা চলচ্চিত্রের মধ্যে যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, যে প্রবল গতি, যে পরিমাণ চমৎকারিত্ব আছে তা অন্য কোনও প্রমোদ শিল্পের মধ্যে নেই। তাই চলচ্চিত্র আজ অবিসম্বাদিত রূপে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ শিল্পরূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছেই শুধু নয়—পৃথিবী ব্যাপী মানব সমাজের মধ্যে তার স্থানও করে নিয়েছে বেশ কায়েমী ভাবেই। অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট সাফল্য লাভই সিনেমার জন-গণ-মন হারিণী শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অবশ্য এর পিছনে আছে আর একটি বিরাট শক্তি,—এই আধুনিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই চলচ্চিত্রকে প্রথম যুগের সেই মূক অভিনয় থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে

"তমসা" চিত্রে প্রদীপকুমার ও সবিতা চাটার্জ্জী। ছবিখানি রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে

নিয়ে এসেছে বর্তমানের ষ্টিরিওফনিক সাউণ্ড ও সিনেমা-স্কোপের সঙ্গে। আর এখানেই এর অগ্রগতি যে স্তব্ধ হবে না তাও সত্য। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে চলচ্চিত্রও এগিয়ে চলবে ধাপে ধাপে, সুদৃঢ় পদক্ষেপে, আরও আরও উন্নতির শিখরাভিমুখে।

চলচ্চিত্রের এই জয়যাত্রা সফল হোক, সম্ভব হোক, সত্য হোক!

* * * *

এল, বি, ফিল্মস্-এর নতুন ধরণের ছবি কারাগার জীবনের চিত্র "লৌহ কপাট"-এর নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এল, বি, ফিল্মস-এর পরবর্ত্তী ছবিটির মধ্যেও নূতনত্ব থাকবে যথেষ্ট। ছবিটি তোলা হবে সুন্দর বনের জঙ্গলের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র শিকারের কাহিনীকে অবলম্বন করে। ছবিটিতে পশুরাজ 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'কে তার গহন বনের নিভৃত রাজ্যে দেখতে পাওয়া যাবে।

ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসন্ ভারতীয় লোক-নৃত্যকে বিষয়বস্তু করে একটি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের ডকুমেণ্টারী চিত্রের কায প্রায় শেষ করে এনেছেন। ভারতের নানা স্থানের তিরিশটি লোক-নৃত্য এই চিত্রে দেখান হবে। এর মধ্যে পঁচিশটি নৃত্যের ছবি গৃহীত হয়েছে এবং বাকীগুলির চিত্র গ্রহণ শীঘ্রই সম্পন্ন হয়ে ছবিটি আগামী ১৫ই আগষ্ট, ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে, সারা পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করবে।

"হরিশ্চন্দ্র" চিত্রে তপতী ঘোষ ও অনুপকুমার

ভারতীয় লোক নৃত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, সর্ব্বজনীনতা ও সৌন্দর্য্যশালীনতা, শুধু ভারতীয় দর্শকদেরই যে মুগ্ধ করবে তা নয়, সারা পৃথিবীর নৃত্য-পিপাসু ও রসগ্রাহী মানুষের মন হরণ করতেও সমর্থ হবে নিশ্চয়। ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসনের এই প্রচেষ্টা প্রশংসাহ এবং আশা হয় ভবিষ্যতেও এইরূপ ডকুমেণ্টারী চিত্রের মাধ্যমে ভারত সরকার ভারতীয় জীবনের ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু আলেখ্য পৃথিবীর দর্শকদের সামনে তুলে ধরে ভারতীয় আদর্শের প্রচার করতে সক্ষম হবেন।

নারী ও পুরুষের প্রেম ও ভালবাসার বিচ্ছেদ ও হাহুতাশের একঘেয়ে গ্লানিপূর্ণ অতি সাধারণ বহু-কথিত, বহু-বর্ণিত গল্পের পথ থেকে সরে এসে ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মনে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে অন্যান্য চিত্র নির্ম্মাতাদের দৃষ্টিও এইদিকে আকৃষ্ট হবে বলে আশা হয়।

* * * *

ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপরাজিত" ছবিখানি নির্ব্বাচিত হয়েছে। পরিচালক শ্রীরায়ও খুব সম্ভব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। "পথের পাঁচালীর" মতন "অপরাজিত" ও বিদেশী দর্শকদের মন হরণ করতে পারবে বলেই আশা হয়।

* * * *

নতুন প্রভাত, মিস্ ইণ্ডিয়া, মোহিনী, প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রের প্রদর্শন আরম্ভ হয়ে গেছে। বিজন ভট্টাচার্য্য লিখিত এবং ছবি বিশ্বাস, শোভা সেন, অনুপকুমার প্রভৃতি অভিনীত 'রাস্তার ছেলে'র প্রদর্শন শীঘ্রই আরম্ভ হবে। উত্তমকুমার, মালা সিন্‌হা, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি অভিনীত 'পুত্রবধূ'ও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

* * * *

সন্ধ্যারাণী—বাদল পিকচার্সের আসন্ন মুক্তিপ্রতীক্ষিত "পরের ছেলে" চিত্রে

নববর্ষ—

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' এই ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসে পঞ্চচত্তারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। একদা পঁয়তাল্লিশ বর্ষ পূর্বে এমনি এক আষাঢ়ের শুভদিনে 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ ভারতবর্ষের নববর্ষে তাই আমরা শ্রদ্ধানতচিত্তে স্মরণ করি সেই মহাকবিকে—প্রণাম জানাই তাঁহার উদ্দেশ্যে। স্বর্গত রায় জলধর সেন বাহাদুরকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অসাধারণ নিষ্ঠার সহিত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনায় যে মহান আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। এই সুযোগে যে সকল বিদ্বজনের অবদানে ও সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' এই দীর্ঘকাল তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। স্মরণ করি ভারতবর্ষের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও তাহার সুধী পাঠক-গোষ্ঠীকে—যাঁহাদের সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' বিগত ৪৪ বর্ষকাল তাহার যাত্রাপথে সাফল্যের গৌরব অর্জন করিয়াছে, কামনা করি তাঁহাদের অটুট প্রীতি ও সহযোগিতা। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও যেন আমরা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হই, একান্ত মনে ঈশ্বরের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

নুতন শিক্ষা ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নূতন ধরণের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে চালু করিতেছেন, তাহাতে দেখা যায় ছাত্ররা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের জন্য অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন। বর্তমান বৎসর হইতে ১৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। আরও ৮৫টি বিদ্যালয়ে শুধু সাহিত্য বিষয়াদি শিখাইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষে ও ৩৫০টি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় খোলা হইবে। সম্প্রতি কলিকাতার সাংবাদিকগণকে তিন দিন ধরিয়া হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪পরগণার নূতন সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলি দেখানো হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত জনগণেরও নূতন বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। তবেই ছাত্রগণ ও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হইতে পারিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে শুধু কেরাণীতে পরিণত না হইয়া 'কাজের লোক' হয়, সে জন্যই এই সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে গত মাসে দুই দিবসব্যাপী একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে; পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—আয়োজিত এই সম্মেলন সদ্য পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ দুইটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিনিধিবৃন্দকে ও স্থানীয় জনসাধারণকে আপ্যায়িত করেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাকার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা সম্পর্কে রচিত একটি মূল-প্রবন্ধের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ছয়টি পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব গৃহীত হয়: (ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন (খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা (গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক (ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব (ঙ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা (চ) গ্রন্থাগার আইন। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য যথোপযুক্ত 'নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার' ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারের এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরি-

ালনার জন্য 'প্রয়োজনীয়', আইনানুগ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা গঠন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনের মতে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগিগণের প্রতিনিধি লইয়া এই পরিচালন সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পারস্পরিক সহযোগিতার আবশ্যকতা এবং শিক্ষা ও গবেষণার যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে গ্রন্থাকার আইন প্রণয়ন, কারখানা আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকগণের জন্য অবৈতনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের আবশ্যকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্মেলন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে পুরুলিয়ার বহু পুরাতন পুঁথি ও দলিলপত্র প্রদর্শিত হয়। এই সকল পুঁথি ও দলিলপত্র রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি সমর্থনে পেশ করা হইয়াছিল। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উপলক্ষে যে জনসভার আয়োজন করা হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘ—

গত ২৬শে মে রবিবার কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ভবনে ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের বার্ষিক সভায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত অধিক ভোট পাইয়া সভাপতি ও অধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সংঘের নূতন পরিচালক মণ্ডলীও নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে নূতন পরিচালকগণের কার্য্যকারিতা ও দক্ষতার উপর সংবাদপত্র সেবীদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিবে। আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করি ও কার্য্যে সাফল্য কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে গোরক্ষা—

দমদম ক্যান্টনমেণ্ট—কুমার পাড়ার (কলিকাতা—২৮) গো গোপালন শিল্প শিক্ষালয় হইতে ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে গোরক্ষা সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এ বিষয় জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়—এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের অভাব, দেশবাসীর শ্রম-বিমুখতা ও বিদেশী গুড়া দুধ ব্যবহারে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি। ভাল দুধ পাওয়া যায় না—কাজেই লোক সুলভে ও সহজে প্রাপ্য দুধ ব্যবহার করে। এমন কি, আজকাল সকল দোকানে গুড়া দুধ দিয়া দধি প্রস্তুত হয়। আইন করিয়া কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে অধিক পশু পালিত হয় ও অধিক পরিমাণ দুধ উৎপন্ন হয়, সন্তোষবাবু এই পুস্তিকায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। বইখানির দাম মাত্র ৫ আনা—সর্বত্র প্রচারিত হইলে বেকার তরুণের দল সমবায় প্রথায় গোপালন ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারে। ফলে শুধু তাহাদের বেকারত্ব ঘুচিবে না, দুধ উৎপাদন বাড়িলে দেশ সকল প্রকারে লাভবান হইবে।

তিনটি নূতন রাজ্যপাল—

২৩শে মে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে (১) উত্তর প্রদেশ রাজ্যে শ্রীকে-এম-মুন্সীর স্থানে শ্রী ভি-ভি গিরি (২) বিহার রাজ্যে শ্রীআর আর দিবাকরের স্থানে ডাঃ জাকীর হোসেন এবং (৩) মধ্য-প্রদেশে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার স্থানে শ্রী এচ-বি-পটাশঙ্কর নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীগিরি ও শ্রীপটাশঙ্কর জুন মাসে ও ডাঃ হোসেন জুলাই মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। নব নিযুক্ত ও জন রাজ্যপালই পুরাতন দেশসেবক।

শ্রীচারুচন্দ্র মাইতি—

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সহকর্মীদের অনুরোধেও প্রথমে তিনি উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই—পরে ডাক্তার রায়ের ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি ৩রা জুন হইতে কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন বয়োবৃদ্ধ ও খ্যাতিমান কংগ্রেস কর্মী।

মেডিকেল কলেজে দুগ্ধ চোর ধৃত—

গত ২৯শে মে বুধবার বিকালে পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্য মন্ত্রী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নিজে ছদ্মবেশে যাইয়া রোগীদের দুধ হইতে দুধ চুরির অপরাধে কে-এন মজুমদার নামক একজন ওয়ার্ড মাষ্টারকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনেপালচন্দ্র রায় এম-এল-এ ও ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীসুশীল বসু এ কার্য্যে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড মাষ্টারকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। ইহার পর মাছ চুরি, ঔষধ চুরি, প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। যে সকল দুর্বৃত্ত এইরূপ জঘন্য অন্যায় কাজ করে তাহাদের এমন শাস্তি বিধান প্রয়োজন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ ওকাজ করিতে সাহসী না হয়।

ভারতীয় সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণ

৫ জন ভারতীয় সাংবাদিকের একটি দল বিদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহারা কয় দিন লণ্ডনে থাকার পর গত ২২শে মে এক মাসের জন্য যুক্ত রাষ্ট্রে গমন করিয়াছেন। ঐ দলে আছেন—(১) মাদ্রাজের হিন্দু সম্পাদক কে-শ্রীনিবাসম্ (২) মাদ্রাজের স্বদেশ মিত্রম্,—সম্পাদক সি-আর শ্রীনিবাসম্ (৩) কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ (৪) কলিকাতার যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও (৫) দিল্লীর টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ডি-আর মানকেকর। সি-আর-শ্রীনিবাসম্ ঐ দলের নেতা এবং কে-শ্রীনিবাসম্ তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস—

২৭শে মে উড়িষ্যা বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হইয়াছে। স্বতন্ত্র শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্রকে ১৩ ভোটে পরাজিত করিয়া প্রবীণ কংগ্রেস-সেবক পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ১৩৯—তন্মধ্যে পণ্ডিত দাস ৭৩ ভোট পাইয়াছেন। পণ্ডিত দাসের বয়স ৭৩ বৎসর। তিনি বর্তমান বিধান সভায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সদস্য। পণ্ডিত দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাস করিয়া কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি গত ২ বৎসর উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ছিলেন! গত নির্বাচনে উড়িষ্যায় শুধু তিনিই বিনা বাধায় বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

বর্তমান বৎসরের শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—তাঁহার 'নয়ান বৌ' উপন্যাসই পুরস্কার লাভ করিয়াছে। তিনি ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প লিখিয়া প্রথম খ্যাতি লাভ করেন এবং রাণুর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা প্রভৃতি ছোট গল্পের সঙ্কলন বহু সংস্করণ লাভ করে। তাঁহার নীলাঙ্গুরীয় বিখ্যাত উপন্যাস। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বর্গাদপি গরীয়সী উপন্যাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। আমরা তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

হৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী—

২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য প্রাচীন কর্মী হৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী গত ৮ই জুন সকালে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় যোগদান করিতে যাইয়া অসুস্থ হন ও ফিরিয়া নিজ বাসগ্রাম ভাঙ্গড়ের নিকটস্থ মৌসালে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় হাসপাতালে আনা হয় ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৩২০ সাল হইতে তিনি কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন ও বহু বৎসর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ছিলেন, তিনি জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ও জেলা স্কুল বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও এক নাবালক পুত্র বর্তমান।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য—

২৪ পরগণা বারাকপুর নিবাসী প্রবীন শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ৬ই জুন সকালে তাঁহার বারাকপুর ষ্টেশন রোডস্থ বাসভবনে ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৬৫ বৎসর কাল নিজেকে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বহু সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর তিনি কয়েকটি বেসরকারী হাইস্কুলেও প্রধান শিক্ষক

ছিলেন এবং শেষে কয়েক বৎসর বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করিতেন। তিনি সমাজ সেবার সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বারাকপুর মহকুমা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপে সারা মহকুমার উন্নতিকর কার্য্যে প্রায় ২০ বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য সকল লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা সম্মান করিত।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা—

গত ৩১শে মে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকগণের এক সম্মিলনে শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা যথেষ্ট অগ্রসর না হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি সকল রাজ্যসরকারকে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ণ করিতে বলেন। তিনি বলেন—আজ দেশের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা—সে জন্য ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা দরকার। কৃষি উৎপাদন বর্দ্ধিত না করিলে খাদ্য শস্য আমদানীর ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা কমানো যাইবে না। আমরা শ্রীনেহরুর এই সকল কথার সার্থকতা সর্বদা অনুভব করিতেছি এবং বিশ্বাস করি, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, সকল রাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারা অবিলম্বে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে চালিত করিবেন।

কেরলে দুই মন্ত্রী বিবাহিত—

কেরল রাজ্যে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর দুই মন্ত্রী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। শ্রমমন্ত্রী শ্রীটি-ভি টমাসের সহিত রাজস্বমন্ত্রী কুমারী কে-আর-গৌরীর গত ৩০শে মে বিবাহ হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে বিবাহ ভারতে এই প্রথম। টমাসের বয়স ৪৫ বৎসর ও গৌরীর বয়স ৩৫ বৎসর।

কলিকাতায় নূতন স্কুল—

কলিকাতার স্কুলগুলিতে ছাত্রের ভিড় কমাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী বৎসর হইতে কলিকাতায় নূতন ১২টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির হইয়াছে। ঐ সকল স্কুলে প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হইবে। নূতন পরিকল্পনানুসারে নূতন বিদ্যালয়ে পড়িয়া ছাত্ররা তাহার পর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতে পারিবে। ৬টি স্কুল বালকদের জন্য ও ৬টি বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

ডাক্তার বিমানবিহারী মজুমদার—

ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৭ সালের সরোজিনী বসু পদকলাভ করিয়াছেন। সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন।

বিধান সভার নূতন অধ্যক্ষ—

গত ৪ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নবনির্বাচিত সদস্যগণের প্রথম দিনের অধিবেশনে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভার নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১৪৩ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজা-সোসালিষ্ট দলের ব্যারিষ্টার শ্রীশিশির দাস ৯৫ ভোট পান। শঙ্করদাসবাবু নদীয়া জেলার অধিবাসী, তাঁহার পিতা উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। শঙ্করবাবুর বয়স ৫৪ বৎসর।

শ্রীআশুতোষ মল্লিক—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রথম দিনের সভায় শ্রীআশুতোষ মল্লিক বিনা বাধায় সভার ডেপুটী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। গত ৫ বৎসর কাল তিনি গত বিধান সভায়ও ডেপুটী অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছেন। আশুতোষ বাঁকুড়া হইতে নির্বাচিত সদস্য, প্রধান দেশকর্মী ও সর্বজনপ্রিয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্তকমল" গল্পটি শরদিন্দুবাবুর "বিষকন্যা" গল্পের চিত্রনাট্য। [ভাঃ সঃ]

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট :

ইংলণ্ড : ১৮৬ (রিচাডসন ৪৭ ; সনিরামাধীন ৪৯ রানে ৭ উইকেট) ও ৫৮৩ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়াড ; মে নটআউট ২৮৫, কাউড্রে ১৫৪)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪৭৪ (স্মিথ ১৬১, ওয়ালকট ৯০, সোবার্স ৫৩, ওরেল ৮১) ও ৭২ (৭ উইকেটে)

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে

বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ২৮ বছর পর বার্মিংহামের এজ্‌বাস্টন ক্রিকেট গ্রাউণ্ড পুনরায় টেষ্ট ক্রিকেট খেলার মাঠ হিসাবে মর্য্যাদা লাভ করলো। ইংলণ্ডের ওয়ারউইকসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের নিজস্ব খেলার মাঠ হ'ল এই এজ্‌বাস্টন মাঠ, এজবাস্টন রোডের ধারে অবস্থিত। ১৯২৯ সালে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাই এই মাঠের শেষ টেষ্ট ক্রিকেট খেলা।

আলোচ্য টেষ্ট খেলায় এই তিনজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে নিজ নিজ দলের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করেছেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনিরামাধীন এবং কাউলি স্মিথ, ইংলণ্ডের পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে। এঁদের মধ্যে পিটার মে এবং কাউড্রের ক্রীড়ানৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ৪১১ রাণ ক'রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই ৪১১ রাণ তুলতে তাঁদের সময় লাগে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট। পূর্ব্বে ৪র্থ উইকেটের জুটির বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৩৮৮ রাণ; ১৯৩৪ সালে পোন্সফোর্ড এবং ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) লিডস মাঠে ইংলণ্ডের বিপক্ষে এ রেকর্ড করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন উইকেটের জুটির যে বিশ্ব রেকর্ড বর্ত্তমানে বলবৎ আছে তার মধ্যে চার শতাধিক রাণ করার রেকর্ড আছে মাত্র ১ম, ২য়, ৪র্থ এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাদ্রাজে ভিনু মানকড় এবং পঙ্কজ রায় ১ম উইকেটের জুটিতে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৪১৩ রাণ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে ৪১১ রাণ ক'রে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কেবল বিশ্ব রেকর্ডই করেননি ইংলণ্ডকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ১৯৫০ সালের ইংলণ্ড সফরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের রামাধীন সম্পর্কে ইংলণ্ডের যে ভয়ের কারণ ছিল এবারও সে ভয় দূর হয়নি। আলোচ্য টেষ্টের প্রথম ইনিংসে রামাধীন ৪৯ রাণে ৭টা উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল থেকে গ্রেভনী এবং ওয়েষ্টইণ্ডিজ থেকে ভ্যালেনটাইনকে বাদ পড়তে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রকাশিত তের জন খেলোয়াড়ের নামের

তালিকায় উভয়ই স্থান পেয়েছিলেন। ইংলণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। চা-পানের আগেই ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ১৮৬ রানে শেষ হয়ে যায়। ওয়েষ্টইণ্ডিজ এক উইকেট হারিয়ে ৮৩ রান করে। দ্বিতীয় দিন ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের ৫ উইকেটে ৩১৬ রান ওঠে। স্মিথ ৭০ এবং ওরেল ৪৮ রান ক'রে নটআউট রইলেন। ৩য় দিন ওয়েষ্টইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৪৭৪ রানে শেষ হ'লে, তারা ইংলণ্ডের থেকে ২৮৮ রানে এগিয়ে গেল। ঐ দিন ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে ২টো উইকেট পড়ে ১০২ রান ওঠে। কাউলি স্মিথ ওয়েষ্টইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী (১৬১) করলেন। দলের উল্লেখযোগ্য রান,

ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে ব্যাট করছেন

ওয়ালকট ৯০, ওয়েল ৮১ এবং সোবার্স ৫৩। ৪র্থ দিনে ইংলণ্ড ৩ উইকেটে ৩৭৮ রান করলো। ৪র্থ উইকেটের জুটী পিটার মে ১৯৩ এবং কাউড্রে ৭৮ রান ক'রে নট-আউট রইলেন। ৫ দিন ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ৫৮৩ রান তুলে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলা শেষ হ'তে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বাকি। ইংলণ্ড ২৯৫ রানে এগিয়ে আছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে খেলায় জিততে হ'লে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময়ে ২৯৬ রান তুলতে হবে। রক্ত মাংসের শরীরে তা মোটেই সম্ভব নয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসে খুব খারাপ খেলেছে, ২ ঘণ্টা ৯০ মিনিট সম তারা মাত্র ৭২ রান করে, উইকেট পড়ে ৭টা। তা কিছুটা সময় থাকলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজয়ই বরণ কর হ'ত। কারণ তাদের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা সকে আউট হয়ে ছিলেন। প্রথম টেষ্ট খেলায় ভাগ্যের জো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছে বল পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ভাগ্যদেবী তাঁদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না; তাদের দুই 'ওপনিং' বোলার ওরেল এ গিলক্রায়েষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলকে বল করে সাহা করতে পারেন নি। আলোচ্য খেলায় ভাগ্যদেবী ঘি দোলকের মতই একপক্ষ থেকে অপর পক্ষে চলে গেছে

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনি রামাধীন বল দিচ্ছেন

স্থায়ীভাবে কোন পক্ষকে সমর্থন করেন নি।

আলোচ্য খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনিরামাধীন প্রথম ইনিংসে ৯৮ ওভার বল দিয়ে টেষ্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক ওভার বল করার রেকর্ড করেছেন। ইংলণ্ডের ৪র্থ উইকেটের জুটি মে এবং কাউড্রে উইকেটে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলেছিলেন। কিছু কম ১০ ঘণ্টা খেলে মে তাঁর নিজস্ব ২৮৫ রান করেছিলেন। তাঁর রানে ২টো ওভার বাউণ্ডারী এবং ২৫টা বাউণ্ডারী ছিল। কাউড্রের ১৫৪ রান তুলতে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লেগেছিল।

তিনি ১৬টা বাউণ্ডারী করেন। এজ্‌বাস্টন মাঠে আলোচ্য খেলা নিয়ে ইংলণ্ড ৫টা টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে। ইংলণ্ড কোন খেলাতেই হার স্বীকার করে নি। এ মাঠে খেলার ফলাফল ইংলণ্ডের জয় ২, খেলা ড্র ৩। প্রথম টেষ্ট খেলে ১৯০২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ইংলণ্ড দলে খেলে-ছিলেন তাদের সর্ব্বকালের খ্যাতিমান খেলোয়াড়—ম্যাকলার্ণ, ফ্রাই, ভারতীয় খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী, জ্যাকসন, টিইণ্ডসলে, জেসপ এবং রোডস। এঁরা সকলেই ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলের দিক্‌পাল খেলোয়াড়। বরুণ দেবের করুণায় শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে খুব জোর রক্ষা পেয়ে যায়। ১৯০৯ সালে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ১৮ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয়। ১৯২৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ মাঠের শেষ টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

রেফারী প্রভুল চক্রবর্ত্তী ঃ

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় গণতন্ত্রী চীন বনাম ইন্দো-নেশিয়া দলের খেলায় ক'লকাতার শ্রীপ্রভুল চক্রবর্ত্তী রেফারী মনোনীত হ'ন।

মহিলাদের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গলা ২-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

আগা খাঁন হকি কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের আগা খাঁন হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং ১-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলকে পরাজিত ক'রে দক্ষিণ ভারত হকি দলগুলির মধ্যে প্রথম আগা খাঁন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে।

জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সার্ভিসেস দল ৩-২ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে। পয়েন্ট ১৫-১৪, ৪-১৫, ১৫-১২, ১০-১৫ ও ১৫-১২।

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ক'লকাতা শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ফুটবল মরসুমে প্রচণ্ড রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যাঁরা কায়িক পরিশ্রমে সহস্র সহস্র দর্শক সাধারণের আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা সঞ্চার করেন সেই সব ফুটবল খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই আজ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়েও খেলবার মত গায়ের জোর পাচ্ছেন না। ফলে ক্লাব পরিচালকদের পক্ষে শক্তিশালী দল গঠন করা এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের খেলা খারাপ হ'লে আর এক বড় বিপদ—সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ। তিনদিন খেলা স্থগিত রেখে এই মহা সমস্যার সমাধান হয়নি। ইংলণ্ডের প্লেগ মহামারীর সময়েও ইংলণ্ডের ফুটবল খেলা বন্ধ হয়নি—অতীতের এই দৃষ্টান্ত দিয়ে ক'লকাতার লীগ খেলা স্থগিত না রাখার পক্ষে আই-এফ-এর সভাপতি মশায় যে যুক্তি দিয়েছেন তা খেলোয়াড়দের প্রতি হৃদয়হীনতার পরিচয় মনে করি। বিভিন্ন দেশের অতীতের বহু সামাজিক রীতিনীতি, আইন-কানুন পরবর্ত্তীকালে লোপ পেয়েছে, এর দৃষ্টান্ত নিষ্প্রোজন। ইংলণ্ডের রাজার তিরোধানে ইংলণ্ডে খেলা বন্ধ হয়নি। কিন্তু মৃত রাজার সম্মানার্থে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ খেলা বন্ধ হয়েছে—এ তো বেশী দিনের কথা নয়। আবার অবস্থা বিপাকে পড়ে ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় কয়েক শতাধিক বছর ধরে ইংলণ্ডের ফুটবল খেলাকে আইন বিরুদ্ধ কাজের পর্য্যায়ে ফেলে রেখে ছিলেন। দেশের অবস্থা বিচারে এসব ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, সুতরাং এ সমস্যা কোন ব্যক্তি বা দলগত ব্যাপার নয়, সমগ্র জাতির জীবন-মরণ সমস্যা। এ সমস্যা আজ দেশের সরকারী মহলকে উদ্বিগ্ন করেছে। এ অবস্থায় সমস্যাটিকে ছোট করার চেষ্টা মূঢ়তা এবং মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচয়।

বর্ত্তমানে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় বিভিন্ন নামকরা ক্লাবগুলির এইরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে—রাজস্থান ১০টা খেলায় ১৭ পয়েন্ট, মহমেডাম স্পোর্টিং ১০টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট, ইষ্টবেঙ্গল ১০টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট এবং মোহন-বাগান ৯টা খেলায় ১১ পয়েন্ট।

বিবর্ত্তন : শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুসাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস বিবর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

দেশ যখন পরাধীন ছিল, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে চালিত বাঙলাদেশের কত তরুণ আত্মোৎসর্গ করেছিল স্বাধীনতার জন্যে, গ্রাম সংস্কারের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য। সেই আপনভোলা সর্বত্যাগী শংকরের দল এখন কোথায়? কোথায় গেলেন তাঁরা যাঁরা ভাবতেন স্বাধীনতা পেলেই গ্রাম-সমাজ-সব কিছুর উন্নতি সাধন তাঁরা করবেন। স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু তাঁরা?

তাঁদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলে অনুরূপা দেবী অংকিত গ্রাম-গত-প্রাণ অনিমেষের ছবি। অনিমেষ, আশমানতারা, পদ্মমালা, সুরুচি, মনীষা, সুচারুর কাহিনী দেশের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ তরুণ তরুণীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল সংস্কার ও উন্নতি-সাধনের কাজের জন্যে সরকারকে দায়ী করে আমরা যখন শুধু সরকার সমালোচনায় মত্ত আছি, সেই সময়ে এ বইখানা পুনরাবির্ভূত হয়েছে যেন আমাদের আত্ম-সচেতন করে দিতে। আদর্শ আমাদের কি ছিল এককালে তা' এই কাহিনী পাঠ করলে মনে পড়িবে। আদর্শ সৃষ্টি করতে গিয়ে অনুরূপা দেবী কাহিনী মোটেই দুর্বল করেন নি। তরুণীর প্রেম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাতপ্রতিঘাত, মানুষের ঈর্ষা, নৃশংসতা পৈশাচিকতা সব কিছু মিলে কাহিনীকে ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণীয় ও মনোমোহকর করে তুলেছে। ইহাই শক্তিমতী লেখিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান কালে এ গ্রন্থ প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে আরও দুটি কথা না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। আমাদের দেশের সুখ্যাত সাহিত্যপত্রগুলি পর্যন্ত যখন ব্যাভিচার আর পরস্পর প্রীতির জঘন্য কাহিনী দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টায় রত—ভুলে যাচ্ছে পাঠকদের মনোবিকার দূর করে, তাঁদের সন্মার্গে পরিচালিত করা সৎ-সাহিত্য-পত্রের কর্তব্য, সে-সময়ে এ আদর্শবাদী উপন্যাসখানি পুনঃপ্রকাশ করে প্রকাশক সত্যিকারের দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র দেশবাসীর নিকট তারা এর জন্য ধন্যবাদার্হ।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য চার টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

অঘটন আজো ঘটে : দিলীপকুমার রায়

ইহা একখানি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহাতে মোট ছয়টি গল্প আছে। যথা:—(১) অমল, (২) শ্যামঠাকুর, (৩) কৃষ্ণদাস, (৪) মন্দিরা, (৫) সতী ও (৬) আনন্দগিরি। এ গল্পগুলির মধ্যে বেশ একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সে যোগসূত্র হইতেছে, কৃষ্ণভক্তির উচ্ছলতা। এ হিসাবে গ্রন্থখানিকে একখানি উপন্যাস বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে একটি সুন্দর, অনাবিল, স্বচ্ছ ভক্তির প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। ভগবত মন্দিরের মত ইহা ধূপধুনা, অগরুচন্দনের গন্ধে সুবাসিত। গল্পগুলির বক্তা আসিত। পটভূমিকা রচনা করিয়াছে সুদূর আমেরিকায় আসিত যখন তাঁহার শিষ্যা তপতীর সহিত সাধনা করিতেন; তখন এক মার্কিণ মহিলা মিস্ বার্ব্বারা ব্রাউন তাহাতে যোগদান করেন। বার্ব্বারা আবার কর্মেলাইট সন্ন্যাসিনীদের দলভুক্ত হইবার প্রয়াসিনী। এই সন্ন্যাসিনীদের বৈরাগ্য অনুশীলন সারা পৃথিবী বিখ্যাত। Catmelite nuns নিভৃতে সাধনা করেন এবং কখনও পুরুষের মুখ দেখেন না। ইঁহারা রাত্রিতে শবাধারের (coffin) মধ্যে শয়ন করিয়া জপতপে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই সকল ভক্তিমূলক আখ্যায়িকা তাঁহার আসন্ন সন্ন্যাস-জীবনের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। রাজপুতানার মরুভূমির স্বর্ণকমল মীরাবাঈয়ের জীবন-আলেখ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলির উদ্বোধন হইয়াছে। গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ মাঝে মাঝে মীরাকে দর্শন দিতেন ও কথা কহিতেন এই লইয়াই গল্পগুলির সূচনা। 'অমল' গল্পে এর শিষ্যাত্রয়ী শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি কুড়াইয়া ঘরে আনেন এবং তাঁহার সেবা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি দেখিতে পান তাঁহার ইষ্টদেবের উদ্দেশে নিবেদিত ভোগের কতকটা উবিয়া যায় এবং সেখানে কচি কচি আঙ্গুলের দাগ পড়ে।

আমারও এইরূপ সুযোগ একদিন হইয়াছিল। সেদিন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আরো অনেকে। কুমিল্লার একজন অসাধারণ কুমারী ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার কতকাংশ অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, কিন্তু সমস্যার সুরাহা হইল না।

'শ্যামঠাকুর' গুরুর কৃপায় চাকরী ছাড়িয়া আকাশবৃত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সাধনা করেন। 'কৃষ্ণদাস' গল্পটি শ্যামাঠাকুরের মুখে শোনা। কৃষ্ণদাস হরিনামে মাতোয়ারা ছিল। ঠাকুর তাহাকে পাকিস্তান হইতে প্রাণ লইয়া আসিবার অলৌকিক সুযোগ দেন। 'মন্দিরা' গল্পটিও শ্যামঠাকুরের নিকট শোনা। তাহার নৃত্য গীতে বিহ্বলতা ও অলৌকিকভাবে শ্রীরাধার করুণা দেখিয়া ক্রূর বিমাতার চক্ষু ফুটিল। 'সতী' গল্পটিও অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ভূমিকম্পে বাড়ী চাপা পড়িয়া তাহার পিতামাতা ও আর সকলে মারা যান। সতীই কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রক্ষা পায় এবং রাওলপিণ্ডিতে অবস্থানকালে পাকিস্তানী ও তাদের অত্যাচারে সে কোনরূপে ঠাকুর লইয়া পলাইয়া আসিতে সক্ষম হয়! 'আনন্দগিরি' সর্ব্বশেষে গল্প। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে আনন্দগিরিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আনন্দগিরির প্রথম দর্শন পাই শ্যামঠাকুরের গল্পে; এবং 'সতী' গল্পেও তিনি অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

কিন্তু, আসল কথা তাহাই নহে; সংসারের সমস্ত আসক্তিশূন্য এই বৈষ্ণব-সাধুটি সমস্ত সংশয়ের নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসের মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ, তাহার সমাধানও আনন্দগিরির জীবনে আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করি।

দিলীপকুমার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন। তিনি একধারে কবি ও সুগায়ক। তিনি দেবদুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী। অনেক গান ও কবিতা এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালায় নাটক ও পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। দিলীপকুমার তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যগুলির উপাখ্যানের ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে এই সব গল্প কেহ কেহ অচল বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু, যাঁহারা বিশ্বাসী, যাঁহাদের হৃদয় ভক্তিপ্রবণ, তাঁহারা এই গল্পগুলি

হইতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। গীতা, ভাগবত, উপনিষদ এবং নানক, কবীর, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবন হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করায় গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। প্রাচীনকালেও যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি লীলাময়ের রহস্যময়ী অনন্ত লীলা চলিতেছে। সে লীলা দেশকালের ধার ধারে না এবং যুক্তিতর্কের জাল ছিন্ন করিয়া এই বস্তুতন্ত্রতার যুগেও সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, বিশ্বাসের যুগ যখন ছিল, তখন আমরাও কিছু মন্দ ছিলাম না। সেই বিশ্বাসের যুগে আমাদের পক্ষে বেদ বেদান্ত উপনিষদ—অধ্যাত্মবিদ্যার চরম বিকাশ- রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলের মত প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল। তখন ভারত হইয়া উঠিয়াছিল মন্দিরময় এবং সাধুসন্তে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। এখন আমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুখ সুবিধা সত্ত্বেও সদাই প্রাণান্ত। নিজ নিজ ক্ষণিক সুখের কাঙাল আমরা। কিন্তু গীতা বলিয়াছেন :-

"সুখমাত্যন্তিকম্ যৎ তৎ বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্" সে অতীন্দ্রিয় সুখ কামনা করেন কজন? যিনি অরণাশরণ চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারেন, কদাচিৎ কখনও তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে ইচ্ছাময়ের লীলার স্ফুরণ হয়।

"গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাস":—যাঁহারা চক্ষুকর্ণের এক্তাহারের উপর একান্ত শ্রদ্ধা পরায়ণ, তাঁহারা সে কৃপাশক্তি লাভ করিবেন কেমন করিয়া? ইংরাজ কবি সত্যই বলিয়াছেন "ছেলেবেলায় আকাশ আমাদের বড় কাছে ছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ (স্বর্গ) আমাদের নিকট হইতে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে।" এখন আমরা বুদ্ধির দৌড়ের গতিতে বিশ্বসংহারকারী বোমা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু এ গৌরব করিবার পূর্ব্বে মানবজাতি নিঃশেষ হইয়া যাইবে না তো!

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোম্পানী, ৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রূপসী না সজীব বোমা"—২,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২৩শ সং)—২৷০, "চরিত্রহীন" (১৬শ সং)—৫,
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "সোনার পুতুল"—৩৷০
মনোজ বসু প্রণীত ভ্রমণকাহিনী "পথ চলি"—৩৷০
শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত "আমিষ ও নিরামিষ আহার" (১ম খণ্ড—৩য় সং)—৩৸০
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত শিশু নাটক "বিশ বছর আগে"—৷৶০
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "কালিদাস-কাহিনী"—৷৶০

নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়ার কয়েকখানি রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82738—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কার পথ চেয়ে আঁখি দুটি ছল ছল" ও "তুমি কত দূরে কোথায় বসে" দুখানি আধুনিক গান জনপ্রিয় হবে নিশ্চয়ই।

N 82739—'শহ্যাদ্রির পাহাড়ের ওপারে' ও "ভোর হইয়াছে এবার"—গান দুখানা শিল্পী সনৎ সিংহের কণ্ঠে অপূর্ব হয়েছে।

N 82740—কুমারী বাণী ঘোষালের সুমিষ্ট কণ্ঠে "ফুল কুঁড়িগো ফুল কুঁড়ি" ও "রিনিকি ঝিনি ঝিনি"—দুখানা আধুনিক গান আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

N 82741—সুচিত্রা মিত্রের "মরিলো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে" ও "আমি যে আর সইতে পারিনে" গান দুখানা আমাদের ভাল লেগেছে।

N 82742—শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে "আমার অঙ্গে অঙ্গে" ও "একটুকু ছোওয়া লাগে" দুখানা রবীন্দ্র সংগীত শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

কলম্বিয়া

GE 24836—"রেখো মা দাসেরে মনে" ও "আশার ছলনে ভুলি" দুখানা গান দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠে অনবদ্য হয়েছে।

GE 24837—কুমারী ইলা চক্রবর্তীর সুললিত কণ্ঠের দুখানা মনোরম গান—"একটী গানের মাঝে" ও "প্রেম যদি মোর অভিশাপ হোল।"

GE 24838—কুমারী গায়ত্রী বসুর সুমিষ্ট কণ্ঠে "সে কোন বনের হরিণ" ও "গোপন কথাটী রবেনা গোপনে" দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের খুবই ভাল লেগেছে।

GE 24839—শ্রীমতী গীতা ঘটকের "সখী বহে গেল বেলা" ও "দুজনে দেখা হোল" গান দুখানা আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রাবণ—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

শঙ্কর-দর্শনে কার্যকারণবাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী

কেবলাদ্বৈতবাদী, বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্যের অতুলনীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। কিন্তু যদি ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব হন, যদি ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই সত্য বস্তু না থাকে, তা হলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে: এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা আমরা সকলে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করছি সত্য ও অস্তিত্ববান বস্তুরূপে, তার উদ্ভবই বা হ'ল কি করে এবং তার প্রকৃত স্বরূপই বা কি? এই মূলীভূত সমস্যা সমাধানের জন্য শঙ্কর তাঁর সুবিখ্যাত দার্শনিকতত্ত্ব বিবর্তবাদ ও অধ্যাসবাদের অবতারণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের কার্যকারণবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে দুটী প্রধান মতবাদ আছে: অসৎ-কার্যবাদ ও সৎকার্যবাদ। অসৎকার্যবাদ বৌদ্ধ ও ন্যায়-বৈশেষিক মত; এবং সৎকার্যবাদ সাংখ্য-যোগ ও বেদান্ত মত।

অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ মতে, সৃষ্টির পূর্বে কার্য সম্পূর্ণরূপে অসৎ বা অস্তিত্বশূন্য, সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই তার উদ্ভব, তার পূর্বে নয়; তার পূর্বে কেবলমাত্র কারণই বিদ্যমান থাকে, কার্য নয় এবং কারণে কার্যের অস্তিত্ব বা

সত্তা বিন্দুমাত্রও তখন থাকে না। এই মতানুসারে, কারণ ও কার্য দুটি পৃথক বস্তু; এবং তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান ভেদ আছে বলে' কারণে কার্যের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই অসম্ভব, যেহেতু সেই সময়ে কেবল কারণই বিদ্যমান থাকে বলে, কারণে যদি কার্যও নিহিত থাকে, তা হলে কারণ ও কার্য ফলতঃ অভিন্ন হয়ে পড়ে।

"বিলক্ষণ-বুদ্ধিতাৎ, শব্দ-ভেদাৎ, আকার-ভেদাৎ, কাল-ভেদাৎ, সংখ্যা-ভেদাৎ, অর্থ-ভেদাৎ।"

অর্থাৎ, প্রথমতঃ কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন বস্তুরূপেই পরিজ্ঞাত হয়, যেমন, মৃৎপিণ্ড ও ঘটকে আমরা দুটি বিভিন্ন বস্তু বলেই জেনে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, তাদের নামও বিভিন্ন, যেমন 'পিণ্ড' ও 'ঘট', সে জন্য তারা নিশ্চয়ই দুই বিভিন্ন বস্তু—এক ও অভিন্ন বস্তুর জন্য দুটি বিভিন্ন নামের প্রয়োজন হবে কেন? তৃতীয়তঃ, কারণ ও কার্যের আকার বিভিন্ন, যেমন পিণ্ড গোলাকার, ঘট তা নয়। চতুর্থতঃ, কারণ ও কার্যের স্থিতির সময় বিভিন্ন, যেমন পূর্বে থাকে পিণ্ড, পরে হয় ঘট, একটি পূর্ববর্তী, অপরটি পরবর্তী। পঞ্চমতঃ, কারণ ও কার্যের মধ্যে সংখ্যাভেদও আছে, যেমন, বহু তন্তু সমবায়ে একটি বস্ত্রের উৎপত্তি। ষষ্ঠতঃ, কারণ ও কার্যের দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যেমন, পিণ্ড দ্বারা জলাহরণ অসম্ভব, ঘট দ্বারা সম্ভব।

শঙ্কর তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদ ভাষ্যে (১।২।১), নানা দিক্ থেকে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্যবাদ স্থাপন বিশদভাবে করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে যা বলেছেন, তা' হ'ল সংক্ষেপে এই—

প্রথমতঃ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বলে, সৃষ্টির পূর্বে কারণ বা কার্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি ত অসম্ভব। সে জন্য কার্যের উৎপত্তির পূর্বে নিশ্চয়ই তার কারণ বিদ্যমান থাকে। পুনরায়, কারণ ও কার্য এক ও অভিন্ন বলে, কারণ থাকলেই কার্যও সেই সঙ্গে থাকে। সে জন্য, সৃষ্টির পূর্বে কারণ ও কার্য উভয়েই থাকে।

শূন্যবাদী পুনরায় বলতে পারেন যে, যাকে উপাদান কারণ বলা হয়, তা পূর্বে ধ্বংস হয়, পরে কার্যের উদ্ভব হয়। যথা, বীজটি ধ্বংস হলেই, তৎস্থলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হতে পারে; মৃৎপিণ্ডকে বিমর্দিত করে, পিণ্ডের আকার বিনষ্ট করলে, তবেই হতে পারে ঘটের উদ্ভব পিণ্ড থেকে। এরূপে, কারণ বস্তুর ধ্বংসই হল কার্যোৎপত্তির হেতু, কারণ বস্তু স্বয়ং নয়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: এস্থলে কেবলমাত্র কারণ বস্তুর আকারেরই ত ধ্বংস হচ্ছে, প্রকৃত কারণ বস্তুর নয়। পিণ্ডাদি আকার কোনোক্রমেই ঘটাদি কার্যের কারণ নয়, স্বয়ং মৃত্তিকাই একমাত্র সেই কারণ। যার সদ্ভাবে কার্যেরও সদ্ভাব, তা'ই হল সেই কার্যের উপাদান কারণ। যেমন, মৃত্তিকার সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব, সে জন্য মৃত্তিকাই ঘটের কারণ। অপর পক্ষে, যার অসদ্ভাবেও কার্যের সদ্ভাব, তা' সেই কার্যের কারণ নয়। যেমন, পিণ্ডাদি আকারের অসদ্ভাব বা অভাবেও ঘটাদি কার্য বিদ্যমানই থাকে, সেজন্য পিণ্ডাদি আকার ঘটাদি কার্যের কারণ হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে, সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সে জন্য, কার্যোৎপত্তির পূর্বেই স্বয়ং কারণটিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বলে, সৃষ্টির পূর্বে কেবল তথাকথিত কারণই এক ক্ষণমাত্র থাকতে পারে, কার্য নয়। বস্তুতঃ, পূর্বদৃষ্ট বস্তু ও পরদৃষ্ট বস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক্, কেবল পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে 'সাদৃশ্য' থাকায় 'এই সেই বস্তু' বলে পরে প্রত্যভিজ্ঞা বা অভেদবুদ্ধি হয়। সে জন্য, পরদৃষ্ট ঘটাদি কার্যে পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকাদির জ্ঞান হলে, বুঝতে হবে যে, পূর্বদৃষ্ট মৃত্তিকাদির অনুভবজাত 'সংস্কার' থেকেই এরূপ জ্ঞান হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে, কারণরূপে কল্পিত মৃত্তিকাদির সঙ্গে কার্য ঘটাদির কোনো সম্বন্ধ নেই।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন: ক্ষণবাদানুসারে, আত্মাও যখন ক্ষণমাত্র স্থায়ী, তখন 'এই সেই বস্তু' বলে, পূর্বদৃষ্ট বস্তু ও পরদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 'সাদৃশ্য' উপলব্ধি করবে কে, যেহেতু পূর্বদৃষ্ট আত্মাও ত পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? একই ভাবে, পূর্বদৃষ্ট কারণের অনুভবজনিত 'সংস্কারই' বা বহন করবে কিরূপে এই ক্ষণমাত্র স্থায়ী আত্মা?

এরূপে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ অথবা বাহ্যাস্তিত্ববাদ প্রমুখ কোনো বৌদ্ধমতবাদই কার্যকারণ সম্বন্ধের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা-প্রদানে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, অস্বীকার করবার

উপায় নেই যে, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ নিশ্চয় বিদ্যমান থাকে এবং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, কারণ থাকলেই কার্যও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

"অতঃ সিদ্ধঃ প্রাক্‌কার্যোৎপত্তেঃ কারণসদ্ভাবঃ,
কার্যস্যাভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ ॥

(শঙ্করের বৃহদারণ্যক ভাষ্য ১।২।১)।

তৃতীয়তঃ, ন্যায়-বৈশেষিকমতে, কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণটী বিদ্যমান আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কার্য নয়। কার্যকে বলা হয় উৎপাদ্য; অর্থাৎ যাকে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে; সেহেতু উৎপত্তির পূর্বেই যদি সে অতীতেই বিদ্যমান থাকে, তবে 'উৎপাদন' কর্মটাই ত নিরর্থক হয়ে যায়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"কার্যস্য চ সদ্ভাবঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সিদ্ধঃ। কথম্ ?
অভিব্যক্তিলিঙ্গত্বাৎ ॥

(বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ১।২।১)।

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে 'উৎপাদনের' অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়, কারণে যে কার্য প্রথম থেকেই অনভিব্যক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন বা নিহিত হয়ে ছিল, সেই কার্যেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশই মাত্র। 'অভিব্যক্তি' শব্দটীর অর্থ কি ? এর অর্থ হল এই :—

"অভিব্যক্তিঃ সাক্ষাদ্ বিজ্ঞানালম্বনপ্রাপ্তিঃ ॥"

(বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ১।২।১)

অর্থাৎ, 'অভিব্যক্তি' হল সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধির প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হওয়া। যেমন, ঘটাদি বস্তু যখন অন্ধকারে আবৃত হয়ে থাকে, তখন তারা পূর্ণতমভাবে বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল হলেও, আমরা তাদের বিষয় জানতেই পারি না। সেজন্য তখন তারা আমাদের নিকট অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত। পুনরায়, আলোকাদির সাহায্যে সেই অন্ধকার দূর হলে, সেই সকল ঘটাদি বস্তুকে আমরা জানতে পারি। সেজন্য তখন তারা আমাদের নিকট অভিব্যক্ত বা জ্ঞাত হয়।

এরূপে, মৃৎপিণ্ডে ঘট, সুবর্ণখণ্ডে হার, বীজে অঙ্কুর, সর্ষপে তৈল, তন্তুতে বস্ত্র প্রথমে কারণাবস্থায় অনভিব্যক্ত-ভাবে, কারণের অন্তর্নিহিত, প্রচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম শক্তিরূপেই নিহিত হয়ে থাকে; পরে কার্যাবস্থায় সেই সেই স্থূল আকারে অভিব্যক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে, শঙ্কর কয়েকটি সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করেছেন (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্য ১ ২।১)

প্রথম আপত্তি এই হতে পারে যে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রমুখ আবরণ থাকলে না হয় ঘটাদি বস্তু অনভিব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে কারণ মৃৎপিণ্ড বিদ্যমান আছে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রভৃতি আবরণও নেই, তাহলে সেই মৃৎপিণ্ডে ঘটাদি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা কেন ?

এর উত্তর হল এই যে, আবরণ দু'রকম : ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত হবার পূর্বে, মৃত্তিকার অবয়ব সমূহই, যথা পিণ্ড, কপাল বা ভগ্নাংশদ্বয়, চূর্ণ প্রভৃতিই হল সেই অনভিব্যক্ত ঘটাদির আবরণ; ঘটাদিরূপে অভিব্যক্ত হবার পরে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রভৃতিই হয় সেই সকল বস্তুর আবরণ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হতে পারে যে, অন্ধকার, প্রাচীর প্রমুখ আবরণ আবরণীয় ঘটাদি থেকে ভিন্নস্থানবর্তী। কিন্তু মৃত্তিকারই অবয়ব পিণ্ড, কপাল প্রমুখ আবরণ ত আবরণীয় ঘটাদির বাহিরে বিদ্যমান নয়। সুতরাং, অন্ধকারাদির ন্যায় মৃত্তিকার অবয়বাদি ঘটাদিকে আবৃত করে রাখতে পারে না।

এর উত্তর হল এই যে, কেবল মাত্র ভিন্নস্থানবর্তী আবরকই যে আবরণ করতে পারে, অভিন্নস্থানবর্তী আবরক নয়—এরূপ কোনো নিয়ম নেই। যেমন, দুগ্ধমিশ্রিত জল দুগ্ধদ্বারা আবৃত হয়, যদি ও দুগ্ধ ও জল এক ও অভিন্নস্থানবর্তী।

তৃতীয় আপত্তি এই হতে পারে যে, পিণ্ড, কপাল, চূর্ণ প্রমুখ মৃত্তিকার অবয়ব সমূহ ঘটেরই অবয়ব এবং সেজন্য ঘটেরই অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য, তারা ঘটের আবরক হবে কিরূপে ?

এর উত্তর হল এই যে, মৃত্তিকা থেকে বিভক্ত বা মৃত্তিকার কার্যস্বরূপ পিণ্ড, কপাল, চূর্ণাদিকে যখন স্বতন্ত্র, অন্য পদার্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তাদের পক্ষে আবরক হওয়া অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আপত্তি এই হতে পারে যে, পিণ্ড-কপাল-চূর্ণাদিতে যদি ঘটের অস্তিত্ব থাকে, অথচ পিণ্ড কপাল-চূর্ণাদিই যদি সেই অস্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়—তা

হলে যিনি ঘটলাভে ইচ্ছুক, তিনি কেবল পিণ্ড-কপাল- (বা ঘটের ভগ্নাংশদ্বয়) চূর্ণাদি বিনাশেই যত্ন করবেন, ঘটোৎপত্তির জন্য আর অন্য কোনো প্রচেষ্টার আবশ্যকতা তাঁর নেই। অথচ এরূপ কোথাও দেখা যায় না।

এর উত্তর হল এই যে, অনভিব্যক্ত বস্তুকে অভিব্যক্ত করবার কালে, দু' প্রকার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কেবল মাত্র আবরণটির বিনাশ সাধন করলেই যথেষ্ট হয়। যেমন, আবরণ-স্বরূপ প্রাচীর ধ্বংস করলেই প্রাচীর দ্বারা আবৃত বস্তু অভিব্যক্ত হয়ে, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। পুনরায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে আবরণের বিনাশ সাধন করা যায় না। কিন্তু আবৃত বস্তুটিতে তাঁর একটি অনভিব্যক্ত গুণের প্রকাশ করতে হয় একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার দ্বারা। যেমন, ঘট যখন অন্ধকারাবৃত হয়ে থাকে, তখন কেউ অন্ধকার বিনাশের জন্য সাক্ষাৎভাবে চেষ্টা না করে, কেবল প্রদীপ প্রজ্বালনেরই জন্য প্রচেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টায় আবৃত ঘটটির স্বপ্রকাশস্বরূপ অভিব্যক্ত হয় বলেই ত ঘটটি তখন অভিব্যক্ত হতে পারে। সেজন্য এস্থলে প্রদীপ-প্রজ্বালনরূপ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য নয় অন্ধকার দূর করা, কিন্তু ঘট-টিতে তার প্রকাশবিশিষ্টরূপ উদ্ভাসিত করা।

বস্তুতঃ, কোনো একটি কার্যোৎপত্তির জন্য, সেই কার্যের অভিব্যক্তি যাতে হতে পারে, সেজন্যই প্রচেষ্টা করা কর্তব্য—কেবল আবরণ বিনাশেই প্রযত্ন করতে হবে, এরূপ কোনো নিয়ম নেই। বরং তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। যেমন, মৃত্তিকায় প্রচ্ছন্ন ঘটের অভিব্যক্তির জন্য যদি আবরক অবয়ব পিণ্ড-কপালাদিকে বিনাশ করবার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে পিণ্ড থেকে কপাল (বা ভগ্নাংশদ্বয়) এবং কপাল থেকে চূর্ণ কার্যরূপে সৃষ্ট হতে পারে এবং এই নূতন কার্যগুলি প্রকৃত উদ্দিষ্ট ঘটরূপ কার্যের অভিব্যক্তির পথে বাধাস্বরূপ হতে পারে। সেজন্য এইভাবে আবরণ বিনাশের জন্য প্রচেষ্টা না করে, বরং কার্যোৎপত্তির জন্য যা প্রয়োজন, সেই ভাবে সাক্ষাৎ প্রচেষ্টা করাই কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ অভিব্যক্তির অনুকূল প্রচেষ্টাই সার্থক প্রচেষ্টা—আবরণ-বিনাশ প্রাসঙ্গিক ফলই মাত্র।

এরূপে, সম্ভাব্য আপত্তির খণ্ডন করে, শঙ্কর সৎকার্যবাদের স্বপক্ষেও কয়েকটি যুক্তি এবং অসৎ-কার্যবাদের বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ভাষ্য ১.২.১)। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

শেষ লেখা

শ্রীমঞ্জুলিকা দাশ

যশের খুড়ি কুড়িয়ে কি হবে বলো ?
কালের কঠিন হাত মুছে কবিতার পাতা।
ছড়ানো আকাশে তবু মগ্ন নীরবতা,
সত্তার গহনে শান্তি তার চেয়ে ভালো।

মৌন বিশ্ব চরাচরে কুড়িয়ে পেয়েছি
সৌন্দর্যের সুবর্ণ সম্পদ ! দেখেছি
পাহাড় কোমল হ'ল বিষণ্ণ বিভাসে
রক্ত-আভা নেমে আসে সবুজের দেশে।

খ্যাতিরও আকাংখা নেভে বেলাশেষ রৌদ্রের সাথে।
পাণ্ডুলিপির পাতা ছিঁড়েছি দু-হাতে।
ছিন্ন সে কাগজের হাওয়ায় বিলাসে
পেয়েছি অসীম সুখ মুক্তির শ্বাসে।

খ্যাতির প্রত্যাশা দেখো যন্ত্রণা বাড়ায়
রাত্রিদিন দুঃসহ সত্তার গভীরে !
আমার ছিন্নপাতা শান্তি চেয়ে ফিরে
অনাবিল, পরিপূর্ণ আনন্দের দূর বনছায় !

দেখেছি বিকেলে শিরীষ হয়েছে লাল।
চা পাতায় অরণ্যের সারি মন্থর পায়ে পায়ে চলে।
ভীতু বাঘ লুকিয়েছে ঝোপের অতলে।
রক্ত মেঘে ও ভেবেছে পশু কী বিশাল !

'দু'চোখে নিবিড় ঘুম নেমে যদি আসে
এই ভাবে প্রকৃতির রূপের তন্ময়ে !
শেষলেখা হয়নি তখনও ছেঁড়া। তার গান ভাসে
পাহাড়ের নীলে, রোদে সকরুণ হয়ে।

স্রষ্টা

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

সেদিন মোটেই সময় ছিল না। তবুও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েই রমেনের সঙ্গে কথা বলতে হ'ল অনেকক্ষণ। অনেক বছর পরে দেখা তাই কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে পারিনি। প্রাণের টান ঘড়ির তাগিদের চেয়ে অনেক বড়।

মৃৎশিল্পী রমেন। আমরা তা'কে জানতাম বলেই নয়, শিল্পীর যা' বৈশিষ্ট্য তা' তা'র চেহারার মধ্যে ছিল। কথা বলত মেপে—যেমন পরিমাপ মতো সে মাটী লাগাত মূর্তি গড়ার সময়। তা'র চোখ ছিল তার নয়। চোখ দু'টীর আড়ালে আরো দু'টী চোখ দিয়ে সে দেখে কোন্ সুদূরের কি। সে-দেখাতেই সে দূরকে আনে কাছে, ছায়াকে দেয় কায়া ; মনের কর্মশালায় যা চলে, কল্পনায় তাকে দেয় বাস্তব রূপ।

সে চেহারা রমেনের নেই। ওর সেই বিদায়ী চেহারাকে মনে করতে করতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। জিজ্ঞেস্ করলাম, তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন ?

মুখে ঝড় ছুটাল রমেন। পরে হ'ল নির্বাক।

অন্যদিকে তাকিয়েই রমেনের কথাগুলো শুনছিলাম। ওর নীরবতায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি—চোখ দিয়ে ওর বাকী কথাগুলো বের হয় হয়। কোথায় ওর ব্যথা তা সঠিক না বুঝলেও বুঝলাম, ওর মনে বড় ব্যথা! আর সে ব্যথা যে এতোদিন পরেও এমন তাজা! কাজেই যে কথা রমেনকে জিজ্ঞেস্ করব বলে ভেবেছিলাম, তা' জিজ্ঞেস্ করা হ'ল না।

কিন্তু বুকের বোঝায় ভারী রমেন। নিজেকে চাইল একটু হাল্কা করতে। তাই তার নীরবতা একটা দম নেওয়া। দম্ নিয়েই সুরু করল, মনে কর পতন হ'য়েছে আমার।

পতন! অবাক হ'লাম। কোথা থেকে।

সারা বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল রমেনের। জানাল ব্যক্তিগত একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পতন আমার হয়েছে, কারণ যে-পথ আমার পথ সে-পথে যখন চলতে পারছিনা তখন এটা পতন ছাড়া কি ? এক কথায় আমার মৃত্যু হ'য়েছে বলতে পার।

আমরা কিন্তু তোমাকে যা বলে জানি, তোমার কাছ থেকে তাই আশা করি।

এবারে রমেন আর কোন যুক্তি এনে দাঁড় করাতে পারল না আমার সাম্‌নে। মনে হ'ল, কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। বল্‌ল না। জোর করেই চেপে রাখতে চাইল তা' মনের অতলে। কিন্তু অন্তরের বহ্নি-বন্যাকে চাপবে কি করে? পথ করে তা' বেরোলই। কথার মালায় নয়—যা' বের হব-হব করছিল তাই পথ করে এলো নীরব ভাষায়। শাজাহানের অন্তর মথিত বেদনায় তাজমহলের সৃষ্টির মতো রমেনের চোখেই প্রকাশ পেল একবিন্দু নয়নের জল!

দিল্লীতে থাকে রমেন। সাত বছর পরে কলকাতার পথে এই দেখা। শুধু ওকে দেখাই নয়—মুহূর্তের মধ্যেই চলে গেলাম গ্রামের সেই পটভূমিকায়। শ্যামল ছায়া ঘেরা, অনাবিল স্নেহভরা গ্রাম-মায়ের কোলে। সংগে সংগে মনে পড়ল সব। চল্‌লাম স্মৃতির পথে উজান বেয়ে। ওল্টাতে লাগলাম মনের এলবামের একখানি একখানি করে পাতা। একই রমেনের দু'খানি মুখ মনের আয়নায় ভেসে এলো তখন। দু'সময়ের দু'খানি মুখে কতোখানি পার্থক্য!

গ্রামের সকলেই যখন রমেনকে শিল্পী বলে স্বীকার করে নিল রমলা তখনও করল অস্বীকার। বল্‌ল, শিল্পী না ছাই! এব্‌ড়ো-খ্যাব্‌ড়ো-করা কিছু মাটীর ঢেলার ওপর কয়েকটা রংয়ের তুলিকে যেমন তেমন করে টানলেই যদি শিল্পী হ'ত তবে আর কথা ছিল না।

শুনে হেসেছিল রমেন। হেসেছিল বাইরে। কিন্তু বাহ্যিক ঐ হাসির সঙ্গে অন্তর-মনে জাগল জিদ্, করল প্রতিজ্ঞা।

সেবারে দেশের বাড়ীতেই একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'য়েছিল। প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ চৌধুরীবাড়ীর বাগান-বাড়ীখানা হেসে উঠল বিভিন্ন শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যে। রকমারি জিনিষ। মাটীর থালায় মাটীর সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা। —কে বলবে আঙুরের থোবাটা মাটীর! আর গ্রামের বুড়ো ঠাকুমাদের সূচের কি সূক্ষ্ম কাজ! পাড়ের সুতো দিয়ে কাঁথার চারপাশে এঁকেছে রকমারী কল্কা। ভেতরের জমীনে দেখান হ'য়েছে বাঘেমোষে লড়াই। কারোর বা হাতের সাক্ষ্য মাটীর সেলাই কল। এ-সবই দেখবার মতো সন্দেহ নেই। তা' সত্ত্বেও মেলার জনতা একমুখী হ'য়ে ভেঙে পড়েছিল বৌদ্ধমূর্তির কাছে। গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীর-ও নয়, বুদ্ধদেব বোধিদ্রুম মূলে উপবিষ্টও নয়, তবুও শূন্য-পটভূমিকায় ভগবান বুদ্ধের সে কি জীবন্ত মূর্তি! যেন সিদ্ধিলাভ করলেন তক্ষুণি। সাধনার সিদ্ধিতে অন্তরের আনন্দ-বন্যা ভগবান তথাগতের কমনীয় কান্তিকে করেছিল আরো জ্যোতিষ্মান! যে তাকাচ্ছিল ঐ মূর্তির দিকে সে-ই পারছিল না চোখ তুলতে। দেখছে তো দেখছেই!

মূর্তিটী যখন প্রথম তৈরী করতে সুরু করে রমেন, রমলা গিয়ে রোজ দেখত। রোজই বলত, যা' হবে আমি আগেই বলে দিতে পারি।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন শুনেও কিছু উত্তর করেনি রমেন। সেদিনও উত্তর দেবে না বলেই ভেবেছিল। তবুও কেন জানি জিজ্ঞেস্ করল—কি?

যেন উত্তরটাও আগে থেকে তৈরী ছিল রমলার। বল্‌ল, শিব গড়তে বাঁদর।

রেগে জ্বলে উঠল রমেন।—বল্‌ল, যাও তুমি—দূর হও।

অভিমানে আহত হ'য়ে নয়, মুখে আলতো হাসি নিয়ে রমলা বল্‌ল, দূর হ'য়ে যাবো?—ঠিক বলছ?

হ্যাঁ যাও—চাইনা তোমার মতো সমালোচক।

বেশ দূর হচ্ছি। কিন্তু শিব গড়তে যে বাঁদর হবে দূরে থেকেও সে-কথাই আমি বলব।

আরো রেগে উঠল রমেন। তাতেই তা'র প্রতিজ্ঞায় পড়ল আরো শক্ত বাঁধন। সাধনায় চাইল সিদ্ধি।

রমলার মতো আমিও মূর্তি গড়া দেখতে যেতাম রোজ। কোনদিন সামনে দাঁড়িয়ে, কোনদিন লুকিয়ে। পাছে আমার উপস্থিতিতে ওর সাধনায় অসুবিধা হয় তা' মনে করেই আমার ঐ চুপিসাড়ে দেখা।

একদিন দেখলাম, মনের মতো মূর্তি হয়নি বলে মূর্তিখানা ভেঙে ফেল্‌ল রমেন—যেন ছিঁড়ে উপড়ে ফেল্‌ছে নিজের গা।' নিজের ওপরে নিজের রাগ—কেন গড়তে পারছে না সে। ওদিকে প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছে। মনের মধ্যে বুদ্ধ এসে বসেছে—তা'ক গড়তেই হবে।

মাটীর স্তূপে আবার হাত দিল রমেন। হাতখানা তা'র কাদামাটীতে—মন তার স্থির। সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা।

দ্রুত গতিতে পা' ফেলে দিন এগিয়ে চল্‌ছে প্রদর্শনীর দিনে। মূর্তিখানা গড়া হ'য়েছে তখন, হ'য়েছে রং-করা। বাকী শুধু চোখ। সেটাই আসল। আধফোটা চোখে চোখের দু'টো তারাকে কল্পনায় সে যেমন দেখছে কিছুতেই পারছে না তেমন করে রূপদান করতে। তুলি নিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ মূর্তির সামনে। একবার তুলিটা ছোঁয়াল মূর্তির চোখে আবার আনল ফিরিয়ে। তারপর বসে থাকল চুপ করে। থাকল চোখ বুজে।

সময় বসে থাকছে না। মাত্র একটী দিন বাকী। পরের দিন সকালে প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

শেষ দিন। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশের আঙিনায় বসে রক্ত চোখে সূর্যদেব দেখ্‌ছে সে-আয়োজন। তা'র চোখের রশ্মি লালিমা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে গাছের মাথায় মাথায়, জানলার ফাঁকে ফাঁকে এসে মেঝের বুকে। রমেনের ঘরখানিও রক্তিম।

জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই রমেন যেন নূতন করে পাগল হ'য়ে উঠল, আর সময় নেই। তুলিতে আবার হাত দিল রমেন। কঠিন পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সে? সারাজীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দেওয়ার সময় যেন আগত ঐ। এর সিদ্ধির জন্যেই সারাদিন স্নান হয়নি রমেনের, হয়নি খাওয়া। কিন্তু ক্ষুধা যে কি অন্ততঃ সেদিন সে-বোধই ছিল না তা'র। তা'র বুভুক্ষু অন্তর শুধু

চেয়েছিল, বুদ্ধের চোখ দু'টী ফুটিয়ে তারই কৃতকার্যতার তৃপ্তিধারায় পান-পাত্র পূর্ণ করে আকণ্ঠ পান করতে। কিন্তু হাতে তুলি নিলেই যে আঁকা যায় না সে-সত্যই প্রমাণিত হ'ল আবার। তখন নিজের ওপর নিজের ঘৃণা, নিজের কাছে নিজের লজ্জা। মূর্তি না হ'লে লোকে কি ভাববে? —কি মনে করবে রমলা?…শিব গড়তে…না…না ও ভাবতে পারে না সে। রমেনের মনের অবস্থা তখন একটা ক্ষ্যাপা পাগোলের মতো। একবার একটু টান্‌ছে তুলি—একটু তাকিয়ে দেখে মুছে ফেলছে তা'। আবার আঁকছে, আবার মুছে ফেলছে। হচ্ছেনা, কিছুতেই হচ্ছে না ঠিক। এমন করে আঁকা আর মোছার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তা'র। রাগে তখন সব তুলিগুলো ফেলে দিল মেঝেতে, রংয়ের বাটীগুলো ফেল্‌ল ছুঁড়ে। তারই ঝন্ ঝন্ শব্দ তার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে রমেনের ব্যর্থতা ঘোষণা করে মিশে গেল নীরবতায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে রমেন গেল বাগানে। সেখানে বসন্তের আসর—প্রকৃতির প্রাণ খোলা হাসি। গাছে গাছে কচিপাতা। তারই আড়ালে লুকিয়ে কোকিল ডাকছে কুহু-কুহু। কান পেতে শুনল রমেন। তাকাল এদিক-ওদিক। দেখতে চাইল কোকিলকে। সন্ধ্যার আঁধারে কোকিল লুকাল।

সময় তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু রমেন তখনও অনেক দূরে। সাম্‌নেই সাফল্য বা অসাফল্য। প্রাণে আর মনে সাধকের পবিত্র মন নিয়ে আবার এসে তুলি হাতে নিল রমেন।—অধীর প্রতীক্ষায় রইল শুভ মুহূর্তটীর জন্যে—একটী মুহূর্তে শুধু তুলির একটী টান দিতে। সে-শুভলগ্ন কি আসবে না? না এলেই যে নয়!

ভোর হ'য়ে এসেছে প্রায়। আঁধারের দুয়ার ভেঙ্গে আলোর আগমন। পাখীরা কুলায় বসে গাইছে প্রভাত বন্দনা। কাকলি কানে গেল না রমেনের। সে শুধু আকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল কখন তা'র অচল হাতখানি হবে সচল, কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা তা'র হাতখানিকে দেবে এগিয়ে। সে যে কি মুহূর্ত! সে মুহূর্তটীই তো তা'কে পরিয়ে দেবে জয়ের মালা।

পূবের আকাশে তখন উষার উঁকিঝুঁকি। দিগন্ত-বিসারী নীলনভের বুকে দেখা দিয়েছে কাঞ্চন রেখা। কি যে যোগাযোগ ছিল রমেনের মনের সঙ্গে ঐ সূর্য ওঠার কে জানে! একটা রেখা পড়ল পূব আকাশের বুকে, আর ঠিক সেই-সময়েই তুলির রেখা টানল রমেন।

রমলা কিন্তু সত্যি তখন জয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছিল রমেনের গলায়—বনফুল আর মনোফুলের মালা। হেসে হেসে বলেছিল, অমন করে তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছিলেম বলেই তোমার এই কৃতিত্ব।

* * *

কৈশোরের ঘন সান্নিধ্যের পর, যৌবনে রমলার বে-হিসেবী কথায় আর তারই দেওয়া মালাতে রমেন গুরুত্ব দিয়েছিল অনেক। সে-কারণেই রমেন যে আঘাত পেয়েছে তা'তে গভীরতা বেশী, শিল্পীর কোমল মন পেয়ে বেদনার বিষ বেশী করে ছড়াল। তাতেই জর্জরিত রমেন। ভাবে, বনফুলের মালা শুকিয়ে যায়ই, কিন্তু রমলার মন-ফুলের মালা শুকিয়ে গেল কি করে? কি করে পারল রমলা! তখনও ভাবতে ভাবতে রমলাকেই দেখে সে, দেখে বিভিন্নরূপে, বিভিন্ন চেহারায়। রমলাকে দেখতে গিয়েই পথ চলতে সে আনমনা। তা'র সাধনা ব্যথার আঘাতে উদাসী! জীবন ছন্নছাড়া!!

* * *

অনেক বছর পরে রমেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। এক সঙ্গে বসে খাব বলে নিমন্ত্রণ করেছিলাম ওকে। তাই পরে যেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলো রমেন, সেদিন নিষ্ঠুরভাবেই তা'কে আক্রমণ করে বল্‌লাম, দেখ্ রমেন! শিল্পীর পক্ষে এমন মুষ্‌ড়ে পড়া উচিত নয়।

জানি।—তবুও মনে পড়ে…। ভুলতে গেলে আরো বেশী করে মনে পড়ে রমলাকে, জানাল রমেন।

তোর মুখে এমন কথা মানায় না। শিল্পী কাঁদবে কেন? সে অপরকে কাঁদাবে।

এ যুক্তি আমি অস্বীকার করি না।

কি করে করবি! শিল্পী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো। সেখানে রমলা কেন, বিশ্ব প্রতারণা করলেও তা'র কি এসে যায়!

একটু অবাক হ'য়ে যেন রমেন শুনছিল আমার কথা। তা'র একখানি হাত ধরে বললাম,—তোর মনের মাঝে এমন কতো রমলা সৃষ্টি করে নিতে পারিস্ না?

আরো যেন বিস্মিত হ'ল রমেন।—তবুও আমার যা' বলার সে-সুযোগেই বললাম, গ্রামের সকলেই তোকে শিল্পী বলে জানে। তোর কাছ থেকে আশাও করে অনেক। এখন দেখছি রমলাই সেখানে তোকে বাধা দিচ্ছে। সুতরাং তুই না করলেও রমলাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, চিরকাল ঘৃণা করব।

আমার এতোগুলো কথার মধ্যে কোন্ কথাটা যে রমেনের অন্তর ছুঁয়েছিল তা' সে-ই জানে। দেখলাম, মেঘমেদুর বরষার কালো মিশ্‌মিশে আকাশে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল এক চমকে।—অনেকটা সম্বিত ফিরে আসার মতো। বুঝলাম, একটু ছোঁয়া, একটু আঁচড়্—একটু কথা এ নিয়েই তো শিল্পীর জীবন।

* * *

ঠিক এক বছর পরে। এর মাঝে রমেনের আর কোন খবর পাইনি। জানি দিল্লীতেই থাকে। কিন্তু কেমন আছে তা' নিয়ে ভেবেছি। একটা দুর্বল মন কেন জানি না, বারে বারে ঘুরে যেত ওর কাছেই, ছুটে যেত কোথায় থাকে রমলা তা'কে খুঁজতে। রমলাকে পেলে, তাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। তবুও বলতাম, এমন করে কেন ব্যর্থ করে দিলে একটা শিল্পী জীবনকে ?—কেন বঞ্চিত করলে দেশকে ?

কিন্তু কোথায় থাকে সে ! রমেনের সাধনার সহায়তাকারিণী, তা'র কল্পনার উৎস, তা'র প্রেরণা, কোথা কার ঘরে গিয়ে হ'য়তো রয়েছে অকর্মা গৃহিণীরূপে—সেখানে হয়তো কোন মূল্যই নেই রমলার !—শুধুই বধূ শুধুই ঘরণী !!

এমন সময়েই একদিন খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থেমে গেলাম হঠাৎ। মৃৎশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ছাপা হ'য়েছে খবরের কাগজে।

কাগজে বড় করে হেডিং, আর্টিস্টি হাউসে মৃৎশিল্প-প্রদর্শনী।—শিল্পী রমেন আচার্যের অপূর্ব শিল্প নিদর্শন।

মনে এখন খুশীর বন্যা। চোখে উৎসাহ। রমেন গড়েছে 'ছেলে কোলে মা'। মা আর ছেলের মিলনের আনন্দে মূর্তির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।—এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। পড়লাম, রমেনের শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা।

সন্ধ্যার পরে রমেন এল আমার কাছে। দেখে তো অবাক ! সকালে কাগজ পড়ার পর থেকে সারাদিন ওর কথাই ভাবছিলাম। সারা মুখে হাসি, আর বুকভরা অভিনন্দন নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

রমেনও কিন্তু দিব্যি নূতন রমেন। প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলল, শিল্প প্রদর্শনীতে আমি প্রথম হ'য়েছি—এজন্যে সব কৃতিত্ব তোর, তাই অভিনন্দন জানাতে এসেছি তোকেই !

নূতন-জগৎ

জয়ন্ত রায়চৌধুরী

মুমূর্ষু পৃথিবী আজি কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে
হাইড্রোজেন বোমার হুংকার শুনি দিকে দিকে
রুশ ও মার্কিণে মোহড়া চলেছে আজি
শক্তি পরীক্ষার :
স্থবির ইংরাজ, নিদ্রালু ফরাসী নিষ্ফলেতে করে আস্ফালন,
ভীরু তাঁবেদার দল ঘোরে আজি ভিক্ষা-ঝুলি হাতে।
দুর্বলেরা শান্তির মুখর বুলি নিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে
দেশে দেশে ফেরে
বান্দুঙের বার্ত্তা বুঝি হয় রে বান্‌চাল !
পঞ্চশীল পায় বুঝি পঞ্চত্বে বিলয়—
বিউগল উঠুক বাজি পুন
হোক পৃথিবীর বুকে হিরোসিমার পুনরভিনয়-
উনো-ন্যাটো-সিয়াটোর হোক অবসান ;
বোমার বর্ষণে ধুয়ে যাক পঙ্কিল সভ্যতা।
চিরতরে পাপ মুক্ত হোক বসুন্ধরা :
গড়িয়া উঠুক প্রেমময় নূতন জগৎ !

অতিমন

শ্রীপ্রিয়নাথ কুণ্ডু

সাফল্য লাভে কর্ম-পারগতা অপরিহার্য্য। কার্যে পরিণত ক'রার ক্ষমতার অভাবে সকল রকম পরিকল্পনাই নিষ্ক্রিয় ও অব্যবহার্য।

জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে কার্যসম্পাদনের উপযোগী করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিলে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা যায় না। শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার পূর্বে জ্ঞান ও প্রচেষ্টাকে শুধু অন্তর্নিহিত পারগতা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাদের দ্বারাই পারগতায় সৃষ্টি করা যায়। যখন কোন নির্দিষ্ট বা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যসাধনের উপযোগী করিয়া ইহাদিগকে বিশেষ প্রকারে সুসংবদ্ধ করা যায় তখনই ইহারা পারগতার সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে কোন আধুনিক গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান ও নানা বিষয়ের তথ্যপূর্ণ পুস্তক ও লিপি বিদ্যমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অবস্থিত এই জ্ঞান ও তথ্য, পারগতা নহে—যদিও এই জ্ঞান ও তথ্যের সাহায্যে পারগতার সৃষ্টি করা যায়। দামোদর নদের জলে, বৃহৎ শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু শুধু এই জলকে পারগতা বলা যায় না। যখন উহা উপযুক্তভাবে শৃঙ্খলিত হয় তখন উহা নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং উহার ঐ সুসংবদ্ধ অবস্থাকেই পারগতা বলে।

এই কর্মপারগতার মূল উৎস তিনটী :—

(ক) সর্বশক্তির, সর্ববস্তুর ও সর্ববিষয়ের, উৎপত্তির মূল সর্বস্বরূপ ঈশ্বর। প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে আত্মনির্দেশ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবচেতন মনের মাধ্যমে এই অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত সংযোগ স্থাপন করা যায়।

(খ) সঞ্চিত অভিজ্ঞতা :—মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অথবা তাহার সুসংবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় অংশ যে কোন আধুনিক সুসজ্জিত—গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহারই মুখ্য বিষয়সমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(গ। পরীক্ষা ও গবেষণা'—বিজ্ঞান জগতে ও মানবের নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যসমূহ প্রত্যহ সংগৃহীত, সুসংবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ করা হইতেছে। যখন কোন ঈপ্সিত কার্য সম্পাদনে ইতঃপূর্বে সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া যায় না তখন উপযোগী নূতন তথ্য ও উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার সাহায্য লওয়ার আবশ্যক হয়। কারণ সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তি এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত ক্ষেত্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিলে পারগতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু একাকী সকল বিষয়ে এইভাবে অগ্রসর হওয়া সহজ সাধ্য নহে। যদি কাহারও পরিকল্পনা ব্যাপক ও বহুমুখী হয় তাহা কর্মে পরিণত করিতে অন্যের অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

বর্তমান যুগের সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত কৃতিত্ব মনোবিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কৃত সূত্র অতিমনের প্রয়োগে সম্পাদিত হইয়াছে। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোন এক নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ একত্ব বোধের অনুপ্রেরণায় সম্মিলিত হয় তখন যে এক সমষ্টিগত অভিন্ন মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাঁহাকেই অতিমন বলে এবং এইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য শূন্য সম্মেলনকে অতিমন সম্মেলন বলে। অত্যন্ত বিবেচনার সহিত অতিমন সংঘের সভ্য নির্বাচন করা উচিত, কারণ একজন সভ্যেরও যদি সামান্য মাত্রও মতানৈক্য থাকে তবে পরিপূর্ণরূপে মিশণ সম্ভবপর না হওয়ায় অতিমনের সৃষ্টি হয় না।

এ সত্য সকলের নিকটই বিদিত যে কাহারও সহিত সংসর্গ মাত্রই-নিদারুণ বিরূপতায় মন বিতৃষ্ণ হইয়া ওঠে এবং কাহারও সংস্পর্শে আসিবা-মাত্রই প্রীতির আকর্ষণ অনুভব করা যায়। এই বৈরাচরণ ও প্রীতির আকর্ষণরূপ দুই প্রকার বিপরীত ধর্মী মনোভাবের মধ্যে নানা প্রকারের মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ মন একপ্রকার অজ্ঞাত সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত যাহাকে মনোপদার্থ বলা যাইতে পারে। যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে তখন তাহাদের মনোপদার্থের মিলনে হয়ত এক অজ্ঞাত প্রকারের রাসায়ণিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় যাহার ফলে এক-প্রকার তরঙ্গপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই তরঙ্গপ্রবাহ হয় উভয়ের হৃদয়কে প্রীতির রসে সিক্ত করে, নতুবা বিরোধভাবের দ্বারা উত্তেজিত করে—যাহার ফলে অন্তঃকরণে বিভিন্নরূপ ভাবধারার সৃষ্টি হয় (এমন কি কোন কথা বলার বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশের পূর্বেই)। এইরূপ অনুমানের দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে "প্রথম দর্শনেই প্রেম" শুধু একটী কথায় কথাই নহে।

এইরূপ বিচার বিবেচনার ফলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব ও ঐক্যপূর্ণ মানসিক সংমিশ্রণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অতিমন বিদ্যমান থাকে এবং সামান্যমাত্র মতানৈক্য ঘটিলেই ইহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ইহা সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে অতি-মন সংঘের যদি একজন সভ্যও গোপনে বিরুদ্ধভাব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির আশা পোষণ করে তবে ইহা গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় সুতরাং যদি কোন সভ্যের এইরূপ মনোবৃত্তি ধরা পড়ে—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অতি-মন সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।

সাফল্যলাভে সামগ্রিকভাবে মতৈক্য ও সহযোগিতার আবশ্যকতা প্রত্যেক সেনানায়ক ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক সুবিজ্ঞ অধিনায়কই

জ্ঞাত আছেন। এই প্রকার সামগ্রিক মনোবৃত্তি দুই প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি করা যায়। একটী হইল স্বেচ্ছাকৃত অথবা বল প্রয়োগে সাধিত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা—অন্যটী হইল এইরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য পুনঃ পুনঃ সাময়িক সম্মেলন—যাহার ফলে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি বিশেষ প্রকারে সংশোধিত হইয়া একটী বিশিষ্ট ও অতিমনের উদ্ভাবন হয়। এইরূপ অতিমন সৃষ্টির সময়ে বিভিন্ন সভ্যের মনোপদার্থের অনুকূলভাবে সমন্বয় সাধিত হইয়া এমন একটী তীব্র কর্মপারকতার সৃষ্টি হয় যাহার দ্বারা অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভবপর। যদি অতিমন সংঘের সকল সভ্য সংঘের সামগ্রিক স্বার্থের নিমিত্ত তাহাদের নিজস্ব আশু স্বার্থ ও ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া পরিপূর্ণ ঐক্যবোধের অনুপ্রেরণায় সকলের মনের সংমিশ্রণ সংঘটন করিতে পারে তবে সাধারণ কর্মপারকতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

অতিমন সংস্থার প্রত্যেক সভ্য অন্যান্য সভ্যের অবচেতন মনের সহিত সংযোগ সাধনে ও তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এই নৈপুণ্য প্রকাশ পায় হৃদয়ের দ্রুততর স্পন্দনের উদ্দীপনায়, জীবন্ত অনুমান শক্তির বিকাশে এবং তথাকথিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিতে। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অনাবিষ্কৃত ভাবধারা মনে সহসা বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহার উপর আধিপত্য বিস্তারকারী আকৃতি ও প্রকৃতি গ্রহণ করে। অতিমন সংঘের সভ্যগণ তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযোগী কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য যখন সকলে একত্র সমবেত হয় তখন ঐ সম্বন্ধীয় একই শ্রেণীর ভাবধারা, যেন বাহিরের কোন অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তড়িৎ চুম্বকের উপর লৌহ কনিকাসমূহের ন্যায় তাহাদের সকলের মনের উপর এক যোগে বর্ষিত হইতে থাকে।

একটী পরিবাহী তারের সহিত বহু তড়িৎ কোষ সংগ্রথিত করার কার্যের সহিত অতিমনরূপে বর্ণিত বিভিন্নমনের এই সংমিশ্রণকে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটী বিদ্যুৎ কোষ যেমন সংযুক্ত হইবার সময়ে ঐ তারের ভিতর দিয়া চালিত কর্মপারকতাকে বৃদ্ধি করে তেমনি অতিমন সৃষ্টিতে প্রত্যেকটী মন যুক্ত হইবার সময়ে ঐ সংস্থার সমষ্টিগত কর্ম পারগতাকে মনোপদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এত শক্তিশালী করে যে পরিশেষে ইহা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমস্ত শক্তির আধার স্বরূপ ভগবানের সহিত সংযোগস্থাপন করে।

মানুষের সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত তিনটী গুরুত্ববিশিষ্ট প্রবর্তনকারী শক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল।

১। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি

২। যৌন মিলনের প্রবৃত্তি

৩। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তি।

এক কথায় আত্মরক্ষা, যৌনমিলন ও অর্থাকাঙ্ক্ষাই কর্মে প্রণোদিত করে। সুতরাং অনুগামীদিগের দ্বারা আগ্রহ সহকারে কার্য সম্পাদিত করাইতে হইলে এক বা একাধিক এই প্রবর্তনকারী শক্তির প্রয়োগ করা নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। মানুষকে সম্পূর্ণ ঐক্য বোধের অনুপ্রেরণায় সহযোগিতা করিতে প্রণোদিত করার পরিমাণ নির্ভর করে প্রবর্তনকারী শক্তির পরিমাণের উপর। যখন প্রবর্তনকারী শক্তি এরূপ তীব্র হয় যে সংস্থার প্রত্যেক সভ্য তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কেবল মাত্র সংস্থার সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য কিংবা লোকহিতকর কোন আদর্শের জন্যই কার্যকরে শুধু তখনই অতিমন প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, পরিপূর্ণ একত্ব বোধের সৃষ্টি হয়।

আমাদের এ কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে আমরা যে প্রকৃতির কর্ম করিতে আনন্দ অনুভব করি শুধু সেই প্রকৃতির কর্মই আমরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। সুতরাং সফলকাম হইতে হইলে নেতার পরিকল্পনার অংশসমূহ তাহার অনুগামীগণের মধ্যে এরূপ ভাবে বণ্টন করা কর্তব্য যে প্রত্যেকেই এই সূত্র অনুসারে তাহার প্রকৃতির অনুকূল ও আনন্দদায়ক কর্ম করিতে সুযোগ পায়; বিশেষতঃ সংস্থার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে এইরূপ ব্যক্তিবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য যাহাদের মন তীব্র প্রবর্তনকারী শক্তির প্রভাবে প্রীতিপূর্ণ একত্ববোধের অনুভূতিতে মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাই হইল অতি মন সূত্রের মর্মার্থ। অপরের পরিপূর্ণ সহযোগিতায় সম্যকরূপে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই মঙ্গলকর সূত্রের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া কর্মপথে অগ্রসর হওয়া সকল প্রকার উন্নতিকামীর পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।

ভারত বিভাগ দ্বারা পাকিস্থান সৃষ্টি, এই মহান সূত্রের প্রয়োগে বর্তমান যুগে অসামান্য সফলতা লাভের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রতিভাশালী নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার, প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণের মনে একটী আদর্শ মুসলমানী রাষ্ট্রে আত্মরক্ষা এবং আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা রূপ দুইটী প্রবর্তনকারী শক্তির সঞ্চারণ দ্বারা সামগ্রিকভাবে অতিমন সৃষ্টির নৈপুণ্যই অবশেষে পাকিস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছিল।

ব্যক্তিগত উন্নতি লাভের জন্য আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, শিক্ষক ও অন্যান্য উপদেষ্টার সহিত অতি মন মৈত্রী গঠনের বিষয় এখন আলোচনা করা হইবে। যাহারা সহানুভূতিশীল, মঙ্গলকামী ও মৈত্রীগঠনকারীর উন্নতিতে আনন্দিত হয় শুধু তাহাদেরই সহিত এই সংযোগ স্থাপন করা উচিত। ব্যক্তিগত সাফল্য লাভের পক্ষে ছয় কিংবা সাত জনের মধ্যে অতিমন মৈত্রী বন্ধনেই সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। বিবাহিত হইলে, মনোবৃত্ত্যানুসারিণী, প্রেমময়ী ভার্য্যাকেই এ বিষয়ে সর্বপ্রথমে মনোনীত করা উচিত। মাতা, ভগ্নী, পিতা, ভ্রাতা, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, সহৃদয় শিক্ষক ও উপদেষ্টা এই সংস্থার সভ্য মনোনীত হইবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কি উদ্দেশ্যে একটী বিশেষ অতিমন সংস্থা গঠিত হইয়াছে তাহার প্রকৃতি প্রত্যেক সভ্যেরই সম্যকরূপে অবগত থাকা এবং উদ্যোক্তার প্রধান লক্ষ্যের বর্ণনায় স্বাক্ষর করা অবশ্য কর্তব্য। এই সংস্থার সভ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রধান উদ্দেশ্যের বিষয় ব্যক্ত করা কখনও উচিত নহে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ সর্বদাই প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হওয়া উচিৎ। গীতার একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক এই ভাবই সমর্থন করে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অতিমন মৈত্রী গঠিত হইলে প্রত্যেক সভ্যেরই কর্তব্য সুবিধা পাইলেই গঠনকারীকে উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উদ্দীপিত করা ও সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিক ভাবে সাহায্য করা। গঠনকারীরও কর্তব্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে অতিমন সংস্থার সভ্যবৃন্দের সভা আহ্বান করিয়া তাহারা সাফল্য লাভের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং অগ্রসর হইবার সময়ে কোনরূপ জটিলতার ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করা। যদি কখনও বুঝিতে পারা যায় কোন সভ্য অতিমন সূত্রে বিশ্বাস হারাইয়াছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ সংস্থা হইতে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য।

হেন্‌রী ফোর্ডের সুবিখ্যাত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করা হইতেছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও অন্যান্য নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিলেও তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে অতিমন সূত্রে ও ফলিত মনোবিজ্ঞানের আরও কয়েকটী সূত্রের প্রয়োগে উজ্জ্বল সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি প্রেমময়ী স্ত্রীর সহিত অতিমন মৈত্রী গঠন করিয়াছিলেন। একটী যন্ত্র মেরামতের সাধারণ কারখানায় সামান্য মিস্ত্রীরূপে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর নিজের বাসায় প্রতি রাত্রে স্ত্রীর উদ্দীপনাময় সহযোগিতায় নিজের প্রস্তুত ত্রুটীবহুল ও অসম্পূর্ণ পেট্রল ইঞ্জিনকে চালিত করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। চক্ষুতে ঔষধ প্রয়োগের অতি সাধারণ বিন্দুপাতকের সাহায্যে স্ত্রী ঐ ইঞ্জিনে বিন্দু বিন্দু তৈল পাতন করিতেন এবং স্বামী স্বকৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদনকারী যন্ত্র পরিচালিত করিয়া ঐ তৈল বাষ্প প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইত কিন্তু উভয়েই সাফল্যের আশায় বিভোর থাকায় কোনরূপ অবসাদ বা বিরক্তি অনুভব করিতেন না। দীর্ঘ দিন এইভাবে কাষ করার ফল স্বরূপ অবশেষে এক রাত্রে তৈল বাষ্প প্রজ্বলিত হইলে ইঞ্জিনের গতিচক্র ঘূর্ণায়মান হইল। একটী দম্পতির একটী নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উভয়ের মধ্যে অতিমন মৈত্রী সংগঠন ভিন্ন এই প্রাথমিক সাফল্য লাভের পশ্চাতে আর কিছু ছিল না। এই শ্রমসাধ্য গবেষণামূলক পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বা আশু অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ভবিষ্যতের আশায় এই অশিক্ষিত কারিগর শুধু পারিশ্রমিকের অতি রক্ত কাষ করার অভ্যাস নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তাহারই ফল স্বরূপ একটী ত্রুটীপূর্ণ নমুনাকে দোষমুক্ত করিয়া আমেরিকায় সর্বপ্রথম স্বয়ংচলিত শকট প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর কয়েকজন সুদক্ষ কারিগর ও যাহারা অংশ স্বরূপ সামান্য মূলধন প্রদান করিয়াছিলেন এমন কয়েকজন বন্ধুদের মধ্যে এই অতিমন মৈত্রী প্রসারিত করিয়াছিলেন।

এই মটর গাড়ী প্রস্তুতের পর প্রথম দশ বৎসর তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সাফল্য তাঁহার নিকট শীঘ্র বা হঠাৎ উদিত হয় নাই, যদিও তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে দূরে একটু চক্ চক্ করিতেছিল। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা টমাস এ, এডিসনের বন্ধুত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই দিন হইতেই তিনি সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। অবশেষ তাঁহার অপূর্ব কীর্তিময় কাষ সম্পাদনা সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে দিন হইতে তিনি হার্ভে ফায়ারষ্টোন, জন বারোজ এবং লুথার বারব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রভূত মননশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের চিন্তা তরঙ্গ নিজ মনে শোষিত করিয়া তাহাদের ধীশক্তি, অভিজ্ঞতা ও নৈতিক শক্তির সারাংশ দ্বারা নিজের কর্মপারদর্শিতা সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলস্বরূপ তিনি নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার মটর শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার অতিমন মৈত্রীর সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার বিস্তীর্ণ শিল্পের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে অসংখ্য কারিগর, যন্ত্রবিদ, রাসায়নিক, গবেষক, আর্থিক উপদেষ্টা এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তিবর্গকে এই মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল স্থায়ী আছে এবং আরও দীর্ঘদিন বর্তমান থাকিবে কারণ ইহার সংস্পর্শে যাহারা আসে তাহারাই উপকৃত হয়। ফোর্ডের অতিমন সূত্রের প্রয়োগের উপরই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল কারণ সমগ্র শিল্প জগতের ইতিহাসে তাঁহার কৃতিত্ব অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত কেহই এ পর্যন্ত দেখাইতে সক্ষম হন নাই। কি মহান দৃষ্টান্ত!

সর্বশেষে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যাহাদের উপর অতিমন-মৈত্রী ক্রিয়া করিবে তাহারা সকলেই ইহার দ্বারা উপকৃত না হইলে বা ইহার ক্রিয়ায় কেহ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইলে উহা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অতিমন মৈত্রী গঠন করিবার পূর্বে উহা গঠনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যদি এইরূপ মৈত্রী গঠনের শেষ ফল স্বরূপ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষরূপে পীড়িত বা বিপদগ্রস্ত হয় তবে ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে যতই শক্তিশালী বা সুদূরপ্রসারী হউক না কেন ইহা নিশ্চয়ই ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং ইহার উদ্যোক্তা ও গঠনকারীগণ পরিশেষে চরম দণ্ড ভোগ করিয়া এই নীতিবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবে। হিটলার ও মুসোলিনী তাহাদের অনুগামীদিগের সহিত এই সত্য সম্যকরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্য সঙ্গীতে রাগ "নট-নারায়ণ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

নট-নারায়ণ রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাগ কাহাকে বলে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। যদিও এ সম্বন্ধে "আর্য্য সঙ্গীতে ছয় রাগ" আলোচনাকালীন বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তদ্ব্যতীত রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে এই রাগটী সম্পূর্ণ ভাবে বোধগম্য হইবে না।

যখন স্বাভাবিক অবস্থায় বিকার ঘটে তখন রাগ উৎপন্ন হয়। স্বভাব অর্থে যাহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখাদির মূল কারণ তাহাই স্বভাব। স্ব অর্থে আত্ম। সুতরাং আত্মগত ভাবই স্বভাব। এই স্বভাবই ব্যাপকাপ্য জীব ও ব্যাপকাপ্য ঈশ্বর। অর্থাৎ আধার ও আধেয় রূপে জীব ও ঈশ্বর। এই স্বভাবই সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান করে। সুতরাং স্বভাবই কারণ তদ্ব্যতীত সমুদায় কার্য্য। পাপ ও পুণ্য যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও একত্রে বাস করে তদ্রূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড়দেহে নিবদ্ধ। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন। জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয় বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। প্রশ্ন উঠে স্বভাব যদি এক হয়, তবে ইহার বিকার পরিদৃশ্যমান হয় কি করিয়া। অগ্নি হেতু এই বিকার পরিদৃশ্যমান। এই অগ্নি সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান। বিষয় অর্থে "গ্রহণেন গ্রাহ্যো যথা ব্যবহ্রিয়তে স বিষয়ঃ"। বিষয় কথাটী বি—সি—অন্ ক্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সি ধাতু অর্থে বন্ধন। যাহা আত্মাকে মোহপাশে বন্ধন করে তাহাই বিষয়। গ্রাহ্য ও গ্রহণের সম্পর্ক ফল হইল বিষয়। কাজেই অগ্নি হেতু বিষয় জ্ঞান। অগ্নি সোমাত্মক সৃষ্টি। ইহাই শিবশক্তির কার্য্য। "শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধা শক্তি সোমামৃতেন সঃ।" শিব দগ্ধ করেন এবং শক্তি অমৃত বর্ষণ করিয়া নব প্রাণে সঞ্জীবিত করেন। জীবের মূলাধারে শিব রূপ অগ্নি অবস্থিত এবং সহস্রারে সোমরূপী চন্দ্র। চন্দ্র সোমরস ক্ষরণ করিয়া শিবরূপী অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। এই হেতু জীব দেহ ধারণ করে। অগ্নি গতি দান করিয়া রতি শক্তি প্রদান করে। অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে জীব বিষয়ে রত হয় তাহাই রতি শক্তি। রতি অর্থে অনুরাগ অর্থাৎ আসক্তি।

রাগ অগ্নি স্বরূপ। রাগ কথাটী রঞ্জ্—ঘঞ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। রঞ্জ্ অর্থে রং করা অর্থাৎ চিত্ত বিনোদন করা। যাহা মনের শান্ত অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উদ্ভব করে তাহাই রাগ। যখন দেহস্থ বায়ু সহায়ে মনের বিকার সাধন করে তখন রাগ উৎপন্ন হয়। এই রাগ জীবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী উদ্দীপ্ত হয়। অন্তঃকরণ রাগের অধীনে শরীরস্থ বায়ুকে সঞ্চারণ করে। সেই কারণ রাগ উদ্দীপ্ত অগ্নি স্বরূপ। রাগ হেতু দেবাদিদেবের পঞ্চ বদন।

বশিষ্ঠ পুত্র কশ্যপ, প্রাণ পুত্র প্রাণ ও অঙ্গিরা পুত্র চ্যবন ও ত্রিসুর্ব্বচার তপস্যায় পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব পঞ্চতেজ উৎপন্ন হয়। বৃহজ্জাবাল উপনিষদে উক্ত আছে যে উহারাই পঞ্চাননের পঞ্চ বদন। এই পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চবর্ণ হইল পঞ্চরাগ।

সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরবর্ণ বিশিষ্ট ধ্বনি ভেদ হেতু যাহা সকলের চিত্তকে রঞ্জন করে তাহাই রাগ নামে অভিহিত হয়। "রঞ্জয়তীতি রাগঃ"। প্রশ্ন উঠে "রঞ্জয়তীতি" যদি রাগ, তবে রাগিনী হইল কি করিয়া। স্ত্রীলোক যেমন সুন্দর সুশ্রী, পুরুষও তদ্রূপ সুন্দর সুশ্রী হয়। এই সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও যেমন তাহাদের প্রভেদ সেইরূপ রাগ ও রাগিনীর মধ্যে প্রভেদ। রঞ্জন যদিও উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু সেই রঞ্জনের প্রকারান্তর ভেদ আছে। রূঢ়ত্ব হেতু পুরুষ বাচ্য প্রাপ্ত। রাগের এই রূঢ়ত্ব সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্নাকর বলেন —

"অশ্বকর্ণবৎ রূঢ়ো যৌগিকো বা মণ্ডবৎ।
যোগরূঢ় অথ বা রাগো জ্ঞেয় পঙ্কজ শব্দবৎ॥"

শালবৃক্ষ যেমন রূঢ়, যোগস্থ ব্যক্তি যেমন সাবলীলতাহীন, মণ্ড দণ্ড যেমন শোভাহীন এবং কর্দ্দমযুক্ত স্থানের ধ্বনি যেমন মধুরতাহীন সেইরূপ রাগও রূঢ়। এই কারণ হেতু রাগ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত।

আর্য্য সঙ্গীত শ্রুতির বিশেষ বণ্টনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহা রাগ ও যেখানে মধ্যম বা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল তাহাই রাগিণী।

রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন যে শিবশক্তির মিলনে ছয় রাগ উৎপন্ন। পঞ্চাননের পঞ্চ বদন অগ্নির পঞ্চ শিখা। এই পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চ রাগ। শিব হইল নাদরূপী শব্দ ব্রহ্ম। নাদ অগ্নিরূপী।

"ন কারং প্রাণনামানং দ কারং অনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোভিধীয়তে।"

ন কার হইল প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ও দ-কার হইল অগ্নি। অর্থাৎ দেহস্থ অনল ও অনিলের মিশ্রণে নাদরূপে প্রকাশিত হয়। এই অগ্নি হইল কামকলা রূপাকুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনী শক্তি মানবদেহের মেরুদণ্ডে অবস্থিত। মেরুদণ্ডই পঞ্চভূতের আধার স্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ ধারণ করে এবং তাহাদের জ্ঞানের সহায় মস্তিষ্ককেও ধারণ করে। জ্ঞান দেবতা শিব পরশু দ্বারা অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন করেন। এই কারণ পঞ্চাননের পঞ্চ বদন হইতে পঞ্চ রাগ ও দেবীর মুখকমল হইতে এক। এই সর্ব্ব সাকুল্যে ছয় রাগ। অর্থাৎ শিব শক্তি সহায়ে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর উদ্ভব। ভূতনাথের পঞ্চ তত্ত্ব এবং মহামায়ার চিৎশক্তি এই ষড়াঙ্গ হেতু ছয় রাগ।

"সন্থোজাতাচ্চ শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসান্তকঃ।
অঘোরাদ্ভৈরবোভূত্তৎ পরুষাৎ পঞ্চমোভবেৎ॥
ঈশানাক্ষ্যান্মেঘ রাগঃ নট্যারম্ভে শিবাদ্ভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্তে নটনারায়ণোভবেৎ॥"

পৌরাণিক মতে শিবের পঞ্চ বদন হইল—যথা সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান। সদ্যোজাত হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম ও ঈশান হইতে মেঘ রাগ এবং গিরিজায়া হইতে নট নারায়ণ।

পুরাণ বলে যে অগ্নি দুঃখিত লোকের মঙ্গল সাধন করে তাহাই শিব। অঙ্গিরা কন্যা শিনিবালি অতিশয় তনুত্ব প্রযুক্ত রতি শক্তি প্রদান করে। তনু শব্দটী তন্ (বিস্তার করা) উ ক্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। অর্থাৎ যিনি বিস্তার করেন। প্রকৃতি শক্তিই জীবের বিস্তারের কারণ। অগ্নি যখন বায়ু সহায়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তখন তাহাকে শুচি নামে অভিহিত করা হয়। অনিল ও অনল সংযোগে নাদের উৎপত্তি। কালচক্রে মিথুন রাশির বৈদিক নাম শুচি। মিথুন রাশি হইল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন জ্ঞাপক। মিথুন কথাটী মিথ্ (বধ্ করা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ যাহা পুরুষকে আবরিত করে। প্রকৃতি শক্তির আবরণ হেতু জীবের আত্ম বিস্মরণ। এই মিথুন রাশির অধিপতি হইল আর্দ্রা নক্ষত্র, যাহার দেবতা শিব যিনি জীবকে দুঃখ পাশ হইতে মোচন করেন। এই আর্দ্রা নক্ষত্রের সংখ্যা ছয় অতএব রাগ হইল ছয়। পঞ্চাননের পঞ্চ বদন ও দেবীর মুখ কমল হইতে এক। শিব শক্তি অভেদ।

পরা সম্বিদ যখন অবিদ্যা সহায়ে কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত হয় ও উন্মেষ-রূপিণী হইয়া বিবিধ কল্পনাময় হয় তখন মনরূপে বিরাজ করেন। এই মনই জগতের কর্ত্তা ও হিরণ্য গর্ভ নামক পরম পুরুষ। যখন বিবিধ চিন্তা একতর পক্ষ অবলম্বন করে তখন বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশিত হয়। যখন দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করে ও স্বীয় সত্তা কল্পনা করে তখন অহংকার নামে কল্পিত হয়। কারণ আত্ম অনুভব করিলেই অনাত্মের বোধ উদিত হয়। সেই হেতু অহং ও ইদং জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার উপাধি বিশিষ্ট সম্বিদই ভববন্ধনী নামে কথিত হয়। যখন এই সম্বিদ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা ত্যাগ করত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করে তখন চিত্ত নামে অভিহিত হয়। যখন শরীরাদি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় তখন কর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন কার্য্যকারণ ভাব প্রাপ্ত হয় তখন ক্রিয়া নামে উদাহৃত হয়। যখন বিষয় কল্পনা করে তখন কল্পনা বলে। যখন পদার্থ শক্তি রূপে বিরাজ করে তখন বাসনা বলে। যখন একমাত্র আত্মাই বিরাজমান এই প্রকার জ্ঞান করে তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। যখন দর্শন, স্পর্শন, ভোজন ইত্যাদির দ্বারা জীবরূপী সত্তার আনন্দ বর্দ্ধন করে তখন ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। ইহা যখন সৎ ও অসৎ সত্তার বশীভূত হয় তখন মায়া নামে কথিত হয়। এই সম্বিদ যখন পরম চিৎকে আবরিত করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে দৃশ্যজাল বিস্তার করে তখন প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ নিজেকে অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত ক্রিয়া ও অনন্ত স্থিতিরূপে বিকাশ করে। এই প্রকাশ হইল সত্ত্ব, ক্রিয়া হইল রজঃ ও স্থিতি হইল তম। ইহাই হইল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি গুণময়ী গুণাশ্রয়া।

গিরিজায়া পরম শিবসান্নিধ্যে আনন্দে বিগলিত ও কামোল্লাসে দ্রবীভূত হইয়া নার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সেই নার আশ্রয় করা হেতু নারায়ণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। কূর্ম্ম পুরাণে উক্ত আছে—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণ স্মৃতঃ॥

আপকে নারা বলা হয় এবং এই আপে নব নব তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। নারা কথাটী নর শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। নর শব্দের এক অর্থ তরঙ্গ। সূ অর্থে উৎপন্ন এবং নব অর্থে নূতন। যিনি এই নার আশ্রয় (অয়ন অর্থে আশ্রয়) করিয়া অবস্থিত তিনিই নারায়ণ। এই নারই হইল কারণ বারি। বারি অর্থে আবরণ। যাহা পরম কারণকে আবরিত করে তাহাই কারণ বারি।

গিরিজায়া এই নার রূপ ধারণ করিয়া সেই নার আশ্রয় করত স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে বিরাজমান হেতু নারায়ণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। পরম শিবকে আবরিত করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে দৃশ্যজাল বিস্তার করা হেতু এই রাগটীকে নিগম রাগ বলা হয় এবং রাগটির নামকরণ হয় নট-নারায়ণ।

ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই রাগটী কামাদিপ্রযুক্ত মৈথুনাভিলাষী মধুর অস্ফুট হর্ষোদ্ধ্বনিযুক্ত কম্পন হইতে কামোদক নিঃসৃত ভাব যুক্ত।

"নট-নারায়ণো রাগঃ কাকল্যান্তর রাজিতঃ-
সম্পূর্ণ সততং সত্রি বর্ষাকালেতিবল্লভঃ॥"

—মল্লার্ণবে—

নট-নারায়ণ রাগ কাকলি স্বর দ্বারা ভূষিত ও সম্পূর্ণ জাতীয় অর্থাৎ ইহাতে সপ্ত স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা বর্ষাকালে গেয়। এই রাগে কাকলিস্বরের প্রাধান্য। কাকলিস্বর দুটী—গান্ধার ও নিষাদ। যখন দ্বিশ্রুতি সম্পন্ন স্বর চতুঃশ্রুতিযুক্ত হয় তখন তাহাকে কাকলিস্বর কহে। কাকলি অর্থে মধুর অস্ফুট কূজন অর্থাৎ হর্ষোধ্বনি।

"বিকৃতো ভেদো গান্ধারোনিষাদস্ত্রিচতুঃশ্রুতি।
কৈশিক কাকলিতে চ দ্বৌ ভেদৌ ভবতস্তথা॥"

—সঙ্গীত বিলাস"

গান্ধার ও নিষাদ সাধারণতঃ দ্বি-শ্রুতি সম্পন্ন। তাহারা যখন বিকার প্রাপ্ত হয় তখন তিন বা চার শ্রুতি গ্রহণ করে। যখন ত্রিশ্রুতিক তখন কৈশিক কহে এবং যখন চতুঃশ্রুতিক তখন কাকলি বলে। চতুঃশ্রুতি সম্পন্ন নিষাদ অর্থে নিষাদ কুমুদ্বতী নামক দ্বিতীয় শ্রুতি আশ্রিত ও গান্ধার প্রসারিণী নামক একাদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। তাহা হইলে দেখা যায় যে সপ্ত স্বরের মধ্যে দুইটী স্বরের বিকার

ঘটিতেছে। অর্থাৎ ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল। সেই হেতু ইহা রাগ।

কুমুদ্বতী অর্থে স্ফোটমুখী। অর্থাৎ অন্তঃ ও বহিঃ শক্তি প্রভাবে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত। Secret Doctrine by H. P. Blavatsky.

The last vibration of the seventh eternity thrills through infinitude. The Mother swells expanding from within without like the buds of the lotus."

সপ্তকল্পের শেষ স্পন্দন অসীমের মধ্যে স্ফুরিত। প্রকৃতি শক্তি অন্তঃ ও বহিঃ শক্তি প্রভাবে পদ্ম কোরকের স্থায় স্ফোটমুখী!

সপ্ত স্বরই সপ্ত কল্প এবং সপ্ত স্বরের শেষ স্বরই নিষাদ। এবং তাহাই স্ফুরণমুখী হেতু কাকলিত্ব প্রাপ্ত। এই কারণ হেতু নট-নারায়ণ রাগে নিষাদ বাদী। এই কাকলি নিষাদ স্বরে মধুর রস নিবদ্ধ এবং রাগটীও মধুর রস জ্ঞাপক। ভাবের প্রসারণ নিমিত্ত প্রসারিণী নামক একাদশ শ্রুতিতে গান্ধার। রতি শক্তি হেতু রতিকা নামক সপ্তম শ্রুততে ধৈবত। অস্ফুটধ্বনি হেতু মার্জ্জনী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম স্বর যাহাতে প্রসবৃত্তি শক্তি অবস্থিত এবং পুরুষ ও প্রকৃতির আলাপন নিমিত্ত আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম এবং আবরণ হেতু ছন্দোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ। ছন্দ কথাটী চন্দ অর্থে আচ্ছাদন হইতে উৎপন্ন।

এই রাগের স্বর বিন্যাস কালচক্রে প্রতিভাত করিলে দেখা যায় যে এই রাগে ষড়জ স্বর বৃষ অর্থে বর্ষণ রাশিতে অধিষ্ঠিত এবং ঋষভ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের মিলন স্থলে অবস্থিত। গান্ধার সিংহ অর্থাৎ ভাদ্র মাস জ্ঞাপক স্থানে স্থিত এবং ধৈবত তোয় রাশি অর্থাৎ ধনুরাশি যাহা প্রকৃতি শক্তি জ্ঞাপক তাহা আশ্রিত। এই কারণে ইহা বর্ষাকালে গেয়। বর্ষাকালই পুরুষ প্রকৃতির মিলন কাল।

উপরোক্ত যে ছয়টী ভাব এই রাগ অবলম্বন করিয়া স্থিত তাহা হইতে ছয়টি রাগিণীর উদ্ভব। যথা—

কামোদক হইতে—কামোদী
মৈথুনাভিলাষী হইতে—অভিরী
কাম হেতু—সারঙ্গী
মধুর অস্ফুট ধ্বনি হইতে—কল্যাণী
হর্ষোধ্বনি হইতে—হাম্বিরী
কম্পন হইতে—নাটিকা

ইহাদের আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল।

কার্য্য কারণ বিশ্লেষণ না করিয়া দৈহিক ও বায়বিক শক্তি প্রকাশ দ্বারা সঙ্গীতের শ্রাদ্ধই করা যায় প্রকৃত সঙ্গীত সৃষ্ট করা যায় না। তথা কথিত সঙ্গীত শাস্ত্রবিদদের নিকট সানুনয় আবেদন তাহারা যেন কিছু করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্র সমূহ যাহা বলে দয়া করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধির করিবার প্রয়াস করেন।

কবি-তীর্থ নারীট

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক একটি স্থানের প্রতি এক এক জন মানুষের বিশেষ আকর্ষণ থাকে। সকলেই যেমন তাহার নিজ জন্মভূমি বা পিতৃভূমিকে ভালবাসে তেমনই সেই সূত্রে অন্যান্য সম্পর্কিত স্থানসমূহকেও ভালবাসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জন্মভূমি ও আজীবন বাসভূমি আগড়পাড়া গ্রামকে যেমন ভালবাসি, তেমনিই পিতৃপিতামহের বাসভূমি পানিহাটী গ্রামের প্রতিও আমার আকর্ষণ কম নহে। আগড়পাড়া আমার পিতার মাতুলবংশের বাস স্থান, আর পানিহাটী পিতামহ প্রভৃতির পৈতৃক বাসস্থান। পিতৃদেব মাতুল গৃহেই পালিত হইয়া আজীবন বাস করিয়া গিয়াছেন, আমরা ও সে জন্য তথায় পালিত হইয়াছি। মাতৃভূমির দিক দিয়া তেমনই মাতামহের পৈতৃক বাসভূমি হুগলী জেলার হরিপাল গ্রাম এবং মাতুলের মাতুলবংশের বাসভূমি হাওড়া জেলার নারীট গ্রাম আমার নিকট প্রিয় এবং আদরণীয়। মাতৃদেবীর পিতৃভূমি বা তাঁহার মাতামহের গৃহাদির সহিত কখনই কোন সম্পর্ক হয় নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে সে সকল স্থান দেখিবার ঔৎসুক্য জাগিত। কর্মজীবনে সভাসমিতি উপলক্ষে কয়েকবার হরিপালে গিয়াছি—কিন্তু মাতুলবংশের কেহ না থাকায় সে গৃহের সহিত সম্পর্ক ঘটিয়া উঠে নাই। একবার সে গৃহের অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—গৃহের দ্বার রুদ্ধ—মাতৃদেবীর এক পিতৃব্য-কন্যা (বিধবা ও সন্তানহীনা) তথায় বাস করেন বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে অনুপস্থিত আছেন। আর একবার যাইয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম—মাতার এক জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র তথায় বাস করেন—কিন্তু সে সময়ে অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় থাকায় গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল।

নারীট যাইবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে হইত। কারণ নারীট হাওড়া জেলার একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। তথায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে খ্যাতনামা পণ্ডিত মহামোহপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামের খ্যাতি আরও বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের সুধী-সমাজে মহেশচন্দ্রের পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের মত তিনি ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। খ্যাতনামা কবি স্বর্গত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও নারীটের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে নবকৃষ্ণবাবুর সহিত যৌবনে পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তাঁহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য এম্-এ ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে কর্ম-গ্রহণ করায় তাঁহাদের পরিবারের সহিত সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ও নবকৃষ্ণবাবুর জন্মভূমি ছাড়াও তাঁহাদেরই জ্ঞাতি স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহোদরা আমার মাতামহী—সে জন্যও নারীটের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল না।

শ্রীমান্ গোকুলেশ্বরের আগ্রহে নারীট দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন (১৯৫৩) শনিবার সন্ধ্যায় নারীটে নবকৃষ্ণ পাঠাগারের ও তাহার সহিত স্থানীয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব। ভারতবর্ষে আমার সহকর্মী শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র রায় এম্-এ হাওড়া জেলার অধিবাসী এবং গোকুলেশ্বরের সহপাঠী, গোপাল ও গোকুল উভয়ে একত্র আসিয়া নিমন্ত্রণ জানাইল—ঐ দিন নারীট যাইতে হইবে—আমার অবস্থা—'সেধো ভাত খাবি—না আমি ত হাত ধুয়েই বসে আছি।' কাজেই সম্মতি দিলাম। তীর্থ দর্শনের এ সুযোগ সহজে মেলে না।

যথাকালে ১৩ই জুন শনিবার বেলা দেড়টায় ভারতবর্ষ কার্য্যালয় হইতে নারীট যাত্রা করা হইল। গোপাল ও গোকুল ছাড়াও একজন যাত্রী হইলেন—তিনি বারাকপুরের অধিবাসী, কংগ্রেস সেবক, আমার স্নেহভাজন শ্রীমান তুলসী দাস চট্টোপাধ্যায়। ৪ জনে বাসে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম—ময়দানে যাইবার বাসে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর। শ্রীমান গোপাল অতি-উৎসাহী—তাহার আর বিলম্ব সহিল না—সে তাড়িতাড়ি এক ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। ৪ জনে হাওড়া ময়দানে গিয়া হাজির হইলাম। উচ্চ শ্রেণীর যে কামরায় আমরা ৪ জনে উঠিলাম—সে কামরায় আমাদের পূর্বেই যিনি বসিয়াছিলেন—তিনি ছিলেন—উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক শ্রীহীরালাল রায়—তিনি নারীটের নাম শুনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ গাড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের বয়স্ক শিক্ষার প্রধান পরিচালক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া জেলার বয়স্ক শিক্ষা পরিচালক শ্রীমন্মথনাথ রায়, নারীটের অধিবাসী শ্রীযুত অনুরূপ ভট্টাচার্য ও শ্রীমান গোকুলের শ্যালিকা পুত্র—সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ি ছাড়িলে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল—মহকুমা শাসক হীরালালবাবু উৎসাহী বক্তা। তিনি ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী—কাজেই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সমস্যা সর্বদা তাঁহাকে বিব্রত করে। তিনি সে বিষয়ে নেহরু-মহম্মদ-আলি আলোচনা হইতে কাশ্মীর-সমস্যা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দিলেন না। দেখা গেল—তিনি সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তা করেন এবং সংবাদপত্র-সমূহে এ বিষয়ে যে সকল আলোচনা ও খুটিনাটি খবর প্রকাশিত হয়, সেগুলি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। নিখিলবাবু ঢাকার ও মন্মথবাবু নোয়াখালির লোক—কাজেই তিন জনের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচিত হইতে শুনিলাম, যাহা সত্যই আমাদের মনেও নূতন আলোক সম্পাত করিল। ক্রমে বড়গেছিয়া ষ্টেশন আসিল—সকলে ডাব পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। জ্যৈষ্ঠের শেষ, ২ মাস কোথাও বৃষ্টি হয় নাই—কাজেই দ্বিপ্রহরে গ্রীষ্মে সকলেই অধীর হইয়া উঠিতেছিলাম। বড়গেছিয়ায় এক সুযোগ উপস্থিত হইল—এস ডি ও' সাহেবকে দেখিয়া রেল কর্তৃপক্ষ এক সেলুন জুড়িয়া দিলেন—আমরা কয়জন সেলুনে গেলাম—কমবয়স্করা উচ্চ-শ্রেণীর গাড়ীতে থাকিলেন। ঐ সময়ে এক নূতন সঙ্গী জুটিল—হাওড়ার সহকারী সিভিল্ সার্জেন ডাক্তার শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পূর্ব-পরিচিত—তিনি সাহিত্য-প্রিয়। তিনি সরকারী কাজে কোথায় যাইতেছিলেন—আমাদের অনুরোধে এক বেলার জন্য সরকারী কাজ স্থগিত রাখিয়া আমাদের সহিত নারীট যাইতে সম্মত হইলেন। দল ভারী হওয়ায় আমরাও পুলকিত হইলাম। যথা-কালে সকলে আমতা ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম। সেখানে এস-ডি-ও সাহেবের জন্য জিপ গাড়ী হাজির ছিল। জিপে চড়িয়া ৮।১০ জন দামোদরের তীরে যাইয়া হাজির হইলাম। আমতা সহর দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। এখানে দামোদর বর্দ্ধমান জেলার ভীষণ দামোদর নহে—নদী প্রায় মজিয়া গিয়াছে—যে বৎসর বন্যা অধিক হয়, সে বৎসর দামোদরের জল উভয় কূল প্লাবিত করে। এ বৎসরে নদীতে জল ছিল না—কোন কোন স্থানে অল্প জল—তাহার উপর দিয়া বাঁশ ও কাঠ ফেলিয়া সেতু নির্মাণ করা ছিল—আমরা সেই সকল সেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে পৌঁছিলাম সে স্থান হইতে নারিট মাত্র ৩ মাইল। সাধারণতঃ সকল অধিবাসী পদব্রজেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে লোক পালকী চড়িয়া যায়। গাড়ী যাইবার ভাল পথ নাই—তবে বর্ষার কয়েক মাস ছাড়া প্রয়োজন মত ঐ পথে মোটর গাড়ী যাইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে ঝিকড়া জয়পুর যাইবার বহু মোটর গাড়ী পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমাদের জন্য একখানি মোটরগাড়ী ভাড়া করা ছিল—আমরা ৫।৭ জন সেই গাড়ীতে করিয়া ৩ মাইল গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া নারিট গমন করিলাম। পথের উভয় ধারে পানের বরজ ও বাঁশ বন—মধ্যে তাজপুর নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রাম—অনেক পাকা বাড়ী আছে—সেখানকার ছেলেরা তাহাদের পাঠাগারের নিকট আমাদের আটক করার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। আমরা নারিটে যাইয়া ন্যায়রত্ন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মোটর হইতে নামিলাম। তথায় আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক উপস্থিত ছিল—ছেলেরা তাহাদের ব্যাণ্ড পার্টি লইয়া হাজির ছিল। সেখান হইতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত আমাদের প্রায় আধ মাইল গ্রাম্য পথের মধ্য দিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাসগৃহের পূজার দালানের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ নাটমন্দিরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রায় ৭৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক তথায় শিক্ষালাভ করিতে আসে। যে গ্রাম্য পথ দিয়া আমরা ন্যায়রত্ন গৃহে

যাইলাম—তাহা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ও গ্রামের যুবকগণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। বন্যার জলে পথ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়—সে জন্য খুব বেশী উচ্চ করিয়া মাটি ফেলিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। গ্রামে বহুসংখ্যক পাকা বাড়ী দেখিলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গৃহের চারিদিকে বহু দ্বিতল পাকা বাড়ী, সেখানকার গলি পথ দেখিলে বড়বাজারের পথের কথা বা কাশীর গলির কথা মনে হয়। শুনিলাম, শুধু ভট্টাচার্য্য পরিবারেরই ২৫খানা পাকা বাড়ী আছে। গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় আমার মাতৃমাতুল উপেন্দ্রবাবুর সংবাদ লইলাম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ স্বর্গলাভ করিয়াছেন—তাঁহার ২ পুত্র কলিকাতায় বাস করেন। দ্বিতীয় পুত্র রমানাথ দীর্ঘকাল রোগে শয্যাগত, তিনি নারিটের বাড়ীতেই বাস করেন। তৃতীয় তারানাথ কলিকাতায় চাকরী করেন—সপ্তাহান্তে বাড়ী আসেন ও চতুর্থ রাধানাথ রেলের চাকরীর জন্য বিদেশে বাস করেন। সভাস্থলে তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইল—অবশ্যই উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিচিত ছিলাম—সাংসারিক বহু কথা আলোচিত হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গৃহের দ্বিতল ২টি কক্ষ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—স্নানের জল প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল—আমরা উপরে যাইয়া হাতমুখ ধুইয়া বিশ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা করিলাম—তখনই বিরাট জলযোগের ব্যবস্থা হইল। ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে পেট ভরিয়া খাওয়ার ফলে রাত্রিতে আহারের আগ্রহ কমিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বিরাট নাটমন্দিরে সভারম্ভ হইল। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররা সুমধুর সঙ্গীত ও বহুবিধ আবৃত্তি শুনাইলেন—সে জন্য তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হইল। মহকুমা-শাসক সভাপতিত্ব করিলেন। সম্পাদক তাঁহার কার্য্যবিবরণে কর্মীদের ও ছাত্রগণের উৎসাহের কথা বলিলেন—নবকৃষ্ণ স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নিখিলবাবু বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনের কথা বিবৃত করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। লেখককেও দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইল। তাহার পর সভাপতির বক্তৃতার পর সঙ্গীত শেষে সভা শেষ করা হইল। সভায় গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম্যসভা হিসাবে ভিড় কম হয় নাই। অন্ধকার রাত্রি—গ্রাম্য পথের অবস্থা শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না—তাহা সত্ত্বেও যে এত লোক আসিবে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী কবিখ্যাতি লাভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন—তাঁহার নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়াছেন—ইহাতে বাঙ্গালী সাহিত্যিক মাত্রেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। আমরা নবকৃষ্ণ পাঠাগারে যাইয়া বার বার শ্রদ্ধার সহিত সে কথা স্মরণ করিয়াছি। আমাদের অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন, সেবাযত্ন প্রভৃতির ব্যাপারেও গ্রামের তরুণদের মধ্যে উৎসাহ দেখিয়া আমরা আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। গ্রীষ্মের জন্য যেমন কষ্ট হইয়াছে, তেমনই দলে দলে ছেলেরা সর্ব্বদা পাখার বাতাস করিয়া আমাদের তৃপ্ত করার চেষ্টা করিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদের সীমা ছিল না। খাদ্যাদি পরিবেশনের সময়েও ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া কাজ করিয়াছে। অনুরূপবাবু (আমাদের সঙ্গী) ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বংশের ও একই বাটীর লোক—তিনি যে স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন, সেখানে আমাদের নৈশ ভোজের ব্যবস্থা ছিল। ভোজের বিরাট আয়োজন ছিল। এখন রাত্রিতে বেশী লোক লুচি খান না বলিয়া লুচি ও ভাত উভয় প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। নারিটে অন্য সকল খাদ্য দুর্ম্মূল্য হইলেও সেখানে মাছের দাম অপেক্ষাকৃত সুলভ শুনিলাম। গ্রামে ডোবা-পুকুরের সংখ্যাও কম নহে—রাত্রিতে তিন প্রকার সুস্বাদু মৎস্যের ব্যবস্থা ছিল। গৃহজাত যে দধি দেওয়া হইল, সাধারণত সেরূপ দধি দেখা যায় না। এস-ডি ও সাহেব রাত্রিতেই আমতা ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার সহিত ডাঃ ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলেন। বাকী কয়জন আমরা ন্যায়রত্ন-গৃহে রাত্রিবাস করিলাম।

কবে বাংলার গ্রাম আবার উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে জানি না। কিন্তু নারিটের মত সমৃদ্ধ গ্রাম যদি এখনও অবহেলিত ও অনাদৃত থাকে, তবে তাহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। আমতায় দামোদরের উপর পুলনির্ম্মাণ বোধ হয় কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্য হইবে না। পুল নির্ম্মিত হইলে ওপারের পথগুলি ও সংস্কৃত হইয়া উন্নত হইবে। তখন সপ্তাহান্তে কেন, প্রত্যহ নারিট হইতে কলিকাতা যাতায়াত বোধ হয় অসম্ভব থাকিবে না। সম্প্রতি আমতা হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত যে পাকা প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইতেছে (তাহা বোধ হয় ২।৪ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে)—তাহাও এক সময়ে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। যাঁহার কৃপায় আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় অচিরে হয় ত নারিট যাতায়াত ও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে—একথা আজ কে অস্বীকার করিবে? মানুষ গ্রামে যাইয়া বাস না করিলে অধিক খাদ্য ও উৎপন্ন হইবে না, আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানেরও উপায় হইবে না—এ কথা সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে। দামোদর পরিকল্পনা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নারিটের মত গ্রামেও আমরা ইলেকট্রিক আলো সরবরাহ করিতে সমর্থ হইব। নলকূপ ও পুষ্করিণীর সাহায্যে জলাভাব দূরীভূত হইবে—তখন নারিটবাসীর সপরিবারে নারিটের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া আদৌ দুষ্কর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে নারিট হইতে ফিরিয়াই উপরের অংশটুকু লিখিয়াছিলাম—তাহা একখানি মোটা পুস্তকের মধ্যে সযত্নে রাখা ছিল—এতদিন মনে ছিল না। ৪ বৎসর পরে ১৯৫৭ সালের মে মাসে (৩০শে হরতালের দিন) তাহা হাতে পড়িল। নূতন করিয়া আর কিছু লিখিবার নাই। হাওড়া-আমতা পথ প্রস্তুত হইয়াছে—কিন্তু ৪ বৎসরের পর হাওড়া জেলার ঐ অঞ্চলের কি উন্নতি হইয়াছে জানি না।

শুধু কৃষির উন্নতি বিধানের দ্বারা নহে, গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া বা লুপ্তপ্রায় কুটীর শিল্পকে পুনরায় জীবিত করিয়া বেকার দেশবাসীদের কর্ম্মের সংস্থান করিতে না পারিলে গ্রামগুলিকে বাঁচান যাইবে না। সরকারী কৃষি ও শিল্প বিভাগকে এ বিষয়ে এক যোগে কাজ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে; তাহাতে অধিকতর উৎসাহী তরুণের দল গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রামোন্নতিকর কার্য্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সকলে সর্ব্বদা যদি গ্রামের কথা মনে রাখেন এবং যিনি যে প্রকারে পারেন, সে বিষয়ে কাজ করেন, তাহা হইলে গ্রামাঞ্চল অবশ্যই উন্নত হইবে। নচেৎ আমরা যতই এন-ই-এস (জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা) বা কম্যুনিটি প্রজেক্ট করি না, তাহা ফলবতী হইবে না। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের মানুষের মন পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেজন্য বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, বুনিয়াদি শিক্ষার সহিত লোকের গ্রামের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে ও লোক সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ধ্যান-যোগ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শুদ্ধজ্ঞান কল্যাণকর, কারণ জীবন-স্রোত পুণ্যপথে প্রবাহিত হয় না জ্ঞান বিশুদ্ধ না হলে। জীবনকে সচল রাখে কর্ম। জ্ঞানীর কর্ম শুভ পথের নির্দেশ দেয় সংসার পথের যাত্রীকে। ভক্তের আত্মোৎসর্গ নির্মল করে প্রাণ, সন্ধান দেয় চিরানন্দময় স্বর্গধামের।

জীবের প্রকৃত স্বরূপ কী? কামিনী-কাঞ্চন, যশ-মান, হিংসা লোভের প্রেরণা কী জীবনের অন্তিম লক্ষ্য। অন্তরাত্মা আভাষ দেয় প্রকৃত মানুষের। জানেনা জীব—দিবারাত্র কার সন্ধানের অনুভূতি জাগে প্রাণে। অজানা অচেনা প্রচ্ছন্ন সে জগতের স্বামী—তবু অন্তরাত্মা উদ্‌বুদ্ধ করতে চায় সুপ্ত চেতনাকে। অথচ

সংসার পথে শত সঙ্কট
ঘুরিছে ঘূর্ণীবায়ে
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমর তরুচ্ছায়ে।

তাই অদৃশ্যের দর্শনের জন্য দিবসরজনী বিদ্যমান অস্পষ্ট প্রেরণা সন্ধানের। মন উপলব্ধি করে—

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্ব-ভুবনে
আপনারে সবচেয়ে রেখেছ গোপনে
আপন মহিমা মাঝে। তোমার সৃষ্টির
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির—
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।

মন ইন্দ্রিয়ের বশ। পাঁচ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলিহে—এ অভিযোগ পিপাসু ভক্তের। নিজের মনকে যে জয় করতে পারে, সে বিশ্বজয়ী। কারণ মনের কাজ চলে—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে। ধ্যান-যোগ বন্ধ করে বিক্ষেপ।

একথা জীব নিত্য উপলব্ধি করে যে—মনের পিছনে আছে বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়-লভ্য তত্ত্ব বুদ্ধি পায় মন হতে। আবার বুদ্ধি দেয় মনকে আদেশ যার, ফলে মন কর্মেন্দ্রিয়দের কাজ-করবার আদেশ দেয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে গোলাপের গন্ধ মনোরম। তাকে বৃন্তচ্যুত করে ঘরে রাখলে মধুর সৌরভে গৌরব-রম্য হবে গৃহ। বুদ্ধি আজ্ঞা দেয় মনকে। মন চরণকে বলে চল, হাতকে বলে—কর চয়ন। পুষ্প হয় বৃন্তচ্যুত। কিন্তু বুদ্ধিকে সদাই ভ্রান্ত করে মন, আর মনকে প্রলোভিত করে ইন্দ্রিয়। ভ্রান্তিও প্রকৃতির এক রূপ।

মানুষ উপলব্ধি করে যে মনের নিয়ন্ত্রক বুদ্ধি সজাগ থাকলে, মন শুভ পথে চলে। বুদ্ধি যদি মার্জিত হয়, এক-কেন্দ্র হয়, তবেই মনকে আনতে পারে বশে। ইন্দ্রিয় অনিষ্টকর সমাচার এনে বুদ্ধিকে প্রলোভিত করলে, সে সমর্থ হয় প্রত্যাখ্যান করতে, জ্ঞান যদি হয় দূরদর্শী। তেমনি নিয়ন্ত্রিত মন অন্যায় আজ্ঞা দেয় না আদেশবাহী স্নায়ুকে ইন্দ্রিয় পরিচালনার। যার জ্ঞান দৃঢ়ভাবে নির্ণয় করেছে যে পরদ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ করা অবিধেয়, তেমন লোকের দৃষ্টির সম্মুখে পথে মরকত-মণি পড়ে থাকলেও, মন হাতকে আদেশ দেয়না সেটিকে তুলে নিতে। তাই সকল সমাজ নিজ নিজ আদর্শ-অনুরূপ নীতি-শিক্ষা দেয়। পরিমার্জিত বুদ্ধি আপনিই সংস্কৃত হয়। নীতি ও ধর্ম-শিক্ষা সহায়ক হয় চরিত্র গঠনের। নৈতিক শিক্ষার বিস্তৃতির উপর সমাজের পুষ্টি ও নিরাময়তা নির্ভর করে।

আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আত্ম-দর্শনে অসমর্থ হয় কেন? প্রধানতঃ সে কর্মের পরিণামে হয় আবদ্ধ। কর্ম-ফলে আশ্রয় না নিলে, মনের স্বাধীনতা জন্মে। পরিণাম সন্ন্যাস মুক্ত করে জীবকে এলোমেলো আপাত-মনোরম কর্মের প্রবাহ হতে। জ্ঞানার্জনের ফলে যখন মানুষ বোঝে দম্ভ, দর্প, অভিমানের ব্যর্থতা, তখন সে সঙ্কেত পায় নিজের স্বরূপের। সে বিচ্ছিন্ন নয় জীবসৃষ্টি হ'তে। দ্বেষ নিজের প্রতি হিংসা। হিংসা আত্মঘাত। মানুষ যখন প্রেমের আনন্দ-প্রবাহে আপনাকে বিস্তৃত করে, তখন বোঝে সে, যে আত্মা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের তুষ্টি ক্ষণিক

সুখে। আনন্দ ভূমায়। প্রত্যেক বিরাটের এ ক্ষুদ্র ক্ষীণ প্রকাশ। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় প্রকৃত সুখ নাই। আনন্দ বিস্তৃতির অনুভূতিতে। অন্তর তুষ্ট হয় পরের মধ্যে আপনাকে দেখলে, নিজের মাঝে পরকে উপলব্ধি করলে। অতীন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ মানাপমানের অভিযান হতে মুক্ত রাখে অন্তরাত্মাকে। তেমন জীবের তৃপ্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্যে। জ্ঞানী নির্বিকার। দৃঢ় শিলাখণ্ডের উপর সাগরের তরঙ্গ যেমন আছাড় খেয়ে পালিয়ে যায়, আত্ম-তুষ্ট ব্যক্তির চেতনাকে তেমনি বিকৃত করতে পারে না বহির্জগতের কর্ম-স্রোত। পৃথিবীর মলিন ক্লেদ স্পর্শ করে না জ্ঞানকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—চুম্বক শতবর্ষ জলে পড়ে থাকলেও, তার আকর্ষণ-শক্তি লোপ পায় না।

যার মন জ্ঞান-পবিত্র, বিক্ষেপশূন্য সে আরও গভীরে অনুসন্ধান করে আত্মার। আত্ম-জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান, আত্ম-দর্শনে ভগবদ্দর্শন। কারণ সবার হৃদ্দেশে ঈশ্বর বিরাজিত।

কী দ্রষ্টব্য তা তো কথায় ব্যক্ত হয় না। বাক্য ফিরে আসে সেথা হতে মনের সাথে, তাকে বর্ণনা করতে না পেরে। কেবল আনন্দের অনুভূতি জেগে থাকে মনে, তাই ভয় পলায় দূরে।*

সেই অনির্বচনীয়ের অনুভূতি ফুটে ওঠে ধীরে মনের একাগ্রতায়। মনের প্রলাপ দমন করা যায় সংযত বুদ্ধিতে, সকল বিষয় হতে মন তুলে নিয়ে মনকে এক-মুখ করলে জ্ঞান হয় চিন্তনীয়ের।

এ সত্য আমরা নিত্য উপলব্ধি করি। প্রসঙ্গ মনোরম হ'লে গল্পের সময় জ্ঞান থাকে না জগতের বিভিন্ন ঘটনায়। রম্য পুস্তকে মন সংসক্ত হলে বোঝা যায় না গৃহে কে এলো, কে গেল, ঘড়িতে কটা বাজলো বা পাশে এসে কে কী বলে গেল। পীড়িত শিশুর পরিচর্যানিরত জননীর ইন্দ্রিয় মনের কাছে পৌছে দিতে পারেনা বাহিরের রূপ রস শব্দ গন্ধ বা স্পর্শের কোনো সমাচার।

অন্তরাত্মায় মনোনিবেশ করলে তেমনি হওয়া যায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সে অবস্থা লাভ করা যেতে পারে একনিষ্ঠ পরা-ভক্তিতে। মহাভক্তকে যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ধ্যান-নিমগ্ন হতে হয় না। জননী যেমন শিশু স্নেহে একাগ্রচিত্ত হতে পারে, তেমনি বাহিরের বোধ লোপ হয় তাঁর যে পরম ভক্ত। তাই মহাযোগী শঙ্করাচার্য বলেছিলেন—

> ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগম্
> ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
> ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস যোগম্
> গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

তিনি যোগের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই শিষ্যের জন্য—যার চিত্তবৃত্তি বদ্ধ হয় না চেষ্টা না করলে। পরা-ভক্তি আপনি একাগ্রতা আনে, নিরোধ করে চিত্তবৃত্তি।

ধ্যান-যোগ চেষ্টা সাপেক্ষ। সাধনার দ্বারা করতে হয় চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ। আত্যন্তিক ভক্তির প্রক্রিয়া যদি ব্যবচ্ছেদ করা যায় দেখা যাবে ভক্ত সেই উপায় অবলম্বন করেছে অজ্ঞাতে—যে প্রণালী ধ্যান-যোগীকে আয়ত্ত করতে হয়, সংযম ও সাধনার ফলে। সেই প্রক্রিয়া অলক্ষে আয়ত্ত হয় তার, যার পরম ভক্তি একনিষ্ঠ। অবশ্য তেমন ভক্ত দুর্লভ-দর্শন।

সংযত এককেন্দ্রিক মনের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আত্ম-দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপায় কি? গীতা সে চেতনা লাভের উপায় স্থূল ভাবে বর্ণনা করেছে। ধ্যান কোন্ সাধনায় সাফল্য-লাভ করতে পারে তার বিস্তারিত উপায় বর্ণিত হয়েছে পাতঞ্জল দর্শনে, বহু মহাযান বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, জৈন দর্শনে। বিষদ উপায় গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। মূল নীতি বর্ণিত হয়েছে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের মুখে, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে।

একথা বলা বাহুল্য যে কোনো শিক্ষক বর্ণিত নীতি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে, সম্পূর্ণ উপদেশের অনুশীলন ও অনুভূতি আবশ্যক। ধ্যান-যোগ সাধনা করতে গেলে গীতার সকল শিক্ষা মানতে হয়। চরিত্র গড়ার অন্য নির্দেশগুলিতে উদাসীন থাকলে, ধ্যানযোগের শ্রম হয় পণ্ড। চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। চরিত্রকে সচেতন ও দৃঢ় করতে হবে বিভিন্ন গঠন-নীতিতে। সাধককে হতে হবে নিষ্কাম কর্মী। আয়ত্ত করতে হবে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান। প্রাণকে সিঞ্চিত করতে হবে ভক্তিরসে। তবেই যোগে সম্ভব হবে আত্মদর্শন। অন্য আদেশ লঙ্ঘন করে কেবল

---

* যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

চক্ষু মুদে ধ্যানে বস্‌লে, নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে পরিশ্রম, নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হবে আত্মদর্শনের প্রয়াস।

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। যত্নশীল বশীভূত এ চিত্ত ব্যক্তি সদুপায়ের অনুশীলনে যোগী হতে পারে। অতি-ভোজীর পক্ষে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার নিরাহারী দেহকে কষ্ট দিয়ে, শরীরের মধ্যে ক্ষুধানল জ্বালিয়ে হতে পারে না যোগী। তাই ভগবান বুদ্ধ নিজের অষ্টাঙ্গ মার্গের সাধনাকে মধ্য-পথ বলেছিলেন। অত্যন্ত নিদ্রাতুর বা সদানিদ্রাহীনের অশান্ত মনে ধ্যানের একাগ্রতা আসবে কেমন করে সাধারণ সাধকের।

সুতরাং যোগের বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার প্রচেষ্টায় যুক্তাহার ও যুক্তবিহার হওয়া আবশ্যক। কর্মযোগীর পক্ষে যোগ সাধনা সম্ভব, কারণ দেহধারণের ক্ষুদ্র তাগিদের অভিযান হ'তে সে মুক্ত। সকল কামনা হতে মনকে উদ্ধার করলে তবেই সম্ভব চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ প্রতিরোধ।

স্থির মনের উপমা দেওয়া হ'য়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের। বায়ুবেগে প্রদীপ-শিখা হয় ইতস্ততঃ আন্দোলিত। অসংযত মন তেমনি ইতস্তত চালিত হয় কর্ম্ম-প্রবাহ, সংস্কার, স্মৃতি, এবং ভাব-হিল্লোলের আন্দোলনে। যেথানে বায়ু বহেনা এমন নির্ব্বাত স্থানে দীপ রাখলে, দোলেনা তায় শিখা। যোগীর মনকে তেমনি স্থির রাখতে হয়—বাহিরের এলোমেলো ভাব-বায়ুর সঞ্চলন বন্ধ ক'রে।

পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নাই। মানুষের অজ্ঞাতে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া তার জীবন-তরঙ্গে বিভিন্ন ছন্দ তোলে। সে ছন্দের কোনোটি শুভ, কোনোটি অশুভ। পরিবেশকে বাছা চরিত্রবানের এক কর্ম। ধ্যানের দ্বারা আত্ম-দর্শনের সাধনায় সহায়তা করতে পারে পরিবেশ। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যোগীর পক্ষে নিরন্তর নির্জন স্থলে দেহ ও চিত্তকে সংযত করা কর্ত্তব্য। আকাঙ্ক্ষা তবে হবে শুদ্ধ।

শুদ্ধ স্থানে স্থির হয়ে নাতি-নীচ নাতি-উচ্চ স্থলে নিজের আসন স্থাপন করলে ধ্যানের সুবিধা হয়। এর কারণও সহজে অনুমেয়। অশুদ্ধ স্থলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ স্বাভাবিক। পুতিগন্ধময় স্থলে মনস্থির করতে গেলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংগ্রামে শক্তির অপচয় নিদারুণ। স্থান দুর্গম ও উৎপীড়ক হলে বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। কোমল শয্যা বিলাস-প্রাসাদ বা প্রমোদ-গৃহ সুপ্তভাব পোষণের বা ভাব বর্জ্জনের সহায়ক নয়। অথচ কষ্টকর ভূমিতে বসে মন স্থির করবার প্রয়াস হয় ব্যর্থ। তাই কুশ, ব্যাঘ্র বা হরিণের চামড়া বা চেন বস্ত্রের আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান করলে একাগ্রতা লাভের সুবিধা অর্জ্জন করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান এমন আসনের উপকারিতার কারণ নির্দেশ করেছে। এরা বিজলীর প্রবাহ-বাহী নয়। তাই দেহের বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় বন্ধ করে।

নিভৃত স্থলে উপবেশন ক'রে আত্ম-বিশুদ্ধির উদ্দেশে যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। মনের বা কর্মের অপর ক্রিয়ায় দেহ মন বা বুদ্ধি নিবদ্ধ থাকলে আর সমাধি হবে কেমন করে। ইন্দ্রিয়ের বশে প্রবাহিত বাহিরের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টির পরিপন্থী।

পরিবেশের এবং দেহের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন ধ্যানীর পক্ষে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—পায়রা তাড়াতে হলে যেমন হাততালি বাজিয়ে কাজে বসতে হয়, তেমনি হরিবোল হরিবোল বলে পূজায় বসতে হয় বাহিরের সাংসারিক ভাবকে তাড়াবার জন্য।

তারপর প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে হয় একাগ্রতার জন্য। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে যোগীর পক্ষে সকল বাহিরের ভাবের যাওয়া আসার অভিনয় বন্ধ না করলে ধ্যান আয়ত্ত হয় না। প্রাণায়ামের ছন্দ বন্ধ করে অভিযান বাহিরের চিন্তা তাণ্ডবের। ধীরে ধীরে মনকে বশে আনলে বহির্জগতের অনুভূতি বন্ধ হয়। চেতনা বিলুপ্ত হয়—থাকে মাত্র ধ্যেয়। তখন আনন্দে চিত্ত হয় আপ্লুত। স্থির দীপ-শিখার জ্যোতি উজ্জ্বল করে অন্তরাত্মা। মোহ হয় দূর। ধ্যানীর মন বিস্তৃত হয় সেই ধ্যানের অনুভূতিতে যেথা বিরাজে শান্তি ও আনন্দ। পূর্ণতার অনুভূতি উন্মুক্ত করে জ্ঞানের রুদ্ধ দুয়ার।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যোগের যে শিক্ষা দিলেন তার মূলে রয়েছে সর্ব্বভূতে মমত্ব বোধ। ব্রহ্ম নির্বিকার। কিন্তু তিনি আপন মায়ায় ধারণ করেন বহুরূপ। সে রূপ জীব দেখে কিন্তু বোঝে না। যোগস্থ সাধক সেই বহুর মূলে একের সন্ধান পায়।

ব্রহ্মসংস্পর্শের আত্যন্তিক সুখভোগ করে যোগী। কিন্তু যোগী ব্রহ্মের কোন চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়? নির্বিকার?

নির্বিকার না সাকারের মাঝে নির্বিকার? শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন —সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে।*

অনন্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—কিন্তু মায়াময় সদা-পরিবর্তনশীল সৃষ্টির লোপে নয়—প্রতীত হয় অনাদি রূপের নিত্যতা, আর উপলব্ধি হয় নিত্য অনন্তের। সর্বভূতে সেই অনাদি অনন্তকে বিরাজিত দেখে যোগী। তিনি সৃষ্টির মূল। এই সমদর্শন সম্ভব ধ্যানে। ভেদের মাঝে অভেদের অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত করে ভেদাভেদের অলীক তত্ত্ব। সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধিতে আনন্দের স্ফুরণ। সৃষ্টি অব্যয় একের পরিবর্তনশীল বহুরূপ—নশ্বর অলীক মায়াময়।

অবিদ্যা ঢেকে রাখে প্রাণের সাম্য এবং একতাকে। যোগে অবিদ্যার বিদায়ে আবির্ভাব হয় পূর্ণের। এই ব্রহ্ম-নির্বাণ—পার্থক্যের অবলুপ্তি। এ অবস্থায় সুখ আত্যন্তিক —মাত্র নিভে যাওয়া শূন্যতা নয়।

গীতার কথায়—সে অবস্থায় এই যোগী শুদ্ধ-বুদ্ধি-গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের অতীত আত্যন্তিক সুখ ভোগ করে। সে অবস্থায় আত্ম-স্বরূপ ভাব হতে বিচলিত হয় না। সে অবস্থা লাভ করে যোগী অন্য লাভকে অধিক বিবেচনা করেনা। সে অবস্থায় দুঃসহ দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয়না। সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থাকে যোগ বলে। এ কথা বিদিত হও। অবসাদ-শূন্য হৃদয়ে সেই যোগ অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য।†

এই যোগে লাভ হয় জ্ঞানের চরম। এর পর জানবার থাকে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম—মায়া বর্জ্জিত। গীতায় সে সমাধির কথা নাই। প্রতি ভূতের অন্তরের মূল-বিকাশে ব্রহ্মজ্ঞান এই তত্ত্বই বিবৃত গীতায়। কারণ গীতার উপদেশ সংসারীর পক্ষে—যোগের, যোজনের। সাংখ্যের বা বিয়োগের নয়।

সে অবস্থা আপনি প্রবর্ত্তিত হবে—নিষ্কাম কর্ম, সম্যক জ্ঞান এবং বিশেষ পরাভক্তির ভিতর হ'তে। অন্তরের বিকাশের পূর্ণতায় সীমার মাঝে লাভ হবে অসীমের অনন্ত চেতনা। মাত্র জীবে নয়, ঘটে পটে অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর শিখরে গহনে বিটপী—লতায় জলদের গায় শশী-তারকায় তপনে—ভগবানের নিজ প্রকৃতির মায়ার অনিত্য লীলার মূলে নিত্যের হবে উপলব্ধি। তখন স্পর্শের আনন্দ জাগে জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র।

গীতার এ সমাধি পাতঞ্জল যোগসূত্রের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা সংশ্লিষ্টভাবে অনুশীলন করলে এই ধারণাই হয় যে সৃষ্টিকে অলীক মাত্র ভেবে নির্ব্বিকার ধ্যানযোগে নির্ব্বিকল্প সমাধির উপদেশ গীতার শিক্ষা নয়। সে অবস্থা কর্ম্ম, ধ্যান, জ্ঞান এবং ভক্তির পরিণতিতে সাধকের পক্ষে সম্ভব। গীতার উপদেশ সংসারীর পক্ষে যে অনায়াসে বলতে পারে—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়। বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস আপনি ফুটে উঠবে যোগ হ'তে। সবার পক্ষে পূর্ব্বাপর যোগের ব্যবস্থা ন্যাস বা ত্যাগের নয়। অর্জ্জুনের বিষাদ সমুপস্থিত হয়েছিল। বিদ্রোহিতার ভাব জন্মেছিল সমরে, ক্ষাত্র ধর্ম্ম পালনে। ভগবানের সংসার লীলার এক লীলা যুদ্ধ। কিন্তু ধর্ম্ম-যুদ্ধ। প্রকৃত জ্ঞানীর মত, ভগবানে আত্ম নিবেদন ক'রে নিষ্কাম ভাবে সে কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করলে চরিত্র গড়ে ওঠে। আত্মা অমর, জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণুর মত দেহ পরিবর্ত্তনশীল। যে আদি কারণের মায়ার বিকাশ জগৎ—সে তো অনন্ত, অব্যয়, শাশ্বত। পূর্ণজ্ঞান আনন্দ। সৃষ্টি তাঁর লীলা। নটরাজের নাচের ছন্দ—বাঁধন-ছেদন, নতুন বাঁধন।

মায়ার ফাঁস, ত্রিগুণের বাঁধন কাটলে মোক্ষ। কিন্তু সাধারণ গৃহীকে সেই মায়ার অভিনয়ে নানা ভূমিকায় জ্ঞান লাভ করতে হবে মায়ার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে।

ধ্যান যোগের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিলেন তার অনুশীলনেও এই ধারণা হয় যে এ শিক্ষা নিবৃত্তি-মার্গের নয়, প্রবৃত্তির পথে চলে নিবৃত্তি লাভের ব্যবস্থা। আরও মনে হয় প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হ'তে গেলে একাগ্রতার আবশ্যক। সেই একাগ্রতা সংগ্রহ করবার

---

* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।৬।২৯।

† সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ৬।২১
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।২২
তৎ বিদ্যা দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসঙ্গিতম্
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্নচেতসা ।২৩

ব্যবস্থা দিলেন ভগবান। কারণ তিনি বল্লেন—সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগনিরত পুরুষ আত্মাকে দেখেন সর্ব্বভূতে অবস্থিত, আর দেখেন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা।

যোগের দ্বারা সমদর্শন লাভ হয়। সমদশী সে যে বহুর মাঝে একের দর্শন পায়, পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখে অপরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্ম। এ কথা আরও স্পষ্ট করে বলে-ছিলেন পরের শ্লোকে।

"যে জগতের সকল পদার্থে আমাকে দেখে এবং আমাতে সমস্ত দেখে, তাহার পক্ষে আমি পরোক্ষ হইনা এবং সেও আমার দৃষ্টির বাহিরে থাকে না।"

আরও বল্লেন—"যে যোগী সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অভিন্ন-ভাবে অবধারণ পূর্ব্বক আরাধনা করে, সেই যোগীপুরুষ সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থেকেও আমাতে বর্ত্তমান থাকে।"

তাঁকে করতে হবে আরাধনা, জনে জনে নারায়ণ এ রঙ্গমঞ্চে অভিষিক্ত হয়ে, তাহলে যোগী বর্ত্তমান থাকবে তাঁর মহিমায়। যে সদাই সর্ব্বত্র তাঁকে দেখে তার দৃষ্টি তো বিশাল। একাগ্রতা তাকে করে নিত্য যোগী। তাই মনে হয় প্রবৃত্তিকে—আরাধনা প্রবৃত্তি, সমদর্শন প্রবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টির প্রবৃত্তিতে পরিণত করলে, প্রাণ নিবৃত্ত হয় পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য, অলীক বিকাশে মুগ্ধ হতে মায়াময় এই অখিলের। মায়ার অসারতার জ্ঞান উপলব্ধি করে শ্রীভগবানের অনিত্য চেতনায় যোগ হওয়ার কথা গীতার উপদেশ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদম্ প্রবিশাশুবিদিত্বা—

অমরতার বোধই সারের বোধ।

অর্জ্জুন নিবেদন করলেন যে মন চঞ্চল, প্রমাথী বলবৎ এবং দৃঢ়। তাকে ধরে রাখা বায়ুকে ধরে রাখার মতই কঠিন ব্যাপার। কেমন করে সম্ভব মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ।

কৃষ্ণ স্নেহভরে তাঁকে বল্লেন—তুমি মহাবাহু তুমি মহা-বীর তুমি কুন্তীপুত্র—সংগ্রাম যাদের করতে হয়েছে নিরন্তর। মনের রাজ্যেও তুমি বল প্রয়োগ করলে জয়ী হবে। আবশ্যক দুটি গুণ—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য।

ঐ কথায় আরও স্পষ্ট হ'ল। মাত্র বৈরাগ্যে বা বিতৃষ্ণায় —ত্যাগ আসে না অভ্যাস না করলে। পুন পুন মন সংযমের চেষ্টা করলে—মাত্র থাকবে এক ভাব সর্ব্বভূতস্থিত একত্বের চেতনা। তখন বিরাগ আসবে আপনি, অলীক অনিত্যভাব-স্রোতে। বিষয়ের সংস্পর্শ দেখিয়ে দেবে তার দোষ, কারণ যে সুখের স্থিরতা নাই তার উপর বিতৃষ্ণা আপনিই আসবে। অভ্যাস করতে হবে অন্তর্দ্দর্শনের। ভগবানের নিত্যস্বরূপ জেগে উঠলে বিতৃষ্ণা আপনি আসবে অনিত্যে। অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বিরাগ।

আবার প্রশ্ন উঠলো—যদি যোগের চেষ্টা করে মানুষ সার্থকতা লাভ না করে তার কি গতি হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে। সে কথার মধ্যে ভারতের সংস্কৃতির বিশেষ তত্ত্ব নিহিত। মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ঘোরে জগতে। তার পাপ পুণ্য স্থান নির্দেশ করে পরজন্মের। অভ্যাস কিন্তু সংস্কাররূপে প্রতি জীবের সঙ্গের উপকরণ। তাই দেখি আমরা মানুষে মানুষে প্রভেদ, দুই ভায়ের এক ভাই পাষণ্ড, এক ভাই ভক্ত।

সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান জগদীশ্বরের অনন্ত প্রভাবের উপলব্ধি। তাঁর প্রতি ভক্তির একটা অঙ্গ। তাই ধ্যানযোগের শেষে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন ভগবান ভক্তির সার্থকতা মোক্ষের পথে। তাই ভগবান বল্লেন—তপস্বী জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ। এই আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও হে অর্জ্জুন।* কারণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করলে মন্মনা বা মৎপরম হওয়া অসম্ভব। ভক্তিতেই হবে চিত্ত বিক্ষেপশূন্য। শেষের বাণী এ প্রসঙ্গে—সকল যোগী-দের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান মদ্গতচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে আমার মতে যোগযুক্তদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। †

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় যোগ শব্দ অন্ততঃ আশীবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন স্থলে শব্দের অর্থ বিভিন্ন। ধ্যানযোগের অধ্যায়ে যোগ শব্দ পাতঞ্জল দর্শনের চিত্তবৃত্তি নিরোধ।

ভগবদ্‌চিন্তায় কেন—সাংসারিক কার্যেও সাফল্য লাভ অসম্ভব মনের একাগ্রতা ব্যতীত। যে জানে না প্রাণায়ামের রহস্য, তাকে যদি পরীক্ষা করা যায় যখন সে একমনে কাজ করে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস বহে সেই ভঙ্গীতে যোগশাস্ত্র যা শিক্ষা দেয়।

---

* গীতা ৬।

† যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।৬।৪৭

কালাডিতে সর্বোদয় সম্মেলন

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের অধীনে কেরলে কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হওয়ায় কেরল দেশবাসীর কাছে এক রহস্যভূমি বলে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এবার সর্বোদয় সম্মেলন কেরলের কালাডি নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে জেনে ঐ নারিকেল, আম, কাঁঠাল এবং কাজু বাদামের গাছে ছাওয়া চিরশ্যামল ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিচিত্র নর-নারীর পরিচয় পাবার সম্ভাবনায় উদগ্রীব হোয়ে উঠেছিলাম। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই ক্ষুদ্রতম প্রদেশটির জনসংখ্যা দেড় কোটীর বেশী নয়। আজ থেকে প্রায় বার শত বৎসর পূর্বে কেরলের পুণ্যভূমিতে পেরিয়ার নদীর তীরে অবস্থিত এই কালাডি গ্রামেই আদিগুরু শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়। ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক সেই নবীন সন্ন্যাসী অতি অল্প বয়সেই আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এই দেশে তাঁর ধর্মযাত্রার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। আজ পুনর্বার শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক ঋষিকল্প মহামানব দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। গান্ধী-শিষ্য বিনোবার ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন কেবল আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নয়, এক ধর্মবিচার প্রচারের ও ধর্মচক্র প্রবর্তনের আন্দোলন হচ্ছে ভূদান যজ্ঞ। মানবীয় মূল্যবোধ কেবল শাস্ত্রীয় পুঁথিতে লিপিবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, জীবনের প্রতিটি কর্মে ও আচরণে সত্য, অহিংসা, প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের অভিপ্রকাশ চাই—এই হচ্ছে সর্বোদয় সমাজের ঋত্বিক বিনোবাজীর বাণী। সেই জন্য গত ছয় বৎসর যাবত অবিরাম পদযাত্রা করে প্রাচীন ভারতীয় সাধকদের মত গ্রামময় ভারতে তিনি এই নবধর্মের ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছেন। ভারতের বিভিন্ন কোনে গান্ধীপন্থায় নিষ্কাম সেবাকর্মে রত সর্বোদয় প্রেমিকরা বৎসরে একবার বিচার বিনিময়ের জন্য মিলিত হন এবং এরই নাম সর্বোদয় সম্মেলন। এবার সেই সম্মেলন কেরলের ত্রিচুর জেলার আঙ্গামালী নামক রেলষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মভূমি কালাডি গ্রামে বিগত মে মাসের ৯ই ও ১০ই তারিখে সুসম্পন্ন হয়।

মোটামুটি তিনটি এলাকা নিয়ে কেরল প্রদেশ। পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে মালাবারের সম্মিলনে এই প্রদেশটি স্বাধীনতার পর গঠিত হয়। জনসংখ্যার এক প্রধান অংশ এখানে খৃষ্টান। তবে এঁদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনের কোন সম্বন্ধ নেই। এঁরা সেন্ট টমাসের অনুগামী "অর্থডক্স" ক্রিশ্চিয়ান। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হবার বহুপূর্বে সিরিয়ার মারফৎ কেরলে খৃষ্টান মিশনারীরা আসেন এবং বর্তমানে এঁরা ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোন থেকে পুরোমাত্রায় ভারতীয়। মুসলমানদের বাস সাধারণতঃ মালাবার এলাকায়। এখানকার মোপলা বিদ্রোহের কথা ইতিহাসের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। খৃষ্টান ও মুসলমানের আধিক্য সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের প্রভাব বা প্রতাপ এখানে তিল মাত্র কম নয়। তবে এখানে হিন্দুদের সমাজ সংগঠন মাতৃকেন্দ্রিক, উত্তর ভারতের মত পিতৃকেন্দ্রিক নয়।

পেরিয়ার নদীর ধারে যেখানে শঙ্করাচার্যের বাসভূমি ছিল বলে কথিত, সেখানে আজ প্রধানতঃ তিনটি দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। শঙ্করাচার্যের মাতার অন্ত্যেষ্টি যেখানে হয়, সেই স্থানটিতে একটি স্মারক বেদী রয়েছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যায় তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে পতিত করেন এবং ফলে তাঁর মায়ের মৃতদেহ সৎকারের লোক পাওয়া যায়নি। কথিত আছে যে শঙ্করকে সেই জন্য মায়ের মৃতদেহ তিনটুকরা করে কেটে গৃহ প্রাঙ্গণেই তার সৎকার করতে হয়। এই বেদীটি ছাড়া শঙ্করাচার্যের উপাস্য পঞ্চদেবীর একটি মন্দিরও এর সংলগ্ন। এই মন্দিরের অপর পার্শ্বে স্বয়ং শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তি একটি ছোট মন্দিরের ভিতর রয়েছে। প্রাচীন কালের কেরলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার জন্য তামিল ব্রাহ্মণরা এখানকার পূজার ভার নেন এবং আজও এখানকার যাবতীয় পূজাপাঠ তামিল ব্রাহ্মণরাই করে থাকেন। শঙ্করাচার্যের লীলাভূমি থেকে অল্পদূরে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পঠন পাঠনের একটি কেন্দ্রও এখানে আছে।

সর্বোদয় সম্মেলন হচ্ছিল এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম পরিচালিত শঙ্কর কলেজের প্রাঙ্গণে। একটি নাতিউচ্চ গৈরিক মাটির টিলার উপর কলেজ ও তার সম্মুখস্থ ময়দানে সম্মেলনের মণ্ডপ। মণ্ডপ তৈরী হয়েছে বাঁশ ও নারিকেল পাতা দিয়ে। সম্মেলনে সমবেত প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একটু নীচে। বাঁশের চাটাই এর দেওয়াল, আর নারিকেল পত্রের আচ্ছাদনের নির্মিত এই সব চালাগুলি গ্রামীণ শিল্পকৃতি ও মিতব্যয়িতার জীবন্ত নিদর্শন।

কলেজের উত্তরপূর্ব দিকের ময়দানে এই রকম চালা তুলে খাদী ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হোয়েছে। নারিকেলের ছোবড়া শিল্প কেরলের এক প্রধান উপজীবিকা। এর সর্ববিধ প্রক্রিয়া এখানে দেখানর ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া কেরলের কাঠ খোদাই, হাতির দাঁতের কাজ এবং মৃৎশিল্পও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেরলের খাদী-শিল্প নানাবিধ নক্সার কাজের জন্য বিখ্যাত। সবচেয়ে বেশী ভীড় হোত অম্বর চরখা বিভাগ ও ভূদান মণ্ডপে। অম্বর চরখায় এক সঙ্গে চারটি টেকোতে সুতা কাটা যায় এবং দৈনিক এতে ১৷৹ টাকা থেকে ২৲ টাকা পর্যন্ত সুতা কেটে রোজগার করা যায়। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবং স্বাবলম্বী অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনার জন্য অম্বর চরখা যে অপরিহার্য, একথা আজ কেউ অস্বীকার করতে

পারেন না। ভূদান মণ্ডপে ভূদান যজ্ঞের ইতিহাস এবং সর্বোদয়তত্ত্ব দর্শন, চিত্র, চার্ট এবং ম্যাপ ইত্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে বোঝান হয়। মণ্ডপের ছবিগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পকৃতি। ভূদান মণ্ডপের যাবতীয় কৃতিত্বের দাবীদার হচ্ছেন তরুণ বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীঅনিলকুমার সেন এবং শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়। তাঁরা কেবল চিত্রকরই নন, গঠনমূলক কর্মী ও বটেন।

এবারকার সর্বোদয় সম্মেলনের বিবরণ দেবার পূর্বে সর্বোদয় আদর্শের সংক্ষিপ্ত ইতবৃত্ত ব্যক্ত করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সর্বোদয় শব্দটির অর্থ হচ্ছে সবার উদয় বা সবার কল্যাণ। ইংরেজ মণীষী জন রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" নামক গ্রন্থের গুজরাতি অনুবাদ কালে সর্বজনহিতায় উৎসর্গীকৃত এই সমাজাদর্শের পূর্বোক্ত নামকরণ গান্ধীজী করেন। তবে গান্ধীজীকে প্রধানতঃ বিদেশী শক্তির অপসারণের কাজেই আত্মনিয়োগ করতে হয় ও স্বরাজের পূর্বে সুরাজ বা নিজেদের শাসন প্রয়োজন বলে গান্ধীজী প্রতীকরূপে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা ছাড়া সর্বোদয় আদর্শকে বিমূর্ত করার জন্য আর বেশী কিছু করে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর গান্ধীজী এই কাজে হাত দেন এবং রাজশক্তি ছাড়াও এক স্বতন্ত্র লোকশক্তি বা সেবাশক্তি অহিংস সমাজের রূপায়নের পক্ষে অপরিহার্য বলে গান্ধীজী কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে একে লোকসেবক সঙ্ঘে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য গান্ধীজী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে তাঁর অনুগামীদের এক সভা ডাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতোমধ্যে গান্ধীজীর মৃত্যু হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গ সমাজ বিপ্লব সংসাধনের জন্য গান্ধীমার্গ গ্রহণে অসম্মত হন, তাঁরা কংগ্রেসের রাজনৈতিক রূপই বজায় রাখেন। সুতরাং অতঃপর নৈষ্ঠিক গান্ধীপন্থীরা "সর্বোদয় সমাজ" নাম দিয়ে সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসীদের এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত গান্ধীপন্থী কর্মীরা বৎসরান্তে একবার করে সর্বোদয় সম্মেলনে মিলিত হোলেও এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর গঠনমূলক কাজ চালিয়ে গেলেও স্বাধীন ভারতের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠন গান্ধীপন্থীরা করার বিশেষ অবকাশ পাননি। সাধারণ দেশবাসী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনীতিকেই একমাত্র মোক্ষ জ্ঞান করতেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল হিংসাবিক্ষুব্ধ তেলেঙ্গানার গোচমপল্লী গ্রামে বিনোবাজী এক ঈশ্বরক নির্দেশ পেলেন। ভূমিহীনদের পেটে খাবার উপায় করে দেবার জন্য গ্রামবাসীদের কিছু জমী দেবার আবেদন জানানর পর বিনোবাজী আশাতিরিক্ত দান পেলেন। ভূদান-গঙ্গা ভারতভূমিতে আবির্ভূত হোল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অহিংস পন্থায় আর্থিক সমতা স্থাপনের এই কর্মযজ্ঞে সমগ্র ভারতে প্রায় ৪৫ লক্ষ একর জমি আহুতি স্বরূপ অর্পিত হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার গ্রামের প্রতিটি অধিবাসী "সমাজায় ইদং, ন মম" বলে তাঁদের যাবতীয় ভূসম্পত্তির মালিকানা বিসর্জন দিয়ে এক সমবায়মূলক জীবনযাত্রাপদ্ধতির অনুসরণ আরম্ভ করেছেন। প্রেম ও অহিংসা ধর্মের প্রচারক বিনোবাজীর আহ্বানে সহস্র সহস্র যুবক যুবতী দেশের কোণে কোণে রাজসত্তা-নিরপেক্ষ লোকসেবার শক্তির আরাধনা করছেন। সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার প্রেরণায় সম্পত্তিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান ইত্যাদি আন্দোলন চলছে। গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেশে আবার নূতন করে নিষ্কাম সেবা কর্মের ব্যাপক প্রেরণা এসেছে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এখনও গভীরভাবে এই সমাজ বিপ্লবকারী আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝার প্রয়াস করেননি। আর সংবাদপত্রগুলিতে খুন রাহাজানি ও অন্যবিধ সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকলেও এতবড় একটা সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনের প্রগতির খবর কদাচিৎ প্রকাশিত হয়।

সর্ব সেবা সংঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার

৯ই মে বিকেলে গান্ধীদর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত দাদা ধর্মাধিকারীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ছিলেন স্বয়ং আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনি কেবল সর্বোদয় ও সাম্যবাদই নয়, বোধ হয় ভারতে প্রচলিত তাবৎ সমাজশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিচার ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করলেন। তিনি বলেন যে সনাতনীরা এই কথা বলে সর্বোদয় বিচারকে নস্যাৎ করেন যে এ বিচারধারা সত্যযুগের। তাঁদের মতে সত্য ও অহিংসা আদর্শ হিসাবে শ্লাঘ্য হোলেও সমাজের বর্তমান অবস্থায় তা অনুসরণযোগ্য নয়। অতীতকালের সত্য যুগে সর্বোদয়ের মানদণ্ড সম্ভবপর হোলেও এখন কেবল দণ্ডশক্তি দ্বারাই সমাজকে সঠিক পথে চালাতে হবে। বিনোবাজীর মতে এঁরা ভূত সত্যযুগবাদী। আর

কমিউনিস্টরা ও এক রকমের সত্যযুগবাদী, কারণ তাঁদের কল্পিত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় হিংসার বিমূর্ত প্রতীক রাষ্ট্র যন্ত্রের স্থান থাকবেনা এবং সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিরীখ হবে সামাজিক দায়িত্ববোধ অর্থাৎ প্রেম। কিন্তু ভবিষ্যতের এই সত্যযুগ আনয়ন করার জন্যই এখন এক দলের একাধিনায়কত্ব স্বীকার করে স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এবং মিথ্যাচার, হিংসা ও উৎপীড়ন ইত্যাদি নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়ে অনিশ্চিত রাষ্ট্রহীন সমাজের আশাপথ চেয়ে বসে থাকতে হবে। বিনোবাজীর মতে তাই কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতের সত্যযুগবাদী। তাহলে এক্ষেত্রে সর্বোদয় আদর্শের কর্মীদের স্থান কোথায়? বিনোবাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে তারা হচ্ছে বর্তমান সত্যযুগকারী। সর্বোদয় আদর্শে সৎ ব্যবস্থা ও সদাচার অতীতের বস্তু নয় বা ভবিষ্যতের আশা নয়। এখনই এইখানে তাদের ঈশ্বরের রাজত্ব বিমূর্ত হোয়ে ওঠে। আর্থিক সাম্য—প্রেম ও অহিংসার পথে ভূদান ও সম্পত্তি দান ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। খদ্দর এবং অন্যবিধ কুটীর শিল্প দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীত করে শাসন ক্ষমতার ও শক্তি হ্রাস করা হয় এবং এইভাবে সর্বোদয়ের অর্থনীতি শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পায়।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দকে বিপ্লবের বৎসর বলা হয়েছে। এ বৎসরে সর্বোদয়ের বাণী কি? এবার সম্মেলনে সর্ব সেবা সঙ্ঘের মূল প্রস্তাব উত্থাপন এসেছে। বিপ্লবী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় কর্মীদের বিপ্লবের বৎসরের বাণী ব্যাখ্যা করলেন। গ্রামদান ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের পরিণত রূপ। প্রথমে কিছু পরিমাণে ভূমি দান থেকে এর আরম্ভ হোয়ে এক ষষ্ঠমাংশ দান এবং তারপর ভূমিহীনতা মেটাবার থেকে শুরু করে সব কিছুর সমাজীকরণ—এই হচ্ছে গ্রামদানের বিকশিত রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা সমবায়মূলক জীবনযাত্রা পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" গ্রামদানে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা রূপী অতীত প্রাচীন প্রথার বিসর্জন দিয়ে দেশবাসী এই বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। আড়াই হাজার গ্রামে গ্রামদান হওয়ায় একথা প্রমাণিত হোয়ে গেছে যে এ আর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সুতরাং প্রেমও অহিংসার পথে সমাজ বিপ্লব সাধনেচ্ছুক সর্বোদয় কর্মীদের এবছর গ্রামদানের উপর সর্বশক্তি কেন্দ্রিত করতে হবে—এই হচ্ছে সর্ব সেবা সঙ্ঘের প্রস্তাব। জয়প্রকাশবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ও আবেগমণ্ডিত ভাষায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের বাণী দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন।

সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি ধেবরজী, কেরলের প্রজা সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা শ্রীপট্টম থানু পিলাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভূদান আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিনোবাজী আর একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে ভারত সরকারের কমিউনিটি প্রজেক্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস. কে. দে মহাশয় গ্রামদানী গ্রাম দেখে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছেন। একথা আজ গোপন নেই যে ভারত সরকার দেখতে পাচ্ছেন যে কমিউনিটি প্রজেক্ট বাবদ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও এ বিভাগের কাজ আমলাতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। জনসাধারণের মনে নিজেদের শক্তিতে সমাজোন্নয়ন কথার প্রেরণা কমিউনিটি প্রজেক্টের কর্মিরা জাগাতে পারেন নি। তাই সরকারের কাছে এ এক প্রচণ্ড সমস্যা। জনসাধারণ ক্রমশঃ সরকারের মুখাপেক্ষী হোয়ে পড়া গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক। দে মহাশয় গ্রামদানী গ্রামে জনগণের ভিতর স্বাবলম্বনের নৈতিক শক্তি দেখে উল্লসিত হোয়ে উঠেছেন। তাই সরকারের তরফ থেকে গ্রামদানী গ্রামে যথাসাধ্য সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ সরকারী কাজের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠান এবং সেই চিঠিতে ভূদান আন্দোলনের আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে কেরলের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য বিনোবাজী এবং সর্বোদয়ের কর্মিদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রতিনিধি হোয়ে কেরলের আইনমন্ত্রী সম্মেলনে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে বিনোবাজীর সঙ্গে তিনি ও তাঁর সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত যে জনমত সৃষ্টি না করে আইন রচনা করলে তা সমাজ পরিবর্তন সংসাধনে ব্যর্থ হয়। তাই তিনি বিনোবাজীর লোকমানস পরিবর্তন অর্থাৎ হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার বাস্তব নিদর্শন ভূদানযজ্ঞের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য এতদপেক্ষা শ্রেয়তর পন্থা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে দেখা যায়নি।

সম্মেলনের সভাপতি দাদা ধর্মাধিকারী নূতন করে সাধ্য ও সাধন Ends and means এর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে নিছক "প্রাগমাটিক" দৃষ্টি থেকেও যদি বিচার করা যায়, তবু পরমাণবিক যুগে হিংসার স্থান নেই। এ যুগে হিংসা বৈজ্ঞানিক হিংসা হবে এবং তার পরিণামে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোয়ে যাবে। অতএব অহিংসা ছাড়া পৃথিবীর বাঁচার নান্য পন্থা। তবে অহিংসা কেবল নিভৃত ভজন পূজনের মন্ত্র নয়। প্রাত্যহিক জীবনে, দৈনন্দিন প্রতিটি কাজকর্মে অহিংসার অনুশীলন না করলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অহিংসার স্মরণ নেওয়া যাবে না। ভূদান, সম্পত্তি দান, শ্রমদান ইত্যাদি অহিংস জীবনচর্যার বাস্তব প্রতিমূর্তি।

সর্বোদয় সম্মেলনের শেষে ১১ই ও ১২ই মে সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের শিবির হোল। এর মধ্যে বিনোবাজী বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হোয়ে সেই সব প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোদয় আদর্শ ও ভূদান যজ্ঞের অধিকতর প্রসারের উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। লোক সেবকদের শিবিরের বর্ণনা করার পূর্বে সত্যাগ্রহী লোকসেবক বলতে কি বোঝায় তার একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। প্রথমেই বলা হোয়েছে যে স্বাধীন ভারতে স্বতন্ত্র লোক শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য গান্ধীজী কংগ্রেসের রাজনৈতিক রূপের পরিবর্তন করে একে লোকসেবকসঙ্ঘের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তখন তা সম্ভব হয় নি। ছয় বৎসর ভূদান আন্দোলন চলার ফলে লোকসেবকের বিচারধারা দেশের জনমানসকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এই বৎসরের প্রথমে তাই বিনোবাজী সত্যাগ্রহী লোক-

সেবকের জন্য নাম আহ্বান করেন। সত্যাগ্রহী লোকসেবকেরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না এবং সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের একমাত্র ধ্যান ও ধারণা হবে। এর জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হোয়ে এবং কেন্দ্রীয় অর্থকোষের সহায়তা না নিয়ে নিষ্কাম জনসেবা করতে থাকবেন। কোন বাহ্যতন্ত্র গড়ার জন্য নয়, চেতনের সঙ্গে চেতনের সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে বিচার বিনিময় করবেন। সমগ্র ভারতে এ যাবত প্রায় এক সহস্র সত্যাগ্রহী লোকসেবক সংগৃহীত হোয়েছে।

সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের শিবিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিনোবাজী সত্যাগ্রহের ভবিষ্যত স্বরূপ সম্বন্ধে যে কথা বললেন, সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। তাঁর মতে সত্যাগ্রহের আদি, মধ্য ও অন্ত—সর্বত্র প্রেমই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং কারও উপর সত্যাগ্রহ প্রযুক্ত হোলে তার জন্য তার মনে সত্যাগ্রহীর প্রতি ভীতি উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সত্যাগ্রহী কখনও চাপ দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষীয়কে তাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য করবেন না। পরাধীন ভারতে সর্বদা সত্যাগ্রহের এই মানদণ্ড আমরা বজায় রাখতে পারিনি। কিন্তু স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় সত্যাগ্রহে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন চাপ দিয়ে কাউকে নতিস্বীকার করাবার প্রয়াসকে সত্যাগ্রহের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। স্বাধীন ভারতে সত্যাগ্রহীকে আরও কঠোর আত্মসংযম, ত্যাগ, তিতীক্ষা, ধৈর্য ও কৃচ্ছ সাধনের পরিচয় দিতে হবে। সেই জন্য সত্যাগ্রহ এখন সৌম্য থেকে সৌম্যতর হবে।

সর্ব সেবা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিপ্লবীর কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বললেন যে—বিপ্লব যে নূতন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বিপ্লবী যদি তার মূর্ত প্রতীক না হয়, তাহলে বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের গর্ভে আত্মসমর্পণ করবে—এই হচ্ছে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিপ্লবের শিক্ষা। সর্বোদয় শ্রমজীবীর সমাজ স্থাপন করতে চায়। সুতরাং সর্বোদয়ের কর্মীকে হয় শ্রম, নচেৎ শ্রমদান দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, নচেৎ চরম পরীক্ষার দিনে নিছক আত্মরক্ষার জৈবিক তাগিদে তাঁরা শ্রমের পূজারী হয়েও ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

নবম সর্বোদয় সম্মেলন শেষ হোল। কর্মিরা নূতন প্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন।

অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও বাঙ্গলা দেশ থেকে বহু সর্বোদয়-প্রেমিক এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, ডাঃ নৃপেন বসু, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা চন্দ, নদীয়ার শ্রীযুক্ত শিশির সেন ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহা, বলরামপুরের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, মেদিনীপুর জেলার প্রবীণ গঠনমূলক কর্মী শ্রীযুক্ত নগেন সেন, কলকাতার খাদীমণ্ডলের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, জলপাইগুড়ি জেলার সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কর্মী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ইত্যাদি প্রধান। তরুণ কর্মীদের ভিতর শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত এবং মনকুমার সেনও ছিলেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের ভিতর কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত, সংহতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নিয়োগী, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র নাগ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের গান্ধীজী কর্তৃক আরব্ধ কর্মের নৈষ্ঠিক অনুগামী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

উমার তপস্যা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

উমার তপস্যা নহে ক্ষণ বসন্তের
অকাল বসন্ত তবু এসেছিল, সাধনা অন্তরে
সে এক আশ্চর্য দিনে, সূর্যস্নাত নির্মল প্রভাতে।
আকাশে অপূর্ব দীপ্তি, নত নেত্র পাতে
উমা আসি প্রবেশিল নিস্তব্ধ নির্জনে ;
সমস্ত অরণ্য ব্যাপি, সেই শুভক্ষণে
কুলে কুলে সুরু হ'ল বসন্ত উৎসব ;
যোগমগ্ন ভোলানাথ ভুলে আছে স্বর্গের বৈভব।
কঠোর সংকল্প তার কঠিন প্রস্তরে অবিচল
সূর্যের অয়নক্রান্তি পূর্বে ও পশ্চিমে অবিকল
চলিতেছে ঋতু আবর্তনে,
কম্প্র বক্ষে উমা আসি দাঁড়াইল অসংশয় মনে।
সেখানে প্রবেশ পথে সজাগ প্রহরী—
দেবাদিদেবের বাক্য শিরোধার্য করি'
দাঁড়াইয়ে নিস্পন্দ যোগে স্তব্ধ বাক্যহীন।
যুগে যুগে যে তপস্যা বিরামবিহীন
অনির্বাণ অগ্নিসম জ্বলিয়াছে কৃচ্ছ সাধনায়,
কর্কশ বল্কল বাসে তুচ্ছ করি' বিশ্ব-বাসনায়
স্বেচ্ছাকৃত রুদ্রতপে ক্ষীণ দেহ বিদ্যুৎ লতিকা
গৌরী আজ ভস্ম ললাটিকা—।
সর্বস্ব ভুলিয়া উমা একমাত্র ভেবেছে শঙ্করে,
তাহার সান্নিধ্যে আসি মৃদুহাস্য বিশুষ্ক অধরে
ফুটিয়া মিলায়ে গেল ; ধ্যান তন্ময়তা
আচ্ছন্ন করিল তারে! ভয়-বিহ্বলতা
ঘুচে গেল সেই ক্ষণে ; বিস্ময়ে দেখিল উমা চাহি'
শিবনেত্র উন্মীলিত, পূর্ব স্মৃতি-সিন্ধু অবগাহি'
জাগিছেন মহেশ্বর বিশ্ব চৈতন্যের দুটি তীরে
শেষ আহুতির শিখা জ্বলিয়া উঠিল ধীরে ধীরে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্বোক্ত ঘটনার এক দণ্ড পরে।

পাটলিপুত্রের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। কুম্ভ এবং অন্যান্য উদ্যান-রক্ষীরা সেনজিতের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পাশের একটি রাস্তা দিয়া নাগবন্ধু প্রবেশ করিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার চোখে চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল—এই সুযোগ! সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

নাগবন্ধু : সেনজিৎ! সেনজিৎকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

সেনজিৎ ঘাড় ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : আমি নির্দোষ। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

কুম্ভ : (ধমক দিয়া) চুপ—কথা কোয়ো না!

তাহারা নাগবন্ধুকে ছাড়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আরও দুই-চারিজন পথচারী আসিয়া জুটিল। নাগবন্ধু দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া চীৎকার করিয়া চলিল—

নাগবন্ধু : ভাই সব—শীঘ্র এস! ছাখো, আমাদের প্রিয় সেনজিৎকে রাজার রক্ষীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

আরও লোক আশপাশের গলি হইতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রবেশ করিল; তাহাদের হাতে লাঠি।

জনগণ : কী হয়েছে! কী হয়েছে?

নাগবন্ধু বাহু প্রসারিত করিয়া দেখাইল।

নাগবন্ধু : ঐ ছাখো—আমাদের প্রিয় বন্ধু সেনজিৎকে রাজরক্ষীরা বিনা দোষে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—

ওয়াইপ্।

অপেক্ষাকৃত জনবহুল পথ। রক্ষীরা সেনজিতকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু রক্ষীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া। বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে নাগবন্ধুর উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—

নাগবন্ধুর স্বর : সেনজিৎ আমাদের বন্ধু—পাটলিপু[illegible] নাগরিকেরা সেনজিৎকে ভালবাসে—রাজার জল্লাদে[illegible] তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আর কতদিন আমরা চ[illegible] অত্যাচার সহ্য করব? আর কতদিন একটা রক্ত পিপা[illegible] রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করবে? মগধবাসি ওঠে জাগো!

ডিজল্ভ্।

রাজপুরীর তোরণ দ্বার। কয়েকজন সশস্ত্র প্রতীহার তোরণ দ্বা[illegible] সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন সতর্কত[illegible] দূর হইতে অগ্রসর জনতার গর্জন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

প্রতীহারদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথাবার্তা হইল; তারপর তাহ[illegible] তোরণ-দ্বার অরক্ষিত রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। বোধ[illegible] রাজসভায় সংবাদ দিতে গেল।

বিপুল জনতা তোরণ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহা[illegible] মাঝখানে সেনজিৎ। রক্ষীরা পলাইয়াছে। জনতা সেনজিতের হ[illegible] রজ্জু খুলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি সহকারে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেন[illegible] দুই হাত তুলিয়া জনগণকে শান্ত হইতে বলিলেন। কোলাহল ঈ[illegible] শান্ত হইলে নাগবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

নাগবন্ধুর স্বর : মগধবাসি! রাজপ্রাসাদের দ্বা[illegible] থেকে ফিরে যেও না—চণ্ড তোমাদের ওপর যে অত্যাচা[illegible] করেছে তার প্রতিশোধ নাও—মারো কাটো—রক্তে স্রোত বইয়ে দাও—

বিক্ষুব্ধ জনসংঘ একবার দুলিয়া উঠিল, তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতে[illegible] মত তোরণ পথে প্রবেশ করিল।

কাট্।

রাজসভার অভ্যন্তর।

চণ্ড সিংহাসনে বসিয়া ঢুলিতেছেন, দুইটি কিঙ্করী পিছনে দাঁড়াই

সিংহাসনে দোল দিতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডের মুখাকৃতি আরও কদাকার হইয়াছে। অদূরে ভূমিতে বসিয়া বটুক ভট্ট নিবিষ্ট মনে একাকী অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সভায় সভাসদ বেশী নাই, যে কয়জন আছে তাহারা তদ্গতচিত্তে মদ্যপান করিতেছে। প্রত্যেকের পাশে একটি ভৃঙ্গার হস্তা তরুণী দাসী দাঁড়াইয়া।

বাহির হইতে জনতার কল-কোলাহল ক্রমে বর্ধিত হইতেছে শুনিয়া চণ্ড ভ্রূভঙ্গ করিয়া আরক্ত চক্ষু মেলিলেন। এই সময় প্রতীহারগণ দ্রুত প্রবেশ করিল।

প্রতীহার: পালাও পালাও—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা ক্ষেপে গেছে—তারা রাজপুরী আক্রমণ করেছে—পালাও—

কিঙ্করীগণ চীৎকার করিয়া যে যেদিকে পাইল পালাইল। সভাসদেরাও ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া সহসা কিঙ্করীদের অনুসরণ করিলেন। বটুকভট্ট লাফ দিয়া সিংহাসনের শৃঙ্খল ধরিয়া ঊর্ধ্বে অন্তর্হিত হইলেন। সভায় চণ্ড ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

চণ্ড টলিতে টলিতে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চণ্ড: আমার খড়্গ—খড়্গ কোথায়!

এই সময় সভার বিভিন্ন দ্বার দিয়া ক্ষুপ্ত জনতা প্রবেশ করিল, চণ্ডকে নিরস্ত্র দেখিয়া তরক্ষুপালের মত তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চণ্ড বন্য মহিষের মত যুদ্ধ করিলেন। বটুক ভট্ট ঊর্ধ্বে ঝুলিতে ঝুলিতে ব্যায়তচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

ওয়াইপ্।

রক্ত-পাগল জনতা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। চণ্ডকে মাটিতে ফেলিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার হস্তপদ মাটির উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া জনগণ বুভুক্ষু চক্ষে চাহিয়া আছে। চণ্ড বন্দী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অসহায় অবস্থাতেও তাঁহার প্রকৃতির দুর্দম বন্যতা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তিনি মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া হস্তপদ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নাগবন্ধু দর্শকচক্রের সম্মুখ ভাগে দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সে চণ্ডের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ছুরিকা ঊর্ধ্বে তুলিল। ছুরিকা চণ্ডের বক্ষে প্রবেশ করিত—যদি না এক বিপুলকায় ব্যক্তি নাগবন্ধুর মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিত।

বিপুলকায় ব্যক্তি: ও কি করছ নাগবন্ধু!

নাগবন্ধু: (উন্মত্তের ন্যায়) ছেড়ে দাও মল্লজিৎ—আমি প্রতিশোধ চাই। আমার শিশুপুত্রকে রথের চাকার তলায় পিষে মেরেছিল—তার প্রতিশোধ চাই—

মল্লজিৎ: স্থির হও নাগবন্ধু। আমাদের সকলের কাছেই চণ্ড ঋণী, তাকে হত্যা করলে সে ঋণ শোধ হবে না। মৃত্যু তো মুক্তি। চণ্ডকে আমরা এত সহজে মুক্তি দেবনা, তিল তিল করে কড়ায় গণ্ডায় তার অত্যাচারের ঋণ আদায় করে নেব। আমরা চণ্ডকে এমন শাস্তি দেব—! কিন্তু ভেবে চিন্তে সে-শাস্তি ঠিক করতে হবে—এখন নয়। ভাই সব, তোমরা চণ্ডকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো—

যাহারা চণ্ডের হস্ত-পদ চাপিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং টানিতে টানিতে সভার বাহিরে লইয়া গেল। অধিকাংশ জনতাও কলকোলাহল করিতে করিতে সঙ্গে গেল।

ওয়াইপ।

সভার মধ্যে সেনজিৎ নাগবন্ধু মল্লজিৎ ও চার-পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ নাই। সেনজিৎ সভাগৃহের এক পাশে বিমর্ষভাবে করলগ্নকপোলে বসিয়া আছেন, অন্য সকলে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া মন্ত্রণা করিতেছে। মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে মল্লজিৎ অগ্রণী। বটুক ভট্ট অলক্ষিতে মন্ত্রণাকারীদের মাথার উপর ঝুলিতেছেন।

মল্লজিৎ: বিপ্লবের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আবার গড়ে তুলতে হবে। আবার আমাদের নতুন রাজা চাই—

নাগবন্ধু: রাজার কী দরকার? বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র—

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে নাগবন্ধুর পানে চাহিল।

একজন: প্রজাতন্ত্র আবার কি?

মল্লজিৎ: প্রজাতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানিনা। আমরা জানি যে-রাজ্যে রাজা নেই সে-রাজ্য অরাজক। অতএব আমাদের রাজা চাই। এখন প্রশ্ন এই—কে রাজা হবে। কাকে আমরা রাজা করব। রাজা হবার যোগ্যতা কার আছে।

সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেনজিতের দিকে ফিরিল। সেনজিৎ এই মিলিত দৃষ্টির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

সেনজিৎ: কী! আমার দিকে চাইছ কেন? আমি রাজা হতে চাই না। না না, তোমরা আর কাউকে—

মল্লজিৎ হাত তুলিয়া সেনজিৎকে নিরস্ত করিল।

মল্লজিৎ: সেনজিৎকে রাজ্যের সকলে ভালবাসে—সেনজিৎ শান্ত প্রকৃতির নিরভিমান হৃদয়বান পুরুষ। আমার অভিমত সেনজিৎ রাজা হোন—

নাগবন্ধু : কিন্তু শিশুনাগ বংশেরই আর একজনকে—

মল্লজিৎ : শিশুনাগ বংশের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

অন্য নাগরিক : আমাদেরও নেই। চণ্ডই আমাদের শত্রু ছিল।

সেনজিৎ : কিন্তু—কিন্তু—সিংহাসনে আমার রুচি নেই। বন্ধুগণ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই—

মল্লজিৎ : সেকথা জনসাধারণ বিচার করুক।

সেনজিতের হাত ধরিয়া মল্লজিৎ সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতায়নের বাহিরে পুরভূমির উপর বিক্ষুব্ধ জনমর্দ আবর্তিত হইতেছে, বাতায়নে মল্লজিতের সহিত সেনজিৎকে দেখিয়া তাহারা সোল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। মল্লজিৎ হাত তুলিয়া তূর্যকণ্ঠে তাহাদের সম্বোধন করিল—

মল্লজিৎ : মগধবাসী জনগণ, আমরা আমাদের প্রিয়-বন্ধু সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাতে চাই—তোমাদের অভিমত আছে কিনা জানাও।

জনমর্দ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সঙ্গে শঙ্খ ও শৃঙ্গ-নিনাদ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সেনজিতের মুখে কিন্তু হাসি নাই। নাগবন্ধুর ললাটও মেঘাচ্ছন্ন।

সেনজিৎকে লইয়া মল্লজিৎ ও অন্য সকলে সভার মধ্যস্থলে গেল এবং সেনজিৎকে সিংহাসনে বসাইল।

মল্লজিৎ : মুকুট—রাজমুকুট কোথায়?

সকলে ইতস্ততঃ রাজমুকুট খুঁজিতে লাগিল। একজন সিংহাসনের পিছনে চণ্ডের শিরশ্চ্যুত মুকুট দেখিতে পাইল। 'এই যে' বলিয়া সে মুকুট কুড়াইয়া লইয়া সেনজিতের মাথায় পরাইয়া দিল।

এই সময় বটুক ভট্ট শৃঙ্খল-যোগে ঊর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসিলেন। দুই হাত তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

বটুকভট্ট : জয়োস্তু মহারাজ!

দীর্ঘ ডিজল্‌ভ্‌।

দিবাকাল। বৈশালীর মন্ত্র ভবনে একটি কক্ষ।

তিনজন কুলপতি বেদীর উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বয়স আরও বাড়িয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে পৃথক আসনে শিবামিশ্র হেঁট মুখে বসিয়া আছেন। প্রধান কুলপতি সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিতেছেন—

১ কুলপতি : আপনার এত দীর্ঘ সাধনা, এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা—সবই ব্যর্থ হল। আবার শিশুনাগ বংশেরই একজন মগধের সিংহাসনে বসেছে।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শিবামিশ্র মুখ তুলিলেন।

শিবামিশ্র : হাঁ, মগধের প্রজাপুঞ্জ আবার শিশু[নাগ] বংশের একজনকে সিংহাসনে বসিয়েছে। কিন্তু আ[মার] সাধনা এখনও ব্যর্থ হয়নি। এখনও আমার হাতে এ[ক] অস্ত্র আছে—একটি অমোঘ অস্ত্র আছে। ভেবেছিলা[ম] অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে না—কিন্তু আর উপায় নেই।

২ কুলপতি : কী অস্ত্র—কোন্ অস্ত্রের কথা বলছে[ন]

শিবামিশ্র : মহামান্য কুলপতিগণ, এতদিন অ[মি] আপনাদের কাছে কোনও সাহায্য চাইনি, মনে করেছি[লাম] আমি একাই শিশুনাগ বংশ নির্মূল করতে পারব। [কি]ন্তু এখন আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে—

১ কুলপতি : কি প্রার্থনা বলুন। আমরা তো সর্ব[দা] সর্বভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

শিবামিশ্র : ধন্য! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মগ[ধের] সঙ্গে লিচ্ছবির ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থাকলেও প্রকা[শ্যে] মৈত্রীভাবই আছে—

কুলপতিগণ সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

৩ কুলপতি : তা আছে।

শিবামিশ্র : কিন্তু দীর্ঘকাল লিচ্ছবির কোনও রা[জ] প্রতিনিধি মগধের রাজসভায় উপস্থিত নেই।

১ কুলপতি : না। মগধও আমাদের সভায় প্রতি[নিধি] পাঠায় নি, আমরাও পাঠাই নি।

শিবামিশ্র : মগধে এখন নূতন রাজা, সুতরাং প্রতি[নিধি] পাঠালেও দোষের হবে না। আপনারা প্রতিনিধি পাঠা[ন]— শুধু আমার প্রার্থনা, আমি যাকে নির্বাচন করব তা[কে] প্রতিনিধি পাঠাবেন।

কুলপতিগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সম্মতি সূচক শিরঃসঞ্চা[লন] করিলেন।

১ কুলপতি : আপত্তি কি? এতেই যদি আপন[ার] কার্যসিদ্ধি হয়—

শিবামিশ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া আশী[র্বাদ] করিলেন—

শিবামিশ্র : আপনারা ধন্য।

ডিজল্‌ভ্‌।

দিবাকাল। শিবামিশ্রের বাটি সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি

পুরুষবেশা উল্কা একজন বয়স্ক অসি-শিক্ষকের সহিত অসিক্রীড়া করিতেছে। দু'জনের হাতে রজ্জু অসি, দেহে লৌহজালিক। অসির সহিত অসির সংঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিতেছে, অসি-ফলকে আলো ঝলকিয়া উঠিতেছে। উল্কার অধরেও মাঝে মাঝে হাসির ঝলক খেলিয়া যাইতেছে।

অসি-ক্রীড়া চলিতেছে এমন সময় শিবামিশ্র ক্রীড়াভূমির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে একাগ্র কঠোর দৃষ্টি। তিনি নীরবে অসিক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উল্কা শিক্ষককে অসি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। নতজানু উল্কার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

গুরু: বিজয়িনি, তোমাকে আর আমার কিছু শেখাবার নেই।

শিবামিশ্র উল্কার পিছনে আ সয়া দাঁড়াইলেন।

শিবামিশ্র: শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবামিশ্রের দিকে ফিরিয়া হাসিল, শিবামিশ্র কিন্তু হাসিলেন না, গম্ভীরভাবে উল্কাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

শিবামিশ্র: উল্কা, তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে—যাও, স্নান কর গিয়ে। স্নান করে আমার ঘরে যেও—তোমাকে কিছু কথা বলবার আছে।

উল্কা ঈষৎ বিচলিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করিয়া প্রস্থান করিল।

উল্কা: যে আজ্ঞা পিতা।

ওয়াইপ্।

একটি প্রসাধন কক্ষ। উল্কা স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, সিক্ত কেশ পৃষ্ঠে লম্বিত। সে একটি ধাতু-নির্মিত দর্পণ বাঁ হাতে ধরিয়া সযত্নে ভ্রূ মধ্যে সিন্দুরের টিপ পরিল।

কাট্।

শিবামিশ্র নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

উল্কা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। শিবামিশ্রকে আত্মস্থ দেখিয়া সে সংকুচিতভাবে বেদীর পাশে আসিয়া বসিল। শিবামিশ্র চিন্তা-জড়িমা হইতে জাগিয়া উল্কার পাশে স্নেহ-বিধুর চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, অঙ্গুলি দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলিলেন—

শিবামিশ্র: কন্যা—আমার কন্যা—

উল্কা: (শঙ্কা বিস্ফারিত চক্ষে) কী হয়েছে পি

শিবামিশ্র আত্ম-সংবরণ করিলেন।

শিবামিশ্র: মা, আজ যে-কথা তোমাকে যাচ্ছি তা উচ্চারণ করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বলতে হবে। তোমার জীবনের কাহিনী আজ তো শোনাব।

উল্কা: আমার জীবনের কাহিনী!

শিবামিশ্র: হাঁ। বড় ভয়ঙ্কর সে কাহিনী। সহ্য করতে পারবে?

উল্কা ক্ষণেক নিজের মনের অজ্ঞাত আশংকার সহিত যুদ্ধ তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল—

উল্কা: বলুন পিতা, আমি সহ্য করতে পারব।

কুণ্ঠিত নীরবতার পর—

শিবামিশ্র: উল্কা, তুমি আমার কন্যা নও।

উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল, তাহার অধরোষ্ঠ বিভক্ত গেল। শেষে সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

উল্কা: কন্যা নই—আপনার কন্যা নই! আমি কে?

শিবামিশ্র: তুমি যখন একদিনের শিশু তখন তোমাকে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান থেকে তুলে এনেছিল

উল্কা: পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান—(রুদ্ধশ্বাসে) সব কথা আমাকে বলুন, কিছু গোপন করবেন না।

দুইজনেই গভীরভাবে অভিভূত। তারপর শিবামিশ্র নিজের ম করিয়া বলিলেন—

শিবামিশ্র: বলছি শোনো। উল্কা, কন্যা আমার বলছি সংযত ভাবে শোনো, ধৈর্য হারিও না—

উল্কা: না পিতা, আমি ধৈর্য হারাব না—আ বলুন।

অতঃপর কয়েকটি ফ্ল্যাশ্-ব্যাক দ্বারা ষোল বৎসর পূর্বে মহাশ্মশানের দৃশ্য প্রদর্শিত হইল। তারপর আবার বর্তমান ফিরিয়া আসিল। শিবামিশ্র উল্কার জীবন কাহিনী বলা শেষ করিয়া উল্কা সারা দেহ ঋজু ও কঠিন করিয়া বসিয়া আছে, তাহার চোখের দ অস্বাভাবিক।

শিবামিশ্র: বৎসে, এই তোমার জীবনের ইতিহা তুমি বিষকন্যা।

উল্কা : বিষকন্যা—

শিবামিশ্র : হাঁ। বিষকন্যা যে পুরুষের সংসর্গে আসবে তার মৃত্যু হবে। তাই তোমার বিবাহ দিইনি।

উল্কা নতদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিবার পর চক্ষু তুলিল।

উল্কা : পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ইতিহাস আমাকে বলবার কি প্রয়োজন ছিল ?

শিবামিশ্র : যতদিন প্রয়োজন হয়নি বলিনি। আজ প্রয়োজন হয়েছে—উল্কা, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আমি বেঁচে আছি। চণ্ড আর মগধের সিংহাসনে নেই বটে, কিন্তু শিশুনাগ বংশ এখনও সদর্পে রাজত্ব করছে। এর প্রতি-বিধান এখন এক তুমিই করতে পার।

উল্কা : আমি ! আমি কি করতে পারি ?

শিবামিশ্র স্থির নেত্রে উল্কার পানে চাহিলেন।

শিবামিশ্র : তুমি বিষকন্যা। শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদ তুমিই করতে পার।

উল্কা তাহার কথার ইঙ্গিত বুঝিল।

উল্কা : কি করতে হবে বলে দিন।

শিবামিশ্র : যা বলব—পারবে ?

উল্কা : পারব।

শিবামিশ্র : শোনো—শিশুনাগ বংশের সেনজিৎ এখন মগধের সিংহাসনে। প্রজারা তাকে ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে মাৎস্যন্যায় করবে না। আমরা স্থির করেছি তোমাকে লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি করে পাটলিপুত্রে পাঠাব। তুমি রাজসভায় আসন পাবে, সর্বদা সেনজিতের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হবে।...সেনজিৎ বয়সে তরুণ, তার ওপর শিশুনাগ বংশের রক্ত তার শরীরে আছে—বুঝতে পারছ ?

উল্কা : বুঝেছি পিতা। আর কিছু করতে হবে ?

শিবামিশ্র : (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) শুনেছি প্রজারা ওকে হত্যা করেনি। সে যদি বেঁচে থাকে, তোমার মা মারিকার ঋণ এখনও শোধ হয়নি।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল।

উল্কা : সে ঋণ আমি শোধ করব।

শিবামিশ্রও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উল্কা তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

উল্কা : পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার মায়ের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তা সার্থক হবে। আপনি আমাকে কন্যার মত পালন করেছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়ে পরিশোধ করব।

শিবামিশ্র উল্কার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল—

শিবামিশ্র : উল্কা ! প্রাণাধিক কন্যা আমার ! আশীর্বাদ করি বিজয়িনী হয়ে আবার আমার কোলে ফিরে এস—

উল্কা নতজানু হইয়া তাহার জানু জড়াইয়া ধরিল

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন।

দিবা দ্বিপ্রহর। পাটলিপুত্র নগরের উপকণ্ঠে মৃগয়া-কাননকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া নির্জন পথ গিয়াছে।

মধ্যবয়স্ক কৃষকশ্রেণীর একটি লোক এই পথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথায় বৃহৎ ঝাঁকা, ঝাঁকার মধ্যে কয়েকটি কলার কাঁদি রহিয়াছে; মনে হয় লোকটি কদলী লইয়া পাটলিপুত্র নগরে বিক্রয় করিতে যাইতেছে।

একটি বৃক্ষতলে আসিয়া লোকটি ঝাঁকা নামাইয়া বসিল, গামছা দিয়া নিজেকে বীজন করিতে লাগিল; তারপর এক কাঁদি সুপক্ব কলা বাহির করিয়া নিশ্চিন্তমনে খাইতে লাগিল।

বাঁকের মুখে অনেকগুলি অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। লোকটি গলা বাড়াইয়া দেখিল। একদল অশ্বারোহী আসিতেছে।

অশ্বারোহীদের অগ্রে উল্কা। তাহার পাশে একটু পিছনে উল্কার প্রিয়সখী বাসবী। তাহাদের পশ্চাতে আরও তিনটি তরুণী। সকলেরই পুরুষ বেশ। তাহাদের পিছনে চার জন পুরুষ রক্ষী।

কদলী-ভক্ষণ নিরত লোকটির পাশ দিয়া যাইবার সময় উল্কা অশ্ব স্থগিত করিল।

উল্কা : পথিক, পাটলিপুত্রের পুরদ্বার আর কতদূর বলতে পারো ?

পথিক : তা পারি বৈকি ঠাকরুণ।—এই রাজপথ দিয়ে যদি যাও, চার ক্রোশ পথ। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, পৌঁছুতে দু'তিন দণ্ড লাগবে।

উল্কা : রাজপথ ছাড়াও অন্য পথ আছে নাকি ?

পথিক : আছে ঠাকরুণ, এই বনের ভিতর দিয়েও

যাওয়া যায়। তবে ওটা রাজার মৃগয়া-কানন, সাধারণ লোকের ওর ভিতর দিয়ে যাওয়া বারণ।

উল্কা : (ভ্রূভঙ্গি করিয়া) বারণ! তবে আমি বনের ভিতর দিয়েই যাব, দেখি কে বারণ করে। (অন্য সকলকে) তোমরা রাজপথ দিয়ে যাও।

বাসবী : ও প্রিয় সখি, তুমি বনের ভিতর দিয়ে একলা যাবে ? যদি হারিয়ে যাও।

উল্কা : ভয় নেই, আমি হারাব না। দেখিস, তোদের আগে পৌছুব।

উল্কা ছাড়া আর সকলে পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, তারপর উল্কা মৃগয়া কাননে প্রবেশ করিল। পথিক কলা খাইতে খাইতে দেখিল।

পথিক : হুঁ। দেবীর দেখছি এবার ঘোটকে আগমন ! ডিজলভ।

মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া উল্কা চারিদিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কোথাও হরিণের দল, কোথাও সরোবরে মরাল সারস ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও ময়ূর নাচিতেছে।

একটি ঝিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, ঝিলের কিনারায় নতজানু হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

জলপানান্তে পিছু ফিরিয়া উল্কা দেখিল ভীষণাকৃতি কৃষ্ণকায় একটা লোক তাহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা মৃগয়া-কাননের রক্ষী কুম্ভ।

কুম্ভ : কে রে তুই ! তোর কি প্রাণের ভয় নেই ?— আরে এ কি—এ যে নারী !!

উল্কা অধর কুঞ্চিত করিল।

উল্কা : হাঁ নারী।—তুমি কে ?

কুম্ভের উগ্রভাব তিরোহিত হইল।

কুম্ভ : আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, তুমি এই পথ-হীন বনে একলা এসেছ—বুঝেছি—অভিসারে এসেছ। (চোখ টিপিয়া) তোমার নাগর কৈ ?

উল্কা উত্তর দিল না, বিরক্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিল। কুম্ভ লুব্ধ ভাবে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুম্ভ : —তা নাগরিকা, নাই বা এল তোমার নাগর, অভিমান করে চলে যেও না।—এস, কাছেই আমার গুল্ম, চল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই—(উল্কা ঘৃণাভরে তাহাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল)—ও কি চললে যে আমিও তো পুরুষ,আমার পানে একবার চেয়েই দেখ

কুম্ভ উল্কার হাত ধরিবার চেষ্টা করিল।

উল্কা : আমাকে ছুঁও না—অনার্য !

কুম্ভ : অনার্য ! বটে ! তবে দেখি আজ অনার্যে[illegible] থেকে কে তোমাকে রক্ষা করে—

কুম্ভ বাম বাহু দ্বারা উল্কার কটি বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিল লালসাপূর্ণ মুখ উল্কার মুখের কাছে আনিল।

উল্কা : বর্বর ! জানিস না—আমি বিষ[illegible] আমাকে ছুঁলে মরতে হয় !

বিদ্যুৎবেগে কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কা কুম্ভের বিদ্ধ করিয়া দিল। কুম্ভ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর মধ্যে শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

উল্কা অগ্নিপূর্ণ চক্ষে কুম্ভকে দেখিতে দেখিতে ছুরিকা আবার কটিতে রাখিল, তারপর এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল।

ডিজলভ্।

দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। পাটলিপুত্রের উত্তুঙ্গ নগর দ্বার। জন-চলাচল নাই ; তোরণ দ্বারের দুই পাশে দুই জন করিয়া প্রতী[illegible] প্রাচীর গাত্রে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে, তাহাদের হাতে বল্লম।

একটি ফুটি-কাঁকুড় বোঝাই গরুর গাড়ী বাহির হইতে ভিতর [illegible] চলিয়া গেল। তারপর দ্রুত অশ্বক্ষুর ধ্বনি শুনিয়া প্রতীহার চতুষ্টয় [illegible] হইয়া দাঁড়াইল।

উল্কা ও তাহার দল আসিতেছে। প্রতীহারগণ ইতিমধ্যে দৃঢ়ভা[illegible] বল্লম ধরিয়া পথ আগ্‌লাইয়া সম ব্যবধানে দাঁড়াইয়াছে। উ[illegible] তাহাদের সম্মুখে আসিয়া রসি টানিয়া অশ্বকে দাঁড় করাইল। তাহ[illegible] সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা কিছুদূর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

প্রতীহারদের মধ্যে যে-ব্যক্তি প্রধান তাহার গালপাট্টা ও গোঁফ ব[illegible] বড়। সে বলিল—

প্রতিহার : কে যায় !

উল্কা : লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি।

প্রতিহার : প্রতিনিধি মহাশয় কোথায় ?

উল্কা : আমি লিচ্ছবির প্রতিনিধি—পথ ছাড়ো।

প্রধান প্রতীহার গোলাকার চক্ষু পাশের প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, পাশের প্রতীহার চক্ষু গোল করিয়া তৃতীয় প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, তৃতীয় প্রতীহার চতুর্থ প্রতীহারকে উক্তরূপে নিরীক্ষণ করিল। উল্কা

অধীর ভাবে অধর দংশন করিল। তখন প্রধান প্রতীহার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল—

প্রতিহার : লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মহাশয়া, নগরে প্রবেশ করুন।

কাট্।

নগরের অভ্যন্তর। তোরণ দ্বার হইতে কিয়দ্দূরে পথের পাশে একটি জলাধার, প্রস্তর নির্মিত গো-মুখ হইতে জল নিঃসৃত হইয়া জলাধারে সঞ্চিত হইতেছে। কয়েকটি মৃত্তিকার পান-পাত্র ইতস্তত পড়িয়া আছে।

সহসা অতিদূর হইতে শুষ্ক কর্কশ কণ্ঠস্বর আসিল—

স্বর : জল! জল! জল দাও—

উল্কার দল মন্থর গতিতে এই দিকেই আসিতেছে। তাহারা জলাধারের পাশ দিয়া যাইবার সময় আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

স্বর : জল! জল! জল দাও—

উল্কা ঘোড়া থামাইল, বাসবীও আসিল। উল্কা আর সকলকে আগে বাড়িতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা চলিয়া গেল।

উল্কা ও বাসবী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

কাট্।

রাজপথ হইতে অদূরে একটি কণ্টকগুল্মের আড়ালে প্রস্তর নির্মিত একটি বেদী ; বেদীটি সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ হাত। ভূতপূর্ব মগধেশ্বর চণ্ড এই বেদীর উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, মাথার রুক্ষ জটিল কেশ, চোখে তীব্র হিংস্র দৃষ্টি।

চণ্ড : জল! জল! জল!

উল্কা ও বাসবী আসিয়া বেদীর পাশে দাঁড়াইল। উল্কার মুখে কোনও বিকার নাই, কিন্তু বাসবী ভয় পাইয়াছে।

বাসবী : এ কে প্রিয়সখি?

উল্কা : (চণ্ডকে দেখিতে দেখিতে) বোধহয় কোনও অপরাধী।

তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চণ্ড মাথা তুলিলেন ; দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন—

চণ্ড : জল দাও—জল!

উল্কা অবিচলিত ভাবে চণ্ডের পানে চাহিয়া বলিল—

উল্কা : বাসবী, জলাধার থেকে জল নিয়ে আয়—

বাসবী যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

উল্কা আরও কিছুক্ষণ চণ্ডকে অবিচলিত মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

উল্কা : কোন্ অপরাধে তোমার এই দণ্ড হয়েছে?

চণ্ড উত্তর দিলেন না, কণ্ঠের মধ্যে ক্রুর ব্যাঘ্রের মত শব্দ করিলেন। বাসবী মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু চণ্ডের নিকটে যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিল। উল্কা তখন মৃৎপাত্র লইয়া চণ্ডের হাতে দিল। চণ্ড দুই হাতে পাত্র ধরিয়া জল পান করিলেন এবং শূন্য পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

উল্কা : কে তোমার এমন অবস্থা করেছে? শিশুনাগ বংশের রাজা?

চণ্ড বিষাক্ত চক্ষে উল্কার পানে চাহিলেন।

চণ্ড : পথের কুকুর সব—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—

বাসবী : (ভীতভাবে) এস প্রিয়সখি, আমরা চলে যাই—

উল্কা : (চণ্ডকে) তুমি কে?

চণ্ড : আমি কে! তুই জানিস না? হা হা—

উল্কা : আমি পাটলিপুত্রে নতুন এসেছি।

চণ্ড : যা—দূর হ—দূর হয়ে যা। একদিন তোদের পায়ের তলায় পিষেছি—আবার যেদিন শিকল ছিঁড়ব—যা, এখন দূর হ'।

উল্কা : (সহসা প্রজ্বলিত চক্ষে) তোমার নাম কি?

চণ্ড : আমার নাম জানিস না! মিথ্যাবাদিনী। আমার নাম কে না জানে! আমি চণ্ড—মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু—তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর। আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি—মহারাজ চণ্ড!

উল্কার সারা দেহ যেন বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে এক পা আগে বাড়িল, অমনি বাসবী পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

বাসবী : প্রিয়সখি, চল আমরা যাই। এখানে কেউ নেই—আমার ভয় করছে।

উল্কা বাসবীর দিকে ফিরিয়া মুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিল।

উল্কা : বাসবি, তুই যা। তোরা সকলে ঐ পিপ্পলি গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাচ্ছি।

বাসবী একটু দ্বিধা করিল ; উল্কা তাহাকে লঘুহস্তে ঠেলিয়া দিল। তারপর চণ্ডের দিকে ফিরিল। বাসবী চলিয়া গেল।

উল্কা : (গভীর বিরাগ ভরে) তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড!

চণ্ড : ভূতপূর্ব নয়, আমিই রাজা। আমি থাকতে মগধে অন্য রাজা নেই।

উল্কা : তোমার প্রজারা তাহলে তোমাকে হত্যা করেনি!

চণ্ড : আমাকে হত্যা করবে এত সাহস কার আছে? যেদিন শিকল ছিঁড়ব—

চণ্ড শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টায় দুই বাহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, শিকল কিন্তু ছিঁড়িল না।

উল্কা : (কুঞ্চিত চক্ষে) মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নামে রাজপুরীর এক দাসীকে মনে পড়ে?

চণ্ড : মোরিকা! কে মোরিকা!

উল্কা : মনে করে দেখুন, আপনার অবরোধে মোরিকা নামে দাসী ছিল—মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মেছিল—আপনি সেই বিষকন্যার পিতা। মনে পড়ে?

চণ্ডের চক্ষু সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

চণ্ড : মনে পড়েছে! সেই বিষকন্যাকে শ্মশানের বালুতে পুতেছিলাম—হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্রী শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খেয়েছিল—

উল্কার কণ্ঠে গাঢ় চীৎকার ফুটিয়া উঠিল—

উল্কা : সে বিষকন্যা মরেনি, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খায়নি। মহারাজ চণ্ড, ভাল করে চেয়ে দেখুন—নিজের কন্যাকে চিনতে পারছেন না? (চণ্ড বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন) আমি সেই বিষকন্যা!—মহা শিশুনাগবংশের চিরন্তন নিয়তি মনে আছে কি? বংশের রক্ত যার শরীরে আছে সেই পিতৃহন্তা হবে। বহু দূর থেকে বংশের প্রথা পালন করতে এসেছি।

উল্কা কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল। কন্তু উত্তেজনার সে চণ্ডের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, চণ্ড শৃঙ্খলিত হস্তে তাহার মা ধরিয়া ফেলিলেন। উল্কা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল চণ্ডের বজ্রমুষ্টির চাপে ছুরি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। নিঃ দুজনের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল।

এই দৃশ্য হইতে কয়দূরে নাগবন্ধুকে দেখা গেল। মুহূর্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে চণ্ড দুই হাতে উল্কার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছেন, উল্কার নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিয়া উল্কার অসিত তুলিয়া লইল এবং একটি আঘাতে উহা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবিষ্ট করাইয়া দি

চণ্ডের হাত শিথিল হইয়া গেল, তিনি চিৎ হইয়া বেদীর উপর পা গেলেন। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কটিলগ্ন হস্তে দেখিতে লাগিল।

চণ্ডের প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুই তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখ গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। তারপর চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

ঊর্ধ্বে বায়সের কর্কশ স্বর শোনা গেল। উল্কা এবং নাগবন্ধু তুলিয়া দেখিল অদূরে একটি বৃক্ষের শুষ্ক শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে

ফেড্ আউট্।

ক্রমশঃ

নিভৃতে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এই ভালো—শান্ত-স্নিগ্ধ বধির এ নগ্ন নীরবতা!
আকাশ বাতাস কহে কানে কানে ভাষাহীন কথা।
নিদ্রাহারা মায়ারাতি,
নাহি যদি থাকে সাথী
ক্ষতি কিবা? আছে শ্যামশষ্পদল, পুষ্প-তরুলতা!
ধূলিধুম কোলাহলে অবিরল ক্লান্তক্লিষ্ট প্রাণ;
কে তুমি দিয়েছ মোরে এ নিভৃতে মুক্তির সন্ধান?
কি কাজ ফিরিয়া ঘরে?
থাকি হেথা চিরতরে,
জীবন সংগ্রাম হ'তে ক্ষণকাল মাগি পরিত্রাণ!

এত যে সুন্দর সৃষ্টি—কে জানিত আগে মরি মরি,
কে বলে জরতী ধরা? এ যে তন্বী নবীন নাগরী!
ক্লেদপঙ্ক মাঝে পড়ি'
করি শুধু গড়াগড়ি,
কেন নাহি করি পান এ সৌন্দর্য্য দুটি আঁখি ভরি!
হিল্লোলিত দূর্ব্বাদলে এলাইয়া তপ্ত দেহখানি—
ধুয়ে যাক্, মুছে যাক্ জীবনের তাপ আর গ্লানি।
অলস কল্পনাবায়
মন যদি ভেসে যায়—
আজি এই স্তব্ধ রাতে সংসারের কার কিবা হানি!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঝিলমের জল তর তর করে বইছে। হব্বার নাম ওরা করলো। আমি তখন বাঁ ধারের শাদা ইমারতখানাকে দেখছি। এককালে ছিল কাশ্মীর-রাজপ্রাসাদ। আজ কাশ্মীর-সেক্রেটারিয়েট। এর সামনে দিয়ে খাল গেছে সোজা চিনার বাগ। এর ধার দিয়ে অন্য খাল গেছে কোথায় কে জানে।

রোদে গা এলিয়ে প্রায় শুয়ে আছি। অসিত বলছে, "থামবেন না দাদা—হাব্বাকে বলুন।"

"হাব্বাকে বড় ভালবাসি আমি। সব কাশ্মীরী ভালবাসে। সুকুমারী

হমদানী মসজিদ

কিশোরী হাব্বা—কাশ্মীরের মীরাবাঈ। তার কাহিনী মীরাবাঈয়ের চেয়েও করুণ, চমৎকার। গান শুনবে? শোনো, তার আগে দেখে নাও মসজিদ, এই হামদানীর মসজিদ—কাশ্মীরে হিন্দুমুসলমানের মিলিত তীর্থ—"

"গান গাও শুনি"—বেণু বললো।

গান ধরলাম—

পথের নেশায় ঘর ছেড়েছি ফিরতে ঘরে চাইনি
আমি ফিরতে ঘরে চাইনি।
বেলা গেলো সন্ধ্যা হোলো, ঘরের পানে চাইনি।
তবু ঘরের পানে চাইনি।

ছিলাম মায়ের স্তন্য ধারায়
বাপের নয়ন তারায় তারায়
হাব্বা খাতুন নাম ভুলেছি, সে নাম তো আর গাইনি।
কোলাহলের মাঝখানেতে
এড়িয়ে যেতে যতই গেছি, যেতে তো কই পাইনি।
ফকীর, সাধু পথের পাগল
ঘরের ছেলে ভাড়া আগল
দেখতে সবাই এলো ছুটে, (আমি) দেখতে কারেও পাইনি।
(আমার) বেলা যে যায় দিন যে ফুরায়
ঠিকানা কই পাইনি, (পথের) ঠিকানা কই পাইনি।

শিকারা চলেছে। খুচ্ করে কোন সময় অসিত একটা ছবি তুলে নিয়েছে, বেণু আর আমি বসে গান গাইছি। বাঁ ধারে শ্রীনগর সংস্কৃত বিদ্যালয়। তারপরে মেয়েদের স্কুল। ঘাটের ওপরে বাড়ীর বারান্দায় বাগান করা। বড় বড় দালিয়াগুলোই চোখে পড়ে, নানা রংয়ের মরশুমী ফুল। জলের গতির মধ্যে চেয়ে থাকার নেশা। শান্ত শীতল প্রবাহ। হাত দিলে বোঝা যায় তার বেগ। গভীরতার নির্দেশ আকুলতার ইঙ্গিত।

হাব্বার কথায় সমস্ত মন কণ্টকিত হচ্ছে রোমাঞ্চ পুলকে। হাব্বাখাতুন বোধ করি মীরার চেয়েও রোমান্টিক আবেদন এনে দেয় কাশ্মীরীদের মনে। এই হাব্বার গানের একটা ধারা আছে, যেটা শোকের ধারা; পরাহত ব্যগ্রতার বেদনা, নিস্ফল প্রয়াসের বেদনা, জীবনভোর, অসাধ্যসাধনের পরে বঞ্চিতের বেদনায় পুষ্ট সেই শোক। এই শোকসক্ত মর্মবাণীর সুর ও ছন্দকে কাশ্মীরীরা বলেছে "লোল"; একটা বিশেষ পর্যায়ের গীতছন্দ, তার বস্তু প্রেম, তার সুর বিরহ, তার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব একটি অশ্রুবিন্দুর মত স্বচ্ছ, স্বল্প, সম্পূর্ণ অচল মানবতায় পরিপূর।

চারশো বছর আগে অজ্ঞাত এক চাষার ঘরে কন্দন নদীর ধারে হাব্বা যেদিন জন্মালো সেদিন হাব্বার মা কেঁদে ফেললো, মেয়ে হয়েছে দুঃখে। কিন্তু হাব্বার বাপ বুকে করে নিলো অপ্সরীর মতো মেয়েটাকে।

তার চোখ দুটি ভাসা ভাসা, তার চাহনিতে একটা শান্তির পরিবেশ। এ মেয়ে এলো কঙ্কন নদীর মতো দুরন্ত উচ্ছলতায় পরিপূর হয়ে নয়,

বেণু আর আমি

কঙ্কনের ধারের পাইন-ভরা পাহাড়ের ভীরু রহস্যের মতো নিবিড় স্থৈর্যে সমাহিত।

তখন নাম হাব্বা নয়। বাপ মায়ের দেওয়া নাম অব্দীরাখের। ডাকনাম 'জু'। গরু ভেড়া নিয়ে জু মাঠে যায়। হুঁশ থাকেনা ভেড়ার দিকে, সে চেয়ে থাকে আলো ছায়ায় ঘেরা ওপারের দীঘল বনের দিকে, আকাশের গায়ে শাদা মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের মাথার শাদা বরফের মিতালির দিকে। সে শুনতে থাকে পাপিয়া, দোয়েল, বুলবুলের শিষ। আর হাততালি দিয়ে নৃত্য করে ওঠে আনন্দে। সন্ধ্যা হয়ে আসে। সহচরীরা সব যে যার ভেড়া নিয়ে ফিরে যায় ঘরে। জু ফিরে যেতে ভুলে যায়। ভেড়ার দল জুয়ের চারপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে। জুয়ের বাপ মেয়েকে খুঁজতে এসে দেখে ভেড়া জড়িয়ে হাব্বা শুয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে ঘাসের ওপর। তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্ফীতা কঙ্কন।

জু বাড়ীতে থাকে না। কেবল বাইরে থাকে। নাচে গান গায়। নিজেই কথার পর কথা জুড়ে জুড়ে গান গায়। বাপ জানে এ মেয়ের দুর্গতি ভোগ আছে কপালে। তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়।

দিব্যি বর হোলো হাব্বার। বড়লোক চাষার একমাত্র ছেলে। সুন্দর, সুপুরুষ। হাব্বার বন্ধু সে, খেলার সাথী। হাব্বা তাকে বলে, "ঘর আমার নয়, বরও আমার নয়। আমার কেবল ভালবাসা। মাটী যার পাত্র, আকাশ যার ঢাকা, সেই পেয়ালায় কে যেন দিয়েছে আমার ভালবাসার এক চুমুক। শেষ করে দিতে ভরসা হয়না গো। তাই একটু একটু করে চেখে চেখে খাই। ঝর্ণার ধারে পাহাড়ের নীচে, নদীর তীরে গিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে থাকি, সে-ই আমার ভালো লাগে। ঘরের মধ্যে বর-বৌ বন্দী থেকে লাভ কি? দেহের মধ্যেই বন্দী রইলাম, এই কি যথেষ্ট সাজা নয়?"

জুয়ের স্বামী আবদাল্লা এসব বোঝেনা। সে বোঝে জুয়ের গান। "জু গান গা তুই, আমি শুনি।"

ঘরের বৌ বনের ধারে প্রাণের দোসরকে গান শোনায়,—

"ওরে, তোরা ডাক দিলিনে কেউ তারে
ভাগ্যে আমার মিলবে কি সে বারে বারে?
আয় না তোরা ডেকে নিয়ে
গলায় তারই পরাই গিয়ে
যে হার আমি একে একে তারার ফুলে গেঁথেছি
ভরে নিয়ে যার পেয়ালা পাহাড়ে পথ ভুলেছি।
কোথায় সে কোথায়
কোন্ সে দূরের পাহাড়কোলে সবুজ ঘেরা আঙ্গিনায়
আর বুঝি কে প্যায়্‌লা ভরে জমালো তার নেশা
আর বুঝি কোন ঝর্ণাধারার পাশে মেলা মেশা
(আমার) আঁচল ভরে যুঁই রেখেছি
গেঁথেছি হার বসে আছি
ঝরে গেল শুকিয়ে গেল কঙ্কা নদীর ধারে।
(ওরে) তোরা বলবিনা কেউ পাঠাবিনা আমার খবর তারে?"

এসব গানের অর্থ আবদুল্লা বোঝে না। বোঝে তার শাশুড়ী। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছে সে এতো সখ করে। এ কোন্ বাউণ্ডুলে উড়নচুড়ে বউ এলো সারাদিন পথে, মাঠে, ঘাটে, বাটে। লোকে করে নিন্দে, দশে করে সন্দেহ। কুল মান লোক লাজ-উজাড় করা এ মেয়ে, এ বৌ নিয়ে কি করবে আবদাল্লার মা?

বকা-ঝকা, গাল মন্দ, অবশেষে প্রহার। জুয়ের পিঠে রক্তের ছড়া। আবদাল্লা পরামর্শ দিলো পালা তুই জু। পালিয়ে যা। আমি তোকে তালাক দিলাম। তোর কষ্ট আমার সয়না।

জু পারেনা বোকা আবদাল্লাকে ছেড়ে যেতে। ওর মায়া পড়ে গেছে এই বন্ধুর ওপর। কিন্তু অবস্থা চরমে উঠলো—যেদিন জল ভরতে গিয়ে বউ আর ফেরেনা।

গাঁয়ের মেয়েরা এসে বলে জু রাশি রাশি ফুল জড়ো করে কঙ্কনের ধারে বসে আছে। আজ চাঁদনী রাত। কঙ্কনে ওর প্রিয়তম আজ নাইতে আসবে রাতে। তাকে ও নিজের হাতে সাজাবে।

গভীর রাত্রে আবদাল্লা আর তার মা গেছে জুকে দেখতে। জু ফুলে ফুলে নিজেকে সাজিয়েছে অপ্সরীর মতো। আবদাল্লা মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে—"স্বর্গের অপ্সরী ও, ওকে তুমি বোলোনা কিছু মা।"

জু সেই কঙ্কনের ধারে ফুলের সাজে নাচে গায়। অদ্ভুত নৃত্য সে, অদ্ভুত গান।

ফেনার রক্তে হাত মোর হোলো রাঙ্গানো
এলো কি এখনও নিশিভোরে ঘুম ভাঙ্গানো?
সুন্দর সাজে সজ্জিত দেহ
আমার প্রেমের হেম বিগ্রহ।
এলো কি এলো সে হিয়ায় হরষ জাগানো?
এসো, এসো আর একটুও নয় দেরী
এ দেহে বেজেছে তোমার বিজয় ভেরী
বিহনে তোমার কাটাই কেমনে আর
মনে মনে জ্বলে বাসনা অনিবার।
তুমি আমি কেন কাছাকাছি নই
কেন আছি দূরে কেমনে এ সই'
শুধুই কেন এ ফেনা মঞ্জরী লাগানো?
ঐ দূরে আজ বনপথে ফুল ফুট্‌লো
এখনো শোনে নি মোর হৃদয়ের কান্না।
হ্রদের বুকের কমল গন্ধ ছুটলো
দূরে নয় বঁধু আর দূরে নয় আর না।
ছুটে যাই দৌড়ে পাহাড় তলীতে ভুলে।
লাইলাক ফুল যেথায় বনের চুলে
লালে ও সবুজে গেঁথেছে মোতি ও পান্না
এখনো এখনো শোনোনি আমার কান্না?

শাশুড়ী জুঁকে ধরে নিয়ে আসে চুলের ঝোঁটা ধরে। পরদিন সকালে সকলে ভাবলো কলির মত কোমল জু মরে গেছে বুঝি।

খালি আবদাল্লা জানতো জু অমন মার অনেকবার খেয়েছে। মরার মেয়ে নয় ও। জুঁকে কোনও মতে কঙ্কনের ধারে নিয়ে এলো।

জুঁয়ের জ্ঞান ফিরলো। আবদাল্লাকে চুমো খেয়ে বলে, "বন্ধু এবার তবে আসি?

ডাক দিয়েছে পথের ধূলো রুখবে কেন আর
বন্ধু আমার পথের বাধা এনোনা বারবার
তুমি আমার মনের সাথী
তোমার দিবস তোমার রাতি
বন্ধু আমার আমি তোমার মনের অহঙ্কার
দূরে করে আমায় তুমি ফিরিওনা কো আর
তোমার খোঁজে সারা জীবন রইব আমি মেতে
হঠাৎ যখন পড়্‌বে মনে পথে যেতে যেতে
আমায় তুমি খুঁজবে তখন
আমি তোমার শুধুই স্বপন
কঙ্কনার এই স্রোতের মাথায় ফেনার হাসির হার
দেখা দিয়ে লুকিয়ে যাবো খুঁজবে চারিধার
আমায় যখন চাইবে তুমি যুঁথীর বনে যেও
গোলাব বাগের রক্ত রঙ্গে পাবে আমার স্নেহ
সুন্দরের এই স্বর্গধামে
রেখো কিছু আমার নামে
তোমায় আমায় দেখা আবার না হয় যদি আর
ফুলের গন্ধে তবু কিছু রইলো যে আমার॥

সেই চলে গেল জু। কোথায় গেল কেউ জানলোনা।

চলেছে পথ বেয়ে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানেনা। পথে দেখা গাঁয়ের সাথীর সঙ্গে। খাজা মাহুদের আশ্রমথেকে সখী ফিরছে গাঁয়ে।

কোথায় চলেছিস্ জু?

ডাগর চোখে—জলভরা চোখে চায় জু। চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠে আকাশের চত্বরে পাইনের গম্ভীরতার মতো। চোখের পল্লবে ভারী দৃষ্টি পীর পঞ্জোলীর শাদা চূড়ার গায়ে কালো মেঘের মায়ার মতো। সে চোখই ভাষা কয়। সখী বোঝে।

"আজ বুঝি তাড়িয়ে দিলে তোকে? চল্‌ আমি খাজা সাহেবের কাছে তোকে নিয়ে যাচ্ছ।"

"কেন? খাজা কেন?" শুধায় জু।

পতির ঘর করতে পারি না। কোথায় ঘুরে মরবি এই কাঁচা বয়সে, স্বামীর সোহাগ শাশুড়ীর ভালবাসা সব ফিরিয়ে দিতে পারেন সেই ফকির। যাবি? চল!

জোর করে নিয়ে যায় আশ্রমে। স্বামী সুখ ফিরে পেতে যায় জু।

খাজা মাহুদ যে সে সাধু নন্‌। সুফী—বৈদান্তিক। সর্বত্যাগী, ত্রিক-যোগী।

জুঁকে দেখে বিস্মিত। নয়ন তো নয়, শুধু চাহনি। মুখ নয়, বিকাশ। প্রেম নয়, প্রেমের আলো।

"ফকিরের কাছে কি হাতে করে এনেছো মা? শুধু হাতে ফকিরের কাছে আসতে নেই।

বিস্ময় বিস্ফারিত সেই সকল-দেখা চাহনি। হাঁটু গেড়ে বসে কাঠের চৌকীতে রাখা জরীর নক্সা কাটা সবুজ বনাতে ঢাকা কোরাণ শরীফখানা টেনে নিয়ে জু বলে—"কণ্ঠে এনেছি গান। আর তো কিছু নেই আমার। কোরাণ পড়ি, শুনুন।

"আর মনের কিছু?" ফকির জিজ্ঞাসা করে।

মন তো দিয়ে দিয়েছি। সে তো আমার নয়।

"কাকে? কাকে দিলে মা?" আগ্রহ ব্যগ্র কণ্ঠে মাহুদ জিজ্ঞাসা করেন।

দু-চোখ ভরে আসে জলে। চিনারের পাতায় দোল লাগে। পপলারের শীর্ণ শাখার মধ্য দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস বয়ে যায়। জু বলে—"জানিনা প্রভু, তাই তো জানিনা। জানি এ মন আমার নয়। কার? কার এ মন? কে নিলো?"

অবাক মানেন খাজা। "পড়ো মা। পড়ো কোরাণ।"

ঐ ছিলো সম্বল। বাল্যে মক্তবে যা সামান্য লেখাপড়া করেছিলো জুঁ তারই আলোয় কোরাণ শরিফ পড়তো। যে শুনতো মুগ্ধ হোতো।

আর সেদিন সে গান শুনে খ্বাজা মাসুদ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আর সমাধি ভঙ্গ করার জন্য জুঁ গায় গান। কতো গান। এমনি দিনের পর দিন।

অবশেষে সখী ফিরে যায় গাঁয়ে। খাজা বলেন "এ বৈরাগিনী। এ ঘরে যাবে না। আবদাল্লাকে বোলো তালাক দেয় যেন এ মেয়েকে। তালাকের টাকা আমি দেবো।"

মুক্তি দিলেন ফকির জুঁকে। আর সাধু তার নতুন নাম দিলেন হাব্বা।

হাব্বা বলে—"কেন এই মুক্তি, কেন এই বন্ধন? আমায় বেঁধে দাও তার সঙ্গে, যে আমার মন নিয়েছে।"

বর দেন সাধু। প্রীত হয়ে বর দেন। পতি সোহাগিনী হও। রাজেন্দ্রাণী হও।

আঁৎকে ওঠেন হাব্বা—"না না প্রভু। বর ফিরিয়ে নাও। যাকে ভালোবাসলাম পেলাম না। তাঁকে এনে দাও। ঘরের বাধন নেই আমার, মনের কাঁদন থামাও। কেবলই ভালবাসলাম। ভালবাসবে যে তাকে দাও। দাও গুরু আমায় বৈরাগ্য দাও। আর পারি না ভালবেসে বেসে। নদী, তারা, পাখী, ফুল এদের শুধু ভালোই বাসলাম। এই একতরফা ভালবাসা আর আমায় ভরাতে পারে না। আমি কি দিলাম, আমি কাকে দেব? সে কে, গুরু আমায় বলে দাও।"

"রাজরাণী হবে তুমি মা। রাজগৃহিণী হবে। রাজ্যের জনের মা হবে। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো। জন্মবৈরাগিনী তুমি। তোমার সন্ন্যাস হবে। অনেক পরে, এখন নয়।"

সিদ্ধ ফকিরের বাক্য মিথ্যা হবার নয়।......

জয়নাল আবেদীন মারা যান ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বাবর কাশ্মীর আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এই সময়ে। কিন্তু বাবর শেষ অবধি কাশ্মীরীদের সাহায্যেই কাশ্মীর জয় করেন। ১৫৪০ অবধি বাবরের মৃত্যু, হুমায়ু শেরশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি ডামাডোলে কাশ্মীরের দুর্গতি। এ দুর্গতির কারণ হুমায়ুনেরই প্রতিনিধি মীর্জা হায়দরের স্বৈরাচার। এ থেকে কাশ্মীর ত্রাণ পায় হুশেন শা চকের রাজত্বে—১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরে আসেন য়ুসুফ শা চক। ছেলেদের মধ্যে সেরা রূপবান এবং অকর্মণ্য। কেবল গান, স্বপ্ন আর ভ্রমণ নিয়ে থাকেন। রাজত্ব করা মছনদে বসে বেনেগিরি ওর ভালো লাগে না। কিন্তু প্রজার প্রিয় এ কুমার। বেড়াতে বেড়াতে ফকীর খ্বাজা মাসুদের আশ্রমে আসে কথাপ্রসঙ্গে সেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মতো ওদের সেই সাক্ষাৎ। মাসুদ ফি ওদের বিবাহ করিয়ে দিলেন। রাজরাণী হয়ে হাব্বা এখন শ্রীনগরে য়ুসুফ এখন সুলতান।

এতদিনে হাব্বা তাঁর প্রেমকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর যৌবনকে ফেললে বন্ধনে, তাঁর নারীত্বকে উৎসারিত করে দিলেন সার্থক জীবন প্রবাহে।

শ্রীনগর সংস্কৃত বিদ্যালয়

কিন্তু সুলতান য়ুসুফের ভাল লাগেনা সিংহাসনের বন্দীত্ব। হাব্বাকে নিয়ে তার প্রভাত সন্ধ্যা নির্মল আনন্দ বৈরাগ্যে কাটে। য়ুসুফ শোনে হাব্বা গান গায়।

ভালো লাগেনি শাহনশার এই ভাব বিলাসিতা কর্মী মন্ত্রী মুবারক শার। তিনি শাসন করার জন্য রাগ করে সেদিন য়ুসুফকে সরিয়ে দেন সে দিনও য়ুসুফ কিছু বলেন না। জন্ম বিবাগী সুলতান। রাজ্য তার হাতের ধুলো। শুধু বলেন—"মুবারক, ভাই, দেখো প্রজারা যেন জয় মুবারক বলে। বল, জয় য়ুসুফ এমন মুবারক দিয়ে গিয়েছিলেন!"

মুবারক য়ুসুফকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিলো। শাসন করলো এমন শাসন যে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে জয় য়ুসুফ ধ্বনি ঘোষিত হোলো। ভেদনীতি

বর্জিত সেই দানশীল, শুভদ রাজত্ব শুকতারার আশা নিয়ে কাশ্মীরকে ।কিত করলো।

পারবে কেন মুবারক? সে য়ুসুফকে শিক্ষা দিতে চেয়েছলো। জত্ব চায়নি। য়ুসুফকে খুঁজতে বেরুলো সে। তক্তের ভার দিয়ে লো য়ুসুফের ভাই-লোহর চক্‌কে। তারপর য়ুসুফকে নিয়ে মুবারক রলো কিন্তু লোহরের অত্যাচারে কাশ্মীরে তখন আর্তনাদ। মুবারক াহুরকে জোর করে সরিয়ে য়ুসুফকে রাজা করে বসালো। হাব্বা র রাণী।

কিন্তু ১৮৮৫ খৃঃ সেটা। আকবর একবার হেরে এবার রাজৌড়ির থ পাঠিয়েছেন মানসিংহকে। ১৮৮৫ এর ২০শে ডিসেম্বর কাশ্মীরের থ বরফের স্তূপ। মোগল সৈন্য রাজৌড়িতে অপেক্ষা করছে। ফেকে বলে হাব্বা—মানসিংহ আর আকবর, বীরত্ব মানবতার প্রতিমূর্তি া। এদের সঙ্গে যুদ্ধ কেন? তুমি তো তোমার প্রজার মঙ্গল চাও। াই তো মঙ্গল। এরা যদি সুশাসক হয়, যুদ্ধ কিসের?

হাব্বা মানসিংহকে জানালেন তাঁর মর্মবাণী। "মানবের কল্যাণই ন কাম্য, কিসের রক্তপাত? আসুন; মোগল সৈন্য নিয়ে নয়, প্রীতি য়ে; আঘাত দিয়ে নয়, ভরসা দিয়ে; আশা দিয়ে। কাশ্মীর মারও নয়, আপনারও নয়, আকবরেরও নয়। প্রজাদের। আপনি, কবর বা য়ুসুফ প্রতিনিধি মাত্র। আসুন।"

বিস্মিত মানসিংহ। কে এই রমণী? দেখার উৎসুক। তিনি শ্মীরে এলেন।

"কিন্তু রাজনৈতিক কানুন তো রাখতে হবে মা। সুলতান চলুন ন্য অতিথি হয়ে আকবরের দরবারে। সৌখ্যবন্ধন প্রথামতো সম্পন্ন রে আবার ফিরে আসবেন।"

য়ুসুফ ব্যস্ত; মহামতি আকবরকে দেখবার জন্য। হাব্বা বলে— সৌখ্যের আবার প্রথা আছে নাকি? রাজনীতির ছল। স্বামীকে য়ে যাচ্ছেন; ঠিক তো, ফেরৎ পাবো তো স্বামীকে?"

মানসিং বলেন—রাজপুত আমি। তুমি আমার বোন। তোমার মীকে জীবন দিয়েও রক্ষা করবো। যদি কথা না রাখতে পারি বনও রাখবো না।"

আকবর নামার পাঠক মাত্রেই জানেন মানসিংহ জীবন রাখেন নি; জের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেন নি। য়ুসুফের মতো প্রিয় সুলতানকে আকবর কাশ্মীরে ফিরে যেতে দিতে সাহস করেন । রাজনীতি সাংঘাতিক। রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রাণধর্ম নেই।

কিন্তু মানসিংহের মৃত্যু আকবরকে স্পর্শ করে। তিনি বিহারের সনকর্তা পদে য়ুসুফকে নিয়োগ করে সেই দারুণ প্রতারণার পাপ লন করার চেষ্টা করেন। ফলে য়ুসুফ কাশ্মীরে আর ফেরেন নি। রতে পারেন নি। ফিরতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে দিন আর রাত, শরৎ আর বসন্ত হাব্বার গানের মধ্য দিয়ে টে যেতে লাগলো। হাব্বার বিরহ শেষ হয়না। কাশ্মীরের প্রাসাদের লিন্দে চন্দ্রজ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চেয়ে হাব্বা ভাবে তাঁর দয়িতের কথা। ঝিলমের জল নীল হয়ে ওঠে শরতে, শাদা হয়ে জমে যায় শীতে; আবার গলে, আবার জমে যায়। যে গাছ একদিন ফুলে ভরে যায় সেই গাছ একদিন তুষারের বৈধব্য-বাস পরে বসে থাকে। হাব্বা করে প্রতীক্ষা? সে কি তার ঐ রাজবন্দী রাজার?

তবে এই রাজবেশ, এই বিলাস বিলম্বিত দিনগুলি কি হাব্বার স্বপ্ন? প্রকৃতির এই নিত্য নব মৃত্যু আর জীবন, নিত্যনব অভিসার ও বৈধব্য—এর প্রচ্ছন্নে কি কোনও মহত্তর, বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা, আবেদন, তৃষা নেই? সেই পরমতৃষার সন্ধানে সে বেরুবে। পণ করল এই মুক্তি-কারার বন্ধন ছিন্ন করে সে চির মুক্তির বন্দিত্ব গ্রহণ করবে। সে বাঁধবে নিজেকে তার পরম প্রেমাস্পদের পায়ে।

রাজরাণী আবার সন্ন্যাসিনী হোলো। হাব্বা এবার জনগণের আড়ালে চলে গেল বহুদূরে—কিষণগঙ্গা নদীর ধারে পপলার ঢাকা স্বপ্নময় গুরেজ গ্রামের কাছে এক পাহাড়ের চূড়ায় উলারের তীরে ৮০০ ফুটের মাথায় মাথায়, বাঁদীপুরা থেকে ৩৫ মাইল দূরে। বহুকাল অজ্ঞাত বাস করলেন তিনি। এখনও সে পাহাড়ের নাম হাব্বা-বল্। এরপরে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে আসেন শ্রীনগরে। হাব্বা চক বলে শ্রীনগরে হাব্বার শেষ বসতি এখনও খ্যাত।

ঝিলমের ধারে চন্দ্রের আলোর মাঝিরা যখন নৌকা বেয়ে যেতো মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতো হাব্বার গান শুনে।

'পাহাড়ের ঝর্ণা, বয়ে যায় উচ্ছল
ওরা কার গান গায় কল্ কল্ কল্ কল্?
সে কি তার গান গায় যে এখন নেই নেই
সে কি আর আসবে হারালো যে নিমেষেই?
পাহাড়ের ঝর্ণা কেন এত উচ্ছল
মোর প্রাণ উতরোল তবু কেন কল্ কল্?'

হঠাৎ শালিমার বাগানে মালী মাঝ রাতে জেগে গান শোনে, হাব্বার গান—

শালিমারে নাগিশ তুলিবারে যাই
তার চোখে বঁধুয়ার চাহনিরে পাই
ক্লান্ত অবশ মোর কপোলের পরে
মুক্তার মতো এতো ঘাম কেন ঝরে
বাকী যে এখনও মোর কুড়াইতে ফুল
বাকী যে এখনও মোর মালা গাঁথিবারে
বেঁধেছি কেশের রাশ সাজায়েছি ডালা
ইশারার কিনারায় ভরেছি পেয়ালা
ক্লান্তি কেন আসে আজ চোখে কেন ঘুম
বন্ধু আসিবে নাকি দেবে নাকি চুম।

এমনি করে হাব্বার গান ছড়িয়ে পড়ে মাঝিদের গলায়, মালীদের ঘরে, চাষী, মজুর, ফকির, পথিকের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের অন্তরকোঠায়। আজও হাব্বার গান গায় মাঝি—

"গাঁয়ের মেয়ে মজিয়েছে মন
প্রেমের তুফান বইলো রে।
হাব্বা খাতুন দিচ্ছে জবাব
'হায় এতো সুখ সইল রে ?'
রাজা আমার-রাজা, দেখো
রাতের আঁধার ধায় নেমে
আমার মনের রাজা যেন
কোথায় আছে আজ থেমে
তার ঘরে সে একা আছে
হেথায় আমি একাই হায়
ফিরতে আমায় হবেই হবে
প্রতীক্ষা কি মিথ্যা যায় ?

জীবনে আর হাব্বা তার রাজাকে পায়নি। মরণের পর পেয়েছিল কিনা জানি না। বহুকাল রাজার প্রতীক্ষা করে হাব্বা প্রাসাদ ছেড়ে যে পথে বেরিয়েছিলেন সেই পথের ধুলায় ধুলায় অন্তহীন পরিক্রমা সেরে জীর্ণা, শীর্ণা, জরাগ্রস্তা হাব্বা আবার ফিরে এসে শ্রীনগরে গান গাইলো—

বল্ গো বন্ধু বল্
কখন আমার ভাগ্য আবার হাসবে গো তাই বল্।
আবার কখন আসবে সে মোর কাছে গো তাই বল্॥
হৃদয় আমার শান্ত শীতল, শূন্য সকল আশা
অনেক চাওয়ার শেষ হোলো কি, শেষ হোলো কি বল্ ?
সময় যে নেই, নেই যে সময় কি আর আছে বাকী
এখনও কি সাজতে হবে বুঝিয়ে তোরা বল্
বাঁধবো বেণী, গাঁথবো মালা, সাজাবো প্রেমের থালি
হেনার রাগে রাঙবো কি হাত বল গো তোরা বল্
তার অঙ্গে অঙ্গে এঁকে দেবো গন্ধভরা চুমো
সোনার পাত্রে ভরে দেবো মদিরা চঞ্চল
হৃদয় সরোবরে আমার ফুটলো কমল কলি
সেই কলি কি তারেই দেবো বল গো তোরা বল্।

কিন্তু বিরহিনী হাব্বা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠেছে তার দয়িতের জন্য। এই বিরহই তার কপালে চিরন্তনীর সীমান্ত রেখা এঁকে দিয়েছিলো সাবিত্রীর মতো। সে গান গায়—

বলো কে তোমারে ছিড়ে নিয়ে গেলো
আমার বক্ষ হতে
যতই বোঝাই বোঝাতে পারিনা
পারি না গো কোনো মতে
সহিতে পারি না হৃদয়ের ভার
আঁখি কোণে মোর অশ্রুর ধার
তবু তো দুয়ার আছে খোলা আছে
কখনও আসিবে বলে
কেন তবে তুমি এমনি আসো না চলে ?
মোর বসন্ত হারায়েছে তার উজ্জ্বল সজীবতা
দারুণ রৌদ্রে হিমানীর মতো গলে গেল ফুললতা
তবুও তো আমি তোমারেই ভাবি
অধিকার করো যা তোমার দাবী
কেন চলে যাও ধরা নাহি দাও ; কে বুঝিবে মোর ব্যথা ;

এই প্রেম থেকে লোকোত্তরতার প্রেম, সে তো মাত্র একটী মৃণ তন্তুর ব্যবধান। মানুষকে আশ্রয় করেই প্রেম মূর্ত্তি পায় ; আর সেই প্রেম আর ভাগবতী প্রেমে প্রভেদ একটা কুয়াশার প্রভেদ মাত্র। কুয়াশা কাটিয়ে দেবার আলো চিত্তে স্পর্শ করলেই বিল্বমঙ্গল সিদ্ধ যায়, মীরাবাঈ দেবী হয়ে ওঠেন।

এই হাব্বাকে কাশ্মীরের লোক পরম আদরে সমাহিত করো একদিন। কিন্তু সে কোথায় ? আশ্চর্য হাব্বা খাতুনের কবরের খ কেউ রাখেনা। পান্থাচোক বলে একটা পল্লীতে একটী কবরকে হাব কবর বলে লোকে পূজা করে। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করে ও আ কবর নয়। সন্দেহ করে না হাব্বা-কদল। কাশ্মীরবাসীর প্রাণের বন্ধ মিশে আছে এই হাব্বা কদল।

আমাদের শিকারা এখন আমরা রেখেছি একটা খালের মোহে প্রকাণ্ড একটা নৌকার রাশি রাশি কাঠ আসছে। রাস্তা বন্ধ। নে চেয়ে আছি সারা শ্রীনগরের দিকে। ফটো নিলাম শ্রীনগরের, ফা একটা বুড়ো মাঝির !

সম্মুখে বিস্তীর্ণ ঝিলম। দুপাশে নগরীর সৌধ। বড় বড় নৌ মাল নিয়ে যাতায়াত করছে। পর পর সাতটা পুল দেখা যাচ্ছে। মী কদল, হাব্বা কদল, ফতেহ্ কদল, জয়না কদল, আলি কদল, নাও কদল, আর শেষ এই সদা কদল। এর পরে "উইয়র্" জল বেঁধে রাখা এখান থেকে চার ধারে খাল বেরিয়ে গেছে। দশফুট জল উঁচু কা নেওয়াতে বড়ো বড়ো নৌকার যাতায়াত সুগম হয়েছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম পুলের মধ্যে জয়নাল আবেদীনের মার মসজিদ এই মসজিদটাকে নিয়ে অনেক গল্প আছে।

শেখ হমাদানের সঙ্গে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর বিবাদ হয়। সেই বিবাদে উভয়ে উভয়ের বিভূতি দেখান। কিন্তু পরে হিন্দু সন্ন্যাসী অভিচার প্রয়োগে শেখকে মারার চেষ্টা করায় শেখ যায় চটে। তখন থেকেই শেখ হিন্দুদে মুসলমান করবার অনুজ্ঞা দেন। হামদানের মসজিদ দিব্যি রয়েছে তার চেয়েও দামী মসজিদ জয়নালের মার। রণবীরগঞ্জ শ্রীনগরের স চেয়ে বড় বাজার। এর মধ্যেই মসজিদ। নীলরংয়ের এনামেল করা ইঁটের তৈরী গম্বুজ। সিকন্দর বুত্‌শিকনের তৈরী ইমারত ১৩৯০ থেকে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এরমধ্যে জয়নাল এ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে আগুন লেগে পুড়ে গেল মসজিদ। সুলতান হাসান শাহ আবার তৈরী করে দিলেন। ফতেশা যার নামে ফতে কদল, তিনি শেষ করলেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে আবা

আগুন লাগলো। আবার জাহাঙ্গীর
করিয়ে দিলেন। কিন্তু ১৬৭৪এ
আবার আগুন। এবার আওরঙ্গজেব করিয়ে দিলেন। এই
এই মসজিদ আওরাঙ্গজেব যার
নার নিয়ে শোক করেছিলেন।
রে ধীরে আফগান আমলে
আফগানীস্থান যখন কাশ্মীর
য় নেয়) এটা ধ্বংস পেতে
ক। পরে শিখেদের আমলে
সংস্কার হয়। এখন সরকারী
যোগে এটা আবার ঠিকঠাক করা
ছে। শ্রীনগরে এতোবার ধাক্কা
য়া মসজিদ আর দ্বিতীয়টি
। এর ভিতরের চারটী চিনার
দেখার জন্যই এ মসজিদে
উচিৎ।

মেরা ফিরলাম যে খাল দিয়ে
খাল আগে দেখিনি। কেবল
মধ্য দিয়ে গেছে। উলঙ্গ
প্রাণের আনন্দে জলে
কাটছে। নৌকার বাসিন্দা

উইয়র

ন মুসলমানীরা আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখছে। পাড়া থেকে
নেমেছে জলে। নিরাবরণ হয়ে মেয়ে পুরুষ জায়গায় জায়গায়
একটু আধটু আড়াল রেখে!

গে এ আড়াল ওরা রাখতো না। এখন ঘাটের ধারে ধারে এক
কাঠের ঘর মতো ভাসছে। তার মধ্যে মেয়েরা গিয়ে স্নান করে।
কোনও কারণে যদি তার ভেতরে ভীড় থাকে তবে কাশ্মীরা মেয়েরা
বৃথা কালক্ষেপ করতে চায়না। ওদের একটাই জামা-পাজামা। স্নান
সেরে সেটাই পরে। কাজেই স্নানের সময়টুকুর জন্য একটু নিরাবরণতা
ওদের ততো আটকায়না।

বেণুর নিশ্চয় আটকাচ্ছিল। কিন্তু আমার সামনে কোনও অভিমত
বা টিপ্পনী প্রকাশ করার মতো সাহস ওর ছিল না।

ক্যাম্পে ফিরলাম তখন দুটোর কাছাকাছি। (ক্রমশ)
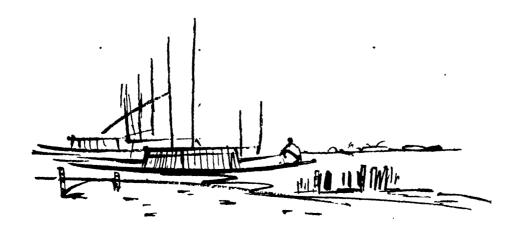
গান

আমার হাতে দাও পরিয়ে
তোমার মিলন রাখী
ধরার কোণে দাও বাঁচিতে
মনের পরাগ মাখি।
শিউলি ঝরা শরৎ প্রাতে,
আগমনীর মন্দিরাতে,
মরণজয়ী সুরের ছোঁয়া
পাওয়া আজো বাকী।

পেলাম যদি এ জীবনে
আলোর পরশখানি,
হারাতে তাই চায় না মন
সেই সুদূরের বাণী।
মনের মণিকোঠার মাঝে
নিত্য আমার যে সুর বাজে,
ও জীবনের আল্পনাতে
দাও সে ছবি আঁকি॥

কথা ঃ গোপাল ভৌমিক   সুর ঃ শ্রীবুদ্ধদেব রায়   স্বরলিপি ঃ শ্রীপরিতোষ

II ণ্া ণ্া সা | গা -া গারা | গা -া মা | -া মা -া I
অ মা র হা ০ তে দা ০ প রি ০ য়ে

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া I
তো মা রি মি ল ন রা ০ খী ০ ০ ০

পা ণা ণা | ণা র্সা -া | পা ণা র্র্সা | ণা ধা পা I
ধ রা র কো ণে ০ দা ও বাঁ চি তে ০

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া II
ম নে র | প রা গ | মা ০ থি | ০ ০ ০

II র্সা -া র্রর্সা | ণা ধা ণা | র্সা র্রা র্গর্মা | র্গা র্মা -া I
শি উ লি | ঝ রা ০ | শ র ৎ | প্রা তে ০

র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রা র্সণা -া | র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
আ গ ০ | ম নী ০ | ম ন্ দি | রা তি ০

ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা ণা -া | ধা ণা -া I
ম র ণ | জ য়ী ০ | সু রে র | ছো য়া ০

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া II
পা ও য়া | আ জো ০ | বা ০ কী | ০ ০ ০

II ণ্া সা -া | গা -া গরা | গা -া মা | গা মা -া I
পে লা ম | য দি ০ | এ ০ জী | ব নে ০

পমা জ্ঞা জ্ঞা | মা মা দা | দা পা -া | -া -া -া I
আ লো র | প র শ | থা নি ০ | ০ ০ ০

পা র্ণা -া | র্রা র্সা -া | ণা -া ণা | ধা -া পা I
হা রা ০ | তে তা ই | চা য় না | ম ০ ন

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া II
সে ই সু | হু রে র | বা ০ ণী | ০ ০ ০

II র্সা -া র্রর্সা | ণা ধা ণা | র্সা র্রা র্গর্মা | র্গা র্মা -া I
ম নে র | ম ণি ০ | কো ঠা র | মা ঝে ০

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সণা -া | র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
নি ০ ত্য | আ মা র | সে সু র | বা জে ০

ধা -া ধা | ধা ধা -া | ধা মা -া | ধা র্ণা -া I
ও ০ জী | ব নে র | আ ল্ প | না তে ০

পা র্সা ণা | পধা মা গা | মা -া মা | -া -া -া II
দা ও সে | ছ বি ০ | আঁ ০ কি | ০ ০ ০

বাঙ্গলার গণ্ডগ্রাম—কোদালিয়া

কালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গলা দেশের অজস্র গণ্ডগ্রামের মধ্যে কোদালিয়া নগণ্য একটী। ইহা ২৪-পরগণা * জেলার রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। ২৪-পরগণা প্রাচীন মোগল শাসনে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দে বারোস (De Barros) কর্তৃক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত এবং ভ্যান ডেন্ ব্রুক্ (Van den Broucke) কর্তৃক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত মানচিত্রে ২৪-পরগণা বিরাট জলা রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; মোগলদিগের দলিল পত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই। ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর বাঙ্গলার তদানীন্তন নবাব-নাজিম মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজরা ইহার ইজারা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা কলিকাতা জমিদারী বা ২৪-পরগণা জমিদারী নামে পরিচিত ছিল এবং আয়তন ছিল ৮৮৩ বর্গ মাইল। ১৭৫৯ সালে দিল্লীর বাদশাহ এই সম্পত্তির মালিকানা সত্ব লর্ড ক্লাইভকে ব্যক্তিগত ভাবে দান করেন এবং ১৭৭৪ সালে ক্লাইভের মৃত্যুতে ইহা পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আসে।

পরগণা মেদন মল্ল

১৭৯৩ সালে বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইলে কোদালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব ইহার ভারপ্রাপ্ত হন। ইহার অধিকাংশ ময়দানমল বা মদনমল্ল পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোদালিয়া গ্রাম বরিদহাটী পরগণায় অবস্থিত। বারুইপুরের জমিদার বংশের অন্যতম আদি পুরুষ মল্ল (বীর) মদন রায়ের নামে মদন মল্ল বা মেদন মল্ল পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। তাঁহার আদি বাস রাজপুরে ছিল। বারুইপুর জমিদারদিগের এককালে প্রবল প্রতাপ ছিল এবং তাঁহারা ঐ অঞ্চলের বিস্তৃত জমিদারীর মালিক ছিলেন। বারুইপুর বাজার, রাজপুর বাজার, সখের বাজার প্রভৃতি তাঁহাদের পূর্ব্বতন প্রভাবের এখনও পরিচয় দিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন "চৌধুরী বাবুরা" বার ভুঁইঞার † মধ্যে একজনের বংশধর।

কিম্বদন্তী

কোদালিয়া গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র; প্রকৃতপক্ষে চাংড়িপোতা গ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি মধ্যমাকৃতি গ্রাম বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে মাহিনগরে পুরন্দর খাঁ অজস্র মজুর সাহায্যে স্বল্পকালের মধ্যে যে দীর্ঘিকা খনন করেন, তাহাদের অগণিত কোদাল ধৌত করিয়া রাত্রি কালে এই গ্রামে রাখা হইত; তখন হইতে গ্রামের নাম "কোদালিয়া" হইয়াছে। ভিন্ন মতে, কোদালিয়া অত্যন্ত প্রাচীন নাম। পুরন্দর খাঁর আমলের পূর্ব্ব হইতেই এই নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চাংড়িপোতা ও কোদালিয়া মিলিত হইয়া রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর একটী "ওয়ার্ড" বিভাগ মাত্র। এই মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত আরও কয়েকটী গ্রামের নাম এই সঙ্গে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে।—কারণ, এই গ্রামসমষ্টি এত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অবস্থিত যে এই সকলগুলি মিলিয়া দুই বা তিনটী গ্রাম হিসাবে ভাগ করিয়া দিলেও উহাদের আয়তন খুব বড় হয় না। চাংড়িপোতা-কোদালিয়া ছাড়া অপর গ্রামগুলি রাজপুর, হরিনাভি, মাহিনগর, মালঞ্চ নামে পরিচিত। এই সঙ্গে জগদ্দল, এড়াচি, গাজিপুর প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম কয়টী রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে পড়ে। ইহাদের মধ্যে মাহিনগর এককালে মহা সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল। জানকীনাথের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মহীপতি বা সুবুদ্ধি খাঁ, ঈশান খাঁ ও পুরন্দর খাঁর সময় মাহিনগর বাঙ্গলা শাসন বিভাগের অন্যতম "রাজধানী" বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

অতীত গৌরব

উপরোক্ত গ্রাম কয়টীর মধ্যে পরস্পরে একটী সৌহার্দ্য বন্ধন ছিল এবং সকলে মিলিয়া কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের দিকে সহরের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একই সঙ্গে অর্থাৎ এত ক্ষুদ্র পরিসর স্থান ও কালের মধ্যে বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে অভাবনীয় হইলেও ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক বলিয়া মনে হইবে না। কোদালিয়া ঘিরিয়া গ্রাম সমষ্টির মধ্যে মাহিনগর একটী। ইহা কোদালিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত মালঞ্চ গ্রামের সংলগ্ন। এই মাহিনগর "বসু" বংশীয়ের এক শাখার আদি বাসভূমি এবং উহারা "মাহিনগরের বসু" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং চাংড়িপোতা কোদালিয়া প্রভৃতি গ্রামের খ্যাতি নিতান্ত আকস্মিক বলিয়া মনে করা অত্যন্ত ভুল হইবে।

---

* ২৪-পরগণা: (১) কলিকাতা, (২) আকবরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) আমিরপুর, (৫) বালিয়া, (৬) বরিদহাটী, (৭) বাসন্দরী, (৮) দক্ষিণ-সাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইখ্তিয়ারপুর, (১২) খাড়িজুড়ি, (১৩) খাসপুর, (১৪) ময়দানমল, (১৫) মাগুড়া, (১৬) মানপুর, (১৮) ময়দা, (১৮) মুড়াগাছা, (১৯) পাইকান, (২০) পেঁচাকুলী, (২১) সাতাল, (২২) সানগর, (২৩) সাপুর, (২৪) উত্তর-পরগণা।

† বারভুঁইঞা: কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমানিক্য, মুকুন্দরাম, চাঁদরায় ও কেদার রায়, হাম্বীর মল্ল, কংসনারায়ণ, রামচন্দ্র ঠাকুর, চাঁদগাজী, গণেশ রায়, ফজল গাজী, ঈশাখা মসনদ আলি।

তাহা ছাড়া গোবিন্দপুর, মল্লিকপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি মাহিনগরের বসু-মল্লিকদের নামের সহিত জড়িত।

এই সকল গ্রামের মধ্যে কোদালিয়ার একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। এ স্থলে উল্লেখ না করিলেও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু সুভাষ বসুবার এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে এবং সমস্ত দেখিয়া ও জানিয়া লইয়া নানা লোককে কোদালিয়ার পাড়া সন্নিবেশ (planning) এর সুখ্যাতি করিয়াছে, তাহাতেই এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল।

কোদালিয়ার আয়তন উত্তর দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে কিছু বেশী দীর্ঘ। পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর রেল লাইন এবং পশ্চিমে অধুনালুপ্ত আদি গঙ্গার পূর্ব্ব তীর ধরিয়া জয়নগর-মজিলপুরগামী কুলপী রাজপথ। কোদালিয়ার উত্তরে হরিনাভি চাংড়িপোতা ও দক্ষিণে মালঞ্চ গ্রাম।

জাতি ও উপজীবিকা

প্রায় এক শত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রামের যে অবস্থা ছিল, তাহা সাধারণতঃ অপরাপর কোনও গ্রামে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন, কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লী কোদালিয়ায় নানারূপ পল্লী শিল্পের অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যাইত।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া গ্রামের মধ্যে যোগী বা তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শিল্পজীবীর আবাসস্থল ছিল। এই স্থলে যিনি গ্রামের প্রথম পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাকে নতি জানাইতে হয়। কোদালিয়া বসুদের (সুভাষদের) ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের বসতি এক বা দেড় বর্গ মাইল পরিসরের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাহা ছাড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে গ্রাম সীমার মধ্যে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র; লোক বসতি নাই। লোকালয়ের পূর্ব্ব সীমায় চর্ম্মকার ও তাহার অনতিদূরে কয়েকঘর মুসলমানের (গাজী) বাস। বর্ত্তমানে গ্রামে আর চর্ম্মকার নাই।

গাজী

"গাজী" বংশ এখনও "পীরের দরগার" তত্ত্বাবধান করেন। গাজীর নাম বরখান গাজী। তিনি এতদঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন এবং সাধু ও সৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও বহু স্থানে গাজীর দরগা আছে। গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলারা পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা বা "মাঙ্গন" করিয়া তাহা দ্বারা স্ব স্ব পরিবার ও গ্রামের সমবেত কল্যাণার্থে গাজীতলায় পূজা বা "সিন্নি" (শির্ণি) দিয়া থাকেন। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দু বাড়ীর গৃহিণীদিগকে সকল লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে হইত। ইহাতে ধনের অহেতুক মর্য্যাদা মন হইতে দূর হইয়া যাইত এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বা সামাজিক সমতার ভাব সৃষ্টি করিত। হিন্দু-পরিবারে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের সিন্নি (শির্ণি) উপলক্ষে গাজীবংশের কাহাকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে পুরোহিত আসিলে যেমন করিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিবার রীতি আছে, গাজী আসিলে, বাড়ীর কর্ত্রী সেইভাবে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দেন। গ্রামের মুসলমানগণ নিজ চাষ ছাড়া পশু, হাঁস, মুর্গীপালন করিতেন এবং গরুর গাড়ী চালাইয়া বা খাটাইয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তখন কার দিনে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু চাষের জমি এবং হাল গরু থাকিত।

কায়পুত্র

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে "কায়পুত্র" বা কাওরাদের বাস ছিল। হাঁস, মুর্গী, শূকর প্রভৃতি পালন করিয়া, পরের জমি বা গৃহস্থ বাড়ীতে মজুর খাটিয়া, পূজা দ উপলক্ষে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ইহাদের উপজীবিকা চলিত। গ্রামের দাঙ্গায় ইহারা লাঠি ধরিত এবং প্রতিমা নিরঞ্জনে ইহাদের ডাক পড়িত। বিশ্বাসী ও সরল সহচর হিসাবে ইহারা লাঠি হাতে দূর পাল্লার সঙ্গী হইয়া থাকিত। কাহারও কাহারও অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল এবং পাকা বাড়ী বা দালান ছিল।

সুবর্ণবণিক

গ্রামের জল সরবরাহের জন্য প্রকাণ্ড দীঘি। ইহারই উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে, গ্রামের মধ্যে সুবর্ণবণিকরা দোকান পাট, ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং গ্রামের মধ্যে তাঁহারা সসম্মানে বাস করিতেন। ঋণদান ও সুদগ্রহণ ইঁহাদের অন্যতম আয়। প্রায় সকল পরিবারের পাকা দালান ছিল।

তাঁহাদের ভিটার উত্তর গায়ে, একেবারে গ্রামের মধ্যস্থলে এক ঘর কলু পরিবার বাস করিতেন। গ্রামের সমস্ত তৈল তাঁহারা সরবরাহ করিতেন।

শঙ্খকার

দক্ষিণ পশ্চিম গ্রাম প্রান্তে শঙ্খকারদিগের বাস। দেশ বিদেশে তাঁহাদের শাঁখা সমাদৃত ছিল, এবং প্রত্যেক পরিবার অর্থাভাবশূন্য ছিল। তাহাদের জীবনযাত্রার ধারা অতি পরিচ্ছন্ন; এমন কি কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ভিটা-দালান অপেক্ষাও সুন্দর।

স্বর্ণকার

গ্রামের মধ্যভাগে পশ্চিম দিক হইতে যে রাস্তা সদর রাস্তা হইতে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক পথ ব হয়া দুইধারে স্বর্ণকার ও অপরার্দ্ধের দুই দিকে কুম্ভকারদিগের বাস। গ্রামের স্বর্ণকারেরা সমৃদ্ধ ছিলেন। দুর্গা প্রতিমা লইয়া তাঁহাদের পূজার উৎসব ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাস, দোল, গোষ্ঠ প্রভৃতি উৎসব মহাসমারহে সাধিত হইত। শুনা যায় শোলার ফুল দিয়া "সেকড়াপাড়া" যেভাবে সজ্জিত হইত তাহা মনোমুগ্ধকর এবং নানা দূর পল্লী হইতে তাহা দেখিবার জন্য বহুলোক আসিয়া সমবেত হইত। উৎসব উপলক্ষে কাহারও কাহারও বাড়ীতে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে প্রচুর মিষ্টান্ন দিয়া আপ্যায়িত করা হইত।

কুম্ভকার

স্বর্ণকারের হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহা কুম্ভকারের হাঁড়ি-পেটা ঠক্-ঠকা-ঠক শব্দের সহিত মিশিয়া যাইত। স্বর্ণকারও

কুম্ভকারের পাড়া বিচ্ছিন্ন করিয়াছ কোদালিয়া হইতে পার্শ্ববর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে যাওয়ার উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এক পথ। কোদালিয়ার হাঁড়ি কলিকাতা দক্ষিণ অঞ্চলে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। বড় রাস্তার ধারে উত্তর হইতে দক্ষিণে লম্বা আদি গঙ্গার স্রোত পথ। ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ষাকালে এই নদীতে এত জল জমিত যে নৌকা পথে কলিকাতা হইতে জয়নগর মজিলপুর এবং আরও দক্ষিণে (উত্তর ভাগ) সহজেই যাতায়াত করা চলিত।

আদিগঙ্গায় নৌকা চড়িয়া কোদালিয়ার হাঁড়ি দেশ বিদেশে চলিয়া যাইত। নদী পথ বন্ধ হইলে নানা দূর স্থান হইতে স্ত্রীলোকগণ কোদালিয়ায় আত্মীয় বাড়ী আসিলে কাপড় বাঁধিয়া প্রকাণ্ড পুঁটুলি কোমরে চড়াইয়া লইয়া যাইতেন। মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ছাড়া গৃহস্থদিগের বাড়ীতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পরিবারে কাজকর্ম্ম করিয়া ইহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

মাটীর জিনিষ পুড়াইতে প্রচুর জ্বালানী দ্রব্যাদি লাগে; তন্মধ্যে কাঁচা (অশুষ্ক) লতাপাতার অংশ প্রচুর। মাটীর হাঁড়িতে সুন্দর রঙ করিতে এবং উহা মজবুত বা ব্যবহারসহ করিতে এই কাঁচা ইন্ধনের প্রয়োজন ছিল। কাঁচা ও শুক্‌না কাঠ পাতা কুমারের "পোণ-এ" পুড়িতে গ্রাম ধোঁয়ায় পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা সমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া লোকে বিনা আপত্তিতে তাহা সহ্য করিত। তাহা ছাড়া "পোণ" পুড়াইতে গ্রামের প্রায় সমস্ত আবর্জ্জনা জঙ্গাল দূর হইয়া যাইত।

চুণুরী

গ্রামের মধ্যে ধূম যখন ভরিয়াই যাইবে, তখন এইরূপ প্রচুর ধূম উৎপাদনকারী আর একটী শিল্পের কথা পল্লী গঠন কর্ত্তা ভুলেন নাই। কুম্ভকার পাড়ার শেষপ্রান্তে একটী "চুণুরী", অর্থাৎ চূণ প্রস্তুতকারী পরিবারের বাস ছিল। ইহারা পুষ্করিণী, খানা, ডোবা হইতে শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জমা করিত। গৃহপালিত হাঁসের খাদ্যরূপে ইহা কাজে লাগে বলিয়া গ্রামের মধ্যেই ইহারা প্রচুর হাঁস পালন করিত। উপযুক্ত পরিমাণ শামুক প্রভৃতি জীবের খোলা বা আবরণ সংগৃহীত হইলে ইহারা তাহা দগ্ধ করিয়া চূণ তৈয়ারী করিত। কুম্ভকার বাড়ীর কৃষ্ণবর্ণ ও চুণুরী বাড়ীর শ্বেত ধোঁয়া মিলিয়া গ্রামের ঐ পল্লীতে এক সুন্দর দৃশ্য হইত। রাত্রি ব্যতীত কেহই "পোণে"এ অগ্নি দিত না, তখন "পাথুরে চূণ" প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং শামুক-চূণ বা "জোমড়া" চূণের অত্যন্ত কদর ছিল। ইহা পাথুরে চূণ অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ এবং গৃহের ছাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণে এখনও ইহার শরণাপন্ন হইতে হয়। দুঃখের বিষয় ইহা আর এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না; তাহা ছাড়া যে সংখ্যায় পাকা কোঠা নির্ম্মিত হইতেছে, সে তুলনায় জোমড়া চূণ পাওয়া এখন সম্ভব নয়। এখন কেবলমাত্র প্রাচীরগাত্রে কলি দিতে বা চূণকাম করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্ম্মকার

গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে কর্ম্মকার পল্লী। ইঁহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি হাটে হাটে বিক্রীত হইত। গ্রামের প্রয়োজনের এমন কি গৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত সরঞ্জাম ইঁহারা তৈয়ারী করিয়া দিতেন। দা, কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, কড়া, হাঁসক, ছিটকানি প্রভৃতি প্রচুর সরবরাহ করিয়া ইঁহারা স্বচ্ছলভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বলিদানের কাতান বা খাঁড়া, তরবারি, বর্শা, তীরফলক প্রভৃতি প্রয়োজন পড়িলেই তৈয়ারী করিয়া দিবার সামর্থ্য ইহাদের ছিল। ইহাদের মধ্যে বহু শক্তিমান পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইত এবং কাহারও কাহারও আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। প্রতিমার সম্মুখে ছাগ, এমন কি, মহিষ বলিদানের সময় "কামার"-এর প্রয়োজন। সুতরাং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ছাড়াও সমাজে ইঁহাদের অন্য প্রয়োজন ছিল।

তন্তুবায়

গ্রামের সরাসরি পূর্ব্বদিকে যোগী বা তন্তুবায়দিগের বাস। বহু পরিবার এই পাড়ায় বাস করিতেন এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমৃদ্ধ ছিল। ঐ অঞ্চলের সমস্ত বস্ত্র তাঁহারা সরবরাহ করিতেন। ইঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন এবং "নাথ" উপাধিতে পরিচিত। মৃত্যুর পর সাধারণতঃ কবর দেওয়াই ইহাদের রীতি; দাহকার্য্য একেবারে অপ্রচলিত নয়। গ্রামে সূক্ষ্ম বস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল, না কিন্তু সাধারণতঃ আটপৌরে কাপড়, গামছা, ঝাড়ন, মশারির থান প্রভৃতি প্রচুর তৈয়ারী হইত। ১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহাদের কাজ খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল।

রজক ও ক্ষৌরকার

সুভাষদের ভিটার উত্তর পূর্ব্বদিকে রজক ও উত্তরদিকে অর্থাৎ কুম্ভকার পাড়ার পাশেই ক্ষৌরকার বা নরসুন্দরদিগের বাস। এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মী না থাকিলে সমাজ চলে না সুতরাং তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুল হয় নাই। ক্ষৌরকার পরিবারের লোকেরা নিজেদের জাতি ব্যবসা ছাড়াও বাজারে মুড়ি মুড়কী ও অপরাপর খাবার বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তাহারা "ময়রা" বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন।

কৈবর্ত্ত

শ্রমশীল লোকের মধ্যে কৈবর্ত্তরা পরিচিত ছিল। তাহারা গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে বাস করিত ইহাদের মধ্যেই অনেকেই সূত্রধরের কাজ করিত। তাহারা বলিষ্ঠ সাহসী এবং দাঙ্গা হাঙ্গামায় পটু ছিল।

গোয়ালা

গ্রামের নানা অংশে গোয়ালাদিগের বাস। সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত হইলেও প্রধানতঃ সাতটি প্রচলিত নামে ইহাদের আবার বিভাগ হইয়াছে; যথা,—আউলি, জাটী, গাঁদি, হাঁটুই, চল, হেয়ো ও খ'য়ে। আউলিরা গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, জাটী ও গাঁদী উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে,

হাটুইয়া সরাসরি উত্তরে এবং চলেরা প্রায় কেন্দ্রস্থলে বাস করেন। হেয়ো ও প'য়ে চাংড়িপোতায় বেশী। ইহাদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ সবই প্রচলিত। কিন্তু এই বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া আজও স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। অধিকাংশ গোয়ালাই দুগ্ধ ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেন না। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের বড় চাষী এবং তরি-তরকারির চাষ ও ব্যবসা করিতেন। লাঠি ধরিতে তাঁহারা অত্যন্ত পটু এবং গ্রামের দাঙ্গায় তাঁহাদের ডাক পড়িত। গাছ কাটা বা ফেলা, কাঠ চেলা করা অথবা তক্তা তৈয়ারী করা প্রভৃতি শ্রম সাপেক্ষ কাজ গোয়ালাদের উপজীবিকার অপর পথ। গোয়ালাদিগের মধ্যে চলেরা বহুকাল যাবত চাউল, তৈল প্রভৃতির দোকান করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। তাহার সহিত ধানের চাষ থাকায় ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল।

কায়স্থ

কায়স্থরা কোদালিয়ার প্রায় কেন্দ্রস্থলে। কিছু পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া, বাস করে। কায়স্থদিগের মধ্যে বসুরা প্রধান। ইঁহারা কোদালিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম মাহিনগর হইতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন; দশরথ বসু ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। ঘোষ পরিবার ছাড়া আদি বাসিন্দা বলিতে অপর কোনও শ্রেণীর কায়স্থ ছিল না। বর্ত্তমানে যে কয়েকটী পরিবার, চৌধুরী, শীল, দে, দত্ত প্রভৃতি বাস করেন, তাহারা সকলেই বসুদের "ভাগিনেয়" বা বিবাহ সূত্রে কোদালিয়ায় আসিয়াছেন! কায়স্থদিগের মধ্যে জমির উপস্বত্ব ভোগ, চাকুরি ও বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা জীবিকার্জ্জন চলিত।

ব্রাহ্মণ

গ্রাম ব্রাহ্মণ প্রধান। প্রায় সর্ব্বত্রই 'পাড়া' করিয়া ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে সংখ্যায় বৈদিক (দাক্ষিণাত্য) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহারাই গ্রামের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যাদান, যজন, যাজন প্রভৃতি কার্য্যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহারা গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাঢী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা পতিত ও অচ্ছ্যুতদিগের মধ্যে মন্ত্রদান করিতেন। তাহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের নিকট ব্রাহ্মণের সম্মান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সাধারণতঃ "চক্রবর্ত্তী" উপাধি দ্বারা পরিচিত হইলেও, কালক্রমে ইঁহারা নিজেদের কুলীন অর্থাৎ রাঢীশ্রেণী (মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) বলিয়া পরিচয় দেন এবং কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত হইয়া যান।

দৈনিক বাজার

সকলের দৈনিক অভাব সরবরাহ করিবার জন্য গ্রামের উত্তর ঘেঁষিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের মাঝামাঝি দৈনিক "সগের বাজার" নামে বারুইপুরের চৌধুরী বাবুদের বাজার বসে। এখন আর পূর্ব সমৃদ্ধি নাই। প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বিদ্যাচর্চ্চা

প্রাথমিক বিদ্যার ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যেই বরাবর হইয়াছে। স্থানীয় লোকের পাঠশালা শিক্ষকদের নামেই পরিচিত ছিল। খুব পুরাতন সংবাদ জানা নাই, কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে সীতানাথ (কুম্ভকার) ও হরি (গোয়ালা) পণ্ডিতের পাঠশালা বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তাহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর ৺প্রসন্নকুমার বসু (ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর পিতা) মহাশয় ইহার পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গ্রামে বহুকাল হইতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আছে এবং পাঠশালা চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য ও সাধারণের সাহায্যে পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার জন্য পার্শ্বস্থ গ্রাম হরিনাভিতে বহু পুরাতন হরিনাভি এ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল রহিয়াছে।

গ্রামে বহু পুরাতন লাইব্রেরী রহিয়াছে। তাহার পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে জানকীনাথ বসু মহাশয়ের বদান্যতায় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "হরনাথ লাইব্রেরী"। পাশের গ্রাম চাংড়িপোতায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর দানে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পাকা গৃহ লাভ করিয়াছে।

গ্রামে কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, তরজা, কুস্তি সমাজ সেবা ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই ছিল। পূজা পার্ব্বণের সবগুলিতে বিস্তর সমারোহ দেখিতে পাওয়া যাইত!

পণ্ডিতমণ্ডলী

সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যোগাযোগে গ্রামে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল। কোদালিয়ার গৌরহরি চূড়ামণি, আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ, রামনারায়ণ শিরোমণি, উমাচরণ সার্ব্বভৌম, রাম সর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ তারা কুমার কবিরত্ন, জানকীনাথ বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় (জন্ম মেদিনীপুর) এবং চাংড়িপোতার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী (জন্ম চাংড়িপোতায়) ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু জ্ঞানী গুণী মনীষী জন্ম লাভ করিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইল।

বাঙ্গলার নানা গ্রামে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একে একে তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মনে হয় আরম্ভ একটু বিশদ তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিলে বাঙ্গলার সমাজ, অর্থনীতি, কৃষ্টি, কলা প্রভৃতি বহু বিষয়ের সন্ধান পাইবার সুবিধা হয়।

ভিটে মাটি

অমলেন্দু মিত্র

জমিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমান করাচ্ছে রজনাকান্ত। ধুপ্-ধাপ্ শব্দে ভাঙ্গছে আল, মাটিতে বসে যাওয়া ইঁটের পাঁজা। নতুন কলোনী উঠবে। উদ্বাস্তুদের সরকার প্রচুর টাকা মঞ্জুর করেছেন এর জন্য।

আলগুলো ভেঙ্গে সমান করছে ওরা। এক টুক্‌রা ছোট্ট মাটি আলগাভাবে ফেলে রাখা ছিল। প্রবাদ কালীমার আস্তানা ওখানটায়। এ জমি যার ভোগে আসে, সেই-ই হয় নির্বংশ। কুলে সাঁঝ সল্‌তে দেবার মত একজনও থাকে না। একক অভিশপ্ত জীবন তাকে বইতে হয়।

কত হাত বদল হয়েছে। সবার ঐ এক অবস্থা। আশ্চর্য! রজনী মানে না ওসব। সে নিতে চেয়েছিল জমিটা। জান্‌ত চাইলেই বিক্রী করে দেবেন অধিকারী। তার ও ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে বিলম্ব হয়নি। প্রভাত সিংহের জমি। যার তার নয়। গাড় কঞ্জুষ। হাঁটুর নীচে কাপড় নামে না কখনো। গলাবন্ধ ময়লা কামিজ গায়ে। অথচ জমিদার মানুষ। ব্যারিষ্টার। ব্যারিষ্টারী পাশেরও একটা কীর্তি আছে। সে বহুকাল আগের কথা। মফঃস্বল থেকে উদ্যোগী কতিপয় সাহিত্যিক, একটা মাসিক পত্রিকা বের করতে চেষ্টা করেন। উদারচেতা একজন চাইলেন টাকা দিতে। প্রথম সংখ্যাই জয় করল সবার হৃদয়। নিজেদের প্রেস চাই এবার। প্রভাত সিংহ বললেন, দাও আমাকে টাকা, প্রেস এনে দিচ্ছি!

সবাই বিশ্বাস করে টাকা দিলেন তুলে তাঁর হাতে। ওদিকে চুপি চুপি পাশপোর্ট সংগ্রহ করে ফেলেছেন প্রভাত-বাবু। সেই টাকা নিয়ে সটান পালিয়ে গেলেন বিলাত, এবং ব্যারিষ্টারী পাস করে চলে এলেন। এ রকম সৎকাজে টাকাটা ব্যয় হওয়ায় বিশেষ উচ্চবাচ্য কেউ করলেন না। কিন্তু কোথায় ব্যারিষ্টারীর পশার! প্রভাত-সিংহ প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে। পৌরাণিক যুগে যেমন শোনা যেত যক্ষের কাহিনী। ঠিক তার সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রভাতবাবুকে। ব্যাকুল হয়ে কেবল জমি আর টাকা সংগ্রহ করেই চলেছেন। চেয়ে-চিন্তে, সস্তায়, দাঁওতে যা মেলে। কালীর বিঘে তিনেক জমিটা মাত্র পঁয়ষট্টি টাকায় দর এসে নেমেছিল। কেউ নিতে চায় না। প্রভাতবাবু বললেন, আমি নেবো! তিন বিঘে জোলো জমি পঁয়ষট্টি টাকায়! এ যে কল্পনাতীত।

বারণ করলে সবাই। যাবে, সব যাবে। বংশই যদি না টিঁকল তবে জমিদারী ভোগ করবে কে? কিন্তু কে কর্ণপাত করে ওসমস্ত কথায়। জমিদারী ভোগের চেয়ে জমিদারীর মোহই বেশী!

সত্যি প্রভাত সিংহের বংশে আর কেউ রইল না। একক ভিটের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। অপ্রতিহত প্রতাপে অন্তঃপুরের রাণী আর বহির্মহলের রাজা হয়ে বসে রইলেন।

লোকে মুখ দেখে না। বলে, সকালে নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যাবে। অপয়া লোক। শকুন বুড়ো!

এতকালপর কালীর জমিটা বিক্রী করবার কথা উঠেছিল কিভাবে কে জানে! তবে প্রভাতবাবু বিজ্ঞাপন দিয়ে-ছিলেন, জমিটা বিক্রী করতে চাই!

জলন্ত সাক্ষ্যরূপে নিজেই উপস্থিত আছেন। কালীমার নামে উৎসর্গীকৃত জমিটুকুর ভোগ দখলে অধিকারীর কি অবস্থা হয়! সুতরাং খরিদ্দার জুটবে না জানা কথা। অথচ এমনও শোনা গেল, খরিদ্দার যারা গিয়েছিল, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রভাতবাবু। বলেছেন, কেন বাপু! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করছ, তাদের হারাবে! কেউ ফিরেছিল, কেউ না-ছোড়বান্দার মত লেগেছিল পেছনে। তাদের সাফ বলে দিয়েছেন প্রভাতবাবু; ওহে। জমি আমি বিক্রী করব না।

: তবে বিজ্ঞাপন দেওয়া কেন ?

: আমার খুশি আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দশহাজারে দেবো ?

পঁয়ষট্টি টাকায় কেনা অভিশপ্ত জমির দশহাজার টাকা দাম !···সভয়ে খদ্দেরকুল কেটে পড়েছিল একে একে।

রজনীকান্ত ভাল সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে গিয়েছিল প্রভাতবাবুর কাছে। সে চিঠি পড়ে প্রভাতবাবু গলে জল হয়ে গেলেন ; ও রাজীববাবু পাঠিয়েছেন আপনাকে ! বেশ ! বেশ ! থাকুন না আজ। কাল কথাবার্তা হবে !

খুব খুশি হয়ে প্রভাতবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

বল্লভপুরে প্রভাতবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিল রজনীকান্ত। সঙ্গে শুধু ছোট স্যুটকেশ একটা। বেডিং-এর বালাই ছিল না। জমিদার বাড়ী যাচ্ছে, সেখানে আর অতশত হাঙ্গামায় দরকার কি !

বারান্দায় বসে বসে ভাবছে রজনীকান্ত। প্রভাতবাবু বের হয়ে আসেন। তাঁর একহাতে ধূমায়িত চায়ের গেলাস, অন্য হাতে মুড়ির বাটি। রজনীকান্তের সামনে টুলটায় বসে বলেন ; তা বেশ ! কোথায় থাকা হয় আপনার ?···

রজনীকান্ত সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। প্রভাত-বাবু জমিদার, তার উপর বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। কিন্তু একমুখ না কামানো দাড়ি, ময়লা গলাবন্ধ কামিজ আর হাঁটু লম্বা লালপাড় আট-হাতি ধুতি একটি। আমলা গোমস্তা নেই। আসবাবপত্র দেখা যায় না। বৈঠকখানা ঘরে ধুলো জমেছে যথেষ্ট। সর্বহারা ভিক্ষুকের মত চেহারা।

: চা খেয়েছেন, চা ? জিজ্ঞাসা করেন প্রভাতবাবু।

: না···এই হ্যাঁ খেয়ে নেবো একসময়।

: এইখানেই বসে খান না। ঐ তো সামনেই দোকান···ওরে ও রামু !···

ময়লা লুঙি পরা একটা লোক দেখা দেয়।

: যা-তো ঐ দোকান থেকে চা এনে দে বাবুকে।

: আর কিছু আনাব ?···জিজ্ঞাসা করে লোকটি।

: এ্যাঁ, আর কি ?···তারপর দারুণ কুণ্ঠাভরে তাকায় প্রভাতবাবুর পানে।

প্রভাত সিংহ অভয় দেন ; বলুন কি খাবেন ? বিস্কুট ? পাঁউরুটি ?···বেশী দাম নয় মশাই খেয়ে নিন ! পয়সা অত জমিয়ে করবেন কি ?

: না···না ··কি যে বলেন ! পয়সা আর কোথায় জমাব !···আমতা আমতা করে রজনী।

: হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই ! জমি কিনে জমিদার হতে চান ! আপনার আবার পয়সার অভাব !···

রজনীকান্তের মনে হল ; একটা যেন মড়ার খুলি দাঁত বের করে উৎকট হাসছে সামনে বসে বসে।···

: আচ্ছা খানকতক বিস্কুট আনো !

: খানকতক কি মশাই ! একটা গোটা প্যাকেটই আসুক· ·হেঁ···হেঁ···হেঁ—অনেকদিন বিস্কুট খাইনি মশাই, বুঝলেন ? সেই বিলেত থেকে ফেরবার পর।···

স্তম্ভিতভাবে বসে রইল রজনীকান্ত।

চা এল। প্রভাতবাবুর মুড়ি শেষ হয়ে গেছে। বিস্কুটের প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে তিনিই গ্রহণ করলেন ; এ্যাঁ···হেঁ···হেঁ···মশাই ! শুধু শুধু বিস্কুটগুলো খাবো কি করে ? রেমো ! চা আন্ একটা।···

রামু আর এক গেলাস চা আন্‌তে ছুট্‌ল।

রজনীকান্তের ক্ষুধা তৃষ্ণা উবে গিয়েছিল। আড়ষ্ট-ভাবে চা খায় শুধু, মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে। বার বার মনে হচ্ছিল তার, ভাল করে নাই—ভাল করে নাই সে এখানে এসে !

রামু চা আনে। প্রভাতবাবুর ততক্ষণে অর্ধেক বিস্কুট শেষ হয়ে গেছে। গেলাস আস্‌তেই টপাটপ্ চায়ে ডুবিয়ে মুখে পুরতে লাগ্‌লেন। রামু বলল ; বাবু ! আপনি বিস্কুট নিলেন না ?

: কে হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, বিস্কুট নিলেন না ?···যোগ দেন প্রভাতবাবু কিন্তু সেগুলো যে তাঁর হাত ছাড়া করবার ইচ্ছা আছে কিছুমাত্রও বোঝা গেল না আচরণ দেখে।

রজনীকান্ত বিনীত হাসি হেসে বলে ; আজ্ঞে না ; চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আমার !

: বাঃ আপনি তো মশাই পাকা ফলারে একজন। এই তো চাই ! এমনি করেই খেতে হয়। না খেলে চল্‌বে কেন মশাই ! পেটের জন্যেই সব···অবশিষ্ট বিস্কুটগুলি একসঙ্গে মুখে পুরে চিবাতে চিবাতে বিকৃত স্বরে বলেন, জমিদার প্রভাত সিংহ।

পকেট থেকে একটা দু'টাকার নোট বের করে দেয় রজনীকান্ত। রামু বাইরে গিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে ইসারায়। রজনীকান্ত উঠে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে রামু; বাবুমশাই ? আর একগেলাস চায়ের দাম দেবেন।

: তোমার জন্যে ?

: ছিঃ ছিঃ ছিঃ, চাকর বাকর মানুষ চা খায়! দিদিমণি খাবেন বাবুমশাই! তেনার ভারী সখ একটু চা খাওয়ার। তা-কি এ বাড়ীতে জুটবে!

যুগপৎ একরাশ কৌতূহল ও বিস্ময় রজনীকান্তের মনে ভিড় করে এল। কিন্তু মুখে বলে; বেশ নিয়ো।

দিদিমণি ? কে সে ? ভাবে মনে মনে। প্রভাতবাবুর তো বংশে বাতি দেবার কেউ নেই।

রামু বাকী পয়সা ফেরৎ দিয়ে চলে গেল। প্রভাতবাবু উঠ্‌লেন ঢেকুর তুলে। বললেন; তাহলে ঐ বাজারের মোড়ে হোটেল আছে, খেয়ে নেবেন। খুব ভাল রান্না করে!

রজনীকান্ত শ্লেষ করবার প্রলোভন দমন করতে পারে না। উত্তর দেয়; তাই নাকি ? আপনার বুঝি অংশ আছে ওটাতে···

: আরে না···না···আমি কি মহাজন যে অংশ থাকবে হোটেলে। ঐ পারুল চাট্টি ফুটিয়ে দেয়···এই আর কি! আচ্ছা! আপনি বসুন, আমি ঘুরে আসি একবার। ইঁটের ভাঁটা পুড়ছে। একবার তদ্বির করতে হবে।

বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে রজনীকান্ত বসে বসে ভাবে। সহসা ভিতর থেকে একটি মেয়ে এসে প্রবেশ করল। রামু বলে; ইনিই পারু দিদিমণি!

শশব্যস্ত হয়ে ওঠে রজনীকান্ত। ঋজু, তীক্ষ্ণ চেহারা মেয়েটির। মুখে একটা বুদ্ধির ব্যঞ্জনা থাকলেও মলিন ও করুণ। পরণের শাড়ীও ততোধিক। কিন্তু গায়ের রঙ, যেন তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। আবরণ ভেদ করে ঠিক্‌রে বের হচ্ছে দ্যুতিঃ। ছোট্ট একটা নমস্কার করে বলল; রামু একটা পাগল। ওর কথা শুনে আপনি চা পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

রজনীকান্ত আমতা আমতা করে অপরাধীর মতো। একটু আলগা হেসে বলল পারুল; আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? যাই হোক, অনেকদিন পর চা খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম। কাকাবাবু নিজের আলমারিতে চা চিনি রাখেন। জল ফুটিয়ে দেবার পর নিজে ছেঁকে নেন। বলেন, চা খাওয়া ভাল নয় ছেলেমানুষদের! বলুন তো আমি কি ছেলেমানুষ ?

: তাই কি বলতে পারি!···রজনীকান্ত ভয়ানক কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

: ঐ দেখুন! অথচ একথাটা কাকাবাবুকে বোঝাতে পারলাম না। ভারী কৃপণ।···কিন্তু আপনি বুঝি জমিটা কিন্‌তে এসেছেন ?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন তো কত দাম চাইছেন উনি ?··· কইবার মতো কথা পেয়ে বেঁচে যায় রজনীকান্ত।

: দাম।·· হেসে ওঠে পারুল; কাকাবাবু ও জমি কি বিক্রী করবেন মনে করেছেন ? কক্ষণো না! বলেছেন; আমাকে লেখাপড়া করে দেবেন। সেই লোভে ঝি-গিরি করছি!

: তবে তো মুস্কিল,···রজনীকান্ত আবার বিব্রত হয়ে পড়ল।

হি···হি·· হি···হেসে ওঠে পারুল পাগলিনীর মত। বলে; আপনি ক্ষেপেছেন! জীবন থাকতে ও জমি কাউকে হাতছাড়া করবেন না। বাবার ভারী লোভ। আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ঝি-গিরি করতে··· যদি মিলে যায় জমিটা···

উচ্ছ্বসিতভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে ও চলে গেল ভিতরে। রজনীকান্ত বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল তার গমন পথের পানে। রামু দরজার বাইরেই বসে ছিল। ধীরে ধীরে এসে বসে সামনের মেঝেয়; কি দেখ্‌ছেন বাবু হাঁ করে! ঐ একরত্তি মেয়েটাকে বাপ, জমির লোভে পাঠিয়েছে। খাজনাও মকুব! এ্যাঃ, মেরে ফেললে একেবারে! জমি দেবার লোভ দেখিয়ে এনেছেন। ঝি-কে ঝি, রাঁধুনী-কে রাঁধুনী। ছোটমুখে বড় কথা বলতে নেই বাবু! কিন্তু কিসের লোভে মেয়েটাকে আট্‌কেছে তা কি বুঝি না ? রাত-দুপুরে মদ খেয়ে এসে কী ধাক্কাধাক্কি দরজায়! চালাক মেয়ে! খুব সামলে চলে। আমিও রয়েছি সড়কী শানিয়ে। বে-তর কাজ দেখেছি কি ফুঁড়ে

দেবো একেবারে! হ্যাঁ···তা আমার কপালে যা-ই ঘটুক!

বাইরে জুতোর শব্দ ওঠে। পরমুহূর্তে প্রবেশ করলেন জমিদার; এই যে রঞ্জনীবাবু! একটা বিড়ি আছে আপনার কাছে?

: আজ্ঞে সিগারেটে চল্‌বে?

: ধ্যাৎ! আপনারা কেন যে ও সব বিলিতি নেশা করেন বুঝিনে! বাঙালীর ছেলে—খাবেন দেশী পদ! নেই যখন দিন, দেখি···

রজনীকান্ত তাড়াতাড়ি সিগারেট কেশ বের করে দিল। প্রভাতবাবু চার পাঁচটা সিগারেট টপ্‌ টপ্‌ করে পুরে ফেললেন বুক-পকেটে একটি ধরালেন ধীরে সুস্থে; এ্যাঃ একেবারে জোলো! এতে কি পোষায়! ছিঃ ছিঃ মশাই, এ আর খাবেন না! দেশী শিল্পকে বাঁচান। আপনারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ।

সুখটান দিতে দিতে প্রভাতবাবু ভিতরে চলে গেলেন। রামুয়া ফিসফিস করে বলে; দেখ্‌লেন পিচেশ বুড়োর কাণ্ডখানা?

রজনীকান্ত উত্তর দেয় না। সবিস্ময়ে সব ঘটনাটুকু অনুধাবন করবার চেষ্টা পায়। রামু সহসা পা-দুটো জড়িয়ে ধরে রজনীকান্তের; আপনি আমাদের উদ্ধার করুন বাবুমশায়! অন্ততঃ পক্ষে দিদিমণিকে।···

: আচ্ছা, আচ্ছা চেষ্টা করব রামু! তুমি পা ছাড়!

চেষ্টা করব বলা পর্যন্তই। কিন্তু কি চেষ্টা করবে রজনীকান্ত ভেবে কূলকিনারা পায় না।

প্রভাতবাবু কোথায় বেরিয়ে গেছেন আবার। রাত্রে খান্‌নে। কখন ফেরেন ঠিক নেই। সদর দরজা খোলাই রাখতে হয়। রামু বারান্দায় থাকে।

নিজ হাতে মেপে চাল ডাল দেন প্রভাতবাবু প্রত্যহ। এতটুকু বেশী নয়; গল্পচ্ছলে বলেছিল রামু, হোটেল থেকে রজনীকান্ত খেয়ে ফিরে আসার পর।

: কিন্তু শোবার জায়গা একটু হবে তো রামু? না তাও হবে না? বলতো স্টেশনে ফিরে যাই!

: আজ্ঞে কি যে বলেন, অতিথি নারায়ণ; রামু, বড় একটা জিভ্‌ কেটে তাড়াতাড়ি কতকগুলো খবরের কাগজ [illegible] দেবে। বেশী [illegible] করতে ইচ্ছা করে না রজনীকান্তের। কাগজগুলো মেঝেয় বিছিয়ে স্যুটকেশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে।

চোখে ঘুম নামে না। প্রভাতবাবুর বিচিত্র চরিত্রটা বারবার মনে পাক খায়। আর মনে আসে হতভাগিনী পারুর কথা।

সবে চোখ ভারী হয়ে আস্‌ছে। সহসা কানের কাছে ফিসফিস কথা। আশ্চর্য হয়ে যায় রজনীকান্ত। পারুল। সে বলল চাপা কণ্ঠে; আসুন!

: কোথায়?

: আসুন না বলছি!

বাড়ীটার পিছন ঘুরে গলিপথ বেয়ে পারুলের সঙ্গে এসে পড়ল ভিতর বাড়ীতে। রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে নিঃশব্দে দরজায় খিল এঁটে প্রদীপ জ্বালল পারুল। আসন পাতা। একথাল ভাত ঢাকা দেওয়া। ঢাকা খুলে দেয় পারুল। একটু শাকজাতীয় তরকারী। সামান্য ডাল আর ডালের বড়া। বলে, এই দিয়েই খেয়ে নিতে হবে।

: সে কি আমি তো হোটেলে খেয়ে এসেছি!

: কেন হোটেলে খেলেন, আমরা কি অতিথিকে চাট্টি ভাত দিতে পারিনে?

: সে কথা কে বলেচে! আপনার কাকাই হোটেলে খেতে আদেশ করলেন যে!

বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে রইল পারুল, কিয়ৎকাল, তারপর বলল, আচ্ছা! আমাকে এই পাপপুরী থেকে উদ্ধার করতে পারেন? আমি চাইনে জমি।

রজনীকান্ত ভাবতে লাগল।

: বুঝেছি, আপনি দ্বিধায় পড়ে গেছেন কিন্তু উপায় আপনাকে যে ভাবে হোক করতেই হবে!

: আচ্ছা! আগে খেয়ে নিন তো! এ ভাবে নিজের গ্রাস পরকে বিলিয়ে লাভ কি?

: সত্যি হোটেলে খেয়েছেন?

: সত্যি খেয়েছি! কিন্তু শুধু ডালের বড়া দিয়ে খাবেন কি করে?

হাসে পারুল ম্লানভাবে; এই যথেষ্ট! অনেক চেষ্টা করে জুটেছে ডাল আর বড়া নইলে শুধু কলাই বাঁটা আর ভাতই জোটে না। চলুন তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি!

পৌঁছে দিয়ে ফিরবার সময় আর একবার পারুল

দাঁড়ায়। বলে ; বলুন তো আমাকে ছুঁয়ে সত্যি উদ্ধারের চেষ্টা করবেন ?

ঃ সত্যি করব—ছোঁবার দরকার নেই !

ঃ উদ্ধার করুন আর না-ই করুন ঐ কালীর জমিটাকে কোনরকমে ঘোচাতে পারেন তা সব চেয়ে বড় কাজ হয়। বিঘে তিনেক জমির জন্য আমার এই বন্ধন দশা !

রজনীকান্ত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা পায় ; সেই চেষ্টাতেই তো এসেছি !

রহস্যময়ী পারুল চলে গেল। মুহূর্তকাল রজনীকান্ত বেদনার্দ্র চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করে দুর্ভাগিণী মেয়েটার কথা।

হেঃ···হেঃ···হেঃ···জলদমন্দ্র স্বরে অট্টহাসি সহসা ঘরখানা ভরিয়ে তুললে। রজনীকান্ত ভয়ানক চমকে উঠে ফিরে দেখ্‌লে ঠিক পেছনেই ছায়ামূর্তির মত এসে দাঁড়িয়েছেন প্রভাতবাবু।

ঃ রজনীবাবু ! আপনাকে তো পথ দেখ্‌তে হোল !

ভক্ ভক্ করে দিশি মদের উগ্র গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রভাতবাবুর মুখ থেকে।

ঃ মানে ?

ঃ মানে বুঝতে পারছেন না ! ওরে রেমো ! শড়কীটা নিয়ে আয় তো। রেমো !···ওঃ সেটাকেও ভজিয়েছেন বুঝি ? বলি, পারুলের সঙ্গে কতদিনের কারবার ?

সহ্যের অতীত হয়ে যায়। রজনীকান্তের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তীরের মত অকস্মাৎ খাড়া হয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি বসিয়ে দেয় প্রভাতবাবুর নাক লক্ষ্য করে !

তুমুল একটা আর্তরব তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রভাতবাবু। রজনীকান্ত দ্রুত প্রাচীরে উঠে, অন্দর মহলে লাফিয়ে পড়ল ; পারুল ! পারুল ! শীঘ্রি !···

পারুল ত্রস্তে বেরিয়ে এল ; না···না···এভাবে নয়—এভাবে নয়। পালান, আপনি এই মুহূর্তে পালান। হাঙ্গামায় অকারণে নিজেকে জড়াবেন না। কাকাকে আপনি চেনেন না। অন্যভাবে আস্‌বেন···যান···যান···যান বলছি ; পারুল ব্যাকুলভাবে ঠেলতে থাকে রজনীকান্তকে।

মনের জোর বেশীক্ষণ টেঁকেনি। রজনীকান্ত পারুলকে ফেলে ত্রস্তে পলায়ন করেছিল। যাবার আগে দেখে প্রভাতবাবু রক্তাক্ত দেহে, একহাতে লণ্ঠন আর অন্য-হাতে বিরাট একখানা রামদা হাতে অন্দর মহলের দরজার চাবি খুলছেন টলতে টলতে।

পথে পড়তেই রামুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে তার হাতে স্যুটকেশটি ধরিয়ে দিয়ে বলল ; আসুন আমার সঙ্গে ! কিছু ভয় নেই। পিচেশ থানা পুলিশ করবে না !···

রামু একটা গোরুর গাড়ী ভাড়া করে তুলে দেয় রজনীকে। তারপর পিছন পিছন চলতে চলতে সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিল ; হুজুর ! দিদিমণির কথা ভুলবেন না যেন !···

অথচ ওদের সবার কথা ভুলে না গিয়ে কি উপায় ছিল রজনীকান্তের। সেই ঘটনার পরদিন কলেরা হয়ে রাতারাতি মারা গিয়েছিল পারুল। রামুর সংবাদ কেউ দিতে পারেনি।

কলেরা হয়েছিল পারুলের একথা যে বিশ্বাস করে করুক, রজনীকান্ত কিছুতেই করবে না।

কালীমার অভিশপ্ত জমিটুকু হাতছাড়া করাবার জন্য কত চেষ্টা পেয়েছে রজনীকান্ত, সে ছাড়া ওর ইতিহাস অপর কেউ জানে না। দুটো চোখে খদ্যোতের জ্বালা জ্বলেছে অহর্নিশ। ঘুরেছে। শুধু ঘুরেছে। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ফলবতী হয়েছে তার। সরকার রিক্যুইজেশান করলেন জায়গাটা। শহরের লাগাও অতবড় জায়গা।

রিক্যুইজিশানের সংবাদ শুনে প্রভাত সিংহ ত্বরিৎগতিতে ছুটে আসেন। স্টেশান থেকে অতটা পথ হেঁটে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে অনাবাদী ছোট্ট কালীর আস্তানাটুকুর উপর বসে চীৎকার করে উঠেছিলেন ; দেবো না···দেবো না ! জীবন থাকতে কাউকে দেবো না।···

সত্যি জীবন থাকতে দিতে হয়নি জমি। ঐখান থেকেই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশান ঘাটে।

এই জায়গাটায় কলোনীর বিল্ডিং উঠছে। রজনীকান্ত কনট্রাকটারী নিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ভাবছে·· প্রভাত সিংহ···রামু···আর হতভাগিনী পারুল ! ···সে কি ওপার থেকে কৃতজ্ঞতা বর্ষণ করছে না ওর দীর্ঘ-শ্বাসের তপ্ত বিষ তাকেও এক করে দেবে এই অভিশপ্ত জমির সঙ্গে ?

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ওঁকার

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সামবেদের একটি অংশের নাম উদ্গীথ। এই অংশ গান করার নাম উদ্গান, যাঁহারা গান করেন তাঁহারা উদ্গাতা। ওম্ এই "অক্ষরকে" উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কেননা "ওম্" প্রথমে উচ্চারণ করিয়া উদ্গান করা হয় (১।২)। পরে বলা হইয়াছে "ওম্"ই উদ্গীথ। এই মন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের প্রথমেই ইহা উচ্চারণ করিতে হয়। ওঁকারকে প্রণবও বলে। পাতঞ্জল দর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে এবং তাহার জপ ও ভাবনা সমাধিলাভের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতায় ওঁকারকে একাক্ষর ব্রহ্ম এবং মৃত্যুকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে পরমাগতি লাভ হয় বলা হইয়াছে (৮।১৩)। তৈত্তরীয় উপনিষদে ওঁকারকে "সাং ঋষভঃ, বিশ্বরূপঃ (১।৪) বলা হইয়াছে—বেদ বাক্যের মধ্যে ঋষভ অর্থাৎ প্রধান, এবং সর্ব্ববাক্যে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বরূপ তিনি। "ছন্দোভ্যো অধ্যমৃতাৎ সম্বভূব" —অমৃতের উৎস বেদসমূহ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই। ঐ বেদের একটি মন্ত্রে "অক্ষরেণ প্রতিমিম (১০ মণ্ডল ১৩।৩) পাওয়া যায়। সায়নাচার্য্য এখানে "অক্ষর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ওঁকার।"* এইমাত্র। অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার তপস্যা হইতে প্রথমে ওম্ শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং ইহার প্রথম বর্ণ 'ও' হইতে জল এবং শেষবর্ণ "ম" হইতে তেজের সৃষ্টি হয়। এই বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মাকে "ওঁ" মন্ত্রের ঋষি বলা যায়। সামবেদ, ঋগ্‌বেদও যজুর্ব্বেদের সন্ধ্যা মন্ত্রে আছে "ওঁকারাস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ গায়ত্রি-চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রাণয়ামে বিনিয়োগ।" অথর্ব্ববেদের উক্তিই বোধ হয় ইহার ভিত্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঁকার সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—পৃথিবী ভূত সমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ঔষধি সকল জলের রস, পুরুষ ওষধিদিগের রস বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ বাক্যের রস, সামবেদ ঋগ্বেদের রস, উদ্গীথ সামবেদের রস (সারভাগ)। দেবগণ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে তিনটি বিদ্যাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন (বেদবিহিত কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন), পরে ওম্ অক্ষরে প্রবেশ করিয়া (ওঁকারের ধ্যান করিয়া) অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। (ছা—১।৪) অসুরদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণ নাসিকাস্থ প্রাণকে পরে বাগিন্দ্রিয়কে তাহার পরে চক্ষুকে, পরে শ্রোত্রকে, পরে মনকে, সর্ব্বশেষে মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। (ছা১।২) সূর্য্য, প্রাণ, ধ্যান, অপানকে, এবং উদ্গীথ শব্দের অক্ষরদিগকে (উৎ, গী ও থ, এই তিন অক্ষরকে) উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। (ছা-১।৩)। ইহার পরে আদিত্যকে, মুখ্য প্রাণকে এবং আকাশকে উদ্গীথরূপে উপাসনার উপদেশ আছে। (ছা-১ম অ, ৫ম ও ৮ম খণ্ড) সকলবেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করে; সকল তপস্যা যাঁহার কথা বলে, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাকে কঠোনিষদ ওম্ বলিয়াছেন। (২। ১৫)

ওঁকার কোথায়ও দ্বিমাত্র, কোথায়ও ত্রিমাত্রা। প্রশ্নোপনিষৎ বলেন ওঁকারের অ, উ ও ম এই তিন মাত্রা স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, কিন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানীব্যক্তি বিচলিত হন না। তিনি ঋক্ মন্ত্র দ্বারা এই লোক, যজুমন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, এবং সাম মন্ত্র দ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানীগণ জানেন। সেই ব্রহ্মলোক জ্ঞানী ওঁকারযুক্ত সাধনা বলে লাভ করেন (৫।৬।৭) ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম। যিনি এই মন্ত্রের প্রথম মাত্র-অকার মরণকাল পর্য্যন্ত ধ্যান করেন, তিনি সংবোধিত হইয়া শীঘ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি দ্বিতীয় মাত্রা "উকারের ধ্যান করেন, তিনি অন্তরীক্ষে, যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকার দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন তিনি সূর্য্যলোকে উপনীত হন। (৫।৩-৫)

আত্মাকে ওঁরূপে চিন্তা করিবে (ওম্ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্—মুণ্ডক ২।২।৬) মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিটি পাদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমপাদ জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা. দ্বিতীয়পাদ স্বপ্ন স্থানের অধিষ্ঠাতা তৃতীয়পাদ সুষুপ্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা। অকার-প্রথম পাদ. উকার দ্বিতীয় পাদ, মকার তৃতীয়পাদ। ব্রহ্মের চতুর্থপাদ মাত্রাহীন। এই উপনিষদের মতে ওঁ-কারই সব। ভূত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই ওঁকার, যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঁকার।

সকল বৈদিকমন্ত্রের প্রথমে ওঁকারের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপরি উক্ত গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে ঐন্দ্রনগরের আধিপত্য লইয়া দেবও অসুরদিগের মধ্যে সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে প্রথমে অসুরেরা জয়লাভ করে। পরে দেবগণ ব্রহ্মার 'জ্যেষ্ঠপুত্র (প্রথম সৃষ্টি) ওঁকারের অধিনায়কত্বে সংগ্রাম করিয়া অসুরদিগকে পরাজিত করেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাবশে দেবগণ অঙ্গীকার করেন যে প্রথমে ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদ মন্ত্র সকলের ব্যবহার হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (২।২৩।২-৩) প্রজাপতি লোক—সকলের ধ্যান করিলে তাঁহার অভিধ্যাত জগৎ হইতে ত্রয়ী-বিদ্যা নিঃসৃত হইল। তখন তিনি ত্রয়ী বিদ্যার ধ্যান করিলেন। ফলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল। পরে এই অক্ষরদিগের ধ্যান করিলে ওঁকার নিঃসৃত

* রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহের ওঁকারও গায়ত্রীতত্ত্ব—পৃষ্ঠা ৮০

হইল। বৃক্ষপত্রের শিরাদ্বারা যেমন সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওঁঙ্কার দ্বারা সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ওম্ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার বলেন বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই সন্তোষজনক নহে। ইহা সর্ব্বনাম "অয়ম্" শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ হইতে পারে। ইহা যে "হ্যাঁ" (yes) অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোজরাজ বলেন এই শব্দ কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। ইহার ঈশ্বরার্থে ব্যবহারের কোনও ঐতিহাসিক অথবা ধাতুপ্রত্যয়গত কারণ যদি থাকে, তাহা অজ্ঞাত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওম্ শব্দের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার "মতে ওম্" হিব্রু Amen শব্দের ভারতীয় রূপ। দুই শব্দের উচ্চারণে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের অর্থের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নাই। Amen শব্দ ইহুদী ও খৃষ্টীয় গীর্জ্জায় প্রার্থনার পরে উপাসকগণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়। ইহার অর্থ "তাহাই হউক (So be it—Oxford Dictionary)। হিব্রু ভাষায় ইহাতে অনর্থ নিশ্চিতি (certainty), ঈশ্বর নহে। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণযুগে এই শব্দ ভারতে আনীত হইবার সম্ভাবনাই বা কি? বরং "অহম্" শব্দ হইতে ওঁ শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর।

ছান্দোগ্যে "ওমকে" অনুজ্ঞাক্ষর বলা হইয়াছে। (১।৮) অনুজ্ঞাক্ষরের অর্থ অনুজ্ঞা বা সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। "ওম্" বলিয়া মতের ঐক্য জ্ঞাপন করা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪) "আত্মা এব ইদং অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। স অনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনঃ অপশ্যৎ। সোঽহম্ অস্মি ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ, ততঃ অহং নাম অভবৎ।" এই জগৎ পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে ছিল। সেই আত্মা আপন হইতে পৃথক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমে "আমি আছি" বলিলেন। ইহা হইতে 'অহং' এই নাম হইল। "অহং অস্মি"—আত্মার এই বাক্য দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছিল। এই বাক্য দ্বারা আত্মা আপনাকে Posit করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব যে সত্য, তাহা যে আছে, তাহা খ্যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে সৃষ্টির আরম্ভ।" "অহম্ অস্মি" এই বাক্যই "ওম্।"

প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ অনুসারে, অকার, উকার এবং ম্ কারের যোগে "ওম্" শব্দ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু গোপথ ব্রাহ্মণে ও এবং ম্ এই দুই মাত্রা মাত্র স্বীকৃত। পরবর্তী তান্ত্রিক যুগে অ, উ এবং ম্ এর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যে ওম্ ব্রহ্মের তিনপাদ—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান এবং সুষুপ্তিস্থান। পরে ওম্ অ, উ এবং ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাচক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

কেহ কেহ "অব্" ধাতু (রক্ষা করা, পালন করা) হইতে ওম্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন। যিনি রক্ষা করেন পালন করেন, তিনিই ওম্।

জগৎ যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা একটী অতি প্রাচীন মত। ভর্তৃহরি ব্রহ্মকে "অনাদি-নিধনং শব্দ-তত্ত্বং অক্ষরং" (এই জগৎ শ তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত) বলিয়াছেন বিবর্ত্ততে অর্থভাবেন জগতো প্রক্রি যথা) ওঁকার শব্দ তত্ত্ব ব্রহ্মের বাগ্ময় রূপ বলা যায়।

কর্ম্ম

বেদে বিশ্বের ধারক নিয়মকে "ঋত" নাম দেওয়া হইয়াছে। ঋত সত্য। বাহ্য জগৎ যেমন নিয়মের অধীন, নৈতিক জগৎও তেমনি অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল উৎপন্ন হয়। পুণ কর্ম্মের ফল কর্ত্তার মঙ্গলকর, পাপ কর্ম্মের ফল অমঙ্গল কর। পাশ্চাত দার্শনিক কিম্‌টে জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার (moral order) যাঃ বলিয়াছিলেন। এবং এই ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"এই নৈতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরের আমাদে প্রয়োজন নাই। জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধে প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহা ভিন্ন অন্য যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়, তাহা এই নৈতিক ব্যবস্থারই ফল। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না।" কর্ম্মবাদ মতে নৈতিক জগতে বিনা কারণে কিছুই উৎপন্ন হয় না। মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মের ফল তাহার চরিত্রের উপর উৎপন্ন হয়। তাহার পুণ্য-প্রবণতা অথবা পাপ-প্রবণতা তাহার পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফল। জ্ঞান কৃত কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তি এবং অসৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বে জ্ঞানকৃত কর্ম্মেরই ফল। কর্ম্মের ফল অনতিক্রম্য। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন। (বৃ-আ ৩।২।১৩) পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লোক পুণ্যবান্ তাঁর পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপী হয়। "ক্রতু ময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—পুরুষ সংকল্প ময় পৃথিবীতে পুরুষের যেমন সংকল্প পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরেও সেই প্রকার হয়।" সুতরাং ইহ জন্মে সৎ সংকল্প করাই কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক সংকল্প ও প্রত্যেক কর্ম্ম আমাদের চিত্তের উপর "দাগ" রাখিয়া যায়। সেই দাগই সংস্কার। পুণ্য প্রবণতা ও পাপপ্রবণতা এই সংস্কারের ফল। মৃত্যুতে এই সংস্কারের ধ্বংস হয় না। ইহজন্মের সংস্কার সহ জীব নূতন দেহ ধারণ করে। এই সংস্কার দ্বারা তাহার নূতন জন্মের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই সংস্কার অতিক্রম করা জীবের অসাধ্য নহে। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করিয়া সঞ্চিত সংস্কার বিরোধী কর্ম্ম করা ও জীবের সাধ্যায়ত্ত। স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম্ম হইতে বন্ধন হয়। স্বার্থহীন কর্ম্ম, পরের সেবা রূপ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ইহা ভিন্ন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য পথ নাই। (ঈশ—২)। জীবাত্মা স্বাধীন। এই স্বাধীনতার বলেই কর্ম্মফল অতিক্রম করা তাহার সাধ্যায়ত্ত। তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) দমন করা সম্ভবপর। যে

এই স্বাধীনতার [illegible]

হইতে উদ্‌ভূত কর্ম্মের সমষ্টি নহে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে থাকিয়া সে তাহার জ্ঞান অনুসারে, তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। স্বাধীনতার ব্যবহার না ক'রলে সে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলের অধীন থাকে। আত্মার স্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন এই স্বাধীনতার বিকাশ হয় না। "তদ্ য ইহ আত্মানম্ অননুবিদ্য, ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি। অথ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।" (ছান্দোগ্য—৮।১।৬)।—যে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্য কামনা সমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্ব্বলোকে অকামচর (পরাধীন) হয়। যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং কামনা সমূহ জানিয়া চলিয়া যায়। সর্ব্বলোকে তাঁহার কামচার (স্বাধীন আচরণ) হয়। ঈশ্বরকে জানা। তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করা ও স্বাধীন হওয়া এক কথা। এই জ্ঞানের অভাবকেই মানুষ স্বার্থপর এবং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আমাদের কর্ম্ম বাহ্যজগতে যে ফল উৎপাদন করে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের মনের উপর উৎপন্ন ফল—অভ্যাস ও তাহা হইতে উদ্‌ভূত মানসিক প্রবণতা—আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। সংযম দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিদিগকে বলহীন এবং সৎপ্রবৃত্তিদিগকে বলীয়ান্ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত।

কর্ম্মবাদের সহিত ঈশ্বরবাদের সামঞ্জস্য আছে কি? কেহ কেহ মনে করেন, নাই। কর্ম্মের ফল যদি অখণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাহা হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর তো খামখেয়ালী পুরুষ নহেন। তাঁহার কার্য্য তাহারই সৃষ্ট নিয়ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বেদে বরুণকে "ঋতের" প্রভু বলা হইয়াছে। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিই ক্রিয়াশীল। ঋতই তাঁহার স্বরূপের প্রকাশক। মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে মুক্ত করেন না। যদি সে তাহার স্বাধীনতার ব্যবহার না করে, তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে. কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন।

উপনিষদে চারি প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লাকৃষ্ণ এবং অ-শুক্লকৃষ্ণ। শুক্লকর্ম্ম—পুণ্যকর্ম্ম। কৃষ্ণ কর্ম্ম=পাপকর্ম্ম। শুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম=অংশতঃ পুণ্য, অংশত পাপকর্ম্ম, অশুক্লাকৃষ্ণ=পুণ্যও নহে পাপও নহে (যাহাদের কোনও নৈতিক গুণ নাই। পাপ পুণ্যের অতীত হওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন যাহারা শেষোক্ত প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের এই প্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। ঈদৃশ কর্ম্ম কোনও ফল কামনা করিয়া কৃত হয় না, বলিয়া, তাহাদের বন্ধন-শক্তি নাই। গ্রীক অদৃষ্টবাদ, ষ্টোয়িক প্রজ্ঞাবাদ (Reason), এবং চৈনিক তাও বাদ কর্ম্মবাদেরই বিভিন্ন রূপ। কর্ম্মবাদ ভারতীয় দর্শনের চরিত্রনীতির একটা প্রধান স্তম্ভ।

বৈষ্ণব কবির কাব্যলোক

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বৈষ্ণব কবির মানস চেতনার অধিষ্ঠান-ভূমি হচ্ছে কাব্যলোক, আর সেই কাব্যলোকটি গড়ে উঠেছে তাঁদের মানস-সাধনার বাণী-রূপে। এই কাব্যলোকটি গড়ার পিছনে প্রেরণাও যেমন আছে, মাধুর্যও আছে তেমনি। প্রেরণা দিয়েছে প্রেমতপস্যা, মাধুর্য দিয়েছে রূপ ও রস-সাধনা। রূপ যখন যেয়ে রসের মধ্যে লীন হয়েছে, তখনই সাধনা হয়েছে শ্রেষ্ঠতর—মধুর রসের আশ্রয় ভূমি। সর্বসাধারণের একান্ত নিষ্ঠায় প্রেম-মাধুর্যের দীক্ষা নিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এই রস। তাই এই রসের পসরা বুকে বয়েই বৈষ্ণব কবিরা কালিন্দী তীরের কদম্বকুঞ্জকে আমাদের ঘরের কাছে এনে রেখে গিয়েছেন, গোপবালাও সাধারণ প্রাণগুলিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আমাদেরই বুকের গহন গভীরে।

এই কাব্যলোকে সুখ আছে, দুঃখ আছে,—আনন্দ আছে, বিষাদ আছে; ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহার পরিচয়ও আছে,—কিন্তু অতীন্দ্রিয়তার আরাধনাময় আকুলতাই সমস্ত লোকটিকে নীরব রসসঞ্চারে রসায়িত ক'রে রেখেছে। যৌবনের চেতনাময়তা জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে ভোগের বাসরে ঠাঁই দিতে চাইলেও পরম রসময়ের প্রতি জীবনের অঞ্জলি না দিলে মন শান্তি পায় না। বৈষ্ণব কবিদেরও পায়নি। কারণ রাধাপ্রেমের আবেগ-বিহ্বলতা কবিপ্রাণগুলিকে আবেশময় ক'রে রেখেছে। শ্রীরাধার মতো পরম প্রিয়তমের পায়ে সব কিছু ঢেলে না দিলে তাঁদের প্রাণেরও স্বস্তি মেলে নি। সেইজন্যেই এই কাব্যলোকটিতে জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রাধার জবানীতে ভোগরাগের রাঙিমা ঢেলে দিলেও কাব্য-সাধনার শেষ পর্যায়ে কবিকণ্ঠে এই ধ্বনিই শুনতে পাওয়া যায়—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ (বিদ্যাপতি)

শুধু তাই নয়—

তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু!

এই কাব্যলোকের আকাশে বিদ্যাপতি সঞ্চার করেছেন সাক্ষাৎ দর্শনের

প্রিয়ের অপূর্ব রূপকল্পনায় বিশ্ব-সৌন্দর্যের আলিপনা, জ্ঞানদাস স্বপ্নদর্শনের মায়াঘন ভাবাবেশ। মহাকাশের বুকে দূর বিস্তৃত নীলিমার যেমন একটি নিস্তব্ধ মহিমা আছে, এই কাব্যলোকটিতেও সবগুলি বৈষ্ণব কবির অপরূপ উপলব্ধির গভীরতা বিপুল একটি মহিমার ঘনত্ব নিয়ে আমাদের চারিদিককে যেন একটি অমৃতের প্রলেপ দিয়ে রেখে দিয়েছে। তাঁদের প্রেমোপলব্ধির জগৎটিকে আমাদের প্রাণের দুয়ারে এনে দিয়ে তাঁদের অনুভূতির আত্মা তৃপ্তিলাভ করেছে।

এই কাব্যলোকটিতে কেউ গড়েছেন পরম সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি, কেউ গড়েছেন অপরূপ রূপময়ী এক রাধামূর্তি,—আবার কেউবা গড়েছেন শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবজীবনের ছবি। নিজস্ব কবি-হৃদয়ের ভাবসাধনাই এই মূর্তিগুলিকে গড়তে সাহায্য করেছে। এইরূপ মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে মনে হয়, এগুলির রূপ দেখার জন্য যেন বৈষ্ণব কবিগণের বিস্ময়বিমূঢ় চোখগুলি নিমেষহীন হ'য়ে চেয়ে আছে, আর প্রেমকে অনুভব করার জন্য বিমুগ্ধ মনের আবেশ বিহ্বলতা নীরব ব্যাকুলতায় সুন্দরের দীক্ষা লাভ করেছে। সমস্ত কথাগুলির মধ্যে ছন্দ রয়েছে,—এবং সে-ছন্দ কবি-মানসের আত্মসমাহিত প্রশান্তির অনুলেপনে অপূর্ব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কাব্যলোকে কবির মননভঙ্গির পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই, যে-পার্থক্য আমাদের গোচরে আসে, সে রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির। কাব্যে আমরা ব্যক্তিসৃষ্টি বলতে যা বুঝি, যে-মনন-চেতনার বৈশিষ্ট্য বুঝি, সেও এখানে ওই রূপসৃষ্টিতে। সেইজন্যই কোন কবির শ্রীরাধা মূর্তিলাভ করেছে বিশ্বসৌন্দর্যের রূপলক্ষ্মী রূপে, কোন কবির ধ্যানময়ী রূপে, কোন কবির বা মর্মনিপীড়িতা বেদনাময়ী রূপে। যে-কবির রূপের প্রতি অনুরাগ বেশি, সেই কবির তুলিতেই আঁকা হয়েছে রূপের প্রকাশমানতায় অপূর্ব সৌন্দর্যের দৈবী-বিচ্ছুরণকে—

যঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয় বিকার॥

*　　*　　*　　*

পুন কিয়ে দরশন পাব।
অব মোহে ইহ দুখ যাব॥ (বিদ্যাপতি)

বয়ঃসন্ধির রসনিবিড় বর্ণনার পঙ্ক্তিও শ্রীরাধার অধররাগের মধুর হাসিকে দেখতে ভুলেন নি। এখানে কবি-মানসটি কাব্যগুণের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে নিজের পরিচয়টিকেও সকলের সামনে তুলে ধরেছে। বৈষ্ণব-কবির কাব্যলোকে বিদ্যাপতি এই রূপ-অংকনের কবি। কবি যেন তাঁর শ্রীরাধিকা মূর্তিতে নিজ হৃদয়ের মানসীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, আর একমনে সেই রূপ দর্শন ক'রে ভাববিহ্বল কণ্ঠে বলেছেন—

দশন মুকুতা পাঁতি　　　অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহিতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ　　　অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পুরল আশা।

চণ্ডীদাসের ধ্যানময়ী রাধা রাঙা বাস পরে' যখন ময়ূরের কণ্ঠে শ্যামকে নিরীক্ষণ করেছেন, তখন কবিও যেন শ্রীরাধার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেই বলেছেন—'তোমা হেন ধন অমূল্য রতন তোমার তুলনা তুমি।' রাধার মনের সঙ্গে যেন তাঁর মনের সম্পর্ক—যেমন সম্পর্ক ফলের সঙ্গে তার রসের। সেখানে যেন রূপকে দেখার কোন প্রয়োজন নেই, নাম শুনলেই যথেষ্ট। 'নাম পরতাপে যার ঐছন করয়ে গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়'—শুধু তাই নয়, 'জপিতে জপিতে নাথ অবশ করিলে গো কেমনে পাইব সই তারে।' রূপাতীতের ধ্যানধূপে যেন তাঁর সমস্ত পরিমণ্ডল শুচিময় হয়ে উঠেছে। রূপের আকাঙ্ক্ষা নেই,—অনন্ত রূপময়ের অমৃত জ্যোতিতে মনকে রাঙিয়ে নিলেই সব পাওয়ার তৃপ্তি যে ঘনিয়ে ওঠে। তাই চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবির কাব্যলোকে ধ্যানময় মানসমণ্ডল গড়ে' তুলবার কবি! তাঁর সেই ভাবমণ্ডলে,—'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' সেখানকার শ্রীরাধা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের কুশলেই কুশল মানেন, আর কোন দুঃখকেই তিনি মনে ঠাঁই দেন না। মনের সমস্ত ভাবনাকে কৃষ্ণময় ক'রে তুলে' জীবনের আরাধনাকে নিষ্কম্প একটি দীপশিখার মত ক'রে নিয়ে, একান্তে বসে' কেবল তারই আরতি করেন আর বলেন—

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি　　　রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে লুকায়ে লব। (চণ্ডীদাস)

আর একজন কবি এই কাব্যলোকের অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে যদিও এখানকার পরম প্রেমের রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়ে দিয়ে, যৌবনের বনে মনকে হারিয়ে ফেলে আকুল হ'য়ে কেবল কিছুদিন ঘুরে ফিরেছেন, তবুও তাঁর সুগোপন মানস-সাধনা আরাধিকা শ্রীরাধার মনের মধ্যেই যেন নিজের ব্যাকুলতাকে খুঁজে পেয়েছিল। সেখানেও তাঁর শ্রীরাধা চিরারাধ্যের কেবল রূপের জন্য নয়, প্রেমের গভীরতাকে বুকের মধ্যে বহন করেই বলেন—'পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।' এখানকারও প্রেম বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়ান, নিবিড়তম সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদ আশংকায় ভারাতুর, প্রগাঢ় প্রণয় অশেষ মিনতিতে প্রতিমুহূর্তেই ঝরে পড়ে। বৈষ্ণব-কবির কাব্যলোকে জ্ঞানদাস তাই রূপের পথ ধ'রে মানস-সাধনার প্রেমলোক রচনার কবি; সে-প্রেম হয়তো ক্ষণিক দৃষ্টিতে অনুরাগের সঞ্চার হয়, ক্ষণিক অদর্শনে অশান্ত তৃষ্ণা ও অপরিতৃপ্তি জেগে থাকে,—কিন্তু সেই প্রেম তপস্যা যখন মনের সমস্ত বেদনাময় আগ্রহকে নিংড়ে নিয়ে পরমারাধ্য রূপ একটি স্থির বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শুধু সেখানে এই কথাই বাজে—'হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।' মানস-পদ্মদলের রসমধুরভিতে প্রাণপ্রিয়কে অভিষেক ক'রে নিয়ে শ্রীরাধার সঙ্গে কবি মন বুঝি বা বৃন্দাবনের নিত্যমাধুর্যের স্বাদ নিয়েছিল।

এই কাব্যলোকের আর একজন কবি রূপাকুলতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরাধাকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু সেই যুগের মনোময় সাধনাকে তাঁর কাব্যসাধনায় যেন রূপময় করতে চেয়েছিলেন। যুগ মানসের উপলব্ধিকে নিজের কবি হৃদয়ে ধ'রে নিয়ে একদিকে যেমন মহারাসের গান গেয়েছেন,

চৈতন্যের রসমধুর ভাবজীবনকে মানসচক্ষে দেখে' দেখে, উঠেছেন—

নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥ (গোবিন্দদাস)

ব অনুরাগের স্বরূপও ফুটি উঠেছে শ্রীরাধার সঙ্গে—
গাবিন্দদাসের চিত্তে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ।"

মধ্যে যে সত্য আছে, সেই সত্যের আনন্দকেই যেন বি-মানস অনন্ত মাধুর্যে ভ'রে ওঠে। অন্তরের আকুলতা র দিয়ে প্রকাশের পথ ক'রে নেয়। গোবিন্দদাস কাব্যলোকে শ্রীরাধার রূপচেতনায় মনকে প্রথম তন্য-সাধনার ভক্তিরসের পদশ্লোক রচনার কবি। ার কাব্যজগতের মানস-সাধনা রূপও প্রেমকে স্বীকৃত ভাবপ্রেমের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। পরমাশ্রয়ের রূপ তায় মিশেছে।

ার উৎপ্রেক্ষার দিকে গোবিন্দদাসের কবি মনের কর্ষণ ছিল বলেই মানস-ভাবনাময় ভাব-সম্মেলনের াফল্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্য- টি আত্মবলয় আছে, তাতে ধরা পড়েছে কেবল দিক—সে-দিকগুলিতে মিলনাকুলতার সঙ্গে প্রিয়ের মন্বয় ঘটেছে।

কের সকল ভাবগুলির যেন রসঘন সাধন-পরিণাম প্রার্থনার পদগুলিতে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কামগন্ধহীন চৈতন্যোত্তর কবিগণের গৌরলীলা বর্ণনায়। উৎসধারার ছ মহাসমুদ্রের অন্তহীন স্পর্শের স্নিগ্ধতার মধ্যে।

হ ও মিলন অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত,—বৈষ্ণব কাব্য- পথটিকে দেখিয়ে দিয়ে এই বিরহ-মিলনেরই জয়ধ্বনি ধ্য এই কাব্যলোকের যে-সাধনা তা' পরম সুন্দরকে প্রিয় করার সাধনা। সাধনার এই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই ভগবান এই কাব্যলোকে মানুষরূপী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। দেবতা প্রিয় হওয়ার অবকাশ পেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব কবি এইভাবে দেখেন—'শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে গলার হার।' চিরসুন্দরকে বুকের আড়ালে একান্ত আপনার ক'রে রেখে দিয়ে প্রাণ যেন গান গাওয়ার আনন্দকে ধ'রে রাখতে পারে; হৃদয়ের উত্তাপ সুর অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে।

রূপ-কল্পনার পেছনে অন্যান্য চেতনার মতো একটি দিব্যচেতনাও আছে। সেই দিব্যচেতনার সাড়া পাই বৈষ্ণব কাব্যলোকে। গভীর নিশীথের নক্ষত্র-স্পন্দনের মতো কেমন যেন একটি সুগোপন চেতনা অপার্থিবতার মাধুর্যরসে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আসে, আর মানস-সাধনার বাঙ্ময় প্রকাশে ঘটে এই ভাবে—

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥ (গোবিন্দদাস)

নিত্যবৃন্দাবনের বাঁশির মর্মসুরটিকে কবি নিজের প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করে দিব্যবোধের আবেশে যেন মেতে উঠেছেন—আর সুদূর প্রসারী সাধন-ঐতিহ্যের নিষ্ঠা নিয়ে বলতে পেরেছেন—'অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস।' এখানে তাই মানবীয় সহজবৃত্তিগুলি ভাবরূপে দেখা দিয়ে মহাভাবে পরিণতি লাভ করেছে। মর্মকোষের মধুসিঞ্চনে সাধন-পুষ্পের একটি পূর্ণায়ত রূপ ফুটে উঠেছে—সে-রূপের মধ্যে এই ভাবের পরাগ কবির প্রাণের বাণীকে বেঁধে রেখেছে—

তোমা হেন ধনে ছাড়িব কেমনে,
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস বলে বিদগধ আর
কোথা কারে গেলে পাব॥

হৃদয়ার্তির সঙ্গে প্রেম-সাধকের নামজপ নিয়ে ভ'রে রয়েছে এই বৈষ্ণব কাব্যলোক; তাই প্রেম-মাধুর্যের পরশ প্রশান্তিতে বাঙলার ভাবৈতিহ্যের আশ্রয়ভূমি এই বৈষ্ণব-সাধনা!

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

আহার অন্বেষণে

ফটো : বিনয়ভূষণ দাস

কেরালা-বাজেটের ফলশ্রুতি

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারতে কংগ্রেসী রাজত্ব চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে একবার মাত্র সংখ্যাগত অনিশ্চয়তার-অস্বস্তিবোধের জন্য কংগ্রেস দল সরিয়া দাঁড়ান এবং প্রজা সোসালিষ্ট দল সাময়িকভাবে সরকার গঠন করেন।

বিগত দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনেই সর্ব্বপ্রথম নিরঙ্কুশ কংগ্রেসী শাসন-ক্ষমতা প্রচণ্ড আঘাত খায় এবং যদিও এই নির্ব্বাচনের ফলাফল ভারতে সমগ্রভাবে কংগ্রেসপক্ষেই গিয়াছে, তথাপি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মালাবারের অংশ লইয়া নবগঠিত কেরালা রাজ্যে এবারকার নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিধানসভায় সর্ব্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করিয়া অন্য দল নিরপেক্ষভাবে সরকার গঠনের অধিকার পাইয়াছেন। ভারতের একটি মাত্র রাজ্যে হইলেও কেরালার কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকের কংগ্রেসী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বামপন্থী সরকার হিসাবে কেরালার কম্যুনিষ্ট শাসনকর্ত্তৃপক্ষ কতখানি সাফল্যলাভ করেন, তাহা সকলেই গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

কম্যুনিষ্ট সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের নীতিবাদ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তাছাড়া এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থায় এই সমাজতন্ত্রের রূপারোপে লক্ষণীয় কার্য্যকারিতাও সম্ভব হয় নাই। অবশ্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবাদী কংগ্রেসে ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এদিকে হইতে কংগ্রেসী শাসনকর্ত্তৃপক্ষের কিছু কিছু পরিকল্পনা ও সক্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।

কেরালায় কম্যুনিষ্ট সরকার সংগঠিত হওয়ায় সকলেই এই রাজ্যের শাসনপরিচালনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আশা করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, ভারতের অন্যতম রাজ্য হিসাবে কেরালার শাসনব্যবস্থা কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ মোটামুটি সর্ব্বভারতীয় শাসনব্যবস্থার সমান্তরালভাবেই চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুও সম্প্রতি স্বীকার করিয়াছেন যে, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার এখনও বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন-মূলক কোন কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই।

আধুনিককালে বাজেট রচনায় সরকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রথম বাজেট রচিত হইয়াছে। এই বাজেট হইতে এবং কেরালা পরিষদে বাজেট উপস্থাপন কালে (৭।৬।৫৭) অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেননের বক্তৃতা হইতে কেরালা সরকারের শাসন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিচয় মেলা স্বাভাবিক। অবশ্য, আগেই বলা হইয়াছে, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার এখনও মোটামুটি কংগ্রেসী সরকারের সর্ব্বভারতীয় আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের বাজেটে কম্যুনিষ্ট নীতি রূপায়নের সর্ব্বাত্মক প্রয়াস খুঁজিলে হতাশ হইতে হইবে। তবু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজেটটি যে অকংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষ রচনা করিয়াছেন, এই বাজেটে তাহারও পরিচয় আছে এবং সেই পার্থক্যটুকুর জনকল্যাণমুখিতার উপর এই বাজেটের এবং এবৎসরের কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে, সন্দেহ নাই।

কেরালার ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই বৎসর রাজ্যের রাজস্ব-খাতে আয় অনুমিত হইয়াছে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং ব্যয় অনুমিত হইয়াছে ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এবং এ হিসাবে ঘাটতি হইয়াছে ২ কোটি ২১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাজস্বখাতের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের বাজেটে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন নূতন কর বসাইয়া ঘাটতি পূরণ না করিয়া ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহের এবং প্রারম্ভিক মজুত হইতে বাকীটা পূরণের সংকল্প করিয়াছেন, কেরালা সরকার সে পথে না গিয়া নূতন করসংস্থাপন দ্বারা ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ফলে তাঁহাদের বাজেটে শেষ পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। অবশ্য একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের পক্ষে এক বৎসরে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা খুব বড় অঙ্ক নয়, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ত্তমানে বাজেট-ঘাটতি চলিতেছে বলিয়া এই ঘাটতি-বাজেটের যুগে কেরালার উদ্বৃত্ত বাজেট লক্ষণীয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাজেটের ঘাটতিতে বা উদ্বৃত্তে সাময়িক দেনা পাওনার হিসাবে সন্তোষ-অস্বস্তির প্রশ্ন থাকিলেও ইহা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের বিবেচনায় শেষ কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে বাজেটে অনুসৃত নীতির স্বরূপ এবং এই বাজেটের কার্য্যকারিতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বর্ত্তমান জীবনযাত্রার নির্বিঘ্নতার ও বাজেটে প্রস্তাবিত উন্নয়নের ফলে ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির কতখানি সম্ভাবনা আছে, তাহাই হইল আসল কথা। বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট সরকার বামপন্থী সরকার বলিয়া এবং কেন্দ্রে ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ কংগ্রেসী সরকারের কার্য্যনীতির-সমালোচনায় যে সব নীতিগত কথা বলিয়া থাকেন তাহার নিরিখে কেরালা-বাজেট বিচার্য্য। এই বিচারের সময় আবার আপাত রূপ এবং নিহিত উদ্দেশ্য উভয় দিক হইতেই বাজেটের প্রস্তাবসমূহ লক্ষ্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ, এযুগে ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে সরকারী অর্থব্যবস্থায় গঠনমূলক পরিকল্পনার-আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহের সহিত সমানতালে চলিতে হইলে ভারতে কৃষি-শিল্প পুনর্গঠন ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন একান্ত

আবশ্যক। সেদিক হইতে ভারতে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন কংগ্রেসী রাজ্যে পরিকল্পনামূলক বাজেট রচনার দিকেই ঝোঁক দেখা যায়। আলোচ্য কেরালা বাজেটের এদিক হইতে একটু পার্থক্য আছে। এই বাজেটের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রতি ততটা সন্নিবদ্ধ নয়, অবিলম্বে রাজ্যবাসীদের কিছুটা সন্তুষ্ট করিবার দিকেই এই বাজেটে অধিক জোর পড়িয়াছে বলা চলে।

কেরালা বাজেটে এই রাজ্যে মাথা ভারী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার এবং ধনী জমিদার ও আবাদ মালিকদের হাতের নগদ টাকা কমাইবার লক্ষণীয় চেষ্টা দেখা যায়।* অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন বলিয়াছেন যে, বিশেষক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের স্বাধীনতা থাকিলেও কেরালা রাজ্যে কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ বেতন সীমা ১০০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া তাঁহাদের নীতি। বাস্তবিক মাথাভারী পরিচালনা ব্যবস্থা ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই সমস্যা। কেন্দ্রেও এই সমস্যা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ এইরূপ সংকল্প ঘোষণা করায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। ধনীদের হাতের নগদ টাকা সরকার টানিয়া লইলে শিল্পে মূলধন যোগানোর প্রশ্নে অসুবিধা দেখা দিতে পারে সত্য, তবে এই শিল্পীয় মূলধনের প্রশ্ন বাদ দিলে জমিদার বা আবাদ মালিকদের হাতের নগদ টাকার যতটা সরকার টানিয়া লইবেন, বাজারের উপর চাপ সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে হাজার টাকা সর্ব্বোচ্চ বেতনের সীমা হইলে কেরালার মত ভূমি উপজীবিকা প্রধান রাজ্যে অর্থবান আবাদ-মালিকদের আয় পরিমিত হওয়ারও একটা গুরুত্ব আছে। ফড়িয়া, দালাল প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তীরা ছোটখাট কৃষিজীবীদের নিষ্করুণভাবে শোষণ করে, এই শোষণ বন্ধ করিতে কেরালা সরকার রাজ্য-বাণিজ্য-সংস্থা (State Trading Corporation) গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কথাকলির দেশ কেরালা দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠভূমি, অর্থমন্ত্রী শ্রীমেননের বাজেট বক্তৃতায় কেরালা সঙ্গীত-নাটক-একাডেমি গঠনের প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি সমেত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য কেরালা সরকারের যে আগ্রহ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত হইয়াছে, তাহা কেরালার মত রাজ্যের হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রাজ্যে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প কম এবং যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষি ও কুটির-শিল্পের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে, সেখানে সমবায় আন্দোলনের মূল্য লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেরালা বাজেটে এই সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হইলেও কেরালার বাজেটে শিক্ষার, বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার প্রসারের সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। সাধারণভাবে ছাত্রদের এবং বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের কল্যাণের জন্য আলোচ্য বাজেটে একটা আগ্রহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। কেরালায় ইতিপূর্ব্বেই খাদ্যশস্য বিক্রয়-করের আওতার বাহিরে গিয়াছিল, এবারের বাজেটে পুস্তক ও শুকনো মাছ সহ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যকে বিক্রয়-কর হইতে অব্যাহতি দিবার আশ্বাস আছে। সমগ্রভাবে বিক্রয়-কর নীতি সংস্কারের যে আগ্রহ আলোচ্য বাজেটে দেখা গিয়াছে, তাহা জনস্বার্থমূলক। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কেরালা বাজেটে মোট ৬৮ লক্ষ ধরা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে সব তপশীলী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদের তপশীলী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট সুবিধা দেওয়া হইত না। কেরালা সরকার আলোচ্য বাজেটে অনুন্নত শ্রেণীর সুবিধা অনুন্নত ধর্ম্মান্তরিতদেরও দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

কেরালা বাজেটে পুলিস কনষ্টেবলদের ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। পুলিস বিভাগ রাজ্যশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কেরালা সরকার অন্যায় প্রতিরোধে সরকারের অন্যতম প্রধান অবলম্বন পুলিস কনষ্টেবলদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকে কিছুটা অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

উপস্থিত সর্ব্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য না হইলেও প্রাথমিক শিক্ষকদের সুখসুবিধার জন্য আলোচ্য কেরালা বাজেটে একটা লক্ষণীয় তৎপরতা দেখা যায়। আগে প্রাথমিক শিক্ষকেরা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৩৫—৮০ টাকা ও মালাবারে ৪৫—৯০ টাকা গ্রেডে কাজ করিতেন, অর্থমন্ত্রী শ্রীমেনন তাঁহার বাজেটে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার ৪০—১২০ টাকা করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক শিক্ষকেরা জাতির ভবিষ্যৎ বনিয়াদ গঠন করেন, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের উপযোগী বেতন প্রদানের যে কোন প্রয়াসই অভিনন্দন-যোগ্য। তবে কম্যুনিষ্ট নীতিবাদে সংস্কৃতির প্রণালীবদ্ধতার (Regimentation of culture) উপর একটা প্রবণতা লক্ষিত হয় বলিয়া কেরালা সরকারের সর্ব্বাগ্রে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করিবার নীতিতে কবিগুরুর মুক্তধারার গুরুমহাশয়ের ও তদীয় শিষ্যবর্গের কথা কেমন যেন মনে পড়িয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্বল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনহার পুনর্ব্বিবেচনার জন্য কেরালা সরকার কমিটী গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কেরালার অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমজীবিদের ক্ষেত্রেই যাঁহারা জীবনধারণের উপযোগী বেতন পান না, তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধির কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। সকল সরকারী কর্ম্মচারীদের হিসাবেই যাহাতে 'নিম্নতম মজুরী আইন' প্রযোজ্য হয়, তজ্জন্য কেরালা সরকার সচেষ্ট হইবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদের জন্য

* শাসনকার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে কেরালার বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা শ্রীথানু পিল্লাই পরিচালিত প্রজা সোসালিষ্ট মন্ত্রীসভার আদর্শে মন্ত্রীদের বেতন মাসিক পাঁচশত টাকায় নামাইয়া আনিয়াছেন।

পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারেও সরকার লক্ষ্য রাখিবেন এবং এইভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। কেরালা অর্থমন্ত্রীর এ সব উক্তি যে প্রশংসার্হ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারত সরকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিল্পবিরোধ আইন (Industrial Disputes Act), ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক মালিক ও সরকারের মিলিত চুক্তিতে শিল্প-শান্তি প্রস্তাব (Industrial Truce Resolution), ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নতম মজুরী আইন (Minimum wages Act) এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ন্যায্য মজুরী আইন (Fair wages Act) প্রবর্তন করিয়াছেন, কেরালায় যদি ভারতসরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ন হয়, তাহা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা।

কেরালা বাজেটের জনকল্যাণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, এই জনকল্যাণ আবার পরিকল্পনাভিত্তিক বা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিমূলক ভবিষ্যতমুখী ততটা নয়, যতটা ইহা বর্ত্তমান কেন্দ্রিক। কর্ম্মহীনের কর্ম্মসংস্থান এই জনকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক সন্দেহ নাই। এহিসাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুৎ মেননের বাজেট বক্তৃতায় কতখানি সুযোগ সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে, তাহা অতঃপর আলোচনা করা যাক।

সকলেই জানেন কেরালা ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এই রাজ্যে ভারতের মধ্যে শিক্ষিতের হার সর্ব্বাধিক, আবার এই রাজ্যে জনসংখ্যার হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও সর্ব্বাধিক। কাজেই কেরালার কর্ম্মসংস্থান সমস্যার একটা বিচিত্র রূপ আছে। সরকারী হিসাবে কেরালায় বর্ত্তমানে ১৮ লক্ষ ২০ হাজার লোক কর্ম্মহীন এবং প্রতি বৎসর এই রাজ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার নূতন লোক কর্ম্মপ্রার্থী হইতেছে। সরকারী হিসাবতত্ত্ববিদদের নিশ্চিতসূত্রের এই হিসাব প্রকৃত হিসাবের চেয়ে কম হওয়াও সম্ভব। এছাড়া শিক্ষিত-বহুল কেরালা রাজ্যে অর্দ্ধবেকারীর বিক্ষোভ বিদূরিত করিয়া জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ-যোগ্য কাজ সংগ্রহও একটা বড় সমস্যা। বেকার সমস্যা ভারতের সর্ব্বত্রই প্রবল, তবে এটা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষিত লোকেরা বেকারীতে এমন কি অর্দ্ধ বা ছদ্ম বেকারীতে সক্রিয় প্রতিবাদের যতটা উৎসাহ পায়, অশিক্ষিতেরা নিজেদের আগ্রহে ততটা পায় না এবং যাহোক একটা কিছু জুটিলেই তাহারা একরূপ মানাইয়া লয়। এই-জন্যই বিহারের বা হিমাচল প্রদেশের সাধারণ মানুষের কর্ম্মসংস্থান সমস্যার চেয়ে কেরালার সাধারণ মানুষের কর্ম্মসংস্থান সমস্যা আরও জটিল। কেরালার আলোচ্য বাজেটে দেশের সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই কর্ম্মসংস্থান সমস্যার উপর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে সত্য, তবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যেন কিছুটা পুঁথিগত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেরালার অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, অথচ এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা প্রচুর। বলা হয়, জমিহীন চাষী আত্মাহীন মানুষের মত। এহিসাবে কৃষিভূমি পুনর্বণ্টনের দ্বারা জমিহীন কৃষককে জমির মালিক করিবার নীতির গুরুত্ব কেরালার অর্থমন্ত্রী তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই স্বীকৃতি নির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা ঘোষিত হয় নাই।

এছাড়া চাষী জমির মালিক হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। কেরালার খাদ্য পরিস্থিতি শোচনীয়, সরকার বর্ত্তমান বৎসরের জুন হইতে আগষ্ট এই তিনমাসের জন্য কেন্দ্রের নিকট হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ হাজার টন সরবরাহে সম্মত হওয়ায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ অবস্থায় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়াইয়া রাজ্যকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কৃষিজীবিকা নিশ্চিত করার চেষ্টা স্বাভাবিক। কেরালা সরকার এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে। রাজ্যের পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সংকল্প দ্বারা তাঁহারা শুভেচ্ছা অবশ্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এহিসাবে সাফল্য করায়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বলা যায় না। সমগ্র ভারতে ৭২ কোটি ৪৬ লক্ষ একর জমির মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৩২ কোটি একরেরও কম, অনাবাদী জমিতে আবাদ করিবার সংকল্প ভারতের সর্ব্বত্রই কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, কিন্তু সেই সংকল্প রূপায়নের পথে দেখা দেয় হাজার বাধা। কাজেই মনে হয় কেরালার ভারগ্রস্ত কৃষি বেকার সমস্যার সমাধানে খুবই কম সাহায্য করিবে। কৃষির উপর অতি-নির্ভরশীলতা সারা ভারতের মত কেরালারও সমস্যা, এ হিসাবে সার বা সেচ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা কৃষির উন্নতিতে ফসল বাড়িতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান কৃষিজীবীদের পুরো কাজ দিয়া নূতন বেশী লোককে কাজ দেওয়া এই কৃষির পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয়।

তাছাড়া আর একটা কথা আছে। ধনী আবাদ মালিকদের অতিরিক্ত কর প্রদানে বাধ্য করিয়া কেরালা সরকার দেশবাসীর মধ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে সমতা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে বাজেটের নূতন ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বেশি ভূমি বা কৃষির উপর চাপ দিয়া আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া কৃষি ব্যবস্থায় কিছুটা অস্বস্তি দেখা দিতে পারে এবং তাহার ফলে হয়তো পূর্ণাঙ্গ ভূমিসংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে অতিরিক্ত কর্ম্ম সংস্থানের প্রশ্নেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

কেরালার ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার আর কৃষিক্ষেত্রের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করা সমীচীন নয় এবং এক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণই বেকার সমস্যা সমাধানের ভরসা। উপস্থিত শিল্পের দিক হইতে কেরালার অবস্থা শোচনীয়। ভারত সরকার কেরালায় মূল শিল্প বা ভারী শিল্প (Basic/Heavy Industries) স্থাপনে কার্পণ্য করিতেছেন বলিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমেনন সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন। ভোগ্যপণ্য শিল্প যদিও কেরালায় লক্ষণীয় ভাবে প্রসারিত হয় নাই, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় এই শিল্পপ্রসারেও বাধা কম নয়। কেরালা সরকার শিল্প-জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন নাই, বরং বেসরকারী শিল্পপ্রয়াসে তাঁহারা সুযোগ সুবিধা দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। [illegible]

ভাব স্বাভাবিক। ভারত সরকার তাঁহাদের ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘোষিত শিল্পনীতিতে দেশরক্ষা, পরিবহন নির্ম্মাণ, নূতন লৌহ, ইস্পাত ও কয়লা শিল্প, বৈদ্যুতিক সংস্কার শিল্প, খনি শিল্প প্রভৃতি 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত ২৯টি শিল্প ব্যতীত বাকী সমস্ত শিল্পকে বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইতে দিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কেরালা সরকারও এই শিল্পনীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য শিল্প-মালিকদের ন্যায্য মুনাফাভোগের অধিকার কেরালা সরকার মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের দৃষ্টিতে ন্যায্য মুনাফা বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে শিল্প-পতিদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাঁহাদের কিছুটা আতঙ্কবোধ স্বাভাবিক। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে যেখানে শিল্প জাতীয়করণ নীতির সর্ব্বাধিক প্রসার আশা করা যায়, সে রাজ্যে পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া শিল্পসংগঠনে উৎসাহ কত লোকের হইবে বলা শক্ত। শুনা যায় কেরালা সরকার বিড়লার মত শিল্পপতিকে কেরালায় আমন্ত্রণ জানাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

শিল্প প্রসারে মালিকের স্বার্থরক্ষার এই নিশ্চয়তার প্রশ্ন ছাড়া মূলধনের ও অভিজ্ঞতার প্রশ্নও খুবই বড় এবং সেদিক হইতে দেশবাসীর হাতের উদ্বৃত্ত টাকার উপর যথেষ্ট নির্ভর করা হয়। কেরালায় এপর্য্যন্ত শিল্পপ্রসারে তেমন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া কেরালাবাসীদের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে ততটা প্রবণতা নাই। যদিও অর্থমন্ত্রী শ্রীমেনন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার বেসরকারী শিল্পোদ্যমে শেয়ার পর্য্যন্ত কিনিয়া সহযোগিতা করিবেন, তথাপি কেরালায় প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিল্পপ্রসারের উপযোগী মূলধন সংগৃহীত হওয়া কঠিন। কেরালার ধনিকশ্রেণীর বৃহৎ এক অংশ আবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কম্যুনিষ্ট সরকার আবাদী আয়ের উপর যেভাবে নূতন কর বসাইয়াছেন, এবং চাষাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত "সম্পত্তিকর" (Wealth-tax) না বসাইবার সংকল্পের সুযোগ যেভাবে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এই রাজ্যে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী অর্থবিনিয়োগে ধনীরা সাহস পাইবেন কি? শিল্প কম বলিয়া কেরালায় শিল্পীর অভিজ্ঞতাও কম এবং শিল্পপ্রসারের প্রশ্নে এই অভিজ্ঞতার অভাবও কম বাধা নয়।

কুটির শিল্প সমুন্নত হইলে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়, একথা কেরালার পক্ষে যেমন সত্য, অন্যান্য রাজ্যের পক্ষেও তেমনি সত্য। অর্থমন্ত্রী শ্রী মেনন দড়ি, তাঁত, মৎস্য শিকার প্রভৃতি কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি কামনা করিয়া এইরূপ শিল্প বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান আশা করিয়াছেন এবং এজন্য তিনি মধ্যবর্ত্তীদের মুনাফা বন্ধ করিতে সমবায় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা বলিয়াছেন। কুটির শিল্পে পূর্ণ কর্ম্মসংস্থান সহজ নয়, তাছাড়া চাষ-আবাদের মত এখনও কেরালায় কুটির-শিল্পের উপর নির্ভর করে খুবই বেশি লোক। এদিক হইতে জমি ও কুটির শিল্পের উপর নূতন চাপ বাড়িলে তজ্জন্য দেশে অনুপূরক পরিবেশ গঠন করিতে হইবে।

আছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করা যায়। পরিকল্পনা কমিশন এই পরিকল্পনার আমলে (১৯৫৬-৬১) মোট যে এক কোটি লোকের কর্ম্মসংস্থানের আশা করিয়াছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই কম এবং সম্ভব মনে হইলে তাঁহারা কর্ম্মসংস্থানের সূত্র নিশ্চয়ই অবহেলা করিতেন না। তাঁহারা এই এক কোটির মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আশা করিয়াছেন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার জনের কাজের। অথচ শ্রী ডি জি কার্ভের নেতৃত্বে গঠিত কার্ভে কমিটি এবং শ্রীবৈকুণ্ঠলাল মেটা পরিচালিত নিখিল ভারত পল্লী শিল্প বোর্ড শুধুমাত্র খাদি শিল্পের উন্নয়ন ঘটাইয়া যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ ও ৪০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ক্ষেত্রে পতিত জমিতে চাষ এবং কুটির শিল্পের উন্নতি এই দুইয়ের সম্ভাবনাই পরিকল্পনার হিসাবে যতটা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা হয় না।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা উপস্থিত ক্ষেত্রে রক্ষার পক্ষে চলতি ব্যবস্থা অনুযায়ী ধীরে সুস্থে শাসনকার্য্য পরিচালনা নিরাপদ সত্য, কিন্তু অভাবগ্রস্ত দেশে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় হাত দিতেই হইবে এবং অর্থের অনটন সত্ত্বেও সরকারকে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনার পিছনে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া চাউলের হিসাবে মণ প্রতি দশটাকা সাহায্য দিয়া প্রতি মণ দশ বারো টাকায় নামাইয়া আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি হয় তো শান্তিপূর্ণ হইত, কিন্তু জাতীয় শাসন কর্তৃপক্ষের দিক হইতে এভাবে দেশের পুনর্গঠন প্রশ্ন স্থগিত রাখা ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, দুর্নীতি বা উপরোক্ত পরিকল্পনা সমূহে অর্থের অপচয়ের অভিযোগের যথার্থতা বিচার না করিয়াই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইল। অর্থের অপচয় বা দুর্নীতির অভিযোগ সত্য হইলে তাহা কর্তৃপক্ষে অবশ্যই কলঙ্কের কথা। কেরালার বাজেট হইতে কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে কেরালা সরকার ঠিক এভাবে জিনিষটি দেখিতেছেন না। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পাঁচ মাস কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছিল, সেই কয়মাসের অন্তর্বর্ত্তীকালীন বাজেটে মূলধন খাতে ধরা হইয়াছিল ৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। কেরালার আলোচ্য ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের পুরো বৎসরের বাজেটে মূলধনী খাতে এই পরিমাণের প্রায় সমান বা ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ১০ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি হইয়াছে, কিন্তু দামোদর পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট, জমিদারী দখল ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা প্রভৃতির হিসাবে মূলধনী খাতে ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইসব পরিকল্পনার ফল হাতে হাতে মিলিতেছে না, এসব খাতে ব্যয় সঙ্কোচে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ঘাটতি রদ হইতে

সত্ত্বেও ইহাতে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠন পরিকল্পনার উপর জোর পড়িয়াছে।

মোটের উপর, কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রথম বাজেটে বর্তমানের প্রয়োজন তথা এই সরকারের নিরাপত্তা কিছুটা বড় করিয়া দেখা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। রাজ্য-খাতের যে সব বিপুল আর্থিক দায়িত্ব সমন্বিত অনিশ্চিত ভবিষ্য-সংস্থানী পরিকল্পনায় কংগ্রেসী রাজ্য-কর্তৃপক্ষ সাহস করিয়া হাত দিতেছেন, অনুরূপ পরিকল্পনায় অবিলম্বে হাত দিতে কেরালার নবগঠিত কম্যুনিষ্ট সরকার ঠিক যেন ইচ্ছুক নন। অবশ্য যে সব পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রের উপর বহুলাংশে নির্ভর করা চলে, সে বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদাররূপে কেরালা সরকার যে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না একথা নিশ্চিত এবং উপরোক্ত চাউল সাহায্য লাভের ব্যাপারে ও কেরালায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ভারী শিল্প প্রসারের দাবী হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।* তবে ক্রম-স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়া আ[illegible] কেরালা সরকারের বর্তমান কার্যধারার লক্ষ্যায় রূপান্তরও আশা[illegible] ক[illegible]

আগেই বলা হইয়াছে, কেরালা সরকার ভারতের প্রথম পূর্ণ[illegible] বামপন্থী সরকার। এদেশে দীর্ঘকাল দুর্গতি চলিতেছে। এই দুর্গ[illegible] নিরিখেই কেরালা সরকারের কার্যধারা সহানুভূতির সহিত বিবে[illegible] করিতে হইবে। পরিবর্তন কল্যাণবাহী, ইহা বহুপ্রচলিত প্রাচীন নী[illegible] কথা। আমরা চাই কেরালার ক্ষেত্রে এই নীতিবাক্যের অবাধ পর[illegible] হউক।

* অকংগ্রেসী সরকার হিসাবে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকা[illegible] ঔদাসীন্যের প্রকাশ্য কঠোর সমালোচনা কেরালা সরকারের পক্ষে অপে[illegible] কৃত সহজ এবং এই সুবিধা তাঁহাদের আপেক্ষিকভাবে অধিকতর কে[illegible] সাহায্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মনে করে[illegible]

(পূর্বানুবৃত্তি)

'কুমারবাবু আছেন ?"

বাহিরের দরজায় ডাক শুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আসুন, কি খবর"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন"

একটু ভাল বলেই বোধ হচ্ছে

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে মার বুঝিল—বাবার খবর লইবার জন্য তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে' গেছি কুমারবাবু। গঙ্গার ড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্য দুধ নিতাম রোজ। গা খবর পাঠিয়েছে সে আর দুধ দিতে পারবে না। কারু য়ালা, কর্পূরা গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা দুধ চাই আপনার"

"আধসেরটাক হ'লেই হ'য়ে যাবে"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্ট-টারবাবুর জন্যে এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলি-টা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি '

"সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তখন যে টেলিগ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ খবর গঙ্গা একটু পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্ট-মাস্টারবাবুর দুধ পাঠাস নি কেন আজ"

গঙ্গা একটু ঝাঁজের সহিত উত্তর দিল, "ওকে আমি আর দুধ দেব না। গোয়ালাটোলার কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে' এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায় নি"

"জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টমাস্টার-বাবু এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে' গেছে"

"মিথ্যুক লোকটা। ঝক্সু বললে টেলিগ্রাম যায় নি"

ঝক্সু পোস্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোষ্টা-ফিসে থাকে, কারণ পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে করিতে হয়। সুতরাং সে যখন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি ? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে' কি আমাদেরও ছোট-লোক হ'তে হবে ?"

গঙ্গা কোনও উত্তর না দিয়া গজগজ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই শ' টাকা লাদুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে' রেখে দাও। একটু পরেই সে মাল নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এখুনি"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও বৌমাকে দিয়ে আসি"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রামচরিত্র তেওয়ারি মহাশয় আসিতেছেন। চোখোচোখি হইতেই নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার গতি-বেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে আসিয়া বলিলেন, "পিতাজি আজ কৈসে হ্যঁয়"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা"

"খুশী কি বাত হ্যয়"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালক-সমিতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসিকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্ব্বদা থাকিবে, কারণ 'বখত্ পর' কখন যে কি দরকার হয় বলা তো যায় না, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধন্যবাদ তিনি লইবেন না। কর্ত্তব্য করার জন্য আবার ধন্যবাদ কেন। কুমার বলিতে পারিত যে 'বালক-সমিতি'র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমার-বাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচকি ঘাড় কামড়া-কামড়ি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায় যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া।

কুমার ধমক দিল—"এই ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কি হচ্ছে"

ল্যাংল্যাংয়ের চক্ষু দুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হা হা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির বয়স কম, ধমক খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সত্যিই রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে না গিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, ছুঁচকিও সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিল তাহার। কুমার ছুঁচকির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজারুর মাংস খেয়ে খুব ফূর্ত্তি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচকি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আস্তে আস্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়"

"হ্যাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌছে দেয়"

"আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট কে"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতো ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হ'য়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্যে রান্না করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—"

"না, না, সে হবে না। আমি আপনার জন্যে অন্য ঘরে আলাদা করে' রামভুজকে দিয়ে রান্না করাচ্ছি। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভৎর্সনার সুরে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অসুখের বাড়িতে··"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

৪

বিরুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকান্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটি বার দুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমের ইজি-চেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বিরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেষ্ট"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু দুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখে এলাম। বলেন তো তাই কিছু কিনে আনি"

পুরসুন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি ডিম খেয়ে পেট ভরে নি বুঝি"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্যেই? গরম গরম জিলিপি খাওয়ার একটা আনন্দ আছে"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহ্যই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পৌঁছবার জন্যে মনটা ছটফট করছে"

এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়া কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কখন গাড়ি"

"শুনছি ছ'টার সময়। বাড়ি পৌঁছতে বারোটা একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

কিরণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবা-মার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বন্দেমাতরম্ টুপি বলে' একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে, রঙীণ সিল্কের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি দেখে এসে ঝোঁক ধরলে পুজোর সময় আমারও ওই টুপি চাই। কাটিহারে পুর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে"

পার্ব্বতী ঘরের একধারে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আলু-পটল তো কুটলাম। শাকগুলা শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব? গরম গরম বড়া ভেজে নিলেই হবে"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "অত হাঙ্গামা করবার দরকার কি মা এখন"

পার্ব্বতী ঝাঁজিয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে' থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও আমি বড়া করব"

পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের সুর ফুটিয়া উঠিল।

পুরসুন্দরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন একটু। কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা"

কি যে জ্বালায় মেয়েটা। পুরসুন্দরী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্ব্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে উনুন জ্বালতে দেবে না। বেকার এসব বার করছ"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফিরখানায় যাব, যেখানে পকৌড়ি ভাজছে"

পুরসুন্দরী পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্ব্বতী ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া মুসাফির-খানার দিকে গেল।

কিরণ বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"পার্ব্বতীটা তোমায় খুব জ্বালায় দেখছি"

"জ্বালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ভারী তো সংসার, তুমি আর দাদা। ছেলে মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘ-বক্‌রিও খেলে যেতো আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার? তোমার বউ কেমন হয়েছে? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো"

পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেয়েরা অতটা পারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। শৌখীন কাজকর্ম্ম অনেক জানে। লেখা পড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে পারে না, করতে চায় না যে তা নয়, কিন্তু তার শরীরেই কুলোয় না। খুব বড়লোকের মেয়ে তো; বাপের বাড়ীতে আদরে মানুষ হয়েছে। একটু বেশী খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে' ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি আমি। দিন রাত্ খালি বই নিয়ে বসে' থাকে"

কিরণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরসুন্দরীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতূহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি। কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিন রাত বসে' থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডাক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হ'ল, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার স্বাস্থ্য কেমন"

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। কলেজে যখন পড়ত তখন না কি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল সহ্য করতে পারে না মোটে। দুটি প্রাণীর জন্য গগনকে একটা ঠাকুর, দুটো চাকর, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। এছাড়া মোটরের ড্রাইভার, আর ডিস্‌পেনসারির কম্পাউণ্ডার তো আছেই"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে?"

"করবে কোত্থেকে। যত্র আয় তত্র ব্যয়। কত রোজকার করে তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ"

"আর দিগন্ত?"

"সে প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকে কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা-অন্ত প্রাণ তো"

হঠাৎ 'ফু ড় ফু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের ঠোট দুইটি বায়ু সংযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অদ্ভুত মানুষ, যেমন অসুরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে। বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেণে অসম্ভব ভীড় ছিল। আমি বসে' জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই খাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য্য ক্ষমতা"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল; তিনি যখন ঘুমাইতেছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃদুতম কণ্ঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কখনও ঘড়িতে এলার্ম দিয়া শোন না, যখন উঠিবেন মনে করেন তখনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেস্ট-অফিসার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন, বাঘ কাছাকাছি আসিবামাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেন্‌জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন! আহার এবং নিদ্রার অসুবিধার জন্য সাধারণত লোকে যে সব কষ্ট

ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি সুখী পুরুষ। কিরণের সহিত তাঁহার সম্পর্কটাও একটু অদ্ভুত গোছের। বড় ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্যজীবনকে কখনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘণ্টু ওরফে ঘনশ্যাম জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেরা কিরণের টিউব দুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে আর সন্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যখন আট কি নয় বৎসর তখনই কৃষ্ণকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সন্তানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বহুরকম বাংলা সাময়িক পত্রিকার গ্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল সংসারের কাজ করিতে হইত না। দিনকতক পরেই কিন্তু তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন ভরে না। তখন মন দিল নানা রকম রান্নায়। ইংরেজি বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম জ্যাম জেলি আচার চাটনি, বিদেশী নানা রকম অদ্ভুত রান্না করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্শেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিসের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তারিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরণের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃষ্ণকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির দ্রৌপদীই বলিয়া বসিলেন। রান্না লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশী দিন নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়া সেলাই শিখিল। তাহার পর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত্র। অন্তর-নিহিত এতটা ক্ষুধার তৃপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে ক্ষুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে। এটা কোরো না, এখন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাওয়া ভাল নয়—এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড় সুখ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল সে, এমন কি আপিসের ব্যাপারও কি করা উচিত কি অনুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহার নাম দিলেন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড় সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কসুর করিতেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাড়ির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া যাইতেন, ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই সুরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজিয়া শুনিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোখের পাতা দু'টি ঈষৎ কাঁপিয়াছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিরণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাগিয়াছেন।

"মটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোথা গেল। বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে দাদা, একটু গল্প সল্প করে, অন্যমনস্ক করে রাখ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ওগো শুনছ—"

"অ্যাঁ, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে

"কি বলছ বল"

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছদ্ম কোপ চকমক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে' পড়ে থাকবার দরকার কি। গল্প-সল্প করে' দাদাকে একটু ভুলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাঘ ভালুকের গল্প আছে"

"এখনকার বাঘ ভালুকের গল্প দু'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে কি। সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

বন্যা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখন আকাশ ভেঙে আলো
ইটের বিবর-পথে জানি না যে
এ ঘরে ছড়ালো।

অশ্রু, অন্ধকার
ছিল যে শূন্যতা—
সব মুছে নামলো আবার
একটি আলোর নম্র কথা।
বিমূঢ় স্নায়ুর
মনে দিল সুর,
—এ আলো কি এতদিন
ছিল বহুদূর?

এতকাল একটু ইসারা
সচপল আলোড়ন, সাড়া
মেলেনি কোথাও।
রিক্ত ব্যোম—শূন্যতা ছাড়াও
তখন দেখেছি শুধু কাছে
বিবর্ণ পৃথিবীখানি স্তব্ধ হয়ে আছে।

একদিন তারপর
নামলো আলোর বন্যা—মূর্ছনা-মমর
ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর 'পর।
অন্ধকার নির্জন প্রাসাদে
যেখানে বাঞ্জনাহীন দেয়ালেরা কাঁদে,
যাদের মেটেনি কোনো সাধ,
সেখানে আলোর ঢেউ অজস্র অগাধ
রাশি রাশি ছড়ালো কি অন্তহীন স্বাদ?
নিয়ে এলো শব্দ, ধ্বনি, প্রাণ
কলুষবিমুক্ত পরিত্রাণ।

যে-মন শুধুই পেলো অশ্রু, অন্ধকার
তারই তরে জ্বেলে দিলে প্রেম কি আবার?

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

দিল্লী-বোম্বাই-আগ্রা অজন্তা যায় মানুষ, ভ্রমণকারীর দল' বেডিং হোল্ডঅল, এট্যাচি-কেস ক্যামেরা নিয়ে। পরনে পোষাক আসাক কেতাদুরস্ত; বাহন হয় বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম অবদান ট্রেন মটরকার কিংবা রূপোর চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্মেছেন তাঁদের জন্য এরোপ্লেন। স্থান জোটে হোটেলে—সাধারণদের জন্য আছে ধর্মশালা না হয় কোন বন্ধুবান্ধবের আস্তানা। সঙ্গীর অভাব নাই, পথে ঘাটে হাটে বাজারে ইংরেজী, বাংলা হিন্দী-উর্দু র চল। প্রাণ ভরে কথা কও—রাজনীতির আলাপ আলোচনা কর। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ঈশ্বরদাস বল্লভদাসের, না হয় কেলনারের বেয়ারা তৈরী আছে, আছে কনডাক্টার গার্ড, প্রয়োজন হয় খানা তুলে দেবে গাড়ীতে, পরের ষ্টপেজে এসে বাসনপত্র নামিয়ে নিয়ে যাবে, বিল-দিয়ে দাম মিটিয়ে যদি কিছু টিপস মেলে লম্বা একটা সেলামও জানাবে। সময় কাটছে না? মেইল ষ্টপেজ ষ্টেশনে আছে হুইলারের বুক ষ্টল পেঙ্গুইন পেলিকান, ক্রাইমক্লাব-ডায়কো সিরিজ আছে—আছে ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন, আর্গসী থেকে সুরু করে বাংলা-হিন্দী-উর্দু বইও মিলবে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য খবরের কাগজ ত সহযাত্রীই হয়ে উঠেছে।

দর্শনীয় স্থানে পৌছবার আগেই টাঙ্গা কিংবা ট্যাক্সী চড়াও করবে গাইডের দল—ইংরেজীতে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে বসবে—স্যার যদুনাথ সরকারের গাইডও ছিলাম। যেন তাঁর সাহায্য না হলে যদুনাথবাবুর ইতিহাস রচনা অনেকখানি বাকী থেকে যেতো। এতবড় এলেমদার লোক—ময়লা আধছেঁড়া স্যুট পরে যখন সামনে এসে দাঁড়াবে তাকে গাইডের পদে বরণ কর। না করলে বেশ বোঝা যাবে যে টুরিষ্ট অতি হেঁজি পেঁজি একজন লোক। কোন সঠিক তথ্য জানবার প্রয়োজন এর নাই। এতবড় সত্য কথাটা অস্বীকার করতে চায় না—বাধ্য হয়েই স্যার যদুনাথের ভূতপূর্ব অপরিচিত গাইডকেই সঙ্গী করতে হবে।

এককথায় টুরিষ্টের করণীয় কর্তব্য কিছুই নাই, কোন দৈহিক মানসিক কষ্ট উৎকণ্ঠা কোথাও পোয়াতে হবে না, তবে একটা কায তাকে ঠিকমত করতে হবে সেটা হচ্ছে রুধির যোগান। অর্থাৎ ট্যাক থেকে টাকাটা বার করতে পারলেই—ব্যস! সব হয়ে যাবে।

এমন সুযোগ জীবনে আসেনি, একথাটা বলা মিথ্যা হবে। এসেছিল গ্রহণও করেছিলাম। যদি কোথাও দুঃখ কষ্টও পেয়েছি—কিন্তু গন্তব্য-স্থলে পৌছে মন্দিরের কারুকার্য্য দেখে—পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে মন সান্ত্বনা পেয়েছিল। যাত্রী পথশ্রম সহ্যকরে যায় দুর্গমতীর্থে, তীর্থদেবতার পায়ের কাছে পৌছে তার সবকষ্ট সবদুঃখ পরিণত হয় অনাবিল আনন্দে। সে পথের একটা লক্ষ্য আছে—উদ্দেশ্য আছে—কামনা আছে। তাই মানুষসহ্য করে এতকষ্ট এত বিপদ। কিন্তু যে দুর্গম দুঃখময় পথের শেষে নাই কোন তীর্থ-দেবতার পাষাণমূর্তি, নাই কোনও তীর্থের সুফল লাভের বিন্দুমাত্র আশা সেই দুর্গম রাজ্যে মানুষ তবুও যায়। সে জানে দুঃখের তমসার পারে আলোর কোন নিশানা নাই; মনষ্কামনা পূর্ণ হবার কোন আশা সেখানে দুরাশা। জীবনও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য সেখানে একটি মাত্র মুহূর্ত—তবুও সে যায়।

ভাসমান 'বিহারীখাল চেকপোষ্ট' এর অনতিদূরে পাকিস্তান ও রায়মঙ্গল নদী

এমনি যাত্রার সঙ্গী হয়ে সেদিন মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—কেন এলাম? কি মিলবে সুফল? কি ধর্মের প্রসাদ আমার নিঃস্ব অন্তরকে দেবসুষমায় ভরিয়ে দেবে? কিন্তু উত্তর মেলে নি।

বহুদূর পথ সে নয়, কিন্তু দুর্গম দুস্তর। এককথাতেই রাজী হয়ে পড়লাম সুন্দরবন যেতে। কয়েকদিনের মধ্যে দুটি বন্ধুও দলে ভিড়লেন। একজন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অন্যজন ডাঃ ঘোষ হাজরা। দেবু তুলি-কালি ইজেল নিয়ে যাবে, আমি নিলাম কিছু বই, কাগজ আর কালিকলম। শীতের সময়, বাধ্য হয়েই বিছানাপত্র কাপড়-

চোপড় এটা সেটাতে বোঝাই হয়ে উঠলো হোল্ডঅল ; ক্যামেরাও চলল সঙ্গে।

সুন্দরবনে একা যাওয়া অসম্ভব। হুটকরে হাওড়া গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলাম—নামবো যেখানে হোক, তারপর আছে টাঙ্গা না হয় ট্যাক্সি আর হোটেল। সুন্দরবন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বাইরে। সেখানে আজও রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে আদিম বন্যরীতি, বাঁচবার জন্য সেখানে প্রতি পদে পদে সংগ্রাম করতে হয়। বড়দার ভরসা এবং আশ্রয় না পেলে কল্পনাতেই আসতো না এই দুর্গম জলে জঙ্গলে যাবার।

বহুদিনের কাঠের কারবার। সুন্দরবন থেকে কাট আমদানী করেন এখানে। ছোট বড় হাজারমণি দেড়হাজারমণি নৌকা, ডিঙ্গি মিলিয়ে প্রায় থান পনের বোল আছে তাঁর। বনের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন কাঠুরে মাঝি কায করে তাঁর কারবারে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে সুন্দরবন আবাদ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে নদীপথ বনের অন্দিসন্ধি চিনেছেন, চিনেছেন গাং-এর জলে স্রোতের চিহ্ন। ঈশান নৈঋ‌‌র্ত কোণে কালোমেঘের বুকে অদৃশ্য আখরে লেখা ঝড়ের পূর্বাভাষ। কান পেতে বহুরাত্রে শুনেছেন শুষ্কবনমর্মরে বিকৃত অতীতের বুকথেকে জেগে ওঠা অধুনালুপ্ত সভ্যতার হাহাকার। শুনেছেন ঝরা পাতায় নিঃশব্দে পা ফেলে শ্বাপদের আনা-গোনা। চোখের সামনে দেখেছেন বাঘের মুখে মৃত বাওয়ালির রক্তলেখা।

—ঠিক বুঝে দেখ, জায়গা ভাল নয়। সবরকম বিপদ আপদই আছে।

—থাক, যাবো যখন ঠিক করেছি, যাবোই।

গোসাবা নদীর উপর ইলিস মাছ ধরার নৌকাবহর

—'বেশ, 'তাহলে দেবু আর ডাক্তারকে তৈরী হতে বলো। জিনিষপত্র যা নিজের প্রয়োজন তাই নেবে। খাবার-দাবার আয়োজন সব আছে।

কর্মব্যস্ত ডাক্তারবন্ধু বেপরোয়া হয়ে কাযকর্ম ফেলে রেখে ক'দিনের জন্য বেরুবার জন্য তৈরী হয়েছে। দেবু দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলে —"এক একদিনে বেশ কিছু ছবি হবে। হলদে রং বেশী করে নোব। ওখানের রোদের টেক্সচারে হলুদ আভা বেশী।

দেবুকে আমরা বলি ভিনসেন্ট ফ্যান গক্ অব বেঙ্গল। সূর্য্যলোক আর হলুদের রং এর উপর চোখ বেশী। ক্যানভ্যাসের উপর চড়া রং চড়ানো ওর একটা নেশা—কথার উপর হাসির ফোড়নের মত।

আমি তৈরী। একটা ব্যাগের মধ্যেই আমার সব পোরা হয়ে যাবে। ব্যস বেরিয়ে পড়বো। ওই ঝুলি নিয়ে অজন্তা-বাগ গুহাই ঘুরে এলাম। সুন্দরবন তো ঘরের দরজায়। ঠিক আছে কাল বেলা দশটায় তুলে নিবি, আমি তৈরী থাকবো।

কেউ কেউ বলে—'কোথায় যাচ্ছো, অকূল অতল গাং, কেবল আর জল, কুমীর বাঘের আস্তানা। খাবার জলটুকু পর্যন্ত সঙ্গে থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। নদীতে ঝাঁক বেঁধে বেড়ায় কামটের দ একবার পেলে হয়। পথে পথে ডাকাতের দল ঘুরে-বেড়াচ্ছে। ওখানে কি মানুষ যায় কখনও ? ও বাওয়ালিদেরই পোষায় বাঘের সঙ্গে বাস করা।

মনের একটা দিক ভয় যে না পায় তা নয়। অন্তর থেকে চুপি বলে—কি হবে ওখানে গিয়ে, তার চেয়ে বিন্ধ্যাচলে কোণারকে এসো। আর একবার না হয় চলে যাও এলাহাবাদ, বন্ধুবান্ধব আ খাবে আর যমুনার চরে বসে আড্ডা মারবে।

অন্তমন গোঁ ধরে, না যেতেই হবে, আর পিছান যায় না। তাই সঙ্গী হিসেবে থাকবে ডাক্তার ঘোষ হাজরা, দেবু। তদারক করবার তো বড়দা আছেন। সবই জিম্মাদারী তার। ভাবনা কি ! মানু মনের অতলে বেপরোয়া মন সংসারের সব বাধা-বন্ধন ছিঁড়ে এমনি এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দেয় ; অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিন সাহস যোগায়।

এরই পরীক্ষা বোধ হয় সুরু হোল। যাবার আগের দিনে ডা বন্ধু হঠাৎ জানালো—তার হাতে কয়েকটা রুগীর বাড়াবাড়ি চলছে, অবস্থায় তাদিকে ফেলে বাইরে যাওয়া—তার ডাক্তারীশাস্ত্রের নিষেধ।

একটু স্তম্ভিত হয়ে যাই, বেছে বেছে রুগীদের কি এই স অঘটন ঘটানোর বিশেষ দরকার পড়লো ! ভাবি হয়তো এ ভাগ্যে ইঙ্গিত। বন্ধুবর নিশ্চিত কোন বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন দৈ কৃপায়, আর আমি চললাম অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে, কে জানে আ

জন্য অপেক্ষা করছে কোন অজানা জলজঙ্গলের বুকে কি পরমতম দুঃসহ ভোগা ! যা থাকে অদৃষ্টে—দেবু এখন ভরসা, সে থাকলেও তবু সাহস পাবো।

দেবু পরম নিশ্চিন্তকণ্ঠে অভয় দেয়—'আমার জন্য ভাবনা নাই, আমি তরী।"

দাঁড়ালাম আমি আর দেবু। কাল সকাল দশটায় আমরা বড়দার বাড়ী গিয়ে হাজির হবো মালপত্র নিয়ে, সেখান থেকে হবে যাত্রাসুরু।

কয়েকটা জিনিষপত্র কিনে বাড়ী ফিরলাম, সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষের তালিকায় টপ প্রায় রটি রইল কয়েকটা ওষুধের, আর কয়েক টিন সিগারেট।

বড়দার ওখানে যাবার পথে দেবুকে তুলে নেবার জন্য ট্যাক্সি থামিয়ে ওর বাড়িতে উঠে গেলাম। দেবু এখন এই তিন সপ্তাহের নিবিড় সঙ্গী। ওর হাসির ঠা ঠা শব্দ আমার একান্ত নিঃশব্দতাকে ভরিয়ে তুলবে, নৌকার ছইএর ছাদে বসে কাটবে কতদিন কত সন্ধ্যা, কত অজানা বনের পাশ দিয়ে একই দৃশ্য দুজনে ভাগাভাগি করে দেখবো।
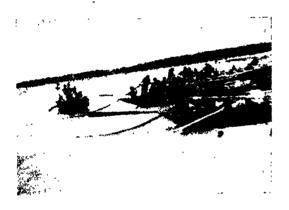
ঘেরা জালে বন্দী মাছের ঝাঁক

কড়া নাড়াতে বার হয়ে এলো দেবুর বোন। দশটা বাজতে দেরী নেই, আমাদের জন্য বড়দা অপেক্ষা করছেন।

"তৈরী হয়েছিস দেবু। বার হয়ে আয়।" উত্তর দেয় ওর বোনই—দাতো বাড়ীতে নাই। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মর্নিং শোতে সিনেমা গতে গেছে। কখন ফিরবে বলে যায় নি।"

থমকে দাঁড়ালাম। আস্কারা দিয়ে বন্ধুবর এমন নিদারুণ মস্করা করবে ভাবতেই পারি নি, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কথা দিয়েছে—আজ সকালেই সে বেপাত্তা। মন দমে উঠলো।

ডাক্তার বন্ধু থেকে গেল, দেবুও বেঁচে গেল। বোধ হয় আমাকে এ বার এমনি করে সাবধান করে দিচ্ছে নিয়তি, তবু দুর্দাম বেপরোয়া আমি না জেনে, না বুঝে বিপদের মুখে ছুটে চলেছি।

বাড়ী ফিরে যাবো কিনা ভাবছি।

কিন্তু কেযেন অন্তর থেকে সাড়া দেয়—এত ভীরু, এতবড় কাপুরুষ তুই। প্রাণের এত ভয়। নিজের জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও সম্পদ অর্জন করতে গেলে তার মূল্য দিতে হয়।

নেমে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। বেলেঘাটার রোজকার হাটাপথ, সেই সরকার বাজারের ফলওয়ালা মুদি, পান সিগারেটের দোকানদার-আলোছায়া সিনেমা হল, লোকজন সবাই যেন আজ কত আপন, পরিচিত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য বন্ধনে আমি যেন ওদের সঙ্গে বাঁধা। সেই সব বাধা ছাড়িয়ে আমি চলেছি আজ, পিছনে পড়ে রইল বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়স্বজন।

বড়দা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন—ওরা আসবে না তা আমি অনুমান করেছি। অনেকেই অনেকবার বলেছে আমাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ বড় একটা এগোয়নি। তুমি একাই এসেছো।

জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে আমরা বার হলাম। শ্যামবাজারের খালধার থেকে ৭৯ সি বাসে করে যেতে হবে হাসনাবাদ। সেখান থেকে লঞ্চে করে আমরা আবাদের ভিতরে এগিয়ে যাবো রামপুর ফরেষ্ট অপিসে, সেই খান থেকে হবে আসল যাত্রাসুরু।

পিছনে পড়ে রইলো পরিচিত সহর, সি-আই-টির নোতুন রাস্তা দিয়ে ছুটলো আমাদের গাড়ী শ্যামবাজারের দিকে।

—"ভয় করছে নাকি !"

জবাব দিই না। ভয় নয়, একা বড় নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে আজ।

ইতিহাসে পাই মারাঠা আক্রমণের সময় কলকাতার উত্তর এবং পূর্বদিকে বিস্তৃত গড়খাই খোঁড়া হয়েছিল, সেই গড়খাই সেদিন কলকাতা রক্ষায় সাহায্য করেছিল—তারপর অকেজো হয়েই পড়ে ছিল, ধীরে ধীরে নদীর পলিমাখা জলের বুক থেকে থিতিয়ে পড়া পলিমাটি ভরিয়ে তুলছিল এর বুক। অতীতের বিপদের দিনে কাজ করেই এর প্রয়োজন শেষ হয়েছিল।

কিন্তু তাহোল না, ধীরে কলকাতার ধারে পাশের অঞ্চলে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বাসভূমি গড়ে উঠল। এই খালই ক্রমশঃ ধমনীর মত এই নবগঠিত অঞ্চলকে প্রাণবন্ত-সজীব করে তুলেছিল। বেলেঘাটা—আশেপাশে চাউলপটি, বেতপটি, চুনাপটি, ছাতাপটি, উল্টাডাঙ্গা—ওপাশে বেঙ্গল কেমিক্যালের খাল; এই খালদিয়েই বয়ে আসতে সুরু হোল আবাদ অঞ্চল থেকে ধান, চাল, বিচালী-বোঝাই বিশাল নৌকা, সুন্দরবন থেকে গরাণ, সুন্দরী, পসুর, গে'ও কাঠের স্তূপ, পূর্ববঙ্গ আসাম থেকে তলদা, মুলীবাঁশ, বেত প্রভৃতি বাংলার বনজশিল্প সম্ভার আমদানীর বিস্তৃত আবাদ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল এই খাল দিয়েই। সেদিন যানবাহনের ব্যবস্থা এত উন্নততর হয়নি, মোটর বোট, লঞ্চ, ট্রাক বা লরী দিয়ে মাল আনানেওয়ার কথা স্বপ্নের মতই ছিল, তাই নৌকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। খালে জমতো হাজারমণি, দেড়হাজার, দু'হাজারমণি নৌকার ভিড়।

আজ অবশ্য সে রূপ বদলে গেছে; তবু ও যাই যাই করে এখনও সওদাগরের যুগে গলুইতোলা বেদনাই নৌকা, পিতলের চৌখুপি বসানো আড়াই হাজারমণি চৌধুরি নৌকাও এখন দেখা যায় খালে। অবশ্য এবার

তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নাকি বেলেঘাটার খাল বুজিয়ে দিয়ে রাস্তা করবার মনস্থ করেছেন। জলপথের অতীত দিনের বিস্মৃত অধ্যায়ের একটি জীর্ণপত্র কলকাতার মন থেকে মুছে যাবে, সেখানে ঠাঁই নেবে এ্যাসফাল্টের রাস্তা—আর গতিবেগের উন্মাদ নোতুন বুইক, শেভ্রলের দল! বাওয়ালিদের কাঠবোঝাই নৌকার মাস্তুলে দড়ি দিয়ে ঝোলান শুকনো ইলিশ—তেড়ে মাছের গন্ধের বদলে বাতাস ভরিয়ে তুলবে পেট্রল, ডিজেলের গন্ধ, দুনিয়া এগিয়ে চলেছে-জোরে।

খালের ধারে শ্যামবাজারের মোড়ে এসে থামলো আমাদের গাড়ী; খালি দেখে একখানা বাসে মালপত্র তুলে বসবার ব্যবস্থা করেছি। প্রায় পয়তাল্লিশ মাইল দূরে হাসনাবাদ, এই পথটা বাসেই যাবার ঠিক-করেছি দুজনে। দেখতে দেখতে বাস বোঝাই হয়ে উঠলো;

এতক্ষণে মনে হয়—হ্যাঁ, কলকাতা ছেড়েই চলেছি এইবার। দুপুরের ম্লানরোদ লুঠিয়ে পড়েছে গাছের মাথায়, দূরে মিলিয়ে গেল টালার ট্যাঙ্ক, ব্রডকাষ্টিং মাষ্টগুলো; কলকাতার চিহ্ন ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছে।

সহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে, বারাসতের একটু আগে বার হয়ে গেল কৃষ্ণনগর রোড, দুপাশে আম, জামরুল, অশত্থ বটের জটলা; বারাসত ছাড়িয়ে গাছের ভিড় কমে এলো। দেখা গেল ফাঁকা মাঠ। ধান উঠে গেছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্য্যন্ত চোখ চলে যায়! মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, তাকে কেন্দ্র করেই বাগানের ভিড়। রাস্তার পাশ দিয়ে চলেছে মরচে-পড়া পরিত্যক্ত লাইট রেলওয়ে লাইনটা; ওর বুকের উপর দিয়ে লোহার বাজনা বাজিয়ে ছন্দতুলে যায় না আর কোন গাড়ী; মৃতের কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝে দু'একটা ষ্টেশনঘর; যাত্রীর কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘোমটা ঢাকা সলাজ চাহনিতে নববধূ কত নীরব চাহনি ফেলে ওখান থেকে দেখে নিয়েছে তার ফেলে যাওয়া পিতৃ-গৃহকে, কত প্রিয়জনকে কেউ জানিয়ে গেছে শেষ বিদায়! সব কিছু আজ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

অনেক আলাপ আলোচনা, লেখালেখি, সভাসমিতি হয়ে গেছে ওই লাইনকে সজীব করবার জন্য, কিন্তু হিমালয়ের ঘুম আর ভাঙ্গেনি। সীমান্ত পর্য্যন্ত কোন রেলপথের যোগাযোগই রইল না, টিম টিম করে বেঁচে আছে ওই চব্বিশফুট একফালি রাস্তা, যে কোনমুহূর্তে তার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সে ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানে এই অঞ্চলের জনসাধারণের দুর্গতি দেখলাম। বাসের ভাঙ্গা হাতল ধরে। কসরৎ কারসাজি করে যাতায়াত করতে কলকাতার অফিসবাবুদিকেও হ মানিয়েছে। কনডাকটার বলে—বাবু খেজুর তালগাছে চড়া মানুষ, যে করে হোক ঠিক যাবার ব্যবস্থা করে নেবে।

নিয়েছে—নিতে বাধ্য হয়েছে।

পথে পড়ে ধান্যকুড়িয়া সরকারী নারী কল্যাণ বিভাগের একটি আশ্রম বিরাট বাগানের ভিতর স্থানীয় জমিদারদের ম্যানর হাউস্ প্যাটানে তিনতলা বাড়ী। এমন বাড়ী সচরাচর বাংলাদেশে একটা চোখে পড়ে না ফটকেও সেই চূড়াওয়ালা বিলেতী ক্যাসলের ছাপ, সারাবাড়ীখানাতে ফু উঠেছে মধ্যযুগের ইংরেজ সামন্ততন্ত্রের মদমত্ত গঠনপ্রভাব, গথি প্যাটার্নের চূড়োগুলো আকাশে মাথা তুলে রয়েছে, বাংলার সবুজ শ্যাম পরিবেশের মধ্যে এখনও বহন করে রয়েছে আমাদের পরাধীন সত্তার ছাপ বড্ড বেমানান ঠেকে চোখে। শুনলাম সায়লেণ্ট ছবির যুগে দুর্গেশনন্দিনী শুটিং হয়েছিল ওই বাড়ীতে।

বঙ্গোপসাগরে সূর্য্যাস্ত—কেদো আইল্যাণ্ড

বসিরহাটে পথটা দুদিকে চলে গেছে, একটা গেছে টাকী, অন্যটি গেছে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত। আমাদের বাস এগিয়ে চললো হাসনাবাদের দিকে। দুপাশে শুরু হল জলা, মধ্যে জেগে রয়েছে ওই চব্বিশ ফুট রাস্তা, মৃতরেললাইনটা যেদিন সজীব ছিল হাসনাবাদ গড়ে উঠেছিল ওকেই কেন্দ্র করে। আজও হাসনাবাদের মধ্যে পড়ে আছে সে পঙ্গু হয়ে, বাস ষ্টাণ্ড হয়েছে সহরের বাইরে বেশ একটু দূরে, কলাগাছিয়া নদীর উপরে। সেইখানেই বসেছে ছোটবড় দোকান পসার, লোকজনের সমাগম সেই খানেই বেশী। হাসনাবাদ গ্রামের সঙ্গে যাত্রীদের আর বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। থাকবেই বা কেন?

আশা যাওয়ার পথে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়—আলাপ হবে, দুদণ্ড কথাবার্তা—চেনাজানা হবে, পথ যেতে তুমি যদি দূরেই রইলে কোন

[সং]বাদে জমবে সেই আলাপ ! আমি তো যাত্রী, পথ উজিয়ে তোমার সঙ্গে [ক]থা কইতে যাবার সময় সুযোগ কোথায় ?

স্থলপথ ছেড়ে জলপথে যাত্রার এই হোল সুরু ।

রাঢ় দেশের লোক আমি। লাল শক্ত পাথুরে মাটিতে শাল বনের [সী]মানায় আমার গ্রাম। রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির টান ; অল[ক্ষুণে] লোনা গাংএর গহিন পানিকে দূর থেকেই নমস্কার করি ; কিন্তু এবার [আ]র দূর থেকে নয়—চোখের সামনেই সেই লোনা গাংএর পলিগোলা [ক]াদামাখা কালো খরস্রোতা জল—তারই বুকে ভেসে রয়েছে লঞ্চখানা : [জো]য়ারের টানে অল্প অল্প দুলছে। নীচের খোলে জমেছে যাত্রীর ভিড়, [ছা]দে বোঝাই হয়েছে ধান, মহাজনের চটের বস্তার স্তুপ, মাছের শূন্য [ঝু]ড়ি, খালি টিন।

বাস থামতেই কয়েকটা ছোট ছেলে এসে হাজির। মাথায় ময়লা [গা]মছা গুলো বিড়ে করে পাক দিচ্ছে ; আমাদের মালপত্র দেখে হাঁকে —চার আনা করে দেবেন বাবু 'তিনজনের' বারো আনা।'

হাওড়া ষ্টেশনের তকমা আঁটা কুলিদিকেও হার মানিয়েছে দরদস্তুরীতে, —ওর কমে হবেনা বাবু এতো মাল।'

—নিজেরাই নিয়ে যাবো তাহলে।

তাড়া ছড়ো কিছু নাই, বড়দার দেখাদেখি হোল্ডঅলটা আমিও [তু]ললাম, অমনি দর নামলো চার আনা থেকে চার পয়সায়, এরপর আর [ক]থা চলেনা। মালপত্র ওদের হেপাজতে ছেড়ে না দিলে নেহাৎ বেমানান দেখায়।

মালপত্র নিয়ে গিয়ে সটান ওরা হাজির করলো লঞ্চের উপরে—[সা]রেংএর ঘরের মধ্যে।

কেদো দ্বীপে একখানি নৌকাতে গেঁওকাঠের খণ্ড বোঝাই করা হচ্ছে

শাখা গিয়ে মিশেছে আরও দক্ষিণে রায়মঙ্গলের সঙ্গে বাঘনা ফরেষ্ট অপিসের কাছে। ওর ওপাশ থেকেই শেষ হয়েছে লোকালয়। সুরু হয়েছে জনবসতিহীন শ্বাপদশঙ্কুল সুন্দরবনের সীমানা।

সেখানে পরে আসবো।

বৈকাল হয়ে গেছে ; কালো পলির উপর সোনালী আলো ঝিকমিক করছে—মাঝে মাঝে দূর গাঙ্গে ভেসে যায় ; দু'একটা সওয়ারী বোঝাই নৌকা,......আমাদের লঞ্চ ছাড়লো।

ভট ভট শব্দ করে চলেছে লঞ্চ তীরভূমি ছাড়িয়ে, পিছনে পড়ে রইলো হাসনাবাদ, শ্যামবাজার গামী বাসগুলো, দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী কনডাকটার, ওরা এখুনিই ফিরে যাবে আবার কলকাতায়, সেখানে জ্বলবে তখন বিজলীর আলো, কর্মব্যস্ত মহানগরের পথে জনতার ভীড়, আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে গায়ের কাপড়মুড়ি দিয়ে জোর আড্ডা দিচ্ছে কেউ কেউ। সেই জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি ভাসলাম অকূলে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পশ্চিম আকাশের বুক থেকে। গাংএর দুপাশে লম্বা ভেড়ি, লোনা জলের হাত থেকে বিলের ধানক্ষেত বাঁচাবার একমাত্র আশ্রয়। মাঝে মাঝে নির্জন নদীতীরে দেখা যায় দু' একটা খড়ো চালের নীচু ঘর, বুনোদের গ্রাম। চাষ বাস করে আর সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে এমনি নিরালায় ঘর বেঁধে দিন গুজরাণ করে, অসীম নির্জনতা ওদিকে করে তুলেছে সমাজ বিমুখ, দল বেঁধে থাকার পক্ষপাতী ওরা নয়।

আকাশের বুকে উড়ে চলেছে গাংচিলের ঝাঁক। পশ্চিম আকাশ আবীরের রংএ লাল হয়ে গেছে। নদীর ধারে—দুপাশে কোথাও গাছ পালার চিহ্নমাত্র নাই, ক্বচিৎ চোখে পড়ে লোনাগাংএর ধারে গজিয়ে উঠেছে কেওড়া-বান গাছের দু একটা চারা, তাছাড়া সবুজের নিশানা আর কোথাও নাই ; খাঁ খাঁ করছে অসীম নিঃস্বতা। এ মাটিতে গাছ হয় না ; মানুষের বাসভূমি এ নয়, মানুষ জোর করে আবাদ করেছে, দখল নিয়েছে। ক্রুদ্ধা প্রকৃতিও তাই পূর্ণতার ভরে দেয় নি এই মৃত্তিকার বুক —মুখ বুজে মানুষের বন্ধন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই সে কৃপণ। বহুকষ্টে—বন্যা তুফানের হাত বাঁচিয়ে মানুষ কেবল একটি মাত্র ফসলই চাষ করে—সে কেবলমাত্র ধান। তাও বহু বিপদ তার।

এ ঘাটে ওঘাটে লঞ্চ থামছে। ঘাট বলতে যা বোঝায় তার চিহ্ন কিছুই নাই, গ্রাম অর্থাৎ দু'চার ঘর লোকের বাস দূরে ছড়িয়ে

কাদা থেকে বহুকষ্টে পরিত্রাণ পেয়ে হৃষ্ট মনে এগিয়ে চললো ভেঁড়ির দিকে। ওর ওপারে দূরে কোথায় আছে তার ঘর।

লঞ্চও চলছে আবার নদীর জলে তুফান জাগিয়ে।

পরিবর্তনটা চোখে পড়ল রাণীনগরের ঘাটে বসে। এই অঞ্চলের মধ্যে রাণীনগরই বেশ সমৃদ্ধিশালী জায়গা, হাটখোলা বেশ জমজমাট. তীর থেকে যাত্রীদের লঞ্চে আশা যাওয়া করবার জন্য কাঠের প্লাটফরমও রয়েছে,...ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দোকানে জ্বলছে একটা পেট্রো-মাক্স ; ব্যাটারি সেট রেডিও থেকে ভেসে আসে গানের সুর।

বড় ভালো লাগে ; মনে পড়ে যায় পিছনে-ফেলে-আসা মহানগরী, নিজেকে তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে জেনে গিয়েছিলাম এতদিন ; আজ মনে হয় ভুল। এতবড় ভুলটা করে এসেছি এতদিন ধরে মহাআনন্দে।

নদী যতো দক্ষিণে চলেছে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে চলেছে ওর বুক। রাণীনগর ছেড়ে চললো লঞ্চ ধামাখালি, তুষখালি, সন্দেশখালি, মোল্লাখালি—পর্য্যন্ত তার যাত্রা পথ।

খালি কথাটার উৎপত্তি হয়েছে 'খাল' থেকে : খালের ধারে কোন গ্রাম বা দু'চার ঘরবসতি, তাই নিয়েই ওই নামপত্তন হয়েছে। ওসব বসতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না, থাকবেই বা কোথা থেকে, ওদের জন্মপত্রিকা খোঁজ করলে দেখা যাবে সবে আবাদ সুরু হয়েছে ওসব জায়গায়, কারুর বয়স পঞ্চাশ—কারুর একশো ; কারুর বা দেড়শ। ইতিহাসের মাপকাঠিতে বলা যায়—অন্নপ্রাশনের বয়সী।

ইতিহাসের কথা থাক। অন্ধকার হয়ে এলো। লঞ্চের উপর বসে চেয়ে থাকি বাইরের দিকে ; নদীর প্রশস্ত বুক থেকে উঠেছে অল্প অল্প কুয়াসার জাল—দিগন্ত সীমা স্পষ্ট মালুম হয় না, ক্রমনিম্ন আকাশ আর নদীর জলধারা এক হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে ; দু'একটা তারার প্রতি-বিম্ব পড়েছে থির নিথর জলরাশির বুকে। আকাশে ফুটেছে তারার মেলা—নদীর জলেও তার আলোক স্পর্শ, আকাশ জলধারা সব যেন এক হয়ে গেছে। তারই বুক চিরে এগিয়ে চলেছে আমাদের লঞ্চ। জলপথে নয়—অসীম আকাশের বুকে মিলিয়ে গেছি আমরা কোন নিরুদ্দেশের পথে যেন।

—ওপারে সন্দেশখালি তার আড়পাড় ভাঙ্গাতুষখালি, এইখানেই আপাততঃ আমাদের যাত্রা শেষ। ঘাট নাই—জোয়ারের জল উঁচু ভেঁড়ির গায়ে এসে লেগেছে, আমাদের ভাগ্য নেহাৎ সুপ্রসন্ন তাই ভাঁটির সময় একহাঁটু কাদাতে না নেমে, জোয়ারের বেলায় শুকনো ভেঁড়িতেই নামলাম, সারেঙ্গ দেখি ভদ্রতা করে খালাসি দিকে হাঁক ডাক করে লঞ্চ থেকে ডাঙ্গায় নামবার জন্য তক্তাখানা পেতে দিল। লোকজন হাজির ছিল ঘাটেই, মালপত্র সমেত আমাদের নামিয়ে দিয়ে, লঞ্চ চলে গেল আরও দক্ষিণে মোল্লাখালির হাটখোলার দিকে। ক্রমশঃ

ভগ্ন-ঘাটে কে ডাকে আষাঢ়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বর্ষা নামে, চমকে বিজলী,
সুরু হোলো মেঘের শৃঙ্গার।
পথে পথে তরঙ্গ উছলি
ধরণীর ভরিছে ভৃঙ্গার।
নীলাকাশে কাগজের তুলি
টেনে টেনে চলে কোন্ জন ?
অভিসারে আবরণ খুলি
কার যেন পুলকিত মন!
উন্মাদিনী অরণ্য বীথিকা
নৃত্যে গানে কেকা-দাদুরীর।
নদীতটে বিরহ-গীতিকা
শুনি কার ?—বহে আঁখিনীর।

বর্ষা মোর জীবনের সাথে
বারে বারে গেল কথা ক'য়ে।
অশ্রু কত নিদ্‌হারা রাতে
বাদলের সনে গেল ব'য়ে!

বাঁধ ভেঙে বন্যা এলো প্রাণে,
যৌবনের উর্ম্মিফণা তুলে ;
সে যে শত রূপসীর পানে—
ছুটেছিল আপনারে ভুলে।
কত আয়ু পর্ণ হোলো লীন,
কালস্রোতে ওঠে হাহাকার।
আজি আর নাহি সেই দিন,
তুমি শুধু শেষ স্মৃতি তার।

সুদূরের লয়ে পণ্যতরী
ভগ্নঘাটে কে ডাকে আষাঢ়ে!
এসংসারে স্বপন-সুন্দরী
খেলা করে আলোকে আঁধারে।
তারি সাথে বরিষণ ক্ষণে
প্রণয়ের জাল বুনে বুনে,
কে গো রাতে চলে নিরজনে,
বরষার বাণী শুনে শুনে!

কথা মোর হারায়েছে আজ,
ফুল-ঝরা রজনীর মাঝে।
সারা হোলো দিবসের কাজ,
সাড়া কেন দাওনাক লাজে!

ঢেউগুলি তব পানে চেয়ে
রাতে কেন করে রসিকতা!
কুটীরের বাতায়ন ছেয়ে
আলো করে আছ কল্পলতা।
মালা দোলে মনের মরমে,
তন্দ্রা-লেখা ক্লান্ত আঁখি 'পরে।
তবু তুমি আনত সরমে!
কাছে এসো, বর্ষা বারি ঝরে।
দুজনায় হৃদয়ের দোল
দেবো সুখে পাতার কুটীরে।
পেয়েছ কি প্রেমের হিল্লোল!
প্রাণপাখী গান গাহে নীড়ে।

তাসের বাজী

লেখক : ওয়াল্টার ডে-লা-মেয়ার

অনুবাদিকা ঃ মণিকা সিংহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আজ মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে কাঠকয়লাওয়ালা মনে করল সেই দিনটিকে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। মনে পড়ল ওর পিটার ওকে বলেছিল—ও যা চাইবে তাই দেওয়া হবে ওকে। মূর্খ সে, নির্বোধ একটা। হাজার চিন্তা করেও তার মাথায় কিছু এল না। হাঁদার মত চেয়ে বসল কি? না তাস খেলায় জয়। হায় ঈশ্বর, এ দিয়ে পৃথিবীর কতটুকু উপকার-ই সে করেছে বা করতে পারে? ভাবতে গিয়ে ভারী কষ্ট হল ওর।

দিনরাত এই ভেবে ভেবে ওর মুখের চারপাশে কোঁচ্ পড়ে গেল। চোখ দুটো গিয়ে ঢুক্‌ল কোটরে। একদিন ও নিজেকে সম্বোধন করে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে ছিল পিটার, আর ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। তখন তুমি যা ইচ্ছে করতে, তাই পেতে। কি চাইলে তুমি? পৃথিবীতে এত জিনিষ থাকতে তোমার মত গঙ্গারামের মাথায় তাসের কথা ছাড়া কিছু আর এলই না। আবার তাই যদি পেলে তবে তাতে তোমার কি হল শুনি? কারও একছিটে উপকার করতে পেরেছ তা দিয়ে?

আর কিছু ভাব্‌তে পারে না ও। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর একটা অজানা পথ ধরে বন পার হয়ে নেমে আসে নীচে উপত্যকায়। একটা সহর সামনেই। তাতে ঢুক্‌তেই ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক চৌকীদারের। তাকে ও শুধোয় 'ভাই, এই সহরে কোন বদলোকের মরবার অবস্থা হয়েছে কিনা খবর দিতে পার?' আরও জানায় 'বুঝলে ভাই, আমি নিজেও একজন বদলোক, কারণ পৃথিবীতে আমি একটিও ভাল কাজ করিনি। তার জন্যই আমার মত আর এক হতভাগ্যের শেষ সময়টুকুতে যাতে তাকে একটু আনন্দ দিতে পারি সেই চেষ্টা করব। শীগ্‌গির আমাদের এক পথেই চলতে হবে। সময় হয়ে এল তার। এখন দুটো গল্পগাছা করলেও তার আনন্দ হতে পারে।

চৌকীদার ভাবে লোকটা পাগল। সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করে ওকে। কিছু বলে না। ধৈর্য আর থাকে না বুঝি কাঠকয়লাওয়ালার। চৌকীদারের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে 'আমি কি বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ না? তোমারও যখন শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তুমি জানতে পারবে—কি তুমি চাও।

পাগলকে ঘাঁটানো সুবিধের নয়। এই ভেবে ওকে ভোলাবার জন্য চৌকীদার জানিয়ে দিল যে এই মুহূর্তে সহরের ও প্রান্তে এক বুড়ো ইহুদী উকীল মরমর অবস্থায় পড়ে আছে। তার মত কঞ্জুষ বুড়ো বদমাইস্ পৃথিবীতে আর নেই বলে সহরের সবার ধারণা।

শুনে আনন্দিত হয় কাঠকয়লাওয়ালা। চৌকীদারকে ছেড়ে চল্‌তে চল্‌তে এসে দাঁড়ায় সেই বুড়োর বাড়ীর দরজায়। দরজা বন্ধ। হাতের লাঠিটা দিয়ে ও দরজায় ঘা দেয়। বুড়োর চাকর-বাকররা তখন ভোজে বসেছে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে। জানে তারা প্রভু তাদের মত্ত হুল্লোড়ের আওয়াজে বিরক্ত হলেও কিছু করতে পারবেন না। পান ভোজনে তারা এত ব্যস্ত ছিল যে দুয়ারে ঘন ঘন আঘাতও তাদের শান্তিভঙ্গ করেনি। শেষকালে একজন শুনতে পেয়ে দরজা খুল্‌তে এল। ওরকম মত্ত অবস্থায় কাঠকয়লা-ওয়ালাকে দেখে সে মনে করল ডাক্তারের লোক বুঝি। সে একেবারে ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

মার্বেল পাথরে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে ও ওপরে উঠতে থাকে। অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ওঠে। সিঁড়ির ঝক্‌ঝকে রেলিংগুলোয় হাত ছোঁয়ায় না মোটে। তারপর ওপরে উঠে ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে খুঁজে বেড়ায় মৃত্যুপথের যাত্রী সেই বুড়োকে। এই যে দেখ্‌তে পেয়েছে এবার। খাটে শুয়ে আছে বুড়ো। চোখ বোজা। দেহে প্রাণটা আছে কি নেই বোঝা যায় না। বোধহয় টিঁকে আছে এখনও। বিছানার ধারে চেয়ার পেতে যে লোকটা বসে, তার জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো দেখ্‌লে তাই মনে হয়। ক্ষুধার্ত লোভী সে দৃষ্টি। ইঁদুরের গর্তের মুখে ওৎ পেতে বসে থাকা হ্যাংলা হুলো যেন লোকটা।

মাথায় কালো টুপী, মুখটা ঢাকা দিয়ে নামানো। অচেনা। কিন্তু ওকে এখানে দেখতে পাবে বলেই কাঠকয়লাওয়ালা আশা করে ছিল। দুয়ার ঠেলে ও যখন ঘরে ঢোকে তখন লোকটা এক নজর চেয়েও দেখেনি। তবু সে নিশ্চিত বুঝল তার ঘরে ঢোকা ও বুঝতে পেরেছে। শুধু তাই-ই নয়, সে কে, কী জন্য এসেছে, সকল ব্যাপার লোকটা ভাল করেই জানে। তাই তার কৌতূহলের অভাব। একটু কেঁপে ওঠে কাঠকয়লাওয়ালা। তারপর মনে সাহস এনে পকেট থেকে ওর তাসজোড়াটা বের করে বলে লোকটাকে ডেকে 'দেখ হে' এ ঘরে রয়েছি তুমি আর আমি। বুড়োটা মারা যাবার আগে একহাত তাস খেলো দেখি আমার সঙ্গে।

লোকটা গম্ভীর গলায় জান্‌তে চায় 'বাজী কি?' সে বলে বুড়ো এখনই মারা যাবে। তুমি তখন ওর আত্মাকে নিয়ে যেও।'

শুনে লোকটা ঘাড় নাড়ল। কিন্তু চাইল না ওর দিকে। বোধ হয় রাজী নয়।

ও বলল, দেখ, আমি কিন্তু আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি আমি তাস খেলে হারি না।

'তাই না কি?' অবজ্ঞার সুর লোকটার গলায়?

তবু সে বলে চলে, যদি আমি জিতি তাহলে কিন্তু এর আত্মার ওপর তোমার কোন দাবী থাকবে না। যেথান থেকে তুমি এসেছ চাঁদ, সেখানেই তোমায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যদি এমন দুর্ভাগ্য আমার হয় যে আমি হেরে গেলাম—যদিও তা হবে না সে আমি ভালই জানি—তাহলে ঠিক মাঝ রাতে তুমি বুড়োকে তো পাবেই, তার ওপর পাবে আমাকেও। আমারও সময় ফুরিয়ে এসেছে, বেশীক্ষণ আর নেই।

কালো আলখাল্লার ভেতর থেকে হাত বার করে লোকটা বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। তাস জোড়াটা ও দিয়ে দেয় সেই হাতে। বিছানার ধারে টেনে আনে আর একটা চেয়ার, ছোট টেবিল একটা। লোকটা তাস শাফল করে, কাঠকয়লাওয়ালা কাটিয়ে দেয়। সে এবার তাস দিতে সুরু করে। কোন কথা না কয়ে ওরা খেল্‌তে আরম্ভ করে। চোখ তাদের শুধু তাসের দিকেই। খেলা শেষ হয়। প্রথম বাজী। জিতেছে কাঠকয়লাওয়ালা।

অচেনা ব্যক্তি বলে, আর এক বাজী হোক।

এবার কাঠকয়লাওয়ালা ভয়ানক শীতবোধ করে। কাঁপুনি ধরে যায় তার। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়। একবার চেয়ে দেখে বুড়োর দিকে। বুড়োর বুকটা ওঠা নামা করছে হাপরের মত। নাভিশ্বাস বোধ হয়। কাঠকয়লাওয়ালা ওর কাছে গেল। অল্প অল্প করে জল দিয়ে এল মুখে। ফের এসে খেল্‌তে বস্‌ল। আর সময় নষ্ট করা নয়।

আবার ও জেতে। নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে লোকটা। ওর সব শরীর যেন বরফে তৈরী। সামনে বসে কাঠকয়লাওয়ালার হাত পা যেন জমে যেতে চায়। লোকটা এবার দ্রুত তাস শাফল্ করতে করতে বলে, আর এক বার।

ও রাজী হয়। বলে, বেশ। কিন্তু মনে রেখ এই শেষ। আর নয় মোটেই। ও তাস কাটিয়ে দেয়। অন্যজন ভাগ করে। খেলা আবার আরম্ভ হয়। এমন ঝড়ের গতিতে খেলা করে ওরা যে টেবিলের তলায় কাঠকয়লাওয়ালার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগে। ঘাম ঝরে কপাল বয়ে। কিন্তু শেষে সে-ই জেতে আবার।

ওর প্রতিপক্ষ এবার উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। একবার হেঁট হয়ে রক্ত-হিম-করে-দেওয়া ভীষণ দৃষ্টিতে চায় ওর দিকে। তাসের গোছা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় ওর মুখের ওপর। তারপর লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কাঠকয়লাওয়ালা আর বুড়ো ইহুদী পড়ে থাকে ঘরে। ঘরের ঠাণ্ডাটা যেন বেয়াড়া রকম বেড়ে গেছে। সেই

নন্ত রাত বুঝি এল এবার। হোঁচট খেতে খেতে সে ড়োর একেবারে পাশটিতে সরে আসে। চাদরের তলা থেকে তার একটা হাত বার করে ধরে থাকে নিজে। ওর াসগুলো কতক টেবিলে কতক মেঝেয় ছড়ানো। অন্ধকার মে আসে ওদের দুজনেরই চোখের ওপর।

কিছুক্ষণ পরে—কতক্ষণ তা সে জানে না—কাঠ-য়লাওয়ালা দেখে সে চলেছে একটা অপরূপ সুন্দর েশের ভিতর দিয়ে। এমন সুন্দর দেশ সে কখনও েখেনি। স্বপ্নেও নয়। সন্ধ্যা হয়েছে সবে। আকাশে াতাসে স্নিগ্ধতার আমেজ। খুব স্ফূর্তির সঙ্গে হাঁটছে া। নিজেকে এমন হাল্‌কা, এত প্রফুল্ল কোনদিন ার মনে হয়নি। ওর ঠিক পেছনেই আসছে একজন াক। অনেকটা সেই বুড়ো ইহুদীর মত চেহারা তার। ক্তু এরও খুব ফুর্তি দেখা যাচ্ছে। বুড়োটা ফুর্তি কাকে লে জানতই না। এমন হাল্‌কা পায়ে জীবনে সে হাঁটেনি।

চল্‌তে চল্‌তে তারা এসে পৌছাল স্বর্গের দুয়ারে। াঠকয়লাওয়ালা হাতের লাঠিটা দরজায় ঠুক্‌ল। ঠক্‌-ক্‌। যেমন ইহুদীর দরজায় তখন ঠুকেছিল। দরজার াঝে একটা ফোকর। কে এসেছে জানতে হলে এই াকর দিয়ে দেখা হয়। একটু পরেই যে উঁকি দিল াকরে, সে আর কেউ নয়, সে পিটার। বর নেবার ন্য ওকে সাধাসাধি করেছিল যে।

পিটারের স্মরণশক্তির তারিফ কর্তে হয়। কাঠ-য়লাওয়ালাকে দেখেই চিনেছে ও। সানন্দে অভ্যর্থনা ানায় 'আরে এস এস।'

বুড়ো ইহুদী কিন্তু পিটারকে দেখেই আরো পিছিয়ে েয়ে কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে কেমন ছোট হয়ে গেল। দরজার খিল্ খুলতে গিয়ে পিটার বুড়োকে দেখতে পেল। ু কুঁচ্‌কে ওকে খানিক দেখে পিটার গম্ভীরভাবে ল্‌ল, 'তোমার পেছনে ঐ ছোট্ট কালমতন প্রাণীটি কে?'

ও উত্তরের বল্‌ল, 'আমি যেখান থেকে আস্‌ছি সেখানে ও ছিল একজন ইহুদী।'

পিটার বলে, 'তা আমিও একজন ইহুদী ছিলাম। কিন্তু ও লোকটা কেমন ছিল শুনি? ভাল না খারাপ?'

'ও খারাপ লোকই ছিল বলতে হবে। কিন্তু ছিল ানে আগে ছিল, এখন নয়।'

তবু দরজা ছাড়ে না পিটার। আবার শুধায়, 'ও কি রত?' কাঠকয়লাওয়ালার মনে পড়ে সেই চৌকীদারের থা। সেই মত বলে, 'ও ছিল একজন উকীল।'

আমরা অভ্যর্থনা করব। কিন্তু তোমার বন্ধুটিকে বাইরে রেখে আস্‌তে হবে।

কাঠকয়লাওয়ালা ব্যগ্রদৃষ্টিতে পিটারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একপা-ও নড়ে না। তারপর বলে, 'আচ্ছা সেই তাসের কথাটা মনে আছে তোমার?'

পিটারের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। শিশুর মত দেখায় ওকে। হেসে বলে, 'নিশ্চয়ই মনে পড়ে!'

কাঠকয়লাওয়ালা তখন বলে, 'সেই তাস দিয়ে শেষ-বারের মত একজন বিশ্রী কাল লোকের সঙ্গে আমি খেলেছিলাম। বাজী ছিল ওই বুড়োর প্রাণ। তিনবার খেলায় আমি জিতেছি তিনবারই। চারপাশের হাওয়া প্রথমে বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু পরে আমার গায়ে লাগছিল যেন আগুনের হল্‌কা। তার আঁচে আমার হাড়ের ভেতর মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তবু আমি জিতলাম। আমার সেই বন্ধুকে ছেড়ে আমি ভেতরে যেতে পারব না।'

পিটার ভাবলে খানিকক্ষণ। আবার উঁকি দিয়ে বুড়োকে দেখে আস্তে আস্তে বলল, 'ও যখন তোমার বন্ধু, তখন ওকে এখানে ঢুক্‌তে দিয়ে আমরা আনন্দই পেতাম। কিন্তু তা হবার নয়। ওর মত লোকের এখানে জায়গা নেই।'

কাঠকয়লাওয়ালা বল্‌ল, 'কিন্তু অনেকদিন আগে সেই ক্রিস্‌মাসের দিন যখন তুমি আর তোমার বন্ধুরা গিয়েছিলে আমার ঘরে তখন আমি ত' তোমাদের এই কথা বলিনি।'

শুনে পিটারের অস্বস্তি আর বিরক্তি বাড়ল। অসন্তুষ্ট-ভাবে ও চেয়ে রইল বুড়োর দিকে। কাঠকয়লাওয়ালা এবার ফোকরটা দিয়ে নিজেই উঁকি মারে ভেতরে। ওর সৌভাগ্য অসীম বলতে হবে, কারণ উঁকি দিতেই ও দেখতে পায় সেই লোকটিকে। ওর প্রথম অতিথি। যাকে খুব চেনা ঠেকেছিল ওর। যিনি বর দিয়েছিলেন। ওকে দেখে স্বর্গীয় হাসিতে তাঁর মুখ ভরে ওঠে। আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে কাঠকয়লাওয়ালা বুড়োর দিকে ফিরে যেন বলতে গেল, 'দেখ, ইনিই আমার বন্ধু।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিটারও চায় সেদিকে। কোন প্রশ্ন করে বোধ হয়। আর ঠিক সেই বর দেওয়ার সময় উনি যেমন পিটারের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন, আজও প্রথমে কাঠকয়লাওয়ালার দিকে ফিরে হাসেন। তারপর সম্মতি দেওয়ার ভাবে পিটারের চোখে চোখ রেখে তেমন করে ঘাড় নাড়েন।

পিটার মুক্ত করে স্বর্গের দুয়ার। ভেতরে ঢুকে যায়

অতুল দত্ত

গত জুন মাসে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ, করাচীতে বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠকে, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা, কানাডার সাধারণ নির্ব্বাচনে লিবারেল দলের পরাজয়, সর্ব্বোপরি, নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটীতে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব এই মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল—

তিন সপ্তাহ ধরিয়া অচল অবস্থা চলিবার পর গত জুন মাসের প্রথমে মঃ বুর্জ্জোয়া ম্যানরীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এই নূতন গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের" মন্তব্যটি খুবই উপযুক্ত : "It has taken three weeks to make the French Government move an inch to the right."—ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে এক ইঞ্চি দক্ষিণে সরাইতে তিন সপ্তাহ সময় লাগিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মলে গভর্ণমেণ্ট সোস্তালিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত হইলেও সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যে ও হিংস্রতায় কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। বুর্জ্জোয়া-ম্যানরীর নেতৃত্বে গঠিত নূতন গভর্ণমেণ্ট আরও একটু রক্ষণশীল হইয়াছে মাত্র ; উহার কোনও গুণগত পরিবর্ত্তন হয় নাই। আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য আরও অর্থাগমের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন-সাধন অপরিহার্য্য হয়। সুয়েজের ব্যাপারে ও আলজেরিয়া সম্পর্কে বুর্জ্জোয়া ম্যানরী জঙ্গী মনোভাবের পরিচয় দিয়া দক্ষিণপন্থীদের প্রিয় হইয়াছিলেন। এই জন্য মঃ মলেই প্রেসিডেণ্ট কোটিকে পরামর্শ দেন যে, মঃ বুর্জ্জোয়া ম্যানরিকে গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান করা হউক ; তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। নূতন গভর্ণমেণ্ট আলজিরিয়া সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের নীতি তো পরিবর্ত্তন করিবেনই না ; বরং তাঁহাদের অনুসৃত নীতি আরও অনমনীয় ও হিংস্র হইবে।

ক্যানাডার সাধারণ নির্ব্বাচন—

দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ক্যানাডার লিবারেল দলের পরাজয় ঘটিয়াছে ; জুন মাসের সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছে রক্ষণশীল দল। লিবারেল গভর্ণমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেণ্ট লরিয়েণ্ট এবং পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন লষ্টার পিয়ার্সন। ইঁহাদের নেতৃত্বে কানাডিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুর ন্যায় কাজ করিয়াছেন। (...it helped to ease tensions between the West as a whole and those Asian and African countries that suspect both European colonialism and the new power of the United States.—Economist) এই গভর্ণমেণ্ট কলম্বো পরিকল্পনা গঠনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, মিঃ পিয়ার্সনের উদ্যোগেই গত বৎসর সিনাই (মধ্যপ্রাচ্য) অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য জাতি সঙ্ঘের সেনাবাহিনী গঠিত হয়।

লিবারেল দলের পরাজয়ের পর মিঃ ডাইফেন-বেকারের নেতৃত্বে ক্যানাডায় রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। লিবারেল দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এইরূপ : প্রথমতঃ দীর্ঘকাল ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় এই দল নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে অত্যধিক আশা পোষণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বহু ক্যানাডীয়ের মনে এইরূপ ধারণার সঞ্চার হইয়াছে যে, লিবারেল দলের আমলে ক্যানাডায় আমেরিকার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ক্যানাডার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মার্কিণ লগ্নীর উপর নির্ভরশীল, এবং উহার মুনাফার অধিকাংশ আমেরিকায় চলিয়া যায়। তৃতীয় কারণটি স্থানীয় রাজনীতির পরিবর্ত্তন। এতদিন ক্যানাডার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল পূর্ব্বাঞ্চল—বিশেষতঃ কুইবেক্ প্রদেশ। বর্ত্তমানে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন পশ্চিমাঞ্চলে এই কেন্দ্র অপসৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ক্যানাডার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে এই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি—

মধ্যপ্রাচ্যে রাজা সৌদের উদ্যোগে নূতন একটি জোট গড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জর্ডানের সহিত মিশর-সীরিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে ; জর্ডানের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সৌদী আরবের সহিত। জর্ডান ইতিমধ্যে আমেরিকার নিকট হইতে দুই কিস্তিতে ২ কোটী ডলার অর্থসাহায্য পাইয়াছে ; সে আরও ১ কোটী ডলারের মার্কিণ সমরোপকরণ পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গত এপ্রিল মাসে জর্ডানের রাজা হুসেন যখন জনপ্রিয় নেতাদের আঘাত করিয়া গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন, তখন স্বভাবতঃ মিশরও সিরিয়ার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অপ্রীতিকর হয়। বস্তুতঃ মিশর ও সিরিয়ার প্রগতিশীল প্রভাব হইতে জর্ডানকে মুক্ত করিয়া সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি অতর্কিতে আঘাত হানিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে জর্ডান, সিরিয়া ও মিশরকে লইয়া সম্মিলিত সামরিক কম্যাণ্ড গঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারেই সুয়েজের সঙ্কটের সময় সিরীয় সেনাবাহিনী জর্ডানে প্রবেশ করে। জর্ডানের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ একটু মিটিলেই রাজা হুসেন এই সেনাবাহিনীর অপসারণ দাবী করিতে থাকেন। এই সময়—গত জুন মাসের প্রথমে রাজা সৌদ জর্ডানে আসেন। আম্মানে তাঁহার

অবস্থিতির সময়েই রাজা হুসেন্ আম্মানের মিশরীয় দূতাবাসের সেনাপতিকে এবং জেরুজালেমের মিশরীয় কনসালকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মিশরও জর্ডান গভর্ণমেণ্টকে জানান যে, তাঁহারা যেন কায়রো হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিয়া লন। ইহার পর, সম্মিলিত সামরিক কম্যাণ্ড হইতে মিশর তাহার প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে। এত ঘটনা ঘটিবার পর গত ১৩ই জুন রাজা হুসেন ও রাজা সৌদের যুক্ত বিবৃতিতে "সুনির্দ্দিষ্ট নিরপক্ষতা", বৈদেশিক চুক্তি ও মিলন এড়াইয়া চলিবার সঙ্কল্প, আরব রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি উল্লেখ করা হইয়াছে। সিরিয়া ও মিশরের সহিত বিরোধ বাধাইয়া, প্রগতিশীল রাজনীতিকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, মার্কিণ অর্থে এবং উদ্ধত মার্কিণ সামরিক শক্তির আড়ালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর রাজা হুসেনের মুখে নিরপেক্ষতা, বৈদেশিক চুক্তির বিরোধিতা ও আরব সংহতির বুলি খুবই বেসুরো। রাজা সৌদের ভূমিকাও রহস্যজনক: সিরিয়া ও মিশরের সহিত তাঁহার বিরোধের কোনও কথা প্রকাশ পায় নাই। এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত জর্ডানের বিরোধে তিনি নিরপেক্ষতার ভাব দেখাইতেছেন; বৈদেশিক চুক্তির (বাগদাদ্) সহিত ইরাকের সম্পর্কের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া ইরাক-সৌদীআরব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। রাজা সৌদের এই নুতন ধরণের তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে যাইতেছে। আরব জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য-বিরোধী মনোভাব প্রবল। তাই, আরব স্বার্থ, আরব সংহতি ও প্যালেষ্টাইন সমস্যার কথা না বলিয়া উপায় নাই, নিরপেক্ষতার ভাবটাও বজায় রাখা দরকার। আরব জনসাধারণের এই ভঙ্গুর মনোভাবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া মধ্যপ্রাচ্যে এক নুতন ধরণের আরব জোট গড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই জোট প্রগতিশীল আরব শক্তির সহিত সম্পর্ক এড়াইয়া চলিবে, অথচ ইরাকের মত সরাসরি সামরিক চুক্তিতে যোগ দিবে না। তবে, আইসেনহাওয়ার নীতির প্রথম পর্য্যায়ের (অর্থনৈতিক) সহিত তাহাদের বিরোধ থাকিবে না। প্রয়োজনবোধে কমুনিজম্ রোধের নামে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে মার্কিণ সামরিক সাহায্যও গ্রহণ করিবে।

বাগদাদ-চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

জুন মাসে করাচীতে সাড়ম্বরে বাগদাদ চুক্তি-কাউন্সিলের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে বৃটেন কর্ত্তৃক মিশর আক্রমণের সময় এই চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলি বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিল। বাগদাদ চুক্তি তখন ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এই দারুণ ফাঁড়া কাটাইয়া বাগদাদ্ চুক্তি এখন শুধু পূর্ব্বের অবস্থাতেই ফিরিয়া যায় নাই, আমেরিকা ইহার সামরিক কমিটিতে যোগ দেওয়ায় ইহা নূতন শ্রী ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং, বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠকে আড়ম্বর স্বাভাবিক, প্রতিনিধিদের আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টাও প্রত্যাশিত। তবে, যতখানি উল্লাস ও আত্মশ্লাঘার ভাব লইয়া কাউন্সিলের বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল, ততখানি সাফল্যের সহিত উহা শেষ হয় নাই।

আন্তর্জ্জাতিক কমুনিজম্কে রোধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বাগদাদ চুক্তির উদ্ভব। কিন্তু পাকিস্থান ইহাতে যোগ দিয়াছে ভারতের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং করাচীতে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের সভায় বসিয়া মন্ত্রীরা কাশ্মীর ও ভারতের বৈরতা বাদ দিয়া আন্তর্জ্জাতিক কমুনিজমের কল্পিত বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহা চলিতে পারে না। স্বভাবতঃ, পাক্ প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি কাউন্সিলের বৈঠকে তুলিতে এবং এই সম্পর্কে দুই চারিটি কড়া কথা বিজ্ঞপ্তিতে জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ইরাকের জনসাধারণ ইস্রাইল-বিরোধী; কম্যুনিজমের বিপদ তাহারা বোঝে না। আরব জনগণের এই মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়া ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নুরী এস্ সৈয়দ কাউন্সিলের বৈঠকে ইস্রাইলের সম্ভাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আশ্বাস চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা বাগদাদ চুক্তিকে এই সব স্থানীয় বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার বিরোধী। পাকিস্থানের সহিত ভারতের বিরোধে, অথবা ইরাকের সহিত ইস্রাইলের বিরোধে পাকিস্থান ও ইরাককে রক্ষা করা বাগদাদ চুক্তির লক্ষ্য—এইরূপ কোনও ইঙ্গিত তাঁহারা দিতে চাহেন না। "সর্ব্বপ্রকার আক্রমণের প্রতিরোধ করা হইবে"—এই কথাটি দৃশ্যতঃ নির্দ্দোষ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঐরূপ উক্তিতে ইহাই বুঝাইবে যে, স্থানীয় বিরোধে বাগদাদ চুক্তি একটি বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিবে। মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েট-বিরোধী জোট গড়িয়া তোলা যেমন বৃটেন ও আমেরিকার প্রয়োজন, তেমনি তাঁহাদের প্রয়োজন ইস্রাইলকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এদিকে ভারতের সহিত বৃটেন ও আমেরিকার সম্পর্ক সৌহৃদ্যপূর্ণ। পাকিস্থানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি হওয়ায় পূর্ব্বের ভারত-মার্কিণ সম্পর্ক কতকটা চিড় খাইয়াছে। ইহা আর বাড়াইয়া তুলিতে আমেরিকা চাহে না। বৃটেন ও আমেরিকার এই মনোভাব তুরস্ক ও ইরাণ সমর্থন করে; তাহারাও স্থানীয় ব্যাপারকে এই চুক্তির মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহে না। দুই পক্ষের এই বিপরীত মনোভাবের সমন্বয় করিয়া চুক্তি কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তির একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘের প্রচেষ্টা সমর্থন করিবার প্রয়োজনীয়তা কাউন্সিল উপলব্ধি করিতেছে।" পাকিস্থানের রাষ্ট্রপুঙ্গবরা ইহাকেই কাশ্মীর সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের তৎপরতার পরোক্ষ উল্লেখ বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দেয় নাই বটে। তবে, সে উহার অর্থনৈতিক ও সামরিক কমিটিতে যোগ দিয়াছে। বস্তুতঃ, এই চুক্তিতে আমেরিকার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়া, বা না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে। "Whether America formally becomes a member or not is of little im-

আজি শ্রাবণ ঘনগহনতলে

উপানন্দ

এসেছে শ্রাবণ। বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আবহাওয়া। ঝুলনের লেগেছে দোলা বনে বনে আর মনে মনে। মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে আকাশপথে চলেছে বাদল বাউল, তার তালে তালে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছে সাগরের ঊর্মিদল, তারই উত্তরীয়ের ছোঁয়া লেগে ঘোমটা ঢাকা বিজলী আপনাকে চক্ষের নিমেষে প্রকাশ্‌ করে লাজনম্রা হয়ে মেঘের ভিতরে আত্মগোপন করছে—ওযে অসীমের অন্তঃপুরচারিণী।

চেনা অচেনার মধ্যে আজ বিরহ-মিলন সমারোহে। কেকা কলরব মুখর দিন। অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো শালের বনে, সজল হাওয়ায় চলেছে সাঁওতালী মেয়ে তার গাগরী নিয়ে—মেঠো পথে বাজ্‌ছে কোথায় বাঁশের বাঁশী! পাতার কুটীরে বসে কৃষাণী বধূ ধানের ওপর ঢেউ-খেলে-যাওয়া বাতাসের আনন্দ গান শুনছে আনমনে। কৃষাণেরা গেছে মাঠে অন্তরে আশা-বৃন্ত দুলিয়ে। তৃষ্ণার্ত্ত সরীসৃপেরা রসনাতৃপ্তি করে পরমানন্দে বিহার করছে এদিকে ওদিকে।

নিঃসঙ্গতার মীড়ে মনের বীণার তার টেনে টেনে প্রান্তরের প্রাচীন বৃদ্ধ বট মেঘমল্লারের আবাহন করছে,—প্রকৃতির গ্রন্থখানি উন্মুক্ত হয়েছে অবারিত মাঠে প্রসন্ন ধান্য শিশুদের পাঠশালায়। ঝাউ বন থেকে শব্দ উঠছে সোঁ সোঁ। এমন দিনে কবি বললেন—'আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে—'

ঘন বর্ষার নিভৃত নিরালয়ে বসে বসে মনে হচ্ছে, জগতের বিচিত্র কলকোলাহলে কত কথাই না লুপ্ত হ'য়ে গেল! এম্নি ঘনঘটার সমারোহে বিদ্যাপতি চোখের জলে ব্যথার পূজা করতে করতে গেয়েছিলেন—

'তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈ সে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

অন্তরের অন্তরতম প্রিয় হরির জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে—যাকে লাভ করা কঠিন, যে দুর্লভ, সেই তো চিরদিনের কামনার ধন—সেই অনন্ত অসীমকে পাবার জন্যে সংসারের ধূলি জালে লিপ্ত প্রতিদিন মানুষ চির-কাল ধরে দুর্গমের পথে চলেছে। অনন্ত অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র ফেনিল হয়ে উঠ্‌ছে—'কে সে গোঙায়বি হরি-বিনে দিন রাতিয়া।' এ ব্যথার-পূর্ণ পরিসমাপ্তি কোথায়? কবি বল্‌লেন—'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে?' মানুষে মানুষে যে মিলন, সে তো আত্মের আবেষ্টনীতে অপূর্ণ—সে তো আধখানা, তাই হরির জন্যে এত ব্যাকুলতা—এত ক্রন্দন! শান্ত সমাহিত চিত্তের ধ্যানভূমিতেও আজ নেমেছে বর্ষা ফসলের প্রত্যাশায়।

চিত্তকে স্তব্ধ মৌন একাগ্র করে শোনো তোমাদের ভেতর থেকে বাহির হয়ে এসে ব্যক্তি-পুরুষ কি বাণী দিচ্ছেন আপনাকে বিকীর্ণ করে। এমন দিনেই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতিকে খুঁজে পাওয়া যায় জড়ে আর জীবে, যেখানে জীবনের খেলাঘর রচনা করে চলেছে। অন্তরে বাহিরে আনন্দের একী-করণের উদ্দেশ্যে সভ্যতার লাবণ্য প্রভাত থেকে মানুষের তপস্যা,—সে তপস্যার সিদ্ধি হবে কবে হৃদয়ের পূর্ণাহুতি দিয়ে! এই প্রশ্নই চিরন্তন। মানুষ বোধিকে জাগ্রত করেছে, তবু এর উত্তর পায়নি—সে কেবলই প্রত্যক্ষ করে আসছে এ সংসারে কোথাও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন বন্ধন, কোথাও বা চিরবিচ্ছেদের অশ্রু হাহাকার, চলচ্চিত্রের মত ক্রমাগত বিবর্ত্তিত হচ্ছে।

তাই—'বিদ্যাপতি কহে, কৈ সে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' কথা বলার লগ্ন এলো, কথিকা রচনার সময় হোলো কবি বললেন

'যে কথা এ জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।'

আজি শ্রাবণ ঘনগহনতলে

উপানন্দ

এসেছে শ্রাবণ। বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আবহাওয়া। ঝুলনের লেগেছে দোলা বনে বনে আর মনে মনে। মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে আকাশপথে চলেছে বাদল বাউল, তার তালে তালে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে সাগরের উর্ম্মিদল, তারই উত্তরীয়ের ছোঁয়া লেগে ঘোমটা ঢাকা বিজলী আপনাকে চক্ষের নিমেষে প্রকাশ করে লাজনম্রা হয়ে মেঘের ভিতরে আত্মগোপন করছে—ওযে অসীমের অন্তঃপুরচারিণী।

চেনা অচেনার মধ্যে আজ বিরহ-মিলন সমারোহে। কেকা কলরব মুখর দিন। অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো শালের বনে, সজল হাওয়ায় চলেছে সাঁওতালী মেয়ে তার গাগরী নিয়ে—মেঠো পথে বাজছে কোথায় বাঁশের বাঁশী! পাতার কুটীরে বসে কৃষাণী বধূ ধানের ওপর ঢেউ-খেলে-যাওয়া বাতাসের আনন্দ গান শুনছে আনমনে। কৃষাণেরা গেছে মাঠে অন্তরে আশা-বৃন্ত দুলিয়ে। তৃষ্ণার্ত্ত সরীসৃপেরা রসনাতৃপ্তি করে পরমানন্দে বিহার করছে এদিকে ওদিকে।

নিঃসঙ্গতার মীড়ে মনের বীণার তার টেনে টেনে প্রান্তরের প্রাচীন বৃদ্ধ বট মেঘমল্লারের আবাহন করছে,—প্রকৃতির গ্রন্থখানি উন্মুক্ত হয়েছে অবারিত মাঠে প্রসন্ন ধান্য শিশুদের পাঠশালায়। ঝাউ বন থেকে শব্দ উঠছে সোঁ সোঁ। এমন দিনে কবি বললেন—'আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে, নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে—'

ঘন বর্ষার নিভৃত নিরালয়ে বসে বসে মনে হচ্ছে, জগতের বিচিত্র কলকোলাহলে কত কথাই না লুপ্ত হ'য়ে গেল! এম্নি ঘনঘটার সমারোহে বিদ্যাপতি চোখের জলে ব্যথার পূজা করতে করতে গেয়েছিলেন—

'তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

অন্তরের অন্তরতম প্রিয় হরির জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে—যাকে লাভ করা কঠিন, যে দুর্লভ, সেই তো চিরদিনের কামনার ধন। সেই অনন্ত অসীমকে পাবার জন্যে সংসারের ধূলি জালে লিপ্ত প্রতিদিন মানুষ চির-কাল ধরে দুর্গমের পথে চলেছে। অনন্ত অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র ফেনিল হয়ে উঠছে—'কে সে গোঙায়বি হরি-বিনে দিন রাতিয়া।' এ ব্যথার-পূর্ণ পরিসমাপ্তি কোথায়? কবি বললেন—'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে?' মানুষে মানুষে যে মিলন, সে তো আত্মের আবেষ্টনীতে অপূর্ণ—সে তো আধখানা, তাই হরির জন্যে এত ব্যাকুলতা—এত ক্রন্দন! শান্ত সমাহিত চিত্তের ধ্যানভূমিতেও আজ নেমেছে নবা ফসলের প্রত্যাশায়।

চিত্তকে স্তব্ধ মৌন একাগ্র করে শোনো তোমাদের ভেতর থেকে বাহির হয়ে এসে ব্যক্তি-পুরুষ কি বাণী দিচ্ছেন আপনাকে বিকীর্ণ করে। এমন দিনেই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতিকে খুঁজে পাওয়া যায় জড়ে আর জীবে, যেখানে জীবনের খেলাঘর রচনা করে চলেছে। অন্তরে বাহিরে আনন্দের একী-করণের উদ্দেশ্যে সভ্যতার লাবণ্য প্রভাত থেকে মানুষের তপস্যা,—সে তপস্যার সিদ্ধি হবে কবে হৃদয়ের পূর্ণাহুতি দিয়ে! এই প্রশ্নই চিরন্তন। মানুষ বোধিকে জাগ্রত করেছে, তবু এর উত্তর পায়নি—সে কেবলই প্রত্যক্ষ করে আসছে এ সংসারে কোথাও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন বন্ধন, কোথাও বা চিরবিচ্ছেদের অশ্রু হাহাকার, চলচ্চিত্রের মত ক্রমাগত বিবর্ত্তিত হচ্ছে।

তাই—'বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' কথা বলার লগ্ন এলো, কথিকা রচনার সময় হোলো কবি বললেন—

'সে কথা এ জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।'

মনে কত কথাই তো রয়ে গেছে, কিন্তু সে সব কথা কাকে বলা যাবে।

'মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে
আসা যাওয়ার আভাস ভাসে
বাতাসে চঞ্চল।'

বর্ষা বিরহের ঋতু—পুবালি হাওয়ায় ঘন কাজল রাতে আকাশ যখন বাঝিয়ে ওঠে আর কেয়ার গন্ধে প্রাণ ব্যাকুল হোতে থাকে, তখন কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—

'আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারই ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে।'

এসো, বিরহের ঋতুতে বেদনায় স্নান করি। এ স্নানে আনন্দের মধ্যে আছে অলৌকিক রসের স্পর্শ আর ভাগবতী অনুভূতি। বর্ষাদিনে বাঙালীর অন্তরে যেরূপ বৈরাগ্যের সাধনা, বৈরাগ্যের সুর আর ঔদাস্যের অলস প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় এরূপ বিশ্বের কোন মানুষের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয় না। বিরহ-মিলনের অভিসার-সঙ্গীত বাংলার আকাশে বাতাসে যেমন করে শোনা যায়, এমনটী পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ। তাই তোমাদের কাছে আমার নিবেদন, আজকের এই শ্রাবণ দিনে ঘন ঘোরঘটাচ্ছন্ন বর্ষা ধারায় তোমরা কান পেতে শোনো স্বপ্নভঙ্গের সুর, এ সুরে আছে বাঙালীর নিজস্ব সত্তা—কীর্ত্তনে বাউলে তার অপূর্ব্ব ব্যাপ্তি।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলনের উৎসব। উৎসবের দিনে মিলনের উৎস উৎসারিত হয়ে হৃদয়ের প্রবাহ আর প্রবাহিনীকে শতদিকে বহমান করে নিয়ে যাবে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তা হোলে দেখতে পাবে চাঁদের অপূর্ব্ব শোভা আর অজস্র জোৎস্না ধারার প্লাবন। এই রাখী পূর্ণিমায় মিলনের রাখী পরে, হৃদয়ে ভালোবাসার গন্থি দিয়ে পড়বে তোমাদের মনে, হাজার হাজার বছর আগেকার কথা, এমি ঝুলনের দিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে, দোলায় দুলে দুলে হর্ষবিভোল হয়েছিলেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের হাতে শুধু রাখী বেঁধে দিয়ে চপলচঞ্চল দুষ্টু ছেলের কল্যাণই কামনা করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্রজের গোপালদের হাতে এই রাখী পরিয়ে দিয়ে বিশ্ব মাতৃত্বের মহামহিমা প্রকাশ করেছিলেন। আজও সেই দিনের স্মৃতি বহন করে উৎসবের রাগে রঞ্জিত হয়ে সহস্র বিচ্ছেদের মধ্যে পরম ঐক্যের সুর বেজে ওঠে রাখী পূর্ণিমায়। যে রাখী সন্তানের কল্যাণ কামনায় বাঁধা হয়েছিল, যে শ্রীতিডোরে কিশোর চির কিশোরকে বেঁধেছিল, যে সখ্যতাসূত্রে বন্ধু বন্ধুর হৃদয়ে গ্রন্থি দিয়েছিল, রাখী পূর্ণিমায় তারই উৎসবের আয়োজন। জীবন দেবতাকে তোমরা ঝুলনের রাতে ব্রজবালকদের মত রাজা সাজিয়ে ঝুলদোলে বসিয়ে দিয়ে দোল দেবে প্রাণভরা ভাবের স্পন্দনে—আর বলবে—হে আর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। "উদ্ভ্রান্ত" ভারতের বিভক্ত বাংলার বিচ্ছিন্ন ভাইবোনেরা এদিনেই মিলন রাখীবন্ধন উৎসব করবে, হাতে করে প্রীতির ডোরে, বন্ধুত্বের ডোরে সকলকে বেঁধে মহত্তর আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণক্ষেত্রে কমল তুলতে পারো—এই কথাই হোলো আজ আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে। তোমরা আমার হৃদয়ের রাখী গ্রহণ করো।

বিজিত মরণ

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

"...না, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা রিভলভারটা।..."

একতলা থেকে দোতালা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘর, আলমারী, তোরঙ্গ, সুটকেশ থেকে সুরু করে সেলফ, এমন কি সিঁড়ির তলা পর্য্যন্ত সম্ভব অসম্ভব কোনো জায়গাই খুঁজতে আর বাকি রইলনা। চাকরবাকরদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধমকানি দিয়েও কোনো হদিশ মিললনা।

রাণুর দাদু ঘরের মধ্যে মাথানীচু করে পায়চারি করে বললেন, তাইত, কালই আমার কলকাতায় ফেরার কথা।

রাণুর মা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে এসে শুকনো মুখে বললেন, আশ্চর্য্য! টাকা নয়, পয়সা নয়, শেষ কালে হারাল কিনা পিস্তল, কি করি ভয়ে আমার হাত পা হিম হয়ে আসছে বাপু, কে কোথায় কি করে বসবে। তুমি একটু সাবধানে রাখলে পারতে বাবা।

দাদু কি চিন্তা করছিলেন, চকিত কণ্ঠে বললেন, সাবধানে আর রাখব কি মা, ছিল হ্যাঙারে ঝোলানো, চামড়ার কেসটা রয়েছে অথচ আসল জিনিসটাই নেই।

তপন আর স্বপন রাণুর দু' ভাই। সেদিন শনিবার। পেট কামড়ানির নাম করে তপন সেদিক স্কুলে যায়নি। স্বপন দুপুরে স্কুল থেকে ফিরতেই রাণু চুপি চুপি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় চোখ দুটো তার বড়ো বড়ো। ফিস্ ফিস্ করে বললে, জানিস ছোড়দা, দাদুর পিস্তল চুরি হয়ে গেছে, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা বলেছে যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে আর আস্ত রাখবে না, দাদু পুলিশে খবর দিতে যাবে। পুলিশ কি জানো, ছোড়দা—ছোড়দা, আরও ভয়ানক বুদ্ধি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে।

বেশ হবে, জানিস, ভোলা, পবন, আমার কাণ্ড মুলে দিয়েছিল।

বাণুর মা ছুটে এলেন, জানিস বাবা স্বপন, তোর দাদুর পিস্তল পাওয়া যাচ্ছেনা, পুলিশ আসবে। হাঁরে, তোর বন্ধু টঙ্কুকে নিয়ে দাদুর ঘরে যাসনি তো?

স্বপন বই গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, তুমি কি যে বল মা। আমার বন্ধুরা অমন নয়। মিছিমিছি তাদের দোষ দিওনা।

জানিনা বাপু, আমার যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

বাজ্যের দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

বাথরুমে যাবার পথে সে সময় দাদুও দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বপনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

বাকি দুপুরটা থমথমে হয়ে রইল সমস্ত বাড়ীটা। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে নির্বিকার হয়ে রইলেন একমাত্র রাণুর দাদু। বিকালে তিনভাই বোনকে নিয়ে রোজকার মতো নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু ওরা যেন মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

দোতালার ঘরের সুমুখের ছাদে শতরঞ্চি বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় ওদের গল্প বরাদ্দ। কিন্তু সেদিন কেউ দাদুর কাছে এগোতে সাহস করলনা। ছাদ থেকে কিন্তু দাদু নিজেই ডাকালেন, কই ভাই, তোরা আজ গল্প শুনতে আসবি না।

মোটা করে এক টিপ নস্যি নিয়ে রাণুর দাদু বললেন, আজ একটা নতুন গল্প বলব। তবে গোড়াতেই বলে রাখি ভাই—এটা গল্প নয় একেবারে সত্যি ঘটনা, কিন্তু শুনেও হাব মামার। মিরাটের মিলিটারি ব্যারাকে যখন ছিলুম, তখন এক মেজরের মুখে শুনেছিলুম করে মারছে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে। কিছুতেই তারা মেনে নেবেনা বিদেশীদের শাসন।

শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকটা স্পেশাল ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নকে পাঠাতে হল ফ্রন্টিয়ারে। কিন্তু কিছুতেই পারা গেলনা ওদের রুখতে। মাথা নীচু করা বুঝি ওদের কুষ্টিতে লেখেনা।

শুকনো খট্‌খটে পাহাড়ী দেশ। বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ থেকে আগুন ঝরে। তবু দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি সজাগ থাকতে হল সমস্ত রেজিমেন্টকে। কখন বন্যার মতো দলে দলে তারা পাহাড় ডিঙিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়বে, আর পালিয়ে যাবে লুটপাট, খুন জখম করে। বুনো নেকড়ের মতো হিংস্র, নির্মম আর ক্ষিপ্র তাদের গতি।

লড়াইয়ে সমস্ত রেজিমেন্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে প্রিজনার্স ক্যাম্পেও বুঝি আর জায়গা হয় না। দিন পনেরো ধরে প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াইয়ের পর অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এলো। মনে হল যেন বেশ কিছুটা লোক ঘায়েল হয়েছে। পাহাড়ের উত্তর দিকটা একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটে গেল একটা ভয়ংকর ব্যাপার। এরকম একটা ঘটনার কথা কেউ ভাবতে পারেনা। তাই প্রস্তুত ছিলনা কেউই এই ঘটনার জন্যে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। নিস্তব্ধ পাহাড়ে রাত আরও গভীর হতে লাগল। অন্ধকারের সঙ্গে নেমে এলো ভয়াবহ নৈঃশব্দ। শুধু শোনা যাচ্ছে নাইট্ পেট্রোলের ভারী বুটের শব্দ খট্...খট্ খট্ খট্।

অনেক রাত্রে পুবের উঁচু পাহাড়ের মাথায় আকাশটা হলুদবর্ণ হয়ে উঠল। জমাট মেঘের মতো কালো পাহাড়ের মাথায় উঠে এলো প্রেত চক্ষুর মতো ঘোলাটে চাঁদ। রুক্ষ পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ডের ওপর ছড়িয়ে পড়ল পীতাভ কিরণ।

ঠিক এই সময়েই ঘটল ব্যাপারটা। কি একটা অস্বাভাবিক শব্দে আচমকা থমকে থেমে গেল সমস্ত বুট গুলোর আওয়াজ। উৎকর্ণ হয়ে উঠল কালো ছায়ার

এই রাত্রে আবার নতুন এ্যাটাক্ শুরু হল নাকি ? বেজে উঠল এলাম বিউগল্। অর্ডার পেয়ে একদল ছুটে চলল গোলমাল লক্ষ্য করে। ততক্ষণে উদ্যত বন্দুক নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলো গোটা রেজিমেন্টের আর্মি।

চিত্রলের বন্দী শিবিরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সকলে। এই দিকেই ছুটে আসছে··কারা ওরা! মুখে মুখে রটে গেল সন্ত্রস্ত সংবাদ। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছে বন্দীরা।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাইফেল থেকে গর্জে উঠল আগুন। ঝড়ের মুখে লতার মতো মুমথের মানুষ গুলো এলিয়ে পড়ল শক্ত পাহাড়ের বুকে। শত শত মানুষের মরণার্ত্ত চীৎকারে দুঃস্বপ্নগ্রস্তের মতো কেঁদে উঠল নিদ্রিত রাত্রি। পাহাড়ের বুকে নামল রক্তের ঝরণা।

অর্দ্ধাশনে অনশনে শীর্ণ রুগ্ন বন্দীদের মুক্তির স্বপ্ন ভাঙ্গাতে এর বেশী কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাকি বন্দীরা করল আত্মসমর্পণ।

অফিসার কমাণ্ডিং কর্ণেল জে, উল্‌ফের চোখে তখনও আগুন জ্বলছে। সেই রাত্রেই তিনি কোর্ট মার্শালের অর্ডার দিলেন। বিচারে হুকুম দিলেন ত্রিশ জন বিদ্রোহীকে তখনই গুলি করে মারবার।

চারিদিকে মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা। কৃষ্ণপক্ষের রহস্যময় জ্যোৎস্নায় ঢাকা ভয়ঙ্কর রাত্রি।

দশজনকে এক সারিতে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল দশটা উদ্যত রাইফেলের সুমুখে।

ফায়ার!

একটি বজ্র কঠিন কণ্ঠের সঙ্গে রাত্রির নিস্তব্ধতা শতচ্ছিন্ন ক'রে রাঙা আগুন ঝলসে উঠল দশটা রাইফেলের কালো নলের মুখে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দশটা মানুষের মরণার্ত্ত চকিত চীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠল রাত্রির বাতাস। শিউরে উঠল বাকি বিদ্রোহীরা। ধূসর পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে গড়িয়ে গেল রক্তের ধারা।

দ্বিতীয়ের পর এবার তৃতীয় আর শেষ দল। কোর্ট মার্শালের রীতি অনুযায়ী কর্ণেলের টেবিলের সুমুখে আগের দলের সকলকে একে একে নিয়ে আসা হল অন্তিম মুহূর্তের বলার আছে। একে একে তারা চলে যেতে লাগল শেষ জানিয়ে। সবার শেষে কর্ণেলের সুমুখে এসে দাঁড়াল এক পাঠান কিশোর।

—কি নাম তোমার ?

—সিরাজুল।

কর্ণেল তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

বছর ষোলোর নীচেই বয়েস। কিন্তু মাথায় যেন উনিশ কুড়ি। মুখ না দেখে বয়স বোঝবার উপায় নেই। দৃপ্ত নির্ভীক। কালো কালো বড়ো চোখে ফুটে উঠেছে গ্রাম্য সরলতা। বাদল দিনের ধানের কচি শীষের মতো নবীন লাবণ্য।

জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের যবনিকা দুলে উঠেছে। আর মুহূর্তমাত্র, তারপর ওই মৃতদেহের স্তূপে পড়ে থাকবে ওর রক্তাক্ত প্রাণহীন, নিস্পন্দ দেহটা।

কর্ণেলের ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হল। হয়ত অকারণেই একবার নত মুখে অধর দংশন করলেন।- কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। শুধু নামে নয়, স্বভাবেও, বুনো নেকড়ের মতোই হিংস্র। দয়া-মায়া-মমতার লেশমাত্রের অস্তিত্বের কথা কেউ ভুলে ও উচ্চারণ করবে না তাঁর সম্বন্ধে। পনেরো বছরের মিলিটারি লাইনে নিজের হাতে কুকুর বেড়ালের মতো গুলি করে মেরেছেন সংখ্যাতীত মানুষকে।

ওর ঠোঁটের কোণে কঠিন হাসির রেখা দেখা দিল। কর্ণেল মাথা তুলে গর্জে উঠলেন ; বললেন, তোমার মৃত্যুর পূর্বের ইচ্ছা জানাতে পার।

পাঠান কিশোর কুর্ণিশ করে খাঁটি পশ্‌তু ভাষায় বললে, আমার সামান্য একটা এবাদত্ (প্রার্থনা) আছে হুজুর।

উপস্থিত সকলে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

নির্ভীক দ্বিধাহীনকণ্ঠে সিরাজুল বললে, আমার মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন ছোটো বেলায়। মানুষ করেছে আমার দাদি। লড়াইয়ে আসবার আগে বুড়ি দাদি আমায় বোসা (চুমা) দিয়ে বলেছিলেন ফিরে গেলে আবার বোসা দেবেন। আমার পথ চেয়ে রয়েছেন দাদি। শুধু তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে একবার ঘরে ফিরে যাব। তাই সময় চাই এক ঘণ্টা। এই আমার শেষ এবাদত্।

একি অদ্ভুত, অসম্ভব হাস্যকর প্রার্থনা! কেউ কি

সশব্দে হেসে উঠলেন মেজর ওসমান আর লেফটেনান্ট জঙ্গ বাহাদুর। ওসমান বললেন, এ শুধু পালাবার মৎলব কর্ণেল।

—"নিশ্চয়, তাছাড়া আর কি। ভেবেছে ওর শয়তানী আমরা বুঝতে পারব না।" আরও অনেকে সায় দিলেন ওসমানের কথায়।

বাস্তবিক, এমন প্রার্থনা মঞ্জুরের প্রশ্নই আসে না। রাইফেলের মুখ থেকে একবার পালিয়ে দুশমন্ আবার নাকি ফিরে আসবে গুলির সুমুখে বুক পেতে দিতে!

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল কুণ্ঠিত সিরাজুল।

সকলে হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠে।

কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিলেন না একজন। তিনি কর্ণেল। টেবিলের ওপর খাটো লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে মেঘ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, তোমার এবাদত্ মঞ্জুর করা হল। জাষ্ট্ এ্যান্ আওয়ার, দেরী না হয়।

মুহূর্তে থমকে গেল সমস্ত মুখের হাসি। কর্ণেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেলেন উপস্থিত সকলে। একি অসম্ভব কাণ্ড করে বসলেন কর্ণেল।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময়—তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল সিরাজুল, পাহাড়ী পথে।

মেজর ওসমান্ শুকনো মুখে বললেন, একি করলেন কর্ণেল!

কর্ণেল নিরুত্তর। নতমুখে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর মন ও যেন পিছু ধাওয়া করল সিরাজুলের। তিনি যেন দেখতে পেলেন, স্তিমিত পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় পাঠান কিশোর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সে পৌঁছল তার জীর্ণ কুটিরে। গভীর নিশীথের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলল তার বৃদ্ধা পিতামহীকে।

কে? কে?

যেন নিজের কানে ডাক শুনেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

সিরাজুল, আমার সিরাজুল, ফিরে এলি ভাই।

ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্না বৃদ্ধা সিরাজুলকে স্পর্শ করবার জন্য কম্পিত হাত বাড়াল। কোথায় ছিলি ভাই এত দিন। বুকের কাছে টেনে নিয়ে নাতির মাথায়, গায়ে বার বার হাত বুলোতে লাগল। আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল বুক।

দাদির কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সিরাজুল তার শীর্ণ গণ্ডে চুম্বন এঁকে দিলে। বললে, সময় নেই, দুশমন্ বন্দী করে মৃত্যুর হুকুম দিয়েছে···তোমার শেষ বোসা দিয়ে দাও দাদি ভাই।

আচম্বিতে শিউরে উঠল বৃদ্ধা। দুর্ব্বল কম্পিত করে নাতির কিশোর মুখখানি তুলে ধরে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। ভুলে গেল কথা বলতে। তারপর থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল সারা অঙ্গ। কিন্তু তখনই নিজেকে সম্বরণ করে সিরাজুলের মুখখানি চোখের সুমুখে নিয়ে অশ্রুজলে গভীর আবেগে ধীরে ধীরে চুম্বন করল।

অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে আশীর্বাদ করল মৃত্যুপথযাত্রীকে। আর তখনই···ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উঠে দাঁড়াল সিরাজুল, —আসি দাদিভাই।

পা বাড়িয়ে ও দুয়ারের কাছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেখল তার মূর্চ্ছিতপ্রায় দাদিকে। পর মুহূর্ত্তেই আবার ছুটে চল্ল নিশুতি রাত্রির নির্জ্জন পথে।

* * * *

কিন্তু শুধুই স্বপ্ন, শুধুই কল্পনা। কর্ণেলের সেই কল্পনার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল মেজর ওসমানের কণ্ঠস্বরে।

কর্ণেল আপনার ঘণ্টা তো শেষ হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে হাসলেন ওসমান; কোথায় সিরাজুল!

তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখলেন কর্ণেল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সময় কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চকিতে মুখ তুলে দেখলেন, উত্তরের পাহাড়ী পথ একেবারে জনশূন্য। কোথায় সিরাজুল। এতক্ষণে বেশ বুঝলেন খেয়ালের বশে কত বড়ো ভুল করে ফেলেছেন। আর এই ভুলের কি খেসারত দিতে হবে তাও তাঁর অজানা নয়। ছিঃ ছিঃ, শেষকালে একটা নেটিভ্ বয়ের বুদ্ধির কাছে পরাজিত হলেন।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কর্ণেল উলফের প্রকাণ্ড লাল মুখটা। রুলটা নিজের হাতের তেলোর ওপরই নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করতে করতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন কর্ণেলের বুদ্ধিভ্রংশতায়।

তাঁরা এবার মনে মনে হাসতে লাগলেন। সকলেই জানতেন—এ বিশ্বাসের কোন অর্থ হয় না। বাঘের থাবা থেকে কোন ক্রমে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়ে শিকার তার মুখে আবার ফিরে আসে—এমন আশ্চর্য্য কথা কেউ কোনোদিন শুনেছে।

মেজর ওসমান বললেন, ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না কর্ণেল। ছোটো ছেলে মনে করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই শয়তানদের চিনতে আমার বাকি নেই। ডাকাতের জাত এরা। পারে না এমন কাজ নেই।

নিরুত্তর অবস্থায় তেমনই পায়চারি করতে লাগলেন কর্ণেল। হ্যারিকেনের ধূসর আলোয় আসন্ন ঝঞ্ঝায় আকাশের মতো মেঘ-থমথমে হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ওসমান পাশাপাশি হাটতে হাটতে বললেন, আমার বেশ মনে হচ্ছে কোর্টমার্শালের খবর পৌছুলে এই রাত্রেই আবার ফ্রেস্ এ্যাটাক সুরু হবে। আমাদের এখনই রেডি হওয়া দরকার কর্ণেল। নতুবা

মেজরের কথা শেষ হলনা। হা-টা দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল। অজ্ঞাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ পলকহীন।

ওসমানের সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন কর্ণেল। সেই সঙ্গে আর সকলেও সচকিতে মুখ তুলে তাকালেন। উত্তরের পাহাড়ের দিক থেকে কি যেন একটা দ্রুত ছুটে আসছে। রুদ্ধ একটা ছায়া মূর্তির মতো।...না, সঙ্গে কেউ নেই, একা।

নির্ব্বাক নিস্পন্দ মানুষগুলোর স্তম্ভিত দৃষ্টির সুমুখে স্থির হয়ে দাঁড়াল সিরাজুল।

কোর্ট মার্শালের সমস্ত সুটিং তখন শেষ হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত নিস্পন্দ দেহগুলো। তারই একেবারে মাঝখানে হাত তুলে দাঁড়াল সিরাজুল। দীর্ঘপথের ক্লান্তিতে তখনও ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে তার বুক। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে জীবনের এক মহাঋণ পরিশোধ করতে।

কিন্তু সিরাজুলের দিকে তাকিয়ে মানুষগুলো যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে। এতক্ষণ সকলে যার প্রতীক্ষা করছিলেন, তাকে সুমুখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।—একি সত্য না স্বপ্ন! বিস্ময়কর নাটকের এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দর্শকের মতো সকলে রুদ্ধশ্বাসে অকস্মাৎ থেমে গেছে। আর ওই পাঠান কিশোরের পায়ের নীচে আচম্বিতে থেমে গেছে মহাকালের রথচক্র।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি ছিল।

আর সকলের সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কর্ণেল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উর্দ্ধবাহু পাঠান বালকের দিকে।

সকলে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন, কর্ণেল কি নিজেই সট্ করবেন নাকি? কিন্তু কই। রিভলভার বার করলেন নাতো!

বরং তুলে নিলেন সিরাজুলের দুটি হাত। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল দুই চোখ। গভীর আবিষ্ট কণ্ঠে বললেন, মরণ (মরণ) আজ তোমার কাছে সরমে নীচু করেছে সিরাজুল। তোমার মরণ নেই। আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমার দিদার কাছে ফিরে যাও ভাই।

সিরাজুল নির্ব্বোধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কর্ণেলের মুখের দিকে।

সকলে নির্ব্বাক। এতবড়ো জাঁদরেল মিলিটারি অফিসারের বুকে এমন দুর্ব্বলতা লুকিয়ে ছিল কে জানত! এমন খাম-খেয়ালী জাত আর দুটো নেই দুনিয়ায়।

রাণুর দাদু থামলেন।

ছাদের ওপর অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। মাথার ওপর কালো আকাশে দপ্ দপ্ করতে লাগল অসংখ্য নক্ষত্র। কথা নেই। রাণুর দাদুর সঙ্গে যেন সমস্ত পৃথিবীটাও থেমে গেছে।

—দাদু? কোলে মুখরেখে স্বপন ডাকল।

—কি ভাই?

—তোমার রিভলভারটা আমি নিয়েছিলুম।

দুরন্ত বিস্ময়ে সমস্ত চোখগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

স্বপন কোলে মুখ লুকিয়ে বলতে লাগল, পাখীমারব বলে ওটা নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আবার চুপি চুপি রেখে দেব। কিন্তু সবাই মিলে এমন ভয় দেখিয়ে দিলে যে

আর বলতে হবেনা ভাই, সব বুঝেছি।

দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

বাথিত হয়ে পড়েন। কেমন ক'জন পারে—ক'জন, সত্যি ক'জন।

বন্ধুরা অনেক বলেন, একটু হিসেব নিকেশ করে দানধ্যান করো। একটা ছকে আঁকা ভালো।' কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, এমনও দিন গেছে যেদিন তিনি সব বিলিয়ে দিয়ে। তাইতো সহকর্মিরা এরকমের কথা বলেন।

দেশবন্ধু কি সেদিকে কান দেন? এর টাকা ঠিক মাথাব্যথা নেই। শুভক্ষণ আছে তক্ষণ দান। দেশবন্ধু বলেন, আরে বাপু কে কাকে কতটা দিতে পারে?'

সত্যিই তো কে কাকে কতটা দিতে পারে। সে তত্ত্ব যে চিত্তরঞ্জনের চিত্ত উপলব্ধি করেছে। দানের মাধুর্য যে তিনি অনুভব করেছেন। দান কি বাপু ঢাক ঢোল পিটিয়ে নাম কেনার জন্য?

দান বিচার নেই! দানের কাছে। তিনি চাইতে পারেন তারই হাতের ওপর নিজের হাত উপুড় করে দেন। যতটা দরকার। কেন সে প্রশ্ন নেই। বন্ধুরা কথা তুলেছেন। বললেন, দেখো বাপু, দেবে দাও—কিন্তু পাত্রাপাত্রী বিবেচনা করে, চোর-জোচ্চোর দেখে।

তা শোনেন না তিনি। বলেন, দেখো—দরকার না হলে কেউ আসে না। হাত পাততে পারে না। এসেছে এই যথেষ্ট। প্রয়োজন না হলে কি কেউ আসে?

এই দুর্বল সুযোগ তো কত' জনে গ্রহণ করে। বুঝতে কি তিনি পারেন না, সব পারেন। পারিষদের মানুষ। মুখ দেখলে লোক চেনেন।

তবু মনে তো সেই দাগ পুঁতেছেন।

কিন্তু এও তো তৃপ্তি। দান করে সুখ। দানের আনন্দ বুঝেছেন চিত্তরঞ্জন। 'যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।' চিত্তরঞ্জনও বলেন সে কথা। সত্যিই তো তাই, সত্যি তাই। বিশ্বাস করো। তাহলে সত্যিই তাই।

কতো, কতো লোক আসতেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। দু' চাইলে দিয়েছেন পাঁচ, পাঁচ চাইলে দশ। অপ্রত্যাশিত দান পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে চলে যেতেন প্রার্থীরা। এমনি কতো দিন, কতো কতজন।

সে হিসেব নেই। গুণে শেষ করা যায়না এমনি অনেক। কতো কতো দিন, কত জন। কতো ঘটনা। আরে বাপু লিখে রেখে কি দান হয়, না কখনো কেউ লোককে দিতে পারে' - অনেকদিন বলেছেন চিত্তরঞ্জন।

সত্যিই তো প্রেম-লুকিয়ে দান তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য। দরকার, বাস! চাইলে আরো বেশী দিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা দিলে আরও মেলে।

এমনি একদিন। ঢাকার ও ময়মনসিংহের ঘটনা। অনেক বছর আগে। চিত্তরঞ্জন তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর দর্শন-প্রার্থী হলেন।

কারণ সহজ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসেছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত। দায়গ্রস্তই। তাইতো দেশবন্ধুর শরণাপন্ন। সাহায্য চেয়েছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তার ওপর কন্যাদায়গ্রস্ত। বাস! দানের আনন্দে চিত্তরঞ্জনের চিত্ত উঠলো নেচে। চেক বই খুলে লিখে দিলেন হাজার টাকা। একের পিঠে তিন শূন্য।

অনেক টাকা তো। সেই পরিচিত বন্ধুটি অবাক হয়ে গেলেন। মনে ভাবলেন চিত্তরঞ্জন বুঝি ভুল করেছেন। একশ লিখতে যেয়ে হাজার লিখে বসেছেন। একের পিঠে দুটো শূন্য দিতে গিয়ে তিনটে দিয়েছেন।

বললেন সেই কথা চিত্তরঞ্জনকে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বললেন, না না ঠিকই দিয়েছি। জেনেই দিয়েছি চেক।

'আশ্চর্য, এতোগুলো টাকা এক সাথে কেউ দিতে পারে?' দিতে পারে কি, দিলেনই তো।'—সেই পরিচিত ভদ্রলোক একথা ভাবতে থাকেন। তাই আবার বলেন, 'তাহলে কিন্তু মশাই সারাজীবন খেটেখুটে মরবেন। এতো দিলে থাকবে কি। শুধু খাটুনিই সার হবে।'

'ভদ্রলোক!' চিত্তরঞ্জন বললেন, 'দেখুন মশাই কে কাকে দিতে পারে। সবই ঈশ্বর করেন। তিনি দেন বলেই তো আমি দিতে পারি। এজন্যে আপনি ভাববেন না, সব আবার আসবে। এসে থাকে যে।'

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। কিছুক্ষণ যায়, সেই দিনই চিঠি তার আসে দেশবন্ধুর নামে যে তিনি কোনও এক মামলায় দৈনিক দেড় হাজার টাকা ফি-হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। সে কথা তিনি সেই ভদ্রলোককে বললেন। দেখলেন তো—দেবার মালিক কে?'

সত্যিই তো ভদ্রলোক নিজের চোখে দেখলেন। আকুল বিস্ময়ে।

এমনি কতো। আশ্চর্য বিশ্বাস কিন্তু দেশবন্ধুর। 'যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।'

সত্যিই তো, সে কথা ঠিক। দেশের বন্ধু দেশবন্ধু সে কথা বহুবার বলেছেন। তাইতো তাঁর দানের পাথারে কার্পণ্যের ভাটা কখনো পড়েনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেশবন্ধু একালের এক আশ্চর্য দাতা। সত্যিই আশ্চর্য, আশ্চর্য দরদী দেশবন্ধু।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিত পর)

পরবর্তী পাঁচশো বছরে বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরে বৈদেশিক শব্দ কিছু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করেছে। কিন্তু তার জোরে বর্তমান বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের মোট অনুপাত যা, ৭৪ : ৫৬, তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন বা চর্যাগীতিকার অনুপাতের অতখানি পার্থক্য মাত্র সময়ের স্বাভাবিক সহযোগিতা পেয়ে কখনই সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে, বিশেষত উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ঐকান্তিক প্রয়াসে বাংলা গদ্যভাষা সমগ্র বাংলাভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে তৎসম শব্দ বহুল হয়ে ওঠে। The Origin and Development of the Bengali Lauguage গ্রন্থে আচার্য সুনীতি কুমার ২১৮-২২৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় যে-হিসাব দেখিয়েছেন, তার উপর ভিত্তি ক'রে বাংলা গদ্যভাষার শব্দ প্রবণতার প্রকৃতি-নির্ণয় করলে দেখা যায়, চর্যাগীতির ভাষা বা হাজার বছর আগের ভাষার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষা বা পাঁচশো বছর আগের ভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত অন্তত আড়াই গুণ বেশি। আবার, আরও পাঁচশো বছর পরে এখনকার প্রমথ চৌধুরীর তথাকথিত বীরবলি ভাষাতে, যিনি তৎসম শব্দের বহুলতা মোটেই পছন্দ করতেন না সেই তাঁর ফার্সিবহুল "রায়তের কথা" প্রবন্ধের ভাষাতে, তৎসম শব্দের অনুপাত অন্তত আরও দ্বিগুণ বেশি। অর্থাৎ :চর্যাপদের তুলনায় বীরবলের ভাষাতেই অন্তত সাড়ে পাঁচগুণ বেশি তৎসম শব্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা কথ্যভাষায় প্রবন্ধেও অন্তত আট গুণ বেশি তৎসম শব্দের প্রচলন দেখা যায়। আর উনিশ শতকের গোড়ার অবস্থা যখন চর্যাগীতিকার যুগের ঠিক বিপরীত, যখন অতিরিক্ত সংস্কৃতানুরাগ দেখা দিয়েছে, তখন তারাশঙ্কর তর্করত্নের রচনায় অন্তত তেরো গুণ বেশি তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—দুটির ভাষাই পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও একটিতে তৎসম শব্দের অনুপাত শতকরা পাঁচ, অপরটিতে শতকরা সাড়ে বারো। দুটির মধ্যে উর্ধ্বপক্ষে আনুমানিক পাঁচশো বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে বর্মণ ও সেন রাজবংশের প্রভাবই ভাষায় তৎসম শব্দের হার বৃদ্ধির কারণ। আমরা সেন আমলের বাংলা গদ্য-পদ্যের নমুনা কিছুই পাই না। যদি জয়দেবের সমকালীন বাংলা রচনা কিছু পাওয়া যেত তাহলে হয়ত তাতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুথির চেয়েও বেশি তৎসম শব্দ দেখা যেত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নিশ্চয়ই তুর্কি আমলে লেখা ; কিন্তু সেন আমলের সংস্কৃত প্রভাবের জের তখনও বর্তমান থাকার কথা এবং তুর্কি প্রভাব বাংলা ভাষায় রাতারাতি এসে পড়েনি। তাই ঐ গ্রন্থে আমরা ১২'৫% তৎসম শব্দ পেলেও আরবি-ফার্সিমূলক শব্দ খুব কম পাই। নবদ্বীপের সন্নিকটে প্রচলিত বাংলা গদ্যে লক্ষ্মণ সেনের আমলে নিশ্চয়ই তৎসম শব্দের হার খুব উঁচু ছিল। কিন্তু পশ্চিম রাঢ়ে যেখানে বড়ু চণ্ডীদাস কাব্য রচনা করেন সেখানে সংস্কৃত প্রভাব খুব বেশি হওয়া শক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পরের যুগে, উত্থান-পতন-বন্ধুর বাংলাদেশে, প্রধানত ইসলামি শাসনের আমলে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব কতকটা স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। সেন-আমল বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সময়ের মতো ক্রমবর্ধমান আধিপত্য অর্জনের কাল সংস্কৃত ভাষার ভাগ্যে আর আসেনি এবং বাংলা ভাষাকে এই সময়ে ফার্সি শব্দ সম্ভারের আধিপত্যের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। কাব্যে তত না হলেও গদ্যে ফার্সি প্রভাব খুবই দেখা গিয়েছিল। বিশেষত, অসাহিত্যিক দৈনন্দিন কাজকর্মে, মামলা-মোকদ্দমা, দলিল-দস্তাবেজ, জমিদারীর কাগজপত্র, চিঠি-লেখা, ইস্তাহার জারি করা প্রভৃতি ব্যাপারে ফার্সি বহুল বাংলা গদ্যের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ইসলামি শাসনে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষার অনুপাতে ঐ গ্রন্থের রচনাকালের পরবর্তী চারশো বছরে, অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে, বহু লিপিকর ও সংশোধকের উনিশ শতকীয় হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, তৎসম শব্দের হার বেড়ে গিয়েছিল মাত্র শতকরা ২০।২৫ ভাগ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রয়াসে মাত্র ৩০।৩৫ বছরের মধ্যেই ইংরেজ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠার আমলে তৎসম শব্দের হার শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তৎসম শব্দের বৃদ্ধির যে হার লক্ষ্য করা যায় তারও খানিকটা এই সময়ের পুঁথি-নকলকারী-লিপিকর ও সংশোধকদের হস্তক্ষেপের ফল। এই সময় মধ্যযুগীয় ফার্সি ব্যবহার-

প্রবণতাও প্রায় লুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়। দৈনন্দিন কাজকর্মে সেজন্তেই এখন ফার্সি শব্দাবলীর প্রভাব অকিঞ্চিৎকর।

বাঙালিদের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়দের মতো পথিকৃৎদের চেষ্টায় কথ্য বাংলা গদ্যের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় আড়ষ্ট গদ্যভঙ্গিমা, নিষ্প্রাণ রচনারীতি ও তৎসম শব্দ বাহুল্য অনেক ক'মে গেল। যে সমস্ত প্রভাব ভাষার স্বাভাবিক গঠনপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না সে-সব বাইরে থেকে রাজশক্তি জোর ক'রে চাপিয়ে দিলেও বেশিদিন বজায় থাকে না। তৎসম শব্দ একেবারে বর্জনীয় নয় বটে কিন্তু তার আধিক্যও খুব বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলা ভাষা প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ায় তার বাহুল্য যে কিভাবে ক'মে গেল একটা সামান্ত হিসাব থেকে তা বোঝা যায়। চর্যাপদে তৎসম শব্দাবলী ৫%, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে ১২.৫% এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নে ৬৭%; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"-র মাত্র ২২%। একটিও তৎসম শব্দের আশ্রয় না নিয়ে বাংলায় গদ্যরচনা এখনও সম্ভবপর হয়নি বটে কিন্তু এমন কথ্য গদ্যে রচনা করা বাংলার এখন খুবই সম্ভব—যাতে প্রায় চর্যাপদের মতো কম পরিমাণে তৎসম শব্দ থাকবে।

বাংলা ভাষা তথা গদ্যভাষার শব্দ-প্রবণতার স্বরূপই এই যে, যখনই দেশে একটা জাতীয়ভাবের জাগরণ এসেছে তখনই কথ্যভাষার উপর জোর দিয়ে দেশি, তদ্ভব প্রভৃতি খাঁটি বাংলা শব্দের প্রচলন বাড়ানো হয়েছে। দেশের তৎকালীন গণ-জাগরণ, বিপ্লব, স্বাধীনতা-প্রিয় শক্তিসমূহ এই প্রয়াসে জোর দিয়ে একে জয়যুক্ত ও সাফল্য-মণ্ডিত করেছে, পাল রাজত্বের প্রাক্-কালে এই কারণেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়; অপভ্রংশের উপভাষা-অবস্থা থেকে সে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার মর্যাদা লাভ করে। আবার যখনই দেশে জাতীয় ভাব হ্রাস পেয়ে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে কেন্দ্রাভিমুখ শক্তি সমূহ বলবতী হয়ে উঠেছে তখনই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত বা ফার্সি ভাষার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা দেখা গেছে। এইজন্তেই সেন আমলে সংস্কৃতের ও মোগল আমলে ফার্সির অবাঞ্ছনীয় উৎপাত বাংলা ভাষাকে সইতে হয়েছে। ইংরেজ আমলেও গোড়ার দিকে পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যকে একটা গুরুগম্ভীর, গাঢ়বন্ধ, তৎসম শব্দকণ্টকিত সর্বভারতীয় সংস্কৃতানুগ-রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম লীগের সমর্থকরাও একদা বাঙালি মুসলমানের ভাষাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ফার্সি শব্দের বোঝা বহন করাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রের মতো একটি বহুভাষিক রাষ্ট্রেও দেখা যায়, তথাকথিত মহাজাতি গঠনের লোভে স্বভাবত পৃথক ও স্বাতন্ত্র্যের বোধে উদ্বুদ্ধ ভাষাগুলিকে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের শক্তিশালী বিকাশ-প্রেরণায় উৎসাহিত করার পরিবর্তে একটি কেন্দ্রাভিমুখ সাম্রাজ্যিক প্রবণতায় সংহত ও আবদ্ধ করার উৎকট প্রয়াস চলেছে। মহাজাতিত্ব-লোলুপ শক্তিপুঞ্জ নিজেদের স্বার্থেই সর্বভাষাকে সংস্কৃতানুগ করবার চেষ্টা করবে, এটা অসঙ্গত হলেও স্বাভাবিক। এক সময় লাতিন ভাষাকে অবলম্বন ক'রে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছে এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। একদিকে খাঁটি বাংলা অ-তৎসম শব্দ সম্ভারের প্রয়োগ-সাধনা, অন্যদিকে প্রচুরতম তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত পরিভাষায় বাংলা ভাষাকে ঢেলে সাজবার উৎকট প্রয়াস; দুয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা ভাষা ও তার গদ্য রচনা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির অপরূপ সংশ্লেষণ-সাধন ক'রে। বাংলা গদ্যভাষা নিজের খাত কেটে নিজের পথ তৈরি ক'রে তার প্রাণ-প্রবাহিনী বহন ক'রে নিয়ে চলেছে চরমতম সামঞ্জস্যের সাগর-সঙ্গম অভিমুখে।

এখন থেকে প্রায় চারশো বছর আগে থেকে বাংলা গদ্যের স্পষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সেই সব নমুনা থেকে বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তন-বিষয়ক আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হবে। এই সব অধ্যায়ে ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসরণ ক'রে বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণের সময় আমরা বিভিন্ন স্তরের রচনারীতি, সাহিত্যিক প্রেরণা, ভাষাগত উপাদানের তারতম্য—এই সব দিক থেকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে বাংলা গদ্য রচনা সমূহের বিচার করব।

আলোচনার সুবিধার জন্তে ঐতিহাসিক নিদর্শন বিশিষ্ট সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্য ও রচনাবলীকে সময়ের দিক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক অধ্যায়ে এক ভাগের আলোচনা করা হবে। পাঁচটি কাল-বিভাগ এইরকম:—

প্রথম অধ্যায়: ১৫৫৫—১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ; খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যরচনার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিদর্শন সমূহ;

দ্বিতীয় অধ্যায়:—১৬৭৫—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ; বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচনার উপযোগী ভাষা-গঠন ও পাদ্রিদের প্রচেষ্টা;

তৃতীয় অধ্যায়: ১৭৭৮—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ: ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও ও বৈদেশিক সরকারের আনুকূল্য;

চতুর্থ অধ্যায়: ১৮১৫—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ: বাংলা গদ্যের রাজ্যে প্রধান পথিকৃৎ চতুষ্টয়ের প্রয়াস ও সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের ধারার পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্টি;

পঞ্চম অধ্যায়: ১৮৭২—বর্তমান কাল: বাংলা গদ্যের মূল ধারার উদ্ভবের পর সর্বপ্রথম সামঞ্জস্যের সন্ধান-লাভ ও শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক-দের মহা সাধনা।

প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত সব ক'টি পর্বের রচনা পরীক্ষা ক'রে কোন্ ধারায় বাংলা গদ্য তার সার্থকতম পরিণতি লাভ করবে, তা সহজেই বোঝা যাবে। ইতিমধ্যে অনুমানের কুয়াসায় ঢাকা বাংলা গদ্যের উষালগ্ন আমরা অতিক্রম ক'রে গেলাম।

প্রথম অধ্যায়

(১৫৫৫-১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কামতার রাজা আহোম-রাজকে একটি চিঠি লিখে

দৃষ্টান্ত। এটি থেকে বাংলা গদ্য ভাষার ষোড়শ শতাব্দীর রূপ যে কেমন ছিল, তা বোঝা যায়। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের আমলের আনুমানিক গদ্য ভাষার তুলনায় এই চিঠির ভাষার পরিণতি দেখে বোঝা যায়, প্রথম উদ্ভবের পরবর্তী ছ'সাতশো বছরে বাংলা গদ্যের অগ্রগতি কি গতিবেগ নিয়ে বিভ্রমান ছিল। প্রথমে মূল চিঠিখানির ভাষা দেখা যাক :—

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ-গোট কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুমা সর্দার, উদ্ভণ্ড চাউনিয়া, শ্যামরাই, ইমরাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকিল সঙ্গে ঘুড়ি ২, ধনু, ১, চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর, বালিচ ১, জকাই ১, সারি ৫ থান, এই সকল দিয়া গইছে। আর সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১, ছিট ৫, ঘাগরি ১০, কৃষ্ণচামর ২০, শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭, মাস আষাঢ়।"

এই চিঠির ভাষার সঙ্গে যদি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, লোক ব্যবহারে যে-গদ্য বেশ শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছিল, আড়াই শো বছর পরে পণ্ডিতবর্গ অতিরিক্ত তৎসম শব্দ, জটিল সমাস ও আড়ষ্ট রচনারীতি প্রয়োগ করে তাকে খানিকটা পঙ্গু করে দিয়েছিলেন; ভাষার সজীবতার দিক থেকে বিচার করলে মোটেই এগিয়ে দিতে পারেন নি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, কেবল শব্দ ভাণ্ডারের উপর ভাষার চরমোৎকর্ষ নির্ভরশীল নয়। তৎসম শব্দ শুনতে তো ভালোই; শ্রুতি-মাধুর্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য উভয় গুণেই সে তদ্ভব, ভগ্ন-তৎসম ও দেশজ শব্দাবলীকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু রচনার প্রাণ হচ্ছে সজীবতা। লেখক যদি তাঁর রচনাকে প্রাণের আবেগে স্পন্দিত, হৃদয়ের তাপে উত্তপ্ত, বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর এবং সর্বোপরি অন্তরাত্মার মর্মকথায় বাঙ্ময় করে তুলে একটি পূর্ণ পরিণত সচেতন সত্তায় রূপান্তরিত করতে না পারেন, যদি লেখার গুণে পাঠকের মনে না হয় যে, সে সজীব মানুষের সান্নিধ্য পাচ্ছে, যদি সে অনুভব না করে যে, লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে সে রক্তমাংসের দেহের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করছে, অপরের প্রাণোল্লাস তার নিজের রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে, অন্যের ঘরোয়া কথা তার নিজ হৃদয়ের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তাহলে লেখকের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেদিক থেকে দেখলে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রাপ্ত গদ্য রচনার নমুনাগুলি মুখ্যত অসাহিত্যিক হলেও গদ্য ভাষা গঠনের কাজে যতটা সার্থক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-দের রচনাবলীর অনেকাংশ সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও ততটা সফল নয়। সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত প্রয়োগের পক্ষপাতী পণ্ডিতবর্গকে মধুসূদনের অভিমত উদ্ধৃত করে "Barren Rascals" বললে ভুল হয় না এই জন্যে যে, ১৮০০-১৮৫০ সাল, এই ৫০ বছর কাল তাঁরা বাংলা গদ্য সৃষ্টি শক্তিকে প্রায় বন্ধ্যা করে রেখেছিলেন; তাঁদের রচনারীতিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

কামতারাজের চিঠির ভাষার সরল শক্তিমত্তার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত ভাষার নির্জীবতার কোন তুলনা চলে না। তার কারণ, কামতারাজের চিঠির ভাষায় চলতি ভাষা ও স্বাভাবিক কথা বলার ভাষার কিছু কিছু প্রয়োগ-ভঙ্গি দেখা যায়। "না কর তাক আপনে জান" ধরণের প্রয়োগ রচনায় সজীবতা এনেছে। আধুনিক কালের কথ্য ভাষায় ঐ চিঠির রূপ যা হবে তার সাধুরূপের সঙ্গে মূল চিঠির ভাষার খুব বেশি পার্থক্য নেই। চিঠিটি মোটামুটি এখনকার সাধুভাষার গদ্যেই লেখা। সেজন্যে চিঠিটির প্রাচীনতার প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সংশয় আসে। সম্প্রতি এক বেতার-আলোচনায় জনৈক সাহিত্যিক আরও পুরোনো এক বাংলা চিঠি পাওয়ার দাবি প্রচার করেন এবং সেটি পড়ে শোনান। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে ঐ সব চিঠির প্রাচীনত্ব মেনে নেওয়া শক্ত।

সাহিত্যিক সহযোগিতা না পেলেও চারশো বছর আগেই বাংলা গদ্য যথেষ্ট প্রাণশক্তি আহরণ করেছিল ঐ সব চিঠি পত্রের ভিতর দিয়েই, তাতে ভুল নেই। এই সব চিঠির আড়ালে ছিল সৃষ্টিসমর্থ সজীব মন। গত চারশো বছরের বাংলা গদ্য রচনার উৎকর্ষের তারতম্য যুগে যুগে নির্ভর করেছে ঐ সৃষ্টি সামর্থ্যের উপর, কেবল শব্দ ভাণ্ডারের উপাদান-তারতম্যের উপর নয়। গদ্য রচনার প্রগতি, উন্নতি, অবনতি, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করতে হলে শাব্দিক উপাদান ছাড়াও ভাষার বিন্যাসরীতির পরিবর্তন ও সৃষ্টি প্রেরণার পার্থক্যও আলোচনা করে দেখতে হবে।

কামতারাজের চিঠির সমসাময়িক কালে অসমিয়া ভাষা বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তা প্রকৃতপক্ষে বাংলার একটি উপভাষা মাত্র। সুতরাং কামতারাজের চিঠির উত্তরে আহোমরাজ যে-উত্তর দেন, সে-চিঠির ভাষাকেও বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলা যায়। ১৫৫৫-৫৬ সালের কামতা-আহোম রাজকীয় পত্রবিনিময় ঐতিহাসিক হিসাবে বাংলা গদ্যের প্রকৃত প্রথম নিদর্শন। তা ছাড়া আমরা ১৫৬৮ সালের আগেকার বাংলা গদ্যের সদৃশ ব্রজবুলি গদ্যের নমুনা পাই। তার ঠিক সময় নির্ণয় করা যায় নি। হয়ত তা ১৫৫৫ সালের আগেও লেখা হয়ে থাকতে পারে। তবে খুব বেশি আগের লেখা হওয়ার কথা নয়। তারপর ১৬২০-১৬৫৭ সালের মধ্যে লেখা নেওয়ারি গদ্যের নিদর্শনও আমাদের হাতে এসেছে, যার সাহায্যে তৎকালীন বাংলা গদ্যের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাংলা গদ্যসংক্রান্ত প্রয়াস আরম্ভ হবার আগেই আমরা উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, নেপালি প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দ্বারা অনুপক্রান্ত অঞ্চলগুলি থেকে আহৃত বাংলা বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাষায় রচিত গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাই। যথাক্রমে সেগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায়, আধুনিক মনের

স্বাভাবিক ভাষা যে গদ্য, এই সত্যের ক্ষীণ উপলব্ধি ষোড়শ শতকেই বাঙালি সাহিত্যিকের মনে এসেছিল। তা না হলে একটা সাহিত্য-গোষ্ঠীর নেতা স্বনামধন্য শঙ্করদেব তাঁর রচনার গদ্য ভাষার ব্যবহারে উদ্যোগী হতেন না।

কিন্তু গদ্যরচনার সৃষ্টিযজ্ঞের হোমাগ্নিতে বাঙালি কবিপ্রতিভার পবিত্র হবি উৎসর্গ করার সময় তখনও হয়নি। সেই জন্যে পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার জন্যে পোর্তুগীস পাদ্রিদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের গঠনের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ আবির্ভূত হল। কোন জাতি নিজে থেকে বৈদেশিক দীপ-দান তার অনির্বাণ সাফল্য-শিখা জ্বালিয়ে দিতে পারে না। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের বারবার সেই শিক্ষাই দেয়।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়, খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাব ও প্রয়াস সুরু হবার আগে স্বাভাবিক প্রেরণায় দেশের মাটিতে বাঙালির নিজের চেষ্টায় যে বাংলা গদ্য দেখা দিয়েছিল, তার মূল প্রবণতা কোন্ দিকে। একদিকে দেখা গেছে ১৬৭৫ সালের আগের সেই বাংলা গদ্যের আড়ালে আছে সুস্থ সজীব মন, যা সাহিত্যিক প্রেরণায় তেমন সমৃদ্ধ হলেও সাবলীল ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে যথা: কুচবিহার—আহোম রাজ-দরবারের পত্রের ভাষা। অন্যদিকে দেখা যায়, বাঙালির লেখা বাংলা গদ্যে তৎসম এবং অতৎসম শব্দের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে; তখনও সে-সমন্বয় সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ নয়, বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা-মিশ্রণ তখনও সুসমঞ্জস নয়; কিন্তু বাঙালির প্রতিভা যেন তখনই নিজের অন্তরাত্মায় প্রকৃত সামঞ্জস্যের বাণীটি ধরতে পেরেছে, তার হৃৎপুরুষ সত্য তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছে।

১৫৫৫ সালের চিঠিটির ভাষায় দেখা যায়, বহুসংখ্যক তৎসম শব্দ তদ্ভব ও দেশি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। জিনিসপত্রের নাম লৌকিক অতিপরিচিত শব্দাবলীর দ্বারা এমন কি কথ্য গ্রাম্য উপভাষায় দেওয়া হয়েছে। হৃদয়াবেগ রাজকীয় গাম্ভীর্যের কঠিন সীমার বাঁধন প'রে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেনি। এর উত্তরে ১৫৫৬ সালে যে চিঠি খানি লেখা হয় তাতে যদিও ঐ হৃদয়াবেগ মিশ্রিত আবেদন কোনও উৎসাহ-উদ্দীপক সাড়া পায়নি, তবু তাতেও রাজমর্যাদা ও উষ্মা প্রকটনের উদ্দেশ্যে তৎসম শব্দগুলির সাহায্য নেওয়া ছাড়া সংস্কৃতের আশ্রয় পরিহার করা হয়েছে। ঐ তৎসম-ব্যবহার গদ্যভাষাকে ক্ষুণ্ন না করে বরং শক্তি-শালী করেছে। অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় তৎসম শব্দ-ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কেবল তদ্ভব শব্দ ব্যবহারে ঐ চিঠি দুখানি এত শক্তিশালী হত কিনা সন্দেহ।

আহোম-রাজের পত্র আলোচনা করলে মনে হয়, অসমিয়া ভাষার স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ষোড়শ শতকের শেষার্ধেও দেখা যায় নি। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, ষোড়শ শতকের কামরূপ-সাহিত্যের ভাষা পুরোপুরি উত্তরপূর্ব বঙ্গের কথ্যভাষা। আহোম-রাজের চিঠিটি এইরকম:—

"লিখনং কার্যঞ্চ অত্র কুশল। তোমার কুশলবার্তা শুনিয়া পরমা-প্যায়িত হৈলো। আর যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অঙ্কুরিত সেয়ে তোমার আমার আপ্যায়িতে বৃদ্ধিক পায়া ফলিত পুষ্পিত হৈবার খান বি কহিছ ই-গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীতি-গোট বি হত হন্তে ঘটিছে সমস্তে জান। সেইরূপ মর্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কি সক ন-হৈব। আমরা পূর্ব অভিপ্রায়তে আছি। আর উকিলর সঙ্গে যি-সকল দ্রব্য পাঠাইছিলা ই-সকল সভাত দেখাইবার উচিত ন-হয়, কি যি-সকলে যি-হক আচরি থাকে, অনীতি হইলেও আচরনীয়ক লৈ তাকে নীতিস্বরূপ দেখে, এতেকে দিবার পোবা, আর সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত প্রবর্তনীয় লোকর দ্বারায়ে যি বুজ্জবা গৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীদামোদর শর্মাক পাঠাবো গৈছে। এমরার মুখে সকল সমাচার বুঝিবা। তোমার অর্থে সন্দেস নড়া কাপোর ২ থান, গজদন্ত ৪, গান্ঠিয়ন ২, মোনা পঁহুছব। শক ১৪৭৮, মাস আহার, দিন ১০।"

বাংলা ৯৬৩ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখে লিখিত এই চিঠির ভাষায় কিছু কিছু অসমিয়া বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি বাদদিলে পত্রের ভাষা কামতার রাজার চিঠির মতোই সুবোধ্য। অনুবাদ করে না দিলেও চারশো বছর আগে লেখা এই চিঠি দুটি আজকের দিনের আধুনিক বাংলা ভাষী যে কোন বাঙালিই বুঝতে পারবেন। কিন্তু এরই সওয়া দুশো বছর পরে লেখা তথাকথিত খাঁটি বাঙালির হাতের খাঁটি বাংলা চিঠিও ভাষার অপগতির জন্যে এমন দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে যে, বিনা অনুবাদে এখনকার বাঙালি পাঠক তার মানে বুঝতে পারবে না। তাছাড়া আহোম-রাজের পত্রের ভাষায় যে নরম-গরম মনোভাব সুতীব্র শ্লেষের ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়েছে তার মতো প্রাণবান্ কোন জীবনস্পন্দনের চিহ্ন-মাত্রও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের বাংলা পত্রাবলীতে নেই। এই চিঠির ভাষা যদি অবাধে পূর্ববৎ অগ্রগতির পথে প্রবাহিত হত, তা হলে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার প্রবর্তনা দেখতে পেতাম।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালির চিঠিপত্রে পারসিক শব্দভাণ্ডারের আবর্জনা জমা হতে লাগ্‌ল। বাংলা ভাষার লাগ-সই ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলে কত যে সুখপাঠ্য রচনার উদ্ভব হতে পারে আধুনিক কালে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষা। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় হাশ্‌মৎ-বিরচিত রচনাবলী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন ফার্সিমিশ্র বাংলা গদ্য কত সুস্বাদু। কিন্তু অতঃপর উদ্ধৃত পত্রখানির ভাষা আলি সাহেব ও হাশ্‌মতের ভাষা থেকে কত যে দূরে, তা বর্ণনা না করে কেবল বুঝবার বিষয়:—

"পূর্বে বাঙ্গালাতে ও নাসার মলুকে বহুৎ তেজারত হইত, হিন্দু মোসলমান লোক তেজারত জন্যে যাইত, আসিত, তেজারত করিত। কথদিন হইল লাড়াই ভিড়াই কারণ মহাজন লোক যাতায়াতে মশ্‌কিল হইয়াছে। শ্রীশ্রীদেবধর্মলামা: রিম্পোছে সহিত শ্রীযুত ৺কম্পনি সঙ্গে মনের সহিত দোস্তি হইয়াছে, সেমতে দো-তরফা লিখাপড়া হইয়াছে যে, দেবরাজ হিন্দু মোসলমান লোক আসিতে, যাইতে, তেজারত করিতে

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরুহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে—খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল—আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

কোন আটক করিবেন না ; তাহারা চন্দন, নীল, গুগুল, সাবন, পান, সুপারি নিতে পারিবেক না ; এঙ্গরাজ ফেরঙ্গী মহাজন লোক উপরে যাইতে না পারে ; বাঙ্গালাতে ভোটান্তের যে লোক ঘোড়া ও গররহ আনিয়া খরিদ ফরক্ত করিবেক, তাহার হাসিল মাশুল দোতরপী নাহি। এ দফাতে আমিহ করার লিখিয়া দিতেছি, এহিমত আমলে আসিবেক, কোনমতে তফাওত হবেক না। ইতি সন ২৬৯ দুই শও উনসত্তরি মোতাবেক সন ১১৮৫ পঁচাশি বাঙ্গালা তারিখ ৯ নও পৌষ মোঃ কৈলকাত্তা।"

এই চিঠিটি আচার্য সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়-সম্পাদিত "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন" থেকে উদ্ধৃত। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা মূলপত্রের বানানগুলি জায়গায় জায়গায় একটু বদলে দিয়েছি বটে কিন্তু ভাষার কোন হস্তক্ষেপ করিনি। এই চিঠিটি ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা। এর ভাষার ফার্সি শব্দের যে-বাহুল্য দেখা যাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকে এদেশে ব্রিটিশ শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্‌কালে চিঠিপত্রে ফার্সি শব্দের আধিক্য অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধিতে ভাষা লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠেনি। অনাবশ্যক বৈদেশিক শব্দের চাপে ভাষার লালিত্য বিনষ্ট, তার স্বাজাত্য ও স্বধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মোট কথা, ভাষার গরিমা কেবল শব্দ উপাদানের উপর নির্ভর করে না বলেই ভাষা সংস্কৃত শব্দ বাড়ালেই মহিমোজ্জ্বল হবে, আর ফার্সি শব্দ বাড়লেই লজ্জায় ক্ষীণ প্রভ হয়ে পড়বে কিম্বা তৎসম শব্দভারে অল্পেই পীড়িত হবে আর "যাবনী-মিশাল" শব্দ সম্ভারে সুসজ্জিত হলেই ময়ূরপঙ্খী তরণীতে পাল তুলে তরতর্ করে ভেসে চলবে, এমন মোটেই নয়। আসল কথা, সাহিত্যিকের সৃষ্টি প্রেরণা ভাষারও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ প্রেরণাকে সজীব মূর্তি দেবার জন্যে সাহিত্যিক যে কোন শব্দ-উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। বিশেষ কোন জাতের শব্দের আধিক্য-বা অল্পতার উপরে ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ খানিকটা নির্ভর করে ; ভাষার একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে যার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শব্দ-উপাদান নেওয়া চলে না ; কিন্তু সীমারেখা অঙ্কনের ভার অর্পিত হবে প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের উপর। কোন্ শব্দ গ্রহণীয় তার মাপকাঠি সাহিত্যের সার্থকতা। আমরা দেখব, ভাষা ঐ সার্থকতার সহায়ক হচ্ছে কোন্ পথে চলে, আর তার পরিণতি ঐ সার্থকতার অভিমুখী কিনা।

১৫৫৩ সালের চিঠির সঙ্গে ১৭৭৮ সালের চিঠির তুলনায় এই ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে, ভাষার স্বকীয়তা নষ্ট হয় এমন ভাবে কতকগুলো বিদেশি শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দিলে ভাষার কদর বা ইজ্জত কমে যায় ; ভাষার অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে না যে বিদেশি শব্দ, ভাষায় তার স্থান হওয়া অনুচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় বহু ইংরেজি শব্দ আছে যা স্বাভাবিক ভাষার মাত্রাতিরিক্ত, কেবল ব্যঙ্গকবিতায় মানানসই। এখন কেউ যদি ঐ শব্দ উপাদান নিয়ে বাংলা গদ্যে কোন গম্ভীরভাবাত্মক রচনা করতে যান, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে, তাঁর ভাষা হাস্যরসসৃষ্টির পরিবর্তে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। জবরদস্তির দ্বারা বিদেশি শব্দ ঢোকানো বা বার-করে-দেওয়া চলে না। বৈয়াকরণদের মগজে মাঝে মাঝে ঐরকম খেয়াল চাপে বটে কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁরা ভাষা গড়েন না, গঠিত ভাষার নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করেন মাত্র। ভাষার সার্থকতা লাভের প্রয়োজনে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই কারণেই বাংলা ভাষাকে ইচ্ছামতো ফার্সিবহুল করতে জুলুমদার ইসলামি শাসকেরাও পারেন নি, তাকে সংস্কৃত সর্বস্ব করতে পারেন নি বড় বড় পণ্ডিতেরাও, আবার তাকে ইংরেজি শব্দ বিবর্জিত জটিল পরিভাষা জাল সমাচ্ছন্ন করতে পারবেন না এখনকার সুধীবৃন্দও। বহতা নদী আমাদের এই বাংলাভাষা নিজেই অন্তত যতদিন জীবিত আছে ততদিন ইচ্ছামতো নানা উপাদানের জলধারা গ্রহণ করে, বিভিন্ন ভাষার উৎসের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বাঞ্ছিত সামঞ্জস্যের সাগরসঙ্গমে ধাবিত হবে।

ক্রমশঃ

উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের
"নিলাচলে মহাপ্রভুর"
সুন্দরী তারকা
সুমিত্রা দেবী বলেন "লাক্স টয়লেট
সাবানের শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয়।"
সুমিত্রা দেবী দুইবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক
"বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী" নির্বাচিত হয়েছেন। এই তাঁর গুণের
নিঃসন্দেহ প্রমান। কিন্তু তবুও শুধু প্রতিভা নয়, তাঁর আছে সুকোমল
সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যার জন্যে তিনি নানারকম চরিত্রে সার্থকতার সঙ্গে
অভিনয় করতে পারেন।
এই লাবণ্য সুমিত্রা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেন
বিশুদ্ধ এবং শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিয়ে।
এই বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত মোলায়েম এবং
সুগন্ধ ফেণার সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন।
LUX
TOILET SOAP
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান।
সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে—
বড় সাইজ কিনে খরচ বাঁচান।

ভারতে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের স্মৃতি

শ্রীআদিনাথ সেন

ভারতের সিপাই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালনের দিন, ১০ই মে তারিখ হইতে সাম্যবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কেহ কেহ বিদেশীয়দের কবর, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি—বিকৃত, ভঙ্গ বা ধ্বংশ করিবে স্থির করাতে, কানপুরের জেলাশাসক তাহাদের ঐরূপ শঙ্কাজনক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ফৌজদারী আইন অনুসারে, ৫ জন বা ততোধিক লোক দলবদ্ধ না হয়—অথবা তাহারা কোনরূপ জোর জবরদস্তী না করে, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। কারণ জনসাধারণের কেহ কেহ উত্তেজিত হওয়াতে, বিরুদ্ধ দলের সহিত সংঘর্ষের আশংকা রহিয়াছে।

এইভাবে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের প্রতিকৃতি বা প্রস্তর মূর্ত্তি কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বা প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইবে কিনা কিছুদিন হইতে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারত ইতিহাসের বুনট, এইভাবে নষ্ট করা সমর্থন না করিলেও, বিগত ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ, ইহাদের মিউজিয়মে রাখা যুক্তিসঙ্গত। ভারত শাসনকর্ত্তাদেরও এই মত। এ বিষয়ে প্রাচীন কাশ্মীর-ঐতিহাসিকের, এমন কি মোগল ঐতিহাসিকেরও প্রবল মন্তব্য রহিয়াছে। কোন লোকের কাজ সমর্থনযোগ্য হউক বা না হউক, ইহাদের স্মৃতি নষ্ট করা উচিত নয়। ইতিহাস সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গুণীলোকের প্রশংসার সহিত শাসনকর্ত্তার ভুল ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করিবার সাহস ঐতিহাসিকের থাকা দরকার। পক্ষপাতীত্ব অথবা হিংসার প্রভাব বর্জিত হওয়া চাই। ইচ্ছামত ইতিহাস তৈয়ার করিলে, যাহাই শুধু লেখকের ভাল বোধ হয় অথবা যাহা ভাল বলিয়া বুঝান যায় তাহারই প্রাধান্য থাকে। দেখা যায় যে রাশিয়ায় কোন পর্যটক গেলে, তাহাকে কর্তৃপক্ষ যাহা যাহা বাছিয়া দেখাইয়া দেন তাহাতে প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। বিদেশী পর্যটকেরা ভদ্রতার খাতিরে বর্ত্তমানে ভারতের ক্রমাগতই যে মনোহর চিত্র আঁকেন, তাহাতে দেশের অপকারই হয়। ইংরেজী নাটকে একটি নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমানের কথাই বলিয়াছিল যে মিত্রেরা অযথা প্রশংসা করিয়া তাহার অনিষ্টই করে। শত্রুরা নিন্দা করে বটে, কিন্তু উহাতে তাহার উপকারই হয়। বর্ত্তমানের ঐরূপ মামুলী প্রশংসা বাদ দিলেও, স্বদেশী ঐতিহাসিক অপেক্ষা বিদেশী ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা অতিশয় মূল্যবান। বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় ইতিহাস প্রায় নাই বলিলেও চলে। ক্ষণস্থায়ী জীবের আবার ইতিহাস কি? যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ঘটনার তালিকা নহে—কি পরিবেশে ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল তাহার দার্শনিক বিচার। প্রধানত সৃষ্টিতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। যাযাবর অবস্থায় অসীম আকাশে প্রকৃতির শক্তির (সূর্য, অগ্নি, বৃষ্টি বা বরুণদেবতার) পূজায়, বেদোক্ত (শ্রুতির) যাগযজ্ঞের বিধি নিয়মের ছড়াছড়ি। উপনিষদযুগে, নিজ বিবেকে আত্মার সত্ত্বার এবং উহা হইতে অভিন্ন (অভেদ) বেদান্তের অজ্ঞেয়, নিরাকার অব্যক্তের চিন্তা এবং ইহাদের আনুসঙ্গিক (স্মৃতি) গার্হস্থ্য, সাংসারিক, সামাজিক নীতি প্রতিষ্ঠা। পরে পৌরাণিক যুগে ভেদ দৃষ্টিতে ভক্তিভাবে ধর্মের অভিব্যক্তি, কোন পার্থিব রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কোন কোন ঘটনা মনীষীদের নিজের পছন্দমত অনুমিত ও সুরচিত গল্পের অদ্ভুত মিলনে রূপকের ভাষায়, শুধু নৈতিক অথবা ধর্মের উৎকর্ষের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে এবং দেশোন্নতিকর সত্যই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।* পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান, চিরস্থায়ী অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর স্থাপিত, ইহাই প্রাচীন ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল। যাহারা বহুদিন গত, এইরূপ প্রাচীন ঋষিদের জীবনধারা এবং উপদেশে যে বর্ত্তমানে প্রভাব সম্পন্ন, ইহাই ইতিহাসের কবিত্ব।

জাতীয় পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রাচীন জীর্ণ হস্তলিপি, কিম্বদন্তী, গোত্রপরিচয়, বংশাবলী, দানপত্র, আবর্জিত স্মৃতিচিহ্নের উদ্ধার, তাম্রলিপি, পর্য্যটকের বর্ণনা ইত্যাদি বাছাই করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করে। বিশেষতঃ স্বপক্ষ, বিপক্ষ হিসাবে, অতিরঞ্জিত, প্রশংসিত বা নিন্দিত বিবরণ বাদ দিতে হয়। ভূগোলে কোন যদৃচ্ছ বিবরণ থাকিলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষ, যাহা ইতিহাসে হয় না। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সমসাময়িক বিশ্বস্ত লোকের লেখা হওয়া চাই। এইরূপ বিভিন্ন কাহিনী একত্রিত এবং যাচাই করিয়া ধারাবাহিক রূপে প্রকৃত তথ্য বাহির হয়। তাহাই ঐতিহাসিকের ভিত্তিমূলক উপকরণ।

সেদিন এক কম্যুনিষ্টের সহিত দেখা হইয়াছিল। উপরোক্ত প্রসঙ্গে তিনি চান যে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাণীবাঁসীর স্মৃতিমন্দির, অক্টার্লনিমনুমেণ্ট, অশোক স্তম্ভ, হ্যারীসন রোড, গান্ধীপথ, উইলিংডেন ব্রীজ, রাণী রাসমণির পোল ইত্যাদি নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। দিল্লীতে লেডী হার্ডিঞ্জমেডিকেল কলেজের নাম বদলাইবার কথা হইতেছে।

আমি বলিলাম: আচ্ছা, লর্ড ডালহৌসির মূর্ত্তির নীচের লেখা বদলাইয়া, রাণা প্রতাপের, অথবা লর্ড ক্লাইবের মূর্ত্তির নীচের লেখা বদলাইয়া তান্তিয়া তোপীর নাম লিখিয়া দিলে খরচও বাঁচিয়া যায়। কে তাহাদের চিনিবে?

---

* দেশের নৈতিক অথবা ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় প্রমাণের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিকের অপ্রিয় সত্য চাপা পড়িত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

শ্যামরায়ের মন্দিরের কাছেও ভিড় কিছু কমে নেই। তবে অধিকাংশই মুণ্কে তুবড়ির তল্লাটেই ঠেলাঠেলি মারামারি করছে। আসবে যখন, গরুর পালের মতো দল বেঁধে আসবে যাত্রার আসরে। সবাই এলে বাতি জ্বালার আয়োজন হবে। আসর এখনো অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই অনেকে বসে গেছে।

সুরীন দাঁড়াল শ্যামরায়ের মন্দিরের সামনে। সঙ্গে মদন আর জগা বাগ্দি। সুরীনের ইতি উতি তাকানো ভাবসাব দেখে, তারা দুটিতে নাক তুলে গন্ধ শুঁকল বাতাসে।

জগা বলল, বড় জবর বাস ছেড়েছে সুরীনদা।

মদন বলল, হ্যাঁ। মনে ল্যায়, দীঘির ওপার থেকে আসছে।

সুরীন সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। মন্দিরের দাওয়ায় তখনো মেয়েদের ভিড় রয়েছে। গোটা দাওয়ায়, মন্দিরের ভিতরে, পিতল-বিগ্রহের সর্বাঙ্গে আবীরের ছড়াছড়ি।

মদন আর জগা তীর্থের কাকের মতো তাকাল দীঘির ওপারের অন্ধকারে। বড় বড় গাছের ঝুপসিঝাড়ে, থেকে থেকে জোনাকীর মত জ্বলে উঠছে দু' একটি বিড়ির আগুন। ফুলকি উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। দু' একবার টর্চলাইট জ্বলে উঠতেও দেখা গেল। মনে হল, সুদূর অন্ধকার প্রেত-প্রান্তরে একদল ছায়ারা ঘুরে ফিরে যেন কিসের জটলা পাকাচ্ছে।

ওখান থেকেই গন্ধ আসছে বাতাসে। সেই গন্ধে পাগল দুটি মানুষ। সুরীনের দিকে তাকাল ব্যাকুল হয়ে। সময় চলে যায়। অন্ধকারের ওই অস্পষ্ট রহস্যের খেলা না জানি কখন শেষ হয়ে যায়।

শ্যামরায়ের পুজারী ঠাকুর মুখুজ্জে লাল হয়ে উঠেছে আবীরে। মাখিয়ে দেয়নি কেউ। সারাদিন ঠাকুরের পায়ে যা পড়েছে, তারই ছিটে ফোঁটায় মুখুজ্জে মাখামাখি হয়ে গেছে। হ্যাজাকের আলো পড়ে একটি অমানুষিক মূর্তি হয়েছে তার। শরিকানার ভাগে যার এ বছরে শ্যামরায়ের সেবার ভাগ পড়েছে, সে সেবাইত হয়তো এখন কলকাতায় অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত। এক আধ পয়সা যা পড়ে, তাই কুড়িয়ে নিতে মুখুজ্জেও বড় ব্যস্ত। সারা-বছরের প্রসাদের চেয়ে, এই দিনটির আয় সারা বছরের পথ চেয়ে থাকে।

সুরীন বলল মুখুজ্জেকে, ঠাকুরমশাই!

মুখুজ্জে তখন ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে, আবীরের অস্পষ্টতায় পয়সা কুড়োচ্ছে উপুড় হয়ে।

সুরীন আবার বলল, ঠাকুরমশাই, আপনার মূল গায়েনটি গেল কোথায়?

মুখুজ্জে সোজা হয়ে বলল, কে? তারপর সুরীনকে দেখে একগাল হেসে বলল, ও সুরীন, আয় ব্যাটা আয়, তোর জন্যে চন্নামিত্তি পেসাদ···

চরণামৃতটুকু মুখে মাথায় দিয়ে, প্রসাদ হাতে নিয়ে, পুরো একটি টাকা আল্গোছে ফেলে দিল সুরীন মুখুজ্জের হাতে। দিয়ে বলল, জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার শ্যামরায়ের গায়েনটি—

—আরে ও শালার কথা—

বলতে বলতেই মস্ত বড় করে জিভ কাটলে মুখুজ্জে। মন্দিরের মধ্যে, শ্যামরায়ের সাক্ষাতে বামুনের ছেলের মুখ-খারাপ করা পাপ। তার ওপরে আবার পুজুরি। ওই পুরো একটি টাকায় কি।রকম গোলমাল হয়ে গেছে সব। বলল, ও মুখ কো হারামজাদাটা হবে আমার ঠাকুরের গায়েন। সে কপাল করে এসেছে ও এ জন্মে? যদিও বা হত, তা কপালে জুটেছে এক গুরু, ব্যাটা শুদ্দুরদের বামুন, মাতালকে মাতাল—ঠন্ করে শব্দ হল পায়ের কাছে। ঝুঁকে পড়ল মুখুজ্জে হাত বাড়িয়ে। ঝুঁকেই বলল, সেই নিতে ভটচাজ এসে ডেকে নিয়ে গেল ছোঁড়াকে। এই তো খানিকটে আগেও বসে বসে গান করছিল।

নিতাই ভটচাজ ডেকে নিয়ে গেছে। সুরান একটু হতাশ হল। সময় নেই আর হাতে বিশেষ। যা বলবার তা' আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।

জগা বলল, ভটচাজ মশায়ের সঙ্গে যদি গিয়ে থাকে তো দীঘির ওপারেই আছে, বুঝলে সুরীনদাদা। চল, ওদিকটায় যাই, দেখি।

অভয়কে খুঁজছে সুরীন। মুখুজ্জের রাগের কারণ আছে, মন্দিরের দোরগোড়ায় বসে অভয় দুটি গান করলে লোক আসে বেশী। গানের মহিমা প্রাণে গেলে তো কথাই নেই। পয়সা দুটি বেশীও পড়তে পারে।

সুরীন বলল, যাবার জন্যে তো হাঁপিয়ে মরছিস্ সেই সন্‌ঝেবেলা থেকে। চল্। কিন্তু ভটচাজ মশায়কে যদি ওখেনে না পাওয়া যায়, তবে তো মুশকিল। দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে, দীঘির পশ্চিম পারে এল তিনজনে।

জগা আর মদনের ছটফটানির কারণ আর কিছু নয়, মদ। আগে শ্যামরায়ের দোলোপলক্ষে মেলায় মদের দোকান বসত। সেই সঙ্গে, দীঘির এপারেই, ম'কার-অন্ত অন্যবিষয়েরও বসত হাট। বর্দ্ধমান কাটোয়া শ'হর থেকে নিজেরাই এসে, কোনোরকমে ছিটেবেড়ার দোচালা আড়াল করে নিত একটি ক'রে। বাইরে থেকে যারা মেলায় আসত, আর গাঁয়ের সব বাদলপোকাগুলি গিয়ে পুড়ে মরত সেই চালাঘরে। এতে আইন কখনো নাক গলাত না। কিন্তু এই অতি প্রকাশ্য ব্যাপারে দীঘির পারের কোলআঁধারের নল্‌চে আড়ালটুকু থাকত।

তারপর দিনকাল গেল বদলে। একটা যুদ্ধ এসে সব-কিছুই দিয়ে গেল এলোমেলো করে। তার নিয়মানুযায়ী, এক জায়গায় মৌচাক ভাঙে,চাক বাঁধে আর এক জায়গায়। মেলায় বসার মদের দোকানের লাইসেন্স গেল উঠে। গাঁ-ঘর-দেশের মানুষেরা নাকি সব সৎ হয়ে গেছে, ওসব আর চলে না। চালাঘরগুলিও উঠে গেল। ওসব পুরনোদিনের কেচ্ছা দেখে, লজ্জায় মরে নতুনদিনের মানুষেরা।

কথাটির গায়ে কিছু সত্যের গন্ধ আছে। বাকী সত্যটা, যুদ্ধের দুর্দিনে মদের দোকানের লাইসেন্সের খরচ ওঠেনি, পড়তা পড়েনি চালাঘরের। তাছাড়া শহরের পোকাগুলির পোড়বার মতো আগুনেই কুলিয়ে উঠত না। বর্দ্ধমানের এই দূর গ্রামে কে আসবে।

কিন্তু মানুষের এ প্রবৃত্তি সমুদ্রের নীচু তলার মতো। যতো গভীর, ততো অন্ধকার, ততো বিস্ময়কর বিচিত্র। দীঘির পাড়ের কোল আঁধারে সেই প্রবৃত্তিটা আবার উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। খালি বদলে গেল তার রূপ।

এখন দোকান বসে না। ঘরে বসে চোলাই করা হাঁড়ি আসে কাঁড়ি কাঁড়ি। চালাঘরের আড়ালের ছলনাটা গেছে মুছে। খোলা আকাশের তলায়, ঝুপসি ঝাড়ের ঘুপ্‌চিটুকুই অনেকখানি।

বেচা-কেনার রকমফের মাত্র। দীঘির পাড়ের কোল-আঁধারে, রহস্যময় নল্‌চে আড়াল এখনো তেমনি ডাকে হাতছানি দিয়ে।

অন্ধকারে ইঁদুর-খোঁজা বেরালের মতো জল্‌জ্বল্ করে উঠল জগা আর মদনের চোখ। দর্শনে আর ঘ্রাণেই তাদের উপোসী প্রাণে অর্দ্ধেক নেশা গেল জমে।

অন্ধকারে সাপের মতো, এখানে ওখানে মানুষের ছায়া নড়েচড়ে উঠছে। কাচের চুড়ির রিনিঠিনির সঙ্গে বাতাসে আচমকা শোনা যায় সব বিচিত্র চাপা কুহর। বেদের চেনা সাপের হাঁচির মতো ভয়ংকর নির্লজ্জ, কিন্তু সলজ্জ খ্যাকারি শোনা যায় কোথাও, কোথাও মাতালের অট্ট-রোল, অস্ফুট প্রলাপ। দীঘির পাড়ের বাতাসও যেন চক্রে-বসা ভৈরবের মতো ঢুকুঢুকু রসোন্মত্ত।

সুরীন খুঁজছে অভয়কে। তিন বছর ধরে, অনেক
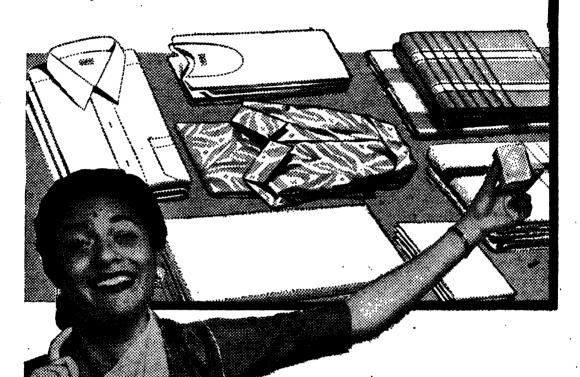
নিয়ে যাবে। জাত-জন্মহীন প্রমীলার ছেলে বলেই শুধু নয়, নিয়ে যাবার মতো এমন ভাল ছেলে আর একটিও তার চোখে পড়েনি, মন কাড়েনি। তার ঘরের মানুষ ভামিনি আর নিমির মা শৈল, সকলের মতামত নিয়ে এসেছে সে এবার।

তিনবছর আগে, প্রথম যেদিন সুরীন দেখেছে, তখনই গিয়ে সে কথাটি পেড়েছিল শৈলর কাছে।

আগামী- কাল সুরীন চলে যাবে। অভয়ের সঙ্গে কথাটা পাকাপাকি করে নিতে হবে রাত্রের মধ্যেই।

ইতিপূর্বে গেয়ে রেখেছে অভয়ের কাছে, শহরে যাবে অভয়পদ ?

অভয় দেখতে যত বড়, মুখের কাঁচা ভাবখানি ততো বেশী। বড় জাতের হলে যেমনটি হয়। হঠাৎ তাকালে মনে হয়, চাউনিটা কেমন যেন রুক্ষ। সেটা জীবনধারণের অভ্যাসে, রুক্ষ হয়ে উঠেছে। আদর যত্নে পালিত হয়নি কোনোদিন। প্রমীলার নিতান্ত বাঁচার তাগিদের পাঁকে ওর জন্মই ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। যে বয়সটা মায়ের হাতে ছিল তার বাঁচন মরণ দায়। ততদিন বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল। সংসারে বাঁচতে হলে, জোর করে বাঁচতে হয়, এইটা জেনেছে সে গোড়ায়। যেমন পৌষ মাঘ মাসে, পথের ধারে, আস্তাকুড়ে-বিয়নো রাশি রাশি কুকুরের বাচ্চাগুলি জানে, সেরকম।

কিন্তু কিসের একটি ভাব-ঘোরের তন্ময়তা আছে ঘিরে অভয়ের সারা মুখে। এমন কি, হাঁটা-চলা-বসার ভঙ্গিতেও। যাদের সঙ্গে চলে ফিরে বেড়ায়, কাজ করে যেখানে, সেখানে ছাড়াও কোথায় আর একটি অদৃশ্য সংসারের সঙ্গে যেন যোগাযোগ আছে তার। মাঝে মাঝে আপন মনে ফিস্‌ফিস্ করে, হাসে, ইশারা করে আঙুল নেড়ে। তারপর চেঁচিয়ে গান ধরে।

লোকে বলে, একটু যেন কেমন কেমন ভাব। মাথায় ছিট আছে।

সুরীন জানে, ছিট নয়। সংসারে খাঁটি মানুষদের কতগুলি পাগলামি আছে। অভয় সেরকম একটি পাগল।

আর খ্যাপামিটা ?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খেপে যায়। সুরীন মনে মনে বলে, ওটা ওর খাঁটি প্রাণের খ্যাপামি। ফাঁকির চেয়ে সেটা ভাল।

সুরীন বাবু ভদ্রলোক নয়, বাগ্‌দি। কিন্তু অভয়ের কথা একটু বেশী মাজা ঘষা। নিতাই ভটচাযের কাছে, দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছে পুরোপুরি। বলেছে, আজ্ঞে, কাটোয়া বর্দ্ধমান শহরগুলান ঘুরে এয়েছি কয়েকবার।

সুরীন হেসে বলেছে, কাটোয়া বর্দ্ধমান, চুঁচ্‌ড়ো চন্দননগরের কথা বলছি।

আর ঘুরে আসার কথা নয়, কাজকম্মো করে থাকার কথা বলছি। অভয় বলেছে, আজ্ঞে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ সুরীনকাকা। শহরে ক'রেকম্মে খাবার মুরোদ নেই আমার।

—মুরোদ মানুষের হাতে। তোমার আমার মত অনেক মুখ্যু সেখেনে ক'রে খাচ্ছে। আর, মানে কথা হল, তোমার ভার তো আমি নিচ্ছি গো।

—কেন সুরীন কাকা, কেন বলতো।

হঠাৎ কথা যোগায়নি সুরীনের মুখে। বলেছে, তোমাকে ভাল লাগে, তাই।

—কেন ?

তা বটে! সংসারে ভাল লাগারও একটা কৈফিয়ৎ আছে। কেন ? না, এই জন্যে। মনের আসল কথাটি তখন চেপে গেছে সুরীন। বলেছে, তোমাকে তো দেখছি আজ কয়েক বছর ধরে। তা ছাড়া, তোমার মা আমাকে বলে রেখে গিছল। বলেছিল, মরণকালে হরিনাম করছি সুরীন ঠা'রপো। শহরে থাক, দশরকম জান। অভেটার কোনো গতি যদি তুমি করতে পার, ক'রো।

সুরীনের মনে হয়, সে একটুও মিথ্যে বলছে না। যেন সত্যি সত্যি প্রমীলার গলায় কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে সে। তা' ছাড়া, অভয়ের অমংগল চিন্তা নেই এর মধ্যে। অকল্যাণের বিষয়ও নয়। তার প্রতিবেশিনী শৈলর একটি ছেলে চাই। মেয়ে নিমিকে বিয়ে দিয়ে সে ঘরে রাখবে। শহরের আশেপাশে, চেনা পরিচিত যারা আছে, তাদের পছন্দ নয় শৈলবালার। একটি ভাল ছেলে চাই তার। যে কাজ কর্ম করবে, নেশাভাঙ করবে না, জুয়া খেলবেনা। অন্য মেয়েদের কাছে যাবে না। ঘর গৃহস্থি করবে মনোযোগ দিয়ে, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করবে।

সেদিক থেকে, অভয়কে নজরে লেগেছে সুরীনের।

মায়ের কথা শুনে অভয় বলেছে, এসব কথা কখনো

মনে গায়নি সুরীনকাকা। মনটন খারাপ হলে, গাঁ ছেড়ে চলে গেছি দুদিনের জন্যে এখেনে সেখেনে। দু' একবার তিন চাকার রিকশা টানবার ফিকির করেছি। আবার চলে এসেছি। আমার রাস্তা ভিন্ন।

—জানি, তুমি গান বাঁধো, গান গাও, বড় মিষ্টি বাবা তোমার গলাখানি।

মান্যিগণ্যি আর সহবত জ্ঞানে অভয়। তার ওই পাগলা ঢংএ টিপ করে একটি প্রণাম করে বলেছে সুরীনকে, যে আজ্ঞে তোমাদের দশজনার কিরপা সুরীনকাকা। তা, জীবনের আগে পাছে টান নেই, ওই নিয়েই কাটিয়ে দেব জীবনটা।

—তাতো হয়না অভয়। ওটা তোমার প্রাণের সাধ বুঝলাম। কাটাতে পারছ কোথায় বাবা। তোমাকে পেটের জন্যে পরের জমিতে লাঙল চষতে হয়, চাকরান খাটতে হয়। দশটা বাড়িতে নানান রকম কাজ করতে হয়। শুধু গান গেয়ে পেট চলার টাইম চলে গেছে।

—কি চলে গেছে বললে ?

—টাইম, টাইম মানে দিনকাল। আবার কলকারখানার হাজিরার টাইমও হয়, বুঝলেনা ?

—হ্যাঁ, কথাটা শুনেছিলাম কিনা আগে।

—তা' যা বলছিলাম, একটু থিতু হয়ে বসতে হবে, বুঝলে। মানে কথা, গান করবে সবই করবে, কিন্তু ঘর সংসারও তো করতে লাগবে, না কি ?

অভয় অবাক হয়ে বলেছে, আমার ঘর সংসার ?

—হ্যাঁ গো, তোমার। কেন, হতে নেই ?

—হতে আছে, কিন্তু হয় কেমন করে, তা জানিনে।

ব'লে দু' চোখ ভরে বিস্ময় সংশয় অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থেকেছে দূরে। তারপর নিঃশব্দে হেসে উঠেছে আপন মনে।

সে হাসি দেখে, সুরীনের বুকের মধ্যে টনটন করে উঠেছে। এমন মানুষকে লোকে পাগল বলে।

তা বটে, বলবে বৈ কি। জীবনে যে সোজা পথ দেখেনি, সমতল দেখেনি, খানা-খন্দ-নালা ঘেঁটে চলেছে, প্রাণের তলায় যার অনেক আগুন, লোকে তাকে পাগল বলে। ঘরের ফাঁদ এড়িয়ে সে বৈরাগী হয়ে জীবন কাটাতে চায়। একদিন সুরীনও তাই চেয়েছিল। তবু গান গাইতে বাঁধতে জানত না। অনেক জায়গায় ঠেকতে ঠেকতে, শেষ ঠেকেছে ভামিনীর ঘরে।

সুরীন বলেছে, ঠিক কথা বলেছ বাবা, কেমন করে হয় ? থিতু হয়ে বসা বড় কঠিন জিনিষ। চাইলেই বা দেয় কে। তা' তোমার এটি ব্যবস্থা আমার হাতে রয়েছে, তাই বলছি। মনের মত একটি ছেলে পেলে, নিজের মেয়ে ঘর, সব দিয়ে যেতে চায় একজন।

—মনের মত ছেলে ?

—হ্যাঁ। চল, মন না চায়, দেখে শুনে ঘুরে চলে আসবে।

গলা নামিয়ে বলেছে অভয়, শুনে আমার মন বড় আন্‌চান করে উঠছে সুরীনকাকা।

—করবে বৈকি, করা উচিৎ। তাদের দরকার, তোমার হলে ভাল হয়, মাঝখান থেকে আমি মিলিয়ে দেবার মানুষ মাত্তর।

তেমনি নীচু গলায় বলেছে অভয়, একখান গান শুনবে সুরীনকাকা ?

—বল।

তিনবছরে অভয়ের মাথায় চুলের গোছায় নাপিতের কাঁচি, সন্তর্পণে ঘাড় ছুঁয়ে গেছে। এই একুশ বছরেও গোঁফ দাড়ি তেমন গজায়নি। কানে হাত দিয়ে, মুখ তুলে সরু গলায় গেয়েছে,

বলেছিলে মনের মত,
সেই ভাবেতে ছিলাম রত।
এখন বল, 'অ'রে পাগল !
এত কথা মনে ফেঁদে'
এবার একলা বসে মরবি কেঁদে।'
জগতের আসল কথা বুঝিস্ নাইতো।

গেয়েই লাফ দিয়ে উঠে গলা ছেড়ে বলেছে, ওসব আজ্ঞে আমি কথাটথা দিতে পারব না এখন। গুরুদেবের সঙ্গে কথাকার্ত্তা বলে দেখি, যা বলে তাই হবে। বলেই হন্‌হন্ করে চলে গেছে। যন্ত্র-ঘাঁটা মানুষ সুরীন। একটু রুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারপরে আবার সামলে গেছে। ডাকলে দশটা ছেলে আসবে এখুনি ছুটে। তা চায়না সুরীন।

কিন্তু গেল কোথায় অভয় তার গুরু নিতাই ভটচাযের

সঙ্গে। দীঘিরপাড়ে তো তাদের চিহ্নও নেই। দুজনে কি আর একসঙ্গে ঘুপ্‌চি অন্ধকারের লীলায় মেতেছে।

জগা আর মদন অস্থির। সুরীনের রক্তেও দোলা লাগছে। এখনও লাগে, চিরকালই লাগবে হয় তো। শ্যামরায়ের দোলমেলায় আসা যে তার জীবনটাকে একবার পিছন ফিরে দেখে যাওয়া।

এখানে ওখানে মেয়ে পুরুষের চাপাগলার হাসাহাসি। আর অস্পষ্ট ছায়াগুলির সব বিচিত্রভাবে নড়াচড়া। দেখে-শুনে রক্তের মধ্যে জ্বলে চিন্‌চিন্ ক'রে। দাউ দাউ করে করে জ্বলার মত আগুন আর নেই।

এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে অনেকে। মাঝখানে বসেছে একজন চোলাই রসের ভাঁড় নিয়ে। ঠাওর করে দেখল সুরীন, সেখানে অভয় আর তার গুরু, কেউ নেই। টিম্‌টিম্ ক'রে একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। মদ মেপে মেপে দেওয়ার সময় মদওয়ালা হ্যারিকেনটি উস্‌কে দেয়, তারপর আবার দেয় নিভিয়ে। যদিও গ্রামের চৌকিদার আর আবগারি দলের লোকও বসে আছে সেখানে গিয়ে। তবু, কাজটা তো বে-আইনি।

হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, দুটি মেয়েও বসে আছে অদূরেই। পুরুষ সঙ্গী নেই। অপেক্ষায় আছে।

সুরীন ডেকে নিল একটিকে। মদ খেল সবাই বসে বসে। মেয়েটি একটু কম খেল। প্রথম জগা বলল মেয়েটিকে, চিনে রাখ আমাদের সুরীনদাদাটিকে, বুইলে। মেয়েটি হেসে বলল, চিনছি।

মদন হিহি করে হেসে গা ঘেঁষে বসল মেয়েটির। বলল, আমাদেরও ছিটেফোঁটা চিনো তা' ব'লে।

মেয়েটি তেমনি হেসে বলল, তা ও চিনছি।

সুরীন তাকাল মেয়েটির দিকে। তারপর চারজনে গিয়ে বসল একটি গাছ তলায়।

জগার নেশাটা তাড়াতাড়ি চড়েছে। বলল, সুরীনদাদা, তুমি অভেকে সঙ্গে নিতে চাও, আমাদের নয় কেন গো?

সুরীন বলল, তোর কি বাপ ছিল না?

—তা হলেই নেবে?

—হ্যাঁ।

—তবে নেই।

—উঁহুঁ, ওরকম হলে হবেনা। যার তিন কুলে কেউ নেই, সেরকম ছেলে চাই। তোর বউ আছে, তুই পালিয়ে আসবি।

—বউ নিয়ে যাব। আমাকে নিয়ে চল।

—বউ থাকলে হবেনা। কুকুর একটা থাকলেও হবেনা।

কিছুক্ষণ পরে, কাছেই অভয়ের গলা শোনা গেল। সুরীন উঠে গেল সেখানে। দেখল, ভটচায আর অভয় বসে আছে।

ভটচায বলল, কে।

—আমি সুরীন ঠাকুরমশাই।

ভটচায প্রায় মহাদেব হয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে বসে আছে অভয়। সামনে একটি ভাঁড়। ভটচায বলল, বোসো সুরীন।

সুরীন বসল। অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না। কিন্তু আলাপে কোনো অসুবিধা নেই। ভটচায বলল, তোমার তো শুনি খুবই বাড়বাড়ন্ত। অভেকে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—নিয়ে যাও। কি হবে এখেনে পড়ে থেকে। একটু দেশবিদেশ মানুষজন দেখুক। গান গেয়ে আজকাল আর পেট চলে না। তবে, ছোঁড়া একটু বেশী ভাল। ওই যে বলেনা, যাদের যতো ছেঁদা, তাদের তত ঢাকা। ব্যাটা-ছেলেকে দ্বিতীয়ভাগের পাঠ শিখিয়েচি, কিন্তু মদ ধরাতে পারিনি।

সুরীন তাতে খুশি, কিন্তু ভটচাযের সামনে প্রকাশ করা যায় না।

মাঝখান থেকে অভয় চোলাই মদের ভাঁড়টা তুলে, চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেলল অনেকখানি। ভাঁড় নামিয়ে বলল, নেও, গুরুঠাকুর, হয়েছে? মদ খেলাম, সুরীন কাকার সঙ্গে চলেও যাব। তোমার হিদয়টুকু তাতে জুড়াবে তো। ব'লে, উঠে হন্ হন্ করে চলে গেল।

সুরীন বসে রইল হাঁ করে। ভটচায অট্টগলায় হেসে উঠল। বলল, দেখলে তো সুরীন। ব্যাটার বাপ কে ছিল, আমি তাই ভাবি।

ভটচাযের কথা আর হাসি শুনে বুঝল সুরীন, লোকটা ভালোবাসে অভয়কে।

ভটচায আবার বলল, ছোঁড়া কথা বানায় ভাল, গলাটিও

মিষ্টি। কিন্তু কপালে জুটবে শেষে ভিক্ষে। নিজেকে দিয়ে তো বুঝতে পারছি। ঘরে এখনো আমার দুটো মেডেল আছে। ভিক্ষে করে মরার চেয়ে বেঁচে থাকা ভাল, নিয়ে যাও। আমাকে এসে বলছিল, না যাবার মন নিয়ে। বলেছি, চলে যা। মনের জিনিষ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাইতেই আরো রাগ হয়েছে আমার ওপর। তা, বিয়ে দেবে ওর ?

—হ্যাঁ।

—ওর জাত জন্ম নেই, কোথায় মেয়ে পাবে ?

—যে মেয়ের জাত জন্ম নেই, সেই মেয়েই পাবে।

—বেশ্যার মেয়ে ?

—হাফ গেরস্থ।

ভটচায বলল, ও-ই হল। বাড়ি ঘর আছে ?

সুরীন বলল, কোনরকম।

যে রকম দিনকাল পড়েছে,কোনোরকম আমাদের হলে আমরাও আজকে ছাড়তে পারিনে।

তা জানে সুরীন। সে চটকলের মিস্তিরি। মানুষ যে সব সময় বাঁচতে গিয়ে জাতের উর্দ্ধে যায় তা দেখেছে সে অনেক। তবু, জিভ কেটে, কানে আঙুল দিয়ে বলল, ছি, ছি, তা কি হয় !

পরদিন অভয়ের দেখা নেই। আতি গয়লানি বলল সুরীনকে, অভয় আজ যাবে না, বলতে বলেছে। আজ শ্যামরায়ের থানে গান হবে, তা এই পেথমবার অভয় কবি গাইবে। কাল যাবে বলেছে।

এর উপরে সুরীনের কথা চলে না। জীবনে এই প্রথম-বার অভয় আসরে নামতে যাচ্ছে। এখানে বাধা দেওয়া যায় না। পরিবর্তে একদিন বেশী থেকে যাওয়া যায়।

কিন্তু সারাদিন পাড়ার মধ্যে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল সুরীনের। অভেকে নাকি তুমি নিয়ে যাচ্ছ ? প্রমীলার ছেলেটাকে। আ মরণ ! কার যে কখন কপাল খোলে। নইলে লক্ষীমুন্ত সুরীন কেন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে।

সন্ধ্যাবেলা সুরীন গেল শ্যামরায়ের মন্দিরের মাঠে। আজকের আসর একটু তাড়াতাড়ি বসেছে। মুনকে তুবড়ির বাজি পোড়ানো নেই আজ।

ঢাকে কাটি পড়েছে এর মধ্যেই। আসরে লোক জমেই আছে।

আমদাবাদের কবিয়াল শরত সাঁতরা দাঁড়াল। শরত শুধু নাম-করা নয়, তার ভালোমানুষি কথার-বিষেরই দাম। বয়স হয়েছে। তা' ছাড়া সম্পন্ন চাষী, তাই এখনো এদিক ওদিক যাতায়াত করে।

নিতাই ভটচাযের কাছেই বসেছে অভয়। ভটচাযেরই একটি পুরনো হাফসার্ট আর ধোয়া ধুতি পরেছে সে। ঘাড় পর্যন্ত চুল নিভাঁজ করে আঁচড়েছে তেলে জলে। গলায় পরেছে মালা।

শরত উঠে প্রায় আধঘণ্টা ধরে, তেত্রিশ কোটি দেবতার আর গুরুর বন্দনা করল। তারপর অভয়ের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটিতে ধূর্ত শিয়ালের হাসি উঠল ঝিকিয়ে। গান গেয়ে বলল, শ্যামরায়ের দোলে, গান গাইব বলে, বড় আশায় এসেছি। এখানকার উঁচুনাচু সকল মানুষের কুল ভাল, সমাজ শিষ্ট। অভয়পদ তার নাম ধাম বলুক, বংশ পরিচয়, বাপের পরিচয় দিক, তবে আমি গাইব। অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে আমি গান করিনে।

হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। দেখা গেল, ভটচায চেঁচাচ্ছে অভয়কে ধরে। অভয় আসর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে জোর করছে। ভটচায বলছে, বোস্ বল্‌ছি হারামজাদা।

আসরেও গুলতানি উঠল। অভয় বসতে আবার থামল। দেখা গেল, ভটচায অভয়কে চেপে ধরে কি সব বলছে।

শরত বসল, কিন্তু অভয় ওঠে না। কই, কি হল গো !

ভটচায প্রায় ধাক্কা মেরে উঠিয়ে দিল অভয়কে। তখন আর চুলের বাহার নেই, টানা হেঁচড়ায় জামাটিও ছিঁড়েছে। ছেঁড়া মালা কোন্ ধূলোয় গেছে লুটিয়ে। ডুম্ ডুম্ করে উঠল ঢাক। মনে হল যেন ঢাকের প্রহার অভয় নিজের পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। অসহায়, পরিচয়হীন বিরাট প্রস্তর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় ভেঙে। শত শত কৌতূহলিত বিদ্রূপাত্মক চোখের সামনে, অপমানে ঘৃণায় শক্ত হয়ে গেছে।

ভটচায হুঙ্কার দিল, গা, গা না। বলে নিজেই উঠে দাঁড়াল আসরে। তারপরে নিজেই [illegible]

বোল্ দিল, শ্যামরায়ের কাছে, জগত বাঁধা আছে। তুই গা তাঁর নাম করে, ভূত প্রেত পালাবে দূরে। কৌরব কুল কিসে মরে? যথন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

অভয়ের গলা শোনা গেল। কিন্তু মানুষ বড় বিচিত্র। মরা গরুর মাংসে, মাছির মত তাদের টিটকারি ভন্ ভন্ করে।

অভয় গেয়ে বলল, শ্যামরায় ছাড়া ওর আর ভজবার দেবতা নেই, তাই বন্দনা করল। গুরু ওর অনেক, তাই ভটচাযকে, শরত সাঁতরাকেও বন্দনা করল। সাঁতরা কেন গুরু? না, মনে করিয়ে দিয়েছে একটা কথা। কি? না……

তবু গলা চড়ে না অভয়ের। ঢাকের বোল চড়া। সে গাইল একটু টেনে টেনে,

বলে গেছেন কবি ব্যাসদেব
কয়েরও বাপ ছিল॥

এইটুকু ধুয়া রেখে গাইল,

জগতের জন্মদাতা, ব্রহ্মা পিতা,
জন্ম দিলেন মানুষেরে
তিনি আদি ছেলের আদি পিতা
নাই অন্যথা
এর বাড়া এর বাপ নাই রে॥
তিনি আপনার পিতা, আমার পিতা,
সবার পিতা, কবির পিতা,
ও ভাই মানব জনম সাথক হল।
কয়েরও বাপ ছিল॥

কিন্তু জমতে চায় না। শরত সাঁতরার টক-ঝাল-নোনতার মধ্যে এ যেন কেমন পান্‌সে পান্‌সে লাগে। শরত যেদিকে স্রোতের ঢল বইয়েছে আসর সেদিকে নেমে গেছে। তাকে টেনে তোলা দায়। অভয়ের গলা বন্ধ হয়ে আসে, ঘাম ঝরে সর্বাঙ্গে। তবু গায়,

ইংরাজের যীশুখিরিষ্ট, মহা ইষ্ট
কি আছে তাঁর বাপের পরিচয়,
তিনি শাদার পিতা, কালার পিতা,
তাঁহারে গড় করি মহাশয়।

কিন্তু ভটচাযের এত শেখানো অস্ত্র দিয়েও অভয় দাগ কাটতে পারলনা। সভায় গণ্ডগোল লেগে গেল।

ভটচায উঠল। হাতজোড় করে, গান চালাবার অনুমতি চাইল। শরত সাঁতরা অনুমতি দিল, অনুমোদন করল সভা। মুখ ঢেকে বসল অভয়। জীবনে এই তার প্রথম আসরে নামার আদিপর্ব।

পুকুরের গা ছাড়া পানা যেমন ধীরে ধীরে জমে, ভটচাযের আসরে নামায় সভা তেমনি ঘন হল আবার।

ভটচায প্রথমেই গাইল,

হায় একি হাল, কী কলিকাল!
বেড়ে মজা দেখালি মা।

শরতকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,

আসরেতে দাঁড়িয়ে বাপ,
ছেলেকে বলে বেজন্মা॥
হায় কলিকাল…!

আসরের নেশা চড়ল। মড়ার রক্ত পেল মাছিরা। তারপর,

অভয়ের বয়স একুশ বছর।
তার আগের বছর…
তার আগের বছর, দশমাস দশদিন আগে
প্রমীলার ঘরে শরত জাগে
জানে এই শর্মা॥
ছেলেকে বলে বেজন্মা।
হায় কলিকাল…!

উল্লাসে, হুল্লোড়ে, হরিধ্বনিতে উন্মাদ হল সভা।

শুধু মাথা তুললনা অভয়। সুরীন সেইটাই দেখল বারে বারে। পাল্টাপাল্টি হল গানের, জিত হল ভটচাযেরই। গান শেষ হল।

শরত সাঁতরা এসে হাত ধরল অভয়ের। দেখেই অভয়ের দু'চোখ জ্বলে উঠল। নিমিষে তার শক্ত লম্বা হাত তুলে সাঁতরার গালে মারল চড়। মেরেই হকচকিয়ে গেল একেবারে।

ভটচায ছুটে এল হা হা করে, আরে হারামজাদা, কি করলি, কি করলি তুই। মারলি?

বলে, ঢুলীর হাত থেকে বেতের কাটি নিয়ে অভয়কে পিটল ভটচায। বলল, শালা, তোর জন্তে যে সাঁতরাকে আমি এত গাল দিলুম, তার কি ?

মার খেল অভয় দাঁড়িয়ে। কিন্তু শরত সাঁতরা গাল খেয়েছে। অভয় যে সত্যিকারের অজাতকুলশীল। সেই জন্তে আঘাতটাও তার সত্যিকারের।

এই অভয়ের আসরে নামার প্রথম দিন।

পরদিন ভোরবেলা নিজে গেল জগার বাড়ী। ডেকে তুলল স্থরীনকে। বলল, কখন যাবে।

—এই তো, এখুনি ফাস্ট গাড়ী ধরতে হবে। তা' তোমার জিনিষ-পত্র ?

অভয় খানকয়েক বই-খাতা দেখিয়ে বলল, সব নিয়েছি।

স্থরীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তা বেশ।

অভয়কে নিয়ে চলে গেল স্থরীন। প্রথম ট্রেন ধরে, বেলা প্রায় এগারোটার সময় শহরের মালীপাড়ায় এসে পৌছুল। উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে বলল স্থরীন, কইলো ভামিনী, ভাখ, কাকে নিয়ে এইচি।

স্থরীনের একদিন দেরী হয়েছে। গলার স্বর শুনে ভামিনি মুখ ঝামটা দিতে গিয়ে থতিয়ে গেল। উঠোনের ওপর অভয়কে দেখে বলল, অ! এই বুঝি ? এস বাছা এস। ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতনের দুপুরে

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

ছায়া থৈ থৈ ঐ ঋজু মেঠো লালপথ বেয়ে,
কাকে যে দেখেছি যেতে. কার মনে আশার দুপুর,
বেজে বেজে সারা হোলো, সে-গানেও রাঙায় আমাকে
কার মন নদী হ'য়ে নামে আজ রাত্রি দুপুর।
দেবদারু পাতা কাঁপে রুপোলী শিশিররেণু স্নানে,
বারোটার চিল যেন কি গোপন কথা বলে কানে,
তাকে বলি—তুমি কি কখনো সেই মাধবিক চিঠি
দৃঢ় নখে দূরে ফেলে আশাহীন করেছ আমাকে,
তুমি কি সফেন প্রেম উদ্ধত রুপো—তলোয়ারে,
ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে রাঙিয়েছ আশার কুহকে ?

আবার দুপুর নামে অজাগর পারাবত-সুরে,
হাওয়ায় অস্থির স্রোত তবু যেন কান্নায় স্থবির,
কাকে যে দেখেছি যেতে, কার পায়ে নিদালী ঘুঙুর,
অণু হয়ে মিশে আছে আমার এ ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির।
শোণিম পলাশ বলে,
জানি জানি সে তো আসবেই,
তোমাকে নিরাশ ক'রে সে কখনো অহেতুক নীড়ে,
একা ব'সে পান করে জীবনের কবোষ্ণ সুরুয়া ?
মনে এক অভিলাষ—
হায়, তার সুর বাজবেই!

তবু জানি চিরদিন তাকে দূর হতে দেখে ছায়া,
বিকেল—হ্রদের জলে ছুঁড়ে দেব প্রেমিকের মন,
একদিন ভীরু এই জিজীবিষু নিটোল যুবক,
উধাও-পাখির মত ছেড়ে যাবে শান্তিনিকেতন।

মেয়েদের কথা

পুরাতন সমাজ, বনাম—নূতন হিন্দু সংহিতা

শ্রীমতী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে—ব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক নরনারী, উভয়েই স্বাধীন নাগরিকত্বের সমান অধিকারী। হিন্দু বিবাহ বিলেও পুরুষ এবং নারী, উভয়েই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তবুও নারীর তরফে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া গেছে একথা বলতে হবে, এবং সেই সুবিধা হোলো পুরুষেরই আচরিত অবিচারের আইনমত প্রতিবাদ এবং প্রতিকার। স্বাধীন ভারতে উপরি পাওনা হোলো নারীর পক্ষে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনটুকু। এই আইনেও, পুরুষ যুক্ত এবং প্রভাবিতও বটে, তবে নারীর মত যে উপকৃত হননি বা সুযোগ সুবিধা পাননি, একথা স্বীকার করতেই হবে।

বর্তমানের মানুষ, যখন শুধু ধর্মের মুখ চেয়ে, অথবা পরকালের বীভৎস নরকের ভয়েই, কোন কিছু থেকে নিবৃত্ত হননা, কিংবা গ্রহণ অথবা বর্জন কিছুই করেন না, তখন অন্যায়ের প্রতিবাদে—আইন করা ছাড়া, কি উপায় থাকতে পারে?

হিন্দু সংহিতা, তথা হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিল, যে মুষ্টিমেয়, হঠকারী ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতায়ই ফল ও নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে, রাজনীতির কূট, মারপ্যাঁচ খেলে, কয়েকজন মিলে, নারী এবং সমাজকে একই সঙ্গে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, এ কথা কেমন করে বলা যায়?

ভারতীয় নারীর বর্তমান বাস্তব অবস্থার কথা, দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা করার পর, আইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু তর্ক বিতর্কের পর, ভালো-মন্দ, সুনীতি ও দুর্নীতি সম্বন্ধে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে, তবেই হিন্দু সংহিতা বিল, আইন মতে বিধিবদ্ধ হয়েছে। রাতারাতিই যখন হিন্দু সংহিতা আইন পাশ না করে, দীর্ঘ দিনের নিরীক্ষা-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, দেশবাসীর মনে এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে, বিলের এক একটি অংশ, দফায় দফায় আইনে পরিণত করা হয়েছে, তখন একথা ধরা যেতে পারে যে, এই আইন সুপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফল। আইন হয় সমষ্টির কল্যাণ কামনায়, ব্যষ্টির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। এই আইনের ফাঁক বা ফাঁকী দিয়ে গলে গিয়ে, বা আইনের সূত্র ধরে, ব্যক্তি মানুষ যদি আপনার চারিত্রিক দুর্বলতাকে আইনত প্রতিষ্ঠিত করায় কোন ছিদ্রের সন্ধান পায়—তারজন্য সর্বতোভাবে, আইনকে দাবী করা যায় না। কারণ এটা আইন নয়, আইনের অপব্যবহার। চুরী-ডাকাতির আইন, যেমন চোরকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই হয়েছে—তেমনিতর হিন্দু সংহিতা আইনও হয়েছে, দুর্নীতির হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

এই আইন যে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি শূন্য, একথা বলা যায় না, কিন্তু তবুও এই আইন যে বহুলাংশেই সুফলপ্রসূ, কালোপযোগী, এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বহু গলদই দূরীভূত করতে সক্ষম হবে একথা অস্বীকার করলে, সত্যের অপলাপ করা হবে।

Mr Jhon D. Mayne. হিন্দু আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"Hindu law has the oldest pedigree of any known system of Jurisprudence···At this day it Governs races of men extending from Cashmere to Cape Comorin, who agree in nothing else except their submission to it."

বর্তমান জীবন ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজে, নারীকে অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া এবং প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার যে একটা সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন প্রয়োজন, একথা সমাজ সংস্কারকগণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই, গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। ১৯৪১ সালে, স্যার বি, এন, রাও, এই "পরিবর্তন আনার" পত্তন করে, বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং ১৯৪৭ সালে, এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি "বিশেষ তদন্ত কমিটি" গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালে, তৎকালীন ল' মেম্বার (law member) ডাঃ আম্বেদকর কর্তৃক, পরিষদে বিলটি আনয়ন করার পর, বিরোধী পক্ষ থেকে তুমুল আপত্তি ওঠে. এবং আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তাঁদের আপত্তি ছিল,—বিবাহ বিচ্ছেদ বিল, জাতি ধর্মের প্রতিবন্ধকতা না রেখে হিন্দু বিবাহ, এক পত্নীত্ব এবং সম্পত্তিতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি স্থাপিত হলে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন এবং ধ্বংস হবে।

১৮৫৮ সালে, হিন্দু বিধবা আইন পাশ হয়।

১৯৫২ সালের ১৮ই মে, হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয়।

হিন্দু বিবাহ আইনে আছে—হিন্দু বিবাহ—এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন। ১৮৫৫ সালের ১৭ই জুন, হিন্দু-উত্তরাধিকার আইন পাশ হয়।

১৯৩৭ সালের, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বলে হিন্দু বিধবাগণের এবং বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে, নারীর অধিকার থাকলেও আইনত নানা প্রতিবন্ধক থাকায়, সম্পত্তির অধিকার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। যদিও স্ত্রী ধনসম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন—নারী তবুও স্ত্রী ধনসম্পত্তির সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ক্ষেত্রেও বিরোধ ছিল, তাছাড়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত, কন্যার উত্তরাধিকার সর্তে, আইনত বহু মত পার্থক্য দেখা যেত। কিন্তু বর্তমান হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে, প্রত্যেক হিন্দু নারীকেই—সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়েছে। তাছাড়া—সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়েছে। কেবল মাত্র বসত বাটীর ক্ষেত্রে, নারীর সীমাবদ্ধ অধিকার থাকবে। বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈন, এই বৃহৎ হিন্দু সম্প্রদায়ই এই আইনের আওতায় আসবেন।—এখন হিন্দু সংহিতা আইনের, মোটামুটি একটা আলোচনা করতে, প্রথমেই ধরা যাক—হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে—কি আছে।—

(১) সম্পত্তিতে—নারীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

(২) বসত বাটীর সম্পত্তিতে; নারীর অধিকার থাকলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পুরুষ অংশীদারগণ বাড়ীর অংশ ভাগ করে নিতে চাইবেন—অথবা নেবেন; ততক্ষণ, নারী অংশীদারগণের বাড়ী ভাগ করার ক্ষমতা থাকবে না—

(৩) এই আইন পাশ হবার আগে, কিংবা পরে, কোন হিন্দু নারী যদি সম্পত্তির অধিকারিণী থাকেন, অথবা হন, তবে—সেই সম্পত্তিতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হোলো।

(৪) যদি, কোন হিন্দু বিধবা, পুনর্বার বিবাহ করেন, তিনি আর বিধবা হিসাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তিকেই যে কোন অসুখ, অথবা বিকৃতি, অথবা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এ ছাড়াও নারীকে দত্তক গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং দত্তক হিসাবে নারীকে গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু বিবাহ:—

যে কোন ব্যক্তি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী, অথবা হিন্দুধর্মের যে কোন শাখার ধর্ম মতে বিশ্বাসী—যথা, বীরসেবা, লিঙ্গায়েত, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা, অথবা আর্য সমাজ ভুক্ত—এই আইন তাঁদের প্রত্যেকের উপরেই প্রযোজ্য।

(১) বিবাহের সময়, স্ত্রী এবং পুরুষ কোন পক্ষই, স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে পারবেন না।

(২) বিবাহের সময়—কোন পক্ষই উন্মাদ অথবা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন থাকতে পারবেন না।

(৪) বিবাহের সময়—পুরুষের পক্ষে আঠারো বছর এবং নারীর পক্ষে পনেরো বছর, পূর্ণ বয়স হওয়া চাই।

(৪) উভয় পক্ষের মধ্যে, এমন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে তবে প্রচলিত প্রথা থাকলে এবং প্রচলিত রীতি নীতির দ্বারা সমর্থিত এবং অনুমোদিত থাকলে—সে ক্ষেত্রে বিবাহ হবে।

(৫) উভয় পক্ষের, কেউ কারো সপিণ্ড হতে পারবেন না। এখানেও উপরিউক্ত বিবরণ অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রচলিত প্রথা বা রীতির, অনুমোদন থাকলে— সে ক্ষেত্রে বিবাহ হবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ:—

(১) দুবছর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত থাকলে। কুষ্ঠব্যাধি এবং নিষ্ঠুরতা

(২) ব্যভিচারিতা

(৩) ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে, হিন্দু সমাজ চ্যুতি

(৪) কোন ধর্ম মত গ্রহণ করে, পার্থিব সম্পর্কের অস্বীকৃতি

(৫) জীবিত থাকবার সংবাদ সাত বছর ধরে না পেলে

(৬) স্বামী, পুনর্বার বিবাহ করলে

এ ছাড়া দাম্পত্য জীবনের, ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ আছে, এই বিধি সংক্রান্ত নীতি লঙ্ঘন করলে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা দায়ের করা যাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রথম সর্ত হোলো যে—বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে, বিচ্ছেদের কোন আবেদন করা চলবে না।

দ্বি ভার্য্যা গ্রহণ করলে, কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অথবা তারও বেশী অর্থ দণ্ড হবে।

উপরের উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে, হিন্দু সংহিতার একটা কাঠামো পাওয়া গেল। ব্যক্তি মানুষ কি ভাবে এই আইনকে কাজে লাগাবেন, অথবা—ব্যবহার করবেন, সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন মানুষের পৃথক মনোভাবের উপর। কথা হোলো যে, এই আইনে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ছিল কিনা, এবং এর থেকে কোন কার্য্যকরী পন্থা পাওয়া সম্ভব কিনা—যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপকারে আসবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা যে—এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে—পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষময় ফল স্বরূপ এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক সংহিতার ১ম অধ্যায় ৭২—৭৪ শ্লোকে দ্বিভার্য্যা গ্রহণ এবং কোন কোন অবস্থায় বিচ্ছেদ হতে পারে, সেই সম্বন্ধে উক্তি আছে। সেখানে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যে কোন অবস্থায় স্বামী পুনর্বার দার পরিগ্রহ করতে পারবেন এবং কোন কোন অবস্থায় পারবেন না, এর অন্যথা হলে রাজার আইনে এবং ধর্মত কোন কোন দণ্ড পেতে হবে—ইহকালে ও পরকালে—সেই সম্বন্ধেও স্পষ্ট বলা হয়েছে। যুগ বিবর্তনে, যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় উক্ত প্রত্যেকটি সর্ত এবং আক্ষরিক মিল যে বর্তমান হিন্দু সংহিতার মধ্যেও আছে—একথা নয়—তবে প্রাচ্যেও যে বিচ্ছেদবিধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না—এই কথারই সত্যতা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য-প্রচলিত বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের দ্বারা—হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রভাবিত সত্য। কিন্তু যতদূর সম্ভব ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমান বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিচ্ছেদ আইন থাকায়, যে ভাবে প্রতিদিন—হাজার হাজার মামলা দায়ের করা হচ্ছে, এদেশেও তার ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে—যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক জাতিই—সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়। জলবায়ুর প্রভাবের ফলে যেমন এক দেশের বিশেষ ফল, অন্যদেশের মত হুবহু হয় না, তেমনি সামাজিক আবহাওয়ার স্বাতন্ত্র্য থাকায় ইউরোপে এবং ভারতের বিচ্ছেদ আইনের ফলে—তারতম্যও ঘটতে পারে।

ইউরোপীয় মেয়েদের সামাজিক জীবন-আদর্শের সঙ্গে, ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতির যথেষ্ট পার্থক্য, আজও আছে। ভারতীয় নারী সমাজ, যতই আধুনিকা, বা উগ্র আধুনিকাই হোন না কেন, বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে বলেই, অকারণ হুজুগের বশে দলে দলে আদালতের শরণাপন্ন হবেন, একথা ভাবা যায় না।

একদিন, বহু আদৃত, স্থানীয় এক বাংলা সংবাদপত্রের শীর্ষস্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, সংখ্যাতিরিক্ত নারীই বিচ্ছেদ মামলা আদালতে দায়ের করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হোলো, চটকদার সংবাদ প্রকাশ করেই এ বিষয়ের গুরু দায়িত্বের ভার এড়িয়ে গেলে তো চলবে না! প্রত্যেক নারীই নিশ্চয়, বিচ্ছেদের মামলা আনেন নি এবং এমন অনেকেই আছেন—যে, পারিবারিক সুনাম রক্ষার জন্য, শত দুঃখের জীবনের মধ্যেও বিচ্ছেদের মামলা আনতে পারে নি। অতএব একথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে, এত হালকাভাবে বিচ্ছেদ মামলাকে ভেবে না নিয়ে প্রকৃত সহানুভূতি এবং স্থির বিচারবুদ্ধি নিয়ে—এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আইনতঃ, বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার, বিশদ বিবরণী, বিদ্রূপাত্মকচিত্র, ব্যঙ্গ রচনা, অথবা অশ্লীল মন্তব্য করা যাবে না। কিন্তু মুখে মুখে যে রটনা অনেকক্ষেত্রে প্রচারিত হয়, তা প্রকৃত সত্য ঘটনাকেও অতিক্রম করে। এই যে মেয়েরা, অথবা পুরুষেরা, যাঁরা, বিড়ম্বিত ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তির আশায়, আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যে, নতুন করে সংসার পাতার আশা নিয়েই মামলা দায়ের করেছেন, এ কথা ভাববার কি কোন কারণ থাকতে পারে? মানুষ চিরদিনই ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে—ঘর ধ্বংস করার নয়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যদি নিজের হাতে সেই ঘরকে ভেঙ্গে দিতেই হয়, সেক্ষেত্রে, সহানুভূতির পরিবর্তে উপহাস করবার কোন কারণ ঘটতে পারে? নারীরা নিশ্চয়ই, "সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে" অথবা "নতুন কিছু করো" এই কথা ভেবেই, বিচ্ছেদের মামলা আনেননি। অত্যন্ত জটিল, এমন নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল—বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার আগে থেকেই, যে যার ফলে জীবনের সেই জট খুলতে, তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আইন পাশ হবার আগে—হলে, এঁদের জীবন সমস্যার কথা, লোকচক্ষুর আড়ালে, অপ্রকাশ্যই থেকে যেত, কিন্তু এখন প্রকাশ্য আদালতে যখন হাজির হয়েছেন, তখন সেই সমস্যা, শুধু যে ব্যক্তি মানুষের সুখ শান্তি ধ্বংস করে চিরদিন চলবে তাই নয়, সমাজের প্রকৃত অবস্থা কি, সেই সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন। প্রতিকার করা না করার প্রশ্ন নয়, এতদিন যে সমস্যা সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষ যে সম্বন্ধে বাস্তব ও কল্পনা মিশিয়ে চিত্র দেখতেন, এখন আর তা' হবে না।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ করার কথা, অথবা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ-এর কথা, একেবারে অশ্রুতপূর্ব, অসম্ভব, বা অবাস্তব ছিল না। কেউই বোধ হয় একথা স্বীকার না করে পারবেন না, যে যিনি, আত্মীয়, অনাত্মীয়। বন্ধু বান্ধব, বা প্রতিবেশীর সংসারেও প্রাচীনা অথবা নবীনা, স্বামী পরিত্যক্তা একটি নারীকেও চাক্ষুস পরিদর্শন করেননি। দোষ, যে কোন পক্ষেরই থাক না কেন,—যার ফলে সংসারে বিশৃঙ্খলতা এবং বিচ্ছেদ এসেছে। এতদিন হিন্দু নারী যখন, একবার বিবাহিতা বলে স্বীকৃতি পেতেন, তখন স্বামী বেঁচে থাকলে, পরিত্যক্তা হলেও পুনর্বার বিবাহ ছিল অসম্ভব। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির, অবস্থা কি হতে পারে সেটাও ভাবা দরকার। স্বামী এবং শ্বশুরকুলের সঙ্গে মেয়েটি সম্পর্ক ত্যাগ করে, যখন পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন, তখন—পিতৃকুলও তাঁকে সাদর আহ্বান জানান না। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে কি বলে—যে আদর যত্ন এবং মর্যাদায় তাঁকে, বুকে তুলে নেওয়া হয়; স্বামী পরিত্যক্তার ক্ষেত্রে, ঠিক এর বিপরীত। আদরে বা অনাদরে—"জীবনের শেষদিন গুলো—কোন গতিকে" কাটিয়ে যাওয়া। আর্থিক সংগতি নেই—আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই। আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশীর, অঙ্গুলি নির্দেশ আছে—আরো আছে নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, আদিম প্রবৃত্তির তাড়না ও সেই সঙ্গে নানা প্রলোভন। তাই অনেকক্ষেত্রে জীবনের শেষ দিন গুলো কোন গতিকে কাটিয়ে দিতে না পারলেই—যে কি ঘটা সম্ভব ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান বিচ্ছেদ আইনে, স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারবেন। বিচ্ছেদ আসবার একমাত্র অধিকারী এক্ষেত্রে শুধু পুরুষই নন, নারীও। স্বামী অথবা স্ত্রী, যদি আপনাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত, জীবিকা অর্জন, না করতে পারেন, তবে অপেক্ষাকৃত ধনীপক্ষ, অপরপক্ষের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় ভার বহন করবেন। এই আইনের ফলে, মেয়েদের দিক দিয়ে বলা চলে যে, তাঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান, অংশত হোলো এবং পুনর্বার বিবাহ করার অধিকার রইল।

বিবাহের প্রথম কথাই হোলো, সামাজিক স্বীকৃতি এবং সামাজিক মর্যাদা লাভ।

হিন্দুধর্মের মধ্যে, জাতির ও গোত্রের বাধা না রেখে বিবাহের আইন প্রবর্তন করা হোলো। এর ফলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের গণ্ডীর সীমা বর্দ্ধিত হোলো—হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে বাঙ্গালী সমাজের বিবাহ প্রথার মধ্যে একটা পরিবর্তন যে-প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। পণপ্রথার কথা বাঙ্গালী সমাজে অবিদিত নয়। স্নেহলতা ভগ্নির আত্মহত্যার ঘটনাও সাম্প্রতিক নয়। তা সত্বেও পণ-প্রথা যে আজও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবেই দুর্দাম গতিতে আধিপত্য করে যাচ্ছে, একথাও অনস্বীকার্য। যে কোন রবিবারের সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়লেই বোঝা যাবে, বিবাহের বাজারে, বাঙ্গালী মেয়েদের সঠিক স্থান কোথায় এবং সমাজের অবস্থা কি? এখানে

শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মেয়ের প্রশ্ন নেই। পরমা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, সূচী শিল্পে পারদর্শিনী সঙ্গীতজ্ঞা, বিদুষী নম্রস্বভাবা ইত্যাদি একজন মানুষের পক্ষে পুরুষ কিংবা নারী, যাই হোক না কেন, একসঙ্গে এত সম্ভব, অসম্ভব রূপ গুণের সমন্বয় অতি বিরল। একমাত্র কন্যা, সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী পাত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হবে, বিদেশে লেখাপড়া শেখানো হবে, কিংবা গর্ভমেণ্ট চাকুরী দেওয়া হবে—এ সব প্রলোভনও আছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে—যে কন্যা চাকুরীজীবী হলে ভালো হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ভারতের উপর দিয়ে পর পর যে বিপর্যয় ক্রমান্বয়ে চলেছে, তাতে তার অর্থনৈতিক অবস্থা যে কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেচে, তা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই প্রমাণ পাচ্ছেন।

প্রতিদিনের, দিন গুজরাণ করার মত অবস্থাই যেখানে দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, সেক্ষেত্রে এত রূপ গুণের অধিকারিণী এবং তার সঙ্গে নিদেনপক্ষে হাজার তিনেক টাকা, একসঙ্গে জোটানো যায় কেমন করে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যার সংখ্যাও একটি নয়। অনেক পরিবারেই আছেন, যাঁদের কন্যা সংখ্যা—সাত, আটটি। এ ছাড়াও, অনেক পরিবারেরই পিতৃহীনা, ভাইঝি, ভাগ্নারও অভাব নেই। যাঁদের দশ বিশ হাজার টাকা অক্লেশে খরচ করার মত সাধ্য আছে, কিংবা একটি মাত্র কন্যা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আজ চাকুরীর ক্ষেত্রে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত মেয়েদের যে এত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়—তাঁরা প্রত্যেকেই কিছু সখ সৌখীনতার খরচ চালাবার জন্যই ক্যানে বশে চাকুরী করেন না! যে অবস্থার মধ্যে শুধু—খেয়েপরে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে—সে অবস্থায় বাঙালীর মেয়ে এত রূপই বা পাবেন কোথায়? মেয়ের বিয়ে দেবার দায়িত্ব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকের। তাঁরা মুখে না প্রকাশ করলেও, একথা বেশ ভালো ভাবেই অনুমান করছেন যে বিবাহ সমস্যা দিন দিন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, এবং আরো দশ বছর পরে—তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। প্রায়ই একথা শোনা যায়—যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের দরকার হয় না, এই কাজটা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নেন। কিন্তু দেখেশুনে বিয়ের ব্যাপারটা কি আইন পাশ হবার পরেই এদেশে এলো? গান্ধর্ব বিবাহ, অথবা স্বয়ংবরার কথা বাদ দিলেও আইন পাশ হবার আগেই এবং তথাকথিত আজকালকার ছেলেমেয়েদের আগেও স্বনির্বাচিত পাত্রপাত্রীর বিবাহের প্রচলন ছিল। পার্থক্য শুধু—বিবাহের ধর্ম মত নিয়ে—আগে যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, বিবাহের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ঘটলে—তিন ধারার আইনে বিবাহ হোতো, অথবা পাত্রপাত্রী ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতেন, এই আইনের বলে, তাঁরা স্ব সমাজে এবং স্বধর্মে থেকেও বিবাহ করতে পারবেন। স্বীকার করি, যে আজকাল মনোমত পাত্র-পাত্রী বিবাহ করার ঘটনা বেড়েছে—কিন্তু তার অর্থে তো ব্যভিচারী হয়ে মর্যাদা হয়; তবে এঁদের বিবাহের ক্ষেত্রেই বা তার বৈপরিত্য ঘটবে কেন? যে কোন কারণ বশতঃই হোক না কেন, গৌরীদানের যুগ বহু দিন অপসৃত। পাত্র এবং পাত্রী যে বয়স অতিক্রান্ত হবার পর নিজেরা বিবাহ করেন, তখন তাঁদের নিশ্চয়ই ছেলেমানুষ বলাও চলে না। তাঁদের বিচার বুদ্ধি বিবেচনা ছাড়াও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও গড়ে উঠেছে। নির্বাচনে ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁদের মতকে তো ভ্রান্ত বলা চলে না? সামাজিক মর্যাদার অস্বীকৃতির জন্যে অথবা আইনের ভয়ে, এক্ষেত্রে বিবাহ না করা ছিল ব্যভিচারিতা এবং সত্যধর্ম চ্যুতি; কিন্তু সামাজিক মর্যাদা আইনত প্রতিষ্ঠা করার পর, পূর্বের প্রতিবন্ধকতা না থাকায়—বিবাহের নামান্তর কি স্বৈরাচারিতা—অথবা স্বেচ্ছাচারিতা?

পাত্রীপক্ষের অভিভাবকদের কাতর আবেদন নিবেদন এবং যোড়-হাত করার পালা তো সমাজে বহুদিন চলে আসছে—অর্থাভাবে বিয়ে দিতে পারেননি, অথবা সর্বস্ব খুইয়ে বিয়ে দিয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও তো বিরল নয়, এবারে একবার একযোট হয়ে নতুন আইনের ফলে কোন সুরাহা করতে পারেন কিনা দেখবার চেষ্টা করলে মন্দ কি হবে? বিবাহের ব্যাপারে তো পাত্রপাত্রী দুজনেরই সমান প্রয়োজন। ব্যক্তি মানুষ মেয়ের বিয়ের সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্যে যা করতে সাহস পাবেন না, সমষ্টিগত ভাবে করলে—সে সমস্যার ভয় থাকবে না। কৌলিন্য প্রথার আমলে যখন একই পাত্রের হাতে শতাধিক কন্যা সমর্পণ করার ফলে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তা যদি সমাজ-বিধ্বংসী কার্য্য-কলাপ না হয়ে থাকে তবে বিবাহ আইনের প্রয়োগে বিবাহ হলেই যে তা হিন্দুধর্ম এবং সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করবে এ বলে তো মনে করার কারণ দেখতে পাওয়া যায় না।

বরং বিবাহ সমস্যার যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে বিরল বিবাহের ফলেই—সমাজে ব্যাভিচারিতা দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশী। শহরের মানুষকে বিভিন্ন দেশ বিদেশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাই, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা করার ফলে, ধর্মনীতি সমাজ নীতি বা রাজনীতি—যে বিষয়ই হোক না কেন, নিজেদের ভালো-মন্দের ও রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর ফলেই বোধ হয় প্রথমেই যে কোন বিষয়ের আলোড়ন বা আন্দোলন সুরু হয়—শহরে, পরে তা পল্লীগ্রামে সংক্রামিত হয়ে পড়ে।

হিন্দু বিবাহ আইনের ফলে, সত্যিই যদি কোন উপকার পাওয়া যায়, কিংবা সামাজিক পরিবর্তন আশা সম্ভবপর বলে বোধ হয়, তবে এই বিষয়েও শহরবাসীকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। শহর এবং গ্রামে মেয়ের বিয়ের সমস্যা যখন প্রায় একই, তখন সাহস ভরে "বেড়ালের গলায় ঘণ্টা" একবার ঝুলিয়ে দিতে পারলে, অনেক অন্যায়ের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পাবারই পন্থা কিছু বার হতে পারে। এবং তখন সমর্থকের অভাব তো হবেই না, বরং অনেকেই আশীর্বাদ করবেন—হিন্দু সংহিতার বিবাহ আইনকে।

• হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বলে, স্ত্রী এবং পুরুষ, সম্পত্তির সমান

বিচার করলে, যত দোষ ত্রুটি দেখা যাবে, সমস্ত আইনের পটভূমিকায় একে বিচার করলে, তা দেখা যাবে না।

বর্তমানে মেয়েরা পণ বা যৌতুক হিসাবে একবার টাকা পাচ্ছেন—আবার সম্পত্তির অধিকারী হিসাবে লাভবান হচ্ছেন—বিরোধী পক্ষের যুক্তি হোলো এই। এই ভাবে সম্পত্তি ভাগ হতে হতে ক্রমে শূন্যে এসে ঠেকবে।

কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীলোকই যখন সম্পত্তির অধিকারিণী তখন কন্যা এবং পুত্রবধূ, উভয়েই উভয়ের পিতৃ সম্পত্তি লাভ করছেন। যোগ বিয়োগের ফলটা প্রায় একই দাঁড়াচ্ছে শেষ অবধি।

পুরুষদের, উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বাটয়া নিতে, যেমন প্রত্যেকেই আইন আদালত করেন না, তখন মেয়েরা উত্তরাধিকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রত্যেকেই আদালতের শরণাপন্ন হবেন, একথা ভাববার কি যুক্তি থাকতে পারে? পারিবারিক স্নেহের বন্ধন নিশ্চয়ই এত ক্ষণ-ভঙ্গুর নয় যে—আইনের উপরেই তা নির্ভর করে।

যে পরিবারের পারিবারিক স্নেহের বন্ধন দৃঢ় নয়, তার সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনতে, গৃহবিচ্ছেদ আনতে, সাংসারিক অশান্তি এবং বিশৃংখলতাই যথেষ্ট, আইনের প্রয়োজন সেখানে হয় না। বর্তমান আইনের বলে, নারীকে অর্থ-নৈতিক পরাধীনতার হাত থেকে, অংশত মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বাঙালী পরিবারে আর্থিক সংগতিহীনা অথবা বিধবা কন্যাগণ ছাড়াও যে অনেক পোষ্যই, একটি পরিবারের ছায়ায় আশ্রয় পান একথা যেমন সত্য, তেমনি এর আবার বিপরীত যে একটা দিক আছে, সেকথাও ভাবা দরকার। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়, প্রায়ই বৃদ্ধা অনাথা বিধবা আছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা আদৃত এবং সর্বময়ী কর্ত্রীও হয়ে আছেন, যেমন একথাও সত্য, কিন্তু আবার অনেকক্ষেত্রেই যে এঁরা ভার বোঝা এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না।

স্বামী কুল এবং পিতৃকুল থেকে বিশেষভাবে বিধবা কন্যাগণ, যদি আইন মতে কিছু আর্থিক সাহায্য পান,তবে তাঁকে এবং তার সন্তানগণকে আর্থিক সংগতিহীন হলে শুধু দয়ার উপর নির্ভর করে থেকেই জীবন কাটাতে হয় না। বিধবা বিবাহ আইন আছে—কিন্তু প্রত্যেক বিধবাই বিবাহ করে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। বিবাহের বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হবার পর বৃদ্ধ বয়সেও অনেকে বিধবা হন, আবার কেউ কেউ বিধবা হবার পর বিয়ে করেন না, পারিবারিক মর্যাদায় এবং স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার আদর্শ রক্ষায়। যাঁরা পুনর্বার বিবাহ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু যাঁরা উপরিউল্লিখিত নানা কারণে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন না, আর্থিক সংগতির দিক দিয়ে তাঁরা কি ব্যবস্থা করবেন? কমবেশী অর্থের প্রয়োজন তো সব মানুষেরই আছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন—ধরে নেওয়া গেল যে তাঁরা অর্থ সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারবেন, কিন্তু যাঁরা লেখাপড়া শেখেন নি, প্রতিক্ষেত্রেই কি তাঁরা এক পয়সার প্রয়োজনে দয়া ভিক্ষা করবেন? যে ক্ষেত্রে স্নেহের বিনিময়ে সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব, সেখানে কি কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে চান?

সমাজের নানা সমস্যার কথা চিন্তা করেই হিন্দু সংহিতা আইন হয়েছে, বিশেষ করে নারীজাতির প্রতি লক্ষ্য রেখে। নারীরা পুরুষের জননী, জায়া, কন্যা ও ভগিনী। এঁদের উন্নতি অবনতিতে এঁদের সুখ দুঃখে, প্রথমে ব্যক্তি পরিবার প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়—তারপর সমাজ

স্বামী-পরিত্যক্তা বা বিধবা কন্যার, সুখ দুঃখের নানা বাস্তব অবাস্তব কাহিনীই অনেকে শোনাতে পারেন তাঁদের ভালো করার কাজে, সমাজ ব্রতী—দেশপ্রেমিক অনেকেই অনেক বড় বড় প্রতিকারের উপায় দেখাতে পারেন—কিন্তু একমাত্র ভুক্তভোগী পিতামাতা ছাড়া, সেই অপরিসীম বেদনা অন্য কারোর পক্ষেই জানা এবং অনুভব করা সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দু সংহিতা আইনে, নারী সমাজের অবস্থার যে আমূল পরিবর্তন হোলো, আর্থিক স্বাধীনতা একপত্নীত্ব প্রভৃতি আইনতঃ সিদ্ধি লাভ করলো, সমাজের সমুদ্র মন্থনে, নারীর কপালে শুধু গরলই নয়, অমৃত লাভও ঘটলো, তাই দেখে আজ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মশাই বেঁচে থাকলে তাঁর চেয়ে বেশী সুখী বোধ হয় কেউই হোতেন না।

সেদিনের ইস্পাত কঠিন কাঠামোয় গড়া, সামাজিক রীতি নীতির শাসনের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ নিষ্ঠুর উপেক্ষা আর উপহাস সহ্য করে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর কঠোর মনোবল নিয়ে বজ্র কঠিন দার্ঢ্যে অটল অনড় এককভাবে দাঁড়িয়ে; বজ্র-নির্ঘোষকণ্ঠে শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়ে প্রতিপক্ষের এক একটি যুক্তির "অকাট্য প্রমাণ", খণ্ডন করেছিলেন—আজও সেই কথা মনে হলে শিউরে উঠতে হয়। যার ফলে শেষ অবধি বিধবা বিবাহ আইনও পাশ হয়—এবং তিনি নিজে পুরোধা হয়ে অনেক বাল-বিধবারও বিবাহ দেন।

সতীদাহ প্রথা যেদিন আইন করে বন্ধ করা হয়, বন্ধ করা হয় নরবলি কৌলিন্য—গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করা, সেদিনও প্রচলিত প্রথার অবসানকে মানুষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেননি, অসংকোচে স্বীকৃতিও দেননি।

স্ত্রী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাতের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল—

"এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে
আর কিছুদিন থাকরে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

ব্যক্তিগত সমালোচনা করে, পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটানো যায় মাত্র, সমস্যার সমাধান হয় না। সত্য যদি শাশ্বত হয় তবে তারও কণ্ঠরোধ করা যায় না। রাজনৈতিক "ইজম্" বাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামাজিক সমস্যা হয়তো চাপা পড়ে গেছে, না হয় এটাকে কোন সমস্যার মধ্যেই গণ্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান হিন্দু সংহিতা আইন প্রণয়নের ফলে যদি হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকতো, তবে মনে হয় না যে বিনা আন্দোলনে বিনা প্রতিবাদে বাঙ্গালী তা' মেনে নিতেন।

ধ্বংসাত্মক, এই আইনকে ধ্বংস করতে গিয়ে,—সপরিবারে ধ্বংস

হতেন, এ কথাও সত্য, তবুও আইন করে ধর্ম বা সমাজ ধ্বংস করার নীতি মেনে নিতেন না। বহু ক্ষেত্রেই সে প্রমাণ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। —বাঙালী আজও নিষ্প্রাণ, নির্বীর্য জড় বুদ্ধি ক্লীবে পরিণত হয়নি— প্রয়োজন বোধে মাতৃভাষা রক্ষা করতে যে বাঙালী প্রাণ দেয়, মাতৃজাতির, মাতৃধর্মের রক্ষা কল্পে প্রাণ দেবার শক্তি তার আছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার মারফৎ, আমাদেরই অতি বৃদ্ধা প্রপিতামহী, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের যে প্রশ্ন তুলেছিলেন—"জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে—একজন অন্যজনের দাস হইবে কিম্বা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে নহে।"

তাঁদেরই উত্তর সুরী হিসাবে তাঁদেরই তোলা প্রশ্নের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, বর্তমান নারী সমাজের যদি সমান অধিকার দাবীর সমর্থনে, কেউ হিন্দু সংহিতার জয়ধ্বনি করে তবে সেই ধৃষ্টতাও কি মার্জনীয় নয়?

প্যাটার্ন—

—ইন্দিরা বিশ্বাস

—দশ—
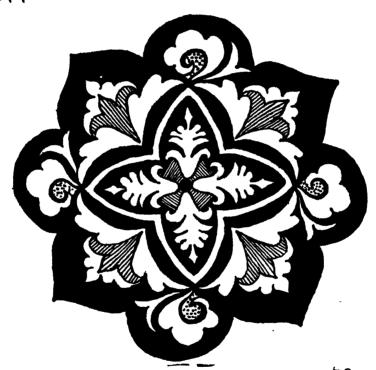
ক্লাসটা বেশিক্ষণ চলল না। সত্যজিৎ সোজা সামনের সাদা দেওয়ালটার ওপরে চোখ আটকে রাখল, তারপর যেন ক্লাস শুদ্ধ মেয়েকে পড়াচ্ছে এম্‌নিভাবে গ্রামোফোন রেকর্ডের ভঙ্গিতে বলে চলল। পূরবীর দিকে একবারও সে চাইতে পারল না।

পূরবীর দিকে এম্‌নিতেই সচরাচর তাকায় না সত্যজিৎ। হঠাৎ চোখের দৃষ্টি কখনো গিয়ে পড়লে দেখতে পায় মাথা নিচু করে একমনে সে বই দেখছে, অথবা নোট করছে। তবু সত্যজিৎ জানত, তাকে না দেখেও পূরবী তার প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করছে, তার প্রতিটি হাতের ভঙ্গি, রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছে ফেলা—সব। তার একটি কথাও পূরবীর কান এড়িয়ে যাচ্ছে না! সকলের মাঝখানে বিশেষ একজন যে মুগ্ধ হয়ে তার পড়ানো শুনছে—সে অনুভূতির রোমাঞ্চ থেকে থেকে তাকে স্পর্শ করত!

কিন্তু আজ—

যান্ত্রিক ভাবে পড়িয়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে সত্যজিৎ ক্লান্তভাবে চিন্তা করতে লাগল, ক্লাসশুদ্ধ সবাই যখন আজ বাইরের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তখন একমাত্র পূরবী এমন করে পড়তে এসেছে কেন? ফ্রীতে পড়ে বলে কলেজ অথারিটির সুনজরে থাকতে চায়? কিন্তু আরো অনেকেই তো ফ্রীসিপ্ পায়। তাহলে কি একমাত্র তার ক্লাস করবে বলেই সকলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতর দিয়েও—

ভাবতে ভালো লাগা উচিত ছিল, কিন্তু ভালো লাগল না। কোথা থেকে যেন একরাশ গ্লানি এসে মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। অনাবশ্যকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নিজের ভেতরের ফাঁকি আর ফাঁকাটা ভুলতে পারল না কোনোমতেই।

শেষ পর্যন্ত পূরবীরই অসহ্য হয়ে উঠল। পড়ানোর মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা ক্ষীণ-প্রায় নিঃশব্দ স্বর সত্যজিতের কানে এল: স্যার, আজকে থাক।

—অল্ রাইট্ লেট্স্ স্টপ হিয়ার—বৈষয়িক ভঙ্গিতে কথাটা ছেড়ে দিয়ে খাতা তুলে নিয়ে সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল।

স্টাফ রুমে তর্কের ঝড় বইছে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের কথার তলোয়ার খেলা। ওসব অনেক শুনেছে সত্যজিৎ—নিজেও অনেক বলেছে অনেকদিন। আজ সব কেমন প্রলাপের মতো মনে হল। এ যেন কেবল কথার বিলাস, মস্তিষ্কে শাণ দিয়ে চলা; হয়তো একদিন এরা হৃদয়ের অনুভূতির মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছিল—সেই ছাত্র-জীবনে মেসে বাস করার সময়, তারুণ্যের আগ্রহে 'লেটেষ্ট্ বুক' গলাধঃকরণ করবার সময়, ইউনিভার্সিটির লনে মুঠি পাকিয়ে বক্তৃতা করবার দিনগুলোতে। তারপরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। জীবন আর জীবিকা। দু'চারজন সদ্য কলেজ ফেরৎ ছাড়া সকলের চোখে মুখে একই ক্লান্তি—একই জোয়াল টেনে চলার শিথিল অবসাদ। আজ কেবল অভ্যাসের চর্চা। বয়সের অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধির চর্চায় কথার ধার বেড়েছে, তির্যক ইঙ্গিত এসেছে—কিন্তু হৃদয় সম্ভূত অনুভবের শিকড়গুলো শুকিয়ে গেছে অনেক-

দিন। কখনো কখনো এমনো মনে হয়—আসলে সবাই নৈরাজ্যবাদী—সবাই 'সিনিক্'—সকলেই এক শূন্যতার মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। এখন কেবল অভ্যাসের জের টানা—কেবল কথার বিলাস।

কিন্তু সবাই? কেউ বাদ নেই?

এত বড় অন্যায় অভিযোগ নিশ্চয় করা যায় না। হয়তো নিজের মনটাই সে সকলের ওপরে আরোপ করেছে।

সত্যজিৎ কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। বীথি কোথায় কে জানে। বাড়িতে যে ফেরেনি সেটা নিঃসন্দেহ।

বাড়ি ফিরতে সত্যজিতেরও উৎসাহ হল না। প্রায় নির্জন ফুটপাথের ওপর একটা শ্রীহীন শিরিষ গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। পর পর চারটে বাস ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তা পার হল, তার পর উলটো দিকের একটা গাড়িতে চেপে বসল।

পথের মানুষ, গাড়ি বাড়ি, রোদের টুকরো, ট্রামের ঘন্টি, ভারী ঠেলা গাড়ি টানতে টানতে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়া একটা বুড়ো। দূরের বাড়িটার কার্নিশে চিল উড়ে এসে বসল—তার নখের নিচে চেপ্‌টে যাওয়া মরা ইঁদুরের নাড়ী ঝুলছে। সত্যজিৎ গাড়ির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মোটা এক ভদ্রলোক তার পাশে এসে আসন নিয়েছেন—অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন—বুকের ভেতর থেকে তাঁর হাপর টানার মতো আওয়াজ উঠছে। হাঁপানি। গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে—পোড়া তেলের এক একটা শ্বাসরোধ করা ঝলক আসছে থেকে থেকে।

এস্‌প্ল্যানেড্।

সত্যজিৎ নেমে পড়ল। ট্রামের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় মুমূর্ষু সংকীর্ণ কার্জন পার্ক। মরা ঘাস, শ্রীহীন কুঞ্জ। কয়েকটা রেলিং টপকে—কিছু ঘাসের জমি মাড়িয়ে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

শিক্ষক ধর্মঘট। অল্-আউট্।

পথ জুড়ে মাস্টার মশাইরা অবস্থান ধর্মঘট করছেন। লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দেশের মানুষ। কিন্তু লালদীঘির লাল ফিতের দপ্তরে সে লজ্জা স্পর্শও করেনি। বরং একজন ওপরওয়ালা হুমকি দিয়ে বলেছেন—কিন্তু মনের দিক থেকে কত নিচে নেমে গেছি আমরা। সমস্ত বিবেক, সমস্ত মনুষ্যত্বহীন আমলাতন্ত্র। ধিকার দিতেও নিজের ওপরে ধিকার আসে।

অবস্থান ধর্মঘট।

কতখানি অসহ্য হয়ে উঠলে হিমালয়ের চাইতেও সহিষ্ণু চিরকালের নির্বিরোধ মানুষগুলোও এমনভাবে চরমপন্থা বেছে নিতে পারেন? ক্ষুধার জ্বালা আর আত্মার অবমাননার কোন্ স্তরে পৌঁছুলে এমন করে পথের ভিক্ষারীর মতো তাঁরা ধূলোয় আসন পাত্‌তে পারেন?

লালদীঘির লাল ফিতের নিচে তার জবাব নেই।

—ভালো আছো তো?

সত্যজিৎ চমকে উঠল। সামনে একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথার শাদা চুল রোদে চক চক করছে—ঝিক মিক করছে পুরোনো ধরণের নিকেলের ফ্রেমের চশমা।

—স্যার, আপনি?

নিচু হয়ে পা স্পর্শ করল সত্যজিৎ। অনন্তবাবু—অনন্ত সেনগুপ্ত। পনেরো বছর আগে স্কুলে তাঁর কাছে ইংরিজি গ্রামার পড়ত। এর মধ্যে কত বুড়িয়ে গেছেন অনন্তবাবু!

—স্যার, আপনি?—প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলে সত্যজিৎ।

—কী করি, আসতেই হল।—অনন্তবাবু হাসলেন। সত্যজিৎ তাকিয়ে দেখল, এখন পর্যন্ত তাঁর স্নান হয়নি, খাওয়াও হয়নি খুব সম্ভব। অপরিচ্ছন্ন ধূলিমলিন জামাকাপড়। চোখের দৃষ্টি প্রায় নিভে গেছে।

—তবু অনন্তবাবু হাসলেন। সেই পুরোনো সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। চল্লিশ বছর না খেয়ে, আধ পেটা খেয়ে আর উদয়াস্ত টিউশন করেও যে হাসি কোনোদিন এতটুকুও ম্লান হয়নি।

—কী করি বাবা—সবাইকেই তো আসতে হবে।

—কিন্তু স্যার, এত বয়েসে—দ্বিধাজড়িত ভাবে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ থামল।

—আমার চাইতেও বয়েসে বড়ো অনেকে আছেন। ওই ওঁকে দেখছ?—আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে অনন্তবাবু বললেন, ওই কোণায় বসে রয়েছেন রোদের মধ্যে? ওঁর

পঁয়তাল্লিশ টাকা। আমার তো তবু দশ জন লোক—মাইনে একশো বাইশ।—অনন্তবাবু আবার হাসলেন।

এবারে সে হাসিটা চাবুকের মতো মনে হল।

অনন্তবাবু বলে চললেন, ওঁকে একটা ছাতা দিতে চেয়েছিল সবাই—উনি রাজী হলেন না। বললেন, সকলের জন্যে যদি ব্যবস্থা না হয়—আমার একার কোনো দরকার নেই।

অনন্তবাবু এখনো হাসছেন। সেই গ্রামার পড়াতে গিয়ে যেমন করে হাসতেন—পরীক্ষায় সত্যজিৎ ইংরেজিতে লেটার পেয়েছে জেনে যেমন করে হেসেছিলেন—সেই একই রকম। হাসিটা বদলায়নি—কিন্তু অর্থ বদলে গেছে। সত্যজিৎ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকক্ষণ গড়ের মাঠে লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে সত্যজিৎ বাড়ি ফিরল।

সিঁড়ির দিকে ওপরে ওঠবার আগেই নিচের ড্রয়িংরুমের দিকে চোখ পড়ল তার। কে যেন এসেছে ওঘরে—গল্প জমিয়েছে—তার একটা উৎকট হাসির আওয়াজ কানে এসে আঘাত করল সত্যজিতের।

মুখার্জি ভিলার এই বসবার ঘরে অনেকদিন এমন হাসির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় নি; মাঝে মাঝে তেতলা থেকে বিকৃত-মন ইন্দ্রজিতের অশ্লীল হাসি ছাড়া কোনো প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়েনি এ বাড়িতে। আশ্চর্য হয়ে এগোল সত্যজিৎ।

প্রীতি বললে, ছোড়দা—আয়। ইনি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

ইনি?

অদ্ভুত মূর্তি। থুতনির নিচে দু পাশ কামানো দাড়ি। গায়ে ছাপমারা ক্যানাডীয়ান বুশশার্ট। ট্রাউজারের বেল্ট থেকে একটা চাবির চেন পকেটে গিয়ে নেমেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললে, সত্যদা—চিনতে পারছেন?

সত্যজিৎ ভ্রুকুঞ্চিত করল। মনে পড়ল না।

—চিনতে পারছেন না? হাউ স্ট্রেঞ্জ! ছেলেবেলায় কতবার এসেছি গেছি। আমি রীতেন রায়।—চোখে একটা স্মার্ট ইঙ্গিত ফুটিয়ে রীতেন বললে, বনশ্রী রায় আমার দিদি।

শেষ কথাটা না বললেও চলত—অন্তত ওইভাবে। সত্যজিতের মুখে চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতা ফুটে বেরুল। হীরেনের কথা মনে পড়ল—হিতেন যদি গ্রেট হয়—রীতেন গ্রেটার।

—বুঝেছি, বোসো।

—বসেছি অনেকক্ষণ। প্রীতি দেবীর সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলাম।

—চা খেয়েছ?

জবাব দিলে প্রীতি। তার মুখে প্রচ্ছন্ন খুশির উদ্ভাস।

—চা দিয়েছি দাদা।—উচ্ছ্বসিতভাবে প্রীতি বললে, উঃ—কী গল্পই যে জমাতে পারেন রীতেনবাবু! জানো দাদা, এতক্ষণ এমন হাসাচ্ছিলেন যে দম আটকে যাওয়ার জো!

প্রীতি হাসছিল—রীতেন হাসছিল। এই মুখার্জি ভিলায়—এই অন্ধকার পঙ্কিলতার ভেতরে। এখানে শিবশঙ্কর তাঁর পঙ্গু চেহারা নিয়ে দেওয়ালের সেই ভেনাস-অ্যাডোনিসের বীভৎস ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন—এখানে ইন্দ্রজিতের বিকৃত কল্পনার সম্মুখে অপমৃত্যু আর অপচ্ছায়ারা শোভাযাত্রা করে চলেছে।

রীতেন বললে, রিয়্যালি—উই ওয়ার হ্যাভিং এ গ্যালা টাইম! অ্যাণ্ড্ শি ইজ্ সিম্প্লি চারমিং!

সত্যজিতের কপাল কুঁচকে এল আর একবার।

—তুমি আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করছিলে সে তো বললে না।

—ওঃ—হিয়ার ইট্ ইজ।—ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করলে রীতেন: দিদি দিয়েছে। বলেছে, একটা জবাব নিয়ে যেতে।

—দিচ্ছি জবাব। একটু অপেক্ষা করো।

—ওকে—ওকে!—প্রসন্ন মুখে রীতেন বললে, আমার কোনো তাড়া নেই। সিম্প্লি আই অ্যাম্ ইন্ এ হলিডে মুড্ টু ডে। তাছাড়া—আই অ্যাম্ হ্যাভিং এ ভেরি নাইস্ কোম্পানি!

রীতেনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সত্যজিৎ একবার প্রীতির দিকে তাকালো। কী একটা কথা যেন প্রীতিকে বলা দরকার বলে তার মনে হল—কিন্তু কথাটা ঠিক যে কী, কী ভাবে তা বলা উচিত, সত্যজিৎ তা ভেবে পেলনা। কয়েক সেকেণ্ড অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে চিঠিটা নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেই সময়ে ওপরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছিল। একটা মেয়ে খবর দিতে চেষ্টা করছিল যে বীথিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

ক্রমশঃ

শ্রী 'শ'—

ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে অব্যাহত গতিতে,—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। শত শত ছবি প্রস্তুত হচ্ছে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে। কিন্তু এই শত সহস্র ছবির মধ্যে সত্যকার ভাল ছবির কথা বলতে গেলে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি ছবির কথাই মনে আসে। সুতরাং এই অল্প কয়েকখানা ছবি দিয়ে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান যাচাই করা চলে না, আর তা উচিতও নয়।

বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই খাটে। 'পথের পাঁচালী' ও 'কাবুলীওয়ালা'কে উদাহরণ না বলে ব্যতিক্রম বলাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। সাধারণতঃ বাংলা ছবিতে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার প্রেম ও বিচ্ছেদ, ভালবাসা ও অশ্রুজলের সেই অতি সাধারণ গল্পের চর্বিত-চর্বণ। তার মধ্যে হয়ত কয়েকটি ছবির গল্পে সামান্য কিছু নতুনত্ব যোগ করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে চেষ্টাও অনেক সময় পরিচালকের পরিচালনা গুণে হিতে বিপরীতই হয়ে পড়ে। এই সূত্রে অধুনা প্রদর্শিত 'সুরের পরশে' চলচ্চিত্রটির কথাই মনে আসছে। এই ছবিটির কাহিনী দুর্বল ও একঘেয়ে। তার মধ্যে নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করা হয়েছে সুন্দরী নায়িকাকে একধারে থিয়েটারের মালিক ও নৃত্য-পটীয়সী সুকণ্ঠী অভিনেত্রী করে দিয়ে। জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীকে দিয়ে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ও করান হয়েছে আর নায়ক-নায়িকার মুখে ঝাঁঝাল সংলাপও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এক শ্রেণীর দর্শকের বাহবা পাবার আশায়। কিন্তু এত করেও ছবিটি ভাল হয়নি মোটেই। কাহিনীর দৌর্বল্য ছাড়া অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি হয়েছে অতি সাধারণ স্তরের। পার্শ্ব ভূমিকায় একমাত্র পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ই চোখে পড়ে। ছবি বিশ্বাসকে অভিনয় কুশলতা দেখাবার বিশেষ সুযোগই দেওয়া হয়নি।

'সুরের পরশে' ছবিতে একটি মনোরম-ভঙ্গিমায় নায়িকা মালা সিংহ

আর অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় সাধারণ স্তরের উপরে ওঠেনি। এর ওপর আছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশেষত্ব,—ছবিটির বিরাট দৈর্ঘ্য, আর তার ওপর রয়েছে বাংলা ছবির বিশেষ গুণ (?),—গতির মন্থরতা। যাঁরা বাংলা ছবি অনবরত দেখে থাকেন অভ্যাসবশতঃ তাঁদের কাছে বাংলা ছবির এই মন্থর গতি হয়ত ততটা পীড়াদায়ক হয় না। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ছবির দৈর্ঘের সঙ্গে তাল রেখে যদি ছবিতে গতি সঞ্চার না করা যায় তাহলে সে ছবি দর্শকদের ধৈর্য্যকে পীড়িত করে তোলে। এই গতির যুগেও বাংলা ছবির নির্ম্মাতারা আজও যে কেন এ বিষয়ে অনবহিত হয়ে রয়েছেন তা বুঝে উঠতে পারি না। আশা করি বাংলা ছবির পরিচালকেরা এই বিষয়ে অচিরেই অবহিত হয়ে ভবিষ্যতে বাংলা ছবির দৈর্ঘ্যকে সংযত ও গতিকে ত্বরান্বিত করে চিত্র-রসিক দর্শকদের অহেতুক ধৈর্য্য পরীক্ষা দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

* * *

'কাবুলিওয়ালা' চিত্রটি বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান পাঁচটি ছবির মধ্যে স্থান পেয়েছে, আর সঙ্গীতাংশের দিক দিয়ে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্মান। কাবুলিওয়ালার এই সম্মানে শুধু বাংলাই নয় সারা ভারতই আজ গৌরবান্বিত। ছবিটির সঙ্গীতাংশ পরিচালনায় অনবদ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের জন্য পণ্ডিত রবিশঙ্করকে জানাচ্ছি আমাদের অকুণ্ঠ অভিবাদন, পরিচালক তপন সিংহকেও জানাচ্ছি আনন্দ অভিনন্দন। আশা করি বিশ্বের চলচ্চিত্র ভাণ্ডারে বাংলা দেশ অদূর ভবিষ্যতে আরও স্মরণীয় দান করে বাংলার তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারবে।

* * * *

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত অগ্রদূত প্রডাক্‌সন্সের গেভা-কলারে তোলা রঙীন ছবি "পথে হল দেরী" আগামী পূজার সময় মুক্তিলাভ করবে। এম্‌কেজী প্রডাক্‌সন্সের হাস্যমুখর চিত্র "ওগো শুনছ" হাস্যরসিক অভিনেতা ভানু বন্দোপাধ্যায় কালি বন্দোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা প্রভৃতির অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

* * * *

ভারত-বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে। তাঁর প্রথম ছবি "নীল আকাশের নীচে"-র মহরত্ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ছবিটিতে এক চৈনিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তম-কুমার আর নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

সান্‌রাইজের 'সুরের পরশে' চিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও মালা সিংহ

* * * *

বিশ্ব-বিখ্যাত ইতালীয়ান চিত্র পরিচালক রবার্টো রোসালিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন। রোসালিনি ভারতের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, হীরাকুঁদ বাঁধ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি নিয়ে তিনি এক বিরাট চিত্র নির্ম্মাণের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

রোসালিনি বলেছেন এই বিরাট চিত্রের মাধ্যমে তিনি ভারতকে ও ভারতবাসীকে নতুন করে জগতের সামনে তুলে ধরতে চান্। রোসালিনির স্বপ্ন সার্থক হোক, তাঁর চিত্র বিশ্ববাসীর হৃদয় হরণ করুক, ভারত আবার জগৎ সভায় নতুন করে জেগে উঠুক,— এইআমাদের কামনা।

* * *

চিত্ত বসু পরিচালিত রঞ্জন পিকচার্সের 'রাস্তার ছেলে'র একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও অনুপকুমার

ছয় বছর বয়স থেকেই মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে আস্‌ছে শ্রীমতী ম্যাবি লেন্, আর ষোল বছর বয়সেই ম্যাবি ব্রড্‌ওয়েতে নৃত্যপটীয়সী বলে খ্যাতি লাভ করল। তারপর ম্যাবির পরিচয় হল বিখ্যাত অর্কেষ্ট্রা পরিচালক জেভিয়ার কুগার্টের সঙ্গে। পরিচয় পরে পরিণত হল পরিণয়ে। কিন্তু ম্যাবির ভাগ্যে একমাত্র ওয়েষ্টার্ণ ছবির মারামারি, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতির মধ্যে অভিনয় করার সুযোগ ছাড়া আর কিছুই হল না। এর জন্য ম্যাবি হলিউডের ওপর বেশ চটে রইল বটে, কিন্তু হলিউডের কর্তারা তার মূল্য বুঝল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ইতালিয়ান্ টেলি-ভিসনের এক প্রোগ্রামে ম্যাবি তার স্বামী জেভিয়ার কুগার্টের অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে নৃত্যে অবতীর্ণ হওয়ায় ইতালীর নানা স্থানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং শেষে ঐ অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন? ম্যাবির প্রতি কি লোকে এতই বিরক্ত! না, ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই, ইতালিয়ান্ দর্শকরা ম্যাবির নৃত্যপরা দেহের চটুল ভঙ্গীমা দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে। রেস্তোরাঁ, কাফে প্রভৃতি সাধারণের গম্য যে সব জায়গায় টেলিভিসন্ সেট্ ছিল সে সব জায়গায় প্রচুর ভীড়ই

"রাস্তার ছেলে"র আর একটি দৃশ্য

শুধু জমে নি, সবাই আর একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টায় এগিয়ে যেতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে আরম্ভ করে, আর সাধারণ নিয়মে অচিরেই ধস্তাধস্তি পরিণত হল মারামারিতে, আর গতানুগতিক ভাবে তারপর পুলিসের আগমন, মারধর, গ্রেপ্তার প্রভৃতির পর শান্তি প্রতিষ্ঠা! রাস্তায়, দোকানেই শুধু নয়, যে সব গৃহে টেলিভিসন্ সেট্ আছে সে সব গৃহেও শান্তি নষ্ট
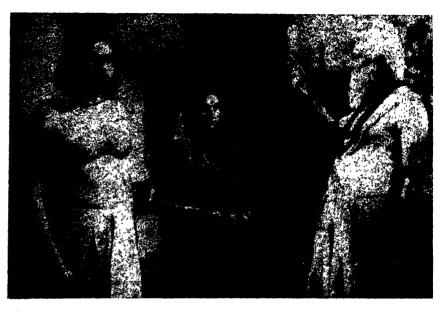
অরোরার 'হরিশ্চন্দ্র' চিত্রে নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় ও ছবি বিশ্বাস

হয়েছিল। না না, ভীড়ের জন্যে নয়। কর্ত্তাদের নিবিষ্ট মনে, রুদ্ধনিশ্বাসে লাস্যময়ী তরুণীর নৃত্য দর্শনে মগ্ন দেখে গৃহিনীরা কাঁচের প্লেট্, বোতল্ প্রভৃতি কর্ত্তাদের মাথায় ভাঙতে আরম্ভ করেন! সুতরাং গৃহের অবস্থার কথা আর না বলাই ভাল। ঐ সব গণ্ডগোল ও তার ওপর ইতালিয়ান্ মহিলাদের প্রবল আপত্তির জন্য টেলিভিসনের কর্ত্তৃপক্ষদের ঐ জনপ্রিয় (পুরুষদের কাছেই অবশ্য) অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হল।

য়্যাবি এতে একেবারেই ভেঙে পড়ল। টেলিভিসন্ থেকেও কি সে ছাঁটাই হয়ে যাবে? এমনি তার ভাগ্য! কিন্তু না, ফল ফলল উল্টো। ফোঁপানির মধ্যেই য়্যাবির মুখে হাঁসি ফুটল রূপালী পর্দ্দার সাদর আহ্বানে। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ এর আগেও সে পেয়েছে, কিন্তু টেলিভিসনে তার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ার পর য়্যাবির জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল হুহু করে,—চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্য ডাক আসতে লাগল অনবরত। আর ইতিমধ্যে য়্যাবি রোমেতেই ছয়টি চিত্রে অভিনয় করে বসে আছে। এর মধ্যে "সান্‌সেট্ ইন্ নেপ্‌লস" শীঘ্রই সারা পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করে য়্যাবি লেন্-এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দেবে।—একেই বলে মন্দের ভাল!
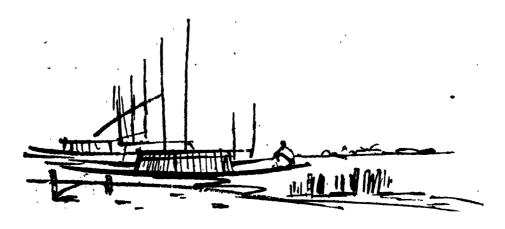
আচার্য্য বিনোবার উপদেশ—

৩রা জুলাই পুণায় আচার্য্য বিনোবা ভাবে শিক্ষিত বেকারদের উদ্দেশ্যে এক আবেদনে জানাইয়াছেন—ভারতে এক নূতন সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য মূল্যবান কাজে শিক্ষিত বেকারদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অসহায়ভাবে গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া সকলকে স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিতে হইবে। এ দেশের যুবকরা বলিষ্ঠদেহের অধিকারী হয় না ও কঠিন পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ। স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের নূতন নূতন পথ সন্ধানে তাহাদের মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। আচার্য্যভাবে দেশে পদব্রজে ঘুরিয়া আজ এক নূতন আদর্শের কথা প্রচার করিতেছেন। দেশবাসীকে এই নূতন আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। ভূদান, গ্রামদান, শ্রমদান অর্থদান প্রাণদান —তাঁহাদের প্রচারের বিষয়। আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে তিনি নূতন করিয়া গীতার সর্বস্বদানের কথা শুনাইতেছেন। মানুষ দলে দলে যাইয়া তাঁহার অনুগামী হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত যুবকের দল কি পিছাইয়া থাকিবে ?

নেপালকে রাজপথ দান—

ভারতের নেপাল-সীমান্ত রক্সল পর্য্যন্ত রেল পথ আছে—তাহার পর নেপাল গভর্ণমেণ্ট রক্সল হইতে আমলেকগঞ্জ পর্য্যন্ত ৩০ মাইল নূতন রেল করিয়াছিল। সম্প্রতি আমলেকগঞ্জ হইতে কাটমুণ্ডুস্থ রাজা ত্রিভূবনের মার্বেল মূর্তি পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল রাজ পথ নির্মিত হইল। ভারতীয় অর্থে ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারগণ ঐ পথ নির্মাণ করিয়া সম্প্রতি তাহা নেপাল রাজাকে উপহার দিয়াছে। ঐ পথের নাম হইবে রাজা ত্রিভুবন রাজপথ। ঐ পথ পুরাতন ভীমপেদী—আমলেকগঞ্জ রাস্তার ভৈসীতে আসিয়া মিসিয়াছে। তিনটি বড় পাহাড় অতিক্রম করিয়া পথ হইয়াছে। পথে ৭টি বড় পুল ও ৮ শত ছোট সাঁকো নির্মাণ করিতে হইয়াছে। এই নূতন রাজপথ খোলার ফলে নেপাল ও ভারতে বাণিজ্য আরও সুবিধাজনক হইবে এবং উভয় দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইবে।

ব্যাপক দুর্নীতি—

জমীদারী উচ্ছেদের পর প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কারের জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে জমী জরীপ ও স্বত্ব নির্ণয়ের যে কাজ চলিতেছে, সে সম্পর্কে নিযুক্ত সেটেলমেণ্ট ও এটেষ্টেন কমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলিতেছে বলিয়া ১১ হাজার অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছিয়াছে। খাদ্যদপ্তর হইতে যাহারা ঐ বিভাগে কাজ পাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অধিক। এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমরা ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

নূতন শিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬টি নূতন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন—নিম্নলিখিত ৬টি স্থানে নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে (১) কল্যানী (২) পলটিকারী, হাওড়া (৩) হাবড়া, (৪) বারুইপুর (৫) শক্তিগড় ও (৬) শিলিগুড়ী। শক্তিগড় ও বারুইপুরের নূতন নগরের আকার ছোট হইবে—তারপর ৪টি স্থানে এ জন্য ১০০ একর করিয়া জমী সংগ্রহ করা হইবে। দুর্গাপুর অঞ্চলে বহু কারখানা হইতেছে—ঐ স্থান শীঘ্রই খড়গপুর, আসানসোল ও বার্ণপুরের মতই সমৃদ্ধ হইবে। কলিকাতার ভিড় কমাইবার এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, হবে তাহা জনগণের উপকার করিবে।

কলিকাতায় গান্ধীজির মূর্তি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে মহাত্মা গান্ধীজির একটি পূর্ণাবয়ব মর্মরমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহা কলিকাতার ইডেন উদ্যানে স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মূর্তিটি প্রস্তুত করিবেন। গান্ধীজির মূর্তি সর্বত্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যিকের সম্মান—

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গিয়ানায় ট্যাগোর মেমোরিয়ল ইনষ্টিটুটের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছেন। তাঁহার এই অযাচিত নিয়োগের পশ্চাতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে। একাদিক্রমে পনের বৎসর গৌরব ও প্রতিষ্ঠার সহিত তিনি নয়া-

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

দিল্লীর প্রখ্যাত যুনিয়ন একাডেমীর অধ্যক্ষতা করিয়া বাঙ্গালী সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সাময়িক পত্র সমূহে গদ্যে ও পদ্যে ব্রজমাধব বাবুর লেখার সহিত অনেকেই সুপরিচিত। "ভারতবর্ষ"-র তিনি একজন নিয়মিত লেখক। তাঁহার আরও উন্নতি আমরা কামনা করি।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি—

গত ৬ই জুলাই লক্ষ্ণৌতে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর প্রতিনিধি সভায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর সকল কংগ্রেস কর্মীকে সক্রিয়ভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষ আজও খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় নাই—অথচ জনগণ এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইলে ভারতকে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয় না। সকল রাজ্যের সকল কংগ্রেসকর্মী যদি এ বিষয়ে অবহিত হন, তবে সমস্যার সমাধান আদৌ কষ্টকর হয় না। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীধেবরের এই আহ্বান সর্বত্র পালিত ও সম্মানিত হইবে।

বনমহোৎসব—

গত ৭ই জুলাই হইতে পশ্চিমবঙ্গে বনমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বন বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত চিন্ময়কুমার রায় জানাইয়াছেন—গত ৫ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ চারা রোপন করা হইয়াছে ও তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বাঁচিয়া আছে। মেদিনীপুর জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক বৃক্ষ রোপিত হইয়া রক্ষিত হওয়ায় জেলার শাসককে রাজ্য সরকার হইতে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরিতাপের বিষয়, দেশের জনগণ এখনও রোপনের উপযোগীতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন না। এ বিষয়ে আরও অধিক প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন।

ইছামতীর ভাঙ্গন—

ইছামতী নদী ২৪পরগণা জেলার বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া যে ধ্বংসলীলা চালাইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য গত ৩রা জুলাই কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিল ও পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় টাকী ও বসিরহাটে গমন করিয়াছিলেন। উভয় স্থানে জনসভায় তাঁহারা জনগণের অভিযোগ শুনিয়াছেন ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, আপাততঃ পাথরের দেওয়াল দিয়া টাকী ও বসিরহাট সহর রক্ষা করা হইবে এবং পরে নদী গর্ভ হইতে পলিমাটী সরাইয়া নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। শুধু সহর দুটি নহে, ভাঙ্গনের ফলে সুন্দরবনের একাংশ বিপন্ন হইয়াছে—নদীর পলি মাটী না সরাইয়া বহু চাষের জমী লবণ-জলে পূর্ণ হইয়া চাষ বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের সমবেত চেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঁচিয়া যাইবে।

দুর্নীতি দমন ও কর্পোরেশন—

তিন বৎসর পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক দুর্নীতি ধরা পড়ে। সন্দেহ ভাজনেরা স্বীকারোক্তি করা সত্বেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। সন্দেহ ভাজনরা নিজ নিজ পদে কাজ করিতে থাকেন। ৩ বৎসর পরে এক দিন হঠাৎ সন্দেহ ভাজনদের সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত এই ঘটনা চলে। ১নং

ডিষ্ট্রিক্টের নর্থগ্যারেজ হইতে নাকি ১৮ হাজার গ্যালন পেট্রল খোয়া গিয়াছে। এই ঘটনাটি কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইলে আরও কতদিন ধামা চাপা থাকিত কে জানে? এইরূপ বহু ঘটনা হয় ত তদন্তকালে প্রকাশ পাইবে। কাউন্সিলাররা কি এ বিষয়ে কিছু করিবেন না?

ওয়াই, এম্, সি-এর শতবার্ষিকী ঃ—

কলিকাতা ওয়াই, এম্, সি-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ওয়াই, এম্, সি-এর চৌরঙ্গী শাখায় একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই ভোজ সভায় কেবলমাত্র অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় একশত বালক-বালিকাকে শুধু ভূরি ভোজনই করান হয় নাই—জামা, কাপড়, খেলিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও প্রত্যেক বালক-বালিকাকে উপহার দেওয়াও হইয়াছিল।

অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকারা ভোজন করিতেছে। ফটো : রণেন ঘোষ

নদীয়া জেলায় পাকিস্তানী হানা—

গত ২৯শে জুন প্রায় ২ শত পাকিস্তানী নদীয়া জেলার করিমপুর থানার কাছারীপাড়া গ্রামে আসিয়া লুটপাট ও মারপিঠ করিয়া গিয়াছে। ৬ জন ভারতীয় আহত হয়, তন্মধ্যে শ্রীভুজঙ্গভূষণ বিশ্বাসকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলে বহু হিন্দু বাস করে, তাহারা ভয়ে আর তথায় থাকিতে চাহে না। সীমান্ত পাহারার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নাই। এ বিষয়ে কি কর্তৃপক্ষ কখনও দৃষ্টি দিবেন না। ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানী হানা এই প্রথম নহে—গত ১০ বৎসর কাল সমানে চলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—

খ্যাতনামা কোবিদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গত ১লা জুলাই বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনস্থ গ্রাম-উন্নতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে তথায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের শ্রীঅনাথনাথ্ বসুও বিশ্বভারতীর বিনয়-ভবনের অধ্যাপকরূপে বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিও পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।

বাঙ্গালী সাংবাদিকদের ভ্রমণ—

আমষ্টারডামে আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য ভারত হইতে যে ৫ জন সাংবাদিক প্রেরিত হইয়াছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সে দলে ছিলেন, তাঁহারা ১লা মে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৩০শে জুন ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপের বহু দেশ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশও ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী সাংবাদিকদের উপকৃত করুক ইহা আমরা কামনা করি।

পাকপুলিস ও সংবাদ সংগ্রহ—

২৪ পরগণা বসিরহাটের নিকটস্থ ইটিণ্ডার খবরে প্রকাশ পাকিস্তানী পুলিস গোপনে সীমান্ত পার হইয়া

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ও স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সহযোগিতায় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। বসিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস ঐরূপ ২১৪টি স্থানে যাইয়া ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বিষয়টি প্রকাশ করায় ভারতীয় কর্তাপক্ষের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়াছে। পাকিস্থান সীমান্তে তাহাদের পুলিস পাহারার ব্যবস্থার মত ভারতীয় সীমান্তে ভারতীয় পুলিস পাহারার ব্যবস্থা নাই ইহা যে কোন প্রত্যক্ষদর্শী দেখিয়া থাকিবেন। আমরা ইটিণ্ডায় যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভারতীয় পুলিসকে চালা ঘরে অরক্ষিত অবস্থায় বাস করিতে হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কেন আকৃষ্ট হয় না জানি না।

২৬৫৫০ ফিট গিরিশৃঙ্গ বিজয়—

অষ্ট্রিয়ার কারাকোরাম অভিযানের নেতা মার্কাস মার্ক কারাকোরাম পর্বতমালার (রাওল পিণ্ডির নিকট) ২৬৫৫০ ফিট একটি গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই গিরিশৃঙ্গ বিজয়ের ফলে বহু নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধাতুর পদার্থের সন্ধান মিলিবে। আজ জগৎ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিতে অগ্রসর—সে জন্যই গিরিশৃঙ্গ বিজয় প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিক্ষামন্ত্রী—

টাকী জমীদার বংশের সন্তান, সুপণ্ডিত, আজীবন কংগ্রেস সেবক শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে পরাজিত হইয়া ৫ বৎসর বসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিনা বাধায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ও গত ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই সঙ্কটময় সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপথে পরিচালিত করুন, ইহা আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

ভারতে প্রথম শরীর চর্চা কলেজ—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী আগষ্ট মাসে গোয়ালিয়রে প্রথম একটি শরীর চর্চা কলেজের কাজ আরম্ভ করিবেন। কলেজটির নাম হইবে লক্ষীবাই কলেজ। ইণ্টার পাশ করা ছাত্রগণ তথায় ৩ বৎসর শিক্ষার পর ডিগ্রী লাভ করিবেন। ছাত্রদের বৎসরে মোট ৩ শত টাকা ব্যয় বাড়িবে—সরকার কতকগুলি বার্ষিক ৩ শত টাকার বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের দেশে শরীর চর্চার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম—কলেজ ত নাই। কাজেই এইরূপ বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

পরলোকে হরিশচন্দ্র ঘোষ—

খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা হরিশ্চন্দ্র ঘোষ গত ২রা আষাঢ় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মুরারীপুকুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন, অনুশীলন সমিতির সদস্য ও যুগান্তর পত্রের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি সারাজীবন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন—এমন কি স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী পেন্সনও গ্রহণ করেন নাই।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালী সম্মানিত—

উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য শ্রীবীরেন মিত্র গত ২০শে জুন উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হরেকৃষ্ণ মহাতাব ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন। উড়িষ্যা ও বাংলা যে সকল বিষয়ে অভিন্ন, তাহা উভয় রাজ্যের সকলের সর্বদা মনে রাখা উচিত।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
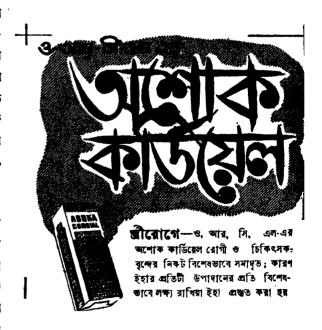
উইম্বলডন লন্ টেনিস ঃ

১৯৫৭ সালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতা জাতিভ্রষ্ট হয়েছে। প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমেরিকার নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় মিস অ্যালথিয়া গিবসনের সিঙ্গলস খেতাব লাভ। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম অশ্বেতকায় খেলোয়াড় উইম্বলডন খেতাব লাভ করলেন। সিঙ্গলস খেতাব ছাড়া মিস গিবসন আমেরিকার ডার্লিন হার্ডের সহযোগিতায় মহিলাদের ডবলস খেতাব লাভ করেন। মিস গিবসন তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলেছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়া পূর্ণ প্রাধান্য বজায় রাখে।

পুরুষদের সিঙ্গলস্ কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় মোট আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ারই ছিল চারজন খেলোয়াড়। বাকি চারজনের মধ্যে আমেরিকার এবং সুইডেনের দু'জন করে। গত চার বছরের প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে তিনবার অষ্ট্রেলিয়ার চারজন খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করলো। এ বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সেমি-ফাইনালে মোট চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ারই ছিল তিনজন খেলোয়াড় —লিউ হোড, কুপার এবং ফ্রেজার। চতুর্থ খেলোয়াড় হলেন সুইডেনের, ডেভিডসন। ফাইনালে উঠেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ারই খেলোয়াড়, লিউহোড এবং অ্যাসলি কুপার। হোড তাঁর স্বদেশবাসী অ্যাসলি কুপারকে অনায়াসে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান হন। উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করতে খুব কম খেলোয়াড়কেই দেখা গেছে। ১৯ বছর আগে ১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ উপর্যুপরি দু'বার সিঙ্গলস খেতাব লাভের পর ১৯৫৭ সালে লিউ হোড সে সম্মান পেলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে মোট আট জনের মধ্যে ছিল আমেরিকার পাঁচজন, বাকি তিনজন মেক্সিকো,বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা খেলোয়াড়। যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এইভাবে প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ লিউ হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-১, ৬-২, গেমে অ্যাসলি কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ঃ মিস অ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২ গেমে মিস্ ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ গার্ডনার মূলয় এবং বাজ প্যাটি (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার লিউ হোড এবং নিল ফ্রেজারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ মিস অ্যালথিয়া গিবসন এবং মিস ডার্লিন হার্ড ৬-১, ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস থেলমা লং এবং মিস মেরী হটনকে পরাজিত করেন।

১৯৫৭ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়িনী আমেরিকার মিস এ্যালথিয়া গিবসন (ডানদিকে) এবং ১৯৫৬ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়িনী আমেরিকার মিস শার্লি ফ্রাই (বামদিকে)

মিক্সড ডাবলস ঃ মেরভীন রোজ এবং মিস হার্ড ৬-৪, ৭-৫, গেমে মিস গিবসন এবং নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলসের খেলায় নরেশকুমার জুটি কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং কৃষ্ণান জুটি চতুর্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলে-ছিলেন।

সিঙ্গলসে নরেন্দ্রনাথ ১ম রাউণ্ডে, নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান ২য় রাউণ্ডে পরাজিত হ'ন। ডাবলসের ২য় রাউণ্ডে কৃষ্ণান ও নরেশকুমার জুটি এবং ১ম রাউণ্ডে নরেন্দ্রনাথ ও প্রেমজিৎলাল জুটি বিদায় নেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে নরেশকুমারের জুটি নিল ফ্রেজার এবং মিস গিবসনের (ফাইনালিস্ট) কাছে পরাজিত হয়। নরেশকুমারের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে দর্শক সাধারণ মুগ্ধ হ'ন। প্রথম দিন তিনি সারা মাঠ একাই খেলেছিলেন। আলোর অভাবে প্রথম দিন খেলাটি শেষ হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় নরেশকুমার জুটি সহজেই পরাজিত হয়।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৬১৯ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রেভনী ২৫৮, পি রিচার্ডসন ১২৬, পিটার মে ১০৪, কাউড্রে ৫৫) ও ৬৪ (১ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৩৭২ (ওরেল ১৯১, সোবার্স ৪৭; ট্রুম্যান ৬৩ রানে ৫ উইকেট) ও ৩৬৭ (স্মিথ ১৬৮, গডার্ড ৬১; ষ্ট্যাথাম ১১৮ রানে ৫, ট্রুম্যান ৮০ রানে ৪)

নটিংহামশায়ার কাউন্টি ক্রিকেটদলের ট্রেণ্ট ব্রীজ মাঠে ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে; ইংলণ্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। আরম্ভ ভাল হয় নি। ১৪ রানে ইংলণ্ডের ১ম উইকেট পড়ে যায়। রিচার্ডসন এবং গ্রেভনী ২য় উইকেটের জুটিতে ২৬৬ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে ইংলণ্ডের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। ২ উইকেট পড়ে ৩৬০ রান ওঠে (গ্রেভনী ১৮৮ ও মে ৪০ রান করে নট আউট থাকেন)। ২য় দিন ইংলণ্ডের পক্ষে বিপুল রান উঠে—৬ উইকেট পড়ে ৬১৯ রান। চা-পানের সময় এই রানের মাথায় ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৯ রান করে।

ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করেন, গ্রেভনী (২৫৮), রিচার্ডসন (১২৬) এবং মে (১০৪)।

অধিনায়ক পিটার মে এই খেলায় ৭৯ রান করলে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর নিজস্ব তিন হাজার পূর্ণ হয়। টেষ্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে তিনি ৮টা সেঞ্চুরী করলেন। গ্রেভনী এই টেষ্টে তাঁর প্রথম ডবল সেঞ্চুরী করেন।

৩য় দিনে ৩ উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২৫৯ রান দাঁড়ায়। ওরেলের নট আউট ১৪৫ রান এই দিনের খেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল। তিনি ৮ ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন। এই দিন ইংলণ্ডের বোলার লেকার প্রথম উইকেট পেলে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তিনি ১৫০ উইকেট লাভের সম্মান লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পক্ষে মাত্র এই চারজন বোলার টেষ্ট খেলায় ১৫০টা উইকেট লাভ করেছেন—এলেক বেডসার, সিডনি বার্ণেস, মরিস টেট এবং জিম লেকার। ইংলণ্ডের ফাষ্ট বোলাররা মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তখনও ১৭৫ রান প্রয়োজন ছিল।

৪র্থ দিনে লাঞ্চের কিছু আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৩৭২ রানে শেষ হ'লে ২৮ রানের জন্যে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। শেষ ৭টা উইকেটে মাত্র ৭৭ রান ওঠে ১০০ মিনিটের খেলায়। ওরেল ১ম উইকেটে খেলতে নেমে ১৯১ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। ৯½ ঘণ্টায় খেলায় তাঁর ১৯১ রানে তিনি ২৬টা বাউণ্ডারী করেন। ইংলণ্ডের ১ম ইনিংসের ৬১৯ রানের থেকে ২৪৭ রান পেছনে পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে।

৪র্থ দিন ২য় ইনিংসের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫টা উইকেট পড়ে, রান ওঠে ১৭৫।

৫ম দিনে স্মিথ এবং গডার্ডের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। ৩৬৭ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২ ইনিংস শেষ হয়। জয়লাভের জন্যে তখন ইংলণ্ডের ১২১ রান প্রয়োজন। সময় ছিল মাত্র ৬১ মিনিট। ইংলণ্ড এই সময়ে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

প্রদর্শনী ফুটবল ঃ

ক'লকাতায় সুদান বনাম আই এফ এ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় আই এফ এ ৩-১, গোলে জয়ী হয়। বোম্বাইয়ে রাজ্যপাল একাদশকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দেওয়ার ফলে কাগজে তাদের সম্বন্ধে খুব নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল; ক'লকাতার মাঠে তাদের খেলার নমুনা দেখে অনেকেই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'টাকাটা গাঁট গচ্ছা' গেল। ক'লকাতায় তাদের খেলায় ২৭ হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১২৭ (বেলী ৪৪ রানে ৭ উইকেট) ও ২৬১ (উইকস ৯০, সোবার্স ৬৬; বেলী ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৪২৪ (কাউড্রে ১৫২, রিচার্ডসন ৭৬, ইভান্স ৮২)

লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে। কিছু কম তিন দিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ফুটবল লীগ তালিকায় উপস্থিত প্রথম পাঁচটিদল: রাজস্থান ২০টা খেলায় ৩৩, ইস্টবেঙ্গল ২১টা খেলায় ৩২, মহঃ স্পোর্টিং ১৮টা খেলায় ২৯, মোহনবাগান ২১টা খেলায় ২৫ এবং উয়াড়ী ১৭টায় ২১ পয়েণ্ট করেছে।

অহল্যা : শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

যে মহান আদর্শ সামনে রেখে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে আমরা সেই তরুণ রচয়িতা শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিনি যে 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' কথাটাকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ না ক'রে ঋগ্বেদের শাশ্বত বাণীকেই বীজমন্ত্র রূপে বরণ ক'রে নিয়েছেন, এর ফলে আগামী কালের কথাশিল্পীরা হয়ত এমন একটি নূতন পথের সন্ধান পাবেন যে পথে আমাদের সাহিত্য জাতীয় কল্যাণ সাধনের বাঞ্ছিত উপকরণ হ'য়ে উঠবে।

"অহল্যা" উপন্যাসখানির মধ্যে আমরা যে কটি বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই তারা কেউ-ই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। তবু চিত্তাকর্ষক। কয়েকটি-মাত্র ক্ষীণ রেখায় তিনি তাদের রূপাভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি পাঠকদের অনেক কিছু ভাববার অবকাশ দিতে চেয়েছেন। সবটাই নিজে ব'লে দিতে চান নি।

এ ধরণের রচনার মধ্যে স্বভাবতঃই গল্পের আর্টের চেয়ে তত্ত্বালোচনাই মুখ্য হয়ে উঠে। "অহল্যার" পাত্র-পাত্রীর নিপুণ ও রসঘন সংলাপের মধ্যে আমরা তার কুশল সন্নিবেশ দেখতে পাই। আশাকরি আদর্শবাদী লেখক ভবিষ্যতে বাংলা উপন্যাসকে নীতি ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের পথে পরিচালিত ক'রে তাঁর আদর্শনিষ্ঠ সংযত লেখনীকে সার্থকতার গৌরব দিতে পারবেন।

[প্রকাশক : কথামৃত ভবন, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ২।০]

নরেন্দ্র দেব

অরবিন্দ-রবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর মত ও রচনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করেছেন আইনব্যবসায়ী গ্রন্থকার। দুই ঋষির বাণীর উদ্ধৃতিতে গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়েছে। লেখকের পাণ্ডিত্য প্রশংসা-যোগ্য।

[প্রকাশক : প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য—৪১টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মুক্তি (নাটক) : শ্রীশীতল সেন

নাটকের রচয়িতার ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি মৌলিক নাটক রেডিও ও অবৈতনিক সম্প্রদায়ে অভিনীত হইয়াছে। নাটক রচনার কৌশল, সংলাপ ও ঘটনা সংস্থাপনা সম্পর্কে শীতলবাবু সিদ্ধহস্ত। বর্তমান নাটকটি—A Doll's House এর পটভূমিকায় অতি কৌশলে দেশাচার ও কালাচারের উপর সংস্থাপিত। নীরা নাটকের নায়িকা। নায়িকার চরিত্রের দৃঢ়তা অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। নীরা যেখানে সন্তান ও স্বামীর জন্য ব্যাকুল সেখানে নাটকীয় ঘটনা এমনভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, 'মুক্তি' বাংলা যে কোন মঞ্চাভিনীত সুখ্যাত নাটকের সমকক্ষ। 'মুক্তি' সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হইলেও সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সৌখীন সম্প্রদায়ের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নাটকের গঠন পরিপূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে 'মুক্তি' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

[প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু লাইব্রেরী। দাম ১।০ টাকা]

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীমণি সেন　　দেবদাসী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেদের সমস্যা ও তার সমাধান

শ্রীঅরবিন্দ

বেদ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার * * হল যে, তার গূঢ়তত্ত্ব পরিস্কার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অথবা কখনই তাতে কোন অজ্ঞাত রহস্য ছিল না ; তার শ্লোক সব যাগ যজ্ঞের মন্ত্র, তা রচনা করেছে আদিম যুগের বর্বরেরা যারা তখনও সভ্যতার আলোক পায়নি, সে সবের প্রয়োগ হল অজ্ঞাত শক্তিকে প্রসন্ন করা বা প্রথামত আনুষ্ঠানিক পূজাঅর্চনা করা ; আর সে পূজা

(On the Veda থেকে। অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত সেন।)

* * আবহমান কাল ধ'রে আমাদের দেশে বেদকে পরমজ্ঞান বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা থেকে প্রাপ্ত কবিতা বলে শ্রদ্ধা করা হয়েছে। কবি শব্দের অর্থই ছিল সত্যদ্রষ্টা। আধ্যাত্মিক আলোকে প্রদীপ্ত ঋষিরা অন্তরের কানে শুনেছেন সে সব বিশ্বজনীন অপৌরুষেয় জ্ঞানের বাণী, তাই তাকে বলা হত শ্রুতি। উপনিষদের ঋষিরাও বেদকে সেই স্থানই দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তা মানেন না। এ বিশ্বাসকে তাঁরা কুসংস্কার, এমন কি, বাতুলতা বলেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজও সেই মতই মেনে নিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ এখানে বেদের যে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন তাতে আমাদের প্রাচীন চিরাগত সংস্কারের যাথার্থ্য সম্যক প্রকটিত হয় এবং বেদ ও উপনিষদের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ সুনির্দিষ্ট হয়। (অনুবাদক)

করা হয়েছে সব নৈসর্গিক শক্তিকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা ক'রে সেই সব দেবতাদের উদ্দেশ্যে ; এবং তাতে আছে অর্ধগঠিত পৌরাণিক কাহিনীর শৃঙ্খলাহীন সমষ্টি, অথবা মনের গঠনের প্রথম অবস্থাতে কল্পিত সব জ্যোতিষ্ক সংক্রান্ত অমার্জিত রূপকথা। কয়েকটা মাত্র অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সূক্তে গভীরতর আধ্যাত্মিক চেতনিক ও নৈতিক ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; তাও আবার অনেকের মতে তাদের শত্রু দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার করা, যদিও সেই সব সূক্তেই এই দস্যু ও বেদনিন্দুকদের অবাধে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তবে, যেখান থেকেই আসুক না কেন, পরবর্ত্তী বৈদান্তিক চিন্তার এই হল প্রথম বীজ। এই ধারণা আজ-কালকার একটা জনপ্রিয় মতবাদের অনুবর্তী—যে, অল্পকাল আগের বর্বর অবস্থা থেকে মানবসভ্যতার দ্রুত পরিণতি হয়েছে। বিচার-শোধিত গবেষণায় জমকালো পোষাকে ও সংস্কারকে সাজান হয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে জড় বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখা—যথা, তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান, দেবতাতত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনীর তুলনামূলক বিচার। তবে দুঃখের বিষয়, এই বিজ্ঞান-গুলির কোনটাই এখনও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করেনি, সেসবের বিচারপদ্ধতি কল্পনাশ্রয়ী। কোন স্থির সিদ্ধান্তে তার একটাও এখনও উপনীত হয় নি।

আমার বিচারের প্রথা ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনাত্মক, নেতি' নয়, পূর্ণতর 'হীত'। আমার অভিপ্রায় এই পুরাতন সমস্যাকে একটা নূতন দিক থেকে দেখা, বর্তমানে গৃহীত কোন মতবাদকে নিরাশ করা বা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা নয়, প্রশস্ততর ভিত্তির উপর একটা বৃহত্তর প্রকল্পনা স্থাপন করা —যাতে অপর সব মতের একরকম অনুপূরক একটা নূতন তাৎপর্য পাওয়া যায়। তাতে একটা আনুষঙ্গিক লাভ হবে যে পুরাকালের চিন্তার ও পূজাঅর্চনার ইতিহাসের অঙ্গীভূত যে সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান প্রচলিত মতে হয়নি, তার উপর আলো পড়বে।

ঋগ্বেদই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে একমাত্র বেদ। তাতে আছে অতি হীন ভাষায় রচিত যজ্ঞীয় স্তোত্রের সংগ্রহ। তার ব্যাখ্যাতে প্রায় অসাধ্য বহু সমস্যা ওঠে। পরের যুগের ভাষায় প্রচলিত নাই এমন বহুশব্দ বা শব্দের আকার-ভেদে তা পূর্ণ। নিজের বুদ্ধিমত আন্দাজে অনেক সময় তার অর্থ করতে হয়, যদিও সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত শব্দও প্রচুর আছে, কিন্তু মনে হয় যেন ভিন্ন অর্থে সেসব ব্যবহৃত হয়েছে, অন্ততঃ সেসবের ভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে। বহুশব্দের বিশেষ করে সব চেয়ে সাধারণ ও অর্থোদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ অপরিহার্য সব শব্দের প্রত্যেকটির এতগুলি ক'রে অন্যান্য অসংলগ্ন অর্থ ধরা হয়েছে যে তাতে বিস্মিত হতে হয় ; সুতরাং ব্যাখ্যাকার নিজের খেয়াল মত তার যে কোন একটা অর্থ বেছে নিয়ে এক একটা সুক্তের বা অনুচ্ছেদের এমনকি সম্পূর্ণ বেদের চিন্তার ধারার ভিন্ন ভিন্ন আকার দিতে পারে। গত ক' হাজার বছর ধ'রে এই সব প্রাচীন স্তোত্রের অর্থ নির্ধারণ করতে অন্ততঃ তিনবার বিপুল প্রয়াস করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটার পদ্ধতি ও ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয়েছিল প্রথম চেষ্টা, তার বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-উপনিষদে। তবে সায়না-চার্যের পরম্পরানুমোদিত ভাষ্যের সবটাই পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে হয়েছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বহুলায়াসে তৈরি তুলনামূলক ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে এক বিষয়ে মিল আছে, দু'য়ের ফলেই এ প্রাচীন গাথাসংগ্রহের অসাধারণ চিন্তার অসংলগ্নতা ও ভাবের দারিদ্র্য প্রতিপন্ন হয়েছে। এক একটা পংক্তির, হয় সহজভাবে না হয় কষ্ট-কল্পনা ক'রে, একটা হয়ত, ভাল অন্ততঃ সংলগ্ন অর্থ করা যায় ; তার ফলে শব্দ যোজনার রীতি হয় অত্যন্ত চটকদার ও অর্থহীন বিশেষণের অলঙ্কার ভারাক্রান্ত, রূপকচিত্রের অদ্ভুত চাকচিক্য ও বাগ্‌বিস্তারের বিস্ময়কর বাহুল্যের মধ্যে থাকে অর্থের অপরিসীম দৈন্য ; তবে তার মধ্যেও যাহোক একটা বোধগম্য বাক্য দাঁড় করান যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা সূক্ত পড়লে মনে হয় যে, যাদের লেখার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, অন্যান্য জাতির প্রথম যুগের লেখকদের মত সুসংলগ্ন চিন্তা করতে বা পূর্বাপর বিরোধহীন ভাবপ্রকাশ করতে তারা অক্ষম। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সরল কয়েকটি সূক্ত ছাড়া তাদের ভাষা সর্বত্র কৃত্রিম না হয় দুর্বোধ্য, চিন্তার কোন সংযোগ-সূত্র একেবারেই নাই, আর না হয় ব্যাখ্যাকারকে গড়েপিটে একটা সমগ্র অর্থ দাঁড় করাতে হয় ; সুতরাং মূল বাক্যের ব্যাখ্যা না ক'রে পণ্ডিতদের প্রায় উদ্ভাবনের আশ্রয় নিতে

হয়। বোঝা যায় যে, মূলের অর্থ উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছেনা, অনমনীয় উপাদানকে হাতুড়ি পিটিয়ে বা ছাঁচে ঢেলে কোন গতিকে একটা আকার বা সংহতি দেওয়া হচ্ছে।

তবুও এই দুর্বোধ্য বর্বরোচিত রচনারঅদ্ভুত সৌভাগ্যের তুলনা সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোথাও নাই। জগতের গভীরতম ও সমৃদ্ধতম এতগুলি ধর্মের শুধু নয়, তদুপরি জগতের একাধিক তাত্ত্বিক দর্শনের উৎস ব'লে তাকে গণনা করা হয়। ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, তন্ত্র-পুরাণে, ষড়দর্শনে ও অন্যান্য প্রচলিত সম্প্রদায়ের এবং খ্যাতনামা সাধু সন্তদের শিক্ষার মধ্যে যা কিছু সত্য ও প্রামাণ্য আছে, সে সবের মূল নিকষ বলে বহুসহস্র বৎসরের পরম্পরাগত দৃঢ়বিশ্বাসে বেদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। তার 'বেদ' নামের অর্থই হল জ্ঞান—উর্ধ্বতম যে আধ্যাত্মিক সত্য মানবমনের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব তার সর্বস্বীকৃত সংজ্ঞা। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাতে, যেমন সায়ন ভাষ্যে তেমনি সাম্প্রতিক মতবাদে—সে মহৎ পুণ্যকীর্ত্তি একটা কল্পনা-বিলাস মাত্র। পক্ষান্তরে সূক্তগুলি হয়ে দাঁড়ায় অশিক্ষিত বস্তুতান্ত্রিক যে সব বর্বরেরা শুধু বাহ্যতম লাভ ও ভোগ নিয়েই ব্যাপৃত এবং অতিপ্রাথমিক দুএকটি ছাড়া যাদের কোন ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিক অভীপ্সা নাই সেই সব অসভ্যদের কুসংস্কারজাত সৌষ্টবহীন অপটু রচনা। এই সাধারণ ভাবধারার প্রতিকূল দু'একটা বাক্য কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে মোটের উপর এই ধারণাই অটুট থাকে। উত্তরকালের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি হল উপনিষদ; সুতরাং মানতে হয় যে উপনিষদ হল বেদের বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তত্ত্বামোদী চিন্তাশীল মনীষার বিদ্রোহ।

য়ুরোপের কতকগুলি সমগোত্রীয় দৃষ্টান্তের ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্যের দ্বারা সমর্থিত হ'লেও এ ধারণা থেকে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। উপনিষদের বিষয়বস্তুতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার, বুদ্ধির গ্রহণসীমার প্রান্তস্পর্শী যে পরম সত্য-বিষয়ক মননের বা যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সযত্নগ্রথিত মনস্তত্ত্বের শূন্য থেকে তার উদ্ভব হয় না। মনের প্রগতি পথে চলার পদ্ধতি হল—এক জ্ঞান থেকে অন্য জ্ঞানে অগ্রসর হওয়া, অথবা তমোগ্রস্ত বা কুসংস্কারাবৃত পুরাতন জ্ঞানকে নূতন তেজ বা ব্যাপকতর রূপ দেওয়া; আর না হয়, পুরাকালের অসম্পূর্ণ তথ্যের সূত্র ধরে নূতন আবিষ্কারে উপনীত হওয়া। উপনিষদের সুপরিণত চিন্তা থেকেই সূচিত হয় যে তার একটা প্রাচীনতর মহনীয় মূল অবশ্যই ছিল। কিন্তু প্রচলিত কোন মতবাদেই তা নাই। আর সে অভাব পূরণ করবার জন্য আর একটা কল্পনা উদ্ভাবিত হল যে বিজয়ী অসভ্য আর্যেরা বিজিত সুসভ্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকে তা ধার করেছে, আর সে কল্পনাও স্থাপিত হল আরও কতকগুলি কাল্পনিক অনুমানের উপর। প্রকৃত পক্ষে এখন বেশ সংশয় এসেছে যে পাঞ্জাবের মধ্যদিয়ে আর্যদের বিজয় অভিযানের সমগ্র কাহিনীই ভাষাতত্ত্ববিদদের কপোলকল্পিত কি না।

দেখি, প্রাচীন য়ুরোপে বুদ্ধিপ্রসূত দর্শনগুলির পূর্বে ছিল গূঢ়বাদীদের গুপ্তবিদ্যা, Orphic ও Eleusinian রহস্যবাদ প্রস্তুত করেছে মনীষার যে উর্বর ভূমি তাতেই জন্ম নিয়েছে Plato ও Pythagorus। ভারতেও উপনিষদের চিন্তা-প্রবাহের মূলেও এমনই একটা পূর্বতর উৎস থাকা অবশ্যই সম্ভব। আর বাস্তবিকই উপনিষদে ভাবপ্রকাশের যে আকার ও প্রতীক দেখা যায়—তা থেকে এবং ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর অনেক অংশ থেকেই নির্দেশ পাওয়া যায় যে ভারতেও তার পূর্বে আর একটা যুগ ছিল যাতে, গ্রীক রহস্যবাদের মতই, সঙ্কেতরূপকে আবরণ বা পরিচ্ছদ দিয়ে ভাবপ্রকাশ করা হত।

প্রচলিত মতগুলির আর একটা ত্রুটি হল যে তাতে বেদের বাহ্য সব নৈসর্গিক শক্তির লোকায়ত পূজার পরে এবং একদিকে গ্রীসের সুপরিণত ধর্মমতের মধ্যে ও অন্যদিকে, উপনিষদ-পুরাণে নির্দিষ্ট দেবতাদের ক্রিয়াবৃত্তি সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও চেতসিক ধারণার মধ্যে বড় একটা ফাঁক থেকে যায়। আপাততঃ আমরা মেনে নিতে পারি যে মাটির মানুষ বাহিরের দিকটাই প্রথম দেখে, ভিতরে যেতে শেখে ব'লে তার সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য ধর্মের প্রাচীনতম রূপ হল বাহ্য নৈসর্গিক শক্তির উপর নিজের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব ও চেতনা আরোপ করা ও তার পূজা করা।

বেদে অবশ্যই অগ্নি, সূর্য, উষা, পর্জন্য (বর্ষণকারী মেঘ) সবই স্থূল প্রকৃতির শক্তি; কয়েকজন দেবতার মূল নৈসর্গিক ক্রিয়াবৃত্তি নিঃসংশয়ে বোঝা না গেলেও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা বা উদ্ভাবন-কুশলতা থেকে সে অস্পষ্টতা দূর

করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রীক পূজাতে দেখি বেশ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন, যদিও নৈসর্গিক ক্রিয়াবৃত্তি বা গুণ-ধর্ম লোপ পেয়েছে বা চেতসিক স্বভাব থেকে গৌণতর স্থান নিয়েছে। দুর্দমবেগ অগ্নি হয়েছেন পরিশ্রমের পঙ্গু দেবতা; Apollo, সূর্য অধ্যক্ষতা করছেন কবিত্ব প্রেরণা ও ভবিষ্যদ্বাণীর উপর; Athene ও উষার অভিন্নতা যুক্তিযুক্তই মনে হয় কিন্তু তাঁর নৈসর্গিক বৃত্তি সম্পূর্ণ স্মৃতিচ্যুত হয়ে তিনি হয়েছেন অভিজ্ঞা শক্তিমতী পূতচরিত্রা জ্ঞানদেবী; আরও অনেকের—যেমন যুদ্ধের, প্রেমের, সৌন্দর্যের দেবতাদের নৈসর্গিত বৃত্তি এমনভাবে হারিয়ে গেছে যেন কোন কালেই তার অস্তিত্ব ছিল না। মানব সভ্যতার উপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী ছিল বলে সন্তুষ্ট থাকা চলে না; এ পরিবর্তনের পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে হবে, তার ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের দেশে, পুরাণেও দেখি এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কোথায়ও বা ভিন্ন নামরূপের নূতন দেবতা উদ্ভাবন ক'রে, কোথাও বা গ্রাসের দেবতাতত্ত্বের পরিণতির সেই দুর্বোধ্য পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। সরস্বতী নদী হয়েছে বাগদেবী, কবিপ্রতিভা ও বিদ্যার দেবতা; বেদের বিষ্ণু-রুদ্র এখানে প্রধান দেবতা, দিব্য ত্রিমূর্তির অন্তর্ভুক্ত, যথাক্রমে বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। ঈশোপনিষদে দেখি, যে প্রত্যাদেশ-লব্ধ গুণের দ্বারা পরমসত্যে উপনীত হওয়া যায় তার দেবতাজ্ঞানে সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানান হচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তান নিত্য যে গায়িত্রীমন্ত্র জপ ক'রে আসছে তাতেও দেখি সূর্যের সেই ভাব—আর সে হল ঋগ্বেদের বিশ্বামিত্র ঋষির একটা স্তোত্রের একটা শ্লোক। সেই ঈশোপনিষদেই আবার দেখি অগ্নিকে নিছক নৈতিক প্রয়োজনে আহ্বান করা হচ্ছে, যেন তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করেন, দিব্য আনন্দের পবিত্র পথের দিশা দেন এবং তিনি ও ইচ্ছাশক্তি যেন অভিন্ন, মানুষের সব কাজের দায়িত্ব যেন তাঁর। অন্যান্য উপনিষদেও দেবতারা স্পষ্টতই মানুষের ইন্দ্রিয়-বোধের প্রতীক। যে সোমলতা থেকে বৈদিক যজ্ঞের দিব্যোন্মাদক সুরা প্রস্তুত হত সে সোম হয়েছে চন্দ্রের দেবতা, আর ব্যষ্টি মানবে মনরূপে হয় তার আত্মপ্রকাশ। এই পরিণতির জন্য সময়ের প্রয়োজন। আদিম মানবের লোকায়ত পূজা অথবা বেদের উপর আরোপিত কথঞ্চিৎ উন্নততর Pantheistic animism, দেবতাবোধে নিসর্গ-শক্তির অর্চনার পরে এবং দেবতাদের চেতসিক গুণক্রিয়া-সম্বলিত পুরাণের উন্নততর দেবতত্ত্বের পূর্বে একটা কালের ব্যবধান চাই। আর হয়ত সেই ছিল গুপ্ত উপাসনার যুগ। প্রচলিত মতে যেভাবে ব্যাপারটা দাঁড় করান হয়েছে তাতে বড় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে; আর না হয় বৈদিক ঋষিদের পূজাতে শুধু নৈসর্গিকতার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে ফাঁক আমরাই তৈরি করেছি।

আমি বলতে চাই যে ঐতিহাসিক যুগের গুপ্তবিদ্যা, Orphic ও Eleusinian Mysteries, মধ্য পাশ্চাত্যের গূঢ় বিদ্যা যার নির্বাণোন্মুখ অন্তিম অবশেষ, মানব মনের মনের সে যুগের যথেষ্ট বৃহদায়তন একমাত্র লিখিত নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। কেন, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে এখন দুঃসাধ্য, কিন্তু যে কারণেই হোক, সেযুগে জাতির অর্জিত চেতসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান স্থূল পার্থিব রূপক ও সঙ্কেতের আবরণে ঢেকে রাখা হত, যাতে সে সবের অর্থ সাধারণের বোধগম্য না হয় কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারে। রহস্যবাদীদের একটা প্রধান নিয়ম ছিল মন্ত্রগুপ্তি, আত্মজ্ঞানের ও দেবতত্ত্বের পবিত্রতা ও গোপনীয়তা। তাঁদের মতে সে জ্ঞান গ্রহণ করবার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের ছিল না, হয়ত তা তাদের পক্ষে বিপদজনক হতে পারত, অন্ততঃ অমার্জিত পশুপ্রকৃতি লোকের কাছে ব্যক্ত হলে তার অপব্যবহার, বিকৃতি ও গুণহানি হতে পারত। তার চেয়ে বরং ভাল মনে ক'রে তাঁরা সাধারণের জন্য কার্যকর অথচ অপূর্ণ বাহ্য পূজার ব্যবস্থা দিয়ে, দীক্ষিতদের জন্য রেখেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং, তাঁদের ভাষাতে রূপকের ও শব্দের এমন পরিচ্ছদ দেওয়া হত যাতে নির্বাচিত শিষ্যেরা তার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করতে পারত; কিন্তু সেই সঙ্গে সাধারণ লোকে বুঝত স্থূল উপচার পূজায় প্রযোজ্য অর্থে। এই পদ্ধতিতেই বেদের সব সূক্ত পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছিল। তার সব সূত্র, সব অনুষ্ঠান বাহিরের দৃষ্টিতে হল সর্বদেববাদের অনুযায়ী প্রকৃতিপূজা—সেই ছিল তখনকার দিনে সাধারণ লোকের ধর্ম; আর গূঢ়ার্থে সেসব পবিত্র মন্ত্র ছিল চেতসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কার্যকর প্রতীক বা সঙ্কেত এবং আত্ম-অনুশীলনের জন্য মানসিক শিক্ষা বা বিনয়ের

অনুশাসন—সেই ছিল তখন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অবদান। সায়ন ধরেছেন যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও রীতি—বেদের বহিরঙ্গ-রূপে তার স্থান আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত নৈসর্গিক অর্থও মোটের উপর মানা যেতে পারে। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যারই পশ্চাতে রয়েছে বেদের প্রকৃত রহস্য যা এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি—নিণ্যা বচাংসি, যেসব গোপন কথা পূতচরিত্র জ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। বেদের বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ, সঙ্কেতগুলির তাৎপর্য এবং দেবতাদের চেতসিক ক্রিয়াবৃত্তি সব নির্ণয় ক'রে এই গূঢ় বা অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যক্ষ অথচ বেশী মূল্যবান অর্থ বিশ্লেষণ করা কঠিন হ'লেও প্রয়োজন। আর এ প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল তার পথ প্রস্তুত করা।

এ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হলে তিনটি লাভ হয়। প্রথমতঃ, উপনিষদে এখনও যেসব অংশ দুর্বোধ্য বা অবোধ্য আছে, সহজ ও সুপ্রযোজ্যভাবে তার অর্থ পরিষ্কার হয় এবং পুরাণের অনেক অংশের মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। তারপর, ভারতের চিরপ্রচলিত প্রাচীন সংস্কার সর্বতোভাবে ব্যাখ্যাত ও যুক্তিযুক্ত হয়, কারণ তাতে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় যে সত্যসত্যই বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র ষড়দর্শন এবং ভারতের সব মহান ধর্মসম্প্রদায়গুলিরই মূল উৎস বেদ। তারপর এদেশে যত চিন্তার উদয় হয়েছে সে সবের মূল ভাব তাতে পাওয়া যায়—হয় বীজাকারে, না হয় তার আদি বা প্রাচীন রূপে। সুতরাং ভারতীয় ধর্মতত্বের তুলনামূলক আলোচনার নির্ভরযোগ্য একটা স্বাভাবিক আদিবিন্দু পাওয়া যায়। অনিশ্চিত কল্পনা বিলাসে পথ না হারিয়ে অথবা অসম্ভব রূপান্তর বা অবোধ্য অবস্থান্তরের কারণ দেখতে বাধ্য না হয়ে, বিচারসহ স্বাভাবিক ও প্রগতিশীল ক্রমপরিণতির একটা সূত্র ধরতে পারি। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য প্রাচীন জাতির পুরাতন পূজা ও দেবতা তত্বে যা এখনও স্পষ্ট হয়নি তার উপরও হয়ত নূতন আলোক পড়বে। পরিশেষে, বৈদিক মূলে অর্থের যেসব অসঙ্গতি আছে সে সবই সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যাত হয়, দেখা যায় যে সেসব অসঙ্গতি আপাতমাত্র, কারণ বক্তব্যের মূল সূত্র হল আভ্যন্তরীণ গূঢ়ার্থে। একবার সেসূত্র পাওয়া গেলে দেখা যায় যে সব সূক্তই চমৎকার যুক্তিযুক্ত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত এক একটা অখণ্ড রচনা এবং তার প্রকাশ-পদ্ধতি আমাদের পরিচিত হলেও এবং বর্তমান কালের ভাষার ও বলার প্রথার অনুগামী না হ'লেও, তার নিজস্ব শৈলীতে যথাযথ ও নিশ্চিতার্থ। তার ত্রুটি হয় বাক্যের বাহুল্য নয়, মিতপ্রয়োগ, অর্থের দীনতা নয়, অত্যধিক অর্থগর্ভতা। বেদ বর্বর যুগে এক কৌতুহলোদ্দীপক অবশেষ নয়, তার স্থান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন ধর্মপুস্তক শ্রেণীর শীর্ষে।

বেদের স্বরূপ ও নষ্ট অর্থ উদ্ধারের প্রথম চেষ্টা।

বেদ, দেখা গেল আমাদের বুদ্ধির গড়া দর্শনশাস্ত্রের পূর্বযুগের রচনা। সে আদি যুগে চিন্তার ক্রমগতি চলত—আমাদের ন্যায়ানুগ যুক্তি ও ভাষা যে পথে চলে তা থেকে ভিন্ন পথে। ভাবপ্রকাশের যে রীতি তখন স্বীকৃত হয়েছিল, আমাদের বর্তমান অভ্যস্ত রীতির কাছে তা অচল। মানুষের নিত্যকার কাজেরও সাধারণ প্রত্যক্ষের বাহিরে সব বিষয়ে তখনকার বিজ্ঞতম ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বোধিমানসের নির্দেশের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আলো ফেলা, যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা নয়, তাঁদের আদর্শ ছিল অনুপ্রেরণা-সমৃদ্ধ দ্রষ্টা, নির্ভুল তার্কিক নয়। বেদ-উদ্ভবের এই বিবরণ ভারতের চিরাগত সংস্কার শ্রদ্ধাভরে রক্ষা করেছে। বেদের সূক্ত ঋষিদের ব্যক্তিগত রচনা নয়, তাঁরা ছিলেন শাশ্বত সত্য ও নির্ব্যক্তির 'দ্রষ্টা'। বেদের ভাষা ও 'শ্রুতি', সে ছন্দোময়ী বাণী বুদ্ধি দিয়ে গড়া নয়, শোনা—যে ঋষি নিজেকে আগে থেকে সে অপৌরুষেয় জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তাঁর অন্তরের কানে ভেসে এসেছে অনন্তের কাছ থেকে সেসব দিব্য শব্দের স্পন্দন। 'দৃষ্টি' 'শ্রুতি' শব্দ দুটি বৈদিক, বৈদিক সংজ্ঞার আভ্যন্তরীণ অর্থে তার তাৎপর্য হল প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞান, অন্তঃপ্রেরণার বস্তু।

প্রত্যাদেশের বৈদিক ধারণাতে অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতের কোন আভাস নাই। সাধনার দ্বারা ক্রমিক আত্মোন্নতির ফলে সে শক্তি অর্জন ক'রে ঋষি তা প্রয়োগ করেছেন। জানা অর্থই ছিল পথচলা ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া, সন্ধান পাওয়া ও জয় করা; প্রত্যাদেশ আসত শুধু পথের শেষে, চরম বিজয়ের পুরস্কার ছিল জ্ঞানের আলোক। চলার, সত্যপথে মানবাত্মার অগ্র-গতির চিত্র বেদে অবিরাম পাওয়া যায়। সে পথে জীব যত অগ্রসর হয় ততই সে উর্ধ্বে আরোহণ করে,

শক্তি ও আলোকের নূতন নূতন ভূমি তার অন্তরের অভীপ্সার সামনে উন্মুক্ত হয়; বীরবলে সে মহত্তর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য অর্জন করে।

ইতিহাসের দিক থেকে ঋগ্বেদকে বলা যেতে পারে জাতীয় প্রগতির একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ উপায়ে মানুষ যে কত বড় একটা উন্নতি করেছিল তার নিদর্শন। ব্যক্ত ও গুপ্ত উভয় অর্থেই বেদ কর্মবাদী, তার বিষয় হল বাহ্য ও অন্তরযজ্ঞ; সাধারণ জৈব মানুষের অগম্য নূতন নূতন চেতনার অভিজ্ঞতার স্তর আবিষ্কার করে তার আত্মা তাতে অধিরোহণ করেছে, এ হল সে সংগ্রাম ও বিজয়ের সঙ্গীত এবং যে দিব্য জ্যোতিঃ-শক্তি-রূপা মর্ত্যজীবে কাজ করছে মানুষের মুখে তার স্তুতি। সুতরাং বুদ্ধি-বিচার বা কল্পনা বিলাসের ফল লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা তাতে মোটেই নাই, আদিম ধর্মের অনুষ্ঠান বা মতও তা নয়। তবে, সব এক রকমের অভিজ্ঞতা ছিল এবং লব্ধ জ্ঞান অপৌরুষের ছিল বলে একই ধরণের ভাবের সমষ্টি বার বার এসেছে, তার একটা নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক ভাষা গড়ে উঠেছে, কারণ হয়ত তখনকার দিনে মানুষের প্রথম ভাষাতে সে সব ভাব-প্রকাশের এই আকারই অবশ্যম্ভাবী ছিল—যে হেতু সাধারণ মনের সেভাব প্রকাশ করবার সাধ্য ছিল না এবং একমাত্র এই সাঙ্কেতিক ভাষার স্ফুট বস্তুবাচকতা ও গূঢ় লোকাতীত অভিব্যঞ্জনা মিলিত হয়েই সে কথা বোঝান সম্ভব হয়েছিল। যাহোক দেখি যে সূক্ত থেকে সূক্তান্তরে একই ধারণার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একই সংজ্ঞা, একই চিত্র দিয়ে, অনেক সময়—একই ভাষাতে—মৌলিক কবিত্বের কোন চেষ্টা নাই বা নূতন চিন্তার অথবা অভিনব ভাষায় সন্ধানে কোন আগ্রহ নাই। রসশ্রী, সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্যের কোন প্রলোভনই অজ্ঞাত আলোকের এই কবিদের কাউকেও সেই স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ ধারা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে নি—সে হয়েছে তাঁদের দিব্যবিদ্যার একটা বীজগণিতের সঙ্কেতের মত, আর সেই পরিচ্ছদেই শিষ্য-প্রশিষ্য অনুক্রমে এ পরমজ্ঞানের সনাতন সূত্র চলে আসছে।

প্রকৃত পক্ষে সূক্তগুলির ছন্দ সুগঠিত, কলাকৌশল সর্বত্র ও সুনিপুণ, কাব্যরীতি ও কবি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বহু বিচিত্র। সংস্কৃতিহীন আদিম অমার্জিত কারিগরের হাতের কাজ তা মোটেই নয়; বরং সে হল সজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কলা সৃষ্টির জীবন্ত অভিব্যক্তি, আত্মদোষদশা অনু-প্রেরণায় ওজস্বী ও সুনিয়ত প্রকাশ। তবে, ইচ্ছা করেই এই সব মহৎ ক্ষমতা সবসময় একই ঠাটে, একই উপাদানের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, প্রকাশের কলা-কৌশল ঋষিদের কাছে একটা যন্ত্রমাত্র ছিল, লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের মূল অভিনিবেশ ছিল কঠোর ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপর—বলা যেতে পারে, বাস্তব উপযোগিতার উপর, তবে উপযোগিতার শ্রেষ্ঠ অর্থে। সূক্ত-রচয়িতা ঋষির কাছে সে ছিল নিজের ও অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। সে স্তোত্র তাঁর অন্তরাত্মা থেকে উঠে মনের একটা শক্তিতে পরিণত হত, তাঁর আন্তর জীবনের ইতিহাসে কোন প্রধান বা সঙ্কট মুহূর্তে আত্ম-প্রকাশের বাহন হত। তাতে তাঁর অন্তরস্থ দেবতাকে রূপায়িত করতে এবং অমঙ্গলের মূর্ত রাক্ষসকে বিনাশ করতে সাহায্য হত। পূর্ণতাপ্রয়াসী আর্যদের হাতে সে ছিল একটা অস্ত্র—ইন্দ্রের বজ্রের মত জ্বলে উঠে তা পড়ত পর্বত সানুদেশে আচ্ছাদক বৃত্রের উপর, পথের পরে বৃকের উপর ও নদীর ধারের সব দস্যুদের উপর।

বৈদিক চিন্তার এই স্থির নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে তার গভীরতা, ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্মতা দেখে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুমান মনে আসে। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা চলে যে চিন্তার বা আত্মিক অভিজ্ঞতার সুরুতে, এমন কি তার বিকাশ বা ক্রমগতির প্রথম দিকে আকার বা বিষয়বস্তু এমন সংহত হতে পারত না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমান সংহিতাতে পাই একটা যুগের [illegible] প্রতিরূপ, তার আরম্ভের ত নয়ই, এমনকি পরের একাধিক স্তরের ও নয়। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান সংহিতার প্রাচীনতম সূক্তগুলি আরও আগেকার মানুষের ভাষায়, আরও বেশী—অবাধ, আরও স্বচ্ছন্দ নমনীয় ও সাবলীল রীতিতে রচিত পূর্বতর আধ্যাত্মিক রূপের অপেক্ষাকৃত নব্য পরিণতি বা সংস্করণ।* হয়ত বা বর্তমান বৃহদাকার

* বেদে বহুস্থলে পুরাতন ও নূতন ঋষিদের—পূর্বা…কথা বলা হয়েছে, আর তার প্রথম যুগের ঋষিরা এমন সুদূর অতীতের যে তাঁদের প্রায় দেবতা বলে, জ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

সংহিতার সবটাই আর্যজীবনের সঙ্গীত-মুখর অতীতের বিপুলতর সমৃদ্ধি থেকে কিয়দংশ বেদব্যাসের বেছে নেওয়া। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে, এই বিরাট সংকলন করেছিলেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কলিযুগের প্রারম্ভের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, ক্রমবর্ধমান গোধূলির স্বল্পালোক ও পরিণামে অপরিহার্য অন্ধকারের কথা ভেবে; আর সম্ভবতঃ এই হল ঋষিদীপ্ত পূর্বপুরুষদের চরম পত্র তাঁদের বংশধরদের উদ্দেশ্যে, যে মানবজাতির আত্মা তখনই নিম্নস্তর স্থূলজীবন ও বুদ্ধিবিচারের সহজলভ্য ও আপাত-দৃষ্টিতে নিশ্চিত ধনের প্রতি উন্মুখ হয়েছিল—তার জন্য সে প্রদীপ্ত উষার শেষ পিতৃধন।

এ সব ত অনুমান। নিশ্চিত হল, প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে মানব প্রগতির যুগধর্মে বেদ ক্রমশঃ অবোধ্য হয়ে পরিণামে লুপ্ত হবে, তা ফলেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতায় বেদোত্তর বেদান্তের যুগ আরম্ভ হবার আগেই বেদের দুর্বোধ্যতা অনেকদূর এগিয়েছিল এবং সে পুরাতন জ্ঞান যতটা সম্ভব রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা তাতে করা হয়েছিল। তা অনিবার্যই ছিল। কারণ, বৈদিক রহস্যবাদী আগম গড়ে উঠেছিল যে সব অভিজ্ঞতার উপর সাধারণ মানুষের পক্ষে তা দুর্লভ, এবং যে সব বৃত্তির সাহায্যে তা লাভ করা যায় অনেকের মধ্যেই তা এখনও অপরিণত বা অগঠিত, কিংবা সে সবের কাজ অনিয়মিতভাবে হয় আর যা হয়—তাতেও মিশ্রণ থাকে। সত্যানুসন্ধানের প্রথম তীব্রতা একবার কমে গেলেই অবসাদ ও শিথিলতা আসে, তাতে পূর্বার্জিত সত্য অনেকাংশে হারিয়ে যায়ই। আর একবার হারিয়ে গেলে, প্রাচীন সূক্তের আক্ষরিক অর্থ বিচার ক'রে সে সত্য পুনরাবিষ্কার করা সহজে সম্ভব নয়, কারণ ইচ্ছা ক'রেই সেসব সূক্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় রচিত হয়েছিল।

অজ্ঞাত ভাষার একটা সূত্র পেলে তার ঠিক অর্থ বোঝা যেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থবোধক শব্দবিন্যাসের পরিচ্ছদে রহস্য অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গোপন থাকে, তার অর্থভেদ দুরূহ হয়—কারণ তার ফাঁদে ওরা তার নির্দেশ সব ভুল পথে নিয়ে যায়। সুতরাং ভারত-মণীষা যখন আমার বেদের অর্থবিচারে দৃষ্টি দিল তখন সেকাজ অতি কঠিন মনে হল এবং কৃতকার্যতাও হল আংশিক। সে অন্ধকারে একমাত্র আলোক ছিল—বেদ যারা কণ্ঠস্থ করত, ব্যাখ্যা করত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার ছিল যাদের উপর তাদের গতানুগতিক বিদ্যা। প্রথমে দুকাজই এক হাতে ছিল, পুরাকালে ঋষি ও আচার্যই ছিলেন যজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু এ আলোও তখন ম্লান হয়ে গেছে, এমনকি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরোহিতেরাও উচ্চারিত মন্ত্রের তাৎপর্য ও শক্তি সম্বন্ধে অতি অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যজ্ঞ করতেন। * কারণ বৈদিক পূজার আনুষ্ঠানিক অঙ্গ এক সময়ে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে রক্ষা করেছে, এখন পুরু খোলার মত জমে তারই শ্বাসরোধ করছিল। ইতিমধ্যেই বেদ ক্রিয়াকর্মের বিধান ও কথা-কাহিনীর স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাঙ্কেতিক অনুষ্ঠানের সব ক্ষমতাই লুপ্ত হয়েছে, গূঢ়ার্থক রূপক-কাহিনীর আলো নিভে গেছে, রয়েছে শুধু কিম্ভূতকিমাকার ছেলে-ভোলান একটা বাহিরের স্তর।

প্রবল নবজীবন সঞ্চারের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ-উপনিষদে। মূল বৈদিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্র গ্রহণ ক'রে তা থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নূতন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এই গ্রন্থ দুটিতে। দুটি তার পরস্পর অনুপূরক দিক, অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ রক্ষা করা আর মন্ত্রের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা। প্রথম প্রয়াস রূপ নিয়েছে ব্রাহ্মণে, † দ্বিতীয় উপনিষদে।

ব্রাহ্মণগুলির প্রয়াস হল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের পুঙ্খানু-পুঙ্খ সব আচার নির্ণয় ও রক্ষা করা: যজ্ঞের বাস্তব ফল লাভের জন্য কি প্রয়োজন, বিভিন্ন অংশের সাঙ্কেতিক অর্থ ও উদ্দেশ্য, ক্রিয়ার প্রয়োগক্রম, পাত্র ও উপকরণ, অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত সব মন্ত্রের তাৎপর্য, অস্পষ্ট পরোক্ষ উল্লেখের অভিপ্রায় এবং আদিম দেবকাহিনীর ও ঐতিহ্যের স্মৃতি—সব উদ্ধার করা। সহজেই বোঝা যায় যে অনেক অল্পই উদ্ভাবিত হয়েছে সূক্ত রচনার পরে, যেসব মন্ত্র আর বোঝা যায় না সে সবের একটা অর্থ দেবার জন্য। কতকগুলি হয়ত প্রাচীন—সাঙ্কেতিক কবিতা

---

* উদাহরণ, ছান্দোগ্য ১।১২ (অনুবাদক)

† অবশ্য মোটের উপর, বিচারের মূল প্রবৃত্তির সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। ব্রাহ্মণেও তত্ত্ববিচার আছে।

রচিত হয়েছিল যেসব মূল রূপক-কাহিনী অবলম্বন করে অথবা রচনার সময়ের পারিপার্শ্বিক কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। মৌখিক ঐতিহ্যের আলোক চিরকালই ম্লান হয়, পুরাতন যেসব সঙ্কেতের অর্থ অংশতঃ হারিয়ে গেছে নূতন রূপকের আচ্ছাদনে তা আরও ঢাকা পড়ে, স্পষ্ট হয় না। সুতরাং, তার সব ইঙ্গিতে কৌতূহল জাগায় বটে, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। আর, এক একটা মন্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যার যে চেষ্টা তাতে করা হয়েছে তা গ্রহণ করাও নিরাপদ নয়।

উপনিষদের ঋষিরা অন্য পথ নিয়েছেন। যে জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে বা লোপ পেতে বসেছে, সে জ্ঞান তাঁরা ধ্যান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আবার উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বেদ মন্ত্রের অক্ষর তাঁরা নিয়েছেন তাঁদের বোধি বা অনুভূতির অবলম্বন বা প্রমাণরূপে—অথবা তা থেকে দৃষ্টির ও মননের বীজ পেয়ে তার দ্বারা পুরাতন সত্য নূতন আকারে অর্জন করেছেন। তাঁরা যা পেয়েছেন তা প্রকাশ করেছেন সে যুগের সহজবোধ্য নূতন সংজ্ঞাতে। এক হিসাবে, তাঁদের মূলের শব্দ-বিচার নিরপেক্ষ নয়—বিদ্বর্জনের মত, পরিবেশ অনুযায়ী প্রতি শব্দের তাৎপর্য সূক্ষ্মভাবে আলোচনা ক'রে এক একটা বাক্যের অভীপ্সিত বক্তব্য নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে তাঁরা চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ছিলেন আক্ষরিক অর্থের চেয়ে মহত্তর সত্যের সন্ধানী, তাঁরা যে আলোকের প্রয়াসী ছিলেন, শব্দে তারই নির্দেশ সন্ধান করেছেন। ধাতুগত অর্থ তাঁরা জানতেন না বা উপেক্ষা করতেন, অনেক সময় শব্দের অঙ্গীভূত বিভিন্ন ধ্বনি বিশ্লেষণ ক'রে তাঁরা যেভাবে সাঙ্কেতিক অর্থ করেছেন সে পদ্ধতি অনুধাবন করা শক্ত। এই জন্যই বৈদিক ঋষিদের প্রধান প্রধান চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের উপর আলোকপাতের জন্য উপনিষদের দান অমূল্য হলেও উদ্ধৃত বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থবোধে, ব্রাহ্মণের মতই, উপনিষদ কোন সাহায্য দেয় না। তবে প্রকৃত কাজ হল বেদ ব্যাখ্যা করা নয়, বেদান্ত প্রতিষ্ঠা করা।

কারণ এই মহৎ প্রয়াসের ফলে তত্ত্বচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হল যে নূতন আকারে তার শক্তি আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হল, বেদের পরিণতি হল বেদান্তে। তবে তার মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি ছিল যাতে প্রাচীন বৈদিক চিন্তন ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রথমতঃ, বিশুদ্ধতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য থেকে বাহ্য অনুষ্ঠানকে, যজ্ঞের ও মন্ত্রের স্থূল ঐহিক প্রয়োজনকে ক্রমশঃ বেশী ও শেষে সম্পূর্ণ গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন গূঢ়বাদীরা আন্তর ও বাহ্য অস্তিত্বের মধ্যে, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয়ের যে একটা স্থিতি রক্ষা ক'রে এসেছিলেন, এখন তা নষ্ট হয়ে গেল। নূতন স্থিতি, নূতন সমন্বয় যা স্থাপিত হল তার ঝোঁক রইল শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের দিকে, তাও আবার বৌদ্ধ-ধর্মে তা প্রবেশের অতিরঞ্জনের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। যজ্ঞ ছিল সাঙ্কেতিক অনুষ্ঠান, ক্রমশঃ তা অর্থহীন প্রাক্তন সংস্কারের অবশেষ, এমনকি জঞ্জাল হয়ে দাঁড়াল। তবু, অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়, প্রাণহীন ও নিরর্থক বলেই জাতীয় মনের একটা অংশ সেসব আঁকড়ে ধরে রইল এবং তার কাছে বাহ্যতম অঙ্গের দাম অনেক বেড়ে গেল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিধানও নির্বিচারে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ফলে, বেদ ও বেদান্তের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বীকৃত না হলেও কার্যতঃ একটা ব্যবহারিক প্রভেদ এসে গেল—বলা যেতে পারে, বেদ রইল পুরুতদের জন্য, আর বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞানীদের জন্য।

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্তে সংকেত প্রতীকের ভাষা ক্রমশঃ বর্জন করা হল। বৈদিক গূঢ়বাদীদের চিন্তার পরিচ্ছদ ছিল বাস্তব কাহিনী ও কবিত্বময় রূপকে, তার স্থলে উপনিষদে এক স্ফুট উক্তি, দার্শনিকের উপযুক্ত ভাষা। এই রীতির পূর্ণ পরিণতির ফলে শুধু বৈদিক অনুষ্ঠানের নয়, বেদের সংহিতারও প্রয়োজন লোপ পেল। ক্রমশ বেশী স্পষ্ট ক'রে ও সোজাসুজি সব কথা বলাতে উপনিষদই ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তার উৎস হয়ে দাঁড়াল, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের অনুপ্রাণিত শ্লোক সব স্থানচ্যুত হল। * বেদ আর শিক্ষার অপরিহার্য মূলও রইল না, সুতরাং আগের মত আগ্রহ ক'রে বা মাথা খাটিয়ে তা আর পড়া হত না। তার সঙ্কেতিক ভাষার আভ্যন্তরীণ অর্থ তখনও যা অবশিষ্ট ছিল, প্রয়োগের অভাবে তাও হারিয়ে গেল, সে নিধি কয়েক পুরুষেই নষ্ট হয়ে গেল, কারণ বৈদিক পিতৃপুরুষদের চিন্তার ধারা থেকে তাদের চিন্তার পদ্ধতি একেবারেই পৃথক হয়ে গেল। বোধির যুগ অস্ত গেল, উদয় হল বুদ্ধি যুগের নূতন উষা।

---

* এখানেও মনে রাখতে হবে যে সেকালের এই ছিল প্রধান ধারা, তাতে প্রতিপ্রসব আছে, বেদ থেকেও প্রমাণ দেওয়া হত বটে, তবে মূলতঃ উপনিষদ হল জ্ঞানকাণ্ড ও বেদ কর্মকাণ্ড।

রিয়েলিজম

সঙ্কর্ষণ রায়

এত অশান্ত—অথচ নাম সুশান্ত। তার চলায়, বলায়, আচরণে এত বিশৃঙ্খলা যে শান্তা শ্রান্ত হ'য়ে ওঠে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে।

শান্ত প্রকৃতির মেয়ে শান্তা—ঘরের নিরিবিলি কোণটি ছেড়ে সহজে সে নড়তে চায় না—তার নিরুত্তেজ, স্তিমিত গৃহবন্দী সত্তাকে বাইরের গতিশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না সে। অথচ তার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে সুশান্ত যেন দুরন্ত ঝড় বইয়ে দিয়েছে—তার ঘরকুণো মনটাকে দুর্দ্দামভাবে নাড়া দিয়ে ঘর ছাড়া করেছে।

সুশান্ত তাকে বলে, সকলের ধারণা যে তোমার মত লক্ষী মেয়ে হয় না। কিন্তু আমার মত লক্ষী ছাড়ার পাল্লায় প'ড়ে লক্ষী দু'দিনেই তোমাকে ছাড়বেন মনে হচ্ছে।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে ঝড়ের মত ছুটছিল সুশান্তর টু-সিটার—গতির স্পন্দন শান্তার সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে—শান্ত ঘরের-কোণ ভোলান অশান্ত পথচলার নেশায় পেয়েছে যেন তাকে।

সুশান্ত আবার বলে, কী—কথা ব'লছ না যে!

শান্তা বলে, তোমার ড্রাইভিং উপভোগ করছিলুম।

সুশান্ত উৎসাহিত হ'য়ে বলে, আরও একটু জোরে চালাব?

শান্তা শিউরে ওঠে, না, না।

অনেক রাত হয় বাড়ি ফিরতে। শান্তার মা গম্ভীর মুখে বলেন, সাড়ে সাতটায় ফিরবি বলেছিলি—সাড়ে ন'টা বেজেছে। এদিকে অশোক তোর জন্য অপেক্ষা করছিল—প্রায় দু'ঘণ্টা ব'সে থেকেছে বেচারী।

শান্তা চমকে ওঠে। অশোক যে আসবে, প্রতিদিনই সুশান্ত এসে তা ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের বিস্মৃতিটা বিশেষভাবে মারাত্মক। আজ সকালে অশোকের বাড়িতে নিজে গিয়ে সে ব'লে এসেছিল যে রিয়েলিজম্ ও নিউ রিয়েলিজমের তত্ত্বগুলো তার কাছে বুঝে নেবে। রীতিমত এ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে এসেছিল। বার্কলের ভাববাদ ও লকের রিপ্রেজেন্টেশনিজমের জটিলতার কথা ভেবে অশোকের জন্য সত্যিই সে অপেক্ষা করছিল অধীর চিত্তে। কিন্তু ধূমকেতুর মত টু-সিটার নিয়ে সুশান্তর আবির্ভাবের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে তার বুঝতে-না-পারা বার্কলের থিয়োরীর রহস্য ভেদের আগ্রহ। সুশান্তর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে—অশোক যে আসবে তা বুঝি তার মনেও হয়নি।

মা বললেন, ভারি অন্যায় হচ্ছে বাছা। তোর মাইনে-করা প্রাইভেট-টিউটর তো নয়—নিজের থেকেই আসছে ছেলেটা—গত দু' বছরে একদিনও বাদ যায়নি। তোকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়েছে বলেই না বি-এ-টা পাশ করতে পারলি।

আরক্তমুখে মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকে শান্তা। সত্যি ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। দিনের পর দিন এমন আত্মবিস্মৃত হচ্ছে সে কী ক'রে। সুশান্তর টু-সিটারে বেড়াবার প্রলোভন কী এমনি দুর্জয়। তার চাপল্যে এত সহজে সে আত্ম-সমর্পণ করে কী ক'রে! অশোক হয়তো ইতিমধ্যে তাকে নিতান্তই লঘুপ্রকৃতির মেয়ে ব'লে ভাবতে শুরু করেছে। ক্ষোভে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে ওঠে তার মন।

পরদিন বিকেলবেলা সে বই-খাতা নিয়ে বসল—সুশান্ত আসতেই বললে, আজ আর বেড়াতে বেরুব না। রিয়েলিজমের সব কটা থিয়োরী আজ অশোকদা'র কাছে বুঝে নেব।

সুশান্ত নাক সিটকে বললে, এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা তুমি নষ্ট করতে চাও! দেখ শান্তা, রিয়েলিজমের তত্ত্ববিচার

ক'রে জীবনটাকে নষ্ট কোরো না—রিয়েলিষ্টের মত এন্‌জয় দি লাইফ।

আত্ম-সম্বরণ ক'রে শান্তা বললে, আমাকে মাপ করো সুশান্তদা'। আজ আমি কিছুতেই বেরুতে পারবো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললে, ভেবেছিলুম ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত যাবো আজ। কী সুন্দর সন্ধ্যাটি—তুমি হয়তো ঘরে ব'সে বুঝতে পারছো না শান্তা!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আচ্ছা চলি তা হ'লে—গুডবাই।

সুশান্তকে এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত গেল শান্তা।

সুশান্ত গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই সে বললে, আমার ওপর রাগ করলে না তো?

না; রাগ ক'রবো কেন?—ম্লান হেসে সুশান্ত বলল। বাট আই ফিল সরি ফর ইউ। এমন সুন্দর সন্ধ্যাটি!

শান্তা বললে, কাল এসো—কাল নিশ্চয়ই বেরুব।

বইখাতার স্তূপ সামনে নিয়ে ব'সে থাকে শান্তা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি ঘনাল—কিন্তু অশোক এল না।

শান্তা মাকে ডেকে বললে, অশোকদা'র বাড়ি যাবো মা? উনি তো এলেন না।

মা বললেন, যাবি বৈ কি। পর পর ক'দিন এসে ফিরে গেছে—ছেলেটা রাগ করেছে বোধ হয়।

শান্তা কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। সমস্ত রাগ-বিরাগ, স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি সব কিছুর বাইরে অশোক তো মূর্তিমান একটি ফিলজফির নোট বই। তার রাগ করা যেন কল্পনা করা যায় না।

অশোকের বাড়িতে এসে সোজা দোতলায় উঠে তার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল শান্তা!

বইয়ের স্তূপের মধ্যে ঘাড় গুঁজে ব'সেছিল অশোক—শান্তা তার পাশে এসে দাঁড়াতেই মুখ তুলে তাকাল। চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে তার ছোট্ট ছোট চোখ দুটি কুঁচকে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবে তাকাবার ক্ষমতা নেই অশোকের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটির। যেন রাজ্যের বিরক্তি জড়ো ক'রে বাধ্য হ'য়ে দেখে যাচ্ছে—দেখতে না হ'লেই

অশোক বললে, সুশান্ত আসে নি বুঝি?

প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে শান্তা বললে, তুমি গেলে না কেন আজ? আমি অপেক্ষা করছিলুম।

অশোক তিক্তস্বরে বললে, অপেক্ষা করছিলে! তার চেয়ে বলো না—সুশান্তর টু-সিটারটা বিগড়ে গেছে।

সত্যিই অশোক রাগ করেছে। ফিলজফির তত্ত্বগুলোর মধ্যে চাপা প'ড়ে থাকা মানুষ অশোক যেন আত্মপ্রকাশ করছে। মনে মনে খুশিই হ'ল শান্তা।

সে বললে, রাগ করলে অশোকদা'?

অশোক চমকে ওঠে। অকস্মাৎ নিজের বেসামাল মেজাজ সম্বন্ধে সচেতন হয় সে—আত্মসংবরণ ক'রে বললে, না, রাগ ক'রব কেন?

শান্তা বললে, সুশান্তদা' জোর ক'রে আমাকে নিয়ে যায়। ওকে তো জান—কারুর কোন ওজর বা আপত্তি ও শুনতে চায় না।

গম্ভীরমুখে অশোক বললে—তুমি কী ভেবেছ যে সুশান্তর সঙ্গে তুমি বেড়াতে বেরোও ব'লে আমি তোমার ওপর রাগ ক'রেছি।

শান্তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিক বাদে সে বললে, রিয়েলিজ্‌মের থিয়োরীগুলো তো সব পড়ান হয়ে গেছে—ক্লাসের লেকচার কিছুই বুঝতে পারি নি। ভাবছিলাম তোমার কাছে সব বুঝে নেব।

অশোক আবার ভুরু কুঁচকে তাকাল শান্তার মুখের দিকে। ঝাঁঝালো গলায় বললে, মনটাকে অন্তর্মুখী না ক'রলে ফিলজফি বোঝা যায় না—শত বোঝালেও বুঝবে না।

শান্তা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিবিড় আকুতি-পূর্ণ চাউনি অশোককে অবশেষে নরম ক'রে আনে—সে তার পাশের চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলে, বোসো।

শান্তা বসল! অশোক মোটা একটা বই টেনে নিয়ে তার পাতা ওলটাতে থাকে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে শুধু পাতাই উল্টে যায়। তার—আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকে শান্তা নির্নিমেষে।

অশোক মুখ তুলে তাকাল। মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়ে উভয়েরই স্নায়ুকেন্দ্রগুলো বিদ্যুচ্চকিত হ'য়ে উঠে। দু'জনেই মুখ নামিয়ে নেয়।

বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অশোক হঠাৎ ব'লে

ওঠে, আজ পড়াশুনা থাক শান্তা—চল, একটু বেড়িয়ে আসি।

শান্তা চমকে ওঠে। এ কী কথা অশোকের মুখে! অহেতুক বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করবে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। শান্তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

অশোক বললে, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে! খুব কী বেয়াড়াগোছের অন্যায় প্রস্তাব করেছি?

না, না, তা কেন!—শান্তা সচকিত হ'য়ে বললে। কখনো তো বেড়াতে যাবার কথা মুখেও আনো না—তাই অবাক হচ্ছিলাম।

লেকের ধারে অশোকের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে শান্তার মন ভ'রে যায়। সুশান্তর টু-সিটারের ঝটিকা গতিতে, তার উত্তেজনাকর সাহচর্যে এমন অনাবিল আনন্দ নেই। অশোকের পাশাপাশি হাঁটবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছে সে—তার তরুণ মন যেন বিপুল গৌরবে ভ'রে ওঠে।

বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে ওরা একটি বেঞ্চিতে এসে বসল পাশাপাশি। প্রশস্ত বেঞ্চি—তিন চারজন বসতে পারে—তবু অশোকের গা ঘেঁষে বসল শান্তা। কেউ কোন কথা বলে না—যেন এক অনির্বচনীয় অন্তরঙ্গতা-বোধের মধ্যে অবগাহন ক'রে যায় ওরা।

শান্তা অস্ফুট কণ্ঠে এক সময় বলে, কী সুন্দর রাতটি!

অশোক বলে—অথচ রীতিমত আনরিয়েল! তোমাকে বাদ দিলে এ রাতের সৌন্দর্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

সুখ শিহরণে শান্তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। এতদিন এত কথা ব'লেছে অশোক—কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে এ কী সুরের ধ্বনি তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল!

পরদিন টু-সিটার নিয়ে সুশান্ত এসে দেখল ড্রইং রুমে সোফায় পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ব'সে আছে শান্তা ও অশোক—ওদের সামনে ছোট নীচু টেবিলটিতে কতগুলো বই ও খাতা ছড়ান।

অশোকের ঘাড়ে হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সুশান্ত বললে, কী হে ফিলজফার, তোমার ঐ বাজে কচকচানি দিয়ে শান্তার ইভনিংগুলোকে মার্ডার ক'রে দিচ্ছ কেন?

অশোক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুশান্তর মুখের পানে।

এমন সময় শান্তার বাবা বিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন। সুশান্ত ও অশোকের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি বললেন, তোমাদের বয়স বাড়ছে—কিন্তু ঝগড়াতে তো কমতি নেই।

সুশান্ত ও অশোক দু'জনেই বিনয়বাবুর ছাত্র ছিল। বি-এতে ফিলজফির অনার্স ক্লাসে দু'জনেই ছিল সহপাঠী—বিনয়বাবুর আশা ছিল যে তাঁর নতুন-গ'ড়ে-তোলা কলেজের মুখ উজ্জ্বল করবে এরা দু'জনেই। কাজেই এদের দু'জনের ওপর ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগী হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি—প্রায়ই এদের দু'জনকে তিনি বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে নিজেই পড়াতেন। শান্তা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে।

বিনয়বাবু সহাস্যে বললেন, কী হে সুশান্ত, ফিলজফি চর্চা তো অনেকদিন ছেড়েছ—আবার ঝগড়া কিসের?

সুশান্ত বললে, ফিলজফির দৌরাত্ম্য ঠেকাবার জন্য। এমন সুন্দর সন্ধ্যাগুলোতে ও হতভাগা ফিলজফির গোবর প্রলেপ দেবে—এ আমার সহ্য হয় না।

শান্তা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। তার এ হাসি অশোকের পছন্দ হ'ল না—মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকে সে।

বিনয়বাবু বললেন, অথচ বছর পাঁচেক আগে এমন একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে না যেদিন সুশান্ত তার বই-পত্র নিয়ে আমার লাইব্রেরী ঘরে এসে বসে নি। অশোক কিন্তু তখন রোজ সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠে হাওয়া খেত। তোর মনে আছে না শান্তা?

শান্তা বললে, মনে আছে বৈ কি। সুশান্তদা'র মত এমন বইয়ের পোকা আমি কখনো দেখি নি। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকাতেনই না। একদিন ওঁকে আমি আমার জিওগ্রাফীর পড়া বুঝিয়ে দিতে বলাতে এমন ধমক দিয়ে উঠেছিলেন।

সুশান্ত বললে, খুব বানিয়ে বানিয়ে বলছ তো!

কৌতুকোজ্জ্বাসিত দৃষ্টিতে সুশান্তর মুখের পানে চেয়ে শান্তা বললে, বানিয়ে বলছি বৈ কি। একদিন বাবার লাইব্রেরী ঘরে ব'সে একটু চেঁচিয়ে পড়াশুনা ক'রেছিলুম ব'লে তো রেগেমেগে আমার বিনুনী ধ'রে টেনে দিয়েছিলে।

মোস্ট শিডিশাস—আনপার্লামেণ্টারী !—সুশান্ত চেঁচিয়ে ওঠে। মেসোমশাইয়ের সামনে এমন ডাহা মিছে কথা বলতে পারছ, এ নির্ঘাৎ অশোকের কাছে রিয়েলিজমের পাঠ নেওয়ার ফল।

এমন সময় শান্তার মা ঘরে ঢুকে বললেন, বাড়িতে কী ডাকাত পড়ল ? তারপর সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাকাতই বটে—আমার ডাকাত ছেলে এসেছেন।

সুশান্ত বললে, কেন মাসীমা ?

শান্তার মা বললেন, তোমার দৌরাত্ম্য সামলাবার ক্ষমতা তোমার মাসীমা ছাড়া আর কারুর নেই। এস, আমার ঘরে এস।

সুশান্ত অপাঙ্গে একবার শান্তার মুখের পানে তাকাল —শান্তা তারই দিকে চেয়েছিল একদৃষ্টে।

সুশান্ত বললে, খাবার খাইয়ে মুখ বন্ধ করবেন তো ! কিন্তু সেটি হচ্ছে না। এই সন্ধ্যাবেলা হাওয়া না খেলে খাবার মুখে রুচবে না আমার। আমি চলি।

সুশান্ত চ'লে গেল। তার গমন পথের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে শান্তা। পুরু চশমার আড়ালে অশোকের চোখ দুটি ঝলসে ওঠে—শান্তার নজরে এল না তা'।

খানিকবাদে রথীনবাবু ঘরে ঢুকলেন। বিনয়বাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, এস হে রথীন—এত দিন ছিলে কোথায়।

রথীনবাবু শান্তা ও অশোকের মুখের ওপর একবার নজর বুলিয়ে বললেন, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ—নানান্ ধান্ধায় ঘুরছিলুম—ড্রইং রুমের কোণে বসে ফিলজফি চর্চার তো সময় নেই।

এক কালে বিনয়বাবুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন রথীন দে—এখন লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর তিরিশ—প্রৌঢ়ত্বের সীমা প্রায় ছুঁয়েছেন। মনের মত পাত্রী পাননি বলে বিয়ে করেন নি এখনো। শান্তা অবশ্য বলে, অমন আলকাতরার ফুটবলটিকে বিয়ে করতে কোন বাঙালী মেয়ের প্রবৃত্তি হবে না। ওঁর জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে হ'লে নাইগেরিয়ায় যাওয়া উচিত।

বিনয়বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যতোই থাক, শান্তা ওঁকে দু' চক্ষেও দেখতে পারে না। অথচ রথীনবাবু বলেন যে শান্তাকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন।

শান্তা ও অশোকের পাশাপাশি ব'সে ফিলজফি চর্চা রথীনবাবুর মনঃপূত হয় না। একদিন তিনি বলেছিলেন, ফিলজফির বদলে ইকনমিক্সে অনার্স নিলে শান্তার উপকার হ'ত।

শান্তা ঝাঁজাল স্বরে ব'লে উঠেছিল, কেন ? আপনি ইকনমিষ্ট ব'লে দুনিয়ার সবাইকে ইকনমিক্স চর্চা করতে হবে তার কী কথা আছে ! আপনার যা পছন্দ—আমার তাতে রুচি না-ও থাকতে পারে।

রুচির চেয়ে বড় কথা হ'ল মনের ডিসিপ্লিন। তা' ছাড়া তোমার মত বয়সে রুচি আদৌ ডেভেলাপ করে না—যাকে রুচি বলছ, সেটা নিতান্তই ফ্যান্সি।

শান্তা রাগ করে চুপ ক'রে ছিল।

রথীনবাবু ঘরে ঢুকতেই শান্তা ব'লে উঠল, চল অশোকদা' আমার পড়ার ঘরে চল। বাবাদের বিজনেস্ টক শুরু হ'বে এবার।

রথীনবাবু হেসে বললেন, বিজনেস্ টক এক-আধটুকু শুনলে ভাল ছাড়া মন্দ হ'বে না। অন্ততঃপক্ষে ফিলজফির একজেজারেশন কিছুটা ব্যালেন্সড হ'তে পারে।

শান্তা রাগ ক'রে বলে, কিসে কী ব্যালেন্সড হয় জানি নে—শুধু এইটুকু জানি যে সায়ে আমার পরীক্ষা।

রথীনবাবু বললেন, বাই দি ওয়ে—গাড়ি বারান্দার নীচে মিষ্টার ফ্রিবলিটিকে দেখলুম ওর টু-সিটারের হুইল ধ'রে বসে আছে উদাসীর মত। ফিলজফি দিয়ে আউট ক'রে দিয়েছ ত ওকে ?

আরক্ত হ'য়ে ওঠে শান্তার মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, চল অশোকদা'।

অশোককে পড়ার ঘরে বসিয়ে শান্তা গাড়ি-বারান্দার নীচে এল। সুশান্তর টু-সিটারটি দাঁড়িয়ে আছে তখনো। চালকের আসনে ব'সে সিগারেট টানছিল সুশান্ত।

শান্তাকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—সোৎসুক কণ্ঠে সে বললে, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম—জানতুম তুমি আসবে। চল, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি।

শান্তা বললে, কিন্তু অশোকদা' পড়ার ঘরে ব'সে আছে।

সুশান্ত অশান্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, তা' থাকুক না। ঘণ্টাখানেক ও অনায়াসে ব'সে থাকতে পারবে।

কিন্তু আর কিছুদিন বাদেই যে আমার পরীক্ষা! কিচ্ছু পড়াশুনা হয়নি।

ও। আচ্ছা, চলি তা' হ'লে।—ব'লে সুশান্ত গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

রাগ করলে সুশান্তদা'।—শান্তা আর্তস্বরে ব'লে ওঠে।

তা' হয়তো করেছি।—গীয়ারটা নামাতে নামাতে সুশান্ত বললে। কিন্তু তোমার তাতে তো কিছু এসে যায় না।

চক্ষের পলকে সুশান্তর টু-সিটার গেট পেরিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তা তার পড়ার ঘরে এল। অশোক বললে, ভাবলুম বুঝি সুশান্তর সঙ্গেই চলে গেলে।

শান্তা চমকে উঠে অশোকের মুখের দিকে তাকাল—তার চশমার পুরু কাচের আড়ালে ঈর্ষার ঝিলিক তার নজর এড়ায় না।

অশোকের সঙ্গে নির্বিঘ্নে পড়াশুনা ক'রে গেল শান্তা তার পর অনেকগুলো দিন। সুশান্ত আর আসে না।

সুশান্তর টু-সিটারের বদলে আজকাল রোজই রথীনবাবুর পুরোনো মডেলের ফোর্ডটি গেট পেরিয়ে আসে—শান্তার প্রতীক্ষাকুল চোখের সামে যেন মূর্তিমান রসভঙ্গ। তারপর অশোক আসে তার স্বাভাবিক শান্ত মন্থর পদক্ষেপে—বারান্দায় শান্তাকে ব'সে থাকতে দেখে সে ভাবে বুঝি তারই জন্য সে প্রতীক্ষা করছে। খুশি হ'য়ে সে বলে, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ তো? আমার আজ একটু দেরি হ'য়ে গেছে।

শান্তা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে যে সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অন্ততঃ পনের মিনিট আগে এসে পৌচেছে অশোক।

অশোক একদিন বললে, সুশান্ত ঠিকই বলেছিল—ফিলজফির চর্চা থেকে এমন সুন্দর সন্ধ্যাগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। চল না শান্তা, বেড়িয়ে আসি।

লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অশোক বললে, সন্ধ্যাগুলো যে কত সুন্দর এত দিনে জানলুম শান্তা!

শান্তা পুলকিত বোধ করে। অশোকের পুঁথি-চাপা সব দার্শনিক তত্ত্বের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসে যেন—সন্ধ্যার রাঙা মেঘে মেঘে তার মনের সমস্ত মাধুর্যের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ সে যেন প্রত্যক্ষ করে।

অশোক নিবিড় কণ্ঠে বললে, এতদিন শুধু তোমার ওপর মাষ্টারি করেছি শান্তা। এতদিন তোমাকে দেখি নি—আজ দেখছি। আজ দেখছি, তুমি পাশে আছ ব'লেই সন্ধ্যাটি এমন সুন্দর। সত্যিই তোমার তুলনা নেই।

আবীর রাঙা হ'য়ে ওঠে শান্তার মুখ। তার দেহ-মনের অণু-পরমাণুতে অন্তহীন আনন্দের স্রোত বইতে থাকে।

অশোকের সাহচর্যে যে এত সুধা আছে শান্তা জানত না। এতদিন ধ'রে ওকে জানে—অথচ এতদিনে যেন চিনল।

সুশান্ত নিখোঁজ। কিন্তু তার জন্য উৎকণ্ঠিত বা চিন্তিত হ'বার অবসর কই শান্তার?

মা বলেছিলেন, হ্যাঁরে, সুশান্ত আজকাল আসে না কেন?

সে আমি কী ক'রে জানব!—শান্তা ঝাঁজালো স্বরে ব'লে ওঠে।

মা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন, ওর শরীর-টরীর খারাপ হ'ল কিনা কে জানে।

ওর আবার শরীর খারাপ হয় না কি!—শান্তা বলে। তার মনের মধ্যে সুশান্তর প্রাণোচ্ছল চেহারাটি ফুটে ওঠে—অমন স্বাস্থ্যদীপ্ত শরীর খারাপ হওয়ার কথা ভাবাও বুঝি হাস্যকর।

রথীনবাবু একদিন বিনয়বাবুকে বললেন, আপনার মেয়ে বড়ো হ'য়েছে বিনয়বাবু।

তাই নাকি!—বিনয়বাবু সকৌতুকে বলেন। তাতো জানতাম না। আমার তো ধারণা ও সেই ছোট্টটিই আছে।

ঠাট্টা নয়।—গম্ভীরমুখে রথীনবাবু বললেন। অশোকের তো দেখছি আজকাল পড়ানোয় মন নেই—শান্তার পড়াশুনার চেয়ে শান্তার ওপরই ও বেশি মনোযোগী। ভেবেছিলুম সুশান্তর মত ও ফ্রিবলাস নয়—কিন্তু—

কিন্তু অশোক বা সুশান্ত—ওরা তো আমার ঘরের ছেলের মত। তা' ছাড়া ছেলে হিসেবে দু'জনেই রত্ন বিশেষ।

বিনয়বাবুর কথাগুলো রথীনবাবুর মনঃপূত হ'ল না—তাঁর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ওপর গাঢ়তর কালিমার সঞ্চার হ'ল। বিনয়বাবু তা' লক্ষ্য করলেন। একটু হেসে তিনি বললেন, অবশ্য তোমার মত কেউই ওরা তেমন সলিড্ নয়।

শান্তা তার পড়ার ঘরে ব'সে একদিন আবিষ্কার করল যে রিয়েলিজ্‌মের তত্ত্বগুলো আগের মতই রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে। পড়াশুনা এগোয় নি বিশেষ। অশোক আজকাল বলে, এতদিনে রিয়েলিটিকে আবিষ্কার করেছি শান্তা—রিয়েলিজ্‌মের থিয়োরীগুলো আপাততঃ তুলে রাখো।

বই ও ক্লাস-নোটগুলো নিয়ে বিরসমুখে ব'সে থাকে শান্তা—অশোকের আবিষ্কৃত রিয়েলিটির যা কিছু রঙ ও রস সব কিছুর ওপর অদূরবর্তী পরীক্ষার বিভীষিকার প্রলেপ এসে লাগে। এখন থেকে আর লেকের ধারে বেড়ানো নয়—সত্যি-সত্যিই পড়াশুনায় মন দেবে সে।

এমন সময় সুশান্তর আবির্ভাব—অপ্রত্যাশিত ও চমক-লাগানো।

শান্তার সামনে একটি টুল টেনে ব'সে প'ড়ে সুশান্ত বললে, এতদিনে নিশ্চয়ই তোমার রিয়েলিজমের থিয়োরী-গুলো বুঝে ফেলেছ—পর পর অনেকগুলো সন্ধ্যা আমি তোমার ফিলজফি ও বেরসিক ফিলজফারকে উৎসর্গ করেছি—কিন্তু আর নয়।

সুশান্তর রোদপোড়া মুখের দিকে চেয়ে শান্তা বললে, এতদিন ছিলে কোথায়? খুব ঘুরে বেড়ান হচ্ছিল বুঝি?

সুশান্ত সোচ্ছ্বাসে বললে, প্রায় হাজার মাইল বেড়িয়ে এলাম। হাজারিবাগ থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে যশপুর-নগর ও ধরমজয়গড়। সমস্ত ছোট নাগপুরের বনে পাহাড়ে Traverse দিলাম। ভারি থ্রিলিং জার্নি! তুমি সঙ্গে থাকতে শান্তা!

শান্তা সকৌতুকে বললে, তা' হ'লে কী হ'ত! তোমার গাড়ির এ্যাক্সিলারেশনের বহর থেকে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত হ'তে পারতুম—তাই না!

তা' কেন? রীতিমত থ্রিল্‌ড বোধ করতে।

শান্তা বললে, ও সব থ্রিলে আমার কাজ নেই। আপাততঃ আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্কে যথেষ্ট থ্রিল্‌ড হ'য়ে আছি।

পরীক্ষা! বাই দি ওয়ে—তোমার পরীক্ষা কবে বলো তো?

কেন!

আমার নেক্‌স্ট টুর প্রোগ্রাম সেই অনুযায়ী ফাইনা-লাইজ করব। জানো শান্তা, প্যাকার্ডের একটি লেটেস্ট মডেল কিনেছি। এবারে আর টু-সিটার নয়—প্যাকার্ডে চেপে পাড়ি দেব। ইচ্ছে আছে এবারে একেবারে কাশ্মীর থেকে কেপ-কমোরিন—অল-ইণ্ডিয়া টুর দেব।

শান্তা মনে মনে রোমাঞ্চিত বোধ করে। উৎসুক-কণ্ঠে বলে, চমৎকার আইডিয়া!

উৎসাহিত হ'য়ে সুশান্ত বললে, তুমি তা' হ'লে এ্যাপ্রুভ্ করছ?

আমার এ্যাপ্রুভ্যালে কী এসে যায়!—শান্তা গম্ভীরমুখে বললে।

স্থির দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে চেয়ে সুশান্ত বললে যথেষ্ট এসে যায়। তুমি নামঞ্জুর ক'রলে প্রোগ্রাম বাতিল হ'য়ে যাবে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

শান্তা চমকে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে সুশান্তর মুখের পানে চেয়ে সে বলে, আমি! তোমার সঙ্গে।

হ্যাঁ। এবারে একা একা বেড়িয়ে বুঝেছি যে আমার আনন্দের ভাগ তোমাকে না দিলে আমার তৃপ্তি হয় না।

এমন সময় অশোক ঘরে ঢুকল। শান্তা তার দিকে চেয়ে হেসে বললে, আজ কিন্তু রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো বুঝিয়ে দিতেই হ'বে অশোকদা'।

সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তা' হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হয়। রিয়েলিজ্‌মের গোলক ধাঁধায় অশোক তোমাকে নিয়ে ঘুরপাক খাবে—তোমাদের এ কষ্ট আমি সইতে পারবো না।

সুশান্তর মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অশোক তার পিঠ চাপড়ে সুশান্ত বললে, টেক্ এভরিথিং ইজি, ফিলজফার। মুখ অমন হাঁড়িপানা ক'রে থেকো না। বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অশোক গম্ভীর মুখে একটি চেয়ার টেনে বসে।

খানিকক্ষণ অস্বস্তিজনক নীরবতার পর শান্তা বললে, অশোকদা', রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলো—

অশোক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, চোখের সামনে

নিদারুণ রিয়েলিটি দেখছি—রিয়েলিজমের থিয়োরীগুলোর চেয়েও গোলমেলে। শোন শান্তা, আজ খোলাখুলিভাবে একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। ঐ সুশান্তকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—ও যা চেয়েছে আদায় না ক'রে ছাড়েনি—

শান্তা বাধা দিয়ে বললে, ও সব কথা থাক অশোকদা।

অশোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, রিয়েলিজম্ বুঝতে চাও, অথচ রিয়েলিটি ফেস করতে পারো না। কিন্তু শান্তা, এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছ, সুশান্ত এইমাত্র যে 'টেকিং ইজি'র কথা ব'লে গেল—সে আমার প্রকৃতিতে নেই। সব কিছু আমি গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে চাই। আমার আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই কথনো হাল্কা ফ্রিবলিটি দেখতে পাও নি—

শান্তা অস্থির হ'য়ে বলে, দোহাই অশোকদা,' ও সব কথা থাক। অত বেশি তলিয়ে না দেখাই ভাল।

অশোক চুপ ক'রে ব'সে থাকে গম্ভীর মুখে। খানিকক্ষণ বাদে শান্তা ভয়ে ভয়ে বললে, পড়াশুনা না হয় পরে হ'বে—এখন একটু বেড়িয়েই আসা যাক বরং।

অশোক ম্লান হেসে বললে, না, আর বেড়ানো নয়। তোমার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হ'য়েছে। আর নয়। এতদিন রিয়েলিজমের বাইরে আনরিয়েলকে খুঁজছিলুম—কিন্তু আর এ ভুল হ'বে না আমার।

শান্তা বেদনার্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, ও কী বলছ, অশোকদা!

তার আর্তস্বরে কর্ণপাত না ক'রে অশোক ব'লে চলে, এসো, প্রথমে "ডাইরেক্ট রিয়েলিজম্" দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

অনেক রাত পর্যন্ত চলল অশোকের পড়ানো।

রাত প্রায় দশটার সময় অশোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রিয়েলিজমে আর কোন ধাঁধা নেই—কী বলো? নিশ্চয়ই আর আনরিয়েলের পেছনে ছোটাছুটি করতে মন চাইবে না। আচ্ছা চলি।

বললে, কাল কখন আসবে, অশোকদা?

কাল নয়—পরশু থেকে মেটিরিয়েলিজম নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাবে। আপাততঃ রিয়েলিজম্ পরিপাক করো।

কিন্তু কাল যে আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে বলেছিলে! শান্তা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠে।

সিনেমা! রিয়েলিজম্ নিয়ে এত আলোচনা করলাম—তার পরও সিনেমার আনরিয়েল ছায়াবাজী দেখতে চাও?

ব'লে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শান্তা স্তম্ভিত হ'য়ে বসে থাকে।

পরদিন সকালবেলা অশোকদের বাড়ির চাকর অশোকের একটি চিঠি নিয়ে এল। অশোক লিখেছে, কাল রাত্রে আমার আচরণে তুমি ব্যথা পেয়েছ—সেজন্য আমি অনুতপ্ত। তুমি ঠিকই বলেছিলে, সব কিছু তলিয়ে দেখতে নেই। সত্যকে সহজভাবে নেওয়াই ভাল। কাল সন্ধ্যাবেলা মেটিরিয়েলিজম্ পড়াবো বলেছিলাম। কিন্তু রিয়েলিজমের এখনো একটু বাকি। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সেটা তোমায় বুঝিয়ে দেব আজ। আমার মনের সহজ নির্মল সত্যটি তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত করব—আশা করি, সহজভাবে তা গ্রহণ করবে তুমি।

অনেকবার চিঠিখানা পড়ল শান্তা।

খানিক বাদে সুশান্তরও একটি চিঠি পেল শান্তা। ছোট্ট চিঠি—তার সঙ্গে ফুলস্কেপ কাগজের পুরো একটি পৃষ্ঠায় ভ্রমণ পরিকল্পনা। সুশান্ত লিখেছে, তোমার পরীক্ষা কবে আরম্ভ হচ্ছে জানা হয়নি। একটা টুর প্রোগ্রামের খসড়া করেছি। আশা করি, ওটা তুমি মঞ্জুর করবে।

ফুলস্কেপ কাগজটিতে কলকাতা থেকে কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে বোম্বাই, তারপর বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ হয়ে কন্যাকুমারিকা—প্রায় সারা ভারত পরিক্রমার পরিকল্পনা। তার পংক্তিতে পংক্তিতে শান্ত, স্তিমিত, নিরুত্তেজ অস্তিত্বের বাইরে অদেখা দূরের হাতছানি যেন প্রত্যক্ষ করল শান্তা—পড়তে পড়তে তার বুকের রক্তস্রোত উদ্দাম হ'য়ে ওঠে।

এমন সময় শান্তার মা ঘরে ঢুকে বললেন, জানিস শান্তা, রথীনবাবু নাকি বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

শান্তা সকৌতুকে বললে, তাই নাকি! কিন্তু কাকে? সৌভাগ্যবতীটি কে?

সে এখনো বোঝা যাচ্ছে না। তোর বাবাও বলতে পারলেন না।

সন্ধ্যাবেলায় অশোকের প্রতীক্ষায় বারান্দায় ব'সে ছিল

শান্তা। সুশান্তর ভ্রমণ-পরিকল্পনা নামঞ্জুর ক'রে এইমাত্র চাকরকে দিয়ে সে জবাব পাঠিয়েছে। সে লিখেছে, আমার পক্ষে তোমার ভ্রমণের সঙ্গী হওয়া সম্ভব নয়। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। আমাকে মাপ কোরো।

আর কোন দ্বিধা নয়—মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে সংযত করেছে শান্তা—সুশান্তর অশান্ত পথচলার সঙ্গিনী হ'বে না সে—জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত।

কিন্তু অশোক এত দেরি করছে কেন?

হঠাৎ গেট পেরিয়ে ঝকঝকে এক প্যাকার্ড বাড়ির কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল—মুহূর্তের মধ্যে গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। চালকের আসনে সুশান্ত।

গাড়ি থেকে নেমে এসে সোচ্ছ্বাসে সুশান্ত বললে, আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে তো? চমৎকার এ্যান্টি-সিপেশন তোমার! শান্তা, এই হ'ল আমাদের প্যাকার্ড—প্যাকার্ডের লেটেষ্ট মডেল।

শান্তা বললে, আমার চিঠি পাও নি সুশান্তদা'?

সুশান্ত বললে, চিঠি লিখেছিলে বুঝি! হাউ সুইট আর ইউ! বাড়ি গিয়ে পাবো নিশ্চয়ই। আমাদের টুর-প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই তুমি এ্যাপ্রুভ্ ক'রছ। কিন্তু শুধু টুর-প্রোগ্রাম এ্যাপ্রুভ করলে চলবে না—আমাদের গাড়িটিও তোমার পছন্দ হ'ল কিনা বল।

তোমার গাড়ি তোমার পছন্দ হ'লেই হ'ল—আমার পছন্দে কি এসে যায়!

যথেষ্ট এসে যায়। এ তো তোমারও গাড়ি। কাছে এসে দেখো না শান্তা—দেখতে একটু বড়ো সাইজের—কিন্তু খুবই কম্ফর্টেব্‌ল। ভেতরটা সাউণ্ডপ্রুফ—এয়ার-কণ্ডিশনিং-এরও ব্যবস্থা আছে।

সত্যিই দেখবার মত। যত উপেক্ষার ভাণ করতে সচেষ্ট হোক, শান্তার মুগ্ধ দৃষ্টি গাড়িটির চাকচিক্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। এম্নি সুন্দর গাড়িতে ক'রে সারা ভারত ভ্রমণের কল্পনাতেও মনে রোমাঞ্চ জাগে। মনে মনে সুশান্তর রুচির প্রশংসা না ক'রে পারে না শান্তা।

শান্তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুশান্ত বললে, গাড়িটা দেখে আর কতটা বুঝবে—চল না শান্তা, এতে ক'রে একটু বেড়িয়ে আসি। দেখবে কী রকম স্মুথ রানিং গাড়িটা—চললেও মনে হ'বে যে চলছে না।

না, না!—শান্তা যেন ঝাঁৎকে ওঠে।

সুশান্ত সানুনয়ে বললে, বেশিক্ষণ নয়—শুধু আধ ঘণ্টার জন্য! গাড়িটা আমার নিজের যত পছন্দ হোক না কেন—তুমি পছন্দ না করা পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি নে। এ গাড়িটা তোমার জন্যই কিনেছি শান্তা। আমার একার সখ মেটাবার জন্য টু-সিটারই যথেষ্ট—তোমার-আমার পথচলার কথা ভেবেই আবার প্যাকার্ডের বিলাসিতা।

শান্তার আপত্তির শক্ত দেয়াল যেন ক্রমশঃ ধ্বসে পড়তে থাকে। সুশান্তর আমন্ত্রণ তার আত্মশাসনের প্রয়াসকে দুর্বল ক'রে দেয়।

ক্ষীণ কণ্ঠে শান্তা বলে, কিন্তু অশোকদা'—

পড়াতে আসবে বুঝি? তা, আসুক না। আমি তো বেশি সময় নেব না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমরা।

ব'লে সুশান্ত তার হাত ধ'রে একরকম জোর ক'রে তাকে গাড়িতে টেনে তুলল।

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই রথীনবাবু এলেন। সুশান্ত ও শান্তার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, মিস্টার ক্রিবলাসের ক্রিবলিটি আবার শুরু হ'ল!

সুশান্ত বললে, সময় নেই রথীনবাবু। আমার ক্রিবলিটি সম্বন্ধে পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

রথীনবাবুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামে প্যাকার্ডটি চকোলেট রঙের তরঙ্গ তুলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

অশোক তখন বিনয়বাবুর বাড়ির উদ্দেশে হাঁটছিল লেক ভিউ রোড দিয়ে। দেরি হ'য়ে গেছে তার। শান্তা হয়তো তার প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠেছে! ওকে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই ইডেন গার্ডেনে পৌছতে হ'বে। আকাশের দিকে তাকাল অশোক। সাদা মেঘ টুকরো টুকরো হ'য়ে আকাশের আশ্চর্য নীলিমার বুকে হাল্কাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজেকে ঐ মেঘের মতই হাল্কা মনে হ'ল তার। মনের মধ্যে অনির্বচনীয় সুরের তরঙ্গ—চোখের সামে লেক ভিউ রোডের কালো পিচের রেখায় তার মনের রঙিণ স্বর্ণলেখা।

হঠাৎ তার সমস্ত স্বপ্নঘোর চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সুশান্তর প্যাকার্ডটির আবির্ভাব। সুশান্তর পাশে ঘনিষ্ঠভাবে

শান্তাকে ব'সে থাকতে দেখল অশোক। পাথরের মত নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার চোখের সামে তার সমস্ত রঙিণ স্বপ্ন ঐ গাড়ির চকোলেট রঙের স্রোতে ভেসে গেল—শুধু লেক-ভিউ রোডের পিচের কালিমা তার সমস্ত দৃষ্টিটাকে অধিকার ক'রে রইল।

শান্তা বা সুশান্ত কেউই দেখতে পায় নি অশোককে।

গাড়ি ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ছুটে চলে—মন্থর-গতিতে প্রায় নিঃশব্দে। স্পীড প্রায় ষাটে তোলে সুশান্ত—চলার রোমাঞ্চ শান্তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

সুশান্ত বললে, আমার আরও একটু কাছে এসে বোসো শান্তা—অত তফাতে বসলে তুমি যে আমার পাশে আছো তা' যেন পুরোপুরি অনুভব করতে পারি নে।

বিনা দ্বিধায় সুশান্তর গা ঘেঁষে বসল শান্তা। স্টিয়ারিং হুইল থেকে বাঁ হাতটি নামিয়ে এনে শান্তার কোমর জড়িয়ে ধরে সুশান্ত।

শান্তা!—আবেশ জড়ানো স্বরে সুশান্ত ডাকল।

শান্তা অস্ফুট স্বরে জবাব দেয়, বলো!

অনেক দিন আমার ঐ টু-সিটারে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। কিন্তু আজ থেকে এই প্যাকার্ডে আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হ'ল। বলো আমার পথচলায় চিরদিন তুমি আমায় সঙ্গ দেবে?

শান্তার সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপে—কোন জবাব দেয় না সে।

অকস্মাৎ শান্তাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধ'রে সুশান্ত বললে, চুপ করে কেন? জবাব দাও।

ছেড়ে দাও আমাকে!—শান্তা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শান্তার মুখের দিকে তাকায় সুশান্ত। তাকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে বাঁ হাতটি আবার স্টিয়ারিং হুইলে রাখল সে।

বাড়ি ফিরে চলো এক্ষুণি!—শান্তা চেঁচিয়ে বলে।

হঠাৎ কী হ'ল তোমার শান্তা?—সুশান্ত বেদনাবিদ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

শান্তার দু'চোখ ছাপিয়ে তখন অশ্রুর বন্যা নেমেছে। কান্নায় কাঁপানো অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে সে বলে, কিছু হয় নি। শুধু আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো—তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল সুশান্ত। প্যাকার্ড মন্থর-গতিতে চলে—স্পীডো মিটারের কাঁটা ৪০ থেকে ৫০-এ বিচরণ করছে—অথচ গাড়িতে কোন শব্দ নেই। সুশান্তর মনে হ'ল একটু শব্দ হ'লেই যেন ভাল ছিল—পাশে শান্তার উচ্ছ্বসিত কান্নার কিছুটা অন্তত চাপা পড়ত।

সপ্তাহ খানেক বাদে একদিন ভোরবেলায় স্টেট্‌স্‌-ম্যানের পাতায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের পাশে বিনয়বাবুর মেয়ে শান্তার সঙ্গে রথীন দে'র বিয়ের এন্‌গেজমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি সুশান্তর চোখে পড়ল। ১৫ দিন বাদে ৩০শে এপ্রিল বিনয়বাবুর লেক ভিউ রোডের বাড়িতে ওদের বিয়ে হ'বে।

সেইদিনই প্যাকার্ডটি ডিলারদের কাছে ফেরৎ দিয়ে এল সুশান্ত।

স্পন্দন

সুরথ বসু

কী গভীর আশ্বাসে পাষাণের বুক চিরে তোমার উত্থান!
কচি শিকড়ে তোমার কী অমিত তেজ!
কিসের সন্ধানী-স্রোত শিরায় শিরায়! বিস্ময় মানি—
মাটীর তিমির-গর্ভে তোমার দুরন্ত পদক্ষেপ,
শিলীভূত স্তরে স্তরে ঘুম-ভাঙা চেতনা-সঙ্গীত!
নিদাঘ-সূর্যের সীমাহীন দীপ্ত সমারোহ ইসারা জানায়,
বর্ষার সজল মেঘে প্রাণে সাড়া জাগে।
তাই তুমি জেগে ওঠ সোনালী সকালে
অসীমের আহ্বানে বিপুলের সম্ভাবনা নিয়ে।
সান্তসীমা হ'তে কান পেতে শোন তুমি
অনন্তের উদার সঙ্গীত;
ঊর্দ্ধশিরে শতবাহু মেলে তাই কর সূর্যপ্রণাম।
আমি দিন গণি শবরী-প্রতীক্ষায়।
সে শুভ্র-তেজ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি এক কণা
চলিষ্ণু-জীবন মাঝে শ্বেত-পদ্ম বিকশিত ক'রে,
জীবনের পাণ্ডুরতা মুছে দিক নব-চেতনায়।

রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু

শ্রীমঞ্জুলা মিত্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুর স্থান একটি উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে নানাভাবে নানারূপে দেখেছেন, তাঁরই চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অমৃত। মৃত্যু কি তা আমরা জানি না। বিভিন্ন কবি, বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে মৃত্যুর স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবু সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, মৃত্যু বলতে আমরা একটা বিরাট শূন্যতা, সুগভীর নিস্তব্ধতাকেই বুঝি। চঞ্চল যেখানে চাঞ্চল্য হারিয়েছে, আলোক যেখানে দ্যুতি হারিয়েছে, জীবন যেখানে স্পন্দন হারিয়েছে—সেই বিরাট শূন্য জগৎ—তাকেই আমরা মৃত্যু বলে জানি।

রবীন্দ্রমানসে মৃত্যু ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর নিকটে আবির্ভূত হয়েছে। বাল্যকালেই তিনি মৃত্যুর মধ্যে অনাদিকালের শান্তি অনুভব করেছিলেন। বুঝেছিলেন, মৃত্যু শুধু মৃত্যু নয়, সে অমৃতময় শান্তির কেন্দ্র। তাই তিনি বলেছিলেন,

"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

প্রিয়ার কাছে দয়িতের আগমন যেমন সুমধুর, তেমনি মানবজীবনেও মৃত্যু বড় সুন্দর চিরবাঞ্ছিত। এ মৃত্যু শেষ নয়, সমাপ্তি নয়, অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়, এ মৃত্যু "অমৃত করে দান।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্নদিকে তার প্রসারতা ক্ষণে ক্ষণে সে তার মর্তলোকের সীমা হারিয়ে অসীমের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। তাই জীবনের মধ্যে মৃত্যু এসে মানবজীবনকে সেই "আনন্দ লোকের" দ্বারে উত্তীর্ণ করে দেয়।

মৃত্যুর পর সে পায় পরম শান্তি, চরম সান্ত্বনা। ইহলোকের সমস্ত দুঃখ-যাতনা, নিরাশা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তখন—

"অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।"

মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্য কবির চিত্ত হয়ে ওঠে উৎসুক। যে যায়, সে কোন অমৃতময় পথের সন্ধানে যাত্রা করে? কবির চেতনা বলে, গ্রহতারকার মালাবেষ্টিত পথের মধ্যে সে তার পথ খুঁজে ফেরে এবং অবশেষে হয়ত খুঁজে পায় তার সাধনধনকে। তাই কবি মৃত্যুর পর শোক করতে চান না; যা অবধারিত, যা চিরন্তন সত্য, তাই সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করে দিক :—

"যা হবার তাই হোক ঘুচে যাক সর্বশোক
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্যজন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক শেষ সব রাগ, সব দ্বেষ
সকলই বালাই।
বলো শান্তি বলো শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।"

প্রতিদিনের ম্লানতা কুশ্রীতা থেকে যে চিরমঙ্গল লোক অজানা রহস্য-জগৎ বিরাজমান, কবি তারই মধ্যে প্রবেশাধিকার চান। এই 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ' মর্ত্যজীবনকে বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে সহ্য করতে তিনি উৎসুক নন।

"শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" বহন করে' রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালিমাময় জীবন তো অভিপ্রেত নয়। জীবনের এইভাবে খণ্ড খণ্ডরূপে ক্ষয়সাধন তাঁর কাছে অপমান-জনক। তাই তিনি মরণকে বরণ করতে চান, যে মরণ 'মহান্ মৃত্যু।'

রবীন্দ্র কাব্যের সংগে Shellyর রচনার সাদৃশ্য কতকাংশে লক্ষিত হয়। দুজনেরই জীবনবীণার তার উচ্চসুরে বাঁধা। মৃত্যু উভয়ের কাছেই বিভীষিকা নয়, তাঁদের কাছে হেয় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয়। মৃত্যুকে তাঁরা অতি পরিচিতরূপেই জেনেছেন। তাই সাগর পারের কবির আহ্বান,

"Derive my dead thoughts over the Universe
Like withered leaves to quicken a new birth!

* * *

Scatter, as from an unextinguished heath
Ashes and speaks,……

রবীন্দ্রনাথও প্রায় তার প্রতিধ্বনি করলেন :—

"শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
শরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

তাই কবির একান্ত বাসনা,

"যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে

মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।"

জীবন যদি কেবলমাত্র কালিমাময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন অচেতনের রাজত্ব হয় তবে তার থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই যদি শীর্ণজীবনের চিত্ত-বিশ্রাম বলে মনে করি জীবনকে, তখন যেন মৃত্যু ভৈরব মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে সে স্বপ্ন ভেঙে দেয়—এই হোলো কবির একান্ত কাম্য। যখন রুদ্রের বীণা বেজে উঠবে, বৃহত্তর জীবনের জন্য আহ্বান আসবে, তখন কবি সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে সে আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত :—

"যদি কাজে থাকি গৃহমাঝ
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে পরমাদ
থাকি আধ জাগরূক নয়নে।
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ হে মোর মরণ॥"

মহামরণ মহাজীবনেরই বার্তা বহন করে আনে। তাই কবি মৃত্যুকে ভয় করেন নি, অবিশ্বাস করেন নি। তাই যতই আঘাত আসুক, ঝঞ্ঝা উঠুক পথে, তিনি সেই মহান মৃত্যুকেই বরণ করে নেবেন :—

"আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ,
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ হে মোর মরণ।

[ক]বি জানেন, এক বিরাট দোলায় এই মানবজীবনের জন্মমৃত্যু গ্রথিত [এ]ক মহাশৃঙ্খলে। তারই পর্যায়ক্রম দোলনের ফলে এই বিভেদ সৃষ্টি [হ]য়। এর অন্তরালে যে কৌতূহলী বাস করেন তাঁরই ক্ষণকালের লীলার [ফলে] এই দোলার উত্থানপতন—জন্মমরণের সৃষ্টি—মানুষী বুদ্ধি তা ভেদ [ক]রে তার গহনে প্রবেশ করতে পারে না।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কেবা জানে॥

সমস্ত জগৎসংসার এই দোলায় দোদুল্যমান। ঘটতে থাকে জীবনের নব নব পর্যায়, নব নব আবর্তনবিবর্তনের স্রোতে মরণদোলা চলতে থাকে।

এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যা-কিছু আছিল
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে-বা বাঁচিল।

মৃতের প্রতি অহেতুক উৎকণ্ঠা, মৃত্যুর গাম্ভীর্যকে আবিল করে তোলে। মৃত্যু চিরবিচ্ছেদ নয়, নব চেতনার আলোক-উদ্দীপ্ত পথের সন্ধানে যাত্রার জন্য মর্ত্য থেকে এ বিদায়মাত্র—একথা কবি ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন—

"যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে, তখন আসক্ত হয়ে শোকাকুল হয়ে তাকে বদ্ধ করবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়—আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে, যখনই দেখেছি কোন আশাই নেই, তখন আমি প্রাণপণ সমস্ত শক্তি একত্র করে মনে করেছি, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম যাও তোমার নির্দিষ্ট পথে।……নিজের সন্তানকেও আঁকড়ে ধরতে চাইনি। যেতে যখন হবেই তখন আমার আসক্তি আমার বেদনা তাকে মর্ত্যের সংগে যেন বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন-ছিন্ন করবার জন্যে যেন কষ্ট পেতে না হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল সেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করাই উচিৎ।"

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বহু শোক সহ্য করিতে হয়েছে, বহু মৃত্যু দেখেছেন চোখের সামনে। তাই ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধি ও দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের সংগে সংগে তিনি মৃত্যুকে বিভিন্ন রূপে দেখেছেন। প্রথম জীবনে তিনি মৃত্যুকে চিরপরিচিত দোসররূপে মাধুর্যময় বলে জেনেছেন, পরবর্তীজীবন তার মধ্যে তিনি নবজীবনের সন্ধান পেয়েছেন। এই নবজীবনের ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে গেলে যে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে—সেই ভীষণ মধুরকে পেতে হলে—এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কিশোর বয়সে লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মরণের সংগে উৎসর্গের "মরণ" এবং 'মরণদোলা' এবং পরবর্তী জীবনের রচনাগুলির তুলনা করলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

ধীরে ধীরে কবি স্বয়ং যতই মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছেন ততই সম্যক্‌রূপে তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম যৌবনে যে মরণকে শ্যাম সমান বলে মনে হয়েছিল, সে মনোভাব পরে দূরীভূত হয়েছে। প্রথমের যৌবনের ভাববিহ্বলতা ও উচ্ছ্বাস, আর পরবর্তী রচনায় নেই, আছে ঋষির পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ণপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের

রচনায় তাঁর অন্তরের উপলব্ধির অভিব্যক্তি, তাই তার রূপ বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর ভাবনার মূলসুরটি প্রায় পূর্ববৎই ছিল। অর্থাৎ তাঁর রচনায় তাঁর প্রথমজীবনের আদর্শ ও তার রূপ পরবর্তীযুগে পরিণত রূপ ও আকার পেয়েছে মাত্র,—তাঁর জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়নি। উৎসর্গে মহান্ মৃত্যুর প্রতি যে আকর্ষণ, কালিমাময় জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে ব্যাকুলতা, তা পরবর্তী প্রায় সব রচনাতেই বিদ্যমান রয়েছে।

ইহলোক থেকে বিদায় নেবার কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯৩৭ সালে কবি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগজীর্ণ কবি শয্যাশায়ী অবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে কবিতারচনা করে যেতেন। এই সময়ে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তবু মৃত্যু তাঁর মনে মৃত্যু বিভীষিকা বা ভীতি উৎপাদন করতে পারেনি। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের যা কিছু ম্লানতা কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়ে আলোক-লোকের দ্বারে উত্তীর্ণ করে দিক্—এই বাসনা তখনও তাঁর মনে জাগরূক। তাই তিনি পরম প্রশান্তির সংগেই বলেছেন—

"ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি মরণের প্রসাদ বহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত বর্ধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক্ আলোকের দানে ; এ মর্ত্যের প্রান্তপথ
দীপ্ত করে দিক্, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্ব সমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচল চূড়ে
অরুণ কিরণ তলে একদিন অমর্ত্যপ্রভাবে।"

মৃত্যুর আগমন ও তার অন্তরালে যে জগৎ অপেক্ষমান তারই ছবি দেখলেন তিনি মানসনেত্রে,

"বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে, জীবনের দিগন্ত আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্মধূলি স্তরে স্তরে দিলো ধৌত করি
ব্যথার দ্রাবকরসে দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোনক্ষণে নটলীলা বিধাতার, নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্যহতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল একপ্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে
আলোকের থরথর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুতবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে,
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায় ;—সেইমত জাগরণ
শুভ্র আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তঃশীলা
জ্যোতিধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিন্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রাম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের'
স্থূলকারা প্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হোল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে।"

* * * *

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম

সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
আলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

মৃত্যুকে তিনি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবনও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। তাই 'প্রান্তিকের' মধ্যেও পাই জীবনের প্রতি তাঁর সম্মান ও ভালবাসা :—

"ধন্য এ জীবন মোর, প্রভাতে প্রথমজাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে' আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। নানা অঙ্কে প্রাণের ফোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের নানাবেদনায়।
এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাত্রির শিশিরজলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহ-স্পর্শনে—তবু আজো
আছে তারা সূক্ষ্ম রেখা স্বপনের চিত্রশালাজুড়ে
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্য গন্ধে বিজড়িত।

* * * *

পেয়েছি যা অযাচিত

প্রেমের অমৃতরস, পাইনি যা বহুসাধনায়
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। কল্পনায়
বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে
বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে ; আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টি রহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্ঘাটিত
আমার জীবনরচনায় তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণ ক্ষণে
অপরূপ অনির্বচনীয়। আজি বিদায়ের পালা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
সব আমি হে জীবন, অস্তিত্বের সারথী আমার
বহু রণক্ষেত্রে তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর জীবনযাত্রায়।"

জীবনের যে আনন্দ, যে মাধুর্য্য যে বিস্ময় বিজড়িত হয়ে রয়েছে ওতপ্রোতরূপে প্রকৃতির সাথে, তাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছেন। এখানে তিনি মরণের পরাজয় মেনে নিয়েছেন। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন—

"রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।"

কবি নিজের অন্তরলোকের রূপসাগরে ডুব দিয়ে কুড়িয়ে পেলেন অরূপ-রতন। তারই বলে জানতে পারলেন—এ জগৎ ও মিথ্যা বঞ্চনা নয়।

জীবনের বহু দ্বন্দ্ব বহু কঠিন আঘাত বহু বিড়ম্বনা সহ্য করে তবে তার চরম ফল পাওয়া যায়। তাই কঠিন সত্যকেই কবি গ্রহণ করলেন। এতদিনে কবির চক্ষে প্রতিভাত হলো, জন্মমরণের মূল রহস্য,

"আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

বিচিত্র এক ছলনাময়ীর ছলনার আবরণে এ জগৎ আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে দুজ্ঞেয় রহস্যের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে মহাসত্য, জীবনের অমৃত। চক্ষুমান যে, সেই রহস্যের সমাধান খুঁজে পায়। এখন,

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।

কবির নিকট মৃত্যু বিরাট লীলাময় রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে। ঋষির দৃষ্টিতে প্রতিভাত সত্য, বহু দ্বন্দ্ব বহু ভ্রান্তির অন্তরালে যে মহাসত্য লুকিয়ে ছিল সাধকের জন্য, তা উপচিত হলো তাঁর অঞ্জলিতে। যে বিরাট পুরুষকারের বলে তিনি সেই অনন্ত অসীম রহস্যদ্বারে উপনীত হয়ে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন সেই পুরুষকারকে সেই শক্তিকে প্রণাম জানাই।

রোম ও রোমাঞ্চ

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (লণ্ডন)

১৯৫৪ সালের বসন্ত কাল। আল্পসের কোল বেয়ে ইতালীর মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চ'লেছে আমাদের গাড়ী। চারিদিকে রূপ-রস-গন্ধে-ভরা প্রকৃতির নৈবেদ্য। কত জন, কত জনপদ পড়ে রইল পেছনে, আর প'ড়ে রইল কত স্মৃতি-সৌধ, কত জীবনের কলরব। ওপরে হাল্কা মেঘের খেলা—কখন আল্পসের ছায়া মিলিয়ে গেছে। আকাশে বিচিত্র বর্ণের আল্পনা মুছে দিয়ে দূর দিগন্তে সূর্য্য জাগল। রোমে পৌঁছতে তখনও আধঘণ্টার মত বাকী। জানার শেষ নেই—চলার অন্ত নেই। রোমের সাথে পরিচয়ের আশায় মন দুলছে। রোম! প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি! এদিকে কখন গাড়ী ষ্টেশনে এসে ভিড়েছে। বিরাট আধুনিক ষ্টেশন—অনেকটা মেট্রোপ্যাটার্ণের। লগেজ রুমে মালপত্র রেখে বেরিয়ে প'ড়লাম রোম দেখতে। সামনেই বাস টার্মিনাস। রোমের কেন্দ্রস্থল। চারিদিকে অফিস দপ্তর, হোটেল ও রেস্তোঁরা।

প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে ট্রাম ছুটে চলেছে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল পথের বাঁকে একটি ফোয়ারার দিকে। প্রাচীন রোমের শিল্পভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। একটি সুন্দরী রমণীর ত্রস্ত বসনের অঞ্চল লুটিয়ে প'ড়েছে—আর একটি সিংহের চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

কখন প্রাচীন নগরীর পথে এসে পড়েছি। ট্রামের যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি ফিরে আসতেই দেখি আমারি সিটের সামনে ব'সে কয়েকজন ভদ্র-মহিলা আমাকে লক্ষ্য ক'রছেন ও মিটি মিটি হাসছেন। সংকোচ কাটিয়ে চেয়ে দেখলাম সুন্দরীদের?

দীর্ঘ আয়ত চোখ, সুঠু বলিষ্ঠ দেহ। শ্রীচরণের দিকে চোখ প'ড়তেই কৌতূহল জাগল তাদের চরণের শ্রী দেখে। জানু থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে অতি অল্প। যেন এক একটি হস্তি-শুঁড়ের মত। পরে জানলাম এটি এদের দেহচর্চ্চার বিষয়। হঠাৎ আমাকে একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে প্রশ্ন করেন—আপনি কি ভারতীয়?

টেগোরের দেশের লোক?

প্রশ্নের মধ্যে ফুটে উঠল আমাকে জানবার সহজ স্বতস্ফূর্ত্ত একটি আগ্রহ। তাই কখন এদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে জানিয়ে ফেলেছি যে আমি সেই কবিরই দেশের লোক। এর পর অজস্র প্রশ্ন আমাকে ঘিরে। কবিকে দেখেছি কিনা, শান্তিনিকেতন কেমন, ভারতের মধ্য-বিত্ত কি ভাবে জীবন কাটায়—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের শেষে আমাদের ট্রাম এসে থামল এক নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে। শুনলাম কাছে টাইবার নদী। এগিয়ে চ'লতে চ'লতে দূরে দৃষ্টি পড়ল নদীটির দিকে। আঁকাবাঁকা নীল রেখার মত স্বচ্ছতোয়া নদী পথ ক'রে নিয়েছে—ধূসর প্রান্তরের মাঝে। এককালে এই নদীটিই নাকি রোমক সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করত। টাইবার শীর্ণ হ'লেও দীর্ঘ নয়—ছুটে চ'লেছে ইতিহাসের কত স্বাক্ষর বুকে বহন ক'রে। দূরে স্থানে স্থানে লতা-গুল্মের ঝাড় জেগে আছে। নীল জলে মাঝে মাঝে দুলে ওঠে—রোমের ঘন নীল আকাশে উড়ন্ত নাইটেঙ্গেল। বসন্তের প্রথম বেলা। সূর্য্য অভিনন্দন জানাচ্ছে ধূলার ধরণীকে। চারিদিকে নাম-না-জানা ফুলের মেলা। কখন টাইবারের ধারে এসে প'ড়েছি।

ভাবছিলাম রোমের কথা—আর ইতিহাসের কথা। দূর থেকে রোমান গির্জার উদাস ঘণ্টা ভেসে আসছিল। মনে হ'ল টাইবারের পুণ্য জলে গা ভাসিয়ে দিই। হঠাৎ অদূরেই কার চলার শব্দ। দেখি এক দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। সঙ্গে একটি বিরাট কুকুর। একদিকে ধড়া চুড়া তীরে রেখে নেমে প'ড়লাম। অসম্ভব স্রোতের টান। দু একটা পাল-তোলা নৌকা তখন তীর বেগে ছুটে চ'লেছে। টাইবারের পবিত্র নীল জলে ছায়া প'ড়েছে আমার। আর ছায়া প'ড়েছে আমার মনের মুকুরে। কত চেনা মুখ, কত মিনতি-ভরা আঁখি, আর কত অস্পষ্ট গৃহকোণ।

হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সম্বিৎ ফিরে এল। সেই বিরাটকায় কুকুরটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ দিয়ে তার হিংসার আগুন ঠিকরে প'ড়ছে। কিন্তু আমার মুখে আকুতি—হিংস্র পশু তা বোঝেনি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চ'লল। শেষে যখন ক্লান্তি নেমেছে তখন দেখি কুকুরটি এগিয়ে চ'লেছে তীরের দিকে—বুঝি বা প্রভুর নির্দেশ। ধীরে ধীরে কম্পমান পা দুটি টেনে যখন তীরে উঠলাম তখন পেছনে তাকিয়ে দেখি টাইবারের নীল জল বেশ ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। কিন্তু তখনও আমার বিহ্বলতা কাটেনি। স্বপ্নপুরী রোম সম্পর্কে মনের কোণে যেন এক কালো ছায়া প'ড়ল—আর সন্দেহ জাগল রোমের অধিবাসীদের সততা সম্পর্কে। হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়ল—পাইন গাছে ঢাকা আঁকা বাঁকা পথটির দিকে। পথের প্রান্তে দেখা গেল সেই অপরিচিত লোকটিকে। তার কাঁধে আমার সেই ওভার কোটটি উড়ছে। আর তার পেছনে ছায়ার মত চলেছে কালো কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে।

ঝরা পাতার বুকে মর্ম্মর-গীতি মধ্যাহ্নের সূচনা ক'রল। মধ্যদিনের গান গেয়ে চ'লেছে নাম-না-জানা পাখী। মন চ'লে গেছে কোন এক কল্পরাজ্যে।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রল একটি নারীকণ্ঠের সম্বোধন। চেয়ে দেখি—আমারই দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইতালিনা। স্মৃতি-মন্থনের পর সে দিনের কথা মনে পড়ল, যেদিন ইতালিনা আমাকে নিভৃতে তার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা জানিয়েছিল। কবে কেমন ক'রে সে তার স্বামীকে বিদায় দিয়েছিল, কেন সে লণ্ডনের রাসেল স্কয়ারে রেস্তোঁরা খুলে বসেছিল।

আমাকে পেয়ে ইতালিনা তার মনের ভাব উজাড় ক'রে দিতে চায়। কতদিনের প্রতীক্ষার পর ইতালিনার জীবননাট্যের যবনিকা উঠেছে।—তার স্বামী আবার ফিরে এসেছে যুদ্ধের অবসানে। বিরহ-রাত্রির প্রতীক্ষা সফল হ'য়েছে কিনা ইতালিনাই জানে। তবে আজও যেন তার মনের গভীরে কোথাও বেদনা লুকিয়ে আছে।

প্রশ্নভরা চোখে তাকাতাম ইতালিনার দিকে।

ইতালিনার অশ্রুসজল দৃষ্টি আমাকে বিস্মিত ক'রল—সে বলল "বহু আশা ক'রে লণ্ডন থেকে রোমে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু সে থাক......"আমাকে সে অনুরোধ ক'রে বসল তার বাড়ীতে যাবার জন্যে। তার বাড়ী নাকি প্রাচীন রোমের কেন্দ্রস্থলে। তাই তাকেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম প্রাচীন রোমের আকর্ষণে। কিন্তু আমার মনিব্যাগ ও পাসপোর্ট? ওভারকোটের সাথে তাদেরও হস্তান্তর ঘটেছে। খুলে ব'লতে বাধ্য হ'লাম ইতালিনাকে সব বৃত্তান্ত। ব'ললাম—পাসপোর্টের জন্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসেই প্রথমে যেতে হবে। ইতালিনা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ল্ল। বেশ খানিকটা উঁচু মালভূমির মত জায়গা পার হ'য়ে সহরে যেতে হয়। স্থানটি বনাকীর্ণ। মাঝে একটি গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ। হঠাৎ পত্রমর্ম্মর বনানীকে মুখর ক'রে তুলল। দেখলাম ঝড়ে ইতালিনার এলো চুল উড়ছে। গীর্জ্জাটিতে আশ্রয় নিলাম। গীর্জ্জাটির ইঁটের পাঁজরে নাকি ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস। রোমের নূতন আন্দোলনের ঢেউ নাকি এই বুড়ো গীর্জ্জা থেকেই ছড়িয়ে প'ড়েছিল।

ঝড় থামল—এগিয়ে চ'লেছি দূতাবাসের দিকে। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় এটির বৈশিষ্ট্য। রোমের বাড়ী ঘরের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই বাড়ীটিতে যেন একটি ভারতীয় ছাপ। নির্জ্জন পরিবেশের মধ্যে এই দূতাবাসটি যেন শান্তির-শিবির। প্রবেশ ক'রতেই মন দ্বিধা সংকোচে ভ'রে গেল। এখানে আছে একটি অলস দিনযাপনের সুর। কাকেই বা বলি আমার অসহায় অবস্থার কথা—সবাই খোস-গল্পে ব্যস্ত। মনে হ'ল বুঝি কাজের কথা ব'লে গল্পের আসর ভেঙে ফেলবার অপরাধ ক'রে ফেলব। আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন আপনার কি চাই? সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেল্লেন, অফিসার ত আজ আসেন নি—কবে আসবেন ব'লতে পারি না। আমার দিকে না চেয়েই দার্শনিকের মেজাজে আবার খোস-গল্পের Link খুঁজতে লাগলেন।

ভাবছিলাম রাষ্ট্রদূতাবাসের অবস্থার কথা। হঠাৎ একজন একটু রসিকতা ক'রেই বোধ হয় বল্লেন—আপনার কি হ'য়েছে বলুন ত'। রোমে এসে এমন লোক কিন্তু খুব কম দেখেছি। আমি সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন ক'রলাম—আপনি কি বাঙালী। ভদ্রলোকে অল্প একটু মাথা নেড়ে ব'ল্লেন হাঁ। এখন আমাকে Continental ব'লতে পারেন, তবে এককালে বাংলাদেশেই ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা....।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ব'ল্লাম, আমার পাসপোর্ট হারানোর কথা। তিনি সব বৃত্তান্ত শুনে ব'ল্লেন—"আপনি একখানা দরখাস্ত দিয়ে যান—কাল আবার খোঁজ নেবেন।" একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ভদ্রলোককে একটি নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম। এদিকে ইতালিনাও বাইরে অপেক্ষা ক'রছিল আমার জন্যে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেও উঠে প'ড়ল। একসাথে পা বাড়ালাম রোমের স্মৃতিচিহ্নিত পথে। এবার ইতালিনার বাড়ীর দিকে। পথের দুধারে কতরকমের দোকান পসার। ট্রাম ছুটে চ'লল প্রাচীন নগরীর দিকে। দূরে দেখা যায় রোমের ভগ্নস্তূপ। চারিদিকে গৈরিক বর্ণের ইঁট—প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ। পথে প'ড়ল বিরাট বৃত্তাকার Coleseum। কতদিনের কত স্মৃতি, কত আনন্দ বেদনার কাহিনী, কত অভিশপ্ত অপরাধীর দীর্ঘশ্বাস! অত্যাবির

শেষ রশ্মিটুকু তখনও সেই জীর্ণ স্তূপের মায়া কাটাতে পারছিল না। বেলাশেষের অস্পষ্ট আলোছায়ার প্রবেশ ক'রলাম সেই পরিত্যক্ত প্রেত-পুরীর অন্তরালে। একতালায় চারিদিকে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, মাঝখানে প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে একটি মসৃণ বেদীতল। চারিদিকে যেন বন্দীশালা। এককালে নাকি সেগুলি হিংস্র পশুদের ও অপরাধীদের জন্ত নির্দিষ্ট থাকত। ইতালিনা বেদীর ওপর দৃষ্টি স্থির নিষ্পলক রেখে কি যেন ভাবছিল। প্রশ্ন ক'রলাম—কি ভাবছ? তার মন হয়ত তখন কোন্ সুদূর অতীতে চ'লে গিয়েছিল। সে বলল—"এই বেদীকে কলুষিত ক'রেছে কত মানুষের তাজা রক্ত।" কিন্তু তাকে ধুয়ে মুছে দিতে পেরেছে কি ইতিহাস?—লক্ষ্য করছিল ইতালিনা।

সেই বেদীর উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত আসামীকে—তারপর...।

তারপর চারিদিক থেকে ছুটে আসত বন্যপশুর দল তাদের হিংস্রলোল শাণিত জিহ্বা নিয়ে। একদিকে হিংস্র পশুর ভয়ঙ্কর গর্জন—আর এক দিকে অপরাধীর করুণ আর্তনাদ আকাশ বাতাসকে মুখর ক'রে তুলত। আর সেই দৃশ্য দেখবার জন্ত অগণিত রোমবাসী ওপরের গ্যালারিতে ভিড় ক'রত। ভীত অসহায় মানুষের নিষ্ঠুর পরিণতি প্রত্যক্ষ ক'রবার মধ্যে সভ্যমানবের কি উন্মাদনা!

সন্ধ্যার তারা দুই একটি উঁকি দিতে সুরু ক'রেছে ভগ্নপ্রাসাদের যবনিকা ভেদ ক'রে। কোথাও বিরাট হর্ম্ম্য যেন আকাশকে হাতছানি দিচ্ছে।

এদিকে কখন ঝিল্লীরবে মুখর হ'য়ে উঠেছে সেই পাষাণপুরী। মনে প'ড়ল কবির কথা—"ভগ্ন প্রাসাদের কোণে

ঝ'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদাইছে নিশার গগন

চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার থম থম ক'রছিল। কোন মতে নীরবে বেরিয়ে এলাম সেই যক্ষপুরী থেকে। তখনও যেন অজস্র প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস কাণে ভেসে আসছিল। বাইরে এসে মনে হ'ল এ যেন এক ভিন্ন জগৎ। অদূরেই কনষ্ট্যানটাইনের তোরণ দুয়ার, আর তার পাশেই রোমের Forum। প্রাচীন নগরীর অজস্র ভগ্নাবশেষের মাঝে পরিচয় পেলাম তার অতুল ঐশ্বর্য্যের। কত ছোট বড় বাড়ী ভূগর্ভে মাথা লুকিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে চোখে পড়ে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের দুই একটি নিদর্শন। কোথাও বা বন্য উদ্ভিদ ভিড় ক'রে আছে—ইট কাঠ পাথরকে ঢেকে ফেলে।

মনে হ'ল কালের কি বিচিত্র গতি? এককালে যেখানে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, যেখানে ছিল আদালত-সভাগৃহ, সেখানে আজ অরণ্য।

রোমের এই অংশটা বেশ নির্জ্জন। কাছেই নাকি ইংরেজ-কবি শেলী-কীটসের সমাধিস্থল। ক'রছিল। পথের নেশা তখনও কাটেনি। তাই বেশ লাগছিল সেই সন্ধ্যার পথ চলা। ইতালিনার বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছিলাম। কিন্তু যে পুণ্যপীঠে দুইটি স্মরণীয় কবির স্মৃতি আঁকা রয়েছে তার ধূলির স্পর্শ যে নিতেই হবে। তাই শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়—সেই কবিতীর্থের যাত্রী হ'লাম। অপরূপ সেই পরিবেশ যেন শান্তিনিকেতন। অস্পষ্ট আলোর মাঝে কবিতীর্থে নতি জানালাম। একটি উজ্জ্বল পাষাণ ফলকের গায়ে লেখা র'য়েছে "To an English Poet." ঝির-ঝিরে মৃদুসমীরণ এসে লাগছিল—আর তাতে ভেসে আসছিল দূরের পাখীর কূজনোচ্ছ্বাস। মনে পড়ে গেল কবির দৃপ্ত কাব্যগীতিকা—Ode to the Nightingale."

কীটসের সমাধির অনতিদূরেই Shellyর পুণ্য স্মৃতি। একটি ছোট পাষাণ স্তূপের মত...তার চারিদিকে ছোট ছোট নাম-না-জানা ফুলের গাছ। ইতালিনা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘুরছিল।—দুজনেই যেন নীরব কবি। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রল ইতালিনা। ব'লল—কাব্য সে বোঝে না—তবে কবিজীবনের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, কারণ তারা বাস্তব দুঃখ সুখের বহু উর্দ্ধে। আমি তার কথার সমর্থন না ক'রেই ব'ললাম—বাস্তবের কান্নাহাসি, চাওয়া পাওয়াকে ঘিরেই ত' কবির কাব্য। আমার কথা শুনে ইতালিনা কি ভাবল জানিনা, তবে সে আমার দিকে একবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আবার নীরব হ'য়ে রইল।

এদিকে সন্ধ্যার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি কখন পার হ'য়ে গেছে। আর দেরী নয়। এবার একবার ইতালিনার বাড়ী যেতেই হবে।

গতি মন্থর হ'য়ে এল। প্রবেশ ক'রতে হবে এক জীর্ণ পুরাতন পরিত্যক্ত অট্টালিকায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় না—তার মাঝে মানুষ আজও বাস করে। কোথাও প্রাসাদের অস্পষ্ট ছায়া, কোথাও বা নানা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। তারই মধ্য দিয়ে পথ করে ইতালিনা আমাকে নিয়ে এল সুন্দর একটি গৃহকোণে। পরিষ্কার ঝকঝকে ঘর। ঘরের একপাশে একটি স্তিমিত আলোক। আর এক পাশে একটি প্রকাণ্ড Violin. মাঝে কয়েকটি কোচপাতা।

কোচে বসে প'ড়লাম। তখনও যেন violinএর ঝঙ্কার কাণে বাজছিল। ইতালিনার চঞ্চল চোখ দুটি যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কোথায় গেল তার স্বামী। আমাকে বসিয়ে খুঁজতে গেল সে। সারা ঘরটি যেন অস্পষ্ট আলোয় রহস্যময় পরিবেশ রচনা ক'রেছিল। দূরে এক কোণে একটি ওভারকোটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়তেই বিস্ময়ে মন ভ'রে উঠল। এলোমেলো চিন্তায় কখন ডুবে গিয়েছি। দেখিনি ইতালিনা কতক্ষণ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রছিল। দৃষ্টি বিনিময় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে একটা গভীর বেদনার সঙ্গে ব'ললে, তোমার ঐ কোটটি ত অনেকদিনই রাসেল স্কয়ারের রেস্তোঁরায় পরে যেতে দেখেছি। তারপর সে ধীরে ধীরে তার স্বামীর যাযাবর জীবনের কথা বলে যেতে লাগল। মন যেন তার ঘরে থাকতে চায় না। তাছাড়া মাঝে মাঝে অনেক অস্তায় প্রকৃতি যেন তাকে পেয়ে বসে।

স্বামীকে ভালোবাসে ইতালিনা। আমি প্রশ্ন করলাম, তার মন একটু হাল্কা ক'রে দেবার জন্তে—ইতালিনা! এ violinটি কে বাজায়? কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল। রুদ্ধ আবেগ যেন দুর্ব্বার হয়ে উঠল। কত কথাই সে বলে গেল। ব'লল, তার স্বামী ছিল সত্যই গুণী।—মানুষের জন্তে তার প্রাণ চিরদিনই কেঁদেছে। তাই শিল্পী হ'য়েও সে গত যুদ্ধে দেশের জন্তে লড়াই ক'রতে গিয়েছিল। তারপর কতদিনের আনাগোনা! একদিন যখন সে ফিরে এল তখন তার আসল পরিচয় গেছে হারিয়ে। যুদ্ধের আগের মানুষ ও পরের মানুষের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান!…

ইতালিনার কথা বাধা পেল কুকুরের গর্জ্জনে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লল—"তার স্বামী আসছে বোধ হয়।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—"ভদ্রলোক।"

একবার ভালো ক'রে দেখে নিলাম।

প্রশস্ত ললাট, উন্নতশির, আর জলজ্বলে দুটি চোখ। পরিচয়ের সুযোগ না-দিয়েই ভদ্রলোক বোধ হয় একটু বিস্মিত হ'য়েই সরে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ইতালিনা তার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল ও রুক্ষ স্বরেই স্বামীকে ব'লল—তোমার মধ্যে থেকে কি ভদ্রতাটুকুও বিদায় নিয়েছে। এই ভদ্রলোককে এনেছি তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্তে—আর তুমি…কথা শেষ না ক'রতেই ইতালিনার চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই তার স্বামী একটি ম্লান হাসি হাসলেন। গম্ভীর স্বরে তিনি আমাকে ব'ললেন—"মাফ করবেন। এমন কাজ জীবনে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয়! দেখুন না—আমার এক যুদ্ধ-প্রত্যাগত বন্ধু এখন একেবারে অসহায়। চোখ দুটি তার যুদ্ধে খোয়া গিয়েছে।…আমাদেরই তাদের জন্তে এমনি ভাবে পাথের আহরণ করতে হয়—"বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে ইতালিনা বিমূঢ়-বিস্ময়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল। আমি উঠে পড়তেই তার চমক ভাঙল। বলল—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, না? চল তোমাকে বাস রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিই।

প্রায় নীরবেই দুজনে বাস রাস্তার কাছে এসে পড়েছি। বাস এসে পড়ল। উঠবার সময় ইতালিনা ওভারকোটটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"আর তোমাকে পাস'পোর্টের জন্তে দূতাবাসে যেতে হবে না, এর মধ্যেই তোমার সবই আছে।" কথাগুলি ব'লবার সময় তার বুকে যেন এক অস্ফুট বেদনা লক্ষ্য ক'রলাম।

বাস ছেড়ে দিল। পেছনে তাকিয়ে দেখি তখনও ইতালিনা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ধারা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রবীন্দ্রনাথের দিনে দেখিয়াছি চোখে,
পড়িতেছে পুরবধু স্বল্প দীপালোকে
প্রেমের কবিতাগুলি প্রিয়-লিপি হ'তে
উজ্জ্বল করিয়া মুখ প্রীতির আলোতে
গোপনে। লজ্জায় রাঙা প্রোফাইল ফেস্
অপূর্ব্ব সুষমা ভরা। ভাঙিনি আবেশ,
মধুর আমেজ তার। অন্ত কক্ষ মাঝে,
দেখি, কুমারীর হাতে আদরে বিরাজে
কবিতার গ্রন্থ কোনো। সেদিন শুনিলে
কেহ করে কাব্য সৃষ্টি ছন্দে আর মিলে,
অলঙ্কারে, নারীমন মোহমুগ্ধতায়
লুটায়ে পড়িত যেন সে কবির পায়ে
শ্রদ্ধাভরে অনায়াসে। আজ সারা দেশে
বি-এ পাস এম-এ পাস তরুণীরা এসে
করিয়াছে ভিড়; কেহ বিলাত ফেরৎ,
কেহ চাকরীজীবী, করে মেহনৎ;
কবিরে বোঝার মত কেহ নাই আর!
কবিদেরও নাই সেই ওস্তাদের মার
অর্দ্ধরাত্রে। চন্দ্রালোকে ভীরু পদক্ষেপে
কবিতা শুনিতে কেহ আসে নাও' চেপে
হৃদয়ের ব্যাকুলতা। অনির্ব্বাণ চিতা
রাখিয়াছে মুলে শুধু বিয়ের কবিতা!
কাব্য-সাহিত্যের ধারা রাখিয়াছে ধ'রে
প্রীতি-উপহার তার সোনালী অক্ষরে
গোলাপী কাগজে, যার তীব্র আকর্ষণে
দুলে ওঠে নববধূ তিলক-চন্দনে!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফেড ইন্।

একটি বকুল গাছের নিপত্র শাখায় নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে, একটা কোকিল শাখায় বসিয়া ডাকিতেছে।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে কোকিলের ডাক শোনা যাইতেছে। কক্ষটি প্রশস্ত ও মহার্ঘ উপকরণে সজ্জিত, রঙীণ পক্ষ্মন্ আস্তরণে ভূমিতল আবৃত, তদুপরি কয়েকটি বৃহৎ উপাধান স্তস্ত। একটি অর্ধগোলাকৃতি গবাক্ষ হইতে পুরভূমির বৃক্ষাদি এবং অবরোধের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। লৌহজালিকে পিনদ্ধবক্ষ একটি যবনী প্রতিহারী ধনুর্বাণ হস্তে দ্বারে পাহারা দিতেছে।

কক্ষটি মহারাজ সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। কক্ষে আছেন স্বয়ং সেনজিৎ, বিদূষক বটুক ভট্ট এবং মহারাজের চারিজন বয়স্য। বটুক ভট্টের চূড়াকৃতি কেশে পাক ধরিয়াছে। তিনি সেনজিতের সহিত পাশা খেলিতেছেন। বয়স্যদের মধ্যে দুইজন বসিয়া তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে খেলা দেখিতেছেন ; একটি বয়স্য ভূমি-শয়ান বীণার তন্ত্রীতে অলসভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, চতুর্থ বয়স্য করতালি দিয়া সঙ্গৎ করিতেছেন। মধু-অপরাহ্নের আলস্যে সকলেই যেন একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। কক্ষে স্ত্রীলোক কেহ নাই।

সহসা কক্ষের বাহির হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। সকলে সচকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। কোন্ রমণী গান গায় ? বটুকভট্ট অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

অলিন্দের এক প্রান্তে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যবনী প্রতিহারী আপন মনে গান ধরিয়াছে। তাহার নীল চক্ষু দুটির বিষণ্ণ দৃষ্টি দিগন্তের পানে প্রসারিত, যেন সুদূর স্বদেশের স্বপ্ন দেখিতেছে—

যবনীর গান শেষ হইলে কক্ষের মধ্যে রাজ-বয়স্যেরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। যবনী লজ্জা পাইয়া চকিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তীর-ধনুক হাতে লইয়া দ্বারের পাশে ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

বটুকভট্ট ফিরিয়া গিয়া রাজার সম্মুখে বসিলেন, ভৎর্সনাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

বটুকভট্ট : ধিক্ বয়স্য ! শত ধিক তোমাকে !

সেনজিৎ : (মৃদু বিস্ময়ে) কী হল বটুক !

বটুকভট্ট : একটি যবনী প্রতিহারী—বসন্তের সমাগমে তার প্রাণেও রঙ ধরেছে—আর তুমি বয়স্য নীরস শকুনির মত বসে বসে পাশা খেলছ ! ছিঃ !

কপট ক্রোধে বটুকভট্ট পাশার গুটিকাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন

সেনজিৎ : (স্মিতমুখে) কি করতে বলো ?

বটুকভট্ট : যাও, অন্তপুরে যাও, নূপুর-নিক্কন শোনো, কঙ্কণ কিঙ্কিনীর ঝণৎকার শোনো ! হায় হতোস্মি—

বটুকভট্ট ললাটে করাঘাত করিলেন

সেনজিৎ : আবার কি হল ?

বটুকভট্ট : ভুলে গিয়েছিলাম। মনে ছিলনা যে তোমার অবরোধে স্ত্রীলোক নেই—অন্তঃপুর শূন্য, খাঁ খাঁ করছে—কেবল হতভাগ্য কঞ্চুকীটা প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, কঞ্চুকীর মুখ দেখলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

সেনজিৎ : বয়স্য, দেখছি তোমার গায়েও বসন্তের হাওয়া লেগেছে। মদনোৎসবের আর বিলম্ব কত ?

বটুকভট্ট : মদনের সঙ্গে যার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নেই, মদনোৎসবের সঙ্গে তার কী প্রয়োজন ! বিল্বফল পাক্‌লো কিনা তাতে—ইয়ে—পরভৃতের কি লাভ ?

সেনজিৎ : ধন্য বটুক, তুমি আমাকে কাক না ব'লে কোকিল বলেছ ! কোকিল কিন্তু ভারি গুণবান পক্ষী—

১ বয়স্য : দোষের মধ্যে পরের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে।

বটুকভট্ট : এ বিষয়ে, বয়স্য, তোমার চেয়ে কোকিল ভাল।

সেনজিৎ : কিসে ?

বটুকভট্ট : কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, তুমি যে একেবারেই—

বটুকভট্ট হতাশাসূচক হস্তভঙ্গী করিলেন। সেনজিৎ ক্ষণকাল বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

সেনজিৎ : দেখ বটুক, তোমাদের একটা গোপনীয় কথা বলি—নারী জাতিকে আমি বড় ভয় করি, তাই মদনোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সময় নারীজাতি অত্যন্ত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে।

বটুকভট্ট : (বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া) সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাদের অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান—বয়সেরও ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তিনি আমার পানে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন।

বয়স্যেরা হাসিল, সেনজিৎ হাসি গোপন করিলেন

সেনজিৎ। বড় ভয়ানক কথা, বটুক। তবে আর তোমার ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই; আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি সেখানেই থাকো। এবয়সে গৃহিণীর কটাক্ষ-বাণ খেলে আর প্রাণে বাঁচবে না।

বটুক আরও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন

বটুকভট্ট : তা হয়না বয়স্য। এই নিদারুণ বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পর-গৃহে ডিম্ব উৎপাদন করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, এসময় গৃহত্যাগ করলে অন্য বিপদ এসে জুটবে।

১ বয়স্য : মহারাজ সত্য বলুন, পরিহাস নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কিসের জন্য। বিশেষ কোনও কারণ আছে কি ?

সেনজিৎ : (লঘুস্বরে) রুচির অভাবই প্রধান কারণ। তাছাড়া, এই নারী জাতিই পুরুষের সকল দুঃখের মূল। ভেবে দেখ, শ্রীরামচন্দ্রের কথা—স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। এই সব উদাহরণ দেখে স্ত্রীজাতির কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

২ বয়স্য : কিন্তু মহারাজ—বংশধর !

সেনজিতের মুখ হইতে লঘুতার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গেল, তিনি গভীর ক্ষোভপূর্ণ চক্ষে বয়স্যের পানে চাহিলেন

সেনজিৎ : বংশধর ! ভানুমিত্র, শিশুনাগ বংশে বংশধরের কথা চিন্তা করতে তোমার ভয় হয় না ? এই অভিশপ্ত বংশে যে জন্মেছে সেই নিজের পিতাকে হত্যা করেছে।—শুনেছি এ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গেই যেন এ বংশের শেষ হয় !

বয়স্যেরা নতমুখে নিরুত্তর রহিলেন

এই সময় বাহিরে প্রাসাদ প্রাঙ্গণ হইতে তুর্যধ্বনি হইল ; এই তুর্যধ্বনির অর্থ কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনে আসিয়াছেন। সেনজিৎ ঈষৎ বিরক্তভাবে চক্ষু তুলিলেন—

সেনজিৎ : এ সময় কে দেখা করতে চায় ?—বটুক, তুমি দেখ গিয়ে—বলবে আমি এখন বিশ্রাম করছি, কাল রাজসভায় দেখা হবে।

রাজকীয় কায করিতে যাইতেছেন তাই বটুকভট্টের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; তিনি উত্তরীয়টি স্কন্ধে রাখিয়া মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ উঠিয়া গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স্য চারিজন সঙ্কোচ বোধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িলেন।

এই সময় বটুকভট্ট প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্তকণ্ঠে 'মহারাজ !' বলিয়া সেনজিতের আড়ালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সেনজিৎ : (সবিস্ময়ে) এ কি বটুক ! কি হয়েছে ?

বটুক : মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করছি।

সেনজিৎ : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে এলে কেন ? কে এসেছে ?

বটুকভট্ট : (ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) তা ঠিক বলতে পারিনা। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।

সেনজিৎ : দিব্যাঙ্গনা ! স্ত্রীলোক ?

বটুকভট্ট : কদাচ নয়। উর্বশী হলেও হতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু তার বক্ষে লৌহজালিক, রণরঙ্গিণী মূর্তি !

এই সময় যবনী প্রতিহারী রাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।
সেনজিৎ তাহার পানে সপ্রশ্ন চক্ষু ফিরাইলেন

প্রতিহারী : বৈশালী থেকে এক রাষ্ট্রদূতী এসেছেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেনজিৎ : রাষ্ট্রদূতী !—নিয়ে এস।

যবনী প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে উল্কাকে
সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল

উল্কা দ্বার পথে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সেনজিতের দিকে চাহিল; উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণেক পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিল। সেনজিৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই উল্কার নিকটবর্তী হইলেন। সহজ সৌজন্যের সহিত গাম্ভীর্যমিশ্রিত স্বরে কহিলেন—

সেনজিৎ : ভদ্রে, শুনলাম তুমি বৈশালী থেকে আসছ, তোমার কী প্রয়োজন ?

উল্কা চিনিয়াছিল ইনিই সেনজিৎ, সে একটু অভিনয় করিল;
সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—

উল্কা। আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্‌মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী, তাঁর কাছেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করব।

সেনজিৎ : (শান্তভাবে) আমিই সেনজিৎ।

উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু ক্ষণেকের জন্য অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল; সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া যুক্ত-করপুট ললাটে স্পর্শ করিল। তারপর নিজ অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হাতে দিল

উল্কা : মহারাজ আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। এই আমার পরিচয়-পত্র—

সেনজিৎ : স্বস্তি—স্বস্তি—

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, সেনজিৎ জতুমুদ্রা ভাঙিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বটুকভট্ট সেনজিতের পিছনে লুকাইয়া ছিলেন, সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলেন উল্কা একাগ্রচক্ষে সেনজিৎকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি আবার মুণ্ড টানিয়া লইলেন। অন্য বয়স্যেরা বিমুগ্ধ নেত্রে উল্কার পানে চাহিয়া রহিল।

সেনজিৎ : দেখছি, মিত্ররাজ্য লিচ্ছবি তোমাকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করে মগধের রাজসভায় পাঠিয়েছেন। তা ভাল। আমি তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। (ঈষৎ হাসিয়া) বৈশালীর রাষ্ট্র নায়কেরা একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে পাঠিয়েছেন এটা তাঁদের প্রীতির নিদর্শন সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ রীতি কিছু নূতন।

উল্কা : মহারাজ, লিচ্ছবির প্রজাতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোনও প্রভেদ নেই—সকলে সমান।

বটুকভট্ট এইবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদূষক-সুলভ
চপলতা আরম্ভ করিলেন

বটুকভট্ট : শুধু তাই নয়, বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটেছে, তাই তারা এই সুন্দরীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বয়স্য, বৈশালী যখন আপনার মিত্ররাজ্য, তখন তোমারও উচিত মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু পুরুষ পাঠিয়ে দেওয়া। তাতে মিত্রতার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

উল্কা : (অবজ্ঞাভরে) মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই বলেই বোধহয় মহামান্য কুলপতিরা এই পুরকন্যাকে পাঠিয়েছেন, নচেৎ লিচ্ছবিদেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নেই।

বটুকভট্ট গম্ভীরভাবে দক্ষিণে-বামে মাথা নাড়িলেন

বটুকভট্ট : বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকত তাহলে কখনই তোমাকে মগধে আসতে দিতনা।

উল্কা উত্ত্যক্ত হইয়া সেনজিতের পানে চাহিল

উল্কা : মহারাজ, এই বিদূষক কি আপনার বাক্-প্রতিভূ ?

সেনজিৎ : আঃ বটুক, চপলতা সম্বরণ কর, এখন চপলতার সময় নয়।

বটুকভট্ট যেন রাজার তিরস্কারে ভয় পাইয়াছে এইরূপ অভিনয় করিয়া
দূরে একটি উপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন। সেনজিৎ উল্কার
দিকে ফিরিলেন

সেনজিৎ : ভদ্রে—

উল্কা : (মৃদু হাসিয়া) আয়ুষ্মন, আমার নাম উল্কা।

বটুকভট্ট ভয়ার্তভাবে চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন

বটুকভট্ট : ওফ্—!

সেনজিৎ : ভাল—উল্কা, আবার তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ যানাচ্ছি। কাল থেকে সভায় অন্য পাত্রমিত্রদের সঙ্গে তোমার আসন হবে।

উল্কা সরল উৎকণ্ঠার অভিনয় করিয়া সেনজিতের
কাছে সরিয়া আসিল

উল্কা : মহারাজ, সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা কি

আমার অবশ্য কর্তব্য? রাজসভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না, এই আমার প্রথম দৌত্য।

সেনজিৎ: সভায় উপস্থিত থাকা-না-থাকা পাত্র-মিত্রের প্রয়োজন আঁর অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। তোমার যখন ইচ্ছা না হবে তখন সভায় না আসতে পার।

উল্কা: ভাল মহারাজ।

সেনজিৎ: যা হোক, বহুদূর পথ এসে তুমি আর তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত হয়েছ, আগে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু—পূর্বাহ্নে সংবাদ না পাওয়ায় তোমাদের সমুচিত বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি—

বটুক অমনি চট্ করিয়া বলিলেন—

বটুকভট্ট: তাতে কী হয়েছে! মহারাজের অন্তঃপুর তো শূন্য, সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হোক না।

সেনজিৎ বিরক্ত মুখে বটুকভট্টের পানে চাহিলেন। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

উল্কা: মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি—!

বটুকভট্ট সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন

বটুকভট্ট: কিছু নেই—রাণী উপরাণী কিছু নেই!

উল্কা চোখের বিজয়োল্লাস গোপন করিয়া ক্লান্তির অভিনয় করিল

উল্কা: মহারাজ, আমরা সত্যই পথশ্রান্ত। যদি বাধা না থাকে আমি আর আমার সখীরা অবরোধেই আশ্রয় নিতে পারি। আমরা নারী, মহারাজের আশ্রয়ে থাকাই আমাদের পক্ষে শোভন হবে।

প্রস্তাব সেনজিতের খুব মনঃপূত হইল না, তিনি মস্তকের উপর দিয়া একবার করতল সঞ্চালিত করিয়া যবনী প্রতিহারীর দিকে ফিরিলেন—

সেনজিৎ: যবনি, কঞ্চুকীকে ডেকে আনো।

কঞ্চুকী বোধহয় দ্বারের বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল। কঞ্চুকীকে পূর্বে চণ্ডের সভায় আমরা দেখিয়াছি, এখন বয়স আরও বাড়িয়াছে

কঞ্চুকী: এই যে মহারাজ, আমি উপস্থিত।

সেনজিৎ: তুমি এসেছ! কাছেই ছিলে মনে হচ্ছে।—যাহাতে, ইনি আর এঁর সখিরা আপাতত অবরোধে থাকবেন, তার ব্যবস্থা কর।

কঞ্চুকী: (মহানন্দে) ধন্য মহারাজ। (উল্কাকে) দেবি, আসুন—আসুন আমার সঙ্গে—

উল্কা গমনোন্মুখী হইয়া হাসিমুখে সেনজিতের দিকে ফিরিল এবং দুই করতল যুক্ত করিয়া বলিল—

উল্কা: জয়োস্তু মহারাজ:

দ্বারের পাশে যবনী প্রতিহারী দাঁড়াইয়া আছে, উল্কা কঞ্চুকীর অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। এই সময় বটুকভট্ট পশ্চাৎ হইতে একটি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন

বটুকভট্ট: বৈশালিকে, রাজকার্য তো বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল, এখন একটি কথা জানতে পারি কি?—

উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ তুলিল

বটুকভট্ট:—বৈশালীর সকল সিমন্তিনীই কি সদা-সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকেন? ভ্রূকুটির ভল্ল আর বক্ষের লৌহজালিক কি তাঁরা একেবারেই ত্যাগ করেন না?

উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্ষিপ্রহস্তে যবনী প্রতিহারীর তূনীর হইতে একটি তীর লইয়া ভল্লের ন্যায় বটুকভট্টের শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, বলিল—

উল্কা: তোমার মত কদাকার কিম্পুরুষ দেখলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্রত্যাগ করে।

বটুকভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উল্কা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কঞ্চুকীর সহিত প্রস্থান করিল। উল্কার নিক্ষিপ্ত শরটি বটুকভট্টের চূড়াকৃতি কেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, বটুক শর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন

সেনজিৎ: তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বৈশালীর মেয়েদের লক্ষ্যবেধ দেখছি অব্যর্থ। তুমি আর ওর সঙ্গে রসিকতা করতে যেও না।

বটুকভট্ট: (কাতরস্বরে) না বয়স্য, আর করব না—এ বয়সে আগুন নিয়ে খেলা আর সহ্য হবেনা। এখন দয়া করে তীরটা বার করে নাও—

সেনজিৎ হাসিতে লাগিলেন, বয়স্যেরাও যোগ দিল

ডিজল্ভ্।

রাজ অবরোধ। পৌর ভবনের একটি অংশ প্রাচীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত; ভিতরে বিস্তৃত ভূমির মধ্যস্থলে সুন্দর একটি ভবন। তাহাকে ঘিরিয়া নানা জাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পোদ্যান, জলাশয়। একটি সুদৃশ্য সেতু পার হইয়া অবরোধে প্রবেশ করিতে হয়, অন্য পথ নাই।

কঞ্চুকী সেতু-মুখে দাঁড়াইয়া উল্কা ও তাহার সখিদের অভ্যর্থনা করিল, কয়েকটি কিঙ্করী মালা পানপাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা উল্কা ও সখিদের গলায় মালা পরাইয়া দিল. সোনার পাত্রে স্নিগ্ধ পানীয় দিয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। পুলকিত কঞ্চুকী সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পরিদর্শন করিতে লাগিল।

উল্কা ও বাসবী উদ্যানের একদিকে চলিল, সখারা অন্তদিকে চলিল। সকলেরই চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

উল্কা ও বাসবী সরোবরের পাষাণ-তটে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে অসংখ্য কমল ফুটিয়াছে। বাসবী ভিতরের কথা কিছু জানিত না, সে উল্কাকে নানা কৌতূহলী প্রশ্ন করিতেছে।

বাসবী : প্রিয় সখি, মহারাজকে কেমন দেখলে বলনা !

উল্কার অধরে অর্থপূর্ণ কুটিল হাসি খেলিয়া গেল

উল্কা : মহারাজ সেনজিৎ ! কেমন আর দেখবো ? সাধারণ মানুষ—দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ বলে মনেই হয় না।

বাসবী : চেহারা কেমন ?

উল্কা : সুকুমার যুবাপুরুষ।

বাসবী : কেমন কথা বলেন ?

উল্কা : বেশ মিষ্টি। মানুষটি খুব নিরীহ—ক্ষত্র তেজ কিছু দেখলাম না।

বাসবী : আচ্ছা প্রিয় সখি, ওঁকে তোমার বেশ ভাল লেগেছে ?

উল্কা চকিত হইয়া বাসবীর দিকে চাহিল

উল্কা : কেন বল্ দেখি ?

বাসবী : (মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে) না—অমনি —জানতে ইচ্ছে হল। বল না।

উল্কার ভ্রূ'র মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম রেখা পড়িল

উল্কা : মন্দ লাগল না···শিশুনাগ বংশের যে খ্যাতি শুনেছিলাম, সে রকম নয়। (মুখ কঠিন হইল) কিন্তু তা বলে আমার কর্তব্য আমি ভুলব না।

বাসবী : (না বুঝিয়া) তোমার কর্তব্য! কোন কর্তব্য !

উল্কা : এই—আমার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। মগধের রাজ-সভায় আমি বৈশালীর প্রতিনিধি, মহারাজ সেনজিতের সঙ্গে আমার তার বেশী সম্বন্ধ নেই।

বাসবী মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল. সে একটু নিরাশ হইল

বাসবী : ও হাঁ—তা বটে।

বাসবীর মুখ দেখিয়া উল্কা মনে মনে হাসিল। একটু দুষ্টামির সুরে বলিল—

উল্কা : আর একটা খবর জানিস ? মহারাজ এখন বিয়ে করেন নি !

বাসবী আবার কুতূহলী হইয়া উঠিল

বাসবী : ওমা সত্যি ! একটিও রাণী নেই ?

উল্কা : একটিও রাণী নেই।

বাসবী অমনি জল্পনা সুরু করিল

বাসবী : বোধহয় মনের মতন সুন্দরী পান নি তা বিয়ে করেন নি—

উল্কা : তা হবে।

বাসবী উল্কার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল

বাসবী : এবার বোধ হয় মহারাজের বিয়ের ফুল ফুটবে।

উল্কা : তাই নাকি ! কি করে জানলি ?

বাসবী হাসিয়া উঠিল, তারপর উল্কার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

বাসবী : মগধের তরুণকান্তি মহারাজ যদি আমার প্রিয় সখীকে ভালবেসে ফেলেন—আর নিজের রাণী করেন তাহলে কিন্তু বেশ হয় ! না প্রিয় সখি ?

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দিনের পূর্বাহ্ণ।

মগধের রাজসভায় মহারাজ সেনজিৎ সিংহাসনে আসীন। সভাসদগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়াছেন। একজন মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া গত অহোরাত্রের প্রধান প্রধান সংবাদগুলি নিবেদন করিতেছেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য চলিতেছে। কেবল বটুকভট্ট সিংহাসনের পাশে নিম্নাসনে বসিয়া সিংহাসনে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

সেনজিৎ : আর কোনও সংবাদ আছে ?

মন্ত্রী : আর···ভূতপূর্ব মহারাজ চণ্ড—কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে—

সেনজিৎ : শুনেছি।—আর কিছু ?

মন্ত্রী : আর বিশেষ কোনও সংবাদ নেই আর্য।—শুধু—রাজহস্তী পুষ্কর—

সেনজিৎ : পুষ্কর! কী হয়েছে তার ?

মন্ত্রী : কাল থেকে পুষ্কর একটু চঞ্চল হয়েছে। তাকে হস্তিশালায় বেঁধে রাখতে হয়েছে—

বটুকভট্ট পুষ্করের নাম শুনিয়া চক্ষু মেলিয়াছিলেন, এখন সেনজিতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন

বটুকভট্ট : উঃ—কী দুরন্ত এই বসন্তকাল! হাতীরও মন চঞ্চল হয়েছে!

এই সময় সভাসদ্‌গণের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহারা সভার একটি বিশেষ প্রবেশ দ্বারের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ দ্রুত দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বটুকভট্ট চকিতে সেই দিকে চাহিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন। মহারাজ সেনজিৎও ঘাড় ফিরাইলেন।

উল্কা আসিতেছে। তাহার পরিধানে পুরুষবেশ, কিন্তু রণসজ্জা নয়। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সদর্পে পা ফেলিয়া সে সভায় প্রবেশ করিল। সভাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—

সভাধ্যক্ষ : এই যে এদিকে—ইদো ইদো অজ্জা।

উল্কা সভাধ্যক্ষের কথা গ্রাহ্য করিল না, একেবারে রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যুক্তকরপুটে রাজাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখ পংক্তির একটি আসনে গিয়া বসিল।

সেনজিৎ : স্বস্তি।

সভাসদ্‌গণ কানাকানি করিতে করিতে অপাঙ্গদৃষ্টিতে উল্কাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন স্থূলকায় সভাসদ্ ঘাড় বাঁকাইয়া উল্কাকে দেখিতে গিয়া আসন হইতে পড়িয়া গেলেন। বটুকভট্ট দেখিলেন—উল্কা যেখানে বসিয়াছে সে তাঁহার নিকট হইতে বেশী দূর নয়। তিনি হামাগুড়ি দিয়া সিংহাসনের পশ্চাতে অদৃশ্য হইলেন।

সভাধ্যক্ষ ; রাজপুরুষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

সভাধ্যক্ষ : মিত্ররাষ্ট্র লিচ্ছবির প্রতিনিধি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর মন্ত্রী আবার গলা খাঁকারি দিয়া অন্যান্য সংবাদ শুনাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন দৌবারিক দ্রুতপদে সভায় প্রবেশ করিল; রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল—

দৌবারিক : মহারাজ, বাইরে বড়ই বিপদ উপস্থিত, রাজহস্তী পুষ্কর হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—শিকল ছিঁড়ে সে মাহুতকে পদদলিত করেছে—

সভাসদ্‌গণ সভায় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া উঠিলেন

দৌবারিক : পুষ্কর এখন সভা-প্রাঙ্গণে ছুটে বেড়াচ্ছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে আক্রমণ করছে।

বটুকভট্ট সিংহাসনের পিছন হইতে গলা বাড়াইলেন

বটুকভট্ট : আরে সর্বনাশ। যদি সভায় ঢুকে পড়ে!

সভাসদেরা আরও ভয় পাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উল্কা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া সেনজিতের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সেনজিৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,
হাত তুলিয়া সভাসদ্‌গণকে আশ্বাস দিলেন—

সেনজিৎ : ভয় নেই, পুষ্কর সভায় প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো—আমি দেখছি—

সিংহাসন হইতে নামিয়া সেনজিৎ দ্বারের দিকে চলিলেন।
উদ্বিগ্ন মন্ত্রী রাজার পিছনে আসিতে আসিতে বলিলেন—

মন্ত্রী : আয়ুষ্মন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

বটুকভট্ট ছুটিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, ক্ষ্যাপা হাতীর সামনে যেও না। পুষ্কর ক্ষেপেছে, এখন তোমাকে চিনতে পারবে না—

সেনজিৎ বটুকভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিলেন

সেনজিৎ : ছি বটুক, এত ভয়! তোমরা বাতায়ন থেকে দেখ, পুষ্কর এখনি শান্ত হবে।

সেনজিৎ সভার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন
উল্কা আসন ছাড়িয়া বাতায়নের দিকে চলিল

কাট্।

রাজসভার পুরঃ প্রাঙ্গণ। উন্মত্ত রাজহস্তী পুষ্কর বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে অঙ্গনময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পায়ে শৃঙ্খলের ছিন্নাংশ, গণ্ড হইতে মদস্রাব হইতেছে। মৃত হস্তীপদের দলিত-পিষ্ট দেহ অঙ্গনের মাঝখানে পড়িয়া আছে। জীবন্ত মানুষ একজনও অঙ্গনে নাই।

সেনজিৎ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, ধীরপদে পুষ্করের দিকে অগ্রসর হইলেন। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে উল্কা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিল। সভাসদ্‌গণও অন্য অন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পাণ্ডুরমুখে রাজার অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সেনজিৎ কোমল তিরস্কারের কণ্ঠে ডাকিলেন

সেনজিৎ : পুষ্কর ! পুষ্কর !

মত্ত হস্তী গর্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার ক্ষুদ্র আরক্ত চক্ষু ঘূরিতে লাগিল। সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

সেনজিৎ : ছি পুষ্কর ! দুরন্তপনা করতে নেই।—

সভার বাতায়ন হইতে উল্কা নিস্পন্দ
স্থিরচক্ষু হইয়া দেখিতে লাগিল
সেনজিৎ পুষ্করের আরও কাছে আসিলেন, পুষ্কর শুঁড়
উদ্যত করিল। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন

সেনজিৎ : পুষ্কর ! আমাকে চিনতে পারছিস না ?

তিনি পুষ্করের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন
পুষ্কর একটু দ্বিধা করিল, তারপর শুঁড় নামাইল

দুই চোখে অবিশ্বাস-ভরা বিস্ময় লইয়া উল্কা বাতায়ন হইতে দেখিতেছে। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে পুষ্করের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, পুষ্কর শান্ত হইয়া শুনিল। সেনজিৎ আগে আগে হস্তীশালার দিকে চলিলেন, পুষ্কর দুলিতে দুলিতে তাঁহার পিছনে চলিল। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে সভাসদগণের হর্ষ ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

দুই দণ্ড পরে। সভাগৃহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, কেবল উল্কা
একাকিনী নিজ আসনে বসিয়া আছে
সেনজিৎ প্রবেশ করিলেন এবং উল্কাকে দেখিয়া
বিস্ময়ভরে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন

সেনজিৎ : এ কি ! সভা অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে—তুমি এখনও এখানে !

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জিত নতমুখে বলিল

উল্কা। আপনাকে একটি কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছি মহারাজ।

সেনজিৎ : কী কথা ?

উল্কা : (আবেগভরে) মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

সেনজিৎ : চিনতে পারনি !

আমি ভেবেছিলাম আপনি নিরীহ—পৌরুষ-হীন—কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আজ যা দেখলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে এমন অটল নির্ভীকতা—

সেনজিৎ : (স্মিতমুখে) মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা উল্কা।

উল্কা : শুধু মৃত্যুকে ! মহারাজ, জগতে এমন কিছু আছে কি—যাঁকে আপনি ভয় করেন ?

সেনজিৎ : আছে বৈকি !

উল্কা : (অবিশ্বাস ভরা কৌতুকে) সে কী বস্তু মহারাজ ?

সেনজিৎ : সে বস্তু—নারী।

সেনজিৎ প্রস্থান করিলেন। উল্কার মুখের কৌতুক-দীপ্তি নিবিয়া গেল ;
সে দাঁড়াইয়া অধর দংশন করিতে লাগিল

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রিকাল। বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহ। একটি কক্ষে প্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া শিবামিশ্র অজিনাসনে বসিয়া আছেন, যেন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দ্বারে শব্দ হইল। শিবামিশ্র সেই দিকে ফিরিলেন। অন্ধকারে একটি হাত তাঁহার হাতে একটি কুণ্ডলিত লিপি দিয়া অপসৃত হইল শিবামিশ্র লিপিটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর জতুমুদ্র ভাঙিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অধরে ক্রূর হাসি দেখা দিল।

শিবামিশ্র : (স্বগত) চণ্ড মরেছে—একটা ঋণ শোধ হল। আর একটা বাকি—.

লিপি পাকাইয়া তিনি প্রদীপশিখার উপর ধরিলেন। লিপি মশালের আগুনে জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ভস্মে পরিণত হইল।

ফেড্‌ আউট্‌।

দিবাকাল। রবিকরোজ্জ্বল আকাশ ; চঞ্চল-মধুর যন্ত্র-
সঙ্গীতের শব্দে বাতাস পরিপূর্ণ

রাজার পক্ষী-ভবন। দীর্ঘ অলিন্দের মত একটি কক্ষ, তাহার দুই ধারে সারি সারি গবাক্ষ। প্রত্যেক গবাক্ষে একটি করিয়া সুন্দর পাখি ঝুলিতেছে, কেহ দাঁড়ে, কেহ খাঁচায়। একটি দীর্ঘ-পুচ্ছ ময়ূর সোনার দাঁড়ে বসিয়া আছে।

মহারাজ সেনজিৎ পক্ষিগুলিকে একে একে সন্দর্শন করিতেছেন. কাহাকেও ফল বা ধান্যশীর্ষ খাইতে দিতেছেন ; শিস্‌ দিয়া কাহাকেও শিস দিতে শিখাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার মন পক্ষীতে নিবিষ্ট নয়, অবরোধের দিক হইতে যে চঞ্চল সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই তাঁহার মন আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে সঙ্গীতের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল দিতেছেন, আবার সচেতন হইয়া পক্ষিদের পরিচর্যায়

আত্মনিয়োগ করিতেছেন। মনে হয় তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল অবরোধের সরোবর তীর হইতে। উল্কা ও বাসবী আবক্ষ জলে নামিয়া জল-ক্রীড়া করিতে করিতে স্নান করিতেছিল; তিনটি সখী ঘাটের পৈঠায় বসিয়া বীণা মৃদঙ্গ সহযোগে বসন্তরাগের চর্চা করিতেছিল।

সেনজিৎ অবশ্য পক্ষী-ভবন হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিলেন না, বাতায়ন পথে কেবল অবরোধ-প্রাচীরের পরপারে তরুশীর্ষগুলি দেখিতে পাইতেছিলেন।

একটি গবাক্ষে শুকপক্ষীর দাঁড় ঝুলিতেছিল। সেনজিৎ বিমনা-ভাবে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; হরিদ্বর্ণ পাখিটার মুখের কাছে একটি ধান্যশীর্ষ ধরিতেই সে হঠাৎ ভয় পাইয়া ঝটপট করিয়া উঠিল। তাহার পায়ের শিকলি কোনও ক্রমে খুলিয়া গিয়াছিল, সে উড়িয়া গিয়া অবরোধ প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেনজিৎ উদ্বিগ্নভাবে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়া আছেন এমন সময় পক্ষীভবনে বটুকভট্টের আবির্ভাব হইল। তিনি রাজাকে গবাক্ষপথে অবরোধের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিলেন।

বটুকভট্ট : এহম্—জয়োস্ত মহারাজ—জয়োস্ত। এই সুন্দর প্রভাতকালে বাতায়ন থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়—না বয়স্য ?

সেনজিৎ ফিরিয়া ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাইলেন

সেনজিৎ : আমার শুক পাখিটা শিকলি কেটে উড়ে গেছে।

বটুকভট্ট : যাক গে, আরও অনেক পাখী আছে। বনের পাখী বনে উড়ে গেছে তাতে দুঃখ কি !

সেনজিৎ : বনে উড়ে যায়নি, অবরোধের ঐ আমলকী গাছটায় গিয়ে বসেছে।

বটুকভট্ট : বাঃ ! ভারি রসিক পাখা তো ! তোমার পাখা এত রসিক হল কি করে তাই ভাবছি।

সেনজিৎ হঠাৎ বটুকভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—

সেনজিৎ : ঠিক হয়েছে—তুমি যাও, পাখিটাকে ধরে নিয়ে এস।

বটুকভট্ট পশ্চাৎপদ হইলেন

বটুকভট্ট : অ্যাঁ ! পাখী আমলকী গাছে বসেছে আমি তাকে [illegible] করে ! আমি কি কাষ্ঠ মার্জার—কাঠবেড়ালী—যে গাছে উঠব।

সেনজিৎ : তুমি যে ভাবে সিংহাসনের শিকল ধরে ওঠা-নামা করতে পারো, কাঠবেড়ালি তোমার কাছে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু। যাও যাও, আর দেরি কোরো না, এখনি হয়তো পাখীটা কোথায় উড়ে যাবে।

বটুকভট্ট : অ্যাঁ— কিন্তু আমি—

সেনজিৎ : নিতান্তই যদি গাছে চড়তে লজ্জা করে, উদ্যানপালিকাকে বোলো, সে ধরে দেবে। যাও।

সেনজিৎ বটুকভট্টের পৃষ্ঠে লঘু করাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে দ্বারের দিকে প্রচালিত করিলেন। বটুকভট্টের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তাঁহার যাইবার একটুও ইচ্ছা নাই।

বটুকভট্ট : অবশ্য রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিৎ হবে ? লোকে যদি নিন্দা করে—

সেনজিৎ : কেউ নিন্দা করবে না, তুমি যাও।

বটুকভট্ট : অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়—

সেনজিৎ ঘাড় ধরিয়া বটুকভট্টকে নিজের দিকে ফিরাইলেন

সেনজিৎ : তোমার এত ভয়টা কিসের ?

বটুকভট্ট : এঁ—এঁ—যদি আবার তীর ছোঁড়ে !

সেনজিৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন

সেনজিৎ : ভয় নেই—রসিকতা করতে যেওনা, তা হলেই আর কোনও বিপদ ঘটবেনা।

বটুকভট্ট : মানে—যেতেই হবে ?

সেনজিৎ : হ্যাঁ—রাজার আদেশ।

গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বটুকভট্ট দ্বারের দিকে চলিলেন,
আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিতে লাগিলেন—

বটুকভট্ট : এই জন্যেই তো প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে—সামান্য একটা টিয়া পাখীর জন্যে—

দ্বার পর্যন্ত গিয়া বটুক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, আমি বলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল না ! দু'জনে থাকলে বিপদে আপদে দু'জনকে রক্ষে করতে পারব !

সেনজিৎ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন

সেনজিৎ : মূর্খ, আমিই যদি যাব তাহলে তোমাকে পাঠাচ্ছি কেন !

বটুক এবার ব্যাকুলভাবে হাত জোড় করিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, ক্ষমা কর, আমাকে একলা পাঠিও না। ঐ—ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি। মিনতি করছি, তুমিও চল।

সেনজিৎ : (ইতস্ততঃ করিয়া) না, তুমি একাই যাও, আমি যাব না।

বটুকভট্ট : কেন তোমার এত ভয় কিসের!

সেনজিৎ : (ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে) ভয়! কোন পাঁষণ্ড এ কথা বলে! আমি কি তোমার মত শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ!

বটুকভট্ট নীরবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। সেনজিৎ তখন অধীরস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : বেশ, একলা যেতে ভয় পাও আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নারী-ভয়ে মুক্ত-কচ্ছ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবত রাজধর্ম।

সেনজিৎ বটুকের বাহু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক সময় বটুকের গলা হইতে চাপা হাসির মত একটা শব্দ বাহির হইল। রাজা সন্দিগ্ধভাবে চাহিলেন, কিন্তু বটুকের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

ভিজলভ্।

(ক্রমশঃ)

'কথা-রামায়ণে' রামচরিত্রের আদর্শ

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

রামায়ণ বাঙ্গালী-জীবনে চির-প্রহসন, অফুরন্ত অমৃত-প্রস্রবণ। এই মহাগ্রন্থ বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও পরিবার-জীবনের উপর এক অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের মহান্ আদর্শকে প্রাত্যহিক চিন্তা ও কর্মের মধ্যে রূপায়িত করার প্রয়াসই বাঙ্গালীর জীবন-সাধনা। সীতা-রামের আদর্শ দাম্পত্য জীবন, রামের অতুলনীয় পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ-বৎসলতা, লক্ষ্মণের আত্মবিস্মৃত জ্যেষ্ঠভক্তির পরাকাষ্ঠা, ভরতের অপূর্ব ত্যাগ ও তপস্যা, হনুমানের সেবাধর্মের চরমোৎকর্ষ—এই সমস্ত দেবলীলার স্ফুরণ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙ্গালী সমাজ ও পরিবারের দৈনিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনুস্যুত হইয়া আসিয়াছে। এই দেবনীতির অনুস্যুতি দ্বারা বাঙ্গালী স্বর্গলোককে মর্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছে, ঘরে ঘরে দিব্য বিভার কনক-প্রদীপ জ্বালাইয়াছে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নরূপ যে সুমহান উদ্দেশ্য ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা, তাহা রামায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থে তাহার তুলনা মিলে না।

সাধারণত দেব বা দেবোপম মনুষ্যের চরিত্র আমাদিগকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করে, ঠিক সেই পরিমাণে অনুকরণে প্রোৎসাহিত করে না। দেব-চরিত্রের দুরবগাহতা, দেব লীলার কুটিল মায়াবরণ, দেবতার অলৌকিক শক্তির বোধাতীত বিকাশ মানুষের অনুকরণ স্পৃহাকে কুণ্ঠিত করে। আমরা দূর গগনের জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে দূর হইতেই প্রণাম জানাই, ভক্তির দূরগামী রশ্মি বিকীরণের দ্বারা তাহাদের আরতি করি, কিন্তু তাহাদের সহিত সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া তাহাদিগকে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে আমন্ত্রণ করিতে সাহস পাই না। রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা বা কালী—ইঁহারা আমাদের নিকট অনাবিল ভক্তি ও একান্ত আত্মসমর্পণের রাজকর আদায় করিলেও ইঁহাদের লীলা অনুকরণের দুঃসাহস আমাদের মনে কোন দিনই জাগে না। রাধাকৃষ্ণ লীলার দুঃসহ উত্তাপ ও দুর্বোধ্য রহস্যময়তার উপর রূপকের আবরণ প্রক্ষেপ করিয়া, অহেতুক ভক্তির সুপ্রচুর ধারায় সিক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া আমরা উহাকে কোন মতে মানবানুভূতির স্পর্শযোগ্য করিয়া লই, মানবজীবনে উহার পুনরভিনয় করিবার কল্পনাও আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া ঠেকে। আমরা ব্রজরাখালের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত খেলাধুলা করি, ব্রজগোপীর ন্যায় তাঁহার সহিত ভালবাসার জোরে মান-অভিমান-কোন্দল-কলহের অভিনয় করি, কিন্তু যে মুহূর্তে অক্রূরের রথ আসিয়া তাঁহাকে মথুরায় লইয়া গেল সেই মুহূর্তেই তাঁহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ফুরাইয়া গেল; আমরা অবোধ বিস্ময়ে তাঁহার প্রহেলিকাময় চরিত্রের প্রতি চাহিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই বুঝিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরিবেন না; তাঁহাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও, দূতী-পরম্পরার শুভশংসী সন্দেশ-বহন সত্ত্বেও, অপ্রশমিত বিরহ-বেদনা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই নির্মম ঔদাসীনের স্বীকৃতি ও উহার যোগ্য প্রত্যুত্তর। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের বিস্ফোরক শক্তিকে কোন বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনে ধরিয়া রাখা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপকে গার্হস্থ্য প্রয়োজনের দীপ জ্বালাইবার কাজে লাগানোর মতই অসম্ভব। বিদ্যুৎ শিখার প্রকৃত স্থান মেঘলোকে; উহাকে ঘরসংসারের চাহিদা মিটাইবার কাজে প্রয়োগ করিলে প্রকৃতি-রহস্যকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম আমাদের আদর্শলোকের সাধনাই রহিয়া গিয়াছে, কোন পার্থিব সংস্কার মধ্যে আমরা ইহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহি নাই।

শিব অবশ্য গায়ে ভস্ম মাখিয়া, উদ্ভট খেয়ালী আচরণের আবরণে, ভিক্ষুক বৃত্তির অতিরঞ্জিত আস্ফালনে ও ঔদরিকতার অভিনয়ে নিজ দৈব-মহিমাকে যতদূর সম্ভব অবলুপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ও নাচিয়া গাহিয়া, জন্ম-দরিদ্রের বে-হিসাবী মতিগতির অনুকরণ করিয়া তাহাদের সহিত এক হইয়া মিশিবার সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার এই ছদ্মবেশ সত্ত্বেও লোকে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়াছে, সম্ভ্রম ও স্নেহের মিশ্রিত অর্ঘ্য তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়াছে ও উচ্চ সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার ধ্যান-তন্ময়, বৈরাগ্যপূত জীবনাদর্শের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু হর-গৌরীর, জগতের আদিম পিতা-মাতার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, অধ্যাত্ম তত্ত্বরস-বিভোর সংসার-জীবনকে কেহই আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। "শিবো ভূত্বা শিবং যজেত'—সাধকের প্রতি এই নির্দেশ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শিব একদিক দিয়া আমাদের অতি নিকট, আর এক দিক দিয়া অনধিগম্যরূপে সুদূর। আমরা প্রতিদিন শিবপূজা করি, বাঙলাদেশে হাজার হাজার মন্দির গড়িয়া আমাদের শিবভক্তির নিদর্শন দেখাই, কিন্তু এই শ্মশান-বিহারী, নিরাসক্ত দেবটির সংসার-লীলাকে আমাদের অনুসরণযোগ্য মনে করি না।

কালী খোলাখুলিভাবেই সমাজ জীবন বহির্ভূতা দেবী। ইনি জীবনের ভয়ঙ্কর, দুর্যোগ-কণ্টকিত দিকটারই প্রতীক। সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলার বিপর্যয়রূপে, আপৎকালীন প্রলয়-ঝটিকার তাণ্ডবলীলার প্রতিচ্ছবি হিসাবেই ইঁহার আবির্ভাব। ইহার নগ্ন, অমানিশার ন্যায় মসীবর্ণ, রুধিরাপ্লুত দেহ, ইঁহার চণ্ড আচরণ, স্বামীবক্ষে চরণ স্থাপনের সীমাহীন অশালীনতা ভক্তের মনে যুগপৎ ভক্তি ও বিভীষিকার সঞ্চার করে। সাধক উৎকর্ষ কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা ইঁহার ভয়াবহ রূপের অন্তরালস্থিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিটিকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল আননে প্রসন্ন হাস্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহে। যে এই দুশ্চর তপশ্চর্যায় সিদ্ধিলাভ করে তাহার অনুভূতিতে জীবনের সমস্ত বীভৎসতা এক নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, পূতিগন্ধময় শ্মশান পারিজাত-সৌরভের আকর হইয়া উঠে। কিন্তু এই শূন্যরূপিনী, সমস্ত সংসারবন্ধন বর্জিতা, মহাঘোরা দেবী মানব পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুরূপে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হন না। ভক্ত ইঁহার নিকট মোক্ষ, বড় জোর বিপন্মুখী কামনা করেন, আদর্শ সংসারযাত্রার প্রেরণা ইঁহার নিকট প্রত্যাশা করেন না। "শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি"—ইহাই দেবীর প্রসাদা-কাঙক্ষী ভক্ত হৃদয়ের আকুল নিবেদন।

দুর্গা শিব-নিরপেক্ষভাবেই বাঙ্গালার ধর্মোৎসবের কেন্দ্রস্থ দেবী ও বাংলার পরিবার-জীবনের একটি মমতা-স্নিগ্ধ, অশ্রুসিক্ত সুকোমল হৃদয়-বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্টা। বাঙ্গালী গৃহস্থ দেবীকে শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসা স্নেহদুলালী দুহিতারূপেই কল্পনা করিয়াছে, বিচ্ছেদাশঙ্কাক্লিষ্ট, ক্ষণিক মিলনের উৎকণ্ঠিত আবেগের সহিত তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়াছে। বাঙ্গালী কবি আগমনী ও বিজয়ার সঙ্গীত-মূর্ছনার ভিতর দিয়া তিন দিনের আনন্দ-বেদনা, মিলনের সাগ্রহ প্রতীক্ষা ও বিদায়ের দুঃসহ ব্যথাকে যুগপৎ উৎসারিত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে কোন চিরস্থায়ী আসন নাই; এ যেন দুদিনের অতিথিকে আমন্ত্রণ ও বিসর্জন দেওয়ার মত জীবনের নিয়মিত ছন্দের বহির্ভূত এক অকস্মাৎ-স্ফীত আবেগের দুর্বার প্রকাশ। দেবীকে আশ্রয় করিয়া আমাদের আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠে, আমাদের বেদনা অসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতায় প্রসারিত হয়, আমাদের রিক্ত ধূসর জীবনের উপর উৎসবের ক্ষণিক দীপ্তি নামিয়া আসিয়া উহাকে দিব্য বিভামণ্ডিত করে, কিন্তু দেবী কোন স্থায়ী বন্ধনে ধরা দিতে চাহেন না। দেবী ভক্তের পূজা লইয়া ফিরিয়া যান, হয়ত সিদ্ধির আশ্বাসও দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের মনে কোন স্থায়ী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান না। এই সর্বাত্মিকা কল্যাণী শক্তির নিকট ভক্ত নিজ মনের কামনা পুরাইয়া বর প্রার্থনা করে, পুত্র, ধন, যশ, রিপু-ক্ষয় প্রভৃতি সর্বসিদ্ধি মাগিয়া লয়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবন-সাধনার কোন নির্দেশ তাঁহার নিকট গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। মা ত ভক্তি ছাড়া আর কিছু শিখাইতে আসেন নাই; ভক্তিভরে ডাকিলেই যখন তাঁহার নিকট সমস্ত প্রার্থনীয় বস্তুই মিলিবে, তখন জীবনে কোন কঠোর আদর্শ-অনুসরণের প্রয়োজন কি? মাতার অচিন্তনীয় মহিমার কোন ক্ষুদ্রতম অংশও আমাদের সমাজ-জীবনের কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে স্ফুরিত হইবার অবসর পায় না।

২

এই দেবমণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্র এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। তিনি যে ভগবানের অবতার, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—এই তত্ত্বটি তাঁহার স্তব-স্তুতির মধ্যে পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মানবধর্মটি, আমাদের মনে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার দেবত্ব ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিজেই আত্মবিস্মৃত, কোন ভক্ত-দেবতা এ কথা মনে পড়াইয়া না দিলে তাঁহার ইহা মনে থাকে না। তাঁহার সমস্ত কর্মসাধনা তাঁহার মানবিকতার ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান। তিনি পাষাণী অহল্যাকে তাঁহার পবিত্র চরণস্পর্শে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তপোবনে আতিথ্য গ্রহণের সময় মুনি ঋষিরা তাঁহার মধ্যে ভগবত্ত্বের পূর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে তাহারা সকলেই পাপমুক্ত হইয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম নামের অপরিমেয় মন্ত্রশক্তি স্বয়ং রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির জীবনেই উদাহৃত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত অবতারের মধ্যে তাঁহারই একান্ত মানবধর্মিত্ব তাঁহাকে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়ে পরিণত করিয়াছে। মনে হয় যেন বাল্মীকির আদি পরিকল্পনায় তাঁহার নরচন্দ্রমা রূপটি পরবর্তী যুগের ভক্তহৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা রূপান্তরিত দেবত্ব-প্রতীতি দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই। রামের জীবনের প্রধান আচরণ সমস্তই বিশুদ্ধ মানবীয় আদর্শের প্রকাশ। মানব-সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। কি রাজধর্ম, কি সমাজধর্ম ও কুলাচার, কি পারিবারিক কর্তব্য নিষ্ঠা—সর্বত্র রামচন্দ্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতির অব্যভিচারী অনুসরণ করিয়াছেন, কোথাও নিজ দেবত্বের সুযোগ লইয়া মানবিক অনুশাসনের অমর্যাদা করেন নাই। হয়ত তাঁহার আচরণের কোন কোন

দিক তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ধর্মবোধ অনুমোদন করে নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত অভিমত বা রুচি যাহাই হউক না কেন, তিনি প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্তনে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তিনি যখন মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন মানবরচিত বিধিনিষেধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও উহাদিগকে তিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র জনসমাজে অনুসৃত হইবে এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার আচরণে বিন্দুমাত্র শিথিলতার প্রশ্রয় দেন নাই। সীতার অগ্নি পরীক্ষা, সীতা-নির্বাসন ও দ্বিতীয় বার পরীক্ষা-গ্রহণের দাবী—তাঁহার গভীরতর ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপ্রতীতির নিকট-নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় ও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি অবমাননাসূচক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু অবশ্য পালনীয় রাজকর্তব্য ও সমাজ-শিক্ষার সহিত ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবিচারকে তিনি সমান মর্যাদা দিতে পারেন নাই। কাজেই জনসমাজে তিনি মানবিক কর্তব্যের মূর্ত প্রতীকরূপে যতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিশুদ্ধ দেব-পরিচয়ে ততটা নহে।

রামচন্দ্র শুধু কর্তব্যপালনের দিক দিয়া নহে, মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতাবোধকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি কোথাও ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়া সুলভে কার্যসিদ্ধি করিয়া লন নাই—মানবের মত পূর্ণ মূল্য দিয়া, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে জীবন রথ পরিচালনা করিয়া সফলতার উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সমস্ত জীবন সাধারণ মানুষের ন্যায় কাঁদিতে হইয়াছে, এই বেদনার অনুভূতি, অবিরত আত্মধিক্কার ও হতাশার মনোভাবই তাঁহাকে মানুষের সহিত অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাসূত্রে বন্ধন করিয়াছে। যে কোন বিপৎ-ঘাতে, যে কোন সঙ্কট-মুহূর্তে মানুষের হাহাকার, দৈবানুকূল্যের জন্য আকুল প্রার্থনার সুর তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। লঙ্কা সংগ্রামের প্রতিটি-স্তর, রাবণবধের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাধা তাঁহার এই আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এই দীনতাবোধকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অধিকারী হইয়াও তিনি রাবণ-বধের অব্যবহিত পূর্বে মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছেন, দীনতম সাধকের ন্যায় মাতৃচরণে হৃদয়ের আর্তি জানাইয়াছেন ও দেবীর ছলনার নিকট নিজ অসহায়ত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতিকূল দৈব তাঁহাকে সারা জীবন ধরিয়াই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; অভিষেকের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে. সীতা বিরহে তাঁহাকে কাঁদাইয়াছে, সীতার পুনরুদ্ধার ও রাজ্যপ্রাপ্তির স্বল্পকালস্থায়ী সুখভোগের পর আবার তাঁহাকে চরম আঘাত হানিয়াছে। সুতরাং তিনি দেবতা হইয়াও দুঃখী মানুষের সমগোত্রীয় এবং এই দুঃখের আগুনে পুড়িয়াই তিনি যেমন মানুষের সম্মুখে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও সংযমের উচ্চতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার একান্ত আপনার জনরূপে হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং রাম সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনোভাবের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি, যাঁহার জীবন মহিমায় মুগ্ধ হইয়া অনুসরণ করিতে চাহি, তাঁহাকে সাড়ম্বরে পূজা করিবার, তাঁহার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকার কথা আমাদের মনে সহজে আসে না। যিনি আদর্শ মানবরূপে স্বীকৃত তাঁহাকে আমরা অনায়ত্ত দেবলোকে উন্নীত দেখিতে চাহি না। তাই বাঙ্গলাদেশে সীতারামের মন্দির দেখা যায় না, কিন্তু অন্তর মন্দিরের অদৃশ্য সিংহাসনে তাঁহারা চিরপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রাম নাম মহামন্ত্র যে সর্বপাপক্ষয়কারী, সকল অভীষ্টপূরণক্ষম, পরমমুক্তি-বিধায়ক এই অধ্যাত্মতত্ত্ব রামের পরিচিত জীবনে ইতিহাসের নীচে চাপা পড়িয়া যায়। রাম আমাদিগকে সৌভ্রাত্র ও পিতৃভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন, সদাচার অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, সীতা কোটি কোটি বঙ্গনারীকে পাতিব্রত্যের সাধনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছেন। এই লৌকিক কর্তব্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার ফলে ও ভালবাসার মধ্য দিয়া যে নৈকট্য স্থাপিত হয় তাহার প্রভাবে সীতারাম চরিত্রের নিগূঢ় অধ্যাত্ম তাৎপর্য আমাদের নিকট অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তি প্রবাহ যখন জমাট বাঁধিয়া লৌকিক কর্তব্যে পরিণত হয়, তাহার তরঙ্গ লীলার উপর যখন কঠিন তুষার আস্তরণ বিস্তৃত হইয়া সুনির্দিষ্ট জীবন-নীতির সহস্র পদাঙ্কিত রাজপথ নির্মাণ করে। তখন আমাদের চিত্তে খানিকটা মোহের সঞ্চার হয়। আমরা মনে করি যে কাজের ভিতর দিয়া যাঁহার স্পর্শ পাইতে পারি, অধ্যাত্ম-শক্তির অনুশীলনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি মানব হৃদয়বৃত্তির মধ্যে স্বপ্রকাশ, পারিবারিক সুপরিচিত স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে যিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, মন্ত্র রহস্যের নিগূঢ়তার ভিতর দিয়া তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি যেন নিষ্ফল কৃচ্ছ্র সাধনের মতই ঠেকে। রাম আমাদের লৌকিক জীবনের পরম হিতকারী বন্ধু ও আদর্শ রাজা; সীতা আমাদের ধরিত্রীর মত সর্বংসহা একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ কুলবধূ; লক্ষ্মণ ও ভরত আমাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ইহাতেই যেন তাঁহাদের সমস্ত পরিচয় নিঃশেষিত হইয়াছে। আমরা রাম-রাজত্বের অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রজাবাৎসলতায় এত মসগুল থাকি, যে তিনি যে শুধু একটা সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের অধিপতি নহেন বা সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র পরিচালনাই যে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য নহে, তিনি যে নিখিল বিশ্বের নিয়ামক ও মানবের অন্তর রাজ্যের অধীশ্বর, তিনি যে মানুষের কেবল ঐহিক সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেন না, তাহার পরম মুক্তিদাতা—এই বৃহত্তর সত্যটি আমাদের মনে তাদৃশ রেখাপাত করে না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-লীলা হইতে আপনাকে চিরতরে অপসারিত করিয়া তাঁহার কৈশোর জীবনপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণ অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন পরিণতিতে তাঁহার আদি লীলা, বংশ পরিচয় ও প্রতিবেশ-প্রভাবের কোন স্থায়ী ছাপ দেখা যায় না। তিনি বৃন্দাবনেরও নহেন, মথুরারও নহেন, দ্বারকারও নহেন, গোপকুলের বা যদুবংশের কেহ নহেন, তিনি সমগ্র ভারতের, সমস্ত যুগের, বিশ্ব-মানবের মধ্যে সমস্ত লৌকিক সীমা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র রাবণবধরূপে তাঁহার প্রধান লীলা শেষ করিয়া তাঁহার প্রথম যৌবনের রঙ্গভূমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; সেই পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিজড়িত রাজধানীতে নিজ কুলধর্ম ও রাজধর্ম অনুশীলনেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রামের বংশপরিচয়ই তাঁহার প্রধান গৌরব, তিনি সূর্যবংশাবতংস, রঘুকুলতিলক, রাঘব, কালিদাসের 'রঘু-

বংশের' কেন্দ্রীয় নায়ক। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন বংশগরিমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই করিয়াছেন। যিনি বিশ্বেশ্বর, পরমতত্ত্ব, তিনি লোকশিক্ষার জন্য পার্থিব রাজার ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয়েই আপনার অসীম শক্তির সঙ্কুচিত প্রয়োগ করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের প্রভাব বাঙ্গালী সমাজ ও পরিবার-জীবনের উপর প্রায় চারিশত বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকার পর সম্প্রতি যুগপরিবর্তনের ফলে অনেকটা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিককালের আত্মস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, ভোগলোলুপ মানসিক বৃত্তির ফলে একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ সহোদর-স্নেহ বিরল ব্যতিক্রমে পরিণত হইয়াছে; পিতৃভক্তির মাত্রা পুত্রের বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন বিবেকের দ্বারা, সীমিত, পাতিব্রত্য দেহে না হউক মনে—উহার বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে অনেকটা স্খলিত হইয়াছে। মানুষের সমস্ত নীতি ও ধর্মের মূল উৎস হইল ভগবৎ-চেতনা; এই চেতনার সহিত সম্পর্ক শিথিল হইলে ধর্মবোধ কর্তব্যনিষ্ঠা অনিবার্যভাবে বিকৃত ও দুর্বল হইয়া পড়ে। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্তাকে যে পরিমাণে গৌণ স্থান দিয়াছি, যে পরিমাণে তাঁহার নাম-মহামন্ত্রের স্বরূপ শক্তি বিস্মৃত হইয়া তাঁহার লৌকিক আচরণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি, ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁহার লোকোত্তর-চরিত্রের সার্থক অনুসরণ আমাদের শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। রামের আদর্শ সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রামের সর্বশক্তিমান্ ভগবত্তাকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। যে মহামন্ত্রে দস্যু রত্নাকর ত্রিকালদর্শী বাল্মীকি ঋষিতে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার নামের গুণে শত শত পাতকী ভবার্ণব হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই নামমহিমা আবার অন্তরে জাগরূক হইলে, সেই নাম মাধুর্যে সমস্ত সত্তাকে নিমজ্জিত করিতে পারিলে, মানবজীবন আবার পরম চরিতার্থতা লাভ করিবে। রাম যে আমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে, আমাদের সম্মুখে সামাজিক আদর্শ স্থাপন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একথা ভুলিয়া তাঁহার প্রতি অহেতুক ভক্তির সহস্রধারা উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতে পারিলে তাঁহাকে পূর্ণভাবে অন্তরের মধ্যে পাইব। অন্তর সেই নবদূর্বাদলশ্যাম রামের রমণীয়ত্ব অনুভব করুক, কণ্ঠে রামনাম মধুর সুরে ধ্বনিত হউক, জপের ও ধ্যানের মধ্যে এই মহামন্ত্র অবিরত আবৃত্ত হইতে থাকুক, সমস্ত হৃদয় এই নাম-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া উঠুক, পৃথিবী রামরূপের প্রতিভাকে নয়ন-মনে তৃপ্তির কজ্জল পরাইয়া দিক—তবেই আবার রামের সহিত আমাদের সত্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে।

৩

এই দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুপ্রেরণা লইয়াই মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ কথা-রামায়ণ নামে এক অপরূপ সুন্দর রচনায় রামচরিত্রকে নূতন নাট্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি রামায়ণের সুপরিচিত কাহিনীকে এক নূতন ভাব-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—অথবা ইহা বলাই হয়ত অধিকতর সঙ্গত হইবে যে তিনি রামচরিত্রের আদিম প্রেরণাটিই নূতন করিয়া অনুভব ও উপস্থাপিত করিয়াছেন। রামচরিত্রের যে অনুপম মাধুর্য, যে আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি তাঁহার সমসাময়িক ভক্তগোষ্ঠীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল তাহাই তাঁহার চিত্তে ও রচনায় নবভাবে স্ফুরিত হইয়াছে। যে রামের প্রতি স্নেহাতিশয্যে অযোধ্যায় প্রজা-সাধারণ সমস্ত বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অরণ্যযাত্রীর অনুসঙ্গী হইতে চাহিয়াছিল, যাঁহার দ্বারা গুহক চণ্ডাল চুম্বকের দ্বারা লৌহমণ্ডবৎ অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রতীক্ষায় শবরী একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়াছিল, বন পরিভ্রমণকালে প্রতি মুনির আশ্রম ও তপোবন যাঁহার আগমনে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিত সেই সর্বজনপ্রিয় রাম রমণীয়ত্বের অফুরন্ত উৎস রাম এই নাটকের মধ্যে যেন আবার আমাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই নাটকে রাম সমাজশিক্ষক ও আদর্শ রাজধর্ম-প্রতিপালক বটেন। কিন্তু ইহা তাঁহার গৌণ পরিচয়! মুখ্যত তিনি ভক্তিরসের পরম আশ্রয়, মানব-দুঃখের প্রতি সমবেদনায় বিগলিতহৃদয় প্রীতি ও করুণার স্নিগ্ধ নির্ঝর। সৌন্দর্য-মাধুর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সংসারতত্ত্বরহস্যের মূলাধার রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

এই সুবৃহৎ দুইখণ্ডে সমস্ত নাট্যদৃশ্যপরম্পরায় গ্রথিত গ্রন্থটির বস্তু-বিন্যাস সর্বত্র রামায়ণের অনুসরণ করে নাই। লেখক নিজ বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনেক নূতন বিষয় গ্রহণ ও সুপরিচিত বিষয় বর্জন করিয়া ইহার ভাবৈকমুখীনতা ও ভক্তিরসপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি আনন্দরামায়ণ সারকাণ্ড, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, শিবপুরাণ, রুদ্রোপনিষদ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি রামায়ণ বহির্ভূত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বের পোষকতা ও পাঠকের চিত্তকে রাম মহিমা উপলব্ধির প্রতি উন্মুখ করিয়াছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ মূলক বা ভক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে অসম্পৃক্ত বহু আখ্যান-বিবৃতি তিনি নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; আর যে সমস্ত দৃশ্য রাম-চরিতের উপাদান, রামভক্তিতত্ত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল সেগুলির অন্তর্নিহিত রসব্যঞ্জনাটি তিনি পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। নাট্যারম্ভে জীবাত্মা মনকে রামলীলার দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা রূপে উপস্থাপিত করিয়া তিনি প্রত্যেক দৃশ্যের ভাবাবেদন ও তাৎপর্যটি পাঠকের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই লীলার দর্শন ও কীর্তনের দ্বারা আমরা কিরূপ অপার্থিব অনুভূতি রাজ্যে উপনীত, কিরূপ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতে পারি তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। রামের লঙ্কা-ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্য প্রকাশ বা তাঁহার রাজকর্তব্যনিষ্ঠাকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই; কিন্তু যেখানে তাঁহার মানবিক আবেগ-আকুতি বা ভক্তিবিহ্বলতা অভিব্যক্তির সুযোগ পাইয়াছে, বা তাঁহার শ্রাদ্ধবিধি, পুজা যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থভ্রমণ ও লুপ্ত তীর্থের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মকার্যের উল্লেখের প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই সমস্ত দৃশ্যের তথ্যপূর্ণ, ভাবোচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়াছেন। মোটকথা, রামের দেবত্ব ও ধর্মানুরাগ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে বাস্তব পরিবেশের প্রয়োজন তাহা এই নাটকে পূর্ণরূপ পাইয়াছে।

'কথা-রামায়ণে'র প্রস্তাবনায় সৃষ্টি ও প্রলয়রহস্য অপূর্ব কল্পনাশক্তি ও শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষার প্রকাশিকা-শক্তি ও অনুভূতির প্রগাঢ়তায় আমরা যেন বিশ্বচরাচরব্যাপী প্রণব-ধ্বনির

ঝঙ্কার কানে শুনিতে পাই ও প্রলয়ের সৃষ্টিলোপকারী প্লাবনোচ্ছ্বাস যেন আমাদের চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। সৃষ্টিবৈচিত্র্য যে প্রলয়-মুহূর্তে ভগবৎ-সত্তায় বিলীন হইয়াছে, সেই কাল পটভূমিকায় ব্রহ্মা-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণ দ্বারা স্তুত যোগনিদ্রামগ্ন ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী নারায়ণের অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তি আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই মহিমাময় দৃশ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কবি-কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে, অনুভূতির অতীত সত্য চিত্রবৎ প্রত্যক্ষতায় প্রতিভাত হইয়াছে। ওঙ্কারধ্বনির সঙ্গে শিবমুখে গীত রামনাম মিশিয়া গিয়া স্রষ্টার স্বরূপের চরম রহস্যকে যেন নামরূপে ধ্বনিত করিতেছে। এই মহিমান্বিত প্রতিবেশে রাম-অবতারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লেখক তাঁহার নাটকের মূল সুরের পূর্বাভাসটি সঙ্কেত করিয়াছেন, রাম নাম-ই যে সৃষ্টিরহস্যের কারণ বীজের ধ্বনিরূপ তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। পুত্রকামনায় রাজা দশরথের শিব-পার্বতী উপাসনাকে উপলক্ষ করিয়া লেখক শিব-দুর্গাস্তোত্রের বিস্তারিত উদ্ধার ও আবৃত্তি দ্বারা তাঁহার যে প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তিরসের উদ্বোধন তাহারই অনুবর্তন করিয়াছে।

এই নাটকে সীতা-চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্যানুযায়ী অভিনব মৌলিকতা দেখা যায়। সীতা শুধু রামের প্রেয়সী নহেন, তিনি প্রধান ও প্রথম ভক্ত, রামমন্ত্রে দীক্ষিতা। তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের পবিত্র পূর্বরাগ ভক্তের আরাধ্য দেবতার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার সহিত মিশিয়া গিয়া এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত সীতা-রামের দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনায় সীতার ভাবাতিশয্যের মধ্যে প্রেমবিহ্বলতা অপেক্ষা ভক্তি-বিভোরতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে, রূপের আকর্ষণের মধ্যে এক রূপাতীত রসমুগ্ধতার আবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে। অবশ্য বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে যে এই অপার্থিব প্রেমের আভাস না আছে তাহা নয়। কিন্তু আলোচ্য-গ্রন্থে ইহা যত সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে অনুভূত কোন পূর্ব-রচনায় আমরা সেরূপ দেখি না। সীতা শুক-শারীর নিকট এই রাম-মন্ত্র প্রথম শিখিয়াছেন এবং রাম-কাহিনী শুনিবার আগ্রহাতিশয্যে শারীকে শুকের সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। মুক্তি-মন্ত্রের প্রবল, সর্বগ্রাসী আকর্ষণের নিকট সংসারের ছোটখাট দয়া-মায়া স্নেহ-সমবেদনা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অহল্যা-উদ্ধারের দৃশ্যে এই একান্ত আত্মনিবেদনের সুর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, গঙ্গাপারঘাটের নাবিকও রামের স্পর্শে একেবারে আত্মহারা, রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-রামের প্রথম মিলনে এই ভক্তিরসই উদ্দীপিত হইয়াছে।

রামের বনবাসের দৃশ্যে আমরা কৈকেয়ীর কুটিলতা বা কৌশল্যা-দশরথের প্রকৃত শোক-বিহ্বলতার কোন উল্লেখ পাই না, এগুলি লেখকের মূল উদ্দেশ্যের পক্ষে অবান্তর, কিন্তু সীতা ও লক্ষ্মণের রামের সঙ্গী হইবার জন্য যে অদম্য আগ্রহ তাহাদের শুদ্ধাভক্তির নিদর্শন তাহারই বর্ণনা সমস্ত দৃশ্যটিকে অধিকার করিয়াছে। গুহক চণ্ডালের রামভক্তি প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু ইহাতে সীতার মনে যে রামকে হারাইবার ঈষৎ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতেই ইহার তাৎপর্য পরিস্ফুট। গুহক ও সীতার মধ্যে যেন একটা ভক্তির নীরব প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে বনে অবস্থানকালে একটি দৃশ্যে (পৃঃ ১১৫, প্রথম খণ্ড) রাম নিজ অবতারত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য একটি স্বগতোক্তির মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাই শ্রীশ্রীসীতারামদাসের রামকাহিনী বর্ণনায় মূল প্রেরণা। "এই যে নবরূপ ধারণ করে ধরায় আসি, এত ভালবাসা শিখাবার জন্য। আমার রূপ দেখে আমার গুণ শ্রবণ করে যখন সকল জীবের আমাতে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়, তখন সে আমারই হয়ে যায়। একান্ত ভালবাসা ভিন্ন আমাকে ত কেউ আপনার করতে পারে না। আর সীতা আমার মূর্তিমতী ভালবাসা।" এখানে রাম লোক-শিক্ষক নন, আদর্শ-প্রতিষ্ঠাতা নন—তিনি ভালবাসার কাঙ্গাল; দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভক্তকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিবার জন্য উৎসুক। আদর্শের স্মৃতি, ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্ত, শিক্ষার প্রভাব কালে লুপ্ত হয়, কিন্তু ভালবাসা কালজয়ী, চিরন্তন। ভগবানকে একান্ত আপনার বলিয়া ভাল-বাসিতে পারিলে, তাহা হইতে সমস্ত শুভই পাওয়া যাইবে। জীবন্ত মানুষ ও তাহার মর্মর মূর্তির মধ্যে যে প্রভেদ, ভগবানকে ও তাঁহার স্থাপিত আদর্শের চেষ্টাকৃত অনুসরণের মধ্যে সেই প্রভেদ। ভালবাসা শক্তি না দিলে, আদর্শ অনুসরণের শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তাই এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীসীতারামদাস এই ভালবাসারই জয়গান করিয়াছেন, রামের প্রেমঘন, অশ্রু-অভিষিক্ত মূর্তিটিই নূতন করিয়া দেখাইয়াছেন, মর্মর প্রতিকৃতির নিষ্প্রাণ বেদীমূলে নির্দিষ্ট কর্তব্যের অর্ঘ্য রচনা করেন নাই।

রামচরিত-রচয়িতা বাল্মীকি রামনামের পাবন শক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও রামচন্দ্রের উদ্‌গাতা। রাম তাঁহার অরণ্য-পরিক্রমার মধ্যে বাল্মীকির তপোবনে অতিথি হইয়াছিলেন ইহাও সেই ভক্তিরসের পুষ্টিসাধনের জন্য। বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রামনামের অলৌকিক মহিমা-ঘোষণা, যদিও তাঁহার বিস্তারিত ঘটনা-বিবৃতির ফলে আমরা রামের রাজনৈতিক জীবন-কাহিনীর সহিত সমধিক পরিচিত হইয়াছি। বাল্মীকির তপোবনে তাঁহার অতন্দ্র রামনাম সাধনার ফলে সমস্ত মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি রামময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া এই নামের মহিমার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

৪

বন পরিক্রমায় লক্ষ্মণের সেবা পুষ্প-মাল্য-চন্দন-উপচারে পূজার রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। রামায়ণে লক্ষ্মণের নীরব আনুগত্য কোন ভাবোচ্ছ্বাসমূলক উক্তিতে মুখর হয় নাই। তাঁহার কথাগুলি কাজের কথা, ভাবের কথা নহে, তবু উহাদেরই মধ্য দিয়া তাহার প্রগাঢ় রাম-হিতৈষণা রূপ পাইয়াছে। সে রামকে উপদেশ দিয়াছে, সান্ত্বনা যোগাইয়াছে, কখনও কখনও ভর্ৎসনা করিয়াছে, কিন্তু পূজার স্তব তাহার মুখে ধ্বনিত হয় নাই। রাম পর্যন্ত তাহার আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে খবর রাখতেন না। কিন্তু 'কথা-রামায়ণে, লক্ষ্মণ আনুষ্ঠানিক ভক্তরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সে সীতা-রামকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অশেষ তৃপ্তি পায়, তাঁহার ইষ্টদেব দম্পতির যুগল মাধুরী নির্নিমেষ নেত্রে পান করে। লেখকের আবেগের উত্তাপ লক্ষ্মণের

হৃদয়াভ্যন্তরে অদৃশ্য কালীতে লেখা ভক্তিলিপিকে উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অত্রি মুনির আশ্রমে অনসূয়া সীতাকে বিধবার কর্তব্য ও পাতিব্রত্য ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন ও কবি বাল-বিধবা অমরাসুন্দরীর পরম পুরুষকে পতিরূপে কল্পনা করার মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই দৃশ্যগুলি রামনামের মন্ত্রশক্তি অন্তরে ধারণ করিবার জন্য যে মানস প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহারই নির্দেশ দিয়াছে, সুতরাং এই তত্ত্বগুলি নীতিকথামূলক হইলেও ইহারা ভক্তের ক্ষেত্ররচনায় সহায়তা করিয়াছে।

অরণ্যবাসের কালে যদিও লেখক রামচন্দ্রের রাক্ষসবধাদি বহির্ঘটনা-মূলক আখ্যানগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য—ধর্মানুষ্ঠান বর্ণনা ও ধর্ম-জীবনের চিত্রণ। সীতারামের বনবাসকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবহেলা করিয়া ক্ষত্রধর্মানুসরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন—রাম মুনিঋষির রক্ষা ও ধর্মানুষ্ঠানের বাধা-বিঘ্ন-অপসারণ তাঁহার আবশ্যিক কর্তব্য এই যুক্তিতে সেই সংশয় অপনোদন করিতেছেন। ফল্গুতীরে ও পুষ্করতীর্থে রাম কর্তৃক পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মন্ত্রোচ্চারণ সংবলিত বিস্তারিত বর্ণনা ও পিতৃপুরুষদের আগমন ও নিবেদিত অন্নগ্রহণের প্রত্যক্ষ দৃশ্য রামায়ণ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চবটী বনে মুনিগণ রামচন্দ্রের অপূর্ব রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া ভাবোল্লাসে মাতোয়ারা হইয়াছেন ও উচ্ছসিত ভাষায় তাঁহার স্তব করিয়াছেন; রামও কৃষ্ণ-অবতারের ইঙ্গিত করিয়া গোপ-গোপীবেশে অবতীর্ণ মুনিদের তাঁহার সহিত একাত্মতালাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ ভগবত্তার রূপটি, তাঁহার বিশ্বসৌন্দর্যসার সত্তাটি চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পরই রামায়ণের যে কেন্দ্রস্থ ঘটনা সীতাহরণ তাহা আসন্ন হইয়াছে। শূর্পণখার রূপমুগ্ধতা ঠিক কামলালসা নহে, কেননা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ—অনুভবের মধ্যে একটা সাত্ত্বিক প্রেরণা থাকিবেই থাকিবে। সীতা সেইজন্য শূর্পণখার প্রতি সহানুভূতিশীলা—রামও প্রেমনিবেদন বাহিরে প্রত্যাখ্যান করিলেও অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকে সীতাহরণের কাহিনীটি—সীতার স্বর্ণমৃগের প্রতি লুব্ধতা, মারীচের মায়া, সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণের ধিক্কার ও ভর্ৎসনা, অনিচ্ছুক লক্ষ্মণের সীতাকে অরক্ষিত রাখিয়া রামের সাহায্যার্থ গমন, রাবণের ছদ্মবেশ ত্যাগ ও সীতার প্রতি নির্লজ্জ আকাংক্ষার প্রকাশ, সীতার ওজস্বী প্রতিবাদ ও অসহায় বন্দীত্ব স্বীকার—সবই মূল রামায়ণের অনুসরণে লিখিত। লেখার গুণে চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার নূতন করিয়া অভিনীত হয়, যুগযুগান্তরের করুণ রস আবার নব-অনুভূতির যোগে উচ্ছসিত হইয়া উঠে। রামের বিলাপে সমস্ত বনস্থলীর মত আমাদের হৃদয়কেও অসংবরণীয় শোকোচ্ছাসে পূর্ণ হয়। রাম বিলাপের পাশাপাশি সীতা নির্যাতনের কাহিনীটিও সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয়ের শোকের মধ্যে যেন সমতা রক্ষা করিয়াছে।

এইখানে শ্রীশ্রীসীতারামদাস আনন্দ-রামায়ণের অনুসরণে পার্বতীর সীতারূপে রামের পরীক্ষার কাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য রামচরিত্রের মোহাতীত, আসক্তিহীন পূর্ণব্রহ্মরূপটি প্রকাশ করা। যে রাম সীতাবিরহে আকুল হইয়া লৌকিক শোকের চূড়ান্ত অভিনয় করিতেছেন, তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ মুক্ত, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ—এই দৃশ্যে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। দুর্গাও রাম পরস্পরকে স্তুতি করিয়াছেন, কিন্তু দুর্গা রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রামনামাঙ্কিত, রামরূপের প্লাবনে নিমজ্জিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শবরীর মিলন দৃশ্যে রামের যে ভক্তমনোহারী, ভক্তিরসের অনন্ত প্রস্রবণরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা এই মহা-নাটকের বিশেষত্ব, তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শবরীর জীবনব্যাপী ঐকান্তিক আরাধনা রামের লৌকিক কর্মাভিনয়ের অন্তরালে তাহার যে রহস্যস্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। শবরীর লক্ষ্য ভগবানের লীলাভিনয়ের অন্তরালস্থিত প্রেমসৌন্দর্যঘন সত্তার প্রতি। এমন কি সীতাহরণ ব্যাপারেও সে রামের মর্মভেদী শোকের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই। এ যেন ভক্ত ও ভগবানের মিলিত সৃষ্টি—বিশুদ্ধ আনন্দরাজ্য; এখানে কোন শোকতাপ নাই, কোন প্রশ্ন-সংশয় নাই, কোন অতৃপ্তির কাঁটা মনে ফোটে না। এখানে আকাশে-বাতাসে সঙ্গীত, দিগ্‌-দিগন্ত ব্যাপিয়া রূপের হিল্লোলিত প্রবাহ, অন্তরে অন্তরে কামনারহিত প্রগাঢ় শান্তি। রামায়ণের সমস্ত অন্তর্নিহিত ভাব-প্রেরণা যেন শবরী-আখ্যানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখানে রামের রমণীয়ত্বের চরম বিকাশ।

৫

নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে উদ্দীপনাময় যুদ্ধবিগ্রহ কাহিনীর সেরূপ প্রাধান্য নাই। আছে রামসীতার বিরহ-বেদনা, পরস্পরের প্রতি একান্ত আকুতি ও রাক্ষসের হাতে সীতার নির্যাতন ও অসুর-মায়ায় শ্রীরামের বিভ্রান্তির বৃত্তান্ত। প্রস্থারম্ভে অশোক বনে সীতার সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনায় করুণরস উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে—ও রামের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার মধ্য দিয়া সীতা-চরিত্রের মহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিভীষণের শরণ লওয়ার মধ্যেও রামের পূর্ণব্রহ্ম রূপ পরিস্ফুট ও রাম-মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। রামলক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন, মায়াসীতাবধ, রামের দেবীপূজা ও সীতার নিকট রাবণ বধের সংবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়া করুণ ও ভক্তিরসের প্রবাহ ছুটিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে শ্রীশ্রীসীতারামদাস কেবল দাম্পত্য প্রেমের অপূর্ব বিকাশ ও ভক্তিরসের কুলপ্লাবী উচ্ছাসই লক্ষ্য করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনায় তাঁহার কোন স্পৃহা নাই, কিন্তু সমরসঙ্কটে চিত্ত যে ভগবদভিমুখী হয়, আত্মাভিমানী জীব হালে পানি না পাইয়া যে দেবনির্ভরতার প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠে তাহাই তাঁহার প্রধান আকর্ষণ। আর একটি বিষয় এখানে

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কেননা ইহা লেখকের বিশুদ্ধ ভক্তিরসাত্মক মনোভাবের উজ্জল নিদর্শন। তিনি ইন্দ্রজিৎবধের পর ইন্দ্রজিৎপত্নী সুলোচনাকে রামশিবিরে আনয়ন করিয়াছেন, স্বামীর মৃত্যুতে ক্ষোভ-শোক-প্রকাশ বা তীব্র ভৎর্সনার জন্য নহে, রামচরণে একান্ত আত্মনিবেদনের জন্য। আধুনিক যুগের কবি মধুসূদন প্রমীলাকে জ্বলন্ত ক্ষাত্রতেজের আধাররূপে রণচণ্ডিকার মূর্তিতে রামের সৈন্য সমাবেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন— ইন্দ্রজিৎ-মিলনের জন্য লঙ্কা-প্রবেশের খোলা পথ দাবী করিতে। শ্রীশ্রীসীতারাম এই উগ্রা সমরব্যসনমত্তা নারীকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, দীনা, অশ্রুপূর্ণনয়না, ভক্তিবিবশা পূজারিণীতে। এই রূপান্তরে নাটকীয়তার ক্ষতিবৃদ্ধি হইল কি না সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। নাট্যরসের প্রকৃত উৎস বাহিরের উত্তেজনা নয়, অন্তরের আলোড়ন, শত্রুবধপ্রয়াসী অস্ত্রের সজ্জা আস্ফালন নয়, ভাবকেন্দ্রে স্থির মনের একাগ্র উন্মুখতা। নাটক যে কেবল স্পর্ধিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে, প্রতিঘাতে আছে তাহা নয়; ইহা ভক্তিমগ্ন আত্মনিবেদন ও একান্ত ভাবতন্ময়তার মধ্যেও সমভাবে বর্তমান। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য বহির্ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রকার বহিঃপ্রভাবমুক্ত, অন্তর্লীন জীবনে যে ভাবের স্বচ্ছ দেহে পুলক-রোমাঞ্চ, তাঁহার অন্তরের দিব্য অনুভূতির মুহুর্মুহু উদ্ভব-বিলয়-রূপান্তর, তাঁহার বিরহ-মিলনের মধ্যে ঘন-আন্দোলিত মানস চেতনা, তাঁহার খোঁজ-পাওয়া ও হারানোর চির-অশান্ত ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বাস—এই সমস্ত বিকার-বিপর্যয়-বিভ্রান্তি তাঁহার অন্তরে যে মহানাটকের অভিনয়ের পরিচয় দেয়, কোন্ পার্থিব উপাদানে গঠিত নাটক তাহার সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে?

সীতার অগ্নিপরীক্ষা উপলক্ষ করিয়া আবার রামের চতুর্দিকে দেব-দেবীর সমাবেশ ঘটিয়াছে ও সকলের মুখেই রামের স্তব-স্তুতি ধ্বনিত হইয়াছে। পিতা দশরথও স্বর্গলোক হইতে নামিয়া সীতার চরিত্র-বিশুদ্ধ সম্বন্ধে রামকে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়াছেন।

উত্তরাকাণ্ডে রাম-সীতার পূর্বস্মৃতি রোমন্থনাত্মক দৃশ্যটি ভবভূতির অনুসরণ বলিয়াই মনে হয়। রামের সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার রাজকর্তব্য পালনের মধ্যে লেখক তাঁহার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার প্রচেষ্টাকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মবিধিপালনই যে তাঁহার অবতারত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইহাই এই দৃশ্যগুলির প্রতিপাদ্য। রামচরিত্রের এই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত দিকটার উপরই নাট্যকার আলোকপাত করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা-অনুযায়ী উহার পূর্ণ পরিণতি ও সুসম-ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

৬

এই রামপ্রশস্তিমূলক নাটকখানি কবিযশঃপ্রার্থী কোন লেখকের দ্বারা রচিত নহে এবং ইহা কাব্যসমালোচনার মানদণ্ডে বিচার্য নহে। সাধনা-লব্ধ দিব্য অনুভূতিই এই রচনার মূল প্রেরণা। শ্রীশ্রীসীতারাম-দাস ওঙ্কারনাথ রামনাম মহামন্ত্র জপের দ্বারাই ইষ্ট সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ও ইহাই তাঁহার জীবন সাধনা। সাধক জীবনে তিনি যে নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সাধনা-প্রণালী-ও মনোগত অভিপ্রায় সুপ্রকাশ। তিনি সাধারণ লেখকের ন্যায় কাব্যসৌন্দর্যের সচেতন সৃষ্টিও নিখুঁত কবিকৃতি নির্মিতির উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত অনুভূতির স্রোতাবেগে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারই অনুসরণে কাব্যপ্রকাশের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে স্বয়ং ভক্তিদেবী তাঁহার হাত হইতে কলম কাড়িয়া লইয়া গ্রন্থরচয়িত্রীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ইহার বিচার ভক্ত ও মুমুক্ষুর অনুভূতির মানদণ্ডে, কাব্যরচনার সাধারণ মানদণ্ডে নহে। অবিরত রামনাম গান না করিয়া তিনি তৃপ্তি পান না, কোন সাহিত্যিক পরিমিতি-বোধের দ্বারা তাঁহার ভক্তির উচ্ছাস নিয়ন্ত্রিত নহে। তাঁহার সমস্ত অন্তরে যে ভক্তির বান ডাকিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের সর্ববিধ পরিব্যাপ্ত রূপমাধুরী যে ভাববিভোরতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার রচনা তাহারই হৃদয়-উপচানো বহিঃপ্রকাশ। কূলে কূলে ভরা নদী যেমন কৃত্রিম প্রণালীর সরল রেখা অনুসরণ না করিয়া আঁকা-বাঁকা প্রবাহে নিজেরই অনিবার্য গতিপথ করিয়া লয়, লেখকের রচনাও তেমনি কোন নির্দিষ্ট সাহিত্যিক অনুশাসনের অপেক্ষা না রাখিয়া অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি স্রোতস্বিনীর নিষ্ক্রমণ-পথ ধরিয়া চলিয়াছে। যে মহামন্ত্র তাঁহাকে ইষ্টদর্শনের পথ খুলিয়া দিয়াছে, বিশ্ববিধানের গোলকধাঁধা তাঁহার নিকট সরল করিয়া দিয়াছে, সেই মহামন্ত্রকেই তিনি এই নাটকে দৃশ্য-ও-বাণী-রূপ দিয়াছেন। রাম-নামের মন্ত্রাক্ষরত্ব; ইহার নিখিল বিশ্বকারণভূত বীজ রূপটিই যেন এই গ্রন্থের রচনায় মূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকির নর-দেবতা, কৃত্তিবাসের সমাজধর্মরক্ষক ও পরিবার-আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীসীতারাম দাসের ধ্যানদীপ্ত অনুভূতির নিকট নিপিল হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বজন মুক্তিবিধাতা, পরম সুন্দর, ঐশ্বর্য-মাধুর্যের অনুপম সমন্বয় শ্রীনীতত্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনা সমুদ্রমন্থনজাত এই পূর্ণচন্দ্র আমাদের কলুষান্ধকার মলিন, ভ্রমান্ধ দৃষ্টির নিকট জ্যোতির্ময়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক ইহাই সেই বিশ্ব-কল্যাণব্রতী মহাসাধকের কামনা, ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তিও তাঁহার রচিত মহা-গ্রন্থের সার্থকতা।

অবগুণ্ঠনবতী

দেবাচার্য

অবগুণ্ঠনবতী ওপার থেকে এপারে আসছে।

অবনী চমকে ওঠে। এ মুখ যেন চেনা।

বোম্বে ইউনিভার্সিটির সামনে যে পার্কটা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে অবনী। হাতে শান্তিনিকেতনী লেদার ব্যাগ। বহুদিনকার পুরনো হলেও ব্যাগটি দেখতে সুন্দর। আবার কাজেরও বটে। অনেক কাগজ ধরে, আবার একদিকে হরিণ, অন্যদিকে শকুন্তলার ছবি। চামড়ার ওপরে কৌশলে আঁকা।

এই ব্যাগ বগলে অবনী সারা পৃথিবী না হলেও সারা ভারতবর্ষটা দেখে নিয়েছে। বেশ লাগে সেলসম্যানের জীবনটা।

একটি কণ্ডিমেণ্ট অর্থাৎ সোজা বাংলায় লবেন্চুষ, জ্যাম্, জেলী প্রভৃতি মিষ্টের বা সুইটের কারখানা। তারই চলমান প্রতিনিধি অবনী। অবনী স্বপ্ন দেখে তার বিদেশ যাত্রার দিন আগতপ্রায়। এবার বুঝি কোম্পানী তাকে পাঠাবে ভারতের বাইরে—কোথায়? বার্মায়—শিলনে, ইন্দোনেসিয়া ঘুরে আসবে সে। সারা পৃথিবী না হোক অর্ধেকটাও যদি দেখবার সুযোগ পায় তাহলে নামটা তার মোটামুটি সার্থক—হ্যাঁ, তা বলা যাবে বৈকি।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—শুধু চলো, চলো, চলো—কেউ তো তাকে বলে না, এমনি করে কি সংসার চলে?

হাঃ হাঃ হাঃ—ট্রেনে, বাসে, আর ট্রামে হিসেব করে অবনী—অন্ততঃ এক লাখ মাইল পথ সে অতিক্রম করে এসেছে। কত টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে যদি কেউ জিগ্যেস করে অবনী মুচকি হেসে বলে, হোটেল খরচ, সুট আর কোটে ব্যয় কুলিয়ে কি আর থাকে—মাইনে যা পাই তাতে শুধু ভদ্রভাবে একজনের থাকা চলে—দুজনে বাস করা কি যায়?

নিখিল, অরুণ, সিতাংশুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, একজন চা, আর একজন লোহা-লক্কড় মানে কোদাল, কাস্তে, আর তৃতীয় জনে কেমিক্যালস অর্থাৎ ওষুধের কনসার্নের প্রতিনিধি। প্রথম পরিচয় ওদের সঙ্গে টাটায় গোলমুরীর এক হোটেলে, তারপর দেখা হয়ে যায় সবকটির সঙ্গে আগ্রা বাঙ্গালী হোটেলে। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোত; কিন্তু অবনী কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় না।

সে হিসেবী। কাজ কি আমার অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে। বন্ধুত্বের অর্থই অশান্তি ও দুঃখ। হয় বন্ধু সুখী, না হয় দুঃখী। যদি সুখী হয় তোমার বন্ধু, তাহলে বন্ধু স্ত্রী মনে করবেন তোমাকে মূর্তিমান উপগ্রহ, বোধ হয় তালে আছো বন্ধুর পকেট কাটবার, ঐ একই কথা—ধার করে কেই বা আর শোধ দেয় কলিকালে···

যদি বন্ধু দুঃখী হয়—

উঃ, ভাবলেও আজ অবনীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। যখন বি·এ পাশ করে কম্প্যারেটিভ ফাইললজির ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল, অবনী মাত্র তিন মাস তার পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অভিজ্ঞতা—তারপর, কেন সে আর পড়লো না জিগ্যেস করেছিল অরুণ—

অবনী উত্তর দেয় নি। সে তখন ভাবছিল, আর দু-বছর ঘুরতে পারলে ব্যাঙ্ক একাউণ্টে তার বিশ হাজার জমে যাবে—তারপর—তারপর—

উদাত্ত দিগন্তে?···না না, ওসব কবিত্ব তার ধাতে সইবে না। ঐ কবিত্ব করতে গিয়েই তো বিমল সুইসাইড করে বস্‌লো। ইশ, অত ভাল ছেলে—কিন্তু শেষকালে পড়ে গেল প্রেমে কিনা ছাত্রীর সঙ্গে।

জানিস বাপু—ছাত্রী হল অন্য জাতের মেয়ে। তুই হলি দে, আর ওরা হল সেনগুপ্ত। মা-বাবা তো আছে, ছাত্রী তো একা নয়। না না অবনী, তুই বুঝছিস না ব্যাপারটা, ছাত্রী বলেছে, আমার গালে গাল রেখে বলেছে···

কি বলেছে ?

বলেছে, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

বলিস কি! গালে গাল দিল—বাড়ীতে কেউ ছিল না আর ?

থাকবে না কেন, কিন্তু আমাদের তো কেউ সন্দেহ করে না। তা ছাড়া ছাদে সিঁড়ির ওপরে ঘরে, সচরাচর মালার মামা কী মামীমা আসেন না। মালা থাকে দিদিমার কাছে।

কেন ওর বাবা নেই ?

আছে তবে তিনি থাকেন বাইরে—কলকাতা থেকে দূরে, তাই মালা থাকে মামার কাছে। এক মামা—বয়েসও বেশী নয়, এখনও ছেলে-পিলে হয়নি, তাই মালার প্রতিপত্তি খুব। খরচ অবশ্য মাঝে মাঝে মালার বাবাই পাঠান। এমনকি আমার মাইনেও মণিঅর্ডারে আসে। মামার অবস্থা তেমন ভাল নয়, থাকবার মধ্যে ক'লকাতায় বাড়ী-খানা যা নিজস্ব।

আর কত কথা বলেছিল বিমল—শুনতে শুনতে অবনীর প্রায় সব কথা মুখস্থ হয়ে যাবার মতন···

অবনী বলে—আর কতবার বলবি ঐ কথা, যা, তেল মেখে স্নান করে আয়, বোর্ডিংএর ঠাকুরটা ঠ্যাটা, শেষকালে ঠাণ্ডা ভাত খেতে হবে।

কিছুতেই কিছু ক'রতে পারে নি অবনী। বিমল অবুঝ, বলে, ছাখ্ অবনী—মালাকে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না, ও কিছুতেই আমাকে আপনি ছাড়া তুমি বলবে না—অথচ, অথচ—ও নিজমুখে বলেছে···

ও তোকে খেলাচ্ছে—স্ত্রীলোক মাত্রেই মার্জারী—ইন্দুর নিয়ে খেলা ক'রতে ওদের ভাল লাগে। দেখিস, আর ক'দিনের মধ্যে মার্জারী ইন্দুর বধ করে রক্তাক্ত মুখে নির্বিকারচিত্তে মাছের কাঁটার সন্ধানে বেরিয়েছে···

বিমল আর্তকণ্ঠে বলে—না, না, না—

কিন্তু, কিন্তু—দেখা গেল—শেষ পর্যন্ত অবনীর কথাই ঠিক। বাপের ঠিক করা একজন নেভ্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মালার—আর তার কিছু দিন পর বিমল লরী চাপা পড়ে যে আঘাত পেল সেই আঘাতেই হাসপাতালে মারা গেল—

এও একপ্রকার সুইসাইড্। আপন দুঃখে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুকে ডেকে নেওয়া।

না না—কবিপ্রাণ হতে চায় না অবনী কোনোদিন। কবিরা হৃদয় দান ও গ্রহণে একেবারেই বে-হিসেবী।··· কিন্তু—কিন্তু—ঐ মহিলাই যে মালা সেন নয়, তাই বা কে জানে।

মনে পড়ে ইডেন গার্ডেনে বিমল নিয়ে এসেছিল অবনীকে। প্যাগোডার একটু দূরে ঘাসের ওপর বসে ছিল মালা—আগে থেকেই বন্দোবস্ত করেছিল বিমল—বিমল কবি হলেও লাজুক, যা কলমে লিখতে পারে, তা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

এটা কি আপনার ঠিক হচ্ছে ? আপনি যখন আমার বন্ধু বিমলকে ব্যবহারের দ্বারা উৎসাহিত করেছেন—ভেবে দেখুন—ওর মনের ওপর কি আঘাত হানবেন। আর সত্যিই তো চিরদিন ও গরীব থাকবে না। গ্রাজুয়েট হয়েছে, আর ক'দিন পরে এম-এ পাশ করে প্রফেসরী জুটিয়ে নেবে—ছেলে তো ভাল ছিলই···

উত্তরে মালা মুখ নীচু করে ছিল, আর মাঝে মাঝে চোরা চাহনিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার মুখে শুধু এক কথা—আমি পরাধীন—বাবাকে আপনারা বুঝিয়ে বলুন। বাবা কালই আসবেন ক'লকাতায়।

মেয়ের বাবাকে বুঝিয়ে বলা—সে যে কি কঠিন তা অবনী বুঝতে পেরেছিল। যখন গম্ভীরভাবে লোকনাথবাবু অর্থাৎ মালার বাবা বল্লেন—তোমার বন্ধুর ক'লকাতায় বাড়ি আছে ?

—না

—যে ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ করেছি, চিঠিও ছাপা হয়ে গিয়েছে সামনের সপ্তাহে বিয়ে—তাদের পৈত্রিক বাড়ী আছে ক'লকাতায় তিন খানা। কিন্তু তাও ছেড়ে দিচ্ছি আমি—তোমার বন্ধুর চেহারাটা দেখে তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো—সুপুরুষ ? এই ছাখো পাত্রের ফটো।

পকেট থেকে ছোটো অক্টোগ্রাফের একটি ফটো দেখান মালার বাবা।

—তাছাড়া মাসে এখনই ছ'শর ওপর আয়—কয়েক বছরের মধ্যে হাজার ছাড়িয়ে যাবে। তোমার বন্ধু যদি

অক্সফোর্ড থেকেও এম-এ তে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে আসে, তাহলেও কি মাসে প্রফেসরী করে হাজার টাকা আয় করতে পারবে—তোমার বন্ধুর বেলায় সবই ভবিষ্যৎ—আর এ পাত্রের বেলায় সবই বর্তমান—

আমি কিছু ব'লবো না—তুমিই বলো—তোমার বোনের সঙ্গে যদি এই পাত্রের বিয়ে ঠিক হ'তো তাহলে তুমি কি এই বিয়ে ভেঙে দিতে ?

অবনী অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। লোকনাথবাবুর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি তখনও মিলিয়ে যায় নি।

সেই লোকনাথবাবুর কন্যা মালা, বিমলের মালবিকা—আর (নয়াল) ইঞ্জিনীয়ার রণধীর দাসগুপ্তের স্ত্রী···

ছিপ্ছিপে গড়নের—কোমর যেন দুহাতের আঙুলের মধ্যে ধরা যায়, বিদ্যুতের ঝিলিক আর অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপে—

এখনও গা শির শির করে অবনীর—কি সাংঘাতিক ঐ মালার গলায় মাল্যদান ব্যাপারটা—হয়তো ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেলেই—না—না—না—এ কখনই হ'তো না—হোক না দেখতে সুশ্রী—যৌবনে কুক্কুরীকে সুন্দরী মনে হয়···

তারপর অবনী শঙ্করাচার্যের শ্লোকটা আওড়ায়

—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ···

বড়দিনের ছুটির অলস মধ্যাহ্নে। রাস্তা নির্জন। রদ্দুর মিষ্টি। কেবল মোটরকারের আওয়াজ—আর কচিৎ একটি দুটি পার্শী মেয়ের সাইকেলের কিড়িং কিড়িং।

মহিলাটির অবগুণ্ঠন চুলের ওপর ক্লিপ্ দিয়ে আঁটা। রঙীণ লাল ছাতাটা মাথার ওপর বা হাতে ধরে ডান হাতে একটি হালকা তালপাতার সুদৃশ্য ব্যাগে কি যেন কাগজ-পত্র বয়ে নিয়ে চলেছেন। একবার অবনীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সাহেবী পোষাকে অবনীকে কি চেনা যায় ?

সেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যুগের অবনী—তখন মাথা ভর্তি চুল থাকলেও অবনী কদমছাঁট ছাঁটতো, আর আজকাল অবনীর চুলে বাবরী—ঐ বাবরীর ওপর অবনীর কেমন একটা মোহ জন্মেছে—কে যেন এক মারাঠী বুড়ী একবার তাকে বলেছিল অনেকদিন আগে—চুল বড় রাখলে সবাইকে মানায় না, কিন্তু সেনগুপ্তকে সুন্দর মনে হয়—আশ্চর্য···

আশ্চর্য, যে অবনী মনের গোপনেও সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখে না—আর, সংসার পাতবে যে, ত্রিভুবনে এক দাদা ছাড়া আর কেউ নেই তার—আর সে দাদাও আজ বিশ বছর নিরুদ্দেশ—লোকে বলে হৃষীকেশ না লছমনঝোলার দিকে কোন আশ্রম বানিয়েছেন ইত্যাদি···

সেই অবনী এক বুড়ীর কথায় বাবড়ীর মোহে পড়ে যায়। নাই বা করল সংসার—ট্রেনে যেতে যেতে কত নবোৎভিন্নযৌবনা, কত স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা পর্যন্ত এখনও তার দিকে চোরা নজরে চায়—সে অনুভূতির মধ্যে একটা তীব্র মাদকতার ছোঁয়াচ পেয়েছে অবনী—তাই বেশভূষায় সে—যাকে বলে ইংরেজীতে টিপটো—

দেখতে সত্যি তাকে সুপুরুষ বলা চলে।

একবার পুনায় সাইকেল রিকশায় আসতে ভারী মজা পেয়েছিল অবনী।—চৌমাথা থেকে একটা টাঙ্গা বেরিয়ে গেল সাইকেল রিকশার আগে। একই রাস্তা দিয়ে অনেকটা চলতে হয় টাঙ্গা ও রিকশাকে। টাঙ্গাতে পিছনের সিটে বসেছিল একটি মারাঠী তরুণী। তারপর সে কি বিড়ম্বনা মেয়েটির। বারবার অবনীর চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। মুখ নীচু করে মেয়েটি। আবার মুখতোলে।

অবনী মিটি মিটি হাসে।

পৌরুষের জয়। মারাঠী তরুণী লাবণ্যময়ী, কিন্তু অবনী—অবনীর কাছে মালবিকাও ম্লান।

ভগবান, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ বিংশশতাব্দীর গ্লানি থেকে—

অবনীর গর্ব, অবনী কোনদিন মেয়েদের প্রেমে পড়ে নি, পড়বে না—'

মেয়েরা পড়ে পড়ুক—তাতে আপত্তি ক'রবে এমন রসহীন পুরুষ কোথায় ?

মহিলাটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল এক সপ্তাহ পর দাদারে। একই বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি অবনী আর অপরিচিতা সেই মহিলা বা মেয়েটি।

বাস আসতে তখনও দেরী। অবনী এগিয়েছিল। বাসে উঠবার অধিকার অবনীর। কিন্তু অবনী সে

অধিকার ছেড়ে দিল? ইংরেজিতে বলে—আপনি যান, আমার তাড়াতাড়ি নেই। মেয়েটি হাত নেড়ে জানায় সে যাবে না—রাস্তা ছেড়ে দেয়।

...তারপর অনেক কিছু ঘটে যায়, সব কথা স্বপ্নের মতন মনে হয়। যখন আর এক মাস পরে তাজমহল হোটেলের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে এগিয়ে যায় সমুদ্রের ধার দিয়ে মিরামারে।

মিরামারে দোতালার কোণের ঘরটায় থাকে অবনী।

কতক্ষণ যে তারা হেঁটে চলেছে, তা তাদের খেয়াল নেই —বাঃ, নারকেল গাছগুলো দেখেছেন কি সুন্দর দেখতে লাগছে। এত ছোটর মধ্যে সুন্দর দেখতে নারকেল গাছ কিন্তু বাংলাদেশে নেই।—মালবিকা বলে।

আসুন ট্যাক্সীতে ওঠা যাক।—এই ট্যাক্সী!

—আবার ট্যাক্সী কেন? চলুন ঐ বেঞ্চটায় বসা যাক, সমুদ্র দেখতে দেখতে কথা বলা যাবে।

—না না, চলুন, আমার ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দি। আমার ঘরে বসেই সমুদ্র দেখা যায়। আপনার সঙ্গে অনেকগুলো জরুরী কথা আছে।

—এই রাত্রে ট্যাক্সীতে উঠে যাবো আপনার সঙ্গে হোটেলে—নিন্দে রটবে না?

—নিন্দে, নিন্দেকে তো ভারী গ্রাহ্য করো তুমি—ও সরী—আই বেগ্ টু বী এক্সকিউজ্ড। তুমি বলে ফেলেছি—তা তুমি তুমিই বলনা কেন।

মালা ওরফে মালবিকা সেন—বিবাহের পর মিসেস রণধীর দাসগুপ্ত, বিবাহ বিচ্ছেদের পর কুমারী মালিনী প্রেব্যাক্-সিঙ্গার—খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা অনুপকুমারের ভ্রাতার প্রেমিকা—রণবীরের স্বাভাবিক মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মুনীর খাঁয়ের বেগম—তারপর পুনরায় বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ তালাক—সর্বশেষে পার্শী মাণ্টি-মিলিয়নেয়ার ওয়াচার নায়িকারূপে মালাবার হিল্‌সে বিরাট ম্যান্‌সন ক্রয়—বহু-বহু—বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মালা আজ আর কুসুমের মতন কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী তরুণী নয়—যে তরুণীর ভীরুতায় বিমলকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে হয়তো—কে জানে?...

—তুমি, তুমি—হোটেলের ঘরে মালাকে কুশনে বসিয়ে অবনী বলে, আর হাসে।

—আমি কি?

—তুমি মুক্তোর মালা—অনেক ডুবুরীকে হাঙরে কেটেছে, তারপর শুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে এলে তুমি—না না —সমগ্র তুমিই বা কোথায়—? বাঃ—আমি বলবো তুমি মহাভারতের সত্যবতীকেও হার মানিয়ে দিয়েছ, তবে দুঃখের বিষয় আজকাল শান্তনুর মতো রাজা মহারাজা খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন।

তাও পেয়েছিলাম, জানেন। তিন তিনটি নেটিভ স্টেটের কুমারের সঙ্গে অনেকবার তাজমহল দেখতে হয়েছে আমাকে। না না, তোমাকে আর আপনি বলবো না।—

—তা, তুমি এই বাঙ্গালা পোষাকে বেড়াও, তাতে মিঃ ওয়াচা আপত্তি করেন না।

আপত্তি কিসের। পার্শী মেয়েরাও তো বাঙ্গালীমেয়ের মতো শাড়ী পরে থাকে, অবশ্য আজকাল মেমদের মতো গাউন পরার অভ্যাস ছড়িয়েছে অনেক পরিবারেই। যাই হোক, আজ উঠি।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় মালা। রাত্রি ৯ টায় আসে বুড়োটা—জ্বালিয়ে খাবে—উঃ, আর পারি না—

মুচকি হেসে মালা বিদায় নেয়। হাত বাড়িয়ে দেয় অবনীর দিকে। নরম হাতের স্পর্শে যেন আগুনের উত্তাপ। অবনী অবাক হয়ে যায়।

কিন্তু, কিছু বলে নি সে দিন।

তারপর।

কোম্পানীর কাজে কয়েকদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল অবনীকে। মালার সঙ্গে দেখা করে নি। যদিও বারবার মালা তাকে দেখা করবার স্থান, কাল নির্দেশ করেছিল।...

যখন পনেরো দিন পরে দেখা হলো।

সঠিক বললে—যখন অবনীর হোটেলে মালা নিজেই উপস্থিত হলো—মোটর আছে দুটো, কিন্তু মোটর ব্যবহার করেনা মালা। বলে মোটরে চড়ে সুখ নেই—আমার সব চেয়ে ভাল লাগে—শহরের রাস্তায় নির্জন মোড়ে বা পার্কে দেখা হয়ে যাক কোনো তরুণের সঙ্গে—

—আর তাকে নিয়ে খেলাও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বধ।

—যাও, তুমি বড় নগ্নভাবে কথা বলো—তোমার মধ্যে কবিত্বের 'ক'ও নেই।

—তা ঠিক, আমি তোমাকে স্বচ্ছদৃষ্টিতে প্রথম দিনেই চিনতে পেরেছিলাম কিনা, তাই হতভাগা বিমলকে বলেছিলাম—

—কি বলেছিলে? বলেছিলে—আমি কুহকিনী, তাই না?

—না তাও বলি নি। তবে কি বলেছিলাম, তা তোমাকে বলবো না আমি।

—না না বলো—বলো—লক্ষীটি বলো।

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসে মালা। হোটেলের ঘরটার মাঝখানে ম্যান্‌-হাইট পার্টিশন—এক পাশ দিয়ে পিছনে শোবার ব্যবস্থা। একই সিংল-বেড্‌ লোহার খাট, গদী দেওয়া—পরিষ্কার চাদর বিছানো।…

—রাত্রি ৮৷৷টা বেজে গেল যে, যাবে না আজ, এপয়েন্ট-মেণ্ট নেই বুঝি?

মালা কোনো কথা বলে না।

শুধু স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকে অবনীর দিকে। অবনী হাসে।—তোমার চোখে ঐ নীল সমুদ্র—অধুনা সুরাকৃষ্ণ রঙের পারাবার - ঐ চোখের রহস্যের পারাপার নেই—কেমন, ব'লতো বিমল? হাঃ হাঃ হাঃ।

বেয়ারা এসে জানতে চায়—দো মিল—না এক মিল—দূর বেটা—দো না হলে কি মিল হয়? কি বল মালা—? ফুল আর সুতো—তেমনি—তেমনি—

বেয়ারাকে মালা মারাঠী ভাষায় কি যেন বলে—বেয়ারা চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই দুজনের খাবার আসে।

—রাত্রি ১১টা। যাও এইবার, হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে যে!

—বন্ধ হোক, আমি যাব না।

নাম ধাম সবই গোপন রেখেছি, একটি যুবক দেবা-চার্যের পরামর্শ চায়। কোষ্ঠী—তিনটে কোষ্ঠী একটি পুরুষের—আর দুটি মেয়ের—মিলিয়ে দেখতে হবে—এ ক্ষেত্রে মিলন হলে তিনজনের পক্ষেই শুভ হবে কিনা। যদি তা না হয়, তাহলে কার কার অশুভ হবে?

—পণ্ডিতজী, ও এত অল্প বয়সে এত ভোগ করেছে, ওর আর মোহ নেই। আপনি কি বলেন—আমি—আমি—আমার তো নেই—আত্মীয় স্বজন নেই কিনা,তাই বলছি।

—কিন্তু, কার সঙ্গে কাঁর বিয়ে হবে তাত বুঝতে পাচ্ছি না। অনুমানে শুধু বুঝছি, বেশী বয়স যার, সেই হল পুরুষ।

—না, ও হ'ল মালবিকার। আমার চেয়ে মালবিকা একমাসের বড়। ও চায় ওর সহচরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক, আর আমরা দু'জনেই ওর বাগানবাড়ীর এরিয়ার মধ্যেই একটা ছোট দোতালা বাড়ীতে থাকি। যশোধরাই—সেই টাঙ্গায়-বসা মেয়েটা—কি আশ্চর্য—সিঁড়িতে যার সঙ্গে ধাক্কা খাই, সেই মেয়েটি যে মালার মাইনে করা সহচরী, তা কি করে বুঝব।

—বুঝলাম সবই। বুঝতে পারছি তোমার টান কেবল যশোধরার ওপর। কিন্তু এরকম অবস্থায় বিয়ের বিপদ জানো তো?

—না না, আমি যশোধরা বা মালা—কাউকে বিয়ে ক'রব কথা দিই নি। জাস্ট ফর ইন্‌ফরমেশন—ফানও বলতে পারেন—হঠাৎ আপনার—

—ছ্যাখো, জ্যোতিষীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে নেই।

—তাহলে ব'লবো আপনিও সত্যি কথাটা ধরতে পারেন নি।

হরিণঘাটা ডায়েরী ফার্ম্ম

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ

হরিণঘাটা ডায়েরী ফার্ম্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সমূহের অন্যতম শুভ প্রচেষ্টা। এই ডায়েরী, ফার্ম্ম পরিদর্শনের জন্য কিছুকাল যাবৎ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ সঙ্ঘের মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের অধিকর্ত্তার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ সদস্যের হরিণঘাটা পরিদর্শন এই প্রথম। ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ম্মরত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক-সমূহের নিজস্ব সংবাদদাতা ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধি লইয়া এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত। সাংবাদিক-দের স্বার্থ দেখা যেমন সঙ্ঘের কাজ, সেরূপ দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেগুলির সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করা ও গঠনমূলক সমালোচনা করাও সঙ্ঘের দায়িত্ব।

২৩শে জুন হরিণঘাটা পরিদর্শনের জন্য দিন স্থির হইল, এবার যাত্রা সুরু। সরকার হইতে যাতায়াতের জন্য একখানি ষ্টেটবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ ষ্টেশন সন্নিকটে পূর্ব্বাহ্ণেই বাস অপেক্ষা করিতেছিল, একে একে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাংবাদিক-গণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ফণীদা পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া সকলকে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। বারাকপুর হইতে সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি শ্রীঅতুল্য চরণ দে পুরাণরত্ন ও অন্যতম সদস্য শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে বসুমতীর নিজস্ব সংবাদদাতা অনুকূল চন্দ্র রায় এবং বাটানগর হইতে লোক-সেবকের প্রতিনিধি জিতেশ বসু মহাশয় আসিয়াছেন। বসিরহাট, বারাসত, বনগ্রাম, ডায়মণ্ড-হারবার, হাবড়া, মহেশতলা, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলা প্রচার অধিকর্ত্তা শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শিয়ালদহ হইতে আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন। ১১-১৫ মিনিটের সময় বাস যাত্রা করিল, কোলাহল মুখর কলিকাতা সহরের বক্ষভেদ করিয়া সরকারী পরিবহন উর্দ্ধশ্বাসে সারকুলার রোড, যশোহর রোড ধরিয়া বারাসতে আসিয়া পৌঁছাইল। বারাসাত মহকুমা প্রচার অধিকর্ত্তা মহাশয়ের ওখান হইতে উঠিবার কথা। তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠান হইল। ইতিমধ্যে কেহ কেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। বারাসাত রেল গেটের সম্মুখেই 'মিণা ভিলা', কোন ভদ্রলোক অবসর বিনোদনের জন্য এক বিরাট সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একে একে সাংবাদিকগণ সেখানে গিয়া হানা দিলেন। ভদ্রলোক জমিদার। কলিকাতায় বাড়ী। এখানে বাগান বাড়ী। মাত্র কয়েকদিন হইল ক্ষুর ভয়ে এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। নাম শ্রীরমেশচন্দ্র রায়। অসময়ে বিরক্ত করিলেও তাঁহার আদৌ ক্লান্তিবোধ হইতেছিল না। বরং পরমাদরে আমাদিগকে লেবু ও চিনির সরবৎ করিয়া খাওয়াছিলেন। ভদ্রলোক নিজে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি যেভাবে আমাদিগকে আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন—তাহাতে মনে হয় বাঙলাদেশের আতিথেয়তা আজও লুপ্ত হয় নাই। প্রায় এক ঘণ্টা এইখানেই কাটিয়া গেল। এখান হইতে পুনরায় বাস ছাড়িয়া হরিণঘাটায় গিয়া সকলে যখন পৌঁছাইলেন তখন বেলা দুইটা। সমস্ত পথ সাংবাদিক-গণ মেঘের লুকোচুরি খেলা ও রাস্তার উভয় পার্শ্বে মরুভূমি সম শস্যক্ষেত্র-সমূহ দেখিতে দেখিতে যান। বৃষ্টির অভাবে শস্যশ্যামল ক্ষেতসমূহ ধু ধু করিতেছে। হরিণঘাটায় পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। পথশ্রান্ত ক্লান্ত সাংবাদিকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া সকলে একটু বিব্রতবোধ করিতে লাগিলেন। কোথায় আমাদিগকে যাইতে হইবে, কে আমাদিগকে সমস্ত ডায়েরী ফার্ম্মটা ঘুরাইয়া দেখাইবেন তাহা কিছুই জানা ছিল না বা এখানে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। সব চাইতে বেশী বিব্রত বোধ করিলেন জেলা প্রচার অধিকর্ত্তা মহাশয়, তিনি ছুটিয়া অফিস ঘরের দিকে গিয়া দেখিলেন সব ফাঁকা। মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন কর্ম্মী ছুটিয়া আসিয়া জানাইলেন যে আমাদিগকে আনিবার জন্য সকলে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। রাইটার্স বিল্ডিং হইতে প্রেরিত চিঠি ত্রুটীপূর্ণ হওয়ায় এই বিভ্রাট হইয়াছে। যাহা হউক সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা করার পর ডেপুটী মিল্ক কমিশনর শ্রীঅশোককুমার রায়চৌধুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রুটীপূর্ণ চিঠির কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীরায়চৌধুরীর নিজ বাটী ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকী গ্রামে। নিজ জেলার এতগুলি সাংবাদিককে এক সঙ্গে দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অত্যন্ত অমায়িক এই ভদ্রলোক। বিদেশে শিক্ষালাভ করিলেও সাধারণ সৌজন্যবোধ তাঁহার এত বেশী যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যোগ্য ব্যক্তির উপর যে কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীরায় চৌধুরী একে একে আমাদিগকে সব ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীগণও বেশ সরল প্রকৃতির। ইহাদের সকলকে এক সঙ্গে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা এক পরিবারের লোক। সাধারণ হাসি, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সব দেখাইতে লাগিলেন এবং কৌতূহলী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর স্মিতহাস্যে দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সাংবাদিকগণ চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু অত্যন্ত চতুর এই ভদ্রলোক, প্রতিবারই সাংবাদিকদের চাতুরী সহজেই বুঝিতে পারিয়া সুকৌশলে তাহা এড়াইয়া যাইতে লাগিলেন।

দুই হাজার দুই শত একর পরিমিত জমির উপর নির্ম্মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ডায়েরী ফার্ম্ম সত্যই অভিনব। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশ গঠনে রাজ্য সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন হরিণঘাটা ডায়েরী তাহার একটী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এখানে ভারত ও পৃথিবীর নানা অঞ্চল হইতে গবাদি পশু আনিয়া লালন পালন করা হইতেছে এবং এদেশীয় গরুর সংমিশ্রণে যাহাতে উন্নত ধরণের গো বৎস পাওয়া যায় তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে, বহু ক্ষেত্রে তাহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। একটী সত্তপ্রসূত গো-বৎসকে দেখিয়া সাংবাদিকগণ কল্পনাই করিতে পারেন নাই যে ইহা সত্তপ্রসূত। শুধু যে উন্নত ধরণের গোপালন ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, একটী গরু দৈনিক ৪২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দুধ দিতেছে। গো-বৎসসমূহকে নম্বর দিয়া এমন সুন্দরভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিয়া রাখা হইয়াছে যে সত্যই সুন্দর। যখন যে বৎসটীর প্রয়োজন তাহার নম্বর ধরিয়া ডাকিলে সে বাহির হইয়া আসে।

মেসিনের সাহায্যে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যেভাবে দুধের পাত্র ধোয়া, বোতল সমূহ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে দুধ ভরা হইতেছে তাহা সত্যই দর্শনীয়। দুধ ভরা হইতে আরম্ভ করিয়া প্যাকিং পর্য্যন্ত যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। এখান হইতে দৈনিক ৫৯০ মণ দুধ কাঁকড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ও কলিকাতা সহরে সরবরাহ করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় দুগ্ধ সরবরাহ যথেষ্ট না হইলেও বৃহত্তর দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ইহা যে আদর্শস্থানীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গো-পালনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের হাঁস, মুরগী ও ছাগল পালন করা হইতেছে। মেসিনের সাহায্যে ডিম হইতে বাচ্চা তৈয়ারী করার অভিনব প্রণালী সাংবাদিকদের দেখান হয়। বৎসরে প্রতিটী হাঁস ও মুরগী ২৫০টা করিয়া ডিম দিতেছে। এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর এক একটী কর্ম্মভার ন্যস্ত আছে। বহু তরুণ বিদেশ হইতে এই সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এখানে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়।

পরিচ্ছন্ন কলিকাতার অঙ্গ হিসাবে কলিকাতা হইতে খাটাল অপসারণ করিয়া হরিণঘাটায় আনার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সাংবাদিকদের দেখান হয়, বোম্বাইর অনুকরণে এখানেও একটা 'মিল্ক কলোনী' তৈয়ারী করা হইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে ২৬টি পরিবার ৬৫০টি মহিষ লইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এখানে প্রতিটি দুগ্ধবতী মহিষ বাবদ দৈনিক ।৴০ এবং দুগ্ধবিহীন মহিষ বাবদ দৈনিক ৵১০ করিয়া খাটাল ভাড়া দিতে হয়। এক সঙ্গে আটটী মহিষ রাখিলে মহিষের মালিক বিনা ভাড়ায় থাকিবার বাসা পান। কলিকাতার পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্যে যে ভাবে মহিষগুলিকে রাখা হয় তাহার তুলনায় এখানে তাহারা স্বর্গে বাস করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই মিল্ক কলোনীর যাবতীয় দুগ্ধ সরকার হইতে ৩০৲ মণ দরে খরিদ করিয়া লওয়া হয়। স্থানটি প্রচুর জল, ইলেকট্রিক আলো, এক কথায় সর্ব্ব সুবিধা যুক্ত। সরকার হইতে বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে ঘাস ও খড় দেওয়া হয়। দৈনিক মহিষ পিছু ৴৪ সের খড় ও বাকীটা সব ঘাস সরবরাহ করা হয়।

এখানে আগত কয়েকটী পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হইল। তাহারা মোটামুটি ভালই আছেন। উন্নত ধরণের খাটাল ও বাসস্থান পাইয়াছেন। দুধ বিক্রয় করিবার জন্য মাথা ব্যথা নাই। তবে তাহাদের ছোট ছোট ২।১টী অভিযোগও আছে। এই কলোনী হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত অফিসে গিয়া তাহাদের দুধ দিয়া আসিতে হয়। যদিও সরকারী পরিবহনে করিয়া তাহারা দুধ দিয়া আসেন তবুও অফিসের পরিবর্ত্তে এই স্থান হইতে দুধ খরিদ করিয়া লইয়া গেলে সময় ও ক্লেশের লাঘব হয় বলিয়া তাহারা জানান। খড় সরবরাহ কম বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিলেন। এ বিষয়ে ডেপুটী মিল্ক কমিশনারের সহিত সাংবাদিকদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, সরকারের হাতে প্রচুর খড় মজুত আছে। তবে প্রতি মহিষকে ৴৪ সেরের বেশী খড় খাওয়াইলে দুধ কম হয়। ভ্রান্তধারণাবশতঃ মহিষের মালিকগণ বেশী খড় চাহিতেছেন। উন্নত ধরণের পশু সহিত প্রতিপালন করিতে হইলে এবং বেশী দুধ পাইতে হইলে যত কম সম্ভব খড় খাওয়ান যায় ততই ভাল বলিয়া তিনি জানান। এইখানে সাংবাদিকগণ ডি, আর, সিং নামক একজন শিক্ষিত তরুণের সন্ধান পান। তাহার বাড়ী উত্তর প্রদেশে। তিনি কৃষি বিদ্যায় গ্রাজুয়েট। সরকারী লোভনীয় চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া তিনি এখানে মহিষ প্রতিপালন করিতেছেন। মাত্র ৮টী মহিষ লইয়া তিনি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। দৈনিক গড় ২৷৹ দুধ তিনি পাইতেছেন। দুই মণ দুধের দাম ৬০৲। তাহার সর্ব্ব সমেত মোট দৈনিক খরচ ৩০৲ মধ্যে। বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকগণ চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিয়া যদি এইরূপ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলে প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। শিক্ষিত যুবকরা কো-অপারেটিভ্ ডায়েরী করিয়া যদি প্রতিটী মহকুমা সহরে দুগ্ধ সরবরাহের দায়িত্ব লন তাহা হইলে নিজের ও জাতির উভয়ের উপকার হয়। সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা করিলে যেমন প্রচুর লাভ হইবার সম্ভবনা সেইরূপ সরকার হইতে প্রচুর আর্থিক সাহায্যও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের তরুণগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

এখানে একটী কৃষি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্ম্মিত হইতেছে এবং গবেষণা চালাইবার জন্য একটী ল্যাবোরেটরী আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এখানে একটী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে ভাল হয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা কথা আছে মিথ্যা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না। একটি মিথ্যা বললে তাকে ঢাকতে আরও পাঁচটা মিথ্যা বলতে হয়। অপর পক্ষে সত্যের আশ্রয় নিলে এমন বিভ্রাটে পড়তে হয় না। সত্য অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সত্য সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে। সত্য উক্তি বাস্তবের সঙ্গে স্বভাবতই সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলে, তার জন্য অন্য দ্বিতীয় বস্তুর সাহায্য অবলম্বন করতে হয় না। জ্ঞানের রাজ্যে সত্য আনে সামঞ্জস্য।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য যা, কর্ম্মের ক্ষেত্রে নীতি তাই। মানুষ একা বাস করে না। মানুষ গড়ে ওঠে সমাজের অঙ্গ হিসাবে। অনেক মানুষ নিয়ে একটি গোষ্ঠী, তাদের মধ্যে সে একজন। তার ইচ্ছাধীন কর্ম্মগুলির প্রভাব এই গোষ্ঠীর উপর গিয়ে পড়ে। নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই স্বভাবত সে কাজ করবে। কিন্তু তার যেমন স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি সমাজের অন্য দশজনেরও নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থের সঙ্গে এদের স্বার্থের সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ ছাড়া সমগ্র গোষ্ঠীরও একটি আলাদা সত্তা আছে এবং ব্যক্তি বিশেষ হতে স্বতন্ত্রভাবে এই গোষ্ঠীরও নিজস্ব একটি স্বার্থ আছে। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থেরও বিরোধের একটা সম্ভাবনা আছে। যে কর্ম্ম এই নানা বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং কারও সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় না, তাকে সেকালে বলা হত অনবদ্য কর্ম্ম। এই অনবদ্য কর্ম্ম করতে যা শিক্ষা দেয় তাই হল নীতি। নীতিবোধ আমাদের কর্ম্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শিক্ষা দেয় যাতে নানা বিভিন্নমুখী স্বার্থের সঙ্গে বিরোধকে পরিহার করা যায়।

সেই কারণে সেকালের মানুষ নীতি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি-শিক্ষা স্থান পেতনা তাকে তারা অসম্পূর্ণ বোধ করত। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়ে ত একটা মানুষ গড়া যায় না। মানুষ সামাজিক জীবও বটে। তার কর্ম্ম অহরহ অন্য ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত জড়িত। নীতিবোধ পরিস্ফুট না হলে আদর্শ নাগরিক হয়ে সে গড়ে উঠতে পারে না।

সেকালের মানুষ সারা জীবনটাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে নিত। এক একটি ভাগকে তারা এক একটি আশ্রম বলত। প্রত্যেকটি আশ্রমের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল বিভিন্ন। জীবনের প্রথম অবস্থাকে বলা হত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। আমাদের কালে এটিকে ছাত্রাবস্থা বলা যেতে পারে। তার পরের ভাগকে বলা হত গৃহস্থ আশ্রম। এই অবস্থায় মানুষ বিবাহিত হয়ে সংসারে প্রবেশ ক'রে গৃহী হত। তার পরের অংশকে বলা হত বানপ্রস্থ। এই আশ্রমে মানুষ সংসার ত্যাগ ক'রে বনে গিয়ে নির্জ্জনে বাস করত। জীবনের সবার শেষ অংশকে বলা হত যতি আশ্রম। সেই অবস্থায় মানুষ পরিব্রাজক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত। আমাদের যুগে এখন আগের মতই ছাত্রাবস্থার পরে সংসারে প্রবেশের ব্যবস্থা। তারপর সে সংসার হতে মুক্তি নাই। সংসারী অবস্থাতেই মানুষের জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা এখন শেষের দুটি আশ্রমকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শিক্ষার যা ব্যবস্থা ছিল তাও বর্ত্তমানে প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র। এখন সাধারণ ক্ষেত্রে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র অভিভাবকের সঙ্গেই বাস করে। অল্প ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু অভিভাবকের সঙ্গে বাস করাই সাধারণ ব্যবস্থা। সেকালে ছাত্র সর্ব্বক্ষেত্রেই গুরু-গৃহে বাস করত। সে ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। শিশু বড় হয়ে বালক হয়ে উঠলে তাকে পিতৃগৃহ হতে গুরু-গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে সে গুরুর সন্নিধিতে বাস করে তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করত। সেই কারণে শিষ্যের আর এক নাম ছিল অন্তেবাসী। গুরুই তার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু অর্থ পাবেন কোথায়?

সেই জন্ম শিষ্যকে ভিক্ষা করতে হত। ভিক্ষা ক'রে যা সংগ্রহ হত তা গুরুর সংসারে যেত এবং সেই অর্থে গুরুর সংসারেই সে প্রতিপালিত হত।

এই ভাবে গুরুর গৃহে শিষ্যকে কম ক'রে বার বৎসর বাস ক'রে বিদ্যা চর্চ্চা করতে হত। গুরু যখন শিষ্যের বিদ্যার অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্ট হতেন, তখন সে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পেত। এই ভাবে শিক্ষালাভ শেষ ক'রে গুরুগৃহ হতে পিতৃগৃহে যাবার নাম ছিল সমাবর্ত্তন।

কিন্তু সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরু শিষ্যের আর একটি পরীক্ষা নিতেন। তা হল নীতি বিষয়ে তার জ্ঞান পরিস্ফুট হয়েছে কিনা এই বিষয়। শিষ্যের নীতিবোধ যে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, এ বিষয় সন্তুষ্ট হলে তবেই তিনি শিষ্যের সমাবর্ত্তনে অনুমতি দিতেন। তবেই শিষ্য পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি পেত। তার কারণ সেকালের লোক নীতিশিক্ষার উপর জোর দিত খুব বেশী। এই শিক্ষা না হলে তারা শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল মনে করত।

এই কারণে সমাবর্ত্তনের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে গুরুর শিষ্যকে উপদেশ দেবারও একটা ব্যবস্থা ছিল। সে সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা উপনিষদের এক জায়গায় পাওয়া যায়।

লেখা আছে বেদ পাঠ শেষ হলে পর আচার্য্য অন্তে-বাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন। যা উপদেশ দিচ্ছেন তার সব কথা উদ্ধৃত করতে গেলে একটা লম্বা তালিকা হয়ে যাবে। কিন্তু তার যা সারমর্ম্ম তা তার একটি অংশ হতে পাওয়া যাবে। সেই অংশটিই এখানে উদ্ধৃত করা যাক। আচার্য্য বলছেন—'যানি অনবদ্যানি কর্ম্মানি। তানি সেবিতব্যানি॥ নো ইতরাণি॥' যে কর্ম্ম অনবদ্য তাই তুমি করবে। অন্য কর্ম্ম করবে না।

এই অনবদ্য কর্ম্ম কথাটির তাৎপর্য্য অনেক। এই-টুকুর মধ্যেই অনেকখানি বলা হয়ে যায়। যে কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন দোষ ধরা যায় না তাই হল অনবদ্য কর্ম্ম। যে কর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন দলের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের হানি করে না, কেবলমাত্র সেই কর্ম্মই প্রতিকূল সমালোচনার বিষয় হয় না। তাই হল অনবদ্য কর্ম্ম। এইভাবে কর্ম্ম করবার কৌশল যিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে বৈকি। তিনি সমাবর্ত্তন ক'রে পিতৃগৃহে ফিরে সমাজের মানুষ হয়ে বাস করবার অধিকার নিশ্চিত পেয়েছেন।

এই আচার্য্য ও অন্তেবাসীকে কেন্দ্র ক'রে সমাবর্ত্তন সম্বন্ধে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। সেটি পাঠককে উপহার দেবার লোভ সংবরণ করা যায় না।

সেকালে প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্যাদানের জন্য এক আশ্রম খুলেছিলেন। সেখানে একবার তিন জন বিদ্যার্থী একই সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য এসেছিল। তাদের একজন ছিল দেবতা, একজন মানুষ এবং তৃতীয় জন ছিল অসুর। প্রজাপতি তাঁর আশ্রমে তাদের শিষ্য ক'রে নিলেন।

তারপর সেই আশ্রমে প্রজাপতির গৃহে দীর্ঘ বার বৎসর ধরে তাদের বিদ্যাচর্চ্চা চলল। বিদ্যালাভ শেষ হয়ে যখন সমাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হল, গুরু তাদের ডেকে পাঠালেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তখনকার রীতি অনুসারে এই সময় শিষ্যের গুরুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করবার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম ডাক পড়ল দেবতা শিষ্যটির। সে গুরুকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম ক'রে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, উত্তরে প্রজাপতি একটি মাত্র অক্ষর উচ্চারণ করলেন। বললেন—'দ'।

তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যা বললাম তার অর্থবোধ হয়েছে?

শিষ্যটি বেশ সপ্রতিভ, গুরুর সন্নিধিতে বাস ক'রে বুদ্ধিও তার বেশ শাণিত হয়েছিল নিশ্চয়। উত্তরে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

কি বলেছি?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন 'দাম্যত' অর্থাৎ আত্মদমন কর।

তারপর মানুষ শিষ্যটির পালা। সে গুরুকে প্রণাম ক'রে উপদেশ চাইল।

গুরু উত্তরে আবার সেই একই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করলেন। আবার বললেন, 'দ'।

খানিক পরে তাঁকেও আবার প্রশ্ন করলেন, যা বললাম বোধগম্য হয়েছে ত?

আজ্ঞে হাঁ।

কি বুঝেছ ?

আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন 'দত্ত' অর্থাৎ দান কর।

এবার সবার শেষে অসুর শিষ্যটির পালা।

শিষ্যটি যখন প্রণামপুর্ব্বক তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা ক'রে দাঁড়াল তখন গুরু তাকে সেই এক অক্ষরে সম্পূর্ণ একই উত্তর দিলেন, 'দ'।

তারপর পূর্ব্বের মত তাকে প্রশ্ন করলেন, কি বুঝলে ?

শিষ্য উত্তর দিল, আপনি উপদেশ দিলেন 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ দয়া কর।

সব শিষ্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে যাবার অনুমতি পেল। স্বয়ং প্রজাপতির নিকট যাদের শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের বুদ্ধি শক্তির উৎকর্ষ যে সাধিত হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। একই অক্ষর হতে উপদেশের শিষ্যবিশেষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল ঠিক। তাই সে উত্তর গুরুকে সন্তুষ্ট করেছিল।

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, একটা গুরু-গম্ভীর ভাব তখন আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। আকাশে তখন সূর্য্য দেখা যায় না, সমগ্র গগনব্যাপী বিপুল মেঘের বিস্তার তার আলোকে নিস্তেজ ক'রে দিয়েছে, সেই গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা যায়। তখন মেঘ কি বলে ?

উপনিষদে লেখে, মেঘ বলে 'দ দ দ'।

কেন বলে ? কেন বলে তার উত্তরও উপনিষদ দিয়েছেন। তা হল এই :

সেই যে কোন আদিকালে প্রজাপতি তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দ দ দ', এ তারই প্রতিধ্বনি। যুগ যুগান্তর ধরে মেঘে ঢাকা দিনে নূতন ক'রে তাকে শোনা যায়। দেবতা অসীম ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে বিশ্বের কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আত্ম দমন করতে। মানুষ বড় লোভী জীব। ভোগ করতে সে নিত্য উন্মুখ। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দত্ত', দান কর, যা পাও তা ভাগ ক'রে ভোগ কর, একা ভোগ কোরো না। আর অসুর স্বভাবত হিংসাপরায়ণ, এই প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিলে অন্যের উৎপীড়ন হবার সম্ভাবনা। তাই তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দয়ধ্বম্', সকলকে দয়া কর, তা হলে হিংসা-বৃত্তি বশে থাকবে।

সেই জন্যই নাকি মেঘ বছরে বছরে প্রজাপতির সেই উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আমাদের বলে, 'দ দ দ—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি।'

যে পরম শক্তি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমাদের স্থাপন করেছেন তাঁর বাণী যে বজ্রে এমন ক'রে নির্ঘোষিত হয় কে জানত ? উপনিষদের ঋষির গভীর মনীষা না হলে তাঁর সেই বাঁশির বাণী কার হৃদয়ঙ্গম হত ? স্তনয়িত্নুর এই দৈবী-বাক আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃত রয়ে যেত।

আমাদের মধ্যেই নানা ধরণের মানুষ আছে। কেউ অসীম ক্ষমতার অধিকারী, কেউ লোভী, কেউবা হিংসা-পরায়ণ। আবার এক মানুষই ভিন্ন অবস্থায় কখনো ক্ষমতাবান, কখনো লোভী এবং কখনো হিংসায় উন্মুখ হয়। সেকালের সেই প্রজাপতির উপদেশ আমরা পালন ক'রে চললে সমাজ অনেক সম্মার্জ্জিত হয় নাকি ?

বিরহ

কীর্ত্তন—তাল লোফা

যারে ভুলিবারে চাই ভুলিতে না পাই
এ কি জ্বালা হ'লো সখি !
মুদিলে এ আঁখি তারেই নিরখি
জাগিয়া স্বপন দেখি।
দীঘি-কালোজল শ্যাম-বনতল
আজি সকলি শ্যামায়মান
চোখের কাজল বুকে জেগে রয়
তবু, পাষাণে জাগেনা প্রাণ।
এ মনকাননে জাতী যূথী-বনে
শুধু বনমালী হেরি—
যেদিকে তাকাই নিয়েছে সে ঠাঁই
কেমনে ভুলিতে পারি।
বিধুরা-বিহগী সারা নিশি জাগি
কাঁদিয়া ডাকিয়া যায়—
পিউ কাঁহা পিউ কাঁ—হা
প্রিয়তম পরাণ বঁধু কোথায় !
রাঙা-অনুরাগে কিংশুক জাগে
সুখের-পরাগ মাখি
নীল্-যমুনায় চাঁদ ডুবে যায়
কপালে কলঙ্ক লেখি।

কথা : শঙ্করানন্দ ঠাকুর

সুর ও স্বরলিপি : রবিদাস কর

সুরপরিচিতি—উদারা—স । মুদারা—স তারা—র্স মিড়—

গ ম I প ধর্স র্স | নর্স ধম পর্ব I গ ম ধ | ধ নর্ধ প I
যা রে ভু লি বা রে চা ই ভু লি তে না পা ই
এ ম ন কা ন নে জা তী যূ থী ব নে

I প প ধন | পধ গ ম I ধ প - | - I
এ কি জা লা হ লো স খি - -
শু ধু ব ন মা লা হে রি - -

প প II প ধ র্স | র্স র্স I ধ র্স র্র | র্র র্র র্র
আ মি মু দি লে এ আঁ খি তা রে ই নি র খি
যে দি কে তা কা ই নি য়ে ছে সে ঠাঁ ই

র্সর্গ র্র র্স | র্সন নধ ধগ I ধ র্স - | - - স II
জা গি য়া স্ব প ন দে খি - - - -
কে ম নে ভু লি তে পা রি -

I স সর র | প প প I পম ধপ পম | গ র - I
দী ঘি কা লো জ ল শ্যা ম ব ন ত ল
বি ধু রা বি হ গী সা রা নি শি জা গি
রা ঙা অ নু রা গে কি ং শু ক জা গে

I র গ ম | প পণ ধ I প - - | - - - I
স ক লি শ্যা মা য় মা - - - - ন্
কাঁ দি য়া ডা কি য়া যা - - - - য়
দুঃ খে র প রা গ মা - খি - - -

II গ মর্ধ ধ | ধন নধ প I প ধন র্সধ | ন ধন ধপ I
চো খে র কা জ ল বু কে জে গে র য়
পি উ কাঁ হা পি উ কাঁ হা প্রি য় ত ম
নী ল্ য মু না য় চাঁ দ ডু বে যা য়

I স র ম | প ধ ন I ধপ - - | - - - I
ম মপ প | প মধপ ধপ I গম - - | গ র স II
পা খা লে জা গে না প্রা - - - - ণ
প রা ণ ব ধূ কো থা - - - - য়
ক পা লে ক লং ক লে - খি - - -

সমাজশিক্ষার সওয়াল

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

সভ্যজগতের সর্বত্রই শিক্ষায় মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। শুধু স্বীকৃতিই নয়, জগতের সভ্য রাষ্ট্রমাত্রেই শিক্ষাকেই আজ সার্বজনীন ও সর্বজনভোগ্যা করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল প্রয়াস চলিতেছে। সার্বজনীন শিক্ষার তাগিদ আজ যেমন অনিবার্য ভাবে অনুভূত হইতেছে, পুরাকালে ততটা কোন দিনই হয় নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সভ্যতারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, গ্রাম-কেন্দ্রিক ও ভূমিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যে সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বাস করিত, সে পরিবেশের চাহিদা মিটাইতে মানুষকে ক্বচিৎ নিজ গ্রাম-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইত। গ্রাম-সমাজ ছিল প্রায় আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দু'চারজন দেশজয়ী রাজা, দুঃসাহসী সওদাগর বা সৌখীন অনুসন্ধানী দেশ-পর্যটকের কথা বাদ দিলে একথা বলা চলে যে 'সাধারণ' লোকের কাছে নিজ গ্রামের বাহিরের জগতটাই ছিল প্রায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত। স্বল্পে তুষ্ট জীবন যাত্রায় বহির্জগতের সহিত কোন যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা অনুভূত হইত না। শিক্ষার ক্ষেত্রও ছিল ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত। জীবন যাত্রা সমস্যা আজিকার মতো এতো জটিল হইয়া উঠে নাই। সরল সাদাসিধা জীবনে যে সামান্য শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সে শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার অনুকূলেই লাভ করা সম্ভব হইত। পল্লী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই। সেই পাঠশালার শিক্ষাটুকুই সহজ-লভ্য ছিলনা এবং উহা অর্জন করিতেই হইবে তেমন কোন তাগিদও ছিলনা। সংস্কৃতিমূলক উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল আরও সঙ্কীর্ণ। রাজদরবার, অভিজাতমহল, মধ্যযুগীয় মঠ-মন্দির ইত্যাদির আওতার বাহিরে কাব্য-কলা-সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনা-অনুশীলনের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ছিল। শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীন করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয় মাধ্যম—ছাপাখানা ও কাগজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূর্জপত্র বা হাতে-তৈরী কাগজে লিখিত কাব্য-সাহিত্য আজিকার দিনের মতো হাজার হাজার লাখ লাখ পাঠক-পাঠিকার পাঠতৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ হইত না। মহাকবি কালিদাসের কাব্য-ঝঙ্কার যে প্রধানতঃ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মনোরঞ্জনেই উদ্গীত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ কি! বিজ্ঞানের আনুকূল্যে আজ আর মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নাই। দেশ-দেশান্তরে উহা প্রকীর্ণ হইতেছে। কালিদাসের কাব্য, সেক্সপীয়ারের নাটক, বিটোভেনের সুর দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাশ্চাত্যদেশগুলিতে সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রথম উদ্যম দেখা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতির বহু রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিতে লাগিল, নানা শক্তি মানুষের করায়ত্ত হইল, পার্থিব জগতের নানা সম্পদে মানুষের অধিকার জন্মিল। এক কথায় মানুষ যেন দৈন্য-দুর্দশার যুগ উত্তীর্ণ হইয়া এক বৈভবের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবীর ধন সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, মানুষের জীবনের মান উচ্চতর হইয়া উঠিল, এবং কেবল পার্থিব অর্থেই নহে মানসিকতার দিক দিয়াও মানুষ বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাইল। যে বহিঃপ্রত্যক্ষ ঘটনাপুঞ্জ এই বিরাট পরিবর্তনের মূলে—ইতিহাসে তাহার নাম শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)। বিগত শতকে ইংলণ্ডের কথাই বিবেচনা করা যাউক। অনেকাংশেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত ভারতের বর্তমান অবস্থার বেশ একটা আনুরূপ্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমিধনিষ্ঠ সমাজ শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় কেন্দ্রচ্যুত হইতেছে। বড় বড় শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। ভূমিহীন শ্রমজীবী শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া আসিতেছে। জীবনের সনাতন মান ও মূল্যবোধ নূতন মান ও মূল্যায়তনকে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। জীবনসমস্যা জটিলতর ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। গ্রামজীবনের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, স্বপ্ন ও সত্যকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। বিশ্ব-জগতের সীমানা আজ বহুদূর বহুদিকে সম্প্রসারিত।

শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই সভ্য, প্রগতিশীল দেশগুলি সার্বজনীন জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে; আগে যে বিশেষ ধরণের শিক্ষা রাজদরবার, অভিজাত মহল বা মঠ-মন্দিরে অনুশীলিত হইত তা'দ্বারা শিল্প-প্রধান সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। শিক্ষা-ধন্য মুষ্টিমেয়ের বদলে সমষ্টির শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নিত্য নূতন আবিষ্কার, কলকারখানা পরিচালনার নিত্য নব কৌশল, শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত করিল। সাধারণ মানুষ নূতন গণ-তান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্ত হইল। ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিল। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে "মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন" নামে খ্যাত এক উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে তদানীন্তন লিবারেল দলনেতা বিখ্যাত রাজনীতিক উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্লাডস্টোনের উক্তি: "Educate your Masters" —বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। নূতন রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই অধিকারের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার তাগিদ আসিল। ইহা সার্বজনীন শিক্ষার একটা বড় তাগিদ। অজ্ঞ নাগরিকের কাছে তাহার দায়িত্ব ও অধিকার মূল্যহীন। নাগরিকতার মূল সংজ্ঞাই হইতেছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি জনসাধা-

রণের নাগরিকতা বোধ। শিক্ষা ভিন্ন বর্তমান যুগে সামাজিক-চেতনার উন্মেষ হইতে পারে না। তাই সার্বজনীন জনশিক্ষা গণতন্ত্রের মূল নীতির অন্যতম। ভারতীয় সংবিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যেক শিশুকেই একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে শিক্ষালাভ করিতে হইবে—এইরূপ একটা বিশেষ অনুচ্ছেদ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে।

উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব, ভূমি সংস্কার, ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদির সহিত প্রায় যুগপৎ সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৮৩২ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—পঁয়ত্রিশ বৎসর এই অগ্রগতির কাল। এই সময় হইতেই ইংলণ্ডে জনশিক্ষা সর্বব্যাপকতা অর্জন করে।

আজ আমরা ভারতবাসী অনেকটা সেই উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই নাই কি? প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিল্প ও উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধিসাধন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, দেশও সমাজ পুনর্গঠন ইত্যাদি বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আসমুদ্র হিমাচল সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু তাগিদ দেখা দিয়াছে। আমরা অতি দ্রুততালে যে যুগান্তরের অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিতেছি দেশের আপামর জনসাধারণকে সেই দ্রুতগতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে না শিখাইলে অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সেদিন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শতবর্ষপূর্তির সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী তাঁহার ভাষণে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। বাখরা নাঙ্গালের বিরাট বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়াছেন জওহরলালজী। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কিছুই দেখিতেছেন পরম আগ্রহের সহিত। সঙ্গে বহুলোক—ইঞ্জিনীয়ার, টেক্‌নিসিয়ান, অ্যাড্‌মিনস্ট্রেটর প্রভৃতি। ইহারা প্রায় সকলেই একটু মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই প্রধানমন্ত্রীকে নানা বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। মাটি কাটিয়া পর্বতপ্রমাণ বাঁধ তৈরি করা হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহটির বিপুল কলেবর বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছে। আর অদূরে একদল স্ত্রী ও পুরুষ মজুর কর্তিত মাটি ঝুড়িতে বহন করিয়া নির্মীয়মান বাঁধের উপর ফেলিতেছে। সহসা জওহরলালজী অত্যুৎসাহী অফিসার-গণকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নের সহিত এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা ঐ নিরক্ষর শ্রমিকদের কাছেও কি এই পরিকল্পনার মূলবাণীটি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন?" অফিসারগণের নেতি বাচক উত্তরে জওহরলালজী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ঐ স্ত্রীপুরুষ শ্রমিকদিগের কাছে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত, এখানে যে কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?" তাহারা বলিল, "হুজুর আমরা মাটি কাটি, তার বেশী কিছুই আমরা জানিনা।" প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যটি, বুঝাইয়া দিলেন যে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকদল সন্তুষ্ট হইল। এতোদিন যাহারা কলুর বলদের মতো মাটির বোঝা বহিতেছিল আজ যেন তাহাদের অজ্ঞতা ঘুচিয়া গেল। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনশিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের উপর। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের উক্তিটিও বিশেষ অর্থবাচক: "Illiterate masses can have no Socialism."

সর্বব্যাপক জনশিক্ষার স্বপক্ষে রাজনৈতিক সওয়াল ছাড়া অন্য যুক্তি প্রাবল্যও কম নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ বিপুল পার্থিব সম্পদ এবং মানসৈশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু এই অপরিমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সাধারণ মানুষের দৈন্য ও রিক্ততা অবর্ণনীয়। বিশ্বসংস্কৃতি সংসদের (Unesco) খতিয়ানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাধিক মানুষ এখনও নিরক্ষর শিক্ষাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত; আর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই চরম দারিদ্র্যদশায় জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে। মানুষের এই নিদারুণ দৈন্যদশা কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ—তাহা নহে। মানসৈশ্বর্যের ভাগ হইতেও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। যতদিন অবধি শিক্ষায় মানুষের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিনই এই দুরবস্থা কায়েম থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী। কতো নূতন ভাবধারাই না এই মহানগরী হইতে উৎসারিত হইয়া সারা ভারতময় নব নব আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে! বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, আনবিক বিজ্ঞানাগার, জাতীয় গ্রন্থশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী এবং আরও কতো উচ্চাঙ্গীয় শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান এই মহানগরীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। কতো মনীষী, কতো চিন্তানায়ক, কতো সাহিত্যস্রষ্ঠা, কতো কবি, কতো দার্শনিক, কতো রাজনীতিক, এই মহানগরীর ধূলিপুঞ্জকে তীর্থমাহাত্ম্যে মহিমান্বিত করিয়াছেন! কিন্তু এই বিপুল মানসোৎকর্ষের প্রসাদ সাধারণ কলিকাতা-বাসী তথা দেশের জনসাধারণের ভাগ্যে কণামাত্রও কি জুটিতেছে! গজদন্তনির্মিত গম্বুজে সাধারণের নাগালের বাহিরে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা কি চিরকাল সংকুচিত হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীরই কি জাতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধ ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার নাই! এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যছন্দের অভিব্যক্তি, আর ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সুরঝঙ্কারের অনুরণন, কি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কাব্য-ব্যঞ্জনা, কি অবনীন্দ্রনাথের লীলায়িত তুলিরেখা—যাহা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—উহা কি কেবল মুষ্টিমেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যই!

শিক্ষার ক্ষেত্র-পরিধি যতোদিন সঙ্কীর্ণ ছিল ততোদিনই জন সমাজের বৃহত্তর অংশটি এক অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্রের মতোই অজ্ঞাত, অসার্থক অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আজ সেই অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া নব নব রত্ন-মাণিক্য আহরণ করিবার সময় আসিয়াছে। জন-শিক্ষাই এই জনসমুদ্র মন্থনের মন্থন দণ্ড। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দ্বারাই জাতি ও সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই ইউরোপ খণ্ডের ক্রমোন্নতিশীল দেশ-গুলিতে শৈশব-কৈশোর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষার কথাও শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবিগণের মনোযোগ আকর্ষণ

করে। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত বয়ঃসীমানার বহির্ভূত সংখ্যাগুরু প্রাপ্ত-বয়স্কগণের শিক্ষার অথবা Adult education এর স্বপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি—জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষার শেষ নাই; যতোদিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে ততোদিনই তাহার শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষ প্রগতিশীল। নিত্য নব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান শিক্ষারই নামান্তর। প্রতিনিয়তই মানুষ এই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতেছে এবং এই খানেই মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রথমে এডাল্ট এডুকেশন কথাটার মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণ-ব্যঞ্জক অর্থ অর্থ নিহিত থাকিত। অর্থাৎ যাহারা আর্থিক বা সামাজিক অন্তরায়-বশতঃ যথা সময়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত থাকিত, অধিক বয়সে তাহাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকেই এডাল্ট এডুকেশন বলা হইত। এই এডাল্ট এডুকেশন প্রকৃত পক্ষে অক্ষরপরিচয়ের প্রতিশব্দ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এডাল্ট এডুকেশন আন্দোলন অচিরেই একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সংজ্ঞা লাভ করিল। কেবলমাত্র লিটারেসি বা লিখন পঠনক্ষমতার কার্যকরী মূল্যের অকিঞ্চিৎ-করতা সহজেই অনুমেয়। বৃহত্তর শিক্ষা ও জ্ঞান-রাজ্যের অপরিহার্য ছাড়পত্র হিসাবে লিটারেসির মূল্য অসীম! কিন্তু গৃহের সিঁড়ি যেমন গৃহ নহে, লিটারেসিও তেমনি শিক্ষা নহে। যে ব্যক্তি কোনও ক্রমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছে তাহাকেই সাক্ষর বলা হয়, কিন্তু সদ্য-সাক্ষরের নামসহির মূল্য কতটুকু! নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষরের বদলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিয়া থাকে? টিপসহি অনমুকরণীয়, কিন্তু সদ্য সাক্ষরের স্বাক্ষর সেদিক দিয়া আদৌ নির্ভর যোগ্য নহে। কাজেই অক্ষরপরিচয় শিক্ষার আবশ্যিক প্রথম ধাপ হিসাবেই মূল্যবান উপায় কিন্তু উদ্দেশ্য নহে। অল্প-বিস্তর প্রারম্ভিক চেষ্টার ফলে অক্ষরগুলিকে আয়ত্ত করিয়া নিরক্ষর নাম ঘুচান সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী নিত্য-অনুশীলন ব্যতীত এই সন্তোলব্ধ লিখন পঠন কৌশল স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বাস্তব উপকারও সাধিত হয় না।

তাই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পরবর্তী অনুশীলন। আজ শিক্ষাজগতে যে কয়টি মূলনীতি গৃহীত ও অনুসৃত হইতেছে তাহার অন্যতম কথা জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সাক্ষরতা অর্জনের পরবর্তী অনুশীলন জীবনব্যাপী শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত। যেমন একক ব্যক্তির তেমনি সমগ্রভাবে সমাজের শিক্ষারও প্রয়োজন। তাই আজ সমাজ-শিক্ষা কথাটা একটা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থের দ্যোতক। শৈশব হইতে বার্ধক্যের শেষ সীমানা পর্যন্তই শিক্ষানুশীলন অব্যাহত চলিতে পারে। কাল ধর্মে এবং অবস্থা বৈগুণ্যে অবশ্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির তারতম্য হইবে, এবং শিক্ষার মাধ্যমও হইতে পারে বহু প্রকারের। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ চলিবে শিক্ষার প্রসারে। শিক্ষা পদ্ধতি হইবে কালানুগ। আবার প্রচলিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহারও ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাহ্য করা চলে না। চলচ্চিত্র, বেতার যন্ত্র এবং টেলিভিশনকে শিক্ষার সহায়ক ও সম্পূরক হিসাবে ব্যাপক ব্যবহার করা হইতেছে। দেশজ ঐতিহ্যের ধারক কীর্তন, কথকতা, মেলা, যাত্রাগান ইত্যাদিও আধুনিক শিক্ষা-মাধ্যম-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রয়োজনবোধে প্রাচীন মাধ্যম গুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-অর্জনের পর যে ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, সেই বিপ্লবের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে ভারতীয় জনগণের চিত্তের উদ্বোধনে। এই মূল সত্য কথাটি কোন নৈয়ায়িক-সুলভ তর্কের অপেক্ষা রাখেনা। জাতীয় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন বিস্তার দ্বারাই জনচিত্তের উদ্বোধন সম্ভব। তাই সমাজশিক্ষার প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে।

পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষার যে সুনির্দিষ্ট বাঁধা পথ রহিয়াছে একদিকে দেশের শিশু-কিশোর-যুবা প্রত্যেককেই সেই পথগামী হইবার সুযোগ দিতে হইবে। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকটি শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বহুলাংশেই স্বয়ংপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তেই অন্ততঃ ৭৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাপথে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। বাকি পঁচিশ জন মাত্র শিক্ষার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারী। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথি-কেন্দ্রিক না করিয়া শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতার পরিপোষক এবং সৃজনধর্মী করা আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী সোপান মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও স্বকীয়তা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাও একমুখী না করিয়া বহুমুখী করাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশাসন। মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চতর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাও বহুধারাবিশিষ্ট। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে একটা খুব বড় কথাই হইতেছে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিপোষণ।

আবার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে মোট জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ রহিয়া গেল তাহাদের জন্য এবং যাহারা স্কুল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে তাঁহাদের জন্যও এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকিবে যাহার দৌলতে মানুষের মনকে সদা-জাগ্রত ও সদা-সক্রিয় রাখা যায়।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বহুলাংশে আজ মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রযোজনা করিতেছে। গ্রন্থাগার আর কেবলমাত্র অবসর-বিনোদক হাল্কা সাহিত্যের বেসাতি করিয়াই নিজ উদ্দেশ্যে সাধন করিতে পারে না। গ্রন্থগারের দায়-দায়িত্ব আজ বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবন-পরিবেশের সহিত সমান তালে চলিবার পাথেয় জোগায় গ্রন্থাগার। সমাজ শিক্ষার বাহক হিসাবে লাইব্রেরী আজ অপরিহার্য।

ব্যাপক সমাজশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ পৃথিবীর অন্যত্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক সরকার

উত্তরেই সমাজ শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সম্প্রসারণ প্রোগ্রামে সমাজশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজ সংগঠক ও সংগঠিকাগণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এই প্রোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি একশটি বা কিঞ্চিদধিক গ্রাম লইয়া এক একটি উন্নয়ন-অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। অদ্যাবধি এইরূপ ১০৩টি ব্লক বা অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক-বিষয়, চলাচল ও যানবাহন, সামাজিক সংহতি, জলসেচ, কৃষি, লোকশিল্প ইত্যাদি নানা দিক হইতে দেশ-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংহত করা সমাজ শিক্ষার দায়িত্ব। এই বিরাট বিপ্লবাত্মক কর্ম যজ্ঞের সহিত জনচিত্তের সংযোগ সাধন করা সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজ শিক্ষার আনুকূল্যেই নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্ভবপর হইবে। সমাজ শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যত অগ্রগতির পথ নির্দেশ করিবে।

সর্বোদয় সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসবাদ

শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক হৈ চৈ যথেষ্ট থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তাধারা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা নাই। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন অর্থাৎ জনগণকে ইন্ধনকাষ্ঠরূপে ব্যবহারের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী কিছু ভাবতে দিতে নারাজ। সীমাবদ্ধ-ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা যা আলোচনা করেন তাও হয় একদর্শী। Comparative study বা বিচার ধারণা দেশ থেকে একেবারে উঠে যাচ্ছে বল্লেই চলে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মতধারা বিচার করে যাকে জনসাধারণ শ্রেষ্ঠ মনে করবে এইভাবেই দেশ সংগঠিত হয়ে উঠুক এই হওয়া উচিত।

পৃথিবী আজ তিনটী শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে—(১) পুঁজিবাদ (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (৩) সাম্যবাদ।

পুঁজিবাদীরা বলেন যাহার কর্ম্মক্ষমতা বেশী তাহাকে বেশী দাও, যাহার কর্ম্মক্ষমতা কম তাহাকে কম দাও। আর এইভাবে সমাজের যোগ্যতা বৃদ্ধি কর। তাঁহারা বলেন—যারা কর্ম্মদক্ষ নহে তাহাদিগকে দুঃখকষ্ট অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আর যাহারা যোগ্যতাসম্পন্ন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার অধিকার তাহাদেরই থাকিবে। ইহার ফলে কিছুমাত্র লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইলেও অধিকাংশেরই জীবন অবনতির অধঃস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। একথা মহানগরীর সৌধের পাশেই বস্তি, ও ডাষ্টবিন হইতে খাদ্য অন্বেষণের করুণ দৃশ্য দেখিলেই বোঝা যায়। এর অনিবার্য্য পরিণতি এসে পড়ে শ্রেণী-সংগ্রাম ও পরস্পরের হিংসায়। পুঁজিবাদের হাতে এর কোন প্রতিকার নাই।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভোটের জোরে কাজ চলিয়া থাকে। সমাজ কল্যাণের জন্য সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার এর একমাত্র হাতিয়ার। একশটীর মধ্যে ৫১টী ভোট কোনক্রমে যদি একদিকে যায় বাকী ৪৯টী ভোটের আর মূল্য থাকে না। তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা হয় না। এবং ভোট-যুদ্ধে জেতার পর তারা নিজেদের ইচ্ছা জনসাধারণের ইচ্ছা বলিয়া চালান ও সেইরূপভাবেই কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা এক অত্যন্ত গোলমালের শব্দ—যার পঞ্চাশ রকম অর্থ হইতে পারে—এর ব্যাখ্যার উপর। ভারতের পুঁজিবাদীগণ বলছেন যে তাঁরাও সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা সমর্থন করেন। আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলেন যে এখন এই শব্দের দ্বারা আর বেশী কিছু উন্নতি হবে বলে তিনি মনে করেন না।

গত মাসের এ,আই,সি, সি প্রকাশিত ইকনমিক রিভিউতে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমন নারায়ণ তাঁর "Need for Ideological Clarity শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন...... "but the word and phrases do not convey a very definite connection and therefore fail to evoke necessary enthusiasm among the masses. Even the Avadi Resolution on the Socialistic Pattern of Socleity is gradually losing its appeal."

আবার সমাজবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর ঝগড়াকে স্বীকার করে নিয়েছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্র বলে কর্তৃপক্ষেরা নিজেদের মধ্যে যে শলাপরামর্শ করেন, তার স্তরও নানাকারণ বিশেষে সময়কার স্তরের থেকে বিশেষ উন্নত নয়। হলে অবশ্যই আনন্দের বিষয় হ'তো। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে শুধু তাই নয়, একই দলের মধ্যের কর্তৃপক্ষের, একের উপর অন্যের অবিশ্বাস, উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় ইত্যাদি যা আমরা দেখি তাতে অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

সাম্যবাদী সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিন্তু তা শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। হিংস্র বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যাবে ফ্রান্সে ও রাশিয়াতে এই বিপ্লব সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নাই। অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিবিপ্লবে একদেশের

হ'য়েছে পুনর্মূষিক অবস্থা, আর একদেশে হ'য়েছে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। হিংসা হইতেই প্রতিহিংসার উদ্ভব হয়। হিংসার কারণে মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য লুপ্ত হয়, প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়। আর একটী কথা পুঁজিবাদের কুফলেই প্রতিক্রিয়া ও সাম্যবাদের উদ্ভব। যাহা কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া থেকে হয় তার কার্য্যকারিতা ও স্থায়িত্ব চিরন্তন হতে পারে না। এটা একটা তৎকালিক ঘটনামাত্র।

সমাজতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আর একটী বিপজ্জনক ফল হ'চ্ছে যে মানব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ায় বিরাটতম রাষ্ট্র দৈত্যকে খাওয়ান পরানর ভার জনগণের স্কন্ধে চাপে। এর ফলে জনগণের অধিকাংশ উৎপাদনই নিঃশেষিত হয়ে যায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য সমাজের এক বিরাটতম অংশ অনুৎপাদক হয়ে যাচ্ছে। অনুৎপাদক হলেও তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার দাবী আজ সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হচ্ছে। এই ভাবে শাসন ব্যবস্থা আজ সমাজের এক বিরাটতম শোষক ও হিংসা সংস্থায় পরিণত হ'য়েছে।

গান্ধীজী প্রমুখ মহাত্মারা স্বাধীনতার পূর্ব্বেই এই সকল অবস্থা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। গান্ধীবাদীরা একথা বিশেষভাবেই জানেন যে গান্ধীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো টলষ্টয় ও রাস্কিনের অমর লেখনী। এর মধ্যে টলষ্টয়ের "Kingdom of Heaven is within you" গ্রন্থ ও রাস্কিনের "Unto the last" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীজী রাস্কিনের বইটা অনুবাদ করেন এবং শিরোনামা হিসাবে বইটীর নাম হয় সর্বোদয়। সর্বোদয়ের মানে সকলের উদয় বা কল্যাণ অর্থাৎ অহিংসার পথে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা—যা শ্রেণী বা বর্ণভিত্তিক হবে না। আচার্য্য ভাবে কিছুকাল আগে বলেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য "রাষ্ট্রহীন সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করা।"

আচার্য্য ভাবে আরও বলেছেন "আজ ওয়েলফেয়ার ষ্টেট নামে সরকার সমস্ত কিছুই নিজের হাতে নিচ্ছেন। মা শিশুকে জোর করে দুধ খাওয়ান ও শিশুর কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু এই ওয়েলফেয়ার ষ্টেটও বিপজ্জনক, কারণ যদি এতে ভালো লোক থাকে তো শাসন ভালভাবে চলবে। আর খারাপ লোক থাকলে খারাপ চলবে।..."

লোকতন্ত্রে সরকার না অধম না উত্তম হতে পারে এতে রাজ্য ব্যবস্থা ডেয়ারী দুধ (toned milk) যেমন হয় তেমন হ'য়ে থাকে।

মার্কসবাদে অর্থ নৈতিক উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার যান্ত্রিক রূপান্তরের যে শাশ্বত নিয়মটি আবিষ্কার করেছেন তাকে মানুষ থেকে তাঁরা বেশী মূল্য দিয়েছেন। সমাজ বিবর্ত্তনের পথে ধর্ম, দেশপ্রেম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আঙ্গর নীতি, আবহাওয়া সবগুলিই রয়েছে, কিন্তু সেগুলি মার্কসবাদীরা বিবেচনা করেন না।

মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর New Humanism নামক উপাদেয় গ্রন্থে বলেছেন :—

"The Socialist Society was not to be created by man, it was a result automatically and inevitably from the operation of forces of production. It was to be a necessary product of the historical development.

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বহারাদের যে একনায়কত্বের কথা আছে তাতে বাইরে রাষ্ট্রীয় সর্ব্বাধিকারবাদের সম্ভাবনায় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি এসে দাঁড়ায়, যা হ'য়েছে রাশিয়াতে। ভারতও আজ যে কোন মুহূর্ত্তে রাষ্ট্র পুঁজিবাদ অর্থাৎ State Capitalismর পপ্পরে পড়ে যেতে পারে, আর অনেকটা সেদিকে চলেও যাচ্ছে।

সর্ব্বহারাদের নামে একনায়কত্ব চালান মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক—বুদ্ধিজীবীলোক. যাঁরা যে কোন উপায়েই শাসন যন্ত্র হস্তগত করেন। আর একবার গদীতে আসীন হ'লে তাঁরা স্বেচ্ছায় যে কোনদিন গদী ছেড়ে দেবেন না তা আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বুঝতে পারব। ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের গণ-শাসন প্রবর্ত্তিত করবেন বলে বিদ্রোহের নায়ক হয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত হওয়া মাত্রই নিজে ডিকটেটর হয়ে বসলেন এবং পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিলেন।

রাশিয়াতেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আজ সমাজতন্ত্রবাদের নামে নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন—হত্যা ও হিংসায় রাশিয়ার ইতিহাস শোণিতলিপ্ত ও পঙ্কিল। পশ্চিমের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন—মুসোলিনী যত নরহত্যা করেছেন তার রক্তে একটা পুকুর ভরে যেতে পারে। হিটলারের নরহত্যায় রক্তে একটা হ্রদ সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু ষ্টালিন যত নরহত্যা করেছেন তার রক্তে সাগর ভরে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা বুমারিণ, ট্রটস্কি প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের কথা জানেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন দেশের মঙ্গল এ পথে নয়।

সর্ব্বোদয়বাদীদের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন শোষণমুক্ত সমাজ এর উল্টাপথে —সত্য, শিব এবং সুন্দরের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। এর প্রতিষ্ঠা রয়েছে মানবিকতাবোধের উপর—মানুষের মানবিক বিচার ও যুক্তিবোধের উপর এর প্রতিষ্ঠা—তার অন্তর্লীন বা সহজাত নীতিবোধকে সংরক্ষিত ও শাণিত করে সমাজ মঙ্গল বিধানের চেষ্টাই এর চরম লক্ষ্য। কারণ সর্ব্বোদয়বাদীরা জানেন যে আদর্শে পৌছিবার পথ আদর্শভ্রষ্ট হয়ে নয়—আদর্শভ্রষ্টপথে লক্ষ্য ভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হওয়াই নিশ্চিত।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মধ্য দিনে

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

শরণে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কবি বলেছেন—

যো যাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ,

উলট্ জলে মছলি চলে বহ্ যায় গজরাজ।

শরণাগতের মানরক্ষা করে মাত্র মানুষ কেন, প্রকৃতির সকল শক্তি। শক্তির আবাহন আবশ্যক। জানতে হয় শরণের সন্ধান—তবে তো মাছ পারে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দিতে। গজরাজ নিজের পশু-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে, তাই তরঙ্গসঙ্কুল স্রোতস্বতীর প্রবাহে যায় ভেসে। সুতরাং শরণের প্রেরণা ও প্রয়াসের উৎসমুখ নিজ নিজ অন্তরে। যার বুদ্ধি চায় শরণ, পায় সে আশ্রয়।

শরণাগতের সভ্য-সহায়তা বর্ষিত হয় প্রবলের শক্তি-ভাণ্ডার হতে। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রণতি ভঙ্গীতে আমরা সর্ব্বমঙ্গলা প্রকৃতির দুয়ারে নিবেদন করি প্রার্থনা—

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে।

সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।

শরণাগত দীন ও পীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণ আপনার অভিষ্ট। আপনি সকলের পীড়ানাশ করেন। হে নারায়ণি! আপনাকে নমস্কার করি।

আর্ত্তমাত্র পরাপ্রকৃতির অনুকম্পার অধিকারী। কিন্তু শরণ না নিলে তো মনের গতি প্রবাহিত হয় না শুভ পথে। দীনের বা আর্ত্তের পরিত্রাণ তো তাঁর প্রকৃতি। কিন্তু শরণাগতের মতি বিশুদ্ধি লাভ করে শরণের ভঙ্গীতে। কারণ শরণ বিনাশ করে ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের দম্ভ। আমিত্বের লোপই প্রকৃষ্ট শরণ।

শরণ-তত্ত্বের সার বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে সমস্ত উপদেশের পর। অর্জ্জুনের প্রাণ উচ্ছসিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রসঙ্গের শিক্ষায়। অন্তর্যামী ভগবান বুঝেছেন সে কথা। পরম গুহ্য কথা তো অপাত্রে ব্যক্ত করা যায় না। মানব মনের অভিব্যক্তির একটা ক্রম আছে। বুদ্ধিরও স্তর আছে। মনের আলো জ্বালিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের প্রতীতি দৃঢ় হয়েছে—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।

সে সত্যসুন্দরের আনন্দলোকের পথের অতি গুহ্য সমাচার—শরণ।

তাই নররূপী ভগবান বল্লেন—

সর্ব্বগুহ্যতমঃ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ,

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষামি তে হিতম্।

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই তোমাকে কল্যাণকর বাক্য বলছি।

এ তত্ত্ব তিনি পূর্ব্বে বলেছেন। এখন পুনর্ব্বার বল্লেন—তত্ত্বটুকু বেছে নিয়ে। শিষ্য বহু কথা শোনে গুরুর মুখে। পুনরাবৃত্তি শিক্ষা বা দীক্ষা ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়। প্রণিপাতে, পরিপ্রশ্নে, সেবায় মার্জ্জিত হয় বুদ্ধি। তখন মেধাবী নীর হতে ক্ষীরটুকু বেছে নিতে পারে। বিচিত্র অনেক কথা প্রবেশ করে মনে। বুদ্ধি বোঝে কোনটি গুহ্যতম। তাই জাগালেন ভগবান সেই ভাব শিষ্যের মনে—সে সত্যটুকু বেছে নিয়ে তাঁর উপদেশ বাণী হ'তে।

তিনি বল্লেন—মদ্গতচিত্ত হও, চিত্ত যেন কৃষ্ণময় হয়—ছড়িয়ে পড়ে যেন ভগবানের চিন্তা সদাই চিত্ত মাঝে। হও আমার ভক্ত—সে ভক্তি ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে ছেয়ে ফেলুক তোমার চিত্ত। যজ্ঞানুষ্ঠান কর আমারি জন্যে—পূজার অর্থ মাত্র পূজা নয়, ভগবদপূজা। প্রকৃত পূজা প্রত্যাশা করে না কোনো ফল। যজ্ঞে আকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। কামিনী কাঞ্চন, যশ বা সমৃদ্ধি লাভের তুচ্ছ উদ্দেশ্যে যজ্ঞ ক'র না। যে আমার কাছে যা চায়, আমি তাকে দান করি সেই কাম্য ভাব। কাম্য বস্তু দানই যদি নেবে, চাও সে দান—যার ফল হবে শাশ্বত। আর আমাকেই কর প্রণাম—একত্র কর দেহ, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, নিজের, মাঝে সূত্রাকারে যে পরমাত্মা বিরাজিত তাঁর চিরানন্দ শাশ্বত চেতনায়। আমাকে পাবার লোভ করলে হবে

না—সে যে কামনা। সমস্ত মন অর্পণ কর—আমাকে মাত্র অর্পণ করছি এই কর্ম চৈতনায়। ভক্ত হও আমার—হক ভক্তি অকৈতব, অহেতুকী। যজন কর আমাকে। যজ্ঞ ফলে মতি। সে তো কামনা।

বল্লেন—তুমি আমার প্রিয় তাই গুহ্যতম কথাটা বলছি। চাইবে না পাবে। তুমি সখা প্রতিজ্ঞা করছি—মনস্তুষ্টির কথা নয়। এমন বুদ্ধি, ভক্তি ও আরাধনায় তুমি আমাকেই পাবে।*

তাহ'লে শোন গুহ্যতম সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ভাবনা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমাত্মা স্বরূপ আমাতেই শরণ লও। আমিই তোমাকে সকল পাপ হ'তে মুক্ত করব। শোকের কোনও কারণ নাই।

তিনি বুঝিয়েছেন পূর্ব্বে যে কর্ম্ম অনিবার্য্য, কিন্তু কর্ম্মফলে হ'তে হ'বে অনাসক্ত। মানুষ ভাবতে পারে, বেশ আমি অনাসক্ত হয়ে অস্ত্র চালাই—কেহ মরে না মরে, সে ফলে আমি হাঁসব না কাঁদব না। এমন অপকর্ম্ম রোধ করবার জন্য তিনি বুঝিয়েছেন যে কর্ম্ম প্রণোদিত হবে বুদ্ধির দ্বারা। কিন্তু নীরস বুদ্ধি তো মানবের সুখের বিধান করতে পারে না। কী কর্ত্তব্য কী অকর্ত্তব্য এ বিস্ময়ের বিচারে মোহ আসে মানুষের মনে। মাত্র নীরস বুদ্ধি কী পারে প্রকৃষ্টরূপে অপসরণ করতে মোহের ঘনঘোর মেঘ? কোন্ বুদ্ধি তাহলে নির্ণায়ক পথের? তিনি বুঝিয়েছেন সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান—যা লাভ করে শ্রদ্ধাবান। সুতরাং প্রাণকে আপ্লুত হবে করতে ভক্তিরসে। সেই ভক্তিই পরিচয় করিয়ে দেবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাথে। তেমন বুদ্ধি যে জীবনরথের সারথি, সে জীবন চলে কল্যাণ পথে। দেহের বা মনের পক্ষে কর্মত্যাগ সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্ম বাছতে বাছতে ভক্তিপ্রণোদিত বুদ্ধি একের পর এক কর্ম প্রেরণার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করে। ছাড়তে ছাড়তে অবশিষ্ট থাকবে এক কর্ম ঈশ্বর আরাধনা।

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। ১৮।৬৫।

বিচারফলে ত্যাগ, অভিজ্ঞতার ফলে বাঁধন কাটা ইষ্ট। তেমন কর্ম্মসন্ন্যাসের পিছনে আসবেনা আক্ষেপ বা অনুশোচনা।

সুতরাং সকল শিক্ষার শেষে বল্লেন, সংসারের নিরর্থক আশার কুহক প্রতিজ্ঞায় আশ্রয় নিয়ো না। আমার প্রতিজ্ঞায় লহ শরণ, আমার আশ্রয়ে কোনো জ্বালা, কোনো যন্ত্রণা তোমায় নাচাবেনা, ভাসাবেনা, ডোবাবে না।

এই সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে তিনি আর একবার শিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ

বুদ্ধিযোগ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্ত সততং ভব।

তুমি চিত্তের দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হ'য়ে জ্ঞানযোগ আশ্রয় ক'রে সর্ব্বদা মদ্‌গত-চিত্ত হও।

কর্ম কর, আমাকে অর্পণ কর তার ফল, জ্ঞানী হও তেমন জ্ঞানী যে জ্ঞানে তোমার চিত্তে হ'ক ভগবানে রতি। তে-রঙ্গা পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধ করলে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত।

তিনি আরও উপদেশ দিলেন গুহ্যতম শরণতত্ত্ব স্পষ্ট কথায় বোঝাবার পূর্ব্বে। সবার প্রাণের অন্তরতম দেবতা ঈশ্বর। তাঁরই মায়ায় জগতের সৃষ্টি তাই মায়ার লীলায় ঘুরে বেড়াচ্চে জীব—অন্তরের মাঝে যিনি বিরাজ করছেন সে দেবতার দিকে দৃষ্টি নাই। মায়ায় গড়া সংসারে বাহিরে দেখবার আছে অসংখ্য পদার্থ। আঁধার আকাশে তারার মত তাদের মনোহর শিখা—মিটি মিটি জ্বলছে। চক্ষু দেখে দিকে দিকে রূপের ঝলক। মুগ্ধ হয় তাদের গৌরবে। সময় কোথা অন্তরে তাকাবার। কত ছন্দ, কত গন্ধ, কত রস, কত কোমলতা ভরে রেখেছে মায়ার জগৎ। তাদের আকর্ষণ-মুক্ত হয়ে রূপের মাঝে অরূপ দেখার অবকাশ কোথা? সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধির ধ্যান কি সদা সম্ভব। তাই যন্ত্রের তালে ঘোরে জীব, চালকের সন্ধান করে না, চেতনার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ঘোরে, কিন্তু শান্তি চায়। এক একবার স্মরণ করে অন্তরদেবতায়, কিন্তু পারে না মন বাসা বাঁধতে সে অন্তরের উর্দ্ধমূল অশ্বত্থের ডালে। অথচ প্রাণ চায় শান্তি। তাই জগতকে শোনালেন শ্রীভগবান মঙ্গল বাণী—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।

হে ভারত সর্ব্বাত্মভাবে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপায় পরম শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।

তার পর বল্লেন—আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য জ্ঞান ব্যাখ্যা করলাম। নিঃশেষরূপে একে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তা' কর।

এখানেও আজ্ঞা নাই, অজ্ঞানে আশ্রয় নেবার নির্দ্দেশ নাই। জ্ঞানে কর্ম্ম বিচার। সেই বিচারের ফলে নির্ণয় করতে বলা হ'য়েছে কর্ত্তব্য পথ। আশ্রয়ই শান্তির নির্ম্মল জ্যোতির রাজ্য, আনন্দধাম।

মানুষ সিদ্ধি পায় স্বকর্মের দ্বারা তাঁর আরাধনা ক'রে। সর্ব্বভূতের প্রবৃত্তি তো আসে তাঁর নিকট হ'তে, এই ভূমণ্ডলে অনু হ'তে অনুরূপে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি।

সত্যই তো জীব তাঁর আশ্রয়ে। কিন্তু সে আশ্রয়ের অপূর্ব্ব কল্যাণ তো বোঝেনা জীব। বাহিরের সুখ-দুঃখের উপলব্ধি হ'লে মনে প্রাণে বোঝে তারা পরিবর্ত্তনশীল, স্বল্পায়ু। তাই চিত্ত যখন শরণ লয় তখন উপলব্ধি হয় শরণের। মনে হয় সত্যই তো জগৎ তাঁরই আশ্রিত। পাপের বিভীষিকা, নৈরাশ্যের ব্যথা, ভাঙ্গা প্রাণের বেদনা এরা তো অলীক। আমার নিবাস যে তাঁর আশ্রয় ভূমিতে। তাই শরণ—বিস্মৃতির অবলুপ্তি প্রকৃত আশ্রয়ের স্মরণে। পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে, নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই।

পরমাত্মবুদ্ধিতে শরণ না নিলে তো নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায় না। প্রথমেই তাই ভগবান বলেছেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ।২।৪৯।

কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির শরণাগত হও। ফলের আশায় যে কর্ম্ম সাধিত হয় সে কর্ম্ম নিকৃষ্ট।

তাই স্থিতপ্রজ্ঞ হবার সন্ধান দিয়েছেন ভগবান। বলেছেন—সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত কর, মৎপর হও, মাত্র আমাকেই ভক্তি কর, আমাতে সমাহিত হও। ইন্দ্রিয় যার বশে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।*

বিভূতি বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম।

একবার অন্তরে দৃষ্টি দিলে কি আর বুঝতে বাকি থাকে যে তিনি গতি, তিনিই পোষণকর্ত্তা। তিনি প্রভু অথচ দ্রষ্টা। তিনিই নিবাস, তিনিই শরণ এবং সুহৃদ্। উৎপত্তি এবং সংহারের কারণও তিনি। তিনিই স্থান তিনিই নিধান তিনিই বীজ।

যিনি বীজ যিনি নিধান তাঁর শরণ না নিয়ে মানুষ সদাই হয় ব্যর্থমনোরথ। প্রাণ কাঁদে, কারণ সব সময় বোঝে না প্রাণী যে সংসারের প্রবাহ অশাশ্বত অনিত্য। পরে বোঝে—

নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই

একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়।

এ অনুতাপ অনুযোগ সত্যই তো লোপ পায় শরণে। অনুভূতি হ'লে—

হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব্ব অমঙ্গল
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্ম্মল।

তিনি তো দীন-শরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণের মাধুরী বুঝিয়েছিলেন হনুমানের কথায়।

হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত! এই আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহন মায়ায় মুগ্ধ না হই।†

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভক্তি-মূলক, জ্ঞানদীপ্ত আত্ম-নিবেদন শরণ। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা সরল কথায় ঠাকুর বুঝিয়ে ছিলেন—"অনেক জানার নাম অজ্ঞান—এক জানার নাম

* গীতা—২।৬১।
† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ৪র্থ ভাগ ৪পৃঃ।

জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর—সত্য সর্ব্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ ক'রে নানা-ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।*

জ্ঞানে ভক্তি, ভক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ—এ কথা পুনঃপুন বলেছেন ভগবান। তিনি বলেছেন—আস্থিত স হি যুক্তাত্মা—যুক্তাত্মা আমাতেই আশ্রিত। বলেছেন—জরা-মরণ মোক্ষের জন্য যারা আমাকে আশ্রয় ক'রে সাধনা করে, তারা কর্ম্ম জানে, অধ্যাত্ম বিদ্যা জানে, ব্রহ্ম জানে।†

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা উপনিষদের সার, ভাগবদ্‌ধর্ম্মের মহাগ্রন্থ। ভক্তি সে ধর্ম্মের প্রাণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদে আত্ম-নিবেদনের নির্দ্দেশ থাকবে, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ। আত্ম-সমর্পণে আত্ম-নিবেদন স্রষ্টার লীলায় ভক্তি পথের রহস্য। তাতে জ্যোতির উদয় হয় মনে। সংসার-জ্বালা বিব্রত করে না ভক্তকে। অনন্য মনে ভাবতে হবে। সকল ভাবপ্রবাহ তাঁর অসীম ভাবের শুভ হিল্লোলের সাথে মেলাতে হবে। কল্যাণ আসবে আপনি: তাই তিনি বল্লেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।

শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক নরনারীদের মধ্যে তাঁর ভক্ত ছিল বহু, এ কথা মহাভারতে বিবৃত। আমি ব্রজের কথা বলছিনা, সেথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তিশাস্ত্রের মূল প্রেরণা। কার সংগ্রহ জানিনা প্রপন্ন-গীতা স্তোত্রম স্তবকবচমালা প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত। সে সংগৃহীত শ্লোকে ভক্তিমূলক শরণের কথা হিন্দু তরুণ-তরুণীর অভ্যাস করা প্রয়োজন তাদের কল্যাণের জন্য। ছন্দ যেমন মধুর, ভাবও তেমনি গভীর। ইন্দ্র বলেছেন—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌর কথিতং পৃথিব্যাম।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ সংঘং
হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব।

তাঁকে স্মরণ করলে বহু জন্মের অর্জ্জিত পাপ হরণ করেন তিনি। তাঁর অপেক্ষা প্রসিদ্ধি হ'তে পারে কোন্ চোরের?

সঞ্জয়ের শরণের একটি কবিতা বিপদ হ'তে পরিত্রাণের। কামনামূলক, তাহ'লেও সংসারীর পক্ষে যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বল-প্রদ।

আর্ত্তা বিষণ্ণা শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
সংকীর্ত্ত্য নারায়ণ শব্দ মাত্রং
বিমুক্তদুঃখা সুখিনো ভবন্তি।

নারায়ণের মাত্র নাম সংকীর্ত্তনে সকল দীনতা ও ভয় হ'তে মুক্ত হয় আর্ত্ত, বিষণ্ণ, শিথিল ও ভীতজন এবং সুখী হয়।

ভীষ্ম বলেছিলেন—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল।

গান্ধারীর ভক্তির মূলে আছে পূর্ণ শরণ।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।

এমন শরণ নিতে পারে দেবী।

দুর্য্যোধনের উক্তি প্রসিদ্ধ। এ শরণ হৃদয়গ্রাহী বিপক্ষ পক্ষের উক্তি।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ উক্তি যেন

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

নির্দ্দেশের অনুগমন।

আমাদের মতো অজ্ঞান সংসারী জীব স্পষ্ট বোঝে ইংরেজি প্রবচনের সার্থকতা—শূন্য মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মনকে তো শূন্য রাখা যায় না। মনে সকল ভাবের সাথে যদি ঈশ্বরের ভাবনা মিশিয়ে দেওয়া যায়—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা অধিকার করতে পারে না প্রাণ-শক্তিকে।

সংসার জ্বালাযন্ত্রণায় পূর্ণ। অতি বড় বীরকেও যাচিঞা করতে হয় সহায়তা। গৃহীর জন্য তন্ত্রসার ব্যবস্থা করেছে আপদুদ্ধারণ স্তোত্র। সে কামনা-মূলক ভীতের স্তুতি। কিন্তু শঙ্কিত মনের শান্তি-মন্ত্র। শেষে আছে—

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৪র্থভাগ ২৭০পৃঃ।
† গীতা—৭ম স্বর্গ।

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মনুজদনুজ জনানাং ভয়েভ্যস্ত্রাসিতানাং
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরমেকো দেবিদুর্গে প্রসীদ।

তাই শরণ সকল ঋষি, অবতার, মহাপুরুষ ব্যবস্থা করেছেন। প্রভু যীশু বলেছেন, প্রার্থনায় নিত্য বল—Thy will be done on earth as it is in heaven—তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক হে জীবন স্বামী। তিনি বলেছেন শরণে সকল ইষ্ট লাভ হয়—Ask him it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you.

হজরত মহম্মদের ধর্ম্মের মূল বিধান—আল্লাহ্ তাহলার নিকট আত্ম-সমর্পণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম, জ্ঞান এবং ধ্যানের পরিপোষক। ভক্তি-তত্ত্ব নাই, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ভগবান বুদ্ধ বলেন নি। কিন্তু তিনি একথা বুঝেছিলেন যে বিশ্বাস না থাকলে তত্ত্ব হয় তর্কের রণক্ষেত্র। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, জ্ঞানের প্রথম পদ। গুরু ভাল কি মন্দ সে বিচার বিবেচনায় যদি জীবনের ক্ষুদ্র শক্তির অপব্যয় হয় তাহ'লে শুভযাত্রাপথে কার নেতৃত্বে হতে পারে অগ্রগতি। তাই ত্রি-শরণের প্রথম শরণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁর আশ্রয়ে ভক্তি আসে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ভক্তি ব্যতিরেকে মানুষের শান্তি কোথা? তাই সর্ব্বত্র দেখি জগদগুরু বুদ্ধদেবের পূজা। মহাযান বৌদ্ধের বুদ্ধ প্রণতি বৈষ্ণবের বিনয় নতি হ'তে কোনো অংশে হীন নয়।

দ্বিতীয় শরণ—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মের শরণ। ধর্ম্ম জীবনের নীতি পথ। বৌদ্ধ নীতির প্রত্যেকটি গীতার নীতির অনুরূপ। কেবল ভক্তি তত্ত্ব নাই অষ্টাঙ্গিক মার্গে। সে ধর্ম্মে শরণ নিলে অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধে জ্ঞান ফোটে কিনা—পথের শেষে না পৌছলে সে কথার আলোচনা সম্ভবপর নয়। নির্ব্বাণ কী, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ও বৌদ্ধ মতের নির্ব্বাণের কী সম্পর্ক সে কথা নিয়ে বহু তর্ক উঠেছে। কিন্তু শরণ প্রসঙ্গে দেখি যে ধর্ম্মের শরণ বৌদ্ধের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য।

তারপর শরণ সঙ্ঘে। জগতের ইতিহাসে প্রচার ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক ভগবান বুদ্ধ। সুতরাং তাঁকে গড়তে হয়েছিল সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। এই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনের বিধিনিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে বৌদ্ধপীটকে। তাদের শরণ না নিলে বৌদ্ধ-জীবন চয়না সম্ভব। তাই তৃতীয় শরণ সঙ্ঘে। ত্রি-শরণ বৌদ্ধের দীক্ষা এবং মন্ত্র।

বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম শ্রীহরির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণের ধর্ম্ম। আত্ম-নিবেদনে মনুষ্যত্বের ক্ষয়। শরণ বিনা গতি নাই। শ্রীরাধিকার প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছে গৌড়ীয় ভক্তিশাস্ত্র। সে প্রেম সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ—কুল মান লাজের তুচ্ছতা প্রতিপাদন ভগবদ্-প্রেমের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে। শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরাও ঐ পথ দেখিয়েছেন।

বাঙ্গালার কৃষ্টি ভক্তি-প্রধান। সাধক রামপ্রসাদ কালী-কীর্ত্তন করেছেন, তাতে ভক্তির লহর ছুটিয়েছেন অপূর্ব সঙ্গীত-ছন্দে। তিনি শরণের মাধুরীতে শমনকে উপেক্ষা করে বলেছেন—

অভয় পদে প্রাণ স'পেছি—
আর কি শমন ভয় রেখেছি

দেহ প্রাণ তারা নামে আপ্লুত। এমন কি—

সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি।

জগদীশ্বরে আত্ম-সমর্পণ জগতের সংস্কৃতি। মাত্র সাধকের কেন, বাঙ্গালাদেশের সকল কাব্য শরণ-গীতিতে সমৃদ্ধ। নামে রুচি জীবে দয়া কি আমিত্বের উচ্ছেদ নয়? ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ দার্শনিক মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে এ ধারণা যার, সে যদি ব্রহ্ম-সঙ্গীতমালার গীতগুলি পর্য্যালোচনা করে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে এদেশের কৃষ্টি কতখানি ভক্তি-মূলক, আর সেই ভক্তিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণেই লাভ করে তৃপ্তি। সাধক সত্যই তো ক্ষণিক স্পর্দ্ধা, বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব করবার শরণ-মন্ত্র—

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধুলার তলে।

মহাভক্তি উছলে ওঠে এ সারা বিশ্বে ছড়ানো মাধুরীর ছন্দে মন নেচে উঠলে। কবি গেয়েছিলেন—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাবিত মহাগগন মাঝে।

তাই গানের শেষে তিনি গাহিলেন—

জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব,
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্তবে পবিত্র ভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে শরণ আবশ্যক।

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।"

তাঁর সকল বিভূতি স্তবে ব্যক্ত করলে প্রাণ উদ্বেলিত হয় ভক্তি রসে। তাই ব্রহ্ম-স্তব আত্ম-ভূমিতে পৌছে দিয়ে ভক্তের প্রাণের কথা মুখে ফোঁটায়—

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং
জগৎস্বাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বোধিপোতং শরণং ব্রজাম।

স্মরণে, জপে, প্রণতিতে তোমারই শরণ গ্রহণ করব নাথ। ভবসাগর পারের উপায় তোমারই শরণ।
গুরু নানক গেয়েছিলেন—

পতিত প্রণীত দীন-বান্ধব হরি
শরণ তাহি তুম আবো।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধিকার আত্ম-নিবেদন আপনাকে মুছে ফেলা, কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য। কামের তাৎপর্য্য নিজের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি, প্রেমের তাৎপর্য্য কৃষ্ণ-সুখ। তার ফলে আমিত্বের বিলোপ।

যেথা আমি নাই সেথা কামনা থাকতে পারে না। সমুদ্রে নদী মিশলে, নদীর অস্তিত্ব লোপ পায়।

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন।
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।

এইভাবে আত্ম-সমর্পণকে মহাপ্রভু প্রেম বলেছেন। এর তাৎপর্য্য বুঝলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। ইহাই গীতার—মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

এই একই আদেশ শ্রীভগবানের শ্রীমুখে শুনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
মামেকমেব শরণমাস্থানং সর্ব্বদেহিনাম্
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাঃহ্যকুতোভয়ঃ।

কিন্তু সে শরণ হওয়া চাই শ্রীরাধিকার পূর্ণ আত্ম-নিবেদন।

সূর্য হাসে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পুরানো দিনের তরে
কিছু অশ্রু ঝরে পড়ে
কিছু রঙ্ তবুও সাজায়—
থরে থরে আকাশের গায়।
আমাদের মনের সেতারে—
কিছু সুর, কিছু মীড় এখনো ঝংকারে।
অনেক রাতেরে ঘিরে পাখিদের নিঃশব্দ বিহার
আজো দেখি মৃত্যুশীল স্বপন সঞ্চার!
আমাদের তোমাদের উজ্জল আকাশ
তবু মেঘে ছেয়ে ফেলে কিছু অবিশ্বাস!

মাঝে মাঝে থেমে যাই তাই
দূরে এক বনগন্ধ, আর কিছু নাই।
কোন এক পাণ্ডুরতা, ধূসর হৃদয়—
থেকে থেকে মৃত-চাঁদে প্রণয় জানায়

সূর্য হাসে:
প্রভাতের ঘাসে ঘাসে
নব-আলো চেতনা বিলায়।
রাতের ফানুস সব কোথায় মিলায়?

মাতৃমন্ত্র

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

মার্সাইতে ওরা এসেছে এক মাসেরও ওপর। শহরের উপকণ্ঠে আর্মেনীয় উদ্বাস্তুদের শিবিরগুলি দেখে মনে হয় যেন ছোটখাটো একটি গ্রামের পত্তন হয়েছে ওখানে। ওরা ওখানে আশ্রয় নিয়েছে যে যেমন ভাবে পারে। যাদের অর্থবল কিছু আছে তারা বাস করছে তাঁবুতে, কেউ কেউ আস্তানা নিয়েছে কয়েকটি পরিত্যক্ত জীর্ণ শেডে, তবে বেশির ভাগ শরণার্থীই উপযুক্ত আশ্রয়স্থল না পেয়ে, চার কোণে চারটি খুঁটির ওপর কার্পেট টাঙিয়ে তারই নীচে আশ্রয় নিয়েছে কোনমতে। তাদের মধ্যে যারা আশ্রয়ের চারপাশটা ঢাকবার মত পুরোনো বস্ত্র খণ্ড সংগ্রহ ক'রে অপরিচিতের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করতে পেরেছে তারা পরম ভাগ্যবান বলে মনে করে নিজেদের। এই সামান্য সুবিধাটুকু পেয়েই ওরা যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। পুরুষেরা কিছু না কিছু কাজ পেয়েছে, তাই ক্ষুধার তাড়নায় ওরা বিব্রত নয়, ওদের ছেলেমেয়েরাও খেতে পায় কিছু না কিছু।

ওদের মধ্যে বেকার একমাত্র মিকালি। প্রতিবেশীরা দয়া করে যা দেয় তাই খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে সে। কিন্তু অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার গ্লানি মনকে পীড়া দেয় তার। চৌদ্দ বছর বয়স হয়েছে তার, শরীরও বেশ সুস্থ ও বলিষ্ঠ। কিন্তু কাজের সন্ধান বেচারা করে কী করে? সব সময় তাকে পিঠে করে ঘুরতে হচ্ছে সদ্যোজাত একটি শিশুকে। ওকে জন্ম দিয়েই মারা গেছেন তার মা। আর জন্মের পর থেকে ক্ষিদের জ্বালায় ও যে কান্না শুরু করেছে তার আর বিরাম নেই। আর কেই বা কাজ দেবে তাকে? ওর স্বজাতীয়রাই ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে ওকে তাড়া করে আসে—বুভুক্ষু শিশুটির অবিরাম কান্না সহ্য করতে না পেরে। মিকালি নিজেও ঐ একটানা কান্না শুনে শুনে কেমন যেন বিকল হয়ে পড়ে। কিছুই ভাবতে পারে না সে, দিবারাত্র ঘুরে বেড়ায় নিঃসহায় ভবঘুরের মত, নিদ্রায় ও ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে পড়ে, বিশ্রামের অবসর নেই এতটুকু। পিঠের ওপর সব সময় ঐ দুঃসহ বোঝা যা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত বিষাক্ত করে তোলে। আর কী হতভাগ্য ঐ নবজাত শিশুটি! বেচারা এমন এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে এসেছে যখন ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই কা'রো। সবাই ওর কান্না শুনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। একেই ওরা নিজেদের দুঃখ ধান্দায় বিব্রত, তার ওপর ঐ বিশ্রী একঘেয়ে কান্না যদি সর্ব্বক্ষণ শুনতে হয় তবে ওদের ধৈর্য্য থাকে কি করে? মনে মনে শিশুটির মৃত্যু কামনা করে সবাই। কিন্তু তাদের ঐ কামনা অপূর্ণ থেকে যায়, কারণ শিশুটি যেন মরিয়া হয়ে ওঠে বাঁচবার জন্য, তার কান্নার তীব্রতা বাড়ে দিনের পর দিন। অস্থির হয়ে কাণে আঙুল দেয় স্ত্রীলোকেরা, শিশুটিকে পিঠের ওপর নিয়ে ক্লান্তপদে মিকালি ঘোরে মাতালের মত। দুধ কিনে শিশুটিকে যে খাওয়ায় এমন একটি পয়সা সঙ্গে নেই তাঁর এবং উদ্বাস্তু শিবিরে এমন একজনও স্ত্রীলোক নেই যার স্তনদুগ্ধ ওর ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত শিশুটির কান্না পাগল করে তোলে মিকালিকে।

একদিন ওর কান্না সহ্য করতে না পেরে মিকালি এসে হাজির হল আনাতোলীয়দের শিবিরের কাছে। তুর্কীদের এশিয়া মাইনর থেকে ওরাও পালিয়ে এসেছে

এখানে। মিকালি শুনেছে, এখানে নাকি এমন একজন স্ত্রীলোক আছে যে কিছুকাল আগে সন্তানের জননী হয়েছে। হয়তো সে ঐ বুভুক্ষু শিশুটির প্রতি সদয় হয়ে স্তন্য দান করতে পারে তাকে।

মনে অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছে মিকালি। এদের শিবিরগুলিও তাদেরই মত—চারিধারে দুঃখ-দৈন্যের একই ছবি। মাটির ওপর মলিন শয্যা বিছিয়ে বসে রয়েছে বৃদ্ধারা, নগ্নপদ ছেলেমেয়েরা খেলা করছে ময়লা জলের ডোবায়। ওকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল জনকয়েক বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করল কী ও চায়। কিন্তু তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল মিকালি। দুচার পা এগিয়ে এসে থামল একটি তাঁবুর উন্মুক্ত দরজার সামনে। তাঁবুর গায়ে যীশুমাতা মেরীর একখানি ছবি টাঙানো। ভিতর থেকে একটি শিশুর কান্না আসে কাণে।

"পবিত্র মেরীর নামে—যাঁর ছবি তুমি টাঙিয়ে রেখেছ তাঁবুর সামনে," গ্রীক ভাষায় বললে মিকালি, "আমি মিনতি করছি এই হতভাগ্য মাতৃহীন শিশুর প্রতি দয়া করো—একটুখানি দুধ দাও ওকে। আমি একজন দরিদ্র আর্মেনিয়াবাসী..."

মিকালির করুণ আবেদনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন স্বাস্থ্যবতী শ্যামাঙ্গী রমণী। কোলে তার একটি শিশু—চক্ষু নিমীলিত করে মাতৃস্তন্য সে পান করছে পরম আনন্দে।

"দেখি বাচ্চাটিকে? ছেলে না মেয়ে?" প্রশ্ন করে রমণী।

আনন্দে মিকালির মন দুলে ওঠে। কয়েকজন প্রতিবেশিনী কৌতূহলী হয়ে এরই মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিকালির কাঁধে থলির মধ্যে তার শিশু ভাইটি। কাঁধ থেকে থলিটা নামিয়ে ফেলতে ওরা সাহায্য করে মিকালিকে। কৌতূহলের বশে ওরা ঝুঁকে পড়ে থলিটার ওপর। যে ময়লা কাপড়খানা দিয়ে শিশুটিকে ঢাকা হয়েছে মিকালি সেটা সরিয়ে নেয় আস্তে আস্তে। অমনি সবাই চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে। সত্যি শিশুটিকে দেখে ভয় পাবারই কথা। ওর দেহের কোথাও যেন মানুষের লক্ষণ নেই! মাথাটা অত্যন্ত বড় এবং দেহ অস্বাভাবিক রকম কৃশ। জন্মের পর থেকে বুড়ো আঙুলটা ক্রমাগত চুষছে বলে এমনি ফুলে উঠেছে যে এখন আর মুখের ভেতর ঢোকে না। বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকালে আঁৎকে উঠতে হয়। মিকালি নিজেও পিছিয়ে আসে আতঙ্কে।

"কী ভয়ঙ্কর!" চেঁচিয়ে ওঠে একজন, "এ কিছুতেই মানুষের বাচ্চা হতে পারে না—রক্তশোষক প্রেত! আমার স্তনে দুধ থাকলেও ওকে দুধ দেবার সাহস হত না আমার।"

"এ নির্ঘাৎ খ্রীষ্টের পরম শত্রু!" আরেকজন বলে আঙুল দিয়ে বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন ক'রে, "দুষমন তুর্কীর বাচ্চা ওটা!"

পিছন থেকে এগিয়ে আসে একজন বৃদ্ধা। "অ্যাঁ! এমন বীভৎস চেহারা তো দেখিনি কখনো! সাক্ষাৎ শয়তান!" শিশুটিকে দেখে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে। তারপর মিকালীর দিকে ফিরে গর্জ্জন করে বলে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে! হতভাগা অলক্ষুণে কোথাকার! খবরদার এখানে আর এসো না কোনদিন। তুমি এখানে পা দিলেই বিপদ ঘটবে আমাদের।"

সবাই মিলে তাড়া করে তাকে—তিরস্কার, গঞ্জনা, শাসানির বর্ষণও অবিরাম চলে। মিকালির চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে, হন্ হন্ করে সে চলতে থাকে শিশুটিকে পিঠের ওপর তুলে। বুভুক্ষু শিশুটির কান্নার বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

এ সঙ্কট থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। অনাহারে শিশুটির মৃত্যু অনিবার্য্য। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে মিকালি। চলতে চলতে এক সময় সে থমকে দাঁড়ায়। পিঠের ওপর বীভৎস একটা জীব নিয়ে সে ঘোরাফেরা করছে হঠাৎ এই চিন্তাটা বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে যায় তার মনে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন এক শীতল হিমানী স্রোত বয়ে যায় তার মেরুদণ্ড বেয়ে। নিকটে একটা শেড্ দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে সেখানে ঢুকে পড়ে সে। তখনও সূর্য্যের উত্তাপ বেশ প্রখর। সামনে ধূ ধূ করছে প্রান্তর, মাঝে মাঝে আবর্জ্জনার স্তূপ। দূরে কোন গির্জ্জায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। আওয়াজটা শুনে মনে পড়ে তার, কাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত কিছুই খায়নি সে। রাস্তায় রাস্তায়, হোটেলের আশে-পাশে তাকে ঘুরতে হবে এক টুকরো রুটির প্রত্যাশায়

অথবা আবর্জ্জনার স্তূপের মাঝে খুঁজতে হবে কোথাও কিছু উচ্ছিষ্ট আছে কিনা—যা হয়তো ক্ষুধার্ত্ত কুকুরও স্পর্শ করবে না। হঠাৎ জীবনটা তার কাছে এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে শুরু করে।

খানিক পরে যখন সে মুখ তুলল তখন দেখে সামনে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। লোকটিকে চিনতে পারে সে। এই চীনা প্রায়ই আসত তাদের তাঁবুতে কাগজের রকমারি খেলনা আর মন্ত্রপূত কবচ বিক্রি করতে, কিন্তু কেউই কিছু কিনত না ওর কাছ থেকে। বরং তারা বিদ্রূপ করত ওকে ওর গায়ের রঙ আর ট্যারা চোখ লক্ষ্য ক'রে। ছেলেরাও ওকে দেখতে পেলে পিছন পিছন ছুটত কৌতুক করবার লোভে।

মিকালি লক্ষ্য করলে, চীনা ফিরিওয়ালা কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং কি যেন বলতে চায় তাকে। একটু ইতস্ততঃ করে চীনা বললে, "তুমি কেঁদো না, খোকা—এসো আমার সঙ্গে।"

মিকালি মুখে কোন জবাব দিলে না, শুধু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইছিল সে। প্রাচ্য দেশের লোকের নৃশংসতা সম্বন্ধে অনেক কিছু ভয়াবহ কাহিনী শুনেছে সে। তাঁবুতে অনেককে সে বলতে শুনেছে—ওরা নাকি খৃষ্টানদের ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'রে তাদের রক্তপান করে ইহুদীদের মত।

তবু লোকটি নড়ল না সেখান থেকে। মিকালির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা মিকালি চলল তার সঙ্গে। ভয় করেই বা কী হবে? যে বিপদের সঙ্গে সে যুঝছে এতদিন তার চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে? শ্লথপদে দু'চার পা এগিয়েই হোঁচট খায় মিকালি। না খেয়ে শরীর তার খুবই দুর্ব্বল, আর একটু হলেই শিশুটিকে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত সে। ত্রস্তে নিকটে এসে চীনা শিশুটিকে কোলে তুলে নিল এবং সস্নেহে বুকে চেপে ধরল তাকে।

অনেকটা পথ অতিবাহন করে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকল ওরা। গলির মধ্যে ঢুকে খানিকটা হাঁটার পর চীনা এসে থামল কাঠের একটি ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে। ছোট একটি বাগানের মাঝখানে কুটিরটি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে দুবার তালি দিল চীনাটি। ভেতর থেকে লঘু পদক্ষেপের শব্দ কানে এল এবং পরক্ষণেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল খর্ব্বাকৃতি একটি নারী। ওদের দেখে মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মিত হাস্যে ঝলমল করে ওঠে তার মুখ। মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানায় সে। মিকালি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে চৌকাঠের কাছে, ভেতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করে। তার দিকে ফিরে চীনা কোমল গলায় বলে, "ভয় পাচ্ছ কেন? এসো ভেতরে। ...ইনি আমার স্ত্রী।"

কুটিরের ভেতর ঢুকল মিকালি। ঘরটা বেশ প্রশস্ত, মাঝখানে রঙীণ কাগজের পর্দ্দা দিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত। দামী আসবাব পত্র কিছু না থাকলেও ঘরখানি বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এক কোণে বেতের একটি দোলনা ঝুলছে।

দোলনার দিকে আঙুল বাড়িয়ে চীনার স্ত্রী মাথাটি একপাশে কাৎ করে মধুর ভঙ্গীতে বলে, "ওটি আমার খোকা। ভারী ছোট্ট, তবে দেখতে খুব সুন্দর। এসো না এদিকে, খোকাকে দেখবে।"

দোলনার কাছে এগিয়ে এসে শিশুটির দিকে তাকায় মিকালি। চোখে তার ফুটে ওঠে নীরব প্রশংসার দীপ্তি। সত্যি ভারী সুন্দর শিশুটি। গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মনে হয় মাতৃ-জঠর ত্যাগ করে পৃথিবীর আলো ও দেখেছে মাত্র কিছুদিন আগে—সোনালি জরি দেওয়া দামী কিংখাপে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, পরম আরামে ঘুমিয়ে আছে রাজার মত।

তারপর স্ত্রীকে ডেকে চীনা বসতে বলল মাদুরের ওপর এবং কোন কথা না বলে অনাহার ক্লিষ্ট সেই শীর্ণ শিশুটিকে তার কোলের ওপর শুইয়ে দিয়ে, মাথাটা নোয়াল গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে। চীনার স্ত্রী অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনে এবং কাপড়ের ঢাকাটি আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলল শিশুটির গা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ বেরিয়ে পড়ল তার সমগ্র বীভৎসতা নিয়ে। স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে ওঠে অস্ফুটস্বরে, কিন্তু তার সে চীৎকার ঘৃণা বা আতঙ্কের নয়, গভীর মমতায় ভরা। দু'হাতে শিশুটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে সুগভীর স্নেহে স্তনটি সে তুলে দেয় তারে মুখে। তারপর ঈষৎ লজ্জিতভাবে গায়ের জামাটা টেনে দেয় দুগ্ধস্ফীত স্তনের ওপর এবং অসহায় বুভুক্ষু শিশুটি সাগ্রহে পান করতে থাকে তার বুকের অমিয়ধারা।*

* গ্রীসের প্রখ্যাত লেখিকা লিলিকা নাকোস্এর রচনা থেকে।

১৯০৩ সালে লিলিকা নাকোস জন্মগ্রহণ করেন এথেন্স্এ। ফরাসী পত্রিকা ইউরোপায় (Europa) প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প। ছোট গল্প ও উপন্যাস উভয়বিধ রচনাতেই তাঁর অসামান্য দক্ষতা। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ Lost Soul। তাঁর অনেক লেখাই ইতিমধ্যে অনূদিত হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তুঙ্গভদ্রা

১২

মনোরমা মেয়ে নয়, ট্রেডমার্ক। ওই মার্কার মেয়ে পর পর কটা দেখলাম। গোলগাল পুরুষ্টু, নড়বড়ে, থলথলে, ফুলো ফুলো গাল, এ্যালবোলে মন, কেঁদে ককিয়েই আছে। আদর করার আগেই আদরায়, ধমক দেবার অনেক আগে ঘাবড়ায়। জাত শিক্ষয়িত্রী।

অপর একটা ট্রেডমার্ক দেখলাম সেই 'বীরার'! সোজাসুজি চেহারার মধ্যে উঁচু নীচুর ধরণ ধারণের বালাই নেই। বরিশালে কোজাগর লক্ষ্মী পুজা করে আমকে শাড়ী' পরিয়ে। ওটা মিথ্যে নয়। এখো-লক্ষ্মী চলন্ত দেখা না গেলে অমন মেরুদণ্ডশীল জেলায় এ দেবীর এরূপে পুজা হবে কেন? কেবল কাপড়ের প্যাঁচ আর তুলির পোঁচে ওঁরা মহিলা; নইলে রোহিলা হলেও আপত্তি ছিল না, এমন খট্‌খটে, ক্যাটকেটে আর মাল-সেঁটে। সোজা পাড়াই চেহারার ওপর যেমন চালচিত্তির, তেমনি তেমনি চরিত্তির। ইনিও জাত-শিক্ষয়িত্রী।

দ্বিতীয় নম্বর যদি এখো-লক্ষ্মী হন, প্রথম নম্বর কলাবতী; দ্বিতীয় নম্বর যদি পাড়াই-চণ্ডী হন, প্রথম নম্বর দোলাই চণ্ডী; দ্বিতীয় নম্বর যদি শুষ্কং কাষ্ঠং হয়, প্রথম নম্বর ফলভারনম্রাং; দ্বিতীয় যদি হন্ ইংরাজী এক, প্রথম তবে শূন্য বা আট। এঁর রেখার সারল্যের প্রতি টান, তো ওঁর রেখার বৃত্তের প্রতি। এঁরা এ্যান্টি-ম্যারিটাল তো ওঁরা প্রো-ম্যারিটাল। বিয়ে না হওয়া একদল আছেন খেঁচিয়ে, কবে বিয়ে হবে বলে অন্যদল আছেন মুখিয়ে। বর্ণাশ্রম বিভাগে প্রথমকে বলি আনুনাসিক বর্ণ, দ্বিতীয়কে বলি উষ্ম।

তাই মনোরমা, বেণু এরা প্রকৃতি নয়, প্রাকৃতিক; ব্যক্তি নয়, ট্রেড্ মার্ক। একটু আধটু রকমফেরে এ চেহারা অনেক কটাই দেখতে পেলাম। মনোরমাই একজনকে আনলো।

বেলা তিনটা হবে। ষ্টোভ আনিনি বলে বেণু তখন খুব এক হাত নিচ্ছে। কেবল যা বলবে গলার জোরে, কারুর রক্ষা তো রাখতে নেই। বাবুর মান খোয়া যাবে যে! 'জানো অসিত, পঞ্চাশবার বলেছি চা নৈলে আমার চললেও তোমার চলবে না, ষ্টোভ নিই!—না ট্র্যাভেল লাইট্!

"যা যা, মেলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস না। দেখো এই নালার জলে ছেড়ে। চা না দিবি না দিবি, অতো কথা কিসের?"

অসিত বললে,—"পাত্রদিন, দেখি—রমন্না!"

"জী হুজুর, অভি লিজিয়ে!"

অসিত এক ধমক লাগালো, "আভি লিজিয়ে কিরে! কি লিজিয়ে? বল্লামই না কিছু!"

রমন্না মাথায় (অবশ্য খুলি ঢাকা টুপী সর্বদাই ঢাকা আছে) হাত বুলিয়ে এক হাত জিভ্ কেটে লজ্জিত হাসি ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে,—"বলেন না বুঝি? তাতে আর কি, বলুন এবার।"

রেগে অসিত বল্লে—"নালার জলটা শুষে ফেল্।"

"অভি লিজিয়ে সা—ব" বলে রমন্না গায়েব। নৌকো ছেড়ে চিনার তলায় বসে দিব্যি হুকো টানছে, উনুনের পাশে। উনুনে টিনে জল গরম হচ্ছে। রামান্নার মা আর বৌ বসে।

অসিতের রাগ থামেনি—"দেখছেন দাদা কাণ্ড। জল শুষতে বল্লাম, 'অভি লিজিয়ে' বলে গিয়ে ঐ চিনার তলায় গুড়ুকে দম মারছে। হেই রমন্না!"

"হুজুর!" বলে এক পায়ে খাড়া।

"নালা শুষলি না?"

সব কটা দাঁত বার করে রমন্না বল্লে—"রাগ করে বল্লেন হুজুর। নালা শুষলে নৌকো থাকবে না, রমন্না থাকবে না, রমন্না না থাকলে—"

"বাঁচিরে বেটা বাঁচি!" হাঁকলে অসিত। জগজীবন দাড়ি কামাতে গিয়ে খোঁচা খেলে। বিহারীলালজী হাসতে হাসতে বলে 'ইন্‌করিজিবল্।'

রমন্না—"সে কি হুজুর এ গালগুলো শুনবে? হুজুরের খিদমৎ করবে কে?"

এক কেটলি গরম জল সহ মনোরমা একটা মহিলাকে নিয়ে এসে নৌকার কার্পেট পাতা মেঝেয় বেশ ফাঁদিয়ে জাঁকিয়ে বসলো। আমরা পাঁচটা পুরুষই বরং একটু সরে বসলাম।

বেণুর তখন রাজত্ব। দাপটের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছে দাদার অটলবট আলস্যের কথা, বন্ধ নিরেট বুদ্ধির কথা এবং ওর প্রখর ভবিষ্যৎদৃষ্টির গুণগান। হতচ্ছাড়া মেয়ের তখন অবধি হুঁশ নেই যে অন্য একজন মহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ না করিয়ে দিলে কথা কওয়া দুষ্কর।

মনোরমা—আনুনাসিক পর্য্যায় কিনা—বল্লে, "দাদা আমার তোমাদের বোটে আনিয়ে নাও। বেণু আর আমি এক বিছানায়ই শোবো।"

"এ্যাঁ!" বলে অসিত গাঁক করে এমন শব্দ করলে, বেচারী জগজীবনের নাক মুখ দিয়ে ছিটকে চা বেরিয়ে গেল।
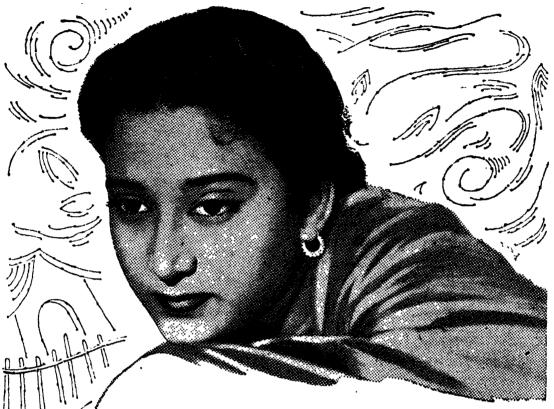
LUX
TOILET SOAP

মনোরমা চটে লাল—"মোটা মোটা বলো, তুমি নিজে কি? আমরা কী এমন মোটা শুনি?···আমার মা শুনলে কি বলতো জানো?"

কিন্তু নবাগতার চোখমুখ থমথমে। চা এর গেলাস হাত বাড়িয়ে নিলেন বটে। কিন্তু তাতেও মন বিশেষ হাল্কা হয়েছে বলে বোধ হোলো না।

পাশের বোটখানায় কেবল মেয়েরা থাকে। বেশ বড় বোট এবং সুসজ্জিত। একটি স্কুলের সাতাশটি মেয়ে, অন্য স্কুলের ছয়টী মেয়ে এই বোটে আছে। দুই স্কুলের দুই শিক্ষয়িত্রী। একজন ইনি—নাম জয়ন্তী সাহ্‌গাল। অন্যটী ছয়টী মেয়ে নিয়ে এসেছেন সেই "বীয়ার"—নাম দিয়েছিলাম 'তুঙ্গভদ্রা'।

লজ্জার কথা বলতে পারছেনা জয়ন্তী। বেণু বললো ঘটনাটা। শুনে ঘৃণায়, লজ্জায় আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। স্বার্থপরতা ও ঔদ্ধত্যের এমন জ্বলন্ত ছোঁয়া জীবনে পাইনি। এতকাল পুরুষদের সঙ্গেই বিতণ্ডা করেছি, শাসন করে থাকলেও পুরুষকেই করেছি। মেয়েদের সঙ্গে মোটামুটী একটা স্নিগ্ধ রসাল সম্বন্ধ রেখে গেছি।

"আশ্চর্য্য! আপনাকে বলেছে?"

"বলেছে কি, ও স্নানঘরে চাবী দিয়ে রেখেছে। নৌকার মধ্যে ওইতো ছোটো একটা ঘর? হাউসবোটওলা পরিষ্কার করে দিতে সর্বদাই রাজী। কিন্তু ওরা সাতজন ছাড়া আর কেউ ওখানে যাবেনা। আমার সাতাশটী মেয়ে আমি নিজে। রাতের বেলায় তো বটেই, দিনের বেলাতেও কথায় কথায় ঐ অতদূরে কে যায় বলুন? এই জন্যই সব মেয়েবোটে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। ও আমায় অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিল। পরে বললে, "তোমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে জলে ভাসিয়ে দেবো। আমায় ঘাঁটিও না।" অপমানের জ্বালায় জয়ন্তী কেঁদে ফেললো।

অথচ বিপদও সত্যকার।

পতিরামের অপূর্ব শব্দচয়ন। চোটে গেলে তো বটেই, এমনিই সে সোজা গ্রাম্য 'রোহতকী' বুলি বলে। কখনও ভুলেও ও 'সাধু' সংস্কৃত ভাষার নিকট কোনও ঋণ স্বীকার করেনি। বাংলায় লিখলেও মাঝে মাঝে ওর ভাষার শব্দ-সম্পদ প্রয়োগ না করলে সে ভাষার ঐশ্বর্য লোপ পাবে। রসিক পাঠককে বঞ্চিত করতে চাইনা।

"সহুরি-কে চাবকালে আমার সাধমেটে। ইংরেজ গেছে তার 'আওলাদ' ছেড়ে গেছে এই সব কনভেন্ট জাতীয় স্কুল গুলোতে। 'মেমীয়ানা' ফলাবার জায়গা পেয়েছে! রোহতকে নিয়ে যেতে পারলে গামছা পরিয়ে হাল টানাতাম।"

লালসিং ভদ্রলোক। বললে—"আরে এর মধ্যে লড়াই কিসের? এই চিনারের তলায় বেড়া বেঁধে একটা বাথরুম করিয়ে দিচ্ছি।"

"আচম্ব হবে কি শহরের মানুষের বুদ্ধি। নালার ওপর ইমারত গড়ে যাদের বাস তাদের বুদ্ধিতে গ্যাস থাকবেনা তো থাকবে কার? অ-জী অকল্‌-কে-দুম্ ফরমাইয়ে তো সহি' (হে মহাশয় বুদ্ধির লেজ অনুগ্রহ করে বলুন তো) একটা চিনার গাছের তলায় একটা বাথরুম হলে দশটা চিনার গাছের তলায় কটা বাথরুম? একটা নালিশে একবার নাক রগড়ালে পঞ্চাশটা নালিশে কবার নাক রগড়াবে? দুদিনে যদি বুদ্ধি এতো ভোবড়াও মাসের শেষে নাম তোবড়াবে. কি—না···সচ্‌ কহতা হুঁ ম্যায়, জী চাহতা শশ্‌রীকা নাক নোচ ডালেঁ—ইমানদারীসে! (সত্যি বলছি মনে হচ্ছে শ্বাশুড়ীর নাক ছিঁড়ে নি—যথার্থ!)

এমন রুল অফ্ থি্র সুরে প্রশ্ন করে গেল পতিরাম যে লালসিং হাত নেড়ে হাসতে হাসতে বললো,—"আচ্ছা কি করবি বল?

পতিরাম বল্লে—"চলো, দেখো কি করি।" বলেই উঠে দাঁড়ালো।

প্রমাদ গণলাম। "বোস্. বোস্। ওরে হাতীতে চড়ি বলে গণ্ডারে চড়বো? হাতী আর গণ্ডারে প্রভেদ আছে। লালসিং, ঢের নিষ্পত্তি করেছ ভাই, এখন এই অগৌরবটীকে থামাও একটু; আমি ভার নিচ্ছি।"

বেণু টিপ্পনী ছাড়লো—"কন্‌ফুশন ওয়স্ কনফাউণ্ডেড্।"

এবার সবাই জোরে হেসে ফেল্‌লো। পতিরাম বেণুর হাত ধরে তো ঝাঁকিয়েই দিলে! (সফিষ্টিকেটেড্ মহিলারা সাবধান!)

"বাঃ বহেন্‌জী বাঃ। তোমায় আমি হালুয়া আর ভাল দুধ খাওয়াবো! যেও আমার গাঁয়ে।"

জয়ন্তী তখনকার মতো চলে গেল। আমি বেশ অনুভব করছিলাম আমাদের ঘর আর ছেলেদের ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ থাকলেও শয়তানগুলো দিব্যি আমাদের গুলতানি শুনছে আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই আমি চট্ করে দরজা খুলে দেখি এলাহি কাণ্ড।

বিজয় আর রঘুবীর গড়াগড়ি খাচ্ছে। হুকুম একটা লাঠি নিয়ে ওদের মার লাগাচ্ছে। ওরা অব্যাহতি পাবার জন্য লেপ আর কম্বল মুড়ি দিতে গিয়ে সমস্ত বিছানা জড়িয়ে, ছড়িয়ে বসে আছে। পার্শ্বনাথ আর রবি একটা গেলাস থেকে জল নিয়ে এই তাণ্ডব শান্ত করার বিশুদ্ধ কামনায় ওদের ওপর ছেটাচ্ছে।

আমায় দেখে সব থেমে গেল, কিন্তু পাষণ্ড দুটো সেই বিছানার কুণ্ডলীর মধ্য হতে বেরুলো না।

হুকুম বল্লে,—"দেখুন না, পতিরামজীর কথা শুনে এদের হাসির ঘটা দেখুন। এতো করে বিছানাগুলো পেতেছিলুম—"

বিজয় সেই বিছানা সমুদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়েই চিৎকার করলে—"সব ঝুট্ হুয়্—বিছানা আমি পেতেছিলুম।"

হুকুম হেসে বললে—"বদ্‌তমীজের মিছে কথা বলতে বাধে না।"

আমি যখন তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে কথা বলতে গেছি—সঙ্গে তখন জগজীবন। শুনেই তো শ্রীমতীর চক্ষু স্থির! "হাউ স্কাণ্ডালাস্! প্রিপসট্রাস্ ইম্পুডেন্স্—(এর বাঙ্গলা হয় না, অন্ততঃ আমার জানা নেই—কতকটা বলা যায়—কি কেলেঙ্কারী! অভাবিত গাড়লপনা!) আপনারা, পুরুষ হয়ে মহিলাদের (প্রাইভেসীর বাংলায় আবার বিপদ্) আবরু নিয়ে এমন সব কথা বলেন? আমি রিপোর্ট করবো, কাগজে দেবো। জানা উচিৎ আমার স্বামী—"

"উকিল; আমি জানি। কিন্তু আপাততঃ আপনাকে এ লোকে ছেড়ে একুশ নম্বরে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"ক্যাম্প কমাণ্ডান্টের হুকুম !"

"তাঁর নাম কি ?"

"অভিমন্যু, জোয়ান-অফ্-আর্ক, খোদাই খিদমৎগার, যা হোক্ না কেন। আপনি ক্যাম্প ডিসিপ্লিন ভাঙ্গবেন না আশা আমরা করি।"

"আপনারা আমার ঘর ছেড়ে যাবেন এখুনি এই আশা আমি করি।"

"সে গেলে আমাদের কাজ হবে না। আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত।"

"কি কাজ আপনাদের ?"

"আপনার আপোষী কণ্ঠস্বরে ও মেজাজের নিম্নগরূপ দেখে আমরা ধন্য। আমাদের কাজ এই নৌকার প্রতিটি বালিকার একরকম সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি করা। অসুবিধা হোলে সবার হবে, সুবিধা হোলেও সবার।"

"আপনারা কম্যুনিষ্ট ? লাল ?"

জগজীবন যেন ক্ষেপে গেল। "কি বক্‌বক্ করছেন আপনি ? কি জানি কি মনে করেছেন নিজেকে !"

আমি লক্ষ্য করলাম আর দু এক মিনিটেই তুঙ্গভদ্রা মূর্চ্ছা যাবে। ওর চোখ কপালে উঠেছে প্রায়।

আমি জগজীবনকে থামিয়ে বললাম—"দেখুন আমি যা করতে এসেছি সেটা যে করে যাবই এ কথাটা যত তাড়াতাড়ি আপনি বোঝেন তত আমাদের উভয়তঃ সুবিধা। আমি আপনার কোনও ক্ষতি করার যোগ্যতা রাখি না, কিন্তু ক্যাম্প থেকে বার করে দিতে পারি। আপনি জম্মুতে প্রকাশ্যে সুরাপান করে এই ক্যাম্পের আদর্শ ও শিক্ষকতার আদর্শ নষ্ট করেছেন। আপনি কুর্দে মেয়েদের খেতে না দিয়ে পরম স্বার্থপরতা ও নীচ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আপনি বাসে সীট থাকা সত্ত্বেও পথের মধ্যে বাস যাত্রীদের ফেলে রেখে এসে গর্হিত অপরাধ করেছেন। এখানে এসে কয়েকটী মেয়েকে আপনি যেভাবে বিপন্ন করেছেন তাতে আপনাকে জোর করে বার করে দিলেও বিশেষ অন্যায় হয় না ; কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি জেদ ছাড়ুন। আমরা এই ক্যাম্পে সকলে মিলে মিশে থাকবো বলে এসেছি। আমাদের মিলে-মিশে থাকতে দিন।"

একটি রোগা ফুটফুটে মেয়ে, বছর চোদ্দ বয়স এসে বললো,—"আমি একটা কথা বলতে পারি ?"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বল্লাম, "কি ? বলো।"

"আমি, বেণুদি…

"বেণুদি ? সে কোথায় ?"

"ঐ তো পাশের ঘরে বসে সব শুনেছে।"

"কি বলেন তিনি ?"

"তিনি কিছু বলেন না। তাঁর কাছে শুনলাম রমলা তাঁর জন্য একটা ঘেরা ঘর নৌকার মাথায় করে দিচ্ছে। আমাদের নৌকা তো লাগালাগিই। বেণুদির আপত্তি নেই আমরা যদি এটা ব্যবহার করি। আর গাছতলায় যদি একটা ছোটো ঘেরা জায়গা করে দেন আমরা ওঁকে কষ্ট দিতে চাই না !"

কিন্তু ওর নিজের স্কুলের মেয়েরাও ওকে বয়কট করলো। আমি শুধু বলে এলাম, "আমি চলি তবে ! বিশ্বাস করুন আপনার কোনও অপমান আমা দ্বারা হবে না। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।"

নিজেদের নৌকায় এসে দেখি এক মুসলমান শালওয়ালা জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে। এরা এই অবসরে ব্যবসা করতে চায়। কেনা কিছু হোলে না। পরে আসতে বলে লোকটাকে বিদায় দেওয়া গেল।

আমি জগজীবনকে প্রশ্ন করি "বলো তো লোকটা মুসলমান না হিন্দু ?"

জগজীবন বল্লে, "হিন্দু মুসলমান একই রকম পোষাক পরে। বোঝা কঠিন।"

কঠিন নয় কিন্তু। কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদটা রাজনৈতিক এবং তাও আধুনিক। সামাজিক ভাবে ওরা এতো মিশে-যাওয়া যে বোঝা কঠিন। তবু এই কারণে খানিক বৈশিষ্ট্য ওদের মধ্যে আছে। পার্থক্যটা বাইরে থেকে ধরা যায়। পাগড়ী ধরা যাক। হিন্দুরা পাগড়ী বাঁধে খুলি ঢাকা টুপীর ওপর কম চওড়া বিশ গজী কাপড়ে এবং বাঁধবার কায়দাটা সোজা, পাটে পাটে। পাগড়ীর শেষ প্রান্ত মাথায় গোঁজা, তবে ডান ধারে। মুসলমান চওড়া দশ গজী কাপড়ে তেরছা পাগড়ী বাঁধে ছুঁচলো খুলি-ঢাকা টুপীর ওপর। প্রান্তটা মাথায় গোঁজা বাঁধবে। হিন্দুর জামার হাত সরু এবং কব্জী পর্য্যন্ত লম্বা। ঠাণ্ডা বাঁচাতে হাতে দস্তানা পরে। মুসলমানের হাতা চওড়া এবং কব্জীর ওপরে গোটানো। ঠাণ্ডা লাগলে সেটা খুলে দেয়, হাতের আঙুলেরও তলায় এসে পড়ে। জামাটার ওপরে কোমরে বাঁধে যে কাপড়টা, গাঁট-টা হিন্দু বাঁধে বাঁয়ে, মুসলমান ডাইনে। হিন্দু ঘোড়ায় চড়ে ডান ধার দিয়ে ; মুসলমান বাঁ দিক থেকে। হিন্দু পা ধুতে গেলে প্রথম ধোয় বাঁ পা, মুসলমান ডান পা। এগুলো লক্ষ্য করে না দেখলে অন্য উপায়ে কিছু বোঝার জো নেই। আজকাল ফোঁটাটা খুব চলেছে। আগে তাও ছিল না। পাগড়ী খুললে মাথায় টিকির দর্শন সব হিন্দুর মেলে না। (ক্রমশঃ)

১৯৫৭-৫৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ও সম্পদ-কর

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বিগত ১৫ই মে তারিখে লোকসভায় ভারতের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—রাজস্ব, মূলধন ইত্যাদি খাতে ঘাটতির মোট পরিমাণ হবে তিনশত সাতষট্টি কোটি ঊনাশী লক্ষ টাকা। তবে এর মধ্যে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ হল তেত্রিশ কোটি বার লক্ষ টাকা। এছাড়া যা বাকী রইল তার সবটাই মূলধন খাতে ধরা হয়েছে।

বাজেট পেশ করার সময়ে শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এই দু ধরণের কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। তাঁর অনুমান, এই কর বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে আয় বাড়বে। শ্রী কৃষ্ণমাচারী বলেছেন, এই আয়ের মোট পরিমাণ সাতাত্তর কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা হবে। তাছাড়া ঘাটতির বাকী অংশটুকু নূতন নোট ছেড়ে পূরণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাজেটে যে সব ছোটখাট দ্রব্যের উপর কর এবং শুল্ক বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব দ্রব্যের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মোট নব্বইটি দ্রব্যের উপর কর এবং শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা রয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন চা, কফি, চিনি, সিমেণ্ট, ইস্পাত, কাগজ, ডিজেল তৈল ইত্যাদি। অন্যদিকে আবার কৃষি সম্পত্তি, বনসম্পত্তি ইত্যাদির উপরও শুল্ক বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া নির্দ্ধারণযোগ্য বার্ষিক আয়ের পরিমাণ করা হয়েছে চার হাজার দু শত টাকা থেকে তিন হাজার টাকা। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অনুমান করেছেন, তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী যদি আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পায় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বছরে ছয় কোটি টাকা বর্দ্ধিত হবে। এখানে আরো একটা জিনিস উল্লেখ করার আছে। সে জিনিষটি হল এই যে, ১৫ই মে তারিখে লোকসভায় বাজেট পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রী পোষ্টকার্ডের দাম এবং তার প্রেরণের মাশুল বাড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন।

সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, যেভাবে সম্পদের উপর কর বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে তা'তে সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া যে ভিত্তির উপর এই কর ধার্য্য করা হবে সে ভিত্তি অধিকতর কার্য্যকরী বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন। ১৫ই মে তারিখে তিনি লোকসভায় বলেছেন, সম্পদের উপর আয়কর ধার্য্য করার প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়ে সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল সমতা নির্ব্বাচনের দিকে। সরকার প্রধানতঃ যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের উপর কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করেছেন। অনুমান করা হয়েছে, এইভাবে প্রায় পনের কোটি টাকা পাওয়া যাবে। বাজেট পেশ করার সময়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী আশ্বাস দিয়েছেন, একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের সম্পদের দাম যদি তিন লক্ষ টাকার বেশী না হয়—তাহলে সে সম্পদের উপর কর ধার্য্য করা হবে না। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন, কেবলমাত্র সে সম্পদের উপর কর বসান হবে যে সম্পদের মূল্য দু লক্ষ টাকার বেশী। তাছাড়া সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার কম হারে কর ধার্য্য করার নীতি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দু লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের সম্পদের উপর প্রথম দশ লক্ষ টাকায় শতকরা ½, পরের দশ লক্ষ টাকার শতকরা ১, এবং অবশিষ্ট টাকায় শতকরা ১½ হারে কর বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী না হয়—তাহলে সে সম্পদের উপর কর বসাবার অভিপ্রায় সরকারের নেই। কিন্তু তিনি এর অতিরিক্ত মূল্যের সম্পদের উপর শতকরা ½ টাকা হারে কর আদায়ের প্রস্তাব করেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার, এই করের আওতা থেকে কয়েক ধরণের সম্পত্তি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাজেটে এই ধরণের সাতটি সম্পত্তির উল্লেখ দেখা যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে সম্পদের উপর যে নূতন কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে সে কর একদিকে যেরকম আশার সঞ্চার করেছে সেরকম অন্যদিকে অর্থনীতি-বিদ্‌দের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। লোকসভায় এই কর বসাবার প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়ে অর্থসচিব প্রধাণতঃ দুটো জিনিষের উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বুঝতে চেয়েছেন, ভারতে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা চলছে, সম্পদ-কর ধার্য্য হলে সে চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বক্তব্য হল ধন বণ্টনে যে বৈষম্য বিদ্যমান, সেটা হ্রাস করতে সম্পদ-কর অনেকখানি সাহায্য করবে।

যেদিন সম্পদকর ধার্য্য করার প্রস্তাব হয়েছে সেদিন থেকে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, দেশের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হচ্ছে। সম্পদ-কর ধার্য্য করার বিরুদ্ধে এঁরা প্রধানতঃ দুটো যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। প্রথমতঃ এঁদের ধারণা, সম্পদের উপর কর বসান হলে শিল্প এবং ব্যবসার প্রসার ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ এঁরা বলেন, সম্পদকর নূতন মূলধন সৃষ্টির পথে গুরুতর অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে।

কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হিসাবটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভারত সরকার সম্পদের উপর যে কর ধার্য্য করতে চাইছেন সে করের আওতা মোটেই প্রসারিত নয়। অর্থদপ্তর বলেছেন, ভারতে যে সব একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করা যেতে

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাবাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে, ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। ত্রিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটি ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

পারে সে সব একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের মোট সংখ্যা হল মাত্র চার হাজার। এছাড়া কেবলমাত্র ছয় হাজার যৌথ কোম্পানী এবং ছাব্বিশ হাজার ব্যক্তি সম্পদ করের আওতার মধ্যে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের আয়তন এবং লোক সংখ্যার অনুপাতে সম্পদ-করের আওতা বেশ সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এই করের আওতার মধ্যে কৃষি সম্পত্তি পড়ে না।

কৃষি সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করার আইনসঙ্গত অধিকার একমাত্র রাজ্য সরকারের হাতে শুধু। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। অর্থসচিব বলেছেন, কয়েক ধরণের দেবোত্তর এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর কর বসাবার অভিপ্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। অর্থাৎ সরকার সে সব সম্পত্তিকে করের আওতা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন যে সব সম্পত্তির আয় ধর্ম্মানুশীলন এবং জনহিতকর কার্য্যাবলীতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেবোত্তর এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় সকল ক্ষেত্রে ধর্ম্মানুশীলন এবং জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা হয় কিনা। এর উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ সকলক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় না। যাঁরা এই ধরণের সম্পত্তি পরিচালনা করেন তাঁদের অনেকেই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় নিজেদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যয় করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা পয়সার অপচয় করতে দেখা যায়। কাজেই দেবোত্তর এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হলেও এই সম্পত্তির আয় কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। সুতরাং প্রস্তাবিত করের আওতার মধ্যে এই ধরণের সম্পত্তি নিয়ে আসা খুব যুক্তিসঙ্গত।

অষ্টাপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

বহুদুঃখ দিলে তুমি অভাগারে সারাটি জীবন
তাই তোমা মানে না সে করে না সে তোমারে স্মরণ।
তোমারে করিয়া অস্বীকার
পশুত্ব হইতে সে যে মানবত্বে পেয়েছে উদ্ধার।
বিদ্রোহী সে দুর্বল মানব
তবু তারে ক্ষমো যদি তবে তব বাড়িবে গৌরব।
হবে প্রভু মানবত্ব হতে তুমি দেবত্বে উন্নীত
ভগবত্তা হইবে স্বীকৃত।

(২)

হেমমণিরত্ন যত গুপ্ত রয় বসুধার তলে
মানুষ লুণ্ঠন করে অস্ত্রাঘাতে পাশবিক বলে।
স্বইচ্ছায় পৃথ্বী তাহা কোন দিন করেনাক দান।
খনির তিমির গর্ভে গুমরিয়া কাঁদে তার প্রাণ।
দেয় সে আনন্দে স্নেহে ইচ্ছাসুখে অতুল প্রতুল
মাতৃ-মমতার দান তরুতৃণে ফলশস্য ফুল।
একাধারে তাই তার উপহার 'বসু' আর 'সুধা'
শুধু সে বসুধা নয় তাতেই সে জননী বসুধা।

(৩)

কারো জীবন মহীরুহ কারো জীবন লতা।
দৃষ্টি কারো উর্দ্ধে ছুটে কারো অধোগতা।
কেউবা পরের শরণ মেগে লতিয়ে রয় নিরুদ্বেগে
কেউবা ঝড়ের সঙ্গে যোঝে চায় না অধীনতা।
শুধু কি তাই? স্বাধীন হতে করে সে প্রাণপণ।
ধৈর্য্য ধরি সহ্য করে দারুণ নির্যাতন।
আবার দেখ গোলাম যারাই বিরোধিতা করল তারাই
আমেরিকায় উঠল যখন ক্রীতদাসের প্রথা॥

(৪)

আঁখি মেলি যাহা পাই তা' ত শুধু আলোকের ফাঁকি,
সত্যেরে পাইতে হ'লে মুদিতে হইবে দুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে রবির কিরণ,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
মনের গভীর সত্য চেতনা করে যা আবরণ
স্বপ্নের তিমির তারে অবারিত করে এ জীবনে।
জ্ঞানে যারে নাহি পাই, যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে,
দিবসে পাই না যাহা পাই তাহা রাতের আঁধারে।

(৫)

ভাগ্যে ভুলি তাই বাঁচোয়া নইলে হ'ত বিষম দায়,
পুরানো না সরলে পরে কেমনে ঠাঁই নতুন পায়?
জ'মে জ'মে স্মৃতির রাশি বন্ধ হ'লে মনের দ্বার
প্রবেশ নিষেধ হতো আলোর, মন যে হ'তো অন্ধকার।
ভাগ্যে ভুলি তাইত আছে আমার লঘু মন ফাঁকা,
কল্পনারা উড়ে বেড়ায় মেলে তাদের নীল পাখা।
ভাগ্যে ভুলি, দেহে মনে হাল্কা তাতেই হয় বোঝা
তাইত জীবনযাত্রাপথে দ্রুতপদেই যাই সোজা।

ভাদ্রশ্রী

উপানন্দ

ভাদ্র এলো। অবগুণ্ঠিতা ঝটিৎ সে আকাশের মেঘ-বাতায়ন থেকে উন্মোচন করছে আগুনের মত তার মুখখানি। সূর্য্যদেব ক্ষণেকের জন্যে পৃথিবীর পানে দেখা দিয়ে আবার মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করলেন। ঝরে পড়ছে কেয়া ফুলের রেণু আর কদম্ব কেশর। ভিজে মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সোঁদালি গন্ধ। অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে।

কখন ঝিরঝিরে ঝিরি মত বৃষ্টি পড়ছে, কখন বা হচ্ছে মুষল ধারায় বারি বর্ষণ। রাত্রি দিন আমাদের মানস প্রকৃতিতে ছায়া ফেলে ফেলে চলেছে। পাহাড় থেকে নামছে ঢল অবিরল ভাবে! বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় অপূর্ব্ব শোভা—যত নদ নদী খাল বিল দীঘি নিপান জলে ভরে গেছে, কোন কোনটা ছাপিয়ে উঠে গৃহস্থকে ভাবিয়ে তুলছে। তরঙ্গ যাত্রীর দল চলেছে সাগর সঙ্গমে। সমুদ্র আগ্রহে আহ্বান করছে এ জলধারাকে, তার ডাকের সঙ্গে মেঘের ডাক মিশে মানুষের মনে এনে দিচ্ছে যেন অনন্তের আহ্বান। বনে প্রান্তরে উদ্ভিদ শিশুরা বর্ষায় অবগাহন করছে। পারাপারের খেয়া বন্ধ। কৃষাণী বধূ তার মাথা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে দাওয়ার ওপর। উজুই মাছ চলেছে নয়নজুলির ধার ঘেঁষে, দু'চারটে ছিটকে এসে পড়ছে গৃহস্থের আঙিনায়। মণ্ডল দীঘির জলে সাঁৎরে বেড়াচ্ছে রোহিত কাৎলা চিতল মাছ। কলকে ফুল উঠছে দুলে। রজনীগন্ধার বনে বাতাস পড়ছে লুটিয়ে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রাখাল ছেলের বাঁশী—সে কোন্ মাঠের ধারে, কোন্ বনের পারে দাঁড়িয়ে আছে, তা কে জানে! ধানের ক্ষেতে সবুজ উৎসব, চাষার প্রাণে জেগেছে আশা।

রাস্তায় লোক কই? হাটে যাবার যারা, ঘরে রয়ে গেছে। পাখীরা পাতাপালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে, ওদের কূজনধ্বনি আসছে কানে। দাদুরী ডাকছে, আর নাচছে কেকা—সেই যে কেকা নৃত্য আরম্ভ করেছে আষাঢ়ে নবীন মেঘ দেখে, আজও তার পেখম তুলে নৃত্য থামছে না। ও যেন বর্ষার অভিসারিকা; ভর ভরা ভাদরের অবগুণ্ঠিকা দিয়েই কি চলেছে অন্তরাত্মার তীর্থযাত্রা মহামিলনের উদ্দেশে!

এমনি ভরা ভাদ্রের কালো নিশীথে এলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। শক্তিমদে উন্মত্ত মথুরার রাজা কংস যে সময়ে মনুষ্য সমাজের প্রতি কঠোর অত্যাচার করছিলেন নিত্য নূতন অপকৌশল বিস্তার করে, সে সময়ে অসংখ্য নরনারী তাঁর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়ে কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। উদ্ধত রাজশক্তির কাছে অসহায় মানুষ নির্য্যাতিত হয়ে শেষে আত্মবলি দিতে লাগলো—নারী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করলো, তার কোলের শিশু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কংসদূতেরা হত্যা সুরু করে দিলে, বিভীষিকার অট্টহাস্য গেল শোনা, হিংসা-কণ্টকিত পৃথ্বী প্রকম্পিতা, জীবনের মরুভূমি করুণার মেঘ প্রার্থনা করে, আর ভগবানের দিব্য আবির্ভাবের প্রত্যাশায় দূর পানে চেয়ে থাকে—ভয়ার্ত্ত বিহ্বল অরণ্যে জ্বলে ওঠে দাবানল, চতুর্দ্দিকে আগ্নেয় উগ্রতা।

এই ভয়াবহ আবেষ্টনীর মধ্যে ভাদ্রের ভীষণ দুর্য্যোগভরা মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে অরূপ রূপের ঘরে এলেন, জন্ম নিলেন কংসপুরীর দুর্ভেদ্য পাষাণ কারাগারে যেখানে বন্দী অবস্থায় ছিলেন বসুদেব ও দেবকী। শৃঙ্খলিতা দেবকীর কোলে এসে নিজের স্বরূপ দেখালেন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে—তারপর পিতামাতাকে সান্ত্বনা, অভয় ও নির্দ্দেশ দিয়ে আবার সদ্যোজাত শিশুর মত রইলেন।

তিনি যে সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন, সে সময়ে মেঘ-মালারা করেছে আকাশে উৎসব পরম হ'য়ে—যমুনা করেছে নৃত্য উত্তাল তরঙ্গ মালা নিয়ে, বনস্পতিরা শির নত করে জানিয়েছে তাদের প্রণতি। ভগবানের জন্মলগ্নে শোনা যায় নি কোন শঙ্খধ্বনি, পুরনারীরা দেয়নি হুলুধ্বনি—বাহিরে কেবল উঠেছে বজ্রের গর্জ্জন গর্বোদ্ধত কংসের রাজশক্তির অত্যাচারের

জীব প্রতিবাদ হিসাবে। তারই অভিনন্দন পেয়েছে নবজাত শিশু সেই তিমির-ঘন গভীর নিশীথে পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে।

ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের দৈববাণী প্রচারিত হোলো দিকে দিকে প্রকৃতির রাজ্যে। কংসের কারাগার থেকে শিশুকে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়্‌লেন বসুদেব। ঐশীমায়ার প্রভাবে কংসপুরীর রক্ষীরা নিদ্রাচ্ছন্ন বন্দীশালার লৌহ তোরণদ্বার উন্মুক্ত। বিদ্যুতের আলোকে পথচারী বসুদেব দিক্ নির্ণয় করতে করতে শেষে যমুনার বিক্ষুব্ধ প্রবাহ ঐশীকরুণায় ঠেলে দিয়ে পার হ'য়ে গেলেন বৃন্দাবনে নন্দগোপের ভবনে। নন্দের স্ত্রী যশোদার কোলে আপন সন্তানকে রেখে তাঁরই সন্তান যোগমায়াকে নিয়ে আবার কংসের কারাগারে ফিরে এলেন। এ ব্যাপার যে কি ভাবে হ'য়ে গেল তা ভাব্‌লেও বিস্মিত হোতে হয়—বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যকায়া নিয়ে জন্মেছিলেন ক্ষত্রিয়কুলে, কিন্তু মানুষ হয়েছিলেন গোপবধূ যশোদার স্তন্য পান করে—আর তাঁরই স্নেহাঞ্চল আশ্রয় করে, ব্রজের গোপবালকদের সঙ্গে খেলাধূলা করেছিলেন—এদের সঙ্গে করেছেন তিনি গোচারণ বৃন্দাবনের বনে বনে আর গোকুলের মাঠে মাঠে, যমুনার জলে বৃন্দাবনের তটে করেছেন খেলা, বাঁশি বাজিয়েছেন বংশী বটের ছায়ায় বসে, কেলিকদম্ব তলে, তমালের মূলে—বৃন্দাবনের পথে পথে। শৈশবেই পুতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন তার স্তন্যপান করতে করতে, আর তৃণাবর্ত্ত অসুরকে বধ করেছিলেন। বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণহৃদয়া যশোদা একদিন কৃষ্ণকে নিয়ে নিজের কোলে রেখে স্তন্যদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন, এমন সময়ে শিশু হাই তুল্‌তেই মা যশোদা দেখলেন—

'খং রোদসী জ্যোতিরনীক মাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থির জঙ্গমানি।

ঐ শিশুর মুখ মধ্যে আকাশ স্বর্গ মর্ত্ত্য, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্ সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী বিরাজ করছে। তখন যশোদা সহসা পুত্রের মুখে বিশ্ব নিরীক্ষণ করে কম্পিতকলেবরা ও অতিশয় বিস্মিতা হয়ে চোখ দুটি মুদ্রিত করলেন—

'সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
সংমীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা।

শ্রীকৃষ্ণ শৈশবেই যে ঐশীশক্তি দেখিয়েছিলেন তা ভাব্‌লেও বিস্মিত হোতে হয়। তিনি বৃন্দাবনেই বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। এই সময়ের মধ্যে পুতনা বধ, তৃণাবর্ত্ত বধ, যশোদাকে নিজের বদনবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ প্রদর্শন, বকাসুর বধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনগিরি অঙ্গুলের উপর ধারণ প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রমাণ করেছেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' এরপর দুরাচার কংসকে সংহার করে মথুরায় রাজসিংহাসন অধিকার ও জনক জননীর বন্ধনমোচন করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 'মোহগ্রস্ত' অর্জ্জুনের মোহদূর করে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা শুনিয়ে তিনি আমাদের সম্মুখে অমর আশার বাণী ও চরম সান্ত্বনার কথা রেখে গেছেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে'—আদর্শ কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা এবং আসুরিক বল ধ্বংস করে ব্রহ্ম তেজ ও ক্ষাত্র তেজের অনির্ব্বাণ দীপ্তি সংরক্ষণ দ্বারা তিনি ভারতের অধ্যাত্ম ও পার্থিব বীর্য্যের বিশুদ্ধি করে গেছেন। একশো পঁচিশ বছর ধরে তাঁকে আমরা পার্থিব দেহে পেয়েছিলাম—আজ অরূপের ঘর থেকে তাঁকে আমরা রূপের ঘরে আস্‌বার জন্তে প্রার্থনা করছি তাঁর শুভ জন্মদিনে। সেই চিরকিশোরের উদ্দেশ্যে তোমরা প্রণামের অঞ্জলি দাও।

ভারতের আজ দুর্দ্দিন,—এদিনে তাঁর আবির্ভাব আমরা একান্তভাবে কামনাও প্রার্থনা করি।

চিঠি

রুদ্রাণীশংকর ঘোষ

পাখী তোমার পাখা দুটি
আমায় দেবে ভাই!—
ইচ্ছা ক'রে ফুড়ুৎ করে
সেই দেশেতে যাই;
খেলার সাথী বন্ধু আমার
আজকে যেথায় আছে;
নইলে তুমি এই চিঠিটি
পৌঁছে দিও কাছে।
হয়ত তখন বন্ধু আমার
অন্য সাথীর সনে
মত্ত আছে পুতুল খেলায়
নেইক আমায় মনে!
হয়ত বা সে ঘুরে বেড়ায়
নিত্য নূতন দেশে;
বন্ধু তাহার জুট্‌চে কত—
কেউ বা ভালোবেসে,
বল্‌বে—'বিশু' যাস্‌না চলে
এইখানেতে থাক্;
তখন তুমি তার হাতেতে
পৌঁছে দিও 'ডাক্।'
মুখে তারে বোলো শুধু—
তোমার সঙ্গ লাগি
কাতর হ'য়ে একটি প্রাণ
সেথায় আছে জাগি।

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

শ্রীআশাবরী দেবী বি. এ

ঘুম ভাঙতেই অণিমা ধড়মড় করে উঠে বসলো—অনেকটা বেলা হয়ে গেছে—ও এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। দিদি রান্নাঘর হ'তে সেইমাত্র চা খেয়ে বেরুচ্ছে, বললে, "অনু এতোক্ষণে উঠলি—যা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।" ছোটভাই মনু রান্নাঘরের ভেতর হ'তে চেচিয়ে বললো—"ছোড়দি আয়, কচুরী হয়েচে।" মা আগুন-তাতের রাঙামুখে বাইরে হাত ধুতে এসে বললেন হেসে, "হ্যা খাবার কুটুম তো সব—নীলি শ্বশুরবাড়ী হতে এসেচে তাই, আর একজন সাহায্য না কোরলে কি হয় এসব ?"

দশটা বাজতে না বাজতে অনিমা ভারী তাড়াহুড়ো করে সাজসজ্জা শুরু করে দিলো। নীলিমা বললো—'আজ এতো ব্যস্ত কেন রে অনু ?" "ওমা দিদি ভুলে গেলে ? আজ আমাদের বনভোজন আছে। দোসরা বৈশাখ যে সেকেণ্ড টিচার রেবাদির বিয়ে হলো—ঐ সময় পরীক্ষার জন্য আমরা ছুটি পাইনি—সে এক মজার ব্যাপার ! আমাদের একটা ছুটি পাওনাই রয়ে গেলো। শেষে আজ গরমের ছুটির ঠিক আগের দিনে আমরা যাচ্ছি পিকনিক কোরতে। টিচাররা প্রথমে বলেছিলেন এই গরমে মেয়েরা পিকনিক কোরো না—যাহোক আমাদের মুখপাত্রী হয়ে সলিলা অনেক তর্ক কোরে শেষে জিতলো। অনুমতি যদি বা পেলাম, তো একদল মেয়ে বেঁকে বসলো—তারা শীতে করবে। ভোটে অবশ্য আমরাই জিতলাম—ক্লাস নাইনের মেয়েরা শীতকালে যাবে—ওরা হেরে গেছে !" অনিমা সগর্বে কলরব করে গল্প করতে লাগলো। দিদি বললো "ওমা—তোরা খুব স্বাধীন হয়েচিস—আমাদের কালে এসব চলেনি !" "ওমা দেরী হয়ে গেলো—দশটার আগে পৌছনো চাই—মা বুঝি পূজার ঘরে ? দিদি তুই মাকে বলে দিস—আমি যাই—!"

অনিমা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটু ব্যস্ত হয়ে নেমে এসে মা অনিমাকে ডাকলেন। "ও ওদের বনভোজনে গেলো মা—তুমি জানতে না মা ?" "হ্যারে বলেছিলো তো—ওদিকে মণিকা এইমাত্র চিঠি পাঠিয়েচে—ওর ওখানে নিমন্ত্রণ—তার গাড়ী আর ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়ে আছে। আবার আজ পূর্ণিমার মেলায় নিধু আর হাবলুর মা ছুটি চাইছে যাবে বলে !" খানিক পরেই বাড়ী বন্ধ করে মা, দিদি ও মলয় মোটরে মণিকা মাসীর ওখানে চলে গেলেন। অনিমার বাবাও নেই—ক'দিন আগে পুরী বেড়াতে গেছেন।

এদিকে যখন অনিমারা তাদের বনভোজনের জায়গায় এসে পৌছলো—তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে—বৈশাখের রোদের তেজ আগুন হয়ে উঠেছে। স্কুল-বাস-ড্রাইভার ওদের ও জিনিসপত্র সব নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো। মেয়েদের ইচ্ছে মতো কোনও টিচার বা বামুন-চাকর কেউ আসেনি সঙ্গে। সবই ওরা স্বাধীনভাবে ও স্বহস্তে করবে ! সন্ধ্যায় বাস এসে আবার নিয়ে যাবে ওদের।

মেয়েরা খুবই উৎসাহ করে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে নানারকম হাসি গল্পের সঙ্গে কাজের প্ল্যান করতে লাগলো—কোথায় উনুন হবে—মাপ জোক—কি কি রান্না হবে, তার ফর্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে সলিলা রমলা এরা বক্তৃতা দিলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু উৎসাহ একটু আসতে লাগলো—কল্পনায় এগুলি বড়ো ভালো লাগছিলো—এখন কিন্তু এই রোদে মাটি খুঁড়ে উনুন তৈরী করা—কাছেকার নদীটা হতে জল আনা—এসব বড়ই কষ্টকর লাগলো। দেখা গেলো মেয়েরা কেউ রান্না জানে না। অনিমা কবে বা নিজের রন্ধন পটুতার কথা নমিতার কাছে গল্প করেছিলো—সে কথা নমিতা সময় বুঝে সকলকে বলে দিলো—এবং শেষ পর্যন্ত অনিমাকে উনুনের সামনে যেতে হলো। বাস্তবিক ও কিছুই বিশেষ জানে না। ভারী রাগ হচ্ছিলো অনিমার।

অতিকষ্টে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরিয়ে ধোঁয়ায় জলঝরা চোখে চারিদিকে চেয়ে অনিমা দেখলো—সেদিকে কেউ নেই। নমিতা, রমলা, প্রতিমা সব অনেকটা দূরে ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসে কি জটলা করছে। সকলেই দলে দলে যেমন ইচ্ছা বেড়াচ্ছে—রান্নার দিকটা সযত্নে পরিহার করে। মশলা, চাল, ডাল, আলু, বেগুন চতুর্দিকে

ছড়ানো—জলও সেই যে উৎসাহ করে দুই ঘটি আনা হয়েছিলো—ওইটুকুনই পড়ে আছে। অনিমার যেন কান্না পেতে লাগলো। বাড়ীতে সে কোনও দিন রান্না করেনি বললে গেলে—মাঝে মাঝে চা-জলখাবারের সাহায্য করে মাত্র—কেমন করে যে এই কুড়ি-পচিশজন মেয়ের রান্না ও করবে ভেবে পেলো না।

যাই হোক উনুন জলে উঠেছিলো—অনিমা একমনে মায়ের রান্না করা ভেবে ভেবে প্রকাণ্ড হাঁড়ীটা চাপিয়ে দিলো উনুনে—ইঁটের পলকা উনুন তো নড়চড় করে উঠলো। অনিমা ঘি ঢেলে দিলো হাঁড়ীতে—জল তখনও না শুকোনোয় হঠাৎ ফোঁশ করে আগুন ধরে উঠলো। অনিমা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালো—নমিতার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেলো ওর। তবে এর ফলে সব মেয়েকেই রান্নার দিকে এগোতে হলো। কোনোরকমে খিচুড়ী চড়ানো পর্ব শেষ হলো প্রায় বেলা আড়াইটে আন্দাজ। খানিকটা জাল উঠেই উনুন তো নিবুনিবু—হতাশ হয়ে ওরা দেখে সব কাঠ ফুরিয়ে গেছে—আসার সময়ে কোন-কালে আরও চারটে কাঠের বোঝা ফেলেই আসা হয়েছে।

"জলও ফুরিয়েচে!" খিচুড়ীতে উঁকি দিয়ে রমলা বললো—"আনতে যাও নয়তো খিচুড়ী পুড়ে যাবে।"

নিরুপায় মেয়েরা ভাগাভাগি করে কিছু গেলো জল আনতে, কিছু গেলো জঙ্গলের দিকে কাঠ কুড়োতে। কল্পনায় এগুলি কি চমৎকারই না লেগেছিলো—এখন এই গ্রীষ্মের দুপুরের আগুন-রোদে পেট জ্বালা—ক্ষিদে পেটে ভয়ানক খারাপ লাগছিলো। সব হাসি-মুখগুলি এক সঙ্গে শুকিয়ে গেছে। বঁটি আনতে ভুলে গেছে প্রতিমা—আস্ত আলুই খোসা শুদ্ধ খিঁচুড়ীতে ছাড়া হলো। কারুর মুখে কথা নেই। সলিলা দলের নেতা হয়ে হেডমিসট্রেসের কাছে তর্ক করেছিলো—এখন তার মুখ কাঁদো কাঁদো। অনিমার তো টস্ টস্ করে দু-ফোঁটা গড়িয়েই এলো—বাড়ীতে সে কখন খেয়ে নেয়। বেলা চারটে এখনও খাওয়া নেই, তার ওপুর রান্নার কাছে থাকা—যা সে একদম পছন্দ করে না। অনিমা প্রতিজ্ঞা করলো, বাজে কথা আর বলবে না।

প্রায় দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে থাকা ও বারবার চাল আলু টিপে দেখার পর সকলের সমবেত চেষ্টায় কোনো রকমে খিঁচুড়ী নামলো। খাওয়া শেষ হতে বেলা একেবারে শেষ হয়ে এলো। অনিমা ভাবছিলো ওর জ্বর আসবে নাকি? হাতে তিন চার জায়গায় ফোস্কা বড্ড জ্বালা করছিলো। রৌদ্রের তাতে থেকে কি মাথা ধরেচে—উঃ! কিন্তু বাড়ীতে বা স্কুলের অন্য মেয়েরা এসব জানলে ভারী লজ্জা। নিজেদের জেদে ওরা এসেচে, এখন ওদের অনুতপ্ত দেখলে সবাই হাসবে—ওঃ কোনো রকমে বাড়ী পৌছে শুতে পারলে হয়। ক্রমে বেশ অন্ধকার হয়ে এলো—ড্রাইভার গাড়ী আনতে এতো দেরী করচে কেন? বোধহয় ভাবচে ওদের উৎসাহ এখনও শেষ হয়নি! এর মধ্যেই হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনে নেতিয়ে পড়া মেয়ের দল সচকিত হয়ে উঠে পড়লো। অনিমা বাসে উঠে বসে গম্ভীর হয়ে বললো, "সত্যি হেডমিসট্রেস ঠিকই বলেছিলেন—গরমকালে পিক্‌নিক জমে না—বিশেষতঃ"—অনিমার বক্তব্য অসমাপ্তই রইলো "কি বোকামী করচিস অনু—দেখচিস না থার্ড টিচার এসেছেন?" ফিস-ফিস করে রমলা বললো। স্কুলের ঘেরার মধ্যে গাড়ী এসে থামতে থার্ড টিচার লীলাদি চশমার ভিতর হতে তাদের ওপর হাসিভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ উপভোগ করেচো—আজকের এই ট্রিপটায়—সব বিবরণ শুনবো কাল। ছোটের অন্য দলটি শীতকালে যাবে পিকনিকে।"

স্কুল হতে বাড়ী কাছেই—অনিমা পা চালিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে দেখে সব অন্ধকার—বাড়ীর দোর বন্ধ। নিধু, হাবলুর মা অবধি নেই! "ওমা মাগো!" বলে অনিমা রাগে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠতেই "কে চেঁচাচ্চে রে?" বলে কারা গেট দিয়ে ঢুকলো কুলীর মাথায় জিনিষ নিয়ে! "আরে দাদা বৌদি?—আরে সরিৎবাবু যে?" বলে অনিমা ভীষণ অবাক! ওরা সকলে প্রায় এক ঘণ্টা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবার পর হঠাৎ এক রাশ হাসি গল্পের সাথে মোটর এসে থামলো—মা, নীলিমা, মণিকা-মাসী, মলয় সব নামলেন। আগন্তুকদের দেখে সব আনন্দে আশ্চর্য—খুব হাসিগল্পের আর এক চোট ধুম পড়ে গেলো। অনিমার খোঁজ করতে দিদি বৌদি দেখেন সে নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেলো ভাঁড়ার ঘরের কোণায় বসে পাঁজি খুলে দেখছে

"নটা চল্লিশ গতে বারবেলা—!" দিদিকে দেখে ভীষণ রেগে অনিমা বললো—"কালই যেন সরিৎবাবু তোমায় নিয়ে যান—বারবেলায় বেরোলাম—কেউ মানা করলেন না ?···বারে চলে যাচ্ছ কেন ? ফোস্কায় ওষুধ লাগিয়ে দাও দিদি।

—

খোকন সোনা

শ্রীসুধীরকুমার রায়

খোকন সোনা
চাঁদের কণা
　　　　এইটুকু এক রত্তি,
একটু হাসে
বেজায় কাঁদে
　　　　মিথ্যে নয়তো সত্যি।
খোকন সোনা
হীরের কণা
　　　　ছোট্ট নিটোল মুক্ত,
মুখটি চুমে
আদর করে
　　　　তাঁ'রে বেজায় সুখতো।
খোকন সোনা
যায় তো গোনা
　　　　দু' এক কুচি দন্ত,
কতই শোভা
পরাণ লোভা
　　　　তাতেই যে শ্রীমন্ত।
খোকন সোনা
চাঁদের কণা
　　　　মায়ের কোলে উপছে,
হাত-পা নেড়ে
হাসছে কেমন
　　　　আদরটুকু বুঝছে।

—

ছোটদের ম্যাজিক

যাদুকর রতনকুমার দাস

আমার ছোট্ট বন্ধুরা গত মাসে তোমাদের একটা দিব্য দৃষ্টির খেলা শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আর একটা সহজ খেলার কথা তোমাদের কাছে বোলবো। তবে আমি যে সব খেলা তোমাদের শেখাবো ঐসব খেলাগুলো ভালো ভাবে অভ্যাস না কোরে কখনও বাইরে দেখাবে না। জানো তো, "সাবধানের মার নেই"। আজকে যে খেলাটি তোমাদের শেখাবো, সেটি একটু সাবধানের সঙ্গে কোরবে, কেননা এতে খানিকটা এসিডের দরকার হয়। এই খেলাটি হ'ল, এক বোতল সালফিউরিক এসিড যাদুকর দর্শকদের সামনে খেয়ে নেবেন। এতে যাদুকরের কোন ক্ষতিই হবে না। আচ্ছা তোমরাই বল, জ্যান্ত মানুষ যদি সালফিউরিক এসিড খায় তাহলে সে কি আর বাঁচবে ? না বাঁচবে না। তবে যাদুকর কি কোরে খান ! সেইটিতোই ম্যাজিক। এমন জিনিস যা স্বয়ং ভগবানেও কোরতে পারেন না, তা ম্যাজিক নিমিষের মধ্যেই ঘটিয়ে দেয়। যাক্ সে যাই করুক, আমি আসল কথায় আসি, কি বল ?

মঞ্চের উপর যবনিকা পড়ে আছে। যবনিকা সরে যেতে, দেখা গেলো একজন যাদুকর দর্শকদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে মঞ্চের উপরে রাখা টেবিল হোতে একটা শীল করা এসিডের বোতল হাতে তুলে নিয়ে দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসেন। তারপর ঐ এসিডের বোতলটা কয়েকজন দর্শকের কাছ থেকে ভালো কোরে পরীক্ষা করিয়ে নেন, যাতে দর্শকদের বোতলটার প্রতি কোন সন্দেহ না থাকে। পরীক্ষা করানো হোয়ে গেলে যাদুকর সকলের সামনে বোতলটার মুখ খুলে খানিকটা এসিড একটা গেলাসে ঢেলে তাতে একটা তামার পয়সা ফেলে দেন। পয়সাটা এসিডের মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোটা আরম্ভ কোরে দিলো। আর বিশ্বাস না কোরে কোথায় যাবেন দর্শকেরা। তারপর যাদুকর বললেন, "উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, আপনারা আমার হাতের এই এসিডের বোতলটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বোতলটি কোম্পানীর ঘর থেকে শীল করা অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তা সত্বেও আমি আপনাদের সামনে বোতলের মুখ খুলে তার থেকে খানিকটা এসিড একটা গেলাসে ঢেলে একটা তামার পয়সা ফেলে দেখালাম, যে বোতলটার ভেতর সত্যিই এসিড আছে। এখন দেখুন, আমি আপনাদের সামনে এই বোতলের সমস্ত এসিড খেয়ে ফেলছি। দর্শকেরা শুনে তো একেবারে "থ" বনে গেলেন। লোকটা পাগল নাকি ? কি আশ্চর্য ! যাদুকর যে সত্য সত্যিই খেয়ে ফেললেন।

খেলাটি খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু এঁর মূল কৌশল ঠিক তার অনুরূপ। আসল কৌশল করা থাকে ঐ এসিডের বোতলে। বোতলটাকে প্রথম হোতেই লেমোনেড জল ভর্তি কোরে পিচ দিয়ে শীল কোরে দিতে

হয়। আর মঞ্চের উপরের টেবিলে রাখতে হয় দুটো কাঁচের গেলাস (রং করা কাঁচের গেলাস)। একটা গেলাসে পূর্ব হোতে খানিকটা সালফিউরিক এসিড রাখতে হয়, বোতলটা পরীক্ষা করিয়ে সকলের সামনে খুলবে, খুলে ঐ এসিড রাখা গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে তাতেই খানিকটা লেমনেডের জল ফেলে দেবে। তারপর খুবই সহজ। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কোরে দেখ, দেখবে এই খেলাটি দেখে ভাল ভাল যাদুকররাও অবাক হয়ে যাবেন।

একটি মোমবাতি

অজিতেন্দ্র সিংহ

মাধুপুর। পাড়াগাঁ। মাত্র ক'ঘর লোকের বাস। বাঁশ, আম-কাঁঠাল আর তাল-নারকেলের বাগান চারদিকে। এদিক ওদিক মজা পুকুর। মশার উৎপাত। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। রাস্তায় বেজায় ধুলো। বর্ষায় হাটুডোবা জল-কাদা। হাট-বাজার, দোকান-পসার, ইস্কল-ডাকঘর কিছুই নেই।

মৃণালকে প্রায় মাইল তিনেক পথ পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনের ওপাশে দানগঞ্জের হাই-স্কুলে পড়তে যেতে হয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করতে আরো দু'টো বছর বাকী। শহরের ইস্কুলে পড়াবার জন্যে তার কাকা তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সে যায় নি।

মাধুপুরকে ভালবাসে মৃণাল। কোন সুখ সুবিধে নেই এখানে। বরং হাজার অসুবিধে। তবু এ তার নিজের গাঁ। এখানকার মাটি, আলো, বাতাস, জল-গাছ-পালা জীব-জন্তু সব কিছুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ।

মৃণালের বেশীর ভাগ সময় কাটে লেখাপড়া নিয়ে। বিকেলে যখন লেখাপড়া থাকে না তখন গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে মাঠের আল পথ ধরে একটু বেড়িয়ে আসে। বেশ লাগে। বেড়িয়ে ফেরার পথে একদিন পাড়ার ভোতন, মন্টু ও ভোলার সঙ্গে দেখা। ভোতনের অভিযোগ, মৃণাল খালি লেখাপড়া নিয়েই থাকে, এক আধ দিন একটু-আধটু খেলাধুলোও তো করতে হয়। ভোলা বললে, আয় না আমাদের সঙ্গে, আমরা একটা নতুন খেলা শিখেছি তোকেও শিখিয়ে দিই। ভারি মজার খেলা।

মজার খেলাটা আর কিছুই নয়, তাস। দু'চার দিনেই মৃণালকে শিখিয়ে দিল। প্রথম প্রথম সে অবশ্য আপত্তি করেছিল, তাস খেলা ভাল নয়। রোজ রোজ খেলা হবে না। পড়াশুনোর তাতে ক্ষতি হবে।

আপত্তি মৃণালের টিকলো না। আস্তে আস্তে তাসের নেশায় তাকে পেয়ে বসল। বিকেলে মাঠে বেড়াতে না গিয়ে এখন বোসেদের পোড়ো বাড়ীতে লুকিয়ে তাস খেলে, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নামা পর্যান্ত। একটা করে বড় মোম-বাতি রোজ সেই কিনে নিয়ে যায়।

দু'পয়সার বাতিটা হাতে করে সেদিন রাস্তা দিয়ে মৃণাল হনহন করে যাচ্ছে। কোথা থেকে তাঁতীদের ছেলে নরেন ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

নরেন বড় ভাল ছেলে। যেমন স্বভাব, তেমনি বুদ্ধি তার। দানগঞ্জের ইস্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে। মৃণালদের সঙ্গে তাকেও পথ হেটে যেতে হয়। ছোট ছেলে, বড় কষ্ট হয়। তবু ওর পড়ার বড্ড ঝোঁক। পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হয়ে নতুন ক্লাসে উঠছে। বড় গরীব ওরা। ইস্কুলের মাইনে লাগে না ওর।

মৃণাল লক্ষ্য করল, নরেন কিছু বলতে চায়। তাকেও দাঁড়াতে হল। শুধুলে, কি নরেন, ব্যাপার কি, কিছু বলবে নাকি।

নরেন বললে, হ্যাঁ। বলছিলাম, তোমার হাতের বাতিটা আমাকে দাও না মৃণালদা। পড়ার জন্যে তেল কেনার পয়সা নেই আজ। আমার পড়া হবে না রাতে।

অবাক হল মৃণাল। পরের জিনিষ চাইতেও লজ্জা নেই। পড়ার জন্যে এমনি পাগল। বাতিটা ওকে দিয়ে দেওয়াই উচিত তার।

নরেন গরীবের ছেলে। পড়ার জন্যে সামান্য একটু তেল কেনার পয়সাও নেই ওদের। মৃণালদের অবস্থা ভাল। জায়গা-জমি আছে। পয়সার অভাব নেই। দু' পয়সা দু'পয়সা করে কত পয়সার বাতি পুড়িয়ে সে তাস খেলেছে। সময় ও অর্থের অপব্যয় করেছে অনর্থক। পড়াশুনোর তাতে ক্ষতি হয়েছে ঢের।

বাতিটা নরেনকে দিয়ে মৃণাল খুব খুশী হল। এমন খুশী সে আর কোন দিন হয়নি। বাতিটা এখন সামান্য দু'পয়সার বাতি নয়। তার দাম অনেক। মোমবাতিটা

তার চোখ খুলে দিয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষতি করে মন্দ ছেলেদের সঙ্গে আর কখনও তাস খেলবে না। নরেনের মত লেখাপড়া করবে। তার মত ভাল হবে।

মৃণালের মনে হল, বাতিটাও যেন আজ ধন্য হবে। পুড়ে সার্থক হবে।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ

শ্রীমতী নীলিমারাণী চক্রবর্ত্তী বি-এ

সাধিকা শ্রেষ্ঠা মীরা গেয়েছেন 'সাধন করনা চাইরে মনোবাঁ, ভজন করনা চাই।' ঈপ্সিত ধন লাভ করতে হলে সর্বাগে প্রয়োজন সাধনা ও ভজনা। চাইলেই যাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পেতে হলে স্বার্থহীন প্রেম ও গভীর তপস্যা চাই। তাইত শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন 'বিচার বাসনা ছেড়ে শুধু চাই গভীর আকুলতা।' ঐ আকুলতা না এলে ত তিনি ধরা দেন না। পাগল হতে হবে—তবে বিচার বুদ্ধিহীন পাগল নয়, এ আত্মাভিমানত্যাগী উপলব্ধি-পাগল। সে এমনই জিনিষ যার আহ্বানে রাজার দুলাল গৌতম শত প্রলোভন ছিন্ন করে বেরিয়ে যান, যার নয়নমণি jerus সে উপলব্ধিতে হাসিমুখে দেন প্রাণ।

ব্রহ্মলাভে যেমন চাই সাধনা, ঠিক তেমনি সাধনাই চাই বিদ্যা, কৃষ্টি লাভে। সরস্বতীর বরপুত্র যারা তাঁরাও ত পাগল—তারা ধন চায় না, মান চায় না, নিরলস শান্তি চায় না, চায় শুধু দেবী সরস্বতীর কৃপা, চায় জ্ঞান।

মনীষী সক্রেটিশ্—মনের উর্দ্ধ বিকাশ স্বীকার করে জীবনাহুতি দিলেন হাসিমুখে—এও এক সাধনা। বৈজ্ঞানিক এডিসন্, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন, ডেভী, আমাদের জগদীশ বসু, সত্যেন বসু, আরো কত জন—কি আশ্চর্য্য এঁদের সাধনা জ্ঞানের পূজায়। সঙ্গীতের সাধনায় তানসেন—গুরু সেই মহাপুরুষ গোস্বামীর কথা কে না জানে, তাঁর নিকট সঙ্গীতেই ছিল আত্মার উপলব্ধি। সে স্বর্গীয় সঙ্গীত তিনি করেন নি পরিবেশন রাজসভায়, সে ছিল যোগসূত্র তাঁর ও সেই মহামহিমের। ইউরোপীয়ান্ সঙ্গীত সাধক, বিঠোফেন ও মোজার্টএর জীবনীও অপূর্ব! ছোট্ট সাত বৎসরের বালকের প্রথম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এমন অদ্ভুত প্রতিভা তবু করতে হয়েছে সাধনা। আজকের জগতে আমাদের বাঙ্গালার ঘরের ছেলে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, যাঁর করস্পর্শে মূক বাদ্যযন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে, তাঁর জীবনী ও সাধনা এবং তন্ময়তার এক অপূর্ব কাহিনী। যন্ত্র সঙ্গীতে তাঁর দান একটি অপূর্ব বিস্ময়, তেমনি অপূর্ব তাঁর সাধনার ইতিহাস। ভক্ত রজ্জবজী বলেছেন—এ ভগবানের রাজ্যে···কেউ বা সৃষ্টি করেন বাণীতে, কেউ বা ধ্বনিতে, কেউ বা বর্ণে, আবার কেউ বা আপন অন্তরকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে মহিমাময়ের চরণে। এভাবে কোন কিছুরই উৎকর্ষ যিনি করেছেন তিনিই করেছেন নতুন সৃষ্টি। এইরকমে আলাউদ্দীন করেছেন নব নব সুরজালের সৃষ্টি।

সাধু সন্ত ব্যক্তির যেমন মন উদাস হয় রামনাম শ্রবণে, তেমনি শিশুবয়স হতেই গানের সুরে আলাউদ্দীনের মন যেত উদাস হয়ে। গান বাজনার আসর যেখানে সেখানেই থাকবে বালক স্কুল পালিয়ে। তবলায় ঠেকা দেবার অপরাধে মার হাতে পিটি খেয়ে সটান বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এলেন কলকাতায়, সম্বল মাত্র ১২৲ ও বাজনা শেখার অদম্য পিপাসা। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ছেলে—কলকাতার পথে সহুরে ছেলেরা তার গ্রাম্য ভাষা ও পোষাক দেখে টিট্কারী দেয়—কিন্তু তা বলে সেই ১২ বছরের ছোট্ট ছেলেটি দমে না। প্রথম কদিন কাটল একবেলা লঙ্গরখানায় খেয়ে ও আর একবেলা শুধু গঙ্গার জল খেয়ে। তবু সঙ্গীত শিখতে হবে। তারপর কত সুখ দুঃখ লাঞ্ছনার ইতিহাস—এ গুরু সে গুরু ধরে শেষে চাকরী মিলল থিয়েটারে বাজ্না বাজাবার। কিন্তু চাকুরী করতে ত ও দেশ ছেড়ে, মায়ের আঁচল ঘেরা গৃহকোণ ছেড়ে পথে বেরোয়নি। ওকে যে পেতে হবে দেবী সরস্বতীর বীণার তারের একটু রেশ। আহমদ্ আলীর শিষ্য হলেন এবং তাঁর যাবতীয় সেবা শুশ্রূষা করে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর সন্ধ্যা ৭টায় একা ঘরে বস্তেন—গুরুর নিকট শোনা সুর সাধনা করতে, আর বাজনা শেষে উঠতেন রাত্রি ৪টায়—এর মধ্যে আর বিশ্রাম নেই। তবু বুক ভরে না, মন ভরে না, কোথায় সেই স্বর্গীয় সুর, যার জন্য ঘর ছেড়েছেন! কিন্তু মনে যদি থাকে আকাঙ্ক্ষা তবে উপায় হবেই। সে

এক নাটকীয় উপায়ে বিখ্যাত ওস্তাদ উজীর খাঁর শিষ্যত্ব লাভ করলেন—দিনের পর দিন কেটে গেছে বিপুল ধৈর্য্যে প্রতীক্ষায় কিন্তু গুরু আসল জিনিষ ছাড়েন না, নৈরাশ্যে ভরে ওঠে মন।—উজীরখাঁর বড় পুত্রের হঠাৎ হল মৃত্যু তখন উজীরখাঁ ব্যাকুল হয়ে ডেকে নিলেন আলাউদ্দীনকে—যে এমন গুণী শিষ্য কতদিন কাটিয়ে গেল তাঁর দরজায় নীরব প্রতীক্ষায়, তাকে বিমুখ করেছেন তিনি, তাই বুঝি ভগবানও বিরূপ হয়েছেন তাঁর প্রতি—অনুশোচনায় ভরে উঠে বুক। প্রাণ ঢেলে উজাড় করে দেন তাঁর সুরসাধনা আলাউদ্দীনের কাছে। সে শিক্ষা বিফল হয় না, যোগ্য পাত্রে তা আরো মধুরতর হয়ে ওঠে। আজ আলাউদ্দীনের সুর চমক লাগায়, কিন্তু এর পেছনে যে সাধনা, যে ব্রহ্মচর্য্য ও নির্লোভতার ইতিহাস আছে, তাই সম্ভব করেছে এই সুরলোকের ঊর্দ্ধভূমিতে বিচরণ-ক্ষমতা। পরমহংসদেব বলেছেন, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোন একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে তাহলে চেষ্টা করলে সে সহজেই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কত অভ্যাস করেই না তবে একটা বিদ্যা রপ্ত করা যায়—এই অভ্যাস যোগেই লাভ হবে ঈশ্বর। সুন্দরের প্রতীক দিবেন ধরা এই অমর সাধনার কাছে।

বাংলার শিল্পী নন্দলাল বসু, যাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মুগ্ধ করেছে আজ সুধীজনকে, তাঁর এই পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছিলেন গুরুর হাতে—আর? আর ছিল একাগ্র সাধনা, যে সাধনায় একলব্য লাভ করেছিলেন ঈপ্সিত বিদ্যাজ্ঞান।

শ্রীতারাশঙ্করের আত্ম-জীবনীতে দেখেছি এমন এক সময় গেছে তাঁর জীবনে যখন ২৫৲ টাকাও তাঁর সংসারে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে মনে হত, সে সময় পেয়েছিলেন সিনেমা কোম্পানীর পক্ষ হতে ৫০০৲ মাইনের চাকুরীর নিমন্ত্রণ। কিন্তু গ্রহণ করেন নি। নিজের মতবাদ বাঁধা-নিয়মে ফেলতে রাজী হননি তিনি। দারিদ্র্য-লক্ষ্মীকেই তবু বরণ করেছেন সাহিত্য-লক্ষ্মীর সাধনায়। এই যে সাধনা, এইত করেছে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত আজকের এই সর্ব্বজন-সম্মানিত আসনে। Bernard Shaw, Dickens, Knut Hampsun আরো কত লেখকের কত লেখা ফিরে এসেছে অনাদৃত হয়ে। সরস্বতীর সাধনায় লক্ষ্মী তাঁদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন নি—তবু কি দৃঢ় সাধনা। তাইত সাফল্য এসেছে পরে জয়মাল্য হাতে নিয়ে। সামান্য ওভারসীয়র স্যার রাজেন্দ্রনাথ শুধু সাধনার বলেই বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রেলগাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা George Stephenson—যাঁর প্রথম বর্ণপরিচয় হয় নিজেরই শিশুপুত্রের নিকট, সেই অক্ষরজ্ঞানহীন লোকটিই তাঁর সাধনার দ্বারা বিজ্ঞান জগতে নবযুগ আনেন।

ভগবানের দান এই দেহ—তাকে যারা সাধনা দ্বারা সুন্দর সুস্থ রাখে তাদের সাধনাও বড় কম নয়। ঠাকুর বলেছেন "শরীর সুস্থ না থাকলে কেমন করে সর্ব্বমন সমর্পণ করে তাঁকে ডাকা যাবে। সুতরাং শরীরটা আগে সুস্থ রাখ। আমাদের দেশে ভীম-ভবানী, গামা, গোবর, হামিদা, শ্যামাচরণ—শরীর চর্চায় এঁদের কি অদ্ভুত সাধনা। বাঙ্গালার ছেলে শ্যামাচরণ শুধু হাতে বাঘ সিংহ রুখতেন। তবে যেমন বেশীর ভাগই দেখা যায় বৈজ্ঞানিকগণ পরিণত জীবনে দার্শনিকে পরিণত হন, তেমনি তিনিও সর্ব্বশক্তিসার সেই মহানের সন্ধানে যোগী হয়ে যান। বিজ্ঞানের বড় বড় মহারথীরা যখন দেখেছেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যে আদি আর কোথায় অন্ত, আর কি দিয়ে যে কে এভাবে এমন সুসামঞ্জস্য রূপে গড়ল, এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়া যায়নি, তখনি মেনে নিয়েছেন যে সবার উপরে এমন একজন কেউ আছে যার কার্য্য-কারণ বিচার দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাই যে কোন বিদ্যাই হোক্ না কেন, তার জন্য যদি প্রকৃত সাধনা করা যায় তবে তাতেই হবে মোক্ষলাভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্ব্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরসুন্দরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন—"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাত্রের গাড়িতে যদি গগন আর দিগন্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও"

"এত সকাল সকাল ঘুমই আসবে না আমার। তুমি শোও" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগন্তকে যে কতদিন দেখি নি"

পুরসুন্দরী কোন জবাব দিলেন না।

কিরণ নিজের স্যুটকেস হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীরবে আলাপ করিতেছে। কখনও ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, কখনও বা উল্টানো নীচের ঠোঁটটি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পা টিপিয়া রাঁধিবার কিছু সরঞ্জাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্ব্বতীকে বাধা দিলেন না, যা খুশী করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল, কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাখিয়া কি ভাবে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করেন তাহারই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল।

পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া একেবারে অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। পার্ব্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্য আর কেহ না বুঝুক তিনি বুঝিয়াছিলেন। দিগন্ত মটর ডালের বড়া খাইতে খুব ভালবাসে। সে হয়তো রাত্রের ট্রেণে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্ব্বতী এত কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার মনে আছে ভগবানই জানেন। দুর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগন্ত উহার দিকে যে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে। কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার বাধা পড়িবে, এক বৎসর কালাশৌচ। মানুষের কিছুই হাত নাই। চক্ষু বুজিয়া পুরসুন্দরী নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও বুঝিলেন না। আজকাল কারণে অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

"বউদি ঘুমিয়ে পড়লে না কি—"

পুরসুন্দরী শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় বাক্সে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল স্তূপ-করা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে,সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাফিরখানাটা কোন দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোষাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি, আপনিও এসেছেন !"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্টদাকে খুঁজছেন ? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন । ডেকে দেব ?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা ! তুমি রেলে ঢুকেছ বুঝি"

"হ্যাঁ"

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো তো"

"মা মারা গেছেন গেল বছর"

"ও—"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে ফরসা থান-পরা, ধপধপে শাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, খর্ব্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারাটা কিরণের চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রবধূর মতোই ভালবাসিতেন। তখনও মণ্টুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্রী কেমন আছে"

যতীশের দাদা সতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও সখী ছিল।

"বৌদির থাইসিস্ হয়েছে"

"ও ! কোথা আছে সে ? হাজারিবাগে ?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে' দিয়েছি। বৌদি ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেরা বলছেন, সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয় নি ?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বৌদির অসুখ হয়, ছেলেটি বাঁচে নি"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্ত্তা কিরণ নির্ব্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি-ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবন্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি-আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা, শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা"

"দাদা, সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন তিনি। ছেলেও হয়েছে দুটি"

"আবার বিয়ে করেছেন ? বিয়ে না করলেই পারতেন"

যতীশ কুণ্ঠিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে যে।

বলিল, "বৌদিকে একথা জানাই নি আমরা—"

"তুমি বিয়ে করেছ ?"

"না। বৌদির স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন"

যদিও ইহাদের সংসারের সুখ-দুঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সকলপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে' সাবিত্রীর চিকিৎসার খরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হয় নি"

"কেন"

যতীশ কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বহুকাল পূর্ব্বে দশবারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

"কতক্ষণ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেণটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিংরুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো"

"না। আচ্ছা, আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন"

কিরণ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চত্বরে বহুযাত্রী। একটা পান সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্ব্বতী পকৌড়ি-ওলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ি-ওলা চিরনজিপ্রসাদও ছাপরা জেলার লোক। পার্ব্বতীর চাল চলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কায়দা দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু পার্ব্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল সে অবাক হইয়া গেল এবং আত্মহারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাতেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরনজি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ গিয়া দেখিল পার্ব্বতী একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মুকুন্দ বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুন্দের হাতে একঠোঙা পকৌড়ি। সানন্দে সে পকৌড়ি ভক্ষণ করিতেছে। চিরনজি তাহার তোলা-উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর জামাইবাবুকে দেখেছিস—"

"ওই যে—"

মুচকি হাসিয়া পার্ব্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণকান্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল যুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকী সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকান্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দাজ করিল, কোনও রসের গল্প ফাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে সে ওস্তাদ তো! সে দলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে—"

"এরা? এরা সাঁওতাল, আমার আলাপী লোক। মুংলিকে তুমিও তো দেখেছ? সেই যে ডালটানগঞ্জে আমাদের বাংলার মাঠে পাতা কুড়োতে আসত ছোট মেয়েটা। কত বড় হয়েছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

পিটে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাড়ির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আড্ডায় বসে' গেছ"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বুধু মাঝির সঙ্গে কত হুঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ"

এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হুয় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে' দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতালও ছিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অনুমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়িয়া গেল যেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল— "কম বয়সী ছুঁড়ি দেখলে আর দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল"

মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের

দিকে আড়-চোখে একবার চাহিলেন। দেখিলেন কিরণও হাসিতেছে।

"গুণের আর শেষ নেই। কি বলে' অতগুলো জিলিপি ওদের সব দিয়ে দিলে। নিজেদের জন্যও কিছু রাখতে হয়—"

"খাবে? গরম গরম ভাজিয়ে নি চল না। চল, দোকানে বসেই খাওয়া যাক। ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। দাদা বৌদি তো খাবে না। পার্ব্বতী আর ওই ছোঁড়া চাকরটা তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি, কি বল—"

"নাও—"

পার্ব্বতী খাইতে চাহিল না। পকৌড়ি খাইয়া মুকুন্দেরও পেট ভরিয়া গিয়াছিল।

"আমরা দুজনেই খাই চল তাহলে—"

"আমার লজ্জা করবে ভারি"

"এতে লজ্জা কি! জিলিপি খাওয়া অন্যায় নয়"

একটু পরেই দেখা গেল, কিরণ আর কৃষ্ণকান্ত দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া দুইটি শিশুর মতো জিলাপি ভক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলাপি নয়, গরম গরম কচুরীও। তাহার পর ভাঁড়ে করিয়া চা।

"তোমার জেদেই কতকগুলো অখাদ্য গিল্‌তে হল"

"কুচ্ পরোয়া নাই। হজমি ওষুধ আছে আমার সঙ্গে—

আগে চল দাদার খোঁজটা করি। কোথায় গায়েব হ'লেন ভদ্রলোক—"

ক্রমশ

অতুল দত্ত

সোভিয়েট রুশিয়ায় মলোটভ্, কাগানোভিচ্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ক্ষমতাচ্যুতি, লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে আবার নূতন সমস্যার উদ্ভব, দক্ষিণ-পূর্ব্ব আরবে বৃটিশ বিমানের বোমা বর্ষণ, মালয়ের শাসনতন্ত্র প্রকাশ— ইহাই সংক্ষেপে গত জুলাই মাসের উল্লেখযোগ্য আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা।

রুশিয়ায় নেতৃবৃন্দের অপসারণ—

জুলাই মাসের প্রথমে অকস্মাৎ জানা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ্, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ, গৃহ নির্ম্মাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কাগানোভিচ্ এবং প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব ও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মঃ শেপিলভ্ ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটী তাঁহাদিগকে প্রিসিডিয়াম (পূর্ব্বে ইহাকে পলিট ব্যুরো বলা হইত) হইতে বহিষ্কার করিয়াছে; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিপদ হইতেও অপসারিত হন। ক্ষমতাচ্যুত রাজনীতিকদের মধ্যে মঃ মলোটভ ও কাগানোভিচ্ বয়সে খুবই প্রবীণ, রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এবং বিপ্লবোত্তর রুশ রাজনীতিতে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। ালিনের তাঁহারা চিরদিন ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী। মঃ ম্যালেনকভের বয়স াপেক্ষাকৃত কম। তবে, তিনি ষ্ট্যালিনের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। : শেপিলভের বয়স আরও কম; তাঁহার সহিত ষ্ট্যালিনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ল না। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ রা হয় যে, বহিষ্কৃত নেতারা প্রাচীন মনোভাবের দাস ছিলেন; হাদের বাস্তব বুদ্ধির বিশেষ অভাব—কম্যুনিজমের অগ্রগতির পন্থায় ্রকর নীতিতে তাঁহারা এখনও বিশ্বাসী। যৌথ খামারের চাষীদের ীর প্রতি তাঁহারা উদাসীন; যে নীতির দ্বারা রুশ জনসাধারণের ীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে, সে নীতির তাঁহারা বিরোধী। ন্দ্রীয় কমিটীর বিজ্ঞপ্তিতে মঃ মলোটভের প্রতি আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র; ন নাকি আন্তর্জ্জাতিক শান্তির জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত ্রতিক নীতির বিরোধিতা করিয়াছেন; যুগোশ্লোভিয়ার সহিত পার্কের, অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তির এবং রুশ-জাপান সম্পর্ক উন্নত বার নীতি তিনি সমর্থন করেন নাই। গত ৬ই জুলাই লেনিনগ্রাডে বক্তৃতায় রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মঃ ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত নেতৃবৃন্দকে তীব্র আক্রমণ করেন। নীতিগত বিষয়ে তাঁহাদের আপোষহীন বিরোধিতার কথা বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় পার্টির সমর্থন হারাইবার পর তাঁহারা উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন; পার্টির এবং গভর্ণমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া লওয়াই ছিল এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য।

রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত একমত হইতে না পারিলে স্বেচ্ছায় অপসরণ করেন। এই ক্ষেত্রে চারজন রুশ নেতা স্বেচ্ছায় অপসরণ না করায় তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু অস্বাভাবিকতা এই যে, এই মতদ্বৈধ সম্বন্ধে অন্যপক্ষের বক্তব্য কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। ক্রুশ্চেভ-বুলগ্যানিন্ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাইয়া ক্ষমতার আসনে রহিয়া গিয়াছেন বলিয়াই শুধু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলিতে (সোভিয়েট রুশিয়ায় সব প্রচারযন্ত্রই সরকার নিয়ন্ত্রিত) ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহা ছাড়া, উত্থাপিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে সন্দেহের কারণও রহিয়াছে। মঃ মলোটভের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ —তিনি অষ্ট্রিয়ান্ চুক্তির বিরোধী। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাসে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ রাব যখন আলোচনার জন্য মস্কোয় যান, তখন মঃ মলোটভই পররাষ্ট্র সচিব; ১৫ই মে তারিখে অষ্ট্রিয়ান্ ষ্টেট ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয় তাঁহারই আমলে। এই বৎসর মে মাসে ক্রুশ্চেভ-বুলগ্যানিন-মিকোয়ান্ যখন যুগোশ্লোভিয়ায় যাইয়া মার্শাল টিটোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখনও মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব। পররাষ্ট্র সচিবের বিরোধিতা থাকিলে পররাষ্ট্র নীতির এত বড় পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। যুগোশ্লেভিয়ার সহিত পূর্ব্বের তিক্ত সম্পর্কের অবসান হইবার পর দীর্ঘ এক বৎসর মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। শোনা যায়, মার্শাল টিটোর সর্ত্ত ছিল যে, মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র সচিব থাকিতে তিনি মস্কোয় যাইবেন না। তাই, ১৯৫৬ সালে জুন মাসে মার্শাল টিটো মস্কো যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মঃ মলোটভকে পদত্যাগ করিতে হয়। সম্প্রতি যুগোশ্লেভিয়ার সহিত রুশিয়ার সম্পর্কের যখন আবার অবনতি ঘটে, তখন মঃ মলোটভ আর পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর বিজ্ঞপ্তিতে ও মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় মঃ মলোটভের প্রতি তীব্র (হয়ত অসঙ্গত) আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, মার্শাল টিটোকে এবং পূর্ব্ব ইউরোপের টিটোপন্থীদিগকে সন্তুষ্ট করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

রুশিয়ার নেতৃবৃন্দকে অপসারণের প্রকৃত কারণ যাহাই হউক না কেন, ক্রুশ্চেভ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বলিতেছেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সহ অবস্থিতি নীতির অবাধ অনুসরণের উদ্দেশ্যে এই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন প্রশংসিত হইয়াছে। শ্রীনেহরু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈপ্লবিক অবস্থার স্বাভাবিকতা বিবর্ত্তিত হইবার লক্ষণ দেখিয়াছেন। রুশিয়ার বর্ত্তমান কর্ণধারগণ

ষ্ট্যালিনের অনুসৃত নীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং আপনাদিগকে উদার ও সহিষ্ণু নীতির সমর্থক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ষ্ট্যালিনের নীতি বর্জ্জিত হইলেও রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এতদিন ষ্ট্যালিনের সহযোগীদের প্রভাব ছিল। এইবার সে প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। ষ্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবমুক্ত রুশ রাজনীতির পরবর্ত্তী গতিধারা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবার মত।

মালয়ের স্বাধীনতা—

আগামী ৩১শে আগষ্ট মালয় (বৃটিশ) কমনওয়েলথের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা লাভ করিবে। মালয়ের নূতন শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিচিত্র নিয়মাবলী। নাগরিকতা মালয়ের এক বিশেষ সমস্যা। পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যের বিশ লক্ষ অধিবাসী মালয়ী, আঠার লক্ষ চীনা, পাঁচ লক্ষ ভারতীয় এবং সাত লক্ষ ইউরোপীয়। ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ রবার বাগিচার মালিক। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ চীনাদের হাতে। ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজকর্ম্ম করে। দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীরাই অগ্রগামী; সহরাঞ্চলে তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য। আজ নয় বৎসর মালয়ের পাহাড়ে-জঙ্গলে যে কম্যুনিষ্টদের গেরিলা তৎপরতা চলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই মালয়বাসী চীনা। রাজনীতিক্ষেত্রে যাহারা অগ্রগামী, তাহাদের—বিশেষতঃ বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মালয়ের নূতন শাসনতন্ত্রে নাগরিকাধিকার সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মালয়ে যাহাদের জন্ম হয় নাই, তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার প্রদানের অথবা সে অধিকার প্রত্যাহারের পূর্ণ ক্ষমতা নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের থাকিবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে চীনা ও মালয়ীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। চীনারা যাহাতে রাজনৈতিক মতলব লইয়া মালয়ে আসিয়া এখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত না করিতে পারে, এবং অবাঞ্ছিত চীনাদিগকে যাহাতে মালয়ী রাজনীতি হইতে দূরে রাখা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে এই বিচিত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে লণ্ডন "টাইম্‌সের" মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: "The carefully weighed proposals for citizenship largely concern the Chinese, and they have been drawn slightly tighter. Citizenship may be withdrawn, or may be granted at Government discretion for those not born in Malaya. On the other side there are the many clauses in ths constitution that seek to safeguard the Malayis. They are to be guaranteed the main share in public services; their rights over land tenure are made permanent; their language will be State language and their religion the State religion ···· In Malaya they (Chinese) are not the minority as they are in Siam or Indonesia. (3.7.57) মালয়ের প্রসঙ্গ বৃটিশ কমন্স সভায় আলোচনার সময় এক জন রক্ষণশীল সদস্য শাসনতন্ত্রে নাগরিকাধিকার সংক্রান্ত এই উদ্ভট ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মালয়বাসী যে সব ভারতীয় এত দিন ঐ দেশকে তাহাদের মাতৃভূমি মনে করিয়া আসিয়াছে, তাহারা স্বাধীনতার দিন অকস্মাৎ উপলব্ধি করিবে যে তাহারা পরবাসী। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ লেনক্স বয়েড্ এই কথার কোনও সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই; তিনি শুধু এই আশ্বাস শুনাইয়াছেন যে, মালয়ে যে সব ভারতীয়ের জন্ম, তাহারা যদি ইতিমধ্যে নাগরিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই অধিকার অর্জ্জন সম্পর্কে "ভিটো" প্রযুক্ত হইবে না। ইহার নিগলিত অর্থ—যে সব চীনা বা ভারতীয় মালয়ে জন্মগ্রহণ না করিলেও তিন যুগ ধরিয়া সেখানে বাস করিতেছে, তাহাদের নাগরিকধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন মালয়ী মন্ত্রীদের খেয়াল-খুসী অনুযায়ী মীমাংসিত হইতে পারিবে; নবাগতদের নাগরিক করা সম্পর্কেও "ভিটো" প্রয়োগের পূর্ণ অধিকার মন্ত্রিমণ্ডলের।

আরবের মরু অঞ্চলে—

আরবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে মাস্কাট রাজ্যটি বৃটিশের প্রোটেক্টোরেট্। গত জুলাই মাসের শেষ ভাগে ওমান্ অঞ্চলের উপজাতিরা মাস্কাটের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ বহর নিযুক্ত হইয়াছিল। পরের রাজ্যে বৃটিশ বিমানের এই আক্রমণ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। পররাজ্যে এইভাবে বিমান-শক্তির নিয়োগ আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে সঙ্গত কিনা, এই প্রশ্নও কেহ কেহ বৃটিশ পার্লামেন্টে তুলিয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কৈফিয়ৎ—"সুলতানের সহিত বৃটেনের বহুকালের বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য" তাঁহার অনুরোধে বৃটিশ বিমানবহর নিযুক্ত হইয়াছিল। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য এইভাবে বৃটিশ বিমানবহরের ব্যবহারের সহিত হাঙ্গেরিতে সোভিয়েট সামরিক শক্তি নিয়োগের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯৫১ সালের চুক্তিতে মাস্কাটের সুলতানকে মাস্কাট ও ওমানের সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ওমানের ইমাম এবং মরু অঞ্চলের বহু উপজাতি মাস্কাটের সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ১৯১৩ সালে প্রথম ওমানের ইমাম মাস্কাটের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, এবং ইব্‌নে সৌদের পক্ষে যোগ দেন। তখন হইতে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত ওমানের উপর সুলতানের কোনও কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এই বৎসর বৃদ্ধ ইমামের মৃত্যু হয়। তরুণ ইমামও সৌদী রাজার সাহায্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখেন। ১৯৫৪ সালে ইমামের সহিত সৌদী রাজার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সেনাবাহিনী বুরামি অঞ্চলে তৎপর হয়। দুই বৎসর সামরিক তৎপরতা চলিবার পর বুরামি বৃটিশ সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হয়; ইহার অল্পকাল পরে,— ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ওমানই বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে সুলতানের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু ওমানের ইমামের এবং মরুঅঞ্চলের বহু উপজাতির আনুগত্য এখনও সৌদী রাজার প্রতিই।

[ই]য়াহী সৈন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া [গিয়া]ছে। এই সব অস্ত্র যে সৌদী রাজাই যোগাইয়াছেন এবং আমেরিকা [হই]তে ইহার আমদানী, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।

[আ]পাততঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, মরু অঞ্চলের এই সঙ্ঘর্ষ সামন্ততান্ত্রিক শাসক [ও উ]পশাসকদের স্থানীয় বিরোধ মাত্র। কিন্তু এই বিরোধের সহিত [মধ্য]প্রাচ্যের "তৈল রাজনীতির" গভীর সংযোগ রহিয়াছে। ওমান [অঞ্চ]লের ভূগর্ভে প্রচুর খনিজ তৈল আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান [কে]রন। এই তৈল সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণ তৈলস্বার্থ [ও] বৃটিশ তৈলস্বার্থের মধ্যে চাপা প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব [আ]রবে মাস্কাটের সুলতানের এলেকা ও সৌদী আরব রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী [সী]মান্ত নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত নাই। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যেমন সুলতানকে [মাস্কা]ট ও ওমানের সুলতান বলিয়া স্বীকার করেন, তেমনি বৃটিশ সূত্রে [প্রকা]শিত মানচিত্রে দক্ষিণ-পূর্ব্বের সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চল সুলতানের রাজ্য [বলি]য়া দেখান হয়। পক্ষান্তরে, সৌদী আরবের তৈল সম্পদের একচ্ছত্র [অ]ধিকারী আরব-আমেরিকান্ অয়েল কোম্পানীর মানচিত্রে (আরামকো) [এ]ই অঞ্চলকে সৌদী এলেকা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। সুতরাং মাস্কাটের [সুল]তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিবা মাত্র কেনিয়া হইতে বৃটিশ [বি]মানবহর প্রেরণ, বাহিরিণ হইতে বৃটিশ সৈন্য আনয়ন প্রভৃতি কার্য্যা[ব]লি নিষ্কাম নহে। আমেরিকাও এই ব্যাপারে অনাসক্ত নহে। সৌদী [আ]রবকে সংযত করিবার জন্য বৃটেনের অনুরোধ-উপরোধে আমেরিকা [কা]ণ দেয় নাই। ১৯৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান [মন্]ত্রী স্যর এন্থনী ইডেন যখন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত [আ]লোচনার জন্য আমেরিকায় যান, তখন সৌদী আরবকে সংযত [ক]রিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে [কো]নও ফল হয় না। দুই রাষ্ট্র-প্রধানের আলোচনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে [ব]লা হয়, "We believe these differences can be resolved [t]hrough friendly discussions."

মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে অফুরন্ত তৈলসম্পদ নিহিত আছে বলিয়া [বি]শেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে যে পরিমাণ [তৈ]লের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা নাকি পৃথিবীর মোট আবিষ্কৃত তেলের দুই-তৃতীয়াংশ। ইহা অপেক্ষাও বেশী তৈল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অনুমান। কূপ পিছু তৈল উৎপাদনের পরিমাণ মধ্য প্রাচ্যে অন্যান্য তৈল-অঞ্চল অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। এখানে প্রতি কূপে দৈনিক তৈল উৎপাদনের গড়পড়তা হার পাঁচ হাজার ব্যারেলের বেশী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই হার মাত্র ১৩ ব্যারেল, ভেনেজুয়েলায় ২৩৮ ব্যারেল্। মধ্যপ্রাচ্যের কূপগুলিতে তৈলের পরিমাণ এত বেশী যে অপেক্ষাকৃত কম কূপ খনিত হয়। ১৯৫৫ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খনিত প্রতি পাঁচটি কূপে দুইটি শুষ্ক দেখা গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যে খনিত প্রতি ছয়টি কূপে মাত্র একটি ছিল শুষ্ক। এই বিশাল তৈল-সম্পদে অধিকার বিস্তৃতির প্রতিযোগিতায় বৃটেন আজ আমেরিকার নিকট হারিয়া ভাগে বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব ছিল। আমেরিকা তখন কর্ত্তৃত্ব করিত মাত্র ১৩ ভাগে। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার কর্ত্তৃত্ব প্রসারিত হইয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদের শতকরা ৬৫ ভাগে; বৃটেনের অংশ কমিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। কুয়াইয়েটের তৈলের শতকরা ৫০ ভাগে, সৌদী আরবে উৎপন্ন সমস্ত তৈল-সম্পদে, পারস্যের শতকরা ২০ ভাগে এবং ইরাকের শতকরা ২৪ ভাগে আমেরিকান্ কোম্পানীগুলি এখন কর্ত্তৃত্ব করে। বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব এখন কুয়াইয়েটের শতকরা ৫০ ভাগে এবং পারস্য ও ইরাকের তৈলের সামান্য অংশে বৃটেন্ এখনও কর্ত্তৃত্ব করে। তৈল-স্বার্থের দ্বন্দ্বে এই জয়-পরাজয়ের কথা স্মরণ রাখিলে আরব উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বৃটেনের আশ্রিত মাস্কাট-সুলতানের প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এত আগ্রহ কেন, তাহা সুস্পষ্ট হইবে। আরব আমেরিকান্ অয়েল কোম্পানীর মানচিত্রে এই অঞ্চল কেন সৌদী রাজ্য বলিয়া দেখান হয়, মরু অঞ্চলের উপজাতীয়দের হাতে আধুনিক অস্ত্র কেন, বৃটেনের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সৌদী আরবের প্রতি কেন আমেরিকার পক্ষপাতিত্ব এবং কেন সে মার্কিণ অস্ত্র নিয়মিত পাইয়া আসিতেছে, তাহাও তৈলস্বার্থ-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

৩১।৭।৫৭
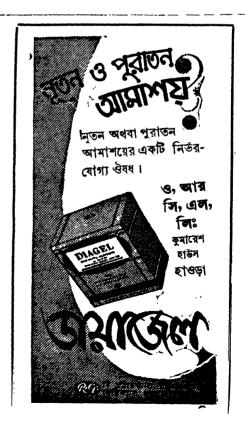
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫৫৫ সালেরও আগে বাংলা গদ্যের তুল্য ব্রজবুলি গদ্য গীতি রচনার কাজে ব্যবহার করা হত, এমন মনে করা একেবারে অসঙ্গত নয়। ১৫৬৮ সালে কামরূপ-সাহিত্য-গোষ্ঠীপতি শঙ্করদেব পরলোক-গমন করেন। তার আগে তিনি "রুক্মিণী হরণ নাট" ও "শ্রীরামবিজয় নাট" রচনা করে গেছেন। এই দুটি নাটগীতিকাতেই সেকালের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও ব্রজবুলি, তবু এদের স্বরূপ আলোচনায় বাংলা গদ্যের অবস্থা অনেকটা বোঝা যায়। এই ব্রজবুলি গদ্য আসলে ছদ্মবেশী বাংলা গদ্য।

এই ছদ্মবেশী গদ্যের কিয়দংশ আলোচনা করলে বোঝা যাবে এর নাটকীয় তথা সাহিত্যিক সার্থকতা আদৌ ছিল কিনা। শ্রীরামবিজয় নাটে এক জায়গায় সীতাদেবী বলছেন :—

"আহে সখিসব! পরম-অভাগিনীত কি পুছহ। হামো পুবজনমে ঈশ্বর নারায়ণক স্বামী ইচ্ছা করলো। অনেক কায়ক্লেশ করিয়ে বহুত বরিষ তপস্যা কয়লো। তদনন্তরে আকাশবাণী শুনলো—আহেকন্যা! তোহো ওহি জনমে স্বামীকে ভেন্ট নাহি পাওব। আওর জনমে শ্রীরাম-রূপে তোহাক বিবাহ করব। ইহা জানি হামো অগনিত প্রবেশ প্রাণ ছাড়লো। সে হামার কারণে দৈববাণী বিফল ভেল। সে-শ্রীরাম স্বামীক চরণ ওহি জনমে ভেন্ট নাহি ভেলো।"

উপযুক্ত অভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তি করলে এই ভাষা সহজেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং নাটকীয় গুণসম্পন্ন এই সংলাপাংশের সাহিত্যিক সার্থকতা আছে। লোক-ব্যবহারে ঠিক এই গদ্য প্রচলিত না থাকলেও শিষ্ট সমাজে ব্যবহৃত উত্তম সাধু গদ্যের আভাস-পরিচয় এই রচনাংশ থেকে পাওয়া যায়।

এই ব্রজবুলি গদ্যের ভাষা ও সাহিত্য-গত উৎকর্ষ পূর্বোদ্ধৃত রাজ-যুগলের পত্রদুটির চেয়ে অনেক বেশি। সুকবি শঙ্করদেবের কবিত্বশক্তির প্রভাবই তার কারণ। ভাষার শব্দসম্ভার যেমনই হোকনা, তাকে ইচ্ছা-মতো গ'ড়ে নিয়ে নিজের কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে-পারা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের একটি লক্ষণ। তা থেকেই Style বা রীতির জন্ম। সুতরাং ভাষার শব্দগত উপকরণের সঙ্গে রীতির সহযোগেই রচনার উৎকর্ষ নিরূপিত ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। এই জন্যে ভাষার আদি যুগে তার কাঁচা গড়নের অবস্থাতেও অনেক সময় শক্তিশালী কবির সন্ধান পাওয়া যায় যেমন, হয়ত পরে ভাষার পরিণততর অবস্থায় দুর্লভ। কবির বেলায় যেমন দেখা যায়, গদ্যরচয়িতার বেলাতেও তাই। চসার যে ইংরেজিতে, দান্তে যে ইতালীয় ভাষায় এবং চণ্ডীদাস যে বাংলাতে সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন, পরবর্তী কালের ইংরেজি, ইতালীয় ও বাংলা নিশ্চয় সে-সব ভাষার চেয়ে সুপরিণত ও শব্দ উপাদানে সমৃদ্ধতর। শঙ্করদেব বা আহোমরাজ বিরচিত বাংলা গদ্যভাষার তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা অনেক বেশি সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ। কিন্তু যেমন চসারের শক্তিমত্তা স্পেন্সারে নেই, দান্তের প্রাণশক্তি নানুনুৎসিওতে নেই, চণ্ডীদাসের ভাববিগলিত তন্ময় কবিত্ব সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে নেই, তেমনি ষোড়শ শতকের অসাহিত্যিক গদ্যের ভাব প্রকাশসামর্থ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেক বাঘা পণ্ডিতের রচনাতে অনুপস্থিত।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে মুসলিম শাসন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উত্তরপূর্ববঙ্গের স্বাধীন রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষাই রাজকার্যের ভাষা ছিল। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসন বিচ্যুত এলাকাগুলির ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, ঐ সব রাজ্যেও কেন্দ্রবিমুখ স্বাতন্ত্র্যবাদী শক্তিসমূহ প্রাধান্য লাভ করে অন্যসব ক্ষেত্রের মতো ভাষার ব্যাপারেও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। সংস্কৃতের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও এই সব রাজ্যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা ও রাজভাষা, উভয় রূপেই বরণ করা হয়, সে সম্মান অখণ্ড বঙ্গেও বাংলা ভাষা কদাচিৎ লাভ করেছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি পারস্পরিক চিঠিপত্র বাংলায় রচনা করায় বোঝা যায়, রাজারা স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং ভাষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙালি পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের দাসত্ব ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁরা আত্মীয়স্বজনকেও বিদেশে বা বিদেশ থেকে সংস্কৃত ভাষায় চিঠি লিখতেন। সুপ্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীও তাঁদের দলের একজন ছিলেন।

ষোড়শ শতকে বাংলায় পোর্তুগীজদের আগমন হল। পাদ্রিরা এসে উঠে পড়ে লেগে গেল ধর্মপ্রচারের জন্যে। স্বধর্মমহিমা ব্যাখ্যা করে, পরধর্মের নিন্দা ও পরিবাদ প্রচার করে তারা যে-সব বই লিখেছিল সে-

সবের খুব সামান্য অংশ আজও প্রচলিত। ষোড়শ শতকে তারা ঐ ধরণের বই আদৌ লিখেছিল কিনা, তা এখনও জানা যায় নি। সপ্তদশ শতকের নমুনা পাওয়া গেছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

১৫৫৫—১৬৭৫ সালের মধ্যে লেখা বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থগুলির গদ্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির ভাঙা গদ্য বা গদ্য-পদ্য সাধনবিষয়ক নিবন্ধের উপযোগী। অন্য ধরণের প্রবন্ধ ঐ মিশ্র গদ্যে ইচ্ছা করলে লেখা যেত। পরে পাদ্রিরা ঐসব কড়চা গ্রন্থ থেকে তাদের প্রচারপুস্তক রচনায় প্রেরণা পেয়ে থাকবে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে লেখা দুখানি কড়চা-গ্রন্থ পাওয়া যায়, "দেহ-কড়চ" ও" আশ্রয়-নির্ণয়" দুখানি বই-ই নরোত্তমদাসের লেখা। সপ্তদশ শতকে এধরণের কড়চা-গ্রন্থ ও অন্যান্য বই আরও পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতিবিষয়ক গ্রন্থে গদ্যের আভাস পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত "শূন্য পুরাণ" এই ধরণের গ্রন্থগুলির মধ্যে বিখ্যাত। মুশ্‌কিল এই যে, এই সব গদ্য রচনার ভাষা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য প্রলাপ বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতকে যে-সব বাংলা চিঠিপত্র পাওয়া যায় সে-সবের সর্বত্র ফার্সি শব্দের প্রাবল্য দেখা যায়। কামতা-আহোম রাজ-দরবার দেশের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় মুসলিম প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। কিন্তু বাংলার অধিকাংশে মুসলিম শাসন প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকায় সাধারণ লোক দাস-সুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে চিঠিপত্রে প্রচুর ফার্সি শব্দ ব্যবহার করত। বিশেষত আইন-আদালত, জমি-জমা, খাজনা প্রভৃতির ব্যাপারে তাদের ঘন ঘন ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করতে হত বলে চিঠিপত্রে ক্রমশ ফার্সি শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

সপ্তদশ শতকে পোর্তুগীজ পাদ্রিদের প্রচেষ্টার পূর্ববর্তী অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাই ১৬২০-৫৭ সালে লিখিত "গোপীচন্দ্র" নাটকে। আধুনিক যুগের বিচারে এটি মোটেই নাটক নয়, পালা বা নাট-গীত। নেপালে-পাওয়া এই রচনায় স্থানে স্থানে নেওয়ারি ভাষা-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের স্পষ্ট নিদর্শন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটু তুলে দেওয়া গেল :—

"আহা মাতা। তুমার রাজা আমাকে ডাকিতেছিলো। তুমার রাজা সনে আমাকে কায না হয়। তুমার রাজা সনে বেদা মানিয়া আমি যাইবো। অহা মহারাজেশ্বর গোপীচন্দ্র! তুমি মায়া এড়িতে না পারো। তুমি উদনা পদুমার সঙ্গে সুখে রাজ্য করিয়া থাকো। তুমার সনে আমার কায না হয়।"

এই ভাষা নেওয়ারির প্রভাবে শ্রুতিকটু ও ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই নিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই সময়ে পশ্চিম বঙ্গে যে উৎকৃষ্টতর বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, তার রূপ এর কাছাকাছি যাবে। পূর্বোক্ত নিদর্শনের সামান্য অদল-বদল করলে আমরা খুব ভালো গদ্যভাষা গড়ে নিতে পারি। ষোড়শ শতকের শঙ্করদেব-রচিত গদ্য ও এই ঈষৎ বিকৃত গদ্য অনেকটা তুল্য মূল্য। বোঝা যায়, এই যুগে (১৫৫৫—১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্য ভাষা সার গর্ভ ও গাঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যের মধ্যে অনেকখানি নিগূঢ় অর্থ পুরে দেবার ক্ষমতা, শ্লেষবাক্য প্রয়োগের সামর্থ্য, এ সবই বাংলা গদ্য এযুগে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই সময়ের ভাষার প্রধান দোষ বা দুর্বলতা এই ছিল যে, ভাষার কোন নির্দিষ্ট মান বা আদর্শ ছিল না। তা ছাড়া, বাক্য গঠনে একটা নিয়মিত যতিস্থাপন সামর্থ্য বা ছন্দোবোধের প্রবল অভাব ছিল। এই সব দোষের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য, সুবোধ্য, স্থিতিগুণসম্পন্ন, কোন গদ্য ভাষা এ-যুগে গড়ে ওঠে নি। ভাষা কোথাও-বা লঘুপক্ষ স্বচ্ছন্দচারী মুক্ত বিহঙ্গম, পরক্ষণেই আড়ষ্ট অনড় জড়পিণ্ড। বাক্য গঠনরীতিও মাঝে মাঝে জটিল এবং বিজড়িত। একটা নির্দিষ্ট ভাবকে নির্দিষ্ট ভাষায়তনে সুঠাম করার ক্ষমতা এ যুগে দেখা যায় না। তার জন্যে আমাদের বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সপ্তদশ শতক থেকে আমরা প্রথম বাংলা দলিলের সন্ধান পাই। এই সব দলিলপত্রে ফার্সি-আরবি-তুর্কি শব্দের প্রাধান্যে বাংলা গদ্য হিসাবে একেবারে অপাঠ্য ও অগ্রাহ্য।

এই যুগ মোটের উপর উন্নতি ও সামঞ্জস্য-সাধনার যুগ। কিন্তু পরবর্তী যুগে আমরা আবার বাংলা গদ্যের অধোগতি দেখতে পাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৬৭৫ থেকে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)

বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় যুগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল পোর্তুগীজ মিশনারিদের এদেশে ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বাংলা গদ্যের প্রসার-সাধন। ওদের দেশে ওরা অনেকদিন আগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করে বই ছাপাতে আরম্ভ করেছিল। মনে রাখার জন্যে ওদের স্মৃতিশক্তির উপর বেশি নির্ভর করতে হত না। নির্ভয়ে লেখার সবরকম কাজে গদ্যের আশ্রয় নিত বলে ওরা ধর্মপ্রচারে গদ্যভাষার সাহায্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাগ্বিতণ্ডা ও যুক্তিতর্ক ব্যতীত বিরুদ্ধপক্ষের মত খণ্ডন করে স্বমত তথা স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সাধারণত সহজ নয়; আর, যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়ের কচ্‌কচির ভাষা হচ্ছে গদ্য। ইউরোপীয় জাতিগুলি অন্তত সপ্তদশ শতকে গদ্য ছাড়া আর কিছুর সাহায্যে ঐ ধরণের তর্কবিতর্ক উপস্থাপিত করার কথা ভাবতে পারত না। এদেশে এসে গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিক পোর্তুগীজ জাতি কেবল ব্যবসা বাণিজ্য ও লুটপাট করে ক্ষান্ত থাকে নি। লাতিন জাতিসুলভ বিকৃত মনোবৃত্তিপ্রসূত হিংস্র পরধর্ম-বিদ্বেষ ও অত্যাচারপরায়ণতায় একদিকে তারা যেমন বাংলার সমতটভূমি উৎসন্ন করল, অপরদিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আক্রমণ করে খৃষ্টধর্ম-প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাতে এদেশে স্বধর্মপন্থী একটি বড় গোষ্ঠী গঠন করে তাদের সাহায্যে নিজেদের বাণিজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য স্থাপন ব্যাপারগুলি অনেকটা বাধামুক্ত হয়।

নবধর্ম প্রচারের উৎসাহে তারা স্বধর্মের মহিমাখ্যাপক চটি বই লিখ্‌তে লাগল এবং বলা বাহুল্য, ধর্মান্তরিত বাঙালিদের সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠ্‌ল। ঐ সব নব খ্রীষ্টান বাঙালি আবার পোর্তুগীজ

দেখুন! অৰ্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

ভাষা, বাগ্‌ভঙ্গি ও রচনারীতির দ্বারা কিছু পরিমাণে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা পোতুর্গীজদের প্ররোচনায় ও অনুকরণে বাংলা গদ্যে বই লিখ্‌তে লাগলেন। এই সব বইএর ধর্মীয় ও সাহিত্যিক মূল্য ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে এদের মূল্য অসামান্য। সেই হিসাবে এগুলি আমাদের আলোচ্য।

গদ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে বাঙালি ও পোতুর্গীজ পাদ্রিরা নিশ্চয় দেখ্‌লেন যে, এদেশে কোন নির্দিষ্ট গদ্য রচনার আদর্শ নেই। Standard Colloquial Language বলে কিছুই তখন ছিল না। তাঁরা দেখলেন, না আছে পণ্ডিত সম্মত লেখ্যভাষার শিষ্ট রূপ, না আছে সর্বজনবোধ্য সুপ্রচলিত একটি কথ্যভাষা—যাকে ইচ্ছা করলে গদ্যভাষার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা যায়। আজ ভাগীরথীর দুই কূলের জনসাধারণের মুখের ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে একটি আদর্শ কথ্যভাষা ও তার উপর নির্ভরশীল লেখ্যভাষা, একাধারে দুই-ই সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সারা বাংলাদেশে প্রচলিত একটি সাধু গদ্যভাষা সর্বত্র আদর্শভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই কেবল-লেখ্যভাষাটি একাধারে লেখ্য ও কথ্যভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত হটে যাচ্ছে ও যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আজ আমরা বাংলাভাষায় একটি সর্বজনগৃহীত লেখ্য ও গদ্যভাষা ও আর একটি অতি শক্তিশালী একসঙ্গে লেখ্যগদ্যভাষা ও আদর্শ কথ্যভাষা পেয়েছি। এখনকার প্রশ্ন বা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই দুটি লেখ্য গদ্যভাষার মধ্যে কে সার্বভৌম অধিকার লাভ করবে। কিন্তু তখন সমস্যা ছিল, আদৌ একটা গদ্যভাষা কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে বা গড়ে তোলা যাবে যা লেখার কাজে ব্যবহারযোগ্য।

অনেকে মনে করেন, পাদ্রিরা গদ্যরচনার কাজে কথ্যভাষার প্রবর্তক; পাদিরা নাকি সমর্থন করতেন যে, লোকের মুখের ভাষা গদ্যরচনায় ব্যবহৃত হোক এবং তাঁদের জন্যেই বাংলাভাষায় লেখার কাজে কথ্যভাষার গদ্যের প্রচলন এত বেড়েছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কথা বাদ দিলে এটি একটি ভুল ধারণা। অন্তত পোতুর্গীজ পাদিরা ঐ কৃতিত্ব করতে পারেন না। পাদিরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে এটা স্বভাবতই চাইতেন যে, দেশে সর্বজনবোধ্য একটি গদ্যভাষা থাক—যাতে ধর্মপ্রচার করলে তাঁদের বাণী সব জায়গার সব লোকের কাছে সহজবোধ্য হবে। কিন্তু সেজন্যে তাঁরা চলতি ভাষার পরিবর্তে সর্ববঙ্গীয় "সাধুভাষা"-র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ঐ সাধুভাষাই যথেষ্ট ছিল। ভাগীরথীর দুই তীরের সুমিষ্ট কথ্যভাষা শিক্ষিতজনের মুখের ও লেখার ভাষায় পরিণত হয়ে সর্ববঙ্গে সব কাজে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করুক, সেটা তাঁরা আদৌ চান নি। আসলে, তা নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা তাঁদের ছিল না। তেমন কোন মহৎ ভাষাগত ঐক্যবিধান তাঁদের সাধ্যবস্তু ছিল না।

বাংলাভাষার রাজধানী নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-কলিকাতাকে কেন্দ্র করে গঠিত শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে যে শিষ্ট গদ্যভাষা রচিত হয়ে একই সঙ্গে কথ্য ও লেখ্য ভাষারূপে সর্বজনের মনোহরণ করে বাংলাদেশের সুদূরতম পল্লীপ্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ছে তা হচ্ছে স্বভাবসঞ্জাত জাতির আপন প্রয়াসে স্বানুভূতি ও গূঢ় অন্তঃপ্রেরণার ফলস্বরূপ উদ্ভূত। এর উপর ইউরোপীয় পাদ্রিদের কোন হাত নেই, কিম্বা তারা এর জন্যে কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে পাদ্রিরা গদ্যরচনা করতে গিয়ে হাতের কাছে যে-ভাষা অর্থাৎ যে-ভাষাভাষী পেয়েছে তার সাহায্যেই বই লিখেছে। দেশে কোন আদর্শ লেখ্য গদ্যভাষা বা কথ্যভাষা সে-সময় না থাকায় তার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ লেখকের নিজ ভাষা যে গ্রাম্য ও স্থানীয় উপভাষা, তারই সাহায্যে বই লিখতে হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র এক অঞ্চলের উপভাষাকে সারা বাংলাদেশের সকল লোকের সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম বা তথাকথিত সাধুরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, স্থানে স্থানে গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট ব্যাকরণ প্রমাদে পরিপূর্ণ এক বিকৃত "সাধু" গদ্যভাষার জন্ম হল—যা প্রসাদগুণে বঞ্চিত এবং অব্যবহিত পূর্বযুগের স্বাভাবিক বাংলা গদ্যের তুলনায় ঢের বেশি খারাপ।

পাদ্রিদের আসল কৃতিত্ব এই যে, তারা গদ্যরচনায় প্রথম যুক্তিতর্কের অবতারণা করল এবং মাত্র দু চারটি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কাটাছাঁটা বাক্যরচনার ভাষাকে সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরাশোভিত নিবন্ধরচনার উপযুক্ত ভাষায় উন্নীত করল। গদ্যরচনায় তর্কবিতর্কের সূত্রপাত এবং তার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধজাতীয় রচনাসৃষ্টি সম্ভবপর করে তোলা এমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যার জন্যে পোতুর্গীজ ধর্মযাজকেরা আজও আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়ে আছেন।

১৬৭৫ সালের আগে লেখা কড়চা-জাতীয় রচনাগুলি পড়লে দেখা যায়, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ নয়, কতকগুলি প্রকীর্ণ গদ্যবাক্যের সমষ্টি মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "দেহকড়চ" গ্রন্থে নরোত্তমদাসের ভাষায় দেখা যাক, কি ধরণের বাক্যাবলীর নমুনা আমরা পাই :—

"তুমি কে? আমি জীব। তুম কোন্ জীব? আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা? ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল? তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি? পঞ্চ আত্মা, একাদশেন্দ্র, ছয় রিপু, ইচ্ছা—এই সকল একযোগে ভাণ্ড হইল।"

যাতে লোকে সহজে মনে রাখতে পারে, তার জন্যে এইরকম টুকরো গদ্যরচনা করা হত। লেখক যেন ভরসা করে বিস্তার লাভ করতে পারেননি পাছে পাঠকদের বিস্মৃতি এসে বাদ সাধে।

এর সঙ্গে তুলনায় পাদ্রিরচিত নিবন্ধের ভাষা যতই শ্রুতিকটু ও কুপাঠ্য হোক না কেন, সেখানে ইউরোপীয় গদ্যের অনুকরণে চিন্তাবস্তুকে একটা পূর্ণায়ত রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এই যুগ ১৬৭৫ সাল থেকে সুরু বলে ধরা হয়েছে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে! ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভূষণার এক বড় জমিদারের ছেলেকে মগ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। পরে পোতুর্গীজ পাদ্রি তাঁকে মুক্ত করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে দোম্ আন্তোনিও নাম দেন। তিনি সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে হিন্দুধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়ে একটি বই লেখেন যার নাম, "ব্রাহ্মণ-রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ।" এর ঠিক রচনাকাল বলা যায় না। আচার্য মনোমোহন ঘোষের ধারণা, এটি ১৭৭৫ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত। এই বই-এর রচনাকাল থেকেই নতুন যুগের সূচনা কল্পনা করা যুক্তি সঙ্গত।

দোম্ আন্তোনিও (Dom Antonio) বই লেখার আগেই বাংলাভাষায় পারদর্শী পোর্তুগীজ পাদ্রিরা অন্তত দুখানি বাংলা গদ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যেই বই দুখানি লেখা হয়। কিন্তু তাদের কোন অংশই আজ আর পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিলেও মূল রচনার আস্বাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। পোর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত প্রোটেস্টান্ট পাদ্রিরা বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের প্রয়াসে এক নতুন ধারা যোগ করে দিয়েছিলেন। সে-কথা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য।

পোর্তুগীজ অভিযান পরিচালিত হয় প্রধানত মধ্য ও পূর্ববঙ্গে। ২৪পরগণা, খুলনা-যশোহর, বরিশাল-বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলায় পোর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত প্রবলতমভাবে অনুভূত হয়েছিল। "সমতট" বলতে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের যে অংশকে বোঝাত, সেই অংশে পোর্তুগীজরা বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক খ্রীষ্টান করেছিল। ঐ সব খ্রীষ্টান যেমন পোর্তুগীজদের দ্বারা প্রভাবিত হত, পোর্তুগীজ পাদ্রিরাও তেমনি এদের মুখের ভাষা অর্থাৎ মধ্যবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ভাষা অল্পবিস্তর শিক্ষা করত। পরে পোর্তুগীজ ও তাদের দ্বারা দীক্ষিত ভারতীয় রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রিরা যখন ধর্ম প্রচার করতে লাগল তখন তাদের ধর্ম-পুস্তকের ভাষায় মধ্যবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব স্বতই দেখা যেতে লাগল।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই সব রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রিরা লৌকিক কথাভাষাকেই তাদের রচনার গদ্যভাষার ভিত্তি স্বরূপ ব্যবহার করেছিল। তারা চেয়েছিল সর্ববঙ্গীয় এক সাধুভাষায় লিখতে, যে-ভাষা সারাদেশের লোক বুঝবে—আর তাদেরও সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লোকের কাছে নিজেদের ধর্মমত প্রচারের সুবিধা হবে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের উপযোগী সাধুভাষার কোন আদর্শ রূপ তখনও না থাকায় পাদ্রি মহোদয়েরা উপস্থিত প্রয়োজন মেটাতে নিজেদের জানা ঘরোয়া কথোপকথনের বাগ্‌ভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাসের রীতি তাঁদের গঠিত সাধুভাষার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। ফলে, একদিকে কড়চা গ্রন্থে ব্যবহৃত গদ্যভাষা বা তার পোর্তুগীজ-কৃত্ রূপান্তর বা ভারতীয় পাদ্রিকৃত সংস্কৃত রূপ এবং আর একদিকে মধ্য-পূর্ববঙ্গের উপভাষা—দুয়ে মিশে এক নতুন খ্রীষ্টানি বাংলা গদ্যের জন্ম হল যার সাহিত্যিক উৎকর্ষ অতি নিম্ন স্তরের। মাত্র নিবন্ধ রচনার সন্নিবদ্ধ প্রয়াস হিসাবে এই গদ্যের যা কিছু মূল্য। পরবর্তী যুগেও পাদ্রিদের হাতে খ্রীষ্টানি বা বাইবেলি গদ্য তার হাস্যকর অপরিণত অবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

আমরা প্রথমে দোম আন্তোনিও-র গ্রন্থের আলোচনা করব। বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাঁকে বুঝবার সুবিধার জন্যে ঐ নামে উল্লেখ করছি তাঁর নামের আসল উচ্চারণ অন্যরকম। কেবল মহাজন পন্থা অনুসরণ করেই তাঁকে ঐ নামে ডাকা গেল যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়। লেখক বাঙালি হলেও তাঁর নামটি পোর্তুগীজ এবং পোর্তুগীজ উচ্চারণের বঙ্গীয় রূপান্তর হচ্ছে দোম্ আন্তোনিও যদিও প্রকৃত উচ্চারণ হল দোঁ আঁতুনিউ।

পোর্তুগীজ নামের অধিকারী বাঙালি খৃষ্টান এই লেখক বাংলাভাষায় বই লিখলেও তাঁর বই বাংলা হরফে প্রথমে ছাপা হয় নি। আজ পর্যন্ত পাওয়া সমস্ত বাংলা গদ্যপুস্তকের মধ্যে "ব্রাহ্মণ-রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ"ই প্রাচীনতম। অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই পাদ্রি ম্যানুএল দা আস্‌সুঁপ্‌সাউ (Manoel Da' AssumpSam) ঐ বইটির অনুবাদ করেন পোর্তুগীজ (প্রকৃত উচ্চারণ পুর্তুগেশ) ভাষায়। পাদ্রি আক্রসিউ-র মতে, ভুল পুস্তকের পুথিতে বাংলা ও রোমক, দুই অক্ষরেই মূল ও পোর্তুগীজ অনুবাদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ্যাভোরায় প্রাপ্তব্য পুথিতে রোমক অক্ষরে লেখা মূল বাংলা রচনা ও পোর্তুগীজ ভাষানুবাদ আছে। পোর্তুগালের এ্যাভোরা শহরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটিই একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডুলিপি হওয়ায় মূল গ্রন্থটি কখনও বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছিল কিনা, তা জোর করে বলার উপায় নেই। ১৯৩৭ সালে বইটি প্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়। আচার্য সুকুমার সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট আচার্যদের মতে, এ্যাভোরার পুথিটিই মূল পুস্তকের প্রথম পুথি নয়, সেটি বঙ্গীয় অক্ষরে লেখা কোন প্রাচীনতর পুথি থেকে রোমক হরফে অনুলিখিত। লেখক স্বয়ং কোন্ অক্ষরে তাঁর বইএর পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন, তা আজ আর ঠিকভাবে বলা যায় না।

দোম্ আন্তোনিও-র বই যে ধরণের, ঠিক সেই ধরণের বই বাংলা দেশে বৈষ্ণবনিবন্ধসমূহের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। তবে আদ্যোপান্ত নিবন্ধ রচনার উপযোগী গদ্যে নয়, এই যা। এই বইটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে চিত্তাকর্ষক না হলেও তার অদ্ভুত ভাষার জন্যে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বই রচিত ও প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ রীতিতে কোন গদ্যগ্রন্থ কোন বাঙালি হিন্দু লেখেন নি; তার জন্যে আমাদের রামমোহনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। উনিশ শতকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজকদের সঙ্গে রামমোহনের তর্কবিতর্কের ফলে বাংলা গদ্যে যে নতুন প্রাণরস সঞ্চারিত হয়েছিল, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মযাজকের আক্রমণটা একতরফা হওয়ায় আন্তোনিও-র বইকে কেন্দ্র করে তেমন কিছু হতে পারে নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু গত আবেদন অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়। তিনি নিজেই বইটিতে এক ব্রাহ্মণ ও জনৈক খৃষ্টান যাজকের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যবশত বইটিকে সেযুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আদৌ আমল দেন নি বলে তিনি তেমন আসর জমাতে পারেন নি। একজন ব্রাহ্মণও রামমোহনের মতো স্বধর্মের মর্যাদা রাখতে প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে

এগিয়ে না আসাতে বাজার সরগরম করবার মতো বাদপ্রতিবাদের অভাবে বইটি চাপা পড়ে যায়। তবে এই ধরণের গদ্যরচনার ভাষাগত একটা সুফল এই ফলেছিল যে, অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইংরেজি আমল প্রবর্তিত হবার আগে থেকেই সংস্কৃত ভাষার সার্বভৌম আধিপত্য ক্ষুণ্ন করে খাঁটি বাংলা গদ্যে ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা গদ্যের পুষ্টি সাধনার প্রয়াসে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের চেষ্টা খানিকটা সাহায্য করেছিল।

"ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক সংবাদ" উত্তর-প্রত্যুত্তরের সাহায্যে মত স্থাপনের চেষ্টা গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও দেখা গেল। পদ্য রচনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অবশ্য বহু প্রাচীন। কিন্তু গদ্যরচনায় সেই প্রচেষ্টা এই প্রথম দেখা গেল। অবশ্য আন্তোনিও-র উপস্থাপনা মোটেই নির্দোষ নয়। কিন্তু তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে সিদ্ধান্ত গঠনের যে প্রয়াস পেয়েছেন তা পক্ষপাতদোষদুষ্ট ও কুসংস্কারবহুল হলেও ঐকান্তিকতাসম্পন্ন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্বাভাষ সূচক। রামায়ণের কাহিনী বর্ণনায় তিনি সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই বইএর বর্তমানে-দৃষ্ট বাংলারূপ মূল পুথির রোমক হরফে লিখিত রূপ থেকে গৃহীত হয়েছে। সেইজন্যে এর প্রথম রচনাকালের ভাষার কিছু হেরফের ঘটে থাকতে পারে। বইটির এক জায়গার ভাষার প্রাথমিক রূপ আদিতে এইরকম ছিল মনে হয়—বর্তমান রূপ লিপ্যন্তরিত করতে গিয়ে অনাবশ্যক বিকৃতি লাভ করেছে যা হয়ত ভূষণার বাঙালি রাজকুমারের মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না:—

"রামের এক স্ত্রী। তাঁহার নাম সীতা। আর দুই পুত্র, লব আর কুশ। তাঁহার ভাই লক্ষ্মণ, রাজ্য অযোধ্যা। বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়া গেলেন। তাঁহার নাম সীতা। সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়া আনিতে অনেক যুর্দ করিলেন। বালিরে মারি' তাহার স্ত্রী তারা সচিবেরে দিলেন।"

আমাদের অনুমিত এইরূপ যদি মূল রচনার পাণ্ডুলিপিতে না থেকে থাকে, তাহলে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কোন বাঙালির পক্ষে এরকম অশুদ্ধ বাংলা লেখা খুব অস্বাভাবিক বলতে হবে:—

"সে বালির ভাই, তাহারে রাজপত্র দিলেন; বিস্তর রাখ্যস বধ করিলেন; কুম্ভকর্ণ বধিলেন, ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রভাতে রাবণ বধিয়া সীতারে আনিলেন; রাবণে মারে রাবণের ছোট ভাই—বিভীষণেরে দিলেন, তাহার নাম মন্দদরী।"

এই অপরিবর্তিত রূপই যদি প্রাথমিক রূপ হয় তাহলে এই নিদর্শন থেকে আমাদের বুঝতে হবে যে, দোম্ আন্তোনিও এত বেশি পোর্তুগীজ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, ফিরিঙ্গি ঢঙে বাকা বাকা বিকৃত বাংলা বলা ও লেখা তাঁর বদ্ধমূল বদভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তা হলে ষোড়শ শতকের অমন স্বচ্ছ বাংলা ভাষার পর এই রকম বিকৃত বাংলা-ভাষার উদ্ভব কি করে হল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। বিশেষত, আন্তোনিও সাহেবের লেখায় সযত্নে ফার্সি শব্দের বাহুল্য বর্জন করা হয়েছে বলে—ফার্সি প্রাচুর্য জনিত কোন উৎকট জটিলতা নেই। তিনি সাধারণ বাংলা সাধুভাষায় লিখেছেন। তাঁর রচনায় তৎসম শব্দও বেশি নেই। তবু যে রচনা এত দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে তা থেকে দুটি ব্যাপার অনুমান করা যায়। হয় দোম্ আন্তোনিও বড় বেশি সাহেব হয়ে পড়েছিলেন, নয় মূল রচনার ভালো বাংলাভাষা দুরূহ পোর্তুগীজ উচ্চারণ পদ্ধতির বাধা লঙ্ঘন করে লিপ্যন্তরিত করতে গিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যাঁরা পোর্তুগীজ ভাষা একটুও জানেন, তাঁরাই জানেন এই আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাটির উচ্চারণ পদ্ধতি অতি জঘন্য। এই বিংশ শতকেও উচ্চারণ বিষয়ে এমন পশ্চাৎপদ ভাষা ইউরোপে আর নেই। সপ্তদশ শতকে "পুর্তুগেশ্" ভাষার উচ্চারণ বিধি ছিল আরও জটিল। তার মধ্যে প্রবেশ করা বিদেশীর পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। আজও জন্ম-পোর্তুগীজ না হলে ঐ ভাষার নিখুঁত উচ্চারণ আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। পাশাপাশিভাবে ইউরোপে অবস্থিত হলেও স্পেনীয় ভাষা যেখানে জলের মতো সোজা, "পুর্তুগেশ্" সেখানে জলচর কুমিরের মতোই বিপজ্জনক। সুতরাং বাংলা ধ্বনিসম্ভারকে বাংলা অক্ষর থেকে রোমক লিপি ও বর্ণমালার সাহায্যে পোর্তুগীজ ধ্বনি-সম্ভারে পরিণত করে তারপর রোমক লিপিতে লেখা সেই বিজাতীয় ধ্বনিনিচয়কে স্বভাষার সুপরিচিত ধ্বনিসমূহে আবার রূপান্তরিত করতে হলে মূলভাষার উপর দিয়ে প্রবল একটা আলোড়ন বয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় মূল রচনা বিকৃত না হওয়া একেবারে অসম্ভব। কাজেই বর্তমান সংস্করণ দেখে দোম্ আন্তোনিও-র গদ্যভাষার ঠিক দোষ-গুণ বিচার করা যাবে না।

ভূষণার জমিদারতনয় পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে সচিবেরে—সচিবকে, এই কথাটিকে হয়ত "সসিবেরে" বা "সৎসিবেরে", এইভাবে উচ্চারণ করতেন। ফলে, পোর্তুগীজে "সচিবেরে" লিখ্বার কোন চেষ্টা না করে সোজাসুজি XONIVERE লেখা হল। তার বাংলা রূপ এখন আবার দাঁড়াচ্ছে, "সসিবেরে", তা ছাড়া, পোর্তুগীজ ভাষায় চ-ধ্বনি মোটেই নেই। ইচ্ছা থাকলেও দোম্ আন্তোনিও সচিবেরে-র অবিকল পোর্তুগীজ ধ্বনিরূপ সৃষ্টি করবেন কি করে? অতএব, তাঁর রচনার বিকৃতি সর্বাংশে তাঁর নিজের দোষে হয়নি, এটা মেনে নেওয়া যায়। তবে, মূল রচনায় উপভাষার যে গ্রাম্য প্রয়োগ, "লঙ্কাৎ", "রে" বা-"এরে" বিভক্তি, "আইয়ো" প্রভৃতি, সে-সবের জন্যে তিনি নিজেই দায়ী। কিন্তু তাতে ভাষার সৌন্দর্য তত নষ্ট হয়নি যত হয়েছে বাংলা ধ্বনি পোর্তুগীজ ধ্বনির কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বলে। ১৭৭০ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে পাদ্রি আম্ব্রোসিও (Ambrosia) বা আঁব্রুসিউ যে বাংলা অক্ষরে লেখা পুথির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই পুথি পেলে হয়ত প্রকৃত ব্যাপারটা বোঝা যেত।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় অধ্যাপক হ্যালডেন—

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে-বি-এস-হ্যালডেন স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করিবার জন্য গত ২৫শে জুলাই কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর—তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। বিলাতে বিদেশী সৈন্য না রাখার প্রতিবাদে তিনি ঐ দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনিষ্টিটিউটে কাজ করিবেন ও বাংলা ভাষা শিখিবেন। তাঁহার দ্বারা ভারত উপকৃত হউক—ইহাই আমরা কামনা করি।

দিল্লীতে ম্যাকস্‌মূলারের স্মৃতি—

খ্যাতনামা জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাকস্‌মূলার উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ভারতবাসীর মহদুপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। গত ২৪শে জুলাই তাঁহার স্মৃতিতে দিল্লীতে 'ম্যাকস্‌মূলার ভবন' নামক একটি জার্মাণ পাঠাগার খোলা হইয়াছে। জার্মাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথায় আলোচনা হইবে। বই ছাড়াও তথায় দৈনিক ও সাময়িক পত্র রাখা হইবে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আবিষ্কারে যে সকল বিদেশী সাহায্য করিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদের কথাও মনে রাখিতে হইবে। ম্যাকস্‌মূলারের মত আরও বহু পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত ভারতের ঐতিহ্য তথা আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা যেন তাঁহাদের দানের কথা ভুলিয়া না যাই।

কলিকাতায় মিঃ রকফেলার—

দানবীর রকফেলার প্রতিষ্ঠিত ধন ভাণ্ডারের কর্ণধার মিঃ জে-ডি রকফেলার গত ২৪শে জুলাই তাঁহার পত্নী, পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ ভাণ্ডারের দানে পৃথিবীর সকল দেশ উপকৃত হইতেছে। তাঁহারা দেড়মাস ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া দেখিবেন। মিঃ রকফেলার বলিয়াছেন—ভারতে কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সে জন্য ধনভাণ্ডার হইতে কৃষির উন্নতির পরিকল্পনায় অর্থব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। সংবাদটি ভাল।

নূতন পাঠাগার আবিষ্কার—

চীনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক লি-ইউ সম্প্রতি তিব্বতে সিগৎসীর নিকট শাক্য মঠে একটি এক লক্ষ পুঁথি-সম্বলিত পাঠাগার আবিষ্কার করিয়াছেন। পুঁথিগুলি অষ্টম হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত। ঐ পাঠাগারে বহু বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ রক্ষিত আছে। সিল্ক ও সাটিনের উপর অঙ্কিত বহু চিত্র দ্বারা ঐ মঠ অলঙ্কৃত আছে। ঐ সকল পুথির পাঠোদ্ধার ও প্রচারের ফলে নূতন জ্ঞানের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সিমলা কালীবাড়ীর অতিথিশালা—

যে কোন বাঙ্গালী সিমলা পাহাড়ে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই সিমলা কালীবাড়ীর সহিত পরিচিত। বাঙ্গালী অতিথি যাইয়া তথায় অল্প খরচে আহার ও বাসস্থান লাভ করেন। এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাস সিমলায় অতিথির ভিড় হয়—সে সময়ে কালীবাড়ীর অতিথিশালায় স্থানাভাব দেখা যায়। কালীবাড়ীটি বাঙ্গালীদের চেষ্টায় গত ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে অতিথিশালায় নূতন ১০টি ঘর নির্মাণ করা হইবে। সে জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সিমলা কালীবাড়ীর অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট সাহায্য পাঠাইতে হইবে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রভাব ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এ সময়ে সিমলা কালীবাড়ীর উন্নয়ন-চেষ্টা প্রশংসনীয়। বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ঐ কালীবাড়ী দ্বারা উপকৃত। তাঁহাদের সহযোগিতা ও চেষ্টায় ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিনেট সভার সদস্য নির্বাচনের ফল গত ২২শে জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। বামপন্থীরা ঐ নির্বাচনে সর্বত্র পরাজিত হইয়াছেন। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট কেন্দ্রে মোট ২৫ জন সদস্য নিম্নলিখিত হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন—(ক) মেডিকেল—(১) ডাঃ সুবোধ মিত্র (২) শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য (৩) ডাঃ বিবেক সেনগুপ্ত (৪) ডাঃ তড়িৎ ঘোষ (৫) ডাঃ অমিয় সেন (খ) এঞ্জিনিয়ারিং—(১) অমীয় বসু (২) কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) বিধুভূষণ ঘোষ (৪) শিবেন্দ্র সেন (৫) বুদ্ধদেব সেন। অন্যান্য—(১) নন্দকিশোর ঘোষ (২) নীরদ ভট্টাচার্য্য (৩) সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় (৪) ডাঃ অতীন্দ্র বসু (৫) চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৬) ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায় (৭) ডাঃ হিমাংশু শেঠ (৮) সলিল রায়চৌধুরী (৯) ডাঃ সুবল লাহা (১০) অশোক দত্ত (১১) শচীন্দ্র গুহ (১২) পশুপতি মিত্র (১৩) রেবতীরমণ মান্না (১৪) সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫) সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুমোদিত কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ ১০ জন—(১) প্রশান্ত বসু (২) রমণীমোহন রায় (৩) অমিয় সেন (৪) অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) অরুণ সেনগুপ্ত (৬) অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) খগেন্দ্রনাথ সেন (৮) নেপাল রায় (৯) অমিয় চক্রবর্ত্তী (১০) শ্রীমতি রাণী ঘোষ। বৃত্তি কলেজের অধ্যক্ষ ৭ জন—(১) কুমারনাথ বাগচী (২) অজিত দত্তগুপ্ত (৩) কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪) মণি বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) শ্রীমতী নলিনী দাস (৬) অতুলচন্দ্র রায় (৭) দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। কনিষ্টিটুয়েণ্ট কলেজের শিক্ষক ৩ জন (১) অমিয় মজুমদার (২) সন্তোষ রায় (৩) রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। কলিকাতা কলেজের পরিচালক ২ জন (১) রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (২) সত্যেন্দ্রনাথ মোদক। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলেজের পরিচালক ২ জন—(১) ডাঃ বি-বি-দত্ত (২) জগদীশচন্দ্র সিংহ। বর্দ্ধমান বিভাগের কলেজের পরিচালক ২ জন (১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) হিমাংশুভূষণ সরকার। অনুমোদিত কলেজের শিক্ষক ৭ জন—(১) রাজকুমার চক্রবর্ত্তী (২) জগদীশ ভট্টাচার্য্য (৩) হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪) ধীরেন্দ্রনাথ রায় (৫) অরুণ সেন (৬) জনার্দন চক্রবর্ত্তী ও (৭) শ্রীমতী অলকা মজুমদার।

রাজ্যপাল মনোনীত সিনেটার—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিনেট সভার সদস্যপদের জন্য নিম্নলিখিত ১৫ জনকে মনোনীত করিয়াছেন—(১) শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু (৩) কর্ণেল ডি-এন চক্রবর্ত্তী (৪) শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (৫) শ্রীএল-ডে গডার্ড (৬) শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান (৭) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র (৮) শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (৯) ক্যাপ্টেন পি-বি মুখার্জি (১০) শ্রীমতী রাণু মুখার্জি (১১) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় (১২) শ্রীগৌরমোহন রায় (১৩) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (১৪) শ্রীহেমনাথ সান্যাল ও (১৫) ডাঃ ত্রিগুণা সেন।

তারাশঙ্করের জন্মদিন—

গত ২৪শে জুলাই খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতা টালা পার্কের বাড়ীতে সারাদিন ব্যাপী এক উৎসব চলিয়াছিল। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, নট, কলাকুশলী প্রভৃতি দলে দলে যাইয়া তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি সুস্থদেহে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন—সকলের সহিত আমরাও এই কামনা জানাই।

গান্ধীজি ও নোবেল পুরস্কার—

নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ঐ পুরস্কার প্রদাতা কমিটী একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের এক স্থানে বলা হইয়াছে—"গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, কিরূপে আমরা তাহার মূল্য নিরূপণ করিব। ইহা অবশ্য একটি অতীব জটিল প্রশ্ন। কিন্তু প্রকৃত শান্তিবাদীগণকে পুরস্কৃত করা হয় নাই, এই বলিয়া যে বারবার আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা লইয়া আরম্ভ করা হউক। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব—মাত্র একজনের ক্ষেত্রেই এই আপত্তির সত্যসত্যই যৌক্তিকতা আছে—ইনি মহাত্মা গান্ধী।" পুরস্কার না দিয়াও দাতারা যে তাহাদের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই ভারতবাসীর পক্ষে আশ্বাসের কথা।

লেবার গেজেট—

পশ্চিমবঙ্গে কারখানার সংখ্যা ভারতের অপর রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী—এখানে শ্রমিকের সংখ্যাও সেজন্য বেশী। তাহাদের সমস্যাও বহুবিধ। সে সকল সমস্যা সমাধানে সরকারী শ্রম-বিভাগ কি কি কাজ করেন, তাহা সকলের জানা দরকার। এতদিন মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হইত, তাহাই ঐ বিষয়গুলি জানার একমাত্র উপায় ছিল। গত জুন মাস হইতে 'লেবার গেজেট' নাম দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-বিভাগ এক ইরাজি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যাটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইলে দেশের জনগণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের অবস্থার কথা তাহাতে দেখিতে পাইবেন। আমরা এই গেজেটের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করি। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহা প্রকাশিত করিলেই ভাল হইত। পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া যাঁহারা ব্যবসা বা কাজ করিবেন, তাহাদের বাংলা ভাষার সহিত পরিচয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নূতন শ্রম-মন্ত্রী জনাব আবদাস সাত্তার খাঁটি বাঙ্গালী—তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কর্তব্য পালনে পশ্চাদপদ হইবেন না।

কলিকাতায় যাদুঘর সম্প্রসারণ—

কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘরে স্থানাভাব হইয়াছিল। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যাদুঘর সংলগ্ন 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব' নামক বিশাল বাড়ীটি যাদুঘরের জন্য ক্রয় করিয়াছেন। ঐ নূতন বাড়ীতে ভূতত্ত্ব বিভাগের নিদর্শনগুলি রাখা হইবে। নূতন বাড়ীটি ২৯ নং চৌরঙ্গী রোডে—বাড়ীটি পূবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা-বিভাগের অফিসের জন্য কিনিতে চাহিয়াছিল—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহা লওয়ায় সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় নূতন কারখানা—

গত ২৮শে জুলাই রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র কলিকাতা মোমিনপুর হুসেন সা রোডে একটি ইস্পাত কাটা করাত তৈয়ারীর কারখানার উদ্বোধন করেন। ষ্টীল এণ্ড এলায়েড প্রডাক্ট্স লিঃ ঐ [illegible] প্রতিষ্ঠাতা। এই দেশের কারখানা [illegible] এ অংশে এই প্রথম। একটি সুইডিস ফার্ম যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ দিয়া এই কারখানাকে সাহায্য করিবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজার টাকায় এই কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। আমরা দেশে এইরূপ বহু নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিব।

৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড—

সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ভারতীয় মুদ্রা ও দশ হাজার মার্কিণ ডলার বেআইনি ভাবে লইয়া যাওয়ার চেষ্টার অপরাধে দিল্লীর শুল্ক কলেকটার (১) মার্কিণ ষ্টক ব্রোকার লিয়রয় ফ্রে ও (২) ব্রেজিলে কিউবার রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী মিঃ টমাস প্রত্যেককে ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ২৩শে জুন অমৃতসরে পাকিস্তান প্রবেশের পথে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় ও ২৫শে জুলাই তাহারা দণ্ডিত হয়। তাহাদের মোটর গাড়ী ও সব অর্থ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। গাড়ীর এক গুপ্ত স্থানে ঐ টাকা ছিল।

কলিকাতায় বৃটীশ জাহাজের আধিপত্য—

কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের একদল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত যোগ সাজস করিয়া এক শ্রেণীর বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী কলিকাতা বন্দরে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং অবৃটীশ জাহাজগুলিকে সময় মত বার্থ না দিয়া তাহাদের অহেতুক ভীতি উৎপাদন করিতেছে। ইহার ফল ভারতীয় বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতি-কারক হইবে বিবেচনা করিয়া বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা হইয়াছে। ডক শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক নেতার আলোচনার সময় এ সকল সংবাদ জানা গিয়াছে। এখন হইতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে ভবিষ্যতে দেশ ভীষণ বিপন্ন হইবে।

যাদু-রত্নাকর উপাধিলাভ—

ভট্টপল্লীস্থ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ বিখ্যাত যাদুকর শ্রীএ, সি, সরকারের অতুলনীয় যাদুপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সম্প্র তাঁহাকে 'যাদু-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ এক বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসবের আয়োজন করেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীএ, সি সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত

শ্লোকে রচিত ও বিশিষ্ট পণ্ডিতবৃন্দের স্বাক্ষরযুক্ত এক মানপত্র প্রদান করেন। পৃথিবীর নানা দেশে স্বকীয় নৈপুণ্যে ভারতীয় যাদুবিদ্যার গৌরব বৃদ্ধি করায় ও তাঁহার নিজস্ব মৌলিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ভারতীয় যাদুকরদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যাদুজগতের এক বিশেষ সম্মান করায় যাদুকর এ, সি, সরকারকে 'যাদু-রত্নাকর' বা 'যাদুবিদ্যার মহাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় শ্রীএ, সি, সরকারের যাদু কৌশল ও 'কণ্ঠ-গীটার'-এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের কৃতিত্ব—

এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ, আই-এস্-সি এবং বি-এ পরীক্ষার পাশের হার যথাক্রমে ৪৬, ৪৯ ও ৮২ হইলেও লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের পাসের হার যথাক্রমে ৮৯, ৯৪, ৯৮। এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় যে চারিজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণী পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী। শ্রীতারা চক্রবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্রে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং শ্রীহাসন বানু পার্সীতে প্রথম স্থান এবং সিতারা জাবিন দ্বিতীয় স্থান ও দুইজন ডিক্‌টিংসন লাভ করিয়াছেন।

জাল নোট ছাপার কারখানা—

গত ২৩শে জুলাই কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস বিহারের দেওঘরে একটি জাল নোট ছাপিবার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার পূর্বে চুনারে একটি কারখানা ধরা হইয়াছে। গত ৮ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একটি ও বাহিরে ৩টি—মোট ৪টি নোট জালের কারখানা আবিষ্কৃত হইল। দেওঘর, ও চুনার ছাড়া আবার একটি কারখানা ধরা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে বহু স্থানে বহু লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবে ভাষা সমস্যা—

পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে—যাহা ভারতীয় যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—ভাষা সমস্যা লইয়া বিরোধ চলিতেছিল। সে জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে হিন্দীভাষী ও পাঞ্জাবীভাষী দুইটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডীগড় পাঞ্জাবী ভাষী অঞ্চলের মধ্যে যাইবে। গুরগাঁ, রোহতক, হিসার, কর্ণাল, বাংড়া, সিমলা প্রভৃতি হিন্দী অঞ্চলে এবং অমৃতসর, ভাতিণ্ডা, ফিরোজপুর, গুরুদাসপুর, হোসিয়ারপুর জলন্ধর প্রভৃতি পাঞ্জাবী অঞ্চলে যাইবে।

পরলোকে অন্নপূর্ণা গোস্বামী—

গত ২৭শে জুলাই শনিবার খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিক অন্নপূর্ণা গোস্বামী মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে ক্যান্সার রোগে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে লীলা পুরস্কার দান করেন

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় তিনি বাংলা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। তিনি কলম্বিয়া পিকচার্সের শ্রীনীতিশচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা ও কলিকাতা চিৎপুর রেল হাসপাতালের ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামীর পত্নী।

মহীশূরের রাজ্যপালের দান—

মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীজয়চামারাজা ওয়াদিয়ার তাহার মহীশূরস্থ পশুশালার জমী, আবাস, জীবজন্তু ও জিনিষ-পত্র—প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সরকারকে দান করিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সকল ধনীকেই এই ভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারকে দান করিতে হইবে।

পাণ্ডুতে রেল অঞ্চলের সদর—

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে আসাম রাজ্যের পাণ্ডুতে রেল অঞ্চলের অষ্টম সদর দপ্তর স্থাপিত হইবে।

উত্তর-পূর্ব রেলের কাটিহার ও বারোণী বিভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রায় ২ হাজার মাইল এলাকা লইয়া এই রেল অঞ্চল গঠিত হইবে। শিয়ালদহ বিভাগকে নূতন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। সদর দপ্তর হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে রেল চলাচলের সুবিধা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

উড়িষ্যার নূতন রাজ্যপাল—

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভার সেক্রেটারী ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্রেটারী শ্রীওয়াই-এন সুখতাঙ্কর আই-সি-এস উড়িষ্যার নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের ১০ বৎসর পরেও কোন নির্য্যাতীত দেশ নেতাকে রাজ্যপাল নিযুক্ত না করিয়া আই-সি-এসকে ঐ পদে নিয়োগের কারণ বুঝা যায় না। বর্তমানে কোন বাঙ্গালী কোন রাজ্যে রাজ্যপাল নাই। বাঙ্গলায় কি প্রতিভাবান লোকের এতই অভাব হইয়াছে।

বসিরহাট রক্ষা ও বেহুলা নদীতে সেতু—

গত ২৫শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে ইছামতী নদীর ভাঙ্গনের হাত হইতে বসির-হাট রক্ষাকল্পে একটি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে এবং হুগলী জেলায় নিত্যানন্দপুরে বেহুলা নদীর উপর কাঠের সেতুটি পুনর্নির্মাণ করা হইবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ করা হইয়াছে। দুইটি কাজই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও জরুরী। ইহার ফলে দেশের বহু লোক উপকৃত হইবে।

বোম্বায়ে বাঙ্গালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

বোম্বাই সহরের নেতাজী সুভাষ রোড (মেরিণ ড্রাইভ) ও বীর নরিমান রোডের সংযোগ স্থলে ইতালীয় মার্বেলে নির্মিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইবে। ওভাল ময়দানের সম্মুখস্থ কুপারেজ ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের পূর্বদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইবে। জনৈক অজ্ঞাতনামা দাতা থারস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের মারফত প্রতিমূর্তি দুইটি বোম্বায়ের মিউনিসি-প্যাল কর্পোরেশনকে দান করিয়াছেন। বোম্বায়ে দুই জন বাঙ্গালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

নরসিংহদাস পুরস্কার—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বাংলা পুস্তকের লেখককে হাজার টাকা নরসিংহদাস পুরস্কার দান করেন। এ বৎসর বাংলার অর্থনীতিক ইতিহাস নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রকাশনী বিভাগের পরিচালক।

বাঙ্গালী নিয়োগের অনুরোধ—

গত ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কুইন্স পার্কে জুনিয়ার চেম্বার অফ কমার্সের এক প্রীতি সম্মেলনে বলেন, অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার সময় বাঙ্গালীদের কোন কাজ দেন না—প্রায়ই এই অভিযোগ করা হয়। ঐ সম্মেলনে বহু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী দেখিয়া তিনি তাঁহাদের বাঙ্গালীদিগকে কাজ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এখনও অবাঙ্গালীদের কারখানাসমূহে বাঙ্গালী শ্রমিকদের পর্যন্ত কাজ দেওয়া হয় না। শঙ্করদাসবাবু বিষয়টি তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া জনগণের উপকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে শুধু অনুরোধ নহে—কি করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে শঙ্করদাসবাবু একটু চেষ্টা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

কাশ্মীরে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ২৬শে জুলাই কাশ্মীরের রাজ্যপাল যুবরাজ করণ সিং বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া দিয়াছেন—(১) শ্রীশ্যামলাল সরফ (২) শ্রীদীননাথ মহাজন (৩) শ্রীমীর গোলাম মহম্মদ রাজপুরী (৪) শ্রীকে-চুনিলাল ও (৫) শ্রীদামসুদ্দীনকে আপাততঃ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নেপালে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১৪ই জুলাই নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্য পদত্যাগ করার পর রাজা মহেন্দ্র স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। গত ২৬শে জুলাই ডাঃ কে-আই-সিংকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া নেপালে ১১জন সদস্য বিশিষ্ট নূতন মন্ত্রী-সভা গঠিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভায় ডেমক্রাটিক দলের ৫ জন, স্বতন্ত্র ৫ জন ও ন্যাশানাল কংগ্রেসের শ্রীজীবরাজ

শর্মা আছেন। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ৬ বৎসরে ৬ বার মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

পঞ্চশীল নীতি সমর্থন—

৪ বৎসর পূর্বে ১৯৫৩ সালের ২৮শে জুন চীনের প্রধান মন্ত্রী চো-এন-লাই ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু একযোগে নূতন করিয়া সমগ্র জগতকে বুদ্ধদেব প্রচারিত পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। গত ৪ বৎসরে জগতের বহু দেশ ঐ নীতি সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিনটি স্মরণ করিবার জন্য গত ২৮শে জুন কলিকাতায় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক বারেশচন্দ্র গুহ, নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। মানুষের জীবনেও আজ পঞ্চশীল নীতি গ্রহণের সময় আসিয়াছে। সে বিষয়ে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

নূতন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিম্নলিখিত ৬ জনকে পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন—সৈয়দ মিয়া (২) এস-পি সিংহ (৩) অর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর (৪) নিশাপতি মাঝি (৫) মহম্মদ আফাক চৌধুরী ও (৬) কমলাকান্ত হেমব্রম।

বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট—

খ্যাতনামা বৈপ্লবিক নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গত ১৯৫৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে হইলেও কর্মকেন্দ্র ছিল কলিকাতা বৌবাজার অঞ্চল। গত ২১শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বৌবাজার ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট' নামকরণ করিয়াছেন। এজন্য বিপিন গাঙ্গুলী স্মৃতি রক্ষা কমিটীর সম্পাদক শ্রীনুটবিহারী দত্তের চেষ্টা প্রশংসনীয়। সমিতি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁহার একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠায়ও উদ্যোগী হইয়াছে।

বিহার বার্তাজীবী ইউনিয়ন—

গত ৩০শে জুন পাটনায় বিহার বার্তাজীবী ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রীনির্মলকুমার চৌধুরী অবিচ্ছিন্ন ভাবে তৃতীয় বারের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছে। বিহারে বাঙ্গালী সাংবাদিকের এই সম্মানে সকল বাঙ্গালীই আনন্দিত হইবেন। আমরা চৌধুরী মহাশয়ের এই সম্মান প্রাপ্তিতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি!

দার্জ্জিলিংয়ে কয়লার খনি—

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতত্ত্ব গবেষণা বিভাগ জানিয়াছেন যে দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার মধ্যে ৫৫ লক্ষ টন কয়লা ভূগর্ভে মজুত আছে। চেল রিজার্ভ জঙ্গলে লেথি, জোয়াম ও রামথী ব্লকে ঐ কয়লা পাওয়া যাইবে। নূতন কয়লা খনির সন্ধানের সংবাদ আশার কথা।

আসানসোলে দুর্ঘটনা—

গত ৩১শে জুলাই বেলা ১১টার সময় আসানসোল রেল ইয়ার্ডে একখানি বাজি ভর্তি মাল গাড়ীতে বিস্ফোরণের ফলে তখনই ১৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হইয়াছে। এত জোরে শব্দ হইয়াছিল যে সমগ্র সহর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মালগাড়ীখানিও নিকটস্থ ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এরূপ ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না।

বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রায় ৫০টি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গত ২৩শে জুন মঞ্জুর করিয়াছেন। ফলে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বোম্বাই—৭টি রাজ্যে ৮৪১১টি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা হইবে। উড়িষ্যায় ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৪৬৩ একর জমী সংগ্রহ করিয়া ২৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭৫২টি পরিবারের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিহারে ৭ হাজার একর জমী, মহীশূরে ৪৮৪৬ একর জমী, ত্রিপুরায় ৮০ হাজার একর জমী; পিলভিট জেলায় ২০ হাজার একর জমী সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইতে উৎসুক না থাকায় এতদিন এ কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। এখন বহু উদ্বাস্তু বাহিরে যাইতে সম্মত হওয়ায় শীঘ্রই এই ৫০টি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে। ফলে উদ্বাস্তুরা যেমন লাভবান হইবে, পশ্চিমবঙ্গেও লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

সুনীলকুমার ঘোষ—

হুগলী জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী সুনীলকুমার ঘোষ গত ২২শে জুন ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ডাক্তার চ্যাটার্জি লেনস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯২৩ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম তিনি কারাবরণ করেন। তিনি সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কংগ্রেস তথা দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলে 'মেজদা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বরাহ নগরে জাল-করা কারখানা—

গত ২৭শে জুন কলিকাতার পুলিস বরাহনগর-আলমবাজারে ডাকটিকিট ও খাম জাল করার একটি কারখানা আবিষ্কার করিয়া তথায় ২ জন মহীশূরবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ৭২নং স্মিথ রোডে ঐ কারখানা অবস্থিত ছিল। এইরূপ কত জালের কারখানা আছে কে জানে?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অভয় উপুড় হ'য়ে প্রণাম করল ভামিনীকে।

যেন সাপ দেখে চমকে উঠল ভামিনী। থতিয়ে গিয়ে, দু' পা পেছিয়ে বলল, ওমা, কোজ্জাব গো! একি, গড় করা কেন?

ভামিনী হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেল না। তার চল্লিশ বছরের জীবনে, কেউ পায়ে হাত দেয় নি। দেওয়ার দরকার হয়নি। তার জীবনের সীমানার মধ্যে, ওসব পাট কোনোকালেই ছিল না। নিজেরা প্রণাম করেছে ঠাকুর দেবতাদের উদ্দেশে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পায়ে। কিন্তু এতখানি জীবনে তার পায়ে হাত দেওয়ার মানুষ জোটেনি।

সুরীন বলে উঠল, তা করুক না। ওটা অল্যাজ্য তো কিছু হয় নি।

ভামিনীর সঙ্গে সুরীনের একবার চোখাচোখি হল। কিসের একটু ইশারা ছিল সুরীনের চোখে।

ভামিনী আর কোন কথা বলল না।

অভয় বলল, সুরীনকাকার ইস্তিরি, বয়সে কত বড়, গড় না করলে চলে?

ভামিনী একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অভয়ের দিকে। দেখে নিল, কথার মধ্যে আসলে কোন খোঁচা আছে কিনা। কেন না, সুরীনের 'ইস্তিরি' কেউ বলে না তাকে।

কিন্তু অভয়ের ভাবসাব দেখে, উল্টে ভামিনীর হাসি পেল। একটু যেন কেমন লাগে। পাগল নয় তো।

দাওয়ার ওপর মাদুর পেতে দিল ভামিনী। বলল, এস, বস।

সুরীন বলল, হ্যাঁ, বস বাবা। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর হাত মুখ ধুয়ো 'খনি।

একটু চা খাবে?

গতকাল রাত্রের গ্লানিটা এখনো যায় নি অভয়ের। চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। নতুন জায়গায়, নতুন শহরে ও মানুষের মধ্যে এসেও, সাড়া পড়ে নি তার প্রাণে। যেন আপন-জন, সাধ আহ্লাদ, সব কিছু ছেড়ে, সে নির্বাসনে এসেছে।

চা খাওয়ার অভ্যাস নেই অভয়ের। কিন্তু না খেয়েছে তা নয়। ঘাড় নেড়ে জানাল, খাব।

সুরীন ঘরের মধ্যে গেল। ভামিনী এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, মাথা খারাপ নাকি?

সুরীনও চাপা গলায় বলল, না, মাথা ভালই। ছেলেও খুব ভাল। তবে একটু ওই রকম। কবি গাইয়ে মানুষ তো। একটু বেশী সভ্যভব্য। কথা একটু মাজা ঘষা। ভাব সাব একটু দুরন্ত। দশজনের চেয়ে ওইখানে তফাৎ। তবে মনটা খুবই ভাল। এখন তোরা যদি খারাপ না ক'রে দিস্, তবেই—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ঠোঁট টিপে একটু হাসল সুরীন।

ভামিনী চাপা গলায় ঝেঁজে উঠল, মরণ! মুখে আগুন তোমার।

সুরীন নিঃশব্দে হেসে উঠল। বলল, তার ওপর কাল রাতে বড় মারধোর খেয়েছে ছেলেটা।

ভামিনী বিস্মিত হয়ে বলল, ওমা! কেন?

সুরীন চুপি চুপি গলায় গানের আসরের ঘটনা বলল। বলল, নিতে ভটচাজ্জ বড় জবর মার মেরেছে ছেলেটাকে।

শুনে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে রইল ভামিনী। নতুন কৌতূহলে, সে উঁকি মেরে আবার দেখল একবার অভয়কে।

সুরীন গলা বাড়িয়ে বলল, তা' লে, একটু চা টা দে।

ভামিনী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, মুখখানি গম্ভীর করল। কিন্তু গম্ভীর মুখে চাপা গলায় কথা বলা বড় মুশকিল। তাতে গাম্ভীর্য বজায় থাকে না যেন।

তবু বলল ভামিনী, ছেলেটার জামাকাপড় কোথায়?

সুরীনও গম্ভীর হল। বলল, নেই।

ভামিনী বলল, জামাকাপড় নেই, কাজকর্ম নেই। তবে কি ঘরে বসিয়ে পুষবে নাকি?

ঘরের বউ হোক আর বাইরের বউ-ই হোক, মন ওই একটিই। ভামিনী ওকথাটা না বললেই বরং অবাক হত সুরীন। বলল, সে ব্যবস্থা হবে, তোকে ভাবতে হবে না। আমার ঘরে থাকবার জন্তে তো আসেনি। তোর একটা মেয়ে থাকলে না হয় তাই করতুম। এখন যা, চা করে নিয়ে আয়, কথা পরে হবে।

ভামিনী যাবার আগে বলে গেল, তার চেয়ে, যার হবু জামাই, তার বাড়িতে তুললেই পারতে, এখানে কেন?

সুরীন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বাইরে, দাওয়ায় এসে বসল অভয়ের পাশে। অভয় মাথা নীচু করে বসেছিল।

সুরীন বলল, কি গো, লজ্জা টজ্জা করছে নাকি?

সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল অভয়। বলল, এঁজ্ঞে না, লজ্জা করব কেন? ভাবছিলুম—

চুপ করে গেল অভয়। সুরীন বলল, কি ভাবছিলে?

—কালকের কাজটা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। সাঁতরাকে মারা আমার ঠিক হয়নি।

সুরীন বলল, আমি সেটা মানব না। তোমাদের আসরের অনিয়ম কতখানি হয়েছে জানিনে। কিন্তু সাঁতরারা লোক ভাল নয়।

অভয়ের চোখ দুটি এমনিতেই একটু ভাবতন্ময়। খানিকক্ষণ দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, যেন চুপি চুপি বলল, সুরীন খুড়ো, খোঁড়াকে খোঁড়া বললে তার কষ্ট হয়। মানুষে সেইটে বোঝে না। না বুঝুক, খোঁড়ার জ্বালা তাতে জুড়োয় না।

সুরীন বুঝল, ওই এক ভাবনা ছাড়া আর কিছু মাথায় নেই অভয়ের। বলল, তুমি যা জবাব দিয়েছ, সেটা কজনা পারে। আর হাত তুলে ফেলেছ, তাও সংসারে চলতে গেলে হয়ে যায়। কিন্তু এসব তুমি এখনো ভাবছ? এটা তো ঠিক নয় বাবা।

—তা বটে। সুরীন খুড়ো, গুরুর আদেশে এই আমার পেথম আসরে নামা।

—ভালই তো। আগে তেতো, পরে মিঠে।

—কিন্তন্ লোকে বলে,যার শুরু ভাল, তার শেষ ভাল।

—বটে কথাই তো। খেতে তেতো হলে কি হবে, আসলে যে সেটাই ভাল। নইলে দশ ব্যঞ্জন বেড়ে দেবার আগে, ওইটি দেয় কেন, বল?

কথাটি মনে ধরল অভয়ের। দুই চোখে তার বিস্মিত খুশির ঝিকিমিকি। মুখের ভার যেন অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ এটা তুমি বেশ বলেছ সুরীন খুড়ো। নইলে দেয় কেন?

ভামিনী মুড়ি আর চা' দিল সামনে।

সুরীন বলল, নাও, খাও। নতুন জায়গায় এয়েছ, একটু এদিক ওদিক দেখ।

অমনি অভয় বলে উঠল, হ্যাঁ, কিছু মনে ক'রো না গো খুড়িমা। আমার তেমন ভালমন্দ জ্ঞান নেই।

ভামিনী ফিরে তাকাল। ঠোঁটের কোণে তার হাসি মিটমিট করছে। বলল, না, মনে আবার কি করব।

আবার বলল অভয়, সুরীন খুড়ো বললে, ভাবলুম, দেখি, একবার কপাল ঠুকে, কি আছে এখেনে। তবে, কথায় বলে, তুক্‌তাক্ ছ' মাস, কপালের ভোগ বারো মাস। কপালে দুঃখু থাকলে, তাকে বাঁধবে কে?

ভামিনীর বারে বারেই হাসি এসে যায়। সঠিক কোনো কারণ নাই তার। অভয়ের ভাবভঙ্গি, কথা শুনলে আপনি হাসি পায়। বলল, কপালে দুঃখু কেন থাকবে। যে জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে, তাতে তোমার ভালই হবে।

একটু আগেই ভামিনীর প্রতি সুরীনের মনটা যে বিরূপ হয়েছিল, সেটুকু কেটে গেল। ভামিনীর মুখ দেখেই বুঝতে পারল, মুখে যা-ই বলুক, ছেলেটাকে ভাল লেগেছে তার।

অভয় মুড়ি তুলতে যাচ্ছিল মুখে। ভামিনীর কথা নে বলল, সেটা হলফ করে বলা যায়না খুড়িমা। ভয়ের কপালখানি তো আমার সঙ্গে আছে।

সুরীনের মুখ দেখে ভামিনী চুপ করে গেল। কথা াড়াতে চায়না সুরীন।

অভয় হঠাৎ সুর ক'রে, নীচু গলায় গেয়ে উঠল,

জোনাকীর আলো, দেখতে বড় ভাল

তাতে আগুন জ্বলে না।…

াকীটুকু শেষ না ক'রে, থেমে গেল অভয়। সুরীন লল, বাঃ, কথাখানি ভারী সোন্দর তো। তারপর ?

ভামিনী বলল, গলাটিও বড় মিষ্টি।

অভয় তাড়াতাড়ি বলল, বড় ভুল হয়ে গেছে সুরীন খুড়ো। ভুলে গেয়ে ফেলেছি।

ভামিনী আর সুরীন চোখাচোখি করে, চুপ করে গেল। অভয়ও নীরব। নীরবতাটুকুও আবার অভয়ের লজ্জার কারণ। সে মচ্ মচ্ করে মুড়ি চিবুতে লাগল।

ভামিনীর প্রাণে যে একটু দুঃখ না হচ্ছিল, তা নয়। তবু অভয়ের মধ্যে আত্মভোলা ছেলেমানুষি ভাবটি, থেকে থেকে হাসির উদ্রেক করছিল তার।

সুরীন বলল, তুই আর দাঁড়িয়ে রইলি কেন গো ভামিনী। রান্না ক'রে নিগে যা। অভয়কে নিয়ে আমি একটু ঘুরে আসি।

কয়েকটা টাকা সঙ্গে অভয়কে নিয়ে বেরুল সে।

সুরীনের বাড়ির মতই আশেপাশে খান পাঁচ সাতেক বাড়ি। টালি ছাওয়া চাল, ছিটেবেড়ায় মাটি লেপা দেয়াল, হাত পা মেলবার মত ছোট একটি উঠোন। সরু গলির একপাশে গঙ্গা, আর এক পাশে বাড়িগুলি।

এই বাড়ি ক'টি পার হয়ে, পশ্চিমে আরো অনেকগুলি বাড়ি। সেগুলি আরো ঘিঞ্জি। তবে সবই কাঁচা নয়, পাকা-বাড়িও আছে দু' একখানা। কিন্তু ছোটখাটো, ভাঙাচোরা পুরনো। তারপরে বড় বড় পাকাবাড়ি, সারি সারি চলে গেছে উত্তর দক্ষিণে; দোতলাই বেশী, তেতলাও আছে খান দুয়েক।

ঘিঞ্জি পাড়াটির দু' পাশে, এখানে সেখানে কয়েকটি মেয়েমানুষ বসেছিল ইতস্তত। কেউ কথা বলছে, কেউ

একটু বেশী বয়সী একজন জিজ্ঞেস করল সুরীনকে, কাজে বেরোও নি মিস্তিরি দাদা।

সুরীন বলল, না, ছুটিতে আছি। একটু দেশে গেছলুম, কাল জয়েন করব।

সবাই তাকিয়ে দেখল অভয়কে। সোজা চোখে নয়, চোখের কোণে তির্যক দৃষ্টি হেনে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে দেখল। কাপড় পরার ধরণ ধারণও একটু কেমন যেন। বাতাস নেই, কেউ টানা হ্যাঁচড়াও করছেনা। তবু আঁচলগুলি যেন বেসামাল। সাজাগোজার ব্যাপার নয়। চিল্‌তে জামায়, অনেকখানি খোলা গায়ে, সবাইয়ের শরীর কেমন একটু খোঁচা খোঁচা দেখাচ্ছে।

বর্দ্ধমানে, কাটোয়ায়, গাঁয়ের মেলায়, এরকম মেয়েমানুষ অনেক দেখেছে অভয়, চেনেও। এসব দেখে তার মনে কোন বিকার হয়না। কিন্তু সুরীনকাকার বউয়ের সঙ্গেও কোথায় যেন একটি অস্পষ্ট মিল রয়েছে এদের সঙ্গে। কথাবার্ত্তা ব্যবহারে নয়। খুড়ির সবটুকু না চিনলেও, মানুষটিকে ভাল লেগেছে অভয়ের। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাঁকা সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে খয়েরি টিপ্। সামান্য জিনিষ। কিন্তু মানুষকে কেমন যেন অন্যরকম দেখায়।

গাঁয়ে, তার বন্ধু নেয়ামত মাঝে মাঝে তাকে বাড়ি নিয়ে যেত, বিবিকে গান শোনাবে ব'লে। বিবি বেরুত অভয়ের সামনে। তার বাঁকা সিঁথের সোণালি রং আর কপালে কাজলের টিপ থাকত। কিন্তু সে যে নেয়ামত চাষীর বউ, বোঝা যেত।

সেটা একরকম, এও আর একরকম। সেটার মধ্যে মুসলমান ঘরণীকে চেনা যায়। এখানে হয় যেন হাটের প্রত্যয়।

ঘিঞ্জি বাড়িগুলি পার হয়ে, একটি বড় বাড়ির পাশ দিয়ে, বড় রাস্তায় এসে পড়ল দুজনে। সেখানে গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। সারবন্দী সাইকেল রিক্‌সার মিছিল। আরো পশ্চিমে গঞ্জ, রাস্তার ওপরে বড় বড় দোকানপাট। অভয় পড়তে পারে। দু'চোখ ভরে বাংলা সাইনবোর্ড পড়ে গেল। 'প্যারাডাইস্ আর্ট গেলারী'কে সে পড়ল, প্যারা-ডাইসো, আ-র্ট-গ্যা-লারি। নীচে লেখা আছে, স্টেজ, ড্রেস ও পেণ্টার সুলভ মুল্যে ভাড়া পাওয়া

যায়। তারপরেই 'দেশী মদের দোকান।' রেষ্টুরেন্ট, মনিহারী দোকান, মুদীখানা, তারপরেই ডুগি-তবলা-খোল, পাশে হারমোনিয়মের দোকান।

সুরীনের পিছনে যেতে যেতে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল অভয়। খোল বাজানোটা ভাল রপ্ত আছে তার। শ্যামরায়ের এদিক নেই, ওদিক আছে। মুখুজ্জের নির্দেশে প্রতিদিনই খোল বাজিয়ে গান করেছে অভয়। ডুগি তবলাতে কোনদিন হাত পড়েনি তার। জীবনে কয়েকবার হারমোনিয়ম টিপেছে। কিন্তু সুরের দিশা পায় নি।

সুরীন ফিরে বলল, কই, এস।

মনে মনে হাসল সুরীন। মুখে বলছে, ভুলে গান গেয়ে ফেলেছো। গানের সরঞ্জাম দেখলে, সেখান থেকে আর পা উঠছেনা ছেলের।

অভয় বলল, বদ্ধোমানের চেয়েও এ শহরখানির রং চং বেশী দেখছি।

সুরীন হেসে বলল, বড় জবর রং বাবা। চোখ কানা হয়ে যায়। এ শহরের আর এক নামই হল রংএর শহর, বুয়েচ? সেজন্যে, তিনটি চোখ দরকার এখেনে।

খানিকটা অবুঝের মত হেসে বলল অভয়, অ। তাই বুঝিন?

—হ্যাঁ বাবা।

তরপরে রেডিওর গান শুনল অভয়। আগেও শুনেছে বর্দ্ধমানে। গাঁয়েও শুনেছে। বাবুদের বাড়িতে ব্যাটারিতে রেডিও শোনা যায়।

অভয়ের মনের গুমোট কেটে গেল অনেকখানি। 'মহামায়া অপেরা পার্টির' সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, ছোট ছোট ছেলেদের মহড়া চলছে নাচ গানের। পায়ে ঘুংগুর বেঁধে সবাই নাচছে আর গাইছে,

চোখের কোণে আঘাত হেনে
যেয়োনা গো, যেওনা।

অভয় বলল, এই বড় বড় বাড়ি-দালান কিসের সুরীন কাকা?

সুরীন এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বলল, মেয়েমানুষের বাড়ি, মানে কথা, বেবুশ্যেদের।

এবার অভয়ের বাক্য হ'রে গেল। এত বড় বড় বাড়িতে শুধু বেবুশ্যেদের বাস! যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি, এমনি চোখে তাকাল অভয়। তারপর বাড়িগুলির দিকে ফিরে তাকাল নতুন চোখে। ইতিমধ্যে বারকয়েক দোতলার বারান্দায়, জানালায় দু' একটি মেয়েমানুষকে চোখে পড়েছে। কিন্তু একবারো বুঝতে পারেনি। বড় মানুষের বাড়িই ভেবেছে। ভেবেছে, তাদেরই ঘরের মেয়েছেলে। ওই যে দেখা যায়, নীলাম্বরীর আঁচল এলিয়ে রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েমানুষটি, গলায় সোনার হার, কানে দুল, হাতে একরাশ চুড়ি। সেও তবে বেচা-কেনার পশরা।

সুরীন ডাকল, এস অভয়পদ।

সামনেই একটি কাপড়ের দোকানে তাকে ডেকে নিয়ে তুলল সুরীন।

অভয় বলল, কী হবে?

—তোমার একটি জামা, আর একটি কাপড় কিনব।

অভয়ের মনটা আনন্দে ভরে উঠল, কিন্তু অস্বস্তি হল তার দ্বিগুণ। এই সমস্ত আত্মীয়তার ব্যাপারটা এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি তার কাছে। সুরীনকাকাকে সে চেনে, গাঁয়ের দশজনের কাছেও শুনেছে অনেক কথা। তবু নিজের অধিকার-সম্পর্কে অভয়ের খুত-খুতুনি যেতে চায় না। বলল, থাক্ না, দুদিন পরে হলেও চলত।

সুরীন শান্ত হেসে বলল, তা' কি চলে কখনো বাবা! এখন হয় তো তোমার মনে দশরকম গাইছে, পরে আর তা থাকবে না। কিন্তু আমি তোমাকে ঘরে এনে তুলেছি। দু' পাঁচজন লোক আসে আমার বাড়িতে। তোমার একটি জামা কাপড় থাকবেনা, সে কি হয়? আর…যখন তুমি রোজগার করবে, হাতে পয়সা পাবে, তখন শোধ দিও, তা' হলেই হবে তো?

অভয় আর কিছু বলল না।

দশ হাত একখানি মাঝারি ধুতি নিয়ে সুরীন বলল, কেমন জামা নেবে বল ত? সাট না পাঞ্জাবী।

—সে আবার কি?

—এই আমার মত নেবে? গলায় এই কলার, না এটি ছাড়া।

অভয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল শরত সাঁতরার পাঞ্জাবী। নিতাই ভটচাজও যখন আসরে নামত, সে রকম জামাই গায়ে দিত। বলল, ওটা ছাড়াই হোক।

'অর্থাৎ কলার ছাড়া, পাঞ্জাবী চায়। লংক্লথের রেডি-মেড পাঞ্জাবী কিনল সুরীন।

দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য রাস্তা ঘুরে বাড়ি ফিরে এল দুজনে।

শৈলবালা আর ভামিনী ছিল উঠোনে। ভামিনী বলল, ওই যে, এসেছে।

মধ্যবয়সী শৈলবালা, বিধবার বেশ। মোটাসোটা মানুষ, কেমন একটু অপলক দিশাহারা চাউনি।

সুরীন বলল, এই যে, শৈলদিদি, এয়েছি? এই আমাদের অভয়।

শৈল অভয়কেই দেখছিল। ঠিক অনুমান করতে পারছিল না, মানুষটি কেমন। বলল, অ!

সুরীন অভয়কে বলল, তোমাকে শৈলদিদির কথা বলেছি তো, এই সেই।

অভয় নত হয়ে প্রণাম করল শৈলকে। শৈলও প্রায় ভামিনীর মতই হাঁ হা করে উঠল, না গো বাবা, না না। এ পায়ে হাত দিও না, ছি!

সুরীন চাপা গলায় প্রায় ধমকে উঠল, আঃ, ও কি কথা শৈলদিদি। তোমার জামাই হবে, পায়ে হাত দেবে না?

অভয় বলল ওর সেই সলজ্জ অমায়িক হাসিটি হেসে, আপনি যে আমার মায়ের তুল্য হলেন কিনা, অর্থাৎ ভগবতী।

শৈলবালার দু'চোখ ফেটে জল এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, সারা জীবন আঁধারে থেকে, দিনমান আর আমার সয়না গো! ছি ছি ছাড়া আর কি বলব আমি। আমার যে সবই ছি ছি!
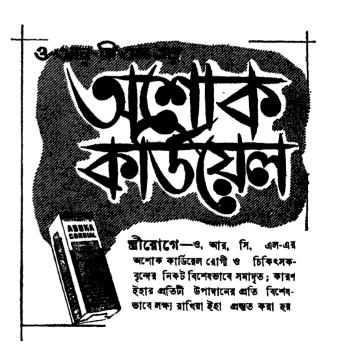
ক্রমশঃ

মুরলীধর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাজায় মুরলী সে, সখী বাজায়,
মধুর আলাপনে মুরছনায়!
বাঁশির তান শুনি' ওঠে লো গুনগুনি'
কুঞ্জবন তারি সুরে-উছল।
যখন দেয় তাল গোপাল—প্রতি ডাল ওঠে লো দুলি',
কাঁপে ধরণীতল,
মধুর আলাপনে মুরছনায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়।
শুনি' সে-মধুতান বিভোর মন প্রাণ, হারাই জ্ঞান,
তনু আবেশে ছায়,
লুপ্ত হয় পলে ভুবন, যায় গ'লে লজ্জা কুল মান তার নেশায়,
প্রেমের অপরূপ মধুরিমায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়!
তোমারে জানি শ্যাম দোদুল অভিরাম অতুল
চিরসাথী হে গুণধাম!
তোমারে চিনি প্রাণে রূপাল অভিধানে
গোপাল ব্রজবাল তোমার নাম।
শরণ মীরা চায় কমল পায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়!

(ইন্দিরাদেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দি গানের অনুবাদ)

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

নোতুন একটা সমস্যা দেখা দিল। বড়দার কাজকর্মের জন্য তুঁষখালিতে প্রায়ই থাকতে হয়, কারণ সুন্দরবনে ঢোকবার ওই আসল মুখ, তাছাড়া ফরেষ্ট রক্সার অপিস ওইখানেই, নৌকাপত্র রাখা—মেরামত করবার জন্য প্রশস্ত জায়গাও দরকার, তাই তুঁষখালিতে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে একখানা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী করেছেন, নোনাজলের পুকুর কাটিয়েছেন একটা, বাড়ীটা নোতুন তাতে গৃহপ্রবেশও হয়নি, তাই আগেকার একটা আস্তানাতেই উঠলাম। এই আস্তানাটার একটু বিশেষত্ব আছে।

বড় নৌকা যদি থাকে তাহলে তার পিছন দিকে ঘর মত যেটুকু ছাউনি ঢাকা থাকে সেটাও লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়; তেমনি পরিমাণ একখানা ঘরজাতীয়। মোটা মোটা কাঠের খুঁটি পুঁতে উপরে তক্তা দিয়ে মাচান করা, চারপাশে কাঠের তক্তার দেওয়াল, গোল-পাতার ছাউনি। ওপাশের একটু অংশ রান্না ঘর। জোয়ারের সময় কুলগাছিয়া নদীর জল ঘরের নীচে কাঠের খুঁটিতে এসে ঠেকে, ভাঁটার সময় জল সরে যায়, মেজের নীচে নরম কাদায় কানকোর ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় মেনো মাছের দল। এমন কুৎসিত কদাকার পোকা জাতীয় জীবকে মাছ বলে কেন ব্যঙ্গ করা হয় সে সংবাদ প্রাণীতত্ত্ব-বিদরাই জানেন। যেমন মেটে মেটে তাদের গায়ের রং—তেমনি বীভৎস দেখতে।

—ভাল ঘর থাকতে এখানে দুজনের থাকা হবে কি করে?

বড়দার কথায় বলে উঠি—বেশ করেকদিন নৌকাতে কাটাতে হবে, এই ঘরখানাতে থাকা অভ্যেস করলে নৌকায় বাস করার কষ্ট মনেই হবে না, বেশ রম্য হয়ে যাবে রিহার্সেল দিয়ে।

বড়দার মনঃপুত হ'ল না কথাটা—"উপায় রয়েছে কষ্ট করতে রাজী নই।"

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল গৃহপ্রবেশ করতে গেলে ঘরণী চাই-ই। তাঁরা যখন কেউই উপস্থিত নন—তখন আমাদের দুজন যাযাবরের ওই নোতুন ঘরে পড়ে শুধু রাতকাটানোর জন্য গৃহপ্রবেশের কোনো মর্য্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবেনা। তাছাড়া আমাদের রান্না খাওয়া হবে এই পুরোনো টংএর উপরই। ওখানে মাত্র গড়াগড়ি দেওয়া, গৃহপ্রবেশের আইন নিশ্চয় এতে ভঙ্গ হবেনা। পুজো টুজো ব্রাহ্মণ ভোজন পরে যখন বিধিসম্মত উপায়ে গৃহপ্রবেশ হবে তখনই হবে; বিছানা-পত্র এনে জয় দুর্গা বলে নোতুন ঘরে পেতে ফেললাম, কষ্ট যখন থেকে সুরু হবে তখন দেখা যাবে, এখন তো হাত পা মেলে আরামসে নাক ডাকাই।

তুষখালি রামপুর বাংলোর দৃশ্য

নদীর জলো বাতাসে কাঁপুনি ধরে ছিল, হাত পা ধুয়ে বসতেই দেখি গরম জল এসে গেল কেটলিতে এককেটলি। বড়দার সখ দেখছি দুটি জিনিষের উপর, সিগারেট এবং তামাক। চায়ের এমন তোফা সমজদার এবং গুণগ্রাহী বিশেষ দেখেছি বলে মনে হয় না। যে সে "চা—বা যার তার হাতের তৈরী চা খেতে ওঁর বিশেষ আপত্তি। নিখুঁত শিল্পীর মত চামচ মাপ করে সন্তর্পণে চা কেটলিতে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, ইতিমধ্যে চায়ের কাপ-দুধ-ছাঁকনি এসে হাজির। তারপর সুরু হল ঢালাই পর্ব, লিকার হবে ঢলঢলে

তাজা মঙ্কটের রসের মত রঙ্গীণ, নাহলে সে চায়ে মৌতাত আসবেনা, চা তৈরী করার সময় তার একাগ্রতা দেখবার মত ; নেশার জিনিষ— তৈরী থেকে খাওয়া পর্য্যন্ত সব কিছু ভুলিয়ে রাখবে তবেই তো !

হ্যা—চা তৈরীর প্রশংসা আমিও করি ; চায়ের বিজ্ঞাপনদাতা লেখেন ভাল চা এক চুমুকেই চেনা যায় ; আমার মনে হল বড়দার তৈরী চা এক চুমুকেই ম'লুম পাওয়া যায়। আর কারুর হাতের তৈরী চা তাই বড়দা খেতে নারাজ। চা পর্ব শেষ করে তিনি বসলেন তামাক নিয়ে—মিঠে কড়া বিষ্ণুপুরী তামাকের গন্ধটাও মন্দ লাগে না।

'টং' এর ওদিকটায় রান্নাঘর, একটা উনুনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ! গোলপাতার প্রাচীর, ছাউনি। বেশ ভয় পেয়ে যাই, শেষকালে কি যতুগৃহ দাহ হয়ে যাবো ওই গাংএর উপরই, না প্রাণ ভয়ে নীচে ওই হাঁটুভোর কাদাতেই লাফ দিতে হবে। এগিয়ে গিয়ে দেখি উনুনটা জ্বলছে, পাশে নামান একটা কড়াই, ওপাশের বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে একটি কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি, ছোট ছোট চোখ দুটো বন্ধ করে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। মাথার চুল থেকে চুইয়ে পড়ছে তেল, লম্বা চুলগুলোয় বাহার করে পাতা কাটা হয়েছে। উনুনের আগুনের আভায় কালো রং তামাটে হয়ে উঠেছে।

—এ্যাই। 'ব্যাটা নিজে পুড়বে, আমাদিগকেও পোড়াবে। ওঠ' -একটা ধাক্কা দিতেই তন্দ্রা ছুটে গেল,

—ঘুমুচ্ছিস ?'

কথার জবাব দেয় না, বোকার মত হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর আকর্ণ সাদা দাঁত বিস্তার করে হাসতে থাকে, যেন ব্যাপারটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয় !

—নাম কি তোর ?

—'নেত্তাই'

বলে উঠি 'গৌরাঙ্গটি কোথায় ?

—"বাবা ! বাবার কথা বলছেন ?"

থেমে গেলাম। এরকম জবাব পাবো আশা করি নি। নিতাই-গৌরাঙ্গের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন কোন দেশের লোক সাহস করে , বুনোদেশে তাও সম্ভব হয়েছে।

"কি রাঁধছিস ?"

আবার সেই হাসি, রাঁধবার কোন গা-ই দেখলাম না। সরে গেলেই আবার যে ঘুম দেবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

বড়দার ডাকে ফিরে এলাম—'চলো, একবার অপিস থেকে ঘুরে আসি। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ফেল নিতাই,' টর্চ নিয়ে গাংএর পাড় ধরে রওনা হলাম নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করে।

এখানে অপিস বলতে ঐ ফরেষ্ট অপিসই। নদীর উঁচু ভেঁড়ি থেকে নেমে রাস্তাটা গিয়ে ঢুকেছে অপিসের সীমানার মধ্যে। উঁচু কাঠের খুঁটির উপর তক্তার পাটাতন—তক্তার দেওয়াল ঘেরা ব্যাংলো প্যাটার্ণের কোয়ার্টার কয়েকটা, ওপাশে তেমনি মাচানের উপর বারান্দা-ঘেরা অপিস ঘর।

রেঞ্জার ভদ্রলোক বাইরে টুরে গেছেন। অপিসের বর্তমান চার্জে আছেন একটি ভদ্রলোক, বয়স বেশী নয়। আমাদের ডাক শুনে বাসা থেকে বার হয়ে এলেন তিনি,…"আসুন—আসুন।"

নিজের ঘরেই ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বড়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়, আমাকে দেখে এবং আমার উদ্দেশ্য শুনে একটু বিস্মিত হলেন তিনি।

—বেড়াতে এসেছেন ! সুন্দরবনে !

…ভদ্রলোকের কণ্ঠে রীতিমত বিস্ময়,…দরজার ওপাশ থেকে তাঁর স্ত্রীও উঁকি মেরে এমন চিজটিকে একনজর দেখবার চেষ্টা করলেন।

—"বনবাসে কি মজাসে আছি দেখে যান মশাই, এখানে তবু তো লোকজনের মুখ দেখি, যান ভিতরে, 'দেখবেন আমাদের চাকরীর ঠ্যালা !"

—"বর্তমানে যেখানে বন কাটাই হচ্ছে সেখানে গেছেন আপনি ?"

—"ভগবান এখনও কৃপা করেছেন ; তবে তার বর্ণনা যা শুনেছি পরম শত্রুকেও যেন সেখানে যেতে না হয়।"

বলে উঠি—'আমরা তার চেয়েও অধম।'

হাসতে থাকেন তিনি। রাত্রি হয়ে গেছে অনেক, বিছানা থেকে তুলে সেই বিছানায় বসে আড্ডা দিচ্ছি। এর বেশি রাত্রি করা ভাল দেখায় না, উঠলাম আমরা। ভদ্রলোক নীচে পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

—"কাল সকালেই আসবেন কিন্তু।"

কথা দিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বাসায়, দেখি নিতাই তখনও ভাত নামাতে পারে নি ; বোধ হয় এক সিরিয়াল ঘুম ইতিমধ্যে তার হয়ে গেছে। ঘরে আর এক বয়স্ক গৃহিনী সচিবসখা রূপ চাকর আছে— তিনি অতুল। ভাতের মাকুর মত অতুল সবদাই একটা তীব্র গতিবেগ নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। তাকেই রান্নার বাকি অংশটুকু সেরে নিতে বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সকলে খেয়ে দেয়েই ঘুমোয়—আমরা না হয় ঘুমিয়ে উঠেই খাবো।

সুন্দরবনের কবল থেকে এই মাটি খুব বেশীদিন আগে ছিনিয়ে নিতে পারে নি মানুষ। এখনও এর চরে জন্মায় সুন্দরী গরাণের গাছ, নদীর লোনা জলের করাল গ্রাস থেকে আবাদী জমি বাঁচাবার জন্য উঁচু ভেড়ি দিয়ে রেখেছে। ওই ভেড়ি বা বাঁধ ভেঙ্গে একবার গাংএর পানি ঢুকতে পারলে সব নিঃশেষ করে দেবে। এই আবাদের এক এক লেট লাট পত্তনের মূলে রয়েছে কত অজানা লোকের প্রাণদান, কত অশ্রু, কত হাহাকার ; লোনা গাংএর গহিন অতলে ওদের কত চোখের জল মিশে আছে তার লেখাজোখা নাই।

সরকারের কাছ থেকে কোন অঞ্চল বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদার সেখানকার বনকেটে নিঃশেষ করে দিল, এই বনকাটার কাজে আনান হোত রাঁচী, বিলাসপুর সাঁওতালপরগণা থেকে কোল ভীল ওঁরাও সাঁওতালের দলকে, যেমন করে চা বাগানে বা কলিয়ারীতে নিয়ে যায়—ওদিকে ঠিক তেমনি প্রলোভন দেখিয়েই আনা হোত এই বন-

বাদায়, জমি কেটে বসবাস করবে, জমি জারাত পাবে, হালগরু ও নগদ টাকা মিলবে।

এই আশার ডাকে তারা সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে শাল পিয়ালের বনের মায়া কাটিয়ে অকূল গাং পাড়ি দিয়ে এই নোনা বাদায় এসেছিল। বনকেটেছে—বাঘের কবলে, সাপের ছোবলে—গাং-এ প্রাণ দিয়ে ওরা বসত করে—মাটির লোনা ঘুচিয়ে সোনা ফলিয়েছে, তারপর জমিদারের চাপে ক্রমশঃ জমি থেকে বেদখল হয়ে—তাদের বংশধররা আজও সেই জনমজুরি করেই লোনা বাদায় অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। অবস্থার উন্নতি হওয়াতো দূরের কথা মরীচিকার ইঙ্গিতে ছুটে গিয়ে মানুষ তৃষ্ণার জল না পেয়ে প্রাণ হারায়, তেমনি ওরাও নোনা বাদায় মরীচিকার সন্ধানে ছুটে এসে ওদের সব হারিয়েছে। সাঁওতাল —ওরাও মুণ্ডার সহজ সরল হাসি-মাখা মন; বাধাবন্ধহীন জীবন-যাত্রা-নির্লোভ আচরণ ভুলে আজ কোন পর্য্যায়ে নেমে গেছে সঠিক বোঝা যায় না। অবশ্য এর জন্য ওরাই দায়ী নয়, সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের মুছে যাওয়া জমিদার বংশ! তাদের শোষণের করুণতম কাহিনী আজও মুছে যায় নি নোনা গাং-এর দুপাশের বসতি থেকে।

সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু মুসলমান এবং বিত্তশালী দুচার ঘর মাহিষ্য দেখা যায়। সাধারণ জীবনযাত্রা বড় কষ্ট-সাপেক্ষ। ...পদে পদে সেখানে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, বাধা দিতে হয় অকূল জলরাশিকে —তার বুক থেকে আহরণ করতে হয় তাদের জীবিকা, তারই বুকের তুফান ডিঙ্গিয়ে চলে তাদের যাতায়াত, লোক-লৌকিকতা; এই দুর্বার জীবনযাত্রাই তাগিদে করে তুলেছে কঠিন, পরিণত করেছে ভাবলেশহীন জড় পদার্থে; বাঁচবার তাগিদে তারা সবকিছুই করতে বাধ্য হয়।

দত্তর ফরেষ্ট অফিস। এর পরই সুন্দরবনের গহন অরণ্য—আবাদ-অঞ্চলের শেষ লোকবসতি

জমিদার গোষ্ঠী বিলুপ্ত হবার পর সেখানে ভার নিয়েছে সরকার, প্রধান কাজ এই বাঁধ বা ভেঁড়িগুলো বছর বছর মেরামত করা। প্রত্যেক অংশটি ছোট বড় নদী খাল দ্বারা বিভক্ত; যেন ছোট বড় দ্বীপ, প্রত্যেকটি লাটের চারি পাশেই ওই ভেড়ি, কোন দিক যদি ভেঙ্গে যায় সেবছর সেই লাটে একগাছি ধানও লোনা জলের ক্ষুরধার রসনার আক্রমণ থেকে বাঁচবে না। সরকার থেকে ওই বাঁধ এখন তদারক করা হয়। আর আগেকার জমিদারী কাছারিগুলো এখন তলিয়ে গেছে। সে প্রতাপ হাঁক ডাক; প্রজাদের মারধোর শাসন—দোল দুর্গোৎসব আর নাই।

পাঁচীল গেছে ভেঙ্গে, সখের সাজান বাগান লোনা মাটির বুকে শুকিয়ে গেছে অযত্নে, ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে।

সকালে উঠে দেখি রোদে ছেয়ে গেছে চারিদিক। বাংলোর বারান্দা থেকে চোখমেলে দেখা যায় কুলগাছিয়া নদীর প্রশস্ত বুক--ওপারে সন্দেশখালি থানার পাকা বাড়ী কখানা। আমাদের বাংলোর নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে রামপুরার খাল—গিয়ে গোসাবা আবাদের নীচে বিদ্যানদীতে মিশেছে। ওপারের জনমানবহীন চরের বুকে গরান গাছের ঘনসবুজ জঙ্গল, ওখানে বাস এখনও গড়ে ওঠেনি।

মরা ভাঁটির সময়, কাদার বুকে হেঁটে বেড়ায় কয়েকটা বক, ভেঁড়ির উপর দিয়ে কোট প্যান্ট পরে এক ভদ্রলোক আসছে দেখে একটু অবাক হলাম। বড়দা বলেন—ডাক্তার। তুমি নোতুন লোক এসেছো কলকাতা থেকে, তাই সেজেগুজেই বার হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—আবার স্কুল মাষ্টারিও করেন ওপারে।

...বড়দা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছেন। অর্থাৎ নেশার আমেজ তাঁর সুরু হয়েছে এবং চলবে চায়ে শেষ চুমুক না দেওয়া পর্য্যন্ত, তারপর সুরু হবে ফড়সি। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন।

পূর্ববঙ্গের খুলনায় আদি বাসস্থান, দেশ বিভাগের পর এখানে এসে ছোট একখানা বাড়ী—একটা পুকুর করে বসবাস করছেন। প্যান্টের আশেপাশে হতে ভিন্নরঙ্গ সুতোয় সেলাইএর দাগ, কোটটা ছোট হয়ে বুকে পিঠে টান ধরেছে। ডাক্তারি ব্যবসা করে এমুলুকে

বেশ নামযশ করতে পারেননি, বর্তমানে স্পেশাল ক্যাডারের মাষ্টারী পেয়ে কোনরকমে তাল সামলে নিয়েছেন আর কি।

—এ অঞ্চলে কেউ কি আর পড়তে আসে মশায়? মাঠে খাটবে—গরু বাছুর সামলাবে, মাছ টাছ ধরবে, তা নয় কাঁহাতক বই পত্তর নিয়ে হুজ্জুতি! সব আজকাল একটু লেখাপড়ার দিকে মন গেছে। তবে অধিকাংশই গরীব, উচ্চ প্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়ে, তার ওধারে কাউকে যেতে হয়না বিশেষ। বড়ো গরীব দেশ।

শুনলাম সারা সুন্দর বন অঞ্চলে মোটে ৪।৫টা হাইস্কুল আছে। নোতুন স্পেশাল ক্যাডারে কিছু হয়েছে প্রাইমারী স্কুল। সন্দেশখালিতে পুলিশথানা, স্পেশাল সার্কেল অফিসার প্রভৃতি সরকারী অপিস রয়েছে কিন্তু কোন হাইস্কুল নাই, বর্তমানে ওঁদের চেষ্টায় ক্লাস 'এইট' পর্য্যন্ত একটা স্কুল হয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা তেমন সন্তোষজনক কিছু নয়।

রোদ উঠে গেছে বেশ। বেলা প্রায় ন'টা; ওদিকে পুরোনো ঘরটার 'টুং'এর ধস্তাধস্তি-চাপা হাক ডাক শুনে একটু এগিয়ে গেলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি অতুল আর মিস্ত্রী দুজনে মাদুরের উপর চট চাপা একটা পদার্থকে ধরে টানাটানি করছে। বেশ খানিকটা গোঁত্তাগাঁত্তা খেয়ে চটের ভিতর চোখ আধবোজা অবস্থায় উঠে বসলো শ্রীমান নিতাই। ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নি, দুহাতে চোখ কচলাতে কচলাতে সূর্য্যের দিকে চেয়ে বেলা পরখ করতে থাকে।

—ঠিক সময় হয়নি অতুল, ওকে আর একটু ঘুমুতে দাও।

আমার কথায় মিস্ত্রী বলে ওঠে—'ব্যাটা একনম্বর পাঁজি, ঘুম নয়—বদমাইসী। খেয়ে খেয়ে তিলিয়ে গেছে ব্যাটা বুনো। ঘুমোক দিখি, ওকে চট বেঁধে খালের জলে না ডুবিয়ে দিইতো আমার নাম মিথ্যে। ওঠ খাবার যোগাড় করতে হবে না?

ডাক্তার বলে ওঠে—বড় বাবুই ওঁর ভাত রান্না করে দিন। তিন কুলে যার কেউ নাই—কোথাও যার ঠাঁই হবে না, বড়বাবু বেছে বেছে সেই সব লোকদিকে পুষবে।

বড়দা তামাক টানতে টানতে নীরবে হাসেন মাত্র। চাকর-বাকর লোকজনকে বিশেষ কিছুই বলেন না।

তুষখালির ঘাট ক'দিনের জন্য সরগরম হয়ে উঠেছে। বড়বাবুর হাজারমণি কয়েকখানা নৌকা কলকাতায় মাল পৌঁছে দিয়ে ফিরেছে; তুষখালি থেকে আবার সুন্দরবনের ভিতরে চলে যাবে মাল আনতে। এক একটা নৌকাতে পাঁচজন্ করে মাঝি, চারখানা 'দাঁড়ে' আর একজন হালে। এই ফিরতি নৌবহরের সঙ্গে আমরাও যাচ্ছি বনের মধ্যে। উদ্যোগ আয়োজন কিছু বাকী, সেগুলো শেষ করে নিয়েই কাল রাত্রির ভাঁটায় আমাদের হবে যাত্রাশুরু।

"আপনার 'লঞ্চ' ঠিক আছেতো?" ডাক্তার বলে ওঠেন।

'লঞ্চ'—একটু আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দিই। কলকাতাতে শুনেছিলাম যে বড়দা একটা ছোট লঞ্চের জন্য খোঁজাখুজি করছেন। বনে যাদায় যাতায়াত করতে অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়—তাই লঞ্চের চেষ্টা। কিন্তু কেনা হয়ে গেছে তা শুনিনি। বড়দা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন "ওই যে। ঠিকই আছে। একেবারে টিপটপ কনডিশিশন।"

চেয়ে দেখি একটি দেড়শমণি সেগুনকাঠের নোতুন ডিঙ্গি, আগাগোড়া 'ছই' তিনটে দাঁড় পরাবার জায়গা, আর সবই ঠিক আছে, তবে ওই কুলপাছিমার গাংএর তুলনাতেই ছোট—বড় গাংএর বুকে মনে হবে মোচার খোলা। ওই ছোট্ট ডিঙ্গিতে করে রায়মঙ্গল, গোসাবা-নদী, বিদ্যা, বঙ্গোপসাগরের একটা খাঁড়ি মুখ পাড়ি দিতে হবে! কথাটা ভাবতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। সাতপুরুষের রাঢ় দেশে বাস, নদী বলতে জানি দামোদর, অজয়—ময়ূরাক্ষী—গঙ্গা আর লালগোলায় পদ্মা—ব্যস! কিন্তু এই অকুলপাথার পাড়ি জমাবো ওই তিনহাত প্রশস্থ আর পঁচিশ হাত লম্বা ডিঙ্গিতে? রক্ষা কর ভগবান!

...আমার হাবভাব—চাহনি দেখে বড়দা তো হেসেই ফেল্লেন—'কোন ভয় নাই, হাওয়ার মত বেরিয়ে যাবো। শীতের গাং পুকুরের মত ঠাণ্ডা। তুফানের ভয় নাই।

—'ভরসাই বা কি।' মনে মনে বলি। মুখ ফুটে বলে উঠি—চার পাঁচ দিন নৌকাতেই থাকতে হবে, একটু বসবার দাঁড়াবার, জায়গাতো চাই—তার চেয়ে আসবার সময় আপনার ওই টাপুরে আসা যাবে, যাবার সময় বরং ওই খানাতে উঠবো আমরা।

...বড় বড় নৌকার পাশে নোঙর করা ছিল একটা নোতুন সাড়ে তিনশ'মণি বেতনাই ধরণের নৌকা। উঁচু গলুই, সবে বছর খানেক হল তৈরী করিয়েছেন তিনি, লোহাকাঠের তলা, সেগুনের আশপাশ, বেশ মজবুত। ছইখানিও চমৎকার। খোলের উপর তক্তা দিয়ে পাটাতন করা আছে। এককথায় দেখতেও বেশ এবং নির্ভরযোগ্য।

হাসেন বড়দা—আচ্ছা দেখা যাকতো!

নৌকার মাঝিরা টিউবওয়েল থেকে ভার ভার জল তুলে এনে নৌকার খোলে বড় বড় মাটির জালায় খাবার জল বাঁধছে। এক একটা নৌকায় চারটে পাঁচটে করে জালা—চলতি কথায় বলে 'মেটে'। ওই জলেই চলবে ওদের পান আহার। চারিদিকে এত জল, কিন্তু লোনা, মুখে তোলা যায় না। যত নীচে নামবে, জল তত নোনা বেশী হবে। কোলরিজের এনসেণ্ট মেরিনারের লাইন কটা মনে আসে—

—Water Water Every Where
Even the boards did Shrink.
Water, Water Every Where
And not a drop to drink.

দুর্গম পথ, দুস্তর পাড়ি। খাবার জল—চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, সাবান, তামাক—ঔষধপত্র যাকিছু মানুষের বাঁচতে দরকার সবই হিসেব করে বেঁধে নিতে হবে। কোন জিনিষের অভাব পড়লে মিলবার কোন উপায় নাই। কিছু তরিতরকারীর দরকার নিজেদের জন্য, কিছু ডিম—আর দু চারটে মুরগী। একবার হাটে যাবার দরকার। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে হাট দেখতে চল্লাম।

এখান থেকে মাইল চারেক দূরে রামপুরের হাট। বাদ নৌকায়

পিছন থেকে ছোট একটা ডিঙ্গি খুলে নিয়ে এলো। দুখানা দাঁড় আর একজন মাঝি।

বেলা দুটো বাজে। স্নান করে বসে আছি, আহার তখনও জোটেনি। নিতাই দশটার সময় অনেক পরিশ্রম করে খানিকটা হালুয়া বানিয়ে দিয়েছিল, তারপর সেই যে ঘরের মধ্যে সেঁদিয়েছে আর বাইরে আসেনি। অতুল জায়গা করে ভাতের থালা ধরে দিল।

সকালবেলায় বড়দার ভেড়ির জলায়—জাল ফেলে মাঝিরা ধরেছিল পারসে, ওমলেট মাছ। দেখি মাছের সঙ্গে মাথামাথা গোছের একটা পদার্থ—ঝোলও ঠিক নয়—কাঁইও বলা যায় না। আর একটা বাটীতে করে ডাক্তারের বাড়ী থেকে দিয়ে গেছে কই মাছের তরকারী; কই মাগুর মাছ ওখানে এই সময় মেলে প্রচুর, বসতির বাইরে বিরাট ধানক্ষেত, বর্ষার সময় ওই সব ধানক্ষেতে প্রচুর কই-সিঙ্গি মাগুর মাছ জন্মে, শীতকালে জল কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই মাছ বসতির আশে পাশে মিঠেজলের অপেক্ষাকৃত গভীর খালগুলোতে এসে দলে দলে আশ্রয় নেয়। তাই দু'একটা পুকুর যা আছে তাতে কই মাগুর—শোল ভর্তি হয়ে থাকে। শুনলাম এক একটা ছোট্ট পুকুর থেকে শ্রেফ কই মাগুর শোল বেচে পাঁচ সাতশো হাজার টাকাও আমদানী হয়।

ভাত ভেঙ্গে নিতাই এর রান্না সেই পারসে ওমলেট মাছের তরকারী? মুখে তুলেই—ফেলবার জায়গা খুঁজি। ঢের ঢের রান্না খেয়েছি এমন অমৃত কোথাও খাইনি। দোষ যে কোনটা তাই বার করতে পারা যাবে না, লোনতায় সমুদ্রের জলকেও হার মানিয়েছে, ঝালে চাটগাঁকে, পোড়ার দিক থেকে 'জতুগৃহ'কে। বেলা দশটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত রান্না করেছে দুজনের মত ভাত, আর এই একটি মাত্র তরকারী. সুতরাং এত খারাপ এবং বিপজ্জনক করে তুলতেও সময় এবং সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। বাকী ছিল ডাল সেটা অতুল রান্না করেছে, মুখে তোলা গেল—আর ডাক্তার গৃহিণীর কইমাছের তরকারী। নিতাইএর বিশেষ দোষ নাই। মাছ কড়াইএ চাপিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছিল, সেটা ছুটতেই তেল দিয়েছে, যা পুড়বার তা আগেই সারা হয়ে গেছে তেলে পোড়া মাছকে ভাজা করে—মশলা সমেত এককড়াই জল দিয়ে—সেই মাপে নুন দিয়েছে। আবার তন্দ্রা—এককড়াই জল যে মরে যাবে নিঃশেষ হয়ে তা নিতাই জানবে কি করে। ঘুম ছুটতে—ঝুর ঝুরে ওই উপাদেয় তরকারী নামিয়েছে।

নিতাই দেখি বেড়ার আড়ালে অন্তরালবর্তিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে, যেন লজ্জাবতী লতা।

—'তুইও খাবি তো?'

আবার সেই আকর্ণ দাঁত বার করা হাসি, "আমার পান্তা ছিল খেয়েছি আলু সেদ্ধ দিয়ে"

...বড় সাধ ছিল ওই সব তরকারীটা ওকেই খাওয়াবো—আপাততঃ তা হোল না। হাটের বেলা হয়ে গেছে, বার হতে হলো।

...বৈকালের দিকে হাট, দূর দূরান্তর থেকে আসে নৌকা ডিঙ্গি বোঝাই তরি তরকারী, মালনৌকায় মুদি বয়ে নিয়ে আসে দোকান পত্র। সপ্তাহের ছয়দিন ধরে এক হাট থেকে অন্য হাটে বেসাতি সেরে সেরে বেড়ায়। সোমবার এক হাটখোলায়, মঙ্গলবার চারক্রোশ দূরে অন্য হাটে, এমনি করে ভ্রাম্যমান তাদের জীবন নদীর বুকে।

তরিতরকারীও বিশেষ এই লোনা মাটিতে হয় না, দু একটা কলা গাছ, লাউ—ব্যস এই পর্যান্তই। অন্য সবকিছু চালানী নৌকা করে আসে।

...সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হাটে জ্বলে উঠেছে কেরাসিন আলো, দু চারটে বাঁধা দোকানে জ্বলছে হেসাক। টিনের চৌখুটি খোপ ওয়ালা ডালায় রং বেরংএর মশলা দিয়ে পান বিক্রী করছে পানওয়ালা. ওপাশে কাঠের তেপায়ার উপর নকল বায়স্কোপ, দুপয়সা দিয়ে কাঁচ বসানো গোল গর্তে চোখ লাগালেই দেখা যাবে মক্কা মদিনা, তাজমহল, কলকাতার মনুমেণ্ট, হাওড়ার পুল। সেই সঙ্গে বায়স্কোপওয়ালার ডুগডুগি বাজিয়ে গান

"—শাউড়ি জামাই পিরীত হোল—

সপ্তাহের দুটো দিন এদের এই নির্বান্ধব নিঃস্ব জীবনে আনে আনন্দের আস্বাদ। হাট ভেঙ্গে আসছে। আমাদের দাঁড়িটাকে পাওয়া যাচ্ছে না; কোথায় হাটে তামাশা দেখতে মেতে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত ভোলা মাঝি তাকে বার করে—'ওই দেখুন বাবু শরিফের কাণ্ড।'

দেখি ছেলেটা উবু হয়ে বায়স্কোপওয়ালার চোঙ্গে চোখ লাগিয়ে মহাসে কলকাতা দেখছে আর ওই গান শুনছে।

—"ওকে ডেকোনা; দুটো পয়সা দিয়েছে, দেখে শুনে উশুল করে নিক—তবে ডেকো। আমি নৌকায় চললাম।"

ভোলা বয়স্ক লোক—গজ গজ করে—'ছাওয়াল পাওয়ালের চ্যাংড়ামি আজকাল বাড়তেই চলেছে বাবু। একেবারে বে সরম।'

ফুর্তি করবার বয়েস, এই সময়ই কঠোর দারিদ্র্যের চাপে তাদিকে মেনে নিতে হয়েছে এই জল জঙ্গলের কঠিন নির্বাসিত জীবন। কোন আমোদ আহ্লাদ নাই; পদে পদে আছে মৃত্যুর ছলনা। তাই দুটো দিনের এই সহর দেখা ওদের কাছে বাকী ছ'মাসের বন জীবনের অমূল্য সঞ্চয়। সঙ্গের আর একটা বাচ্চা দাঁড়িকে গোটাকয়েক পয়সা দিয়ে বললাম—"যা তুই একটু ঘুরে আয়। বেশী দেরী করিস না।"

ভোলামাঝি আমার দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চল একটু চা খেয়ে নৌকায় উঠি।

...নৌকার সামনে একটি লোক আবছা অন্ধকারে গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদিগকে দেখেই এগিয়ে এলো।

—'আপনারা তুষখালি যাবেন?'

—'হ্যাঁ'

—আমাদের ডিঙ্গিতে যদি একটু নিয়ে যান, সঙ্গে সের পনের চাল আছে। অন্ধকারে খেয়া পার হয়ে দুক্রোশ ভেড়ি ভেঙ্গে যেতে খুবই কষ্ট হবে।

অপরিচিত জায়গা, সন্ধ্যাবেলা, নদীপথ, তার উপর এই অজানা লোক,. কে জানে কি মতলব আছে মনে। শুনেছি এদিককার পথঘাট ভালো নয়, বসতির সামনেই নৌকায় মারধোর করে ডাকাতি করে নিয়ে যায় সব। ভাবছি—কি জবাব দোব। লোকটি নিজের পরিচয় দেয় গায়ের চাদরখানা সরিয়ে—

—আমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি।

সরকারী পোষাকও গায়ে রয়েছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম—"আচ্ছা—ওঠো।"

...দাঁড়ি দুজন সহর দেখে বায়স্কোপের গল্প করতে করতে এসে হাজির হয়েছে, মুখে পানের ভুরভুরে গন্ধ, বিড়ি টানছে ফুক ফুক করে।

—'দে নৌকা ছাড়।'　　　　(ক্রমশঃ)

এগারো

থে রঘু ছুটে এল।

ছোট্দা—একবার এসো। সর্বনাশ হয়েছে।

ত্যজিৎ বনশ্রীর চিঠিখানা খুলতে যাচ্ছিল, হাত থেকে া টুপ করে টেবিলের ওপরে খসে পড়ল। উত্তেজিত দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে? কোনো বাড়াবাড়ি হল নাকি?

না, বাবুর কিছু হয় নি।—রঘু প্রায় কেঁদে ফেলল:— কবার টেলিফোনে এসো।

ট এসে সত্যজিৎ ফোন ধরল।

স্যার, আপনি? আমি জয়া কথা বলছি। বীথি স্টেড্ হয়েছে। অনেককেই ধরেছে আজ। র এখান থেকেই জামিনের ব্যবস্থা হবে। আপনারা া না—খবরটা দিয়ে রাখলাম।

ত্যজিৎ ফোন ছেড়ে দিয়ে, টেবিলের কোণায় হাত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মুখার্জি ভিলার ত আরম্ভ হয়েছে। বীথির ছায়া ছায়া চোখে লা সে জ্বলে উঠতে দেখেছিল, তারই একটা এসে পড়েছে এই বাড়ির বিষাক্ত অন্ধকারের । এই সবে শুরু। এখন কেবল আলোই , এর পরে যখন কয়েকবিন্দু আগুন এসে পড়বে ই রুদ্ধ-পুঞ্জীত বিষাক্ত গ্যাসগুলো একটা বিকট ণের রূপ নেবে—এই মুখার্জি ভিলার জগদ্দল াগুলো দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। থি তারই সূচনা করে দিয়েছে।

ধরাগলায় বললে, কি হবে ছোট্দা?

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ বললে, কিছুই হবেনা। ভাবিসনি।

—তুমি একবার থানায় যাবেনা?

—দরকার নেই। ওরাই বন্দোবস্ত করবে এখন।

রঘু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারল না। মিনিট্খানেক দ্বিধাগ্রস্তের মতো অপেক্ষা করে বললে, তুমি একটিবার থানার গেলেই পারতে কিন্তু।

সত্যজিৎ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে বললে, বললাম তো, কিছু ভাবতে হবেনা। বীথি কালকেই ছাড়া পাবে—আজও আসতে পারে। তুই শুধু চুপ করে থাকিস রঘুদা। বাবা যেন জানতে না পারেন। প্রীতিকে আমিই বলব এখন।

সত্যজিৎ চলে এল। রঘু দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেবেলায় বীথির মরণাপন্ন অসুখের সময় রঘু নবদ্বীপে ছুটে গিয়ে কোন্ এক ভৈরবীর কাছ থেকে মাদুলী নিয়ে এসেছিল—একদিন উপোস করে থেকে সেই মাদুলী বেঁধে দিয়েছিল বীথির হাতে।

ঘরে এসে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সত্যজিৎ। চেয়ে রইল বারান্দাটার দিকে। অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল ঝোলানো অর্কিড্গুলো কেমন পাংশুটে আর শীর্ণ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন বোধ হয় জল পড়েনি। নিচে দুটো চড়ুই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল—কী খাচ্ছিল ওরাই জানে। সত্যজিৎ বসে রইল। আর তার কনুইয়ের তলায় চাপা পড়ে রইল বনশ্রীর সেই নীল খামখানা।

তারপরে তার চমক ভাঙল। নীচ থেকে হাসির

আওয়াজ এল। রীতেন হা-হা করে হাসছে বাড়ী ফাটিয়ে। তার সঙ্গে প্রীতির মিষ্টি তীক্ষ্ণ হাসির ঝঙ্কারও শোনা গেল।

তখন বনশ্রীর চিঠিটার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রীতেন এসে জবাব নেবার জন্য বসে আছে। নীল রঙের খামখানা তুলে নিয়ে একবার ভ্রূকুটি করলে সত্যজিৎ। প্রীতির হাসিটা তার কিছুতেই ভালো লাগলনা। অনেককাল আগে সে এ বাড়িতে এসেছে নিজে, প্রীতি তার একেবারে অচেনা তা-ও নয়, তবু আজ মনে হল এতটা না হলেও চলত। প্রীতির হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঙালপনা আছে—সেইটেই তার কানে যেন ঘা দিতে লাগল বারবার।

আর ওদিকে ইন্দ্রজিৎ আচম্কা চিৎকার করে উঠল।

Have you ever heard the laughter of Death.
Have you ever heard it"

প্রিস্ট্‌লির না কার একটা উপন্যাস সে পড়েছিল অনেককাল আগে। সে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর গল্প। দুর্যোগের এক বীভৎস রাত্রে তিন চারিটি মানুষ পথ ভুলে আশ্রয় নিয়েছিল নির্জন পাহাড়ের কোলে এক রহস্যময় বাড়ীতে। পাগলামি হত্যা আর অপঘাত দিয়ে ছাওয়া সেই বাড়ী বাইরের বৃষ্টি বজ্র আর ধ্বসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল যে রাত বারোটায় বই শেষ হওয়ার পরে সে আর চোখের পাতা বুজতে পারেনি। তার মনে হতে লাগল—ওই রকম শুধু একটিমাত্র রাতই নয়—রাতের পর রাত এই বাড়ীতে আসন্ন হয়ে আসছে। সেই পরম দুঃস্বপ্নের লগ্নে এ বাড়ীতেও কেউ আর ঘুমুতে পারবেনা; কেবল প্রিস্ট্‌লির উপন্যাসের মতো বুকের স্পন্দন বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকবে: যখন ধ্বস্ আর বন্যা নেমে মুখার্জি ভিলাকে ঠেলে নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে:

"Have you seen her grinding teeth
Tinged with the blood of my son—
my generation—"

সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত চাপল। কা'র কবিতা? কোথা থেকে এ-সব পায় ইন্দ্রজিৎ। কা'রা লিখেছিল? চেঙ্গিস? সাইবাস? ক্যালিগুলা?

মানুষের চিন্তা চেতনার মৌলিক অবস্থাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারপরে কোন্ মৌলিক উপকরণটা সব চেয়ে প্রধান আর প্রবল হয়ে ওঠে? ক্যানিবালিজম্? ভালোবাসার অধর সঙ্গমে কি সেই আদিম ইচ্ছাই প্রতীকিত হয়ে ওঠে?

সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করে নিলে। এ কোন্ জাতের উৎকট ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব চিন্তা আরম্ভ করেছে সে? মনটাকে যথাসম্ভব সংহত করে নিয়ে সে বনশ্রীর চিঠিটা খুলল।

সংক্ষিপ্ত কয়েক ছত্র চিঠি। দু পয়সার একখানা পোষ্ট্‌কার্ডেই লেখা চলত। এর জন্য নীলখামের কোনো দরকার ছিলনা, রীতেনকে পাঠানোও না।

বনশ্রী লিখেছিল,

"কাল বিকেলে, ধরো সাড়ে-পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ, তুমি কি ঘণ্টাখানেকের সময় পাবে? এসে যদি আমাদের এখানে চা খাও তা হলে খুশি হবো। তোমার কোনো ভয় নেই, বিব্রত করব না। শুধু কয়েকটা কাজের কথা বলব—একেবারে বৈষয়িক কথা। যদি আসতে পারো, রীতেনের হাতে খবরটা জানিয়ে দিয়ো।"

কাজের কথা—বৈষয়িক কথা। কত জোর দিয়ে লিখেছে বনশ্রী। আণ্ডার লাইন করে দিলেও ক্ষতি ছিল না। মনের এই বিরক্তি আর বিশৃঙ্খলার ভেতরেও এক ধরণের কৌতুক অনুভব করল সত্যজিৎ। বৈষয়িক কথার উল্লেখটা এমন বিশেষ করে করবার কী দরকার ছিল? ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলোর পরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সত্যজিতের স্মৃতি থেকে কবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল বনশ্রীর নীল রুমাল, তার আঙুলে পোখরাজের আংটিটা, তার সর্বাঙ্গের একটা বিশেষ সুগন্ধ। আর বনশ্রীও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিল তাকে—অন্তত এতদিন তার প্রয়োজন তাকে বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে হয়নি।

আজ আর বৈষয়িক ছাড়া কী কথাই বা হতে পারে তাদের মধ্যে? কোনো চল্‌তি ট্রামে যদি কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা হত, কোনো নীল্‌চে বিকেলের আলোয় পার্কের কোনো পাম গাছের তলায় হঠাৎ দেখা হয়ে যেত যদি—তা

; হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে মনে গুন্‌গুনানি জেগে উঠত, তা কয়েকটা এলোমেলো রঙের ছোপ তুলে যেত খের সামনে দিয়ে। কিন্তু তা তো হয়নি। হীরেনের নার দু'জনের দেখা হয়েছিল। সেখানে একটা পুরোনো -জলা লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জী পরে একটা ভাঙা চায়ের বালা নিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল হীরেন, দেওয়ালে ছার-কার রক্তের দাগ যেন বীভৎসভাবে সমস্ত রুচি-বোধকে ন করছিল, হীরেন একটানা বলে যাচ্ছিল বাজারে ফর্মা তি রেট্ কত আর মেজের বসে পড়ে জিলিপি আর প্রায় ণা চা খেয়েছিল বনশ্রী। জীবিকার রেশনের লাইনে র পর দাঁড়িয়েছিল দু'জন—স্থূল স্বার্থের তাগিদ ছাড়া আর ানো সম্বন্ধই ছিল না দুজনের মধ্যে।

ওই স্বার্থ ছাড়া আজকে আর কোন্ নতুন বন্ধন সে ড় তুলবে বনশ্রীর সঙ্গে? বনশ্রীই কি ভাবতে পারে ার কিছু? সেই বয়েসের সেই চোখ নিয়ে সে তো ানোদিন বনশ্রীকে দেখতে পায়নি। সেদিন বনশ্রীর ন্ত সত্তাই ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর; শালবনে বৃষ্টি পড়ার ন, আউটরাম ঘাটের বুকের জ্যোৎস্না। সেদিন চোখ জে সত্যজিৎ বনশ্রীর মুখখানা মনে আনতে পারেনি, তার রীরী রূপটা যেন কোথাও কোনোদিন ছিল না। আজ ত তা নয়। এখন হীরেনের ওখানে দেখা বনশ্রীর ক্লান্ত খের প্রায় প্রত্যেকটা ডিটেল্ সে ভাবতে পারে—এমন কি ার নাকে চশমার যে শাদা দাগটা পড়েছে—তার অসঙ্গতিও ত্যজিতের চোখ এড়িয়ে যায়নি। এখন বনশ্রী তার াছে একটা শারীরিক আর সামাজিক অস্তিত্ব—ার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা চলে আর চলে ভদ্রতার বিনিময়।

কেন ডেকেছে বনশ্রী? 'জএন্ট্ অথরশিপে' বই লিখবে বলে? 'বাই এক্সপিরিয়েন্স্‌ড্ প্রোফেসারস্'—এই নামে নতুন কোনো নোট বই বের করবে বলে? কিংবা কোনো কোচিং ক্লাস খোলবার মতলব আছে? টিউশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর টানাটানির বাজারে 'কোচিং ক্লাশই' তো এখন একমাত্র পন্থা।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে সত্যজিৎ ইতস্তত করল মুহূর্তের জন্যে। তারপর লিখল:

তার সঙ্গে চিঠির বৈষয়িকতাটাকে আরো স্পষ্ট করবার জন্যে জুড়ে দিলে: "আশা করি ভালোই আছো।"

চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে আবার রঘুর আবির্ভাব।

—আবার কী হল রঘুদা?

এবার রঘু আর চোখের জল সামলাতে পারল না।

—ঠিক বলছ ছোড়দা? ছোড়দিকে আজই ছেড়ে দেবে?

রাগ করতে গিয়েও সত্যজিৎ কোমল হয়ে এল। আস্তে আস্তে রঘুর কাঁধে হাত রাখল।

—ঠিকই বলছি রঘুদা। ওরা ব্যবস্থা করবে।

স্নেহের ছোঁয়ায় রঘুর শোক উথলে উঠল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মেয়েদের মতো।

—এই বাড়ীর মেয়েকে শেষে পুলিশে ধরল ছোড়দা? এই বাড়ীর মেয়ে শেষে হাজতে গেল?

এই বাড়ীর মেয়ে। কটু একটা মন্তব্য সত্যজিতের ঠোঁটে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু রঘুর দিকে তাকিয়ে এ-বারেও সে সামলে নিলে। যে-কথা সে বলতে চাইছিল রঘু তা বুঝবে না। মুখার্জি ভিলার এই প্রায়শ্চিত্তে রঘুর কোনো সান্ত্বনা নেই। রঘু এখনো চাপরাশ পরে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো ব্রহাম গাড়ীর পিছনে, ওয়েলারের খুরের তলায় এখনো খোয়া ওঠা রাস্তায় খট্ খট্ খস্ খস্ করে আওয়াজ উঠছে, রঘু এখনো ঝিল আর ঝাউ গাছের ভেতরে সেই বাগান বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে—যেখানে একশো বছরের পুরোনো মদের বোতল খুলে নিয়ে শিবশঙ্কর মুখুজ্জে বসে আছেন সম্রাটের মহিমায়।

এতগুলো কথা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভাবল সত্যজিৎ। তারপর রঘুর উচ্ছ্বসিত শোককে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ড্রয়িং রুমে রীতেন তখন প্রায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

—মিউজিক? সেণ্ট্রাল ইয়োরোপের জিপসী মিউজিক শুনেছেন কখনো? অরিয়েণ্টের সঙ্গে অক্সিডেণ্টের যে কী ব্লেন্‌ডিং তাতে ঘটেছে—আপনি ভাবতে পারবেন না।

নিজের চিৎকারই শুনছিল রীতেন, সত্যজিতের পায়ের আওয়াজ সে পেলোনা। সত্যজিৎ একবারের জন্যে ড্রয়িং

তার বেশি দ্রষ্টব্য মনে হল প্রীতিকে। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রীতি রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। জীপসী, অরিয়েণ্ট, অক্সিডেণ্টের একটি বর্ণও সে বুঝছেনা—কিন্তু অভিভূত ভক্ত যেমন স্তব্ধভাবে পুরুতের দুর্বোধ্য মন্ত্র শ্রদ্ধা-ভরে শুনতে থাকে, তেম্নি করেই রীতেনের কথা শুনছে প্রীতি।

প্রীতিকে বারণ করা উচিৎ। সত্যজিৎ ভাবল। এ ঠিক হচ্ছে না। এমন ভাবে তার রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু প্রীতিকে বারণ করা গেল না।

সত্যজিৎই সাড়া দিলে।

—চিঠিটা নাও।

প্রীতি সামান্য একটু চমকে উঠল—যেন সুর কেটে গেল কোথাও। রীতেন দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

—ও-কে সত্যদা—আমি চলি তবে।—প্রীতির দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে রীতেন বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভালো লাগল মিস্ মুখার্জি। আবার দেখা হবে। আসি আজ। টা-টা—

হাতের একটা অদ্ভুত মুদ্রা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল রীতেন।

প্রীতি তখনও কেমন আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল চুপ করে। সত্যজিৎ একবার বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে চাইল তার দিকে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল এখুনি প্রীতিকে তার একটা আঘাত করা উচিত—এই আচ্ছন্নতার ঘোর তার কাটিয়ে দেওয়া দরকার।

নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাষায় সত্যজিৎ বললে, তুই বোধ হয় জানিস না প্রীতি। আজকে বেলা তিনটের সময় বীথিকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে।

—কী বললে!

যেন বন্দুকের একটা গুলি খেয়ে প্রীতি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ল অ্যাশ্ ট্রে-টা—একটা জলন্ত সিগারেটের শেষ অংশ গড়িয়ে পড়ল কার্পেটের ওপরে আর প্রীতির মুখের রঙ দেখতে দেখতে ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বাইশে শ্রাবণ

গোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবি-অস্তরাগ মেলে' গেল সে অমর আভাসন
বাইশে শ্রাবণ!
সহস্র শ্রদ্ধার মালা বিদায়ের ব্যাকুল লগনে
ঝরলো কবির কণ্ঠে, অনন্তের যাত্রার স্বপনে
উদয়-প্রশান্তি এসে রবির অসীম পরিধিকে
প্রদক্ষিণ ক'রে গেল জীবনের শত বাণী লিখে'!
স্মৃতির মমতা দিয়ে শ্রাবণের বুক আসে ছেয়ে,
ব্যথার বাতাসে দোল্লা মেঘগুলো চলে' গেল
নীলের সমুদ্রতট বেয়ে!
সেই হতে বাইশে শ্রাবণ আঙিনায়,
মুঠো মুঠো স্মৃতি এসে প্রীতি দিয়ে কবিরে সাজায়!

কবি সে তো চিরদিন জেগে আছে
সুন্দরের মৌন রাজপুরে,
তবু খেয়া পাড়ি দিয়ে, মৃত্যুর আঁচলখানি ধ'রে—
যেতে হয় কোন্ দূর পানে!

দিনের মোহনা এসে রাতের রহস্য মাঝে মিশেছে সেখানে!
মহাকাল সেইখানে ধ'রে নিয়ে চলে তাঁরে
অসীম আলোতে:—
কীর্তির অনন্ত বীথি পথে!
আর সে পথের প্রান্তে চেয়ে থাকে উজ্জ্বল নয়ন,
বাইশে শ্রাবণ!

পাট ও পীঠ

শ্রী 'শ'—

লচ্চিত্র ও তার দর্শক,—অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এ দুয়ে। একটি না থাকলে আর একটি থাকে না। একটির ওপর নির্ভর করছে আর একটির সাফল্য। একটির জন্যে আর একটির প্রয়োজন। দর্শকদের মতের ওপরই নির্ভর করছে চলচ্চিত্রের সাফল্য ও অসাফল্য,—এটা সবাই স্বীকার করবেন। দর্শকদের ওপর চলচ্চিত্র নির্ভর করলেও চলচ্চিত্রের ওপর কি দর্শকরা নির্ভর করছেন? হ্যাঁ, করছেন বই কি! চলচ্চিত্র আজ সভ্যসমাজের সবচেয়ে লোকপ্রিয় প্রমোদ শিল্প, আর তাই চলচ্চিত্রের প্রভাবও সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের ওপর প্রচুর এবং এই প্রভাব যদি খারাপের দিকে যায় অর্থাৎ উদার মতবাদ, উন্নত মনোভাব, উচ্চ অভিলাষবিহীন কুরুচিপূর্ণ নিম্নস্তরের, খামখেয়ালীময়, অতি হাল্কাধরণের, অতিসাধারণ ছবিরই খালি প্রস্তুত ও প্রকাশ চল্‌তে থাকে তাহলে সিনেমার দর্শকসমাজের প্রবৃত্তি ও পছন্দের অবনতিই যে শুধু ঘটবে তা নয়, অপরিণত বয়স্ক বালক বালিকাদেরও অপরিণত মন তরুণ তরুণীদের ওপর এই সব চিত্রের প্রভাব পড়ে জাতির ভবিষ্যত, দেশের ভবিষ্যত, সমাজের ভবিষ্যত এই আগামীকালের নর-নারীদের মন ও মস্তিস্ককে চির রুগ্ন করে রেখে যাবে। সমাজ গঠনের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য আজ অনস্বীকার্য্য; তাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের অনুরোধ তাঁরা যেন শুধু বক্স অফিসের ওপরই লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ মুনাফা লাভের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়েই না থেকে, জাতীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, উন্নত সমাজ গঠনের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও দশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—'বসন্ত-বাহার' কথাচিত্রের নায়িকা চরিত্রে একে দেখা যাবে

* * * *

* * *

হাওড়া ই-আর রঙ্গমঞ্চে "নৃত্যম"-এর ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর "বাসব দত্তা" ও "ভারত-তীর্থ" নৃত্যনাট্য সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী ঠাকুর ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ফটো—রণেন ঘোষ

'যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান' সাধক বামা ক্ষ্যাপার জীবনীকে অবলম্বন করে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। জীবনী-চিত্রের প্রয়োজন সর্ব্বদেশের সমাজ জীবনে সর্ব্ব-কালেই রয়েছে। আমাদের দেশে জীবনী-চিত্র প্রস্তুত হলেও এর প্রাধান্যও যেমন অনুভূত হয় না, সংখ্যাতেও তা তেমনি প্রচুর নয়। জাতি গঠনের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানবদের লিখিত জীবনী যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, আজকালকার সিনেমা অনুরাগী সমাজকে গঠনের জন্যে জীবনী-চিত্রেরও তেমনি প্রয়োজন। বামা খ্যাপার জীবনী-চিত্র সু-অভিনীত ও সু-পরিচালিত হলে যে দর্শক সাধারণের ভাল লাগবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

চিত্রপালী প্রযোজিত ও পরিচালিত "অভিষেক" চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রবীরকুমার, অনিলকুমার ও দেবযানী

* * *

রাজ কাপুরের "জাগতে রহো" (বাংলা: "একদিন রাত্রে") চলচ্চিত্রটির চেকোশ্লোভাকিয়ারকার্লোভি ভেরি আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ সম্মান (Grand Prix) প্রাপ্তির জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরাই শুধু নয়, চল-চ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্ব্ব-স্তরের সর্ব্বরকমের ব্যক্তিরাই যে সবিশেষ আনন্দিত হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহই

। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভাগ্যে
র্জ্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনিতে সর্ব্ব-
সম্মানলাভ এর আগে আর ঘটে
—এই প্রথম ভারতীয় চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বলে পরিগণিত হল। "জাগ তে
"-র এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তির
দায়ী ছবিটির যুগ্ম-পরিচালকদ্বয়
ভুমিত্র ও শ্রীঅমিত মৈত্র। পরি-
কদ্বয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাগুণেই
গ তে রহো" আজ বিশ্ব-সম্মানের
কারী হতে পেরেছে; তাই আজ
চ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু নয়—
বাসীমাত্রেই পরিচালকদ্বয় ও অন্যান্য
দের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

* * *

বকাশ রায় প্রডাকসন্সের সঙ্গীত
রত চিত্র "বসন্ত বাহার" শীঘ্রই
লাভ করবে। চিত্রটির সঙ্গীতাংশ
করেছেন শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন
গোলাম আলী, আমির খান্,
বাই বরোদেকার, এ-কানন,
মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যো-
ায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়ক
কাগণ। ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের যাঁরা ভক্ত তাঁদের এই
ট নিশ্চিতই মুগ্ধ করবে এবং আজকালকার 'লারে
' জাতীয় হাল্কা সিনেমা সঙ্গীতের ভক্তদেরও কিছুটা
দিতে পারে বলে মনে হয়।

বাদল পিকচার্সের "পরের ছেলে" চিত্রে: সন্ধ্যারাণী ও অসিতবরণ

* * *

াইকেল মধুসূদন দত্তের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী
জর ওপর লেখা ব্যঙ্গাত্মক নাটক "বুড়ো শালিকের
রোঁ"-কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন এ, এম,
কৃসন্স। ছবিটিতে অভিনয় করছেন তুলসী লাহিড়ী,
প হালদার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা এই সর্ব্বপ্রথম পর্দ্দায়
রূপায়িত হয়ে মাইকেলের রচনাকে আরও জনপ্রিয় করে
তুলবে।

* * *

প্রখ্যাত অভিনেতা বলরাজ শাহনিকে "মমতা" নামক
বাংলা চিত্রে নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের সহিত
অভিনয় করতে দেখা যাবে। বলরাজ শাহনির এই সর্ব্ব-
প্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয়। এই চিত্রেও তিনি তাঁর
স্বভাবসুলভ অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ
করতে পারবেন বলেই আশা হয়।

অভিসার

আশা গংগোপাধ্যায়

খুকুর জীর্ণ জামায় জোড়ায় জোড়ায় তালি লাগাচ্ছে মহাশ্বেতা: জোরে ছুঁচ চালাতে গেলেই সুতোর টান লেগে ফেঁসে যাচ্ছে ফ্রকটা। সামনে স্তূপীকৃত করা রয়েছে স্বামীর শার্ট-পাঞ্জাবি, নিজের শাড়ী, খুকুর পেনি আর খোকার পাজামা।

সবগুলিই শতছিন্ন, ঝরঝরে।

এদিকে টানতে গেলে ওদিক ঝরে পড়ে।

এই পুরাণো জামাকাপড়ের সংস্কার কোরে ও মন দেবে নতুন কাপড়ের টুকরোগুলির দিকে। আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে এক ডজনের উপর ব্লাউজ।

দোকানের সংগে কনট্রাকট্ কোরেছে।

সেলাইয়ের হাত মহাশ্বেতার খুব নিপুণ। অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে রঙীন সুতোর ফুলগুলি ওর চাঁপা-কোমল আঙ্গুলের মোহন স্পর্শে। ছোট বেলা থেকে সূচী-শিল্পের দিকে ঝোঁক অহেতুক মনে হত সকলের। পাড়াতে সকলে—অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবরা যখন গর্বিত হত স্ব-স্ব পোষাকের ছাঁটকাটের অভিনবত্বে—মহাশ্বেতা তখন অনন্যমনা হয়ে কাঁচি চালিয়ে যেত কাপড়ের বুকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সৃষ্টি করত নবনব মনোহর শিল্পসম্ভার।

'চোখের মাথা তুই খাবি, শ্বেতা—আজকাল এত সস্তা তৈরী জামা, তবু তোর আর পছন্দই হয় না। কি কাজে যে লাগবে তোর ঐ সূক্ষ্ম কারুকাজ?'—

মা কত যে অনুযোগ-কোরেছেন তার এই বাতিক নিয়ে।

আজ মা কোথায়? তিনি কি দেখছেন দুপুরের ওই মেঘ-মেদুর আকাশের কোণ থেকে শ্বেতার সেই শৈশবের শিল্পনৈপুণ্য আজ কি কাজে লাগছে!

সৌখীন ঘরের মেয়েরা আজকাল পছন্দমত পোষাক চায়—ব্লাউজ চায়—অংগে অংগে জড়ায়ে রবে—আঁট-সাঁট; ব্লাউজের বুকে চায় রঙীন চটক্‌দার পুষ্পরাগ, কিন্তু সে হবে অন্যের কষ্টকৃত। অর্থের বিনিময়ে সুলভ মূল্যে যে দ্রব্য দোকানে দোকানে মেলে, তার জন্য চোখের দৃষ্টি ক্ষয় কোরে মেয়েরা চায় না নিজেদেরকে তথাকথিত আধুনিক সভ্যসমাজে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে।

স্বকৃত পোষাকের মধ্যে যে আত্ম-গৌরব বা আত্মতৃপ্তি লুকিয়ে থাকে, সেই পরিচ্ছদ পরিধানের পরে যে আরাম-আনন্দ অংগ প্রত্যংগে প্রিয়জনের স্নেহালিংগনের মত শিহরণ জাগায় তা বোঝবার মত অনুভূতি মহাশ্বেতা ছাড়া আর কা'র আছে?

যাই হোক্—অকারণে নয়, বরং বিশেষ কারণেই আজ সেই শিল্পকলা ওকে কাজে লাগাতে হয়েছে।

স্বামী চিন্ময় আজ বেকার।

ব্যাংকে অর্থ নেই, অংগে নেই অলংকার, পরিধানে নেই বস্ত্র; সর্বোপরি গৃহে নেই একটি দানা অন্ন।

সব গেছে। সবই ছিল—অবশ্য তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। তবু জল গড়িয়ে নিতে নিতে একদিন শূন্য ঘড়া উপুড় কোরতে হল।

তারপর ঋণ, ঋণ, ঋণ। এই অপরিশোধ্য পর্বত প্রমাণ দায় স্কন্ধে নিয়ে চিন্ময় বা মহাশ্বেতা চোখে অন্ধকার দেখল। দুটি শিশু। জীর্ণ, রোগাক্রান্ত। কোনও রকমে জীবনের ক্ষীণ সুতোটাকে টেনে রেখেছে ওরা স্বামীস্ত্রীতে।

চিন্ময় দোকানে দোকানে হিসাবের খাতা লেখে। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা সাইকেল নিয়ে ছোটে রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে সংবাদপত্রের বোঝা বয়ে।

অনুভব করল মহাশ্বেতা। মধ্য রাত্রের নৈঃশব্দ্য ভেদ কোরে দুই কানে বেজে চলল শত দামামা।

সে কি পারবে পুরাণের নারীর মত স্বামীর আদেশে দেহদানে তুষ্ট কোরতে অতিথি দেবতাকে?

সে কি পারবে তাদের মত দেহের বিনিময়ে শুষ্ক সংসারের বুকে জাগাতে সবুজ উদ্যান শোভা?

মুহূর্ত কয়েক অসাড় মুহ্যমান হয়ে পড়ে রইল। চিন্তা-শক্তির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ হতে লাগল। নিজেকে উন্মাদ মনে হতে লাগল।

অকস্মাৎ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল মহাশ্বেতা—পরক্ষণে ভেসে গেল উদ্বেলিত অশ্রু-বন্যায়।

সত্যিই ত কে দেবে সম্মান—যখন এই পৃথিবীতে কেউ আর থাকবে না—না স্বামী, না সন্তান।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজন সব যেন মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে—শুধু জেগে রইল অনিমেষ নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে—অর্থবান্, বিত্তবান—কাল-নাগের বিষময় ফনা বিস্তার কোরে।

*　　*　　*　　*

উদয়াচলে আবীর রাঙা রঙের লুকোচুরি, বাতাসের কানে কানে ভোরের ভৈরবী। পাখার পাখায় পাখায় সোনার স্রোত। গাছের মাথায় মাথায় আবছায়া আগুণের আভা।

সারাটি বিনিদ্র রাত্রি অস্থিরভাবে কাটিয়ে শেষপ্রহরে সংযত স্থির-সংকল্প হল মহাশ্বেতা।

অনেক খুঁজে বার করল নীলাম্বরী, জরির বুটি দেওয়া দামী শাড়ী। চিন্ময়ের দেওয়া সখের শেষ উপহার। সযত্নে তুলে রাখা শাড়ীটাকে টান মেরে ধূলি-ধূসরিত কক্ষতলে এনে ফেলল।

'ঠিক যেন বরতনু শ্রীরাধা চলেছেন অভিসারে'—বলে গভীর প্রেমভরে বক্ষে টেনে নিয়েছিল চিন্ময় সেদিন এই শাড়ী পরে সে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

অভিসারেই ত চলেছে!

না, আজ আর ওই শাড়ীর প্রতি তার একটুও মমতা নেই। ওর মর্যাদা-হানি ঘটাতে যে বস্তু ওকে সাহায্য করবে সে ত মহাশ্বেতার প্রিয় নয়। সে স্নেহবঞ্চিত অনাদরের জিনিষ।

ওই বহু মূল্য নীলাম্বরীর আর কোনও মূল্য রইল না মহাশ্বেতার কাছে।

পিঠ-ছাওয়া কালো চুলের রাশি যত্ন কোরে কবরী-বদ্ধ করল নতুন ছাঁদে—বহুদিনের অনভ্যাস। বহু আয়াসে তবে কুন্তলপাশ আয়ত্তে আনল। রাতজাগা আঁখির কোণে কালো ছায়া বিষাদে ম্রিয়মান। তবু সেই কাজলকৃষ্ণ ঘনপল্লবে দিল অঞ্জনের মায়া-পরশ, শাঁখ-সাদা চামেলির মত কোমল কপোলে দিল পাউডারের তুলি বুলিয়ে, ঈষৎ রক্তাভ কোরে তুলল নম্র অধর। দর্পণে প্রতিচ্ছবি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল মহাশ্বেতা। যে সৌন্দর্যের, খ্যাতি যুবক মহলকে বিভ্রান্ত কোরে তুলত কলেজ জীবনে, তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তবে তখন যা ছিল স্বাভাবিক এখন সেইটাই রঙ তুলির স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে।

না—অনিমেষ রায়কে ভোলানো কঠিন হবে না। চিরদিন পিছনে পিছনে প্রেতের মত তাড়া কোরে ফিরেছে—আর আজ সে স্বয়ং উপযাচিকা।

সুপ্রসন্না দেবীর মত বরদান কোরতে চলেছে—উজাড় কোরে ঢেলে দেবে যা কিছু সম্বল।

নিদ্রিত স্বামীর মুখের পরে চোখ পড়ল।

অনেক ভালবাসা অনেক স্নেহযত্ন পেয়েছে সে। অভাবের তাড়নায় পীড়িত হয়ে যে হীন প্রস্তাব কোরতে পেরেছিল নিজের স্ত্রীর কাছে—তার জন্য মহাশ্বেতা প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেও পরে আর রেগে থাকতে পারে নি। সত্যি বলতে কি—সে কথা চিন্ময়ের অন্তরের কথা নয়।

দারিদ্র্যের কষাঘাত যখন জর্জরিত কোরে তুলেছিল—তখনই এসেছিল ওই ধনী দুর্বৃত্তটার কাছ থেকে নব নব প্রলোভন। সামান্য সম্মানের মূল্যে যদি ভদ্রভাবে গ্রাসাচ্ছাদন জোটে তাতে আর মহাশ্বেতার কী বিশেষ আপত্তি থাকতে পারে? যে স্ত্রীকে স্বামীর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে অর্থোপার্জন করতে হয়—সে কি তার ওই অলীক সম্মানটুকু বজায় রাখতে পারে অন্যান্য পতি বিলাসিনী ধনগর্বিতা পত্নীদের মত?

চিন্ময় চিরদিনই সরল প্রকৃতির। কি থেকে কি হতে পারে—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে অত ভাববার মত দূরদর্শিতা তার নিরীহ প্রকৃতিতে নেই।

অনিমেষের নিরন্তর মন্ত্রণাদানে বিমূঢ় চিন্ময় সত্যিই দিশেহারা হয়ে যেন একটা আশার আলো একটা সহজ পথ দেখতে পেয়েছিল। আলেয়ার কথাটা ভেবে দেখেনি।

কিন্তু শোনামাত্র মহাশ্বেতা জ্বলে উঠেছিল প্রজ্জ্বলিত শিখার মত! কলহ কোরে, অভিমান কোরে স্বামীকে উদ্বাস্ত কোরেছে—তবু অর্থকরী পরামর্শ দিতে পারেনি—পারেনি ভাসমান সংসারতরীকে একটুকরো সবুজ ডাঙার আশ্বাস দিতে।

অতলান্ত দারিদ্র্য সাগরে সে নিজেও ভরাডুবি হয়েছে।

আজ তার সংকল্পকে সে কোরেছে সুদৃঢ়। ধূলায় যদি লুটিয়ে দিতে পারো নারীত্বের মর্যাদাকে, যদি পুরুষের হীন লালসার সাথী হতে দিতে পারো এই যৌবনময় স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহটাকে, সহজেই মেলে অনায়াস লব্ধ অন্ন-গ্রাস। আর সে গ্রাস গলাধঃকরণ ক'রতে মহাশ্বেতাকে যতই যাতনা ভোগ ক'রতে হোক, বাঁচবে স্বামী সন্তানের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণ—ওদের শীর্ণ বিরস মুখে আবার ফুটবে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা, গৃহ কোণে দেখা দেবে শান্তির শুকতারা, ওদের চোখে ধরণীর রঙ্ যাবে বদলে।

তবে তাই হোক্—তাই হোক্ তবে।

* * * *

সহরের প্রান্তে মেঘ-ছোঁওয়া প্রাসাদ—

একাধিক মিলের মালিক, গ্র্যাণ্ড মোটর কোম্পানীর একমাত্র অধিকারী, বহু অট্টালিকার অধিপতি ঐশ্বর্যশালী অনিমেষ রায়ের বাসভবন।

সযত্নসজ্জিত দেহটাকে বিরাট ফটকের কাছে টেনে নিয়ে এসে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে মহাশ্বেতা।

ভোরের আলোয় তখনও লোক-না-চেনার রহস্য আছে জড়িয়ে, রাজপথ জনবিরল।

ট্রাম বাসের চলাচল তখনও সুরু হয়নি।

'সাহেব ত বেরিয়ে গেছেন।'—

আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে মহাশ্বেতার পাথর চাপা বুকের গভীর হ'তে।

'আপনি ভিতরে বসুন।'

কর্মচারী একজন অপেক্ষাকক্ষের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। মাথার উপর ঘুরিয়ে দেয় পাখা।

আঃ, এতক্ষণে মনে হয় মহাশ্বেতার, ঠিক এই ঘূর্ণিত পাখাটারই যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার।

গেট খোলার শব্দ হয়· নিঃশব্দ গতিতে বিরাট গাড়ী এসে প্রবেশ করে পোর্টিকোয়।

অত্যন্ত লঘুচ্ছন্দে ক্ষিপ্রভাবে নেমে আসে অনিমেষ রায় —ময়দানের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অতি প্রত্যুষে রাইডিং কোরে ফিরে আসে সহরের কুখ্যাত হীন চরিত্র ধনী অনিমেষ রায়। বুকের মধ্যে সজোরে পড়ে হাতুড়ির আঘাত।

'একি আপনি?' প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষ—প্রাত্যহিক ব্যায়ামান্তে শরীরটাকে যতটা হাল্‌কা মনে হচ্ছিল ঠিক ততখানিই ভারী বোধ করে পদযুগল।

আঁটসাট পোষাক, খাঁকি ব্রীচেস্, টি'শার্ট, খাঁকি হোস্, হেভি লেদার বুট—সব মিলিয়ে একেবারে ঝকঝকে, তক্‌তকে। তবু সর্বাংগ ঘিরে যেন চেপে ধরল পাষাণের ভয়াবহ পোষাক! স্বেচ্ছাচার কোরে সারা জীবনটাকে কোরেছে তছনছ, কিন্তু ভুলে যায়নি পাঠ্যাবস্থার প্রথম প্রণয়িনীকে।

যাকে ভুলে থাকবার জন্য কোরেছে নেশা—যার দর্পিত প্রত্যাখ্যানের অপমান জ্বালা জুড়োবার জন্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য নারীর আসংগ-লিপ্সায় নিজের মনকে পংকিল রসাতলে ডুবে যেতে দিয়েছে—কখনও পায়নি এতটুকু শান্তি বা সান্ত্বনা—সে দহনের নিবৃত্তি হয়নি এক মুহূর্তের জন্যও—তারই সাক্ষাতে আজ অকস্মাৎ নিজেকে বড় দুর্বল, ভীরু মনে হতে লাগল।

কত কলাকৌশল দিয়ে চেয়েছে আয়ত্তে আনতে এই একদা গর্বিতা চির মহীয়সী মহাশ্বেতাকে! নিজেকে কত ভাবেই না হীন প্রতিপন্ন ক'রতে হয়েছে জনসাধারণের চক্ষে —তবু—তবু আশা ছাড়তে চায়নি মন। তবু ছুটে চলেছে উন্মাদের মত শুষ্ক বালুকাজর্জর ওই মরীচিকাময়ীর দিকে।

তার ঘৃণিত ব্যবহার যে ক্রমশই ঘৃণ্যতর কোরে তুলেছে তাকে সেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেও সুযোগ পেলেই ওই রহস্যময়ীর অনুসরণ কোরেছে অন্ধের মত। প্রতিদানে, অদৃষ্টে জুটেছে শুধু দুর্নাম, শুধু অবমাননা।

নিমেষহারা হয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষ। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে—

এত ভোর বেলাই যে এখানে—আমার বাড়ীতে আপনি? উপহাসসূচক ভংগী কোরতে গিয়েও পারে না।

ভূমি সংলগ্ন দৃষ্টিকে প্রশ্ন কর্তার মুখের 'পরে ভয়ে ভয়ে তুলে ধরে মহাশ্বেতা। না—লালসালুব্ধ দৃষ্টি ত নয়—বরং স্নেহে কোমল, নিতান্ত প্রিয়জনের মত সাহায্য ব্যাকুল,

থায় ভারাক্রান্ত করুণ চাউনি। রুক্ষতা ত নেইই, বরং অনুরাগে টলোমলো চক্ষু-যুগল!

এতক্ষণে থেমে আসে বুকের ভিতরের হাতুড়ির আঘাত কানের কাছের সেই রণভেরী আর শোনা যায় না। র-কম্পিত দেহলতা যেন কা'র ভরসায় সহজ ভংগীতে মাথা চু কোরে দাঁড়ায়!

মুখর দৃষ্টি মেলে ধরে অনিমেষের উৎসুক মুখের দিকে কিন্তু ওষ্ঠাগ্রে জোগায় না কোনও কথা; কোনও শব্দ!

বসুন, বসুন, দাঁড়ালেন কেন? ব্যস্ত বিব্রত হয়ে ত্যন্ত আপনজনের মত এগিয়ে আসতে গিয়ে সহসা সংযত য় থেমে যায় অনিমেষ।

তাই ত—এ যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্ত্রী—পরনারী। জীবন অন্তরের নিভৃতে সবার অলক্ষ্যে পরম আত্মীয় বলেও সমস্ত পৃথিবীর চোখে অনিমেষের সংগে এর ত নও সম্পর্কই নেই!

চিন্ময় কেমন আছে? কি করছে আজকাল? নেক দিন আমার সংগে তার দেখাই হয়নি।

অতিশয় সহজ সুরে বলে অনিমেষ।

তিনি অসুস্থ। মৃতের হিম-শীতল কণ্ঠস্বর!

কি অসুখ? আর আপনাকেও ত খুব সুস্থ মনে হ না।

—সর্বাংগে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় অনিমেষ। মহাশ্বেতার জোদৃপ্ত অপরূপ সৌন্দর্য যেন ভোরের আবছা আলোয় রজনীগন্ধার গুচ্ছকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

যতদূর সম্ভব নিজেকে সুসজ্জিত কোরে অভিসারিকার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে তার চির আকাংখিতা মানসী ই অনুগ্রহ লাভের আশায়। অনিমেষের বুঝতে একটুও লাগে না মহাশ্বেতার আসল উদ্দেশ্য কি?

আজ তার কৃপাকণিকার বিনিময়ে কতখানি মূল্য দিতে ত হয়ে এসেছে চিন্ময় চৌধুরীর পরিণীতা পত্নী তারই গ ইংগিত পায় অনিমেষ এই মানগর্বিতা রূপাম্বিতার তে আঁখির পানে চেয়ে চেয়ে।

নিজের অন্তঃস্থলের অতলে খুঁজে পায়-কী এক অজানা র চিরন্তন জবাব।

কামনায় উগ্র মন দিশেহারা হয়ে যার সংগ খুঁজে খুঁজে ছে সে ত এই সকালবেলার শুচিস্মিতা নয়—নয় এই ত আলোর প্রথমক্ষণের উপযাচিকা। এর আসন ষ্ঠিত হয়ে আছে আরও অনেক উঁচুতে ধরা-ছোঁওয়ার র শেষপ্রান্তে।

বুকের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস সবলে চেপে রেখে আশ্বাস ার মত কোরে বলে অনিমেষ—

আপনি না এলেও পারতেন। কথার মাঝে থেমে পরে কি যেন ভেবে নিয়ে বলে—

ভাল কোরে সেরে উঠলে চিন্ময়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার ব্যারাকপুরের অফিসে একজন এ্যাকাউন্টেন্ট দরকার—ওরই মত একজন লোকের সন্ধান করছিলাম আমি। ভালই হল, ও এখনও কোথাও কাজে লাগেনি।

যেন কোথাও কিছু ঘটেনি।

বহু দিনের সঞ্চিত অপমানের ভার, ঘৃণার বোঝা যেন নিতান্ত অবহেলা ভরে সরিয়ে দিল অনিমেষ। ধুলি-মলিন জঞ্জালটাকে উড়িয়ে দিয়ে যেন কুড়িয়ে নিল অতি সুলভ সোনার টুকরোগুলি! শুষ্ক জীবনের মাঝে নেমে এল করুণা-ধারা। এই মহার্ঘ দান দুই অঞ্জলি ভ'রে ত মহাশ্বেতাকেই নিতে হবে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজ-পত্র খুঁজে বার কোরে আনল একটা স্ফীতবক্ষ এন্‌ভেলাপ; তার ভিতরে আরও কি সব গোছা কোরে ভরে দিল ভিন্ন ড্রয়ার থেকে।

নতুন নোটের খস্‌খস্‌ শব্দ মধুময় সংগীতের মত মহাশ্বেতার কানে এসে বাজল।

এই নিন—খামটা ধরল এগিয়ে স্তম্ভিত মহাশ্বেতার চোখের সামনে।

চিন্ময়ের নিয়োগপত্রখানা আপনার মারফৎই দিয়ে দেওয়া ভালো।

একি, এ কি ক'রছেন আপনি?

কোমল যুক্তকরপল্লবে অনিমেষের খামশুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল চির-গর্বিত আত্মমর্যাদাময়ী নারী—

ক্ষমা করুন, এতদিন যে কি ভুল বুঝে এসেছি—শুধু নিজের মানটুকু বজায় রাখতে গিয়ে পথে বসেছি সবাই, অনিদ্রায় অনাহারে দিন কাটিয়েছি, শিশুদের মুখে দিতে পারিনি অন্ন, স্বামীর অসুখে পারিনি পথ্য যোগাতে শুধু ভেবেছি মাথা নোওয়াব না কারো কাছে—পারব না হাত পেতে দয়ার ভিক্ষা নিতে।

অশ্রু-ধারায় ভিজে যেতে লাগল অনিমেষের হাতে-ধরা নিয়োগ-পত্র। ব্যস্ত হয়ে কথার উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিল অনিমেষ। জোর কোরে মহাশ্বেতার কম্পিত দেহ ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

আশ্চর্য! এই নারীর শুচিস্পর্শে নিজেকেও যেন আর ঘৃণিত অপমানিত মনে হল না। জীবন বীণার তারে মধুর রাগিণী।

শয়তানের হৃদয়েও পাতা থাকে দেবতার আসন—রজনী শেষের সেই ছায়া-ছায়া রহস্যঘন পরিবেশে মহাশ্বেতা উপলব্ধি করল মর্মে মর্মে সার্থক হ'ল তার সুসজ্জিত সযত্ন অভিসার!!

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ **১৪২** (কানহাই ৪৭, বকট ৩৮ ; লোডার ৩৬ রাণে ৬ উইকেট) ও **১৩২** ালকট ৩৫ । লোডার ৫০ রাণে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ **২৭৯** (মে ৬৯, **কাউড্রে** ৬৮, শেফার্ড ওরেল ৬৯ রাণে ৭ উইকেট)

িডসের হেডিংলে মাঠের চতুর্থ টেষ্টে ইংলণ্ড এক স এবং ৫ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত ক'রে । সালের ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট সিরিজে রাবার করেছে। হেডিংলের অপেয়া নাম এত দিনে দূর এই মাঠটা ইংলণ্ডের পক্ষে মোটেই শুভ ছিল না। ঠটা কতকটা ছিল ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ১৩ নম্বর।

৯৫৭ সালের টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড ২-০ খেলায় ইণ্ডিজকে হারিয়ে রাবার পেয়েছে। মোট পাঁচটা র মধ্যে ইংলণ্ডের জয় ২, খেলা ড্র ২; ৫ম টেষ্ট এখনও বাকি। তবে ওভালের ৫ম টেষ্ট খেলার কোন আকর্ষণ নেই। ৫ম টেষ্টের ফলাফল ইংলণ্ডের আর মাথা ঘামাতে হবে না। আলোচ্য টেষ্ট খেলা নিয়ে ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে টেষ্ট র সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪টা। ফলাফল ইংলণ্ডের জয় ১৩, ইণ্ডিজের ১০, খেলা ড্র গেছে ১১টা। টেষ্ট জর ফলাফলে ইংলণ্ড এগিয়ে আছে। টেষ্ট সিরিজে পেয়েছে ইংলণ্ড ৪ বার, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৩ বার ; ৩ টে রিজ ড্র গেছে। যুদ্ধোত্তর কালে উভয় দেশের মধ্যে ষ্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০ সালের টেষ্ট সিরিজে পর পর দু'বার জয়ী হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের টেষ্ট সিরিজ ড্র যায়। ১৯৫৭ সালের টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড হৃত গৌরব ফিরে পেয়েছে। এর আগে ইংলণ্ড শেষ রাবার পেয়েছিল ১৯৩৯ সালে।

১৯৫৭ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলকে সরগরম করা হয়েছিল। কাগজে কলমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তিমত্তার পরিচয় ফলাও ক'রে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল কার্য্যতঃ অন্যরকম দাঁড়াল। অতিরিক্ত প্রচারের ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বেশী রকম ফেঁপে গিয়ে থাকতে পারে। ফলে তাদের এ ব্যর্থতা।

৪র্থ টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়। কিন্তু টসে জয়লাভের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪২ রাণে শেষ হয়। পিটার লোডার পর পর বলে তিনজনকে আউট ক'রে হ্যাট-ট্রিক করেন।

টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে হ্যাট-ট্রিক করার দৃষ্টান্ত মাত্র ১২টি আছে। ইংলণ্ডই করেছে অর্দ্ধেক। পিটারের আগে ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যাট-ট্রিক করেছিলেন টম গডার্ড, ১৯৩৮-৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গে। সুতরাং দীর্ঘ দিন পর ইংলণ্ড একটা দুর্লভ সম্মান অর্জ্জন করলো। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে ইংলণ্ডের রাণ ১১, তাদের কোন উইকেট খোয়া যায়নি।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডই খেললো। প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৭৯ রাণে। প্রথম দিকে ইংলণ্ড বেসামাল হয়েছিল। ৩টে উইকেট পড়ে মাত্র ৪২ রাণ। মে, কাউড্রে এবং

শেফার্ড ইংলণ্ডের ত্রাণকর্তা হিসাবে খেলেছিলেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওরেল ৬৯ রাণ দিয়ে ৭ জনকে আউট করেন। ইংলণ্ড ১৩৭ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে খেলার ২½ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৩২ রাণে শেষ হ'লে ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ৫ রাণে ৪র্থ টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় এবং টেষ্ট সিরিজ লাভ করে। পাঁচ দিনের খেলা ২½ দিনেই খতম হয়। তৃতীয় দিনের খেলায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এভার্টন উইকস টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৪০০০ রাণ পূর্ণ করেন এবং অপরদিকে ইংলণ্ডের গডফ্রে ইভান্স তাঁর ২০০ তম উইকেট লাভ করেন।

একমাইল অতিক্রমে বিশ্বরেকর্ড ঃ

বিখ্যাত হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামে ইংলণ্ডের ডেরিক ইবটসন দৌড় প্রতিযোগিতায় একমাইল দূরত্ব পথ ৩মিঃ ৫৭.২ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল অষ্ট্রেলিয়ার জন লাণ্ডির, সময় ৩মিঃ ৫৮.০ সেকেণ্ড। ১৯৫৪ সালের ফিনল্যাণ্ডে জন লাণ্ডি এই বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। এ পর্য্যন্ত পনের জন এক মাইল দূরত্ব পথ চার মিনিটের কম সময়ে অতিক্রম করেছেন। ইংলণ্ডের রোগার ব্যানিষ্টার ১৯৫৪ সালে এক মাইল দূরত্ব পথ ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ফলে চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দূরত্ব পথ অতিক্রম করার সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড তিনিই করেন।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

নিউইয়র্কের পোলো মাঠে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ফ্লয়েড প্যাটারসন তাঁর প্রতিদ্বন্দী টমি জ্যাকসনকে ১০ রাউণ্ডের লড়াইয়ে পরাভূত করেছেন। কথা ছিল, পনেরো রাউণ্ড পর্য্যন্ত লড়াই হবে; কিন্তু ১০ রাউণ্ডের লড়াইয়ে রেফারীর সিদ্ধান্তে প্যাটারসন জয়ী হ'ন। বিশ্ব হেভী ওয়েট বিভাগে এ পর্য্যন্ত যাঁরা বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন প্যাটারসন বয়সের দিক থেকে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এই লড়াইয়ে অগ্রিম টিকিট বিক্রী বাবদ ১২৫,০০০৯ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। প্যাটারসন ১৭৫,০০০ ডলার পাওনার করারে লড়েছিলেন।

ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণ মুষ্টিযুদ্ধের পেছনে যে পরিমাণ উল্লাস এবং অর্থ ব্যয় করে থাকেন তা দেখে আমাদের দেশের লোকের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার মত অবস্থা।

মুষ্টিযদ্ধের বীভৎসতা মানুষের কৃষ্টির ক্ষেত্রে দুষ্ট ব্রণের মতই পীড়াদায়ক। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি দুর্ব্বৃত্তের কবল থেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা হয়, তা হলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ঘুসির আঘাতে মুষ্টিযোদ্ধার মুখমণ্ডল যখন বিকৃত অবস্থায় রক্তবর্ষণ করে—সে বীভৎস দৃশ্য দর্শকদের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক ক'রে না—করতালি আর উল্লাসের ধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ে। উচ্চমূল্যের টিকিট কিনে মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শুভ নয়। নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রতি মানুষের প্রকাশ্যভাবে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন যে মানব সভ্যতার কৃষ্টিতে বাধে এবং তা আইন বিরুদ্ধ আচরণ হিসাবে সভ্যরাষ্ট্রে দণ্ডার্হ সেখানে কি যুক্তিতে মুষ্টিযুদ্ধের এই বীভৎস তা স্বীকার করা হয়? ইংলণ্ডের জনৈক পার্লামেণ্ট সদস্য মুষ্টি-যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। তাঁর আন্দোলন সমর্থন-যোগ্য।

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন ট্রফি ঃ

বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোনের প্রথম রাউণ্ডেই থাইল্যাণ্ড ৮-১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

দাত্তু ফাদকারের সাফল্য ঃ

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দাত্তু ফাদকার ইংলণ্ডের সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ প্রতিযোগিতায় আলোচ্য ক্রিকেট মরসুমে সর্ব্বপ্রথম এক হাজার রান এবং একশত উইকেট লাভের কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা এখনও হয়নি। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ওয়াড়ীর খেলা বাকি। এই খেলার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই খেলাটি ড্র হ'লে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানস্পোর্টিংয়ের সমান ৪২ পয়েণ্ট হবে। ওয়াড়ীর জয় হ'লে ইস্টবেঙ্গল লীগ পাবে। লীগের প্রথম খেলায় মহামেডানস্পোর্টিং দলকে হারিয়ে ওয়াড়ী অঘটন ঘটিয়েছিল।

লীগ তালিকায় উপরের তিনটী দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৮	৬	২	৪২
মহঃ স্পোর্টিং	২৫	১৮	৫	২	৪১
রাজস্থান	২৬	১৬	৮	২	৪০

৯।৮।৫৭

রূপসী না সজীব বোমা ? : দীনেন্দ্রকুমার রায়

বাঙলা কথা সাহিত্যে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তাঁর লেখা গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়েন নি, এমন লোক বাঙলা দেশে খুবই কম। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁর এ জাতীয় রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এক সুন্দরী মার্কিণ তরুণী নিজের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য কেমন করে এক নৃশংস হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তার সমস্ত চক্রান্ত সুচতুর গোয়েন্দা ব্লেকের চেষ্টায় কেমন করে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল তারই চমকপ্রদ কাহিনী এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনভঙ্গীর সরসতায় ও ভাষার সাবলীলতায় গ্রন্থখানি আগাগোড়া সুখপাঠ্য। রহস্যোপন্যাস সম্বন্ধে যাঁরা উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন না তাঁরা যে এ বইখানি পড়ে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ আকর্ষণীয়।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট : মূল্য—দুই টাকা]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

রক্তরাগ : দেবেশ দাশ

সাহিত্য জগতে উপন্যাসের স্থান কোথায়, তাতে কতটা থাকবে চরিত্রাঙ্কণ, কতটা হবে ঘটনা পুঞ্জের সমাবেশ সে বিষয়ে তার্কিকরা তর্ক করুন, আমরা ইতরে জনা। উত্তমা, দেবল, মিত্রা, উরায়ম সিং প্রভৃতিকে নিয়ে পথের পাঁচালী গাই, মাধুকরি ব্রত উদ্‌যাপন করি, বলি যুদ্ধের ও জীবনের রক্তরাগের মধ্যে হে বন্ধু বিদায়।

দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা উপন্যাসকার মহাকালের পটভূমিকাতেই তার কাহিনী লিখে যান। পটুয়া আর নটুয়া নিয়েই এই সংসার চলে। উপন্যাসের উপজীব্য উপকরণের মধ্যে সুষ্ঠু পটভূমিকা ও তার পরিবেশে ঘটনাগুলিকে ফুটিয়ে তুলে চরিত্র সজীব করে আঁকা—একটী বিশেষ প্রয়োজন। সেই দিক থেকে দেবেশবাবুর উপন্যাস শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা বিরাট পটভূমিকার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবতারণা। দেবেশবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি আছে, সাংস্কৃতিক চেতনা আছে; এবং বিশ্ব কবি কর্ত্তৃক তাঁর রম্য রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। সুধীজন সাধুবাদ করেছেন তাঁর কাব্যের। কিন্তু "রক্তরাগে" তিনি ভারতীয় সাহিত্যের যে একটা নূতন জানালা খুলে দিলেন সে বিষয়ে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই। এর জন্য তার সৃষ্টি ধর্ম্মী দৃষ্টি কোণ ও তাঁর মানসই দায়ী। পটভূমিকার আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মিলিটারি মেসে বিদায় উৎসব—সবাইকে যেতে হবে অজানার পথে, বেশীর ভাগই ফিরবেনা, এরা চলেছে মৃত্যুতীর্থে। তবু চালাও স্ফূর্ত্তি, জীবন দু দিনের বইত নয়—এর মধ্যে যে মানবতা, করুণতা বেদনা আছে তার আভাস লেখক কয়েক ছত্রেই দিয়েছেন। এই পটভূমিকার শেষ অঙ্ক-নাট্যের অবসান নয়! আর একদিনের নির্জ্জন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় দিল্লীর লাল কেল্লার রক্তরাগ। এই দুই রেখার মাঝখানে ইতিহাসের পতন অভ্যুদয় কত ভাঙ্গাগড়া হয়ে যায়, কত কিছু ঘটে যায়, সৈন্যদল সাম্রাজ্য মান সম্মান, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন—কত নাচ গান, কত মন দেওয়া নেওয়া।

এই বইটি সামরিক পটভূমিকায় লেখা বা স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী সম্পর্কিত এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের গল্প বলেই শুধু অভিনন্দন জানাব না, শাশ্বত মানব মনের চিরন্তনী আকুতি ও বেদনাও এতে পরিস্ফুট হয়েছে।

একটা কথা মনে হয় বলা উচিত। কোর্ট মার্শালের কাহিনীটা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজানা ও বিস্ময়কর ভাবে জটিল চরিত্র উদ্ঘাটন করেছে। তবু এই দৃশ্যকে গল্পে বেশী টানা হয়েছে বলে কোন কোন সমালোচক ইঙ্গিত করেছেন।

[প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ। ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—৪৲ টাকা]

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন মিছিল (কাব্যগ্রন্থ) : কুমারেশ ঘোষ

কবিতাগুলিতে বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গ ও বিষয় বস্তুর নতুনত্ব দেখা গেল। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন অধিকাংশ কবিতাই ইংরেজীতে অনূদিত ও বিদেশে বৈঠকে পঠিত। তেষট্টি কবিতাই সাগ্রহে পড়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেছে। এলোমেলোভাবে, ভাঙা গদ্য ছন্দে লেখা কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দানা বেঁধেছে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমান্ কুমারেশ ঘোষ ইতিপূর্ব্বেই কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, রস রচনায়ও ইনি সব্যসাচী। সুতরাং এঁর পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার হয় না। 'নতুন মিছিলে' আধুনিক বাস্তব ধর্ম্মী সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন দিকের চিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। জটিল প্রতীকিতা নেই, বাক্‌ভঙ্গিমায় ও শব্দপ্রয়োগে রসালো সতেজ লিখন-শৈলীর পরিচয় পেয়ে প্রীত হয়েছি। নিজের উপলব্ধি আর বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর মাধ্যমে আমাদের মানসিক ভোজে কবি যে সব আহার্য্য পরিবেশন করেছেন তা'তে শুধু রসনা-রুচিরই পরিতৃপ্তি নেই,

আছে রসানুভূতির পরিপূর্ণ আনন্দের সমারোহ। 'হুইশিল', 'মিছিল' 'তেনজিং', 'সবাই সুমোয়', 'গৃহস্থের মেয়ে', 'পেঁচা' 'শকুন' 'জুতো প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালের অসুস্থতার লক্ষণগুলি আলোচ্য গ্রন্থে শিল্পরূপ ধারণ করেছে, গদ্য ছন্দের ভেতর দিয়েও সার্থক কবিতা রচিত হয়েছে। পড়ে খুব খুসী হয়েছি, কাব্যামোদীগণ পড়ে তৃপ্তিলাভ করবেন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

[প্রকাশক: গ্রন্থগৃহ। ৪৫এ গড়পার রোড্, কলিকাতা—৯। দাম ২৲ টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গ্রাম ছায়াদি: সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়

লেখক সাহিত্য জগতে নবাগত। তবে কিছুটা সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে আছে বলে মনে হয়। তাঁর সদ্য প্রকাশিত চিত্র উপন্যাসটি হিংস্র মানুষ-অধ্যুষিত অত্যাচারী জমিদার শাসিত গ্রামের ভয়ংকর ঘটনার সংবর্তে ও 'নায়ক অরুণের কথার চটুলতায় চমকপ্রদ।

পুস্তকের নাম "গ্রাম ছায়াদি"। মলাট দেখলে মনে হবে তার নাম 'গ্রাম হায়াদি'। অবশ্য তার জন্য লেখকের কোন দোষ নেই—প্রচ্ছদ-শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যই দায়ী।

[প্রকাশক—বুক রিভ্যু। ১৯।১ হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৩.

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "দেহ ও দেহাতীত" (৩য় সং)—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পণ্ডিত মশাই" (১৪শ সং)—২৲, "শ্রীকান্ত" (৪র্থ—১৩শ সং)—৩৲, "ষোড়শী" (১০ম সং)—২৲
সব্যসাচী অনূদিত গ্রন্থ "টারজান দি গ্রেট"—১৸৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বলয়গ্রাস"—০·৫০, "মায়াকানন"—০·৫০, "চন্দ্রহারা"—০·৫০

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 76056—'নীলাচলে মহাপ্রভু' বাণীচিত্রের "জগন্নাথ জগদ্বন্ধু" ও "জ্ঞান বিমল সাধু"—গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N 80122—কণিকা ব্যানার্জীর "গোবিন্দ কবহ মিলে পিয়া মেরা" ও "সখারে মোরি নীগদ নসানী যে"—এ দুখানি ভজন সংগীত সুমধুর কণ্ঠস্বরের দরদী পরিবেশনে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

N 82749—কুমারী পূরবী দত্তের মধুর কণ্ঠে "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" ও "ঐ গোধূলি বঁধুর সিঁথিতে"—গান দু'খানি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কলম্বিয়া

GE 24811—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "শাওন এল ঐ" ও "রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্" গান দু'খানি সুরবৈচিত্রে প্রত্যেককে আকৃষ্ট করবে।

GE 30365—"বঁধু আজি কালি কই" ও "শ্যাম অভিসারে" 'নীলাচলে মহাপ্রভু' বাণীচিত্রের এই দু খানা গান কুমারী ছবি ব্যানার্জীর কণ্ঠে ভাব ভাষা ও পরিবেশনায় অনবদ্য হয়েছে।

GE 30361—প্রতিমা ব্যানার্জীর দরদী কণ্ঠে "কিরূপ হেরিনু" ও "মাধব বহুত মিনতি" এই ভক্তিমূলক গান দু খানা সত্যিই আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী : শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

অস্ত্র-প্রাপ্তি

আশ্বিন—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ভূমা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

;মাস্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

ভূমাই জানিবার বস্তু। ভূমার একার্থবোধক শব্দ ়ৎ, নিরতিশয় ও বহু। যাহা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠ ার নাই তাহাই ভূমা। "বৃহ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম টীও বৃহৎ বা মহৎ বাচক। অতএব ভূমা ও ব্রহ্ম এক ্কেই নির্দ্দেশ করে। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই ়তিতে ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে; ন্তু ভূমা শব্দটীতে ব্রহ্মের আনন্দঘন ভাবটীর উপরই ার।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা মহৎ তাহাই সুখ, অল্পে (ক্ষুদ্র, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে) সুখ নাই।

প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে হইলে বৃহত্তম বস্তুকে লাভ করা চাই, কারণ তদপেক্ষা অল্প বস্তু প্রাপ্তিতে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। সাধের বস্তু এখন একটা পাওয়া গেল, পরক্ষণেই অনুরূপ অপর একটী বা তদপেক্ষা অধিক পরিমিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা হয়। তাহা পাইলে আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে। এইরূপে জীবের প্রাপ্তির আশঙ্কা কিছুতেই নিঃশেষে মিটিতে চায় না—অধিক পাইবার ইচ্ছায় ক্রমাগত উদ্বেগ। অল্পে

তাই যথার্থ আনন্দ নাই। অনল্প বা সর্ব্বাধিক বস্তুটী লাভ হইলেই এই ইচ্ছা ও উদ্বেগের নিঃশেষ—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। সর্ব্বাধিক আনন্দময় বস্তুটী লাভ হইলে অপর সকল খণ্ড খণ্ড আনন্দের বস্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আনন্দময় অবস্থায় সমাহিত থাকায় কোন ক্লেশাদিরও বোধ থাকিতে পারে না।

দৃষ্টির প্রসারতা যত বৃদ্ধি পায়—বৃহত্ত্বের অনুভূতি হয়, ভূমার অনুভূতি তত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে এই বিশালত্বের অনুভূতি প্রায় অনুরূপ কাজ করে। বহির্জগতে মহাসমুদ্র বা দিগন্তপ্রসারী আকাশের প্রতি অভিনিবেশ হইলে মন যেন স্বতঃই প্রসারিত ও নির্ম্মল আনন্দে বিভোর হয়—আমাদের ক্ষুদ্রত্ব সাময়িকভাবে অপ্রসারিত হয়, বৃহত্ত্বে একীভূত হইতে চায়। অন্তর্জগতেও বৃহত্ত্বের অনুভূতি এইরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ আনিয়া দেয়। যখনই আমাদের অন্তরে দয়া বা জগতের ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্যাণ কামনা উপস্থিত হয় বা অপরে এইরূপ আচরণ লক্ষ্য করি, তখনই এইরূপ প্রসারতা ও আনন্দের ভাব উপলব্ধি হয়। এই প্রসারতার উৎকর্ষ সাধনই নিঃশ্রেয়স সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই মননশীল ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত বলিয়া অনুভব করেন এবং স্বাত্মানন্দ হইয়া ভূমা লাভ করেন—

"স বা এস এবং পশ্যন্, এবং মন্বানঃ, এবং বিজানন্, আত্মরতিঃ, আত্মক্রীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ, স স্বরাড় ভবতি—।"

ছাঃ ৭ম প্রঃ।২৫।২

এই প্রসারতার উৎকর্ষ সাধনে অন্তরায় কি? অন্তরায়—চিত্তের ক্ষুদ্রতা বা মালিন্য। এই মালিন্য কিরূপে দূরীভূত হয়? আহার শুদ্ধিকেই এই মালিন্য অপসারিত করিবার উপায় বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আহৃত বা সংগৃহীত হয় তাহাই আহার। শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় সমূহের শুদ্ধরূপে (রাগদ্বেষবিবর্জিত ভাবে) মনোমধ্যে যে গ্রহণ তাহাই চিত্তশুদ্ধি। এই আহার বা বিষয়জ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্বপ্রকাশ ভূমা নামক আত্মা মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় মননশীল ব্যক্তির চিদাকাশে প্রকটিত হয়। তখনই জীবরূপ পথিকের গন্তব্য স্থানে পৌছান হয়—ভূমার স্মৃতিধারা আর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভূমাস্বরূপের ধ্যান করিতে মননশীল ব্যক্তির চিত্তের এমনই একটী দৃঢ় সংস্কার আসিয়া যায় যে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার চিত্তে ভূমা বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে বিস্মৃতি উপস্থিত হয় না। আচার্য্যগণ এই ধ্রুবা স্মৃতিকেই পরাভক্তির মুখ্য হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই পর্য্যায়ের গোড়ার কথাটা আর একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—কথাটা আহারশুদ্ধি বা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিশিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের রাগদ্বেষবিযুক্ত হইয়া গ্রহণ। কিন্তু এই রাগদ্বেষ (অনুকূল বিষয়লাভে সুখবোধ ও প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্তিতে বিরক্তি) ও মানুষের সহজ সংস্কার (instinct)। এই সংস্কার অপনোদনের উপায় কি? শাস্ত্রে বহু উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমা-কেন্দ্রে অভিনিবেশ তন্মধ্যে সহজ ও প্রকৃষ্ট—'পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'। যাবতীয় বিষয়গুলি সেই কেন্দ্র হইতেই আমার নিকট পৌছিতেছে—এই ধারণা অভ্যাসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ঐ বিষয়গুলিতে ভূমা হইতে আর ভিন্নতা বোধ থাকে না, রাগদ্বেষাদি দ্বৈতভাব আপনিই অপসারিত হয়—অপর কোনও সাধনপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। গীতার ভগবদুক্তিতে এই কথাটাই ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যপদেশে বর্ণিত হইয়াছে—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতিনিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" ৮.১৪
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" ১০।৮
"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" ১০।১১

'যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করে সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। আমিই সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ—আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিতহইতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমানগণ ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া—জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি।

এই অনন্তচিত্তচিন্তন আপাতদৃষ্টিতে বড় সহজ মনে হয় না। তবে উপায় আছে, কেননা, ভালবাসার আনন্দ আছে এবং আনন্দলাভ সকলেই করিতে চায়। আত্মপ্রীতিও সকলের মধ্যেই প্রবল। যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া আত্মতুল্য বা আত্মীয় করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভোলা যায়। আনন্দঘন ভূমাই জীবাত্মার স্বরূপ। ভূমার প্রীতি এই আত্মপ্রীতিরই নির্মল রূপ। সত্যিকার আমিই ভূমা। তাই সত্যিকার আমিকে আঁকড়াইয়া ধরাই সহজ পথ। ঐ পথেরই সীমান্তে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতার নির্ব্বাপণ—ডিম্বকোষাবদ্ধ পাখীর অসীম মুক্ত আকাশে উড্ডয়ন। ইষ্টলব্ধ পথিক তখন প্রাণের প্রসাদে ও প্রসারতায় বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলেন :—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

'হে বিশ্ববাসিগণ, শোন, তোমরা অমৃতের পুত্র, সেই অমৃত ধামেই আছ। আমি সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষ অমৃত ভূমাকে জেনেছি।'

বাদল শেষে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এই সেই রোদ যার প্রচণ্ড প্রখর—
প্রতাপে হইনু গ্রীষ্মে নিতান্ত কাতর ?
সাতদিন অবিরল বর্ষণের পর
আজিকে উঠেছে রোদ বড় মিঠা বড়ই সুন্দর।
এই রোদ লাগাইতে গায়
ঘর হ'তে ছুটি পথে এবে সাধ যায়।
কোন জ্যোতিষ্কের শোকে জানিনা গগন
ছিল শোক বিলাপে মগন।
পাখীরা উঠিল ডাকি কুলায়ে কুলায়ে
উঁকি দিয়ে দেখে নিল মুখটি বাড়ায়ে
সত্যই উঠেছে রোদ। উঠিল কুহরি
পড়িল তাহার সাড়া সারা বন ভরি!
কুকুর বিড়াল
সহসা চাহিল খুলি চোখ দুটি লাল
সজোরে গাঝাড়া দিয়ে ছুটিল প্রাঙ্গণে
খাদ্য অন্বেষণে।
ফেরিওলা বন্দী ছিল আপন কুটীরে
চিবাইয়া শুষ্ক চানা-চিড়ে
সারা পথ করিয়া মুখর
উঠিল ক্ষুধিত কণ্ঠে তার কণ্ঠস্বর।
ভিখারী এ কয় দিনে তার বাঁধা বুলি
গিয়াছিল ভুলি'
বাহির হয়েছে নিয়ে তার ঝোলাঝুলি।
পশারী ছুটেছে পুন শিরে বহি পশরা তাহার
বুঝিলাম বসেছে বাজার।
ডাকের পিয়ন
ভিজা চিঠি নিয়ে পুন দিল দরশন।
ছাদ থেকে ভিজা ধুতি শাড়ী
ঝুলে বাড়ী বাড়ী।
সাতদিন একটানা রাত—
বেলা তিনটায় আজ হইল প্রভাত।
রোদটুকু বড় মিঠা লাগে—
মনে মোর যৌবনের সুখ স্মৃতি জাগে—
দিন ভোর প্রিয়া মোর অভিমানে
অশ্রুজলে ভাসি
হঠাৎ ফেলিল যেন হাসি।

নিষ্কৃতি

অমিয় চৌধুরী

সামনের ক্যালেক্টরীর ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

স্কুলের ছুটী হয়ে গেছে। পথে ক্লান্তমুখ কেরাণী-গুলোর ভিড় বেড়েছে। জ্বলজ্বলে আকাশটা সমস্ত দিন রোদে পুড়ে এখন কালো হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীতের বেলা। এরই মধ্যে পাঁজর-বেঁধা বাতাস কনকনিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। রক্ত হিম হয়ে আসছে। এক পাশে জড়ো-করা ছেঁড়া গরম চাদরটা জড়িয়ে নিলেন পালিতবাবু। ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ জ্বালা করছে। আর বসে থাকতে পারছেন না। তাছাড়া বসে থেকে আর লাভও বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। যা বিক্রি হবার তা আগেই হয়ে গেছে। এই অবেলায় আর কেউ তাঁর কাছে এসে খাতা পেনসিল কিনবে, সে ভরসাও নেই।

সেই সকাল দশটার সময় উবুউবু গোটাচার ভাত গিলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। রংচটা নীল স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে এ স্কুল ও স্কুল করে এসে শেষে জেলা-স্কুলের কমনরুমের লাগাও এক চিলতে বারান্দায় এসে বসেছেন স্যুটকেশটা সামনে খুলে রেখে। বেশী কিছু নেই ওতে। ডজন খানেক পেন্সিল, খান দশেক এক্সারসাইজ খাতা। ছোট ছোট দুটো দোয়াতে কিছু লাল কালো কালির বড়ি, আর গোটা কয়েক কলমের হ্যাণ্ডেল। আর তারই সঙ্গে আছে গোটা কয়েক নিজের হাতের আঁকা ছবি। হাল আমলের নয়। নেহাৎই মামুলি ঢংএ আঁকা। তাই বছর চারেক থেকে হাজার চেষ্টা করেও ওগুলো কারুকে বিক্রি করতে পারেন নি তিনি। অথচ আজ থেকে ছ'সাত বছর আগে তারই হাতের আঁকা ছবির চাহিদা ছিল কতখানি, সে কথা আজ নিছক কল্পনা বলে মনে হয় তাঁর। এই জেলাস্কুলেরই ড্রয়িং মাষ্টার ছিলেন তিনি। এখনও তাঁর হাতের আঁকা অনেক ছবি এই স্কুলের টীচার্স রুমে টানানো আছে।

অথচ রিটায়ার্ড করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবির মূল্যও যেন কমে গেছে আকাশ থেকে একেবারে পাতালে। তা যাক। নিজের জীবনেও তো ফাটল ধরেছে অনেক। ঘরে বাইরে মান সম্মান গেছে। পালিতবাবু সে কথা বোঝেন। মনে মনে হাসেন। খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্ত্তি মুখখানায় তীর্য্যক্ রেখা পড়েছে একটা। ফর্সা ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড়ের জায়গা অধিকার করেছে ছেঁড়া-আধ-ছেঁড়া আলপাকার কোট। আর ময়লা চিটচিটে জামা। মাঝে মাঝে আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব হিজিবিজি বকে যান। নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখদুটো অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। অজস্র প্রশ্নের ভিড় সেখানে। লোকে কপট সমবেদনা জানায়। বিদেশীর চোখে হঠাৎ পড়ে গেলে বলে, পাগল। ছোট ছোট ছেলেরা পেছনে লাগে। বলে, বুড়ো পাগলা।

বুড়ো পাগলার মাথা ঝিমঝিম করছে। সমস্ত দুপুর ধরে আজ নাস্তানাবুদ হয়ে গেছেন তিনি। এক এক করে পয়সা ক'টা গুণলেন। মাত্র সাড়ে বারো আনা। আবার সেই বিচিত্র হাসি বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিল তাঁর মুখেচোখে। এক টাকাও পুরোপুরি হল না। এ ক'টা পয়সায় আগামী কালকের বাজারটাও হবে না। অন্যান্য জিনিষ তো দূরের কথা। প্রতিদিনের মত আজও পয়সা ক'টা স্ত্রীর হাতে গিয়ে দেবেন। মুখ-ঝামটা দিয়ে খিঁচিয়ে উঠবে স্ত্রী। ছুঁড়ে ফেলে দেবে পয়সা ক'টা চৌকাঠের ওপারে। আর একটা তীব্র কাঁটা বুকে করে কাঁপতে

কবেন পালিতবাবু। কোনও কিছু বলবার থাকবে না। ানও কিছু করবারও থাকবে না। গোটা কয়েক শ্বাস-াধী নিঃশ্বাস চেপে ফেলা ছাড়া। আর মুখ ধোয়ার ছলে াখের জল গোপন করা ছাড়া। সে যাই হোক্, আর ানে বসে থাকা মানায় না। তাছাড়া পোড়া পেটটাও আর বাগ মানতে চাচ্ছে না কিছুতেই। বড্ড জ্বালাচ্ছে।

—কি বাবু, আপনি আজ এখোনো উঠা নেহি।

—কে, ও চমনরব, হ্যাঁ এইবার উঠবো।

উঠেই দাঁড়ালেন পালিতবাবু। লাল ধূলো-মাখা াম্বিসের জুতো জোড়া পরে নিলেন পায়ে। তারপর কেশটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন ছোট্ট একটা। তে তুলে নিলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, চমনরব,— গেলাস জল খাওয়াতে পারো?

—সে কি বাবু, এই ঠাণ্ডিমে আপ লোক জল বেন! আশ্চর্য্য চোখে চাইলো চমনরব পালিতবাবুর খর দিকে। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। একটা জ্বালা অনুভব করলো অন্তরে অন্তরে। বললো, ু, হামি একঠো বাত বলবো আপনাকে, কুছ্ মনে বেন না তো?

—না, না, মনে করবো কেন, বলো। নিঃসঙ্কোচে তে পারো তুমি। অনেক কষ্টে ফিস্ ফিস্ করে বলে লেন পালিতবাবু। কথা যেন আর বেরুতে চায় না দিয়ে।

চমনরব বললো,আপনার বড়া ভুখ্ লাগা—না বাবুজি?

ভুখ! চোখ তুলে তাকালেন পালিতবাবু। আশ্চর্য্য আর কোমল শোনাল চমনরবের কথাগুলো। সত্যিই লেগেছে পালিতবাবুর! কিন্তু এই স্কুলের বুড়ো ুস্থানী দারোয়ানটাকে তা বলবেন কি করে! একটা নো ঢোক গিলে বলে উঠলেন পালিতবাবু, না, না, লাগবে কেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে কি না, তাই!

—নেহি বাবু, হামি বহুত মালুম করতে পারছি, বলোগকা ভুখ্ লাগা। লেকিন্ বাবু, এ হাল হাপনার করে হোলো? সজল সমবেদনা গলে পড়লো চমনরবের ায়। বললো, আচ্ছা বাবু, আব্‌লোক যখন স্কুলমে করতা থা, তখন তো এমনি হাল হোয়নি! তোবে ান কেনো এমন হোলো?

পরিষ্কার বুঝতে পারলেন পালিতবাবু, তিনি ধরা পড়ে গেছেন চমনরবের কাছে। তার জন্যে আজ আর কোনও ক্ষোভ হল না তাঁর মনে। ধরা তিনি পড়বেনই, এ কথা অজানা ছিল না তাঁর কাছে কোনওদিন। অবশেষে ধরাও পড়লেন। শুধু চমনরবের কাছে নয়, বিশ্বসংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে। তবু বললেন, তুমি শুধু শুধু ভাবছো চমন, আমার ভুখ্ লাগেনি মোটেই।

—ফের হামার কাছে লুকোতে চেষ্টা করবেন না বাবুজি! বলে আরও মুহূর্ত্ত কয়েক দাঁড়িয়ে রইলো চমনরব। তারপর পালিতবাবুকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। কমনরুমের পেছন দিকে এক ফালি বারান্দা-ওয়ালা একটি ঘরে থাকে ও। রাত্রে স্কুল পাহারা দেয়। দিনে পিওনের কাজ করে। মাষ্টারদের বরাত খাটে। ঘরে ঢুকে বেরিয়ে এলো চমনরব। হাতে একটা পিতলের রেকাবীতে করে গোটা চারেক ছাতুর লাড্ডু আর এক গেলাস জল পালিতবাবুর সামনে এনে নামিয়ে দিল চমনরব। বললো, কাল হামারা লড়কা আয়া থা বাবু, এই মিঠাই লিয়ে এসেছিল। খাইয়ে দেখুনবাবু, বড়া আচ্ছা চীজ্ হায়।

অপ্রস্তুত বোধ করলেন পালিতবাবু। খানিকটা লজ্জা আর অপরাধ। বেচারার এক বেলাকার খাবার ওটা। অন্যায়ভাবে তাতে ভাগ বসালেন পালিতবাবু। তবু মুখে একটা কথা জোগাল না তাঁর। কয়েক পলক দেখে নিলেন চমনরবের মুখের দিকে। একটা স্মিত তৃপ্তি যেন ছড়িয়ে আছে তার সারা মুখে-চোখে। চোখ নামিয়ে নিলেন পালিতবাবু। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টিটা ক্রমশঃ। সত্যিই ক্ষুধার যন্ত্রণা যেন চোখের তারায় ফুটে বেরুতে চায়। আর অপেক্ষা করলেন না তিনি। রেকাবীটা তুলে নিলেন। কয়েক নিমেষে শেষ করে ফেললেন লাড্ডু ক'টা। জল খেলেন, তারপর ভিজে হাতটা মুছে নিলেন নিজের চাদরে। একটা তৃপ্তি আর মুক্তির নিঃশ্বাস যেন বেরিয়ে এলো তার বুক ফেটে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

পরক্ষণেই একটা দুঃসহ মোচড়ে কুঁচকে গেল যেন ফুস্‌ফুস্ দুটো। আর থাকতে পারলেন না। মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন সেখান থেকে। আর বিস্মিত চমনরব চেয়ে রইলো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে নিমেষ কয়েক।

অবাক হবারই কথা। আজকাল তাঁকে দেখে সবাই অবাক্ হয়ে যায়। অথচ আজ থেকে কয়েক বছর আগে পালিতবাবুর এই অবস্থা কল্পনা করেনি কেউ। হাসি-খুশী মানুষটি। দশটার সময় স্কুলে আসতেন। ফিটফাট জামা পরে। আর সব সময়ই তাঁর হাতে একটি ছোট্ট খাতা। আর একটা হার্ড পেন্সিল। চমনরব বলেছিল একদিন—বাবু, হামাব একঠো ছবি আঁকিয়ে দেন না বাবুজি।

তার উত্তরে খানিক হেসেছিলেন পালিতবাবু। অদ্ভুত প্রশান্তিভরা হাসি। তারপর বলেছিলেন, আচ্ছা তুমি যে কোনও একটা পোজ নিয়ে বসে থাকো, আমি এঁকে দিচ্ছি।

সেদিনকার আঁকা ছবিটা আজও আছে চমনরবের কাছে। ভাল করে বাক্সে পুরে সযত্নে রেখে দিয়েছে। খালি কাগজটা একটু পুরোন হয়ে যাওয়ার দরুণ লাল হয়ে গেছে, এই যা। আরও মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলো চমনরব। পরে জলের গেলাস আর রেকাবীটা হাতে করে চোলে গেল।

ততক্ষণে পথে এসে পড়েছেন পালিতবাবু। অন্যান্য দিনকার চেয়ে আজ আরও একটু দেরী হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ধূসরতা মুছে দানা-বাধা কালো জমেছে বুক চেপে—পথে-ঘাটে আনাচে-কানাচে। ওপাশকার অশোক গাছগুলোর পাতাগুলোয় শির-শিরে হিমেল হাওয়ায় কাঁপন লেগেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা। আর তারও ওপাশে অন্ধকারটা কাঁদছে ডুকরে ডুকরে।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন পালিতবাবু। নিতান্ত নিরুপায় মনের কাছে কেমন যেন ম্লান হয়ে এলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর ছোট বাচ্চাটার অসুখ। আজ চারদিন থেকে বিছানায় পড়ে আছে। ওষুধ নেই। ওষুধ নেই নয়, ওষুধ কিনবার মত পয়সা নেই। পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন পালিতবাবু। মাত্র সাড়ে [illegible] আনা পয়সা। সমস্ত দিনের রোজগার। বেশ [illegible]ছ জীবনটা, বেশ! আবার সেই বিচিত্র করুণ হাসি। আর কান্না। কোনও তফাৎ নেই।

[illegible]ঠাৎ বাড়ীর কাছে গিয়ে আবার ধাক্কা খেলেন তিনি। [illegible]কার স্তম্ভিত অন্ধকারটা যেন কেঁপে উঠলো একবার গলা ফাটানো চীৎকারে। কেঁপে উঠলেন পালিতবাবু থরথর্ করে! ঝগড়া লাগিয়েছে ওরা। পালিতবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে শাশ্বতী।

শাশ্বতী বলছে, যাও যাও—তোমরা কত ভাল বাপ-মা জানা আছে আমার। পেটের খাবার দিতে পারে না, পরণে কাপড় দিতে পারে না, সে আবার বাবা।

মায়া বলছে, চুপ কর্ মা—তোর দুটি পায়ে পড়ছি চুপ কর্। এতবড় হলি বাপের অবস্থাটা একটু বুঝতে শিখলি না! নিজের ছেলে মেয়েকে কোন্ বাবা আর সুখে রাখতে চায় না বল্। এই বুড়ো হাড়েও কত কষ্ট করে রোজগার করছে! আর ক'টাকাই বা পেনসেন্ পায়।

—যাও, যাও, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না।

—শাশ্বতী! বৈশাখী রুক্ষতা প্রকাশ পায় মায়ার কথায়।

—হুঁঃ! আবার চোখ রাঙ্গাতে লজ্জা করে না তোমার মা। ভারী আমায় দুটো ভাত দাও, তাও তো কোনও দিন ভাল একটু তরকারি থাকে না।

—শাশ্বতী, ছি মা, তোর বাবার কানে গেলে কি মনে করবে বল্ তো! আবার নরম হয়ে আসে মায়া। পালিতবাবু বাইরে থেকেও বেশ বুঝতে পারছেন, একটি অবদমিত কান্নার টুকরো পথ খুঁজছে মায়ার কণ্ঠনালীর পথে।

তবু শাশ্বতী বলছে, শুনতে পেলে তো ভারি বয়েই গেল আমার। কিছু বলতে পারে আমাকে, সে মুখ রেখেছে! হুঃ! যত সব!

—ছি, ছি, শাশ্বতী কথাগুলো বলতে তোর মুখে আটকায় না?

—আটকাবে কেন, এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি সব। আর সহ্য করবো না, এই বলে রাখলাম তোমাকে। তোমরা খেতে না দাও, আমার বিকাশদা আছে।

—বিকাশদা! ওই লম্পট ছেলেটা! ও, সেই বুঝি তোমাকে এইসব কথা বলতে শিখিয়েছে!

—না, সে শিখোবে কেন, বড় হয়েছি, যা সত্যি তাই বলছি।

এবার সত্যি সত্যিই আগুন চড়ে যায় মায়ার মাথায়। ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে অসম্ভব রকম, যা সত্যি তাই যদি বলছিস্ তবে কোন্ মুখে বাবার টাকার ভাত খাচ্ছিস্, লজ্জা করে না তোর!

—কি ! আমার খাবার খোঁটা দিলে তুমি ! এই ও তোমার ভাত। তোমাদের ভাত না খেলেও আমার বে। বোমার মত ফেটে পড়লো শাশ্বতী। বাইরে ড়িয়ে থেকেও বুঝতে পারলেন পালিতবাবু, ভাতের লাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শাশ্বতী। দুম্‌দাম্ করে পা ফেলে ঘরে চলে গেল। ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ফেটে পড়ে গেল লাটা। কিন্তু তার থেকেও বুঝি আরও চিড় খেয়ে ল পালিতবাবুর কোমল হৃৎপিণ্ডটা। একটা অপ্রতি-ধ কান্নায় গলা বুঁজে এল। সম্মুখের সব কিছু ঝাপসা য় এল চোখের জলে। ঠিকই বলেছে শাশ্বতী। পিতার নও কর্ত্তব্যই তো রাখতে পারছেন না তিনি আজ। নে এলো তার ছোট ছেলেটা কাশছে অবিরত। তরাচ্ছে গোঁ গোঁ করে। বুকে সর্দি বসেছে খুব। ক্তার ডাকতে পারেনি। ও পাড়ার বিশু কোবরেজ থে বলে গেছে, ডবল নিউমোনিয়া। ভাল ওষুধ চায়। রধ্বজ দিয়েছিল কোবরেজ। ওতে কিছু হয়নি। র হবে বলে আশাও করেন নি পালিতবাবু। ঘরটা ড সেঁতা, সব সময় ভিজে ভিজে। কম ভাড়ায় এর য়ে আর ভাল বাড়ী পাওয়া যাবে না ; তা তিনি জানেন। র এও জানেন, ওই ছেঁড়া কাপাটা দিয়ে বাচ্চাটার শীতও টে না একেবারেই।

শীত তাঁর নিজেরও আর আটকাচ্ছে না কিছুতেই। শিরভেজা হিমেল হাওয়া ছুটে আসছে হা হা করে। ; কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যাচ্ছে । কোনও রকমে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন ন ছোট্ট চাতালটার ওপর। হাতের সুটকেশটা মিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠলো মায়া, বলি ক্ষণে বাবুর আসবার সময় হল ! আজকে আর না ই পারতে !

তবু কোনও কথা বললেন না পালিতবাবু। লণ্ঠনের আলোটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন বার মত। আর বলে যায় মায়া, নিজে তো সারা টা বাইরে বাইরে কাটায়, আর তুই হতচ্ছাড়ী মরগে য়। বলি ছেলেটার অসুখটা যে আরো বেড়েছে সেদিকে াল আছে ?

—তা আমি কি করতে পারি বলো ! স্বগতোক্তির মত শোনাল পালিতবাবুর কথাগুলো। আর্দ্র মেশানো স্বর।

তাই শুনে আরো চড়ে গেল মায়ার গলা, আহা মিনসের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বাপ হতে পেরেছো, আর কি করতে হয় তা জানো না ? ওদিকে মেয়েটা যে দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে সেদিকে নজর যায় না তোমার ? এত পই পই করে তখন বলে দিলাম ছেলেটার ওষুধ এনো, তা বুঝি কথাটা বড্ড তেত লাগে না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওষুধ আনতে হবে ! বিব্রত পালিতবাবু কেমন যেন আঁৎকে ওঠেন এবার।

মায়া বলে, আনতে হবে, তা আনবে কখন্, ছেলেটা মলে পর ?

—ছি ছি, ও কথা বলো না মায়া ! ওই আমার একমাত্র ছেলে ! শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান তিনি। বুক ফেটে যায় যন্ত্রণায়।

—হ্যাঁ, একমাত্র ছেলে—ছেলে পিলেকে কত মানুষ করছো দেখতেই পাচ্ছি। ঐ একটা মেয়ে, অত বড় হল এখনো বিয়ে দেবার নাম নেই। সব্বনাশীর জন্যে আমার পর্য্যন্ত ঘরে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।

আবার চুপ করে গেলেন পালিতবাবু কিছুক্ষণের জন্য। বোঝেন তিনি সবই। কিন্তু পথ কই ? আঁকড়ে ধরবার মত কোনও কিছুই তো অবশিষ্ট নেই আজ ! আকণ্ঠ কান্নায় শুধু অশ্রুমোচন আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া। নিজেকে সামলে আস্তে আস্তে বললেন, বড় দুঃখেই মেয়েটার আজ কথা ফুটেছে মায়া, কিন্তু আমি, আমি কি করতে পারি বলে দিতে পারো মায়া ? কান্না-জড়ানো গলার আওয়াজে বুঝি চমকে উঠলো বুক-চাপা অন্ধকারটা।

চমকে উঠলো মায়ার বুক। হারিকেনের কাঁচে কালি জমেছে অনেক। তার চেয়েও কালি জমেছে মায়ার মনে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে তাই রাগ ঝরে তার কথায়। থাকতে পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে, তাই ! নরম হয়ে এলো মায়া। বললো, এবার থামো তুমি, মেয়েটার কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু ওষুধ না হলে যে ছেলেটা বাঁচবে না আর।

দাঁত চেপে কান্না চাপতে চেষ্টা করলেন পালিতবাবু।

শিহরিত গলায় বললেন, আচ্ছা ওষুধ এনে দিচ্ছি, একটা শিশি দাও।

শিশি হাতে করে পথে বেরিয়েই আবার সেই অন্ধকারে। অন্ধকারে হোঁচট খেলেন অনেকবার। রাজপথে অবশ্য আলো জ্বলেছে অনেক। রেঁস্তোরায় ভিড় জমেছে। রাস্তার মেথরগুলো নীচু পটিতে আসর জমিয়েছে। পাখোয়াজ বাজিয়ে গান ধরেছে। বাতাসে কেঁপে কেঁপে আসছে তার শব্দ। বেশ আছে ওরা। স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন পালিতবাবু, তাঁর এই বিকৃত জীবনের থেকে ওদের জীবন অনেক ভালো। অন্ততঃ মান সম্মানের কচকচি নেই।

রাজপথে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবলেন তিনি। একবার হাতের শিশিটার দিকে চাইলেন। আর একবার সাহা ডিস্‌পেনসারীর দিকে। বড় বড় বিজ্ঞাপন আঁটা রয়েছে দোকানের দেয়ালে। দামী দামী ওষুধ। কিন্তু দাম দেবেন কি করে তিনি। জানেন তিনি, অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে মায়া। ওষুধ নিয়ে যাবেন পালিতবাবু। সেই ওষুধ খাইয়ে দেবে মায়া বাচ্চাটাকে, তিন দিন থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বাচ্চাটা বিছানার সাথে। বেচারার চোখ দুটো তলিয়ে গেছে ভিতর দিয়ে। রা বসে গেছে। সেই প্রায় মৃত বাচ্চাটা আবার চোখ মেলে চাইবে। হাসবে ফোঁকলা ফোঁকলা দাঁত বের করে। রাত্রে কান্নার চোটে ঘুমুতে দেবে না। সেই অপেক্ষায় অপেক্ষা করছে মায়া।

হ্যাঁ অপেক্ষাই করছে মায়া। উঠোন থেকে ঘরে ঢুকে লণ্ঠনের পলতেটা একটু উস্‌কে দিল। শাশ্বতী রাগ করে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। তা যাক্—আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবে রাগটা একটু পড়লে পর। বড় অবুঝ মেয়েটা। অকারণে রাগ করে, আর মায়ার কাছে কথা শোনে। রক্তে রক্তে একটা অনুশোচনা অনুভব করলো মায়া। মেয়েটাকে খাবার খোঁটা না দিলেই ভাল হত। কান্না পেল মায়ার। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এসে বসে পড়লো ছেলেটার মাথার কাছে। গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলো। উঃ! জ্বরে গা-টা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যেন। কাতরে কাতরে উঠছে। কাঁপছে শীতে ঠকঠক্ করে। আস্তে আস্তে কাঁথাটা ভাল করে জড়িয়ে দিল মায়া ছেলেটার গায়ে। তারপর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। আর একটু একটু করে কালি জমতে শুরু করে দিল তার চোখের কোলে। ঘুম নেই। গত চার রাত্রি থেকে এক ফোঁটা ঘুম আসেনি তার চোখের পাতায়। চোখ দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছে! মাথা ঝিমঝিম করছে।

কতক্ষণ কেটেছিল জানে না মায়া। এক সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ পেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নিঃসীম ব্যাকুলতা ঝরে পড়লো তার কণ্ঠস্বরে, ওষুধ এনেছো।

চুপ করে থাকলেন পালিতবাবু। চোখের কোণে জল দাঁড়িয়ে গেল তাঁর। অন্ধকারে তা দেখা গেল না। পরক্ষণেই একটা জান্তব বিকৃত রুক্ষতায় পাথর হয়ে এলো। অন্ধকারে সেটাও চোখে পড়লো না মায়ার। আস্তে আস্তে শিশিটা এগিয়ে দিলেন তিনি মায়ার দিকে। শুকনো গলায় বললেন, এই নাও তোমার ওষুধ।

—এনেছো, দাও, দাও, বাছা আমার চার দিন থেকে চোখ খোলে নি! শিশিটা একরকম পালিতবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল মায়া ঘরের ভেতরে। অদ্ভুত আকুলতায়। এখান থেকেই শুনতে পেলেন পালিতবাবু, ছিপি খোলার শব্দ হল একটা।

আর একটা তীব্র ঘূর্ণী হাওয়ায় যেন ছিটকে পড়লেন পালিতবাবু। অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে গেল বুকের ভেতর। আবার সেই আগের মত বিচিত্র কান্নার হাসি। ও ওষুধ খেয়ে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ছেলেটা। আর কোনও দিন চোখ মেলে চাইবে না। যন্ত্রণার চোটে ছিন্নপক্ষ পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করবে না বিছানায় পড়ে পড়ে। আর পালিতবাবুও ছেলেটার কষ্ট দেখার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন চিরদিনের জন্য। ওষুধ নয়। ওটা বিষগোলা জল। মায়া তা জানে না। বোকা ছেলেটাও না।

বনমহোৎসব

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

বনমহোৎসব উপলক্ষে আমাদের বৃক্ষের, তথা উদ্ভিদের উপকারিতার কথা মনে পড়ে। ক্ষুধার আহার্য্য ও রোগের ঔষধ প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ হইতেই পাওয়া যায়। আমাদের পরিচ্ছদ বল্কল না হইলেও সে যে তাহার সমগোত্রের, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি কয়লা, তাহা উদ্ভিদেরই রূপান্তর। উদ্ভিদ আমাদের আশ্রয় দেয়। দূষিত বাতাস পরিষ্কার করিয়া ও তাহাতে আমাদের অপরিহার্য্য—অক্সিজেন সরবরাহ করিয়া আমাদের জীবন ধারণের সহায়তা করে। ভূমিসংস্করণ, বৃষ্টি আকর্ষণ, ভূমির নীচে জল সংরক্ষণ করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সুদূর-প্রসারী উপকারী কার্য্যেও উদ্ভিদের দান অপর্য্যাপ্ত। এই সব কারণে বৃক্ষরোপণ সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর।

পূর্ব্বে বৃক্ষরোপণ আমাদের কাছে একটী ধর্মীয় আচরণ বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্ত্তমানে আমরা জৈবিক মঙ্গলের দিক হইতে বিচার করিয়া বৃক্ষরোপণকে অভিনন্দিত করি। প্রাচীন যুগের বৃক্ষবন্দনা তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষরোপণকে ধর্ম্ম হিসাবে স্বীকার করিতে হইলে তাহার সহিত ঐহিক সংযোগ ব্যতীত আত্মিক সংযোগের কথা আসে।

যে বৈদিক ঋষিদের সহিত আমরা আমাদের সংযোগের কথা বলিয়া গৌরব অনুভব করি তাঁহারাও বৃক্ষবন্দনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। জানা যায় যে বৃক্ষপূজা দ্রাবিড় সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু এই বৃক্ষপূজাকে অনার্য্যীয় কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। বৈদিক ঋষিরাও যেমন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ক্রমবিবর্ত্তনের দিক হইতে বিচার করিলে উদ্ভিদকেও সম্পূর্ণ অনাত্মীয় বলা চলে না। উদ্ভিদ হইতে তাহার উদ্ভব একথা স্বীকার করিতে বর্ত্তমানের মননশীল মানুষ দ্বিধা করিতে পারে, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে জড় জগতের পর উদ্ভিদ জগৎ ও উদ্ভিদ জগতের পরে প্রাণী জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। উদ্ভিদদেহ কার্ব্বণ প্রভৃতি যে সব উপাদান দ্বারা সংগঠিত, মনুষ্যদেহেও সেই সব উপাদান রহিয়াছে। বৃক্ষের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া যে প্রাণধারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থিত শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবহমান। বৃক্ষের অন্তঃসংজ্ঞাই মানবের চিন্তাশীলতার অগ্রবর্ত্তী দূত। সুতরাং উদ্ভিদকে আমাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার না করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। বস্তুতঃ বৃক্ষকে অনেক সময় যোগমগ্ন তপস্বী বলিয়া মনে হয়। নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে জীবকুল যখন পীড়া অনুভব করে তখন বৃক্ষ সমাহিতভাবে তাহাকে বরণ করিয়া লয় ও সূর্য্যকরদগ্ধ জীবকে শীতল ছায়ার আশ্রয় দেয়। বর্ষার অজস্র জলধারা যখন পৃথিবীর উপর নামিয়া আসে আমরা মানুষ তাহাকে এড়াইবার জন্য ঘর বাড়ী, ছাতি, বর্ষাতি প্রভৃতির আশ্রয় লই। কিন্তু দেখি বৃক্ষ তাহার শাখা প্রশাখা পত্র প্রভৃতির দ্বারা সাগ্রহে জলধারাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের সহিত উৎসবে মত্ত হয়। হিম-শীতল বায়ুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা যখন নানা উপায় উদ্ভাবন করি, তখন দেখি বৃক্ষ অবিচলিত—শৈত্যের সংস্পর্শে তাহার কোনও চাঞ্চল্য নাই। আবার বসন্তের আগমনে সে নবকিশলয় ও পুষ্পসম্ভার লইয়া তাহার অভ্যর্থনায় উল্লসিত। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছেদের নানারূপ নিগড় তৈয়ারী করিতে মানুষ ব্যস্ত। বৃক্ষ সকল ঋতুতেই বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই যে একাত্মতা—এই ত যোগ। বৃক্ষ যেন সামান্য দুই বিঘার পরিবর্ত্তে বিশ্বনিখিল পাইয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় বৃক্ষের উদ্ভব এক মহান্ তাৎপর্য্যের সূচনা করে। জড়ের মধ্যে শ্যামল নিশান লইয়া বৃক্ষের আগমন—জড়ের উপর প্রাণের বিজয় জ্ঞাপন করে। সূর্য্যের অগ্নিগর্ভ হইতে যেদিন পৃথিবী সৃষ্ট হইল সেদিন হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীও ছিল একটী ভীষণ অগ্নিময় রাজ্য। কিন্তু সেই প্রচণ্ড রুদ্র রাজ্যের মধ্যে যেদিন উদ্ভিদ তাহার শ্যামলিমা লইয়া সামান্য একটু স্থান লাভ করিল সেইদিন সূচনা হইল, জড়ের উপর প্রাণের আধিপত্য, রণহুঙ্কারের মধ্যে শান্তির মৃদু বাণী। ধীরে ধীরে প্রাণের সেই মৃদু ভীত স্পন্দন রুদ্ররাজ্যের মধ্যে কোমলতা ও শান্তির আভাষ দিল। অগ্নিময় পৃথিবী শীতল বসুন্ধরায় পরিণত হইয়া প্রাণী জগতের আবাসযোগ্য হইল—ভীষণতাকে আবৃত করিল কোমল সুষমা, এ যেন ক্রোধের উপর অক্রোধের, হিংসার উপর প্রেমের জয়। তাই দেখি বৃক্ষের আবির্ভাব লইয়া আসিল—একটী পরম আশ্বাসের বাণী—সে বাণী হইল কঠোরতার উপর কোমলতার আধিপত্য, কদর্য্যতার উপর সুন্দরের বিজয়, জড়শক্তির উপর আত্মার জয়।

এই যে ক্রমবিবর্ত্তন—যাহার মধ্যে আমরা দেখি জড়ের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব, প্রাণের মধ্যে মনের উদ্ভব, তাহা আরও সূচনা করে যে মনই শেষ নয়, এর উপরে আরও মহান সত্য আছে। মানবের সার্থকতা সেই মহান সত্যের উপলব্ধি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার যোগ ও দর্শনে সেই মহত্তর সত্যের কথা বলিয়াছেন—আশ্বাস দিয়াছেন অতিমানবের নিশ্চিত আবির্ভাব। মানব জীবনের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্যের পরিণতি আনন্দঘন পরম পুরুষে—সচ্চিদানন্দে।

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছেন যে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে—শুধু এই জন্যই যে জড়ের মধ্যে তাহাদের বীজ নিহিত ছিল। অসতো ন সদ্ভাবঃ—শূন্য হইতে প্রাণ ও মনের উদ্ভব হয় নাই—ইহা আকস্মিক নহে। সৃষ্টির দুইটী পর্ব্ব আছে। একটি অবরোহণ পর্ব্ব—যাহাতে পরমপুরুষ বা সচ্চিদানন্দ তাঁহার অনন্তশক্তিকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করিয়া নিজেকে

জড়ে পরিণত করিলেন। অন্যটী আরোহণ পর্ব্ব—যাহার ফলে ধীরে ধীরে আবার জড়ের মধ্য হইতে সচ্চিদানন্দের নিহিত শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। আরোহণ পর্ব্বের শেষ অধ্যায়েও সচ্চিদানন্দের শক্তি নিহিত রহিল যাহার জন্যই আরোহণ পর্ব্ব সম্ভব হইয়াছে। ক্রমবিবর্ত্তনের এই সত্যই আমাদের পরম আশ্বাসের বাণী। আমাদের মধ্যেও সত্যের বীজ নিহিত, আমরাও ইচ্ছা করিলে পরম সত্যে উপনীত হইতে পারি।

মানবের পরিণতি সম্বন্ধে আজ সারা বিশ্বে মহা আতঙ্ক। সকলেরই ভয় যে বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে মানবের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ভয়ের মূল কারণ আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত পরমসত্যে বিশ্বাস করিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তাহা হইলে আতঙ্কের কারণ নাই। এই হিংসা অশান্তি বীভৎসতার মধ্যেই সত্য শিব ও সুন্দরের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—বৈসম্য যত বেশী, সাম্য ও তত বিশাল হইবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—

"রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।"

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া—ভগবানের দূতরূপে আমাদের সেই আশ্বাসের বাণী শ্রবণ করান ও পরমসত্যের পথে উদ্বোধিত করেন।

তাই মনে হয় বৃক্ষপূজাকে শুধু একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান মনে না করিয়া ধর্মের অঙ্গ মনে করায় অযৌক্তিকতা নাই। বৃক্ষ শুধু গ্রীষ্ম-পীড়িত জীবকে ছায়া দিয়া ক্ষান্ত হয় না, আধিপীড়িত মানবকে শান্তির আশ্বাস দেয়। তা শুধু জড় নয়, আত্মারও সে প্রতীক্। তাই মনে হয় বৃক্ষ বন্দনা শুধু আচার নহে, তাহা মৃত্যুঞ্জয়ী চিরকিশোর, আনন্দঘন পুরুষোত্তমেরই আবাহন। বৃক্ষ রোপণ শান্তির বীজ রোপণ সূচনা করে।

"য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"

রবীন্দ্রোত্তর কবি-ব্যক্তিত্ব ও যতীন্দ্রনাথ

বিভূতি রায়

প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। একেই বলা হয় স্বকীয়তা। যে কোন মহৎ শিল্পের মধ্যে এই ছাপ পরিস্ফুট। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যেমন প্রশংসনীয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন নিন্দনীয়ও হ'তে পারে। কিন্তু অন্তরের আসল সত্তাটির পরিচয় এর মাঝেই ধরা পড়ে। সমালোচকেরা এরই নাম দিয়েছেন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের কষ্টিপাথর দিয়েই সাহিত্যস্রষ্টার অন্তরের মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। যে সব সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যকারের ব্যক্তিত্ব ফোটেনি সে সাহিত্য যতই সুখপাঠ্য হোক্ বা যতই জনপ্রিয় হোক্ না কেন, সে সাহিত্য নিঃসন্দেহে এবং বিনা ব্যতিক্রমে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিংবা বিশেষ কোন মতবাদকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকলেও সেই স্রষ্টাকে মানুষ নিশ্চয়ই ভুলে যাবে। যে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে নি বা পরের মনযোগাতে নিজেকে ছাঁটাই করে প্রকাশ করেছে—আগামী কালের বুকে তার কোন দামই থাকে না। তাই তুমি যা ভেবেছ, তুমি যা বুঝেছ তাকে তুমি নিজের মত করে বল। লেখকদের এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে Ruskin বলেছেন: তোমাকে এমন কথা বলতে হবে যে কথা কেউ বলে নি।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশে বাংলার সাহিত্য গগন যেদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের পর দীপ্তিতে দেদীপ্যমান—সেদিন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন একটি গুরুতর সমস্যার মত উপস্থিত হয়েছিল। যুগাতিশায়ী রবীন্দ্র-প্রতিভার সুদূর-সঞ্চারী কল্পনাশক্তিকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বা রবীন্দ্রোত্তর কিছু সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব ছিল বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের অতলস্পর্শী ঘন গম্ভীর দর্শনকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রাতীত মননও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ কবির দল বেপরোয়া ভাবে কবির প্রশস্তি রচনায় মনোনিবেশ করলেন। আর এক-দল, কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রবীন্দ্রাতিশায়ী হ'য়ে উঠতে চাইলেন। কিন্তু অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে এ কথা খাটলেও সবার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। একদল কবি তাঁদের প্রতিভাকে ব্যক্তিত্বের অঙ্গরাগে চিহ্নিত করতে চাইলেন। গ্রাম-বাঙলার কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় 'বকুলের ঘ্রাণমুগ্ধ' পল্লীবালকের মত গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে তাঁর কাব্যে এক নবতর রাস্তার নিশানা দিতে চাইলেন। পরম ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দেশপ্রেম ও ছন্দ সরস্বতীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ নিয়ে বাংলার কাব্য

জগতে এক আশ্চর্য মাধুর্যের বন্যা বইয়ে দিলেন। খুব উৎকৃষ্ট কাব্য উপহার দিয়ে যেতে না পারলেও তিনি তাঁর কবিতায় যে ছন্দের কারু-শিল্প নির্মাণ করে গেলেন তাই তাঁকে অমর করে রাখবে। কবি করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা চিনেছি তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল সুরেলা কণ্ঠ-স্বরের মধ্য দিয়ে। কবি কালিদাসকে যদি বলা যায় পল্লী বাউল—কবি করুণানিধান তা'হলে পল্লী বাংলার বৈরাগী কবি। উদার নির্লিপ্ত ছন্দে অপূর্ব তাঁর পল্লী-বাংলার আধ্যাত্মিক—স্নিগ্ধ-রূপ-চিত্রায়ন। শিশির-ঝরা কাশের বনে যখন চাঁদের আলোর ঢল্ নামে তখন তাকে আশ্চর্য বা অদ্ভুত কিছুই মনে হয় না—শুধু মনে হয়: সুন্দর!

কবি করুণানিধানকে তাই আশ্চয বা অদ্ভুত কিছুই মনে হয় না—শুধু মনে হয়—সুন্দর!

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদারের আবির্ভাব পরম বিস্ময়কর। সাহিত্যে ভাববাদই ছিল এতদিন প্রধান। তারই সুরে সুরে দিন কেটেছে ভাবপাগল বাঙালীর। কিন্তু মোহিতলাল তাঁর কাব্যে আমাদের শোনালেন বুদ্ধিবাদী মানসিকতার তীক্ষ্ণ ও শাণিত সুর। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও অপূর্ব রসঘন-রূপকল্পের ব্যঞ্জনায় তিনি তাঁর উপযুক্ত পথ খুঁজে পেলেন। আর একজন কবিকেও আমরা পেলাম যার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না—তিনি বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। আত্ম প্রতিষ্ঠার দৃঢ় আত্মবলয়ে তার আবির্ভাব। প্রত্যক্ষ জীবনের বাইরের কোন জগৎ বা জীবনের সঙ্গে নজরুলের সৌহাদ্য ছিল না। ইন্দ্রিয়ের বাইরে ইন্দ্রিয়াতীত বলে কোন অনুভূতির সঙ্গেও কবির পরিচয় ছিল না। নজরুলের কাব্যের জগৎ একান্ত বাস্তব জগৎ। রূপ-অরূপ, সীম-অসীম, বা দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রতিফলন সেখানে নেই। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে জাগে শুধু অন্যায় আর অসাম্য। মানুষে মানুষে বিভেদ। মাতার অশ্রুজল—শিশুর আর্তনাদ—আর দরিদ্রের বেদনায় তাঁর কাব্যের জগৎ অশ্রুসিক্ত। স্বার্থান্ধ মানুষের কুটিল চক্রের আবর্তে নিপীড়িত সমাজ-মন যেখানে।

'লোভী আর বর্বরের ফাঁদে
বন্দী মোর ভগবান কাঁদে।

কবি নজরুল সেই ভগবানেরই ঘুম ভাঙ্গাতে তার অগ্নি বীণার দীপক রাগে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন। এক হাতে জাগরণের বীণা—আর এক হাতে ভাঙ্গনের কুঠার নিয়ে তাঁর কাব্য পথ-যাত্রা। এক দিকে বলেছেন—জাগো জনগণ, তোমাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নাও। ওঠো সর্বহারার দল, সঞ্চয়ী ধনিকের প্রাসাদ ভেঙ্গে তোমাদের প্রাপ্য বুঝে নাও। আবার অন্যদিকে প্রলয় হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট।"

দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা অপূর্ব আন্তরিকতার স্পর্শে অগ্নিস্বরা হ'য়ে ফুটে উঠেছে। উচ্ছ্বাস আর অসংলগ্নতার অবাধ দৌরাত্ম্যে কবির অধিকাংশ কবিতার কাব্য মূল্য হয়ত ব্যাহত। শরাভাবে তিনি প্রতিপক্ষকে 'তৃণ' দিয়েই আক্রমণ করতে চান। কিন্তু কবির তাতে বিন্দুমাত্র 'পরোয়া' নেই। নাই বা হলেন তিনি কালজয়ী—মহাকবি। তিনি বরং হুজুগের কবি—এই ভালো। এর চেয়ে বড় পরিচয় নজরুলের আর কি আছে? তাঁর ব্যক্তিত্ব অসংকোচ আন্তরিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রাণগঙ্গায় অনন্য হয়ে রইল। বাংলা সাহিত্যের গতি যখন রবীন্দ্রনাথের অরূপ ও অসীম প্রবণতায়—মোহিতলালের বুদ্ধিবাদে—নজরুলের দেশাত্মবোধের প্রলয় হুঙ্কারে—কালিদাসের 'একতারায়' -করুণানিধানের 'শতনরীতে'—ও সত্যেন্দ্রনাথের 'জলতরঙ্গে' এক বিচিত্র সুর-যমুনার ছন্দে ও গভীরতায় প্রকাশ লাভ করছিল—বাংলার কাব্য জগতে তখন অকস্মাৎ আর এক কবির আবির্ভাব হ'ল যিনি ব্যক্তিত্ব, রক্ষার উপায় খুঁজতে গতানুগতিক সব পথ পরিহার করে এক অভিনব বক্র পথের যাত্রী হলেন। পাথেয় হ'ল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদ ও শাণিত ব্যঙ্গ।......

Byron তাঁর খ্যাতি বা যশ সম্পর্কে বলেছেন—I woke up one morning and found myself famous. কাব্যের ক্ষেত্রে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার দিক্ দিয়ে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঐ একই উক্তি করতে পারতেন। যে কোন সাহিত্যিককেই খ্যাতি অর্জন করতে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়—কারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করবার আগে তার যথাযথ মূল্য দিয়ে নিতে হয়। অতি সার্থক প্রমাণ কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। আর বার্ণার্ড শ'য়ের খ্যাতি অর্জনের সংগ্রামত' বিশ্বজনবিদিত। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রীতি অতিক্রম করবার মত প্রতিভা আমরা আরো দু'একটি পেয়েছি। 'অতসী মামীর' শক্তিমান লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মাত্র গল্প দিয়েই বাংলার সাহিত্য জগতে স্থায়ী সম্মানিত আসন পেয়েছিলেন। পেয়েছি আমরা প্রতিভাবর কথাশিল্পী—সুবোধ ঘোষকে—কিন্তু এতো গেল কথা সাহিত্যের কথা। কবিতার ক্ষেত্রে এই জনপ্রিয়তা রাতারাতি অর্জন করা রীতিমত শক্ত।

কবি যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ছাত্র নন্, তিনি এঞ্জিনীয়র। মানব মনের এঞ্জিনীয়র কবি (Poets are the engineers of human soul) যতীন্দ্রনাথ। নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন B. E. পাশ করার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি।

এহেন ব্যক্তির পক্ষে কাব্যের এমন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও শ্লেষের মাধ্যমে রাতারাতি বাঙালী পাঠকের মন জয় করা অবিশ্বাস্য না হলেও অভিনব বৈকি!

এ কবিকে আমরা পেলাম বুদ্ধিবাদের চড়া পর্দায় শাণিত শ্লেষের দক্ষ রূপকার রূপে। সঙ্গে আছে নজরুলের দেশাত্মবোধ ও সমাজ সচেতনতা। কিন্তু নেই নজরুলের উচ্ছ্বাস ও অসংগতি। পরিবর্তে আছে মোহিতলালের বুদ্ধিবাদের সূক্ষ্মতা আর সংযম। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথ এমন একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন যা তাকে গতানুগতিক গোষ্ঠিক কবি হওয়ার হাত থেকে মুক্তি দিল।

চিরসুন্দর ও তারুণ্যের পূজারী ভাববাদী কবি রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা' 'পূরবী' ও 'মহুয়ার'—'মায়ালোকে' বিচরণ করছেন—কবি যতীন্দ্রনাথ তখন মরুভূমির ধূ ধূ বালুকণার মাঝে 'মরীচিকায়' আর 'মরুমায়ার' রূপ দেখছেন। কবিগুরু যখন বিশ্বপ্রাণের রঙ্গে রঙ্গেল

—লোকে লোকে—সেই অরূপদেবতার আনন্দময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন—কবি যতীন্দ্রনাথ তখন সকৌতুকে তাঁর ব্যঙ্গ বান নিক্ষেপ করেন :

"চেরাপুঞ্জির থেকে
ধার দিতে পার একখানি মেঘ গোবি সাহারার বুকে ?"

ইনিই কবি যতীন্দ্রনাথ স্বপ্রকাশ ও সোচ্চার।

এর যে কোন কবিতা থেকে এর ব্যক্তিত্বটি চিনে নেওয়া সহজ। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা প্রথম শুনলাম দুঃখ-বেদনার গান। এ দেশে দুঃখবাদী কবি নেই বললেও চলে—কারণ এ দেশে অবিমিশ্র ক্ষয় বলে কোন জিনিস নেই। এ দেশের আকাশ,-বাতাস, জল, মাটি সবই যেন এক নতুন জীবনের গান শোনায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই সুরেলা প্রাঙ্গণে বাঙালী কবিরা তাই স্বভাবতই সুরপ্রবণ ও মিষ্টিক্।

কবি যতীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিক সুরের যমুনায় গা ভাসিয়ে দিলেন না—তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের দুঃখবেদনার মূলীভূত কারণগুলিকে নিয়ে এক তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের অগ্নিবাণ যোজনা করলেন।

সমসাময়িক যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা কবিকে নির্মমভাবে পীড়িত করেছে। কবি সমাজের শঠতা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে এক তির্যক বাক্‌ভঙ্গী অবলম্বন করে অতি নির্মমভাবে তাদের সমালোচনা আরম্ভ করলেন। ভিতরের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার পাঁক এমন করে তুলে দিলেন যে তা আর কারো চোখ এড়াবার যো রইল না। এই আত্ম-বিদ্রূপ ও আত্ম সমালোচনা আমরা একদা বঙ্কিমের কাছেও পেয়েছি। বঙ্কিমের সমালোচনার পিছনে ছিল একটি দৃঢ় সংস্কারকের সংশোধনী মনোবৃত্তি। কবি যতীন্দ্রনাথের শ্লেষের পিছনেও সেই সংশোধনী—মনোবৃত্তি বর্তমান। তাই এই শ্লেষ বা সমালোচনা নিঃসন্দেহে সংগঠন-মূলক। কবি যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তিনি দুঃখবাদী কবি। প্রশ্নটি বিশেষ বিতর্কমূলক। পাশ্চাত্য সমাজের নেতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদ তদানীন্তন সমাজে আলোড়ন তুলেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কবি যে সেই বিপ্লবাত্মক নেতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদ দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নি—একথাই বা কি করে বলা যায়।

কিন্তু কবির কাব্যজগতের মাঝে এই মতবাদটি একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। কবি কখনও জীবনকে অস্বীকার করে নেতিবাদের প্রশ্রয় দেন নি—আর কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে সে সম্ভবও ছিলনা। যে কবি কাব্য রচনা করলেও 'চালের দর' সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন, তার মত সমাজ-সচেতন কবির পক্ষে সমাজ-জীবনকে অস্বীকার করা একেবারেই অভাবনীয়।

দুঃখ-বেদনা-শঠতা-প্রবঞ্চনাই কবিকে অধিক আকুল করেছে বলেই কবির কাব্যে দুঃখ বেদনার সুর মুখ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন জীবনকে অস্বীকার করে নয় বা নেতিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েও নয়—বরং ইতিবাচক চেতনা সঞ্চারের মানসে দুঃখ ঝঞ্ঝার অভিঘাতকে মাথায় তুলে নয়েছেন। আর তা ছাড়া কবির দুঃখবাদ বিচারে তার ব্যক্তিক অনুভূতি ও তাঁর বিশেষ প্রবণতা বিচার্য। সে ক্ষেত্রে বাংলার শৃঙ্খলিত মানুষের অনির্বাণ হাহাকার তাঁকে নিছক ভাবাশ্রয়ী সৌন্দর্য-প্রেমিক হতে বাধা দিয়েছে। 'পাঁচীর ছেলের পং ভাব, 'কচি ডাবের পশরাবাহী বৃক্ষের বেদনা—তার কবি হৃদয়ে অনুভূতিকে বেদনাজর্জর ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। সেই বিদ্রো হৃদয়ের বেদনা শতধা-তীক্ষ্ণ হয়ে ফেটে পড়ে 'চাষার ব্যারিষ্টার' 'ফেমিন রিলিফের' তির্যক কটাক্ষে।

শেষ কবি জীবনের এই প্রবঞ্চনাময় কুটিলতাকে তোলপাড় ক নতুন ছাঁচে আবার সব গড়বার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তাঁর আরা দেবতা শিব। ইনি পুরাণ-কথিত শিব নন—ইনি প্রধানত চাষী চাষের দেবতা। একাধারে ইনি বজ্রকঠোর ধ্বংস কর্তা, অন্যদিকে ইঁ পরম কল্যাণময় সংগঠনের দেবতা। ইনি কবির সঙ্গে মাঠে মাঠে লাঙ চালাবেন, তাঁর লাঙলের আঘাতে 'পাথরও' ফেটে যাবে।

কবির এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর যে মানস প্রবণতাটি ধরা পড়েছে সেটি নিশ্চয়ই দুঃখবাদের নয় এবং প্রচ্ছন্ন দরদী কবির মানব-প্রেমিকতার এ ছাড়াও কবির মরমী বন্ধুর কাছে সীমাহীন দুঃখ বেদনার অভিযোগে তীব্র কটাক্ষের অন্তর শায়া হয়ে আছে কবির মানব প্রেম। দুঃখবা ছাড়াও রোম্যান্টিকধর্মী কি রোম্যান্টিকতা বিরোধী—এ নিয়েও এ কবি সম্পর্কে একটি জল্পনার অবকাশ আছে। ধূ ধূ মরুভূমির উত্তপ্ত সাইমুসে বিষকন্যা ইরাণী সাকীর স্বপ্ন গতানুগতিক কাব্যের মোলায়েম জগতে একটি ঝাঁঝালো সফেন সুরার সৌরভ আনলেও—কবির এ প্রবণতা চরম রোম্যান্টিক্।

কবির দুঃখবাদ সম্পর্কে মানসিকতাটি অনুধাবন করলেই কবির রোম্যান্টিকতার এই রীতিকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে বোধ হবে। অবশ্য কবির শেষ জীবনে তাঁর আপোষ-বিরোধী তীব্র মানসিকতার অবসান ঘটেছে। জীবনের আসন্ন বিদায় অন্ধকার তাঁর কাব্য জগতের সাহারার বুকেও এনেছে গভীর কালো রাত্রি।

নির্দ্বন্দ্ব—নির্মোহ—তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রাণ সেদিন নিতান্ত অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করেছে রহস্যময়ী রাত্রির কাছে। বিদ্রোহ নয়—বিরোধ নয় —শান্ত সমাহিত কবিপ্রাণ নিজেকে সঁপে দিয়েছে প্রশান্ত ঘুমের হাতে।

জীবনের অপরাহ্নে কবি তাঁর দুঃখবাদ সম্পর্কে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন সুগভীর মর্তপ্রেমের পরিচয়ে। জীবনের আকাশ যখন নিতান্ত নীল মৃত্যু মদিরায়, মরুভূমির কালো আকাশে যখন 'জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়' তখন জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বেদনায় কবিকণ্ঠ করুণ মধুর :

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চলে যেতে হবে ভেবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই :

পাশ্চাত্যের জীবন বিরোধী কোন Pessimistic কবির সঙ্গে এ কবির কোন কালেই সহধর্মিতা নেই—বরং একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। কারণ, কবির দুঃখবাদ জীবন বিমুখ হয়ে নয়—
জীবনকে ভালবেসে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

অবরোধের সরোবর তীরে উল্কা ও বাসবী স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে। বাসবী গা-মোছা দিয়া চুলের জল ঝাড়িতেছে ; উল্কা একটি রক্ত-কুরুবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া অর্ধ-বিকশিত কুরুবকের কলি কানে পরিতেছে। অন্য সখীরা জলে নামিয়া স্নানের উপক্রম করিতেছে।

সহসা বাসবী বাহিরের দিকে তাকাইয়া গলার মধ্যে অস্ফুট শব্দ করিল—ও মা ! উল্কা শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল।

অনতিদূরে এক আমলকী বৃক্ষের নিকটে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বৃক্ষের একটা শাখা দেখাইতেছেন। বটুকভট্ট সঙ্গে আছেন। স্নানের ঘাটের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

ওদিকে সখিরা উল্কার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ। সে হ্রস্বকণ্ঠে সখীদের বলিল—

উল্কা : তোরা যা—

বাসবী ও সখীরা চুপি চুপি অপগত হইল। উল্কা সেনজিতের উপর চক্ষু রাখিয়া নতজানু হইল, হাতের কাছে নূপুর পড়িয়াছিল নিঃশব্দে দুই পায়ে পরিল, কয়েকটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। উল্কার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে নিজের সঙ্গেই যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে।

উল্কার দিকে প্রায় পেছন ফিরিয়া সেনজিৎ ও বটুকভট্ট আমলকী বৃক্ষে পক্ষী অনুসন্ধান করিতেছিলেন, রিমঝিম্ নূপুরের শব্দে চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। উল্কাকে সেনজিৎ পূর্বে স্ত্রী-বেশে দেখেন নাই ; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বটুকভট্টও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নূপুরের ছন্দে বরতনু লীলায়িত করিয়া উল্কা রাজার দিকে অগ্রসর হইল ; রাজা মোহগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উল্কা হাসি মুকুলিত মুখে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ফুলগুলিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে রাজার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল—

উল্কা : প্রভাতে রাজদর্শন পেলাম—আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ গ্রহণ করুন।

সেনজিৎ নির্বাক চাহিয়া রহিলেন

বটুকভট্ট : দেখছ কি বয়স্য ? আশীর্বাদ কর—জয়োস্তু জয়োস্তু—প্রজ্ঞাবতী হও—চিরায়ুষ্মতী হও। ইতি বটুকভট্টঃ।

বলিতে বলিতে বটুকভট্ট পিছু হটিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেনজিৎ ঈষৎ সচেতন হইয়া একটি ফুল উল্কার অঞ্জলি হইতে তুলিয়া লইলেন, সংযত স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : স্বস্তি। আয়ুষ্মতী হও।

উল্কা : মহারাজ ! এতদিনে বিদেশিনী আশ্রিতার কথা মনে পড়ল ! রাজকার্য কি এতই গুরু ?

সেনজিৎ একটু অপ্রতিভ হইলেন

সেনজিৎ : আমার একটা টিয়া পাখী উড়ে এসে এই আমলকী গাছে বসেছে—তাকে ধরতে এসেছি।

উল্কা কলহাস্য করিয়া উঠিল

উল্কা : সত্যি ! টিয়া পাখী ধরতে এসেছেন ! কৈ, আসুন তো দেখি কোথায় আপনার পাখী।

দুইজনে আমলকী বৃক্ষের আরও নিকটে গেলেন

উল্কা : আপনার পাখীর নাম কি মহারাজ ?

সেনজিৎ : বিম্বোষ্ঠ।

উল্কা : (আনন্দে করতালি দিয়া) বিম্বোষ্ঠ ! কি সুন্দর নাম। আমারও একটি টিয়া পাখী আছে, কিন্তু—

সেনজিৎ : তুমি টিয়া পাখী কোথায় পেলে ?

উল্কা : কঞ্চুকী মশায় আমাকে দিয়েছেন। পাখী

এরই মধ্যে আমার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছে ; কিন্তু তার নিজের এখনও নামকরণ হয় নি। কি নাম রাখি আপনি বলুন না মহারাজ।

সেনজিৎ : বাচাল নাম রাখতে পার।

উল্কা আবার কৌতুক বিগলিত কণ্ঠে হাসিল। সেনজিৎও একটু হাসিলেন ; তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টি আমলকী বৃক্ষের চূড়ায় বিম্বোষ্ঠকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কাট্।

বটুকভট্ট অবরোধ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। দেখিলেন কঞ্চুকী হন্তদন্ত ভাবে ভিতরে আসিতেছেন

বটুকভট্ট ! হন্ হন্ করে চলেছ কোথায় ?

কঞ্চুকী : মহারাজ নাকি অবরোধে পদার্পণ করেছেন !

বটুকভট্ট : তা করেছেন—কিন্তু তাই বলে তুমি এখন ওদিকে পদার্পণ কোরো না।

কঞ্চুকী : সে কি ! আমি না গেলে মহারাজের পরিচর্যা করবে কে ?

বটুকভট্ট দৃঢ়ভাবে কঞ্চুকীর বাহু ধরিয়া বাহিরের দিকে প্রচালিত করিলেন

বটুকভট্ট : পরিচর্যা করবার লোক আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। মহারাজ এখন ব্যস্ত আছেন। তিনি আর ঐ বৈশালীর মহিলাটি—দু'জনে মিলে পাখী ধরছেন। ইতি বটুকভট্টঃ।

বটুক গম্ভীরমুখে চোখ টিপিলেন

কাট্।

উল্কা ও সেনজিৎ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে পক্ষী অন্বেষণ করিতেছেন। সহসা উল্কা একহাতে সেনজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত চাপা স্বরে বলিয়া উঠিল—

উল্কা : ঐ যে। ঐ দেখুন আপনার ধূর্ত পাখী পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাচ্ছে ! ঐ যে ! দেখতে পেয়েছেন ?

সেনজিৎ দৃষ্টি নামাইলেন, উল্কার হাত হইতে ধীরে ধীরে নিজের মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া আবার ঊর্ধ্বে চাহিলেন

সেনজিৎ : বিম্বোষ্ঠ ! নেমে আয় !

পাখীটা পত্রান্তরালে বসিয়া ফল খাইতেছিল, রাজার স্বর শুনিয়া তাকাইল, তারপর পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল। উল্কা কপট ভ্রূকুটি করিয়া পাখীকে ডাকিল

উল্কা : ধৃষ্ট পাখী ! এত সাহস তোর, মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করিস। এখনও নেমে আয়, নইলে দুই পায়ে শিকল দিয়ে খাঁচায় বন্ধ করে রাখব।

পাখী কিন্তু উল্কার শাসনবাক্য গ্রাহ্য করিল না

সেনজিৎ : বিম্বোষ্ঠ !······না, ডাকলে আসবে না। কী করা যায় !

উল্কা কপোলে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল।
সহসা তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

উল্কা : এক উপায় আছে। একটু অপেক্ষা করুন—

উল্কা অন্তঃপুর ভবনের দিকে কয়েক পা গিয়া ডাকিল—

উল্কা : বাসবী ! ইন্দ্রসেনা ! আমার পাখী নিয়ে আয়—পাখী।

বাসবী ছুটিয়া ভবন হইতে বাহির হইয়া আসিল,
আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল

সেনজিৎ : পাখী কি হবে ?

উল্কা : এখনি দেখতে পাবেন মহারাজ।

বাসবী ফিরিয়া আসিল ; তাহার মণিবন্ধে বসিয়া আছে একটি টিয়া পাখী। উল্কা আগাইয়া গেল, টিয়া পাখীটা উল্কাকে দেখিয়া 'উল্কা' 'উল্কা' বলিয়া তাহার মণিবন্ধে আসিয়া বসিল। বাসবী উল্কার পানে অর্থপূর্ণ হাসিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। উল্কা রাজার কাছে প্রত্যাবর্তন করিল। পাখী দেখিয়া সেনজিৎ উল্কার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ তুলিলেন।

সেনজিৎ : পাখী দিয়ে পাখী ধরবে !

উল্কা গূঢ় হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইল

উল্কা : হাঁ। কেন, তা কি অসম্ভব ?

সেনজিৎ : (শুষ্কস্বরে) জানিনা। চেষ্টা করে দেখতে পার।

উল্কা তখন বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক মধুর স্বরে ডাকিল—

উল্কা : আয় আয় বিম্বোষ্ঠ ! তোর সাথী তোকে ডাকছে। আয় আয় !

গাছের উপর বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর উড়িয়া আসিয়া উল্কার

উল্কা : (বিজয়দীপ্ত চক্ষে) দেখলেন মহারাজ!

সেনজিৎ : দেখলাম। এবার আমার পাখী আমাকে দাও—আমি যাই।

বিম্বোষ্ঠের পায়ে শিকলির ছিন্নাংশ লাগিয়া ছিল, সেনজিৎ কাছে আসিয়া শিকলি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। অমনি উল্কার পাখী ঝটপট্ করিয়া উড়িয়া গেল। বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেনজিৎ শিকলি ধরিয়া ফেলিলেন। ভয় পাইয়া বিম্বোষ্ঠ সেনজিতের উপর গিয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ণ নখ রাজার উন্মুক্ত বক্ষে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল। সেনজিৎ শিকলি ছাড়িয়া দিলেন, বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাজার বক্ষে রক্ত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই বিন্দু রক্ত সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল। উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—

উল্কা : সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হল! (ফিরিয়া) ওরে কে আছিস, অনুলেপন নিয়ে আয়—মহারাজ আহত হয়েছেন! বাসবি! বিপাশা!

সেনজিৎ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া প্রায় রূঢ়স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।

উল্কা : সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না পশুপক্ষীর নখে বিষ থাকে!—(ব্যাকুল ভাবে) কই, কেউ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে শরীরে প্রবেশ করবে—বাসুলি! ইন্দ্রসেনা!

কেহ আসিল না। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—

উল্কা : মহারাজ, আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আমি বিষ টেনে নিচ্ছি—

উল্কার অভিপ্রায় মহারাজ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই উল্কা তাঁহার একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর অধর স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন। উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত, সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল—

উল্কা : কি হল?

সেনজিৎ : (ঘৃণাভরে) স্ত্রীলোকের পুরুষভাব আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য।

উল্কার প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া সেনজিৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। উল্কা স্থির নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তারপর সে সজোরে দাঁত দিয়া অধর দংশন করিল।

ওয়াইপ।

সেনজিতের বিশ্রাম গৃহ

রাজা একাকী কক্ষের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পাদচারণ করিতেছেন তাঁহার অশান্ত মুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি প্রতিফলিত। একবার পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি সোনার দর্পণ তুলিয়া লইলেন, নিজের বক্ষস্থলে পাখীর নখাঙ্কিত আঁচড়গুলি দেখিলেন। তারপর দর্পণ রাখিয়া দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিবার পর তাঁহার মনে হইল বদ্ধ ঘরে নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। তিনি একটি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিলেন, অদূরে বলভির উপর কপোত-মিথুন প্রণয়-লীলায় নিমগ্ন, চঞ্চু-চুম্বনের অবসরে কুজন করিতেছে। সেনজিৎ আবার গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ডিজলভ্।

অন্তঃপুরে উল্কার শয়নকক্ষ। বাতায়ন বন্ধ, তাই কক্ষটি ঈষদন্ধকার। উল্কা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া শয্যায় শুইয়া আছে।

বাসবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পিছনে অন্য সখীগণ। সকলের মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যা পাশে দাঁড়াইল।

বাসবী : (কুণ্ঠিত স্বরে) প্রিয়সখি, কী হয়েছে—!

উল্কা তড়িদ্বেগে উঠিয়া বসিল, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ ক্রোধে বিকৃত

উল্কা : কী—কি চাও তোমরা? যাও আমার সুমুখ থেকে—যাও—!

সখীরা উল্কার মূর্তি দেখিয়া পিছু হটিল, উল্কা আবার শুইয়া পড়িল এবং উপাধানে মুখ ঢাকিল। সখীরা শঙ্কিত মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে উল্কা আবার উঠিয়া বসিল; মুখের উপর হইতে স্খলিত কুন্তল সরাইয়া স্মরাক্রান্ত চোখে শূন্যে চাহিয়া রহিল। তারপর শয্যা হইতে নামিল।

কক্ষের একটি প্রাচীরে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। চর্ম অসি ছুরিকা ইত্যাদি। উল্কা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অস্ত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া ছুরিকাটি হাতে তুলিয়া লইল। তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় ছুরি. উল্কা তাহা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বাম করতলের উপর তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিল। উল্কার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া পাশের দিকে তাকাইল।

পাশের দেয়ালে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, বীণা বংশী মৃদঙ্গ। উল্কা সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, বীণার তন্ত্রীতে মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিল। তন্ত্রীর ঝঙ্কার শুনিয়া তাহার কঠিন মুখ একটু কোমল হইল, অধরে তিক্ত-তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিল। সে ডাকিল—

উল্কা : বাসবি—

বাসবী সাগ্রহ সশঙ্ক মুখে প্রবেশ করিল

বাসবী : প্রিয়সখি—

উল্কা বাসবীকে জড়াইয়া লইল, বাসবী গলিয়া গেল

উল্কা : তোরা আমার ওপর রাগ করিস নি ?

বাসবী : না না—কিন্তু কি হয়েছে প্রিয়সখি ? মহারাজ কি—?

উল্কা : কিছু হয় নি—বসন্ত-পূর্ণিমা কবে জানিস্ ?

বাসবী : বসন্ত-পূর্ণিমা ! সে তো আর তিন দিন আছে। কঞ্চুকী মশাই বলছিলেন।

উল্কা : (নিজ মনে) তিন দিন—যথেষ্ট।

বাসবী : কী বলছ—কি যথেষ্ট ?

উল্কা : (দৃঢ়স্বরে) বাসবি, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে—বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার আগে—মহারাজ সেনজিৎ আমার কাছে আসবেন—আমার প্রেম-ভিক্ষা করবেন। এ যদি না হয়, আমার নারী-জন্মই বৃথা।

ফেড আউট্। ফেড্ ইন।

প্রভাত কাল। মধুর স্বননে বংশী বাজিতেছে। পাটলিপুত্রের নগর-উদ্যানে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, অশোক চম্পা কর্ণিকার কিংশুক ; ফুলে ফুলে ফুলময়।

বেলা বাড়িয়া চলিল। পাটলিপুত্রের গৃহে গৃহে পুষ্প কেতন উড়িতেছে, দ্বারে দ্বারে আম্রপত্রের মালিকা। নাগরিক নাগরিকাগণ দল বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা চলিয়াছে, পথিকদের গায়ে কুঙ্কুম ছুড়িয়া মারিতেছে। বংশীর কলিত কলস্বনের সহিত যুবতীদের কলহাস্য মিশিতেছে।

চতুষ্পথের মাঝখানে মদন-মন্দির। মন্দিরের প্রাচীর নাই, পঞ্চস্তম্ভের উপর ছাদের চূড়া উঠিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ধনুর্ধর দেবতার মূর্তি দেখা যাইতেছে। একদল যুবতী নাচিতে নাচিতে মন্দির পরিক্রমা

ওয়াইপ্।

সেনজিতের শয়ন কক্ষ। রাজা পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন।

সহসা বাতায়নের বাহিরে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের কর্ণবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। রাজার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বিরক্ত মুখে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—

সেনজিৎ : অভিজিৎ !

রাজার সন্নিধাতা অভিজিৎ প্রবেশ করিল। তাহার বেশবাস উৎসবের উপযোগী ; কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে পট্টাম্বর ও উত্তরীয়। সে প্রবেশ করিতেই রাজা রুক্ষস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : এ কি ! এত শব্দ কিসের ?

সন্নিধাতা : আয়ুষ্মন্, আজ দোলপূর্ণিমা—মদনোৎসব !

রাজা শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন

সেনজিৎ : মদনোৎসব—তা এত গণ্ডগোল কেন !

সন্নিধাতার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল

সন্নিধাতা : মহারাজ, আজ আনন্দের দিন—তাই পুরবাসীরা উৎসব করছে !

সেনজিৎ বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে চাহিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন

সেনজিৎ : উৎসব ! কিসের জন্য উৎসব ! যাও, এখনি বন্ধ করে দাও—মদনোৎসব হবে না।

সন্নিধাতা : মদনোৎসব হবে না—(বুদ্ধিভ্রষ্ট ভাবে) মদনোৎসব হবে না ! কিন্তু মহারাজ—

সেনজিৎ : আমার আদেশ, মদনোৎসব বন্ধ থাকবে। যাও, নগরে ঘোষণা করে দাও—দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? যাও।

সন্নিধাতা : যথা আজ্ঞা মহারাজ—

হতভম্ব অভিজিৎ প্রস্থান করিল

রাজপ্রাসাদের অঙ্গন। পুরীর দাসদাসীরা অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে। যুবতী দাসীরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাঁখে কলস লইয়া নাচিতেছে, ভৃত্যেরা শিঙা বাঁশী ঢোল বাজাইতেছে। যবনী প্রতিহারীরাও স্বদেশের পোশাক পরিয়া যোগ দিয়াছে। উদ্দাম উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

কাট্।

দিকে চাহিয়া আছে। প্রাসাদ অঙ্গন হইতে বাদ্যযন্ত্রের নিনাদ আসিতেছে। উল্কার চোখেমুখে অসহ্য উৎকণ্ঠা।

বাসবী আসিয়া উল্কার পাশে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাসবী কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল—

বাসবী: প্রিয়সখি, মহারাজ তো আজও এলেন না!

উল্কা: (অধর দংশন করিয়া) না।

সহসা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ থামিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী বিস্মিতভাবে পরস্পরের পানে চাহিল

কাট্।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গন। দাসদাসীরা নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া অবাক-বিস্ময়ে রাজসন্নিধাতা অভিজিতের পানে চাহিয়া আছে। অবশেষে এক দাসী স্খলিতস্বরে প্রশ্ন করিল—

দাসী: মদনোৎসব বন্ধ থাকবে—!

সন্নিধাতা: (সক্ষোভে) মহারাজের আদেশ।

কাট্।

অবরোধের অলিন্দে উল্কা ও বাসবী পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। কঞ্চুকী কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল

বাসবী: কঞ্চুকি মশায়, গীত-বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল যে!

কঞ্চুকী হতাশভাবে দুই হস্ত প্রসারিত করিল

কঞ্চুকী: মহারাজ আদেশ দিয়েছেন—মদনোৎসব হবে না।

ডিজলভ্।

দিবা কাল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও গীতবাদ্যের শব্দ নাই। সেনজিৎ আপন বিশ্রাম গৃহে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার ললাট ভ্রূবদ্ধ। তিনি দুই হাতে একটি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছেন।

বটুকভট্ট আসিয়া রাজার কাছে বসিলেন

বটুকভট্ট: জয়োস্তু মহারাজ।

সেনজিৎ হাস্যহীন মুখে বটুকভট্টকে নিরীক্ষণ করিলেন

সেনজিৎ: স্বস্তি।

বটুকভট্ট: শুনলাম তুমি দোলপূর্ণিমার নৃত্যগীত আনন্দ উৎসব বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ করেছ, ভাল করেছ, উত্তম কার্য করেছ।

সেনজিতের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল

সেনজিৎ: এই সব অর্বাচীন উৎসব আমার ভাল লাগে না।

বটুকভট্ট: বটেই তো, কেন ভাল লাগবে! এবং তোমার যখন ভাল লাগে না তখন প্রজাদেরই বা কেন ভাল লাগবে! কোন স্পর্ধায় তারা উৎসব করবে!

বটুকভট্টের ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সেনজিৎ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—

সেনজিৎ: কী বলতে চাও তুমি?

বটুকভট্ট: কিছু না বয়স্য। বছরের মধ্যে এই এক উৎসব, যেদিন ধনী-দরিদ্র বালক-বৃদ্ধ একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তুমি যখন নিষেধ করেছ তখন সকলে নীরব থাকবে। কেবল—

সেনজিৎ:—কেবল—?

বটুকভট্ট: কেবল তোমার পক্ষীশালার পাখীগুলো অকারণে বড় কিচির-মিচির করছে। যদি অনুমতি দাও এখনি গিয়ে তাদের গলা টিপে নীরব করে দিতে পারি।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ নতমুখে রহিলেন, তারপর ব্যথাক্লিষ্ট মুখ তুলিলেন

সেনজিৎ: বটুক, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বয়স্য, আমার বুকের জ্বালা যদি বুঝতে!

বটুকভট্ট: (গাঢ়স্বরে) আমি সব বুঝেছি বয়স্য।—কিন্তু তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ!

সেনজিৎ: যাক।—সন্নিধাতাকে ডাকো।

ডাকিতে হইল না, সন্নিধাতা অভিজিৎ নিজেই প্রবেশ করিল। দেখা গেল তাহার পশ্চাতে পুরীর দাসদাসী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

সন্নিধাতা: আজ্ঞা করুন আর্য।

সেনজিৎ: (ঈষৎ লজ্জিতভাবে) আমার আদেশ প্রত্যাহার করছি। যাও, সকলে উৎসব কর গিয়ে।

দ্বারের কাছে দাসদাসীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল

সকলে: মহারাজের জয়—জয় দেবপ্রিয় মহারাজ!

ভৃত্যেরা আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল

বটুকভট্ট: বয়স্য, আশীর্বাদ করি কন্দর্পদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

সেনজিৎ: (নিশ্বাস ফেলিয়া) বটুক, দ্বার বন্ধ করে দাও, বাতায়ন বন্ধ করে দাও। উৎসবের শব্দ আমি শুনতে চাইনা।

কাট্।

অবরোধের একটি কক্ষ। উল্কাকে ঘিরিয়া চারিজন সখী বসিয়াছে, তাহারা উল্কাকে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে। কঙ্কন অবতংস গলায় চন্দ্রহার—সমস্তই ফুলের। উল্কা চোখে-মুখে বিদ্রোহ ভরিয়া বলিতেছে—

উল্কা : ···মহারাজ সেনজিৎ যে আদেশই দিন, আমরা বসন্ত-উৎসব করব। তিনি যদি পারেন, নিজে এসে বাধা দিন।

সখীরা নীরব

সহসা বাহিরে বিপুল বাদ্যোদম শুনা গেল। সকলে হত চকিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময় কঞ্চুকী মহাউল্লাসে প্রবেশ করিয়া বলিল--

কঞ্চুকী : সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহারাজ আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। উৎসব হবে—মদনোৎসব হবে—

কঞ্চুকী প্রায় নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। উল্কার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, চোখে আশার আলো ফুটিল

ডিজল্‌ভ্।

বেলা দ্বিপ্রহর। নগরের বিভিন্ন স্থানে আবার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পুষ্করিণীর দলে রঙ গুলিয়া নাগরিক নাগরিকারা জলক্রীড়া করিতেছে। বিলাসী নাগরিকেরা নৌকায় চড়িয়া জলবিহার করিতেছে। বনে বনে প্রেমিক প্রেমিকাদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, গাছে গাছে হিন্দোল দুলিতেছে।

ডিজল্‌ভ্।

অপরাহ্ন। উল্কার শয়নকক্ষ। বাতায়নে দাঁড়াইয়া উল্কা প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে উৎসবের মিশ্রিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। উল্কার চোখে ব্যর্থতার শুষ্ক জ্বালা। মহারাজ আসেন নাই।

সহসা রূঢ় হস্ত সঞ্চালনে উল্কা নিজের গলার মালা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তারপর নিজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল। তীক্ষ্ণ নীরব কণ্ঠে ডাকিল—

উল্কা : বাসবি!

বাসবী উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিল

উল্কা : বেলা কত?

বাসবী : অপরাহ্ন। কৈ প্রিয়সখি, মহারাজ তো

উল্কা : (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) আসবেন। তুই লেখনী মসীপাত্র নিয়ে আয়, মহারাজকে পত্র লিখব—

বাসবী দ্রুতপদে চলিয়া গেল, উল্কা মুখে বাণ-বিদ্ধ মৃত হাসি লইয়া বসিয়া রহিল।

ওয়াইপ্।

সায়াহ্ন। সেনজিৎ বিশ্রামগৃহে একাকী জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। দীর্ঘ অন্তর্যুদ্ধে তাহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত।

দ্বারের নিকট হইতে মন্ত্রী বলিলেন—

মন্ত্রী : জয়োস্তু মহারাজ।

সেনজিৎ : মন্ত্রী! কি প্রয়োজন?

মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন, তাহার মুখে কুণ্ঠা, হাতে কুণ্ডলীকৃত একটি লিপি

মন্ত্রী : ক্ষমা করবেন, একটা গুরুতর কথা মহারাজকে জানাবার জন্য এলাম।

সেনজিৎ : কী গুরুতর কথা? কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি চলত না?

মন্ত্রী : না মহারাজ, বিলম্বে ঘোর অনিষ্ট হতে পারে। —আমরা জানতে পেরেছি যে গোপনে আপনার প্রাণ-নাশের চেষ্টা হচ্ছে—

সেনজিৎ : (তাচ্ছিল্যভরে) কে চেষ্টা করছে?

মন্ত্রী : মহারাজ, যাকে আপনি বিশ্বাস করে অবরোধে স্থান দিয়েছেন সেই চেষ্টা করছে।

সেনজিৎ চকিত বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন

সেনজিৎ : বটে! প্রমাণ পেয়েছেন?

মন্ত্রী : (লিপি দেখাইয়া) এই যে প্রমাণ। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। লিচ্ছবি দেশের এক গুপ্তচর এই লিপি নিয়ে আসছিল, পথে আমাদের গুপ্তচর লিপি চুরি করে এনেছে। এতে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে, সুযোগ পেলেই যেন রাষ্ট্র দূতী আপনাকে হত্যা করে।

লিপি লইয়া সেনজিৎ নীরবে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ অমার্জিত প্রস্তরখণ্ডের মত কর্কশ হইয়া উঠিল

মন্ত্রী : মহারাজ, এখন এই বিশ্বাসঘাতিনী রাষ্ট্রদূতীকে —যদি অনুমতি হয়—

মন্ত্রী : আপনি সাবধানে থাকবেন? সতর্ক থাকবেন?

সেনজিৎ : (ঈষৎ হাসিয়া) অবশ্য। আপনি এখন আসুন :

মন্ত্রী : জয়োস্তু মহারাজ।

মন্ত্রী মহারাজের এই ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলেন না, একটু যেন অতৃপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ তখন আস্তরণে আসিয়া বসিলেন; আবার লিপি খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি নিশ্বাস পড়িল।

সেনজিৎ : উল্কা—আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু কেন? কেন?

দ্বারের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সেনজিৎ দেখিলেন একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

সেনজিৎ : কে তুমি?

বাসবী : (সলজ্জভাবে) আমি উল্কার সখী—বাসবী।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : কাছে এস।—তুমি উল্কার সখী! কী নাম তোমার?

বাসবী : বাসবী।

সেনজিৎ : বাসবী। কিছু প্রয়োজন আছে?

বাসবী মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন কঞ্চলীর মধ্য হইতে একটি পত্র বাহির করিল

বাসবী : মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

পত্র হাতে লইয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ বাসবীর সলজ্জ সরল মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

সেনজিৎ : তোমার সখী তাঁর মনের সব কথা তোমাকে বলেন?

বাসবী : (আরও লজ্জা পাইয়া) হাঁ, বলেন।

সেনজিৎ : তিনি আমার প্রতি বিরূপ কেন বলতে পারো?

লজ্জা ভুলিয়া বাসবী সবিস্ময়ে চাহিল

বাসবী : বিরূপ! মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আজ তিন দিন আপনার পথ চেয়ে আছেন।

এবার সেনজিৎ সবিস্ময়ে চাহিলেন; তারপর নীরবে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল তিনি উল্কার স্বর শুনিতে পাইতেছেন—

দেবপ্রিয়, আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে লজ্জাহীনা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে—একবার দর্শন দিবেন না কি। শুধু একটিবার দেখিব—আর কিছু না।

পত্র পাঠ করিয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ নির্বাক বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পত্র কুণ্ডলিত করিয়া অন্য পত্রটির পাশে রাখিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

বাসবী : (সঙ্কোচভরে) মহারাজ, পত্রের উত্তর দেবেন কি?

সেনজিৎ : (সচেতন হইয়া) উত্তর—! হাঁ—এই উত্তর।

সেনজিৎ অন্য পত্রটি লইয়া বাসবীর হাতে দিলেন। বাসবী ক্ষণেক পত্র হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিনের আলো ফুরাইয়া আসিতেছে। বটুকভট্ট আসিয়া রাজার নিকটে বসিলেন

বটুকভট্ট : বয়স্য, দিনটা তো উপবাসে কাটল, এবার পারণের ব্যবস্থা হোক।

সেনজিৎ : উপবাস! পারণ! বুঝতে পারলাম না।

বটুকভট্ট : বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, তবে একটা গল্প বলি শোনো।—পুরাকালে ঘরট্টবর্মর নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন—মুনিবর যখন নিদ্রা যেতেন তখন তাঁর নাক দিয়ে—

সেনজিৎ : বটুক, আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো?

বটুকভট্ট : কী ইচ্ছা হচ্ছে বয়স্য?

সেনজিৎ : তোমাকে শূলে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বটুকভট্ট লাফাইয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন—

বটুকভট্ট : বয়স্য! ও ইচ্ছা দমন করো, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে চাই—

বটুক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেনজিৎ অবিচলিত মুখে বসিয়া রহিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

(ক্রমশঃ)

আমডাঙ্গা মঠ—করুণাময়ী কালীবাড়ী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পঞ্চাশ-বৎসর আগে ২২কি ২৩নং হেরিসন রোডের মোড়ে 'স্টুডেন্টস্ ফ্রেণ্ড' নামে একটি দর্জার দোকান ছিল। দোকানের মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দোকানে সেকালের কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা জামা প্রস্তুত করাইতেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় একটি মজলিস বসিত। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি,রঙ্গালয়—এমন কোন বিষয় ছিলনা যে বিষয়ের না আলোচনা হইত। একটা বিষয় লক্ষ্য করিতাম যে প্রতি রবিবার সকালে সুরেনবাবু যেন কোথায় চলিয়া যাইতেন, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতেন। রবিবার দোকান বন্ধ থাকিত, কাজেই নেহাৎ আপনার জন ব্যতীত কেহ বড় একটা থাকিতেন না।

শ্রীশ্রী৺ করুণাময়ী কালীবাড়ি

একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সুরেনদা, আপনি নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন কোথায় যান এবং আমাদের সন্দেশ প্রসাদই বা কোথা হ'তে আনেন? সুরেনবাবু বলিলেন—আমডাঙ্গা করুণাময়ী কালীর বাড়ী যাই। অনেকটা দূর। বারাসত হয়ে যেতে হয়। যাবেন একদিন? অতিমনোরম স্থান।' আমার সে সময়ে নানা কারণে যাওয়া হয় নাই। কিন্তু করুণাময়ী কালীবাড়ীর নাম আমার মনে ছিল। ভাবিতাম যদি কোন দিন কোন সুযোগ ঘটে দেখিয়া আসিব। আজ সুরেনবাবু জীবিত কিনা জানিনা, তবে তাঁর দোকান বহুদিন পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছিল। সুরেনবাবু সেই যে আমার মনের মধ্যে করুণাময়ী কালীবাড়ীর কথা জাগাইয়া দিয়াছিলেন—বহু বৎসর পরে সেই কালীবাড়ী দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল।

ইংরাজী ১লা মার্চ্চ তারিখে আমি বাণীপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক Literary workshop—Child literature Training centre এর ডিরেক্টার বা অধিকর্ত্তা রূপে যাই। সেখানে একদিন কথা প্রসঙ্গে করুণাময়ী—কালীবাড়ীর কথা শিক্ষার্থীদের বলি এবং হাবড়ার (HABRA) থানার বড় দারোগা O. C. (officer in Charge) শ্রীযুত চণ্ডীদাস ঘটক এবং বারাসতের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুত হরিপদ মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—করুণাময়ী বিশেষ বিখ্যাত পীঠস্থান। চণ্ডীবাবু পূর্ব্বে সেখানকার থানার বড় দারোগা ছিলেন। সেখানকার পথঘাট, এবং মন্দিরের সব কথা তাঁর জানা আছে। হরিপদবাবুও বলিলেন—আমারত প্রায় প্রতিদিনই ঐ অঞ্চলে যাইতে হয়—একথা শুনিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলাম তাঁহারা রাজী হইলেন। সে সময়ে বাণীপুরে চলিতে ছল লোক উৎসব। বিরাট মেলা, যাত্রাগান, কবিগান, বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতা সব কিছুই চলিতেছিল। লোক সমাবেশ হইতেছিল প্রচুর। দূর গ্রাম হইতেও প্রতিদিন লোক আসিত। যাত্রা শুনিতে, কবিগান শুনিতে, প্রদর্শনী দেখিতে ও মেলায় সওদা করিতে। থানার বড় দারোগা, সার্কেল ইন্‌স্পেক্টার আসিতেন মেলার তত্ত্বাবধান করিতে যাহাতে সেখানে কোন গোলযোগ না হয়। এ মেলার পরিচালক ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র হোড়, শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল মজুমদার. শ্রীযুক্ত সুধাংশু সাহা, শ্রীযুক্তা কল্যাণী প্রামাণিক প্রভৃতি। বাণীপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল মজুমদার তাঁহাদের কলেজের বাস দিলেন আমাদের করুণাময়ীর মন্দিরে যাওয়ার জন্য। আমরা ২৩শে চৈত্র (১৩৬৩) ইংরাজী ৯ই এপ্রিল (১৯৫৭). মঙ্গলবার নয়টার সময় তেরোজন শিক্ষার্থী সহ রওয়ানা হইলাম। ইঁহার মধ্যে ছিলেন দুইজন শিক্ষার্থিনী শ্রীমতী দীপ্তি সেনগুপ্তা ও শ্রীমতী নীলিমা সেন। পথে হাবড়া থানা হইতে বড় দারোগাবাবু চণ্ডীদাস ঘটক মহাশয়কে তুলিয়া লইলাম।

অতি সুন্দর পথ। দুইদিকে বট গাছ ও আমগাছের সারি। রৌদ্রের

প্রখরতা নাই। ছায়া শীতল পথে চলিতে লাগিলাম। বারাসত হইতে বাঁ দিকের পথ ধরিয়া হরিণঘাটার পথে চলিলাম। আমাদের লক্ষ্য পথ করুণাময়ার বাড়ী। দুই দিকে আমগাছ সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। উদার বিস্তৃতমাঠ-কৃষক পল্লী। আমতলার বাজার উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম সুন্দর প্রশস্ত পিচ ঢালা পথে। মাঝে মাঝে বাস ও লরি আসা যাওয়া করিতেছে—হরিণঘাটার দুধের গাড়ী, কলিকাতা সহরে দুধের যোগান দিয়া ফিরিতেছে। এইবার বড় পথের ধারে একটি ছোট রাস্তার মোড়ে দেখিলাম—একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে আমডাঙ্গার মঠ। পথটি তেমন ভাল নয়। কাঁচা পথ। একটু যাইতেই আমরা পৌছিলাম আমডাঙ্গার মঠে—করুণাময়ী দেবীর মন্দির সন্নিকটে।

শিক্ষার্থীর দল আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা চণ্ডীবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে গেলাম দ্বিতল মন্দিরের দিকে। এই গ্রামের নাম আগে ছিল রামডাঙ্গা। এখন রার স্থলে আ হইয়া—নাম হইয়াছে আমডাঙ্গা। বোধ হয় চারিদিকে আমগাছের প্রাচুর্য দেখিয়া গ্রামবাসী নাম দিয়াছেন আমডাঙ্গা।

সম্মুখে বৃহৎ সবুজ মাঠ—বা প্রাঙ্গণ। বাঁ দিকে বৃহৎ পুষ্করিণী। ঘাট বাঁধানো। অনেকে স্নান করিতেছেন। প্রথমেই পড়িল শ্মশানে এক বিরাট বটগাছ। তার চারিদিকে বেদীর আকারে বাঁধান। তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে। বেদীর গায়ে আমডাঙ্গা মঠের কল্যাণ-কামী কয়েকজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতি ফলক রহিয়াছে। তাহার একটিতে আছে—'ভক্তকর্মী বীরেন্দ্রনাথ! নশ্বর দেহ করি পাত ৺করুণাময়ার অপার কৃপাবলে তাঁহারই চরণতলে শান্তি সুধা অবিরলে ভুঞ্জ সুখে, যাবে দীন ভক্ত সকলে। ৯ই পৌষ ১৩৪৫, আমডাঙ্গা মঠ। জন্ম ১৭ই আশ্বিন ১২৮৩। পরলোকগমন ১৬ই বৈশাখ—১৩৪৩।

চণ্ডীবাবু অগ্রণী হইলেন, আমরা তাঁহার সঙ্গী হইলাম। প্রাচীর-ঘেরা একটি প্রাঙ্গণে তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। তাহার চারিদিক বেড়িয়া সমাধি-মন্দির। বাড়ীটি দ্বিতল। দ্বিতলের উপর মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। নীচের একটি স্থানে ১০৮টি নারায়ণ শিলা প্রোথিত। তার উপর ছিল এক সাধু মোহন্তর আসন বা গদি। এখন তাহা পরিত্যক্ত। স্থানটি পরিচ্ছন্নও নয়। নীচের ঘরে মায়ের সেবক ভৃত্য ও কর্ম্মচারীরা থাকেন।

সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। প্রশস্ত বারান্দা। সম্মুখের তিনটি প্রকোষ্ঠ। সিংহাসনোপরি পাষাণময়ী চতুর্ভুজা কালী মূর্ত্তি। আমরা সকলে প্রথমে দেবীর সম্মুখস্থিত বারান্দায় বসিলাম। বাতাস বহিতেছিল, শরীর শীতল হইল, দেবীকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। দেবীর সম্মুখের দরজাটি কারুকার্য্যখচিত এবং চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত। দেয়ালের গায়ে কতজনে কত কি লিখিয়া রাখিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—ফুটন্ত ফুলের মাঝে—দেখরে মায়ের হাসি'। কেহ লিখিয়াছেন—বিশ্বের ভাণ্ডারী সে কি শুধিবেনা ঋণ, রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবেনা দিন।' কোথাও লেখা রহিয়াছে—'বেদনা যদি দাও হে প্রভু শক্তি দাও সহিবারে, হৃদয় আমার যোগ্য কর তোমার বাণী বহিবারে। ওঁ তৎসৎ', 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' কি ফুলে পূজিব মা চরণ তোমার।'

মোহন্তদের সমাধিমন্দির

আমরা চণ্ডীবাবুর সহিত বর্ত্তমান মোহন্ত গিরির ঘরে গেলাম। একটি বড় ঘর। এক পাশে তাঁর আসন। তিনি বাঙ্গালী—চণ্ডীবাবুর পরিচিত। কাজেই আমাদের পরিচয় পাইয়া পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বসিবার জন্য আসন বিছাইয়া দিলেন। মন্দিরের পূজারী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সঙ্গী শ্রীমান্ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষের উপর আমরা সকলে পূজার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিয়া ভোগ দিবার ভার দিলাম। শ্রীমান্ লাবণ্যপ্রকাশ ক্যামেরা হাতে চারি দিকের আলোক চিত্র তুলিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী মন্দিরের ও দেবীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আশ্চর্য্য রকমের। কথিত আছে এই পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺ করুণাময়ী মাতার দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মোহন্ত গিরি প্রতিষ্ঠা করেন। তারকেশ্বর মঠ সংক্রান্ত ৯২ ধারার ট্রাষ্ট সুট মোঃ ২২।১৯২২

মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট স্থিরীকৃত দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত তারকেশ্বর মণ্ডলীর অন্তর্গত মঠ সমূহের নাম এই ১। তারকেশ্বর মঠ ২। ভোট বাগান মঠ। হাওড়া ৩। আমড়াঙ্গা মঠ ৪। গুপ্তিপাড়া মঠ ৫। পুরি মঠ সন্তোষপুর ৬। দেওয়ান মঠ, সন্তোষপুর ৭। নৈনগর মঠ ৮। ভদ্রকালী মঠ বৈদ্যবাটি ৯। চাইপাই মঠ। মেদিনীপুর ১০। বেরশীপাড়া মঠ। মেদিনীপুর ১১। বড়ালী মঠ। ২৪পরগণা ১২। গড়ভবানীপুর মঠ। হুগলী ১৩। রায়াণ মঠ। হুগলী ১৪। আমড়া মঠ। হুগলী ১৫। খামারপাড়া মঠ। হুগলী ১৬। পারবাগান মঠ হুগলী।

১২ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত মঠের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া আমড়াঙ্গা মঠের সংযুক্ত হুগলী জেলায় বাঁশবেড়ে গ্রামে একটি মঠ আছে, দেবী শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ী সেখানে অধিষ্ঠিতা আছেন।

বর্ত্তমান মোহন্ত—দণ্ডীস্বামী

কে কবে শ্রীশ্রী৺করুণাময়ী মাতার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সঠিক্ ভাবে জানা যায় না। শোনা যায় রামানন্দ গিরি গোস্বামী এই মন্দিরের প্রবর্ত্তক। তাঁহার ডাকনাম ছিল রামায়েৎ গিরি। মঠে তাঁর সমাধি-মন্দির আছে। মৃত্যু শকাব্দ ১৬৭২ বাং ১১৫৭, ইংরাজী ১৭৫০।

মন্দিরের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ বৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিদিক বেড়িয়া পাশাপাশি বারোজন মোহান্তের বারোটি সমাধি মন্দির আছে। এখানে সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। নারায়ণ গিরি গোস্বামী—কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা 'ব্রহ্মনারায়ণ পরমহংস' বলিয়া অভিহিত। বাং ১১৭৩ ইংরাজী ১৭৬৫-৬৬ সালে ৯১।৬ দেবোত্তর দলিলে মোহন্ত বলিয়া অভিহিত। অম্বিকা গিরি সম্পর্কে কোন দলিল পাওয়া যায় নাই। রাজেন্দ্র গিরি নলাবিল সম্পর্কিত দলিলে লাখেরাজদার বলিয়া লিখিত। জ্ঞানানন্দ গিরি জনশ্রুতি সচ্চিদানন্দ গিরি। গুরু চেলা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। ভৈরবানন্দ গিরি ও শিবনাথ গিরির মধ্যে—ভৈরবানন্দ ছিলেন কীর্ত্তিমান মোহন্ত। তিনি ছিলেন তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারভুক্ত লোক। 'প্রাণতোষিণী' নামক বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। এখানে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। কোনটি তাহা স্থির হয় নাই। শিবনাথ গিরির সমাধি মন্দিরে খোদিত লিপি আছে। ২২৭৪ বাজেয়াপ্তির দলিলে 'সেবাইত' লিখিত। এখানকার মোহন্তদের মধ্যে অচলানন্দ গিরি ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন সাধক। তৎকালীন তারকেশ্বরের মহান্ত স্বয়ং আমড়াঙ্গায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজটীকা ললাটে পরাইয়া দিয়াছিলেন। ১২৭৪ বাজেয়াপ্তীর দলিলে লিখিত নলবল সম্পর্কিত সি রেজিষ্টারে লাখেরাজদার বলিয়া লিখিত। সরকার বাহাদুর লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিলে ইনি আপিল করিয়া লাখেরাজ সাব্যস্ত করেন। (ইংরাজী ১৮৪৩) এখানকার অন্যান্য মোহন্তদের মধ্যে শুভানন্দ গিরি। (জনশ্রুতি ইনি আত্মহত্যা করেন; দেবানন্দ গিরি ইংরাজী ১৮৮০ ১৭ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। আমড়াঙ্গার মঠে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। আনন্দানন্দ গিরির অসময়ে মৃত্যু হয়। এখানকার ইতিহাসের মধ্যে উত্তমানন্দ গিরির নাম উল্লেখযোগ্য। ইতি ১৮৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী মঠের গদি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৮, ১লা বৈশাখ হইতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ২১ বৎসরের জন্য দেবোত্তর রক্ষার জন্য ইজারা দেন। ইংরাজী ১৮৯০ সালে ২২৭৫ বাজেয়াপ্তি খাজনার দায়ে কালেক্টারীতে বিক্রয় হয়। ১৯০৮ সালে ইজারার শেষ হয় ও মঠের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সূত্রে মোহন্ত পদ শূন্য হয়। ইংরাজী ১৯২৭ সালে দৈব বলে ২২৭৫ বাজেয়াপ্তি পুনঃ উদ্ধার হয়।

একে একে মুকুন্দানন্দ গিরি ইং ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭। দেবানন্দ গিরির মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারী উত্তমানন্দের অনুগামী। তবে ইনি গদি দখল করেন। পরে উত্তমানন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে আপোষে মীমাংসা হইয়া যায় এবং মুকুন্দানন্দ গিরি মঠ অন্যায় পূর্ব্বক দখল করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ১৮৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী রেজেষ্ট্রীকৃত অর্পণনামায় উত্তমানন্দকে মঠ প্রত্যর্পণ করেন। এই সময় ১৮৮৫ সালে লাখেরাজ নলবিল সম্পত্তি সেসের দায়ে কালেক্টরীতে বিক্রয় হয়।

এদিকে মুকুন্দানন্দের শিষ্য গোকুলানন্দ গিরি মঠের মোহন্তের পদ দাবী করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে এক রেজেষ্ট্রী কৃত অর্পণনামা দ্বারা ভোটবাগান মঠের মোহন্ত ওমরাও গিরিকে আমড়াঙ্গা মঠ লিখিয়া দেন। ভোটবাগান মঠের মোহন্ত ওমরাও গিরির ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার কোনও শিষ্য ছিল

মঠ ইজারাদারের দখলে ছিল। ইংরাজী ১৯০৫ সালে তারকেশ্বর মণ্ডলীর দ্বারা ত্রিলোকগিরি ভোটবাগানে মোহন্ত হন। আমডাঙ্গা মঠের ইজারাদারের ২১ বৎসরের মেয়াদ ১৯০৮ মার্চ মাসে শেষ হইলে ইনি মঠ বলিতে ভগ্ন স্তূপ মাত্র দখল করেন ও ১৯৩৫ সালে ইহার বিরুদ্ধে ৯২ ধারার ২০ নং ট্রাষ্ট সুট হাওড়া জজকোর্টে দায়ের হয়। ১৯৮৬ ১লা মার্চ ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ঐ মোকদ্দমা বিচারাধীন। সংক্ষেপে বর্ত্তমান মোহন্তের নিকট যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা বলিলাম।

যে দ্বাদশটি সমাধি মন্দির দেখিলাম—পূর্ব্বোক্ত মোহন্তদের কোন কোন মন্দিরে মৃত্যুর তারিখ খোদিত আছে। মন্দিরের ভিতরে আছেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দির শোভিত প্রাঙ্গণের পর একটি ছোট দ্বার দিয়া আবার একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ছোট একটি চত্বর। একটি মন্দির আছে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মা করুণাময়ীর ভিতরের মন্দির বলিয়া পরিচিত। নিয়মিত পূজা হয়। তার পাশে ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান। নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। সাধান স্থান। পঞ্চমুণ্ডীর আসন সম্বন্ধে স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে শীতকালে দারুণ শীতের মধ্যেও নিমগ্ন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া যদি কেহ জপ করেন তবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া যায়। গায়ের উপর দিয়া সাপ চলিয়া যায়। সাপ, শৃগাল, কাক, চণ্ডালের মাথা ও একটা নারায়ণশিলা প্রোথিত করিয়া হয় পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরী, এবিষয়ে ভিন্ন মত ও আছে।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া করুণাময়ীর মন্দিরের প্রাঙ্গণ এবং চারিদিকের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিলাম। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিত ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ শ্মশান সংলগ্ন একটি বিরাট বট গাছের ডালে ও ঝুরিতে উঠিয়া বসিলেন।

কেহবা ছুটিলেন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে—ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কেহ ভাঁড়ে করিয়া চা আনিয়া সকলকে চা পানের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীমান্ লাবণ্যনিকাশ ঘোষ ছবির পর ছবি তুলিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম এক পাশের একটি ছোট মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। চণ্ডীবাবু বলিলেন, শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তিও তাঁহার গায়ের বহু মূল্যবান অলঙ্কার সহ নাকি একবার চুরি হইয়াছিল।

বড় রাস্তা হইতে দূরে আমডাঙ্গার মঠের তরুলতা বেষ্টিত, নারিকেল, আম, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ গাছের শোভা, পল্লীর সংকীর্ণ পথের পাশে বেণু বন, নানা পাখীর গানে মুখরিত ছায়া শীতল প্রদেশটি আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। চণ্ডীবাবু অনেকদিন এখানকার বড় দারোগা ছিলেন, কাজেই স্থানীয় নানাতথ্য পরিবেশন করিলেন।

বেলা বাড়িতে লাগিল। আমাদের এইবার ফিরিবার পালা। বর্ত্তমান মোহন্ত দণ্ডীস্বামী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। বায়ের ধারে ভরা মরাই, ভাণ্ডার ঘর, পূজারির থাকিবার স্থান সব একে একে দেখাইয়া দিলেন। তিনি আমাদের কাছে মন্দির সম্পর্কিত নানা কথা ৺করুণাময়ীর দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তির জন্য যে মামলা মোকদ্দমা চলিতে সেকথা বলিলেন।

আমার একটা প্রশ্ন মনে হইতেছিল—কে এই করুণাময়ী প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন? কত বৎসরের প্রাচীনা এই দেবী, কে ই নাম দিলেন করুণাময়ী, সে ইতিহাস বর্ত্তমান মোহন্ত ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না। বলিলেন ৪০০।৫০০ বৎসরের প্রাচীনা এই মূর্ত্তি সে ইতিহাস জানিতে পারি নাই। শুনিলাম কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। দশনামী সম্প্রদায় গিরি উপাধিধারি সকলেই শৈব। তাঁহারা কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন কেন? রামানন্দ গিরি বা রমায়েৎ গিরি নাম 'প্রবর্ত্তক' হিসাবে জানিতে পারিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে

দত্তপুকুরের মন্দির

পলাশীর যুদ্ধের সাত বৎসর পূর্ব্বে। বাংলা ১১৫৭, শকাব্দ ১৬৭২, এই হিসাব ধরিয়া যদি দেবীর প্রতিষ্ঠার সময় নির্ণয় করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা দুই শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে রামায়েৎ গিরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি, অবশ্য যদি তিনিই দেবী মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এ বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এখানকার মোহন্তদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী ছিলেন। ভৈরবানন্দ গিরি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। সে পরিচয় আগেই দিয়াছি। একথাও সত্য যে গিরি সম্প্রদায়ের মোহন্তরাই এই মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব ভার বরাবর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান মোহন্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শ্যামনগরের অধিবাসী। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগে কাজ করিতেন। ইঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ইত্যাদি সবই আছেন। বিপত্নীক

হইবার কিছু দিন পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমানে এখানকার মোহন্তরূপে আছেন। করুণাময়ীর দেবোত্তর ইত্যাদি নানা মোকদ্দমা সম্পর্কে ইনি প্রায়শঃই কলিকাতা যাতায়াত করেন।

আমাদের সঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীরা আসিয়াছিলেন,—তাঁহারা হইতেছেন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীরবিদাস সাহারায়, শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী দীপ্তি সেন, শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত (সহকারী অধিকর্ত্তা) শ্রীসত্যকুমার নাগ, শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ আচার্য্য, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য (শিল্পী) প্রভৃতি এবং হাবড়া থানার বড় দারোগা শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঘটকও ছিলেন। শ্রীমান মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অনুপস্থিত।

আমরা বেলা বারোটার সময় আমডাঙ্গা শ্রীশ্রীকরুণাময়ীর মন্দির হইতে বিদায় লইলাম এবং বারাসতে পৌঁছিয়া শ্রীমান হরেন ঘোষের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং চণ্ডীদাসবাবুর সমর্থনে, চৌমাথার কোণে অবস্থিত করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসিয়া—ডাবের জল, বারাসতের বিখ্যাত মিষ্টি লেক্কা প্রভৃতি খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। বাণীপুর আমাদের সাহিত্য কর্ম্মশালায় যার যার নির্দ্দিষ্ট আবাসে।

জনশ্রুতি এই যে বহুদিন পূর্ব্বে এই অরণ্য সঙ্কুল স্থানে দেবী করুণাময়ী ছিলেন ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিতা নররক্ত পিপাসিনী ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি। এ ইতিহাসের বা জনশ্রুতির মূলে কতটা সত্য আছে জানি না। যদি কেহ করুণাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানেন ও বলিতে পারেন তবে উপকৃত হইব।

পথে দত্তপুকুর নামক প্রসিদ্ধ পল্লীর বাজারে দেখিলাম তিনটি মন্দির। মধ্যে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্মশানের উপরে স্থাপিত এই মন্দির। মন্দির শীর্ষে খোদিত লিপি আছে। দুইটি মন্দিরই দুই শত বৎসরের উপর। খোদিত লিপি হইতে জানা যায় একটির প্রতিষ্ঠা কাল ১৬৫৬ শকাব্দ, অন্যটি ১৬৬৭। মন্দির দুইটি অযত্নে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। কে আর রক্ষা করিবে। ধীরে ধীরে একদিন প্রকৃতির আক্রমণে আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে।

আমাদের এই সাহিত্য কর্ম্মশালার দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের বয়স্ক শিক্ষার প্রধান পরিচালক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন রায়, ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শান্তিনিকেতনের সমীরেন্দ্রনাথ, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি আমাদের কর্ম্মশালায় আসিয়া নানা বিষয়ে ভাষণ দানে শিক্ষার্থীদের ও আমাদের আনন্দদান করিয়া গিয়াছেন। পরিসমাপ্তি উৎসবে—শিক্ষা সচিব ডাক্তার ধীরেন্দ্রমোহন, শ্রীযুক্ত প্রমথ সেন ও শ্রীযুক্ত বি, সি, নিয়োগী প্রভৃতির উপস্থিতিতে উৎসব অতি সুন্দরভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। তারপর আমাদের সাহিত্য কর্ম্মশালার কর্ম্মশেষ হইল। ইংরাজী ১২ই এপ্রিল ২৯শে চৈত্র, শুক্রবার।

‘পূরবী’র লীলাসঙ্গিনী

অলোক রায়

রোমান্টিক কবি মাত্রেই 'কল্পনাকে তাঁর সঙ্গিনী রূপে ভেবেছেন। মধুসূদনের মত ক্লাসিক কবিও মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনাতে কল্পনাকে আবাহন করেছেন। আসলে কল্পনাই হচ্ছে রোমান্টিক কবির প্রেরণা।* এই কল্পনা সুন্দরীর সহায়তা ব্যতীত কবির পক্ষে কাব্যরচনা অসম্ভব, তাই অধিকাংশ কবিই তাঁদের এই প্রেরণা দাতৃকে কাব্যসৃষ্টির নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে দেখেছেন। যদিও বিভিন্ন কবির বিভিন্ন মানস পরিমণ্ডলে এই প্রেরণাদাতৃশক্তিটি নানারূপে প্রকাশ পেয়েছেন।। বিহারীলালের কাব্যের সারদা হচ্ছেন এই নিয়ন্ত্রীশক্তি। ইনিই রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিজীবনে প্রতিটি ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যেরও রীতিবদল হয়েছে। সেই জন্যই 'মানসসুন্দরী'তে কবির মানসী প্রিয়াকে যতখানি উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, উর্ব্বশী কিম্বা বিজয়িনী কবিতায় সেই প্রেরণাদায়িনী শক্তি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী রূপেও ততখানি উপলব্ধি নিবিড় রূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আবার জীবনদেবতা' কবিতায় এই শক্তির ওপর কিছুটা দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে—প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ যাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন —"The presiding deity of the poets life, the inner self of the poet'। আবার 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য'তে এই নিয়ন্ত্রী শক্তিই বিশ্বদেবতার রূপ নিয়েছেন এবং কবি তার ওপর যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছেন।

'স্মরণ' কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলি যদিও কবির স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করেই লেখা তাহলেও তার মধ্যে ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়েও থাকে মানবমানবীর শাশ্বত প্রেমকথা অনেক সমালোচকের মতই 'স্মরণে'র কবিতা-

---

* Imagination is the inspiration to the Romantic poets' Hertford.

† 'Poetic fancy'-Shakespeare.
'Vision and faculty devine'—Wordsworth.

কবির ব্যথা সুনিবিড় ব্যক্তিগত পার্থিব প্রেম-উপলব্ধির কথা। সেই সমালোচকেরা এও বলেন যে, 'শেষ সপ্তকে'র প্রেমের কবিতাগুলি (সেই অপূর্ব প্রথম কবিতাটি 'হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণকরে') এবং আরও পরবর্তীকালের শ্যামলী পুণশ্চ বিচিত্রিতার প্রেমের কবিতা-গুলিও মর্ত্ত্য-প্রেমের কথাতেই পূর্ণ। এবং কবির শেষের দিকের কাব্যে এই প্রেমই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। (পরিশোধে'র 'পত্রলেখা, 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী', 'পুণশ্চে'র 'ক্যামেলিয়া', বীথিকা'র পাঠিকা' 'নিমন্ত্রণ', শ্যামলী'র 'হঠাৎ দেখা', 'আকাশ প্রদীপে'র 'শ্যামা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়)।

'পূরবী'র লীলাসঙ্গিনী আর একটি দিক—তিনিও কবির প্রেরণা-দায়িনী শক্তি—এই লীলাসঙ্গিনীই এখানে আবার তাঁকে 'আহ্বান' জানিয়েছেন, নবতর জীবনের পথে—'দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার অঙ্গুলি পরশ' (আহ্বান) স্পষ্টই সেই 'চিত্রা'র 'জীবন-দেবতা'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু 'পূরবী'র মধ্যে না আছে 'জীবনদেবতা'র দেবত্ব, না আছে 'বিশ্বদেবতা'র আধ্যাত্মতত্ত্ব। এই লীলাসঙ্গিনী'কে প্রথম নাথ বিশী ব্যাখ্যা করেছেন—প্রকৃতি, নারী ও শিশুর সমন্বয়ে গড়া নতুন এক সৃষ্টি প্রেরণা রূপে। কিন্তু ভুললে চলবে না বিচিত্রের মধ্যেও কবি সবসময়েই সেই একের বাণী শুনতে পান। তাই লীলাসঙ্গিনী' কবিতার মধ্যে বারবার পুরনো দিনের কথার উল্লেখ আছে, সমগ্র 'পুরবী' কাব্যেরই মূলসুর—স্মৃতির ঢেউ কবির মানসতটে এসে আছড়ে পড়েছে।

> 'দুয়ার বাহিরে যেমন চাহিরে
> মনে হয় যেন চিনি,—
> কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
> ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
> কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে
> মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
> ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
> বাজাইলে কিঙ্কিনী।
> বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
> আলোতে তোমারে চিনি।'

এই যে সঙ্গিনী তাঁর সঙ্গে কবি লীলাই করতে চেয়েছেন, এবং কবিতাটির মধ্যে বারবার উল্লেখ করেছেন 'কাজ ভোলাবারে ফের বারে বারে কাজের কক্ষকোণে।" লীলাসঙ্গিনী কবিতাটির মধ্যে পুরণো স্মৃতির সঙ্গে নতুন আনন্দের বিস্ময়ই প্রধান হয়েছে। এতে প্রেমের নিবিড়তা একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যখন 'বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীন' তখন 'লীলা সঙ্গিনী'কে আবার ফিরে পাওয়ার আনন্দ, কবিকে যদিও শেষ-সপ্তকে'র অনুরূপ প্রেমের কবিতার মত শান্ত স্নিগ্ধ উপলব্ধির গভীরতা দেয়নি, তবুও প্রেমের স্বরূপ যে উভয় কাব্যেই এই ক্ষেত্রে অনেকাংশে সমগোত্রের তা এই উদ্ধৃতাংশটি থেকে বোঝা যাবে—

> 'সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
> ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
> সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
> বেজে উঠল কালের বীণায়
> প্রসারিত হল আগামী জন্ম জন্মান্তরে।
> সেই মুহূর্তে আমার আমি
> তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
> পেল নিঃসীমতা।' (শেষসপ্তক-নং ১৪)

'লীলাসঙ্গিনী'কে আমরা প্রেমের কবিতা বলারই পক্ষপাতী। এই প্রেম প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, এমনকি 'সাবিত্রী'র সঙ্গেও বলা যেতে পারে। কিন্তু 'লীলাসঙ্গিনী' সম্পূর্ণ রূপে কবির পূর্বজীবনের 'মানসী' বা 'মানস-সুন্দরী' বা 'স্বপ্নমালবিকা' (কল্পনা) বা 'বধাভিসারিকা' (ক্ষণিকা) বা 'স্মৃতি অবগাহিনা' (উৎসগ) বা এমনকি 'বলাকা'র 'চঞ্চলাবৈরাগিনী'র সঙ্গে একগোত্রের নয়। 'লীলাসঙ্গিনী'র মধ্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই কবির পূর্বজীবনের প্রিয়তমার আভাস এসে গেছে,—কিন্তু লীলাসঙ্গিনী' এদেরই নবতর আর একটি রূপকল্প। 'লীলা-সঙ্গিনী'র মধ্যে একটা সমন্বয় দেখা গেছে—এখানে একের মধ্যে বিচিত্রের বাণী শোনা গেছে।

'লীলাসঙ্গিনী'কে আমরা তাই 'জীবনদেবতা'র একটি নবতর রূপ-কল্পও বলতে পারি। কিন্তু 'লীলাসঙ্গিনী' আর 'জীবনদেবতা' † এক নয়। যে 'কল্পনাসুন্দরী' বা কবির কাব্য প্রেরণাদাতৃ মানসী কবির জীবনে বারবার এসেছেন, এবং যাঁকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টির কথা ভাবতেই পারেন নি, সেই 'The Presiding deity of the poets life' 'লীলাসঙ্গিনী'র মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এখানে কবির মর্ত্ত্যপ্রীতির ফলে বা 'মাটির ডাকে'র উত্তরে কবি মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছেন, বলেছেন—

> "এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
> এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘটভরেছি নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
> পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
> এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়
> তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নতুন প্রাতের আশায়।'

বলাবাহুল্য কবির এই কান্নাসির গঙ্গা যমুনায় ডুব দেবার ইচ্ছা এবং ধুলোমাটি হাওয়া জল-এর প্রতি অসঙ্গ 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিকে ব্যাপ্য করে করে দিচ্ছে। ঠিক এই সুরটি জীবনদেবতায় নেই।

* রবীন্দ্রনাথের 'পুরবী' : অধ্যাপক অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়।

† 'জীবনদেবতা'কে কবি 'প্রাণেশ' 'জীবন নাথ' প্রভৃতি সম্ভ্রম সূচক সম্বোধন করেছেন। শুধু তাই নয়—

> 'পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত,
> কত বারবার ফিরে গেছে নাথ'—

তার জন্তে 'ক্ষমা' প্রার্থনাও করেছেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই কবির এই 'অন্তরতমে'র ওপর কিছুটা পরিমাণে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। 'লীলাসঙ্গিনী'র সঙ্গে একই সুরের মালায় একে গাঁথতে গেলে নিশ্চয় ছন্দোপতন হবে। অন্যদিক দিয়ে যদি বলা যায় 'জীবনদেবতার সঙ্গে কবি অদ্বৈত সত্তায় এক হয়েছিলেন, তাহলে বলতে পারি লীলাসঙ্গিনী'র ক্ষেত্রে যে দ্বৈতসত্তা স্পষ্ট এবং দ্বৈত উপলব্ধি ছাড়া লীলাও অসম্ভব তাও বলা যায়।

স্বদেশীগানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

ভাস্কর বসু

॥ ১ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় জাতীয় সংগীতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি এই স্বল্পসংখ্যক গানের দ্বারাই সংগীতের ইতিহাসে দীর্ঘস্মরণীয়তা লাভ করবেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী-প্রতিভ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা প্রধানত কাব্যে এবং নাটকে। সংগীতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা প্রাগুক্ত সৃষ্টির পথে আনুকূল্য করেছে। নাটকে ইচ্ছামত সুর যোজনার স্বাধীনতায় এবং হাসির কবিতাকে গানে পরিণত করে তিনি পাঠ্য ও শ্রাব্যে পরিণয় ঘটিয়েছেন। বাঙলা দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেনি, তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভার জ্যোতির্বন্যা। দ্বিতীয় কারণ, কৃষ্ণনাগরিক দ্বিজেন্দ্রলাল মুখ্যত কাব্যলোকে হয়ে পড়েছিলেন হাসির গানের কবি এবং ব্যঙ্গকুশলী। বাঙালী জাতি পক্ষান্তরে অত্যন্ত আঘাতকাতর। বাঙলাদেশে শ্লেষশিল্পীর সমাদর অতি বিরল ঘটনা। যাঁরা সমাদৃত হয়েছেন, তাঁরাও তাঁদের শ্লেষের নৈপুণ্যে হন নি, পাঠকদের শিষ্টাচারে হয়েছেন। তবে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে ম্লান করেছে।

সংগীতস্রষ্টা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বলুপ্তি দুঃখদায়ী। বাঙলা গানকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে ঐশ্বর্যভূষিত করেছেন। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের দানের পরিমাপ করা হয়নি। একথা বলা হয়ত খুবই দুঃসাহসিক যে, কখনো কখনো গানের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে গেছে। তবে কাব্যসংগীত অপেক্ষা স্বদেশ সংগীতেই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রিত রাখবো।

॥ ২ ॥

বাঙলা গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই, উনিশ শতকের শেষ পাদে। সংগীতের সনাতন পদ্ধতি অতিক্রম করার দুঃসাহস গোড়া থেকেই তাঁর গানে বীক্ষিত হয়। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত আর্যগাথায় কোনো প্রেমের গান নেই। এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

"বঙ্গভাষায় গীতের অভাব পূরণার্থে আর্যগাথা রচিত হয় নাই। শৈশব হইতেই গীতিরচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতিরচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সে সব গীত কোনো শাস্ত্রোক্ত সুরে গীত হইত না। যখন যে সুর ভালো লাগিত, তখন সেই সুরেই গাহিতাম। আমার অধুনাতন রচিত গীতের কতকগুলি প্রচলিত গীত নিয়ম-বিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে।"

এই প্রথাবৈরিতা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বয়ংসিদ্ধ। ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রূপ সহ্য করে গিয়েছিলেন। ইউরোপীয় রীতি অবলম্বনের জন্য সংগীত সমাজেও তিনি ছিলেন অপাংক্তেয়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই বিরোধিতা ও নীরবতার ষড়্‌যন্ত্র তাঁকে নৈরাশ্যবিদ্ধ করেনি। রবীন্দ্রনাথের মত কখনো তিনি একলা চলার সান্ত্বনায় মগ্নসমাধি হন নি। দেশী সুরের সঙ্গে বিদেশী সুরের নিপুণ মিশ্রণে তিনি পারঙ্গমতা লাভ করেছিলেন। রাগমিলনেও তাঁর কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের সমস্পর্ধী। জনৈক সমালোচকের ভাষায় 'গায়ন পদ্ধতির নমনীয়তার সঙ্গে দৃঢ়তার একটা সহজ এবং সুন্দর সমন্বয়' ছিল তাঁর অনায়াসলব্ধ। রবীন্দ্রনাথ সংগীত-ব্যাকরণে কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় হয়েছে কবিমনের প্রতিভার আপন ধর্মে। রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন, মিশ্রণ যা হয়েছে, যেন হঠাৎ হ'য়ে গেছে, তার জন্য কবির কোনো সচেতন দায়িত্ব ছিল না। অর্থাৎ ব্যাকরণকে স্মরণ রেখে রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রয়োগবীক্ষা (experiment) করেন নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল গান রচনা করেছেন সংগঠনের আদর্শে, সচেতন শিল্পীরূপে। রবীন্দ্রনাথ আগে কবি, তারপর সংগীত রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-নজরুল আগে সংগীত রচয়িতা, তারপর কবি। এই প্রভেদটি মনে রাখার মত।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ; স্বাদেশিকতা এবং ধর্ম, কোনটির স্থান ঊর্ধ্বে এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় মেলে না। বিক্ষোভকে তিনি স্পর্শ করেন নি, কিন্তু বিক্ষোভ তাঁকে বিচলিত করেছিল। অথচ আন্দোলনের সাময়িকতাকে তিনি কখনো রূপদান করেন নি। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিতে সাধারণ জনচেতনার অসন্তোষের ঊর্ধ্বে একটি স্থির নিষ্ঠা—

অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত বিরাজমান। অবশ্য গানের ভাষায় তিনি প্রাচীনপন্থীই। মাতৃমূর্তির বন্দনাই তাঁর উপজীব্য। কিন্তু সেই বন্দনা প্রথাসিদ্ধ পুরাণকথিত হ'লেও ধ্যানগম্ভীর মন্ত্রগুঞ্জরণের মত। বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধ্যের তিনি যুগপৎ সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বিদেশী শিক্ষায় তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। বিদেশী গানের উচ্চমানের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অবিচলিত। কিন্তু বিদেশী আদর্শের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। বিলেত 'দেশটা মাটির'—একথা বেশ সরস সুরেই তিনি গেয়েছিলেন। প্রেমের গানও তিনি রচনা করেন, কিন্তু প্রেম অপেক্ষা প্রকৃতিই তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আর্যগাথা গ্রন্থে তাঁর স্বদেশসংগীতের অঙ্কুর দেখতে পাই—

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে
কখনো বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে।
অভূষণ শোভারাশি মাতঃ তব ভালোবাসি
চাইনা সুরম্য স্থান নানা অলংকার,
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার ॥

আর্যগাথা দ্বিজেন্দ্রলালের অপরিণত যৌবনের রচনা। কিন্তু এই বয়সেই জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা জানাবার বাহনরূপে তিনি গানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন দেখতে পাই। আর্য গাথার অন্তর্গত আর্যবীণা খণ্ডে অন্তত ৩৮টি দেশ-গৌরবী গান আছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে রচিত Lyrics of Ind গ্রন্থে তাঁর পরবর্তী জীবনের স্বদেশী সংগীতের আভাস পাওয়া যায়। এই কবিতা ইংরাজী দীর্ঘপদী বর্ণনাত্মক গানের ছন্দে রচিত। এই ছন্দস্পন্দই পরবর্তী দেশাত্মবোধক গানে-রক্ষিত হয়েছে।

The Land of the Sun.

There's a land rank and blazing into beauty
Where a radiance perpetual shines
Where Love's angels sleep pillowed in Terror,
And round Grandeur frail Loveliness twines—
Whom the year woos with tears, smiles
and whispers,
Whom the seasons with rare treasures greet:
Where Dawn blushes with fragrance and music
And the sunset is glorious and sweet.

চরণের পর চরণ এইরকম দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রূপচিত্র রচনা চলেছে। কবি কিন্তু স্বপ্নবিভোর নন।

O my land! Can I cease to adore thee
Though to gloom and to misery hurled?
O Dear Bharat! my beautiful maiden,
O Sweet Ind! once the queen of the world.

পরবর্তী যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রগীতির বাণীবিদ্ধ পূর্বাভাস পাই এই ইংরেজি গীতিকথায়। শেষ পংক্তিটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে একটি বহুশ্রুত ছত্রে—সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তাঁর গানেও গায়কের স্বাধীনতা উন্মুক্ত। নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তিনি গায়ককে সুর বিহারের অবাধ মুক্তি দিয়ে গেছেন। এই মুক্তি রবীন্দ্রগীতে নেই।

রবীন্দ্র সংগীত সমাজে এই উক্তি অবশ্য সমালোচ্য হ'তে পারে। কোনো স্রষ্টার নিজস্ব গায়নভঙ্গীর বিকৃতিকে মুক্তি বলা আমার বাঞ্ছনীয় নয়। সংগীতশাস্ত্রে গায়কের একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু সুরে স্বাধীনতার অর্থ, আমার মতে সুরকারের আত্মবিলোপ করার ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশী গানে একটি পর্দানশীল অবগুণ্ঠন তুলে বলিষ্ঠতাজ্ঞাপনের একটি সূত্র নিরূপণ করে দিয়েছিলেন। এর সুরটি মোটামুটি জেনে নিলেই হয়, তারপর গায়ক তাঁর ইচ্ছামত এর কথাকে আপন উপলব্ধির দরদে গাইবেন। রবীন্দ্রনাথের লোকসুরাশ্রিত গান-গুলিতে মাত্র এই বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য গান তান-লয় রাগের স্বরলিপি নির্দেশে যন্ত্রস্থ অবরোধে বন্দী। রবীন্দ্রনাথের গীত-বিতান নানা পুষ্প-মধুকর, লতাবাহার ও বিহঙ্গকাকলিতে পরিমুখর। কিন্তু তার চার পাশে অভিজ্ঞ মুষ্টিমেয়ের নির্দেশপ্রাপ্ত কাঁটাতার। যথা, আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে এই স্বদেশী গানটি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গান পথচলার আনন্দে পথিপার্শ্বের বনকুসুম সমাহার। আধিকারিকের ছাড়পত্রের দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'সোনার বাঙলা' রচনা করছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন 'বঙ্গ আমার জননী আমার গান রচনা করছেন। 'সোনার বাঙলা' জাতীয় গান হওয়া সত্ত্বেও একক সংগীত; এ গান মনকে উদাস করে, কর্মে চাঞ্চল্য থামিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সুর কর্মকে সজীব করে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বলিষ্ঠতার কোনো সমকক্ষ গান রবীন্দ্র গীতিমালায় একটিও আছে বলে আমার মনে হয় না। সম্ভবত এই সর্বপ্রথম বাঙলা গানে বিশুদ্ধ ইংরেজীমতে একক ও সমবেত (কোরাস) প্রথার প্রবর্তন হ'ল। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানের সমবেত অংশ 'জয় হে' অংশের কোরাস প্রথার সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গান গোড়া থেকে সমবেত সুরে গাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কোরাসের পূর্ববর্তী স্তবকে একক অংশের মূর্ছনাধারায় কোনো বিপরীত ভাবের তরঙ্গ তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের গানটি গোড়া থেকে সমবেত গাওয়া যায় না। তবে এই রীতি জাতীয়তাবোধক উত্তেজনামূলক গানেই ব্যবহার্য হয়েছে, যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল একক ও সমবেত গীতিরীতি সমস্ত শ্রেণীর গানেই চালাতে চেয়েছিলেন। প্রেম বা প্রকৃতিবিষয়ক গানে এই পদ্ধতি চলেনি। এই রীতির উত্তর-কালীন ব্যবহার দেখতে পাই নজরুলের জাতীয় গানে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু এই পদে। এই বিখ্যাত গানের এই অংশটুকু সমবেত কণ্ঠে গীত।

সুর বিষয়ক আরো কয়েকটি কথার আলোচনা করা যাক। সাধারণের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন আছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি একেবারে ইংরেজি সুরের নকল। ইংরেজি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের পারদর্শিতা ছিল এবং ইংরেজি সুরের ব্যবহারেও তিনি পটুতা দেখিয়েছেন। কোরাস পদ্ধতি তার অন্যতম। কিন্তু যে কয়েকটি গান সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত, সেই কয়টি গানের কাঠামো সম্পূর্ণ দেশী সুরের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির রাগ মিশ্র ঝিঁঝিট, তাল একতালা। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির সুর 'ইমন ভূপালী; 'বঙ্গভাষার প্রতি' গানটি ইমন কল্যাণ। রবীন্দ্রসাময়িক ও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী স্বদেশী গানে খাম্বাজ রাগের অত্যধিক আধিপত্য দ্বিজেন্দ্রলাল মেনে নেননি। এখানেও তিনি সহজ সুরের একটি অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

॥ ৫ ॥

'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গানটি আমার মতে, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ গান এবং শ্রেষ্ঠ দশটি স্বদেশী গীতের অন্যতম। এই গানে গতানুগতিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মাতৃভূমির ভৌগোলিক মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু অপরিসীম কাব্যমূল্যে ও সুগভীর দরদচেতনায় এই গানের তুলনা নেই। কেবলমাত্র ভাষার জন্যও অন্তত গানটি স্মরণ করা যায়—

ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।

এই রচনায় বাস্তবের উপর আদর্শের অধ্যাস (illusion) আরোপিত হয়েছে। স্বপ্নসৃষ্ট স্মৃতিসীমায়িত চিন্ময় মাতৃভূমির এই রূপকল্প ভাবস্থির চিত্তপটে একটি জননান্তর সৌহার্দের পর্যাকুলতা জাগায়। উত্তেজনা আছে অথচ সংযমহানি নেই, আবেগে কম্পিত, কিন্তু বেগে বিক্ষুব্ধ নয়। দেশের প্রতি অটুট ভালোবাসার উষ্ণতা এই গান যে-কোনো দেশ-প্রেমিকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। যখন কবি বলেন

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

তখন সুর কথাকে অতিক্রম ক'রে প্রতিকার বলিষ্ঠতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।' 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—গানে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদবো নয়ন শেষে।

একই ভাব, কিন্তু একটি প্রতিকার-অবিচল নিষ্ঠায় দুর্মর, আর একটি বাসনার অন্তিম ইচ্ছায় মৃদুমধুর। উভয় গীতিকারের পার্থক্য এই পংক্তি মিথুনেই সহজগোচর।

॥ ৬ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল সৌন্দর্যের যে অনুপম চিত্র এঁকেছেন তার দেশাত্মভাবিত গানে, তার তুলনাও দুর্লভ। আমরা ইতিপূর্বে 'আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হ'তে' রবীন্দ্রনাথের এই গানে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান কল্পনার মূর্তিরূপের আগমন দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও মূর্তিরূপক নেই, একমাত্র গানই তার ব্যতিক্রম। কিন্তু কথাটা স্পষ্টভাবে ভেবে দেখা যাক। Image বা চিত্রকল্প ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের সীমা কতখানি? 'আমার সোনার বাঙলা' গানে বাঙলাকে মা সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বোধন একান্ত গতানুগতিক। মাতার রূপগ্রাহ্য চিত্রকল্প এতে ফোটেনি। abstract ভাবের আতিশয্যে এই চিত্রকল্প দ্বিধান্বিত। জাগায় না। এক স্থানে আছে, 'কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে'—এই আঁচল শব্দ সত্ত্বেও দেহের পূর্ণ প্রতীক এলো না। 'দিন ফুরালে সন্ধ্যা-কালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে' চকিত একটি পংক্তি মাত্র। 'বাঙলা দেশের হৃদয় হতে' গানে যে মাকে দেখে কবির আঁখি ফেরে না, তাকেও ভালোভাবে দেখাতে পারেননি কবি। ডান হাতে খড়্গ এবং বাঁ-হাতে শঙ্কাহরণ, ললাট নেত্রে অগ্নিরেখা—তাকে দেবীপ্রতিমার কাছাকাছি নিয়ে গেছে; 'দুই নয়নে স্নেহের হাসি'—এই ভাবটি খণ্ডিত হয়েছে। 'মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি' একান্ত ইন্দ্রিয়লক্ষ্য, অথচ 'আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী' পুনশ্চ অতীন্দ্রিয়। একে মাতার অপরূপ রূপ-বর্ণনা বলা যায় না। এ যেন কবির আপন মনের পরস্পর বিপরীত ভাবের কতকগুলি উপলব্ধি মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দেহময় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপবর্ণনা অত্যন্ত অসার্থক। একথা নিন্দাচ্ছলে বলা নয়, সমালোচনা প্রসঙ্গ মাত্র। সংগীতে তুলনামূলক সমালোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইবার পূর্বোক্ত আলোচনার পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' কবিতায় মাতৃমূর্তির 'মহিমা' প্রত্যক্ষ করি। এ মূর্তি কদাচ বিদেহী নয়, একান্তভাবে প্রত্যক্ষকল্প ধ্যানধৃত হ'য়েও বস্তুরূপায়ন। সুনীল জলধির বুক থেকে জননী ভারতবর্ষ উদিত হয়েছে, কবি সেইরূপকে বাঙ্ময় করেছেন—

সদ্যঃ স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত।
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গর্জে জলদমন্দ্র॥

রবীন্দ্রনাথের 'আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হ'তে গানেই মাতৃমূর্তির বিপ্রতীপ রূপটি কত অস্পষ্ট। তার চিত্রকল্পগুলির বাচ্যার্থ অর্থান্তরে সংক্রামিত হয়নি। 'দুই নয়নে স্নেহের হাসি' ও 'ললাটনেত্র আগুনবরণ' অথবা মাতার বজ্রকেশরী ও রৌদ্রমেখলা রূপ কোনো অভিনব বাঞ্ছনীয় সমৃদ্ধ নয়। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের দুটি ছত্র দেখা যাক—

কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্তমরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামলশস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

এর ভাষায় ইঙ্গিতধর্মিতার রসলোক এক cosmic imagination সৃষ্টি করেছে।

॥ ৭ ॥

আন্দোলন-কেন্দ্রিক গানের মূল্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে? আন্দোলনের দুটি চরিত্র, একটি তার সাময়িকতা ও অপরটি তার উদ্দীপনা। উদ্দীপনা আন্দোলনের স্থায়ী ভাব। সাময়িকতা তার সঞ্চারী ভাব। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে গান রচনা ক'রেছিলেন সেগুলির কয়েকটি তাদের দেশকালের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে। আমার সোনার বাঙলা গানের সমাপ্তি স্তবকটি এইরূপ—

ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে

সন্তর্পণে সমকালকে অতিক্রম করলেও, এ গানে বিদেশী বস্ত্র বর্জন-আন্দোলনের আবহ আছে। এই ছত্রটিই তার ব্যাপকতার অন্তরায়। কিন্তু আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হতে, 'সার্থক জনম আমার', 'ও আমার দেশের মাটি—গানে এই ত্রুটি নেই। বস্তুত আন্দোলনের যে উদ্দীপনা, যে উজ্জীবনচারিত্র্য, তা কোনো দেশকালের সঙ্গে জড়িত নয়। নয় বলেই ইক্‌বালের প্রমত্ততাকে নজরুল আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়াবাসী যে গান গেয়ে গৃহযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার সুর পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপকে প্রবুদ্ধ উদ্‌বেজিত করেছে। জনৈক সংগীত-সমালোচক এই উদ্দীপনার নাম দিয়েছেন, romantic echoes of revolutionary tumult—মহাযুদ্ধকালীন সুরকার Scriabin-এর রাশিয়ান স্বদেশী গীত Poem of Ecstasy'র প্রয়োগ নৈপুণ্য ইংলণ্ডের সুরকারদের মুগ্ধ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সুরের এই সত্যকার প্রাণমর্মর বেজেছে—যাকে বলা যায়, বৈপ্লবিক অভিঘাতের রোমান্টিক ধ্বনি। বৎসরাধিক পূর্বে কলকাতার কোনো রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েট সাংস্কৃতিক দলের কণ্ঠে গীত 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গান শুনে আমার এই মত আরো দৃঢ় হয়েছে।

॥ ৮ ॥

কাব্য অপেক্ষা মুখ্যত সংগীত এবং দ্বিতীয়ত নাটকের মধ্যে দিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতভূমির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। চাকুরি জীবনে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদেরই দেশীয় সহায়ক। কিন্তু প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক খুব বেশি দাক্ষিণ্যসাশ্রিত ছিল না। প্রতাপসিংহ নাটক রচনার জন্য তাঁকে রাজমুকুটের বিরাগভাজন হ'তে হয়েছিল—এ কথাও সুবিদিত। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর তাঁকে বাঙলার বাইরে বদলি ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গভাষা-প্রীতি তাতে কমেনি। দুর্গাদাস, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত তার প্রমাণ। বাঙলার প্রতি উৎসর্গিত তাঁর শ্রেষ্ঠ গানগুলি বাঙলার বাইরেই মুকুলিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের দেশবন্দনা এত স্বরিত-উদাত্ত এবং আন্তরিক, যা রবীন্দ্রনাথে দেখিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচীন কীর্তিতে শ্রদ্ধিত, কিন্তু বর্তমান-বিমুখ রক্ষণশীল ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক নাটকের গানগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয় রাগ ইমনভূপালী এর ভিত্তি :

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী   গর্জে সিন্ধু চলিছে তরণী,
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী   ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ মা ওঠ মা দেখ মা চাহি   এই ত' এসেছি আর চিন্তা নাহি,
জননী হীনা কন্যা দীনা   ওঠ মা ওঠ মা প্রদীপটি ধর॥

এ গান যারা শুনেছেন একমাত্র তারাই অনুভব করতে পারবেন, কথা ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণে এ গান দেহের রক্তে কেমন ক'রে শিহরণ জাগাতে পারে। ঠিক এই কারণে নাটকের গান হওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত গানখানির রোমান্টিক ধ্বনি একে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে—

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কী সংগীত ভেসে আসে,
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে॥
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা
হেথা নাইক' মৃত্যু নাইক' জরা
হেথা বাতাস গীতি গন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে।
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে॥
কেন কারাগৃহে আছিস বদ্ধ
ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ
ওরে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালোবাসে,
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে॥

এ গান কি স্বদেশী সংগীত? স্বদেশী যুগের সভায় আন্দোলকদের কণ্ঠে এ গান বহুবার শুনেছি, এ হ'ল বাস্তব সাক্ষ্য। তাছাড়া বঙ্গ বা ভারত শব্দের উপস্থিতিই দেশাত্মবোধের একমাত্র পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তমুকুরে স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি ও স্মৃতি-দিয়ে-ঘেরা দেশের যে অনির্বচনীয় ভাবরূপ ছিল, এ গানে তারই প্রতিফলন পড়েছে।

॥ ৯ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ও হাসির গান দুই কোটিক। একটি যুক্ত ব্যঞ্জনের উত্থান পতনে মণ্ডিত, ধ্বনি-প্রধান ছন্দে বিলম্বিত, ধনগম্ভীর ভঙ্গীতে মন্ত্রবৎ! আর একটি শ্বাসাঘাত-প্রধান শব্দে বলবৃত্ত, ছড়ার ছন্দে দ্রুত, লঘুকৌতুকে অম্ল বা বিদ্রূপে শাণিত। দেশী সুরে accent ও movement এর স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল, এই সত্য জনৈক রবীন্দ্র-সংগীত-সমালোচক মানতে চাননি; কিন্তু ঘটনাটি সত্য। আকস্মিক সূত্রপাত আর সচেতন প্রবর্তনা এক কথা নয়। প্রথমটি রাবীন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি দ্বিজেন্দ্রলালের। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানে হাসির গানও স্বদেশী গানে মিলন হয়েছে। এ গানকে স্বদেশী গান বলতে বাধা নেই। আর দেশবাসীও দেশের জন্য কবির এই কামনা যখন আজো অপূর্ণ, তখন সাময়িকতা দিয়েও একে তুচ্ছ করা চলে না—

কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের পরে কেন এ রোষ নিজেরা যদি শত্রু হোস,
তোদের এ যে নিজেরই দোষ আবার তোরা মানুষ হ'
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।

স্বাধীনতার উত্তেজিত বাসনা এখানে যেন স্তিমিত হয়েছে। বস্তুত দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা না থাকলে কেবল গান দিয়ে কোনো আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এ সত্য রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই অসহযোগ আন্দোলনের পর তিনি কোনো স্বদেশী গান লেখেনি। এ সত্য দ্বিজেন্দ্রলালও বুঝলেন। এই চরম সত্য অতুলপ্রসাদও বুঝেছিলেন। তার প্রমাণ এই কয়েকটি ছত্র—

পরের শিকল ভাঙিস পরে নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই
আপন কারায় বদ্ধ তোরা পরের কারার বন্দী তাই।

সংগীত দয়ে সাহিত্য দিয়ে আন্দোলনকে দূর থেকে প্রেরণা দেবার এই প্রয়াস বাঙালী জাতির ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্তে ব্যাহত হয়ে গেছে। আমাদের স্বদেশী গানগুলি এইদিক দিয়ে তার সমস্ত উদ্বেগ উদ্দীপনা ব্যাকুলতা-স্বপ্নসম্ভাবনা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ। 'আবার তোরা মানুষ হ' গানেরও একমাত্র ত্রুটি কবির আত্মস্বাতন্ত্র্য। কবি নিজেকে দূরে রেখে উপদেশ দিয়েছেন। তা মানতে আমরা বাধ্য নই। পরশ্রী-কাতরতা আমাদের গুণ হ'তে পারে, কিন্তু আত্মসমালোচনা আমাদের ধর্ম নয়। সত্যচ্ছলে অপ্রিয় বললেই যে তাকে সমাদর করবো বাঙালী এতে বিশ্বাস করে না। সত্যভাষণের এই সর্বনাশা অভ্যাস পরিত্যাগ করলে সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে এত তাড়াতাড়ি বিচ্যুত হতেন না।

॥ ১০ ॥

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত করেছেন, কিন্তু বাঙলা ভাষার উপর তাঁর কোনো গান নেই। নিধুবাবুর 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' এই ধারার আদি রচনা। অতুলপ্রসাদ আরো পরবর্তীকালে 'মোদের গরব মোদের আশা' রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'বঙ্গভাষার প্রতি' একটি গান রচনা করেছিলেন, আমাদের পরম দুর্ভাগ্য তাকে আমরা ভুলে গেছি। এর কয়েকটি চরণ—

নয়নে বয়েছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন সুধা।
মরুভূমে সম যখন তৃষায় আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।
(কোরাস) জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান॥

কিন্তু এতখানি আন্তরিকতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষার কমলচরণে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নি। এর কারণ অনেক। সংগীতে তাঁর প্রতিষ্ঠার কারণগুলি আংশিক বলা যায়। ১) দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো স্কুল তৈরি ক'রে যান নি, বিশিষ্ট শিক্ষা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর গানকে প্রচারিত করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেন নি। ২) রবীন্দ্রনাথের সংগীতের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য আমাদের অভিভূত করে রেখেছে। তাঁর গানগুলি দীর্ঘদিনের সাহচর্যে আমাদের সহজেই কণ্ঠস্থ হয় এবং তার গীতরূপ আমাদের আয়ত্তগত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা না থাকলে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংগীত আয়ত্তে আনা কঠিন। ৩) দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপির সুপ্রচার ঘটেনি। ৪) দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ক্রমশ থিয়েটারী ঢঙে পরিণত হওয়ায় যাত্রা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির প্রেরণাদায়ক একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। এক দিক দিয়ে এই জনপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে অসামান্য গর্বের কথা, কারণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তার একঘেয়েমির দায়িত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। সতেরো-আঠেরো শতকে ইউরোপীয় গানের ইতিহাসে Vandevilie গানের পরিণতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পুনরুদ্ধার করা কি আমাদের দায়িত্ব নয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কষ্টকর। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঁচে থাকলে সম্ভবত এই আশা করতেন না। বলতেন, গিয়েছে গান দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'। অতএব একই অপরাধে দ্বিজেন্দ্রলাল আবার বহুদিনের জন্য বাঙালীর মনোজগৎ থেকে নির্বাসিত হতেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে, সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

সৌরভাশ্রিতা

সনতকুমার মিত্র

এটুকু নিয়োনা কেড়ে। নিশ্চিহ্ন কোরোনা একেবারে
তাকে এই মন থেকে। থাক আগ্ মনের আধারে
সৌরভও টুকু তার। সব স্মৃতি গেছে তার ঝ'রে।
যাক! তবু কিছু থাক। এটুকু এখানে
থাক পড়ে।

সে না হয় খেলা শেষে, ফেলে রেখে ছেঁড়া স্মৃতিগুলো,—
পা মেপে হেঁটেই গেছে ছড়িয়ে ধসর ধূ ধূ ধূলো
প্রান্তরে—অঙ্গনে—মনে, দিন শেষে সবিতার মত
কথার শায়কে ছুঁড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া আলোময় ক্ষত
অন্তলোকে; তবু—তবু যেটুকু পেয়েছি আমি তার
তাই নিয়ে গেয়ে যাব এই লোকে বসন্ত বাহার।
সব গেছে। সব যাক। আজও তবু তার সৌরভে
যেটুকু ছড়ানো আছে অন্ততঃ অন্তে ত এই রবে
এই শিখা জ্বেলে রেখে হেঁটে যাব সাগরের পারে

নটেশাক

সমীর মুখোপাধ্যায়

মন এখন তালপাতার এক বাঁশী নয়। শুকনো খড়। বাতাস বইলে তাতে খস্ খস্ করে শব্দ হয়।

ভালোবাসা আর নটেশাক—আয়ু আড়াই মাস মাত্র।

ওসব ফরসা এখন। তাছাড়া শিকের মাছ বেরালের হারাম। লীলা এখন পরের ঘরণী, তার কথা ভাবাও পাপ।

এছাড়াও গণ্ডাতিনেক 'তাছাড়া' আছে।

একসময় ভালোবাসার আগুন জ্বলে জ্বলে এতো আবেগের কয়লা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়েছে যে বিরক্তি আর অবসাদের ধোঁয়ায় মন এখন আচ্ছন্ন। মাত্র বছর দুয়েক লীলা এখানে নেই। ভিনদেশে সেই কালো, কর্কশ, লম্বা লোকটি—সেই মোটা মাইনে পাওয়া স্বামী নামক মালিকটির ঘর করতে গেছে।

এই বছর দুয়েকের মধ্যে লোহা আর পাথরে অনেক যুদ্ধ হয়েচে, আর আমি সোনার মত পুড়েছি। পুড়েছি তবে মরিনি।

বয়েস অল্প বলে বাপ মারা যাবেনা—এটা উচিত কথা নয়। আর বাপ মারা গেলেও, পেটে কিল মেরে উপোস দিতে থাকলেও যে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে হবে বিভক্ত বাংলা এতোখানি বেলাল্লাপনা বরদাস্ত করেনা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে নিয়ম বলে একটা বস্তু আছে তো!

তাছাড়া এই থলু সংসারে আমি শতদল ভাসাতে আসিনি, ভাগ্য নেহাৎ ভালো থাকলে শালুকের মালা জুটলেও জুটতে পারে—ভরসার মধ্যে এইটুকু।

বেশ কয়েকদিন জুতোর পেরেকগুলো ঘসে ঘসে ভোঁতা করে ফেলার পর ঐ 'শালুকের মালা' জুটে গেল। পেয়ে গেলাম 'আহামরি' একটা চাকরী। মেটের কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে লিষ্ট তৈরী করতে হবে। এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায়। সরকারী ট্রাক আসে। তাতে কপালে রুমাল বেঁধে সোজা পাশাপাশি করে দাঁড়িয়ে যেদিকে ট্রাকের দু'চক্ষু যায় সেদিকে চলে যেতে হবে।

কাজটাও নেহাৎ হেলাফেলার নয়। দস্তুর মতো দেশ সেবা। ডি, ডি, টি, পাউডার স্প্রে করতে হবে। মশা, মাছি, আরসোলা, বিছে এনারা মানুষের চেয়ে যদিও কম সাংঘাতিক, তবুও এনারা তো মশা, মাছি, আরসোলা ও বিছে। এদের ঝাঁটিয়ে বিদায় দেবার কাজটা বেশ গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করেছি আজকাল।

স্বপ্নটপ্ন দেখিনা। দিব্যি ঘুম হচ্ছে। ঢেঁকুর ঢেঁকুর—না, সে সব বালাই নেই। প্রথম দাড়ি কামাবার আনন্দ, প্রথম সিগারেট খাওয়ার উত্তেজনা, প্রথম নিষিদ্ধ বই পড়ার আবেগ—ভগবানকে ধন্যবাদ—সে সব কবে পার করে দিয়েছি।

শুনলাম, দশবারো দিন হল লীলা বাপের বাড়ি এসেছে। ওরা তো আর আমাদের ভাড়াটে বাড়িতে থাকেনা। বিয়ের পরই উঠে গেছে এখান থেকে এই বর্মাগলিরই অন্য পাড়ায়। সেইখানেই আছে বোধ হয়। বাপের বাড়ির আদর, যত্ন, সোহাগ, আহ্লাদ ভোগ করছে।

কিন্তু আশ্চর্য আমার মন!

লীলাকে দেখবার জন্য মনে মনে আর একটুয়ো ইচ্ছে নেই। অথচ এমন কিছু বেশীদিন তো নয় যখন—

কতোদিন পরও এখানে এসেছে অথচ—

ইতিমধ্যে কি করে যে মেজাজটা দরকচা মেরে গেল, কবে যে শুকিয়ে কাঁকুড় হল হৃদয়—কিছুই জানতে পারিনি। পুরানো দিনের কথা দৈবাৎ মনে এলে এখন পোড়ামুখে হাসি আসে। সে কাল গেছে বেয়ে, এঁটে কচু খেয়ে। নাঃ, আমি একটা মরণ দশা। মনও

পোড়েনা, সাধও করেনা। এখন বেশ জেনেছি, ভালোবাসা আর উচ্ছের ঝাড়—এ দুইই সমান। দুইই ঝাড়ে মূল তেতো। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপচাপ থাকা কি ভালো? লীলা দশদিনের ওপর হল এখানে এসেছে অথচ একবারও যাওয়া হয়নি—এঠা কি উচিত হয়েছে? লীলা এই না যাওয়ায় কি মনে করবে? অতি ইতর, অপদার্থ ভাববে না? পর পর দশদিন পার হয়ে গেল। অপরাধ ক্রমশঃই বাড়ছে না? সাধারণ ভদ্রতাবোধ, যৎসামান্য আত্মীয়তাবোধও কি নেই? আর কি দেরী করা উচিত? উচিত নয়।

সুতরাং কোন এক প্রসন্ন দিনে, মাছ ধরতে যেদিন ভালো লাগলোনা, গণ্ডাখানেক হাই তুলে আঙুলের সব কটি মোটকে মনে বেশ শান্তি পাওয়া গেল যেদিন অনেক পাখির কলরব শুনতে শুনতে মাতাল মাতাল বিকেলে লীলাদের নোতুন বাড়ির সামনে এসে সেদিন হাজির হলুম।

মাসিমাই দরজা খুলে দিলে। হাসিতে পুরানো দিনের রঙ। চোখে অবিকল পুরানো দিনের আস্কারা।

ভেতরে গেলাম। মাসিমা বল্লে—বোস। মেঝেতে বসলাম।

পানের বাটা সামনে। সেখান থেকে জাঁতিটা তুলে এনে মুখ মচ্‌কে মাসিমা সুপুরী কাটতে বসলো। হেসে জিগ্যেস করলে—আমি অন্য পাড়ায় উঠে এসেছি বলে আমাকে ভিন্ন করে দিলি কমল? আমি নয় খোঁজ নিতে পারিনা, তাই বলে তুইওতো একবার খোঁজ নিতে পারতিস!

কথাটা এতোই-যুক্তিসংগত যে মুখে প্রথমে কোন কথা জোগালোনা। মগজ একটা, ভাবনা চিন্তা কিন্তু অনেক। এক মগজে কতো আর ধরবে? কিন্তু নির্ঘাৎ এটা কোন কৈফিয়ৎ নয়। তাই বেমানান রকমের চুপ করে খানিক পর ধীরে ধীরে বল্লাম—আসল কথা কি জানো মাসিমা—সেই সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে বার হই, আসি প্রায় বিকেল শেষ করে। তারপর আর সত্যি বলছি বার হতে ইচ্ছে করেনা। ছুটির দিন হলে হয় মাছ ধরতে যাই, নয়তো ঐ বাড়িতেই চুপচাপ বসে থাকা। বুঝলেন, খুব খারাগ লাগে না।

বলে আমি জোরে জোরে হেসে উঠলাম।

প্রায় সংগে সংগে মাসিমা কট্‌করে আস্ত সুপুরীখানা দু' আধখানা করে ফেল্ল। একটা টুক্‌রো এক অন্ধকারে চলে গেল, আর একটা টুক্‌রো আরেক অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আমি দুটোই কুড়িয়ে এনে দিলাম। সুপুরী হাতে পেয়ে মাসিমা ফের বল্লে—সে যা হোক। কিন্তু এই ক'বছরে তোর চেহারা এমন খারাপ হল কি করে?

ফের জোরে জোরে হাসলাম।

বল্লাম—খারাপ তো হয়নি। আগের চেয়ে শক্ত হয়েছে এই যা। মাসিমা সে কথা শুনে একটু ময়লারকমের হাসলো।

আর আমি চারিপাশে তাকালাম।

মেঝেতে লোটানো জানালার ভেতর দিয়ে আসা বিকেলের করুণ আলো এইবার যাই যাই করছে। উইধরা কড়িকাঠ থেকে অন্ধকার এতোক্ষণে নেবে আসবো আসবো করছে। ঝিমিয়ে পড়া রোদ্দুরের নেতানো ভাব নিয়ে বোধ হয় কোন ক্ষ্যাপা হাওয়া ঘরে ঢুকে একটু হো হো হেসে নিলো একচোট।

তখন লীলা এলো। এসে সোজাসুজি আমার দিকে না তাকিয়ে মাসিমার দিকে তাকালো। তারপর দাঁড়িয়ে থেকে অন্য এক জগতের ভাষায় বল্ল—তুমি আমাকে ডাকলে বুঝি মা?

মাসিমা পানে চুণ মেশাতে মেশাতে বল্ল—কই, ডাকিনি তো!

—ডাকোনি? যাই তাহলে।

লীলা চলে যেতে আরম্ভ করলো।

খুবই খারাপ লাগলো ব্যাপারটা। একটু বিচলিত। একা আমি নই। মাসিমাও।

মুখটা ব্যাজার করে মাসিমা বল্ল—দেখ মেয়ের কাণ্ড! কমল এসেছে যে রে! তুই যে বড় চলে যাচ্ছিস?

—তাই নাকি! বলে লীলা ঘুরে দাঁড়ালো। একটু ঠোঁট কেটে হাসলো। তারপর ঝপ্‌ করে কোথায় আমার পাশে বসবে, তা না করে তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলো। ব্যাপারটা আগেই আমি একটু অনুমান করতে পেরেছিলাম।

হেসে বল্লাম—বুঝলেন মাসিমা, লীলা মনে মনে আমার

ওপর চটেছে। দশদিন ও এখানে এসেছে, অথচ আমি এখানে একদিনও আসতে পারিনি। কাজের চাপে—

লীলা সে কথা শুনে দীপ্ত চোখে একবার তাকালো আমার দিকে। তারপর অদ্ভুত ভাবে হেসে বল্ল—তাতে কি হয়েছে? এরপর নিশ্চয় রোজ রোজ আসবে।

—না, রোজ রোজ যদি নাও আসতে পারি—

কথা আর শেষ করতে পারলাম না।

লীলা হঠাৎ উঁচু পর্দায় হেসে উঠলো। বল্ল—না, না। পারবে। তোমার ওপর এ বিশ্বাস আমার আছে।

ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। কেমন একটা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে বোধ করতে লাগলাম। বল্লাম—মাসিমা আজ উঠি।

মাসিমা বল্ল—সে কি রে? এলি কতোদিনের পর, আর এক্ষুণি চলে যেতে চাচ্ছিস? না, না, বোস।

আমি উঠে পড়লাম। বললাম—না মাসিমা। খেয়াল ছিলোনা। দোকান করা হয়নি এখনো মনে ছিলোনা আমার।

—যা তাহলে। আসিস বাবা। তোদের দেখলেও মনে শান্তি। বুঝলি, আবার আসবি। মাসিমার চোখে পুরানো দিনের মায়া। যেদিন হারিয়ে গেছে মাসিমার হাসিতে তার বেদনা।

আমি কি এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে লীলার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমার। কিছু যেন যাচাই করে নিতে চাইছে।

বল্লাম—আসি লীলা।

লীলা একটুও দ্বিরুক্তি করলোনা। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

অক্লেশে বল্ল—আচ্ছা। বলেই তেমনি দীপ্তচোখে আমার দিকে তাকালো।

তারপর ও আমার সংগে সংগে এলো। আমি রাস্তায় বার হলে দরজাটা ও বন্ধ করে দিলে।

আর কে জানে কেন, মাসিমার সুপুরি কাটার কথা তখন আমার মনে হল। আমি চোখের সামনে দেখলাম, সুপুরিটা আর আস্ত নেই। দু'খানা হয়ে দুদিকে অন্ধকারে চলে গেছে।

লীলা যখন দরজা বন্ধ করেছিলো তখন দরজা বন্ধ করার শব্দ পাইনি। এতোক্ষণ পর, যখন অনেকটা এসে পড়েছি, তখন দরজা বন্ধ করার শব্দটা কানে খটাং করে বাজলো।

এরকম কারুর হয় কিনা জানিনা, আমার তো হল।

দরজাটা সত্যি দরজা কিনা, কারুর মন কিনা, সেটা শব্দ করে ভেজিয়ে দেওয়ার মানে কি—এসব আমি আর ভাবতে পারলাম না।

মাসিমার কাছে মিথ্যে বলিনি। সত্যি বিকেলে বাড়ি এসে আর কোথাও বার হইনা। সমস্ত জায়গাগুলো, যা একসময় ভালোই লাগতো, এখন কেমন মরা মরা মনে হয়।

মনটা নিমগাছের মতো তেঁতো হয়ে গেছে। নিমগাছেও ফুল ফোটে। কিন্তু আমি যে নিমগাছের মতো, নিমগাছ নই। আমার ফুল ফুটবেনা কোনদিন। সারা জীবন তেঁতো হয়েই থাকবো।

এক একদিন বাড়ির ভেতর যখন টিকতে পারিনা, তখন জি, টি, রোড ধরে জোরে জোরে হাঁটি। ওদিকে দু' একটা তাড়ির দোকান আছে। খুব খারাপ লাগলে তাড়ি খাই।

বন্ধু কেউ নেই। মেটের কাজ করি। নড়বড়ে, হলহলে জামা ছেঁড়া তাপ্পি মারা পায়জামা। চোখের নিচে জমাট কালি। গালের হাড় দুটো শিংয়ের মতো উঁচু। কেই বা আমার সংগে ঘুরবে। তাছাড়া ওদের আমার আদপেই ভালো লাগেনা। কি ই বা করি। ভাবতে ভাবতে মাথাটা সাফ হয়ে গেল।

মাসিমা তো আসতে বলেছেই। বিকেলটা তবু একরকম কাটবে। কিন্তু কাল কিরকম যেন ব্যবহার করলো লীলা। খারাপ কিছু করেনি। বার বার কেমন করে যেন আমাকে দেখলো। ঠোঁট টিপে টিপে হাসলো। কেমন অদ্ভুত ধরণের কথা টথা বল্ল।

ঠিক বোঝা গেল না। না যাক। তবু যাওয়া উচিত। ও এখানে একলাটি আছে। আমি গেলে তবু কথা বলার একটা লোক পায়। ভাবতে ভাবতে কখন ওদের বাড়ি চলে গেছি খেয়াল নেই।

আজ দরজা খুলে দিলো মাসিমা নয়, লীলা।

লীলা তেমনি ঠোঁট টিপে হাসলো, চোখ দুটোতে

অদ্ভুত একটা ভংগী এনে, ঠিক ঢলে পড়ে নয়, ঢলানির একটা ভাব করে মিষ্টি মিষ্টি করে বল্ল—ঠিক সময় এসেছো তো।

লীলার মিষ্টি কথাও আমার মিষ্টি লাগলোনা। তেঁতোও না। কেমন এক রকম যেন। আমি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লাম—বুঝলাম না। তাড়ি খেলে মাথাটা যেমন ঝিম ঝিম করে তোমার কথা গুলো তেমনি মনে হচ্ছে।

—মা যে এখন বাড়ি নেই—কি করে জানলে বলতো?

বলেই লীলা তীব্র চোখে আমার দিকে তাকালো। সেই চোখের আলোয় আমার চোখ বোধ হয় ধাঁধিয়ে গেল। কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা ক্রমশঃই কেমন জটিল হয়ে যাচ্ছে।

গতমত খেয়ে বল্লাম—আমি কি করে জানবো?

লীলা তেমনি দীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—সেই কথা তো তোমাকে জিগ্যেস করছি।

বাইরে এইভাবে কতোক্ষণ দাঁড়ানো যায়।

বল্লাম—চলো ভেতরে।

—ভেতরে? লীলা সচকিত হয়ে উঠলো হঠাৎ।

বল্লাম অবাক হয়ে—অমন করছো কেন?

—কই, কিছু করিনি তো। ঐ যে, মা এসে গেছে।

এতোক্ষণে ওর চোখ দুটো স্বাভাবিক হল। সহজ, সরল ভাব ওর চেহারায়, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো।

—চল চল। ভেতরে চল।

মাসিমা আমাদের সকলকে নিয়ে ভেতরে গেল।

লীলা কালকের মত আমাদের কাছ থেকে চলে যেতে চাইলো। বল্ল—মেয়েটাকে নিয়ে ভারি জ্বলন আমার! আমি দেখি গে যাই। মাসিমা অবাক হয়ে বল্ল—সে কি রে! তোর কি মতিভ্রম হয়েছে! চোখের মাথা একবারে খেয়েছিস? পাশের বাড়ির অমলা তো তোর মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। আচ্ছা ভুলো মন! তবেই তুমি মা হয়েছো!

লীলার চমক ভাঙলো। ও বল্ল—তাই নাকি! হঁ্যা, হঁ্যা, মনে পড়েছে। তবুও যাই দেখি। মেয়েটা যা দুরন্ত, অমলা হয়তো থামাতে পারবে না। কোথায় কি করে বসবে, কখন কি খেয়ে বসবে—যাই দেখিগে যাই।

যাবার আগে এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে গেলো যে সেই হাসিতে আমার গায়ে কাঁপন লাগলো।

বল্লাম তাড়াতাড়ি—চল্লে যে?

চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার তেমনি করে হেসে লীলা বল্ল—তাতে তোমার কি। তুমি তো মার সংগে কথা বলতে এসেছো।

লীলা চলে গেলে মাসিমা বল্ল—মরুগ্যে যাক। ছুঁড়িটা দিন দিন যা হচ্ছে? তুই তো ম্যালেরিয়া সেন্টার না কোথায় কাজ করিস। একটু তোদের পাউডার আনতে পারিস? ভয়ানক বিছের উপদ্রব বেড়েছে। কাল আমাকে কামড়ে ছিলো।

বল্লাম—আনবো মাসিমা।

একটু আনমনেই কথাটা বল্লাম। এমন কি কথাটা বল্লাম কিনা, কি কথা বল্লাম—বলার পর আর মনে পড়লো না।

আমার কানে তখন অন্যের কথা বাজছিলো। লীলার কথা।

—তাতে তোমার কি। তুমি তো মার সংগে কথা বলতে এসেছো। আর কানে এসে বাজলো সেই মর্মস্পর্শী হাসি।

অমন করে হাসে কেন লীলা? অমন করে কথা বলে কেন?

পরদিন খানিকটা ডি, ডি, টি পাউডার সংগে করে গেলাম। যে পরিমাণ ডি, ডি, টি, নিয়ে আমরা কাজে বার হই, তার সবটা খরচ হয় না। ওর থেকেই খানিকটা জোগাড় করে দরজায় কড়া নাড়লাম। ঢুকলাম ভেতরে।

মাসিমা বল্ল—এনেছিস? কমল আমার চিরদিন লক্ষ্মী ছেলে।

মাসিমা এমন করে কথা বলে যে চোখ দিয়ে জল এসে যায়। চোখে জল এসে গিয়েছিলো। কোনরকমে বল্লাম—আমি যদি লক্ষ্মী হই তবে লক্ষ্মীছাড়া কে মাসিমা? আমি তো একটা হতভাগা।

—এই জন্যেই তোকে পাগল বলি। আবোল তাবোল কি সব বকছিস?

মাসিমা স্নেহের হাসি হাসলো।

তারপর ফের বল্ল—হঁ্যা রে, বিছে টিছে মরবে তো।

—হ্যাঁ। আমি হেসে তাকালাম লীলার দিকে।

এতোক্ষণে লীলা কথা বল্ল। সেই একই হাসি হাসি ভংগী। কিন্তু অন্য হাসি। কেমন যেন জ্বালাধরা, কেমন গোলমেলে। ঠিক বোঝা যায় না।

আর যে ভাষায় লীলা কথা বল্ল সে ভাষাটা আমি তেমন বুঝলাম না। লীলা হেসে বল্ল—সাপের কামড় তো দুর করলে মা, মানুষের কামড় দুর করতে পারবে?

বলেই সেই অদ্ভুত দীপ্ত চোখে ও আমার তল পর্যন্ত দেখে নিলো। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তটস্থ হয়ে বসে রইলাম। মাসিমা সে কথা শুনে বল্ল—ওই আর এক পাগলী। কি সব মাথা মুণ্ড বলে।

এতোক্ষণে মাথাটা আমার পরিষ্কার হয়েছে। মাথা মুণ্ড কিছু লীলা বলেনি। লীলা পাগলীও নয়। বেশ ভেবে চিন্তেই ও এসব বলছে। হাসছে বেশ ভেবে চিন্তে। এমন কি অমন করে যে থেকে থেকে তাকাচ্ছে তাও ভেবেচিন্তে।

কিন্তু লীলার ভাবনাটা কি!

রোজই আমি ওদের বাড়ি যাই। রোজই অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চায়। আমাকে দেখলেই উঠে যাবার চেষ্টা। কেমন সব কথা বলে রোজ রোজ। তার আমি কিছু বুঝতে পারি না।

লীলা হয়তো গুণগুণ করে গান গাইছে, আমি গিয়ে পড়েছি, লীলা অমনি গান থামালো। ও হয়তো মায়ের সংগে সহজসুরে কথা বলছে, আমি গেলাম, কথার স্রোত পাল্টে গেল। বড় বড় চোখে আমাকে দেখলো। ঠোঁট টিপে হাসলো বিদ্রূপের হাসি।

আমি যে কিছুই বুঝিনা—ওর ভাব দেখে তা মনে হয় না।

ওর ধারণা আমি সব বুঝতে পারি।

সমস্ত আকাশ আরক্ত কামনায় থরথর করে কাঁপে, উদাসী বিবাগী বাতাসে শুক্‌নো পাতার মতন আমি উড়ে উড়ে চলি। পাখির গানে চারিদিক মুখরিত হয়, রাঙা বেদনার মত কতো রোদ নামে, জোয়ারের জলে ফেঁপে ওঠা নদীতে স্বপ্নের মত জ্যোৎস্না আসে যায়, আর আমি শুধু শুক্‌নো পাতার মতন ভেসে ভেসে চলি। শুক্‌নো পাতার মতন গুঁড়ো হই।

কিন্তু হঠাৎ আমার হাসি এলো সত্যিই আমি সব বুঝেছি।

সেই মোটা-মাইনে-পাওয়া লোকটির সংগে লীলার বিয়ে হবার সময় আমি থাকতে পারিনি। কিসের এক অসহ্য জ্বালায় আমায় চলে যেতে হয়েছিলো দূরে। ওর বিয়েতে ওকে উপহার দেবার জন্যে সাড়ী কিনেছিলাম একটা। সে সাড়ি ওকে দেওয়া হয়নি। পার্শেল করে পাঠাতে পারতাম। তাও পাঠাইনি। ভাল লাগেনি। ভারি তো একটা সাড়ি—মোটা, খসখসে, খেলো।

হয়তো সেই মোটা-মাইনের ভদ্রলোক—সেই রোগা, কর্কশ, লম্বা লোকটি—লীলার স্বামী—বাঁকা ভাবে হাসবে। মুখে কিছু বলবে না। লীলার হয়তো সেই হাসি ভালো লাগবে না। সে হয়তো দুঃখ পাবে, চোখের জল ফেলবে।

কিন্তু এখন সাড়িখানি ওকে দেওয়া যায়। বেশ হাসি-মুখেই সাড়িটা ফেরৎ দোব। বলবো, সেদিন মনে গোল-মাল ছিলো ভাই, আজ সত্যি ওসব গোলমাল মনে নেই, তাই সাড়িটা দিতে এলাম। তা ছাড়া ওটা নিজের কাছে রাখবার আর আমার কোন অধিকার নেই। সামান্য উপহার, তুমি বড়লোকের ঘরণী, শুধু ঘেন্না কোরো না।

সাড়িটা দিতে গেলাম। মাসিমা বাড়ি ছিলো না। লীলা ছিলো। হাসি মুখে বল্লাম—এমন চমৎকার বিকেল বেলাটা মুখ গম্ভীর করে নষ্ট করে ফেলো না। তোমার বিয়ের সময় দিতে পারিনি। আজ এনেছি। ভেবে দেখলাম ওটা আমার কাছে রাখার কোন মানে হয়না। জিনিসটা খেলো। কিন্তু তুমি তো সুন্দরী। যা পরবে তাই তোমার নিজের গুণে মানিয়ে যাবে।

সে কথা শুনে লীলার চোখ দুটো কিন্তু দপ্ করে জ্বলে উঠলো। প্রথমটায় কথা খুঁজে পেলো না। দিশে-হারা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর ঠিক সামলে নিলো। মুখটা কুঁচকে অদ্ভুত ঘৃণার সংগে লীলা বল্লে—লজ্জা করেনা হাসতে? আবার সাড়ি এনেছো? আমি হাসতেই থাকলাম। হাসতে হাসতে বল্লাম—হাসতে লজ্জা করা উচিত নয় ভাই।

এ কথা শোনার পর লীলা থামবেনা আমি জানতাম। ও থামলোনা। ও তেমনি ভাবে মুখটা পাগলিনীর মত

করে, বুকে যতোখানি বিষ ছিলো সব ঢেলে, বল্ল—তুমি এলে আমি উঠে চলে যাই। গান গাইলে গান থামাই। তবুও তুমি থামবেনা। তুমি ছায়ার মতন গায়ে লেগে থাকবে। লজ্জা তো তোমার করবেনা! আবার ঢং করে সাড়ি এনেছো! মানুষের গায়ে এমন শুয়োরের চামড়া থাকে তা জানতাম না।—আমি তখনো হাসছি। কিন্তু লীলার এতো অহংকার ভালো নয়। আমি আগেই কিছু বুঝেছিলুম। এখন আর লীলা কিছুই বুঝবার বাকি রাখলোনা। কিন্তু তবুও আমি হাসবো। মুখের হাসিটা মরে যেতে দোবনা। কিন্তু এতোখানি অহংকার কি লীলার ভালো ?

—আমার স্বামী আছে, আজ বাদে কাল শ্বশুরবাড়ী যাবো। তবুও তুমি আমার সংগ ছাড়বেনা, তবুও ছায়ার মত লেগে থাকবে, তবুও তুমি হাসবে, তবুও তুমি সাড়ি এনে পুরোনো দিন মনে করিয়ে দেবে। কেননা তোমার যে লজ্জা নেই। মানুষের গায়ে এমন শুয়োরের চামড়া থাকে তা জানতাম না।

কিন্তু সত্যিই তো আমার গায়ের চামড়া শুয়োরের নয়। মেটের চাকরী করি, তাড়ি খাই, আর বোধ হয় কিছু বদখেয়াল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এতেও চামড়াটা মানুষের থেকে গেছে। লীলার এতোখানি অহংকার কি ভালো ? আমি আগেই কিছু বুঝেছিলাম। এখন আর বোঝার লীলা কিছু বাকী রাখলোনা।

এতোখানি অহংকার তার সত্যি খাঁটি কিনা প্রমাণের সময় এসেছে।

এবার শুধু হাসি নয়। একটা হাসির কথা বলি। আর চুপ করে থাকা যায়না। এতো অহংকার লীলার ভালো নয়। হাসতে হাসতে বল্লাম—একটা হাসির কথা বলছি। একদিন তো তুমি আমায় ভালোবাসতে। আজ ঘেন্না কর। তাতে ক্ষতি নেই। একদিন যাকে ভালোবাসতে তার জন্যে আজ একটা কাজ করোনা। কাজটা সামান্য। তুমি বললেই হয়। জামাইদাকে বলে যাহোক একটা চাকরী করে দাওনা। ভদ্দরলোকের ছেলে, মেটের কাজ তো ভাই পোষায়না আর।

লীলা বোধ হয় কথাটা প্রথম ঝোঁকে ঠিক বুঝলোনা। নিচেকার ঠোঁট দুটো হঠাৎ কিসের এক তীব্র আবেগে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলো, নাকটা নড়ে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত আপন মনে ও কি সব ভাবলো। কি একটা কথা বোধ হয় বলতে চাইলো। বললো না। তারপর কিন্তু এই বিকেল বেলার আলোর মতন এক অপরূপ কান্নায় লীলা ভেঙে পড়লো।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন লীলা কাঁদছে। কেননা কাঁদবার কথা তো আমি বলিনি। তবে ?

এই অসহ্য কান্নার বেগ এক আশ্চর্য সংযমের সংগে রোধ করে সেই একই বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে কেমন করে যেন কয়েক মিনিট চেয়ে অকস্মাৎ লীলা বল্ল—তুমি…তুমি তাহলে চাকরীর জন্যেই এতোদিন আসতে, আমার জন্যে নয়! তুমি তাহলে…

আর বলতে বলতে এই বিকেলের মতন করুণ সেই কান্নায় আবার লীলা ভেঙে পড়লো।

আমি খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখে আমারও জল এসে গেছে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। অনেক জল একদিন কিশোর বেলায় লীলার জন্যে ফেলেছি। এই বুড়ো বয়সেও যদি ফেলতে হয় সে বড় লজ্জার। মনের ঢেউ উতলা হয়ো না।

লীলার চোখে যতো ইচ্ছে জল আসুক। আমি পুরুষ। আমি পাষাণ। না, আমি কাঁদবোনা। তাছাড়া, কে বলতে পারে, কান্না থামাবার এরচেয়ে বড় সুযোগ জীবনে আসবে কিনা। হয়তো এই শেষ সুযোগ। মনের ঢেউ চুপ করে থাকো। যে কথাটা হাসতে হাসতে একটু আগে খুব হাল্কা ভেবেই বলেছিলাম, সেই কথাটা ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করে কাঁপা কাঁপা গলায় কিন্তু দৃঢ়ভাবে বল্লাম—তুমি ঠিকই ধরেছো লীলা। আমি চাকরীর জন্যই আসি লীলা, তোমার জন্যে নয়।

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

(১)

কোন দেশ বা জাতির সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার ঐশ্বর্য্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় নয়—সংস্কৃতি ও শিল্পই তার সত্যকার পরিচয়। এই সংস্কৃত ও শিল্প যা মানুষের মনকে উন্নত করে, সঙ্গীতই তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এ কথা সকল দেশের মনীষী স্বীকার করেন। এ যুক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের ভারত বিশ্বের সংস্কৃতির দরবারে আজও গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বৈদিক যুগ থেকে প্রবহমান। বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দেখি যে, সেখানে সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত শুধু মাত্র মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য। রস ও শিল্প মাধুর্য্যই তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের মূল আবেদন শুধু মানুষকে আনন্দ দেওয়াই নয়, তার আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা। তাই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস খুঁজতে হলে আমাদের ভারতের ঋষিদের মনের উপলব্ধি থেকে সঙ্গীতের যে প্রথম প্রকাশ রূপটী বর্ণিত হয়েছে—তা জানা প্রয়োজন। তাঁরা বলেন যে সৃষ্টি রহস্যের মূলে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল নিস্তব্ধ, নিশ্চল; সারা বিশ্বময় জুড়ে ছিল শুধু শূন্যতা। এই স্পন্দনহীন বিশ্বে প্রথম আলোড়ন সঞ্চারিত ব্রহ্মনাদ উৎপত্তি থেকে। নটরাজ কণ্ঠনিঃসৃত এই রাগ ভৈরব ব্রহ্মনাদই বিশ্বের যুগপৎ প্রথম সৃষ্টি ও সঙ্গীত। এই আধ্যাত্মিক পট-ভূমিকার উপর ভারতীয় সঙ্গীতের মূল আবেদন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপর।

দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে জীবনে অনিবার দ্বন্দ্বের মাঝে মানুষ সাধনা করেছে—সত্যশিব-সুন্দরের। জীবনকে সে বরণ করেছে। যুগে যুগে তাই মানুষ প্রদীপ্ত করে চলেছে সত্যের এই অনির্ব্বাণ দীপালোক। রূপ রস গন্ধের গভীর অনুভূতিতে এই পরম সত্যকে সে রূপায়িত করে চলেছে—শিল্পের রেখায়, কাব্যের ছন্দে ও সঙ্গীতের সুষমায়। সৃষ্টি মাধুর্য্যের অপরূপ বর্ণচ্ছটায় অধীর হয়ে যখনই সে উপলব্ধিকে করেছে অবিশ্বাস, তখনই এসেছে তার বিভ্রান্ত, সুন্দরের হয়েছে অমর্য্যাদা। তাই মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবটাই তার কালজয়ী গৌরবময় জীবন-ইতিহাস নয়। কিন্তু সেই ব্যর্থতাই দিয়েছে তাকে পুনরায় পথের সন্ধান। জীবন দর্শনের পরম সত্যকে সে করেছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। এই মহিমাময় সত্যকে পরম অনুভূতির মাঝে পাওয়ার জন্য মানুষ রসের যা কিছু সৃষ্টি করেছে—সঙ্গীতের অমিয় রসধারাই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুভূতির দিক থেকে তাই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব জীবনের উপর অত্যন্ত গভীর ও কল্যাণময়। এমন পবিত্র আনন্দময় রূপটীর জীবনে কোথাও তুলনা নাই। দ্বন্দ্বময় জীবনের পথে মানুষ যতই দিশাহারা হক না কেন, সত্যের আনন্দময় পথের সন্ধান পাবেই সে—সঙ্গীতের পরম উপলব্ধির মাঝে। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের বিপুল সম্ভার যদি মানুষকে করে বিভ্রান্ত—সঙ্গীতের পবিত্র গাম্ভীর্য্য তখন তাকে পরম সম্পদের সন্ধান দেয়। শিল্পীর শিল্প সুন্দর, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের এত মাধুরিমা আর কোথায়? যা আছে সঙ্গীতে। সকল বৈষম্য দূর করে, সমস্ত বক্তব্যের ও কল্পনার সীমা অতিক্রম করে, সুরের তুলনাহীন বৈচিত্র্যময় অনুভূতি আমাদের ভাবের এক অলৌকিক লোকে পৌঁছে দেয়। ভাবের অমরালোকে আমরা সত্য সুন্দরকে দর্শন করি; জীবন হয় ধন্য। চিত্তের চরম উৎকর্ষতা ও মানবতার এক বিরাট কল্যাণময় অনুভূতি সঙ্গীতের অমৃত দান। দুঃখের মাঝে সুখ, সুখের মাঝে আনন্দ, আনন্দের মাঝে পবিত্রতা, পবিত্রতার মাঝে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের মাঝে মুক্তি খুঁজে পাই আমরা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির মাঝে। ইহাই জীবনে রূপহীন পরম রসাস্বাদ। সঙ্গীত জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য। সঙ্গীত তাই জীবের আত্মাস্বরূপ। জীবনের সকল অবস্থায় সঙ্গীতকে মানুষ করেছে পাথেয়—উৎসবে, মিলনে, বিরহে, শোকে মানুষ সঙ্গীতের জয়গান গেয়েছে। কল্পনাবিলাসী মনের কাছে সমগ্র কর্মময় জীবনটী যেন এক বিরাট সঙ্গীত স্বরূপ। এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বোধের উপর ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক কালে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মাঝে যত দ্বন্দ্বই থাক না কেন, তবু শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের আবেদন থাকবেই থাকবে। বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীত হয়ত শুধু উৎসব বা অনুষ্ঠানকে অধিকতর উদ্দীপ্ত কোরে তুলতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সুরের আবেদনে আমাদের নয়নযুগল মুদিয়া আসে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সঙ্গীতের সূত্র আমরা সামবেদে পাই। বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ সামবেদ মন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। তা হলো ভারতীয় সঙ্গীতের আদিপর্ব্ব। তারপর যুগে যুগে দেশের শিল্প, রুচি ও সংস্কৃতের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে, এবং বহু সাধক শিল্পীর বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিভা ও সঙ্গীত সাধনার ফলে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি হয়। সেটাই বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপের যত পরিবর্ত্তনই হয়ে থাক না কেন, আধ্যাত্মিক আবেদনটী আজও বেঁচে আছে। তাই ভারতীয় সঙ্গীতে চরম প্রতিষ্ঠা লাভ—শুধু মাত্র সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়াও—তার গভীর উপলব্ধির দিকটা উপেক্ষা করে, সম্ভব নয় সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ভারতীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা শুধু শিল্পীই নন, সাধকও বটে। উক্ত

লোকের বাসিন্দা ছাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাওয়া বা তার যথার্থ অনুরাগী হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে দেশের রুচি-বিকৃতির ফলে নানা হাল্কা সঙ্গীতের সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের দেশের সঙ্গীত সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। দেশের সুধী পণ্ডিত আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য বহুবার অনেক সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে দেশবাসীর মন এ দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন বা করছেন। বর্ত্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন মুষ্টিমেয় শিল্পীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কারণ যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে সাথে মানুষের রুচি বিকৃতি। সত্যিকার সাধনার পথে মানুষ এখন যেতে ভয় পায়। এটা যেন কতকটা তার চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পূজা উপাসনায় আজ উৎসবটাই পেয়েছে প্রাধান্য, কিন্তু ভক্তি ও সাধনা যা ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য—তা আজ হয়েছে গৌণ। মনের এই অবনতির ফলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মর্য্যাদা আজ ক্ষুণ্ণ। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের অনুশীলন ক্ষেত্র সব সময় খুব বড় না হলেও তার উৎকর্ষ ও মর্য্যাদাবোধ দেশের লোকের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধ যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তুলনা মেলা ভার। হিন্দু যুগেও সঙ্গীতের গৌরবময় স্থান অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই প্রত্যেক দেব দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। সে সঙ্গীত বর্ত্তমানে সিনেমার হাল্কা সঙ্গীত নয়—তা ছিল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীত। তারপর মুসলমান রাজত্বের সময়ও মহারাষ্ট্র, গোয়ালীয়র, দিল্লী, রামপুর প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তখন কয়েকজন গুণী শিল্পীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং দেশের জমিদার, রাজা, বাদশাহ ছিলেন সে সমস্ত গুণীদের অনুরাগী ও পরিপোষক। বর্ত্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে রূপটী আমরা পাই তা এই মুসলমান রাজত্বের সময়ই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

এই সঙ্গীতই উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীত নামে খ্যাত। গোয়ালীয়র, বারাণসী, রামপুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান ভারতীয় সঙ্গীতের পীঠস্থান বলা যেতে পারে। বহুগুণী তাঁদের অসামান্য সাধনা ও প্রতিভা বলে নূতন নূতন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি করে নিজস্ব 'ঘরানা' স্থাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিক্ষার্থী এই সব গুণীদের কাছে দীর্ঘকাল বাস করে সঙ্গীত সাধনা করতেন, এবং পারদর্শী হয়ে পরে নিজের নিজের দেশে ফিরে সেই সব গুণীদের ঘরানা সঙ্গীত প্রচলন করতেন। এই ভাবে ধ্রুপদ, ধামার, হোরি, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, ঠুংরি, তারানা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করে। ভারতীয় সঙ্গীতের দুটী শ্রেণী। একটি উত্তর ভারতীয়, অপরটী কার্ণাটিক সঙ্গীত। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে আমরা অভ্যস্ত তা সমস্তই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত। কার্ণাটিক্ সঙ্গীত যদিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ না করার জন্য বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

সে যাই হ'ক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্যক্ রসাস্বাদ করতে হলে তার বৈজ্ঞানিক দিকটাও অপরিহার্য্য। যে কোন রাগ-সঙ্গীত শিক্ষা বা উপভোগ করতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন—তার রূপ, রস, অলঙ্কার ও স্বর গঠন পদ্ধতি। এই বৈজ্ঞানিক কাঠামোর সাথে যোগ করতে হবে আমাদের অন্তর অনুভূতি বা শিক্ষা অনুভূতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অন্তর অনুভূতি নিয়েই ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপটী প্রকাশিত হয়। যে কোন রাগের এই পরিপূর্ণ রূপটী যে উপলব্ধি করে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বহু গুণীর যুগ যুগ সাধনায় রাগ-রাগিণীর রূপ-রস বর্দ্ধিত ও মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং নূতন নূতন রাগ-রাগিণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ভারতের প্রতিভাবান শিল্পী শুধু ১।২টী রাগ নিয়ে সারা জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে। এই সমস্ত সাধক শিল্পীর কঠোর সাধনায় ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য আজও গৌরবের সন্দেহ নেই ; কিন্তু সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য যে কঠিন প্রয়াস প্রয়োজন তার অভাব যে বর্ত্তমানে বিশেষ রয়েছে আমাদের মধ্যে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার চাপে ক্লিষ্ট দেশবাসী স্বাধীনতা লাভের পর এ কথা অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে সঙ্গীতের গৌরবময় অধ্যায়ের পুনর্জীবন আজ প্রয়োজন : এবং সেজন্য দেশবাসী যে আজ সঙ্গীতমুখী হয়ে উঠেছে সে কথাও স্বীকৃত। তাই ভারতের বিভিন্ন নগরীতে গত কয়েক বৎসর ব্যাপী বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে আসছে। গত ১৯৪৫ সাল থেকে কলিকাতাতেও ভারতের বিখ্যাত শিল্পীসমাবেশে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সত্য এবং রস পিপাসু সঙ্গীতামোদীরও তাতে যথেষ্ট আগ্রহ, ও সহযোগীতা আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু শিক্ষা ও অনুশীলনের দিক থেকে বিচার করলে তার থেকে সঙ্গীতকে যে আমরা অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে পারিনি সে কথা স্বীকার না কোরে উপায় নেই। তার কারণ আমাদের বোঝা উচিৎ যে শুধু মাত্র প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী সমন্বয়ে কতকগুলি জলসা জাতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান মাধ্যমে সঙ্গীতক্ষেত্রের প্রসার সম্ভব নয়। তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যবস্থা। আর সে ব্যবস্থা রাষ্ট্র ও দেশবাসীর উপর নির্ভরশীল। দেশে সঙ্গীত-শিক্ষায়তনের প্রসার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থা না হলে সঙ্গীতের মান নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। এবং মান না নির্ণয় হলে শিক্ষা হিসাবে তার কোন দিনই অগ্রগতির পথে চলা সম্ভব নয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থক করে তোলার জন্য আজ খুব বেশী প্রয়োজন দেশের সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিভাবান শিল্পীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত করা এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাঠামোর উপর সঙ্গীতের বণিয়াদ গোড়ে তোলা। প্রতিভাবান শিল্পীদের উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা বা তাঁদের বৃত্তি ব্যবস্থা দ্বারা সঙ্গীতের শিক্ষান্নোতি সম্ভব নয়—যদি তাঁদের সাধনা লব্ধ বিদ্যাকে উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে না পারি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবেই দেশের বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গীত 'ঘরানা' আজ স্তিমিত বা অবলুপ্ত ; সুতরাং সে ক্ষতির পরিমাণ যদি আর না বৃদ্ধি পায়—তবে সেটাই হবে আমাদের আশার কথা।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উপনিষদে পাপ ও পুণ্য

বেদে ও উপনিষদে বহুস্থলে পাপের কথা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। "যুয়োধি অস্মৎ জুহুরাণং এনঃ" (ঈশ-১৮)—আমাদের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। "অথ একয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপং" (প্রশ্ন-৩।৭)—এক নাড়ীদ্বারা উদান উর্দ্ধ-গত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যান। বর্গঃ অসি। পাপমনং মে বৃঙ্ধি (কৌষীতাকী—২।৫)—তুমি পাপনাশক, আমার পাপ বিনাশ কর। "উদ্বর্গঃ অসি পাপনানং মে উদ্ বৃঙধি" (কৌষী—২।৫) তুমি বিশেষরূপে পাপবিনাশক, বিশেষরূপে আমার পাপ বিনাশ কর। "সংবর্গং অসি, পাপামানং মে সংবৃঙ্ধি" (কৌষী—২।৫) তুমি সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশক, সম্যকরূপে আমার পাপ বিনাশকর। "স য এতমেবং বিদ্বান্ উপাস্তে তে অপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি" (ছা—২।৬)—যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম্ম বিনাশ করেন এবং গর্হিপত্য অগ্নিলোক প্রাপ্ত হন। অথ ন যে এতান্ এবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন স হ তৈরপি আচরন্ পাপমনা লিপ্যতে" (ছান্দোগ্য—৫।১০।১০)—যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদের সহিত আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। "যথা ইষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতঃ প্রদূয়েত ; এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩)—যেমন সুধীকার তুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহার সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। অয়ং আত্মা সেতুর বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায় সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ অযতঃ নিবর্ত্তন্তে।" (ছান্দোগ্য—৮.৪।১) এই আত্মা সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, সেইজন্য ইনি বিবৃতি হইয়া আছেন। সমুদয় পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে (সুপ্তাতিতে) বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না। তখন পুণ্য ও পাপ ইহার অনুগমন করেন না (বৃ আর ৪।৩।২১-২২)।

এইরূপ বহুস্থলে পাপ ও পুণ্যের কথা আছে। বেদের অনুশাসন মানিয়া চলা বেদ অনুসারে ধর্ম্ম ও তাহা অমান্য করা অধর্ম্ম। উপনিষদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই ধর্ম্ম, অজ্ঞান অধর্ম্ম। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহার কর্ম্ম স্বার্থপ্রণোদিত। সে আপনাকে অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র গণ্য করে এবং তাহার আচরণও স্বকীয় সুখের অনুসরণ করে। এতাদৃশ আচরণই পাপ। কিন্তু যে জগতে সকল বস্তুই ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত মনে করে, সে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না ; তাহার আচরণ জীবের মঙ্গল অনুসরণ করে ; তাহা পুণ্য।

বেদে যাগযজ্ঞের বিধি এবং যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থা থাকিলেও "মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি ; কোন ভূতির হিংসা করিবে না, এ বিধিও ছিল। পরোপকার, পুণ্য। সেইজন্যই "ইষ্টাপূর্ত্ত" ফলে লোকে স্বর্গলাভ করে। উপনিষদে "দ",—দম, দয়া ও দান—পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা চিত্ত শুদ্ধিকর, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক তাহাই পুণ্য। যাহাতে চিত্তের অশুদ্ধি হয়—বিষয়-লালসা, পরের অপকার প্রভৃতি—তাহা পাপ। কিন্তু এই পাপ ও পুণ্যের ফল চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে পাপ ও পুণ্য থাকে না। প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মে ও ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে অমঙ্গল (Evil) একটি স্বতন্ত্র সনাতন তত্ত্ব বলিয়াই পরিগণিত। ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, আহ্রিমান্ বা সয়তান অমঙ্গল স্বরূপ। কিন্তু বেদ ও উপনিষদে অমঙ্গল স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত নহে। বেদের রুদ্র দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষের ক্ষতি করেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্তুতি ও বেদে আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, গো বা অশ্ব বিনাশ করিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বলবান ভৃত্যদিগকে বধ করিও না।" (৪।২২) কিন্তু তাঁহার "দক্ষিণ-মুখের কথাও তাহাতে আছে। রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" তোমার দক্ষিণ (আনন্দদায়ক, চিন্ময়রূপ) মুখ দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। রুদ্র অমঙ্গল স্বরূপ (Evil) নহেন। অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হয়। কিন্তু তাহাকে জয় করিতে চেষ্টার প্রয়োজন। অমঙ্গল একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে।

সক্রেটিস্ বলিতেন জ্ঞানই ধর্ম্ম। শ্রেয়ঃ কি যে জানে, সে অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে না। উপনিষদ বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। যে আত্ম জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে আপনার স্বার্থের অনুসন্ধানে অন্যের ক্ষতি করিতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই মঙ্গল, এবং সত্যই জয়লাভ করে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" পাপ অভাবাত্মক।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। "অনেকে তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেও পায় না, শ্রবণ করিয়াও অনেকে তাহাকে জানিতে পারে না। তাহরে বক্তা দুর্লভ। নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতা দুর্লভ। "(কঠ)" হীন নর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইহাকে জানা যায় না, নানালোকে নানাভাবে তাহাকে ভাবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন তাহাকে জানা যায় না। "(কঠ—১।২।৭-৮)। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" "ক্ষুরের শাণিত ধারের মত, সেই পথও দুরত্যয়।" "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্পূর্ণ পৃথক, যে প্রেয়কেবরণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।" অবিদ্যা-

তঃই লোকে প্রেয়কে কামনা করে। ভ্রান্ত জ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যাই পের মূল।

উপনিষদে মনোবিজ্ঞান

উপনিষদে মনস্তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত না হইলেও মানসিক পার সকলের কিছু কিছু বর্ণনা আছে।

'মন দ্বারা লোকে দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে। কামনা, কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভয়, এসকলই । এই জন্য কেহ পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করিলেও মন দ্বারা জানা যায়।" বৃ-অ, ২।৫।৩)

কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়, মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মার কথা আছে। ৩।১০) রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যিনি জানেন তিনি আত্মা (কঠ ৩।৯) স্বপ্ন বিষয় ও জাগরিত বিষয় আত্মাই অবগত হন। (কঠ ৪।৪। ন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ, সেইজন্য অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না (কঠ ১)। সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাহার রশ্মিসকল যেমন সূর্য্যে একীভূত, বং সূর্য্য পুনরায় উদিত হইলে, তাহারা পুনরায় চারিদিকে বিকীর্ণ , তেমনি নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়গণ মনে একীভূত হয়। ইজন্য পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, ত্যাগ, হণ, আনন্দানুভব, মল আশা, গমন কিছুই করেন না। প্রশ্ন ৪।২)। কে বলে তখন তিনি নিদ্রিত।

প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চভূতের মাত্রা বা মূল উপাদানে এবং ইন্দ্রিয়গণ ও হাদের বিষয়ের কথা আছে। (৪।৮) এই ভূতমাত্রাই পরবর্ত্তীকালে তন্মাত্রা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তাহারই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও র্শ। (৪।১১)

ইন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়া সম্বন্ধে কৌষীতকীতে (৩।২) আছে "(প্রতর্দ্দন রিলেন) কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্রিয়গণ একত্ব প্রাপ্ত হয়; নতুবা কেহ ক সঙ্গে বাক্য দ্বারা নাম জানাইতে, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে, কর্ণ দ্বারা দ শুনিতে এবং মন দ্বারা চিন্তা করিতে পারিত না। সুতরাং ন্দ্রিয়গণ একীভূত হইয়া এই সকল কার্য্য করে। যখন বাক্য উচ্চারণ রে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া বাক্য উচ্চারণ করে। খন চক্ষু দেখে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখে। খন কর্ণ শোনে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া শোনে। খন মন চিন্তা করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চিন্তা রে। যখন প্রাণ প্রাণন কার্য্য করে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণন কার্য্য করে।" ইন্দ্র কহিলেন "হাঁ, এইরূপই বটে। বে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা আছে।"

বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধের বর্ণনা করিতে কৌষীতকী বলেন াক্ প্রজ্ঞার এক অর্থ দোহন করিয়াছে (অর্থাৎ তাহার এক রূপ প্রকাশ রে। "নাম উহার বহির্দেশে স্থাপিত ভূতমাত্রা। সেইরূপ ঘ্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, শরীর, উপস্থ, পাদদ্বয়, বুদ্ধি প্রজ্ঞার এক এক রূপ প্রকাশ করিতেছে। ঘ্রাণের ভূতমাত্রা গন্ধ, চক্ষুর ভূতমাত্রা রূপ, শ্রোত্রের ভূতমাত্রা শব্দ। জিহ্বার ভূতমাত্রা রস, হস্তদ্বয়ের ভূতমাত্রা কর্ম্ম, শরীরের ভূতমাত্রা সুখ-দুঃখ; উপস্থের ভূতমাত্রা আনন্দ; রতি ও প্রজাতি (সন্তান-সন্ততি), পাদদ্বয়ের ভূতমাত্রা গতি, বুদ্ধির ভূতমাত্রা জ্ঞাতব্য ও কামনা সকল। জীব প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্ এ আরোহণ করিয়া সকল নাম, ঘ্রাণে আরোহণ করিয়া সকল গন্ধ, চক্ষুতে আরোহণ করিয়া সকল রূপ, শ্রোত্রে আরোহণ করিয়া সকল শব্দ জিহ্বায় আরোহণ করিয়া সকল রস, হস্তে আরোহণ করিয়া সকল কর্ম্ম, শরীরে আরোহণ করিয়া সুখ-দুঃখ, উপস্থে সকল গতি বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া আরোহণ করিয়া আনন্দ, রতি ও প্রজাতি, পাদযুগলে আরোহণ করিয়া সকল জ্ঞেয় ও কামনা প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা কৃত হয়, সে সকলই তাহারা প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত বলিয়াই সম্ভবপর হয়। প্রজ্ঞাই বক্তা, আঘ্রাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসজ্ঞাতা, সুখ-দুঃখ জ্ঞাতা, কর্ত্তা, আনন্দ, রতি, প্রজাতি, বিজ্ঞাতা, গন্তা ও মন্তা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভূতমাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নাম কর্ম্ম গমন, রতি ও মন্তব্য বিষয়), এবং এই সকল বিষয়ের সংস্পর্শে প্রজ্ঞা যে যে রূপ ধারণ করে, তাহারাই প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রাগণ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রজ্ঞামাত্রাগণ ভূতাধিষ্ঠিত। ভূতমাত্রা না থাকিলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না, প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলে ভূতমাত্রা থাকিত না। দুইএর মধ্যে কেবল-মাত্র একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভবপর নহে। অথচ প্রকৃত বস্তু একমাত্র, নানা নহে। যেমন রথনেমিতে অর সকল স্থাপিত এবং অরয়ফল রক্ষণাভিতে স্থাপিত, তেমনি ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাসকলে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে স্থাপিত। প্রাণই আনন্দময়, অজ অমর প্রজ্ঞাত্মা (কৌষী-৩।৮)। ইহার অর্থ একই প্রজ্ঞাত্মা বিষয়ী ও বিষয়-রূপে প্রকাশিত। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর সম্বদ্ধ, অবিনাভাবী।

ঐতরেয় উপনিষদে (৩.২)" হৃদয়, মন, সংজ্ঞা, আজ্ঞান (কর্ত্তৃভাব), বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মণীষা, জুতি (তৎপরতা), স্মৃতি, সংকল্প (সম্যক অবধারণ (, ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (প্রাণনাদি), কাম (বিষয়াকাঙ্ক্ষা), বশ (আত্ম-সংযম)—এ সকলই প্রজ্ঞানের বিভিন্ন নাম বলা হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মূল্য যাহাই হউক উপনিষদের সময়েও যে মনের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণগণ সকলেই আত্মা কর্ত্তৃক চালিত হয়। এই আত্মা "আসীনঃ দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" "মদামদ" (হর্ষাহর্ষ —(বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) মহান্ ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী) কঠ (২।২৩।২২) আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন (বৃ-আর ৫।৬।১। ছা—৮।৩।৩)। তিনি মনোময় (জ্যোতী) স্বরূপ। ব্রীহি বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম (বৃ-আর ৫।৬।১)। "তিনি ব্রীহি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা, এমন কি শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনিই আমার আত্মা, এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান্ এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্ "(ছা—৩।১৪।৩)। কঠ উপনিষদে আত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা"

৬।১৭) বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৫।১৮।১) "প্রদেশ মাত্রম্ ...ভিবিমানন্" ও বলা হইয়াছে। প্রদেশমাত্র—এক "বিঘৎ" ...রিমাণ, অথবা দ্যুলোকাদি প্রদেশ যাহার পরিমাণ। অভিবিমান— ...তি ব্যাপ্ত ও অপরিমেয়। অশরীরী চিন্ময় আত্মাকে স্থানব্যাপী হৃদয়ে ...বস্থিত মনে করা অসংগত বোধ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য ...র্শনিক দেকার্ত Prineal gland ও আত্মার অবস্থিতি বলিয়াছিলেন। ...রিস্টটলের মতে হৃদয় আত্মার অধিষ্ঠান। বস্তুতঃ উপনিষদের ঋষি ...ত্মাকে স্থূল হইতে স্থূলতর এবংসূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়াছেন। ...হার অর্থ স্থূলতা ও সূক্ষ্মত্ব গুণ তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না।

উপনিষদে মন একটি ইন্দ্রিয় এবং অচিৎ। মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির ...রে মহৎ, মহত্তের পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ। জাগরিত, ...প্ন, সুষুপ্তি এবং এই তিনের অতীত তুরীয় অবস্থাপন্ন সংবিদের বর্ণনা ...ভিন্ন উপনিষদে আছে। তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। বহির্জগৎ ও ...ন্তর্জগৎ যে একই অসঙ্গ (absolute) পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত ...ইয়াছে, সকল উপনিষদে এই বস্তু নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ...জীবের জ্ঞানময় আত্মা ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চ প্রাণের সহিত অক্ষরে ...তিষ্ঠিত।" (প্রশ্ন—৪।১১)

উপনিষদ ধর্ম্ম

ধর্ম্ম শব্দ ইংরেজি Religion শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ...হা সমাজকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ...াহার উপাসনা যেমন ধর্ম্ম, তেমনি সৎ আচরণও ধর্ম্মের অন্তর্গত। ...চরণ চরিত্রনীতির (Ethics) আলোচ্য বিষয়। উপনিষদের ...রিত্রনীতি পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ঈশ্বরে ...শ্বাস, ভক্তি ও উপাসনা সম্বন্ধে উপনিষদের মত আলোচিত ...ইবে।

উপনিষদ একেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী, সর্ব্বেশ্বরবাদী, কিন্তু ...antheism নহে। Pantheism এ জগৎই ঈশ্বর, জগতের ...হিরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। উপনিষদের ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ...হ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু কোথাও নাই, কিন্তু তিনি যেমন জগৎরূপে ...কাশিত, তেমনি জগতের বাহিরেও বর্ত্তমান। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট, ...তি পরমাণুর মধ্যে তিনি বর্ত্তমান, বস্তুতঃ পরমাণুগণের মধ্যে তিনিই ...ংশিক ভাবে প্রকাশিত, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও উপাদানে পরমাণু-...গের মধ্যে নাই। আবার তিনি বিশ্বাতীতও বটেন। তাঁহার অনন্তসত্তা বিশ্বে ...পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই বিশ্বের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহার ...রূপ সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায় না। সসীমের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান কিন্তু ...নি সসীম নহেন। যাহা কিছু আমরা জানি, তিনি তাহা নহেন। ...মাদের যাহার সহিত পরিচয় আছে ; তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাই ...মাদের আছে। কিন্তু যাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তাহা ...কাশ করিবার ভাষাও নাই। সুতরাং তিনি বাক্যাতীত, বাক্য দ্বারা ...বর্ণনীয়। মনের দ্বারাও অসীমের ধারণা করা অসম্ভব। তিনি মনের অতীত। কিন্তু যিনি অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বাক্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন যাঁহার ধারণা করিতে পারে না, তিনি যে আছেন, তাহা জানিব কিরূপে ? ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও প্রাকৃতিক জগতের শৃঙ্খলা এবং সুনীতির ভিত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। যে ধর্ম্মে প্রাকৃতিক জগতের ও নৈতিক জগতের কারণ-রূপে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (Natural Religion) বলে। যে ধর্ম্মে প্রত্যাদেশ (revelation) ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তি তাহা অতি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রত্যাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উপনিষদের ঋষিগণ কোথায়ও ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত উপদেশের কথা বলেন নাই। উপনিষৎ বেদের অংশ, এবং বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বাহির হইয়াছে, একথা উপনিষদে আছে। কিন্তু বেদের মন্ত্র তাঁহারা মানস চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের দাবি। বেদান্ত দর্শনে আছে, শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই শাস্ত্রই বেদ, এবং বেদ ঋষিগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। সকল সত্যই মানুষের চিন্তায় আবির্ভূত হয়, সত্য কেহ সৃষ্টি করে না। বেদের সত্যও তেমনিই আবির্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়া ঋষিদিগকে দান করেন নাই ; তাঁহার বাণীও ঋষিগণ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এ কথাও তাঁহারা বলেন নাই। ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া-ছিলেন এ কথাও উপনিষদে নাই। সুতরাং যে অর্থে খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলামিক ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট, উপনিষদের ধর্ম্মকে সেই অর্থে প্রত্যাদিষ্ট (revealed) বলা যায় না। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মও নহে। ইহা ঋষিগণের প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ—অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভব। ইহা "বোধি' নামে অভিহিত। পাশ্চত্য দার্শনিক বার্গস্ ইহাকে Intuition বলিয়াছেন। Intuition অব্যবহিত জ্ঞান—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে জ্ঞান নহে, বুদ্ধির বিচারের দ্বারাও এ জ্ঞান লব্ধ নহে। শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করা যায় না। শ্রবণ মনন তাঁহার জ্ঞান লাভের সহায়ক, কিন্তু নিদিধ্যাসন বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারাই উপনিষদের ঋষিগণ সত্য লাভ করিয়া-ছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং"—ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি দর্শন করিয়াছিলেন।" শ্বেতাশ্বতর "তপঃপ্রভাবাৎ, দেবপ্রসাদাৎচ" ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। দেবপ্রসাদাৎ—কেননা প্রবচন, মেধা, বহুশ্রুত দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে বরণ করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই 'বরণ' লাভের জন্য, তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য 'তপস্যার' প্রয়োজন। তপস্যার অর্থ শুদ্ধচিত্তে মনন ও নিদিধ্যাসন। তপস্যা ব্যতীত উচ্চতর সংবিৎ লাভ করা যায় না। আমাদের সাধারণ সংবিদের উচ্চতর সংবিদে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সাধারণ সংবিদে জগৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টি-রূপে প্রতিভাত হয়—তাহাদের একত্ব দৃষ্টিগোচর হয়না। কিন্তু সুধিগণ

সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর পরমপদ দেখিতে পান। তাহাদের সংবিদ সাধারণ সংবিদ অপেক্ষা উচ্চতর, তাহা ধর্ম্মীয় সংবিদ।

অসঙ্গ (Absolute) ব্রহ্ম সাধারণ ধর্ম্মীয় সংবিদের (Religious Consciousness) নিকট প্রকাশিত হন না। তিনি বিষয়রূপে বিষয়ীর নিকট প্রতিভাত হন না। যেরূপে তিনি সাধারণ সংবিদের নিকট প্রতিভাত হন, সেরূপে তিনি ঈশ্বর। মূর্ত্ত মাত্রে ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি জীবের মধ্যেও অনু-প্রবিষ্ট, অন্তর্যামী। তিনি সাক্ষী। জীবাত্মা ভোগ করে, তিনি তাহা দর্শন করেন। জীবাত্মার সহিত তিনি সখ্যসূত্রে বদ্ধ। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্। তিনিই প্রত্যগাত্মা। জীব তিনিই। কিরূপে তিনি অনন্ত হইয়াও সসীম জীব হন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান। এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বিশ্বের আত্মা। জীবাত্মাও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। তিনি অফুরন্ত "ধী"র উৎস। যাবতীয় জীব সেই উৎস হইতেই তাহাদের "ধী" প্রাপ্ত হয়। জীব যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে তখন জীবও তাঁহার মধ্যে ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়; জীব সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যায়, তাঁহার সহিত একীভূত হয়, জীব তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে। এই অনুভূতি যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া, তাহার বর্ণনা করিতে পারে না। সকলের অনুভূতি একপ্রকার হয় না। অনেকে সেই চিৎ ও আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়াও আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ তাহাদের বিলুপ্ত হয় না।

ব্রহ্ম ভূমা। তিনি সুখ স্বরূপ। উচ্চতর সংবিদ লাভ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন তাঁহারা অমৃত হন, জন্ম মৃত্যু চক্র হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পরাভক্তির প্রয়োজন (শ্বেত-৩।২৩)। ভোগের ইচ্ছা বর্জ্জন না করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সমস্ত কামনা ও সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ করিতে হয়। সাধক যখন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তখন সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পান। যাহাকে তিনি ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে চান, তাহাকে দিয়া তিনি সাধুকর্ম্ম করেন। যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে চান, তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম্ম করান। (কৌষকী ৪।৮) পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার হইতেই সাধু ও অসাধু কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মের ফলোৎপাদক শক্তিতে তাঁহারই শক্তি ক্রিয়াশীল।

ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা সকলে করিতে পারে না। কোনও উপাসনাই উপনিষদে নিন্দিত হয় নাই। তবে উপাসনার বিষয় ভেদে ফল ভিন্ন হয়। যিনি প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন, যিনি তাঁহাকে "মহৎ" (মহত্ব) রূপে উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হন। যিনি মননরূপে উপাসনা করেন, তিনি মননসমর্থ হন। যিনি 'নমন'রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট ভোগ্য বিষয় সকল নত হয়। যিনি তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মবান হন। তৈত্তিরীয় (৩।১০)

জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নহে। যখন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বোধ হয়, এই অভিন্নতার বাস্তব উপলব্ধি যখন হয়, এমন সাধক সাধনার উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত। সেখানে উপাসনার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যতদিন সে অনুভূতি না হয়; ততদিন রস-স্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় সাধকের মন ভক্তি প্লাবিত হয়, ততদিন উপাসনার—প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। উপাসনা তখন "ব্রহ্মাস্মি"—এই অনুভূতিলাভের উপায়।

উপনিষদে অবতারবাদের কোনও কথা নাই। প্রত্যেক জীবেই যিনি প্রকাশিত, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার নররূপ ধারণের কোনও কথাই উপনিষদে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তি গঠন করিয়া উপাসনার কথাও উপনিষদে নাই।

"ধর্ম্মংচর।" উপনিষদে মানব-সেবা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। "অন্নং বহু কুর্ব্বীত তৎ ব্রতং।" বহু অন্ন অর্জ্জন করিবে. তাহা ব্রত। কেন? অন্ন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। "ন কং চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত।" (তৈত্তী—৩।১০) বাসের জন্য আগত কাহাকেও ফিরাইয়া দিবে না। তাহা ব্রত। সেইজন্য যে কোনও প্রকারে বহু অন্ন সংগ্রহ করিয়া সাধুগৃহস্থগণ অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলেন "আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" যিনি শ্রেষ্ঠ উপচারের সহিত এই অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন শ্রেষ্ঠরূপে উপস্থিত হয়। যিনি মধ্যম উপচারের সহিত অন্ন নিবেদন করেন, অন্ন তাহার নিকট মধ্যমরূপে উপস্থিত হয়। যিনি অবজ্ঞার সহিত অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন নীচভাবে উপস্থিত হয়। অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, অন্ন তাহাকে ভোজন করে।

ব্রহ্মের উপাসনাবিধি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ বলেন, "উপনিষদ বিহিত মহাস্ত্র (ব্রহ্মজ্ঞান) ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। ব্রহ্মভাবনাগত চিত্ত দ্বারা সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে।" আবার 'প্রণবই ধনু, আত্মা শর, লক্ষ্য ব্রহ্ম। অপ্রমত্ত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে।" শর-যেমন ঠিক লক্ষ্যাভিমুখী হয়, তেমনি ব্রহ্মময় হইবে। "(মুণ্ডক—২।২।৩.৪) ওঁ শব্দে আত্মাকে ধ্যান করিবে।" (মু—২।২।৬) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সামবেদের একটি অংশের নাম উদ্গীথং। এই অংশ গান করার নাম উদ্গান। ওঁ উচ্চারণ করিয়া উদ্গান করা হয়। পৃথিবী ভূতদিগের রস (সার), জল পৃথিবীর রস, ওষধিগণ জলের রস, পুরুষ ওষধিগণের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ্ বাক্যের রস; সামবেদ ঋগ্বেদের রস, উদ্গীথ সামবেদের রস, রস দিগের মধ্যে পরম রস, পরম বস্তু, পরম ধাম (১।১।১-২)। প্রশ্নো-পানিষদে ওঁকারকে পরও অপর ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যিনি ওঁকারের এক মাত্রা (অকার) ধ্যান করেন, তিনি শীঘ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন। যিনি দ্বিতীয় মাত্রা (উকার) ধ্যানজ্ঞান করে, তিনি সোমলোকে মহিমা অনুভ-

ফিরিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন। যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ+উ+ম্) ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করেন; তিনি সূর্য্যলোকে উন্নীত হন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে উন্নীত হন এবং জীবঘন (সর্ব্বজীবাধার) হিরণ্যগর্ভ পদ হইতে পরাৎপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্ট-পুরুষকে দর্শন করেন। (প্রশ্ন—৫) "যখন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে (নিশ্চল হয়), বুদ্ধিরও কোনও চেষ্টা থাকে না তাহাকেই পরমাগতি বলা হয় "(কঠো—২।৬) (উপাসনাকালে ইন্দ্রিয়, মনও বুদ্ধি—সকলই স্থির হইয়া থাকা চাই" তাহাদের ক্রিয়া যখন শুদ্ধ হয় তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার—হয়।)।

"বক্ষস্থল, গ্রীবা ও মস্তক এই তিন উন্নত অঙ্গবিশিষ্ট শরীর সমভাবে রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে মনদ্বারা হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মসমুদ্রে ভেলাস্বরূপ প্রণবমাত্র দ্বা া জ্ঞানী সংসার স্রোত উত্তীর্ণ হন।" (শ্বেত—২।৮) "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা—(অঙ্গমেজয়ত্ব) সংযত করিয়া, প্রাণবায়ুকেও সংযত করিয়া, মন নিঃশক্তি হইলে নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিবে। (মুখ দ্বারা নয়)। দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া মনকে ধারণ করিবে।" (শ্বেত—২।৯)। "ক্ষুদ্র উপল-অগ্নি-বায়ু-বর্জ্জিত সমতল পবিত্র ভুমিতে শব্দ, জল ও আশ্রয় বিষয়ে মনের অনুকূল, চক্ষু-পীড়ার কারণ হীন বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য কুটীরের নিকটবর্ত্তীস্থানে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে।" (শ্বেত—২।১০) "নীহার ধুম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র—এই সকল রূপ ব্রহ্ম প্রকাশের নিমিত্তস্বরূপ প্রথমে আবির্ভূত হয়। ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম সমুত্থিত এবং পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হইলে শরীর যোগাগ্নিময় হয়। তখন রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না।" (শ্বেত—২।১১।১২)

কঠ ও শ্বেতশ্বতরে বর্ণিত এই যোগ পরে স্বতন্ত্র—দর্শনে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্ম উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা দ্বারাই অমৃতত্ব-লাভ হয়। কিন্তু যাগযজ্ঞ বৃথা বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। যাগযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ভোগঅন্তে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাগযজ্ঞাদি নিকৃষ্ট উপাসনা, সকাম উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা নিষ্কাম ভাবে করিতে হয়।

গোবিন্দদাসের একটিপদ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের নানা পদ আমরা পড়ি। ভাবে ভাষায়, বর্ণনার লালিত্যে, রসের ব্যঞ্জনায়, চিন্তার বৈদগ্ধ্যে, গাঢ় তন্ময়তায় এই পদগুলি অপূর্ব্ব আনন্দের খনি। পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী শ্রীজয়দেব হরিচরণস্মৃতিসারকে সম্বল করে সরস বসন্ত সময় বনবর্ণনমনুগত মদনবিকার স্বরূপ কৃষ্ণরাধার প্রেমকথাকে শরণ করে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছারূপসাধনার ধারা এবং তারই উপযুক্ত কাব্যিক রীতির যে প্রচলন করেছিলেন পরের যুগের মহাজন কবিরা ব্রজবুলিতে ও নিজ নিজ ভাষায় সেই রসঘন স্বরূপতত্বকে মানুষী তনুমাশ্রিত করে রসের সায়রে ডুবায়ে অমর করে দেশের আকাশে বাতাসে প্রান্তরে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। নবরসের প্রথম রস শৃঙ্গার, শেষ রস শান্তম অর্থাৎ যেখানে মনবাকচিত্ত নির্ব্বাপিত, স্থির, অচঞ্চল, উপাধিবিহীন। প্রাকৃতিক জীবনের লীলায় প্রথম ছন্দই হচ্চে মিলনের অভীপ্সা, আত্মপ্রকাশ, আত্ম-প্রসারণ, যিনি ছিলেন এক, তিনি হবেন দুই, তিনিই হবেন বহু। মহাপ্রকৃতি এই আকর্ষণের মাধ্যমেই সৃষ্টিলীলার ধারাবাহিকতাকে স্থুল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে যান। এই শক্তি বিশ্বজন্যা, নারায়ণী, অনন্তবীর্য্যা, পরমা মায়া। এর মধ্যে তাই এতো লীলার খেলা, প্রাণের স্পন্দন, আনন্দের ঝঙ্কার, চাওয়ার বেগ, পাওয়ার আবেগ, রাগ-অনুরাগ, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য। প্রকাশপিয়াসী মানুষের মন উন্মুখা হয়ে উঠেছে আকাঙ্খায়, আকুল কামনায় সে ব্যাকুল, সে জানবে, দেখবে, বুঝবে, চাইবে—এই তার প্রকৃতির রীতি, জগন্নাথস্বামীকে সে নয়ন-পথগামী করবে এই তো তার প্রার্থনা—দেখে দেখে তার নয়ন তিরপিত না হবে। তবেই ত মদীয়া রতির সঙ্গে মিলবে লীলাজলধি তীরে ভগবানের তদীয়া রতিও। আমায় তুমি শুধু চাইবে না, তোমাকেও আমার চাই। আমি উঠবো, তুমি নামবে—এই double ladder of Conciousness ধরেই বিকশিত হবে জীব ও শিবের লীলা, সীমা ও অসীমের লুকোচুরি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির

রূপায়ন—এইটেই হচ্ছে বিশেষ বিপুল বিরাট জ্ঞানের উপলব্ধি, শুধু প্রেমের মন্ত্র নয়। হয়তো কামজ মোহে এর আরম্ভ, কামকলার চাতুর্য্যে এর বিকাশ, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছায় এর বিস্তার, তবু পরকীয়া আবেশের মধ্যেই আছে রসের ঘনীভূত রূপ। প্রেমসক্ততা থেকেই আসে অনন্ত মমতা, সর্ব্বত্র সমতা—যেথা যেথা নেত্র পড়ে সেথা সেথা কৃষ্ণ স্ফুরে—বাসুদেব সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত শিব যে তিনি। সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া সেই পরমনাগরের দিকে নিক্ষিপ্ত পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই ইষ্টে আবিষ্টতা আসে, তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাবসাধনার এই যে গতি—বহির্মুখী রূপ থেকে অন্তর্মুখী অপরূপকে পাওয়ার এই যে পন্থা, ঐশ্বর্য্যের দিক থেকে মাধুর্য্যের দিকে মুখ ফেরানো, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই ইন্দ্রিয়াতীতের সন্ধান, বহিরঙ্গের দ্বার দিয়ে অন্তরঙ্গে প্রবেশ—এই সহজ সাধনা অত্যন্ত কঠোর হলেও মহাজনরা এরি গান গেয়েছেন। নরোত্তম দাসের ভাষায়—"কেবল রসময় মধুর মূরতি পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ"

ভক্তকবি গোবিন্দদাস আরো সংক্ষিপ্ত করে বল্লেন—"কেবল রস নিরমাণ" এবং রসনা রোচন শ্রবণবিলাস রুচির পদ গেয়ে নন্দনন্দনচন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ যার সেই নটবর কৃষ্ণের কেলি-কীর্ত্তন করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ডে ভক্ত পরিবারে শ্রীমতাং গেহে এঁর জন্ম। সঙ্গীত দামোদরের রচয়িতা প্রসিদ্ধ শাক্ত পণ্ডিত ও কবি দামোদর সেনের দৌহিত্র এবং এঁর ভ্রাতা রামচন্দ্র, শ্রীনিবাসাচার্য্যের একজন পরম ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সুহৃদ ছিলেন। মাতামহের আশ্রয়েই এঁরা প্রতিপালিত হন। গোবিন্দদাসকে আমরা পরম-বৈষ্ণব মহাজন ও কবীন্দ্র বলেই জানি। তখনকার দিনে "কবিরাজ" বলতে কবিকুলশিরোমণিদেরই বুঝাইত, যেমন লক্ষ্মণ সেনের সভায় ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, জয়দেবকে পঞ্চরত্ন কবিরাজ বলা হইত। চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসও কবিরাজ ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যে তিনজন গোবিন্দ দাসের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের পদও মিশিয়া গিয়াছে। যদিও গোবিন্দ দাসের খ্যাতি বৈষ্ণবপদকর্ত্তা বলে—তবু তাঁর প্রথম জীবনে তিনি যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় চিন্তাধারার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। গোবিন্দদাসের এই এই পদটিই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়—

হেমহিমগিরি দুই তনু ছিরি
আধ-নর আধ-নারী।
আধ-উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারী॥
দেখ, দেখ দুহুঁ মিলত একগাত
আধ ফণিময় আধ মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার।
আধ বাঘাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার॥
ন দেব কামিনী না দেব কামুক
কেবল প্রেম-প্রকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণ কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "রসনির্য্যাস" হতে এই পদটি উদ্ধার করেন এবং তাঁর ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে। সাহিত্যে বা সাধনায় অর্দ্ধনারীশ্বরের কল্পনা নূতন নয়। শঙ্করাচার্য্যের হরগৌর্য্যাষ্টকে কস্তুরিকা চন্দন-লেপনায়ৈ এর সঙ্গে শশ্মান ভস্মাঙ্গবিলেপনায় এর মিলন দেখেছি, পংকুণ্ডলায়ৈ এর সঙ্গে ফণিকুণ্ডলায়, মন্দারমালার সঙ্গে কপালমালার, চাম্পেয় গৌরীর অর্দ্ধদেহের সঙ্গে কর্পূর-শুভ্রশরীরার্দ্ধের। সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের ভাস্করবমার নিধানপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ দেখেছি এক আদিদেবের, যিনি অর্দ্ধযুবতীশ্বর, যাঁর গলার একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদ্যত ফণাফণী, যাঁর বরবপুর একদিকে যুবতী-সুলভ স্তনভারনম্র, আর একদিক ভস্মাচ্ছাদিত—এ যেন বৈষ্ণব কবির "ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত, ধবল রহল বাম" যদিও সেটা প্রযুজ্য হয়েছে অন্য অর্থে। দারিদ্র্যদহন স্তোত্রে শিবকে বলা হয়েছে গৌরীবিলাসভূমি।

ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা—তাই শক্তিবাদ বা বৈষ্ণববাদ গোষ্ঠীগতবাদ হিসাবেই সাধকের কাছে বড়ো নয়—তাছাড়া ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটেছে—যেমন মহাযানী বজ্রযানী বুদ্ধতত্ত্বই সহজযানের পথপ্রদর্শক, আবার সহজযানই,

সহজিয়া বৈষ্ণববাদের একটি ধারার উৎস স্বরূপ। বিমল-প্রভায়, কালচক্রের বর্ণনায়, চর্য্যাপদে, ডোম্বি, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী প্রভৃতি পঞ্চকুলের কল্পনায়, প্রজ্ঞার সঙ্গে কালচক্রের যে আলিঙ্গন তাহাই কালে মহাকালের সঙ্গে তারার, হরপার্ব্বতীর ও রাধাকৃষ্ণের মিলনেরই সূচনা করে। ওদিকে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে অবলম্বন করে ভক্তিবাদ ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। সেইজন্য মধ্য-যুগের বৈষ্ণব ভাবপ্লাবনের উপযুক্ত মালমশলার অভাব ছিল না। তাছাড়া প্রাচীনকাল হতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব দর্শনের এক বিশাল বটক্রম গড়ে উঠেছিল। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তে, তৈত্তেরীয় উপনিষদের প্রথম অনুবাকে শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ এর নাম আমরা শুনি। পঞ্চরাত্র বা সাত্বত আগমের কথাও মহাভারতে পড়ি, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদ ও শাণ্ডিল্যবিদ্যারও উল্লেখ দেখি। এমন কি গ্রীক হেলিওডোরাসও ভাগবতপ্রধান ছিলেন। দক্ষিণে আড়বাররা ভক্তির প্লাবনে অপূর্ব গাথায় দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব মাধবদেবের কথাও শুনেছি। তাই আমরা যখন ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু প্রভাবিত এক বিশাল নবজাগরণের যুগে এসে পড়লাম, তখন সমাজ-জীবনে, সংস্কৃতিতে, চিন্তায় সাধনায় এক সমন্বয়ের সূত্রই দেখলাম—তারই প্রকাশ হিসাবে যদি পদাবলী সাহিত্য পড়া যায় তাহা হইলে গোবিন্দদাসের ঐ পদটিকে শুধু শাক্ত পদই বলবো না, একটি রসঘন মিলনের প্রতীক বলেও গণ্য করবো। আর বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথাইত "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো" কে "এক" হিসাবে দর্শন করা। এই প্রসঙ্গে নরোত্তম দাসের একটি পদ মনে পড়িতেছে!

নাথ হে—
কৌপীন খুলিয়া লহ কপালে সিন্দুর দেহ
পরিবারে দেহ নীল সাড়ী
কঙ্কণ কেয়ুর দিয়া নিজ দাসী বানাইয়া
হাতে দেহ সুবর্ণের চুড়ী
দাসী করি রাখ বামে শুনাহ বাঁশীর গানে
পুরাহ আমার মন আশ।

বৈষ্ণব কবি সাধারণত রাধাকৃষ্ণকে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করেননি বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ যে একাত্ম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। স্বয়ং মহাপ্রভুই ত রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং', রসকদম্বমূর্ত্তি, অন্বয়াত্মা, পরানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ!

স্বপনচারিনি শোনো

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নে তোমার পেয়েছি সোহাগ স্বপ্নচারিণি, শোনো,
কী গভীর সে যে তব অনুরাগ অলীক এ নয় কোনো।
এত কাছে আছ বুঝিতে পারিনি এতখানি ভালোবাসো,
মরু-অন্তরে ফল্গু-তটিনী মনে মনে তুমি হাসো।
জাগরণে নেই কোনো আয়োজন ঘুমঘোরে পরিচয়,
দিনের আকাশ তারা-নির্জন যামিনী জ্যোতির্ময়।
তুমি অপর্ণা করিছ সাধনা অন্তরে গোপনীয়,
হৃদয়ের শুধু তব আরাধনা নেই বাণী রমনীয়।
কেউ ত বোঝে না আমিও বুঝিনি নেই কোনো ইংগিত,
মনে হয় এ যে সুপ্তি চারিণি নির্ব্বাক সংগীত।

অন্তর মোর সেইদিন হ'তে ভ'রে আছে অনুরাগে,
বর্ষা-প্লাবিত আকুলিত স্রোতে গিরি-নদী বুঝি জাগে।
সেই দিন হ'তে ভালবাসি যেন সব কিছু পৃথিবীর,
বিস্ময় মানি উচ্ছ্বাসে হেন অন্তর জলধির।
তোমার মনের গোপন ধনের শাশ্বত পরিচয়ে
ধন্য আমি যে মৌন প্রেমের সুদূর দিগ্বিজয়ে।
জানিল না কেউ, জানিবে না কেহ সুগোপন জানাজানি,
দুটি হৃদয়ের সুগভীর স্নেহ দিবাযামী কানাকানি।
স্বপনের মাঝে হে মোর মানসী এসো এসো নিতি এসো,
সবার গোপনে আঁধারে বিকশি মোরে শুধু ভালোবেসো।

বাজি

শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎকাল। রাত্রি গভীর হ'য়েছে, একজন বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী নিজের পড়ার ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করেছেন। মনে হচ্ছে তিনি খুবই চিন্তিত। সত্যিই তাই!...

..তাঁর মনে পড়ছে আর এক শারদীয় সন্ধ্যার কথা। সে আজ পোনের বছর আগেকার কথা।...

একটি চমৎকার আলো-ঝলমল্ সান্ধ্যপার্টি। নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন অনেকেই, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত লোকের সংখ্যা কম—অবশ্য আক্ষরিক অর্থে। সাংবাদিক আছেন দু'একজন। কিন্তু আগতদের মধ্যে সবাই চতুর—অনস্বীকার্য্য। আর তাই তাঁদের মধ্যে একটা মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল।

প্রাণদণ্ড না চিরজীবনের মত নির্ব্বাসন! কোনটা গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে—এই ছিল আলোচনার বিষয়।

অনেকেই বল্লেন যে—প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভাল এবং সেই প্রথাই চালু হওয়া উচিত। কারণ—প্রাণদণ্ড নীতির দিক থেকে তো খারাপ বটেই, উপরন্তু খৃষ্টানরাষ্ট্রের পক্ষে এ ব্যবস্থা অনুপযুক্ত।

—"আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না," গৃহস্বামী বল্লেন—"অবশ্য আমি নিজে এই দু'টো কোনটাই অনুভব করিনি। কিন্তু যদি নীতির কথাই তোলেন তবে আমার তরফ থেকে বলার কথা হ'চ্ছে এই যে, প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনেক খারাপ। কারণ প্রাণদণ্ড হ'লে একজনকে খুব বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয় না। কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে একজনকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়—তা'তে কষ্টের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। এই অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়াটাই নীতির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।"

একজন অতিথি বল্লেন, "আমার কিন্তু মনে হয় এই দু'টোই নীতির দিক দিয়ে খারাপ। দু'টোরই তো উদ্দেশ্য সেই এক—মানুষের জীবন নেওয়া। রাষ্ট্রকে ভগবান বলা চলে না যখন, তখন ইচ্ছামত কারুর জীবন নেবার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।"

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন যুবক ছিলেন। বয়েস ২৫।২৬ হবে। পেশায় উকীল, তাঁকে তাঁর অভিমত জানাতে বলা হ'লে বল্লেন—"নীতির দিক দিয়ে উভয়ই খারাপ বটে, কিন্তু প্রাণদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য। যেমন ধরুন আমায় যদি কেউ বলে, 'কারাদণ্ড আর প্রাণদণ্ডের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নাও', তো আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই পছন্দ করব। কারণ আমি যেভাবে হোক বাঁচতে চাই এই সুন্দর পৃথিবীতে।"

যুবক উকিলটির কথা নিয়ে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চল্‌ল। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী তখন ছিলেন বয়েসে অনেক জোয়ান। তাই যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, তিনি সহসা রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারালেন।

টেবিলের ওপর হাত মুঠো করা অবস্থায় এক চাপড় দিয়ে বল্লেন "এটা তুমি বাজে কথা বলছ। আমি তোমায় চ্যালেঞ্জ করছি। তুমি যদি পাঁচবছর কারাদণ্ড ভোগ করতে পার তবে তোমায় আমি ২ লক্ষ টাকা দোব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।"

উকিলটি জবাবে বল্লেন—"আপনি যদি জিনিষটাকে সত্যিই গভীরভাবে নেন, তবে আমি এ বাজি ধরতে

রাজি আছি। আর এ কারাদণ্ডের মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছর নয়, আমি ১৫ বছর ভোগ করতে রাজি, এই বলে দিলাম।"

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী রাগে ক্ষোভে, আর উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন এই কথা শুনে—"১৫ বছর! তা হ'লে তাই হোক। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ২ লক্ষ টাকা বাজি ধরলুম।"

—"বেশ আমিও সম্মত।"—

এইরকম ভাবে একটা হাস্যকর বাজি ধরা হ'ল। যেন মানুষের লুপ্ত আদিম প্রবৃত্তি সুড়সুড়ি পেয়ে মাথা নাড়া দিল।

এই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর তখন অনেক লক্ষ টাকাই বাজে খরচ করার মত অবস্থা ছিল। তাই তিনি আত্মবিস্মৃত হ'লেন।

তারপর রাত্রির খাওয়া যখন শেষ হ'ল তখন উকিলটিকে নিরিবিলি দেখে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বল্লেন,—"ভাই সময় থাকতে থাকতেই একটু কাণ্ডজ্ঞান কর। ২ লক্ষ টাকা আমার হাতের ময়লা। কিন্তু তোমার জীবনের এখন অনেক দাম। এর প্রয়োজন আছে এখনও প্রভূত। কাজেই জীবনের তিনটে কি চারটে বছর এমন করে নষ্ট কোর না। তিন-চার বছর বলছি এই জন্যে যে, আমি জানি যে তুমি তিন-চার বছরের বেশী কারাদণ্ডভোগ করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে যে-কোন মুহূর্তে মুক্ত হ'তে পারবে—এই চিন্তাই তোমায় সুস্থির থাকতে দেবে না।"

...এবং এখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী পড়বার ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে এই সমস্ত ঘটনা মনে করতে লাগলেন। তারপর চিন্তা করলেন, "আমি কেন এ বাজি ধরেছিলুম? কি ফল পেলুম? উকিলটি জীবনের মূল্যবান পোনের বছর নষ্ট করবেন আর আমিও ২ লক্ষ টাকা নষ্ট করব। এতেই কি সবাই বিশ্বাস করবে যে প্রাণদণ্ডের চেয়ে কারাদণ্ড ঢের ভাল। না! না! এটা আমার কাছে ছিল একজন সুস্থ ধনীর অর্থহীন বিলাস, আর উকিলটির ছিল টাকার লোভ। আর কিছুই নয়।

সেদিনের সান্ধ্যপার্টির পরেকার ঘটনা তাঁর মনে পড়তে লাগল।...

ঠিক হ'য়েছিল উকিলটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর বাগান বাড়ীর একটি ঘরে বন্দী থাকবেন, তাঁকে সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া হবে। বন্দী থাকার সময় চিঠি লেখা চলবে, কিন্তু বাইরের থেকে লেখা একবর্ণও ঘরের চৌকাট পেরুবে না। তাঁকে কেবল তামাক, মদ আর বই দেওয়া হবে অজস্র—যত তাঁর প্রয়োজন। আর দেওয়া হবে একটা বাদ্যযন্ত্র—যা তাঁর পছন্দ।

উকিলটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এই সর্তেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত ১২টা থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত—ঠিক পোনের বছর বন্দী থাকবেন। এ সর্তের একটু এদিক ওদিক হলেই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী বাজির ২ লক্ষ টাকা ইচ্ছে করলে না দিতেও পারেন।

ছোট্ট একটা ঘরে একাকী আটক থাকার সময়ে তিনি যা লিখে রেখে গেলেন তার থেকে জানা যায় যে বন্দী থাকার প্রথম বৎসরে খুব কষ্ট হয়েছিল। তিনি মদ আর তামাক খেতে চাইলেন না। চাইলেন কেবল বই—হালকা প্রেমের গল্প আর উপন্যাস। আর চাইলেন একটা পিয়ানো। বন্দী অবস্থার প্রথম বছরে ছোট্ট ঘরটা থেকে হরদম্ পিয়ানোর করুণ সুর শোনা যেত। মদ আর তামাক না খাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি লিখে-ছিলেন,—"সুস্বাদু মদ্য একাকী পান করার চেয়ে শাস্তি আর কিছুই নেই। তামাকের ধোঁয়া ঘরের বাতাসকে বিষাক্ত করে দেয়।"

দ্বিতীয় বছরে পিয়ানোর সুর শোনা গেল না। বন্দী কেবল ক্লাসিক গ্রন্থের তাগাদা দিতে লাগলেন।

পঞ্চম বছরে, আবার পিয়ানো শোনা গেল এবং বন্দী এবার মদ খাওয়া ধরলেন। এ সময়ের প্রহরীরা বলে যে, এই সময়টাতে তিনি একটাও বই পড়েন নি। কেবল মদ খেয়েছেন আর শুয়ে সময় কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে নিজের ওপর রেগে চীৎকার করতেন, আবার মাঝে মাঝে কেঁদে উঠতেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যখন বন্দী অবস্থার ছ বছর চলেছে ঠিক সেই সময়ে তিনি প্রচুর ভাষা সম্বন্ধীয় বই পড়তে লাগলেন। আর পড়লেন ইতিহাস এবং দর্শন। এই বছরের শেষের দিকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী একটা চিঠি পেলেন। বন্দী লিখেছে।

"প্রিয় জেলার! এই কয়েক লাইন আমি ছ'টা ভাষায় লিখে পাঠালাম। এ সমস্ত ভাষায় যাঁরা পণ্ডিত দের দেখাবেন। যদি তাঁরা এগুলোর মধ্যে একটাও ী না পান তবে দয়া করে আমায় জানিয়ে দেবেন। মি এ'তে আনন্দিত হ'ব। স্বর্গীয় আনন্দ যে কি নিস আপনি জানেন না, কিন্তু আমি আজ অনুভব ছি।"

আরো পরে, দশম বছর পার হবার পর উকিলটি পুরো বছর হ্যাটেষ্টামেণ্ট পড়লেন। এ ব্যাপারেই ব্যাঙ্ক সায়ী অবাক হ'লেন। কারণ যে লোক ছ'বছরে প্রায় মোটা বই পড়লেন—সেই লোক পুরো এক বছর ধরে টা এমন বই পড়লেন—যেটা খুব মোটাও নয় আবার ক্তও নয়।

বন্দী অবস্থায় থাকার শেষ দু'বছর তিনি অস্বাভাবিক-র প্রচুর বই পড়তে লাগলেন। কিন্তু এ পড়ার কোন বাহিকতা রইল না। কখনও ইতিহাস পড়লেন, র কখনও বা বায়রণ পড়লেন, সেকস্‌পীয়ার পড়লেন। য়ত রসায়ন শাস্ত্র চাইলেন কিংবা সুখপাঠ্য উপন্যাস লেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত বা ডাক্তারী বই কিংবা সম্বন্ধীয় বই চাইতে লাগলেন। এই যে খাপ ছাড়া পড়া এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে সেই কর—যে সমুদ্রের গভীরে তলিয়েছে জাহাজ ডুবি হয়ে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য একটার পর একটা ভাঙা কাঠকে র ধরছে!

্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এই সব মনে করে চিন্তা করলেন: আগামী কাল রাত বারোটার সময় ও ছাড়ান পাবে, র আমাকে বাজির দুই লক্ষ টাকা দিতেই হবে। যদি ় দিতে হয় তো আমি পথের ভিখিরী হয়ে যাব।"

৫ বছর আগে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে অহেতুক বিলাস করার মত অর্থ তাঁর ছিল। কিন্তু আজ? টিকা বাজারের জুয়ায় তাঁর ব্যবসার ভিত্তি ধ্বসে। ঋণের জালে মাথার চুল পর্য্যন্ত আজ বিকিয়ে

আজকের বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী মনে মনে বলছেন—ই অভিশপ্ত বাজির ফল···লোকটা মরল না কেন? ওর বয়স চল্লিশ। কালকে রাত বারোটার পর আমার শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নেবে। তারপর বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করবে। হয়ত আমার অবস্থা দেখে ওর করুণা হবে। বৃদ্ধের মুখে, চোখে কাঠিন্য ফুটে উঠল, ফুটে উঠল আত্ম-প্রত্যয়ের চিহ্ন। তিনি ঠিক করলেন, "এই সমস্ত অপমান থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় আছে—সেই ছোক্‌রা উকিলটিকে আর বাঁচতে দেওয়া চলবে না।"

ঘড়িতে ঠিক তিনটে বাজল, বৃদ্ধ তা কান পেতে শুনলেন, বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে। কেবল বাইরের থেকে কুয়াসার সঙ্গে হাওয়া দেওয়ার ফলে গাছের শিরশিরানি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অখণ্ড মৌনতার মাঝে ঐ একটাই ব্যতিক্রম।

কোন রকম শব্দ না করে তিনি দরজার চাবিটা নিলেন। তারপর ঘর থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে চললেন সেই দরজার দিকে—যেটা গত পোনের বছর এক মুহূর্ত্তের তরেও খোলা হয়নি।

সমস্ত বাগানটা অন্ধকার এবং হিমশীতল। তীক্ষ্ণ স্যাত-স্যেতে হাওয়া বইছে। এই জন্যে গাছগুলো পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। কুয়াসার ঘন আস্তরণ ভেদ করে তিনি চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। আন্দাজে আন্দাজে পা টিপে টিপে শেষে তিনি এক সময়ে সেই ঘরের জানলার কাছে এসে পৌঁছলেন, তারপর দ্বারোয়ানের নাম ধরে দু'বার ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুয়াসার হাত থেকে রেহাই পেতে সে ইতিমধ্যে উষ্ণ কোমল বিছানার আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে জানলার কাছে গেলেন। উত্তেজনায় তখন তিনি কাঁপতে শুরু করেছেন। ছোট্ট জানলার ফাঁক দিয়ে তিনি ঘরের ভেতরে উঁকি দিলেন···

···বন্দীর ঘরের টেবিলে তখনও একটা বাতি মৃদু মৃদু জ্বলছে। বন্দী নিজে সামনের চেয়ারে বসে। বাইরের থেকে কেবল মাথাটা চুলটা আর হাতটা দেখা গেল। টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ, বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট সময় পেরিয়ে গেল, বন্দী একবারও নড়লেন না। পোনের বছরের নির্জ্জনতা তাকে নিশ্চল

থাকতে শিখিয়েছে। তিনি জানলায় দু'বার টোকা দিলেন কিন্তু বন্দী ঘুমিয়েই রইলেন।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে দরজার চাবি খুললেন। দরজার পাল্লা খোলবার সময় অনেক সাবধানতা স্বত্ত্বেও আওয়াজ হ'ল—ক্যাঁচ। বন্দীটি উঠলেন না, তিনি ভেতরে তাকালেন। টেবিলের ওপর মাথা রেখে সামনের চেয়ারে বসে বন্দীটি ঘুমুচ্ছেন। কঙ্কালসার চেহারা হয়ে গেছে, মাথার চুল মেয়েদের মত লম্বা লম্বা কোঁকড়ান হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে তাঁকে দেখলে মায়া লাগে। মাথার পাশে একটা লেখা কাগজ পড়ে রয়েছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী চিন্তা করলেন, "হায়, হায়! তুমি এখন ঘুমিয়ে হয়ত লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছ। তোমার এ স্বপ্ন আর বেশীক্ষণ দেখতে হবে না। কেবল একবার বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বালিশটাকে দিয়ে মুখটা চেপে ধরার অপেক্ষা, ডাক্তাররা তাহলে তোমার অসময়ের মৃত্যুতে কিছুই অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পাবে না। আগে কাগজটায় কি লেখা আছে পড়া যাক্।"

তিনি টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

—"আগামী কাল রাত বারোটায় আমি ছাড়ান পাব এবং মানুষ-জনের সঙ্গে মিশবার অধিকার পাব। কিন্তু নতুন সূর্যালোক, নতুন পৃথিবীকে দেখার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই। আমার নিজস্ব স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি থেকে এবং যিনি আমার ওপর সব সময়ে নজর রেখেছেন, সেই ভগবানের নামে শপথ করে আমি আজ জানিয়ে দিচ্ছি যে, স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য এবং আপনার দেওয়া গ্রন্থরাজি যাকে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ বলে মনে করি,—সমস্তই আমি আজ অবজ্ঞা করতে পারি এমন মনের জোর আমার আছে।

এই পোনের বছর আমি পার্থিব সুখ অনুভব করেছি। অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে পৃথিবীর সমাজ থেকে বাইরে নির্ব্বাসনে থেকে তা সম্ভব হয় কি করে? কিন্তু তাই হ'য়েছে। আপনার দেওয়া গ্রন্থরাজির মধ্যে দিয়েই আমি সুস্বাদু মদের আস্বাদন পেয়েছি, বই-এর সুরের সঙ্গে গলা মিশিয়েছি, বনে বনে হরিণ, ভালুক শিকার করেছি। এমন কি সাধারণ মানুষের মত প্রেমও করেছি নারীদের সঙ্গে।

কবির প্রতিভায় সৃষ্ট—দূরের নীলাকাশে সঞ্চরণশীল হাল্কা মেঘখণ্ডের মত সুন্দর মেয়েরা আমার কানে কানে অচিন দেশের রূপকথা শুনিয়েছে—আমি তা শুনেছি। আপনার দেওয়া বইএর শৃঙ্গদেশে সুস্থদেহে অনেকবার উঠেছি এবং সেখান থেকে দেখেছি সকালে উদয়ের সময়ে আর বিকেলে অস্ত যাবার সময় কেমন করে সূর্য্য সমুদ্রের বুকে আর অনেক নীচে পৃথিবীর গায়ে সোনা মাখিয়ে দেয়।...

আপনার বই আমায় জ্ঞান দিয়েছে। শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সংস্কৃতির আরকে-ভেজা মানবতাবোধের থেকে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে—তা এখন আমার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আজকে আমি জেনেছি, আমি আপনার চেয়ে অনেকগুণে বেশী চতুর।

এবং আমি আজকে আপনার দেওয়া বই, সমস্ত জাগতিক পৃথিবীর জ্ঞান, সম্পদ—সব অবজ্ঞা করছি।

আপনি পাগলের মত ভুল পথে চলেছেন। অসত্যকে সত্য বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, অসুন্দরকে সুন্দর বলে স্বীকার করেছেন। আজকে যদি কোন আপেল বা লেবু গাছে ব্যাঙ্ বা কোন সরিসৃপ জাতীয় জন্তু জন্মায় তো আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন। ঠিক তেমনি আমিও আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছি। কারণ আপনি পৃথিবীর বিনিময়ে স্বর্গের চিন্তা করেছেন। এ কথার প্রতিবাদ হিসাবে আপনার কথা, আপনার আদর্শ শোনাতে আসবেন না। তা আমি মানি না, মানতে পারি না।

তাই আপনার আদর্শকে, আপনার জীবন যাত্রাকে অবজ্ঞা করে আমি জানাচ্ছি যে দু'লক্ষ টাকার স্বপ্ন আমি এককালে দেখেছি তার দাবি আমি ছেড়ে দিচ্ছি! আপনার দু'লক্ষ টাকার ওপর যাতে আমার কোন দাবি না থাকে তার জন্যে আমার মুক্তি পাবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে সর্ত্ত ভঙ্গ করে এখান থেকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

চিঠিটা পড়ার পর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী অশ্রু-সজল চোখে চিঠিটা টেবিলে রেখে ঐ আশ্চর্য্য লোকটির মাথায় আলতো ভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেলেন। তারপর চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই মাত্র তিনি কি করতে চলেছিলেন তার চিন্তায় এবং যুবকটির প্রতি অসীম মমতায় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এর আগে এমন করে তিনি কখনও কাঁদেন নি। এমন কি ফাট্কা বাজারের জুয়ায় তাঁর সবচেয়ে ক্ষতির সংবাদ পেয়েও না! কিন্তু এখন তিনি কাঁদলেন।

তারপরের দিন, তখন সকাল হয়েছে। সংশয়ের কুয়াসার ঘন আস্তরণ তখন পাতলা হয়ে আসছে। সূর্য্য উঠেছে, প্রকৃতির বুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার গুঞ্জরণ উঠছে। বন্দীর জন্যে যে দ্বারোয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছিল সে এসে খবর দিল যে বন্দী পালিয়েছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী গম্ভীর হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হলেন, তাই স্বাভাবিক! কিন্তু মনের উত্তেজনা যথা সম্ভব চেপে দ্বারোয়ানের সঙ্গে গিয়ে বন্দীর ঘর থেকে ঘুরে এলেন। দেখে এলেন সত্যিই সে পালিয়েছে কিনা! ফেরার পথে টেবিল থেকে তাঁকে লেখা চিঠিটা নিয়ে এলেন।

অস্বাভাবিক গুজবের মুখচাপা দেবার জন্যে।… *

('Anton chekhov' রচিত 'The Bet' নামক গল্পের অনুবাদ)

গ্যয়েটের ধ্যানধারণা—শিল্প ও ব্যক্তিত্ব

শ্যামলদাস সেনগুপ্ত

শিলারের মৃত্যুর পর থেকে জার্মাণ ক্লাসিকাল যুগের শেষ হয়। শিলারের মৃত্যু হয় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। ক্ল্যাসিকাল যুগের শেষ প্রায় শিলারের মৃত্যুর সঙ্গে হলেও ক্লাসিকাল ধ্যানধারণা বোধ হয় গ্যয়েটের মন থেকে সরে যায় নি। সারা জীবনব্যাপী ক্লাসিকাল যুগের স্বীকৃতি ও প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সুন্দরের উপাসক। গ্রীক সভ্যতার ঐতিহ্য স্বভাবতঃ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নানা আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রীক সভ্যতার নজীর তুলে মন্তব্য করতেন। সেই দেশের চিত্রকলা ও নাটক তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ফাউষ্ট নাটকের হেলেন চরিত্রে তিনি ক্লাসিকাল রূপ দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ হেলেন অফ্ ট্রয়ের ছায়া হিসাবে। ফাউষ্ট নাটক হচ্ছে এই মহাকবির অন্তরের সঙ্গীত। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্ক, শয়তানের সৃষ্ট বেড়াজাল ও মোহ থেকে আলোকের প্রতি মানুষের যে তীর্থযাত্রা এবং পুরুষের জীবনে চিরন্তন নারীর যে অস্তিত্ব বোধ এ-গুলি নিশ্চয়ই ক্লাসিকাল রসের আধার, ক্লাসিকাল সৌন্দর্য্যবোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে হেলেন চরিত্রে তিনি অর্দ্ধ ঈশ্বরী সত্তা আরোপ করেছিলেন, গ্রীক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা তিনি হেলেন চরিত্রে আরোপ করেছেন। ক্লাসিকাল সৌন্দর্য্য বোধের চূড়ান্ত পরিণতি এই হেলেন চরিত্র। এ পরিচয় আকস্মিক নয়। কারণ ফাউষ্ট নাটক তিনি চব্বিশ বছর বয়সে লেখা সুরু করেছিলেন! বিরাশী বছর বয়সে এ লেখা তিনি সমাপ্ত করেন। যৌবনের কামনা-রাঙা প্রবৃত্তি তখন শেষ হয়েছে এবং সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন। চব্বিশ বছর থেকে বিরাশী বছর পর্য্যন্ত তাঁর মানস জীবনের অধ্যাত্ম তীর্থযাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে এই ফাউষ্ট নাটক।

তিনি ছিলেন জার্মান। জার্মাণ গথিক শিল্পকলার মত তাঁর ছিল মন। মনের গথিক গাঁথুনি খাঁটী জার্মান হয়ে তিনি পেয়েছিলেন সেই যুগে। তা না হলে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে এত পরিণতি দেখান সম্ভব হত না। গথিক গাঁথুনির মত তাঁর ছিল অখণ্ড ব্যক্তিত্ব।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার তিনি অনুরাগী ছিলেন। সেই উভয় দেশের শিল্পকলা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। অতীত গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ও সংস্কৃতির ওপর জোর দিয়ে তিনি প্রায় মন্তব্য করতেন।

ব্যক্তিত্বকে তিনি স্বীকার করতেন, তা শিল্পকলাতেই হোক বা কবিতার ক্ষেত্রেই হোক। তিনি মনে করতেন জাতশিল্পীও কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে। এই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ না থাকলে কোন মানুষ কু ও সুকে বেছে নিতে পারবে না। দুর্বল ধ্যানধারণা শিল্পীকে ও কবিকে পথভ্রষ্ট করবে। পথ নির্বাচন ব্যাপারে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মন দরকার। তারা দুর্বল ও অসাড় ধ্যানধারণা ও মত পরিত্যাগ করে সুন্দরের পথ বেছে নেবে। শিল্পের ওপর পূর্ব্বসূরীদের প্রভাব পড়ে। এ স্বাভাবিক। তবুও যারা যথার্থ শিল্পী তারা পূর্ব্বসূরীর প্রভাব ও দানকে গ্রহণ করে নতুন সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীতে সুন্দর জিনিষ বহু আছে। সুন্দর দেখে বিস্মিত হলেই হবে না, সুন্দরকে আরও সৃষ্টি করতে হবে সুন্দরের অতীতের প্রভাব নিয়ে। অবশ্য তরুণ শিল্পীদের জীবনে কদর্য্য প্রভাবটা আগে পড়ে। তরুণ শিল্পীর ওপর কদর্য্য প্রভাব পড়বার কারণ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব। এই অভাবের জন্য তরুণ শিল্পীরা বিপথে পরিচালিত হয়। তারা বিচার করতে পারে না, বিশ্লেষণ করতে পারে না। এই না-পারার দরুণ তারা সুন্দরের পথ বেছে নিতে পারে না। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শিল্পীর জড়িয়ে আছে পৌরুষভাব। এ পৌরুষভাব বোধ হয় অনেকটা সহজাত। তবে সম্পূর্ণ সহজাত কী না—সেটাও বিচার করা দরকার। সহজাত শিক্ষা ছাড়াও শিল্পীর জীবনে নৈতিক আদর্শ ও শিক্ষার ওপর জোর দিতেন।

ভেনিসে Titian ও Paul Vernoseর শিল্পকলা দেখবার জন্য কয়েক জন জার্মান শিল্পী গিয়েছিলেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই দুই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রতিটী রেখাঙ্কনে জড়িয়ে আছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বই শিল্পকে মহান করে। জার্মান অভিযাত্রী দলটীর বিষম বিরূপ মন্তব্য করে বলেছিলেন যে রাফেলের ছবি সেই সব শিল্পীদের কাছে বিসদৃশ বলে মনে হ'বে। ব্যক্তিত্বহীন শিল্প বলবে যে Titian সুন্দর রং ফলাতে পারেন। তা ছাড়া Rubenoর নির্মল ছবিগুলিতে যে Double shadowর লীলা খেলা চলছে তা সেই সব অভিযাত্রী শিল্পীরা ধরতে পারবে না। যারা নিসর্গ ছবি আঁকবে বা দেখবে তাদের বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকা চাই, কারণ প্রকৃতির সামান্য মাটী, জল, পাহাড়, মেঘ প্রভৃতির মধ্যে শিল্পীর রেখাঙ্কন একটা গূঢ় রসসঞ্চারী ভাবের সৃষ্টি করে। সামান্য প্রকৃতির মধ্যে শিল্পীর প্রসাদ গুণ শিল্পকে মহৎ করে তোলে। মহৎ কিছু করতে হলে ব্যক্তিত্বকে উন্নতমার্গে নিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীতে যারা অসার্থক শিল্পী তারা উন্নতমার্গে উঠতে পারে না। হাতুড়ে ডাক্তারের মতন তারা নিজেদের শূন্যগর্ভ বিদ্যা ও বুদ্ধিকে বেশ বলে মনে করে। নিজেদের অসংস্কৃত মন নিয়ে তারা গর্ব করে। এই সব ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব নাই। ব্যক্তিত্ব না থাকার ফলে পৌরুষও থাকে না। কারণ যথার্থ শিল্পে পৌরুষের যে ব্যঞ্জনা রূপ পেয়েছে তা তারা দেখতে পারে না। জাত শিল্পীদের নিজের ওপর আস্থা আছে। আস্থা শিল্পীর যদি না থাকে পরের ইংগিতে তারা পরিচালিত হবে। পরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহৎ প্রতিভার সৃষ্টি হয় না। শিল্প মানস তাতে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। ভ্রান্ত মতধারা সেই সব তরুণ দুর্বল শিল্পীরা গ্রহণ করে। অন্য শিল্পীকে পথ প্রদর্শক বলে নিজেরা আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের কারণ হচ্ছে: নিজের ওপর আস্থার অভাব। নিজের ওপর যাদের আস্থা নাই তারা হচ্ছে দুর্বল শিল্পী। অতি দ্রুত তারা নিজেদের মত পালটায়। খেই হারিয়ে ফেলে, পূর্বাপর সম্বন্ধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকে না। কোথায় শেষ করতে হবে ও আরম্ভ করতে হবে—তা তারা জানে না। এই কারণে তারা মত পালটায়। মত পরিবর্তনের কারণ এই যে তাদের ভিত্তিই দুর্বল। আর দুর্বল মনে সহজেই অন্য লোকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেই কারণে এই দুর্বল ভিত্তিতে ভ্রান্ত মতবাদ দ্রুত শিকড় চালাতে সক্ষম হয়। ক্রমশঃ সেই শিকড় মনে এত জট পাকায় এবং দুর্বল শিল্পীকে আষ্টেপিষ্টে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরে যে সেই জটের পাকে নিজেকে শিল্পী হারিয়ে ফেলে।

সার্থক শিল্পীদের তফাৎ এই খানেই। শিল্পের পিছনে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। এর ফলে শিল্পে প্রাণশক্তির উজ্জীবন হয়। যে শিল্পে প্রাণশক্তি নাই সে শিল্পে সৌজন্য থাকে না, সৌন্দর্য্যও থাকে না তাতে। পরিমিতি বোধের অভাব দেখা যায় সে শিল্পে। শিল্পাঙ্কন সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় যেখানে শিল্পীর সহজাত পৌরুষ সহজেই আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছে।

তদানীন্তন যুগে অনেকে বলতেন যে গ্রীক শিল্পীরা যখন কোন জীব-জন্তু বা প্রাণীদের ছবি এঁকেছে তখন তারা প্রকৃতিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে নি, কারণ প্রকৃতিকে অনুসরণ করবার ক্ষমতা গ্রীকদের ছিল না। তা ছাড়া গ্রীক শিল্পীরা কত গুলো রীতি নীতি মেনে চলত। এই রীতি নীতি তারা এমন আদব কায়দায় মেনে চলত—যার ফলে তাদের শিল্প খুব মনোজ্ঞ ও সুন্দর হয় নি। তারা যে সব পশু, পাখী ও জীব জন্তুর ছবি এঁকেছে তাদের পিছনে পটভূমিকার গভীরতা ও রেখাঙ্কন খুব স্পষ্ট নয়; বরঞ্চ সে গুলো আড়ষ্ট রেখা। গঠন ভঙ্গিমা খুব ভাল নয়—কারণ সে গঠন ভঙ্গিমার রূপ বিকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ নয়।

এর উত্তরে তিনি বলতেন বিশিষ্ট শিল্পীর-ব্যক্তিমানস জানা দরকার। সেই সময়কার ধ্যান ধারণা বিষয়ে অবহিত হয়ে এবং তদানীন্তন যুগের জাতির যে সমগ্রতার অগ্রগতি তার সঙ্গে শিল্পীকে একক রূপে দেখে তবে সেই শিল্পীকে বিচার করতে হবে। কারণ এই বিশিষ্ট শিল্পী সমগ্রতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির সমকক্ষ না হয়েও গ্রীক শিল্পীরা প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে অধিকাংশ গ্রীক-শিল্প নিখুঁত ও অনুপাত সমর্থিত। তবে তিনি এও বলতেন যে গ্রীক-শিল্প সর্বক্ষেত্রে সর্বাঙ্গ সুন্দরও নয়, অভ্রান্তও নয়। যদি কেউ ধারণা করে থাকে গ্রীক শিল্পকলা সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত, তা হলে ভুল করা হবে। গ্রীক শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের ইতিহাসের ওপর জোর দিতেন। ইতিহাসের বিবর্তন আছে। ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সব কিছু বিধৃত হচ্ছে। ইতিহাসের এই বিবর্তনের ফলে গ্রীক শিল্প ও নাটক এমন স্তরে এসে পড়েছিল যেখানে শিল্পীরা জাতির সমগ্রতার সঙ্গে নিজেদের অখণ্ড ব্যক্তিমানস ও পৌরুষকে প্রকাশ করতে পেরেছিল। এর ফলে তারা যে শিল্পসাধনার চূড়ান্ত পরিণতিতে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কী আছে। সেই-যুগের ধ্যানধারণা, পূর্ববর্তী যুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা অলক্ষ্যে মানুষের শিল্প জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিসীম। গ্রীক নাট্য সাহিত্যের নিয়তি বা অদৃষ্টবাদকে অবশ্য তিনি কোন কালে অন্তর হতে গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য তিনি স্বীকার করতেন গ্রীক নাট্য সাহিত্যের যুগে নিয়তি বা অদৃষ্টের প্রয়োজন থাকতে পারে—তা বলে সব যুগে সব ব্যক্তির কাছে নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ যে অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হবে, তার কোন অর্থ নেই। অদৃষ্টবাদকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন বলে বোধ হয় তাঁর ফাউষ্ট বাধা বিপত্তির মাঝেও জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান পেয়েছিল, মানুষ ভুল করতে পারে, বিকৃতি তার আসতে পারে, তবু মানুষ শয়তান সৃষ্ট বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে। সবকিছুর ওপরে এই মানুষ। মানুষ সব সৃষ্টি করে। অদৃষ্ট মানুষকে সৃষ্টি করেনা।

মহৎ সৃষ্টির পিছনে বহু যুগের সাধনা আছে। যুগের সাধনার পিছনে জাতির জীবনবোধ জড়িয়ে আছে। কোন জিনিস আকস্মিক নয়। সব কিছুর প্রস্তুতির দরকার। প্রস্তুতি না থাকলে দান্তের মত মহাকবির জন্ম সম্ভবপর হত না। যারা বলে দান্তের আবির্ভাব আকস্মিক তাদের স্মরণ করা দরকার যে দান্তের আবির্ভাবের আগে

যুগের প্রস্তুতি চলছিল। যুগের প্রস্তুতির পূর্ণ রূপ দেন মহৎ শিল্পীরা। গ্রীক শিল্পকলার পরিপূর্ণ রূপের আগে প্রস্তুতি চলছিল। প্রস্তুতির মধ্যে থেকে জাতি অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারে। অনেক সমস্তা প্রত্যক্ষ করতে শেখে। এই প্রত্যক্ষ করতে পারে বলে বাস্তব জীবন অনেক কিছু আহরণ করতে পারে। সব কিছু আহরণ করার ফলে শিল্পীর সৃষ্টি সুন্দর হয়—শুধু সুন্দরও হয় না সৃজনধর্মীও হয়। প্রকৃতির তারা অনুকরণ করে না, কারণ অনুকরণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে যথাযথ কাজ নয়। যে সব গ্রীক শিল্পী প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছে তাদের দুর্বলতা শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। আর দুর্বলতা যদি শিল্পীর থাকে তা হলে তার শিল্পজ প্রকৃতির স্তরে ওপর উঠতে পারে না।

নিসর্গ শিল্পীদের বিষয়ে তিনি বলতেন যে যারা নিসর্গ ছবি আঁকবে তাদের জ্ঞান বহুমুখী হওয়া দরকার। নিসর্গ ছবি দু-একটা রেখাঙ্কনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলেই-তা যথেষ্ট নয়। নিসর্গ শিল্পীরা প্রকৃতির মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির রূপ যদি দিতে চায়, তা হলে তাদের দেহবিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ পরিমাপ বোধের জ্ঞান না থাকলে আঁকা ছবির কোন সৌন্দর্য্য থাকবে না। তা ছাড়া সেই শিল্পীর ভূ-তত্ত্ব বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ দেশের জলবায়ুর সঙ্গে দেশের মাটী, চুণ ও বালির পরিবর্ত্তন আসে। দেশের বর্ণবৈচিত্র্য ও মাটীর সম্বন্ধে শিল্পীর যদি জ্ঞান না থাকে, রূপ ও রঙ এর মধ্যে যদি সাদৃশ্য না থাকে তা হলে সে ছবি ব্যর্থ হবে। দেশের জল, হাওয়া, মাটীর রং, ফুলের বর্ণবিন্যাস, লতা পাতার বর্ণবাহার ও বৈচিত্র্য যদি নিসর্গ ছবিতে না ফোটে তা হলে সে ছবির সার্থকতা থাকে না। বাস্তববোধের সঙ্গে শিল্পীর প্রবণতা যদি নিসর্গমূলক ছবিতে না ফোটে তাতে বৈসাদৃশ্য বেশী হয়ে ফুটবে। এই কারণে উদ্ভিদবিদ্যা সেই শিল্পীর জানা দরকার। নিসর্গ মূলক ছবিতে প্রকৃতির রূপ, রেখা ছন্দ লতা পাতা ও গাছের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ফুল ও লতা-পাতার সমাবেশে রং এর বর্ণবাহারে নিসর্গ মূলক ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে সজীব সত্তা, যে চিরন্তন সঙ্গীতের ধ্বনি আলোছায়ার খেলা তা ও' এই নিসর্গ মূলক ছবিতে ফুটে ওঠে।

কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ক্লাসিকাল রীতি, নীতি প্রয়োগ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। শিলারের মৃত্যু হচ্ছে ক্লাসিকাল যুগের শেষ অধ্যায়। তবু এর পাঁচ বছর পরে তাঁর রচিত Pandora প্রকাশিত হয়। গীতি কবিতার উচ্ছল সুরের স্পন্দনা এই সৃষ্টিতে। সুতরাং অনেকে Pandora প্রকাশিত হবার পরবৎসর পর্য্যন্ত ক্লাসিকাল যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। হাফিজের গীতি কবিতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর বন্ধু শিলার গাথা কবিতার মধ্যে নীতিধর্মিতা আনবার চেষ্টা করছিলেন। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে শিলারও ছিলেন অসাধারণ ও শিলার ছিলেন তাঁর বন্ধু। অন্তরের গীতি-ধর্মিতার সঙ্গে বোধ হয় গ্রীক দেশের বহুতন্ত্রী লায়ারের সুর তাঁর অন্তরে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তার কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর 'বিশ্বমন'। সেই বিশ্বমনকে তিনি পরিচালিত করেছিলেন ভাব দিয়ে। কবিতার ছন্দে, মাত্রা ও শব্দ ছাড়া কবিতার পিছনে অমূর্ত্ত সত্তা ভাব জড়িয়ে আছে। কিছু কাল কবিতার ক্ষেত্রে তার ভাটা পড়লেও এই দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। এই ফাউষ্ট নাটকে তিনি সৃষ্টি করলেন অন্তরের সঙ্গীত-সজীবতার দ্যুতি, শুধু ছন্দে ও ভাবে তা ঠিকরিয়ে পড়ছে। তার অখণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছিল শেষ জীবনে এক অধ্যাত্ম ভাবসাধনা। ঘটনা থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন ঘটনার উদ্দেশ্যের কারণ প্রকাশ করতে। আর বাইরের দোষ এবং ভেতরের অসংস্কৃত সত্তাকে পরিশীলিত ঘটনার বিম্ব-প্রতিবিম্ব থেকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চস্তর—প্রজ্ঞায় তিনি চলে গিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে।

রহো প্রভু রহো আমার পাশ

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

Lyte এর "Abide with me" কবিতার ভাবানুবাদ•

সন্ধ্যা ঘনায় দ্রুত—দ্রুততর, আলোকের রেখা মিলায়ে যায়,
ঘোর অমানিশা-মরণ-কালিমা এবার আমার জীবন ছা'য়।
সব সুখরাশি হ'য়ে যাবে গত, যত সুহৃদের হৃদয়-দান—
অশরণ-জন হে মহাশরণ—নারিবে আমারে করিতে ত্রাণ।
হে দীন-তারণ তাইতো শরণ ল'য়েছি অভয় চরণ-দ্বয়ে,
সদা রও পাশে, সকরুণ হাসে ঘুচাও আমার মরণ-ভয়ে।

তোমার সংগ-পরসাদ লাগে প্রতিটী নিমেষে আকুল মন,
তব করুণাই নাশিবে আমার শয়তান রিপু সর্ব্বজন।
তুমি যে আমার চির আশ্রয় ত্রিভুবন মাঝে হে মহারাজ,
পথ নির্দ্দেশ কেবা দিবে আর তুমি বিনে ওগো রাজাধিরাজ!
কাজল মেঘের দুখদলে যবে ঘনাবে দারুণ সর্ব্বনাশ—
তুমি থেকো সাথে,সুখ-লগনেও রহো প্রভু রহো আমার পাশ॥

নিম্মি
তাঁর ত্বকের যত্ন নেন লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এর শুভ্রতাই পরিচয় দেয় এটি বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন
সুন্দরী নিম্মি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ভাবাবেগ পূর্ণ ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাঁর চোখ দুইটি অপূর্ব সুন্দর এবং তাঁর কোমল ফুলের পাপড়ির মত লাবণ্যও মনোমুগ্ধকর। শুভ্র এবং বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তিনি তাঁর লাবণ্যের যত্ন নেন—এটি একটি মোলায়েম, সুগন্ধ সৌন্দর্য্য সাবান।
নিম্মি এবং পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরন করুন—বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান নিয়মিত ব্যবহার করুন!
লাক্স
টয়লেট সাবান
LUX
TOILET SOAP

পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৩৪ সালে ম্যানুএল দা আসসুম্পসাউ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। বইটি পোর্তুগীজ ভাষায় লেখা ; রচয়িতা নিজেও পোতুগীজ তিনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালে থাকতেন। মাতৃভাষা পোর্তুগীজে পৃথিবীতে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা ছাড়াও তিনি পোর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ সঙ্কলন করেন। এইভাবে বাংলাভাষার ইতিহাসে এক নতুন ব্যাপার দেখা গেল। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সর্ব প্রথম রচিত হয়ে বাংলাভাষার যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত হল। এরপর থেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ভাষার বিবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করার পথ সুগম হয়ে গেল। বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করা ছাড়াও চিরস্মরণীয় এই ক্যাথলিক যাজক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামে একটি বাংলা নিবন্ধগ্রন্থ পোর্তুগীজ থেকে অনুবাদ করে ঐ ১৭৩৪ সালেই রচনা করেন। ১৭৪৩ সালে লিসবন নগরে রোমক অক্ষরে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ পোর্তুগীজ ভাষায় ছাপা হয়। ঐ ১৭৪৩ সালেই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামক বাংলা অনূদিত প্রবন্ধ পুস্তকটি ও লিসবনেই রোমক অক্ষরে কিন্তু বাংলাভাষায় ছাপা হয়। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ একত্র একটি বই হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বইএর প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা বাংলা ব্যাকরণ, অবশিষ্ট অংশ শব্দকোষ। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" সম্ভবত বাংলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। ১৭৩৪ সাল বাংলাভাষা ও গদ্য রচনার ইতিহাসে এবং ১৭৪৩ সাল বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বৎসর।

অবশ্য তখনও বাংলা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রের স্পর্শ লাভ করে নি। প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হল ১৭৭৮ সালে ন্যাথানিএল ব্রাসি হালহেড সাহেব লিখিত ইংরেজি ভাষায় তৈরি বাংলা ব্যাকরণে। সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় বাংলা গদ্যে লেখা বই বাংলা অক্ষরে পূর্ণাঙ্গভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হল ১৭৮৫ সালে ; লেখকের নাম জোনাথান ডানকান। তখনও বাঙালির লেখা বাংলারচনা বাংলা অক্ষরে ছাপানোর সৌভাগ্য বাঙালি অর্জন করতে পারে নি। সে-সৌভাগ্য হল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সালে। ১৮০১ সালে রামরাম বসু লিখিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রথম বাঙালির লেখা বাংলায় রচিত ও বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বই।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—ও "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ" এর মতো প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থ। তবে, ব্রাহ্মণ ও রোম্যান ক্যাথলিকের বদলে এই পুস্তকটিতে প্রশ্নোত্তর চলেছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের সাহায্যে এই বইটিতে খৃষ্ট ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র যে কৃপা বা দয়ার শাস্ত্র এবং বইএ যে সেই দয়া বা করুণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, গ্রন্থের নামের দ্বারাই তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ-এর মতো এই বইটিরও বাংলা অক্ষরে ছাপা সংস্করণ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তোনিও-র বইএ আছে ভূষণা অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব, আর এতে আছে ভাওয়াল অঞ্চলের মৌখিক ভাষার চিহ্ন। আন্তোনিও তবু বাঙালি ছিলেন ; তাই তাঁর রচনায় বহু ভুল সত্ত্বেও ভাষা সামান্য পরিমাণে সুবোধ্য। কিন্তু ভাওয়ালপ্রবাসী আসসুম্পসাউ জাতিতে নিতান্ত পোর্তুগীজ ছিলেন বলে তাঁর বাংলা রচনার ভাষা আরও দুর্বোধ্য। তাঁর রচনায় স্থানীয় উপভাষার ছাপ তো আছেই, ফার্সি-আরবি শব্দও অনেক আছে। তাছাড়া, তিনি মূলত বাংলায় লেখেন নি, পোর্তুগীজ ধর্মনিবন্ধের বঙ্গানুবাদমাত্র করেছেন। বাক্যবিন্যাসে পোর্তুগীজ ভাষার রীতিও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। গুরু-শিষ্য-সংবাদ ধরণের অনেক লেখা বাংলাভাষায় আগে থেকেই ছিল। এই "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেগুলির অনুকরণমাত্র। বইটির গদ্যভাষাও ষোড়শ শতকের বাংলা চিঠিপত্রাদির ভাষাকে প্রগতির পথে কিছুমাত্র এগিয়ে দেয়নি। বাংলা গদ্যভাষা এই সব লেখকদের হাতে পড়ে অনেকক্ষেত্রে অবনত হয়েছে এবং মোটের উপর এক জায়গায় স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক ও প্রথমে বাংলা অক্ষরে লিখে পরে রোমক লিপিতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তারপর আবার সেই রোম্যান হরফে লেখা বাংলা গদ্যরচনাটিকে বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে, মূল রচনা যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে নিম্নলিখিতরূপ ধারণ করেছে :—

"হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই বালিম পুরুষ শত্রু আছিল। বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল। লাগাল পাইয়া দুইজনে ও তারোয়াল খসিয়া মারা-

মারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত, সে আরো এক চোট দিল। সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল। পরাজয় হইয়া শত্রেরে মাফ চাহিয়া কহিল, "ঠাকুর! পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা; আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর, তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন।"

পোর্তুগীজ ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" তেমন কোন সযত্ন সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নি। কলিকাতা থেকেই পুনর্মুদ্রিত হলেও এটির সম্পাদনায় পোর্তুগীজ ভাষার ধ্বনিরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। "কেপার" স্থলে "কৃপার" পড়তে হবে এবং অনুরূপ প্রমাদ সব বাদ দিয়ে সমস্ত রচনাটী পুনর্লিখিত করতে পারলে মূল রচনার ভাষা সহজতর হবে।

এই রচনায় "দাদ তোলা", "তেজবন্ত", "আঠ করিয়া" প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, "তালাশ", "মাফ" প্রভৃতি ফার্সি শব্দ পাওয়া যায় এবং "কষ্টের দিন" ধরণের যে-সব প্রয়োগ পাওয়া যায় সেগুলি পাস পোর্তুগীজ ভাষা থেকে ইউরোপীয় ভাবধারা প্রসূত আমদানি। "রাইত্রে", মৈধে প্রভৃতি অপিনিহিতির প্রয়োগও লেখকের ভাওয়ালবাসের নিদর্শন। দোম্ আন্তোনিও ফার্সি শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। হয়ত সেটা নিষ্ঠাবান্ ক্যাথলিকের সহজাত মুসলিম-বিদ্বেষের ফল। কিন্তু আস্‌সুঁপ সাউ-এর ফার্সি-ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, এই সময়ে সাধারণভাবে বাংলা গদ্যভাষায় ফার্সি শব্দের আধিক্যই তাঁর রচনাকেও প্রভাবিত করে থাকবে।

আন্তোনিও ও আস্‌সুঁপসাউ-এর রচনার তুলনায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অন্য অনেক গদ্য নমুনার ভাষা যে উন্নততর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুএকটি চিঠি ও নিবন্ধের ভাষা আলোচনা করা যাক।

১৭০৮ সালে লেখা একটি চিঠির ভাষা এইরকম :—

"তোমার পত্র সমাচার পহুছিল...পরম প্রসন্ন হইলাম। আর তোমার পিতা সমেত্তে পূর্বপ্রীতি স্মরিয়া এই কমে অধিক প্রীতি হইবে, হেন যে লিখিছা, এ বিশেস। কিন্তু পরস্পর যেমত্তে প্রীতি হয়, তেমন করিবা। জয়ন্তা ও কাছারিও আমার ঠাই নিমকহারামি করিলেক। তার কারণ ঈশ্বরে তারে যে অবস্থা করিলেন, তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব, তোমার মাঝে বিগ'ড় নয়, সেই করিবা।"

এই চিঠির ভাষা কামতা-আহোম রাজাদের চিঠির অনুরূপ। দেখা যাচ্ছে, সাদাসিধে তদ্ভব ও দেশি শব্দের সহযোগে কিছু পরিমাণে তৎসম শব্দ থাকলে উৎকৃষ্ট গদ্যভাষার উপাদান প্রস্তুত হয় এবং আবেগপূর্ণ চেতনা নিয়ে রচনা করতে বসলে ঐ গদ্যই বেশ সজীব ও সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে। বাংলা চিঠিপত্রের ভাষার শক্তিমত্তা ও স্বাভাবিকতা এই সব দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়। নিবন্ধ-প্রবন্ধ সাহিত্যের গদ্যে ততটা অগ্রগমন সম্ভবপর হয় নি। লোকব্যবহারে গদ্যের উন্নতি থেকে প্রমাণ হয় যে, সহজ ঘরোয়া ভাষায় লেখাই প্রশস্ত, কৃত্রিম ভাষা গদ্যরচ পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার অষ্টাদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে অ হলেও কোন শক্তিশালী লেখক বা সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী সেদ হাত দেননি। সুনীতিকুমার—আবিষ্কৃত একটি গল্পের ভাষা (বোঝা যায় যে, চেষ্টা করলে ১৭৫৮ সালের আগের যুগেও তদানী অপরিণত বাংলা গদ্যের সাহায্যেই ভালো গল্প লেখা যেতে পার কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে ও অন্যান্য কারণে সেই চেষ্টারই এ অনুপস্থিতি ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাগজপত্রের মধ্যে হঠাৎ-প্ৰ পাওয়া গল্পটি থেকে অনুমান করা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে গ সাদাসিধে লোকপ্রিয় হাল্‌কা ধরণের কথা বা গল্প রচনার কাজে গ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই গল্পটির ভাষার নমুনা এইরকম :—

"একদেশে এক সওদাগর ছিল। সে বাণিজ্যকে গিয়াছিল। তাহার জাহাজ ও নৌকাসকল ডুবিয়া গেল। একখানা তক্তা ধ সওদাগর কিনারায় উঠিল। সেই দেশে এক মায়েমানুষ জল আ আসিয়াছিল। সে সওদাগরকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল। বি সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক।"

এই রচনাংশ ঝরঝরে সহজ গদ্যের নিদর্শন। এতে আরবি-ফ বা সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নেই। পরিমিতভাবে বিভিন্ন শব্দ উপাদা সাহায্যে রচনাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করা হয়েছে বলে এখানে বে আতিশয্য চোখে পড়ে না। ফার্সি শব্দের বেশি প্রভাব যে অবাঞ্ছ তা এই প্রসঙ্গে আর একবার দেখা যেতে পারে। এই গল্প ভাষার সঙ্গে স্বনামধন্য মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি চিঠির ভা তুলনা করা যাক। নন্দকুমার যে পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সকলে জানেন। তিনিও ১৭৪৯ সালে সাধুভাষায় যে চিঠি লিখেছিে তার মধ্যে অনেক ফার্সি শব্দ প্রবেশ করেছে এব চিঠির ভা দুর্বোধ্যতাই প্রমাণ করে যে, তাদের প্রবেশলাভ অবাঞ্ছনীয়। প করলে দেখা যাবে যে, ফার্সি শব্দগুলো তুলে দিলেই নন্দকুমারের চি ভাষা প্রায় সমসময়ে রচিত সুনীতিকুমার আবিষ্কৃত গল্পের ভাষ মতোই সরল ও সহজ হয়ে উঠবে। নন্দকুমারের চিঠির ভাষার নম এইরকম :—

"অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন ম দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখপ্রক্ষালনাদি কিছুই করকে পা নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। সর্জাহৎ যত যত পাইলাম তাহা ন লিখিব। তবে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি সে কেবল তোমার খো- খোসবাগে পাইয়াছিলাম, সেই দমে জীবিত আছি।"

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছ ব্যাপী মুসলিম আধিপত্যের ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষের দৌলতে বাং ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফার্সি তথা আরবি-তুর্কি শব্দ প্রবেশ করে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তুর্কি আমলে তত বেশি ফা শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করেনি। কিন্তু ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে

মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের চাপে বহুসংখ্যক ফার্সি শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করে, বিশেষভাবে চিঠিপত্রের জগৎটাকে বন্যার জলের মতো ভাসিয়ে দেয়। বৈদেশিক শব্দাবলীর প্রবেশ অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যে স্বতস্ফূর্ত প্রয়াসে বিদেশি উপকরণগুলি আত্মস্থ করা দরকার, তা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থায় গড়ে উঠতে পারে না, সে-শাসন সমাজেরই হোক কিম্বা রাষ্ট্রেরই হোক। ফার্সি শব্দ সম্ভারের কবলে পড়ে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকেই বাংলা চিঠিপত্রের ভাষার এমন দুরবস্থা হয় যে, দেববিগ্রহ চুরির প্রসঙ্গেও তৎসম শব্দের বদলে ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা হল :—

"শ্রীযশোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিলা। রাম শর্মা, ভগীরথ শর্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার আপনার ওয়াদামাফির সেবা করিতেছিল। রাত্রিদিন চৌকি দিতেছিল। শ্রীরামজীবন মৌলিক সেবায় সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মইধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা ও মুরুত তোড়িবার আহাদে...দেওতা ও মুরুত তোড়িতে আসিল।"

এই চিঠিটি ১৬৭২ সালের ; এতে "গয়রহ," "ওয়াদামাফি," "আহাদ", "সরবরাহ" ধরণের ফার্সি শব্দ এবং "দেওতা," "মুরুত," "তোড়িতে" প্রভৃতি হিন্দুস্থানি রূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিয়ে সহজ বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে চিঠির গদ্যভাষা বেশ সুবিন্যস্ত ও সহজ পাঠ্য হয়। এই সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্যের গঠনভঙ্গি বেশ খানিকটা কায়দাদুরস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। তবে ভারতচন্দ্রের আগে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গি গড়ে ওঠে নি। তিনিই প্রথম ফার্সি শব্দ ঠিকভাবে পরিপাক করে সুসমঞ্জস ও সুললিত এক পদ্যভাষা রচনা করলেন। যাঁরা হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতির সুসমন্বয় চান, তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্র চিরদিনই এই কারণে প্রণম্য হয়ে থাকবেন। কিন্তু সেযুগে কোন গদ্যলেখকের তাঁর মতো প্রতিভা না থাকায় ফার্সি শব্দের "মিশাল" দিয়ে মাতৃভাষায় সুপাচ্য উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে হল না। সাধারণ লোক ভাষার পক্ষে যতটা বহন সম্ভবপর, তার চেয়ে অনেক বেশি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করতে লাগল রাজদরবারের ভাষার মোহে ও প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে। ভারতচন্দ্রের আমলে এই অবস্থা চরমে উঠেছিল। এমন চিঠিও পাওয়া যায় যা নামে মাত্র বাংলা চিঠি, আসলে বাংলা অক্ষরে লেখা ফার্সি চিঠি ছাড়া আর কিছু নয়। ১৭১৯ সালের একটি মনুষ্যবিক্রয়পত্রের ভাষা দেখা যাক :—

"আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে বেআজি তিন রুপায়া লৈয়া, আমার বেটি, যার উমর এগার বরিস, তুমার স্থানে আকির খাস করিয়া দিলাম। লআজীমা ধুরাক পুবাক থাইয়া পীন্দিয়া মুর্দত সর্তের বরস খেদমত আবকসী তুমাহর করিব।"

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরবর্তী দুই শতকের ইংরেজি শাসনে অতিরিক্ত ফার্সি প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। ফার্সি প্রভাব যদি বাংলাভাষার পক্ষে অনুকূল বা স্বাভাবিক হত তাহলে ঐ দূরীকরণ সম্ভবপর হত না। আজ আড়াই হাজার ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে, যখন মুসলিম লীগের পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন খুব বেশি প্রবল হয়ে ওঠেনি তখন, উচ্চশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষায় শতকরা ১৫টি পর্যন্ত ফার্সি শব্দ থাকত। সাধারণ হিন্দুর মুখের ভাষাতেও শতকরা ৭টি শব্দ ফার্সি ভাষার হত। মুসলিম সাহিত্যেও শতকরা ৩০টির বেশি ফার্সি শব্দ পাওয়া কঠিন। জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি, আনন্দবাজার পত্রিকার "হাপমৎ" প্রভৃতির লেখায় এখনও প্রচুর ফার্সি শব্দ দেখা যায়। অবশ্য মজতবা আলি, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি পরিমিত মাত্রায় ফার্সি শব্দ ব্যবহার করায় সবক্ষেত্রে শ্রুতিকটু হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি সময়ে "মুসলমানি বাংলা"-য় বা "আজাদ", "মিল্লাত" প্রভৃতি পত্রিকার ভাষাতে বড় বেশি ফার্সির অসুন্দর ব্যবহার দেখা যায়। গদ্য ভাষায় তো বটেই, সমগ্র ভাষার পক্ষেও এত বেশি ফার্সি শব্দের ব্যবহার অস্বাস্থ্যকর।

বাংলা শব্দসমূহের মোট সংখ্যার মধ্যে ফার্সি ও তার মতো শব্দের অনুপাত শতকরা সাড়ে তিনেরও কম। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ফার্সির প্রয়োগ সুষমভাবে আছে ; কিন্তু তার প্রয়োগ শতকরা তিনের বেশি হবে না। প্রমথ চৌধুরী ফার্সি শব্দসমূহ প্রয়োগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর "রায়তের কথা" প্রবন্ধেও ফার্সির অনুপাত শতকরা প্রায় তেরো ভাগ। ঐ প্রবন্ধে জমিজমার প্রসঙ্গে বহু ফার্সি শব্দ ব্যবহার না করে উপায় ছিল না, তা সত্ত্বেও এই ব্যাপার। মনে হয়, এর বেশি ফার্সি শব্দ বাংলাভাষায় রাতারাতি জোর করে চালাবার চেষ্টা সফল হবে না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে বাংলাভাষার মর্যাদা এখন বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বাংলা ভাষা এখন যেখানে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে, খুব বেশি ফার্সি শব্দ ধার করার দরকার হবে না। এখন শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু পাঠক রচনার মাঝে মাঝে ফার্সি শব্দের প্রয়োগে বিব্রত হয় না, বরং বৈচিত্র্য হিসাবে পছন্দই করে। কিন্তু প্রয়োগবাহুল্য ঘটালে সে আর তা বরদাস্ত করবে না। এখন বাংলাভাষার মেজাজ অন্যভাবে গড়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্রের আমলে অবস্থা ছিল অন্যরকম। হিন্দু দেবীর মহিমা-জ্ঞাপক "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেও ফার্সির বহুলতা দেখা যায়। ঐ সময়ে বাঙালি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে ফার্সি শিখত। তার সেই প্রবণতা পরবর্তী শতকেও অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। ব্রাহ্মণ হয়েও ভারতচন্দ্র যত্নের সঙ্গে ফার্সি শিখেছিলেন। কাজেই সাধারণ লোকে উন্নতির আশায় যে খুব বেশি করে ফার্সি ব্যবহার করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শিক্ষিত কায়স্থ চিঠিপত্রে ফার্সি ও হিন্দুস্থানি শব্দাবলী ও বাগ্ভঙ্গি যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করতেন। তাতে প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্রের যে দুরবস্থা হয় তার নিদর্শন আমরা আগে দেখেছি, পরে আরো দেখ্বো পরিমিত ফার্সি ব্যবহারে বাংলাভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেলেও সেই সুষমারচনারহস্য জানতেন কেবল ভারতচন্দ্র বা তাঁর মতো অসামান্য প্রতিভাধর দু একজন। বাকি সকলে ফার্সি মিশ্র জগাখিচুড়ি ভাষা লিখে যে বাংলা গদ্য স্বভাবজাত শক্তি নিয়ে সুঠাম দেহে গড়ে উঠছিল তাকে বিকৃত করছিল।

পক্ষান্তরে, আড়ষ্ট তৎসম শব্দের আধিক্যও এযুগে বাংলা গদ্য ভারা-ক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এমন নজির দেখানো যায় :—

"শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সহিত আত্মচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণাদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন।" এর রচনাবলি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের সমসাময়িক।

(ক্রমশঃ)

ফেনিলাস

দুঃখের দিনকে আমরা বর্ষে বর্ষে আনন্দের মাধ্যমে গ্রহণ করে আসছি, —অপ্রত্যাশিত উৎপাত ও উপদ্রবে বিচলিত হইনি, অশ্রুজলে মায়ের বোধন ঘট পেতেছি—প্রতিমার মুখে হাসি ফুটেছে আমাদের সাধনায়, বার্থার পূজায় আমরা সকলে সম্মিলিত হয়ে যে আনন্দ লাভ করি, তা ভাষার অতীত—নাইবা পরলাম নতুন কাপড় নতুন জামা ও জুতা ! না খেয়ে খেয়ে তো পেটি মরে গেছে ; আমরা বিশ্বাস করি যদি আমরা জ্যান্তো মহাশক্তির পূজা ও সেবা করতে পারি তা হোলে জগজ্জননীর বরাভয় লাভ করে আমরা বাণী ও কমলাকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। প্রবাসে যারা ছিল, তারা এসেছে ঘরে ফিরে। আজ তাদের কাছে পেয়ে আমাদের উৎসব পরিপূর্ণ হবে আনন্দ রসে। আজ আর দুঃখ দৈন্য অভাবের কথা বলবার দিন নয়, আজ নয় দ্বন্দ্ব-কলহ বিক্ষোভ নিয়ে সময়ের অপব্যবহার করা—শুধু ধ্যানগম্ভীর নেত্রে মাতৃরূপ অবলোকন করা—উপলব্ধি করা মৃন্ময়ী কেমন করে চিন্ময়ী হয়ে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে সহস্র বাধাবিঘ্নের জালে জড়িয়ে নিয়ে কোন্ অজ্ঞাত রহস্যের পথে চালনা করছেন,—চিরকালই বাঙ্গালী দারুণ দুর্যোগের মধ্যে অকাল বোধন করে শক্তি সাধনা করে আসছে প্রতিমা গড়ে গড়ে—দুর্গতিহারিণী দুর্গা রূপেই বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপে মহাশক্তির রূপে এসেছে আঙিনা। দেবী সূক্তে মা বলেছেন

> ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
> যঃ প্রাণিতি যঈং শৃণোত্যুক্তম্।
> অমন্তবো মাম্ উপক্ষিয়ন্তি
> শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।

যে যেখানে অন্ন ভোজন করে, যে যাহা কিছু দেখে, যখনই সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয়, উক্তি শোনে সবই আমার প্রসাদে ঘটে থাকে। আমি যে তাদের মধ্যে অন্তরাত্মা রূপে থেকে সব প্রাণ যাত্রা সিদ্ধি করছি, সে তত্ত্ব তো তারা জানেও না। তবু এই সত্য আমি ঘোষণা করছি তোমরা প্রত্যেকে এটা শোনো, শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে সকলে শোনো—

> যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
> তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।

আমি যাকে যোগ্য মনে করি, যাকে আমি ইচ্ছা করি তাকেই বড় করে প্রবল শক্তিধর করে তুলি। তাই তো কেউ হয় মন্ত্রদ্রষ্টা, কেহ হয় ঋষি, কেহ বা শোভন প্রাজ্ঞ। এসো আমরা দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিই আর বলি-

> সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
> শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আশ্বিন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

শিউলি সকালে আশ্বিন এলো ফিরে।
আকাশে উড়িছে হালকা মেঘের ঘুড়ি।
কাঠ-বিড়ালীরা খুঁজে কি যে চাল চিঁড়ে।
ঝিঙে গাছে ফিঙে নেচে ফেরে ঘুরি ঘুরি।

চাও, চাও, চেয়ে থাক টিয়েপাখী মাঠে।
হরিণ হাওয়ার সেখানে যে ছুটোছুটি।
শামুকেতে চড়ে যে শরৎ এলো ঘাটে,
কাশের মাথায় খায় সে যে লুটোপুটি।

উঠোনেতে যায় সোনা রোদ গড়াগড়ি।
সোনামণি খুকু সেথায় পুতুল খেলে।
চাঁদমামা তার টিপ করি ছড়াছড়ি
মণি ভাইদের চাঁদ কপালেতে ফেলে।

ডাক ডুমাডুম ঢাকের বাজি উঠে।
খোকাখুকুদের মুখে মুখে হাসি ফুটে।

নীল-লোহিত পদ্মের জন্ম-কথা

শ্রীঅনিন্দিতা সিংহ বি-এ

কবেকার কথা সে কেউ জানে না। প্রকৃতি রাণীর নিভৃত নন্দনপুরী কাশ্মীর দেশের পাঁচটি পাহাড়ের প্রহরার মধ্যে ছিলো এক অপূর্ব রাজ্য পাহাড়-ঘেরা বনাঞ্চলের ছায়ায়। পাহাড়-কন্দর, জল-জঙ্গল পার হওয়া সহজ ছিলো না—তা ছাড়া ও দেশের মানুষ পছন্দ করতো না বিদেশীকে—সন্দেহের চক্ষে দেখতো তারা আগন্তুককে। রাজ্যের শেষ সীমানায় শুরু হয়েছিলো আকাশ-চুম্বী পাহাড়মালা—দুর্লঙ্ঘ্য সে প্রাচীর—তবু কি কোরে যেন তারই মধ্যে ক্বচিৎ অতি গোপন প্রকৃতি-রচিত পরম নিভৃত দুয়ার ছিলো—অশ্বারোহী সৈনিকের পাহারা থাকতো সেখানে রাত্রি দিন।

পাহাড়পুরীর রাজা বিক্রমসিংহ ও রাণী যশোমতীর যেন রাজ-সৌভাগ্যের আর অন্ত ছিলো না। অনুগত প্রজাবৃন্দ—প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ বিস্তৃত প্রাচুর্যভরা রাজ্য—তবু একটি শিশুর কলধ্বনির অভাবে রাজা-রাণীর অন্তরের নিদারুণ শূন্যতা দিনে দিনে যেন বেড়ে চলেছিলো।

প্রতি বসন্তে রাজ-দম্পতি বন-মহোৎসবে যেতেন—ঐ সময় বনাঞ্চলে সফর করতেন রাজা রাণী। রাজা মৃগয়ায় আনন্দও লাভ করতেন। সেবার বনাঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমায় পাহাড়ী প্রজাদের গ্রামে রাণী দেবী পুষ্প-ভৈরবীর পূজা দিয়ে এলেন পরম ভক্তিভরে। রাজ-দম্পতি তারপর পাহাড়পুরীতে ফিরে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই সারা রাজ্যে আনন্দের বান ডাকলো রাজকন্যার জন্মোৎসবে।

রাজকুমারীর রূপের তুলনা হয় না। হাসলে মাণিক, আর কাঁদলে যেন সত্যিই মুক্তা ঝরে। অপূর্ব তার অঙ্গ

লাবণ্য যেন সোনার সূক্ষ্ম দ্যুতির 'পরে রক্তকমলের আমেজ ঢালা। অতল সাগরের নীল তার চোখে আর দুটি ওষ্ঠে চুনীর রঙিমা।

রাজকুমারী পদ্মপর্ণাই হবেন পাহাড়পুরীর ভবিষ্যৎ রাণী —তাই রাজরাণী তাঁকে সেই রকমভাবেই গড়ে তুললেন— কি অশ্বচালনা—কি সৈন্যচালনা—নির্ভীকতা, ন্যায় বিচারে রাজনীতি-জ্ঞানে, সাহসে আর সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম কলা-বিদ্যায় অদ্বিতীয়া রাজকুমারী পদ্মপর্ণা। এই বিস্তীর্ণ সোনার সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত যে পদ্মার ওপরেই ন্যস্ত হবে তাই রাজ্য-চালনার কূটমন্ত্রগুলিও আয়ত্ত করে নিচ্ছে সে।

আবার যখন সে সখীদের মাঝে খেলায় নাচে গানে কল-কাকলীতে মশগুল হয়, কে বলবে যে ক্ষণকাল আগেই সে মুক্ত অসি হাতে পার্বত্য পথে দ্রুত অশ্ব চালনার পরীক্ষায় সফল হয়ে এসেছে।

এমন কোরেই পদ্মপর্ণা ষোলো বছরেরটি হলেন—যেন ষোলোকলা পূর্ণ হলো পূর্ণ চন্দ্রিমার। রাজরাণী এক শুভ দিন দেখে দেশ বিদেশে দূত পাঠিয়ে দিলেন—আগামী বসন্ত-পূর্ণিমায় হবে পাহাড়পুরীর রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সভা।

পদ্মপর্ণাও শোনেন স্বয়ংবর-সভার আয়োজনের কথা। তাঁর মনে বিশেষ কোন রেখাপাত হয় না। সখীরা কতো প্রীতিভরা নির্দেশ উপদেশ জানায়—পদ্মা হয়তো শোনেন, হয় তো শোনেন না—তাদের নিয়ে কখনও ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় দূর পাহাড়ের অরণ্য-সীমায়—খেলায় হাসিতে কল-কাকলীতে আনন্দের বন্যা বইয়ে পথে পথে। কখনও তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে দেন তীর ধনু হাতে। গভীর জঙ্গলে রাজপুত্রের বেশে পদ্মা শিকার সন্ধান কোরে ফেরেন —কখনও পাহাড়ী ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকেন।

সেদিন এই রকমই যোদ্ধার বেশে রাজকুমারী চলে এসেছেন রাজপুরী হ'তে বহু দূরে ঘন অরণ্যানীর মাঝে। এই দিকে পদ্মা আগে আসেননি কখনও—মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যে রাজকুমারী ঘোড়ার লাগাম ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন আত্মহারার মতো। কোথাও থোকায় থোকায় আঙুর নিয়ে ফলন্ত লতা নুয়ে পড়েছে। আপেল বাদাম অজস্র ছড়িয়ে আছে গাছের তলে। কতো পাখীর কূজনে মুখরিত হয়ে আছে বনভূমি। আনমনে মাথার লোহিত উষ্ণীষটি হাতে নিয়ে ঘোড়ার রাশ হাতে এগোতে থাকেন পদ্মপর্ণা ঝরণার সন্ধানে—ক্লান্ত ঘোড়া অরুণাচলকে জল খাওয়াতে হবে—নিজেও একটু পান করবেন রাজকুমারী।

হঠাৎ বনের পটভূমি হ'তে পাইন চিনারের লক্ষ বিশাল বাহু ফাঁক হয়ে অদূরে দেখা দেয় বরফ-ঢাকা পাহাড় চূড়া—নীচে পাহাড়সারির চড়াই উৎরাই। খানিক চড়াই পার হতেই রাজকুমারী কুলকুল শব্দে খুশী হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেন—অরুণাচলের পায়ের ক্ষুরে ধ্বনি ওঠে খট খট করে।

ঝরণার জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর হয়েযায় রাজকুমারী —আঙুরের একটি গুচ্ছেই তাঁর ক্ষুধা যায় মুছে, আর ঝরণা স্বচ্ছ জলে হয় তৃষ্ণা দূর। শরীরের ক্লান্তি যেতেই নিবিড় শান্তিভরা ঘুম আসে দু-চোখে—পলকে ফুলে ফুলময় শ্যামল শষ্পরাজির কোমলতার ভিতর গভীর ঘুমিয়ে পড়েন পদ্মা।

কতোক্ষণ পরে অপরাহ্নের সোনা-গলানো রোদের অরণ্য লতার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র রেশের মধ্য দিয়ে কার যেন দীপ্ত সুঠাম দেহের ছায়া এসে পড়ে ঝরণার আঁকাবাঁকা তৃণ-ফুল-ভরা পথে—তারপরেই ধ্বনি ওঠে আর একটি ঘোড়ার ক্ষুরের। ছায়ার পেছনে আসে এক পরম সুন্দর নবজলধরকান্তি যোদ্ধাবেশী নীল উষ্ণীষপরা তরুণ—এক নীল-তেজী ঘোড়ার রাশ হাতে।

তরুণের পায়ের গতি হঠাৎ সমুখে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়… একি নিদ্রিত বন দেবতা? কুসুম সুকুমার দেহে যোদ্ধাবেশ তীর ধনুক পাশে। অদূরে দাঁড়িয়ে রাঙা টকটকে এক সুন্দর ঘোড়া। ঘুমন্ত কিশোরের অরুণাভ সুগৌর মুখে কি পেলবতা—অবাক হয়ে আগন্তুক ঘোড়া অদূরে রেখে কিশোরের একান্ত কাছে এসে হাঁটু মুড়ে উপবেশন করতে গিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় অস্ফুট শব্দ করে উঠল—ঘুমন্ত যোদ্ধার লোহিত-রাঙা উষ্ণীষ খসে পড়েছে ঘাসে আর ভ্রমরকৃষ্ণ রেশম-কোমল দীঘল মুক্তাহার জড়ানো বেণী এলিয়ে পড়েছে শুভ্র হাতের রক্তাভ চাঁপা আঙুলের পাশে।

—একি বনদেবী? তরুণের গভীর মধুর কণ্ঠের এই বিস্ময় ধ্বনি রাজকুমারীর তন্দ্রা ভেঙে দিলো—তখনও চোখের সমুখে যেন স্বপ্ন আর সত্য একাকার। ঝরণার ঝরঝরাণি গান এই ফলে ফুলে ভরা অপূর্ব পার্বত্য বনভূমি যেন স্বপ্নের দেশেরই অংশ। আধো জাগরণের স্বপ্নভরা দুই ভ্রমরকৃষ্ণ পদ্ম আঁখি মেলতেই রাজকুমারীর দৃষ্টি মিললো তরুণের অনিন্দ্য মুখের দুটি অতল গভীর দৃষ্টিতে—দুজনেরই মনে হলো এমন সৌন্দর্য কেমন করে সম্ভব হলো পৃথিবীর মানুষের।

…তারপর দেখতে দেখতে দুটির হৃদয়ে হৃদয়ে এক হয়ে গেলো। কতো কথায় হাসিতে—দৃষ্টিতে দুটি প্রাণে প্রাণে ছুঁয়ে যেতে লাগলো কেবলই। রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী ফিরে এলেন, তখন চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে—রাজা-রাণী পুরপরিজন উৎকন্ঠিত। পদ্মা মৃদু হেসে আপন মহলে ত্বরিত চলে গেলেন।

দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝে সুন্দর রাজ্য সাগরপুরী—শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে করুণায় অতুলনীয় যুবরাজ নীলাদ্রিবিজয় নির্বাসিত হলেন বিমাতার কুটিল ষড়যন্ত্রে। প্রিয় ঘোড়া নীলাচলের পিঠে ভারত পার হয়ে তিনি এসেছেন পার্বত্য সীমান্তের অরণ্যচ্ছায়ে আত্মগোপন করতে। কবে হবে নীলাদ্রির দুঃখের অবসান? এই পরম ক্রন্দনের ভিতরে বিধাতা কোথা হ'তে পাঠালেন এই আনন্দ প্রতিমা মরমী

সাথী পদ্মাকে ? নীলাদ্রি আর পদ্মা বসে থাকেন পাশা-পাশি ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে—পাশে পড়ে থাকে দুজনের নীল আর লোহিত উষ্ণীষ। অদূরে নীলাচল আর অরুণাচল রাজপুত্র রাজকন্যার পানে চেয়ে থাকে। বিশ্ব-ভুবন কোথায় মুছে যায়—একটি পরিপূর্ণ আনন্দভরা মধুর ক্ষণ হয়ে থাকে সারা সময়টি দুই বন্ধুর।

: জানিনা কখন এই দুর্লভ আনন্দভরা তোমার সঙ্গ হারাতে হবে—আমার দুর্ভাগ্য তো জানো বন্ধু !

: না কুমার ! নীল-লোহিতের এই প্রীতির ডোর কোনও দিনই ছেদ হবার নয়।

: রাজার কন্যা—তুমি রাজ্যের ভবিষ্যত রাণী পদ্মা—তোমার প্রতিদিন এই ঝরণাধারে আসা নিয়ে পাহাড়-পুরীতে ক্ষোভের গুঞ্জন উঠেছে। এক দুর্ভাগ্য নির্বাসিত রাজপুত্রের জন্য তোমার পিতার রোষ জাগিয়ো না রাজকুমারি !

: আমি যে দক্ষিণ সমুদ্রে যাবো তোমার সঙ্গে—ভারত পার হয়ে কুমার ! তোমায় তোমার সিংহাসনে বসাবো যেমন কোরে পারি—জানো তো বন্ধু, লোহিত উষ্ণীষে সাহসের অভাব নেই ?

: সে জানি পদ্মা—তোমায় ছাড়া যে নীল উষ্ণীষ প্রাণহীন। কিন্তু বসন্তোৎসবের তো আর মাত্র তিনটি দিন বাকী—

: আমার বরণমালা তো তোমারই বন্ধু ! বলেই চকিতে রাজকুমারী কণ্ঠের ফুলমালা নীলাদ্রির গলে দিয়ে প্রণাম করেন। বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে রাজপুত্র বলেন—

: কেন একাজ করলে রাজকুমারি—স্বয়ংবর-সভায় যে নির্বাসিত রাজপুত্রের প্রবেশাধিকার নেই… !

: স্বয়ংবর তো হয়েই গেলো আমার—আমিও এখন নির্বাসিতা ! হেসে পদ্মা ওঠেন অরুণাচলের পিঠে।

* * * তিনদিন তিন রাত্রি নীলাদ্রি ঝরণাধারে বসে আছেন। রাজকুমারী আসেন নি, আর সে সন্ধ্যার পর। সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি ঘন হয়েছিলো রাজ-কুমারীর প্রাসাদে পৌছোতে। না জানি ক্ষুব্ধ পাহাড়পুরীর প্রজাপরিজন হয় তো অবরোধ করেছে তার যাত্রাপথ। বিচলিত মর্যাদাহানির আশঙ্কায় রুষ্ট রাজ-দম্পতি হয়তো তাকে অন্তঃপুরে দৃষ্টিপথ-বন্দিনী করে রেখেছেন।

বসন্তোৎসবের প্রত্যূষে নীলাদ্রির ধৈর্যের সকল বাঁধ টুটে যায়। রাজকুমারীর বরণমালার মর্যাদা তাঁকে রাখতেই হবে। অধীর রাজপুত্র নীল উষ্ণীষ মাথায় যোদ্ধার সাজে নীলাচলের পিঠে হাওয়ার বেগে চলেন পার্বত্য পথ ভেঙ্গে। ঝড়ো হাওয়ার মতো নীলাচল উড়ে চলে যেন পাহাড়পুরীর পথে। উৎসবের সাজে সাজা রাজধানী এসে পড়ে। বিরাট বিচিত্র স্বয়ংবর-সভা ঐ যে—আজই সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে হবে রাজকুমারী পদ্মপর্ণার শুভ স্বয়ংবর। রাজোদ্যানে দেখা যায় সহস্র রাজকীয় শিবির—তাদের চূড়ায় সহস্র বিচিত্র কেতন বসন্তের মৃদুল বাতাসে দুলছে। সহস্র রাজা—রাজপুত্র রাজমুকুটে সেজে এসেছেন স্বয়ংবর-সভা ধন্য করতে—কাশী, কাঞ্চী, অঙ্গ, বঙ্গ ও আরও কতো দেশ দেশান্তর হতে পাহাড়পুরীর অতুলনীয়া রাজকুমারীকে রাজ্য-সহ পাবার কামনায়।…স্বয়ংবর-সভার ঐ সহস্র মণিময় সিংহাসনের ভেতর নির্বাসিত যুবরাজ নীলাদ্রির স্থান কোথায় ? প্রজা-পরিজন পিতামাতা সবাকার ক্ষোভ রোষ উপেক্ষা করে কেন পদ্মা এলো দিনের পর দিন সেই ঝরণা তলে ?—কেন দিলো এক নির্বাসিত দুর্ভাগ্য মুকুট-হীন রাজপুত্রের গলে বরণমালা ?

…আবেগে বেদনায় থরথর হৃদয়ে নীলাদ্রি ঘোড়াকে আরও জোরে চলার ইঙ্গিত করেন—নীলাচলও প্রভুর নির্দেশ পালনে পলকমাত্র বিলম্ব করে না—কুমারের নীল উষ্ণীষ দোলে। পদ্মার বরণমালার মান রাখতেই হবে। কোথায় সে ? ঐ তো দেখা যায় বিশাল পরিখা-ঘেরা—অশ্বারোহী রাজপুরুষের পাহারায় আকাশচুম্বী মর্মরগড়া রাজপ্রাসাদ।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন নীলাদ্রি—হঠাৎ পাশেই অশ্বক্ষুরের শব্দে চমক ভেঙ্গে চেয়েই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান রাজপুত্র—অদূরে অরুণাচলের পিঠে পদ্মা স্বয়ংবরের সাজে। ইঙ্গিতে অনুসরণের আহ্বান জানিয়েই রাজকুমারী হাওয়ার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন পার্বত্য পথে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নীলাচল ও অরুণাচলের পায়ের তাল গতি এক তালে বাজতে লাগলো। পদ্মার রাঙা আঁচল দুলতে লাগলো নীলাদ্রির নীল উষ্ণীষের পাশে।

: বড় কষ্টে আজই প্রিয় সখীর সাহায্যে বন্দী-দশা হতে গোপনে মুক্ত হয়ে গোপনেই তোমার কাছে যাচ্ছিলেন কুমার। ধৈর্য ভেঙ্গে আমার সন্ধানে এসে ভুল করেছে বন্ধুর চলো দ্রুত চলো !

: আমরা কোথায় চলেছি পদ্মা ?

: দেবী পুষ্প-ভৈরবীর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলেই আমরা নির্ভয় হবো কুমার—দেবীর শরণাগতকে স্পর্শ করার সাহস কারও হবে না…!

রাজকুমারীর কথা শেষ হতে না হতে শোনা গেলো সহস্র রাজন্যের সহস্র যুদ্ধাশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি—চার পাশের সমস্ত পার্বত্য পথ ছেয়ে তারা পশ্চাদ্ধাবন করেছে ব্যর্থতার ক্ষিপ্ত মত্ততায়—অশ্বক্ষুরের প্রচণ্ড কোলাহলে আর তাদের বজ্রনাদী প্রতিহিংসার হুঙ্কারে কোথায় চাপা পড়ে গেছে রাজা বিজয়কেতু ও রাণী যশোমতীর কাতর অনুনয়ের অশ্রুজল।

হাজার ঘোড়ার সঙ্গে এই দারুণ লুকোচুরি খেলা খেলতে খেলতে অরুণাচল ও নীলাচল প্রাণপণ ছোটে

আঁকাবাঁকা সর্পিল পার্বত্য বন্ধুর পথে—ঘন অরণ্যানীর লতাবন্ধন ছিন্ন করে—তাদের মুখে ফেনা ওঠে। পিছনে শত্রুর ঘন কলরোল ক্রমেই নিকট হয়ে আসে। সহসা এক বিষাক্ত তীর এসে অরুণাচলের পঞ্জর ভেদ কোরে চলে যায়—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তীর এসে বেঁধে রাজকুমারীর দক্ষিণ হাতের পেলব মণিবন্ধে, পদ্মপর্ণার হাতের রাশ লুটিয়ে পড়ে—অচেতন হয়ে ঢলে পড়েন রাজকন্যা। অরুণাচলের প্রাণহীন দেহ পদ্মার বুকে তুলে নিল নীলাদ্রি—পলকে অপরূপ স্বয়ংবরের বধূবেশে সাদা রাজকুমারী বাঁধা পড়েন নীল উষ্ণীষে। নীলাচলের গতিতে ঝড়ের তাণ্ডব বাজে। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে—তবু ঐ দেখা যায় বনাঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমা—ঐ দেখা যায় বিস্তীর্ণ গভীর অতল জলের হ্রদে-ঘেরা দেবী পুষ্প-ভৈরবীর মন্দির। ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর এসে পড়তে থাকে। অদ্ভুত কৌশলে দুঃসাহসী রাজপুত্র আত্মরক্ষা করেন—দেখতে দেখতে হ্রদের কূলে এসে নীলাচল ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কালো অতল জলে। শত্রুর হাজার ঘোড়া ছুটে আসে চারিদিক ছেয়ে। নীলাচল কোনো মতে প্রাণের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে হ্রদের মাঝামাঝি অবধি সাঁতরে এসে এক সময় তলিয়ে যায়। রাজকন্যার অচেতন দেহ বুকে কোরে রাজপুত্র অতি ধীরে সাঁতরে যান দেবী-মন্দির অভিমুখে। শত্রুরা কূলে দাঁড়িয়ে শরতে তীর যোজনা করছে।

দেবী শরণাগতকে আশ্রয় দাও!—অন্তর হতে প্রার্থনা ওঠে নীলাদ্রির। সহসা হ্রদের সমস্ত জল শুভ্র তুষারে ঢেকে যায়। রাজপুত্র রাজকন্যার অনিন্দনীয় কান্তি কোথায় মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো। তুষারের ওপরে নেমে আসে আকাশ হতে গোধূলি লগ্নের স্বর্ণাভ আলোর স্রোত!

ঐ সন্ধ্যাতেই পূজারী দেখলেন দেবী পুষ্প-ভৈরবীর বুকের কমলের মালাটির সকল কমলে লেগেছে এক অপরূপ নীল-লোহিতের আভা।

দিনে দিনে বসন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে শত সহস্র নীল-লোহিত কমল দলে হ্রদ ভরে ওঠে।

(সীমান্ত প্রদেশের এক কাহিনীর অনুসরণে।)

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

নন্দ বোসের ছেলে মাণিক যখন তিনবারের বারও থার্ডক্লাস থেকে প্রমোশন পেলে না, তখন তার বাবা তাকে ডেকে বললেন এবারও যদি পাশ করতে না পারো, বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। খবরদার, আর খেলতে পাবে না। খেলতে দেখেছি কি মরেছ। সঙ্গে সঙ্গে মাথার গোটা কয়েক গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন। তারপর নন্দবাবু বাড়ীর ভেতর বলে দিলেন—এবার থেকে মাণ্‌কেকে কড়া শাসনে রাখতে হবে! সাবধান, এখন থেকে ওকে দিনে রাতে দু'বারের বেশী খেতে দিতে পারবে না। একটা পয়সাও দেবে না। আমার এ' কথার আর নড়-চড় হবে না। দেখি ছেলে ঢিট হয় কি না!

বাড়ীর সকলেই তাকে বাঘের মত ভয় করে। ওর বিরুদ্ধে একটা কথা বলতেও কেউ সাহস করলে না। জানে—বললেও কোন ফল হবে না।

দিন তিনেকেই কিন্তু মাণিকলাল একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। এক মুহূর্তও যখন ছাদের ওপর দিয়ে নানা রংয়ের ঘুড়ি কেটে যায়, সে তখন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এক একবার তার ইচ্ছে হয়—ছুটে গিয়ে সে সেটি ধরে আনে; কিন্তু বাবার ভয়ে আর এগুতে পারে না। ওর চোখের সামনে পাশের বাড়ীর ভোঁদা পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে সব ঘুড়ি ধরে নিয়ে যায়। সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে সেই দিকে চেয়ে থাকে। রাগে তার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু একটা কথাও তাকে বলতে পারে না।

সকালে বিকেলে তার সামনেই সবাই খাবার খায়, তার পেট জ্বলে যায়। কেউ তাকে একটু কিছু দেয় না। সে জিভ দিয়ে ঠোঁট্‌টা চেটে মুখ ভার করে বসে থাকে। তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে থাকে। তখন তার মায়ের রোগ-কাতর মলিন মুখখানি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার মা তাকে কত স্নেহ করতেন, তিনি বেঁচে থাকলে আজ তাকে কিছুতেই না খেতে দিয়ে পারতেন না। শুধু সৎ-মা বলেই তার এত কষ্ট। সে তাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে। তার সামনে নিজের ছেলে মেয়েদের খেতে দেয়। কি নিষ্ঠুর সে! একটু কি তার মায়া-দয়াও থাকতে নেই? দারুণ ঘৃণায় তার দেহ-মন বিষিয়ে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে—না, কিছুতেই এখানে আর থাকবে না সে। যেখানে হোক চলে যাবে সে। সেদিন থেকে সে রাত্দিনই শুধু পালাবার চেষ্টা করতে থাকে।

রায়েদের বাড়ীর ফটিক তার খেলার সাথী, বন্ধু। দু'জনে খুব ভাব। ফটিক বলে—আমিও তোর সঙ্গে যাবো। আমারও কি যন্ত্রণা কম?

দু'জনে অনেক পরামর্শ করে। স্থির হয়—শনিবার দিন স্কুলের ছুটির পর তারা আর বাড়ী ফিরবে না। খাতা বই রাস্তে ফেলে রেখেই দু'জনে যেদিকে হোক্ পালিয়ে যাবে।

—দুই—

আজ শনিবার।

ফটিকের মনে ভারি ফূর্ত্তি। আগের দিন সে তার মায়ের বাক্স থেকে দশ টাকার আটখানি নোট আর দেরাজ থেকে বৌ'দির চেন হার ছড়া বেমালুম সরিয়ে ফেলেছে। কেউ কোন সন্দেহ করেনি। আজ সে খুব সকালেই বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে মনে মনে ভাবলে—এই তার শেষ পড়া!

ফটিকের মা তো একেবারে অবাক্! মনে মনে তিনি প্রার্থনা করলেন—ঠাকুর, বাছাকে আমার সুবুদ্ধি দাও। তার মতি গতি ফিরে যাক্। ছেলের পাঠের মনোযোগিতা দেখে তাঁর মন খুশীতে ভরে গেল। যে ছেলেকে বার বার খোসামোদ করে পড়তে বসাতে পারে না, আজ তার হোল কি?

এদিকে মাণিকের মনেও আজ খুব উৎসাহ। সকালে বাবা যখন বেড়াতে বেরিয়েছে, আর মা যখন নীচে কাজে ব্যস্ত, সেই সুযোগে সে তখন আলমারি খুলে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এবং তার মার হাতগাছা চুড়ি গাপ্ করে ফেলেছে।

মাণিকলালের শোবার ঘরে তার মার একখানি ছোট্ট ফোটো আছে; তার কাঁচটা অনেকদিন হলো কে ভেঙ্গে দিয়েছে। সে ফ্রেম থেকে সেখানি খুলে বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রাখলে। তখন বেলা প্রায় নটা বেজে গেছে। মাণিক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলে। তার মা থালায় গরম ভাত বাড়তে বাড়তে বললে—হ্যাঁরে, আজ তোর এত তাড়াতাড়ি কেন? কোথায় আড্ডা দিতে যাবি শুনি?

মাণিক আস্তে আস্তে বললে—দশটা বাজে যে, রোজ দেরী হয়ে যায় তাই।

তার খাওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ সে দ্বারের কাছে ফটিকের শিষ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি খাতা-বই এবং কুলুঙ্গী থেকে টাকা ও চুড়িগুলো নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ফটিক খুব চালাক ছেলে। সে বললে—ভাখ্ মাণ্কে, যখন বাড়ী ছেড়ে চলেই যাচ্ছি, তখন স্কুলে গিয়ে আর কি হবে? আমি একটা মতলব ঠাউরেছি,—বারোটার সময় একটা ট্রেণ আছে, চল, তাতে করে আমরা কাশী যাই। সেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। আমি বাবার সঙ্গে অনেকবার সেখানে গিয়েছি, সব জানা আছে। সেখানে দু'একদিন থেকে বুদ্ধি-শুদ্ধি করে পরে যা' হয় করা যাবে'খন।

মাণিক বলে—ঠিক্ ঠিক্, তোর খুব মাথা তো। স্কুলে গেলে বিপদ আছে; চাই কি টাকার খোঁজ পড়লে হয় তো আমাদের ধরেও ফেলতে পারে। চল্ হাওড়া ষ্টেশনেই গিয়ে বসা যাক্।

তাদের সহপাঠি ললিত সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, বললে—কিরে ফটকে, স্কুলে যাবি নি? ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্ রে? দশটা যে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

ফটিক জবাব দিলে—হ্যাঁ ভাই, দেরী হয়ে গেছে। বাড়ীতে অসুখ কিনা, ডাক্তারবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি। তুই আমাদের বইগুলো নিয়ে যা'না ভাই!

ললিত বললে—দে, তোদের জন্য ঠিক ফার্ষ্ট বেঞ্চি রাখ্বো, শীগ্‌গির আসিস কিন্তু।

মাণিক বই থেকে তার মার ছবিখানা বের করে নিয়ে বইগুলো তার হাতে তুলে দিলে।

সে চলে গেলে দু'জনে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগ্‌লো।

সামনে দিয়ে একখানা বাস যাচ্ছিল, দু'জনে তাতে উঠে বসল।

হ্যারিসন রোডে নেমে একটা ছোট ট্রাঙ্ক ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিছু কিনে নিয়ে তারা আবার হাওড়ার বাসে উঠে বসল। ট্রেণ ছাড়তে তখনো অনেক দেরী। দু'জনে দু'গ্লাস সরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে কাশীর থার্ড ক্লাস দু'খানি, টিকিট কেটে নিলে। গাড়ীতে বসে মাণিক টাকা ও গয়নাগুলো বেশ হিসেব করে ট্রাঙ্কে তুলে রাখলে।

ফটিক বল্‌লে—মাণ্কে তোর একটু ও বুদ্ধি নেই। ট্রেণে যে রকম চোরের ভয়, যদি ট্রাঙ্ক চুরি যায়? তবে যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হবো, টাকা কতক তোর কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখ, আর কতক আমায় দে! বাকীগুলো সব ট্রাঙ্কে থাক্।

মাণিক হেসে বলে—মাইরী তোর কি বুদ্ধি! ফটিক ও হাসে। একটু পরেই ঘণ্টা দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দেয়।

মাণিকের বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে, কান্নায় চোখ ছল ছল করে ওঠে। এই তার প্রথম গৃহ ত্যাগ।

ফটিকের মনে আনন্দ আর ধরে না! সে মাণিককে বোঝায়,—নানারকম গল্প জুড়ে দেয়। তার চোখে-মুখে একটা পুলক—শিহরণ!

—তিন—

পরদিন সকালে বেলা প্রায় আটটার সময় তারা কাশী পৌঁছলো। একখানা একা ভাড়া করে দু'জনে তাতে চড়ে বস্‌লো। খানিক দূর যেতেই ফটিক সুর করে বলে উঠল—

'বিহারে বিপোরে চড়িনু একা!'

খিদেয় এবং ভয়ে মাণিকের মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। সে বল্‌লে—দেখ্ ফট্‌কে, সব সময় তোর ইয়াকি ভালো লাগে না। তুই চুপ কর বাপু!

ফটিক হাসে, বলে—কত বড় পোয়েটিক ভাব, তুই বুঝবি নে না গদ্দভ!

মাণিক কোন উত্তর দেয় না। তখন তার অনুতাপ হচ্ছিল; মনে মনে ভাবছিল—কেন সে এমন করে পালিয়ে এলো! বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে এসে তারা এক্কা থেকে নেমে পড়ল। সামনের গলিটায় ঢুকে ফটিক একটা বাড়ীর দরজায় আঘাত করে ডাক্‌লে—ভৈরবদা, বাড়ী আছো? একটু পরেই 'কেরে' বলে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। ফটিককে ভালো করে দেখে হেসে বল্‌লে—এসো দাদা, এসো! প্রথম তোমাকে চিন্‌তে পারি নি। তারপর খবর কি? হঠাৎ কি মনে করে, বাড়ীর সব খবর ভালো?

ফটিক বাধা দিয়ে বল্‌লে—হাঁ, সব ভালোই আছে। তোমার প্রশ্ন করো পরে; আগে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দাও দিকিন? কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি; আর খিদেও যা লেগেছে।

ভৈরব বল্‌লে—এক্ষুনি সব ঠিক্ করে দিচ্ছি; ঘর একখানা খালিই আছে, ভাড়া লাগ্‌বে সাত টাকা। আর শ্রীকণ্ঠের হোটেলও খুব কাছেই।

ফটিক বল্‌লে—বেশ, তাই দেওয়া যাবে, চলো।

ঘরখানি দোতলায়। ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাক্স ও কাপড় জামা রেখে দু'জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে গেলো।

ফেরবার সময় একেবারে শ্রীকণ্ঠের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে করে এলো। ফটিক বল্‌লে—আগে ঘুমিয়ে নে, এখন আর কোন কথা নয়। বিকেলে পরামর্শ করা যাবে'খন।

ভৈরব আগেই একটা মাদুর এনে পেতে রেখেছিল। দু'জনে তাতে শুয়ে পড়্‌ল। মাণিক আবোল তাবোল কত কি ভাবছিলো, তার চোখে ঘুম আসছিল না।

একটু পরেই কিন্তু ফটিকের নাক ডাকতে সুরু করে দিল।

—চার—

দিন দশেক কেটে গেছে।

কি যে করবে তারা এখনো তার কিছুই স্থির করতে পারে নি। দু'জনে বনি বনাও বিশেষ হচ্ছে না। ফটিক এখন প্রায়ই মাণিকের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে। কি মনে করে ফটিক সেদিন একখানি 'বসুমতী' কাগজ কিনে ফেললে। হঠাৎ সে দেখ্‌লে—এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

নিরুদ্দেশ

ফটিক, ফিরে এসো। কোন ভয় নেই! কেউ কিছু বলবে না। মা তোমার জন্ম বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন। তুমি না এলে তিনি আর বাঁচবেন না। লক্ষ্মী ভাইটি অভিমান করো না, শীগ্‌গির চলে এসো। টাকার প্রয়োজন হলে জানাও। ইতি—

তোমার দাদা, মণী।

এরপর থেকে ফটিকের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না। মার কাছে ফিরে যাবার জন্য তার প্রাণটা ছটফট করতে থাকে।

সে রাত্রে খুব গরম পড়েছিলো। ফটিক দরজাটা খুলে রাখ্‌লে, বললে—ভারী গরম, একটু হাওয়া আসুক। রাত্রির প্রথম দিকটায় ঘুম না আসায় শেষের দিকে দু'জনেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে যখন মাণিকের ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে। মাণিকই প্রথম ফটিককে ডেকে তুলে বললে—ওরে শীগ্‌গির ওঠ্, আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। বাক্স যে নেই ওখানে!

ফটিক চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধড়মড় করে উঠে বসলো। সত্যিই তো ঘরে বাক্স নেই! চোরে এমন করে সর্ব্বনাশ করে গেল? সে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে। তার চীৎকারে ভৈরব ছুটে এলো। সব শুনে সে বললে—দাদাবাবু, এখনই পুলিশে খবর দিয়ে দাও!

পুলিশের নামে ফটিক ভয় পেয়ে গেল। সে বললে—থাক, আর লাভ কি হবে? শুধু হাঙ্গামা বই তো নয়? ওসবে আর কাজ নেই। ভৈরব আর কিছু বল্‌লে না। তার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

ফটিক তার জামার পকেটে কাল দশটাকার একখানি নোট রেখে দিয়েছিলো। জামাটা তার শিয়রে বালিশের কাছে ছিল। কাজেই চোর বেটা সেটা নেবার আর সুবিধে পায় নি।

জামাটা তুলে নিয়ে সে নোট্‌টা ট্যাঁকে গুঁজে রাখ্‌লে। তারপর সে ভৈরবের দিকে ফিরে বল্‌লে—ভৈরবদা, আজই আমাকে কলকাতা যেতে হবে। যাবার সময় তোমার ক'দিনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যাবো'খন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভৈরব উত্তর দিলে—এমনিই তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো, ও আর দিতে হবে না।

মাণিক ফটিককে জিজ্ঞেস করলে—তুই তো কলকাতা যাচ্ছিস, আমার কি হবে? কোথায় যাবো?

ফটিক রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলে—যারে, সে আমি কি জানি। আমি যদি না আসতুম, তবে কি করতে তুমি?

মাণিক আর কোন উত্তর দিলে না। তার মুখের দিকে বেদনা কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। হায় রে বন্ধুত্ব!

—পাঁচ—

পাঁচটার ট্রেণেই ফটিক রওনা হলো।

যাবার সময় সে মাণিককে আর কিছুই বলে গেল না; জামাটা গায়ে দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।......

সে চলে গেলে, মাণিক অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে কাঁদলো। কিছুক্ষণ পরে প্রাণটা একটু হাল্কা হলে সে উঠে বসে মনে মনে আলোচনা শেষ করে

পায়ে ঠেকিয়ে মনে মনে বললে এ বিপদ হতে তুমি আমায় রক্ষে করো মা! অদয়ে বল দাও মা! তার মনে হলো—যেন তার মা বলছেন—তোর কোন ভয় নেই বাছা! মার অভয়-বাণীতে তার মনে হুস ফিরে এলো! সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

* * * *

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আনন্দের মেলা বসেছে! কোথাও গান, কোথাও রঙ্গ-তামাসা, গল্পগুজব, কোথাও বা ভাগবত পাঠ হচ্ছে। সমস্ত স্থানটা যেন গিজ্ গিজ্ করছে।

মাণিক একটা সিঁড়ির উপর বসে আপন মনে কত কি ভাবছিল! তার চিন্তার যেন আর কূল কিনারা ছিল না।

একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে তাকে লক্ষ্য করছিলেন। বুঝি তার অন্তরের বেদনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ধীরে ধীরে কাছে এসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তিনি মাণিককে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার নাম কি খোকা? কি এতো ভাবছ তুমি? স্নেহস্পর্শে সে একেবারে গলে গেল। ধীরে ধীরে তার নামটি বলে চুপ করে রইলো। তখন তার কান্না পাচ্ছিল; চোখ ছল ছল করে উঠল। ভদ্রলোক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—বলো বাবা, বলো, তোমার কোন ভয় নেই।

মাণিক তখন তাকে অকপটে সব কথা খুলে বললে।

তিনি বললেন—এমন করে পালিয়ে আসা তোমার ভাল হয় নি। যাক্। কোনো ভয় নেই তোমার, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

ভদ্রলোকের নাম শ্রীপতিবাবু। তিনি খুব বড়লোক; কাশীতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর পুত্র সন্তান নেই; একটি মাত্র মেয়ে তার নাম মুক্তো। মুক্তো মাণিক অপেক্ষা দু' তিন বছরের ছোট হবে, বেশ মেয়েটি সে।

মুক্তোর সঙ্গে মাণিকের খুব ভাব হয়ে গেল। কি জানি কেন, হঠাৎ তার লেখা পড়ায় মন বসে গেল। শ্রীপতিবাবু মনে মনে খুব খুসী হলেন। একজন গৃহ শিক্ষক রেখে দিলেন, তার কাছে মুক্তো আর মাণিক এক সঙ্গে লেখা পড়া করে। মুক্তো এক মুহূর্ত্তও মাণিককে ছেড়ে থাকতে পারে না। তার মা যখন যা কিছু দেয়, অমনি ছুটে গিয়ে তার খানিকটা মাণিককে তার দেওয়া চাই। মাণিকের কিন্তু ভারি লজ্জা করে।

মুক্তোর মা হাসেন। শ্রীপতিবাবুকে বলেন—বেশ মিলেছে দু'জনে। এদের বে' দিলে বেশ হয়। মাণিক আর মুক্তো! তারপর দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠেন।...

ছয়

এরপর বছর দশেক কেটে গেছে।

মাণিক এখন একটি কলেজের প্রোফেসর। শ্রীপতিবাবুর যত্নেই ইতিহাসে এম-এতে সে প্রথম হয় এবং তাঁরই চেষ্টায় এই চাকুরিটি পেয়ে যায়।

মুক্তোও এবার ফার্ষ্ট ডিভিসনে আই-এ পাস করেছে।

শ্রীপতিবাবু একদিন মাণিককে ডেকে তাকে জামাতা করবার অভিলাষ জানালেন। মাণিক 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' করেই তার মনের ভাব প্রকাশ করলে। শ্রীপতিবাবু মনে মনে খুব খুসী হয়ে তখনই সংবাদটা গৃহিণীকে জানিয়ে দিলেন।...

তারপর এক উৎসবময়ী শুভ রজনীতে মাণিকের সঙ্গে শ্রীমতী মুক্তোর শুভ পরিণয় হয়ে গেল।...

সেদিন হঠাৎ মাণিকের সঙ্গে ফটিকের দেখা হয়ে গেল। ফটিক একেবারে বদলে গেছে, দেখলে আর চেনা যায় না। মাণিককে দেখে ভারি খুসী হলো সে। পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করে তার কাছে সে ক্ষমা চাইতে লাগল।

মাণিক তাকে সে কথা আর তুলতেই দিলে না। বাড়ীতে এনে আদর যত্ন করে, তাকে লজ্জায় একেবারে লাল করে তুললে। তার কাছেই সে শুনলে ফটিকের মা আর এ' জগতে নেই। তাকে একেবারে স্নেহের কাঙাল করে চলে গেছেন। তার দাদা বৌদিরা আর তাকে দেখতে পারে না। সর্ব্বদাই খিট খিট করে। সংসারে তার মন টেকে না; ভবঘুরে জীবনই তার এখন ভালো লাগে।

ফটিকের কাছেই সে জানলে যে, তার বাবার খুব অসুখ। আফিসের চাকরিটিও গেছে, বড়ই দুঃখে এখন তাদের দিন কাটছে। মা-বাবাকে দেখার জন্য তার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। মুক্তোকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিনই সে বাবার কাছে ছুটে চললো!

নন্দবাবু তার হারানিধি ফিরে পেয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মাণিককে বুকে টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে অশ্রু রোধ করতে পারলেন না।

মাণিক যে জীবনে এত উন্নতি করতে পারবে, এ' তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তার সৎ মাও এখন খুব অনুতপ্ত। মুক্তোকে পেয়ে তার মনে আনন্দ আর ধরে না, তাকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন। নিরানন্দ ঘরে আজ আনন্দের ঝরণাধারা ঝরতে সুরু করে দিল।

সুযোগ সুবিধা পেলে এবং ইচ্ছে থাকলে মন্দ ছেলেও যে জীবনে কেমন করে উন্নতি করতে পারে, মাণিকের জীবন থেকে তোমরা সেইটুকু নিতে পারলেই এই গল্প লেখা সার্থক হবে।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT SOAP
Rs. 10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
S. 249-X52 BG

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিরুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিরণ শেষে অনুমান করিল, "দাদাতো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয় তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিং রুমে ফিরবে ? তার চেয়ে চল ওই ওভার ব্রিজটায় ওঠা যাক—যাবে ?"

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

"এই গরমে—?"

"গরম বলেই যেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টংয়ের ওপর।"

"দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব"

"বুড়ো বয়সে শখও কম নয়"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইলেন। তার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অনুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি ছেলেমানুষী এই রাত দুপুরে।

·

...বিরুবাবু ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁধা লোক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পরে জানা গেল সে নৌকার মাঝি। বিরুবাবু ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই ঝকৃসু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বিরুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবে। বাতাস অনুকূল আছে, হয়তো পাঁচটার আগেই পৌঁছিয়া যাইবেন। বিরুবাবু মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেনের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। ঝকৃসু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন।

বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্‌ক'ও তো আছে। যদি ঝড়বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

ঝকৃসু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল, মনে হইল একটা বাঘ বুঝি গর্জ্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব যে বলিষ্ঠ তাহা নয়, যুবকও নয়। দোহারা চেহারা, কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুচ্ছে পাক ধরিয়াছে, গোঁফও কাঁচা-পাকা। সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আশ্বাস দিত না। সে রেল-কম্পানীর মতো বেইমান নয় যে অগ্রিম ভাড়া লইয়া সে যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আজ রাত্রে ঝড়বৃষ্টির কোন আশঙ্কা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়বৃষ্টি হয় বা নৌকা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরন্তু কান কাটিয়া (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল" বিরুবাবু কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেনে এদের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম।

বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন ক'রে হোক আমি সেখানে পৌছতে চাই"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বিরুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এক সহকর্মীর সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বিরুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আরে পাঁচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!"—সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা বৃথা।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"

পুরসুন্দরী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এক কোনে বসিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ফাঁড়া আছে শুনেছি। তোমাকে এই রাত্রে একা আমি নৌকোয় যেতে দেব না"

"পাগল না কি! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে? আমাকে যেতেই হবে"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই"

"তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি—"

পুরসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড় গামছা সমিজ ব্লাউস পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে' বসে' দুশ্চিন্তা করতে পারব না। তার চেয়ে চল সঙ্গেই যাই"

"চল—"

কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

"নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবেনা? সবাই গেলে কেমন হয়"

"না সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক! গগন দিগন্তও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেণে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্ব্বতী?"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রান্না নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি, সে কথা ওকে জানাবারও দরকার নেই। যদি জেদ ধরে' বসে যে যাব—তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

"যা করবে তাড়াতাড়ি করে' ফেল। এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌছতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে"

"চল, আমি তো প্রস্তুত"

পুরসুন্দরী হাত ব্যাগটি ঝুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণ বলিল, "আমারও দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না—"

বিরু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"তোরা পরে যাস—"

তিনি ঝকুসুর মাথায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পুরসুন্দরীও পিছু পিছু গেলেন। ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় দুই মাইল দূরে। রাস্তাও ভালো নয়। মিউনিসিপালিটির রাস্তা অত্যন্ত বেমেরামত। মিউনিসিপালিটির বাহিরের রাস্তাও সুগম নয়, গলিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে খানাখন্দও আছে। বিরুবাবুর হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কষ্ট হইতেছিল না, তাছাড়া তিনি খালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরসুন্দরীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুঁতে দেননা, বরাবর নিজেই বহন করিয়াছেন। পুরসুন্দরীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল, খুবই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বিরুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে যে ট্রেণটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিস বোস আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি খাটাইয়া দিয়া একটি টেব্‌ল্ ফ্যান পর্য্যন্ত

লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতটুকু তাহারা আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়াছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র পাহারা দিতেছিল পার্ব্বতী আর মুকুন্দ। পকৌড়ি-ওলা চিরনজিও ওয়েটিং-রুমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্ব্বতী হুকুম দিলেই বড়া ভাজিতে আরম্ভ করিবে। পার্ব্বতী মুখ-ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরসুন্দরী যে তাহাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না। প্রতিশোধ-স্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না। যাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবে তিনিই তো নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরসুন্দরীর সহিত দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত সে অনাহারে থাকিবে।

···ট্রেণটা যখন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকান্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে-অবতীর্ণ যাত্রী চতুষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন দিগন্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ হইতেছিল, কারণ দ্বিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগন্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা ভাবা শক্ত। অথচ মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন কথা-বার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত রসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম—"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্ব্বতী দ্রুতপদে আসিতেছে। কথাগুলি সে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন রসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে? পারছ না নিশ্চয়ই"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিন্যস্ত গুলা পড়িয়াছিল। তাহা সরাইয়া সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গগনও তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্ব্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল।

"বড় পিসেমশাই। বড় পিসিমাও এসেছেন"

তখন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।

পার্ব্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ আবার কে!

গগনকে চোখের ইসারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে!

গগন বলিল, "উনি একজন মিড্-ওয়াইফ। শ্বশুর মশাই সঙ্গে দিয়েছেন"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়া-ছিলেন, পার্ব্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমমে চলো—"

কুলিদের লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পার্ব্বতী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোষাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপসী। ফরসা রং, অদ্ভুত কালো চোখ, দেহ সৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী প্রশ্ন করিল—"খৃষ্টান না কি—"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোষাক কেন তবে"

"আমিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোষাক থাকলে ঢের সুবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকি মিলিটারি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেল্ট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চমৎকার মানাইয়া-ছিল তাহাকে। দিগন্ত বেশ পরিবর্ত্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডাল। বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর বারবার সেটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত সানন্দে ইহাদের দেখিতেছিলেন। চম্পাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মী

প্রতিমা। চম্পা তো চম্পাই। কনক-চাঁপার মতো গায়ের রং। ফিকে নীল শাড়িটি কি চমৎকারই না মানাইয়াছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে! কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যেন দেবী-দর্শন করিতেছেন। আসন্ন-প্রসবা? কই দেখিয়া তো মনে হয় না।

গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনারা বসেছেন কোথা—"

"ওয়েটিং রুমেই"

"বাবা মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি"

"তাঁরা কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকো করে' চলে' গেছেন"

"কেন! দাদুর অবস্থা খুব খারাপ না কি"

"না, সে রকম কোনও খবর আসে নি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিন্তু উত্তর আসেনি। তাই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন"

পার্ব্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে' যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি মুসাফির-খানায় গিয়ে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে' চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব অন্যায় করেছেন। তোমার অনুমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল"

পার্ব্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। দাঁড়াও না আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি—"

"নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মজাই তো জানা আছে তোমার—উপোষ—"

গগনের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি—"

পার্ব্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

দুইজনে সমবয়সী, এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে।

"কি রান্না করে' রেখেছ"

"কিছু করি নি—"

"চল, ওয়েটিং রুমে বসেই ঝগড়া করা যাক"

গগন পার্ব্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।

ক্রমশঃ

দীনেশ মজুমদার

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের দুর্দমনীয় দীনেশ মজুমদার :
সম্মানে তা'র বিজয়-শঙ্খ বাজাও একশো বার।
নত শিরে হাত জুড়ি'
সহস্রবার শহীদ-শিলার চারিধার এস ঘুরি'।

অগ্নি যুগের কথা :
নিঃশেষে প্রাণ দিতে বলিদান দুরন্ত ব্যগ্রতা।

শঙ্কা-বিহীন সন্তান শত হাতে নিল পিস্তল;
বৃটিশ-সিংহাসনের শাসন সন্ত্রাসে চঞ্চল।
দীনেশ মজুমদার
অত্যাচারীর হত্যায় লাগি চালাল রিভলবার।

রক্ত-আখরে শ্বেত মর্মরে সঙ্গীত লেখ নামে,
অশ্রু-পূর্ণ স্বর্ণ-কলস রেখ দক্ষিণে-বামে।
গগন-চুম্বী স্ফটিক-স্তম্ভে সাজাও কবিতা-বাতি :
ফাঁসির মঞ্চে বাঙালী মেরেছে মৃত্যুর মুখে লাথি।

নিতান্ত ছিল পরমায়ু তাই শয়তান গেল বাঁচি,
বিদেশী বিচারে জীবন-দণ্ড লভিল সব্যসাচী।

দীনেশ মজুমদার
অভূতপূর্ব অতুল্য ছেলে শ্যামলা বাঙলা মা'র॥

অষ্টপাশ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সখির মুখে শ্যামনাম শুনে, বিরহিণী শ্রীরাধিকা মধুর আবেগে গেয়েছিলেন—

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সে
আকুল করিল মোর প্রাণ।

মহাপূজার মহোৎসবে সোনার বাংলার হাটে মাঠে গৃহে মণ্ডপে বিশ্বজননীর পূজা প্রাঙ্গণে পুরোহিত পাঠ করবেন শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য। কে জানে কজনের প্রাণ স্পর্শ করে সে আখ্যায়িকা—দেবাসুর সংগ্রাম, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহামায়ারূপে অসুর নিধনের মহাসমাচার।

বিজ্ঞেরা মন্ত্রগুপ্তি, অধিকার, অনধিকার প্রভৃতি প্রাকারের অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন জ্ঞান ভাণ্ডার। পূজা প্রাঙ্গণের জনসাধারণ নরনারী উপলব্ধি করে পরিহাসের বাণী—গোলে মালে চণ্ডীপাঠ। বোঝে বাণীটা বিদ্রূপের, কিন্তু ব্যাপারটা বচনের অনুরূপ। নরনারী পূজা-মণ্ডপের পবিত্র পরিবেশে প্রাণে প্রাণে অনুভব করে পূজা বিশ্বরূপিনী কল্যাণময়ী মাতৃ-শক্তির। তারা মহোৎসবে মাতে, ভক্তি জাগে অনেকের প্রাণে, কিন্তু সে স্পষ্ট রূপ নেয়না। কারণ যাঁর রূপের জাগরণ তাঁর রূপের চেতনার অনুভূতি উজল করে না জিজ্ঞাসুর প্রাণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী শ্লোক বর্ণনা করেছেন সুরাসুরের যজ্ঞ। মহিষাসুর, চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ—এরা প্রধান অসুর-সঙ্ঘের রাজা। একের পর এক তাদের সৈন্য-শ্রেণী এবং সেনাপতিদের পরাজয় করেছিলেন—নিঃশেষ দেবশক্তি-সমূহ মূর্ত্তি দেবী। দেবতাদের হৃত-সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য তাঁদেরই স্তব স্তুতিতে। সুর এবং অসুরের উৎপত্তি একই পরমাশক্তির বিপরীত বিকাশ। দেবতারা স্তবে বলেছিলেন—যিনি সুকৃতীদের গৃহে লক্ষ্মী, তিনিই পাপাত্মার ঘরের অলক্ষ্মী।

মেধস মুনি চণ্ডীলীলা শুনিয়েছিলেন সুরথ রাজাকে এবং বৈশ্যকে। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন—

সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

সনাতনী দেবী সর্ব্বেশ্বরী। তিনি পরাবিদ্যারূপে জগতের মুক্তি হেতু। সংসারে বন্ধনের কারণ হন তিনিই অবিদ্যারূপে।

মানুষ নিত্যই উপলব্ধি করে যে তার মাঝে বিদ্যমান দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাদের সম্পদ বলেছেন। সুর-সম্পদ বাড়লে ক্ষয় হয় আসুরী-সম্পদ। তাই মাতৃ-শক্তি আবাহন করে সাধনা, দানব শক্তির নিগ্রহ হ'তে পরিত্রাণ পাবার সাধু সংকল্পে। মনের আসুরী ভাবকে পরাস্ত না করলে মানুষ পারে না মোহ-নিষ্কৃতির পথে অগ্রসর হতে। মন তো পারে না শূন্য থাকতে। তাই বাড়াতে হয় দৈবী-সম্পদের পুঁজি। গীতা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—

দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াঽসুরী মতা।

অবশ্য শেষ সোপানে হতে হবে সকল সম্পদহীন—গুণাতীত—তবে আত্মা পৌছবে অনন্ত আনন্দের শিখর-ভূমিতে। কিন্তু সে চরম অবস্থালাভের এক ব্যবস্থা মনের অসুরের সবংশে বিনাশ। দৈবী সম্পদে বাঁধন কাটে।

গীতায় যে দেব এবং অসুর ভাবের বর্ণনা আছে তারা মাত্র নিজেকে ঘিরে নয়। পরের মাঝে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে অন্যের দুঃখ দূর করবার চরিত্রবল উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক—জীবে শিব জ্ঞানের মধুর চেতনায়। মনকে বলতে হবে—জগৎটা যে মায়ের গড়া, পোড়া মন কি তাও জাননা? কাজেই জগতের পদার্থের নিরাময়তায় মাতৃ-সেবার আয়োজন।

সত্ত্ব, সংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দম, যজ্ঞ, সাধ্যায়, তপ, তেজ, ধৃতি, শৌচ প্রভৃতি সাধনায় বল অর্জ্জন হয়। তখন অন্য দেব-শক্তি আপনিই আয়ত্ত হয়। তেজ, দম প্রভৃতি যার—তার ভয়হীনতা প্রাণে আপনি আসে। পরকে ভাল বাসলে প্রাণে ভয় থাকবে কেন? কতকগুলি দেব-সম্পদ

পরকে ঘিরে—ঋজুতা, দান, অহিংসা, জীবে দয়া, অলোভতা, মৃদুস্বভাব, হ্রী, অচপলতা, ক্ষমা, অদ্রোহ এবং নাতিমানিতা। ধর্ম্ম নিত্যকর্ম্মের পদ্ধতি। আপনাকে ঘিরে কর্ম্ম করলে ধর্ম্ম-জগতে উন্নতি অসম্ভব।

আসুরী সম্পদ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য এবং অজ্ঞান। এদের উল্লেখ আছে গীতায়। কিন্তু এদের সঙ্গে সঙ্গে বহু অসুর ভাবে পূর্ণ জীব-প্রকৃতি। তারাও সম্পদ—উত্তরাধিকারা সূত্রে বা নিজের পরিশ্রমে লাভ করা ধনের মত।

দেবাসুরের রূপকে ভারতের কৃষ্টি বুঝিয়েছে মানবের অন্তরের নিত্য রণ। ভারত-কৃষ্টি মানে—ঈশ্বর ছাড়া কোনো ভাব নাই। তাই সুরও যেমন মায়ার খেলা, তেমনি অসুর। য়িহুদী শাস্ত্রও শয়তান মানে। কিন্তু তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

বিভিন্ন শক্তিকে রূপদান ক'রে শাস্ত্র গড়েছে তেত্রিশ কোটী দেবতা এবং কে জানে কত কোটি অসুর। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বহু অসুরের উল্লেখ আছে—বিভিন্ন অধ্যায়ে।

দেবাসুরের যুদ্ধের কথা উপনিষদ উল্লেখ করেছে। শঙ্করাচার্য্য বুঝিয়েছেন শাস্ত্রোদ্ভাসিত হ'লে ইন্দ্রিয় বৃত্তি জ্বলে ওঠে, দ্যোতনশীল হয়—অজ্ঞান-তিমির লুপ্ত হয়। সেই দিব্য-দৃষ্টিই দেবতা। এই দ্যোতনশীল প্রাণদেবতার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন মানুষের আশা কোথায় ?

আর অসুর—তদ্বিপরীত, বলেছেন শঙ্করাচার্য্য। উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন—সর্ব্ব-প্রাণীর প্রতিদেহ দেবাসুর সংগ্রামে সদাই প্রবৃত্ত।

গীতা বলেছেন—

দ্বৌভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।

মনে অসুর বিজয় লাভ করলে মানুষ জন্ম জন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, কারণ তারা আমাকে পায়না—বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

চণ্ডীপুরাণ—রূপক ছলে বর্ণনা করেছে মানব-হৃদয়ে দেব-ভাব ও অসুর ভাবের দ্বন্দ্ব। এ সমরের সন্ধান পায় জীব নিত্য। বহু দেবশক্তির উল্লেখ আছে এ মহাগ্রন্থে। প্রত্যেক অসুর ভাবের বর্ণনা আছে। অসুরদের নাম হ'তেই বোঝা যায় মানুষের কোন্ মন্দ-ভাব আসুরিক।

সাংসারিক জীবনে মনের স্বর্গ রাজ্য প্রায় অধিকার করে আসুরিক ভাব। দৈব-ভাবও জীবের সঞ্জাত। তারা পরাজিত হয়, কিন্তু তাদের উচ্ছেদ হয়না। সকল দেবশক্তির সুপ্ত-চেতনা এক-কেন্দ্র করলে তবে পরমেশ্বরীর শক্তি উপলব্ধি হয়। সেই উদ্বুদ্ধ শক্তি সহকারে দানব-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করলে তবে নিবৃত্ত হয় অসুর-ভাব।

নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে মনের সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয় অসুর। তাদের অস্ত্রও নানা রূপ। আমি ঋষি ব্রহ্মদেবের ব্যাখ্যায় বর্ণিত কতকগুলি অসুর ও অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছি বিভিন্ন প্রবন্ধে।

মানুষের প্রকৃতি কয়েকটি কোষে বিভক্ত। সেই কোষগুলির একের পর এক উচ্ছেদ না করলে মুক্তি অসম্ভব। অস্মিতা সহজে বিনষ্ট হয় না তপস্বীদেরও।

শুম্ভ নিশুম্ভ অস্মিতার রূপক। তাদের বিনাশের পূর্ব্বে মহাদেবীকে কতকগুলি অসুরকে বিনাশ করতে হয়েছিল। আমাদের সম্যকদর্শন অসম্ভব সেই দোষগুলি না মুছতে পারলে চরিত্র হ'তে। অস্মিতার আটটি পার্শ্ব-বাঁধন।

কুলার্ণবতন্ত্র বলে—সংসারে আটটি বাঁধন দড়িতে জীব বদ্ধ থাকে। সেই বাঁধনগুলি কাটতে পারলে তবে মানুষ শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই বাঁধন কাটানোর সাধনাই নানা ভঙ্গীতে নানা শাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে।

তন্ত্রে আছে—পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ
পাশমুক্ত সদাশিবঃ

পাশে বদ্ধ জীব, পাশমুক্ত হলে হয় সদাশিব। সে ভাব সোজা। এই পাশ আটটি কী ?

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশা প্রকীর্ত্তিতা।

ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি মানব চরিত্রের এই আটটি বিকাশের কথা অনুশীলন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এদের বিপুল প্রভাব মনুষ্য চরিত্রের উপর। সারা জীবজগতে এই বন্ধন-রজ্জুর প্রভাব এবং বিকাশ প্রত্যক্ষ। এইগুলি আমিত্বকে ঘিরে চিত্ত অধিকার করে মানুষের দেবত্বকে নাশ করে। আর একথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে এই অষ্টপাশের ফাঁসে প্রত্যেক মানুষ আপনার আসুরী ভাব প্রকাশ করে। আবার সদাই দেখি, সমাজে সেই পাশ-বদ্ধ নরনারীর সমষ্টি সারা সমাজের উপর আধিপত্য

় করে। তার ফলে আজ কেন চিরদিন মরম মাঝে
ত হয় অসুর নৃত্য। ইংরাজি কথায় বলে অক্টোপাশের
প্রায় অচ্ছেদ্য। অষ্টপাশ ভীষণ বাঁধন, সামুদ্রিক
অক্টোপাশ আষ্টেপিষ্টে যেমন বাঁধে শীকারকে আটটি
স্তর মত পায়ে জড়িয়ে।

স্মিতা অন্তরের আমিত্বের মূল-প্রবাহ। ক্ষণিক
কো আত্মদোষ উপলব্ধি করলে অনুশোচনা করে,
র স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। যার প্রতি অন্যায়
জীব অনেক সময় তার প্রতিকার করে দেব-ভাব
ক'রে। কিন্তু অস্মিতার অহঙ্কার গভীর। আমি
আমি গুণী, আমি ধাৰ্ম্মিক, আমি সাধু—এ গভীর
া অসুর-ভাব প্রণোদিত।

অন্তরের আমিত্বের মূল-প্রবাহের উপর প্রত্যেক
ত্তর কর্তৃত্বাভিমান প্রতিষ্ঠিত। আবার প্রত্যেক
ত্তর অন্যায় আসুরিক কর্ম্মের পলি পড়ে গভীর
ত্বে। তার বাঁধনকে তন্ত্র বলেছে—অষ্টপাশ।

চণ্ডী মহাপুরাণে দেবীর অসুর ধ্বংসের ক্রম বিবৃত
ছে। সমস্ত দেব-শক্তির একীকৃত শক্তি—দেবী।
মুণ্ড বিনাশের পর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা বর্ণিত
ছে।

শুম্ভ নিশুম্ভ—অস্মিতার রূপক। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি
রূপেই অস্মিতার বিকাশ হয়। অস্মিতা চায় পরিণীত
ত দেবীর নিকট। নানা প্রকার দূত পাঠালো অসুর
দ্বয় দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। বলে
জিত হ'লে তবে দেবী তাদের শরণাগত হবেন, এই
দেবীর উত্তর।

নিগূঢ় আমিত্ব চায় সাত্ত্বিক জগতেও আধিপত্য
তে। কিন্তু অস্মিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে মহা
সাধুরও সাধ্য কোথা দেবী লাভের। দেবী পূর্ণ মুক্তি—
পদ প্রবেশ। শুম্ভ নিশুম্ভ তা বোঝেনা। তারা
ঝে ভিন্ন ভিন্ন দেব-শক্তিকে পরাজিত করার ফলে
রা দাবী করতে পারে ত্রিজগতের স্বামীত্ব। তারা
ঝে শেষ রাজ্য—দেবরাজ্য স্বর্গ। কিন্তু একথা বোঝেনা
পূর্ণ আত্ম-সমর্পণে, শ্রীরাধিকার প্রেমে, মাত্র সে রাজত্ব
্য। অস্মিতা—আমিত্বের নিলয়, অহমিকার ধারার
াপ, মহামায়া মহাদেবীর লাভের একমাত্র উপায়।

আত্মলোপে বিশ্বজয়—এ শিক্ষা ভারত-কৃষ্টির সার।
শ্রীরামকৃষ্ণ বড় সরস উপমা দিয়েছেন শেষ আমিত্বের—

"অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তবে ভিতরে
যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী
দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি
কি? ঘট আছে বলে জল দুভাগ দেখাচ্চে, অন্তরে
বাহিরে বোধ হচ্চে। "আমি" ঘট থাকলে এই বোধ
হয়। ঐ "আমিটি" যদি যায়, তা হ'লে যা আছে তাই,
মুখে বলবার কিছু নাই।"

কালীরূপে দেবী এদের দুই সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডকে
বিনাশ করেছেন। কালী-শক্তির নাম তাই চামুণ্ডা।
দুর্গোৎসবে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে সেই পূজার
হয় অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর বাঙলা দেশে। ক'জন সুজন সে
পূজার মর্ম্ম বোঝে? চরিত্র সংশোধন করবার জন্য কজন বা
মাতৃচরণে আত্মোৎসর্গ করে? আপনাকে, অস্মিতাকে বলি
না দিয়ে মানুষ বলি দেয়—ছাগল ছানা।

চণ্ড-মুণ্ড বিনাশের পর অসুরেশ্বরেরা এবার পাঠালেন
তাদের আট প্রকার প্রিয় সেনাব্যূহ। এরাই অষ্ট পাশ,
জীবন সমুদ্রের অক্টোপাশ। এরা উদায়ুধ, কম্বু, কোটিবীর্য্য,
ধৌম্র, কালক, দৌহৃত, মৌর্য্য এবং কালকেয়।

উদায়ুধ—ঘৃণা। এর আয়ুধ বা অস্ত্র সর্ব্বদাই উদ্যত।
অহঙ্কারের প্রিয় সেনাধ্যক্ষ ঘৃণা। আমি পণ্ডিত সুতরাং
বাকী সবাই ঘৃণ্য। আমি প্রাতে উঠে এক হাজার আশীবার
ওঙ্কার জপ করি, সুতরাং বাকী সব জীব পাপী। আমি
লক্ষপতি, আমার আত্মীয় দরিদ্র সুতরাং ঘৃণ্য—এ সব ভাব
নিবিড় আমিত্বকে ঘিরে। মায়ের কৃপা সুরাসুরে সমান।
অস্মিতার এক বাঁধন কাটে উদায়ুধকে বধ করলে। অসুর-
পতির মনে হল উদায়ুধকে সমরে পাঠাবার। এটুকুও মার
কৃপা। উদায়ুধের সংখ্যা ষড়শীতি।

কম্বু পাঠালে—চতুরশীতি। কম্বু মানে শাঁক। শাঁক
যেমন বাহিরের জীব দেখলে আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে
খোলের মাঝে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, এক শ্রেণীর মানুষ
আছে তারা সকলকে এড়িয়ে নিজের খোলের মাঝে সুখে
থাকতে চায়। গভীর স্বার্থপর তারা। এমন কি তারও মুক্তি
নেই, যে ভাবে মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করলে যোগাসন
মুক্তির উপায়। ভারতের ধর্ম্ম বলে—সাধনার প্রধান

সোপান সর্ব্বজীবে শিব জ্ঞান। রাক্ষস বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র নর-বানরের সঙ্গ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পালিত হয়েছিলেন গোপগৃহে, মহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম বিলিয়ে ছিলেন। লজ্জা ও সঙ্কোচ ওঠে ভেদ জ্ঞান হতে।

তারপর কোটিবীর্য্য—ভয়। ভয় অমিতপরাক্রম। জীবনের পদে পদে অনুভব হয় ভয়। তাই কোটিবীর্য্য—ভয়াসুর। ভয় নাশ না হ'লে অহমিকার নিস্তার নাই। "কোটিবীর্য্যানি পঞ্চাশৎ।" পঞ্চকোষ এবং দশ ইন্দ্রিয় গুণ করলে হয় পঞ্চাশ। এরা শঙ্কারূপ পাশ। দৃষ্টি অস্পষ্ট—তাই শঙ্কা।

ধৌম—ধোঁয়াটে ভাব মনের যা হতে জন্মে শঙ্কা। অস্পষ্ট দর্শন ধৌম দর্শন। যেথা ভয়ের কারণ নাই অথচ স্পষ্ট প্রতীতি নাই সেথা জন্মে আশঙ্কা, লোকে ভূত দেখে। এই দশ-ইন্দ্রিয়—পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চভূত মিলে দশ। এদের গুণ করলে হয় একশত। তাই ধৌম্র অসুরের সংখ্যা "শতং কুলানি ধূম্রাণাং।"

কালক—জুগুপ্সা। কুৎসা, নিন্দা, এরা কালো বর্ণ কারণ গোপন থাকতে চায়। পরনিন্দা, পরের দোষালোচনা নিভৃতে—সবই অহমিকার বিকাশ।

দৌহৃত—কুলাভিমান—ষষ্ঠ পাশ।

মৌর্য্য—মুর অসুরের সন্তান—শীলাভিমান। শীলতা পরের তুষ্টির জন্য। কিন্তু শীলে অভিমান হ'লে মানুষকে ছোট করে, হাস্যাস্পদ করে।

কালকেয়—জাত্যাভিমান। এ এক মহা বন্ধন।

এই অষ্টপাশের বাঁধন না ছিঁড়লে কি শরণ বা আত্মসমর্পণ সম্ভব দেবীর শ্রীচরণে? কখনই নয়। মাত্র এদের উচ্ছেদেই উদ্ধার নয়। শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশ চাই—উচ্ছেদ চাই। চাই অহৈতুক বিশুদ্ধ ভক্তিভরে শ্রীরাধিকার মত পূর্ণ আত্ম-নিবেদন।

ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হতে দেহীকে উপবাসী রাখলেও রসবর্জ্জিত দেহীর অন্তরে রসের স্বাদ থাকে। কেবল পরমতত্ত্ব দর্শন হলে সংসার ভোগের রস নিবৃত্তি হয়। শূন্যতায় সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠায় নিষ্কৃতি।*

মনে পড়ে কালিদাসের ধীরের বর্ণনা। বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকলেও যাদের চিত্ত বিকৃত হয়না তারাই ধীর।

বিকারহেতৌ ন বিক্রিয়ন্তে যেষাং না
চেতাংসি তে এব ধীরাঃ।*

ধারণা সোপান মাত্র। দেবী দর্শন, দেবীর পবিত্র অস্ত্রে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি আট শ্রেণীর অসুরের নিধন আবশ্যক। তবে তো হবে জীব গুণাতীত—বাঁধন ছেঁড়া। শূন্য হৃদয় দান করলে আসে ভক্তি-প্রেমের বরষা।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরষায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।

গীতার শিক্ষা ও চণ্ডীর শিক্ষায় প্রভেদ নাই—রূপকের আবরণ ভেদ করে প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে চিত্তকে আলোকিত করলে।

জগৎ প্রতীতিকে বৌদ্ধ-দর্শন ক্ষণিক বিজ্ঞান নাম দিয়েছে। জগতের আসল সত্তা নাই। অসৎ বা শূন্য হতে উদ্ভূত এক অলীক জ্ঞান—আমিত্ব, একে বিনাশ করলে নির্ব্বাণ। বুদ্ধ-দর্শনে ক্ষণিক বিজ্ঞান, ধারা-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞানের উপর অস্মিতার স্থিতি। সে শাশ্বত নয়, তাই বৌদ্ধ-দর্শন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আমরা সর্ব্বদা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের দ্বারা যে জগতকে উপলব্ধি করি তার মধ্যে একটা আমিত্বের ধারা বিদ্যমান। সেই ধারাবাহিক খণ্ড আমিত্বের অন্তরে একটি অখণ্ড আমিত্বের চেতনা বিদ্যমান। আজকের সুগন্ধ ভোগী আমিই যে দশ বৎসর পূর্ব্বের একদা পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার গন্ধের দুর্ভোগী আমি—এ ধারা বিজ্ঞান। কিন্তু তার আশ্রয় আমিত্বরূপ আলয়ে। তাই ক্ষণিক বিজ্ঞান কলাকাষ্ঠার পরিণাম, ধারা-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞানের চেতনা—

---

* বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে। গীতা

* কুমারসম্ভব ২, ৫৭।

জীবত্ব। এ তিনটি জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে মুছে ফেলতে পারলে নির্ব্বাণ।

চণ্ডী এই কথাই বলেছেন। তবে নির্ব্বাণ যদি হয় শূন্যতা—চণ্ডী বলেছেন তার পরেও অধ্যায় আছে, চিরানন্দময় চিরস্থিতি সম্যক চেতনা।

চণ্ডীপুরাণে শুম্ভও ভেবেছিল শূন্যবাদেই প্রকৃতি জয়। তাই সে মর্ত্ত্যযুদ্ধে দেবীকে পরাজিত করতে না পেরে—

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈ দেবীং গগনমাস্থিতঃ।

শুম্ভ উৎপতিত হয়ে দেবীকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশে উপস্থিত হল। আকাশ শূন্য। কিন্তু তাতে তো তার অভিষ্টসিদ্ধ হ'ল না।

শেষে অস্মিতা বিনষ্ট হ'ল শূলের প্রহারে ভূমিতে। শূল—ত্রিপুষ্টি জ্ঞান। সে জ্ঞান ছিন্ন করে আমিত্বকে, যা হতে ফুটে ওঠে সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার নিবিড় একতা।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

মায়াকে না জানলে তো মায়া কাটা পড়েনা। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর উপলব্ধি স্পষ্ট হয়—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজম্ পরমাসি মায়া

পূজা হবে মঙ্গলময়—যখন পূজাগৃহের দ্বারে মঙ্গল কলস রেখে শান্তচিত্তে বলব—

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন দ্বারে।

মহামায়ার পূজার দিনে প্রাণে অধিষ্ঠিতা শক্তির বেদীতে মুক্তকণ্ঠে দেবতাদের সঙ্গে এক কণ্ঠ হয়ে বলতে হবে—

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

মহাপূজার মহা-সমারোহ সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও মধুর হবে বিকসিত হবে যখন আমরা ভক্তিভরে বলব—মাগো তুমি সর্ব্বজীবের সকল প্রকার মঙ্গলের কারণ, শান্তিই তো তুমি সকল অর্থ সাধিত হয় তোমার শরণে। সত্য কথা যেছে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভজে তৈছে। মা তোমার শরণ গ্রহণ করলে আমাদের যোগ মোক্ষের ভার নেবে তুমি তুমি ত্রিনেত্রা—ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সমস্তই তোমার দৃষ্টির মধ্যে—ত্রিজগত তোমার দৃষ্টির ভিতর যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের দৃষ্টিও তোমার। হে গৌরী, হে নারায়ণী তোমাকে নমস্কার করি।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমস্তুতে।
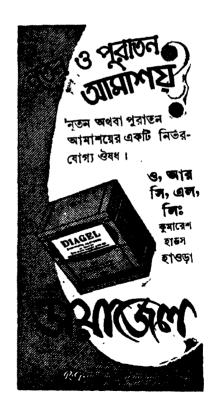
ডিনার খাওয়ার কথা বেজওয়াদায়, কিন্তু হিসাব করে দেখলাম ট্রেন বেজওয়াদা পৌঁছোবে রাত একটায়। হন্তদন্ত হ'য়ে ষ্টেশনে নেমে কণ্ডাক্টর-গার্ডের সন্ধানে বেরোলাম। ওয়ালটেয়ার থেকে ডাইনিং-কার কেটে রাখে, কাজেই আগে থেকে তার না করে দিলে বেজওয়াদায়ও কিছু পাবার আশা নেই। তার মানে সারাটা রাত নিরম্বু উপবাস।

কণ্ডাক্টর-গার্ডকে দেখতে পেলাম কিন্তু ব্যূহ ভেদ করে কাছে এগোনোই দুষ্কর। ডিনার-লোভী যাত্রীরা ছেঁকে ধরেছে। ওরই মধ্যে ভিড় একটু পাতলা হতে মাথা গলাবার চেষ্টা করলাম।

—দেখুন দয়া করে, একটা ননভেজিটেরিয়ান-ডিস অর্ডার দিয়ে দেবেন।

—নন-ভেজিটেরিয়ান ডিস? ভদ্রলোক খাতা খুলে লিখতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ থেমে আমার মুখের দিকে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, আরে অজয়দা না?

হোঁচট খেলাম। আলো অবশ্য যথেষ্ট, কিন্তু কপাল অবধি টানা হ্যাট আর রেলের বোতাম আঁটা জামা জড়ানো ভদ্রলোককে হাজার স্মৃতি মন্থন করেও চিনে উঠতে পারলাম না।

—কে বলুন তো? ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। আমতা আমতা করলাম। ততক্ষণে ভদ্রলোক নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়েছে হাসি-হাসি মুখে।

আমার দুর্ভাগ্য, এততেও চিনে উঠতে পারলাম না। মনে মনে আত্মীয়-স্বজনের মুখ ছুঁয়ে যেতে লাগলাম, অনাত্মীয় সতীর্থদের দেহের কাঠামো, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

আমার মুখচোখের চেহারায় বোধ হয় হতাশার ভাব ফুটে থাকবে, তাই ভদ্রলোক এবার অপরিচয়ের খোলস খোলবার চেষ্টা করল, আমি পরেশ, অজয়দা। রতন সরকার লেনের।

ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। চিনি, খুব চিনি। একেবারে পাশাপাশি আস্তানা ছিল, পাড়াগাঁ হ'লে বলতে পারতাম এক উঠান। খোঁড়া পান্নালালের ভাই পরেশ ভৌমিক। কিন্তু অনেক বদলে গেছে পরেশ। সেদিন-কার পাতলা ছিপছিপে ছোকরা বেশ মেদ সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে। আগের সে ফুটফুটে রং তামাভ। গলার আওয়াজটাও ভারিক্কি।

—আরে পরেশ, আপ্যায়িত করার চেষ্টা করলাম, কতদিন পরে দেখা বল তো?

একটা চোখ আধবোজা করে দাঁত দিয়ে পরেশ ঠোঁট কামড়াল, তা প্রায় বছর বারো হবে অজয়দা, কিংবা তারও বেশী। তারপরই গলার স্বর পালটে জিজ্ঞাসা করল, দাদা আপনি এ লাইনে।

অফিসের কাজে মাদ্রাজ চলেছি, সে কথা বললাম।

আনন্দের আতিশয্যে ডিনারটা না বানচাল হয়, সে কথা ভেবে বললাম, তা হ'লে পরের ষ্টেশনে সব পাওয়া যাবে তো। গাড়ী তো প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেট।

পরেশ অমায়িক হাসি ফোটাল মুখে। বলল, মাদ্রাজ মেইলের পক্ষে এ আর নতুন কথা কি দাদা। মাঝে মাঝে পুরো একটা দিনও লেট হয়।

কথা শেষ করে পরেশ এগিয়ে এসে একেবারে আমার জামার আস্তিন আঁকড়ে ধরল, একটা কথা আছে দাদা, গরাব ভাইয়ের এ অনুরোধ রাখতেই হবে।

এক সময়ে খোঁড়া পান্নালাল আমার সহপাঠি ছিল, সেই সুবাদে ছোট ভাইয়ের সম্পর্ক একটা আছে বটে, কিন্তু অনুরোধের ধরণটা না জেনে ঘাড় নাড়তে সাহস হ'ল না।

পরেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, অনুরোধটা মোটেই মারাত্মক নয়, বরং লোভনীয়।

পরেশ বেজওয়াদায় থাকে, তার ডিউটিও সেখানেই খতম। আমাকে যাত্রাভঙ্গ করে তার আস্তানায় গিয়ে উঠতে হবে। রাত্রের আহার সেখানে সেরে পরের দিন মাদ্রাজ রওনা হতে হবে।

নেহাৎ লৌকিকতা রক্ষার্থে দু একবার ঘাড় নাড়লাম, কিন্তু আপত্তি টিকল না। রাজী হ'তেই হ'ল।

রাজী হওয়ার কারণও ছিল। নিজের কামরায় বসে সেই কথাই মনে পড়ে গেল। দ্রুতবেগে রেলের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বছর পার হ'য়ে গেলাম। বছর বারো তেরোই হবে। পরেশ তখন কলেজের ছাত্র। ছাঁপোষা পরিবারের ছেলে। শুধু বাপের আয়ে নির্ভর করে সংসার চলে না, দাদা পান্নালালের মনোহারী দোকানের আয়ও মনোহরণ করার মতন নয়। কাজেই পরেশকে নিজের খরচ চালাতে বাড়তি আয়ের দিকে নজর দিতে হ'য়েছিল। সকাল বিকাল ছুটো টিউশনি।

সকালেরটি ছেলে, বয়স বছর বারো, বিকেলে একটি মেয়ে, ষোড়শী।

শুধু যে অধ্যাপনাই চলছিল না, অন্ততঃ বিকেলের দিকে, সেটা বোঝা গেল কিছুদিন পরেই।

মেয়েটিও আমাদের পাড়ার। বাপের লোহার কারবার, অন্তরটিও লোহার মতনই নিরেট। মেয়ের পড়ার বই থেকে চিঠি বেরোতেই বাপ অগ্নিশর্মা। কান টানলে মাথা আসার মতন চিঠির সূত্র ধরে পরেশও এসে হাজির হ'ল।

এমন একটা মুখরোচক খবর পাড়ার ছেলেরা বাড়ী বাড়ী বিতরণ করল। কারুরই অজানা রইল না। পরেশের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে মেয়ের বাড়ীতে আমার ডাক পড়ল। পাড়ার আরো দু একজন বিজ্ঞ বয়স্থ ব্যক্তিও ছিলেন।

কৌতূহলী চোখ এড়াবার জন্ত পঞ্চায়েত বসল বাড়ীর ভিতর দিকে।

এক কোণে মেয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, এদিকে পরেশ, এমন একটা নাটকের নায়ক হতে পারার গর্বে উন্নতশির। মাঝখানে আমরা। প্রথমে অনুনয়, বিনয়, তারপর থানা পুলিশের ভয়, গালি-গালাজ। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল। পরেশ অটল।

কিন্তু এ হবার নয়। মেয়ের বাপ এমন টিউশনি-সম্বল কপর্দকহীন ছেলের হাতে তাঁর মেয়েকে কোনদিনই তুলে দেবেন না, সেটা সুনিশ্চিত। তা ছাড়া পরেশ কায়স্থ, মেয়েরা ব্রাহ্মণ। অসবর্ণ বিয়েতে সম্মতি দেবার মতন উদারতা লোহার কারবারীর নেই। কাজেই অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হ'ল, উঠতি বয়সের নেশা কাটতে কতক্ষণ। চোখের আড় হ'লেই মনের আড়! মেয়েকে মাসীর বাড়ী গড়পারে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হল।

চোখের আড় হলেই যে উঠতি বয়সের নেশা কাটে না, তার প্রমাণ মিলল প্রায় হাতে হাতে।

দেড় বছরের মধ্যে মেয়ে নিখোঁজ। বালিশের তলায় চিঠিও পাওয়া গেল। কিছুদিন পরে মেয়ের বাপের কাছে পরেশের চিঠি এসেও পৌছাল। দুজনে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছে, যেন তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। শেষ দিকে পরেশ একথাও লিখেছে, ব্রাহ্মণ আর কায়স্থের বাধা মানুষের তৈরী কৃত্রিম বাধা, তার কোন দাম নেই, কিন্তু মীরাকে গ্রহণ না করলে পরেশ ধর্মে পতিত হ'ত।

পাড়ার বুড়োদের ব্যাপারটা মনঃপূত হয়নি! তাঁরা মেয়ের বাপকে থানায় নালিশ ঠুকে দেবার জন্ত উস্কানী দিয়েছিলেন। সাত-পাঁচ ভেবে অবশ্য মেয়ের বাপ আর ততটা এগোন নি। বাড়ীর ময়লা সরকারী পুকুরে কাচার কোন মানে হয় না।

একমাত্র আমারই বোধ হয় এমন একটা ব্যাপারে মনে মনে সায় ছিল; বয়স কম বলেই হ'ক, কিংবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যই হ'ক, আমি ভেবেছিলাম একটা মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে, মন দেওয়া নেওয়া পালা শেষ ক'রে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসা সত্যিই অন্যায়। সেটা করলে পরেশ ধর্মে পতিত হ'ত, সন্দেহ নেই।

মীরাকে দেখেছি। পাড়ার মেয়ে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দু একবার কথাও বলেছি। শান্ত, ধীর প্রকৃতির মেয়ে। নরম মেজাজ। এমন একটা মেয়ে মনের মানুষকে নিয়ে সুখী হয়েছে ভাবতেও আনন্দ হ'ল।

তারপরে আর পরেশ ও মীরার খোঁজ রাখিনি। প্রয়োজন হয় নি, তা ছাড়া, কিছুদিন পরেই মনোহারী দোকান বিক্রি করে পরেশের দাদা পাড়া ছাড়ল। তার বাবা আগেই পেন্সন সম্বল হ'য়ে কাশীবাসী হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজের পাতায় এই রকম ঘটনা চোখে পড়লে, পরেশদের কথা মনে এসেছে, খুব আবছা। শুধু এইটুকু মনে হয়েছে, এই বিরাট দেশের কোথাও একটি সুখী দম্পতি বাস করছে। সামাজিক বাধা যারা অপসারিত করেছিল হৃদয়ের উত্তাপে।

এতদিন পরে, হঠাৎ পরেশকে দেখে ভালই লাগল। এই সুযোগে পরেশের গৃহস্থালীও একবার দেখে আসা যাবে।

একটা নয়, ট্রেণ বেজওয়াদা পৌঁছলো প্রায় বারটা। এত রাত্রে পরেশদের বাড়ী গিয়ে উঠতে সঙ্কোচ হ'ল। মাঝ রাতে অতিথি আপদই হ'য়ে দাঁড়ায়।

মুখ ফুটে সে কথা পরেশকে বলতেই পরেশ জিভ কাটল, কি যে বলেন দাদা তার ঠিক নেই। আপনার মতন লোকের পায়ের ধুলো বাড়ীতে পড়া কম ভাগ্যের কথা। তা ছাড়া, আপনার জন্য আর বাড়তি বন্দোবস্ত কি করা হবে। আমার জন্য তো রান্না তৈরী থাকবেই, তাই ভাগ করে দুজনে খাব, আসুন। নামুন। এই কুলি, কুলি।

অগত্যা, নামতেই হল। সব ব্যবস্থা পরেশই করে কিছু একটা বলা দরকার এইভাবেই বললাম, তোমার বাবা কেমন আছেন পরেশ? কাশীতেই আছেন তো?

তিনি বহুদিন দেহ রেখেছেন। এমন চাকরী দাদা যে শেষ সময়ে একবার দেখাও করতে পারলাম না। বাবা নেই, দাদাও গত বছর মারা গেছে। ওদিক আমার একেবারে ফরসা।

পরেশ মাথা নিচু করে রইল। আমিও আর বলবার মত কোন কথা পেলাম না।

বড় রাস্তা ছেড়ে গলি তারপর ছোট মাঝারি নানা শড়ক পেরিয়ে সাইকেল-রিক্সা থামল।

পরেশ নেমে রাস্তা থেকেই হাঁক দিল, তাম্বি, তাম্বি।

ছোকরা গোছের একটি চাকর বেরিয়ে এল। পরেশ তাকে মদ্র ভাষায় কি বলতেই সে আমার বাক্স আর বিছানা বগলদাবা করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

পরেশ আমার দিকে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলল, আসুন দাদা। এই গরীবের কুঁড়ে। এখানেই পড়ে আছি।

ঢোকবার আগে একবার চেয়ে দেখলাম। দু তলা কোঠাবাড়ী। বেশ ঝকঝকে তকতকে। পরেশের পিছন পিছন বাইরের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

পরিপাটি করে সাজান। দামী আসবাব হয়তো বেশী নেই, কিন্তু ছিমছাম। চেয়ারের ঢাকনায় ফুলের কাজ। জানলায় বাহারি পর্দা। মেঝেতে সস্তা কিন্তু সুদৃশ্য ম্যাটিং। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। খান কয়েক ছবি। সব কিছু মিলিয়ে গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় দেয়।

কোণ থেকে গোটান একটা ইজি চেয়ার টেনে নিয়ে পরেশ এগিয়ে দিল, বিশ্রাম করে নিন, দাদা। আমি একবার এদিকের ব্যবস্থাটা দেখি।

পরেশ ভিতরে যেতে, ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলাম। কথার গুঞ্জন কানে এল। হাবে ভাবে মনে হ'ল সুখী পরিবার।

ভালই করেছে। সে দিন পরেশ ভয় পেয়ে সরে এলে দুটো জীবনই হয় তো ব্যর্থ হ'য়ে যেত। মীরাকে জোর করে লোহার কারবারী বাপ অন্য জায়গায় বিয়ে দিতেন। হয়তো পরেশকে ভুলে যেত মীরা, কিংবা না ভুলতেও

পোষাক অঙ্গে জড়িয়ে সারাটা জীবন তাকে কাটাতে হত। নিজের দুঃখে, নিজের বেদনা ছড়িয়ে দিত আরো একজনের সংসারে।

পরেশও সম্ভবতঃ বিয়ে করত না। সারাটা জীবন ছন্নছাড়া-ভাবেই কাটাত। নীড় বাঁধবার স্পৃহা জাগত না। বেপরোয়া ভবঘুরে জীবন।

ভাবতে ভাবতে আরো গভীরে চলে গেলাম। অসবর্ণ বিবাহের যৌক্তিকতার কথাও মনে এল। এক জাত, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক দেশ, শুধু কেবল বর্ণের বৈষম্যের জন্য সরিয়ে দিতে হবে মানুষটাকে! প্রাচীন এ প্রথার অবসান হওয়াই সমীচীন। যে যুগে দূরের মানুষকে কাছে টানার প্রয়াস চলেছে, দেশদেশান্তরের মধ্যে চলেছে কৃষ্টির বিনিময়, সে যুগে ঘরের মানুষকে, কাছের মানুষকে এ ভাবে সরিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয়!

মানে হয় না, এটাই আমার স্থিরবিশ্বাস। সেই জন্যই আমি নিজের মেয়ের অসবর্ণ-বিবাহে আপত্তি করি নি। আত্মীয়-স্বজন সবাই বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন কি কিছু পরিমাণে মেয়ের মাও, কিন্তু আমি একটু টলি নি।

পরেশ আবার ঘরে ঢুকতেই চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

—আসুন দাদা, হাত মুখ ধুয়ে নিন। এতরাত্রে মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু তবু লোভ সামলাতে পারলাম না। এতদিন পরে দেখা। এ লাইনে চেনা শোনা লোক তো নজরেই পড়ে না।

পরেশ একহাতে পর্দাটা সরিয়ে ধরল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একবার আড়চোখে চেয়ে নিলাম। মাঝারি সাইজের ঘর। একটা পালিশ-চকচকে খাট। পরিপাটি বিছানা পাতা। আলনায় শাড়ী, জামা, প্যাণ্ট। বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে আবার বাইরে এলাম।

দু খানি ঘর। তা হোক, বেশ ফিটফাট। ছেলেপুলে বোধ হয় হয় নি। হ'লে এত রাত্রে তাদের খাটের ওপরই দেখতে পেতাম। অবশ্য ছেলেপুলে ছাড়া সংসার সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু পরেশের তো আর বয়স যায় নি। মীরারও নয়!

আবদুল মিস্ত্রী লেনের পালেস্তারা-খসা জরাজীর্ণ কামরার তুলনায় এতো স্বর্গ। মীরার সঙ্গে পরিচয় হ'লে তার রুচিজ্ঞানের কি ভাবে তারিফ করব মনে মনে তার তালিম দিয়ে নিলাম।

পরেশই হাতে ক'রে নিয়ে এল। একথালা গরম লুচি, কিছু তরকারীও রয়েছে। আর এক হাতে ঘন দুধের বাটি।

আশ্চর্য লাগল। স্ত্রী থাকতে নিজে পরেশ এসব নিয়ে এল যে। মীরা কি এত পর্দানশীন নাকি।

—আসুন দাদা। টেবিলের ওপর থালা বাটি রেখে পরেশ চেয়ারটা টেনে দিল।

চেয়ারে বসতেই শাড়ীর খসখস শব্দ। অলঙ্কারের আওয়াজ। আমি আগে থেকেই তৈরী ছিলাম। বুক পকেটে আলাদা একটা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছি। মীরার হাতে তুলে দেব।

পায়ের কাছে নরম স্পর্শ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিচু হ'য়ে মেয়েটি প্রণাম করছে পা ছুঁয়ে।

—থাক, থাক, হ'য়েছে। এতদিন পরে মাঝরাতে হঠাৎ এসে তোমাদের বিরক্ত করে গেলাম, চিরদিন মনে থাকবে কি বল? যেমন বিয়ের খাওয়া ফাঁকি দিয়েছিলে।

হাসতে গিয়েই থেমে গেলাম। ততক্ষণে প্রণাম সেরে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। সরে গেছে মুখের ঘোমটা। জোর বাতির সামনে কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

মীরা নয়। কালো রংয়ের দোহারা চেহারা, চোখ মুখের এমন কিছু বাহার নেই। মীরার চেয়ে যেন অনেকটা বেঁটে বলেই মনে হ'ল।

মনে মনে ঠিক ক'রে রাখা কথাগুলোর একটাও বলতে পারলাম না। সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

আমার মুখের অবস্থা বোধ হয় পরেশের চোখে পড়ে থাকবে, সে ইসারায় মেয়েটিকে ভিতরে যেতে বলে আমার কাছে এগিয়ে এল।

—দাদা, আপনি যাকে ভেবেছেন এ সে নয়। বসুন, সব বলছি।

—তার মানে।

আমাকে বসিয়ে পরেশও সামনে বসল।

—আমাদের পিতৃপুরুষ যে বিধান করে দিয়েছেন তা লঙ্ঘন করতে যাওয়াই বোকামী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, কায়স্থের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে হবে এটাই প্রথা। এ প্রথা না মানলে অদৃষ্টে দুঃখভোগ হবেই। উঠতি বয়সে অতটা

বুঝতে পারি নি, একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছিলাম, অবশ্য সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও করেছি।

থালার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম, পরেশের কথায় গুটিয়ে নিলাম হাতটা। আস্তে আস্তে বললাম, তা'হ'লে মীরা কোথায়?

—কি জানি খবর রাখি না। তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে ফেলেছি। তবে অবুঝ মেয়ে নয়। ঠিক বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। হাজার হোক্ মুনি-ঋষিদের বাঁধা নিয়ম, এ এড়ালে মানুষ সুখী হ'তেই পারে না। চোখের ওপর দেখতেই তো পেলে আমার অবস্থা। চাকরী নেই, বাকরী নেই, রোখের মাথায় এককথায় বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ী থেকে, কষ্টের অবধি ছিল না।

আমার কথা বলবার শক্তিও যেন লোপ পেল। চেষ্টা করেও একটি কথা বলতে পারলাম না।

—দেখুন ভগবানের লীলা। এক ওয়েটিং রুমে দেখা। এর বাপ রেলের বড়বাবু। তাঁরই দয়ায় রেলের চাকরী জুটে গেল। পাল্টা ঘর, কোন অসুবিধা নেই। হিন্দু মতে বিয়ে ক'রে সংসার করছি।

পরেশের মুখে আত্মপ্রসাদের ছায়া। দুঃখের কাঁটা তার পার হয়ে এসেছে, চোখের এমনি ভাব।

হঠাৎ বোধ হয় আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল। হাত গুটিয়ে আছি দেখে পরেশ চেঁচিয়ে উঠল, একি আপনি যে এখনও হাতও দেন নি। নিন, নিন, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, তারপর চাপা স্বরে বলল, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন দাদা, না হলে ধর্মে পতিত হতাম।

পরেশের দিক থেকে চোখ সরাতে গিয়েই ক্যালেণ্ডারের ওপর নজর পড়ল। দু এক সেকেণ্ড, তারপরই পা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

—কি হ'ল দাদা। পরেশও দাঁড়িয়ে উঠল।

—ওঃ, খুব বেঁচে গেছি পরেশ। আমার মনেই ছিল না একেবারে। আর একটু হ'লেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

পরেশ অস্ফুট গলায় বলল, কি ব্যাপার দাদা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।—ভাগ্যিস ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়ল। আজ, একাদশী, একেবারে মনে নেই! আমি একেবারে নির্জলা একাদশী করি।

—আপনি একাদশী করেন? পরেশের গলায় ডুবন্ত মানুষের ক্ষীণ আর্তনাদের ছোঁয়াচ।

—নিশ্চয়। মুনি ঋষিদের নিয়ম। লঙ্ঘন করলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হতে হ'বে।

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, আর একটু হ'লে ধর্মে পতিত হতাম।

টেবিল থেকে সরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। পরেশের দিকে না ফিরে বললাম, তুমি একটা সাইকেল-রিক্সার বন্দোবস্ত করে দাও ভাই। দেখি যদি গাড়ীটা ধরতে পারি।

গান

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

(যখন) সাঁঝের কোলে উঠবে জ্বলে
তারার দীপগুলি—
তখন যেন পড়ে হেথায়
তোমার চরণধূলি।
হিয়ার আঁচল ধূলায় দিব পাতি'
আসবে যখন ঘনায়ে আঁধার রাতি—
(আমি) চোখের জলে ফেলবো তুলে
পথের কাঁটাগুলি।

তোমার কাছে নাইকো আমার
অপমানের ভয়;
ব্যথা দিয়ে হৃদয় আমার
করেছ যে জয়।
জীবন ভরে চেয়েছিলাম যত,
আমি পেয়েছি যে অবহেলা তত,
(আছে) তোমার হাতে আমার আলো
আর কি তা ভুলি

ভোড়ী-ভৈরবী—দাদ্‌রা

যে তোরে দিবে কাঁটা
তারে তুই দিস্ ফুল
তারে তুই দিস্ গান
তবেই ভাঙিবে ভুল !
অমৃতেরি সন্তান
এক সুরে বাঁধা প্রাণ
কর যদি প্রেম দান—
অরি হবে অনুকূল !

পান্থশালায় এই
দুদিন হাসো ও গাও
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে
সব ত্রুটি ভুলে যাও !
তারপর কে কোথায়
কোন্ দিকে চলে যায়
দেখা হয় কিম্বা নাহি হয়—
সংশয়ে মন আকুল ॥

ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল্, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়াল

II

১´ ০ ১´ ০
রা মা মা | পা পা দা I দর্সা -া -া | -া -া -া I
যে তো ০রে দি বে কাঁ ০টা -

জ্ঞা মা জ্ঞা | -া ঋা -া I সা -া -া | -া -া -া I
তা রে তু ই দি স ফু ল

সা সজ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞা -া I জ্ঞমা -পদা -া | -া -পা -মা I
তা ০রে তু ই দি স্ গা০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
P. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

জ্ঞা মা -াজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা I সা -া -া | -া -া -া I } II
ত বে ই ভা ঙ্গি বে ভু ০ ০ ০ ল্ ০

II { র্জ্ঞা র্জ্ঞা দা | দা ণা -া I র্সা -া -া | -া -া -া I
অ মৃ তে রি স ন্ তা ০ ০ ন্ ০ ০

র্সা র্মা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্ঋা র্ঋা I র্সা -া -া | -া -া -া }
এ ক সু রে বাঁ ধা প্রা ০ ০ ০ ণ্ ০

র্ঋা র্সা ণা | ণপ পণা দা I র্সা -া -া | -া -া -া I
ক র য দি প্রে ম দা ০ ০ ০ ন্ ০

জ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা I সা -া -া | -া -া -া II
অ রি হ বে অ নু কু ০ ০ ০ ল্ ০

II { সা -া -দা | ণ্া ণা -সা I সা -া -া | -া -া -া I
পা ন্ থ শা লা য় এ ০ ০ ০ ই ০

সা সা মা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা I সা -া -া | -া -া -া I
দু দি ন্ হা সো ও গা ০ ০ ০ ও ০

সা পা পা | -া পা -া I পণা -দা পা | -া -া -া I
ক্ষ মা সু ন্ দ র্ চ ০ ক্ষে ০ ০ ০

জ্ঞা মা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা I সা -া -া | -া -া -া II
স ব্ ত্রু টি ভু লে যা ০ ০ ০ ও্ ০

II { দা -া মা | -া দা ণা I র্সা -া -া | -া -া -া I
তা র্ প র্ কে কো থা ০ ০ ০ য়্ ০

র্জ্ঞা -া জ্ঞা | র্মা র্জ্ঞা র্ঋা I র্সা -া -া | -া -া -া } I
কো ন দি কে চ লে যা ০ য়্ ০

র্সা র্ঋা র্সা | -া ণা ণপা I ণা দা পা | -া -া -া I
দে খা হ য় কিম্ বা০ গা হি হ য়্ ০ ০

জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা র্ঋা I সা -া -া | -া -া -া II
স ং শ য়ে মন্ আ কু ০ ০ ০ ল ০

(১৩)

দাল

ঝিকিমিকি বিকেল বেলা। খালের একধারে উঁচু পাড়। তার গায়ে লিক্‌লিকে পপলারের চারা, শাদা শাদা সাইকামোরের ডাল গুলো সোজা দাঁড়িয়ে, অন্যধারে অতিকায় চিনার। তীরে তীরে সব হাউসবোট বাঁধা। শিকারটা যাতায়াতে সাতটাকা চেয়েছিল। এক টাকায় রফা হয়েছে।

হাউস বোটের ভেতরের ঘরকন্না দেখতে দেখতে মনে যেন কি একটা বিমন্নতা এলো। দুর্বলতা আমার। বেণু যে লক্ষ্য করেছে টের পেয়েও সে জড়তা দূর করতে পারিনি। পাতলা নদী আর রোগা নদীর মধ্যে তারতম্য অবশ্যই আছে। এ খালটা ততটা রোগা নয়, বেশ পাৎলা। তলার মাটী দেখা যায়, আর দেখা যায় রাশি রাশি উদ্ভিদ্। আমার চোখ দূরের সাইমোরের চূড়ায় লাগা সোনালী রোদের ঈশারায়, বেণুর চোখ বোটের ভেতরের ঘরকন্নায় আর ছোট মেয়েদের ফ্রক আর বোনা কোটের প্যাটার্ণের পানে, আর অসিতের চোখ নিবদ্ধ জলের তলার উদ্ভিদ্‌গুলোর পানে।

হঠাৎ ও বলে উঠলো—"যাঃ কিস্‌সু নেই।"

"কি নেই!" প্রায় একসঙ্গে বেণু আর আমি বলে উঠলাম।

"ইন্‌টারেষ্টিং কোনও একটা স্পিসিস্—এতো সব জলা-ক্ষেত। জলের নীচে তো সুন্দর বন। অথচ ভ্যারাইটি আছে কচু। আচ্ছা, দেখা যাক্, কাশ্মীর তো এখানেই খতম্ নয়।"

"আমারও যেমন জ্বালা। বেড়াতে বেরিয়েছি—একপাশে বোটানী, অন্য ধারে ডোমেষ্টিক সায়েন্স্—আমার পোয়েট্রি থাকবে কি করে?"

পেটেন্ট বেণুর সেই "আ—হা—হা—রে! শোনো অসিত কাল থেকে আমরা আলাদা বেরুবো! এ দিকে মানুষ আর সঙ্গ নেলে একদণ্ড চলেনা, কুঁড়ের জাসু, আবার কথা!"

"বাল ভাষিতং যদি অমৃতং হয়, বালা ভাষিতং একেবারে মৃতং! ঝিলমের জলে মুখধুয়ে নাও, যদি অমৃতত্ব লাভ করে জিহ্বা।"

এক জায়গায় শিকারাটা দাঁড়ালো। অনেক কখানা শিকারা দাঁড়িয়ে। বড় বড় কাঠ বোঝাই নৌকোও দু'খানা। সামনে একটা স্লুইস্ গেট—বলে দাল গেট। পাশাপাশি দুটো গেট আছে অমনি। একটা একেবারেই বন্ধ আছে। অন্যটা কাজ করছে তবে এখন বন্ধ।

একটু পরে বুঝলাম একেবারে বন্ধ নয়। অদ্ভুত ব্যাপার।

দালের বুকে ভাসানো বাগান

আসলে দালের জলের উচ্চতা ঝিলমের উচ্চতার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ দাল হ্রদ জল বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে দোতলায়। একতালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী-ঝিলম। এখন ঝিলমের নৌকা দালে এবং 'ভাইসীভার্সা' চলাচল করে কি করে? বেণুর উত্তর—জলের আবার উচ্চতা কি? গেট খুলে দাও, জল নিজের তলা নিজে খুঁজে নেবে।' তা দেওয়া যেতো। সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ভাসিয়ে নিতো অনেকখানি শ্রীনগর। কাজেই ওদের বাঁধ দিয়ে দাল আর ঝিলমকে আলাদা রাখতে

হয়েছে। এই বাঁধের ওপর পর পর দুটো গেট। দুটো গেট ঝিলমকে ছুঁয়ে, আবার দুটো গেট দালকে ছুঁয়ে। মাঝখানটার ফাঁকা জায়গাটা আর কিছু নয়, বাঁধটার গভীরতা বা বিস্তৃতি। অর্থাৎ বাঁধের এ পিঠে এক লোহার দরজা, ও পিঠে এক লোহার দরজা। দালের জলের ওপর নৌকা ভাসতে ভাসতে এলো দালগেটের কাছে। নৌকা ভাসছে ওপরে। ঝিলমের জল নীচু। গেটটা একটু ফাঁক করা হোলো, সঙ্গে সঙ্গে জল ভরতে লাগলো মাঝের খালি জায়গায়। জল ভরতে ভরতে জল দাঁড়ালো দালের সমান উঁচুতে। ব্যস্ গেট গেল খুলে। এখন হুড়মুড় করে দালের যতো শিকারা, নৌকা, বাজরা, ডুঙ্গা, ঢুকে পড়লো সেই বাঁধের মধ্যেকার খালি জায়গাটাতে, যেটা আছে, জলে ভরে এবং দালের সঙ্গে এক বিস্তৃতিতে সমতল। এখন নৌকোগুলোকে নামতে হবে গিয়ে নীচের তলার ঝিলমে।

কি করে নামা যায়? দাও এইবার ঐ দালের দিকের গেট বন্ধ করে। খুলতে থাকে ধীরে ধীরে ঝিলমের দিকের গেট। জল গিয়ে মিশতে থাকলো ঝিলমে। জলের তল নামছে, নামছে, নামছে। হয়ে গেল ঝিলমের সঙ্গে সমতল। এইবার দাও গেট খুলে। দালের নৌকা গুলো চলে গেল ঝিলমে, ঝিলমের নৌকাগুলো ঢুকে পড়লো বাঁধের মধ্যেকার জলে। এরা যাবে দালে। আমরাও ঢুকে পড়লাম।

এবার জল ফুলতে লাগলো। জল উঠছে উঠছে। দালের জল কেবল পড়ছে এই জায়গায়। উঠ্‌তে উঠ্‌তে দালের জলের সমতল যেই হওয়া, গেট গেল খুলে। আমরা ঢুকলাম দালে, আর দালের নৌকা ঢুকে পড়লো এই বাঁধের মধ্যে—ঝিলমে যাবে।

অনবরত এই চলছে।

"আশ্চর্য্য ব্যাপার তো।"

দাল দেখে খুব ভাল লাগলো। খুবই ভালো। কিন্তু বড় বেশী াজানো। বড় বেশী বিলাস। দালের বুকের সেই নীল জল, গভীর ীল, প্রায় কালো বলা চলে। তুঁতে রঙের ডেরনাগ নয় এ। এ াল। এই জলে একধারে—উত্তর দিকটায় হবে—সারি সারি অতিকায় এবং অত্যন্ত সজ্জিত বোট। খানসামারা উর্দ্দিপরে খিদমৎ করছে দশী বিদেশী মেম-সায়েবদের। উৎকট প্রচার নিয়ে বিলাস চলছে।

দালে সজ্জিত নৌকাবাড়ীতে থাকা শ্রীনগর পর্য্যটকের একটা বশিষ্ট বিলাস। হোটেলে যারা থাকে—তাদের বাধ্য হয়ে থাকতে হয় াই থাকে। শ্রীনগরের এক তৃতীয়াংশ স্থায়ী বাসিন্দা নৌকা-বাড়ীতে াকে। সে তাদের দারিদ্র্যের নিশানা। কিন্তু এই দারিদ্র্যই চরম নোৎকর্ষতার পরিচয় পর্য্যটকের পক্ষে। প্রভেদ শুধু সজ্জায়। যেন ঁড়ে আর অট্টালিকা। নৌকা-বাড়ীতে থাকা একটা ফ্যাশন ও ব্যয়-াপেক্ষ। নৌকা-বাড়ীতেও পাড়া আছে। ঝিলমের বাঁধ একটা নীল াড়া, নীলতর পাড়া দাল।

অথচ এই নৌকা-বাড়ীর প্রচলন গেটোর নির্য্যাতনের ইতিহাস। তাপসিংয়ের আমলে ইংরাজরা শ্রীনগরে বসবাস করবার চেষ্টা করে। ংরেজদের ভদ্রতার অন্তরালে ওদের সত্যকার রূপ তখন ভারতবর্ষ জেনে গেছে। প্রতাপসিং আইন করলেন—কোনও বিদেশী শ্রীনগরে জমী কিনতে পারবেনা। অথচ শ্রীনগর ফুর্ত্তির জায়গা। থাকা যায় কি করে? ইংরেজরা শ্রীনগরে অন্ত্যেবাসীদের অনুকরণে নৌকা-বাড়ী করে থাকতে লাগলো। তবে নৌকা-বাড়ীগুলো সাজিয়ে নিলো নিজেদের মতো করে। তখনকার দিনের ইংরেজ। সেটাই উঁচু মহলে কায়দা হয়ে গেল। কুলীনমণ্ডল তখন নৌকা-বাড়ীতে থাকা সুরু করলো। ইতি শ্রীনগরে নৌকা-বাড়ীর ইতিকথা।—

শুধু এই নৌকোবাড়ীই নয়। এ ছাড়াও চলছে শিকারের পর শিকারা। দাল যেন ক্ষেত, শিকারা যেন তার ফসল। তার মধ্যে দুজন, বড়জোর চারজন করে বসে। কেমন পাশেই এসে দাঁড়ায় অন্য শিকারায়—"বাবু ফুল নেবে? রায় সায়েব, লাইলাক্, প্যান্সী, সুইটপী, জনাব কাশ্মীর গুলাব।" চমকে দেওয়া রংয়ের বাহার নিয়ে সদ্যস্নাত ফুলগুলি তাকিয়ে থাকে। অসাধ্য ওদের চাহনিকে নিরস্ত করা। বেণুর চোখ চক্ চক্ করছে। আট আনায় এক রাশ ফুল নিলাম, লিলি আর প্যান্সী। পেয়ে বেণু কোলের ওপর রাখলো খুব আদরে। যুগলে বেড়াচ্ছে এমন শিকারা অনেক। এরাও রং বোলাচ্ছে দালের আকাশে। এখানে সুর শুধু একটা—অবকাশ, অখণ্ডচ্ছন্দতার ছন্দ, অনভ্যস্ত এলিয়ে পড়ে—ভোগ করা নিজেকে নিজে। মনে যার সাড়া নেই তার পক্ষে দালে বেড়ানো শুধু জল, নৌকো আর খানিকটা ঘোরা।

কিন্তু এর চারধারে পাহাড়, সবুজ। দূরে দূরে শিখরে শিখরে যে গোলাপী আর কাঞ্চনফুলি রং, ফাঁকে ফাঁকে যে বেগুনবেলীর ছোপ ও হোলো অস্ত সূর্য্যের লীলা খেলার বরফের বাহাদুরী। দক্ষিণ ধারে শঙ্করাচার্য্য পর্বত, তখৎ-ই—সুলেমান, দূরে উত্তরে হরিপর্বত, মাঝে মাঝে গভীর বন উপদ্বীপের মতো এগিয়ে আসছে, তার ভেতরে তার বুকে জমাট রহস্য, শতাব্দীর ইতিহাস। আকাশে যেন মেঘ করলো, বাতাস হোলো ভারী, মেঘ এসে হঠাৎ ঢেকে দিল সূর্য্যের মুখ। আর তখন ফুটলো সেই তিমির বিদার জ্যোতির মহিমা। মেঘের কিনারায় কিনারায় জ্বলে উঠলো আগুন। সে আগুনের ছায়া লাগলো দূরে ঐ ঝিলমের বুকে সারা দাল জুড়ে। উইলো, পপ্‌লার, বার্চ, সাইকামোর দুলতে লাগলো, যেন পেয়েছে আজ নগরের আহ্বান। জলে উঠলো ঢেউ। শিকারার বুকে গান উঠলো ছলাৎ ছলাৎ।

সামনে একটা দ্বীপের মতো। হোটেল আছে একটা। এক কাপ চা আট আনা দাম! কেন? কম দামের কিছু চাও? কেন চৌবাজারে যাও। দ্বারিক ঘোষের দোকানে গিয়ে বোসো গে। এ কাশ্মীর, আর এ দ্বীপের নাম নেহরু দ্বীপ! এখানে চায়ের দোকানে বসে চা খাবার 'হৈসিয়ত্' থাকে তো দুটাকা খরচা করো, চারজন চা খাবে।

কিন্তু নামলো বর্ষা তুমুল বেগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। সামান্য একটু ঢাকা যা ছিল তার ভেতর অবধি জলের ছাট্ আসতে লাগলো। ভিজেই যাচ্ছি বলা যায়।

এই হোলো দামোদর কদ [illegible]

মাইল এবং চাওড়ায় ২·৫৮ মাইল, সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ১০ মাইল। দ্বীপ বাদ দিয়ে জলে ঢাকা ক্ষেত্রফল ৭ বর্গমাইল। দামোদরের কথা রাজতরঙ্গিণীতে বলেছে ঐ কুশানদের ইতিহাস প্রসঙ্গে। হুস্ক, জুস্ক আর কনিষ্ক, এই তো তিনজন কীর্ত্তিমান মধ্য এশিয় রাজা যাঁরা ভারতের ঐশ্বর্য্য জয় করতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা বিজিত হয়ে পড়েন।

কাশ্মীরে তাঁদের কীর্ত্তি হিসেবে আছে তিনটী সহরের ধ্বংসাবশেষ। হুস্কপুর, জুস্কপুর আর কনিষ্কপুর।

কনিষ্কপুর বর্ত্তমান কাম্পুর সরায়, শ্রীনগর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে। পীরপঞ্জল গিরিপথে যাবার রাস্তায় পড়ে। নাম কাম্পুর। মণ্টগোমারী এর তথ্য বার করতে না পেরে নাম দিয়েছেন খান্‌পুর। কাম্পুরই ঠিক নাম, 'ঠিক' করে খানপুর করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। বারামুলার কাছে আছে হুস্কর গ্রাম। এটাই হুস্কপুর। আর শ্রীনগরের চার মাইলের মধ্যে আছে জুকুর গ্রাম—প্রাচীন জুস্কপুর। কহ্লন বলেছেন এই জুস্ক সম্বন্ধে—"হৃদে দামোদরীয়ে যৎ তস্যাসীৎ স্বকৃতং পুরং।" মাঝের এই জমীই হোক বা অন্য কোথাও হোক দামোদর হ্রদের মধ্যে তাঁর নিজের জন্য একটী প্রাসাদ ছিল। দামোদর থেকে দাঁওহর, তা থেকে দাহর্, দা-আ-ল্, দাল হ্রদ। বেশ দুটো ভাগ আছে। পূর্ব-দিকটায় মোটর লাঞ্চ ঘুরছে, জলে স্কেটিং চলছে, পয়সা দিলে সকলকে চড়াচ্ছে। পূর্ব-দিক থেকে ওপর দিয়ে উত্তরের দিকে গেলে বড় বড় বন ঢাকা দ্বীপ দেখা যাবে, দেখা যাবে তন্দ্রালু জলা, দেখা যাবে বেতের বন, লতাকুঞ্জ, পদ্মবন, শত শত পদ্ম ফুটে আছে। ডাক দেবে এই সব উপবন "এসো এসো শান্তি পাবে—বোসো—"

> "The lotus blooms below the barren peak;
> The lotus blows by every winding creek;
> Round and rond the spicy downs the yellow
> lotus-dust is blown"

এ সেই দ্বীপ। "Death is the end of life; and why life all labour be?" "এখানে এই প্রশ্ন জাগে। যার সমাধান এই পল্লবিত শাখা বাহুর আহ্বানে, এই মেঘেমেদুর আকাশে, এই কান্ত-কোমল জলস্রোতের সজল নিবেদনে ছড়িয়ে আছে—। কবির ভাষায় সে সমাধান—

> "How sweet it were, hearing the downward
> strewm
> With half shut eyes over to seem
> Falling asleep in a half-dream!
> To dream and dream like you amber light."

এই amber light যে কি অবর্ণনীয় অনুভূতি, তা দালের ওপরে সেই সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আরও এগিয়ে যাওয়া যাক। এবার দালের অন্য কোনে এসে পড়লাম। এখানে ভেলার ওপর মাটী ছড়ানো। তার ওপর শাক, সব্জী, ফুল উৎপন্ন হচ্ছে। জলের ছোঁয়াচে বিট, শিম, কড়াইশুটি, গাজর অঢেল হচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায় পালং ও লেটুশের রং দেখে। কিন্তু এই পরিক্রমা করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগে। একটা পুরোদিন দিলেই ভাল হয়।

সন্ধ্যার সময় চারধারে বিজলী জ্বলে উঠলো। তখৎ-ই সুলেমানের গায়ে সারি সারি বাতি জ্বললো, বুলভার্দের গোল আলোগুলো দালে তাদের প্রতিবিম্ব ফেললো।

শ্রীনগরের বিজলী আলোর ছায়া জলে দেখতে বেশ চমৎকার এবং ওর প্রয়োজনীয়তাও ঐখানেই শেষ।

নৈলে ফিরে 'নৌকায় এসে বাতি জ্বালা সত্ত্বেও মোমবাতি জ্বেলে বসলাম কেন? রাতে আজ খাবার দিলো, কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ। বেশ কড়া এবং বিশ্রী। ধরতে পারলাম না। শকুন্তলা বলে একটী মেয়ে পরিবেশন করছে আর কান্তা। তিন চারটী আরও ছেলে এবং মেয়ে।

"কি কান্তা, আজ একা পারলে না বুঝি?"

"পারবোনা কেন? ব্যবস্থা বদলেছে!"

সর্বনাশ, অভিমান যে! পেছিয়ে এলাম। ও বাক্য আর নয়। কিন্তু শকুন্তলা 'ওস্তাদনী' যে! ওস্তাদ মেয়ে না হয়ে যায় না। বললে, "এঁরা সব নানা 'রঙ্গ' দেখাচ্ছেন ডেকচীর মধ্যে। আমরা নিজেরা পরিবেশন করবো। নিজেদের তদারকে রাঁধাবো। খাচ্ছেন কেমন?"

সেই উৎকট গন্ধ। কিন্তু বল্লাম,—"ভালই। দু এক বেলা সঠিক খবর দিতে পারবো।"

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গেছে। ঝক্‌ঝক্ করছে জ্যোৎস্না। কারা গাইছে বাইরে। একটি মেয়ে, একটি পুরুষ, একসঙ্গে "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে"—অদ্ভুত লাগছে গান। কে গাইছে?

জগজীবন বললো—"কাল আবিষ্কার করতেই হবে।"

বিহারীলালজী বললেন—"নিন্ একটা সিগারেট ধরান।"

ঘরের মধ্যে তখন ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ ভুরভুর করছে। মনের মধ্যে Lala Rookhএ বর্ণিত কাশ্মীর সম্বন্ধে সেই পংক্তিগুলো:—

> When the waterfalls gleam like a quick fall of
> stores
> And the Nightingales gleam from the Isle of
> Chinars
> Is broken by laugh and light echoes of feet;
> From the cool shining walks where the young
> people meet.

(ক্রমশঃ)

শাক্ত পদাবলীতে আগমনী ও বিজয়া

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বাঙলা দেশের গীতিকবিতার ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলী যেন এক প্রেম-বাৎসল্যের রস-তীর্থ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা প্রেমের বিচিত্র লীলারসের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের ব্যক্ত-অনুভূতি এসে এক নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছিল ; রাধাপ্রেমের আবেদনের সঙ্গে কবি-হৃদয়েরও প্রেম-সংগীত এসে মিশেছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে আত্মসম্পর্কিত গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রে সেই আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতিগুলি রসরূপ লাভ করেছে। শাক্ত পদাবলী এই দিক দিয়ে বাঙালীর মাতৃ সাধনার মর্মসংগীত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হ'তেই এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান কবিওয়ালা ও ভাটদিগের মুখে মুখে গীত হ'তো। কিন্তু রামপ্রসাদের আগে সেগুলো বিশেষ একটি রূপ নিয়ে ধরা দেয় নি। একমাত্র রামপ্রসাদই অন্তরের সাধনার সুরকে বাঙ্ময় ক'রে সুডৌল আকারে বাঙালীর কণ্ঠে তুলে দিয়েছিলেন—ত্যাগের ছায়াকে কায়া ক'রে তুলেছিলেন। এইজন্যে রামপ্রসাদকেই শাক্তপদাবলীর যুগ রচনার কবি বলা যেতে পারে। তাঁর ভক্তিবিহ্বল কবি-কল্পনা মাতৃমন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে, বাঙালীর চিরদিনকার গোপন তপস্যার আকৃতিকে যেন মুক্ত ক'রে দিল। সংগীতের রূপ নিয়ে সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাও দিল। বাঙালীর স্নেহাকুল হৃদয় বৃত্তিতে সত্যের শাশ্বতী প্রতিমা কন্যারূপিণী হ'য়ে অভিষিক্ত হলেন। বাঙলার শ্যামল মাটির রসস্নিগ্ধতা দিয়েই এই প্রতিমাটির গঠনকর্ম শেষ করা হয়েছে। রামপ্রসাদ সেই স্নেহধর্মের ব্যাকুলতায় চিরন্তনী মাতৃপ্রতিমাকে গৃহজীবনের হাসিকান্নায় এক ক'রে মিশিয়ে দেওয়ার কবি।

রামপ্রসাদের পরেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত শাক্ত পদাবলীর সংগীত ধারা বিভিন্ন কবির মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। এই কবি কর্মে শব্দের কোন ছটা নেই ; ছন্দের কারিগরি নেই, অলংকারের বাহুল্য নেই—যা' আছে সে শুধু কন্যারূপিণী উমাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য সহজ সরল ব্যাকুলতার প্রকাশধ্বনি !

এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-গানের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। এর মধ্যে সামান্য একটি পৌরাণিক পরিকল্পনার সূত্র আছে, কিন্তু মঙ্গল কাব্যের মতো বিশেষ কাঠামো নেই। গার্হস্থ্য জীবনের ভাব-মহিমায় স্নেহ সম্পর্কের হৃদয়গুলি বাঙলা সাহিত্যের প্রাংগণে শাক্তপদাবলীতে নূতন ক'রে ধরা দিয়েছে। বাঙালীর প্রাণস্নেহ প্রকাশের নূতন ভাষা পেয়েছে শাক্তপদাবলীর কবিদের কাছে। অন্তর স্নেহের সুকোমল এক চিরন্তন ধ্বনিকেই শাক্তপদাবলী অবলম্বন করেছে, এবং এইজন্যই তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়েছে সংগীতের সুর।

বাঙালীর গৃহজীবন স্নেহ-সম্পর্কের মমতা দিয়েই ভরা। মমতার স্নিগ্ধ ছায়ায় অন্তরকে একটু ঠাঁই দিতে না পারলে বাঙালী প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তি খুঁজে পায় না। এখানকার মাতাপিতা বালিকা কন্যাকে গৌরী-দান ক'রে পরের সংসারে পাঠিয়ে দিতেন, ফল্গুধারার মতো অপরিতৃপ্ত বাৎসল্য সারাদিনরাত্রি কেবল অন্তরের গহনে মাথা কুটে মরতো। একটু অবকাশ পেলেই হৃদয়ের বেদনা পাথর-চাপা পথকে ঠেলে দিয়ে বিপুল উচ্ছ্বাসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো। বিরুদ্ধ ব্যথার কথাগুলিকে প্রকাশের অশ্রুতে রূপময় করতে না পারলে কিছুতেই যে স্বস্তি পাওয়া যায় না ! কন্যাবিরহের চিন্তাক্লিষ্ট মুহূর্তগুলি যে নীরব বেদনার মধ্য দিয়ে কেটেছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গানে। গার্হস্থ্য জীবনের শান্ত পরিবেষ্টনীর মাঝখানে থেকেও স্নেহ-কাতরা মাতা প্রাণের সমস্ত আকুলতা নিয়ে বল্‌তেন,—

> গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমাকে পাঠাবো না,
> বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না
> যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,—
> এবার, মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে' মানবো না।
>
> (রামপ্রসাদ)

বাঙালী মায়ের মর্মবেদনা জীবন-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রামপ্রসাদী সুরেই সর্বপ্রথমে ধরা দিয়েছে। রামপ্রসাদ তাই বাঙালীর মর্মলোকের কবি ও এত আপনার।

যখন মেয়েকে মেনকারূপিণী বাঙালী মাতা নিজের কাছে পেয়েছেন, তখন স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় সন্তানের অশুভ দারিদ্র্যের শংকায় সংকিত হ'য়ে এই কথাই প্রশ্ন করেছে,—

> কেমন ক'রে হরের ঘরে ছিলি উমা বল্ মা তাই,—
> চিতাভস্ম মাখি' অঙ্গে, জামাই ফিরে নানা রঙ্গে,
> তুই নাকি মা তারি সঙ্গে, সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই।

মাতৃপ্রাণের আকুলতার সঙ্গে সন্তান-স্নেহের অপূর্ব প্রকাশ এই গীতি-কবিতায় ! স্নেহের আকুলতা দিয়ে কন্যারূপিণী বিশ্বজননীকে ঘিরে রাখার যেমন অপূর্ব প্রচেষ্টা, তেমনি সাধনার আপন-করা ভাবে ভাবনা-গুলি অমৃতময় হ'য়ে উঠেছে।

এই যে দারিদ্র্যের ঘনগন্ধার আশংকা এবং অপরিণতবয়স্কা অশ্রু-কাতরা কন্যার স্বামীগৃহবাস বাঙলার মাতৃহৃদয়কে এমন ক'রে বিচলিত করেছে, তারই ছায়া এসে পড়েছে ভিখারী শিবের কাছে কন্যা উমাকে সম্প্রদান করার মধ্যে। রাজকন্যা উমা, ভিখারী-স্বামীর নিত্য অনটন-

ষ্ট সংসারে এসে একটি মুহূর্তের জন্যও মনে শান্তি পান না—এই বেনায় গিরিরাজ মহিষী মেনকাকে যেমন আকুল ক'রে তুল্তো, মনি বাঙালী-গৃহের অজস্র স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় তাঁদের কন্যার রহে মাথা খুঁড়ে মরেছে। মায়ের প্রাণের যে গভীরতম বেদনা, সেই দনাকেই তাঁর মেয়ের সন্তানকে আটকে রেখে বুঝাতে চেয়েছেন,—

বোঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে,
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন জানবি তখন আপনি ঠেকে।
(গিরিশ ঘোষ)

য়েকে কাছে রাখার জন্যে মায়ের চোখের জলের সীমা নেই। কন্যার বহু প্রতীক্ষার বেদনা আজ মুখর হ'য়ে উঠে' ফাঁকি দিয়েই কন্যাকে জর কাছে রাখতে চায়,—

কালকে ভোলা এলে বল্‌বো—উমা আমার নাইকো ঘরে,
কনক প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেবো কেমন করে।
বলে বলুক যে যা' বলে, মানবো না জামাই বলে—
যায় যাবে সে,—গেলে চলে, যা হয় তখন দেখবো পরে!

পর যখন বোঝেন কিছুতেই আর সেই কন্যাকে ধরে রাখা যাবে না— আকুল হ'য়ে স্নেহ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় শেষ প্রহরের রাত্রিকে ডেকেই ন—

রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোর ছেড়ে যায়!

রজনী প্রভাত হলেই আদরের কন্যা যাবে চলে', আর মাতৃহৃদয় কন্যা-বিদায়ের দুঃসহ বেদনায় এই কথা বলেই কাঁদবে—

'বিজয়া গরল পান, করিয়ে ত্যজিব প্রাণ।'

গানগুলিতে যেন চিরদিনকার মাতৃপ্রাণের বেদনা বহু চোখের মূল্য দিয়ে শরৎকালের 'আগমনী' আর 'বিজয়াকে' জাগিয়ে ছ,—আমাদের প্রাণের পরিবেশকে বেদনাময় ক'রে দিয়েছে। ননীর পূজার আরতি-দীপকে ঘর কন্যার অন্তরঙ্গতা দিয়ে উজ্জ্বল দেওয়ার সুর জুগিয়েছে। শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' একটি পন বাৎসল্য-স্বপ্নের আগ্রহ দিয়ে গড়া—তা'র বিজয়া কন্যারূপিণী ননীর মৌন সান্নিধ্যে বিদায় না-দেওয়ার দুঃখত রাগিণী!

ই 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' শিবেরও একটি ভূমিকা আছে। দরিদ্র ন্যাকে আশানুরূপ সুখে রাখতে পারেন নি বলে' যাদের অন্তরের অভিমান আছে, কিন্তু শিবকে বাদ দিয়ে গান রাখা চলে নি। াচীন যুগ থেকেই শিবের জন্য বাঙলার পুরাণ কাহিনীতে একটি র আসন নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সেই শিবকে বাঙালী কবিরা কৃষক-কল্পনা করতেও দ্বিধা করেন নি। শিব চিরদিন এইভাবে বাঙালীর একান্ত আপন হ'য়েই এসেছেন। শাক্তপদাবলীতেও সেই শিব একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছেন। স্বর্গীয় দ্যুতিময় পরিমণ্ডল হ'তে নেমে গৃহস্থালির হাসি-কান্নায় এসে যেন মিশে গিয়েছেন। কন্যা-রূপিণী গৌরীকে হৃদয়ের স্নেহরসে অভিসিক্ত ক'রে, সেই সঙ্গে শিবকেও নূতন ভাবে এঁকে নিয়েছেন,—হৃদয়-গলানো অশ্রুকে মন ভুলানো শিব রূপের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

শিবের বাসভূমি কৈলাস, সেই বাসভূমি হিসাবে কৈলাসকে স্বীকৃতি দিয়েও শিবকে ঘরজামাই ক'রে রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আগমনী-গানে,—

ঘর জামাতা ক'রে রাখবো কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস।

শিবকে জামাতা ক'রে নিলেও সে যে দেবতা, তা' ভুলবার যেন কোন সুযোগই নেই। রাম বসুর 'আগমনী' গানে দেখতে পাই, মেনকা গিরিরাজকে বলছেন,—

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাস পুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।

শিব যে ধুতুরার ফল ভক্ষণকারী, বাঘছাল-পরিহিত ভিক্ষাজীবী, ঘরের ভাবনাহীন শ্মশানবাসী শূলপাণি, পৌরাণিক সেই দিকটিও আগমনী-সংগীতে বাদ পড়ে নি! মাতৃপ্রাণের স্নেহভরা চেতনার উপর দিয়ে দেবতারূপী জামাতার কথা বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিবের মধ্যে মানবীয় বিরোধেরও সমাবেশ ঘটেছে। শিবের মধ্যেও অনুভবের আবেগ আছে, মমতার আবেশে কোমল হওয়ার অবকাশ আছে। সাধারণ মানুষ যেমন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়, তেমনি শিবের বিচ্ছেদ বেদনার আর্তভাব ফুটেছে এই কয়েকটি ছত্রে—

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচায় ফণী,
ততোধিক শূলপানি ভাবে উমা মারে।
তিলেক না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে।

প্রাত্যহিক পরিচয়ের একটি সুন্দর আভাসের মতো শিব আমাদের হৃদয়ে চিরদিন জেগে আছেন। সেই শিব-চরিত্রের পৌরাণিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করেই শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' অধিকাংশ সংগীত বেজে উঠেছে। কন্যারূপিণী উমার প্রতি যে-স্নেহ-বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস তা' শিবকেও ঘিরে' ধরেছে। বাঙলার চির-আপন আত্মভোলা দেবতাকে বাদ দিয়ে শাক্ত পদাবলী নিজের সত্তাকে প্রচার করে নি। 'আগমনী' ও 'বিজয়া' তাই আমাদের অন্তরে স্নেহসুর নিয়ে হরগৌরীর গান গেয়ে জীবনের সাধনার সঙ্গে মিশে আছে।

ঈশ্বরগুপ্ত জয়ন্তী উৎসব—

গত ১৮ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা বেলগাছিয়া রাজবাটীতে ঈশ্বরগুপ্ত জয়ন্তী উৎসব কমিটী অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্র-নাথ চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। কমিটীর সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস নাগ তাঁহার ভাষণে কমিটীর পক্ষ হইতে কুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ ও কমিটীর সম্পাদক শ্রীসঞ্জীব-কুমার বসু কর্তৃক ঈশ্বর গুপ্তের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টার প্রশংসা করেন। শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখকগণকে পুরস্কার দান করেন। নানা ভাবে কবির স্মৃতি রক্ষা করা হইবে—তাঁহার রচিত গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা কমিটীর সভ্যগণকে অধিকতর উৎসাহের সহিত কবির কথা প্রচারে অবহিত হইতে অনু-রোধ করি।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ—

৫ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের পুরাবস্তু ও প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের নামে তাহার নাম হইবে—'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।' এই চেষ্টা সর্বজন প্রশংসনীয়। যাহাতে জনগণের ও সরকারের সাহায্য লাভ করিয়া সত্বর ঐ সংগ্রহশালা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে জন্য শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীকালিদাস নাগ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সরকার ও জনগণের সাহায্যের অভাব হইবে না। কলিকাতার বাহিরে প্রতি জেলায় এইরূপ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

গুণী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২০শে আগষ্ট মঙ্গলবার কলিকাতা ইডেন গার্ডে-নের প্রদর্শনীতে প্রদেশ কংগ্রেসকমিটীর গুণী সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে খ্যাতনামা শিল্পী অতুল বসুকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়—গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীচিন্তামণি কর সভায় পৌরোহিত্য করেন, অতুলবাবু সম্বর্দ্ধনার উত্তরে চারুকলার উন্নতির জন্য সমাজ-সেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন।

১৯শে আগষ্ট সোমবার প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন রায়কে ইডেন উদ্যানে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ঐ সভায় প্রবীণ ক্রীড়াবিদ শ্রীউমাপতি কুমার সভাপতিত্ব করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শৈলজাবাবু বলেন—দেশে খেলোয়াড়ের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কারণ খেলোয়াড় হইতেই দেশরক্ষক সৃষ্ট হয়। তিনি সরকারকে খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণের ভার লইতে অনুরোধ করেন।

১৮ই আগষ্ট কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। কালিদাসবাবু উত্তরে নিজের সারাজীবনব্যাপী সাধনার কথা উল্লেখ করেন ও বলেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেশের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার বিকালে বরাহনগর টবিন রোডে দত্ত-ভিলায় জেলার ৯ জন গুণীকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে—উৎসব সভায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়—(১) পণ্ডিত প্রবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, ভাটপাড়া (২) সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য, হরিনাভী (৩) ইঞ্জি-নিয়ার ডাঃ বি-এন-দে, মজিলপুর (৪) প্রবীণ রাজনীতিক কর্মী শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী, কোদালিয়া (৫) খেলাধুলার সংগঠক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শিকদার, খড়দহ (৬) অভিনেতা

শ্রীজহরলাল গাঙ্গুলী, শ্বেতপুর (৭) শ্রেষ্ঠ দেহী শ্রীকমল ভাণ্ডারী রাজপুর (৮) প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা (৯) সেবাব্রতী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, আরিয়াদহ। ১৬ই আগষ্ট বিকালে মসলন্দপুরের নিকট দক্ষিণচাতরা গ্রামে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় ঐ অঞ্চলের তিন জন গুণী ব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে—(১) প্রবীণ দেশকর্মী শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র (২) বিপ্লবী ও সমাজ-সেবক শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেন (৩) বিপ্লবী শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চাতরা চণ্ডীপুর কংগ্রেসের উদ্যোগে ও খ্যাতনামা কর্মী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়ের চেষ্টায় এই সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে অজ্ঞাত ও অনাদৃত গুণীদের এই ভাবে আদর করার চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে—

১৭ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভায় খ্যাতনামা অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উৎসবে খ্যাতনামা সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সভাপতিত্ব করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বর্তমান বয়স ৬৩ বৎসর, তিনি ১৮ বৎসর বয়সে সঙ্গীত সাধনা আরম্ভ করেন, তিনি সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলেন—দেশবাসী কর্তৃক এই সম্বর্দ্ধনার ফলে তাঁহার ৪৫ বৎসরের সাধনা সার্থক হইয়াছে।

স্বাধীনতা উৎসবে ছাত্রছাত্রী সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত এক উৎসবে ৮ জন ছাত্রী সহ মোট ৭৪ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন পুরস্কার প্রদান করেন! স্কুল ফাইনালের প্রথম ১০ জন, আই-এ'র প্রথম ১০ জন, আই-এস্‌সির প্রথম ১০ জন, বি-এ অনার্সে ১৫ জন, বি-এস্‌সি অনার্সে ১৩ জন, বি-ই'তে শিবপুরের ৮ জন ও যাদবপুরের ৭ জন, এম-বি-বি-এস' এর ২ জন পুরস্কার লাভ করেন। প্রত্যেকে শেফার্স কলম, রৌপ্যপদক, ২৫ টাকার বই ও চন্দন কাষ্ঠে খোদিত শুভেচ্ছা বাণী পাইয়াছেন। ডাক্তার সেন ছাত্রদের বলেন—আজ যুব সমাজের উপর এক বিরাট দায়িত্ব আসিয়াছে। দেশ হইতে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, দুর্নীতি, দুঃখ, দারিদ্র্য দূর করিবার ভার তাহাদিগকেই লইতে হইবে। বর্তমান শুভেচ্ছা যেন সেই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে ছাত্র সমাজকে সচেতন করিয়া তোলে। এ বৎসরের এই ব্যবস্থা দ্বারা কংগ্রেসকর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে অভিনন্দিত করি।

বাংলার প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্মিরা ২৪পরগণা জেলার বেড়াচাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতু গড়ে খনন করিয়া গত মার্চ মাসে যে বুদ্ধমূর্তি পাইয়াছেন, তাহা বাংলার প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তি বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে পাথরের বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়, তাহারই মত এই মূর্তি—এটি খাস বেলে পাথরে নির্মিত—ভগ্ন অংশটি সাড়ে ৪ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে ৩ ইঞ্চি চওড়া। স্থানটি খনা-মিহিরের ঢিপি বলিয়া পরিচিত। ইহা কলিকাতার অতি নিকটে। বাংলার এই প্রাচীন স্থানটি দেখিবার জন্য আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই অনুরোধ করি। সারনাথ, বুদ্ধগয়া বা নালন্দা-রাজগীরের মত এই স্থানটি হয়ত বৌদ্ধ যুগের বহু স্মৃতি বহন করিয়া আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত একটি যক্ষিণীমূর্তিও তথায় পাওয়া গিয়াছে।

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—

'ভারতবর্ষ' প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা স্বর্গত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য্য) গত ৭ই ভাদ্র শনিবার রাত্রি ৩টার সময় (রবিবার ভোর) তাঁহার কলিকাতা দমদমা-নাগেরবাজারস্থ নিজ বাটীতে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি স্নেহভাজন ছিলেন এবং হরিদাসবাবুর আগ্রহে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। হরিদাসবাবুর চেষ্টায় পাঁচুগোপালের সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুকালে তিনি যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে—তন্মধ্যে 'রাত্রি',

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না, কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন

'সাধারণ মেয়ে' 'গরবিনী' প্রভৃতি জনপ্রিয় হইয়াছিল। পাঁচুগোপালের লিখিত কথা-সাহিত্য—মদনভস্মের পর, তন্ত্বতীর্থ, লামাদের দেশে, মন নিয়ে খেলা, ভোরের আলো প্রভৃতিও পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছে। তাহার বিধবা পত্নী, ৫ পুত্র ও এককন্যা বর্তমান।

অভিনেতা সম্বর্দ্ধনা—

স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কর্ত্তৃক গুণী সম্বর্দ্ধনার শেষ দিন গত ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পের সার্থক অভিনেতা শ্রীনরেশ-চন্দ্র মিত্রকে অভিনন্দিত করা হয়। পৌরোহিত্য করেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ নরেশবাবু ও বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করেন। নরেশবাবুকে গরদের ধুতি-চাদর প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

মুর্শিদাবাদে সোনার হাতী –

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সরকারী পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগের কর্মীরা মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের নিকট নবগ্রাম থানার মাধুলিয়া মৌজায় গোঁসাই পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের সময় একটি সোনার হাতী পাইয়াছেন। হাতীটির ওজন ৫।৬ সের—উহার মূল্যও ৫০ হাজার টাকার কম নহে। হাতীটি যাহাতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যাদুকর পি-সি সরকার—

খ্যাতনামা যাদুকর শ্রীপি-সি সরকার আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া ২৪শে জুলাই পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ সহরে গমন করিয়াছেন ও তথায় যাদুবিদ্যার খেলা দেখাইতেছেন। সেখানে তাঁহাকে কয়েকমাস থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে যাদুকর শ্রীপি-সি সরকার বিশ্বের প্রথম যাদুকর বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তাঁহাকে পৌর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। সেজন্য এক হাজার টাকা ব্যয়ও বরাদ্দ হইয়াছে। আমরা আশা করি, যাদুকর সরকার ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত সম্মানলাভ করিয়া বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

মণিলাল জন্মোৎসব—

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্যামবাজার মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ভবনে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের ৭২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে এক উৎসবে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী উৎসবের উদ্বোধন করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মৌমাছি শ্রীবিমল ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উত্তরা সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মতিলাল দাস, গ্রামের কথার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীহিরন্ময়ী বসু, কবি শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন বসু ও শ্রীপান্নালাল মাইতি প্রভৃতির ভাষণের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথি মণিলালবাবুর সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস বিবৃত করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের সুমধুর সঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বহু প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তি ঐ উপলক্ষে মণিলালবাবুকে [illegible] উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রূপভারতী সম্পাদক শ্রীসত্যদাস দত্তের যত্ন ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উৎসবে সংস্কৃত ভাষায় পিতা-পুত্রী সংবাদ সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব পালিত-অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র গত ১২ই জুলাই শুক্রবার প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণের পর তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী ছিলেন।

ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত ডাঃ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি স্বর্গত অধ্যাপক পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর পুত্র এবং স্বর্গত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর ভ্রাতা। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করার পর হইতে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বলতর জীবন কামনা করি।

শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী—

খ্যাতনামা লীলাকীর্তন গায়িকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী কীর্তন-কলা-ভারতী সম্প্রতি বারাকপুর (২৪পরগণা) শ্রীগুরু আশ্রমে লীলাকীর্তন গান করিয়া ৫ হাজার শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী চৌধুরীর সুরময় ভাষণ ৪ ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার এইভাবে নাম প্রচার কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত হউক—ইহা সকলেই কামনা করেন।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

হুগলী, উত্তরপাড়া রাজবংশের শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২৬শে জুলাই বিমানযোগে মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভারত স্কাউটের একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া যুব-উৎসবে যোগদান করিবেন। তিনি উত্তরপাড়া-রিষড়া মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সহ-সম্পাদক। ঐ উপলক্ষে তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশও দর্শন করিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

বেরিলির খয়ের কারখানার রাসায়নিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সান্যালের কন্যা কুমারী দীপালি সান্যাল এ বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করিয়াছেন। তিনি নৈনিতাল কনভেণ্ট হইতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ, বিশ্বভারতী হইতে আই-এ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী মহিলার এই সম্মানে বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িবে।

ভাগলপুরে সুবর্ণ জয়ন্তী—

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ৪ঠা আগষ্ট হইতে তথায় ৩ দিন ধরিয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ উৎসবে যোগদান করেন। উপেন্দ্রবাবু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাকে উৎসব উপলক্ষে মানপত্র দান করা হয়। বনফুল রচিত 'কবয়ঃ' নাট্যানুষ্ঠানে বনফুল স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীপঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত সহযোগে বাংলা গানের ধারা বিশ্লেষণ করেন। রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৯টি বিষয়ে মোট ৯১জন যোগদান করেন এবং বনফুল-পত্নী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী তাহাদের পুরস্কার বিতরণ করেন। ভাগলপুরে 'বনফুল' বাস করায় তথায় বাংলা সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র জমিয়া উঠিয়াছে এবং প্রায়ই তথায় বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিক এইভাবে সমবেত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

ডাক্তারদের বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩০ হাজার শিক্ষিত চিকিৎসক আছেন। তাহার মধ্যে ২ হাজার ডাক্তার বেকার হইয়া আছে। একজন যুবককে ডাক্তারী পাশ করার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর যদি তাহাকেও সাধারণ মানুষের মত বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিছু দিন পূর্বে মালয় গভর্ণমেণ্ট এক দল ডাক্তারকে মালয়ে লইয়া গিয়াছে। গত মাসে দিল্লীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্মিলনে সকল রাষ্ট্রকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের বেকার ডাক্তারগণকে যেন তাঁহারা কাজ দিয়া সাহায্য করেন। কেরল সরকার কিছু বাঙ্গালী ডাক্তারকে তাঁহাদের রাজ্যে কাজ দিতে চাহিয়াছেন। প্রতি বৎসর কলিকাতায় ৪টি মেডিকেল কলেজ হইতে প্রায় ৬ শত ডাক্তার পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীমতী বসন্তমঞ্জরী দেবীও উড়িষ্যায় ৪১ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা ডাক্তারকে লইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় বেকার ডাক্তারদিগের কাজের ব্যবস্থায় মনোযোগী হউন—ইহাই আমরা কামনাকরি।

কলিকাতায় ১৩৫০ গৃহনির্মাণ—

কলিকাতা সহর হইতে বস্তী ভাঙ্গিয়া দিয়া ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ১৩৫০টি নূতন গৃহ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভারত সরকার যাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। মোট টাকা অর্দ্ধেক ভারত সরকার ঋণ হিসাবে দিবেন, বাকী শতকরা ২৫ টাকা ভারত সরকার ও ২৫ টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করিবেন। ইহা ছাড়া ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার গৃহ

নির্মাণের আর একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই সকল নূতন গৃহ নির্মিত হইলে গৃহ-সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে বলিয়া আশাকরা যায়।

বালেশ্বরে যতীন মুখার্জি রোড—

উড়িষ্যায় বালেশ্বর সহর হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে অমাখণ্ড নামক স্থানে বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জি ওরফে বাঘা যতীন বৃটীশ সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিতে গত স্বাধীনতা উৎসবের সময় বালেশ্বরের প্রধান রাস্তাটির নাম যতীন মুখার্জি রোড রাখা হইয়াছে। উড়িষ্যার গ্রাম কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান ঐ নামকরণ করেন। বাঘা যতীনের মত সাহসী বিপ্লবী যোদ্ধার কথা ভারতবাসীর সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহার নামে পথের নামকরণ করিয়া বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সুতা প্রস্তুত—

তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে অন্য রাজ্য হইতে প্রচুর পরিমাণ সুতা আমদানী করিতে হয়; সে জন্য পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত কলগুলিতে নূতন টাকু চালাইয়া সুতা প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—গয়েসপুর—২৫ হাজার টাকু। কোন্নগর—১১৩০০। আসানসোল সূর্য্য-নগর—২৫ হাজার। দাশনগর আরতি—১২ হাজার। রিষড়া লক্ষ্মীনারায়ণ—১৮ হাজার। ফুলিয়া—১২ হাজার। কাসিম-বাজার রাজা মনীন্দ্র মিল—৮ হাজার। বঙ্গলক্ষ্মী—৮ হাজার। বারুইপুর—১২৫০০। ওরিয়েন্টাল কটন—১২ হাজার। তাহা ছাড়া কল্যাণীতে ৫০ হাজার টাকু চালাইবার জন্য একটি সরকারী মিল খোলা হইবে। ইহার ফলে বহু বেকার এই সব মিলে কাজ পাইবে ও প্রচুর সুতা পাইয়া বহু বেকার তাঁতি কাপড় বুনিতে পারিবে।

সর্বোদয়ের জন্য পদযাত্রা—

ভূদান-নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গত ১৯শে আগষ্ট একদল কর্মী সঙ্গে লইয়া গয়া জেলায় এক সপ্তাহ কাল পদ যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। তিনি ভূদান, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, বিদ্যাদান ও বুদ্ধিদানের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া বেড়াইবেন। মহাত্মা গান্ধী যে সর্বোদয়ের আদর্শ প্রচার করিতেন, তাহা সাফল্য মণ্ডিত করায় জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাবের আদর্শে সর্বত্র এইরূপ পদযাত্রা সুরু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয়ও ঐ ভাবে পদ যাত্রা করিতেছেন।

অরফানগঞ্জ বাজার—

কলিকাতা বেলভেডিয়ারের নিকস্থ অরফানগঞ্জ বাজারটি ভারত সরকারের ছিল। সম্প্রতি উহা ২৫ লক্ষ টাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনিয়া লইবেন স্থির হইয়াছে। ঐ অঞ্চলটি আবর্জনায় পূর্ণ। নূতন ব্যবস্থায় ঐ সকল আবর্জনা দূরীভূত হইলে ঐ অঞ্চলের লোক উপকৃত হইবে!

ভূদান ও সর্বোদয়—

পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। মহামতি শ্রীবিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে ভারতের প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাইয়া সারা ভারতবর্ষে পদ-ব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভাণ্ডারী মহাশয়ও সারা পশ্চিমবঙ্গে পাদ-পরিক্রমা করিয়া ভূদানের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। কলিকাতা-১২, সি ৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে তাহাদের কার্য্যালয়। তাঁহারা এ বিষয়ে বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। (১) সাধনা, বিনোবা—নয় আনা (২) সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—বিনোবা—তিন আনা (৩) ক্রান্তির পথে—দাদা ধর্মাধিকারী—চার আনা (৪) ভূদান যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ—বীরেন্দ্রনাথ গুহ—চার আনা—পুস্তকগুলি তাহাদের অন্যতম। পৃষ্ঠার তুলনায় বই গুলির মূল্য সুলভ। একজন ভারত-বাসী মনে করে—নৈতিক শক্তির দ্বারা ত্যাগ ও সাধনার পথে ভারতকে দারিদ্র্য প্রভৃতি হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইবে। বিনোবাজী সেই পথের শ্রেষ্ঠ কর্মী। বিচার বুদ্ধি দ্বারা আমরা দেশবাসীকে এই পথ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

সাহিত্যিকের নূতন প্রচেষ্টা—

শ্রীঅমূল্যকুমার চক্রবর্ত্তী কলিকাতা—৬, ৪২ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে গল্পের মিছিল নাম দিয়া ছোট গল্পের এক সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় সব গল্পগুলিই তরুণ লেখকের লেখা। তাঁহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া সমবায় প্রথায় বইখানি ছাপার খরচ দিয়াছেন—বইখানির দাম অপেক্ষাকৃত সুলভ—মাত্র ২ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা। গত

২রা ভাদ্র সোমবার শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সংহতি কার্য্যালয়ে এক সভায় বইখানি লেখকগণের মধ্যে প্রথম বিতরণ করা হইয়াছে। গল্পের বইএর চাহিদা কম বলিয়া প্রকাশকগণ সাধারণতঃ অখ্যাতনামা লেখকদের গল্পের বই প্রকাশ করেন না। এইভাবে কয়েকজন করিয়া মিলিয়া সমবায় প্রথায় বই প্রকাশ করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। লেখকগণ ছাপা বই-এ গল্প দেখিয়া উৎসাহিত হইবেন এবং গল্প পুস্তকের সংখ্যাও বাড়িবে।

কলিকাতার উত্তর লবণ হ্রদ—

কলিকাতা ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেষ্টায় কলিকাতার উত্তরস্থ লবণাক্ত জলার ৩'৭৪ বর্গ মাইল বা ২৩১৮ একর জমী উদ্ধার করিয়া তথায় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হইবে। তথায় কল্যাণীর মত এক সহর হইবে এবং প্রতি কাঠা জমীর দাম হইবে ১৭৫০ টাকা। সত্বর এ ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে কলিকাতার গৃহ-সমস্যা দূর হইতে পারিবে।

নূতন ১৩ তলা বাড়ী—

রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান (কালচার ইনিষ্টিটিউট) বালীগঞ্জ গরিয়াহাটা অঞ্চলে ৭ বিঘা জমীর উপর এক নূতন ১৩ তলা বাড়ী নির্মাণ করিতেছেন। স্থানটি লেকের ধারে গোলপার্কের কাছে। গৃহ নির্মাণে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ও আগামী বৎসরে ১১১ রসা রোড হইতে প্রতিষ্ঠান নূতন গৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। তথায় এক হলে এক হাজার লোক বসিতে পারিবে। মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী, লাইব্রেরী প্রভৃতিও থাকিবে। দক্ষিণ কলিকাতায় এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা প্রয়োজন—জনসংখ্যার তুলনায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

বস্ত্র শিল্প শ্রমিকদের বেতন—

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত ২৫ জন শ্রমিক কারখানায় কাজ করে—তন্মধ্যে ৩৭ হাজার ৭ শত ৭০ জন কাপড়ের কলে কাজ করে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এক তদন্ত করিয়া জানিয়াছেন, কাপড়ের কলের ২৫ হাজার ৭ শত ২৬ জন শ্রমিকের মধ্যে ১২ হাজার ৮ শতজন দৈনিক এক টাকারও কম পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫টি কাপড়ের কল আছে, তাহাদের সকলকে প্রশ্ন প্রেরিত হয়—মাত্র ২৪টি কলের কর্তৃপক্ষ উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরের অবস্থা জানাইতে বলা হইয়াছিল। কেরানী, ম্যানেজার, সুপারভাইজার প্রভৃতির সম্বন্ধে তদন্ত করা হয় নাই। শ্রমিকরা দৈনিক ২৫ নয়া পয়সা হইতে ৫ টাকা ৬৯ নয়া পয়সা পরিশ্রমিক পাইয়া থাকে। শতকরা প্রায় ৪৫ জন দৈনিক এক টাকার কম উপার্জন করে। গড়ে প্রতি শ্রমিকের মাসিক আয় ৩১ ২ নয়া পয়সা। কাপড়ের কলে মোট ১৯৫৪ মহিলা কর্মী গড়ে তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক বেতন দেড় টাকা। ঝাড়ুদার ও কুলীরা প্রত্যেকে গড়ে মাত্র দৈনিক ৭৩ নয়া পয়সা বেতন পায়। অবস্থা সত্যই শোচনীয়, এ বিষয়ে নূতন করিয়া তদন্ত করিয়া অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—

গত ১৪ই আগষ্ট কটকে এক জনসভায় নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু ঘোষণা করেন যে—সুভাষচন্দ্র ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতেছেন—তাহা শেষ হইতে মাত্র ৩ মাস বাকী আছে। তিনি জীবিত আছেন, ২।৩ মাস পরে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করায় তিনি অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ—তিনি তাঁহার দল সহ তিব্বতে বাস করিতেছিলেন—এখন নেপালে আসিয়াছেন। সিকিমের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন। ইহা কি সত্যে পরিণত হইবে?

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান—

কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহন ও পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীলালবিহারী শাস্ত্রী গত ২৩শে আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—কলিকাতা ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম বন্দর এবং তাহা বৃহত্তমই থাকিবে। কাজেই যদি এখনই ঐ বন্দরের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতার আর মান থাকিবে না। বহু দিন হইতে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধান সম্পর্কে নানা কথা শুনা যাইতেছে। এখন মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রীআর-কে মিত্রের চেষ্টায় ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে কলিকাতা সহর ধ্বংসের পথ হইতে

রক্ষা পাইবে। কলিকাতা সহর ও বন্দরের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দুর্দশা আরও বহু গুণ বাড়িয়া যাইবে। এ বিষয়ে শ্রী শাস্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রই আশান্বিত হইবেন।

স্বাধীনতা উৎসবে বন্দী মুক্তি—

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

—মশাই, আপনি তো ওদিক থেকে আসছেন⋯ওপথে পুলিশ-টুলিশ দেখেছেন ?

—কৈ না—কাকেও তো দেখিনি !

—বেশ, তাহলে দিন্ তো আপনার ঐ সোনার বোতাম, ঘড়ি আর মণি-ব্যাগটি !⋯

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুপাশে নিস্তব্ধ নদী তীর, আকাশে ফুটে উঠেছে দু'-একটা তারার রোশনী। দাঁড় ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ, নৌকা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। দূরে কোথায় জ্বলছে অন্ধকার ভেদ করে আগুনের শিখা ; দূর থেকে লোকজনের কোলাহল শোনা যায়। লোকটিই বলে, কার খড়গাদায় আগুন লেগেছে বাবু, আক্রোশ ছিল—ফাঁক পেয়ে দিয়েছে দেশলাই ঠুকে।

—'ধান যে সব পুড়ে খই হয়ে যাবে !

—"তার জন্যই :তো।' চুপ করে থেকে বলে ওঠে সে—"দেশ বড় খারাপ বাবু, লোকের ঘর বাঁধা এখানে বিপদ, নদী—লোনা জল তো শত্রু বটেই—তার উপর আছে মানুষ। সুখের ঘরে আগুন না দিলে তাদের সোয়াস্তি নাই। এর চেয়ে বন ভালো, ঢের ভালো। বেশ ছিলাম বনের ডিউটিতে, এখানে বদলি হয়ে এসেছি। মোটেই ভালো লাগেনা—বনেই থাকি বেশ।"

লোকটার দিকে চেয়ে থাকি বিস্মিত দৃষ্টিতে, পঞ্চবটী বন হলে এ কথা চলতো বেশ। কিন্তু এযে সুন্দরবন। সৌন্দর্য্য এর কোথায় আছে জানিনা। জল আর জল, মাটিতে নুন, সারা বনে এমন কোনও গাছ নাই যার ফল মানুষ মুখে দিতে পারে। জলে কুমীর-কামট, ডাঙ্গায় বাঘ সাপ।

—'কে কে আছে ?"

মুখ তুলে চাইল লোকটি—'আমার !'

এক মিনট চুপ করে কি ভাবলো, তারপর জবাব দেয়—'কেউই নাই, আমি একা। একাই থাকি। নিন-বিড়ি খান।'

এগিয়ে দিলো একটা বিড়ি। দেশলাই জ্বেলে সেই ধরিয়ে দেয়। খাটা চাপা দেবার জন্যই যেন বলে ওঠে—'শুনছিলাম আজ অপিসে যাননি—বনে যাচ্ছেন বেড়াতে, আপনি বই টই লেখেন বলছিলেন বাবুরা। যান্—ভালো লাগবে। বনের একটা জীবন আছে বাবু, সেখানের গাছপালা—গাং-পাখী—জানোয়ার সব কিছুর মধ্যে যে সেই 'জান্'টির সন্ধান পেয়ে যায় 'বন তার কাছে সুন্দর হয়ে ওঠে। তবে বান জলে ভাসলে মরণের ভয় আছে সত্যি—তবু সুন্দর তার মধ্যে কিছু নাই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বার বছর বনে বনে ঘুরছি—সব দুঃখ ভুলে গেছি ওর বুকে।"

চুপ করল লোকটি। বিড়ির অল্প আগুনে ওর মুখখানার দিকে চেয়ে থাকি। রাত্রির অতল অন্ধকারের বুকে তারার চাহনির মত জেগে আছে ওর দুটো চোখ, কি এক অন্তবিহীন রহস্য ওর মুখখানাকে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভোলা মাঝি দাঁড়ি দুটোকে তাগাদা দেয়—'ঝিঁমেয় টান। এসে গেছি।'

বাঁকের মাথায় আমাদের বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছে। খালের উপর কয়েকখানা বড় নৌকার মাঝিরা রান্না করছে, কে বাজাচ্ছে বাঁশী। সুরটার কোন মুন্সীয়ানা নাই—একেবারে বেসুরো, তবু নির্জন নদীর বুকে কেমন এক উদাস করে তোলে সারা মন। সহুরে মন মাঝে মাঝে উঁকি মারে—বিজলীবাতির ঝলক নিয়ে, মনে হয় এতক্ষণ বোধহয় অমিয়র বইএর দোকানে জমাটি আড্ডা সুরু হয়েছে ; নির্মল-বাবু অমনি বেসুরো গান সুরু করছে—"মুখ পানে চেয়ে থাকি।"

শান্তিরঞ্জন হয়তো বিলেতী কগ্‌নির গল্প ফেঁদেছে। অশোকদা হাসছেন সজোরে।

…চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কানে আসে ওই বাঁশীর সুর, একফালি লালচে আলো নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে কাঁপছে জলের বুকে—সুরের মতই। সত্যজগত থেকে পরিত্যক্ত আমি আজ একা।

যে ডাক শুনেছে ওই বুড়ো বোটম্যান, যে ডাক অহরহঃ বনের অন্ত প্রত্যন্তে ধ্বনিত হয়, সেই হারানো সুরই আমাকে ঘরছাড়া—বন্ধুহারা করে এনেছে এই অজানার বুকে ; আমার মনের অতলেও শুনেছি সেই ডাক—চুপে চুপে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বনভুমির শ্যামলরূপ আমাকে হাতছানি দিয়েছে। আমিও তা জানিনা, আমার অন্তরসত্বা শুনেছে সেই আহ্বান—আমার অগোচরে। তাইতো ছুটে এসেছি তোমার অসীমরূপের স্বর্ণাতলায়, তারার আলো যেখানে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে—নদীর জল যেখানে গান গেয়ে যায়, আমিও সেই রূপ-সাগরের যাত্রী, মন প্রাণ দিয়ে সেই অসীমকে যদি ক্ষণিকের জন্যও অনুভব করতে পারি—যাত্রা হবে আমার সার্থক। তাই যেন হয়।

…ঘাটে নৌকা থামতে লোকটি পুঁটুলি হাতে নীরবে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একবার ভব্যতা করে বিদায় নেবার কথাও জানাল না, ধন্যবাদ তো দূরের কথা। বনে থেকে থেকে বুনোই হয়ে উঠেছে।

মাঝিরা জিনিষপত্র তুলছে ঘরে।

বড়দা ঘড়ি দেখে বলে ওঠেন মাঝিদিকে—'কি ব্যাপার, কি গোণে আসতেও এত দেরী হ'ল ?"

ভোলামাঝি মুখিয়ে ছিল, জবাব দেয়—'ওই শরিফ আর—থামিয়ে দিলাম আমি—"জিনিষপত্র কিনতেই দেরী হয়ে গেল, আসতে মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে। বেশী কোথা।"

—"চা খেয়ে তৈরী হয়ে নাও, অপিসে যেতে হবে।" বড়দা ওয়ার্নিং দেন। বার হবার সময় দেখি নিতাই হ্যারিকেন জ্বেলে

কাঠ চ্যালা করছে। ওই কাঠ দিয়ে উনুন জ্বলবে—তারপর নিতাই রাঁধবে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে কোথায় দাঁড়াবে তখন কে জানে।

বনবিভাগের কাযের একটু রীতিনীতি সম্বন্ধে জানানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গের বনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে নর্থ—সেণ্ট্রাল এবং সাউথ। নর্থ বলতে ডুয়ার্স—বক্সা অঞ্চল, সাউথ বলতে বিশেষ করে সুন্দরবন, সেণ্ট্রাল বাকী বাঁকুড়া বীরভূম মেদিনীপুর ইত্যাদি। এই অঞ্চলটাতে শাল গাছই বেশী, এবং অনেক জায়গায় নতুন করে বন তৈরী করা হচ্ছে। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু বনসম্পদ বাড়াবার জন্য।

সুন্দরবন অঞ্চলে কনজারভেটারের অধীনে ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার, সাবডিভিসনাল অফিসার, রেঞ্জ অফিসার—তার নীচে ফরেষ্টার ইত্যাদি পদ। রেঞ্জ অফিসার পর্যন্ত 'লঞ্চ', তারপরের লোকদের জন্য স্পিডডিঙ্গি, নাহয় তো নৌকা। এছাড়া পেট্রল বা বন্দুকধারী পাহারাদার ও আছে। মোটর ডিঙ্গি নিয়ে তারা বনের জলপথে ঘুরে বেড়ায়—(অবশ্য আইন তাই বলে) চোরা কাটাই বন্ধ করবার জন্য বন পাহারা দেয়।

সুন্দরবন অঞ্চলে দুটো রেঞ্জ 'নামখানা', এবং 'রামপুরা' এবং অধীনে আবার ছোট ছোট ফরেষ্ট অফিস আছে—একটু ভিতরের দিকে। যেমন বাগনা, দত্তর, সজনেখালি—শকুনখালি ইত্যাদি। বন থেকে বের হবার মুখেই কোন নদীর ধারে এই অফিসগুলো।

বনের যে কোন অঞ্চলে খুসি গাছ কাটা চলবে না। বনকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা আছে। রাফ ওয়েদার ক্যুপ, ফেয়ার ওয়েদার ক্যুপ। 'রাফ ওয়েদার' অর্থাৎ চৈত্র থেকে ৫।৬ মাস গাংএর বুকে ঝড় তুফান ওঠে, বর্ষাকালে নদী প্রলয়রূপ ধরে, এই সময় বেশী দূরে বা বড় বড় নদীতে নৌকা যাওয়া অসম্ভব, বিশেষ করে বোঝাই নৌকা, তাই এই ক'মাস একটু কাছাকাছি অঞ্চলে বন কাটাই হয়। শীতকালে গাংএর অবস্থা শান্ত থাকে—তখন দূর বনে কাটাই চলে। এক একটা অঞ্চল কুড়ি বৎসর পর কাটাই হয়, এই ক' বৎসরে নোতুন গাছ গজাতে পায়—বাড়তে পায় ছোট গাছগুলো।

'ক্যুপে' নৌকা পৌঁছানোর আগে প্রতিটি নৌকার জন্য মণ দরুণে 'পাস' করাতে হয় এই ফরেষ্ট অফিস থেকে। সুন্দর বনে কাঠ বলতে গরাণ, সুন্দরী, গর্জন, পশুর, কেওড়া, ধুন্দুল-বাইন, গেঁও প্রভৃতিই বোঝায়। আর আছে গোলপাতা।

এক এক কাঠের একরকম দর এবং প্রয়োজনও বিভিন্ন। গরান কাঠ ঘরের খুটি, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়। সুন্দরী পশুর, বাইন, কেওড়া তক্তা; কড়ি বরগার কাজে লাগে। কেওড়া কাঠের তক্তা বা বরগা দেখতে অনেকখানি সেগুন কাঠের মতই। অমনি আঁশ—কিন্তু গুণে সেগুন কাঠ অনেক সরেশ। কিন্তু শোনা যায় অনেক ঝুনো ব্যবসায়ীর দল সাধারণ খদ্দেরকে ওই কেওড়া কাঠই সেগুন বলে চালিয়ে দেয়। অবশ্য কয়েক বৎসর পরই ব্যাপারটা ধরা পড়ে, তখন আর করবার কিছুই নাই, মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া।

সব চেয়ে দামী কাঠ গেঁও। মণকরা প্রায় আটাশ টাকা এর দাম দিতে হয় সরকারকে। পাইনজাতীয় কাঠ, সোজা সরল গাছগুলো, তবে খুব বিশেষ উঁচু হয় না। খুব হালকা এবং গুড়ির রং সাদা। এর থেকে চায়ের প্যাকিং বাক্স তৈরী হয়, আরও অনেক হালকা কাযে লাগে। এই গুড়ির ডাক নাম 'তবলা'। তার চেয়ে ছোট গাছগুলোর থেকে তৈরী হয় ব্রাস হ্যাণ্ডেল, খেলনা, লাটু, ইত্যাদি। তাই ছোট গেঁও গাছগুলোও দামী, এর ডাক নাম 'লাটিম'। কচি সটকা গাছ-গুলোতে কাযে লাগত জাহাজে বস্তা বোঝাই করবার সময়, চাপ লেগে যাতে মাল নষ্ট না হয়ে যায়—তাই এই গাছের সরু সরু কাণ্ডগুলোকে পাতা হতো, তার চলতি নাম 'ড্যানিস'।

ধুন্দুল গাছ থেকে সাধারণতঃ পেন্সিলের কাঠই তৈরী হয়।

কতমণ নৌকায় কি মাল নেবে সেই হিসাব করে ফরেষ্ট অপিস থেকে টাকা জমা নিয়ে পাশ 'ইস্থ' করা হয়। প্রতিটি নৌকার রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার আছে, আয়তন কসে মণের পরিমাণ লেখা হয়—এবং পুরো বোঝাই হলে নৌকা কতটুকু জলের নীচে থাকবে তার হিসাব করে জল দাগ (Water mark) দিয়ে দেওয়া হয় অপিস থেকে, তার বেশী পরিমাণ মাল বওয়া বেআইনী, তার জন্য জরিমানার বেশ সুব্যবস্থা আছে। এক কাঠের পাশ করিয়ে অন্য কাঠ কাটলেও বিধি তদ্রূপ। কোনদিকে সুঁচ গলবে না।

এইতো গেলো নৌকার ব্যাপার, তারপর আসে মানুষ। কেউ যাচ্ছে সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্টে। দু' তিন সপ্তাহ থাকবেন, রান্নাখাওয়া করতে জ্বালানী কাঠের দরকার, বন থেকেই ভাঙ্গবেন নিশ্চয়, সুতরাং সেই শুকনো মরা জ্বালানী কাঠেরও দাম দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে হবে। রেট—সপ্তাহে তিন আনা।

বনবিভাগের কায তদারক করবার জন্য কয়েক হাজারী মনসবদার রাশি রাশি টাকার পেট্রল পুড়িয়ে, সারেঙ্গ লস্কর মালা নিয়ে দামী সরকারী লঞ্চে গাং টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। পান থেকে চুণ খসবার উপায় নাই। অথচ যারা এই সরকারী তহবিলে বনের বুক থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে কাঠ এনে রসদ যোগাচ্ছে—তাদের জন্য এই মনসবদারের বাহিনী কি নিদারুণ অবজ্ঞা অবহেলা ব্যবহার করেন, তাদের নিরপত্তার বিন্দুমাত্র চেষ্টার বদলে উঁচুতলা থেকে নীচু তলার কর্মীরা পর্যন্ত কেমন পরিহাস সূচক ভাষা প্রয়োগ করেন—তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সুন্দরবনে বাঘ-ডাকাত-কুমীর কামট আছে তাই জানতাম, সেখানে গিয়ে মানুষ 'Bug' (ছারপোকা) ও দেখে এসেছি।

তবুও বলবো অনেককে দেখেছি, ওই বিভাগেরই যারা অসাধুতার অনেক উদ্ধে; সাধারণের উপকার করবার জন্য ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু আছে—সব শক্তিই নিয়োজিত করেন। এমনি সৎলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। গহিন বন এবং অকূল নদীর মধ্যে—বনবিভাগের কর্মীরাই সরকারের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিটি নীতির মর্য্যাদা যাতে রক্ষা করা হয়—তার প্রতি নজর রাখা দরকার।

বসে বসে চা সিগারেট ধ্বংস করছি, আর ম্যাপ দেখে আমাদের গন্তব্য পথের নিশানা খুঁজছি।

—যেদিকে ফিরাই আঁখি
সব কৃষ্ণ ময় দেখি।'

ওমা, ম্যাপের বুকে কেবল বন আর নীল রংএর নদীর ছাপ। সবই বেশ মোটাসোটা' সরু সরু খাল, নদীগুলো ক্রমশঃ দক্ষিণের দিকে যত গেছে ততই সমুদ্রের নিকটস্থ হয়েছে, ফলে তাদের আয়তনও বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠেছে। আমাদের গন্তব্যস্থল বঙ্গোপসাগরের সীমানার মধ্যে একটি দ্বীপ, চলতি কথায় বলে 'কেঁদোর চর'। গোসাবা নদী, হলদি নদী এবং ভাঙ্গাদুয়ানী নদী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে; সেখানের মূল ভূখণ্ড থেকে মাইল চারের দূরে সমুদ্রের বুকে ওই চর। কোন অতীত যুগে হয়তো দ্বীপটার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না, ক্রমশঃ ভূমিকম্প বা কোনরূপ ভূপৃষ্ঠের বিবর্তনের জন্য ওই সমুদ্র এগিয়ে এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে,—নাহয় তিনটি নদীর দ্বারা বাহিত পলিমাটিই ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়ে গড়ে তুলেছে ওই চর। দুটোর যে কোন একটা কারণই সম্ভব। দূর দূরান্তে ওই রকম কয়েকটি দ্বীপই আছে—যেমন সাগর দ্বীপ, ডালহৌসী দ্বীপ--লোথিয়ান দ্বীপ ইত্যাদি।

…ম্যাপে দেখা যাচ্ছে দুটো পথ, একটা কুলগাছিয়া নদী ধরে এক ভাঁটার পথ গেলে পড়ে বাঘনা ফরেষ্ট ষ্টেশন, তার কাছেই এসে মিলেছে ঝিলে এবং রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গলের নাম শুনলে অতি সাহসী মাঝিরও হৃৎকম্প আসে। দুর্মদ-দুদ্দম ও নদী; এ তিনটি নদী এক হয়ে বয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে—এক ভাঁটির পথ (অর্থাৎ আন্দাজ চৌদ্দ-ষোল মাইল) এগিয়ে এসে তাতে মিলিত হয়েছে দত্তর বা হরিণগাড়া নদী—এই হরিণগাড়া মঙ্গলের মুখ থেকে একটু গিয়েই বাঁ হাতে একটা ভারানী ধরে আমরা বেঁকে যাবো, এই ভারানী অর্থাৎ দুটি বড় নদীর সংযোজক খাল গিয়ে পড়েছে গোসাবা নদীতে। গোসাবা ধরে সোজা দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে নেমে যাবো আমরা। অন্য একটা পথ আছে ওই ভারানীর মুখ পর্য্যন্ত, অপেক্ষাকৃত ছোট নদী ধরে গিয়ে আমরা পড়বো ওই হরিণ-গাড়াতে। বাঘনা থেকে হরিণগাড়ার মুখ পর্য্যন্ত পথটা বিপদজ্জনক। বড় নদীতো বটেই তাছাড়া রাস্তায় আছে ডাকাত-জলদস্যুর ভয়।… অবশ্য এ পথেও যে ওই প্রভুদের গতায়াত নাই—তা নয়। কয়েকটি দুর্ঘটনা এই হরিণগাড়ার বুকেই ঘটেছে এই বৎসরই—পুলিশ এখনও যার কোন রহস্য ভেদ করতেই পারেনি। তবুও এই পথই বেছে নিলাম আমরা। শুনলাম শেষ ফরেষ্ট ষ্টেশন দত্তায় দু'একদিনের মধ্যে কোন উপরওয়ালা সাহেব আসবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সেই সাহেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা—অবশ্য ভাগ্যে যদি থাকে।

সুন্দরবনে আর এক শ্রেণীর হিংস্র প্রাণী আছে, মানুষ ইচ্ছা করলে একটু সাবধান হলে—বনে নামবার সময় সতর্ক হয়ে নামলে বাঘের হাত থেকে বাঁচতে পারে, সাপও আছে যথেষ্ট, সবই কুলীন ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ফণাধারী গোখরো বা বিষাক্ত চন্দ্রবোরা জাতীয়। কিন্তু তেড়ে কামড়াতে তারা আসে না। কুমীর-কামট আছে কিন্তু নদীতে না নামলেই হলো। বেঁচে যাবে তাদের আক্রমণ থেকে। কিন্তু যে শ্রেণীর জীবদের কথা উল্লেখ করেছি তারা বাঘের চেয়ে হিংস্র, কুমীরের চেয়েও বীভৎস, কামটের চেয়েও রক্ত পিপাসু, শকুনির চেয়েও সন্ধানী। তারা ও জলদস্যুর দল। নির্ভয়ে-বিনাবাধায় বনের বুকে নদীতে নদীতে তারা ছিপ-ডিঙ্গি বেয়ে বেড়ায়, নৌকা দেখলে এসে রাত্রে কেন দিনে দুপুরে চড়াও হয়ে চাল ডাল-তেল কাপড়-চোপড় টাকা পয়সা যাকিছু থাকে সবই নিঃশেষ করে নিয়ে চলে যায়, বাধা পেলে প্রাণেও মারবে। একটা ছেঁড়া গামছা মাত্র পরিয়ে রেখে—আকুল নদীতে জনমানবহীন বনে নিশ্চিত অনাহারের বুকে ফেলে চলে যাবে। ছায়া যেমন কায়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে, তেমনি প্রতিটি মালগুজারী নৌকা-জেলে ডিঙ্গির মাঝি লোকজনদের সঙ্গে ফেরে এই ভয়, এবং তারা প্রতিটি মুহূর্ত—কিবা রাত্রি কিবা দিন, ওই জলদস্যু-দের সভয় প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে।

এরা যে কারা—কোন শ্রেণীর লোক তা আজও পুলিশ বা বনবিভাগ একটিকেও ধরে জানতে পারেনি। পুলিশ বা বনবিভাগের পেট্রল বোট এদের খবর রাখে না; এত ডাকাতি ঘটেছে নদীর বুকে একজনকেও এ্যারেষ্ট করতে পেরেছে বলে কোথাও শুনলাম না। তবে দেখলাম পুলিশ দোষ চাপায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ঘাড়ে, ওরা মশায় এদিক সেদিক করে, বড়লোককে নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত করে—তাই ওদের বরাতে মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে।

…কয়েকমাস আগে নাকি ওই হরিণগাড়া নদীতেই একজন ফরেষ্টার এবং দুজন গার্ডকে কারা হত্যা করে তাদের বন্দুক নিয়ে উধাও হয়েছে। পুলিশ তদন্ত এখনও চলছে, শেষ হয়নি।

বনবিভাগও পুলিশের দোষ দেয়।…অর্থাৎ দুটি বিভাগের কর্মীদের মধ্যে কোথায় একটা চাপা হিংসা যেন রয়েছে একজন অন্যজনের সৌভাগ্যকে হিংসা করে। কে জানে সুন্দরবনে কি এমন মধু আছে--যার জন্য এই অসূয়ার উদ্ভব।

তবে শুনলাম যা কিছু দুর্ঘটনা বনের মধ্যে ঘটে—প্রায়ই সেটা নাকি পাকিস্থান হতে ছটকে আসা দুর্বৃত্তদের কাণ্ড বলেই ধরে নেওয়া হয় এবং দণ্ডের ইতি করা হয়। তারা ঘড়ির কাঁটা ধরে ওই অপকর্মগুলো করেই আবার ফিরে চলে যায় ওই এলাকায়। সুতরাং আমাদের পুলিশ তাদিকে ধরবে কি করে বলুন? কিন্তু কে দেখলো—তারা অন্য রাষ্ট্রের লোক, কে দেখলো তাদিকে ওই দিকে চলে যেতে? এর কোন জবাব নাই।

প্রথমেই বলেছি ওই অঞ্চলেও অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে, দু'একটি কুখ্যাত গ্রাম আছে, সেই সব বসতির নীচে নদী থেকে প্রায়ই ডাকাতি হয়, অথচ তার কোন প্রতিকার আজও সম্ভব হয় নি, বা সেই সব বসতির লোকদের উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় না। তারাও যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায়, নদীর বুকে; দুষ্কৃতকারীরা যে কোন শ্রেণীর লোক যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাউকে ধরে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা আবোল-তাবোল খবর লোককে জানালে—আসল বিপদের কোন নিরাকরণই হবে না। তারা হিন্দুস্থানেরই হোক, আর পাকিস্থানেরই হোক—ডাকাত—ডাকাতই। তাতে যাত্রী সাধারণের আশ্বস্ত হবার কিছুমাত্র নাই। তারা চায় পথ নিরাপদ হোক—পুলিশ,

বনবিভাগ তাদের এই পরম উপকারটুকু করুক। রেভিনিউ জমা দিয়ে নৌকা পাশ করেই তাদের কর্তব্য যেন শেষ হয় না।

বড়দা হাসেন—"কি হলো? ভয় করছে নাকি?"

…"করলেই বা কি বলুন। এতদূর ঠেলে এসেছি—দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত।"

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, নিস্তব্ধ হয়ে আসে নদীর বুক, আমরা ফিরলাম বাসার দিকে। জোয়ারের জলে ফুলে উঠেছে নদী, জল এসে উছলে পড়ে ভেঁড়ির গায়ে, টর্চের আলোয় সন্তর্পণে এগোচ্ছি আমরা, একদিকে দুস্তর ভরজোয়ারের লোনা গাং, অন্যদিকে অনেক নীচে রাস্তা! আমাদের বড় দুখানা হাজারমণি নৌকা নোঙর তুলে বড় গাং এ এসে পড়েছে, ভাঁটার অপেক্ষা করছে তারা, আজ রাত্রির ভাঁটায় ওরা এগিয়ে যাবে; আগামীকাল বেরুবো আমরা ছোট নৌকায়।

একদল মানুষের জগত ছেড়ে এগিয়ে চললো বনের দিকে—ওরা যেন আমাদেরই দিকহারানোর পথে যাত্রার সঙ্কেত আনে। রাত্রে, তারার মালা পরা নির্ধূম স্বচ্ছ আকাশে, কেমন নিঃসঙ্গতার আভাষ।

পরদিন সকালে ঘুম না ভাঙ্গতেই এসে হাজির ডাক্তার, মাষ্টার, সঙ্গে একটি ছেলে। র‍্যাগখানা জড়িয়ে বিছানাতে বসেই চা খাচ্ছি, হাঁক ডাক করে তারা ঘরে ঢুকলো;—"এখনও ওঠেননি। আজ বৈকাল চারটায় ওপারে লাইব্রেরীতে মিটীং করছে এরা। একজন সাহিত্যিককে হাতের কাছে পেয়ে ছাড়া যায় না মশায়।"

ছেলেটির পরিচয় দেয় ডাক্তার—"এর নাম সুশীল, আপনার লেখার ভক্ত।" নমস্কার করলো ছেলেটি। একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, সুন্দরবনের নোনা গাং এর ধারে এই তুঁষখালি—সন্দেশখালি। এখানেও বইপত্র এসে পৌঁছায়—তাহলে বাংলার পত্রপত্রিকা. প্রকাশকদের পক্ষে কিছুটা আশার কথা বই কি।

'ভারতবর্ষে' প্রায়ই আপনার লেখা পড়ি। উপন্যাসও আছে লাইব্রেরীতে।…আজ একটু কষ্ট করে চলুন ওবেলায়।'

…অনিচ্ছায় গান গাওয়া যায় না। তেমনি মিটিং করতে গেলেও মানসিক প্রস্তুতির দরকার। যে মানুষটি কলকাতায় ফিট-ফাট হয়ে ঘুরে বেড়ায়; সাহিত্যিক সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয়, দরকার মত সাহিত্যবাসরে বুলিও কপচায়, সেই ভদ্রলোকটিকে কলকাতায় রেখে দিয়ে যে মানুষটি আমার খোলস পরে আজ বাইরে এসেছে সে যে সাহিত্যিক নয়, যাযাবর—তা কেমন করে বোঝাই। তার পর চোখের সামনে ঘোলা জলভরা ওই দুস্তর গাং—ওই পাড়ি দিয়ে যেতে হবে সখ করে, এই অকাজ করতে—ভাবতে গেলেই মনে হয় সাহিত্য করার সখের জন্য এই নিদারুণ শাস্তি।

ছেলেটি বলে ওঠে—"কোন কথাই শুনবোনা। যেতে হবে।"

…'বার হচ্ছি রাত্রি দশটায়, প্রথম ভাটাতেই।'

আমার কথা ঢেকে দিয়ে বলে ডাক্তার—সাতটার মধ্যেই ফিরে আসবো আমরা।

এর পর আর কিই বা বলি—ওদের বিধান মেনে নিলাম অগত্যা।

পথে রান্নার জন্য সঙ্গে যাচ্ছে নিতাই, দরকার হলে দাঁড়ও ধরতে পারবে। কিন্তু সেই নিতাই আজ বহুকষ্টে ভাত ডাল তরকারী নামিয়েছে বেলা তিনটেয়।

…'কাপড় চোপড় নিয়ে তৈরী হয়ে আয় নিতাই, আজ রাত্রেই বেরুবো।' নিতাই নির্বিকার। মাথার লম্বা তৈলসিক্ত চুলগুলোকে একবার হাত বুলিয়ে পাতা ঠিক করে নিয়ে চুপ করে রইল। খাওয়া-দাওয়া করে হুঁকো হাতে বড়দা নৌকায় রসদপত্র তোলাচ্ছেন, চাল ডাল নুন তেল, ডিম, আলু-বেগুন, টম্যাটো,চা-চিনি-সুজি, চিঁড়ে, ওষুধের বাক্স, গড়গড়া—তামাক, টিকে-এবং হোয়াট নট। গোটা তিনেক টর্চ, প্যাঁচ ব্যাটারী থেকে এক ব্যাটারী-মায় ফিলিয়াসের খিচখিচে অটোমেটিক টর্চ পর্য্যন্ত। পাকাপাকি একটি সংসারের মালপত্র। জলের বড় মেটেগুলো চেক করা হোল, ঠিক ভর্তি আছে কিনা। দড়ি দড়া পাল-মাস্তুল পর্য্যন্ত চেক করে বিছানায় এসে বসেছেন—এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে এসে হাজির ডাক্তার।

—"সাংঘাতিক খবর মশাই, শুনলে এখুনি শক্তিবাবুতো ঘাবড়ে যাবেন; ভীষণ ব্যাপার। এখুনি ওপারে রেডিওগ্রাম এসেছে—দেখলাম।"

—"কি খবর?"

—"আবার ডাকাতি হয়েছে কাল সন্ধ্যায়, বিহারীখাল চেকপোষ্ট থেকে তিন মাইল দূরে খালের মধ্যে জেলে ডিঙ্গির উপর হামলা করেছিল। একজন জেলের হাতে গুলি লেগেছে। কাজ সেরে ডাকাতের দল 'হাওয়া'।"

…বিহারী খাল! আমাদের পথেই পড়বে ওই রাস্তা। ডাক্তার খবরটা দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে—বোধহয় মুখ কতখানি ফ্যাকাসে হয় তাই দেখছে মজাসে।…ভয় হয়নি সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু করবারই বা আছে কি। যাবো ঠিক করেছি—যাবোই। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।

…চায়ের জল এসে গেছে।…টি বোর্ড যদি চায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন কোন ক্যাপসন চায় তাহলে আজ দিতে পারি। এমন ভয়-জয়ী পবিত্র পানীয় আর নাই। কি এর অপরূপ স্বাদ—সেই স্বাদ এবং আমেজটুকুই মনকে চাঙ্গা করে তোলে।

—"চারটে বাজে।"

ডাক্তারের কথায় আমরা তৈরী হয়ে নিয়েছি। বেরুলাম সাহিত্য-সভা করতে। দারোগাবাবু—সার্কেল অফিসার, এদের সঙ্গেও দেখা হবে, জানিয়ে আসবো—যদি আপনাদের এলাকার মধ্যে কিছু ঘটে যায়—অন্ততঃ সত্য খবরটা দয়া করে প্রকাশ করবেন।

…ফরেষ্টার ভদ্রলোক ঘাটে ডিঙ্গি নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন। আমাদের নৌকায় মাল উঠছে—অগত্যা তাঁর ডিঙ্গিতেই উঠলাম। ছোট পঞ্চাশমণি সেগুন কাঠের ডিঙ্গি।

—"সেই যে ফরেষ্টার ডুবেছিল দত্ত পশুর নদীতে, সেই ডিঙ্গি নাকি মশাই।"

ভদ্রলোক হেসে জবাব দেন—"না-না, তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তেরো, এটা নয়।"

মানুষখেকো বাঘ—মানুষখেকো নদী আর নৌকা একই স্বভাবের। একবার স্বাদ পেলে হয়। কেবলই ছোঁ, ছোঁ করবে। একজন বোটম্যান মাত্র একটা বৈঠা নিয়েই দেখলাম পাড়ি জমালো ওপারে।

—ভাঁটার শেষ অবস্থা। জল অনেক নীচে, উঠতে হবে কাদা ভেঙ্গে। হায় সাহিত্যসভা, তোমার আকর্ষণে অনেকে অনেক পথে বিপথে ছোটে, মালার বদলে জ্বালাও পায়; ষ্টেশন প্লাটফরমের ছারপোকায় অসহ্য কামড় সহ্য করেও স্থানে অস্থানে চাপড়ে মশা তাড়িয়ে পালিপেটে রাত কাটিয়েছে অনেক সাহিত্যিক এ নজিরও আছে। জাতসাহিত্যিকের এ দুর্ভোগ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আমার মত ভেক-ধারী সাজা-বৈষ্ণবের বরাতে এই বিড়ম্বনা কেন? হাঁটুর উর্দ্ধে জঙ্ঘার কাছাকাছি গঁদের আঠামিশ্রিত চন্দনের তুল্য নোনা কাদার হাবড়ে পড়ে আঁকুপাঁকু করতে করতে পরাণ যায় আর কি।

কে যেন সতর্ক করে দেয়—হাসবেন না, আরও বসে যাবেন।

...হাসি কি পোড়া মুখে আসে সহজে! দুঃখ-দুর্দ্দশা যখন সীমা অতিক্রম করে যায়, মানুষ তখন কাতর না হয়ে পাথরে পরিণত হয়। আমার কোন অবস্থা কে জানে। তবে তুরীয় ভাব আসতে আর দেরি নাই—তা বুঝতে পারছি।

উদ্ধার করল বোটম্যান ছোকরাটি,

—'মম পুচ্ছাগ্রে হস্তং দত্ত্বোত্তিষ্ঠ।' হিতোপদেশের গল্পের মত। লিকলিকে ছোকরা বৈঠেখানা ধরিয়ে দিয়ে বলে—"ধরে থাকুন, তুলছি।"

তুললও শেষ পর্য্যন্ত।

স্থানীয় অধিবাসী এসেছেন মাত্র কয়েকজন; শিক্ষার হার সেখানে কোন অতলে একটু দেখলেই বোঝা যাবে। পরিচয় হোল সার্কেল অফিসার ভদ্রলোক—থানার ছোট বাবু (তখন তিনিই চার্জে) আরও কয়েকজনের সঙ্গে। গানের আয়োজনও ছিল। ডাক্তার দেখলাম "জ্যাক অব অল ট্রেডস" মাষ্টারী, ডাক্তারী গান—তিনটে বিদ্যের পরিচয় পেলাম, আরও কি কি জানে—দেবাঃ ন জানন্তি।

সহর থেকে বহুদূরে আত্মীয় পরিজন থেকে নির্ব্বাসিত কয়েকটি মানুষ গড়ে তুলেছে একটি মধুচক্র, অবসর সময় যাপন করবার পন্থা বার করেছে সংস্কৃতির মধ্য থেকে। বড় ভালো লাগলো ওঁদের ওই ঘরোয়া পরিবেশে ওই ছোট্ট সভা, একটি কুয়াসা ঢাকা সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের ম্লান আলোকশিখা অন্ধকার মনের অতল মধুর আভায় ভরিয়ে তুলেছিল। যেখানে প্রতিপদে মৃত্যুর আহ্বান—মাটি যেখানে কৃপণ—ক্ষুধাতুরা, আকাশে বাতাসে যেখানে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের আহ্বান, সেখানে যারা দখল নিয়েছে, নোনা মাটিতে ফসল ফলাবার সাধনা করেছে—জ্বেলেছে শিক্ষার সংস্কৃতির দীপ তারাই মানুষের বংশধর। সে সুন্দরবনেই হোক—আসামের সামান্তেই হোক আর আন্দামানেই হোক—বাঁচবার সাধনা তার সার্থক হবেই।

ছোট দারোগাবাবু আসবার সময় বলেন—"দিনে দিনে নৌক বাইবেন, রাত্রির আগেই নিরাপদ ঠাঁইএ আশ্রয় নেবেন।"

—"নিরাপদ কোনখানটা বলতে পারেন?"

চুপ করে যান তিনি।...প্রায় ২৫০ বর্গমাইল লোকালয়, ২৬০ বর্গমাইল জঙ্গল, একটা থানার এলাকা; মাত্র কয়েকজন কনেষ্টবল। এই নিয়ে এতবড় সীমানা শাসন করা সত্যই অসম্ভব। তারপর যাতায়াতের উপায়ও তেমন নাই, বোট ছাড়া, অথচ ছোট লঞ্চ হলেও একটু দ্রুত যাতায়াত করতে পারেন উপদ্রুত অঞ্চলে।...এতবড় সুন্দরবন এলাকায় মাত্র তিনটি থানা; এবং যে কয়েকটি আউট পোষ্ট আছে—আর যাতায়াতের যা ব্যবস্থা তাতে যোগাযোগ রক্ষা করা একরকম অসম্ভব। আরও বেশীসংখ্যক সশস্ত্র রক্ষী (অফিসার নয়) এবং কিছু ছোট ছোট লঞ্চ হলেও সুন্দরবন এলাকায় এই ভয় কিছু দূর করা যেতে পারে। কিন্তু এসবই অরণ্যে রোদন।

ফিরবার সময় জোয়ার এসেছে, কাদা ভাঙতে আর হোল না, কিন্তু ওমা—একে কুয়াসার ছিটে আকাশে, জলের বুকে। তারপর ছোট্ট নৌকায় যাত্রী আরও কয়েকজন জুটে গেছে। প্রায় ইঞ্চি দুয়েক জেগে আছে জলের উপর, মোল্লাখালি সার্ভিসের লঞ্চ আসবার সময়ও হয়ে গেছে, লঞ্চের এদিক নাই ওদিকে আছে। স্পীড নাই—ঢেউ তুলতে খুব দড়।

—ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই ছোট সে তরী—

কিন্তু কে কার কথা শোনে, কয়েকজন উঠে পড়ল ডিঙ্গিতে, উপছে উঠলো খানিকটা জল, ফরেষ্টার ভদ্রলোক বলে কয়ে দু'একজনকে নামালেন, কিন্তু—"তবুও তরীতে, তখনই উঠিল জল দারুণ ঝলকে।"

কে একজন সাহস দেন—"এখনও অনেক লোক ধরবে।"

—"খেয়াঘাটের ডিঙ্গি নয় মশাই—নেমে যান।"

'মশাই' অন্ধকারে নৌকাতে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন, ডিঙ্গি চলতে লাগলো কূল ছাড়িয়ে—মধ্যের দিকে।

গায়ে আমার একটা 'ফুল সোয়েটার,' জলে পড়লে ভিজে ভুজে ওজন কমসে পাঁচ সের হবে, অন্য ধড়াচূড়ার কথা বাদই দিলাম, তার পর আছে কুমীর কামট। এদিকে একজন নড়লেই নৌকা টলোমলো। বোটম্যান-ছোকরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে "নড়বেন না, ডিঙ্গি রাখা যাবে না।"

অতল অন্ধকারের বুকে বয়ে চলেছে কত মুহূর্ত্ত!...প্রতিটি বয়ে যাচ্ছে পরমায়ুর উপর দাগ কেটে; চারিদিক নিস্তব্ধ, নদীর কোন স্পন্দন নাই—যেন মুখ বেয়ে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছে—কখন ওর অতল গর্ভে গড়িয়ে পড়বো আমরা—ওই আধডোবা আশ্রয়টুকু থেকে। আরোহীদের সকলেই কেমন অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

...ধীরে ধীরে কুয়াসার আবছা আবরণ ভেদ করে দেখা দেয় ঘাটের ধারে গরাণগাছগুলো,...আমরা তীরে এসে গেছি।...মাটিতে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিজের প্রাণের উপর মানুষের এত মায়া হতে পারে—ঠিক অনুভব করিনি এর আগে। (ক্রমশঃ)

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

সজ্বে ওমান প্রসঙ্গ—

ানে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। আরব লীগের পক্ষ হইতে বৃটেনের
রাক জাতি-সঙ্ঘে ওমানে বৃটিশের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে
গ আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে
তে হয় নাই। জাতি-সঙ্ঘের বিধান অনুসারে কোনও প্রসঙ্গ
। পরিষদে আলোচনাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করাইতে হইলে কম
৭টি ভোট প্রয়োজন হয়। ওমান সম্পর্কে ইরাকের প্রস্তাব
াসূচীর অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য ভোট দিয়াছিল সোভিয়েট
সুইডেন্, ফিলিপাইনস ও ইরাক ; প্রস্তাবের বিরোধিতা করে
স্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও কিউবা ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল।
ায় সাতটি ভোট প্রস্তাবের পক্ষে না হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদে
ালোচনা হয় নাই ; আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের
পরিষদে প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপিত হইবে। ইরাকের প্রস্তাবের
টেন এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, ওমান স্বাধীন রাজ্য নহে ;
এই প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘে আলোচনার যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে,
প্রতিনিধি মিঃ হাসিম্ জওয়াদ্ যুক্তি দেখান যে, ওমান পূর্ব্ব
স্বাধীন ছিল ; ১৯২০ সালে সিবের শান্তি-চুক্তিতে (Peace
of Sib) এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা
আলোচনার সময় মার্কিণ প্রতিনিধি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন
নর অবস্থাটা প্রকৃতপক্ষে জটিল ; তাহার আইনগত স্বাধীন
হের অবকাশ আছে।

লীগের চুক্তি—সিবের শান্তি-চুক্তিতে ওমানের স্বাধীনতা
য়াছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশ
াত হন নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই বলিতেছেন
নর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা
ছল না ; শুধু মাস্কাটের সুলতানের সহিত মিত্রতার জন্যই
ই ব্যাপারে নাক গলাইয়াছেন। ওমান যদি মাস্কাটের
অধিকৃত অঞ্চলই হয়, এবং ওমানের ইমাম সুলতানের
র্দ্দার মাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্রোহ দমনের জন্য
সাবে বৃটেনের সেখানে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পক্ষে কোন্
তে পারে, তাহা অবোধ্য। অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ
বিদ্রোহ দমনে বহিঃশক্তির সামরিক বল প্রয়োগের এই নীতি যদি
নিন্দনীয় না হয়, তাহা হইলে হাঙ্গেরীর ব্যাপার লইয়া এত হৈ চৈ হইল
কেন? তাহা ছাড়া, ওমানের ইমামের সহিত মাস্কাটের সুলতানের
আইনগত প্রকৃত সম্পর্ক কি, তাহাকে অন্যায়ভাবে বৃটিশের ট্যাঙ্ক-বিমান
চালাইয়া সায়েস্তা করার চেষ্টা হইয়াছে কি না, তাহার সন্ধান যদি জাতি-
সঙ্ঘ না লইবে, তো লইবে কে?

গত ১৯২০ সালে মাস্কাটের সুলতান ও আঠার জন ওমানি সুলতানের
মধ্যে সিব সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। মাস্কাটের বৃটিশ রেসিডেণ্ট এই
চুক্তির সাক্ষী ছিলেন। বৃটেন্ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে না…এই
যুক্তিতেই বৃটিশ সরকার সিব চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন
না। মাস্কাটের সুলতানও উহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ; তিনি বলেন
যে, ওমান তাহার ১৯৫৫ সালের আচরণের দ্বারা সব চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছে,
এবং ইহার ফলে চুক্তির সর্ত্তাবলী এখন আর প্রযোজ্য নাই। সুলতানের
কথায় মনে হয় যে, সিব চুক্তির সর্ত্তে এমন ব্যবস্থা ছিল, যাহা তাঁহার
পক্ষে অসুবিধাজনক ; তাই ঐ চুক্তি অপ্রযোজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা
তাহার স্বার্থ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আরব-লীগ ওমানকে স্বতন্ত্র
রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করে নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, সিব
চুক্তিতে ওমানের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই ; তবে, তাহার স্বায়ত্ত-
শাসনাধিকার স্বীকার করা হইয়াছিল। এই সর্ত্তও হয়ত ছিল যে, ইমামের
অনুমোদন ব্যতীত ওমানের কোনও যায়গায় বৈদেশিক শক্তিকে
তৈল নিষ্কাশনের অধিকার দেওয়া হইবে না। ১৯৩৭ সালে ইরাণ
পেট্রোল কোম্পানীকে ফাহুদে তৈল নিষ্কাশনের ইজারা দিবার সময়
সুলতান ইমামের অনুমোদন লন নাই। সুতরাং, ইজারা অস্বীকার
করিবার অধিকার ইমামের আছে। সিব চুক্তি গোপন রাখিবার এবং
ইমামের মাথায় বৃটিশ ঠ্যাঙ্গা মারিবার প্রকৃত কারণ বোধ হয় ইহাই।
ইরাণ পেট্রোল কোম্পানীর বিশ ভাগ সেয়ার এখন আমেরিকার।
জাতি-সঙ্ঘে আমেরিকাকে নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যাপারে মার্কিণ তৈল
স্বার্থের এই অংশ পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে
করা অযৌক্তিক নয়। আবার অন্য দিকে ওমানের ইমাম্ সৌদী-
আরবের সমর্থনপুষ্ট ; ওমান স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করিয়া সৌদী-আরবের পক্ষে
যোগ দেয়, ইহা নির্ভেজাল আমেরিকান্ কোম্পানী—"আরামকোর"
স্বার্থ। এই দিক হইতেও মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর চাপ আসা
সম্ভব। তাই, জাতি-সঙ্ঘে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ লজের দুই-কুল-রাখা
দার্শনিকোচিত মন্তব্য "এখন সামরিক সজ্ঘর্ষ থামিয়া গিয়াছে ; উভয়পক্ষ
এই শান্ত অবস্থার সুযোগ লইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা
করিতে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্র আশা করে।" সামরিক
সজ্ঘর্ষ থামিয়া ওমানের মরু অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে শান্ত হয় নাই। বৃটিশের
স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর চাপে ওমানের রাজধানী নিজোয়া হইতে
অপসরণের সময় ইমামের কায়রোস্থিত দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হয়,
"The wise withdrawal from Nizwa to fortified posi-

tions in the mountains and the continuation of the struggle will be the decisive blow to the criminal British plan of aggression : it will be the road to victory for the heroic Arabs of Oman."

সিরিয়ার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ—

সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ওয়াশিংটনে ও লণ্ডনে দারুণ দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ, ইহার প্রকৃত কারণ এখনও অস্পষ্ট। সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল নিজামুদ্দীন এবং আরও কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন—অথবা পদচ্যুত হইয়াছেন। সিরিয়ার নূতন প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন জেনারেল বিজরি ; ইনি নাকি কম্যুনিষ্ট! আপাতদৃষ্টিতে ওয়াশিংটনে ও লণ্ডনে উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ ইহাই ; সিরিয়া নাকি কম্যুনিষ্ট বনিয়া যাইতেছে।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা: সিরিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী খালিদ্ এল্-আজম্ এবং তৎকালীন প্রধান সেনাপতি নিজামুদ্দীন আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মস্কোর গিয়াছিলেন। সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সিরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মহল সন্দেহ করেন যে, সিরিয়ায় আরও অধিক পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর চুক্তিও মস্কোয় হইয়াছে। "The statement naturally did not reveal whether Soviet arms shipment are to be stepped up as well,..."—London Economist". মস্কোয় এই চুক্তি সম্পাদন করিয়া গত ১৪ই আগষ্ট সিরিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী এল্-আজমা দামাস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অভিযোগ করেন যে, দামাস্কাসস্থিত মার্কিণ দূতাবাসের তিন জন কর্ম্মচারী সিরিয়ার গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ঐ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শিশাকলির (বর্ত্তমানে নির্ব্বাসিত) সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ; এই তিন জন মার্কিণ কর্ম্মচারীকে দামাস্কাস্ হইতে বহিস্কার করা হয়। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানাইয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনস্থিত সিরিয়ান্ দূত মিঃ জৈনাদ্দিন এবং দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারী ডাঃ জাকারিয়াকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। এই সঙ্গে জানান হইয়াছে যে, দামাস্কাসস্থিত মার্কিণ দূত মিঃ জেমস্ মুস্ বর্ত্তমানে ওয়াশিংটনে আছেন, তিনি আর দামাস্কাসে ফিরবেন না। এদিকে সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ; ইতিপূর্ব্বেই সিরিয়ার প্রতিনিধি জাতি-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্টকে বেসরকারীভাবে জানাইয়াছেন যে, আমেরিকা তাঁহার দেশের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

সিরিয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের অভিমত—সিরিয়ার বামপন্থীরা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহার আড়ালে নিজেদের সুসংহত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সেখানে "পুরাতন সোভিয়েট পদ্ধতি" অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় ;—সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া অনুচর ও আশ্রিতে সাহায্যে গ্রহীতা দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলিতেছে। পক্ষান্তরে, সিরিয়া প্রেসিডেণ্ট কোয়াৎলি বলেন, "পশ্চিমী শক্তিবর্গ অভিযোগ করেন যে আমরা কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইতেছি এবং প্রাচ্য শিবিরে যোগ দিতেছি দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উদার নীতি ও আরব জাতীয়তাবাদে এবং কম্যুনিজমে পার্থক্য বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের আওতা না গেলেই তাঁহারা কম্যুনিষ্ট মনে করেন। আরব রাষ্ট্রগুলি কখন কম্যুনিষ্ট হইবে না ; কখনও কম্যুনিজমের অথবা অন্য কোনও বৈদেশি আদর্শের ঘাটীতে পরিণত হইবে না।"

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতেই সিরিয়ার শাসনক্ষেত্রে বামপন্থী প্রতিষ্ঠিত। গত ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ায় বিভিন্ন দল লইয়া পার্লামেণ্টারী ন্যাশন্যাল ফ্রণ্ট গঠিত হয় ; সিরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা, বাগদাদ্ চুক্তির বিরোধিতা প্রভৃতি ছয়টি মূলনীতি তখন ফ্রণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে মন্ত্রিসভা হইতে পিপ্‌ল্‌স্ পার্টি ও কনষ্টিটিউশন্যাল্ ব্লক্‌কে বাদ দেওয়া হয়, এবং অবিমিশ্র বামপন্থী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। বর্ত্তমানে সামরিক বিভাগেও বামপন্থী কর্ত্তৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইল। সামরিক বিভাগে বামপন্থীদের এই কর্ত্তৃত্বই বোধ হয় পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের উৎকণ্ঠার বিষয় ; কারণ লণ্ডন "টাইমসের" ভাষায় "Since 1949 the Army has been the arbiter of Syria's destiny, and a continual struggle for power has gone inside the officer corps, each faction allying itself for tactical reasons with outside parties and personalities." শাসনক্ষেত্রে বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্য শক্তি এত উৎকণ্ঠা বোধ করেন নাই,—ইহার পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন সামরিক বিভাগে বামপন্থী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়াছেন। সিরিয়ায় বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাস মনে করা হইতেছে : লণ্ডন টাইমস্ বলেন, "আজ পর্য্যন্ত কোথাও যাহা সফল হয় নাই, সিরিয়ার শাসকরা তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সোভিয়েট রুশিয়া বা চীনের সহিত সীমান্তের সংযোগবিহীন দেশে তাঁহারা কম্যুনিজম চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন।" এই আশঙ্কা কতদূর সত্য, অথবা সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কতখানি অতিরঞ্জন ইহাতে রহিয়াছে, তাহা বলা শক্ত। তবে, এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গই সিরিয়ায় বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া তুলিতে পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। সিরিয়াকে আধা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র আখ্যা দিয়া তাহার সহিত অসহযোগ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বে হইতেই। সিরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব সেয়দ শালা বিতার অভিযোগ করিয়াছেন যে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল ; সিরিয়ার গম যাহাতে বিক্রয় না হইতে পারে, তাহার জন্য সম্ভাবিত ক্রেতা দেশগুলিতে নামমাত্র মূল্যে প্রচুর মার্কিণ গম বিক্রয় করা

হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক চাপে উল্টা ফল ফলিয়াছে; সিরিয়া নতি স্বীকার না করিয়া ক্রমে অধিক পরিমাণে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি নির্ভরশীল হইয়াছে। অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সামরিক ঘনিষ্ঠতাও বাড়িয়া থাকিবে। সিরিয়ান গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মার্কিণ কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বলা-দুষ্কর। তবে ইতিপূর্ব্বে সিরিয়ায় যে সব সামরিক "ক্যুপ" হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে বৈদেশিক শক্তির গোপন হস্ত কাজ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। সাম্প্রতিক কালে সিরিয়াকে সায়েস্তা করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ ব্যর্থ হইবার পর মার্কিণ দূতাবাসের কর্ম্মচারীদের সামরিক ষড়যন্ত্রে উস্কানি দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতায় সিরিয়াকে সায়েস্তা করিবার শেষ আশা নিস্ফল হইল বলিয়াই অতলান্তিকের দুই পারে "গেল" "গেল" বলিয়া আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে কিনা, কে বলিবে?

ইয়েমেনে সোভিয়েট অস্ত্র—

ইয়েমেনে সোভিয়েট রুশিয়া হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী সাম্প্রতিক কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত বৎসর ইয়েমেনের যুবরাজ মস্কোয় যাইয়া এই অস্ত্রচুক্তি করিয়া আসেন। হাল্কা রাইফেল, মেসিন গান ও ষ্টেন্ গান কিছু কাল যাবৎ ইয়েমেনে আসিতেছিল। সম্প্রতি ছয় সাতখানি জাহাজভর্ত্তি হইয়া ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান প্রভৃতিও ইয়েমেনে আসিয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক ইয়েমেনে জাহাজভর্ত্তি হইয়া সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছিবার কারণ আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্পষ্ট।

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে,—বৃটিশ প্রোটেক্‌টোরেট এডেনের সীমান্ত ঘেঁষিয়া স্বাধীন ইয়েমেন্ রাষ্ট্র। গত কিছু কাল যাবৎ এডেন-ইয়েমেন্ সীমান্তে মধ্যে মধ্যে সশস্ত্র সঙ্ঘট চলিতেছে। ইহা গুরুত্বহীন সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষ নহে; ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এডেন্ প্রোটেক্‌টোরেটের পশ্চিমাংশের প্রতি ইয়েমেনের দাবী, এবং প্রোটেক্‌টোরেটের অভ্যন্তরে ইয়েমেন্ ও সৌদী আরবের সহিত মিলিত ইহার গণ-আন্দোলন। এডেনের খাস বৃটিশ উপনিবেশ শাসন করেন এক জন বৃটিশ গভর্ণর; পার্শবর্ত্তী তেইশটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যের (প্রোটেক্‌টোরেটের) সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা বৃটেন এই অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছে। বৃটিশের প্রতি এই সব রাজ্যের আনুগত্যের উপর এডেনের বৃটিশ এলেকার নিরাপত্তা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই আনুগত্যকে 'পাহারা" দেন এবং "প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন" অত্যন্ত আগ্রহ ও সতর্কতার সহিত। এক দিকে এই আগ্রহ ও সতর্কতা এবং অন্য দিকে এডেনের পশ্চিমাংশের প্রতি ইয়েমেনের দাবী ও এডেনের অভ্যন্তরে আরব ঐক্যের আন্দোলন। সুতরাং ইয়েমেনের সহিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তি-পরীক্ষা লাগিয়াই আছে। এই পরিস্থিতির সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে পাল্টা চাল চালিতেছে।

"Middle east in now used as pawn in the Power politics. This is an incentive for the Arab Powers to gain advantage from the manovering of Powers."—New Statesman, মধ্য প্রাচ্যকে সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের জন্য এক দিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চেষ্টা যেমন প্রবল, তেমনি অন্য দিকে সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে সোভিয়েট রুশিয়ার আগ্রহও তীব্র। তাই, এডেনের ন্যায় বিপুল সামরিক গুরুত্ব সম্পন্ন ঘাঁটীর সন্নিকটবর্ত্তী ইয়েমেনকে বৃটিশের বিরোধিতায় শক্তি যোগাইতে রুশিয়া সানন্দে সম্মত হইয়াছে। কয়েক খানি ট্যাঙ্ক ও জঙ্গী বিমান পাইয়া ক্ষুদ্র ইয়েমেন্ বৃটিশ সমর শক্তির সমকক্ষ হইয়া উঠিবে না: তবে বৃটেনকে সাময়িকভাবে সে বিব্রত রাখিতে পারিবে। ইয়েমেনের সামরিক শক্তি হয়ত এডেনের আরব প্রোটেক্‌টোরেটগুলির বৃটিশের প্রতি অনুরক্তি শিথিল করিতে সাহায্য করিবে। প্রাচ্যে বৃটেনের সে শক্তিশালী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আর নাই সত্য; কিন্তু এই অঞ্চলে বৃটেনের অর্থ নৈতিক স্বার্থ এখনও প্রচুর এবং সে স্বার্থ রক্ষার জন্য এডেনে তাহার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, এডেন্ বন্দর আরও প্রসারিত করিবার কাজ এখন চলিতেছে। অতি সত্বর ইহা নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরে পরিণত হইবে; প্রাচ্যের বাণিজ্যপথে ইহার গুরুত্ব খুবই সুদূর প্রসারী। ২৫।৮।৫৭

—বারো—
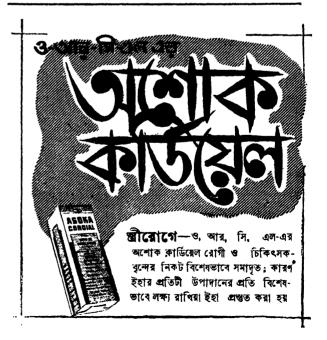
ঠিক সামনে 'ভেনাস আর অ্যাডোনিসের' বড় ছবিটা। চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায়। আজ কুড়ি বছর ধরে সকালে ঘুম ভেঙে ইষ্ট দেবতার মতো ওই ছবিখানাকে দেখেছেন শিবশঙ্কর। ওর যে একটা বিশেষ অর্থ ছিল, সেটা ফিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এখন ওটা দেওয়ালের পুরোনো ক্যালেণ্ডারের মতোই একখানা নির্বিশেষ ছবি মাত্র—যেমন কলকাতা শহরের অন্যান্য বাড়ীর পাশে 'মুখার্জি ভিলা'ও নিছক একখানা বাড়ী হয়ে গেছে।

আর শিবশঙ্কর মুখুজ্জেও আরো দশজনের একজন। আলাদা করে কেউ আর তাঁকে চেনে না। ব্যাধি-জর্জরিত জীর্ণ দেহে আজ আরো অনেকের মতো তিনিও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন—আর কুড়ি বছর আগে তাঁর মৃত্যু ঘটলে এই কলকাতা শহরে উল্কাপাত ঘটত।

আজকের ইতিহাস শিবশঙ্করের জন্যে নয়। সামনের নতুন চারতলা বাড়ীটার মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর জন্য।

বালিশে হেলান দিয়ে শিবশঙ্কর উঠে বসলেন। পাশের ছোট টেবিলটার ওপরে সকালের খবরের কাগজ ভাঁজ করা অবস্থাতেই পড়ে আছে। সারাটা দিনের ভেতরে কাগজখানাকে খুলে পড়বার মতো উৎসাহও তিনি পাননি। শিবশঙ্কর ক্লান্ত শিথিল হাত বাড়িয়ে কাগজ টেনে নিলেন।

ভারী-ভারী পর্দা আর ফার্ণিচারে ছায়াচ্ছন্ন ঘর। পুবের জানালাটা যে কতদিন খোলা হয়না কে জানে। তার জন্য এরই মধ্যে অকালসন্ধ্যা ছড়িয়েছে ঘরে। বেড্-সুইচ্ টিপে শিবশঙ্কর মাথার ধারে ছোট আলোটা জ্বাললেন।

প্রথম পাতাগুলো চোখ বুলিয়েই উঠলেন। রাজনীতি, নাগা বিদ্রোহ, শিক্ষক ধর্মঘট, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা, পৃথিবীর দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়কের সাক্ষাৎকার। এ-সবের কোনোটাতেই শিবশঙ্করের আপত্তি নেই। এ-যুগের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তিনি সরে গেছেন, এ-কালের খবরের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নেই আর। এগুলো তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, অর্থহীন।

শিবশঙ্কর চলে এলেন শেষের দিকে। 'রেস'। এই অংশটুকু তাঁর চেনা। এই পাতাটারই অদল-বদল হয়নি। সেই মাইসোর প্লেট্, ব্যারাকপুর প্লেট্, সেই জুবিলি গোল্ড্ কাপ। এখন আর 'রেসে' যাননা শিবশঙ্কর—সে অর্থ সামর্থ্য নেই, সে উদ্যমও নেই। তবু খবরের কাগজের এই পাতাটাতে এসেই শিবশঙ্কর এ-কালের সঙ্গে তাঁর যোগ অনুভব করেন। এইখানে এসেই তাঁর মনে হয় পৃথিবীটা এখনো পুরোপুরি বদলে যায়নি।

কিন্তু রেসেরই কি সে-সব দিন আর আছে। সে সমারোহ—সে উত্তেজনা এখন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। একালের সংক্ষিপ্ত এই বৈচিত্র্যহীন টার্ফ নিউজটুকুর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ বুজলেন শিবশঙ্কর। সেই বড়দিনের রঙ ঝল্মল্ কলকাতা। চৌরঙ্গীতে বিচিত্র পোষাকপরা সাহেব মেমের দল—যেন মরশুমী ফুল ফুটেছে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর। ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড-স্টাণ্ডে গোরার বাজনা বাজছে। আর রেসের মাঠ ঝমঝম গমগম করছে।

দিল্লী থেকে বড়লাট এসেছেন। মাঠে সব বাছাবাছা

ঘোড়া—যেন পক্ষীরাজের বংশধর। ছোটে না—তীরের মতো উড়ে যায়, তাদের পা মাঠে ছোঁয় কিনা বোঝা যায় না। আর সেই সব জকি। যেন রাজপুত্রের মতো চেহারা। আর কি তাদের ঘোড়া-দৌড়ানোর কায়দা!

এখন? এখন সব চলন-সই। সে সব ঘোড়াই বোধ হয় আর জন্মায়না—সে-রকম জকিও না। আর খেলাও কি তেমন হয়? এখন ব্যবসায়ীর দিন—সাবধানীর কাল। বেনেটোলার শীলেরা একদিন মাঠে তিনখানা বাড়ী ঘোড়ার ক্ষুরে গুঁড়িয়ে দিলে—সে-রকম মেজাজী লোকই কি এ-কালে কোথাও আছে।

সব সাধারণ। সব চলন-সই।

রঘু এসে ঘরে ঢুকল।

—বাবু—

শিবশঙ্কর চোখ মেললেন।

—কিরে? কী চাই?

রঘু দরজার পাশে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে শিবশঙ্করের ছোট ল্যাম্পটার আলো পড়েনা। শিবশঙ্কর রঘুর মুখ দেখতে পেলেন না।

—কী চাই তোর?—আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—অক্ষয়বাবু এসেছেন দেখা করতে।

অক্ষয়? শিবশঙ্কর খুশি হয়ে উঠলেন: নিয়ে আয় এখানে।

পটুয়াটোলার ঘোষচৌধুরী বংশের অক্ষয় ঘোষ। শিবশঙ্করের বন্ধু। একমাত্র বন্ধু।

অক্ষয়ের জীবন তাঁর চাইতেও উদ্দাম। শিবশঙ্কর এক সময় ঈর্ষা করতেন তাঁকে। ভাবতেন—অক্ষয়ের মতো যোগ্যতা যদি তাঁর থাকত, তা হলে তিনি মানুষ হতে পারতেন। কতদিন মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে তিনি অক্ষয়ের পা ধরতে গেছেন—বলেছেন, দাদা, আমায় পায়ের ধুলো দাও।—আর অক্ষয় কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ভাইরে, তোকে পায়ের ধুলো দিতে কি আমার অসাধ? কিন্তু কী করব বল্—তুই হতচ্ছাড়া বামুনের ঘরে জন্মেই সব মাটি করে ফেলেছিস। আমি কায়েতের ছেলে হয়ে কী করে তোকে পদধূলি দিই বল্‌দিকি? সোজা কুম্ভীপাক নরকে চলে যাব যে!

পায়ের ধুলো না-ই পান—অক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে ভক্তির সত্যিই অন্ত ছিল না শিবশঙ্করের। শুধু ঘোড়ার রে[স] শানাত না অক্ষয়ের—আরো বড় জুয়াড়ী ছিল সে। জুয়ার নাম ব্যবসা। অক্ষয় কয়লার খনি কিনেছে গিরিডিতে অভ্রের খনি তৈরী করেছে। কিছু কর[তে] পারেনি—কেবল ক্ষতির খেসারৎ নিয়েছে। তবু অ[ক্ষয়] বলেছে, ঘাবড়াসনি শিবু, ঘাবড়াসনি। দেখবি, লে[গে] যাবেই একবার।

লাগেনি। রেসে আর ব্যবসায়ে অক্ষয় সর্বস্বান্ত হয়েছে[।]

তবু নেবার আগে দেখিয়ে দিয়েছে প্রদীপ [কী] ক'রে জ্বালাতে হয়। নিতান্তই পৈত্রিক বাড়ি দে[বোত্তর] করা আর অক্ষয় তার সেবায়িৎ—তাই সেটাকে [বি]ক্রি করতে পারে নি। কিন্তু বাকী বাড়ী জমীগুলোকে কে[মন] অবলীলায় এক মুঠো ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে[।] শেষ বাড়ীখানা যখন বিক্রী হল, সেদিন রাত্রেও—[সে] পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক বর্ষার রাত্রে—থিয়েটারের এ[ক] সেরা অভিনেত্রীকে বাগানে নিয়ে গিয়ে অক্ষয় যে উদ্দ[াম] আনন্দের বান ডাকিয়ে দিয়েছিল, আজও তার কথা ভুল[তে] পারেনি শিবশঙ্কর।

সত্যি—অক্ষয় আশ্চর্য।

হাজারীবাগে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে একটা চিতাবাঘে[র] মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই অক্ষয়। রিভলভারের গুলিতে রামবাগানের এক রক্ষিতাকে খুন করে আইনের ফাঁ[স] কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল এই অক্ষয় ঘোষ চৌধুরী। আ[জ] পেট পুরে খেতে পায় না—তবু একবিন্দু টোল খায়নি।

—কেমন আছো অক্ষয়-দা?

—খাসা আছি।

—শীতে কাঁপছ যে? এই ঠাণ্ডায় একটা গরম জাম[া] পর্যন্ত পরোনি?

—জীবনে তো অনেক শাল বালাপোষই পরলা[ম] ব্রাদার। এখন একটু অন্যরকম করে দেখি—কেমন লাগে। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে একটু কৃচ্ছ সাধনও করা ভালো হে—পুণ্যি হবে।

একখানা গরম চাদর অক্ষয়কে দেওয়া অসম্ভব নয় শিবশঙ্করের পক্ষে। অক্ষয় তা নেবে না। আর নিলেও বিলিয়ে দেবে। শিবশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বাইরে অক্ষয়ের চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—এসো অক্ষয় দা, এসো।

অক্ষয় ঢুকল। পাকা গোঁফ—বাবরী-করা শাদা চুল। কালো অবস্থায় তার চুল যেমন ছিল, আজও ঠিক সেই রকমই আছে। এক ইঞ্চিও টাক পড়েনি। ফর্সা লাল্‌চে রঙ বয়েসের প্রভাবে আজ পুরোনো হাতির দাঁতের মতো ময়লা আর হলদে হয়ে গেছে, কিন্তু আজও বুঝতে পারা যায় এককালে কী রূপবান ছিল সে! লোকে বলত, কন্দর্প। থিয়েটারের মেয়েরা কেবল তার টাকার আকর্ষণেই ছুটে আসতনা—রূপের টানেও সেদিন অনেক পতঙ্গ এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

অক্ষয় ঢুকে শিবশঙ্করের মুখোমুখি জীর্ণ শোফাটায় বসল। কয়েকটা ভাঙা স্প্রাঙের চকিত আর্তনাদ শোনা গেল।

—কেমন আছো অক্ষয় দা?

—খাসা আছি।—বাধানো দাঁতের ঝিলিক ছড়িয়ে অক্ষয় হাসল: দিব্যি কেটে যাচ্ছে। তবে এতদিন একা একা ছিলুম—ভারী ফাঁকা ঠেকত। এখন সঙ্গী জুটেছে একটি।

—সঙ্গী? সঙ্গী পেলে কোথায়?

—বাত। পরশু থেকে ডান পায়ে জানান দিচ্ছে। রাত্রে আর ঘুমুতে দেয় না হে! আমার নেহাৎ মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে উঃ আঃ করি—একটা কবরেজী তেল আছে তাই মাখি, আর সারারাত পাশের বাড়ীর ছাতে হুটো হুলো বেড়ালের ঝগড়া শুনি। ব্যাটারা ভারী অপদার্থ বুঝলে! এই দু'রাত ধরে সমানে চেঁচাচ্ছে, অথচ এ পর্যন্ত একবারও জুৎসই গোছের একটা মারামারি অবধি করতে পারলে না।

শিবশঙ্কর তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর দিকে। অক্ষয় ঘোষরা ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শিবশঙ্করের কাল। অক্ষয়েরা আর জন্মাবে না—সে কালও আর ফিরে আসবে না।

—তারপর, তুমি কেমন আছো আজকে?—অক্ষয়ের জিজ্ঞাসা।

শিবশঙ্কর অক্ষয়ের মতো বলতে পারলেন না, খাসা আছি। সে জোর তাঁর নেই। বললেন, আছি একরকম।

—তুমি বড্ড বুড়িয়ে গেছো হে!—অক্ষয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ল: চাবুক মারতে গেলে ভাড়াটেকে—অথচ নিজেই পড়লে অজ্ঞান হয়ে! তুমি তো আমার চাইতে আরও পাঁচ ছ' বছরের ছোট!

শিবশঙ্কর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই তিন চারটে তীক্ষ্ণ চীৎকার ওঠে মুখার্জি-ভিলাকে যেন খান খান করে দিলে।

সেই সঙ্গে শোনা গেল প্রীতির বুক ফাটা ডুক্‌রান কান্না!

—কি হল?—শিবশঙ্কর সবেগে বিছানার উপর উঠে বসলেন: কি হলো? কি হলো?

রঘু—রঘু—

রঘুর সাড়া এলো না। আবার প্রীতির কান্নার শব্দ ঝোড়ো হাওয়ার মতো বাড়ীটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। শিবশঙ্কর থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

—রঘু-রঘু—প্রীতি—বেসুরো গলায়, বিকৃত মুখে আর্তনাদ করতে লাগলেন শিবশঙ্কর।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমি দেখছি—

পরিচিত বাড়ীতে অভ্যস্ত আগন্তুক অক্ষয় খবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। টেবিলের ওপর কী করে একখানা দাড়িকামানোর ব্লেড্ পেয়ে তাই দিয়ে নিজের গলার শ্বাসনলী কেটে ফেলতে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। রঘু তাই দেখে ছুটে গিয়ে সেটা কেড়ে নিয়েছে—কিন্তু রঘুর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আধখানা হয়ে ঝুলছে, তীরের মতো ছুটছে রক্ত—আর তাই দেখে চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়েছে প্রীতি।

(ক্রমশঃ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ভোজন-পর্ব

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আর্থিক বিপর্য্যয়ে পর্য্যুদস্ত, রসনা-লোলুপ বাঙ্গালীর নিকট ষোড়শ শতাব্দীর ভোজন-পর্ব্বের কথা কহিতেছি। ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালীর রসনাকে ভোজন বৃত্তান্তের কথকতা শুনাইয়া উদ্রিক্ত করিতেছি না। বাংলার একটা ঐতিহ্য ও কৃষ্টির উল্লেখ করিতেছি মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর ভোজন-পর্ব্ব আজ হয়তো বাঙ্গালীর রুচি বোধের সঙ্গে মিশিতে পারিবে না। কিন্তু না মিশিলেও, পূর্ব্বে বাঙ্গালীর খাদ্য-ব্যবস্থার ও রন্ধন প্রণালীতে যে একটা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বা ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডী কাব্য বাংলার মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। বঙ্গের প্রাচীন কাব্যে-গাথায়, চরিত-সাহিত্যে, ধর্ম্ম-কাহিনীতে বাঙ্গালীর ভোজন-পর্ব্বের বহুল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম যে ভোজন বিলাসী ছিলেন, কবির বর্ণনাই তাহার দৃষ্টান্ত। সরসতা ও মধুরতা বাঙ্গালী কবির সজীবতার লক্ষণ। পান্তাভাতের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলায় পান্তাভাতের মাহাত্ম্য-অপচীয়মান হইতে বসিয়াছে। "পান্তা ওদনে ব্যঞ্জনবাসী"—পান্তা ভাতের সঙ্গে বাসী তরকারীর এই যে মিলন, তাহার মাধুর্য্য সেই বুঝিতে পারে, যে একবার পান্তাভাতের স্বাদ পাইয়াছে।

> ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক।
> মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ি॥
> সরস সফরি ভাজা চিংড়ী।
> যদি ভাল পাই মহিষা দই।
> চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খাই।
> পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়।

বাংলার রন্ধন প্রণালী একটা শিল্প। তাহার স্বাদ ও আকর্ষণ সেই বুঝিতে পারে, যে একবার প্রবাসী হইয়াছে। বাংলার জননী-জায়ার অনুপম সুধা-স্নেহ এই পাক্ প্রণালীর মধ্যে রহিয়াছে।

রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাই ভোজন-বিলাসী বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় বহু ইঙ্গ-বঙ্গ তরিতরকারী দেখা যায়। বর্ত্তমানে মাছ বাঙ্গালীর রসনায় কেবলমাত্র লালসা জাগাইয়া তোলে। পঞ্চ ব্যঞ্জনের মাঝেই বাঙ্গালীর ভোজন পর্ব্ব সীমাবদ্ধ থাকিতনা, ভোজন-পর্ব্বের মধ্যে ছিল একটা স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া। রন্ধনবিদ্যা হইতেছে সূপবিদ্যা। এই শব্দটি বৈদিক ভাষা। মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্যসামগ্রীর অভাব ছিল না। অভাব ঘটিয়াছে বর্ত্তমানে।

চণ্ডীকাব্য ভোজন ও খাদ্য সামগ্রীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীয়ানার ইতিহাস মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য। সেকা[ল] সমাজ জীবনের পরিচয় পাইতে হইলে মুকুন্দরামকে বুঝিতে হইবে [এ]ং সেই সমাজের সঙ্গে আজিকার মনের সখ্য পাতাইতে হইবে।

> চাকা চাকা মূলা বেগুন তায়।
> আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালতা।
> আমসি কাসন্দী কুল করঞ্চা।
> খোর উড়ুম্বার ইচালি মাচে।
> খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে॥

কবি যে খাদ্যরসিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছা[ড়া] রুচি কোন্ খাদ্যে পরিপূর্ণ হয়, কবি সেকথাও বলিতে ভুলেন নাই। ক্ষী[র] নারিকেল, তিলের পিঠা, দুধ গুড় ও তিলের সঙ্গে লাউ মিশাইয়া এ[বং] দইয়ের সঙ্গে খুদের জাউ প্রভৃতি বাঙ্গালীর-সৌখীন খাদ্য তালিক[ায়] অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার পোড়া মাছ ভক্ষণের কথাও চণ্ডীকা[ব্যে] রহিয়াছে।

> নিধানী করিয়া খই তাহাতে মহিষা দই
> কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
> যদি পাই সাজে ঘোল পাকা চালিদার ঝোল
> প্রাণ পাই পাইলে আমসি॥

গোসাপ খাওয়ার প্রথাও ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। তবে উহা উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা তাহাই বিবেচ্য।

> গোধিকা রেখেছি রান্ধি দিয়া জাল দড়া।
> ছাল উপাড়িয়া প্রিয়ে কর শিক-পোড়া॥

আমিষ খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের প্রক্রিয়া বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

> লোন কিছু দিয়া বাড়া নকুল গোধিকা পোড়া
> হংস ডিমে তোল কিছু বড়া
> ভাজ কিছু রাই খাড়া চিঙ্গড়ীর কর বড়া
> সজারু করই শিখ পোড়া॥

সজারু ও গোধিকার শিক পোড়া বাংলার খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত ছিল। তবে শিকপোড়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত না থাকাই স্বাভাবিক। থাকিলেও উহা উচ্চ বর্ণের মধ্যে ছিল না। মুকুন্দরামের যুগ মুসলমান প্রাধান্যের কাল। হয়তো—মুসলমান প্রথা হইতেই হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে শিক-পোড়ার ব্যবহার ছিল।

> মূলা বেগুনেতে সিম, তাহে দিয়া রান্ধ নিম
> তাহে দাও উড়ুম্বার ফল॥

কবি সুকুতার (শুক্তানী) ভক্ত ছিলেন বলিয়া মনে করার কারণ রহিয়াছে। চণ্ডীকাব্যের যেখানে রন্ধনের—বর্ণনা রহিয়াছে, সেইখানেই কবি সুকুতার-মহিমায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি নটে শাকে ফুল বড়ি
চিঙ্গড়ী কাঁটাল বীচি দিয়া
ঘৃতে নলিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া শাক। ইত্যাদি।

বাংলার সুপ-বিদ্যা এখানকার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপের একটি বৈশিষ্ট্য।

মুগ সুপে ইক্ষু রস কই ভাজে গণ্ডা দশ
মরিচ গুড়িয়া আদা রসে
মসুরি মিশ্রিত মাষ সুপ রান্ধে রস বাস
হিঙ্গু জিঁরা বাসে সুবাসিত॥

মানকচু চিতলের পেটির এবং রুই মাছের বর্ণনায় চণ্ডীকাব্য মুখর হই উঠিয়াছে। সোলমাছের কাঁটা ছাড়াইয়া আম দিয়া ঝোল রাঁধিবা প্রথাও সেকালে প্রচলিত ছিল। তেতুলসহ পাঁকাল মাছের টক কা খুব ভালবাসিতেন।

বৈষ্ণব কাব্যও ভোজন ও রন্ধনের বর্ণনায় পঞ্চমুখ। বাঙ্গালী স্ব বৈশিষ্ট্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। তাই, বাংলার-জীবনে আড়ম্বরে আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। শাক ও তেঁতুলপাতার ব্যঞ্জনে যে জাতি তৃপ্তি পাইত, সে জাতি আজ খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতেছে।

গ্রামোন্নয়নে শরৎচন্দ্রের “পণ্ডিতমশাই”

শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল

পল্লী প্রাণ আমাদের এই দেশ। পল্লীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, আমাদের আচার ব্যবহার। পশ্চিমের যান্ত্রিকতার ছোঁয়াচে আমাদের দেশে কিছু কিছু সহর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; তবু আজও বেশির ভাগ লোকই বাস করে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে। কিন্তু পল্লীর সে শান্ত-সৌম্য রূপ আর নেই। “ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়” বাংলার পল্লীগুলি আজ ধ্বংসের মুখে। গ্রামের দেবালয়, শিক্ষানিকেতন ভেঙে পড়েছে। লোকালয়গুলি একের পর এক নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, পথঘাট জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। সহরের “হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে” আমাদের চিত্ত ঝলসিয়ে উঠেছে। মরণোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আমরা ছুটে চলেছি নগরের বুকে। বার মাসে তের পার্বণে মুখরিত গ্রামগুলি পরিণত হয়েছে বন্যজন্তুর লীলানিকেতনে। এই সব ছেড়ে-আসা গ্রামে যারা বাস করে, তাদেরকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সংকীর্ণতা একেবারে পংগু করে রেখেছে। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কল্যাণ চাই, তা'হলে এই সব পরিত্যক্ত গ্রামগুলির উন্নতি সাধন সর্ব্বাগ্রে দরকার। বাংলার দরদী লেখক শরৎচন্দ্র একথা বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝেছিলেন। তাই পণ্ডিতমশায়ের মধ্যে দিয়ে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে পল্লীউন্নয়নের সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন;—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার। এই পল্লীর উন্নতি করতে হলে সব্বাগ্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন, একথা তিনি পণ্ডিতমশায়ে দেখিয়েছেন।

‘পণ্ডিতমশাই’ উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাহাদের সেবা করার মধ্যে তাহার জীবনের সাধনা। বাড়ল গ্রামের অধিবাসী বৃন্দাবন। গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে গ্রামে একটি পাঠশালা খোলে। তারপর বিনা বেতনে গ্রামের চাষীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে থাকে। আজকাল ডেনমার্কের লোকশিক্ষার যে মূলমন্ত্র “Each one to teach one” তারও পূর্ব্বাভাষ শরৎচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন। বৃন্দাবনের পাঠশালার প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিজ্ঞা ছিল, “প্রত্যেক ছাত্র বড় হয়ে অন্ততঃ দু'একটি ছাত্রকে লেখাপড়া শেখাবে।” বৃন্দাবনের একাজ যে নকল সেবাবিলাস নয়, এ যে তার আপন অন্তরের প্রেরণা, কেশবের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে থেকে সেটা ফুটে উঠেছে। কেশব ইংরাজী শিক্ষিত এম. এ, পাশ যুবক। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে সে তাদের গাঁয়ে একটি পাঠশালা খোলে। কেননা আজকাল একথা সবাই বুঝেছে যে—“যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত ইতর জনসাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যা কিছুই করা যাক না কেন নিছক পণ্ডশ্রম। যদি তারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় তবে আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে।” অথচ দুর্ভাগ্য কেশবের পাঠশালা ছাত্র জোটেনি। ইংরাজী শিক্ষায় আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক নতু তথ্য জেনেছি সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের “দেশ দেখা চোখ”-দুা হারিয়েছি। তাই দেশের সেবার জন্যে কেশবের ন্যায় উচ্চশিক্ষি হৃদয়বান যুবক যখন গ্রামে পাঠশালা খোলে তখন সেটা বন্ধ হয় ছাত্রে অভাবে। কেশবরা “মাটির সন্তানের” সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না “জীবনে জীবন যোগ” করতে পারে না। পল্লীর সকল সংস্কারকে তার ঘৃণা করে, ‘prejudice’ বলে উড়িয়ে দেয়, তাদের বিশ্বাস-সারলে আঘাত হানে। তাহলে গ্রামে পাঠশালা খোলা কেশবের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। “কেননা শুধু ভাল করার ইচ্ছা থাকলেই লোকের ভাল এবং দেশের কাজ করা যায় না।” বৃন্দাবনের কথায় “আমাদের ষোল আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জ্জন করে, আমাদের বাস স্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তাহলে কোন-দিনই আমরা বুঝতে পারব না তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থ ই আমাদের কল্যাণ হবে।” অশিক্ষিতের সঙ্গে শিক্ষিতের সম্পর্ক যদি আত্মীয়ের মত না হয়, মনিবের মত হয়—তাহ'লে অশিক্ষিতের দেবতা এই “অশ্রদ্ধার করুণা” “উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়াতে” মুখ ফেরান। একি শুধু বৃন্দাবনের মুখের কথা? আমরা জানি একথা শরৎচন্দ্রের প্রাণের কথা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলেছেন, “শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। রামা কিভাবে দিন যাপন করে, তার কি অসুখ—তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। সাহেবরা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন নদের ফটিক-চাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্ তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার মনের ভিতরে যাহা আছে রামা ও রামার সেই গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শো—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না!”

আর এই পণ্ডিতমশায়ের উত্তরণ দেখি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সন্দীপন পাঠশালা”র সীতারামে। অপমান অনাদর অবজ্ঞা লাঞ্ছনা সব কিছু উপেক্ষা করে নীচ অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদানের কী ব্যাকুল আগ্রহ! অনেকবার সে হোঁচট খেয়েছে, অনেকেই তার জ্ঞানের বাতি নিভাতে চেষ্টিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়ে নি।

বৃন্দাবন শুধু অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। তাদের বিপদের দিনে তাদের পাশে ছুটে গিয়ে তাদের দুঃখের শরিক হয়েছে। ওলাওঠার ন্যায় ভাষণ মহামারীর দিনেও বৃন্দাবন নিজের

জীবন বিপন্ন করে, প্রাণপ্রতিম পুত্রের কথা চিন্তা না করেই আর্তের সেবা করেছে। এ কেবল সম্ভব হয়েছে বৃন্দাবনের পক্ষে মানুষের জীবনের অসীম দুঃখ দৈন্যে এক মানবিক মমত্ববোধের তাড়নায়। এই ওলা-ওঠাকে কেন্দ্র করেই পণ্ডিত মশায় আমাদের দৃষ্টি ফেরায় বাংলার পল্লী-সমাজের এক দুষিত ক্ষতের দিকে :—পল্লীজীবনের অনুদার স্বার্থপরতা ষড়যন্ত্রপরতা প্রীতিহীন উপলব্ধিহীন ধর্মনিষ্ঠার দিকে। ধর্ম যদি বাইরের আচার-সর্বস্ব হয়, তবে সে ধর্মের পরিণতি ধর্মহীন নিষ্ঠুরতায়। তারিণী চাটুজ্যে, ঘোষালেরা অতিশয় নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ। সংকীর্ণতা নিষ্ঠুরতা ব্রাহ্মণ্যের মর্যাদাবোধ এদের অমানুষ করে। এরা স্বার্থান্বেষী। বৃন্দাবনের অবস্থায় ঈর্ষান্বিত। কাজেই এদের ষড়যন্ত্রে বৃন্দাবনের পুত্র যদি অচিকিৎ-সায় মারা যায় তা'হলে আর আশ্চর্যের কী আছে? যে সমাজে "আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃ পথ"কে গ্রাস করেছে, সে সমাজের উপযুক্ত কীর্তিই বটে! বৃন্দাবন যখন কাঁদতে কাঁদতে তারিণীর পায়ের উপর এসে পড়ল তখন সে "লাথি মারিয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিল 'সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করিনে—কেমন ফলল কি না! নির্বংশ হলি কিনা' !"...এই বলে "ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্বশরবিদ্ধ ভূপতিত জন্তুটার মৃত্যু যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।" বৃন্দাবনের কান্না শুনে তারিণীর স্ত্রী ছুটে এসে বলল. "ছি ছি এমন অধর্মের কাজ করো না। যা হবার হয়েছে,' —নাবালক শিশু, বলে দাও গোপালকে ওষুধ দিক।" তারিণীর স্ত্রীর মধ্যে দেখি আমরা স্নেহময়ী জননীকে। আমাদের সমাজ হয়ত শুকিয়ে যেত, যদি না এদের পাশে তারিণীর স্ত্রীরা থাকত।

আজও, পল্লীজীবনের সেই অবস্থা। গোপাল ডাক্তার তারিণী চাটুজ্যের দল আজও এদেশে আছে। তখনকার গোপাল ডাক্তাররা ছিল 'হাতুড়ে' তাদের সম্বল ছিল হাতযশ। তারা ছিল অমার্জিত তাই রূঢ় ব্যবহার, অর্থগৃধ্নুতা আত্মপ্রকাশ করত উলঙ্গরূপে। কিন্তু আজ-কালকার এইসব ডাক্তাররা শিক্ষিত। এরা পোশাকী। কপট মার্জিত ব্যবহারে এরা নিজেদের অর্থগৃধ্নুতাকে ঢেকে রাখে। ভিতরে ভিতরে এরা প্রত্যেকেই এক একটা গোপাল ডাক্তার, কি তারও বেশি।

গোপাল ডাক্তার ও তারিণী চাটুজ্যের ষড়যন্ত্রে চরণের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনের সামনে এক অজানিত নতুন জগতের রুদ্ধ-দ্বার খুলে গেল। ঈশ্বরের মহিমা তার মনে নতুন করে দেখা দিল, বিশ্ববোধ জাগল। এক চরণকে হারিয়ে সকল শিশুর মুখে চরণকে দেখার সুযোগ হল। যে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর ইতর অনুদার অপ্রত্যাশিত আক্রমণে তার চিত্ত-সংযম বিনষ্ট হয়েছিল একবার, আজ চরণের মৃতদেহ সৎকার করার পরেও তার চিত্তের সংযম অবিচলিত রহিল। তাই বাল্যবন্ধু কেশব যখন ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে উদ্ধতভাবে এই সব ব্রাহ্মণদের "জোচ্চর" "হারামজাদা" "শয়তান" বলে বাক্যবানে জর্জরিত করতে থাকে তখনও দেখি বৃন্দাবনকে তার স্বাভাবিক অবস্থায়। বৃন্দাবন বলে "কেশব গোখরো সাপের খোলোষকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করা ভুল অজ্ঞান ব্রাহ্মণকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছে তাই বরং দেখ।" কিন্তু তবুও বৃন্দাবন মানুষ—দেবতা নয়। তাই মানুষের স্খলন পতন দুর্বলতা তার মধ্যে আছে। এত কথা বলার পরও যখন তার মধ্যে চরণের কথা জেগে উঠে তখন সে আর চিত্ত সংযম রাখতে পারে না। কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠা বোবা কান্না তার উৎসের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। যে গৃহের কক্ষে কক্ষে তার চরণের স্মৃতি বর্তমান সে গৃহে বৃন্দাবন থাকতে চায় না। কিন্তু এ গৃহত্যাগ সন্ন্যাস নয়, আপনার আদর্শ থেকে পলায়ন নয়। তিনি আবার অন্য জায়গায় পাঠশালা খোলার সঙ্কল্প করেন। গৃহ ত্যাগের সময় তার সমস্ত সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করে তুলে দেন কেশবের হাতে নলকূপ স্থাপনের জন্যে। কেশবকে বলে, "এইটি করো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এরও ভার যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোন দিন ফিরে আসি যেন দেখতে পাই আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিন শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।"

আর কেশব যখন এই সব ভার বইতে রাজি হয়, তখন উপলব্ধি করি বৃন্দাবনের সাহচর্যে তার হৃদয়ের পরিবর্তন। কেশবের কাছে প্রথমে যা ছিল সেবা-বিলাস. বৃন্দাবনের সাহচর্যে সেটা হল তার অন্তরের জিনিস। কেশব তখন কলেজের প্রফেসারী ছেড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালায় আত্মনিয়োগ করে। বৃন্দাবনের সাহচর্যে কেশব মানুষ হবার সুযোগ পায়।

আজ স্বাধীন ভারতে পল্লীর পুনর্গঠনের দিনে দেশের জননী-হৃদয়ের অশ্রান্ত ক্রন্দনে অনেকেরই মোহভঙ্গ ঘটেছে, অনেকেই পল্লীর কথা চিন্তা করছে 'Go back to village' মন্ত্রে অনেকে পল্লীতে ফিরছেনও। তবুও কোথায় যেন গলদ থেকে গেছে—যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে। 'কর্মে ও কথায়' তাদের অনেকেই পল্লীবাসীর "সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করতে পারছে না। বোধ হয় তাদের জীবনের মূল সুর পণ্ডিত-মশায়ে'র সুরে বাঁধা পড়েনি। আমরা যারা পণ্ডিতমশায়ের সগোত্র, পণ্ডিতমশায়ের পরীক্ষিত পথেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমরা সমাজের পুরোভাগে দাঁড়াব। আমরাই হব জাতীয় জীবনের পথপ্রদর্শক। সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার গড়ে তুলব নতুন সমাজ। হীন দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা মুছে দিয়ে পল্লীর ঘরে ঘরে আমরা রোপন করব বলিষ্ঠ সমাজ চেতনা। একমাত্র এ পথেই আছে জীর্ণপ্রায় সমাজের বহুমুখী সমস্যার সমাধান —নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তাই এই পথের যাত্রী যতই বাড়তে থাকবে ততই মঙ্গল।

বাংলার আদি-মহাকবি কৃত্তিবাস ও রামায়ণ

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

চতুর্দশ শতকের শেষভাগ। বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সত্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্নতার ব্যাপক ভাঙন। বৌদ্ধযুগ, জ্ঞান-মার্গ আর ব্রহ্মণ্যবাদের ক্ষীণ কলরব তখনও মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু বাঙ্গালীর অবদমিত জীবন-ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুর্বার ভাগীরথী-ধারা সমূহ বাধা-বিপত্তির উপলখণ্ডে বারংবার ভিন্নমুখী হলেও তথাপি কোন সময়ে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারেনি। যুগ-পলির প্রভাবে বাংলার কোমল মাটিতে তখন সৃজন-মনীষার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গ-ইতিহাসের মধ্যযুগের গৌরবোজ্জ্বল শুরুতে বাংলার কাব্য রসধারায় আবার ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখা দিয়েছিল। বিদগ্ধ বাংলার সাংস্কৃতিক মানসে একদিক দিয়ে বেজেছিল দেবভাষার সুললিত গীতি-গুঞ্জরণ, আর একদিকে কল্যাণপ্রসূ গ্রামীণ বাংলার নিজস্ব রূপটি বিচিত্র অথচ বিশিষ্ট রঙে রেখায় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। একদিকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মনে মনে কানাকানির আকুল-করা অশ্রুঝরা তান, অন্যদিকে লোক-চেতনাকে বাংলার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশে সুপরিস্ফুট করার জন্য কবি কৃত্তিবাসের অবিস্মরণীয় চিরন্তন দান।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে নদীয়া জেলার ফুলিয়া অঞ্চলে মহাকবি কৃত্তিবাসের আবির্ভাব ঘটে। সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাসে ফুলিয়ার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। ফুলিয়ার দুটি ধারা—একটি ধারা সাধক হরিদাস ঠাকুরের গঙ্গাতীরের ভজন-কুটির থেকে প্রবাহিত হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-অঙ্গনে গিয়ে বিস্তৃতি নিয়েছিল, আর একটি ধারা কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করে এককভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি ধারা খণ্ড-ছিন্ন বহুধাবিভক্ত জাতির জন্য নাম-প্রেমের অমৃতধারায় নিবিড় ঐক্য এনে দিল, আর একটি ধারা কর্তব্য ও মাধুর্যের এক চির-নূতন বিরাট উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে গড়া সনাতন বঙ্গ-মানসের ক্ষুধা-তৃষ্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার হয়ে রইল।

কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রাম থেকে ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে এসে বসবাস করেন। নৃসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভ-শ্বরের পুত্র মুরারি, মুরারির পৌত্র কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন শেষ করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গমন করেন। সেখানে প্রথমে তিনি রাজার প্রীত্যর্থে স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক দৌবারিকের মারফতে পাঠিয়ে দেন, পরে রাজাজ্ঞায় রাজসভায় উপস্থিত হয়ে আরও অনেক 'রসাল' শ্লোক পড়েন। মহারাজ তখন খুসি হয়ে তাঁর গলায় পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন। ওদিকে পরিষদমণ্ডলীর মধ্য থেকে "সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত। মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥" এদিকে "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ। রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ।" গৌড়েশ্বরের অভিনন্দন ও উচ্চকিত ধন্য-ধন্য-ধ্বনিমুখরিত সেদিনের সেই প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে বাংলার কীর্তিবাস মহাকবি কৃত্তিবাস তখন ফুলিয়ায় আপন কুটিরে ফিরে এলেন। ফুলিয়া তখন কাব্য সাধনার অভিনব পীঠভূমি।—সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অবিরাম কুলু কুলু ধ্বনি, উপরে সৌরকরোজ্জ্বল নীল আকাশ, বনকুসুমের সুরভি মেখে দক্ষিণের হাওয়া জাহ্নবী-জলে নানাভাবে তরঙ্গ তুলছে! বনস্পতির ছত্রছায়ার বসে বিভোল মহাকবি তখন বোধ হয় ক্ষণে ক্ষণে ত্রেতাযুগের স্বপ্ন দেখতেন, আর কবিলেখনীর অঙ্কন-স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালবৃন্তে ধরা দিত বঙ্গ-বাল্মীকির স্বপ্ন-সম্ভব সেই অভিনব বঙ্গ-জীবনবেদ। আনুমানিক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়। সূত্রপাতেই যার ধন্য ধন্য রব পড়েছিল, তার সেই সুদীর্ঘ প্রতি-ধ্বনির আজও বিরতি ঘটেনি।

লোকস্মৃতির কষ্টি-পাথরে কবির পরীক্ষা। মহাকবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নদী যেমন তার প্রলম্বিত প্রবাহ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল-সমূহকে উর্বর শস্যশ্যামল করে তোলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্পর্শে তেমনি নিখিল বাংলার মন-প্রাণ ভাব-সাধনা সমভাবে সজীব ও সচেতন হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ কবির মৌলিক মহাকাব্য বলা যেতে পারে। কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি, বরং তার থেকে মোটামুটি আখ্যানভাগ নিয়ে আপনি খুসিমাফিক শ্রেণী বিন্যাস পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে সেই সঙ্গে অদ্ভুত রামায়ণ ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নতুন নতুন বহু গল্প ও কাহিনী চয়ন করে সম্পূর্ণ নতুন-ভাবে তাঁর এই মহাকাব্য রচনা করেছেন। মূল রামায়ণে বীরবাহু-বধ—তরণীসেন বধ, অঙ্গদ রায়বার, রাক্ষসদের মুখে রামচন্দ্রের স্তুতিগান, শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন, মহীরাবণ আর অহিরাবণের কাহিনী প্রভৃতি নেই। কবি স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে অপরূপ শিল্প শৈলী দিয়ে বাংলার এক মৌলিক জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করে গেছেন। আত্মবৎ সেবা বলে একটা কথা আছে। কৃত্তিবাস বাঙালী, তাঁর রামায়ণে বাঙালিয়ানার ছাপ সুস্পষ্ট, আপন মানসপ্রতিমাকে সেখানে তিনি বাঙালী মনের নিখুঁত রঙে-রসে-স্বাদে-বর্ণে অনুপম করে গড়ে তুলে নিখিল বঙ্গজনের কাছে উপভোগ্য ও আস্বাদনীয় করে গিয়েছেন। রাম সীতা থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি চরিত্র সেখানে রক্তে-মাংসে জীবন্ত বাঙালির রূপ পেয়েছে। তাদের সামাজিক বৃত্তি, উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা, চাল-চলন, সংলাপ, আহার-বিহার, কলহ-কোন্দল এমন কি নারী-প্রকৃতিতেও বাঙালিয়ানা হুবহু মূর্ত হয়ে

উঠেছে। স্থান-কাল-পাত্রের কোন ব্যবধান রাখেননি কৃত্তিবাস। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রায় সর্বত্র বাংলার আবহাওয়া বয়ে গেছে—কি দণ্ডকারণ্য, কি লঙ্কার স্বর্ণপুরী, প্রয়োজনে সর্বত্র বাংলার ফল-ফুল ফলেছে, বাংলার জলের অভাব ঘটে নি; রক্ষ-যক্ষ-নর-বানর সুযোগ বুঝে সকলেই পর্যাপ্তভাবে বঙ্গীয় মসল্লা-গন্ধী নানাবিধ ব্যঞ্জন, পায়স-পিঠা, এমনকি সুপরিপুষ্ট মর্তমান কলাটি পর্যন্ত সানন্দে ভক্ষণ করেছে। রামায়ণ তাই বাংলার নিজস্ব সম্পদ, বাঙালী প্রতিটি চরিত্রকে পরমাত্মীয় করে নিতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তপোবনবাসী বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালার চালাঘরে পুনর্জন্ম হইয়াছে। মনে হয়—সীতাদেবীর মত বাঙ্গালার মাটি চিরিয়া এই রামায়ণী কথারও জন্ম হইয়াছে।... বাঙ্গালীর হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"

রামচন্দ্র নিঃসন্দেহে আদর্শ চরিত্রের বজ্র-কঠোর অথচ কুসুম-কোমল। দাম্পত্য আর ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, প্রজাপ্রীতি প্রভৃতি মহৎগুণসম্পন্ন মনুষ্যত্বের পূর্ণতম পরিচায়ক। মহাকাব্য রামায়ণ বিশ্বসাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ। তবুও সাহিত্যিক-রসসৃষ্টির সূক্ষ্মতম বিচার-বিবেচনায় কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র দোষেগুণে-গড়া পূর্ণতর মনুষ্যত্বের ভগবান, ভক্ত-বৎসল ভগবান। ভগবান হয়েও রাম তাই গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালী করেন। চরম সাম্যবাদের পরম সূচনা সেদিনই প্রথম ঘটে যায়। শবরীর তৃষ্ণা মেটে, বনের বানরও রামের প্রীতিতে ধন্য হয়, ভক্তিতে বীর হনুমান হয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বিভীষণও ভক্ত—এমন কি, রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণ পরম শত্রু হয়েও রামের হাতে মরতে পেয়ে ধন্য মনে করেন নিজেকে। রামায়ণের মতে—এ সবই পাপীতাপীর উদ্ধারলীলা, নিয়তির অমোঘ বিধান। অতএব, অদৃষ্টবাদী বাঙালীর হাতে ভগবান রামচন্দ্রের অশ্রুপাত ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ, ইতিপূর্বেই নির্বিরোধী গুণ-গ্রাহী স্বভাব-ভক্ত বাঙালী কবির লেখনীতে বাল্মীকির রামের সমস্ত কাঠিন্য ও স্থানে-স্থানের রূঢ় সংলাপ একেবারে বাদ পড়ে গিয়েছে। ভগবান তাই হয়েছেন (কাঠিন্য) সুখ-দুঃখে ব্যথার ব্যথী। লোকাপবাদের ভয়ে তাঁকেও আপন পত্নী বিসর্জন দিতে হয়েছে।

নারী-চরিত্রেও পার্থক্য সুপরিস্ফুট। বাল্মীকির সীতা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনী দর্পিতা ক্ষত্রিয়রমণী। কৃত্তিবাসের সীতা জনমদুখিনী ভয়াতুরা অশ্রুসম্বলা সনাতন বঙ্গললনা। প্রমীলা-সরমা-মন্দোদরীকে চিনতে খুব বেশী কষ্ট হয় না, সন্তানহারা নিকষা তো বাঙালীর চিরপরিচিতা অতি-বৃদ্ধা ঠাকুমা।

বাল্মীকি বা তুলসীদাসের রামায়ণে কুরুচিও অশ্লীলতার বিশেষ বর্ণনা নেই, কিন্তু বাঙালী কবির কাব্যে তা সরস ও মুখর হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বাঙালী শুধুমাত্র লেখনীর মাধ্যমে তার চির-আশার স্বর্ণলঙ্কায় অবাধ ও অপ্রতিহতগতিতে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণপুরী গড়ে ফেলেছে। অর্থকোষ রিক্ত হলে কি হবে, মনের কোষ তোষাখানায় কানায় কানায় ভরা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এমনি নানাভাবে যুগ যুগ ধরে বাঙালীর সমাজ জীবনে নিবিড় করে জড়িয়ে আছে। বহু নাটক, যাত্রা, পাঁচালী, পালাগান, কথকতা, কবিয়ালি-তরজা প্রভৃতি কৃত্তিবাস-রচনাকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে। মহাকবি শ্রীমধুসূদনও তাঁর কাব্যের অধিকাংশ উপাদান এর থেকেই আহরণ করেছেন।

আজকালকার বুদ্ধিজীবী-মহলে 'গণসাহিত্য' কথাটি বহুল পরিমাণে চালু হয়েছে। সাহিত্যে ও এ-নিয়ে বহু দলাদলি, ব্যাপক ভাগাভাগি। বামসাহিত্য ডানসাহিত্য পরস্পরে কামড়া-কামড়ি শুরু করেছে।

সাহিত্যের চিরন্তন সংজ্ঞায় ডাইনে-বামের কোন ঠেলাঠেলি চলে না। গণসাহিত্য বলে যদি প্রকৃতই কিছু থেকে থাকে তো, তার সূত্রপাত কৃত্তিবাসী রামায়ণেই প্রথম ঘটেছিল। বঙ্গীয় বৈঠকখানা ও আটচালার আসর থেকে শুরু করে ছিবাস মুদীদের দোকানের টিমটিমে লণ্ঠনের তলায় পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে প্রসারিত হয়েছে এই জন্ম জন্মান্তরের রামায়ণী ট্র্যাডিশান। শিশু আর কিশোরদলও সেই রামায়ণী এ্যাড্‌ভেঞ্চার শুনে উত্তেজনা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কৃত্তিবাস 'গণ'-স্রষ্টা, রামায়ণ তাঁর 'গণ-সাহিত্য'।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুরীন দেখল, শাশুড়ি জামাইয়ে মিলবে ভাল। শৈল-দিদিও যেমন পাগল, অভয়ও তেমনি আর এক পাগল।

শৈলকে চেনে সে অনেকদিন। অভয়কেও চিনেছে ভালো। অবশ্য তফাৎ একটু থাকবেই। কেন না, দুজনের জীবনধারার রীতিনীতি আলাদা ছিল। অভয় যত সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, আবার ওত সহজেই আর একজনকে আঘাত করতে পারে। নইলে শরৎ সাঁতরাকে ও-ভাবে মারতে পারতনা। সংসারের ঘোরপ্যাচ জানে না এখনো অভয়। অভাবকে চেনে, ক্ষুধা কাকে বলে সেটা বোঝে মর্মে মর্মে। কিন্তু সংসারের সেইটাই সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। সংসারের আর একটি বড় পরিচয়, অভয়ের গানের আসর। ওকে বলে ঘোর-প্যাচ। নদীতে স্রোত আছে, ঢেউ আছে, সেটা এক কথা। তা' ছাড়াও আছে দহ এবং ঘূর্ণী। নদীর সুদীর্ঘ পথে সে যে কোথায় ওৎপেতে আছে তার হিংস্র থাবা বাড়িয়ে, আচমকা ঘাড় মুচড়ে মারার জন্যে, সেটা ঠাহর করা বড় কঠিন। তেমন পাকা মাঝির অভাব।

ওই দহ আর ঘূর্ণীর মতো মানুষের মন। আসল ঘোর প্যাচটা ওইখানে। লোকে খাটিয়ে নিয়ে খেতে দেয়না, সেটা অভয় বোঝে। সাঁতরা-কবিয়ালের মন বোঝে নি অভয়, তাই মেরে বসেছে। তার গুরু নিতাই ভটচাজের ওপর অভিমান করে তাড়ি গিলে ফেলেছে অমন ঢক্ ঢক্ করে।

প্রাণের বশে চলে অভয়, বুদ্ধির বশে চলে না। এসব মানুষ জীবনভর দুঃখ পায়। কেননা, এরা প্রাণ খুলে হাসে, কাঁদেও প্রাণ উজাড় করে। ঘৃণা করে রুদ্র হ'য়ে, ভালবাসে গোলামের মতো। সেজন্যে এরা শত অভাবের মধ্যেও দুটি পয়সা জমিয়ে, এক চিমটি জমি কেনার কথা ভাবে না। সেই সময়টা বসে বসে গান বাঁধে।

সেদিক থেকে বলা যায়, অভয়ের জীবন নতুন করে শুরু হ'তে যাচ্ছে।

অভয়ের সঙ্গে শৈলবালারও একরকমের মিল রয়েছে। বলতে গেলে অভয়কে যে শৈলবালার জামাই করার চিন্তা মাথায় এসেছিল সুরীনের, তাও বোধহয় সেই কারণেই।

ভামিনীর আগে শৈলবালার সঙ্গে সুরীনের চেনা-শোনা। আজ সে প্রকৃত ঘাটে এসে উঠেছে কিনা বোঝে না। বছর বাইশ আগে সুরীনের জীবন তখনো পুরোপুরি অঘাটে ঘুরে মরছিল। রোজগার করে বটে, মন বসাবার ঘর নেই। জোয়ান বয়স, রক্তের টানেই যেত শহরের বারোবাসরে। সরকারী কার্ড নিয়ে শৈলবালা তখন দেহের ব্যবসা করে। বয়স তখন শৈলর বাইশ-চব্বিশের মতো।

এই যে বসে বসে শৈল এখন প্যাচাল পাড়ছে, দেখে মনে হয়, আজো সেই শৈলই বসে আছে যেন। আগের তুলনায় মোটা হয়েছে বটে। বয়সও হল পয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। কিন্তু কটা রংটি আছে ঠিক। চোখ দুটি তেমনি ছেলেমানুষের হারিয়ে যাওয়ার মতো দিশেহারা। তার মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ের আবেশ মাখানো চোখে। ভামিনীদের মতো কোনদিনই তাকে বারোবাসরের মদমত্তা নাগরী বলে মনে হতো না।

যৌবনের অভাব ছিল না তার শরীরে। শেষপ্রান্তে

এসে আজো যেন সেই যৌবন না-ছোড়বান্দা। মেয়েমাহুষের প্রতি যে-পুরুষের স্বভাব-টান আছে, তারা এখনো শৈলবালার কাছে কাছে ঘোরে। কিন্তু তখন এবং এখন, সব সময়েই একটি গৃহস্থ আটপৌরে মেয়ের মতো মনে হয় তাকে। ছিটে-ফোঁটা রূপের সঙ্গে যৌবন যে তার ছিল, সে-বিষয়ে সে কেমন যেন বরাবরই অচেতন। কিংবা বেশী সচেতন, তাই রেয়াৎ করেনি। কিন্তু সেটা মনে হয় না তাকে দেখে।

দেহ বিক্রী করতে এসে, সোহাগ কেড়ে দাম বাড়াবার ছলনাটা রীতি। শৈলবালার সেটাও রপ্ত ছিল না। সবাই তাকে বোকা মেয়েমানুষ বলেই জানত। বাড়িউলী বলত, সাজগোজ করেও তুই দেখছি একটা মড়া। কে কত দাম দেয়, তোর সময় কাড়ে, সেটাও আন্দাজ পাস্‌নে। মিছিমিছি এ রাস্তায় আসা কেন বাপু।

কথাটা মিথ্যে নয়। শৈলকে দেহোপজীবিনী হিসেবে মনে হয়, বোধশোধ নেই যেন। এ জীবনে আনন্দ না থাক, নিরানন্দ থাকার কথা। শৈলকে দেখে সেটুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য ছিল।

সুরীন যেদিন প্রথম তার ঘরে গিয়েছিল, সেইদিন ফিরে যাবার সময় শৈল তাকে বলেছিল, আবার এস দাদা।

কথাটি শৈল সবাইকেই বলত। খুবই যান্ত্রিক ভাবে বলত। বোঝা যেত, কথাটি শিখানো। এমনিতেই কেমন যেন সুরীনের খাপছাড়া লাগছিল মেয়েটিকে। কথা শুনে তার মেজাজটাই গিয়েছিল বদলে। মনে হয়েছিল রাতটা ব্যর্থ গেছে তার। কিন্তু রাগ করতে পারে নি। শৈলকে ভাল লেগেছিল তার।

তবে শৈলর জন্য একদল মানুষ সব সময় উৎসুক ছিল। তাদের মধ্যেই একজন শৈলকে বেশ্যালয়ের বাইরে নিয়ে এসেছিল। বেশীদূর নয়, পাড়ার কাছেই আলাদা একটু জমি কিনে, ছিটেবেড়ার একখানি ঘর তুলে দিয়েছিল। তারপরে শৈলর মেয়ে হল।

যে শৈলকে ঘর দিয়েছিল, সে মারা গেছে। তারপরে দু' চারজন বাস করে গেছে শৈলর সঙ্গে। কিন্তু শৈল বড় বিচিত্র রূপে বদলে গিয়েছিল। মেয়ে হওয়ার পর সেই প্রথম টের পাওয়া গেল, শৈলবালার মধ্যে একটি সুষ্ঠু, নিয়ে সে প্রথমে পালাবে ভেবেছিল। কিন্তু পেট বড় দায়। পালাতে পারেনি, কিন্তু মেয়ে আগলানো তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

বারো-বাসরের পাড়ার ধারে বাস। বড়দের দেখে, ছোটদের অনুকরণের খেলা একটি অদৃশ্য কলকাঠির কারবার। শৈলর মেয়ে নিমি, ছোটকালে অনুকরণ করত। যদিও সেটা খেলা। দিবারাত্রি বাস, কখন কোন্ ফাঁকে কি দেখেছে। সেইটুকু সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেছে। নিজে উনুনের ছাইয়ের পাউডার মেখেছে মুখে, কাজল দিয়েছে চোখে, শৈলর দশহাত শাড়ি জড়িয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। সমবয়সী বন্ধুকে বলেছে, আমি যেন আনি মাসী, তুই এসে আমাকে বলবি, কি গো সই। চল ঘরে যাই।

টের পেয়ে শৈলর বুক কেঁপে ঝনঝনিয়ে উঠেছে। ছুটে এসে মেয়েকে মেরেছে ঠাস্ ঠাস্ করে, হারামজাদী, বজ্জাত, বড় সাধ হয়েছে, না?

নিমি কেঁদেছে পা ছড়িয়ে বসে। আশেপাশের আধা-গৃহস্থ প্রতিবেশিনীরা ঠোঁট উল্টে হেসেছে, মাগীর রকম দেখে মরে যাই। বলে মেয়ের রক্তের মধ্যে বেবুশ্যের বাস। উনি তাকে সতী-সাবিত্রী করতে যাচ্ছেন।

সেইটাই বিস্ময়। সেই শৈলবালা যে এই কারণে মেয়েকে শাসন করতে পারে, গালাগাল দিতে পারে, বিশ্বাস হয়না। বাড়িউলী যাকে মরা বলত, তার মধ্যে যে সহসা একদিন এমনি করে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে, আগে ভাবা যেত না।

আগে শৈল কথা বলতে পারত না। এখন বলে। শুধু বলে না, বড় আশ্চর্য সব কথা বলে। কথা শুনলে মনে হয় না, দীর্ঘজীবন কেটেছে তার পতিতালয়ে। যেন চিরদিনই সে এমনি নিমির মা ছিল। তাকে নিয়েই জীবনের যত ওঠা নামা ছিল তার। কোথা থেকে সে এসেছিল, কেউ জানত না। আঠারো উনিশ বছরের একটি ভীরু মেয়েকে এক আধ-বুড়ো বিক্রী করে দিয়ে গিয়েছিল বাড়িউলীর কাছে। সে-বছরটা বাংলাদেশে অজন্মার কাল গিয়েছিল। এ যুদ্ধের মড়কটা হয় তো বেশী হয়েছে। কিন্তু দু' তিন বছর অন্তর দর বাংলায় আকাল

বাড়িউলী তার ভাবসাব দেখে প্রথমেই ফেলে দিয়েছিল তাকে কয়েকটি পুরুষের হাতে। মানুষ বুঝে নানান রকমের ওষুধের ব্যবহার ছিল, আছেও এই আধুনিক জীবনের ভয়াল হিংস্র অন্ধকারে। ঘন ঘন অজ্ঞান হত তখন শৈল। কোন কোনদিন জ্ঞান একেবারেই থাকত না। কঙ্কালসার হয়ে উঠেছিল শৈল।

তারপরে শৈল বারোবাসরের উপযুক্ত হয়েছিল। ফিরেও পেয়েছিল স্বাস্থ্য। সুতরাং কোনকালেই বোঝা যায় নি, কোনদিন তার বোধবুদ্ধি ছিল কিনা। বোঝা গেল নিমির জন্মের পর।

বছর কয়েক আগেও লোকজন এসেছে তার কাছে। মদ ভাং খেয়ে নেশা ক'রে এসেছে। কিন্তু জেনেই এসেছে, শৈলবালার ঘরে ঠাঁই পাওয়া যাবে না। নতুন বাড়িতে আসার এই উনিশ কুড়ি বছর, যে কজনা এসেছে, তারা গৃহস্থের মতো বাস করে গেছে শৈলর সঙ্গে। নিমি তাদের প্রত্যেককেই ডেকেছে মেশো ব'লে।

এখনো শৈলর কাছে যারা ঘোরাফেরা করে, তাদের চাটু কথায় মাঝে মাঝে ভুলে যায়। সেটা জীবনের অভ্যাসও খানিকটা। শুধু মেয়ের দিকে কেউ ফিরে চাইলেই সে রুদ্রাণী মূর্তি ধরে। সুরীন দেখেছে, শৈলদিদির ঠকবার কপাল। ভালোমানুষি কোনকালেই গেলনা। যখন যেটুকু পারে লোকের করে। সেদিক থেকে শৈলও প্রাণের বশেই চলে। মেয়েকে যে রক্ষা করে, সেটুকুও প্রাণের বশেই। নিমির যে ক্ষতি করতে চায়, তাকে ছিঁড়ে খাবে শৈল।

কিন্তু নিমির জন্ম এখানে, এখানেই সে বড় হয়েছে। এই আধা-গৃহস্থ আর পাশের বারবধূ-পাড়ার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে সে। তার চরিত্রে সেসব কিছু কাজ করেছে বৈকি।

তা' ছাড়া মেয়ে আগলানোও এখানে বড় সহজ নয়। যেন শেয়ালের মুখে হাঁস মুরগী-ছানা ছেড়ে রাখার মতো। কখন কোন্ ফাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় সেই ভাবনা। ঘরে থাকলে, বাইরে শিস্ দিয়ে ডাকে, নাম ধ'রে গান গায়। আড়াল আবডাল পেলে তো কথাই নেই। ডাকে হাতছানি দিয়ে। সেই ভয় সবসময় ফুঁসে উঠে বলে, অমন করবি তো বেরিয়ে যাব ঘর থেকে।

—কোথায় যাবি?

—যাব, পাড়ায় গিয়ে দাঁড়াব বলে দিলুম।

অর্থাৎ বারোবাসরের বারোবধূদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে। নিমি জানত, ওইটি শৈলর সবচেয়ে বড় রাগ, বড় দুর্বলতার জায়গা। শোধ তুলতে হলে, মা'কে শাস্তি দেওয়ার ওর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

মারতে গিয়েও শৈলর হাত পা কেঁপে যায়। মাথা ঘোরে, উঠোনে পড়ে দাপায়। নিমি শোধ নিয়ে ঠাণ্ডা হয়। শৈলকে ধরে তোলে। বুকে করে তুলে মা'কে আদর করে বলে, মুখপুড়ি, আর লাগবি আমার পেছুতে? এখন চ' খাবি, রান্না করেছি। নইলে ভাল হবেনা।

যেমন জায়গায় মানুষ, যেরকম মেশামেশি, তাদের হাসি কান্না ঝগড়ায় সেটা না ফুটে পারেনা। কিন্তু মন ব'লে জিনিষ। সেটা ঠিক থাকলেই হল। সেইটুকু ভরসা নিমির উপরে। বড় যে রূপসী হ'য়ে উঠেছে।

যত বয়স হয়েছে, ততই নিমির রূপ ফুটেছে। ভাল খাইয়ে পরিয়ে আর দশটা মায়ের মতোই নিমিকে বড় করেছে শৈল। কেন? না, মেয়েকে ভালো হাতে তুলে দিতে হবে।

ভামিনীকে নিয়ে সুরীনও অনেকদিনের বাসিন্দা এখানে। শৈলর সঙ্গে দাদা-দিদি সম্পর্কটা তাদের প্রথম দিন থেকেই।

সুরীনকে বারবার বলেছে শৈল, সুরীনদাদা, আমার নিমির মতন ছেলেও তো সংসারে জন্মায়। দেখছি, আশেপাশে তাদের বে'থাও হচ্ছে। আমার নিমির তোমরা একটা ব্যবস্থা করে দাও। নইলে, মেয়েটাকে খুন করা ছাড়া আমার মরা হয় না দাদা।

শুধু সুরীন নয়, অনেককে বলেছে শৈল। মেয়ে দশ বছরে পা দিতে না দিতে বলেছে। একটি ভাল ছেলে এনে দাও, জোয়ান ছেলে এনে দাও, জোয়ান ছেলে, এই মেয়ে আর ঘর যাতে রক্ষে করতে পারে, বার-টান যেন না থাকে।

অভয়কে এনেছে সুরীন। এর চেয়ে ভাল ছেলে আর

দেখা হ'তে না হ'তে শৈল এক রাশ কথা পেড়ে বসল অভয়ের কাছে। বলল, আমি বাবা সংসারের উচ্ছিষ্ট।

অভয় বলল, না মা, ওকি কথা। মা কখনো উচ্ছিষ্ট হয়।

অভয়ের কথা শোনে আর শৈলর চোখ ফেটে জল আসে।

—বাবা, আমার জীবনে অনেক দুঃখু, অনেক কথা। শেয়াল কুকুরেরও বাড়া। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগল বাবা!

—আমি বড় মন্দ গো মা, নিতান্ত নিধম।

বোধহয় অধমের এইটি পরিভাষা অভয়ের।

বোঝা গেল, অভয়কে খুবই ভাল লেগেছে শৈলর।

ভামিনী মুখ টিপে টিপে হাসছিল। শৈলর চেয়ে তার বয়স কিছু কম। চোখে মুখে সেই ছটা ধরে রাখবার প্রয়াস একটু যেন বেশী। হাসির মধ্যে মাঝে মাঝে তার রাগও হচ্ছিল। ভ্রূ দুটি এঁকেবেঁকে উঠছিল। কেন যেন প্রাণের এক গহন দেশে তার জ্বলছিল চিন্‌চিন্ করে।

বেলা মাঝখান থেকে ঢল খেয়ে গেছে। সুরীন হেসে বলল, শৈলদিদি, এবার চান খাওয়া দাওয়া করতে হবে যে!

লাফ দিয়ে উঠল শৈল, ওমা! তাই তো গো। যাই ভাই, উঠি।

যেতে যেতে ফিরে বলল, শোন, শুনে যাও একবারটি সুরীনদাদা।

বাড়ির বাইরে এসে বলল শৈল ফিস্‌ফিস্ ক'রে, ও সুরীনদাদা এ যে আমার নিমির চেয়ে ভাল ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। কী সহবত, শান্ত।

সুরীন হেসে বলল, আজ কী বার সেটা দেখে কথা বল শৈলদিদি। পরে কি হয়, সেইটি দেখ।

শৈল বলল, তা' বটে। তা ভাই, তোমার দুটি হাতে ধরি, ছেলেটার একটা কাজকর্ম জোগাড় করে দাও তোমাদের কলে।

সুরান বলল, নিশ্চয় দেব। আমাদের কলে না হয়, এখানকার কারখানার ম্যানেজারও আমার চেনা মানুষ। সে তুমি ভেবনা।

শৈল হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে চলে গেল।

ক্রমশঃ

শান্তিপুরে শিকার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস

স্বাস্থ্য চচ্চায় আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই। সুনামও অর্জ্জন করেছি যথেষ্ট। সেই শান্তিপুরের বিখ্যাত ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান মহাবীর ব্যায়ামাগারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের যোগাযোগ। সেখানে প্রায়ই শুনতে পাই, চাষাদের গরু একটি একটি করে মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে একদল ভাগ্যহত মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে শহরের প্রান্তে—ষ্টেশনের প্রথম গুমটি ঘরের কাছে। আর তারপর থেকেই বারেবারে এমনটী ঘটছে। ক্ষতিগ্রস্ত গরীব চাষীদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে তাদের উপরেই। মনে একটু সন্দেহ জাগলো; তাঁদের অনুরোধ করলাম—আবার যদি কোনদিন কোন গরু নির্খোঁজ হয়—কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ীতে খবরটা যেন তাঁরা পৌঁছে দেন এবং আরও বললাম—যিনি যাবেন তাঁর যাতায়াতের খরচ আমিই দেবো।

ক'দিন পরেই খবর দিলেন শ্রীতারাপদ ঘোষ—ঐ ব্যায়ামাগারেরই খবর পাওয়ামাত্রই বন্দুকটি কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে 'নয়নতারা'। ডুলের সর্দ্দার নয়নতারা আজ নেই,—ডুলে সম্প্রদায়ের অখ্যাত এক বৃদ্ধ, কিন্তু এই শহরের অধিকাংশ শিকারীই তার কাছে ঋণী এবং প্রত্যেকেই Panthar, Leoperd ও বুনো শুয়োর শিকারের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারই কাছ হ'তে। জানোয়ারের গতিবিধি এবং চরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। বহু চিতা শিকার করে আজ আমার যতটুকু খ্যাতি, তা শুধু সম্ভব হয়েছে শিকার জীবনের শুরু থেকে সবল, নিরভিমান এই বৃদ্ধ নয়নতারার স্নেহ-সহযোগিতা এবং তার কাছ হ'তে পাওয়া নিপুণ শিক্ষার জন্যই।

শান্তিপুরে গিয়ে নিহত গরুটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের আর সন্দেহ রহিল না যে এটি ব্যাঘ্র কবলিত হয়েছিলো এবং বনের ভিতরের পায়ের ছাপ থেকে অনুমিত হ'ল বাঘ একটি নয় দু'টা। একটি বড়

আসবে আশা করে সেই রাত্রিতে ডালপালার আড়াল সৃষ্টি করে মাটিতেই অপেক্ষা করে রইলাম বন্দুক উঁচিয়ে তার অভ্যর্থনার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুগম্ভীর আওয়াজে সে আমাদের জানিয়ে দিল কাছাকাছি কোথাও সে আছে। রাত্রি তখন সবে একপ্রহর অতীত হয়েছে। আকস্মিক শব্দের আলোড়ন লক্ষ্য করে মনে হ'ল বাঘটা কিছুদূরে আর একটা গরু মারলো। আর অপেক্ষা করা বৃথা। নতুন শিকার ছেড়ে পুরোনোটির কাছে সে আসবে না। ফিরে এলাম সেদিনের মত। পরদিন সন্ধ্যায় আবার তার প্রতীক্ষায় গিয়ে বসলাম দ্বিতীয় দিনের গরুটিকে লক্ষ্য করে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, যখন বুঝলাম এইদিন রাত্রেও এটির কাছে না এসে সে আর একটি গরু মারলো আমাদেরই শ্রবণশক্তির পাল্লার মধ্যেই। এভাবে চেষ্টা করে ফল হবে না। চাষীর সম্পদ নিরীহ গরুগুলো একের পর এক নিহত হচ্ছে, আর আমি প্রহর গুণছি তার অসহায় সাক্ষী হয়ে।

কৃষ্ণনগর হতে এসেছি বাঘ শিকার করতে শান্তিপুরে। পৌর

সহযোগীগণসহ শিকারী শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস (চিহ্নিত)

এলাকার মধ্যে বাঘ। দু'দিনের ব্যর্থতা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল মুখরোচক গল্প হয়ে। একটুখানি উপহাস, কখনও বা টিটকারী উত্তাপ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে মনে। নিহত বাঘটিকে তাদের উপহার দেওয়াই এর একমাত্র উত্তর। সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠলো, মারতেই হবে একে, চতুরতায় আমাকে ছাড়িয়ে যায় সুতরাং শুধু কৌশলে নয়, কৌশল ও বল একত্রে। শিকার সঙ্গে না নিয়ে বাড়ী ফিরবো না। নয়নতারার মারফৎ খবর পাঠালাম শ্রদ্ধেয় অজিতদার (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) কাছে। শিকারীর অমন বন্ধু বুঝি নদীয়াতে আর নেই। তাঁর উৎসাহে, আয়োজনে তরুণ শিকারীরা একটি একটি করে বাঘ মেরেছে, আর অজিতদা যেন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করেছেন, এমনি তাঁর আনন্দ! নিজেও তিনি ভাল শিকারী। বাঘও মেরেছেন অনেক ; কিন্তু তরুণ শিকারীদের সুযোগ দিয়েই তাঁর আনন্দ। তাদের সব ব্যয়, আয়োজনের সব ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন স্বেচ্ছায়ও আনন্দে।

অজিতদাকে খবর দিয়ে নয়নতারা ফিরে এলো সকাল বেলাতেই। বেলা ১২টার মধ্যে অজিতদা আমার কাছে এসে পৌঁছালেন কয়েকজন বীটার (Beater) নিয়ে। তাদের সাথে চারটে কুকুর। আমাদের দেশী কুকুর—কিন্তু জঙ্গল বিট করে শিকার খুঁজে বার করতে—দুলে, বাগদী, সাঁওতালদের হাতে গড়ে ওঠা এই কুকুরের তুলনা নেই। কালবিলম্ব না করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শহরের প্রান্তে পৌর এলাকার মধ্যেই ছোট্ট একটি জঙ্গলে বাঘ। তবু নয়নতারা জঙ্গলের চারিদিক ঘুরে ভাল করে পরীক্ষা করে বললে, "বাঘ এই বনেই আছে।" জঙ্গলের মধ্যে বাঘের চলাচলের পথটা দেখে নিয়ে তারই উপান্তে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো অজিতদাকে। আর তাড়া খেয়ে সম্ভাব্য যেদিকে ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমনি একটা (Track) বাঘের যাতায়াতের রাস্তা বেছে নিয়ে আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। বীটিং (বনতাড়ানো) শুরু হয়ে গেল। নিস্তব্ধে অপেক্ষা করছি—দশ মিনিটের মধ্যেই অজিতদার বন্দুক থেকে আওয়াজ এলো, 'গুড়ুম'। বীটারদের হৈ হৈ থেমে গেল, —সব নিস্তব্ধ! তারপরই সমবেত কণ্ঠে সকল দিক হ'তে প্রশ্ন, "কি হোল?......"বাঘ মরেছে"—উল্লসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন অজিতদা।

বীটাররা আনন্দে বয়ে নিয়ে এলো বাঘটাকে জঙ্গল থেকে। অব্যর্থ লক্ষ্যের গুলি বাঘের ঘাড় বিদীর্ণ করেছে। শান্তিপুরের লোকেদেরও উপহাসের জবাব দিয়েছে। শহরের মানুষ বিস্মিত হয়ে জানলো—বাঘেরা বাস করছে তাদেরই মধ্যে বুঝিবা নাগরিকত্বেও দাবী নিয়ে।

শান্তিপুরের স্বর্গত জননেতা, পৌরাধিপতি শ্রীশশী খাঁ মহাশয় এসে অভিনন্দন জানালেন শিকারীর কৃতিত্বের জন্য। শহরের উপকণ্ঠের অধিবাসী চাষীদের যে উপকার হ'ল তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তাঁকে আমাদের আশঙ্কার কথা জানালাম—একটি বাঘ মারা পড়েছে কিন্তু আরও একটা রয়ে গেল এবং পায়ের ছাপ দেখে মনে হয় এটা আরও বড় ; এখন আমাদের উপর তাঁর বা অন্যান্য সকলের আস্থা এসেছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন এটিকেও মেরে যদি আমরা শহরকে এদিক থেকে নিঃশঙ্ক করতে পারি তাহ'লে তিনি শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের পুরস্কৃত করবেন। নিহত বাঘটিকে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরে এলাম। আবার পরদিনই শান্তিপুর থেকে অপরাহ্ণ বেলায় সংবাদ এনে দিলেন শ্রীতারাপদ ঘোষ—"বাঘে গত রাত্রেও আবার গরু মেরেছে—হাঁক ডাক করে ফিরেছে পল্লীর অভ্যন্তরে পথে পথে।" এর আগের বারেও সংবাদের বাহক ছিলেন ইনিই। সুতরাং নিঃসন্দেহে খাঁটী সংবাদ। সময়াভাবে এইদিন আর আয়োজন সম্ভব হ'ল না। পরদিন ২৮শে জুলাই ১৯৫৪ সাল। অজিতদা, আমি আর নয়নতারা সেই সমস্ত বীটারদের সঙ্গে নিয়ে ভোরবেলায় শান্তিপুরের ট্রেনে উঠে বসলাম। ষ্টেশনে নেমেই দেখি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আমাদের চারটে কুকুরের মধ্যে একটি—যেটি এর আগের বারে আমাদের সাথে এসেছিল কিন্তু আর ফেরেনি। হারিয়ে গেছে মনে করে তার জন্য আমাদের বড় দুঃখ ছিল! নিজের জিনিষ ফিরে পাওয়া—কিন্তু এ যেন আশার অতিরিক্ত পাওয়া, মন বলে দিল আজকের যাত্রায় এ আমাদের

বাঘের অনুমিত আবাসস্থলের কাছে গিয়ে যথারীতি পর্যাবেক্ষণের পর নয়নতারা আরেকটি অপেক্ষাকৃত বড় জঙ্গল দেখিয়ে দিয়ে জোরের সঙ্গেই জানালো—"বাঘ এই জঙ্গলে আছেই"। বীটিং এর সুবিধার জন্য জঙ্গলটিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রথম অংশ বীট করে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অপর অংশ বীট করা হবে। দেখা গেল নয়নতারা বড় বেশী 'সাবধানী'। জঙ্গলের প্রান্তে বীটিং যেখানে গিয়ে শেষ হবে এমনি একটি নির্দ্দিষ্টস্থানে (বাঘ যে রাস্তা দিয়ে যাবে) আমাকে বসিয়ে দিয়ে ডালপালা এনে আমাকে প্রায় অদৃশ্য করে ঢেকে দিল। ইসারায় দেখিয়ে দিলো—বাঘ কোন পথে আসতে পারে। অজিতদা বসলেন আমার থেকে আট দশ হাত দূরে আর একটি সম্ভাবনাময় স্থানে। বীটিং শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি বাঘ গুড়ি মেরে আমারই দিকে আর একটি রাস্তা ধরে আসছে—যে পথ দিয়ে তাকে আশা করেছিলাম বা নয়নতারা বলেছিল সে পথে নয়। তখন সে আমার কাছ হ'তে মাত্র দশ বার হাত দূরে। কিন্তু তখনও সে আমাকে দেখতে পায়নি। যেভাবে আমি বসেছিলাম তাতে বন্দুকটি বাম দিক থেকে আমার দেহের ডানদিকে এনে বামহাতে গুলি না চালালে লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয়। দু'হাতেই গুলি ছোঁড়া আমি অভ্যাস করেছি, কাজেই অসুবিধা আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার সেই সামান্য নড়ে ওঠাতেই বাঘের দৃষ্টি এসে পড়লো আমার উপরে। বাঘ সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমারই সম্মুখে মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে। নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, বন্দুকের ঘোড়া টিপলে প্রথম গুলি খেয়েই বাঘ লাফিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে এবং তার সেই মরণ কামড়ে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। আমি গুলি না করলেও প্রাণভয়ে সে আমাকে আক্রমণ করবে। মৃত্যুর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের—কয়েক সেকেণ্ডের। প্রথম যৌবন থেকেই শিকারে অভ্যস্ত, সঙ্কটের সম্মুখেও পড়েছি অনেকবার—তাই মানসিক দৃঢ়তা তখনও হারাইনি। ভয় হচ্ছে—জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি কিন্তু তবু স্নায়ুতন্ত্রী শিথিল হয়ে পড়েনি। বাঘ আর আমি এক সাথেই দেনা পাওনা চুকিয়ে দেব পৃথিবী থেকে সংকল্প স্থির করে ফেলেছি—গুলিও ছুড়বো হঠাৎ কুকুরের শব্দ "ঘেউ" "ঘেউ"। বাঘ ঘাড় ফিরিয়ে গতি পথ পরিবর্ত্তন করল অকস্মাৎ এবং অতিদ্রুত আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। এতক্ষণে অনুভব করলাম আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত। বীটারদের হাঁক ডাক ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এবার জানি বাঘ তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং আসতে হবে সেই পথেই যে পথে তাকে নয়নতারার কথামত অপেক্ষা করেছিলাম। নির্দ্দিষ্ট পথ লক্ষ্য করে আছি। পর মুহূর্ত্তেই দেখি বাঘ ছুটছে সেই পথেই তীব্রগতিতে। ঘোড়া টিপলাম। উল্টিয়ে পড়েই গর্জ্জন করে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বিপরীত দিকে সে উল্টিয়ে পড়লো। আবার গুলি করলাম। জানোয়ারটা তখনও ছটফট্ করছে, আর সেই সঙ্গে তার মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ। কুকুরটা এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপরে—সেই কুকুরটি যে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো শান্তিপুর ষ্টেশনে। মৃত্যু আর আমার মাঝখানে সংকীর্ণ ব্যবধানটুকু সে আজ করে তুলেছিল দুর্লঙ্ঘ্য! জীবন পণ রেখে আজকের এ খেলায় জিতে গেলাম। মানুষের চোখে অতি তুচ্ছ, কিন্তু পশুজগতে মানুষের অন্তরতম বন্ধু এই কুকুরটির জন্য।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক ভেঙ্গে পড়ল সেখানে। তাদের অনেক দুঃখের সঞ্চয় দিয়ে গড়া গোধন সম্পদের এতবড় শত্রুর নিধনে আজ তাদের আনন্দ আমাদের থেকেও বেশী। দল বেঁধে তারাই বাঘটিকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চললো পৌরসভার প্রাঙ্গণের দিকে তাদের প্রিয় পৌরাধিনায়ক শশীবাবুকে এই এই আনন্দের সংবাদ জানাতে। পথের দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষের ভীড়! একটি ব্যাঘ্র শিকারকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের এত উল্লাস এর আগে কখনও দেখিনি।

শহরের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে—তাকে দেখবার জন্য এমন কি স্কুল-কলেজ পর্য্যন্ত ছুটি হয়ে গেল—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসে ভীড় জমলো পৌরসভা প্রাঙ্গণে। তারা শুধু শিকার নয় শিকারীকেও দেখতে চায়। একটি চিতা শিকার, শিকার জগতের একটি সামান্য ঘটনা। অগণিত খ্যাতিমান শিকারীদের সাথে তুলনায় আমি নগণ্য তাই যার যোগ্য নই। সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এবং স্তুতিতে যখন বিব্রত এবং সঙ্কুচিত বোধ করছি, তখন লোকমুখে সংবাদ পেয়ে শশীবাবু তাঁর বাড়ী থেকে এসে পৌঁচেছেন এবং আমার সঙ্কোচের আড়াল ভেঙ্গে দিয়ে পরম স্নেহে তিনি একেবারে আমাকে সবার সামনে তুলে ধরলেন। সম্মান ও ফুলের মালা সেদিন আমার জন্য ছড়াছড়ি। আনন্দে তিনি ফিতে দিয়ে বাঘটিকে মাপলেন 'সাত ফুট আট ইঞ্চি'—নিহত হওয়ার প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মাপ নেওয়া হ'ল। চিতার মধ্যে একে অতিকায়দের অন্যতম বলা চলে।

ক'দিন পর আমন্ত্রণ পেলাম শ্রদ্ধেয় শশীবাবুর কাছ থেকে। তিনি এবং শান্তিপুর পৌরসভার সদস্যগণ আমাদের অভিনন্দন জানাবেন, একেবারে তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেতেই হোল—সঙ্গে অজিত-দা ও নয়নতারা, তাঁরাও নিমন্ত্রিত। রাণাঘাট, নবদ্বীপ এবং জেলার আরও নানা জায়গা হ'তে এসেছেন কত বিশিষ্ট মানুষ নিমন্ত্রিত হয়ে। সভাপতি হয়েছেন শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, সি—প্রধান অতিথি উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। নূতনভাবে তাঁদের সকলের স্নেহে ধন্য হলাম, নতুন শক্তি সঞ্চয় করলাম তাঁদের উৎসাহে। লজ্জানত শিরে তাঁদের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম। শশীবাবু আজ নেই, কিন্তু সেইদিন তাঁর দেওয়া উপহার The man-eating Leopard of Rudra Prayag এবং Theman-eater of Kumaun ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিকারী।

এই লেখা যে কোন শিকারীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য, বই দু'খানি আজও আমার কাছে তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

মধুকর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কোন অকূলের সিংহল হতে—
দিবস শেষে,
গ্রামের চেনা বন্দরেতে—
ভিড়লে এসে ?
বিপুল ধনের অধিকারী,
এলে মথি সুনীল বারি,
ধ্রুব-তারার ধ্রুব জ্যোতি—
ভালবেসে

২

এড়িয়ে এলে ভয়াল তুফান,
ক্ষণে ক্ষণে।
ক্ষয় ক্ষতি হবে লবণ জলের
রসাঞ্জনে।
জলনিধির মদোদ্ধত
ফেনিল ফণা অবনত।
এলে পরিপূর্ণ হয়ে
পণ্যধনে।

৩

রত্নাকরের বন্ধু তুমি
হে কালজয়ী,
চলো সুধার সন্ধানেতে
ভার যে বহি।
তোমায় ডাকে সুখের দ্বীপই
অকূল পাঠায় প্রণয় লিপি
ভাসন্ত এক স্বর্ণমরাল—
লও হে ক্ষয়ী।

৪

হে মধুকর, আশ্রয় মোর,
—মকর তরী,
তোমার ভাগ্য, ভাগ্য তোমার—
নিত্য স্মরি।
তুমি প্রলয় পয়োধিতে
পেতে পার আকাঙ্ক্ষিতে
কালিদহে কমল কানন
জাগাও, মরি!

৫

বিস্ময় এবং আনন্দের যে
নাইকো সীমা,
দেখা দিলেন তোমায়—কমল—
কামিনী মা
সেথাম্ভোজের পরিমলে
অটুট এবং অমর হলে
ম্লান হবে না কালের জলে
ওই মহিমা।

৬

হে মধুকর শক্তিধর হে
প্রণাম লহ,
উঠে বোমার জয়ধ্বনি
অহঃরহ।
জয়টিকা দেন চণ্ডী নিজে,
কমল দলে ভিড় করিছে
সুহৃদ আমার, অমৃতের—
হও বার্ত্তাবহ।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

দর্শকদের পছন্দমত না হলে সে চলচ্চিত্র যেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনা অর্থাৎ দর্শকদের পছন্দর উপরই চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও কতকাংশে যেমন নির্ভর করতে হয়, তেমনি দর্শকসাধারণের এই পছন্দকে উন্নত করার এক গুরু-দায়িত্বও স্বাভাবিক ভাবেই চলচ্চিত্র শিল্পের উপর নির্ভর করছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। সাধারণ দর্শকরা যে হাল্কা ধরণের অতিসাধারণ ছবির পক্ষপাতী সেরূপ ছবিই যদি চলচ্চিত্র পরিবেশকরা অনবরত পরি-বেশন করে যেতে থাকেন তাহলে দর্শকদের পছন্দ বা Taste-এর উন্নতি কোনও দিনই তো হবেই না, অধিকন্তু চিত্র-নির্ম্মাতাদের, বর্ত্তমানে কোনও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হলেও, ভবিষ্যতে যে তাঁদের সে ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। একই ধরণের, একই রকমের, একই ভাবধারার ছবি নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সু-অভিনয় সমৃদ্ধ হলেও অনবরত দেখতে দেখতে অতি-ধৈর্য্যশীল দর্শকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি একদিন ঘটবেই—আর সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে এই ধরণের ছবির আকর্ষণও—দেখা দেবে তখন চিত্র-ব্যবসায়ে আর্থিক সংকটও। তার ওপর সাধারণ ধরণের একঘেয়ে ছবি প্রস্তুত করতে করতে স্বাভাবিক নিয়মেই চিত্র-নির্ম্মাতা ও পরিচালকদেরও প্রগতিশীল মন ও মস্তিষ্কের অবনতি ঘটবে, তখন তাঁরা চেষ্টা করলেও নতুন কিছু দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন না,—পারবেন না উন্নত কিছু, প্রগতিবাদী কিছু দর্শকদের উপহার দিতে,—পারবেন না এই দ্রুতগামী জগতের সঙ্গে, এই প্রগতিশীল [illegible]

শ্রীমতী সবিতা চট্টোপাধ্যায়—রূপসজ্জার বাইরে সাধারণ বেশে। ফটো নির্ম্মল মল্লিক

উন্নত, অতি আধুনিক কলাকৌশলময় বিদেশী চিত্রের সঙ্গে তাল রেখে চলে দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে। পিছিয়ে পড়বেন তাঁরা,—তাঁদের শিল্প, তাঁদের ভাবধারা, তাঁদের মননশক্তি হয়ে পড়বে স্তব্ধ,—প্রাণবন্ত একটি শিল্প হয়ে পড়বে প্রাণহীন, স্তব্ধ। সেই সঙ্গে আসবে দর্শক সাধারণের মনেও একটা বিরক্তি, একটা অবসাদ,—একটা না পাওয়ার, না দেখার, না ভাবার অসোয়াস্তি। তাই চিত্র-নির্ম্মাতাদের বিশেষ করে চিত্র-পরিচালকদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের নির্ম্মিত প্রতিটি চিত্রের মধ্যে দিয়েই একটা নতুনত্বই শুধু যে আনবার চেষ্টা করবেন তা নয়, একটা ভাববার মতন, বোঝবার মতন, দেখবার মতন কিছু পরিবেশন করবার চেষ্টা যেন করেন। এতে সাধারণ দর্শকদের পছন্দের ও তার সঙ্গে মনের উন্নতিই যে শুধু হবে তা নয় দেশের ও জাতিরও যথেষ্ট উপকার হবে।

'চলন্তিক'-র মুক্তিপথে "মাধব" চিত্রের একটি দৃশ্যে পাহাড়ী সান্যাল ও ছবি বিশ্বাস

* * *

শ্রীঅরবিন্দের একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের জীবনী চিত্র প্রস্তুতের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা-র কাছ থেকে এই চিত্র নির্ম্মাণের অনুমতিও পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাপুরুষের জীবনী-চিত্র সু-পরিচালিত ও সু-অভিনীত হয়ে প্রকাশ পেলে দর্শকসমাজে যে শুধু আলোড়নই তুলবে তাই নয় সাধারণ দর্শকরা এর থেকে অনেক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারবেন।

* * *

সুবিখ্যাত শিশু নৃত্য-নাট্য "অবন্ পটুয়া"-র নির্ম্মাণ কার্য্য অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 'চিল্‌ড্রেন্স লিটল্ থিয়েটর' এই চিত্রের নির্ম্মাণ কার্যে সর্ব্বরকম সহযোগিতা করছেন বলে মনে হয় চিত্রটি সবিশেষ সাফল্যলাভ করবে।

* * *

'সান্‌রাইজ্ পিকচার্স'-এর নতুন গীতিমুখর ছবি "তানসেন"-এর মোহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। নবাগতা তন্দ্রা বর্ম্মণ ও অসীমকুমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। 'তানসেন' এর আগে হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরলোকগত ভারত-বিখ্যাত গায়ক সায়গলের কণ্ঠ-সঙ্গীতে সে চিত্রটি সমৃদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান চিত্রটিতে গানগুলি সু-গীত হলে আশা করা যায় ছবিটি উপভোগ্য হবে।

* * *

ভারতের পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারী চিত্র "Gotama, the Buddha" এডিনবার্গের চলচ্চিত্র উৎসবে শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে। ভগবান বুদ্ধের বাণী ও কাহিনী যদি নতুন করে এই চিত্রটির মাধ্যমে আবার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে সত্যই এই চিত্রটির নির্ম্মাণ সার্থক হবে।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

হলিউডের সরকারী খতিয়ান্ থেকে জানা যায় যে মার্কিন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৬ সালে ...

চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে ৪১টি চিত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তোলা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে মোট ২৪৬টি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল; আর এই ১৯৫৭ সালে ৩৬৫টিরও বেশী চিত্র তৈরী করা হবে।

* * *

"মেট্রো-গোল্ড্‌ইন্‌-মেয়ার" চিত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭-৫৮ সালে ছত্রিশটি চলচ্চিত্রের মুক্তিদান করবেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—"Raintree Country"—এলিজাবেথ্‌ টেলর ও মণ্টোগোমারী ক্লিফ্‌ট অভিনীত; "Something of Valne"—রক্‌ হাড্‌সন্‌ ও ডানা ওয়েণ্টার অভিনীত; "Silk Stockings"—ফ্রেড্‌ য়্যাস্‌টেয়ার্‌ ও সীড্‌ চেরিস্‌ অভিনীত এবং "The Little Hut"—এভা গাডনার ও ষ্টুয়াট গ্র্যাঞ্জার অভিনীত।

* * *

সি স্লিল-বি-ডিমিল্‌-এর বিখ্যাত চিত্র "Samson and Delilah"-তে ডেলাইলা চরিত্রে অভিনয়ের দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রূপময়ী অভিনেত্রী হেডী ল্যামার "ইউনিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনাল্‌"-এর "Hideaway House" নামক চলচ্চিত্রে আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।

* * *

পরলোকগত আগা খাঁর ভূতপূর্ব্ব পুত্রবধু স্বনামখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী রিটা হেওয়ার্ড কিছুকাল অবসর যাপনের পর 'কলম্বিয়া পিকচার্স'-এর "Pal Joey" নামক চিত্রে বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার সঙ্গে আবার অভিনয় করবেন।

* * * *

বিখ্যাত মার্কিণ অভিনেতা জন্‌ ওয়েন্‌ 'ইউনাইটেড্‌ আর্টিষ্ট'-এর "Legend of the Lost" নামক চিত্রে লাস্যময়ী ইতালীয়ান্‌ অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন্‌ এর সঙ্গে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

* * *

প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী জিঞ্জার রজার্স পঁচিশ বৎসরের অধিককাল চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আসছেন। এখন তাঁর বয়স ৪৭ হলেও এখনও তিনি নায়িকায় ভূমিকায় প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন। শ্রীমতী রজার্স তাঁর এই সুদীর্ঘ অভিনেত্রী জীবনের মধ্যে মাত্র চারবার বিবাহ করেছেন! কিন্তু এই চারিটি বিবাহের চতুর্থ স্বামীটিকে বিবাহের মাত্র চার বৎসর পরেই তিনি বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছেন,—চতুর্থ বিবাহের স্বামীটিকে চার বৎসরের বেশী আর ধরে রাখতে পারলেন না! বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে তাঁর ৩১ বৎসর বয়স্ক স্বামী ফরাসী অভিনেতা জ্যাকুইস্‌ বার্জেরাক অভিযোগ করেছেন যে হলিউডের পারিবারিক জীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ও নিস্পভ হয়ে উঠেছে। জ্যাকুইস-এর স্ত্রী

"মাধব" চিত্রের পরিচালক শ্রীসুধীর বন্ধু, সঙ্গীত প্রযোজক শ্রীদিলীপকুমার রায় ও সঙ্গীত সহযোগী ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী রজার্স ধূমপান ও মদ্যপান তো করেনই না উপরন্তু পার্টি ও জনসমাবেশে যাওয়া আসাও বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই চার বৎসর এই পান, ধূমপান ও পার্টি বিদ্বেষী নিষ্প্রাণ স্ত্রীর সঙ্গে হলিউডের মতন জায়গাতেও বৈচিত্র্যহীন দিন যাপন করবার পর ফরাসী সন্তান বার্জেরাককে বিদায় নিতে হল! অভিনেত্রী-স্ত্রীর এই পানদোষহীনতার জন্য বার্জেরাক তাঁকে ত্যাগ করলেন! বৈচিত্র্যপূর্ণ হলিউডের এটাও একটা বৈচিত্র্য!

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই নিয়ে তারা ৯ বার লীগ জয়ী হ'ল। শেষ লীগ জয়ী হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লীগ জয়ী হয়ে তারা প্রথম বিভাগে খেলা আরম্ভ করে ১৯৩৪ সালে এবং ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে যে অভূতপূর্ব্ব রেকর্ড স্থাপন করে তা আজ পর্য্যন্তও কোন দলেরই পক্ষে ভাগীদার হওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচ্য বছরের ২৬টা খেলার মধ্যে তারা ২টো খেলায় হেরে যায়, ওয়াড়ীর কাছে লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় ০-১ গোলে এবং ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ০-১ গোলে। ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে মহামেডান স্পোর্টিং দলের পরাজয়ের পর লীগ খেলা শেষের দিকে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় ফিরে আসে। তখন মহমেডান দলের ৩টে খেলা বাকি। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেতে হ'লে এই তিনটে খেলাতেই পুরো পয়েণ্ট নিতে হবে; একটা পয়েণ্ট নষ্ট হওয়া মানেই ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে পয়েণ্ট সমান করা আর তাদের হার হ'লে ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ জয়। ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে হেরে গিয়ে মনের বল অনেকখানি তারা হারিয়েছিল। সে দিন তাদের খেলার নমুনা দেখে অনেকেরই মনে সন্দেহ জেগেছিল তারা বাকি খেলাগুলিতে পুরো পয়েণ্ট পাবে কিনা। যাই হ'ক তারা শেষ পর্য্যন্ত দলের সমর্থকদের নিরাশ করেনি। লীগে রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, মহমেডান দলের থেকে তারা এক পয়েণ্ট কম পেয়েছে। ৩য় স্থানে রাজস্থান, ৩ পয়েণ্ট কম; আর ৪র্থ স্থানে মোহনবাগান ১০ পয়েণ্ট কম। গত তিন বছরের (১৯৫৪-৫৬) লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের এই শোচনীয় অবস্থা সমর্থকদের খুবই নিরাশ করেছে। মহমেডান দলের রেকর্ড ভাঙ্গার সুযোগ তারা যে এভাবে নষ্ট করবে তা কেউ ভাবেনি।

এবারের প্রথম বিভাগের খেলায় ৭টা হ্যাট-ট্রিক হয়েছে। দামুদরণ (রাজস্থান) দু'বার হ্যাট-ট্রিক করেন। একবার করে হ্যাট-ট্রিক করেছেন—পি কে ব্যানার্জি (রেলওয়ে স্পোর্টস), এস ঘোষ (ওয়াড়ী), কে সি পাত্র (হাওড়া ইউনিয়ান), সৈয়দ আমেদ (মহমেডান স্পোর্টিং) এবং চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান)।

প্রথম বিভাগ থেকে কোন দল এ বছর নামবে না—লীগ খেলার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়াতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক কমে যায়। এই নিয়ে কাগজে-কলমে ও লোকের মুখে মুখে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়ে গেছে। কাজটা খুবই অশোভন হয়েছে। ক'লকাতার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের উপর ফোর্ট অঞ্চলের ময়দানের কর্ত্তৃত্বভার রয়েছে; পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ভিন্ন আই এফ এ চ্যারিটি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করতে পারে না। এই চ্যারিটি ম্যাচ থেকে আই এফ এ-র মোটা লাভ। গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানো হয়; ফলে ক্লাবের সভ্যদের উপর আর্থিক চাপ পড়ে; ক্লাবের সভ্যদের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করা হয় না। তাদের বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই; ক্ষমতা আছে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের। লীগ প্রতিযোগিতায় পুলিশ ক্লাব এবং

স্পোর্টিং ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে নামা নিয়ে যখন প্রতিযোগিতা চলেছিল তখন ... জানা গেল এ বছরের মত লীগ খেলায় ... কোন দলকেই আর নামতে হবে না। স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে আই এফ এ-র বেতনভুক সম্পাদকের সম্পর্ক অনেকদিন থেকে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে খুশী করতে এবং স্নেহভাজন স্পোর্টিং ইউনিয়নকে নিরাপদ আশ্রয় দিতেই আই এফ এ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতার মাঝ-পথে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—জনসাধারণের এই অভিযোগের উত্তর আই এফ এ কর্তৃপক্ষ কি ভাবে দিবেন? একমাত্র 'ফ্লু' দোহাই টিকে কি?

কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতি-যোগিতায় সারে ক্রিকেট দল ১৯৫৭ সালের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে উপর্যুপরি ৬ বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। ২৩টা খেলায় সারে দল ২৫২ পয়েণ্ট করে।

ইংলণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ৪১২ (রিচার্ডসন ১০৭, গ্রেভনী ১৬৪; রামাধীন ১০৭ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৮৯ (লক ২৮ রানে ৫ এবং লেকার ৩৯ রানে ৩ উইকেট) ও ৮৬ (লক ২০ রানে ৬ এবং লেকার ৩৮ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৩৭ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলকে পরাজিত করেছে। মোট পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ইংলণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ২।

টসে জয়ী হয়ে ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করে। প্রথমদিন ৫টা উইকেট পড়ে ইংলণ্ডের ২৮৩ রান ওঠে। রিচার্ডসন ১০৭ রান করেন। গ্রেভনী সেঞ্চুরী ক'রে (১০৩ রান) নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪১২ রানে শেষ হয়। গ্রেভনী ১৬৪ রান করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি খেলার সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ১ম ইনিংস মাত্র ৮৯ রানে সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় দিন ৩২৩ রান পিছিয়ে থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ২½ ঘণ্টার খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের ২ ইনিংসের খেলা খতম হয়ে যায়; মাত্র ৮৬ রান ওঠে। ইংলণ্ডের বিপক্ষে এই রানই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন রান।

লকের বোলিংয়ের মুখে ওয়েষ্টইণ্ডিজ কাবু হয়ে পড়েছিল। লক্ ১ম ইনিংসে ২৮ রানে ৫ এবং ২য় ইনিংসে ২০ রানে ৬টা উইকেট পান।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের গড়পড়তা তালিকায় ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম স্থান পেয়েছেন গ্রেভনী—মোট রান ৪৭২, এভারেজ রান ১১৮·৪০। ২য় স্থানে আছেন অধিনায়ক পিটার মে, মোট রান ৪৮৯, এভারেজ রান ৯৭·৮০। ইংলণ্ডের সাতজন খেলোয়াড় ব্যাটিং গড়পড়তা তালিকায় পঞ্চাশ রানের ওপরে আছেন। বোলিংয়ে লোডার এবং লক্ যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান পেলেও ট্রুম্যানের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়। সিরিজে (তিনটে ইনিংস ইংলণ্ড খেলেনি) ট্রুম্যান সর্ব্বাধিক উইকেট (২২টা) পেয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক সিরিজের খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ডের সমান করেছেন। প্রথম রেকর্ড করেন, ১৯২৮ সালে টিঞ্চ ফ্রিম্যান।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছেন স্মিথ (৩৯·৬০) এবং বোলিংয়ে ওরেল (৩৪·৩০)। সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন রামাধীন, ১৪টা।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলার ৩য় দিনে শেষ হয়েছে। ফলে জনসাধারণের বেশ মোটা টাকা গাঁটগচ্চা গেছে।

সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ঃ

'ইণ্টারন্যাশানাল ক্রশ-চ্যানেল সুইমিং' প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মহিলা সাঁতারু গ্রিটা মেরী এ্যাণ্ডারসন সর্ব্বাগ্রে ডোভারের নিকটবর্ত্তী লক্ষ্য স্থলে পৌছে প্রথমস্থান লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা হিসাবে শীর্ষস্থান অধিকারের গৌরবলাভ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ্রিটা এ্যাণ্ডারসন ১৯৪৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলিস চ্যানেলের পরপারে ডোভারে পৌছতে তাঁর ১৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট সময় লেগেছিল। শীর্ষস্থান লাভের পুরস্কার হিসাবে গ্রিটা এ্যাণ্ডারসন ১,০০০ গিনি মূল্যের একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ট্রফি এবং নগদ ৫০০ পাউণ্ড লাভ করেছেন।

প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান পেয়েছেন ইংলণ্ডের মিঃ কেনেথ ইউরে। দূরত্বপথ অতিক্রম করতে তাঁর ১৬ ঘঃ ২৫ মিঃ সময় লেগেছিল। এই প্রতিযোগিতায় মিহির সেন এবং হিমাদ্রি রায় নামে দু'জন ভারতীয় যোগদান ক'রে-ছিলেন। মাত্র দেড়ঘণ্টা সাঁতার কেটে হিমাদ্রি রায় এবং ১৫ ঘণ্টা জলে থেকে মিহির সেন প্রতিযোগিতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মিহির সেন এক সময় ইংলণ্ডের উপকূল থেকে মাত্র সাত মাইল দূরত্বে ছিলেন।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন : দুর্গাচরণ রায়

অমর্ত্ত্য লোক হইতে দেবগণের মর্ত্ত্যভবনে আসিবার সাধ হয়। দেবতার সাধ দিব্য ইচ্ছা। তাহা কেবলমাত্র জীবভাব তাড়িত নহে। এই মর্ত্ত্যটা কেবলমাত্র মাটির পৃথিবী নহে, ইহা উর্দ্ধমূলের অধঃশাখ। সেই পরম মূলের অমৃত রস লইয়াই এই অধঃশাখ পল্লবিত হইয়াছে। আবার পার্থিব লোককে আশ্রয় করিয়াই—পরম লোকের অভিমুখীনতা। উপনিষদে একটি আখ্যান রহিয়াছে—উদ্গীথ কুশল শিলক, চৈকিতায়ণ এবং প্রবাহন। উদগীথের গতি কি, এই বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিয়া—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—যেসাথের গতি—অসৌলোক। দালভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ঐ উর্দ্ধলোকের গতি কি? তখন শিলক বলিলেন—অয়ং লোক, অয়ং লোকই পৃথিবী। গীতায় ইহাকেই বলা হইয়াছে—পারস্পরিক—সম্পর্ক—পরস্পরম্ ভাবয়ন্তম্।

"প্রজাপতি-ব্রহ্ম, নারায়ণ এবং ইন্দ্র বরুণকে সাথী করিয়া—মর্ত্ত্য-লোকে ভ্রমণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? তাঁহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া প্রথমে ভারতবর্ষেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কারণ, ভারতবর্ষই সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র কর্মভূমি অন্য সব ভোগভূমি, সেইজন্য কেবল দেবতারা নহেন, স্বয়ং ভগবানই এখানে আসিয়া ভগবদ্গীতা গাহিয়াছিলেন। সেইজন্য কবি—জলদ মন্ত্রে ভারত বন্দনা করিয়াছেন—ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—একটি রস-রচনা। ইহাতে রস আছে, রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে। রম্য রচনা—যাহাকে বলে, তাহার ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন; কিন্তু আধুনিক রম্য রচনার গোষ্ঠীভুক্ত ইহা নহে। ইহার অর্থ আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বুঝিয়া কোথাও আনন্দ হয়, কোথাও বেদনা জাগে, কোথাও বা হাস্যরসে আপ্লুত হইতে হয়। হরিদ্বার হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে দেবগণের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া কত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, পুরাণ কাহিনী, তীর্থের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর এই বিবরণ সমূহ কেবলমাত্র বিবরণ পঞ্জী ও ঘটনার তালিকা catalouge of events—মাত্র নহে। সে তথ্যগুলি রস সুমধুর। কাব্যের যাহা লক্ষণ—রসাত্মক বাক্য—সেই সব বিবরণ সেই আনন্দ রসে টল টল করিতেছে। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। নারায়ণ নারায়ণীর নিকট বিদায় লইলে—নারায়ণী বলিতেছেন :—

"নাথ! আর কেন জ্বালাও? সেখানে গেলে তুমি যদি তিন দিন ছেড়ে তিন শত বৎসরের মধ্যে ফিরে এস এক কলম আমি লিখে দিতে পারি। সেখানে গিয়ে যদি আরমানি বিবি পাও, আর কি আমায় মনে ধ'রবে? হয়তো তাদের সঙ্গে মিশে মদ, মুরগী, বিস্কুট, পাঁউরুটি, খেয়ে ইহকাল-পরকাল ও জাত খোয়াবে। এমনও হ'তে পারে, ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে বিধবা বিয়ে করে বসবে। কিংবা থিয়েটারের দলে মিশে ইয়ারের চরম হয়ে রাতদিন কেবল ফ্লুট বাজাবে ও লক্ষ্মীছাড়া হবে।" ইহা শুধু রঙ্গ রস নহে, ইহা ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতকের বাঙ্গালী সমাজের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

আর্টের জন্য আর্ট—art for art's sake—এই ফরাসী মতবাদ ফ্রান্সের অধঃপতন যুগের মনোবৃত্তি সমোদ্ভূত। কামনার সম্বেগ না থাকিলে কোথাও কিছুই হৃদ্য বলিয়া অনুভূত হয় না। আর্ট বা সাহিত্য কলা বলিয়া যাহাকে সমাদর করা হয়, তাহাতে কামনার বেদনা বোধ না থাকিলে কখনও সমাদৃত হয় না। আর্টের জন্য আর্ট এই মতবাদের আচরণে সাহিত্যে অনেক অধমতার পরিবেশন হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই দোষ দুষ্টতা বিবর্জ্জিত। তাহার ইতিবৃত্তে বা জীবনী কথায়—কোথায় পঙ্কিলতার লেশমাত্র নাই। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন সম্বন্ধে বলিতে বলিতে গ্রন্থকার বৃন্দাবনের বানরের উপদ্রব কথা বলিয়া যে হাস্য রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেখক বলিতেছেন :—

"এই সময় কতকগুলি বানর আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে গুড়গুড়ির নলগুলি লইয়া নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষে উঠিল। পিতামহ "তু" শব্দে কুকুর ডাকিয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে বানরগণ রাগে নলগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া দাঁত খিঁচাইতে লাগিল।" তজ্জন্য ব্রহ্মা খেদ করিয়া বলিতেছেন—বাড়ী গিয়ে ফরসিতে লাগিয়ে একদিনও একছিলিম মিঠেকড়া তামাক খেতে পেতাম, মনে এত আপশোস হ'ত না। লোক পিতামহ ব্রহ্মার এই একছিলিম মিঠেকড়া তামাক খাইবার প্রলোভন দেখিয়া জীবন্ত মানুষ কেন, পাষাণও বোধহয় হাস্য করিতে করিতে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। এই গুরু গম্ভীর বিষয়ের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব্ব মিশ্রণে লেখকের কৃতিত্ব অতুলনীয়। "কমলাকান্তের দপ্তর" ব্যতীত কঠোর কোমলে, মেঘে রৌদ্রে এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

একান্ত লঘু রঙ্গ ব্যঙ্গ থাকিলেও গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত ইতিহাস কথায় পরিপূর্ণ। শুধু ইতিহাস নহে, ইতিহাসের সহিত অনেক পৌরাণিক কাহিনীও কথিত হইয়াছে। লেখক দিল্লী নামের সম্বন্ধে

বলিতেছেন—"অনেকে বলেন ডিলু রাজার নামানুসারে ইহার নাম—দিল্লী। এখানে একটি লোহার পিল্লের উপর লেখা ছিল—১৪শ শতাব্দীতে এই নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ অক্ষর সংস্কৃত। এজন্য ইহা যে হিন্দু রাজার নির্ম্মিত ইহাতে সন্দেহ নাই।"

পুরাণ কাহিনী সম্বন্ধে লেখকের বিবৃতি। বরুণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—এই ইন্দ্র প্রস্থের রাস্তা। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবকে পানিপত, সোনপতি, ইন্দ্রপত, টিলপত এবং ভাগপত নামক যে পাঁচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত এবং ভাগপত—নামক ঐ দেখুন দুইখণ্ড জমি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।...যে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম করেন, সে ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাকে আগম জোড়ের ঘাট বলে। এইরূপ নানা তথ্যে, ইতিহাসে, পুরাণ কথায়—পুস্তকখানি সামলঙ্কৃত।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে গ্রন্থকারের স্বদেশপ্রীতি অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার পরিচয় দিতে হইলে বক্তব্য আর শেষ হইতে চাহিবে না। সেইজন্য আলোচনা এক্ষণে সমাপ্ত করিতে হইল। পুস্তকখানি প্রথম যৌবনে পাঠ করিয়া হরষিত হইয়াছি, হাস্য করিয়াছি, কৌতুকবোধ করিয়াছি। বার্দ্ধক্যে উহা অধ্যয়ন করিয়া—বুঝিতেছি—যে ইহা একখানি—বিশ্বকোষ। ইহাতে একাধারে—ইতিহাস, পুরাণ, শিল্প বিবরণ, তীর্থ কাহিনী, মহৎ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের জীবনী, বিখ্যাত নগর এবং গ্রাম সকলের ইতিবৃত্ত—সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারটি—অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ক্রোধ কহিল—"আমি পিতৃমাতৃ ও স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইব।" বিদ্যা কহিলেন—"আমি অদ্য হইতে অবিদ্যারূপে দেখা দিব।" বুদ্ধি কহিলেন—"আমি আর সুবুদ্ধিরূপে থাকিব না।" লক্ষ্মী বলিলেন—"আমার অলক্ষ্মীই এখন ভারতে থাকিবে।" সরস্বতী বলিলেন—"আমার দুষ্টমূর্ত্তিই এখন লোকের স্কন্ধে চাপিবে।"

রিরংসা মূলক গল্প উপন্যাস এবং রম্য-রচনা নামক অসার পুস্তক-প্লাবিত বাংলায় দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন অভিনবত্বে মনোরম। ইহাতে ষড়রস সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এবং ইহা প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপযোগী। এই শ্রেণীর সাহিত্য পুনঃপ্রকাশ হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ব্যাপার যখন মনে করিতেছিলাম, তখনই নবপ্রকাশিত 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থখানির সংবাদ পাইয়া উহা সংগ্রহ করিলাম। এবং পড়িতে পড়িতে বুঝিতেছি বইখানি সংগ্রহ করা সার্থক হইয়াছে। আশা করি প্রকাশকগণ ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয় সরকার, যোগেন্দ্র বসু প্রভৃতির গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন। গ্রন্থকারের সহিত আমিও শিবমস্তু এই শুভবাণী উচ্চারণ করিতেছি।

[প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—আট টাকা।]

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বৈদেহী: এমিল জোলা। অনুবাদ—বিমান গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বের বিখ্যাত কাহিনীকার এমিল জোলা। La bonte তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। কিন্তু আমাদের দেশের আদর্শ বিচারে তাঁর এ কাহিনী ব্যভিচারের নির্লজ্জ বর্ণনা মাত্র। এর মধ্যে আদর্শের প্রতি কারও আকর্ষণ নেই একমাত্র উইলিয়মের ছাড়া। তার জীবনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আদর্শ নিষ্ঠার গৌরবে বা সাফল্যে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠে নি। সে যাই হোক, অনুবাদকের অনুবাদ অতি চমৎকার হয়েছে। ভাষার ঝংকারে শব্দ যোজনার বৈশিষ্ট্যে তাঁর উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

[প্রকাশক আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। ৩৭ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৷০।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82750—"আজি গোকুল নগরে" ও "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—এই দুখানা কীর্ত্তন গান শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে ভাবভাষা ও সুরবিন্যাসে অপূর্ব হয়েছে।

N 82751—সুবীর সেনের মধুর কণ্ঠে "তোমার হাসি লুকিয়ে হাসে" ও "এত সুর আর এত গান"—এ দুখানি গান শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

N 82752—কুমারী শ্রীলা সেনের গাওয়া "দোলে দোলেরে" ও "তোমার কাছে তো কোন দিন"—গান দুখানি শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

N 87511—মিলন গুপ্ত মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর।

কলম্বিয়া

GE 21845 17—শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত অসিত রায়ের রেকর্ড নাটিকা "ধরার মেয়ে" লোকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে আশা করি।

GE 21848 50—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক পরিচালিত লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত ইন্দিরা দেবী রচিত আর একখানি রেকর্ড নাটিকা "অনির্বাণ দীপ" শ্রোতার মনেও আনন্দ ও জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তুলবে এবং সে দীপও বহুকাল অনির্বাণ ভাবে জ্বলবে এমনও আশা করতে পারি।

GE 21852—শৈলেন রায় রচিত শ্যামল মিত্র কর্ত্তৃক গীত নব জীবনের গান "মনের সুধা তোমারে প্রণাম করি" সুরের ঝংকারে ভাব-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। শৈলেন রায় রচিত মৃণাল চক্রবর্তীর মধুর কণ্ঠে "হে পরমেশ এ মহাদেশ" এই সাধন সংগীতখানা শ্রোতার মনে প্রেরণা জাগায়।

GE 21853—শ্যামল মিত্রের গাওয়া মাটীর গান "আমি বাউল হ'লাম তোমার মাটীর সুর নিয়ে" এবং তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নবযুগের গান "ভোর হোলো ভাই ভোর হোলো" শ্রোতাকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

GE 21854—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দু ধারে দুটী ঘর নদীর তীরে" গানখানি আমাদের ভাল লেগেছে এবং উৎপলা সেনের "বিহনে মোর মনের মানুষ" গানখানিও সুরবৈচিত্র্যে ও ভাব-মাধুর্যে অপূর্ব হয়েছে।

GE 21855—"বিশ্বমানব মানস নিঝর হোতে" "এই ভাবসংগীত খানা" সমরেশ রায়ের মধুর কণ্ঠে অনাবিল মাধুর্যে পরিস্ফুট হয়েছে এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "ধানের শীষে ভোরের শিশির মুক্তা হোয়ে ঝরে" গানে পল্লীচিত্র শ্রোতার মানস-পটে যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে।

GE 21856—শিল্পী সুরেন চক্রবর্তীর কণ্ঠে "নয়া পয়সার গান" আমরা বার বার শুনেছি—তবুও শোনবার আকাংখা মেটে না।

GE 21857—"আশার খেলা এই জীবনে" ও "তোমার মতন আমিও তো" গান দুখানা শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের মধুর কণ্ঠে ভাব-ভাষা ও পরিবেশনায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

GE 21858—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে" ও "সে কেন দেখা দিলরে" গান দুখানা সুরবৈচিত্র্যে ও ভাব-ব্যঞ্জনায় মনকে আকৃষ্ট করবে।

GE 21859—নির্মলা মিশ্রের গাওয়া "মনে আমার ফাগুন এলো" ও "ধূসর গোধূলি আকাশের মেঘ রঙে" গান দুখানা সুরের ঝংকারে আমাদের মনকে ঝংকৃত করে তুলেছে—আমরা আনন্দ পেয়েছি।

GE 30366—"তাসের ঘর" বাণীচিত্রের "জ্বালিনু মিছে দীপ"—গেয়েছেন রবীন মজুমদার ও "আমার গানে সুর ছিল" গানখানি গেয়েছেন প্রতিমা ব্যানার্জী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। দুখানা গানই সবদিক দিয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

GE 30367—"দুষ্টু ডানা মেলে"—গানখানা গেয়েছেন সুরস্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও "নীরবে যত কথা" গানখানা একসংগে গেয়েছেন রবীন মজুমদার ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 30368—"আমার যে বীণা" ও 'আমি নীলপরি" গান দুখানা গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা যে অপূর্ব হয়েছে—ভাবে-ভাষায় ও সুরের ঝংকারে তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী—শ্রীপঞ্চানন রায়

দশভুজা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কার্ত্তিক—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ভূদানের প্রসার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক যুগই মানুষের কাছে বহন ক'রে আনে নিজস্ব একটী বিশেষ আহ্বান। বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে দলিতদের উদ্ধারের আহ্বান। যুগের এই আহ্বানে আচার্য্য বিনোবা আশ্রমের নিভৃত জীবন থেকে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তপথের বুকে—কণ্ঠে ভূদানের বৈপ্লবিক-বার্ত্তাকে বহন ক'রে। ভূদানের মধ্যে যুগ-দেবতার পদধ্বনি, প্রেমধর্ম্মের অভিব্যক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, দরিদ্র-নারায়ণের কথা। আচার্য্য বিনোবা আর এক পা আগিয়ে গিয়ে বললেন, দেশে দরিদ্র ব'লে কেউ থাকবেনা, থাক্‌বে শুধু নারায়ণ। দলিতের উদ্ধার মানে দানকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া নয়, তার পরের উপরে নির্ভরতা চিরদিনের জন্ম ঘোচানো।

ভূদান-যজ্ঞ-আন্দোলনের প্রবর্ত্তন—গ্রামময় ভারতবর্ষের লাখো লাখো ভূমিহীন চাষীকে ভূমিতে অধিকার দেবার জন্ত। চাষীদের দুঃখের সত্যিই কোন পরিসীমা নেই। তাদের অন্নের অভাব নিদারুণ। আর এই নিদারুণ অন্নাভাবের মূলে তাদের জমির অভাব। নিজেদের ভূমি না থাকায় তারা পরের জমিতে খাটতে বাধ্য হয়—নাম-মাত্র মজুরিতে তাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। তাদের অবস্থা তাদের অযত্ন-পালিত পশুদের মতোই শোচনায়।

অগণিত ভূমিহীন চাষীর এই দুঃখকে আচার্য্য বিনোবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন—যেমন অনুভব করেছিলেন বিবেকানন্দ ও গান্ধী। এই অনুভূতির গভীরতা থেকে জন্ম নিল ভূদান-যজ্ঞ-আন্দোলন। মানুষের যত রকমের প্রয়োজন আছে সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন হচ্ছে অন্ন। আর এই অন্ন প্রসব ক'রে থাকেন ভূমি-মাতা। যে-ভূমি সকলের অন্নের উৎস, তার উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকার থাকা তাই কোন-মতেই উচিত নয়। ভূমিতে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে বলেই সমাজজীবনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিষময়। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষী বংশপরম্পরায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও চরম দুর্গতির মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জন্যই আচার্য বিনোবা বল্‌ছেন, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা কোনমতেই ঠিক নয়, ভূমি হওয়া উচিত সমস্ত সমাজের সম্পত্তি।

নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বিনোবাজীর এই মত খুবই যুক্তিসহ। ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূত ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং একমাত্র তিনিই এসবের মালিক। আকাশ-জল-বাতাস-আলোর মতো ভূমিও ভগবানের দান এবং এই দানে মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষ যখন তাঁর সন্তান, তখন পিতার দানে সমস্ত সন্তানের সমান অংশ থাকবে—এ সত্য অনস্বীকার্য। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত জমির মালিক—এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভূদান আমাদের সমগ্র জীবনকে নূতনতর ছাঁদে গড়ে তুল্‌তে চায়।

একমাত্র ভূদানের মধ্য দিয়েই সম্ভব গ্রামরাজ্যকে গ'ড়ে তোলা। স্বরাজ্য আর গ্রামরাজ্য যে একই কথা—এতে কি কোন সন্দেহ আছে? শতকরা পঁচাশীজন লোক তো গ্রামেই বাস ক'রে থাকে, আর এই শতকরা পঁচাশীর বলবীর্য্য সাহসসম্পদের উপরে নির্ভর করছে সমগ্র জাতির উন্নতি।

আমরা শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের কয়জন? আসলে দেশ বলতে বুঝায়—দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায় যেখানে সবল সুস্থ দেহে আনন্দময় জীবনযাপন করছে, সেখানে বুঝতে হবে দেশ ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যেদেশে কৃষিজীবী সম্প্রদায় জীবনের সন্ধানে শহরের অভিমুখে ধাওয়া করেছে, গ্রামের মাটিতে তাদের মন আর সন্তুষ্ট নয়—সে দেশ নিশ্চয়ই দুর্ভাগা। তার জনাকীর্ণ শহর-গুলিতে বিরাট বিরাট অট্টালিকা থাকতে পারে, বড়ো বড়ো কলেজ, লাইব্রেরী এবং বন্দর থাকতে পারে—তবু সে দেশ সেই ফলের মতো—যার উপরটা দেখতে লাল, কিন্তু ভিতরটা পোকায় কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।

এইজন্যই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে গ্রামের সেই হতভাগ্য মানুষগুলির দিকে, যাদের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করছে জাতির সমস্ত শক্তি এবং সামর্থ্য—না, জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত। এরা যদি সুসম খাদ্যের এবং পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে জীবন্মৃত হয়ে থাকে—জাতি জাহান্নামে যাবেই, কারও শক্তি নেই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে।

আর এই ভূমিহীন কৃষিজীবীসম্প্রদায়কে যদি বাঁচার মতো করে বাঁচাতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাদের জন্যে ভূমির ব্যবস্থা করতেই হবে। কৃষকদের ভূমিহীন রেখে দেশের উন্নতিকল্পে আমরা যাকিছু করতে যাবো তা হবে—ভস্মে ঘৃত ঢালার অথবা বালুতে লাঙল দেওয়ার মতোই একটা পণ্ডশ্রম মাত্র।

কিন্তু যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি আছে তারা সেই জমি ভূমিহীনদের স্বার্থের অনুকূলে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে যাবে কেন? স্ব-ইচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করা কি মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়? বিপ্লব কি শান্তির পথে সম্ভব? এ একটা জটিল প্রশ্ন বটে। এই প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বল্‌ছেন: প্রেমের পথে, যুক্তির পথে, বিচার-বিপ্লবের পথে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটানো খুবই সম্ভব। আর মানুষের হৃদয়ের যদি পরিবর্ত্তন ঘটে, সত্যের এবং প্রেমের আদর্শে যদি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগে তবে বিষয়ের মোহ দূর হতে কতক্ষণ? গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের মূর্ত্তি আমরা বারম্বার দেখেছি আইনঅমান্য আন্দোলনের মধ্যে—সেই বিপ্লবের মধ্যে কি অহিংসার জয়বার্ত্তাই ঘোষিত হয়নি? লক্ষ লক্ষ মানুষ কি ভয় এবং ক্রোধকে জয় ক'রে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে আগিয়ে যায় নি? মানুষের স্বভাবের গভীরে একটা আদিম বর্ব্বর আছে—একথা

সত্য। কিন্তু প্রতিটী মানুষের দেহের মধ্যে আত্মার শিখা সমভাবে জ্বল্ জ্বল্ করছে এবং এই আত্মার অসীম শক্তিকে সহায় ক'রে মানুষ তার স্বভাবের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় করতে পারে—এ হচ্ছে আরও বড়ো সত্য। বিনোবাজীর আবেদন মানুষের সর্ব্বশক্তিমান আত্মার কাছে, তার পরিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির কাছে।

ভূদানের মধ্যে রয়েছে একটা সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের বার্ত্তা। বিনোবাজী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমায় ঘটাতে চাইছেন একটা আমূল পরিবর্ত্তন। ঐশ্বর্য্যকে মূল্য দান করতে তিনি একান্ত নারাজ। বরং বলছেন, নিজের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা পাপ। বলছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি বা অর্থ রাখা অন্যায়। ভূদান বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে চায় একটা যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন। এ আন্দোলনকে বিনোবাজী বলেছেন—'দেনেকো আন্দোলন'—সমাজের মঙ্গলের জন্যে প্রত্যেককে কিছু না কিছু দিতে হবে তার সাধ্যে যা কুলায়। সে ভূমিমান সে ভূমি দেবে, যার আর কিছু দেবার নেই সে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করবে। ভূদানের পথে ভিক্ষার কোন স্থান নেই। জমি যে দেবে সে ভূমিহীনকে দাক্ষিণ্যের আকারে ভিক্ষা দেবে না। জমি ঈশ্বরের দান, ভূমির মালিক একমাত্র ভগবান এবং এই কারণেই ভূমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হতে পারেনা। একই কারণে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে না। এই স্বচ্ছ বুদ্ধি থেকেই ভূমিমান ভূমিহীনের জন্যে ভূমি দান করবে। জমির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করার মধ্যে পরিশুদ্ধ বিচারের জয়জয়কার। ভূদানের মধ্যে রয়েছে একটা উচ্চতর আদর্শে শ্রদ্ধা। এ আদর্শ এ আন্দোলন জয়যুক্ত হলে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে প্রেমের আদর্শে। এই নয়া সমাজে শোষণের কোন স্থান থাকবেনা, আলস্যেরও নয়।

বিশ্বরূপা

প্রবীরকুমার বিশ্বাস

তোমার অন্বেষে—
কনোজ-শ্রাবস্তী হ'তে বিদর্ভের অন্ধকার দেশে
ভ্রমিলাম কতবার যুগ যুগান্তরে ;
বুকে নিয়ে অনন্ত পিপাসা। মান্দুরায়, তাঞ্জোরে—
অজন্তা ও ইলোরার গুহায় গুহায় শত শত শতাব্দীর পরে—
আমার স্বপ্নিল আঁখি আজো দেখি খুঁজে খুঁজে মরে
তোমারে সুন্দরী—বিস্মৃত বিদেশের দেশে !
শিল্পতীর্থ উড়িষ্যায়,
জয়পুরে—নালন্দায়—অতীতের গৌড়-সভ্যতায় ;
ইতিহাসের সূত্র ধরে ধরে। তোমাকে খুঁজেছি আমি
হাতে নিয়ে স্বপ্নময় দীপ্ত দীপশিখা ; দুচোখ সন্ধানী
পাহাড়ের গায়ে গায়ে—অরণ্যের শাখায় শাখায়
ধূলার ধরণীতলে সবুজের শ্যামল প্রচ্ছায়—
তোমারে এঁকেছি আমি কত ছন্দে—
কত রূপে—কত না বিন্যাস
স্বপ্ন মোর নিঙাড়িয়া জীবনের ধারা রুদ্ধ করি।'
তোমার উদ্দেশে
রাত্রি-দিন চলিয়াছি ক্লান্তি-শ্রান্তিহীন
জীবনের পথে বারম্বার।
তবুও বুঝিনি আমি, কোন মন্ত্রে গীত হবে গাথা—
লেখনী ধারার
কোন রূপান্তরে—দেবী তুমি মূর্ত্ত হয়ে, দেখা দিবে আসি' !
চেতনার প্রত্যুষ দ্বারে বিচিত্র বর্ণের মাধুরী
অরুণের মত হাসি হাসি।
গলায় পরায়ে মোর শুভ্র কুন্দ কুসুমের মালা
নির্ব্বাপিত করি দিবে এ বক্ষের যত তৃষ্ণা জ্বালা
সার্থক করিবে মোরে, এ ধরণী হেরিব সুন্দর
তোমার পরশ লাগি' হবে মোর নব রূপান্তর।
বিদায়ের আগে বলে যাবো তুমি অপরূপা
[illegible]

(পূর্বানুবৃত্তি)

গভীর রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্যাকাশে

অবরোধের সরোবর তীরে শুভ্র সোপান শ্রেণীর এক পাশে উল্কা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, একটি মাত্র বেণী অংসের উপর দিয়া বুকের মাঝখানে লম্বিত হইয়া আছে।

উল্কার হাতে বীণা। সে খেদ বিনীত মৃদু কণ্ঠে গান গাহিতেছে—

ফাগুন রাতি পোহায়—তুমি এলেনা!

কাট্।

সেনজিতের বিশ্রাম কক্ষ। চতুষ্কোণে দীপ জ্বলিতেছে, মুক্ত বাতায়ন পথে জ্যোৎস্না-প্লাবিত বহির্দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেনজিৎ বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, উল্কার গান মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—

চাঁদ মাথা নোয়ায়—তুমি এলেনা।

সহসা সেনজিৎ বাতায়ন হইতে ফিরিলেন। প্রাচীর গাত্রে একটি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া নিজের কটিবন্ধে বাঁধিলেন। তারপর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে।

কাট্।

সরোবরের ঘাটে উল্কা গান গাহিতেছে। তাহার দেহ মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—তুমি এলে না! তুমি এলে না!

হঠাৎ সেনজিতের স্বর শুনিয়া উল্কা চমকিয়া উঠিল।

সেনজিৎ: উল্কা!

দীর্ঘ পদক্ষেপে সেনজিৎ আসিতেছেন। উল্কার কোল হইতে বীণা পড়িয়া গেল, সে উদ্ভাসিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উল্কা: দেবপ্রিয়—!

সেনজিৎ আসিয়া উল্কার হাত ধরিলেন, আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ: উল্কা: আমি এসেছি। আর পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারলাম না—

উল্কা: প্রিয়—প্রিয়তম—

সেনজিৎ: উল্কা! মায়াবিনি! এ তুমি আমায় কী করেছ? আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশে গেছ—আমার বুকের স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না? এই শোনো।

সেনজিৎ উল্কার মস্তক নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে এই ভাবে জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিলেন। উল্কার চক্ষু আপনি মুদিয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে মেলিল। তাহার একটি হাত সেনজিতের কটির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সেখানে কোষবদ্ধ ছুরিকার অস্তিত্ব সে অনুভব করিল। সে মাথা তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—

উল্কা: এ কি?

সেনজিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কটি হইতে নিষ্কোষিত ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কার হাতে দিলেন

সেনজিৎ: ও—হাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।—তুমি নাকি আমাকে হত্যা করতেই মগধে এসেছ? এই নাও, তোমার কাজ শেষ কর।

উল্কা ছুরিকা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল

উল্কা: প্রিয়তম, এ উল্কা আর সে উল্কা নেই—সে উল্কা মরে গিয়েছে—(স্বপ্নাবিষ্টমুখে হাসিল) আমি কে তা নিজেই জানিনা। প্রিয়তম, তুমি বলে দাও—

সেনজিৎ উল্কাকে আবার বাহুবদ্ধ করিলেন।

সেনজিৎ: উল্কা, তুমি মগধের পট্ট মহাদেবী।

সহসা মাথার উপর একটা পেচক কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। চমকিয়া উল্কা ঊর্ধ্বে চাহিল, তাহার স্বপ্নাচ্ছন্নতা কাটিয়া গেল;

বজ্রনির্ঘোষের মত তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—তুমি বিষকন্যা! সে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করিল—

উল্কা: পট্ট মহাদেবী—মগধের পট্ট মহাদেবী—

সেনজিতের মুখের পানে চক্ষু তুলিয়া উল্কা দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। উল্কার চোখে ধীরে ধীরে ভয়ের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর সে সেনজিতের বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সত্রাসে পিছু হটিয়া গেল।

উল্কা: না না না—

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে উল্কার দিকে অগ্রসর হইলেন, উল্কা আবার পিছাইয়া গেল; আর্ত্তস্বরে বলিল—

উল্কা: না না, রাজাধিরাজ, তুমি আমার কাছে এসো না—

সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

সেনজিৎ: ছি উল্কা, এই কি ছলনার সময়!

উল্কা এবার দেহ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিল—

উল্কা: মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি আপনাকে ভালবাসি না।

সেনজিৎ: আর মিথ্যা কথায় ভোলাতে পারবে না। এস—কাছে এস—

উল্কা: (ব্যাকুলস্বরে) না না, প্রিয়তম তুমি জানো না—তুমি জান না—

কাঁদিতে কাঁদিতে উল্কা বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ ক্ষণেক বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, তারপর উল্কার অনুসরণ করিলেন।

কাট্।

অন্তঃপুর গৃহের দ্বার। উল্কা ছুটিতে ছুটিতে দ্বার পথে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সেনজিৎ দৌড়িতে দৌড়িতে সেই পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

সেনজিৎ: উল্কা—!

কাট্।

উল্কার শয়ন কক্ষের দ্বার। উল্কা প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ অশ্রুসিক্ত।

সেনজিৎ আসিয়া দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিল না।

কক্ষের ভিতর উল্কা কবাটে গণ্ড রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিতেছে।

উল্কা: রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আপনার যোগ্য নারীর অভাব নেই, আপনি উল্কাকে ভুলে যান।

দ্বারের অপর দিক হইতে সেনজিৎ ভিক্তস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ: হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে?

উল্কা: আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরে যান, দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।

সেনজিৎ: কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা!

উল্কা: (ভগ্নস্বরে) সে কথা বলবার নয়।

সেনজিৎ: কেন বলবার নয়? তোমাকে বলতে হবে। আমি শুনতে চাই।

উল্কা ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল

উল্কা: আচ্ছা, কাল সকালে বলব।

সেনজিৎ দ্বারের কাছে অধর আনিয়া স্নেহ-স্ফুরিত স্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ: উল্কা, আজ এই বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি—

উল্কা: (আর্ত্তস্বরে) না না না—

সেনজিৎ: ভাল—কাল সকালে বলবে?

উল্কা: বলব।

আশাহত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেনজিৎ চলিয়া গেলেন। উল্কা দ্বারের কাছে নতজানু হইয়া হৃদয়-বিদারক কান্না কাঁদিতে লাগিল

ফেড্ আউট্। ফেড্ ইন্

পরদিন প্রভাত

উল্কা শয়ন ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে। মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া রাত্রি কাটিয়াছে; উল্কার চোখের কোলে নীলাভ ছায়া তাহার মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশবেশ শিথিল, কবরীর অর্ধ-শুষ্ক মালা অংসে লুটাইতেছে।

সহসা বাহির হইতে একটি তীর আসিয়া বাতায়নের কাষ্ঠে বিদ্ধ হইল। উল্কা চকিতে তীর বাতায়ন হইতে টানিয়া মুক্ত করিল। দেখা গেল তীরের কাণ্ডে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে! উল্কা সযত্নে লিপি উন্মোচন করিয়া পড়িল। সে শিবামিশ্রের স্বর শুনিতে পাইল—

কন্যা, স্মরণ রাখিও, শিশুনাগ বংশকে নির্মূল করা চাই।

উঠিল। সে পত্রখানি ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড করিল. তারপর চারিখণ্ড করিল। এই সময় বাসবী প্রবেশ করিল।

বাসবী : ওকি প্রিয় সখি, কার চিঠি ছিঁড়ছ ?

উল্কা : বৈশালী থেকে পিতা লিখেছেন—

সে পত্রের ছিন্নাংশগুলি বাতায়নের বাহিরে ফেলিয়া দিল।

উল্কা : জানিস বাসবি, পিতা একটি ভুল করেছেন। আমার শরীরেও যে শিশুনাগ বংশের রক্ত আছে তা তাঁর মনে নেই।

বাসবী : তোমার শরীরে শিশুনাগ বংশের রক্ত !

উল্কা : ও—না না! আজ আমি কী সব বলছি তার ঠিক নেই।

ঘরের যে-প্রাচীরে অস্ত্র-শস্ত্র টাঙানো ছিল উল্কা সেখানে গিয়া দুই হাতে দুইটি তরবারি তুলিয়া লইল। উল্কার হাতে ঋজু শাণিত তরবারি দুটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে তরবারি ঘুরাইতে লাগিল।

বাসবী : এ কি করছ প্রিয়সখি !

উল্কা : দেখছি অসি-বিদ্যা ভুলে গেছি কিনা। আজ মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করব। বাসবি, তাঁকে অসি-যুদ্ধে কি হারাতে পারব না ?

বাসবী উন্মুক্ত অধরে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বাসবী : তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না !

উল্কা : তুই এখন বুঝতে পারবি না। আমি উদ্যানে যাচ্ছি, মহারাজ যদি আসেন তাঁকে বলবি, আমি মাধবী-কুঞ্জে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

উল্কা দুইটি তরবারি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ওয়াইপ্।

উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবীকুঞ্জ। পুষ্পিতা মাধবীলতা মাথার উপর বিতান রচনা করিয়াছে।

বিতান তলে উল্কা এক পাশে দাঁড়াইয়া. তাহার দুই হাতে দুই তরবারির প্রান্তভাগ ভুমি স্পর্শ করিয়া আছে। মুখে চোখে দৃঢ় যুযুৎসা। বিতানের অপর প্রান্তে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে কোমল ভৎর্সনা।

সেনজিৎ : আজ আবার একী নতুন ছলনা ?

উল্কা : ছলনা নয়। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারির ব্যবধান।

সেনজিৎ : (ভ্রূ তুলিয়া) অর্থাৎ ?

উল্কা : অর্থাৎ অসি-যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারলে আমাকে পাবেন না।

সেনজিতের বিস্মিতমুখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া পড়িল

সেনজিৎ : সে কি !

উল্কা : এই আমার বংশের প্রথা।

সেনজিৎ : কিন্তু তুমি নারী, নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব কি করে !

উল্কা : মহারাজ কি আমার অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ মনে করেন না ?

সেনজিৎ : (হাসিয়া) তা নয়। তোমার অস্ত্র-বিদ্যার পরিচয় আগেই পেয়েছি, এখনও বুক তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত—কিন্তু উল্কা, আমি যদি যুদ্ধ না করি ?

উল্কা : তাহলে আমাকে পাবেন না।

সেনজিৎ : যদি জোর করে গ্রহণ করি ?

উল্কা : তাও পারবেন না—এই তরবারি বাধা দেবে।

উল্কা ডান হাতের তরবারি তুলিল। সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন

সেনজিৎ : বেশ, তোমার তরবারি আমাকে বাধা দিক।

সেনজিৎ যতই কাছে আসিতে লাগিলেন উল্কার মুখ ততই বিবর্ণ হইতে লাগিল। শেষে উল্কার অসির অগ্র যখন সেনজিতের বক্ষ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে তখন উল্কা কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল—

উল্কা : মহারাজ, আর কাছে আসবেন না—

মহারাজ কিন্তু অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উল্কা তখন নিজেই তরবারি টানিয়া লইল। সেনজিৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উল্কা বাধ্য হইয়া অসি নামাইল। সেনজিৎ তাহার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া কপট-ক্রোধে বলিলেন—

সেনজিৎ : আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

উল্কা কাঁদিয়া ফেলিল

উল্কা : নিষ্ঠুর—নির্দয় ! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নেই ? অসহায়া নারীর ওপর অত্যাচার করতে তোমার লজ্জা হয় না ?

সেনজিৎ : না—হয় না। এস, এবার যুদ্ধ করি।

নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমি ভয় পাই, তাই অসি ধরলাম। এস।

উল্কা : প্রতিজ্ঞা করুন, যদি পরাজিত হন আমাকে স্পর্শ করবেন না।

সেনজিৎ : (গর্বিতস্বরে) প্রতিজ্ঞা করছি যদি পরাজিত হই, কখনও স্ত্রী-জাতির মুখ দেখব না।

উল্কার হাত হইতে একটি তরবারি লইয়া সেনজিৎ কয়েক পদ পিছু হটিয়া অসি ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উল্কা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না, তাহার তরবারি করচ্যুত হইয়া দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ নিজের তরবারি ফেলিয়া দিয়া উল্কার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেনজিৎ : এবার হয়েছে ?

উল্কা ব্যাকুল চক্ষে সেনজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ তখন তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা, আর তো বাধা নেই।

উল্কা : (নিষ্প্রাণকণ্ঠে) না, আর বাধা নেই।…আজ মধ্যরাত্রে তুমি এসো, তোমার গলায় মালা দেব…আর… রক্ত-কমল দিয়ে তোমার পূজা করব।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি। অন্তঃপুরের বৃহৎ একটি কক্ষে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে, চারিদিক পুষ্পমালা পুষ্পস্তবকে সমাকীর্ণ। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদীর মত আসন, তাহাতে বধূ-বেশিনী উল্কা বসিয়া আছে। তাহার হাতে এক গুচ্ছ রক্ত-কমল। চারিজন সখী তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে ও গান গাহিতেছে। উল্কার মুখে স্বপ্নাতুর বেদনা-বিধুর হাসি।

সখিদের গান

আজি উজল মন-মন্দির সুন্দর এল
তারে বরণ করিয়া নে লো।
নয়ন সলিল ধারে
ভুজ-বন্ধন হারে
মন-মন্দির দ্বারে
বরণ করিয়া নে লো।
মোর-মুকুট শিরে—শোভে শিরে
কনক-পীত চীরে—ধীরে ধীরে
সুন্দর এলো
তারে হৃদয়ে বরিয়া নে লো—

নৃত্যগীত শেষ হইলে দেখা গেল মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে বর-বেশ, মুখে আনন্দের উল্লাস। সখীরা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থির-আয়ত নয়নে রাজার পানে চাহিল ; রক্ত-কমলগুচ্ছ তাহার বুকের কাছে রহিল। সেনজিৎ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। চোখে চোখে অনির্বচনীয় প্রীতির বিনিময় হইল।

সেনজিৎ : উল্কা !

সেনজিৎ উল্কার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন, তারপর বিপুল আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বক্ষে বক্ষ নিষ্পেষিত হইল। উল্কার মাথা সেনজিতের বুকের উপর এলাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ : উল্কা !

ঈষৎ উদ্বেগে সেনজিৎ উল্কার মুখের পানে চাহিলেন, উল্কা অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে ম্রিয়মান হাসিল। সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষ হইতে দূরে সরাইয়া দেখিলেন। রক্ত-কমলগুলি বুকের মাঝখান হইতে ঝরিয়া পড়িল। সেনজিৎ সভয়ে দেখিলেন, শলাকার ন্যায় সূক্ষ্ম ছুরিকা উল্কার বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা। সর্বনাশী ! এ কি !

উল্কা অস্ফুটস্বরে বলিল—

উল্কা : এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা—প্রিয়তম, আরও কাছে এস…তোমাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না—

সেনজিৎ উল্কাকে দুই বাহু দিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন। উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন—

সেনজিৎ : কিন্তু কেন উল্কা—কেন এ কাজ করলে ?

উল্কার চোখের কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গলিয়া পড়িল। সে নির্বাপিত স্বরে বলিল

উল্কা : প্রিয়তম, আমি বিষকন্যা—

উল্কা আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বলিতে পারিল না ; তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। সেনজিৎ তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া হৃদয়-বিদারক স্বরে ডাকিলেন—

সেনজিৎ : উল্কা—উল্কা—উল্কা—

ফেড আউট্‌।

শেষ

শঙ্কর-দর্শনে কার্যকারণবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(২)

পূর্ব এক সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৬৩), শঙ্কর সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি কি ভাবে খণ্ডন করেছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। এই সংখ্যায়, তিনি সৎকার্যবাদের স্বপক্ষে এবং অসৎকার্যবাদের বিপক্ষে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ-ভাষ্য ১-২-১)

সৎকার্যবাদের স্বপক্ষে প্রথম যুক্তি হল এই যে, 'ঘট ছিল; 'ঘট আছে, 'ঘট হবে'—এরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘট সম্বন্ধে আমাদের তিনটী সমান প্রতীতি হয়। প্রতীতি বা জ্ঞান থাকলে, তার বিষয়ও থাকা আবশ্যক—বিষয় না থাকলে জ্ঞানও থাকতে পারে না। যেমন: 'আকাশকুসুম ছিল, 'আকাশকুসুম আছে, 'আকাশকুসুম হবে',—এরূপ জ্ঞান ত আমাদের কস্মিন্ কালেও হয় না। সে জন্য, যেমন 'ঘট আছে', এই জ্ঞানের বিষয় 'ঘট', তেমনি 'ঘট ছিল, ও 'ঘট হবে, এই দুই জ্ঞানের বিষয়ও 'ঘট।' এরূপে, স্পষ্ট কার্য যে সৃষ্টির পূর্বে ও লয়ের পরে কারণেই নিহিত হয়ে থাকে, তা' অবশ্য-স্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিলাষই লোক-প্রবৃত্তির হেতু। কিন্তু যা সম্পূর্ণরূপে অসৎ, তার ত উৎপত্তি অসম্ভব। সহস্র সহস্র, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণও ত একটী মাত্র ক্ষুদ্রতম আকাশকুসুম সৃষ্টি করতে পারেন নি। সেজন্য, উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি অসৎই হয় তবে কে তার জন্য প্রচেষ্টা করবে?

তৃতীয়তঃ, ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি মিথ্যা না হয়, তবে সৎকার্যবাদও সত্য।

চতুর্থতঃ, ঈশ্বরেরও ঈদৃশজ্ঞান যদি মিথ্যা না হয়, তবে সৎকার্যবাদও সত্য।

অসৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি হল এই যে, যা উপরে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে কার্যটী যদি সম্পূর্ণরূপে অসৎই হয়, তা হলে 'ঘটঃ ভবিষ্যতি' 'ঘটটী ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে' এরূপ আশায় কেউ কর্মে প্রবৃত্ত হবেন না। সে ক্ষেত্রে 'ভবিষ্যন্ ঘটোঽসন্নিতি' এবং 'অয়ং ঘটো ন বর্ততে', এই উভয় বাক্যই সমান বিরোধ দোষ দুষ্ট। অর্থাৎ, বর্তমানে সৎ বা বিদ্যমান ঘটকে অসৎ বলা যেমন হাস্যকর, বর্তমানে অসৎ ঘটকে ভবিষ্যতে সৎ বলাও ঠিক তাই।

দ্বিতীয়তঃ, অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে, 'অভাব' চতুর্বিধ: প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব। কোনো উৎপাদ্য বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব, তা 'হল "প্রাগভাব," ধ্বংসের পরে যে অভাব, তা' হল "ধ্বংসাভাব," এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর ভেদ, অথবা এক বস্তুর স্থিতিক্ষেত্রে অন্য বস্তুর যে অভাব, তা' হল "অন্যোন্যাভাব"; এবং এক বস্তুতে অপর এক বস্তুর ত্রৈকালিক অভাব হল "অত্যন্তাভাব"। এরূপে, ঘট সৃষ্টির পূর্বে ঘটটী নেই, ঘট ধ্বংসের পরেও ঘটটী নেই—প্রথমটী ঘটের "প্রাগভাব," দ্বিতীয়টী ঘটের "ধ্বংসাভাব"। ঘট ও পট পরস্পর-ভিন্ন,—ঘটটীও পট নয়, পটটীও ঘট নয়, সেজন্য যে স্থলে ঘটটী আছে, সে স্থলে পটটী নেই, যে স্থলে পটটী, আছে সে স্থলে ঘটটী নেই—এই হল "অন্যোন্যাভাব"। বায়ুতে কোনদিনই রূপ বা বর্ণ নেই—এই হল "অত্যন্তাভাব"। এক্ষেত্রে, অনায়াসে প্রমাণ করা যায় যে, "অন্যোন্যাভাব" ভাবস্বরূপ। অর্থাৎ, যেমন, যে স্থলে ঘট আছে সে স্থলে পট নেই, তেমনি যে স্থলে ঘট নেই সে স্থলে পট (বা অন্য কোনো বস্তু) আছে। এরূপে, ঘটাভাবের অর্থই হল পট (বা অন্য কোনো বস্তুর) ভাব বা অস্তিত্ব। সেজন্য "অন্যোন্যাভাব" ঘট থেকে স্বতন্ত্র একটী ভাবপদার্থ। একই ভাবে, অন্য তিন প্রকার অভাবও ভাবপদার্থ। সুতরাং "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" বললে, ঘটটীর যে উৎপত্তির পূর্বে কোনোরূপ অস্তিত্বই ছিল না বা ঘট-স্বরূপটীরই অভাব ছিল—তা' বোঝায় না; কেবল এই মাত্র বোঝায় যে, বর্তমানে যে রূপে আছে, ঠিক সেই রূপেই তা' তখন ছিলনা।

বস্তুতঃ, "প্রাগভাব" অর্থে স্বরূপাভাবই যদি বোঝায়

তা হলে "ঘটস্য প্রাগভাবঃ" বাক্যটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, এস্থলে "ঘটস্য" বা "ঘটের", এই শব্দদ্বারা "ঘট" ও "প্রাগভাবে'র" মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুটী ভাবপদার্থের মধ্যেই ত কেবল সম্বন্ধ থাকতে পারে—সম্পূর্ণ অসৎ "ঘটের" সঙ্গে আর কার কি সম্বন্ধ হতে পারে?

যদি বলা হয় যে, কল্পিত বস্তুর সঙ্গেও সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয়; যেমনঃ "শিলাপুত্রকস্য শরীরম্"—"শিলের নোড়ার শরীর"—তাহলে তার উত্তর এই যে, সে স্থলে, কল্পিত ঘটের প্রাগভাব আছে, প্রকৃত ঘটের নয়, তাই স্বীকার করতে হয়।

পুনরায়, উৎপত্তির পূর্বে আকাশকুসুমের মতই সম্পূর্ণ অসৎ ঘটের সঙ্গে স্বকারণসত্তারও ত কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকতে পারেনা—যে হেতু সম্বন্ধ সর্বদাই দ্বিনিষ্ঠ বা দুটী ভাবপদার্থের মধ্যেই কেবল থাকতে পারে।

যদি বলা হয় যে, অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধের স্থলে এরূপ কোনো দোষ হয় না—তার উত্তর এই যে, অযুতসিদ্ধ বা যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ কেবল ভাব পদার্থেরই মধ্যে হতে পারে, ভাব ও অভাবের মধ্যে, বা দুটী অভাবের মধ্যে কোনোদিন নয়। অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। এস্থলে, সম্বন্ধের পূর্বে সেই সকল পদার্থ সেই সেই রূপে সিদ্ধ বা বিদ্যমান থাকে না। যেমন, দুটী কপাল বা ঘটাংশের সমবায়ে একটী সম্পূর্ণ ঘটের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এরূপ সমবায়ের পূর্বে ঘটটীর অস্তিত্বই ছিল না। সেজন্য এই ঘটটী হল অযুতসিদ্ধ পদার্থ। যতুসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হল সংযোগ-সম্বন্ধ। যেমন, রাশি বা কয়েকটী বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ। এক্ষেত্রে, সেই বস্তুগুলি সবই এরূপ সংযোগের পূর্বেও সিদ্ধ বা বিদ্যমান ছিল। সেজন্য 'রাশি' হল যুতসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে, কোনোরূপ সম্বন্ধই ত সম্ভব নয়।

সুতরাং শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন—

"নষ্টোৎপন্ন-ভাবাভাবশব্দ-প্রত্যয়ভেদস্তু অভিব্যক্তি-তিরোভাবয়োর্দ্বিবিধত্বাপেক্ষঃ।" (বৃহদারণ্যকভাষ্য ১।২।১।

অর্থাৎ, 'নষ্ট', 'উৎপন্ন', 'অভাব' প্রভৃতি যে শব্দব্যবহার এবং তদনুযায়ী যে প্রতীতি [illegible]

হল 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাবই' মাত্র। এরূপে, প্রচ্ছন্ন কার্যের যখন আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়, তখনই বলা হয় যে, কার্যটী 'উৎপন্ন' হল, তখনই তার 'ভাব' বা অস্তিত্ব। পুনরায়, কারণে যখন অভিব্যক্ত কার্যের তিরোভাব হয়, তখনই বলা হয় যে, কার্যটী 'নষ্ট' হল, তখনই তার 'অভাব' বা অনস্তিত্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কার্যের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই, অভাবও নেই। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, কার্য সর্বদাই কারণেই স্থিতিশীল—এই ত হল সৎকার্যবাদ।

ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪—২০ সূত্রভাষ্যেও শঙ্কর সৎকার্যবাদ স্থাপনের জন্য বিবিধ প্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রথমতঃ, এক বস্তু অন্য বস্তুতে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান না থাকলে, সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, বালুকা থেকে তৈলের উদ্ভব অসম্ভব (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৬)।

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হয়। যেমন, দুগ্ধ থেকে দধি, মৃত্তিকা থেকে ঘট, স্বর্ণ থেকে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সেজন্য, দেখা যায় যে, দধি-লিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করে না, ঘট-লিপ্সুও দধি গ্রহণ করে না। এরূপ সাধারণ লোক-ব্যবহার অসৎকার্যবাদ দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। শঙ্কর বলছেন—

অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্বত্র সর্বস্যাসত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধ্যুৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে, ন ক্ষীরাৎ॥ (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

অর্থাৎ, যদি উৎপত্তির পূর্বে কোনো বিশেষ কার্যই কোনো বিশেষ কারণে নিহিত হয়ে না থাকে, তা হলে কেবলমাত্র দুগ্ধ থেকেই দধির উদ্ভব হয় কেন, মৃত্তিকা থেকে নয় এবং কেবলমাত্র মৃত্তিকা থেকেই ঘটের উৎপত্তি হয় কেন, দুগ্ধ থেকে নয়? সেজন্য, স্বীকার করতেই হয় যে, উৎপত্তির পূর্বেও বিশেষ বিশেষ কার্য বিশেষ বিশেষ কারণে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে বলেই, কেবল সেই সেই কার্যের সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয়তঃ যদি বলা হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে কার্য কারণে নিহিত হয়ে না থাকলেও, প্রতি কারণে একটী 'অতিশয়',

কারণটি একটি বিশেষ কার্যেরই জনক হতে পারে; এরূপে, দধি সম্বন্ধীয় 'অতিশয়' দুগ্ধেই থাকে, মৃত্তিকায় নয়; ঘট সম্বন্ধীয় 'অতিশয়' মৃত্তিকাতেই থাকে, ঘটে নয়—তার উত্তর এই যে: সে ক্ষেত্রেও অসৎকার্যবাদ ভঙ্গ হয়, যেহেতু কার্য ত শক্তিরূপেই পূর্বে কারণে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত হয়ে থাকে, পরে সেই শক্তিপ্রভাবেই কার্যের অভিব্যক্তি হয়। শঙ্কর বলছেন—

"তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতা কার্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)

অর্থাৎ, শক্তি কারণেরই স্বরূপ, কার্য শক্তিরই স্বরূপ।

চতুর্থতঃ, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের কারণে অস্তিত্বই না থাকলে, অর্থাৎ কার্যটী সম্পূর্ণ অসৎ হলে, উৎপত্তিই সম্ভবপর নয়; যেহেতু—

উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্তৃকৈব ভবিতুমর্হতি, গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ, অকর্তৃকা চ, ইতি বিপ্রতিষিধ্যেত। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।১।১৮)।

অর্থাৎ, উৎপত্তি হল ক্রিয়াবিশেষ, এবং ক্রিয়া থাকলেই কর্তার প্রয়োজন। কিন্তু পুনরায় কর্তা থাকলেই, সেই কর্তার সেই ক্রিয়ার যোগ্য একটী বিষয়ও থাকা চাই। কিন্তু অসৎকার্যবাদ মতে, 'ঘটটী' সৃষ্টির পূর্বে অসৎ, সেজন্য ঘটোৎপত্তিরূপ ক্রিয়ার যোগ্য বিষয় নেই, সেজন্য তার কর্তাও নেই, সেজন্য তার উৎপত্তিও নেই।

চতুর্থতঃ, যদি বলা হয় যে, কার্যের সঙ্গে স্বকারণের সম্বন্ধ হলেই ত সেই কার্যটীর উৎপত্তি হয়, অন্য উৎপত্তি-রূপ ক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই—তার উত্তর এই যে: অসৎ কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কি করে? দুটী সৎ বস্তুর মধ্যেই কেবল সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে—একটী সৎ ও অন্যটী অসৎ, অথবা দুটী অসতের মধ্যে নয়। শঙ্কর বলছেন—

"কথমলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতো হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোরসতোর্বা।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্করভাষ্য)।

অর্থাৎ, যার কোনো স্বরূপই নেই, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হবে কি প্রকারে? সৎ ও অসৎ বা অসতের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধই সম্ভবপর নয়।

পঞ্চমতঃ, অসৎকার্যবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের 'অভাব' ছিল। কিন্তু 'পূর্বে', 'পরে' প্রভৃতি সীমা-সূচক বর্ণনা কেবলমাত্র সৎ বস্তু বা ভাবপদার্থেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অসৎ বা অভাবের ক্ষেত্রে নয়। যেমন: "পূর্ণবর্মার অভিষেকের পূর্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হয়েছিলেন"—এরূপ হাস্যকর কথা ত কেহই বলেন না! (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।১৮)

সপ্তমতঃ, সৎকার্যবাদ মতে সৃষ্টির পূর্বেও কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে বলে, কারক ব্যাপার বা কার্যোৎপত্তির অনুকূল ("দুগ্ধ-মন্থন," "সর্ষপ-পেষণ," "মৃত্তিকা-বিমর্দন," প্রভৃতি) ক্রিয়াকলাপ নিরর্থক হয়ে যায় না। এর হেতু হ'ল এই যে, কার্য কারণে পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকলেও, কার্যাকারে থাকে না, কারণের শক্তিরূপেই থাকে। সেজন্য এই শক্তিকে বর্তমান কার্যের আকারে প্রকাশিত করার জন্য নিশ্চয়ই ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন আছে। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্করভাষ্য)

এইভাবে, নানাবিধ যুক্তির ভিত্তিতে, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন—

"ন কারণাদন্যৎ কার্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথাচ মূলকারণমেবান্তাৎ কার্যং তেন তেন কার্যাকারেণ নটবৎ সর্ব ব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং যুক্তেঃ কার্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।১৮)।

অর্থাৎ, বর্ষশত ধরে চেষ্টা করলেও, কার্যের কারণাতিরিক্ততা কল্পনামাত্রও করা যায় না। বস্তুতঃ, একমাত্র মূল কারণই নটের ন্যায় নানা কার্যের আকার ধারণ করে, লোক-যাত্রা নির্বাহ করায়। এরূপে, যুক্তির সাহায্যে স্থির হল যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণ থেকে অনন্য বা অভিন্ন।

যে অপূর্ব তর্ককুশলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিবিচার-প্রণালী শঙ্করের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তারই সামান্যমাত্র আভাস দেবার জন্যই দর্শনশাস্ত্রের এই দুরূহ কার্যকারণসম্বন্ধ সমস্যা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল। অতি অল্প কথায় কি ভাবে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চনা করা যায়—তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্কর। রামানুজে যুক্তির প্রাচুর্য যেমন আছে, তেমনি আছে কথারও প্রাচুর্য। সুবৃহৎ সমাসবদ্ধ বাক্যাদি সেজন্য তাঁর

যুক্তিবহুল রচনার সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু শঙ্করে যুক্তির প্রাচুর্য থাকলেও কোনো স্থলেই বাক্যের বাহুল্য নেই। তাঁর জগতে অতুলনীয় যুক্তি-তর্ক-বিচারমূলক রচনার সর্বত্রই পরিস্ফুট রয়েছে এক অনুপম সংযমের পরিচয়। শঙ্কর-ভাষ্যের সুবিখ্যাত "ভামতী" টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সত্যই বলেছেন—

"নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥"

সত্যই শঙ্করের এই "প্রসন্ন-গম্ভীর" ভাষা বিশেষভাবেই মনোমুগ্ধকর। যিনি সকল শঙ্কা-সংশয়, সকল বিচার-বিবেচনার বহু উর্দ্ধে আরোহণ করে' এক স্থির, গভীর উপলব্ধি লাভে ধন্য হয়েছেন, তিনিই কেবল এরূপ সরল, মধুর ভাবে তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারেন লোকহিতার্থে। সেইদিক থেকে বিশ্ববন্দ্য, আচার্য শঙ্কর ছিলেন সত্যই ভারতীয় অর্থে শ্রেষ্ঠ "কবি"—একাধারে সত্য-দ্রষ্টা ও সত্য-স্রষ্টা বা সত্য-প্রকাশক।

আমি মহীদাস

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতরার পুত্র আমি মহীদাস
মাটি মায়ের কোলেতেই আমার বিকাশ
প্রকাশ পেয়েছি আমি রূপে রঙে রসে
বেদনায় কামনায় বাসনার বশে
সংগ্রামের সংঘাতে আর রক্তরেখায়
জীবনের রণক্ষেত্রে ক্ষত-লাঞ্ছিত লেখায়
সাবিত্রী ধরিত্রীরে প্রণাম করেছি
বেগবতীর তীরেতে মন্দির গড়েছি
নামহীন নীলিমা যেথা দিগন্তে মিলায়
দূরে লীন শ্যামলিমা অঞ্চল বিছায়,
সেথায় বিদীর্ণ হয়েছে মোর জৈবিক আস্তরণ
কয়মুঠি ধূলির কম্পিত আবরণ
আরণ্যক্ তরঙ্গের নগ্নরূপে
বিধ্বস্ত চেতনার ভগ্নস্তূপে ;
তবুও গেয়েছি আমি জীবনেরি নামগান
প্রাণরসে সিঞ্চিত স্ফূর্ত যে অভিজ্ঞান
চলেছি সেই চিহ্ন লয়ে তীর্থযাত্রী ঐতরেয়
চলার পথের পরিচয়ে আপনি ধন্য অপরিমেয়,
প্রশ্ন করেছি আমি, চেয়েছি ঐ মুখরার দিকে
কোথায় সে কবি-কথার ধ্যান নিমগ্না উধাও মেঘলোকে
উত্তর মেলেনি আমার, উত্তাল শিহরণে
শুনিনি সমাধানের গান, ধৈর্য্যহীন মনে
বঞ্চিতের বারতায়, ক্ষুধার দোদুল-দোলে
ক্ষুরধার প্লাবনে, প্রমত্তার কলরোলে
হেমন্তের হিরণ্যে, হিমবাহী ঝটিকায়
ফাগুনের আগুনে আর দগ্ধদিনের মৃত্তিকায়
আমার ধ্যানের রাত্রি হারায় যদি বা যতি তার
অশান্ত নৃত্যে হয় মূর্ত জীবনের রতিভার
আতুরের আরতিতে যদি জাগে ক্ষোভ
প্রিয়জনের বিরহে অণুতে-তনুতে লোভ
কতটুকু স্মৃতি তাতে মহা আরণ্যের চেতনায়
ঝঙ্কৃত ইতিহাসের লাস্যে বেদনায়
সত্যের প্রকাশ শুধু নিত্যতায় নয়
তুচ্ছের মাঝেও আছে স্বচ্ছ পরিচয়
বিস্মরণের বাঁধ ভেঙে ছোটে যে পলাতক জল
ঝড়ের মুখেতে উৎপাটিত যে মহীরুহ দল
তাদেরি সাথী আমি গতির যোগেতে
ব্যর্থ চরিতার্থতার জটিল ভোগেতে,
এরি মাঝে স্থান আমার, পূর্ণ আছেন বসে
ত্রিকালের দোহন করেন ত্রিকায়েরই রসে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ

ইংরাজি ১৯৫৭র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষের তিনটি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে প্রথমে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব পালন করিব, তারপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব হবে এবং শেষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯শে জানুয়ারি আরম্ভ হয়ে ২৪শে জানুয়ারি শেষ হয়, যদিও শতবার্ষিক উপলক্ষে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলি ৪ঠা জানুয়ারি আরম্ভ হইয়া ৩১শে শেষ হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব ২৮শে জানুয়ারি আরম্ভ হইয়া ১লা ফেব্রুয়ারি পরিসমাপ্তি হয় এবং ২রা ফেব্রুয়ারি হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদর আমন্ত্রণে তাহাদের শতবার্ষিক উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার গুরুদায়িত্ব ও সম্মান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত আমার উপর অর্পণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যথারীতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়া দেন আমার সস্ত্রীক মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের কথা। মাদ্রাজ যাত্রার পূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ স্যার লক্ষণস্বামি মুদালিয়রের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আমরা ২৭শে জানুয়ারি মাদ্রাজ পৌঁছাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যথানির্দিষ্ট হোটেলে যাইয়া অবস্থান করি। ঐদিন বৈকালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শতবার্ষিক অফিসে যাইয়া ডেলিগেট ব্যাজ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও অধিবেশনের নিমন্ত্রণপত্রাদি, কর্ম্মসূচি প্রভৃতি লইয়া আসি। ২৮শে জানুয়ারি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কর্ম্মসূচি অনুযায়ী শতবার্ষিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখন লিখিতেছি। ২৮শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় মাদ্রাজের উপকণ্ঠে মাদ্রাজ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও আলগাপ্পাচেটিয়ার টেকনোলজি কলেজ প্রাঙ্গণ গুইণ্ডিতে, ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডাঃ চিন্তামন দেশমুখ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শতবার্ষিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ এই বিরাট প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য এক মাস উন্মুক্ত ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজের কলেজগুলির শিক্ষাবিভাগসমূহ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই বিশাল প্রদর্শনী গড়ে উঠেছিল। প্রদর্শনীর বিভিন্ন ষ্টলগুলিতে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, পশু বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগগুলির দান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজসমূহের শিক্ষাবিভাগগুলি এমন কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছিলেন যাহার দ্বারা জনসাধারণও উচ্চশিক্ষা বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন। প্রদর্শনীর সম্যক পরিচয় দিতে হলে একখানি বড় বই লিখতে হয়, সেজন্য এই প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রদর্শনীর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিভাগ নানাবিধ নক্সা ও নমুনা দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন।

মাদ্রাজের সরকারি পরিবহন বিভাগে অতি আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত যাত্রিবাহী বাস, দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলির ছবি ও পথি-নির্দ্দেশক মানচিত্রসমূহ দেখান হয়েছিল।

মাদ্রাজ করপোরেশনের বিভাগসমূহ তাহাদের কার্য্যের ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন নমুনা দেখিয়েছিলেন। নানাবিধ চার্ট, গ্রাফ, মানচিত্র, মডেল প্রভৃতি দ্বারা মাদ্রাজ কর্পোরেশনের জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও নিরাপত্তাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। বন জঙ্গলের সম্পদ, নানাবিধ মূল্যবান কাঠ প্রভৃতি কি ভাবে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করছে এবং বন জঙ্গলের জিনিস মানুষের প্রতিদিনের জীবনে কত কাজে লাগে তাহা দেখলাম।

প্রদর্শনীর একাংশে জাতীয় সঞ্চয়নী কেন্দ্রে দর্শকগণকে বোঝান হয়েছে কিভাবে সাধারণ মানুষও সামান্য সঞ্চয় দ্বারা অল্পমূল্যের National Savings Certificate কিনিয়া ধীরে ধীরে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হতে পারে; সমবায় বিভাগের ষ্টলগুলিতে নানাবিধ তাঁত ও হস্তজাত শিল্প দ্রব্যাদি, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের তৈয়ারী ও সরবরাহ, তালগুড় শিল্প ও তালপত্রের তৈয়ারী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল।

হাইওয়েস্ ডিপার্টমেন্ট—জাতীয় জীবনে এবং দেশের সংগঠনে পরিবহন ও রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেন, এঁরা দেখিয়েছেন বিভিন্ন যানবাহনের ব্যবহার-উপযোগী রাস্তাঘাট সেতুর ছবি, কিভাবে রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হচ্ছে এবং এঁদের গবেষণা বিভাগের কাজের তথ্যও পরিবেশন করেছেন। সরকারি পূর্ত্তবিভাগ চার্ট, মানচিত্র ও ছবি দ্বারা এক শতাব্দির এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্রমোন্নতি দেখিয়েছেন, জলসেচনের জন্য যতগুলি খাল কাটা হয়েছে, বিভিন্ন রিভার ভ্যালি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়সমূহের ছবি দ্বারা বোঝান হয়েছে দেশের ও জনগণের কি প্রভূত উন্নতি সাধন হইতেছে।

সরকারি পশুবিজ্ঞান কলেজ এবং পশু ও মৎস্যপালন বিভাগ তাদের বিভিন্ন বিষয় বস্তুর দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে দেশের বনজঙ্গলের সম্পদের জন্য পশু সম্পদও খুব প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গৃহপালিত পশুসম্পদ কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহাও দেখান হয়েছে।

কৃষি বিভাগ—বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্য, বৈজ্ঞানিক প্রথাতে চাষের জমিতে সার দানের পদ্ধতি এবং জমির উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কি ভাবে চাষীর সম্পদ বাড়িয়ে দেশকে সম্পদশালী করছে সে সকল দেখান হয়েছে।

জন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ—এদের কর্ম্মিরা একদিকে নিত্য নূতন উদ্ভাবনীর দ্বারা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করছেন, অপরদিকে নানাবিধ গবেষণার দ্বারা রোগের প্রতিষেধমূলক ঔষধাদি ব্যবস্থা করছেন। মানুষের রোগও যন্ত্রণা উপশমের মহৎ কার্য্যে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে কতরকম প্রচেষ্টা চলছে তাহা এঁরা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। মূল প্রদর্শনীতে প্রায় ২৮০টি ষ্টল ছিল। ইহার মধ্যে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ১১টি ষ্টল, মাদ্রাজ করপোরেশনের ১৪টি এবং মাদ্রাজ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের ৫০টি ষ্টল ছিল। ইহা ব্যতীত আলগাপ্পা চেটিয়ার কলেজ ভবনে এবং এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও প্রদর্শনীর অনেকগুলি বিভাগ ছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্রে শতবার্ষিক মিউজিয়ম, আর্টগ্যালারী, প্রমোদ উদ্যান, ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, টেলিফোন, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতি ছিল। মুক্ত প্রাঙ্গণে নাটক অভিনয় ও হলের ভিতর টেলিভিসন অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আলগাপ্পা চেটিয়ার টেকনলজি কলেজের হলে ২৬শে জানুয়ারি হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত টেলিভিসনে নিম্নলিখিত কর্ম্ম সূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কুইজ প্রোগ্রাম ইংরাজি ও তামিল, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, টেনিস, ক্রিকেট, হকি, এ্যাথলেটিকসের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের দর্শন, যাদুবিদ্যা, আসন, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ, যন্ত্র সঙ্গীত এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। প্রদর্শনীর মুক্তপ্রাঙ্গণ থিয়েটারে ২৮শে জানুয়ারি হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাতে বিভিন্ন রকম নাটক অভিনয় ও নৃত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাদ্রাজ সরকারি আর্টস কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "উত্থামা চোলান" নাটক অভিনয়, রিনয়দাস আর্টিষ্টগণ কর্ত্তৃক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভারত সন্ধান (The Discovery of India—in Ballet) ব্যালেট অভিনয়, ললিতা, পদ্মিনী ও রাগিনী—তিন ত্রিবাঙ্কুর ভগিনীর নাচ, বিভিন্ন রজনীতে মহিলা কলেজসমূহের ছাত্রীদের অভিনয়, বিখ্যাত কেরালা ভগিনীদের নাচ, পুরুষ কলেজ-সমূহের ছাত্রদের নাটক-অভিনয় ও কুমারী পদ্মিনী প্রিয়দর্শনীর নাচ। টেলিভিসন অনুষ্ঠানে প্রবেশ মূল্য চার আনা এবং মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য আট আনা ছিল, ফলে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। বিশাল উন্মুক্ত স্থানে অভিনয় হওয়াতে স্থানাভাব হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রীগণ জনসাধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ এ সমস্ত দেখার সুযোগ পেয়ে খুসী হয়েছিলেন। বিনামূল্যে প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা না থাকায় প্রবেশপত্রের জন্য কাড়াকাড়ি হয় নাই। এখন শতবার্ষিক উৎসবের মূল অধিবেশনগুলির বর্ণনা দিতেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি বিশেষ আকর্ষণীয়—এক দিকে সেনেট হল, অপরদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাসন বিভাগীয় দপ্তর, সম্মুখে বিখ্যাত মেরিণা রাজপথ এবং তারপরই সুদূর প্রসারিত বঙ্গোপসাগর, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মনোরম সজ্জিত এক বৃহৎ প্যাণ্ডালে অধিবেশনগুলি হয়েছিল। সমস্ত প্যাণ্ডালটি আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মধ্যে মধ্যে জরি দিয়ে সাজান হয়েছিল, সুন্দর আলোর ব্যবস্থাও ছিল। প্যাণ্ডালে প্রায় বার হাজার দর্শকের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত ছিল এবং প্ল্যাটফর্ম্মের উপর প্রায় এক হাজার চেয়ার ছিল। যাতায়াতের জন্য ভিতরে তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির নিজ নিজ পতাকা প্যাণ্ডালে শোভিত ছিল এবং প্রত্যেক কলেজের পতাকার নীচে সেই কলেজের মর্য্যাদা অনুযায়ি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আসন দেওয়া হয়েছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ লয়লা কলেজের পতাকা সর্ব্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল। মঞ্চের উপরে মধ্যস্থলে ৫টি বিশেষ আসন ছিল চ্যান্সেলর প্রভৃতির জন্য। মঞ্চের বামদিকে ৫০০টি আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট প্রভৃতি সভার সদস্যদের জন্য এবং ডানদিকে প্রায় ৫০০টি আসন ছিল বিদেশী ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিদের জন্য। প্রত্যেক প্রতিনিধির নামও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা বড় কার্ড নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে আঁটা ছিল এবং প্রতিনিধিরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতেন। মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের পতাকা উড়িতেছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা ঠিক মধ্যেই ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের নির্দ্দিষ্ট আসনের প্রথম সারিতে প্রথম আসনটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ২৮শে জানুয়ারি বৈকালে শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে—স্বেচ্ছাসেবকগণ হোটেল থেকে আমাদের লইয়া আসেন। অন্য ডেলিগেটদের সঙ্গে আমি সেনেট হলে প্রবেশ করি। প্রত্যেক ডেলিগেটের সবুজ রংএর রেশমী ব্যাজের উপর নিজ নামও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা থাকায় পরস্পরের সঙ্গে সহজেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ আমার স্ত্রীকে প্যাণ্ডালের ভিতরে প্রথম সারিতে বিশিষ্ট অতিথিদের আসনে বসাইয়া দেন। এখানেই উল্লেখযোগ্য যে প্যাণ্ডালে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য্যের ভার ছিল শ্বেত সাড়ী ও পোষাকে সজ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রীগণের উপর এবং তাঁহাদের ব্যবস্থাপনার গুণে প্যাণ্ডালে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা হয় নাই। যথাসময়ে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মহীশূরের রাজ্যপালসহ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেটগণ নিজ নিজ একাডেমিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া একটি

মঞ্চের উপর নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া বসিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতঃপর শতবার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতির আমন্ত্রণে মহীশূরের মহারাজা শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করিয়া তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সামান্য একটি উচ্চ বিদ্যালয়রূপে আরম্ভ করিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উহার সঙ্গে একটি কলেজ বিভাগ যুক্ত করা হয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়, তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা করিয়া দক্ষিণ ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। সময়োচিত এই অভিভাষণটি উপস্থিত সকলের অন্তরকে স্পর্শ করে। অতঃপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায্য এক এক করিয়া বিদেশী ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করেন এবং সকলকে চ্যান্সেলারের সঙ্গে পৃথক ভাবে পরিচিত করিয়ে দেন। প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ-ইচ্ছাবাণী ও অভিনন্দন চ্যান্সেলরের হাতে অর্পণ করেন। আমার নাম ডাকা হইলে আমি যাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শুভ-ইচ্ছাবাণী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের হাতে অর্পণ করি। অতঃপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোচ্যান্সেলর মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জাতীয় সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয় এবং আমরা সেনেট হলে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া—পোষাক বদল করিয়া আবার রাত ৮টার সময় সেনেট হলে উপস্থিত হই। তথায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক সস্ত্রীক ডেলিগেটগণকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়। মাদ্রাজের রাজ্যপাল ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতিসহ প্রায় চার শত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। শতবার্ষিক উপলক্ষে সেনেট হলের ভিতর আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ডিনার শেষে অতিথিগণকে মটরে নিকটেই সমুদ্র তীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের Examination Hall এ লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে রাত সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণ এবং কুমারী রাধার বিখ্যাত ভারত নাট্যম্‌এর অভিনয় দেখিয়ে পরিতৃপ্ত করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই আমোদ অনুষ্ঠান কেবলমাত্র ডেলিগেট ও নিমন্ত্রিতদের জন্য এবং বাহিরের কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রও প্রবেশের চেষ্টাও করেন নাই বা হলের বাহিরে দাঁড়িয়ে ভীড় করেন নাই। ইঁহাদের শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসনীয়। অতিথিদের সম্মানার্থে এই প্রমোদ অনুষ্ঠানগুলি প্রতি রাত্রে ডিনারের পর অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং সকলেই এগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শতবার্ষিকের প্রথমদিনের উৎসব এইভাবে শেষ হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রধান কর্ম্ম সূচি ছিল সেনেটের শতবার্ষিক কনভোকেশনের অধিবেশন। যথাসময়ে আমরা সেনেট হলে মিলিত হই। ঠিক সাড়ে ৮টার সময় পূর্ব্বদিনের মত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মহীশূরের মহারাজা ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণসহ শোভাযাত্রা সহকারে আমরা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করিয়া মঞ্চের উপর নিজ নিজ আসনে যাইয়া বসি। অতঃপর প্রথমেই উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে অনারারী ডক্টর অব ল' উপাধিদানে সম্মানিত করা হয়, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র বলেন যে ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং উপরাষ্ট্রপতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আরও কয়েকজন বিদেশী ও ভারতীয় পণ্ডিতকে অনারারী ডিগ্রী দেওয়া হয় তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ডাঃ মিঃ সি ভি রমণ। অতঃপর ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একটি সময়োচিত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বেলা সাড়ে দশটায় কনভোকেসনের পরিসমাপ্তি হয়। এখান থেকে আমার স্ত্রী হোটেলে ফিরিয়া গেলেন, আমি অপর ডেলিগেটদের সঙ্গে নিকটস্থ Examination Hallএ গেলাম। সেখানে বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য—ডাঃ স্যার লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র ৭১ বর্ষ উৎসব কমিটি কর্ত্তৃক প্রদত্ত—ডাঃ মুদালিয়রের একটি বৃহৎ তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই দিন সন্ধ্যাতে মাদ্রাজের সেনেট হলে অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ডাঃ মুদালিয়রের অপর একটি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন মহীশূরের রাজ্যপাল মহীশূরের মহারাজা। এতদুপলক্ষে বক্তৃতা হইতে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায্য ডাঃ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মাদ্রাজ কর্পোরেসন ষ্টেডিয়ামে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক ক্রীড়া কমিটির উদ্যোগে নানাবিধ স্পোর্টসএর ব্যবস্থা করা হয়, এখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিসিক্যাল ডিরেক্টর শ্রীসুব্রমনিয়ম ও শতবার্ষিক ক্রীড়া কমিটির সম্পাদক শ্রীকনকরাজের। এঁরা আমার পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক স্পোর্টস উপলক্ষে জানুয়ারি মাসে এঁরা মাদ্রাজ থেকে এ্যাথলেটস্ নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীসুব্রমনিয়ম ওঁদের শতবার্ষিকী স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেণ্ড ফাদার মরফির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের ও শতবার্ষিক স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, সেজন্য ফাদার মরফির সঙ্গে শতবার্ষিক স্পোর্টস সম্বন্ধে অনেক আলাপ হল। স্পোর্টসএর বিভিন্ন বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, ছাত্রদের মার্চ-পাষ্ট হয় এবং রাজকুমারী অমৃত কুমারী অভিবাদন গ্রহণ করেন। ইহার পর পুরস্কার বিতরণের কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছাত্ররা কৌতুহলের আতিশয্যে এবং পুরস্কার বিতরণ দেখার জন্য প্রচুর সংখ্যায় চারদিকের গ্যালারী থেকে নেমে মাঠের মধ্যে চলে আসেন ও মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসেন, ফলে মঞ্চের সামনে মাটিতে উপবিষ্ট ছাত্রীরা উঠে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্বেচ্ছাসেবকগণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন নাই। ফাদার মরফি এবং উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র ছাত্রদিগকে শান্ত ও সংযত হইবার জন্য বারবার মাইকে অনুরোধ জানান কিন্তু কোনও ফল হয় না। অতঃপর রাজকুমারী অমৃত কুমারী কেবলমাত্র আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আর কৃষ্ণণকে স্বর্ণপদক ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের

ট্রফি দিবার পর গোলমালের জন্য অবশিষ্ট পুরস্কার বিতরণ স্থগিত রাখা হয় এবং রাজকুমারী অমৃত কুমারী তাঁর ভাষণ দিবার পূর্ব্বেই সভা ভঙ্গ হয়। শতবার্ষিক উৎসবের মাত্র এই একটি অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন সকালের স্থানীয় কোনও খবরের কাগজে এজন্য কর্ম্মকর্ত্তাগণকে দোষ দিবার কোনও প্রচেষ্টা দেখি নাই ; কেবল-মাত্র ঘটনা যাহা ঘটেছিল তারই সংক্ষিপ্ত সংযত বর্ণনা ছিল, অথচ গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উপলক্ষে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসএর প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি—যাহার উপর কর্ম্মকর্ত্তাদের বিশেষ হাত ছিল না তাহার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের যথেষ্ট নিন্দা করা হয়েছিল। আকস্মিকভাবে স্পোর্টস অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমি হোটেলে ফিরিয়া আসি। রাত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ মুদালিয়র সেনেট হলে আমাদিগকে ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন ; উহাতে মাদ্রাজের রাজ্যপাল, কেরালার রাজ্যপাল, রাজকুমারী অমৃত কুমারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় দিবসের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল বিজ্ঞান সংক্রান্ত সিম্পো-সিয়াম বা আলোচনা সভা—যাহার উদ্বোধন করেন বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি, ভি, রমণ মাদ্রাজের সেনেট হলে সকাল সাড়ে দশটায়। আমরা উহাতে যোগদান করিতে পারি নাই। পূর্ব্ব হইতেই শতবার্ষিক উৎসব কমিটি ব্যবস্থা করেছিলেন ঐদিন সকালে ডেলিগেটদের মাদ্রাজের বাহিরে কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির দেখানর। প্রতি চারজনের জন্য একখানি বৃহৎ মটর গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল এবং একজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ছিল। এইরূপে একখানি মটরে ৩০শে জানুয়ারি সকাল ৭টায় আমাদের হোটেল হইতে আমি, আমার স্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেট অধ্যক্ষ রমানাথন ও কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেট ডাঃ ব্রেষ্টেড্‌ ও একজন স্বেচ্ছাসেবক—নাম পার্থসারথি-সহ যাত্রা করি। সঙ্গে হোটেল থেকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়েছিল। দক্ষিণভারতের বিশেষ মাদ্রাজের রাস্তাগুলি খুব ভাল। প্রথমে আমরা মাদ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ৪৭ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন সহর কঞ্জিভোরন বা কাঞ্চিপুরম সংক্ষেপে কাঞ্চি পৌছালাম বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায়। আমাদের সঙ্গে ডেলিগেটসহ আরও কয়েকখানি মটর আসিল। ভারত-বর্ষের ৭টি অতি পবিত্র স্থানের একটি হচ্ছে কাঞ্চি—এই প্রাচীন নগরীর ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত ইতিহাস অতি পরিচিত। কথিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দীতে গৌতম এই স্থানের অধিবাসিগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চি ছিল পল্লব রাজাদের রাজধানী এবং এখনকার সুন্দর মন্দিরগুলি তৎকালে নির্ম্মিত হয়। কাঞ্চির বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দির যাহা বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমলের মন্দির নামে খ্যাত, তাহা রাজা দ্বিতীয় নন্দীবর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন। পল্লব রাজাদের সহিত চালুক্য রাজাদের সংগ্রাম মন্দির গাত্রে খোদিত আছে। পল্লব রাজাদের সময়ের স্থপতি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে—কাঞ্চির বৈকাল-নাথের মন্দির। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত এই বিশাল মন্দির বহু বড় ভারতের প্রাচীন পল্লব যুগের ভাস্কর শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে। কাঞ্চির অপর উল্লেখযোগ্য পবিত্রস্থান হচ্ছে একম্বরের মন্দির ও কামাক্ষি আম্মান মন্দির যেখানে শঙ্করের সমাধি আছে বলিয়া কথিত। কাঞ্চি হইতে আমরা চিঙ্গলপুট ঘুরিয়া আরও ৯ মাইল দূরে অবস্থিত তিরুকালু-কুনরম পৌছাই—ইহারই অপর নাম পক্ষীতীর্থ এবং বাঙ্গালী দর্শকের নিকট এই নামই সমধিক পরিচিত। পাহাড়ের তলায় মটর দাঁড়াইল। আমরা মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে চুয়শতকেরও অধিক সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিলাম, এখানে ভেদগীরিশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়া আবার কয়েকটি সোপান নামিয়া অন্যদিকে আর একটি চূড়ায় পৌছালাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। সেখানে পাহাড়ের মাথার উপর পুরোহিত বসে আছেন, তাঁর সামনে পিতলের থালায় খাদ্য দ্রব্যাদি ও ঘটিতে জল, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। নিকটে আরও অনেক স্ত্রী ও পুরুষ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বেলা প্রায় এগারটার অল্প পরে জঙ্গলের দিক থেকে শূন্যে উড়িতে উড়িতে প্রথমে একটি পরে আরও একটি বৃহদাকার ঈগল পাখীর মত দুইটি পাখী নামিয়া আসিল ও পুরোহিতের হাত থেকে খাবার খেল, জল পান করল এবং উড়িয়া গেল, এখানে কিংবদন্তি যে এই দুইটি পাখী প্রাচীনকালের দুইজন ঋষি যাঁহারা প্রত্যহ বারাণসী হইতে রামেশ্বর যাওয়ার পথে এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া যান। তীর্থযাত্রীরা এই ঋষিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পক্ষীতীর্থ হইতে আবার সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীন নগরী মহাবলী-পুরম আসিলাম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে মহাবলীপুরম পাশ্চাত্য ভৌগলকারগণের এবং পর্য্যটকগণের নিকট পরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চির পল্লব রাজা প্রথম নরসিংহ বর্দ্ধনের উপাধি মামলা হইতে মামাল্যপুরম বা মহাবলীপুরম নামের উৎপত্তি। রাজা নরসিংহ বর্দ্ধন এখানকার বিখ্যাত মন্দির, স্তম্ভ ও গুহগুলি নির্ম্মাণ করেন। এক স্থানে পাহাড়ের গায়ে পাঁচটি রথ সুন্দরভাবে খোদিত আছে। প্রাচীন পল্লব যুগের স্থপতিবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মহিষমর্দ্দিনি নামে খ্যাত গুহা, এখানেই সর্পাসনে বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং মহিষমর্দ্দিনি মূর্ত্তি খোদিত আছে। সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীন মন্দিরও অপূর্ব্ব এবং কোনারকের সমুদ্র-তীরস্থ সূর্য্য মন্দিরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আগে এখানে ৭টি মন্দির ছিল এখন মাত্র একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, বাকিগুলি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অনেকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ এখনও সমুদ্রের ঢেউএর উপর মাথা তুলে আছে। মহাবলীপুরমে সরকারী বাঙ্গলো আছে সেখানে ভ্রমণকারিগণ অবস্থান করিতে পারেন। সমুদ্র স্নানের জন্য মাদ্রাজ থেকে অনেকে এখানে ছুটীর দিনে বেড়াতে আসেন। এইরূপে আমরা প্রায় একশত ষাট মাইল মটরে ঘুরে বেলা ৪টার সময় মাদ্রাজে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা মাদ্রাজের রাজ্যপালের নিমন্ত্রণে গুইণ্ডি রাজ-ভবনে গেলাম। সেখানে চা পানের পর রাজ্যপাল ও অতিথিদের ছবি

চতুর্থ দিন অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারি সকালে ডেলিগেটদের মাদ্রাজ সহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান যথা ফোর্টসেন্টজর্জ্জ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হাইকোর্ট, জেমিনি ষ্টুডিও, করপোরেসন ভবন প্রভৃতি দেখান হয়। এই দিনের বৈকালের উৎসব বিশেষ আকর্ষণীয় করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আগমন। আমরা বৈকাল ৪টায় সেনেট হলে সমবেত হই। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতি ও ডেলিগেটদের একটি ছবি তোলা হয়। যথাসময়ে মাদ্রাজের রাজ্যপালের সঙ্গে শ্রীনেহরু আসেন এবং আমরা শোভাযাত্রা করিয়া প্যাণ্ডালে প্রবেশ করিয়া মঞ্চোপরি নিজ নিজ আসন গ্রহণ করি। এই দিন বিশাল প্যাণ্ডালটি জনসমাগমে পূর্ণ ছিল। প্রথমে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনেহেরুকে অনারারী ডক্টর অব ল উপাধি দেওয়া হয়। তারপর শ্রীনেহরু মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া প্যাণ্ডালের একাংশে প্রস্তাবিত শতবার্ষিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মঞ্চোপরি ফিরিয়া আসেন। অতঃপর শ্রীনেহরু তাঁর আসন ছেড়ে মঞ্চের একেবারে পুরোভাগে এগিয়ে আসেন এবং মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। শ্রীনেহেরুর বক্তৃতা সমবেত জনগণ গভীর আগ্রহের সহিত শুনেছিলেন—বিশেষ যখন তিনি আন্তঃ জাতীয় পরিস্থিতি ও ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই বক্তৃতা খবরের কাগজে সকলেই পড়েছেন। শতবার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। অধিবেশনের পর আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা রাত আটটার সময় আবার সেনেট হলে ফিরিলাম। ঐদিন রাত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ ডেলিগেটদের এক বিদায়ী ডিনারে আপ্যায়িত করেন। পরদিন সকালে আমরা এবং আরও অনেক ডেলিগেট চলে যাব—সেজন্য এই কয়দিনের বন্ধুদের নিকট অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ডিনারের পর নিকটবর্তী Examination Hall এ শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী পরিচালিত কলাক্ষেত্র আর্টিষ্টগণ কর্তৃক বিচাত্রানুষ্ঠানে দক্ষিণ ভারতীয় নাচ ও কথাকলি প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জন করা হয়। অনেক রাত্রে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসি। প্রকৃতপক্ষে ৩১শে জানুয়ারি রাত্রে শতবার্ষিক উৎসব শেষ হয়, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার শেষদিন ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি। সেদিন মাদ্রাজের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। আমরা ১লা ফেব্রুয়ারি সকাল এগারটার ট্রেণে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রথম গন্তব্য স্থান পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব যেরকম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেজন্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন। এই সম্পর্কে দুইটি ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিতেছি—প্রথম, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উপলক্ষে কেবলমাত্র মাদ্রাজ সহরবাসীগণের বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট জনগণের নহে, সারা দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা এবং দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থা—বিশেষতঃ ছাত্রীদের হাতে প্যাণ্ডালের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ভার থাকায় কোথাও কিছুমাত্র গোলযোগ লক্ষ্য করি নাই।

শারদ কারুচিত্র

সুনীল বসু

কত জলছবি, রাঙা চুড়ি আর কাঠের পুতুল
পুজোয় এবার মিলেছে মেলায় প্লাষ্টিক দুল।
টিনের মোটর পাউডার কেস্ সিল্কের ফিতে
তরল আলতা সিঁদুর কৌটো—দূরে ছাউনিতে
বসে ও লোকটা, একমনে আজ কেমন বিকোয়!
দোকানটা ওর শাদা হয়ে গেছে হ্যাজাক্ আলোয়।

সকালে ওখানে ছেলেরা-মেয়েরা নাগর দোলায়
চড়ে নামে ওঠে। ঘোরেও আবার কাঠের ঘোড়ায়।
বত্রিশ ভাজা খেয়ে কারো ওঠে কণ্ঠে ঢেকুর
কেউবা আবার সরবৎ খায় বাতাবী লেবুর।
এই গাঁ-য়ে আজ যাত্রা হবে, এ কথা কানে শুনি :
ভিন্‌দেশী লোক ভাজছে কড়ায় গরম বেগুনী।

মেয়েরা কিনছে শাড়ি ও ব্লাউজ খুশি খুশি মুখে
আবার কেউবা হাত দেখাচ্ছে পথের সাধুকে।

মরা গ্রামখানি নেচে ওঠে আজ
কিসের নেশায়?
দোকানীরা সব ব্যস্ত দারুণ নানান্ পেশায়।
গম গম করে চারদিকে লোক পাড়ায় পাড়ায়
ভোগের প্রসাদ নিতে কলাপাত
দু'হাতে বাড়ায়।
মণ্ডপে সব প্রতিমা দেখতে হাত দু'টি জোড়,
হয়ত বা বউ হাঁটু মুড়ে বসে গলায় কাপড়।
থেকে থেকে আজ ঢাকীরা বাজায় শুধু জয়ঢাক
মেয়েদের মুখে জোর ফুঁ-য়ে বাজে মঙ্গল শাঁখ॥

গালে বুরুশ ঘষছিল সুধাংশু, আর বিবেচনা ক'রে দেখছিল যে সেধে সে বাড়ীতে যাওয়াটা কি রকম দেখাবে। দিলখুশা ষ্ট্রীট পার্কসার্কাসের ওধারে গেলেই মিলবে, আর নম্বর খুঁজে বাড়ী বার করাও শক্ত হবে না, কিন্তু তারপর! তারপর চাই মানানসই একটি অজুহাত। মানে বাধ্য হোয়েই কষ্ট ক'রে খুঁজে বার করতে হোয়েছে ওদের সুধাংশুকে। নয়ত—নয়ত—যাকে বলে নেহাতই মানুষের মত ব্যবহার করা হোত না সুধাংশুর। অর্থাৎ একটা সংবাদ না নিলে কাজটা একেবারে ছোটলোকের মত হয়।

কিন্তু ওরা কি বুঝবে সুধাংশুর এই সহৃদয়তাটুকু!

বুঝবে না, বোঝার মত মন নয় ওদের। তা' না হোলে সুধাংশুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত সবুর করা সইল না। অথচ দেড় ঘণ্টা আগে আফিস থেকে বেরিয়েছে সুধাংশু অনর্থক একটা মিথ্যে কথা ব'লে। একদম অপদার্থ উঞ্ছপ্রকৃতির উজবুক সব। নয়ত জানা নেই, চেনা নেই, ফট্ ক'রে বাড়ীতে এসে ওঠে।

কাঁদ কাঁদ হোয়ে বলা হোল—"যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসেন, আমি এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

ওঃ—কি আমার ন্যাকা রে! যেন সে বাড়ীর ছোঁড়াগুলো ওঁকে খেয়ে ফেলতে এসেছিল। শুনেই সুধাংশুর মাথাটা গরম হোয়ে ওঠে। ছুটছিলও তৎক্ষণাৎ ও-বাড়ীতে। ভাগ্যিস মা ধমক দিলেন, আর সুধাংশুর ছোট বোন তনু দৌড়ে গেল সেখানে। কই খেয়ে ত' ফেললে না কেউ তনুকে। উলটে তনু আবার ওখানকার ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে একটা সমিতি গ'ড়ে ফিরে এল। কেন—তনু কি ওঁর চেয়ে বয়সে বড় না দেখতে কুৎসিত? তা' ত' নয়—উনি দিনরাত ভাবছেন যে ওঁকে দেখে দুনিয়া শুদ্ধ মানুষ ভিরমি যাচ্ছে—আর ওঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছে। বেহায়া বজ্জাত ধেড়ে খুকী কোথাকার। নয়ত সাত সকালে, যখন রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়াও হয় নি, কাক পাখী জাগে নি ভাল ক'রে, তখন বাপ আধিক্যেতা ক'রে দুধ খুঁজতে বেরয় মেয়ের জন্যে। কি না, তাঁর কন্যার চায়ে গুঁড়ো দুধ দিলে আর রক্ষে নেই। কন্যাটি তৎক্ষণাৎ বমি ক'রে ফেলবেন। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত আর কাকে বলে! হুঁঃ—

সুধাংশু আরও জোরে বুরুশ চালাতে লাগল নিজের গালে।

সেদিনই ভোর বেলা।

যথা নিয়মে একটা নিমের ডাল চিবতে চিবতে সুধাংশু পায়চারি করছিল তাদের বাড়ীর সামনে। যারা ঝাড়ু

দেয় রাস্তায় আর যারা রাস্তা ধোয়, তাদের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত সুধাংশু দাঁত ঘষে আর পায়চারি করে। স্বাস্থ্য ফাস্থ্যর জন্যে নয়, থোড়াই কেয়ার করে সুধাংশু পেটরোগাদের স্বাস্থ্য উপার্জনের জন্যে ভোরবেলা পায়চারি করাকে। নিজের পেট মাথা বুক হাত পা, কোনটার জন্যেই সুধাংশুর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। কারণ সব যন্ত্রগুলোই তার অতিরিক্ত রকম ঠিকঠাক চলছে। তবু সে ভোরবেলা ঘুরে বেড়ায় নিজেদের দরজার সামনের রাস্তায়—আর নিম ডাল চিবোয়। কারণ একটু অন্ধকার থাকতে—আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াতে তার খুব ভাল লাগে। বিস্তর মানুষজন তখন বেরয় না রাস্তায়, কারও মুখদর্শন করার ভয় নেই, একটু একলা সমস্ত পথটা ভোগ দখল করা যায়। তাই ফরসা হবার আগেই ঘুম ভাঙে সুধাংশুর, আর সে খোলা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ায়।

সেদিনও সে ঘুরছিল। পেছন দিকে কে বললে—"এখানে একটু দুধ কোথায় পাওয়া যাবে—বলতে পার বাবা?" একেবারে বেহদ্দ আত্মীয়তা। ঝাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল সুধাংশু, একটা বেশ জুতসই জবাব এসেও গিয়েছিল সুধাংশুর ঠোঁটে। চোখ পাকিয়ে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাতেই সুধাংশুর কি রকম যেন সব গোলমাল হোয়ে গেল। মানুষটি নেহাত যাকে বলে গোবেচারী গোছের—তাই। একটু ভুঁড়ি আছে, একটু নাদুসনুদুস দেখতে, আর মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ সজাগ হোয়ে আছেন যেন ভদ্রলোক। বড় বড় দুটো চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি আর অনেকটা ক'রে জল টলটল করছে। দাড়ি গোঁফ নিশ্চয়ই কয়েকদিন কামানো হয় নি। প'রে আছেন সদ্য পাটভাঙা একখানা খদ্দরের থান। তাড়াতাড়িতে বা অন্যমনস্ক থাকার দরুণ ভাল ক'রে গুছিয়ে পরা হোয়ে ওঠে নি কাপড়খানা। কোঁচা না ক'রে কোঁচার কাপড়টা কোমরে জড়িয়েছেন। গায়ে কিছু নেই, সাদা ধপধপে রঙের ওপর প্রচুর পরিমাণ কালো চুলে বুকটা বোঝাই। চটা-ওঠা এনামেলের গেলাস একটা হাতে নিয়ে ভোর হবার আগেই পথে নেমেছেন দুধের জন্যে।

নিম ডাল চিবতে চিবতেই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় থাকেন?" যেন মহা-অপরাধ ক'রে ফেলেছেন, এই রকম কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললেন ভদ্রলোক—"ঐ বাড়ীতে আমরা এসেছি—কাল। অনেকটা রাত হোল কি না, বাড়ী খুঁজে বার করতে। তাই কাল আর কিছু—"

মুখ থেকে নিমডাল নামিয়ে সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কোন বাড়ীতে? ঐ পলটু শীলের গোয়ালে! আরও ঘর খালি ছিল নাকি ও বাড়ীতে?"

একটু ঘোকা বোকা হাসি দেখা দিল ভদ্রলোকের মুখে। বললেন—"হাঁ—তা,' ঘর বৈকি। আজ এক বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রে আমার এক মামাশ্বশুর ঐ ঘরখানা জুটিয়েছেন। ঘর পাওয়া গেছে, চিঠি পেয়েই এসে পড়লাম। তা' ওতেই একরকম এখন চলে যাবে আমাদের। ওই ছাতের ওপরের চিলে কোঠাটা পেয়েছি, আর ওঁরা বলেছেন টিন দিয়ে একটু রান্নার জায়গা ক'রে দেবেন পরে।"

সুধাংশু বললে—"তা' বেশ করেছেন এসেছেন। এর পর আরও ভাড়াটে পেলে পলটু শীলের ছেলে কি ব্যবস্থা করে' তা' দেখতে হবে। কিন্তু এত ভোরে দুধ খুঁজতে বেরিয়েছেন যে—ছোট কেউ মানে বাচ্চা টাচ্চা আছে বুঝি সঙ্গে?"

একটু লজ্জা পেলেন যেন ভদ্রলোক। বললেন—"না না, বাচ্চাটাচ্চা নয়। গুঁড়ো দুধের চা মেয়েটা মুখে দিতে পারে না কি না, খেলেই বমি ক'রে ফেলে—তাই ভাবলাম—" আর এগলো না ব্যাখ্যা করা তাঁর।

খপ্ ক'রে গেলাসটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিল সুধাংশু। তারপর বেশ একটু ধমকের সুরে বললে—"আরও এক ঘণ্টা পরে দুধ পাওয়া যাবে। যান আপনি—দুধ নিয়ে আমি যাবখন।" কথা কটা বলেই সে ঢুকে পড়ল তাদের বাড়ীতে। কারণ ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা দেখে বেদম হাসি পাচ্ছিল সুধাংশুর। এই রকম মানুষ কেন যে ঘর বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় আসে! কেউ যদি না এখন পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওঁদের, তা'হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে, এইসব ভাবতে ভাবতে—সুধাংশু তার ইলেক্ট্রিক ষ্টোভে জল চাপিয়ে মুখ ধুতে গেল। চা চিনি দুধ মানে দুধের গুঁড়ো—সুধাংশুর ঘরেই থাকে। রাত্রে পড়তে পড়তে সে দু' একবার চা খায়। মুখ ধুয়ে এসে অনেকটা চা ক'রে ফেললে সুধাংশু। চার কাপ চা পুরে নিলে তার

ফ্লাস্কে। তারপর নিজের কাপটা—তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফ্লাস্ক নিয়ে চলল পলটু শীলের তেতলার ছাতের চিলে-কোঠায়। দেখতে হবে কেমন সে মেয়ে, যে মেয়ের গুঁড়ো দুধ দিয়ে চা খেলে বমি হোয়ে যায়।

শীলেদের বাড়ীর একতলায়—দোতলায় তেত্রিশটা উনুনে তখন আগুন দেওয়া হোয়েছে। একতলা দোতলার বারান্দাময় গণ্ডা গণ্ডা মনুষ্য-সন্তান উবু হোয়ে ব'সে গেছে —প্রাতঃকালীন প্রাকৃতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে। জলপাত্র হাতে তাদের মা বোনেরা দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হোয়ে। ওরই মধ্যে কে সুর তুলেছে—"আজি বসন্ত জাগ্রত রে—"। নিচের কলতলায় লেগেছে বিষম ঝগড়া। নারী কণ্ঠের অশ্রাব্য সম্বোধনের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে। তার মাঝে হেঁড়ে গলায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে হাঁকরাচ্ছে কে। তেতলার ছাতে পৌছতেই প্রায় দম বন্ধ হোয়ে এল সুধাংশুর। ধোঁয়ার জ্বালায় জল এসে গেল নাকে চোখে। সিঁড়ির দরজাটা পেরিয়ে খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে আগে সে হাঁ ক'রে খানিক বাতাস টেনে নিলে। তারপর কোঁচার খুঁট তুলে মুছে নিলে চোখ দু'টো—নিয়ে চোখ খুলল। আর তৎক্ষণাৎ হাঁ ক'রে ফেললে। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে তার চোখের সামনে। সুধাংশুর দিকে পিছন ফিরে দু' হাতে একটা পেতলের গামলা মাথার ওপর উঁচু ক'রে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তার সামনে হাত তিনেক তফাতে একটা হনুমান ওত পেতে ব'সে আছে। হনুমানটাকে এক নজরেই চিনতে পারলে সুধাংশু। পাড়ার হনুমান ওটা, মিত্তির বাড়ীতে ওটাকে বাচ্চা অবস্থায় এনে পুষেছিল। বড় হোতে ছেড়ে দিয়েছে—পাড়াশুদ্ধ লোককে জ্বালাতে।

সুধাংশুকে দেখেই বোধ হয় হনুমানটা দাঁত বার ক'রে খেঁকিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ঘটল তাজ্জব এক ব্যাপার। মাথার ওপর তুলে ধরা পেতলের গামলাটা গিয়ে পড়ল হনুমানের মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো এক চিৎকার। হেই হেই ক'রে তেড়ে গেল সুধাংশু হনুমানটার দিকে। চক্ষের নিমেষে এক লাফে সেটা পাশের বাড়ীর ছাতে গিয়ে পড়ল। ছাতময় চাল ডাল আলু—ছত্রাকার হোয়ে পড়েছে তখন।

ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে ধ'রে সুধাংশু বললে—"ধর এটা শিগ্‌গীর।"

ভয়ানক থতমত খেয়ে ধরলে সে ফ্লাস্কটা। সুধাংশু আলু কটা কুড়োতে লাগল।

ততক্ষণে সামলে উঠেছে মেয়েটি। বলল—"সরুন আপনি, আমি তুলছি।"

সুধাংশু বললে—"ঝাঁটা আন একটা, চাল ডালগুলো জড় করতে হবে।"

বিব্রত হোয়ে মেয়েটি বললে—"ঝাঁটা যে নেই।"

সুধাংশু সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে বললে—"থাক গে তবে। ও আর তুলে কাজ নেই। পায়রায় খেয়ে যাবে ওগুলো। যা নোঙ্‌রা ছাত, তুললেও আর রান্না করা চলবে না ঐ চাল ডাল।"

মেয়েটি করুণ চোখে চেয়ে রইল সারা ছাতে ছিটনো চাল ডালগুলোর দিকে। মুখে কিছু বললে না।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"আর নেই নাকি কিছু ঘরে।"

মেয়েটি এবার বেশ অপ্রতিভ হোয়ে পড়ল। বললে—"না, তা' যাক্ গে। দোকান খুললে আবার আনলেই হবে। কিন্তু তখন আর ওদের উনুনটা পাওয়া যাবে না। বড় কষ্টে কাল রাত্রেই নিচেকার একটি বোয়ের সঙ্গে ভাব ক'রে ভোর বেলাতেই একটু খিচুড়ি রেঁধে আনবার ব্যবস্থা করি। বাবা ত' রাস্তায় খান না কিছু। আজ দু'দিন পরে যদি দু'টো খেতে পান তাই। আবার বেরিয়ে যাবেন কি না এখনই বাবা। হয়ত সারা দিনে আর ফিরতে পারবেন না। তা' যাক্ গে—"

সুধাংশু বুঝল। চট করেই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। বললে—"ঠিক আছে। ষ্টোভ চাল ডাল সব এনে দিচ্ছি আমি। এই ঘরের ভেতরেই তুমি রান্না কর খিচুড়ি। ততক্ষণে ঐ চা খাও তোমরা।" ব'লে আর এক বিন্দু সময় নষ্ট না ক'রে তরতর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

দোতলা থেকে একতলায় নামবার সিঁড়িতে দেখা পাওয়া গেল সেই ভদ্রলোকের। স্নান ক'রে উঠে আসছেন মাথা মুছতে মুছতে। মুখে শাম্ব শাম্ব মহাবাহো। সুধাংশুকে

উঠল সেই নেহাত গোবেচারী গোছের ভাবটি। একান্ত অপ্রতিভ হোয়ে বললেন—“আরে! এই যে, ফিরে যাচ্ছ কেন বাবাজী। চল চল, ওপরে চল।” সুধাংশু থামল না। তাঁর পাশ দিয়ে নামতে নামতে বলল—“যান আপনি ওপরে, আমি আসছি।”

তারপর ঘণ্টা দু’য়েকের মধ্যে বার তিনেক সুধাংশু পলটু শীলের তেতলায় উঠেছে আর নেমেছে। ষ্টোভ কেরোসিন স্পিরিট নিয়ে গেছে একবার, দোকান খুলতেই চাল ডাল মাখন আর কি কি সব মশলা নিয়ে গেছে দ্বিতীয়বার। তিনবারের বার গিয়েছিল সত্যিকারের গরুর দুধ খানিকটা আর একখানা সাবান নিয়ে। যাচ্ছেতাই হোয়ে উঠেছিল তেল কালি হলুদে মায়ার হাত দু’খানি। তাই সাবানটা নিয়ে গিয়েছিল সুধাংশু, আর ঐ সাবানই ঘটালে বিপদ।

মায়া বললে, যেমন ওর স্বভাব—চোখ দু’টিকে বাঁ দিকে একটু তেরছা করে, মাথাটি সামান্য একটু ডান দিকে কাত ক’রে বললে—“সাবান কি হবে আবার?”

সুধাংশু বললে “হাতটাত ধুতে লাগবে।”

সহজ কথার জবাব সহজভাবেই দিয়েছিল সুধাংশু। ভাবতেই পারে নি যে ঝগড়া করার সখ চাপলে মানুষে কত তুচ্ছ কারণ নিয়েই না ঝগড়া বাঁধাতে পারে।

ফস করে মায়া ব’লে বসল—“ও—ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা ভদ্দরলোকের জায়গা। এখানে সাবান-টাবান না মাখলে টেকাই যাবে না।”

সুধাংশুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—“এখানে ছোট-লোকেও হাত-পা পরিষ্কার রাখে।”

“তা’ ত রাখবেই, কারণ সাবান যোগাবার মানুষ মেলা সহজ কি না এখানে।”

এ কথার জবাব সুধাংশু দেয় নি। দিতে প্রবৃত্তি হয় নি তার। বললে সে অনেক কথাই বলতে পারত। গুঁড়ো দুধের চা খেলে মেয়ের বমি হয়, সে জন্যে যে মেয়ের বাপ ভোর না হোতেই দুধ খুঁজতে বেরোন পথে, সে মেয়েকে বাছা বাছা বাক্য শোনাতে একটুও আটকাত না সুধাংশুর। তার ষ্টোভ স্পিরিটের বোতল এবং আরও অনেক কিছু তখনও ব’সে রয়েছে ওদের ঘরে। সুধাংশু কিন্তু চেয়েও দেখলে না সেদিকে। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মায়া তখন ঘরে ঢুকেছিল বোধ হয় ষ্টোভের ওপর খিচুড়িটার কতদূর কি হোল তাই দেখবার জন্যে। ওর বাবা ঘরের মধ্যে কি সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। বাপ মেয়ে দু’জনের কেউ জানতেও পারলেন না যে সুধাংশু পালাল।

কিন্তু পালিয়েই কি নিস্তার আছে নাকি!

সুধাংশু তখন ঢুকেছে স্নানের ঘরে। সেখান থেকেই শুনতে পেল কি রকম যেন একটা গোলমাল হচ্ছে বাড়ীতে। ওপর থেকে মা বললেন—“কে রে? কে এসেছে? নিয়ে আয় ত’ ওপরে।” নিচে বৌদি কাকে বললেন—“যাও না ভাই, ওপরে গিয়ে বসগে মার কাছে। সুধাংশুবাবু স্নান করছেন, এই বেরলেন বলে।” বোন তনু একে কবি, তায় আবার কমরেড। বড় একটা কথা কয় না বাড়ীতে। তার গলাও শোনা গেল—“ও আপনি! লাভ্‌লি ত! চলুন, চলুন, ওপরে চলুন। ব্রাদার এখন গোসলখানায়। এই ফাঁকে দুটো মন-ভেজানো কথা বলবেন চলুন মাকে।”

তাড়াতাড়ি জল ঢালতে লাগল মাথায় সুধাংশু। কে এল! কাকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ মানুষ মেতে উঠল! আফিসে বেরবার সময় সুধাংশুকে খুঁজতে কে এসে উপস্থিত হোল বাড়ীতে?

আধখানা স্নান সেরে বেরিয়ে এল সুধাংশু। চাপা গলায় বৌদি তাড়া দিলেন—“যাও যাও, দৌড়ও শিগ্‌গীর ওপরে। আর কিছুক্ষণ সুধাংশুবাবুকে না দেখতে পেলে পাগল হোয়ে যাবেন হয়ত তিনি।”

লোকটা কে, তা জিজ্ঞাসাও করলে না সুধাংশু। দুটো তিনটে সিঁড়ি—এক একবার টপকে উঠে গেল ওপরে। মার ঘরের সামনে মাদুর বিছিয়ে বসানো হোয়েছে তাকে। মা বললেন—“এই যে সুধা, তোকে খুঁজছে এই মেয়েটি।”

খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল সুধাংশু। কি এমন হোল এর মধ্যে, যে ও এসে পড়ল একেবারে এ বাড়ীতে। সোজা ধমক দিয়ে উঠল একেবারে—“কি? হোল কি আবার? চলে এলে যে এখানে?”

মায়া মাথা তুলতে পারলে না। কোনও রকমে বলতে পারলে—“বাবা যতক্ষণ না ফেরেন, আমি এখানে বসে থাকব। [illegible]—”

সুধাংশুর মা বললেন—"থাকবে বৈ কি মা—নিশ্চয়ই থাকবে।"

কি এমন ঘটতে পারে ওখানে, যার জন্যে ও থাকতে ভয় পাচ্ছে ও বাড়ীতে। আন্দাজ করতে গিয়ে ঘাড়ের শির শক্ত হোয়ে উঠল সুধাংশুর। গোঁ গোঁ করে উঠল সে—"কেউ চালাকি করতে এসেছিল বুঝি তোমার সঙ্গে? চল ত', চল আমার সঙ্গে। দেখিয়ে দেবে চল তাদের, দাঁত যদি একটাও আস্ত রাখি তাদের—"

তনু একান্ত ভালমানুষী গলায় সুর টেনে টেনে বললে—"আহা—দাঁত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন অনর্থক। একলা তুমিই উপকার করবে, অন্য কেউ করতে পারবে না, এই বা কেমন কথা?"

দাঁতে দাঁতে ঘষে সুধাংশু বললে—"এই যে যাচ্ছি আমি সেখানে। উপকার করার সখ একেবারে—"

মা ধমক দিলেন—"না, যেতে হবে না সেখানে তোকে। কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।"

তনু বললে—"আহা—বাধা দিচ্ছ কেন মা, এ অবস্থায় প্রাণটা দিয়ে দেবার রেওয়াজই চলে আসছে কিনা জগতে।"

গর্জন ক'রে উঠল সুধাংশু—"এই ফের—"

তনু গ্রাহ্যও করল না। মায়ার পাশে বসে পড়ে বললে—"তুমি থাক ভাই এখানে। আমিই যাচ্ছি সেখানে। দেখি গিয়ে, আমার উপকার কেউ করতে আসে কি না।"

ভয় পেয়ে গেল মায়া। বললে—"না না, দরকার নেই আপনার সেখানে গিয়ে। ভয়ানক অসভ্য সব।"

তনু হেসে উঠল। বললে—"যার তার কাছে অসভ্যতা করে না তারা। যদি করেই, তার জন্যেও আপনি ভাববেন না কিছু। আপনি ব'সে থাকুন মার কাছে।"

মা বললেন—"হ্যাঁ তনুই বরং যাক একবার পলটু শীলের বাড়ীতে। দেখে আয়, এদের ঘরের তালা টালা সব ঠিক আছে কি না। যা সব ছ্যাচড়, তালা ভাঙতেও ওদের আটকাবে না।"

তনু চ'লে গেল। সুধাংশু গজরাতে লাগল—"ও বাড়ীতে মানুষ থাকতে পারে নাকি। যত সব লোফার ভ্যাগাবণ্ডস নচ্ছার।"

মা বললেন—"আচ্ছা, যা ত' তুই এখন নিচে। খেয়ে নিগে যা, দেরি হোয়ে যাবে কাজে বেরতে।"

অগত্যা সুধাংশুকে তখনই নিচে নামতে হোল। আর খেয়ে দেয়ে আফিসে বেরতেও হোল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু নতুন চাকরির নতুনত্ব আর রইল না সেদিন। একদম অনর্থক চাপরাসীটা ধমক খেলে একটা। চিঠির নোট নিতে এসে মিস মল্লিককে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল। সুধাংশু বসতে বলতেও ভুলে গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে চিফ্ একাউন্টেন্ট গ্রিফিথ্‌কে ফোন করলে সুধাংশু যে তার মাথা ধরেছে। সুতরাং বাড়ী চলল। বাড়ী এসে যা দেখলে তাতে মাথা ত' মাথা, তার বুকের ভেতরে কেমন যেন হাওয়া আটকে গেল।

মা বললেন—"তুই আফিসে যাবার ঘণ্টা দু'য়েক পরেই মায়ার বাবা এসে মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। পার্ক সার্কাসের ওধারে একটা ভাল বাড়ীতে আলাদা ফ্লাট পেয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের বড় বড় সব লোকের সঙ্গে জানা শোনা আছে কি না। কাজেই ঘর পেয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।"

ঢোঁক গিলে গলার ভেতরটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে সুধাংশু কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিল—"পার্ক-সার্কাস—তা বেশ। তা' ঠিকানাটা ব'লে গেছে নাকি! পার্কসার্কাস ত আর অল্প একটু জায়গা নয়।"

মা বললেন—"হাঁ—এই যে ঠিকানা, পাঁজির কোণে লিখিয়ে রেখেছি। ভদ্রলোক নিজেই মেয়েকে বললেন, ঠিকানাটা লিখে দিতে। বললেন—বিদেশে এসেছি, চেনা জানা বহু লোকজন আছে, কিন্তু আত্মীয় কেউ নেই! তা' আপনারা ত' একরকম আত্মীয়ের মত হোয়ে গেলেন—"

সুধাংশু খিচিয়ে উঠল—"বিদেশ—ঢাকা থেকে এসেছেন কলকাতায়। এই হোল বিদেশে আসা। যত সব ন্যাকামো। দাও ঠিকানাটা, আমার আফিসের এক বাবু আসে পার্কসার্কাস থেকে। কাল ঠিকানাটা তাকে দিয়ে ওদের খবর নিতে বলব।"

কিন্তু কাল আসবে কালকে।

সুধাংশুর পক্ষে কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকা

[illegible]

প্রয়োজনে বুরুশ ঘষতে লাগল গালে। দাড়ি কামায় সে দু' তিন দিন অন্তর। কারণ ওবস্তুটার ফলাও চাষ তখনও আরম্ভ হয় নি. সুধাংশুর মুখে। কিন্তু কি জানি কি ভেবে, অথবা একেবারে কিছু না ভেবেই সেদিন বিকেলে হঠাৎ দাড়ি কামালে সুধাংশু। আর একান্ত বাধ্য হোয়েই কষ্ট ক'রে খুঁজে বার করতে গেল তাদের পার্কসার্কাসে। যে রকম অপদার্থ উজবুক বাপটি; বাপটি শুধু কেন মেয়েটিও—তাতে কোথায় গিয়ে আবার উঠল, কি অবস্থায় পড়ল, এটা স্বচক্ষে একবার দেখে না এসেই বা সুধাংশু নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকে কি ক'রে।

কিন্তু ওরা কি বুঝবে সুধাংশুর এই সহজ ভদ্রতাটুকু!

বুঝুক না বুঝুক, তাতে সুধাংশুর কি। পাঁচ মিনিটও থাকবে না সেখানে গিয়ে সুধাংশু। এমন কি কথাও কইবে না মেয়েটির সঙ্গে। অভিরামবাবুকে বাইরে ডেকে দু'টো কথা ব'লে চলে আসবে। ব্যাস।

দিলখুশা ষ্ট্রীটে বাড়ীর নম্বর খুঁজে বার করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না! কিন্তু বাড়ী পেলেও অভিরামবাবু বা তার মেয়েকে খুঁজে বার করতে হিমশিম খেয়ে গেল সুধাংশু। বাড়ীখানা পাঁচতলা, শ'পাঁচেক ভাগে বিভক্ত এবং বিশ্বের সব রকম জাত ও বর্ণের মানুষ বাস করছে সেই বাড়ীতে। হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান বৌদ্ধ, মাদ্রাজী চীনে কাফরী উড়িয়া, শুঁটকীমাছের আড়তদার, মোতির জহুরী, ছেলে প্রসব করাবার মেয়ে ডাক্তার আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুর্জয় যাদুকর, সবাই পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বিরাজ করেছেন মনের সুখে এক ছাতের তলায়। মনের সুখে—কারণ কেউ কারও মনের ত' দূরের কথা, নামের খবরও রাখেন না সে বাড়ীতে। কাজেই অভিরামবাবু বা তাঁর মেয়ে কোথায় কোন তলার কোন ঘরে এসে উঠেছেন, তা' বার করতেই অনেকটা সময় লেগে গেল সুধাংশুর। শেষ পর্য্যন্ত যখন সে গিয়ে পৌছল সেই ঘরের দরজায় তখন দেখল যে দরজায় তালা ঝুলছে। এপাশে ওপাশে দু'পাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বাঙ্‌লা হিন্দী ইংরেজী কিছুই বুঝলেন না, কারণ তাঁরা আদি এবং অকৃত্রিম মগ। আকিয়াব থেকে কলকাতায় এসেছেন—বেতের চেয়ার টেবিল বানিয়ে জীবিকার্জনের আশায়।

সুতরাং নামতে লাগল সুধাংশু সিঁড়ি দিয়ে। নেমে পথে বেরিয়ে এল। ঠিক সেই সময় একখানা মোটর-গাড়ী এসে থামল সেই বাড়ীর দরজায়। প্রথমে নামলেন অভিরামবাবু। ঢলঢলে বেমানান কোট-প্যাণ্ট পরে আছেন তিনি। তাতে আরও গোবেচারী হোয়ে উঠেছেন যেন। নেমেই অভিরামবাবু যে গাড়ী চালাচ্ছে তার পাশে গিয়ে অল্প একটু ঝুঁকে দু' হাত কচলাতে কচলাতে কি বলতে লাগলেন তাকে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রমহিলা নেমে এলেন গাড়ী থেকে। তার দিকে তাকিয়ে সুধাংশু হাঁ ক'রে ফেললে। কেমন যেন একটু অদ্ভুত আওয়াজও বেরিয়ে গেল তার গলা থেকে। তৎক্ষণাৎ সে সামলে ফেললে নিজেকে। পরমুহূর্ত্তেই হনহন ক'রে চলতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে ট্রামে উঠে ব'সে তবে সে হাঁফ ছাড়লে। আর তখন জ্বালা শুরু হোল তার দুই চোখে—আর বোধহয় বুকের ভেতরেও। যা সে এইমাত্র দেখে এল তা' দেখবার আশা সে যে মরে গেলেও করতে পারত না।

এক ঝলক মাত্র তাকে দেখেছিল সুধাংশু। তাতেই তার অনেক কিছু দেখা হোয়ে গিয়েছিল। গোবেচারী অভিরামবাবুর নিতান্ত নিরীহ কন্যাটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত রঙে রঙে রঙিন। জুতো থেকে শুরু ক'রে কাপড় জামা বক্ষবন্ধনী, ঠোঁট গাল চুল সবই এমন যাচ্ছেতাই রকম আত্মঘোষণা করছে যে দেখে সুধাংশুর মুখের ভেতর পর্য্যন্ত বিস্বাদ হোয়ে উঠল। যে মেয়ে সেদিন সকালেই তার মার কাছে ব'সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলেছিল তন্নকে—"না না, দরকার নেই আপনার সেখানে গিয়ে, ভয়ানক অসভ্য সব"—সেই মেয়েই অতটা অসভ্যের মত কাপড়চোপড় প'রে বাপের পাশে ব'সে ঘুরে বেড়াতে পারে, এ যেন সুধাংশু—বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বিশেষতঃ—ঐ পেটের মাংস দেখানো জামা পরা। কোনও বাঙালীর মেয়েকে পেটের মাংস দেখানো জামা প'রে থাকতে দেখলেই সুধাংশুর পিত্তি জ্বলে ওঠে।

কেমন যেন একটা ওলটপালট হোয়ে গেল সুধাংশুর মাথার মধ্যে। সে রাত্রে তার না হোল খাওয়া, না হোল ঘুম। মানে কি যে সে [illegible]

পারলে না। আর ঘুমুতে গিয়ে দেখল যে একটা নিষ্ফল আক্রোশে তাকে পেয়ে বসেছে। আক্রোশটা যে কার ওপর তাও সে বুঝতে পারলে না। ওদের মানে অভিরামবাবুদের ওপর নিশ্চয়ই নয়, কারণ কি সম্পর্ক আছে ওদের সঙ্গে যে সুধাংশু রাগ করতে যাবে। কোথাকার কে, তার ঠিকানা নেই। আজকাল ওরকম অদ্ভুত জীব কত শত আসছে, কে তার খবর রাখে। তবু—

তবু সেই ন্যাকা মেয়েটির অসহ্য ন্যাকাপনা, পলটু নীলের বাড়ীতে একখানা সাবান দিয়েছিল ব'লে সুধাংশুকে অনর্থক অপমান করা—এটা সুধাংশু কিছুতেই ভুলতে পারলে না। সকালের সেই শান্ত স্নিগ্ধ নিতান্ত সাদাসিধে মেয়েটি সন্ধ্যার পর কি ক'রে যে ঐ রকম বেহায়া হোয়ে উঠল তাও মাথায় ঢুকল না সুধাংশুর। পরদিন সে বেশ ভারী মন নিয়েই আফিসে গেল। এক ঘণ্টা পরেই এমন একটি সংবাদ শুনতে পেল ফোনে, যে রাগ আক্রোশ সব উবে গেল তার বুক থেকে। তার বদলে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় আর ভয়ে সে আড়ষ্ট হোয়ে উঠল।

ফোন করছেন স্বয়ং অভিরামবাবু। সুধাংশুই তাঁকে বলেছিল কোথায় সে চাকরি করে। কাজেই সুধাংশুর ফোন নম্বর পেতে তাঁর আটকায় নি। কিন্তু তাঁর গলায় আর মুখে আটকে যাচ্ছিল কথা। বহুকষ্টে তিনি শোনালেন যে মায়াকে ভোরবেলা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

"কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি?" সুধাংশু এইটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করতে পারলে। অভিরামবাবু কি জবাব দিলেন তা' সে ধরতে পারলে না।

কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও সে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলে না আফিসে। দিন তিনেকের ছুটির জন্যে লিখে রেখে বেরিয়ে পড়ল। দিলখুশা ষ্ট্রীটে পৌছতে আধঘণ্টাও লাগল না। অভিরামবাবু ঘরেই ছিলেন, মেঝেয় শুয়ে ছিলেন চোখ বুজে। দরজা ভেজানো ছিল। সুধাংশু ঘরে ঢুকতেও তিনি চোখ চাইলেন না। ঘরের ভেতরে একখানা খাট, একটা আয়না লাগানো টেবিল, দু'খানা চেয়ার আর একটা আলমারি। সুধাংশু বুঝতে পারলে যে ওগুলো শুদ্ধই ঘর ভাড়া করা হোয়েছে। খাটের ওপর ওঁদের বিছানার বাণ্ডিলটা রয়েছে আর সেই শৌখিন সাজ পোষাক, যা দেখেই বোঝা গেল যে সদ্য দোকান থেকে কিনে ওগুলোকে পরেছিল মায়া, সেগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। মায় সেই সোনালী রঙের জুতো জোড়াও রয়েছে একটা চেয়ারের ওপর। অর্থাৎ—!

সুধাংশু তার নিজের ঠোঁঠ কামড়ে ভাবতে লাগল। কিছুই সে নিয়ে যায় নি। তা'হলে গেল কি কি নিয়ে?

চাপা গলায় সুধাংশু ডাক দিলে—"দেখুন—শুনছেন—আমি" অভিরামবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"বস বাবা, বস।" ব'লে পাশ ফিরে শুলেন।

চটে গেল সুধাংশু। লোকটা চোখও খুললে না যে! প্রায় ধমক দিয়ে উঠল—"দেখুন—উঠে বসুন শিগ্‌গীর। চোখ বুজে শুয়ে থাকার সময় নয় এখন।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন অভিরামবাবু, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

প্রথম কথাই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে—"কি কি নিয়ে গেছে সে? কি প'রে গেছে?"

"তা' ত জানি না বাবা আমি।" আকাশ থেকে পড়লই যেন অভিরামবাবু। আরও খেপে গেল সুধাংশু, খিঁচিয়ে উঠল।

"তা জানবেন কেন? মেয়েকে ওই সব ছাইভস্ম পরিয়ে কাল কার গাড়ীতে বেরিয়েছিলেন? কোথায় গিয়েছিলেন এ বাড়ীতে এসেই? কে জুটিয়ে দিলে আপনাকে এই ফ্লাট?"

হাউমাউ ক'রে অনেক কথা ব'লে গেলেন অভিরামবাবু। তা' থেকে সুধাংশু এইটুকু মাত্র বুঝল যে অভিরামবাবুর এক বন্ধু ঢাকার একজন নামকরা ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে কাল সকালে হঠাৎ তাঁর দেখা হোয়ে যায়। সে ছোকরা সিনেমা করায়। মানে একজন ফিল্ম ডিরেক্টার সে। তার বাবা ঢাকায় থাকেন, তিনি অভিরামবাবুকে বলেছেন যে ছেলে কলকাতায় বহু টাকা রোজগার করে। সেই ফিল্ম ডিরেক্টারকে অভিরামবাবু জানান সব। মায়াকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন, এসে কি বিশ্রী জায়গায় উঠেছেন, আর কি মুস্কিলে পড়েছেন। শুনে তৎক্ষণাৎ সে এই ফ্লাটে ওঁদের নিয়ে আসে। ঐ সব [illegible]

বিকেলে ঐ সব পরিয়ে তাঁকে আর মায়াকে ছবি তোলবার দোকানে নিয়ে যায়। হাঁ অভিরামবাবু মেয়েকে সিনেমার ছবিতে নামতে দিতে আপত্তি করেন নি। কারণ আজ-কাল অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও যে ফিল্মে কাজ করছে। তবে মায়া রাজী হয়েছিল কি না, তা' তিনি ঠিক বলতে পারলেন না। কিন্তু সে খুব বেশী আপত্তিও করে নি। আর আপত্তি করবে কি ক'রে। সবই ত' সে জানে। কলকাতায় একটা কিছু উপার্জনের পন্থা না করতে পারলে গুষ্ঠী শুদ্ধ উপোস ক'রে মরবে যে।

গর্জন ক'রে উঠল সুধাংশু—"কি নাম সেই শুয়োরটার?"

ভয়ানক থতমত খেয়ে অভিরামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কার?"

আরও তেতে উঠল সুধাংশু—"সেই ফিল্ম ডিরেক্-টারটার?"

অভিরামবাবু বললেন—"বাসব—বাসব বোস।"

শুনেই সুধাংশুর সব আগুন যেন ঝপ ক'রে নিভে গেল। নিচু হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বললেন? কি নাম বললেন?"

অভিরাম আরও ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে তোতলাতে উচ্চারণ করলেন—"বাসব—বোস।"

ব্যাস—তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল সুধাংশু, ছুটতে ছুটতে নেমে গেল নিচে। রাস্তায় পা দিয়েই সামনে যে ট্যাক্সীখানা পেল তাতে লাফিয়ে উঠে বলল—"চালাও সাদার্ণ এভিনিউ, জলদি।"

বাসব বোস বাড়ীতে ছিলেন না। তখন তাঁর বাড়ীতে থাকার কথাও নয়। শ্রীমতী বোস ষ্টুডিওর নামটা বললেন যেখানে তাঁর স্বামী কাজ করছেন। সেই মুহূর্তে ছুটল গাড়ী টালিগঞ্জে।

সুধাংশুর মুখ চোখের অবস্থা দেখে বাসব বোস আঁতকে উঠলেন—"একি ব্যাপার হে! এ সময় এ অবস্থায়! ব্যাপার কি?"

সুধাংশু থপ ক'রে তাঁর হাতটা ধ'রে ফেলে বললে—"—মায়াকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আকাশ থেকে পড়লেন বাসব বোস—"মায়া! কে মায়া?"

সুধাংশু বললে—"অভিরামবাবুর মেয়ে, কাল আপনি যাকে কাপড় চোপড় কিনে—"

বাসব বোস থামালেন সুধাংশুকে—"আরে থাম থাম। বুঝতে দাও ব্যাপারটা। মায়া অভিরামবাবুর মেয়ে। কে এই অভিরামবাবু?"

সুধাংশু বাসব বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিললে একটা। জিজ্ঞাসা করলে—"কাল সারাদিন কোথায় ছিলেন আপনি?

"কেন! কাল সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত ত' আমি সুটিং করেছি এখানে! হোয়েছে কি?" বাসব বোসের দুই চক্ষু কপালে উঠল।

সুধাংশু তাঁর হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে—"শিগ্‌গীর আসুন দাদা আমার সঙ্গে। আমাকে ত আপনি চেনেন। শুধু শুধু আপনার মত লোককে বিরক্ত করতে আসিনি এসময়। ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে। বাসব বোস নাম নিয়ে কোনও বদমাশ—"

সুধাংশুর কথা আটকে গেল। অদ্ভুত ভাবে সে চেয়ে রইল বাসব বোসের মুখের দিকে। ঠোঁট দু'খানা শুধু কাঁপতে লাগল তার।

ঝানু ডিরেক্টার বাসব বোস অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারলেন সুধাংশুর অবস্থা দেখে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাঁর সহকারীদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে নিজের গাড়ীতে সুধাংশুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললে সুধাংশু।

বাসব বোস জিজ্ঞাসা করলেন—"যে লোকটা কাল রাত্রে ওদের গাড়ীতে ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার চেহারা বোধ হয় দেখতে পাও নি তুমি?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়লে।

"আচ্ছা, চল সেই অভিরামবাবুর কাছে। দেখি, তিনি কি বলেন।"

বাসব বোস দিলখুশা ষ্ট্রীটে গাড়ী ঢোকালেন।

অভিরামবাবু তখনও শুয়ে ছিলেন একভাবে। বাসব বোসের চেহারার যা বর্ণনা দিলেন তিনি তা' শুনে স্বয়ং বাসব বোসের খাবি খাবার উপক্রম হোল। অভিরাম-বাবুর বাসব বোসের সরু গোঁফ আছে। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি চলে গেছে। চুল নেমেছে ঘাড়

পর্য্যন্ত। লোকটি অতিরিক্ত রকম সৌখিন। তার গরদের পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি—অত্যন্ত বাহারী চাদর, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদির ফিরিস্তি শুনতে শুনতে—বাসব বোস তাঁর খাকী প্যাণ্ট আর সাদা সার্টের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু লজ্জিতই হোয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকল না যে একজন ফিল্ম-ডিরেক্টার—যাকে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্য্যন্ত করতে হয়, সে অমনভাবে সেজে থাকে কি ক'রে।

কিন্তু সে ভাবনা মুলতবী রেখে তিনি অভিরামবাবুকে জেরা করতে সুরু করলেন। কি কি প'রে গেছে তাঁর কন্যা তা' তিনি জানবেন কেমন ক'রে। রাত্রে সে একটা সাদা জামা আর একখানা ডুরে শাড়ী প'রে শুয়েছিল। কত টাকা অভিরামবাবুর কাছে ছিল তা' তিনি বললেন। গুণে দেখা গেল, টাকাও একটি কমে নি। গয়নাগাটীও খুঁজে পাওয়া গেল তার পেঁটরায়। সুতরাং কিছুই নিয়ে যায় নি মায়া। এক বস্ত্রে চলে গেছে।

বাসব বোস বললেন—"এবার চলুন আপনি আমার সঙ্গে। আর—একটুও দেরী করা উচিত নয়। লালবাজারে আমার বন্ধু দু' একজন আছেন, তাঁদের ধরতে হবে গিয়ে।"

অভিরামবাবু ঘাড় নাড়লেন।

সুধাংশু চিৎকার ক'রে উঠল—"তার মানে! যাবেন না আপনি থানায়?"

অভিরামবাবুর থানায় যাবার দরকার নেই। তিনি ঢাকায় তাঁর বন্ধু বাসবের বাবাকে টেলিগ্রাফ করবেন। থানায় গেলে তাঁর বন্ধুর ছেলে বাসব বোসকে নিয়ে টানাটানি করবে যে পুলিশে।

বাসব বোস এবার চিৎকার ক'রে উঠলেন—"করেছেন নাকি টেলিগ্রাম ঢাকায় আপনি? সর্ব্বনাশ—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মাথার মাঝখানে সিঁথী-কাটা, গরদের পাঞ্জাবী পরা, সরু গোঁফওয়ালা একজন ঘরে ঢুকে একটি সবিনয় নমস্কার করলে অভিরামবাবুকে। মেয়েলী গলায় বললে—"এই যে ঠিক সময় এসেছি ত আমি? না দেরী করে ফেললাম। আর যা কাজের চাপ পড়েছে। সকাল থেকে সুটিং চলছিল। তা শ্রীমতী মায়া দেবীকে দেখছি না যে? তিনি কি এখনও তৈরী হোচ্ছেন নাকি?"

বাসব বোস আর অভিরামবাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সেই লপেটা-মার্কা ভদ্রলোকটির দিকে। তিনি তাঁর পকেট থেকে সিল্কের রুমালখানি বার করে নিজের ঘাড় ঘষতে লাগলেন। সুধাংশু খপ ক'রে ধরলে তাঁর সযত্নে সাজানো চুল। ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর গজরাতে লাগল—"কে তুমি? তুমি কে? শিগ্‌গীর বল? বল শিগ্‌গীর?"

ভদ্রলোক শকুনের মত ককিয়ে উঠলেন। অভিরামবাবু লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে শুরু করলেন—"আহা-হা-হা কর কি, কর কি। আমার বন্ধুর ছেলে ও, ওর গায়ে হাত—"

বাসব বোস প্রচণ্ড ধমক দিলেন তাঁকে—"থামুন আপনি। কে আপনার বন্ধুর ছেলে? ওই স্কাউণ্ড্রেলটা বাসব বোস নাকি?"

সুধাংশু তার কাজ করেই চলেছে। চুল ছেড়ে ধরেছে তার গর্দান। মাথাটা নুইয়ে ফেলেছে নিজের হাঁটুর কাছে। আর দমাদম ঝাড়ছে কিল তার ধনুকের মত বাঁকানো পিঠের ওপর।

বাসব বোস ধরে ফেললেন সুধাংশুর হাত। বললেন—"থাক এখন, যথেষ্ট হোয়েছে। এই শুয়োরের বাচ্চাটাকে মেরে লাভ কি? মায়াকে যে ও সরায় নি তা' ত বোঝাই যাচ্ছে। ও যদি সরাত মেয়েটাকে—তা'হলে আর এ মুখো হোত নাকি?"

সুধাংশু বললে—"কিন্তু একে ছাড়া হবে না, যতক্ষণ না মায়াকে পাওয়া যায়।"

অভিরামবাবু বিষম রকম তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন—"তার মানে! ও কে? ও কি বাসব বোস নয়?"

সুধাংশু সট্ করে একটা চড় কষালে লোকটার গালে—"বল, বল শিগ্‌গীর, তুই কে? নয়ত হাড় ভেঙে ফেলব মারের চোটে।"

নকল বাসব বোস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিলে। বেচারার সাজ পোষাক চুল মুখের রঙ্ সব গোল্লায় গেল। বাসব বোস বললেন—"ছেড়ে দাও ওকে। ওকে আমি জানি। ও একটা গর্ভস্রাব। ব্যাটাচ্ছেলে বড়-

সেজে ঘুরে বেড়ায় আর বাপের টাকা ওড়ায়। এই জানোয়ারগুলোর জন্তেই এত বদনাম আমাদের। ওর নামও আমি জানি। ব্যাটা নাম নিয়েছে চন্দনকুমার। কিন্তু ও যে এত বাড় বেড়েছে—আমার নাম নিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা করছে, তা' ত জানতাম না।"

সুধাংশু বললে—"ছাড়ব। আগে ও বলুক, কাল কোথায় নিয়ে গিয়েছিল এঁদের। না বললে ওকে আস্ত ছাড়ব না।"

তখন বেগতিক বুঝে চন্দনকুমার বললেন সব। অভিরামবাবু ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভবানীপুরের ওধারে। চন্দনকুমারের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হোয়ে যায়। কোথাও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করেন তিনি চন্দনকুমারকে। তখন সে কথায় কথায় জেনে নেয় যে অভিরামবাবু মেয়ে নিয়ে সভ্য এসে নামছেন ঢাকা থেকে। ঢাকা শুনেই সে বাসব বোসের বাবার নাম করে। বাসব বোস কার ছেলে, কোথায় তাঁর বাড়ী এ সব সংবাদ ত বহুবার সিনেমার কাগজে ছাপা হোয়েছে। যখন সে শুনল যে বাসব বোসের বাবা অভিরামবাবুর বন্ধু, তখন নিজেকে বাসব বোস বলে পরিচয় দেয়। দিলখুশা ষ্ট্রীটের ফ্লাটটা ও ভাড়া নিয়েছিল মাঝে মাঝে মনের মত শিকার এনে তোলবার জন্তে। কাজেই তৎক্ষণাৎ ঘর জুটিয়ে দিতে তার আটকায় নি। অভিরামবাবু মেয়ে নিয়ে এসে উঠলেন ফ্লাটে। চন্দনকুমার তাঁকে বোঝাল যে অবিলম্বে মেয়েকে সিনেমায় নামাতে পারে সে। প্রচুর টাকা আর প্রচুর সুনাম, কারণ আজকাল সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাই সিনেমায় নামছে।

অতঃপর কিছু সাজ-পোষাক কিনে দিয়ে ওদের নিয়ে সে যায় ধর্ম্মতলায় এক ফোটোর দোকানে। সেখানে মায়ার খানকতক ফোটো তুলে ফিরিয়ে আনে। আর তখনই সুধাংশু ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিল এখানে। আজ চন্দন ঠিক সময় এসেছে মায়াকে নিয়ে একেবারে সিনেমা ষ্টুডিওতে গিয়ে কনট্রাক্টে সই করাবার জন্তে।

শুনে আসল বাসব বোস বললেন—"চুলোয় যাক্ ওটা। এখানে আর সময় নষ্ট ক'রে হবে কি। চল শিগ্‌গীর লালবাজার।"

সুধাংশু বললে "একে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না তাকে পাওয়া যায়, ততক্ষণ একে ছাড়ব না আমি।"

সুতরাং অভিরামবাবু আর নকল বাসব বোসকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ওরা রওয়ানা হোল লালবাজারের দিকে।

লালবাজারের মিষ্টার গুপ্ত সভ্য আই-পি-এস ছাপ মারা অফিসার। বাসব বোসের বন্ধু এবং ভক্তও। সমস্ত ব্যাপারটা শোনবার পর একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে ফোন তুলে ডাকলেন একটা নম্বর। নম্বর শুনেই চমকে উঠল সুধাংশু। কারণ নম্বরটি তার মুখস্ত। নম্বরটি তার বড় হুজুর মেজর জেনারল নাথুরামের। কনেকশন পেয়ে গুপ্ত অকপট নির্লিপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করলে—"হাঁ, সার—আমি গুপ্ত কথা বলছি লালবাজার থেকে। আপনার সেই অফিসার সুধাংশু মিত্তিরকে আমরা পেয়েছি। আজ্ঞে হাঁ—বসিয়ে রেখেছি এখানে। আজ্ঞে হাঁ—সুস্থই আছেন। একটি মেয়ের খোঁজে পাগল হোয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। হাঁ—সার—তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর দাদার হাতে দিয়ে দোব। গুড্ নাইট—সার।"

সুধাংশু বললে—"আরে! এ সব কি?"

গুপ্ত বললেন—"কিছুই নয়। বেলা একটায় একখানা মানে হয় না এমন চিঠি লিখে রেখে আপনি ফেরার হন। এক ঘণ্টা পরে আপনার দাদা আপনার খোঁজ করেন আফিসে। আফিস আমাদের জানায়। আমরা আপনাকে খুঁজে পেলাম এবং আপনার কর্ত্তাকে জানিয়ে দিলাম। এবার আপনার সঙ্গে একজন অফিসার দিয়ে আপনার বাড়ীতে পৌছে দোব।"

সুধাংশু চিৎকার ক'রে উঠল—"চুলোয় যাক্ আমার বাড়ী যাওয়া। এখন সেই মেয়েটার কি হবে।"

গুপ্ত বললেন—"পুলিশের চাকরির নিয়ম হচ্ছে, এক একটা কেস শেষ করা। আপনার কেসটার শেষ ক'রে ওটা ধরব। আপনারা মিলিটারির লোক, আমাদের ব্যাপার বুঝবেন না।"

বাসব বোস বললেন—"তা' ত বুঝলাম সব। কিন্তু আমি এখন করব কি।"

গুপ্ত বললেন—"ইচ্ছে হয় আসতে পার আমাদের সঙ্গে। আমিই ওঁকে পৌছতে যাচ্ছি কি না। কারণ ওঁর দাদা আবার—আমার বড় কর্ত্তার বন্ধু।"

অগত্যা প্রথমে সুধাংশুদের বাড়ীতেই যেতে হোল সকলকে। শুধু সেই চন্দনকুমারকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল।

স্থান সুধাংশুদের বাড়ী।

সময় রাত আটটার পর।

সুধাংশুর দাদা বাইরের ঘরে ব'সে তাঁর ওকালতির কাগজপত্র দেখছেন আর চুরুট টানছেন।

বিদকুটে আওয়াজ ক'রে পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। লাফিয়ে নামলেন প্রথমে গুপ্ত, নামল সুধাংশু। সুধাংশুর হাত ধ'রে একরকম টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গুপ্ত ঢুকলেন সুধাংশুর দাদার ঘরে। পেছনে বাসব বোস আর অভিরামবাবুও ঢুকলেন।

কেউ কিছু বলবার আগেই হিমাংশুবাবু মুখ তুলে বললেন—"কোথায় ছিলি সারা দিন তুই? মা এধারে হুলস্থূল বাঁধিয়েছেন যে।"

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করলে মিউমিউ ক'রে—"মা জানলেন কি ক'রে—যে বেরিয়ে গেছি আমি আফিস থেকে।"

পেছন থেকে তনু বলে উঠল—"মার দোষ নেই। আর একজন এসে তোমায় না দেখে একেবারে মরমর হোয়ে উঠলেন কি না। তাই আমাকে ফোন করতে হোল তোমার আফিসে। তোমায় না পেয়ে হাইকোর্টে দাদাকে ফোন করলাম।"

"কে সে?" টপ্ ক'রে ফিরে দাঁড়াল সুধাংশু।

"তা' আমি জানব কি ক'রে। ওপরে গেলেই দেখতে পাবে। চলুন, আপনারা সবাই ওপরে চলুন।" ব'লে সকলকে নিয়ে তনু চলল ওপরে।

মার ঘরের সামনে গিয়ে সকলে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলে সুধাংশু—কে একজন একখানা লাল-পাড় গরদ প'রে পেছন ফিরে ব'সে আছে এক কোণে।

সুধাংশুর মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অভিরাম-বাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"এবার আপনি বেয়ান ঠাকরুণ আর ছেলে মেয়েদের আনতে যান বেহাই মশাই। মা লক্ষ্মী এখন এখানেই থাকবে আমার কাছে। বেয়ান এলে বিয়ে হবে।"

ঘরে ঢুকে নতমুখী মায়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল তনু। এনে বললে—"এখন একটু মুখে জল দেবেন ত' দেবী। এই দেখুন এই আপনার সুধাংশুবাবুকে ধ'রে এনে খাড়া ক'রে দিয়েছি আপনার সামনে। বাপস্ বিয়ে না হোতেই এই। স্বামী মুখ না দেখে জলস্পর্শ করবেন না।"

বাসব বোস বললেন—"আইডিয়াল প্লট একখানা।"

গুপ্ত বললেন—"একটা অতি যাচ্ছেতাই কেস। কাকে যে চালান দোব ভেবে পাচ্ছি না।"

একদম পেছন থেকে সুধাংশুর দাদা বললেন—"চল, আমরা নিচে চালান হই সকলে। তনু এবার নিশ্চয়ই এক পেট করে মিষ্টি খাওয়াবে আমাদের। কারণ ও কবি মানুষ, এই নিয়ে একটা সাতগঞ্জি কবিতা লিখতে পারবে।"

জোনাকিরা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জানলার ফ্রেমে আঁটা তারা ভরা আকাশের নাল
কালো রাতে ভ্রুকুটির মত জেগে করে ঝিল্‌মিল্‌
হৃদয়ে আভাস পেলে মন মাতে বাতাসের ঘ্রাণে
রজনীগন্ধার আর নীল আলো জোনাকিরা আনে।

টুকরো আকাশ ভ'রে ফুটে আছে তারাদের জুঁই
আলোর পাপড়ি দেখে মন করে শুধু ছুঁই ছুঁই,
নির্জনের নীল রাতে সুখা মন বুঝি তারা দেখে;

পৃথিবীর মাটি চেয়ে মনে ভাবি যত জোনাকিরা
আকাশের খসা তারা, কালো বুকে নিয়েছে রাত্রিরা
হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে গিয়ে কামনার ভিড়ে,
স্বপ্ন দেখি তারাগুলো জোনাকির মত আসে ধীরে।

কখন মনের কাছে উড়ে এসে হঠাৎ হাওয়ায়
ছুঁই ছুঁই ক'রে গেলে আশ্চর্য সে অস্তিত্ব হারায়,
মন ফাঁকা লাগে তাই, তবু দেখি তারাগুলো জ্বলে

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রফুল্লে পদাব্জে কলিমলহরে শান্তিনিলয়ে
নমেন্নিষ্ঠা কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি হরে তিষ্ঠতি মর্তেঃ।
সদা ভোগাকাঙ্খা ধনজনসুহৃদসৌধনিচয়ং
জগন্নাথস্বামিন্নগতিকমিমং পাহি কৃপয়া ॥ ৫ ॥
কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥
নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় দেবকী-নন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্
সকৃদেব পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ প্রভাস পুরাণে ॥

এই কৃষ্ণনাম অনিত্যজ্ঞানপ্রদ বিষয়রস হইতে শাশ্বত-পরমানন্দদায়ক মধুর রস ; "রসোবৈ সঃ"—নাম সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্মূর্ত্তি। স্বপ্নোপম অতি তুচ্ছ সাংসারিক মঙ্গলের মঙ্গল এই নামের কৃপায় মানুষ প্রকৃত মঙ্গলের রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হয়। সমস্ত বেদলতার চৈতন্যময় ফলস্বরূপ—হেলা অথবা শ্রদ্ধা করে একবারও এনাম যদি কেহ গান করে, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, তাকে কৃষ্ণনাম ভীমভব—পারাবার হতে উত্তীর্ণ করে।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদাপার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥

আদি পুরাণে।

হে অর্জ্জুন ! হেলা অবজ্ঞা অথবা শ্রদ্ধা করে যারা আমার নাম কীর্ত্তন করে তাদের নাম আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

এই শ্লোকটাকে কণ্ঠহার করে রাখ্‌তে ইচ্ছা হয়, কোনরকমে তাঁর নাম করলে ঠাকুরের হৃদয়ে নামকারীর নাম সর্ব্বদা থাকে, শ্রীভগবান তাঁকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন—এতবড় আশার কথা আর শুনি নাই।

তিনি যে করুণাময় শরণাগত-পাগল—কেবল তিনি ডাকছেন ওরে আয় আয় আয়, আমার বুকে আয়।

কালকের গীতার শ্লোক দুটীর ব্যাখ্যা বল।

মন্মনাভব মনের বৃত্তি সঙ্কল্প-বিকল্প করা, তুমি আমার লীলাগুণের সঙ্কল্প-বিকল্প কর, নবধাভক্তির অনুষ্ঠান করে আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর, তা'হলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।

প্রত্যেকটাই করতে বললেন ?

যে সমর্থ হবে সে চারিটিই করবে—শ্রীভগবান বল্লেন মন্মনা হও।

চঞ্চল মন নিয়ে আগত-চিত্ত হতে পাচ্ছি না।

নবধা ভক্তির সাধন করে আমার ভক্ত হও, নবধা ভক্তি—শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন।

ভক্তঃ—অত যে করতে পারি না সংসারের পেষণে, অত সময় যে নেই।

আচ্ছা—আমার পূজা কর।

ভক্তঃ—তাও যে পাই-হারাণো মনের দ্বারা করতে সমর্থ হই না।

উত্তম, আমায় নমস্কার কর।

ভক্ত :—সতত বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে তোমাকে প্রণাম্ করবার যে অবকাশ নাই।

ঠাকুর :—ঠাকুর-ঘরে তোমায় যেতে হবে না।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বাণি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

শ্রীমদ্ভা ১১।২।৪১

গগন পবন অনল সলিল ধরণী চন্দ্র সূর্য্যগ্রহ তারা জীব সকল দশদিক বৃক্ষসমূহ নদী ও সমুদ্র সমুদয় যা কিছু সবই আমার শরীর। অনন্যভাবে তুমি আমায় প্রণাম কর, তাহলেই সব হবে।

তা'হলে মাত্র নমস্কার করলেও হবে।

নিশ্চয় হবে গীতার চরম উপদেশ "আমাকে নমস্কার কর।" নমস্কার আত্মযজ্ঞ—

নমস্কারঃ স্মৃতোযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষুচোত্তমঃ
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতঃ হরিং ব্রজেৎ ॥

সমস্ত যজ্ঞের উত্তম যজ্ঞ নমস্কার—একটী নমস্কারের দ্বারা মানব পবিত্র হয়ে হরিকে প্রাপ্ত হয়।

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।
রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতঃ সমাঃ ॥

ভক্তি সহকারে যিনি হরিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন তাঁর গাত্রে যত ধূলি লাগে তত সংখ্যক শত মন্বন্তর স্বর্গে বাস করেন।

শিব-পুরাণে কথিত হয়েছে—

সহস্রমযুতং লক্ষং কোটিং বাকারয়োদ্বুধঃ ॥
নমস্কারাত্মযজ্ঞেন তুষ্টাঃস্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ

বিশ্বেশ্বর সংহিতা—১৬

বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র, অযুত, লক্ষ কিম্বা কোটিবার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করবে, নমস্কাররূপ আত্মযজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতা তুষ্ট হন।

নম্রোঽহং হি স্বদেহেন ভোমহাংস্ত্বমসি প্রভো।
নশূন্যো মৎস্বরূপোবৈ তবদাসোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ঐ

হে প্রভো! তুমি মহান্, আমি স্বীয় দেহের দ্বারা প্রণত হচ্ছি, নিশ্চয় আমার স্বরূপ শূন্য নহে, অধুনা আমি তোমার দাস।

প্রণাম করা মহাসাধনা দেখ্‌ছি।

সেইজন্য বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ নিত্য ১০৮ বা ১০০৮ প্রণাম করেন।

জ্ঞানীগণ বলেন—

প্রহ্বতা লক্ষণঃ প্রোক্তো নমস্কারঃ পুরাতনৈঃ।
প্রহ্বতানাম জীবস্য শিবাৎ সত্যাদি লক্ষণাৎ ॥
ভেদেন ভাসমানস্য মায়য়া ন স্বরূপতঃ।
সম্বন্ধ এব তেনৈব সোঽপি তাদাত্ম্যলক্ষণঃ ॥

প্রাচীনগণ নমস্কার প্রহ্বতা লক্ষণ বলেছেন প্রহ্বতার অর্থ সত্যজ্ঞান অনন্ত লক্ষণ শিব হতে স্বরূপও নয়—মায়ার দ্বারা ভেদে ভাসমান জীবের সম্বন্ধ নমস্কার দ্বারাই হয়, তাহা তাদাত্ম্যলক্ষণ, তৎস্বরূপতা—অভেদ।

অদ্বৈত জ্ঞানিসকলও নমস্কারকে অভেদের সাধন বলেছেন, নমস্কার তো বড় সহজ নয়?

আরও শোন।

মকারো মমশব্দার্থোলুপ্তস্তেকো মকারকঃ ॥ সূতসংহিতা

ভক্ত বল্‌ছেন ন মম—এ দেহ আমার নয় এ তোমার। একটী মকার লোপ হয়ে গিয়ে "ন মম" স্থানে নম হয়েছে। নম মানে আত্মদর্শন—

বৃদ্ধহারীত বলেছেন—

মকারেন স্বতন্ত্রঃ স্যান্নকার স্তন্নিষিধ্যতি।
তস্মাচ্চ নম ইত্যত্রস্বতন্ত্রমপনেষ্যতি ॥

মকারের দ্বারা স্বতন্ত্র বুঝায়। নকার তাহা নিষেধ করে। সেইহেতু নমঃ শব্দ স্বাতন্ত্র্য অপনীত করে থাকে। বেশী কথা কি ঠাকুর বলেছেন—

নম ইত্যেব যোব্রূয়ান্মদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্যাক্ষয়োভবেল্লোকঃ শ্বপাকস্যাপিনারদ ॥ অনুস্মৃতি।

হে নারদ। শ্রদ্ধাযুক্ত আমার যে ভক্ত "নমঃ" এই কথা মাত্র বলে সে যদি চণ্ডালও হয় তাহলে তার অক্ষয় লোক লাভ হয়ে থাকে।

গুরুজনকে প্রণাম করার ফল মনু মহারাজ বলছেন

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃস্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥
অভিবাদন শীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্ ॥ মনুঃ—২-১৪-২১

গুরুজন আগমন কর্‌লে যুবকসকলের প্রাণ ঊর্দ্ধগত হয়, প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদনের দ্বারা প্রাণে স্বস্থানে নীত হয়ে থাকে, বৃদ্ধগণের সেবাপরায়ণ নিত্যপ্রণামকারিগণের আয়ুর্বিদ্যা যশঃ বল এই চারিটী বৃদ্ধি হয় ॥

যাক্।

কৃষ্ণ নাম হইতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
নাম বিনা কলি কালে নাহি আর-ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥ চৈ, চ,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

পূজা-আয়োজন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এমন প্রভাতে হয়েছে কি তব পূজা-আয়োজন সারা?
মনের কাননে ফুটেছে কি আজ শুভ্র শেফালি-রাশি,
নীলিমার মাঝে হ'ল কি আকুল চিত্ত আত্মহারা,
সাদা মেঘ সাথে গেল কি সে কোন্ দূর দিগন্তে ভাসি?

সে নীল কি নেমে মিলে গেল হেথা সবুজের সমারোহে,
জীবনে জীবনে উঠিল কি রণি' সোনালী আলোর গান?
যে আলো ছিল না, যে জীবন হেথা মূর্চ্ছিত ছিল মোহে,
সে আলো ফুটিল? পেলে কি চেতনা নিদ্রা বিমূঢ় প্রাণ?

প্রভাতে প্রদোষে শোননি কি কোথা সন্ধ্যা-আরতি বাজে,
ঊর্দ্ধে গগন, নিম্নে পবন বন্দনা করে কারে?
বর্ণে গন্ধে কার সাড়া পেলে মুগ্ধ হৃদয়-মাঝে,
চঞ্চল নদী চির-ঈপ্সিত পেলে কি পূর্ণতারে?

রজত রজনী—কোন্ অসীমায় উদিল পূর্ণ চাঁদ,
জ্যোৎস্না ধারায় স্নিগ্ধ হ'ল কি সারা অন্তরখানি?
প্রশান্তি মাঝে মিলায়ে গেল কি সকল বিসম্বাদ,
বাজে উন্মুখ ধরণীর বুকে দূর আকাশের বাণী!

এ নহে বেদনা, নহে আকুলতা, নহে ত উন্মাদনা,
শান্ত স্নেহের স্পর্শের মত একি অনুভূতি জাগে!
বিহ্বল প্রাণে কার আহ্বান সহসা গিয়াছে শোনা,
বাজে তার সুর দিবস-যামিনী হৃদয়ে মধুর রাগে।

নদী-তরঙ্গে বাজে সঙ্গীত, তরু-মর্ম্মরে ভাষা,
কুলায়ে কুলায়ে জাগে বিহঙ্গ, বনে বনে জাগে সাড়া
আনন্দময় স্নিগ্ধ আলোকে ফোটে অপূর্ব্ব আশা,
এমন প্রভাতে হয়েছে কি তব পূজা-আয়োজন সারা?

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উপনিষদে দেবতা

উপনিষদে যাগযজ্ঞও বৈদিক দেবতাদিগের পূজা নিষিদ্ধ হয় নাই, তাঁহাদের অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয় নাই। ঈশোপনিষদে পুষণ (সূর্য্য) ও অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে (১৫।১৮)। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আছে—যে সূর্য্যের জ্যোতি দ্বারা তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অগ্নিকে যাবতীয় কর্ম্মের জ্ঞাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পাপ হইতে মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন উপনিষদে দেবতাগণের শক্তি যে ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তাহা এক আখ্যায়িকা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত অগ্নির উপাসনার বিধি বলিয়াছেন। উক্ত উপনিষদে সূর্য্য যে ব্রহ্ম হইতে উদিত এবং ব্রহ্মেই অস্ত যায় এবং সমস্ত দেবতা ব্রহ্মে অবস্থিত, একথাও আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "দেব-পিতৃ-কার্য্যে অবহেলা করিও না" একথা আছে। কিন্তু মুক্তির জন্য যাগযজ্ঞ ও দেব পূজায় কোনও বিশেষ গুরুত্ব উপনিষদে অর্পিত হয় নাই, দেব পূজাও যাগযজ্ঞে নিষ্ফল। ইহা না বলিয়া উপনিষদে বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা মুক্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু ভোগ শেষ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাগযজ্ঞ ও দেব পূজা নিষ্ফল নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট উপাসনা। সকাম উপাসনা মাত্রই নিকৃষ্ট। ইহাই উপনিষদের মত।

মোক্ষ বা মুক্তি

মুণ্ডক বলেন—"প্রবহমান নদীগণ যেমন নামও রূপ বর্জন করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়", জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়," (৩।২।৮) পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্তিই মুক্তি। তখন নামরূপ থাকে না, অর্থাৎ ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের নিগড় হইতে মুক্ত হয়। অসীম ও সসীমের মধ্যে মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ত হয়, সসীম তখন অসীমে মিশিয়া যায়। তখন অসীম হইতে স্বতন্ত্র তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অসীম হইতে স্বাতন্ত্র্য তো তাহার কখনও ছিল না। পরমাত্মাই তো ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেক আত্মারূপে বিরাজিত। পরমাত্মার বাহিরে তো কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। তবে মুক্তি ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার মধ্যে ভেদ কোথায়? পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে বাস্তব ভেদ থাকুক বা না থাকুক, ভেদ যে উপলব্ধি হয়, তাহা সত্য। এই ভেদ অজ্ঞতা প্রসূতা—অবিদ্যা সঞ্জাত। এই অজ্ঞান যখন দূরীভূত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ থাকে না। এই ভেদ বাস্তবিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রান্ত উপলব্ধি হয়। সেই ভ্রান্তি নিরসন, ভ্রান্ত উপলব্ধির অভাবই মুক্তি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্‌ক্যকে অমৃতত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্‌ক্য বলিয়াছিলেন, এক খণ্ড সৈন্ধব জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলে বিলীন হইয়া যায়; তাহাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। তেমনি অনন্ত অপার বিজ্ঞান-ঘন মহান আত্মা সমুদয় ভূত হইতে জীবাত্মারূপে উত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার সংজ্ঞা থাকেও না। শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—"মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না! ইহা বলিয়া আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্‌ক বলিলেন "মোহজনক কিছু বলিতেছি না। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ অভিবাদন করে, মনন করে, জানে। কিন্তু যখন একজনের নিকট সকলই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কে কাহাকে কিরূপে জানিবে? যাঁহা দ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?" যাজ্ঞবল্‌ক্য বলিয়াছিলেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" "প্রেত্য" শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে যাইয়া অর্থাৎ "সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া"। ইহার অর্থ কেহ কেহ করেন "মৃত্যুর পরে"। এই অর্থ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর পরে পরমাত্মায় মিশিয়া যায় বলিতে হয়। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয়। মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন থাকে না; জন্মান্তরও থাকে না। কিন্তু "প্রেত্য" শব্দের অর্থ "সংসারক্ষেত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া" ধরিলে যাজ্ঞবল্‌ককে উক্তির অর্থ হয়—"জন্ম মৃত্যু চক্র হইতে লোক যখন মুক্তিলাভ করে, তখন তাহার সংজ্ঞা থাকে না।" যাজ্ঞবল্‌ক বলিয়াছিলেন "এই আত্মা অবিনাশী অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।" ইহার উচ্ছেদ নাই। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না, এই উক্তির সহিত "আত্মা অবিনাশী" এই উক্তির-সংগতি থাকে না। সে যাহা হউক মুক্তিতে আত্মার সংজ্ঞা থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্‌কের মত। সৈন্ধব খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, আত্মাও পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। কিন্তু ইহার বিপরীত মতও উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ পরিমুক্ত হন—"তাহাদের কর্ম্মও বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়। (মুণ্ডক—৩।২।৬) যিনি অক্ষরকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, এবং সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। (প্রশ্ন—৪।১১) ইত্যাদি বহু উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, এবং তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না বলা হইয়াছে। তখন তাহার কোনও ক্রিয়া থাকে না। প্রতীতি, চিন্তা ও সংবিদ্ দ্বৈত-বোধক।

তাহাও জীবাত্মায় তখন থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই যেখানে নাই সেখানে প্রভৃতি চিন্তা ও সংবিদ থাকে না। অসঙ্গের মধ্যে বহুত্ব থাকে না। অসঙ্গ অপরিণামী ও সনাতন। তাহার বর্ণনা করা যায় না। সেই অসঙ্গের সহিত জীবাত্মা যখন মিশিয়া যায় এমন তাহার যে অবস্থা হয় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

কিন্তু উপনিষদে এরকম ও বহু শ্লোক আছে, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে বলা হইয়াছে। "যখন জ্ঞানী জ্যোতির্ময় হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ কর্ত্তা ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত সমতালাভ করেন।" (মুণ্ড—৩।১।৩)। "এই যে আত্মা মনুষ্যে—আর এই যে আত্মা আদিত্যে, উভয়ে এক। যিনি ইহা জানেন তিনি এই অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা, আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ অন্নবান ও রূপবান হইয়া এই সকল লোক উপভোগ করিয়া, গান করিতে থাকেন —"আমি অন্ন * * * আমি অন্নভোক্তা * * * আমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জগতের প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ, দেবতাদিগের পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব প্রাণীর অমরত্বের নাভি অর্থাৎ কারণ হইলাম।" (তৈত্তী—৩।১০) কৌষীতকী উপনিষদে মুক্তাত্মার ব্রহ্মলোকে গমনের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহাতে মুক্তিতে জীবের যে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, তাহা মনে হয় না। মুক্তাত্মায় ব্রহ্ম গন্ধ, "ব্রহ্মরস," ও ব্রহ্মাংশ প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনা নদীতে দেবতাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে ; তাহাতে আছে "প্রসাদ-গুণপ্রাপ্ত শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ। তখন * * * ক্রীড়া করিয়া ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য বাচক এবং সাদৃশ্যবাচক উভয় বিধ উক্তিই পাওয়া যায়। ইহা হইতে পরে বেদান্তের বহুবিধ ভাষ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব মত অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ সকলের ভিত্তিই উপনিষদ।

বেদের ঋষিগণ বহির্জগতে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন ; বহির্জগৎ—যাহাকে জড় জগৎ বলা হয়, তাহার মধ্যে চিন্ময় ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট, তাহা ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহার আত্মা, তাহা ব্রহ্মই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষিগণ অন্তরের মধ্যে বর্হিজগতের আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে চিন্ময় আত্মা তাহা ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যিনি বর্ত্তমান, তাহারা এক ও অভিন্ন, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন একই চিন্ময় পরমাত্মা—বর্হিজগতে ও অন্তঃজগতে বর্ত্তমান, তিনি বর্হিজগৎ ও অন্তঃজগতে শুধু অনুপ্রবিষ্ট নহেন, তিনিই বর্হিজগৎ, তিনিই অন্তর্জগৎ, বর্হিজগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও অন্তর্জগতে প্রতি জীবের প্রতীতি, অনুভূতি ও জ্ঞান সকলই তাঁহার প্রকাশিত অবস্থা। সাধক ধ্যান বলে এই একত্ব অনুভব করেন। এই অনুভূতির প্রকার ভেদ আছে। কেহ কেহ অসীমের মধ্যে ডুবিয়া আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলেন। কাহারও কাহারও সেই সত্তা সাগরে —আনন্দ সমুদ্রের মধ্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। এই বিভিন্ন অনুভূতিই বিভিন্ন প্রকার বর্ণনার কারণ।

সংবিদের বিভিন্ন অবস্থা

মাণ্ডুক্য উপনিষদে চারি প্রকার সংবিদ বর্ণিত হইয়াছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যাহা দেখি স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর তাহার সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় বস্তু সকল দেশ কালে, অবচ্ছিন্ন, এবং কার্য্য কারণের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সকল দেশ কাল ও কার্য্য কারণের নিয়ম সকল সময় মানে না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট ঘটনার সহিত জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনাবলীর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ ও সকল সময় থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও কামনা থাকে না, কোনও স্বপ্নও দৃষ্ট হয় না, তখন যাবতীয় বিচ্ছিন্ন জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, আনন্দ অনুভূত হয়। চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ও থাকে না, অন্তর্জ্ঞানও থাকে না, তাহা প্রজ্ঞান ঘন অবস্থাও নহে সে অবস্থা বর্ণনাতীত। তখন কেবলমাত্র এক আত্মারই অনুভব হয় (একাত্ম-প্রত্যয়সারঃ)।

স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইয়া তাহা দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমিত হয় স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব নাই—অন্ততঃ জাগ্রদবস্থার দৃষ্ট বস্তুর যে প্রকার অস্তিত্ব স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর তাহা নাই। তাহারা আসে কোথা হইতে কিরূপে? কঠোপনিষৎ বলেন "য এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (৫।৮) প্রাণিগণ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তিনি (ব্রহ্ম) জাগ্রৎ থাকিয়া কাম্য বস্তু সকল নির্মাণ করেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্ন দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পায় না। আবার স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাগরিত হইয়া স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু দেখিতে পায় না। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছিলেন "পুরুষের দুই স্থান ইহলোক ও পরলোক। সন্ধিস্থান তৃতীয়-স্থান। তাহা স্বপ্ন স্থান। স্বপ্নে আত্মা রথ, রথযোগ (রথের বাহন) এবং পথের সৃষ্টি করেন। মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় পারে বিচরণ করে, তেমনি পুরুষ স্বপ্ন এবং জাগরিত উভয় অবস্থানেই বিচরণ করেন। শ্যেন-পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে পক্ষদ্বয় সংকুচিত করিয়া নীড় অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি পুরুষ সুষুপ্তি স্থানের দিকে ধাবিত হয়। (বৃঃ আঃ—৪।৩।১৮-১৯ ।

স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে বিলীন হয়। তাহাদের কার্য্য থাকে না। কিন্তু মনের, কার্য্য থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মন প্রাণ বায়ুতে বিলীন হয়। তখন প্রাণের কার্য্য থাকে, কিন্তু মনের কার্য্য থাকে না। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। সুষুপ্তির এই আনন্দ স্মৃতিতে উদিত হইলে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মানুষ বলে "সুখে নিদ্রা গিয়াছি।"

"মধু মক্ষিকা নানাবৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সকল রসকে এক ভাবাপন্ন করে। তখন যেমন বিভিন্ন রসের বিবেক থাকে না যে "আমি অমুক বৃক্ষের রস" তেমনি প্রাণিগণ সুষুপ্তি কালে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে আমরা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি। [illegible]

পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক প্রভৃতি যে যে অবস্থায় ছিল সেই সে অবস্থা প্রাপ্ত হয় (ছান্দোগ্য—৬-৯-২)। পূর্ব্বদিকস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদিকস্থ নদী সকল পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারা সমুদ্রেই গমন করে, সমুদ্রই হইয়া যায়। তাহারা জানিতে পারে না—"আমি এই নদী" তেমনি এই সমুদয় প্রজা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না "আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি।" (ছান্দোগ্য—৬।১০।২)।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সংবিদ্ জীবের ব্যক্তিগত সংবিদ্। তুরীয় বা চতুর্থ সংবিদ্ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সংবিদ্। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তির সংবিদ সকলেরই আছে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিন প্রকার সংবিদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাভ করে। কিন্তু তুরীয় সংবিদ্ আয়াসলভ্য। যোগিগণ এই সংবিদ্ যোগ দ্বারা লাভ করেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে জাগরিত সংবিদ্‌কে বৈশ্বানর, স্বপ্ন-সংবিদ্‌কে তৈজস, সুষুপ্ত সংবিদ্‌কে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে। জাগরিত অবস্থায় সকলেই এক অভিন্ন জগৎ অনুভব করে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ইহার নাম বৈশ্বানর (বিশ্ব+নর)। তখন ইন্দ্রিয়-সহায় আত্মা শব্দাদি স্থূল বিষয় উপভোগ করে, তখন আত্মার জাগরণ। বৃহৎ আরণ্যক এই অবস্থাকে "বুদ্ধান্ত" বলিয়াছেন। "স বা এষ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যং পাপং, পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি স্বপ্নান্তায় এব"। বুদ্ধান্তে সুখ ভোগ করিয়া ও বিচরণ করিয়া পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া প্রতিলোম ক্রমে স্বপ্নান্ত অভিমুখে গমন করেন। (অন্ত=স্থান) স্বপ্ন স্থানকে তৈজস বলা হইয়াছে, তাহার কারণ বোধহয় স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা তখন স্বকীয় তেজদ্বারা উজ্জ্বলিত হন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় কার্য্য স্তম্ভিত থাকিলেও জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয় সকলের বাসনা (সংস্কার স্মৃতি) মনে উদিত হয়। কঠোপনিষদ্ বলেন—পুরুষই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয় সকলের সংস্কার নানা প্রকারে সজ্জিত করিয়া উপভোগ করেন)। সুষুপ্তিতে মনের কার্য্যও বিলীন হয়। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিতে গৌড়পাদ বলিয়াছেন "দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং উভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ ; বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে।" (মাণ্ডুক্য কারিকা) উভয় অবস্থাতেই দ্বৈত জ্ঞানের বিলোপ হয় ; কিন্তু প্রাজ্ঞ নিদ্রিত তুরীয় অবস্থায় নিদ্রা থাকে না। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন সুষুপ্তি অবস্থা—is the condition of deep sleep in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. তখন পুরুষ আপনাকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন মনে করে (অর্থাৎ আপনাকেই বিশ্ব বলিয়া বোধ করে এবং চিন্তা করিবার কোনও বিষয় তাহার থাকে না। সুতরাং তাহার ব্যক্তিগত সংবিৎ তখন থাকে না। তুরীয়-অবস্থা সম্বন্ধে ডয়সেন বলেন—"The spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, setfree from all exiting things." তখন আত্মা কেবল নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকে। ভেদহীন অদ্বৈতরূপে, যাজ্ঞীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধহীন রূপে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা সকলেরই সময় বিশেষে হয় (তুরীয় অবস্থা সাধনগম্য)। আমাদের সাধারণ সংবিদ বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধি সকল বস্তুই খণ্ড খণ্ডরূপে দেখে। বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছিবার উপায় নাই। তুরীয় অবস্থা বুদ্ধির অতীত অবস্থা।—Supramental, supra rational অবস্থা।—চিৎস্বরূপ যে "এক" হইতে এই "নানা" সমন্বিত জগতের উদ্ভব হইয়াছে, যে চিৎস্বরূপ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট নানা খণ্ডে বিভক্ত রূপে প্রতীত হইয়াছেন, তাঁহার স্বরূপাবস্থা।

শিল্প ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

শ্রীমনুভাই শাহ বলেন—কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বলেছেন যে সব শিল্প বেসরকারী তরফের সাধ্যায়ত্ত সে সব শিল্পের উপর থেকে বেসরকারী কর্তৃত্ব অপসৃত হোক, এ জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, চৌদ্দটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এমন সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করার লাইসেন্স পেয়েছেন যেগুলোর সাহায্যে পনেরটি চিনির কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এমন সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করারও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলো চটকল, কাপড়কল এবং সিমেন্ট কারখানার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়।

আজকাল আমাদের দেশের কোন কোন ব্যবসায়ী মহলে এই ধরণের একটা ধারণা দেখা যায়, সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ধারণাটি সত্যি কিনা সেটা নির্দ্ধারণ করার আগে কেন আজ এই রকম ধারণার উদ্ভব হয়েছে সেটা সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। যদি সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করেন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিম্বা যদি সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে কোনপ্রকার সহযোগিতা করতে না চান তাহলে বর্তমানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবার আশা কম।

আজ প্রত্যেকটি অর্থনীতিবিদ্ স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে যা'তে শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেজন্ত চেষ্টা করা দরকার। একদিকে যেরকম ক্রমাগতভাবে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সেরকম অন্তদিকে সামগ্রিক চাহিদাও ক্রমাগতভাবে বর্দ্ধিত হচ্ছে। কাজেই এই চাহিদা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যতই শিল্প-ব্যবসা প্রসারিত হবে ততই দেশের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটান সহজ হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁরা অনায়াসে নূতন শিল্প গড়ে তোলায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন প্রশ্ন উঠবেনা বা কোন কারণ ঘটবে বলে মনে হয়না।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে রামনাদ চেম্বার্স অব কমার্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশন বসেছিল মাদুরা সহরে। মাদুরাই মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারত সরকারের ভারী শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীশাহ অধিবেশনে যে ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণ একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন তথ্য এবং যুক্তি দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, সরকার মোটেই বেসরকারী তরফের প্রতিদ্বন্দ্বী নন। শুধু তাই নয়। যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় সরকারের আছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধির দিক থেকে সে সব শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয় এটা তিনি অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা বলছেন দেশের অর্থনৈতিতে উন্নতি যদি সরকারের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত শিল্প বেসরকারী তরফের সাধ্যায়ত্ত করা দরকার। সরকার কিন্তু এঁদের যুক্তি এবং দাবী মেনে নিতে রাজী নন। বর্তমানে সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন সেটী একটু ভিন্ন ধরণের। রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত অধিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের মালিকানা এবং পরিচালনা সম্বন্ধীয় একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত থাকুক এটাই সরকার আসলে চাইছেন, কারণ সরকারের ধারণা, বেসরকারী তরফের হাতে এই ধরণের শিল্পের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিলে শিল্পের আশানুরূপ প্রসার হবেনা। অবশ্য যদি মনে করা হয়, সরকার এই ধরণের শিল্পের ব্যাপারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনপ্রকার সহযোগিতায় পক্ষপাতী নন তাহলে ভুল হবে। সরকার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি কখনও বেসরকারী তরফের সহযোগিতা অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের প্রসারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তাহলে সে সহযোগিতা গ্রহণ করতে সরকার দ্বিধা করবেন না। শুধু তাই নয়। প্রয়োজনের সময়ে সরকার বেসরকারী তরফের সহযোগিতায় উপর নির্ভর করতেও রাজী আছেন। তবে সে ক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। কিন্তু আসল কথা হল, সরকারের হাতে কোন শিল্পের মালিকানা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত [illegible] নেয় কর্ণধাররা মেনে নিতে পাচ্ছেননা। তাই দেখি, রাষ্ট্রের জন্ম কোন কোন শিল্প স্থাপন এবং পরিচালনা করার অধিকার রক্ষিত হবার ফলে এঁরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং দেশবাসীকে বুঝাতে চাইছেন, সরকারী শিল্প প্রয়াস বেসরকারী তরফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের জন্ম প্রচুর মূলধন দরকার। অথচ অতটা মূলধন সরবরাহ করা বেসরকারী লগ্নীকারীদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই এই ধরণের শিল্পের প্রসার যদি দেশের অর্থনীতির দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে সরকারের পক্ষে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, এমন কোন উদাহরণ আছে কিনা যা-দ্বারা প্রমাণিত হয়, বেসরকারী লগ্নীকারীরা অতিকায় এবং ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিরাট মূলধন সরবরাহ করতে পারেননি। নিশ্চয় আছে। কিরকম শোচনীয়ভাবে বেসরকারী তরফ প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেটা তখনই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা নয়া ইস্পাত কারখানাগুলোতে বেসরকারী তরফের ভূমিকা পর্য্যালোচনা করে দেখি। মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে বেসরকারী তরফের ব্যর্থতার ফলে সরকার নিজের হাতে কারখানাগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকার যদি—উদাসীন থাকতেন তাহলে বাইরে থেকে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি এবং অত্যাবশ্যক ইস্পাত আমদানী করার সময়ে আমাদের দেশ থেকে বাইরে প্রচুর সম্পদ চলে যেত। এমন কতকগুলো যন্ত্রপাতি আছে কলকারখানার ক্ষয়-পূরণের দিক থেকে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের দেশ এই ধরণের যন্ত্রপাতির জন্ম পরমুখাপেক্ষী। ফলে প্রত্যেক বছর মোটা টাকা বাইরে চালান যাচ্ছে। অথচ বর্তমানে এই চালান এড়াবার উপায় নেই। কারণ যে সব কারখানা চালু আছে সে সব কারখানায় উৎপাদন বজায় রাখতে হলে বাহির থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করতেই হবে। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার গতি অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে—এর কারণ হল প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতে নূতন নূতন শিল্প স্থাপন করা দরকার। কিন্তু এজন্ম যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেটী বাইরে থেকে আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেহেতু প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে সেহেতু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা যাচ্ছেনা। তাই সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষের দিকে বছরে দুশত কোটি থেকে দুশত পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি দেশের ভিতর তৈরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এজন্ম বিরাট মূলধন দরকার হবে। বেসরকারী লগ্নীকারীর পক্ষে এই মূলধন সরবরাহ করা অসম্ভব। কাজেই সরকারকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী তরফের অতীত ভূমিকা পর্য্যালোচনা

[illegible] ভক্ত যে সুযোগ গ্রহণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ জাহাজ ব্যবসার কথা বলা যেতে পারে। ইচ্ছা করলে ভারতের বেসরকারী তরফ অনায়াসে বৈদেশিক বাণিজ্য বহন করবার জন্য জাহাজ ব্যবসা গড়ে তুলতে পারিতেন। অথচ এদিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, যে সব শিল্প দীর্ঘমেয়াদী ও বিরাট মূলধন সাপেক্ষ সে সব শিল্প গড়ে তোলার তেমন আগ্রহ বে[সরকারী] ব্যবসায়ীমহলে দেখা যায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার[কে] হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

গম্ভীরাগান ও সমাজজীবন

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে গম্ভীরার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের এই লোকসঙ্গীত সারা ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। লোকশিক্ষাদান ও সমাজ-সচেতনতা উদ্বোধন করা—এই উভয়বিধ কার্যে গম্ভীরাগান নিয়োজিত হইয়াছিল—

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা
খেতে দিব মাণিকরে কলা, নইলে আঁঠ্যার কলা।
বানিয়া হ'ল দেশপতি, কি বলব ভাই ত্রাশের গতি।
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়, (যেন) হাতে দিয়ে মাটির খোলা।

এমন কি, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে আইন করিয়া এই শ্রেণীর গানের প্রচলন বন্ধ করিতে হয়।

গম্ভীরা গানের মাধ্যমে নিপীড়িত ভক্তমণ্ডলীর সমাজ-সচেতনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিব হইলেন চাষী গৃহস্থের গৃহদেবতা, তাঁহার কাছেই তাহারা নিজেদের সারা বৎসরের দুঃখলাঞ্ছনার বিবরণী পেশ করে, অভাব-অভিযোগ জানায়; কাতরভাবে প্রার্থনা করে প্রতিকারের, যাচ্ঞা করে তাঁহার অভয়মন্ত্রের—

শিব, তোমার লীলা খেলা কর অবসান।
বুঝি বাঁচে না আর জান।
তারপর ম্যালেরিয়ায় হইলাম সারা,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অন্নদা মা ভিক্ষা কইর‍্যা করবে কী আর গতি হে,
মুশুরি কলাই তোল ভাসাইয়া, ক্ষেতের ফসল গেল ডুইব্যা,
বুঝি বাঁচে না আর জান॥
আমগেল, আমছাল গেল, কেমনে বাঁচাই প্রাণ,
বুঝি বাঁচে না আর জান॥

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো তাঁহারই অবহেলার ফল, অনাবৃষ্টিও তাঁহার উদাসীনতার পরিচয়—

(এবারে) অনাবৃষ্টি কইর‍্যা সৃষ্টি
মাটি কইরল্যা নষ্ট হে,
বৃষ্টি থাকতে কষ্ট কইর‍্যা মিষ্টি কথায় তুষ্ট হে॥

দুঃখকষ্টের জন্য ভক্তরা নিষ্ক্রিয় শিবকেই দায়ী করিতেছে—

প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব ও শিব ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো॥
পরনে নেতা নাই, ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব ও শিব ম্যাইয়া লোকের মান।
ও বোকা শিব, দয়া করো॥

এ সকল গানে কেবল নিজেদের লাঞ্ছনার দুঃখই নাই, সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির অবনতির জন্য আক্ষেপও আছে—

—শিব হে, বুঝি বাঙালী আর মানুষ হ'ল না।
শি-ই-ব-অ-হে॥

পল্লীকবিরা দ্বেষ হিংসা হইতে মুক্ত নন, তাই অনেক গম্ভীরা গানের মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষের সুরটি নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—

শিব হে, সিদ্ধিতে বেশ দম দিয়ে গাঁজা টেনে,
আছ ভালই সুখে;
(এদিকে) কারও লেংটি, আবার কেউ
মটর গাড়ি হাঁকে;
দুঃখ হয় তাই, জানাই তোমার লীলা দেখে॥

গানের মধ্যে চিরকালই সমাজ-সচেতনা গভীরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মানভূমের ভাদু ও টুসু গানের মধ্যে যেমন রঙ্গচ্ছলে সামাজিক দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অবিচারের নিন্দা করা হইয়াছে, যুগের পরিবর্তমান আবহাওয়াকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, গম্ভীরা গানেও ঠিক সেই ভাবেই বিবিধ ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হইয়াছে।

. পণপ্রথার বিয়ে বাঙলায় গার্হস্থ্য সংসার আজিও কলুষিত। পণপ্রথার দুর্নীতিকে আঘাত করা হইয়াছে নিম্নের গানটিতে নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়া—

পিতা—মা, তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে,
অমন শিক্ষাতে ধিক্, অঙ্ক অধিক, বেচে যেন শালিক টিয়ে।
কন্যা—সোনার চেন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনোনা বাবা দিয়ে টাকা কড়ি।
বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝেনা ছেলে পেয়ে।
পিতা—কি কুক্ষণে আদিশূর আমল দেশে এই অসুর,
বল্লালের চোখে নুন দিয়ে মারতে কেন কল্ল কসুর—
মেয়ের বাপ দুষ্মেষ-এ পোড়া বাঙলাদেশ,
নিত্তি খাচ্ছে মাংস কেটে নিয়ে দিচ্ছে ক্লেশ॥

দারিদ্র্য নিপীড়িত গ্রামবাসীরা যেন বৎসরান্তে এই সময়টার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, গম্ভারার আসরে ভোলানাথের কাছে তাহারা জানায় যত নালিশ, প্রতিকারের জন্য তাঁহার কাছে জানায় আবেদন—

ভোলা হে, ভোলা এ কি কর্যাছ মোদের দশা
ভাঙধুতুরা খ্যায় শুধু ব্যোম ভোলা হয়্যা আছ বস্যা।
প্যাটেতে আজ ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা
হায় বলদ সব বেচ্যা ফেল্যা দিতে হ'ল খাজনা।
এখন করি কিহে, ভোলা নানা তার উপরে রোগের জ্বালা,
হারিয়্যা ফেল্যাছি দিশ্যা॥

তবে তাঁহার ভক্তদেরই তো শুধু এই দুর্দশা নয়, তিনি নিজেও তো সমান দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সাজসজ্জা এত প্রাচীন যে, লোকে আজ তাঁহাকে ভক্তি করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছে—

শিব তোমার একি সাজ, মাথায় বাঁইধ্যাছ কেনে জটা;
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা ভুঁড়ি কর্যাছ মোটা।
হাতিঘোড়া ছাড়্যা দিয়্যা ষাঁড়ের উপর চড়্যা
তোমার কপাল গিয়াছে পুড়্যা
এবার নূতন সাজে না সাজলে পূজা করবে তোরে কেটা?

শুধু কি তাই? ভক্তরা ঠিক করিয়াছে—"শিব যদি আমাদের দুঃখ দূর না করতে চান, তবে তাঁকে ধ'রে রাখব, দেখি কেমন সে পালিয়ে বেড়ায়।"

সাঁওতালি সুরের রীতিতে দ্রুত লয়ে নৃত্যের ছন্দে এই গান গাওয়া হয়—

ধর ধর ধর দিস না ছাড়্যা লিয়্যা চলেক সঙ্গে কর্যা।
এই বুঢ়াটা দিলে বড় দুরুখ হে, দিলে বড় দুখ॥
ধান বুনিলে দ্যায় না পাণি, এই বুঢ়াটা বড়ই শনি
সদাই রহে মোদের প্যাটে ভুক হে॥
দ্যামড়্যার উপর চড়্যা বেড়ায় কুচনী পাড়ায় ঘুর্যা
বুঢ়া ঠাটকুমুরা জানে কতই কর্যা বেড়ায় ভুক হে,
ক'রে কতই ভুক॥

রাজনীতিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এই গম্ভীরা গানের মাধ্যমে। ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়াই দেশের দুর্দশার অবসান হয় নাই; শ্রেণীবিদ্বেষ ও রাজনীতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গম্ভারা গানের মাধ্যমে আজও চলিতেছে—

দ্যাশের কত হোমড়া চোমড়া ভুস্যা নিজ ধর্ম
বিদেশীর চাল পড়্যা দেখলে সুখ ও স্বপ্ন
র্যাডক্লিপের কবলে আর রাজনীতির খেলে
(তারা) ভারতকে দিলে কিস্তিমাত কর্যা হে।
কাঁদতে ছিল মনটা (তাই) চোখে প'ল কুট্যা।
(দিলে) হিন্দু নিধন পালা শুরু কর্যা হে॥

গম্ভারাগানের একটি প্রকার ভেদ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'গমীরা' নামে প্রচলিত। গম্ভারার ন্যায় গমীরা গানেও সমাজ-সচেতনতা সুপ্রকাশিত; যেমন, নিম্নের গানটিতে ভোট ভিক্ষুকদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—

হামরা হলাম চাষীমানসী
যে বুলাইছ সেই বুইল্যাছি।
আইযাছে ভোটের পালে
পায়্যায়া দিমু কাচা কলা॥

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাওয়া দাওয়া করে নৌকাতেই উঠবো, রাত্রি সাড়ে দশটায় ভাঁটা—আমাদের হবে যাত্রা সুরু। নিতাই দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে সেই সন্ধ্যা থেকে, রান্না করেছে অতুল।

—"যাবি না ?"

কোন জবাব নাই, নিতাই সেই অবস্থাতেই বসে আছে। ঠেলে-ঠুলেও কোন রা' শব্দ নাই। কেবল চেয়ে থাকে নীরবে।

বিরক্ত হয়ে উঠি। তোল ওকে গুড়ের নাগরির মত চ্যাংদোলা করে, ওই অবস্থাতেই গাংএ ছেড়ে দোব।

বড়দা আর কথা বাড়ান না, যাবার সময়। গম্ভীর ভাবে বলেন

কেঁদো আইল্যাণ্ডে কাঠ-মহাজনদের নৌবহর
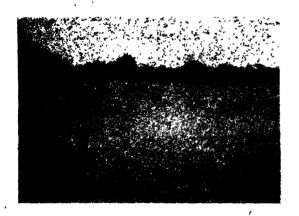
—"কাল সকালেই তুই চলে যাবি তোর বাড়ীতে, বাকী মাইনে মিস্ত্রীর কাছে দিয়ে যাচ্ছি। আর তোকে দরকার নাই।"

তবু নিতাই নির্বাক।

মাটিকে মনে মনে নমস্কার করে নৌকায় উঠলাম। ছইএর ভিতর বিছানা পাতা হয়ে গেছে। টাইমপিস ঘড়িটা টিক টিক করছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে গেছে ছিটকে পড়া গ্রাম ; প্রশস্ত নদীর বুকে ঝুলছে তারার দেউটি। নোঙর তুললাম আমরা।

চারদিন চাররাত্রি চলবে এই যাত্রা, তার পর পৌঁছবো কেঁদোর চরে। অবশ্য পথে যদি এরমধ্যে কোন বিপদ আপদ না ঘটে।

নিজের অজ্ঞাতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাড়ীর দৃশ্য—ভাইবোন স্ত্রী-পুত্রের মুখ—বন্ধু বান্ধবদিগকে স্মরণ করি। পরক্ষণে মন থেকে দূর করে দিই সব চিন্তা।

পথে বার হয়েছি যাযাবর আমি, ওসব বাধা বন্ধন কেন মনকে দুঃখভারাতুর করে তোলে !…পথের দেবতা—তোমাকে জানালাম নমস্কার—অকূলে তরী ভাসিয়েছি এখন তুমিই কর্ণধার। এ যাত্রা শুভ হোক।

…দুটো দাঁড় পড়ছে—ছপ—ছপ—ছপ।…হালের মোচড়ানির শব্দ শোনা যায়, আর্তনাদ করছে নৌকাটা।…র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজবার চেষ্টা করি। ঘুম আসছে…নৌকার মৃদু দোলানি সারা শরীরে আনে তন্দ্রার আবেশ।…তুষখালি সন্দেশখালি বাঁকের ওদিকে মিলিয়ে গেল ! রাত্রির অন্ধকারে ভেসে চলেছে নৌকা—জেগে আছে মাঝি, দাঁড়ি আর আকাশের অগণিত তারা। আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙলো তখন ভোর হয়ে গেছে। ভাঁটা শেষ হয়ে গেছে। নৌকা নোঙর করে রাখছে—আবার ভাঁটা আসার অপেক্ষায়।…

আমাদের নৌকাটা সাড়ে তিনশো মণি একটা বেতনাই ধরণের নোতুন নৌকা। বেশ চালু, দুটো দাঁড়ি আর একজন মাঝি ; তাছাড়া সঙ্গে চলেছে বড়দার পেয়ারের সেই 'টাপুরি' নৌকা। একজন মাঝিতেই হাল মেরে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আমাদের নৌকার গায়ে বেঁধে রেখে সে এই নৌকাতে উঠে আসছে তামাক বিড়ি খেতে—গালগল্প করতে।

একটা রাত বেশ কেটে গেল ; খালের বিস্তার তখনও আতঙ্কিত হবার পর্য্যায়ে ওঠেনি। তবে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায় ; দুপাশে বাঁধের ওপারে গোলপাতা—না হয় খড়ের ছাওয়া ছোট ছোট্ট চমড়ি খাওয়া ঘরও চোখে পড়ে, দু' একজন লোকও চলেছে। খালের ধারে চরছে কদাচিৎ দু' একটা গরু ছাগল। নদীতে ড্রাম নোঙর করে রেখে হাবড়ের জাল পেতে বসে আছে জেলেরা নৌকায়,…জলের বুক থেকে জালটা উঠে রয়েছে প্রবল স্রোতের বেগে কাঁপছে ; ওর টানের মধ্যে গিয়ে পড়লে নৌকা আরোহী সকলেরই সমূহ বিপদ, তাই জালের মালিক রাত্রে আলো দিয়ে নিশানা করে রাখে—দিনের বেলায় বসে পাহারা দেয়।'

সকালবেলায় চায়ের যোগাড় করতে গিয়েই লাগলো মজা। বড়দার আগেই উঠেছি আমি। চা বানাবার শেষ পর্বটা বড়দার একচেটিয়া, তার আগের পর্বটা অর্থাৎ জলগরম করবার ব্যাপারটা আমিই করবার আয়োজন করছি। তাছাড়া ভোরে উঠবার প্রয়োজন ছিল অন্য রকমের। প্রাতঃকৃত্যের ব্যাপার সারতে হবে নৌকা থেকেই। ডাঙ্গায় যদিও এখনও লোকালয় আছে—নীচে নামাটা নিরাপদ, কিন্তু সে বহু দৈরাৎ। তাছাড়া জল পাওয়া দুরুহ, এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে নামবার ইচ্ছা শীতের সকালে আমার কেন, কারুরই হবে কিনা

সন্দেহ। ছই এর কাঠ ধরে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থায় পড়ে ওকর্মটি সমাপন করা যে কত দিনের সাধনার প্রয়োজন তা ভুক্তভোগী না হলে অনুভব করতে পারবেন না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি পড়লাম গাংএর জলে—সেই ভাবনাতেই কোষ্ঠকাঠিন্য এসে যায়।

তারপর ওই উনুন জ্বালা সে যে কি মর্মজ্বালা তা কাকে বোঝাই। নিতাই বুঝে সুঝেই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে কেটে পড়ে। গরান কাঠের টুকরো বেশ যত্ন করে সাজালাম উনুনে, ঢাললাম কেরাসিন তেল, দেশলাই সংযোগও ঘটল। ওমা—ব্রহ্মাদেব যে এত চতুর তা কে জানে। কেরাসিন তেল টুকু পুড়ে যেতেই তিনিও অন্তর্ধান হলেন।

লাগাও 'ফু', চোখ ঠেলে বার হয়ে আসে, ছইএর ঘরটার মধ্যে জমাট ধোঁয়া মাতামাতি সুরু করেছে, কিন্তু শুধু ধোঁয়াই, আগুন আর জ্বলে না। বড়দা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেন।

—"কি হলো? আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর তাঁর, যেন অগ্নিকাণ্ডই সুরু হয়েছে। আমি তখন দুহাতে চোখ কচলাচ্ছি—আর চায়ের বাপান্ত করতে সুরু করেছি। ঢাল কেরোসিন তেল, ধোঁয়ার রং বদলালো, আগুনও জ্বললো, কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং।

ধাক্কা সামলালো এসে শরিফ, আমাদের দাঁড়ি; হাটের সেই বায়স্কোপ দেখা ছেলেটি।

—"সরুন বাবু দেখছি আমি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্বললো উনুন,...চাও জুটলো, চোখের জ্বালা তখনও থামেনি।

পাল তুলে দিতে জোর বাতাসে কয়েকটা বাঁক বেশ বেগেই নিয়ে গেল। একা মাঝি টাপুরে নৌকা নিয়ে সমান তালে এগোতে পারছে না। পালে বাদাম ধরান নৌকা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে ছোটে, দাঁড়িদের এসময় কোন কাজ নাই; হাল ধরে বসে থাকে, মাঝে মাঝে পালের দড়ি ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়েই খালাস।

শরিফ রান্না সুরু করেছে।...সমস্ত সংস্কার মন থেকে মুছে ফেলে তৈরী হয়ে নিই। ইতিমধ্যে শরিফকে স্নান করিয়ে নিয়েছি, গায়ে ওর নোনা-গাংএর একপ্রস্থ পলির ছাপ তুলতে খরচ হয়েছে আধখানা লাইফবয় সাবান। নোনা জলে ফেনা মোটেই হ'ল না, তবু ঘসেমেজে অনেকখানি দুরস্ত করে নিয়েছি তাকে।

পিয়াজ-লঙ্কা বাঁটার পর্বশেষ করে শরিফ ডিম-আলু সিদ্ধ করতে বসেছে। বেগুন ভাজা—ডিমের ডালনা আর ভাত। এখন দেখছি উনুন ঠিক জ্বলছে। শুকনো গরাণ কাঠও লোকচেনে, যার তার হাতে পুড়ে ছাই হতে ওর আপত্তি!

বেলা বেড়ে চলেছে; আকাশের বুকে সোজা উঠে গেছে একটা চিমনী; ধোঁয়ার রেখাও বার হচ্ছে অল্প অল্প। আমতলির ধানকল। এই সুদূর আবাদ অঞ্চলেও এসে বসেছে এক মাড়বার-নিবাসী; ধানকল খুলে ব্যবসা চালাচ্ছে। জনহীন নদী ধরে চলেছি আমরা;—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ঢেউএর মাথায় মাথায় সুরু হয়েছে হাজারো-বুকে। গাং এইবার এস্তরূপ ধরছে ও পার হয়ে গেলাম মোল্লাখালির হাটতলা; এই অঞ্চলের মধ্যে নামকরা হাট; এখান থেকে সভ্যজগতের নাড়ীর বন্ধন সব যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। এই মোল্লাখালিই হাসনাবাদ, হ্যামিলটনগঞ্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে লঞ্চ সার্ভিসের শেষ ষ্টেশন।

বাঁক ঘুরেই নদী বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে, দেখলে একটু মন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে; নৌকা তখনও পালে ভর করে চলেছে; বেলা প্রায় একটা; খাওয়াদাওয়ার পর শোবার চেষ্টা করলাম; কলকাতায় এই সময়টা একটু আরামের, শীতের দিন—আহারাদির পর খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে—বুক অবধি লেপ চাপা দিয়ে বেশ মিঠে একটু তন্দ্রার সাধনা করি; সেই অভ্যাসটাই একবার কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম, তবু একটু সময় কাটুক। পড়াশোনা করবার তাগিদ ইচ্ছা কোনটাই নাই। শুয়ে পড়লাম; কিন্তু বিফল সাধনা। কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনে দেহ মন সামান্য বিশ্রামের ক্ষণটুকুর সদ্ব্যবহার করতে তৈরী থাকে, কিন্তু অবসর

কেঁদো আইল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত
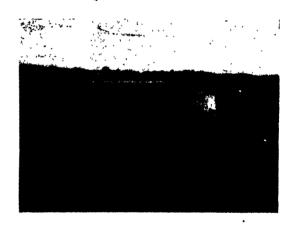
যেখানে অখণ্ড, কাজ যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে সময় কাটাবার মত ঘুমটুকুও অদৃশ্য হয়ে যায়।

দুপুরের রোদ স্তিমিত হয়ে আসে। বাঘনা নদীর মুখ থেকেই সুরু হল আসল বনসীমা। একদিকে ভেড়ির ওপাশে ছোট ঝুপড়ি বনের পারে দু'একটা বুনোদের বসতি—অন্যপাশে সুন্দরবনের গহন অরণ্য। এতক্ষণে নদী ও বনের একটা রূপ চোখে ফুটে উঠলো। ভাঁটার টান। নদীর জল অনেক নীচে নেমে গেছে, নদীর বিশাল সুগভীর তটরেখা অতল গভীরতার ইঙ্গিত আনে, যেন একটা ক্ষুধার্ত-হিংসালোলুপ দৈত্য-শিকারের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় করাল গ্রাস বিস্তার করে পড়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। একদিকে লোকালয়; মানুষ ওই বনের বুক থেকে মাটি ছিনিয়ে নিয়ে বাঁধ দিয়ে জমি তৈরী করেছে, এপারে পরাজিত বনসীমা হিংসা—প্রতিশোধের জ্বালা বুকে নিয়ে ব্যর্থ আক্রোশে রোষকষায়িত নেত্রে চেয়ে রয়েছে আদিম রহস্যের অন্তরালে। নদী-গাং সাঁতরে পার

জল মত্ত আক্রোশে বাঁধে আঘাত হেনে ফিরে যায়। জীবন এখানে সংগ্রামমুখর। এপারের আদিম অরণ্য থেকে ওপারের দিকে চেয়ে থাকে বানর দল—কিচমিচ করে পড়ন্ত বেলায়। এর একদিকে জীবন—মানুষের কলধ্বনি—ফল ফসলের ইসারা, নদীর অন্যপারে মৃত্যু, শ্বাপদের হুঙ্কার—ক্ষুরধার লোনাজলের তীক্ষ্ণ রসনা—অরণ্যের ক্রুদ্ধগর্জন। মানুষের জগতের সীমান্ত—ওপারে পরাজিত বনভূমি। সর্বদাই চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি. কে হারে—কে জেতে ?

বড়দার হাঁক ডাকে মাঝি দাঁড়ি সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। বেলা আড়াইটা, আর ঘণ্টা দুয়েক থাকবে ভাঁটা, তার পরই আসছে জোয়ার। আমাদের যাত্রা বন্ধ করতে হবে ছ'ঘণ্টার জন্য। আজ রাত্রের গন্তব্যস্থল আমাদের দত্তর ফরেষ্ট ষ্টেশনের ঘাট, সেই খানেই নোঙর করে রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। এর আগে এই পথে কোথাও রাত্রি-যাপন করা মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ যে গতিতে আমরা চলেছি তাতে দত্তর ষ্টেশনে পৌছনো অসম্ভব, তার আগেই জোয়ার এসে যাবে।

"কালরাত্রে পুরো ভাঁটা বাসনি তোরা, বাইলে ঠিক আমতলি পার হয়ে আসতিস। এখন বোঝ ঠ্যালা। পাল আর চলছে না, দাঁড় লাগা।"

পথ হিসেব করা। এক ভাঁটা বাইতে গাফিলতি করলেই পথের মাঝে বিপাকে পড়তে হবে। হয়েছেও তাই।

জায়গাটা ভালো নয়, দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলতে সুরু করলো প্রাণপণে। ভোলামাঝি হালের মাচা থেকে নীচে জলের স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিমেলে। নদীতেই কাটে ওদের জীবন, ওর স্রোত সব ওদের নখদর্পণে। বলে ওঠে—আর তিনপো টান হতে দেরী নাই। জোরে বেয়ে চল' সাতজেলের মুখ পার হতে হবে টান থাকতে থাকতে।

—এই নদীতেই এক্ রাত্রির ঘটনা ওর চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

চাল চালান নিয়ে বনের মধ্যে যাচ্ছে, নোঙর করতে বাধ্য হয়েছিল এইখানে। রাত্রি নেমে এসেছে, সারাদিন দাঁড় বওয়ার পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে মাঝিরা, নৌকার একপাশে নোঙর করা, অন্যদিকে ডাঙ্গার সঙ্গে ছিট বাঁধা রয়েছে কাছি দিয়ে। রাত্রি কত জানেনা; জোনাকি-জ্বালারাত্রি, হঠাৎ ভোলা উঠে পড়ে। বেশ বুঝতে পারে নৌকার নোঙর নাই। ভেসে চলেছে গাংএর মধ্যে। নোঙর ছুটে গেছে বোধহয়। বাইরে আসতেই দেখে অস্পষ্ট অন্ধকারে নৌকার পাশে দুখানা ছিপ, গলুইএর উপর কারা প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখেই এগিয়ে এসে ধাক্কামারে, মেহাৎ বরাতজোরেই গাংএ ছিটকে না পড়ে—ছিটকে পড়ল নৌকার খোলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতপা বেঁধে ফেললো তারা; নৌকার মধ্যে সদ্যঘুমভাঙ্গা মাঝিদের আর্তনাদ—অস্ফুট কোলাহল, দু'চার ঘা দিয়ে ওদিকে বেঁধে ফেলে নৌকাথেকে সবকিছু নামিয়ে নিয়ে গেল তারা। চাল-ডাল তরকারী। লাথিমেরে ভেঙ্গে দিয়ে গেল জলের কয়েকটা জালাও। কথাকইবার ক্ষমতা নাই, চোখের সামনে লুটে নিয়ে গেল তাদের আহার তৃষ্ণার জলটুকুও। ওদের বড়নৌকার গায়ে বাঁধা ডিঙ্গিখানাতে মালপত্র চাপিয়ে রাতের আঁধারে আবার নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল তারা।

ভোলামাঝি ভেসে চলেছে অকূল হরিণগাছা নদীর বুকে, টানা-টানি করে বাঁধন খুলে যখন মুক্ত হোল, তখন তারা হতবাক ভয়ে। হিমে ঠক ঠক করে কাঁপছে। রাতের তারায় তারায় এখনও সেই আতঙ্কের লিপি পড়তে পারে ওই নিরক্ষর মাঝি, শিউরে ওঠে সেবারের কথা স্মরণ করে।

দাঁড় পড়ছে ছপ্-ছপ্-ছপ্। একটানা একঘেয়ে শব্দ আর সেই দোলানি। শুধু আতঙ্কে মন কেমন নিঝুম হয়ে আসে। আকাশের দিকে আর ঘড়ির পানে চেয়ে থাকি। সাতজেলে নদীর মুখ ছাড়ালাম।

—দত্তর আর কতদূর ? প্রশ্ন করি।

—'দূর আছে' তিনবাঁকের পথ।'

বাঁক যেন আর শেষ হয় না। ভাঁটা শেষ হয়ে এলো, স্তিমিত হয়ে এলো ভাঁটার টান। থমথমে হয়ে উঠেছে হরিণগাড়া নদীর বিস্তৃত বুক। ওপারের বনসীমায় নামছে শেষ সূর্য্যের আলো। বেগোণে দাঁড় বয়ে চলেছে—নৌকা যেন বিশমণী পাথর, এগোতেই চায় না।

শীতের সন্ধ্যা। সাতজেলের হাটবার আজ। দু'একখানা ডিঙ্গি বেয়ে ফিরছে কেউ কেউ। ডিঙ্গিতে দেখতে পাচ্ছি ঝুনো নারকেল, মাটির হাঁড়ি, সরা, আরও কি সব তরকারী। পৌষ পার্বণের আর দেরী নাই। আমার দেশের বাড়ীতেও চলেছে পৌষপার্বণের আয়োজন; নলেনগুড়-চালগুঁড়ো পিঠের আয়োজন। ছেলের দল শুকনো খেজুর পাতা—বটের ডাল দিয়ে বুড়ীর ঘর বানাচ্ছে পুকুরের ধারে, স্নান করেই সকালবেলায় সেদিন আগুন পোয়াবে। শালবনের ধারে দলবেধে এমনিবেলায় পেতেছে খরগোস শিকার করা জাল, মহাউল্লাসে বন-পিটছে। দূরে দেখা যায় গ্রামসীমা। আর আমি ?...চলেছি অনিশ্চিতের পথে, পিছনে পড়ে রইল সব আকর্ষণ, সব আনন্দ...সব আহ্বান।

—'কোথাকার নৌকা ?"

...নদীর বুক থেকে কে যেন প্রশ্ন করে। ছই থেকে বার হয়ে মাঝিরা উত্তর দেবার আগেই বেশ সতেজ কণ্ঠে বড়দা উত্তর দেন।

—'সন্দেশখালির বাবুদের নৌকা'।

পাশে গিয়ে আমিও দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডার জন্য মাথায় হাটটা চাপিয়েছিলাম। টুপি—সিগারেট দেখে ও ডিঙ্গির মাঝি একটু চমকে উঠলো যেন।

ভয় করবার কিছু নাই, হাটফেরতা ডিঙ্গি। সঙ্গে মালপত্র রয়েছে। বড়দা মাঝিদিগকে বলেন—'হোক বেগোণ—বেয়ে চল। দত্তরে পৌছতেই হবে।"

ওদিকে এখন অবশ্য ভয় নাই, কিন্তু এমনি করেই ওরা নজর রাখে পথচলতি নৌকার উপর, কি মালপত্র আছে খোঁজ নেয়, সঙ্গে কে চলেছে। সব তল্লাস নিয়ে আসে রাতের আঁধারে তৈরী হয়ে। এ পথে কাউকেই বিশ্বাস নাই, কে যে কি মতলবে আসে ভগবানকে মালুম।

বড় মালগুজারী নৌকা। তবুও সঙ্গী পাওয়া যেতে পারে। যদিও জানি ও সঙ্গীর কোন নাম নাই, শোনা গেছে পঞ্চাশখানা নৌকার মধ্য থেকেও ডাকাতি—খুনখারাপি ঘটেছে, তবুও মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো এই ভরসাতেই মাঝিরা বেয়ে চলে। বাঁকের মাথাকে বাওয়ালিরা বলে ট্যাক। সেই ট্যাক আর ফুরোতে চায় না। কাছাকাছি এসে দেখি আমাদেরই আগেকার ছাড়া দুখানা হাজারমণি নৌকা। দত্তর পৌঁছতে তারা পারেনি, তার আগে 'কাকমারির হাটখোলায় নোঙর করে বসে আছে।

বড়দা ছই থেকে বার হয়ে এসে সুরু করেন—"জলিল কোথায় ?"

ওই দুটো নৌকার চার্জে সেইই। পথে ডাকাতের ভয়, বড় দুটো নৌকাকে আলাদা করে পাঠানো হয়েছিল আগে, কারণ যদি লুঠতরাজ হয়ই দোকান একটা, তাহলে পিছনের নৌকাগুলো বেঁচে যাবে। তাই আলাদা আলাদা করে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা না হয়ে এক হয়ে পড়লো, এবং এমন জায়গায় একত্রিত হলো যেখানে ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনোও উপায় নাই।

নামেই হাটখোলা, কিন্তু হাট বা বসতির কোন চিহ্ন নাই। নদীর ভাঙ্গন থেকে বাঁধ বাঁচাবার জন্য বেশ খানিকটা গাছপালার আড়ালে বাঁধ, তার ওধারে একটু জায়গায় দুখানা খোলার দোকান আছে—ছিটিয়ে আছে কয়েকঘর বুনো এদিক ওদিকে কুড়ে বেঁধে, এই নিয়েই হাটখোলা। ঘাটে কোন নৌকা নাই—যাত্রী নাই, নাই লোকজন। কলসী কাঁখে কেউ ভুলেও আসেনা ঘাটে ঘট ভরতে। ওপাশে অন্ধকারের ঘোমটা টেনে নেমে এল রাত্রি।

ললাট ভরে অসংখ্য তারার টিপ পরানো, কুয়াসার অস্পষ্ট আবরণের অন্তরালে কি মদভরা তার চাহনি ?

...আমরা ক'টি প্রাণী। ওপাশের নৌকাগুলোতে মাঝিদের রান্না হচ্ছে। টেমির আলোয় কে যেন সুর করে পড়ছে—আল্লা আল্লা বলো রে ভাই নবী কর সার।"

...শরিফ রান্না করছে আমাদের নৌকায়। ওর পালিত একটি জীব আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, ওর মত অনাথ সে। রামপুরের ঘাটে একদিন পেয়েছিল ওকে, কাকের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ওই বেওয়ারিশ ছানাটিকে তুলেছিল নৌকায়। চালের গুড়ো খাইয়ে বাঁচিয়েছে—আজ বেশ পুরুষ্ট হয়ে চিক্-চিক্ করে ঘুরে বেড়ায়। একটা মুরগীর বাচ্চা। এখন বেশ তেলগোল হয়ে উঠেছে। মানুষের কাছ ছাড়া হলেই চিঁক চিঁক শব্দ করে এসে হাজির হয়। নৌবহরের মধ্যে সেই একটি করুণা করবার জীব।...সারা জীবন যাদের কাটে পরের অনুগ্রহে,—পরের কাজে মুখ বুজে খেটে, যখন তারা দেখে যে তাদেরও অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হয়ে কোন অবলাজীব ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তারাও সজীব হয়ে ওঠে। ব্যর্থ প্রাণের সব ভালবাসাটুকু দিয়ে তাকে গড়ে তোলে। তাই মুরগীর বাচ্চাও ওদের এত প্রিয়।

—"ভাতের হাঁড়িতে ফেলে দে ওটাকে বেশ রোষ্ট হয়ে যাবে।"

আমার কথায় শরিফ তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে সামলে নেয়, কে জানে বাবু যদি ফেলেই দেয়।

নীরবতা ভেদ করে একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসে—ভট—ভট—ভট।

বার হয়ে এলাম ছই থেকে—নদীর বুক চিরে চলেছে সাদা একটা লঞ্চ, শুনলাম রেঞ্জ অফিসারের। দত্তর ষ্টেশনে নীলাম ছিল, সেরে ফিরছেন।

টর্চের আলো ফেললাম লঞ্চের গায়ে, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করি, তবুও সরকারী লোক—ইচ্ছা করলে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবার কোন উপায় বাতলে দিতে পারেন।

ওমা, 'কা কস্য পরিবেদনা।' অফিসার সাহেব এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজনই বোধ করলেন না, ইঞ্জিনের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন। আমরা পড়ে রইলাম এই অন্ধকার

অথৈ জলে মৎস্য শিকার

গাঙএ, কাকমারির নাম পরিবর্তন করে' নৌকামারি' নাহয় 'মানুষমারি' নাম বহাল করবার জন্য। অবশ্য রেঞ্জ অফিসার একবার দয়া করে শ্রীমুখ বার করেছিলেন মনে হল। রাজদর্শন ঘটেছে বরাতে, সেই পুণ্যজোরেই যদি এ যাত্রা বেঁচে যাই। দূরে বহু দূরে মিলিয়ে গেল লঞ্চটা। আজ রাত্রেই উনি ফিরে যাবেন রামপুরায়, আরামে বাংলোতে ঘুম করবেন। খাওয়া ? সেতো মাছ মাংস জুটছেই। জুটুক—খোসমেজাজে, বহাল তবিয়তে থাকুন উনি।

জলিল ডাক পাড়ে—'খোদা মেহেরবান।'

...জলিলের বয়স হয়েছে বেশ। মাথায় আকাশ-জোড়া টাক। এই বয়সে তৃতীয়বার পত্নী বিয়োগ ঘটেছে। বেচারা বড় দাগা পেয়েছে। তিসরা বিবি নাকি বেশ খবসুরৎ ছিল, জান মাল বাহৎ কব্জায়

কামাই নেই এক বেলা। কিন্তু ভয়ানক মুখ। ঝগড়ার শেষ নেই ওর। স্থান কাল পাত্র নেই। গয়লা গয়লাই সই,—মেথরাণী মেথরাণীই।

'দুধে জল দিচ্ছ বাছা? গোরুর বাঁটে ঘা হবে যে! না কি সে ভয়ও নেই। বিলিতি শুঁড়ো গুলছো করপেষণের জলে?'

করপোরেশন্‌কে করপেষণ বলে ও'। উচ্চারণটা ওর, বানান্‌টা আমার। তাতে একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। আর, সে-মানেটা বেশ গম্ভীর। কর মানে হাত নয়, ট্যাক্স।

'ও মেথরাণী, বলি নর্দমাটা যে পাঁকে বজ্‌বজ্‌ করছে। শ্যাওলায় যে পড়ে মরছে সবাই পা পিছলে। ঝাঁটার ডগায় কি তোমার তুলো লাগানো আছে যে, ঘষলেও শ্যাওলা ছাড়ে না?'

যেদিন মেথ্‌রাণী বা গয়লাকে নাগালের মধ্যে না পায়, সেদিন খোদ্‌ গিন্নীর ওপরেই চড়াও হয়। ইচ্ছে কোরে বাসনের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তোলে। গিন্নি কিছু বলতে গেলেই মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে—'মানুষ তো বটে। কাজ করতে গেলে আওয়াজ অমন এক-আধদিন হবে বৈকি। সইতে না পার রবাটের বাসন কিনে এনো।'

রবাট্‌ মানে রবার।

কিন্তু মেজাজটা যেমনই হোক্‌, কামাই নেই ওর এক বেলা।—আর, কাঁসা-পেতলের বাসন ওর হাতে যেন সোনা হয়ে ওঠে। এলুমিনিয়ম্‌ হয়ে ওঠে রূপো।

নতুন ভাড়াটের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন একদিন মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি। পাশের ঘর থেকে গিন্নির সঙ্গে তাঁর মৃদু আলাপ শুনতে পাচ্ছিলুম—

'তোমরা না কি ঐ পার্বতী মাগীকে রেখেছ?'

'হ্যাঁ। বেশ কাজ করে।'

'তা তো করে। কিন্তু ওর বচন শুনলেই যে পিত্তি জ্বলে ওঠে।—নেক্‌চার দেয়নি কিছু?'

'লেকচার?'

'এই ওর শ্বশুরের চোখ কি ক'রে অন্ধ হল,—ওর শাশুড়ী কি খেতে ভালবাসে,—ওর দেওর কেন বিয়ে করছে না,—ওর ননদের বরকে বশ করবার জন্যে কি কি তুক্‌তাক্‌ করা হয়েছে,—এই সব?'

'কৈ না তো।'

'শুনবেখন।'

পাশের ঘর থেকে না দেখেই বুঝতে পারি, মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি এবার পান পুরেছেন মুখে। পানের ভিড়-ঠেলা কথার আওয়াজ।

'শুনবে, শুনবে। এই তো সবে এলে। কটা দিন আরো যাক্‌, সব শুনবে। এ-পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এলেই আগে ছুটে গিয়ে চাক্‌রী নেয় ও' সেধে। কৈ? এ-পাড়ায় তো গুরুদাসী, খোকার-মা, সাবিত্রী, আরো কত সব ঝি রয়েছে। এসেছিল কেউ তোমার কাছে যেচে?'

'আজ্ঞে না।'

'চোদ্দটাকার কমে কাজ করে না ওরা কোথাও। মাসে তিনদিন অন্ততঃ কামাই ওরা করবেই। আর, একখানার বেশি দুখানা পোড়া বাসন বেরুলে সে বাসন ঐ উঠোনেই পড়ে থাকবে, রান্নাঘরে আর উঠবে না সেদিন।'

'সেদিক থেকে পার্বতী খুব ভাল কিন্তু।—একখানার জায়গায় তিনখানা পোড়া বেরলেও রা নেই মুখে।'

'রা থাকবে কেন? ওর রা যে ঐ এক জিনিস নিয়েই। খালি ওর সংসারের গল্প।—তা' কদিনে কিছু আন্দাজ করতে পারলে, মাগীর জাতটা কি?'

'বোধহয় হিন্দুস্থানী।'

'হিন্দুস্থানী না ছাই। হিন্দুস্থানীর অমন ক্যাঁক্‌লাশের মতন চেহারা হয়? ওর বাঙ্‌লা কথার কেমন বাঁধুনি দ্যাখোনি?—ওর সবটাই যেন ঢং! যাক্‌ না কদিন, ওর ঐ সংসারের গল্প শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। শুধু ঐ দোষেই তো ওকে ছাড়িয়ে চৌদ্দ টাকা মাইনে দিয়ে গুরুদাসীকে রেখেছি।'

'ও।'

'ছেলেপুলে কটি?'

'দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'বেশ মানানসৈ। তা' মেয়েটি বড়, না ছেলেটি?'

'ছেলে।'

'ইস্কুলে গেছে বুঝি?'

'হুঁ।'

'কত্তাটি চাকরি-বাকরি করেন না ?'

'হ্যাঁ। এ-মাসে নাইট-ডিউটি।'

'চলি ভাই। আসবো আবার।'

পরদিন দুপুরে খেতে বসেছি। গিন্নি তদারক করছেন। এমন সময় সামনের দালানে পার্বতীর আবির্ভাব। হাতে একখানা নীল রঙের সুতির সার্ট, তার পিঠের দিকটা ছেঁড়া। ওকে দেখে বেরিয়ে গেলেন গিন্নি।

'কি রে ? এমন অসময়ে ?'

'নীল রঙের সুতো আছে মা তোমার কাছে ? এই সার্টটাকে সেলাই করবো।'

'সার্ট আবার পেলি কোথায় তুই ?'

'পাবো আবার কোথায় ? সেই বাঁদরটা এসেছে।'

'বাঁদরটা আবার কে রে ?'

'কে আবার ;—আমার গুণধর দেওর।—কেন এসেছে জান মা ? আমার কাছ থেকে একটা দু-চাকার সাইকেল্ গাড়ী আদায় করতে। আচ্ছা, বলতো মা, টাকার কি গাছ আছে আমার যে নাড়া দিলেই পড়বে ? তা' এসেছে যখন, তখন আদায় করে তবে ছাড়বে। বলেছিলুম দেব না, তাই রাগ কোরে জামা ছিঁড়েছে। এখন সেলাই করতে বসি। দাও না মা একটু নীল সুতো।'

'রেখে যা। মেসিনে ফেলে মজবুৎ করে সেলাই করে দেবখন। ও-বেলা এসে নিয়ে যাস্।'

সার্টটাকে রেখে চলে গেল ও।

গিন্নি সারা দুপুরের এটা-ওটা সেলাইয়ের মাঝখানে সেই নীল সার্টটাকেও সেলাই করলেন দেখলুম।

কদিন পর বাজার থেকে ফেরবার সময় সেলাই-করা সেই নীল সার্টটাকে যে বুড়ো দুখীরাম কয়লাওলার গায়ে ঝুলতে দেখেছিলুম,—গিন্নিকে আর জানাইনি সেকথা।

কদিন পর পার্বতী ঢুকলো কোন্ অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে।

'...হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছ কাকে ? পার্বতী কেয়ার করে না কাউকে। দেখব, দেখব কতদিন পায়ের ওপর পা দিয়ে খাওয়ায় তোমায় তারা। দুদিন বাদে দেবে মুড়ো

আপন মনেই গজ্ গজ্ করতে করতে দুম্‌দাম্ করে বাসন মাজতে লাগল পার্বতী।

গিন্নি হেসে বললেন—'কি রে ? কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস ?'

মুখটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঁট উল্টে পার্বতী বললে—'কার সঙ্গে আবার ? তোমার জামাইয়ের সঙ্গে।'

'জামাই ?'

'হ্যাঁ গো। সেই যে খোঁড়া মিন্সেটা বসে আছে দেশের বাড়ীতে।'

'ও: হো!'—হেসে উঠলেন গিন্নি—'তা' কি করেছে সে ?'

'এই গ্যাখো না,'—কলের জলে ছাই-লাগা হাতটা ধুয়ে আঁচল থেকে একটা হিন্দি অক্ষরে লেখা দোমড়ানো পোষ্টকার্ড বের করে দিলে গিন্নির হাতে—'পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

হিন্দি অক্ষর পড়া গিন্নির পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই পার্বতীকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হয়।

'তোমার গুণধর জামাই লিখেছেন গো।—কদিন আগে একটা চিঠিতে আমায় যেতে লিখেছিলেন—মন নাকি কেমন করছে। লিখেছিলুম, এখন যেতে পারব না। তাই আমাকে ভয় দেখিয়ে লিখেছেন—ভকতরামের বিধবা মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে ভকত্‌রাম নাকি খুব পেড়াপেড়ি করছে ; যদি আমি না যাই, তাহলে তাকেই বিয়ে করে শ্বশুরের ক্ষেত-খামারের তদারক করবে, আর পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাট্ হয়ে বসে খাবে।'

'তা যা না বাছা।'—গিন্নি মুচকি হেসে বলেন—'বেচারার মন যখন খারাপ হয়েছে তোর জন্যে।'

'বুড়ো বয়েসে ওসব আদিখ্যেতা আর ভাল লাগে না বাপু।'—লজ্জা-লজ্জা মুখে পার্বতী বলে—'নেহাৎ বাঁজা মেয়েমানুষ, তাই। নৈলে এতদিনে ও' সাত ছেলের বাপ হোত। ঢং-এর কথা শুনলে লজ্জায় মরে যাই।—যাব যে, তো সামনের দেওয়ালী পূজোর খরচের টাকার জোগাড় হবে কি কোরে ? শ্বশুরদের সাত পুরুষের পূজো। গাঁয়ের পাঁচজন আসে আজো। মন কেমনের ঢং কোরে

বাপু। আগে শ্বশুরের বংশের মান-মর্য্যেদা, তারপর তোম্মার সোয়ামী। কি বল মা ?'

'তা তো বটেই।'

'কড়া একখানা চিঠি দোব আজই।—তা' ওমা, ঐ কয়লা-রাখা চৌবাচ্চাটার পাড়ে একখানা নতুন খাম এনে রেখেছি। বাবুকে বোলে ওর ওপর ঠিকানাটা ইংরিজিতে লিখিয়ে দাও না। ইংরিজিতে ঠিকানা লিখলে খাতির কোরে পিওনরা তাড়াতাড়ি বিলি করে দেয়। ভাবে মিলিটারির সাহেবের চিঠি।'

'ঠিকানাটা কি বল্ ?'

'গ্রাম আমেদপুর, থানা করিমবাগ, পোস্টাপিস বিত্‌ওয়ান্ বাজার, জেলা মুঙ্গের।'

মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি বলেন—ওসব তার বানানো আদিখ্যেতা ভাই। সংসার আছে, না ছাই আছে ওর। ঐ যে কালোবাবুর বস্তির বাড়িউলী বুড়ি মোক্ষদা ? ওর কাছে সেদিন শুনলুম সব কথা। বেবুশ্যের মেয়ে গো, বেবুশ্যে-মেয়ে। নারকেলডাঙ্গার বস্তিতে ওর মা মাগী থাকতো। সেইখানেই জন্ম। ওর মা-মাগীর জাত কি ছিল জানে না কেউ। রূপ তো দেখেছ মাগীর—নেহাৎ বেবুশ্যেগিরির ব্যবসাটা ঐ রূপের ছিরিতে জমবে না বলেই বাসন মেজে খায়।'

গিন্নি বলেন—'কিন্তু ও যে ওর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা লিখিয়ে নিলে সেদিন আমাদের কাছে।'

'গ্রাম আমেদপুর, থানা করিমবাগ, পোস্টাপিস বিত্‌ওয়ানবাজার তো ? আমার ছোট দেওরের শালা বড় পোস্টাপিসে কাজ করে। সে বললে, ভূ-ভারতে ওরকম ঠিকানাই নেই কোনো। ও ঠিকানাটাই ভুয়ো।'

'ও মা! কি ঘেন্নার কথা! মাগীর সবটাই ছল্ ?'

পাশের ঘর থেকে না দেখেও বুঝতে পারি, চোখ ছুটোকে বড় বড় কোরে গিন্নি নিশ্চয়ই গালে হাত দিয়েছেন।

নতুন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে থেটে-খুটে একটা প্রবন্ধ লিখছিলুম। গিন্নি এসে হাজির—'নতুন একটা ঝি রাখবো। মাইনেটা তিন টাকা [illegible]।'

কলমটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলুম—'কেন ? পার্বতী কি করলে ?'

'ছাড়িয়ে দেব ওকে। অসহ্য হয়ে উঠেছে।'—গিন্নির মুখটা ভারী।

কামাই করছে বুঝি খুব ?'

'তাহলে তো বাঁচতুম। অন্তত এক-আধদিন ওর ঐ সংসারের আদিখ্যেতার ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে-গল্প শোনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। আজ সকালে মাগী এল যেন নতুন কনে-বৌয়ের মতন মুখ টিপে হাসতে হাসতে। সে ঢং দেখলে অঙ্গ জ্বালা করে! বলে—মাগো—তোমার জামাই আসছে।'

'কথাটা কারুর অঙ্গে জ্বালা ধরাবার মতো তো নয়। বেচারার স্বামী আসছে কতকাল পরে—না হয় হাসলোই একটু মুখ টিপে।'

'তুমি আর ন্যাকামো কোর না বাপু। সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা!—বললুম না সেদিন, ও-মাগী ইয়ের মেয়ে। মুখুজ্জেদের মেজগিন্নি বলেছেন, সাতজন্মে কেউ ওকে ঐ কালোবাবুর বস্তির ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে ছাখেনি। শ্বশুরবাড়ী থাকলে কি আর যেত না কোনদিন ?'

বললুম—'কিন্তু বাসনটা তো ভালই মাজে। আর মাইনেটাও সস্তা।'

'কিন্তু ঐ তিনটাকা সস্তা বলে একটা ইয়ের মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ীর মিথ্যে বানানো গল্প শুনতে হবে দিনের পর দিন ?'

বললুম—'তোমাদের ছুপুরের মজলিসে পাড়ার সবাই যখন আসেন, তখন তোমাদেরও তো ঐ শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদের গল্পই হয় শুনতে পাই। ও-গল্প শুনতে আর শোনাতে তোমাদের অরুচি আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আহা, কি কথাই বললেন!'—ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন গিন্নি—'সে তো সব ভদ্দরলোকের বৌ-ঝির সত্যিকারের গল্প।'

বললুম—"ভদ্দরলোকেদের বৌ-ঝি, এ-অবধি নিশ্চয়ই মেনে নিচ্ছি;—কিন্তু গল্পগুলো সত্যি কতখানি, সে-বিষয়ে [illegible]।'

'ওসব সাহিত্যিক প্যাঁচানো কথা ছেড়ে শুনবে সবখানি, আজ সকালে পার্বতী কি বলেছে?'

'বলো।'

'মুচকি হেসে বলে কি না—খোঁড়া পা নিয়ে তোমার জামাই কেন ছুটে আসছে কলকাতায় জানো মা?'

'তুমি কি বললে?'

'আমি? সাড়াও দিলুম না। ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ করে মোচা কুটতে লাগলুম ভাঁড়ার ঘরে বসে।—কিন্তু সাড়া না দিলেও মাগী কি থামে? হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, লজ্জায় নুইয়ে গিয়ে বললে—কদিন আগে একখানা চিঠিতে তোমার জামাইকে লিখেছিলুম মা ঠাট্টা করে যে, বিয়ে-ভাঙ্গার আইন তো পাশ হয়ে গেছে, আমার আর তোমার ঘর করতে ইচ্ছে নেই।—ওমা, তাই পড়ে চিঠিতে তার সে কী আকুলি-বিকুলি! ভাবলে, সত্যি সত্যিই বুঝি আমি পালিয়ে যাচ্ছি।—বোঝো মা বুদ্ধি! হিঁদুর মেয়ের বুঝি এক বৈ দুই স্বামী হয়?'

থামলেন গিন্নি। তারপর বললেন—'বলতো এসব শুনলে গায়ে বৃশ্চিক দংশন হয় কি না।'

হেসে বললুম—'শেষের কথাটা কিন্তু ওর তো খুব উঁচুদরের—গিন্নি।'

মুখ বেঁকালেন গিন্নি—'তা' বলে ঐ জাত-গোত্তর ছাড়া ঝি মাগীটার মুখে শুনতে হবে?—এই আমি তোমাকে বলে গেলুম, এ-মাসের কটা দিন গেলেই ওকে আমি বিদেয় করবো। এ আর সহ্য হয় না।'

গিন্নি থর থর করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

সেদিন দুপুরে পাশের ঘরে খেলার টেবিলে বসেই শুনতে পাচ্ছিলুম গিন্নিদের দুপুরের মজলিসের আলাপ-আলোচনা। পার্বতীর মিথ্যের মুখোস খুলে দেবার জন্যে ওঁরা বদ্ধপরিকর। এই দরিদ্রা জাতি-গোত্রহীনা দুর্ভাগিনীকে তার কল্পিত সংসারের গৃহিণীর আসন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়ে তাকে তার কলঙ্কিত অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে নামিয়ে দেবার জন্যে ফন্দি ফিকিরের অবধি নেই ওঁদের।

মেয়ে, সেটা আমরা সবাই টের পেয়ে গেছি।'—মুখুজ্জেদের মেজগিন্নির গলা।

'বলতে হবে, আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে টাকা দিচ্ছি, তোর সোয়ামীকে এনে দ্যাখা।'—একটি অল্পবয়সী বধূর কণ্ঠ।

'তাহলেই ঠিক জব্দ হবে মাগী।'—আর একটি বধূর সমর্থন।

'আমার কাছে কাল সকালে এসে ওর স্বামীর নতুন চিঠির গল্প ফাঁদতে বসেছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললুম—তুই যে সেদিন বললি যে, মাস কতক আগে তোর সোয়ামী আর শাশুড়ী গঙ্গাসাগরের তীর্থে যাবার পথে তোর বাসায় এসে ছিল সাতদিন, তা কৈ? মোক্ষদা বাড়িউলী যে বললে, বিশ বচ্ছর আছে ও' এই বস্তিতে, কিন্তু জীবনে তোর সোয়ামীকে দ্যাখেনি।'—গলাটা আমার গিন্নির।

গিন্নি থামতেই চার পাঁচটি কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠল—'কি বললে? কি বললে মাগী শুনে?"

'বলবে আর কি? থোঁতা মুখ ভোঁতা করে চুপচাপ বাসন মাজতে লাগলো।'

'ঠিক আছে।'—আনন্দে ডগমগ সেই অল্পবয়সী বধূটির কণ্ঠ—'এর পর যদি ওর বর দেখাতে বলি, তাহলেই একেবারে জন্মের মতন জব্দ হয়ে যাবে।'

এঘর থেকে বেশ টের পেলুম—একটি দুর্ভাগিনীকে তার কল্পনার সোনার সংসার থেকে নির্বাসিত করবার মোক্ষম ফন্দি আবিষ্কার কোরে পৈশাচিক আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন আমাদের স্বামী-সোহাগিনী ভদ্রঘরের কুলবধূরা।

কিছুদিন কেটে গেছে এর পর। ওদের ফন্দিটা কিছুটা নাকি ফলবতী হয়েছে। পার্বতী আজকাল আর নাকি সংসারের গল্প করে না, চুপচাপ বাসন মাজে। শুধু নতুন অভিযোগ গিন্নিদের—বাসন আর নাকি আগেকার মতো চক্চকে হচ্ছে না।

সেদিন সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজটায় সবেমাত্র চোখ বুলিয়েছি—হাউমাউ কোরে কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে পার্বতী এসে আছড়ে

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বললুম—'কি হয়েছে রে? অমন করে কাঁদছিস কেন?'

'ওগো মা গো!'—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো পার্বতী—'তিন ঘণ্টার কলেরায় তোমার জামাই সব ভাসিয়ে চলে গেল গো।'

পার্বতী আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদতে লাগলো।

গিন্নি ভাঁড়ারঘরে কুটনো কুটছিলেন, কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললুম—'আহা, কাঁদছে মানুষটা, কাছে গিয়ে দুটো কথা বলো।'

দাঁতে দাঁত চেপে গিন্নি বললেন—'ন্যাকা মাগী কত থিয়েটারই জানে।'

ম্লান হেসে বললুম—'তা' হয়তো জানে। কিন্তু শুধু দারিদ্র্য আর জন্মের দোষে সমাজ যাকে দিল না সংসার, এ-জীবনে স্বামী-সোহাগ জুটলো না যার বরাতে তোমাদের মতো—তাকে আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ বিধবা হওয়ার দুঃখের সম্মানটা নকল করেও একটু ভোগ করতে দাও। বৈধব্যের দুঃখটা তো তোমাদের কাম্য নয়—ওটাকে নাহয় ঐ ওকেই দান করলে।'

গিন্নি শিউরে উঠে অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

পার্বতী উঠোনে পড়ে তখনো কাঁদছে।

ঈশ্বরগুপ্ত ও সিপাহী-বিদ্রোহ

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বৎসর পরে তাঁর স্মরণার্থে আজ যে চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস আলোচনার পক্ষে ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাহিত্যিক ঈশ্বরগুপ্ত, সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত, লোকশিক্ষক ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যোৎসাহী ঈশ্বরগুপ্ত, দেশপ্রেমিক ঈশ্বরগুপ্ত, স্ত্রীশিক্ষার সহায়তাকারী ঈশ্বরগুপ্ত ও ঈশ্বরভক্ত ঈশ্বরগুপ্ত, একটি মানুষের মধ্যে এমন গুণরাশি সমাবেশ খুবই কম দেখা যায়, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের সৃষ্টি করা যায়। বর্ত্তমান বৎসর সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী। এই বৎসরে ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ করার আরও একটি কারণ আছে, সেটি হল "ঈশ্বরগুপ্ত ও সিপাহী বিদ্রোহ।" নীলকর অত্যাচার, ডালহৌউসির স্বত্ব লোপ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সর্ব্বশেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮২৪ সালে ব্যারাকপুর থেকে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত—কবি ঈশ্বরগুপ্ত এই সমস্ত বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করে গেছেন, ইংরাজের চোখে ধুলি দিয়ে তিনি যেভাবে এই বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করে গেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর; কাজেই তাঁর কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী। তাঁর অপরিমেয় ঋণ জাতিকে স্মরণ করার জন্য ভারতের তথা বাংলার সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ভবিষ্যত ও জনকল্যাণে ঈশ্বরগুপ্তের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হলেন না ঈশ্বরগুপ্ত। সমগ্র জাতির মর্ম্মস্থলে ছড়িয়ে দিলেন তিনি পরাধীনতার তীব্র বেদনা; দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বাধীনতাই মানুষমাত্রের কাম্য এবং পরাধীনতাই জাতির দুঃখ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। তাই তিনি লিখলেন—

"যৎকালীন একজাতীয় একরূপ স্বভাবান্বিত ব্যক্তি এক ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন স্বভাবান্বিত ভিন্ন ধর্ম্মী ব্যক্তিব্যূহের শাসনের অধীন হয়েন, তৎকালীন ভিন্ন ব্যবস্থায় অনুগামী হইয়া কোন মতেই সুখী হতে পারেন না, কারণ তখন তাঁহারদিগের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত থাকে, কিন্তু পরে তত্তৎ ব্যক্তিদিগের পুত্র পৌত্রেরা আর তদ্রূপ দুঃখে দুঃখি হয়েন না, কারণ তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ জ্ঞাত নহেন, পরাধীন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করত শুদ্ধ প্রভুভক্তিপরায়ণ হয়েন, অধুনা আমাদিগের অবস্থা সেইরূপ 'হইয়াছে'। পূর্ব্বপুরুষদিগের শাস্ত্রীয় সংস্কার যদ্দারা এই ভারত রাজ্য অগ্রগণ্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছি, কি আক্ষেপ? পূর্ব্বে অনবরতই যে জাতির বিদ্যার্থি বালকবর্গের বদন সুধাকরে সুধার সঞ্চয় হইত এবং পরমেশ্বর আরাধনা কল্পে কৃতজ্ঞতা রথে সুমিষ্ট রচনাদি বিনির্গত হইয়া জনক জননীকে আহ্লাদ বিতরণ করিত, এইক্ষণে সেই জাতীয় বালকেরা অর্থকরী বিদ্যার ক্রীতদাস হইয়া সর্ব্বদাই কেবল বিজাতীয় ভাষা উচ্চারণ করিতেছে এবং ঐ ভিন্নদেশীয় অর্থকরী বিদ্যাকে পরমার্থকারী জ্ঞান করিতেছে, জাতীয় ভাষার আলোচনার প্রায় লোপ হইয়াছে, এইক্ষণকার প্রাচীন লোকেরাও তাহার মর্য্যাদা দান করেন না ...সকলেই মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেছেন আমাদের স্বাধীনতা লোপ হওনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ভাষা আচার [illegible]

প্রভৃতি সকল বিষয়েরি লোপ হইতেছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সন্তানেরা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারাও অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া অর্থের নিমিত্ত বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয়েরা অশেষ প্রকার ক্লেশ সম্ভোগান্তর বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও দেশস্থ জনগণ সমীপে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং ইহাতেই তাহারা উৎসাহশূন্য হইয়া মনের আক্ষেপে শাস্ত্রালোচনায় বিরত হইতেছেন, এবং লোকসকল ক্রমে আচারভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াতে ক্রিয়া কর্ম্মে ব্যাঘাত বশতঃ তাঁহাদিগের উপজীবিকার বিড়ম্বনা হইতেছে, হে বন্ধুবর্গ আপনারা প্রণিধান করিলে কেবল ইহাই জানিতে পারিবেন যে, শুদ্ধ পরাধীনতাই আমাদিগের হিন্দু জাতির এবম্ভূত দুর্গতি হইয়াছে।"

(সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র দেশবাসীকে স্বাধীন হবার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন, তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার স্পৃহা যে ভারতবাসীর অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিল, অনুকূল বায়ুর সহযোগিতা তাহা যে ভীষণ দুর্দ্দৈব ঘটাইতে পারে তাহা ইংরাজও বুঝিয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এদেশের বড়লাট নিযুক্ত হইলে তাঁহার সম্মানার্থে বিলাতে প্রদত্ত ভোজ সভায় লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন—"I wish for a peaceful term of office. But I cannot forget that in the sky of India, serene as it is, a small cloud may arise no longer than a mainland, but which growing long and longer may at last theaten to burst and overwhelm in ruin." ক্যানিংএর এই কালো মেঘই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে "সিপাহী বিদ্রোহ" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আজ এই ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হতে চলেছে, এই ইতিহাসে স্বাধীনতামন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম লিখিত হইবে কি? যদি না লেখা হয় তবে যে ইতিহাস রচিত হইবে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

"সংবাদ-প্রভাকর" পাঠ করিলে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী। ভারতবর্ষকে শোষণ করাই যে বৃটিশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি প্রভাকরে লিখেছেন—

"ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই দেশের অধীশ্বর হইয়া শুদ্ধ স্বদেশের উপকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃত নিয়মাদিতে পরিপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক হইয়াছেন এবং সেই অর্থে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, সুতরাং সাহেবগণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এতদ্দেশীয় মানুষেরা নিঃস্ব হইয়াছেন।"

বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি চান কিনা এই প্রশ্ন পর্য্যালোচনা করে তিনি তার কাগজে সম্পাদকীয় কলমে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

..."পরন্তু ষ্ট্যাম্পের কর, লবণের ও আফিমের এক চেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি উপায়ে যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা কোন মতে রাজনীতি-সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিসূচক তাহাতে আবার একচেটিয়া রূপে বাণিজ্য করা কত বড় অন্যায় তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, অতএব যে রাজা স্বীয় শক্তি প্রচার পূর্ব্বক একচেটিয়া বাণিজ্য করেন, সেই রাজা কিরূপে প্রজার যথার্থ হিতকামী রূপে গণ্য হইতে পারেন"

(সংবাদ প্রভাকর ২০শে বৈশাখ ১২৫৭)

ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১০৮ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন তাহা সত্যি বিস্ময়কর। আজ ইতিহাস ঘাঁটলে আরও দেখা যাবে এই মানুষটি সঙ্গীহীন অবস্থায় ভীষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য ধরে একহাতে কলম ও একহাতে চাবুক নিয়ে। এই চলার পথে তিনি সাথী পান নি কাউকে, কেউ তাকে উৎসাহ ও আশ্বাস দেয় নি, দিয়েছে শুধু পীড়ন। সারাজীবন একা সাধনার দ্বারা যে বিষয়গুলি জানতে পেরেছিলেন—সে হল নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও তার প্রতিকারের জন্য লিখে গিয়েছেন সংবাদ প্রভাকরের পাতায়। তার বাহক বা প্রচারক কেউ ছিল না, তাই তাঁর নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত নয়।

কোন ব্যক্তিকে জানতে হলে চিনতে হলে বা বুঝতে হলে তার চিন্তাধারাকে আগে জানা উচিত। কাজেই ঈশ্বরগুপ্তকে জানতে হলে শুধু তাঁর কয়েকটি অশ্লীল কবিতা জানলে চলবে না। তাঁকে জানতে হলে সর্বাগ্রে চাই তাঁর ব্যথিত জীবনের দিনগুলির সহিত পরিচয় লাভ। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও স্বজনপরিজনের বিদ্রূপ তাকে পীড়া দিলেও অপর দিকে তাকে সঞ্জীবিত করেছে, মনের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাকে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবুও তিনি দমিত হন নি।

বাংলার ভাগ্যাকাশ তখন অন্ধকার ঘনঘোর। একদিকে দেশের নব্য ইংরাজীনবীশদল যাঁরা একদা জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে এসেছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য ঈশ্বরগুপ্তকে অশ্লীল ও ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর অপরদিকে ইংরাজকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর লেখনীর দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হয়। আজ বিংশ শতাব্দিতেও দেশের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাতেও আমরা মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলাকারীদের ব্যঙ্গ কবিতায় বা ছড়ার সঙ্গে তীব্র কষাঘাতের চেষ্টা করি। ইহাকে সামাজিক ইতিহাসের একটি ধারা বলা যেতে পারে অর্থাৎ এই ধরণের উক্তি বা আঘাতের দ্বারা সমাজ বিরোধী লোকের মনে চেতনা উদয়ের জন্য যুগে যুগে এক এক জন মনীষার জন্ম

গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। কাজেই বিগত কালের দিনের সহিত বর্ত্তমানের অনেক সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কোন ঈশ্বরগুপ্তের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাগুলিকে কবিতার ছন্দে গ্রথিত করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন শিখ যুদ্ধকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন—

"লিপিতে উদার দুঃখ লেখনীর মুখে।
সেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্রধরি বলে।
মরিল শীকের যুদ্ধে, সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূর।
ব্রিটিশের রক্ত খায়, শৃগাল কুক্কুর॥

সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের যে সব ছোট বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেইগুলি কখনো ব্রিটিশের জয়—কখনো বা দেশীয় সৈন্যদের জয়, এই রকম ভাবে বহুবার জয় পরাজয়ের পালা ঘটেছে উভয় পক্ষের। ব্রিটিশের পরাজয়ের কলঙ্কের উপর আরো কালি লেপনের জন্য ঈশ্বরগুপ্ত কি সাহসিকতার সহিত কবিতা লিখেছেন তাহাই উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের রাজত্বে বাস করে তার পরাজয়ের কথা এমন কি "ব্রিটিশের রক্ত খায় শৃগাল কুক্কুর" এ কথা লেখা কত যে সাহসিকতায় বা মনোবলের প্রয়োজন তাহাই লক্ষণীয়। যুদ্ধ বিষয়ক সম্পর্কে কবির যে সকল কবিতা আছে তাহা সত্য ঘটনার অনুরূপ বলে মনে হয়, কারণ যখন ব্রিটিশের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা লিখেছেন, আবার যখন বিদ্রোহীদের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা লিখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় সত্য ঘটনাগুলিকে তিনি পরিপূর্ণ সাংবাদিক দৃষ্টিতে দেশের সামনে পরিবেশন করেছেন সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে। বহু যুদ্ধের কথা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে আছে শিখযুদ্ধ, কানপুরের যুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধ, এলাহাবাদের যুদ্ধ, কাবুলের যুদ্ধ, আগ্রার যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম, ইত্যাদি। আজ আমরা স্বাধীনতা শতবার্ষিকী পালন করছি, এই স্মরণীয় দিনে ঈশ্বরগুপ্তের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহের মূলে অবদানের কথা নিশ্চয়ই স্মরণ থাকবে।

চিঠি

প্রভাকর মাঝি

প্রতিদিন যে চিঠিই পাই,
ফাইলে গুছিয়ে রাখি, কিছু না হারাই।
টিং টিং সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠে—
দূর দূরান্তর থেকে সকালে বিকালে ওরা জুটে।
সঙ্কোচের, সম্ভ্রমের নীল ছায়া ফেলে,
ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে।
আটপৌরে খামে-মোড়া, ওরি মধ্যে ভব্যমতো কেউ,
সব কথা শেষ করে' আরো কিছু বলে পুনশ্চ ও।
আত্মীয়ের আত্মীয়তা—অবস্থা সঙ্গীন,
ব্যবসায় মন্দা বড়ো, কায়ক্লেশে কাটাতেছি দিন।
একফোঁটা বৃষ্টি নাই, কী উত্তাপ সারা দেশ ময়,
শস্যের যা হাল হবে, তাহা আর কহতব্য নয়।

তরুণ কবির দল করিতেছে কবি-সম্মেলন;
একটু সক্রিয় উপস্থিতি নিতান্তই সেথা প্রয়োজন:
শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায়।
শান্তিনিকেতনী খামে মৌন মিনতিটুকু
স্পষ্ট পড়া যায়!
রাঙাদির চিঠি পড়ি—সোনালি ঘোষের
এসেছে সম্বন্ধ ঢের:
কিছুতেই রাজি কিন্তু হলনা সে মেয়ে। অতএব…
অতএব সে কথাটা অনুক্তই রয়।
অবচেতনার স্তরে হল তার অন্তিম সঞ্চয়।
আপিসেও রক্ষা নাই; সার্ভিস ষ্ট্যাম্পের
পালতুলে
বন্দী হয়ে উর্দি-পরা বেয়ারার কঠিন আঙুলে,
নীরস চিঠির ঝাঁক কৈফিয়ৎ চায়—
উদ্ধত ভাষায়।
কত চিঠি আসে—তবু খুঁজি বার বার,
—এলো না একটি চিঠি, সে চিঠি তোমার।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আহার

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

(১৪)

তখৎ-ই-সুলেমান

আজ শঙ্করাচার্য্য মন্দির দেখবার প্রোগ্রাম টুরিষ্টরা জানে, তখৎ-ই-সুলেমান বলে। ওরা গেছে পায়ে হেঁটে। আমরা গেলাম শিকারায়। আমাদের বোটের ছেলেরা আর জাগজীবনরা তিনজন আলাদা বেরিয়ে গেছে। আমাদের নাইতে যেতে হয় অন্যত্র। স্নান সেরে ফেরার পথে আজ বালানন্দজী এক কোঁচড় ভর্ত্তি করে চেরী দিলেন। প্রায় দু'সের চেরী হবে। আজও একটা প্রসাদী ম্যাগনোলিয়া লাভ হোলো।

ফিরে এসে দেখি ক্যাম্প খালি। কোণের তাঁবুটায় রান্না চলছে। আজ ছানার ডালনা, এরা বলে 'পানীয় কে সব্জী।' কান্তা একটা ধারে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। ওর একটা কিছু দুর্য্যোগ ঘটেছে। সে দিকে নজর দিতে পারিনি।

"আপনারা চা নিতে বড় দেরী করেন।" বলে বিরক্ত হয়ে এক এক মগ চা দিল, মিষ্টির সমুদ্র। আর মাখন রুটী। রমন্না গরম জল দিল, চা তৈরী করে খেয়ে শিকারা নিয়ে গেলাম সেই দাল গেট।

পাশেই সিঁড়ি। ওপরে বুলেভার্ডে এলাম। কয়েকটা পেপার-মেশীর দোকান ইত্যাদি পার করেই ভারতবর্ষের সেই দিব্যমূর্ত্তি, মুসলমান বস্তী : দারিদ্র্য, অন্ধকার আর নোংরামীর আকর। পোড়া মাংসের গন্ধ, রসুনের গন্ধ, মুর্গীর ডিমের ঝুড়ির পাশে গুড়ের ডালা। সস্তা এক আনা প্যাকেটের চায়ের মালা আর মোমবাতির মালা দুলছে। টিনের মগ রয়েছে টিন মেরামতের দোকানে। পথের ধারে কল থেকে জল পড়ছে। ন্যাংটা ছেলে-মেয়ের দল আর মুর্গীর পাল দৌড়ো-দৌড়ি করছে। একটা ছেলে বসে নোংরা করেছে পথের ধার, এক পাল মুর্গী তা খুঁটে খেতে ব্যস্ত। একটা চাপা দুর্গন্ধ নাকে আসছে, তেলসিটে, রসুনী আর ঘামে ভেজা।

এর পাশেই চার্চ থাকবে না, কোথায় থাকবে? দারিদ্র্য আর নোংরামী যেখানে, সেখানেই উৎকোচ কাজ করে বেশী। এদেশে মুসলমান-করণের ইতিহাস দৈহিক জুলুম, খ্রীষ্টান করণের ইতিহাস অর্থ-নৈতিক জুলুম। উৎকোচ প্রত্যক্ষ এলে তাকে পাপ বলা যায় এবং বুঝবা নিরস্তও করা যায়। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এলে তার রূপ ধরা যায় না বলেই বিপদ বেশী। অথচ যীশু খৃষ্টের বাণী এই বেদান্তের দেশে কতো চমৎকারই না মানাতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে হিন্দুরা কি কম ভক্তি করে? কিন্তু অদ্ভুত এই মিশনারীরা। কি একটা কথা বলে এরা "জীল্"। এই "জীল্" আর "জিদ্" যেন সম-সংজ্ঞক; জীলাস্ আর জেলাস্ যেন এক পর্য্যায়ের। এখানে প্রকাণ্ড চার্চ, হাসপাতাল, মেটার্নিটি সেণ্টার। কত উপকার করছে। এরা উপকার করেছে চীনে, মাদ্রাজে, কোরিয়ায়, আফ্রিকার জঙ্গলে। প্রথমে মিশনারীর ক্রশ্, তারপর মিলিটারীর বেয়নেট......

তারপরেই পাহাড়ের চড়াই সুরু। এক হাজার ফুটের চড়াই। বইয়ে 'এক হাজার ফুট' পড়া বড় কিছু নয়, বিশেষ তেনসিং নোরকে যখন ২৯০০০ মেরে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু খাড়া এক হাজার ফুট মানে বোঝাতে গেলে বলতে হয়—কুতবমীনার মাত্র ২৩৮ ফুট উঁচু। এই হিসাবে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে আমরা উঠেছি। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের নাম শুনেই আমি অবাক্। শঙ্করাচার্য্য এসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাকি?

কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে শ্রীনগরের কাছাকাছি এখানে এত খাড়া পাহাড় নেই আর। একবার দাঁড়ালে সারা শ্রীনগরীর শোভা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর ইতিহাস বহু প্রাচীন। এর মন্দির নিয়ে নানা বচসা। এর বিগ্রহকে নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই।

প্রাচীন নাম গোপাদ্রি। গোপাদিত্য এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ৩৭০ খৃঃপূর্ব্বে—নাম জ্যেষ্ঠেশ্বর। মন্দির পরে ভাল করে নির্ম্মাণ করেন ১৭০ বৎসর পরে রাজা অশোকের (সম্রাট অশোক নয়) পুত্র জলোক। ২৫৩ খৃঃ—৩২৮ খৃঃ রাজত্ব করেন অপর গোপাদিত্য। তিনি মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করান। কিন্তু এসব প্রাচীন কথার যথার্থ প্রমাণ হয়নি এখনও। এখন মন্দির আট-কোণ। তাতে মুসলমান কারি-গরীর চিহ্ন স্পষ্ট। জয়নাল আবেদীন এবং পরে জাহাঙ্গীরও এই মন্দির সংস্কার করান। মন্দিরে দুটী শিলালিপি আছে। একটা শিলালিপি বলে ৫৪ সম্বতে হাজি হস্তি নামে কোনও ব্যক্তি এর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৯৩০ বছর আগে কোনও 'নির্ম্মিত' মূর্ত্তি মন্দিরে ছিলো। এখন তো শিবের বাণলিঙ্গ মূর্ত্তি। সুতরাং সে মূর্ত্তি নেই। অন্য শিলালিপি বলে—"মীর জানের পুত্র খাজা রুক্‌ম্ ৭ই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেখা যাচ্ছে মূর্ত্তি ভাঙ্গার পর আবার নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান লিঙ্গ মূর্ত্তি জাহাঙ্গীরের সময়কার। মন্দির শেষ হয়নি। আওরংজেবের সময়, বোধ করি ১৬৫৯ খৃঃ (১০৬৯ হিঃ অব্দ) থেকে মন্দির বর্ত্তমান সময়কার অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই থেমে থাকে।

বেশ কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দির। সামনেটায় অনেকটা খালি জায়গায় খোবানী, আপেল আর আখরোটের গাছ। ভিতরে

বেশী। একটু চ্যাপ্টা মতো লিঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য নাকি অমরনাথ যাত্রার সময়ে এই ভাঙ্গা মন্দিরে এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে যান, সেই থেকে নাম শঙ্করাচার্য্য পাহাড়। আবার ভগবান শঙ্করের মন্দির আছে বলে শঙ্করাচার্য্য পাহাড় এই নাম। শঙ্কর বর্মণ ছিলেন কাশ্মীরের রাজা, তাঁর নামেই এ নাম কিনা কে জানে? সঠিক তথ্য জানতে পারিনি।

জানতে পেরেছি 'তখৎ-ই-সোলেমানের' তথ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের দৌলতে কাশ্মীর আর হতভাগ্য সোলেমানের কথা বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিষ। কাজেই কাশ্মীরে এসে সোলেমানের নামে কোনও ইমারত দেখলে মনটা ছলছল্ করে ওঠে। কিন্তু তখৎ-ই-সোলেমানের সঙ্গে দারাপুত্র সোলেমানের কোনও যোগাযোগ নেই। এই সোলেমান নাকি সলোমানের নাম থেকে এসেছে। ইহুদী পীর সলোমানের সঙ্গে কাশ্মীরের এই যোগাযোগ কি য়িহুদীদের কাশ্মীরে পালিয়ে এসে বসবাস করা সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে তার সাথে কোনও মিল বোঝায়? কে জানে! কোথা থেকে কে এই গোপাদ্রীর নামের সঙ্গে সলোমানের নাম জুড়ে দিল? আজ গোপাদ্রী বললে কেউ চিনবে না। তবে তখৎ-ই-সোলেমান বা শঙ্করাচার্য্য মন্দির বল্লে সকলে চিনবে।

এর শিখর থেকে সমগ্র শ্রীনগরের দৃশ্য অপূর্ব্ব দেখায়। যেন 'ছবির মতো।' কাশ্মীর যে কত উর্ব্বর উপত্যকা, কাশ্মীরে যে খাল, নালা, নদীর কি বাহার, কাশ্মীরের স্থলপথের চেয়ে জলপথ যে কত দীর্ঘতর, কাশ্মীরের ঘন বসতির কতটা অংশ যে ভাসমান বাড়ীতে বাসা করে আছে, এ সব পরিস্ফুট হয় এই গোপাদ্রীতে এসে দাঁড়ালে। ছবির পর ছবি নিতে ইচ্ছে করে। অসিত পর পর কয়েকটা ছবি নিলো।

কতো ছেলে, কতো মেয়ে এসে ভীড় করেছে এই একটুখানি পাহাড়ের ওপর। ওদের উচ্ছল কলরবের সঙ্গে মিশে যাবার দিন আমার আর নেই। কি ভয়ই না ছিল, ছেলে আর মেয়েদের এক সাথে নিয়ে আসার সময়। "ঘৃতকুম্ভ সমা নারী"—সূত্রে-গ্রথিত চিত্তে কতো জটপাকানই ছিল। এই সহজ, নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীর মিলিত এই আনন্দ বন্যার মধ্যে কোথায় আগুন? কেবল ঝিকিমিকি আর চিকিচিকি। দুষ্টামী ওরা চাহনি, অপ্রত্যাশিতকে পাবার চমক, উৎসারিত কণ্ঠস্বরের কল-কলিতের গমক, ছুটাছুটী, দৌড়া-দৌড়ি—দেখি আর ভাবি চিরকাল আমরা বেঁধে রাখলাম এই প্রাণবন্যা স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে। ডিসিপ্লিনের নির্ম্মম অনুশাসনকে আয়ত্ত করাতে চাই বেঁধে। এই যে এদের চঞ্চলোন্মত্ততা, কৌতুকপ্রিয়তা, অজ্ঞলোলুপতা, সাহচর্য্য-পিপাসু এর প্রকৃত রূপটা কি গলিঘুঁজির মধ্যে, উদ্ধত ইমারতের মধ্যে, পেটা ঘণ্টার চৌহদ্দীর মধ্যে ধরা যায়? এই প্রাণস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনার কতটুকু অংশ আমরা স্কুলে ধরতে পারি, গড়তে পারি? ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে প্রাণ সে প্রাণের উপর স্পর্শ রাখতে যে আমরা পারিনে এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? প্রকৃতপক্ষে আমরাই এক রকম প্রতিহিংসার বশে এদের নিকন্ধ করে পঙ্গু করে রেখেছি, এদের অস্বীকার করেছি সত্যের জগতে, প্রাণের জগতে। অথচ দাবী করেছি একটা নৈসর্গিক বিকাশ, চিত্তের একটা সুললিত ছন্দোবদ্ধ—যার ফলে সমাজ-জীবন হয়ে উঠবে গান। অবিমৃষ্যকারিতা, স্পর্দ্ধা ছাড়া এ আর কি।

এরাই তো ডিসিপ্লিনড্। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক দলে দলে বছরে দুবার এদের নিয়ে যেতে হয় পাহাড়ে, সমুদ্রে মরুভূমিতে, জঙ্গলে, খনিতে, কারখানায়। দেখুক ওরা প্রাচীন কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্রগুলিকে, জানুক ওরা ভারতের মন্দির, গুহা, দুর্গ, খাল, প্রস্রবণ জলপ্রপাত। দেখুক ওরা চা বাগানে চায়ের চাষ, গুজরাটের তুলোর চাষ, বিহারে নীলের চাষ, বাংলায় পাটের চাষ, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি ইটারসি, পাঁচমারীর মাঙ্গানীজের খনি সাদিয়া ডিব্রুগড়ের পেট্রোলের খনি, বাঙ্গালোরে সোনার খনি, বসতরের অভ্র খনি। চন্দনকাঠের জঙ্গল কি, সেগুনকাঠের ইতিকথা কি, কোথা থেকে আসে এত শাল, বাঁশ, কাগজ তৈরীর ঘাস জানুক ওরা গিয়ে গিয়ে। তরায়ের খয়ের বন দেখুক, সমুদ্রে মাছধরা দেখুক, জব্বলপুরে শাদা পাথরকাটা দেখুক। সেই হবে ওদের শিক্ষা জ্ঞান। বিশাখাপত্তনে জাহাজ তৈরী হচ্ছে, চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন, মৈসুরে মোটর, জামসেদপুরে লোহার লাইন,—দেখুক ঘুরে ঘুরে। ছেলেমেয়ে এক সাথে ঘুরুক, অসঙ্কোচে ঘুরুক। বুঝে নিতে পারবে নিজেদের দায়িত্ব, বোধ হবে মহাভারতের, ঘুচে যাবে প্রাদেশিকতা, জানবে রাষ্ট্রভাষার উপযোগিতা ও প্রয়োজন। এই যে প্রদেশে প্রদেশে আবদ্ধ বিদ্যার পুঞ্জীকৃত আবর্জনা একে সারা ভারতের সম্পদ করে তোলার জন্য চাই মনের চাষ সমগ্র ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সেই কালচারই ভারতের কালচারকে এক করে রাখবে।

এখনও রাষ্ট্রনায়করা এ বিষয়ে সচেতন হতে পাচ্ছেন না। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই। শিক্ষা বিভাগ থেকে নিশ্চয় একদিন কোনও মনীষা বোধ করবেন চলাচল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্পেশাল ছাত্রবাহী যানবাহনের ব্যবস্থা করার উপযোগিতা। ছুটীর দিনে স্বল্প দূরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থা হবেই। শিক্ষার বিষয়ের আঙ্গিক হিসেবে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা একদিন বোধ করবেনই। সেদিনকার তাদের—আমাদের মতো এতো কষ্ট সহ্য করতে হবেনা জানি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, এদের দেখে মনে হচ্ছে, সেদিন এতো দূর কেন?

ওপারে আর একটা পাহাড়। তার মাথায় দুর্গ।

ওটা কি? কি পাহাড়? জিজ্ঞাসা করলো বেণু।

চেরী বেচ্ছে লোকটা। বলো উঠলো "ওয়্হাঁ বারাহ্ বজ্তা হ্যয়্!" অর্থাৎ ওখানে বারটা বাজে!

হাসবার কথাই।

এককালে দুর্গ ছিল। আজ কিছু নেই। কেবল বারটার সময় একটা তোপ দাগা হয়।

পাহাড়টার নাম হরিপর্বত। প্রাচীন নাম শারিকা পর্বত। জলোদ্ভব

পঙ্কটী শ্রীমান্ জলোদ্ভবের মাথায় ফেলেন। তেত্রিশ কোটী দেবতা এসে পার্বতীর স্তব করেন তখন। তাদের মূর্তি এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে হরিপর্বতের পথের ধারে। হরিপর্বতের প্রতিটী প্রস্তরখণ্ডই নাকি এক-একজন দেবতা।

এককালে হরিপর্বত ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বহু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও সাক্ষ্য দেয়। দুটী মসজিদ আছে এই পাহাড়ে। দেখলে বেশ বোঝা যায় মন্দিরের পঞ্জর দিয়ে মসজিদের দেহ। সেও হয়েছে বহুদিনের কথা। তারপর বহুদিন হিন্দু রাজত্ব গেছে। পাল্টা মসজিদের অপমান কিন্তু কেউ করেনি। হরিপর্বতে দুর্গ নির্মাণ নাকি আকবরের এক মহৎ কর্ম। দেশে দুর্ভিক্ষ ও অভাব। সেই অভাব মোচন কল্পে সম্রাট বিরাট অর্থব্যয়ে দুর্গ তৈরী করান, যাতে কাশ্মীরি শ্রমিক কিছু উপার্জন করার উপায় পায়। এমপ্লয়মেণ্ট আর আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট নিয়ে তবে সেকালের রাজারাও বাজী খেলতেন।

আকবর কাশ্মীরকে জাহাঙ্গীরের মতো ভালবাসেন নি সত্য, কিন্তু জাহাঙ্গীরের ভালোবাসার পথ তৈরী করে গিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাশ্মীরের হরিপর্বতে বিরাট দুর্গ নির্মাণ করানোর প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণকে উপার্জন করার সুযোগ সৃষ্টি করা। তা তিনি করেছিলেন। হিন্দুদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য কাশ্মীরে ভ্রমণ করে হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তীর্থে গিয়ে পূজা দিয়ে এসেছেন। আকবরের হৃদয়ের তত্ত্বই ছিল ভারতীয়-বাদ। ভারতীয় হওয়াই তাঁর কাছে প্রধান মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি শীর্ষে তিলক পর্যন্ত ধারণ করে স্বধর্মীয়ের নিকট উপহাসের পাত্রও হয়েছিলেন। তবু সেই উদার মনোবৃত্তির ফলেই মোগল মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে; আর সেই উদার নীতির অভাবেই যোগ্যতা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব খুঁড়ে যান মোগল মহিমার কবর।

নামার পথ দুর্গম। কেবল ছোটো ছোটো নুড়ি-ভরা পথ। একটু অসাবধানে পা হড়কাবে। আমি বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করে নামতে হবে। ছেলেরা, মেয়েরা শুনে নামছে। কতটুকু? যতটুকু আমার চোখের ওপর। তারপর যে যার মতো ছুটছে, পড়ছে, ছড়ছে, ঝাড়ছে, চলছে।

চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, টকটকে রং, ছোটো ছোটো চোখে উজ্জ্বল চাহনি, পাৎলা ঠোঁটে ধরা চেপা একটা দৃঢ় হাসি, মাথায় তামাটে পাৎলা চুল, পরণে মহারাষ্ট্র প্যাটার্ণের চেককাটা শাড়ী—মিসেস্ শর্মা বলি আমরা। একটি মেয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল। চমৎকার ভদ্রমহিলা, জবরদস্ত, নিরাতঙ্ক, ভারসহ। একজন বর্ষীয়সী মহিলার হাত ধরে ধরে নামছেন।

হাসলাম মিসেস্ শর্মাকে দেখে। উনিও হাসলেন আমায় দেখে। হঠাৎ আমি চিৎপাত হয়ে পড়লাম।

হাততালি দিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন মিসেস্ শর্মা। "একটু আগে শেখাচ্ছিলেন না? চালগুলি কোথায়? দেখে ফেলার আগে উঠে পড়ুন।"

শঙ্করাচার্য মন্দির

যত হাসেন মিসেস্ শর্মা, তত হাসি আমি।
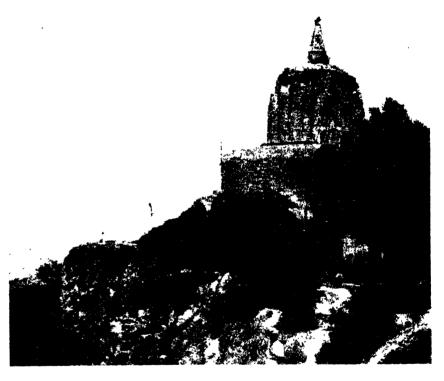
"আপনি পড়লে হাত ধরে আমি তুলতাম। অথচ—"

"আমি তো ভাবছিলাম তুলবো। বড্ড তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। আচ্ছা এবার হলে তুলবো, কথা রইলো।"

মজা লেগেছে বেণু আর অসিতের। প্রাণভরে হাসছে ওরা। হঠাৎ একটা গুজব এলো ভেসে একটি ছেলে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে। তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

এক নিমেষে শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

হলেই কি পথে হবে রক্তস্নান, বলি! তিব্বতের পথে এমনি করে মৃত্যু দেখেছি তিস্তার পিতমের। থাকতে পারিনি, পালিয়ে এসেছি। আজও সেই মৃত্যু। ধড়ফড় করতে করতে নামছি।

পিছন থেকে শান্তস্বরে বল্লেন মিসেস্ শর্মা—"অত ছুটছেন কেন? মাত্র একটা খবর বই নয়? যা হবার হয়ে গেছে এতক্ষণ। সঙ্গে নিশ্চয় লোক আছে, ঘাবড়ালে চলে?"

কে যেন রাশ টানলো। বেণু হাত ধরে আছে মিসেস্ শর্মার। বুঝলাম বেণুর ইঙ্গিত। অসিত এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

"ভগবানকে ডাকুন।"

"বিশ্বাস করেন ভগবানে?"

"নিশ্চয় করি" চোখ পাকিয়ে বলে মিসেস্ শর্মা—"ভগবানে বিশ্বাস করি না? জানেন ভগবান আমায় কি দিয়েছেন?"

"আপনার ভগবান কেবল দেনই বুঝি?"

"সেইটাই তো গোড়ার কথা। কেবল দেন। দরকার কি তাঁর যে নেবেন? সুখও দেন, দুঃখও দেন। সুখকে হেসে নিই, দুঃখকে নিতে চাই না। এই তো মায়া, এই তো ঝঞ্ঝাট! সেই তপস্যাই তো তপস্যা।"

"আপনাকে তিনি কি দিলেন শুনি?"

"স্বামী দিয়েছেন। এমন স্বামী যে আমার মনে হয় সীতা, শৈব্যা, পাঞ্চালী অমন স্বামী পাননি। কি ছিলাম আমি জানেন? নেহাৎ গোঁড়া পরিবারের নোলকপরা খুকী বৌ। আমায় স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভাল লাগে তোমার, কি চাই? কি জানি মনে এসেছিলো, বলেছিলাম—সূর্য্য তুমি আমি অন্ধকার। আমায় তুমি বিদ্যা দাও। কি কঠিন যে এই চাওয়া ধারণা করতে পারবেন না। কতবড়ো পরীক্ষায় ফেললাম তাঁকে। কিন্তু সমাজের গঞ্জনা, তিরস্কার, অত্যাচার সব সহ্য করে নিজে তিনি আমায় অ—আ পড়িয়েছেন। আমি তাঁকে তিনটি ছেলে দিয়েছি, আর তিনি আমায় এম-এ অবধি পাশ করিয়েছেন, বিলেত পাঠিয়েছেন; যখন যা চেয়েছি দিয়েছেন। এই কাশ্মীরে আসতে চাইতে তিনিই রাজী হয়েছেন। তাই তো আসতে পেলাম। চাকরি করছি তাঁর অনুমতি পেয়ে। তাঁকে বাদ দিয়ে আজ অবধি কিছু করিনি। তিনি আমার বন্ধু, দেবতা, ইষ্ট, আমার নব জন্মদাতা গুরু।"

এমন পরম নির্ভর প্রীতি ভক্তির কথা শুনলেও মন ঝরঝরে হয়।

এতক্ষণে লাল হোলো মিসেস্ শর্মার গাল। "এবারেই বিপদ। এসেছি জোর করে। আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যাতে অমরনাথ না যাই। কিন্তু এখান থেকে চিঠি লিখে মত আনাতে হবে। যদি চলেন অমরনাথে, আপনার মতো যদি সঙ্গী পাই, জোর করে লিখবো। বলুন।"

"মত দেবেন তিনি?"

"আমায় না বলার আগে তিনি অনেক ভাববেন। আমি রোজ ঠাকুরকে ডাকছি—ঠাকুর তাঁর মতি করিয়ে দিও। সে যেন কষ্ট না পায়, অশান্তি না পায়। যেন সহজ মনে আমায় অনুমতি দেয়।"

"ঠাকুর যদি সাড়া না দেন"

চোখ পাকিয়ে মিসেস্ শর্ম্মা বল্লেন—"কখ্খনো না। ঠাকুর কখ্খনো পবিত্র কাজে বাধা দেবেন না। আমার স্বামী আমায় অনুমতি দেবেন। আপনি যাবেন?"

কখনও অমরনাথ যাবার কথা ভাবিনি। বলে দিলাম "যাবো। আপনার সঙ্গে থাকার আনন্দে যাবো।"

কয়েকটী ছেলে বসে আছে এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করি—"কি রে কি হয়েছে? কে পড়েছে?"

"একটি ছেলে নীচে পড়ে গেছে।"

"কেমন আছে?"

"চোট লেগেছে, হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে।"

মরেনি তাহলে! মিসেস শর্মা আমার দিকে চাইলেন।

আরও কিছুদূর, আরও কিছুদূর। নীচে নেমে শুনি একটি ছেলে পড়ে গিয়েছিল। খানিকটা ছড়ে গেছে। শিকারা করে চিনার বাগে চলে গেছে।

মিসেস্ শর্মার ভগবান আছেনই। নৈলে আজ এই সকালটাই কাশ্মীরে আমার শেষ সকাল হোতো।

আমাদের শিকারাটা ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। চড়েছি আমি আর বেণু। কিন্তু হঠাৎ অসিত অদৃশ্য। তার দেখা নেই। ক্রমে ক্রমে আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট। কোথায় গেল অসিত? পাঠালাম শিকারা-ওলাকে তার খোঁজে। সে চলে যেতেই দেখি শ্রীমান দু'গাল ফুলিয়ে পান খেয়ে, পান আর সিগারেট নিয়ে হাজির।

"ও: পান কি এখানে? সে—ই ওইখানে।"

শিকারাওলাকে ডাকতে গেল অসিত। এমনি করে একঘণ্টা পরে শিকারা ছাড়লো।

(১০)

শুধু দুটো দিন

বিকেলে সবে চিনারবাগ থেকে বেরিয়েছি। ডালের দিকে পা বাড়িয়েছি। আজ হেঁটে যাবো। হঠাৎ টাঙ্গা থেকে বিরাট—"আরে!" শব্দে চকিত হলাম।

আমাদের সত্যেন'দা, বৌদি আর গুণেন'দা! সত্যেনদার সদা মিষ্ট হাসির মতোই বৌদিটি। মিষ্টি ঝগড়া করায় অসাধারণ দক্ষতা তাঁর; সে ঝগড়া দাদার সঙ্গেও এবং দাদার কাছাকাছিদের সঙ্গেও। এঁদের মধ্যে গুণেন একটা আবশ্যিক বন্ধন। গুণেন শিল্পী। ছবি আঁকতে কাশ্মীরে আসা এই এঁর প্রথম নয়। এঁদের সাহচর্যে অনেক সরস মুহূর্ত কেটেছে দিল্লীতে। সত্যেনদার গানের সখ, ফুলের সখ, ছবির সখ, সাহিত্যের সব সবই আছে; আবার সুন্দরী ভার্য্যার সখ মিটেছে টুলটুলে বৌদিকে পেয়ে।

"আরে !" বলে উঠলেন শিপ্রাবৌদি ! তারপরে সত্যেনদার হৃদয়ের মত প্রশান্ত হাসির ঢেউয়ে সবাই গাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়ালেন।

শিপ্রাবৌদির প্রথম চমক কাটতেই তাঁর ঝগড়ালু মনটা গেয়ে উঠলো—"তা হলে হোলো না ! "মুখখানা বিরক্তি, হতাশা আর বিষণ্ণতার একটা "পাক্।"

"কি হোলো না ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার আর কাশ্মীর সম্বন্ধে লেখা হোলো না !"

শুনেন আর সত্যেনদা হাসছেন।

আমি বল্লাম, "বহুৎ খুব। কিছু লিখবো না।"

"তা হবে না। সাহিত্যিককে এমনিই. বিশ্বাস করিনা। তাতে আবার কাশ্মীর ; দেখতে দেখতে প্রতিজ্ঞা ভোলা এমন কিছু ব্যভিচার হবে না।"

"কি চাও তুমি। ভদ্রলোক কলম ভেঙ্গে ফেলবেন"—বললেন সত্যেনদা।

"নুন খাইয়ে প্রতিজ্ঞা করাবো। নেমকহারামি না করেন। আপনাদের নেমন্তন্ন রইলো আমাদের বোটে—Swan Song—ঝিলমের বাঁধের ওপর ; পাকা সায়েব পাড়ায়। খুঁজতে বেগ পেতে হবে না। সাহেব পাড়ার সব চেয়ে কালো সাহেব বল্লেই···"

সত্যেনদার রং নিয়ে বৌদির ল্যাংমারা এই প্রথম নয়।

সত্যেনদা মহা খুশী। লাঞ্চের নেমন্তন্ন করে ছাড়লেন।

"বাপ্‌রে বাপ্—যে পথ দিয়ে এসেছেন যেন পঙ্গপাল চলে গেছে। জম্মু, কুদ, বাতোত, ভেরনাগ, ইসলামাবাদ—সর্বত্র খাদ্য নেই। জিজ্ঞাসা করলেই বলে ছেলের দল এসে খেয়ে গেছে। যেন আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়।"

"দাল দেখেছেন ?···শিকারা চড়ে যাবেন, দূরে দূরে বেড়াবেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত শিকারায় থাকবেন···" বলে যাচ্ছে শুনেন। "আছেন তো চিনারবাগে। এককালে নৌরোজের নক্সী কাটা হোতো ওর ছায়ায় : এখন একটা নোংরা বদ্ধ জলের কুণ্ডলী। তার চেয়ে চলে যাবেন দালে···"

"রাখো, রাখো তোমার কবিত্ব। ভারি তো দাল। তা নয়, দেখবেন খিলান মার্গ, সোন্‌মার্গ ঘোড়ায় চড়ে বরফের মধ্য দিয়ে—" বলতে বলতে হঠাৎ বেণুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"ভয় পাবেন না ঘোড়ায় চড়তে। দিব্যি চড়া যায়। ঘোড়াগুলো কী শান্ত।···"

বল্লাম—"যেন দোজবরে বর !"

হাসতে হাসতে বললো—"কি চমৎকার উপমা !···শাড়ী পরে উঠলে একটু কাপড় উঠে যায়। যাক্ গে। সামনে দিয়ে চাদর দিয়ে দেবেন। তা বলে পাজামা পরবেন না। ওতে সুখ নেই।"···

আমরা এগুতে লাগলাম। দালের পাশে পাশে পথটা গেছে—হেঁটে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ এলো ঝড় ;—বীর বিক্রমে ঝড়। সমস্ত যেন লণ্ডভণ্ড করে, উড়িয়ে, শাসিয়ে, ঝাপটে ঝড় এলো পাহাড়ের শাদা লুট করে, আকাশের অসীম শূন্যতাকে কোণঠাসা করে রেখে, দালের জলের কালো নিবিড় প্রত্যয়কে একেবারে আলুথালু বিভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত করে ঝড় এলো। শিকারাগুলো তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটেছে—কোথা তীর লক্ষ্য করে, বাঁধের দেওয়ালে এসে ঢেউয়ের আর্ত্তনাদ বুক ফাটাচ্ছে, পথের ধুলো মার্ক্সীয় নীতির অনুজ্ঞার মতো চড়েছে গিয়ে গাছের মাথায় ; সেখানেও না থেমে আকাশের মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে ধরণীর এককর্মা বাঞ্ছাকে।

আমরা আর কোথায় আশ্রয় নিই ! ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ। ফিরলাম যখন হাউস বোটে তখন দেখি ছটো তাঁবু পড়ে গেছে ; রান্না লণ্ডভণ্ড। অন্ধকারে কিছু করার উপায় নেই। কেবল সকলে বলছে "ওঃ কী ঝড় গেল, কী ঝড় !"

হাউসবোটে অসিত, জগজীবন আর বেণু আড্ডায় জমেছে। আমি আর বিহারীলালজী, লালসিং আর পণ্ডিয়ামের খোঁজে বেরিয়েছি। ওদের বোটে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফিরছি। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কান্তা। প্রকাণ্ড একটা চিনার গাছ কবে কে কেটে ফেলে রেখেছে। অতিকায় গুঁড়িটা লম্বালম্বি পড়ে আছে জল পর্য্যন্ত ! পেছনটায় অন্ধকার। সামনেই রমল্লার ভাই গফুরার ঘর। গফুরার বৌ আর বড় মেয়ে নান্‌কী থেকে ভাত খাচ্ছে মাছের তরকারী দিয়ে। গফুরা বসে বসে বাটী থেকে গরম কালো চা খাচ্ছে। ভেতরে টিম্‌টিম্ করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে। জানালা দিয়ে যে আলোটুকু কান্তার পায়ের কাছে পড়েছে, কান্তার মুখের মতোই তা ম্লান।

কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে কান্তার। জানার উপায় নেই। কিন্তু মেয়েটা চাকরি করতে এসেছে। কেন এই চাকরি এভাবে নিয়েছে কে জানে। সাজ-সজ্জার প্রতি এতো মোহ ওর, অথচ চোখ মোহগ্রস্ত নয়। শরীর ক্ষীণ, আচরণে কেমন একটা মার্জিত ভাব আছে। অথচ সব ছাপিয়ে কেমন একটা কাঙ্গাল-পনা ওকে হীন করে না রাখলেও দীন করে রেখেছে।

চলে আসছি লুকিয়ে লুকিয়ে ছবিটাকে দেখে। মনোরমা ডাকলো—"দাদাজী চলো তোমার ডুঙ্গায়। আজ গান শুনবোই। এই এক বহিনজীকে ধরে এনেছি। এ ও বাংলা গান জানে। বেণুদিদি কোথায় ?"

মেয়েটার নাম সরোজ। শান্তিনিকেতনে ছিল বেশ কিছুদিন। ওরা এখানে এসে কয়েকজন একজোট বেঁধেছে—সবাই আশ্রমিক। ওরাই গান গেয়েছিল রাতে।

কাজেই ঝড়ের শেষের সেই রাতে কয়েকখানা গান শোনা গেল।

গান শেষ হোলো। ডুঙ্গায় ফিরে এসে দেখি আর এক কাণ্ড !

নিরীহ গোবেচারি রমল্লা আমাদের জুতো সাফ্ করতে লেগে গেল, বোঝা কঠিন। আরও বোঝা কঠিন জুতো সাফ্‌টা এতো রাত্রেই বা করছে কেন ? আমি জিজ্ঞাসা করতেই ও জবাব দিলে—"জুতোর সমান যাদের কদর নয় তারাই জুতোকে পরিষ্কার করার কাজে লাগে।"

ভূকম্প জবাবে কাশ্মীরী বুদ্ধি প্রখর। প্রতি বিদেশীর প্রশ্নে কাশ্মীরী

সহজাত চিন্তাপ্রবণতার প্রশংসা—আকবর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত লেখা সব গ্রন্থে আছে। আমি রমল্লাকে প্রশ্ন করি "কি ব্যাপার রে?"

যা উত্তর দিলে তেমন কিছু একটা কোলকাতায় বা এলাহাবাদে হলে ভালো রকম একটা হরতাল তো হোতেই। এখানে কেবল রমল্লা জুতো সাফ্ করছে। এমন অহিংস মনোবৃত্তি চোখে দেখাও আত্মিক-স্নান। হবেনা কেন? জল ছাড়া তো পানীয় নেই ওদের মধ্যে। সাধারণ লোকের মধ্যে মদ্যপানের চলনই নেই॥ কাশ্মীরী একটা প্রবাদ আছে—"রোজ মদ, সপ্তাহে 'হামাম', মাসান্তে জোলাপ আর বৎসরান্তে রক্তমোক্ষণ।" প্রবাদ সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে মুসলমানরা কোনও মদ্য-জাতীয় উত্তেজক পানীয় ব্যবহার করেনা। আপেলের রস পচিয়ে এক ধরণের মদ কেউ কেউ ব্যবহার করে। কিন্তু মদ্যপানের দোষ ওদের জাতে নেই বললেই চলে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তবু মদ-মাংস খায়; কিন্তু বহু মুসলমান মদ বা মাংস কিছুই খায়না।

হামামের কথা বলা হয়েছে প্রবাদে। রমল্লার কথায় আমার আগে হামামের কথাটা সেরে নেওয়া যাক। 'হামাম' কাশ্মীরী সমাজে এমন একটা বিশিষ্ট অঙ্গ যার তুলনা কলকাতা-সমাজে চায়ের আড্ডাকে বলা চলে। হপ্তায় একবার অন্ততঃ হামামে ঢুকে গোসল করা কাশ্মীরী জীবনের একটা অবশ্য আচরণীয় প্রয়োজন। কাপড়-চোপড়ের 'সেট্' তো কুল্লে একটা। হামামে গেলে নাইবার সুবিধে, আড্ডা দেবার সুবিধে। কাশ্মীরীরা ভারী আড্ডা-প্রিয় জাত। না খেয়ে খোস গল্প করে সময় কাটাতে ওস্তাদ। স্রেফ খোস গল্প। রাজনীতি, পরচর্চা বা কলহ নয়। স্রেফ গল্প। কিন্তু সেটা এতো প্রাণশক্তির সঙ্গে যে প্রায়ই কলহ বলে বোধ হয়। এদের আড্ডা নিয়ে নানা মজার গল্প আছে। সময় মতো বলা যাবে। এখন রমল্লার কথাটা সারা যাক্।

আমাদের বত্রিশখানা বোট যা ভাড়া হয়েছিল একটা ঠিকাদারের মারফৎ! ঠিকাদার ওদের একটা পয়সা দেয়নি, অথচ আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে আগাম। এ কদিনে ওরা পয়সা না পেয়ে না খেয়ে থাকার সীমায় পৌঁচেছে। এতগুলো ভদ্রসন্তান ও সম্মানিত অতিথির মধ্যে কোনও প্রকার গোলমাল করতে ওদের ইজ্জতে, অর্থাৎ কাশ্মীরী ইজ্জতে বাধছিল। তাই ওরা চুপ করে আছে!

"পয়সা পাস্‌নি?" চিৎকার করে উঠি।

ও কেবল মাথা নাড়লো।

"ঠিকাদার কি বলে?"

"বলে পাবি।"

"কতো? কবে?"

"দুটোর কোনটাই জানিনা।"

"সে কি? দর ঠিক করা নেই?"

"সরকারী দর ঠিক করা আছে; কিন্তু ঘুষ না দিলে ও দর তো কউ দেয় না। সেই ঘুষের মাপটাই ঠিক করা হচ্ছে না।"

সন্ধ্যাবেলাতেই ঠিকাদারকে ধরে ওদের টাকা দিইয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু মনে আছে রমল্লার নিবেদনের ঢংটা। এটা কাশ্মীরী ঢং। নিজেদের অভিযোগ জানাতে ওরা যে রকমে ঢং করতে পারে, তার উদাহরণ স্বরূপ খানিকটা অনুবাদ দিই বিশিষ্ট পর্যটক ও কাশ্মীর-সরকারের উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মচারীর পরিবর্ণন থেকে—

"কাশ্মীরী যখন নালিশ জানাতে চায় যে তাকে কোনও রাজ-কর্মচারী বা প্রতিবেশী প্রহার করেছে, সঙ্গে করে নিয়ে আসে পকেটে সুরক্ষিত একটা মোড়ক। মোড়কের মধ্যে থাকে একগুচ্ছ চুল। প্রায়ই শেষ পর্যন্ত মালুম হয় সেগুলো ঘোড়ার চুল। (যাই হোক বুঝে নিতে হবে, চুলগুলো তার মাথা থেকে কেউ ছিঁড়েছে।) নিজের দুঃখ দৈন্য নিবেদন করতে হলে সে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে বা উলঙ্গ দেহ ধুলায় মেখে এসে দাঁড়াবে। অথবা বিচিলীর দড়িতে ইঁট ঝুলিয়ে গলায় বেঁধে এসে দাঁড়াবে। ইঁটের তাৎপর্য্য এই যে তার দশা একটা ইঁটের ঢেলার সামিল এবং দড়ির তাৎপর্য্য তার অন্তিম দশা। স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ কাশ্মীরী এসে দাঁড়িয়ে তার লাঙ্গল আর কাস্তে ছুঁড়ে মাটীতে ফেলে প্রমাণ করতে চাইবে যে চাষবাসে আর তার চলছেনা; তাতে তার মন নিরাসক্ত হয়ে গেছে। বীজ বোনবার সময় হলে প্রায় নিত্য কেউ না কেউ আসবে, বলবে চাষের জল সে পাচ্ছেনা। সঙ্গে শুকনো একগুচ্ছ ধানের চারা থাকবেই। প্রায় আসবে দুজন পুরুষ ও একটা নারী। পুরুষদের একজন পরে আছে ছেঁড়া মাদুর, একজনার মাথায় এক তসলা আংরা, মেয়েটা বয়ে এনেছে একঝুড়ি ভাঙ্গা মাটীর বাসন। কখনও বা নালিশ জানাবার পদ্ধতি এর চেয়েও ব্যাপক। একবার একজন এসেছিল; সঙ্গে বোঁচকা; সাংঘাতিক পুতিগন্ধময়। বোঁচকায় তার মৃত শিশুর গলিত দেহ। প্রমাণ করতে চায়, ঐ শিশুটীকে কবর দেবার মতো জমীও তার নেই। আসল কথা তার জমীদত্ব সংক্রান্ত একটা মামলার নিষ্পত্তি তখন মুলতুবি আছে। সেটাই তাড়াতাড়ি করাতে চায়। নগমার্গ থেকে একবার একটা লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এসে দাঁড়ালো। বক্তব্য, তার কাকা তাকে একেবারে রিক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন খুব শীত। আমি তাকে একপ্রস্থ জামা কাপড় দিই। পরিহাস করে বলেছিলাম যে এখন ইংরেজের পোষাক পেয়ে ইংরেজের মতো তাকে নিজের দাবী রাখার দায় বইতে হবে। সে তো চলে গেল। পরদিন তার কাকা এসে হাজির। বেচারীর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত।"

চিত্রটী এমন একজন লেখকের যার কাশ্মীর ও কাশ্মীরীদের প্রতি অদ্ভুত দরদ ছিল। তখনকার কাশ্মীরে অত্যাচার অনাচার ছিলই। সে কথা স্বতন্ত্র। এখানে বক্তব্য এই যে নালিশসালিশের অদ্ভুত একটা চরিত্র আছে কাশ্মীরী পদ্ধতিতে। তাতে দৈন্য আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিশয়োক্তির একটা ব্যঙ্গবহুল প্রকাশও আছে। বারবার, প্রায় রোজ একখানা আর্জি এক পণ্ডিত আনতো এক সাহেবের কাছে।—সাহেব তাকে তাড়া দিয়ে ভাগিয়ে দেয়, ফের যদি সে আসে তাকে সাজা দেবে। কিন্তু পণ্ডিত আবার এসেছে • এবং [illegible]

সাহেব খাপ্পা, "নিকাল দেও!" পণ্ডিত জবাব দেয়, "হুজুর আর্জি নয় এটা। একটা কবিতা; শুনুন।" কবিতা ভর্ত্তি নালিশে !!

ঠিক এতোটা, অন্ততঃ এইরূপের দৈন্য কাশ্মীরে নেই। চাষবাস ভালো। গৃহশান্তি বেশ। মুসলমানদের মধ্যে বা হিন্দুদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি বা তালাক নেই বললেই চলে। বাইরে কাশ্মীরীরা বলে বেড়ায় বৌদের তারা পিটিয়ে সায়েস্তা রাখে। কিন্তু প্রকৃত কাশ্মীরী জীবন যাত্রায় যদি কাশ্মীরী কাকেও ভয় করে সে তাদের স্ত্রীদের। বাড়ীতে ওদের ক্ষমতা অপ্রতিহত এবং সব কাশ্মীরীই সেই রাজত্বে ভয়ে কেঁচো।

রমন্নার জীবনযাত্রা তো মাসাবধিকাল প্রত্যক্ষই করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও সব মাঝিদের। রমন্নার জুতো পালিশী পলিসি মনে হলেই হাসি চাপতে পারি না। এই ধরণের আবেদন-নিবেদন ওদের সনাতন পদ্ধতি।

বহুদিন পর্য্যন্ত কাশ্মীরীদের আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-বাণিজ্য সম্বন্ধে অপবাদ প্রায় প্রবাদ বাক্য বলে প্রচারিত হোতো। বহু প্রামাণিক গ্রন্থে ওদের মিথ্যাবাদ, জুয়াচুরি, শাঠ্য, তঞ্চকতা সম্বন্ধে অনর্গল স্তবগান আছে। তবু যারা কাশ্মীরীদের অন্তরের পরিচয় পর্য্যন্ত নেবার সহিষ্ণুতা রেখেছেন তেমন লেখকেরা বারবার বলেছেন এটা জাতির বৈশিষ্ট্য নয়। জাতি হিসাবে এমন রুচিপূর্ণ, শিল্পপ্রিয়, সহিষ্ণু ও সহজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সৌভাগ্য। এদের বর্ত্তমান দোষগুলো খুবই সাময়িক। যুগ যুগ ধরে রক্ষিত, পর্য্যুদস্ত ও অবহেলিত থাকার ফলে প্রথমটায় এরা মজ্জাহীন অবনতির স্তরে পৌঁছে এখন মরিয়া হয়ে গেছে। এরা যদি সুবিচার ও সহানুভূতি পায়, এদের মতো চমৎকার কর্ম্মকুশলী ও মেধাবী জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ।

চরম দুর্দ্দশাতেও কাশ্মীরীর বুদ্ধি লোপ পায় না। অদ্ভুত এদের তুরুপ-জবাব দেবার ক্ষমতা। এক সাহেব একদিন দেখে মাথা নীচে পা ওপরে করে এক শ্রীমান অপেক্ষামান। উক্ত অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় বলে, "দুঃখে কষ্টে দিকবিদিক জ্ঞান তার আর নেই।" মাঝিদের মধ্যে এক বুড়ো মাঝিকে ঐ সাহেবই একদিন বলেন—মাঝিগিরি ছেড়ে তারা চাষ করে না কেন? বুড়ো মাঝি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—"করবো সাহেব করবো। দাড়াও ঝিলম আগে শুকিয়ে যাক্। তার তলার মাটীতে চাষ করবো!" এতো দুঃখ কষ্টেও ওরা হাসির সময়ে হাসতে হাসাতে ভোলেনি। মাথা ঠিক করে জবাব দিতে ওস্তাদ।

(ক্রমশঃ)

সিং-দরজা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

চির-জীবনের তোরণে দাঁড়ায়ে
　　মর-জীবনের পথিক ভাবে
এ-সিংদরজা পারায়ে গেলে কি
　　অমরাবতী সে দেখিতে পাবে?
সে-পারে কি আর এ-পারের কথা
　　পার হয়ে গেলে স্মরণে রাখে—
রাখে যদি তবু সবুজ পাতার—
　　মত কি সে আর সজীব থাকে?
এ-মরলোকের প্রেম কি অমর—
　　যে অমর লোক সে কি ওপারে—
দেখি না তো দ্বারী ভাবিতে না পারি
　　কেমনে কোথায় পাইব তারে।
তাহার প্রেমের সীমা তো ছিল না
　　অগাধ গভীর ছিল না তল
তবে কি এখনো সেই স্নেহরাশি
　　আজিও তেমনি সুধা শীতল?
এ-পারে আঁধার গোধূলির পারে
　　রাঙা করে আছে সিঁদূরে মেঘ
তারো পারে তারা কত দবে আর
এ-পারে ও-পারে সংযোগ সেতু
　　বিয়োগী জনের মনের আশা
মরু-তীর্থের মৃত্যু পথিক—
　　মরীচিকা দেখি বাড়ে পিপাসা
মরণের জয় নহে তো কখনো
　　জীবন সে চির মরণ জয়ী
হৃদয়ের ধন করে সে হরণ
　　মানসে মানসী স্মরণময়ী।
মানস প্রতিমা অমর অসীমা
　　মরণ পারে না ছুঁইতে তারে,
সে যে আমি-ময় আমি যে 'সে-ময়'
　　সময়ের সীমা পরিধি পারে।
হায়রে জীবন! ক্ষুদ্র জীবন—
　　খণ্ডিত হয় গণ্ডী দিয়ে—
মরণের পারে যে নব-জীবন
　　গণ্ডীরে যায় সে লঙ্ঘিয়ে।
এ জীবনে হয় যে প্রেম বপন
　　অঙ্কুর তার ওপারে ধরে
আশ্রয়-তরু অক্ষয় বট

স্বীকারোক্তি

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

[হেরমান জুডারমান (Hermann Sudermann) জার্মান কথা-সাহিত্যের দিকপালগণের অন্যতম। ১৮৫৭ সালে পূর্ব্ব প্রাশিয়ার Matzicken শহরে ইনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে এঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু দারিদ্র্য এঁর সাহিত্য-সাধনার একাগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ইনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। এঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে Fran Sorge (ইংরেজী অনুবাদে এর নামকরণ হয়েছে Dame care) ও The song of songs সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। দুর্নীতির অজুহাতে The song of songs উপন্যাসখানি এক সময় নিষিদ্ধ হয়েছিল ইংলণ্ডে। নাটক রচনাতেও ইনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এঁর নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য Die Ehre ও Heimat। ১৯২৮ সালে বার্লিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বক্ষ্যমান গল্পে হেরমান জুডারমানের দার্শনিক-সুলভ মননশীলতা ও মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্য বিশ্লেষণের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।]

কর্ত্রীঠাকরুণ, আবার আপনার সান্নিধ্যে এই আরাম-কেদারায় বসে নিশ্চিন্তমনে যে আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উৎসবের কোলাহল গেছে থেমে, অতিথি আপ্যায়নের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমার কাছে একটু বসবার ফুরসৎ হয়েছে আপনার।

এই খৃষ্টমাস পর্ব্বটা কী বিরক্তিকর! আমার বিশ্বাস এ পর্ব্বটা উদ্ভাবন করেছে শয়তান—আমাদের মত চির-কুমারদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য। গৃহহীন ছন্নছাড়া জীবনের বেদনা ও রুক্ষতা আমরা যাতে একান্তভাবে উপলব্ধি করি, তারই জন্য এ উৎসবের আয়োজন। অপরের কাছে যা অনাবিল আনন্দের উৎস আমাদের কাছে তা দুঃসহ পীড়ন। অবশ্য আমরা যে সবাই নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করি তা নয়। অপরকে আনন্দ পরিবেশন করে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায় আমাদের অনেকেই তা উপভোগ করে থাকে। তবে ঐ আনন্দটুকু প্রায়ই আবিল হয়ে ওঠে কতকটা আত্মসমালোচনার অনিবার্য্য সংমিশ্রণে, আর কতকটা বিবাহিত জীবনের প্রতি উদগ্র লালসায়।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, আমার অন্তরের রুদ্ধ বেদনা আপনার কাছে এতদিন ব্যক্ত করিনি কেন? প্রশ্ন করাটা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কারণ বেশির ভাগ নারী যেমন অকৃপণভাবে ঈর্ষার হলাহল বর্ষণ করে থাকে, আপনি তেমনি নিঃশেষে বেদনার্ত্তকে উজাড় করে দেন অন্তরের প্রীতি ও সহানুভূতি। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি যত সহজ মনে করছেন ঠিক ততটা নয়। স্পাইডেল তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'নিঃসঙ্গ চড়ুই' এ যা বলেছেন তা আপনি জানেন নিশ্চয়ই। ঐ বইখানিই তো আপনার কাছ থেকে উপহার পেয়েছি এবারের উৎসবে। স্পাইডেল বলেছেন, প্রকৃত চিরকুমার সান্ত্বনা চায় না। একবার সে যখন অসুখী হয়েছে, বেদনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মেনে নেয় সে—বেদনার মধ্যেই রচনা করে কল্পনার স্বর্গ।

স্পাইডেল-বর্ণিত ঐ নিঃসঙ্গ চড়ুই ছাড়া আর এক ধরণের চিরকুমার দেখা যায়—যারা কোন না কোন পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আমি অবশ্য তাদের কথা বলছি না যারা বন্ধুত্বের মুখোস পরে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমি বলছি সেই সব চিরকুমারের কথা—যারা হয়তো গৃহস্বামীর বাল্যবন্ধু, স্কুলে পড়াশুনা করেছে একসঙ্গে, বন্ধুর শিশুপুত্রটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে যারা আদর করে পিতৃব্যের স্নেহে, কখনও বা সান্ধ্য-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প বন্ধুপত্নীকে পড়ে শোনায় অশ্লীল অংশগুলি সযত্নে পরিহার ক'রে।

আমি এমন কয়েকটি চিরকুমারকে জানি যারা বন্ধু-পরিবারে পরিচর্য্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে—যারা সুন্দরী বন্ধুপত্নীর পাশে বসে কাটিয়েছে দিনের পর দিন, অথচ কোনদিনই কোনরকম অসংযত ব্যবহার করেনি বন্ধুপত্নীর প্রতি, যাদের ভালবাসা একান্ত নিষ্কাম।

আমার কথাগুলো আপনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না? বুঝেছি ঐ 'নিষ্কাম' শব্দটায় আপনার আপত্তি। হয়তো আপনার ধারণা অসত্য নয়। অত্যন্ত নিরীহ মানুষেরও মনের মধ্যে কামনা উকিঝুঁকি মারে, কিন্তু ঐ কামনা প্রকাশ পায় না তার আচরণে—সে তাকে দাবিয়ে রাখে প্রবল চেষ্টায়।

আপনাকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই এবং এবারের নববর্ষের পূর্ব্বদিনে দুটি প্রবীণ ভদ্রলোকের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারও উল্লেখ করবো ঐ প্রসঙ্গে। এই আলাপ-আলোচনা আমার কানে এসে পৌছুল কি ক'রে সে সম্বন্ধে আপনি কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং আমার অনুরোধ, শোনার পর এ কথা কা'রো কাছে প্রকাশ করবেন না। তাহলে আরম্ভ করা যাক—কি বলেন?

কল্পনা করুন উঁচু ছাদবিশিষ্ট একটি ঘর, সেকেলে ধরণের আসবাবপত্রে সাজানো, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে সবুজ শেড্-লাগানো পালিশ-করা ঝকঝকে একটি ল্যাম্প—কেরোসিনের ব্যবহার প্রচলিত হবার আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে রকম ল্যাম্প ব্যবহার করতেন প্রায় সেই রকম। ল্যাম্পটির মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি গোল টেবিলের উপর। নববর্ষের পানীয়ের যাবতীয় উপকরণ টেবিলের উপর সাজানো—মাঝখানটায় ল্যাম্পের তেল বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে পড়েছে চাদরের উপর।

পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ ভদ্রলোক দুটি বসে আছেন 'শেড'এর অস্পষ্ট ছায়ায়। ওঁরা দুজন যেন কোন প্রাচীন অট্টালিকার শৈবালাচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষ, প্রত্যেকেই আপনার মধ্যে একান্ত ভাবে নিমগ্ন, প্রত্যেকেই বার্দ্ধক্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছেন। ওঁদের একজন—যিনি গৃহস্বামী—একসময় সৈন্যবিভাগে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কুঞ্চিত ভ্রূর রুক্ষতা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। একটি ঘূর্ণায়মান চেয়ারে স্থাণুর মত বসে আছেন তিনি—দু'হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং রডের হাতলটা ধরে। তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে নিশ্চল, শুধু নীচেকার চোয়ালটা অবিরাম নড়ছে চিবানোর ভঙ্গীতে। অপর ভদ্রলোকটি—যিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তির পাশে একখানি সোফায় উপবিষ্ট—দীর্ঘ ও শীর্ণ, কাঁধ অপ্রশস্ত, মুখাবয়বে চিন্তাশীলতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট—একটা লম্বা পাইপ তাঁর মুখে—ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। তাঁর মুখের চারিধারে তুষারশুভ্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ওষ্ঠে মৃদু প্রশান্ত হাসি। দেখে মনে হয় যেন স্বার্থপঙ্কিল সংসারের বহু ঊর্দ্ধে রয়েছেন তিনি—তাঁর অন্তরের শান্তি চির-অব্যাহত।

ওঁরা দুজনে বসে আছেন নীরবে। ঘর এমনি নিস্তব্ধ যে জ্বালানো ল্যাম্পের তেল পোড়ার অস্ফুট শব্দ শোনা যায়। দূরে দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারোটা বাজে।

"এই সময় তুমি নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করে থাকো প্রতিবারেই।" চিন্তাশীল বৃদ্ধটি বললেন বন্ধুকে উদ্দেশ করে। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু ও ঈষৎ কম্পিত।

"হ্যাঁ, নববর্ষের পানীয় প্রস্তুত করবার সময় হয়েছে বটে।" অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন গম্ভীরভাবে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুষ্ক ও কঠোর—চিরাভ্যস্ত আদেশের সুর যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"তাঁর অভাবে সবই যে এমন নিরানন্দ হয়ে যাবে একথা ভাবিনি কোনদিন," অতিথি ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন বিষাদের সুরে।

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলেন তাঁর কথায় এবং তারপর পূর্বের মতই চোয়াল নাড়তে লাগলেন চিবানোর ভঙ্গীতে।

"চুয়াল্লিশবার তিনি নববর্ষের সুরা তৈরী করেছেন আমাদের জন্য," অতিথি পুনরায় বলতে শুরু করেন।

"হ্যাঁ," বৃদ্ধ সৈনিক বললেন একটু অন্যমনস্কভাবে, "আমার বার্লিনে আসার পর থেকেই।"

"গত বৎসরও এমনি সময় আমরা তিনজন ছিলাম একত্র, আর কী আনন্দেই না কাটিয়েছিলাম সময়টা!" অতিথি বলতে থাকেন গাঢ় স্বপ্নকণ্ঠে—ঐ আরামকেদারাটির উপর

তাঁর আঙুলগুলি চলছিল অতি দ্রুত। বারোটা বাজবার আগেই বোনাটা শেষ করবেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। আর সে সঙ্কল্প রেখেও ছিলেন তিনি। তারপর নববর্ষের সুরা-পান ক'রে আমরা পরম স্বচ্ছন্দচিত্তে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় দু'মাস পরেই মৃত্যুর রাজ্যে যাত্রা করলেন তিনি। তুমি জানো, আমি একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলাম আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে। তুমি আমার মত কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারো নি। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমারও মত গেছে বদ্‌লে—আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমার আর এখন বিশেষ আস্থা নেই। বলতে কি, কোনো চিন্তা বা কল্পনার উপর আমি আর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করি না।"

"হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভাল ছিল সে," মন্তব্য করলেন মৃতার স্বামী, "আমার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার। ভোর পাঁচটায় আমায় যখন কাজে বেরুতে হত, প্রতিদিনই আমার ঘুম ভাঙার আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠে আমার জন্যে ভালো করে এক পেয়ালা কফি বানিয়ে দিত। তবে তার দোষ ত্রুটি যে না ছিল এমন নয়। একবার সে যেই তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করতে শুরু করল, ওঃ ···তার সেই অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রলাপ···"

"তুমি তাঁর কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারতে না, ওকথা বলছ," মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করেন অতিথি ভদ্রলোকটি। নিরুদ্ধ ক্রোধের আবেগে তাঁর ঠোঁটের প্রান্তভাগ ঈষৎ কেঁপে উঠল, যদিও বন্ধুর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা গেল না। শান্ত করুণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, মনে হ'ল যেন তাঁর মনের গোপন কোণে পাপের ছায়া ঘোরাফেরা করছে সন্তর্পণে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, "শোনো ফ্রাঞ্জ্, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। মনের উপর আমার একটা বোঝা চেপে রয়েছে অনেকদিন থেকে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বোঝাটা বহন করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। আজ সব কথা তোমাকে অকপটে বলে মনটাকে হাল্‌কা করতে চাই।"

চেয়ারের একপাশে রক্ষিত লম্বা পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে তামাক ভরতে ভরতে ফ্রাঞ্জ্ বললেন, "বেশ, তবে

"এক সময় তোমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল···"

"দেখো ডাক্তার, রহস্য ক'রো না," ফ্রাঞ্জ্ বললেন বন্ধুর দিকে চেয়ে।

"আমি মোটেই রহস্য করছি না। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এ ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। নিদারুণ অশান্তি ভোগ করেছি আমি। এখন সেটা ব্যক্ত করে মনটাকে আমি ভারমুক্ত করতে চাই।"

"তুমি কি বলতে চাও আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?" বৃদ্ধ সৈনিক চেঁচিয়ে উঠলেন উগ্রকণ্ঠে।

"ছিঃ, তুমি ও কথা বলছ!" ম্লান হাসি হেসে বিষাদ মাখানো কণ্ঠে বললেন দার্শনিক বন্ধু।

ফ্রাঞ্জ্ বিড়বিড় করে কি বলে পাইপটা ধরালেন।

"না, তিনি ছিলেন দেবদূতের মতই পবিত্র," দার্শনিক বন্ধুটি বলতে লাগলেন, "আমরা দুজন হলাম পাপাচারী। শোনো তাহলে সব কথা। তেতাল্লিশ বছর আগেকার ব্যাপার বলছি। তোমাকে সবে বার্লিনে বদ্‌লি করা হয়েছে, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। সে সময় তুমি কি রকম উচ্ছৃঙ্খল ছিলে তা হয়তো তোমার স্মরণ আছে।"

"হুঁ।" কম্পিত হাতখানা তুলে ফ্রাঞ্জ্ গোঁফের প্রান্ত-ভাগ পাকাতে লাগলেন।

"সে সময় বার্লিনে একটি সুন্দরী অভিনেত্রী ছিল যার চোখ দুটি ছিল কালো, আর দীর্ঘায়ত এবং দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত শাদা আর ছোট ছোট। তোমার মনে পড়ে কি?

"হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে। বিয়ান্‌কা তার নাম।" একটা ক্ষীণ হাসি বৃদ্ধ সৈনিকের রুক্ষ কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে খেলে গেল। "মেয়েটি কী দুষ্টুই ছিল! বিশ্বাস করো আমাকে, কামড়ে দিতেও সে দ্বিধা করতো না!"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রতারিত করেছিলে, তোমার স্ত্রীও তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে তিনি কোন অনুযোগ করতেন না, নীরবে এ বেদনা সহ্য করতেন। তুমি ওটা লক্ষ্য কর নি, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম। মার মৃত্যুর পরে তিনিই প্রথম নারী যাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি আমার জীবনে এসে-

পেয়েছি তারই কাছ থেকে। অবশেষে আমি একদিন সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সাম্প্রতিক ভাবান্তরের কারণ কী। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, শরীরটা তাঁর তেমন ভালো নেই। তোমার হয়তো স্মরণ আছে ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে পলের জন্ম হয়েছিল। তারপর এল নববর্ষের পূর্ব্বদিনটি—ঠিক তেতাল্লিশ বছর আগেকার এই রাত্রি। প্রতিদিনকার মত সেদিনও আমি তোমাদের বাড়ী এসেছিলাম রাত্রি আটটা নাগাদ। তোমার স্ত্রী চেয়ারে বসে একটা কাপড়ের উপর ছুঁচের কাজ করছিলেন, আর আমি তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম। আমরা তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, কিন্তু তোমার দেখা নেই। আমি লক্ষ্য করলাম, তোমার স্ত্রী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছেন আর তাঁর সর্ব্ব শরীর থর থর করে কাঁপছে। আমারও সারা দেহ কেঁপে উঠল। কেন যে তুমি আসতে পারছ না তা আমি জানতাম এবং আমার ভয় হল সেই মায়াবিনী অভিনেত্রীর বাহুবন্ধনে তুমি হয়তো বারোটা বাজার কথা একেবারেই ভুলে যাবে। বারোটা বাজতে আর দেরী নেই—ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আসছে। তোমার স্ত্রী হাতের কাজ বন্ধ করলেন, আমিও পড়া বন্ধ করলাম। এক ভয়াবহ স্তব্ধতা যেন নেমে এল ঘরের মধ্যে। আমি লক্ষ্য করলাম, এক বিন্দু অশ্রু তাঁর চোখের পাতার মধ্যে টলটল করছে, তারপর গাল বেয়ে গড়িয়ে হাতের বোনাটার উপর পড়ল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—ইচ্ছা, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তোমাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনি। ঐ ছলনাময়ী নারীর কবল থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনবার ক্ষমতা আমার আছে এ আমি বেশ অনুভব করলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোমার স্ত্রীও লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। এখন আমি যে আসনে বসে রয়েছি এইটেতেই বসেছিলেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'ফ্রাঙ্ককে আনতে,' জবাব দিলাম আমি।

কথাটা শুনে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এলেন তিনি।

'দোহাই আপনার, এখানে থাকুন খানিকক্ষণ। আমাকে একলা ফেলে যাবেন না।' কথাটা বলতে বলতে তিনি আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কাঁধের উপর হাত দুটি রেখে অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে লুকিয়ে ফেললেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থর থর করে। এর আগে কোনদিন কোন নারীর এত নিকট-সান্নিধ্য আমি অনুভব করিনি। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম এবং তাঁকে শান্ত করবার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। সত্যি, সান্ত্বনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলে তুমি। আমার মুখের অবস্থা তখন কী হয়েছিল তুমি লক্ষ্য করোনি। তোমার গণ্ডদেশ অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছিল এবং তোমার দুই চোখ প্রেমের মাদকতায় বুঁজে আসছিল যেন।

সেবার নববর্ষের পূর্ব্বদিনের ঘটনা আমার মনে এমন একটা পরিবর্ত্তন নিয়ে এল যাতে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। তাঁর সুকোমল বাহুর স্পর্শ ও নিবিড় কেশ-পাশের সুমধুর সুবাস অনুভব করার পর থেকে মনে হল যেন আমার সেই উজ্জ্বল তারকা চিত্তাকাশ থেকে খসে পড়েছে, আর তার স্থানে দেখা দিয়েছে এক প্রেমময়ী নারী তার অতুল রূপলাবণ্য নিয়ে। আমি বুঝতে পারতাম আমার দৃষ্টিতে এখন প্রেমের আবেদন ফুটে উঠেছে এবং মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করতাম হীন প্রতারক বলে। বিবেকের গঞ্জনা থেকে কতকটা নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে আমি চেষ্টা করলাম তোমার প্রণয়িনীর কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে। সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতে তখন কিছু অর্থও ছিল—যা আমি পেয়েছিলাম উত্তরাধিকার-সূত্রে। আমি সেই অর্থ যখন সেই কুহকিনীকে দিতে চাইলাম তার সাহায্যের প্রত্যাশায়, সে তা প্রত্যাখ্যান করলে না আর ··"

বৃদ্ধ সৈনিকটি বাধা দিয়ে বললেন, "ও, তাহলে তুমিই বিয়ান্‌কার সেই মর্ম্মান্তিক চিঠির জন্য দায়ী, যাতে সে আমায় ভগ্নহৃদয়ে বিদায় জানিয়েছিল জন্মের মত?"

"হ্যাঁ, আমিই তার জন্য দায়ী। কিন্তু শোনো—আরও কিছু বলতে চাই আমি। ভেবেছিলাম, আমি তাকে যে অর্থ দিলাম তার বিনিময়ে শান্তি ফিরে পাবো। কিন্তু সে আমার ভুল। ঐ সব অসংগত চিন্তা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে আমার মনে বাসা বাঁধতে লাগল। নিরুপায় হয়ে আমি কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। ঠিক সেই

সময় আমি আমার গ্রন্থ 'আত্মার অবিনশ্বরতা'র মূল বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনা করি। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। শান্তি এল না মনে।

এইভাবে পূর্ণ এক বৎসর কেটে গিয়ে আবার নববর্ষের পূর্ব্বদিনটি এসে হাজির হল। আবার তাঁর পাশটিতে এসে বসলাম এই চেয়ারের উপর। এবার বাড়ী ছিলে তুমি, কিন্তু ক্লাবে আমোদ-প্রমোদ করে ক্লান্ত হয়ে সোফায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে পাশের ঘরে। তাঁর খুব নিকটে বসে তাঁর সেই পাণ্ডুর সুডৌল মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গতবারের নববর্ষের পূর্ব্বদিনটির স্মৃতি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ভেসে উঠল এবং আমার হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করে ফেললে। আর একবার আমার কাঁধে তাঁর সুচিক্কণ কেশদামের স্পর্শ অনুভব করবার জন্য, একটিবার তাঁকে চুম্বন করবার জন্য মন আমার মাতাল হয়ে উঠল। পরিণাম যাই হোক না কেন, সেদিকে আমার তখন ভ্রূক্ষেপ নেই। মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। তাঁর চোখ দেখে মনে হল যেন তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে আমার উত্তপ্ত মুখখানা তাঁর কোলের মধ্যে গুঁজে দিলাম।

এইভাবে নিশ্চল হয়ে আমি পড়েছিলাম সম্ভবতঃ দু'তিন সেকেণ্ড। হঠাৎ তাঁর কোমল হস্তের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম মাথায়। শান্ত সহজ স্বরে তিনি বললেন, 'আপনাকে ভালো হতে হবে, মনকে দুর্ব্বল করবেন না।'

হ্যাঁ, আমাকে ভালো হতে হবে। আমার বন্ধু যে আমায় একান্তভাবে বিশ্বাস ক'রে পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে—তাকে আমি কিছুতেই প্রতারিত করতে পারি না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে। টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে এনে আমার হাতে তিনি দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে আমার দেরী হল না। বইখানা তাড়াতাড়ি খুলে আমি চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কী যে পড়ছিলাম তা জানি না।

অক্ষরগুলো যেন আমার চোখের সামনে নাচতে লাগল। কিন্তু আমার মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা শান্ত হয়ে এল। যখন বারোটা বাজল আর তন্দ্রাজড়িত চোখে তুমি উঠে এলে আমাদের নববর্ষের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে, তখন মনে হল যেন আমার পাপের মুহূর্ত্ত বহু দূরে, বিস্মৃত অতীত যুগের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

সেই সময় থেকে আমার মন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। আমি বুঝেছিলাম, আমার ভালবাসায় সাড়া দেননি তিনি এবং তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই আমি প্রত্যাশা করতে পারি না। বছরের পর বছর কেটে গেল। তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হল এবং বিবাহ করে সংসারী হল। আমরা তিনজন বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে পৌঁছুলাম। উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে তুমি একটিমাত্র নারীকেই আশ্রয় করলে—আমারই মত। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করতে পারলাম না আমি। সেটা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু আমার ভালবাসা অন্য রূপ নিলে। পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সংস্রব কাটিয়ে সে ভালবাসা এক আধ্যাত্মিক মিলনে রূপান্তরিত হল। তোমার স্ত্রী ও আমি যখন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতাম তখন তুমি প্রায়ই উপহাস করতে। কিন্তু তুমি যদি বুঝতে পারতে আমার আত্মা একীভূত হয়ে গেছে তাঁর আত্মার সঙ্গে, তবে নিশ্চয়ই তোমার মনে ঈর্ষা দেখা দিত। এখন তিনি পরলোকে, হয়তো আগামী নববর্ষের পূর্ব্বদিনটির আগেই আমরাও তাঁর অনুসরণ করবো। সেইজন্যেই ভাবলাম মনের গোপন কথাটা তোমার কাছে ব্যক্ত ক'রে মনটাকে হাল্কা করে নেওয়ার এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়।...ভাই ফ্রাঞ্জ, আমি তোমার প্রতি একদিন অন্যায় আচরণ করেছি...আমায় ক্ষমা করো।"

অনুনয়ের ভঙ্গীতে তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন বন্ধুর দিকে, কিন্তু ফ্রাঞ্জ সহজ স্বরে বললেন, "কী যে বলছ! এর ভেতর ক্ষমা করবার আছে কী? তোমার এই কাহিনী, এই স্বীকৃতি নিতান্ত পুরানো। এ আমি জানি অনেক কাল। সে নিজেই এ ঘটনা আমায় সবিস্তারে বলেছিল চল্লিশ বছর আগে। এবার আমি বলবো কেন আমি বৃদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত নারীর পশ্চাতে ঘুরেছি। সে আমায় বলেছিল—যখন তোমার সম্পর্কিত ব্যাপারটা জানায়—জীবনে সে একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছে, আর কাউকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অতিথি-বন্ধু নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেওয়ালে সংলগ্ন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে উঠল।
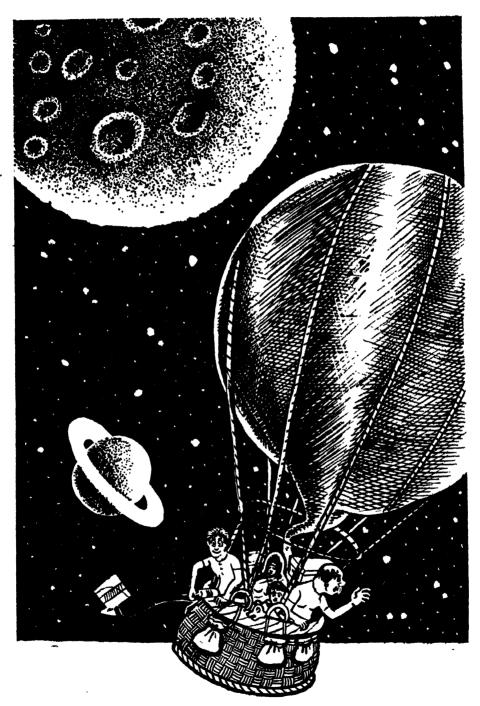
বাস্তু-সমস্যা সমাধান

·ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, হে উদ্বাস্তুগণ·

ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা
ঝিকিমিকি তারা,
বনের মাঝে মনের ময়ূর
হেসেই হ'ল সারা।
চম্‌কে দু'টি পাখী,
ডালে ডালে কাঁপন লাগে
পাতায় পাতায় রাখী
খুসীতে হয় হারা।
ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা……।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—অধ্যক্ষ শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতরত্ন (গোয়ালিয়র)

স া ম |. গ া প | ক্ষ া প | ধ প া | ধ প া | ধ প া
ঝি •র ঝি র ঝি র ঝ র ণা ধা রা ০ ঝি কি ০ মি কি া
\+ ০ + ০ + ০

ম ম া | া া া
তা রা ০ ০ ০ ০
\+ ০

গ গ ম | ধ প া | গ গ ম | রে স া | স স া | রে নি্ া | স স া | া া া
ব নে র মা ঝে ০ ম নে র .. ম যূ র হে সে ই হ' ল ০ সা রা ০ ০ ০ ০
\+ ০ + ০ + ০ + ০

প প । | নি নি । | র্স র্স । | । । । I

চ ম্ কে দু'টি • পা খী • ॰ ॰ ॰

\+ ॰ \+ ॰

র্স র্স র্গ | রেঁ রেঁ । | র্স র্স । | র্স র্স নি | ধ ধ ণি | ধ প ধপ

ডা লে ॰ ডা লে ॰ কাঁ প ন লা গে ॰ পা তা য় পা তা য়॰

\+ ॰ \+ ॰ \+

ম ম । | । । ।

রা খী ॰ • ॰ •

\+

স ম । | গ প । | হ্মপ । | । ম ।

খু সী ॰ তে হ য় হা রা ॰ ॰ • ॰

\+ ॰ \+ ॰

স । ম | গ । প | হ্মা । প | ধ প ।

ঝি র ঝি র ঝি র ঝ র ণা ধা রা ॰

\+ ॰ \+ ॰

ভগবৎ শক্তির মিডিয়াম শরীর

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

শরীর—এ একটা বিরাট শক্তির আধার। এ শক্তিকে মহাশক্তিতে পরিণত করার নিমিত্ত আবাহমান কাল ধরে মানুষ করে আসছে বিভিন্ন ধরণের চর্চা।

যে কোন একটা শক্তিতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষ তার মানবীয় সত্ত্বা লাভ করতে পারে না।

নাস্তিক যে সে'ও তার দাম্ভিকতার অন্তরালে কোন না কোন একটা শক্তিকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে।

আমাদের এই রক্ত মাংসে গড়া দেহটার ভিতরে যে কি অসীম শক্তি থাকে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সাফল্যমণ্ডিত জীবন দীপগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আত্মপ্রত্যয় লাভ করা যায়।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শক্তিতে প্রত্যয় ঘটিয়ে, আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ করে শাশ্বত শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়েছিলেন। যেদিন মানুষ এই নিরাকার শক্তির মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন—সংসার আর তখন মনের অলিন্দে স্থান পায়না। মহাশক্তির পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণের বাসনাই অর্জ্জুনের জীবন লেখ্য তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামিজী এবং শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধিজী, নেতাজী—তাছাড়া আরো কতো মহাজন মহাশক্তির জয়গান গেয়ে গেছেন। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'র জগাইমাধাই এবং রামায়ণ-স্রষ্টা বাল্মীকি মুনির জীবনাদর্শও তার চরম সাক্ষ্য দান করে গেছেন।

ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অলক্ষ্যে যে শক্তির চর্চা মানুষ প্রতিনিয়ত করে আসছে—সহসা বিবেক একদিন তার কুশলতার প্রতিচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে তুলে ধরে তাকে অবচেতন ভগবৎ শক্তিতে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের পরম পরশ একবার যে পেয়েছে, দিব্য দৃষ্টি তার লাভ হবেই হবে। এই মহাকর্ষণ শক্তির উজ্জ্বল আলোকের বিচ্ছুরণে যে নাস্তিক তাকে দেয় আস্তিকতার মোক্ষম পথের সন্ধান। ভগবৎ শক্তির এই অলিন্দ মিতালিতে আস্তিক তখন এগিয়ে চলে আপন গন্তব্য পথে—ঈশ্বর সৃজিত জীবের কল্যাণ কামনায়।

হুসিয়ার! ঘাবড়াবেন না। এই অপার অনন্ত ক্ষমতা ধারণ করার

বাংলার পূজাপার্ব্বণের কথা

উপানন্দ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষ সাধনের পথে এই সব পূজাপার্ব্বণ সমারোহের প্রভাব রয়েছে। আজ বাঙালীর উৎসবময় জীবনের এসেছে বিষণ্ণতা, সেকালের মত প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত পরিবারে বেজে ওঠে না আনন্দমুখর মঙ্গল শঙ্খ—বেজে ওঠে না উৎসবের বাঁশী বা ঢাক ঢোল। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে গৃহে আবাল বৃদ্ধ নরনারী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। বাঙ্গালীর ভাব জীবনেও এসেছে গতিমন্থরতা, এর কারণ বাঙালী শুধু যে তার ধর্ম্ম, আদর্শও সামাজিকতাকে হারাতে বসেছে তা নয়, তার অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ও তার ভেতর এনেছে অকালবিভ্রান্তি। এর ওপর আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত যা দেশের মৃত্তিকাকে দগ্ধ করে তুলেছে, ফলে প্রাণের ফসল ফল্‌বার পক্ষে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছে না। সেকালে বাঙালী ধর্ম্মাদর্শকেই প্রাণের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছিল, এখন সে আদর্শ তার অন্তর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে, এজন্যই আজকের দিনের পূজা পার্ব্বণে রয়ে গেছে অন্তরের অভাব—পারিবারিক পূজাপার্ব্বণ উৎসবের পরিবর্ত্তে দেখা দিয়েছে, সার্ব্বজনীন বারোয়ারী পূজাপার্ব্বণের নি[illegible] ঐকান্তিক মত্ততা। এই মত্ততায় বহু অর্থ অপচয় হয়, আর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির উদর স্ফীত হয়ে ওঠে। পূজাপার্ব্বণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এই সব সামাজিক উৎসব একদা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথা বেদনার ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে, আমাদের চিত্তের ক্ষত দূর করেছে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও মালিন্য অপসারিত করে আশাআকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ আনন্দ-চেতনা দিয়েছে, আর স্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে দূর করে সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আজ যাকে আমরা সামাজিক প্রগতি বলে থাকি—সেটা প্রগতি নয়,—সেটা আমাদের জাতীয় সুষুপ্তির অবসাদ; সেটা আমাদের দুর্গতি। সমাজ নদীর মতই প্রবহমান—সে এককূল ভেঙে চলেছে, অপর দিকে সে রেখে যাচ্ছে চড়া—অনাগত দিনের বসতির জন্যে। অতএব এর জন্যে বিশেষ ভাব্‌বার নেই, ভাব্‌বার কারণ ঘটেছে জাতির সামাজিক গতিকে নিয়ে, আজ যদি তার প্রবাহ হ্রাস হয়ে আসে, তা হোলে মজা নদীর মত হবে তার দুরবস্থা, অবগাহন করাও সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। আজ যেন মনে হচ্ছে তার প্রবাহ ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসছে, তাই আমরা আশঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছি। এখন বিত্তকৌলিন্য চিত্তকৌলিন্যকে নির্ব্বাসিত করেছে, পূর্ব্বে বিত্তকৌলিন্য কোনদিন বড় হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। অতীত দিনের বাঙালী তার অর্থ সম্পদ ও প্রাণ প্রাচুর্য্য সর্ব্বস্তরের মধ্যে বিকীর্ণ করে পরার্থপরবোধ নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্রত নিয়ম, পাল পার্ব্বণ প্রভৃতি পালন করেছে জাতির বৃহত্তম পরিবারের অন্যতম কর্ম্মী হিসাবে; স্বল্প ও স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থেকে মানসিকতার অপমৃত্যু এনে আজকের দিনের মত তারা সামাজিক ভয়াবহতা আনেনি। গভীর একাত্মানুভূতি, মমত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রীতিমধুর প্রবল আকর্ষণ, সৌহার্দ্দ্যের দানে ও গ্রহণে সামাজিক সম্মিলন সেদিনের বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পরম প্রকাশের পথে সহায়তা করে এসেছে এই সব উৎসব মণ্ডপে।

বাঙালীর সর্ব্বোত্তম জাতীয় পার্ব্বণ-উৎসব সমারোহ শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় ঘরে ঘরে যে প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে তা আজও আনন্দ-সুন্দর স্মৃতির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। বাঙালী কোনদিনই দুর্গাকে শুধু জগন্মাতা বলেই তার গৃহমণ্ডপে অর্চ্চনা করেনি, সে এই মহাশক্তিকে তার মাতা, তার দুহিতা, তার দুঃখ সুখের একমাত্র অবলম্বনরূপে অন্তরে স্থান দিয়েছে, তাই দুর্গা পিতৃগৃহে বৎসরে মাত্র তিনদিনের জন্যে এসে তাঁর স্বামী ভোলা মহেশের গৃহে ফিরে যান। পুরাণের পরিকল্পনার সঙ্গে বাঙ্গালী তার ভাবময় কল্পনাকে সংমিশ্রিত করে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাশক্তিকে দেশমাতৃকারূপেই দেখেছেন, আর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গেয়ে আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করেছেন। এই

রয়েছে। প্রকাশ করার ভঙ্গিমা সবার হয়তো সমান থাকে না। ওকে প্রকাশ করতে চান? বেশ, আপন অভীষ্ট কর্ম্মচিন্তায় একাগ্র হউন। মনে প্রাণে সে কর্ম্মের সাধনা করুন। উদ্দেশ্য সাধনের রূপটিকে ধ্যান করুন, দেখবেন সব কিছুই বাস্তবের নিশানা উড়িয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের দাবী জানাবে।

কেন অকারণ সময় নষ্ট করেন বলুন তো—কেন অপরের কথায়, অপ্রিয় আলোচনায় মশ্‌গুল থাকেন? আপনার কাছে কি আপনার কোন কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই? অনেক—অ-নে-ক আছে, ঠিক্ ঠিক্ প্রশ্ন করুন—অন্তর দেবতার কাছ থেকে সত্যই সঠিক জবাব পাবেন।

আচ্ছা বলুন তো আপনার শরীর মনের জ্বালা যত আপনার কোন বন্ধু বা কোন আপনজন প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পাবেন?—পারেন না।

ওতো আপনার স্বতন্ত্র অধিকারের বস্তু।—উপায়?—এও আপনাতেই

. বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

সংগ্রহ করা আছে। হিসাব করে প্রকাশ করুন। বেহিসাবী হবেন না। তবেই আসল মুসকিলে আশান পাবেন। আপনি যদি এই নশ্বর দেহ মনকে ঈশ্বরেরই অংশরূপে মনোময় করতে পারেন,—দেখবেন মনের কাছে যা চাইবেন ঠিকই পাবেন। কিন্তু বেচাল করেছেন কি—দেহমন-ঘরের চালাটি যাবে বিষাক্ত ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে। বেচাল করবেন না।

আমাদের এই শরীর ভাণ্ডারে কতপ্রকার শক্তিবীজই না রক্ষিত রয়েছে। যার যেটা খুসী তুলে নিয়ে গিয়ে মন জমিতে বপন করার পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে একবার বলুন Oh Lord give me your sun shine into my heart field. (হে ভগবান আমার মনো জমিতে তুমি তোমার সূর্য্য কিরণ প্রদান কর। উপযুক্ত ফল পাবেন। দেখুন না একটিবার চোখ খুলে—সবাই কি আর ব্যায়ামে—সঙ্গীতে এবং শিল্প বিজ্ঞানে সিদ্ধ হতে পারেন—না পেরেছেন?—পারেন না,—কেননা সে শ্রেণীর মানুষের সাধনায় একাগ্রতা এবং নিষ্ঠাচারের অভাব থ বলেই সিদ্ধিলাভের পথে বাধা দেখা দেয়।

আমি আমাদের ব্যায়াম সাধকদের কথাই বলবো। অভ্যাস যা —মনপ্রাণ চর্চায় উজাড় করে দিন। ব্যায়ামের উৎকৃষ্টতম গুণ আপনার জন্য আলাদা করে তোলা রয়েছে।

নেবেন যদি—দিন আগে।

কেননা শারীরিক ব্যায়াম বিজ্ঞানে যদি অসংখ্য প্রাণময় কোষে সৃষ্টি হয় এবং সেই কোষ সমষ্টিকেই আমরা যদি প্রাণ শক্তি—ভ ভগবৎ শক্তির উৎস বলে মেনে নেই—তাহলে আমাদের কর্ম্মে এবং ধ নিষ্ঠা এবং সদাচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। একথা অস্বীকার ক যায় না।

কার্যে এবং ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও সদাচার থাকলে কোন আসুরিক শক্তি দেহ মনকে আক্রমণ করতে পারবে না।

মিস্ বেঙ্গল: বাদল রায়
(মনতোষ রায়ের ছাত্রী)

সেখানে দেবতাত্মার প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব এখানে এই যুক্তিই প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক ব্যায়াম-বিদ্যার মাধ্যমে দেহ মনের যে ক্ষমতার (Power) সৃষ্টি হয়েছে—সেটাই ভগবৎ শক্তি। যেহেতু সেখানে কোন Hoztile forceএর আকর্ষণ নেই এবং সেই অবস্থাতেই মানুষ তার দেহস্থিত অদৃশ্য শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে—তার সেই সাধনালব্ধ শক্তির মাধ্যমে।

আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার অধ্যয়গুলির সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অনুষ্ঠান করে যান—ভগবৎ শক্তির করুণা বিন্দু আপনার শিরে বর্ষিত হবেই হবে।

বাংলার পূজাপার্ব্বণের কথা

উপানন্দ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমাদের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের পথে এই সব পূজাপার্ব্বণ সমারোহের ঐতিহ্য রয়েছে। আজ বাঙালীর উৎসবময় জীবনের এসেছে বিষণ্ণতা, সেকালের মত প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত পরিবারে বেজে ওঠে না আনন্দমুখর মঙ্গল শঙ্খ—বেজে ওঠে না উৎসবের বাঁশী বা ঢাক ঢোল। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে গৃহে আবাল বৃদ্ধ নরনারী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। বাঙ্গালীর ভাব জীবনেও এসেছে গতিমন্থরতা, এর কারণ বাঙালী শুধু যে তার ধর্ম্ম, আদর্শ ও সামাজিকতাকে হারাতে বসেছে তা নয়, তার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও তার ভেতর এনেছে অকালবিভ্রান্তি। এর ওপর আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত যা দেশের মৃত্তিকাকে দগ্ধ করে তুলেছে, ফলে প্রাণের ফসল ফল্‌বার পক্ষে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ছে না। সেকালে বাঙালী ধর্ম্মাদর্শকেই প্রাণের আদর্শ বলেই গ্রহণ করেছিল, এখন সে আদর্শ তার অন্তর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে, এজন্যই আজকের দিনের পূজা পার্ব্বণে রয়ে গেছে অন্তরের অভাব—পারিবারিক পূজাপার্ব্বণ উৎসবের পরিবর্ত্তে দেখা দিয়েছে, সার্ব্বজনীন বারোয়ারী পূজাপার্ব্বণের নি[illegible] ঐকান্তিক মত্ততা। এই মত্ততায় বহু অর্থ অপচয় হয়, আর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির উদর স্ফীত হয়ে ওঠে। পূজাপার্ব্বণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এই সব সামাজিক উৎসব একদা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথা বেদনার ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে, আমাদের চিত্তের ক্ষত দূর করেছে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও মালিন্য অপসারিত করে আশাআকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ আনন্দ-চেতনা দিয়েছে, আর স্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে দূর করে সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আজ যাকে আমরা সামাজিক প্রগতি বলে থাকি—সেটা প্রগতি নয়,—সেটা আমাদের জাতীয় সুষুপ্তির অবসাদ ; সেটা আমাদের দুর্গতি। সমাজ নদীর মতই প্রবহমান—সে এককূল ভেঙে চলেছে, অপর দিকে সে বেঁধে যাচ্ছে চড়া—অনাগত দিনের বসতির জন্যে। অতএব এর জন্যে বিশেষ ভাব্‌বার নেই, ভাব্‌বার কারণ ঘটেছে জাতির সামাজিক গতিকে নিয়ে, আজ যদি তার প্রবাহ হ্রাস হয়ে আসে, তা হোলে মজা নদীর মত হবে তার দুরবস্থা, পুনর্জীবন করাও সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। আজ যেন মনে হচ্ছে, তার প্রবাহ ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসছে, তাই আমরা আশঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছি। এখন বিত্তকৌলিন্য চিত্তকৌলিন্যকে নির্ব্বাসিত করেছে, পূর্ব্বে বিত্তকৌলিন্য কোনদিন বড় হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। অতীত দিনের বাঙালী তার অর্থ সম্পদ ও প্রাণ প্রাচুর্য্য সর্ব্বস্তরের মধ্যে বিকীর্ণ করে পরার্থপরবোধ নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্রত নিয়ম, পাল পার্ব্বণ প্রভৃতি পালন করেছে জাতির বৃহত্তম পরিবারের অন্যতম কর্ম্মী হিসাবে ; স্বস্ব ও স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থেকে মানসিকতার অপমৃত্যু এনে আজকের দিনের মত তারা সমাজিক ভয়াবহতা আনেনি। গভীর একাত্মানুভূতি, মমত্ব-বোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রীতিমধুর প্রবল আকর্ষণ, সৌহার্দ্দ্যের দানে ও গ্রহণে সামাজিক সম্মিলন সেদিনের বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পরম প্রকাশের পথে সহায়তা করে এসেছে এই সব উৎসব মণ্ডপে।

বাঙালীর সর্ব্বোত্তম জাতীয় পার্ব্বণ উৎসব সমারোহ শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় ঘরে ঘরে যে প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে তা আজও আনন্দ-সুন্দর স্মৃতির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। বাঙালী কোনদিনই দুর্গাকে শুধু জগন্মাতা বলেই তার গৃহমণ্ডপে অর্চ্চনা করেনি, সে এই মহাশক্তিকে তার মাতা, তার দুহিতা, তার দুঃখ সুখের একমাত্র অবলম্বনরূপে অন্তরে স্থান দিয়েছে, তাই দুর্গা পিতৃগৃহে বৎসরে মাত্র তিনদিনের জন্যে এসে তাঁর স্বামী ভোলা মহেশের গৃহে ফিরে যান। পুরাণের পরিকল্পনার সঙ্গে বাঙালী তার ভাবময় কল্পনাকে সংমিশ্রিত করে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাশক্তিকে দেশমাতৃকারূপেই দেখেছেন, আর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গেয়ে আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করেছেন। এই

সংগে ব্যবসা বাণিজ্য করবার জন্যে কিছু লোকজনও কলকাতায় এসে বসবাস করে। কিন্তু পর্তুগীজরা এখানে রইল না; চলে গেল।

জোব চারনক যখন সুতোনুটিতে এলেন তখন বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ। সায়েস্তা খাঁর সংগে জোব চারনকের কি এক গোলমাল বাঁধল। জোব চারনককে সুতোনুটি ছাড়তে হলো।

এর বছর চারেক পরে (১৬৯০) বাংলার নতুন নবাব ইব্রাহিম খাঁর জোব চারনককে সুতোনুটিতে আসবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। ইংরেজরা সুতোনুটিতে থাকলে নবাবেরই লাভ; কেননা ইংরেজরা তাহলে নবাবকে খাজনা দেবে। যাহোক ১৬৯০ সালের ২৪ এ আগষ্ট এক বিশ্রী গুমোট গরমের দিনে জোব চারনক আবার সুতোনুটির ঘাটে এসে হাজির হলেন। এই দিনটিকেই কলকাতার প্রতিষ্ঠার দিবস দিন বলে ধরা হয়। পরে চার বছরের মধ্যে অবশ্য আর একবার জোব চারনক এখান থেকে ঘুরে গিয়েছিলেন।

জাহাজ থেকে নেমে তিনি বিলিতি পতাকা উড়িয়ে দিলেন মাঠের মাঝে। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এলো। এই সব অদ্ভুত পোষাক পরা টুকটুকে ফর্সা লোকগুলোর কাণ্ড কারখানা দেখে তো অবাক!

জোব চারনক তাঁর পুরানো বাড়িগুলোর খোঁজ করলেন। কিন্তু এতদিনে সেগুলো ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে, আর তার ভেতরের জিনিষ-পত্তরও লুটপাট হয়ে গেছে। এদিকে মুষলধারে নামল বৃষ্টি। জোব চারনকের দল ছুট ছুট করে আশ্রয় নিল নিজেদের জাহাজেই।

যা হোক জোব চারনকই আজকের কলকাতা শহরের গোড়া পত্তন করেন। তিনি এদেশে থেকে একেবারে এদেশের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। এদেশের লোকের মত বসে বসে তামাক খেতেন; এদেশের মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারী।

কেমন করে কলকাতায় সহর প্রতিষ্ঠা হল, পড়লে তো? বড় হয়ে এর পরের ঘটনা পড়বে, সে ঘটনা এর চেয়ে মজার।

বাবরের মাতৃভক্তি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কনক কিরণ পড়েছে প্রথম প্রভাতের পটভূমে,
সভাসদগণ করে কুর্নিশ উষ্ণীষ ধূলি চুমে।
মসনদে বসি কহেন বাবর—"আমি ভারতেশ্বর,
হাজার হাজার মানুষের সেবা লভিয়া অনন্তর
দুঃখ আমার হেরিনাক কিছু। তোমরা পরমসাথী
নতুন ভারত গড়িবে হেথায়, বিজেতা মোগল জাতি।"
উল্লাসে তাঁর কণ্ঠমুখর স্তুতি গান করে সবে,
ওঠে গুঞ্জন—"কীর্ত্তি তোমার চির শাশ্বত র'বে।
ধন্য তোমার শৌর্য্যবীর্য্য, তুমি আজ সুমহান্,
সাধনায় তব করতলগত হোলো হিন্দুস্থান।"
কহেন বাবর—"খোদার দোয়ায় জিনিয়াছি এই দেশ,
আর কেহ নহে ধন্যভাজন, শুধু সেই পরমেশ,—
যাঁর করুণায় পেলাম আমার মহাপার্থিব ধন,
পথের ফকির পেয়েছে আজিকে সোনার সিংহাসন।
শৈশব আর কৈশোর মোর সজল অশ্রুমাখা,
পিতার রাজ্য কেড়ে নিল জ্ঞাতি, আঁধারে ডুবিল রাকা।
পিতারে হারায়ে জনমের মত শৈশবে বাহিরিয়া
ভ্রমিলাম বনে শৈলশিখরে জুড়াতে দগ্ধ হিয়া।
তৃষা মিটায়েছি নির্ঝরে এসে ক্ষুধার যাতনা সহি'
তরুশাখা হোতে ফল পেড়ে পেড়ে তাই খেয়ে সদা রহি।
মিতালী করেছে কাঠ বিড়ালীরা, কাছে এসে প্রজাপতি—
কত সান্ত্বনা দিয়েছে আমারে হেরি মহা দুর্গতি।
বিহগবিহগী কহিয়াছে কথা আমারি দুঃখ দেখে,
ধরার কোলেতে নিয়েছি শয্যা ধূলি অঙ্গেতে মেখে—"
কহিতে কহিতে উদাস নেত্রে চাহিয়া শূন্য পানে
হেরিলেন যেন হারানো অতীত দোল দিল তাঁর প্রাণে।
সভাসদগণ কহিল তখন—"সমভাবে সংসার
চলে কি কখনো! পরিবর্ত্তন চলিতেছে অনিবার
বিশ্ব ভুবনে—"দার্শনিকের সম কহে কথা সবে,
সকল ব্যথার এবে অবসান—" ধ্বনিল ঐক্য রবে।
ব্যথাতুর হয়ে কহেন বাবর—"সেই নির্জ্জন বনে
মোর কৈশোরে দেখেছিনু যারে, তাকে আজ পড়ে মনে।
পঙ্গু রুগ্না বৃদ্ধা বিরলে চলৎশক্তিহীন
ছিল পড়ে একা বন তরুতলে, তার মহা দুর্দ্দিন—
লক্ষ্য করিয়া মোর দুর্দ্দিনে সেবা করেছিনু তার
অঞ্জলি ভরে তারে দিয়েছিনু বারিপান করিবার
মিষ্ট ফলের রস ঢেলে তার কণ্ঠ সরস করি......"
"—অসীম করুণা জাঁহাপনা তব মানবের রূপ ধরি
এসেছ দেবতা নবীদের মত—" কহে সভাসদগণ।
"—বৃদ্ধা সে নারী কয়ে গেছে মোরে—স্বর্ণ সিংহাসন
মহাভারতের পাবে তুমি, বীর! কেন কাঁদো নিরাশায়?—'
"—অদ্ভুত সেই বাণী জাঁহাপনা! দৈববাণীর প্রায়—"

সভাসদগণ হর্ষ বিভোল। কহেন বাবর ধীরে—
"আমি অসহায়, বালক তখন, দিন যায় আঁখিনীরে,
কেমনে ভারত সিংহাসনের অধিকারী হবো আমি?—"

কহেন বাবর—"নিরাশার তটে আলো দিল সেই বাণী,
সেই আলো দেখে পথ রচেছিনু পাষাণে কুঠার হানি ;
সুখের স্বপনে আপনি বিভোর হইনি অন্যমনা…"
"—আজ আর নহে মধুর স্বপন, সত্যি সে জাঁহাপনা!—"
দৃপ্তকণ্ঠে কহেন বাবর—"আশা বাণী বৃদ্ধার
মোরে উদ্ধার করেছে বন্ধু! তাই ভাবি অনিবার—"

"—ওরে নরাধম! বিজয় গর্ব্ব কর কেন বারে বারে!
সত্য কি জয়ী হোলে জাঁহাপনা! একথা শুনাও কারে?—"
বিস্মিত সভা! হেরিল সকলে প্রৌঢ়া একটি নারী,
অতি দীনহীন দেহমন লয়ে দিয়ে যেতে চায় পাড়ি
গাঢ় বেদনার বহ্নি শিখায়। কহেন বাবর হেসে—
"কে জননী তুমি!—" ক্রুদ্ধা রমণী কহিল অট্টহেসে
"—শোন গো বাবর! বিজিত দস্যু! শত জননীর বুকে
হানিয়া অশনি, নররক্তেতে রঞ্জিত করি মুখে,
সারা দুনিয়ার মালিক হবার স্পর্দ্ধা দেখাও আজি?
দুই হাত ভরি তুমি তো নিয়েছ! রণসজ্জায় সাজি
সর্ব্বনাশের জ্বালালে আগুন—এনেছ গর্ব্ব তব!
তোমারে মূর্খ নরাধম কহি, আঁধার করেছ নভ—"
রোষে সেনাপতি কোষ হোতে অসি তুলে তার দিকে ধায়,
শতকণ্ঠের ওঠে কটূক্তি, প্রতিশোধ সবে চায়।
সংযত করি সবারে বাবর সম্ভ্রমনত শিরে
কহিলেন "মাতা! কেন ক্ষোভ তব? কহ মোরে আজ ধীরে।
মূর্খতনয়ে কহিতে কি ক্ষতি শঙ্কা বিহীন হয়ে?—"
কহিল রমণী—"পুত্র আমার. মরণেরে সাথে লয়ে,
তোমার লোভের অগ্নি শিখায় করেছে আত্মদান ;
মাণিক আমার! পুত্র আমার! তুই তো হারালি প্রাণ!—"
আর্ত্তনাদেতে সবার নয়নে দেখা দিল আঁখি জল,
কহেন বাবর—"সন্তানে তব আনিতে নাহিক বল,
পুত্র তোমার হোতে পারি মাগো!—". পদতলে তার লুটি,
কহেন আবার—"ক্ষমা কর মোরে—" পঙ্কে পদ্ম ফুটি
পূজার অর্ঘ্য হোলো যেন সেথা অভাগিনী রমণীর।
নয়ন মুছিয়া কহিল সে নারী—"বাবর! বিজয়ী বীর,
আমি অভাগিনী। তোমার যোগ্য জননী হবার মত
কি আছে আমার?—" কহেন বাবর—"সন্তান অবিরত
মায়ের স্নেহেরে প্রার্থনা করে, নহে ধন দৌলত ;
এই সংসারে তুমি মা আমার জীবনের জন্নৎ।
মা-হারা ছেলে সে পেয়েছে মায়েরে প্রথম ভারতে এসে,
তোমার চরণে সঁপিনু আমারে—কোলে দাও ভালোবেসে—"
কহিল রমণী—"কত দুখিনীর কলিজার ছেঁড়া ধন
গিয়েছে সমরে ফেরে নাই আর! তাহাদের ক্রন্দন
তুমি কি শুনেছ বিদেশী তনয়! প্রাণের বাবর মোর?—"
"—আশিস্ কর মা সকল দুখীর মুছাতে অশ্রুলোর—"
সভাসদ্‌গণ রহিল নীরব, স্তম্ভিত মগন.
সেথা এখন মধ্য গগনে ঠেলে চলে দিনরথ।
পুত্রহারা সে রমণীর ডাক বহু বরষের পরে
এলো একদিন। রোগশয্যায় ভারতেশ্বর করে
শুশ্রূষা তার, সযতনে মুখে দেয় তুলে জলরস।
"—শোনো জাঁহাপনা! যাতনা ব্যাধিতো হয়না ঔষধে বশ,
কেন দিন রাত অনশনে রহি সেবা কর
মোরে সদা?—"
কহিল রমণী। কহেন বাবর—"কয়োনাক সেই কথা,
দুর্ব্বল ক্ষীণ তুমি মা আমার। মায়ের বেদনা ব্যথা—
কেমনে অধম সন্তান যাবে অসহায় করে রেখে!
মাতৃ সেবা যে পরম ধর্ম্ম, তারি দিয়ে অধিকার
আমারে ধন্য করেছ জননী! দুঃখ নাহি তো আর!—"
চারিদিক হোতে অগণিত নত অনুচর পরিচর
বাবরের জয় ধ্বনিতে মুখর করিল অতঃপর।

চির বিদায়ের মহালগ্নেতে কহিল বৃদ্ধা থেমে
"—তোমার বাবার পূজায় আজিকে স্বর্গ এসেছে নেমে,
একদা তোমারে কয়েছিনু আমি,—তুমি নহ জয়ী বীর ;
যাবার সময় শোনো, বলে যাই, তারিতো উচ্চ শির
যেজন মানব অন্তর জয় করিয়া হোয়েছে জয়ী,
প্রতি প্রজাটীর জয় করে যদি সবার ভিতরে রহ,
তুমি দুর্জয়, বিজয়ী তনয়! আমার জীবন-ধন—
স্পন্দনহীন হেরি বৃদ্ধারে বাবরের ক্রন্দন
ধ্বনিল সহসা চরণে তাহার, শির অবনত করি ;
শিশুর মতন ভারতেশ্বর রহিল চরণ ধরি।

একটি ছোট্ট ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

বহুদিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

(রবীন্দ্রনাথ)

ঘরের পাশে হলেও এ. কিন্তু শিশির বিন্দুর কথা নয়—আকাশ-জোড়া শ্রাবণ-মেঘের মতো সুবিশাল ধ্বংসস্তূপের পুঞ্জীভূত বেদনা। বোরোবুদুর বিশ্বকবির অমর লেখনীতে ঠাঁই পেয়েছে—কিন্তু নালন্দার কাব্য এখনও লেখা হয়নি। ভারতের অতীত গৌরবের ধ্বংসস্তূপ নালন্দা ইতিহাসের এক হাসি কান্নার বিচিত্র অধ্যায়।

পূজোর ছুটিটা বক্তিয়ারপুরে কি আনন্দেই কাটলো তিনটি ভাইবোনের। শংকু, পার্থ ও রুচিরা যতো পারে আনন্দ করে নিলো। রোজ খোলা মাঠে মুক্ত আকাশের তলে বেড়ানো ছাড়াও কতো রকম খেলাধূলা। বাবা ওপরের ঘরটিতে নিরিবিলি বেশ নিজের 'বিশ্বভুবনটি' ও বইপত্রের দপ্তরে মগ্ন। মা দিদুর সঙ্গে নানা গল্পে বিভোর। একবার পেয়ারাগাছে একবার ডিস্পেনসারিতে দাদুর কাছে গিয়ে ওষুধ তৈরী দেখা আর গাছ লাগানো এই সব কাজে পার্থ মশগুল। আর শংকু তো গল্পের বই নিয়ে পেয়ারা গাছে বসে—রসদ থরে থরে হাতের কাছেই ঝুলছে। ছোট্ট রুচিরা দিদুর পেছনে ঘোরে—মাংস-লুচি, মালপো, জিবেগজা, পায়েস আর জেলী মোরব্বার তদারকে।

আনন্দের দিন অর্থাৎ ছুটি শেষ হয়ে এলো—পরীক্ষার পড়ার কতোটা ক্ষতি হচ্ছে সেই নিয়ে মার গজগজানি শুরু হলো। এ হেন সময়ে বাবা ওপর হ'তে পার্থর হাতে নোটিশ পাঠালেন যে কাল রাজগীর—নালন্দায় যাওয়া হবে ভোরে।

খুব ভোরে উঠে যা স্ফূর্তি ওদের—মা ওদের সাজিয়ে-গুজিয়ে নিজেও তৈরী হয়ে নিলেন। কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারীয়ার, আর ব্যাগে চললো স্নানের সরঞ্জাম—রাজগীরের গরম জলের কুণ্ডে স্নান হবে।

বক্তিয়ারপুর হ'তে ছোট লাইনের ছোট্ট রাজগীরের ট্রেণে উঠে ভাইবোন তিনটি উৎসাহে লাফাতে শুরু করলে, আর মুহূর্তের মধ্যে সব যাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললে। বেশীর ভাগই বাঙালী—দেশ-ভ্রমণের আনন্দ বাঙালীর বড়ো প্রিয়। গাড়ী এক এক সময়ে এতো দুলতে লাগলো যে মা তো ভয়েই সারা। তিন ঘণ্টায় ট্রেণ পৌঁছে গেলো রাজগীর ষ্টেশনে। বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে বুদ্ধ-চরণস্পর্শে পবিত্র

এই স্থানগুলি সরকারী উদ্যমে যেন রাতারাতি বদলে গেছে। জন্মচক্রের পার্থকে ডেকে বাবা বললেন—'খোকা! তোর বয়স হ'তে আমি এখানে আসছি—কি বদলে গেছে! চমৎকার ষ্টেশন ঘর হয়েছে, ইলেকট্রিক্, হোটেল, রিক্শা আর চাই কি!' মা ষ্টেশনে রুণুকে নিয়ে বসলেন। বাবা হালুইকরের কাছ হ'তে গরম পুচি তরকারী নিয়ে এলেন। তারপর কুণ্ডের পথে রওনা। এই সুন্দর প্রাচীন পথটি এখন পিচঢালা—কতো আধুনিক বাড়ী, বেশীর ভাগই বাঙালীর টুরিষ্ট অফিস—সুন্দর রেষ্ট-হাউস। এই পথেই ভগবান তথাগত একদিন এসেছিলেন রাজগৃহে। পাশেই অজাতশত্রুর তৈরী পাথরের মোটা প্রাচীর। কুণ্ডের প্রবেশ-পথে ভ্রমণবিলাসীদের সারি সারি মোটর। সাম্প্রতিক উন্নতির ছাপ সবখানে। চওড়া সিঁড়ী উঠে গেছে—পাশে পাশে চমৎকার লন—বসবার জায়গাও আছে—একটি বাঙালী মেয়ে বসে ছবি আঁকছে। রাজগীরের পাঁচটি পাহাড়ের ঢেউ আকাশে দেখা যাচ্ছে।

তিনটি ভাইবোনে গরমজলে যা স্নানটা করলে। স্নানের আগেই কুণ্ডের শিয়রের পাহাড়টিতে বাঁধানো সিঁড়ী বেয়ে ওরা উঠতে লাগলো। রোদে মা তো দেখতে দেখতে কাবু—বাবাও প্রায় তাই। কিন্তু স্বভা আর পার্থ হালকা পালকের মতো ভেসে ভেসে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পলকের মধ্যে কোথায় জঙ্গলে পাথরে ঢাকা পড়ে গেলো, ছোট্ট রুণুও।

পাহাড়-অভিযান আর স্নানের পরে খাওয়া দাওয়া হলো মন্দিরের চাতালে। সময় বেশী নেই—তক্ষুণি রিকশায় ষ্টেশনে এসে ট্রেণ ধরা। রাজগীর হ'তে সাত মাইল আগে নালন্দা। টমটমে মাইল দেড়েক গিয়েই ভারতের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এসে পড়লো—এখানেও সরকারী উদ্যমের প্রশংসনীয় ছাপ চোখে পড়ে। ভগ্নস্তূপের আবর্জনার স্তর অপসারণ—প্রাচীন কুঁয়াটির সংস্কার ও সেচ ব্যবস্থা—আর ঐ সুবিস্তীর্ণ জায়গাটি জুড়ে অতি সুন্দর পুষ্পোদ্যানের রচনা হয়েছে।

পশ্চিমদিকের একই শ্রেণীতে ছোটো বড়ো নানা আকারের ভগ্ন মন্দিরের, আর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের শ্রেণী উত্তরে চলে গেছে। এগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক বিরাট অপরূপ শিল্পৈশ্বর্যের স্বাক্ষর বৌদ্ধযুগের মধ্য যুগের—'যে শিল্প আজ 'নালন্দা' চারুকলা' নামে অভিহিত। বাংলার শিল্পী ধীমান্ ও বীতপালের স্মরণীয় দান আছে নালন্দা শিল্পে। শিল্পশাস্ত্র মেনে শান্তি ও সমাধির ভাব মূর্তিতে প্রকাশ করতে সফল হয়েছেন শিল্পী। পাল শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নালন্দার ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি।

চটি বিহার এই মন্দির ও সঙ্ঘরাম শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তকে সংযোজিত করেছে। মনে হয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তোরণ তার উত্তর দিকেই ছিলো। হিউয়েন সাঙের উল্লিখিত দীর্ঘিকার নিদর্শনও পাওয়া যায়। পরিব্রাজক ই-সিং বলেন, নালন্দার নিকটবর্তী দীর্ঘিকায় নন্দ নামে এক মহানাগ বাস করতো—'নাগ-নন্দ' হতেই ক্রমে হয়েছে নালন্দা। পালি

কাছে পার্শ্ববর্তী আম্রকাননে পাবরিক নামক বাসগৃহে অবস্থান করেন। তিব্বতে বলে, বণিক সম্প্রদায় দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে নালন্দা গ্রাম ক্রয় করে ভগবান তথাগতকে নিবেদন করেন। ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন, বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র ঐ স্থানেরই অধিবাসী এবং নালন্দাতেই নির্বাণলাভ করেন। এই বিরাট ধ্বংসস্তূপ খননকার্য প্রথম শুরু করেন জেনারেল কানিংহাম।

প্রাচীন নালন্দায় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার ভিক্ষু ছাত্র ও পণ্ডিত একত্র বাস কোরে বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য বিশেষ প্রভেদ আছে—কারণ প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মানুশাসনের প্রাধান্য ছিলো এবং ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষা হতো। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া দর্শন-শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাদিরও প্রভূত চর্চা ছিলো। বিদ্যালয়ের দ্বারপালদের কূট প্রশ্নসমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হতো অধ্যয়নের অনুমতির জন্য। এখনকার অ্যাডমিশন টেষ্ট বা ইন্টারভিউ আর কি। জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল আর বাঙ্গালী শীলভদ্রের নাম নালন্দার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

সে নালন্দা প্রায় সাতশ' বছর ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সারাভারত, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন সর্বত্র জয়পতাকা উড়িয়েছিলো, দ্বাদশ শতকের শেষে মুসলমানের ভারত আক্রমণের ফলে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী (বিহার) ও অন্যান্য বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র সমূলে বিনষ্ট হলো। পরিশেষে বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণে নালন্দার সঙ্ঘরাম ও মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মুসলমানের দেওয়া আগুনের চিহ্ন আজও নালন্দার ধ্বংসরূপে রয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিহত, আর ঐ বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র বছরের মানব ধ্যান ধারণা, সাধনা ও জ্ঞানানুশীলনের ফল অমূল্য গ্রন্থরাজি ও পুঁথির বিরাট সংগ্রহ বিনষ্ট হয়। এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই প্রকৃতির অভিশাপ ভূমিকম্প হয়ে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই মানব সাধনার এই বৃহত্তম উত্তুঙ্গ প্রাচীন সৌধ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়—পম্পেয়াইয়ের সভ্যতা আর মহেঞ্জোদরো-সভ্যতার মতো। কোথায় গেলো চিরতরে নিভে ঐ সুবিশাল বিদ্যামন্দিরের জ্ঞান ধর্ম, ত্যাগ ও ক্ষমার প্রদীপ।

*   *   ফেরার পথে নানা ভাবনা জাগে

জীবন রহস্য যায়

মরণ রহস্য মাঝে নামি,

মুখর দিনের আলো

নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

লাখ সাল

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আচ্ছা তুমি ভাবতে পারো, লক্ষ বছর পরে
বাংলা ব'লে দেশ কি রবে? ভারতবর্ষ ভ'রে
হয়তো সেদিন গভীর বনের অসংখ্য গাছপালা!
নতুন যাত্রী আস্‌বে, হবে নতুন বাতি জ্বালা।
মাটি খুঁড়ে হাতা-বেড়ি চাম্‌চে কাঁটা পাবে,
শিলিং ফ্যানের হাওয়ার কথায় হেসেই ম'রে যাবে!
এরোপ্লেনের গড়ন দেখে ভাব্‌বে মনে মনে,
কত আস্তে চ'লে তারা যেত কতক্ষণে।

মঙ্গলেরি বাসিন্দারা শুক্রগ্রহ ঘুরে
পৃথিবীটা হ'য়ে যাবে ধূমকেতুতে উড়ে।
নয়া পয়সা যতই আছে, সবই যাবে গ'লে:
খননকার্য সাঙ্গ হ'লে যাদুঘরের কোলে
দাঁড়িয়ে তারা বল্‌বে—"দেখো লক্ষ বছর আগে
মুদ্রা মোটে চল্‌তনা, তা ভাব্‌তে কেমন লাগে!
হয়তো তারা কিন্‌ত হাঁড়ি মোটরগাড়ী দিয়ে।
দুধের জন্যে দিত ছেলের গয়লাবাড়ী বিয়ে।

নোট ব'লে কি বস্তু ছিল, ছাপার পাতায় লেখা।
কোথায় সে নোট? কোনোখানেই মিল্‌ছেনা তার দেখা?
ধান খেত সব, গম খেত সব, অক্সিজেনের বড়ি
খায়নি তারা; পায়নি তারা বিশুদ্ধ চচ্চড়ি
নাইট্রোজেনের পোস্ত দিয়ে। আকাশ-পথের জমি
কিন্‌তে তারা পায়নি, কারণ নয়তো পরিশ্রমী!

টাক বলে এক কথা ছিল, টাকাও আছে ছাপা।
ঢাক ব'লে কি জিনিষ ছিল—ভেতরটা যার ফাঁপা।

ভাবতে শুধু অবাক্ লাগে ছোট্ট ছেলের মাথা
খেত তারা আবোল-তাবোল ভাবনা দিয়ে যাতা!
ভেবে ভেবেই পূজোর দিনে আমার মাথা ধরে—
এম্‌নি কথা বল্‌বে তারা লক্ষ বছর পরে!

ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেইন

বেলা দে

ভারতবর্ষের দুঃখে সহানুভূতি করবার জন্য ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য বিদেশে যে সব বন্ধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে মিষ্টার কেইন ছিলেন অন্যতম ও প্রধান। তিনি বহুবার ভারতবর্ষে এসে নানা জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম, আত্মবিস্মৃত বন্ধু ভারতবর্ষ অল্পই পেয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভারতের সেবা করে গেছেন। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় সেইদিনই পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে তাঁর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার কথা ছিল। তিনি বহুদিন ধরে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লিভারপুল সহরের সিকুম্ব নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে উইলিয়ম স্পোর্টন কেইনের জন্ম হয়। তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত ধার্মিক লোক ছিলেন। কেইনের পিতা লৌহ ও টিন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পুত্রকে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়ে এই ব্যবসায় কাজেই নিযুক্ত করেন। সামান্য শিক্ষালাভ করেও কেইন নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থলোভী বণিক ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানোই তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল স্বদেশের সেবা ও মানবের কল্যাণ করা। কেইন উদারনৈতিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু যখন যা সত্য ও ন্যায় মনে করেছেন, কোনো দলের মুখাপেক্ষী না হয়ে নির্ভয়ে সে কাজ করেছেন।

"কর্তব্য বুঝিব যাহা অবশ্য করিব তাহা
যায় প্রাণ থাকে প্রাণ।"

এই মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন। আসল কথা তাঁর অন্তরে গভীর ধর্মভাব ছিল। ধর্ম তাঁর জীবনকে সরস ও মধুময় করে রেখেছিল। কেইন যা কিছু করতেন, তার সকলেরই মূলে ধর্ম। কি ভারতে সুবিচারের জন্য আন্দোলন, কি সুরাপান নিবারণের চেষ্টা, সমস্ত কাজই তিনি ঈশ্বরের কাজ মনে করে করতেন। তিনি নিজে ধার্মিক ছিলেন এবং তাই তাঁর দৃষ্টান্তে পরিবারের সকলেই ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। নিজের টাকায় তিনি লণ্ডনের দরিদ্র লোকের কল্যাণের জন্য একটী ধর্মমন্দির নির্মাণ করে সেখানে নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করতেন।

ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবাসী এই পরমহিতৈষী বন্ধু কেইনকে চিরদিনই সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করবে। তোমরা বড় হয়ে তাঁর কথা আরো অনেক জানতে পারবে।

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়॥"

মূর্ত্তি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রতিমা-পূজা কার পূজা? মৃণ্ময় মূর্ত্তির পূজা—না মূর্ত্তিকে সম্মুখে রেখে ইষ্টদেবতার উপাসনা? অতি অজ্ঞ ব্যক্তিও জানে মাটির ঠাকুর ভাবের জনক। ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার উপায়। সবাই জানে

> ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে
> দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্।

সত্য কথা দেবতা কাষ্ঠে, পাষাণে বা মৃত্তিকায় গড়া মূর্ত্তিতে বাস করেন না। তিনি বিরাজ করেন ভাবে। সুতরাং ভাবই কারণ। মনের সিংহাসনে ভাবরাজ্যের অধীশ্বর ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে দেবের দেবত্ব বিকাশ পায়না। দেবত্বের চেতনা শুদ্ধ করে প্রাণকে, নির্ম্মল করে ভাবকে।

সারা বিশ্বে প্রতি অনু-পরমাণুতে তাঁর ব্যাপ্তি। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের তুচ্ছ অনুভূতি বিরাটের সঙ্কেত। তাদের মোহ ভেদ করলে বিশাল হয় উপলব্ধি। অন্তর দেবতার সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনার আভাস পায় জীব—তখন মুছে যায় ভেদ-জ্ঞান। তবে কেন সে অন্তরের অসীম রূপকে কাঠের মূর্ত্তিতে বা মৃত্তিকার প্রতিমায় প্রকাশ করতে প্রচেষ্ট? তাতে কি মানুষ অসার তুচ্ছ ক্ষুদ্রত্বকেই আবেষ্টন করে না?

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু আমার মাঝে আছেন মহতোমহীয়ান। এই ক্ষুদ্রত্বের ধীর বিস্তারে আয়ত্ত করতে হয় বৃহৎকে [illegible]ত্যকর্মে। বিরাট ভূমাকে যোগী, ঋষি, মহাপুরুষ, মহামানব উপলব্ধি করেন ক্রমিক সাধনার নিষ্ঠায়। সে সাধনার এক বিধান, মূর্ত্তিকে সম্মুখে রেখে ভাবের উদ্ভাবন।

অরূপ অনন্তকে ভাবের রাজত্বে প্রতিষ্ঠা করবার উপায় বুঝিয়েছেন অবতার, মহাপুরুষ, মুনি, ঋষি। কিন্তু সাধনার সকল বিধান পালন করা সবার পক্ষে কী সম্ভবপর? মায়াময়ী প্রকৃতি রাণীর লীলা-ভূমি সংসার, এ বুদ্ধি আছে সবার। বিশ্ববিদ্যা অবিদ্যার আবরণে ঢাকা। সে আবরণ উন্মোচনে তৎপর জীব মাত্রেই। সে উন্মোচনের মাত্রাও বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে দর্শন পেতেন মুহূর্ত্তে। কিন্তু অচিন্ত মূর্ত্তির বেদীমূলের বহু যোজনের মধ্যে পৌঁছবার শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়নি আমাদের। ভাবতে পারিনি যে কী ব্যাপার, কী রহস্য। ঋষিরাই রূপ কল্পনা করেছেন অরূপের। অজ্ঞের মনস্থির করবার জন্য শাস্ত্রই নির্দ্দেশ দিয়েছে সাধককে প্রতিমা-পূজার। সে পূজা উন্নতির হয়তো এক নিম্ন সোপান। কিন্তু সে প্রথা অনর্থক নয়—ভাবকে প্রবুদ্ধ করতে পারলে। তাই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আয়োজন। উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মনকে বহু বিক্ষেপের চঞ্চল-ভূমি হ'তে তুলে এনে ভক্তির-রসে আপ্লুত-করা। একবার ভক্তি জাগলে, সে নিজের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভক্তকে অন্তরের দেব-মন্দিরে।

যে সব মহাপুরুষ পুতুল পূজাকে নিন্দা করেছেন, তাঁরাও ধর্ম্মগ্রন্থকে বলেছেন পবিত্র প্রতীক। সত্যই তো মোক্ষ-পথের নির্দ্দেশ থাকে সেথায়। কিন্তু সবাই তো গ্রন্থে বর্ণিত সত্য বা বিধান স্পষ্টরূপে বিদিত নয়। তাই প্রতীক হিসাবে সাধক তাদের সম্মান করে, মনে মনে শ্রদ্ধা করে, গির্জা ও মসজিদে পবিত্র বেদীতে সংরক্ষণ করে। তারাও সাধারণের পক্ষে প্রতীক, মূর্ত্তি ঐশ-বাণীর। ক্রশ, ত্রিশূল, ওঙ্কার চিহ্ন শুদ্ধ সঙ্কেত পবিত্রতার। মাতা মেরীর মূর্ত্তি কোটী উপাসকের প্রাণে কল্যাণকর। ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি আশা জাগায় নিরাশ চিত্তে। তাই শান্তিকামী ভক্ত বৌদ্ধ মন্দিরে ধূপ জ্বালায়, পুষ্প অর্ঘ দেয়।

পূর্ণ জ্ঞানী ঋষি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নিকট ত্রিদোষের জন্য। কারণ পূর্ণ জ্ঞান উদ্বোধনের পূর্বে তাঁকেও করতে হয়েছে রূপ-কল্পনা, গাহিতে হয়েছে স্তুতি, করতে হয়েছে তীর্থযাত্রা। বলেছেন—

> রূপম্ রূপবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতম্ যন্ময়া।

ব্যাপিত্যাচ্চ নিরাকৃতম ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্য জগদীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ম্ মৎকৃতম ।

যিনি রূপ-বর্জ্জিত তাঁর রূপ-কল্পনা ক'রে ধ্যান করেছি। যিনি অনির্ব্বচনীয় অখিল গুরু, তাঁর স্তুতি ক'রেও দোষ করেছি। আপনি সর্ব্বব্যাপী, সে সত্য নিরাকরণ করেছি তীর্থযাত্রা করে। হে জগদীশ আমার দ্বারা এই যে তিনটি দোষ হয়েছে বিকলতায়, সেগুলি ক্ষমার যোগ্য।

সুতরাং ঋষিপরিকল্পিত রূপকে যদি শিল্পী কাষ্ঠে, মৃত্তিকায় বা প্রস্তর ফলকে প্রতিফলিত করে, আর নিজের অন্তরে ভক্তির স্রোত বহাবার জন্য অসীমকে সসীমভাবে কেহ উপাসনা করে, ভগবানের সে ক্ষমার পাত্র। মাত্র ক্ষমা কেন? তাঁর আশীর্ব্বাদে সে উর্দ্ধপথের সঙ্কেত পায়।

জ্ঞান ফোটে ধীরে ধীরে। বিশ্ব মায়ার আবরণে আবৃত। নাদ ধ্বনি অনাদি অনন্তের দ্যোতক। নাদ শব্দ। কিন্তু শব্দই সীমা সৃষ্টি করে, অসীমকে ঢেকে রাখে, জগতকে বিভক্ত করে। ঋষিকল্পনা কালী-মূর্ত্তি। তাঁর দেহে শোভে অক্ষর-মালা নর-মুণ্ড রূপে। অক্ষরে অক্ষরে মিলেই তো সীমাবদ্ধ করে ভাবকে। ম-কার অক্ষর দুবার উচ্চারণ করলে হয়—মম। এই মমত্ব বিশেষত্ব দান করে জীব, পদার্থ, ভাব এবং অধিকারকে —জগতের অপর জীব, পদার্থ, ভাব এবং অধিকার হ'তে। যে চরম স্রষ্টা সে বোঝে যে এ বিভাগ জীবকে অহমিকা দান করেছে। মানুষের ভাষা তাকে সহায়তা করেছে এ বণ্টনের ফলে ভেদ-জ্ঞান।

কিন্তু ভেদ-জ্ঞান জীবের সংস্কার। তার অন্ত হলে আমিত্বের উচ্ছেদ। মানুষের বিস্তারের পক্ষে এ আমিত্ব প্রয়োজন। আমার দেশ, আমার বিশ্ব, এ-সব কথার মাঝে আছে আত্ম-প্রসার। এইভাবে মানুষ পারে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের উচ্ছেদ করতে।

দ্রষ্টা কবি বলেছিলেন—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ
ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশ ভুবনত্রয়ম ।

কিন্তু এঁরাও তো কল্পিত ভেদ-মূর্ত্তি পার্ব্বতী মহেশ্বর ত্রিভুবন।

যতই আস্ফালন করি, অন্তরে বুঝি আমরা ক্ষুদ্র— বিরাটের সৃষ্টি মাঝে। অথচ অনুভব করি আমাদের সীমাবদ্ধ সংসার অসীমের ছায়া। তাই বিজ্ঞ বোঝবার চেষ্টা করে অসীমকে সসীমভাবের ভাষা ও রূপে—দৃষ্টির পরিধি ও বিভিন্ন দর্শক ভেদে। যার ভাব উন্নত, জ্ঞান উজ্জ্বল, তার দৃষ্টি হয় প্রসারিত। কিন্তু সকলেই সীমার বাঁধনে আবদ্ধ যতদিন না পূর্ণ জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় মনে। তিনি অরূপ্ রূপের মাঝে। কিন্তু রূপের গণ্ডীভেদ ক'রে অরূপে পৌঁছান সাধনার শেষ ফল। মনের বিক্ষেপ নিরাকরণ হয় আয়াসে, অভ্যাসে।

শব্দ যেমন সীমার বেড়াজাল নির্ম্মাণ করে, তেমনি শব্দেই আমরা শুনি ঋষিবাক্য। চক্ষের দৃষ্টি কতটুকু পৌঁছতে পারে, অন্তর দৃষ্টি না ফুটলে। আমাদের জগতের পরিচয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তাই আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ সসীম জ্ঞানের বিকাশেই পাই আভাস অনন্তের। আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষণের জন্য ঋষিরা রূপ-কল্পনা করেন। যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথা জ্ঞানীকে বোঝাবার উপায়, তেমনি অজ্ঞানীকে রূপের মাধ্যমে অনন্তশক্তির প্রকৃতি বোঝাবার প্রয়াস করেছেন সকল দেশের বিজ্ঞ।

আমাদের শারদীয় মহোৎসব দুর্গাপূজা। সকল দেব-শক্তি একত্র ক'রে রূপ কল্পনা হয়েছে মায়ের। আমাদের মনের মহিষাসুর দেবশক্তি পরাহত ক'রে যখন মানুষকে অসুরে পরিণত ক'রে, আমাদের কর্ত্তব্য মনের সমস্ত দেবভাবকে সম্মিলিত করে মহিষ-দানবের মুণ্ডপাত করা। তা হ'লে আবার মানব প্রাণের দেবভাব মুক্তি পায়। এই শিক্ষা দেবার জন্য ঋষি পরিকল্পনা করছেন মাতৃরূপ। শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'লে সে হয় বিশ্বব্যাপী। তাই মূর্ত্তির দশ হাত পরিকল্পনা ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সাধককে যে দশদিকে প্রবাহিত হ'তে পারে বিশ্ব-শক্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রত্যেক বর্ণনা সত্য প্রকাশ করেছে রূপকে, অজ্ঞকে অবহিত করার জন্য। একবার প্রাণে ভক্তির স্রোত বহিলে সকল অজ্ঞতা ও জড়তা ভেসে যায়।

কিন্তু সে বোঝবার জীবও আমি। আমিত্ব-ক্ষয়ে মুক্তি। কিন্তু আমিত্বের বোধ না হ'লে জ্ঞানও তো ফোটে না। জীবজগত চলে সংস্কারে। একটি মেষ যে পথে যায় সবাই চলে সেই পথে। মানুষ জগতের স্বামীত্ব লাভ করেছে এই আমিত্বের বিশেষত্বে। আমিত্বেরই গৌরবে সে নব নব ভাবে আপনাকে নিয়োজিত করে

কার্যে। যার ফলে আজ তার প্রধানেরা প্রকৃতির ধন-ভাণ্ডার হ'তে অনেক রহস্য-সম্পদে সম্পন্ন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসালে মানুষ আজ ইতর জীবেরই একটা শ্রেণী রূপে জগতে অবস্থান করত।

জগতের এটিও এক প্রধান রহস্য—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। অহমিকা-শুদ্ধ হ'য়ে, বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে উচ্ছেদ করে আপনাকে। ধীরে ধীরে তার গণ্ডী প্রসারলাভ করে। তাই কবি বলেছেন—

উদার চরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকম।

অহমিকার বিকাশে সদ্‌গুণের উদ্ভব। এ বিষয় কবি রবীন্দ্রনাথের বড় হৃদয়গ্রাহী এক তত্ত্ব কথা কানে বাজে। তিনি বলেছেন—

"নদীর জল যখন নদীতে থাকে সে সকলের জল। যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি সে আমার জল। তখন সে আমার ঘড়ার বিশেষত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'য়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাওগে তাকে জল দান করা হ'ল না—যদিও সে প্রচুর বটে, নদীও হয়তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডুষ দিলেই সেটা জলদান করা হোলো। বনের ফুলতো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার ক'রে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেঁসে বলেন—হঁ্যা তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হ'য়ে যায়। অহং আমাদের সেই ঘট সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 'আমার' বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি জন্মালে, দানের অধিকার জন্মায়।"

এ সুন্দর উক্তিতে এক অবিসম্বাদী সত্যের সঙ্কেত দিয়েছেন কবি।

চিরদিন মানুষ বোঝে তার নিবিড় আত্মীয়তা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে। কিন্তু উপলব্ধি আসে ধীরে ধীরে ক্রম বিস্তৃতির ফলে। প্রকৃতির লীলা মানুষকে গভীর মাঝে ছোটায়, আবার জ্ঞান উদ্বুদ্ধ ক'রে বাঁধন খোলে। বৈষ্ণবী মায়া নানা বর্ণে নানা ছন্দে নানা রূপে নানা গন্ধে জীবের মন হরণ করে। তাই বিক্ষেপ মনের একাগ্রতা নষ্ট করে। এতে হতাশ হবার কারণ নাই। দেখি কতকটা বৃত্তি নিরোধ করলে মনের একাগ্রতা বাড়ে। সে সম্ভাবনাও মায়ার খেলা।

বিশ্ব-জ্ঞান নিবিড় ও স্পষ্ট হয় ব্রহ্ম-সম্ভাবে। সে ভাব আসে ধ্যানে। ধ্যানের সহায়ক জপ। জপে হয় সারা চিত্তের অভিনিবেশ। কিন্তু মন্ত্র শক্তির উদ্বোধন সম্ভবপর নয় স্তুতি বিনা। স্তুতি পূজার উপচার। পূজা তো সম্ভব নয় রূপ কল্পনা বিনা। বিক্ষিপ্ত মন রূপ কল্পনা করতে পারে পটে বা প্রতিমায় রূপ দেখে। শেষ লয়ের এগুলি সব সোপান। একবার ওঠ্‌বার আকাঙ্ক্ষা জলে উঠলে সোপানে উঠে মানুষ ভাবে—দেখি উপরে কী আছে। এমনি করেই সে ওঠে। পরে মন্ত্র জপ করতে তার স্তুতির আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় মূর্ত্তির পরিকল্পনায় মন স্থির ক'রে রূপের মাধ্যমে অরূপের চিন্তা—নিরর্থক নয় সত্য।

পূজাকোটি সমম্ স্তোত্রম, স্তোত্রকোটি সমঃ জপঃ
জপকোটি সমম্ ধ্যানম ধ্যান কোটি সমোলয়ঃ।

তাই একে বারে পৃথিবীর কাজে মজে থাকা অপেক্ষা মূর্ত্তি পূজা মঙ্গলময়।

অন্যত্র শুনি—

উত্তমা সহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যানধারণা
তৃতীয়া প্রতিমাপূজা হোমযাত্রা চতুর্থিকা।

এ ক্রমোন্নতির উপায় হোম যাত্রায় মাত্র মগ্ন হ'লে হবে না। যাত্রার মাঝে আছে ভ্রমণের আনন্দ। কিন্তু অন্যত্র ভ্রমণ অপেক্ষা তীর্থভ্রমণে যায় মানুষের প্রবৃত্তি। শ্রীজগন্নাথ দেব তাকেই টানেন যার বিশ্বাস আছে জগন্নাথের ত্রিভুবন স্বামিত্ব সম্বন্ধে। তীর্থযাত্রী দেখে সাগরের ঊর্ম্মি, সিন্ধু-কূলের শোভা। মাত্র অর্দ্ধনগ্ন দেহে কত নরনারী বিভিন্ন দেশে সাগর কূলে রোদ পোহায়। পুরীতে তীর্থ-যাত্রীদের বেলা উপভোগের বিভিন্নতা স্পষ্ট।

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞান এবং সেই বোধে জীবসেবা আমাদের শাস্ত্র বহু স্থলে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন, যে করে পরসেবা সে তাঁর প্রিয়। সে জন-সেবার প্রসঙ্গ আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনি। তীর্থযাত্রায়, একই মন্দিরে বহুজনের সাথে পূজা ও দর্শনে

লোকের স্বার্থপরতা ক্ষুণ্ণ হয়, বিশ্ব-আত্মীয়তার পরিচয় প্রসার পায়। যারা মূর্ত্তিপূজা করে না তারাও একই গীর্জ্জায় বা মন্দিরে সমবেত হ'য়ে প্রার্থনা করে ভগবানের বেদীতে আপন আপন ধর্ম্মগুরু প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। মুসলমান সমাজের একতা ও ভ্রাতৃ-ভাবের এ একটা প্রধান কারণ। আমাদের শ্রীমন্দিরেও ধনী নির্ধনের সমান অধিকার। কিন্তু সেথায়ও দুর্ম্মতি স্বার্থান্ধদের দৌরাত্ম্যে বাধা পায় তথা-কথিত হীনজাতি। এ পাপের পরিণাম স্পর্শে সমস্ত হিন্দুজাতিকে।

প্রতিমা-পূজার সার্থকতা তাই স্পষ্ট। যার চিত্ত উন্নত, ধ্যানে যে ভগবদ্দর্শন করে, তারও পূর্ব্বস্মৃতিতে দেব-মূর্ত্তি প্রসন্নতার বিধান করে। প্রতীক সম্মুখে থাকলে একাগ্রতার সুবিধা হয়। রূপ-চিত্রের বিভিন্ন অংশে সন্নিবিষ্ট মনে ধীরে ধীরে জাগে উপাধি। বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্ত স্মরণ করিয়ে দেয় সকল ছন্দ, সকল বিদ্যা-ভগবতী-ভারতী —ক্ষুদ্রত্ব দূর হয়, অহঙ্কার খর্ব্ব হয়, জ্ঞানের বিশালতার দীপ্তি ও ঝঙ্কার আপ্লুত করে চিত্ত। তখন আপনি শির নত হয় প্রণামের ভঙ্গীতে। অন্তর হ'তে সুর ওঠে—দেবি নমস্তে। অবশ্য আবশ্যক মনোনিবেশ—কলাবিদ্যার উপরে তোলা চেতনাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে জীবনের বহুকাল অতিবাহিত করেছেন। অপানিপাদো-জবনো গ্রহীতা—উপাধি স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর মূর্ত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবসুন্দরী শঙ্করীর মন্দিরে প্রকৃতিতত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে আত্ম-ভোলা হ'তেন তিনি। আবার সে চৈতন্য অবরোধ ক'রে চিনি-খাওয়ার পরমানন্দে লীলা-ভঙ্গীতে অবহিত হ'তেন পরমহংসদেব। মূর্ত্তি তিনি অবহেলা করেননি। মূর্ত্তিপূজারূপ প্রথম ধাপে আরম্ভ ক'রে তিনি সমাধির শিখরে উঠ্‌তেন।

মাত্র লোকশিক্ষার জন্য, আপনাদের প্রীতির জন্য এবং সাধনাকামী সকলের হিতার্থে রূপ-কল্পনা করতেন ঋষি। পর-হিত কামনাকে দূরে রাখলে তো শুম্ভনিশুম্ভ অহমিকা অস্মিতা অসুর ধ্বংস হয়না। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, তাই জগতের তুষ্টি—তাঁর তুষ্টি। শাস্ত্র বলেছে—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিগুণস্য শরীরিণ

সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।

তিনি চিন্ময়—বিশুদ্ধ পূর্ণজ্ঞান, তিনি অপ্রমেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিন গুণে বাঁধা জীব। ব্রহ্ম গুণাতীত। তাঁর রূপ তো চিন্তার উর্দ্ধে। তাঁর জ্ঞানে তো জ্ঞানের অন্ত, সে জ্ঞান ছিঁড়ে ফেলে গুণের বাঁধন যা হতে জন্মে ভেদবুদ্ধি। কিন্তু সে চেতনা জাগে সাধনার ক্রমোন্নতির ফলে। তার একটা সোপান—পরহিত। তাই সাধকের হিতার্থে অরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন ঋষি।

অবশ্য চাই নিষ্ঠা। প্রতিমার রূপ কোন সত্য বোঝাবার জন্য পরিকল্পিত, সে ভাব-মাধুরী জন্মে একাগ্রতায় এবং তন্ময়তায়। ভাবের মূলে পৌছে যায় চেতনা—সাধনার ঐকান্তিকতায়। চেতনা বুঝিয়ে দেয় সত্য—যাকে বোঝাবার জন্য পরহিতের জন্য মহাপুরুষ করেন রূপ-কল্পনা। মাত্র পাষাণে বা কাষ্ঠে ব্রহ্ম বিরাজ করেন না—তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়। তিনি শব্দের অতীত। অথচ শব্দে বুঝতে হয় ব্রহ্ম। ধ্যান-যোগে উদয় হয় অতীন্দ্রিয় ভাবের। কিন্তু সে অবস্থাকে আনতে হয় ইন্দ্রিয়কে জয় ক'রে—মনরূপ ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে।

দেবতা বিরাজ করেন ভাবে। ভাবকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় ভাষায়। ভাষা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত।

দুর্গামূর্ত্তি নিঃসন্দেহ চণ্ডী মহাপুরাণে বর্ণিত মহালক্ষ্মীর রূপের প্রতিফলন। মা দুর্গা সমস্ত দেব-শক্তির সার। আমাদের মনের অসুর-শক্তি মাত্র দমন হতে পারে—নিঃশেষ দেব-শক্তিসমূহে। পূজার উদ্দেশ্য দেব-শক্তির উদ্ধার মনের মাঝে। দেব-সম্পদে মনের মাঝে অসুর-সম্পদের সাথে সংস্কাররূপে বিদ্যমান। অসুর সদাই জয়ী হয় জীবের চিত্ত রণাঙ্গনে—কারণ সংসার প্রকৃতির লীলা-ভূমি, মায়ার ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। অথচ মনের অসুরদের একের পর এক বিনাশ না করলে, উদ্ধারের আশা নেই। একগুঁয়ে মদমত্ত রজোগুণের প্রতীক মহিষাসুর রাজত্ব করে যখন মনের স্বর্গে, তখন সকল দেবশক্তি একত্র ক'রে না যুঝলে মনের সুষ্ঠু গতি অসম্ভব। অসুর নিধনে মন হয় নির্ম্মল।

এই সত্যকে প্রকট করেছেন ঋষি—যিনি রূপ-কল্পনা করেছেন মহালক্ষ্মীর, সেই সাধকের মঙ্গলের জন্য যে সাধন-সোপান বহে উঠতে চায় শিখরে। চিত্ত অবহিত হলে শোনা যায়—মাভৈঃ ধ্বনি। বোঝা যায় অসুরের বিজয়

চিরদিনের সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন নয়। তেজের আকরের নিকট যাচ্ঞা করলে—তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি—তেজ জন্মে মনে। শক্তিমান শক্তি দেন অসুর দমনের।

এইরূপে মনের ভাব উদ্বোধনের আয়োজন মূর্ত্তির পরিকল্পনা। কিন্তু সকল বিধান যেমন দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয় ফল প্রসব করতে পারে, প্রতিমা-পূজাতেও সে বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবোঝা এবং ভুল-বোঝার অভিসম্পাতে জীবন হতে পারে তিক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে। মহিষাসুর বধ হ'তে পারেনা অন্তরের নিষ্ঠুরতায় পরের প্রতি। পরের উৎসাদন নয় অসুরবধ। প্রকৃত-ভাবে বুঝলে প্রতীকের ইঙ্গিত বোঝা যাবে—এ সমর নিজের প্রকৃতির। বহুস্থলে দেখেছি—নৃশংস নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা দিয়েছে দেবী-মূর্ত্তি। কী ভ্রান্তি! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মিলনের মূর্ত্তি কাম-সম্ভোগের প্রেরণা জাগিয়েছে কত মনে, কে জানে। অথচ কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিয়েছেন শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণব-কবিরা স্পষ্ট ভাষায়।

তাই প্রয়োজন গুরুর। যিনি প্রকৃত উপদেশের দ্বারা মানুষের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি জাগাতে পারেন তিনি গুরু। এমন উপদেষ্টার শরণ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ কর্মেও বিপদ আছে। মন যদি ভগবানের শরণ যাচিঞা করে একনিষ্ঠ হয়ে—তাহ'লে সকল সুবিধার বিধান করেন তিনি।

প্রয়োজন—নিষ্ঠা, ভক্তি, শরণ, আত্ম-সমর্পণ। ব্যাকুল প্রাণে মূর্ত্তির সান্নিধ্য কল্যাণকর—আত্ম-নিবেদনের আয়োজনে।

আচার্য্য হরপ্রসাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে যে কয়জন বাঙ্গালী ভারতীয় চিন্তাধারার নিয়ামক-রূপে দেশ বিদেশের বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, মনীষী হরপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্ম-গ্রহণের ফলে শুভাদৃষ্টবশে তিনি যেমন বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া তিনি তেমনই উদার সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল পাণ্ডিত্য তেমনই ছিল মননশীলতা, যেমন ছিল কর্ম্মশক্তি, তেমনই ছিল বিচার নৈপুণ্য। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং রসিক। তাঁহার স্বচ্ছ সরল সরস রচনা বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক আবিষ্কারে এবং গবেষণায় ভারতীয় ইতিহাসের এবং ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যায় রচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্ম ও দর্শন—তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। জীবনের পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নিরলস সাধনায় এই সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সার্থক আলোচনা ভারতবাসীকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে। আমার মতে তাহার যুগান্তকারী প্রথম আবিষ্কার নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ, যাহা "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" (হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা গান) নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চর্য্যাপদগুলি মাত্র প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার নহে, আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষারও প্রাচীনতম নিদর্শন। শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তি নেপাল রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার, সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত এই কাব্য ঐতিহাসিকগণের নিকট মূল্যবান গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আচার্য্য হরপ্রসাদের তৃতীয় কীর্ত্তি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ এবং সেই পুঁথিগুলির বিষয়ানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন। এই কীর্ত্তি সারা ভারতে তুলনাহীন। ভারতের বাহিরেও ইউরোপের বৃহৎ বৃহৎ সংগ্রহ শালার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগ্রহ ও তাঁহার বিবরণ সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে তাঁহার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বিরচিত "বর্ণ রত্নাকর" গ্রন্থ। ইহা মৈথিল ভাষায় প্রাচীনতম উপলব্ধ পুস্তক। শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পথানুসরণে বাঙ্গালী গবেষক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৈথিলীপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুয়া মিশ্র ইহা যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং আধুনিক আর্য্যভাষার ভাবাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থ কীর্ত্তি "বেনের মেয়ে" উপন্যাস, মেঘদূত ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গালায় রচিত নানাবিষয়িনী প্রবন্ধমালা। বিশেষ করিয়া কালিদাসের রঘু, কুমার ও শকুন্তলা এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিবন্ধ নিচয় তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

দুঃখের বিষয় আমরা এ হেন একজন মনীষী ও মনস্বী পুরুষের স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করি নাই। এমন কি ধৎসরান্তে তাঁহার স্মৃতি

সভায় সমবেত হইয়া আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি অর্পণেও কৃপণতা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হয় নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া ধন্য হয় নাই। আমরা আজিও এই কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্তও করি নাই।

আশা ও ভরসার কথা একজন বাঙ্গালী যুবক বাঙ্গালার এই কলঙ্ক স্খালনে উদ্যোগী হইয়াছেন। সিনেমা-তারকাগণের জীবনী অথবা নিত্য কৃত্য, গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দাকাহিনী কিম্বা তথাকথিত কোন রম্য রচনা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যপুত্রগণের পূর্ণসহযোগিতায় হরপ্রসাদের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাবলী সম্পাদনের ভারগ্রহণ করিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত স্বনামধন্য আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রিয়দর্শী যোগ্য ব্যক্তির উপরেই এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই-এর সৌন্দর্য্যে রচনাবলীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। সুনীতিকুমারের সম্পাদন-কুশলতা, তাঁহার লিখিত ভূমিকা রচনাবলীকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়াছে। শ্রীমান্ প্রিয়দর্শী ঋষিঋণ পরিশোধে অগ্রণী হইয়া আমাদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক। হরপ্রসাদ রচনাবলীর ইহা প্রথম সম্ভার।* সম্পাদকও প্রকাশক অনুমান করেন যে প্রথম খণ্ডের ন্যায় প্রতি খণ্ডে আনুমানিক ছয় শত পৃষ্ঠা করিয়া চারি খণ্ডে হরপ্রসাদের সমগ্র বাঙ্গালা রচনাবলী সম্পূর্ণ হইবে। সুখের বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ রচনাবলীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—শাস্ত্রী মহাশয় যে রস, তত্ত্ব, ও তথ্য পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক সমাজ ভুলে নাই এবং ভুলিবে না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকায় তাঁহার যুগের পাঠ-পরিচিতিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্র ও অবদান সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের নানাদিকের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রচনাবলী সম্পাদনকার্য্যে শ্রীমান্ অনিল কাঞ্জিলাল অতন্দ্র পরিশ্রম করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সুষ্ঠু ও পরিপাটি পাঠ নির্দ্ধারণে শ্রীমান্ অনিলের সহায়তা সম্পাদক মহাশয়ের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। প্রবীণ ও তরুণের এই সমধর্ম্মী সাহচর্য্য আধুনিক কালে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আশা করি যথাকালে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র বাঙ্গালা রচনাবলী (এবং সম্ভব হইলে তাঁহার স্বল্পসংখ্যক ইংরাজী রচনা ও রচিত পত্রাদি) দেখিতে পাইব। এইরূপ গ্রন্থ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রকাশকে যে সমৃদ্ধ করিতেছে তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

* হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রকাশক—ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪ এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। প্রথম খণ্ড, মূল্য ১১৲ টাকা।

অনু ও পরমাণু

রজতকুমার মৈত্র

১৮০৮ সালে ডালটন বলেন যে মৌলিক পদার্থমাত্রই এটমের সমষ্টি—বিভিন্ন মৌলিক পদার্থদের এটম সকল বিভিন্ন এবং সকল মৌলিক পদার্থের অন্তিম উপাদান হচ্ছে এটম; এটমকে কোনোমতেই ভাঙা সম্ভব নয়। পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক-একটী এটমের ব্যাস। দশমিক ২৪টা শূন্য ১৭ গ্রাম হচ্ছে একটী হাইড্রোজেন এটমের ওজন। এত সব আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা জানতেন যে এটম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং কোনো মতেই একে ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৯৬ সালে বেকেরল যখন এটম হতে ইলেকট্রন আবিষ্কার করলেন তখন বিজ্ঞানীরা জানলেন যে এটম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়—অন্য কিছু দিয়ে এটম তৈরি এবং তার মধ্যে ইলেকট্রন একটী। কেবলমাত্র ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হবার ফলে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার হতে লাগলো। ইলেকট্রনের সাহায্যে পাওয়া গেল ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ, ভালভ ও আলোক তড়িৎকোষ ভালভের জন্য পাওয়া গেল রেডিও এবং আলোক তড়িৎকোষ হতে এলো টেলিভিসন।

বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন যে ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত এবং এর ওজন অত্যন্ত কম। ইলেকট্রন যখন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, তখন নিশ্চয় পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ এটমের মধ্যেই আছে এবং তাঁরা এমন একটী বস্তুর সন্ধানে থাকলেন যা এটমের মধ্যে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরে আসতে পারে। মাদাম কুরী সেই সময় রেডিয়ম আবিষ্কার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে রেডিয়মের ন্যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে আলফা কণিকা সকল প্রচণ্ডবেগে বার হয়।

রাদারফোর্ড এই আলফা কণিকাদের এটমের মধ্যে পাঠিয়ে জানতে পারলেন যে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ এটমের কেন্দ্রে আছে; ঐ পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থের নাম দেওয়া হোলো 'প্রোটন'। জানা গেল যে ইলেকট্রনেরা প্রোটন হতে কিছুদূরে অবস্থিত এবং এটম জমাট নয়,

সছিদ্র। এরপর ১৯৩২ সালে এটম এতে নিউটন নামে আর একটা পদার্থ পাওয়া যায়; এই নিউট্রন তড়িৎযুক্ত নয় এবং আকারে অতি ক্ষুদ্র— এত ক্ষুদ্র যে অনায়াসে এটমের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে সক্ষম।

জানা গেল যে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে এটম তৈরি— এটমের কেন্দ্রতে আছে প্রোটন ও নিউট্রন আর বাইরে আছে ইলেকট্রন। বিভিন্ন এটমদের কেন্দ্রক বিভিন্ন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রকই বিভিন্ন এটমদের বৈশিষ্ট্য। এই কেন্দ্রক ভাঙা অসম্ভব। কেন্দ্রক ভাঙা সম্ভব হলে ধাতুদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতো না। কেন্দ্রক ভেঙে ইচ্ছে মতো যে কোনো ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করা যেত।

ষোড়শ শতাব্দীতে আলকেমিষ্ট বলে একদল বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। সফলকাম না হলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। তাঁরা বিফল হলেও বা পূর্ব্বতন বিজ্ঞানীদের 'কেন্দ্রক বদলানো অসম্ভব'—এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে বিজ্ঞানীরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এটমের কেন্দ্রক ভেঙে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রক ভাঙা সম্ভব এবং তার ফলে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে তাও জানা গিয়েছে।

আণবিক শক্তি—

আইনষ্টাইন সর্ব্বপ্রথম বলেন যে পদার্থমাত্রেই জমাট বাঁধা শক্তি-পদার্থ এবং শক্তি হচ্ছে এক অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। এই বিষয়ে তাঁহার জগৎবিখ্যাত সূত্র হচ্ছে—$E = m c^2$

আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পদার্থের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি লুক্কায়িত আছে। আইনষ্টাইন আঁক কষে দেখিয়েছিলেন যে একগ্রাম যে কোনো পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে তা থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হচ্ছে ৯০০,০০০০০০০০০০০০০০০,০০০ আর্গ। তাঁর এই উক্তি প্রমাণিত হয়েছে বিগত যুদ্ধের সময় জাপানের উপর আনবিক বোমার বিস্ফোরণে।

পদার্থের বিলোপে শক্তি উৎপন্ন হবে; পদার্থ বিলোপ পেতে পারে দুই প্রকারে—এটম ভেঙে, আর এটম জুড়ে। যে প্রক্রিয়াতে এটম জুড়ে পদার্থ লোপ পাচ্ছে এবং সেই বিলোপে—শক্তির উদ্ভব হচ্ছে তাকে বলা হয় 'ফিউশন' এবং যে প্রক্রিয়াতে এটম ভেঙে—পদার্থের লোপ পাচ্ছে এবং সেই বিলোপে শক্তির উদ্ভব হচ্ছে—তাকে বলা হয় 'ফিউশন', সূর্য্য হতে যে আমরা এত তেজ পাই তার কারণ হচ্ছে—ফিউশন। সূর্য্যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনে মিশে হিলিয়মে পরিণত হচ্ছে ও কিছু পদার্থ লোপ পেয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আনবিক বোমার শক্তির কারণ হচ্ছে—ফিউশন ইহাতে ইউরেনিয়ম ভেঙে বেরিয়মে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে এবং কিছু পদার্থ লোপ পেয়ে শক্তির রূপ পাচ্ছে।

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড আলফা কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন এটম ভাঙেন। তারপর কক্রফট ও আলটন লিথিয়ম এটম ভাঙেন এবং তখনই আইনষ্টাইনের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁদের পরীক্ষাতে প্রোটন, লিথিয়ম এটমকে আঘাত করে এবং তার ফলে প্রোটন ও লিথিয়ম এটম, দুইটী হিলিয়ম এটমে পরিবর্ত্তিত হয়ে প্রচণ্ডবেগে দুই দিকে ছুটলো। এই ছুটবার শক্তি কোথা হতে এলো?

দেখা গেল যে প্রোটন ও লিথিয়ম এটমের ওজনের সঙ্গে নবজাত হিলিয়ম এটম দুইটার তফাৎ আছে—হিলিয়ম এটম দুইটার ওজন তাদের জন্মদাতা প্রোটন ও লিথিয়ম হতে সামান্য কম, তখন বুঝতে পারা গেল যে বাকি ওজনের পদার্থটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এরপর ১৯৩৯ সালে হান ও ষ্ট্রাসমান ইউরেনিয়ম এটম ভেঙে বেরিয়ম পান এবং সেই সময় আনবিক শক্তির সঙ্গে সকলকে পরিচিত করেন। নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ম এটম ভেঙে গিয়ে বেরিয়মে পরিণত হয় এবং কিছুটা পদার্থ শক্তির রূপ যে কি ভয়ানক তা আমরা সকলেই জানি। আনবিক বোমার ভয়াবহতা আজিও জগতের বুক হতে মুছে যায়নি।

বিজ্ঞানীরা আনবিক শক্তি উৎপাদনের চাবিকাঠি পেয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন—যাতে এই শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু তাঁরা এক সমস্যার মধ্যে থাকলেন। ইউরেনিয়ম কেন্দ্রক ভাঙতে প্রচুর নিউট্রনের প্রয়োজন এবং বাহির হতে এই নিউট্রন যোগাড় করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান করলেন জোলিয় কুরী—তিনি বললেন যে নিউট্রনের আঘাতে কেন্দ্রক বিভক্তিত হবার সাথে প্রচুর নিউট্রন জন্মগ্রহণ করে এবং তখন আর বাহির হতে নূতন নিউট্রন না যুগিয়ে ঐ নবজাত নিউট্রনদের কাছে লাগলেই হবে। কেবল প্রথমে একবার নিউট্রন দিয়ে কাজ আরম্ভ করলেই হবে—আর নূতন নিউট্রনের দরকার হবে না; নবজাত নিউট্রনরা কাজ চালাবে। আনবিক শক্তির রহস্য আর বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা থাকলো না। তারা তখন এই শক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন; আনবিক শক্তি উৎপাদন করেচে নিউট্রনেরা। তাঁহারা অন্য ধাতুর পাত এমনভাবে ব্যবহার করলেন যে ঐ পাতের সাহায্যে নিউট্রনদের সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে—এইভাবে আনবিক শক্তিকে নিজেদের হাতের মধ্যে এনে বিজ্ঞানীরা আজ প্রকৃতির এই শক্তিকে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন; কয়েকটী দেশ ইতিমধ্যেই আনবিক শক্তির দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আমরাও অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তির দ্বারা উপকৃত হবো আশা করা যায়।

কথার যাদুকর শরৎচন্দ্র

শ্রীতারাকুমার ঘোষ এম-এ

কাটালপাড়া থেকে দেবানন্দপুরের দূরত্বের হিসাব আছে, 'টাইম-টেবিলের' পাতায় ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের দূরত্বের মাপকাটি 'সেল্‌ফের' ওপর থাক্‌, আর মাথার বালিশের নীচে। আধুনিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-দের এই মন্তব্যের টিপ্পনী হিসেবে বলা যায় যে বঙ্কিম 'ক্লাসিক', তাঁর স্থান ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের উঁচুতে, আর শরৎচন্দ্র আটপৌরে, স্থান মাথার বালিশের নীচে, হাতের কাছে, চোখের জলে। এত চোখের জল বুঝি আর কেউ ফেলেন নি, ফেলান-ও নি।

যিনি এত কাছে এসে আসন জুড়লেন, তার আসন জোড়ার ইতিহাস কিন্তু মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এককালে তিনি ছিলেন অভিভাবকদের শাসনের বস্তু, নারী-মহলে প্রবেশ অধিকার ছিল না মোটেই ; পণ্ডিত-মহল এড়িয়ে চলতেন শুচিতা বাঁচিয়ে, রাজসরকার দেখতেন রোষ কষায়িত নেত্রে, সাহিত্যিক, সমালোচক-মহলে ছিলেন এক-ঘরে, এই রকম এত তর্জ্জনীর গণ্ডী পেরিয়ে, তিনি গণ্ডী দ্বারা পৃথকীকৃত জাতের হৃদয়দেশ জুড়ে কি করে আসন পাতলেন, সে ইতিহাস বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ তাঁর সেই সময়ে, যে সময় বঙ্গ-সাহিত্য-গগন প্রখর সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত। সেখানে কক্ষে পেতে গেলে যে আপনার স্বকীয়তার জোরেই প্রসারিত হস্তের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, সে কথা বলাই-বাহুল্য।

এই স্বকীয়তা নিয়েই তিনি প্রবেশ করলেন যমুনায় 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে। যিনি যমুনায় অনিলা দেবী, তিনিই 'বেণুর' পরশুরাম, আর তিনিই সর্ব্বজন-বিদিত কথায় অপরাজেয় যাদুকর শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের কালটা খুব দূরের নয়। তাই বলে যে তিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, নির্ভরযোগ্য কোন জীবনীর মাধ্যমে আমাদের খুব কাছের হয়েছেন, তা আমার মনে হয় না। অবশ্য এ রকম আশা সার্থক শিল্পীর অপেক্ষা রাখে, আর তা একদিন পূর্ণ হবে কল্পনা করা যায়।

বাংলা, অধুনা বিহার আর ব্রহ্মদেশ জুড়ে ছিল তার জন্ম আর কর্ম্ম-স্থান। জন্মেছেন হুগলি জেলার অন্তঃপাতী দেবানন্দপুরে, কৈশোর আর তারুণ্য কাটিয়েছেন বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে, আর জীবিকা অর্জ্জন করতে গেছেন সুদূর ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুনে। পড়েছিলেন এফ, এ পর্য্যন্ত, ফি'র অভাবে পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্ব্বাদ কুড়োতে পারেন নি। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিক্রম করে গেছেন প্রতিভার জোরে; শরৎচন্দ্রকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবেই হয়েছিলেন জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আর শরৎচন্দ্রের পরিধি সীমায়িত হলেও তাঁর রসপিপাসু, সত্যান্বেষী, গভীর কবি-প্রকৃতি জ্ঞানের গভীরতার স্তরে উঠেছিল। ডিকেন্সীয় সূক্ষ্ম অনুভূতির [illegible] উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার-কাছে-প্রাপ্ত অসমাপ্ত কয়েকখানা উপন্যাস আর তীব্র বেদনানুভূতি নিয়ে, বাঙালীর স্বাভাবিক প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধির সহযোগে তিনি দেখলেন এই তিন প্রত্যন্তদেশের জীবন। কবি-ধর্ম্মী, সূক্ষ্মদৃষ্টি শরৎচন্দ্রের কাছে খুলে গেল সেদিন এই তিন প্রদেশের জীবনী থেকে উত্তরকালের ভারতের সাধনার পীঠ স্থান। কোন একস্থানে বসবাস করাটাই বড় কথা নয়, সেখানকার বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সঞ্জীবিত করে ঐক্য সামঞ্জস্যের মধ্যে যে সুষমা—তাকে আহরণ করাই হল দীপ্তি। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতেও তাই খুলে গেল। দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া আর ব্রহ্ম-দেশই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতিহাসে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, তার পটভূমিকা যে রচিত হয় নি শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসে, তা বাঙালী সাহিত্য-ইতিহাসজ্ঞকে অস্বীকার করবে? সেই ভাবীকালের ছায়াপাত হয়েছিল, সেদিন শরৎচন্দ্রের চোখে, এই নীল-জলধি-ধৌত আরাকানের ওদিকে।

অথচ পেশার দিক দিয়ে ছিলেন, এ-জি বর্ম্মা অফিসের ইংরেজ রাজ-সরকারের বৃত্তিভোগী মসিজীবী। সহজেই কল্পনা করতে পারা যায়, মসি-লিপ্ত জীবনের এই সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যেন তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। কি স্বার্থপরতা, নীচতা, হীনতা আর দৈন্যে কলঙ্কিত এই মসি-জীবন। কি অসহায় দয়ার পাত্র এইসব মূঢ় মূক শ্রেণী। তাই মনে হয় এই শীর্ণকায় ব্যক্তিটির অন্তর্নিহিত অসীম তেজ, দুর্জ্জয় সাহস, গভীর হৃদয়াবেগ থেকে থেকে আন্দোলিত, উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। 'রিমাইণ্ডার' আসার দরুণ পাশের কেরাণীর ফাইন হওয়ায়, অসহায়ত্বের আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়া তার সহকর্ম্মীর মর্ম্মবেদনা তাকে এতদূর বিচলিত করে তুলেছিল যে একখানা পদত্যাগ-পত্র পর্য্যন্ত তিনি নিজে লিখে ফেলে, তার নিজের ওপর আক্রমণ নিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কত সাধাসিধেভাবেই থাকেন তিনি। দা' ঠাকুরের হোটেলে খান। কৈশোরের আর যৌবনের ডানপিটেমি, লাজুকতা ও মুখ-চোরার আবরণে ঢাকা। মজলিসী বটেন—কিন্তু সভা সমিতি, মজলিসী আসর এড়িয়ে চলেন। গানে গলা আছে, কিন্তু গানের আসরে সবার অগোচরে থাকেন বসে। ইংরেজের চাকুরে, কিন্তু মেশেন গিয়ে ইংরেজ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে, অভিনয়ে পটু, অথচ খুঁজেই পাওয়া যায় না রঙ্গমঞ্চের ত্রি-সীমানায়। এ হেন একটি লোক থাকেন কি নিয়ে, কি ভাবেন, কিসে ভরে ওঠে তার সন্ধ্যার আবছায়া, ভোরের আলোর আশীর্ব্বাদ? সেই 'মিসিং লিঙ্ক' পাওয়া যায়। দুর্গতদের অসীম দুর্গতি তাকে হাত ছানি দেয়, থাকতে পারেন না, ছুটে চলেন মাসের প্রথমে সিকি দু-আনি, আধুলি, পয়সায় পকেট ভর্ত্তি করে। কত যে দুর্গত দিন গণছে তার এই ক্ষণটির জন্য। চুপি চুপি গিয়ে পৌঁছেই খেয়ে এসে ফিরে ফেলে

ছোট বড় বৃদ্ধ বৃদ্ধা বর্ম্মীর দল। সুদূর দেশ, বিদেশ বিভূঁই—আপনার তো এরা কেউ নয়। কিন্তু তা বলে পর তো নয়। ওরা যে মানুষ সেই মানুষের ডাকেই উতলা হয়ে ওঠেন।

ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন বাবা।—বৃদ্ধের কণ্ঠে জেগে ওঠে ভক্তি-মিশ্রিত বিহ্বলতা। শরৎচন্দ্র ছল ছল চোখে দেখেন এই ভগবৎ-কৃত দীনদুঃখীদের। কে বলে বাঙালী প্রাদেশিক, সঙ্কীর্ণ? যারা বলে তারা দেখুক শরৎচন্দ্রকে, শিখুক তারা আন্তর্জাতিকতার মর্ম্ম, জানুক তারা সাম্যমৈত্রীর গভীর অর্থ।

বাস্তবতার ডাক যদি রোমান্স নিয়ে আসে, তবে তা এসেছে শরৎচন্দ্রের জীবনে। মদ্যপ পিতার কন্যাকে বৃদ্ধস্বামীর হস্তে মর্মহীন সমর্পণের প্রতিবাদে যে কন্যার আশ্রয় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, কন্যার পিতার দয়া বিষয়ক ইঙ্গিতের গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, এ কথা রোমান্টিক শোনালেও সত্য।

দেশের দুঃখ দৈন্যে পরাধীনতার গ্লানির সঙ্গে মিশ্রিত হ'ল নিজের অসুখ। অসুখে অসুখে তিনি হাড়-সার হয়ে গেলেন। অসুস্থতার প্রবল চাপে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। জীবন সম্বন্ধে ক্রমশঃ নিরাশ হ'তে লাগলেন। এদিকে কর্ম্মজীবনেও দেখা দিল বিপর্য্যয়। বিভাগীয় পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় চাকরি পাকা হ'ল না। তাঁর স্বভাব-সুলভ ভবঘুরে বৃত্তি আর দুর্দ্দমনীয় তেজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো প্রবল সংঘাতের আকারে। সাহেবের ঘুসির উত্তর দিলেন ঘুসিতে। এদিকে অসুস্থতাও নোটিশ দিতে সুরু করেছে। বন্ধু-বান্ধবহীন মনুষ্য-বৎসল শরৎচন্দ্রের মন সেদিন আশ্রয়প্রার্থী হয়ে উঠলো। স্বদেশ থেকে বন্ধুদের এল আমন্ত্রণ। ডাকছে বাংলা তার শ্যামলক্রোড়ে ফিরে যেতে। বিশ্রামের আশায় আবার পা দিলেন দেশের মাটিতে। দেশের হাওয়া বাতাসে তাঁর ভাঙ্গা স্বাস্থ্যও জোড়া লাগলো। বহুদিন ছিলেন দেশের বাইরে, দেশকে দেখলেন তিনি দেশের মধ্যে, হৃদয়ের সমগ্রতা দিয়ে।

এখন অফুরন্ত সময় সক্রিয় হয়ে উঠলো ভারতীর কমল-বনে। অজস্র ধারায় চল্লো তাঁর রচনা। বাংলাদেশও তাঁকে লুফে নিলে। যেন অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা তাঁরই অপেক্ষায় ছিল। মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা পাঠকবর্গ সাগ্রহে পড়তে লাগলেন আর মন্তব্য করলেন, সরলতা ও সরসতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে। "রবীন্দ্রনাথের লেখায় অস্পষ্টতা থাকে, আপনার লেখায় স্পষ্টতা"—ভক্তের এই চাটুবৃত্তির উত্তরে শরৎচন্দ্র বলতে বাধ্য হলেন, "তিনি লেখেন আমাদের জন্য, আমি লিখি তোমাদের জন্য।"

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ ঘুচিয়ে, সরস্বতীর মাধ্যমে পেলেন তিনি লক্ষ্মীকে। বাঙলার লেখকদের বেশীরভাগই কেটেছে দুঃখ দৈন্যে, শরৎচন্দ্র দেখালেন বাণী অর্চনায় নিমগ্ন থাকলেও লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বই লিখে যশ মান অর্থ অর্জ্জন করতে পারা একেবারে অসম্ভব নয়।

এর পরে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন বাজে-শিবপুরে। মাঝে মাঝে এলো তাঁর ডাক নানা সভাসমিতি থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করলেন কাউকে, কাউকে করলেন প্রত্যাখ্যান। দেশের লোক যে তাঁকে ঠিক মত চিনেছিল তা নয়, তবে দেশের মানস সত্তাকে তিনি আঁকড়ে ধরলেন। তাই তার প্রাঙ্গণ হ'ল দেশমুক্তিকামী অগণ্য নরনারীর সহজ প্রবেশ স্থান। সোজা, স্পষ্ট, গভীর আর অর্থদ্যোতক উক্তির জন্যে যে গালাগালি খেলেন তা কম নয়, কিন্তু প্রতিঘাত করতেও কসুর করলেন না একবিন্দু। কাপের পর কাপ চা খেলেন, পাতার পর পাতা ভরালেন। পাতায় পাতায় রইল তাঁর, অসহায় দুর্গত মানব আত্মার অভিনন্দন বাণী, মুক্তকণ্ঠে গাইলেন তিনি এই দীন দুঃখী অথচ মানবতা ধর্মে অগ্রগণ্য মানবের বেদনার কাহিনী।

পাতা তো ভরালেন, কিন্তু নিজের জীবন পাতা এলো ঝরে। আবার পড়লেন অসুখে, এ কাল্ আর তাঁকে ছাড়লে না। অগণিত অসহায় নরনারীর মুখে যিনি কথার ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, তাঁর মুখের বাণী স্তব্ধ হ'ল এক সেবায়তনে অগ্রহায়ণের এক শীতের বিকেলে।

শরৎচন্দ্র চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন অজস্রভাবে দানের ডালিতে ফুল ভরে। চোখের জলে, বুকের বেদনায় তা হয়ে রইল অম্লান, তাজা, টকটকে। আজ সেইখানেই আমি তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম রাখলেম।

আরোহণে

শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

ঊষার অরুণ আলোক ফুটে উঠলো আকাশের ভালে। তমসার ঘোর অন্ধকার থেকে ফুটেছে ভাস্কর, চলেছে আমাদের আরোহণ, এ আরোহণে যতই এগুবে দৃষ্টি হবে প্রসারিত—দূর দিগন্ত যেখানে মিলেছে অসীমের সাথে। দেশব্যাপী চলেছে আজ মহাযজ্ঞ, সারা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের বিস্ময় দৃষ্টি তাঁর পানে। নির্ভিক বিপ্লবী বিনোবা। গ্রাম থেকে গ্রামে চলেছেন তিনি, অদ্ভুত ছন্দে ফুটে উঠেছে গতি—এই গতি থেকে জগতের উৎপত্তি।

চলেছেন বিনোবা, ভূমিহীন আর্তের আকুল ক্রন্দন ব্যথিত করেছে তাঁর মহাপ্রাণ, তিনি শুনেছেন আকাশ বাতাস আলোড়িত করে যে মহাবাণী বইছে—আলো বাতাস জলের মত এও আমাদের জন্য দান। মানুষ তুমি একে মান নাই, তাই গড়ে উঠেছে বিবাদ বিসংবাদ আর অন্যায়ের নিপীড়ন। একক মালিক কেউ থাকবে না, সবাই হবে মালিক—ব্যষ্টির দাবী প্রমাণিত হয়েছে সমূহের মারফতে।

চলেছেন বিনোবা, ভাস্করের ভাস্বর-জ্যোতি ফুটে উঠেছে তাঁর স্নিগ্ধ

হাস্তে, ঝরে পড়েছে মানব প্রেমের লহরী। সম্মুখে পশ্চাতে অগণিত জনতা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে আজ এই আরোহণের উপর। গম্যপথ দুরূহ সন্দেহ নাই, এভারেষ্টও দুর্জ্জয় ছিল কিন্তু ইচ্ছা একে জয় করেছে। তবে কেন সংশয় এই আরোহণে।

এই আরোহণে বিকশিত হ'বে তোমার অন্তর। সে মহাসুযোগ এনেছেন তিনি সকলের দুয়ারে—ছেড়ে দাও রাজনীতির মার প্যাঁচ, তন্ত্রবাদের কচকচি বিলোপ কর—প্রবর্ত্তিত হউক সমাজ নীতি, লোকনীতি ও ধর্ম্মচক্র। সকলের উদয়ে তোমার উদয়, সকলের বাইরে তুমি নও।

বিপ্লবী বিনোবা দেশ বিদেশের মনীষীর লেখনী বহন করছেন, তাঁর অহিংস বিপ্লবের বাণী। সাথে চলেছেন আমেরিকান ডেভিড্, ফরাসী লাঁজাভা, শ্রীমতী চেষ্টার-বোলস্। মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশেরপ্রেমীরা তাঁর সাথে! ওঠো, চলো—সর্বহারাদের মুখে ফোটাও হাসি। আড়াই হাজার গ্রামের অধিবাসীরা ভালবেসে বিচার করে মেনে নিয়েছে তাঁর অনুশাসন, তারা বুঝেছে মানুষের মত বাঁচতে হ'লে নান্যপন্থা অয়নায়। সংকল্প দৃঢ় করো, আড়াই হাজার গ্রাম আড়াই লক্ষ হ'তে কতক্ষণ? সবাই যদি মঙ্গল চাও, তবে একদিনে হ'তে পারে।

অদ্ভুত এই বিপ্লব, অহিংসার মারফতে এ সম্ভব হ'তে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সংকল্প নাও, সকল শক্তি নিয়োগ করে আহ্বান কর ক্রান্তিকে।

ক্রান্তি! ক্রান্তি! ক্রান্তি! অরুণ আলোকে উদ্ভাসিত হ'বে গরীবের নয়া-ঢুনীয়া। মুছে যাবে ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রতিষ্ঠিত হ'বে সমূহের সাধনা।

আরো মহাবাণী তিনি বহন করে চলেছেন—বিলোপ কর রাষ্ট্রের নিপীড়ন। মুক্ত কর সমাজিক শাসনের অত্যাচার থেকে। রাষ্ট্র বলে যে বিরাট দানবটা সমাজকে নিঃশেষে খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে গজভুক্ত-কপিত্থবৎ করে—বন্ধ কর এর শোষণ। উৎপাদনকে সমূহভাবে কাজে লাগাও সকলের বিকাশের জন্ম—সকলের উদয়ে তোমার উদয়। বিপ্লবী বীর বিনোবা।
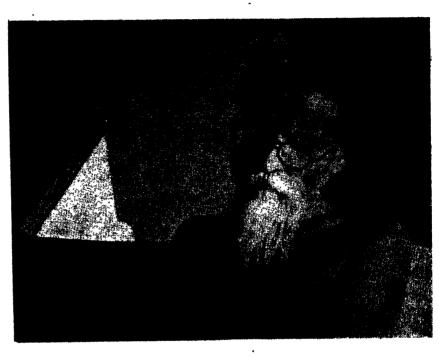
বিনোবা ভাবে

হাজার বছরের তমসার ঘোর অন্ধকারের মাঝে দেখা দিয়েছে দূর-দিগন্তে অগণিত আলোক—ময়ূরপো—তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সৎগময়। চেষ্টা কর, বিশ্বের ঈশ্বর যিনি তাঁর করুণাতে বইছেই, কিন্তু পাল তুলে না দিলে কি করে ধরবে। তাই সংকল্প নাও, দৃঢ় কর মন, এগিয়ে চলো আরোহণে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে এই সর্বাত্মক বিপ্লব চরম ফলপ্রাপ্ত হোক, কারণ সকলের উদয়ে তোমার উদয়—তোমার উদয়ে সকলের উদয়—সকলের বাইরে তুমি নও।

মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত
সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ !" তিনি বলেন
বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম।
তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন, তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময় ! অবশ্য লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।"
নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে উঠছে !
কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের তারকা
LUX
TOILET SOAP
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটির বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে ; সোভিয়েট রুশিয়া কর্ত্তৃক আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ারীর সংবাদে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে ; সীরিয়ায় রাজনৈতিক পট-পরিবর্ত্তনে জর্ডানে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছে।

নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার ব্যর্থতা—

গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে বর্ত্তমান পর্য্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস আলোচনা চলিবার পর আগষ্ট মাসের শেষভাগে কোনরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই বৈঠকের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়াছে। গত জুন মাসের প্রথমে সোভিয়েট-প্রতিনিধি মিঃ জোরিণ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন : আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা স্থায়িভাবে বন্ধ রাখিবার আলোচনা সাপেক্ষ—ঐ অস্ত্রের পরীক্ষা আপাততঃ দুই-তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখা হউক ; চুক্তি লঙ্ঘন করা হইতেছে কিনা, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে ও অন্যান্য স্থানে উপযুক্ত যান্ত্রিক সরঞ্জাম সহ এক একটি কণ্ট্রোল পোষ্ট স্থাপিত হউক। এই প্রস্তাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হয়। এক সময়ে এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, নিরস্ত্রীকরণ সাবকমিটির চার বৎসরব্যাপী অচল অবস্থার অবসান হয়ত আসন্ন ; অন্ততঃ সাময়িকভাবে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি হয়ত হইয়া যাইবে। ইহার পর মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ষ্ট্যাসেন্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা সোভিয়েট প্রতিনিধি নীতি হিসাবে মানিয়া লন। কিন্তু সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে মীমাংসা যাহাদের কাম্য নহে,তাহারা এই আলোচনায় জটিলতা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ২৯শে আগষ্ট তারিখে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত প্রস্তাব একত্র সন্নিবেশ করিয়া এক দীর্ঘ মিশ্র প্রস্তাব উত্থাপন করেন ; আণবিক উপকরণের উৎপাদন হ্রাস, বিভক্ত জার্ম্মানীর ঐক্য প্রভৃতি এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) স্থায়ী কাউন্সিল কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সোভিয়েট রুশিয়া এই প্রস্তাবকে আলোচনার ভিত্তিরূপে স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছে। সোভিয়েট মুখপাত্র বলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রস্তাবে কোনও নূতনত্ব নাই ; আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রাখিবার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যে সব সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহাতেই নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

লণ্ডনে জাতি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটির আলোচনা এইভাবে ব্যর্থ হইবার পর এই প্রসঙ্গটি এখন জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত হইতে যাইতেছে। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর এই অধিবেশন আরম্ভ হইবে ; ইহা জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ১২শ অধিবেশন। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনকে ও উহার সাব-কমিটিকে প্রসারিত করার জন্য ভারত এই অধিবেশনে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। (১) গত চার বৎসর ধরিয়া জাতি-সঙ্ঘের যে নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটির নিস্ফল অধিবেশন চলিতেছে, তাহাতে যোগ দিবার জন্য নূতন কয়েকটি দেশকে মনোনয়ন করা হউক ; (২) নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানের জন্য নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে আরও কয়েকটি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হউক। আনুষঙ্গিক স্মারক লিপিতে বলা হইয়াছে—অস্ত্রসজ্জার যে স্তরে পৌঁছিয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ; এই ব্যাপারে যাহারা উদ্যোগী নহে, এইরূপ কতকগুলি শক্তি সাব-কমিটিতে থাকিলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আশু মীমাংসার সম্ভাবনা। সাবকমিটী গঠিত হইবার পর অস্ত্রসজ্জার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে ; গত কয়েক বৎসরে অবস্থার আরও অবনতি লক্ষ্য করিয়া এবং নূতন অস্ত্রের বিপুল সমাবেশ ও উহার অধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এই বিষয়ে এখন অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ অধিবেশনে হাঙ্গেরি প্রসঙ্গ—

গত ১০ই আগষ্ট জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া হাঙ্গেরি সম্পর্কে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরিতে যে অভ্যুত্থান ঘটে, সে সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পাঁচশক্তির এক কমিটী নিযুক্ত হয় ; সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, ডেন্মার্ক, টিউনিসিয়া ও উরুগুয়ের প্রতিনিধি এই কমিটীর অন্তর্ভুক্ত হন। গত জুন মাসে কমিটীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহাতে কমিটীর এই সিদ্ধান্ত জানান হইয়াছিল যে, গত বৎসর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হাঙ্গেরিতে "স্বতস্ফূর্ত্ত জাতীয় অভ্যুত্থান" সোভিয়েট ইউনিয়ন জোর করিয়া দমন করিয়াছে ; বর্ত্তমান কাদার গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিমূলক নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হাঙ্গেরিয়ান গভর্ণমেণ্ট ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেশে কমিটীকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। প্রধানতঃ নিকটবর্ত্তী অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ এবং পলায়িত হাঙ্গেরিয়ান্দের নিকট হইতে কমিটী তথ্য আহরণ করেন। জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে ছত্রিশটি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই ছত্রিশটির মধ্যে

যোলটি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র, ইউরোপের বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, বেলজিয়াম্, লুক্সেমবর্গ, আয়ার্লণ্ড, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্—এই এগারটি, আমেরিকা ও কানাডা, লাইবেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্থান, ফিলিপাইন্স্—কুয়োমিংটাং চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। অর্থাৎ, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি বাদে প্রায় সকলেইহয় ন্যাটোর, না হয় সিয়াটোর, না হয় বাগদাদ-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রস্তাবে হাঙ্গেরির জনগণের "রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের" জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিন্দা করা হইয়াছে; হাঙ্গেরির বর্ত্তমান কাদার গভর্ণমেন্টকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক "চাপানো" গভর্ণমেন্ট বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও হাঙ্গেরির বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে দমনমূলক নীতি পরিত্যাগ করিতে ও সোভিয়েট রুশিয়ায় নির্ব্বাসিত হাঙ্গেরিয়ানদিগকে ফিরাইয়া আনিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবের পরিশিষ্টে জাতি-সঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ১১শ অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট প্রিন্স ওয়ান্ ওয়েথায়াকন্‌কে (থাইল্যাণ্ড) হাঙ্গেরির সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

রুশিয়ার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে নাৎসী জার্ম্মানী বৃটেনের লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর বৈমানিক-বিহীন বিমানের সাহায্যে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সেই "ভি-২" রাকেটকে আরও উন্নত করিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে নিক্ষেপের উপযোগী যান্ত্রিক প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য গত কিছুকাল যাবৎ আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। গত ২৬শে আগষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া দাবী করে যে, সে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রুশিয়ায় তৈয়ারী এই অস্ত্রের পাল্লা দেড় হাজার মাইল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সম্প্রতি উত্তর রুশিয়া হইতে পাঁচ হাজার মাইল দূরে সাইবেরিয়ায় একটি লক্ষ্যবস্তুর উপর এই অস্ত্র সাফল্যের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া রুশিয়ার দাবী। সংবাদটি স্বভাবতঃ পাশ্চাত্য শিবিরের পক্ষে উদ্বেগজনক।

সোভিয়েট রুশিয়ার দাবীর যাথার্থ্য কেহ অস্বীকার করিতেছেন না; কারণ সামরিক শক্তি সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার মিথ্যা আস্ফালনের কোনও নজীর নাই। লণ্ডন "ইকনমিষ্ট" এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "...when they (Russians) have claimed specific technical achievements, particularly in the military field, Soviet official announcements have never been empty boasts; on jet aircraft and atomic and hydrogen bombs they were rapidly substantiated." তবে, রুশিয়ার এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে; "ন্যাটোর" সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল নরস্ট্যাড্ বলেন—নির্দ্দিষ্ট পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়মিতভাবে তৈয়ারী করিতে রুশিয়ার এখনও বিলম্ব হইবে; ইহা ছাড়া মনুষ্য-চালিত বিমান-বহরে "ন্যাটো" এখনও শক্তিশালী। বৃটিশ সামরিক বিভাগের মুখপাত্র বলেন—এই অস্ত্র নিয়মিত ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে এখনও বহু "টেক্‌নিক্যাল্" সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিবিরের উদ্বেগ চাপা থাকে নাই। রুশিয়ার বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর মার্কিণ গভর্ণমেন্টের গোপন উৎসাহে বিভিন্ন সূত্রে প্রচারিত হইতে থাকে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মাঝারী ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়মিত উৎপাদন আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অস্ত্র নির্ম্মাণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গত ৩০শে আগষ্ট "থর" নামক মাঝারী ধরণের (পাল্লা দেড় হাজার মাইল) ক্ষেপণাস্ত্র ফ্লোরিডা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই দেড় হাজার মাইল পাল্লার "থর" সাফল্যের সহিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত জুলাই মাসে আমেরিকায় পাঁচ হাজার মাইল পাল্লার "এট্‌লাস্" (আই-সি-বি-এম) নামক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হয় নাই; অস্ত্রটি তখন আকাশপথে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। সুতরাং, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই—For the first time, Russia has a margin over the U. S. (New Statesman).

ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতায় রুশিয়ার এই অগ্রগামিতার রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কম্যুনিষ্ট জগৎ সম্পর্কে মার্কিণ নীতির ভিত্তি "পজিশন্ অব্ ষ্ট্রেংথ্"; অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট শিবির অপেক্ষা অধিকতর সামরিক শক্তি লইয়া যদি শান্তির আলোচনা চলে, একমাত্র তাহা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়া নতি স্বীকার করিবে বলিয়া মার্কিণ রাষ্ট্রনায়করা মনে করেন, এবং তাঁহারা ইহা প্রচারও করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের চূড়ান্ত অস্ত্র নির্ম্মাণে রুশিয়ার সাফল্যে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, তাহাকে অস্ত্রসজ্জায় হারাইয়া দিবার চেষ্টা সফল হইবার আশা এখনও সুদূরপরাহত। পশ্চিম জার্ম্মানীর আসন্ন নির্ব্বাচনে ইহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পশ্চিম জার্ম্মানীর এডেনয়ার প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়করা প্রচার করেন যে, পশ্চিম জার্ম্মানীর "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন; কারণ "ন্যাটো" যদি আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি অর্জ্জন করে, তাহা হইলে রুশিয়া ক্ষান্ত হইয়া নিজ সীমানার মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, বিভক্ত জার্ম্মানী তখন আপনা হইতে ঐক্যবদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে, সোস্যাল্ ডিমোক্রাটরা পশ্চিম জার্ম্মানীকে "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত রাখিবার বিরোধী। তাহারা রুশিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী ইউরোপীয় নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় জার্ম্মানীকে নিরপেক্ষ রাখিবার পক্ষপাতী। এডেনয়ার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের যুক্তি এখন স্বভাবতঃ বাস্তব গুরুত্ব হারাইল; অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় যোগদান যে বিভক্ত জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রকৃত পন্থা নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইল। বলা বাহুল্য, এডেনয়ারের ক্রিশ্চিয়ান্ ডিমোক্রেটিক দল যদি সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়, তাহা হইলে "ন্যাটো" সংস্থায় প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে।

চূড়ান্ত অস্ত্র নির্ম্মাণে রুশিয়ার এই সাফল্য রণনৈতিক ক্ষেত্রে এক

নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। আণবিক বোমা তৈয়ারীতে রুশিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চার বৎসর পশ্চাতে ছিল, হাইড্রোজেন্ বোমা তৈয়ারীতে সে ছিল নয় মাস পশ্চাতে। এখন চূড়ান্ত অস্ত্র নির্ম্মাণে সে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অপেক্ষা, অন্ততঃ সামরিকভাবে, অগ্রবর্ত্তী হইল। আণবিক বোমায় ও হাইড্রোজেন্ বোমায় রুশিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমকক্ষ হইলেও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সুবিধা এই ছিল যে, তাহারা বিশেষতঃ আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়াকে ঘিরিয়া চারি দিকে বহু আক্রমণ-ঘাঁটী স্থাপন করিয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা রুশিয়াকে অতি দ্রুত প্রবলভাবে আঘাত করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। আমেরিকার অনুগত রাষ্ট্রগুলি তাহার অস্ত্রশক্তির উপর এবং রুশিয়াকে অতি দ্রুত আঘাত করিবার এই শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিত। এখন এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইল। এখন, …if development continues at its present pace, the two giants (Russia and America) will arrive almost simultaneously, in a few years' time, at a position where either can launch rocket-borne hydrogen warheads at selected targets in the heart of the others' territory at the throw of a switch.—(Economist)

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ অস্ত্র—

মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগের মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ মিঃ লয় হেণ্ডার্সন সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়া নাকি জানাইয়াছেন যে, সিরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব বন্ধ করিবার আর উপায় নাই; সুতরাং অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন,—বিমানযোগে এবং বেশ ঘটা করিয়া অস্ত্র পাঠাইলে সিরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাবের উপযুক্ত মার্কিণ উত্তর দেওয়া হইবে। এই সুপারিশ অনুসারে অস্ত্র প্রেরণের স্বাভাবিক গোপনতা বর্জ্জন করিয়া এবং খুব সোরগোল করিয়া জর্ডানে এখন মার্কিণ পৌঁছিতেছে। ইহার পর ইরাকে, লেবাননে ও তুরস্কেও জরুরী ব্যবস্থায় মার্কিণ অস্ত্র পৌঁছিবে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এবং বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমের তৎপরতার জন্য এখানকার জাতিগুলিকে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইল। মিশরীয় মহল বলেন যে, প্রাপ্ত অস্ত্র ইস্রাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না—এই সর্ত্তে জর্ডানকে অস্ত্র সরবরাহ করা হইয়াছে; জর্ডানকে ঘাঁটি করিয়া ভবিষ্যতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানই এই অস্ত্র সরবরাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ গ্রোমিকো বলেন যে, সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য এই আয়োজন চলিতেছে: এক দিকে সিরিয়ার সীমান্তে ষষ্ঠ মার্কিণ নৌবাহিনী টহল দিতেছে; অন্য দিকে তাহার সন্নিহিত দেশগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হইতেছে। তুরস্ক এই সময় সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তুরস্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার নিজের সীমান্তে বৈদেশিক সৈন্যের সমাবেশে তাহার মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহা যেন সে স্মরণ রাখে; আর গত দুইটি মহাযুদ্ধ যে স্থানীয় ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও যেন তুর্কী রাষ্ট্রনায়করা স্মরণ রাখেন। কর্ণেল নাসের সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিরিয়ার বিপদে মিশরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি তাহার পক্ষে নিযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ, মধ্য প্রাচ্যের পরিস্থিতি বর্ত্তমানে অত্যন্ত জটিল এবং আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য হইতে রুশিয়াকে অপসারণের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সকল প্রকার চেষ্টা এতদিন বিফল হইয়াছে; এখন সিরিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা সিরিয়ার বামপন্থী গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদের, তথা ঐ রাজ্যে সোভিয়েট প্রভাব দূর করিবার শস্ত্র-চেষ্টা যদি চলে, তাহা হইলে হয়ত এইখানেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম গোলা নিক্ষিপ্ত হইবে। ১২।৯।৫৭

দেখুন! অর্দ্ধেকটা সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT
SOAP
Rs. 10,000 Reward!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
S. 249-X52-BG

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ব্যবস্থা

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

হুগলী ও হাওড়া জেলার ১২টি সংবাদপত্রের মফঃস্বলের প্রতিনিধি আমরা—পরিচিত ও অপরিচিত সহযাত্রী দল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম—আমাদের ভারতবর্ষ আজ কি-ভাবে ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি-বিজড়িত এই মহান্ ও বৃহত্তম দেশ পশ্চিমবঙ্গ বাস্তবিকই ক্ষুদ্র বৃহৎ নব নব পরিকল্পনা রূপায়নে নূতনরূপে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। চলচ্চিত্রে ছবি দেখিয়াছি, সংবাদপত্রে পরিকল্পনার সার্থকরূপের বিবরণী পাঠ করিয়াছি—স্বপ্ন দেখিয়াছি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির। স্বাধীনতার পরে ভারত আজ যে পথে অভিযান করিয়াছে—সেই মনুষ্য সৃষ্টির অসাধ্য সাধনা সম্যক উপলব্ধি করিলাম—মাইথন, মশান-জোড়, দুর্গাপুর, তিলপাড়া, চিত্তরঞ্জন ও আদর্শপল্লী—প্যাটেলনগর পরিদর্শন করিয়া। এই সকল বাঁধ, কারখানা ও আদর্শনগর পরিক্রমা করিবার সময় মানসচক্ষে আপনিই ভাসিয়া উঠিল আগামী ভারতের সুসমৃদ্ধ রূপটি। বৰ্দ্ধমান বিভাগীয় প্রচার অধিকারিক শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা দেখিবার আমন্ত্রণ পাইলাম। ২০শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ব আয়োজন অনুসারে রাত্রি ৯টার মধ্যে আমরা নিমন্ত্রিত সাংবাদিকগণ হুগলী জেলা-শাসকের ডাক বাংলোর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তথা হইতে ট্রাকযোগে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। গণেন্দ্রবাবু যাতায়াতের ও আহার নিদ্রার সমুদয় সুব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই সমাধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথা সময়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে মোগলসরাই ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত বগীতে করিয়া আমরা প্রথমে আসানসোল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোরবেলায় আসানসোল ষ্টেশনে বৰ্দ্ধমান জেলা প্রচার-অধিকারিক শ্রীভবেশচন্দ্র চাকী ও আসানসোল মহকুমা প্রচার-অধিকারিক শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং প্রাতরাশের পর আমরা সকলে আসানসোল হইতে বাসযোগে বাহির হইয়া পড়িলাম। যে বাসনা অন্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহার বাস্তব রূপ দেখিয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্ত মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। দানবীয় যন্ত্রশক্তি লইয়া মানুষ খেলিতেছে। বাংলার প্রতিভাবান কর্ম্মপাগল তরুণরা আজ এই কীর্ত্তি-সৌধ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রথমেই আমরা পৌঁছাইলাম আসানসোল হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী মাইথনে। সেখান হইতেই আমাদের পরিকল্পনার সার্থকরূপ দেখিবার পালা সুরু হইল। আমরা একের পর এক দেখিয়া চলিলাম—প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর বিরাট পরিকল্পনা-গুলি কিভাবে সার্থকরূপ লাভ করিয়াছে—(১) মাইথন বাঁধ এবং উহার ভূগর্ভস্থ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (২) চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (৩) দুর্গাপুর বাঁধ, ময়ূরাক্ষী, তিলপাড়া বাঁধ (৪) মাসাঞ্জোর বাঁধ, জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন ব্যবস্থা (৬) আদর্শ পল্লী প্যাটেলনগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া। বরাকর নদীর উপর দুই পার্শ্বের পাহাড়কে সুউচ্চ বাঁধ দ্বারা সংযুক্ত এই মাইথন বাঁধের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্তি পথে। নদীর তলদেশ হইতে ২০ ফিট নীচে নির্ম্মীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই হইল মাইথন বাঁধের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সাংবাদিকদের মাইথনের গঠন তথ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। কর্ম্মপাগল তরুণ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরায়কে এই কাজে তিনি কিরূপ আনন্দ পাইতেছেন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন যে "আমি নিজেকে একজন সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি, কারণ জীবনে এইরূপ বিরাট কাজে লাগিবার সুযোগ হয়ত আর পাইব না।" তিনি আজ নিজেকে সৃষ্টির তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; সেজন্য শ্রীরায় এবং তাঁহার সহকর্মীরা আমাদের নিকট নমস্য। বাঁধের উপরে ও ভিতরে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে এই বাঁধের কাজ সমাপ্ত হইলে উহা দু'হাজার আট শত বর্গ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সহায় হইবে। এখানকার তাপ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে দু'লক্ষ চার হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। যে সকল মফঃস্বল সহরে ও গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা স্বপ্নের অতীত ছিল, সরকারী প্রচেষ্টায় আজ সেই সকল স্থানের বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। সেই বিদ্যুৎ হইতে ঘরে ঘরে যে কেবল আলোই জ্বলিবে তাহা নয়, অনেক ছোট বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে ঐ সকল অঞ্চলের বৈদ্যুতিক সরবরাহের সুযোগ পাইয়া। মাইথন পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আমরা চিত্তরঞ্জন অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে পড়িল দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। মায়ের আকর্ষণে সকলেই মাইথনের দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে বাস হইতে নামিয়া পড়িলাম। সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির। মন্দিরের মধ্যে সিন্দুরলিপ্ত শীলাবেদী—তাহারই নিম্নপ্রান্তে ভারতের কোন ঐতিহাসিক যুগের শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্যের পুণ্যময় আকর্ষণকেন্দ্র শীলাময় চণ্ডীমূর্ত্তি। দেবী মূর্ত্তিকে ভূনত হইয়া প্রণাম করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

পূর্ব্বের মিহিজাম এখন হইল চিত্তরঞ্জন। প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু দাশের স্মৃতিতে নির্ম্মিত এই কারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। সুসজ্জিত তোরণ পথ দিয়া চিত্তরঞ্জন নগরে আমরা প্রবেশ করিলাম। বাস হইতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের সম্মুখে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাবলিক রিলেসান্ অফিসার—শ্রীবিজন মিত্র সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএ,

চৌধুরীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীচৌধুরী চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কারখানার ইতিবৃত্ত বিবৃত করিলেন। এখানকার রেল ইঞ্জিনের কারখানা বাংলার গৌরবের বস্তু। ইঞ্জিন তৈয়ারী সম্বন্ধে এখনও সাধারণ মানুষের ধারণা ভ্রান্ত। অনেকের ধারণা বিদেশ হইতে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ আসে এবং সেইগুলি সংযোজিত হয় এই চিত্তরঞ্জন কারখানায়। শ্রীচৌধুরী আনন্দের সহিত আমাদের জানাইলেন যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে আনীত যন্ত্রাংশের শতকরা ৯৫ ভাগই এখানকার কারখানায় নির্ম্মিত হইতেছে এবং উহার নির্ম্মাণ করিতেছেন বাংলার ও ভারতের ইঞ্জিনিয়ারেরাই। তিনি জানান যে এখন বৎসরে দু'শতের অধিক ইঞ্জিন এই কারখানা হইতে তৈয়ারী হইতেছে এবং শীঘ্রই বার্ষিক গড়ে তিন শ'তের অধিক ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে বলিয়া তিনি আশা রাখেন। এই কারখানার পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছে উহারই কর্ম্মীদের জন্য আধুনিক শিল্প নগরী। সহরটিকে দেখাইতেছিল একটি সুন্দর ছবির মত। তৃপ্তি ও শান্তিস্থাপনের সুখ সুবিধার প্রয়োজনের সকল প্রকার

তিলপাড়া বাঁধ

আয়োজনেরই এখানে সুব্যবস্থা দেখিলাম। বিদ্যালয়, পাঠাগার, ক্রীড়াক্ষেত্র, স্বর্গীয়া কস্তুরবা গান্ধীর নামে সুপরিচালিত হাসপাতাল এবং শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেতন উপযোগী বাসগৃহ সমুদয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। চিত্তরঞ্জনের বিশ্রাম-ভবনে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা পুনরায় রওনা হইলাম দুর্গাপুর অভিমুখে।

সেচ ব্যবস্থার দিক দিয়া দুর্গাপুর বাঁধ দামোদর-পরিকল্পনার চাবিকাঠি। যে দামোদরের বিভীষিকা পুরুষানুক্রমে গ্রামবাসীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল আজ সেই দুর্দ্ধর্ষ দামোদর বাঁধা পড়িয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে তিলায়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ বাঁধ ও দুর্গাপুর বাঁধ।

এখানে দুরন্ত দামোদরকে শাসন করিয়া তাহার জলধারাকে পশ্চিম বাংলার মাঠে মাঠে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। বাঁধের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সেচের খালগুলির কার্য্যকে শেষ করিবার এখনও কিছু বাকী আছে। বর্দ্ধমান আর বাঁকুড়া জেলাকে সংযোগের পথ করিয়া দিয়াছে এই বাঁধটি। এই বাঁধটি ২২৭১ ফিট দীর্ঘ। ২৫১ ফিট চওড়া এই পথটি দিয়া মোটর বাস যাতায়াত করিতেছে। দুর্গাপুরের সেচের ব্যবস্থা দ্বারা সেখানকার জলে ১০,২৬০০ একর জমিতে ফসল ফলিবে। দুর্গাপুর হইতে আমরা পুনরায় পৌঁছিলাম আসানসোলের উপর দিয়া অণ্ডালে এবং তথায় রাত্রিযাপনের পর ট্রেণযোগে পরদিন সিউড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বীরভূম জেলা প্রচার অধিকারিক শ্রীনদীয়ালাল গোস্বামী এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার স্পেসাল ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিসিটি অফিসার শ্রীসুদানচন্দ্র ঘোষ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং ময়ূরাক্ষী কার্য্যালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার চীফ্ সুপারিণ্টেণ্ডিং-ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস, গুপ্ত এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিলেন। তথা হইতে আমরা তিলপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। জলাভাবের দরুণ ভাল ফসল না হওয়ায় বীরভূম জেলায় প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, সেচ কার্য্যের সুবিধার জন্যই সরকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ময়ূরাক্ষী বাঁধ ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনারও উদ্দেশ্য বহুবিধ কর্ম্ম সাধন। এই পরিকল্পনাটির অন্যতম উদ্দেশ্যগুলি হইতেছে বন্যার জল আটকানো, ফসলের সুবিধার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। এই পরিকল্পনায় বিহারের মসানজোড়ে একটি জলাধার বাঁধ ও সিউড়ি সহরের নিকট তিলপাড়ায় একটি সেতু-বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতু বাঁধটি হইতে শাখা প্রশাখায় খাল কাটিয়া বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিলপাড়া সেতু-বাঁধটির নির্ম্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এই বাঁধটি ১০১৩ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বীরভূম জেলার বিচ্ছিন্ন দুই অংশ যুক্ত করা হইয়াছে। এই নদী হইতে খালগুলিকে শাখা প্রশাখায় এমন ভাবে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সহজেই ৬ লক্ষ একর খারিফ শস্য এবং রবিশস্যের ১'২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ

হইতে পারে, ইহার আবদ্ধ জলে মাছও উৎপন্ন হয় প্রচুর। মাছগুলি মিস্ ল্যাডারে ধরা পড়িয়া নীলামে বিক্রয় হয়। আমাদের অনুরোধে তিলপাড়া ১৫টি স্লুইস গেট দ্বারা নির্ম্মিত এই বাঁধের একটি গেট খুলিয়া কিভাবে জলস্রোত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয় তাহা দেখাইলেন। বৈদ্যুতিক চাবি ছাড়াও হাত দ্বারা গেট বন্ধ বা খুলিবার ব্যবস্থা আছে, কারণ যদি বৈদ্যুতিক চাবি খারাপ হইয়া যায় তখন হাতের দ্বারা এই গেট খোলা বা বন্ধ করার কার্য্য চলিবে। ইহার উপরে অবস্থিত মসানজোড়। পাহাড়ে ঘেরা মসানজোড়ের দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর।

উন্মত্ত দামোদরের উদ্দাম গতি আজ রুদ্ধ। আর উন্মাদিনী ময়ূরাক্ষী মসানজোড়ের রুদ্ধ দ্বারে আজ বন্দিনী। নৃত্যের উন্মত্ততা যাহা একদিন প্লাবিত করিত শত শত গ্রাম, আর শত শত নর-নারীকে করিত গৃহহারা—আজ সরলা বালিকার মতো এগাইয়া চলে মন্থর গতিতে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া। সঞ্জীবিত করিয়া তুলে দুই ধারের জমি। শস্য শ্যামলা হইয়া উঠে ধরিত্রী।

১৯৫৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মসানজোড়ে কানাডা-বাঁধে ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী ডি-এন-মিত্র।

প্রাথমিকভাবে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই এই নদী উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যাহাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহারা প্রথম থেকেই বুঝিয়াছিলেন যে এ পরিকল্পনা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

মসানজোড়ের এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ১২টি শহর ও পল্লী সহর এবং ৬টি কয়লাখনি ও কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার বিদ্যুৎ অংশের জন্য মোট ৮১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

দেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে অসংবদ্ধ ও অব্যবহৃত রাখিবার জন্যই আমাদের এই শোচনীয় দারিদ্র্য। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তড়িৎ শক্তির সম্যকভাবে ব্যবহার ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

মাসানজোড় বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়
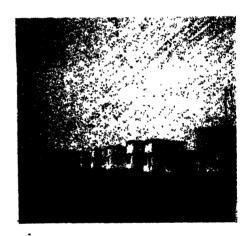
কম্যুনিটি ডেভেলাপমেন্ট ব্লক—প্যাটেলনগর

ফটো—শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

তিলপাড়া হইতে মাসানজোড়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ইহাই প্রধান অংশ। দুই পাহাড়ের মধ্যে সুরক্ষিত এই বাঁধ। কি অপূর্ব্ব এই বনানী দৃশ্য। বিমুগ্ধ চিত্তে প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব লীলা-বৈচিত্র্য এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে হারাইয়া ফেলিলাম। যেদিকে তাকাই ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় তাহাদের বাহু প্রসারিত করিয়া যেন আমাদের সাদর আহ্বান জানাইতেছে—তাহাদের মধ্যে পাইবার জন্য। আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

মাসানজোড় বাঁধটি ১২৩ ফিট উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে ২০১০ ফিট। মাসানজোড় জলাধার ও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন কেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন ও বুঝাইলেন তরুণ বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারগণ।

শিল্পের উন্নতির দিক হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। দেশ বিদেশ হইতে আগত ছাত্রদের গবেষণা করিবার জন্য সরকার একটি ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ম্যাসেনজোরের বাঁধে আবদ্ধ জলের উপর আমাদের মোটর লঞ্চে করিয়া ঘুরাইয়া দেখিবার ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করিলেন।

বাঁধ পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া দুইখানি ট্রাকযোগে বীরভূমের লালমাটি রাস্তার উপর দিয়া ধূলা উড়াইয়া আমরা ছুটিয়া চলিলাম সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্ম্মিত আদর্শ সহর প্যাটেলনগর পরিদর্শনে। দুই ধারে অসংখ্য শাল মহুয়ার বৃক্ষ শ্রেণী যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমাদের সহিত ছুটিয়া চলিতেছে। লালমাটিতে সজ্জিত হইয়া বৈকালে আমরা প্যাটেলনগরে উপস্থিত হইলাম। কল্যাণীর ন্যায় একটি সুন্দর সহর। ১৭৫টি ছোট বড় গৃহ বসবাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। সকল

ঘরগুলিতেই বসবাস না হইলেও ইহার মধ্যে ৯৫টি গৃহে স্থায়ীভাবে বাস শুরু হইয়াছে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যিনি আসিলেন তিনি হইলেন সেখানকার ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার। তরুণ, শান্ত কর্ম্ম-পাগল যুবক। তিনি আন্তরিকতার সহিত আমাদের সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ এখানে হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদের কাজ এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এখানে চুনা ও চীনামাটি পাওয়া গিয়াছে। চীনামাটি হইতে এখানে একটি শিল্প খোলা হইয়াছে। এখানকার মাটি হইতে পুতুল, খেলনা প্রভৃতির চেষ্টাও তাহারা করিতেছেন। বীরভূম জেলার এই স্থানটির নাম পূর্ব্বে ছিল মহম্মদ বাজার। স্বর্গীয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম অনুসার এই স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্যাটেলনগর। এই নগরটি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুনরায় সিউড়িতে পৌঁছাইবার জন্য ট্রাকে চাপিয়া বসিলাম। ট্রাক হইতে শেষ বারের মত প্যাটেলনগর ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে রাত্রে সিউড়ি ইরিগেসান অফিসে উপস্থিত হইলাম। এইবার আমাদের ফিরিবার পালা। এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। রাতে আহারাদির পর আমরা তথা হইতে সিউড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বীরভূম জেলা প্রচারাধিকারিক শ্রীনন্দীয়ালাল গোস্বামী এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা স্পেশ্যাল ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার শ্রীসুদামচন্দ্র ঘোষ ষ্টেশনে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের এই আন্তরিকতা আমাদের মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং পরদিন সকালে আমরা আমাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইলাম।

পরিক্রমা শেষ হইল। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা ফিরিয়াছি তাহা শুধু আমাদের মনের সম্পদ হইয়াই রহিবে না, ভবিষ্যৎ জাতির অগ্রগতির পথ সুপ্রশস্ত করিবে।

পশ্চিমবাংলায় দুর্ভিক্ষ—

গত ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সাল পর পর ২ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথায় অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি নানা দৈবদুর্ঘটনা হইয়াছে—তাহার ফলে দেশে খাদ্যাভাব ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। রেশন প্রথা চালু থাকার সময় লোক সাড়ে ১৭ টাকা মণ বা ৭ আনা সের দরে চাউল পাইত। রেশন প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় ধীরে ধীরে চাউলের দাম বাড়িয়া চলিল—১৯৫৭ সালের প্রথমেও ১৮ টাকা মণ দরে চাউল পাওয়া যাইত। তাহার পর ক্রমে বাড়িয়া আজ ভাদ্র মাসের শেষে চাউলের মণ হইয়াছে ২৮ টাকা। সরকার পক্ষ হইতে বার বার বলা হইয়াছে যে দেশে খাদ্যের অভাব নাই। সরকার বিদেশ হইতে প্রচুর চাল ও গম আমদানী করিতেছেন, তাহার ফলে দেশে খাদ্যাভাব হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—সাধারণ মানুষকে আজ ১৮ টাকার স্থলে মণ করা ১০ টাকা বেশী দিয়া ২৮ টাকা দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে—এ বিষয়ে সরকারী অব্যবস্থা ও অকর্মণ্যতা—ইহার মূল কারণ। সরকার পক্ষ হইতেই বলা হয়—এক দল ব্যবসায়ী চাউল কিনিয়া গুদামজাত করায় সাধারণ মানুষ ন্যায্য দামে বাজারে চাল পায় না। সরকারী কর্মচারীরা ঐ সকল ধনী ব্যবসায়ীকে অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়াও কিছু বলেন না—ধরিয়া দিলেও তাহাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা হয় না। সরকার কম দামে চাল ও গম বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি দোকান খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানেও যাইয়া ক্রেতাদিগকে প্রায়ই শুনিতে হয়—দোকানে গম বা চাল নাই। ২।৩ দিন না ঘুরিলে চাল বা গম পাওয়া যায় না—সরকারী সরবরাহ বিভাগের এমনই।কর্মতৎপরতা। অথচ সে সময়ে বাজারে ২৮ টাকা মণের চাল বা ১০ আনা সেরের আটা প্রচুর পাওয়া যায়। দরিদ্র জনগণ কম দামের চাল বা আটা পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া সে সময়ে বেশী দাম দিয়া চাল ও আটা লইতে বাধ্য হয়। তাহার উপর ৭ আনা সের দরের চাল,অধিকাংশ সময়েই অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দিনের চাল সিদ্ধ করিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়,কোন দিনের চাল সিদ্ধ করিতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। ভারতবর্ষে যদি প্রচুর চাল ও গম মজুত আছে বলিয়া সরকার মনে করেন, তবে তাহা সুষ্ঠুভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হয় না কেন—ইহাই আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ১২ আনা সের দাম দিয়াও আটা পাওয়া যায় নাই—তাহার পর হইতে কি কর্ত্তৃপক্ষের গম-সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল না? প্রায় প্রত্যহই কাগজে পড়ি, আমেরিকা হইতে গম-বোঝাই জাহাজ কলিকাতায় আসিতেছে—সে গম যায় কোথায়? কি করিয়া ঐ গম মুনাফা-খোর ব্যবসায়ীদের গুদামে চলিয়া যায় ও বাজারে দরিদ্র ব্যক্তিরা ১০ আনা সের দরে আটা কিনিতে বাধ্য হন—এ বিষয়ে সরকারী অব্যবস্থা কিছুতেই দূর হইল না। সম্প্রতি একদিন কলিকাতা ও সহরতলীর কয়েকটি চালের কলের গুদামে তল্লাসি করিয়া দেখা গেল—বেআইনিভাবে সেখানে প্রচুর চাল মজুত করা আছে—সে চাল আটক করা হইল বটে, কিন্তু তাহা দরিদ্র জনগণের মধ্যে সস্তা দরে বণ্টনের কোন ব্যবস্থা হইল না। ইহা ত সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার কথা। মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। কৃষকের ঘরে ধান মজুত ছিল—বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৪ মাস পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ স্থানে চাষের উপযোগী বৃষ্টি হয় নাই। মাঠে বীজ ছড়াইয়া তাহা হইতে চারা বাহির হইল না, চারা জন্মিয়া জলাভাবে তাহা শুকাইয়া গেল—এ অবস্থা দক্ষিণ বাংলার শতকরা ৭৫ ভাগ জমীতে ঘটিয়াছে। ফলে কলিকাতা সহরের নিকবর্ত্তী কৃষিপ্রধান স্থানগুলি হইতে দরিদ্র কৃষকের দল ঘরবাড়ী ও চাষের ভরসা ছাড়িয়া সহরে আসিয়া ফুটপাথে বাস করিতেছে ও পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে—কিন্তু কে তাহাদের ভিক্ষা দিবে? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের ভিক্ষা দিবার সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। শুধু কলিকাতা
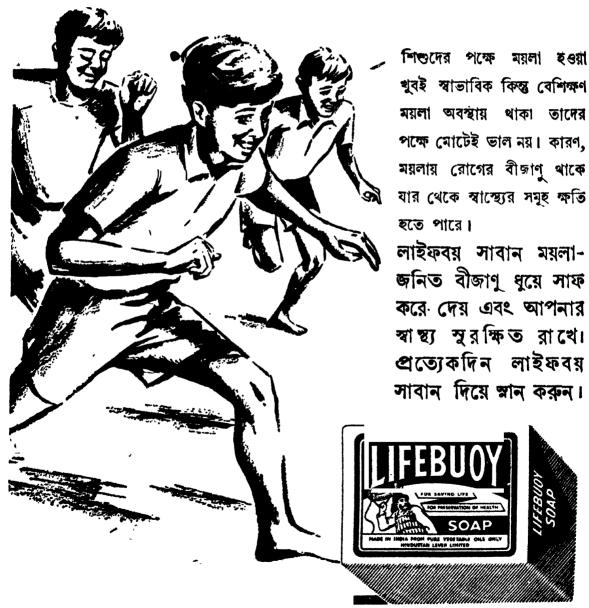
সহরে নহে, শিল্পাঞ্চলগুলিরও ঐ একই অবস্থা হইয়াছে—সেখানে ভিখারীর সংখ্যা অসম্ভবরূপ বাড়িয়াছে এবং সেখানকার পথে ঘাটে সর্বত্র রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া ভিখারীর দল বাস করিতেছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল—এবার ১৯৫৭ সালে কত লোক এই ভাবে পথে ঘাটে পড়িয়া মরিবে, তাহা চিন্তা করিয়া সকলেই আতঙ্কিত হইয়াছেন। চালের দাম বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিষের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সরিষার তৈল কেন যে ৯০ টাকা মনের কমে পাওয়া যায় না—ইহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। সকলের বিশ্বাস একদল দুষ্টপ্রকৃতির ব্যবসায়ীর চালাকির জন্য সরিষার তেলের দাম কমে না—বাংলার লোকের সরিষার তেল না হইলে চলে না—সরিষাও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না—কাজেই ব্যবসায়ীরা এই জিনিষ লইয়া জুয়া খেলে—তাহার ফলে দরিদ্র জনগণের দুঃখ কষ্ট দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। চিনির বেলা ঐ একই অবস্থা—সাধারণ মানুষকে এক টাকা সের দরে চিনি কিনিতে হয়, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, সরকার চিনির বাজারের ফাটকাবাজদিগকে একটু সায়েস্তা করিয়া দিলে চিনির মণ সহজেই ২৫ টাকায় নামিয়া আসে। চিনির দাম বাড়ায় ব্যবসায়ীরা গুড়ের দামও বাড়াইয়া দিয়াছে—গুড়ের মণ ১৪ টাকা স্থলে ২০।২২ টাকায় উঠিয়াছে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে তরিতরকারীও অগ্নিমূল্য হইয়াছে—লোক কি খাইয়া বাঁচিবে? কুমড়া, বেগুন, শাক প্রভৃতির দাম এত বেশী যে, লোক তাহাও অল্প পরিমাণে কিনিতে বাধ্য হয়। আলুর ত কথাই নাই। খাদ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে কোন সময়েই বাংলা দেশে আলুর খুচরা মণের দাম ১৫ টাকার বেশী হইবে না—কিন্তু আমরা গত কয় মাস ধরিয়া ২০।২২ টাকা মণ দরে আলু কিনিতে বাধ্য হইতেছি। এই সে দিনও মুখ্য-মন্ত্রী বলিয়াছেন—কয়েকজন আড়তদারের জন্য কলিকাতার বাজারে মাছের দাম কম হয় না—কিন্তু তাহারও কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা হয় নাই। মোটের উপর সকল দিক দিয়া সাধারণ দরিদ্র মানুষ জীবন-যাত্রা সমস্যায় জর্জরিত—সরকার যদি উহার প্রতিবিধানে চেষ্টিত না হন, তবে লোকের সরকারের উপর কিরূপে আস্থা থাকিবে? আমরা মাত্র কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সুপারী, লঙ্কা, নারিকেল তৈল, কয়লা প্রভৃতি বহু জিনিষ সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়।

ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সুধীবৃন্দ
(গত সংখ্যায় সাময়িকীতে এ সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে)

ভারতের বিপদাশঙ্কা—

১০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান—দুইটি বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তান আবার—পূর্ব ও পশ্চিম—দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ—পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তান। কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্গত। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানের একদল অধিবাসী বলপূর্বক কাশ্মীরের একাংশ দখল করে—অপরাংশ কাশ্মীর ভারতের মধ্যে থাকিয়া যায়। তাহাই ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ঐ রাজ্যের যে অংশ আজ 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পরিচিত—তথায় এখন কোন শাসনযন্ত্র নাই—পাকিস্তানীদের জবর দখলে থাকিয়া ঐ অংশের অধিবাসীরা এই দশ বৎসর ধরিয়া অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য বহুবার বহু প্রকারে রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করা হইয়াছে—রাষ্ট্রসংঘের পরিচালকগণ ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য বহু প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন—কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোন প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

এই ১০ বৎসরে বহুবার ভারত ও পাকিস্তানের বহু সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় রাষ্ট্রের নেতারা ও কর্মীরা মিলিত হইয়াছেন—কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই। ভারত-রাষ্ট্রে কোন মিলন বৈঠক বসিলে পাকিস্তানের নেতারা যে সকল বিষয়ে সম্মতি দান করেন, অল্পকাল পরে পাকিস্তানে মিলন-বৈঠক বসিলে তাঁহারা সে সকল প্রস্তাবে অসম্মত হন। এইভাবে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া দিন কাটিতেছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়ক শ্রীজহরলাল নেহরু সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসুক—পৃথিবীর বুকে যে কোন দেশে অশান্তি উপস্থিত হইলে শ্রীনেহরুকে মধ্যস্থ মানা হয় ও শ্রীনেহরু তথায় যাইয়া বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেন। কাজেই রাষ্ট্রসংঘে নির্ভর না করিয়া শ্রীনেহরুর পক্ষে পাকিস্তানের সহিত বিরোধ মীমাংসার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। প্রথম যথন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরের একাংশ জোর করিয়া দখল করে বা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—যথন পাকিস্তানের সৈন্যরা কাশ্মীরের একাংশে ভারতীয় সৈন্যগণকে প্রবেশ করিয়া শান্তি স্থাপনে বাধা দেয়—সে সময়ে শ্রীনেহরু বলপ্রয়োগ না করিয়া বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের গোচরীভূত করেন—ইহা দ্বারা তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের শক্তির তুলনায় পাকিস্তানের শক্তি অনেক কম—তাহার উপর গত ১০ বৎসরেও পাকিস্তানের কোন স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম-পাকিস্তান বহুদূরবর্তী হওয়ায় উভয় অংশের অবস্থা বা চাহিদা এক নহে। ফলে কোন অংশের নেতারা শাসন ব্যবস্থায় অধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে, তাহা লইয়া বিরোধের মীমাংসা গত ১০ বৎসরেও সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তান নানা বিষয়ে শক্তিহীন বলিয়া গত ১০ বৎসর ধরিয়া—যথনই যে কোন প্রয়োজন হইয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে—ফলে পাকিস্তানের উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব কায়েম হইয়া আছে। পাকিস্তানের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া মার্কিণ সেনাবাহিনী আনয়ন করিয়া পাকিস্তানে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা না থাকায় আমেরিকা হইতে গত ১০ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তানকে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। পাকিস্তানে সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহের জন্য মার্কিণের মুখাপেক্ষী হইতে হয়—তথায় অধিক চাষের জমী নাই—কলকারখানা নাই—লোকের সংখ্যাও কম। পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু ও বহু মুসলমান অধিবাসী দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসায় পূর্ব-পাকিস্তানে বহু চাষের জমী পতিত অবস্থায় থাকে—সেখানে খাদ্য উৎপন্ন না হওয়ায় পাকিস্তানকে প্রতি বৎসরই আমেরিকা হইতে প্রচুর চাল ও গম আমদানী করিতে হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিকাংশ জমী পাহাড়, জঙ্গল ও অসমতল—কাজেই সেখানে যেমন অধিবাসীর সংখ্যা কম—তেমনই উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণও অধিক নহে। ভারত ১০ বৎসরে যে ভাবে নিজ অংশকে উন্নত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছে, পাকিস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অর্থাভাব ও অভিজ্ঞ লোকের অভাবে সে ভাবে কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। আজও পাকিস্তানে কে অধিক শক্তি ও অধিকার পাইবে, তাহা লইয়া রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি চলিতেছে। ইহার ফলে একদল স্বার্থান্ধ লোক—নিজেদের সুখসুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই ভারতের উপর হামলা করিয়া ভারতীয় জনগণের জিনিষপত্র লুঠপাঠ করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়া থাকে—ইহা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। সামান্য চুরি-ডাকাতির মত এই সকল ব্যাপারকে উপেক্ষা করা ছাড়া ভারতের উপায়ান্তর নাই। ঐ সকল দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলে শাস্তি ভোগ করে; পাকিস্তানে এমনই অরাজকতা যে ঐ সকল দুর্বৃত্তকে ধরিয়া দিলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন না। পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু বাস করে, তাহাদের গৃহে মুসলমানরা চুরি ডাকাতি করিলে পাকিস্তান সরকার, নিজেদের শক্তি-হীনতার জন্য, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে না। সম্প্রতি আমেরিকার নিকট বহু যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আজাদ কাশ্মীরে নানাপ্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিতেছেন। তথায় জোর করিয়া খাল কাটার চেষ্টা হয়—শান্তিকামী

অধিবাসীরা তাহাতে বাধা প্রদান করায় তাহাদের গ্রেপ্তার ও প্রহার করা হয়—বহু লোককে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। আজাদ কাশ্মীরে গত ১০ বৎসরে কোন শান্তিপূর্ণ স্থায়ী শাসন ছিল না—ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর যেমন সকল বিষয়ে অগ্রগতির পথে যাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের বহু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছে, আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসীরা সে সকল ব্যবস্থা ত পায় নাই—অধিকন্তু অরাজকতার ফলে দিন দিন অবনতির পথে যাওয়ায় অধিবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বার বার রাষ্ট্রসংঘে বিষয়টি জানাইয়া কোন ফল না হওয়ায় শ্রীনেহরু বর্তমানে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন—কাশ্মীর সমস্যা আজ শুধু শ্রীনেহরুর নহে, জগতের সকল শান্তিকামী দেশের ও শান্তিপ্রিয় রাজনীতিকের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করিয়া যদি আজাদ কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে তাহাদের বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে শ্রীনেহরুর পক্ষে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। অপর দিকে যদি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ—গত কয় মাস যেভাবে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে সেইভাবে—অশান্তি বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের ঐ অংশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ছাড়া শ্রীনেহরুর গত্যন্তর থাকে না। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জগৎ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়া কোন দেশই সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। রুশিয়ার সহিত আমেরিকার প্রকাশ্য বিরোধ না থাকিলেও একথা সর্বজনবিদিত যে, রুশিয়া আমেরিকার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত এবং আমেরিকা ও রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ভাল চক্ষুতে দেখিতেছে না। সমগ্র পৃথিবীর অপর সকল দেশ—রুশিয়া বা আমেরিকা—একটি দেশকে সমর্থন করিয়া থাকে। শুধু ভারতের নেতা শ্রীনেহরু রুশিয়া বা আমেরিকা কাহারও অন্যায় কার্য্য সমর্থন করেন না এবং পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী দেশসমূহ যাহাতে ভারতের মত—উভয় দেশকে সমানভাবে দেখিয়া কোন দলে না যান, সেজন্য শ্রীনেহরু সর্বদা চেষ্টা করেন। কিন্তু আমেরিকা কর্তৃক পাকিস্তানকে অবাধে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সাহায্যদানের ফলে ভারতকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যদিও মার্কিণ কর্তৃপক্ষ বার বার বলিতেছেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ দিয়াছে—অপরের দেশ যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, আমেরিকা তাহা সহ্য করিবে না—তথাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকার ঐ কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যত দিন না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়, অর্থাৎ কাশ্মীরের সমগ্র অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমগ্র কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা না করা হয় ততদিন কাশ্মীরে যে কোন সময়ে যুদ্ধারম্ভের আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। মার্কিণ সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাহা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত না করিয়া ভারতকে জয় করিবার জন্যই আজ অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে। মুসলমানগণ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া একাংশ অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রভুত্ব লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই—সমগ্র ভারতের কর্তৃত্ব লাভের জন্য তাহাদের মধ্যে লোভ ও লোলুপতা দেখা যাইতেছে। শ্রীনেহরু দেশ বিভাগে সম্মত হইয়াও সকল মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থায় সম্মত হন নাই—ফলে কয়েক কোটি মুসলমান এখনও ভারতরাষ্ট্রে বাস করিতেছে। সে জন্য ভারত আজ নিজকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীরা এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বুঝে না ও ভারতকে সে জন্য মর্য্যাদা দান করিতে চাহে না। ফলে আজ এই বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে সুবুদ্ধি জাগ্রত হউক এবং তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কারণ স্বরূপ না হইয়া তাঁহারা ভারতের সহিত আপোষ করিয়া শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্র উভয়ে সমানভাবে উন্নতি লাভ করিলে সমগ্র বিশ্ব তাহাদের সমৃদ্ধি দ্বারা উন্নত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ—

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ও বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন পাশ হইয়াছে—শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানে পঞ্চায়েৎ গঠন করা হইবে। ভারতীয় সংবিধান রচনার

সময় বলা হইয়াছে, গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া তাহার মারফত স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে শক্তি ও প্রাধিকার প্রদান করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী যে সর্বোদয় সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও গ্রামকেই শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া জন-পঞ্চায়েৎ গঠনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ক্রমে ভারত তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পঞ্চায়েৎ গঠনের সময় আইনটি সকলের জানা ও বুঝা প্রয়োজন। সম্প্রতি খ্যাত-নামা দেশ-সেবক ও এডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলা ভাষায় আইনটি প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বাংলা গ্রন্থের দাম সাড়ে তিন টাকা। যাঁহারা গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ গঠনের কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদের এই পুস্তকের একখণ্ড সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের প্রত্যেক নরনারী নিজকে শাসন-যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রেলপথ—

কলিকাতা ১১ গার্ডেন রীচ রোড হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব রেলের জনসম্পর্ক বিভাগের কর্তা শ্রীএ-কে মিত্র 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে' শীর্ষক এক-খানি ৩২ পৃষ্ঠা সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক-খানি রেলের উন্নতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত এবং তাহাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য্যের অন্যান্য হিসাবও প্রদত্ত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে—উন্নয়ন ও প্রাচুর্যের তীর্থ পথে রেলপথগুলির অংশ অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের প্রায় ১০ লক্ষ রেলকর্মিদের এ এক গৌরবময় দায়িত্বের অধিকার ও সুযোগ। এদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কর্মিদের দায়িত্ব বোধ হয় সব চেয়ে বেশী, কারণ আগামী ২।৩ বছরের পরিসরের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান যানবাহন চলাচলের মধ্যে রেলপথকে সর্বাংশে সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ও প্রস্তুত করতে হবে, যাতে সমস্ত উৎপাদিত যানবহরের কাজে কোন কিছু বাধা উপস্থিত না হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঅমিয় বসু বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—পাঠক পাঠিকাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁহারা ইহাতে পাইবেন। আমরা দেশের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের এই বই একখানা করে সংগ্রহ কর্তে অনুরোধ করি। উহা পাঠে অনেক অজানা খবর জানিয়া পাঠক উপকৃত হইবেন।

সুপণ্ডিত শিক্ষাব্রতী সম্মানিত—

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ সম্প্রতি কাম্বোডিয়ার পনম্পেন (phnom penh) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল
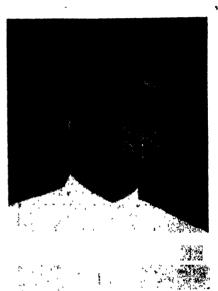
ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ

রিলেসন্স কর্তৃক তাঁহাকে এই কার্য্যভার প্রদান করা হইয়াছে। তিনি সুপণ্ডিত ও প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ভার যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সর্বপ্রকার সাফল্যকামনা করি।

পাটকল শ্রমিক—

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটে প্রায় শতাধিক পাটের কল আছে—তাহার শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। সম্প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের মত এখানেও কল-সমূহে নূতন নূতন যন্ত্র আমদানী করা হইতেছে ও তাহার ফলে গত প্রায় এক বৎসর ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে ২।৪ হাজার করিয়া শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ

অন্য প্রদেশের শ্রমিক অশিক্ষিত—কলের মালিকগণ তাহাদের প্রাপ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার জন্য সকল প্রকার জাল-জুয়াচুরির নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। কারখানা-বহুল অঞ্চলে নিত্য হাহাকার বাড়িতেছে—এমনই কলিকাতা ও সহরতলী খুব বেশী সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন করায় বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল—তাহার উপর চটকলগুলিতে ছাঁটাই-এর ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এ সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। চারিদিকে ছোট শিল্প বা কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে জন্য যেরূপ ত্যাগী, ধৈর্য্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী লোকের প্রয়োজন, দেশে তাহার অভাব খুব বেশী—কাজেই ছোট শিল্প বা কুটীরশিল্প সরকারী সাহায্যের আশা বা প্রতিশ্রুতি থাকা সত্বেও আশানুরূপ বাড়িতেছে না। এ বিষয়ে সরকারী প্রচারও যেমন পর্য্যাপ্ত নহে—দেশের শিক্ষিত, ধনী তরুণদের আগ্রহও সেরূপ অধিক নহে। আমরা এ বিষয়ে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

কুমারী দীপালি সান্যাল। ইনি এবৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাস করিয়াছেন

শিল্প-সংকট—

দেশে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের মূল্য ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায় বেতনভোগী শ্রমিকের দুঃখও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই সর্বত্র আজ শ্রমিক-মালিক বিরোধ অধিকতর ব্যাপক ভাবে দেখা যাইতেছে। সরকারী শ্রমিক-কল্যাণ আইন সমূহ এ বিষয়ে বড় বড় কলকারখানা গুলিকে অধিকতর উদারভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু আইন প্রণীত হইলেও তাহা মান্য করা অধিকাংশ লোকই প্রয়োজন বলিয়া মনে করে না। ফলে সহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে অসন্তোষ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিত্যই বাড়িয়া যাইতেছে। সর্বত্র শ্রমিকগণ অধিকতর বেতনের দাবী করিয়া ধর্মঘট করিতেছে, অবস্থান ধর্মঘট করিতেছে বা একদিনের জন্য কাজ বন্ধ করিয়া ধর্মঘটের হুমকী দিতেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল—মালিকগণকে বর্তমানে তাহা উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে। শ্রীজহরলাল নেহরু-শাসিত ভারতের শাসনযন্ত্র পূর্বেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়াছে—কাজেই সরকারী আইনগুলি পূর্বের মত করিয়া ধনিকের স্বার্থরক্ষা করে না—শ্রমিকের কল্যাণের জন্য আইনে অধিক ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ সকলেই স্বীকার করিবে যে, ধনিককে রক্ষা করা যতটা প্রয়োজনীয়, ততটা গুরুত্ব দিয়াই শ্রমিকের কল্যাণসাধন দরকার—নচেৎ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে কিছুতেই উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

স্বনামধন্য দেশসেবক ও বিপ্লবী নেতা, হুগলী উত্তরপাড়া নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা আগষ্ট বুধবার দ্বিপ্রহরে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও বি-এ পাশ করিয়া বিপ্লব-আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন—পরে আবার তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা আইনে আটক ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন এবং বোমার মামলার রায়ে যখন কর্মীরা আন্দামানে নির্বাসিত হন, তখন অমরেন্দ্রনাথ পুলিসের হাত এড়াইয়া দীর্ঘকাল ভারতের বনেজঙ্গলে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় আইন সভার কিছুকাল সদস্য ছিলেন। তিনি তিনখণ্ডে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ধনী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত

পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি দেশের মুক্তি কামনায় সারা জীবন দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই আদর্শ ভারতের জনগণকে তাহাদের সকল সংগ্রামে প্রেরণা দান করিবে।

৭২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সংবর্ধিত হন। চিত্রে শ্রীমণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, ভাষণরত নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীফণীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় দৃশ্যমান।

মাছের মূল্য বৃদ্ধির কারণ—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতা আউট্রাম ঘাটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৮টি জেলে-ডিঙি ও একটি মোটর চালিত নৌকা জলে ভাসাইবার উৎসবে বলিয়াছেন—মাছের আড়তদাররা মৎস্যজীবীও মৎস্যভোজী জনসাধারণকে বঞ্চিত করিতেছে। এই আড়ত-দারেরা সংখ্যায় ১০।১২ জনের বেশী নহে। আড়দারেরা জেলেদের দাদন দেয় ও বিনিময়ে তাহাদের সমস্ত মাছ লইয়া যায়। ফলে একদিকে মৎস্যজীবীরা কম দাম পায়, অন্য দিকে বিক্রয়ের সময় মাছের দাম জোর করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হয়।' এই সংবাদ পাঠ করিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। ডাক্তার রায় নিশ্চয়ই ঐ ১০।১২ জন আড়তদারের নাম জানেন। যাহাদের দুর্নীতির ফলে সারা দক্ষিণ বাংলার লোক বেশী দামে মাছ কিনিতে বাধ্য হয়। ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে চালিত সরকার কেন তাহাদের দমন করেন না—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এ কথা বলিয়া ডাক্তার রায় মানুষকে সমালোচনার সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত সরকার কি সত্যই এত শক্তিহীন যে জানিয়াও তাঁহারা এই সামান্য ব্যাপারের প্রতিবিধান করিতে পারেন না।

হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—

অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী নাম—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ) গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রি ১১টার পর কলিকাতা হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে ট্রেণে বর্দ্ধমান ও আসনসোল ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিপ্লবী নেতা ✓উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ✓অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহকর্মীছিলেন। ১৯০৩ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ-দান করিয়া আলিপুর বোমার মামলায় দ্বীপান্তরিত হন ও ১৯২১ সালে মুক্তিলাভ করিয়া 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উপনিষদগুলি সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ, সহনশীলতা প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার জীবন-কথা রচিত হইলে তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগের তরুণের দল প্রেরণালাভ করিবে।

বরদাচরণ দত্ত রায়—

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বরদাচরণ দত্ত রায় গত ২৮শে আগষ্ট ৫৯ বৎসর বয়সে ৪৮।এ বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন সাংবাদিকের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেল্সম্যানসিপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও সমাজ-সেবক হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল।

হাসনাবাদ পর্য্যন্ত রেল—

কলিকাতার নিকটস্থ বারাসত হইতে বসিরহাট হইয়া হাসনাবাদ পর্য্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন ও সেজন্য বর্তমান বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করিলেই কাজ আরম্ভ হইবে। ঐ অঞ্চলের ছোট রেল বন্ধ হওয়ায় জনসাধারণকে অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। সত্বর হাসনাবাদ পর্য্যন্ত নূতন বড় রেল হইলে সুন্দরবনের ঐ অংশের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ বাড়িবে ও ঐ অঞ্চলের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইবে। কলিকাতার তরকারী, ফল, মাছ প্রভৃতির সমস্যা ক্রমশঃ দুরীভূত হইবে।

আমেরিকার নিকট ঋণ গ্রহণ—

স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের নিকট ঋণ পাইবার জন্য অর্থমন্ত্রী শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারীকে আমেরিকায় পাঠাইলেন। তিনি ওয়ার্লড্ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় যোগদান করিবার জন্য ওয়াশিংটন যাইয়া ৫০ হইতে ৬০ কোটি ডলার ঋণ প্রার্থনা করিবেন—ঐ টাকা দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পাদন করা হইবে। সকলের বিশ্বাস মার্কিণ ধনপতিরা সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। ঐ ঋণ না পাইলে ভারতের পক্ষে তাহার উন্নয়ন কার্য্যগুলি অব্যাহত রাখা কঠিন হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সরবরাহ—

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন গত ৭, ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর তিন দিন কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রভৃতি সকল নেতা ও কর্মীর সহিত খাদ্যসমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া খাদ্যাভাবের কারণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১০ই সেপ্টেম্বর জানা গিয়াছে—কেন্দ্রীয় সরকার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গকে ৮০ হাজার টন চাল দিয়া সাহায্য করিবেন। তাছাড়া প্রতি মাসে পশ্চিমবঙ্গকে ৫৫ হাজার টন করিয়া গমও প্রদান করা হইবে। পূজা ও পরবর্তী তিন মাসে তাহার উপর দৈনিক ২ শত টন করিয়া গম দেওয়া হইবে—ঐ গম রক্ষিত হইয়া অভাবের সময় ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে ৭৭ লক্ষ লোককে সপ্তাহে ১ সের চাল ও ১ সের গম দেওয়া হইতেছে ; ঐ ৭৭ লক্ষের মধ্যে ৩৭ লক্ষ কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে এবং বাকী ৪০ লক্ষ গ্রামে বাস করে। ঐরূপ আরও ২৩ লক্ষ লোককে চাল আটা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ভাবে চাল আটা দেওয়া হইলে, মনে হয়, পশ্চিমবাংলার খাদ্যাভাব কতকটা কমিয়া যাইবে।

কৃত্রিম সুতা তৈয়ারী কারখানা—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বজবজের নিকট বিরলাপুরে আঁশযুক্ত কৃত্রিম সুতা প্রস্তুত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। কাঠের খণ্ড হইতে পশ্চিম ভারতে নাগদা নামক স্থানে এই কৃত্রিম সুতা প্রস্তুত হয়। নূতন কারখানায় দিনে ১৪ হাজার পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইবে ও ৫ শত নূতন লোক তথায় কাজ পাইবে। এই ভাবে বহু নূতন শিল্প আরম্ভ করা হইলে দেশের বেকার সমস্যা কমিবে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা—

গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চাকরী প্রাপ্তি স্থানে (এম্প্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ) মোট ১৫ হাজার বেকার চাকরী পাইবার জন্য নাম লিখাইয়াছে। গত জুন মাসের শেষ দিনে পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ নাম-লেখা বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩৭৯৪১ জন। তন্মধ্যে ১৪৩ ডাক্তার (তন্মধ্যে ১৪ মহিলা), ৭৬ এঞ্জিনিয়ার ও ৪৯৭৬ গ্র্যাজুয়েট (তন্মধ্যে ১৭৬ মহিলা)। তাহাদের মধ্যে ৯২৭৩২ বালকবালিকা ম্যাট্রিকও পাশ করে নাই। ম্যাট্রিকুলেটের সংখ্যা ২৬৫-৬২ তন্মধ্যে ১১৬৭ জন মহিলা। এই সংখ্যা হইতে দেশের

ফুলের মত.
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
RP. 150-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

বর্তমান অবস্থা বুঝা যায়। নাম লেখান নাই, এরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে।

চৈৎরাম গিদওয়ানী—

নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ডাঃ চৈৎরাম গিদওয়ানী গত ১২ই সেপ্টেম্বর বোম্বায়ে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে সিন্ধু হায়দ্রাবাদে তাহার জন্ম—১৯১০ সাল হইতে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন—২৫ বৎসর তিনি সিন্ধু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাঙ্গেরী দর্শন—

হাঙ্গেরী সরকার ভারতের তিনজন প্রতিনিধিকে এক সপ্তাহের জন্য হাঙ্গেরীতে যাইয়া সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। রাজ্য সভার স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু, লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীএস-সি-কাসলিওয়ান ও লোকসভার পি-এস-পি সদস্য শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা লণ্ডনে আন্ত-পার্লামেণ্টারী ইউনিয়নের সম্মেলনেও যোগদান করিবেন।

উড়িষ্যায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

৭ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না নয়া দিল্লীতে এক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন—উড়িষ্যার মালকানগিরির নিকট ৩০ হাজার একর পরিমিত এক প্রকাণ্ড ভূমি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পাওয়া গিয়াছে। এখনই সেখানে লোক লইয়া যাওয়া চলিবে। দণ্ডকারণ্যেও প্রথমে ৫ শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে লইয়া গিয়া কাজ আরম্ভের ব্যবস্থা হইবে। যত শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গ হইতে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, ততই মঙ্গলের কথা। কারণ স্থানাভাবে পশ্চিমবঙ্গে;লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু অকালে প্রাণ হারাইতেছে।

গেঁওয়াখালিতে নূতন বন্দর—

ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলিকাতাকে বাণিজ্যের উপযোগী, জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না—ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য মেদিনীপুর জেলা গেঁওয়াখালিতে একটি অতিরিক্ত ছোট বন্দর তৈয়ার করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে কলিকাতা বন্দরে প্রবেশে নদীর বুকে জলের তলায় ১৪টি বালি চর অতিক্রম করিতে হয়। মাটি-কাটা জাহাজের দ্বারা ১২ মাসই ঐগুলি কাটিয়া গভীর করিলেও আবার ভরাট হইয়া যায়। গেঁওয়াখালিতে ঐ অসুবিধা নাই ২৪।২৫ মাইল রেলপথ তৈয়ার করিলে গেঁওয়াখালি যাওয়া যাইবে। সে জন্য এই নূতন ব্যবস্থায় সরকার মনোযোগী হইয়াছেন।

তমলুকে হলুদে বৃষ্টি—

গত ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার মেদিনীপুর জেলার তমলুকে এক পসলা হলুদে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ছাদ ও যে সকল কাপড় বাহিরে ছিল, সব হলুদের রং ধারণ করিয়াছে। সহরের উত্তরাংশে মাত্র কিছুক্ষণ এই বৃষ্টি হইয়াছে। ঐ দিন সমস্ত দিনই তমলুকে মুশলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। ব্যাপারটি অদ্ভুত বটে।

বিধান-পরিষদ-সংবাদ—

অন্ধ্র রাজ্যে কোন বিধান পরিষদ ছিল না। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর লোকসভায় অন্ধ্র রাজ্যে ৯০ সদস্য বিশিষ্ট এক নূতন বিধান-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত ৮টি রাজ্যে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) পশ্চিমবঙ্গ—৫১ স্থলে ৭৫ (২) উত্তর প্রদেশ ৭২ স্থলে ১০৮ (৩) বোম্বাই ৭২ স্থানে ১০৮ (৪) বিহার ৭২ স্থানে ৯৬ (৫) মধ্যপ্রদেশ ৭২ স্থানে ৯০ (৬) মহীশূর ৫২ স্থানে ৬৩ (৭) মাদ্রাজ ৫০ স্থানে ৬৩ ও (৮) পাঞ্জাব ৪০ স্থানে ৫১। সংবিধান সৃষ্টির পর রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হওয়ায় এই ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের অভিনন্দন—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের ৬৯বৎসর বয়স হইয়াছে। সেজন্য ঐদিন তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রভৃতি বহু

নেতা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ দার্শনিক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করুন, সকলেই তাহা প্রার্থনা করে।

কলিকাতা-ধাপার জমি—

কলিকাতার নিকট ধাপার ৩১০০ বিঘা জমী কলিকাতার করদাতাদের—কিন্তু ঐ জমীর লাভের সামান্য অংশ করদাতারা পায়। ২৫ শত বিঘা জমীতে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের ভুট্টা, ফুলকপি, বেগুন, লাউ অন্যান্য তরকারী জন্মে। চাষীরা ২০ লক্ষ টাকা খাজনা দেয়—তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা এজেণ্টরা পাইয়া থাকে। করদাতারা বা পৌর প্রতিষ্ঠান বৎসরে ২৪০১৬ টাকা খাজনা পায়। ধাপা অঞ্চল ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত—কলিকাতার মধ্যে নহে। ইজারাদার সেনবাবুরা—কিন্তু তাহাদের পাওনা কম—তাহাদের এজেণ্টই অধিক লাভ করিয়া থাকে। এখন উত্তরদিকের লবণ হ্রদ ভরাট করিয়া সেখানে সহর বসানো হইবে—আবর্জনা ফেলার নূতন জমীর প্রয়োজন হইবে। এই ধাপা সমস্যা এখন কলিকাতা-বাসী সকলের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

সফল সন্ধ্যা

জসীমউদ্‌দীন

আজকে আকাশে কত রঙ আর কত খুশী আর হাসি,
বাতাসে ছড়ায়ে মেঘেতে গড়ায়ে উড়াইছে রাশি রাশি।
যত ভাল কথা যত মিঠে কথা রোদের গুঁড়ায় ঘুরি,
মেঘ হতে মেঘে রঙ হ'তে রঙে হেলায় দিতেছে ছুড়ি।
এত রঙ আমি কোথায় রাখিব, এত গান কি বা করি?
মেঘেই ধরেনা মেঘের রঙ যে
বাতাসের গান বাতাসেই আছে ভরি।
তুমি কি আজকে অধরে করিয়া
আজের রঙেরে কিছুটা রাখিবে মাখি,
বাতাসের গান আকাশের গান
আজিকে কিছুটা রাখিবে কণ্ঠে আঁকি?
ওই যে সুদূরে আঁধার করিয়া নামিছে রাতের ছায়া,
ও দু'টি আঁখির গহন তিমিরে মাখিবে তাহার মায়া।
রাতের মতন ঘুমের মতন জড়িত-জড়িমা ভরা
এমন মরণ-নিবিড় শান্তি সকল শ্রান্তিহরা।
তোমার আমার স্নেহ মমতার গড়িয়া সে সুখনীড়,
সে মহাশান্তি রাখা যায় না কি করি চির মহাথির।

—তেরো—

এই মাত্র ভবিষ্যৎ 'গ্লোব-ট্রটার' রীতেন দি গ্রেটার তার মোটর সাইকেলে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন জে কে রায়। একটা ছেলেও মানুষ হল না।

রীতনকে প্রশ্রয় অবশ্য অল্প-বিস্তর বরাবরই দিয়ে এসেছেন, কিন্তু হিতেন? সে যে এমন হয়ে যাবে সে-কথা কোনোদিন কি ভেবেছিলেন? ব্যারিস্টার হতে গিয়ে বাঁদর হবে, তারপর ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে তার ফলের দোকানে সেল্‌স্‌ম্যানের চাকরি করবে—এমন আশঙ্কা কে কবে করেছিল?

গেটের গায়ে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে জে-কে রায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কী ক্লান্তি—কী ক্লান্তি সারা শরীরে! রিটায়ার করবার আগে কোনোদিন বুঝতে পারেননি, শরীর মনে তিনি এমন করে ফুরিয়ে গেছেন। অফিস থেকে ফুলের মালা গলায় পরে পথে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই—বুঝলেন আজ থেকে কোথাও তাঁর কোনো দাম রইলনা। দু'দিন আগেও মনে হত—পৃথিবীতে অনেক-গুলো কাজের জন্যে তিনি অপরিহার্য, এখন থেকে মনে হল, মিথ্যেই ভার সৃষ্টি করেছেন। এখন আর তিনি কোথাও নেই।

না:—রিটায়ার করার পরে মানুষের আর বাঁচা উচিত নয়।

কিছুই রেখে যেতে পারলেন না এই বাড়ী ছাড়া। তাঁর মৃত্যুর পরে বনশ্রী নিজের চাকরি-বাকরি দিয়ে একরকম চালিয়ে নেবে, কিন্তু কী দশা হবে রীতেনের? এই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাবুয়ানার খরচ তার জোগাবে কে? রী[illegible] ভবিষ্যৎ পরিণাম চোখের সামনে প্রায় স্পষ্টই [illegible] পাচ্ছেন জে কে রায়। বাড়ীটা বিক্রী করে দেবে, টাকা হাতে পেয়ে পরমানন্দে সেগুলো ওড়াবে কি[illegible] তারপর নেমে পড়বে রাস্তায়। চুরি জুয়াচুরি ঠ[illegible] করে বেড়াবে, হয়তো জেলও খাটবে। চমৎকার!

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে জে-কে রায়ের পড়তে লাগল, ঠাকুর্দা মধ্যে মধ্যে যজমানী করতেন। বাবা তখনও কালতীতে পশার করেছেন; রাগ করে বল[illegible] 'কেন ওসব আর করে বেড়াও বাবা—আমাদের থাকে না।' ঠাকুর্দা হেসে জবাব দিতেন, 'বলিস বামুনের ছেলে হয়ে যজমানী করতে অপমান হবে! আমাদের কত বড় অধিকার সেটা ভাবছিস্ না?'

জে-কে, রায় ভাবলেন, ছেলে দুটোকে কলেজে না করে যদি পুরুতগিরি শেখাতেন তা হলেও এর চা[illegible] ভালো হত। এই বালীগঞ্জেই পুরুতের টানাটানি—[illegible] পার্বণের সময় একজনকে নাকি জোগাড় করাই [illegible] বেশ করে খেতে পারত। আর ঠাকুর্দার কথাই [illegible] বামুনের ছেলের যজমানীতে লজ্জা কিসের!

কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রণাম করল [illegible] হাত দিয়ে। জে-কে রায় চমকে উঠলেন।

—কে?

—আমাকে চিনতে পারলেন না?

ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন জে-কে রা[illegible] মনটাকে গুছিয়ে আনতে একটু সময় লাগল।

—তুমি সত্যজিৎ না?

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ঝিকিমিকি

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অনেকদিন পরে এলে এদিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।
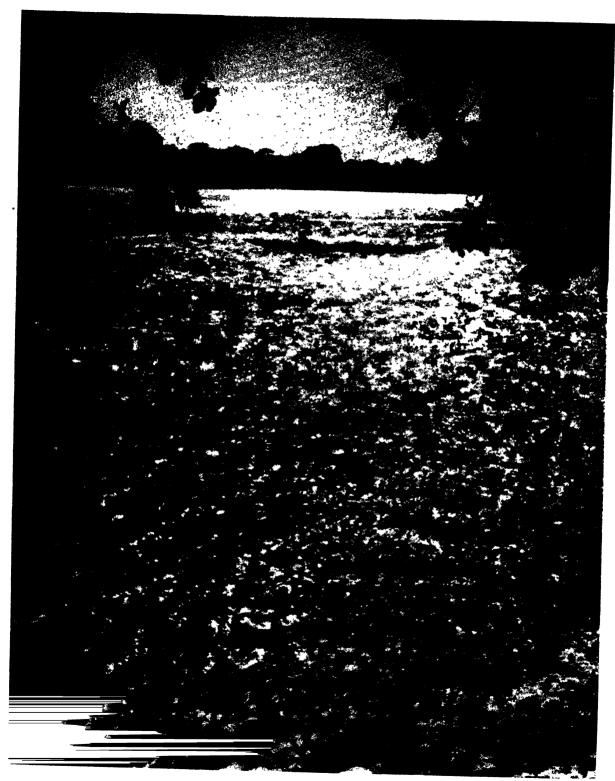
—তোমার বাবা কেমন আছেন আজকাল ?

সত্যজিতের মুখে ছায়া পড়ল : বিশেষ ভালো নেই, একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে দিনকয়েক আগে।

—স্ট্রোক ?—মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করে রইলেন জে কে রায়। ছুটির বাঁশি বাজছে। তাঁদের সকলেরই। দু'দিন আগে পরে। তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু একটা ছেলেও যদি মানুষ হত !

নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, ভেতরে যাও—বনশ্রী আছে।

—আপনি বেরুচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি লেকের দিক থেকে।—শান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, জানোই তো, বয়েস হয়েছে। বিকেলে দু এক পা হেঁটে না এলে রাতে আবার ক্ষিদে হয়না। যাও—ভেতরে যাও—

তারপর নিজেই রাস্তায় নামলেন। ক্লান্তভাবে হেঁটে চললেন সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের দিকে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল সত্যজিৎ। জে-কে রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। গালে প্রকাণ্ড বর্মাঠাসা সেই টিপিক্যাল্ ব্যুরোক্র্যাট্—সেই ইংরিজি ধরণে বাংলা উচ্চারণ, সেই 'ওয়েল মাই ডিয়ার বয়', সেই জামা-কাপড়ের কড়া ক্রীজ্। জে-কে রায় বদলে গেছেন। যেমন বদলে গেছেন বাবা—বদলে গেছেন অক্ষয় ঘোষচৌধুরী।

একটা নিশ্বাস ফেলে সে বসবার ঘরে এসে ঢুকল। কেউ নেই। একদিন এ ঘরে পা দিতে তার বুক দুরু দুরু করত, গালে বর্মা চুরুট লাগানো জে-কে রায়কে দেখে তার ভয় করত, টেনিস্ র‍্যাকেট্ হাতে করে জিতেন যখন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যেত, তখন নিজেকে ভারী গ্রাম্য আর অমার্জিত বলে মনে হত। তা ছাড়াও একটু পরেই আসবে বনশ্রী, যে তার চোখে রঙ লাগিয়েছে আর মনে ধরিয়েছে নেশা—যে সেদিন তার ইণ্টেলেক্চুয়্যাল কম্প্যানিয়ন। সেই বনশ্রী সামনে এসে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাতেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যেত, শিরশির করত শরীর।

আজ আর সে সব কিছু নেই। জে-কে রায় বুড়িয়ে গেছেন; বনশ্রীর বয়েস বেড়েছে—সে আরো অসংখ্য চাকুরে মেয়েদের একজন মাত্র। এখন আর রাত জেগে সে কাব্য পড়েনা—হয়তো পরীক্ষার খাতা দেখে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতেই একটা সোফায় বসে পড়ল সত্যজিৎ। সামনে একটা কাচের আলমারিতে সারি সারি 'রবীন্দ্র রচনাবলী'—সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই তার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
　পড়ত ব'সে "ওড্ স্ টু নাইটিঙ্গেল"—
···বরষ কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
　মরীচিকার পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা সেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির—"

অযোধ্যা এসে হাজির হল।

—এই যে সত্যবাবু—কেমন আছেন ?—এক মুখ হেসে আপ্যায়ন করল অযোধ্যা। অযোধ্যার মাথার চুলও পাকা হয়ে গেছে, সত্যজিতের চোখ এড়ালোনা।

—আছি একরকম, তোমাদের খবর ভালো ?

—আমাদের খবর আর কী থাকবে—বড়দাদাবাবুর ব্যাপার সবই তো জানেন। বাবুর শরীর মেজাজ সবই খারাপ। মা মরে যাওয়ার পরেই সংসারে কী যে হয়ে গেল !—অযোধ্যা অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যজিৎ ভাবল, এইখানে তার সঙ্গে বনশ্রীর মিল আছে। তারও মা নেই। কিন্তু মা-র কথা যতটুকু মনে পড়ে—তাতে বাবার সংসারে তাঁর কোনো ভূমিকাই ছিল না। একান্ত স্বল্পভাষিণী ছায়ামূর্তির মতো মা কখন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছেন নিঃশব্দে।

অযোধ্যা বললে, আপনি একটু বসুন। দিদিমণি স্নান করছে, এখনি আসবে।

—আমি বসছি, তুমি যাও।

বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আলোটা জ্বেলে

দিনের পুরোনো পরিচিত ঘরটাকে চোখ মেলে দেখতে লাগল অযোধ্যা। যতদূর মনে পড়ে, দু-একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র ছাড়া সবই সেই রকমই আছে। পরিবর্তনের ভেতরে সোফার আবরণ জীর্ণ হয়েছে, আল্‌মারীর কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে, দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথার ওপর ধুলো জমেছে, জে-কে রায়ের চাকরি জীবনের কোনো সুখস্মৃতি একখানা গ্রুপ ফোটোগ্রাফের কাচে ফাট ধরেছে। আর ওপাশে একটা জাপানী ফুলদানিতে সব সময়েই কিছু ফুল থাকত—সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

বয়েস হয়েছে—ঘরটারও বয়েস হয়েছে। জীর্ণতার ছাপ। সত্যজিৎ ভাবল, তারও বয়েস বেড়ে গেছে। তাই এ ঘরের ভেতরে বসেও সেদিনের কোনো অনুষঙ্গ তার মনকে চঞ্চল করে তুলছে না। কিন্তু পূরবী—

ওদিকের পর্দাটা যেন হাওয়ায় একটুখানি সরে গেল। ঢুকল বনশ্রী।

—তুমি এসে গেছ?—প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল বনশ্রী।

—তুমি তো পাঁচটাতেই আসতে বলেছিলে।

—তা বলেছিলুম। তাই বলে তুমি এত পাংচুয়াল হবে সে ভাবিনি।—বনশ্রী এসে মুখোমুখি বসল।

—অধ্যাপনা করে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করে ফেলেছি—হাসিমুখে সত্যজিৎ জবাব দিলে। সত্যি, এই মুহূর্তে ঘরটা যেন তার বহুদিনের জীর্ণ বিষণ্ণতাকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠেছে। জে-কে রায়ের মেয়ে হয়েও বনশ্রী চুল ছেঁটে এখনো ফাঁপিয়ে তোলেনি—বোধ হয় স্কুলে মাস্টারি করে বলেই। কিন্তু ভিজে চুল মেলে দিয়ে এই যে সামনে এসে বসেছে—কী যে আশ্চর্য লাগছে ওকে দেখতে। এখনো এত চুল আছে বনশ্রীর—এত রাশি রাশি নিবিড় কোঁকড়ানো চুল। গায়ের অতিরিক্ত ফর্সা রঙের জন্যে চুলটা একটু লালচে—কিন্তু সেই লালের ছোঁয়াটুকু যেন আভার মতোই জড়িয়ে আছে। এই মাত্র স্নান-করা শরীরের সুগন্ধ, চুলের অরণ্য পরণের নীলাম্বরী শাড়ী—এরা সব মিলিয়ে শান্ত, সুরভিত একটা শীতল গভীরতায় সত্যজিৎকে মগ্ন করতে লাগল।

বনশ্রীর সঙ্গে সেদিন এত সহজে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল কেন? কেন দু-জনে দু-জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল? কোনো কারণ ছিল না, ভুল বোঝবার অবকাশও ঘটেনি—তবু ওরা আলাদা হয়ে গেল। অন্তত নিজের দিক থেকে সে বলতে পারে, এর মধ্যে বনশ্রীর জন্যে কোনো আকুলতা সে বোধ করেই নি—মনে করেনি বনশ্রীকে। আর বনশ্রীও যে তার কথা কখনো ভেবেছে, তেমন অনুমান করারও কোনো কারণ নেই। হয়তো সে যেমন পূরবীকে চেয়েছে, বনশ্রীও তেম্‌নি ভাবেই—

সম্ভাবনাটা তাকে খোঁচা মারল। অকারণ 'জেলাসি।'

বনশ্রী অনুভব করছিল, অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে আছে। কেমন অপ্রতিভ লাগল।

—তোমার কাজের ক্ষতি করিনি বোধ হয়?

—না।—সত্যজিৎও সহজ হতে চাইল: আজ বিকেলে সে-রকম কিছু কাজের দায় ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ ডেকে পাঠালে যে?

—কেন, তোমাকে ডাকতে পারিনা আমি?—বনশ্রী নিজের মধ্যে সংহত হয়ে এল।

—নিশ্চয়ই পারো।—সত্যজিৎ হাসল: তা বলিনি। যে-ভাবে দূত পাঠিয়েছিলে তাতে মনে হল কোনো জরুরি কাজ কিছু আছে।

কয়েক বছর আগে হলে বনশ্রী বলত, কোনো কাজ না থাকলেই যখন কেউ কাউকে ডেকে পাঠায়—তখন সে ডাকের যে কত বড় অর্থ আছে, তা কি তোমার জানা নেই? কিন্তু স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস্ বনশ্রী সে-কথা বলতে পারল না। কেবল বললে, বিনা কাজেও আমি তোমাকে বিরক্ত করতে পারি। জরুরি তাগিদ পাঠাতে পারি।

—সবই পারো। কিন্তু তুমি নিজে তো এখন সিরিয়াস মানুষ। এ সব লঘুতা তোমার নিজেরই ভালো লাগবে না। তোমার এখন সব রুটিনে বাঁধা—নিজের রসিকতায় সত্যজিৎ পুলকিত হল।

কিন্তু বনশ্রীকে কেমন আঘাত করল কথাটা। চকিতে নিজের সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল সে। স্নানের পরে আজ সে যেন একটু বেশি মাত্রায় প্রসাধন করেছে, কপালে পরেছে কুম্‌কুমের টীপ, বেছে নিয়েছে নীল শাড়ী। এক মুহূর্তে বনশ্রীর মনে হল, আজ সে সত্যিই সিরিয়াস্ মানুষ—এসব লঘুতা আর তাকে মানায় না। বহুদিন পরে এই বাড়ীতে সত্যজিৎ আসবে—এই কথাটাই তাকে যেন নেশার

মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, বিভ্রম ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্যে, অনেক দিন আগে যা ছিল তাই হতে চেয়েছিল আর একবার। কিন্তু বনশ্রী ভুলে গিয়েছিল, নিজেকে কখনো নকল করা যায় না; সেটা সংসারের সব চাইতে বিশ্রী প্যারডি—বীভৎস আত্মাবমাননা।

ঠিকই বলেছে সত্যজিৎ। আজ আর কোনো বাহুল্য শোভা পায় না তাকে—কোনো রঙ তাকে মানায় না। অদ্ভুত এক বর্ণহীনতার প্রশান্তিতে সে এখন পৌঁছে গেছে; এখন এই ঘর নিতান্তই বসবার ঘর, এখন জানলা বেয়ে ওঠা ওই ফুলের লতাটা আর কোনো অর্থ বহন করে না, এখন বাইরে বর্ষার নটমল্লার বাজলে বনশ্রী হয়তো সত্যজিৎকেই বলবে: জানলাটা বন্ধ করে দাও—ঠাণ্ডা আসছে, আমার আবার সর্দির ধাত!

নিজের নীল শাড়ী আর প্রসাধন তাকে লজ্জা দিতে লাগল। সম্ভব হলে, উঠে গিয়ে মুছে ফেলত মুখের মৃদু পাউডারের প্রলেপন, বদলে আসত শাড়ীখানা। কিন্তু সে উপায় আর নেই।

বনশ্রী বললে, হাঁ, একটু কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। একটু সাহায্য করতে হবে।—গলার স্বরে বিন্দুমাত্র জড়তা সে আর রাখল না, আকস্মিক মোহভঙ্গের ফলেই যেন সেটা কেমন রুক্ষ শোনালো। অল্প একটু বিস্মিত হল সত্যজিৎ, কী যেন একটা সন্দেহও করে অস্পষ্ট ভাবে—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না।

—কী কাজ?

—বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।—নিজের লজ্জার ওপর সৌজন্যের আবরণ টেনে বনশ্রী বললে, এত তাড়া-হুড়ো কেন? চা খেতে ডেকেছি, আগে চা-টা খাও।

অযোধ্যা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এল। চায়ের সঙ্গে রাশীকৃত খাবার।

সত্যজিৎ বললে, এমন তো কথা ছিল না।

—মানে?

—আমি চা খেতে এসেছি। ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে তা জানতুম না।

মুহূর্তের জন্যে নিজের অস্বস্তি ভুলে গেল বনশ্রী। হেসে ফেলল।

—তুমি সেই রকমই আছো দেখছি। কিছুই বদলাওনি?

—তুমিই বুঝি বদলেছো?—সত্যজিৎ বনশ্রীর চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে: তোমারও তো তেম্‌নি পাগলামি এখনো আছে। মানুষকে খাওয়াতে গেলেই তাকে রাক্ষস ঠাউরে বসে থাকো।

তুমিও বদলাওনি। রক্তে আবার ঢেউ উঠল বনশ্রীর। আবার একটুখানি লজ্জা এসে তার মুখকে রাঙিয়ে দিলে। কিন্তু এবারে অন্য কারণ ছিল।

বনশ্রী বললে, হয়েছে, বাজে কথা বন্ধ করো। খাও এখন।

—তথাস্তু।—সত্যজিৎ খাবারের প্লেট্ টেনে নিলে নিজের দিকে। ক্রমশঃ

মেয়েদের কথা
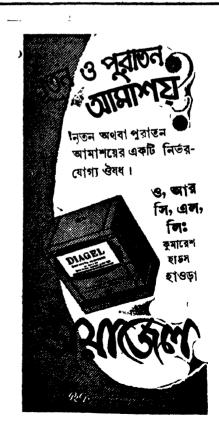
হিন্দু কোড্ বিল ও পারিবারিক শান্তি প্রসঙ্গে আলোচনার সমালোচনা

প্রভাবতী ভট্টাচার্য

'ভারতবর্ষের' গত বাংলা তেষট্টির ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি"র সমালোচনা করেছেন শ্রীযুক্তা মমতাময়ী দেবী ভারতবর্ষের চৈত্র সংখ্যায়। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

আমি যদিও মমতাময়ী দেবীর লেখাটিকে সমালোচনা আখ্যাই দিলাম কিন্তু ওটি সত্যিকারের সমালোচনা হয়নি। যে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তিনি আলোচনার ভেতরে, তার প্রত্যেকটি যুক্তি ও উদাহরণ সহকারে আমার প্রবন্ধে নিবদ্ধ আছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে তাঁর পড়বারও ধৈর্য হয়নি। শুধু কয়েকটি শব্দেই তিনি উত্তেজিত হ'য়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তাঁর এ যুক্তিহীন অন্ধ আলোচনার উপর পুনরায় সমালোচনা করবার আমার আর প্রবৃত্তি ছিল না—'ভারতবর্ষের' কয়েকজন পাঠকপাঠিকার বিশেষ অনুরোধেই আমি পুনরায় আমার প্রবন্ধের জাবর কাটতে বাধ্য হলাম।

লেখিকা তার আলোচনার মুখবন্ধেই বলেছেন—"এ বিষয়ে ব্যর্থকাম হইব বা সফলকাম হইব তাহা জানিনা, তবে মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সত্যের খাতিরে ইহার সামান্য কিছু আলোচনা করিতেছি।"

কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে যে তিনি আমার —"হিন্দু কোড্ বিল ও পারিবারিক শান্তি" প্রবন্ধটি আলোচনা করলেন এবং কোন্ সত্যের খাতিরে কী ভাবে সফলকাম হওয়ার আশা পোষণ করলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তাঁর আলোচনা পড়ে এটুকু বোধ-হ'ল যে তিনি হিন্দু কোড্ বিলের বিরোধী। গৌরীদান ও সতীদাহ প্রথার সমর্থক। বিধবা বিবাহ আইন তাঁর অপছন্দ এবং নারীর চিরপরাধীনতা তাঁর যুক্তিতে কল্যাণকর। সুতরাং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মঙ্গলকাম হ'তে হ'লে তাঁকে প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড বেণ্টিকের সঙ্গে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন যাতে পাস না হ'তে পারে তার জন্য সংগ্রাম করা দরকার ছিল।

দ্বিতীয়বার সংগ্রাম করা উচিত ছিলো যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের সময়। আর একদফা পুণ্যশ্লোকা বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর সঙ্গেও। কারণ তিনিই গ্রামের শত শত বাল-বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হ'য়ে পুত্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—"ঈশ্বর তোদের শাস্ত্রে কি এদের জন্য কোন বিধানই নেই ?"

মাতৃভক্ত উদার-চেতা মানব-দরদী মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মায়ের নিকট হ'তে অনুপ্রেরণা পেয়েই শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের অজ্ঞাত পরাশর-সংহিতার আবিষ্কার করলেন—বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামী বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকলে, স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হলে, কিংবা স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে—সে নারী পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করতে পারবে।

হিন্দুকোড্ বিলে পরাশর সংহিতার এ বিধানটিকেই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করে হিন্দুবিবাহ আইনে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এতে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলদের 'গেল' 'গেল' বলে চীৎকার করবার কিছুই নেই।

মমতাময়ী দেবীর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সর্দা আইন প্রচলনের সময়ও প্রতিরোধ আন্দোলন করা দরকার ছিল। তাহলে গৌরীদান প্রথাটি অব্যাহত থাকত (অবশ্যই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সমাজের)। এ প্রসঙ্গে লেখিকাকে একথাটিও জানিয়ে দিই যে গৌরীদান প্রথা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রীয় প্রথা নহে। সাময়িক আত্মরক্ষার জন্যই একদা এর প্রচলন হ'য়ে পরে প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন ভারতে

স্বয়ম্বর প্রথার প্রচলন ছিল। আমরা রামায়ণ মহাভারত ও প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হ'তে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পেয়েছি। একটি বিরাট সভা হ'তে গুণাগুণ বিচার পূর্বক নিজের পতি নির্বাচন করে নেওয়া একটি কিশোরী বালিকার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এদ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৈদিক যুগে মেয়েদের পূর্ণবয়স্কা হলেই বিবাহ দেওয়া হতো।

লেখিকার সবশেষে সংগ্রাম করা উচিত ছিলো—হিন্দু কোড্ বিল পাস হওয়ার পূর্বে জাতীয় সরকারের সঙ্গে। গত ইং ১৯৫৬ সনের মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিন্দু বিবাহ ও হিন্দু উত্তরাধিকার দুটো বিল, পর পর পাস হ'য়ে গেছে। আমি হিন্দু কোড বিল্ আমাদের বর্তমান সমাজের পক্ষে কতটুকু প্রয়োজন এবং হিন্দু বিবাহ আইনে কি কি ধারা আছে তা নিয়ে "হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছি ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। আর মমতাময়ী দেবী তার প্রতিবাদ করলেন ১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে। সীতা সাবিত্রীর দেশের সর্বশেষ আইন হিন্দু বিবাহ আইন পাস হওয়ার এক বৎসর পরে এবং বিংশ শতাব্দীর এ মধ্যাহ্ণ প্রহরে আমার একটি প্রবন্ধের সমালোচনার ভেতর দিয়ে সতীদাহ থেকে শুরু করে বর্তমান হিন্দু কোড্ বিল্ পর্য্যন্ত প্রতিটি নারী কল্যাণ মূলক আইনের বিরোধিতা করে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য কতটুকু সফলকাম হয়েছে আমাকে দয়া করে জানাবেন কি?

মমতাময়ী দেবী তার আলোচনার প্রথম দফায়ই লিখেছেন—আমার প্রবন্ধেই নাকি তিনি প্রথম পাঠ করলেন যে পৃথিবীর সকল দেশেই নারীজাতির উপর অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো।

আমিও এই প্রথম এ ব্যাপারে একজন নারীর অজ্ঞতার পরিচয় পেলাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খবর না জানলেও নিজের দেশের সমাজ সম্পর্কে এত অজ্ঞ খুব কম মানুষই আছে। তিনি হয়তো সহরের উপর তলার সমাজে জন্মাবধি বাস করছেন—তাই গ্রাম্য সমাজের খবর রাখেন না। আজও যে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও দুর্বৃত্ত পুরুষের হাতে কত লক্ষ লক্ষ নারী প্রপীড়িত হচ্ছে সে খবর তাঁর প্রাচীন তালাবদ্ধ মনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করবে কেমন করে।

তারপর তিনি লিখেছেন যে—"আমাদের শাস্ত্রকারগণ নারীকে কখনই অমর্যাদাকর আসনে প্রতিষ্ঠা করেন নাই।"

আমি আমার প্রবন্ধের ভেতরে কখনও শাস্ত্রকারদের কথা উল্লেখ করিনি। আমি নারীদের নির্যাতনের ব্যাপারে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা ও পুরুষদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরই জোর দিয়েছি। তিনি লিখেছেন—অতীতের এ সকল কথার পুনরুল্লেখ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি না করাই ভাল। তিনি হয়তো জানেন না যে বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত নর-নারী মাত্রেই প্রত্যেক দেশের পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। রাশিয়ায় জারের আমলে যে নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে সে কথা কে না জানে?

মিসেস্ রুজভেল্টের আত্মজীবনী হতেও আমরা জানতে পারি—আমেরিকাতে পূর্বে নারী পুরুষে কী বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপেও তাই। রাজতন্ত্র চীনদেশেও নারীর উপর অন্যায় ব্যবহার কম করা হয়নি। আর ভারতবর্ষের সমাজ হতে তো আজও নারী নির্যাতন দূর হয়নি। আজও অনেক নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে বিলিয়ে দিতে হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। তার প্রমাণ কিছু-দিন পূর্বেও অনাথ আশ্রমগুলোর অন্ধকার কোণ হ'তেই সুস্পষ্ট দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। লেখিকা কি এতবড় খবর সম্বন্ধে অজ্ঞ!

তারপর তিনি বলেছেন—নারীজাতি অবলা, দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তারা দুর্বল, সুতরাং নারীকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা যদি কোন ব্যবস্থা করে থাকেন তাতে দুঃখের বা লজ্জার কারণ নেই।

তার এ কথা আজকের বিংশ শতাব্দীতে একেবারেই অচল। কারণ প্রকৃতপক্ষে দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল নয়। তাদের জীবনধারা প্রণালীই তাদের এতটা দুর্বল করে রেখেছে। তার প্রমাণ —যে সকল মেয়েরা ব্যায়াম বা খেলা-ধূলা করে তারা পুরুষের মতই শক্তিশালিনী হয় এবং যে মেয়েরা পুরুষদের মতো বাইরের জগতে চলাফেরা ও কাজকর্ম করে, তারা অন্তরপুরবাসিনী মেয়েদের চেয়ে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই অনেক বেশী শক্তি অর্জন করে এবং পুরুষদের মতই হয় আত্মরক্ষায় সমর্থা।

আমার মতে এসব বিতর্কের সৃষ্টি না করে নারীকে মানুষ হিসাবে সমাজে স্থান দিতে হবে। কারণ দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক গুণবত্তার দিক দিয়ে স্রষ্টা তো কোন রকম বিভেদ সৃষ্টি করেন নি নারী পুরুষে! বরঞ্চ উভয়ের জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করবার জন্য তাদের অন্তরে দিয়েছেন একটি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা।

তারপর লেখিকা অভিযোগ করেছেন—"ইহার পর বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন"—।

প্রথমতঃ মমতাময়ী দেবী এ কথাটি যথাযথ বলতে পারেন নি। কারণ বিবাহবিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার এক কথা নহে বা এক আইনও নহে। উত্তরাধিকার হিন্দু কোড বিলেরই অন্য একটি ধারা, সুতরাং বা শব্দটি দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার এ দুটি শব্দকে যুক্ত করা যায় না। তা ছাড়া আমি "হিন্দু কোড্ বিল্ ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিনি। হিন্দু কোড বিলের উত্তরাধিকার ধারা সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ অন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ প্রবন্ধটি সমালোচনা করতে গিয়ে তাকে টেনে আনবার অধিকার লেখিকার আছে কি? হিন্দু কোড্ বিল প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে আমি আলোচনার প্রারম্ভেই লিখেছি—"এখানে আমি হিন্দু কোড বিলের এক নম্বর ধারা হিন্দু বিবাহ নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করছি"—সুতরাং উত্তরাধিকার ধারার অভিযোগ এ প্রবন্ধের সমালোচনায় আনা নিতান্তই অযৌক্তিক হয়েছে।

তিনি লিখেছেন—"বালবিধবা ও দুশ্চরিত্র স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কখনই আমাদের শাস্ত্রকারেরা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই; তাহা হইলে এই প্রবাদ বাক্যের কখনই প্রচলন হইত না—বাপের বোন পিসী, ভাত কাপড় দিয়া পুষি।"

এ কথাগুলো এত ছেলে মানুষি যে এর উত্তর দিতেও ইচ্ছে হয় না। লেখিকার যদি জীবনের প্রতি এতটুকু দরদ থাকত এবং বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তবে একথা তিনি কখনই লিখতেন না। কারণ, বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যায় মানুষকে এমনি সঙ্কটে ফেলেছে যে নিজের মা, বাবা ও স্ত্রী-পুত্রকে উপযুক্ত ভাবে ভরণ পোষণ করতে পারছে না হাজার-করা নয়শত নিরানব্বই জন। সে অবস্থায় মাসীপিসীকে প্রতিপালন করবে কেমন করে? সে জন্য গৃহিণীপনা নিয়ে মেয়েরা আর গৃহ কোণে বসে থাকতে পারছেন না—অন্ন সংস্থানের জন্য তাদের রাজপথে বেরোতে হচ্ছে। তা' ছাড়া মানুষের জীবনের প্রয়োজন কি শুধু ভাতকাপড়েই সীমাবদ্ধ? লেখিকা নিজে একজন নারী হ'য়ে নারীর জীবনের মূল্যকে যে এমন করে নস্যাৎ করে দিতে পরেলেন কেমন করে, তা' ভেবে আশ্চর্য না হ'য়ে পারলাম না।

মমতাময়ী দেবী নিজেই আলোচনার চতুর্থ স্তবকে লিখেছেন—"দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করার বিধান আমাদের শাস্ত্রকারেরা আমাদের সমাজকে দিয়াছেন।" আবার ষষ্ঠ স্তবকে তিনি লিখেছেন—"আমাদের এই যে সমগ্র হিন্দু ধর্ম ও সমাজ তাহাতে এই হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের সমগ্র অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে।"

তাঁর এ অসামঞ্জস্য উক্তির আমি কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। আমার প্রবন্ধে লিখেছি যে বিদ্যাসাগর কর্তৃক আবিষ্কৃত পরাশর সংহিতার বিধানটিকেই ভারত সরকার হিন্দু বিবাহ আইনে পরিণত করেছেন—এতে অশাস্ত্রীয় ফল কোথায়। আর ব্যাপকভাবেই এ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'বে কেমন করে?

তিনি যেন দয়া করে ঠাণ্ডামস্তিষ্কে হিন্দু বিবাহ আইনের ধারাগুলো পাঠ করেন তবেই তাঁর হিন্দু সমাজের ভাঙ্গনের ভয় দূর হবে।

লেখিকার অভিমত—নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে মাতৃত্বে—নারীত্বে নহে।

কিন্তু যে নারীর মাতৃত্বের বিকাশ হওয়ার পূর্বেই সমাজের অনুশাসনের কাঠ গড়ায় জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা বলি দেওয়া হল, তার নারীত্বে সার্থকতা আসবে কোন পথে (যেমন বাল্য-বিধবা, পরিত্যক্তা স্ত্রী)! সমাজের প্রত্যেক নারীকে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিশেষ

মমতাময়ী দেবীর শেষ অভিযোগ—"আজ যখন পাশ্চাত্য জগতের সকল মনীষিগণ তাঁহাদের দেশে প্রচলিত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রতিকূলে জনমত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিমগ্ন, তখনই দেখি নবীন ভারতের প্রবীণ কর্ণধারগণকে এই ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের নারী সমাজকে উপহার দিতে।"

লেখিকাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাশ্চাত্য দেশের রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহের বিচ্ছেদ ও হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ এক নয়। রেজিষ্ট্রি করে বিবাহ করা আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ রাজত্বের আমলে প্রচলিত হয়েছে এবং দিনের পর দিন অসবর্ণ বিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্ট্রি বিবাহও বেড়ে চলেছে। কারণ আমাদের শাস্ত্রকারগণের ('নীচ জাতি হইতেও কন্যা রত্ন লইবে'—চাণক্য) বিধি থাকলেও অভিভাবকগণ কখনও ছেলেমেয়েকে শাস্ত্রসম্মতভাবে অসবর্ণ বিবাহ করাতে রাজী হন না। সুতরাং অভিভাবকদের অজ্ঞাতে রেজিষ্ট্রি করেই তাদের অনেককে বিবাহ করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের অমিল হলেই রেজেষ্ট্রি করা বিবাহের অবসান ঘটানো চলে। সুতরাং এ বিবাহে অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তুলনা করে হিন্দু বিবাহ আইনের প্রবর্তনের জন্য লেখিকা মিছামিছি ভারত সরকারকে দোষারোপ করেছেন।

তারপর লেখিকা বলেছেন—আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের আদর্শ কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী। আমাদের আদর্শ ত্যাগের উপর সেই জন্য স্বামিজী বলে গেছেন—"আমরা জন্মাবধি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।"

এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত। স্বামিজী কী অর্থে বলে গেলেন একথা—আর লেখিকা কী অর্থে ব্যবহার করলেন। আর সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদীর সঙ্গে আমাদের সমাজের লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা নারীদের কোন তুলনা চলে না। লোকে কথায়ই বলে—রাজার সঙ্গে সাজা! অর্থাৎ রাজার সঙ্গে তুলনা!

সমাজ কল্যাণে নারীর দায়িত্ব

শ্রীআরতি দেব

সুদূর অতীত হতে ভারতের নারী শক্তিরূপে পূজিত হয়ে আসছে, কে এই পূজার প্রথম সাধক ছিলেন সে প্রশ্ন আজ পণ্ডিতদের আলোচনার বস্তু হয়ে থাকলেও, ভারতের সন্তানরা আজও সেই সাধকের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে মহান আদর্শের পথ দেখিয়ে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণী—মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, সকলেই সেই বিশ্বজননীর সন্তান। এই মহামন্ত্র আজ বিশ্বের আকাশে বাতাসে মিশে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

গৃহ সমাজের কেন্দ্র। নারী সেই কেন্দ্রের প্রাণ। সকল দেশে সকল কালে সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, নারীর উত্থান পতনের সঙ্গে জাতির উত্থান পতন এক সূত্রে বাঁধা, নারীর ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শিক্ষা, ত্যাগের মন্ত্র মহৎ আদর্শ পথের নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের কর্ণধার শিশুরূপে জন্মায় নারীর কোলে, মায়ের চরিত্র শিক্ষা দীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিশুর চরিত্র গড়ে উঠে। আজ আমাদের দেশের সমগ্র নারীজাতির কাজ—ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষা সুগঠিত করে সমগ্র জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করা। বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশ মেয়েদের দুটি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব—দৈহিক ও মনের শক্তি। এককথায় দেহ ও মনে আমরা পঙ্গু। নারীর আজ স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। ভারতের দুর্দশা সেই দিন থেকে সূচনা হয়েছে—যে দিন ভারতের নারী তার নিজের মর্য্যাদা নিজে রাখবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখের বিষয় আজও আমরা এই বিষয় সম্পূর্ণ অচেতন।

সেকালের প্রচলিত অনেক কুসংস্কার নিয়মকানুন উঠে গেলেও মেয়েদের শিক্ষা প্রসার হলেও প্রগতিশীলা মেয়েদের মন উদার হয়নি। সামান্য একখানা শাড়ি কি সিনেমা দেখা না হলে অনেক শিক্ষিতা মেয়ে বিরক্ত হয়। নিজেদের অভাব অভিযোগ নিয়ে যদি সর্ব্বদা থাকা যায়, তবে দেশ কিংবা জাতি আমাদের কাছ থেকে কি আশা করবে।

সেকালের কুসংস্কার যুগের মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সুসন্তানের মা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, অথচ এই সব মায়েরা বিদেশে গিয়ে কি স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। ছোট পরিবেশে অল্প জিনিষে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। অথচ দেশ এবং জাতিকে যাহা দিয়ে গেছেন তাহা অতুলনীয়, রত্ন সদৃশ। এই সব মহাপুরুষের জীবনের অনেক সুশিক্ষা তাঁদের মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

আজ আধুনিকা মায়েদের দিকে তাকিয়ে শিশু কল্পনা করে বড় হয়ে

সে সিনেমা শিল্পী হবে। বাহিরের মাহিনা-করা অশিক্ষিত লোকের কাছে মাতৃশিক্ষা, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত হয়ে যে সব শিশু বড় হয়—তাদের না থাকে পিতা মাতার উপর শ্রদ্ধাভক্তি ও ভাইবোনেদের উপর স্নেহ ভালবাসা। সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বার্থপর ভাব-বিলাসী অহঙ্কারী এই সব শিশুদের কাছে জাতি সমাজ দেশ কি আশা করে?

অনেকে বলেন—"বর্ত্তমানের পরিবেশ বৃহৎ হওয়ায় ছোট গৃহকোণ মানুষকে আর বন্দী করে রাখতে পারে না।" পরিবেশ বৃহৎ হোক আর ক্ষুদ্র হোক—যে ব্যবস্থা সমাজের দেশের কেন্দ্র স্থলগুলির সুখ শান্তি আনতে পারে না, উপরন্তু ভেঙে যায়, তার প্রয়োজন কি? মানুষ গৃহ রচনা করে সুখ স্বাচ্ছন্দের আশায়—সেই সুখ স্বাচ্ছন্দ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে গৃহের প্রয়োজন কি? আর গৃহকে সুন্দর কল্যাণকর মনোরম করে তোলে নারী, সেই নারী, যদি বাহিরে যায় তবে তার পরিণতি কি? নারীর কল্যাণময়ী করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি সত্য? না বিলাস ব্যসনে সজ্জিতা মোহিনীরূপ সত্য? আজ সমগ্র নারীসমাজ এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে কতকগুলি ক্ষণিকের মোহ দুর্ব্বলতা স্বার্থপরতা এ-কালের যেমন ক্ষতি করছে, সেকালে তেমনি কতকগুলি অন্যায় বিধি ব্যবস্থা সমাজসংস্কারকদের জোরজুলুম সমাজ জীবনে সমান ক্ষতি করেছিল। লোভ, মোহ, দুর্ব্বলতার প্রতিরোধ করবার শিক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় না, এই শত্রুগুলিকে নিজেদের প্রতিরোধ করতে হবে, তবে জাতি ও সমাজ জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত বাড়ি যত সুন্দর সুদৃশ্য করে তৈরি করা হোক, তার যেমন কোন দাম থাকে না, আমাদের সমাজে তেমনি বাহিরের আড়ম্বর যতই উজ্জ্বল হোক গৃহ জীবনের সুখ শান্তি শ্রী নষ্ট হওয়ায় বাহিরের ঐশ্বর্য্যের কোন দাম থাকবে না।

নারীর শিক্ষা প্রয়োজন—কিন্তু যে শিক্ষা তার চরিত্র গঠনে মহীয়সী করতে সাহায্য করে না সে শিক্ষায় প্রয়োজন নেই, শরীরে শক্তি মনের বল, হৃদয়ের সাহস যে শিক্ষা দিতে পারে না সে শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে নারীর শিক্ষার প্রয়োজন; কারণ তারাই ভবিষ্যৎ জাতিকে গঠন করে। তবে নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে স্বতন্ত্র হবে কারণ দুজনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। "নারীর সব অধিকার পুরুষের সঙ্গে সমান" বলে যারা দাবী করেন—তাঁদের জানা উচিত শুধু অধিকার নিলেই হয় না অধিকারের উপযুক্ত হতে হয়। কর্ম্মে সাহসে শক্তিতে, দৃঢ়তায় এবং তেজস্বিতায় যেদিন নারী অধিকারী হবে সেইদিন পুরুষের সব অধিকার আপনা হতে হাতে চলে আসবে।

আজ ভারতের ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল নারীর চিন্তা করা উচিত যে জাতির এক মহান দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে। দেশকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান শান্তিপূর্ণ রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব, মেয়েদের বিলাস ব্যসন সঙ্কীর্ণতার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজ জীবনে যে অন্যায় ব্যভিচার লোভ প্রভৃতি যে বিরাট অসুরের উদ্ভব হয়েছে তাকে বিনাশ করতে ত্যাগ ক্ষমা জ্ঞান সৎশিক্ষার অস্ত্রে সজ্জিতা নারী প্রয়োজন।

এস না গান গাই

শৈলজানন্দ রায়

ধানের শীষে মৌপিয়াসীর পরাগ মিথুন খেলা
কিষাণ প্রিয়ার মেঠেল সুর ঘরে ফেরার বেলা
শুনতে এলুম তাই।
নিয়ন আলো ধাঁধিয়ে গেল আমার চোখে সব
লাউঞ্জ ফেরা প্রেয়সী নারীর সুরের কলরব
পালিয়ে এলুম তাই।
ছোট্ট ঘরে ছোট্ট খোকা আধো আধো স্বর
সূর্য্যমুখার পরাণপ্রিয় সূর্য মধুকর
আলো দিয়ে যায়
দোপাটি ফুলে রাঙিয়ে দিলেম তোমার কালো চুল-
স্নিগ্ধ মধুর হেলেনরূপে শিফন পরা ভুল
নদীতে নামো রাই
নব-মাথুর রচি এস নতুন সমাজ অঙ্গে
গ্রামীণ ভারত ফুটন্ত ফুল নকল মোহ ভঙ্গে
এস না গান গাই!

ওয়েসিস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
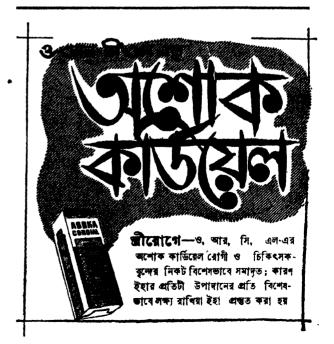
তারা দুই ভাই। সুধাংশু সেন আর হিমাংশু সেন। একজনের বয়স বত্রিশ, আর একজনের ত্রিশ। দুই ভাই দীর্ঘকাল ধরে একই বাড়িতে—শুধু একই বাড়ীতে কেন একই ঘরে পাশাপাশি বাস করলে প্রাপ্ত বয়সে যা হয় তাদের মধ্যে সেই বন্ধুত্ব হয়েছে। অবশ্য শুধু যে ভাই হয়ে জন্মালে—আর ঠাঁই ঠাঁই না হলেই এই বন্ধুত্ব জন্মে তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই তারা গরীব বাপমায়ের ঘরে মানুষ। তাদের পরে অনেকগুলি ভাই বোন। দুজনেই অনেক কষ্ট করে পড়াশুনো করেছে। কখনো বা ছেলে পড়িয়ে, কখনো বা ছোটখাট পার্টটাইম চাকরি করে নিজেদের পড়ার খরচ নিজেরাই চালিয়েছে তারা। একজন আর একজনকে সাহায্য করেছে। তারপর কলেজ থেকে বেরোতে না বেরোতে দুজনেরই ঘাড়ে পড়েছেন বুড়ো বাপ মা, আর চারটি ভাই বোন।

বুড়ো হবার আগেই অবশ্য বাপ বিনোদবিহারী প্রায় বছর দশেক আগে বাতে পঙ্গু হয়েছেন। গোড়ার দিকে তেমন চিকিৎসাপত্র হয়নি। এখন অর্ধাঙ্গ এমন অবশ হয়ে গেছে যে আর সারবার আশা নেই। তবু একেবারে বসে থাকেননা বিনোদবিহারী। প্রথম জীবনে ওভারসিয়ারের চাকরি করেছেন কর্পোরেশনে। সে চাকরি যাওয়ার পরে নিজেই স্বাধীনভাবে রোজগারের চেষ্টা করেছেন। জমি আর বাড়ির দালালিও যে গোপনে গোপনে না করেছেন তা নয়। কতজনের কত বাড়ির প্লান করেছেন, বাড়ি তুলে দিয়েছেন। ইচ্ছা ছিল নিজেও সহরতলীতে একখানা বাড়ি করবেন। হঠাৎ অসুখে পড়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। চোরবাগানের সরু গলির মধ্যে সেই ভাড়াটে পুরোনো বাড়িতেই রয়ে গেছেন। শুয়ে থাকলেও তিনি একেবারে চুপ করে থাকেননি। তাহলে তো সবশুদ্ধুই শুকিয়ে মরত। শুয়ে শুয়েই তিনি আগেকার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু কিছু কাজকর্ম করবার চেষ্টা করেছেন, এই অবস্থার মধ্যেও বাড়ির প্লান তৈরি করে বিক্রি করেছেন, দু একজন সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বছর পাঁচেক ধরে সব বন্ধ হয়ে গেছে। সব যোগসূত্রই ছিন্ন। ছেলেরা কেউ তাঁর

লাইনে গেলনা, গেলে কিছুটা যোগাযোগ থাকত। এখন পুরোপুরিই দুই ছেলের ওপর নির্ভর করতে হয়।

পুরেনো বাড়ির তিনখানা ঘরে এতগুলি লোককে থাকতে হয়। দোতলায় আরো এক ঘর ভাড়াটে আছেন। তারা জলকলের ভাগীদার। বাড়িটা ক্রমেই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। ড্যাম্প লাগা দেয়াল। চূণ বালি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ঝরে পড়ছে। সুধাংশুর মার মুখে অভিযোগের আর অন্ত নেই। তিনি কেবলি বলেন—'বাড়ি বদলাও বাপু, আমি এমন করে আর থাকতে পারবনা।'

সুধাংশুকে কিছু বলতে হয়না। তার ভাই বোনেরাই জবাব দেয়—'বাড়ি বদলাবার কথা কি করে তুমি মুখে আনো মা। এই খরচ জোগাতেই বড়দাকে রাতদিন মুখে রক্ত তুলতে হয়।'

সুধাংশু হেসে বলে, 'একটু সুবিধে সুযোগ হোক মা। ভালো বাড়িতে যাব বই কি। তোমার যে কষ্ট হয় তা কি আমি বুঝিনে?'

মা বলেন, 'ছাই বোঝ। বেশ, বাড়ি যখন পারো বদলে নিয়ো। এবার বিয়ে কর।'

গীতা রীতা কানাই বলাই সকলেই মার পক্ষ নেয়। তারাও হেসে আবদার করে, 'সত্যি বড়দা, তোমার এবার বিয়ে করা উচিত। আমোদ নেই আহ্লাদ নেই, বড় এক ঘেয়ে হয়ে গেছে সব।'

হিমাংশুও মুখ টিপে হাসে, 'কথাটা মিথ্যে নয়। এখনও যদি সাহস করে বিয়েটা না করতে পার দাদা, জীবনে আর পারবেনা।'

সুধাংশু বলে, 'ঈস, খুব যে সাহসের বড়াই করছিস। তুই কর না।'

হিমাংশু পরিহাসের সুরে বলে—'তোমাকে ডিঙিয়ে? সে বড় মর্মান্তিক হবে দাদা।'

সুধাংশু হেসে জবাব দেয়, 'হোক মর্মান্তিক। তবু একটা মিলনান্ত ঘটনা ঘটুক।'

হিমাংশুও হাসে, 'অমন মিলন আমি চাইনে। ভাইয়ের বদলে বউ? মানে নাকের বদলে নরুণ? আমি কি অতই আহাম্মক?'

পাশের ঘরে সুধাংশুর বাবা হুঁকো টানেন আর কাসেন। মানে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই ছেলেকে সচেতন করে তোলেন। মানে হয়তো বলতে চান, তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুই ভায়ের এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা ভালো দেখায়না। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দেয় বলে মনে হয় না। সুধাংশু বাপের জন্য আলাদা দুধ রোজ করে দেয়, তাঁর খাওয়া পরার কোন কষ্ট না হয়, সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে মা আর বোনদের লক্ষ্য রাখতে বলে। কিন্তু পারতপক্ষে বাপের সামনে যায়না। কিংবা গেলেও, 'কেমন আছেন, ভালো আছি' গোছের দু একটা বাঁধা-ধরা কথা ছাড়া কি বলবে ভেবে পায়না। খানিকক্ষণ নীরবতার অস্বস্তি ভোগ করে এবং ভোগ করিয়ে সুধাংশু বাইরে চলে আসে। বাবার রোগ আর বার্ধক্যের জন্য তার যে দুঃখ না আছে তা নয়, কিন্তু সব সময় কি আর কেউ সে কথা মনে করে রাখতে পারে? সুধাংশুর দুঃখ—তার এত কষ্ট সত্বেও তার বাবা তার ওপর ঠিক যেন প্রসন্ন হতে পারেননা। ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ প্রায় লেগেই আছে। সুধাংশুর মায়ের কাছে তিনি মাঝে মাঝে বলেন, 'সুধা সংসারের জন্যে খাটে বটে কিন্তু ওর মন তেমন পরিস্কার নয়। আমাকে ও ভিতরে ভিতরে যেন ঠিক দেখতে পারেনা।'

সুধাংশুর মা প্রতিবাদ করেন, 'ছি ছি ছি—ও কি কথা। ছেলেটা রাতদিন সংসারের জন্যে পরিশ্রম করছে, আর তুমি কিনা বাপ হয়ে—'

বিনোদবাবু বলেন 'বাপ বলেই তা বলছি। নিজের ছেলেকে বুঝি আমি চিনিনে? নিজের ছেলের মন বুঝি আমি বুঝতে পারিনে? সুধা দিনরাত কষ্ট করে, আর সেই কষ্টের জন্যে আমাকেই দায়ী করে। আমার এই বড় সংসারের জন্যেই তো ও বিয়ে-থা করতে পারলনা।'

অমিয়বালা বলেন, 'ছিছি। কবে কোন্‌দিন কি বলেছিল, তুমি বুঝি তাই মনে করে বসে আছ।'

বছর তিনেক আগে বিয়ের কথা একবার বিনোদবাবু নিজেই পেড়েছিলেন। দু একটা ভালো সম্বন্ধ হাতে এসেছিল বলেই তুলেছিলেন কথাটা। সুধাংশু বিয়েতে যা পণ-যৌতুক পাবে তা খরচ না করে সেই টাকা গীতার

বিয়েতে ব্যয় করতে পারলে মোটামুটি একটা ভালো সম্বন্ধ জুটবে। মনে মনে এমন একটা হিসেব করেই প্রস্তাবটা করেছিলেন তিনি।

আদর করে বড় ছেলেকে কাছে ডেকে সামনে বসিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'বাবা, এবার আমার একটি বউমা না হলে কিন্তু চলবেনা। আমার তামাকটুকু সেজে দেবার লোক নেই, পানটুকু ছেঁচে দেবার মানুষ পাইনে—।'

সুধাংশু গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'কেন সংসারে মানুষ জনের অভাব কি। মা আছেন, গীতা রীতা আছে—।'

বিনোদবাবু তবুও হেসে বলেছিলেন, 'ওদের দিয়ে আর কতকাল চলবে।'

সুধাংশু অধীর হয়ে রূঢ় ভাষায় জবাব দিয়েছিল, 'যতকাল চলে চলুক। এই গুষ্ঠীকে আগে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচাই, তারপর ফের গুষ্ঠী বাড়াবার কথা ভাবব।'

এত বড় রূঢ় কথাটা হজম করতে বিনোদবাবুর সময় লেগেছিল। একটু বাদে তিনি খুব শান্তভাবে খোঁচাটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, 'কিন্তু তুমি বিয়ে না করলে হিমুরও তো বিয়ে দিতে পারিনে।'

সুধাংশু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'দিন না। দিতে কে না করেছে। সেই আগের দিন আর নেই, আগের দিনের নিয়ম-কানুনও আর নেই। এখন ছোট হোক বড় হোক যার যখন প্রবৃত্তি হবে, সময় সুযোগ হবে, সেই তখন বিয়ে করবে। হিমু যদি বিয়ে করতে চায় করুক না।'

সুধাংশুর বাবা নৈরাশ্যের সুরে বলেছিলেন, 'কিন্তু সে তো তোমারই ভাই, তোমারই মন্ত্রশিষ্য। দাদার কথা ছাড়া সে কার কথাই বা শোনে।'

এত কথার পরেও সুধাংশু ঠিক অন্তর থেকে ছোট ভাইকে তখন বিয়ে করতে বলতে পারেনি। মুরুব্বির জোর নেই, তেমন জোগাড়ে ছেলেও নয়। তাই চাকরি বাকরির ব্যাপারে হিমাংশু দাদারই অনুগমন করেছে। এম-এ পাস করেও দেড়শ টাকা মাইনের ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরি করে হিমাংশু। সাড়ে নটায় বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যার পরে। এমনিতেই রোগাটে চেহারা। অফিসের পর দুটো একটা যে টুইশন করবে, তাও ওর সামর্থ্যে কুলোয়না। ভরসা করে সে কথা বলতেও পারেনা সুধাংশু। কিন্তু বিয়ে যে করবে—খাবে কি, এই সামান্য রোজগারের ভাগ সে ভাইবোনকেই দেবে, না বউ ছেলেকেই খাওয়াবে? এখনকার দিনের ছেলেরা বেশ ভেবেচিন্তে হিসেব করে চলে। ভাবপ্রবণতায় গলে যায়না। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যার' প্রবচনেও তাদের বিশ্বাস নেই। আগে ইহলোকের পিণ্ডির ব্যবস্থা হোক, তারপরে পরলোকের ভাবনা। হিমাংশু বুদ্ধিমান ছেলে। ও সব কথায় মোটেই কান দেয়না।

আর সুধাংশুর নিজের তো বিয়ের কথা ওঠেই না। এত বয়স পর্যন্তও সে কোন স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। স্কুল-মাষ্টারী, সেলসম্যানশিপ, বইয়ের ক্যানভাসিং—না করেছে এমন কাজ নেই। এখন ছোট একটি পাবলিসিটি অফিসে বিজ্ঞাপনের কপি লেখে, তাতে শ দেড়েক টাকা পায়। আরও শ দেড়েক টাকা তোলে টুইশন করে। ছাত্র বয়সে সেই যে টুইশন আরম্ভ করেছিল আজও তা ছাড়তে পারেনি। তবে আগে যেমন অল্প টাকায় ছাত্র পড়াত, এখন আর তা পড়ায় না। এখন তিরিশ চল্লিশ টাকার কমে টুইশন নেয়ই না। ঘণ্টা দেড়েক দুটি ছাত্রকে এক সঙ্গে পড়িয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকাও কোন কোন বাড়িতে পায়। পরীক্ষার মরশুমে রোজগার আরো বাড়ে। তখন বাড়িতে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেয় সুধাংশু। হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে নেয়। এই মরসুম-টাকায় মায়ের জন্যে হয়ত একখানা বাড়তি শাড়ি, গীতা রীতার জন্যে পোষাকী শাড়ি ব্লাউস, কানাই-বলাইর জামা-জুতো প্যাণ্ট-সার্টের ব্যবস্থা হয়। আর নিজেদের দুভাইয়ের জন্যে কেনে বই। হাতে দুটো টাকা এলেই একজন আর একজনকে বই উপহার দেয়। সে সম্পত্তি দুজনেরই।

দুজনে একই ঘরে তারা থাকে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরখানাই তারা বেছে নিয়েছে। একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে তারা জীবন আর জগতের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তর্ক করে। রাত যে অনেক হয়ে যায় সে খেয়াল থাকে না। কোন কোনদিন সুধাংশুর মা বিরক্ত হয়ে উঠে এসে ধমক দেন—আচ্ছা তোরা কি ঘুমোবিনে? সুধা তোকে তো সেই ফের ভোরে উঠতে হবে। ভেবেছিস কি? এমন করলে শরীর টিঁকবে না কি?'

সুধাংশু আর দ্বিরুক্তি না করে আলোর স্যুইচ অফ করে দেয়। তারপর মা চলে গেলে আবার ফিস ফিস করে দুজনের আলাপ শুরু হয়।

তাদের আলোচনা নারীপ্রসঙ্গ বর্জিত নয়। ও সম্বন্ধে তাদের কোন শুচিবায়ুতা নেই। স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের পক্ষে নারী যে অপরিহার্য একথা তারা দুজনেই স্বীকার করে। নারী ভূমিকা ছাড়া যে জীবননাট্য—তা না ট্রাজেডি, না কমেডি! না ঝাল না মিষ্টি, এ কথা তারা মানে। নারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে না হোক, প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে সঙ্গিনী। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে দক্ষতায় তাদের সমকক্ষ করে তোলায় পুরুষের শুধু দায়িত্বই নেই কৃতিত্বও আছে। সমাজ দেহের এক অঙ্গকে অনগ্রসর করে রাখলে যে আরেক অঙ্গ কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হয়না, এ সম্বন্ধে তারা দুজনেই একমত। কিন্তু তাই বলে যে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে তার কি কথা আছে। এই তো ঘর-দোর আর চাকরি-বাকরির অবস্থা। এর মধ্যে যে আসবে সে বাস করবে কোথায়? খাবে কী? দুদিনে নতুন বউয়ের নতুনত্ব যাবে, বধূমূর্তি মারমূর্তি হয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করবে। তার চেয়ে যা আছে তাই ভালো। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। কিন্তু গরুতো আগেই দুষ্ট হয় না। গোয়ালে জায়গা না পেলে, পেট ভরবার মত জাবনা না জুটলেই অস্থির হয়ে ওঠে, দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে চায়। তা পাটের দড়িই হোক, আর স্নেহ ভালোবাসার রজ্জুই হোক।

কিন্তু সুধাংশু হিমাংশুর মা একথা মানে না। তিনি বলেন, 'হাঁরে, তোদের অত ভাবনা কিসের? গরীবের ঘরে গরীবের মেয়ে আনব, কোন বড়লোকের ঝিকে তো আর পায়ে ধরে সাধতে যাচ্ছিনে। গেরস্তর ঘরের বউ হবে। তারা হাতীও খাবে না, ঘোড়াও খাবেনা, সোনা জহরৎও পরতে চাইবেনা তোদের কাছে। অত ভয় কিসের তোদের?'

মার যুক্তি শুনে দুই ভাই হাসে। বিয়েটা জোড়াতালির ব্যাপার নয়, গোঁজা মিলের ব্যাপারও নয়—প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রাচুর্য আর প্রসন্নতার মিল। সেই মিলের সম্ভাবনা যতক্ষণ না আসে, অসম্ভবের পিছনে ঘুরে কোন লাভ নেই।

হ্যাঁ, তবে যদি কোন মেয়ে ভালোবাসে—সব জেনে-শুনে তাদের দু-ভাইয়ের কোন একজনকে বিয়ে করে, তা-হলে হয়তো ততখানি আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু কোথায় সেই বিবাহপর্ব অনুরাগ? মেয়েদের সান্নিধ্যে তারা যে একেবারে না এসেছে তা নয়। না, শুধু ট্রামে-বাসে সভা-সমিতিতে বইয়ের দোকানে অপরিচিতা কি অল্প-পরিচিতাদের কথাই হচ্ছে না, আরও একটু বেশি পরিচয় আছে এমন মেয়েদের সঙ্গেও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে এবং হয়। দু-জনেরই দু-চারজন করে ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের স্ত্রী কি বোনদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। দুই তরফ থেকেই আসা যাওয়া—কি চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিচয়ের কোন গভীর স্তরে কেউ গিয়ে পৌছায় না। এম-এ ক্লাসে দু-একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে হিমাংশুর কিছু অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। কফি-হাউসে বসে এক সঙ্গে গল্প-টল্প করেছে। কিন্তু তাদের কারো বা পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেছে, কেউবা পাস করবার পর আর অপেক্ষা করেনি। তাদের কেউ বা খুবই বড়লোকের মেয়ে, কেউবা অসামান্যা রূপবতী, কেউবা হিমাংশুর তুলনায় অতিরিক্ত ভালো ছাত্রী—বিদুষী আর বুদ্ধিমতী। তাদের মনে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হয়ত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রচুর। হিমাংশু সে কথা টের পেয়ে হয় বেশিদূর এগোয়নি, কিংবা এগিয়ে গিয়ে নিজের মনের পঞ্চশরের অঙ্কুরকে শ্লেষ-বিদ্রূপের চাপে পিষে মেরেছে।

সুধাংশু সব খবরই রাখে। মাঝে মাঝে ভাইকে সে তিরস্কার করেছে, 'তুই একটা বোকা। অত ভীতু হলে কি কিছু করা যায়?'

হিমাংশু অমনিতে খুব লাজুক। মেয়েদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। কিন্তু দাদার সঙ্গে তর্ক করতে ওস্তাদ। সে বলে—দুনিয়ায় কিছু করা মানেই কি শুধু প্রেম করা?

সুধাংশু হেসে বলে 'কিন্তু ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

হিমাংশু বলে 'এ যুগে ও প্রবাদ মানতে গেলে অপদস্থ হবার আশঙ্কা থাকে দাদা। কপালে জেল-জরিমানাও জুটে যেতে পারে। বেশ তো, তুমি দেখনা সব ত্যাগ করে।'

এ কথায় সুধাংশু বড় আহত হয়। সে জানে, সব ত্যাগ

করেও তার পক্ষে কিছু লাভ হবে না। সে বড় কুদর্শন। শুধু মোটা আর কালো বলেই নয়, তার নাক মুখ চোখের কোন আনুপাতিক সুষমা নেই। মুখখানা পাটার মত। ছেলেবেলায় বসন্ত হয়েছিল। তার গভীর দাগগুলি এখনো রয়েছে। নাকটি থ্যাবড়া। চোখ দুটি গোল আর ছোট ছোট। পুরু ঠোঁট আর বৃহদাকার দাঁতে ভাগ্য যেন তার সব ক্ষুদ্রত্বের ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করেছে। ভাগ্য ছাড়া কি। আর কোন বেলায় ভাগ্যকে মানে না সুধাংশু, কিন্তু নিজের চেহারার বেলায় মানে। সে জানে তার এই চক্ষু-পীড়াদায়ক রূপের জন্যে মেয়েরা তার কাছে ঘেঁষে না। সে জন্যে তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই খারাপ চেহারার জন্যে দুটো ভালো চাকরি পর্যন্ত তার হাত ছাড়া হয়েছে সে জন্যে আফশোষের অন্ত নেই সুধাংশুর। রূপ শুধু মেয়েরাই চায় না, মনিবেরাও পছন্দ করে। বাপ-মা ভাই-বোনদের চোখে তার এই রূপহীনতা সহ্য হয়ে গেছে। হয়তো কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরাও তার এই দীনতা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যে সব তরুণী সুশ্রী মেয়ে একবার তার দিকে আড়-চোখে তাকায় তারা দ্বিতীয়বার সুধাংশুকে চেয়ে দেখে না।

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা উঠলে হিমাংশু দাদাকে প্রবোধ দেয়, 'ও তোমার এক ধরণের complex। আমার মনে হয় রূপ সম্বন্ধে আমরা পুরুষরা যত সচেতন মেয়েরা তা নয়। তারাই সত্যিকারের গুণের আদর করতে জানে।'

সুধাংশু বলে, 'হয়তো পারে। গুণবানকে তারা শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভালোবাসে রূপবানকে। ভালোবাসে রূপের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে। এ ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে তাদের প্রকৃতি আলাদা নয়।'

হিমাংশু বলে, 'আসলে সুরূপেও কিছু এসে যায় না, কুরূপেও কিছু এসে যায় না—পুরুষের মধ্যে মেয়েরা চায় পৌরুষ। যেমন মেয়েদের মধ্যে পুরুষ চায় নারীত্ব, নারীর লালিত্য আর লাবণ্য।'

দুজনেই বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র দুজনেরই ছোট। ছোট মানে এখানে হীন নয়। ছোট চাকরি, কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু সহকর্মীর ছোট পৃথিবী, বাপ-মা ভাই-বোনের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন ঝগড়াঝাটি, মিলন বিরহের ছোট ছোট ঢেউ। সকালে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ, সারাদিনের কাজের শেষে রাত্রে ঘুমের সঙ্গে গল্পের বই। এত বড় সহর, তবু মাত্র কয়েকজন চেনা মানুষের সঙ্গে ওপর ওপর মেলামেশা। কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ নেয়না, কোন গঠনমূলক কাজে তারা হাত লাগায় না, কোন পূজা পার্বণ, উৎসব শোভাযাত্রার ভিড় তাদের আকর্ষণ করেনা, তারা সব দূর থেকে দেখে, তারা শুধু বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়—ইতিহাস দর্শন থেকে শুরু করে সমাজের রাষ্ট্রের ছোট বড় যে কোন সমস্যা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কি আরো দুচারজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তর্ক করে আলোচনা করে—তারপর সব ভুলে গিয়ে অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি সুরু করে। নিত্যকার অন্নের গ্রাসে যে রস আছে, প্রতিদিনের অভ্যাসের মধ্যে যে নিশ্চিন্ততা আছে তা তাদের ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু একেকদিন যেন তাদের চমক ভাঙে। তারা আফশোস করে কিছুই হল না, কিছুই হল না। জীবন বৃথা গেল, যৌবন বৃথা গেল। জীবনের এমন একটি মুহূর্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, যার দীপ্তিতে রাশি রাশি ভস্মস্তূপও ধন্য হয়। সেই one crowded hour of glory কি শুধু কারো কারো জীবনের জন্যে? প্রত্যেকের জীবনের জন্যেই নয়? সুধাংশু বলে, 'তুই বড় হয়ে ওঠ, আমি দেখি।' হিমাংশু বলে, 'দেখার কাজটা আমার আছে আমারই থাক।'

বড় হওয়ার মানে কি—সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা নড়ে চড়ে বেড়ায়। বড় হওয়া মানে কি ধনী হওয়া, মানী হওয়া, গাড়ি বাড়ির অধিকারী হওয়া? মন সায় দেয়না। তা কি স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করা? মন সায় দেয়না। সেই বৃহত্বের স্বাদ কি নেতৃত্বের মধ্যে আছে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আছে? তারা অনেক নেতাকে জানে, অনেক স্রষ্টা, অনেক আর্টিষ্টকে দেখেছে—তাঁরা সব সময় বড় নন। 'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ' একথাটা অনেকের বেলাতেই বলা যায়না।

সুধাংশু প্রশ্ন করে, 'তবে বড় হওয়ার মানে কি?'

হিমাংশু হেসে জবাব দেয়, 'বড় হওয়ার মানে বোধহয়—বড় হওয়ার কথাটা একেবারেই মনে না আনা।'

কিন্তু এ কথায় সুধাংশুর মন সব সময় সায় দেয়না। তার একেক সময় ইচ্ছা করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ব্যাপক বৃহৎ মহৎ কোন কাজের মধ্যে, সেই বিপুল মানব

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়।

কিন্তু সাধ আর ইচ্ছা যাই হোক, কাজ করবার সময় সুধাংশু কাজ করে নিজের পরিবারের জন্যে। বৃহৎ মানব পরিবার নিজেদের একটি পরিবারের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়। তাদের জন্যে দিনরাত খাটে সুধাংশু। তাও কি সচেতনভাবে খাটে? পরিবারের প্রত্যেকের মুখ, অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখের কথা মনে রাখতে পারে? পারে না। বিজ্ঞাপনের কপি যখন লেখে সুধাংশু পৃথিবীর আর সব কথা ভুলে যায়, ছাত্রদের যখন পড়ায় আর কারো কথা মনে থাকেনা। এই বিপুল বৃহৎ পৃথিবীর বিরাট মানব পরিবারকে শুধু একটি ইউনিট ধরে কাজ করা কি সম্ভব? এমন কি মনে রাখা সম্ভব? রাষ্ট্রনেতারা ধর্মনেতারা শিল্পনেতারা কি তা পারেন? সুধাংশুর তা জানতে ইচ্ছা করে! না কি—তারাও কোন কোন সময়ে শুধু বিশ্বের নাগরিক, বেশির ভাগ সময় নিজ নিজ পল্লীর অধিবাসী?

এই সব কথা যখন মনে হয় সুধাংশুর, হঠাৎ তার ধরণধারণ বদলে যায়। বাবার সঙ্গে হেসে কথা বলে, মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, ভাইবোনদের সবাইকে সিনেমা দেখার জন্যে হঠাৎ একখানা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে তাদের হাসি মুখের দিকে তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। গীতা রীতা বলে, 'বড়দা, তোমার হল কি?' মা বলেন, 'হ্যাঁরে তোর কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে? এই কি তোর বাজে খরচ করবার সময়? তোর নিজের জামা নেই, জুতো নেই, সেইগুলি কর। তোকে তো পাঁচ জায়গায় বেরোতে হয়। ওই ছেঁড়া ঝুলি পরে তুই যে কি করে বেরোস বাপু, দেখে আমার নিজেরই লজ্জা করে।'

বাবা বলেন, 'ওগো, বাক্স থেকে ওকে আমার জামাটা বার করে দাও। সেটা বেশ আস্ত আছে। ধোপা বাড়ি থেকে আসবার পর আমি আর ভেঙে পরিনি। ওটা ওর বেশ গায়ে লাগবে। ওর বুকটুক সব আমার মাপেই হয়েছে।'

নিজের জামা জুতো সম্বন্ধে সুধাংশুর বাবা খুব হিসেবী। নিজের গামছাখানা পর্য্যন্ত আর কাউকে ব্যবহার করতে দেন না। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি হৈ-চৈ লেগেই থাকে। কিন্তু কোন কোনদিন নিজের ঔদার্যে বিনোদবাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ আর বিস্মিত করে দেন। আর তারই কোন কোন মুহূর্তে সুধাংশুর চোখে মুক্তার বিন্দুর মত দুই ফোঁটা অশ্রু টলটল করে। Hour of glory নয়, hour of tears, সেই অশ্রু বিন্দুর ভিতর দিয়ে মানবতার মহাসিন্ধু তাকে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে যায়। সে ভাবে ওদের জন্যে সে চিরকৌমার্য নেবে। কোন ক্ষোভ, কোন আফশোস মনে রাখবেনা। শুধু স্বামী হওয়া আর জনক হওয়াই সার্থকতার একমাত্র পথ নয়। এই মানব সংসারে যে কোন সম্পর্কের মধ্যে সেই নিগূঢ় হৃদয় রস লুকিয়ে রয়েছে। তাকে যে খুঁড়ে বার করতে পারে, সেই অন্তঃশীলাকে যে স্রোতস্বতী করে, তার ধারায় নিত্য স্নান করতে পারে তার জীবন কোনদিন শুষ্কও হয়না, শূন্যও হয়না।

কিন্তু হিমাংশুর জন্যে সে এই জীবন চায়না। সুধাংশু ভাবে—হিমু অন্য ধারা নিক, সে অন্যরকম হোক।

সুধাংশু বলে, 'তুই বিয়ে কর হিমু। ও সব প্রেম-ট্রেমের আশা ছেড়ে দে। সিম্পলি বিয়ে। অন্যভাবে যদি খোঁজটোজ না আসে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে।'

হিমাংশু হাসে, 'এবার তুমি বাবার মত কথা বলতে শুরু করেছ দাদা। সত্যিই গার্জিয়ান হয়েছ। কিন্তু বিয়ে যে করব, বাসর ঘরের মত বাড়তি ঘর কি এ বাড়িতে আছে? তোমাকে তা হলে এ ঘর ছেড়ে দিতে হবে।'

সুধাংশু বলে, 'ঘর কেন, এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ি ভাড়া নেব। এমন বাড়ি যাতে আরো দু'একখানা ঘর বেশি পাওয়া যায়। আমাদের সংসারে অবশ্যই এমন বউ চাই যে বাইরে থেকে কিছু রোজগার করে আনতে পারবে; শুধু ঘরে বসে হাতাখুন্তি নাড়লে চলবেনা।'

হিমাংশু বলে, 'কিন্তু হাতাখুন্তি না নাড়লেও মুখ-নাড়া ঠিকই দেবে। বাইরে থেকে সে দুপয়সা আনলে তার তিন পয়সার মুখনাড়া সহ্য করতে হবে। তোমার ভাদ্রবধূ যদি বলে এই গুষ্ঠীর পিণ্ডি চটকাতে আমি পারবনা। আমি ভালো বাড়িতে একা একা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করতে চাই। আমরা নিজেরাই

তো বলি এখনকার দিনে জয়েণ্ট ফ্যামিলি অচল। সে যদি সে কথা কাজে খাটায়।'

সুধাংশু বলে, 'বেশ তো তাই করবি। আলাদা জায়গায় আলাদা সংসার তুই গড়ে তুলবি। আমাদের আর একটা বেড়াবার জায়গা হবে।'

হিমাংশু একটুকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, 'মানে বুড়ো বাপ-মা ভাইবোনদের পক্ষে তুমি যতখানি indispensible আমি ঠিক ততখানিই নই। আমাকে একটু চেষ্টা করলে বাদ দেওয়া যায় এই তো? দাদা কর্ত্তব্যটা শুধু তোমার একার নয়, আমারও আছে।'

সুধাংশু ব্যথিত হয়ে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝিসনে। আমি যা বলছি সেও আর এক কর্ত্তব্য। স্বামী হওয়া, ছেলে-মেয়ের বাপ হওয়া, নিজের সংসারের ভিতর দিয়ে জগৎ সংসারের স্বাদ পাওয়া। প্রত্যেকেরই তার নিজের ঘর চাই। ঘর ছাড়া যে পৃথিবী—সে তো মরুভূমি।'

যেন নিজের মনেই কথা বলতে থাকে সুধাংশু। ভারি উদাস আর করুণ শোনায় তার গলা। হিমাংশু চমকে ওঠে। মরুভূমির উত্তাপ আর তার শূন্যতা কি তাহলে সুধাংশুকেই বেশি স্পর্শ করেছে, কিন্তু উপায় কি। এত অনুরোধ সত্ত্বেও তার দাদা বিয়েতে মত দিচ্ছেনা। দেখতে কুরূপ হলেও চলনসই গোছের সম্বন্ধ তার দাদারও কয়েক-বার এসেছে। বাংলা দেশে তো অনূঢ়া মেয়ের অভাব নেই। সুধাংশু যদি রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে থাকে তাহলে সে নিজেই ভুল করেছে। যদি ভেবে থাকে বরণমালা নিয়ে কোন মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসবে তাহলে তার বাস্তববুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। সুধাংশুকে কন্যার পিতা আর পুরোহিতের সাহায্যই নিতে হবে। তারপর সহায় হবে বল, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা।

এমনি করেই চলছিল। এ ওর কথা ভাবে, ও একে বিয়ের জন্যে তাগিদ দেয়। কিন্তু কেউ কারো কথায় মাথা পাতে না।

মাঝে মাঝে তারা এক সঙ্গে কোন ইংরেজী ছবি দেখে; কি রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খেতে খেতে গল্প করে। সে গল্পের মধ্যে সব থাকে। নিজেদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বোনদের বিয়ে, ভাইদের পড়াশুনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। কানাই একটু বেশি বাবুগিরির দিকে ঝুঁকেছে, বলাইর কথাবার্তা বড় কড়া কড়া—ওকে একটু শুধরে দেওয়া দরকার। গীতা বড় বেশি মুটিয়ে যাচ্ছে। দেখে-শুনে এবার ওর বিয়ে দিতেই হবে, রীতা ইকনমিক্সএ অনার্স তো নিল, কিন্তু পেরে উঠবে কি? রাতদিন তো কলেজের ইউনিয়ন, ম্যাগাজিন আর কালচারাল ক্লাব নিয়েই আছে। সাজ-সজ্জার দিকে আগ্রহও কম নয়। কিছু বললে আবার অভিমান করে হাতের বালা আর কানের দুল পর্যন্ত খুলে রাখে। মিষ্টি ভাষায় ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিতে হবে।

দুই ভাইয়ে মিলে জল্পনা-কল্পনা চলে। নিজেদের কথা নিয়ে, বিশেষ করে বিবাহপ্রসঙ্গ নিয়ে যেমন কোন কোন সময় ওদের মধ্যে খুব বেশি আলোচনা হয়, তেমনি কখনো কখনো তারা ও বিষয়ে একেবারেই নীরব হয়ে থাকে। যেন ও একটা বিষয়ই নয়, যেন ওকথা তারা একেবারেই ভুলে গেছে।

এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ সেদিন রীতা নিয়ে এল এক খবর—'বড়দা, ভালো একটা টুইশন আছে। করবে?'

এ ধরণের যোগাযোগ ও আগেও করে দিয়েছে।

সুধাংশু বলল, কি রকম টুইশন শুনি?

রীতা বলল, 'আমাদের কলেজেরই মেয়ে। আমাদের ক্লাসেই পড়ত। গতবার ফেল করেছে। প্রথমে রাগ করে ভেবেছিল পরীক্ষাই আর দেবেনা। বাপের বকুনিতে ফের পথে এসেছে। আমাকে এসে ধরেছে একজন টিউটর জোগাড় করে দিতে। আমি তোমার কথা বলেছি। সপ্তাহে তিন দিন। চল্লিশ টাকার বেশি কিন্তু দিতে পারবে না। করবে বড়দা?'

সুধাংশু মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু।'

রীতা মুখ ভার করে বলল 'উঁহু কেন। তুমি তো ইণ্টারমিডিয়েটের ছেলেদের মাঝে মাঝে পড়াও।'

সুধাংশু বলল, 'ছেলেদের পড়াই। কিন্তু মেয়েদের মেহনৎ বেশি। তারা নিজেরা পড়ে না। মাষ্টার মশাইকে দিয়ে পড়াটা মুখস্থ করিয়ে নিতে পারলেই ভালো হয় তাদের।'

রীতা বলল, 'মোটেই না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আজকাল ঢের বেশি পড়াশুনো করে।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আমার সামনেই আছে।'

রীতা বলল, 'আহা সবাই আমার মত কিনা।'

সুধাংশু বলল, 'তাছাড়া মেয়েরা সময় বড় বেশি নেয়। দেড় ঘণ্টা বলে দুঘণ্টা, দুঘণ্টার কথা বলে আড়াই ঘণ্টা তারা আটকে রাখবেই। সব শেষ করে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ বলবে মাষ্টারমশাই এই অঙ্কটা একটু দেখুন তো।'

রীতা হেসে বলল, 'অঞ্জলির অঙ্ক নেই। সিভিক্স, লজিক, হিষ্ট্রি। সব বাংলায়। ইংরেজীটাও যদি বাংলায় হত তাহলে আর দুঃখ ছিল না। আচ্ছা আমি ওকে বলে দেব। আমার দাদার সময়ের দাম অনেক বেশি। একটি মিনিটও যেন এদিক-ওদিক না হয়।'

'কোথায় থাকে?'

রীতা বলল, 'পাতিপুকুর।'

সুধাংশু বলল 'ওরে বাবা। সে কি এইখানে নাকি? যাতায়াতেই আমার অনেক সময় লেগে যাবে। পোষাবে না রিতু।'

রীতা মুখ ম্লান করে বলল, 'আগে ওরা শ্যামবাজারেই ছিল। ভাড়াটে বাড়িতে। ওর বাবার কি দুর্মতি হয়েছে অত দূরে গেছেন বাড়ি করতে। অঞ্জলি সেদিন কত দুঃখ করল। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই। নতুন পাড়া। এখনো একেবারে পাড়াগাঁ। কিন্তু বড়দা তোমাকে কিন্তু পড়াতেই হবে। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, তুমি তো বেলগাছিয়ায় সপ্তাহে তিন চার দিন যাওই। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই হবে।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'তুই তো খুব সোজা রাস্তা বলে দিলি। কিন্তু আমাকে কি ওদের পছন্দ হবে? তোর বন্ধুর বাবার সঙ্গেও তো আলাপ-টালাপ হয়নি।'

রীতা মুখ টিপে হেসে বলল, 'ওর বাবা কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। যা করবার অঞ্জুই করে। ওর মা নেই। বাবা ভিতরে ভিতরে বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভালো কথা, আমি কিন্তু তোমাকে ওর কাছে এম-এ পাশ বলে চালিয়ে দিয়েছি। যদি কথা ওঠে, তুমি যেন অস্বীকার কোরো না।'

সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কিরে। হিমুর ডিগ্রীটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে চাপাতে গেলি কেন।'

রীতা বলল, 'মেজদার ডিগ্রী দিয়ে কি হবে। টিউশনি-ফিউশনি কিছু করবেনা। নবাব। তোমার নামের পিছনে এম-এ তো ভালো, পি আর এস, পি এইচ ডি লাগিয়ে দিতে পারলে আমাদের আরো সুবিধে হত। টিউশনিগুলি থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ রোজগার হয়ে যেত। সত্যি বড়দা, তুমি এত কর আমাদের জন্যে, রাতদিন এত খাট—।'

সুধাংশু বলল, 'যাক যাক। একটা ডিগ্রীই যথেষ্ট। গুডকণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট তোকে আর দিতে হবেনা। আমি তোর বন্ধুকে পড়াব। একা না পারি, হিমু মাঝে মাঝে আমার বদলী দেবে।'

বড়দার ওপর ভাইবোনেরা খুব কৃতজ্ঞ। কথাটা সুধাংশুর আর একবার মনে হল। সে যেমন সবাইর জন্যে খাটে, বাড়ির প্রত্যেকে তেমনি তাকে তোয়াজ করে সেবাযত্ন করে, আত্মীয়স্বজনের কাছে তার কথা নিয়ে গল্প করে, গর্ব করে। পরিবারের ছোট বড় সবাইর কাছে যে সম্মানটা সুধাংশু পায়, হিমাংশুর ভাগ্যে তার চেয়ে অনেক কমই জোটে। ভাইয়ের জন্যে সহানুভূতি বোধ করে সুধাংশু। হিমুও তো কম খাটেনা। তার ত্যাগও কম নয়। তা ছাড়া সে সুধাংশুকে প্রেরণা জোগায়। অবসরক্ষণকে তার সঙ্গসান্নিধ্য দিয়ে ভরে রাখে। হিমাংশুর দানও কম নয়। সুধাংশু পরিবারের সবাইকে সে কথা বলে। ছোটকে বড় করে সে প্রত্যেকের কাছে আরো বড় হয়ে ওঠে।

তারপর দিনকয়েক বাদে পাতিপুকুরে টুইশন আরম্ভ করে সুধাংশু। ম্যাঙ্গো লেনে অফিস। সেখান থেকে বেরিয়ে পাথুরিয়াঘাটায় দুটো টুইশন সেরে পাতিপুকুরে পৌছতে পৌছতে রাত আটটা বেজে যায়। বাসে যা ভিড়! প্রায় বেশির ভাগ পথই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ভারি ক্লান্তি লাগে। শরীর যেন আর বইতে চায়না। কিন্তু নতুন ছাত্রীটির বিবেচনা আছে। আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বই খুলে ধরেনা, কি খাতাপত্র এগিয়ে দেয়না। বলে, 'মাষ্টারমশাই, আপনি একটু জিরিয়ে নিন।' তারপর কোনদিন চা করে আনে, কোনদিন কফি। সেই সঙ্গে কিছু না কিছু খাবারও থাকে। কোনদিন লুচি তরকারি, কোনদিন বা হালুয়া, কোনদিন

টোষ্ট, কোনদিন অমলেট, কোনদিম বা ডিম সিদ্ধ। নিত্য নতুন জিনিস দেওয়ার দিকে ওর ঝোঁক। সুধাংশু খুসি হয়। সকালে সন্ধ্যায় চা জলখাবার সে আরো দু' এক বাড়িতে পায়। কিন্তু এমন যত্ন কেউ করেনা।

সুধাংশু বলে, 'তুমি এই সবই যদি কর পড়বে কখন?'

অঞ্জলি লজ্জিত হয়ে বলে, 'এর জন্যে কি পড়া আটকায়?'

সুধাংশু বলে, 'বাড়ির অন্য কাজকর্মও বোধ হয় করতে হয়?'

অঞ্জলি মুখ নিচু করে বলে, 'তা হয়। লোকজন তো সব সময় পাওয়া যায়না।'

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করে, 'রান্না বান্না?'

অঞ্জলি একটু হেসে বলে, 'তাও করি। বাবা আবার ঠাকুর চাকরের রান্না খেতে পারেননা।'

সুধাংশু লক্ষ্য করল অঞ্জলির বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। আজকালকার তুলনায় একটু বেশি বয়সেই পড়াশুনো আরম্ভ করছে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। সুন্দরী বলা চলে না। তবে মুখশ্রীটুকু মিষ্টি। এমনো হতে পারে, স্বভাবের মাধুর্যের জন্যেই ওই মিষ্টত্বটুকু বেশি করে চোখে পড়েছিল।

অঞ্জলির এক বৃদ্ধা দিদিমা আছেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল সুধাংশুর। থান-পরা মাথার চুল ছোট করে ছাটা। লাল শালুর তৈরি জপের মালাটি হাতে নিয়ে তিনি রোজ এসে দোরের সামনে জলচৌকি পেতে বসেন। মালা জপ করেন, আর মাষ্টারের পড়ানো দেখেন শোনেন। অনেক অভিভাবকেরই এ অভ্যাস আছে। গোড়ার দিকে সুধাংশু অস্বস্তি বোধ করত। আজকাল আর কোন অসুবিধা হয় না।

উঠে যাওয়ার সময় অঞ্জলির দিদিমা প্রায় রোজই জিজ্ঞাসা করেন 'পড়ানো হ'ল?'

সুধাংশু বুঝতে পারে 'এরই মধ্যে' কথাটি উহ্য আছে।

সুধাংশু একটু হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

অঞ্জলি আরক্ত হয়ে বলে 'উনি অনেকক্ষণ আগে এসেছেন দিদা।'

দিদিমা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি কি তোর কাছে তাই শুনতে চেয়েছি? তোর সবতাতেই বড় বাড়াবাড়ি।'

অথচ কোন ব্যাপারেই অঞ্জলির যে কিছুমাত্র আতিশয্য আছে সুধাংশুর তা মনে হয় না। এই মেয়েটির বড় সম্পদ হল ওর পরিমিতি-বোধ। অঞ্জলির চালচলনে, পোষাকে পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় যে সংযম আর সুরুচির সুষমা আছে, সুধাংশুর মনে হয় এর আগে তা সে আর কোন মেয়ের মধ্যে দেখেনি।

শুধু সংযমই নয়, সুধাংশু লক্ষ্য করল বয়সের তুলনায় অঞ্জলির মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় গাম্ভীর্য আর বিষণ্ণতাও আছে। তা শুধু মাতৃহীনা বলে নয়। ওর মা মারা গেছেন দশবছর আগে। এই দশবছরের মধ্যে ওর বাবা বিয়ে তো করেনইনি, কেউ সে প্রস্তাব তুললে কানে আঙুল দিয়েছেন।

কিন্তু এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে তাঁর মন নাকি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। থিয়েটারে তাঁর একখানি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। নিজের মৌলিক নাটক নয়। এক লেখক বন্ধুর উপন্যাসের নাট্যরূপ। তারই মহড়ায় রোজ হাজিরা দিতে গিয়ে এক মধ্যবয়স্কা মাঝারি-খ্যাতির অভিনেত্রীর সঙ্গে অঞ্জলির বাবা সুরেনবাবুর আলাপ এবং পরে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁর নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে বছর দুয়েক হল। দ্বিতীয় নাটক আর হয়নি। কিন্তু তারপর থেকে সুরেনবাবুর থিয়েটার-প্রীতি বেড়েছে। কোর্ট থেকে সরাসরি তিনি আর বাড়িতে আসেন না। যেদিন অভিনয় থাকে থিয়েটারে যান, যেদিন তা না থাকে অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটে গিয়ে গল্পগুজব করেন। ফিরতে তাঁর রোজই রাত হয়।

এ গল্প অঞ্জলির কাছে শোনেনি সুধাংশু। সে কোন দিন তার বাবার সম্বন্ধে দু একটির বেশি কথা বলে না। এ সব কাহিনী রীতাই বলেছে বাড়িতে গিয়ে। যেকটি ভাইবোন বড় হয়েছে তাদের মধ্যে সবরকমের আলোচনাই হয়।

রীতাই বলেছে, 'মেয়েটার বড় দুঃখ দাদা।'

সুধাংশু বলেছে, 'দুঃখের কি আছে। অঞ্জলির মা যদি বেঁচে থাকতেন দুঃখটা তিনি পেতে পারতেন।'

হিমাংশু বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'সবই তোমার অঙ্কের ব্যাপার নয় দাদা। অঙ্ক দিয়ে সব ব্যাপারকে বুঝতে যেয়োনা।'

সুধাংশু হেসে বলেছে, 'আচ্ছা, আচ্ছা। আমার এই ছাত্রীটির ওপর হিমুর খুব যে সহানুভূতি দেখছি।'

ছোট ভাইয়ের কাছে সুধাংশু কোন কথাই গোপন করেনা। এই নতুন ছাত্রীটির কথাও কিছু গোপন রাখেনি। অঞ্জলির স্বভাবের নমনীয়তা, শরীরের কমনীয়তা, তার শিষ্টাচার সৌজন্য সবই বর্ণনা করেছে।

হিমাংশু তা শুনে হেসেছে, 'দাদা টুইশন করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে, কত ছাত্রছাত্রীই না তোমার হাতে পার হল, কেউ বা examinerএর হাতে মার খেয়ে সোজা চাকরিতে কি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঢুকল। আশ্চর্য। আজও তাদের একেক জনকে আলাদা করে তুমি দেখতে পাও? আজও তাদের সবাইকে চেয়ার টেবিলের সমান মনে হয়না?'

সুধাংশু বলে, 'যদি স্কুল কলেজের বড় বড় ক্লাস নিতাম তাহলে হয়তো তাই হত। এক বছরের ছাত্রদের মুখের সঙ্গে আর এক বছরের ছাত্রদের মুখের কোন তফাৎ থাকতনা। বাঙালীরা যেমন চীনাদের মুখ সব একাকার দেখে, আমিও তাই দেখতাম। কিন্তু এই বালীগঞ্জ, এই বেলেঘাটা, এই পাতিপুকুর, এই পটলডাঙ্গা একেক জায়গায় গিয়ে একেকজনাকে পড়াই বলে আমি সহজে কাউকে ভুলিনে।'

হিমাংশু ঠাট্টা করে, 'তবু পাতিপুকুরকে যেন বড় বেশি মনে রেখেছ। কই তোমার মুখে পটলডাঙ্গা কি বেলেঘাটার গল্প তো এত শুনিনি। কলকাতায় পুকুর কি কম আছে নাকি? লালদীঘি গোলদীঘির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু শ্যামপুকুর, বেনেপুকুর, পদ্মপুকুর—সারা কলকাতা ভরে পুকুরের ছড়াছড়ি। কিন্তু তোমার মুখে পাতিপুকুর ছাড়া আর কোন কথা নেই—।'

হিমাংশু হাসতে থাকে। গীতা রীতাও হাসে।

সুধাংশু লজ্জিত হয়ে বলে, 'কী যে বলিস। সময় মত বিয়ে থা করলে আমার মেয়ের বয়সই ওই রকম হত।'

রীতা প্রতিবাদ করে ওঠে, 'থাক দাদা থাক। বেশি বাড়াবাড়ি করতে হবেনা। বত্রিশ বছর বয়সে কুড়ি বছরের মেয়ে কেন, নাতনী হত তোমার। দাঁড়াও অঞ্জুকে আমি কালই গিয়ে বলব, আমার দাদা তোমার দাদু হতে চায়। ঠাকুরদা-নাতনীর সম্পর্ক পাতাতে চায় তোমার সঙ্গে।'

হিমাংশু ও হো হো ক'রে হাসে, 'পাতাও না দাদা, পাতিপুকুরের এই নতুন পাতানো সম্পর্কটা নেহাৎ মন্দ হবেনা। অন্তত টিচার-ছাত্রীর চেয়ে সরস আর নতুন ধরণের কিছু হবে।'

সুধাংশুর কোন কোন ছাত্রীকে নিয়ে এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা তার ভাইবোনেরা আগেও করেছে। কিন্তু কখনোই তারা তাদের বড়দাদাকে এত লজ্জিত হতে দেখেনি। অঞ্জলির প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে সুধাংশু তা থামিয়ে দেয়। তারপর অন্য কোন কাজের অছিলায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুধাংশুর এই মধুর লজ্জা হিমাংশু গীতা রীতা সবাই মিলে উপভোগ করে। একজন আর একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে।

অঞ্জলির বাবা সুরেনবাবুর সঙ্গেও সুধাংশুর ইতিমধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। সৌম্য শান্ত সুদর্শন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক। ব্যাঙ্কশালকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণের কৈফিয়তও তিনি দিলেন। জনকয়েক উকিল বন্ধু মিলে ছোট একটা ক্লাব করেছেন ফরডাইস লেনে। সেখানে গল্পগুজব তাসপাশা চলে। আবার মক্কেলের জরুরী কোন কাজকর্ম থাকলে তাও সেখানে বসেই সারেন। একটি কমন মুহুরী আছে, টাইপরাইটার আছে, সেখানে বসে কাজ করার খুব সুবিধে। বাড়ীতে আসেন না সুরেনবাবু। কারণ বাড়িতে এলেই অঞ্জলিকে তিনি এটা ওটা ফরমায়েস করবেন, কি গল্প শুরু করবেন আর ওর পড়ার ব্যাঘাত হবে। তারপর মেয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন 'কিরকম মাষ্টারমশাই? কেমন তৈরী হচ্ছে? এবার পারবে তো পাশটাস করে বেরিয়ে যেতে?'

সুধাংশু ভরসা দিয়ে বলে, 'তা পারবে। পড়াশুনোয় তো খারাপ নয়।'

পড়াশুনোয় খুব ভালো একথাটা বলতে পারলেই যেন বেশি খুসি হত সুধাংশু।

সুরেনবাবু বলেন, 'না খারাপ ঠিক নয়। তবে ছেলেবেলা থেকেই ওর ঝোঁক ছিল নাচের দিকে।

ওর ইচ্ছে ছিল বরাবর নাচ নিয়েই থাকবে। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর জোর করে নাচের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। মেয়ের সে কী কান্না। কিন্তু বাঙালী গেরস্থঘরের মেয়ের নাচের কী ভবিষ্যৎ বলুন। কজন আর অমলাশঙ্কর হ'তে পারে। বিয়ে থা হয়ে গেলে দুদিন বাদে তো সেই গৃহিণী-নৃত্য শুরু করতেই হবে। হ্যাঁ, এবার ওর একটা বিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। দেখবেন তো মশাই—ভালো একটা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ।'

এবার অঞ্জলি প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, 'বাবা!'

সুরেনবাবু হাসিমুখে বলেন, 'আহা, তুই পড়ছিস পড়না। ছেলেটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র হয়, খেয়ে পরে মোটামুটি থাকতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। আমি বড়লোক জামাই চাইনা মশাই। গরীবের মেয়েকে ঘরে নিয়ে দাসীর মত রাখবে, শ্বশুরকে গোমস্তার মত মনে করবে, মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বে, তেমন ইচ্ছে আমার নেই।'

অঞ্জলি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'আঃ বাবা, তুমি ও ঘরে যাও।'

সুরেনবাবু হেসে বলেন, 'দেখলেন তো, এই জন্যেই আমার মেয়ে চায়না আমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরি। আমি ওকে বড় বিরক্ত করি।'

সুধাংশু বলে, 'হ্যাঁ পরীক্ষার কটা মাস ওসব আলোচনা না করাই ভালো।'

তারপর সিভিক্‌সের ব্যাঙ্কিং-এর চ্যাপটার পড়াতে পড়াতে সুধাংশু হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে বসে, 'তুমি যে নাচতে জানো একথা তো আমাকে কোনদিন বলনি।'

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে অঞ্জলি বিস্মিত হয়, লজ্জিতও হয়। একটু হেসে বলে, 'আপনি বুঝি বাবার সেই কথা এখনো মনে রেখেছেন? একটু একটু শিখেছিলাম। সে এমন কিছুনা।'

সুধাংশু আর একটু ঘনিষ্ট ভঙ্গিতে বলে, 'ঘুঙুর জোড়া রেখেছ! না তাও বিদায় দিয়েছ?'

অঞ্জলি বলে, 'বিদায় দেওয়ার মতই। সব ভুলে বসে আছি। এখন আছে শুধু স্মৃতি।'

শেষ কথাটুকু বলে নিজেই বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে অঞ্জলি।

জানালা দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়। তার প্রতিবিম্ব পড়ে পুকুরের জলে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর অনেক আছে। আর আছে সবুজ ঘাসের জমি। তার স্নিগ্ধতা যেন সমস্ত জ্বালা ভুলিয়ে দেয়, সকল দীনতা, রিক্ততা ভুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ সুধাংশু একদিন বলল, 'ওই ঘাসের জমিটুকু বড় চমৎকারতো অঞ্জলি।'

খাতা থেকে অঞ্জলি মুখ তুলল, একটু বিস্মিত হল হয়তো, তারপর শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ওদিকটা আমারও খুব ভালো লাগে দেখতে। একেকবার শুনি ও জমি বিক্রি হয়ে যাবে। ওখানেও বাড়ি উঠবে।'

সুধাংশু আহত হয়ে বলে, 'সত্যি? তাহলে তোমাদের বাড়িটা কিন্তু কানা হয়ে যাবে।'

অঞ্জলি সুধাংশুর মুখের দিকে তাকায়—তারপর মাষ্টার মশাইকে যেন আশ্বাস দিয়ে বলে, 'কিন্তু শিগগির তা হবে না: ও জমির স্বত্ব নিয়ে কি যেন গোলমাল আছে। কতজনে এসে ঘুরে গেল, কেউ কিনতে পারেনি।'

সুধাংশু বলে, 'না পারলেই ভালো। বেশ একটু ওয়েসিসের মত জমিটুকু পড়ে আছে।'

অঞ্জলি একথায় হেসে বলল, 'কিন্তু আপনার ওয়েসিসের কথাটা কেন মনে হল মাষ্টারমশাই। এই খানা ডোবা আর পুকুরের রাজ্যে মরুভূমি কই?'

সুধাংশু হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলল, 'জীবনের আর একনাম মরুভূমি। তা তুমি জানো না অঞ্জলি, তা যেন তোমাকে কোনদিন জানতে না হয়।'

এ কথার পর দুজনেই একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদিমার শরীরটা খারাপ, আজ তিনি একটু সকাল সকাল খাবেন, তাঁর খাবারটা গুছিয়ে দিয়ে আসি।'

যেতে যেতে একটু ফিরে দাঁড়াল অঞ্জলি, একটু যেন হেসে বলল, 'আজ আর লজিকটা পড়বনা মাষ্টারমশাই। আজ থাক। বুধবার পড়ব।'

সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'আচ্ছা।'

সারারাত সুধাংশুর ঘুম হল না। সে কি হাস্যকর

ভাবে ধরা দিয়েছে ? সে কি নিজেকে বড় বেশি প্রকাশ ক'রে ফেলেছে ? ছি ছি ছি, এমন দুর্মতি তার কেন হল ?

হিমাংশু বলল, 'দাদা, কি হয়েছে, অমন এপাশ-ওপাশ করছ কেন ?'

সুধাংশু বলল, 'তুই ঘুমো, বাজে বকিসনে। কী আবার হবে।'

বুধবার থেকে সুধাংশু আবার বেশ শক্ত হয়ে গেল। মরুভূমির কথাও তুললনা, ওয়েসিসের কথাও তুলল না। পড়াশুনোর মধ্যেই সমস্ত আলোচনা আবদ্ধ রাখল। তার চালচলনে একটু বরং রূঢ়তাই দেখা দিল। অঞ্জলি বুঝুক, মরুভূমির তাপ সহ্য করবার শক্তি সুধাংশুর আছে। এক আধ দিনের এক আধটু দুর্বলতাই মানুষের সব নয়।

ইতিমধ্যে আরো একটা ঘটনা ঘটল। একশ টাকার আর একটা ভালো টুইশনের খোঁজ এল সুধাংশুর কাছে। সেকেণ্ডক্লাসের দুটি মারোয়াড়ী ছাত্রকে পড়াতে হবে। সব বিষয় নয়, ইংরেজী আর অঙ্ক। যদি বনিবনাও হয় তাহলে পুরো দুবছরের চুক্তি। কিন্তু সময় করাই যে শক্ত। একটু ভেবে সুধাংশু নিজেই সমস্যার সমাধান করল। সে বলল, 'আমি মারোয়াড়ী ছাত্রদের পড়াব, হিমু পাতিপুকুরের টুইশনটা করুক।'

হিমু আপত্তি করে বলল, 'সে কি দাদা, লজিক আর সিভিকদের কিছুই যে আমার মনে নেই।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'বাড়িতে রাত জেগে জেগে পড়ে নিবি। তিন দিন পড়বি, তিনদিন পড়াবি। কটা মাস চালিয়ে নিতে পারবিনে ?'

সুধাংশুর বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'কেন পারবে না ? একজন খাটবে আর তোরা সবাই মিলে আরাম করবি। এ কি স্বভাব তোদের। না হিমু, তোমার ওই টুইশন নিতেই হবে।'

হিমুর খুব আপত্তি দেখা গেল না। কিন্তু সত্যিসত্যিই ও যখন পাতিপুকুরে যেতে শুরু করল সুধাংশুর বুকের ভিতরটা চড়াৎ করে উঠল। ইচ্ছা হল, এখনো ওকে ফেরায়। কিন্তু তার আর সময় নেই। তাতে নিজেকে আরো ধরা দেওয়া হবে। সবাই হাসাহাসি করবে। কিছু মাত্র মর্যাদা থাকবে না সুধাংশুর। অন্যের জন্য অনেক কিছু হারাবার মত বিচারমূঢ়তা এই বয়সে কি শোভা পায় ?

কিন্তু পাতিপুকুরে যাতায়াত শুরু করবার পর এক মাসও গেল না, তার আগেই হিমাংশুর চালচলন পোষাক-আসাকের পরিবর্তন আরম্ভ হল। রাত জেগে সত্যিই নতুন করে ইণ্টারমিডিয়েটের কোর্স পড়তে লাগল হিমাংশু। নোট বই সংগ্রহ করল, পাতায় আলাদা করে নোট করল, ছাত্রীকে সাহায্য করতে।

আগে বেশবাসের দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না হিমাংশুর, এখন মিহি আর পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় না হলে তার চলে না।

রীতা ঠাট্টা করে বলল, 'সিলকের একটা চাদর কিনে নাও দাদা, নইলে প্রফেসর বলে চেনা যাবে না। না—কি চেনা বামুনের পৈতার দরকার নেই ?'

হিমাংশু হেসেই ধমক দেয়, 'আচ্ছা, ফাজিল হয়েছিস।'

কিছুদিন বাদে অঞ্জলির পরীক্ষার আসন্নতার অজুহাতে তিনদিনের জায়গায় চারদিন যেতে লাগল—দু ঘণ্টার জায়গায় তিনঘণ্টা থাকতে লাগল পাতিপুকুরে। ওর তো আর অন্য টুইশনের তাগিদ নেই, ওকে তো আর সংসারের জন্যে বেশি চিন্তা করতে হয় না। সুধাংশু ভাবল, তাই বলে চক্ষুলজ্জাটুকুও কি গেছে ?

সে যেমন এসে অঞ্জলির সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করত হিমাংশু তা করেনা। হিমু ও ব্যাপারে একেবারে চুপ। সুধাংশু এক আধটু কৌতূহল প্রকাশ করলে—কি রসিকতার চেষ্টা করলে হিমাংশু তাতে যোগ দেয়না, বরং বেশি-মাত্রায় গম্ভীর হয়ে যায়। যেন সুধাংশু অশোভনভাবে বড় অনধিকার চর্চা শুরু করেছে। সুধাংশু ওর ভাবভঙ্গি দেখে হাসতে যায়, কিন্তু ঠিক যেন হাসতে পারেনা।

রীতা ওদের সব খবর দেয়। হিমাংশু ওবাড়িতে খুব সমাদৃত হয়েছে। যেমন ধৈর্য তেমনি সহিষ্ণুতা, তেমনি পড়াবার পদ্ধতি। সুরেনবাবু ওকে খুব পছন্দ করেছেন, অঞ্জুর দিদিমাও খুব পছন্দ করেছেন। রীতা ঠোঁট টিপে হেসে বলে, 'নাতনীটির কথা বলাই বাহুল্য। যাই বল, ওদের দুজনকে কিন্তু খুব মানায়। না দাদা ?'

সুধাংশু গম্ভীরভাবে বলে, 'হুঁ।' মনে মনে ভাবে, 'মেয়েরা এই রকমই হয়।'

হিমাংশুর চেষ্টা যত্ন বৃথা গেলনা। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করল অঞ্জলি। এই উপলক্ষে তার দিদিমা সবাইকে

নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। হিমাংশু গেল, রীতা গেল। সুধাংশুকেও যাওয়ার জন্যে অঞ্জলি বিশেষ অনুরোধ করে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার সময় নেই। সে চলে গেল পোস্তার তার মারোয়াড়ী ছাত্রদের বাড়িতে।

এতদিন কথাটা মনে মনে ছিল। সেই ভোজের দিন অঞ্জলির দিদিমা মনের কথাটা খুলেই বললেন। হিমাংশুকে তিনি নাতজামাই করতে চান।

রীতা লাফিয়ে উঠে বলল, 'এ তো আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি। অঞ্জুর হাত দেখে আমি অনেক-দিন আগেই বলেছি একথা। ওর কপালে আছে আমার বউদি হওয়া, আর আমার খোঁটা খাওয়া।'

মনের আনন্দে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল রীতা। অঞ্জলি লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল।

রাত্রে রীতার মুখে সব শুনে সুধাংশু বলল, 'খুব ভাল কথা। শুভ কাজটা তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক হিমু।'

কোথায় যেন একটু খোঁচা, কোথায় যেন একটু জ্বালা আছে সুধাংশুর গলায়।

হিমাংশু স্থিরদৃষ্টিতে তার দাদার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার মানে ?'

সুধাংশু বলল, 'মানে তো জলের মত সোজা।'

হিমাংশু বলল, 'না, অত সোজা নয় দাদা। আমি তোমাকে আগেই বলেছি দাদা, আমি অত আহাম্মক নই। খানিকটা ঘাসের জমির জন্যে আমি কারো জীবনকে মরুভূমি করতে চাইনে।'

সুধাংশু যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'হিমু।'

হিমাংশু একথার জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছে সে জন্যে সুধাংশুর দুঃখ নেই। অঞ্জলি সুধাংশুর একমুহূর্তের দুর্বলতাকেও যে ভোলেনি, ক্ষমা করেনি—বরং সে কথা নিয়ে হিমাংশুর সঙ্গে হাসিপরিহাস করেছে। যাকে কোমলতার প্রতি-মূর্তি মনে করেছিল সুধাংশু, তার মধ্যে নির্মমতার কল্পনা করে দুঃখে রাগে তার বুকের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল।

বিয়ের জন্যে হিমাংশুকে তার বাবা-মা নানাভাবে অনুরোধ করলেন। সম্বন্ধটা ভালো। নগদে গয়নায় সুরেনবাবু বেশ ভদ্ররকমই ব্যয় করবেন। মেয়েটিও কাজকর্ম লেখাপড়া শিখেছে, চেহারার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কোনদিক থেকেই এসম্বন্ধ অবরণীয় নয়।

কিন্তু হিমাংশুর এক গোঁ। সে কিছুতেই বিয়ে করবেনা। সুধাংশু তাকে নানাভাবে অনুরোধ করল, তার ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু হিমাংশুর মত বদলালনা।

রীতার কল্যাণে তার বিয়ে না করার কারণটা চাপা রইলনা। কিছুদিন ধরে এঘরে ওঘরে, এ কোণে ওকোণে নিচু গলায় এ নিয়ে আলাপ আলোচনাও চলল। সুধাংশুর মনে হল হিমাংশু যেন হঠাৎ পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বড় আসন অধিকার করে বসেছে। যে শ্রদ্ধা সহানুভূতির আসন সুধাংশুর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, তা এখন হিমাংশুর। সুধাংশুর রোজগার বেশি, কিন্তু হিমাংশুর ত্যাগ বেশি। বড় হিমাংশুই। অনুচ্চারিত এই পারিবারিক রায় সুধাংশু যেন দিনরাত শুনতে লাগল।

কিছুদিন একজন আর একজনকে এড়িয়ে চলল। একঘরে থেকেও বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখল। দুজনে যেন দুই আলাদা দ্বীপের—দ্বীপের নয়, আলাদা গ্রহের বাসিন্দা।

তারপর হিমাংশুই এগিয়ে এল, 'অমন মুখ ভার করে থাকবার মত কী হয়েছে দাদা ?'

সুধাংশু বলল, 'কিছুই হয়নি।'

হিমাংশু বলল, 'আমরা কি এতই বোকা যে সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যে—'

সুধাংশু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই না। আমরা কেন অত বোকা হ'তে যাব।'

হিমাংশু বলল, 'পৃথিবীতে মেয়ের অভাব নেই। অমন ঢের ছাত্রী তোমারও জুটবে, আমারও জুটবে।'

সুধাংশুর কানে কথাটা একটু স্থূল শোনাল, কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না।

সে শুনেছে—রীতাই এসে বলাবলি করেছে বাড়িতে—অঞ্জলি এখনো বিয়ে করেনি, বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। তার নাকি ধারণা সে বিয়ে করলেই তার বাবা সেই অভিনেত্রীকে বিয়ে করে বাড়িতে এনে তুলবেন। তা যখন একদিন হবেই, তার চোখের সামনেই হোক। অঞ্জলির জন্যে তার বাবার চক্ষুলজ্জার কোন কারণ

নেই। এই নিয়ে নাকি বাপ আর মেয়েতে মনোমালিন্য চলছে।

সংসারের জন্যে যথেষ্ট খাটে সুধাংশু। চাকরি ছাড়াও প্রাণপণে টুইশন করে। এক মুহূর্ত ফাঁক নেই। বেলেঘাটা, পার্কসার্কাস, বড়বাজার, শোভাবাজার সব জায়গায় তার ছাত্রছাত্রী ছড়ানো।

অনেক রাত্রে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ক্লান্ত সুধাংশুর একেকবার বেশ একটু ঝিমুনি আসে। মিনিট কয়েকের শ্রান্তিহর তন্দ্রা। আশে পাশে ছোট ছোট পুকুর, নারকেল গাছ। পাতায় পাতায় চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি, পুকুরের জলের প্রতিযোগিতা। তার পারে দূর্বাকোমল দূর্বাশ্যামল একখণ্ড জমি। যেন এক অখণ্ড স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপ। তারপর সাদা ধবধবে কবুতরের মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ি। তারপর—। না তারপর আর কিছু নেই। তারপর কণ্ডাকটরের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন 'আপনার টিকেট হয়েছে ?

তারপর সুধাংশুর বিব্রত লজ্জিত জবাব 'না হয়নি।'

বানান-ভুল

[অনুব্রো]

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

অধ্যাপক শ্রীঅজরামর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ত্রিশ বৎসর যাবত কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। নামটী যেমন উদ্ভট কিম্ভুতকিমাকার, নামধারী ভদ্রলোকের আকৃতি প্রকৃতিও তেমনই অদ্ভুত ধরণের। পিতামহ-প্রদত্ত এই অপূর্ব্ব নামের জন্য অবশ্য অধ্যাপক মহাশয়কে দায়ী করা চলে না; তবে তিনি ইচ্ছা করিলে পরে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে বাছিয়া একটী শ্রুতিমধুর কবিত্বময় নাম নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে পারিতেন। অজরামর-বাবুর অভিভাবকেরা হয়ত এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে নামেরগুণে নামী সারাজীবন বিদ্যাধন অর্জ্জন করিবেন। সে আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারিব না, অজরামরবাবু পড়ান ভাল, যদিও তাঁহার মেজাজটী বেশ কড়া। ক্লাসে 'ডিসিপ্লিন' রক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি অতিমাত্রায় সজাগ। পাছে সত্যের অপলাপ হয় এই ভয়ে আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে অধ্যাপক মহাশয়ের সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে "হেরম্ব মৈত্র", "moralist", "puritan" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁহার "নীতি-বাতিকতা" লক্ষ্য করিয়া আড়ালে হাসি-কৌতুক করিয়া থাকেন।

অজরামরবাবু—জীবনে চা-চুরুট স্পর্শ করেন নাই। তিনি কখনও হোটেল বা রেষ্টুরেঁায় খান না, থিয়েটার-সিনেমায় যান না, রেশমের জামা চাদর ব্যবহার করেন না। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শুনিয়াছি তিনি নাকি বিবাহের সময়ে আংটী পরিতে পর্য্যন্ত আপত্তি করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখার মরসুমে ভদ্রলোককে দেখিলে মনে হয় তাঁহার অশৌচ চলিতেছে—চুল উস্কু-খুস্কু, মুখে কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল, ত্রস্ত-ব্যস্ত-চিন্তিত-উদ্বিগ্ন ভাব। অজরামরবাবু ভোর চারিটায় শয্যাত্যাগ করেন এবং রাত্রি এগারোটার পরে শয্যাগ্রহণ করেন। বলিতে গেলে তিনি দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্ম ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরীক্ষার খাতা দেখেন। তিনি-বিবেক-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার এক একখানা খাতা দেখিতে অন্ততঃ ৪০।৪৫ মিনিট সময় লাগে। খাতার পাতায় রংয়ের বিলাস অর্থাৎ নানা রংয়ের পেন্সিলের দাগ—কোথাও বর্ণাশুদ্ধি, কোথাও বা তথ্যগত ভ্রম-প্রমাদ, কোনটায় মন্তব্যের অযৌক্তিকতা; কোনটায় পৌর্ব্বাপৌর্য্যের অসমাঞ্জস্য, কোনটায় ব্যাকরণের ভুল, কোথাও বা দুইটী উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি, আবার কোন স্থানে ভ্রমাত্মক উক্তি ইত্যাদি। প্রধান-পরীক্ষক মহাশয় নাকি পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে অজরামরবাবু সোনার ওজনে নম্বর দিয়া থাকেন,—উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় যে ১৬ নম্বরের একটী প্রশ্নে যদি ৬টা পয়েন্ট্ থাকে তবে অজরামর বাবু উত্তরটীকে ছয়ভাগে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রত্যেক অংশের নম্বর আলাদা-ভাবে ধার্য্য করিয়া ষড়াঙ্গের সমষ্টি যোগ করিয়া তবে ছাড়িবেন। ভুলমাত্রই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চক্ষুশূল। বানান ভুলে তিনি শুধু ক্রুদ্ধ নয়, রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। টিউটোরিয়াল, ট্রার্মিন্যাল, বার্ষিক এবং টেষ্ট্ পরীক্ষার খাতায় লক্ষিত বিভিন্ন ধরণের বানান ভুলের একটী তালিকা তাঁহার কাছে পাইবেন। তালিকার নীচে মন্তব্যের ধরে লেখা আছে—"সাধারণ বানান ভুল (অর্থাৎ অধিকাংশ বা সকল ছাত্রছাত্রীর যে ভুল হইয়া থাকে)। সতর্ক হও। অন্ততঃ একশতবার শুদ্ধ বানান লেখ।" গুজব শুনিয়াছি যে অজরামরবাবুর এরূপ অভিপ্রায় আছে যে তিনি নূতন ধরণের একখানা পকেট পঞ্জিকা ছাপাইয়া প্রচার করিবেন এবং সেই পঞ্জিকার সাধারণ বর্ণাশুদ্ধির একটা তালিকা সংযোজিত থাকিবে। অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। স্থানাভাবে সমগ্র তালিকাটী এখানে দেওয়া গেল না। নমুনা হিসাবে মাত্র শব্দ-পঞ্চকের উল্লেখ করিতেছি :—

সাহার্য্য, দারিদ্রতা, ব্যাবস্থা, শাষন, মূল।

বানান-ভুল-সংশোধনের বাতিক অজরামরবাবুর যে কত প্রবল সে সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়—তাহার মধ্যে গুটীকয়েক এখানে উল্লেখ করিব।

১নং ঘটনা। অজরামরবাবুর এক ছাত্রী বি, এ, বি, টী, পাস করিয়া এক বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিজয়ার পরে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে একটা বানান-ভুল ছিল। উত্তরে অজরামরবাবু ছাত্রীকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বহু-দিনের অভ্যাসবশতঃ ঐ ভুল বানান কাটিয়া সংশোধন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়া দিলেন,—একশতবার লেখ। বলা বাহুল্য, ছাত্রীটীর নিকট হইতে ফেরত ডাকে খামে একখানা চিঠি আসিল। প্রথম চিঠিতে যে শব্দটীর বানান ভুল করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে তাহার ঠিক বানান একশতবার লিখিয়া দিয়াছেন। নীচে চিঠিখানার নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীচরণেষু,

আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। ইতি—

স্নেহধন্যা গীতা

নিম্নে 'সৌজন্য' শব্দটী একশতবার লিখিত হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে উপরোক্ত পত্র-বিনিময়ের সময়ে অজরামরবাবুর ছাত্রী স্বামী-পুত্র-সৌভাগ্যবতী প্রৌঢ়া গৃহিণী।

২নং ঘটনা। অজরামরবাবুর এক ভাগিনেয়ী—জামাতা অনার্স সহ বি, এ, পাস করিয়া ডব্লিউ, বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সব-ডেপুটী হইয়াছে। ছেলেটি সুদর্শন, মিষ্টভাষী, চালাক-চতুর এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। মামাশ্বশুর বাড়ীর সকলেই, খোদ কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'জামাইবাবু' বলিতে যেন অজ্ঞান। খুঁৎ খুঁতে অজরামরবাবু পর্য্যন্ত শতকণ্ঠে ভাগিনেয়ী-জামাইর প্রশংসা করেন। দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া, জলযোগের দই এবং গাঙ্গুরামের বসন্ত ভোগ সর্ব্বাগ্রে প্রেরিত হইত এই জামাতার বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন অজরামরবাবুর যেন ভাবান্তর দেখা গেল। জামাতা বাবাজীর আগমনে তিনি উৎফুল্ল হইলেন না। তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন না; কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেলেন। ইহার পরে ভাগিনেয়ী-জামাতা যতবার মামা-শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছেন অজরামরবাবু তাহাকে আগের মত তেমন আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্নেহ-সলিল সহসা বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল কেন, ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া আমরা অজরামরবাবুর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে একটি রচনায় ভাগিনেয়ী-জামাতা tranquillity বানান ভুল করিয়াছিলেন, দুইটী 'l' এর স্থানে একটী l বসাইয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটী মামাশ্বশুরকে দেখাইয়া মুগ্ধ করিবেন এই আশায় সব ডেপুটী জামাতা খুব বিনীতভাবে বলিলেন, "মামাবাবু, একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আপনি যদি একটু দেখিয়া দিতেন।" জামাতা-জীবন ভাবিয়াছিলেন তাঁহার রচনা এমন মৌলিক ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে যে বৃদ্ধ পড়িয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, রচনা-কুসুম স্তবকের মধ্যে যে বর্ণাশুদ্ধি-কালসর্প লুক্কায়িত থাকিতে পারে এমন আশঙ্কা তরুণ লেখকের কল্পনারও অতীত ছিল।

৩নং ঘটনা। অজরামরবাবুর ট্রামের মাসিক টিকিট আছে। এক দিন ট্রাম-ধর্ম্মঘট থাকায় তিনি বাসে উঠিয়াছেন এবং দশপয়সা দিয়া একখানা টিকিটও কিনিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল বাসের গায়ে লিখিত একটী নির্দ্দেশের উপর—ধূমপান নিশেধ। বলা বাহুল্য বানান-ভুল যেখানে যতদূরে থাকুক না কেন, অজরামরবাবুর শ্যেন দৃষ্টি ঠিক তাহার উপরে পড়িবেই পড়িবে এবং ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু বলিতেন মক্ষিকা ব্রণম্ ইচ্ছন্তি—আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। বাসের নিষেধাজ্ঞায় বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া অজরামরবাবুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। তিনি চলন্ত বাস হইতে লাফাইয়া পড়েন আর কি? আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন। বাস থামিতেই তিনি নামিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় বাসে উঠিয়া দেখেন সেখানেও ধূমপান-নিষেধের নির্দ্দেশ বানান-ভুলে কণ্টকিত। তিক্ত-বিরক্ত অজরামরবাবু টিকেট করার আগেই নামিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কণ্ডাক্টার হাঁকিল, "মশাই, ভাড়াটা দিয়ে যান্।" অজরামরবাবু পকেট হইতে একখানা সিকি ছুঁড়িয়া দিলেন। পরবর্ত্তী বাসে উঠিয়া দেখেন সেখানেও ধূমপান নিষিদ্ধও বানান অশুদ্ধ। বার বার তিনবার। অজরামরবাবুর মনে হইল সারা দুনিয়া আজ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং কলিকাতার বাস-সঙ্ঘ তাঁহার মানসিক শান্তি নষ্ট করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জীবনে আর কখনও বাসে চড়িবেন না। অজরামরবাবুর পকেটে তখন যে পয়সা ছিল তাহাতে ট্যাক্সি বা রিক্সা কোনটাই ভাড়া করা চলে না। এমন অবস্থায় 'বাস্-বর্জ্জন' করিলে কলেজ কামাই সেদিন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যে যান-বাহনে একটানা ৩০।৩৫ মিনিট চক্ষুঃ-পীড়া সহিতে হইবে অর্থাৎ চোখের সামনে জল-জ্যান্ত বানান-ভুল দেখিতে হইবে তাহাতে কোন ভদ্রলোক আরোহণ করিতে পারেন কি? অজরামরবাবু উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন—কলেজ কামাই করা অসহ্য, আবার বানান ভুল বরদাস্ত করাও অসম্ভব। কি করেন, অধ্যাপক মহাশয় কলেজের অভিমুখে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। তিন মাইল পথ ৪২ মিনিটে অতিক্রম করিয়া কলেজের ফটকে পৌঁছিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন। ক্লাসে ঢুকিয়া জানিলেন দুই মিনিট আগে ঘণ্টা বাজিয়াছে। ২৭ বৎসরের মধ্যে তিনি আজ এই প্রথম late হইলেন। আত্মগ্লানিতে তাঁহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া গেল। স্বভাব-গম্ভীর অজরামরবাবুকে সেদিন ক্লাসে উদ্যত বজ্রের মত দেখাইতেছিল।

অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলে তিনি হুঁ, হাঁ করিয়াই সারিলেন এবং অধ্যাপকদের বসিবার ঘরে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে এক মনোহারী দোকানে ঢুকিয়া এক প্যাকেট্ সিগারেট্ কিনিলেন। খানিকক্ষণ পরে সিগারেট প্যাকেটের লেবেল পড়িয়া দেখিলেন তাহা বিলাতি জিনিষ। অমনই সিগারেটের প্যাকেটটী নিকটবর্ত্তী ডাষ্ট বিনে ফেলিয়া দিলেন এবং একটী বিড়ির দোকান হইতে এক বাণ্ডিল দেশী বিড়ি কিনিলেন। অজরামরবাবু যখন বিড়ির বাণ্ডিলসহ বাড়ীতে ফিরিলেন তাঁহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইল, কেহ আর কাছে ঘেঁসিতে ভরসা পাইল না। অজরামরবাবু ধপ্ করিয়া আরাম চেয়ারে বসিয়াই "হরিয়া, দেশ্‌লাই দিয়ে যা" বলিয়া হুঙ্কার দিলেন। ভৃত্যরত্ন হরিচরণ ওরফে হরিয়া একটী দিয়াশলাইর বাক্স লইয়া হাজির। বাণ্ডিল হইতে একটী বিড়ি খুলিয়া অজরামরবাবু দিয়াশলাইর সাহায্যে তাহাতে আগুন ধরাইলেন। তখন তাঁহার মুখের অবস্থা অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াল—যেন তিনি খুন করিতে বা আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন। বাবুকে বিড়ি ধরাইতে দেখিয়া চাকর ছুটিয়া গৃহিণীকে খবর দিতে গেল, যেন সমস্ত গৃহখানা প্রবল ভূমিকম্পে কাঁপিতেছে এবং এক নিমেষেই সব উলটপালট হইয়া যাইবে। গৃহিণী পরদার আড়াল হইতে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির। তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যিনি কখনও কাহারও উপরোধ-অনুরোধে পান-সিগারেট খান নাই, এমন কি বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে আতিথ্যের খাতিরেও অভ্যাগতদের হাতে সিগারেট তুলিয়া দেন নাই, তিনি কিনা আজ জীবন-সায়াহ্নে বিড়ি ধরাইয়া মুখে লাগাইয়াছেন। হঠাৎ স্বামীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির এই লক্ষণ দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে গৃহিণী পরদা ঠেলিয়া বৈঠকখানার ঢুকিয়া কাতর কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—এ কি? অজরামরবাবু স্ত্রীর দিকে অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, "চুপ কর। ধূমপান নিষেধের নির্দ্দেশ জারি করিতে গিয়া যে মারাত্মক বানান-ভুল করিয়াছে তাহার সংশোধন আমাকে করিতেই হইবে। এ তো আর আমার ছাত্র ছাত্রীর খাতা নয় যে আমি ভুল কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিব। আমি বাসের লিখিত ঐ আদেশ বাসের বাহিরেও লঙ্ঘন করিয়া বানান-ভুলের প্রতিশোধ লইব। আমি এইভাবে কার্য্যতঃ বর্ণাশুদ্ধির প্রতিবাদও অন্যথা করিব। ইহা বলিয়া অজরামরবাবু আবার বিড়িতে দিয়াশলাই ধরাইয়া মুখে সংলগ্ন করিলেন। স্বামীর অপূর্ব্ব যুক্তি শুনিয়া এবং বর্ণাশুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁহার বস্তুতান্ত্রিক এই অভিযান দেখিয়া স্ত্রী বেচারা নির্ব্বাক। বেশী কিছু বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, কেননা অতীতে বহু মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা তাঁহার সঞ্চিত আছে। এই মহিলা উচ্চশিক্ষিতা এবং আগে বাংলা মাসিকে ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিন্তু তাঁহার রচনার পাণ্ডুলিপির মধ্যে বানান-ভুল ধরা পড়ে। তদবধি তিনি দাম্পত্য-সম্পর্ক পাছে ফাটল ধরে এই ভয়ে আর কিছু লেখেন না। (অবশ্য বাজার খরচ ও ধোপার হিসাব ছাড়া)।

৪নং ঘটনা। একদা পরীক্ষার খাতায়, মুর্চ্ছা, ভুল, উচ্চ, ঈর্ষ্যা, ভৌগোলিক, শস্য, প্রযোজ্য, আদিম, প্রভৃতি ছাব্বিশটী শব্দে বর্ণাশুদ্ধির জন্য অজরামরবাবু একটি ছাত্রকে খুব তিরস্কার করিয়া ভয় দেখাইলেন যে পুনরায় এরূপ বানান ভুল হইলে তাহাকে ক্লাস হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে এবং তাহাতেও তাহার চৈতন্যোদয় না হইলে তাহাকে বাৎসরিক পরীক্ষার পরে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রোমোশন দেওয়া হইবে না। যে কোন কারণেই হউক ছাত্রটী পড়া ছাড়িয়া দিল, আর ক্লাসে আসিল না। পর-পর ৩।৪ দিন ছেলেটিকে ক্লাসে অনুপস্থিত লক্ষ্য করিয়া তাহার এক প্রতিবেশী সহাধ্যায়ীকে অজরামরবাবু ছাত্রটির অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেটি জানিত যে আর্থিক অভাবের জন্যই তাহার সহাধ্যায়ীর পড়া বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে তাহা না বলিয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিল, স্যর; আপনার বকুনির ভয়েই ও পড়া ছাড়িয়াছে। অজরামর ছেলেটিকে খবর দিলেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করার জন্য। ছেলেটি আসিল না। তারপর তিনি তাহার অভিভাবককে সংবাদ দিলেন। অভিভাবকও আসিলেন না। তারপর তিনি ছেলেটির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া একদিন তাহার বাড়ীতে গিয়া জানিলেন যে ছেলেটির অভিভাবক সপরিবারে বাংলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। অনেক কষ্টে সেখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া অজরামরবাবু ছেলেটিকে ও তাহার অভিভাবককে একখানা যুক্ত চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি ছাত্রটির শিক্ষার সমুদয় ব্যয় ভার বহন করিবেন এবং তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তিনি পড়াইতে চাহেন। পত্রোত্তরে অভিভাবক অজরামরবাবুকে বহু ধন্যবাদ জানাইয়া লিখিলেন যে "তাহারা পূর্ব্ববঙ্গাগত বাস্তুহারা, তাহাদের উড়িষ্যায় পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছেলেটি এম্প্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জের মারফৎ একটি সরকারী চাকরী পাইয়াছে এবং সমস্ত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে; এক্ষেত্রে তাহার আর পড়া হইবে না।" অজরামরবাবু কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনুতপ্ত—তিনি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ধারণা তাঁহার জন্যই ছেলেটির লেখাপড়া হইল না। বহুদিন তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে অজরামরবাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বানান-ভুলের জন্য তিনি আর কাহাকেও তিরস্কার করিবেন না। আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রী'শ'—

চলচ্চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকদের আনন্দ দান করা। সে আনন্দ মিলনান্ত, বা বিয়োগান্ত হাস্যরসাত্মক বা অশ্রু-সজল, হাল্কা বা গুরুগম্ভীর যে কোনও রকমের বা ধরণের চিত্রের মধ্য দিয়েই পাওয়া যেতে পারে। বেশির ভাগ দর্শক শুধু নিছক আমোদ পাবার জন্যেই ছবি দেখতে আসেন, তাই সাধারণতঃ তাঁরা হাস্যরসাত্মক ছবিই বেশি পছন্দ করেন। কেউ কেউ আবার চলচ্চিত্র দর্শনকে সময় কাটাবার সবচেয়ে প্রশস্ত উপায় বলে মনে করেন বলে যে কোনও ধরণের ছবি দেখেই তৃপ্তি পান—বেশি কিছু বাছ-বিচার করেন না, তবে হাল্কা ধরণের ছবিই এঁদের প্রিয়। সামান্য কিছু দর্শক আসেন ছবি দেখার মধ্যে দিয়ে কিছু শিক্ষালাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এঁরা অবশ্য ছবি দেখবার আগে কিছু বাছাই করে থাকেন, কিন্তু এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যা খুবই কম। এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যাঁরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশুদ্ধ শিল্পরস উপ-ভোগ করবার জন্যেই ছবি দেখতে আসেন। এই শ্রেণীর রসিক দর্শকেরাই ছবির গুণা-গুণ বিচার করেন সবচেয়ে বেশি এবং নিক্তির ওজনে। কোনও নিকৃষ্ট ছবি শুধু নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে এঁদের ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ছবির সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিও এঁদের চোখ এড়িয়ে যায় না। ভাল ছবির গুণ ব্যাখ্যাতেও যেমন এঁরা পঞ্চমুখ, খেলো ধরণের ছবির দোষত্রুটিও তেমনি লোকচক্ষে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে এঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। এই শ্রেণীর রুচিবান নিরপেক্ষ দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে হলে সত্যকার ভাল ছবির প্রদর্শন ছাড়া উপায় নেই। তবে এধরণের দর্শকের সংখ্যা খুব বেশি নয় বলেই আমাদের দেশে অনেক সময়ে

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

"হারানো সুর" চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। ফটো : নির্মল মল্লিক

যাজে ছবিই বাজার মাৎ করে রাখে। তাই এই সত্যকার শিল্পরসিক শ্রেণীর দর্শকদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে চলচ্চিত্রের তথা দর্শকসমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। কারণ এই শ্রেণীর দর্শকদের তুষ্ট করতে হলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্প-রস-মণ্ডিত ও সু-অভিনয়-সমৃদ্ধ চিত্রের পরিবেশন প্রয়োজন হবে—আর তা করতে হলে সু-অভিনয় ছাড়াও ছবির পরিচালনা, প্রযোজনা, সম্পাদনা, গল্পাংশ, সঙ্গীতাংশ, সংলাপ, চিত্রগ্রহণ, আলোকসম্পাত, সাজসজ্জা প্রভৃতি ও অন্যান্য আরও খুঁটিনাটি বিষয়ের সব কিছুই নিখুঁত হওয়া চাই। এইভাবে প্রতিটি ছবিই যদি চিত্রনির্ম্মাতারা নিখুঁত করবার চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের মান যে উন্নত হবেই তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। আর সেই সঙ্গে উন্নত হবে সাধারণ দর্শকদের পচ্ছন্দ ও শিল্পবোধেরও। তখন আর নিকৃষ্ট স্তরের নাচ-গান-হুল্লোড়ে ভরা নিম্নরুচির ছবির বাজার থাকবে না। দর্শকদের উন্নত রুচির সঙ্গে তাল রেখে পরিবেশন করতে হবে শিল্পরসসমৃদ্ধ সত্যকার ভাল ছবির। তাই দর্শকসাধারণের কাছে অনুরোধ, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি তাঁরা চান তাহলে কখনই যেন নিকৃষ্ট ধরণের কোনও ছবিকে আমোল না দেন। আর এটাও যেন তাঁরা না ভোলেন যে তাঁদের পচ্ছন্দ ও রুচির ওপরই নির্ভর করছে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি।

* * *

॥ হারানো সুর ॥

সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথাচিত্রের মধ্যে "হারানো সুর" চিত্রটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না মোটেই। কয়েকটি বিশেষ গুণ এই ছবিটির মধ্যে আছে বলেই ছবিটি সর্ব্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিশেষ গুণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ছবিটির গতি। সাধারণতঃ বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের, বিশেষ করে সামাজিকধরণের চিত্রের, প্রধান দোষ হচ্ছে মন্থরগতি ও একঘেয়েমী। এই দিক থেকে 'হারানো সুর' সর্ব্বাংশে না হলেও অনেকাংশে মুক্ত এবং বাংলা চিত্রজগতে সে দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে বলেই মনে হয়। চিত্রটির আর একটি গুণ, গুণই বলব, যে ছবিটি অযথা

"অভয়ের বিয়ে" কথাচিত্রের একটি সুমধুর ভঙ্গিমায়
শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতভারাক্রান্ত নয়। গীতিমূলক চিত্র ছাড়া যে কোনও সামাজিক চিত্রের মধ্যে একটি সুগীত সঙ্গীতই যথেষ্ট। এর পর অভিনয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের নায়িকা রমার ভূমিকায় অভিনয় সত্যই প্রশংসার্হ হয়েছে। পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ে কাজরী গুহ ও পাহাড়ী

সান্যাল কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। উত্তমকুমার, দীপক মুখার্জী ও চন্দ্রাবতীর অভিনয় নিখুঁত না হলেও ভাল বলা চলতে পারে। পরিচালনা ও প্রযোজনা প্রশংসার যোগ্য। গল্পাংশ ও সংলাপ ভালই বলতে হবে। চিত্রগ্রহণ ও আলোকসম্পাতে কৃতিত্ব আছে।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও ছবিটিকে সম্পূর্ণ নিখুঁত বলা চলে না। ছবিটির যেটি বিশেষ গুণ, সেটি হচ্ছে ছবিটির গল্পের অভিনবত্ব; কিন্তু একটি বিশেষ দিক থেকে বিচার করে এইটিকে ছবিটির একটি ত্রুটি বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে না নিশ্চয়ই। 'হারানো সুর'-এর গল্পটি যত ভালই হোক, এটিকে মৌলিক বলা চলতে পারে না কিছুতেই। কারণ, প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী রোনাল্ড কল্‌ম্যান্ ও গ্রীয়ার গারসন্-এর অভিনয়সমৃদ্ধ বিখ্যাত মার্কিণ চিত্র "র‍্যাণ্ডম্ হার্ভেষ্ট"-এর ছায়া হারানো সুরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মৌলিকত্ব অনুকরণের চেয়ে ঢের বেশী কৃতিত্বের দাবী রাখে। বিদেশী গল্পের অনুকরণ বা অনুসরণ শুধু যে অসমর্থনীয়ই তাই নয়, এতে করে আমাদের দেশের কথাশিল্পীদের ভাবের দীনতাকেই প্রকট করে তোলা হয়; তাই এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা সর্ব্বসময়েই বর্জ্জনীয়। হারানো সুরের গল্প যদি বহু-প্রশংসিত, বহু-দৃষ্ট একটি বিদেশী চিত্রের অনুকরণ না হত, তাহলে 'হারানো সুর' কাহিনীর নতুনত্বের দিক দিয়ে না হলেও অভিনবত্বের দিক দিয়েও চিত্রজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারত। এ ছাড়া গল্পের দিক থেকেও একটি ত্রুটি রয়েছে চিত্রটিতে। সেটি হচ্ছে নায়ক অলককে খুঁজতে নায়িকা রমা যখন কল্‌কাতায় এল, তখন তার পক্ষে অলকের ঠিকানার জন্য স্বাভাবিক কারণেই তার পূর্ব্বতন সেই মানসিক হাসপাতালেই যাওয়া উচিত ছিল। হাসপাতালের রেজিষ্টারীতে রোগীর নামের সঙ্গে তার ঠিকানাও নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রমা সে সূত্রে অলকের ঠিকানা জানবার চেষ্টা না করে কল্‌কাতার মতন একটা বিরাট সহরের বুকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অলককে খুজে বেড়াতে লাগল! আর সহরের এই জনারণ্যে হঠাৎ রাস্তার ধারে অলককে মোটর থেকে নেমে একটা অফিসে ঢুকতে দেখাটাও নেহাৎ গল্প বলেই বোধ হয় সম্ভব হয়েছিল। অলককে খুঁজে পাওয়ার এই ব্যাপারটিকে একটু যুক্তিপূর্ণভাবেই দেখান উচিত ছিল।

"অন্তরের বিয়ে" চিত্রের আর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও বিকাশ রায়

গল্পের গতি ও বিন্যাসের দিক দিয়েও একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। এই চিত্রটির প্রাণ হচ্ছে এর দ্রুত গতি, কিন্তু, গল্পের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এই গতি যেন বড়ই মন্থর হয়ে পড়েছে। এইসময় রেডি-ওর গানটিও এই মন্থর গতির জন্য কিছুটা দায়ী। ঐ গানটি চিত্রটির গতিমন্থরতার জন্যই যে শুধু দায়ী তা নয়, যেখানে একটি ভাব বা রস বেশ দানা বেঁধে উঠছে ঠিক সেই সময় ঐ দীর্ঘ, অযাচিত গানটি সেই ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেছে। বোধ হয় ঐ গানটি যোগ করে ভাবটি জমাবার চেষ্টাই করা হয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। এর ওপর, আমাদের ভারতীয় চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—চিত্রের অতিদীর্ঘতা, হারানো সুরেও বর্ত্তমান রয়েছে। চিত্রের এই অতি-দীর্ঘতাই শেষের দিকে বিরক্তি এনে দেয় দর্শক-মনে এবং

কখন নায়ক তার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে গল্পের সমাপ্তি করে দর্শকদের মুক্তি দেবে, তার জন্যে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে দেখতে হয়। ছবির এই অতি দীর্ঘতা দোষ থেকে ভারতীয় চিত্র যে কবে মুক্তি পাবে তা জানি না।

ছবির প্রথম দিকে মানসিক হাসপাতালের এক শয়তান ডাক্তারের চরিত্র অভিনয় করান হয়েছে উৎপল হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশেই চিত্র-গ্রহণ করা উচিত ছিল। আর একটি বিশেষ ত্রুটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। সেটি হচ্ছে নায়ক অলক যখন তার টাইপ-করা দরখাস্ত ডাকে দিতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন দ্রুতগামী লরীর প্রচণ্ড ধাক্কায় উল্টে পড়ে গড়িয়ে গেল ও চৈতন্য হারাল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চৈতন্য ফিরে

শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণ

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী কমলা লক্ষ্মণ ভারতনাট্যম নৃত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি দূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে নৃত্য প্রদর্শন করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন। অধুনা কলিকাতায় সভ্যসমাপ্ত সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর অনবদ্য নৃত্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। এখানে শ্রীমতী লক্ষ্মণকে ভারতনাট্যম নৃত্যের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে।

দত্তকে দিয়ে। একটি মানসিক হাসপাতালের ডাক্তারের পক্ষে এরকম হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব। ছবি তোলার দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবিটির বহিদৃশ্যের চিত্রগ্রহণ এদেশের ক্যামেরাম্যানদের পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও কয়েকটি জায়গায় ছবিটি যে সেটের মধ্যে তোলা পেয়ে যখন সে উঠল তখন দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অক্ষত—সামান্যতম আঘাত, এমন কি একটি আঁচড়ও তার গায়ে লাগে নি। ওরকম প্রচণ্ড ধাক্কার পতনের ফলে যখন মানুষ জ্ঞান পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে তখন যদি তার গায় সামান্যতম আঘাতের চিহ্নও না দেখা যায় তাহলে সেটা

সত্যই আশ্চর্য্য ও অবাস্তব হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে নায়কের এই আঘাত প্রাপ্তিতে তার প্রতি সহানুভূতির বদলে হাসিরই উদ্রেক হয়েছে। তাছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদে,আচার-ব্যবহারে নায়ককে বড্ড বেশী সাহেবী করা হয়েছে। ধুতি পাঞ্জাবীতে নায়কের একান্ত আপত্তি থাকলে ট্রাউজারের ওপর গলাবন্ধ প্রিন্স-কোট্ পরিয়েও কিছুটা স্বদেশীকতা বজায় রাখা চলত। মনে রাখা উচিত আজকাল শুধু বিদেশেই যে ভারতীয় ছবি দেখান হয়ে থাকে তাই নয়, এদেশেও অনেক বিদেশী এদেশীয় ছবি দেখে থাকেন। এই সব বিদেশীদের চোখে তাদের দেশেরই পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারের হুবহু নকল নিশ্চয়ই বিসদৃশ লাগবে এবং তা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। এই সূত্রে মনে পড়ছে নায়িকার পিতারূপী পাহাড়ী সান্যাল দু'দুবার নায়িকা রমাকে আশীর্বাদ করলেন, "God bless you"—এই কথা বলে। বাঙ্গালী পিতা যর মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবার সময় মাতৃভাষায় কি কোনও আশীর্ব্বাণী খুঁজে পেলেন না ?

যাই হোক, খুঁটি-নাটি ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করবার স্থান এটা নয়, আর এই সব অল্প-বিস্তর দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও "হারানো সুর" যে সত্যই একটি দেখবার মতন ছবি হয়েছে তাতেও কোনও সন্দেহ নেই ; তাই হারানো সুরের পরিচালক, প্রযোজক সমেত সমস্ত শিল্পীবৃন্দকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

"পথের পাঁচালী"-র সুবিখ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁর "অপরাজিত" ছবিটির জন্য বিদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করে দেশে ফিরে এসেছেন। "অপরাজিত" ভেনিস চিত্র-উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে পরিগণিত হয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে! "অপরাজিত"-র এই বিশ্বজয়ী সম্মানে বাঙ্গালীই শুধু নয়, ভারতবাসীমাত্রেই আজ গৌরবান্বিত।

* * * * *

বৃটেনের "র‍্যাঙ্ক অরগানিজেসান্" রিচার্ড ম্যাসন্-এর উপন্যাস "The Wind Cannot Read"কে চিত্রায়িত করবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ভারতের পট-ভূমিকায় গল্পটি লিখিত। সেজন্য ভারতে কিংবা সিংহলে এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে। র‍্যাঙ্ক অরগানিজেসনের আরও দুইটি ছবির চিত্রগ্রহণ ভারতে করবার দরকার হবে। এই চিত্র দু'টি ঔপন্যাসিক জন্ মাষ্টারস-এর "The Deceivers" ও "The Night Runners of Bengal" অবলম্বনে রচিত হবে।

মরাহাতি লাখটাকা

(একাঙ্কিকা)

মন্মথ রায়

[...চেণ্ট অফিসের কেরাণী এককড়ি বসু ছা-পোষা লোক, কলিকাতার ...ট বস্তিতে কোনো রকমে মাথা গুঁজিয়া বসবাস করেন। চারপুত্র ...ড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি ও সাতকড়ি। এককড়িবাবুর স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী- এবং অবিবাহিতা কন্যাটির নাম টাকা। বেলা তিনটা। যে ...র কাজে চলিয়া গিয়াছে। গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী নিদ্রাসুখ উপভোগ ...তছেন। কিশোরী কন্যা টাকা এক ফিল্ম ম্যাগাজিন পাঠরতা। ...সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

টাকা ॥ (বিরক্ত হইয়া) আঃ, (পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া) জ্বালালে! যাচ্ছি বাপু (অর্ধোত্থিত হইল বটে, কিন্তু পাঠ ছাড়িল না)

[পুনরায় সজোরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। এইবার গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল]

লক্ষ্মী ॥ আঃ—দুপুরেও একটু ঘুমোবার জো নেই। এই অসময়ে কে জ্বালাচ্ছে দেখ না! গিয়ে বল কর্তা আপিসে। ছেলেরাও কেউ বাড়ি নেই।

টাকা॥ মা, ফিল্মের জন্যে আবার মেয়ে চাইছে। এবার আমি কোনো কথা শুনবো না—এবার আমি যাবোই।

লক্ষ্মী॥ যাবি তো জন্মের মত যাবি।

টাকা॥ হ্যাঁ তাই যাবো, এখানে আর উপোষ করে মরতে পারবো না। (দরজা খুলিতে গেল এবং পরক্ষণেই কম্পমান পিতা এককড়ি বসুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। এককড়ি বসু কোনো কথা বলিতে পারিতেছেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াও কাঁপিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী ও টাকা ব্যাপারটি না বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।)

লক্ষ্মী॥ ওগো, ব্যাপার কি? কি হয়েছে? কাঁপছো কেন?

টাকা॥ কি হলো বাবা, ডাক্তার ডাকবো?

এককড়ি॥ না না, কাউকে ডাকতে হবে না। ভীষণ ব্যাপার। দু'কড়ি আসেনি?

টাকা॥ না, সে তো আফিসে।

এককড়ি॥ তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি—কেউই আসেনি?

লক্ষ্মী॥ তিনকড়ি পাঁচকড়ি তো চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছে, সাতকড়ি রয়েছে স্কুলে—ছেলেদের খুঁজছো কেন, কী হয়েছে?

এককড়ি॥ গিন্নী আমায় ধরো। তোমার নাম লক্ষ্মী। আমি মনে করতাম্ অলক্ষ্মী। আমায় মাপ কর। দোহাই তোমার, আমায় মাপ করো।

লক্ষ্মী। কি হয়েছে তাই বলো। কি দোষ করেছ যে মাপ করবো।

এককড়ি॥ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুমি, তোমাকে কিনা আমি অলক্ষ্মী ভেবেছি, অলক্ষ্মী বলেছি।

লক্ষ্মী॥ মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার! এই টাকা ছুটে যা দেখি। গোবর্দ্ধন ডাক্তারকে ডেকে আন তো।

[টাকা ছুটিয়া যাইতেছিল। এককড়ি খপ করিয়া তাহার হাত ধরিল]

এককড়ি॥ খবরদার। আমার কিছু হয়নি। বোস, শোন—কি হয়েছে আমি বলছি। (টাকাকে টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া) সার্কাস।

টাকা॥ সার্কাস!

এককড়ি॥ হ্যাঁ, সার্কাস। হাতি।

লক্ষ্মী॥ হাতি!

এককড়ি॥ হ্যাঁ হাতি।

লক্ষ্মী॥ (সশংকচিত্তে) দেখছিস কি টাকা, মাথা খারাপ হয়েছে।

এককড়ি॥ মাথা খারাপ আমার হয়নি। এখুনই হবে তোমাদের। আমি সার্কাসের হাতিটা পেয়েছি।

টাকা॥ তুমি বলছো কি বাবা! ডাক্তার ডাকবো মা?

এককড়ি॥ দাঁড়া। শোন। গ্রেটইণ্ডিয়া সার্কাসের বুড়ো হাতিটা লটারীতে তুলেছিল। একটাকার সব টিকেট। তোর মা'র নামে আমি একটা কিনেছিলাম। তা' ওর নামেই উঠেছে।

লক্ষ্মী ও টাকা॥ বলো কি!

টাকা॥ আমরা হাতিটা তবে পেয়েছি?

এককড়ি॥ হ্যাঁ পেয়েছি। আফিসে গিয়েই দেখি সার্কাস পার্টি থেকে চিঠি এসে গেছে। হাতি এবাড়ীতে 'ডেলিভারি' দিতে আসছে আজ বিকেলে। দুকড়িকে আফিস থেকে টেলিফোন করে দিয়েছি—তিনকড়ি পাঁচকড়ি সাতকড়িকে খুঁজে-পেতে সংগে নিয়ে বাড়ী আসতে। হাতির ডেলিভারি নিতে হবে—চারটি খানি কথা নয়।

টাকা। (হাততালি দিয়া) কি মজা! আমরা তবে এখন থেকে হাতি চড়ে বেড়াব। ট্রাম নয়, বাস নয়, ট্যাক্সি নয়, একেবারে হাতি। হাতিটা আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকবে না বাবা!

লক্ষ্মী। হাঁ-গা, হাতি কি খাবে?

এককড়ি। এখানে গাছপালা কোথায় পাবো। চালই খাবে।

লক্ষ্মী॥ চাল!

টাকা॥ আমি হাতে করে খাওয়াবো মা!

লক্ষ্মী॥ হাঁ-গা, হাতি ক' সের চাল খাবে?

এককড়ি॥ পাঁচসেরও হতে পারে, পাঁচ মণও হতে পারে, কে জানে?

[দু'কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি ও সাতকড়ির প্রবেশ]

দু'কড়ি ॥ হাতিটার দাম কত হবে বাবা ?

তিনকড়ি ॥ দাঁত আছে তো ?

পাঁচকড়ি ॥ বয়স কত বাবা ?

সাতকড়ি ॥ মাদী না মদ্দা ?

এককড়ি ॥ কি জানি বাবা, এলেই সব দেখবে। এখন কথা হচ্ছে, এ হাতি রাখবো কোথায় ?

তিনকড়ি ॥ কেন, আমাদের বাড়ীর সামনে কর্পোরেশনের ওই খোলা জায়গাটায় !

দু'কড়ি ॥ হ্যাঁ ! কর্পোরেশন দিচ্ছে।

পাঁচকড়ি ॥ ট্যাক্স দেবো—কেনো দেবেনা।

এককড়ি ॥ সে না জানি কত টাকা হবে !

দুকড়ি ॥ শুধু জায়গার ট্যাক্স নয়—হাতিরও ট্যাক্স দিতে হবে হয়তো। হ্যাঁ—কুকুরের দিতে হয়, হাতির দিতে হবে না ?

এককড়ি ॥ ওরে বাবা !

লক্ষ্মী ॥ হাঁ-গা, হাতি ক' সের চাল খায় বললে না তো ?

তিনকড়ি ॥ সে একদিন খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

টাকা ॥ (সাতকড়িকে) যা তো ভাই সাতু, এক পাতা সিঁদুর কিনে আন।

সাতকড়ি ॥ (দুষ্ট হাস্যে) লিপষ্টিক্ বুঝি ?

[টাকা সংগে সংগে সাতকড়িকে চপেটাঘাত করিল, সাতু 'ভ্যা' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

লক্ষ্মী ॥ ওকে মারলি কেন হতচ্ছাড়ি ?

টাকা ॥ হাতির মাথায় সিঁদুর দেব—আর বলছে কিনা—আমি আমার লিপষ্টিকের জন্যে সিঁদুর আনতে বলেছি !

সাতকড়ি ॥ সিঁদুর দিয়ে ওর লিপষ্টিক করেছে মা। বলে সিনেমায় নামবে।

লক্ষ্মী ॥ (সাতকড়িকে) না না, তুই যা বাবা, হাতিকে সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে হবে। সিঁদুরটা নিয়ে আয়।

[সাতকড়ির প্রস্থান। দুইজন বস্তিবাসীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী ॥ (টাকাকে) টাকা তুই মা যা'—একটু ধান দুর্বার জোগাড় দেখ। (টাকার কক্ষান্তরে প্রস্থান)

১ম্ বস্তিবাসী ॥ কথাটা কি সত্যি এককড়ি দা !

এককড়ি ॥ কি কথা ভাই।

২য় বস্তিবাসী ॥ শুনলুম, লটারিতে আপনি একটা হাতি পেয়েছেন ?

এককড়ি ॥ (ছেলেদের প্রতি চাহিয়া) তোরা বুঝি বলেছিস ?

তিনকড়ি ॥ বলবো না বাবা।

পাঁচকড়ি ॥ হাতিকে চেপে রাখবে কে শুনি ॥

১ম্ বস্তিবাসী ॥ তা' নয়তো কি, এ বাবা হাতি। ট্যাঁকে গুঁজতে পারবে না, সিন্দুকেও ঠাঁই হবে না। নাঃ, খুব কপাল বলতে হবে। তা শুনলুম। এখুনিই নাকি ডেলিভারি হবে ?

২য় বস্তিবাসী ॥ ডেলিভারি ! কার ডেলিভারি হবে ?

১ম্ বস্তিবাসী ॥ হাতির।

২য় „ ॥ আসতে না আসতেই বিয়োবে ?

১ম „ ॥ তুমি একটি হস্তিমূর্খ। হাতির ডেলিভারি হবে না, হাতিকে ডেলিভারি দিতে আসবে।

২য় বস্তিবাসী ॥ সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই গলি দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে ?

১ম্ বস্তিবাসী ॥ তা নয় তো কি উড়িয়ে আনবে ?

২য় „ ॥ আমাদের ঘরদোর ভেঙেচুরে যাবে না ? না না, সে চলবে না।

তিনকড়ি ॥ চলবে না মানে ?

পাঁচকড়ি ॥ পাবলিকের রাস্তা।

২য় বস্তিবাসী ॥ হ্যাঁ, পাবলিকের রাস্তা, কিন্তু হাতির রাস্তা নয়। (১ম্ বস্তিবাসীকে) দেখছো কি দাদা, যদি ঘর বাড়ী বাঁচাতে চাও আর দেরী নয়, এখুনি বস্তিতে একটা মীটিং ডাকা হোক। টেলিফোন করে পুলিশে খবর দেওয়া হোক।

১ম্ বস্তিবাসী ॥ না, না, তা' কেন ? আমার ছেলে-মেয়েরা হাতি দেখবে বলে নাচছে। বস্তিতে হাতি আসছে, এ শুধু এককড়িদার সৌভাগ্য নয়, গোটা বস্তির একটা গর্ব। আমাদের রামু হাতিটাকে সংবর্দ্ধনা জানাবার জন্যে একটা মীটিং ডাকতে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে।

২য় বস্তিবাসী ॥ খবরদার। এসব চলবে না। আমি দেখছি কি করে হাতি আসে ! (ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

১ম বস্তিবাসী ॥ বটে। আমিও দেখছি, হাতি কেমন না-আসে !

(ছুটিয়া চলিয়া গেল)

লক্ষ্মী ॥ ওগো, হাতির খোরাকটা তো বললে না, হাতি ক'সের চাল খায় !

[বাড়ীওয়ালার গোমস্তার প্রবেশ]

গোমস্তা ॥ এই যে এককড়িবাবু, নমস্কার ! আর কেন, মরা হাতিই লাখ টাকা, আর আপনি তো পেয়ে গেছেন তাজা হাতি। আর আপনাকে পায় কে ? তিন মাস বাড়ী ভাড়া ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—এবার দয়া করে ফেলুন। আমি রসিদ লিখছি।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা !

(ইতিমধ্যে বাহিরে আরো অনেক লোকজনের সমাগম সূচক কোলাহল শোনা গেল।)

কোলাহল ॥ "এক কড়িবাবু বাড়ী আছেন ?"

"হাতিটা কখন আসবে ?"

"দু'কড়িবাবু, একটিবার বাইরে আসুন না মশাই !"

"তিনকড়ি, আমরা এসেছিরে, বাইরে আয়না ভাই।"

নানা—কিউ দিয়ে সব দাঁড়াও। হাতিতে চাপতে হলে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

গোমস্তা॥ এই নিন্, একশো কুড়িটাকা বারো নয়া পয়সা।

এককড়ি॥ কোথায় পাবো মশাই, একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা?

দু'কড়ি॥ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি, আমাদের হয়েছে তাই।

(সিঁদুর লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ। তৎপশ্চাতে বস্তির মুদির প্রবেশ)

সাতকড়ি॥ এই যে মা, সিঁদুর। (মায়ের হাতে সিঁদুরের পাতা দিল) কিন্তু মা, মুদী মশাই খাতা নিয়ে এসেছেন—ওই দেখ।

মুদী॥ বড় আনন্দ হলো বাবু, সব শুনে বড় আনন্দ হলো। একেই বলে রাজভাগ্য।

এককড়ি॥ কিন্তু খাতা খুলছেন যে মুদীমশাই।

মুদী॥ দেড়শ' টাকার ওপর আমার পাওনা। আজ খাতা খুলবো না তো কবে খুলবো? হাতির খোরাকটা আমার দোকান থেকেই নেবেন মা। টাকায় দু'পয়সা আমি ছেড়ে দেব।

লক্ষ্মী॥ হাতির খোরাকটা যে কত—তাই তো জানতে পারলাম না বাবা!

গোমস্তা॥ আমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখবেন না এককড়িবাবু।

মুদী॥ আমাকেও ছেড়ে দিন বাবু, দোকান খালি রেখে এসেছি।

[দুধের বাঁক কাধে গোয়ালার প্রবেশ]

গোয়ালা॥ নিয়ে নিন মা, আপনার হাতির খোরাকী দুধ এনেছি দশ সের। আরো চাই দেব, তবে পাওনাটা দিয়ে দিন।

[নেপথ্যের কোলাহল তীব্রতর হইতে লাগিল]

এককড়ি॥ (চটিয়া গিয়া) বেরিয়ে যাও—সব বেরিয়ে যাও—

গোমস্তা॥ বেরিয়ে যাবো মানে?

মুদী॥ পাওনা না নিয়ে যাচ্ছিনা। (গোমস্তাকে) হাতি পেয়েছে—পিঠে চেপে আমাদের কলা দেখিয়ে হাওয়া হবার মতলব।

গোয়ালা॥ হাঁা হাঁা, তা নয় তো কি!

এককড়ি॥ বটে! আমি কি চোর না জোচ্চোর—যে হাওয়া হবো?

দু'কড়ি॥ হাতি ঘরে না আসতেই এই, এলে তো দেখছি—

গোয়ালা॥ এলে তো আর তোমাদের ধরাছোঁয়া পাবো না বাবা।

এককড়ি॥ (আরো চটিয়া গিয়া) তোরা দাঁড়িয়ে থেকে এই সব অপমান সইবি? (সংগে সংগে ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া পাওনাদারদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।)

গোমস্তা॥ আচ্ছা, দেখে নেব। (পলায়ন)

মুদী॥ তা' নয় তো কি? (পলায়ন)

গোয়ালা॥ (বাঁক তুলিয়া লইয়া) আচ্ছা যাচ্ছি। এতটা দুধ জলে গেল। (পলায়ন)

দু'কড়ি॥ যা' ব্যাটা—ওটা জলই ছিল। কলের জল কলে ঢেলে দে'।

লক্ষ্মী॥ হাঁা-গা হাতির খোরাক কত বললে না?

এককড়ি॥ সবাইকে খাবে। দেখছো না?

সাজিয়া গুজিয়া ধানদুর্বার থালা লইয়া টাকার প্রবেশ

সাতকড়ি॥ দিদির সাজটা দেখেছ? আমি জানি ও সিনেমায় নামবে।

টাকা॥ দেখতো মা, আবার আমার সংগে লাগছে! বরণ করে হাতির পিঠে চাপবো। দশজনে তাকিয়ে দেখবে, ফটো নেবে। একটু সাজবো না মা!

[এইবার কোলাহল আরো বাড়িল, বাহির হইতে ঘোষণা হইতে লাগিল]

একদল॥ বস্তির গলিতে হাতি আসা চলবে না—চলবে না।

আর একদল॥ (গানের সুরে)

এককড়ি এনেছে হাতি
আঁধার ঘরে জ্বলেছে বাতি॥
ভাঙাঘরে চাঁদের আলো
হরিবল ভাই হরিবল॥

কোলাহল॥ এই—সব থামো। দেখ এ আবার কোন সাহেব এলেন।

নবাগত॥ এককড়ি বসুর বাড়ী কি এই?

কয়েকজন॥ হাঁা, স্যার।

নবাগত॥ উনি তো হাতি পেয়েছেন?

সকলে॥ হাঁা স্যার।

নবাগত॥ আমাকে একটু পথ দিন।

এককড়ি॥ (ছেলেদের প্রতি) আবার না জানি কে এলো!

[নবাগতের প্রবেশ]

নবাগত॥ আপনিই এককড়ি বোস?

এককড়ি॥ আজ্ঞে।

নবাগত॥ (ছেলেদের দেখাইয়া) এরা?

এককড়ি॥ আমার ছেলে—দু'কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি।

নবাগত॥ শুনলাম লটারিতে হাতি পেয়েছেন। কনগ্রাচুলেশানস্…

এককড়ি ॥ ছা'পোষা লোক। নিজেদেরই চলেনা, হাতি পেয়ে হয়েছে গোদের ওপর বিষফোড়া!

নবাগত ॥ না না, এ আপনি কি বলছেন? ইনকাম তো কম নয়। আপনারা বাপ ব্যাটাতেই তো—এক গ্রাস দুই গ্রাস তিন গ্রাস পাঁচ গ্রাস সাত—মানে একুনে আঠারোটি মূল্যবান কড়ি। লক্ষ্মীর সংসার বলুন।

এককড়ি ॥ মসকরা রাখুন মশাই। লক্ষ্মী, টাকা, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি শুনছো—ওঘরে যাও।

নবাগত ॥ আঠারো কড়ি। ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী। সিন্ধুকে টাকা। এর ওপর হাতি।

এককড়ি ॥ বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান বলছি! জানবেন, এ কড়িগুলি অচল নয়।

[ছেলেরা আস্তিন গুটাইতে লাগিল]

নবাগত ॥ তা' দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছি। এবার ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ণ দেবেন। আর তাতে হাতিটা দেখাতে ভুলবেন না।

এককড়ি ॥ কে মশাই আপনি?

নবাগত ॥ ইনকামট্যাক্সের অফিসের লোক। ইনকাম-ট্যাক্স কে ফাঁকি দিচ্ছে—তাই দেখাই আমাদের কাজ। এক আপনি ছাড়া আর কারোর বিয়ে হয়নি দেখছি। বিয়ের ওপরেও ট্যাক্স বসাবার কথা হচ্ছে জেনে রাখবেন। নমস্কার।

[নবাগতের প্রস্থান]

এককড়ি ॥ ওরে বাবা!

[বাহিরের কোলাহল এবার চরমে উঠিল। কেহ কেহ টিন পিটাইতে লাগিল]

দু'কড়ি ॥ হাতি না আসতেই এই। এলে কি হবে বাবা?

লক্ষ্মী ॥ এলে তো খোরাক দিতে হবে। হাতির খোরাকটা যে কি—তা তো এখনও কেউ বললে না তোমরা।

এককড়ি ॥ (রাগে চীৎকার করিয়া) হাতির খোরাক আমরা সবাই। শুনলে?

[সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের প্রবেশ]

এককড়ি ॥ আপনি আবার কে মশাই?

ম্যানেজার ॥ আমি সার্কাস পার্টির ম্যানেজার, নরসিংহ চোংদার।

এককড়ি ॥ আমার হাতি এনেছেন বুঝি!

ম্যানেজার ॥ না মশাই। একা আমিই এসেছি।

এককড়ি ॥ আপনি তো মশাই সিংহ। আমি চাই হাতি।

ম্যানেজার ॥ মিঃ এককড়ি বোস, আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, বুড়ো হাতির করোনারি থ্রমবোসিস হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় মারা গেছে।

এককড়ি ॥ (হাঁফ ছাড়িয়া) বাঁচা গেছে।

এককড়ির পরিজন ॥ (সার্তনাদে) হাতিটা তবে মারা গেল!!

ম্যানেজার ॥ করোনারি থ্রমবোসিস! মারা যাবে না!

এককড়ি ॥ মারা গেল মানে আমরা বেঁচে গেলাম। না কেঁদে, আনন্দ করো, নৃত্য করো। (ম্যানেজারকে) বসুন মশাই, চা খেয়ে যান।

ম্যানেজার ॥ বসবার হুকুম নেই। প্রোপ্রাইটরের হুকুম আপনাকে এখুনি নিয়ে যেতে হবে।

এককড়ি ॥ কোথায়?

ম্যানেজার ॥ সার্কাসের তাঁবুতে।

এককড়ি ॥ কেন?

ম্যানেজার ॥ মরা হাতিটার সৎকার করতে হবে না? হাতির লাস, বুঝতেই পারছেন।

এককড়ি ॥ (হাসিয়া) মুখাগ্নি করতে হবে? আমাকে?

ম্যানেজার ॥ করতে হবে না?—হাতির মালিক তো আপনি! খান দুই লরী—চল্লিশ-পঞ্চাশমণ কাট—দাহ করবার ট্যাক্স—পুলিশের লাইসেন্স—শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে চলুন। একি, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে?

এককড়ি ॥ করোনারি থ্রমবোসিস।

ম্যানেজার ॥ কার?

এককড়ি : আমার। [শুইয়া পড়িয়া হাতপা ছুঁড়িতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মী ॥ ওগো! কি হ'ল গো?

ছেলেমেয়েরা ॥ বাবা—বাবা গো—

এককড়ি ॥ দেখছিস কি! আমার হয়ে গেছে। পাঁচশো টাকা দিয়ে হাতি দাহ করার আগে আমায় দাহ কর বাবা।

ম্যানেজার ॥ শুনুন মশাই। আপনি লিখে দিন হাতিটা লটারিতে পেলেও আপনি নেবেন না। তবেই আপনি বেঁচে গেলেন।

এককড়ি ॥ এ্যাঁ! [চটপট উঠিয়া] লিখে দিলেই বেঁচে যাব! এখনি লিখে দিচ্ছি।

[লিখিতে লাগিলেন]

দু'কড়ি ॥ [ম্যানেজারকে] বুঝলাম মশাই। হাতিটা আবার লটারিতে তুলবেন।

ম্যানেজার ॥ জানেনই তো—হাতি সহজে মরে না। আর, মরলেও লাখটাকা। যা আসে, তাই লাভ।

যবনিকা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস ঃ

১৯৫৭ সালের আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা এই দুই কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে—পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালকম এণ্ডারসনের এবং মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে আমেরিকার নিগ্রো মহিলা খেলোয়াড় কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনের জয়লাভ। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য অনুসারে যে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয় সেই তালিকায় ম্যালকম এণ্ডারসন কোন স্থান পাননি। অর্থাৎ নাম-নির্ব্বাচন-কমিটির বিচারে এণ্ডারসন ছিলেন অতি সাধারণ শ্রেণীর খেলোয়াড়। আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের ইতিহাসে এতদিন বাছাই খেলোয়াড়রাই জয়ী হয়ে এসেছেন, বিচারক-মণ্ডলীকে অপদস্থ হ'তে হয়নি। এণ্ডারসনের জয়লাভ সেই ইতিহাসের পাতায় ব্যতিক্রম হয়ে রইলো। অপরদিকে নিগ্রো মহিলা কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনের জয়লাভও প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর আগে কোন নিগ্রো খেলোয়াড় আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়ী হ'তে পারেন নি। শ্বেতকায় জাতীর সুদীর্ঘকালের একাধিপত্য আজ খর্ব্ব হ'ল। এ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেট বল, বক্সিং, সাঁতার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর খেলাতে নিগ্রোজাতি ইতিপূর্ব্বে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে; টেনিস খেলায় তারা পিছিয়ে ছিল। কুমারী গিবসন তাঁর স্বজাতির পথকৃৎ হয়ে রইলেন। সাত বছরের চেষ্টায় কুমারী গিবসন সাফল্যলাভ করলেন। ১৯৫৬ সালের প্রতিযোগিতায় অতি অল্পের জন্যে তিনি এই সম্মান হাতছাড়া করেন, ফাইনালে হেরে যান। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের ইতিহাসে ১৯৫৭ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় তিনি সিঙ্গলস এবং ডবলস খেতাব লাভ করেন।

আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কুমারী গিবসন দু'টি খেতাব লাভ করেছেন—মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডবল্স। তাছাড়া মহিলাদের ডবল্সের ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছেন।

অল্পের জন্য এই প্রতিযোগিতায় তিনি 'ত্রিমুকুট' লাভ থেকে অপারগ হয়েছেন। সিঙ্গলসে তিনি পরাজিত করেন চারবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান লুই ব্রাউকে।

অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালকম এণ্ডারসনের সিঙ্গলস জয়লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছেঁড়া' নয়। তাঁকে রীতিমত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনজন বাছাই খেলোয়াড়—অষ্ট্রেলিয়ার ডিক সেভিট (২নং), সেমি-ফাইনালে সুইডেনের ডেভিডসন (৩নং) এবং ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান অ্যাসলে কুপার (১নং)।

আলোচ্য প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালের চারজন খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন, অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন—এণ্ডারসন এবং কুপার, সুইডেনের ডেভিডসন এবং আমেরিকার ফ্লেম। ফাইনালে দু'জন অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজনই আমেরিকার খেলোয়াড় খেলেছিলেন ; আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, চারজনই কুমারী—এ্যালথিয়া গিবসন, লুই ব্রাউ, ডোরথি নোড, ডার্লিন হার্ড।

মিক্সড ডবলসের সেমি-ফাইনালে যে আটজন উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ৬ জন, একজন ক'রে ডেনমার্ক এবং অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রামনাথন কৃষ্ণান ৩য় রাউণ্ডে উঠে ২নং বাছাই খেলোয়াড় রিচার্ড সেভিটের কাছে হেরে যান।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ম্যালকম এণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ১০-৮, ৭-৫, ৬-৪ গেমে ১নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যাসলি কুপারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২ গেমে ২নং খেলোয়াড় লুই ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : কুর্ট নেলসন (ডেনমার্ক) এবং এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩, ৯-৭ গেমে রবার্ট হো (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিস ডার্লিন হার্ডকে পরাজিত করেন।

আগষ্টমাসে ব্রুকলিনে অনুষ্ঠিত মহিলা এবং পুরুষদের ডবলস খেলার ফলাফল :

মহিলাদের ডবলস ফাইনালে মিস লুই ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট ৬-২, ৭-৫ গেমে মিস এ্যালথিয়া গিবসন এবং মিস ডার্লিন হোকে পরাজিত করেন। এই মিস ব্রাউ এবং মিসেস ডু পণ্ট ১২ বার মহিলাদের ডবলস খেতাব লাভ করলেন। পুরুষদের ডবলস ফাইনালে এ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রেজার ৪-৬, ৭-৩, ৯-৭, ৬-৩ গেমে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান গার্ডনার মুলয় এবং বাজ পেটিকে পরাজিত করেন।

অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফুটবল ঃ

অল্-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইণ্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী (পেরাম্বুর) বনাম সাউথ রেলওয়ের ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। ফলে উভয় দল ভাগাভাগি ক'রে ট্রফিটি জয় লাভ করে। কোচ ফ্যাক্টরী টসে জয়ী হয়ে প্রথম ছ'মাস ট্রফি রাখার অধিকার পায়।

মারদেকা ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

মালয়ে অনুষ্ঠিত মারদেকা ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান ত্রিলোকনাথ শেঠ অল্-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান মালয়ের এ ডি চুংয়ের কাছে পরাজিত হ'ন।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালে ইলিয়ট শীল্ড ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী আশুতোষ কলেজ ১—০ গোলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজকে পরাজিত করে। প্রথম দু'দিন ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়।

মহিলাদের আন্তঃকলেজ সন্তরণ ঃ

মহিলাদের প্রথম আন্তঃকলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গোখেল মেমোরিয়াল কলেজ দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। উক্ত কলেজের ছাত্রী কুমারী রীণা ব্যানার্জি চারটি অনুষ্ঠানেই প্রথম স্থান লাভ করেন।

আন্তঃ স্কুল সন্তরণ ঃ

আন্তঃ স্কুল রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় উত্তর কলিকাতা অঞ্চল ১১২ পয়েণ্ট লাভ ক'রে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ২য় স্থান পায় দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চল, মাত্র ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে। উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্র বেণীমাধব তালুকদার বড়দের বিভাগের মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৬টিতে শীর্ষস্থান লাভ করে। তাছাড়া তালুকদার ১০০ মিটার বুক সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে। বালিকাদের বিভাগে সন্ধ্যা চন্দ্র ২টি বিষয়ে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করে।

আন্তঃ কলেজ সন্তরণ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সিটি কলেজ ৪৬ পয়েণ্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ৩৭ পয়েণ্ট পেয়ে ২য় স্থান লাভ করেছে গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান বিদ্যাসাগর কলেজ।

টেবল টেনিস ঃ

আমেরিকার তিনজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি টেবল টেনিস দল ভারত সফরে এসেছে। এই দলে

আছেন আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বিল গান' ১৯৫৭ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বার্ণার্ড বাকিয়েট এবং প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়ান রবার্ট ফিল্ডস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই টেবল টেনিস দলটি খেলবে। দলটি ক'লকাতায় সফরের প্রথম খেলায় যোগদান করেছিল। প্রথমদিনের খেলায় আমেরিকান দল ৩—২ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে। মোট পাঁচটি খেলা হয়—চারটি সিঙ্গিলস ও একটি ডবলস। বাংলা দলের পক্ষে সরোজ ঘোষ এবং দীপক ঘোষ হু'টি সিঙ্গলসে জয়ী হয়। বাংলা দলে খেলেছিলেন সরোজ ঘোষ, দীপক ঘোষ এবং জে ব্যানার্জি। আমেরিকার পক্ষে খেলেন বার্ণার্ড বাকিয়েট এবং রবার্ট ফিল্ডস। বাকিয়েটের খেলাই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয়দিনের আমন্ত্রণমূলক খেলার ফাইনালে আমেরিকার বাকিয়েট তিন গেমে মাত্র ১৫ মিনিট সময়ে বাংলার প্রতিনিধি জ্যোতির্ম্ময় ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেন। ফাইনাল খেলার থেকে সেমি-ফাইনালের দীপক ঘোষ বনাম বাকিয়েটের খেলায় দর্শক সাধারণ উত্তেজনা অনুভব করেছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির নিজস্ব ভবনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ ক'রে পুরস্কার বিতরণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানে যোগদানকরিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে সোসাইটির সভাপতি স্যার এস,এম, বসুর সহধর্ম্মিণী লেডী বসু পুরস্কার বিতরণ করেন। এইউপলক্ষে মনোজ্ঞ জলক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জলনাট্যের একটি দৃশ্য

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালের আই এফ এ শীল্ড-এর ফাইনাল খেলার দিন পিছিয়ে গেছে। এক দিকের ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে। কিন্তু অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি আজ পর্য্যন্ত হয়নি। সহরে ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে; তার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ খুবই ব্যস্ত; এ দিকে পুলিশের সাহায্য ছাড়া ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ খেলার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ অক্ষম।

শীল্ডের কোয়ার্টার-ফাইনালে ৫টি স্থানীয় দল এবং ৩টি বহিরাগত দল খেলেছিল।—ফলাফল: মহমেডান স্পোর্টিং ৩: জর্জ্জটেলিগ্রাফ ১; ইণ্ডিয়ান নেভী ১,৩: ই, এম্ ই ১,১; রেলওয়ে স্পোর্টস ৪: হায়দ্রাবাদ এফ সি ৩; ইস্টবেঙ্গল ৩: খিদিরপুর ০। একদিকের সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ৩-০ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ফলে ১৯৫৭ সালের প্রতিযোগিতার আই-এফ-এ শীল্ড ক'লকাতায় রয়ে গেল।

১৯।৯।৫৭

ফুটবল রেফারীং

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

(সভ্য—রেফারী এসোসিয়েশন, ইংলণ্ড)

রবীন সরকার

ফুটবল রেফারীং করাকে অনেকেই কঠিন কাজ বলে মনে করে। সেটা তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা উৎসাহী—তারা সহজেই ফুটবল খেলায় রেফারীং করতে পারবে তা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, অপরে যদি করতে পারে—তা আমরা পারবো না কেন? নিশ্চয় পারবো। কেবল চাই মনের জোর।

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে রেফারীএকজন "গোলকি-পারের" মত "গেমকিপার"। যেমন গোলকিপার গোল রক্ষা করে—তেমনি রেফারী সময় রক্ষা করে—নিয়ম রক্ষা করে চলেছে কিনা তাই দেখে, সেইজন্য রেফারীকে আইনের সঙ্গে খুব পরিচিত থাকতে হয়।

লাইনসম্যানরা দেখে বল সীমানার বাইরে গেছে কিনা। তারা সঙ্কেত মাত্র দিতে পারে, বিচার দিতে পারে না, অফসাইড্ হয়েছে কিনা তা দেখাতে পারে—কিন্তু খেলা থামিয়ে বিচার দিতে পারে না, অর্থাৎ লাইনসম্যানদের সঙ্কেতে খেলা বন্ধ হতে পারে না। রেফারীই এই সব বিচার ভার নিয়ে থাকে, লাইনসম্যান কেবল সাহায্যকারী—যাতে রেফারীং সুষ্ঠুভাবে হয়।

রেফারী খেলা বন্ধ করতে পারে, তবে কেন যে খেলা বন্ধ করবে তার কারণ জানে,আবার কিভাবে খেলা আরম্ভ করাতে হবে থামানোর পরে—তাও জানে। খেলাকে চালু রেখে দেওয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। থামানোর দিকে মোটেই দৃষ্টি দেয় না। যদি সব সময় খেলা থামাতে থাকে আজে বাজে দোষের জন্য—তাতে খেলার মাধুর্য্য চলে যায়। আমি এক মারাত্মক দোষ না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা থামাই না। সেইজন্যই খেলার গতি দ্রুত ও দর্শনীয় হয়।

খেলুড়েরা খেলে বল, বলটাই হচ্ছে আসল দ্রষ্টব্য, ওই বলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, যত দোষ হয়ে থাকে তাই বলটাকে নিয়ে। বলটা যখন চালু থাকে তখনই হয় যত দোষ। কিন্তু বল থেমে গেলেই আর তখন দোষের আওতায় ততটা আসে না।

রেফারী মাত্র তিনটে কাজ করতে পারে মাঠে। যেমন, বিচার দিতে পারে—ফাউল হয়েছে কিনা, সতর্ক করে দিতে পারে যদি ছোটোখাটো অন্যায় হয়। অথবা মারাত্মক ইচ্ছাকৃত দোষের জন্য খেলার মাঠের বাইরে বার করে দিতে পারে।

অন্যায় বা দোষের জন্য আইন মাফিক্ বিচার প্রদান করে, কিন্তু নিজের থেকে কোন আইন বানিয়ে শাস্তি বা বিচার দিতে পারে না, আদালতে বিচারের রায় দিতে হলে মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে যায়। কিন্তু খেলার মাঠে একমাত্র বাঁশীতে ফুঁ দেবামাত্রই বিচার হয়ে যায়।

বাঁশীর শব্দ বিচারকের চাইতে বেশী কার্য্যকরী। বাঁশীর অদ্ভুত ক্ষমতা।

নিয়ম জানার জন্য রেফারী খেলা পরিচালনা করতে বেগ পায় না, কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় না। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে খেলাতে সক্ষম হবার জন্য বাহাদুরী দেখাতে সমর্থ হয়। রেফারী যত মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলের দিকে চোখ রেখে খেলাতে পারে—ততই ভাল পরিচালনা করতে পারে। টপ করে ভাববার ক্ষমতা থাকার জন্য বিচার দিতে বাধা হয় না।

জগতের যেখানে যেখানে ফুটবল খেলা হয় তারা একই নিয়মে খেলে চলে, তবে মাঝে মাঝে খেলার সময় এমন সমস্যা এসে হাজির হয়, যা জনসাধারণ বা দর্শকরাও ঠিক করে উঠতে পারে না। ফলে গোলমাল করতে সুরু করে দেয়। তাতে মনের শান্তি দূর হয়। খেলার ভিতর যা আনন্দ আছে তা মোটেই লাভ করা যায় না।

আগে যখন ফুটবল খেলা হত তখন কেউ যদি ইচ্ছা করে অন্যায়ভাবে খেলতো তখন তার খেলা বন্ধ হয়ে যেত। যাদের বার করে দেওয়া হত তাদের আর দলে নিত না।

মনে রাখতে হবে যে আগেকার আইন এখন আর চলে না, এখনকার যুগে আইন অনেক বদলে গেছে, আইন ভঙ্গ করলে বা রেফারীর কথা না শুনলে এখন ১২ আইনের মতে শাস্তি পেতে হয়। ১২নং আইনের জন্য আইন বই পড়ে দেখতে হবে।

খেলার মাঠে যতসব গোলমাল শোনা যায় ১১নং আইন ও ১২নং আইন মেনে না চলার জন্যই। একটা হচ্ছে অন্যায়ভাবে খেলা ও অভদ্র ব্যবহারের জন্য দোষ করা, আর একটি হচ্ছে অফসাইড্ থেকে সুযোগ খোঁজার জন্য, সেই জন্য এই দুটি আইন ভাল করে জানতে হয়।

রেফারীকে মনে রাখতে হবে যেমত সহজভাবে খেলাতে পারা যাবে ততই খেলার আকর্ষণ বাড়বে, যদি কোন চালাকী দেখাতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তখনই বুঝা যাবে যে সমস্যা সৃষ্টি করে কোনই কাজ হয় না। ঠকতে হয়, গোলমালে পড়তে হয়।

খেলুড়েদের বল কেড়ে নিয়ে খেলতে হয়। তা না হলে খেলা হয় না, এর জন্য অনেক সময় ধাক্কা লাগে গায়ে। তাতে অন্যায় হয় না, রেফারীকে দেখতে হয় যে ধাক্কাটা অন্যায় ভাবে দিয়েছে কিনা ফেলে দেবার জন্য। কাঁধে কাঁধে লাফিয়ে ধাক্কা দিতে পারে। তবে কাঁধ এসে বুকে ধাক্কা দেবে না, বা এক হাত অন্য একটা হাতকে নিজের হাতের উপর চেপে ধরে ধাক্কা দিতে যাবে না, তাতে কঠিন হয়ে থাকে। ধাক্কা দিয়ে খেলা ভাল নয় কোন মতেই।

গোলকিপারকে কোন মতেই লাথি মারতে পারবে না, বা তার হাত থেকে বল কেড়ে নেবার জন্য পা তুলতে পারবে না। এসব অভদ্র ব্যবহারের লক্ষণ।

ফুটবল খেলা এখন মানুষদের খেলা, যদিও আগে বর্ব্বরদের মত খেলা হত—কিন্তু ১৮৯১ সাল থেকে আইন কানুন হবার জন্য বর্ব্বরতা একটু কমে এল। অনেক বিচার বুদ্ধির পর সকলে জানতে পারল যে বলটাকে নিয়ে খেলতে হবে যখন তখন মানুষদের মেরে ধরে বল কেড়ে নিয়ে খেললে কি বাহাদুরী হবে। কিন্তু মানুষদের ভিতর লুকিয়ে আছে অন্যায়ভাবে খেলার একটা অভদ্র ইঙ্গিত। দরকার পড়লেই ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করে না। মানুষ—যারা শিক্ষিত ও ভদ্র—তারাই আজ অশিক্ষিতের মত অভদ্র ব্যবহার করে বলেই যত সব নিয়মকানুনের আবির্ভাব। তা না হলে ফুটবল খেলা রেফারী ছাড়াও হতে পারে যা ছোট খেলুয়াদের ভিতর সচরাচর দেখা যায়। তারা খেলে আনন্দ পায় সত্যি, কিন্তু বড়রা পায় না।

সাহিত্য সংবাদ

স্বপ্ন মঞ্জরী : গল্প-সংগ্রহ, শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্পের লক্ষণ নানাভাবে সূক্ষ্মাকারে বিশ্লেষিত হইয়াছে ; একটা লক্ষণ খুব সূক্ষ্ম না হইলেও বেশ ব্যাপক মনে হয়। লক্ষণটি এই, জীবনের আশপাশে প্রতিনিয়ত ছোটখাট কত জিনিসই ত ঘটিয়া যাইতেছে,—তাহার ভিতরে এক আধটা যেন কেমন চোখে পড়িয়া যায়! এমনি একবার চোখে পড়িয়া যায়—মনে লাগিয়া যায়। এমনি একবার চোখে পড়িয়া এবংমনে লাগিয়া গেলেই হইল—অমনি সংবেদনশীল মনের স্পর্শ চিরদিনের পরিচিত একান্ত সাধারণই কেমন অনন্যসাধারণ হইয়া ওঠে। শ্রীযুত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি সংবেদনশীল মন লইয়াই আধুনিক গল্পক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থে লেখকের বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এগারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। লেখক হিসাবে হরিনারায়ণবাবুর কোনও উগ্র আত্মসচেতনা বা ভান নাই। তাঁহার অনাড়ম্বরতা এবং সরলতা গল্পের বিষয়-বস্তু গ্রহণেও—গল্পের পরিবেশনেও। দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'দ্বিধা' গল্পটির উল্লেখ করিতে পারি। ছোট ছোট মেয়েদের স্কুলে গিয়া দৌড়া-দৌড়ি এবং লম্ফ-ঝম্পে গলার হার হারাইয়া যাওয়া এবং তাহা লইয়া স্কুলের ঝিকে সন্দেহ করা এবং অভিযুক্ত করা—ইহা ত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু সেই জাতীয় একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া মোক্ষদা-হৃদয়ের যে পরিচয় তাহাতে মানুষের জীবনের লক্ষণীয় মূল্যায়ন রহিয়াছে। শিল্পাঙ্গী গল্পটির পরিবেশনে একটি কৌশল-চমৎকারিত্ব আছে। 'মথুরা-কাটির মাষ্টার' গল্পে মাষ্টারের আত্মাভিমান এবং সেই অভিমানের পরাজয়ের মধ্যে যে বেদনা মনে তাহা বেশ আঁচড় কাটে।

হরিনারায়ণ বাবুর নিজস্ব একটা ষ্টাইল আছে, বাহুল্যবর্জিতরূপেই তাহা আকর্ষণীয়। বর্ণনা কোথাও অকারণ দীর্ঘায়িত নয়—অথচ গল্প তুলির টানে স্পষ্ট। অলঙ্কারের ভার নাই—কিন্তু যেখানে সে সহজাগত—সেখানে তাহার স্বাতন্ত্র্য অবশ্য লক্ষণীয়। কথা-সাহিত্যিক রূপে হরিনারায়ণবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, এই খ্যাতি তাঁহার প্রাপ্য।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য তিন টাকা]

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভক্ত কবীর : উপেন্দ্রকুমার দাস

মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে কবীরের দানের তুলনা নেই। সে-যুগের ভারতে কলহরত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন পরমসন্ত কবীর। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, যে দ্বন্দ্ব তা দূর করবার জন্যে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি—"এক নিরঞ্জন অলহ মেরা, হিন্দু তুরুক দহুঁ নহী মেরা।"

কলহপরায়ণ বিশ্বে সমন্বয়ের বাণীই আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। তাই "ভক্ত কবীর"-এর প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দন যোগ্য। গ্রন্থকার কবীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন করে সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

[ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য ৫৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিমানে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি : চার্লস এ লিণ্ডবার্গ।

অনুবাদ—অ-কু-রা

১৯২৭ সালে বৈমানিক লিণ্ডবার্গ নিউ ইয়র্ক থেকে বিমানে এটলান্টিক পাড়ি দিয়ে প্যারিসে পৌঁচেছিলেন। পথে কোথাও নামেন নি। একা চলেছিলেন বিমানে। ৩৬১০ মাইল পথ একা একটানা বিমান চালানো—ঝঞ্ঝা সংকুল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে, মৃত্যুকে সাথী করে নিয়ে বিমান চালানোর দুঃসাহসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে লিণ্ডবার্গের "স্পিরিট অব সেন্ট লুই" পুস্তকে। আলোচ্য পুস্তকটি তার অপূর্ব অনুবাদ ; পড়তে পড়তে পাঠক নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করবেন মরণজয়ী আকাশ অভিযানে আশা ও ভয়ের হৃৎস্পন্দন।

[প্রকাশক—হসন্তিকা প্রকাশিকা। ৩৯বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। মূল্য ২॥০ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শেষপ্রশ্ন" (১৯শ সং)—৫৲,
"পরিণীতা" (৪১শ সং)—১৷৷০
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রকাশিত ছোটদের পূজা—বার্ষিকী "নবপত্রিকা"—৪৲
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ছোটদের "পূজার দিনের উপহার"—২৲
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "একালের মেয়ে"—২৲
[illegible] মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দুর্গতোরণ"—৩৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত কিশোরপাঠ্য গল্পগ্রন্থ "যত হাসি তত মজা"—২৲
শ্রীশ্রীস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত "কথার কথা"—২৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "বউ ডুবির খাল"—৩৲
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "যাত্রা সহচরী" (২য় সং)—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীপরিমলকান্তি দত্তরায় | পরিব্রাজক | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৬৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পণ্ডিতদের বেদব্যাখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ*

বেদের গূঢ় সাধনার প্রতীকরূপে বাহ্যক্রিয়াকলাপ ও তদুপযোগী সাঙ্কেতিক ভাষার পরিবর্তে বেদান্তের স্বচ্ছ সত্যদৃষ্টি ও তদুপযোগী বিশদ ভাষার অবতারণার ফলে, বৈদিক অনুষ্ঠান ও সংহিতা দুইই অপ্রচলিত হয়ে গেল। সে পরিবর্তন সম্পূর্ণ করল বৌদ্ধধর্ম। প্রাচীন জগতের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বেঁচে রইল শুধু শ্রাদ্ধার্থের কয়েকটি সমারোহ ও কয়েকটি গতানুগতিক আচার। বৌদ্ধরা চেয়েছিল যে বৈদিক যাগযজ্ঞ একেবারেই উঠে যায় এবং সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ কথ্য ভাষা চলে। তবে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হতে আরও কয়েক শতাব্দী বেশী সময় নিল। কিন্তু এ অবকাশে বেদের নিজস্ব কোন উপকার হয় নি। কারণ নূতন ধর্মের জনপ্রিয়তা প্রতিরোধ করবার জন্য, তাৎকালীন সহজ সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র রচিত হল ; প্রাচীন ব'লে সম্মানিত হলেও দুর্বোধ্য শ্রুতির ব্যবহার আর রইল না। প্রাচীন অনুষ্ঠানের স্থলে পুরাণের নূতন ধর্মে নূতন আকারে পূজা

* On the Veda থেকে। অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত সেন

প্রবর্তিত হল ; সুতরাং দেশের বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই বেদ অনেক দূরের বস্তু হয়ে গেল। সত্যদ্রষ্টা আচার্যের কাছ থেকে ত বেদ আগেই পুরুতদের হাতে গিয়েছিল, এখন তা পুরুতদের হাত থেকে গেল পণ্ডিতদের হাতে। আর সেখানেই হল তার অর্থের চরম বিকৃতি, তার প্রকৃত গৌরব ও অমোঘ প্রামাণ্যের চরম অপচয়।

তবে খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে, বেদ নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের কারবারে কেবল যে ক্ষতির অঙ্কই জমা হয়েছে তা নয়। বেদের গূঢ় অর্থ লোপ পাবার পরেও জীবন্ত ধর্মগ্রন্থরূপে তার ব্যবহার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেদ বেঁচে আছে পণ্ডিতদের রক্ষণশীলতা ও কর্তব্যপালনে প্রাণান্ত পরিশ্রমের গুণে। আর, সে নষ্ট অর্থ উদ্ধারের যে সাহায্য পাওয়া যায় সনাতন পাণ্ডিত্যের কাছ থেকে, তাও অমূল্য। প্রথম অতি যত্নে নির্ধারিত, প্রত্যেকটি স্বরচিহ্নসহ নির্ভুল-ভাবে রক্ষিত মূল পাঠ ; দ্বিতীয়, যাস্কের মূল্যবান কোষ—নিরুক্ত ও নির্ঘণ্ট ; আর সর্বোপরি, সায়নের বিরাট ভাষ্য,—বহুত্রুটি, এমন কি মারাত্মক সব বিচ্যুতি সত্ত্বেও বেদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীর প্রথম সহায়রূপে তা অপরিহার্য।

বেদের যে মূল সংহিতা আমরা পেয়েছি তা দুহাজার বছরেরও বেশী দিন ধ'রে চলে আসছে, বিকৃত বা দূষিত হয় নাই। যতদূর জানা যায়, সে সংহিতা গ্রথিত হয়েছিল ভারতীয় বুদ্ধির গৌরবময় যুগে। গ্রীসে বুদ্ধিদীপ্ত যুগ বিকাশের তা সমকালীন, তবে তার সঞ্চার হয়েছিল আরও আগে। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কালিদাস প্রভৃতি কবির রচনাতে, যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই যুগে। আর, মূল সূক্ত সব রচিত হয়েছিল যে আরও কতকাল পূর্বে, তা বলা যায় না। কতকগুলি বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তার প্রাচীনত্ব অমেয়, বয়স প্রায় গণনাতীত। তবে, মন্ত্রের নির্ভুল পাঠ, প্রত্যেকটি অক্ষরের এমন কি প্রত্যেকটি স্বরের বিশুদ্ধতা ছিল বৈদিক যজ্ঞের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কারণ, মন্ত্রের উচ্চারণের উপর তার কার্যকারিতা নির্ভর করত। যেমন ব্রাহ্মণে ত্বষ্টার কাহিনীতে আছে, ইন্দ্রকৃত পুত্রহত্যার প্রতিশোধ কল্পে তিনি যজ্ঞ করলেন—কিন্তু তার [illegible] যে তার [illegible] ছিল, কারণ তাদের জন্য সে ইন্দ্রের নিহন্তা না হয়ে হল ইন্দ্রের দ্বারা নিহত। প্রাচীন ভারতের অলোক-সামান্য স্মৃতিশক্তি সর্বজনবিদিত এবং তার মূল পাঠে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি। কারণ অবান্তর বিষয় সংযোগ ও ভাষার পরিবর্তন বা তাৎকালীন প্রয়োগ অনুযায়ী সংশোধনের ফলে যেভাবে কুরুবংশীয় প্রাচীন মহাকাব্য বর্তমান মহাভারতের রূপ নিয়েছে, সেভাবের হস্তক্ষেপ থেকে তার অপৌরুষেয় সম্মান তাকে রক্ষা করেছে। সুতরাং মোটেই অসম্ভব নয় যে বেদব্যাস এ সংহিতার যে আকার দিয়েছিলেন সেই আকারেই আমরা তা পেয়েছি।

তবে, বর্তমান লিখিত আকার তা নয়। বেদের ছন্দও সাহিত্যিক সংস্কৃতের ছন্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষ করে সন্ধি সম্বন্ধে তখন অনেক স্বাধীনতা ছিল। পরের যুগে সন্ধি ছিল ভাষার একটা বিশেষ গুণ, প্রায় নিত্য প্রয়োজ্য। কিন্তু সব জীবন্ত ভাষাতে যেমন হয়—বেদের ঋষিরা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানতেন না, অন্তরের শ্রুতি অনুসারে স্বতন্ত্র দুই শব্দের মধ্যে কখনও সন্ধি করতেন, কখনও বা করতেন না। কিন্তু বেদ যখন লেখা হল তখন ভাষার উপর সন্ধির প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে। সে সব নিয়ম মেনে নিয়েই ব্যাকরণবিদেরা প্রাচীন মূল লিপিবদ্ধ করলেন। তবে, সংহিতার সঙ্গে সযত্নে পদপাঠ রক্ষিত হয়েছে। তাতে সব সন্ধি-বিচ্ছেদ ক'রে, এমন কি সমাস-বদ্ধ বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক ক'রে দেখান হয়েছে। প্রাচীন শ্রুতিধরদের নিষ্ঠাকে খুব প্রশংসা করতে হয় যে, এব্যবস্থাতে যত গোলযোগ আসতে পারত তার কিছুই আসে নি। সংহিতার প্রত্যেকটি মন্ত্র বিশ্লেষণ ক'রে অতি সহজে বৈদিক ছন্দোবিধানের স্বরসঙ্গতি অনুসারে নির্ভুল ভাবে সাজান যায়। পদ-পাঠের বিশুদ্ধতা বা সূক্ষ্ম-বিচারের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সুতরাং, আলোচনার ভিত্তিরূপে বিনা দ্বিধায় এ গ্র আমরা গ্রহণ করতে পারি। ক্বচিৎ কদাচিৎ সংশয় আসলে বা ভ্রমাত্মক মনে হলেও, য়ুরোপের প্রাচীন মহাকাব্য সবই যেমন নিরঙ্কুশ ভাবে সংশোধন করা হয়েছে এখানে তার কোন অবকাশ নাই। কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে এই অমূল্য সুবিধার জন্য আমরা ভারতীয় পাণ্ডিত্যের সত্যনিষ্ঠার কাছে কৃতজ্ঞ।

অপর কয়েকদিকে আবার পণ্ডিতদের গতানুগতিক ধারণা তেমন নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়ত নিরাপদ নয়, যেমন, সূক্তের সঙ্গে যে ঋষির নাম সংযুক্ত হয়েছে, অন্ততঃ প্রাচীনতর ঐতিহ্য সেখানে দৃঢ় ও নিঃসংশয় নয়। কিন্তু এসব ছোটখাট কথার গুরুত্ব অতি কম। আমার মতে, প্রত্যেক সূক্তের ঋক্‌গুলি যে যথাযথ অনুক্রমে সাজান হয়েছে এবং প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সূক্ত যে ঠিক ঠিক ধরা হয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ করবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকেও, তার সংখ্যা ও গুরুত্ব নগণ্য। সুতরাং কোন সূক্ত যদি পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার অর্থগ্রহণ করতে পারা যায় নি। সংযোগ সূত্র একবার ধরতে পারলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি সূক্ত স্বতঃসম্পূর্ণ এবং যেমন চিন্তার সংগঠনে তেমনি ভাষা ও ছন্দে অনবদ্য।

তবে, বেদব্যাখ্যাতে ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য চাইলে তা গ্রহণ করতে সবচেয়ে বেশী দ্বিধাবোধ অনিবার্য হয়। কারণ, বুদ্ধিগ্রাহ্য বিদ্যার আসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই সূত্রের যুগের প্রথম দিকেই, আনুষ্ঠানিক বেদ-বাদের প্রভাব অতি প্রবল হয়েছে, শব্দের ও পংক্তির এবং পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা বা উদ্দিষ্ট বিষয়ের আদিম অর্থ ম্লান হয়ে গেছে, চিন্তার প্রাচীন পদ্ধতি হারিয়ে গেছে। আর পণ্ডিতদেরও বোধি বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এমন তেজ ছিল না যাতে সে গুপ্ত রহস্য আংশিক ভাবেও পুনরুদ্ধার করা যেতে পারত। অথচ, এই রকম গূঢ় বিদ্যার ক্ষেত্রে কেবল পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে যদি তার সঙ্গে উদ্ভাবনদক্ষতা ও বিদ্যাভিমান থাকে, অনেক সময়ে ঠিক পথের দিশা না দিয়ে বিপথে ভুলিয়ে নেয়।

আমাদের প্রধান সহায় হল যাস্কের কোষ। তার দু অংশের মূল্যে অনেক তারতম্য আছে। শব্দকোষ বা 'নির্ঘণ্টু' প্রণেতা যাস্ক যখন বৈদিক শব্দের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেন, তার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত, তাঁর সাহায্য অতি মূল্যবান। সব শব্দের যথাযথ পুরাতন অর্থ যে তিনি জানতেন তা নয়। কারণ, কালের গতিতে স্বাভাবিক বিবর্তনের বশে তার অনেক তখন লোপ পেয়েছে। আর বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব তখন ছিল না, তাই সব নষ্ট অর্থ পুনরুদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তবে পরম্পরাগত সংস্কারে তার অনেকগুলিই বেঁচে ছিল। বৈয়াকরণের উদ্ভাবন-কৌশল না দেখিয়ে যাস্ক যেখানে এই সব চিরাগত ধারণা সংগ্রহ করেছেন সেখানে নির্ভর-যোগ্য ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারা তাঁর দেওয়া অর্থ সমর্থন করা যায়, যদিও যে বাক্যের ব্যাখ্যাতে তিনি সে অর্থ নিয়েছেন সে প্রসঙ্গে হয়ত সে অর্থ সব সময়ে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু নিরুক্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার ক'রে যাস্ক যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তার প্রামাণ্য শব্দ-কোষের সমতুল মোটেই নয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ বা শব্দের গঠন (Etymology) ভারতেই প্রথম গড়ে উঠেছে; কিন্তু নির্ভরযোগ্য ভাষাতত্ত্ব (philology) আমরা পেয়েছি বর্তমান কালের গবেষণা থেকে। এমন কি উনিশ শতক পর্যন্তও, যেমন ভারতে তেমনি য়ুরোপে, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে চতুর উদ্ভাবনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তার চেয়ে অযৌক্তিক ও উন্মার্গ-চারী আর কিছু হতে পারে না। যাস্ক যখন সে পথে চলেন তখন তাঁর সঙ্গও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতেই হয়। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ঋকের বা সূক্তের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পাণ্ডিত্যের অবদান, সায়নভাষ্যের চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য নয়।

বেদ সম্বন্ধে প্রাণবান মৌলিক আলোচনার সূত্রপাত হল যাস্কের নিরুক্ত ও অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রামাণ্য কীর্তিতে, আর তার শেষ নিদর্শন হল সায়নভাষ্য। নিরুক্ত সঙ্কলিত হয়েছিল যখন ভারত মনীষা প্রথম উদ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আহৃত সম্পদ সব সংগ্রহ করছিল, তার মৌলিকতার প্রস্রবণের নূতন উচ্ছ্বাসের উপাদান সন্ধানের উদ্দেশ্যে। আর সায়নভাষ্য হল এ শ্রেণীর প্রায় শেষ অবদান, মুসলমান অভিভবের ফলে প্রাচীন সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে খণ্ডিত আঞ্চলিক আকার নেবার পূর্বে, দক্ষিণ ভারতে তার শেষ আশ্রয়-কেন্দ্রে পৌরাণিক সংস্কৃতির অন্তিম মহাগ্রন্থ। তার পরে, সতেজ মৌলিক প্রয়াসের দুএকটি প্রবল ধারা উৎসারিত হয়েছে বটে, নবজন্ম ও নূতন সংশ্লেষণের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু এমন ব্যাপক বিশাল অক্ষয় কীর্তির চেষ্টা আর সম্ভব হয় নি।

অতীতের এই মহাদানের পরমোৎকর্ষ সুস্পষ্ট। সে সময়ের বিজ্ঞতম পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে সায়ন এ ভাষ্য

রচনা করেছিলেন। বহুমুখী পাণ্ডিত্যের এমন বিরাট উত্তম কার্যে পরিণত করা তখন একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে সমন্বয়ী মনীষার ছাপ তাতে রয়েছে সর্বত্র। ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও মোটের উপর তা বেশ সুসমঞ্জস্য-তার পরিকল্পনায় বিরাট অথচ রচনা অনাড়ম্বর। ভাষা সহজ, বিশদ ও বাহুল্যবর্জিত, প্রায় যেন একটা সাহিত্যিক লালিত্য তাতে আছে, যা এ ভাবের ভারত-প্রচলিত টীকার আকারে রচনাকে আনা সম্ভব বলে মনে হত না। কোথায়ও বিদ্যাজাহির করবার চেষ্টা নাই। মূলের দুর্বোধ্য অংশে অর্থনির্ণয়ের প্রয়াসের সবচিহ্ন অতি নিপুণ ভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য প্রামাণিকতার এমন একটা সহজ ভাব রয়েছে যে বিবাদীদের মনেও বিশ্বাস জন্মে। বেদের প্রথম পাশ্চাত্য অধ্যাপকরাও বিশেষ ক'রে সায়ন ভাষ্যের যুক্তিনিষ্ঠার গুণগ্রহণ করেছে।

তথাপি, বেদের বাহ্য অর্থ সম্পর্কেও সায়নের পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, অন্ততঃ অনেক ব্যতিক্রম-ব্যতিরেক বিচার না ক'রে। মূলের ভাষার উপর তিনি এমন অত্যাচার করেছেন, এমন যথেচ্ছ অন্বয় করেছেন—না দেখলে যা বিশ্বাস করা যেত না এবং যার কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার অনেক স্থলে নিজের কল্পিত অর্থ স্থাপন করতে মূলের সব সাধারণ সংস্কার, এমনকি, সুনির্দিষ্ট সব সূত্রের এক এক স্থলে এক এক অর্থ করেছেন—যা অদ্ভুত ভাবে পূর্বাপর বিরোধী ও সঙ্গতিহীন। তবে এসব ত্রুটি হল ছোটখাট আঙ্গিক বিষয়ে, আর তিনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন তাতে হয়ত অপরিহার্য। কিন্তু সায়নের পদ্ধতির প্রধান দোষ হল যে তিনি সর্বদা আনুষ্ঠানিক বিধান নিয়ে মেতে আছেন, আর অবিরাম বেদের অর্থ জোর করে এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখছেন। সেইজন্য অনেক সময় বেদের বাহ্য অর্থ প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক নূতন নির্দেশের সূত্র তিনি হারিয়েছেন। আর, এত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের পক্ষে সেসব বাহ্য ব্যাপারও আভ্যন্তরীণ অর্থের মতই কৌতূহলোদ্দীপক। ফলে তাঁর ব্যাখ্যাতে বেদের ঋষিদের এবং তাদের চিন্তা, সংস্কৃতি ও অভীপ্সার এমন দীন ও সংকীর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে যে, তা মেনে নিলে বেদের উপর চিরাগত গভীর সম্ভ্রম, তার অলঙ্ঘনীয় অসামান্য ও অপৌরুষেয়-তার খ্যাতি বিচার বুদ্ধির অগ্রাহ্য হয়, বলতে হয় যে সে কুসংস্কার আদিম ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর বিচার-বিমুখ গতানুগতিক অন্ধ বিশ্বাসের জোরে তা চলে আসছে।

অবশ্য, ভাষ্যের আরও সব দিক ও উপাদান আছে। কিন্তু সে সবই গৌণ, এই মূল ধারণার আনুসঙ্গিক। সায়ন ও তাঁর সহকর্মীদের কাজ করতে হয়েছিল সুদূর অতীত থেকে উদ্বর্তিত, অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী সব ঐতিহ্য, সংস্কার ও মতবাদের বিরাটস্তূপ নিয়ে। তার অনেক বিষয় বাহ্যতঃ মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন, আর কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুমোদন করা তাঁরা সঙ্গত মনে করেছিলেন। আর খুবই সম্ভব, তাঁর আগেকার এই অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সায়ন যে দক্ষতার সঙ্গে একটা দৃঢ়সংহত আকারের ব্যাখ্যা গড়ে তুলেছেন, সেই জন্যই তাঁর ভাষ্যের প্রামাণ্য এত বেশী ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়েছে।

সায়নকে প্রথম কাজ করতে হয়েছে শ্রুতির পুরাতন আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার যেসব ক্ষুদ্র অংশ তখনও প্রচলিত ছিল তা নিয়ে। এই উপাদানই হল আমাদের কাছে সব চেয়ে আদরের, আর সেই হল বেদের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্যতার প্রকৃত মূল। তার মধ্যে যতটা ধর্মনিষ্ঠ সমাজে স্বীকৃত বা প্রচলিত বিশ্বাসের অনুগত ছিল সায়ন তা গ্রহণ করেছেন। তবে তার ভাষ্যে এ উপাদান বেশী নাই, তার পরিমাণ ও গুরুত্ব নগণ্য। আর কথঞ্চিৎ কমপ্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কচিত কখনও তিনি উল্লেখ করেছেন প্রসঙ্গক্রমে, যেন সৌজন্যবশে। তার অনুমোদন করছেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে প্রাচীন একটা মতে বৃত্রকে আচ্ছাদক অর্থে নেওয়া হয়েছে, মানুষের কাছ থেকে মনোরথ ও অভীপ্সার বস্তু সে সরিয়ে রাখে। কিন্তু সে অর্থ তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাছে বৃত্র শুধু শত্রু বা স্থূল মেঘরূপী অসুর—যে জল ধরে রাখে, যাকে বিদীর্ণ ক'রে ইন্দ্রকে বৃষ্টি দিতে হয়।

আর একটা উপাদান হল দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, প্রায় বলা যেতে পারে, পৌরাণিক। দেবতাদের বিষয়ে নানা কথা ও কাহিনী বাহ্যতম্ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সেসবের গভীরতর অর্থ বা সে সঙ্কেতে আভাসিত তথ্যের দিকে দৃষ্টি

দেওয়া হয় নি, অথচ সেই সত্যই হল পুরাণ কথার অস্তিত্বের উপলক্ষ।*

তৃতীয় উপাদান হল কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক আখ্যান। বেদে যেসব বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈঙ্গিত করা হয়েছে সেসব ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণে ও পরবর্তী লোককথায় ঐতিহ্যে রাজাদের ও ঋষিদের অনেক গল্প আছে। এবিষয়ে সায়নের দ্বিধা আছে বোঝা যায়। কখনও বা মূল সূক্তের প্রকৃত অর্থ বলে তিনি তা মেনে নিয়েছেন, কখনও বা প্রচলিত কাহিনী উল্লেখ করে মূলের আর একটা বৈকল্পিক অর্থ দিয়েছেন। বোঝা যায়, তাঁর সহানুভূতি সেই দিকেই, অথচ ইতস্তত করছেন, প্রচলিত সংস্কার অগ্রাহ্য করতে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নৈসর্গিক। ইন্দ্র, মরুৎ, ত্রিবিধ অগ্নি, সূর্য, উষা, প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে সব নৈসর্গিক সুস্পষ্ট বা চিরাগত যোগ ত আছেই। তাছাড়াও তিনি ধরে নিয়েছেন যে 'মিত্র' হলেন দিন ও 'বরুণ' রাত্রি, অর্যমা ও ভগ হলেন সূর্য আর রিভুবা সূর্যের রশ্মি। এই হল বেদের নৈসর্গিক ব্যাখ্যার বীজ, আর সেই মতকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতেরা কিন্তু এ মতকে এত অবাধে গ্রহণ করেন নি বা এমন নিয়মিত বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করেন নি। তবু সায়নভাষ্যে এ উপাদান আছে, আর তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক দেবতাতত্ত্ব Comparative Mythology।

কিন্তু সায়নভাষ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চিন্তাই সবত্র ছেয়ে আছে। এই হল তার একমাত্র প্রতিপাদ্য। আর সব উপাদান তার চাপে পিষে গেছে। দর্শনের সব শাখাতেই বেদের সূক্তটিকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু মূলতঃ ও প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডেই তাদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে; আর সে কর্মের অর্থ হল, সর্বাগ্রে, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের যথাবিধি আচরণ। সর্বত্র সায়ন এই ধারণা নিয়ে কাজ করেছেন, এই ছাঁচে ঢেলে বেদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বার করেছেন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রায় পারিভাষিক, সব সংজ্ঞার অর্থ ঘুরিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযোজ্য সব রূপ দিয়েছেন: অন্ন, হোতা, দাতা, ধন, স্তুতি, প্রার্থনা, যজ্ঞ ও যজ্ঞবিধি।

ধন ও অন্ন: কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ধরা হয়েছে চরম আত্মম্ভরিতা ও স্থূলতম ঐহিক ভোগের বিষয়: সম্পত্তি, বল, ক্ষমতা, দাসদাসী, সন্তান, স্বর্ণ, গো-অশ্ব, যুদ্ধজয়, শত্রুনাশ ও শত্রুধনলুণ্ঠন, প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্বেষী সমালোচকের উৎসাদন। সূক্তের পর সূক্ত এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা পড়ে বোঝা যায় গীতার দৃষ্টিতে আপাত সঙ্গতিহীনতার হেতু,—কেন বেদকে সর্বক্ষণ দিব্যজ্ঞানের আকর ব'লেও* আবার বেদবাদ রত প্রভুত্বকামী ভোগৈশ্বর্যপ্রযুক্ত যেসব অজ্ঞেরা শিক্ষা দেয় যে, স্থূল জগৎ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নাই, তাদের পুষ্পিত বাক্যের নিন্দা করা হয়েছে।

বেদের এই নিকৃষ্টতম, যত প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে তার মধ্যে হীনতম অর্থে চিরকালের জন্য প্রামাণিক ভাবে বেঁধে দেওয়াই হয়েছে সায়নভাষ্যের অশুভতম ফল। আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যার প্রাবল্যে ইতিপূর্বেই ভারতে এই মহতী শ্রুতির জীবন্ত প্রয়োগ লুপ্ত হয়েছিল এবং উপনিষদের সমগ্র তাৎপর্য সন্ধানের সূত্র হারিয়ে গিয়েছিল। আর এই প্রাচীন ভ্রান্ত সংস্কারকে চরম সত্য বলে সায়নভাষ্যের যে প্রামাণ্যতার মুদ্রা অঙ্কিত হল, বহুশতাব্দী ধরে তা অটুট রইল। পরে যখন অপর এক বিজাতীয় সভ্যতা বেদ আবিষ্কার ক'রে তার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করল, তখন সায়নের সব পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দেশ থেকেই পাশ্চাত্য মনীষাতে নূতনতর ভ্রমের জন্ম মিল। তবুও, আভ্যন্তরীণ অর্থের অন্তঃকক্ষের দ্বার একাধিক অর্গলাবদ্ধ করে রাখলেও, বেদবিদ্যার উপশালায় প্রবেশের জন্য সায়নভাষ্য অপরিহার্য। বিরাট অধ্যবসায় সত্ত্বেও পাশ্চাত্য তার স্থান নিতে পারে নি। প্রতিপদে সায়নের সঙ্গে মতদ্বৈধ হতে বাধ্য, অথচ প্রতিপদে তার সাহায্য নিতেই হয়। রেলের প্লাটফর্মের মত, গাড়ীর পাদানির মত, দেউলের সিঁড়ির মত তা প্রয়োজন, তাকে ব্যবহার করতেই হবে, অথচ এগিয়ে যাবার বা গর্ভগৃহে প্রবেশ করবার ইচ্ছা থাকলে তাকে যেতেই হবে।

* মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে পুরাণ ও ঐতিহাসিক মহাকাব্য বর্তমান সুপরিণত আকার নেবার বহু পূর্বে পুরাণ ও ইতিহাস—আখ্যান, নীতিকথা ও ঐতিহাসিক কাহিনী-বৈদিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* যথা, গীতা ১৫।১৫ * গীতা ২।৪২

মাছ

দিব্যেন্দু পালিত

'ল কম্পাউণ্ডের ভিতর থেকে শ্লথ পায়ে বেরিয়ে এলো নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুলোট গরম হাওয়ার অভ্যর্থনা পেলো। চোখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল একরাশ বালু। একমুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণি ঝড়ের ধাক্কাটা সামলে নিলো নিরুপমা। তারপর এগিয়ে চলল।

আশ্চর্য্য ক্লান্ত আর ভারি মনে হচ্ছে দেহটাকে। মনে হচ্ছে দু' মণ বোঝা কেউ যেন চাপিয়ে দিয়েছে পিঠে। মাথার উপর বৈশাখের নিষ্করুণ সূর্য্য। পায়ের তলায় তরল আগুনের নদী!

মেয়েদের হোমটাস্কের খাতাগুলো হাত-বদল করল নিরুপমা—হাতের ছাতাটা খুলতে গিয়েও খুলল না। একটা অনাবশ্যক লজ্জায় বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো একবার। ছাতাটার যা চেহারা হয়েছে, তাতে তার বাহনকে আর যাই হোক, মানুষ ভাববে না কেউ। স্কুলের মেয়েরা নতুন দিদিমণির ছাতার চেহারা দেখে হাসাহাসি করে; আড়ালে চোখ টেপাটেপি করে টিচাররা। বোধহয় ভাবে, সত্যিই মানুষ কিনা নিরুপমা!

পথ চলতে চলতে হাসি পেল নিরুপমার। সত্যি সত্যিই বোধহয় সে আর মানুষ নেই। মানুষের চেহারার ভিতরে একটা বোবা, ভারবাহী পশুর মনকে সর্ব্বদা বয়ে চলেছে যেন!

কপালের ঘামে লেপ্‌টে যাওয়া কয়েকটা চুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিল নিরুপমা। রগের দু'পাশে একটা চাপা যন্ত্রণা। পা দুটো বিশ্রাম চাইছে। গরম হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। ফুটপাথের উপর একটা পানের দোকানের ছায়ায় দাঁড়ালো সে।

বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। পেটের ভিতর পাকস্থলিটা দারুণ খিদেয় মোচড় দিচ্ছে মাঝে মাঝে। গলার মধ্যে শুক্‌নো ক্ষতের যন্ত্রণা। পানের দোকানে দড়িতে অসংখ্য ডাব ঝুলছে। একটা কিনলে হোত! কিন্তু—

ভুরু কোঁচকালো নিরুপমা। দুটো বখাটে ছোকরা এসে দাঁড়িয়েছে পানের দোকানটার সামনে, বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে টান দিচ্ছে। আর লোলুপ চোখের নগ্ন দৃষ্টি দিয়ে গিলছে তাকে—যেন একটু আশ্বাস পেলেই হিংস্র বাঘের মতো কর্কশ জিবে চেটে চেটে তার দেহটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ক্ষুধা আর ক্ষুধা! ক্ষুধার্ত্ত একটা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে নিরুপমার বিরুদ্ধে! একটা ভালো মানুষ নেই কোথাও!

শক্ত চামড়ার কাবুলি চটিটা টেনে টেনে এগিয়ে চলল নিরুপমা। গোড়ালির নীচে একটা পেরেক ফুটছে থেকে থেকে। চটিটা এবার বয়কট না করলেই নয়।

কিন্তু, মানুষ নেই পৃথিবীতে! সেই কোন সকাল পাঁচটায় বেরিয়েছে বাড়ী থেকে—সামান্য দু'টি মুড়ি আর একবাটি তেঁতো চা খেয়ে। বোস পাড়ায় একটি মেয়েকে পড়াতে হয়। সময় একঘণ্টা, তবু ছাত্রীর অভিভাবক সওয়া ঘণ্টা দেড়ঘণ্টার আগে কিছুতেই ছুটি দেন না। মেয়ের পড়বার ঘরেই একটি সোফায় বসে বসে অলস ভঙ্গীতে ঘড়ি ধরে দেড়ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়েন। তারপর তিনি ভিতরে চলে গেলে নিরুপমার ছুটি।

ছাত্রী পড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্কুলে ছোটা। হেডমিস্ট্রেস মিস মল্লিক টিচারদের একমিনিট দেরী করে আসা পছন্দ করেন না। ওতে নাকি মেয়েদের 'মর‍্যাল' খারাপ হয়ে যায়। মেয়েদের ঠিকমতো গড়ে তোলবার ভার শিক্ষিকাদের উপর। সুতরাং, তাদের এতটুকু অনিয়ম,

উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সে কথাটা মিস মল্লিক তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের মধ্যেই প্রচার করেন। টিচারদের কী করে শিক্ষা দিতে হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন।

বিশেষত নিরুপমা! তার মতো মেয়ে ভয় করে মিস্ মল্লিকের মতো হেডমিস্ট্রেসকে। অন্য টিচাররা তাঁকে মান্য করুক না করুক, নিরূপমা করে। না করে উপায় নেই। তার বিদ্যের দৌড় মাত্র ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত ;—প্রত্যেক কথায় মিস্ মল্লিক তা স্মরণ করিয়ে দেন। আজকাল বি, এ, এম, এ, পাস মেয়ে অজস্র পাওয়া যাচ্ছে। নিরূপমার কোয়ালিফিকেশনের দাম কতটুকু তাদের কাছে? তবু, মিস্ মল্লিকের অশেষ করুণা—দয়া, মায়া আর হৃদয়ের দাক্ষিণ্য দিয়েই যেন নিরূপমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি।

সুতরাং, সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত একভাবে একটার পর একটা ক্লাশ করে যাওয়া। নিচু ক্লাশের মেয়েদের ধারাপাত মুখস্ত করাতে করাতে গলার টাক্‌রা ঝলসে যাক।—কমা,সেমিকোলন আর ইনভার্টেড কমা'র পার্থক্য বোঝাতে বোঝাতে রগের শিরা ছিঁড়ে যাক। তারপরেও কী নিস্তার আছে! মিস্ মল্লিকের যেদিন মাথা ব্যথা করে কিংবা দাঁতের মাড়ি কন্ কন্ করে, সেদিন উঁচু ক্লাশের অঙ্ক বা ইংরেজী পড়ানোর দায়ও নিরূপমার!

মাসান্তে ষাট টাকার হাতছানি। যেন টাকার নেশাতেই একটা মাতাল কিংবা নির্ব্বাক পশুর মতো সময়ের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ায় নিরুপমা। তাইতো আজ আর মানুষ নেই সে! সেইজন্যেই তার ছাতাটা দেখে হাসাহাসি করে স্কুলের ছাত্রীরা; সাম্‌নে না হোক্, আড়ালে চোখ ও মুখের ভঙ্গিমা বদলায় স্কুলের টিচাররা।

চুলের আবরণ ভেদ করে সূর্য্যের উত্তাপ ঢুকেছে মাথায়। পায়ের তলার আগুনের নদীটা ফুটতে শুরু করেছে। খাতাগুলো আবার হাত-বদল করল সে। শাড়ীর আঁচলে কপালের ঘাম মুছলো। ছাতাটা এবার না খুললেই নয়। এই তীব্র রোদ মাথায় করে বাড়ী ফেরা কষ্টকর। যদি বা ফেরে, তবে জ্বরে পড়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। অকারণ আতঙ্কে শিউরে উঠলো নিরুপমা। না, এমন ভাবে সকলের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে কোন লাভ নেই।

অগত্যা ছাতাটা খুলে ধরল মাথার উপর। জনমানুষ নেই এ-পথে। যারা আছে, বিবর্ণ ফুটো ছাতা দেখে তাদের হাসি পায় না। পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল নিরূপমা। নির্জ্জনতার একটা আশ্চর্য্য তৃপ্তি আছে, এতক্ষণে যেন তা টের পেল নিরূপমা। কেন কে জানে, মানুষের ভিড় আজকাল একেবারে সহ্য হয় না। মনে হয়, ওরা যেন একটা দুষ্ট ব্রণকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে; যেন ওই ব্রণটা ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য্য বা শুচিতা নেই নিরূপমার মধ্যে।

তন্ময় হয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিরূপমা। একটা কুকুর মরে পড়ে আছে একেবারে পথের উপরে। একরাশ নীল, বিষাক্ত মাছি ভন্ ভন্ করছে সেটাকে ঘিরে। পচা দুর্গন্ধ। একটু হলেই পা দিয়েছিলো আর কী! একটা তিক্ত অনুভূতি নিরূপমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো।

ঘণ্টা খানেক আগে আরো একবার এই ধরণের একটা বিস্বাদ ঠেলে উঠেছিলো গলা দিয়ে! বুকের বেদনাগুলো বমি হয়ে বেরুতে চাইছিলো যেন। নিরূপমার মনে হয়েছিলো—সে কেঁদে ফেলবে; উদ্গত অশ্রুকে ধিক্কার দিয়ে রুদ্ধ করতে পারবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় মাড়ির ব্যথাটা কন্ কন্ করে উঠেছিলো মিস মল্লিকের। নিরূপমা তখন বাড়ী ফেরবার জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু ফেরা হলো না সহজে। অসুস্থতার জন্য ক্লাশ নিতে পারলেন না মিস মল্লিক। সব চেয়ে উঁচু ক্লাশে অঙ্ক করাতে হবে। নিরূপমা ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করেন না হেড মিস্ট্রেস্—সেই বহু পুরনো কথাটাই নতুন করে আর একবার বললেন তিনি।

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রীরা এমনিতেই একটু বাচাল—সহজে আমল দিতে চায় না টিচারদের। তার উপর নিরূপমা—বোকা আর ভালোমানুষ এবং বয়সও কম। শুরু থেকেই তাই ভয় করছিল নিরুপমার, থর থর করে কাঁপছিলো পা দুটো। তারপর একটা সহজ অঙ্ককে অকারণে জটিল করতে গিয়ে বার বার ভুল করল, সামান্য

যোগ বিয়োগের অনুশাসন ভুলে গেল ; কাঁপা হাতে অক্ষর লিখতে গিয়ে হাতের খড়িটা ভেঙে গেল কয়েকবার।

ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে মেয়েরা। প্রথমে চাপা বিদ্রূপের লুকোচুরি। তারপর অস্ফুট গুঞ্জন, চপল হাসির কোলাহল। শেষকালে সেকেণ্ড গার্ল রুবি রায় কাছে এগিয়ে এসে বললে, আজ বোধহয় আপনি খুব ক্লান্ত, নিরুদি। বসুন, আমি কষে দিচ্ছি অঙ্কটা।

হাসছিল ক্লাসের মেয়েরা ; রুবি ধমক দিলো বন্ধুদের। আর, ঠিক সেই সময়ে—সেই বিস্বাদটা, সেই তরল বিষের জ্বালাটা উঠে আসতে চাইল গলা দিয়ে। ডেস্কের একটা কোণা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিরূপমা। সহসা তার মনে হলো, উচ্ছল হাসির উচ্ছ্বাসে তার কানের পর্দাটাই ছিঁড়ে যাবে। মনে হলো, মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরছে চতুর্দ্দিকে—তার জ্বালা-ধরা মাথায় একটা গাধার টুপি পরিয়ে দিচ্ছে!

আর এখন, এই প্রখর রৌদ্রজ্বলা দুপুরে ক্লান্ত শিথিল হাতটা একবার ঘর্ম্মাক্ত মাথার উপর বুলিয়ে নিলো নিরূপমা। বোধহয় দেখল, গাধার টুপিটা এখনো ঝুলছে কিনা মাথায়!

আরো জোরে পা চালালো সে। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারলে ছোট বোন মনুটা জিরোতে পারে খানিকক্ষণ। মা পঙ্গু হয়ে বিছানা নেবার পর, আর যেদিন থেকে চাকৃরি করতে শুরু করেছে নিরূপমা—সেই দিন থেকে অতবড় সংসারের এতগুলো মানুষের রান্না-বান্নার কাজ একলা সামলায় ওই তেরো বছরের মেয়েটা। এক এক সময় নিরূপমার মনে হয়, মনুর প্রতিই যেন সব চেয়ে বেশি অবিচার করা হয়েছে। মনুর পরিশ্রমের কাছে তার খাটুনির কোন দাম নেই! অতটুকু বয়সেই খুন্তি নাড়তে নাড়তে আর মশলা বাটতে বাটতে হাতে কড়া পড়ে গেছে মেয়েটার! চোয়ালের কোণিক হাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে। দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক, চোখের কোলে বিবর্ণ কালিইয়ের আভাস—দেখলেই কেমন একটা ঘৃণা হয়।

ঘৃণা নয়, করুণা হয় নিরূপমার। আত্মসুখী মনে হয় নিজেকে, যখন ভাবে : হেঁসেল সামলাবার জন্য মনুকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হলো, যখন দেখে—বারো বছরের মনুর চেহারাটা ক্রমশ বত্রিশ বছরের কুরূপা বিধবার মতো হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য্য! এতো খাটে, তবু একটু বিরক্ত হয় না মনুটা! মায়ের কাছে দিন রাত গালাগালি শোনে ; বাবা কথা বলেন না ; খেতে বসে থালায় মাছের টুকরো না দেখলে ছোট ছোট ভাইগুলো চুল ছিঁড়ে নেয়—হিংস্র হাতে খিমচে গায়ের মাংস তুলে নেয়। তবু হাসে মনু। এতো জ্বালা, যন্ত্রণা, ঘৃণা সহ্য করেও একটা প্রতিবাদ করে না কোনদিন।

এই তো কাল। সন্ধ্যের ট্যুইশন সেরে বাড়ী ফিরে লণ্ঠনের ফিকে আলোর সামনে পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসেছিলো নিরূপমা। টুলু আর বুলু খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন—বাতের যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে কাতর আর্ত্তনাদ করছেন মা। বাবা ফেরেন নি তখনো। খাতা দেখতে দেখতে নিরূপমার মনে হচ্ছিল : হাজার হাজার কালো কালো পিঁপড়ে চলে বেড়াচ্ছে খাতার উপরে—অঙ্কের সঠিক উত্তরগুলো যেন অনিবার্য্য মৃত্যুর পরোয়ানা! সেই সময়, সেই আচ্ছন্ন অনুভূতির মধ্যে মনুর ক্ষীণ, নিরুত্তেজ গলার স্বরটাকে সহসা একটা প্রেতের নিঃশ্বাসের মতো মনে হলো যেন। ভয়ে চম্‌কে উঠে ফিরে তাকাতেই দেখল, মুখে একটা বিষণ্ণ হাসির ম্লানিমা ফুটিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে মনু, নিরূপমা তাকাতেই বললে, খাবি চল দিদি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

খাতাগুলো গোছাতে গোছাতে নিরূপমা বললে, অনেক রাত! ক'টা বেজেছে বলতো?

—দশটা বেজে গেছে।

—দশটা! সে কি রে! বাবা ফেরেন নি এখনো?

—না। বিকেলে সেই যে বেরিয়েছেন, এখনো ঘরে ঢোকেন নি।

নিরূপমা জবাব দিলে না। মুখটা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তোর খাওয়া হয়েছে? না কি, খাস্‌নি এখনো?

কথা না বলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল মনু। নিরূপমা এগিয়ে এলো : বড় অবাধ্য হয়েছিস আজকাল। রোজ পই পই করে বলি, সকাল সকাল খেয়ে নিবি ; তা, কথা কানে তোলা হয় না। কেন, এতো বেহায়া হয়েছিস কেন?

মনুর শীর্ণ হাতটায় একটা মোচড় দিয়ে চড় তুলতে

যাচ্ছিল নিরূপমা ; হঠাৎ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে নিলো। নির্লজ্জের মতো হাসছে মন্টু। হাসি নয়—কান্না ; নীরব বেদনার অশ্রু নিঝর, শান্ত হয়ে আছে ওর চোখে। বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে যেন!

নিজেকে সামলাতে পারল না নিরূপমা। ক্লান্ত মন্টুর রোগা হাড় জিরজিরে শরীরটাকে বুকের উত্তাপের মধ্যে ধরে রেখেছিলো অনেকক্ষণ। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে মন্টু বললে, 'ছাড় দিদি, ছেড়ে দে।'

শক্ত-হয়ে-আসা হাতদুটোকে একটু শিথিল করে মন্টুর মুখের দিকে তাকালো নিরূপমা। বললে, 'আমার কথায় রাগ করিস না তো?'

—না বাবা, না। খাবে এসো।

খেতে বসে মন্টু বললে, 'জানিস দিদি, বাবা আজ বিকেলে আবার দাদার কথা বলছিলো।'

মুখে গ্রাস তুলতে যাচ্ছিল নিরূপমা, হাতটা নামিয়ে বললে, 'কেন?'

—কী জানি, কেন! দাদার এক পুরনো বন্ধু নাকি রাস্তায় বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো দাদার কথা। তারপর বাড়ী ফিরে বাবা মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল। কোন কথা বলল না—চা-জলখাবার পর্য্যন্ত খেল না।

নিরূ বললে, 'আশ্চর্য্য! কতদিন তো হয়ে গেল, এখনো ভুলতে পারলেন না বাবা! আচ্ছা মন্টু, দাদাকে মনে পড়ে তোর?'

মন্টু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর মুখ নীচু করে থালায় আঙুল ঘষতে লাগল নিঃশব্দে।

আড় চোখে তাকালো নিরূপমা: 'কী, বসে রইলি যে! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। বাসন-কোসন ধুতে হবে না?'

মন্টুকে কথাগুলি বললে, কিন্তু নিজেও খেতে পারল না নিরূপমা। মনে পড়ছে—বড় বেশি করে মনে পড়ছে আজ দাদাকে! অদ্ভুত মেজাজের মানুষ ছিলো দাদা। সব সময় হাসত, ভাইবোনগুলোকে যেন মাথায় তুলে নাচতো সারাদিন!

সেই দাদাই শেষ পর্য্যন্ত মজুর ধর্মঘট পরিচালনা করতে গিয়ে মারা গেল পুলিশের গুলিতে। রক্তে ভেসে গিয়েছিলো জামা-কাপড় সবকিছু। অত রক্ত কখনো দেখেনি নিরূপমা!

আকস্মিক শোকের ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে শয্যা নিলেন মা। বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ঠিক পাগল নয়—বোবা। কেমন এক ধরণের নির্বেদে ছেয়ে গেল বাবার মন। সেই পুরনো মানুষটিকে আর ফিরে পাওয়া গেল না।

বলতে গেলে দাদার একার রোজগারেই সংসার চলত বেশ স্বচ্ছলভাবে। সে পথ বন্ধ হলো। তারপর দেশবিভাগ। পদ্মা মেঘনার স্বপ্ন ছড়ানো দেশ ছেড়ে চলে আসতে হলো—কলকাতায়। কিছুদিন চাকরি ছিলো না বাবার ; মায়ের কিছু সোনার গয়না আর জমানো পুঁজি ভেঙে চললো কিছুদিন। উদ্বাস্তুদের তালিকায় নাম লেখাতে চাইলেন না বাবা। বললেন: উদ্বাস্তু কেন! আমরা তো বাংলা দেশেরই মানুষ। মা ছেড়ে মাসীর বাড়ী যায় না মানুষে!

কলকাতার সংসারও টিকলো না বেশি দিন—বিহারের একটা বেসরকারী অফিসে সামান্য কেরাণীর চাকরি নিয়ে চলে এলেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও!

কিন্তু ভাঙা সংসার আর আর জোড়া লাগল না। বাবার রোজগারে চলে না। মায়ের চিকিৎসা হয়না ভালোভাবে। সামান্য একটুকরো মাছের জন্য রোজ দু'বেলা কান্নাকাটি করে টুকু আর বুলু। দেশে থাকতে সেই যে স্কুল ছেড়ে এসেছিলো, তারপর আর ভর্তি করা হলো না মন্টুকে। মনের মধ্যে অনেকদিনের লালন করা কলেজে পড়ার মধুর স্বপ্ন অদৃষ্টের রূঢ় আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল নিরূপমার।

অমন যে মা, তিনিও গালাগালি করতেন সব সময়। যেন সব দোষ নিরূপমার। উঠতে বসতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ওই এক বিপদ। পাত্রস্থ করবার টাকা নেই ; বরপণ জোগাবার সামর্থ্য নেই ; কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হলো না—সব দোষ নিরূপমার একার!

স্কুলের এই ষাট টাকা মাইনের চাকরিটার খবর দিয়েছিলেন বাবার এক বন্ধু। বিয়ে যখন হচ্ছে না এবং খুব তাড়াতাড়ি হবে বলেও মনে হয় না ;—তখন শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। মাসের শেষে ষাটটা টাকা ঘরে তুললে সংসারের অনেক সুবিধে হবে।

অতএব শুরু হয়েছে সেই দুঃসহ শাস্তির জীবন! সকাল পাঁচটা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত যন্ত্রের মতো জীবনকে

নিংড়ে নিংড়ে পরীক্ষা করা! স্কুলের ছাত্রী আর টিচারদের চোখের আর মুখের বিদ্রূপ বান সহ্য করা! মিস মল্লিকের কড়া কথার চাবুক নির্ব্বিবাদে সওয়া! নেকড়ের মতো মাংসলোলুপ ছেলে-ছোক্‌রাদের কদর্য্য দৃষ্টির সর্ব্বনাশা জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে নেওয়া—সব যেন রুটিন বাঁধা হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ী পৌঁছুলো নিরুপমা। কিন্তু দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েই চকিতে হাত সরিয়ে নিলো।

—অসভ্য, ছোটলোক।—পাত্‌লা ঠোঁট দুটো ঘৃণায় কুঁচকে কেঁপে গেল নিরুপমার।

না, কোন মানুষ নয়। কিন্তু একটা নীচ মানুষের জঘন্য ইচ্ছার কথা খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে দরজার গায়ে। নিরুপমা বুঝলো, এ কার অপকীর্তি। লজ্জায়, ঘৃণায় বিষিয়ে উঠলো মনের ভিতরটা! এর কী কোন প্রতিকার নেই!

ঘামে ভেজা হাত দিয়ে ঘষে ঘষে লেখাগুলো মুছে দিলো নিরুপমা। ছেলেটাকে চেনে—এই বস্তি অঞ্চলেরই কোন একটা বাড়ীতে থাকে। মোড়ের টিনের চালার রেষ্টুরেণ্টটার নোংরা বেঞ্চে প্রায়ই বসে থাকতে দেখে। রোগা, লম্বা, কালো চেহারা—মাথায় বিশ্রী রকমের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; গাল দুটো ভেঙে ব-দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। দিনরাত পান চিবোয় আর পরিশ্রান্ত পশুর মতো একহাত ঘেয়ো রক্তাক্ত জিব বের করে বীভৎস হাসে। নিরুপমা লক্ষ্য করেছে, সে যখনই ওই পথে যাওয়া আসা করে—মুখে দুটো অঙুল পুরে দিয়ে জোরে জোরে শিস টানে ছেলেটা; পিছু পিছু বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসে কোন কোন দিন। এ তারই কীর্তি—নিরুপমা জানে। আর এও জানে: এখানে বাঁচতে হলে এইভাবেই ক্লেদাক্ত সাপের আলিঙ্গন জড়িয়ে পঙ্কিলতার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। বুকের হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে গেলেও মুখে একটি শব্দ করা যাবে না! শিরায় পিন ফুটিয়ে মারলেও একটু আর্তনাদ করতে পারবে না!

মন্থু এসে দরজা খুলে দিলো।—এত দেরী করলি আজ?

—হ্যাঁ—এগোতে এগোতে নিরুপমা বললে, 'কাজ ছিল।'

তারপর তক্তপোষের উপর খাতার স্তূপগুলো সরিয়ে রেখে, চটিটাকে ঠেলে দিয়ে, চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো।—বাবা অফিস গেছেন কখন?

—অনেকক্ষণ।

—মা-কে ওষুধটা ঠিক সময়ে দিয়েছিলি তো?

—হ্যাঁ।

নিরুপমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। চুপ করে বসে বসে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে লাগল নিজেকে।

কিছুক্ষণ শান্তভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মন্থু বললে, 'বিজনদা এসেছিলো আজ।'

বিজনদা! চম্‌কে উঠলো নিরুপমা: 'কখন?'

—এই তো, কিছুক্ষণ আগে।

—অফিস যায়নি আজ?

মন্থু হাসল: 'তা কী করে জানবো? আমাদের সঙ্গে কী আর ভালোভাবে কথা বলে বিজনদা; না কথার জবাব দেয়!'

—চুপ কর।—ধমক দিলো নিরু। কিন্তু লজ্জাটুকু গোপন করতে পারল না। চোখে মুখে একটা কুণ্ঠিত আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। দোলা লাগে—এখনো বুক দুলে ওঠে মাঝে মাঝে; শিরাস্নায়ুগুলো হঠাৎ বড় বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন নিরুপমার মনে হয়, আর বুঝি সামলাতে পারবে না নিজেকে, প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

রুক্ষ মরুভূমির মাঝেও কেমন একটা স্নিগ্ধ বারিধারার আশ্বাস বয়ে আনে বিজন। দিনের পর দিন ক্রমাগত দুঃখ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে কোমর-ভাঙা, শ্রান্ত অবসন্ন সংসারের ভোঁতা মুখে কেমন একধরণের পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে! একটানা অনেকদিন বৃষ্টির পর রোদ্দুরের কাঁচা ঝলমলে রঙটুকুর মতো।

বিজনকে সামনে বসিয়ে বাবা যখন গল্প করেন তখন মনে হয় না—হাতুড়ির মার খেয়ে খেয়ে বাবার মস্তিষ্কের শিথিল ইঞ্জিনগুলোয় মর্‌চে ধরে গেছে। বিকৃত মুখে গোঙানির মতো অদ্ভুত শব্দ করে বিজনকে অভ্যর্থনা করেন মা; লোলচর্ম্ম, কাঁপা হাতে নিরুপমার কপালে

মাথায় হাত বুলিয়ে দেন; আর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

এখানে আসার পর কার যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে বিজনের সঙ্গে। সেই বিজন, যে নিরুপমার দাদার বন্ধু ছিলো এককালে; সব সময় পড়ে থাকত নিরুপমাদের বাড়ী। দেশভাগের আগেই চলে এসেছিলো বিজন, তারপর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। এখানে এসে আবার দেখা হয়ে গেল, আলাপ হলো নতুন করে। আর বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পরম নির্ভরতা যেন খুঁজে পেল নিরুপমা। বিজনকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল পদ্মাতীরের সেই হিজলের গাছগুলোকে। মনে পড়ল সেই বিরল নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলিকে।

এখানে যখন উনুনের ধোঁয়ায় ভোর বেলাতেই অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়; একটা কলের জলের জন্ত ঝগড়া বেঁধে যায় দুশো লোকের মধ্যে; বুকের ব্যথায় কামারের হাঁপোরের মতো ওঠানামা করে মায়ের বুক;—আর টুলু-বলুর কান্না শুনতে শুনতে পেরেক-ওঠা ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে স্কুলে বেরোয় নিরু—ওখানে তখন মাছের আঁশের মতো উজ্জ্বল রোদ কাঁপছে পদ্মার কাকচক্ষু জলের আয়নায়। পাল তুলে সার বেঁধে ভেসে চলেছে জেলে-ডিঙিগুলো। সুপারি, নারকেল গাছের পাতায় উতরোল হাওয়ার অনুরণন। টুপ টুপ করে জলের উপর ঝরে পড়ছে একটি কী দু'টি শুকনো পাতা। দিগন্ত বিশারী বালুচরের উপর ত্রিশূল পায়ের ছাপ রেখে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে চখাচখি, গাংশালিক আর সরালি, বালিহাঁসের দল!

সেই মেঘ, রোদ্দুর আর উদ্দাম হাওয়ার গন্ধ মেখে আসে বিজন। আর বালিহাঁসের মতো উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে নিরুপমা। হ্যাঁ, অর্থ আর সামর্থ্য না থাকলেও নিরুর বিয়ে হতে পারে; বিজনকে পেয়ে সে কথাটা হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন নিরুপমার মা আর বাবা।

স্কুলের শাড়ী ব্লাউজ ছাড়তে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলল নিরুপমা! সত্যি, ভালো লাগে না আর। তৃণভোজী বন্ধুর মতো এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সংসারের দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্দ্দয়তা আর বিদ্রূপের বর্ব্বরতা সহ্য করতে করতে এক এক সময় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। সব জ্বালার শেষ হয় তা'হলে।

বিয়ের সানাই শুনলে কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে যায়। কালো কুৎসিৎ, মাথার চুল-ওঠা, কপালে ধবলের চিহ্ন-আঁকা মেয়েগুলোও যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরে আধহাত ঘোমটায় মুখ ঢেকে স্বামীর ঘর করতে যায়—তখন নিরুপমার বুকের অনাহূত আকাঙ্ক্ষাগুলো যেন বিদ্রোহ করে ওঠে, অস্থির চেতনায় আগুন ধরে যায়—ইচ্ছে হয় বিশ্বাসঘাতকতা করতে অন্তত একমুহূর্ত্তের জন্তেও নিরুপমা প্রতিজ্ঞা করে: সেই গাল-ভাঙা, রক্তাক্ত ঘেয়ো জিব-বের-করা ইতর ছেলেটার সঙ্গেই পালাবে সে।

কিন্তু বিজন! ছ' ফুট লম্বা চেহারা বিজনের, চওড়া কপাল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ ইঞ্চি বুকের পেশীগুলো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে—আর নিরুপমার ইচ্ছে করে একটা মাছরাঙা হয়ে ওই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

অনাবশ্যক লজ্জায় আর একবার শিউরে উঠলো নিরুপমা। তারপর ধিক্কার দিল নিজেকে। লোভির মতো কী সব ভাবছে দাঁড়িয়ে। ওদিকে ক্ষুধার্ত্ত মন্টুর মুখটা আরো করুণ হয়ে উঠেছে, ঘড়িতে বোধহয় একটা বেজে গেল। ময়লা শাড়ীর আঁচলটা তাড়াতাড়ি পিটের ওপর ফেলে দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল নিরুপমা।

বিকেলে আবার এলো বিজন।

এত তাড়াতাড়ি ও আসবে, নিরুপমা ভাবতে পারেনি। তা ছাড়া এইভাবে, এই পোষাকে এমন পরিবেশের মধ্যে বিজন এসে পড়াতে লজ্জায়, সঙ্কোচে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল সে।

কলের জল নিয়ে তখন ঝগড়া চলছিল পাশের বাড়ীর এক মার-মুখী বিধবার সঙ্গে। আর, সে বিবাদের ভাষা আর যাই হোক, অন্তত ভদ্র নয়। শান্ত, সরল নিরুপমাও যেন ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুঁসে উঠেছিলো।

সেই সময় বিদ্যুচ্চমকের মতো খবরটা এলো। মন্টু এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে—'চুপ কর, দিদি। বিজনদা এসেছে।' বিজনদা! যেন একটা মৃত্যুর খবর এনে দিয়েছে কেউ—বিবাদ-ক্লান্ত আরক্তিম মুখটা সাদা কাগজের

মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। কোনরকমে এসে ঢুকলো শোবার ঘরে।

তারপর রুক্ষ চেহারাটা একটু মেজে ঘষে শান্তভাবে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, বিজন তখন অদ্ভুত ভাবে হাসছে।

দারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করলে সে। তেমনি হাসতে হাসতেই বিজন বললে, 'আর একটা ভয় কেটে গেল।'

চোখ তুললে নিরুপমা। বিজন বললে, 'ভেবেছিলাম, অমন মেনি বেড়ালের মতো শান্ত মেয়ে বৌ হয়ে ঘরে ঢুকে চারদিক সামলাবে কী করে। আজ সত্যিই সে ভয় গেল।

—দোষটা ঠিক আমার নয়।—নিজেকে ঢাকবার একটা অক্ষম চেষ্টা করলে নিরুপমা।

বিজন হাসল। আনতে চাইলো একটা অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ সুর: 'জানি, সবই জানি। এবার চলো তো একটু বেড়িয়ে আসি দু'জনে।'

চোখের তারা দুটোয় চকিতে একটা আনন্দের ছায়া দুলে গেল। তারপর ভয় করতে লাগল নিরুপমার। আশ্চর্য্য বিজনকেও ভয় করতে শুরু করেছে সে! কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয় বিজনকে নয়—নিজেকেই কেমন ভয়ঙ্কর মনে হলো নিরুপমার। পিছনে তাকিয়ে দেখল, অপলকে তাকিয়ে আছে টুলু, বুলু আর মনু—কেমন ভয়ার্ত দৃষ্টি ওদের চোখে।

বিজন আবার বললে, 'চুপ করে রইলে যে! বেশী দেরী কোরো না, নিরু।'

চেতনা ফিরে পেল নিরুপমা। বললে, 'যাই মা'কে বলে আসি একবার।'

মাতাল ঝড়ের মতো নিরুদ্দেশে ছুটে বেড়াবার উন্মত্ত আহ্বান জানায় বিজন;—আর, বুলু, মনু টেনে আনে শুষ্ক সঙ্কীর্ণতার যাঁতা কলে। বুকের ভিতরটা দুলে উঠলো নিরুপমার। অল্প কয়েকদিন আগেই পাড়ার সবচেয়ে কুশ্রী মেয়ে শৈলর বিয়ে হয়ে গেল একটা কেরানীর সঙ্গে। একটু বয়স হয়েছিলো লোকটার। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! নিরুপমা দেখেছে, স্বামীগর্বে শৈলর ট্যারা চোখটা মাঝে মাঝে কেমন সোজা হয়ে যাচ্ছিল!

ফিরে এসে নিরুপমা বললে, 'চলো।

মাত্র কয়েক-পা এগিয়েছে, হঠাৎ আঁচলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে বুলু; অসহায় চোখ তুলে দেখছে নিরুপমার সাজ-পোষাক! একমুহূর্ত্ত বুঝতে পারলনা নিরুপমা—কী করবে, কী বলবে। কিন্তু সামলে নিলো বিজন। পকেট থেকে একটা দু'আনি বের করে গুজে দিল বুলুর হাতে।

শরীরের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুত বয়ে গেল, নিরুপমার মাত্র দু' আনার আনন্দেই সব ভুলে গেল বুলু? ওই অতটুকু বুলু! নিরুপমার মনে হলো, একটা লোহার স্ক্রু দিয়ে কেউ তার পা এঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। নড়তে পারল না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এক সুখ আছে বিজনের সঙ্গে পরিক্রমায়। অতএব যেতে হলো।

পার্কের জনারণ্যের মাঝে একটু জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। সেখান থেকে নির্জন নদীর তীরে। সন্ধ্যার ধুসর অন্ধকার নামলো পৃথিবী জুড়ে। কসাই পাড়ার পিছনে পরিত্যক্ত দোতলা বিরাট মসজিদটার উপরের চাতালে এসে বসল দু'জনে। একটানা ডেকে চলেছে কয়েকটা মৈথুনবিলাসী পায়রা। অনেকদূরে চক্রবালের গায়ে দপ্ দপ্ করে জলছিলো ষ্টীমার ঘাটের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো। ম্লান জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সেই রহস্যময় জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখল নিরুপমা—একটা শকুন উড়ে এসে বসল কাছেই একটা সুপারিগাছের ডালে।

—আর মাত্র একমাস।—নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহজ হাল্কাসুরে বিজন বললে।

নিরুপমা হাসল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় অদ্ভুত নিষ্প্রাণ মনে হলো ওর হাসিটা। সেই হাসিটুকু ঠোঁটে মিলিয়ে যাবার আগেই বিজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বলো, সুখী হবে তুমি? আমায় বিয়ে করলে সুখী হবে?"

—কী জানি—অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিলে নিরুপমা। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ষ্টিমার ঘাটের বিদ্যুতবাতির সরল রেখাটা থেকে থেকে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে!

—কী ভাবছ নিরু?—স্তিমিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে বিজন।

—ভাবছি, সুখ সইবে কিনা কপালে।

—ভয় কী। আমি তো আছি। নিরূপমার শীতল আঙুলগুলো শক্ত মুঠিতে ধরে ঘনিষ্ট হতে চাইল বিজন। আর বিজনের কথাগুলোকেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করে নিরূপমা বললে, 'হ্যাঁ, তুমি তো আছো।'

খস্ খস্ শব্দ করে কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ে গেল পরিত্যক্ত মসজিদের শুক্‌নো চাতালের উপর দিয়ে। সুপারির ডালে বসে, ঝটপট্ ডানা ঝাড়ল শকুনটা।

বিজন বললে, 'বসবে একটু? আমি আসছি এখুনি।'

—কেন?—ভয়ার্ত একটা ধ্বনি বেরুলো নিরূপমার গলা দিয়ে।

বিজন বললে, 'কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি। নাকি, সঙ্গে যাবে?'

—না, থাক্। তুমি এসো।—অদ্ভুত নির্ভর গলায় বললে নিরূপমা। এতটুকু ভয় করছে না এমন একটা ছায়া-থম থম রাত্রিকে। বরং ভালো লাগছিলো নিরূপমার; আত্মীয়তার একটা নিবিড় স্বাদ যেন ছড়িয়ে আছে রাত্রির সর্বাঙ্গে।

কোমল চোখে একবার চারদিকে তাকালো নিরূপমা। কসাইপাড়ার হিংস্র রূপ আজকাল আর চোখে পড়েনা। নামটাই থেকে গেছে শুধু। কসাইপাড়ার আনাচে কানাচে বাসা বেঁধেছে বাস্তুহারার দল—সরকারের কৃপণ মুঠির দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু কলোনী।

প্রেতের মতো নিঃশব্দে কথা বলে এখানকার মানুষ-গুলো; ছায়ার মতো সন্তর্পণে রোগা রোগা পা ফেলে ঘোরাফেরা করে। অন্ধকারের বুকে টিমটিমে প্রদীপের জ্যোতিগুলো যেন তাদের ক্ষীণায়ু প্রাণের পরমায়ু নিয়ে জলে আর নেভে!

হাতের উল্টো পিঠে চোখ দুটো ঘষে নিল নিরূপমা। অদ্ভুত লাগছে আজকের এই নিরবচ্ছিন্ন রাত্রিটাকে। একটা আলস্য-মদির অনুভূতি যেন নেশার মতো ছড়িয়ে পড়েছে শরীরের সর্বত্র। হু হু করে জোলো বাতাস ছুটে আসছিলো গঙ্গার দিক থেকে। সমস্ত দিনের যান্ত্রিক পরিশ্রমের পর ঘুম পাচ্ছিল নিরূপমার।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে আবেশ ছিঁড়ে গেল নিরূপমার। ভৌতিক ডানা মেলে মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরে গেল সুপারির ডালে বসে-থাকা শকুনটা। বিজন তখনো ফেরেনি।

কেমন যেন রহস্যের মতো মনে হলো নিরূপমার। তখনো কানে আসছিলো চীৎকারটা এবং খুব কাছেই কোথাও কিছু একটা ঘটেছে যেন! বারেক কান পেতে শুনলো নিরূপমা। তারপর মসজিদের চাতালের উপর দিয়ে ছুটে গেল পশ্চিম দিকে। ঝুঁকে দেখল নীচে।

তারপরেই চম্‌কে উঠলো।

মসজিদটার পিছনেই একটা উদ্বাস্তু সংসার। সেই খানেই দেখল ঘটনাটা। ছেঁড়া চটের আড়াল দিয়ে বারান্দা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল:

কালো কুচকুচে রোগা একটা ছেলে, পাঁজর বের-করা বুকের নীচে কুমড়োর মতো গোলাকার পেট। সেই ছেলেটারই গলাটা সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে চেপে ধরেছে এক প্রৌঢ়া—রাক্ষসীর মতো চেহারা, কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত একটা ময়লা কাপড় ঝুলছে; খোলা বুক—

আরো আশ্চর্য্য হলো নিরূপমা: পরিত্রাহি চীৎকার করছে ছেলেটা; শক্ত দাঁতে কামড়ে ধরেছে কী একটা বস্তু, যার খানিকটা অংশ মুখের ভিতরে, বাকীটা বাইরে। এক হাতে ছেলেটার গলায় চাপ দিচ্ছে মেয়েমানুষটা, অন্য-হাতে টানছে ছেলেটার মুখ থেকে সেই বস্তুটার ভগ্নাংশ।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করল নিরূপমা। লণ্ঠনের ম্লান নিষ্প্রভ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বস্তুটা।—একটা মাছ।

চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে ছেলেটার। রাক্ষসীর মতো চেহারার মেয়েমানুষটার গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে কতগুলো শব্দ বেরুলো: 'ছাড়, ছাড় কইছি।'

গোঁ গোঁ করল ছেলেটা—সাপে ব্যাঙ ধরেছে যেন। মুখ খুলল না একটু, শক্ত দাঁতে কামড়ে রইল—আর মাছটাকে গিলে ফেলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। দুটো মোটা মোটা শিরা কাঁপতে লাগল গলার উপর।

—গোটা মাছটা একা গিলবি, তো বাকীগুলা খাবো কী? ছাড়, ছাড় কই—ছাখ তবে। গলা টিপ্যা মাইরা ফ্যালাম।'

আবার একটা বিকট চীৎকার। রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচ্যাচ্ছে ছেলেটা। আর—

চোখদুটো ঢেকে ছুটে পালাতে গেল নিরূপমা। একটা মাছ শুধু একটুকরো মাছের জন্য! যেন বিভীষিকা দেখে আর্তনাদ করে উঠলো নিরূপমা।

সহসা মনে পড়ল নিরূপমার। মনে পড়ল টুলু-বুলুর হ্যাংলা করুণ মুখ দুটো। মনুর চোখের কোলের কালিমা রেখাটা কুয়াশার মতো ভেসে উঠলো চোখে। যেন ভাবছিল নিরূপমা, ওই মেয়েমানুষটাকে অনেকটা তার মায়ের মতো দেখতে!

একটু আগেই যে রাত্রিকে পরম আত্মীয় বলে মনে হয়েছিলো—হাজার হাজার অন্ধকার বাহু বিস্তার করে সেই রাতটা যেন তার কণ্ঠরোধ করবার জন্য ছুটে আসছে। এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল নিরূপমা: কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে—কী যেন ঘটতে পারে!

সেই সময় বিজন না এসে পৌছুলে কী হতো বলা যায় না। যেন একটু ঢালু পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে চলছিলো নিরূপমা। দৃষ্টি হারাবার পূর্ব মুহূর্তে আশ্রয় পেলো বিজনের পেশল বুকের মধ্যে।

—হাঁপাচ্ছ কেন! কী হয়েছে নিরূপমা, নিরু!—ওর শরীরটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল বিজন।

প্রলাপের মতো বিড় বিড় করে নিরূপমা বলল, 'মাছ।'

—মাছ!—আর্ত, অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গীতে তাকা[illegible] বিজন। নিরূপমার অবশ-প্রায় দেহটাকে টানতে [illegible] বুকে।

আর—সেই মুহূর্তে তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গে[illegible] নিরূপমা: 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি বা[illegible] যাবো।'

—নিরু! নিরূপমা!—ডুবন্ত দেহের একটা পা যে[illegible] হাঙরে কামড়ে ধরেছে। তেমনি আড়ষ্ট শোনাল বিজনে[illegible] গলাটা।

রাত্রে শোবার আগে মায়ের কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেবার সময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিজন কী বললে রে, নিরু?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নিরূপমা। তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'কী কথা, মা?'

—তোদের বিয়ের। সব জোগাড়-টোগাড় হয়েছে তো?

সূক্ষ্ম একটু হাসল নিরূপমা। বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস সম্বরণ করলে কোনরকমে। তারপর অদ্ভুত কঠিন, নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, মা। আমার বিয়ে দিও না। আমি বিয়ে করতে পারব না।'

আত্ম-জিজ্ঞাসা

শ্রীকালিদাস রায়

(টমাস-গ্রে-র অনুসরণে)

চির-বিদায়ের পথে চলিয়াছি, আসিয়াছে তাড়া।
নিতান্ত আপনজন যারা
তাহারা কাঁদিবে শোকে দিন কয়, ক্রমে শান্ত হবে।
সত্যই ভুলিয়া মোরে যাবে আর সবে?

স্মরিবে কি তারা কভু ভুলে
বহুবর্ষ সহযোগী ছিল যারা স্কুলে,
বলিবে কি?—"ক্লাস থেকে এসে প্রতিদিনই
ক্লান্ত হয়ে এইখানে বসিতেন তিনি।

উপদেশ দেওয়া ছিল রোগ
দিতাম না মোরা কভু তাতে মনোযোগ।
গাম্ভীর্য্যের সাথে তর্ক করিতেন মৃগাঙ্কের সাথে।
আমোদ পেতাম মোরা তাতে।
ঘনিষ্ঠ মোদের মাঝে ছিল কেহ কেহ,
কনিষ্ঠ আমরা তাঁর পাইতাম স্নেহ
কোনদিন আচরণে আলাপনে দিইনি মর্যাদা।

তবে তাঁরে নাম ধ'রে বলিনিক দাদা।"

ছাত্রগণ পরস্পর দেখা হলে ট্রামে, সিনেমাতে
বলিবে কি ?—"মনে পড়ে আজ স্যার পড়াতে পড়াতে
নস্যে নাক রুধি
ভাবাবেশে দুটি চক্ষু মুদি
কত কথা বলিতেন—শুনি নাই সব মন দিয়া
পরীক্ষায় লাগিবে না সে সব বলিয়া।
মোদের চাপল্য বিঘ্ন ঘটাইত তাঁর পাঠনায়
জানি না কতই ব্যথা পাইতেন তায়।
যাহাতে নব্বইজন শতকরা পাশ
তার তরে ছিলনাক অবধান আগ্রহ প্রয়াস।"

বলিবে কি ভ্রাতৃকল্প অধ্যাপকগণ
বসিয়া বিশ্রাম কক্ষে ?—"ভাবিতাম তাঁরে একজন
আমাদেরি, যদিও ছিলেন তিনি স্কুলের টীচার
মোদের মৈত্রীর পরে ছিল তাঁর পূর্ণ অধিকার।
আনন্দ পাননি তিনি মজলিসে, সাহিত্যসভাতে
যা কিছু আনন্দ মিশি পাইতেন আমাদের সাথে।
ছিলেন না সাহিত্যের সারথি বা রথী—
আজীবন নানা পথে মনে-প্রাণে তিনি শিক্ষাব্রতী।"

বলিবে কি সাহিত্যিক ভ্রাতৃগণ ?—"মোদের আড্ডাতে
আসিতেন প্রুফে ভরা ঝোলা নিয়ে হাতে।
বসিতেন ঘণ্টা দুই আমাদের মাঝে
বেমানান আলুথালু সাজে।
কভুবা টেবিলে, কভু বসিতেন টিনের চেয়ারে,
খাইতেন দুই মুঠো মুড়ি যাহা পড়িত শেয়ারে।
পাঠ্য বই লেখা পেশা, নেশা ছিল শুধু নাসিকার,
নিরস্ত-চাদর-গুম্ফ দেশে অঙ্গে দুই-ই ছিল তাঁর।
দেখিতাম প্রায়ই মুখ ম্লান
কোন দিন কারণের লইনি সন্ধান।
কত ব্যথা পাইতেন সংসারজীবনে অবিরল
কভু খোঁজ লই নাই পরিহাসই করেছি কেবল।
যার সাথে হয় প্রায়ই দেখা—
যে লেখকে কাছে পাই, পড়িনাক তার কোন লেখা।
লেখা তাঁর হ'তনাক পড়া,
এই দুঃখে মাঝে মাঝে শুনাতেন কথা কড়া কড়া।
সুলভ ছিলেন তিনি তাই তিনি হারালেন দাম,
অতি ঘনিষ্ঠতাজাত অবজ্ঞাই তার পরিণাম।"

বলিবে কি প্রকাশক ?—"শুক্রবারে আসিতেন তিনি
বলিতেন—চা আনাও দিয়ে কম চিনি।
চাহিতেন দু-বছর আগেকার প্রাপ্য কিছু তাঁর
অনুনয়সিক্তকণ্ঠে বলিতেন,—হইতেছে ধার।
বিশ্বাস না করি তাহা, দিতাম বিদায়,
দেখায়ে ড্রয়ার টেনে, শুটিচার মধুর কথায়।
চলিয়া যেতেন তিনি চা-পান করিয়া এক কাপ,
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ধীরে, আমরাও ছাড়িতাম হাঁপ।"

বলিবে কি সম্পাদক ?—"বিদায় নিলেন কবিবর,
কখনো দিইনি তাঁর পত্রের উত্তর।
বেঁচেছেন বহুকাল, ক'জনইবা এত দিন বাঁচে
আক্ষেপ করার কী বা আছে ?
গল্পের লেখক ন'ন তবু ঠাঁই ছিল পত্রিকায়,
জীবিতের দলে আর পাঠকেরা গণিত না তাঁয়।
ছিলনাক লেখার চাহিদা,
সাহিত্যে তাঁহার কিছু হয়নি সুবিধা।
ছাপিতাম পদ্য তাঁর গদ্যের তলার ফাঁকটিতে,
জানাতেন সে আক্ষেপ—অনেক চিঠিতে।
ফুরায়েছে ছন্দে-রচা পাঁচালীর দিন
এ কথা বুঝানো ছিল বড়ই কঠিন।
বহু লেখা ছাপি নাই। খুঁজিলে দপ্তর
কিছু কিছু মিলিবেই। এইবার ছাপিব সত্বর।"

বলিবে কি তরুণেরা ?—"শুনিতাম কত সব কথা
তাঁর দীর্ঘজীবনের। কত স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা।
মোদের সরস ভাষা না বুঝিয়া হতেন সরোষ,
পদে পদে ধরিতেন দোষ।
ছাত্রদের জাত-শিক্ষাদাতা
আমাদের লেখাকেও ভাবিতেন পরীক্ষার খাতা।
মোদের ও তাঁর মাঝে উঠিয়াছে চীনের দেওয়াল,
সে বিষয়ে ছিল না খেয়াল।
বলিতেন—দেখ বাবা দিন ত ফুরালো,
তোমাদের সঙ্গ মোর লাগে বড় ভালো।
এসো মাঝে মাঝে
হ'তো না মোদের কিন্তু যাওয়া বিনা কাজে।
চলে গেল, আর যাই হোক,
পুরাণো দিনের কথা বলিবার একজন লোক।"
বিচ্ছেদ আঘাত
করিবে কি কারো চিত্তে কোন রেখাপাত ?
অনুভব করিবে কি কেহ দেশে আমার অভাব ?

রহিবে কি কারো মনে আমার প্রভাব ?
লোভী কবি, বৃথা তব ক্ষোভ !
প্রেতের পিণ্ডের তরে এ যে হায় জীবিতের লোভ !

"হিন্দ্‌-হিন্দু-হিন্দী !"

নরেন্দ্রদেব

স্বাধীন ভারতের এক কোনে কিছুদিন ধরে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে "হিন্দ্‌-হিন্দু-হিন্দী !"

এই সাম্প্রদায়িক আওয়াজ আমাদের কানে ও মনে ধর্মের নামে উত্থিত এক বিচ্ছেদমূলক অনতিপ্রাচীন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ আওয়াজের অন্তরালে যে মনোবৃত্তি উঁকি মারছে তার সঙ্গে পূর্বোক্ত আন্দোলনের অভিন্নতা সুস্পষ্ট !

"হিন্দ্‌" অর্থাৎ হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থান কাদের ?—হিন্দুর ! সুতরাং তাদের ভাষা 'হিন্দী' ছাড়া আর কিছু তো হতে পারে না ! 'আওয়াজ-দেনে-ওয়ালাদের' এই মনোগত অভিপ্রায় !

এতদিন অবশ্য আমরা এঁদের এ পাগলামীতে কান দিই নি। কিন্তু, সরকারী ভাষা কমিশনের যে রিপোর্ট সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সুপারিশে ওই 'হিন্দ্‌-হিন্দু-হিন্দীর' দলের আওয়াজেরই প্রতি-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এই রিপোর্টের দিকে সত্বর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। অল্প কয়েকজন মাত্র সজাগ লোকের চোখে এর বিপজ্জনক স্বরূপ ধরা পড়েছে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, যদিও ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারেই এই সরকারী ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তবু এর মূল উদ্দেশ্য যে হিন্দী ভাষাকেই সর্বভারতীয় ভাষায় পরিণত করা—এটা অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও চখে পড়ে যে, ভাষা কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে বেশির ভাগ হিন্দী ভাষার উগ্র অনুরাগী এবং হাততোলা 'জো হুকুম'দের বাছাই করে। কারণ, সংবিধান সভার তিক্ত অভিজ্ঞতা এঁরা ভুলতে পারেন নি। সেখানে মাত্র একটি ভোটের জোরে 'হিন্দী' ভারতীয়যুক্ত-রাষ্ট্রের ভাষা হবে বলে স্থির হয়েছিল।

এতেও কোনও আপত্তির কারণ হয়ত' থাকতো না, যদি না তাঁরা হিন্দী প্রচারের অতি উৎসাহে তাঁদের নিজ নিজ অধিকার অতিক্রম করতেন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যে যে ব্যাপার নিয়ে তাঁদের আলোচনা করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সে অধিকারের বাইরেও হস্তক্ষেপ করেছেন। যেমন, তাঁরা সুপারিশ করেছেন :—১। হিন্দীকে সারা ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা বলে গ্রাহ্য করতেই হবে এবং হিন্দীই যাতে শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীদের একমাত্র ভাষা হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থাও করাতে হবে। আর, সারা ভারতের রাষ্ট্রশাসন ও শিক্ষার বাহনরূপে হিন্দীকেই গ্রহণ করতে হবে।

২। সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, এমন কি, নিম্ন আদালত পর্যন্ত সমস্ত মামলার নোটিশ, সমন, ডিগ্রী, রায় আর আদেশ জারি ইত্যাদি হবে হিন্দীতে।

৩। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক যা-কিছু আইন সমস্তই হিন্দীতে লেখা হবে।

৪। সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শিখতে হবে এবং না-শিখলে শাস্তি পেতে হবে। সরকারী চাকরীর নিয়মাবলী, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি এবং অডিটার জেনারেলের হিসাব নিকাশাদি সমস্তই হিন্দীতে করতে হবে।

৫। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিরও ভাষা হবে হিন্দী।

৬। ইংরিজী ১৯৬৫ সালের পর শুধু মাত্র কেন্দ্রে নয়, রাজ্য-পাবলিক্‌ সার্ভিস্‌-কমিশনের' পরীক্ষাও হিন্দীতে হবে।

৭। সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ শিক্ষার স্তরে হিন্দীতে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একমাত্র হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

৮। মধ্য-শিক্ষা পর্যদের সর্বত্র হিন্দী পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকা চাই।

৯। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের একমাত্র হিন্দী ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে হবে।

১০। সরকারী ব্যয়ে বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার প্রসার, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের হিন্দী ভাষাতে অনুবাদ করতে হবে।

আমরা সবিনয়ে জানতে চাই যে এসব অনধিকার চর্চার অধিকার 'সরকারী-ভাষা কমিশনের' সদস্যদের কে দিলো ? যে ভাষা কমিশন তাঁদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষেত্রান্তরে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের বে-আইনী সুপারিশ ও মন্তব্য প্রচার করতে সাহস করেন, তাঁদের সে অন্যায় সুপারিশ কোনও সরকারের পক্ষেই গ্রহণীয় হতে পারে না। তাঁদের প্রস্তাব ও সুপারিশ গুলির অধিকাংশই যে শুধু বর্তমানেই অবাস্তব তাই নয়, কোনও কালেই কোনো প্রদেশেই সেগুলি মেনে চলা সম্ভবপর হতে পারে না।

সরকারী ভাষা কমিশনের হিন্দী পক্ষপাতিত্বমূলক অযৌক্তিক সুপারিশগুলি ভাষা কমিশনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করেছে। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বেশ জোর করেই বলেছেন যে যতশীঘ্র সম্ভব ইংরিজীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষাকে সারা ভারতের সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত করতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিধানের অজুহাত তুলে তাঁরা বলেছেন এদেশের জনসাধারণের এক-ভাষাভাষী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এবং এই প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁরা ভারতের একটি মাত্র প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা—হিন্দীকেই সর্ব-ভারতীয় সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছেন। যুক্তি দিয়েছেন যে এদেশের অধিকাংশ লোকই নাকি হিন্দী ভাষাটা অতি সহজেই বুঝতে পারে ও বলতে পারে।

কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় সেটা দক্ষিণভারতে যারা গেছেন তাঁরা ভাল করেই জানেন। ভারতে হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা তাঁরা শতকরা ৪২জন ধরেছেন। কিন্তু সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে পাঞ্জাবী, উর্দু, হিন্দী, মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধী, গাড়ওয়ালী, রাজস্থানী প্রভৃতি নানাভাষাকে টেনে এনে জড়িয়ে হিন্দীর কলেবর বৃদ্ধি করবার অসাধু চেষ্টা করা হয়েছে। এই হিসাবে আমরাও যদি বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী ও অসমীয়া ভাষাগুলিকে একত্র করে 'বাংলা' বলে চালাবার চেষ্টা করি,তাহ'লে বিবিধ 'ডায়ালেক্ট'-সংযুক্ত হিন্দী ভাষাভাষীদের চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশী হবো। সুতরাং অহেতুক হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার এ উদগ্র আগ্রহ কেন? এক-ভোটের খুঁটির জোরটা তো খুব বেশি নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় এখানে যত কিছু বিরোধ, অশান্তি-মারামারি, কাটাকাটি হয়েছে তা' ভাষা নিয়ে কখনো হয়নি, হয়েছে ধর্ম নিয়ে। সুতরাং, ভারতের ঐক্যবিধানই যদি একভাষাভাষী-করণের যুক্তি হয় তবে তার আগে তো ভারতবর্ষকে 'এক-ধর্মী' করা প্রয়োজন আরও বেশি! এই ধর্মের দোহাই দিয়েই তো সেদিন আমাদের ডাইনে বাঁয়ে পাকিস্তান সম্ভব হল! কিন্তু মজা এই যে, ভারতীয় সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের কোনও নির্দিষ্ট 'ধর্ম' রাখা হয়নি; সম্ভবতঃ এই ধর্মীয় বিরোধ এড়াবার জন্যই; তা ছাড়াও ধর্মের বালাই না থাকাই ভালো। এই ভেবে তাঁরা এটা বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব, এ প্রশ্ন কি আমরা করতে পারিনা যে তাতে যদি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিধানে কোনও বাধার সৃষ্টি না হ'য়ে থাকে, তবে ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত আমাদের চৌদ্দটি জাতীয় ভাষা থাকলে সেটা ভারতের ঐক্য বিধানের পরিপন্থী বলে মনে করবার কারণ কি? হঠাৎ একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে সারা ভারতের ভাষা করে তোলবার জন্য এ অশোভন ব্যগ্রতা কেন? শাসকগোষ্ঠীতে গরিষ্ঠ হিন্দীভাষাভাষীদের মর্জী বলেই কি?

একথা বলাই বাহুল্য যে মাতৃভূমির চেয়েও মানুষ তার মাতৃভাষাকে বেশি ভালবাসে। ভারতবাসীরা যখন দেখবে যে নবগঠিত রাজ্যের সংখ্যা-গুরু শাসকেরা তাদের উপর এমন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন—যে-ভাষা শাসক সাম্প্রদায়েরই অধিকাংশের মাতৃভাষা,তখন তারা শাসক ও শাসন ব্যবস্থার উপর স্বভাবতঃই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। ফলে, ভারতের জাতীয় ঐক্য এতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই আশঙ্কা করি।

পাঞ্জাবের হিন্দী-ভাষা-ভাষীরা পাঞ্জাবী ভাষার পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা হিন্দীকেই ধরে থাকতে চায়। তারা সেখানে 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করেছে। রাজ্য জুড়ে প্রচণ্ড অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। সরকারী জুলুমে তারা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবের এ বিরোধ মেটবার উপায় জোর জবরদস্তি নয়—পাঞ্জাবীর সঙ্গে হিন্দীকেও রাজ্য-ভাষা রূপে স্বীকার করে নেওয়া।

পৃথিবীতে বহুভাষী আরও অনেক দেশ আছে, যাঁরা জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে একটিমাত্র ভাষার পরিবর্তে একাধিক ভাষাকে তাঁদের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন। কারণ এ না করলে সে সব দেশেও পাঞ্জাবের অবস্থা দেখা দিত। এই প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের কথা মনে পড়ছে। কায়েদে আজম জিন্নার মত সর্বজনমান্য মোসলেম নেতা এক বিরাট জনসভায় যেদিন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'পাকিস্তানের একমাত্র সরকারী ও জাতীয় ভাষা হবে উর্দু!' সেদিন পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষাভাষী তরুণেরা দৃপ্তকণ্ঠে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা উর্দুকে আমাদের জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে পারবো না!' পাকিস্তান সরকার সে কথায় কর্ণপাত না করে জবরদস্তী উর্দু চাপাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, পূর্ব-পাকিস্তানের নির্ভীক যুবকেরা মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। মাতৃভাষাকে রক্ষা করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁরা বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। আগুন জ্বলে উঠেছিল সারা পূর্ব পাকিস্তানে, সে প্রবল আন্দোলনের সামনে শেষ পর্যন্ত করাচীকে মাথা নত করতে হয়েছিল। বাংলা ও উর্দু দুটি ভাষাই সেখানে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

চখের সামনে ঘরের পাশে এসব দৃষ্টান্ত দেখেও ভারত সরকার যদি ভাষা-কমিশনের কয়েকজন দূর-দৃষ্টিহীন হিন্দী-প্রেমিক সদস্যের সুপারিশ মেনে নিতে যান, তবে আশঙ্কা হয়, ভারতে তাঁরা অশান্তির বীজ বপন করবেন। শুধু তাই নয়, দেশে তখন ভাষা নিয়ে একটি অবাঞ্ছিত নূতন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। এ সত্য অস্বীকার করা চলে না যে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা—তাঁরা রাজকার্যে ও অন্যবিধ নানা ব্যাপারে—হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, এবং হিন্দীভাষাভাষী দেশগুলিও অধিকতর অগ্রসর হবার সহজ উপায় হাতের মুঠোর মধ্যে পাবেন। এমন কি, হিন্দী ভাষাভাষীরাই তখন ভারতের 'শাসক সম্প্রদায়'রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠে একটা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন! তার ফলে, হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তারা ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হ'তে হ'তে ক্রমে হিন্দী-বিদ্বেষী ও হিন্দী-বিরোধীও হয়ে উঠতে পারেন। তখন হিন্দী ও অহিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। এ অশুভ সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। এ প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীতে যে আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একটা অবাঞ্ছনীয় অশুভ অবস্থার সৃষ্টি করে-ছিল, ভাষাকমিশনের হিন্দী-প্রেমিক সদস্যদের এত শীঘ্র সেকথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি। হিন্দী-ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলের কিয়দংশের মাতৃভাষা। সুতরাং, সেই আঞ্চলিক হিন্দীভাষাকে যদি সমগ্র ভারতের সরকারী বা জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়,—তাহলে,

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের অর্ধশতাব্দী ব্যাপী চেষ্টায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ইংরিজী ভাষার মাধ্যমে যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলেছেন তা ভেঙে চুরমার হবে। হিন্দীভাষী আর অহিন্দীভাষীদের মধ্যে এমন একটা প্রবল রেষারেষি ও বিবাদ শুরু হবে যে তা নিবারণ করা শাসকদের বন্দুকের গুলির পক্ষেও সম্ভব হবে না।

ইতোমধ্যেই স্বাধীন ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁদের হিন্দী পক্ষপাতিত্বের জন্য 'একদেশদর্শী' বদনাম ধ্'ইয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই বেলা সংযত হলে বিপদ কেটে যেতে পারে। ভাষা মানুষের কাছে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্র মাত্র নয়। ভাষাকমিশনের অধিকাংশ সদস্য এইখানে প্রচণ্ড একটা ভুল করে যে অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য করেছেন তা বাস্তবিকই গহৃকর! মাতৃভাষার প্রতি সকল মানুষের যে একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে তাকে তুচ্ছ করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং নিরাপদও নয়।

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে একটা স্বাভাবিক জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে, ভাষা কমিশনের সুপারিশ কার্যে পরিণত করত গেলে তার মূলোচ্ছেদ হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কা করেই সরকারী ভাষা কমিশনের দু'জন নিরপেক্ষ-সদস্য অধিকাংশের ভ্রান্তমতকে প্রশ্রয় দিতে না পেরে পৃথক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা তাঁদের অভিমতকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। একটা আঞ্চলিক ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালাতে চেষ্টা করবার ফলে যে ভবিষ্যৎ অকল্যাণের সম্ভাবনা দেখা দেবে সেটা হিন্দীভাষার উগ্র অনুরাগীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। সরকারী ভাষা কমিশনের যে দু'জন সদস্য অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দীভাষার যিনি চিরদিনই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী সদস্য সেই ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—'এ ব্যবস্থাকে ভারতে **হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ** প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে!'

সুতরাং, ভারতের জাতীয় ঐক্য যাতে এই ভাষার দ্বন্দ্ব নিয়ে বিঘ্নিত না হয় তার একমাত্র সহজ ও নিরাপদ রক্ষাকবচ হল ইংরিজীকেও ভারতের সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়া। ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী একাধিক মনীষীই এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত মুন্সী, ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রেড্ডী—এমনকি, প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু নিজেও এই উপদেশই দিয়েছেন। জহরলাল এই সেদিনও জাপানে বলে এলেন যে 'ইংরিজী আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।' আমরা সরকারী ভাষা কমিশনের হিন্দী-মোহান্ধ অধিকাংশ সদস্যকে তাই এই কথাই বুঝিয়ে দিতে চাই যে ভারতের সকল প্রদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হিন্দীতে না হয়ে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না পেলে কোনও জাতির শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার ভাষা, আর সরকারী ভাষা আপাততঃ ইংরিজীই থাকুক।

হিন্দীভাষা আজ দশ বৎসর ধ'রে নানাভাবে সরকারী পক্ষপাতমূলক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েও এখনও ততটা পরিণতি লাভ করতে পারেনি—যাতে সে সর্ব-ভারতীয় ভাষার সিংহাসনে উঠে বসবার অধিকার দাবী করতে পারে। যতদিন না তার সে উন্নতিলাভ ঘটে ততদিন ইংরিজীকে ভারতের সরকারী ভাষা রূপে রাখলে নবভারতের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। নচেৎ, অপুষ্ট ও অনুন্নত হিন্দীভাষাকে গ্রহণ করলে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ আবার এক অনগ্রসর দেশ বলেই গণ্য হবার আশঙ্কা থেকে যাবে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় অভব্য হিন্দীকে ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা বলে গ্রহণ করলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তাকে পৃথিবীর এগিয়ে চলা জাতগুলির চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

কয়েকজন হিন্দী-পাগল মানুষের খেয়াল ও জিদের বশে ভারতের এক আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীকে হঠাৎ এই যে সুয়োরাণীর মহলে এনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে, এর ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষাগুলির যে দুয়োরাণীর দুরবস্থা ঘটবে এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই অনৈক্যপূর্ণ অবস্থা কখনই কোনও দেশের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না।

ইংরিজীকেও যে আমরা আজ ভারতের সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে চাইছি সেটা দাস-মনোভাবপ্রসূত বলে যদি কেউ মনে করেন তাহ'লে ভুল করবেন। একথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবাসী বহুসংখ্যক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং নেটিভ-খৃষ্টানদের মাতৃভাষা ইংরিজী। ইংরিজী ভাষা আজ কেবলমাত্র ইংরেজেরই ভাষা নয়। ইংরিজী আজ বিশ্বজনের পরস্পরের প্রজ্ঞা ও চিন্তা বিনিময়ের ভাষা হয়ে উঠেছে। ইংরিজি ভাষা আমরা রাখতে বলছি এই জন্য যে—জগৎসভায় ভারত যাতে শ্রেষ্ঠ আসন নিয়ে তার আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধনের শুভ সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে পারে। বিশাল পৃথিবী আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আজকের জগতের মানুষকে জাতীয়তার সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই সবকিছু দেখতে হবে এবং ভাবতে হবে। আবার বলি, ইংরিজী আজ আর জগতে একমাত্র ইংরেজের ভাষা নয়। 'বিশ্বময় গিয়েছে তা' ছড়ায়ে!'

বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও চিন্তা-বিনিময়ের পক্ষে, বিশ্ববাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ রক্ষার পক্ষে, সর্বদেশের সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য—ইংরিজী শেখা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইংরেজকে বর্জন করেছি বলে যদি কেউ বলেন যে ইংরিজী ভাষাকেও বর্জন করতে হবে, সেটা তাঁদের স্বদেশানুরাগ নয়, সংকীর্ণ চিত্তেরই পরিচায়ক। এ ধরণের গোঁড়ামীপূর্ণ মনোভাব ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোনও শিক্ষিত ও উন্নত জাতিই নিজেদের স্বয়ংসিদ্ধ, আত্মনির্ভর ও আত্মসর্বস্ব ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

আজকের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নিয়ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান, চিন্তা ও আদর্শের বিনিময় এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতেই হবে। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি কারুকলা ও শিল্পানুশীলনের ক্ষেত্রে, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি নানা উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী বা যান্ত্রিক বিদ্যা অধিগত করার জন্য ইংরিজী ভাষা আমাদের রাখতেই হবে এবং শিখতেই হবে। এমন কি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। এটা একেবারে অবধারিত সত্য যে ইংরিজীকে বর্জন করলে আমরা বিশ্বের অগ্রগামী যাত্রীদের সঙ্গে অগ্রগতির পথে চলতে গিয়ে পশ্চাৎপদ হ'য়ে পড়বো। মনে রাখতে হবে ভারত বহু-ভাষাভাষী দেশ। ইংরিজী ভাষাই আজ তাকে এক করেছে। সর্ব-এশিয়ার ঐক্যও সম্ভব হয়ে উঠেছে ঐ ইংরিজী ভাষার কল্যাণেই!

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষার ক্ষেত্রে ইংরিজীর প্রসার ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে, যারা য়ুরোপ ঘুরে আসবার সুযোগ হয়েছিল। দেখে এসেছি, যেসব দেশে আগে কখনো ইংরিজী ভাষা চর্চার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না, সেখানে এখন অনেক দেশেই একাধিক বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরিজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা তাঁরা নিকটাগত-বিশ্ব-পরিস্থিতির চাপে করতে বাধ্য হয়েছেন বলা যায়! ভাবীকালের সুযোগসুবিধা লাভ ও জাতীয় কল্যাণের জন্য বহির্বিশ্বের ভাষা হিসাবে ইংরিজী শেখা তাঁরা কর্তব্য বলেই মনে করেছেন। আর, আমরা মূঢ়ের মতো তাকে বর্জন করতে উদ্যত হয়েছি!

প্রায় দু'শো বছরের কাছাকাছি আমরা ইংরিজী ভাষার সংস্পর্শে এসেছি। ইংরিজী লেখাপড়া-শেখা লোকের সংখ্যা এদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইংরিজী ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অনেক উন্নত হয়ে উঠেছে। আমাদের সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য একটা নূতন ও বলিষ্ঠরূপ পেয়েছে। এরকম একটি স্থায়ী কল্যাণকর বিশ্বজনের গৃহীত সমুন্নত ভাষাকে ভ্রান্ত দেশাত্মবোধের মোহে বর্জন করলে জাতিকে পিছিয়ে দেওয়ার অপরাধ অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করি।

আমরা যদি একটু অপক্ষপাত মনোভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ধীরভাবে চিন্তা করে দেখি, যে ইংরিজী বর্জন ক'রে, আমরা এই শব্দ-সম্পদে নিঃস্ব অপুষ্ট, অপরিণত ও অবৈজ্ঞানিক ভাষা হিন্দীকে সারা ভারতের 'এক ও অদ্বিতীয়' সরকারী ভাষা বলে যদি গ্রহণ করি, তবে, অদূর ভবিষ্যতে তার ফল কি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে,—তাহলে সকলের পক্ষেই আতঙ্কিত না হয়ে পারা যাবেনা।

ধরুন, যে সব ছেলে মেয়ে অতঃপর ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসন বিভাগে বা বিচার বিভাগে বা শিক্ষা বিভাগে বা অন্যান্য বিভাগে বড় কাজে 'পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশনের' নির্বাচনের অধীনে হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য হবে, তাদের সংখ্যা তো নিতান্ত কম নয়, আর, তারাই হল দেশের উচ্চশিক্ষিত সেরা ছেলে মেয়ের দল, তারা যখন জানবে হিন্দী ভাল করে শিখতে না-পারলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই—তখন তারা ইংরিজী শেখবার জন্য আর বৃথা অর্থ ও সময় অপব্যয় না করে, সমস্ত শক্তি নিয়ে হিন্দী শেখায় মনোযোগী হবে। তার ফলে, ইংরিজী তারা পড়বেনা এবং মাতৃ ভাষা শিক্ষাও যে উপেক্ষিত হবে একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, পরিণামে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে।

ইংরিজী ভাষা বর্জন করা মানে বহির্বিশ্বের সকল ব্যাপার থেকে ভারতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উপরন্তু হিন্দীর জুলুমে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু হবে। মাতৃ-ভাষার অবনতি জাতীয়-অবনতিরই পরিচায়ক বলে গণ্য হবে। যাদের মাতৃভাষায় কোনোও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হয়নি তারা অনগ্রসর জাতি বলেই গণ্য। হিন্দীর মতো একটি আঞ্চলিক বৈশ্যশূদ্রজনোচিত পঙ্গুভাষা একমাত্র সর্বভারতীয় ভাষা হয়ে উঠলে ভারতের পক্ষে সে হবে এক মহাদুর্ভাগ্য।

এ আশঙ্কা করাও অমূলক হবে না যে, ভবিষ্যতে বাংলা-সাহিত্য হিন্দী-ভাষাতেই রচিত হবে। সর্বভারতীয় বাজারে হিন্দী ভাষায় লেখা বইয়ের কাটতি সেদিন বেশি হবে বুঝে আমরা হিন্দী ভাষাতেই বই লিখতে প্রলুব্ধ হবো।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট বিপন্ন হয়ে পড়তে হবে। আমাদের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরিজী রাখতেই হবে—যতদিন না আমাদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি রচিত বা অনুদিত হচ্ছে। সুতরাং, জবরদস্তী ইংরিজীকে হটিয়ে হিন্দীকে এনে না-বসিয়ে এটাকে ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছা, অভিরুচি ও অনুরাগের উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। এতে বিরোধের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করাই রাজ্য সরকারের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হলে কোনও বিশ্বগ্রাহ্য উন্নত ভাষাকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। সে হিসাবে ইংরিজীকেই সবচেয়ে উপযুক্ত বলা যায়। যাঁরা বলেন যে একটা বিদেশী ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে কি ভারত চিরদিন থাকবে? দুঃখের সঙ্গে তাঁদের এ রূঢ় সত্য বলতে হচ্ছে যে ভারতের এমন কোন ভাষা নেই যা সর্ব-ভারতীয় ভাষা রূপে গ্রাহ্য হতে পারে। কেউ কেউ 'সংস্কৃত' ভাষাকে এ সম্মান দিতে চান। সংস্কৃত সাহিত্যের যে ঐশ্বর্য্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু ভারতবর্ষ তো আর সে কালিদাসের আমলের ভারত নয়। চার কোটি ভারতবাসী আজ মুসলমান, কয়েক লক্ষ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান অধিবাসীর উপর কি আজ আর জোর করে দেবভাষা 'সংস্কৃত' চালানো চলে? তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের যোগ কোথায়? অতএব, সকল দিক বিবেচনা করে, সহজেই এই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইংরিজী ভাষা আমাদের এখন বেশ কিছুদিন রাখতেই হবে। তাড়া হুড়ো করে ইংরিজী বর্জন করলে

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা গেঁয়ো লোকের মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। সরকারী ভাষা, কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায়ের ভাষা, উচ্চ শিক্ষার ভাষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষা সকল ব্যাপারেই ইংরিজী রাখা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করি।

জোর জবরদস্তি করে, জুলুম করে, রাজশক্তি বা শাসন দণ্ড প্রয়োগে বহু ভাষা-ভাষী কোনও দেশকেই এক ভাষা-ভাষী করা যায় না। একমাত্র আপন ঐশ্বর্যের গুণেই কোনও একটি ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে এবং সেটা হয়ে ওঠে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের পথে স্বাভাবিক নিয়মেই। ইংরিজী ভাষা সেই গুণেই আজ বিশ্বের ভাষা হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার ও বারদোলমেলা

ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযানরত সম্রাট আকবরের বিশ্রুতনামা সেনাপতি মানসিংহ তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদলকে ঘোড়ার ঘাস ও দানা দিয়া সাহায্য করা ও প্রতাপের রাজধানীর পথ বলিয়া দেওয়ার জন্য ভবানন্দ মজুমদারকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মত সুবিশাল এক জায়গীর দানে কৃতার্থ করেন। এইরূপে "অধিকার রাজার চৌরাশীপরগণা" সহ নদীয়া রাজ্যের পত্তন হইল। দক্ষিণে বেহালা, পশ্চিমে খাগড়াজোল ও মহানাদের পূর্ববর্ত্তী অঞ্চল, পূর্বে বনগ্রাম ইহার অন্য সীমানার সহিত "রাজ্যের উত্তর সীমা ধুল্যাপুর (ধুলিয়ান?) বড়গঙ্গাপার" (ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতম্) ছিল। স্তবে বর্ণিত "সর্বানন্দকরে সর্বসাম্রাজ্য দায়িনী" দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় গাঙ্গিনী, জলঙ্গী বা খড়িয়া পার হইয়া আসেন। "অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গিনীর তীরে 'পার কর' বলি ডাকিল পাটুনীরে।" তাঁহারই সন্তান রাজা রাঘব অশ্বারোহণপটুতা ও অন্যান্য গুণে বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দিল্লীর দরবারে তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে বাদশাহ ছয়হাজারী মনসবদারের পদাভিষিক্ত করিয়া নদীয়ায় ফিরাইয়া পাঠান। তাঁহার কথা "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতের একখানি ইংরাজী সংস্করণে আছে। মূলক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতম" বার্লিন লাইব্রেরীতে ছিল। তাহা হইতে ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছিল। দিগ্‌নগরের দীঘি ও তৎপাড়স্থ মন্দির তাঁহার কীর্ত্তি। কথিত আছে রাজা যখন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, তখন গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে এক মালুই জলের জন্য ঝগড়া চলিতে দেখিয়া—ঘোড়া ছুটাইয়া দৈর্ঘ্য ঠিক করিয়া দিয়া দীঘি কাটানর হুকুম দেন। রাঘব রাজার শিবমন্দির এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় বাঘের আড্ডায় পরিণত। লোকে কথায় বলে "এখনও সে রাঘব রাজার কালে।" তাহার পরে রাজা রুদ্রের সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি মীর কাশিমের কাছে শুল্ক স্থির করিতে যাওয়ার আগেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত হেজেস্ বাগাঁচড়ার Sprite de gulgate অর্থাৎ 'ঘথের বিলে' বাজরা রাখিয়া রাজারুদ্রের মিত্র চাঁদরায়ের কাছে হইয়া যাইতেছেন। চাঁদরায় তখন মহা প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি, রাজদরবারে খুব তাঁহার প্রভাব। এই চাঁদরায় ভারতচন্দ্র বর্ণিত "জগন্নাথ রায় চাঁদরায়" কিনা বলিতে পারি না। তবে তিনি রাজারুদ্রের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া একটী মতও প্রচলিত আছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ইহাকে বার ভূইয়ার অন্তর্গত চাঁদ রায় বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে আমি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একখানি কুলজীগ্রন্থে দেখিয়াছি এই চাঁদ রায় "রুকুনপুরের পারীরাজা চাঁদ রায়"। এই রুকুনপুর যশোহর জেলায় ছিল। বাগাঁচড়ার গাঙ্গুলীরাও যশোহর হইতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূজামণ্ডপ ও ধ্বংসোন্মুখ বসতবাটী চাঁদ রায়ের মন্দির ও প্রাসাদ স্তূপের সন্নিকটেই অবস্থিত। চাঁদ রায়ের চারিটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী শিবমন্দির এখনও বনভূমি-মাঝে দণ্ডায়মান; মাথায় একটী বটগাছ ধরিয়া মন্দির তাহার শিকড়ে পরিবেষ্টিত আছে। মন্দিরগাত্রে ভগ্নপ্রায় ইষ্টক ফলকে নিম্নধৃত শ্লোকটী লেখা আছে:—

> শাকে বার মতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কেনাঙ্কিতশঙ্করং
> সংস্থাপ্যাত্ত সুধা সুধাকর ক্ষীরোদনীরোপমং
> তস্মৈ সৌধমিদং মুদা নিলীন লোলধ্বজং
> তৎপাদেরিত ধীর ধীর বিরত শ্রীশ্রীচাঁদরায়ো দদৌ।

কেহ কেহ মনে করেন যে কৃষ্ণনগর নাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম হইতেই হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বহু গোপ-জাতির বাস। তাহারা ঘরে ঘরে কৃষ্ণপূজা করিতেন বলিয়া স্থানের নাম কৃষ্ণনগর। সর, দধি, ছানা ও মিষ্টান্নাদির জন্য এতদঞ্চল বিখ্যাত। শুনা যায় বার্ষিক কৃষ্ণপূজা উপলক্ষে গোপগণ রাজাকে ফলাহার করাইতেন। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অজন্মার সময়ে এখানে অঞ্জনা নদীর তীরে গোরু আনিয়া খোঁয়াড় করিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর ক্লাইভ কয়েকটী কামান বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ (as a token of friendship") কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিয়া যান। বাংলার রাজপ্রমুখ হওয়াই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরের কামনা; সে জন্য তিনি কলিতে অশ্বমেধ নিষিদ্ধবিধায় নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার পতাকা

অধলাঞ্ছিত করেন। এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সিংহদ্বারে বা সিংহ-দরজায় অধলাঞ্ছন সে পতাকা সলজ্জ ও মলিন ভাবে উড়িতেছে। পলাসীর যুদ্ধের পর ঘটনাচক্রের গতি অন্যরূপ দেখিয়া কলিকাতার দরবারে তিনি উপস্থিত হন নাই—দরবারের সেই সারা দিনটাই কৃষ্ণনগরে বসিয়া তাঁহার বিমর্ষভাবেই কাটিয়াছিল। অতঃপর ক্লাইভের সঙ্গে এক সন্ধিতে প্রেসিডেন্সিবিভাগের বেশীর ভাগই কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতে উল্লিখিত হয় যে ইংরাজ যখন এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবে তখন নদীয়ারাজকে তাহার রাজ্য ফিরিয়া দিয়া যাইবে। এখন কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়েরা আইন অনুসারে ভারত সরকারের কাছে খেসারৎ পাইতে পারেন কিনা তাহাই প্রশ্ন। এখানে ব্রিটিশ ভারতের রৌপ্য ঋণশোধের ন্যায় কোন কথা উঠিতে পারে কিনা ?

কৃষ্ণনগর কলেজের জন্য বিস্তীর্ণ জমিদানের সময় কৃষ্ণনগরের অদূরে কোম্পানীর বাগান বলিয়া খ্যাত বর্ত্তমানের হর্টিকালচারাল গার্ডেন (ফলবাগিচা) এর দিগন্ত প্রসারিত জমি এক সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কোম্পানীকে দানস্বরূপ লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে একখানি দলিল গোয়াড়ীর প্রভাসচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে সংরক্ষিত আছে। উহাতে স্বাক্ষর আছে বড় বড় বাংলা অক্ষরে কলমি কলমে লেখা—মহারাজ রাজশ্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

লেখকের মাতার পূর্বপুরুষ দেওয়ান রঘুনন্দনমিত্র এক সময়ে নদীয়া রাষ্ট্র তথা প্রেসিডেন্সি বিভাগের জরীপ করিয়া ছিলেন। সেই হইতেই 'ব্রহ্মোত্তর' জমির বিষয়ে "রঘুনন্দনী ছাড়ের" প্রচলন হয়। কৃষ্ণনগরের পূর্বে অবস্থিত দেওয়ানের বেড় গ্রাম রঘুনন্দনের নামানুসারে খ্যাত হয়; তাহারই কাছে শিবনিবাস কঙ্কনানদীর ধারে তীর্থস্বরূপ বিবেচিত হইত; সেখানকার শিব প্রায় একতলাসমান উচু। চলতি ছড়ায় আছে :—

শিব নিবাসই তুল্যকাশী—ধন্য নদী কঙ্কনা
উপরে বাজে দেব ঘড়ি—নীচে বাজে ঝঞ্ঝনা।

রঘুনন্দন এক সময়ে সমগ্র ষ্টেটের, এমনকি রাজসংসারের আয় ব্যয়ের ভার লইয়া ইহাকে ঋণমুক্ত করেন; সেজন্য তিনি রাজ কুমার শিবচন্দ্র প্রভৃতির কুনজরে পড়েন। আবার রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব সেবার রাজার পরিবর্ত্তে দেওয়ানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিতে ঢালিতে নগর পরিক্রমা করান; তখন শিবচন্দ্র তাহা দেখিয়া রাজপথের ধারে কোন বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকেন। তাহাতে রঘুনন্দন বলিলেন—"গাধার পিঠে আমিতো চড়ি নাই চড়েছে তোমার বাবা!" তারপর বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদের ষড়যন্ত্রে ও অভিযোগক্রমে নবাব রঘুনন্দনকে গ্রেপ্তার করিয়া মুর্শীদাবাদ লইয়া যান। সেখানে মীরজাফরের জামাতা মীরণের আদেশে তাঁহাকে কামানের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দেয়। কিছুদিন পরে মীরণ বজ্রাঘাতে মারা যায়।

সাধক রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন ও তান্ত্রিকচূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার গুরু ছিলেন। দুর্গাপূজার মুখে ওয়াটসন কর্ত্তৃক মীরকাশিমের কবল হইতে মুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টমী পূজার দিন নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিয়া আর মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে না পারায় নৌকাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন "তিনি যেন দুর্গাষ্টমীর একমাস পরের নবমীতিথিতে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতেছেন; তখন অষ্টমী, নবমী ও দশমীপূজা এক 'দিনেই হইতেছে, আর মা সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা—শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারিণী। পরে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন পণ্ডিত জগদ্ধাত্রী বলিয়া অভিহিত করেন ও সেই মত স্তবাদির দ্বারা জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত হয়।

রাজবাড়ীতে শক্তির সকল পূজাই প্রচলিত ছিল। সেজন্য দুর্গা কালী প্রভৃতির প্রতিমা গঠন সেনরাজ্যকাল বা তৎপরকালীন প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রাচীন অলঙ্কার ও সাজ সজ্জাদিসহ অধুনা প্রচারিত ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি হইতে কতকটা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত—ইহার বিশেষ ভাবগম্ভীর শৌর্য্যবীর্য্যাত্মক বর্ণবিন্যাস ও ভঙ্গিমা মনোহারী ছিল।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশে শক্তিসাধনা সর্বজনবিদিত হইলেও তাঁহাদের বৈষ্ণবী সাধনার দিকটাও কমছিল না। নদীয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেবোত্তর ব্যবস্থায় শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, বীরুইএর মদনমোহন, গঙ্গাবাসের বলরাম, চিত্রকূট হইতে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তরাঙ্কিত রামচন্দ্রের পদচিহ্ন, ও বটুকভৈরব শিব এবং নবদ্বীপের গোপাল, বিদ্ধ্যজননী ও ভবতারিণী, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, শিবনিবাসের শিব, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, নদীয়ার ও শান্তিপুর গড়ের গোপাল বা রাজবাটীর কৃষ্ণচন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ ও ব্রহ্মণ্য-দেব কেহই কম বেশী ভক্তির পাত্র ছিলেন না।—সকলেই সমানভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন।

এখানে গঙ্গাবাসের ঠাকুরবাড়ীর কথা একটী বলি। "জয় জয় ধন্য নদীয়ানগরী-অলকানন্দার কূলে। কমলা ভামিনী ক্রীড়া করে যথা বিরাজিত বকুলমালে।" চৈতন্যমঙ্গলে এই বলিয়া আখ্যাত প্রাচীন নবদ্বীপের কিছুটা সন্নিকটে ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের কিছুটা পূর্বে রাজা অলকানন্দার তীরে গঙ্গাবাস হিসাবে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন; বিভিন্ন বিগ্রহের মন্দিরে পরিবৃত ও ফলপুষ্পবিটপী রাজি শোভিত গঙ্গাতটে এই শোভাময় স্থানে তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া বাস করিতেন।

বাদশাহ শাহ-আলমের প্রিয় মহারাজরাজেন্দ্রবাজপেয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় দূত হইয়া আসিয়াছিলেন পীর দোস্ত আলম। তাঁহারই পরিকল্পনা অনুসারে রাজবাড়ীর বিখ্যাত চক ও দিল্লীর দেওয়ানই-খাস ও আমের দীন অনুকরণে কতকটা নির্মিত বিরাট পূজার দালান ও বিষ্ণু-মহল। এই পূজার দালানের এক একটী সমুন্নত খিলানের নীচে বার দোলের বার ঠাকুরের লাল কাপড়ে মোড়া কাঠরাগুলি সাজান হয়। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান পান বীরুইএর প্রমাণগঠন দারুবিগ্রহ মদনমোহন নীলকণ্ঠ, হরিদ্রারঞ্জিত মোহন বেশ—বেণু ও টানা টানা চোখ শ্রীরাধার পার্শ্বে মধুর ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান; তৎপরে বাল্যাকল্পতরু তেহট্টের শিলাময় কৃষ্ণরায় ও ঘোষ ঠাকুরের পিণ্ডদাতা বলিয়া কথিত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, শান্তিপুর গড় ও নদীয়ার কালপাথরের গোপাল, রাজবাটীর ধাতু নির্মিত ব্রহ্মণ্যদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ প্রস্তর বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র,

গঙ্গাবাসের শ্বেতবর্ণ শিলাময় বলরাম প্রভৃতি বার ঠাকুরের অপূর্ব মেলা বা সমাবেশে বার দোল বসে। পূর্ব্বে মদনমোহন কৃষ্ণরায় প্রভৃতি বিগ্রহ স্ব স্ব স্থানে থাকিতেন। তাঁহাদের চতুর্দ্দোলায় শায়িত অবস্থায় গোয়াড়ীর ঘাটে নৌকা হইতে, কীর্ত্তন ও তরবারী ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ সহ দোলের আগে রাজবাটীতে আনা হইত। দোলের সময়ে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখরিত পূজার বাটীর বিরাট হল অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে। এই দোল রামনবমীর পরের একাদশীতে বসে ও চতুর্দ্দশীর সকালে উঠে। রাজবেশ, রাখালবেশ ও যুগলবেশ এক একদিন এক এক বেশে ঠাকুরদের সাজান হয়।

গড়ের চৌহদ্দির মধ্যে মেহগিনি, রাধাচূড়া, চম্পক ও সেগুণ প্রভৃতি বড় বড় গাছের তলে বারদোল উপলক্ষে এক বিরাট মেলা বসে। ইহা ন্যূনপক্ষে ঝড়জল না হইলে প্রায় একমাস থাকে। এখানে চাঁদের আলোর রাতেও দূর গ্রামান্তর হইতে আগত যাত্রীদের সমাগমে বেচাকেনা চলে, তাঁহারা তখন গাছতলাতে রাত্রি কাটান। ইহাতে সার্কাস, মিষ্টান্নের দোকান, ডাবের দোকান, বাঁশের বাঁশী, শাঁখা, পাখা, ধামা, পাথরের জিনিস, মাদুর, বেলডেঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতের সাড়ী ও সাধারণ মনোহারী জিনিস, কাঁসার বাসন, কাঠের পুঁতুল, মাটির পুতুল ও ফল প্রভৃতির বিভিন্ন দোকানের সারি বেশ চিত্তাকর্ষক। তবে সব চেয়ে বেশী মনোরম ঘূর্ণীর মাটির পুতুলের বড় বড় দোকান—যাহা প্রদর্শনীকেও হার মানাইয়া দেয়। এখানে আমরা মেলায় দৃষ্ট কয়েকটী শিল্প দ্রব্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলিব। ধামা, কাটা, পালি আগে রাণাঘাটের অধীন ফুলিয়া, নবলাতে তৈয়ারী হইত। এখন বেতবনবহুল মেহেরপুর পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপনের পর নিকটস্থ দিগনগর প্রভৃতি স্থানে বেতবনের অভাব ঘটায় শিল্পীদের পক্ষে অন্য যায়গা হইতে বেত আনিয়া কাজ চালান কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। কাঠের পুতুল সাধারণতঃ দাঁইহাট মেটিয়ারি হইতে আমদানী হয়; ইহার বর্ণিকাভঙ্গি অনেকটা মিশরের "মামী"র ন্যায়; দাঁইহাটের কোন ভাস্কর পরিবার এই পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; ইঁহাদেরই এক শাখার শ্রীবিশ্বনাথ ভাস্কর পাথরের মূর্ত্তিশিল্পে বিশেষ পারদর্শী; জয়পুর কাশী প্রভৃতি স্থান হইতেও ইঁহার ডাক পড়ে। তবে পাথরের মূর্ত্তি এখন আর ততটা বারদোল মেলায় দেখা যায় না; ভাস্করদের আর এক পরিবার কাঁসার বাসন তৈয়ারীতে বেশ নিপুণ। তাঁহাদেরও নবদ্বীপ, খাগড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের কাঁসারিদের ভাল ভাল কাজের নমুনা এই মেলায় মিলে। দেশভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গের লাঙ্গলবন্ধের কারিগরেরা শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত সকল আকারের রংকরা কাঠের ঘোড়া ও হাতী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাগজের মণ্ডের তৈয়ারী বাঘ, হাতী, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতিও মিলে।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আরম্ভ হইয়াছিল কৃষ্ণনগরের রাজার জন্য "নবনারীকুঞ্জর"—গঠন হইতে; নয়টী নারী পুতুলের সমষ্টিতে গড়া হইয়াছিল এই অদ্ভুত পুতুল। বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের পূর্ব-পুরুষ গোপাল পালই ইহার স্রষ্টা। সেই সময়েই বিখ্যাত 'স্বপ্নে পাওয়া' জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় কৃষ্ণচন্দ্রের পূজার জন্য। ইহা প্রথম প্রথম দাক্ষিণাত্যের কোন পণ্ডিতের উপদেশ মত কোন আচার্য্য-বংশীয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় বলিয়া অনুমান হয়। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে প্রাচীন শিল্পের নিয়ম-কানুন অনুসারে বৈষ্ণনাথ পাল তাহা গড়িতেন। এখন তাদৃশ অর্থের ব্যবস্থার অভাবে তিনি এই কাজ ত্যাগ করায় কৃষ্ণনগরে দর্শনীয় প্রতিমা নির্ম্মাণের সেই প্রকৃত প্রাচীনধারা বিসর্জিত হইতে বসিয়াছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা সময় থাকিতে হস্তক্ষেপ না করিলে এখানে ও ইলামবাজারের গালা শিল্পের মত অবস্থা ঘটিবে।

কৃষ্ণনগরের মাটির কাজের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর মাটির কাজের কতকটা তুলনা চলিতে পারে। স্বাভাবিকতায় কৃষ্ণনগরের কাজের গড়ন ও রংফলান অতুলনীয়। মাটিতে তৈয়ারী ছোট ছোট দেব দেবীর মূর্ত্তিও বড় সুন্দর। অত ছোটর মধ্যে সুগঠন ও রংএর মাধুর্য্যই দেখিবার জিনিস। আর জিনিসের তুলনায় সেখানকার দামও বেশী নহে। বিভিন্ন প্রকারের ফল এক একটী এক আনা দরে পাওয়া যায়। সেগুলি দেখিতে এতটা স্বাভাবিক যে শিশুরা দেখিলেই হয়তো কামড় দিবে।

যাহাই হউক, কৃষ্ণনগরের বারদোলে দর্শকবৃন্দের কাছে সুপ্রসিদ্ধ রাজার চক, যেখানে কবি ভারতচন্দ্র থাকিতেন, গড়, ফিনিক্সের মত নারীমুখ সিংহোপবিষ্ট সিংহদ্বরজা, বিষ্ণুমহল ও বিরাট পূজার দালান আর বিভিন্ন বারগায় ঠাকুর বাড়ী হইতে আনীত ঠাকুরদের বিষয়ে ও সেই সঙ্গে বসা মেলায় স্থানীয় বেতশিল্প, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, শঙ্খ শিল্প, কাংস্য-শিল্প প্রভৃতির বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার ও দেখিবার আছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

হরেন ঘোষ এম্-এ

[১]

রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হলেও প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি 'উজ্জ্বল একক জ্যোতিষ্ক' স্বরূপ। বিশেষ-ভাবে গদ্য-লেখক হিসেবেই প্রমথ চৌধুরী আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর একটা পরিচয় আছে—আজকের সাহিত্য-পাঠক যেটি অল্পদিনেই বিস্মৃত হতে পেরেছেন। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও কবিমানস সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টভাষী, নির্ভীক; তাই অনায়াসে বলতে পেরেছেন—"রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম।" এ জন্যে নিজেই নতুন ধারার সূচনা করলেন। তিনি সচেতন ও বিদগ্ধ শিল্পী। তাই তাঁর কাব্যে আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি-নৈপুণ্য বেশী, হৃদয়বোধের চেয়ে প্রাধান্য বেশী মননের। তাঁর কবিতার সঙ্গে গদ্যের নিকট সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে নিজেই মন্তব্য করেছেন—"গদ্যের কলমে লেখা এ পদ্যগুলি……এগুলির ভেতর আর কিছু না থাক, আছে Rhyme, এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ Reason." নিজের সনেট সম্বন্ধে বলেছেন যে তার মধ্যে art-এর চাইতে artificiality বেশী। এবং সেটি তাঁর "honest experiment" মাত্র। স্বীয় রচনা সম্বন্ধে স্বয়ং কবির মন্তব্য এবং আত্মসমালোচনা—জানতে পারায় তাঁর কবিতা ও কবিমানস সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে।

অন্যদিকে দেখি, প্রমথ চৌধুরী নিজের কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন। তিনি নিশ্চয় জানতেন, তাঁর গদ্য রচনার মত 'কবিতার' সমাদর হবে না। তাঁর এই সচেতনতার পরিচয় পাই—

"কবিতা আমার জানি যেমন শঙ্কুর,
দুদিনে সবাই যাবে, বেবাক ভুলিয়ে॥"

[২]

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার ধারার সঙ্গে প্রাচীন বা সমকালীন কোন কবির রচনার ধারার—মিল নেই। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, চিত্রকল্পে তিনি অনন্য, একক। তিনি ভাবানুষঙ্গ অতিক্রম করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একপত্রে লিখেছিলেন—" আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলিকে আমল না দেওয়া।" তাজমহলকে অনায়াসে বলতে পেরেছেন—

"মমতাজ! তাজ নহে বেদনার মূর্তি।
শিল্প সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্তি॥"

প্রমথ চৌধুরী রূপের ভক্ত। তিনি চোখের দেখাকেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন। শুধুমাত্র জীবন-ধর্মকেই তিনি স্বীকার করেন নি, যুগ-ধর্মকেও মেনেছেন এবং উচ্চমূল্য দিয়েছেন। বিশেষতঃ প্রমথ চৌধুরী জ্ঞানমার্গের পথিক। লেখার style সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সচেতন। Style-এর দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়ায় রচনার প্রসাদ গুণ অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—যে লেখার ভিতর অহং নেই, সে লেখা আর যাই হোক সাহিত্য নয়। তিনি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন নি—"Style is the man."

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার যে বস্তুটি আমাদের আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে—তাঁর রচনার এতটুকু শৈথিল্য নেই—দৃঢ়পিনদ্ধ একটি অখণ্ড শিল্প বস্তু, সহজভাবে বলা যায় নিখুঁৎ কারুকার্য—ঠাস বুনুনি। তাঁর রচনায় Rhyme থাকলেও Reason এরও অভাব নেই। শব্দালঙ্কারের চাইতে তিনি অর্থালঙ্কার বেশী পছন্দ করতেন। Paradox ভালো-বাসতেন, Epigram সৃষ্টি করে আনন্দ পেতেন।

সাধারণতঃ বাঙ্গালী জাতির যে বদনাম আছে ভাবালু ও জড়—সেটি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। যা দিয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করেছেন বাঙ্গালীকে। সর্ব্বোপরি তিনি হাস্যরসের পূজারী। তাই আমাদের বিস্মিত হতে হয়, মনে প্রশ্ন জাগে যে বাঙ্গলা সাহিত্যে এতগুলি অসাধারণ গুণ নিয়ে সাহিত্য চর্চ্চা করেও প্রমথ চৌধুরী আজ সাহিত্য-পাঠকের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন কেন? মনে হয় যে সংবাদপত্রের দাবী মেটাতে গিয়ে সাময়িক কালকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যেই কালাতীত কিছু রচনা করবার দিকে গভীর দৃষ্টি দেন নি।

[৩]

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনার পাশে তাঁর কবিতা অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'কে না জানলে 'পূর্ণ' প্রমথ চৌধুরীর মনন-গঠন আমাদের অজ্ঞাত থেকে যাবে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। "বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার প্রখর দীপ্তি, পরিমিতবাক পদবিন্যাস, শ্লেষাত্মক মন্তব্যের সুমার্জ্জিত রীতি, আবেগবিরল তীক্ষ্ণধার জীবন সমালোচনা,—ফরাসী চিন্তাজগতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।" প্রমথ চৌধুরীকে বাংলার নব্যন্যায় স্রষ্টাদের আধুনিকতম সাহিত্যিক বংশধর আখ্যায় ভূষিত করেছেন আধুনিক প্রখ্যাত-সমালোচক।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর দু'একটি মন্তব্য স্মরণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেছেন—"ভাষায় এখন শানিয়ে ধার বার করা দরকার, ধার বাড়ানো নয়।" তিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য ব্যক্তির একক-সাধনা, একথা তিনি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছেন। সাহিত্যিকদের প্রতিভাবানও হ'তে হবে, নিয়মিত চর্চ্চাও করতে হবে।

তিনি প্রাচীন রীতির অন্ধ অনুকরণে রাজী নন, যুগের প্রয়োজনে, নতুন সৃষ্টি করতে হবে। তাই তাঁর কবিতায় ভাবের সংযম, ভাষার বৈচিত্র্য, আকারের সংহতি এবং প্রকাশের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। প্রমথ চৌধুরীকে বলতে শুনি—

"হ'লে ভাবেতে ফতুর. হই ভাষায় চতুর।" তিনি ভাবের অভাব, ভাষার চাতুর্য্য দিয়ে পূরণ করেন। তবে চাতুর্য্যই তাঁর লক্ষ্য নয়, ওটি একটি উপায় মাত্র। তাঁর কাব্যে বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য, আবেগ ও উচ্ছাসের অভাব দেখে মনে করা যেতে পারে যে, চমক সৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,—যেন সর্বত্রই বীরবলী ঢং বজায় রাখবার চেষ্টা, Emotionকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করার প্রয়াস—এক কথায় 'high seriousness এর অভাব।

[৪]

প্রমথ চৌধুরীর কবিমানস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলাম। এবার তাঁর কাব্যালোচনায় অনুপ্রবেশ করি। দুটী কাব্য-গ্রন্থের একটির সমস্তই সনেট, অপরটিতেও সনেটের সংখ্যা কম নয়। দেখা গেল সনেট রচনার প্রতিই তাঁর প্রবণতা বেশী।

গীতি কবিতার অঙ্গ হিসেবেই সনেটের প্রথম প্রকাশ—বিশেষভাবে সনেট প্রেমের কবিতা ছিল। লিরিক হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত্ত বাহন, সনেট নিয়ন্ত্রিত ঘনীভূত বাহন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীতে সনেটের জন্ম। প্রত্রার্ক্য সনেটের স্রষ্টা হিসেবে সুপরিচিত। ইংলণ্ডে ওয়াট ও সারে সনেট রচনা করে খ্যাত হন। এরপর একে একে সার্থক সনেট রচনা করেন, শেক্স্‌পীয়র, মিল্‌টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স্। সবকবিই সনেট রচনা করতে পারেন না। "উচ্ছসিত আবেগের সঙ্গে প্রশান্ত সংযমের উদ্বাহ বন্ধনেই" সনেটের সৃষ্টি।

শেলী, বায়রণ প্রকৃত সনেট রচনা করতে পারেন নি। কোলেরিজও পারেন নি। তাঁরা অস্থিরমতি, চঞ্চল। গভীর ভাবের প্রকাশ, অনুভূতিকে মনের নিগূঢ়ে নিয়ে গিয়ে রোমন্থন—বিশুদ্ধ ভাবনির্য্যাস নিষ্কাষণ—এই আত্মানুসন্ধান যে সব কবিতে আছে তারাই সার্থক সনেট রচনা করতে পারেন। এখানে গভীর একনিষ্ঠ উপলব্ধির প্রয়োজন। রসেটি ও মিসেস ব্রাউনিংএ সনেটের বৈশিষ্ট্য ফুটেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রতিষ্ঠা করলেন মাইকেল মধুসূদন। এরপর লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। অতঃপর আসি প্রমথ চৌধুরীতে। এঁর গন্ত রচনায় যে ব্যঙ্গ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, উপহাস-প্রবণতার স্বাক্ষর পাই, কবিতারও সেই একই মননশীল রীতিই বিদ্যমান। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে ও পদ্যে ভাবগত ও মর্ম্মগত মিল সুস্পষ্ট। কবিতায় সাধারণতঃ যে উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ ও কল্পনা-প্রাধান্য দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরীতে তা নেই। তিনি এখানেও চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণযুক্তিবাদী। সনেট রচনার কোন রীতিই তিনি মানেন নি। প্রাচীনকে অন্ধ অনুকরণও করেন নি। তাঁর সনেটের নবম দশম লাইনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয়। এই অস্নগতি চমকের সৃষ্টি করে, কৌতুকরস জাগায়। তাঁর ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবের পরিচয় পাই—

"ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন॥"

কবির সুর লঘু, ছন্দমধুর, ব্যঙ্গময়।

[৫]

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের প্রেরণামূলে কবিত্ব নেই, আছে বাগ্‌-বৈদগ্ধ ও চিন্তাঘটিত চাতুরীর চমক। এটি বারবার স্মরণ করতে হবে; অন্যথায় তাঁর প্রতি অবিচার সম্ভব। কোনও সমালোচক মন্তব্য করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর সনেট যথার্থ অর্থে সনেট নয়—কারণ মূল সনেটের আদর্শের সঙ্গে এর মিল নেই, ভাষাও কবি-ভাষা নয়, মিলে ছন্দধ্বনির চাইতে শব্দধ্বনিরই প্রাধান্য—তাই একে উৎকৃষ্ট চতুর্দ্দশপদী বলা চলে। আমার মনে হয় সনেট বলতে আপত্তি না থাকাই উচিৎ—হয়ত প্রচলিত রীতির সঙ্গে এর কোন মিল নেই, কিন্তু নতুন রীতির সনেট বলবো না কেন?

পেত্রার্ককে গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা জানালেও প্রমথ চৌধুরী তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেন নি। নিজের সনেট সম্বন্ধে বলেছেন—

"আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ,
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট
তিনটি চাবিতে যার. খোলে রঙ্গ প্রাণ।
* * * * *
এ হাতে মূরতি ধরে আজি এ সনেট
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য
প্রকৃতি যাহার "জ্যেঠ" আকৃতি 'কনেঠ'॥"

প্রিয়নাথ সেন প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্বন্ধে বলেছেন—"তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয়সকলকে লঘু ভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়েছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু, তাঁহার ভাব ও ভাষায় এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দ্দেশ ভঙ্গী আছে যে তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন।"

বিষয় ও ভাষায় তিনি বরাবর চুটকীর পক্ষপাতী—

"তাই আজ ছাড়ি যত ধ্রুপদ-ধামার,
চুটকিতে রাখি যত, আশা ভালোবাসা॥"

[৬]

প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত রীতি, ভাবানুষঙ্গ অতিক্রম করেছেন। ফুল সম্বন্ধে তাঁর একাধিক কবিতা রয়েছে। তাঁর প্রিয় ফুল—কাঁঠালীচাপা, করবী, কাঠমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

"ভাল আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল।"

তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"আমি খুঁজি সেই ফুল, হইয়া বিহ্বল,
যাহার অন্তরে আছে গন্ধ হলাহল॥"

গোলাপকে বলেছেন—"ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল।" অবশেষে বলেছেন—"নবাবের যোগ্য তুমি হাকিমী গোলাপ।" ভাবানুষঙ্গ অতিক্রম করতে গিয়ে কাব্যতত্ত্বকেও আঘাত করেছেন—

"কবিতার যত সব লাল নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই॥"

প্রতিযুগেই কবিরা কবিবন্দনা করে থাকেন। প্রমথ চৌধুরীও করেছেন। মাইকেল একাধিক কবিবন্দনা করেছেন। তবে নিতান্ত Conventional, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে একক, অনন্য। যে সব কবির সঙ্গে আত্মার যোগ আছে, স্বভাবগত মিল আছে, শুধু তাঁদেরই বন্দনা করেছেন তিনি।

'ভর্তৃহরিকে' বলেছেন—

"নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা।
তব ধর্ম্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা॥"

মনে হয় তিনি নিজেও তাই, বহুরূপী সাজেন। 'ভাব'কে তাঁর ভালো লাগে—কারণ,

"সরাগিনী, অরাগিনী তব বীণাপাণি"—

এবং তাঁর মধ্যে—

"বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাব" ছিল না—উপরন্তু তাঁর "পত্রে পত্রে স্ফুরে যার বালার্ক আভাস।"

বার্ণাড শ'র প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা—

"মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো
অপরে বোঝে না তাই, নাটকেতে হাসো॥"

এবার নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন—

"এ হাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক॥"

'জয়দেব' 'চোরকবি' 'বসন্তসেনা' 'পত্রলেখা' শীর্ষক সনেট রচনা করেছেন তিনি।

কয়েকটি সনেটে প্রমথ চৌধুরীর দার্শনিক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে তিনি বিশ্বকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি Agnostic অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী।

"আত্মপ্রকাশ" বলেছেন—

"ভাষার যা কিছু ধরি উপরেই ভাসে
যেচ্ছায় করেছে যাহা আলোকবরণ।
সত্য কিন্তু তারি নীচে মুখ ঢেকে হাসে,
কভু নাহি দেখা দেয় বিনা আবরণ॥"

বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের একটা রহস্যময়তা আছে। এক্ষেত্রেও আমাদের চেতনাকে আঘাত দিয়ে লিখেছেন 'বিশ্বরূপ' 'বিশ্বব্যাকরণ' "বিশ্বকোষ"। 'বিশ্বকোষে' বলেছেন—

"বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া
সে তো নয় ঘরকরা, করা সে ঝগড়া।"

'বিশ্বরূপে' বলেছেন—"দেখেশুনে হতবুদ্ধি, আমি সনৎকার।" "বিশ্বব্যাকরণে" কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"আমরা নির্বোধ নই চাই অর্থবোধ।" 'ব্যর্থ জীবনে' স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—

"অন্যে কভু দিই নাই নীতি উপদেশ
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ
তপস্বী হবো না আমি জীবনের শেষে॥"

উপরন্তু প্রমথ চৌধুরীকে জানতে হলে' আমাদের মনে রাখতে হবে—"সুখী যারা তারা মোর মনের মানুষ।" কিন্তু শুধু আনন্দ, শুধু হাসি নয়—

"নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।"

কবিতা লেখবার জন্তে উপদেশ দিয়েছেন—

"প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালোবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটী আয়োজন
জোর করা ভাব, আর ধার করা ভাষা।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা আলোচনায় সবচাইতে বড় অসুবিধে যে তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন উদ্ধৃতি দেবার লোভ জাগে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন..."সরস্বতীর বীণায় তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়েছো।" ইস্পাত সুলভ দার্ঢ্য ও তীক্ষ্ণতা তাঁর রচনায় ছিল।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে—"মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখায় ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা।" তিনি নূতন ও অভিনব শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠে পাঠকমন মগ্ন, তাই নতুন কিছু প্রয়োজন। ইংরেজী Spoken idiom এর মত বাংলায় কথা-ভাষা ব্যবহার করেছেন, 'মানুষেতে ভালোবাসে যে বরল'। সংস্কৃত শব্দও ব্যবহার করেছেন, 'সুপ্তোত্থিতা', 'শিখিলজী' প্রভৃতি। তাছাড়া দেখি, 'হকিমী গোলাপ', 'পৃথিবীর শোর', বিদেশী শব্দ দেখি 'লা—আল্লা—ইলাল্লা', 'পার্শী কেতাব' 'চঞ্চল' 'বিরাগ' ইত্যাদি। আবার ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দও দেখি—সনৎকার।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার প্রাথমিক আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। তাঁর কবিতার রীতি সম্বন্ধে শেষ কথা মনে হয়—"He wrote thus, because he thought thus. He wrote thus, because he could not write otherwise."

পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত এম-এস্‌সি, পিএচ্‌-ডি

দশ বছর হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বিভিন্ন রাজ্যে বহুবিধ জনহিতকর পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষ যদিও কৃষিপ্রধান দেশ, তথাপি শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে যে কোন দেশই বর্তমান যুগে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না, ভারত সরকার এ কথাটা উপলব্ধি করেছেন। তাই কৃষির উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে তাই বিবিধ শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছেন সরকার। আজকের দিনে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন শিল্পই যথাযথভাবে গড়ে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি তাই সন্তোষজনকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ শিল্পের কী পরিমাণ উন্নয়ন ঘটেছে বর্তমান প্রবন্ধে সেটাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। এর আয়তন মাত্র ৩৩৯৭৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৪৮ কোটি (১৯৫১ সালের লোক-গণনানুযায়ী)। কলকাতা এবং হুগলী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী সহরগুলিতে অধিবাসীর সংখ্যা ৬·১৫ কোটি। অবশিষ্ট ১৮·৬৬ কোটি লোক গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে আবার বেশীর ভাগ লোকই (৬৮%) এমন অঞ্চলে বাস করেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি যেখান থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কলকাতার জনসমাবেশ বেশী হলেও পশ্চিম বঙ্গের সমাজ-জীবন প্রধানতঃ গ্রামীণ। এই রাজ্যে গ্রামবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৬১০ জন।

যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত, ১৯৪৮ সালে সেখানে মাত্র ৩৭টী মিউনিসিপ্যালিটিযুক্ত শহরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। তখন ছিল ২৪টী সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে আটটী কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ সমিতি (The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd) গৌরীপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি (The Gouripur Electric Supply Co. Ltd), দিশেরগড় বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি এবং এসোসিয়েটেড্ তড়িৎ কোম্পানি নামক বৃহত্তর বাষ্পোৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতো। অবশিষ্ট ১৬টার মধ্যে ১০টী প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট ডিজেল কারখানায় নিজেরাই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতো এবং বাকি ২টী বিদ্যুৎ আহরণ করতো জলশক্তি থেকে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনকোনটি মাত্র কয়েক শত একর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতো এবং বছরে মাত্র এক হাজার ইউনিট শক্তি বিক্রয় করতো, আবার কোন কোনটী পাঁচশত বর্গ মাইলেরও বেশী আয়তনযুক্ত অঞ্চলে বছরে ১০০০ লক্ষ ইউনিট শক্তি সরবরাহ করতো।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল তার ৮০% ভাগই শহর অঞ্চলে। ৮৯৭ লক্ষ ইউনিটের মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ ইউনিট (অর্থাৎ ১·৮% ভাগমাত্র) সরবরাহ করা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে।

গ্রাম এবং শহরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের এই অসাম্য দূর করার উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কল্পে একটী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৪৮ সালের বিদ্যুৎ সরবরাহের আইন অনুযায়ী যতদিন না State Electricity Boardএর প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই বিদ্যুৎ উন্নয়ন সমিতিটির উপরেই রাজ্য সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ নানাবিধ পরিকল্পনা রচনার এবং এইসব পরিকল্পনাকে রূপ দেবার ভার ন্যস্ত ছিল। ১৯৫৫ সালের পয়লা মে State Electricity Board প্রতিষ্ঠিত হলো। তখন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয়নি সেই সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কথা চিন্তা করছে। কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র প্রদেশটীকে ৩টী আঞ্চলিকভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তর বঙ্গে (তার মধ্যে দুয়াস ও কুচবিহারও পড়ে যে সব জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে রূপদেবার চেষ্টা চলেছে, সেই সব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে সে অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে তার আঞ্চলিক নাম দেওয়া হয়েছে "গ"। "খ" অঞ্চলে এখনকার মতো কতকগুলি স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর "ক" অঞ্চলে (প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগে) কলিকাতায় অবস্থিত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে এবং D.V.C. র সঞ্চালন ব্যবস্থার সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। বিদ্যুৎ শক্তির যথেষ্ট অভাব ঘটেছিল, যদিও বোম্বাই এবং অন্যান্য কতকগুলি সহরের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালোই ছিল। ১৯৫১ সালে Calcutta Electric Supply Corporation বড়ো বড়ো দুটি নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির এই ঘাটতি পূরণ করেন। বর্তমানে যদিও কলকাতার উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তি ৪৬০ মেগাওয়াট, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। Calcutta Electric Supply Corporation তাঁদের নিউকাশীপুরস্থিত

কেন্দ্রে আর একটী ৫০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করছেন। ১৯৫০ সালে Gouripur Electric Supply Co. ১৮·৭৫ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী একটী নতুন যন্ত্রের আমদানী করেছেন। বর্ত্তমানে তাঁরা ৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁদের বয়েলারের ক্ষমতা যথোপযোগী না হওয়ার জন্য তাঁরা মাত্র ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। Associated Power Co.র শিবপুর কেন্দ্র যাতে আরও ১৮৭৫ কিলোয়াট বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করতে পারেন এবং তাঁদের মোট উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ হয় ৮৩৭৫ কিলোয়াট, তার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া Dishergarh Power Supply Co. জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৬০০০ কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন। উপরন্তু D. V. C. বিভিন্ন কোলিয়ারি অঞ্চলে এবং অপরাপর শিল্প যে সব স্থানে গড়ে উঠছে সেই সব স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সঞ্চালন পথের প্রতিষ্ঠা করছেন। ভবিষ্যতে কলকাতা অঞ্চলে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ শক্তির ঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে সরকার D. V. C. কে বর্দ্ধমান এবং খড়্গপুরের ভেতর দিয়ে কলকাতা পর্য্যন্ত তাঁদের উচ্চ ভোলটেজ-সম্পন্ন গতিপথকে পরিবর্দ্ধিত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে বর্ত্তমান বৎসর থেকেই (১৯৫৭) Calcutta Electric Supply Corporation. আরও ১০০ মেগাওয়াট বেশী বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২টী ২০০০ কিলোয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষম যন্ত্রসমন্বিত একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। এই কেন্দ্র থেকে তখন ৪০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে। ময়ুরাক্ষী উপত্যকায় অবস্থিত শহরগুলির চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের আকস্মিক ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি মজুত রাখার জন্য বোর্ডের পাণ্ডবেশ্বর শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে D. V. C গ্রীড হতে শক্তি আমদানী করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে গ্রীড্ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করার প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। চারিটি ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং তার ফলে কলকাতার চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী প্রায় একশত মাইল আয়তনযুক্ত আধাগ্রামাঞ্চলে এবং ময়ুরাক্ষী উপত্যকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

স্পষ্টতঃ ছোট ছোট সহরগুলিতে পৃথক উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা লাভজনক হতে পারে না, কারণ এইরকম এক একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই আধা-শহর এবং পুরোপুরি গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন কল্পে নিকটবর্ত্তী বড়ো বড়ো বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্রগুলি থেকে (যেমন C. E. S. C, D. V. C এবং Dishergarh Power Supply Co) স্বতন্ত্র এবং শাখা সঞ্চালন-পথের সাহায্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করাটাই অধিকতর সমীচীন। প্রকৃত-পক্ষে তাহাই করা হচ্ছে। উপরন্তু কতকগুলি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান সরকার দখল করে নিয়েছেন এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে (যার আশে পাশে কোন উৎপাদন কেন্দ্র নাই) বিদ্যুৎ সরবাহের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট ডিজেল চালিত কতকগুলি উৎপাদন কেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিষয়ে সরকার উচ্চতর আশা পোষণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৬৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা—বর্ত্তমান পরিকল্পনায় ৮৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে একটী ৬০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন ক্ষম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বোর্ড অবশিষ্ট ২৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে দশটি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা হবে। এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো জলঢাকা জলশক্তি পরিকল্পনা—সেটী রূপায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুতের স্বচ্ছলতা আসবে। ভুটান সীমান্তবর্ত্তী বিন্দুখেলায় জলঢাকার প্রবেশ-মুখে একটী বাঁধ বাঁধা হবে। তারফলে বিন্দুখেলা এবং নাক্শাল-খেলার মধ্যে যে জলরাশি সঞ্চিত হবে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল-শক্তি উৎপন্ন হতে পারবে। তাছাড়া নদীটির বিভিন্ন স্তরে যদি উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহলে অন্যবারে অধিকতর বিদ্যুৎ পাবারও সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে একথাটাও বলে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিন্দুখেলা থেকে নাকশাল-খেলা পর্য্যন্ত জলঢাকার যে জলপ্রপাত, তার সমস্তটাকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না; আপাততঃ বিন্দু-খেলা থেকে নাকশালখেলা পর্য্যন্ত (জলপ্রপাতের যে অংশ শুধু সেই অংশটুকুই) ব্যবহার করা হবে। ঝালালখেলা থেকে নাক-শালখেলা পর্য্যন্ত বিস্তারিত অংশটুকুর ব্যবহার করা হবে ভবিষ্যতে। দুটী ১২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রযুক্ত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি এইরূপ একটী যন্ত্রেই স্থানীয় শহর এবং পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং চা শুকনো করার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার কাজ ভালভাবেই চলে যাবে। দ্বিতীয় যন্ত্রটীর প্রতিষ্ঠা করা হবে পরে। তার সাহায্যে সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণ করার এবং বৃষ্টির দিনে চা শুকনো করার জন্য তাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি মজুত রাখা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য জালিকাপথ তৈরী করা হবে। এই পথ আসবে চাল্সা মাল-বাজারে, তারপর বিন্নাগুড়ি, হাসিমতোলগঞ্জ এবং আলিপুর-দুয়ার হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এবং তারপর কুচবিহারে। আর একটী পথ আসবে বাগড়াকোট হয়ে কালিম্পংএ, এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে কয়লা সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার আর প্রয়োজন হবে না। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সহজপ্রাপ্য হলে সেখানে নানা রকম শিল্প গড়ে উঠবে এবং

বিশেষ করে ডুয়ার্সে'র নিকটবর্তী চা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

উপরোক্ত দশটী পরিকল্পনার অন্য একটী হলো—দুর্গাপুরে ৬০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা। এখানে নিম্নশ্রেণীর কয়লা এবং শিল্পজাত জঞ্জাল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পরে D.V.C.র ১৩২ কে-ভি শক্তি-সম্পন্ন যে সঞ্চালন পথটী কলকাতা গেছে, তার সঙ্গে এই কেন্দ্রটীর সংযোগ স্থাপন করা হবে। এই অঞ্চলে বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার উপযোগী নানারকম পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত দশটী পরিকল্পনার বাকীগুলি বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অনুন্নত অঞ্চলে, প্রধানতঃ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে কতিপয় ডিজেল-চালিত উৎপাদন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করার জন্য গৃহীত হয়েছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে ৮৩১ লক্ষ ইউনিট, ১৯৫০ সালে ৮৯৭ লক্ষ ইউনিট, এবং ১৯৫৫ সালে ১৪৭০ লক্ষ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে শতকরা মাত্র ৭'১ ভাগ বেশী বিদ্যুৎ বিক্রিত হয়েছিল; কিন্তু ১৯৫৪ সালের তুলনায় ১৯৫৫ সালে বিদ্যুৎ বিক্রিত হয়েছিল শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। ১৯৫৫ সালে মোট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়েছিল ১৪৭৩'৮ লক্ষ ইউনিট। তার মধ্যে ১২২১'৫৩ লক্ষ ইউনিট ব্যবহৃত হয়েছিল কলকাতায় এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলে। Gouripur Electric Supply Co. ও কয়লাখনি অঞ্চলে যে সব সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে তারা ২১২'৫৫ লক্ষ ইউনিট বিক্রয় করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পল্লী অঞ্চলে মোট ৪০'৭২ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়েছিল, তার মধ্যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ২৭'৯ লক্ষ ইউনিট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ১২'৮২ লক্ষ ইউনিট বিক্রয় করেছিল। রাজ্য সরকার প্রায় ৪৫০,০০০ জনসংখ্যাযুক্ত আধা-পল্লী শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। এই সব অঞ্চলে মাথা পিছু বছরে গড়ে ৩০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে সব মফঃস্বল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন সেখানে বছরে গড়ে মাথা পিছু ১৬ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার শেষভাগে দেখা গেল বোর্ড নানাবিধ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৪'৫ কোটি টাকার মূলধন ব্যবহার করে ৯০টি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তৎস্থলে তাঁদের বাৎসরিক আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বিদ্যুৎ শিল্পে যে মূলধন প্রয়োজন, তার অনুপাতে আয়ের হার অপেক্ষাকৃত কম।

কলকাতা এবং কলকাতার সহরতলী, হাওড়া এবং হুগলী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী ৪৫ মাইলের মধ্যস্থিত শিল্প অঞ্চল—মোট ৮ লক্ষ জনসংখ্যাযুক্ত এই ৫০০ বর্গ মাইল স্থানে মাথা পিছু বছরে ৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। তার প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিই উক্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

১৯৪৮ সালে বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রেতাসংখ্যা ছিল ১৩২৬৮৭, আর ১৯৫৫ সালে ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে হলো ২৪৬২১০। ১৯৫৬ সালেও বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালের তুলনায় শতকরা ৯'২৫ ভাগ বেশী এবং ১৯৪৮ সালের তুলনায় প্রায় দুগুণ বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে ১৯৫৬ সালে।

কলকাতায় এবং তার আশে পাশে বিদ্যুৎশিল্প এবং অপরাপর শিল্প পারস্পরিক সহায়তায় যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করেছে। এই সব অঞ্চলে নানা-প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল বলেই যে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এ কথাটা খুবই সত্যি, কিন্তু এ কথাটাও অস্বীকার করা যায় না যে বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতির জন্যই অপরাপর শিল্পগুলি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে দেশের শিল্পকে উন্নত করতে হবে। শিল্পোন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি অপরিহার্য্য। গ্রামাঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ না পেলে শিল্পের বিস্তার হবে না। অথচ গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থা শহরতলীর লোকের আর্থিক অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একই দরে বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে হলে, স্বভাবতই বোর্ডকে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তবু রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে বোর্ড সে রকম ক্ষতি স্বীকার করতেও প্রস্তুত আছেন।

তাজমহল

মর্ম্মর-কুসুম-শেজে কালিন্দীর কূলে
মৃত্যু-মুগ্ধ মমতাজ যাপে অবসর।
ক্ষরিতেছে অভ্র-শোভা শুভ্র সূর্য্যকর
সৌধ শিরে—স্মৃতি-সুধা-স্নিগ্ধ তাজ-ফুলে।
স্বপ্ন-ঘুমে অকস্মাৎ পড়িল কি ঢুলে
মমতার মমতাজ! অনিন্দ্য সুন্দর
প্রেমার্দ্র মর্ম্মরে সে কি পেলো রূপান্তর!

তুরন্ত জীবন-পথে যেতে গেলো ভুলে!
শুদ্ধ মহাকাল আর মর্ম্মর-মূরতি
পাশাপাশি শোভা পায় মহাশূন্যতলে।
নিস্তব্ধ—নিমেষ-হত জীবনের গতি
হেথা বুঝি! সৌন্দর্য্যের ফুল্ল শতদলে
জীবন লভিল হেথা শান্ত সমুন্নতি।
মহাদৃশ্য;—মুগ্ধ আঁখি ভরে অশ্রুজলে।

বিকল্প

বিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

সারাদিন জেলা-শহরে কাটিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রওনা হয়ে আসছিল। শহর শেষ হবার পর ধূলি-ধূসরিত লাল মাটির সড়ক। দীর্ঘ সরল রেখার মত। কখনও বিসর্পিল। আর ফসলের ভারে নুইয়ে পড়া দুপাশের আদিগন্ত মাঠ। রাশি রাশি ধান কাটা চলেছে মাঠে মাঠে। এখানে ওখানে তাঁবুর মত ছাউনি বেঁধে ধান পাহারা দিচ্ছে সাঁওতালরা। কোথাও বা ধান বোঝাই গাড়ী চলেছে মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। জোতদার—মহাজন—আর অবস্থাপন্ন চাষীর খামার বাড়ীতে।

মণ্টাদের গাড়ীটাও চলছিল। ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে। গাড়োয়ান দাস্থ মাঝে মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছিল খয়েরি রঙের বলদ দুটোর। চাবুক মারছিল আর চীৎকার করছিল, চল না শা—এই হাঃ হাঃ—আরে ডাহিনে।

গাড়ীর ভেতর বসে গল্প করছিল ওরা তিনজন। মণ্টা, দিলীপ আর স্মরজিৎ। টুকরো টুকরো হাসি, গুণ গুণ কথা, আর পোড়া সিগারেটের গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। গরুর পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছিল—সে ধুলো ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকের মাঠে। ধূলাচ্ছন্ন আকাশের দিগন্তের সঙ্গে যেন শীত-কুয়াশা-সন্ধ্যার আশ্চর্য্য মিতালি।

মণ্টা অনেকক্ষণ কোন কথা বলছিল না। চুপ-চাপ বিড়ি ফুঁকছিল অন্যমনস্কের মত। স্মরজিৎ এবার মণ্টাকে খোঁচা মেরে বলল, এত ভাবছ কি?

—কিছু না। মণ্টা উদাসীন জবাব দিলে।

—নিশ্চয়ই কিছু। দিলীপ স্মরজিতের দিকে তাকাল।

—শহরে মালাটা কার জন্যে কিনলে? স্মরজিৎ মণ্টার চোখে চোখে তাকাল।

মণ্টা কিছু বলল না। শুধু হাসল।

স্মরজিৎ বললে, হাসি নয়, বল কার জন্য কিনলে?

—রঙ্গুর জন্য। দিলীপ আর একটা সিগারেট টেনে বের করল প্যাকেট থেকে।

—রঙ্গু! সেই সাঁওতাল মেয়েটা! স্মরজিতের দুটো চোখ আয়ত হয়ে যেন স্থির হলো।

মণ্টা কোন কথা বললে না। শুধু এক ঝলক রক্ত এসে জমা হলো তার পোড়াটে মুখেচোখে আর কপালে।

গাড়ী এগিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর্ত্তনাদ করছে গাড়ীখানা। দাস্থর ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে দু-চারটে আলো দুলছে। হাট করে ফিরে চলেছে গ্রামের দেহাতীরা। শীতার্ত্ত বাতাসে ভাসছে ধান খেতের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। গাড়ী চলছেই। মৃদু-মন্থর শম্বুক গতিতে। কখনও উঁচু নীচু অসমতল পথে ধাক্কা খাচ্ছে। কখনও প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে বুকে পীঠে ব্যথা পাচ্ছে তিন বন্ধু। তখন গালাগালি করছে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে।

এমনি করেই দীর্ঘ পথে পাড়ি জমিয়েছে মণ্টা, দিলীপ আর স্মরজিৎ। দাস্থ গাড়ী চালাচ্ছে আপন মনে। কখনও 'চুরুট' ধরিয়ে টান দিতে দিতে আপন মনে গেয়ে উঠছে গানের দুটো কলি। কখনও সে বলদ দুটোকে বকছে। আর কখনও তাকিয়ে দেখছে শীতকাঁপা আকাশের গায়ে রুগ্ন তারার ক্ষয়িত দ্যুতি। এক সময়ে দাস্থ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, হা হা এই থাম, থাম না, শা—

স্মরজিৎ আর দিলীপ যেন ঝুঁকে পড়ল। দেখল বাইরে লাল মাটির পথের ওপর এক সার বাবলা ঝোপের মাঝে একটা কালভার্ট। কালভার্টের ওপর বসা একটি সাঁওতাল তরুণী। তন্বী শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যৌবন যেন কূল ছাপিয়েছে। মাথার খোঁপাতে রাঙ্গা জবা। হাতে একটি পুটুলী। তার হাত ধরে টানছে আর একটি সাঁওতাল—

পানোন্মত্ত, অপ্রকৃতিস্থ। দুটো মদ-মত্ত চোখ যেন ঝক্‌ঝক্‌ করে অন্ধকারে জ্বলছে। মণ্টা উঁকি মেরে দেখেও অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না। চিনতেও পারল না কালো কালো দুটো পাথরের মূর্ত্তির মত দেহকে। কি যেন বলতে চাচ্ছিল মণ্টা, স্মরজিৎ বললে, ওদের বাধা দিয়ো না। যেতে দাও।

গাড়ী চলছিল। দীর্ঘ পথের পর ক্লান্ত বলদ-জোড়ার ধীর-মন্থর পদক্ষেপ। চোখে চিক চিক করছিল ফোঁটা ফোঁটা জল। দূরে কোন সাঁওতাল জনপদ থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছিল, আর গানের দু-চারটে অস্পষ্ট কলি। গাড়ীর ভেতরে তিনজনেই চুপ-চাপ। পাখীহারা বাসার মত নিঃঝুম। মণ্টা আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

চাকরি হারিয়েছে মণ্টা। জমিদারী-জোতদারী মধ্যস্বত্ব লোপ হতে চলেছে দেশে। জোত-কৃষিতে নির্ভরশীল মণ্টার বাবা ওকে পাঠালেন চাকরিতে। কোলকাতার শিল্পাঞ্চলে। একবার আই-এ পরীক্ষার সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে চাকরি নিয়েছিল বেলঘরিয়ার এক লোহা-কারখানায়। বছর ঘুরতেই ছাঁটাইয়ের নোটিশ। তারপর আবার ফিরে এসেছে তার গ্রামের বাড়ীতে। উত্তর বাঙ্গলার এই ধলপুর গ্রামে। বাবা বলেছেন, খেত-খামার হাল গরু দেখ, আর কি করবি ?

কোন প্রতিবাদ করেনি মণ্টা। এ যুগের ছেলে হয়েও খেত-খামার আর হাল গরুতে মন দিয়েছে সে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে খামার বাড়ীতে ধান তোলে, ধান মাড়াইয়ের কাজ চলে তখন। আর এ সবের তদ্বির-তদারক দেখা-শুনা করে মণ্টা। বাবা আজকাল সকাল-সন্ধ্যা ঠাকুর ঘরে। আর কমার পর যেন বড় বেশী আশ্রয় করেছেন ঠাকুরকে। অবসর সময়ে ঘুরে বেড়ায় মণ্টা। পাখী মারে। শীকার করে বনে-জঙ্গলে। আর খালে-বিলে নদীতে ছিপ ফেলে। ষোলো মাইল দূরের জেলা শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে। কিম্বা আনন্দ খোঁজে। কখনও জেলার বড় বড় মেলাগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই একক অবিবাহিত জীবনে উত্তেজনা আছে মণ্টার, কিন্তু শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রেরণা নেই। আশ্চর্য্য! আর তখন একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে মণ্টা ভাবে—ভারী রোজগারের স্বপ্নভরা কোল-কাতার স্বচ্ছন্দ জীবন—দিলীপ আর স্মরজিতের। সময় মত টোপর মাথায় পরে সংসারী হয়েছে দুজন—বাচ্চাও নাকি হবে শীগ্‌গিরই। এবার যেমন এসেছে, তেমনি মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। একা নয়। জোড়া মিলিয়ে। কখনও জ্যোৎস্না-পাগোল কোন রাতে, পাশাপাশি ওরা হাঁটে। পা' মেলায়। চুরির রিণি-রিণি, ভাঁজ-ভাঙ্গা শাড়ী আর স্নো-পাউডারের খুশি করা সুরভি। বাতাস বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর বয়স হয়েছে মণ্টার, অথচ রোজগার নেই। খেত-খামারের যা আয় তাতে সংসার করা চলে মণ্টাদের, কিন্তু বিয়ে করা চলে না। ভেবেছিল মণ্টা, লোহা-কারখানার রোজগারটা আর একটু বাড়লে বিয়ে করবে সে। একদিকে জীবনের অতন্দ্র বাসর রাত্রি, আর একদিকে আত্মীয়-পরিজন ঘেরা সংসারের আনন্দ কল্লোল মণ্টা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল। আনন্দে দুলে উঠেছিল সারা মন। কিন্তু তা হয়নি। অতন্দ্র বাসর-রাত্রির স্বপ্ন বুঝি আজ খান্ খান্ হয়ে ভাঙে নারীহীন যৌবনের কোন দুঃসহ মুহূর্ত্তে। মণ্টা জানে, তার জীবনের সীমানা থেকে কোকিলের ডাক, পাখীর গান, আর ফুলে ফুলে আকুল বসন্ত বুঝি অনেক দূরে। অনেক।

আজ আর কোন স্বপ্ন দেখে না মণ্টা। খামার বাড়ী, রঙ্গু, মাছ-মারা, আর পাখী-শিকারের ভেতরেই জীবনকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। আনন্দ পেতে চেয়েছে।

ছাঁটাইয়ের নোটিশ হাতে কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল মণ্টা। ম্যানেজারের ভ্রু-কুঁচকে বলেছিলেন, স্যরি, আর কিছু করা সম্ভব নয়।

আর কোন কথা বলেনি মণ্টা। তেমনি নোটিশ হাতে ফিরে এসেছে তার গ্রামে। ধলপুরে। আর কোথাও যায়নি সে।

বরিন্দের এই ধলপুর গ্রাম। চারিদিকে আম-কাঁঠাল আর বাঁশ বনের ছায়া-শীতলতা। এখানে ওখানে মজে-আসা পুকুরের শান্ত সৌন্দর্য্য। আর লাল মাটির অকর্ষিত প্রান্তর। এই গ্রাম, এই পরিবেশ, এই মাটি-ঘেঁষা জীবন যেন বন্ধুর মত পাশে দাঁড়িয়েছে মণ্টার। ভুলিয়েছে তরুণ বয়সের যত দুঃসহ ক্ষোভ আর হতাশা। এখানে জোত-জমি দেখে, মাছ মেরে, শিকার করে খুশি হতে চেয়েছে মণ্টা। গত ছ' মাস সে এই ভাবেই কাটিয়েছে।

তারপর মাঠে মাঠে ফসল কাটার সময় হয়েছে। সঙ্গে ধান মাড়ার কাজ।

এইখানেই রঙ্গুকে দেখেছে মণ্টা। বছর কুড়ি বয়সের এক লাস্যময়ী সাঁওতাল তনয়া। দেহের রেখায় রেখায় যার স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য্য। আগুনের আঁচ। আরও অনেক খেত-মজুরের সঙ্গে কাজ করে রঙ্গু, ধান মাড়ে। গোলায় ধান তোলে। ধান ঝাড়ে। মণ্টা আর একটা বিড়ি ধরালো।

দাসু এইবার গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, নামেন বাবু—পৌঁছে গেছি।

—সে কি রে? মণ্টা গায়ের আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল।

দাসু বলদ দুটোর লাগাম বাঁধলো গাড়ীর চাকার সঙ্গে। আর রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে মণ্টা বাড়ীর পথ ধরল। তারপর দাসু লণ্ঠন হাতে গেল পৌঁছে দিতে! দিলীপ আর স্বরজিৎকে।

বাইরের ঘরের মেঝেতে বসে ঠাকুমা সলতে পাকাচ্ছেন। বাবা রামায়ণ পড়ছেন। পাশে হ্যারিকেন জ্বলছে। আর চারিদিকে অন্ধকার। এ দিকে গোয়াল ঘরে লালমণি গাইটা হঠাৎ ডেকে উঠল একবার। মণ্টার পায়ের শব্দে ঠাকুমা চমকে তাকিয়ে অবাক হলেন, সে কি রে, তুই?

—এত দেরী করলি কেন? বাবা 'রামায়ণ' থেকে মুখ তুললেন। ঠাকুমা বললেন, যা চট করে হাত মুখ ধুয়ে নে, অনেক রাত হয়েছে।

হাত-মুখ ধুয়ে মণ্টা দেখলে খাবার জায়গা তৈরী। আসন থালা গ্লাস প্রস্তুত। ভাতটা নিজেই বেড়ে নেবে ভেবেছিল—কিন্তু বাবা বারণ করলেন, বললেন, তুই বস, আমি দেই।

বাবা পরিবেশন করলেন ভাত-ডাল-ভাজা ও মাছের ঝোল। ঠাকুমা এক বাটি ঘন দুধ, আর একটা কলা দিলেন নামিয়ে। মণ্টা ধীরে ধীরে খেতে লাগলো। ঠাকুমা বললেন, ভাল করে খা, সারাদিন এত ভাবিস কি?

ঠাকুমার কথায় হাসি পেল মণ্টার, তবুও হাসল না। আপন মনে খেয়ে চলল। ছেলেবেলায় মা'কে হারিয়েছে মণ্টা। মা'কে মনে পড়ে না। জ্ঞান বয়স থেকেই বাবা আর ঠাকুমার ছায়ায় মানুষ হয়েছে সে। খাওয়ার পর শুতে এল মণ্টা! পাশের ঘরে বাবা ও ঠাকুমা শুয়ে গুণ গুণ করে কি কথা যেন বলছেন। কান পেতে শুনল মণ্টা। সব কথা। ঠাকুমা ও বাবা তাকে নিয়েই আলোচনা করছেন। ঠাকুমা বলছেন, মণ্টার এখন বয়স হয়েছে, বিয়ে দেওয়া দরকার। বাবা শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছেন, হুঁ।—যে বয়সের যে ধর্ম। বয়স কালে বিয়ে না করলে চলে? ঠাকুমার গলা আবার শুনতে পেল মণ্টা।

বাবা বললেন, রোজগারটা বাড়লেই ত' হয়।

শুয়ে শুয়ে মণ্টা একটা বিড়ি ধরালো। দেশলাই কাঠি জ্বালাবার শব্দে ঠাকুমা বললেন, কিরে মণ্টা ঘুমাস্ নি।

মণ্টা ইচ্ছা করেই কোন জবাব দিল না। লেপটা টেনে নিল আরও একটু। লেপের ওয়াড়ের খানিকটা ছিঁড়েছে। ওখানে পা' ঢুকিয়ে বেশী করে ছিঁড়তে যেন মজা পায় মণ্টা। আজও তাই করল। তারপর বিয়ের প্রসঙ্গে রঙ্গু এসে ভীড় করল চেতনায়। এই রঙ্গু—যে রোজ আসে খামার বাড়ীতে, ঘর-দুয়ার নিকিয়ে দেয়, ঘরে ফুল রাখে, বয়সের ধর্মেই তাকে ভাল লাগে মণ্টার। অথচ—অথচ তা বলতে পারে না কাউকে। সারা সকাল মাঠে মাঠে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খামার-বাড়ীতে ফেরে মণ্টা। আর তখন তারই চোখের সম্মুখে মাঝ বেলার রোদ গায়ে মাথায় মেখে লাল শাড়ী মোড়া লাস্যময়ী একটা দেহ-রেখা সারা খামার বাড়ীতে ছুটে ছুটে বেড়ায়। টক-টকে লাল এক আগুনের শিখা ছুটে ছুটে বেড়ায় যেন। রঙ্গু ধান মাড়ে, ধান তোলে, ধান মেলে দেয় রোদে। মণ্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—যেন দুটো চক-চকে চোখে লেহন করে রঙ্গুকে। তারপরেই ডাকে, রঙ্গু!

—বাবু। রঙ্গু এসে পাশে দাঁড়ায়। দুটো ঠোঁটে মিটি মিটি হাসে। মণ্টা তাকিয়েই থাকে—রঙ্গুর গোলাকৃতি মুখ, পরিপুষ্ট কাঁধ-গলা আর আশ্চর্য্য ভরাটবুক যেন জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে মণ্টার চোখের ঐ আগুনে। আর মণ্টার ভেতর একটা চাপা আগুন সব কিছু চৌচির করে' থেকে থেকে জ্বলে ওঠে যেন। তারপর ডুবে যাওয়া গলায় মণ্টা বলে, এক গ্লাস জল দিবি রঙ্গু?

কোন কোন দিন বা বিকালে। ইজি-চেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়েছে মণ্টা। রঙ্গু ধান ঝাড়ছিল। মণ্টা ডাকলো, রঙ্গু!

—বাবু।

—হাটে যাব।

রঙ্গু চাপা হাসে, কিছু বলে না।

মণ্টা আবার বলে, তোর জন্য কি আনব?

রঙ্গু খিল-খিলিয়ে হাসে।

—বল কি আনব? কাণের দুল, না গলার মালা? মণ্টা অস্থির হয়ে ওঠে।

—যা মন চায়। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কাজে যায় রঙ্গু।

রঙ্গুর স্বামী লক্ষণ। রঙ্গুর পাশে কৃশকায় লক্ষণ যেন বেমানান এবং কুৎসিৎ। আজ এই রাতে একা একা শুয়ে কথাটা মনে হলো মণ্টার। বার বার মনে হলো। তারপরেই ফস করে যেন কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলে মাথায়। গ্রামে যাত্রা গানের ঢোল সহরৎ করে ভিখন। ভিখন কেন ঘোরে রঙ্গুর পাশে? কেন ঘুর-ঘুর করে? এই ত' সেদিনও সন্ধ্যার পর নদীর পাড়ে ভিখন আর রঙ্গুকে পাশাপাশি দেখেছে মণ্টা। ভিখনের হাতে ছিল একটা বাঁশি। লক্ষণ কি এসব জানে? নিশ্চয়ই জানে। তাই বুঝি রঙ্গুর চারপাশে ঘোরে লক্ষণের সজাগ-সন্ধানী দৃষ্টি। সেই একদিন। এক নিরিবিলি প্রথম রাত্রির অন্ধকারে খামার বাড়ীর ঘরে বসেছিল মণ্টা। চুপ-চাপ একা একা বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টাচ্ছিল, আর ধান পাহারা দিচ্ছিল। এমন সে প্রায়ই থাকে এই ধানের মরশুমে। বাইরে শীতার্ত্ত রাত্রির মৌনতা। একটা শিয়ালও ডাকছে না কোথাও। উঠানে একটা ছায়া পড়ল।

—কে? চমকে উঠল মণ্টা।

—রঙ্গু।

রঙ্গু হাসল। মণ্টা বলল, এত রাত্রে কেনরে রঙ্গু?

রঙ্গু এসে চৌকাঠে দাঁড়ালো। তার স্ফীতকায় কাঁধ, সুডৌল বাহু, আর নিটোল বুকের রেখায় রেখায় উদ্ধত যৌবন যেন কথা কয়ে উঠল। হেসে বলল, একটা টাকা দিবি বাবু? মেলায় যাব।

মণ্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রঙ্গুকে। চারিদিকে এই অন্ধকার শীতের রাত, কেউ কোথাও নেই, চুপ-চাপ নিঃঝুম এই খামার বাড়ীর ঘরে মণ্টা আর রঙ্গু। শরীরের ভেতর সিরসিরিয়ে উঠল কি একটা লাভা-স্রোত। মণি-ব্যাগ খুলে একটা টাকা এগিয়ে দিচ্ছিল মণ্টা। বাইরে পায়ের শব্দে থেমে পড়ল সে। লক্ষণ এসে সাক্ষাৎ যম-দূতের মত দাঁড়িয়েছে। লক্ষণের দিকে তাকাল মণ্টা—অপরাধীর মত। লক্ষণ হাসল, কিন্তু দুটো চোখে কি এক হিংস্রতা। লক্ষণের চোখেত সেই দৃষ্টি ভুলতে পারে না মণ্টা। অনেকদিন ভোলেনি।

অনেক রাত হয়েছে। পাশের ঘরে বাবা আর ঠাকুমা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। মণ্টার আর ঘুম এল না। সারা মাথা যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। রক্ত ফুটছে। এ পাশ ও পাশ করে আর একটা বিড়ি ধরালো মণ্টা। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা। তার পাশে মায়ের ফটো। মণ্টা চোখ দুটো বুজবার আগে আর একবার তাকাল সে দিকে।

পরদিন সকালে। সিল্কের মত রোদ ছড়িয়ে আছে খামার বাড়ীর চারিদিকে। তকতকে নিকানো এই খামার বাড়ীর আঙিনা। এক ঝাঁক পায়রা নেমেছে উঠানে। খুঁটে খুঁটে সকালের রোদে ধান খাচ্ছে। উঠানে নিম গাছটায় একটা ঘুঘু ডাকছে অলস হয়ে। চারিদিকে ধান মাড়া চলছে। খেত-মজুর আর দিন-মজুরেরা কাজ করছে যে যার মতন। লক্ষণও কাজ করছে। শুধু রঙ্গু আসেনি। ইজি চেয়ারটা টেনে নিলে মণ্টা। একটা বিড়ি ধরালো। বিড়ির প্যাকেটটা বের করতে গতকাল বিকালে কেনা সেই পুঁতির মালাটায় যেন হাত লাগলো মণ্টার। আর তখনি যেন আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল মণ্টা। রঙ্গু? রঙ্গু এখনও এল না কেন?

বেলা আরও বাড়লো। সূর্য্য আরও ওপরে উঠে এল। নিম গাছের ডাল ছেড়ে ঘুঘুটা কখন উড়ে গিয়েছে। সেখানে নতুন একজোড়া শালিক বসে কিচির মিচির করছে বিশ্রীভাবে। কিন্তু রঙ্গু এল না তখনও। আরও একটু পরে এল দিলীপ আর স্মরজিৎ। যেন রাজ্য জয় করে এল। এসেই বললে, কি হে চা' কোথায়?

—চা' হবে না।

—কেন ?

—রঙ্গু আসেনি।

গত ক'দিন সকালে যখন ওরা এসেছে, রঙ্গু জল গরম করে দিয়েছে। তারপর চা'দুধ-চিনি নিজেরা মিশিয়ে নিয়েছে। হাতে চায়ের পেয়ালা, রোদে পীঠ দিয়ে হাসি-গল্প, আর জমাট আড্ডা। কলরবে মুখর। আজ কিন্তু সে আসর জমল না। রঙ্গু নেই। সুতরাং চা' তৈরী হলো না। স্মরজিৎ জানতে চাইল—কিন্তু রঙ্গু আসছে না কেন ?

—জানি না। মণ্টা নিরুৎসাহিত হয়ে বললে।

চারদিকে বেলা বাড়ছে। শালিক জোড়া কখন উড়ে গিয়েছে কে জানে। নিম গাছটার নিচে ছায়া-স্নিগ্ধতা।

মণ্টা ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু।

—রঙ্গু আসেনি ?

—না। আর কোনদিন আসবে না।

কলিজায় যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল মণ্টা। আর রোদে-পোড়া লম্বাটে মুখটায় দ্রুতগতি রেখান্তর। তারপর ভ্রু কুঁচকালো, আসবে না কেন ?

—পালিয়েছে।

—সে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিখনের সঙ্গে পালিয়েছে। শালা বদমাস !- লক্ষণের চোখ জোড়া জলতে লাগলো বন্য-বেড়ালের মত। ফাটা ফাটা বিবর্ণ ঠোঁট-টা কাঁপতে থাকলো উত্তেজনায়। ভিখনকে পাশে পেলে বুঝি এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ত লক্ষণ। নিশ্চিত ঝাঁপিয়ে পড়ত। মণ্টা তখনই কিছু বলল না। খামার বাড়ীর চারি দিকে তাকাল একবার। কি ভাবল মনে মনে। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরবার পথে কালভার্টে বসা সেই মেয়েটীকে মনে পড়ল। মণ্টা ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু।

—বাড়ী থেকে বন্দুকটা নিয়ে আয়। পকেটে পুঁতির মালাটা অকারণে আর একবার হাতিয়ে নিল মণ্টা।

—সে কি হে ? শেষে সুইসাইড ? স্মরজিৎ অবাক হয়ে তাকাল।

—শেষে রঙ্গুর জন্ত সুইসাইড ? দিলীপ উঠে দাঁড়ালো উত্তেজনায়।

মণ্টা হাসল, তার চেয়ে চল পাখী শিকার করে আসি, ভাল লাগবে।

দিলীপ আর স্মরজিৎ হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু মণ্টা হাসল না। ইজি-চেয়ারে শরীর এলিয়ে তেমনি বসে রইল সে। উঠবার কোন আগ্রহ দেখাল না।

চারিদিকে রোদ বাড়ছে। এই প্রান্তরের বাতাসে শীতের কুহেলি। সম্মুখে দক্ষিণের প্রসারিত আকাশ। তারপরে দিগন্ত। নীচে মেঠো-পথে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি। স্ত্রীর কোলে শিশু-সন্তানের হাসিমাখা মুখ। একটুকরো নিখুঁত শিল্পরূপ যেন। অনন্ত কালের ম্যাডোনা। মণ্টা সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। বেশ অনেকক্ষণ। তারপর ডাকলো, লক্ষণ !

—বাবু !

—বন্দুক আনার আর দরকার নেই।

—আজ্ঞে।

মণ্টা তাকিয়েই রইল। মেঠো-পথ ধরে তখনও এগিয়ে চলেছে সাঁওতাল-দম্পতি। সুস্থ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের প্রাচুর্য্য ছড়িয়ে পড়ছে ওদের প্রতি পদক্ষেপে। একটা সিগারেট ধরালো মণ্টা। সে জানে পাখী শিকারের ঐ বিকল্প রোমাঞ্চ আজ আর ভাল লাগবে না তার। ভাল লাগতে পারে না। তার চেয়ে বরং এই সকালের প্রসন্ন রোদে বসে ঐ সাঁওতাল-দম্পতির মত আর এক জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগছে মণ্টার। যে জীবন সে কামনা করেছে এতকাল, কিন্তু পায়নি।

খাদিগ্রামে কয়েকদিন

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

(১)

গন্তব্যস্থল হচ্ছে : খাদিগ্রাম।

শাসন আর শোষণ-মুক্ত সর্বোদয়-সমাজের এক শান্তিপূর্ণ বাস্তব রূপায়ন নাকি সেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিফলিত হয়েছে! আর, তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করাবার জন্য অক্টোবরের পাঁচ থেকে আট তারিখের এক চারদিনব্যাপী শিবির সেখানে স্থাপিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক শহরজীবনের অলিতে গলিতে তর্কবাগীশ—শালিক আর উত্তেজিত ছুছুন্দরের কল-কোলাহল ছোঁয়াচে রোগের মত বড়ই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এ-ও নাকি এক ধরণের গণতন্ত্র, এরাও ত গণ! কিন্তু, কি জানি—এই গণের মুখ থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পাওয়ার জন্য একদল অতি-সাহসী উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কর্মী, সাহিত্যিক-সাংবাদিক বিজয়া-দশমীর পরদিন সেই খাদিগ্রামের উদ্দেশে গিয়ে জমায়েত হল হাওড়া ষ্টেশনে, রাতের মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেণের এক রিজার্ভ করা বগিতে।

রাতের বিনিদ্র মুসাফিরিতে বৈচিত্র্যের রাসোৎসব দেখা যাবে।—থাকবে সেখায় তারুণ্যমনা প্রৌঢ় ফণিদাদার সরস গল্প, প্রবোধবাবুর টিপ্পনি, বিনয়মাষ্টারের প্রামোদ্যোগী নারিকেল-টুকরো বিতরণ, ভবানী-ভায়ার অক্লান্ত জল-পরিবেশন, সপ্ত-তরুণ ছাত্রদলের শারদীয়া সংখ্যা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র সুরে গান আর আবৃত্তি, পক্বচুলো সার্বজনীন সুধীরদাদার নির্ভেজাল গাণিতিক পরিমাপের নিদ্রা। এর ফাঁকে ফাঁকে রাত্রির দীর্ঘ যামে বাইরের জোছনা-ধোয়া প্লাটফরম থেকে কামরার মধ্যে ভেসে আসবে দেহাতী গলার সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'চা-য়-গ্রা-ম' সুর। সেই সুরে হয়তো কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়বে, আসবে সেখানে সুপ্তিনিসূদন ত্বলন্ত-মুখ টিকেট-চেকার, তন্দ্রার ঘোরে কেউ বুঝি টিকেটের বদলে রোমাঞ্চিত চিঠি ই একখানা তার হাতে দিয়ে দেবে—উঠবে আবার চৌমোড়া হাসির ঢেউ। এমনিভাবে দুরান্তিক মাইথন জলাধারের চালচিত্র পিছনে রেখে রূপনারায়ণপুর নগরের উপর দিয়ে রাত্রি প্রভাত হবে। প্রধানদলের কণ্ঠে জাগবে সামগানের মত পবিত্র এক প্রভাতী ভজন। নতুন আলোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুয়াশা-জড়ান ঘুম-ঘুম পাহাড়গুলো দল বেঁধে দূরে দূরে ছুটবে।

বেলা ক্রমে বাড়বে। আসবে কারমাটার, মধুপুর, জসিডি, ঝাঁঝা। তারপরে জামুই ষ্টেশন। সাঁওতালী পরগণার শেষে ঝাঁঝা থেকে মুঙ্গের জেলা শুরু হয়েছে। হাওড়া থেকে দু'শো সাঁইত্রিশ মাইলের ব্যবধানে জামুই ষ্টেশনে ঝোলাঝুলি নিয়ে নামতে হবে। ওপারে দেখা যাবে—সারি দিয়ে অপেক্ষা করছে টাঙ্গা আর বয়েল-গাড়ি। হাসিমুখে এগিয়ে আসবেন খাদিগ্রামের সুপরিচিত কর্মী শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ করার মত তাঁর হাতে নিজেকে নিঃসঙ্কোচে ছেড়ে দেওয়া চলবে। কুণ্ঠা নেই, ক্লান্তি নেই—। গান্ধীবাদী কর্মঠ মানুষটির তত্ত্বাবধানে অতঃপর টাঙ্গার টক্‌টক্ করতে করতে জামুই বাজারকে পেছনে রেখে মহুয়া-অশ্বত্থ-আম-জামের ছায়ায় ছায়ায় প্রশস্ত পিচঢালা মুঙ্গেরের বাস-পথ ধরে মাইল তিনেক চারেক অগ্রসর হলে দেখা যাবে—শ্রম-ভারতী, খাদি-গ্রাম। গন্তব্যস্থলের আপাত-নিশানা।

(২)

শ্রম-ভারতী, খাদিগ্রাম।

বিহারের এলাকা হলেও বাংলার শ্যামায়মান প্রাকৃতিক পরিবেশ এই অঞ্চলটিকে নিবিড় করে ঘিরে রেখেছে। উলঙ্গ পাহাড়ের বদলে নধর বনশ্রীমণ্ডিত শৈলশ্রেণী এর চারপাশে, সতেজ লালমাটিতে বিভিন্ন শাক-সব্জীর সোঁদালো সবুজ যৌবন, মাঝে-মধ্যে ফলন্ত উদ্যানের জটলা। এদিক-ওদিকে উঁচু আলের তৈরী বাঁধে জল ধরে রাখা হয়েছে। আশ্রম-কর্মীদের শ্রমে গড়া চওড়া উঁচু সড়ক সরকারী রাস্তার গা দিয়ে বেরিয়ে এঁকে-বেঁকে এই আশ্রমে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

গোটা খাদিগ্রামটি একটি আশ্রমের মত। স্বয়ং-সম্পূর্ণ মুক্ত গ্রাম। একশ' কুড়ি বিঘা জমির উপর এর প্রতিষ্ঠা। পূর্বে এটি বিহার চরকা সংঘের জমি ছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আসে, এবং তাঁরই নিজস্ব পরিকল্পনায় এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভূদান-মূলক কর্ম-আশ্রমস্থলী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। সাম্যযোগ, ভূদান-মূলক গ্রাম প্রতিষ্ঠা, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি এই কর্ম-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচী।

শাসন-শোষণ ও সংগ্রাম-চৌচির পৃথিবী আজ শান্তির জন্য লালায়িত। যুগের প্রয়োজন আজ, সকল রকম শ্রেণী-বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সকলের মধ্যে সর্ব-সমতার শান্তিপূর্ণ উদয়—বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-ধর্ম-রাজনীতি-নির্বিশেষে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদও শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে হবে। নবশান্তি স্রষ্টা অহিংস সর্বোদয় এখন বিশ্বের মুক্তি-মন্ত্র।

এই সর্বোদয়েরই আদর্শ সম্মুখে রেখে একদল শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মী শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে খাদিগ্রাম শ্রম-ভারতীর শান্ত ছায়ায় বসে নবীন ভারত গঠনের জন্য হাতে-কলমে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করছেন। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন পঁচিশটি কর্মী-পরিবার ও দশটি অবিবাহিত কর্মী। খাদিগ্রামের কাছাকাছি আরও কয়েকটি গ্রাম দান হওয়ায় পরিবেশটি আরও সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

(৩)

বিরাট আশ্রম-চত্বরের প্রবেশপথ ধরে বিস্ময়াবিষ্ট মনে এগিয়ে চলেছি। রৌদ্র তাপকে দহন বলে অনুভব করা যাচ্ছে না। বন-নীল 'ধনুশির' শৈলশ্রেণী থেকে আসছে বাতাসের উদ্দামতা, গৈরিক বাঁধের জলে মৃদু তরঙ্গের ইসারা, বহুরঙা ফুলের বনে রোমাঞ্চিত সুরভি—বৈরাগী মনে অজান্তে কখন যেন সারা ভারতের সমগ্র বিশ্বের জন্ম-জন্মান্তরের মুসাফির মনটি এক নিমেষে দেহজ জীবনে এসে ভর করে দাঁড়াল। মনে মনে জন্ম নিল কবিতার মত কয়েকটি লাইন:

আমি কবি ধরণীর
উত্তর সরণির
কঙ্করে রচি যত গান—
আমি কবি বিশ্বের
রিক্তের নিঃস্বের
গ্রামীণের লাঙলের তান।
আমি কবি শ্রমিকের
মজুরের দিনেকের
ঘামে-জলে সাধা তাজা প্রাণ—
কর্মের ডঙ্কে
চলি নিঃশঙ্কে
কর্মে নি জীবনের ত্রাণ।…

কার ডাকে সহসা কাব্যে ছেদ পড়ল।—ওই দেখুন, ওটি হচ্ছে শ্রম-সরঞ্জাম-ভবন। অম্বর চরকার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ওরই মধ্যে রাখা হয়ে থাকে।

দেখলাম। পাশাপাশি চলেছেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মুখে তাঁর পরিতৃপ্তির আমেজ।

বললেম—দাদা, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ম যদি এমনি নিরালয় থাকার সময় পেতাম, তাহলে হয়ত কিছু লেখার মত লেখা হত!

—যেটুক পাও, আপাততঃ তারই সদ্ব্যবহার করে নাও, ভারতবর্ষ তো তোমাদের মুখ চেয়েই আছে।

দাদা বিদগ্ধ মানুষ, প্রতি কথায় তাঁর টিটকিরি। এইভাবে সরস আলাপনে চলতে চলতে পথে পড়ল 'কলাশিল্প ভবন।' মাটির দেওয়ালেই কলাশিল্পের কিছু নৈপুণ্য নজরে পড়ল। ভবনের আশে-পাশে দেখা গেল সুদৃশ্য বাগান।

শ্রমভারতীর কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপস্থিত হতেই শৈলেশবাবু এগিয়ে এসে বললেন—আসুন, তিলক-ভবনে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রবেশ-দ্বারে লেখা রয়েছে 'বঙ্গাল শিবির'। অতএব সত্তর আশীজন 'বাঙ্গালকা রূপেওয়ালে' তাঁর নির্দেশে নির্বিবাদে গিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিলেন।

তিলক-ভবন। তিনদিকে লম্বা টানা ঘর—পাকা মেজে, ছ্যাঁচা বেড়ার উপর মাটি-লাগান দেওয়াল, খড়ের উপরে বসান পোড়া মাটির গেলাসের মত গোলাকার ছোট ছোট খোলা দিয়ে ছাউনি। সামনে টানা বারেন্দা, পাকা গাঁথুনি। সুপ্রশস্ত গোবর-নিকানো অঙ্গন সম্মুখে, মাঝে ফুলের কেয়ারী। অঙ্গনের সম্মুখে ইটের প্রাচীর টানা সব্জি-বাগান। খনিত লাল মাটিতে তখনও সব্জি লাগান হয়নি। চারদিক ঝকঝকে তক্‌তকে। যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা, কাগজের টুক্‌রো ছেঁড়া ফেলা যায় না। তার জায়গা দেখি সুনির্দিষ্ট; চুণ আর ব্লিচিং-ছিটোনো টব অনেক-গুলি এদিক ওদিকে লাগান আছে সেজন্তে। পরে সমগ্র খাদিগ্রামটিতে ঘুরে দেখেছি—এই একই বিধান সর্বত্র। প্রাচীরের বাইরে দূরে একটি প্রকাণ্ড কুয়া, বাঁধান' অবস্থানটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে, 'টাবিং'-রীতিতে ঘুরে ঘুরে বলদে জল টেনে তোলে এর থেকে। মাটির তলা দিয়ে আশ্রমের মধ্যে স্নানাগারের বিরাট লম্বা জলাধারে পাইপের সাহায্যে সেই জল এসে জমে। চৌবাচ্ছার চারদিকে জলের ব্যবহারোপযোগী অনেকগুলি নলী-মুখ লাগান আছে। তিলক-ভবনের বাইরে এককোণে কাপড়-কাচার জন্য আলাদা চৌবাচ্ছা, আর একদিকে একটু দূরে সারিবদ্ধ স্যানিটারি শৌচাগার। তার সম্মুখে ছোট ছোট জলাধার, মাটির ভাঁড় আর বাল্‌তি। পাঁচ-আইনী প্রাতঃকৃত্যের ও অনেকগুলি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে—মাটি থেকে অল্প উঁচুতে মাথা খোলা টিনের বেষ্টনী দেওয়া ছোট ছোট খুপরি, তার মধ্য দিয়ে একটি নল মাটিতে গিয়ে লেগেছে, দেহজ ময়লা সেখানে জমে সার তৈয়ারীর কাজ করছে। বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে স্বল্প খরচায় গ্রামোদ্যোগী ব্যবহার, এমনি অনেক পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেল। শুনলাম—এখানের জল যেমন ঠাণ্ডা, আর তেমনি হজমকারক। স্নানে আর পানে অবশ্য কদিনেই তা উপলব্ধি করা গিয়েছে।

অন্যান্য আশ্রমের মত 'শ্রমভারতী-খাদিগ্রামের' ও একটা ছক্-বাঁধা দিন-চর্যা আছে। রাত পৌনে চারটের সময় নিদ্রা-ভঙ্গের ঘণ্টা বাজে নির্মমভাবে। সকলকে সেই সময়ে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। ভোর ৪-৪৫ মিঃ সমবেত প্রার্থনা, ৫-৬টা পর্যন্ত সূত্রযজ্ঞ, ৬-৮টা পর্যন্ত শরীর-শ্রম, ৮ থেকে ৮-৩০ মিঃ গ্রামোদ্যোগী জলপান গ্রহণ, ৮-৩০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত স্নান, ৯-৩০ মিঃ—১১টা পর্যন্ত আলোচনা, ১১-২টা পর্যন্ত আহার ও বিশ্রাম, ২টা থেকে বিকেল ৪-৩০ মিঃ আলোচনা-সভা, সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিঃ থেকে ৬-১৫ মিঃ পর্যন্ত সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, ৬-৩০ মিঃ রাত্রিকালীন ভোজন ও রাত্রি ন'টায় মনোরঞ্জন। এই সময়টায় ধরা-বাঁধা কানুন নেই, যে কোন গান আবৃত্তি প্রভৃতি তখন করা যেতে পারে। নৈশ বিদ্যালয় ও বয়স্কশিক্ষার বিধান-ব্যবস্থা রয়েছে—শোনা গেল।

দুপুর বেলায় আমরা খাদিগ্রামে পৌঁচেছিলাম। সেজন্তে সকালের দিনচর্যাগুলি সেদিন আমাদের দেখা হয়নি। স্নানান্তে দলবেঁধে খাওয়ার চত্বরে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রন্ধন ও ভোজনাগারটি একটা বিরাট মহলের ব্যাপার। সম্মুখে লেখা আছে 'গ্রামোদ্যোগ'। অতএব খাওয়ার বহরটা আন্দাজ করা গেল কতকটা। লম্বা লম্বা বারেন্দা ও উঠান জুড়ে এক সঙ্গে শ' তিনেক মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে! ঢালাও লম্বা আসন পাতা, সম্মুখে সারি সারি আধ-কাঁচা শালপাতার পাত্র দেওয়া,

পাশে পাশে একটি করে মাটির গেলাস ও দুটি করে খুরি। সকলে গিয়ে আসন গ্রহণ করতেই খানিক পরে একজন কর্মী 'শান্তি' বলে হাঁক মারতেই জল নুন পরিবেশনরত যে যেখানে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে অচল 'অনড়' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্য করেছি, এই 'শান্তি' শব্দটিই এখানকার যত কিছু জানাবার একমাত্র প্রারম্ভিক সঙ্কেত। তারপরেই জনৈকা হিন্দুস্থানী মহিলা ঘোষণা করলেন—

'আজিকা ভোজনমে আপকো মিলেগা চাব্‌ল, রোটি, দাল, সব্জী, লিমু, মির্চা, শক্কর আউর্ রায়তা।' সঙ্গে সঙ্গে দশবিশ হস্তে পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। দুবেলা খাওয়ার আগেই এমনিধারা ঘোষণা করা হত আগে। মাঝে মধ্যে আরও কয়েকটি ঘোষণাও করা হত— যেমন, খাওয়ার পরে নিজেদের উচ্ছিষ্ট তুলে নিয়ে যেতে হবে, কোথায় কিভাবে কোন্‌টিকে ফেলতে হবে, দৈনন্দিন কর্মতালিকায় কিছু সংযোজন হবে কিনা—ইত্যাদি।

খেতে খেতে জানতে পারা গেল, এ সবই আশ্রম বা স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদিগ্রামের তৈরী। চাল, গম, আটা, তেল, নুন, মসলা, সব্জী সবই এখানকার—এমনকি, মাটির গ্লাস খুরি থেকে আশ্রমের যাবতীয় জিনিষপত্র কাঠ-কাঠরা, মায় মিস্ত্রি রাজ প্রভৃতি। গ্রামের মধ্যে নিজেদের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সর্বোদয়।

খাওয়ার শেষে বিশ্রামান্তে যথাসময়ে আলোচনা-সভায় যোগদান করলাম। মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি—একটি টানা লম্বা হল ঘর। এখানের অধিকাংশ ঘরই অবশ্য এই ধাঁচে তৈরী। হল-ঘরটির দেওয়াল এখানের লাল মাটির রঙে রঞ্জিত, দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে সুদৃশ্য পেন্টিং।

পরিপূর্ণ সভাগৃহ। মাঝে কার্পেট-মোড়া উচ্চ মঞ্চে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মজুমদার উপবেশন করেছেন। মঞ্চের সম্মুখে মাঝারি সাইজের একটি ঝালর ঢাকা টুলের উপর কয়েকগুচ্ছ ফুল, ফুল আর ধূপের সম্মিলিত সুরভি সমগ্র পরিবেশটিকে বড়ই মোহনীয় করে তুলেছে। ভাষণের পূর্বে সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন করা হল। শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য বিনা যন্ত্রে গাইলেন—'অরূপ তোমার বাণী...'। সুর-বিস্তার আর কণ্ঠ-লালিত্যের অভিনব ঐকতানে গমগম করছিল প্রেক্ষাগৃহ। সূচিশব্দশূন্য নীরবতা। গানের শেষে খানিকক্ষণ পর্যন্ত এই ধারা বজায় রইল। তারপরে শ্রীমজুমদার দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে তাঁর ভাষণ বিশ্লেষণ-ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে তিনি বিশ্ব-বিপ্লববাদের বিবর্তন তথা ফ্রান্স-জার্মানী-ইংলণ্ড-আমেরিকা-রাশিয়া থেকে প্রাচ্যভূমি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার ধারা পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে সূত্ররূপে সবায়ের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, সারা পৃথিবী তথা আমাদের ভারতভূমে আজ গণতন্ত্র বনাম আমলাতন্ত্রের লড়াই চলেছে। গণতন্ত্র তথা আত্মরক্ষার সমস্যাই আজ সবচেয়ে প্রবল। শাসন-শোষণে ভরা আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্ব আর বরদাস্ত করতে চাইছে না জনগণ। তারা আজ বাঁচতে চায়, তারা চায় যৌথভাবে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে। সর্বোদয় আন্দোলনই এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কি আর্থিক, কি সামাজিক, কি ব্যবহারিক রাজনৈতিক জীবন—সর্বোদয়ই সর্বত্র মুক্তি-নিশানী। এর পরে তিনি এর আদর্শ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পরিশেষে বললেন, প্রয়োজনের অনুভবই হচ্ছে সর্বোদয়ের বাস্তব প্রয়োগ। মানুষ যদি সত্যিকার শান্তি চায়, সর্বোদয় আসবেই। আমরা দেখছি, দশ বছর আগে যেখানে আধকাঠা মাত্র জায়গা নিয়ে তুমুল লাঠালাঠি চলতো, এখন সেখানে এককথায় গ্রামকে গ্রাম দান করা চলেছে এবং আমরা আশা করবো—এই মানুষগুলো বর্তমানে নিশ্চয়ই বাস্তব-বুদ্ধিবিবর্জিত হুজুগসর্বস্ব জীব নয়।

বক্তৃতা-শেষে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি-পর্ব শুরু হয়ে গেল। সরস কলহাস্যের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

আধ ঘণ্টার মত বাধাবন্ধবিহীন সময় পাওয়া গেল এর পরে। 'বাঙ্গাল শিবিরে' এই সময়ে চা-চক্র চলবে। চা আর মাছ-মাংসের কোন বিধিব্যবস্থা শ্রম-ভারতীতে নেই—যদিও মাছ-চাষের ব্যবস্থা এখানে আছে, এবং শুনলাম—তা নাকি শুধুমাত্র বিক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী। কিন্তু, চা? জানা গেল—বাঙালী ভায়াদের চা না খেলে নাকি মাথা ধরে যায়, অতএব এতগুলো বাঙালীবাবুদের মাথা বাঁচাবার জন্য কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে আশ্রমিক আইন কিঞ্চিৎ শিথিল করে শুধু দুটি বেলা দু কাপ করে চা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন।

চা-চক্রের উত্তাল আড্ডা যখন ভাঙল, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। ধমু-শির শৈলশ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে শুক্লাদ্বাদশীর চাঁদ সারা আশ্রমে ঢলঢলে প্রলেপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডাল-পাতার আলোছায়ায় এক প্রাচীন মহুয়া গাছের তলায় উন্মুক্ত আকাশের তলে সুপ্রশস্ত ঝকঝকে আশ্রমিক বেদীতে সন্ধ্যাকালীন সমবেত প্রার্থনা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের সনাতন আশ্রমিক জীবনের রূপটি এখানে এসে নতুন করে মানসপটে নিমেষে ভেসে ওঠে। মুনি ঋষিদের সংহিতার অনুশাসনে ভারতের সমাজ জীবন চিরদিনই নিয়ন্ত্রিত—তাঁরা বলেছেন—সমাজ-সংসারে সুস্থ সবল শরীরে কর্ম করে যাও, সুখাদ্য গ্রহণ কর, প্রভাতে-সায়ংকালে ভগবানের চরণে নতশির হও, ধ্যান-ধারণা চিন্তা-প্রণালী চিত্তবৃত্তি সুসংবদ্ধ কর, সমাজের সেবার জন্য আরও সুস্থ সবল কর্মঠ জীবন কামনা কর পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও ভগবানের সাধনা বাদ পড়ে যায়নি। গুপ্ত বিপ্লবের যুগে দেখা গিয়েছে, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামযাত্রার অব্যবহিত পূর্বেও বিপ্লবীরা দেবতার কাছ থেকে আশীষ প্রার্থনা করে গিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের সাংগঠনিক ক্রান্তিতে কর্মযুগের বিরাট ব্যাপ্তির মাঝেই বা তবে কেন ভগবান তথা দেশ-মাতৃকার কাছে আশীষ প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত থাকলে চলবে? ধ্যানের সময় নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট থাকা চাই, বিনা ধ্যান-ধারণায় কর্মী জ্ঞানী হওয়া যায় না, কর্মী-জ্ঞানীর এই মহা-ভারতবর্ষে।

তানপুরার ছন্দে মহুয়াতলার পরিবেশটি ততক্ষণে বড়ই বিবশ করুণ রিণরিণে হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে একপ্রান্তে বসে

পড়লাম। ভজন গান গাইছেন আশ্রমেরই একজন মহিলা কর্মী শ্রীমতী শোভা চক্রবর্তী। এমন মাধুর্যভরা দরদী মিহিগলার আকুল পাগল-করা সুর আমি বহুকাল শুনিনি। ছন্দে গানে ধ্বনিতে মিলিয়ে বিশ্বপিতার কাছে সন্তানের এক নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের আকুল মিনতি!

চারিদিকে নির্বাধ নৈঃশব্দ। সবারের চোখে নেমেছে জলধারা। শ্রমভারতীর মহুয়াতলে আছে নিবিড় প্রশান্তি।

(৫)

নির্ধারিত দিন-চর্যার মাঝ দিয়ে রাত্রি অবসান করে আর একটি নতুন দিন এল শ্রমভারতীতে। উষাকালীন অনুষ্ঠানাদি সাঙ্গ করে কোদাল গাঁইতি ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে সবাই চললেন আশ্রমের ক্ষেতে শরীরশ্রম করতে। ছাত্র-অধ্যাপক যুবক-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশুটি পর্যন্ত মাটি কাটার কাজে লেগে গেলেন। লৌকিক মান-মর্যাদা সবই ঢাকা পড়ল মৃত্তিকামায়ের অঙ্গাবরণের মাঝে। সে অভিনব প্রেরণা!

এর পরে স্নান ও গ্রামোদ্যোগী জলপান—অর্থাৎ, মুড়ি, ভিজে-ছোলা, নারকেল, হালুয়ার এক পর্যাপ্ত গ্রামীণ সংস্করণের আহারের ব্যাপার। তারপরে ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত শ্রীমজুমদারের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে সর্বোদয় ব্যাখ্যানমূলক আলোচনা-চক্র। এবারের বৈঠকটি চলল মহুয়া গাছের ছত্রছায়ায়। আজকের ব্যাখ্যানটি আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠল। আলোচনার শেষে তিনি বৈকালিক অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতির ঘোষণা সকলকে শুনিয়ে দিলেন। কাছাকাছি একটি আদিবাসী-প্রধান গ্রামে গ্রামদান সম্বন্ধে উদ্দীপনা জেগেছে—সে সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দুপুরেই তাঁকে বেরিয়ে যেতে হবে। তবে তিনি বললেন, আপনারা ঐ বৈঠকে নিজেরা আলোচনা করে প্রশ্ন ঠিক রাখবেন, আমি পরদিনের বৈঠকে তার জবাব দেব।

আলোচনা-অন্তে খাদিগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা কিছু কিছু ঘুরে দেখলাম। দেখলাম—শ্রমভারতীর প্রধান কার্যালয়, নিজস্ব ডাকঘর। এরই লাগোয়া একটি ছোট্ট টিলার মত পাহাড়। শুনলাম—ওখানে শীঘ্রই খাদিগ্রামের নিজস্ব গ্রন্থাগার তৈরী হবে। শীর্ষদেশে বাড়িটি নির্মিত হবে, আর পাহাড়ের পাদদেশে থাকবে ফুলবাগানের বেষ্টনী।

বেশীক্ষণ দেখার সময় হল না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়ল। অতএব ভ্রমণ-পর্ব বিকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখতে হল। অতঃপর খাওয়া-দাওয়া-বিশ্রাম শেষ করে বেলা দুটোর আলোচনা-চক্রে গিয়ে হাজির হলাম।

আজকের আলোচনার উদ্বোধন করলেন বর্ষীয়ান সমাজসেবী-সাংবাদিক ও ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি এক আবেগময় ভাষণে স্বাধীনতোত্তর ভারতের পুনর্গঠনের ব্যাপক কর্ম-পন্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী প্রবর্তিত ও বিনোবাজীর রূপায়ন-পুষ্ট সর্বোদয় কর্মযোগের উপযোগিতা সম্বন্ধে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করলেন। তারপরে ভাষণ দিলেন সর্বোদয় প্রকাশনী সমিতির বাংলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা। শেষ ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত মশায়ের দাদা শ্রদ্ধেয় শ্রীনীরেন দাশগুপ্ত মশায়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনের মাঝে সেখানের কৃষি বিষয়ে তিনি যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা আমাদের দেশের উপযোগী করে কতদূর প্রয়োগ করা সম্ভব—সে বিষয়ে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন।

এর পরে স্থানীয় কর্মীদল আমাদের খাদিগ্রাম দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রথমে গেলাম 'গ্রামোদ্যোগ-ভবনে'। এটির একদিকে রন্ধন ও ভোজনশালা—যার সঙ্গে আমরা দুটি বেলা পরিচিত। সারি সারি ছোট ছোট গোলাকার সুদৃশ্য শক্ত-রাখার মরাই দিয়ে ভবনটিকে দুটি ভাগে বিভাগ করা হয়েছে। চেঁচা বেড়ার উপর মাটি লেপে আলকাতরা মাখিয়ে, উপরে খড়ের আচ্ছাদন লাগিয়ে মরাইগুলো তৈরী হয়েছে। রন্ধনশালায় ঢুকে দেখি এলাহি ব্যাপার। আশ্রমের এতগুলি কর্মী-পরিবার, তার উপরে এই অভ্যাগতের দল—অর্থাৎ, প্রতি বেলায় প্রায় ২৫০।৩০০ মানুষের জন্য বিরাট আহার পাক করা হচ্ছে মাত্র একটি 'কুকারে'! শুনলাম-কুকারেই এখানে বারমাস রান্না হয়। আর, কুকার তো নয়, যেন একখানা কামারের হাপর মাটিতে বসান রয়েছে। কুকারের বাটিগুলোও তদনুরূপ, প্রকাণ্ড গামলার মত এক একটি বাটি। দুটি বাটিতে একসঙ্গে পঞ্চাশ জনের ভাত রান্না করা চলে—দুটি বাটিতে চাল, একটার ডাল, আর একটায় তরকারী চাপিয়ে কুকারে চড়িয়ে দেওয়া হয়। তার আগে আর একটি চুল্লীতে ডাল, তরকারি ভেজে সেঁকে নেওয়া হয়। মূল কুকারটির আঁচ উঠতে আধঘণ্টা সময় লাগে, রান্না হয়ে যায় একঘণ্টার মধ্যে। হাঁড়ির খবর নেওয়া শেষ করে গেলাম 'গ্রামোদ্যোগ-ভবনের' অপর বিভাগটিতে। সেখানে দেখলাম—চাল ভানার ঢেঁকি, গম ও ডাল ভাঙার চাকি, সরষের তেলের ঘানি। এর পরে 'বস্ত্র উদ্যোগ বর্গ'।—ব্যাপার কি! দেখি—সারি সারি চরকা ও তাঁতের ব্যাপার। সেখানে থেকে অম্বর চরকা ও কলাভবন। সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের খদ্দরের তৈরী বিভিন্ন বস্ত্র-সম্ভার সেখানে সাজান রয়েছে।

গ্রামোদ্যোগ-ভবন থেকে বেরিয়ে এবার পাহাড়ের কোলে ক্ষেত-খামার, গোশালা প্রভৃতি দেখতে গেলাম। বর্ষার সময়ে ধনুশির পাহাড় থেকে যখন প্রবলভাবে ঢল নামে, তখন তার থেকে ক্ষেত-গুলোকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে চওড়া উঁচু করে মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে এর থেকে ক্ষেতে জল সরবরাহ করাও হয়। এছাড়া, খুব বড় একটা ইঁদারাও বসান রয়েছে। জমির উঁচু আলের উপর দিয়ে দুপাশের চলচলে ধানগাছের হাওয়া খেয়ে চারদিক দেখতে দেখতে অবশেষে গোশালায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। নধর চেহারার একপাল গরু দেখে চমক লাগল বৈকি! দুধও দেয়

শুনলাম কামধেনুর মত—এক একটি দিনে আধমণ, পঁচিশ সের করে। গোশালার মেজেটি পাকা—মাঝের দিকে ঢালু করা নালি কাটা, এখান থেকে গোমূত্র বেরিয়ে বাইরে মাটির নিচে এক চৌবাচ্চায় গিয়ে জমে। সেখান থেকে গিয়ে জমা হয় সার তৈরীর আর একটি জায়গায়, গোময় প্রভৃতিও সেই জায়গায় মাটির সঙ্গে জমতে থাকে। সব মিলিয়ে অতি উৎকৃষ্ট দেশীয় সার তৈরী হচ্ছে সেখানে। হাড়ের গুঁড়ো থেকে সার তৈরীর জন্যও একটি ঘর রয়েছে। শুধু গোশালাই নয়। হাঁস মুরগী প্রভৃতি পশুপালনের ব্যাপারও রয়েছে—দেখা গেল। এগুলো ছাড়িয়ে কয়েকটি সব্জীবাগানও দেখলাম। অড়রকলাই, লাউ, কুমড়ো, ধুঁদুল, পেঁপে, পটল, আলু, কচু, শাক প্রভৃতি বিভিন্ন সব্জীর ক্ষেত। অন্যদিকে শণের চাষ।

বিভিন্ন বিভাগ দেখে ফিরলাম যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি গেলাম—'সঙ্গীতায়ন'। এটি ঠিক মহুয়াতলার পাশেই। সঙ্গীতায়নের দেওয়ালে দেওয়ালে সুদৃশ্য পেন্টিং, ঘরের মধ্যে খোল মাদল সেতার তানপুরা তবলা মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ। আদর্শ গ্রামে কোন শিক্ষা ত অপূর্ণ থাকার কথা নয়।

(৬)

প্রার্থনা ও খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত সাড়ে সাতটার সময় খাদিগ্রাম থেকে মাইল খানেক উত্তরে এক গ্রামদানী এলাকার আমন্ত্রণে সদলবলে যাত্রা করা গেল। কিছুদূর অগ্রসর হলে একটি ছোটখাটো পাহাড় পড়ে রাস্তার পাশেই। সেখানে পাকা গাঁথুনি দিয়ে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। শুনলাম, এটি একটি বিদ্যালয় হবে খাদিগ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য, নাম দেওয়া হবে—'শিশু বিহার বিদ্যালয়'।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরে শুরু হল সেই গ্রামদানী এলাকা, গ্রামের নাম— লালমাটিয়া।

লালমাটিয়ার ধান ও গমের ক্ষেত এবং সব্জীবাগানের নূতন প্রথায় চাষ করা হয়েছে। শস্যক্ষেত্র দেখলাম অধিকাংশই শুকনো। মাঝে মাঝে কুয়ো বসান হয়েছে জল সেচের জন্য।

অবশেষে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এক নৈশ পাঠশালার সম্মুখে খানিকটা প্রশস্ত উঁচু জায়গা। সেখানে এক মহুয়াগাছের তলায় গ্রামীণ ছেলেমেয়ে যুবকবৃদ্ধ জমায়েত হয়েছেন। আমরা গিয়ে তাঁদের মধ্যে বসতেই ছোট ছোট মেয়েরা উঠে দলবেঁধে চক্রাকারে লোকনৃত্য প্রদর্শন শুরু করলে। নাচের পরে দেশীয় ভাষায় একটি সম্মেলক গান গাওয়া হল। গানটির মর্মার্থ হচ্ছে: 'ভোর হয়েছে, মোরগ ডাকছে, খাওয়া-দাওয়া সেরে গ্রামবাসীরা ক্ষেতে ফসল কাটতে গেল। ফসল কাটল তারা, আঁটি, বাঁধল, তারপরে সেগুলো খামারে বয়ে নিয়ে এল।' অর্থাৎ, গ্রামীণ-জীবনের সাধারণ মানুষের একটি অতিবাস্তব দৈনন্দিনতার নিটোল রূপ; কোন ফাঁক নেই, কোন কাব্য-কল্পনা নেই—এর থেকেই এরা দেহও মনের খোরাক বিনা দ্বিধায় সানন্দচিত্তে বিপুলভাবে আহরণ করে চলেছে।

দ্বিতীয় সম্মেলক গান গাইলে একদল দেহাতী কিশোর। তার যা গাইলে তার মোটামুটি মর্মার্থ হল: উপরে ঘন ঘোর মেঘের ঘটা, এদিকে গাছের ডালে ডালে ময়ূরের নৃত্য ও ডাক। এই পর্যন্ত বেশ চলল, এবং তা দেখে গ্রামের লোক উৎসাহিত হয়ে ক্ষেত-খামারের কাজেও লেগে গেল—এমন সময় গানের অর্থে যা বোধগম্য হল তাতে শুনলাম—'গ্রামীণ চাষী চাষ করতে করতে অকস্মাৎ মুখ তুলে দেখল, বাবুভায়ের দল হাতে ঘড়ি বেঁধে টম্‌টম চড়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে চলেছে! ময়ূরের জায়গায় এদের দেখে তারা দুঃখ করলে এবং তাদের সাজপোষাকের উপর কিছুটা ব্যঙ্গ করে আপাতত ঝাল মেটালে!'

গানের সুর ও তালটিতে বেশ অভিনবত্ব লক্ষ্য করলাম।

নৃত্যগীতের শেষে লালমাটিয়া গ্রামের পরিচালক শ্রীরবীন্দ্রভাই হিন্দীতে এই গ্রামদানী এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তথা বর্তমান কর্মপন্থা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। তিনি যা বললেন, তাতে জানা গেল—তিন বছর আগে এখানকার গ্রামীণরা সমবায় প্রথায় উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এখানে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে 'ধরমগোলা' বা সর্বসাধারণের জন্য সম্মিলিত শস্যাগার স্থাপন করেছে। ক্ষেতে সকলে শ্রমদান করে সকলের জন্য এখানে শস্য সঞ্চয় করে রাখে। দিনে শ্রম করে, সন্ধ্যায় এই পাঠশালায় ছেলে বুড়ো সকলে সম্মিলিত হয়ে লেখাপড়া শেখে। এখানে চব্রিশটি পরিবারে একশ উনসত্তর জন লোক বাস করে। বায়াত্তরটি ইউনিটে বিভক্ত এই গ্রাম। প্রত্যেকের ভাগে আটচল্লিশ একর করে জমি। প্রায় কুড়িটি ইঁদারা এরা তৈরী করেছে!

অন্যান্য কাজের মধ্যে এরা হাঁস মুরগী ও গরু পালন করে, খাদি বোনে, ছোটখাটো ব্যবসা হিসাবে শালপাতার খাওয়ার পাত্র তৈরী করে।

ধরমগোলা থেকে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী করে গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়। তবে সাধারণতঃ ফসল বিশেষ উদ্বৃত্ত হয় না, মাঝে-মধ্যে ঘাটতিও দেখা দেয়। তখন এখানের কাউকে কাউকে বাইরে গিয়ে মজুরীর কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। ঢেঁকীতে এরা চাল তৈরী করে, আর চাকীতে ভাঙে গেঁহু আর মকাই। মহুয়া থেকে এক ধরণের তেলও এরা তৈরী করে। নিচু জমিতে ধানের চাষ, আর উঁচু ক্ষেতে মকাই, গম আর অড়হর চাষ হয়।

লালমাটিয়া থেকে যখন শিবিরে ফিরলাম, তখন রাত অনেক হয়েছে, কিন্তু মনটি হয়ে উঠেছে ভরপুর কানায় কানায়! শিবিরে আজ রাতে আর মনোরঞ্জনী শাখার কোন অনুষ্ঠান নেই। গতরাত্রে এই বিভাগে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কথিকা দিয়ে গান্ধীজীর জীবনী, জাতীয় আন্দোলনে বিবর্তন, বিনোবাজীর পদযাত্রা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছিল।

(৭)

রাত্রি পৌনে চারটের ঘুমভাঙার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে লটবহরও বেঁধে ফেললাম।

আজ নিষ্ঠুরের মত বিদায় নিতে হবে আমাকে খাদিগ্রাম থেকে। আসন্ন বিদায়ের আশংকায় মনটি ছল্ ছল্ করে উঠল। থাকার কোন উপায় নেই ছক-বাঁধা জীবনে, যেতেও বাধাবন্ধহীন জ্বালা!

প্রভাতের অস্পষ্ট স্নিগ্ধ আলোয় বয়েল-গাড়ী অপেক্ষা করছে। টুং টুং করে বাজছে বলদের গলার ঘণ্টি।

ছলছল চোখে শৈলেশবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সজলনেত্রে গিয়ে গাড়িতে চাপলাম।

টুং টুং করে গাড়ি চলেছে…

দূর থেকে ওদিকে অভয় হস্তের আন্দোলন তুলে শৈলেশবাবু আমার যাত্রা পথ শুভেচ্ছা-সুন্দর নির্বিঘ্ন করে দিচ্ছেন…

কক্ষ থেকে চলেছি আর এক নতুন কক্ষান্তরে।

মহুয়াতলার প্রভাতী ভজনস্থলী থেকে কি'কে মিঠে সুর কানে আসছে : নির্ভয় কর প্রভু রাজারাম…

জলচোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

আর কোন বিচ্ছেদ নেই এখন। নিবিড় একাকার।

নয়া পঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র—চণ্ডীগড়

মেজর শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কর এম-এ

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী পশ্চিম পঞ্জাব হইতে পূর্ব্ব পঞ্জাবে আগমন করে। অবিভক্ত পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাস্তুহারা পূর্ব্বপঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সিমলাতে আশ্রয়লাভ করে। সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন প্রধান-সহর ও হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। সিমলাতে তিনটি রাজধানীর পক্ষে একান্ত স্থানাভাব। তাহা ছাড়া ইহার প্রসারের সুবিধাও সীমাবদ্ধ। সিমলা পঞ্জাবের এক প্রান্তে অবস্থিত। অমৃতসহর ও জলন্ধরে রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ দুইটা সহর প্রায় সীমান্তে অবস্থিত এবং পশ্চিম পঞ্জাবের উদ্বাস্তুগণ ঐ নগর গুলোতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে মোটেই উৎসাহী ছিলনা।

কাজেই ৩০ কোটী টাকা অর্থব্যয়ে বাদশাহী আমলের ইতিহাস বিখ্যাত পিঞ্জোর উদ্যানের তের মাইল দূরে চণ্ডীগড় নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আম্বালা—কালকা রাজপথের চার মাইল দূরে বার মাইল ব্যাপী ধূসর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ঐ নগরের ভিত্তি পত্তন হয়। পণ্ডিত নেহেরু চণ্ডীগড় সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ইহা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-বর্জ্জিত নব স্বাধীন ভারতের মূর্ত্ত প্রতীক। তাই আম্বালাতে থাকা কালে চণ্ডীগড় যাওয়া স্থির করিলাম। আম্বালা হইতে চণ্ডীগড় অনুমানিক ৫০ মাইলের পথ। আম্বালা-কালকা রাস্তায় বাস সারাদিনই চলে। আমি ভোরের বাস ধরিলাম। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। এ বৎসর পঞ্জাবে যেমন শীত পড়িয়াছে এমন বহু বৎসর পড়ে নাই। তৎসত্ত্বেও রাস্তায় বিপুল জনসমাগম। এই অঞ্চলের লোকেরা খুবই কর্ম্মঠ এবং কায়িক পরিশ্রমের কাজে বিশেষ উৎসাহী।

বাস দ্রুত বেগে চলিয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সহরের সীমা অতিক্রম করিলাম। আম্বালা ছাউনী হইতে চার মাইল দূরে গড়িয়া উঠিয়াছে উদ্বাস্তু উপনিবেশ বলদেবনগর। আজ পশ্চিম পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আম্বালা বিভাগ তেমন উর্ব্বরা নয়। কিন্তু ইহারা প্রাণপাত পরিশ্রমে ফলাইয়াছে সোনা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পথে একবার সিমলা বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তখন এখানকার ভূমি এমন শস্যশ্যামলা দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়েনা।

প্রায় ষোল মাইল চলার পর আমরা প্রাক্তন পাতিয়ালা রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ পল্লী লালরু অতিক্রম করিলাম। লালরু জায়গাটি আমার পূর্ব্বপরিচিত। কয়েকমাস পূর্ব্বে লালরুর প্রান্তরে আমরা কোম্পানীর শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। একদিন স্থানীয় স্কুলের সহিত আমরা ভলিবল ম্যাচ খেলিলাম। স্কুলের শিখ প্রধান-শিক্ষক এবং আর একজন সুট-পরা ভদ্রলোক টীমের সঙ্গে আসিলেন। যথারীতি পরিচয় ও করমর্দ্দন করিলাম। ইহারা নিজেদের নাম কি বলিয়াছেন ভাল করিয়া শুনি নাই। একজনের নাম হইবে সর্দ্দার আজব সিং, আর একজনের নাম হইবে জগজিৎ বা পাঞ্জাবী আধুনিক নাম মদনলাল। খেলার শেষে চায়ের জন্য বসিলাম। চা পানের সময় মার্জ্জনা চাহিয়া আবার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম—সর্দ্দারজীর নাম আজব সিং আর সুটপড়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—আমার নাম ডাঃ চক্রবর্ত্তী; এই সুদূর পাতিয়ালা রাজ্যের একটি পল্লীতে একজন বাঙ্গালীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। সর্দ্দারজী উপস্থিত থাকায় ইংরাজীর মাধ্যমেই আলাপ চলিয়াছিল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী যাওয়ার সময় আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন: পরের দিন বিকালে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঢাকা জেলায়। আজ আট বৎসর হয় একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে ইহারা তিন চারজন বাঙ্গালী ডাক্তার প্রাক্তন পাতিয়ালা সরকারের কাজ নিয়াছেন। তাঁহার

দুইটী ছেলেই গ্রামের স্কুলে পড়ে—শিক্ষার বাহন গুরমুখী। ছেলেদের বাঙ্গালা উচ্চারণ পঞ্জাবীদের মত বিকৃত। আমি আট বৎসর বয়স্ক ছেলেটিকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল "সাড়া নাম সুকুমার চক্রবর্ত্তী"। পাঞ্জাবীতে সাড়া অর্থ আমার। সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত যোগসূত্র রাখার চেষ্টা বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

এই ভাবে বহু সমৃদ্ধ পল্লী ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিন ঘণ্টা পথ চলার পর আমরা প্রায় নয়টার সময় চণ্ডীগড় পৌঁছিলাম। চণ্ডীগড পূর্ব্ব-পঞ্জাবের রাজধানী। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে মনে হয় যেন একটি ঘুমন্ত রাজপুরী। রাজধানীর কোলাহল ও জীবন প্রবাহের একান্ত অভাব। চণ্ডীগড় সরকারী কর্ম্মচারী ও এম-এল-এরা ছাড়া এখনও জনসাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। চণ্ডীগড় সিমলা ও নয়াদিল্লীর মত সরকারী সহর।

কিন্তু চণ্ডীগড়ের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে যাহা ইহাকে অন্যান্য নগর হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। এমন সুপরিকল্পিত সহর ভারতে বোধ হয় বেশী নাই। চণ্ডীগড়কে ত্রিশটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগে স্কুল, পার্ক, সাঁতারের পুকুর, বাজার এবং ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক এক বিভাগে গৃহ সংখ্যা হইবে একহাজার হইতে পাঁচ হাজার এবং জন সংখ্যা ১২০০০ হইতে ১৫,০০০।

এখানকার বড় রাস্তাগুলি এভাবে করা হইয়াছে যাহাতে একটি সেক্টরের দূরবর্ত্তী বাড়ী হইতেও গাড়ী ধরার জন্য চারশত চল্লিশ গজের বেশী যাইতে না হয়। তাহা ছাড়া এই নগরীতে পদাতিক-নাগরিকের একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে। বড় রাস্তা ছাড়াও ছোটরাস্তাগুলো এমনভাবে করা হইয়াছে যে একই সেক্টরের মধ্যে বা এক সেক্টর হইতে অন্য সেক্টরে নিশ্চিন্তে পদব্রজে চলাফেরা করা চলে। উন্মাদের মত দ্রুতগামী যানবাহনের অভাব এখানে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

এই সহর প্রথমের দিকে পরিকল্পনা করিয়াছেন নিউইয়র্কের শিল্পী আলবার্ট মেয়ার। তিনি বৃহত্তর বোম্বাই এর পরিকল্পনা করিয়া এদেশে প্রথমেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শেষ দিকে এই সহর পরিকল্পনার ভার পড়ে ফরাসী ভাস্কর এম, লির উপর। তিনিই এখানকার অট্টালিকাগুলো এ ধরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহাতে প্রখর সূর্য্যালোক সোজাভাবে গৃহে প্রবেশ না করিতে পারে। পঞ্জাবের প্রচণ্ড গরমে ইহা বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে শীতকালে গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের কোন অসুবিধা নাই। ভারতে গৃহ নির্ম্মাণে 'সান-ব্রেকারের' প্রবর্ত্তন চণ্ডীগড়েই প্রথম।

খুব ভোরে আম্বালা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। এখন বেলা দশটা। একটি সাধারণ হোটেলে প্রাতরাশ করিলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশটি ভাল।

প্রাতরাশের পর সহরটি দেখার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। এখানে আয়ের অনুপাতে বিভিন্ন সেক্টরে সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চণ্ডীগড় সরকারী সহর, কাজেই এখানে লালফিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে এখানে সর্বনিম্ন কর্ম্মচারী পিয়নদের জন্যও সুদৃশ্য দুই কোঠাযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, আলাদা রান্নাঘরও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। ভারতের আর কোন সহরে পিয়নদের থাকিবার এমন সুব্যবস্থা দেখি নাই।

আমি পিয়নদের কলোনী হইতে মন্ত্রীদের কুঠী, পঞ্জাবের হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিলাম। এম-এল-এ দের জন্য একটি সুদৃশ্য হোস্টেল নির্ম্মাণ হইতেছে দেখা গেল

চণ্ডীগড়ে শীঘ্রই পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবে শুনিলাম। এখানকার গভর্ণমেণ্ট কলেজটি এরই মধ্যে পঞ্জাবে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। আমি কলেজে যাওয়ায় কয়েকটি ছাত্র আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিল। ইহারা সকলেই ভারতীয় সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে আগ্রহশীল।

আমাদের বাজেটের বেশ মোটা অঙ্ক দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। সৈন্য বিভাগে প্রায় শতকরা ৭৫জন অফিসারই পঞ্জাবী। ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করার পর প্রত্যেক পঞ্জাবী যুবকই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়া ডিফেন্স একাডেমীতে প্রবেশের চেষ্টা করে। কাজেই পাঁচ ছয় হাজার ছেলে পরীক্ষা দিয়া দুইশত সীটের মধ্যে প্রায় দেড়শত সীট ইহারা লাভ করে। আমাদের বাংলা দেশে বহু ছাত্র এই পরীক্ষার নামও শোনে নাই এবং পনের কুড়িটি ছেলের বেশী এই পরীক্ষা দেয় না। ইহার প্রধান কারণ সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিসীম অজ্ঞতা। অনেক অভিভাবকের ধারণা সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিলে ছেলের উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হইবে। অর্থাৎ নামের শেষে বি-এ, বি-টি, বি-এল থাকিবে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে কমিশনের জন্য প্রত্যেক ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষার্থীকে ডিফেন্স একাডেমীতে চার বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই চার বৎসর শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সরকার যাহা ব্যয় করেন তাহা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। এখানে একজন শিক্ষার্থীর খাওয়া-থাকা বাবদই সরকার খরচ করেন তিন শত টাকারও বেশী। সৈন্য বিভাগে কমিশন পূর্ব্বে রাজপুত্র ও ধনীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল—আজ সরকার সকল খরচ বহন করেন বলিয়া জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেই সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে পারেন। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া দেশ রক্ষার জন্য প্রত্যেক যুবকেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা লাভের জন্য কত বাঙ্গালী যুবক নিজেদের প্রাণদান করিয়াছেন। আজ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখে যাওয়ার দিন আসিয়াছে।

চণ্ডীগড়ের অনতিদূরে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে খনন কার্য্য তখন চলিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগত। সময়াভাবে সেখানে আর যাওয়া হইলনা।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দূর হিমালয় পর্ব্বতমালায় ছোট ছোট প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এর একটি উজ্জ্বল আলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাই চণ্ডীমাতার মন্দির এবং এই মন্দির হইতেই চণ্ডীগড়ের নামকরণ করা হইয়াছে। পরদিন সকালে শুদ্ধশুচি হইয়া চণ্ডীমাতার মন্দির দর্শন করিলাম। চণ্ডীমন্দিরের প্রায় ছয় মাইল দূরে মনসা দেবীর মন্দির। এই দুইটি মন্দিরই এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। চণ্ডীগড় হইতে এই দুইটি মন্দিরে বিপুল জনসমাগম হইয়া থাকে।

চণ্ডীগড়ের বাহিরে ভবিষ্যতে শিল্প প্রসারের জন্য বিস্তৃত ভূমি রাখা হইয়াছে এবং এরই মধ্যে শিল্পপতিরা এদিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

তাই যখন আম্বালার বাস ধরিলাম তখন শুধু ইহাই মনে হইল যে অদূর ভবিষ্যতে এই নগরীই পঞ্জাবের বহুমুখী জীবন প্রবাহের প্রাণকেন্দ্র হইবে।

তুমি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি জানি আর নাহি জানি—
যদি মর্ম্ম-মুকুরে দেখা ছবিটিরে সত্য বলিয়া মানি—
তুমি কোরোনাকো সংশয়—
জেনো, অন্তরে মম শাশ্বত চির-স্মরণের জাগে জয়!

যদি জীবনের পারাবারে—
ওঠে দুলে দুলে কভু মরম-কাহিনী কম্পিত ব্যথা-ভারে,
আমি আপনারে ভুলে যাই—
ওই ধেয়ান-মগ্ন ধূসর আকাশে কী যেন দেখিতে চাই।

জানি, নিষ্ফল আশা মোর,
জানি হবে না কখনো ব্যর্থ-জীবনে দুঃখের রাতি-ভোর!
তবু, তোমার মুরতিখানি
আমি মানস-মুকুরে নিত্য নিরখি সত্য বলিয়া মানি।

তুমি এলে আর নাহি এলে,
ওই জীবনের শত সন্দেহভরা গ্রন্থিরে অবহেলে;—
মোর কল্পনা-তুলিকায়
জাগো চির-উজ্জ্বল প্রেম শতদল স্বপ্নের অলকায়।

কেন সে কথা পড়ে না মনে?
সেই প্রথম জীবনে বসন্ত-প্রীতি-বিহ্বল সমীরণে
শুধু আঁখিতে মিলায়ে আঁখি
যবে বিবশ পরাণে বেঁধেছিলে হাতে মিলনের রাঙারাখী?

সেই নিদাঘ-তপ্ত বায়
জাগে দুর্দ্দম এক দুরন্তপ্রেম নিঃসীম বেদনায়—
নব—জীবনের কলরবে
ওঠে নব বরষের যৌবন-গীতি প্রাণের মহোৎসবে!

সেই কুন্দকুসুম মালা—
সেই বর্ষারাতের গুঞ্জন, কত পরাণে পরাণে ঢালা—
সেই শেফালীর হাসি-মাখা
সেই শারদ নিশীথে দুঁহু দোঁহা পানে অনিমেষ চেয়ে থাকা—

আজি বিস্মরণের কূলে
যদি ভুল করে সখি, স্মৃতির ভেলায় বারেক ওঠে গো দুলে,
তুমি ক্ষমিও আমারে তবু,
আমি দিয়েছি শুধুই, তার প্রতিদানে কিছুই চাহিনি কভু।

যদি হেমন্তে হিমছায়,
ওই আকাশের চাঁদ ডুবে যায় নভে অনন্ত কুয়াশায়—
আর শীতের আর্ত্তনাদে,
শুনি আমারো পরাণে বিরহ-বিধুরা ক্রন্দসী কোন্ কাঁদে,

ভাবি, এই বুঝি তব খেলা—
এই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ শিশির শীতার্ত্ত অবহেলা;
শুধু অন্তর-সাথী তুমি—
মোর সাধনা, বাসনা, কামনার চির-বসন্ত-লীলাভূমি।

তাই যখন তোমারে হেরি
শত কর্ম্মের মাঝে বহু বন্ধন নিয়ত রয়েছে ঘেরি—
আমি চলে যাই চুপে চুপে—
সেই স্বপন-কুঞ্জে, যেথায় তোমারে পেয়েছি দয়িতারূপে!

ক্যালিফর্নিয়ার একটি মুদ্রার গ[illegible]

সুভাষ সমাজ[illegible]

শরতের রোদের সোনা ঝরছে বালুরঘাট বিমান ঘাটির দিগবিকীর্ণ মাঠে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আকাশের একটা দূর কোণ থেকে ক্ষিপ্ত কোন জন্তুর ডাকের মত গোঁ গোঁ একটা গর্জন ভেসে এল। এয়ারষ্ট্রিপের অপেক্ষমান যাত্রীদের ভেতরে চঞ্চলতা জেগে উঠল। দক্ষিণ পশ্চিমের নীল আকাশের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল অতিকায় একটি যান্ত্রিক পাখী। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনারসের ডেকোটা মাঠের ওপরে চক্রাকারে পাক খেয়ে মাটিতে নেমে এল। বালুরঘাট এয়ার 'ফিল্ডে'র উড়িয়া কুলীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, এসে পড়েছে রে!—এসে পড়েছে! আত্রাইয়ের ওপারে কালকাপুর থেকে সাঁওতাল মংলু মাঝি তাদের পাড়ার একদল মেয়ে-পুরুষ নিয়ে উড়োজাহাজের ওঠানামা দেখতে এসেছে। মংলুর বৌ ফুলমণি মাঝিন হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ কেনে মংলু হাওয়াই জাহাজের প্যাটের ভেতর থে কেমুন আগুনের পারা গোরো মানিষ বার হছে! প্লেনটা বাগডোগরা থেকে বালুরঘাট হয়ে কলকাতায় যায়। দার্জিলিং বেড়িয়ে ফিরে-আসা একদল শ্বেতাঙ্গ নরনারী কলকাতায় চলেছে। বালুরঘাট এয়ারষ্ট্রিপে কুড়ি মিনিট 'স্টপেজ।' তাই ফাঁকা মাঠের হাওয়া খেতে তারা নেমে পড়ল। সাঁওতালরা প্লেনের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের দিকে বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য এমন রূপ মানুষের হয়! ওদের গায়ের ধবধবে ফরসা রঙে বরফের শুভ্রতা। ভাসা ভাসা চোখে দূর সমুদ্রের নীলিমা। বালুরঘাট এয়ারষ্ট্রিপটাই যেন তাদের আবির্ভাবে হারিয়ে গেল। তরুণ পাইলট গিলবার্ট মাটিতে নেমেই এক আমেরিকান তরুণী যাত্রী রোজকে প্রশ্ন করল—বাঙলাদেশের এই গ্রামের এয়ারফিল্ড কেমন দেখছেন? রোজ কোন কথা বলল না। সে বড় বড় গভীর দুটো চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল মাঠের পারে কা[illegible] কালো দিগন্তের দিকে। ছাড়া ছাড়া গলায় বলল—[illegible] ফিল্ড লুকস্ লাইক ক্যালিফর্নিয়ান ফিল্ড।

হোয়াট! এ্যংলোইণ্ডিয়ান পাইলট হো হো ক[illegible] হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল, বলল—পশ্চিম দিনাজপু[illegible] এই পাড়াগাঁর মাঠকে ক্যালিফর্নিয়ার ফিল্ডের মত ম[illegible] হচ্ছে? তার কথা যেন শুনতেই পেল না রোজ[illegible] সাঁওতালদের দলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল—আমা[illegible] দেশে যেমন রেড-ইণ্ডিয়ান, ওরা কি তেমনি এদে[illegible] ট্রাইব্যাল?

ইয়েস ম্যাডাম, বলল, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনারসে বালুরঘাট অফিসের কর্মচারী শ্রীকৃষ্ণম, ঐ যে দেখছে[illegible] ছেলেটা, ও খুব চমৎকার বাঁশী বাজায় ম্যাডাম।

ইজ ইট? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রোজ। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] মংলুকে বলল—এই সরদার তোর কোমরে গোঁজা বাঁশীট[illegible] বাজা তো? সকলের চোখের দৃষ্টি মংলুর ওপর আছড়ে[illegible] পড়তেই, সে কেমন সংকুচিত হয়ে গেল। এই মংলু তুকে বাঁশী বাজাতে বুলতিছে সাহেব, বলল ফুলমণি—বাজ কেনে। বাঁশীতে সুর তুলল মংলু। সেই সাঁওতালী গানের সুর বিপুলব্যাপ্ত প্রান্তরের উদাস হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল দূর-দুরান্তরে। অপরূপ মধুর সেই সুরের মূর্চ্ছনায় বালুরঘাট এয়ার 'ষ্ট্রিপ' যেন মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও বিবশ হয়ে গেল। মংলু মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাজিয়েই চলেছে। সে দেখতে পেল না, রোজের মুগ্ধ দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন নিবিড় হয়ে উঠেছে। এক্সেলেণ্ট!—এক্সেলেণ্ট! বিপুল আনন্দে ভেঙ্গে পড়ল রোজ। ওদিকে পাইলট, ওয়ারলেশ অপারেটার, কো-পাইলট তাদের ভারী বুট মসমসিয়েসিঁড়ি দিয়ে প্লেনের ভেতরে উঠল। এয়ারহোষ্টেস মৃদু গলায়

অনুরোধ করল যাত্রীদের—প্লীজ গেটআপ—প্লেন এখুনি ছাড়বে।

রোজ তখনও মুগ্ধ, তন্ময় একটা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে বাঁশী শুনছে। শ্রীকৃষ্ণম খুব ব্যস্ত হয়ে বলল—ইউ প্লিজ, গেট-আপ মিস···লেট হয়ে যাবে প্লেন, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল! সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল! উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রোজ। জীপ ক্যাসনারটা খুলে একটা মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—লেও—আপকা বখশিষ্! বলেই গট গট করে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়ল। গর্জন করে উঠল ডেকোটা ইঞ্জিন। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল চারটে প্রপেলার। মুহূর্তে আটলান্টিক পারের সেই বড় বড় গভীর দুটো নীল চোখের রোজ আকাশের বিশাল নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু—

কিন্তু বালুরঘাট এয়ারফিল্ডের বাতাসে ছড়িয়ে রেখে গেল এক অপরূপ সুরভি। মংলু হাতের মুঠোয় মুদ্রাটা নিয়ে রোদজ্বলা আকাশটার দিকে অর্থহীন শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। তার হাতের তালুতে রোজের রক্তাভ আঙুলের উতপ্ত মধুর সেই স্পর্শটা যেন তার চেতনার ভেতরে তখনো বিন্দু বিন্দু মধু ছড়িয়ে দিল। চল কেনে মংলু—দেলা বং—বিরক্ত হয়ে বলল ফুলমণি। তবুও আকাশের দিকে চোখ দুটো মেলে দিয়ে শিলীভূত একটা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মংলু। তাদের পাড়ার সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা যারা মাঠে এসেছিল, তারা সবাই কলরব করে উঠল—ফুলমণি, ডোঙাবাবার থানে তু ধন্না দে। ঐ আগুনের পারা গোরো বেটীছেলে সরদারোক তুক করিছে।

না, না, তুক নয়, চেঁচিয়ে উঠল মংলু-তুরা দেখ কোন ইটা কি বটেক? ডানহাতের করতলটা প্রসারিত করে মুদ্রাটা তাদের দেখালো। মৃদুগুঞ্জনে উঠল জনতার ভেতরে ধুর, ইটা টাকা লয়, আধুলি লয়। কে জানে, ইটা কি বটেক?

উটাকে লদীর জলে ফেলায়ে দিব চল, ফুঁসে উঠল ফুলমণি। তার চোখের তারায় আগুন জ্বলছে। সাঁওতাল-দের দলটা বাড়ীর দিকে রওনা হলো। একটু পরেই আত্রাইয়ের ওপারে নিবিড় সবুজ বনদেহে কতগুলো কালো কালো ছায়ামূর্ত্তির মত তারা মিলিয়ে গেল।

দিন কাটে। দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে হিংস্র বাঘের মত গর্জন তুলে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনারসের ডেকোটা আসে। মৃত্যুর মত শান্ত ও শুষ্ক বালুরঘাট এয়ারপোর্টের বিশাল প্রান্তরে চাঞ্চল্যের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। রোজের দেওয়া ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা ছিদ্র করে একটা মোটা কালো সুতোর সঙ্গে ঝুলিয়ে গলায় বেঁধেছে মংলু। প্রতি-দিনই বাগডোগরা থেকে প্লেন আসার আগে সে এয়ার পোর্টের মাঠের একপাশে শিরীষগাছের নীচে ওয়ারলেস অফিসের সামনে একটা অভিসন্ধির মূর্ত্তির মত ঘুর্ ঘুর করে। গ্রাউণ্ড ওয়ারলেশ অপারেটার বিজয় কানে হেডফোন লাগিয়ে ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে—হ্যালো বাগডোগরা—হ্যালো বাগডোগরা প্লীজ, ইনফরম দি এক্স্যাক্ট লোকেশান অফ প্লেন,জাষ্ট টেকিং অফ্ ফ্রম ইয়োর পোর্ট—প্লীজ! বিজয়ের ব্যস্ত উত্তেজিত মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে মংলু ভাবে, বাবু কি সেই মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলছে! একথা ভাবতেই তার বুকের রক্তে দামামা বাজতে থাকে। ওয়্যারলেশ অফিসের বেয়ারা নিতাই খেঁকিয়ে উঠল—এই কি চাস এখানে? কিছু নিয়ে সরে পড়বার মতলবে ঘুরছিস না কি! তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তির যন্ত্রণা ফুটল মংলুর মুখে। গরীব, ছোট জাত হলেই কি চোর হয়! কি ভাবে এই বাবু ভদ্রলোকগুলো? ধীর পায়ে সে এয়ারপোর্টের মাঠে চলে এল। গলায় ঝুলানো চকচকে ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা হাতের ওপরে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। আর একটা কুহকিত বাসনা তার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মধুর ঝঙ্কার তোলে। আজ নিশ্চয়ই সে আসবে! কানের কাছে বাতাসে বাজতে থাকে রোজের রিন রিনে গলার স্বর বখশিষ! দূর দুরান্তর থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসে প্লেনের গর্জন। দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে ডেকোটা প্লেন মাঠে নেমে পড়ে। মংলুর দুটো চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। না। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙের সেই মেয়ে আজও এল না! শ্রীকৃষ্ণম বিরক্ত হয়ে বলে—ব্যাটা তুই রোজ আসিস কেন রে? তুই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছিস—

কেনে বাবু?

তোর সেই মেমসাহেব পাখী হয়ে কোথায় কোন সাত-সমুদ্র পারে চলে গেছে।

আর আসবেক নি?

না, কোনও দিন না।

করুণ হয়ে উঠে মংলুর চোখের দৃষ্টি। হতাশ হয়ে সে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে টলতে টলতে বাড়ীর দিকে চলে যায়। তবুও—

তবুও প্রতিদিন প্লেন নামবার আগে একটা উদগ্র প্রতীক্ষার মূর্ত্তির মত মংলু এয়ারফিল্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। অবারিত আকাশের সোনা ঝরাণো রোদে ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা চকচক করে। মংলুর যেন মনে হয়, মৃদু একটা সৌরভ জড়িয়ে আছে মুদ্রাটার চারিদিকে। সেই সুগন্ধ তার সমস্ত ধমনীকে মাতিয়ে রক্তের উচ্ছ্বাস বইয়ে দেয়। তার দুচোখে একটা অসম্ভব স্বপ্নের উল্লাস ছটফট করে। নিজের মনের গভীরে অনুভব করে—দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে সে। ফুলমণির চোখে আশঙ্কার কালো ছায়া পড়ে। টগরু মাঝির মুখে সে শুনেছে, ধানকলের কাজ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন মংলু কোমরে বাঁশীগুঁজে উড়োজাহাজের মাঠে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে পাড়ার লোকের কথা শোনে ফুলমণি। আর রাগ চাপতে গিয়ে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে। মুহূর্তে তার উত্তপ্ত জ্বালাধরা মনে সেই রাত্রির দুঃসহ মূর্তিটা ঝলসে ওঠে। সেদিন মংলু তার পাশেই ছেঁড়া মাদুরের ওপরে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। দূরে আত্রাইয়ের ধারে বাঁশ ঝাড়টা এক একটা মাথাপাগলা হাওয়ার ঝড়ে ককিয়ে উঠছিল। মংলুর গলার বাঁদিকে কালো সুতোর সঙ্গে বাঁধা সেই ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা একটা মরাসাপের মত মুখ নীচু করে ঝুলছিল। তার মজ্জায় মজ্জায় তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে বয়ে গিয়েছিল। ঐ চকচকে টাকাটাই তো তাদের সুখের সংসারের ভিতরে অভিশাপের বিষ ঢালতে উদ্যত হয়েছে। মংলু তার মুখের দিকে তাকায় না। ডেকে একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। ঝড়ু কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেলেও তাকে একবারও কোলে নেয় না। দুঃসহ একটা ব্যাথায় মুচড়ে উঠেছিল তার বুকের ভেতরটা! আর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজিত হিংস্র একটা হাতের থাবা এগিয়ে গিয়েছিল ঐ উজ্জ্বল ভয়াল অভিশাপ-টার দিকে। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল মংলু। শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে তার হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠেছিল—মংলু কি করতেছিস তু?

—টাকাটা খুলে ফেলায়ে দিব।

—কেনে?

—ওই আগুনের পারা গোরো বিটি ছাওয়ালটা তুকে তুক করিছে মংলু। তু আর হামার দিকে তাকাস না।

—টগরু বুঝিন ইসব তুকে বলিছে? ঘৃণায় মংলুর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—শালা দিনরাত হাঁড়িয়া খাবেক, আর গাঁয়ে ঐ ডোঙাবাবাকে লিয়ে পড়ে থাকবেক—তু বল, কেনে তুই ঝড়ুকে কোলে লিস না? কেনে তুই—বাদবাকী বক্তব্যটা তার গলার ভেতরে আটকে গিয়েছিল। গম্ভীর ও শান্ত গলায় বলল মংলু, ধানকলে মাহিনা মেলে নি। জানিস না তু? মন খারাপ—না। তু ওটা খুলবিক কি না বলেক—বলেই হ্যাঁচকা একটা টান দিয়েছিল, তার গলার সুতোয়। আহত একটা বাঘের মত গর্জন করে উঠেছিল মংলু। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল সে—খবরদার উটাতে হাত দিবি না। উটা হামাকে পেয়ার করে দিছে সে। ইটার ভেতরে তোর ডোঙাবাবা নাই—সেদিন গভীর রাত্রির বাতাসকে শিউরে দিয়ে ফুলমণি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

কয়েক দিন পর। দুপুরের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে কালকাপুরের ভূতকুঁড়ির পুকুরের জলে। পুকুরের পাড়ে তালগাছের পাতায় পাতায় থর থর শব্দ উঠছে বাতাসে। সেদিনও মংলু প্লেনের মাঠ থেকে ফিরছে। কত সে ভেবেছে—আর যাবে না উড়োজাহাজের ঘাঁটীতে। কি হবে যেয়ে! কী লাভ? কিন্তু আকাশ থেকে দিক-দিগন্তে যখুনি ছড়িয়ে পড়ে সেই বিশাল যান্ত্রিক পাখার তীব্র গর্জ্জন, অমনি তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বেজে ওঠে। তার দেহের শিরায় শিরায় বিচিত্র একটা মত্ততার ঝুমুর বাজতে থাকে। অবাধ্য পাদুটো এয়ার-ফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলে। তার বুকের ভেতরে একটা বলিষ্ঠ সঙ্কল্প স্তম্ভের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—না আর সে যাবে না মাঠে। পাড়ার লোক তাকে পাগল বলছে। ফুলমণির চোখে চাপা কান্না থমকে থাকে। বাড়ীতে যেয়েই সে ঝড়ুকে কোলে নেবে। ডাহুকের মাংস খেতে ভালবাসে ফুলমণি। আজই বিকেলে সে মেড়ার মাঠে যেয়ে ডাহুক শিকার করে নিয়ে আসবে। শক্ত, পেশীবহুল হাতদুটো নিদারুণ অস্থিরতায় নিসপিস করে ওঠে।

এ কী! ফুলমণি কোথায় গেল! নিঃশব্দ পায়ে মংলু বাড়ীর দাওয়ায় এসে উঠল। উঠোনে ধান স্থকোতে দেওয়া হয়েছে। শালিখ পাখীর দল সেই ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। চীৎকার করে ডাকল মংলু—ফুলমণি কুথা গেলি রে? এক পাঁজা বাসুন মেজে নিয়ে ভিজে কাপড়ে ফুলমণি এসে দাঁড়াল উঠোনে। তার চোখে হিংস্র বিষাক্ত তীরের মত দৃষ্টি। বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে থমথম করছে তার মুখখানা। পরম মমতায় মংলু তার হাতটা ধরে বলল—তুই রাগ করিস না ফুলমণি। তুকে হামি ডুরাশাড়ি কিনে দেব—

কোন কথা বুলিস না হামার সাথে। ঐ আগুনের পারা গোরো বেটীছেলেটার কাছে যা। তীব্র অভিমানে ফুলমণির চোখ ফেটে জল এল। ঘরের ভেতর থেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠল ঝড়ু। মাতলা একটা ঝড়ের মত ফুলমণি ঘরের দিকে গেল। মংলু বলল—ঝড়ু কাঁদোছে কেনে রে? উকে খাওয়াস নি? ফুলমণির দেহের রোমকুপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিল। বুকের ভেতর থেকে একটা জ্বালা যেন পাক দিয়ে উঠল মাথার ভেতরে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—তু ঝড়ুকে চিনিস!

. কেনে? কি হোয়েছে ঝড়ুর? ছুটে এল মংলু ঘরের ভেতরে। জ্বরের যন্ত্রণায় চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়েছে ঝড়ুর। বাঁশের মাচায় একটা ছেঁড়া ময়লা কাঁথার ওপরে শুয়ে সে ছটফট করছে। বিস্মিত হয়ে মংলু বলল—ওর জ্বর হামাকে বুলিস নি যি!—তুই বাড়ীতে থাকিস যি তুকে বুলবো?

—হামি বড় পাদরীর ডাগদরখানা থিকে ওষুধ লিয়ে আসি, বলেই একটা শালপাতার লম্বা বিড়ি ধরিয়ে বাড়ী থেকে বেরোতে যেতেই বাধা। কঠিন একটা সঙ্কল্পের মূর্ত্তির মত দৃঢ়পায়ে ফুলমণি তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসেছে গালে। বলল—তু ওই ডাইন মাগীটার ঐ টাকাটা খুলবু কিনা কহেক?

—কেনে ইটার সাথে ঝড়ুর অসুখের কি সাঁথ?

—হয় সাঁত আছেক। ঐ আগুনের পারা মাগীটোর তুক-করা টাকাটা তোর গলাত আছে বলেই ঝড়ুর জ্বর আসছে; তোরও জ্বর হবে। তুই মরবি—মোর ছাওয়াল মরবি—

মরণ অত সস্তা লয় রে ফুলমণি! ধান কলের কুলী, পঁচিশ বছরের জোয়ান মংলুর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝিকিরে ওঠে। ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা আগুন নিশ্বাস ফেলে ফুলমণি বলল—টগরুকে স্বপন দেখাইছে ডোঙাবাবা। তু সাঁওতালের ব্যাটা হয়ে ডোঙাবাবার কথাও মানিস না?

না। উসব তুকতাক ডোঙাবাবা হামি বিশ্বাস করি না।

ফুলমণির পেশীগুলো আচমকা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলল—তু টাকাটো খুলবু কিনা কহেক। না হলে মুই গলাত দড়ি দিমু—যেন একটা আগুনের জ্বালায় ছটফট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল ফুলমণি। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মংলু।

গভীর হয়ে রাত্রি নেমেছে। কালকাপুরের চারিদিকে ধানকাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে কালো রাত্রির স্রোত তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটে বেস্থরো বাঁশী বাজছে বাঁশঝাড়ের ঘুনেকাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দূরে কোথায় একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল—ধু—ধু—ধুম্।

মংলুর ক্লান্ত অলস দু'টো চোখে ঘুম নেমেছে। নিবিড় একটা সুখস্বপ্নে পরিতৃপ্তির ছাপ পড়েছে তার মুখে। ধান-কলে আর সে কাজ করবে না। ফুলমণিকেও আর কারো বাড়ীতে জন-মজুর খাটতে দেবে না। তার যে দুই বিঘা ধানী-জমি আছে। সেই জমিতে সে নিজের হালে চাষ করবে। মাঠ জুড়ে দিগন্তের সীমায় সীমায় সোনার ধানের মঞ্জরী বাতাসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচবে। সকাল থেকে সে মাঠে কাজ করবে। দুপুরে ফুলমণি গামছায় করে ভাতের থালা বেঁধে নিয়ে মাঠে গেলেই সে তাকে নিয়ে শিয়ালকুঁড়ির পাথারের একপাশে বসবে। ফুলমণি দুচোখে মিষ্টি হাসির ঝরণা ঝরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে গুণ গুণ করে গাইবে। আর সে গানের তালে তালে মাদল বাজাবে—দিপির দিপাং—ধিতাং—ধিতাং—হ্যাঁ। তার আর ফুলমণির সেই বর্ষার রাতে চন্দনতরীর পাথারে জীওলমাছ ধরা, বুড়োপুকুরের পাড়ে পাড়ে আম-কুড়ানো, আর নিজের জমিতে দুহাতে খেটে খাওয়ার সেই অবাধ আনন্দেভরা পুরানো দিনগুলোর ভেতরে সে ফিরে

থানে। ধানকলে কাজ নিয়ে সে একটু একটু করে মদ খেতে শিখেছে। কায়দা করে চুল কেটে, আর ফরসা জামা গায়ে দিয়ে সে পুরানো জীবনটাকে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে ফুলমণিকে ভালবাসতে। মংলুর ঘুমন্ত মুখের ওপরে অসহ্য একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে। জ্বরাক্রান্ত ঝড়ু হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠল। আচমকা মংলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কালিঢালা অন্ধকারে মোড়া ঘরের চারিদিকে তার ঘুম-জড়ানো চোখ দুটোর দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—ঝড়ু কাঁদোছে রে ফুলমণি! ওঠেক—ওঠেক। বাইরে আকাশে ঝলসে উঠল লাল বিদ্যুতের ঝলক। কোন দূর-দুরান্তর থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল অসময়ের কালো মেঘের গুরু গুরু বাজনা। একটানা ঝড়ো হাওয়া আর মেঘের ডাকের ঐক্যতান চলতে লাগল। কিন্তু ফুলমণির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধক করে উঠল মংলুর বুকের ভেতরটা। ভয়ে, উত্তেজনায় আবার পাগলের মত চীৎকার করে ডাকল—ফুলমণি রে—ফুলমণি! খট-খট-খট করে হাওয়ার দাপটে বেজে উঠল ঝাঁপের দরজাটা। বাইরে এল মংলু। তার বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলেছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। তবে কী—তবে কি ফুলমণি এতক্ষণ কোন গাছের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে-দিয়েছে! ক্যালিফর্নিয়ান মুদ্রাটা হাতের শক্ত থাবায় খিমচে ধরে একটা হিংস্র নিশ্বাস চাপতে চাপতে পাগলের মত সে ছুটে বেরিয়ে গেল। দূরে তমসাস্তীর্ণ আত্রাই নদীকে একটা ভোঁতা ছুরির মত দেখাচ্ছে। ফুলমণি রে—ফুলমণি—মংলুর আকুল-করা চীৎকারটা ঝড়ো রাতের বাতাসের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। নদীর ধারে জজ্ঞডুমুর শিমুল গাছের নীচে জমাট অন্ধকারে তলিয়ে গেছে ডোঙাবাবার থান। সেইদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মংলুর চোখের দৃষ্টি। দুর্যোগ রাতের ঘনীভূত কালোর ভেতরে ডোঙাবাবার থানের আকাশ ছোঁয়া রয়না গাছটার একেবারে নীচ দিকের ডালের কাছে ঘন নিবিড় জঙ্গলে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি যেন দুলছে মনে হচ্ছে! একটা হিমশীতল জলের স্রোত যেন হু হু করে বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দুঃসহ দৃশ্য—অপঘাত মৃত্যুর যন্ত্রণায় ফুলমণির বিকৃত চোখ দুটো যেন দুটো রক্তের ডেলার মত বাইরে ঠেলে এসেছে। দিনের পর দিন ফুলমণির জন্য কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠছে ঝড়ু। দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল মংলু, ফুলমণি রে—তু, কি করলেক! সংগে সংগে ডোঙাবাবার থানের কাছে সেই কালো অন্ধকারটাই যেন ছটফট করে উঠল। টলতে টলতে সেদিকে ছুটে গেল মংলু। আর সেই মুহূর্তেই গলা চিরে চীৎকার করে উঠল ফুলমণি—মুই রাতোত বাড়ীর থে আছিনু দেখে আগ (রাগ) করিছু মংলু? না, না, হামাক মারিস না! ভয়ে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে নদীর দিকে ছুটতে লাগল ফুলমণি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই নদীর চরের ওপরে তাকে কঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দী করে ফেলল মংলু। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—বলেক, কেনে তুই মরবা আসিছু? মুখ তুলল ফুলমণি। হাল্কা মেঘের আবরণে ঢাকা দুটো ম্লান নক্ষত্রের মত চকচক করে উঠল ফুলমণির চোখ দুটো। বলল, না মরবা আসি নি।

—তাহলি তোর হাতোত ওটা দড়ির মত কি?

—ওটা ডোঙাবাবার থানের ধুলোপড়া-মাথা লাটা-ঝোপের শিকড়। টগরু বলিছে, মাথার চুল খুলি দিয়ে ইটা লিয়ে আসে বাটে থাওয়ালে ঝড়ু ভাল হয়ে যাবি।

—এই দানো পাওয়া (ঝড়ের রাত) রাতোত এটা আসতে জীনের ডর লাগল না তোর? আলাদ সাপেও তো কাটবা পারতো!

ঝাঁঝিয়ে উঠে ফুলমণি বলল—তুই তো ঐ টাকাটো লিয়ে সেই গোরো ফটফটা মাগীর কথা ভাবছো দিনরাত। হামি ঝড়ুর মা। হামার তো জীনের ডর, সাপের ডর করলি চলবি না। ছাওয়ালোক তা বাঁচবো হবি—

স্তব্ধ হয়ে গেল মংলু। হুহু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। দুর্যোগ রাতের সেই নির্জন নদীর চর, ঝড়ো-বাতাসে ফুলে ফুলে ওঠা, গর্জিত আত্রাই নদীর একটানা ঢেউয়ের শব্দে মংলুর চেতনা কেমন একটা বিস্বাদ বিবর্ণ অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখুনি ফুলমণিকে অবাক করে দিয়ে একটা কাণ্ড করে বসল মংলু। সাগরপারের নন্দিনীর মুগ্ধ হৃদয়ের যে উপহারটা তাদের শান্ত স্নিগ্ধ ও মধুর সংসারে এতদিন ঝলকে ঝলকে অশান্তির বিষ ঢালছিল সেই মুদ্রাটাকে আত্রাই নদীতে ফেলে দিল। একটা বিস্ময়ের খোঁচায় কেঁপে উঠল ফুলমণির চোখের দৃষ্টি।

—টাকাঠো ফেলায়ে দিলি!

—হঁ্যা দিলাম। টাকাঠো ফেলায়ে দিলে ঝড়ু ভাল হবেক কিনা জানে না। কিন্তক টাকাঠো তোর বুকোত বিষমাখা তীরের মত বেঁধোছে। তু কষ্ট পাছু—তু পাগল হয়ে যাবি—একটু থেমে কেমন ভিজে ভিজে কান্নাভরা গলায় মংলু বলল—তোর চেয়ে ঝড়ুর চেয়ে টাকাঠো হামার কাছে বড় লয় ফুলমণি!

কথা নয়। ফুলমণি যেন গান শুনছে। মংলুর জল চিক চিক চোখ দুটোর দিকে সে তার নিবিড় মুগ্ধ দৃষ্টিটা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অর্থনীতি ও বাঙ্গালী

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু এম-এ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা অর্থনৈতিক চিন্তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে যাইতেছি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বহু সূত্র, তত্ত্ব, মতবাদ বা দর্শন উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত বা আলোচিত হইয়াছে। মাসিক-পত্রের জন্য লিখিত প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সেগুলির আনুপূর্ব্বিক খতিয়ান বা সুসম্বদ্ধ বিচার সম্ভবপর নয়। বাংলায় এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে অর্থনীতির অনুশীলন তেমন ব্যাপক ও গভীর হইতেছে না, বাংলা-সাহিত্য অর্থনৈতিক চিন্তায় সুসমৃদ্ধ হইতেছে না। এতদিনে বাংলাভাষাভাষী পাঠকের চিত্তে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যতখানি ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জাগিবার কথা এবং তৎপ্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মিবার কথা তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনুশীলন সম্বন্ধে আমাদের কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য আছে—তাহা এই প্রসঙ্গে নিবেদন করিতে চাই।

বাংলায় অর্থনীতির পঠন-পাঠন, আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে বটে, কিন্তু ঐ বিদ্যা যেন আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, আমাদের প্রাণরসে জড়িত হইয়া একান্ত আপনার হইয়া উঠিতেছে না। ধন-বিজ্ঞান আমাদের মনের উপরে ফেণার মত ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু চিত্তের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আলোড়ন তুলিতে পারে না। এই অপরাবিদ্যা আমাদের সমগ্র সত্তাকে উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত, আন্দোলিত, সঞ্চালিত বা হিল্লোলিত করিতে পারিতেছেনা। পারিতেছেনা যে তাহার প্রমাণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার দৈন্য, তত্ত্ব-আবিষ্কারের অভাব এবং অর্থনৈতিক দর্শনের অবিদ্যমানতা। গবেষণার নামে কচিৎ কিছু তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, কোথাও বা সংগৃহীত তথ্যরাশি প্রণালীক্রমে সুবিন্যস্ত হইতেছে; বড় জোর অন্যত্র অপরের উদ্ভাবিত সূত্রের মাধ্যমে তথ্য বা ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিতেছে। তাহার বেশী আর কিছু নয়। "পশ্চিমা" অর্থশাস্ত্রীদের মতবাদ কণ্ঠস্থ ও উদ্গীরণ করিয়া প্রাকৃতজনের সম্ভ্রম ও বিস্ময় উদ্রেক করা অথবা পাঠাগারের অভ্যন্তরে বসিয়া গ্রন্থসমূহের নাম-পঞ্জী, বিষয়-সূচি, সংক্ষিপ্ত বিবরণী রচনা তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে প্রকাশিত করা অন্য কথা। আবার বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যোগ-বিয়োগ, হরণ-পূরণ, সমন্বয়-সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে "এহো বাহ্য", কেননা, অধ্যয়ন-আলোচনা—গবেষণার মধ্য দিয়া নূতন তত্ত্ব, নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছেনা; নূতন পথ বা পদ্ধতিও বাহির হইতেছে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলার মৌলিক চিন্তার এই যে ক্ষীণতা, দীনতা ও রিক্ততা -ইহার কারণ কি?

বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে এই অভিযোগ শোনা যায় যে বাঙ্গালীর ধীশক্তির অপকর্ষ ঘটিয়াছে। সত্যই কি তাই? এই জন্যই কি ধনবিজ্ঞানে আমাদের মৌলিক চিন্তার এত দৈন্য? যে তীক্ষ্ণধী দেশীয় পণ্ডিতেরা ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও বিচার করিতেছেন তাঁহারা কি বিদ্যাবুদ্ধিতে পশ্চিমা অর্থশাস্ত্রীদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট? য়্যাডাম্ স্মিথের শ্রম (কর্ম্ম) বিভাগ, বা করনীতি-চতুষ্টয়, মার্শালের মূল্যতত্ত্ব, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব, ফিশারের সমীকরণ, এবং ম্যালথাসের প্রজাতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে উচ্চ গভীর জটিল ও সূক্ষ্ম চিন্তার এমন কি উপাদান বা বিষয় আছে যাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অসাধারণ মণীষার প্রয়োজন হয়? বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপকদের কাছে উক্ত তত্ত্বগুলি এমন কিছু দুর্ব্বোধ্য বা জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাহা ছাড়া দেশীয় লেখকেরা বিভিন্ন বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ সন্দর্ভ রচনা করেন তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধির ও চিন্তাশীলতার ছাপ থাকে। তাহাদের লেখায় তীক্ষ্ণতা, গভীরতা ও চমৎকারিত্বের সমাবেশ দেখা যায়। তাহাদের সহজাত শক্তি ও অর্জ্জিত নৈপুণ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। তবে কেন তাহার হাতে এ দেশে অর্থশাস্ত্রে নূতন দর্শনের আবির্ভাব হইতেছে না? কাব্যে উপন্যাসে, সাহিত্য শিল্প সমালোচনায়, ঐতিহাসিক গবেষণায়, রম্য-রচনায় যে মননশীলতার, অন্তর্দৃষ্টির ও সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, ধন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার অভাব লক্ষিত হয় কেন? যে প্রতিভা বিভিন্ন

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আমাদের প্রথমেই মনে হয় যে আমরা ধন-বিজ্ঞান লইয়া যেন সখের চর্চা করি, নেহাৎ দায় সারার মত কায়ক্লেশে কাজ সারি,—মনপ্রাণ দিয়া, হৃদয়ের অনুরাগ ঢালিয়া তাহার সেবা করি না। ব্যক্তিগত রুচিও প্রবৃত্তি অনুসারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমালোচনা, যেমন আমাদের স্বাভাবিক মনন ও ধ্যানের বস্তু, স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণার উৎসমূল, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রস্রবণ বা চিত্তের নিভৃত লীলা নিকেতন হয়, ধন-বিজ্ঞান কিছুতেই তেমন হইয়া উঠিতেছেনা। এই বিদ্যা আমাদের মানসিক সত্তার বহিরঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। কিছুতেই অন্তরঙ্গ হইতে পারিতেছেনা। মাননীয় এই অতিথিকে মনের বহির্বাটীতে সাড়ম্বর-সমারোহে গুরু—গম্ভীর জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যর্থনা করি বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে আপন জনের মত করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। আমাদের রচিত অর্থনৈতিক প্রবন্ধে ও সন্দর্ভে, গ্রন্থে ও পুস্তিকায় যেন রহিয়াছে একটা আড়ষ্টতা, কেমন একটা কৃত্রিম ক্লিষ্ট প্রয়াস—তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দ সাবলীল-গতিবেগ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একদিকে যাঁহারা ভারতীয় দর্শন, শঙ্কর ভাষ্য, নব্যন্যায় এবং অপর দিকে প্লেটো, আরিস্তুতল, কান্ট্, হেগেল, কোঁৎ, স্পেন্সার, মিল ও মার্ক্স প্রভৃতির গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাদের হাত দিয়া আজ পর্য্যন্ত একখানা উল্লেখযোগ্য ধন-বিজ্ঞানের বই বাহির হইলনা? ভারতীয় পণ্ডিতদের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে স্মিথ, জেভনস্, রিকার্ডো, মার্শাল, ফ্রেডরিক লিষ্ট, বোহম-বায়ের্ক, পিগু, কেইনস্, কার্ভার, সেলিগম্যান্, প্রভৃতির অর্থনীতি কদাচ দুরধিগম্য হইতে পারে না। তবু কেন অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার দিক দিয়া বাংলায় এত দৈন্য? অপরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বা সত্য আয়ত্ত করিতে যে মানসিক শক্তি দরকার তাহা এ দেশে পূর্ণমাত্রায় আছে। ব্লটিং কাগজ যেমন কালির আঁচড় নিঃশেষে চুষিয়া লয়, ঠিক তেমন ভাবে আমরা অপরের আহরিত জ্ঞান অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আত্মসাৎ করিয়া ফেলি—এত দ্রুত ও পরিপাটী অঙ্গীকরণ এবং অনায়াস অনুকরণের দৃষ্টান্ত অন্যদেশে দুর্লভ। কিন্তু আমাদের মানসিক কসরতের কেরামতি ও কায়দা ঐখানে পৌঁছিয়াই থামিয়া যায়। তথ্য, বস্তু বা ঘটনার উপরে মননশক্তির আলোকপাত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যময় তত্ত্বকে প্রকাশিত করার প্রতিভা কোথায়? শ্রম-অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রভৃতি গুণের অভাবে আমাদের গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা তেমন ফলপ্রসূ হইতেছে না। আমাদের গবেষকদের মধ্যে অনেকেই তীক্ষ্ণধী, অধীতবিদ্য ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু অর্থ-বিদ্যা-সমুদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-নিমজ্জন কোথায়? চাই আত্ম-বিস্মৃতি, আত্ম-বিলোপ, আত্ম-বিসর্জ্জন, অর্থাৎ এই বিদ্যার সঙ্গে একান্ত একাত্মতা। অনন্যানুরাগ ও তজ্জনিত একাগ্রতা ব্যতীত এরূপ একাত্মতালাভ অসম্ভব। এরূপ শোনা যায় যে আলফ্রেড্ মার্শাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ-অবকাশে আল্পস্ পর্ব্বতের শৈবাল-শিলার উপরে বসিয়া সমাহিত-চিত্তে মূল্যতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেন। যোগীজনোচিত এই যে ধ্যান-তন্ময়তা, একনিষ্ঠ সাধনা বা যায় কি? মননশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও তাহার প্রভাবে ব্যক্তি-সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আলোড়িত করিয়া তুলিতে না পারিলে বিদ্যা কখনও জীবন্ত হয় না এবং বিদ্যা জীবন্ত না হইলে তত্ত্ব-আবিষ্কার বা সত্য-দর্শন সম্ভবপর হয় না। জলের মাছের জলে সঞ্চরণ কেমন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও সানন্দ, আর মুক্তা-আহরণ-কল্পে ডুবুরীর জলে ডুবিয়া থাকার জন্য সে কি প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্র-প্রয়াস! উপরে লিখিত এই উপমা বা রূপকটী স্বতই মনে উদিত হয়—যখন পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রীদের কৃত্যের সঙ্গে দেশীয় ধন-বিজ্ঞান-সেবিগণের কার্য্যের তুলনা করি। বিদেশী ও দেশীয় পণ্ডিতদের কর্ত্তৃক ধন-বিজ্ঞান-অনুশীলনের তুলনা করিতে গিয়া অন্য উপমা ও প্রয়োগ করা চলে। পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রীরা ধন-বিজ্ঞান-রূপ ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যেন শুধু ছিবড়াই চুষিতেছি; পক্ষান্তরে আমরা নারিকেলের শাঁস ও জল কোনটারই নাগাল পাইতেছি না, শুধু শুষ্ক মালা ও নীরস খোসার উপরে নিষ্ফল চঞ্চু—আঘাত করিতেছিমাত্র। আর পাশ্চাত্য ধন-বিজ্ঞান-রসিকেরা অর্থনীতি-রূপ নারিকেলের মিষ্ট জল ও সুস্বাদু শাঁস পাইয়া তৃপ্তি পাইতেছেন। অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন যে আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সুলভ হইতেছে না তাহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। তন্মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মনে হয় যে বাস্তব-বিষয়-জগতের সঙ্গে আমাদের দেশীয় ধন-বিজ্ঞান-সেবিগণের প্রত্যক্ষ পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। তদুপরি তাহারা আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদত্ত সূত্র, নীতি বা মতবাদরূপ রঙীণ চশমার ভিতর দিয়া আর্থিক তথ্যগুলিকে দেখিতে অভ্যস্ত। রৌদ্র-রূঢ় বাস্তব-জগতের কর্কশ স্পর্শ এড়াইয়া পাঠাগারের নীল পরদার অন্তরালে একটী নিভৃত স্নিগ্ধ পরিবেশে বইর ভিতর দিয়া তাঁহারা যে ছবিয়া দেখেন তাহা বাস্তবের একটা মায়িক প্রতিচ্ছবি মাত্র। কায়ার সঙ্গে ছায়ার যে পার্থক্য, বাস্তবের সঙ্গে পুঁথিঘরের নকল ছবিরও সেই পার্থক্য। সত্যিকার রূপ, রস, রং, ধ্বনি, ও পরশ হারাইয়া তাহা শেষ পর্য্যন্ত একটা খণ্ডিত প্রাণহীন যান্ত্রিক ফরমূলায় (formula) পর্য্যবসিত হয়। কৃষি-ক্ষেত্রের, হাট-বাজারের, কল-কারখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় এবং শিল্প-সংগঠনের, বণ্টন-নীতির মূলগত সমস্যার, বিনিময়-ব্যবস্থার কলাকৌশলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় আমাদের অধীত বা আয়ত্ত বিদ্যা নিতান্তই ভাসা-ভাসা কেতাবী বিদ্যাই থাকিয়া যায়; তাহা মনন-শক্তির মূলে রস সিঞ্চন করে না এবং উদ্ভাবনী-কুশলা কল্পনাকে সার্থক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে না।

হাড়গোড়সমেত নিরেট শক্ত মাংসখণ্ডকে দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া আয়ত্ত করা এক, আর তাহার কঠিন অংশটুকু সযত্নে বর্জ্জন করিয়া কৃত্রিম-ভাবে থেঁতলাইয়া মোলায়েম চপের রসনা-বিলাসে পরিণত করিয়া বিনা আয়াসে আরামের সঙ্গে গলাধঃকরণ অন্য জিনিষ। মানসিক ব্যাপারেও অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তুনিষ্ঠ নিরেট তথ্যকে অপরের তৈরি-করা (ready-made) তত্ত্বের ছাঁচে ফেলিয়া নিতে পারিলে চিন্তার ক্লেশ ও ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায় বটে, কিন্তু সত্যের দর্শনলাভ হয়

পারিলাম না। সম্মুখে গর্জ্জনমান অতল নীলসমুদ্র প্রসারিত—তাহার রহস্যময় আকর্ষণ দুর্নিবার। দুঃসাহসী অভিযাত্রী অতল গভীর নীল জলের কোলে আত্ম-সমর্পণ করে, আর ভীরু সাবধানী পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রী তটের কাছে হাঁটুজলে মুলিয়ার হাত ধরিয়া কাকস্নান সারিয়া সমুদ্রস্নান করিলাম বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। ধন-বিজ্ঞান-সমুদ্রের অকূল-পাথারে নির্ভয়ে ভাসিতে না পারিলে তাহার রহস্য-রাজি আয়ত্ত করা যায় না। যে জিনিষের যাহা ন্যায্য মূল্য তাহা তাহাকে দিতেই হইবে। লোনাজলে বিস্তর নাকানি-চোবানি খাইতে হইবে, স্নায়ু-পেশীতে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইবে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিবে। অপরের তৈরি-করা তত্ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুর ও ভাবুকের মধ্যে অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন আড়াল বা ব্যবধান, কোন মায়া মোহ থাকিবে না। নির্ম্মম বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। স্পর্শকঠোর বাস্তবের মুখামুখি দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়া রহস্য কাড়িয়া লইতে হইবে। রাগদ্বেষের, পূর্ব্ব-সংস্কারের, পূর্ব্বকল্পিত মতবাদের, আকাঙ্ক্ষিত পরিণামের কোন ছায়া যেন আসিয়া না পড়ে। খোলাচোখে, খোলামনে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্যগুলিকে গ্রহণ, বাছাই ও বিচার করিতে হইবে। তারপর প্রজ্ঞার শুভ্র আলোকে যে সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত হয়, তাহা যেন অবিচলিত চিত্তে অম্লান-বদনে গ্রহণ করি ; কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত যদি আমাদের পছন্দসই, মনোমত বা স্বার্থানুসারী না হয় তবে তাহা বর্জ্জনীয় হইবে এরূপ যেন মনে না করি।

আমাদের ভারতীয়দের মানসিক গড়ন দার্শনিক ছাঁচের। তাত্ত্বিকতা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম। জ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বাবিষ্কার, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ইহাই সকলের ধারণা। সুতরাং চিন্তার অন্য ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনই তত্ত্ব-ভুয়িষ্ঠতা আমাদের কাছে প্রত্যাশিত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটা গোটা দর্শন ত দূরের কথা, এক আধখানা মৌলিক সূত্র বা মতবাদ পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কপিলের সাংখ্যদর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, নব্যন্যায় প্রভৃতি যাঁহারা আয়ত্ত করিতেছেন তাঁহাদের ধীশক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কপিল, শঙ্কর প্রভৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চিন্তাশীলতার যে তুঙ্গশৃঙ্গে বা অতল গভীরে পৌঁছিতে হয় তেমন উচ্চ বা গভীর মানসিকতা কি আছে স্মিথে বা মার্শালে ? প্রজাতত্ত্ব, খাজনাতত্ত্ব, মূল্যতত্ত্ব প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে হইলে মগজে যতটা ঘি থাকা দরকার তাহার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী ঘি আছে ভারতীয় পণ্ডিতদের মস্তিষ্কে। তবু কেন এদেশে আজ পর্য্যন্ত অর্থনীতি বিষয়ক এমন কোন মৌলিক সূত্র বা মতবাদ উদ্ভাবিত হয় নাই যাহা পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রীদের দানের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। আমাদের অর্থ-নৈতিক রচনাগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থের উপরে লিখিত নোটের মত—ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাবানুবাদ, ভাব-সম্প্রসারণ বা সরলীকরণ মাত্র। তথ্যের সুনিপুণ বর্ণনা, বিশদব্যাখ্যা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সূক্ষ্ম সমালোচনা ক্ষেত্র বিশেষে মৌলিকতার দাবীও করিতেছে। তাহাতে বিলক্ষণ মুন্সিয়ানা আছে এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে নাই ধন-বিজ্ঞানের আসল প্রাণ, সারসম্পদ, মূলসুর ও অকৃত্রিম প্রেরণা। অর্থ-নৈতিক ভাবনা যেন আমাদের পোষাকী বহির্বাসের মত, দরবারে বৈঠকে, সভা-সমিতিতে, সম্মেলনে-পরিষদে পরিয়া যাই, কিন্তু ইহাতে স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম পাই না। কতক্ষণে ইহা খুলিয়া ফেলিয়া কথা-সাহিত্যের ঢিলা-ঢালা আরামদায়ক ধুতি-চাদর পরিতে পাইব তাহার প্রত্যাশায় থাকি। আমাদের বাঙ্গালী-চরিত্রের কল্পনা-প্রবণতা, ভাবালুতা, আবেগ-পরায়ণতা, উচ্ছ্বাসাতিশয্যের জন্য এবং অধ্যবসায়ের ও বস্তুনিষ্ঠার অভাববশতঃ এই শাস্ত্রে আমাদের মতি ও রতি হইতেছে না। অবশ্য সংকল্পের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা থাকিলে অসাধ্য-সাধনও হয়। তাহার প্রমাণ আছে বাংলার ইতিহাসেই। বাঙ্গালীর মনীষা মিথিলা হইতে নব্যন্যায়কে জয় করিয়া আনিয়াছিল। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, মনন শক্তি ও কল্পনা কুশলতাকে ধন-বিজ্ঞানের খাতে সংহত ভাবে দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিতে পারিলে অবশ্যই অভীষ্টলাভ হইবে। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ আজ আর্থিক দিক দিয়া মৃতকল্প। মরা বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে একদল আত্মত্যাগী দৃঢ়সংকল্প কচকে সাহিত্যের নন্দন-কানন হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন স্বীকার করিয়া শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গিয়া ধন-বিজ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে।

কেরালায় কয়েকদিন

ভূপতি চৌধুরী

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমতম অংশ কেরালা। সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি এখন এর দিকে নিবদ্ধ। এই প্রদেশটিতে কংগ্রেস-বিরোধী দল—মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। প্রাক স্বাধীন যুগের ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যসমন্বয়ে নতুন কেরালার উদ্ভব-ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের একটা দৃষ্টান্ত। "কন্যাকুমারী" অন্তরীপ পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু নতুন বিভাগের ফলে সে সহরটী এখন মাদ্রাজ প্রদেশের কুক্ষীভূত।

কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রম—কলকাতা থেকে যেতে তিনদিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। রেলের হিসাবে দূরত্ব কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ১০৩১ মাইল, আর মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রম ৫১২ মাইল—একুনে ১৫৪৩ মাইল। দ্রুত যেতে হলে—হাওয়াই জাহাজে যেতে হয়, কিন্তু তাতে সময় কম লাগলেও অসুবিধা কম নয়। রাতের প্লেনে গেলে সবচেয়ে কম সময় লাগে, কিন্তু দুপুর রাতে নাগপুরে প্লেন থেকে নেমে আবার অন্য প্লেনে চড়ার কথা স্মরণ করলে এ পথ ত্যাগ করার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। দিনের প্লেনে সোজা মাদ্রাজ যাওয়া যায় বটে, কিন্তু একটা রাত মাদ্রাজে কাটাতে হয়। সবদিক ভেবে অর্থাৎ রাত্রি জাগরণের অসুবিধা ও খরচের কথা স্মরণ করে স্থির করা গেল যে ট্রেণে ভ্রমণই প্রশস্ত—দিব্য শুয়ে আরাম করে বিশ্রাম উপভোগ করা যাবে।

সাড়ে চারটায় মাদ্রাজ মেল—মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তখন সন্ধ্যাই বলা চলে—হাওড়া ষ্টেশন আলোকে উদ্ভাসিত—ষ্টেশন ইয়ার্ডের শেষে গাছের মাথায় শীতের কালো চাদরের ঢাকা নেমে এসেছে—গ্রামের বাড়ী ঘর স্পষ্ট দেখা যায় না—দু'একটা সন্ধ্যার প্রদীপ দেখা যায় মাত্র।

মাদ্রাজ মেল নামেই মেল—অন্য দিকের মেলের তুলনায় এর গতিবেগ অনেক মন্দ—দিল্লী মেল ৯০৫ মাইল যেতে সময় নেয় ২৫ ঘণ্টা—ভেষ্টিবিউল এক্সপ্রেস ত আর তিন ঘণ্টা কম সময়ে যায়, আর মাদ্রাজ ১০৩১ মাইল, যেতে সময় লাগে ৪০ ঘণ্টা। এত সময় লাগার অজুহাত নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আজকের এই গতির যুগে সে অজুহাতের নিরাকরণ একান্ত প্রয়োজন।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে জুট মিলের সারি—দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথ সেগুলির গা ঘেঁসে চলতে চলতে দামোদর ও রূপনারায়ণের সেতু পার হয়ে খড়্গপুরে এসে দুটী ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগ চলে গেছে পশ্চিমমুখে—বোম্বাই, অপর ভাগ দক্ষিণমুখী মাদ্রাজে। খড়্গপুরে গাড়ী এসে যখন থামল, ঘড়িতে ১৮।৪৯ মিঃ। মনে মনে হিসাব করলাম ৭২ মাইল পথ আসতে সময় লাগল ২ ঘণ্টা ৩৪ মিঃ—গাড়ীর গতিবেগ কত? ৩০ মাইলের কম মেল-ট্রেণের গতিবেগ বিরক্তিকর। আমার সহযাত্রী বন্ধু কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় হেসে বললেন—বিশ্রামের অবকাশ কিন্তু বেশী মিলবে। অগত্যা সেই কথা স্বীকার করে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল।

একটি রাত কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হল—দেখি গাড়ী বেরহামপুর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ রাত্রে চিল্কাহ্রদের পাশ দিয়ে গাড়ী চলে—দৃশ্যটি বড় উপভোগ্য, কিন্তু অকালে সকাল ক'রে নিদ্রাভঙ্গ করার বাসনা মোটেই ছিল না। এখান থেকে ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য—বড় উপভোগ্য, কিন্তু তারপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল—আহার ব্যবস্থার অব্যবস্থা—ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত গাড়ীর সঙ্গে খানা-কামরা থাকে। এই পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেল পথের সীমানা—তারপরই সুরু হল দক্ষিণ রেলপথের অধিকার। দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা অনেক ষ্টেশনে আছে বটে, কিন্তু আমাদের মতো আমিষ আহারীদের আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করতে হলে কিছুটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। রেলের সময়সূচী থেকে আমিষ আহার্য্য পাওয়া যায় এমন ষ্টেশনের নাম খুঁজে আগে থেকে খবর না দিলে সময় মতো আহার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সময় কাটাবার পক্ষে এই চেষ্টা যে খুবই কার্য্যকরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪০ ঘণ্টা পরে, দুটি রাত ট্রেণে কাটিয়ে সকাল সাড়ে আটটায় যখন মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল, তখন সত্যিই যেন একটা ক্লান্তি বোধ হয়। মাটিতে পা দিয়ে মন অনেকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মামলা—আবার সাড়ে আটটায়—ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস্—মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশন থেকে। মাদ্রাজের এগমোর ষ্টেশনটি—মিটার মাপের লাইনের প্রধান আস্তানা। ঔজ্জ্বল্যে ও আয়তনে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের তুলনায় অনেক নীরেশ। তবে ব্যবস্থা মন্দ নয়; ষ্টেশনের দোতলায় দশটি রিটায়ারিং রুম আছে—ভাড়া দৈনিক পাঁচ টাকা। রিটায়ারিং রুম দখল করতে হলে—ট্রেণ থেকে নেমেই তৎপরতাবে অগ্রসর হতে হবে। বিলম্বে হতাশা অনিবার্য্য। একথা পূর্ব্বেই জানা ছিল বলে সময়ক্ষেপ না করে এগমোর ষ্টেশনে এসে হাজির—সব ঘর দখল হয়ে গেছে, মাত্র একটি ঘরখালি আছে—সেটি মহিলাদের জন্য। আমাদের দলে রাণীগঞ্জের বন্ধু মণিমোহন মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক ভ্রমণে বার হয়েছিলেন—অগত্যা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের নামেই সেই ঘরটি দখল করা গেল। নতুবা এই বারো ঘণ্টার জন্য আবার হোটেলে উঠতে হত।

স্নান পর্ব্ব সেরে নীচে প্লাটফরমের পাশে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে আশ্রয় নেওয়া গেল—ঘরটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয় বটে তবে আহার্য্যের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়—দাম সস্তা।

প্রাতর্ভোজনের পর মণিমোহন ও আর এক বন্ধু বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যুত পরিদর্শক নৃপেন্দ্র নাথকে সস্ত্রীক মহাবল্লীপুরম্ ও পক্ষীতীর্থ দর্শনে

প্রেরণ করে একটি অটোরিক্সা সহযোগে সহর পরিক্রমণে বার হওয়া গেল। ভাড়া খুব সস্তা—মাইল পিছু চার আনা। মোটর সাইকেলের গতিজ্ঞাপক যন্ত্রের মাইল মিটার দেখে দূরত্বের হিসাব ঠিক রাখতে হয়। মাদ্রাজের রাস্তায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রাস্তা অনেকটা ফাঁকা মনে হল।

মাদ্রাজের ধারে পাশে দ্রষ্টব্য স্থানের অভাব নেই। মহাবল্লীপুরম্, পক্ষীতীর্থ ও কাঞ্জীভরম্—এগুলি পুরানো যুগের তীর্থ। নতুন যুগের তীর্থও কম নয়—বিখ্যাত বাকিংহাম ও কার্ণাটিক মিলের কারখানা ও ভারতসরকারের রেলকামরা তৈরীর কারখানা খুবই আকর্ষণযোগ্য। সময়ের অভাবে এবারের মতো নতুনযুগের তীর্থ দেখার ইচ্ছা স্থগিত রেখে, রাত্রের ট্রেণে ত্রিবাঙ্কুর যাত্রা করতে হল।

পথে তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা প্রভৃতি বিখ্যাত সহর। নীলগিরি পর্ব্বতমালা ভেদ করে রেলপথ চলেছে—মধ্যে মধ্যে সুড়ঙ্গ—ঘাটপথের দৃশ্য বড় সুন্দর—একধারে সমতল, অন্যধারে উঁচু পাহাড় ও জঙ্গল। রেলের লাইন পাহাড়ের গা বেয়ে সমুদ্রের ধারে নেমে এল—দুধারে নারিকেল ও কাজু বাদামের গাছের সারি। ছোট ছোট নারিকেল গাছে—ফল ফলেছে অসংখ্য—দেখতে ভারি ভালো লাগে।

সমুদ্রের খাঁড়ির সঙ্গে নারিকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ট্রেণ এসে গন্তব্যস্থানে দাঁড়াল। ত্রিবান্দ্রম ষ্টেশনটী ছোট—বাহার বিশেষ নেই, তবে যাত্রীদের থাকার জন্য রিটায়ারিংরুমের ব্যবস্থা আছে। আমাদের অবশ্য রিটায়রিংরুমে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি। স্থানীয় নির্ম্মাণবিদ্ বন্ধুরা ষ্টেশনে আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। গাড়ী থেকে নামতেই চা-পানের অনুরোধ—ইতিমধ্যে আমাদের জিনিষপত্র গাড়ীর মধ্যে বোঝাই করে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল।

চা-পান শেষ করে, ধীরে সুস্থে ষ্টেশন থেকে বার হয়ে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে নবলব্ধ বন্ধু সমভিব্যাহারে উপস্থিত হওয়া গেল। বাড়িটী বড়

টাউনহল

সুন্দর, দুতলা বাংলো ধরণের—চার পাশে প্রকাণ্ড বাগান। গাড়ী-বারান্দার তলে গাড়ী এসে দাঁড়াল। শোনাগেল দেশীয় রাজার আমলে এগুলি মন্ত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—বর্ত্তমানে এটী বিশিষ্ট সরকারী অতিথিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

রাস্তাঘাট পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে—পিচ্ মোড়া। পথের দুধারে কৃষ্ণচূড়া জাতীয় গাছের সারি—তাতে হালকা নীল রঙের ফুলের কী অপূর্ব্ব সমারোহ—সূর্য্যের আলো ফুলের রঙে রঙিণ হয়ে উঠেছে। কে যেন চার দিকে নীল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের আস্তানার সামনে যে রাস্তা, তার অপর পারে যাদুঘর—বাড়িটীর গঠনে মধ্যযুগের ইংলণ্ডের স্থাপত্য রীতির ছাপ সুপরিস্ফুট—যাদুঘরের প্রবেশ দ্বারের গঠনটী কিন্তু ভারী সুন্দর—চার পাশের পরিবেশের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে।

যাদুঘরের সীমানার মধ্যেই চিড়িয়াখানা ও চিত্রশালা। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় যাদুঘরের বাড়ি—চারপাশে সুন্দর বাগান ও বসবার

মিউজিয়ামের তোরণ

স্থান। যাদুঘরের সংগ্রহ খুব বড় কিছু নয়—মোটামুটিভাবে চিত্তাকর্ষক। যাদুঘরের কিছু দূরে চিত্রশালা—চারপাশের গাছপালার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়ে আছে—চোখ ধাঁধান কিছু নয়। কিন্তু চিত্রশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে চিত্রসংগ্রহ দেখলে সত্যই আনন্দ পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য একটু বিশেষ ভাবে গর্ব্ব বোধ করলাম এই দেখে যে বাংলা দেশের প্রত্যেক খ্যাতনামা শিল্পীর চিত্র এই সংগ্রহশালার অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ, অতুলবসু প্রভৃতি শিল্পীর যথেষ্ট ছবি এই চিত্রশালাটীতে সুন্দরভাবে সাজান আছে। এই চিত্রশালাটীর আর একটী অপূর্ব্ব অংশ হল—রবি বর্ম্মার ছবির সংগ্রহ। রবিবর্ম্মা যে কতবড় শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন তা এই সংগ্রহ দেখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ছেলে বেলায় বাংলা মাসকপত্রে রবিবর্ম্মার ছবির অনুলিপি দেখে আমাদের মনে যে ধারণা হয়েছিল—এই সংগ্রহটী দেখবার পর সে ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। চিত্রশালাটীতে কিছু জাপানী ও চীনা ছবিও সংগৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত মহাভারতের ফার্সী অনুবাদ ও আওরঙজেবের লিখিত কোরাণের অংশ বেশ সুন্দর ভাবে কাঁচের আলমারীর ভিতর

নয়। তবে কিছুক্ষণ থাকার পক্ষে আরামপ্রদ বলা চলে। পূর্ব্বেই খবর দেওয়া ছিল—সুতরাং ডাকবাংলোয় প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃ-ভোজনের আহ্বান পাওয়া গেল।

কুইলোনে দ্রষ্টব্য স্থান বলতে বিশেষ কিছু নেই, তবে জানা গেল এখানে "ইলেকট্রিক মিটার" তৈরীর একটী কারখানা আছে। বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার মিটার তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠানটী কেরালা সরকারের পরিচালনাধীন। দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকায় এটী অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, আমরা এখানে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পর আবার উত্তরদিকে অগ্রসর হলাম। টার বা আলকাতরা ঢালা মসৃণ পথ, দুপাশে নারিকেল গাছের সারি, মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের খাড়ি, সরু খাল আর মাছধরার নৌকা। এই হল মালাবার উপকূলের খাঁটী দৃশ্য। পথে পড়ল একটী লোহার সেতু—এত সরু ও নীচু যে তার মধ্যে বড় গাড়ী চালনা করতে হলে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। সরকারী বাসগুলি যে কী ভাবে এর মধ্যে যাওয়া আসা করে তা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে।

পথে "চাভারা" নামক একটী ছোট উপনিবেশে কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করা হল। এখানে "নরওয়ে" দেশের একটী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায়—একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কংক্রীটের পাইপ বা নল তৈরীর কারখানাস্থাপন করেছেন। এই পাইপ কেরালা সরকারের জল সরবরাহের পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হবে। কারখানাটি বিশেষ বড় নয়, তবে ব্যবস্থা বেশ সুসম্বদ্ধ। শোনা গেল যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কয়েক বছর বাদে এই কারখানাটি স্থানীয় সরকারের সম্পত্তি হয়ে যাবে এবং স্থানীয় নির্ম্মাণবিদ্‌রা এখানে ইতিমধ্যে কাজ শিখে নিয়ে এখানকার পরিচালক হতে পারবেন।

আপাত দৃষ্টিতে ব্যবস্থা ভাল বলেই মনে হল।

কারখানা পরিদর্শনান্তে পরিশ্রান্ত বন্ধুরা ডাবের জল পান করে শ্রান্তি দূর করলেন। কারখানার পরিচালকদের সৌজন্যে প্রীত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আবার যাত্রা সুরু করা গেল।

আকাশে নীল মেঘ—সূর্য্যদেব বেশ প্রচণ্ড তেজে প্রকাশমান। মাঘমাস হলেও রৌদ্রের প্রখরতা অপ্রীতিকর বলে মনে হচ্ছিল। পথের দুপাশে মধ্যে মধ্যে তরু বিহীন প্রান্তর। সহসা দৃষ্টিগোচর হল একটী কাঠের সেতু—জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়তে পারে। তার পাশেই একটী লোহার সেতু—অতি অপ্রশস্ত, কোনোরকমে একটি বড় গাড়ী বা লরি যেতে পারে। খালের দুই পাড় বেশ উঁচু। সেতুর উপর যেতে বেশ সাবধান হতে হয়। একটি প্রধান রাজপথের উপর এই ধরণের সেতু দেখে বড় বিস্ময় বোধ হল। অথচ আর একটু অগ্রসর হতেই গাড়ী এসে দাঁড়াল একটী বিরাট বাঁধের সামনে। খোটাপল্লী স্পিলওয়ে সমুদ্রের চওড়া খাড়ির ওপর এই বাঁধ। লোনা জলের গতি রোধ করে ভিতরের জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করার জন্য এই পরিকল্পনা, বাঁধের ওপর প্রশস্ত রাজপথ—খাড়ির দুধারে সারি সারি একই ধাঁচের অগুণতি বাড়ী—ছোট কিন্তু কুশ্রী নয়। বাঁধ পার হতেই দেখা গেল একদল লোক কিছু ডাব সংগ্রহ করে বসে আছে। বাংলাদেশের লোক, ডাব দেখেই কণ্ঠ পিপাসিত হয়ে উঠল। গাড়ীর সারথীর সঙ্গে কথা বলে তার সহায়তায় ডাবের

খোটাপল্লীর বাঁধ

জলপান ও শাঁস ভক্ষণ করা হল। ডাবের দাম কলকাতারই মতো—চার আনা।

আর কালক্ষয় না করে আবার অগ্রসর হওয়া গেল—দুপাশের দৃশ্য বাংলাদেশেরই মতো সবুজ—পথ চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট খালের উপর দিয়ে—খালের দুপাশে ছোট ছোট ফলন্ত নারকেল গাছ ঝুঁকে পড়েছে। নৌকার সারি তারি ফাঁকে ফাঁকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেতে যেতে কাঠের ফলকে লিখিত বিজ্ঞাপন মারফৎ জানা গেল যে নারকেল গাছ সম্বন্ধে এদেশে সরকারীভাবে অনেকগুলি গবেষণাগার আছে। এদেশে এই গাছটি একটি অমূল্য সম্পদ। এই সঙ্গে আর একটি জিনিষ নজরে এল—বাংলাদেশ বা পূর্ব্ব উপকূলে তালগাছ ও নারকেল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—কখনও তালকুঞ্জ, কখনও নারিকেল কুঞ্জ। কিন্তু পশ্চিম উপকূলে তালগাছের অস্তিত্ব বিশেষ দেখা গেল না।

কেন তালগাছ দেখা গেল না এনিয়ে আলোচনা শেষ হবার পূর্ব্বেই

এলেপ্পির জাহাজঘাট

গাড়ী একটি সহরের মধ্যে প্রবেশ করল—সরু পথ দুধারে আমাদের

দেশের হকারস কর্ণারের মতো অসংখ্য ছোট ছোট দোকান। মধ্যে মধ্যে ছোট নোংরা জলে ভর্ত্তি খাল—তাতে বেশ বড় বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। স্থানটিকে বেশ একটি বড় রকমের গঞ্জ বলে মনে হল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—এ সহরের নাম এলেপ্পি—এটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ছোট বন্দর। ছোট ছোট মাপের জাহাজ এখানে এসে বাণিজ্য করে যেতে পারে।

জাহাজ ঘাটটি বড় নয় তবে বেশ কর্ম্মব্যস্ত—সমুদ্রের ধারেই ফ্ল্যাগষ্টাফ। বাতিঘরটি কিন্তু একটু ভিতরে। জাহাজ ঘাটের পাশেই

এলেপ্পির ফ্ল্যাগষ্টাফ
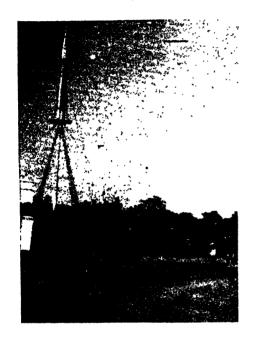
একটি খাল—দুটি তীরই বাঁধানো। কপাটকলের সাহায্যে খালের জল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জলের উপর ভাসমান নোংরা, শুধু দৃষ্টিকটু নয় দুর্গন্ধময়ও বটে। খালের ওপর পারাপারের সেতু। এই খালের ধার দিয়ে বাতিঘরের পাশে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল ইন্‌পেকসন বাংলোর সামনে। দুতলা বারান্দাযুক্ত পাকাবাড়ী—সামনে সামান্য খোলা জমি—কয়েকটি গাছপালা আছে—গাড়ী থেকে নেমে একটা স্বস্তিবোধ হল। মধ্যাহ্নে এইখানেই বিশ্রাম।

ত্রিবান্দ্রম থেকে এলেপ্পির দূরত্ব প্রায় ৯৮ মাইল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকলেরই চোখ নিদ্রাভারাক্রান্ত। ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর আবার সতেজ হয়ে পরিভ্রমণ সুরু হল।

রৌদ্রের তেজ তখন কমে এসেছে—গাড়ীতে ভ্রমণ অনেকটা প্রীতিকর। আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গাড়ী এসে থামল একটি ঘাটে —পারাপারের জন্য। অতি প্রশস্ত সমুদ্রের খাড়ি—স্থানটির নাম—আরুর। দশ মিনিটের মধ্যে মোটর ফেরীতে আমাদের গাড়ী অপর পারে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ী পারাপার করার ব্যবস্থা বেশ ভাল। দুটি মোটর ফেরী ক্রমাগত এপার ওপার যাতায়াত করে। ফলে "একনদী বিশ ক্রোশ" কথাটি ঠিক এখানে প্রয়োগ করা গেল না। যাতায়াতের জন্য ফেরীর ভাল ব্যবস্থা থাকলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও সরল করার জন্য এখানে একটি কংক্রীটের সেতু নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। কাজ সুরু হয়েছে তার নিদর্শন দেখা গেল। খুব সম্ভব তিন বছরের মধ্যেই এই সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

"আরুর"য়ের অপর পারের নাম—এড়া কোচিন। সুতরাং আসল কোচিন যে অদূরে অবস্থিত হবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোচিন বন্দরে এসে পড়া গেল। বন্দরটি একটি দ্বীপের মধ্যে, দুটী প্রকাণ্ড সেতুর সাহায্যে এই দ্বীপটি অন্তর্দ্দেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। চওড়া মাপের রেলপথ--মাদ্রাজ থেকে সরাসরি কোচিন পর্য্যন্ত এসেছে—"কোচিন এক্সপ্রেস" আঠারো ঘণ্টায় ৪৭৩ মাইল ছুটে একেবারে জাহাজঘাটায় এসে পৌঁছায়। কোচিন থেকে কোট্টায়াম পর্য্যন্ত মিটার মাপের একটি রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে। আশা আছে যে বছর দুয়ের মধ্যেই এই রেলপথটি কুইলোন পর্য্যন্ত টেনে নিলেই ত্রিবান্দ্রমের সঙ্গে কোচিনের সরাসরি ভাবে রেলপথের সংযোগ স্থাপিত হবে।

কোচিন বন্দরে লোকের বসতি বিশেষ নেই—যা আছে তা শুধু বন্দরের কর্ম্মচারী ও হাওয়াই জাহাজ আড্ডার কর্ম্মচারীদের জন্য। সাধারণের থাকবার জায়গা হল—মালাবার হোটেল। বিলেতি ব্যবস্থায় এর পরিচালনা, থাকা ও খাবার বন্দোবস্ত বেশ উচ্চশ্রেণীর। হোটেলের বাড়ীটি একেবারে সমুদ্রের উপর। হোটেলের হাতার মধ্যে সাঁতারের জন্য একটি বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে। হোটেলের নিজস্ব মোটর বোটে, হোটেলের বাসিন্দারা সমুদ্র বিহার করতে পারেন।

আমরা যখন কোচিন বন্দরের কার্য্যালয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা পাঁচটা। শীতকাল হলেও আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো তখনও

কোচিন বন্দর থেকে আরব সাগর

নিভে যায়নি। বন্দরের প্রধান নির্ম্মাণবিদ্ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ী থেকে নামামাত্র চাপানের জন্য অনুরোধ করলেন—

বললেন, চাপানাস্তে ষ্টীমপকে সমুদ্র ভ্রমণ। কোচিন বন্দরের জাহাজ-ঘাটার সমুদ্র খুব গভীর নয়। জাহাজ যাতে আরব সমুদ্র থেকে নিরাপদে বন্দরে ভিড়তে পারে, এজন্য সমুদ্র বক্ষে একটা গভীর খাত প্রস্তুত করতে হয়েছে। এই খাতের দুপাশে ভাসমান আলোক বর্ত্তিকা পথের নিশানা সঙ্কেত করে। খাতটি সুগভীর রাখবার জন্ম ড্রেজারের সাহায্যে মাটি কাটবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ভাসমান পাইপ লাইনের সাহায্যে সেই মাটী দূর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। একটি বিরাট সরীসৃপের মতো এই পাইপ লাইনটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কোচিম বন্দরের অন্তর্দেশ—আর্ণাকুলম—এইটাই বন্দরের আসল সহর। স্কুল কলেজ, কেরালার হাইকোর্ট, মিউনিসিপাল আপিস, বাজার, ব্যবসাবাণিজ্য ও বসতি সবই আর্ণাকুলমে—বাইরে থেকে দেখলে সহরটাকে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলেই মনে হল। কোচিন বন্দরের নিকট একটা দ্বীপে "টাটা অয়েল কোম্পানী"র নারিকেল তেলের কারখানা বিখ্যাত। সেখানে আমাদের পরিচিত এক বন্ধু, কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট নির্ম্মাণবিদ্। একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু কার্যগতিকে তা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। এতদূরে বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাটা যে কতদূর অপরাধ তার প্রমাণ পেলাম পাঁচ মাস বাদে যখন তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল। কথার ফাঁকে যখন শুনলেন যে আমরা কোচিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি, তখন ব্যথাহত কণ্ঠে যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন—তা মনে হ'লে আজও নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু তখন ছোটার নেশায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মার্কিনী কায়দায় সারা সহরটা গাড়ীতে প্রদক্ষিণ করে—কেরালার শিল্পকেন্দ্র আলওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেল। আর্ণাকুলম থেকে আলওয়ের দূরত্ব মাত্র বিশ মাইল—মোটরে একঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয়। তবে পাহাড়ী পথে চড়াই ও উতরাই যথেষ্ট, তার উপর রাত্রের অন্ধকার, ফলে সময় প্রায় দ্বিগুণ লাগল। সময়ের জন্ম ততটা আমরা গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম তখন, যখন আমাদের গাড়ী পথের বাঁক কাটিয়ে রেলের লাইন পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি ট্রেণ দ্রুতবেগে লাইনের ওপর দিয়ে চলে গেল। মাত্র তিলেকের ব্যবধান। একটু এদিক ওদিক হলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। উত্তেজনা নিবৃত্ত হতে, তখন সহরের দিকে চোখ ফেরান গেল।

রাত হয়ে গেছে—দূরে দূরে বিজলীবাতির মালা দোলান রয়েছে। কোথাও অতি উজ্জ্বল আলোর আভা—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রক্রিয়ার নিদর্শন। রাতের আকাশে চিমনির কালো দণ্ড সজাগ দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিনের পথশ্রমে নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা বিশেষ ছিলনা। স্থানীয় একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অতিথি ভবনে সে রাত্রির মতো আহার ও বিশ্রাম লাভ করা হল। অতিথি ভবনের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর।

পরদিন প্রভাতে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করার কথা। আলওয়ে সহরটা অর্থাৎ যেখানে রেলষ্টেশন ও সাধারণ লোকের বসতি—বিশেষ বড় বা সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলে মনে হলনা, যদিচ পাকা-বাড়ির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আলওয়ের বিশেষত্ব হল এই সহরটাকে কেন্দ্র করে এরই সহরতলীতে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—এলুমিনিয়মের কারখানা। রাঁচি অঞ্চল থেকে এলুমিনিয়ামের পাথর (বক্সাইট) নিয়ে এসে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এখানে এলুমিনিয়ামের বাঁট তৈরী করা হয়। এলুমিনিয়ামের বাঁট থেকে এখানে এঙ্গেল ও চ্যানেল প্রভৃতি এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়। বেশীর ভাগ বাঁট কিন্তু বাংলা দেশে লিলুয়ার এলুমিনিয়ামের কারখানায় চালান যায় এবং সেখানে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য তৈজসপত্রাদি নির্ম্মিত হয়। সাধারণ বুদ্ধিতে রাঁচি থেকে আলওয়ে ও সেখান থেকে লিলুয়া দু'দুবার রেল ভাড়া খরচ করার ব্যবস্থা অসমীচীন মনে হয়। কিন্তু ব্যবসা করতে পেলে অসাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয়। এখানে কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল—নামমাত্র মূল্যে জমি পাওয়া ও অতি সুলভ মূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুবিধার জন্য। এখানে যখন কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল তখন আমাদের এদিকে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বা হীরাকুদ বাঁধের পরিকল্পনার কোন কথাই ওঠেনি। এখন জানা গেল যে হীরাকুঁদ বাঁধের উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভে পাওয়া যাওয়ায়, এই কোম্পানী সম্বলপুরে একটি কারখানা স্থাপন করছেন।

এলুমিনিয়াম কারখানার পরিদর্শন ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারখানার মধ্যে বিরাট বৈদ্যুতিক চুল্লীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য হাতের ঘড়ি, ক্যামেরা প্রভৃতি আপিস ঘরে জমা রাখতে হল। পরিদর্শনের সময় কারখানার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী আমাদের সঙ্গে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগের প্রক্রিয়া বেশ যত্ন সহকারে বুঝিয়ে দিলেন। কারখানার গঠন, আপিস ও অন্যান্য বাড়ী ঘর বেশ সুপরি-কল্পিত। কারখানাটি আইন অনুসারে সুরক্ষিত—সুতরাং ছবি তোলা নিষেধ।

এখান থেকে নিকটেই পেরিয়ার নদীর তীরে "সার ও রাসায়নিক পদার্থ তৈরীর কারখানা। (F. A. C. T.)। এই প্রতিষ্ঠানটিতে কেরালা সরকারের অংশ থাকলে ও এটীর পরিচালনা একজন স্থানীয় শিল্পপতির উপর ন্যস্ত। শিল্পপতি নিজে একজন শিল্পবিদ্—ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা অংশ তাঁর নখদর্পণে। ব্যবহার খুবই অমায়িক; প্রথমেই তাঁর আপিস ঘরে আমাদের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করে তবে বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। এ দেশে খনিজ কয়লা পাওয়া যায় না—কাঠ পুড়িয়ে তার থেকে কয়লা বার করে সেই কয়লা কারখানায় বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় সহজপ্রাপ্য উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করার জন্য এঁদের বিজ্ঞানবিদ্ ও কর্ম্মীরা প্রচলিত প্রক্রিয়ার সুবিধা মতো পরিবর্তন করে

তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। এই ধরণের স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা দেখে সত্যই বড় আনন্দ হল। পরিদর্শন শেষ হলে এঁদের তৈরী "এ্যামানিয়ম সালফেট সারের" কিছু নমুনা উপহার পাওয়া গেল প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য থলিতে।

রাসায়নিক কারখানার পাশেই—ভারত সরকারের পরিচালনাধীন দুর্লভ মাটী বা তেজস্ক্রিয় বালি তৈরীর কারখানা। ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্র-তীরে "মোনাজাইট" বালি সুপ্রচুর। এই বালি থেকে নানাপ্রকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে "তেজস্ক্রিয়" অংশ নিষ্কাশনকরে—সেই দুর্লভ বস্তুটী বিদেশে চালান দেওয়া হয়। স্বর্ণমুদ্রা বা ডলার অর্জ্জন করার ব্যাপারে এ বস্তুটী খুবই প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি বম্বেতে পরমাণুশক্তি সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে কারখানাটী স্থাপন করা হয়েছে—সেখানেও এ বস্তুটীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য এ কারখানাও সংরক্ষিত এবং এর বাড়ী ঘরও আসবাবপত্র ভারত সরকারের বিত্তশালীনতার পরিচায়ক।

এ ছাড়া এখানে কাঁচ, চিনে মাটির বাসন, মাটির পাইপ, টালি প্রভৃতি তৈরীর কারখানাও দ্রষ্টব্য হিসাবে মন্দ নয়। আয়তন ও উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে অবশ্য প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় নয়। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠার দিক থেকে কেরালায়—ত্রিবাঙ্কুর "রবার" কারখানা, রেয়নের কারখানা, টাইটানিয়মের কারখানা খুবই উল্লেখযোগ্য। আলওয়েতে ছোটখাট আরও অনেক কারখানা আছে—খুঁটিয়ে দেখতে হলে বেশ কয়েকদিন কেটে যাবে—কিন্তু অতদিন থাকার ইচ্ছা আমাদের ছিল না সুতরাং কারখানা পরিদর্শন ছেড়ে—এখানকার রাজার প্রাসাদ দেখতে যাওয়া গেল। বাইরে থেকে বাড়ীটির অস্তিত্ব বিশেষ বোঝা যায় না, কিন্তু বাইরের বড় গেট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে—বাড়িটির বাগান ও অবস্থান খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িটি এমন কিছু বড় নয়—দু'তলা—বাংলাদেশের যে কোন বড় জমিদারদের একমহলা বাড়ীর মতো। বাড়ীর পিছনে নদী ও স্নানের ঘাট—বিশ্রামকুঞ্জ। বাগানটি সুপরিকল্পিত ও সযত্নবর্দ্ধিত। বাড়ীর আসবাবপত্র মূল্যবান ও সুরুচি-সম্পন্ন। বর্ত্তমানে বাড়িটি কেরালা সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সময় বিশেষে উচ্চশ্রেণীর অতিথিশালা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

আলওয়ে থেকে আমাদের যাবার কথা—চালাকুড়ী হয়ে পরিঙ্গল-কুট্টু। চালাকুড়ী একটি ছোট সহর—প্রচুর পাকা বাড়ী, পথের ধারে গুণতি খুচরো দোকান। দোকানগুলি অভিজাত শ্রেণীর না হলেও একেবারে নগণ্য বলা চলে না। এই সহরে সরকারী সেচ বিভাগের একটি আস্তানা আছে—কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য খালের মাথায় "স্লুইস্" গেট বা কপাট কল বসিয়ে নানাদিকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এখান থেকে করা হয়। খালে জল আসে পরিঙ্গলকুট্টুর বাঁধ থেকে। পরিঙ্গল-কুট্টু জায়গাটী পাহাড়ের উপর, সমুদ্রতীর থেকে প্রায় ৪০০০ ফুট উপরে চালাকুড়ী নদীতে বাঁধ দিয়ে; সেই বাঁধের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পাহাড়ে উঠতে প্রথমেই নজরে পড়ে—"পাওয়ার হাউস" ও তার প্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন—বড় বড় ট্রান্স্ফরমারের মাথা। গাড়ী থামিয়ে পাওয়ার হাউসে নামা হল। পাহাড়ের অপর পিঠে বাঁধ সুতরাং ৪০০০ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ কেটে জল এনে পাহাড়ের এ পিঠে একটা জলাধার তৈরী করে সেখান থেকে মোটা পাইপের সাহায্যে "টারবাইন" ঘোরান হচ্ছে। উৎপাদন করার জন্য তিনটি টারবাইন বসানর ব্যবস্থা আছে—বর্ত্তমানে দুটি যন্ত্র চলছে, তৃতীয়টি বসান হচ্ছে। প্রয়োজন হ'লে আরো একটি টারবাইন বসানর জায়গা আছে। ৬০০ ফুট জলের চাপের সাহায্যে টারবাইনগুলি ঘুরছে। প্রত্যেকটি জেনারেটারের উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০০ কিলোওয়াট, তিনটি যন্ত্রে ২৪০০০ কিলোওয়াট। পাওয়ার হাউসটি দেখে আমাদের দেশের মশানজোড় বাঁধ ও তার পাওয়ার হাউসের কথা মনে পড়িয়ে দিল। ব্যবস্থা প্রায় একই রকমের, তবে মশানজোড়ের পাওয়ার হাউস একেবারে বাঁধের সঙ্গে এবং আকারে ছোট। মশানজোড়ে যে পাওয়ার হাউস—সেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সামান্য ৪০০০ থেকে ৬০০০ কিলোওয়াট। দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সুবিধা করা হয়েছে। "পরিঙ্গল-কুট্টুর" পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের ছবিটাই বার বার ফুটে উঠতে লাগল। ভাবলাম এতদূরে এসে উৎসাহভরে এখানকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখে যাচ্ছি, কিন্তু কলকাতা থেকে দু'শ মাইলের মধ্যে বাঙালী নির্ম্মাণবিদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল মশানজোড়ের বাঁধ কজনই বা দেখেছে, আর কজনই বা তার খবর রাখে।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। পাওয়ার হাউসের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল যে চারপাশ যেন বড় বেশী অন্ধকার আর অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—শুধু শোনা যাচ্ছে জলকল্লোল—একটা চাপা আর্ত্তনাদের মতো। মানুষের হাতে বন্দী হয়ে কি জলদেবতা ক্রন্দন করছেন! কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা—চমক ভাঙল গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে। আমাদের গাড়ীর সারথি তাগাদা দিচ্ছেন। আর কাল বিলম্ব না করে আমরা ইন্স্পেক্‌সান বাংলো অভিমুখে অগ্রসর হলাম, আরও হাজার ফুট চড়াই উঠতে হবে।

বাংলোটির অবস্থান বড় সুন্দর, প্রায় পাহাড়ের চূড়ায়। নীচে চালাকুড়ীর বাঁধ—আয়তন খুব বড় নয়—১১৩০০ লক্ষ ঘনফুট। দুদিকে পাহাড়, মাঝখানে পাথরের বাঁধ। শোনা গেল পাহাড়ের ওপারে জলাশয়ের ধারে বুনো হাতীর পাল মধ্যে মধ্যে স্নান করতে আসে। সে আনন্দলীলা নাকি দেখার মতো।

বাংলোতে যখন পৌছান গেল তখন রাত ৯টা। সারাদিন ভ্রমণের ফলে শরীর বেশ ক্লান্ত। সুতরাং বিলম্ব না করে নৈশ আহার সেরে শয্যা গ্রহণ করা গেল। পাহাড়ের চূড়া ৪০০০ ফুট উঁচু হলে কি হবে—জায়গাটি বিশেষ ঠাণ্ডা নয়, তার উপর দুএকটা মশার উপদ্রব আছে বলে মনে হল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ একথা চিন্তা করার প্রয়োজন হল না। নিদ্রাদেবীর দয়ায় অচিরে চৈতন্য লোপ হল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও সূর্য্যের আলো ভালো করে

ফোটেনি। জানালার মধ্যে দিয়ে নীল আকাশের আভা দেখা যাচ্ছে, গাছের শাখায় দুচারটি পাখির ডাক। চারদিকে বেশ একটা নীরব প্রশান্তি। বিছানায় শুয়ে থাকবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। পাশের ঘর থেকে বন্ধুবর স্মরণ করিয়ে দিলেন—সেদিনের কার্য্যক্রম। অতএব আর কাল হরণ না করে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্নানাদি শেষ করে প্রস্তুত হওয়া গেল।

প্রথমেই যাওয়া হল—বাঁধের ওপর। তিনকোটি টাকা খরচ করে এই বাঁধ ও অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছে। জলাশয়ের জল পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে পাওয়ার হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানকার পাথরের প্রকৃতি বেশ ভাল বলেই এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। জলাশয়ে বেড়াবার জন্য মোটর-চালিত একটি নৌকা আছে—বাঁধের স্থানীয় অধিরক্ষক সেই নৌকায় বেড়াবার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা চালাকুড়ীর সেচের বাঁধ পরিদর্শনে অগ্রসর হলাম।

সেচের বাঁধটি লম্বায় বড় হলেও উচ্চতায় খুবই কম। পাহাড়ের গায়ে নালা কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদেশে জল-কষ্ট বিশেষ নেই—বছরে সবসময়েই কিছু না কিছু বৃষ্টি পাওয়া যায়। তবে নদীর জল অনর্থক নষ্ট হতে না দিয়ে তাকে সময় ও সুবিধা মতো ব্যবহার করার জন্যই এই বাঁধের সৃষ্টি। সেচ বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে জানা গেল যে কেরালার প্রধান সমস্যা জলের নয়—জমির। সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও বন্যায় শস্যের যে ক্ষতি হয়—তার নিবারণই হল আসল সমস্যা। অনেকটা আমাদের দেশের সুন্দর-বনের আবাদের অবস্থা।

প্রাকৃতিক সম্পদে কেরালা দেশটি বেশ ঐশ্বর্য্যশালী। চিনেমাটি, অভ্র, গ্রাফাইট, চূণাপাথর, কোয়ার্টজ্ বালি, লিগনাইট কয়লা প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পনের হাজার বর্গমাইল এই কেরালা দেশটির লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ, ঘনত্ব হিসাবে প্রতি-বর্গমাইলে ৯০০র একটু বেশী, এ হিসাবে বাংলার স্থান কেরালার পরেই। কেরালার স্থান সর্ব্বপ্রথম।

শিক্ষার দিক্ থেকে কেরালা খুবই অগ্রগামী। শতকরা ৬৪ জন পুরুষ ও ৪৩ জন মহিলা শিক্ষিত। ধান, ট্যাপিওকা, নারিকেল, কাজুবাদাম, আখ, রবার, চা, কফি, মরিচ প্রভৃতি কৃষিশিল্প কেরালার প্রধান সম্পদ। কেরালার পনের হাজার বর্গমাইলের একপঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৩০০০ বর্গমাইল বনভূমি। বন অঞ্চলের একটি অংশ হিংস্র জন্তুদের আবাস হিসাবে বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট—জায়গাটার নাম থেকাড়ী, অরণ্যময় পার্ব্বত্য অঞ্চল—হিংস্রজন্তুদের আবাস হিসাবে যে উপযুক্ত স্থান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ—নীচে অরণ্য, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দিনমানেও হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়, বন্যজন্তুদের মধ্যে হাতীর সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। নীল-গিরি পর্ব্বতমালার এ অংশটি বিশেষ রমণীয়।

কেরালা দেশটি আয়তনে ছোট, কিন্তু নানা বিষয়ে এদেশটি ভারতের রাজনীতিক অংশে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যাঁদের সঙ্গে মিশেছি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পেয়েছি।

বাংলাদেশ থেকে এতদূরে এসেছি—বাংলা দেশের শিল্প ও সাহিত্য যে খুবই সমৃদ্ধ এ ধারণা এঁদের আছে—সুতরাং আমরা যখন কেরালার শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম, তখন তাঁরা সানন্দে কথাকলি নাচের ব্যবস্থা করলেন।

কেরালার ভাষা মালয়ালম্—মালয়ালম্ সাহিত্য বেশ প্রগতিশীল; ভাষার আলোচনা করতে করতে দেখলাম—অনেক শব্দই সংস্কৃত থেকে নেওয়া। পরিঙ্গলকুট্টু থেকে ফেরবার পথে—এইসব আলোচনা করতেই সময় কেটে গেল।

আর্ণাকুলম্ হয়ে ফিরতে হল। এখানকার হাট বাজার ও বসতির ভিতর একটু বেশী করে ঘোরাঘুরি করা গেল। কেরালার হাইকোর্ট এই আর্ণাকুলমে। রাজধানী ত্রিবান্দ্রম, কিন্তু হাইকোর্ট আর্ণাকুলমে হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুরের লোকেদের বেশ অসুবিধা। এ ব্যবস্থা বোধ হয় কোচিনের খানিকটা প্রাধান্য রাখার জন্য।

সহরটি দেখে ভালই লাগল—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হল, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখা হল না। সেই রাত্রেই কুইলোন ফিরতে হবে। এড়া-কোচিন ও আরুরের ফেরী পার হয়ে কুইলোনে যখন পৌছান গেল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ত্রিবান্দ্রমে না ফিরে সে রাত্রি কুইলোনের ডাকবাংলোতেই কাটান গেল। পরদিন প্রভাতে ত্রিবান্দ্রম মাদ্রাজ এক্স্প্রেস্। পূর্ব্বেই আসন সংরক্ষণের কথা জানান ছিল, কিন্তু ট্রেণ এলে দেখা গেল যে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়েছে। কোথায় যে ত্রুটী হয়েছিল তা অনুসন্ধান করার মতো সময় হল না। কোনো রকমে স্থান সংগ্রহ করে ট্রেণে ওঠা গেল। একে মিটার মাপের গাড়ী, তার উপর গাড়ী ভাগ করার ব্যবস্থা বিচিত্র—কামরাগুলি ভারী ছোট মনে হয়। মনে একটা অস্বস্তি—বার্থ পাওয়া গেল না—দিনটা না হয় কোনো রকমে কাটান যাবে কিন্তু রাত্রে কি করা যাবে? ট্রেণের গার্ডকে বলায় তিনি আশ্বাস দিলেন—মাভৈঃ মাদুরা বা ত্রিচিনপল্লীতে একটা ব্যবস্থা হবে। এ আশ্বাসে কতখানি ভরসা করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও উপায়ান্তর না থাকায় মানুষের আদিম প্রচেষ্টা অর্থাৎ আহার্য্য সংগ্রহ ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা গেল।

ট্রেণের সময়-সূচীর পাতা উল্টে দেখা গেল—এ পথে আমাদের রুচি মতো খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে সকাল বেলাটা অনাহারে কাটাতে হয়। বিকল্প ব্যবস্থা স্থানীয় আহার গ্রহণ। অগত্যা সেই ব্যবস্থাই স্বীকার করা হল। সেনকোটা ষ্টেশনে খাবার এল—পিতলের টিফিন কেরিয়ার, পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে—তার মধ্যে ভাত দই সম্বর্‌ম, তরকারী পাঁপড়, দুখানি কলাপাতা ও মুখে ঢাকনি দেওয়া গেলাসে খাবার জল। ব্যবস্থা পরিপাটি—মূল্য সুলভ মাত্র এক টাকা। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারিত হল বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যায় গাড়ী এসে মাদুরায় থামল। রেলের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মাদুরায় নেমে যেতে হল। আধ ঘণ্টা বাদে টিনেভ্যালি

মাদ্রাজ একস্‌প্রেস্ আসবে। তাতে স্থান মিলবে। ট্রেণ অবশ্য আধ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে প্রায় এক ঘণ্টা পরে এল, কিন্তু তাতে আমাদের দুটি বার্থ পাওয়া গেল। এই সঙ্গে একথাটাও জানান ভাল যে এখান রেল কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের সাহায্য করতে খুবই উৎসুক। আমাদের এতদিনের সহযাত্রী মুখোপাধ্যায়-দম্পতি মাদুরায় রয়ে গেলেন—মাদুরা রামেশ্বর প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। এ অঞ্চল আমরা অনেক আগে পরিভ্রমণ করেছি সুতরাং মুরুব্বিয়ানা করে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। ট্রেণ ছাড়ল রাত সাড়ে আটটায়, মন বেশ সুস্থ—গার্ডকে ডেকে অনুরোধ করা হল যেন তিনি কোডাইকানেল রোড ষ্টেশনে আমাদের রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করে দেন। "কোডাইক্যানাল রোড" ষ্টেশনটি বড় নয় বটে, কিন্তু আমাদের রুচি অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থা ভাল।

মাদুরা থেকে কোডাইক্যানাল রোড ষ্টেশনের দূরত্ব মাত্র ২৫ মাইল, ট্রেণে সময় লাগে চল্লিশ মিনিট। রাত ৯টায় ষ্টেশন প্রায় নিশুতি—একটা একস্‌প্রেস্ ট্রেণ এসে দাঁড়াল কিন্তু সেজন্য বিশেষ কোলাহল নেই। প্লাটফরম জনবিরল। শুধু খানসামা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালবিলম্ব না করে আহার সমাপনান্তে শুয়ে পড়া গেল। সে কী গভীর নিদ্রা—সারা রাত যেন কয়েক মুহূর্ত্তে কেটে গেল—প্রভাতের আলো যখন চোখে লাগল তখন দেখি ট্রেণ তাম্বরম ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে—অপর প্লাটফরম থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেণ সাঁ সাঁ করে ছুটতে সুরু করেছে।

বৈদ্যুতিক ট্রেণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ষ্টীম এঞ্জিন ৩৩ মিনিটে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করে "এগমোর" ষ্টেশনে এসে থামল—ঘড়িতে তখন সকাল ৭-৩৫ মিনিট।

সেই রাত্রেই মাদ্রাজ ত্যাগ করতে হবে। আগে থেকে খবর দেওয়া থাকলেও গত রাত্রির দুর্দ্দশা স্মরণ করে—প্রথম কাজ হল মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে খবর নেওয়া যে বার্থ ঠিক আছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সহর পরিভ্রমণে বার হওয়া গেল। কলকাতার ট্রেণ ছাড়বে রাত ৮-২৫ মিঃ সুতরাং হাতে অনেক সময়—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এনজিনিয়ারিং কলেজে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। শিবপুর এনজিনিয়ারিংএর একজন স্নাতক-বিএইচ মার্কে এখন এনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ। এই সুযোগে পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ ও প্রদর্শনী দর্শনের সৌভাগ্য—একঢিলে দুই পাখী মারার আনন্দ পাওয়া যাবে। কালক্ষেপ না করে বিদ্যুৎ ট্রেণে চড়ে গিন্‌ডি ষ্টেশনে নামা গেল। ষ্টেশন থেকে কলেজ প্রায় দুই মাইল পথ—ষ্টেশনে যানবাহন বিশেষ দেখতে পাওয়া গেল না। পথে বাস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে আরোহণ না করে পদব্রজেই অগ্রসর হওয়া গেল। বেশ প্রশস্ত রাজপথ অনেকটা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মতো—দুপাশে বাংলো ধাঁচের বাড়ী—কয়েকটি উনবিংশ শতাব্দীর থামওয়ালা বাড়ীও দৃষ্টিগোচর হল। তার পাশে বাগান, পথের দুধারে বড় বড় গাছ—তারি ফাঁকে দেখা গেল বিজ্ঞাপনের ফলকে একটি সিনেমার ষ্টুডিয়ো। যতদূর মনে আছে—এই ষ্টুডিয়োর উদ্যানে অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও আছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখা গেল—মাদ্রাজ রাজ্যপালের ভবন। বিরাট আয়তনের উদ্যানের মধ্যে রাজ্যপালের প্রাসাদ—রাজ্যপালোচিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজ্যপাল ভবন অতিক্রম করেই রাস্তার বাঁদিকে এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের সীমানা। প্রধান তোরণটি শতবার্ষিকী প্রদর্শনী উপলক্ষ বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। প্রধান তোরণের অভ্যন্তর দিয়ে দেখা গেল—কলেজের বাড়িটিকে—পুরাণো ধাঁচের বাড়ী, গঠনে বেশ একটা গাম্ভীর্য্য আছে। কলেজে প্রবেশ করে প্রথমেই অনুসন্ধান করা হল—অধ্যক্ষ মহাশয়ের—এর সঙ্গে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শিবপুর কলেজে সমকালীন ছাত্র হিসাবে জানাশোনা ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় শুধু ছাত্র হিসাবে নয়, সুদক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌ হিসেবেও কলেজে বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন। তবুও এতদিনবাদে সাক্ষাৎ করা—সে হিসাবে আমাদের নামের কার্ড তাঁর বেয়ারা মারফৎ পাঠিয়ে দিলাম। অপেক্ষা করতে হলনা। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন—দেখে ভারী ভাল লাগল যে কলেজের ছাত্রজীবনে খেলাধূলা ও পড়াশুনায় অগ্রণী ছাত্রটী আজও তাঁর যৌবনের জীবনস্পন্দন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পুরাণো দিনের গল্প সুরু হল—বহুদিনের দেশ ছাড়া ছাত্র যেন তার কলেজজীবনে ফিরে গেল। শিবপুর কলেজের তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা, আর শতবার্ষিকী উৎসবের কথা আলোচনা করা গেল। তারপর নিজে সঙ্গে করে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত। প্রথমে পদার্পণ করা হল—জরিপ বা পরিমাপ ব্যবস্থার প্রদর্শনীতে—এটি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অতি প্রিয় বিষয়—বহুবর্ষ তিনি একাধারে নির্ব্বাহ করে দক্ষতাও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন—পরিমাপ কার্য্যের জন্য বিভিন্ন যুগে যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হত, তার সংগ্রহ শুধু বিচিত্র নয় শিক্ষনীয়ও বটে। এরপর পথঘাট ও সেতুর যুগে যুগে ক্রমোন্নতির সচিত্রও সাকার উদাহরণের প্রদর্শনী। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী দুই স্তরের পথের সংযোগ ও যানবাহন চলাচলের সক্রিয় ব্যবস্থা সত্যই চিত্তাকর্ষক।

যন্ত্রবিভাগে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী সংগ্রহ হিসাবে সবিশেষ উদ্যমের পরিচায়ক। কলেজের বৈদ্যুতিক বিভাগের পরিকল্পিত—ইলেকট্রনিক শক্তি ব্যবহারের নিদর্শনগুলিও একান্ত প্রশংসার যোগ্য।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত করার পর অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর গৃহে চা-পানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। চা-পানান্তে তিনি নিজে গাড়ী করে আমাদের গিনডি ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এগমোর ষ্টেশনে ফিরে এলাম।

কলকাতা গামী ট্রেণ রাত ২০.৩৫ মিনিটে। এখন হাতে অনেক সময়। সুতরাং সহর প্রদক্ষিণ করে কিছু জ্ঞান ও দ্রব্যসম্ভার আহরণ করা যেতে পারে। মাদ্রাজে, ষ্টেশনের খুব নিকটে ব্যবসা কেন্দ্রে নেতাজীর নামে একটি রাস্তা—দেখে ভারী আনন্দ হল। পদব্রজে দোকান ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠী, ফ্রেমে আঁটা রূপার সরস্বতী ও

নটরাজমূর্ত্তি,মাদ্রাজী উত্তরীয়, স্থানীয় তাঁতের কাপড়, বিছানার ঢাকা প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করা গেল। সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল— দেখি দোকানে দোকানে ফ্লুয়োরেসেণ্ট বাতি জ্বলছে—রাস্তার অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে জ্বলে উঠেছে—মার্কারি ভেপার ল্যাম্প—সহর সরগরম।

ঘড়ি ও পকেটে মাণিব্যাগ দেখে বন্ধুকে সতর্ক করে দিলাম— পকেটের টাকা ও অবসর সময় একান্ত সীমাবদ্ধ। অতএব কালবিলম্ব না করে অবিলম্বে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হওয়া সমীচীন।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করছে, প্লাটফরমের পাশে ট্রেণ এসে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। সেই জনারণ্যের মধ্যে আমাদের নামাঙ্কিত বার্থ খুঁজে বার করে বিছানা বিস্তার করে ফেলা গেল। দ্রুতবেগে অন্ধকার ভেদ করে ট্রেণ ছুটছে—ভাবতে ভাল লাগছে যে বাড়ী ফিরছি—কাল দুপুরে ওয়ালটেয়ার, তার পরের দিন সকালে খড়্গপুর।

খড়্গপুরের পরে গাড়ী যেন চলতেই চায় না। মনে হয় ট্রেণের গতি অতি মন্থর, অথচ সময়সূচী খুলে দেখি খড়্গপুর যেতে ও সেখান থেকে ফিরতে সময় সমানই লাগে। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই বিরক্তি বোধ হয়। হাওড়ার পোলের চূড়া দেখবার জন্য মনটা যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

অবশেষে বারোটা দশ মিনিটে ট্রেণ এসে হাওড়ার প্লাটফরমে দাঁড়াল। সেই সুপরিচিত কলকোলাহল। কী মধুর!

শান্তি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অশান্তি এবং অতৃপ্তির গভীর হ'তে কবি শুনেছিলেন মর্ম্মবাণী—

যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি

আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মদলে।

অশান্তি যার উপাস্য এমন রক্তলোলুপ, হিংসা-দ্বেষ-দুষ্ট নরঘাতকও কতদিন রক্তনদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে শোনে নিজের চিত্ত হ'তে উচ্ছসিত বাণী—

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বাণী।

হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে ওঠে ক্ষণিক বৈরাগ্যের কল্যাণ-মধুর প্রশ্ন—কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান?

কিন্তু মনকে বাক্যে অধিষ্ঠিত ক'রে, বাক্যকে মনের সাথে মিলিয়ে সহজে কি মানুষ আবাহন করতে পারে আনন্দলোকের নির্ম্মল রশ্মি? বলতে পারে কি—আবিরাবির্ম এধি?

অসুরবধের অশান্তির পর দেবতারা দেবীর নানা প্রকৃতির উল্লেখ ক'রে গেয়েছিলেন স্তুতিগান। তার মাঝে বলেছিলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

কারণ শান্তির আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বজীবের মরমের অন্তস্তলে বিরাজিত। কর্ম-প্রধান প্রাণধারায় তাই সেরূপ লক্ষ্য হয় না। শান্তির বাণী কি কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, প্রাণের আগুন নেভার বাণী? না কবির কথায়—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে লওগো মোরে সেই গভীরে
অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান।

বাস্তবের ধারাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি অর্জ্জন না করলে কি সন্ধান পাওয়া যায় শান্তিধামের? অশান্তি খোঁজে শান্তি। কিন্তু তাকে লাভ করা সত্যই কঠিন। বাক্যকে দেহের বলে রোধ করলে, দুষ্ট মনের মাঝে তুফান ওঠে—অশুভ বাণীর। কর্ণরোধ করলে কি কুকথা, কুমন্ত্রণা, দাম্ভিকের তিরস্কার, দরিদ্রের হতাশ সুরের রেশ বন্ধ হয়? অশান্তির অসুর সহস্ররূপে ফিরছে ধরাধামে—বর্ষিতে অশান্তি জীবের প্রাণে। এ বাস্তবের তাণ্ডব প্রাণকে বেঁধে বিষের শরে, আবার সেই শরের ক্ষত কমাবার মানসেই মানুষ চায়—শান্তি।

শান্তি তো শূন্যতা নয়। শান্তি উপভোগ্য অবস্থা প্রাণের। সংক্ষেপে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণের কথায়—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ,
জ্ঞানং লব্ধা পরা শান্তি অচিরেণাধিগচ্ছতি। ৪।৩৯]

শ্রদ্ধাবান, জগদীশ্বরে দৃঢ় ভক্তিমান, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞান লাভ ক'রে অতি শীঘ্র সে শান্তি পায়।

ভগবানে ভক্তি দৃঢ় হলে জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ জীবনের যে রহস্য—জীবাত্মা, পরমাত্মা, মায়াময় এই সংসার—এ-সমাবেশের নিগূঢ়তত্ত্ব হয় জ্ঞানগম্য। তখন বোঝে সৃষ্টির প্রকৃত রূপ। বোঝে নর—কে সে লীলাময়। তখন মানুষ শান্তি পায় অচিরে। শূন্যতা এ নয়। ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন করে জ্ঞান—তখনি জ্ঞান লোপ ও ভক্তির অবসান—এ বাতুলতার উপদেশ নিশ্চয় ভগবান দান করেননি। সুতরাং শাশ্বত শান্তি এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা—যা লাভের উপদেশ দিয়েছেন বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ এবং সকল মহাপুরুষ। আমাদের ক্ষণিক শান্তি তারই ছায়া।

জীব ক্ষুদ্র—সে অনুভূতি সহজ। অথচ সে বিরাট এ প্রেরণাও আমাদের সংস্কার-সুলভ। এই ক্ষুদ্রত্বকে মহত্ত্বে পরিণত করাই সাধ্য-সাধনা। ক্ষণিক শান্তি পরিচয় দেয় অন্তিম অনন্ত শান্তির। কেন সে ক্ষণিক শান্তিও মানুষ লাভ করে না? জীবনকে বিশ্লেষণ করলে দেখি শান্তির শত্রু বহু। অশান্তির উপদ্রব আঘাত করে জীবকে, বাহিরের প্রকৃতি তরঙ্গে। তারা আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। রৌদ্র, বর্ষা, রোগ, শোক—আরও কত উপদ্রব আসে দৈব অভিযানে। আধিভৌতিক উপদ্রবেরও অভাব নাই। যেহেতু অন্যের দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, দম্ভ প্রভৃতির আঘাত লাগবেই প্রাণে জগতে বাস করতে গেলে। অপর উপদ্রব সংস্কারমূলক আধ্যাত্মিক। নবীন ও পুরাতন সঞ্চয় মনের মাঝে একটা পৃথিবী গড়ে। তার প্রতিক্রিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ভোগ করে জীব। আবার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গড়ে ভবিষ্যতের রূপ।

মানুষের উপর প্রকৃতির অভিযান সকল যুগের শাস্ত্র উল্লেখ করেছে এবং তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করেছে। গীতার সার কথা—জিতেন্দ্রিয়, তৎপর, শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে—সে জ্ঞানে পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিধামের।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ সংক্ষেপে বলেছে—

সর্ব্বম খল্বিদং ব্রহ্ম—সারা বিশ্ব ব্রহ্মময়। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মে জাত, তাঁতেই লীন এবং ব্রহ্মেই জীবিত। সুতরাং শান্তভাবে তাঁর উপাসনা করবে। সেই শান্ত উপাসনা সন্ধান দেয় শাশ্বত শান্তির, সেথা বিরাজ করে চিরশান্তি।

এই শান্তভাব কি? যা ভবিষ্যত দুঃখের প্রসূ নয়, তাই শান্ত ভাব। তার কারণ বিবৃত করলেন ছান্দোগ্য।

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষ—কারণ জীব স্বভাবতঃই সংকল্প-যুক্ত। সংকল্প গোষ্ঠি কি এই জীবনেই মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় না? প্রত্যেক বাসনার পরিণাম বহুদূর প্রসার। যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতি প্রেত্যভবতি। এই জীবনে যে কর্ম্ম বা কামনা করবে মৃত্যুর পর-জীবনেও তেমনিই বাসনা পোষণ করতে হবে। কাজেই সেই ঘূর্ণীপাক—কর্ম্মের চাকা। সুতরাং জীবের কর্ত্তব্যের উৎস ক্রতু। সক্রতু—কুর্বীত।* মনের মাঝে পোষণ করতে হবে উত্তম বাসনা। তার পরিণাম কল্যাণকর।

মানুষের কর্ম্মের প্রবাহ তো আত্মাকে স্পর্শ করেনা। সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করলে আত্মার দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—সংকল্পপ্রভব কাম। তার বর্জ্জন আবশ্যক। বলেছেন—সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাস যোগ। তাঁর নির্দ্দেশ—

বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহংকার স শান্তিমধিগচ্ছতি।২।৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা উপেক্ষা করে নিস্পৃহ নিরহঙ্কার এবং বিষয়ে মমতাশূন্য হয়ে জীবন যাপন করে সেই পায় শান্তি। সত্যই তো অশান্তির কারণ কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং অহঙ্কার।

জরা, মৃত্যু, সুকৃতি, দুষ্কৃতি তো আত্মাকে অভিভূত করতে পারেনা। আত্মা দ্রষ্টা। দ্রষ্টার দর্শনেই শান্তি। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আত্মাই সংসার ও ব্রহ্মলোকের সেতু। আত্মদর্শনে হয় সেই সেতু অতিক্রম—ব্রহ্মপদ-প্রবেশ।

তাই ছন্দোগ্য বল্লেন—

তস্মাত্মা এতং সেতুং তীর্ত্বা—আত্মারূপ সেই সেতু—(আত্মজ্ঞান) লাভ হলে—অন্ধঃ সন্নন্ধোভবতি—অন্ধের অন্ধত্ব লোপ পায়। জীব তো মায়ার আবরণরুদ্ধ আত্মাকে

---

* ছান্দোগ্য—৩।১৪।১

দেখতে পায়না। তাই অন্ধের মত অশান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

আত্মজ্ঞানের আরও ফল—বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যু পতাপী-সন্নূপতাপী। বিদ্ধ ব্যক্তির আঘাত লোপ পায়, তাপীর তাপ দূর হয়, রাত্রির অন্ধকার হয় অবলুপ্ত। তা' হ'লেই—

সকৃদ্‌বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোক :—কারণ সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিত্য প্রকাশমান। সে মঙ্গল রশ্মি রাঙিয়ে তোলে চিত্ত, দেখিয়ে দেয় শান্তিময় আনন্দ লোক।

সুতরাং চরমশান্তি, শোক, তাপ, দুঃখ, আঘাত এবং অজ্ঞান তিমিরের লোপ। মায়ার শান্তি শূন্যতা নয়।

এ চরমশান্তি তো চরমলভ্য। নিত্যকার্যে সদা শান্তি লাভ করতে চায় মানুষ। তাই বেদ বিধান করলেন শান্তির মন্ত্র। সে মন্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করলে বুঝি অশান্ত আঘাত আসে কোথা থেকে। সেই হেতুগুলি বুঝে, তাদের অভিযানে বিব্রত না হলে লাভ হয় শান্তি। আমাদের কৃত নয়, এমন বহু কর্ম যারা বাহির হ'তে অশান্তি নিয়ে আসে। শান্তভাবে সে অভিযান সহ্য করায় শান্তি। আমাদের দেবশক্তির দ্বারা তাদের স্বরূপ দেখলে অশান্ত ভাব লোপ পায়। সেই লোপের ফল শান্তি।

অথর্ব্ববেদে মন্ত্র আছে :—

"পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি আপশান্তিরোষধয় শান্তি-র্বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বে মে দেবা শান্তি সর্ব্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

পৃথিবী শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, সকল বনস্পতি শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

শান্তি মনের অবস্থা। আমার শান্তি আমার নিজস্ব চিত্তের অবস্থা। মন্ত্র পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, জল ও গাছপালা প্রভৃতির নিকট শান্তি যাচিঞা করতে শিক্ষা দিল। নিশ্চয়ই সে শান্তি নিছক স্বার্থপরের মনোরঞ্জন নয় যে জল বায়ু তাদের নিজ নিজ জীবন ধারা শুদ্ধ করুক বা এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করুক—সিদ্ধ হক আমার অতিক্ষুদ্র স্বার্থ। নিশ্চয় এর অর্থ এই যে বাস্তবকে মেনে নিয়ে, জল, বায়ু, বনস্পতি, ভূলোক, দ্যুলোকের গতিপ্রবাহ যাতে সাধকের চিত্ত প্রবাহের পরিপন্থী না হয় সে ভাবে জীবন-ধারণ করা। এদের স্রোতের কোন্‌টি শুভ তা বাছা। সূর্য্য দেবতা প্রাণ-শক্তি। সূর্য্যতেজ যে পরিমাণে সহনীয়, তার সহায়তায় জীবন স্রোত নিয়ন্ত্রিত করলে চিত্ত দহন দুঃখের অভিযান সহ্য করতে পারে। দেবতা দ্যোতনশক্তি। জ্ঞানের উদ্বোধক। সেই দেবশক্তির সাহায্য নিয়ে, মন্ত্রের-দ্বারা মনকে দৃঢ় করলে—বিশ্বদেবতার আলোকে, দিব্য-জ্ঞানে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, বনস্পতি প্রভৃতির কর্ম্মধারার শরণ নিয়ে, নিরাপদ হ'তে পারে চিত্ত। তখন শান্তি আপনি উদ্বুদ্ধ হবে। চিত্ত শান্ত হবে। আনন্দ লোকের আনন্দের রশ্মি সমুজ্জ্বল করবে মনকে।

মন ভেবে দেখে সুখতো ক্ষুদ্রত্বে নয়। পৃথিবী অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূলোক সকলের-মধ্যে আপনাকে প্রসার করতে না পারলে সুখ নাই। জীবন-ধারা ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের ধারা নয়। বিস্তারে সুখ। সকল জীবন ধারার সাথে আপনার জীবন-ধারা নিরুপদ্রবভাবে মেশালে আনন্দ। প্রতিরোধী, প্রতিগামী, বৈর জীবনী-শক্তি পারেনা লাভ করতে শান্তি! তাকে পেতে হয়—মৈত্রী, করুণা, অহিংসার সাহচর্য্যে। তাই উপনিষদে অমৃতবাণী শুনি—

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যিনি ভূমা—সর্ব্বশক্তিমান অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম,—তিনিই সুখের আকর। নশ্বর কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই।*

এই সুখই শান্তি। ধীরে ধীরে শান্তি আসে—মনকে বিস্তার করলে।

বলছিলাম বেদ-মন্ত্রের কথা। পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতির মাঝে শান্তির অনুভূতির পর আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বিশ্ব দেবগণের নিকট শান্তি ভিক্ষা করে মন্ত্র বললে—

তাভিঃশান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ ঘোরং যদিহক্রূরং

যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ।

সেই সকল শান্তি হ'তে, সকল বিষয়ে শান্তি লাভকরলে এই বিশ্বে সব লুপ্ত হ'বে—যা কিছু আছে ঘোর ভীতিপ্রদ অশান্তির কারণ, যত কিছু আছে ক্রূর, নিজের ও পরের

---

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—

মনে, যা কিছু আছে পাপ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম—এসব হক শান্ত, সমস্ত হক শুভ। সকল উপদ্রব হ'ক বন্ধ।

সত্যই তো প্রকৃতির লীলার মাঝে নিজের শুদ্ধ অনুভূতি প্রক্ষিপ্ত হ'লে, অবশ্য মানুষ পারে তার ঘোর, ক্রূর: পাপ অভিমান প্রতিরোধ করতে। বিশ্বসংসারে এ রহস্যটুকু আয়ত্ত করাই জীবন-রহস্যের সমাধান।

তাই শান্তির পথের সন্ধান পাই আমরা গীতায়—যখন ভগবানের শ্রীমুখে শুনি—

আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং-
সমুদ্রমাপ: প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।২।৭০।

বহু নদীর জলে পূর্ণ হয়েও স্থির প্রতিষ্ঠ থাকে সমুদ্র। সকল নদীর জল সে নিজের বিরাট অস্তিত্বের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। তাতে লোপ পায় নদী। সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ—নিজের তালে চলে, নিজের ছন্দে বহে। যার সকল কামনা তার বিরাট অনুভূতির মধ্যে নিষ্প্রয়োজন পদার্থের মত লুপ্ত হ'য়েছে—সে ব্যক্তি লাভ করে শান্তি। কামনাকে যে স্থান দেয় প্রাণে—তারশান্তি কোথায়?

আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রায় বুঝি আরাম হ'তে ছিন্ন করে বাসনা। কাম্য বস্তু লাভে অকৃতকার্য্য হয় মানুষ। আপনাকে ভাবে পরাজিত। দুঃখ নানা রূপ নিয়ে দহন করে তার চিত্ত। যদি আপনাকে মাত্র পরাজিত ভেবে বিফলমনোরথ শুদ্ধ হত, তার অধ্যবসায় নূতন রূপ নিত। কামনাই তাকে দুঃখ দিত। কিন্তু আশা ভঙ্গে মানুষ দোষ দেয় পরকে। আত্ম গ্লানির বিষ হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে চিত্তে পোষে বৈরিতা ও ঈর্ষা তার প্রতি, যে তাকে করে ব্যর্থ-প্রয়াস। আবার কামনা হ'তে কামনা বাড়ে, হিংসা সংগ্রহ করে শত্রু। এ সবের ফল অশান্তি। অশান্তস্য কুতঃ সুখম?

কু-প্রবৃত্তির সাথে কেবল তর্কের দ্বারা সংগ্রামে জয়ী হয়না জীব। জ্ঞান স্পষ্ট বোধ না আনলে মনের আঁধার হয়না দূরীভূত। আবার সে জ্ঞানকে যদি ভক্তি না পরিচালিত করে, কল্যাণকর হয়না জ্ঞান। ভক্তি আত্ম-নিবেদন। ভক্তি শরণ। শরণ পূর্ণ এবং অনাবিল না হ'লে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। তেমন শরণ শান্তির-জনক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।
গীতা ১৮।৬২

হে ভারত, সর্ব্বভাবে মাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হও। তাঁরই প্রসাদে পাবে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান।

তাই দেখি নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পথের শেষে বিরাজ করে পরম শান্তি। দিনের পর দিন সে শান্তি আনন্দের সন্ধান দিতে পারে মানুষের যদি ভক্তি থাকে প্রাণে, জ্ঞান উন্মুক্ত হয় ভক্তের হৃদয়ে এবং সেই জ্ঞানের আলোকে নিষ্কামকার্য তুষ্ট করে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে। বোধ হবে সেদিন—তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

সেদিন মন্দ কর্ম্ম করতে পারবেনা অজ্ঞ, যেহেতু কর্ম্মটা তাঁর। ভগবান বলেছেন—যাঁর প্রেরণায় আসে প্রবৃত্তি সকল ভূতের, যিনি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করছেন, নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে অর্চ্চনা ক'রে মানব সিদ্ধিলাভ করে।*

রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—মা বিরাজে সর্ব্বঘটে। এ জ্ঞান হ'লে সকল কর্ম তাঁর—জীবের কুকর্ম্ম আপনি পরিত্যক্ত হবে। সর্ব্বঘটে মা—এ বোধ দূরকে করবে নিকট বন্ধু, পরকে করবে ভাই। পরের ক্ষতি হবে নিজের ক্ষতি।

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সন্ন্যাস যোগ শিক্ষা দিয়ে শেষে বল্লেন ভগবান—আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ জেনে শান্তি লাভ করে জীব।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ৫।২৯।

শেষে আবার সেই সিদ্ধান্ত প্রবল হবে—শরণ বিনা পথ নাই।

---

* যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮।৪৬।

মিসেস্ মিলাবীর ফুলদানী

লেখক—জে. সি. মাস্টারম্যান

অনুবাদ—গীতা চক্রবর্ত্তী

মিসেস্ মিলাবী বিধবা। স্লোয়্যান স্কোয়্যারের কাছেই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকতেন। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ কিংবা হয়ত তারও কিছু বেশী। কিন্তু রাত্রে তাঁকে তিরিশ বছরের বেশী দেখাত না। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, যে কোন বিশেষজ্ঞের সমান ছিল—এবং মেক্-আপ্ সম্বন্ধেও তাঁর পারদর্শিতা যে কোন অভিনেত্রী এমন কি 'ডলি-ভিউ'-এর সৌন্দর্য্যবিদের থেকেও বেশী বই কম ছিল না।

মিসেস্ মিলাবী অত্যন্ত প্রফুল্ল রসিকা, বুদ্ধিমতী, পরোপকারী নারী ছিলেন এবং অবিসংবাদীরূপে জনপ্রিয় ছিলেন। কোন পার্টিতে যদি শেষ মুহূর্ত্তে একজন লোকের প্রয়োজন হোত—দশটি পূর্ণ করার জন্য—তা সে 'ডিনারই হোক্—লাঞ্চই হোক্—থিয়েটার বা ব্রিজ যে কোন পার্টিই হোক্—মিসেস্ মিলাবার কথাই সবার আগে মনে পড়ত।

তিনি প্রত্যেক জিনিষই এত বেশী উপভোগ করতেন যে তাঁর উপস্থিতিতে প্রত্যেক উদ্যোগই সফল হোত। যদি তিনি ব্রিজে হেরে যেতেন (সেটা খুবই কদাচিত হোত—কারণ তিনি অত্যন্ত ভাল খেলতেন), তাহলে অত্যন্ত নম্র ও শোভন ভাবেই হারতেন। তাঁর কাছ থেকে ছোট্ট এক টুকরো চিঠি পাওয়া খুবই আনন্দের বিষয় ছিল—কারণ যেমন সুন্দর ছিল তার শব্দ চয়ন,তেমনি সুন্দর প্রকাশ পেত স্নেহের সুর।

তাঁর মৃত স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তো সকলেরই সম্ভ্রমের বস্তু ছিল। তিনি কদাচিৎ তাঁর কথা বলতেন—কিন্তু যখন বলতেন—তখন তাঁর প্রফুল্লতা অল্পক্ষণের জন্য ম্লান হয়ে যেত—আর তিনি নিঃশব্দে ব'সে থাকতেন। তারপরই তাঁর নিজের দুঃখ যাতে অন্যের আনন্দ নষ্ট না করে দেয়,সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি আবার দ্বিগুণভাবে প্রফুল্ল ও হাস্যামোদী হয়ে উঠতেন।

তাঁর বন্ধুরা এর জন্য খুবই দুঃখ করতেন। বলতেন—"আহা বড় দুঃখের কথা। ওঁর কিন্তু অনেকদিন আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল। এরকম একটি প্রাণবন্ত বুদ্ধিমতী, মিষ্টস্বভাব, আনন্দদায়িনী নারী—আর যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্নাও বটে—তাঁর পক্ষে বিধবা থাকা কি অসঙ্গত নয়?"

কিন্তু তাঁর বন্ধুদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও মিসেস্ মিলাবী তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতিকে সযত্নে হৃদয়ে পোষণ ক'রে রাখতেন—আর একটি বিষণ্ণ মিষ্ট হাসি দিয়ে তাঁর ভক্তদের সর্ব্বদাই দূরে রেখে চলতেন। আশা করি, এতক্ষণে তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা আপনারা করতে পেরেছেন।

যেদিনের কথা আমি বলছি—মিসেস্ মিলাবী তাঁর ঘরটিতে ব'সে ছিলেন। সেই ঘরটির একটি ছবিও দিতে চেষ্টা করছি। সেটা একেবারেই মেয়েদের ঘর। ঘরের চারিপাশের ছিট্ গুলি খুব উজ্জ্বল, বিচিত্রবর্ণ। ফুলগুলি তাজা ও সুবিন্যস্ত। বই যদিও বেশী নেই—কিন্তু মনে হোত অতিথিরা এসে যে বইগুলি পড়তে চাইবেন তা সবই আছে। আসবাবপত্রে লক্ষ্য করার মত বিশেষ কিছু নেই, তবু প্রত্যেকটিই সুরুচির পরিচয় দেয়। ঘরের প্রত্যেক জিনিষই সুন্দর, সুশৃঙ্খল, আরামদায়ক। ঘরটি মনে কিরকম একটি প্রসন্নতা আনে। ঘরের আবহাওয়াটি মেয়েলি হলেও সেটা এখন কিছু অস্বস্তিকর নয়, বরং ঐ ধরণের ঘরেই পুরুষেরা মেয়েদের আতিথ্য বেশী করে উপভোগ করে। মিসেস্ মিলাবীর ঘরে ঢুকবার সঙ্গে
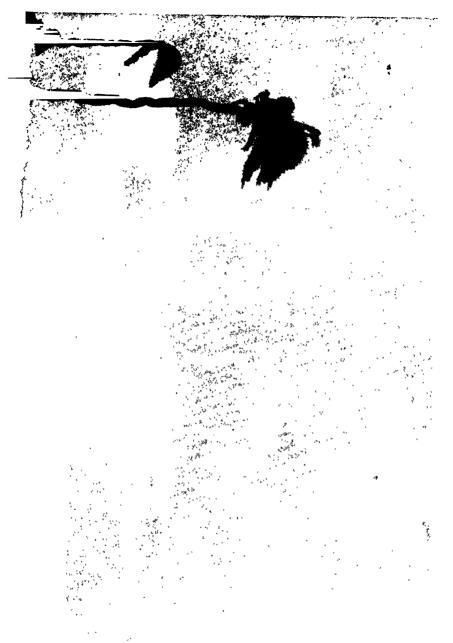
সঙ্গেই কেমন মনে হয় যে যখন তাজা ভারজিনিয়ার দরকার—তখন তিনি কখনই বিস্বাদ টারকিস সিগারেটের টিন ধরে দেবেন না—মনে হয়—যে আলমারী খুললেই তিনি ঠিক সেই পানীয়টিই এনে দেবেন—যেটা তখন শরীর ও মনের পক্ষে দরকার।

যদিও বলেছি যে ঘরের সজ্জাপ্রকরণ বিশেষ কিছু ছিলনা—তবু একটা জিনিষ ঘরের অন্যান্য জিনিষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্য্যায়ে পড়ত। লেখার টেবিলের পাশে একটা নীচু শেল্‌ফে (Shelf) একটা রূপোর ফুলদানী ছিল। হ্যাঁ—এইটাই মিসেস্ মিলাবীর বিখ্যাত ফুলদানী।

সেটা সুন্দর—সত্যিই সুন্দর—প্রায় বলতে ইচ্ছে করে যে শিল্পকলার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন সেটি। যদিও আকৃতিতে তা অত্যন্ত ছোট ছিল। ভারী আশ্চর্য্যের কথা এটি—যে একটি মাত্র সুন্দর বস্তু চারিপাশের অন্যান্য বস্তু থেকে কী ভাবেই ছাপিয়ে ওঠে। আমার মনে হয়—মানুষের সম্বন্ধেও সে কথাটা খুবই খাটে। একটি সৎ, অভিজাত বংশের লোক কোন রকম প্রচেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সাধারণ লোকদের থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য রেখে চলে—এবং তুলনায়-অন্যান্য লোকেরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

মিসেস্ মিলাবীর ফুলদানীটাও ঠিক তেমনি ছিল। সেটি যেন ফুলদানীদের ভিতর অভিজাত্যপূর্ণ ছিল—এবং সমস্ত ঘরটিকে প্রভাবান্বিত করে রাখত। কী করে এটা যে মিসেস্ মিলাবীর কাছে এল—তা জানিনা। কিন্তু মনে হয়—যে স্বনামধন্য বেন্‌ভেনুটো চেলিনি'ও ওটা পেলে নিতে অস্বীকার করতেন না। মিসেস্ মিলাবী ওটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ব'সে লেখার সময়—গল্প করার সময়—পড়ার সময়—সর্ব্বক্ষণই থেকে থেকে তাঁর চোখ দুটো ফুলদানীটার দিকে পড়ত এবং আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত।

তবুও যেদিনকার কথা বলছি—সেদিন যদিও ফুলদানীটা গোধুলির আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছিল—মিসেস মিলাবীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বিরক্ত ও দুঃখিত দেখা গেল। তিনি একটা পার্শেল খুলছিলেন—এবং তাঁর মুখে স্বভাবতঃ মিষ্ট হাসির পরিবর্ত্তে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছিল। সেটা খুলে তিনি তার থেকে আধুনিক ধরণের একটি রূপোর ফুলদানী বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু ক'রে ধ'রে তিনি খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগলেন। যতই তিনি তাঁর নিজের অতুলনীয় ফুলদানীটার সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন—ততই তাঁর অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিরাশায় ও অসন্তুষ্টিতে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এ নতুন ফুলদানীটা তাঁর বন্ধু মার্গো ফোবিসের বিবাহের উপহার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি এটা কিনেছিলেন। দোকান থেকে যখন উনি পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে এটা কিনেছিলেন তখন সেটা তাঁর কাছে দুগুণ দামের জিনিষের মত দেখাচ্ছিল। এখন কিনে আনার পর যতই ভাল ক'রে এটা খুঁটিয়ে দেখছেন, ততই এটা অত্যন্ত সাধারণ ও নিম্নস্তরের বলে বোধ হচ্ছে। বিশেষ ক'রে ওঁর নিজের ফুলদানীটা তুলনায় এটাকে উপহাস করছে।

এইবার মিসেস্ মিলাবীর সম্বন্ধে গোপনীয় কয়েকটা কথা প্রকাশ করতে হোল। তাঁকে এইভাবেই খোলাখুলি উপস্থিত করতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে! সত্যি কথা যা, তা তো বলতেই হবে।

প্রথমতঃ মিসেস্ মিলাবী আসলে বিধবাই নন। যে স্বামীর স্মৃতির প্রতি তাঁর আবেগ ও আত্মত্যাগের উদাহরণ, বিখ্যাত ভদ্রলোক বস্তুতঃ কয়েকবছর আগে হঠাৎ দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে—খুব সম্ভবতঃ মেজরকা'তে ছদ্মনামে বাস করছেন। দ্বিতীয়তঃ মিসেস্ মিলাবীর আর্থিক অবস্থা যেরকম স্বচ্ছল ব'লে বোধ হোত—আসলে তা অত্যন্ত—অত্যন্ত সামান্য। কী ক'রে যে তিনি এমন ঠাট বজায় রেখে চলতে পারতেন, তা আর বিশদভাবে বর্ণনা করতে চাই না। তবে এতে সন্দেহ নেই যে—যে ব্রিজখেলা তিনি অত্যন্ত শোভন ও সুচারুরূপে খেলতেন তাতেও তাঁর কিঞ্চিৎ আয় হোত। যদি তাঁর হিসেবের খাতা উল্টে দেখা যেত—তাহলে নিঃসন্দেহে জানা যেত যে তাঁর বন্ধুবর্গই তাঁর আহার-সংস্থানের অধিকাংশ ব্যয় বহন করতেন।

তিনি সত্যিই অত্যন্ত চতুরা স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হয়ত আপনারা অনেক কথাই বলছেন—তাঁকে

ভাগ্যান্বেষী ব'লে গালাগালি দিচ্ছেন—কিন্তু তবু তাঁর বুদ্ধির ও সাহসের তারিফ না ক'রে আমি থাকতে পারি না।

তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে মার্গো ফেবিসই ছিল একান্ত নিকট বন্ধু। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটে থাকতেন এবং তাঁদের বাড়ী মিসেস্ মিলাবীর কাছে সর্ব্বদাই অবারিত ছিল। সপ্তাহে দুদিন—বুধবার ও শনিবারে তিনি ওখানে ডিনার খেতেন। তাছাড়া একদিন, দুদিন বা তিনদিনও তিনি ওখানে লাঞ্চ খেতেন। অকস্মাৎ এক বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত। মার্গোর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

অবশ্য মিসেস্ মিলাবী এই বিপদের কথা আগেও ভাবতেন এবং সত্যি কথা বলতে দুবার তিনিই এটা ঘটতে দেননি—কারণ এসব বিষয়ে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু এবার দেখলেন যে আর কোন উপায় নেই। গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের ডিনার, লাঞ্চ, পার্টি তিনি চিরকালের মত হারাতে বসলেন। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা হোল, কী ক'রে মার্গোর সঙ্গে বন্ধুত্বটা বজায় রাখা যায়—এবং ধীরে ধীরে তার নূতন বাড়ীতেও আসনঅধিকার করা যায়। সেইজন্য তার বিবাহের উপহার সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে, উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে বহু চিন্তা করেছেন। তাস খেলাতেও ইদানীং তাঁর ভাগ্য অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল। ফলে টাকারও টানাটানি ছিল। তবু তাঁর বিশ্বাস ও আশা ছিল যে পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে তিনি এমন জিনিষ কিনবেন যে মার্গো অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ব'লে মনে করবে। আর এখন এত চিন্তা, এত গবেষণার পর তিনি যখন জিনিষ কিনলেন—তখন সেটা একান্ত নৈরাশ্যজনক বোধ হ'ল।

প্রায় ক্ষিপ্তভাবে তিনি উপহারটা প্যাক্-বাক্সর মধ্যে ফেলে দিলেন।

দরজায় শব্দ হোল এবং তার পরেই তাঁর মাসী এসে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মাসী এমিলির বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। অত্যন্ত বকে, খুঁতখুঁতে—তবে মনটি ভাল। তাহলেও তাঁর সঙ্গ বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না। 'নাইট্‌স্‌ব্রিজে' তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে থাকতেন এবং মিসেস্ মিলাবী যদিও তাঁকে বেশী পছন্দ করতেন না—তবুও মধ্যে মধ্যে যখন আর কোথাও নিমন্ত্রণ থাকত না—তখন বাধ্য হ'য়ে তাঁর কাছেই যেতেন। সুতরাং এমিলিমাসী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মনোহারী হাসিটি মুখে টেনে আনলেন। চা আনতে বললেন এবং তাঁর অতিপ্রিয় এমিলিমাসীর গুণবর্ণনা ও তাঁর উপর অশেষ দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে লাগলেন।

এমিলিমাসী বললেন—"তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে এবং বন্ধুদের কথা শুনে আমি খুব আনন্দ পাই। এখন প্রত্যেকের সম্বন্ধে যা জান বল।"

ভদ্রমহিলা গল্পগুজব ভাল বাসতেন। সুতরাং মিসেস্ মিলাবী তাঁকে খুসী করার খুব চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিশ্রম সার্থক হোলো। আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি আগামী বৃহস্পতিবার তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ পেলেন। (সে দিনে বাড়ীতে খেতে হলে একটি ডিমের পোচের বেশী কিছু জুটত না।)

অনেকের ব্যক্তিগত কথা বলা হোল ও শোনা হোল। শেষে খাবার ঠিক আগে এমিলিমাসী ঘরে যেন তোপ ফেললেন।—

"ওমা! তোমায় বলতে একেবারে ভুলে গেছি। একটা অত্যন্ত নতুন খবর আছে। আমি এইমাত্র 'হিউএট্‌সন্‌সের ওখান থেকে আসছি। সেখানে শুনলাম তোমার বন্ধু মার্গো ফেবিসের বিয়ে ভেঙে গেছে।"

"কী!"। রুদ্ধনিশ্বাসে মিসেস্ মিলাবী বললেন।

"হ্যাঁ সত্যিই। একেবারে আকস্মিক, অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার! ছেলেটির স্বভাব, চরিত্র নাকি অত্যন্ত খারাপ ব'লে জানা গেছে। একটা অত্যন্ত লজ্জাকর তথ্য আবিষ্কার করা হ'য়েছে। আমি জানি না ঠিক কী হ'য়েছিল। তবে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুতর রকম কিছু। মিঃ হিউয়েট্-সন্‌স্' নিজে তা আবিষ্কার করেছেন এবং মার্গোর বাবাকে বলেছেন! তারপরই যথারীতি সম্বন্ধ ভেঙে গেল। কালকের কাগজেই খবর পাবে। কিন্তু সত্যি বল তো—যদি খবরটা না পাওয়া যেত তাহলে কী কাণ্ডটাই হোত! মার্গোর নেহাৎই ভাগ্য।"

ছাতা, ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে এমিলিমাসী চলে গেলেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মিসেস্ মিলাবী পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর হ'য়ে রইলেন। যাক্—তাহলে ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁর অমন উপকারী বন্ধুটি এখনও অধিকারে রইলেন। বিবাহের আপদ দূর হ'য়ে গেল। গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের নিরাপদ আশ্রয় এখনো তাঁর জন্য সঞ্চিত রইল—এখনো সেখানে তাঁর অপ্রতিহত গতি বজায় রইল। আর এই হতভাগা ফুলদানীটার জোচ্চোর দোকানদার নিশ্চয়ই তার জিনিষ ফিরিয়ে নিবে—সুতরাং ৫টা পাউণ্ডও বেঁচে গেল। তিনি আর একবার তাঁর অপরূপ ফুলদানীটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এবং প্রসন্ন অন্তরে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হঠাৎ তাঁর একটি চমৎকার চিন্তা মাথায় খেলে গেল। দৈব যে এতটা সুপ্রসন্ন হ'ল, এর থেকে কি আরও সুফল আদায় করা যেতে পারে না। একটু কূটবুদ্ধির সাহায্যে তিনি কি মার্গোকে আরও গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ করতে পারেন না! বিবাহের দিনের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকী। গ্রস্‌ভেনার ষ্ট্রীটের বাড়ী নিশ্চয়ই উপহারে ভরে গেছে। এবং কাল যখন 'টাইমস্' পত্রিকায় ছোট্ট খবরটুকু বেরুবে তখন সব উপহারগুলিই আবার ফেরৎ পাঠান হবে! তাহলে? তাহলে কেনই বা নয়? কী ক্ষতি?

তক্ষুণি তিনি কাগজ কলম নিয়ে বিদ্যুৎবেগে এই ছোট্ট চিঠিখানি লিখলেন—

"আমার প্রিয়—অতি প্রিয় মার্গো—দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—আমি তোমার বিবাহের উপযুক্ত উপহারের কথা চিন্তা করেছি। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে আবিষ্কার করলাম আমি কী দিতে চাই। বন্ধু! তুমি ভাল ক'রেই জান যে আমার রূপোর ফুলদানীটা আমার সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রিয় জিনিষ! সেই জন্যই তা তোমায় দিতে ইচ্ছা করি। আমার একান্ত শুভকামনার সঙ্গে তা পাঠালাম।

ডরোথি"

চিঠিটা লিখে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। বাস্—ঠিক আছে। তারপর আর কালবিলম্ব না ক'রে তিনি সেই মহার্ঘ ফুলদানীটা জায়গা থেকে তুলে—বাক্সের মধ্যে পুরে বেঁধে ফেললেন ও শিল-মোহর ক'রে ঠিকানা লিখে ফেললেন। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে বললেন—

"এমা শিগ্‌গীর যাও। পার্শেলটা Post officeএ নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রী ক'রে এস। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এটা যাওয়া চাই।" কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে শেষ করলেন।

তারপর নতুন ফুলদানীটা নিয়ে তার ফুলদানীটার শূন্য স্থানে রাখলেন। ইস্! কী শোচনীয় পার্থক্য! অন্যটির কাছে কী কল্পনাতীতরূপে অযোগ্য! যাক্ ক'দিনের মধ্যেই তাঁর অতুলনীয় ফুলদানীটা ফিরে এসে ঘর আলো ক'রে দেবে। কিন্তু মার্গো তার দুঃখের মধ্যেও নিশ্চয়ই মনে রাখবে যে তিনি—ডরোথি মিলাবী তাঁর প্রিয়তম সামগ্রীটিই উপহার দিয়েছিলেন। আর তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে গ্রস্‌ভেনার স্ট্রীটে সপ্তাহে দুটির পরিবর্ত্তে তিনটি নিমন্ত্রণ তিনি পাবেন। একটি মৃদু হাসি—সফল কূটনীতিজ্ঞের হাসি—মনালিসার হাসি—তাঁর মুখে ফুটে উঠল। শোফায় ব'সে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হোলো যে তিনি ভালই করেছেন।

আধঘণ্টা পরে জোরে আবার ঘণ্টা বেজে উঠল এবং আবার এমিলিমাসী প্রবেশ করলেন।

ঘরের চারদিকে হাতের জিনিষ রাখতে রাখতে তিনি বললেন—"এতখানি পথ আবার ফিরে আসতে হোলো। মনে হচ্ছে এখানে আমার একটি দস্তানা ফেলে গেছি। একেবারে নূতন আর ঘোর বাদামী রংএর! আরে—এই তো। যাক্ বাঁচা গেল। আচ্ছা এবার তাহলে আসি।

ওহো বলতে ভুলে বসেছিলাম আর একটু হ'লে। তুমি নিশ্চয়ই খুবই খুসী হবে শুনে। তখন কী ভুলই করেছিলাম। তোমার বন্ধু মার্গোফোবিসের বিয়ে ভেঙ্গে যায়নি—মার্গো এলিম্যানের ভেঙ্গেছে! কী যে সব এক রকম নাম! কেবল গুলিয়ে ফেলি। ভাবলাম তোমায় এক্ষুণি বলে যাই—কারণ জানি মার্গো ফোবিস্ তোমার কত প্রিয় বন্ধু! মরণ আমার! কোন দিন নিজের নামই ভুলে বসব। যাক্ বাছা, তুমি কিছু ভেবোনা। তোমার মার্গোর বিয়ের সমস্তই ঠিক আছে। আচ্ছা আসি এবার। ভুলো না যেন বৃহস্পতিবার আমার ওখানে খাবে।"

মিসেস্ মিলাবী সোফার মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে নূতন ফুলদানীটার দিকে তাকালেন। কী অসহ্য! কী কুৎসিত। কী নির্লজ্জ রকম আধুনিক!

তিনি খুবই শক্ত মেয়ে ছিলেন—কিছুতেই তাঁকে দমাতে পারত না। কিন্তু এবার তিনি হাতে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

রাত পোহাল। দুটি রাত্রি কাটলো পথে পথে। তবু পথের এখনও অনেক বাকী। নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখি আমার চারি পাশে হরিণগাড়া নদী এখানে বাঁক নিয়েছে, বাঁকের মাথায় নদী এত প্রশস্ত যে ওপার সীমাকে আবছা দেখা যায়। বাঁ পাশে এতক্ষণ ছিল বন, একটু দূরে খালের ওপারেই ডান পাশেও এইবার সুরু হল গহন অরণ্য। দত্তরের পর থেকেই চারি পাশে বন—গভীর, শ্বাপদসঙ্কুল বনানী। এতে নিরাপদ আশ্রয়টুকুর কোন যোগ্য নির্ভরতাই খুঁজে পেলাম না। এ পাশেও নজরে পড়ে না কোন লোকালয়, ফরেষ্ট অফিসের নিশানা। ভেঁড়ির এধারের ঘন বনই চোখে পড়ে। নৌকা বলতে আমাদের খানকয়েক, তাছাড়া আর জনমানব নাই।

কোন সংজ্ঞা অনুসারে একে নিরাপদ বলা হয়—ঠিক বুঝতে পারলাম না। ফরেষ্ট অপিস কোনখানে ?

এখান থেকে ওই ডান হাতি খাল ভেঙ্গে গেছে তারই মধ্যে।

চা হালুয়া খেয়ে আমরা ডিঙ্গি নিয়ে অফিস দেখতে বার হলাম। পথে দেখি আমাদেরই মাঝিরা ডিঙ্গিতে করে জল আনতে গিয়েছিল ওই অফিসের কাছে একটা মিঠে জলের খাল থেকে। ক'দিন রাস্তায় সঞ্চিত জল থেকে খরচ করে এসেছে, পথে এই মিষ্টিজল পাবার শেষ আশ্রয়, সেই ব্যয়টুকু তারা এইখান থেকে জল তুলে পুরণ করে নিলো। এরপর মিষ্টি জলের কোন সন্ধান নাই।

খালের মধ্যে গিয়ে চোখে পড়লো ফরেষ্ট অফিসের ঘাট। নদীর বুক থেকে ওঠানামা করবার জন্য কাঠের গুড়ি পুঁতে সিঁড়ি বানান হয়েছে। জোয়ারের সময় নিরাপদেই উঠলাম।

ভেঁড়ি পার হয়ে অফিসের সীমানা! খানিকটা বন কেটে পরিষ্কার করে কাঠের গুঁড়ির পাটাতন করে তার উপরে কাঠের ঘর তৈরী করা হয়েছে। একখানাতে এক অংশে অফিস, অন্য দিকটায় কোয়ার্টার, পাশে অপেক্ষাকৃত নীচ কয়েকটা ঘর, ফরেষ্ট গার্ডদের বাসা। খালের ওপরেই বনসীমা, এদিকে নদীর এপারে বন। এরই মধ্যে দেখলাম ফরেষ্টার ভদ্রলোক ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে রয়েছেন, গার্ডদের কয়েকজনও সপরিবারে রয়েছে।

এই বনের মাঝে—সভ্যজগত থেকে এতদূরে ফ্যামিলি নিয়ে আছেন? ভদ্রলোক হাসেন—' কি করবো বলুন, আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি এদেশে। বাড়ীঘর কোথাও নাই, বাধ্য হয়েই সঙ্গে রাখতে হয়েছে সবাইকে।' ছেলেপুলের শিক্ষা, চিকিৎসা—সমাজ সব কিছু থেকে নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অবশ্য এর জন্য ক্ষোভও দেখলাম না। শুনলাম ওই বাসায় পাটাতনের নীচেও মাঝে মাঝে বন থেকে প্রভুরা আসেন, তত্ব তল্লাস নিয়ে যান হুঙ্কার ছেড়ে। কাছাকাছিই কয়েকদিন আগে একটা বাঘ মেরেছে একজন গার্ড। ব্যাঘ পুঙ্গবের শেষ চিহ্ন শুকনো চামড়াটা, পচা মাংস তখনও দেখলাম আশে-পাশে।

গোপাল ভাঁড়কে তার সত্য ভাষণের জন্য ধন্যবাদ দিই। রাজার নাতি হওয়ার সংবাদে তিনি বলেছিলেন—মল খোলসা হলে যেমন খুসি হয় মন, তিনিও নাকি তেমনি খুসি হয়েছেন, মহারাজ তো চটে লাল।

মাছ ধরার আনন্দ

তারপর একদা সেই অভিজ্ঞতা যেদিন মহারাজের হয়েছিল, তারপর থেকে তিনি গোপাল ভাঁড়কে ভুলবোঝেন নি।

দু'রাত্রি একটা দিন কেটে গেছে। নৌকা থেকে ও কর্ম করাটা তখনও ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি, তাই অস্বস্তির সীমা নাই। সকালে চা খেয়ে ডাঙ্গায় নেমেছি, একটু ধূমপান করতেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি। ডাঙ্গাতে রয়েছি, ও কাযটা সেরে যেতে পারলে—একটা কাযের মত কায হয়।

অবস্থাটা বুঝতে পেরে ফরেষ্টার ভদ্রলোকই জায়গাটার সন্ধান বলে দেন ; দূরে ভেড়ির ওপারে 'টুং' বাধা রয়েছে, চারিদিক ঘেরা, উপরে ছাউনিও আছে।···দুরাত্রি এক দিনের পর বেশ একটু হালকা হাওয়া গেল।

গোপাল ভাঁড়ের কথার সত্যতা নোতুন করে উপলব্ধি করলাম। যাক্ আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

…অপিসের সামনে পড়ে আছে কয়েকটা গরাণ খুঁট, ওপাশে নামান একখানা ছোট ডিঙ্গি। খোঁজ নিয়ে জানলাম—কারা বনে চুরি করে কাঠ কাটছিল, বনবিভাগের লোক তাদিকে ধরবার চেষ্টা করে, লোকজন ডিঙ্গি কাঠ কুড়ুল ফেলেই পালিয়েছে। তাঁরা নিয়ে এসে মালিকের সন্ধান না পেয়ে নীলামে বিক্রী করেছেন এবং এই নীলাম-পর্ব সারবার জন্যই কলকাতা থেকে লঞ্চে সদলবলে এসেছিলেন ছোট সাহেব, রেঞ্জ অফিসার তাঁর লঞ্চে লোক লস্কর নিয়ে। হাঁক ডাক, কয়েক হাজার টাকা খরচান্ত এবং মোটা 'টি'-'এ' বিল খসিয়ে সরকারী তহবিলে একুনে তাঁরা অনেক টাকা জমা করিয়ে দিয়েছেন। পরিমাণ একশো আটটাকা প্রায়। কাল এই কাজ সেরে ফিরছিলেন একজন অফিসার, আমাদের বরাতে তাঁরই দর্শন ঘটেছিল।

'ডাক্তার নাই এদিকে ?"

ফরেষ্টার ভদ্রলোক বলেন—এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে একজন এল-এম-এফ আছেন সাতজেলেতে, কিন্তু তার টাকার চাহিদা মেটানো যার তার কাজ নয়। একবার রোগী দেখে দুচার দাগ ওষুধ দিয়েই কমসেকম তিরিশ টাকা হাঁকেন। কলকাতার বিলাত-ফেরৎ ডাক্তারদেরও কথাটা শুনে তাজ্জব লাগবে। কিন্তু যাদের মুখ থেকে শুনেছি আমি—মনে হয় তাঁরা মিথ্যে বলেননি। বন-রাজ্যে সবই সম্ভব।

আশপাশে দূরে দু' চার ঘর লোকের বাস আছে, একটি চাষী হাতে একটুকরো সাদা কাগজ সন্তর্পণে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। কাল নিলামে কুড়ুল কিনেছে তারই রসিদ দিয়ে নিয়ে যাবে মালটা। রসিদ লেখা ঠিকমত হয় নি, অন্য কাগজে লিখতে হবে। লোকটি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, ওই কাগজটুকু এখানে মেলা ভার, আবার কাগজ পেতে গেলে ২।৩ দিন পর তাকে চার ক্রোশ নদীপথ বেয়ে সাতজেলে যেতে হবে হাটবারের দিন, নাহলে কাগজই মিলবেনা।

বেলা হয়ে আসছে, বিদায় নিয়ে আমরা বার হয়ে এলাম, জোয়ার শেষ হতে আর দেরী নাই। ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হবে যাত্রা সুরু, বেলাবেলি পৌঁছতে হবে বিহারীখাল চেকপোষ্টে, তার আগে কোথাও থামা চলবে না। বড় গাং—কুখ্যাত গাং। এর প্রতিটি খালে—বনের অন্তরালে লুকায়িত রয়েছে কত ডাকাতির কাহিনী, এই নদীর গহন-তলে শেষ আশ্রয় নিয়েছে কত নৌকা, কত হতভাগ্যের দল। সুন্দরবনের গহনে—নদীর বুকে যেন তাদেরই অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। সন্ধ্যার পর থেকেই সারা বনভূমি অন্যরূপ ধারণ করে, সেই সুন্দররূপ এর কোথায় যায় মিলিয়ে, জেগে ওঠে আদিম বন্যশ্বাপদ-লালসা এর অন্ধিসন্ধিতে। উত্তরে হাওয়া বইছে। পাল তুলে দিতেই এগিয়ে চল্ল নৌকা। পিছনে আসছে হাজারমণি দুখানা। ওদের গতি আমাদের চেয়েও কম। গলুইএর ওপাশ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি…ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল দপ্তর অফিসের টিনের ছাদটা, লোকালয়ের চিহ্ন মুছে গেল। দুপাশে সুরু হল গহন অরণ্য। প্রকৃত সুন্দরবনের বুকে প্রবেশ করলাম আমরা।

আদিম অরণ্যানী, পিছনে মুছে গেছে লোকালয়ের বন্ধন, নিজের অবাধ রাজত্বের মধ্যে বনানীর সেই সংগ্রামীরূপের পরিবর্তে ফুটে উঠেছে শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর একটি মূর্তি। স্তরে স্তরে উপরের দিকে উঠেছে নদীর বুক থেকে ঘনসবুজ কেওড়াগাছের বনসীমা, কোথাও বনভূমি হলুদের রং-এর হয়ে উঠেছে হিঁতাল বনের সীমানায়; সূর্য্যের দ্বিপ্রহরের প্রখর তাপ—ঘন কালো আবরণে ভরিয়ে দিয়েছে দূর অরণ্যসীমাকে। কি এক দুর্ভেদ্য রহস্য বুকে নিয়ে সে আপন-হারা, মানুষের স্পর্শ ওর শুচিরূপকে কলুষিত করেনি। স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি দূরে বনসীমার দিকে। মাঝে মাঝে দু' একটা পাখীর ডাক ভেসে আসে। শোনা যায় দাঁড়ের শব্দ, ঢেউ আঘাত করছে ছন্দবদ্ধভাবে নৌকার গলুই-এ।

…দেখা যায় ছোট বড় খাল, বড় নদী থেকে বার হয়ে অরণ্যের গভারে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে—কেউ বা গিয়ে ওপাশে কোন নদী-খালে পড়েছে, নাহয় বনের ভিতর ওর মুখ বুজে গেছে পলিতে; তাই চেনা-পথ বড় গাংএর বাওয়ালিরা ছাড়া কেউ নৌকা বায় না। খালের উপর দুদিকে প্রাচীরের মত ঘিরে রয়েছে বড় বড় সুন্দরী-গরাণ-কেওড়াগাছ, তা যেন কোন মানুষকে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ ওর রহস্য ওরই অতলে থাক।

…কিছুদিন আগে এই নদীর উপরই নৌকা বেয়ে যাচ্ছে এক মহাজন। দিনের বেলায়—দুদিক থেকে তীরবেগে এসে পড়লো দু'খানা ছিপ। নৌকার দাঁড়ি মাঝি সকলেই চেনে ওই ধরণের ছিপগুলোকে; হাল দাঁড় ছেড়ে দিয়ে এসে একজায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে, আতঙ্কিত বিস্ফারিত চাহনিতে। বাধা দেবার চেষ্টা করাই বোকামি। যাখুসী ওরা নিয়ে যাক!

কিন্তু তা করেনি ডাকাতের দল। পাহারা দিয়ে আগলে রেখে ওদিকে নৌকা বাইয়ে নিয়ে চললো বনের ভিতর একখালে। টাকা-কড়ি জিনিষপত্রের প্রয়োজন ত' বটেই, আর দরকার আছে ওই মহাজন ভদ্রলোককে নিয়ে।

বনের মধ্যে বড় নৌকায় ডাকাতদের সর্দার রয়েছে, আসামীকে হাজির করা হোল তার কাছে। মহাজন তো কাঁপছে ঠক ঠক করে। শুনেছিল লুটে পুটে নিয়েই ছেড়ে দেয়, কিন্তু এমন অবস্থা ঘটবে ভাবতেই পারেনি। কে জানে বন্দীদশায় কাটবে কতদিন! শেষ-কালে প্রাণটুকু নিয়েই ফিরতে পারবে কিনা কে জানে।

সর্দার তাকে কয়েকদিনই আটকে রেখে এঁটো বাসন ধোয়ানো, তামাক সাজা ইত্যাদি করিয়ে নিয়ে, সর্বস্ব কেড়ে…গামছা সম্বল করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। শুনলে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী, কিন্তু সত্যই ঘটেছিল।

…দূরে দেখা যায় জোয়ারের জল উঁচু তীরভূমির বুক থেকে নেমে এসেছে কাদামাটিতে—দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দরী ছায়ামূর্তির মত —কালো কালো কোন দৈত্যের দল প্রতীক্ষা করছে কাদের আশায়।

ওই বাঁকের মাথায় মুইয়ে পড়া কেওড়া ঝোপের নীচেই কয়েক

াস আগে ভাসছিল সরকারী ডিঙ্গি, কারা তিনজন বনবিভাগের র্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।…আততায়ীরা াজও বেপাত্তা; ঘটনাটা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। পথচলতি াঝি—বাওয়ালির দল সভয়ে চেয়ে থাকে ওই ঘন ছায়াকালো রহস্যময় াইটার দিকে, নৌকা তীরে ভিড়ায় না কেউ, অকূল গাংএর মাঝ দিয়ে বয়ে চলে প্রাণটুকু ঠোঁটের ডগায় নিয়ে।

শরিফ সেদিন পথেই যাচ্ছিল। আগের রাতে বয়ে গেছে ঝড় ুফান, একখানা ডিঙ্গি উপুড় হয়ে ভাসছে। হয় তো কোন ডিঙ্গি ়ুড়ে গেছে (ডুবে গেছে), ডিঙ্গিখানাকে সোজা করে বুঝতে পারে—রকারী বোট। লোকজন কেউ কোথাও নাই—একশ'টা বেয়ে গয়ে বিহারীখাল পুলিশ চেকপোষ্টে খবর দিতে তাঁরা অনুসন্ধান করে ার করেন ওই মৃতদেহগুলো। সে ইতিহাস থানার ছোটবাবুর মুখেও ুনেছি। স্নতেরোটা রাইফেল সঙ্গে নিয়ে সদলবলে তারা বনে

মাছ সংগ্রহের দৃশ্য

ঢোকেন। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, সোজা হয়ে একপাও এগোন সম্ভব নয়, কাদায় বসে যাচ্ছে পা, এমনি করে বনের মধ্য থেকে বিকৃত মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।

বাওয়ালীর দলও অমনি বনে কাঠ কাটতে যায়, সঙ্গে রাইফেল বন্দুক তো স্বপ্ন, হাতিয়ার বলতে দু'হাত লম্বা কুড়ুল, নাহয় 'দা' আর নৌকার বৈঠে।…পেটের দায়ে তারা ঢোকে বনে, চাকরীর দায়ে অন্যশ্রেণী বনে ঢোকেন সঙ্গে আধুনিক হাতিয়ার—কতো মারণাস্ত্র।… পেটের জ্বালা—ভবিষ্যৎ মানে না, চাকরী পেটের জ্বালা ছাড়াও ভবিষ্যতের কথা।

নৌকা চলেছে। খেতে বিশেষ কোন রুচি নাই। চতুর্দিকে এই নিথর নীরবতা, মৃত্যু মুখ বুজে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। গাংএ অতল লোনা জলে, বনের গভীরে—আকাশে বাতাসে। বাইরে দেখা যায় দন্ত-পশুর গাং।…চোখের সামনে ভেসে ওঠে নৌকা ডুবির একটা করুণ দৃশ্য। পাল ছিঁড়ে গেছে, নৌকা কাৎ হয়ে গোত্তা খেয়ে পড়েছে জলে। মত্ত উল্লাসে কলরব করে উঠছে ক্ষুধিত জলরাশি নৌকাটাকে গ্রাস করতে। ফরেষ্টার ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল তার ভাইপো। ছিটকে পড়ে দুজন বোটম্যান-মাঝি—তারা সকলেই।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তলিয়ে গেল তাঁর ভাইপো,… ফরেষ্টার ভদ্রলোক ইচ্ছা করলে হয়তো তীরে উঠতে পারতেন, কিন্তু কি যেন হয়ে গেল তার,…হাত পা অনড় হয়ে গেল।…কালো ভারি জলের বুকে মিলিয়ে গেলো তার দেহটা।…ক্ষুধিত শ্বাপদ-লোলুপ ওই গাং, কালো গাছের প্রহরার অন্তরালে ওৎ পেতে আছে; দুর্মদ লালসা থলথল করে ওঠে ওর বুকে। পথে পথে ছড়ানো মৃত্যুর ইতিহাস।… জীবন এখানে অনিশ্চিত, বড় হয়ে উঠেছে মৃত্যু। এ মৃত্যুর রাজত্ব; মানুষ এখানে আসে মাথা নুইয়ে সন্তর্পণে। আকাশ বাতাসে—বনের শ্যামলিমায় মধুর শোভা বিস্তার করে মৃত্যু এখানে জাল পেতেছে। তবুও এসেছি, তোমার সুন্দর ভীষণ রূপ আমাকে বিচলিত করেছে সত্যি। তোমার মায়া-কাননের ছলনা আমাকেও মুগ্ধ করেছে।…বিভ্রান্ত আমি, নীরব আত্মসমর্পণে তোমার হাতে ধরা দিয়েছি। তোমাকে স্পর্শ করতে চাই…সে লগ্ন আসে আসুক; যদি ফিরে যাই, তোমাকে চিনে যাবো; …শেষ দিনের মিলন বাসরে এই পথিককে তোমার চিনে নিতে দেরী হবে না। শুভদৃষ্টি আগেই হয়ে থাক।

—চিঁক-চিঁক-চিঁক ফিরে চাইলাম। মুরগির বাচ্চাটা কাছে এসে ডাকছে। আপনা থেকেই এগিয়ে এলো হাতের উপর। কচি ঠোঁটটা দিয়ে হাতের তালুতে ঠোকর মারে খাবার আশায়। বিছানাপত্র ছই থেকে বার করে নৌকার পাটাতনে পেড়ে দিয়েছি, রোদ লাগছে—আমিও গড়াগড়ি দিচ্ছি। 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' খানা খোলা পড়ে আছে, পড়বার আগ্রহ মোটেই নাই। 'লুইস ড্রেফাসের' করুণ নির্বাসনের কাহিনী কয়েক পাতা পড়েই ফেলে রেখেছি।…দূরে আর গাছ বনসীমা কিছুই দেখা যায় না। বিলা আর হরিণগাড়া নদীর সঙ্গম।…দূর দিগন্ত আকাশে মিলিয়ে গেছে, অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত সাদা সাদা হয়ে উঠেছে দিক-চক্রবাল সীমা।

…এপাশের বনে লেগেছে সূর্য্যের হলুদ আলো। সকালের সূর্য্যালোকের গিনিগলা রং, দুপুরের তীব্রতা, অপরাহ্নের হলুদ আভা—এখানের বনে বনে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। নিধূম নীল আকাশ; স্তব্ধ নির্জন পড়ন্ত বেলায় অসীম নিঃসঙ্গতার স্বপ্ন দেখে বনে বনে লাগে তারই নিবিড় স্পর্শ। কি এক হতাশার পুঞ্জীভূত বেদনা থরে থরে সঞ্চিত হয় বন সীমায়। এই নীরব ক্রন্দন কিসের জন্য জানিনা—তবুও অনুভব করেছিলাম। স্পষ্ট প্রত্যয় হয়েছিল এ আমার ব্যর্থ নিঃসঙ্গ একক জীবনের বহিঃপ্রকাশ নয়, প্রকৃতির বুকভরা এই দশা আমাকেও বিচলিত করেছিল।

বড় নদী থেকে ডানহাতের গাংএ ঢুকলাম, এরই নাম 'বিহারী খাল'। নামেই খাল, কিন্তু আয়তনে কলকাতার গঙ্গার ছুটোরও বেশী, গভীরতায় ৮০।৯০ হাত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। 'ভোঁ' এর শব্দ শুনে চাইলাম, দূরে রায়মঙ্গলের দিক থেকে আসছে আসাম ডেসপ্যাচের

বড় বড় ডবল ডেকার ষ্টীমার মালপত্র বয়ে নিয়ে, কলকাতা থেকে আসছে কেউ, কেউ বা পাকিস্থানের মধ্যদিয়ে আসামের দিকে।

বৈকাল হয়ে আসছে। বনের পাশ দিয়ে চলেছি, এত সোনালী রোদ বড় একটা দেখিনি, দেখেছি কদাচিৎ শরতের সকালে। এখানে দেখলাম—কেওড়া গাছে কচি কচি পাতার স্তবকে কি এক রংএর নেশা বুলিয়েছে। ছোট বড় কয়েকটা বাঁদর আমাদিগকে দেখে এগিয়ে এল জলের কাছে; কেউ বা মাতামাতি করে আপন মনে। নৌকা দুলছে, গাংএর মধ্যে নোঙর করা রয়েছে একটা ডবল ডেকার ষ্টীমার, সেইটাই চেকপোষ্টের হেডকোয়ার্টার। কাষ্টমস্ অফিসার, সশস্ত্র প্রহরী, রেডিও, রেডিওগ্রাম ষ্টেশন, বিজলী আলো সবকিছুই আছে। গহন অরণ্যের মধ্যে পরম নির্ভরতার মাঝে আছেন তাঁরা, তবে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁদের নাই। ষ্টীমার গাধাবোট সব কিছু চেক করে ভারতে ঢুকতে দেন বা বেরুবার অনুমতি দেন তাঁরা।…

বৈকালের স্বর্ণ-আভা মুছে কাছে নেমে আসছে রক্তআভামাখা সন্ধ্যা। এপারে নির্জন বনের ধারে আমরা বাঁধলাম নৌকা। আশে পাশে দু' একটা জেলে ডিঙ্গি ছিল, শুনলাম তাদের কাছে—কাল সন্ধ্যায় গোসাবা নদীর উপর হামলা করেছে ডাকাতের দল, তার তিন দিন আগে ঘটে গেছে এই বিহারীখাল থেকে তিন মাইল দূরে একটা খালের মধ্যে। আর আমরা কিনা সেই ছোট ডাকাতে খালের সামনে নৌকা বেঁধেছি। একটু পিছিয়ে আনলাম নৌকা। এই বিহারী-খালে গুলি চালানোর খবর পেয়েছিলাম তুষখালিতে বসে রেডিওগ্রাম। সেই ঘাটে এসেছি। সন্ধ্যা নেমে এলো;

একদল জেলে ডিঙ্গি একটা সরু খালের মধ্যে জাল পেতেছিল। জোয়ারের সময় মজা খালগুলো ভরে যায় জলে, সেই সময় ভর্তি খালের মুখে জাল পেতে দেয়, ভাঁটার টানে জাল নেমে যায় জলের ওধারে, খালের কাদায় পড়ে থাকে পারশে, ভেটকি, ভাঙন, পায়রাতেলি মাছ। জেলের দল সেই কাদায় হাতড়ে মাছ ধরে জলশূন্য খালে।

মাছের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে তারা, এমন সময় প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ সন্ধানে থাকে—সুযোগ বুঝে চকিতের মধ্যে এসে লাফ দিয়ে কাউকে তুলে নিয়ে উধাও হয়। বাঘের মুখ থেকে তবুও তারা মাছ কেড়ে আনে। বরফ ঢাকা হয়ে সেই মাছ আসে শিয়ালদা, শ্যামবাজার মার্কেটে। ওর মৌন অস্তিত্বের পিছনে লুকিয়ে আছে এমনি কোন রক্তাক্ত কাহিনী। ডাকাতের হামলাতো আছেই পাওনার উপর ফাউ হিসেবে।

ওপাশে চামটের খাল। অসংখ্য নদীনালা খালখাড়ি এই সুন্দর-বনের সারা দেহ জুড়ে ধমনী শিরা উপশিরা তন্ত্রীর মত বয়ে গেছে। সীমা-সংখ্যা এর নাই। এতো বেশী—যে নামকরণ করবারও কেউ প্রয়োজন বোধ করেনি। যেগুলো বড় বড় বা যাতায়তের পথে পড়েছে সেইগুলোর নামকরণ হয়েছে; যেমন কালিন্দী, ছায়াকুপ্রা, রায়মঙ্গল, হরিণ গাড়া, গোসাবা, বিদ্যা মাতলা ইত্যাদি। আর খালনালানীগুলোর নামকরণ হয়েছে কোন নৌকাডুবি, না হয় খুনখারাপিকে কেন্দ্র করে—যেমন মানুষ-মারি। বেহারীখালের নামকরণের ইতিহাস সঠিক জানিনা, হয়তো বা কোন দুর্ভাগ্যের কাহিনীই জড়িয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

সেখানে ও এখানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চল্ যমুনার পরপারে যেথা ডাকে "আয় আয়"
সুন্দর সে-মনোমোহন।
চল্ ছেড়ে জগতের যত জঞ্জাল যাই সখী,
বরিতে তাহার শ্রীচরণ।
হেথা আমার আমার করে সবে নিয়ত,
সেথা প্রতি প্রাণ রাজে তারি শরণাগত,
হেথা শোক তাপ দুখ মোহ ঘনায় নিতি,
সেথা নির্মল সবে গায় একেরি গীতি
হ'য়ে মাতোয়ারা অবিরাম হরির প্রেমল নাম
সকলেই করে কীর্তন।
হেথা ধনজন মানে প্রতি জনের বিচার,
সেথা প্রেমেরি পারানি নিয়ে পারী করে পার,
হেথা আলোর পিছনে ছায়া বেদনা ঘনায়,
সেথা নন্দিত নরনারী তারি করুণায়,
চিত নন্দন সেথায় যে অশোক বাঁশরী প্রেমকুঞ্জে
বাজায় অনুখন।
মীরা গায়: "চল যাই সেই বৃন্দাবনে
যেথা উছলি' গোপাল ডাকে মুরলী স্বনে,
সব মিথ্যার বন্ধন টুটি' যাই চল্
মুখ ফিরিয়ে দুঃখ সুখে প্রেমবিহ্বল
চল্ প্রেমের দীক্ষা নিতে গোকুলে—
যেথায় প্রেম কারে বলে শিখায় সে-প্রেমনন্দন।

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দি ভজনের অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড্-ওয়াইফ্ নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি"

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড়"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, হাসির দ্বারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়া-ঝাঁটি করে এসেছ ?"

"না, তা হয় নি"

দিগন্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"কি হ'ল তাহলে—"

"যা বরাবর হয়, দাদা ঝড়াৎ করে' আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বসল—কাম শার্প। গেলাম। দাদা বললে —চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তখন দাদার শ্বশুর শাশুড়ীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যখন সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে চাইছে তখন আপনাদের ভাবনা কি। দাদারও খুব কষ্ট হবে বৌদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ভরা পোয়াতি, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায় তখন গগন কি একা সামলাতে পারবে ? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নার্স কিম্বা মিড্-ওয়াইফ সঙ্গে চলুক। আপনাদের যার উপর বিশ্বাস বলুন —তাকেই নিয়ে যাই। যার উপর তাঁদের বিশ্বাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই মিস্ বোসকে রেকমেণ্ড করলেন। মেয়েটি নাকি বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি দাদার শ্বশুর বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শ্বশুর-শাশুড়িও হয়তো দাদুকে দেখতে আসতে পারেন—"

"জমজমাট ব্যাপার তাহলে বল—"

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে' এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার মাথায় চায়ের টি পট্ সুদ্ধ উল্টে, চেন টেনে ট্রেণ থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড"

"তাই না কি ! কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত—"

"কি আর হবে। ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে,তা না হলে লাভ হয় না,কেলনার তো উঠে গেছে—"

"না, তা বলছি না। পুলিশ কেস টেস হয় নি তো—"

"না। আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা দুই টাকা দিয়ে দিয়েছি"

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে হইল বেশ চটিয়াছে।

"ও, এরা সব এসে গেছে বুঝি। বাবু, তুমি বেশ লোক তো, একলা উঠে চলে' এলে, আমাকে ডাকলে না"

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথাটি বলিলেন।

"দু'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা টাথা ধরবে, তাই আর বেশী ডাকলাম না"

"মিথ্যুক কোথাকার। একবারও ডাকনি আমাকে"।

কৃষ্ণকান্ত অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্টার সতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্য চা করতে বলেছি। ক' কাপ আনতে বলব"

কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল বলে' গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে এসেছে—"

"কে বললে"

"দিগন্ত"

কিরণকে প্রণাম করিয়া দিগন্ত হাসিমুখে বলিল, "দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আলকাতরার মতো রং—"

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভাল চা করাচ্ছি, সতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

সতীশ বলিল, "আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে' দিচ্ছি। আপনি ওঁদের সঙ্গে যান না"

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

"আমাদের সঙ্গে ভাল দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ ডিসও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্ব্বতী। কোথা গেল, পার্ব্বতী—"

মুকুন্দ ওয়েটিংরুমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "সে চিরন্জীকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে—"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে—"

সতীশ বলিল, "আমি তাহলে গরম জল নিয়ে আসি। দুধও চাই বোধহয়"

"হ্যাঁ, তা চাই—"

সতীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। কিরণ উভয়ের থুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে রাজলক্ষী দেখছি। ট্রেণে ঘুম হয় নি নিশ্চয়, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি দেখি সতীশ চা-য়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটন্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া একটি ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ শশব্যস্ত হইয়া মুসাফির-খানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একটু আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগন্ত প্রবেশ করতে মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশী চেয়ার ছিল না। গগন দিগন্তকে বলিল, "দেখতো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ্ ওয়েটিংরুম থেকে যে ক'টা পাস টেনে বার কর। প্লাটফর্ম্মেই বার কর। বাইরেই বসা যাক—।" দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে সে একজন গণ্যমান্য প্রফেসার।

গগনরা চলিয়া যাইবার দুইঘণ্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেণটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেণ হইতে সূর্য্যসুন্দরের একমাত্র ভ্রাতা চন্দ্রসুন্দর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভীড়ের মধ্যে ব্রজগোপালবাবুকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তিনি যেমন শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের মতো ধপ্ধপে শাদা। বৃদ্ধ নন, অকালে চুল পাকিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর ট্রেণ হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং খুশী হইলেন। ব্রজগোপাল আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল যে বিলকুল শাদা হ'য়ে গেল রে, অ্যাঁ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকে নি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিস্ট—"। এক সুদৃশ্য কাপড়ের-তৈরি মণি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজগোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, মানে ছাত্রের মেয়ে—আমাকে করে'

দিয়েছে। আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত, না?" ব্রজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি ট্রেণে উঠিয়া গেলেন এবং লিস্ট মিলাইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রসুন্দর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রসুন্দরের বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাখেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রসুন্দর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু, সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে খুব খাতির করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা উদ্ভব হইয়াছিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ, এমন কি কুসংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন, চন্দ্রসুন্দর সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কণ্ডাকটার, সূর্য্যগ্রহণের সময় হাঁড়ির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেছিলেন তখন চন্দ্রসুন্দর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানন্দের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রসুন্দর কিন্তু সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-বোধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন তিনি? বার তিনেক ফার্ষ্ট আর্টস (সেকালে আই, এস, সি ছিল না) ফেল করিয়া অবশেষে তিনি স্কুল মাষ্টারি গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে বরাবরই তিনি গোঁড়া। ছাত্র জীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, দুইবেলা ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সুতরাং ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেন, কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মান্যগণ্য। এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্থস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান—তখন পথে নিবার্য্য কোন কষ্ট-ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক পোষ্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার হালে আসিয়াছেন। জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলমান ছাত্র হাওড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অসুখের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিয়াছিলেন। জলিল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট কলেক্‌টারটি ট্রেণে যাইতেছিল তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—সে যেন পথে মাষ্টার মশায়ের খোঁজ খবর লয়। নরেশ রামপুরহাটে থাকে। সে রাত্রি তিনটার সময় আসিয়া তাঁহাকে শুদ্ধাচারে প্রস্তুত বাড়ির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজগোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চন্দ্রসুন্দর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাধ্য ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসঙ্কোচে ফাই-ফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছে ফাই-ফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রসুন্দর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাই ফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র কার্ত্তিক-গণেশের মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, ততদিন বালক-ভৃত্যের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহার স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে দুইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কারণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের সকলের মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভাল নয়'। চন্দ্রসুন্দরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার না কি [illegible] দৌর্ব্বল্য আছে। মাথা ঘোরে, হাত পা ঝিন ঝিন করে, [illegible] মাঝে হাত-পা অসাড়ও হইয়া যায়, অকস্মাৎ সারা গায়ে আমবাত বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শরীর ভাল থাকে চন্দ্রবাবুর তাহা নাই। সেইজন্য কখনও বায়ু, কখনও পিত্ত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে তাই সর্দ্দি হয়, একটু গরমেই সর্ব্বাঙ্গে ফোঁড়া বাহির হইয়া পড়ে। কার্ত্তিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধাক্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চন্দ্রসুন্দরের পত্নী চিণ্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্য্যে তিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। ছেলেরাই বাবার সেবা করিত। চন্দ্রসুন্দরের একটিমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাকে তিনি দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসন্ধ্যা করিত, নিরামিষাশী ছিল, বেশ বড় একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রসুন্দর ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বেশী পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশী বেতনের সন্ধান পাইতেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভাবে বহু স্কুলে তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিণ্ময়ী এই অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ সূর্য্যসুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। যখনই করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোষ করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ সূর্য্যসুন্দরকে ঠিক তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বার বার ফেল করা সত্ত্বেও তাঁহার পড়ার খরচ জোগাইয়াছেন—একথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্য্যসুন্দরের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাষ্টারি এবং তাহার পর পোষ্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেষোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই ; পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিত না। অর্থাভাবে পড়িলে সূর্য্যসুন্দরই বরাবর তাঁহাকে টাকা জোগাইয়াছেন। তাই সূর্য্যসুন্দরকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে এমন একটা নিগূঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে কখনও তিনি ইতস্তত করেন নাই। দাদার অসুখের সংবাদ পাইয়া তাই তিনি সুদূর উড়িষ্যা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনের নেপথ্যে একটা অনুতাপের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল দাদার সহিত তিনি ঠিক আদর্শ অনুজোচিত ব্যবহার করেন নাই। এজন্য দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—একথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন—যাইতে হইবে, যত কষ্ট যত অসুবিধাই হউক—যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফার্ষ্ট আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"টাকার জন্য তুমি ভাবিও না। আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে সে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামীবারে নিশ্চয় পাশ করিবে।" কার্ত্তিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোষ্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্ত্তিক-গণেশ কেহই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে

পারে নাই। কার্ত্তিককে তাঁহার এক গুরু-ভাই রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাঁহার এক বড়লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পত্নী চিণ্ময়ী এবং কন্যা জামাতাকেও তিনি একটি করিয়া পোষ্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যে আসিবে সে ভরসা তাহার নাই।

ব্রজগোপালবাবু জিনিসপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়া পুনরায় গণিয়া গণিয়া দেখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লিষ্টে লিখিত একটি ছোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তখন চন্দ্রসুন্দরের নিকট গিয়া বলিলেন, "একটি পুঁটুলি ছাড়া আর সব জিনিস পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পুঁটুলিটা নেই? নরেশ তাহলে তুলে দিতে ভুলে গেছে। নরেশ ভোর বেলা রামপুরহাটে আমার জন্যে চা এনেছিল। পুঁটুলিতে নিমকি ছিল কিছু। পুঁটুলিটা নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং রুমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা করে' রেখেছিল সে। গায়ত্রীটা জপে' নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহয় পুঁটুলিটা তুলে দেয় নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"লি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে তো কাছেই।"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবায় উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্যার উদ্ভব হইল।

"কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

ডাক শুনিয়া চন্দ্রসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটা-সোটা ফরসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী উষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই।

উষা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারেন নি, আমি উষা"

চন্দ্রসুন্দর বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরে, সত্যিই আমি চিনতে পারিনি"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন খবর তো জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে—"

"ও—"

উষা ঘাড় ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই তিন সর' আয় ওখান থেকে। গাড়ির নীচে কি দেখছিস। ছোটদাদুকে প্রণাম কর এসে। দাদাদের ডেকে নিয়ে আয়"

উষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেজটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, দুই, তিন। তিনজনই হাফ্‌প্যাণ্ট হাফ্‌শার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিন-জনেরই চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রসুন্দর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি—"

"তা পারব। কিন্তু—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও"

চন্দ্রসুন্দর ইতস্তত করিতে লাগিলেন। নিজের ভাইঝিদের ষ্টেশনে রাখিয়া আরামে থাকিবার জন্য ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টিকটু—এই ধারণাটা তাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইটি আমার ছাত্র। তোরা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন—"

উষা বলিল, "আমরা এখানকার এস, ডি, ওর বাংলোয় যাব। রজনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রজনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একসঙ্গে বিলেতে ছিল—"

ব্রজগোপাল বলিল, "এস, ডি, ওর কার বাইরে এসেছে।—তিনিও এসেছেন—"

"রজনাথ কে—?"

"সন্ধ্যার স্বামী। তুমি সব ভুলে গেছ কাকাবাবু এই যে ওরা—"

স্লিপিং-স্যুট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, ইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, র কাপড় নাই। কালো হইলে কি হয়, অপূর্ব্ব ী। তাহার পায়ে স্যাণ্ডাল, হাতে লিটারারি ডাইজেষ্ট।

"—সন্ধ্যা, কাকাবাবুও যাচ্ছেন—"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

এস, ডি, ও সাহেব ভীড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্দ্দন লেন।

"জিনিসপত্র নেবে গেছে সব? তোমার সদানন্দদা থায়—"

"ওই যে—"

উষার স্বামী সদানন্দ ভীড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলিং য়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রোগা, লম্বা, ফরসা চেহারা। কর চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। বাঙালী চেহারা। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচানো শান্তিপুরী গলায় একটি পাকানো চাদর, পায়ে পেটেন্ট-লেদারের ও। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জল জল তেছে। তিনিও আসিয়া চন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। ন্দকে চন্দ্রসুন্দর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় পূর্ব্বে সম্প্রতি দুই একবার দেখা হইয়াছিল।

"এবার চলুন যাওয়া থাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি যাবে—"

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—। আমি তাহলে চলি—"

ব্রজগোপালের সহিত চন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। নের বাহিরেই দেখিলেন এস, ডি, ও সাহেবের প্রকাণ্ড র' টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস, ডি, ও, কি ? ব্রাহ্মণ? চেহারাটা তো ব্রাহ্মণের মতো—"

"উনি কিছুই নয়, মুসলমান—।"

"রাধামাধব, রাধামাধব—"

অকারণে চন্দ্রসুন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ লেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, ক মুসলমানের সহিত হৃদ্যতাও আছে, কিন্তু সামাজিক ত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, াদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন। চ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা অসঙ্কোচে গিয়া মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখা-পড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই দুটিও বিলাত-ফেরত। উহারা যে মুসমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল—ব্রজগোপাল যদিও চুপ করিয়া আছে কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চন্দ্রসুন্দরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলেমেয়েদের মনে ম্লেচ্ছ মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অনেক মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা শোনেন নাই। মেয়েদের বেথুনে লরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল—মুমূর্ষু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে? চুপ করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণ
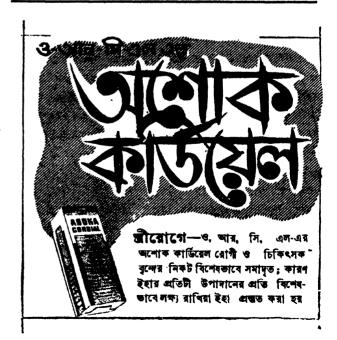
উপানন্দ

এলো অগ্রহায়ণ মাস। বৎসরের এই মাস অগ্র অর্থাৎ হেতু এই মাসের নাম অগ্রহায়ণ, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্ম বলিয়া মার্গশীর্ষ নামেও এই মাস অভিহিত হয়ে থাকে। শস্যের প্রাচুর্য্য হেতু ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। বনবীথিকায় শোনা যায় বিহঙ্গের আনন্দ কাকলী। এসেছে শীতের সঙ্কোচন। ঘরে ঘরে মেয়েরা বসিয়েছে ইতুর ঘট। মিত্রপূজাকেই গ্রাম্য ভাষায় ইতু পূজা বলে—মিত্র শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়—প্রতি রবিবারে চলেছে এই পূজা, এর ব্রত কথা শুনবার জন্যে মেয়েরা একত্র হয়ে বসেন। মটর শুঁটি, আলু, কপি প্রভৃতি সব্জীর ক্ষেত্রগুলি মনোরম হয়ে উঠেছে, সর্ষপ ও মাসকলাইয়ের ক্ষেত্রগুলিও অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করছে—ফসল তোলার সময় হয়ে আসছে। আজ আমাদের মন জেগে উঠেছে ফলে-ভেঙ্গে পড়া গাছের মতন পল্লীর প্রাকৃতিক শোভা দেখে। হিমেলী হাওয়া বইতে সুরু করেছে, এমনদিনে গায়ে হিম লাগানো অনুচিত। নদী আজ স্বচ্ছতোয়া, নেই তার উন্মাদিনীভাব—পাহাড়িয়া নদীগুলি ক্রমেই শীর্ণা হয়ে আসছে, আর বালুকস্কর তাদের বুকে বিস্তার লাভ করছে। উড়ে আসছে নানাদিক থেকে হংসবলাকা, উড়ে আসছে বক। দীঘিতে দীঘিতে ফুলে উঠছে কলমি-লতা। কে যেন গান গেয়ে চলেছে রামপ্রসাদী সুরে পল্লী প্রান্তর দিয়ে—ওই শোনো তার গান—

মনরে, কৃষি কাজ জান না।

এমন (মানব) জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥

দূরে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন দেউলের চূড়া, এই সব দেউলের বুকে ঘুমিয়ে রয়েছে কত শতাব্দীর ইতিহাস, তাকে জানে! পল্লীই দেশমাতৃকার প্রতিমূর্ত্তি, করুণাময়ী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা হয়ে দেশমাতা পল্লী প্রান্তরেই প্রবাহিত করেন স্তন্য পীযূষধারা,—কোলাহলমুখর নগরে নগরে আমাদের রূপশ্রী কেমন করে পাবে!

এই মাসটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব এই মাসেই ঘটেছে। বাবাজী মহাশয় ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়ে ছিলেন, কিন্তু কৈশোরে সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভগবানের জন্যে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়ে ছিলেন, আর ভগবানই তাঁকে কৃপা করে ছিলেন, ভগবানের অবতার-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন তাঁর ধ্যানের দেবতা ও নাম-বিগ্রহ।

এই মাসে সহিদ্ ক্ষুদিরামের জন্ম হয়। স্বাধীনতা যজ্ঞে কিশোর ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ঋষি অরবিন্দের তিরোধানও এই মাসে। তিনি ছিলেন এশিয়ার অন্যতম দিব্য পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ অসাধারণ রাজনৈতিক জীবন যাপন করে ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরীতে চলে আসেন, আর যোগ সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেন। একটি স্বপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ জগৎ, একটি নূতন স্বর্লোক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করাই তাঁর সুমহান সাধনার চিরকালের উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁর পূর্ণ যোগ, তাঁর অতিমানসস্তরের উপচেতনা বিশ্বের পরম বিস্ময়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবির্ভাব তিথি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। শতাধিক বছর আগে বিশ্বজননী মহাশক্তি দ্বিভুজা মানবীর রূপ ধারণ করে জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—'বাবা, এবার হেমন্ত শেষে তোর বাড়ী যাবো—' আজকের দিনে কলকাতা থেকে রেলপথে বিষ্ণুপুর হয়ে জয়রামবাটী যাবে যেতে প্রায় দেড়শো মাইল পথ। বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ছাব্বিশ মাইল। এখন যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু সে কালে জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সারদামণিকে পদব্রজে আসতে হোতো। পথের মাঝে জাহানা-বাদ অর্থাৎ আরামবাগের পথে তেলোভেলো আর কৈকালার বহুধা-বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরে নানারকম বীভৎস কাণ্ড ঘটতো—সেখানে ছিল

ডাকাতের আড্‌ডা। দিনের বেলাতেই এখানে মানুষ খুন হোতো। ডাকাতরা এখানে একটি কালী প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল, আর সেই কালীমূর্ত্তির সম্মুখে নর বলি দিত।

দিনের বেলায় দলবদ্ধ হয়ে এপথ দিয়ে না গেলে ডাকাতের হাতে জীবন বিপন্ন হোতো—সন্ধ্যার পর লোক চলাচল একেবারেই বন্ধ থাক্‌তো। একবার মাতাঠাকুরাণী দলের সঙ্গে সংযোগ রেখে কোন রকমে আরামবাগ পর্য্যন্ত এলেন। মা জোরে হাঁটতে পারতেন না। দলের সকলেই ঠিক করলে সন্ধ্যা হবার আগেই বিপৎ সঙ্কুল প্রান্তর পার হয়ে যাবে। মায়ের জন্যে কেউ অসুবিধা ভোগ করতে রাজি হোলোনা, পাছে দস্যুর কবলে পড়ে তারা জীবন হারায়। আসন্ন বিপদে মা অধীরা না হয়ে সঙ্গীদের সম্বন্ধে কোন আপত্তি করলেন না। সঙ্গীরা এত জোরে হেঁটে চল্‌তে লাগ্‌লো, যে মায়ের পক্ষে তাদের নাগাল ধরা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। মা পিছিয়ে পড়লেন—সঙ্গীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যা হোলো—সম্মুখে তেলো ভেলোর মাঠের দীর্ঘপথ। এই ভয়াবহ নির্জ্জন স্থান দিয়ে চলেছেন কুলবধূ একাকিনী। দূরে দক্ষিণেশ্বরে পতি সন্দর্শনের আশার ক্ষীণ আলোক, আর অদূরে ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনীর ভয়াবহ আবেষ্টনী। তিনি ভীতা হয়েও পথ চল্‌তে থাকেন—ভাবেন এই নির্জ্জন মাঠে যদি কোন বিপদ ঘটে?

হঠাৎ একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এসে বিরাট হুঙ্কারের সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—কে…রে? বিরাট হুঙ্কারে অসহায়া নারীর অন্তর কাঁপ্‌তে থাকে। সেই ব্যক্তি আরও কাছে' এসে দেখ্‌লো এক নারীমূর্ত্তি। বল্‌লে—'তুমি কে? এত রাত্তিরে একলা এখানে?'

ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে, তবু সাহসের সঙ্গে মধুর কণ্ঠে মা বল্‌লেন—বাবা, আমি সারদা, তোমার মেয়ে। সঙ্গীরা আমায় ফেলে এগিয়ে গেছে—

মায়ের কথা শুনে সেই বিরাট দৈত্যের মত মানুষটীর অন্তর বিগলিত হোলো। সেও মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌লো—'কোথায় যাবে মা, তুমি?'

'—তারকেশ্বরে যাবো, বাবা! আমার সঙ্গীরা সেখানে অপেক্ষা কর্‌বে—'এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। মা তার হাতখানি ধরে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বল্‌লেন—'ভাগ্যিস্ মা তোমরা এসেছ, কি যে ভয় কর্‌ছিল আমার—'

সেই স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যেন এই যাদুমন্ত্রে রূপায়িত হোলো। মাতৃস্নেহে কন্যা সারদাকে সে আশ্বস্ত কর্‌লো। এবার মার মনে সাহস হোলো। বল্‌লেন—'তোমাদের মেয়েকে যদি তারকেশ্বরে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও—তোমাদের জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী-রাসমণির কালীমন্দিরে থাকেন আমাকে সেখানে যেতে হবে। যদি তারকেশ্বরে সঙ্গীদের সঙ্গে না দেখা হয়, তা হোলে কিন্তু মেয়েকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিলে তোমাদের জামাই খুসী হবে—" সে রাত্রে তারকেশ্বরে যাওয়া খুব কষ্টকর হবে এই বিবেচনা করে ডাকাতদম্পতী জলযোগ করিয়ে শয়নের ব্যবস্থা কর্‌লো। ডাকাত বল্‌লে—'ঘুমোও মা, কোন ভয় নেই, আমি দরজার কাছে রইলাম।' পরদিন সকালে দস্যুসর্দ্দার ও তার স্ত্রী মাকে তারকেশ্বরে নিয়ে এলো। সঙ্গীদের সঙ্গে মায়ের দেখা হোলো এক পরিচিত দোকানে। মা ডাকাত-দম্পতির কাছ থেকে যখন বিদায় নেবার উদ্যোগ করলেন তখন তাঁর ডাকাতবাবা, তার স্ত্রী আর তাঁর চোখে জল এলো। ডাকাতের স্ত্রী ক্ষেত থেকে কিছু মটরশুঁটি সংগ্রহ করে কন্যা সারদার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বল্‌লে—'মাগো ক্ষিদে পাবে যখন রাত্তিরে, মুড়ির সঙ্গে এগুলো খেও—'

এইভাবে তেলোভোলার মাঠের দস্যুসর্দ্দার ও তার পরিবারবর্গ মায়ের পরমাত্মীয় হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে দস্যুদম্পতী কন্যা ও জামাতার আকর্ষণে বহুবার এসেছে ফল মিষ্টান্ন নিয়ে, আর এনেছে তাদের অন্তরের স্নেহ ও ভক্তি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগৎজননী বলেই জান্‌তেন, তাই তিনি এক সময়ে অমাবস্যা তিথিতে সর্ব্বকর্ম্মফল-বিনাশিনী শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শীরূপে অর্চ্চনা করে সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে সমর্পণ করেছিলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখে শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে পরমহংসদেব অঞ্জলি দিলেন,—পরমহংসপত্নী জগজ্জননীরূপে পতির সেই পূজা গ্রহণ করলেন। উভয়ে সমাধিতে মগ্ন হোলেন।

শ্রীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে দেশে দেশে তাঁর অগণিত সন্তান হবে, আর দূর দূরান্তর থেকে শ্বেতাঙ্গ সন্তানরাও পরবর্ত্তীকালে তাঁর কাছে আসবে। ঠাকুরের দুটি কথাই সত্যে পরিণত হয়েছে। মা যাবার সময়ে বলে গেছেন—'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্ব্বাদ, সকলের ওপর আছে।"

১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রীমা নিত্যধামে মহাপ্রস্থান করেছেন। তিনি ছিলেন শৈশব হোতেই মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি, পবিত্রতার মূর্ত্তবিগ্রহ ও বিবাহিতা হয়েও কৌমারীশক্তির জীবন্ত প্রতিমা। আজ এস আমরা তাঁর জন্মতিথি দিনে তাঁকে অর্চ্চনা করি আর প্রণাম করে বলি—

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ"

দ্বিজেন্দ্র স্মরণে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের পাতে স্বর্ণ-আখরে লিখিয়া নিজের নাম
মরিয়া যাহারা অমর হইয়া আছে,
তাহাদের প্রতি জানাই দীনের দীনতম এ প্রণাম

হে দ্বিজেন্দ্র! তাদের দলে যে তুমি
স্বদেশ তোমার জীবন-জননী সাধনা জন্মভূমি।

জানিনা কোথায় কোন সে সুদূর লোকে
হাতছানি দিয়ে ডাকছ মোদের কাছে
কাঁদতে যে তুমি বলছ ভায়ের শোকে
পরের নিগড় ভাঙতে বীরের সাজে।
চিন্তার সেই বিস্ময় অনুরাগে
কল্পনা যেন বার বার মোরে ডাকে।

আকাশের কোণে তারাদল ওঠে ফুটি
ধানের ক্ষেতে বাতাস দেয় যে দোলা।
মেলিয়া তোমার ব্যথাভরা আঁখি দুটি
চেয়ে থাকো তুমি ভাবেতে আপন ভোলা।
তোমার মতন নিজেরে আকুল ক'রে
কাঁদেনিকো কেউ দেশের চরণ ধরে।

তাই মনে হয় মরেও তুমি তো মরনি
হৃদয়ে আমার তোমারে দেখিতে পাই।
তোমার গানেতে ভরিয়া গিয়াছে ধরণী
আজ শুধু আমি তোমার সে গান গাই।
নয়নে ভাসিছে তোমার করুণ ছবি
চরণে প্রণাম লয়ে যাও মহাকবি।

সাবিত্রী পাহাড়ে

শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রে রাজস্থানের বালু মাটি তেতে হলুদ হয়ে উঠেছে। আজমীরের পীচ ঢালা রাজপথে হু হু করে বইছে ধুলো-ভরা গরম আভাস। ষ্টেশনের প্রকাণ্ড ঘড়িটার কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে মন দুলে চলেছে—অতীতের স্মৃতি-সরণীতে।—আমরা চলেছি আনাসাগর লেক দেখতে। আনাসাগর হ্রদ আজমীরের একটা প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য ও আরাম নিকেতন। এর উত্তর দিকে আছে জাহাঙ্গীর নির্মিত দৌলতবাগ। তারপর সাজাহান তার তটে তৈরী করেন মনোরম শ্বেত পাথরের উত্থান বাটিকা। নানা কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচটী মর্মর অলিন্দ পথ এই হ্রদকে দিয়েছে সাম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্য। হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলে থর থর করে কাঁপে তীরের মর্মর ঐশ্বর্য। রাজস্থানের মাটিতে মোগল কীর্তি, মনকে কেমন যেন বিমনা করে দেয়।

এখানে একটি দরগায় সাধু খাজা মইনুদ্দীনের চিস্তির সমাধি আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দরগা নির্মাণ করেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন। অতঃপর সম্রাট আকবর এখানে নির্মাণ করেন একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা-সমন্বিত সুন্দর মসজিদ। আরও পরে তাঁর পৌত্র সাজাহান এখানে তৈরী করেন শ্বেত মর্মরের অনবদ্য সৃষ্টি—আজকের জামি মসজিদ্। এর বিরাট তোরণদ্বার তৈরী করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর। সাধুর সমাধিক্ষেত্রের জন্য সমস্ত মুসলিম সমাজের কাছে আজমীর মক্কা মদিনার মত একটি পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে আছে।

এখানে তারাগড় দুর্গে ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল অধ্যায় বিধৃত

তীর্থগুরু পুষ্কর

ফটো: মধুচ্ছন্দা ভাদুড়ী

রয়েছে—৮ শত ফুট উচ্চ পার্বত্য টিলার উপর। ১১৫১ খৃষ্টাব্দে চৌহান বংশের রাজা বিশাল দেব, বিদ্যা এবং জ্ঞান মন্দির রূপে নির্মাণ করেন তারাগড়ের প্রাসাদ প্রাকার। তারপর ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আফগানরা ভারত আক্রমণে এসে তারাগড় দুর্গ ধ্বংস করে। কালান্তরে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে মসজিদ। আজও সেই মসজিদ বহু মানুষের উপাসনার মধ্য দিয়ে স্মরণ করে তার অতীত ঐতিহ্যকে।

আজমীর একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। তার একদিকে মানুষের অধ্যাত্মবাদের মোক্ষদ্বার খুলে রেখেছে—পুষ্করতীর্থ, অপর দিকে তার আগের ষ্টেশন রম্যভূমি মাদার মানব সেবা কল্যাণের জন্য উদার হস্ত প্রসারিত করে রেখেছে আমেরিকান মিশনারী প্রতিষ্ঠিত টি, বি, স্যানেটেরিয়াম। এখানে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে উন্নত ধরণের চিকিৎসাদি হয়ে থাকে।

আজমীর থেকে পুষ্কর হ্রদ প্রায় সাত মাইল পথ। সবশেষের যাত্রী-বোঝাই বাসখানিতে টিকেট কেটে আমরা উঠে বসলুম। বসা নয় তো একটু পা রাখার জায়গার জন্য রাজস্থানী মানুষদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ।

ক্রমশঃ সহর ছাড়িয়ে বাস চলেছে অসমতল পার্বত্য পথ দিয়ে। বৃক্ষলতাহীন ধু ধু বালুর রাজ্য শেষ হয়ে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল চতুর্দিকে সবুজের তরঙ্গায়িত সুষমা। ছোট ছোট পাহাড়গুলি শ্যামল বনরাজিতে আচ্ছাদিত —মখমলের মত মনোরম মনে হয়। তারই অঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে আমাদের বাস ক্রমশঃ উপরে উঠছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশের মানুষ আমরা। একটু সবুজ দেখলে শ্রমশ্রান্ত দেহমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এক সময় ধীরে ধীরে সেই শৈলধনবনতল পথের ধার থেকে দূরে সরে গেল। বাস নামতে লাগল সমতল ভূমিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা স্পর্শ করলুম পুষ্করতীর্থের বালুময় মৃত্তিকা।

আজমীর ষ্টেশন থেকে একটা বৃদ্ধ পাণ্ডা ভাদুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। পুষ্করে তিনিই হলেন আমাদের কাণ্ডারী। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলোয় পুষ্কর হ্রদের নীল জল ছল ছল করছে, যেন বাসন্তী আকাশে জোয়ার ঝলমলানি! দেখে মন ভরে উঠল আনন্দে—হ্রদের ধারে একটি ধর্মশালায় আমরা বেশ ভালো ঘর পেলুম। একটা ছেলে এসে আমাদের ঘর পরিষ্কার করে জল তুলে দিয়ে গেল। সূর্যাস্ত হচ্ছে—রাজপুতানার
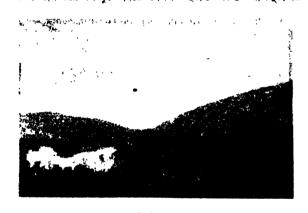
সাবিত্রী পাহাড়

আকাশে। হ্রদের জলে তার অনবদ্য প্রতিভাস।—নানা রংএর—মনোময় সমাবেশ। জানালার ধারে আমাদের কে যেন বসিয়ে রেখেছিল ভাবাবিষ্ট করে। ছন্দা পাপড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হ্রদের ধারে গিয়ে পুষ্করের বিখ্যাত কুমীরদের দেখার জন্য। কাজেই ঘরে তালা দিয়ে আমরা নেমে এলুম ঘাটে।

বৈকুণ্ঠনাথ মহাদেব সাবিত্রী ও ব্রহ্মা, এই চার মন্দির ও প্রকাণ্ড এই হ্রদ নিয়েই পুষ্কর হয়েছে পরম তীর্থক্ষেত্র। তীর্থ ছাড়া পুষ্করের আর অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানকার বেশীর ভাগ মানুষই পাণ্ডা পুজারী আর ধর্মশালার সরকার।

পথ ঘাটগুলি যেমন অতি পুরাতন, সেই রকম এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার গতিও মন্থর ও বৈচিত্র্যহীন।

সন্ধ্যার পর পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে আমরা প্রথমে এলুম বৈকুণ্ঠজীর মন্দিরে। তখন লক্ষ্মীনারায়ণের স্বর্ণ বিগ্রহ রথে স্থাপন করে বহির্জনে হচ্ছিল সান্ধ্য আরতি। ধূপ ধুনার ধোঁয়ায়, পুষ্প চন্দনের সুগন্ধে মানুষের প্রাণের প্রার্থনায় মন্দির প্রাঙ্গণ প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। মন্দির অভ্যন্তরে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ভাস্কর্যে খোদিত আছে। তাছাড়া মর্মর প্রাচীর গাত্রে নানা বর্ণানুরঞ্জনে সুচিত্রিত আছে। বেদ, উপনিষদ ও গীতার মূল্যবান শ্লোকগুলি মর্মর ফলকে উদ্ধৃত করা আছে। স্থাপত্য শিল্পে ও ঐশ্বর্যে পুষ্করের বৈকুণ্ঠজীর মন্দির অনেকটা দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মত।

এই মন্দির নির্মাণ করেন কোলকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের মাঙ্গীরাম তাঙ্গুর। মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করে আমরা প্রাঙ্গণে এসেছি, সেখানে সিঁড়িতে একজন গুণবতী সালঙ্করা মহিলা বসেছিলেন। পাণ্ডাজী বললেন, "ইনি মাঙ্গীরামের পুত্রবধূ।" বৈকুণ্ঠজীর মন্দির থেকে আমরা গেলাম পাতালেশ্বর শিব মন্দিরে। রাত্রির অন্ধকার তখন আকাশ ও মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। শিবমন্দির মাটীর থেকে অনেক নীচে। টর্চের সামান্য আলোয় আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছি।

মহাদেব এখানে মাটী থেকে আপনি উদ্ভূত হয়েছেন। গর্ভ গৃহের দ্বারে প্রকাণ্ড পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট আছে। নিস্তব্ধ পাতাল মন্দিরের প্রদীপের স্তিমিত আলোকে কোন্ অনাদি যুগের অলিখিত ইতিহাস যেন প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। এবারে আমরা চলেছি ব্রহ্মার মন্দিরে। পুষ্কর ছাড়া ভারতের আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দির নেই। মধ্যপ্রদেশের সারগুজা জেলার চিরিমিরি নামক স্থানে একদা সুদূর অতীতে ব্রহ্মার মন্দির ছিল। কিন্তু কালের প্রলেপে এখন তা চিহ্নহীন।

মাটী থেকে প্রায় তিনতলা সমান সোজা খাড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা এসে দাঁড়ালুম দর দালানে। সুদৃশ্য রৌপ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তার পাশে গায়ত্রী দেবী। রত্নখচিত অক্ষিযুগলে যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে। ব্রহ্মার বিগ্রহ মূর্তি এই প্রথম দেখলুম। ভারী ভালো লাগল। অঙ্গনের পুষ্পবৃক্ষের নীচে একটী বেদীতে এসে আমরা বসলুম। মন্দিরে মন্দিরে আরতি ও ভোগরাগের বাজনা বাজছে। হ্রদের জলও পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাত্রির পুষ্করকে মনে হচ্ছে যেন এ আমাদের পরিচিত পৃথিবী নয়। এখানে অন্য কিছু আছে।

বৃদ্ধ পাণ্ডার তরুণ ভাইপো কবরলাল, ভাদুড়ীর কাছে বসে বসে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলছে। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ভক্ত সন্ন্যাসীরা বসে শুয়ে বিশ্রাম করেছেন। অদূরে শিবালয়ের দ্বারের সমুখের বেলগাছ থেকে ভেসে আসছে মৃদু সুমিষ্ট সুগন্ধ। আকাশ থেকে নেমে আসছে গভীর প্রসুপ্তি। ব্রহ্মলোকের ও পাতা গাঢ় হয়ে উঠছে। গর্ভগৃহের পানে চেয়ে দেখলুম সিংহাসনে বসে রয়েছেন ব্রহ্মা, তাঁর পাশে গায়ত্রী দেবী। এ যেন বিগ্রহ নয়, জীবন্ত প্রাণময়। বৃক্ষ পত্রের মৃদু মর্মরের মধ্যে দিয়ে আমি স্পষ্ট অনুভব করলুম এই স্থানে তাঁদের অলক্ষ্য অবস্থিতি।

পুষ্কর হ্রদের চতুর্দিকে ৫২টী বেশ মনোরম ঘাট-নির্মাণ করে দিয়েছেন রাজস্থান ও অন্যান্য জায়গার রাজা মহারাজারা। তার মধ্যে ব্রহ্মঘাট, ও গৌঘাট দুটোই সর্বাধিক বৃহৎ। এখানে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে

গুরুগোবিন্দ সিংহ গ্রন্থ সাহেব আবৃত্তি করেছিলেন। গান্ধীজীর চিতাভস্ম এখানে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা ও ৪০০ মন্দির আছে।

পুষ্কর নামের অর্থ সম্বন্ধে প্রবাদ শোনা যায়, সত্যযুগে ব্রহ্মা একদা স্থির করলেন যজ্ঞ করবেন। কিন্তু কোথায় করবেন সেই হোল মহা সমস্যা। তখন "মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক," এই বলে তাঁর করধৃত একটী পদ্মপুষ্প পৃথিবীতে ফেলে দিলেন। সে পুষ্প যেখানে পতিত হোল সেখানকার মাটী থেকে কিন্তু ধারার মত নির্গত হোতে লাগল নির্মল নীল জলরাশি। সেই অমৃতধারা থেকেই সৃষ্টি হোল এই পুষ্কর হ্রদ। ব্রহ্মা করদ্বারা পুষ্প নিক্ষেপ করেছিলেন, পুষ্পাকর ; তাই এই স্থানের নাম হোল পুষ্কর।

অতঃপর সেই হ্রদের তীরে যজ্ঞের আয়োজন করলেন ব্রহ্মা। সব প্রস্তুত, লগ্ন উপস্থিত, কিন্তু সাবিত্রী দেবী আর আসেননা। অধীর হয়ে ব্রহ্মা যজ্ঞভূমির বাহিরে আসতেই দেখলেন সেখান দিয়ে একটী পরম সুলক্ষণা গোপ-বালিকা মাথায় দুধের কলস নিয়ে যাচ্ছে। আর কালবিলম্ব না করে তিনি সেই কন্যাকে একটি গাভীর মুখ বিবরে প্রবেশ করিয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে তার নামকরণ করলেন গায়ত্রী। এবং গায়ত্রীকে পাশে নিয়ে যজ্ঞাসনে বসলেন। ইতিমধ্যে সাবিত্রী প্রস্তুত হয়ে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার পাশে গায়ত্রীকে দেখে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে স্বামীকে অভিশাপ দিলেন। "একমাত্র পুষ্কর ক্ষেত্র ব্যতীত আর কোথাও কেহ কোনওদিন আপনার পূজার্চনা করবেনা।" অতঃপর সাবিত্রী চলে গেলেন দুর্গম পর্বত শিখরে তপস্যা করবার জন্য। সেই থেকে ব্রহ্মার পাশে সাবিত্রীর স্থান অধিকার করলেন গায়ত্রী।

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে পুষ্কর হ্রদে কুমীর আর কচ্ছপরা করে আসছে অখণ্ড রাজত্ব। জলের কুমীরও ডাঙ্গার মানুষের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে কুমীররা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠায় অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে জলে নামলেই।

এইজন্য ভারত সরকার ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হ্রদে জাল ফেলে সমস্ত কুমীরও কচ্ছপদের তীরে তুলে চম্বল নদীতে বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুষ্কর তীর্থের কুমীর বলে তাদের হত্যা করতে দেশবাসীরা ভয় পায়। তাই জীবন্তই তাদের নির্বাসিত করা হয়। এই দৈববিপত্তির ভয়ে হ্রদ শূন্য না করে দুটী কুমীরকে এখনও অবশিষ্ট রাখা হয়েছে জলে। হ্রদের একটী প্রকাণ্ড কুমীর নৃশংসভাবে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে তাই শুধু তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। তার মৃতদেহটী ঘাটের ধারে একটী লোহার শিকযুক্ত ঘরে সুরক্ষিত আছে। সত্যি কুমীরটী প্রকাণ্ড ; ঘর জুড়ে রয়েছে। দেখলে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটি চোখ তার গুলীতে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে কুটীল হয়ে রয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা ; আমরা শুনেছিলুম মথুরা বৃন্দাবনের মত পুষ্করের জলেও কিলবিল করে অসংখ্য কচ্ছপ। তাদের জন্য জলে নামা যায়না। কিন্তু আমরা একটি কচ্ছপও দেখতে পেলুমনা। কবরলাল বললে—"এ অথৈ জলে নীচে আরও কতকি যে আছে তা কেউ জানেনা।

দিবা ও রাত্রির মধুর সন্ধিক্ষণে আমরা এসে দাঁড়ালুম পুষ্কর হ্রদে তীরে। নীল নিতস্ত জল ছলছল গানে বয়ে চলেছে। কানপেতে শুনছি তার গভীর মর্মবাণী। তার ভাষা বুঝতে পারছিনা। শুধু মনে হয় মনের অতলে কে যেন আমায় ডাকে, "এস, এস, চলে, এস,"—

আকাশের অপস্রয়মান নক্ষত্র মণ্ডলীর স্তিমিত আলো কাঁপছে আবছা অন্ধকারে। সামনের ঘাটে বসে কোনও সাধু করছেন বেদ মন্ত্র পাঠ। আকাশ মাটী মানুষ ও জলের একাত্মতায় সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত হয়ে উঠেছে শাশ্বত প্রাণময়। আমার মনে হোল—সান্তের সঙ্গে অনন্তের এই লীলা মাধুরী প্রত্যহ কি সংঘটিত হয় এই ব্রহ্মতীর্থে? হ্রদের জল ছলছল করে বললে, "হাঁ প্রত্যহ"—

ভোর থাকতে যাত্রা না করলে রৌদ্র উঠে পাহাড় তেতে গেলে সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠা বড় কষ্টকর হয়। তাই আমরা ভোর থাকতে

সাবিত্রী দেবীর মন্দির

উঠে তৈরী হয়ে সাবিত্রী মন্দিরের পথে চলেছি। সহর ছাড়িয়ে ব্রহ্মা মন্দিরের পাশ দিয়ে সুরু হোল পাহাড়ে ওঠার পথ। এ এক বিচিত্র পথ। শুধু বালুর পাহাড়।—চতুর্দিকে ধুধু করছে ধূর মরুভূমি ক্রমশঃ ঢেউ খেলিয়ে উপরে উঠে গেছে। কোথাও একটী বৃক্ষ বা ঘাসের সবুজ চিহ্নমাত্র নেই। কখনও দেখা যায় কণ্টকপূর্ণ একজাতীয় আগাছার ঝোপ, যা সেই বালুর মধ্যে শাড়ী আটকে ধরে পথে বিভ্রান্তিই ঘটায়।

প্রায় মাইল খানেক এই মরুপথ অতিক্রম করার পর সুরু হোল আসল পাহাড়, যার পাথরে পাথরে অটল হয়ে রয়েছে অনাদি কালের সুপ্তি। এ ছায়াশীতল বৃক্ষরাজি মাঝে মাঝে থাকলেও খাড়া পাহাড় বলে উপরে উঠা বড় কষ্টকর। পথে সংগৃহীত বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে আমরা একটু বিশ্রাম করে আবার হেঁটে কোনও রকমে উপরে উঠছি লক্ষ্য আমাদের পর্বত শীর্ষে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। এমন সময় আমাদের গাইড ছেলেটা হঠাৎ পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যে ছিটকে পড়ে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। পাথরের আঘাতে তার হাঁটু থেকে

রতে লাগল অজস্র ধারায় রক্ত। সে এক বিষম অবস্থা। আমরা বলুম বোধ হয় সাপ কামড়েছে। কোথাও একটু জল বা জনমানবের ই মাত্র নেই। ভাদুড়ী বললেন—"ওকে জঙ্গল থেকে তুলে আনতে ব"—কিন্তু ওই পাহাড়ী কাঁটাবনের মধ্যে থেকে ওই জোয়ান মানুষটাকে নে বয়ে আনা কি সোজা কথা? ঠিক সেই সময় ভগবানের আশীর্বাদের ১ দূর পাহাড়ে দেখা গেল দুটী ছোট্ট ছেলে মেয়ে একপাল ছাগল নিয়ে াতে যাচ্ছে।—ভাদুড়ী তাদের উচ্চকণ্ঠে ডাকতে তারা ছুটে নীচে মে এসে মৃতপ্রায় গাইডকে ভীষণ ভাবে ধাক্কা দিতে লাগল, "খলিফা, খলিফা বলে"—খলিফার ছটফটানি তখন থেমে গেছে। সে মৃতের ১ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। ভাদুড়ী ছেলেমেয়েদুটীকে বললেন, াছে কোথায় কি জল পাওয়া যায়না"? রাজপুত ছেলেমেয়ে দুটি ত নেড়ে বললে—বাবুজী ডরো মৎ, খলিফা ভীষণ মাতাল। ভাং য়ে এরকমকরছে, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি আশ্চর্যের কথা। ় সেই সময়ে খলিফা—এক লাফে ভূমিশয্যা ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে ড়য়ে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নীচে নামতে সুরু করল। কোনও দিকে না কিয়ে টলতে টলতে এলোমেলো ভাবে সে পাহাড় টপকে টপকে যছে। দৃশ্য দেখে আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। যদি ফসকে পড়ে যায়! পাহাড় ছাড়িয়ে সে বালুর মধ্যে ছুটতে লাগল। চিত্র পথে বেরোলে কত বৈচিত্র্যের সঙ্গে না পরিচয় ঘটে। ছেলেমেয়ে কখন চলে গেছে আমরা দেখতে পাইনি। খলিফার পরিত্যক্ত ঠটা ও আমাদের জিনিষ গুলি তুলে নিয়ে আমরা আবার উপরে ত সুরু করলুম।

এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে উঠে, পূর্বাশায় র সূর্যোদয় দেখতে দেখতে, আমরা একসময়ে এসে উপস্থিত হলুম বিত্রী দেবীর মন্দিরের পদপ্রান্তে। ঘন বনরাজিপরিবেষ্টিত আড়ম্বর- া মন্দির। যেন একটি আশ্রম। এই মরুভূমির দেশে গগনচুম্বী এই পর্বতশিখরে এত শ্যামলতা বৃক্ষলতায় মৃত্তিকার এই প্রাণপ্রাচুর্য এল থা থেকে? একি তবে সাবিত্রী দেবীর তপস্যার সিদ্ধরূপ? মন্দিরে ন নবরাত্রির পূজা সুরু হয়েছে। অঙ্গনে সামিয়ানা খাটিয়ে বেদী নির্মাণ র পূজারী নব রাত্রির দুর্গা পূজা করছেন।—মন্দিরে সাবিত্রী দেবীর র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তার পাশে কুমারী সরস্বতীর সর্বশুক্লা মূর্তি ষ্ঠিত। গায়ত্রী ব্রহ্মা লক্ষ্মী সাবিত্রী ও সরস্বতী। তাই সাবিত্রীর বাম বেদ বিধৃত, ও তাঁর মন্দিরে সরস্বতী পদ্মসমাসীনা। আর ব্রহ্মার শ গায়ত্রীর দক্ষিণ হাতে রয়েছে লক্ষ্মীর মঙ্গল কড়ির ঝাঁপি। সাবিত্রী সরস্বতীর পূজা করে মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ উপবেশন করে দ্বার প্রান্তে টি আমলকী গাছের ছায়ায় এসে আমরা বসলুম। একজন সাধু মাদের দিলেন পূজার নির্মাল্য, কিছু মিছরি প্রসাদ ও অতি সুমিষ্ট ল জল। মনে হোল যেন মহামৃত। এই পর্বত শিখরে এমন মিষ্ট র কূপ রয়েছে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

মন্দিরের চতুষ্পার্শে সবুজ নিবিড় বন। তার কোলে অসংখ্য টার জঙ্গল। বালির চিহ্ন কোথাও নেই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমাট বাঁধা কালো মাটি। তাইতে ঘাস ও লতার বুকে ফুটে রয়েছে হলুদ সাদা লাল ও বেগুনী ছোট্ট ছোট্ট ফুল।—পাখীর চিহ্ন নেই, কিন্তু সাদা ও নীল প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে—ঘাসের ফুলে ফুলে। একদা কোন্ অতীতে এইখানেই তপস্যা করেছিলেন সরস্বতীরূপা সাবিত্রী। ভারী ভালো লাগল। সেখানকার মাটি স্পর্শ করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। এবার ফেরার পালা। ছন্দা পাপড়ীর পাথর সংগ্রহ শেষ হয়েছে। এমন সময় লাফাতে লাফাতে নীচ থেকে উঠে এল, আমাদের পথপ্রদর্শক সেই খলিফা। চোখ দুটি তখনও লাল থাকলেও মুখে ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। ভাদুড়ী বলিলেন—"তুমি আবার কেন এতদূর এলে? আমরা নিজেরাই ত চলে যাচ্ছি"—আমাদের সকলের হাত থেকে খাবারের কোটো জলের ফ্লাস্ক ব্যাগ ইত্যাদি গুলি নিয়ে লাঠির সঙ্গে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে সে হাসতে হাসতে বললে "তোমাদের ফিরিয়ে নিতে যেতে এলুম"—

বদ্যিবুড়োর দাবাই

শ্রীঅসিত মৈত্র

সত্যি কথা বলছি শোন ধাপ্পাবাজীর গল্প না,
ভাববে না কেউ কবি মনের নিছক বাজে কল্পনা।
সেদিন রাতে স্বপ্নে দেখি ভীষণ সেকি কাণ্ড ভাই,
পদি পিসির খিল লেগেছে লম্বা করে তুলতে হাই।
হাঁ-করা মুখ আর বোজেনা বকবকানি বন্ধ সব;
পাড়ার যত বৃদ্ধ-কচি তারেই ঘিরে করছে রব।
কেউ বলেবা—"ঠিক হয়েছে"—কেউবা কষে ভেঙায় মুখ
এবার বোঝ সবার সাথে ঝগড়া করার কেমন সুখ।
পিসির কথা বলবো কি আর—চাচ্ছে আগুন চক্ষু মেলে
ভাব যেন তার জ্যান্ত সবায় ফেলবে গিলে সামনে পেলে।
হেনকালে বদ্যি এলো বার করে এক লম্বা ছুঁচ
বল্লে হেসে—"এ কিছু নয় মাথার মাঝে জমছে পুঁজ,
পুড়িয়ে নিয়ে ছুঁচটারে তাই পুঁজটা টেনে ক'রবো বার,
ভয় পেয়োনা,—ঘাবড়োনাকো, নড়বেনাকো ঘণ্টা চার।"
যেমনি শোনা অমনি পিসি পাঙাশ মুখে আঁৎকে ওঠে
পেটের পিলে ফাট-ফাট খিল ছাড়ে তার ভয়ের চোটে।
ডুকরে বলে—"রক্ষা কর কান মুলছি সাতাশ বার
কখনো ভাই কারুর সাথে করবোনাকো ঝগড়া আর।"
বদ্যি-বুড়ো মুচকি হাসে—ঠিক পড়েছে এর দাবাই
সবাই বলে বিজ্ঞে বটে, সাবাস দাদা সাবাস ভাই।

নহুষের শাপমুক্তি

বেদব্যাস

পাণ্ডবদের বনবাসের একাদশবর্ষে তাঁহারা যমুনানদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী বিশাখযূপবনে বাস করিতেন। হিমালয় পর্বতের অন্তর্বর্তী এই বিশাখযূপবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই রমণীয় ছিল। পাণ্ডবেরা এই বনের পশু-পক্ষী প্রভৃতি মৃগয়া করিয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

একদিন ভীমসেন মৃগয়ায় বাহির হইয়া মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বধ করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মহাবীর ভীম অজগরের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিলেন না। অজগর ভীমকে জড়াইয়া ক্রমশঃই কঠিন-ভাবে আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে ভীম ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অজগরকে বলিলেন, আমি মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির আমার অগ্রজ। আমি হস্তীর সমান বল রাখি। মহা মহা বীরগণ এবং রাক্ষস-দিগকেও আমি বাহুবলে জয় করিয়াছি। কিন্তু আজ আমি সামান্য অজগরের কবল হইতেও নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। তুমি নিশ্চয়ই সাধারণ অজগর সর্প নহ। তুমি কে এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাকে এই ভাবে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছ? তখন অজগর বলিল,—আমি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ নহুষ, অগস্ত্যের শাপে সর্প হইয়া এই বনে বাস করিতেছি। তোমাকে দুই দণ্ড আমি ধরিয়া রাখিব এবং এই দুই দণ্ড তোমার সহিত কথা বলিব। যদি দুই দণ্ড পরেও আমি শাপমুক্ত না হই, তবে তোমাকে ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি করিব। এখন তুমি বল, ব্রাহ্মণ কে?

অজগরের প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীমের সংজ্ঞা লোপ হইল। কাজেই তিনি আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অজগর ও তাহার কথানুযায়ী ভীমকে বেষ্টন করিয়া দুই দণ্ড অতীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে ভীমের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্তই চিন্তাকুল হইলেন—এবং ভীমের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিবার পরই যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে এক বিরাট অজগর সর্প সংজ্ঞাহীন ভীমের দেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই সেই মহাসর্প বলিল, যদি তুমি আমার উপর অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হও, তবে এখনি এই ভীমকে বধ করিয়া তোমাকেও বধ করিব। আর যদি তুমি দুই দণ্ড আমার সান্নিধ্যে থাকিয়া আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে দুইদণ্ড পরে বিবেচনা করিয়া দেখিব—ভীমকে মুক্তি দেওয়া চলে কি না। যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। তখন অজগর প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিল—ব্রাহ্মণ কে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহার আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। অজগর বলিল—মহারাজ, যে সমস্ত গুণের কথা বলিলেন, সেই সমস্ত গুণ ব্রাহ্মণবংশে জাত অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না, আবার এমন শূদ্র ও আছেন, যাঁহার মধ্যে এই সমস্ত গুণ দেখা যায়। যদি গুণানুসারেই ব্রাহ্মণত্ব স্থির করিতে হয়,—তবে গুণহীন ব্রাহ্মণরা এবং গুণবান শূদ্রেরা তোমার মতে কি?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সন্তানে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নাই, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া শূদ্র বলাই উচিত এবং ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য নয়। আর ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণের লোকদের মধ্যে যাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী আছে, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি যে সকল বর্ণের লোকের মধ্যেই গুণগত সঙ্করত্ব আছে—এবং তজ্জন্য মানুষের জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য।

অজগর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, জ্ঞাতব্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, সর্ব্বসুখদুঃখের অতীত যে পরমব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞাতব্য। মহাসর্প বলিল, ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যেও এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি সুখদুঃখের অতীত।

দুঃখের অতীত যে কেহ আছেন, এমন মনে করিবার ান ও কারণ দেখি না। সুখদুঃখের অতীত ব্রহ্ম আছেন, ার কি কোনও প্রমাণ আছে ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ব্রহ্মকে প্রমাণ করা যায় না, তিনি ল প্রমাণের বাহিরে। ব্রহ্ম ধারণার ও অতীত। কিন্তু আমি মনে করি যে ব্রহ্ম আছেন—এবং তিনিই ন। অজগর বলিল—কিরূপে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ রা যায় ? যুধিষ্ঠির বলিলেন—ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী র্জন করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে অনুশীলন করাই ব্রহ্মকে জানিবার া।

মহাসর্প প্রীত হইয়া তখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিভিন্ন রমের দার্শনিক আলোচনা করিতে লাগিল। এই ভাবে ই দণ্ড সময় পার হইয়া গেল। দুই দণ্ড পার হওয়ার ঙ্গে সঙ্গেই অজগরের দেহ এক দিব্য পুরুষে রূপান্তরিত ইল। ভীম ও বন্ধনমুক্ত হইয়া সংজ্ঞালাভ করিল। ধিষ্ঠির আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—আপনি কোন বেতা, কেন এই সর্পরূপে এই বনে বাস করিতেছিলেন ? খন সেই দিব্য পুরুষ বলিলেন—আমি দেবতা নহি, ামি তোমাদেরই বংশের একজন পূর্বপুরুষ, মহারাজা হুষ। পুণ্যবলে আমার স্বর্গ লাভ হইয়াছিল—এবং টনাচক্রে স্বর্গে আমার ইন্দ্রত্ব লাভও হইয়াছিল। ক্ষমতার দম্ভে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায় আমি মহর্ষিগণকে আমার শিবিকা-বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। একদিন আমি উত্তেজিত অবস্থায় দম্ভসম্ভূত অজ্ঞানতার বশে শিবিকাবহনে নিযুক্ত মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তক আমার পদদ্বারা স্পর্শ করি। তখন মহর্ষি অগস্ত্য এবং অন্যান্য ঋষিরা আমাকে শাপ দেন। সেই শাপের ফলেই আমি এই ভাবে সর্পরূপে বিচরণ করিতাম। মহর্ষি অগস্ত্যকে অত্যন্ত অনুনয় করাতে তিনি বলেন, যদি তুমি কোন ও প্রকৃত মহৎলোকের সঙ্গে দুইদণ্ড যাপন করিতে পার—তবে তোমার শাপবিমোচন হইবে এবং পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তদবধি দশ সহস্র বৎসর যাবত আমি পৃথিবীতে একজন প্রকৃত মহৎলোকের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। বহুদিন বহুলোককে মহৎ মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বহু দুইদণ্ড যাপন করিয়াছি, কিন্তু আমার শাপবিমোচন হয় নাই, সেই সমস্ত লোক সকলেই আমার ভক্ষ্য হইয়া আমার উদরস্থ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে প্রকৃত মহৎলোক যে এতই দুর্লভ, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। মহারাজ, তুমি প্রকৃতই মহৎ এবং তোমার দুইদণ্ডের সাহচর্য্যেই আমার মুক্তিলাভ সম্ভব হইল। এই কথা বলিয়াই নহুষ অন্তর্ধান করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম নিহত পশুগণকে স্কন্ধে করিয়া তাঁহাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ঃ 'মুমূর্ষু পৃথিবী' কল্পান্তর ঃ
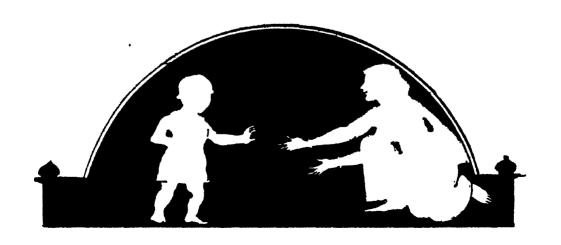
কিলো অতসী, ঘুম কি তোর ভাঙবে না? ভিক্ মাগার বেলা যে উৎরে গেল!

ঝন্-ঝন্ করে শিকলটা নেড়ে পদ্ম দরজা ঠেলে। খিলটা খোলাই ছিল। একটুখানি ছোঁয়া লাগতেই কানেস্তারার কপাটটা সরে গেল।

বন্ধ ঘরে তখনও রাতের অন্ধকার থিতিয়ে আছে। মহানগরীর সৌধ-সীমানা ছাড়িয়ে সূর্য দিনের প্রহর অতিক্রম করেছে। কিন্তু ওদের বস্তির ঘরে ঘরে রাত্রিশেষের ঘোলাটে অন্ধকার যেন থমথম করে।

অতসী তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে, পদ্ম ঘরের ভিতর পা বাড়ায়। ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির দাগ লাগে: অবস্থা ওদের আজও বদলায় নি ঠিক তেমনি আছে! সেই তালপাতার চাটাই, ছেঁড়া মাদুর আর তেলচিটধরা বালিশ!

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম ঘরের ভিতরটা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেয়। আসবাব-পত্র নয়; দেখে, ঘরের কোণে দীনু চুপটি ক'রে বসে আছে কিনা!

সাড়াৎ কই লো?

অতসী সাড়া দেয় না। অস্পষ্ট একটা কাতরানি পদ্মর কানে আসে। কি ভেবে পদ্ম বিছানার পাশে ব'সে পড়ে; গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অতসী! ও অতসী! এখনও শুয়ে আছিস যে?…ওমা, গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে লো!

অতসী চোখ মেলে চায়, কিন্তু কথা বলতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে কেমন দম আটকে আসে।

মিন্‌সে বুঝি ফেলে পালিয়েছে?

পদ্ম একটু ঝুঁকে পড়ে অতসীর মাথার কাছে: পুরুষমানুষ অমনি হয় লো। সুখের পায়রা! সুখ ফুরিয়ে গেলেই ফুরুৎ করে উড়ে পালায়।

পদ্মদিদি!

ঠিক কথাই বলেছি অতসী। দেখিস, দিন তো এখনও পড়ে আছে…নিশ্চয়ই সে পালিয়েছে। আর আসবে না ফিরে।

না—না। ও কথা বলো না: অতসী হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। শীর্ণ হাতখানা দিয়ে পদ্মর মুখটা চেপে ধরবার চেষ্টা করে। ওর অর্ধস্তিমিত সংবিৎ নিমেষে সজাগ হয়ে ওঠে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে—ক'দিন ভিক্ষেয় বেরুতে পারিনি। হয়তো না-খেয়ে না-নেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে, কোম্পানীর বাগানে এককোণে প'ড়ে থাকবে, তাও ভাল; তবু চেয়ে খেতে সে পারবে না, তা আমি জানি।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে, অতসী বিছানার এপাশ ওপাশ হাতড়ে, উঠে বসে—ছেলেটা! আমার খোকা! খোকা ছিল যে এইখানে ঘুমিয়ে?

তা হলে যার ছেলে সেই নিয়ে গিয়েছে। এবার পোষ মেনেছে লো। ছেলে কোলে নিয়ে নিজেই গিয়েছে ভিক্ মাগতে। তা আবার যাবে না?—পদ্ম খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

গয়াকাটা ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো ছুরির ফলার মত পদ্মর সেই হাসি! অতসীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিমেষে ঝিমঝিম ক'রে ওঠে। আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে। আবার বুঝি ঘটলো তার কোন সর্বনাশ! হঠাৎ পোড়া চুলের উৎকট ঝাঁজালো গন্ধে নাকের ভিতরটা যেন জ্বালা করে!

গয়াকাটি, এই গয়াকাটিই দিয়েছিল ওর মাথাভরা চুলের গোছায় আগুন ধরিয়ে।…ও জানতেও পারেনি।

সারাদিনের মেহনতে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। ভোরের বেলায় কখন চুরি করে গন্নাকাটি ঢুকেছিল ঘরে। দীনু ছিল না তখন। হিংসার জ্বালায় ও দিয়েছিল অতসীর মাথাভরা গোছা গোছা চুলের গোড়ায় আগুন ছুঁইয়ে। একরাশ চুল পুড়ে ছাই হয়ে গেল।…চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দুঃস্বপ্ন-জড়িত প্রভাত। ভয়ে অতসী আড়ষ্ট হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। মগজের ভিতর শিরাগুলো টনটন করে। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে কি ভাববার চেষ্টা করে। আঙুল চালিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করে মাথার চুলগুলো আছে কিনা!…কোন দোষ তো সে করে নি। তবে কেন এলো আবার ওদের বস্তিতে সেই গন্নাকাটি!

চিন্তার সূত্র কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। পদ্মর পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে অতসী চীৎকার করে ওঠে—পদ্মদিদি, খোকাকে ফিরিয়ে দাও।…কিছু তো করিনি তোমার। একপাশে পড়ে আছি। তাই থাকবো। দাও—দা—ও—

নিজেকে সামলাতে পারেনা: মুখ গুঁজড়ে পড়ে পদ্মর পায়ের কাছে। শরীরটা থরথর করে কাঁপে।

অতসীর রকম দেখে হঠাৎ পদ্ম কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। ভাবতে পারে না কি বলবে সে অতসীকে। পুরনো দিনের কথা মনে প'ড়ে নিজের কাছেই যেন পদ্ম আজ বিব্রত হয়ে ওঠে। লজ্জায় অতসীর মুখপানে চাইতে পারে না। ওতো আসেনি অতসীর কোন ক্ষতি করতে। কতকাল পায়নি ওদের খবর। তাই সাত-বস্তি খুঁজে খুঁজে বের করেছে এই আস্তানা। দীনুকে ওর ভাল লাগতো। কিন্তু একথাও জানতে তার বাকী ছিল না যে, হাতের নাগালে দীনুকে সে পাবে না কোনদিন। ভদ্দর-লোকের ছেলে অদৃষ্টের বিপাকে এসে পড়েছিল ওদের বস্তিতে। পোষ মানবার নয়, তাই সে কারো পোষ মানেনি। অতসীও পারেনি তাকে গাঁটছড়া দিয়ে বেঁধে রাখতে। যেমন এসেছিল,তেমনি হয়তো আবার ছিটকে পালিয়েছে।

পদ্মদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও। আর কেউ নাই,…দুনিয়ায় কেউ নাই আমার। দাও, এনে দাও।—অতসী কাকুতি মিনতি করে। পদ্মর মুখপানে চাইতেও যেন তার ভয় হয়।…পদ্ম! সেই গন্নাকাটি পদ্ম! খোকাকে নিয়ে যাবে বলেই হয়তো এতকাল পরে খুঁজে খুঁজে এসেছে ওদের বস্তিতে।…অতসীর মুখে কথা সরে না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। রোগজীর্ণ পাঁজরা-গুলো আগুন-তাওয়ানো হাপরের মত ফুলে ফুলে ওঠে।

ছেলে! ছেলের কথা তো পদ্ম জানে না কিছু। নিশ্চয়ই নিয়ে পালিয়েছে সেই দীনু। না-হয়, দিনের পর দিন না-খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে মরেছে। রোগে ভুগে ভুগে অতসীর হাড় পাঁজরাগুলো ঝির ঝির করে। বুকে কি আর এক ফোঁটাও দুধ আছে! ওই তো দেহের হাল। কতদিন যে ভিক্ষেয় বেরোয় নি, কে জানে! লোকটা ভিক্ষে চাইতে পারে না, হা-ঘরের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অতসী জোর ক'রে ধরে এনে তাকে খাওয়াতো। কোনদিন জুটতো শুক্‌নো দুমুঠো মুড়ি, কোনদিন বা একদলা ফেনা-ভাত!…একটা একতারা কিনে দিয়েছিল ভিক্ষের পয়সা বাঁচিয়ে, তাও মিন্‌সেটা কাকে দাতব্যি করে এসেছে; না-হয় পয়সার লোভে বেচে দিয়েছে বোষ্টম ভিকিরীদের কাছে।—পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে।

অতসীর স্তিমিত চেতনার অন্তরালে আচম্বিতে ওঠে প্রলয়ের ঝড়। অবচেতন মনের অর্ধ-বিস্মৃত সন্ত্রাস নিমেষে তোলপাড় করে ওর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া।…পদ্ম—রাধা বোষ্টুমি—মানিক পেয়াদা! নিশুতি রাতে বস্তির আনাচে কানাচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। শুধু রাধা বোষ্টুমির ঘরে মাটির পিদিমটা মিটমিট ক'রে জ্বলছিল। দরজা বন্ধ। রাধা কাকুতি-মিনতি করে—'ওগো অমন রাজপুত্তুরের মতন ছেলেটাকে দিওনা জন্মের মত অন্ধ ক'রে। কখনও তো বলিনি কিছু। দুধের ছেলে! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।"

মানিক পেয়াদা যমদূতের মত চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে-রাধার মুখপানে। কিন্তু মেয়ে মানুষের প্রাণ! রাধা সইতে পারেনি। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল মানিকের হাত দুটো—না—না, ওগো দিও না, দিও না অমন রাজ-পুত্তুরের মত ছেলেটাকে জন্মের মত কানা করে।'

কে শোনে! সে তখন দিয়েছে ছেলেটার চোখদুটো শেষ ক'রে। লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে অন্ধ করে দিয়েছে জন্মের মত। এক লাথিতে রাধা বোষ্টুমি হুমড়ি খেয়ে

ছিট্‌কে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। ছেলেটা আর্তনাদ করে উঠেছে। মানিক পেয়াদা চোয়ালটা চেপে ধ'রে খানিকটা আফিং-এর জল গিলিয়ে দিয়েছে।…ঝিমিয়ে গেল। দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে ছেলেটা ঝিমিয়ে গেল। ঘুম! না না, জন্মের মত গেল তার চোখ দুটো। সব অন্ধকার হয়ে গেল। কচি গাল বয়ে ঝরে পড়ছিল তাজা রক্ত!…দেখে দীনুর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সইতে পারলে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি সে কাঁপুনি তার! দীনু চীৎকার করতে চায়: অতসী মুখে হাত চাপা দিয়ে কতকষ্টে ঘরের মেঝেয় এনে বসায়। তখনও সে আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে চলেছে।…শুনেছ অতসী, ওই মাটির ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে কান্না! লাখ লাখ অন্ধ অসহায় শিশু ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পৃথিবীর পথে চলেছে ওদের পেটের ভাত যোগাতে!… অতসী! অতসী!

হঠাৎ অতসীর বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে আসে। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো টন টন করে। মনে হয়, মগজটা বুঝি ফেটে পড়বে।…খোকনকে নিয়ে যাবে ব'লেই হয়তো পদ্ম এসেছিল ওদের বস্তিতে। নিয়ে গিয়েছে —নিশ্চয়ই সে নিয়ে গিয়েছে মানিক পেয়াদার আখড়ায়। ওরা ভিকিরী তৈরি করে।…লোহার কাঁটা ফুটিয়ে মানিক পেয়াদা হয়তো এতক্ষণে খোকার চোখদুটো দিয়েছে অন্ধ করে। গেল! জন্মের মত গেল খোকার অমন ঢলঢলে চোখ দুটো! চোয়াল চেপে ধরে খাইয়ে দিলে খানিকটা আফিং-এর জল। উঃ! খোকা! খোকা!—অতসী চীৎকার করে ওঠে। সইতে পারে না। ওর বুকের ভিতরটা যেন যাঁতাকলের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়। মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়। মুখে আর কোন কথা সরে না। রুদ্ধ কান্নার আবেগে শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

পদ্ম হকচকিয়ে যায়। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অতসীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অতসী! অতসী!

কোন সাড়া নাই। অতসীর মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা আস্তে আস্তে বেঁকে গেল। মুখখানা নীল হ'য়ে আসে। থুতনিতে হাত দিয়ে পদ্ম নেড়ে দেখে, দাঁতি লেগেছে।

তাড়াতাড়ি কলাই-করা মগটা নিয়ে উঠে গেল জল আনতে। কিন্তু ঘরে এক ফোঁটা জলও নাই। শুকনো কলসীটা এককোণে কাত হয়ে পড়ে আছে।

এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখে পদ্ম মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়ায়: কুলুঙ্গিতে ওষুধের শিশি, ছোট একটা কাঁচের গেলাস আর আধখানা কমলা লেবু!

…লোকটার আক্কেল আছে, কিন্তু মতির ঠিক নাই। ভদ্দর ঘরের ছেলে, অভাবে পড়ে মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে। নইলে বার বার এমন করে ফেলে পালায়!—আপন মনে বকতে বকতে পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জলের সন্ধানে।

পাশের ঘরের দরজাটা বন্ধ। ভিতর থেকে খিল দেওয়া! দরজায় ধাক্কা দিয়ে পদ্ম ডাকে—কে আছো? খোল না একবার। একটু জল—

হঠাৎ পদ্ম চম্‌কে উঠলো! ওর কথা শেষ হতে না হতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বছর বত্রিশ বয়েসের একজন ভদ্র লোক: চোখমুখ দীনুর মতই ঝকঝকে। আচমকা চোখো-চোখি হতেই পদ্মর বুকের ভিতরটা সিমসিম করে ওঠে! চোখদুটো মাটির দিকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি নীচের ঠোঁটটা দিয়ে ওপরের কাটা-ঠোঁটটুকু চেপে ধরে। একটা ঢোক গিলে বলে—একটু জল নিতাম। মেয়েটা মূর্চ্ছো গিয়েছে।

কে!—অতসী?

হাঁ।—পদ্ম আড়চোখে তার মুখপানে একবার ভাল করে থাকিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না ক'রে লোকটি ঘরের ভিতর থেকে জলের কুঁজোটা নিয়ে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে এলো। পদ্মর বিস্ময়ে তখন ঈর্ষার আঁচ লেগেছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ সৌষ্ঠবটা একবার সে দেখে নেয়: এমন রূপ কটা মেয়ের আছে! ঘসা-ঘসা গায়ের রঙ। মানানসই ছিপছিপে গড়ন। গায়ে-পায়ে ভরা যৌবন। লীলায়িত দেহভঙ্গী নিমেষে পুরুষের মনে টাল খাইয়ে দেয়। কিন্তু কপাল মন্দ; তাই গেরণ-লাগা চাঁদের মতন ওর ওই গন্নাকাটা ঠোঁটখানা। দেহের সবটুকু সৌন্দর্যকে গ্রাস করেছে মনটা যেন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ভেঙে পড়ে। ওর সহজাত উচ্ছল গতি নিমেষে শ্লথ হয়ে আসে।

অতসীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর উত্তাপে স্যাঁৎ-সেঁতে বস্তির ভাপ্‌সা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এতবড় বস্তিটা যেন নিশুতি রাতের মত নিঝুম। দু'একখানা ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শান্‌কি-সামানের ঠুং ঠাং শব্দ ছাড়া জীবনের আর কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। রাতের কুলায় ছেড়ে উড়ন্ত পাখীরা দিনের আলোয় ডানা মেলে দিক্‌দিগন্তে বেরিয়েছে আহারের সন্ধানে।

অতসী চোখ মেলে চায়—কে? নিবারণ বাবু!

হাঁ।

অতসীর নিষ্প্রভ শুকনো ঠোঁট-দুটো কাঁপে। কথা বলতেও যেন শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। চোখ ছাপিয়ে আসে জল। দিনের পর দিন না-খেয়ে রোগে ভুগে সারাটা দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়েছে; কিন্তু চোখের জল ওর এখনও শুকোয় নি।

আবার কাঁদছো?

না:—অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। কি যেন ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

পদ্ম এতক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল ওর মাথার কাছে। অতসীকে সুস্থ ক'রে তুলবার জন্যে নিবারণের এই প্রাণান্ত চেষ্টা যেন সে সইতে পারছিল না। মনের অস্বস্তিটুকু সামলে নিয়ে, নিবারণের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে বললে: তোমরা—আপনারা বুঝি পাশের ঘরেই থাকো?

হাঁ।—আর কোন কথা না ব'লে নিবারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে গেল ওপাশের কুলুঙ্গীটার দিকে। ওষুধের শিশি আর গেলাসটা নামিয়ে এনে আবার অতসীর পাশে এসে বসলো।

এক দাগ ওষুধ অতসীর মুখে ঢেলে দিয়ে বললে—বেশী কথা ব'লো না, শরীর তাহলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

পদ্ম নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিবারণের মুখপানে। ওষুধ আর কমলালেবু তা হলে দীনু আনেনি। এনে দিয়েছে পাশের ঘরের এই লোকটা!—দ্রুত-তালে মনটা মাকড়সার জাল বোনে। হোক না অতসীর চেয়ে বয়েস তার বেশী। তবু গায়ে-পায়ে যৌবন তার আজও উপচে পড়ছে। এমন বুক-পিট-কোমর-মাজা! নিটোল হাত-পা! কিন্তু অমনি ক'রে কেউ তো কোনদিন চায় না তার দিকে!

পদ্মর অন্যমনস্কতাটুকু হঠাৎ কেটে গেল নিবারণের কথায়: তুমি তো ওর আপনার লোক। একটু দেখো, যেন আবার কান্নাকাটি না করে। আমি এখুনি আসছি।

কান্নাকাটি কি সাধ ক'রে করছে ও। ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের কাছ থেকে কে নিয়ে গেল, জানো তুমি?

জানি।—কলাইকরা মগটা হাতে নিয়ে নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পদ্মর তির্যক্ দৃষ্টি নিবারণের পায়ে পায়ে দরজা পার হয়ে এগিয়ে যায়। মুচকি হাসির সঙ্গে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: কি লো! মিন্‌সের এত দরদ কিসের?

জানি না।···অতসী চোখ বন্ধ ক'রে পাশ ফিরে শোয়। ওর বুকের গুরুভার যেন নিমেষে নেমে যায়। ছেলেটা আছে নিবারণের কাছে।···শীর্ণ পাঁজরাগুলোয় লাগে স্বস্তির স্পর্শ: ছেলেটা তাহ'লে আছে। চকচকে নীল চোখ দুটো তুলে আবার সে চাইবে ওর মুখপানে।···ঠিক যেন দীনুর চোখ দুটো ভগবান বসিয়ে দিয়েছে খোকার মুখে!

পদ্মর বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস থমথম করে। মনের জড়তাকে চাপা দিয়ে, অতসীর গায়ে হাতখানা রেখে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে—কতদিনের চেনা-শোনা? বস্তি বাড়ীতে ভদ্দর লোকের ছেলে—

মাসখানেক হলো এসেছে আমাদের পাশের ঘরে। নন্দা বলে—একটা মেয়েকে নিয়ে এই বস্তিতে এসে উঠেছিল। মেয়েটা হতচ্ছাড়ি, আবার কার সঙ্গ ধরে পালিয়েছে। সেই থেকে ও একলাই আছে। লোকটা ভালো।···কথা বলতে বলতে অতসী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

পরক্ষণেই মনে ঝাঁকানি লাগে পদ্মর উচ্ছল হাসিতে। সুর কেটে পদ্ম বলে—লোকটা ভালো হোক না-হোক, কপাল তোর ভালো, অতসী। একজন যেতে না-যেতেই আর একজন এসে জুটেছে—

পদ্মদিদি!—অতসীর চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে।

পদ্ম আবার হাসে। খিলখিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ে অতসীর গায়ে: লজ্জা কিসের লো? বল না খুলে। সে মিন্‌সে যতদিন ছিল, হাড়ে দুন্-মিত্তিকে দিয়েছে। এতো দেখছি সোনার চাঁদ!

ছিঃ! পেটের দায়ে না-হয় ভিক্ মেগেই খাই। জন্মেছিলাম তো ভদ্দরলোকের ঘরে।···চল্লিশ দিন সান্নিপাতের জ্বরে ভুগে বাবার চোখ-দুটো অন্ধ হয়ে গেল। মা আর ছোট ভাইটা দিনের পর দিন গোটা-গোটা উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরলো। কপাল পোড়া; তাই আমি বেঁচে রইলাম। তাই ব'লে কি—কথা বলতে বলতে অতসীর মুখখানা আবার কেমন বিবর্ণ হয়ে আসে। নাকের পেটি দুটো কাঁপে। চোখ ছাপিয়ে হু হু ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে জীর্ণ বালিশটার ওপর।

না-না, আমি তা বলিনি।—পদ্ম অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে অতসীর চোখদুটো মুছিয়ে দেয়।

আবার বুঝি কান্নাকাটি করেছে?—নিবারণ এসে দাঁড়ালো পদ্মর পিঠের কাছে।

পদ্ম হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে একটা ঢোক গিলে বললে—কেমন ক'রে দোষ দিই। মায়ের মন তো! বলোই না বাপু, ছেলেটাকে কোথায় সরিয়ে রেখেছ?

এই দুধটুকু আগে খাইয়ে দাও। গরম আছে।

গরম দুধের ভাঁড়টা অতসীর পাশে নামিয়ে রেখে নিবারণ দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

পদ্মর প্রশ্নটাকে হঠাৎ এমন ক'রে এড়িয়ে যেতে দেখে, অতসীর সন্ত্রস্ত চোখদুটো নিবারণকে খোঁজে। মনটা আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।···খোকা আছে তো!

বাইরে পায়চারি করতে করতে নিবারণ দরজার সামনে এসে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালো। ক্ষণেক কি ভেবে পদ্মকে উদ্দেশ করে বললে—কোথায় থাকো তোমরা?···রুগ্ন শরীর, একলাটি এখানে পড়ে থাকে, যাও না তোমাদের বস্তিতে নিয়ে। ঘর ভাড়া যা বাকী পড়েছে, আমিই দেবো মিটিয়ে।

না-না। আমি যাবো না।—অতসী উঠে বসবার চেষ্টা করে।

পদ্ম তাড়াতাড়ি হাতদুটো ধ'রে বাধা দিয়ে বলে—উঠিস না। শুয়ে শুয়েই দুধটুকুন খেয়ে ফেল।

দুধ!—অতসীর মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো নিষ্প্রভ হাসি। উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসটা চেপে, বিড়বিড় ক'রে বলে—পথ-ভিকিরী। ছেলেটাকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারিনি কোনদিন।···একটুখানি ভাতের ফেন, সুদের জাও পেলেও মা-ভাইরা বাঁচতো দু-দিন। কিন্তু তাও শেষটায় জোটে নি।—দুধ আমি খাবো না, পদ্মদিদি।

অতসী!—কি বলতে গিয়ে নিবারণ থেমে যায়। ঘরের সামনে আবার অস্থিরপদে কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে বলে—তোমার শরীর অসুস্থ। যে ক'দিন ভালো হয়ে না ওঠ, ওদের বস্তিতেই গিয়ে থাকো। এখানে তো কোন মেয়ে-ছেলে নেই, কে দেখা-শোনা করবে তোমার!

কা'কেও দেখতে হবে না। যে ক'দিন বাঁচি, এই ঘরের মেঝেতেই পড়ে থাকবো।···যদি আবার কোনদিন সে ফিরে আসে, ভাল না হয়, হাড় ক'খানা এইখানেই মেটিয়ে যাক। —কথা বলতে বলতে অতসীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। একটু সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বলে—না—না। নিবারণবাবু, আমার খোকাকে তুমি ফিরিয়ে এনে দাও। দুধের ছেলে, কিন্তু দুধ কখনো সে চোখে দেখেনি। তোমার দেওয়া দুধটুকুন আমি তাকেই খাওয়াবো।

খোকা হাসপাতালে।

হাসপাতালে?

হাঁ। দিনের পর দিন না-খেয়ে—

না, না, হাসপাতালে নয়, নিবারণবাবু, মরেছে, সে নিশ্চয়ই মরেছে। ভিকিরীর ছেলেকে হাসপাতালে নেয় কখনো?—হঠাৎ অতসী পদ্মর হাত-দুটো ঠেলে দিয়ে পাগলের মত উঠে বসে: বলো, সত্যি ক'রে বলো, নিবারণবাবু!

না।—নিবারণবাবু আস্তে আস্তে সরে যায় ওর চোখের সামনে থেকে।

বস্তির ওপাশে ঘুগ্‌নিওয়ালার দোকানের মেয়েটা বুঝি তখন উনুন ধরিয়েছে। বদ্ধ বাতাসে পোড়া কেরোসিনের গন্ধ থমথম করে। খাপরা-খোলার চালের ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে ওঠে।···ঝাঁজালো বাতাসে অতসীর নাকের ভিতরটা জ্বালা করে। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পদ্মর মুখপানে। অবচেতন মনে কিলবিল করে সেদিন সেই স্মৃতি। মনে হয় তেলচিটে-ধরা সেই বালিশটা বুঝি তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে

পুড়ছে। সেই সর্বনাশী পদ্ম আবার এসেছে। আবার বুঝি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোনখানে। দুর্বল মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ যেন আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। অতীতের আবর্ত থেকে মনটাকে ছিনিয়ে আনবার জন্তে অতসী প্রাণান্ত চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।···নিবারণের মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে। অবনমিত বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলো যেন মগজের ভিতর জট পাকিয়ে যায়।

*   *   *   *

সুরেখার জীবনে তেমনি চলে বসন্তের সমারোহ: মহুয়া ফুলের মরশুম। পাতার আড়ালে চঞ্চল মৌমাছিরা রাত্রিদিন গুন গুন করে। তৃষিত ভৃঙ্গ ঘুরে মরে পাপড়ির আশে-পাশে। ডানায় যাদের মৌ লাগে তারা এগিয়ে যায় মরণের পথে।

নতুন আলিপুরে খাণ্ডেলওয়াল করে দিয়েছে ইতালিয়ান ফ্লোরিং করা স্বপ্নসৌধ—সুরেখার মনের মত ছোট একখানা বাড়ী। টাকা খাণ্ডেলওয়ালের, কিন্তু পরিকল্পনা সুরেখার। মাধবীলতার অবগুণ্ঠনে ঢাকা ফটকের একপাশে পিতলের ফলকে সুরেখার নাম, আর এক পাশে সর্পিল ইংরেজি হরফে লেখা 'দি সলিটারি নুক': ওর নিভৃত প্রহরের বিরাম কুঞ্জ। বান্ধবীদের নেমন্তন্ন ক'রে সুরেখা উদ্‌যাপন করে বর্ষতিথি—বর্ষামঙ্গল, বসন্ত উৎসব—আরও কত ঋতুপর্ব! বন্ধুরা জানিয়ে যায় প্রীতি। স্তাবকেরা বয়ে আনে অর্ঘ: নরম মাটিতে ওর ঋগ্বেদী ছন্দে পা ফেলে চলবার নানা উপকরণ।

বর্ষা নামে। আকাশে কাজল মেঘের আনাগোণা সুরু হয়। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সুরেখা আয়োজন করে মেঘদূত উৎসবের। কবে কোন শতাব্দীর বিস্মৃত দিবসে মহাকবি লিখেছিলেন তাঁর অমর কাব্য: বিরহী যক্ষের অপার্থিব প্রেমের কথা! তারই স্মরণ-উৎসব।

এবার উৎসবের ব্যয় বহন করে সুরেখার নবাগত বন্ধু রতনলাল। রতনলালবাবু খাণ্ডেলওয়ালের পরিচিত। কিন্তু সে পরিচয়ের মরচে-ধরা তারে নতুন ক'রে সরগম বাজিয়ে আবার ঝংকার তুলেছে সুরেখা। রতনলালকে সে-ই আবিষ্কার করেছে খেলার মাঠে। আচম্বিতে খাণ্ডেল-ওয়ালের সামনে টেনে এনে যখন জিজ্ঞেস করেছে—চিনতে পারো?

আকস্মিক বিস্ময়ে খাণ্ডেলওয়াল চমকে উঠেছে—চোপরা! রতনলাল!

না, শেঠ। শেঠ রতনলাল।—মিষ্টি হাসিতে সুরেখা রতনলালের মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।

খাণ্ডেলওয়াল অভিবাদন করেছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। খেলার মাঠ থেকে ওরা রতনলালের গাড়ীতেই ফিরেছে পাশাপাশি ব'সে। সুরেখা অনর্গল কথা বলেছে। খাণ্ডেলওয়াল শুধু মাঝে মাঝে সায় দিয়েছে তার কথায়। খাণ্ডেলওয়ালের চেয়ে অনেক ভালো বাংলা বলে চোপরা। সুরেখার মতই চনমন করে তার চোখের দৃষ্টি। সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের স্পর্শ যেন উপচে পড়ে!

ক্রীম রঙের ফোর-সীটার জাগুয়ার। বিটুমেন-ঢালা ঝকঝকে পথে হালকা পালকের মত বাতাসে গড়িয়ে চলেছে গাড়ীখানা। চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলোটা জ্বলে উঠতে নিঃশব্দে যখন থেমেছে, নরম এক ঝলক ঝাঁকানি লেগেছে সুরেখার গায়ে। ঈষৎ হেলে পড়েছে ডান পাশে চোপরার গা-ঘেঁসে। কপালের পাশে উড়ন্ত চুলগুলো আলগোছে লেগেছে চোপরার চোখে-মুখে।

সলজ্জ সরু এককালি হাসির সঙ্গে সুরেখা ছুঁড়ে মেরেছে ছোট্ট এক টুকরো কথা: স্বপনপুরীর রাজকুমার!

খাণ্ডেলওয়াল শোনেনি। কিন্তু চোপরা শুনেছে। আরও নীচু গলায় কানের কাছে মুখ নিয়ে পরমুহূর্তেই শুনিয়েছে চাটু-পুষ্পাঞ্জলি: ধনকুবের!···শেঠজি—

চোখ বিদায় নিয়েছে কিন্তু মন বিদায় নেয়নি। চোপরার মনে লেগেছে শ্যাম্পেনের গোলাপী নেশা। ব্যবধান সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে খাণ্ডেলওয়ালের মনটা কেমন ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ডেক চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে থাকে। কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

সুরেখা পাশে এসে দাঁড়ায়। কপালটা উল্টো হাতে ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করে: শরীর খারাপ হয়নি তো?

না। খাণ্ডেলওয়াল সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

তবে?··আরও কি বলতে গিয়ে সুরেখা কথা চুরি করে। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলে: চলো না। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ঢেউ দেখে আসি। যাবে ডায়মণ্ডহারবার, হেড-লঙ স্পীডে ড্রাইভ ক'রে?

খাণ্ডেলওয়াল উঠে বসে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে।

না, থাক। আজ তোমায় বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বরং ঘুমিয়ে নাও একটু: সুরেখা ঝুঁকে পড়ে ডেক চেয়ারের ব্যাকে। আলতো আঙুলে আস্তে আস্তে বিলি কাটে খাণ্ডেলওয়ালের এলোমেলো চুলে। (ক্রমশঃ)

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না

তাঁকে। বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে ?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা ?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন ! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি— কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

মেয়েদের কথা

গোড়ায় জল ঢালা

শ্রীমতী ইলারাণী সরকার

সাধারণ মধ্যবিত্ত-ঘরের অবস্থা আমাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা আছে। মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই ঘরে সব জিনিষের বাড়বাড়ন্ত! মাসের শেষ ক'টা দিন যেন আর ফুরাতে চায় না। আজকাল প্রায় সংসারেই মাসের শেষে অবস্থা চরমে উঠে। তখন তেলটা আনতে নুনটা থাকে না—নুনটা এলে ও বেলার চা গুড় দিয়ে খেলে কি রকম স্বাদ লাগবে—একথা ভাবতে হয়!

এর মানে এ নয় যে আমরা অমিতব্যয়ী। আসল কথা—সকলেরই ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ কম। প্রায়ই একটি লোকের রোজগারের উপর গোটা পরিবারকে নির্ভর করতে হয়—কাজেই বাজেটের আর সমতা থাকে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একটি বা দু'টির বেশী রোজগারে লোক চোখে পড়ে না—অথচ খাবার লোক থাকে কয়েক গণ্ডা। এমতাবস্থায় কোন কারণে গৃহকর্তার শরীরটা একটু খারাপ হয়ে দু'চারদিন অফিস কামাই হ'লে দুশ্চিন্তার আর অন্ত থাকে না। শরীরটা কতটুকু খারাপ হয়েছে—এটা ভাববার আগেই হয়ত মনে পড়ে—আগামী মাসটা চলবে কি ক'রে! পাওনা ছুটিতো বছরের প্রথম দিকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিঃশেষ হয়েছে। এখন কামাই করা মানে—বেতন কম পাওয়া। ভাবতেও শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে না কি? কিন্তু এই শারীরিক অসুস্থতার মূল কারণটা আমরা অনেকেই অনুসন্ধান ক'রে দেখি না। অথচ এদিকটা ভাবাই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

বর্তমানে খাদ্যের দুর্মূল্যতার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রায় কিছুই খাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাংগালীরা মাছে-ভাতে মানুষ। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দূরে থাক, পেটভরে ভাতক'টা গেলবার মতো মাছও কারো পাতে পড়ে না। টাকায় দেড়সের বা পাঁচপো করে দুধই আর ক'জনে খেতে পাবে? তাও আবার সেটা নির্ভেজাল নয়। শাক্-সব্জী, টাট্কা ফল ইত্যাদিও ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাজেই শরীরটারই বা আর দোষ কী! সারাদিন (কারো কারো বেলায় সারারাত্রি) হাড়ভাংগা খাটুনির পর উপযুক্ত 'তেল-মসলা' না পড়লে দেহযন্ত্র বিকল হবেই।

বাড়ীতে যেটুকু জিনিষ আসে তাই সকলে ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয়। যিনি রোজগার করছেন, যাঁর উপর এতবড় একটা বিরাট-সংসার নির্ভর করছে—তাঁর ভাগের ভাগেও একই পরিমাণ পড়ছে! কিন্তু পরিবারের আর সকলের এবং তাঁর মধ্যে যে পরিশ্রমের বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং সে অনুযায়ী খাদ্যেরও পার্থক্যের প্রয়োজন—একথাটা আমরা একদম ভুলে যাই। এভাবে দিনের পর দিন কম খাদ্য খেয়ে পরিশ্রম করতে করতে—শেষে একদিন পুরো দেহটাই বিদ্রোহ ক'রে বসে। তখন গোটা পরিবারকে অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ডাক্তার ও ঔষধের দাম যোগাতে হয়। কখনো কখনো চরম সর্বনাশ হয়ে পরিবারটিকে 'বানের জলে তৃণের ন্যায়' ভেসে যেতে হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদের মা-বোনদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে। পরিবারে যিনি উপার্জন করেন (স্বামী, পুত্র বা অন্য যে কেহ) তাঁর স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সংসারে যা-আয় হয় তাতে করে সকলের দিকে সমান নজর দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যিনি সকলের মুখে অন্ন দেবার ব্যবস্থা করছেন—তাঁর দিকে নজর না দিলে তো চল্‌তে পারে না। আমি দেখেছি এতে মাসে সাত-আট টাকার বেশী কিছুতেই লাগে না। যাঁরা তাও পারবেন না, তাঁদের অন্ততঃ যেভাবেই হোক পাঁচটা টাকা খরচ করতেই হবে। যিনি ডিম খান তাঁকে দৈনিক একটি করে অর্ধ সিদ্ধ ডিম খেতে দিলে মাসে ৪৲ টাকার বেশী খরচ হয় না। বাকী ৪৲ টাকার ঘি বা টাট্কা ফল কিনলেই চলে। মাঝে মাঝে এবং সম্ভব হ'লে প্রতিদিন

একটি করে লেবু (পাতি, বাতাবী বা কাগজী) দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে 'ভিটামিন সি'এর অভাব পূরণ হবে। যিনি ডিম খান না তাঁকে ডিমের বদলে একপো দুধ দিতে হবে। খাঁটি দুধের চেয়ে বড় আর কিছু নেই; কিন্তু সেটা যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। যাঁদের বাড়ীতে গরু আছে তাঁদের কথা আলাদা। ডিমে ভেজাল দেবার উপায় আজো আবিষ্কৃত হয়নি বলে সর্বাগ্রে ওটার নাম করে রাখলাম।

খাদ্য-হিসেবে তিল একটি অতি মূল্যবান পদার্থ। দৈনিক এক বা দেড় ছটাক তিল একজন লোককে সুস্থ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট, তিল বেটে গুড় বা চিনি সহযোগে ভাত দিয়ে খেতেও খুব সুস্বাদু। গত ১লা সেপ্টেম্বরের যুগান্তরে বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তিল সম্বন্ধে যা লিখেছেন—নিম্নে তার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম :

"...তিলের ন্যায় একটি পুষ্টিকর খাদ্য পৃথিবীতে কমই আছে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর এবং বিভিন্ন খাদ্য মূল্যে সমৃদ্ধ। ইহার ভিতর প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১৮·৩ ভাগ, চর্বি ৩৩·৩, শর্করা জাতীয় খাদ্য ২৫·২, ক্যালসিয়ম ১·৪৫, ফসফরাস ০·৫৭ এবং লৌহ শতকরা ১০·৪ (মিলিগ্রাম) বর্তমান থাকে। বিভিন্ন –মূল্যবান ভিটামিনের ও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ আধার...তিলের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা দ্বারা মাছ-মাংস খাওয়ার কাজ হয়। সাধারণ মাছ-মাংসে তিল অপেক্ষা বেশী প্রোটিন থাকে না।

"...তিল বিশেষভাবে একটি রক্তবর্ধক খাদ্য।—ইহার ভিতর যে লৌহ আছে তাহা পালংশাক এবং পাঁঠার মেটের প্রায় দ্বিগুণ। ইহা বিশেষভাবে থিয়ামিনে (ভিটামিন বি-১) সমৃদ্ধ।—প্রতি শতগ্রাম তিলে ১০১০ মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন আছে। এই ভিটামিনটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে, সমস্ত পরিপাক যন্ত্রগুলিকে কার্যক্ষম রাখে, স্নায়বিক স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং বেরিবেরি রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।"

তিল খুব দামী জিনিষ নয় এবং নির্ভেজাল অবস্থায় অনায়াসে পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই উচিত—প্রতিদিন কিছুটা তিল ব্যবহার করা। সকলের জন্য সম্ভবপর না হ'লে ও অন্ততঃ একজন বা দু'জনের জন্য উপরোক্ত দ্রব্যের একটা বাদ দিয়ে হ'লে ও তিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি জানি অনেকের পক্ষে এ টাকাটা খরচ করাও খুব কষ্টসাধ্য। তবু অন্য সকলকে বাঁচাতে হ'লে এটা না করে উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হল, যাঁর জন্য এ ব্যবস্থা তিনি তা মেনে নেবেন কিনা। 'সিপাহীবিদ্রোহ' না হ'লেও 'অসহযোগ আন্দোলন' যে সুরু হয়ে যাবে—একথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। আর সে লোকটিরই বা দোষ কি? বাপ হয়ে ছোট ছোট মেয়েদের বা বড় ভাই হয়ে ছোট ছোট ভাইবোনদের সামনে কি এসব জিনিষ গলা দিয়ে নামে?

এর সমাধানও মেয়েদেরই হাতে। আপনি যদি তাঁকে এটুকু বুঝাতে পারেন যে রসনার তৃপ্তির জন্য নয়, শুধু স্বাস্থ্যের জন্য 'টনিক' হিসেবে এটুকু তাঁর খাওয়া নেহাৎ প্রয়োজন—তবেই সব গোলমাল মিটে যাবে। তাঁকে বুঝাবেন—ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের গোড়ায় জল না ঢাললে উপরের ফল-ফুল বা ডালপালা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে বাধ্য। গাছকে বাঁচাতে হ'লে আগায় জল ঢাললে কিছুই হয়না—গোড়ায় জল ঢালতেই হ'বে।

রোজগেরে ব্যক্তিটি হ'লেন সংসাররূপ বৃক্ষ—আর তাঁর উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সকলে সেই বৃক্ষের ফল-ফুল এবং ডালপালা। তাই এ সংসার-বৃক্ষকে বাঁচাতে হ'লে—তার গোড়ায় জল ঢালতেই হবে। গোড়ায় জল না ঢাললে একদিন না একদিন সম্পূর্ণ গাছটি শুকিয়ে যাবে।...যে ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনের জন্য তিনি সামান্য বস্তুটুকু মুখে তুলতে পারেন না, তাঁর অবর্তমানে তাদের অবস্থাটা কী হতে পারে, শুধু একথাটা তাঁকেও ভাবতে বলবেন। যেই মাত্র তিনি বুঝবেন যে এটা ছোটদের বঞ্চিত ক'রে নয়—তাদের বাঁচার জন্যই শুধু 'গোড়ায় জল ঢালা' হচ্ছে—তখনই তিনি আর কিছুমাত্র আপত্তি করবেন না।

তবে হ্যাঁ, প্রথমটায় আপনার বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে—খাবার সময় ছেলেপিলেদের কাছে যেতে না দেওয়া। সামনে থাকলে প্রত্যেকেরই সাময়িক দুর্বলতাটুকু আসতে বাধ্য। বাপের সংগে ছেলেমেয়েদের কখনো খেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ যা কিছু ভালোমন্দ জিনিষ

তারাই খেয়ে নেয়। যাদের সে অভ্যাস হয়ে গেছে তাদেরও দু'চারদিন খাবার সময় কাছে যেতে না দিলে অল্প ক'দিনের মধ্যেই সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরাও তখন বেশ মেনে নেবে যে—"বাবা" বা 'দাদা' হ'লে শুধু সে বিশেষ জিনিষটা খেতে পাওয়া যায়—অন্যদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ। ক'দিন পরেই দেখবেন যে তারা কখনো সে জিনিষের দিকে ফিরেও চাইবেনা। অথচ পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন—কোনদিন ভাইবোনদের একজনকে সে জিনিষের সামান্য একটু দিলে তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।

সুতরাং সংসার-বৃক্ষকে বাঁচাতে হ'লে তার গোড়ায় জল ঢালা সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং সেটা আমাদের মা বোনদের হ'ল একমাত্র কর্তব্য।

হিন্দুকোডবিল ও পারিবারিক শান্তি-প্রসঙ্গ

(প্রতিবাদ)

শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী

গত বাঙলা ১৩৬৩ চৈত্র সংখ্যায় ভারতবর্ষে "হিন্দুকোডবিল ও পারিবারিক শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের যে সমালোচনা আমি করিয়াছিলাম, তাহার সমালোচনা বা জবাব হিসাবে, ১৩৬৪ কার্ত্তিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে শ্রীমতী প্রভাবতী ভট্টাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম এবং বলা বাহুল্য তাঁহার এইরূপ সমালোচনার বিশিষ্টতা দেখিয়া নিজে নিজেই প্রমাদ গণিলাম।

প্রথমতঃ তাঁহার প্রধান অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহাকে জানাইতে চাই যে, আমার মূল সমালোচনাটি ভারতবর্ষে কেন বহুদিন পর প্রকাশিত হইয়াছে সেই বিষয় আমায় তাঁহার কোনরূপ প্রশ্ন করা নিরর্থক বলিয়াই মনে করি; কারণ কোন সমালোচনা বা প্রবন্ধ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বা না হওয়া তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে ঐ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক বা পরিচালক মণ্ডলীর উপর, ইহাতে কোন লেখক বা লেখিকার হাত নাই।

তাহার পর যেহেতু আমি বর্ত্তমান হিন্দুকোড বিলের বিরোধী, সেইজন্য তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি একজন সতীদাহ সমর্থনকারী, বালবিধবাবিবাহ বিরোধী এবং আমাদের সমাজে গৌরীদান প্রথা সমর্থন কারী; ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি; কারণ বর্ত্তমান হিন্দুকোডবিলের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা সত্যই আমার মত একজন "অজ্ঞ" নারীর বুদ্ধির বোধগম্যের বাহিরে! সতীদাহ নিবারণ বা বাল বিধবাদের বিবাহ-প্রসঙ্গে যে মন্তব্য আমি পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম, তাহা শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য অনুগ্রহপূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়াছেন কি? ৺রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতৃবর্গের সহিত আমার প্রথমতঃ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল বলিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাকে আমি হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই মনে করি, কারণ এই প্রসঙ্গে এই সব মনীষীদের নামোল্লেখ করার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে সর্দ্দা আইনের উল্লেখ করিয়া তিনি আমাকে ইহার বিরুদ্ধেও পূর্ব্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল বলিয়া—মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে আমার মূল সমালোচনার এইরূপ ভাবে কদর্থ করিবার জন্য অভিনন্দন না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না, কারণ আমাদের সমাজে গৌরীদানপ্রথা সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম সে সম্পর্কে এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; তবে এই প্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে আমাদের কন্যাদায় আজ এক জাতীয়সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে, সর্দ্দা আইনের নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমাকে অতিক্রম করিয়াও আমাদের সমাজে অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা কত সংখ্যায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার খবর তিনি রাখেন কি? বলা বাহুল্য ভারতের পল্লীগ্রামে সর্দ্দা আইনের কার্য্যকারিতা এবং তাহার ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁহাকে একবার চিন্তা করিতেও অনুরোধ জানাইতেছি।

তাহার পর তিনি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং পুরুষের অত্যাচারের ও পীড়নের কথা উল্লেখ করিয়া নজির হিসাবে আমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আজ যাঁহারা জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া এবং জ্ঞান-গরিমায় আত্মহারা হইয়া জাতির ফেলিয়া-আসা অতীত ইতিহাসকে এখনও আঁকড়াইয়া থাকিতে চান এবং বর্ত্তমান কালকে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিষয় আমার বলিবার কিছুই নাই; কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এখানে কবে সতীদাহ হইত, কৌলিন্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থে কে কাহার উপর পীড়ন করিয়াছে সেই প্রসঙ্গ আজ শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে, রুচিবহির্গতও বটে কারণ—ইহাতে আমাদের সমাজ জীবনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিবে এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হইবে; মূল সমস্যার ইহাতে কোন সমাধান হইবে না। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন সমাজের দুর্ব্বৃত্তস্বভাব ব্যক্তির হাত হইতে মুক্তির জন্য হিন্দুকোডবিলের প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ; মানুষের মধ্যে দুর্ব্বৃত্তপরায়ণ স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য প্রথমতঃ শিক্ষার প্রসারতা ঘটাইতে হইবে। ইহার জন্য চাই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা; কারণ কোন অধিকার দিলেই যে কেহ তাহা [illegible]

সুতরাং পুরুষ ও নারীকে এই বিষয় একই পথের সহযাত্রী হইতে হইবে এবং ইহার প্রসারতার জন্য ভারতের দিকে দিকে চাই প্রকৃত জ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তাহার পর শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে হিন্দুকোডবিল পাশ হইবার বহুপর আমার এইরূপ সমালোচনার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? পূর্ব্বে কেন আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হই নাই? বলা বাহুল্য যে হিন্দুকোডবিল গৃহীত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং প্রখ্যাত আইনবিদেরা এবং লোকসভার নেতৃস্থানীয় বিলের বিরোধী নেতৃবর্গ যেরূপ একতাবদ্ধভাবে এই বিলের বিরোধিতা করিয়াছিলেন সেই বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তদানীন্তন দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পুনরায় পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। সুতরাং আমার মত এক অজ্ঞ নারীর বিরোধিতায় কি যায় আসে?

এখানে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে এই হিন্দুকোডবিল আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে বলিয়া আমি ভারতবর্ষে ইহার সমালোচনা করিয়াছিলাম, যদিও পূর্ব্বে এই বিলের বহু সমালোচনা হইয়া গিয়াছে এবং পরেও হইবে। আমাদের জাতিগত বিশিষ্টতাকে অস্বীকার করিয়া লাভ কি? কারণ আমাদের সমাজ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে না? ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রভেদ। তাহার পর তিনি পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন ও তাহার শারীরিক শক্তির পার্থক্যের সম্বন্ধে যে অবতারণা করিয়াছেন সেই বিষয় আমার পক্ষে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি; কারণ যাঁহারা বিধাতার সৃষ্টিগত পার্থক্যকে অস্বীকার করেন তাঁহাদের কথার উপর আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির নির্ব্বাক থাকাই শ্রেয়।

আকাশের ওই যে পশ্চিমকোণে এক টুকরো রাঙা মেঘ দেখা দিয়েছে,ওইটির দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসতে থাকে শকুন্তলা রায়। বিগত-যৌবনা শকুন্তলা রায় ওই টুকরো মেঘের যৌবন দেখে বিমুগ্ধ হয়নি, ও জানে, ওটা থাকবে না।

এমনি করেই জীবনে কত রঙ মুছে যায়। ছাদের ভাঙা আলসের ওপর বুকটা চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সোনার কাঠির গল্পের কথাটা বার বার ওর মনে হয়। মিষ্টি নুপুর বাজিয়ে চলে গেছে যেন এক সুদীর্ঘ রজনী! স্বপ্নের মতই মনে হয়। স্বপ্ন—স্বপ্ন হয়েই থাক।

শকুন্তলা রায়ের দীর্ঘায়ত চোখের পাতাদুটি ভিজে ভিজে লাগে। মনটাও কি ভিজে উঠল? আজ একখানি চিঠি পেয়েছে ও। এক আশ্চর্য চিঠি।

'কল্যাণীয়াসু, জীবনের এ অনুশোচনার বুঝি আর শেষ নেই। অপরাধ যে করিনি, এই কথাটাই আজ পর্যন্ত জানাতে পারলুম না। এইটেই যেন অপরাধ হয়ে গেল। আজীবন মনে মনে জ্বলে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে, এ দেহটাও আর বেশী দিন থাকবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ জানলে শান্তিতে মরতে পারতাম। স্বামী হয়ে এ শান্তির দাবীটুকুও কি করতে পারব না? উত্তরের আশায় রইলাম।

চোখ দুটো ভিজে ভিজে লাগলেও মুখে এক তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে ওর। যৌবনের শেষপ্রান্তে এসে হাসির কথাই। বড় বেদনার হাসির কথা।

ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই মানুষটির মুখটা যে ওর একেবারে ভুল হয়ে গেছে তা নয়। তবু সে মুখ মনে করতে চায়নি কখনও। ও জানে ওই মুখই ওর জীবনে ওর সত্য। তবু সত্যকে অস্বীকার করেই আসতে হয়েছিল এতকাল ওই একটু সময়ের রাঙা টুকরো মেঘের মত। কতই বা বয়েস তখন—তেরো বছর। নাম ছিল ওর অমলা। শকুন্তলা পরের নাম।

তেরো বছরেই ওর রূপ নাকি ফেটে পড়ত বলত সবাই। আজীবন শুনে আসছে ওর মত রূপসী নাকি দেখাই যায় না। এর চেয়ে রূপ না থাকলেই হয়ত ভাল হত, কে জানে!

ভ্রমর কালো চোখ দুটো ওর আবার ভিজে ওঠে। নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে ওঠে। ছাদের আলসে থেকে সরে এসে বসে পড়ে। তাকায় আকাশের দিকে।

আকাশে কত ছবি, একটার পর একটা ছবি সরে যায় ওর চোখের সামনে। অনন্ত আকাশে টুকরো সময়ের টুকরো টুকরো কাহিনী।

বিয়ে কি ? তখন কি আর কিছু বুঝত ? তবু তেরো বছর বয়সেই বিয়ে হোল। বাবা অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া পছন্দ করতেন। তাই হোল।

রূপসী বলেই কিনা কে জানে, ওর শ্বশুর ঘর থেকে এক পয়সাও নেয়নি, জমিদার ওরা। একমাত্র ছেলে। ছেলের বয়েস একটু বেশীই ছিল। প্রায় চব্বিশ।

বেশ মনে আছে ওর মানুষটার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চোখদুটো। শান্ত নিরীহ মুখখানা। মানুষটিকে খুব যে ওর মন্দ লেগে-ছিল তা নয়। বেশ ভালই লাগছিল।

বিয়ের পর রাত্রে বাসরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই।

ও ঘুমোয় নি। আর সেই মানুষটি।

বলেছিল—কি সুন্দর তুমি!

খুব আস্তে বলেছিল, বুকটা কাঁপছিল অমলার। একটা অচেনা মানুষের এত কাছাকাছি বসে রূপের প্রশংসা শুনা! এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল মনটা।

তারপর বলেছিল—কাল বিকেলে আমরা যাব।

যাওয়ার কথায় একটু ভয় পেয়ে গেল অমলা। হাজার হোক, ছেলে মানুষ ত'।

—ভয় নেই। আমি ত' থাকব।

ছাই! উনি থাকলেই বা কি ভরসা? পরিচয় ত' মোটে আজ।

মানুষটির গলাটি কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

ও এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবারে বললে—কত দূরে?

—কলকাতা থেকে অনেক দূরে।

আরও শুকিয়ে গেল অমলার মুখ।

ও কিন্তু আরও কাছে সরে এলো। অমলার গা ঘেঁসে বসল।

মন্দ লাগল না অমলার। তবু একটু সরে বসল।

বাসরের সবাই ঘুমোচ্ছে। তবু যদি জেগে ওঠে কেউ।

—তুমি ফুল ভালবাস?

অমলা ঘাড় নেড়েছিল ছেলে মানুষের মত।

—আমাদের ওখানে মস্ত বাগান আছে। সে সবই তোমার হবে!

—সব?—অমলা ফস্ করে বলে।

—হ্যাঁ। সব। তাছাড়া আর কি ভালবাস?

অমলা ডাগর চোখদুটো তুলে তাকাল। গল্প করতে বেশ লাগছে। আর কি ও ভালবাসে? কত কি ভালবাসে। সব মনেও পড়ে না।

তবু ও বলে—এই কামরাঙা, চালতে।

—খুব পাবে। বড় বড় চালতে গাছ আছে। কামরাঙা গাছ ত' ছ'টা।

—ছটা!

—হ্যাঁ। কামরাঙা ত' সব পেকে পড়ে যায় মাটিতে। কেউ খায় না।

ভারী মজাত! অমলা আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে।

—খুব বড় বাগান বুঝি?

—খুব বড়। সবই ত' তোমার।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। লোকটা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছে। সব ওর!

সবই ওর হোত। আজ শকুন্তলা ভাবে, ও ইচ্ছে করলে সবই ওর হোত। ওঃ সেই বিরাট প্রাসাদ, বাগান, লোকজন, গরু ঘোড়া সবই ওর হোত। কিন্তু হোল না।

দোষ করে সে বিষয়ে বিচার করতে বসে আজ আর লাভ নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শকুন্তলা রায়।

আকাশের সেই রাঙা টুকরো মেঘটা মুছে যাচ্ছে।

তারপর শ্বশুরবাড়ী ওকে যেতে হোল। পরদিনই। মানুষটি মিথ্যে বলেনি। অনেকদূর, ট্রেনে চেপে এক স্টেশনে নেমে সেখান থেকে পাল্কীতে প্রায় ছঘণ্টা। বাজনাবাদ্যি এসেছিল স্টেশনে। সমস্তদিন ট্রেনের ঝাঁকু-নীতে জল তেষ্টায় শরীর কেমন করছিল অমলার, বাজনার আওয়াজ সহ্য করতে পারছিল না। বুড়ী ঝিকে ধরে উঠল ও পাল্কীতে।

বর কনেকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে সবাই ঝিকে বলে সরে আসতে। অমলা কিন্তু ছাড়ে না। ঝিয়ের আঁচলটা চেপে ধরে থাকে। অগত্যা ওর পাশে ঝিকে বসতেই হয়।

না। একটুও মিথ্যে বলেনি। বিরাট এক প্রাসাদে গিয়ে পৌছয় ওরা, কত বড় বড় থাম। মুখ উঁচু করে দেখতে হয় অমলার। ভেতরে উঠোনখানি কি বিরাট আর ঠাকুর দালান!

ও মানুষটি ওর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকী হাসে।

—ভয় কচ্ছে ?

অমলা তাকায়, বলে—কচ্ছে একটু।

—কেন ? ভয় কি ?

এরি ভেতর শাশুড়ী আসেন। বিধবা,বরণ করে তোলেন দের। আশীর্ব্বাদ করেন একটি সোনার হার দিয়ে। হার খে অমলার চক্ষুস্থির, গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে, টা দড়ির মত। শোনা গেল, হারটির ওজন পঞ্চান্নভরি। য়েলি আচার সুরু হোল। শেষ হোল। মানুষটি চলে ল। সেই যে চলে গেল, দেখা হোল পরদিন রাত্রে!

এই দেড়দিন যে ওর কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই ল না। শুধু বুড়ী ঝিটি একবার ওর কাছে এসে াপনে বলছিল—কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে দিমণি।

তেরো বছরের অমলা কিই বা বোঝে তখন। বললে— হোল ?

—বাবুকে তখন পই-পই করে বলনু—একটু খোঁজ র নিয়ে বিয়ে দিন, তা শুনলেনি।

এর ভেতর কে একজন এসে পড়ায় ঝি চলে গেল।

অমলা কিছুই বুঝল না। বোঝবার চেষ্টাও বিশেষ রল না।

পরদিন রাত্রে বিশাল পালংকের একধারে অমলা য়েছিল। ও এলো। ফুলে ভরা বিছানা। রজনীগন্ধা- খা ফুলের মশারী, দেয়ালে ফুলের বিচিত্র রংবেরং। শুধু ্যা নয়। ফুলের রাত্রি।

ও এলো। এসে পাশে বসল।

চোখ পিটপিট করে একবার দেখেছিল অমলা। রপর ঘুমের ভান করল।

—এই!

হাতটা ধরে নাড়া দেয় ও।

অমলা কাঠ।

—এই, ঘুমোলে ?

অমলা চোখ পিটপিট করে তাকায়।

—আজ ঘুমোতে নেই।

অমলা ওপাশ ফেরে।

—এদিকে ফেরো। শোনো।

অমলা বলে শুধ—ঘুম পাচ্ছে।

ও পাশে শুয়ে পড়ে। একেবারে অমলার গা ঘেঁসে।

অমলা অনেকটা তফাতে সরে শোয়।

ও কিন্তু আর সরে না। তেমনি চুপ করে শুয়ে থাকে। কিছু বলেও না।

ঘরটা একেবারে নীরব। বাইরেটাও নিঝুম হয়ে আসে, জানালা দিয়ে কালো আকাশটা চোখে পড়ে অমলার, হঠাৎ কানে আসে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। শব্দটা সুতীব্র, অথচ ভয়ানক।

অমলা চমকে ওঠে। ভয় পেয়ে সরে এসে তাড়াতাড়ি পাশের মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে।

কাকে যেন মারছে। বুকফাটা কান্নার আওয়াজ।

হঠাৎ আওয়াজটা থেমে যায়।

লোকটিও যেন চমকে ওঠে। তাকায় অমলার দিকে।

—কি হোল। ও কিসের শব্দ।

—কি জানি।

—কে যেন কাঁদছে।

—তা হবে।—মানুষটি যেন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে।

আবার তীব্র কান্নার শব্দে অমলা চমকে ওঠে।

—কার কান্না।

মানুষটি যেন খানিকটা রেগে খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে—কি করে বলব। আচ্ছা দেখে আসি।

অমলা ওকে যেতে দেয়নি।

—তুমি যেও না। আমার ভয় করবে।

আস্তে আস্তে সব নীরব হয়ে আসে। আর কোন শব্দ আসে না। অমলা চোখ খোলে এতক্ষণে। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়, মুখটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেছে। চোখদুটোয় একমুহূর্ত আগের সে হাসি নেই। একটা কথাও বলে না।

অমলার ভাল লাগে না।

বলে—তুমিও বোধহয় ভয় পেয়েছো ?

চমকে ওঠে যেন ও, এতক্ষণ বোধহয় কি একটা ভাবছিল।

জোর করে একটু হেসে বলে—কই না' ?

—আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলাম। কি কান্নারে বাবা!

ও আর কথা বলে না। [illegible]

সে রাত্রিটা বৃথাই যায়! কোন কথাই আর জমেনি। কোন ভাবাবেগে ওরা অস্থির হয়ে ওঠেনি। এমনি অপূর্ব ফুলশয্যার রাত্রি আর কখনও শোনেওনি শকুন্তলা রায়। সে রাত্রে আর মানুষটা কথা বলেনি ভাল করে, কাছে টেনেও নেয় নি।

কি অদ্ভুত মানুষ! চিঠিখানা পড়ে আজ কত কথাই যে ওর মনে আসে। কিছুই ভোলেনি ও। প্রতিটি মুহূর্ত ওর মনে আছে। এ সত্য অস্বীকার করবার জো' নেই যে —সই-ই ওর জীবনে একমাত্র পুরুষ যে ওর অপরূপ সুন্দর দেহটাকে পরিপূর্ণ করে পেয়েছিল। তাও ত ছোট একটা স্বপ্নের মত। রাত্রি কটি ওর জীবনে যেন এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জেগে আছে।

পরের রাত্রিটাও অদ্ভুত। সে রাত্রে ঘুমিয়েই পড়েছিল অমলা। ও এসে অমলাকে জাগাল। ওর যে কেন এত রাত্র হোল আসতে কে জানে! অল্প বয়সে এত কৌতূহল ওর মনে আসেনি। ঠেলে জাগিয়ে ও বললে— আমার আসতে খুব দেরী হোল, না?

অমলা কথা বলেনি।

—আচ্ছা' এসব তোমার কেমন লাগছে?

—কি?

—এই বাড়ী-ঘর বাগান—।

—ভালই।

ও অমলার কাছে এসে ওকে দুহাতে ধরে টেনে বলে—চল, বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—বাগানে। বেশ লাগবে।

—না, আমার ভয় করবে।

লোকটি হাসে, কেমন যেন হাসিটা—ভয় নেই, আজ আর কান্নার শব্দ পাবে না।

অমলা একটু চুপ করে থাকে, তাকায় ওর দিকে।

আস্তে আস্তে বলে—তা হোক। বাইরে যাব না।

আর কোন কথা বলে না ও। অমলার মাথাটা টেনে নিজের কোলের ওপর নেয়।

অমলার ভাল লাগে। বেশ ভাল লাগে। ও আরও এগিয়ে আসে ওর কোলের কাছে।

ভাবতেও আজ কেমন যেন লাগে। শকুন্তলা রায় ভ্রূ কোঁচকায়। কি বোকাই ছিল, আর কি সরল! কিছুই ও বুঝত না। বোঝেও নি। নইলে পরের কয়েকটা রাত্রি সে কেমন করে অকপটে ভালবেসেছিল স্বামীকে। কেমন দেহমন সব ঢেলে দিয়েছিল মানুষটির কাছে! পরের রাত্রি কটা যে ওর জীবনে সবচেয়ে মধুর সঞ্চয়, এ কথা ত' আজও অস্বীকার করতে পারে না ও।

কিন্তু জোড়ে বাপের বাড়ী আসবার আগেরদিন সন্ধ্যায় যাকে সে দেখল, তাকেও সে ভুলতে পারেনি আজও। কি এক মূর্তি।

পা টিপে টিপে আসছিল।

ও দাঁড়িয়ে ছিল সন্ধ্যায় ঘরের চৌকাঠে, চোখ ছিল সামনের বাগানে—আর বাগানের পাচীলের ওপাশে বটগাছের আগায়।

হঠাৎ সামনে নজর পড়তে আঁতকে উঠল।

পা টিপে টিপে আসছে। রোগা ময়লা-রঙের একটি বউ। চোখদুটি ভরা বিষাদ। ভাসা ভাসা চোখদুটো কি সুন্দর, অথচ কি বেদনায় ভরা।

ভাল করে দেখতে পেল যখন তখন সে কাছাকাছি এসে গেছে।

—তুমিই বুঝি নতুন বৌ?

গলার স্বর এত ক্ষীণ যে প্রায় শোনাই যায় না।

ও অবাক হয়ে দেখছিল, একটু ভয়-ভয় করছিল না এমন নয়।

বউটি পিছনে একবার তাকাল, পাশে একবার ভয়ে ভয়ে।

ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল—শোন।

অমলা কি করবে ভাবছে এমনি সময় পেছন থেকে 'এ্যাই'—বলে একটা বিশ্রী আওয়াজ এল কানে।

একটা বিশালকায় মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

বউটি ওকে দেখেই ছুটে প্রাসাদের দক্ষিণে বারান্দা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মেয়েমানুষটিও পিছন পিছন গেল। যাবার সময় অমলার দিকে ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে গেল। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল অমলার।

দু'তিন মিনিটের ভেতর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল অমলা। আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছিল

না ওর। এই মুহূর্তে যেন এ বাড়ী থেকে যেতে পারলেও বাঁচে।

সে রাত্রিটা ভাল করে কথা বলতে পারল না ও। কাউকে কিছু বললও না।

কাল সকালে এখান থেকে যেতে পারলে সে বাঁচে।

যেতে হোল। বাপের বাড়ি এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, ভাবল আজ রাত্রে এখানে ওকে জিজ্ঞেস করবে সব, কিন্তু সে সুযোগ আর জীবনে মিলল না, দুপুরের আগেই তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল বাড়ীতে।

কিছুই ও বুঝল না। শুধু দেখল ওর বাবা এসে ওর স্বামীর হাতটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আর চীৎকার করে বলছে—জান তোমায় আমি খুন করে ফেলতে পারি, তুমি এমন জানোয়ার!

ওর স্বামী শান্ত চোখদুটি তুলে তাকাল—কি বলছেন আপনি?

ওর মা বললে—আবার কথা বলছ, বেরোও এ বাড়ী থেকে।

মানুষটার মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

—তুমি এক বউ ঘরে থাকতে আমার মেয়েকে বিয়ে করেছ! বেরোও এখুনী।

ও শুধু বললে—কে বললে আপনাদের?

মা উত্তর দিলেন—আমার ঝি বললে ও সব শুনে এসেছে।

ও তেমনি শান্তস্বরেই বললে—আপনার ঝি মিছে কথা বলেছে। সব কথা সে জানে না।

—কি সব কথা শুনি?

—আপনাদের বলব না। আপনার মেয়ের কাছে বলতে পারি। সে আমার স্ত্রী।

মা জ্বলে উঠল—স্ত্রী। আমার মেয়ে তোমার কেউ নয়। তুমি বেরিয়ে যাও।

অমলা পাশেই ছিল। সামনে আসতেই ওর মা অমলার শাঁখা দুটো পট পট করে ভেঙে ফেললে, আঁচল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছিয়ে দিলে।

—আজ থেকে জানব আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি।

মানুষটি অমলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, কি জন্যে অপেক্ষা করেছিল কে জানে!

অমলা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কাঁপতে লাগল।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ও। আর কখনও আসেনি।

তারপর? শকুন্তলা রায় মনে মনে হাসে। তারপর [illegible]

আর যোগাযোগ আছে! ব্যাপারটা বুঝতে অমলার দুএক বছর কেটে গেল। এর ভেতর একখানি চিঠি এসেছিল ওর নামে, চিঠিটায় কি লেখা ছিল ও আজও জানে না। ওর মা চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছিল। খবরটা দিয়েছিল ওকে সেই বুড়ি ঝি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়েছিল যে চিঠিটা এসেছিল তার স্বামীর কাছ থেকেই।

তারপরের কাহিনীটা আর ভাবতে ইচ্ছে হয় না। কি করে অমলা দিন দিন স্বাধীনা হয়ে উঠল। নিজের খুসীমত চলতে সুরু করল, সে আরেক জীবন। মা বাবা কিছু বলতে পারত না। ও নিজের খুসীমতই চলত, ধীরে ধীরে ছায়াচিত্রেও অভিনয় সুরু করল। অমলা তখন হলো শকুন্তলা রায়। যশ আর অর্থে বনিয়াদ গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। বহু পুরুষের নোনা চোখের জল পড়ল ওকে ভালবেসে, কিন্তু ও আর কাউকে ভালবাসল না। পুরুষগুলোকে একটু একটু করে জ্বালিয়ে আরাম পেত শুধু। ভারী আরাম পেত। জ্বালাত আর হাসত মনে মনে।

এ সব শকুন্তলা রায়ের কাহিনী। অমলার নয়।

আজ বহুকাল পরে শকুন্তলা রায় চিঠি পেল। অমলার চিঠি। কি জবাব দেবে এর? চিঠিটি আবার পড়ে ও—"জীবনে এ অনুশোচনার বুঝি আর শেষ নেই। অপরাধ যে করিনি, এই কথাটাই আজ পর্যন্ত জানাতে পারলুম না। এইটেই যেন অপরাধ হয়ে গেল। আজীবন মনে মনে জ্বলে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে এ দেহটাও আর বেশীদিন থাকবে না—"

থেমে যায় শকুন্তলা রায়।

দেহটাও বেশীদিন থাকবে না! সেই শান্ত মানুষটি। মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে।

একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে ও।

গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

নীচে নেমে আসে। কলমটা নিয়ে বসে। উত্তর তাকে দিতে হবে। নিশ্চয়ই দিতে হবে।

"আপনার স্ত্রী অমলার মৃত্যু হয়েছে, বহুকাল আগে।"

থামে শকুন্তলা রায়। চোখদুটো মুছে নেয়। আবার লেখে।

"আজ শকুন্তলার কাছ থেকে আপনি কোন সান্ত্বনা পাবেন না। বৃথা আশায় থাকবেন না। নমস্কারান্তে ইতি শকুন্তলা রায়।"

বার বার চোখদুটো মুছতে হয়।

থাক ঠিকানাটা কালই লিখবো। লিখতে গেলেই ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। বার বার।

অতুল দত্ত

গত কয়েক সপ্তাহ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্বের মানুষ "হাতে গড়া চাঁদ" দেখিবার জন্য কৌতুহলী দৃষ্টিতে মহাশূন্যের দিকে তাকাইয়াছে, কখনও মধ্যপ্রাচ্যে রণদুন্দুভির চাপা শব্দ কান পাতিয়া শুনিয়াছে; কখনও দৃষ্টি ফিরাইয়াছে পশ্চিম জার্ম্মানীর দিকে; কখনও ফ্রান্সে, কখনও তুরস্কে।

রুশিয়ার "হাতে গড়া চাঁদ"—

গত ৬ই অক্টোবর বিশ্বের মানুষ সবিস্ময়ে শুনিল—সোভিয়েট রুশিয়া রকেটের সাহায্যে আকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করিয়াছে; উহা পাঁচ শত ষাট মাইল উর্দ্ধে ঘণ্টায় সত্তর হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, প্রতি পঁচানব্বই মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। উপগ্রহটির ব্যাস তেইশ ইঞ্চি, ওজন এক শত তিরাশী পাউণ্ড। বিজ্ঞান জগতের বহু কালের সাধনার ফল এই কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাশূন্যের পথে চন্দ্রে এবং সম্ভব হইলে মঙ্গলগ্রহে মানুষের যাওয়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষামূলক তৎপরতা চালাইতেছিলেন। সোভিয়েট রুশিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্ব্বপ্রথম সে পরীক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইল; এই ভাবে পরবর্ত্তীকালে আরও তথ্য সংগৃহীত হইবার পর রকেটের সাহায্যে মানুষের চন্দ্রে পৌঁছান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

রুশিয়ার এই সাফল্যের সহিত সমরায়োজনের পরোক্ষ সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ, এই সাফল্য সমরায়োজনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে, এবং এই বিষয়ে রুশিয়ার অগ্রগামিতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মার্কিণ বিজ্ঞানীরা বলেন—রুশ উপগ্রহটি নিক্ষেপের জন্য উহার প্রতি পাউণ্ডে এক হাজার পাউণ্ড করিয়া রকেট্ লাগিয়াছে; সুতরাং, এক শত তিরাশী পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ করিতে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড রকেট প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিণ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা যে "প্রজেক্ট ভ্যানগার্ড রকেট" প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রুশিয়ার রকেটের শক্তি নাকি আট গুণ বেশী। গত অগাষ্ট মাসে রুশিয়া রকেটের সাহায্যে পাঁচ হাজার মাইল দূরে হাইড্রোজেন্ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। তখন শক্তিশালী রকেট নির্ম্মাণে রুশিয়ার যে দক্ষতা প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার উপগ্রহ নিক্ষেপের সামর্থ্যে। এখন সোভিয়েট রুশিয়া হইতে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে রকেট এবং প্রয়োজন হইলে রকেটের সাহায্যে হাইড্রোজেন্ অস্ত্র নিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব। এই নূতন শক্তি রণনীতিতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতেছে, যে যুগে মঃ ক্রুশ্চেভের ভাষায়, "জঙ্গী-বিমান ও বোমারু বিমান মিউজিয়ামে পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

রকেট-যুগের সূচনার প্রধান কথা এই—যুদ্ধোত্তরকালে দুইটি বিরুদ্ধ-শিবিরের অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতায় এটম্-বোমার পর হাইড্রোজেন্ বোমা এবং তাহার পর এই রকেট্ নির্ম্মাণে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইল যে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও সঙ্গতি কাহারও একচেটিয়া নহে। রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে হাইড্রোজেন অস্ত্র নিক্ষেপে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিপন্ন হওয়ায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একটি বিশেষ সামরিক সুবিধা নষ্ট হইল। তাঁহারা কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে ঘাঁটী সাজাইয়াছেন; যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র এই সব ঘাঁটী হইতে ষ্ট্রাটেজিক বোমা বর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিশেষ সামরিক সুবিধায় তাঁহারা এখন বঞ্চিত হইলেন। এত কালের আয়োজন এইভাবে পণ্ডশ্রম প্রতিপন্ন হওয়ায় এখন তাঁহা-দিগকে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। অবশ্য, রকেট নির্ম্মাণে রুশিয়ার অগ্রগামিতা চিরস্থায়ী হইবে না নিশ্চয়ই: পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অধিকতর সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন কোনও অস্ত্র বা আক্রমণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিবেন; রুশিয়া আবার পাল্টা আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হইবে এবং সে চেষ্টায় সফলকামও হইবে। বস্তুতঃ, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কোনও পক্ষকে পরাজিত করা যে সম্ভব নয়, এই বাস্তব সত্য মানিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, কোনও পক্ষেরই তাহা মানিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নূতন আয়োজন—

একমাত্র অস্ত্রশক্তির (Position of strength) দ্বারাই কম্যুনিষ্ট পক্ষকে নতি স্বীকার করানো সম্ভব—আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই মূলনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। রকেট নির্ম্মাণে রুশিয়ার অগ্রবর্ত্তিতা প্রতিপন্ন হওয়ায় এই নীতি প্রচণ্ড আঘাত খাইল। ইতিপূর্ব্বে রুশিয়া যখন এটম্ বোমা নির্ম্মাণ করে, তখন আমেরিকার সান্ত্বনা ছিল -নির্ম্মিত এটম্ বোমার সংখ্যা তাহার বেশী; হাইড্রোজেন্ বোমা রুশিয়ায় প্রস্তুত হওয়ায় মনে করা গিয়াছিল যে, এই বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে রুশিয়ার অনেক সময় লাগিবে। সর্ব্বোপরি, রুশিয়ার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটী হইতে আক্রমণ চালাইবার বিশেষ সুবিধা মিত্রপক্ষের। কিন্তু রকেট নির্ম্মাণের ব্যাপারে রুশিয়ার অগ্র-

গামিতা এত নির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট যে এবার আর কোনও সান্ত্বনা নাই ; পূর্ব্বের সকল প্রাধান্য এবার ম্লান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং position of strengthএর নীতি এবার বিপন্ন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য নূতন আয়োজন করিতেছেন।

অক্টোবর মাসের শেষভাগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্‌ এবং অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সেক্রেটারী-জেনারেল মঃ হেন্‌রী স্প্যাক্‌ ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত তাঁহাদের আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর আমেরিকা বৃটেনের সহিত এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির সহিত আণবিক অস্ত্রের গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করিবে ; প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আমেরিকার আণবিক আইন সংশোধনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইবেন। পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিগুলির সহিত আণবিক অস্ত্রের গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "ন্যাটোর" বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যোগ দিতে পারেন। মিত্র-শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র বৃটেনই আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে ; কাজেই, আমেরিকার সহিত আণবিক তথ্যের আদান-প্রদানে আপাততঃ সে-ই সর্ব্বাধিক উপকৃত হইবে।

আমেরিকার নিকট হইতে আণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য পাইবার জন্য বৃটেনের আগ্রহ বহু দিনের। প্রথমে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিলের মধ্যে আণবিক তথ্য সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল ; ট্রুম্যান ও এট্‌লির আমলেও সে ব্যবস্থা কিছু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর ১৯৪৬ সালে আমেরিকায় ম্যাক্‌-ম্যাহন্‌ আইনে আণবিক তথ্যের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী কালে বৈজ্ঞানিক ফুস্‌ অবাঞ্ছিত শক্তিকে আণবিক তথ্য জানাইবার অপরাধে বৃটেনে দণ্ডিত হওয়ায় আণবিক তথ্য গোপন রাখার কঠোরতা আমেরিকায় আরও বাড়ে। বৃটেন এই গোপনীয়তায় প্রথম হইতেই অত্যন্ত অপ্রসন্ন। ১৯৪৯ সালে "ন্যাটো" গঠিত হইল, বৃটেনে ন্যাটোর ঘাঁটি স্থাপিত হইল, মার্কিণ সৈন্যও আসিল। কিন্তু আণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য অতলান্তিকের অপর পারে ম্যাক-ম্যাহন্‌ আইনের শক্তি দড়িতে বন্তাবন্দী হইয়াই রহিল। ১৯৫৩ সালে লণ্ডন 'টাইম্‌সের' খেদোক্তি, "The Western Allies are Jambling with their safety. An alliance which refuses, for whatever reason, to pool all its knowledge about new and prodigious weapons ties one hand behind its back. ইহার পর ১৯৫৪ সালে আণবিক শক্তি আইনের কিছু সংশোধন হয় ; এবং 'ন্যাটোর' সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে আণবিক তথ্য জানাইবার এক পরিকল্পনা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে আণবিক অস্ত্র সঞ্চালনে সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং আণবিক কামান চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৫ সালে জুন মাসে আণবিক তথ্য সম্পর্কে বৃটেনের সহিত আমেরিকার প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বৃটেনকে জানাইবার ব্যবস্থা হয়। তখন 'টাইম্‌স্‌' লেখেন, "Evidently the new agreements will widen valu-ably the general area of co-operation iu atomic process for peaceful industry and research. And co-operation will extend to defence against the effects of atomic weapons. But the weapons themselves are not included. So persists, in its essentials, the split which has caused the crucial tools of modern warfare—and the crucial deterrents against war being waged—to be developed in isolation on the two sides of the Atlantic…" (16. 6. 55) এত কাল পরে রুশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহের কল্যাণে, বৃটেনের সমরকামী মহলের দীর্ঘকালের ক্ষোভ হয়ত শেষ হইবে ; এবার ম্যাক্‌-ম্যাহন্‌ আইনের সংশোধন হইলে আণবিক তথ্য সম্পর্কে বৃটেন্‌ ও আমেরিকার মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থাই হইবে। আণবিক তথ্যের আদান-প্রদানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় কতদূর অগ্রসর হইবেন, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে, সমরায়োজনের ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে একটি নূতন পর্য্যায়। আমেরিকার মিত্রশক্তি ইহাতে সমরায়োজনে নূতন মর্য্যাদালাভ করিবে। এত দিন তাহারা ছিল সম্পূর্ণ গৌণ ; প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল দুইটি রাষ্ট্রের—সোভিয়েট রুশিয়ার ও আমেরিকার। এখন এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে ; সমগ্রভাবে দুইটি শিবির পরস্পরের মুখোমুখী হইবে।

মধ্য-প্রাচ্যে ঘনঘটা—

গত অক্টোবর মাসে রুশিয়ার চীৎকারে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র বিশেষ-ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। রুশিয়ার পক্ষ হইতে চীৎকার করিয়া সারা বিশ্বকে জানান হয় যে, তুরস্ক সীরিয়াকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে ; তাহাকে প্ররোচনা দিতেছে আমেরিকা। সীরিয়াও তুর্কি-সীরিয়ান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশে আতঙ্ক প্রকাশ করিতে থাকে এবং সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সীরিয়া-মিশর সামরিক চুক্তি অনুসারে মিশরীয় সেনাবাহিনী আসে সীরিয়ায়। বস্তুতঃ, তুরস্ক-সিরিয়া বিরোধ হইতে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। শেষপর্য্যন্ত বিষয়টি জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে জোর আলোচনার পর আপাততঃ প্রসঙ্গটি চাপা পড়িয়াছে।

তুর্কি-সিরিয়া বিরোধ সম্পর্কে রুশিয়ার এই চীৎকারের বাস্তব ভিত্তি কতখানি তাহা বলা শক্ত। তবে ইহার কূটনৈতিক কারণ খুবই স্পষ্ট। গত আগষ্ট মাসে সীরিয়ার সহিত অর্থনৈতিক চুক্তি এবং সীরিয়ার প্রধান সেনাপতির পদে জেনারল বিজরির নিয়োগকে উপলক্ষ করিয়া

মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ মিঃ লয় হেণ্ডাস ন সীরিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির দরজায় দরজায় ঘুরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহারা সীরিয়ার আক্রমণাশঙ্কায় একেবারে কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সুপারিশ অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে অস্ত্র প্রেরণের স্বাভাবিক গোপনতা পরিহার করিয়া বিমান-ভর্ত্তি মার্কিণ অস্ত্র জর্ডানে পাঠানো হয়; ঢাক পিটাইয়া শোনান হয়—এই জরুরী ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিণ অস্ত্র ইরাকে, লেবাননে ও তুরস্কেও পৌঁছিবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—সিরিয়া সম্পর্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির এই আতঙ্কের কথা তাহারা নিজেরাই অস্বীকার করিল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সীরিয়ার আমন্ত্রণে রাজা সৌদ ও ইরাকের প্রধান মন্ত্রী দামাস্কাসে আসিলেন। দামাস্কাসের এই বৈঠকে লেবাননের রাজধানী বেইরুৎ, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ্, এমন কি জর্ডানের রাজধানী আম্মান হইতে এই মর্ম্মে বাণী আসিল যে, তাহারা কেহই সীরিয়ার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত নয়। অক্টোবর মাসের প্রথমে সৌদী আরবের প্রতিনিধি আহম্মদ শুকেরী জাতিসঙ্ঘে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন—সীরিয়ার সামরিক শক্তির সংগঠনে কোনও আরব রাষ্ট্রের বিপদ ঘটে নাই; তুরস্কের বিরুদ্ধে সীরিয়ার কোনও দুরভিসন্ধি নাই; কে সিরিয়ায় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে, আর কে থাকিবে না, তাহা সিরিয়ার নিজস্ব ব্যাপার, অন্যের তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বাগদাদ্ চুক্তি জোটের একমাত্র আরবরাষ্ট্র ইরাকের প্রতিনিধি ডাঃ মুসা এল শাবান্দর বলিলেন—কতকগুলি শক্তি তাহাদের "নারকীয় অভিসন্ধি" সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে কমুনিষ্ট আশঙ্কার ধুয়া তুলিয়াছে; আরব জগতে কোথাও কমুনিজম্ নাই। স্বভাবতঃ, অগাষ্ট মাসে যাহারা সিরিয়া সম্পর্কে চীৎকার করিয়াছিল, তাহাদের মুখে চুণ-কালি পড়িয়া গেল। যে লণ্ডন 'টাইমস্' অগাষ্ট মাসে লিখিয়াছিলেন, "Syria's rulers are··· forcing Communism on a country which has no common frontier with Russia or China" সেই 'টাইমস্' পরে লিখিলেন, "The···lesson arising out of the story of past month is not to shout too much or too soon about a danger······"

সিরিয়ার ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে বড় রকমের কূটনৈতিক বিজয়; তাহাদের প্রত্যেকটি উক্তিতে সিরিয়ার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার আচরণ সমর্থন লাভ করিয়াছে। এতখানি কূটনৈতিক সাফল্য হয়ত সোভিয়েট রাষ্ট্র-নায়কদের অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁহারা এই সাফল্যের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সোভিয়েট-বিরোধী উত্তর অতলান্তিক সামরিক জোট (স্তাটো) ও বাগদাদ্ চুক্তি জোটের সভ্য তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রচার করা, এবং তাহার বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা সোভিয়েট রুশিয়ার কূটনৈতিক স্বার্থ। আমেরিকার বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সচেতন করিয়া তুলিবার এই সুযোগও সোভিয়েট রুশিয়া পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াছে। সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মার্কিণ বহু বাহিনীর আনা-গোনা এই সুযোগ বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশ্য, সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রচার খুব সম্ভব একবারে বাস্তবতার ভিত্তিবিহীন নহে। সিরিয়া হইতে নির্ব্বাসিত দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা ইস্তাম্বুলে ভিড় করিয়াছেন। তুর্কি-মার্কিণ সামরিক ছত্রের আড়ালে তাহাদিগকে দামাস্কাসে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্র হয়ত সত্যই তুরস্কে চলিতেছিল। এই ধরণের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছিল বলিয়া সিরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট অভিযোগ করেন: সিরিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট (বর্ত্তমানে নির্ব্বাসিত) শিশ-কালির সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে দামাস্কাসের মার্কিণ দূতাবাসের তিনজন কর্ম্মচারী তখন বহিষ্কৃত হন। ইস্তাম্বুলে এই ধরণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই হয়ত সোভিয়েট রুশিয়ার চীৎকার। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে তুরস্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছিল,—গুলী চলিলে রকেটও চলিবে, যুদ্ধ বাধিলে একদিনে তুরস্ক নিশ্চিহ্ন হইবে ইত্যাদি। এই ধমকানির দ্বারা রুশিয়া বলিতে চাহিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে তৃতীয় মহা-যুদ্ধের ঝুঁকি লইয়া সে সিরিয়ার বর্ত্তমান বামপন্থী গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে। সিরিয়ায় দক্ষিণপন্থী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অতিরিক্ত কিছু তুরস্কে হইতেছিল বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের রাজ-নীতিক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা তুরস্ককে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে প্ররোচিত করিবে—ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন—

গত ১লা অক্টোবর ফ্রান্সে বুর্জ্জোয়া-ম্যানরী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আল্‌জেরিয়া যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করায় মলে-মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বুর্জ্জোয়া-ম্যানরী গভর্ণমেণ্ট আল্‌জেরিয়া সম্পর্কে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করায় গদি হারাইয়াছেন। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী প্রতিনিধিরা একযোগে তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বুর্জ্জোয়া-ম্যানরীর খসড়া প্রস্তাবে প্রথমে আল্‌জেরিয়ায় একজন আরব-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের কথা ছিল। দক্ষিণপন্থীদের আপত্তিতে সে পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। পরে তাঁহারা সমগ্র আল্‌জেরিয়ার জন্য পার্লামেণ্ট ও শাসন-পরিষদ গঠনেও আপত্তি করেন। আল্‌জেরিয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট নিয়োগে যেমন, তেমনি সর্ব্ব-আল্‌জেরিয়া পার্লামেণ্ট ও শাসন-পরিষদ গঠনেও নাকি এই রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃতির আভাস ছিল এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইবার আশঙ্কা দেখা দিত। পক্ষান্তরে, বামপন্থীরা শাসন-পরিষদের ক্ষমতাহীনতার জন্য আপত্তি করেন। এই-ভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি কারণে বামে ও দক্ষিণে মিলন ঘটে এবং শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের সঙ্গে ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিতেছে; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশময় পুনঃ পুনঃ শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ইহারও পরোক্ষ কারণ আল্‌জেরিয়া। "The fact is that the

mass of the French people are only now beginning to feel the pinch of a campaign that has become a long and drawn-out colonial war.···Algeria took the place of Indo-China, the residue of dollars provided by the Americans for one war helped the French to carry on the next. But now the dollar flow has dried up, the foreign exchange reserves have been taken away, and the position has become highly uncomfortable" (London 'Economist') কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা আল্জেরিয়া সম্পর্কে তাহাদের জিদ্ কিছুতেই ছাড়িবে না। বুর্জ্জোয়া-ম্যানরী মন্ত্রিমণ্ডল আল্জেরিয়ার শাসন-সংস্কার সম্পর্কে যে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। জাতীয়তাবাদী আল্জেরিয়ানরা কিছুতেই এই ব্যবস্থায় সম্মত হইত না; কারণ আল্জেরিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃতির যে মূল দাবী তাহারা প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছে, তাহা একেবারেই অস্বীকার করা হয়; খসড়া প্রস্তাবের মুখবন্ধে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা হয়—Algeria is and must always be French. এই প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্রাজ্যবাদী গোঁজামিলও ঝুঁনা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সহ্য করিতে পারিল না। সাহারা মরুভূমিতে তৈলের সন্ধান পাওয়াতে সাম্রাজ্যবাদীদের অনমনীয়তা আরও বাড়িয়াছে; এমন লোভনীয় শিকার সম্মুখে রাখিয়া আল্জেরিয়া হইতে সরিয়া আসিতে তাহারা কিছুতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে, তৈল নিষ্কাষণের বিপুল ব্যয় সঙ্কুলনের ক্ষমতা যদি ফরাসী অর্থনীতির হয়ও, তাহা হইলেও সাহারার তৈল ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত আনিতে হইলে কোনও না কোনও আরব রাষ্ট্রের মধ্য দিয়াই আনিতে হইবে। আল্জেরিয়ার সহিত আচরণে সমগ্র আরব জগতকে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যেভাবে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাহাতে টিউনিসিয়া, আল্জেরিয়া, মরক্কো—কোনও আরব রাজ্যের মধ্যেই ফরাসী পাইপ্‌লাইন নিরাপদ হইবে না।

৩।১১।৫৭
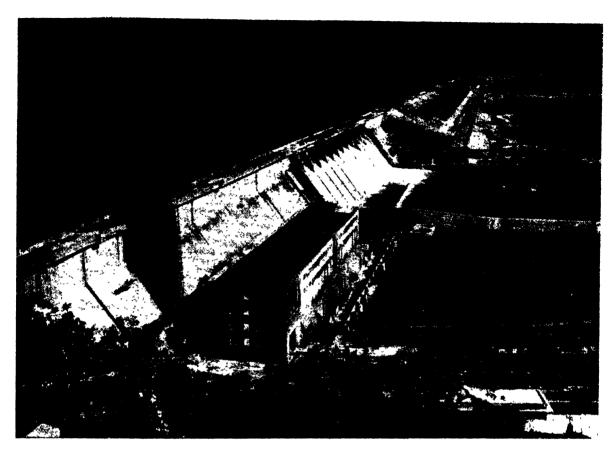
উড়িষ্যার আশা

রাজ্যসভার বিগত অধিবেশনে সেচ্ ও বিদ্যুত মন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাতিল জানান যে, হীরাকুদ পরিকল্পনায় গত মার্চ মাস (১৯৫৭) পর্য্যন্ত ৮৯,৪৮৩ একর জমিতে জলসেচ করা হয়েছে। "হীরাকুদ দ্বীপে" (ইহার উপর বাঁধটি অবস্থিত) একটি পার্ক ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে হীরাকুদ তাহার অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রথমে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই বাঁধ নির্মিত হলেও এখন ইহা উড়িষ্যাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

হীরাকুদের জলাধারটিতে গত বৎসরে জল ৬১০ আর. এল. (রিজর্ভেয়ার লেভেল) পর্য্যন্ত উঠেছিল। এবারে জল ৬৩০ আর. এল. উঠেছে। জলাধারটিতে ৬৭ লক্ষ একর—ফুট জল ধরতে পারে। সম্বলপুর বোলাঙ্গীর জেলায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে এই জলাধার হতে জল দেওয়া হবে। ইহা মহানদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করবে। বাঁধের নিকটস্থ পাওয়ার-হাউসে প্রথম পর্য্যায়ে ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হবে।

হীরাকুদ বাঁধটি তিন মাইল দীর্ঘ। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৭) প্রধান মন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করেন। এই বাঁধ উড়িষ্যাবাসীদের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করছে।

এখানে হীরাকুদ বাঁধ ও জলাধারের সাধারণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

নিখিল সেন

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

াদেশের পুনর্বাসন নিয়ামক (কণ্ট্রোলার) নিখিল সেন অকস্মাৎ াক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবন কথা লিখিবার মত বয়স তাঁর । যদিও কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মাত্র সাত আট বছরের সে তাঁর। তাঁর জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয়ে ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসে

নিখিল সেন

শে জুলাই ১৯০৪)। মুর্শিদাবাদ ইসলামপুরের জমীদার চারুকৃষ্ণ দার তাঁর মাতামহ ছিলেন। পিতামহ ছিলেন জয়পুর রাজ্যের ন্ত্রী—২৪ পরগণা সোদপুর নাটাগড়ের সংসার চন্দ্র সেন। পিতা ার স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র সেন (রামবাবু)।

তিনি দিল্লীর সেন্ট-ষ্টীফেন কলেজে কিছুদিন পড়ার পর ১৯২২ সালে বিলাত যান। সেখানে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯২৯ সালে তিনি দেশে ফিরে এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারে কাজ নেন। সেখানে পাঁচ বছর কাজ করার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪২ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন সংগঠনে (I. R. O.) নিয়ম বিধায়ক অফিসার হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও তারপরেও মধ্যপ্রাচ্য, ইরাণ ও অন্যত্র এবং ইটালী, রোম ও জার্মানীতে ১৯৫০ সাল অবধি কাজ করেন এবং উচ্চপদে উন্নীত হ'ন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগের বিপর্য্যয়ের পর ১৯৫০ সালে তাঁর কর্মখ্যাতি পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগে সেনকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ গ্রহণ করতে বলেন। ১৯৫০ সালে তিনি দিল্লীতে আসেন। তারপর তাঁকে উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগের কণ্ট্রোলার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সেই অবধি তাঁর কর্মক্ষেত্র ও কর্মজীবন বাংলাদেশেই ছিল। সুনিয়মিত কাজ করায় ক্ষমতা ও দক্ষতা তাঁর ছিল। সাহস, সৌজন্য, নিরহঙ্কার মধুর—ব্যবহারের জন্য কি কর্মক্ষেত্রে কি বন্ধু সমাজে—কি আত্মীয় দলে সমান প্রিয় ছিলেন। উদ্বাস্তু নরনারীর সমস্ত অনুযোগ অভিযোগ তিনি পরম ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন এবং মমতা ও মর্যাদার সহিত বিচার করতেন। ধৈর্য-চ্যুতি বা বিরাগ তাঁর কখনো দেখা যেত না। বহুক্ষেত্রে তাদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য ও অন্য সাহায্য করেছেন। অফিসার হিসাবে তাঁর কাছে কেউ অহঙ্কৃত বা উদ্ধত ব্যবহার পায় নি। তাদের যে অসুবিধা তিনি নিজে মোচন করতে না পারতেন তার জন্য তিনি অন্যের কাছে যেতে বা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্য, চিত্রকলা, নানা শিল্পকলা ও সঙ্গীতে অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল। তাঁর আবাল্য সঞ্চিত নানা বিষয়ের সাহিত্য, শিল্প ও চিত্র সংগ্রহে তাঁর ঐ গোপন গভীর রসিক ও ভাবুক অন্তরের পরিচয় ছড়ানো রয়েছে।

অভিবাদন—

আমরা এবার মহাপূজার পূর্বেই কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ প্রকাশ করিয়া সকলের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহার দীর্ঘদিন পরে অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই অবসরে আমরা সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও লেখক বন্ধুবান্ধবকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করি। বাংলার মহাপূজার পর বিজয়া—আমাদের জাতীয় উৎসব। স্বাধীন বাংলায় সকল কষ্ট, অভাব ও অসুবিধা সত্বেও মানুষ যেমন জগজ্জননীর পূজা করিয়াছে, তেমনই পূজার পর সর্বত্র বিজয়া-সম্মিলন অনুষ্ঠান করিয়া পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। এই সম্মিলন যেন আমাদের মন হইতে সকল বিবাদ-বিভেদ দূর করিয়া কর্মক্ষেত্রে—সমবেত চেষ্টার ফলে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করে, আজ সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়—

খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক ও সঙ্গীত-সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডীচেরী আশ্রম ছাড়িয়া বর্তমানে পুনায় এক আশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতির কয়েকদিন বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় ও তিনি প্রত্যেক সভায় ভজন গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। 'ভারতবর্ষে'র সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ট—তাঁহার পিতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা—দিলীপকুমারও তাঁহার রচনা দ্বারা সারা জীবন 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি একদিন তিনি ভারতবর্ষ কার্য্যালয়েও পদার্পণ করিয়াছিলেন। গত ২০শে অক্টোবর রবিবার কলিকাতা নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁহাকে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর উপাধ্যক্ষ আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ঐ দিন তাঁহাকে এক স্মারক গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের নাম 'দি গোলেন বুক অব দিলীপকুমার রায়।' সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি তাঁহার পিতার রচিত 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গানটি গাহিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে এক উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতির সভায় অধ্যক্ষ ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক 'স্তুতি গাথা' দিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন। শিক্ষা সমিতিতে দিলীপকুমারের কণ্ঠে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গান শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অসুস্থ থাকায় কালীপূজার পরদিন সন্ধ্যায় দিলীপকুমার তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। কয় দিন কলিকাতা সহরের সর্বত্র তাঁহার অপূর্ব্ব-কণ্ঠস্বর ও অলোকসামান্য সুর তানলয়ের কথা সহরবাসীর আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। আমরা 'ভারতবর্ষে'র পক্ষ হইতে তাঁহার সুদীর্ঘ ও উন্নততর জীবন কামনা করি—কারণ তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিতে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত মনে করিবে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা—

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভের পর তাহার রাষ্ট্রভাষা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। গত ২ শত বৎসর কালে ভারতে ধীরে ধীরে ইংরাজিই রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের সকল প্রদেশে (বর্তমান নাম রাষ্ট্র) অধিকাংশ লোক —বিশেষ করিয়া স্কুলে-পড়া সব লোক ইংরাজি বলিতে বা বুঝিতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ভারতের একদল লোক হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার পক্ষপাতী। হিন্দী ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহা কেহ জানে না বা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

৪।৫টি প্রদেশে নাকি হিন্দী ভাষা প্রচলিত আছে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা পূর্ব পাঞ্জাব প্রতিটি প্রদেশে একরূপ হিন্দী চলে না—প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাই স্বতন্ত্র। অথচ ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসীদের সংখ্যা রাজধানী দিল্লীতে সংখ্যায় অধিক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে তাঁহাদের অধিকাংশ প্রতিনিধি স্থানলাভ করায় তাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করিতেছেন। অপরপক্ষে বাংলা, উড়িয়া, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরল, বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের লোক হিন্দী বুঝে না। এ অবস্থায় ঐ সকল স্থানের লোকদিগের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ইংরাজি শুধু সর্বভারতীয় ভাষা নহে, সমগ্র জগতের অধিকাংশ লোক ইংরাজি বুঝে বা জানে। এ অবস্থায় যদি ইংরাজিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তবে বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতবাসী অনেক বেশী সুবিধা পাইবে। ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে না কি ভারতের দাস-মনোভাব প্রকাশিত হইবে—অনেকে এই কথা বলিয়া ইংরাজি বর্জন করিতে চাহেন। কিন্তু হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ নহে, হিন্দী ভাষায় ভাল সাহিত্য নাই, হিন্দী ভাষা ভারতের কিছু অংশের লোক বুঝিলে ও অধিকাংশ লোকের পক্ষে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। এ অবস্থায়, সামান্য মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া, আমরা যদি ইংরাজি ভাষাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখি, তাহা হইলে সকল প্রকারে আমরা উপকৃত হইব। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকার কমিশন বসাইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষা করা উচিত কি না, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায়, ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। ভারতের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিয়া উপায় নাই। তাহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার মত সমৃদ্ধ ও সুললিত ভাষা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয় না। সে জন্য যাহাতে ভারতের অধিকাংশ লোক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ব্যবস্থা ও অর্থব্যয় আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই দেখা যায়, ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজ প্রাদেশিক ভাষা, জগৎবাসীর সহিত পরিচয়ের জন্য ও জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার আহরণের জন্য ইংরাজি ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগের জন্য সংস্কৃত ভাষা—এই তিনটি ভাষা অবশ্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তাহার উপর যদি আবার হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা যে কোন ছাত্রের পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। সে জন্য ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ ইংরাজিকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষপাতী ও সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা বাংলার সকল অধিবাসীকে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীর পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করা হয়, সে জন্যও ভারতবাসী সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করি। ইহার ফলে প্রাদেশিক ভাষা গুলি আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে এবং হিন্দীর মত একটি অপুষ্ট ভাষা অযথা সরকারী সাহায্য লাভ করিয়া লোকের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাঘ্র শিকার—

গত ১৯শে অক্টোবর বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরণজিৎকুমার ঘোষ আই-এ-এস বাঁকুড়া সিমলাপাল রোডে ১১ ও ১২ নং মাইলষ্টোনের মধ্যে পথের উপর একটি ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা ব্যাঘ্রকে মারিয়াছেন। একঘণ্টা পূর্বে বাঘটি এক বাসের উপর লাফাইয়া উঠিতে চেষ্টা করে—সেচবিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারও ঐ পথে আসিবার সময় বাঘটিকে দেখিয়া

ম্যাজিষ্ট্রেট ও নিহত বাঘ

ম্যাজিষ্ট্রেটকে খবর দেন। ঘোষ মহাশয় মাত্র ১৫ গজ দূর হইতে গুলী করিয়া বাঘটিকে হত্যা করেন। পর পর ২টি গুলী খাইয়া বাঘ পড়িয়া যায় ও তিনি সেটিকে মোটরে তুলিয়া লইয়া সহরে ফিরিয়া আসেন। মফঃস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এইভাবে সাহসের সহিত কাজ করিলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে। রাত্রি ৯টার সময় বাঘটি মারা পড়িয়াছে।

—চৌদ্দ—

চা খাওয়া শেষ হলে সত্যজিৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে ছ'টা।

একটু আগেই দুজনে চুপ করে গিয়েছিল। হয়তো একই কথা ভাবছিল এক সঙ্গে। এই ঘরে এম্‌নি ভাবেই কতদিন মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে ওরা। কিন্তু সেদিন চোখের রঙ ছিল আলাদা—জীবনের অন্য একটা অর্থ ছিল। সেদিন সত্যজিৎ মুখার্জি কিংবা বনশ্রী রায়ের কোনো ব্যক্তিরূপ কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। ভাব সেদিন ব্যক্তিত্বকে আড়াল করে রাখত, রেখার চাইতেও বেশি ছিল রঙ। সে বিগত জন্মের কথা।

তখন দেওয়ালে টাঙানো ওই হরিণের মাথাটার ওপর আলো পড়লে—ডাল মেলা শিঙের ছায়া দেওয়ালের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, কেমন যেন রহস্যময় মনে হত; ঘড়ির পেণ্ডুলামের সোনালি রঙটা আরো উজ্জ্বল ছিল—ওর মুহূর্ত গণনা এই ঘরটার হৃৎস্পন্দনের মতো বাজতে থাকত; ম্যাডোনা-ডেল্‌-গ্র্যাণ্ডুকার নকল ছবিটা কৌতূহলভরা জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। আর—

কিন্তু সে অতীত জন্ম। একদিন সহজভাবেই বনশ্রী নিজের হাতে সুতো কেটে দিয়েছিল। কেন কেটে দিয়েছিল বনশ্রীই তা জানে। সেদিন সে-কথা নিয়ে সত্যজিৎ ভাবতে চায়নি—আর আজকে তা জিজ্ঞাসা করবার অর্থই হয় না। এমন কি বনশ্রীর সঙ্গে দেখা না হলে যে শান্ত অনাসক্তিতে মন তলিয়ে থাকত,দেখা হওয়ার পরেও যে তার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে বলে অনুভব করে না সত্যজিৎ। কেবল এক এক টুকরো স্মৃতি। কিন্তু তারা তো বুদ্বুদ।

এখন বোঝা যায় এ ঘরটা পুরোনো হয়ে গেছে। হরিণের শিঙে মাকড়সার জাল। পেণ্ডুলামের শব্দ যান্ত্রিক। মেজের ছেঁড়া কার্পেট চোখে আঘাত দেয়—একটা নেপথ্য দৈন্যের আভাস বয়ে আনে। জি-কে রায় এখন আরো দশজন পেন্‌সন্‌ পাওয়া মানুষের মতোই সাধারণ ভগ্নোদ্যম ব্যক্তিত্ব। বনশ্রী ক্লান্ত হেডমিস্ট্রেস্‌। সত্যজিৎ বিরক্ত মোহমুক্ত অধ্যাপক। অবশ্য কখনো কখনো অলস মুহূর্তে দক্ষিণের জানলা খুলে দেয় পূরবী—কিন্তু সে ও কিছুক্ষণের আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। আর দেড় বছর পরেই পূরবী কোথাও থাকবে না—জীবনে নয়, অসংখ্য নতুন মুখের ভিড়ে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। আরো কিছুদিন পরে পথে-ঘাটে পূরবীকে হঠাৎ দেখলে চিনতেও পারবে না।

কে থাকবে?

সত্যজিৎ শিউরে উঠল একটুখানি। একটা অশুভ ভবিষ্যতের ছাপ। কে থাকবে? সে আর বনশ্রী। এই পুরোনো হয়ে যাওয়া ঘরটার মতো দুটো পুরোনো মন। বৈষয়িক, ব্যবহারিক, সন্দিগ্ধ, স্বার্থপর।

যেন এই মুহূর্তে তারা দুজনেই সেই ভবিষ্যতের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যজিৎ আবার ঘড়ি দেখল।

ঠাণ্ডা চায়ের শেষ অংশটুকুতে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিলে বনশ্রী। তারপর সরিয়ে দিলে পেয়ালাটা।

—ঘন ঘন ঘড়ি দেখছ কেন অমন করে? তাড়া আছে বুঝি?

সত্যজিৎ হাসল।

—ঠিক তাড়া নেই। তবে—

—তবে? টিউশন?—বনশ্রী চোখ তুলে ধরল।

—ওটা তো মাস্টারির অ্যাপেন্‌ডিক্স—নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করল সত্যজিৎ: অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ও বলা যায়। কিন্তু ও পাট আজ নেই। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব ভাবছি।

—বাড়ী সম্পর্কে আজকাল তুমি খুব ডিউটিফুল হয়ে উঠেছ।—বনশ্রীও এবার ক্লিষ্টভাবে হাসল। আর একটা বুদ্বুদ স্মৃতি। ছাত্র জীবনে বাড়ী ফেরার জন্যে অনেকদিনই শেষ বাস ধরতে হয়েছে সত্যজিৎকে। তখন হাত খরচার জন্যে দরাজভাবে টাকা দিতেন শিবশঙ্কর। বই কিনে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়েও কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকত—লাস্ট্‌ বাস মিস্‌ করেও ট্যাক্সি চাপতে অসুবিধে হত না।

বান্ধব জগতে সত্যজিৎ এখন প্রায় নিঃসঙ্গ। সামাজিক পরিচিতির অভাব নেই—কিন্তু চিৎকার করে আড্ডা দেবার মতো অন্তরঙ্গকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সিনেমা এখন বিরক্তিকর। অভ্যাসে বই কেনে—কিন্তু তর্ক করবার লোক নেই বলে নতুন-কেনা সব বই পড়তে হয় না। বাড়ী সম্পর্কে ডিউটিফুল হয়ে নয়—বাইরের আকর্ষণ নেই বলেই ন'টার মধ্যেই সে বাড়ী ফেরে আজকাল। বাইরের নিঃসঙ্গতার চাইতে ঘরের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশী সহনীয়।

আজ অবশ্য তাড়াতাড়ি ফেরবার মানসিক তাগিদটা অন্য কারণে। বীথি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে বলে নয়—খবরটা বাবার কানে গেলে অন্যরকম একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রীতির বুদ্ধির ওপর সত্যজিতের আস্থা নেই। মনে হচ্ছে আজ তার বাড়ীতে একটুখানি পাহারা দেওয়া দরকার। বীথি যদি জামিন পেয়ে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে তা হলে আলাদা কথা। আর তা যদি না হয়—

কিন্তু ও-সব বনশ্রীকে বলে লাভ নেই।

একটু আগেই নিজের অসতর্ক প্রসাধনের জন্যে যে-লজ্জাটা বনশ্রীকে পীড়ন করছিল, সেটা ক্রমশ অর্থহীন বিরক্তির রূপ নিচ্ছিল। বনশ্রী তেমনি দু'চোখ মেলেই তাকিয়ে রইল সত্যজিতের মুখের দিকে—কেবল আস্তে আস্তে ভ্রূদুটো কুঁচকে এল একটুখানি।

—কথা বলছ না যে?

সত্যজিৎ আচ্ছন্নতা থেকে জানাল।

—কী বলব?

বনশ্রীর স্বর চাপা-ঝাঁঝ মিশল।

—সোজাসুজি বলবে, আমি কাজের লোক, খামোকা এ-ভাবে ডেকে আমার সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। ভারী বিরক্তি বোধ করছি।

সত্যজিৎ সচকিত হয়ে উঠল।

—কি ছেলেমানুষি হচ্চে বনি!

বনি! মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে যেতেই দু জনে চমকে উঠল এক সঙ্গে—বিদ্যুৎ খেলল ঘরের ভেতর। কোন্‌খান থেকে কথাটা এমনভাবে ফিরে এল। বনশ্রীর সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে একটা ইংরেজি শব্দের অর্থ যোগ করে নিয়ে ওই নামে মধ্যে মধ্যে ডাকত সত্যজিৎ—যেদিন ইডেন্‌ গার্ডেনের আলো অন্ধকারে হঠাৎ হাতে হাত মিশে যেত—আর ব্যাণ্ড্‌ স্ট্যাণ্ড্‌ থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের মতো গর্জে উঠত মিলিটারী অর্কেস্ট্রা।

বনশ্রী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি আসছি এখুনি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। বোকার মতো তাকিয়ে রইল দেওয়ালের হরিণের মাথাটার দিকে। ডালমেলা সিঙটার ছায়া আবার সেই পুরোনো তাৎপর্যে ভরে উঠতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না মাকড়সার জাল জমেছে তার গায়ে। 'বনি'। কথাটা হঠাৎ অমন করে এসে না পড়লেও পারত। বুদ্বুদ। একটু পরেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু বনশ্রী কি রাগ করল? সে এখন হেড্‌ মিস্ট্রেস্‌—রাগ করা অন্যায় নয়।

অস্বস্তিভরে সত্যজিৎ ভাবতে লাগল: কী করা উচিত এখন? উঠে চলে যাবে? অপমান বোধ করল নাকি বনশ্রী? বিদায় না নিয়ে চলে যাওয়াটাই কি এখন সৌজন্যসম্মত?

ঘড়িটা সমানে মুহূর্ত গুণছে। ক্লান্ত—কী আশ্চর্য্য ক্লান্ত। বনি ডাকটা বড় বেমানান এখন। এখানে।

বনশ্রী ফিরে এল। তার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতি হল সত্যজিতের। যেন এতক্ষণ একটা মুখোস পরে তার সামনে বসে ছিল বনশ্রী—এই মুহূর্তে সেটাকে সে খুলে রেখে এসেছে। একটা সুকঠিন গাম্ভীর্যের বলয় ঘিরে ধরেছে তাকে। ঠিক এমনি চেহারা নিয়েই সে ক্লাসে গ্রামার পড়ায়।

এবার খুব সহজভাবেই বনশ্রী বললে, যে জন্যে ডেকেছিলাম তোমাকে। খুব সংক্ষেপেই সেরে নেব। বেশিক্ষণ আর আটকে রাখবনা।

সত্যজিৎও সহজ হতে চেষ্টা করল। তাদের দুজনেরই বয়স বেড়েছে। জীবনকে তারা দেখেছে, চিনেছে জীবিকাকে। দাঁড়িয়েছে সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের সীমান্তে।

—যত তাড়া আমার ভাবছ, ঠিক ততটা ব্যস্ত আমি নই। তুমিও ব্যস্ত হয়োনা।

—না-না, এম্‌নিতেই তোমার দেরি হয়ে গেছে।—এবার বনশ্রীই দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালো: তোমাকে তো যেতেও হবে অনেক দূরে। নিরুত্তাপ বৈষয়িকভাবে বনশ্রী বললে, একটু স্বার্থের খাতিরেই ডেকেছি।

—বলো।

—একটা গ্রামার আর কম্পোজিশনের বই লিখেছি। তোমাকে একবার রিভিশন করে দিতে হবে!

—তোমার বই আমি রিভিশন করব?—প্রগল্‌ভ সৌজন্যের প্রয়াস করল সত্যজিৎ: এত বিনয় কেন?

—বিনয় নয় সে তুমি নিজেই জানো।—তেম্‌নি বৈষয়িক স্বরেই বনশ্রী বললে, আসছে মাসেই বই প্রেসে যাবে। তুমি দেখে দিতে পারবে দশ বারো দিনের মধ্যে? সময় হবে?

—তোমার জন্যে আজও আমার সময়ের অভাব হয়না—এমনি একটা কথা মুখের কাছে এসেও থমকে গেল সত্যজিতের। না—আর ও-সব বলা যায়না। হয়তো অন্য অর্থ কানে বাজবে বনশ্রীর।

—সময় করে নেব। দাও।

—আজ নয়। কাল বয়ং পাঠিয়ে দেব রীতেনের হাতে। আর শোনো। দুশো টাকা পাবে রিভিশন ফী। আপত্তি আছে তোমার?

. কোনো কারণ ছিলনা। আজ যেখানে দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে, যে ব্যবসায়িকতার পটভূমিতে, যে বৈষয়িকতার মাঝখানে—সেখানে এ-ই স্বাভাবিক। তবু কোথায় একটা খোঁচা লাগল সত্যজিতের।

—সে কি কথা! টাকা দেবে নাকি তুমি?

—বাঃ, বিনা টাকায় খাটিয়ে নেব তোমাকে? তোমার সময়ের, পরিশ্রমের দাম নেই?—বনশ্রীর মুখের কাঠিন্য কোমল হল মুহূর্তের জন্যে—একটুখানি হাসির আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অবশ্য আমাকে নিজে থেকে দিতে হলে হয়তো তোমায় খানিকটা কন্‌সেশন করতে বলতাম। কিন্তু টাকা আমি দেবনা—দেবে পাব্‌লিশার। তা হলে কালই তোমায় একটা একশো টাকার চেক আর কপি পাঠিয়ে দেব।

—টাকার জন্যে এত তাড়া নেই। পরে হলেও চলবে।

বনশ্রী এবার স্পষ্ট করেই হাসল। ব্যবসার জগতে নেমে এসে আবার যেন অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে সে। বললে, টাকাটা পাব্‌লিশারের। একটু সাবধান থাকাই ভালো।

সত্যজিৎও হাসল।

—ঠেকে শিখেছ?

—ঠিক তাই।

কাজের কথা শেষ। এবার ওঠা যেতে পারে। সত্যজিৎ দাঁড়ালো।

—আজ আসি তা হলে।

—এসো।

পেছনে আর একবার ফিরে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সত্যজিৎ। এখন আর পেছন ফিরে তাকানোর কোনো অর্থ হয়না। সেদিন আর নেই।

পথে ঝলমল করছে সন্ধ্যা। কলকাতার চোখে এখন নেশার রঙ। চলতে চলতে সত্যজিতের মনে হল বনশ্রী একবার তাকে ভদ্রতা করেও জিজ্ঞাসা করতে পারত—সে আবার কবে আসবে।

আর ঠিক তখনি চোখে পড়ল দেওয়ালে একটা পোস্টার। সন্ধ্যার আলোয় রক্ত জলছে তাতে। শিক্ষক

ধর্মঘট। লাটভবনের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষটির মাথার চুলগুলো দুপুরের রোদে রুপোর মতো চিকমিক করছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অনন্ত সেনগুপ্ত।

আর বীথি।

একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ সামনের ট্রাম-স্টপটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

* * * *

তাসের আড্ডায় বার বার হেরে যাচ্ছে রীতেন। কিছুতেই মন বসছেনা।

সঙ্গী বিরক্ত হয়ে উঠল।

কী কাণ্ড করছ বলো তো? কী লীড্ দিলে? মাটি করে দিলে শিয়োর গেমটা? হোয়াট্'স্ রং উইথ্ ইউ?

ইয়েস, সাম্থিং রং—অপ্রতিভ ভাবে হাসল রীতেন। হাতের তাসগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, ওয়েল নাই, দ্যাট্‌স্ এনাফ্!

—তার মানে? আর খেলব না?

—নাঃ, মুড্ নেই।

সংক্ষেপে উঠে পড়ল রীতেন। পথে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিজের মোটর বাইকটার সামনে।

গ্রামোফোনে কোথায় বিলিতী প্রেমের গান বাজছে। রীতেনের চেনা। গিল্‌বার্ট।

গ্লোব ট্রটার রীতেন সম্প্রতি মুখার্জি ভিলার ছোট গণ্ডির মধ্যে পাক খাচ্ছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না প্রীতিকে। রিয়্যালি শি ওয়াজ—

আবার কবে যাওয়া যায় মুখার্জি ভিলায়? কী উপায়ে? কিংবা কোনো উপায়েরই দরকার নেই। খুব সহজেই যাওয়া যেতে পারে। গেলে হয়তো কেউ কিছু মনে করবেনা।

দুটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে চলে গেল তার পাশ দিয়ে। একজন যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, কী বললে তার সঙ্গিনীকে, তারপর দুজনেই হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের থুত্‌নিতে হাত দিলে রীতেন।

—এর জন্যে? এই দাড়ির জন্যে?—রাস্তার ওপারে ময়দানের অন্ধকার-মাখা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রীতেন ভাবল: ডু আই লুক কমিক্যাল্? রিয়্যালি কমিক্যাল্?

ক্রমশঃ

এই রাতে

কৃতী সোম

মেঘে মেঘে রাত নেমে এলো,
গায় গান উতলা ডাহুক;
মনের আকাশ ছলোছলো,
আমি বসে ভাবি তব মুখ।
বকুল শাখায় দুটী পাখী
ঘন হয়ে কাঁপে থর থর
বুকে সখী কামনার ঝড়।
ঝুপ ঝুপ্ ঝরে পড়ে জল,
টুপটাপ ঝরে কালোরাত;
চোখে ভাসে দেহ ঢল ঢল,
হাতে চাই দুটী সোনা-হাত।

তোমাতেই কামনার শেষ,
এই রাতে তাই তোমা চাই;
দাও সখী নিবিড় আশ্লেষ,
তুমি তো নিকটে আজ নাই।
এই রাত, এই কৃষ্ণাতিথি,
আজ চাই তব উপস্থিতি।

প্যাট ও প্যাঁচ

শ্রী'শ'—

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অধুনাতন নাটকগুলির অভিনয় রজনীর সংখ্যাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। এই কিছুদিন আগেই "শ্রীকান্ত" নাটকের দুই শততম অভিনয় উদ্‌যাপিত হয়েছে, আর এই উপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

বাংলার রঙ্গমঞ্চ যে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চলচ্চিত্রের কাছে পরাজিত হয় নি, "শ্রীকান্ত" ও অন্যান্য কয়েকটি নাটকের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্রের প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় পাল্লা দিতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চকেও যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক হতে হয়েছে—আর সুখের বিষয় বাংলার রঙ্গমঞ্চের এই উন্নতি অব্যাহত গতিতেই এগিয়ে চলছে। তাই আশা হয় বাংলার রঙ্গমঞ্চ, বাংলার নাটক, বাংলার নট-নটীগণ একদিন শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর নাট্য-রসিক সমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ করতে পারবে। আমরা ষ্টার ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ ও শিল্পীবৃন্দকে তাঁহাদের সাফল্যে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

*　*　*　*

ভেনিস চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মানে ভূষিত বিশ্ববিখ্যাত চিত্র "অপরাজিত"-র পরিচালক শ্রীসত্যজিত রায়কে "গোল্ডেন লায়ন্" পুরস্কার প্রদানের চিত্র সারা ইতালীতে টেলিভিসনের মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

"অপরাজিত"-র জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ছবিটিকে সারা ইউরোপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যারিসে শীঘ্রই "অপরাজিত"কে ফ্রেঞ্চ সাব্-টাইটলসহ দেখান হবে। লণ্ডনে ফ্রেঞ্চ সাব্-টাইটল্ সহ ইতিমধ্যেই ছবিটি দেখান হয়েছে। আর ইংরাজি সাব্-টাইটল্ দিয়ে এই চিত্রটি শীঘ্রই ছয় সপ্তাহের জন্য অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একাডেমি থিয়েটর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

*　*　*　*

"অগ্রদূত চিত্র"-র গেভাকলারে তোলা ছবি "পথে হল দেরী"র মুক্তি আসন্ন। ছবিটিতে বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় সুচিত্রা-উত্তমকে ছাড়াও ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী, ভারতী প্রভৃতিকেও দেখা যাবে।

*　*　*　*

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার অভিনীত আর একটি ছবি—"জীবন তৃষ্ণা"-র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পার্শ্ব চরিত্রগুলিতে আছেন—বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায় প্রভৃতি। সঙ্গীত রচনা করেছেন ডাঃ ভূপেন হাজারিকা।

*　*　*　*

প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্তর প্রথম বাংলা ছবি "গৌরী"-র কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন গুরু দত্ত এবং তাঁর বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন তাঁর সহধর্মিণী ও নেপথ্য সঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী সুগায়িকা শ্রীমতী গীতা দত্ত। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ছায়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি, আর সঙ্গীত রচনা করেছেন শ্রীশচীনদেব বর্ম্মণ।

*　*　*　*

বিদেশী খবর ঃ

"The Amcrican Soeiety of Cinematographers" George Stevens-কে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন। জর্জ ষ্টিভেন্স প্রথমে সাধারণ ক্যামেরাম্যান্ রূপে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৫১ সালে তাঁর ছবি "A Place in the Sun" "Oscar" পুরস্কার লাভ করে। কিছুদিন আগে Academy এবং Screen Directors Guild

তাঁকে তাঁর "Giant" ছবির পরিচালনার জন্ম "শ্রেষ্ঠ পরিচালক" পুরস্কার প্রদান করেছেন।

*　　*　　*　　*

১৯৫৬ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে "অস্কার" পুরস্কার-প্রাপ্ত চিত্র "Around the World in 80 Days" চিত্রের প্রযোজক Michael Todd জানিয়েছেন যে তাঁর পরবর্ত্তী ছবি Cervantes-এর বিখ্যাত উপন্যাস "Don Quixote" অবলম্বনে রচিত হবে। চিত্রটি রঙ্গীণ হবে এবং স্পেন দেশে এর ছবি তোলা হবে। মেক্সিকান্ হাস্যাভিনেতা Cantinflas উপ-নায়ক স্যাঙ্কো পাঞ্জার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রধান চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন তাঁর নাম পরে জানান হবে।

"Variety" পত্রিকার মতে গত এপ্রিল মাসের মধ্যে—"Funny Face" (Paramount), "Around the World in 80 Days" (United Artists), "The Ten Commandments" (Paramount), "Boy on a Dolphin" (20th. Century-Fox) ও "The Spirit of St. Louis" (Warner Brothers)—এই চিত্রগুলি আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে।

'Metro-Goldwyn-Mayer' আগামী বছরের মধ্যে তাঁদের নির্ম্মিত ছবির সংখ্যা প্রায় ২৫% হিসাবে বাড়াবার মনস্থ করেছেন। তাঁদের সর্ব্বাধুনিক যে ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে সেটি হচ্ছে ঔপন্যাসিক Daphne Du Maurier-এর সদ্যপ্রকাশিত একটি উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "Scape-goat" নামক চিত্রটি।

*　　*　　*　　*

Louis Clyde Stoumen লিখিত, পরিচালিত ও প্রযোজিত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ডকুমেণ্টারী চিত্র "The Naked Eye" নিউ ইয়র্ক-এর দর্শক ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। আলোক-চিত্রশিল্প সংক্রান্ত এই চিত্রটি ভেনিস ও এডিনবার্গের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতেও বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে।

*　　*　　*　　*

শ্রীবিভূতি লাহা

প্রথম জীবনে ক্যামেরাম্যান্‌রূপে নির্ব্বাক যুগের চিত্র-জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৩ সালে "কালী ফিল্মস্"-এ যোগ দেন ও এখানেই "কচি সংসদ" নামক ছবিটির চিত্র-গ্রহণ করেন। এখন শ্রীলাহাকে "অগ্রদূত" গোষ্ঠীর প্রাণস্বরূপ বলা চলে। অগ্রদূতের প্রথম ছবি "স্বপ্ন ও সাধনা" ১৯৪৬ সালে মুক্তি লাভ করে। আর এই অগ্রদূত পরিচালিত "বাবলা" চিত্রটিই প্রথম বাংলা ছবি—যা আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করে ভারতের বাইরেও বাংলা চলচ্চিত্রের উচ্চমানের পরিচয় দেয়।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশে শ্যামরায়ের গায়েন ছিল অভয়, গাঁয়ে তাকে সবাই চিনত। খাতিরও ছিল মোটামুটি। বিদেশী লোক গাঁয়ে এসে একখানি গান করলে, লোকেরা বলত, 'ও আমাদের অভে'ও পারে। এ আর এমন কি?' বড়লোক নয়, ছোট জাতের লোকেরা বলত।

শহরের মানুষ কেউ কাউকে চেনে না, এমনি প্রবাদ আছে। মিথ্যে নয় তা', কিন্তু সবখানে সমান নয়। কলকাতার কথা জানে না অভয়। চন্দননগরেরও সব দেখা শোনা হয়ে ওঠেনি তার। কিন্তু সুরীনদের মতো মানুষের সমাজ সেরকম নয়। অভয়ের বিষয় কোথায় কী বলেছে সুরীন, সে-ই জানে। তা' ছাড়া একা শৈলবালাই অনেকখানি। পাড়ার অনেকেই যে যার অবসর মতো একবার ক'রে দেখে গেছে অভয়কে। সব সময় দেখা হ'য়ে ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে অভয় সুরীনের সঙ্গে রোজ কাজের ধান্দায় বেরুচ্ছে।

সুরীন ভোরবেলার প্রথম বাস ধরে। তার কারখানা অনেক দূর। চাপদানি থাকতে পারলেই তার পক্ষে সুবিধে ছিল। ভামিনীর মুখ চেয়ে, বরাবর তাকে এখানেই থেকে যেতে হয়েছে।

কিন্তু অভয়কে সারাদিন থাকতে হয় না কারখানায়। হাজিরা দিতে হয় রোজ। বেলা ন'টার মধ্যেই আবার ফিরে আসে সে। সেও বড় বিপদের বিষয় হয়েছে অভয়ের কাছে। সুরীনকাকা তাকে পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাসে। বাস থেকে নামবার জায়গাটা কিছুতেই ঠাহর করতে পারেনা তার নতুন চোখ দিয়ে। প্রথমদিন ভয়ে ভয়ে অনেক আগেই নেমে পড়েছিল। দ্বিতীয় দিন জায়গা ছাড়িয়ে নামতে যাবে, কনডাকটর ধরেছিল চেপে। চার পয়সা নাকি বেশী দিতে হবে। ওসব হাবাগোবা-মুখো ভাল মানুষ তারা নাকি অনেক দেখেছে। সব ব্যাটা-ই সাধু, শুধু অল্প পয়সার টিকেট কেটে বেশী রাস্তা যাবার ফোকটিয়া বাবুগিরির বেলায় সাধুগিরি থাকে না। অপমান বোধ হয়েছিল অভয়ের, রাগও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কনডাকটরই বুঝেছিল, অভয় সত্যি নতুন মানুষ। তারাও মানুষ চেনে।

শহরের এ জীবন পরে কেমন লাগবে কে জানে। এখন সবকিছুই তার ভাল লাগছে, সবাইকেই মনে হচ্ছে আপন জনের মতো।

এ আসে, সে আসে। মেয়েরা এসে বলে, কই গো ভামিনীদিদি। শৈলীর জামাই দেখাও।

অভয়ের খুড়ি ভামিনী যেন একটু কেমন কেমন কথা বলে সকলের সঙ্গে। ঠোঁট বাঁকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে, একটু যেন শ্লেষভরেই বলে, দেখাবো আবার কি? আঁচলে ক'রে তো বেঁধে রাখিনি।

কী দেখবার আছে, দেখে যাও।

যারা আসে তারা ভাবে, ও মা! এ কি ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে কথা। তুমি খাওয়াও, না তুমি পোষো? তোমার কেন বাপু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!

মনে মনে বলে। মুখে বলবার সাহস কারুর নেই। বলার দরকারই বা কি। সবাই অভয়কে দেখে যায়। অভয় যেন কেনা-বেচার পুতুল। নেড়েচেড়ে দেখবার উপায় নেই, চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যায় সবাই। খুশি হ'য়ে বলে যায়, বাঃ, বেশ জামাই হবে শৈলীর।

কেউ কেউ দু দণ্ড কথাও বলে যায়। অমায়িক মিষ্টি কথাবার্ত্তা শুনে সবাই খুশি। লোকের স্বভাব নাকি এমনি, তারা সব কিছুর খুঁত ধরতে চায়। কালো রং ছাড়া অভয়ের কোনো খুঁত ধরতে পারেনা কেউ। বলে, আহা, বেশ বেশ। শৈলীর কপালখানি ভাল। পুরুষ মানুষের আবার রং! চেহারাখানিও দেখতে হবে তো।

ফিরে গিয়ে বলে, এই মস্ত বুক, এতখানি কাঁধ ছেলেটার। সুরীন জুটিয়েছে একটি মস্ত মদ্দো। এই রকম ছেলেই দরকার।

ওই খুশির রংটুকু ঘষে ঘষে তুললে, একটি অস্পষ্ট দাগ থেকেই যাবে, তাকে তোলা যাবে না। সেটুকু এক অস্পষ্ট বেদনা, খানিকটা জ্বালা। এ সমাজে ছেলের বড় টান, অর্থাৎ অভাব। আধা-গৃহস্থ কিংবা পুরোপুরি দেহোপজীবিনী, সকলেরই সন্তান নেই। তবু একদিন বয়স যায়, রং-রস-স্পৃহা ধুয়ে যায় কালের জলে। তখন একজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার দরকার হয়। সে-একজন যত খারাপই হোক, মরণের সময়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরতে হবে না। অশ্রদ্ধা ক'রেও দু'গণ্ডুস জল দেবে। সন্তান যাদের আছে, যাদের নেই, সকলেরই আখেরের ভাবনা বড় ভাবনা। যাদের যৌবনে ঘর ছেড়ে মানুষ উঠতে চায় না, ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হয়, একদিন তাদেরই ঘরের দোরে নেড়ি কুকুরটাও থাকতে চায়না এক দণ্ড। দেহ পণ্যের আড়ত ছাড়িয়েও, জীবনের কতগুলি নিয়ম এমনি একবগ্‌গা চলে। তাই জামাই কিংবা ছেলে—অন্যথায় উপপতি, যেমন সম্পর্কেরই হোক, একটি পুরুষ দরকার। মেয়েমানুষ হয়ে শুধু মাত্র পুরুষ মানুষ নিয়ে কারবার করেও এ সমাজ পুরুষের বড় কাঙাল। যারা এ পথে ভোগ করতে আসে, সেই স্বৈরিণীরা তপস্বিনী সাজতে পারে। যারা ভুগতে আসে, জীবনের তৃষ্ণা তো তাদের কোনদিন মরে না। তাই তারা নিরাপত্তা খোঁজে।

তাই শৈলবালার জামাই দেখে খুশি হ'য়ে হাসতে গিয়ে বুকের গভীরে একটু ফিক ব্যথার মতো খচ্‌ খচ্‌ করে। নিজের কথা মনে পড়ে তাদের। অভয় অতশত বোঝে না। সকলে আসে, তার লজ্জা করে, কিন্তু ভাল লাগে। সেও সকলের সঙ্গে দশটা কথা বলে, মাসী-পিসী, খুড়ো-জ্যাঠা সম্পর্ক তৈরী করে নেয় নিজেই। গাঁয়ের জন্যে মনটা টনটন করে এক এক সময়। কিন্তু ভুলে যেতেও দেরী হয় না। একলা বসে ভাববার সময় কোথায়। সর্বক্ষণই কাছেপিঠে কেউ না কেউ আছে।

কোনো কোনো সময় মনটা অভয়ের থম্‌কে যায়। ভামিনী খুড়িকে সে সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। লোকের কাছে এমনভাবে বলে অভয়ের কথা, যেন সে ভামিনীর কেউ নয়। উটকো ঝামেলা, আপদ বিশেষ যেন। কেউ এসে অভয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে, বড় খোঁচা দিয়ে কথা বলে। বলে, 'মানুষ, তার আবার দেখবার কী আছে? চারটে হাতও নেই, তিনটে চোখও নেই।' কখনো বলে, পুতুল খেলনা নাকি যে দেখাবো। এ এক কাজ হয়েছে বটে আমার।

শুয়ে বড় মন খারাপ হয় অভয়ের। কিন্তু লোক না এলে, না থাকলে, ভামিনী আর এক মানুষ। তখন কত হাসি, কত কথা। এক দণ্ড ভামিনীর কাছ-ছাড়া হওয়ার উপায় থাকে না অভয়ের। নিজেই ডেকে নেয়। বলে, একলা বসে কী করছ। এস, রান্নাঘরে এস, কথা বলতে বলতে রান্না করি।

সে ভামিনী অন্য মানুষ। কারখানায় কী কথা হল, অভয় কি দেখল—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে ভামিনী। তখন কটুভাষিণী ভামিনীর কথা ভুলে যায় অভয়। শিল টেনে নিয়ে, ভামিনীর হাত থেকে নোড়া কেড়ে নিয়ে নিজেই বাটনা বাটতে বসে যায়। ভামিনী অসহায় কৌতুকে হেসে বলে, ও মা, এ কি ছেলে গো। দাও দাও, তোমাকে বাটনা বাটতে হবে না তা' বলে।

অভয় বলে, কেন হবে না। পারি না বুঝি? খুড়ির কাজ ক'রে দেব, তার আবার কি আছে?

মস্তবড় শরীরটাকে উপুড় ক'রে সেই বাটনা বাটা দেখে ভামিনী হেসে বাঁচে না। বলে, থাক, আর দুদিন বাদে তো বাপু পরের ঘরেই চলে যাবে। তখন খুড়ির বাটনা বাটবে কে?

অভয় বলে, পরের ঘরে যাব বলে, খুড়িকে আমার পর করবে কে?

ভামিনীর চোখে মুখে দেহে এখনো রংএর খেলা খেলে বেড়ায়। চোখের কোণে তাকিয়ে বলে, কেন, বউ-শ্বশুড়ি?

অভয় বলে, ইস্! খুড়ির চেয়ে বুঝি তারা আপন?

ভামিনী বলে, তাই হয় গো, তাই হয়।

বলতে বলতে ভামিনী কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। মনের কোণে কোথায় যে তার কিসের একটু জ্বালা অষ্টপ্রহরই জ্বলছে, সেটুকু নিজেও যেন সবসময় ঠাহর করতে পারে না। সেই জ্বলুনির কারণটুকু অভয়। যেন কোথায় একটি অস্পষ্ট পরাজয়ের ব্যথার ছিটা লেগে আছে তার প্রাণে। বেশী ঘষে ঘষে তুলতে গেলে, সেই দাগ স্পষ্ট হয় আরো। সংসারের উপর, সমাজের উপর, সুরীন-অভয়ের প্রতিও মনটা বিমুখ হয়ে ওঠে। পাড়ার লোকে এসে অভয়কে দেখতে চাইলে, তখন কোপটা গিয়ে পড়ে তাদের উপর। এমনিতেই তার কথা একটু বাঁকা বাঁকা, একটু রোখপাক করা সুর। তাই বিশেষ কেউ কিছু মনে করে না।

রান্না শেষে ভামিনী চান করতে যায় গঙ্গায়। সঙ্গে অভয়ও যায়। অভয় হয়ত সামান্য একটু সাঁতার কাটে। চান করে শান্তভাবে। ভামিনীই একটু বেশী সাঁতার কাটে, জলে ঝাঁপায়, ছেলেমানুষের মতো হুল্লোড় করে।

খুড়ির ছেলেমানুষী দেখে অভয়ের হাসি পায়। বলে, দেখো, খুড়ি, বেশী জলে যেওনা।

—কেন, গেলে কি হবে? ডুবে যাব?

অভয় এমনিতে যা-ই হোক্, আসলে কথার কারবারি। বলে, না। সাঁতার জানো, তুমি ডুববে কেন। কিন্তু স্রোতের জলে পড়ে গেলে, টানে টানে ভেসে যাবে যে?

—কেন, আমার গতরে ক্ষ্যামতা নেই বুঝি? টান কাটিয়ে চলে আসব। অভয় হেসে তাকায় ভামিনীর দিকে। ভামিনীর মনে হয়, অভয় যেন তার শরীরে বয়সের দাগ খুঁজছে। সাঁতার জানলেও, টান কাটিয়ে আসতে শরীরে ক্ষমতার দরকার। তখন ভামিনী একটু করুণ হেসে বলে, আর খুড়ি ভেসে গেলেই, কার কি হবে বাবা।

অভয় বলে, না খুড়ি, ও কথা তা বলে তুমি বলতে পার না। ভামিনী আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার মনের গতিবিধি বোঝা বড় দায়। নিজের উপরেই তার রাগ হয়, মনে মনে বলে, মুখপুড়ি ভামি, তোর মরণ নেই লো? বয়স হয়ে মরতে চললি, এইটুকু ছেলেকে তুই কী বোঝাতে চাস্?

আবার নিজেই জবাব দেয়, রক্ষে কর। আ মরণ, ছি ছি ছি। ভামিনীর কি সামান্য ধর্মজ্ঞানও নেই?

তবু জ্বলুনিটুকু তো বিদেয় হয় না। পুরুষের মতো পুরুষ সুরীন মিস্তিরির ঘরের মানুষ সে। শুধু ঘরের কেন, মনের মানুষ সে সুরীনের। এখনো সুরীন দুদিন বাইরে থাকলে, ঘরটা যেন খা খা করে। কল থেকে ফিরতে দেরী হলে, মরে ঘর-বার ক'রে। যেচে মান, কেঁদে সোহাগের ফাঁকিবাজী করতে হয়নি কোনোদিন ভামিনীকে। সুরীনের অন্যায়ে কখনো রাগ করলে, সুরীন ভয়ে ও আফশোসে এতটুকু হয়ে যায়। বলে, এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি গো ভামিনী, আমাকে মাপ করে দে ভাই। ভামিনীর কাছে, মেয়ে হ'য়েও দেহ বড় কথা নয়। তা ব'লে মন কি কোনো পদার্থ নয়? মনের ঘেন্না ব'লে কোন বস্তু নেই নাকি সংসারে?

তবু মনের কোণের সেই জ্বলুনিটুকু, মনকে যেন বিপথে চালিত করে। জীবনভর প্রায় হাটের কারবারে যেটি মূলধন ছিল, সেই দেহই সব কিছুতে, সবার আগে সামনে এসে দাঁড়ায়। এটা তাদের অভ্যাসের দাসীবৃত্তির অভিশাপ। আসল মেয়ে-মানুষটি চিরদিন তার আড়ালেই থেকে যায়।

এই যে ভেজা গায়ে, শাড়ি জড়িয়ে, শরীরে একটু বেশী ঢেউ তুলে তুলে যায় ভামিনী অভয়ের আগে আগে, আর আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে তাকায় অভয়ের চোখের দিকে, এসব কিসের জন্যে? ওটা তার জ্বলুনির প্রশ্রয়। আপনি আপনি হয়ে যায়, বুদ্ধি কূট হয়।

খেতে বসে, বেশী ক'রে ভালটুকু খাওয়ায় ভামিনী অভয়কে। ধমক দেয়, চোখ পাকায়। স্নেহের শাসনও যে কতখানি কঠিন হ'তে পারে, ভামিনীর মতো মেয়ের হাতে পড়লে সেটা অনুমান করা যায়।

কিন্তু ভামিনী কপালের টিপ্ কাঁপায় কেন? দুপুরের নির্জনে, বিস্রস্ত হ'য়ে, কথায় কথায় খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে, মাথা ধরার বিপজ্জনক ভান তো ভাল নয়।

'ভালো নয়' মনে হলেই গম্ভীর হ'য়ে ওঠে ভামিনী। চোখে বুঝি তার জলই আসতে চায়। নীচু স্বরে, করুণ

সুরে, ডেকে বলে—অভয়, সংসারে মানুষের কিন্তু বড় জ্বালা বাবা।

—কেন খুড়ি, এ কথা বলছ কেন?

—বলছি এই জন্যে, নিমি শৈলদিদির মেয়ে না হ'য়ে তো আমার মেয়েও হতে পারতো, অ্যাঁ?

কোন্ কথায় কি হয়েছে, অভয় না বুঝে হেসে বাঁচে না। বলে, ছেলে পেয়ে বুঝি তোমার মন ভরে না খুড়ি?

ভামিনী চুপ ক'রে যায়। তার জ্বলুনি বোঝার মতো মনের আনাচে গতিবিধি নয় অভয়ের। আর কেমন করেই বা বুঝবে। সত্যি, বড়লোকে রক্ষিতা রাখে, সুরীনের মতো মানুষেরা বিয়ে না করেও, যাকে ঘরে এনে রাখে, সে বউয়ের চেয়েও বড়। সে মনেরই মানুষ। ভামিনী সুরীনের সেই মানুষ। মন বুঝি ছোট ভামিনীর, প্রাণ বুঝি হিংসেয় ভরা। তাই পেটের নাড়ি ছিঁড়ে তার কোনো নিমি আসবে না, কোনো অভয় তাকেই মা বলে এ ঘরে ঘর বাঁধবে না, এই ভেবে তার জ্বলুনি কাটতে চায়না। তাই চল্লিশের অঙ্গনে বিপরীত রীতি খেলা ক'রে ওঠে। সবকিছু দিয়ে বাঁধতে ইচ্ছে করে। একে ভামিনী রোধ করবে কী দিয়ে, সে ওষুধ তার জানা নেই। তাই শৈলবালাকে দেখলেও গা' জ্বালা করে ভামিনীর। শৈলবালা রোজ রোজ চচ্চড়িটা, তরকারিটা রেঁধে দিয়ে যায়, সেসব ফেলে দিতে ইচ্ছে করে ভামিনীর। লোকজন এলে, মন তিক্ত হয়।

কথনো কথনো কলহের উপক্রম হয়ে ওঠে শৈলবালার সঙ্গে। পাড়ার লোকেরা গিয়েও শৈলবালাকে নানান কথা বলে।

কিন্তু অভয় ভালোবাসা ও স্নেহটুকু পেয়েই সুখী।

ক্রমশঃ

স্বপন-মত্তা

শ্রীমমতা ঘোষ

বিরলে স্বপন রচে উদাস মনে,
মগন আপন মাঝে গৃহের কোণে।
ভাবে আর ব'সে থাকে,
নিজেরে লুকায়ে রাখে,
সাড়া নাহি দেয় ডাকে
স্বপন বোনে
বিরলে বসিয়া ও যে উদাস মনে।
সুন্দর তনু দেহ, আঁখি ভাবময়,
গৌরী কিসের ধ্যানে আছে তন্ময়!
আপনার পরিচয়
আপনি ও যেন লয়,
খোঁজে ধন অক্ষয়
পরাণময়,
কী আছে নিজের মাঝে দেখে তন্ময়।
মধুর গলার স্বর মৃদুল কথা
কোন্ সুদূরের যেন দেয় বারতা।
দেহ মন সুকুমার
সহিতে পারে না ভার,
স্থূল এই সংসার
দেয় যে ব্যথা,
তুচ্ছের মাঝে শোনে স্বপন কথা।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি যে মনে,
কোন্খানে রাখি এই প্রাণের ধনে!
ঘুম ভেঙে যাবে যবে
বিকশি জাগিবে তবে,
জানাজানি জানি হবে
ভুবন সনে,
কেমন লাগিবে ধরা ভাবি যে মনে।
ও থাক্ এখন ওর কল্প লোকে,
চিনে নিক্ আপনারে,—ডেকো না ওকে!

হৃদয়ের রঙে ওর
নয়নে লেগেছে ঘোর,
এখনো হয় নি ভোর—
ভাবের ঝোঁকে
গৌরী ঘুমায়ে আছে, ডেকো না ওকে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ওয়েষ্টবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এথলেটিক ক্লাব গত দু'বছরের মত এ বছরও দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন ১৬ বছরের স্কুল-ছাত্র বেনীমাধব তালুকদার। তিনটি বিষয়ে তিনি রেকর্ড ভঙ্গ করেন, তার মধ্যে দুটি ভারতীয় রেকর্ড—(১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক)। মহিলাদের বিভাগে ব্যক্তিগত কৃতিত্বলাভ করেন স্কুল-ছাত্রী সন্ধ্যা চন্দ্র। তিনি ২টি বিষয়ে রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং মোট ৪টি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন।

নতুন ভারতীয় ও রাজ্য রেকর্ড

২০০ মিটার ব্রেষ্টস্ট্রোক: বেনীমাধব তালুকদার (ন্যাশন্যাল এ সি)। সময়—২মিঃ ৫৩.১ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড: সামসের খান (সার্ভিসেস)—সময় ৩মিঃ ০.৪ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই: দুলালচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্র এ সি) সময়—১ মিঃ ২৩ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: কানাইলাল চ্যাটার্জি (বৌবাজার বি সি)। সময় ১ মিঃ ৯.২ সেঃ।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এ সি)—সময় ৩মিঃ ১২.৭ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক: বেণীমাধব তালুকদার। সময় ১মিঃ ১৯.৮ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)। পূর্ব্ব ভারতীয় রেকর্ড—রঘুপৎ সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১ মিঃ ২১.৩ সেঃ।

৪×১০০ মিটার রিলে: স্টেট ট্রান্সপোর্ট। সময় ৫মিঃ ৮.৯ সেঃ।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক: বেণীমাধব তালুকদার। —সময় ১মিঃ ২২.৪ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (জুনিয়ার): সত্যেন দাস (ন্যাশন্যাল এ সি)—সময় ১মিঃ ৯.৩ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই: অরুণ সাহা (জগৎ জননী) —সময় ১মিঃ ১৯সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক: দুলাল কুণ্ডু।—সময় ১মিঃ ২৭.৬ সেঃ।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই (জুনিয়ার): তপন দত্ত (সেণ্ট্রাল এ সি)।—সময় ১মিঃ ২৪.৯ সেঃ।

১০০ মিটার বেস্ট স্ট্রোক (জুনিয়ার): অনিল চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এ সি)—সময় ১মিঃ ২৮.৫ সেঃ।

৪×১০০ মিটার রীলে (জুনিয়ার): ন্যাশনাল এস এ।—সময় ৫মিঃ ৪৫.৮ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র।—সময় ১মিঃ ২৩.৫ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল: সন্ধ্যা চন্দ্র।—সময় ৬মিঃ ৩৫.৩ সেঃ।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

১ম ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট (৭১ পয়েণ্ট); ২য়

ন্যাশনাল এস এ (২৯); ৩য় জগৎ জননী (৮); ৪র্থ বৌবাজার বি এস (৮)।

ওয়াটার পোলো: ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী সেণ্ট্রাল এস সি ৪-২ গোলে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েসনকে পরাজিত করে।

ধ্যানচাঁদ হকি ঃ

১৯৫৭ সালের ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালোরের মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ ১-০ গোলে জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। পেনালটি কর্ণার থেকে গোলটি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ এ বছরের আগা খাঁন হকি কাপও জয়লাভ করেছে। অনেকের মতে, মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ হকিদল।

রাজ্য স্নুকার প্রতিযোগিতা ঃ

হামিদ করিম ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ান চন্দ্রা হিরজিকে পরাজিত করেন।

রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে চন্দ্রা হিরজি সোমনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত ক'রে তাঁর খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৫২ সালে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয় এবং চন্দ্রা হিরজি ১৯৫২ সাল থেকেই চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছেন।

পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ২-১ গোলে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা নির্দ্দিষ্ট ফুটবল মরসুমে শেষ হ'ল না। একদিকের ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে। অন্যদিকের ফাইনালে আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তে উঠেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন ড্র যায়। উভয়পক্ষে একটি ক'রে গোল হয়। পুনরনুষ্ঠিত সেমি-ফাইনালে খেলাটি খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রেফারী কর্ত্তৃক ইস্টবেঙ্গল দলের রাইট-ইন্‌সাইড খেলোয়াড় নারায়ণ মাঠ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর পুনরায় খেলায় যোগদান করেন এবং খেলার মাঝ পথে ইস্টবেঙ্গল দল খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে—এই দুই অপরাধে আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটি নারায়ণকে এক বছরের জন্য এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড করেছেন। তাছাড়া টুর্নামেণ্ট কমিটিতে স্থির হয়েছে, খেলা পরিত্যাগ করার জন্য ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ফুটবল সম্পাদকের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য তাঁদের তলবও করা হবে।

আই এফ এ টুর্নামেণ্ট কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক নিজ ও ক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে এক তরফা আবেদন ক'রে টুর্নামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্থায়ী ইন্‌জাংশন লাভ করেন। মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং খেলোয়াড় নারায়ণের পক্ষে বাহিরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের বাধা উপস্থিত রইল না।

———

আসা যাওয়ার পথের ধারে : ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
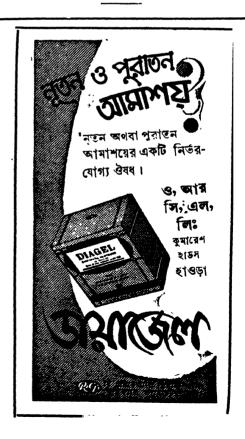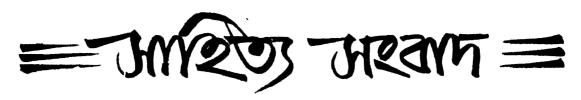
অনেক সাগর পেরিয়ে : চিত্রিতা দেবী

পরিক্রমা : তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বাংলা ভাষায় অনেক ভাল ভাল ভ্রমণ কাহিনী রচিত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থ তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাত্রার বিবরণ আর পথ-চলার খুঁটিনাটি নিয়ে এ কাহিনীগুলি জটিল ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি। লেখিকা আর লেখক দুজন নিজের নিজের অভিজ্ঞতা-আনন্দ ও জ্ঞানের পসরা পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন।

বিজ্ঞান-গবেষণা-যশস্বী ডক্টর মুখোপাধ্যায় কেদার-বদরী ভ্রমণ উপলক্ষ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি, সমবেদনা ও মমতাবোধকে অতি সরসরূপ দিয়েছেন "আসা যাওয়ার পথের ধারে" প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে দাঁড়িয়ে তিনি সত্যকে উপলব্ধির প্রয়াস করেছেন। রূপের আবেশে মুগ্ধ হয়ে যাননি, হারিয়ে ফেলেননি আপনার বিজ্ঞানী দৃষ্টি।

'অনেক সাগর পেরিয়ে' গিয়েছিলেন চিত্রিতা দেবী। অনেকেই আজকাল যায়। কিন্তু সাগরপারের অভিজ্ঞতা নিয়ে এমন রসঘন সাহিত্য কয়জন রচনা করতে পারেন? অনেককিছু জ্ঞাতব্যবিষয় তিনি পাঠকপাঠিকাকে পরিবেশন করেছেন। বিশেষ করে মিশর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য নিবদ্ধ করেছেন তা সকলকেই আকৃষ্ট করবে। লেখিকার বর্ণনাভঙ্গী চমৎকার, ভাষা নিপুণ রসসৃষ্টির দক্ষতা প্রভৃত। তাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী অতীব চিত্তাকর্ষী হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে লেখিকা পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে পশ্চিমের ললনাদের লক্ষ্য করেছেন।

"পরিক্রমা"র লেখক বোম্বাই থেকে অজন্তা ইলোরা ঔরঙ্গাবাদ গিয়েছিলেন। ভ্রমণেরই কাহিনী পরিক্রমায় পরিবেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত ইতিহাসের অনেক চমকপ্রদ কাহিনী এ গ্রন্থে রসঘন রূপ পেয়েছে, অনেক অজানা তথ্য শ্লোক ও কবিতা গিয়েছে জানা। কিন্তু লেখক 'মুক্তপুরে মুক্ত" শ্লোকের যেমন বাঙলা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তেমনি জাহানারার কবিতা "বেসাঘর সবজা—"এর অর্থ প্রকাশ করেন নি। অনেক পাঠক পাঠিকার কৌতূহল তাতে অতৃপ্ত থেকে যাবে। তারপর ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এই ভ্রমণ কাহিনীর মাঝখানে ষোড়শ পরিচ্ছদের গল্পটি নিতান্তই খাপছাড়া মনে হতে পারে।

[প্রথম দুইটি গ্রন্থের প্রকাশক—প্রজ্ঞা প্রকাশনী। আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩। মূল্য যথাক্রমে ২৲ ও ৪৲ টাকা। তৃতীয় গ্রন্থটির প্রকাশক আর্ট অ্যাণ্ড লেটারস্ পাব্লিশার্স, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

শবরী (কাব্যগ্রন্থ) : সুনীলকুমার লাহিড়ী

গ্রন্থকার বাংলার কাব্যক্ষেত্রে অপরিচিত নন বহু সাময়িক পত্রিকায় এর কবিতা প্রকাশিত হয়ে থাকে। গ্রন্থের মধ্যে যে কাব্য নাটিকাটী স্থান পেয়েছে, সেটি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের 'কিশোরজগতে' বেরিয়েছিল। এযুগে কাব্য ও নাটক পৃথক হয়ে যাওয়ায় এ ধরণের লেখা বিরল। গ্রন্থকার প্রাচীন পদ্ধতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণরেখে তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে আছে সতেরোটি মৌলিক কবিতা কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাষা ও ভাবগত শৈথিল্য বর্জ্জিত—প্রাঞ্জলতা ও অনায়াস বোধ্যতার জন্য কবির মনন ধারায়-অবগাহন করবার সুযোগ পাওয়া গেছে। অন্তরের এক একটি সুর এক একটি অনুভবের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ছন্দে অর্থে তালে ফুটে উঠেছে। 'শেষ জহর ব্রতের গানে' আছে ইতিহাসের খণ্ড স্মৃতি। কয়েকটি কবিতায় আছে বর্ত্তমান শতাব্দীর আচার ও আচরণের ওপর বিক্ষোভ। অতি আধুনিকতার উৎকট প্রভাব কবিতাগুলির মধ্যে নেই, আছে জীবনের নব নব পর্য্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন প্রকাশ ভঙ্গীর সুন্দর মিলন। দ্বিতীয় বিভাগে আছে নানা অনুবাদ কবিতা। অনুবাদেও গ্রন্থকার কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। প্রচ্ছদ পট ও ছাপা সুন্দর আশা করা যায় গ্রন্থকার একদিন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। কাব্যামোদী পাঠক পাঠিকাদের কাছে এ গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

[প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ নং বঙ্কিমচাটুর্য্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য ২৸০ টাকা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান"—৫৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রনাথ" (২৯শ সং)—১.৫০, "গৃহদাহ" (১১শ সং)—৪.৫০, "দেবদাস" (২২শ সং)—২৲, "মেজদিদি" (২২শ সং)—১.৫০, "বিধি-বিধান" (১১শ সং)—১.৭৫

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "ভীষ্ম" (৭ম সং)—২.৭৫

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মিষ্টি মন"—২৲

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82753—"প্রথম তারার মত" ও "আমার এগানে"—দুখানা আধুনিক গান সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠে অনবদ্য হয়েছে।

N 82754—উৎপলা সেনের কণ্ঠমাধুর্যে ও সুরবৈচিত্র্যে "তোমার ভুবন হ'তে" এবং "দোলা দিয়ে যায় কে" দুখানা গান জনপ্রিয়তা লাভ করবে আশা করি।

N 82755—অতুলপ্রসাদের "রইল কথা তোমারি নাথ" ও "ওগো নিঠুর দরদী" গান দুখানা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরদীকণ্ঠে অপূর্ব হ'য়েছে।

N 82756—"আমি আজ আকাশের মত" ও "এই ক্ষণটুকু কেন এত ভাল লাগে"—গান দুখানা মান্না দে দরদ দিয়ে গেয়ে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত ক'রেছেন।

N 82757—জনপ্রিয় গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ওগো আমার কোকিলকালো মেয়ে" ও "ঘুমে ঢুলু ঢুলু চাউনি চোখে" দুখানা গান যে জনপ্রিয় হবে তা বলাই বাহুল্য।

N 82758—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি" এবং "যে প্রেমের দেখা মেলে জীবনে"—গান দুখানা শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

N 82759—"রথের মেলা, রথের মেলা" এবং "ঐ ঘোর ঘোর লেগেছে" গান দুখানা সনৎ সিংহের কণ্ঠে আমাদের ভাল লেগেছে।

N 82760—শিল্পী শ্যামল মিত্রের গাওয়া "সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা" ও "এই পথে যায় চলে" গান দুখানা ভাব ভাষা ও সুরের মূর্চ্ছনায় অপূর্ব হ'য়েছে।

N 82761—সুগায়িকা কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় "আমি আলপনা এঁকে যাই" ও "তারাদের চুমকি জ্বলে" গান দুখানা গেয়েছেন এবং আমাদের খুবই ভাললেগেছে।

N 82762—"এই ফুলের দেশে" ও "গানে গানে আমি যে খুঁজি" গান দুখানা গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ। ভাবব্যঞ্জনায় ও সুরঝংকারে শিল্পী তার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

N 82763—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষের (ফিল্ম) 'ধামী চাই' (কৌতুক নক্সা—চ-খণ্ড) গোমড়া মুখেও হাসির ফোয়ারা ছোটাতে সমর্থ হবে।

N 82764—শ্রীমতী গীতা দত্ত রায়ের আধুনিক দুখানা গান "ঝির ঝির চৈতালী বাতাসে" ও "কৃষ্ণ চূড়া আগুন তুমি" আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি।

কলম্বিয়া

GE 24860—"জীবনের নদীতটে" এবং "ও বন্ধু, এই বকুল ঝরা শ্রাবণরাতে" গান দুখানা গেয়েছেন যশস্বী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান দুখানাই খুব সুন্দর হয়েছে।

GE 24861—লতা মুঙ্গেশ করের মধুর কণ্ঠে "মনে রেখো" ও "রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে" গান দুখানি ভাবভাষা ও সুর বিন্যাসে আমাদের মুগ্ধ করেছে।

GE 24862—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ভুপেন হাজারিকা যুগ্ম কণ্ঠে গেয়েছেন "গুম গুম মেঘ" ও "আঁকা বাঁকা এ পথের"—এ দুখানা গান।

GE 24863—"প্রজাপতি মন আমার" ও "আজ কেন ও চোখে লাজ কেন" গান দুটি গেয়েছেন সুগায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। দুটী গানই সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

GE 24864—"দোষ কারো নয় গো মা" এবং "শ্যামা মা কি আমার কালো" এই শ্যামাসঙ্গীত দুখানা পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠে ও সুন্দর হয়েছে।

GE 24865—শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে "ওগো কৃষ্ণচূড়া" ও "এ নহে যা চেয়েছি" দুখানা গান আমাদের ভাল লেগেছে।

GE 24866—"কত মেঘ করেছে আজ" ও "দূর বন পথে" দুখানা গানে কুমারী গায়ত্রী বসু তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

GE 24867—"তোমায় দেখেছি" ও "এ মন আমার যেন" গান দুইটি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হ'য়েছে সুগায়ক শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।

GE 24868—"জনপ্রিয় শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছেন "ফুল গো তোমারে ছুয়ে" ও "কুসুম যেমন ঐ" এই দুখানা গান। গান দুখানাই আমাদের ভাল লেগেছে।

GE 24869—"দোলে দোলে ঐ" ও "তোমার তরী নয় গো আমার" গান দুখানা সুন্দর ভাবে গেয়েছেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24870—"বলনারে সখি" ও "প্রভাতে উঠিয়া মাতা যশোমতী" এ দুখানা কীর্ত্তন গেয়েছেন কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। দুখানা কীর্ত্তনই আমাদের খুব ভাললেগেছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শ্রীপঞ্চানন রায় | জলকেলি | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পৌষ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

রবীন্দ্রকাব্যে ভগবদ্ভক্তি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিদেবী বন্দনা করিতেছেন নিত্য নব নব সাজে বিশ্বদেবতাকে। পূজা করিতেছেন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমকে—ঈপ্সিতকে। ঋতুর আবর্তনপথে চলে তাঁর এই অভিসার। অঙ্গে তাঁর কখনো শ্যামলশস্যের শ্যামলিমা—কখনো বা নীলাকাশের নীলিমা, বিহগের কল-কাকলীতে বাজে আরতিধ্বনি—ফলে ফুলে পূর্ণ হয় পূজার অর্ঘ্য। পূজারিণী প্রকৃতিদেবীর বুকে ভক্তিগঙ্গা চিরবহমানা।

ভজ × ক্তি = ভক্তি। অভিধানকার ভক্তির পর্য্যায়শব্দ বলিতেছেন—সেবা, প্রেম, শ্রদ্ধা। প্রেম-ও ভক্তির ভাব বহন করে। ভক্তি ও প্রেমে সমপ্রাণতা বর্ত্তমান। 'পঞ্চরাত্র' বলিয়াছেন—

> অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
> ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।

অন্যের প্রতি মমতা পরিহার পূর্ব্বক ভগবানে যে মমতা তাহার নাম প্রেম, এই প্রেমকেই উদ্ধবাদি ভক্তি বলিয়াছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—'সাধনভক্তি হইতে রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥'

প্রেম সম্বন্ধে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেন—

> সম্যঙ্‌ মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
> ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম নিগদ্যতে॥

যাহা হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ রূপে নির্মল হয় এবং যাহা অত্যধিক মমতাযুক্ত—এরূপ যে-ভাব—তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই বুধগণ তাহাকে প্রেম বলেন।

প্রেম ও ভক্তি একই হৃদয়াবেগের দুইটি দিক। ইহাদের উৎসস্থানের ভেদ নাই।

প্রেম কবির মানসভূমি। প্রেমের সাধনাই কবির জীবনসাধনা। প্রেম হইতেই আদিকবি প্রেরণা লাভ করিলেন কাব্যরচনার—রচিত হইল আদিকাব্য। প্রিয়বিরহকাতর ক্রৌঞ্চীর প্রতি প্রেম শোকার্ত করিয়াছে বাল্মীকিকে। যদি ভালবাসি তবেই জাগে সমবেদনা। আগে ভালবাসা, প্রেম—পরে বেদনাবোধ। ভালবাসিয়াছেন কবি ক্রৌঞ্চীকে। তার দুঃখে তিনি তাই শোকাভিভূত। শোক পরিণতি লাভ করিল শ্লোকে—রামায়ণে। প্রেম-ই কাব্যের আত্মা।

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

—ধ্বন্যালোক, ১৷৫

এই প্রেম—এই সসীম-ভালবাসা একদা অসীমের অন্বেষণে যাত্রা করে—অপূর্ণ হইতে পূর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে চায়। হৃদয়ের ঘটে বিস্তৃতি। সীমার মাঝে আর সে আনন্দ পায় না। সীমার মাঝে অসীমকে পাইবার আকুতি জগিয়া ওঠে। ইহাই ভাগবতী-পিপাসা—ইহাই ভগবদ্ভক্তি। কবিকণ্ঠে তখন ঝঙ্কৃত হয়—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
তোমায় আমায় মিলন হোলে
সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।

—রবীন্দ্রনাথ।

অসীমের প্রতি এই প্রেম—এই ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রকাব্যে পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহিনী বিশ্বদেবতার বন্দনাগানে মুখরিত। তিনি গাহিয়াছেন—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগতমন্দিরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান—
পুণ্যকিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহবন্ধ রে।

—বৈতালিক।

ভক্ত প্রার্থনা করেন—'হে হরি, অজ্ঞান-অন্ধকার আমাকে পথভ্রান্ত করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসল। শরণাগতকে তুমি রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার হৃদয়-অন্ধকার দূর কর। হরি বিনা আশ্রয়-দাতা আর তো কেহ নাই!' হরির গুণগানে যে-হৃদয় দ্রবীভূত হয় না শ্রীতুলসীদাস তাহাকে 'কুলিশ-সমান' বলিতেছেন—হৃদয় সো কুলিশ সমান, যে ন দ্রবহি হরিগুণ শুনত। কবীরজী গাহিয়াছেন—হরি সে লাগ্ রহো ভাই, তু বনত বনত বনি যাই। পদ্মপুরাণে আছে—যেনার্চিতং হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥ রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে,
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় 'কি করি কি করি'
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী

তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি
হরি বিনা কেহ নাই হে।

—গীত বিতান, ৮৩১ পৃঃ

'সেবা' ভক্তিধর্মে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেবা হইতে ভক্তি লাভ হয়। আদিপুরাণে আছে—মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা। ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা নতু মুক্তি কদাচন॥ সেবাহীন রাত—পূজাহীন দিন রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন—

কী দেখিছ বঁধূ মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি,
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটী ?
পূজাহীন দিন—সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে পড়ে গেছে
বিজনবিপিনে লুটি।

—জীবনদেবতা

যে গীতিগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছিল তাহার প্রথমসংগীত—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

শুধু এই গান খানি নয়—এই গ্রন্থখানিই ভক্তিসুধায় পরিপূর্ণ। ইহার রসমাধুর্য্য দুর্গম অধ্যাত্মপথকে সরস করে—সেই দূরতমকে নিকটে লইয়া আসে। ইহার আলোকে ভক্তের হৃদয়-অন্ধকার দূর হইয়া যায়—সে প্রিয়তমের সান্নিধ্য অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথের এই সকল গ্রন্থ-ও ভক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ—'খেয়া' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' 'গান' 'নৈবেদ্য'।

১৯১২ র ২৭শে মে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যান। তাঁহার সঙ্গে ৫০টি গানের ইংরাজি-অনুবাদ ছিল। 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' হইতে এই গান গুলি ও অন্য কয়েকখানি গান একত্র করিয়া 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করা হয়। 'গীতাঞ্জলি-'ই নোবেল-পুরস্কার লাভ করে।

রাত্রির আকাশ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অপরাহ্ণ হ'তে নীল আলোকের ধারাগুলি ধীরে
ফুরাইয়া এলো শেষ শ্যামল বনান্ত শিরে শিরে,
ম্লান হ'লো প্রান্তরের বুকে ; ফুরালো উজ্জ্বল দিন
পৃথিবীর এপারের থেকে। হ'লো ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ
চেতনার পদধ্বনি, কলরব, অরণ্য মর্ম্মর ;
সহসা নিভিয়া গেল পৃথিবীর স্পন্দনের স্বর।

বসিলাম সে বিজনে মুখোমুখা সন্ধ্যার আঁধারে।
মনো হ'লো এ রাত্রি ছড়ানো দূর আকাশেরও পারে
কোনখানে। নিবিড় নিঃশব্দ, তবু দিগন্ত আকাশ
তখনও জ্যোতিতে ভরা। অজস্র নক্ষত্র প্রতিভাস

দূর অনন্তের পানে প্রসারিত দীর্ঘ ছায়াপথে
উদ্দীপ্ত স্বপ্নের মত। পৃথিবীর অন্ধকার হ'তে
বহুদূরে···তবু তার হৃদয়ে আশার দীপালোকে
জাগ্রত উজ্জ্বল ; তবু কি আশার স্বপ্ন আঁকা চোখে!

জানিলাম এতদিনে, এ' পৃথিবীর অন্ধকার রাতে
কোথা হ'তে আলো পায় পথ চলিবার। কার হাতে
হাত দিয়ে এ' উষর হতাশার মরুবালুচরে
হেঁটে যায় দুর্নিবার ক্লান্তিহীন বেদনার ঝড়ে!
জানিলাম এ' পৃথিবী কি আনন্দে হাঁটে অন্ধকার,
বহু দুঃখ বেদনার পুঞ্জ পুঞ্জ রাত্রি হয় পার!!

শাশ্বতিক

দুর্গাদাস ভট্ট

চোখ আড়ালেই মন আড়াল। বিশেষ করে অনেকদিন যদি কেউ অদেখা থেকে যায়। তবু কিন্তু ওকে চিনে নিতে পারলাম। টোলখাওয়া গালের অভিজ্ঞানটুকু পরিচিত। একটুকালের জন্য ভুলে গেলাম নিজেকে। ভুলে গেলাম যে আমি যাত্রী হয়েছি চৌরঙ্গী বেহালার সকালের ট্রামে। ও যখন মাঠের দিকে দৃষ্টি মেলেছে, অন্যমনে দেখছে বুঝি—কেমন করে সবুজের বাহুপাকে টাটকা রদ্দুর এসে দাঁড়ায়। আর আমার মনে শুধুই রোমন্থন—বর্ত্তমান থেকে অতীতে। ভাবনার সুতো ছাড়তে ছাড়তে মনে পড়ে লিণ্ডসেষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কঅফিস। মনে পড়ে ক্যাস ডিপার্টমেণ্টের লতিকা সান্যাল।

আমার অবশ্য ছিল অন্য ডিপার্টমেণ্ট। তবু চোখ এড়াতে পারেনি সে। যেদিন সস্তা দরের একটা মিলের সাড়ি পরে সুগঠিত নিতম্বের ঢেউ তুলিয়ে প্রথম ঢুকলো অফিসে—সেদিন অনেকের মত আমিও চোখ তুলে দেখেছিলাম। তবে অনেকের সঙ্গে দৃষ্টিভংগির পার্থক্য ছিল বোধ হয়। প্রথমেই চোখ পড়েছিল ওর অতলান্ত চোখে, এক আকাশ ছোঁয়া হতাশা—আর অন্য সবাই দেখেছিল হয়ত অন্যকিছু।

এই হতাশার সঙ্গে আরো কিছু জিজ্ঞাসা ওর চোখের ভাষাকে যেন রহস্য-মধুর করে তুলল দিনকয়েকের মধ্যে। তাই যেচেই আলাপ করলাম। লিফট্ এসে সামনে দাঁড়াতেই একটু ইতস্তত: করেই 'যা হয় হবে' বলে উঠে পড়লাম ওর সঙ্গে। আলগা পাউডারের প্রলেপে ঢাকা পড়েনি বিশীর্ণ ক্লান্তি রেখা। তবু স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে যেন একটুকরো অবাক অবাক ঠিকানা। লিফটের ফ্যান্খানা—ঘুরে চলেছিল আপন মনে। দুচারটি চূর্ণ কুন্তল উড়ছিল লতিকার। একটু বিগলিত গলায় কথা বললাম—আপনিই তো ক্যাস ডিপার্টমেণ্টের নতুন কর্ম্মী। মৃদু একটু প্রতিবাদ করলে লতিকা।

—'বলুন সহকর্ম্মী'—অবশ্য আলাপ এখনও হয়নি আপনার সঙ্গে।

—'আলাপ এতদিন হয়ত হয়নি, এবার তো হয়ে গেল।'

উত্তরে নরম একটু ঘাড় নাড়ল সে। আমার কপালটুকু সামান্য বুঝি রেখা-কুটিল হয়ে উঠল একবার। ততক্ষণ লিফট্ এসে নেমেছে নীচের তলায়।

—সহজ হতে আরও দিন কয় কেটে গেল। তবু এর মধ্যেই ওর দ্রুত পরিবর্ত্তন সকলেই লক্ষ্য করে। স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠা কণ্ঠার হাড় দুটো ইতিমধ্যে মাংসের পর্দ্দায় ঢাকা পড়েছে। চোখের কোলের ক্লান্তির রেখা কর্ম্মশক্তির দ্যুতির স্থায় রূপ নিয়েছে ধীরে ধীরে। আমার চোখেও যেন গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে রূপ থেকে অরূপ। অভাব থেকে ভাবে। তবু চুপচাপই ছিলাম—। মনের উচ্ছ্বাস চেপে রেখেছিলাম সযত্নে। কিন্তু সংযমের বাঁধ নিজের হাতেই কেটে দিলে একদিন লতিকা। বস্তাজাত গোলআলুর মতই হরাইজেণ্টাল আর ভার্টিকাল প্রেসারের ধাক্কা খেতে খেতে অফিস-পথে বাসে করে ফিরছিলাম। সামনের লেডিজসিটে কচি-কলাপাতা রঙের শাড়ির ইংগিত দেখেই মনটা একটু আনমনা হয়ে ওঠে। বাঁকা চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখি লতিকা লক্ষ্য করছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। চোখের ভাবে মনে হল দৃষ্টি দিয়ে ডাকছে বুঝি আমাকে। ইচ্ছা অনিচ্ছার পরিবাদ মিটিয়ে দেবার আগেই পা দুটো তৎপর হয়ে উঠল—ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর সিটের পিছনেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মরালগ্রীবা একবার ধনুকের মতো পিছনে বেঁকিয়ে মৃদু একটা আহ্বান জানালে আমাকে—'বসুন না'। তাকিয়ে

দেখি লতিকা তার নিবিড় নিকটে বসবার জায়গা করে দিয়েছে। বাসের অন্য সকলের হিংসা আর নিঃশব্দ বিদ্রূপের কারণ হয়ে ওর পাশে বসতে ইচ্ছা করল না। 'এই তো বেশ আছি"—ভাবলাম মনে। ওর দীর্ঘ চুলের অবাক স্পর্শ এক একবার মিলে যাচ্ছে অসভ্য বাতাসের দুরন্তপনায়। গায়ে জড়ানো কচিকলাপাতা রংএর শাড়ী-খানার অবাধ্য আঁচল মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে এগিয়ে আসছে এধারে। আর কি চাই, তাই অল্প একটু চুপ করে থেকেই বললাম—"কেন এইতো বেশ আছি।" উত্তরে একটাও কথা বল্লে না ও। পিছন ফিরে শিড়দাঁড়া শক্ত করে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে থাকলো। বাসটা মৌলালির কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। নামার পর কি মনে করে আবার একবার তাকালাম বাসের মধ্যে। দেখ্‌লাম তখনো বসে আছে লতিকা ঠিক আগের মতন ভংগি নিয়ে। কৃত্রিম একটা গাম্ভীর্য্য যেন জড়িয়ে ধরেছে ওর সর্ব্বশরীরে।

পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি আমার টেবিলের উপরই গোটাপনেরো ফাইল একটা জমাট বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। পাশের টেবিলের সুনীল রায়ের দিকে তাকাতেই বলে উঠলো ও "দেখছো কি?" রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের গুঁতোর চোটে বড়কর্ত্তাদের দশম দশা। আর ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো···মানে এই আমরা। অদ্ভুত এক-ঠোঁট উল্‌টানো অভিযোগ জানালে সে। বিনানোটিশে গাদা গাদা ফাইলের বোঝা আমার মত ওর কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। আর বাক্যালাপ না করে নিজের টেবিলে বসে পড়লাম। আর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাজের সাগরে ডুবে গেলাম। কিন্তু—হঠাৎ যেন মনে হল লঘু একটু রিণ্‌রিণ আওয়াজ আমাকে ঘিরেই বেজে উঠছে। কার চটুল চরণধ্বনি এগিয়ে এল আমার টেবিল পর্য্যন্ত। চোখ তুলে তাকালাম এবার। যা ভেবেছি তাই। চুড়ির আওয়াজ বন্ধ হ'ল, আর নড়ে উঠল ঠোঁট জোড়া মৃদু একটু ইতস্ততঃ। আর পরপর ছিট্‌কে এল দুটো কথা "ট্রানজাক্‌সানের ফাইলটা"?

"সেটা তো আমার কাছে থাকার কথা নয়"—বলে সুনীলের টেবিলের দিকে ইংগিত করি।

সুনীল ততক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে। মদালস পায়ে শ্রীনিকেতনী স্যাণ্ডেল জোড়া মোজাইক্ করা মেঝের উপর ঘসে ঘসে চলে গেল সে। ফাইলখানা অবশ্য হাতে নিয়ে।

আর ফিক্ করে হেসে উঠে নাটকীয় ঢঙে আবৃত্তি করে সুনীল—মন বন উপবনে চলে অভিসারে—মানে লতিকার মত চালু মেয়ে কোন ফাইল কার কাছে থাকা সম্ভব এটা কি জানেন্ না—মনে করো? আর আমাদের অফিসে কি চাকরবাকরের অভাব হয়েছে?

হয়ত বেয়ারাগুলো সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো না তাই। আমি প্রতিবাদ করি।—ও বাবা এর মধ্যেই এত? একে-বারে হৃদয় দিয়ে হৃদি। সুনীল রায় চোখ কপালে তুলল। অগত্যা গম্ভীর হতে হল আমাকে। ওর বাচাল-পানাকে প্রশ্রয় দিয়ে শেষে অফিসের মধ্যেই একদৃশ্যের অবতারণা করবে।

গাম্ভীর্য দিয়ে অস্বীকার করা গেলনা চারিপাশের চাপা গুঞ্জন, আমার আর লতিকার গতিবিধি-বুঝি সকলেরই নখদর্পণে। আপন মনের মাধুরি মিলিয়েই রচনা চলছিল তাদের কল্পনার প্রবাল বলয়। এমনি একটি দিনে বৃষ্টি ঝরছিল শ্রাবণের আকাশ থেকে। বড় বড় অফিস-বাড়ী-গুলোর কাঁচের সার্সির উপর জলের ছাট সাপের ফণার মতই ছোবল মারছিল বার বার। কাজের চাপে সময়ের নাড়ী টিপতে ভুলেছিলাম—তাই সামনের আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পেলাম নিজেকে। ফাইলগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে অন্যমনে নেমে এলাম নীচের গাড়ী বারান্দায়, বাইরে শুধু অগাধ বৃষ্টি, একটানা আওয়াজ ঝুপ্-ঝুপ্। তাই রাস্তায় বেরুনোর আগে থমকিয়ে দাঁড়াতে হলো। আর আলো আঁধারের ধুপ-ছায়ায় কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চমক দিয়ে গেল এক ঝলক বিদ্যুৎ। আর সেই আলোতে চিনতে পারলাম লতিকাকে। একটু সৌজন্যের হাসি হেসে কাছে এগিয়ে গেলাম, আমাকে দেখেও যেন না দেখার ভান করলে লতিকা, তাই মুখ খুললাম—কী ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে দেখেছেন। মৃদু একটু ঘাড় হেলিয়ে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর রহস্য গম্ভীর একটুকরো কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়—ওরা কি বলে জানেন?

ওরা যে কি বলে আমি বেমালুম জানতাম, তবু না জানার ভান করলাম—কি বলে ?

—"ওরা বলে………"

কথা বলতে গিয়ে দুবার হোঁচট খেলে লতিকা। বাইরে শোঁ শোঁ হাওয়ার ক্রুদ্ধগর্জ্জন উঠ্‌ল। বিজুরির ছুরিতে অন্ধকারের কলজে্ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে লালরক্ত বেরিয়ে এল বুঝি। সেই রক্ত আবির মাখানো ওর কোমল কপোলে। কড় কড় করে বাজ ডেকে উঠ্‌লো। আর হাতুড়ি হানল আমার বক্ষপঞ্জরে। চমকিয়ে তাকিয়ে দেখি লতিকা কখন বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীরু কপোতির মত ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠছে যেন। অকস্মাৎ আমার পুরুষোচিত বলিষ্ঠবাহু তাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য উদ্যত হতে চাইলো—বললাম—ভয় কিসের ? আকাশে বাজ ডেকে উঠলে এই রকমই আওয়াজ হয়। উত্তর দিতে না পেরে সভয়ে চেপে ধরলে আমার হাতখানা। আর আমি তাকে দিলাম আমার আশ্বাসের আশ্রয়। দীর্ঘ সময় চুপচাপই কাটল।

দূরের গেট লাগানো বাড়ীটার সীমানায় লম্বা দুটো ইউক্যালিপটাসের মাথার উপর বৃষ্টি বাদলের ঝুর্ ঝুর্ কান্না। আর আঁধারের আড়ালে আত্মগোপন করে আছি আমরা। তবু লতিকাই মৌনতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আপনার পদবীটা কিন্তু এখনও আমার অজানাই রয়ে গেল।

আমি রহস্য গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ? ঠিকুজি কুষ্টি মেলাবার জন্য দরকার হবে নাকি।

আর অবাক অবসর এগিয়ে চল্‌ল সময়ের তালেতালে। সেই মৌনতায় আবার ছন্দপতন ঘটল, আমি বললাম—আমার পদবী হচ্ছে মিত্র—মানে একেবারে কুলীন কায়স্থ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গায়ের স্পর্শে বুঝতে পারলাম কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল লতিকা। একটু ব্যথামগ্ন চেতনা সাড়া দিয়ে উঠল ওর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উঠা-নামায়। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ। বৃষ্টি ততক্ষণ ধরে এসেছে। কালো পিচের রাস্তায় চোখধাঁধান বৈচিত্র্য এনেছে ওপাশের শো কেসের আলোগুলো। একটু নড়ে চড়ে উঠে মুখ খোলে লতিকা—যাই এবার, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে লেডিজ্ ছাতাটা মেলে দিলে ওর বেণী ঝোলানো মাথার চারপাশে। আর তারপর ঘুঠ্ ঘুঠ্ করে এগিয়ে চলল্ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট্ ধরে চৌরঙ্গীর দিকে।

আসল ব্যাপারটা জানতে বেগ পেতে হয়নি। সেই বৃষ্টি-ঝরা অবসরটুকুর স্বপ্নময়তায় যে প্রসঙ্গ ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল—তার কারণ অনুসন্ধানে জানতে পারলাম—আমার আর লতিকার জাতি বৈষম্য। সেইজন্যই বোধহয় ব্যতিক্রম এল তার সবটুকু আচরণে। অতি সাবধানে এড়িয়ে চলতে লাগল আমাকে। তবু আমি নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সরিয়ে আনতে পারলাম না নিজেকে। অকঠিন মনে হল এতই ভংগুর আমার ভালবাসা। এতই এর ভিত্তি ভূমি। তাই একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্যে সময় গুণছিলাম। ততদিন সহকর্ম্মীরা আমাকে 'হতাশ প্রেমিকের' দলে ভর্তি করিয়ে শ্লেষ-বিদ্রূপের ইতিহাস সৃষ্টি করছিল। তাই নিঃসঙ্গদিন আর নিঃসঙ্গ মন নিয়ে এতদিন টিফিন খাচ্ছিলাম অফিসের বারান্দায় বসে। শ্রীনিকেতন স্যাণ্ডেলের মৃদু আওয়াজ শাণিত করে তুলল আমার চেতনা। এপাশে ওপাশে দরজার পর্দ্দাগুলোর আশে পাশে অনুসন্ধানী চোখগুলো মিটমিটিয়ে উঠলো বোধ হয়। পদশব্দ এসে পৌছুল আমার পিছনে। এখুনি পেছন ফিরলেই চোখ পড়বে সেই অনেক চাওয়া মুখ। তবু নিদারুণ অভিমানে চুপ করে থাকলাম। শব্দ উঠল "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?" আমাকে অনুরোধ ? হয়ত সে কোনো উঁচুদরের পয়সা-ওয়ালা অফিসারের অঙ্কশায়িনী হতে চলেছে। তার জন্যই হয়ত বিবাহের নিমন্ত্রণ। তবু বললাম "যদি সাধ্যে কুলায়" বলে একটু তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম লতিকার দিকে। ওর কবরি-স্তবকে একটা জমাট রুক্ষতা। কালোচোখের অতন্দ্র ইশারায়—আবার সেই ক্লান্তির ভিড়। পদ্মপলাশ অধরে যেন রক্তহীন শূন্যতার প্রকাশ। তাই মোচড় দিয়ে উঠল মন। ভাল করে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই লতিকা বলল্—আজকে অফিস্ আওয়ারের পর আমার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন ? বিশেষ কতকগুলি জরুরী কথা আছে। প্রত্যুত্তরে ঘাড় নাড়লাম শুধু।

বৈকালি ব্যস্ততাকে ছাপিয়ে দিয়ে জেগে উঠে লতিকার কণ্ঠস্বর—"না না [illegible]

কিছুতেই করতে পারে না……"পর্য্যাপ্ত উত্তেজনা অভি-ব্যক্তির মাঝপথে টেনে আনল জেদের যবনিকা। সামনেই দুলছিল ইডেনগার্ডেনে প্যাগোডাটার প্রতিচ্ছবি ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পুকুরটার ইন্দ্রনীল জলে। সামান্য একটু চুপ করে থেকেই আমি বলি—"মিথ্যে কতকগুলি বাজে স্তোক-দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে কি করবে। আমার সহকর্ম্মী সুনীল রায়ের কাছে শুনেছি তোমার আগামী শুভদিনের ইতিহাস। কোনো মোটা মাইনের অফিসার তো তোমার বাহ'ন হতে চলেছেন। ছি লতিকা, শেষ পরে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হারিয়ে দিল তোমার মনুষ্যত্বকে……" শেষ করতে পারলাম না কথাটা।

কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত সে ঝুঁকে পড়ল আমার সামনে। নরম নরম হাত দিয়ে চেপে ধরল আমার মুখ,আর চেঁচিয়ে ওঠে বললে—"কিছুতেই আমি তোমাকে ও ধরণের কথা বলতে দেব না—তুমি শিক্ষিত, তুমি ভদ্রসন্তান। আমার এই সামান্য কথাটা যদি তুমি সহানু-ভূতি দিয়ে না বিচার কর"—

এই হল তোমার সামান্য কথা? ওসব কেতাবি বুকনির জীবন-ভাষ্য হয় না।

"কে বললে হয় না।"

লতিকা আবার কিছুক্ষণ আগে বলা তার কথাগুলো আরো আবেগ বিহ্বল করে বললে, আমার আত্মীয় পরিজন বাবা মা সকলেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমার প্রিয়জনকে ছাড়া আর সবাইকে যদি অস্বীকার করি; সংসারের পরিধি থেকে আমি যদি একটা উল্কার মতন ছিটকিয়ে বেরিয়ে আসি,তাহলে সমস্ত সংসার নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাকে। এই যে আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা, একি নিজের ভার নিজে বহন করতে পারবে? সকলের দীর্ঘশ্বাস কি তোমার ও আমার কল্যাণের পথে প্রয়োজনের পথে বিরাট এক বাধার সৃষ্টি করবে না…"

"—থাক্ থাক্, আর নাটক করে কাজ নেই" একটা ধমকানি দিয়ে চুপ করিয়ে দিই ওকে। মনের মধ্যে কথাগুলো কুণ্ডলি পাকানো বিষাক্ত সাপের মত কিলবিল করে চলে বেড়াতে থাকে। কত বড়বড় কথা বললো লতিকা—সামগ্রিক স্বার্থ, বিশ্ব-পরিধি যেখানে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অসম্পূর্ণতার প্রতীক। অর্থনীতির প্রচণ্ড চাপে জোড়াতালি দিয়ে সেখানে কাটাতে হয় আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন সেখানে এল বিশ্বপরিধির কথা। সামান্য একটু মা বাবার প্রতিবাদই যার কাছে ভালবাসাকে পিছিয়ে দেয়, তার মুখে এই সব কেতাবী কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। বললাম—"তুমি তোমার বিশ্বপরিধি নিয়েই থাকো। আমাকে তাহলে বিদায় দাও। প্রেমসূচী তোমাদের জীবনের অন্যান্য কর্ম্ম-সূচীর মতই একটা বিশেষ ধাপ হয়ত, কিন্তু এর জন্য আমাদের যে কতখানি জীবন মূল্য দিতে হয় তা যদি জানতে"…আবেগ উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে আসে আমার গলা। শুধু স্থান ত্যাগ করার আগে একবার তাকিয়ে দেখলাম বিশীর্ণ রজনীগন্ধার মতই ব্যথাক্লিষ্ট মুখখানা চোখের জলে ঢেকে গিয়েছে লতিকার।

তারপর—কতদিন কেটে গেল। বোধহয় সুদীর্ঘ বাইশ বছর। শুধু মাঝে একবার একখানা নেমন্তন্ন পত্র আর লতিকার নিজের হাতে লেখা একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। তার নবজীবনের প্রান্তে আশীর্ব্বাদ জানাবার জন্য। আশীর্ব্বাদ! তা জানিয়েছিলাম বই কি। নিজের ঔদার্য্য দিয়ে ক্ষমা করেছিলাম ওর সমস্ত হীনতাকে। এর মধ্যে কত জায়গার চাকরী করেছি আবার ছেড়েছি, মহিলা বন্ধু যে জোটেনি এমন নয়। তবু আন্তরিকতা দিয়ে বাঁধতে পারিনি কাউকে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ক্ষত ঠনঠন করে উঠত—আর তার উপর স্মৃতির প্রলেপ লাগিয়ে সাময়িক ভাবে সুখী হতে চাইতাম।

আর আজ?—ওইতো সামনের লেডিজ সিটে বসে আছে লতিকা, ওর ওই ঘাড় হেলিয়ে দূরান্তে চেয়ে থাকার চল্‌তো আমার চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। চোখের বিক্ষণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কত যাত্রী উঠল, কত যাত্রী নাম্‌ল। তবু আমি আর লতিকা স্থির হয়ে বসে। ও ইতিমধ্যে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে-ছিল, কিন্তু দেখতে পেলে না বুঝি আমাকে। সময় এগিয়ে চলল দ্রুত তালে। কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। এক সময় এসে গেল বেহালার ট্রাম ডিপো। ট্রাম আর এগুবেনা। জনস্রোতের পিছু পিছু লতিকা নামল মাটিতে—আর এগিয়ে চল্‌ল ডায়মণ্ড-হারবার রোডের কালো পিচ পায়ে মাড়িয়ে। আমি তখন

ভুলে গিয়েছিলাম আমার গন্তব্যস্থল। গজ দশেকের দুরত্ব বাঁচিয়ে পিছু নিলাম লতিকার। এ যাত্রাও সেই ব্যাঙ্ক অফিসের গাড়ী বারান্দার মত যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল আকাশ গলা বৃষ্টি। কাগজে কলমে বর্ষা ততদিন শেষ হয়েছিল। অথচ ভাদ্র আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও বাষ্পবহা মৌসুমী বেয়াদপী সুরু করলে আকাশে। গজ দুই এগুনোর পর আরম্ভ হল বারিপাত। আশ্রয় পেলাম পথপাশের এক মোটর গ্যারেজে। আমার একটু আগেই লতিকাও পৌঁছিয়েছে সেখানে। আমি ভিতরে ঢুকতেই কেমন যেন তির্যক একটু দৃষ্টি মেলে দিল মুখের দিকে। ক্ষণিক বোধহয় দ্বন্দ্ব জাগল ওর মনের মরদানে। রেখা কুটীল হয়ে উঠল গৌরবর্ণ কপাল। আর তারপর এগিয়ে এল—"যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামই কি ?..."

—"তাতে কোন সন্দেহ আছে" রহস্য করার সুযোগটুকু হারাতে ইচ্ছা করলো না। একটা সামুদ্রিক ঢেউ মাটির উপর আছড়িয়ে পড়বার আগে ক্ষণেক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো ওর নরম মুখের রেখা বিভঙ্গ। উদাস দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এল শ্রাবণের ঘনঘটা। কথা কইতে পারলাম না আমরা কেউ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করলাম অনেক দূরের মেঘের দেশে। তবু কথা কইতে গেল, বললাম—"হঠাৎ এই দিকে যে বড় ।"

—"একটু বিশেষ দরকার মানে—মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করতে এসেছি ।"

—"তোমার মেয়ে ?" একটু অবাক হ'লাম। আগের কথার জের টেনে আবার বলি—"কই মেয়ে হবার খবরতো পাইনি তোমার ? আর কত্ত বড়ই বা হয়েছে সে আজকাল ?

—"অনেক খবরই তো তুমি রাখনি, চিঠি দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়েছি ।" লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়ার পর বাড়ীও বদল করেছিলাম সে কথা হয়ত লতিকা জানতো না। কিন্তু একি কথা বলছে লতিকা, ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। সেই কালো চোখের অতলান্ত হতাশা যেন আরও প্রকট। কণ্ঠার হাড় দুটো আগের মতই উঁকি ঝুঁকি মারছে। কথার জের টেনে লতিকা আবার বলে—"মনকে চোখ ঠেরে আত্মীয় পরিজনকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলাম, তাই সমস্ত জীবনটা জোড়াতালি দিয়েই কাটল।" মনের মধ্যে ঝড় তুফানের প্রলয়ঙ্কর দাপট গোলমাল করে দিল সব কিছু ।"

তবে কি ? তবে কি ? বিয়ে করে সুখী হতে পারেনি লতিকা ! আর একবার তাকিয়ে দেখলাম—মনে হল প্রৌঢ়ত্বের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দেখছে সে, সমস্ত শরীরের উজান ঠেলা সংসার যাত্রার লবণাক্ত স্বাক্ষর। গুরু গম্ভীর আবহাওয়ায় হাল্কা বৈচিত্র্যের বেগ টেনে আনার চেষ্টা করি—"থাক্‌গে ওসব কথা। তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বল ।"

—"আমার মেয়ের বিয়ে ? হ্যাঁ সেই কথাই বলা যাক্। আচ্ছা একটা কথা আছে না, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আবার নতুন করে ফিরে আসে। আমার মেয়ে সবিতাকে দিয়ে সে কথার প্রমাণ পেলাম ।"

—"অর্থাৎ ! প্রশ্ন করি আমি।

—"সে একজন ভিন্ন জাতের ছেলেকে ভালবেসেছে। আর এই বিয়েতে আমিই করছি আনুষ্ঠানিক ঘটকালি" —কথাটি আর শেষ করতে পারলে না লতিকা।

একটী আবেগ-বিহ্বল চেতনা মূক করে দিল বুঝি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ওর ফর্সা গালের পুলক আবেশে, আর ডাগর চোখের অতীত ইংগিতে মনে হল—এতকাল বুঝি দূরে দূরে থেকেও কাছের মানুষই রয়ে গেছে সে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্ম ও জগৎ

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই শঙ্করের বিশিষ্ট মত। ব্রহ্মই চরম সত্য। ব্রহ্মই আত্মা। আত্মা একটি মাত্র, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। সকল দেহে একই আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থিত। জীবের—ব্যক্তিগত আত্মার—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বাহ্য জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। জাগতিক ও মানসিক যাবতীয় ঘটনা, যাহা প্রতিক্ষণে সংঘটিত হইতেছে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাস মাত্র, আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। মানসিক ও জড়ীয় সকল প্রতিভাসের তলদেশে যে স্থায়ী অবিনশ্বর আত্মা বর্ত্তমান, বেদান্ত তাহারই জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট। "তৎত্বম্ অসি, শ্বেতকেতু", ইহাই বেদান্তের মহাবাক্য। সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র ইহারই ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত! বিশুদ্ধ চিত্তে ভিন্ন এই জ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

"তৎত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যের তৎ শব্দ ব্রহ্ম বাচক, ত্বম্ ব্যক্তিগত আত্মা বা জীববাচক। জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্ম (বা তৎ) সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই জ্ঞান যখন অধিগত হয়, তখন জগতের বহুত্ব জ্ঞাতার মনে বিলুপ্ত হয়, জ্ঞাতা তখন ব্রহ্মই হইয়া যান। তাহার নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ও তাহাতে প্রতিফলিত জগৎ প্রপঞ্চ বিলুপ্ত হয় এবং স্বয়ং জ্যোতি ব্রহ্মই কেবল প্রকাশিত থাকেন। ইহাই মুক্তি। শঙ্কর বেদান্তের এই মুক্তি অন্যান্য দর্শনের মুক্তি হইতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে বাহ্যজগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবাত্মা আপনাকে দেহ এবং যে বুদ্ধি দেহের অংশ এবং প্রকৃতি হইতে উৎভূত, তাহার সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে। ফলে নানা দুঃখকষ্টের উৎপত্তি হয়। জীবাত্মা যখন আপনাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনে করিতে সমর্থ হয় এবং বুদ্ধি হইতে আপনাকে ভিন্ন বুঝিয়া স্বকীয় স্বরূপ চিৎ-মাত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতেও আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, দেহের সহিত সংসর্গ হইতে উদ্ভূত স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও ধন-সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়। আত্মার এই অবস্থায় তাহার চৈতন্য থাকে না। বেদান্তের মুক্তি ভিন্ন। বেদান্তের মতে জগৎই মিথ্যা, তাহার সত্য অস্তিত্ব নাই। জীবের সীমিত চৈতন্যে এই জগতের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়, তখন জীবের জ্ঞানের সাক্ষী যে চৈতন্য, তাহা ব্রহ্ম চৈতন্যে মিশিয়া যায়, (নুনের পুতুল যেমন সমুদ্র জলে মিশিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়), এবং তাহাতে প্রকাশিত জ্ঞান ও তাহার বিষয় যে জগৎ তাহারও (প্রপঞ্চের) বিলয় হয়। জীবের সসীম চৈতন্যের বিলয়-বশতঃ তাহাতে প্রতিফলিত জগতেরও বিলয় হয়। তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই বেদান্তের মুক্তি। প্রপঞ্চের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব না থাকিলেও অনাদি কাল হইতেই তাহার অস্তিত্বের বোধ হইতেছে। এই বোধ মায়িক। শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়। তাহার পরে সত্যজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায় যে সেখানে রজতের প্রতীতি হইলেও, রজতের অস্তিত্ব কখনও ছিল না। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায়—জগতের অস্তিত্ব তো তখন নাই, পরন্তু কখনও ছিল না। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিনই প্রপঞ্চের জ্ঞান হয়। ততদিন আমরা বুঝিতে পারি না, যে যদিও প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীত হয় তথাপি তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; আমাদের যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্ত, মায়িক। ততদিন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিতে পারি না; জগতের স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। জগৎ আমাদের নিকট নিয়মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রজ্ঞার যে সকল নিয়ম অনুসরণ করে, বাহ্য জগতেও সেই সকল নিয়ম বর্ত্তমান, ইহা আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানে দেখিতে পাই। কিন্তু এই জ্ঞান পারমার্থিক ভাবে সত্য নহে। যতদিন জগতের মায়িক জ্ঞান হয়, ততদিনই ইহা সত্য। যখনই পারমার্থিক জ্ঞান হয়, তখনই ব্যবহারিক জগৎ সহ তাহার জ্ঞানেরও বিলোপ হয়। তখন এক মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। অন্যান্য দর্শনে মুক্তির পরে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না (বৌদ্ধ শূন্যবাদ ব্যতীত), এবং জগৎকে মায়ামাত্র বলা হয় না। তখন জগতের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকে না, এই মাত্র বলা হয়। কিন্তু শঙ্কর বেদান্ত মতে মুক্তিতে জগৎ ও তাহার জ্ঞান উভয়ই বিলুপ্ত হয়। উপনিষদে বহুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। "(নেহ নানাস্তি কিঞ্চন)" শঙ্করের মতে এই নানাত্বের বোধ—বিভিন্ন বস্তুসমন্বিত জগতের জ্ঞান—মায়া। ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে এই মিথ্যা জ্ঞানের বিলোপ হয়। ব্রহ্মের সহিত এই মায়ার সংসর্গের কারণ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না কেননা, এই সংসর্গের কখনও আরম্ভ হয় নাই, ইহা অনাদি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সহিত মায়ার কোন সংযোগ নাই, পরম সত্যের উপর তাহার কোনও প্রভাবই নাই। ব্রহ্মের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। মিথ্যা জ্ঞানই মায়া। মায়া কোনও সৎ বস্তু নহে; তাহা অবিদ্যা। তাহা হইতে প্রতিভাসের উদ্ভব হয়। যখন সত্যের জ্ঞান হয়, তখনই তাহা তিরোহিত হয়। যতক্ষণ মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে যতক্ষণই অস্তিত্ব। তাই মায়া সৎও নহে, মিথ্যা জ্ঞানের অসৎও নহে। তাহা "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্বচনীয়।" স্বপ্ন ও অন্যান্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে

সর্প জ্ঞানে এবং স্বপ্নে যে যে বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহাদের এই অর্থে অস্তিত্ব আছে যে তাহাদের অনুভূতি হয়। কিন্তু এই অনুভূতি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনও সত্তা নাই বলিয়া তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। মায়া হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা মায়ার ন্যায়ই মিথ্যা। মিথ্যা জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টির অস্তিত্ব। মিথ্যা জ্ঞানের নাশের সঙ্গে সৃষ্টিরও নাশ হয়।

মায়াবাদের যৌক্তিক ভিত্তি

শঙ্কর কেবল শ্রুতিবচন দ্বারা স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। স্বাধীন যুক্তি দ্বারাও তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদ বিবর্ত্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইতি উদাহৃতঃ" (বেদান্তসার)। তত্ত্বের অন্যথা ভাব (পরিণাম) না হইয়া, অন্যরূপে বস্তুর যে ভাণ, তাহাই বিবর্ত্ত। পরিণামবাদেও (রামানুজ) জগৎরূপে ব্রহ্মের পরিণাম দ্বারা তাঁহার অবিকারিত্বের অপহ্নব হয় নাই। কিন্তু পরিণামবাদে ব্রহ্মের পরিণাম যে জগৎ, তাহা মায়া নহে, সত্য। শঙ্করের মতে এই জগৎ প্রতীতিমাত্র, তাহার ভান হয় কিন্তু প্রকৃত অস্তিত্ব তাহার নাই। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, অথচ ব্রহ্মাকে জগৎ বলিয়া ভাণ হয়। জগৎ তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। "অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"ই অধ্যাস। ঈশ্বর জগৎ নহেন, অথচ ঈশ্বরকে জগৎ বলিয়া প্রতীতি হয়। তত্ত্ব-প্রদীপিকা, অদ্বৈত-সিদ্ধি, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থে এই তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেদান্ত মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। সুবর্ণের অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণ ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না। সুবর্ণই অলঙ্কারে পরিণত হয়। ঘটের মধ্যে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। উপাদান কারণ হইতে কোনও কার্য্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। সুতরাং কার্য্যকে উৎপন্ন নূতন বস্তু বলিয়া ধারণা করা যায় না। উপাদান কারণের মধ্যে কার্য্য তাহার তথাকথিত উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উদ্ভবের কল্পনা করা যায় না। উপাদানের রূপের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু উপাদান হইতে স্বতন্ত্রভাবে রূপ থাকিতে পারে না। তিলের মধ্যে তৈল আছে বলিয়াই তিল হইতে তৈল পাওয়া যায়। বালুকার মধ্যে তৈল নাই বলিয়া তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায় না। এই সৎকার্য্যবাদ সাংখ্যদর্শনেও স্বীকৃত। কিন্তু সাংখ্যমতে উপাদান কার্য্যে পরিণত হয়, এই পরিণাম সত্য। কিন্তু কার্য্য যখন উপাদানের নূতন রূপ গ্রহণমাত্র, তখন এই রূপ আসে কোথা হইতে এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যখন অসতের ভাব হইতে পারে না, তখন উপাদান যে রূপ ধারণ করিয়া কার্য্য রূপে গণ্য হয়, সেই রূপেরও পূর্ব্ব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। রূপ উপাদানেরই একটি অবস্থা। যখন রূপের পরিবর্ত্তন হয়, মৃত্তিকা ঘটে রূপান্তরিত হয়, তখন দ্রব্যের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। বিভিন্ন রূপের মধ্যে দ্রব্য অপরিবর্ত্তিত থাকে। দেবদত্ত বসিয়াই থাকুক, শুইয়া থাকুক অথবা দাঁড়াইয়া থাকুক, সে একই ব্যক্তি। (শঙ্করভাষ্য—২।১।১৮), বস্তু ও তাহার রূপ (অথবা গুণ) হয়, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব হইত। বস্তু ও গুণের মধ্যে সংযোগ বিধানের জন্য তৃতীয় এক বস্তুর কল্পনা করিতে হইত। কিন্তু এই তৃতীয় বস্তুর সহিতই বা বস্তুর সংযোগ কিরূপে হয়? তাহার জন্য চতুর্থ এক বস্তু কল্পনা করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং বস্তু ও তাহার রূপ যে ভিন্ন নয়, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, কেননা উপাদান ও তাহার রূপ ভিন্ন নহে। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই কারণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কারণে যখন কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, তখন প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ত্তনের (বা পরিণামের) কোনও অস্তিত্বই নাই বলিতে হয়। পরিবর্ত্তনের অনুভব হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে সত্য বলা যায় না। অনুভূতির বাইরে রামধনু, নীলাকাশ এবং সূর্য্যের গতির অস্তিত্ব যে নাই, তাহা আমরা যুক্তি সাহায্যে বুঝিতে পারি। যাহার অনুভূতি হয়, অথচ সত্য অস্তিত্ব নাই, তাহাকে প্রতিভাস বলে। যাবতীয় পরি-ণামই প্রতিভাস মাত্র—তাহা অসৎ। তাহা বিবর্ত্ত, তাহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপের অন্যথা হয় না, কিন্তু বস্তু অন্যরূপে প্রতীত হয়। জগৎ এই অর্থে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। আমরা জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহা আমাদের মনের-ভাব মাত্র, সেই ভাব আমরা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আরোপ করি। এই মিথ্যার আরোপই অধ্যাস। ইহা আমাদের অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানবশতঃ যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহার অনুভব হয়। এই অজ্ঞানই অবিদ্যা বা মায়া।

জগতে সকল বস্তুই বিকারী। ঘটের উপাদান যে মৃত্তিকা তাহা অন্য বস্তুর বিকার। অঙ্গুরী স্বর্ণের বিকার, স্বর্ণ অন্য বস্তুর বিকার। বিকারের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা দ্রব্য। মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি যাহা পরি-ণামের অধিষ্ঠানরূপে প্রতীত হয়, তাহাও অন্য বস্তুর পরিণাম এবং প্রতিভাসমাত্র। এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের মূলে এমন কি কিছু আছে, যাহা এই সকল বিকার বা প্রতিভাসের অধিষ্ঠান? শঙ্কর বলেন— "সত্তা"ই সে বস্তু। তাহা সকল বস্তুতেই বর্ত্তমান। এই সত্তাই যাবতীয় বিকারের তলদেশে অপরিবর্ত্তিত থাকে। সকল বস্তুই এই সত্তারই প্রতিভাস। বিশুদ্ধ সত্তাই বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হয়। সকল বস্তুর জ্ঞানে এই সত্তাই প্রকাশিত হয়। সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। এই সত্তা হইতেই যাবতীয় "ভূত" উৎপন্ন হয়, সত্তা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং সত্তাতে লীন হয়।

"সত্তা" যেমন বহির্জগতে সর্ব্ববস্তুসাধারণ, তেমনি মনোজগতের সকল ভাবেই বর্ত্তমান। প্রত্যেক প্রত্যয়ের অস্তিত্ব আছে। যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এরূপ বস্তুর প্রত্যয়েরও অস্তিত্ব আছে। সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাবস্থারও অস্তিত্ব আছে। যদিও তখন কোনও বস্তুর জ্ঞান থাকে না। বাহ্য ও আন্তর জগতের সকল অবস্থারই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তাই যাবতীয় বস্তুর উপাদান কারণ। বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও এই সত্তার কোনও রূপ নাই। বহুঅংশে বিভাজ্যরূপে প্রতীত হইয়া ও সত্তা নিষ্কল (অংশ মাত্র)। এই নির্বিশেষ সত্তাই জগতের সার বা উপাদান।

স্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা কি জড় বা চেতন ? বাহ্য বস্তু আমাদের নিকট অচেতন এবং মানসিক অবস্থা চেতনরূপে প্রতীত হয়। মানসিক অবস্থাকে চেতন বলি, তাহার কারণ তাহা আপনা হইতে প্রকাশিত হয় ; কিন্তু যখন বাহ্য বস্তুর অনুভব হয়, তখন তাহা ও তো প্রকাশিত হয়। বাহ্য বস্তুর মধ্যে যদি চৈতন্য না থাকে তাহা হইলে তাহা প্রকাশিত হয়—প্রতিভাত হয় কিরূপে ? ভাণ—প্রতিভাত হইবার শক্তি—যেমন মানসিক অবস্থায় আছে তেমনি বাহ্য বস্তুতেও আছে। সুতরাং সত্তা, যাহা বাহ্য ও আন্তর উভয় জগৎ সাধারণ, তাহাও যে চৈতন্যবান্, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহার সত্তা নাই, যাহা অসৎ (যেমন বন্ধ্যাপুত্র) তাহার প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাও নাই।

কিন্তু স্বয়ং-প্রকাশিতা যদি চৈতন্যের লক্ষণ হয়, এবং সত্তা যদি চেতন পদার্থ হয়, তাহা হইলে যাবতীয় সত্তাবান্ বস্তুই প্রকাশিত, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এমন বস্তুর অস্তিত্বও তো আছে, যাহা প্রকাশিত নহে। ইহার কারণ প্রকাশে বাধা—মেঘ দ্বারা আবৃত সূর্য্য যেমন প্রকাশিত হয় না, তেমনি প্রকাশের বাধা থাকায় অনেক বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে না। স্মৃতিতে বাধা উৎপন্ন হয় বলিয়া স্মৃতির বিষয় সকল সময় উদিত হয় না। বাধা বিদূরিত হইলে, এই সকল বিষয় স্মৃতিতে উদিত হয়।

আবার ভাণ হইতেছে, অথচ প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, এমন বিষয়ও আছে। সুতরাং প্রকাশের সামর্থ্য ও সত্তা সমব্যাপী বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, যে ভাণের বস্তু নাই, তাহারও তলদেশে সত্তা আছে।

যাবতীয় সত্তার সহিত তাহার বোধ সংশ্লিষ্ট। মৃত্তিকা কাহারো সম্মুখে উপস্থিত হইলে মৃৎবুদ্ধি হয়। মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হইলে ঘটবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কাল্পনিক বস্তু কল্পনামাত্র। বাহিরে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রত্যয়রূপে তাহার সত্তা আছে। বস্তুত্বহীন ভাণের প্রত্যয়রূপে অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সত্তার সহিত জ্ঞান নিত্য সংশ্লিষ্ট।

আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্তার প্রকাশ হইলেও প্রকাশের রূপ বিভিন্ন। অনেক সময় অভিজ্ঞতার এক রূপ অন্যরূপ দ্বারা বাধিত হয়। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগারত অভিজ্ঞতা দ্বারা, ভ্রান্ত প্রতীতি (Illusion) সত্য প্রতীতি দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতার বিষয়ের মধ্যেই সত্তা বর্ত্তমান। অভিজ্ঞতার একরূপ রূপান্তর দ্বারা বাধিত হইলেও সত্তা কখনও বাধিত হয় না। সত্য, মিথ্যা সকল অনুভবের মধ্যেই সত্তা বর্ত্তমান। যখন রজ্জুতে সর্পের মিথ্যা জ্ঞান হয়, তখন সেখানে "সত্তা" মিথ্যা হয় না, শুধু তাহার সর্পরূপটিই মিথ্যা। স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা হইলেও সেই স্বপ্নের অনুভূতি যে হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হয় না। সেই অনুভূতির "সত্তা" অবাধিত থাকে। সুতরাং সত্তা ও চিন্তা (Thought) সমব্যাপী। এই সার্বিক সত্তা বা চৈতন্যের কখনও বাধা হইতে পারে না, কেননা ইহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহার বাধার কল্পনা করাও অসম্ভব। ইহাই, এই সার্বিক সত্তা চৈতন্যই (সৎ-চিৎ) পারমার্থিক সত্তা। এইরূপ উপনিষদের সৎ ও চিৎরূপী ব্রহ্মকে শঙ্কর যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সার্বিক পারমার্থিক সত্তা কোন কালেই বাধিত হয় না। যদ্বিষয় বুদ্ধির ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যদ্বিষয় বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। ঘট বুদ্ধির (ঘটজ্ঞান) ব্যভিচার হয়, যখন ঘট বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঘট অসৎ। জাগতিক যাবতীয় বস্তু দেশকালে অবিচ্ছিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহারা অসৎ। কিন্তু ইহাদের মধ্যগত "সত্তা" বিনাশ হীন। সত্তার বিভিন্ন রূপই জগৎ ও তাহার মধ্যস্থ সকল বস্তু। এইসকল রূপই অসৎ। কিন্তু যে সত্তার তাহারা বিভিন্নরূপ, তাহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই। তাহাই পরম সত্য। তাহার কখনও বাধা হয়না।

ভগবদ্গীতার ২।১৬ শ্লোকের ভাবে শঙ্কর বলিয়াছেন "অসতের ভাব অর্থাৎ ভবন বা অস্তিতা নাই। শীত, উষ্ণ প্রভৃতি সকারণ বস্তুর অস্তিতা নাই, কেননা তাহারা বিকার। বিকারের ব্যভিচার হয়। ঘটআদি চক্ষুগ্রাহ্য বস্তু তাহার কারণ মৃত্তিকার রূপেই উপলব্ধ হয়। মৃত্তিকাবর্জিত তাহার উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ কোন বিকারই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না, এইজন্য সকল বিকারই অসৎ। ঘটাদি কার্য্যের কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না এই জন্য তাহারা অসৎ। কিন্তু সেই জন্য সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ হয় না। অর্থাৎ কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, বহা বলা যায় না। কেননা সর্ব্বত্রই দুইটি বুদ্ধির (বোধ-জ্ঞান) উপলব্ধি হয়—সৎ বুদ্ধি (অস্তিতার জ্ঞান) ও অসৎ বুদ্ধি (অস্তিত্ব হীনতার জ্ঞান)। যাহার বোধের ব্যভিচার নাই, তাহা সৎ, যাহার বোধের ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ। জ্ঞানে সৎ ও অসৎ—এই দুই বিভাগ আছে বলিয়া, সকলেরই এই দুই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়।—সামানাধিকরণ জন্য (দুই বোধের অধিকরণ এক বলিয়া)। ঘট, পট, হস্তী প্রভৃতিতে ঘট, পট, হস্তী ইত্যাদি বোধের ব্যভিচার হয়, কিন্তু সৎ বুদ্ধি অর্থাৎ সত্তার বোধের ব্যভিচার হয় না। সুতরাং ঘটাদি জ্ঞানের বিষয় অসৎ, কিন্তু সত্তা জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহা সৎ। ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সত্তার বোধেরও ব্যভিচার হয় ইহা বলা যায় না, কেননা ঘটের অবর্ত্তমানে পটাদিতে তাহার উপলব্ধি নয়। "সদ্‌বুদ্ধি বিশেষণ বিষয়া" এই জন্যও তাহার নাশ হয় না। এক ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ঘটবুদ্ধি দেখা যায়, সুতরাং ঘটবুদ্ধিকে অসৎ বলিবে কেন? ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্যত্র সত্তা বোধ হয় বলিয়াই তো সত্তাকে সৎ বলা হয়। ঘটবুদ্ধি যখন এক ঘটের বিনাশের পরে অন্য ঘটে হয়, তখন তাহাকে সৎ বলিবে না কেন? ইহার উত্তর ঘটবুদ্ধি পটাদিতে হয় না।" সত্তার অনুভব প্রত্যেক বস্তুতে হয়—উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হয়। এই জন্যই উহা নিত্য বা সত্য।

বাংলা সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা

সতীরঞ্জন রায়

ালের ধ্বনি এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রবহমান স্রোতের ্রায় ব'য়ে নিয়ে চলেছে আদিম যুগের নির্বাক ভাবলোক। আদিম ্নের চিরন্তন মানস-মানসী সেদিন সংকেতময় চোখের ভাষায় নাস্বাদিত যৌবনের সংগমতীর্থে পান করেছিল যে মাধুর্য, তারও ্নের পাতায় ছিল অকথিত, অপঠিত, অপ্রচারিত সাহিত্য-রস-সুধা। ্ত তার ছিল না বাহ্যিক ভাষা, ছিল না অলংকার, ভাব, অর্থগৌরব ্ার ছন্দের নৃত্য ; কিন্তু আদিরস জন্ম নিয়েছিল অন্তরের কোমল পলি-্টিতে। অন্তরের এই রূপটিকে অতিক্রম করেও আর একটি রূপ ধরা ্ল। সে হলো আদিম মানবের অতিপ্রাকৃত রূপ। সে কোমল নয়, ্সে ছিল নিষ্করুণ কঠোর—মমতাহীন নিষ্ঠুরের ভয়াল ভ্রূকুটি। এতৎ ্ত্বেও বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সে যুগের সেই ভাবলোকের ্সত্য আজও প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। বাইরের সেই কঠোর দৈহিক ্প মনের অন্দর-মহলের দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিতে পারে নি। সেদিনকার ্দিম মানবের দৈহিক বলবীর্য পরাজিত হয়েছিল মানব-প্রাণের ্সিন্দাদের কাছে। সেই প্রাণ-মন আজও আবর্তিত হ'য়ে চলেছে। ্গিতে নর-নারীর পারস্পরিক মাধুর্যপান, সংকেত শব্দে অবরুদ্ধ ্জনার বহিঃপ্রকাশ ধীরে ধীরে পল্লবিত হ'লো—ভাব এলো, এলো ্ষা। তারই সুর যুগ অতিক্রম করে আর এক যুগে নিয়ে এলো ্ব ও ভাষার সমন্বয় বৈচিত্র্য। দেখা দিল অন্তরের ভাব-মাধুর্য ও ্ম-সত্যের বিকাশ—কাব্যে ও গানে। তারপর আর একদিকে, ্বনস্রোত বিভিন্ন পথ ও মতের জটিল জটাজালে বিশীর্ণ হ'য়ে এলো, ্ন্ত সমাজের আবেগ হলো স্ফীত। অবরুদ্ধ সেই আবেগ বিভিন্ন ্থে গতি নির্ণয় করে এগিয়ে গেল। দেখলাম কত বিচিত্র মানুষের ্ত বিচিত্র পথ। এলো জীবনে রূপকথা গল্প উপন্যাস। সেই ভাষাহীন ্গের তীর ঘেঁসে চলতে চলতে মনের আবেগ ছন্দোবদ্ধ সংগীত সমুদ্রে ্আত্মপ্রকাশ করেছিল। রচিত হলো কাব্য-গাথা-উপাখ্যান আর ্গীত। কালের মন্দিরে মহাকাল পরিবর্তনের মন্দিরা বাজিয়ে চলে। ্ই আদিরসাত্মক সংগীত জটিলতাপূর্ণ মানবমনকে নতুন জগতের দ্বারে ্নে পৌঁছে দিল। খণ্ডিত জীবনের সংঘাত-চাঞ্চল্য-ঘটনায় হলো ্আত্মপ্রকাশ। মানবজীবনের অপরিমিত অসংখ্য 'ঘটনা মানুষ যেমন ্চনা করে চলেছে, তেমনি বিরাট জীবনের পরিধিচ্যুত বিদ্যুৎ-দীপ্ত ্কটি ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে চকিতে মিলিয়ে যেতে লাগলো। ্নবের মনে জাগলো জিজ্ঞাসা। বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবনের ্ত্রে ঘটনাগুলোকে রূপায়িত করে চলেছেন যাঁরা, তাঁদেরকেই ছোট ্গল্পের কথক বলা যেতে পারে।

শিশু সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নামটা একটু বদলে বলা যেতে পারে—সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা রচনাই আমার উদ্দেশ্য। পূর্বে যে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনায় চিরকালই আমরা দু'জনকেই দেখেছি—নায়ক আর নায়িকা। আদিম যুগের নায়ক নায়িকা আজো মানুষের অন্তরের বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সেই যুগেরই সুর বাজিয়ে চলেছে। সমাজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কোন ভূমিকাই নায়ক-নায়িকার উপাখ্যানের মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য প্রথম যুগের নায়ক-নায়িকার আদি রসাত্মক মর্মকথায় আত্মীয়স্বজনদের ঠাঁই হয়েছিল, কিন্তু শিশুদের স্থান নির্ণীত হয়নি। তারপর এমন এক যুগ এলো, যখন গল্পের প্রয়োজনে শিশু চরিত্রের আবির্ভাব দেখা দিল।

আধুনিক যুগের সমালোচকবৃন্দ উপন্যাস ও গল্পের পাত্র-পাত্রীর বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সূত্র ধরে বিশ্লেষণের বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে কোন চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন, আবার কোন চরিত্রের প্রতি অবিচার করেছেন। কোন কোন সমালোচক পাত্র-পাত্রীর বিষয় পরিত্যাগ ক'রে শিশুর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য শিশু চরিত্রের আলোচনার কথা বলতে গিয়ে অপর একটি কথা বলারও প্রয়োজন আছে। অধিকাংশ সমালোচকই শিশুর প্রতি লেখকের দরদপূর্ণ অন্তরের দৃষ্টিকোণের কথা বিচার করেছেন। লেখকই সমালোচকদের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছেন—শিশুর চরিত্র বিশ্লেষণ অনেকাংশে গৌণ দেখা গেছে। গল্পের প্রয়োজনে যেখানে শিশু চরিত্র এসেছে, তাকে নিয়ে আমার ব্যস্ত হবার কারণ অতি অল্প। সে শিশুচরিত্র গল্পের অতিবেগ, এমন কি অনেক সময় উপন্যাসের মূল স্রোতঃধারাকে বিচিত্র পথে পরিবর্তন করে, সেই সকল চরিত্রই আমার প্রধান বিচার্য বিষয়। সে শিশু চরিত্রকে লেখক সচেতন মননশীলতার দ্বারা পরিচালনা করেন, সেই চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিল্পরসের অন্তরালে হারিয়ে যায়। পরিবেশের অব-গুণ্ঠনে শিশুচরিত্রের জন্মলাভ হয়, বিকাশ হয় এবং ঘটনার আবর্তনের আবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নেয়, সেই চরিত্রের মধ্য দিয়েই শৈল্পিক সংগতি ও রসবোধের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ প্রসংগে শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশায়ের শিশু চরিত্র 'চরণের' কথা বলা যেতে পারে। ছোট্ট শিশু 'চরণ,' অথচ ঘটনার আবর্তে পড়ে সেই চরণ উক্ত গল্পের মধ্যমণিই বলা যায়। বিরাট পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের তরংগ খেলে গেল কুসুম ও বৃন্দাবনের জীবনে। সন্ধান পাওয়া গেল অপ্রকৃতিস্থ সমাজের দূষিত আবর্জনায়। সেই অসংখ্য ঘটনার অভ্যন্তরে চরণের একটি নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। মাতৃহীন চরণ বিমাতার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, অথচ পিতার অবাধ্য হতেও সে শেখেনি। যেদিন গ্রামে ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, সেইদিন থেকে এই শিশুর মনে দ্বন্দ্ব দেখ

দিয়েছিল। চরণ মা'র কাছে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে আসতে হয় নিজের গ্রামে—মৃত্যুর দ্বারে। কিন্তু মৃত্যুর শেষদিনে চরণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পিতা মাতার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে মিলনের সেতু তৈরী করে দিয়েছিল। এই চরিত্রই আপন চারিত্রিক মাধুর্যে নির্মল ও সুন্দর। লেখকের পরিচালন কৌশল নিয়ে এই চরিত্রটি গড়ে ওঠে নি, বরং স্বতস্ফূর্ত গতির বেগে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে নিয়েছে।

যে শিশুদের নিয়ে আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষিত হবে, তাদের বয়ঃসীমা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন মনের কোণে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, শিশুর পর্যায়ে আমরা কাকে ফেলি? কারণ পণ্ডিত মশায়ের চরণও শিশু, আবার রামের সুমতির রামকেও শিশু সাহিত্যের আওতায় ফেলে বিশ্লেষণ করতে দেখা গেছে। তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার গোপালও শিশু, আবার শরৎচন্দ্রের মেজদিদির কেষ্টও কি শিশু? রবীন্দ্রনাথের গল্প গুচ্ছে যে কতরকম শিশু, বালক ও কিশোর চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তার কথা বিশদভাবে আলোচনা না করে এটুকু বলা যায় যে আলোচনার রাজত্বে বয়ঃসীমাকে কেন্দ্র করে শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং শিশু, বালক ও কিশোর চরিত্রের যথাক্রমে সাধারণত বয়ঃসীমা থাকবে—আট, বার ও তদূর্ধ। জ্যামিতিক ও গাণিতিক নিয়মানুসারে এই পরিমাপ সর্বদাই মেনে চলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। হয়ত সাত বৎসরের এক শিশু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি দশ বৎসর বালকের চরিত্রে প্রতিফলিত হ'তে দেখা যেতে পারে, তখন সেই বালকের চরিত্রকে শিশু চরিত্রের আওতায় এনে বিশ্লেষণ করলে কোন দোষে অপরাধী হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং বয়ঃসীমাকে কেন্দ্র করে শিশুর এই শ্রেণী বিভাগ ভুল বলে পরিগণিত হবে, যতক্ষণ না শিশুর মানসিক সচেতনতার বিষয় ভাবছি। যাঁরা শিশু সাহিত্যের বিচার করেন, তাঁরা যদি এই দিকে বিশেষ নজর দিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলির পর্যালোচনা করেন, সে আলোচনা যথাযথ হবে বলে মনে করি।

উনবিংশ শতকে যে সকল লেখক সাহিত্যের আসরে মানব জীবনের রূপায়ণে তৎপর ছিলেন, তাঁদের লেখনী শিশু মনের সন্ধান পায়নি। ভাবতেও পারেনি যে মানুষের অন্তরে যে আদিরসের ঝরণা-ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই ঝরণা স্রোতের সঙ্গেই শিশু চরিত্র জটিল-তার বন্ধ হয়ে আত্ম-গোপন করেছিল। নায়ক-নায়িকা, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের গ্লানি কখনও বাড়িয়ে দিয়েছে এই শিশু, বালক বা কিশোর; আবার মিলনের সেতুও সৃষ্টি করেছে এই চরিত্রগুলি।

প্রাচীন যুগের অগ্রগতির স্তরে স্তরে মানব জাতির জীবনায়ন বিচিত্র উন্মেষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে এসেছে। আদিমযুগের জীবনধারায় দু' একটি প্রবৃত্তিরই ছিল প্রাধান্য প্রবল। জনসংখ্যার আধিক্য আর ঘটনার বাহুল্য মানব জীবনে এনেছে বৈচিত্র্যে-বৈশিষ্ট্য আর জটিল সাহিত্যে নায়ক-নায়িকাই ছিল প্রধান। পরিবর্তনের আবর্তের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্র। নায়ক নায়িকার অন্তরে নতুন করে সৃষ্টি করলো সংঘাত। ঐ পার্শ্ব-চরিত্রগুলি এক একজন 'সংঘাতের' প্রতিমূর্তি। আজকের সাহিত্যেও শুধু এঁরা নয়, এমনি সংঘাত সৃষ্টি ও সমাধানের মূলে রয়েছে শিশুর অকৃত্রিম ও সাবলীল ভূমিকা।

বেদ ও পুরাণের সমকালিকতা ও স্বাধর্ম্য

শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার

বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'সংহিতা' বা 'মন্ত্র-ব্রাহ্মণ' বা 'য এবং বেদ'-লক্ষণযুক্ত। পুরাণ শব্দের অর্থ—'পুরাকালে যে নিয়ে যায়', 'পুরাতন যে হয় না' ইত্যাদি। বেদে প্রধাণতঃ যাগযজ্ঞ বা উপদেশের কথা ও বহু ঋষি ও দেবতা প্রভৃতির কাহিনী আছে; আর পুরাণে পঞ্চ বা দশ লক্ষণের মধ্যে ওগুলির স্থান ত আছেই, উপরন্তু ধারাবাহিকভাবে বহু বংশ বর্ণনা আছে। এজন্য পুরাণ ও ক্ষত্রিয় কাহিনীর মূল্য পার্জিটারএর মতে বেদের অপেক্ষাও অধিক। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ নয়), বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শতাধিক বৈদিক ঋষি ও সৌম্য বুধ, পুরুরবা, ঐল প্রভৃতি রাজর্ষি বা রাজার কাহিনী বিস্তৃতভাবে পুরাণে আছে।

বহু পুরাণ বা উপপুরাণে ৪।৩.শত বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী থাকায় শেষ পুরাণ-সঙ্কলনের যুগ ১½।২ হাজার বছরের মধ্যে তা অনুমান করা যেতে পারে; কিন্তু সেজন্য পৌরাণিক যুগকে ঐ সময়ে ধরা যুক্তি-বিরুদ্ধ। সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন পরবর্ত্তী রাজাদের বংশপরম্পরা রক্ষা করা পুরাণের কাজ হওয়ায় পৌরাণিক যুগের অর্থ হবে (প্রাগ্বৈদিক যুগসহ?) বৈদিক যুগ+পরবর্ত্তী যুগ। পুঁথির যুগ ভাবতে গেলে বেদ পুরাণাদির পুঁথি ৪।৫ শত বৎসরের অধিক হবে না। এই সমস্ত বিচার কালে ভবিষ্য পুরাণ নামও অসঙ্গতঃ বোধ হয় না। আবার প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি হতে উক্ত সাহিত্যের কাহিনীর কণিকা বা আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

সংহিতার মধ্যে পাঠভেদ তেমন নাই বলা চলে। কিন্তু জৈমিনীয় ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাঠভেদ ও প্রকরণাদির ভেদ আছে। উক্ত ত্রুটিগুলির সঙ্গে অতিরঞ্জন বা অলৌকিক কাহিনী যেমন পুরাণে আছে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ আছে। এই স্বাধর্ম্যেরই কতকগুলির উল্লেখ করছি। অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসেও ঐরূপ আছে।

আকৃতিগত বর্ণনীয় পুরাণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চানন, ষড়ানন, দশানন, কবন্ধ, রক্তবীজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতিতেও দ্বিমূর্দ্ধা আপ্ত্য মায়া, ত্রিশীর্ষা ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ, সপ্তবদন বৃহস্পতি, 'অনাস' প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ছাগবদন দক্ষ, গজবদন গণেশ, বড়বারূপী বিবস্বান্ প্রভৃতির মধ্যে 'টটেম' (Totem) এর অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর সমান নামা ব্যক্তির উল্লেখ থাকা সম্ভব।

লিঙ্গ পরিবর্ত্তন বিষয়ে মহাভারতাদিতে দেখি মনু কন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামক রাজায় পরিণত হইয়াছেন, ভীষ্ম পরিত্যক্ত অম্বা তপোবলে শিখণ্ডীত্ব পেয়েছেন, অর্জ্জুন ক্লীব মূর্ত্তিতে অজ্ঞাতবাস করেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদ ৮।১ ও সায়ণভাষ্য হতেও দেখা যায় যে প্লয়োগিপুত্র অসঙ্গ দেবতার শাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন ও পরে মেধাতিথি ঋষির প্রভাবে পুংস্বপ্রাপ্ত হন। এইভাবে বাবিলনের ইস্তার দেব সেমিতিক ভাষায় আষ্টার্ট—দেবী নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমানেও এরূপ দেখা যায়।

দেবতাদের মৃত্যু সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণে উল্লেখ পাওয়া দুষ্প্রাপ্য। আবার দেব শব্দের ও মৃত্যু বা গ্রহাদিরূপ প্রাপ্তির বহু ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদ ১০।১৭।১ এ যমের মাতা ও বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু, শতপথ ব্রাঃ ১৪।১।১।৯এ আপ্ত্য বা ধনুর বিস্ফোরণে বিষ্ণুর মৃত্যু ও আদিত্যলোকে গমনের কথা আছে। মৎস্য পুঃ (আ) ৮।১৮এ ইধ্মবাহ বৈশ্বানরের মৃত্যু ও স্কন্দ পুঃ (বাং) নাগর ২৪৭।২এ প্রহ্লাদাদির সহিত সংগ্রামে দেবতাদের মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমনামা ব্যক্তিদের চরিত্র বা সাদৃশ্য যুক্ত ঘটনার মিশ্রণ পুরাণে দেখা যায়। অসুর বলির স্ত্রীর সহিত সুতপা-পুত্র ক্ষত্রিয় বলির কালের দীর্ঘতমা ঋষির সংযোগ (বায়ু প্রভৃতি দ্রঃ), হরিবংশমতে বৈবস্বত হর্য্যশ্বের পুত্র দ্রুহ্যুর বংশীয়দের যযাতিবংশে প্রবেশ বা তুর্বসুবংশীয় দুষ্মন্তের বংশের সোম-পুরু-বংশে প্রবেশ প্রভৃতি দেখা যায়। বেদে এরূপ কাহিনী আছে কিনা বলা শক্ত ; তবে মনু কন্যা ইলা (বায়ু পুঃ মতে)র সময় মৈত্রাবরুণ বশিষ্ঠকে (হয়ত মনুপুত্র নিমির ইনিই পুরোহিত) পাওয়া যায়, আর ঋগ্বেদে এক স্থলে গাথী বিশ্বামিত্রাদির কালের বশিষ্ঠ ঋষি স্থানে পাঠভেদে মৈত্রাবরুণ বশিষ্ঠ বলা হয়েছে—এটা মিশ্রণ হতে পারে ; অথবা যেমন বিগ্রহ করলে ৩টী পরীক্ষিত জনমেজয়, ৩টী কাণ্ব মেধাতিথি, ৩টি দেব সাবর্ণ্য প্রভৃতি পাওয়া যায় এখানে সেরূপও হতে পারে।

কয়েকটী মহাপুরুষ বা অবতারাদির বর্ণনা দুই সাহিত্যেই দেখা যায়। ঋগ্বেদ ১০।৯০র সহস্রাক্ষ পুরুষের বর্ণনার মত ভাগবতাদিতেও তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়। এইভাবে শতপথ ব্রাঃ র মনু-মৎস্য আখ্যান ও কূর্ম-কাহিনী তৈত্তিরীয় সংহিতার বরাহ কাহিনী, ঋগ্বেদ ১।২২।১৭-১৮র বামনকাহিনী প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণোক্ত কাহিনীর অল্পবিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়। জামদগ্ন্য রাম ঋগ্বেদ ১০।১১০র ঋষি আর এক দেবকীনন্দন কৃষ্ণের কাহিনী ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। বেদের সূক্তাদির বিভিন্ন মতে ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্ক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও সশরীরী দেবতার অস্তিত্বের ব্যাখ্যার উল্লেখও বহুস্থলে করেছেন।

অথর্ববেদের তুলনায় অল্প হলেও ঋগ্বেদ ১০।১৫৯ প্রভৃতি ৭টী স্থলে বশীকরণাদি সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। গরুড়পুরাণেও বশীকরণ প্রকরণ আছে। বিবিধ বহু ঘটনার মধ্যে শুনঃ শেপ, দীর্ঘতমা, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, গৃৎসমদ, বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ বানান বহু পুরাণে আছে)—বিশ্বামিত্র কাহিনী, নহুষ, দেবাপি-শান্তিনু প্রভৃতির বর্ণনায় ঋগ্বেদ ও পুরাণের মধ্যে বহুস্থলেই সাদৃশ্য আছে।

সৌম্য বুধ প্রভৃতি শতাধিক ঋগ্বেদীয় ঋষি ও অন্যান্য বেদোক্ত রাজন্যাদির কাহিনী পুরাণে বংশবর্ণনাদিতে আছে।

জৈমিনীয় ব্রাঃ, শতপথ ব্রাঃ, ঐতরেয় অরণ্যক প্রভৃতির মধ্যে বহুস্থলে গুরুপরম্পরার আদিতে স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মের নাম আছে। পুরাণমতে ব্রহ্মা বেদ ও পুরাণের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক। ২টী উদ্ধৃতি (বহুপুরাণমতে) দিচ্ছি।

"ত্রেতায়াং প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।"

"পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।"

এগুলি, বিশেষভাবে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা অন্ততঃ এই বোঝা যায় যে পুরাণে বৈদিকযুগের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিবরণ ও পরবর্ত্তীকালের ঘটনাও আছে। মতভেদ থাকলেও মৎসংস্কৃত অতিসংক্ষিপ্ত বংশসূচী নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১।	২।	৩।	৪।
১। বিবস্বান্	১। সোম	...	...
৩২। মান্ধাতা	৩৪। দুষ্মন্ত	...	...
৩৯। হর্য্যশ্ব	৪১। অজমীঢ় ১ম	...	৩৯। হর্য্যশ্ব
৫০। হরিশ্চন্দ্র	৫৬। সুদাস	৫৬। সুদাস	৪০। যদু
৬১। সগর	৬৪। পরীক্ষিৎ	...	...
১৩৬। বৃহদ্বল	১৪৬। অভিমন্যু	১৪৮। জরাসন্ধ	১২২। কৃষ্ণ

(৩১০১-খৃঃ পূঃ ?)

১৬৭। গৌতমসিদ্ধার্থ ১৬৬। শতানীক ১৮১। বিম্বিসার (৫৬০-খৃঃ পূঃ ?)

মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সন্ন্যাসগমনকালে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি

১

বিষ্ণুপ্রিয়ে পতিপ্রাণে কঠোরোঽয়ং কলের্যুগঃ।
বৈরাগ্যমেব মার্গোঽস্মিন্ আবয়োর্ন মহাস্থিতিঃ ॥১
অন্তর্যোগো বহির্ভেদো নাস্তি নৌ গতিরন্যথা।
বিরহানলসন্তপ্তা মা ত্যজ ব্রতমুত্তমম্ ॥২

২

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
নামকীর্তনযজ্ঞে নো ন ব্যাঘাতঃ কথঞ্চন ॥৩
পিতৃহীনাঃ সুতাঃ খিন্না জীবন্তি হি কথঞ্চন।
মাতৃহীনাস্তু তে নষ্টাঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥৪
সন্তানার্থং নবদ্বীপে বাসঃ স্যাত্তে নিরন্তরম্।
মাতৃসেবা তথা কার্যা নাম্বা দুঃখমবাপ্স্যতি ॥৫

৩

পঙ্কে নিমজ্জিতং রাষ্ট্রং হিংসাদ্বেষপ্রপূরিতম্।
সদা সংরক্ষিতব্যং তে ন রাষ্ট্রং ধর্মবর্জিতম্ ॥৬
স্বয়ং পঙ্কজিনী ভূত্বা পঙ্কং সর্বং বিদূরয়।
বিষ্ণুপ্রিয়ে জগদ্ধিতে পূর্ণাং শক্তিং প্রদেহি মে ॥৭

৪

মহাপ্রভোর্মহাশক্তে মহাব্রতপ্রপালিনি।
যতীন্দ্রবিমলং দীনং পাদপুষ্পদলং কুরু ॥৮

অনুবাদ

অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী

সন্ন্যাসগমনকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ॥

পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া! এই কলিযুগ অত্যন্ত কঠোর।

এই যুগে একমাত্র বৈরাগ্যই মুক্তির পথ। সেজন্য আমাদের একত্রে বাস সম্ভবপর নয়।১

অবশ্য-আমাদের বাহিরের দিক থেকে বিচ্ছেদ হলেও অন্তরের যোগ অক্ষুন্নই থাকবে। এ ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই।

কিন্তু এইভাবে বিরহানলসন্তপ্তা হয়েও তুমি তোমার এই শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্রত ত্যাগ করোনা ॥২

হরির নাম, হরির নাম, কেবলই হরির নাম ॥—এই নাম সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে যেন কোনও প্রকার ব্যাঘাত না হয় ॥৩

সন্তানগণ পিতৃহীন হলে অবশ্যই দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করে।

কিন্তু মাতৃহীন হলে তারা ধনে প্রাণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায় ॥৪

সেজন্য সন্তানদের কল্যাণার্থে তোমাকে নিরন্তর নবদ্বীপেই বাস করতে হবে।

তুমি সেভাবে আমাদের জননীর সেবাও করবে, যাতে তিনি কোনও ক্রমেই আমার বিচ্ছেদ দুঃখকে দুঃখ বলে গণনা না করেন ॥৫

৩

আমাদের এই দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত ও হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তুমিই তাকে সর্বদা রক্ষা করো। কারণ, রাষ্ট্র ধর্মহীন হয়ে চলতে পারে না ॥৬

সেজন্য তুমি স্বয়ং পঙ্কজিনী হয়ে সমস্ত পঙ্ক বিদূরিত কর।

জগৎকল্যাণকারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া তুমিই আমাকে পূর্ণ শক্তি প্রদান কর ॥৬

৪

মহাপ্রভুর মহাশক্তি এবং মহাব্রত পালনকারিণী জননী বিষ্ণুপ্রিয়া!— তুমি দীনহীন সন্তান যতীন্দ্রবিমলকে তোমার শ্রীচরণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুষ্পদল বা পাঁপড়ি কর, অর্থাৎ তোমারই শ্রীচরণে সামান্যতম স্থান দাও ॥৮

মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার উত্তর

নদীয়েশ!

বিশ্বং তব পরমো বিকাশঃ।
অনলেঽনিলে সুচিরমম্ভোনীলে
স্ফুরতি তে সুমোহনহাসঃ ॥১
প্রিয়াদেশবাণী পালনপ্রয়াসিনী
"প্রিয়া" তব ভবতু প্রাণেশ।
ত্বমেব মম শরণং ত্বমেব মম স্মরণং
ত্বমসি সাধনং বিশেষ ॥২
জননীক্রন্দনাসার- সংজাতপারাবার-
স্রোতোধারা-বারণ-ব্রতিনী।
শ্রীগৌরাঙ্গভক্তদল- হাহাকারকলরোল-
বিলোড়ন প্রশমন-বিধায়িনী ॥৩

নাথপাদপদ্মতলে জন্মান্তরতপঃফলে
সেবানতা সুধর্মপালিনী ॥
হস্তং তব প্রসারয় রূপং স্বকং প্রকাশয়
নূনমস্মি প্রিয়সংসাধিনী ॥৪

২

বিশালপারাবার- সঞ্চারিমানাকার-
"প্রিয়া" তব জনচক্ষুরগোচরা।
ত্বয়ি জগদ্ধরভূধরে শ্রীগৌরাঙ্গনটবরে
ভবিষ্যতি ক্ষীণা জলধারা ॥৫
অনন্তে চিরবসন্তে ধরিত্রীপরসুকান্তে
ক্ষুদ্রা বল্লরী নৃত্যপরী।
মহাকাশে দিগন্তে ধ্যানযোগপ্রশান্তে
মেঘধারা স্বল্পতোয়ধরা ॥৬
তপস্তাতপনে "প্রিয়া" তেজোরূপলবতয়া
পরং স্যাস্তাতি তে বিরহবিধুরা।
ব্রহ্মাণ্ডহ্রদয়গৌর- ক্ষীণপ্রবাহাকার-
বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরসঞ্চারা ॥৭
সেবাভক্তিসংবলিতে ক্ষেমময়প্রেমপথে
ধূলিধোরণীকণিকাকারা।
গৌরমহাসঙ্গীতে ত্বয়ি বিশ্বসঞ্জীবিতে
বিষ্ণুপ্রিয়া মৃদুল-তানপরা ॥৮

৩

ধরণীভারহরণ- নাথপঙ্কজচরণ-
শৃঙ্খলং ন, ভবেয়ং নূপুরম্।
গহনঘোরবিপিনে দুর্গপথবিচরণে
কণ্টকং ন, কুসুমং সুকুমারম্ ॥৯

৪

মাতৃপদসংবলো দীনো যতিবিমলো
ভণতি হি জননীং বারংবারম্।
ত্বমসি গৌরবিধুরা তারাসারপরা
তারয়সি মে পিতরমনিবারম্ ॥১০
ত্বং হর্ত্রী কর্ত্রী ভবসি বিশ্বধাত্রী
পরং স্থিরজ্যোতিঃ পরাৎ পরম্।
শক্তেরসি শক্তিঃ গতেস্ত মহাগতিঃ
পারাবারেঽপারে পারম্ ॥১১
ধরণীপাপহরে ভক্তিশক্তিসারে
পাদং ময়ি নিধেহি শোকহরম্।
মমৈকাধারে সুতস্নেহসারে

খ

মহাপ্রভুর প্রতি

নদীয়ার ঈশ্বর !

এই সমগ্র বিশ্বই তোমার পরম স্বরূপের মূর্ত প্রকাশ। সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই—অগ্নিতে, বায়ুতে, জলে, চিরস্থির নীল আকাশে তোমার বিশ্বমোহন হাস্য স্ফুরিত হচ্ছে * ॥১

তোমার প্রিয়া † তারি প্রিয়ের আদেশ পালন করতে যেন সর্বদাই সচেষ্ট হয় প্রাণেশ্বর !

একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়, একমাত্র তুমিই আমার ধারক ও পালক, তুমিই আমার সাধন ভজন, বিশ্বেশ্বর !২

জননীর অশ্রুধারায় যে সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, তার স্রোতোধারা রোধ করাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

একইভাবে তোমারই ভক্তদলের হাহাকার ধ্বনিতে যে আলোড়ন বিলোড়নের উদ্ভব হবে, তাও আমি প্রশমিত করবো ‡ ॥৩

আমার জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলস্বরূপ তোমারই যে শ্রীচরণ আমি লাভ করেছি, সেই শ্রীচরণতলেই যেন আমি সর্বদা নত হয়ে সেবা করতে পারি, তোমারই সদ্ধর্ম যেন সর্বদা পালন করতে পারি।

তোমার মঙ্গলহস্ত সর্বদাই আমার দিকে প্রসারিত করে রাখ, তোমার পূত রূপ সর্বদাই আমার সম্মুখে প্রকাশিত কর, আমি যেন সর্বদাই তোমার প্রিয় কার্য সাধন করতে পারি ॥৪

তুমি সুবিশাল সমুদ্র, তার মধ্যে নামামৃতপায়িনী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রা মৎসী হয়েই, তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া থাকতে চায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

নটরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ ! তুমি জগদ্ধারণকারী উত্তুঙ্গ পর্বত, তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী ক্ষীণা পার্বত্যনদী হয়েই প্রবাহিতা হতে চায় ॥৫

তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময় অনন্ত চির-বসন্ত,

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রা লতা হয়েই তোমার শোভা দেখ্তে চায়।

তুমি ধ্যানগম্ভীর দিগন্তবিস্তৃত মহাকাশ,

(*) অর্থাৎ তুমি আজ গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেও আমি তোমার প্রতিচ্ছবি এই জগতের সর্বত্রই নিরন্তর তোমাকেই দর্শন করবো এবং তোমারই সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হবো।

(†) বিষ্ণুপ্রিয়ার আদরের সংক্ষিপ্ত নাম প্রিয়া।

(‡) গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটী নির্দেশ দিয়েছিলেন—(ক) সন্তান-বিচ্ছেদবিধুরা জননী শচীদেবীর সেবা ও শোকে সান্ত্বনা প্রদান এবং (খ) প্রভুর বিরহক্লিষ্ট ভক্তবৃন্দের পরিপালন।

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী স্বল্পজলধারিণী মেঘমালা
রেই বিলীন হতে চায় ॥৬

তুমি প্রচণ্ড তপস্তার মধ্যাহ্ন-ভাস্কর,

তোমার বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রা
আলোককণারূপে সুন্দরভাবে দেদীপ্যমানা হয়ে থাকতে চায় ॥৭

গৌরাঙ্গ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎপিণ্ড, তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে
কটী ধীরে-প্রবাহিতা ক্ষীণা রক্তধারা হয়েই সঞ্জীবিতা থাকতে চায় ॥৭

তুমি সেবাভক্তিসংবলিত মঙ্গলময় প্রেমপথ,

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে অগণিত ধূলিরাশির একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রা
লিকণা হয়েই পড়ে থাকতে চায়।

গৌরাঙ্গ ! তুমি বিশ্বের সঞ্জীবনকারী মহাসঙ্গীত,

তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া তার মধ্যে একটী মৃদু সুর হয়েই নিরন্তর ধ্বনিত
তে চায় ॥৮

৩

প্রভু ! পৃথিবীর পাপতাপভারহারী তোমার যে শ্রীপাদপদ্ম,

আমি যেন তার শৃঙ্খল না হয়ে একটা ক্ষুদ্র নূপুর হয়েই রণিত হতে
রি।

তোমার বিচরণের যে অতি দুর্গম, গভীর বনপথ,

আমি যেন তাতে কণ্টক না হয়ে, একটা ক্ষুদ্র কোমল কুসুম হয়েই
কশিত হতে পারি ॥৯

৪

মাতৃপদসম্বল দীনাতিদীন যতীন্দ্রবিমল জননীকে বারংবার এই কথাই
বনয়ে নিবেদন করছে :—

[তুমি পিতা গৌরমহাপ্রভুকে বিনয় করে যাই বলনা কেন, আমি নিজে জানি যে,] তুমিই এভাবে গৌরবিরহক্লিষ্টা হয়ে বিলাপ করলেও প্রকৃতপক্ষে তুমিই তো তারা বা তারণকারিণী, তুমিই তো জগতের শ্রেষ্ঠ সার-পদার্থ—অপরপক্ষে তুমিই শ্রীগৌরাঙ্গের অনবরত নির্গলিত প্রেমাশ্রু ধারাপুত নয়নতারা*।

তুমিই ত আমার পিতা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিরন্তর রক্ষা কর।১০

এ ভাবে প্রকৃতপক্ষে তুমিই তো বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী,

তুমিই তো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেয়: পরম শাশ্বত জ্যোতিঃ

তুমিই তো সকল শক্তির পরমা শক্তি, সকল গতির পরমা গতি,

তুমিই তো অকূল ভব-সমুদ্রে একমাত্র কূল ॥১১

পৃথিবীর পাপহারিণী ভক্তি ও শক্তির সাররূপিণি জননি !

তোমার সেই শোকহারী শ্রীপাদপদ্ম আমাতে স্থাপন কর।

পরমমমতাময়ি সন্তানস্নেহসর্বস্বে জননি !

তোমারই হৃদয়-উদ্যানে দীনাতিদীন ভক্ত যতীন্দ্র-বিমলরূপ যে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অঙ্কুরকে তুমি পরম স্নেহভরে স্থান দিয়েছ, তাকেই তুমি আজ কৃপা করে বিকশিত করে তোল ॥১২

(*) এস্থলে "তারাসারপরা" এই শব্দটী দুই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে—(১) তারা সারপরা বা সারভূতা জগত্তারিণী ; (২). তারা আসারপরা বা ধারাসংযুক্তা নয়নতারা !

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দত্ত

্যাপতি ও গোবিন্দদাস বৈষ্ণবপদাবলীর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি। বৃন্দাবনের প্রাকৃত লীলামাধুরীর পরিমণ্ডলীর মধ্যেই উভয়ে তাঁদের কাব্য-বিষয়ের স্থাপনা করেছেন এবং ললিত 'মধুরকমলকান্ত' ব্রজভাষার রীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্তযুগের মৈথিল-কোকিল, আর গোবিন্দদাস চৈতন্ত পরবর্তীযুগের বাঙালী শুকপাখী, তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই দু'জনের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ভাবতত্ত্বগত কিছুটা পার্থক্য আছে।

'প্রার্থনাপদগুচ্ছের পূর্ব-পর্যন্ত বিদ্যাপতি ভক্ত নন, কবি—'তাতল-সৈকতে বারি-বিন্দুসম' সুতমিত রমণীসমাজের অসারত্ব উপলব্ধি ক'রে কবি 'জগ-তারণ দীনদয়াময়' মাধবের পদপল্লব প্রাপ্তির জন্ত আকুল হয়ে ওঠেন, অন্তত্র ভক্ত-হৃদয়ের এই নৈষ্ঠিক আর্তির পরিবর্তে অন্তরের সাহজিকে প্রেম-চেতনা ও সৌন্দর্য-পিপাসার-স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-বোধই তাঁর কবিকৃতির মূলপ্রেরণা ব'লে মনে হয়। "গোবিন্দদাস যত বড় কবি, ততোধিক ভক্ত"—হৃদয়ের সহজাত প্রেমানুভূতি তাঁর কাব্য প্রেরণা নয়, প্রেমিক-সন্ন্যাসী গৌরাচাঁদের আবির্ভাবের ফলে বাঙলার শ্যামল প্রান্তরে যে প্রেম-মন্দাকিনীর জোয়ার এসেছিল, সেই অনাবিল ভাবস্রোতের এক-জন কৃতী উত্তরাধিকারীরূপে রাগ-ভক্তির সংজ্ঞান চর্য্যাই তাঁর শিল্পৈষণার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতি জনম অবধি বিশ্বপ্রকৃতির যে-সৌন্দর্যকে তিল তিল ক'রে উপভোগ করেছেন এবং যে-রূপের ধ্যান করেছেন, তাঁর [illegible]

দিয়েছেন, নিখিল সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাতে বিলসিত হ'য়ে উঠেছে—যে-প্রেমের নব নব আস্বাদনে তাঁর অন্তরের রসলোকটী নবায়িত হ'য়ে উঠেছে, মানসী-সখী রাধিকার মধ্যে তিনি প্রেমের সেই মহিমময়ী দীপ্তিই সঞ্চার করে দিয়েছেন। আর যে-গভীর রাগ-ভক্তির উদ্বেল-আনন্দে গোবিন্দদাসের হৃদয় তরংগিত হ'য়ে উঠেছে, তাঁর রাধিকার মধ্যে—বৃন্দাবনের হ্লাদিনীর সংগে বৈকুণ্ঠের শ্রীর অপূর্ব সম্মিলনে ভক্তিমতী আরাধিকা ও প্রেম-গরবিনী শ্রীমতী একাকার হ'য়ে গেছে ; সে রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মত—

'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী-পারা'

নাহ'লেও 'অভিসারকলাগি দুতরপন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি।'

বিদ্যাপতির রাধা কিশোরী মুগ্ধা নায়িকার মতই "অঙ্গে অঙ্গে মুকুলিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে।…চারিদিকে একটা যৌবনেরকম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে,…একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। আপনাকে এবং পরকে (সে) ভাল করিয়া জানে না, দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী—নিকটে কম্পিতা, শংকিতা, বিহ্বলা।…হৃদয়ের বাসনা সকল পাখা-মেলিয়া উড়িতে চায়, কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহলে এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়োসড়ো অঞ্চলটীর অন্তরালে আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশী (রবীন্দ্রনাথ)। এ-রাধা বিশ্ব-সৌন্দর্য্যময়ী হ'লেও কৈশোর-জীবনের ভাব রহস্যের উচ্ছল-তরংগে লীলা চঞ্চল, সজীব তিলোত্তমা। গোবিন্দদাস রাধা রূপের স্থূলাংশটুকু হরণ করে তার অম্লান দ্যুতিটুকু উজ্জ্বলতর ক'রে তুলেছেন—উর্ধ্বমুখী আরতির শিখার মতই নিরালম্ব সৌন্দর্য্যের এই তপতী ভাব-প্রতিমা স্তম্ভিত করে, দিশাহারা করে, প্রেমমুগ্ধ করে না, মানবচক্ষুকে অতিক্রম ক'রে তা' বিশ্ব-প্রকৃতির পরিবেষ্টনীমাত্র নয়, পরিবেশমণ্ডলে পরিণত করে। 'যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি' পদটীকে রাধাকে চিনেও চেনা যায় না, তার এই সৌন্দর্য্য রক্তমাংসে-গড়া সজীব দেহসীমার উর্ধ্বে কবির স্বপ্নে-গড়া কোন্ এক অ-বস্তু। গোবিন্দদাস তাঁর মানসলোকের নিখিল সৌন্দর্য্যকে রাধাভাবের অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় প্রেমরসে অভিষিক্ত ক'রে রাধাকে গড়েছেন। তাই বিদ্যাপতির রাধা নবীনা রূপের রাধা প্রৌঢ়া-ভাবের রাধা।

বিদ্যাপতির রাধা যেখানে সহজ হৃদয় ধর্মের পথে চলেছেন, গোবিন্দ-দাসের রাধা সেখানে পদক্ষেপ করেছেন কঠিন দার্শনিকতার ভূমিতে—সংসারের আবিলতাভরা ক্ষুদ্র চাওয়া ও বন্ধন অতিক্রম ক'রে বৃহৎ উপাসনার আঙ্গিনায় অনন্তের দিকে উৎসারিত হ'য়ে ; প্রাণের কামনা ও অন্তরের সাধনার [illegible]

যখন কেঁদে ওঠে—'বিপথে পড়ল যৈছে মালতীর মালা' তখন বিরহিণীর সেই আর্ত হৃদয়ের হাহাকারের সংগে ধূলিলুণ্ঠিত রাধার ব্যঞ্জনাময়ী মূর্তিটীও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর গোবিন্দদাসের 'যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে' পদখানি দেখি, বিরহ-বরণ ও মৃত্যুকামনা নিয়ে রাধা হৃদয়ে যে দোলাচল-বৃত্তি সৃষ্টি হ'য়েছিল, কবি তার এক চমৎকার সমাধান করেছেন।

বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধা শুধুই প্রেম-বিহ্বলা উচ্চাংগের নায়িকা মাত্র, গোবিন্দদাসের রাধা অন্তরে পূজার অর্ঘ্য থালিকা সাজিয়ে ভক্তির অনির্বাণ দীপশিখাটী জ্বালিয়ে রেখেছেন—অভিসার এখানে প্রেমানুরাগের পর্য্যায় থেকে ভক্তির পর্য্যায়ে উন্নীত। 'কণ্টকগাড়ি…' পদখানিতে বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়সী রাধার তপশ্চর্য্যার সংগে একমাত্র মহা-যোগিনী উমার পঞ্চতপা সাধানরই তুলনা হ'তে পারে। কিন্তু ভাব-সম্মিলনেও বিদ্যাপতির রাধা যেখানে—

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই'

সেখানে প্রথম প্রণয়ের চপল উচ্ছ্বাস বা অতৃপ্তির আর্তি নয়, অবিচল প্রশান্তিতে ভাস্বর এই যে প্রেমাত্মতা—ত্বদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের এই অদ্বয়-অনুভূতি কোন তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়, অনুক্ষণ প্রিয়-ধ্যান ও প্রিয় ভাবনার ফলে ধ্যানানন্দ ও ভাবানন্দের সহজ যোগ সাধনা। কিন্তু 'অধিক-আধনদিঠি' পদটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বল্লভাবৃন্দের—এমন কি জগতের সমস্ত প্রণয়িনীর ভিতরে শ্রীমতীর যে স্বতন্ত্র মূর্তিটী গোবিন্দদাস প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন, বিদ্যাপতির মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পাইনে—

"প্রেমবতী প্রেম— লাগি জিউ তেজত
চপল জীবনু মঝু সাধ।

প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই জগতের সাহিত্যে চরম কথা, কিন্তু রাধা যে প্রাণোৎসর্গের চিরবিচ্ছেদ বরণ করিতে চায় না, তার কারণ গোবিন্দদাসের রাধা চরিত্রের ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই নিহিত।

বিদ্যাপতির ভণিতার মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রীমতীর প্রতি যে-উপদেশ, যে-সান্ত্বনা-বাণীর সাক্ষাৎ লাভ করি, তাতে সখ্যভাবের ইংগিত থাকলেও পূর্ণ বিকাশনা নেই ; রাধার দুঃখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলেও কবি এখানে শ্রীমতীর চলার পথের দিশারী, সহযাত্রী নন। গোবিন্দদাস কিন্তু লীলার বর্ণনা ক'রেই ক্ষান্ত নন, তিনি লীলার মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে ও মিলিয়ে দিয়েছেন—মানস-নেত্রে লীলারস উপভোগ করতে শ্রীমতীর ব্যথার ব্যথী, সুখে সুখী, সাধের সাথী—লীলাসংগিনী হ'য়ে উঠেছেন। সখীভাবের এই নাট্যরসসমৃদ্ধ স্ফূর্তি অন্য কোনও পদকর্তায় নেই। 'প্রার্থনা' পদগুচ্ছে পঞ্চতন্মাত্রার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যভাবের সংগে [illegible]

রিক অনুশাসন মেনে ঐশ্বর্য্যভাবের আরোপ দ্বারা রসাভাস ঘটাতে নি। বিদ্যাপতির ভক্তি এখানে স্বাভাবিক সংস্কার, গোবিন্দদাসের ই ভক্তিই তাঁর কবিত্বের উৎস খুলে দিয়েছে। সংক্ষেপে, বিদ্যাপতি লিদাসপন্থী, আর গোবিন্দদাস জয়দেবপন্থী।

গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণলীলার রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস, গোষ্ঠ-হার প্রভৃতি কোন পর্বই বাদ দেন নি—গৌরচন্দ্রিকা, মান ও ভিসারের পদে তিনি অদ্বিতীয় ; বিশেষতঃ জ্যোৎস্নাভিসার, তিমিরাভি-র, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার ইত্যাদি অভিসারের এত বৈচিত্র্যও র কারও পদে দেখা যায় না। আবার বয়ঃসন্ধি, বিরহ মাথুর, সাল্লাস ও প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস উভয়েই সম্ভোগের কবি, উল্লাসরসের কবি। বিদ্যাপতির রাধা বিরহ-মাথুরে

'এভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর'

লে অসহ্য দুঃখে কেঁদে ওঠে, সেই-ই আবার আসন্ন প্রিয়-মিলনের শায় 'মংগল যতহু করব নিজ দেহে'র অটুট সংকল্পে আত্মহারা হ'য়ে ঠে। গোবিন্দদাসের রাধাও একদিকে যেমন সমস্ত অস্তিত্ব-বিচলিত-া আসন্ন বিরহে আকুল হ'য়ে কেঁদে ওঠে—

'যাহুক লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জনু
দুরজনে ফিরে নাহি কেল'

রদিকে তেমনি বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে চির-আকাংক্ষিত দয়িতের ন-লাভে সব দুঃখ বেদনা ভুলে গিয়ে সার্থকতার আনন্দে ও রতৃপ্তিতে ব'লে ওঠে—

'তুয়া দরশনে আশে কুছ নাহি জানলুঁ
চির দুঃখ তব দূর গেল'।

াপি মিলনের বর্ণনা করতে, সুখের কথা বলতে বিদ্যাপতির লেখনী মহোৎসবে উদ্দাম বেগে ছুটে চলে, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য্য হরণ ক'রে মধুচক্র রচনা করে ; গোবিন্দদাসও অনুরাগের আধারে ত্ত জগৎকে রঞ্জিত ক'রে তোলেন, বিশ্বপ্রকৃতির বুকে সমারোহ ক'রে ৷ আনন্দ-কুঞ্জের বিচরণ। "বিদ্যাপতির বর্ণিত বর্ষাপ্রকৃতি ও বসন্ত-রতি-রসের উদ্দীপন বিভাবের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ব ও প্রকৃতির যে একটা গূঢ় গভীর সংযোগ আগে, তাহারও আভাস াছে" (কালিদাস রায়)। কবি বিরহের দিনে বসন্তকেও উপেক্ষা রছেন কিন্তু বর্ষার দুর্দাম প্রভাবে তাঁর রাধাহৃদয়ের হাহাকার শের অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম র এই দেশকালাতিশায়ী শাশ্বত প্রেমের উপলব্ধিতে নিখিলের সকল াবন, সমস্ত লীলাভুবন একাকার হয়ে গেছে। "গোবিন্দদাসের তায় ও প্রকৃতির সহিত মুখ্য ভাবে না হউক, গৌণভাবে মানব হৃদয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে"—প্রকৃতি শ্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত ও বিরহে সহমর্মীই হয় নি, অভিসারের পথে যেখানে বিঘ্নও ঘটিয়েছে, সেখানেও রাধাপ্রেমের দুর্নিবারতাই বাড়িয়েছে। সর্বস্ব দিয়েও যে-প্রেম 'তিলে তিলে নূতন হোয়,' দুঃখবেদনা, ত্যাগ-সাধনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে যাকে উপলব্ধি করতে হয়, যে-প্রেম অন্তরে অনন্তের স্পর্শ এনে দেয়, উভয় কবিই সেই-প্রেমের বেদীমূলে জয়মাল্য অর্পণ ক'রে, তাকে বন্দনা জানিয়েছেন। তথাপি বলতে হয়, বিদ্যাপতির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনা বেশী, আর গোবিন্দদাসের পদে আত্মত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক। বিদ্যাপতি একাধারে বসন্ত ও বর্ষা, গোবিন্দদাস শরৎ। বিদ্যাপতির কবিতা "মুরজ বীণ সংগিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি" (বংকিমচন্দ্র)—তা'তে পুরবী ও বেহাগ দুইয়েরই মধুময় আলাপ চলে, গোবিন্দদাসের কবিতা মৃদংগ-বাদ্যের মন্দ্রধ্বনি।

এই প্রসংগেই গোবিন্দদাসের ওপর বিদ্যাপতির অসামান্য প্রভাবের কথা ওঠে। গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'সর্বসাধ্যসার' কান্তা-প্রেমের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হ'য়েও পদরচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতিকেই আদর্শরূপে বরণ ক'রেছেন। তাই ব্রজবুলির ললিত মধুর ছন্দ-হিল্লোল বা অলংকৃতির সুষমাময় ভংগীই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভাবের দিক থেকেও গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিরই অনুগামী হ'য়েছেন। 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে' পদটী বিদ্যাপতির 'যাঁহা যাঁহা পদ যুগ ধরহি তহি' পদেরই প্রতিধ্বনি এবং 'মাথহি তপন তপন ভেল…' দ্বিপ্রহরীয় অভিসারের পদখানি বিদ্যাপতির 'তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল' পদের রূপান্তর মাত্র। নব-অনুরাগের আবেগ-কম্পিত 'আধ কি আধ দিঠি অঞ্চলে' পদখানি বিদ্যাপতির (কবিবল্লভের?) 'কি পুছসি অনুভব মোয়'-র প্রায়-সদৃশ, 'ভজাহুরে মন নন্দ-নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে' পদটী বিদ্যাপতির প্রার্থনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও উভয়ের মধ্যে শুধু দার্শনিকতার পরিমণ্ডল নয় ; প্রকাশ ভংগীর দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শব্দ চয়ন, বাণী-বিন্যাস, ছন্দ-রূপায়ণ, অলংকরণ, রচনা শৈলী প্রভৃতির সমবায়ে যে সুষ্ঠু মণ্ডন-কলা উভয়ের পদেই স্ফূর্তিলাভ ক'রেছে, সেখানে বিদ্যাপতির কাব্যে চাতুর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্যের অভিনব মেল-বন্ধন হয়েছে, কিন্তু গোবিন্দদাসের কাব্যে মাধুর্য্যের চাইতে চাতুর্য্যের আকর্ষণই বেশী। মণ্ডন-কলার পারিপাট্যে শিষ্য কখন কখন গুরুকে ছাড়িয়ে গেছেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন কোন পদ তত্ত্বের ভারে না হ'লেও অলংকৃতির আতিশয্যে পংগু হ'য়ে গেছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। উদাহরণ স্বরূপ কাজের ভমর তিমির তনু', 'যোগিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু,' 'বেণুক কুলে ফুলে মদনানল,' প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কবি যেখানে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীগৌরাংগের ভাবকান্তিকে বাণীরূপ দিয়েছেন, সেখানে শুধু কল্পনার সবলতার সংগে প্রকাশভংগীর নির্মল অনবদ্যতা মিলে রচনা করে অপূর্ব মধুচক্র—"যে-অলংকারের সাহায্যে মহাপুরুষের ঐশ্বর্য্য বাঙ্ময় রূপলাভ করে, সেই উদার সরল 'উদাত্ত' অলংকারই এখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে (কালিদাস রায়)। বিদ্যাপতিও রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি,

অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকারের প্রচুর প্রয়োগ করেছেন কিন্তু বিদ্যাপতির হাতে অলংকার হীরক-হার নয়, কুসুম-মালিকারূপেই দেখা দিয়েছে আর রাধিকার অংগলাবণ্য ও বর্ণদ্যুতিতে তার সৌরভ পাঠকচিত্তকে আমোদিত ক'রে তোলে। এমন কি মাথুর বিরহের পদাবলীতে তিনি অলংকরণের ইচ্ছাও অনেকটা সংবরণ ক'রে সহজ-ভাবের ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই গোবিন্দদাসের পদে আবেগাত্মক ক্রম-বিন্যাস, আলংকারিক পরম্পরা (Rhetorical sequence) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "রস সম্পর্কে বিদ্যাপতি দণ্ডী প্রভৃতির সহিত বাৎসায়নের অনুগত, গোবিন্দদাস বিশেষভাবে রূপগোস্বামীরই অনুগত" (অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী)। এমন কি 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির কোন কোন শ্লোককেও তিনি সুললিত পদে পরিণত ক'রেছেন। 'যাঁহা পহু অরুণ চরণে' পদখানি উজ্জ্বল নীলমণির 'পঞ্চত্বং তনুরেতু' ইত্যাদি শ্লোকের, 'সজনি, মরণমানিয়ে বহুভাগি' পদটি বিদগ্ধমাধবের 'একাগ্রশ্রুত মেবলুম্পতিমতিং' শ্লোকের মুক্তানুবাদ হ'য়েও কাব্যসৌন্দর্য্যে অভিনব আস্বাদের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির মত তাঁর ছন্দের গঠন-পারিপাট্য ও সবুজ-প্রসাধনও নিষ্কলংক।

তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, ভাবের রস-প্রসূতির দিক থেকে বিদ্যাপতি, তত্ত্বের গভীরতার দিক থেকে গোবিন্দদাস এবং মণ্ডল-কলার সৌকুমার্য্যের দিক থেকে উভয় কবিই পদাবলীর কাব্যকুঞ্জে অমরত্বের প্রীতি-মালিকা কণ্ঠে ধারণ ক'রে আছেন।

দুই মন

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

যাযাবর মন মোর চলে—শুধু চলে,
নীড় নাহি বাঁধে কোন ছলে।
বাসা-বাঁধা ঘরকুনো মন
দেখে শুধু ঘরেরই স্বপন।
এক মনে আছে দুটি মন ;
কে বলিবে কে মোর আপন ?
ঘরে আছে ভীরু ভালোবাসা,
পিছু-ডাকা মিনতির ভাষা,
সেবাস্নিগ্ধ আছে দুটি চোখ,
অপলক প্রেমের আলোক !
এ স্নেহ-সেবা দিয়ে ঘেরা
এ বাঁধন যায় কি গো ছেঁড়া ?
এক মন বলে, 'এই খাসা,
ভালোবাসি এই ভালোবাসা।'
এরি মাঝে ফাঁকে ফাঁকে পথ ডেকে যায় ;
মন ভ'রে যায় মোর পথের নেশায় !
ডাকে বাট, ডাকে মাঠ, 'প্রিয়ারি প্রান্তর,
ডাকে মেরু, ডাকে মরু গোবি আর থর,
হিমাদ্রির তুংগ শৃংগ, জলধির তরংগ-বর্তন
এরা মোর একান্ত আপন।
পাখী-ডাকা জাগা প্রভাত,
তারা-জাগা কুহকিনী রাত,
ডাকে মোরে ডাকে আর ডাকে
আবিষ্ট আবিম্র মনে চেতনার ফাঁকে।
এ ধরণী আনন্দের খনি ;
এরে মোর অর্থ ব'লে গণি !
এর কাছে তুচ্ছ ক্ষুদ্র-ঘরের স্বপন,
প্রাণ-বংশী ভ'রে লই প্রকৃতির প্রীতির চুম্বন !
ছিঁড়ে যায় স্বপ্নজাল, মায়া যায় টুটে,
আঁখি-আগে ছোট সেই নীড়খানি ফুটে
বৃহতের বুক থেকে দ্বীপের মতন ;
পিছু ফিরে চলে মোর মন।
যেথানে উৎসুক দৃষ্টি উন্মুখ আগ্রহে
মোর আসা-পথ চেয়ে নিত্য জেগে রহে,
কলে চলে গৃহ-কর্ম, তিক্ত লাগে
জীবনের স্বাদ,
মধুলুব্ধ মধুপের আছে যেথা প্রীতির প্রাসাদ,
সেথা ফিরে যেতে চায় মন ;
মুক্তি চেয়ে মিঠা লাগে স্নেহের বন্ধন !
মমতার মায়া-মাখা জীবনের শত অভিজ্ঞান
সেথায় আকীর্ণ আছে আজিও অম্লান
নিজ হাতে-পাতা সেই সুষীম সংসার,
নিজহাতে গাঁথা সেই ফুল্ল ফুলহার,
ছিন্ন ক'রে নিজ হাতে নামানো
কি সোজা
বিস্মৃতির সুপ্তিতলে জীবনের বোঝা ?
এই মত ঘরে-পথে ঘুরে ফিরে মন,
মুক্তি ও বন্ধনে বোনে আপন জীবন।
জন্ম-মৃত্যু সেও বুঝি এ নিয়মে বাঁধা,
আসা-ও-যাওয়ার ছন্দে তারো সব সাধা !
গৃহী ও বিরাগী দুই-ই বাস করে মনে ;
পূর্ণ ক'রে তোলে তারে মুক্তি ও বন্ধনে !

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুলমার্গ—খিলানমার্গ

কাশ্মীরের ন্যূনতম প্রচার পত্রিকাতেও গুলমার্গের উল্লেখ আছে। মুরি, ল্যান্সডাউন্, কোদাইকেনাল, এরা যেমন পুরোপুরি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সভ্যতার তীর্থস্থান, এরা যেমন সায়েব-মায়া ভারতীয়বাবুদের স্বপ্নের মায়াপুরী, গুলমার্গ তেমনি কাশ্মীরের তীর্থস্থল। সেকালের ইংরাজদের আক্ষেপ ছিল যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শেকড় গাড়লোনা। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, কোথায় নয়? সর্বত্র ইংরেজ গিয়ে

গুলমার্গের পথে

নিজের নিজের গোড়া গেড়েছে। পারেনি ভারতবর্ষে। এ জন্য একদল ইংরেজের মহা আক্রোশ, বিক্ষোভ। শেষে তারা প্রচার আরম্ভ করলো "যদি ভারতে ইংরেজ নিজের আড্ডা গড়ার উপযুক্ত জায়গা চায়, এই গুলমার্গ থেকে আরম্ভ করো। অধিকার করো কাশ্মীর ধীরে ধীরে। একবার এখান থেকে এদের 'ঘেটো' করে তাড়াতে পারলেই···ইত্যাদি? কাশ্মীরে ইংলণ্ডের ভারতীয় কলোনী হতে পায়নি, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এর সার্থক জয়যাত্রা পূর্ণ বিক্রমে চলেছে।

'গুলমার্গ যাবো', 'গুলমার্গ যাচ্ছি' এই কথা বলার মধ্যেই কেমন একটা বিলাস, একটা দম্ভ আছে; অন্য প্রেরণা নেই। 'গঙ্গোত্রী যাচ্ছি বললেই তীর্থকামীদের স্থূল অন্ধবিশ্বাস প্রভৃত ভ্রান্তির প্রতি কেমন নাক উঁচু হয়ে কুঁচকে যায়, কিন্তু 'গুলমার্গ' যে একালের খান শান্, কদর-দানের মহাতীর্থ। সায়েব-সায়েব খেলার এমন অপরূপ স্থান নেই।

ভারতসরকারের পদস্থ একজন সুকৃষ্ণ কর্মসচিবের ছোট্ট মেয়েকে

গুলমার্গ

পহালগামে তার পিতা আমায় শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"রূপা, গুলমার্গ আর সোনীমার্গের মধ্যে কোন্‌টা তোমার ভাল লাগে?" রূপা ভ্রূ (ছোট্ট ভ্রূটী, কত সুন্দর হোতো যদি অমন না উঠতো। যদি থাকতো সভ্যতাসুলভ বিনয়) তুলে বললো "হে ঈশ্বর, কিসে আর কিসে। গুলমার্গ—আহা লভলি!" বলা বাহুল্য সবটাই ইংরাজীতে বলেছিল

ইংরিজি ট্রু হ্যাটের তলায় কাঁচা তিলের রংয়ের মুখখানা ঢেকে। খুব কৌতুক লেগেছিল তাই জিজ্ঞাসা করলাম,—'সোনীমার্গ কোন্ পথে গিয়েছিলে তোমরা ?"

"সোনীমার্গ ?" ঘৃণায় কুঁকড়ে ফ্রকপরা ছোট্ট ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন,—"রাস্তা বন্ধ। কাশ্মীর সরকার এখনও ও পথ খোলার কষ্ট স্বীকার করেন নি। জনপ্রিয় নয় তো !"

সেই গুলমার্গ যাবার দিন আজ। খাবার বাঁধা হয়ে গেছে। অসিত পান নিয়েছে। আমাদের দল প্যাক হয়েছে একগাড়ীতে। আমি চড়েছি পাঁড় শিক্ষকদের গাড়ীতে। আজ ওরা ছাড়লো না। সবাই হোমরা চোমরা অধ্যক্ষ। মেকীর মধ্যে বেণু, অসিত আর মনোরমা।

তুষারাবৃত দিগন্ত

আমরা বাকী সব "বড় বড় পেট—মাথা করে হেঁট"—সেই দলের চাই। কিন্তু এ যে সব এক করে দেবার দেশ। এখানে যে বড় থেকে ছোটো, ধনী থেকে দরিদ্র সকলেরই আত্মবোধ চুর চুর হয়ে যাবে। নিরলস সৌন্দর্য্যের পায়ে পায়ে।

খানিক যেতেই এসে গেল এক দেশ। দুধগঙ্গার দেশ। গাড়ীকে খানিকক্ষণের জন্ম থামতে হোলো। কল্ কল্ শব্দে নদী বয়ে চলেছে, বেশ নীচে দিয়ে হলেও খুব নীচ দিয়ে নয়। দুধগঙ্গা তো দুধগঙ্গা ! জল বয়ে যাচ্ছে, তার রং শাদা ; পালকের মতো শাদা, দুধের মতো শাদা। তুষারহারধবলা যে কি জিনিষ বোঝা যায়। নদীর ধারে ধারে মনোরম ক্ষেত—'সন্নিতঃ [illegible]' । [illegible]

এ্যাশ্, উইলো। মাঝে মাঝে আপেল, আখরোট, খোবাণী। ফুলের সময় নয় এটা কাশ্মীরে। সে আরও মাস তিন পরে। তবু ফুলের কৃপণতা নেই। এর মাঝে মাঝে গা ঢেকে তিনচার খানা পাথর কাদায় গেঁথে তোলা কুঁড়ে ঘর। কয়েকটা ভেড়া, কয়েকটা গরু, মুর্গী ঘোরে, ছোটো ছেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখে, হাত পেতে চায় ভিক্ষা—"বখ্শিস্"।

এককোণে ছায়াঘেরা রমণীয় একটু পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। দুর্বার লোভ সামলানো গেলনা। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্মও সরে পড়লাম অলক্ষ্যে যেন সবুজের মায়ায় মিলিয়ে গেলাম। পপলার, আখরোট আর চিনারে ঘেরা একটু চৌকো জায়গা। চারধারে কোমর উঁচু দেয়াল তোলা। একটি কাঠের গেটের ওপর হলি-হকের মতো ফুলের লতা। চমৎ-কার সাজানো বাগান। দু-সার সাইপ্রেসের তলায় বর্ডার করা ফুলের গাছ। ঝকঝকে তকতকে পরিচ্ছন্নতার ছবি। একধারে একটি মেয়ে গায়ের ওড়না দিয়ে একটা কবর থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলছে। এমনি অনেক কবর। গাঁয়ের কবরস্থান। কাশ্মীরের গ্রামের কবরস্থান শ্রী আর শান্তির একটী আকর। যেখানেই গেছি এর ব্যতিক্রম পাইনি। অথচ জীবনে কাশ্মীরীরা নোংরা !

সেদিনকার ডায়েরি থেকে তুলে দি কয়েকটা পংক্তি—"আমি বলতে পারবোনা যে এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। কিন্তু গুলমার্গ যাবার চড়াইয়ের পথের সৌন্দর্য্য, সেই পথ থেকে শ্রীনগরের সমতলের চুল ছড়ানো, পাছড়ানো, স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষমার বর্ণনা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আগাগোড়া পথে ঝরণার সুষমা মনকে মাতিয়ে রাখে।"

একটা 'হল্ট্'। তন্মার্গ। এখানে থেকে গুলমার্গ পাহাড়ের চড়াই। গুলমার্গ একটা পর্বত শিখরে অধিত্যকা ভূমি। আরোহণ করতে হবে।

ঘোড়া নিলাম তিনটে। পাঁচ টাকা করে ভাড়া। বেণুর ঘোড়ার চড়ার হাতে খড়ি। ভয়ে ভয়ে চড়লো। কিন্তু কাঠ হয়ে বসে রইলো। ঘোড়াও ভাবলো কি বুঝি বা পিঠে চেপেছে। একেবারে মুখটা নীচু করে চলতে লাগলো দারুণ অপমানে বিপর্য্যস্ত।

আমি আর অসিত ঘোড়ায় চড়েছি। তবে আমরা তত বুঝিনা

ঘোড়া চলেছে। পাশে পাশে ছেলের দল দৌড়ুচ্ছে, লাফাচ্ছে। মেয়েরা আর ছেলেরা উঠছে দলে দলে। কত জনই যে ঘোড়ায় চড়েছে। সব ঘোড়া আমাদের দলই কাবার করে দিয়েছে। চলে চলে হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি নীচে একটা সবুজ মখমল ঢাকা বাটী। ওই বাটিটাই গুলমার্গ।

গুলমার্গে রাণী হাব্বা বেড়াতে আসে যুসুফকে নিয়ে। সেই কবিমনটাই আবিষ্কার করে গুলমার্গের সুষমা। সেই থেকে গুলমার্গ যুগে যুগে বেড়াবার জায়গা। শীতের দিনে বরফে 'স্কী' খেলার জায়গা। সমস্ত গুলমার্গ-বাটীটির বিশেষত্ব কচি ঘাসের বাহার। মাটীর রং এক পীচঢাকা পথ ছাড়া আর দেখা যায়না। এত নরম, ঘন, কচি ঘাসে ঢাকা এতখানি জায়গা আগে দেখিনি আটহাজার ফুটের মাথায়। যথারীতি দিগ্বলয়-ঘেরা আছে পাহাড়ের সারিতে। পাইনের গাছই বেশী এখানে। একটা হোটেলে চা-ইত্যাদি রয়েছে। ডাকখানায় গিয়ে একখানা চিঠি লিখলাম। তুষারাবৃত দিগন্তের একটা ছবি নিলাম। গুলমার্গে সৌখীন ইংরাজী-কায়দার বাংলো ঘরবাড়ী বিস্তর। ঘোড়দৌড় খেলার উপযুক্ত জায়গা। বরফের সময়ে যে এই 'বেসিনে' চমৎকার স্কেটীং চলতে পারে তা বেশ বোঝা যায়। মাঝ দিয়ে ক্ষীণ একটি স্রোত ধারায় কনকনে ঠাণ্ডা জল। মুখে মাথায় দিয়ে শরীর মন তাজা হোলো।

ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা ছোটাছুটি করে উঠতে লাগলাম খিলাজ মার্গ। পথে গুলমার্গের ছোটো একটা বাজার চোখে পড়লো।

খিলাজমার্গ

আর চোখে পড়লো বহু ভাঙ্গা বাংলো, একটা ভাঙ্গা চার্চ। ইংরেজরা যখন যেখানে থাকে পরিবেশটা রমনীয় করে রাখে ফুলে, বেড়ায়, গাছে, যত্নে। চার্চ এবং তার আশেপাশের জায়গা এককালে যে কতো সুন্দর ছিল এখনও তা বেশ বোঝা যায়। কে যেন, কারা যেন, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে, লণ্ডভণ্ড করে গেছে। তিন চার বছরের মধ্যে নানা গুল্মলতায় আকীর্ণ হয়েছে ভগ্নস্তূপ, দেয়ালের ইঁটে শ্যাওলা জমেছে, ধরণীর ক্ষুধার কবলে গ্রস্ত হয়েছে মানুষের দম্ভ, আর দর্পের সীমানা। ঘোড়ার মালিক যুবকটী বললে আফ্রিদিগের কীর্ত্তি!

মনে পড়ে গেল ১৯৪৭, ১৯৪৮ এর সেই ভীষণ সংবাদ, কাশ্মীরে যায়নি, চার্চ, কলেজ, হাসপাতাল বাদ যায়নি। সভ্যমানুষ লেলিয়ে দিয়েছে ক্ষুধার্ত্ত জীবের জঘন্য ক্ষুধাকে। প্রাঙ্‌মানবিকতার কদর্য্য বিকাশ তখনকার নেতৃস্থানীয়েরা করতে দ্বিধা তো করেননি। রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপলক্ষে এই নির্মম আতঙ্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সর্বরাষ্ট্রীয় মহাধিকরণে।

প্রায় মাইল দেড় ধরে এই অত্যাচারিত বনভূমি পার হলাম। তারপর দুঃখদ ও দুস্তর পথ। পাথরের নুড়িতে ভর্ত্তি। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেউ আগে, কেউ পরে। পাহাড়ী পথে চলার এই এক সুবিধা হারিয়ে গেলে একেবারে গেলে, নইলে হারাবার জো নেই। যে যার নিজের চালে চলে; কেউ ধিমতালে, কেউ দ্রুত লয়ে। কাজেই খানিক চলার পর যে যার খুঁজে পায় নিজের মনের ছন্দ, যে ছন্দে বাঁধা পড়ে চলার ছন্দ। গতির ছন্দ তো মনের দ্বারা নিয়মিত। এখানে আফিসের তাড়া নেই, পাওনাদারের তাড়া নেই। ট্রেণ ধরার তাড়া নেই, রেষারেষির তাড়া নেই। এখানে সব স্থাণু, স্তব্ধ, সমাহিত। এখানে সব নিবিড়, প্রচ্ছন্ন, তন্দ্রিত। এখানে সময় বয়ে যায়না ঘড়ির কাঁটার তালে তালে; কাল এখানে নৃত্য করে শিখর শিখরে, পল্লব হতে পল্লবে, সবুজ থেকে নীলে। আকাশ এখানে ক্লান্ত মধ্যাহ্নকে পার করে সন্ধ্যার কুলায়ে প্রবেশ করার জন্য ব্যস্ত নয়; আসন পেতে রেখেছে সে সমগ্র প্রকৃতির উপর মানুষের মনের শান্তং সুন্দরংকে

চায়, নানা ভাষায় করে জল্পনা, নানা সীমারেখায় করে চিন্তন। এখানে কেউ ওঠে ঘেমে, কেউ যায় থেমে; কেউ ভেবে চড়ে, কেউ নেমে। তাই পায়ে-চলার সুর এক নয়। চোখের চাওয়া যেখানে এক নয়, মনের পাওয়া যেখানে এক নয়, হৃদয়ের কওয়াও যেখানে এক নয়, সেখানে পায়ে চলা এক হবে কেন? কেউ এগিয়ে যায়, কেউ পেছিয়ে। মনে মনে সবাই জানে পথ একই। আগেই যাই, পিছেই থাকি ঋজু বা কুটিল যে পথই কেন না ধরি—"নৃণাং একো গম্যঃ" মিলবো গিয়ে সেই খিলানমার্গে।

মিললামও সেখানে। শেষ ধাপ উঠছি। অত্যন্ত খাড়াই পথ বলে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ। পিছনে পিছনে ঘোড়াওলা ঘোড়া নিয়ে নামছে। খিলান মার্গের ওপরে এসে গেছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি দীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ অথচ বয়োবৃদ্ধ পরিচিত ব্যক্তি একা একা নেমে আসছেন, হাতে লাঠী। বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়কে এখানে দেখব এমনি একটা চমৎকার পরিবেশ, কি করে আশা করি? কোনও লোকজন সঙ্গে নেই, প্রচার নেই, তোষামোদকারী নেই, একা একা এই আনন্দে অবগাহন এবং এই বয়সে; এক বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের দেশের মনটি ছাড়া সম্ভব নয়। হাত তুলে নমস্কার করলাম; মনে মনে সন্দেহ তিনি ন হয়তো। তারপরেই মনে হোলো, কাশ্মীরে এখন সর্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন চলছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ী বন্ধুর পথে দীর্ঘ-দেহ পাইনের জঙ্গলের মধ্যে সে মূর্ত্তি নেমে গেল।

'মার্গ' মানেই পর্বত শিখর—যে শিখর তুঙ্গ নয়, খানিক সমতল এবং তা তুষারাচ্ছন্ন। গুলমার্গ সায়েবদের প্রিয় আড্ডা ছিল, এবং খিলান মার্গ ছিল চড়ি ভাতির আড্ডা। বেশী নয় তিন মাইল চড়াই। আগাগোড়া শিখরটা তুষারাবৃত। নীচের দিকে ঢালটার ওপরেও বরফ জমা। দিব্যি 'স্কী' খেলা চলে। সেজ তো চলেই। সেজ গাড়ীও আছে কিছুরে ব্যবসায়ীদের বন্দোবস্তে। ছেলেরা ভাড়া নিচ্ছে আর চড়ছে। শিখরের চূড়া অবধি খুদে খুদে ছেলেমেয়েদের দল উঠে গেছে। শাদার গায়ে পিঁপড়ের সারের মতো উঠছে। কী আনন্দ ওদের এই বরফ পেয়ে। মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে জলের কণা পড়ছে গায়ে, আকাশে যে মেঘ চলাচল করছে তার মাঝেই যে আমরা। যখন মেঘ আসছে সব ভিজে যাচ্ছে শিকরকণায়; আবার রোদে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনজন আর্টিষ্ট বসে গেছে ছবি আঁকতে; আমাদেরই দলের। রুক্মিণীও আছে এদের মধ্যে। আরও একজন মহিলা। শিক্ষয়িত্রী কিন্তু ঘরোয়া চেহারা, দোহরা ভারী, স্তিমিত দৃষ্টি মানবতায় ভরা; স্থূল বস্তুজগতের সাধরণিকতা মাখানো। কিন্তু আঁকার হাত পাকা। সামান্য রং ব্যবহার করছেন, কিন্তু আঁচড় কাটছেন এক সঙ্গে অনেকটা নিয়ে। মনের ঢল শরীরের ঢলের মতই প্রশস্ত; সাবলীল ও দৃঢ় ওঁর রেখাপাত; স্বল্প টয়লেট করা মুখখানার মতোই স্বল্প বর্ণে অশেষ বিকাশ আছে চিত্রে। নাম মন্দার। (ক্রমশঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস

মন্দাক্রান্তা রায়চৌধুরী

বি দেখে তার সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত না হয়ে আর্টের বিচার করতে বসেন, দের সৌন্দর্য্যপিপাসু মনটার ভাগে পড়ে ফাঁকি। তেমনি কাব্য তে বসে যদি তার রসের বিচার করতে বসা যায়, তবে পাঠকের পক্ষে র আস্বাদগ্রহণ দুরূহ হয়ে পড়ে। সহৃদয় পাঠকের অনুভূতিশীল মনই ণ করতে পারে সে রসের আস্বাদ। মনের বাইরে রসের স্বতন্ত্র কোনও নেই। "রসের প্রতীতি বা অনুভূতি" হচ্ছে রস। এ দুইয়ে নো ভেদ নেই। রসের আস্বাদই রস।

রসবিচার ও বিশ্লেষণ উভয়ই রসাস্বাদের পরিপন্থী হলেও রসের য়ের হাত থেকে রসপিপাসুর নিষ্কৃতি নেই। রসের আস্বাদই রস।

রস বিচার ও বিশ্লেষণ উভয়ই রসাস্বাদের পরিপন্থী হলেও রসের য়ের হাত থেকে রসপিপাসুর নিষ্কৃতি নেই। এই বিশ্লেষণের ফলে গেছে, সংস্কৃত সাহিত্যে রসের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশীরকম কৃত হতো বলে প্রাচীন আলংকারিকরাও এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" হতে হয়েছে। মনের ভাব হতে রসের উৎপত্তি। রস সম্বন্ধীয় অন্য আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

যে ভাবের আলোকে রস উদ্ভাসিত হাস্যরস সেই ময়ুখমালারই একটি রশ্মি। আলংকারিকরা রসকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

হাস্যরস তাদেরই অন্যতম।

সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু এই হাস্যরসের স্থান অতি নিম্নাসনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' আদিরসে পর্য্যবসিত হয়েছে। নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। বিরল কেন, নেই বললেই হয়। কাজেই হাস্যরসকে কখনও অন্যরসের সঙ্গে এক পঙক্তিতে গণনা করা হয়নি। সস্তার মনোরঞ্জনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় এই রস পরিবেশিত হতো। কাজেই এর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিলো সাহিত্যের নিম্নশ্রেণীতে। হাস্যরস যে কেবল প্রহসনের সীমায় সীমায়িত নয়, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য যে সমস্ত বিষয়কেই আলোকিত করতে পারে, সে সংবাদ

গৌরব হ্রাস না করে সে বিষয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে পারে, প্রাণ ও গতির ছন্দ যে আরও সহজ ও দীপ্যমান করে তুলতে পারে, সেই সম্ভাবনার দুয়ার সংস্কৃত সাহিত্যে ছিলো প্রায় রুদ্ধ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যরস পরিবেশিত হতো বিদূষকের মাধ্যমে। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র হোক না কেন, কোনও গম্ভীর আলোচনায় একে সযত্নে পরিহার করা হতো। এই বিদূষক-পরিবেশিত হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো শৃঙ্গারমূলক। কাজেই তা ভাঁড়ামোরই নামান্তর মাত্র ছিলো। Humour অথবা এর পর্য্যায়ের এই হাস্যরস কোনোদিনও উন্নীত হোতে পারে নি। কেবলমাত্র শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকে" এবং কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রমের" বিদূষক ভাঁড়ামিবিরুদ্ধ। কিন্তু তথাপি হাস্যরসে এদের অবদান কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। চারিত্রিক অবদান হিসেবেই এই বিদূষকযুগলের খ্যাতি। কালিদাসের বিদূষক-সৃষ্টি অনন্যসাধারণ। অনেকের মতে Shakespeareও বিদূষক-সৃষ্টিতে তেমন সক্ষম হন নি। কিন্তু তা'হলেও হাস্যরস পরিবেশনে কালিদাসও প্রায় অপরাপর সংস্কৃত সাহিত্যিকের মতো এবং সে গণ্ডীটুকু কাটিয়ে উঠতে তিনিও সমর্থ হন নি।

রামায়ণ মহাভারতে হাস্যরসের কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মেলে না। পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটক, এক অংক থেকে আর এক অংকের অবতারণায় দর্শকচিত্তের ক্ষণেক বিশ্রান্তি লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবেশনের জন্য এই বিদূষক সৃষ্টি হয়েছিলো। যেমন 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র বসন্তক ও "অভিজ্ঞানশকুন্তলমের" বিদূষকের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দর্শকচিত্তের বিশ্রান্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শুধু যে হাস্যরসের জন্য এই চরিত্রসৃষ্টি, তা নয়। কারণ নাটকের বহু ইঙ্গিত ও গতিশীলতা বহনেও বিদূষক সহায়তা করেছে। শকুন্তলার বিদূষকের মাধ্যমে কালিদাস বহু ইঙ্গিত সাধিত করেছেন। আবার নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, নাটকের সকল রসে পুষ্ট হওয়া উচিত। কাজেই সেই প্রয়োজন সাধনার্থেও এ রসের অবতারণা করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বত-উৎসারিত রস ও চেষ্টাকৃত রসসৃষ্টি—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা অতি স্পষ্ট। প্রথমটা দিতে পারে সহজ অনাবিল নির্ম্মল হাস্য। দ্বিতীয়টার সে উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য-দানের ক্ষমতা নেই। তাই প্রয়োজন সাধনার্থে সৃষ্ট হাস্যরস সংস্কৃত সাহিত্যে কোনোদিন উচ্চাসনে আসীন হতে পারে নি। বক্রোক্তি, শ্লেষোক্তি ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম হাস্যরস আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কোনও নাটকীয় চরিত্রাবলম্বনে হাস্য পরিস্ফুটনে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

+ সাহিত্যদর্পণ

আর্য্য সঙ্গীতে "শ্রী" রাগ

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

"শ্রী" রাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে "শ্রী"র উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। তাহা না হইলে রাগটী সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় না।

পুরাণ বলে—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা খ্যাতির ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুর সহিত বিবাহ হয়। ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে "শ্রী" নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যা নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করেন।

পরাসম্বিদ যখন অবিদ্যা সহায়ে কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত হয় ও উন্মেষমুখী হইয়া বিবিধ কল্পনাময় হয় তখন মনরূপে বিরাজ করে। অর্থাৎ চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ। যাহা বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক সত্তা ও অসত্তার বোধ সম্পাদন করে এবং যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে তাহা চিদাকাশ। যাহা জীবগণের ব্যবহার পরম্পরার প্রধান কারণ এবং যাহা দ্বারা জগৎ বিস্তার তাহার নাম চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশই কালের প্রকাশাত্মা। অর্থাৎ চিত্তাকাশ হইতেই কালের উৎপত্তি। প্রাণদাতা পবন ও বর্ষণকারী মেঘ যাহাতে অবস্থিত ও যাহা ভূমণ্ডলের দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে তাহাই ভূতাকাশ। চিদাকাশই সকলের কারণ। ইহা হইতেই চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ অবিদ্যা মায়ার দ্বারা আবির্ভূত। এই চিৎ চিত্তরূপে আবির্ভাব হইয়া মনের রূপ প্রকটন করে। অর্থাৎ মনরূপে বিরাজ করে। সেই মন জগৎরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। এই মনই ব্রহ্মা। কারণ ব্রহ্মা মন সহায়ে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার কল্পনাময় মনোরূপ। এই মনই জগতের কর্ত্তা ও হিরণ্যগর্ভ নামক পরম পুরুষ।

এক বস্তু হইতে আর এক বস্তু যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই উৎপাদিত বস্তুকে পুত্র বলে। যখন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আবির্ভাব হয় সেই নব আবির্ভূত অবস্থার নামকরণ করা হয় পুত্র। অর্থাৎ যখন উচ্চ সূক্ষ্মতা হইতে নিম্নমুখী হইয়া স্থূলগামী হয় তখন সেই নিম্নমুখী শক্তির অবস্থাই হইল ভৃগু। ভৃগু অর্থে প্রপাত, (ভৃগু—ভ্রস্জ্+কু ক। ভ্রস্জ্ অর্থে উচ্চ হইতে পতন)। মন নিম্নমুখী হইলেই ভূত প্রকাশ শক্তির বিকাশ। এই প্রকাশ শক্তিই হইল খ্যাতি। যাহা প্রস্ফুরিত বা বিকসিত করে তাহাই হইল "শ্রী"। "শ্রী"র অর্থ হইল সৌন্দর্য্য ও শোভার বিকশিত হওয়া। "শ্রী" শব্দটি শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্বিপ্ কর্ম্ম প্রত্যয়ে সিদ্ধ। তাহারা হইল বুদ্ধি, সিদ্ধি,

কীর্ত্তি, বুদ্ধি, শোভা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ত্রিবর্গ। ইহারা শ্রীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে "শ্রী" অমৃত মন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্ন। জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী "শ্রী" নিত্যা। বিষ্ণুর ন্যায় ইনিও সর্ব্বগতা। বিষ্ণু অর্থ ইনি বাণী। বিষ্ণু বোধ ইনি বুদ্ধি। বিষ্ণু ধর্ম্ম ইনি সৎক্রিয়া। বিষ্ণু স্রষ্টা ইনি সৃষ্টি। বিষ্ণু ভূধর ইনি ভূমি। বিষ্ণু কাম ইনি ইচ্ছা। ইনি স্বাহা বিষ্ণু হুতাশন। বিষ্ণু শঙ্কর ইনি গৌরী। বিষ্ণু অবকাশ ইনি আকাশ। বিষ্ণু শশাঙ্ক ইনি কান্তি। বিষ্ণুদ্রুম সংহিত ইনি লতাভূতা। বিষ্ণুধ্বজ ইনি পতাকা। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত ইনি কলা। বিষ্ণু রাগ ইনি রতি। অর্থাৎ বিষ্ণু আধার ইনি আধেয়। ইঁহারা অভিন্ন।

দুর্ব্বাসা শাপে যখন স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট ও অসুর আক্রান্ত, তখন ইনি ক্ষীরোদ সাগরে নিমজ্জিত। দেবতাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করত সমুদ্র মন্থনে আদেশ দিয়া স্বয়ং কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করত মন্দার পর্ব্বত মন্থ দণ্ডরূপে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। সেই মন্থনে "শ্রী" উৎপন্না হইয়া নারায়ণের বক্ষ সংলগ্না হন।

যিনি নার আশ্রিত তিনিই নারায়ণ। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূ নবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণ স্মৃতঃ॥"

আপকে নারা বলা হয় এবং এই আপে ইন্দ্রিয় কারণে নব নব তরঙ্গ উৎপন্ন। কারণ ইন্দ্রেন আপ্ত হইল আপ্ত। এই রূপ তরঙ্গায়িত আপ আশ্রিত যিনি তিনিই নারায়ণ। নার কথাটি নর শব্দ+ক ইদমর্থে। অর্থাৎ পরা সম্বিদকে অচিত্তরূপে রূপায়িত করিবার জন্য ইদমর্থে ক প্রত্যয়। নর শব্দের এক অর্থ তরঙ্গ। এই নারকেই সমুদ্র, মহোর্ণব, কারণ বারি, প্রকৃতি, মায়া ইত্যাদি বলে। কারণ বারি বলিবার হেতু—যাহা পরম কারণকে বারিত করে ও স্বয়ং কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই কারণ বারি। বারি শব্দটি বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃ অর্থে আবরণ। এই বারিতে যখন তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন সেই বারি চিহ্নিত হয়। মনই কারণ বারি। বেদ বলেন—

"সরস্বতী মহোর্ণব প্রচেতয়তি কেতুনা
ধীয়ো বিশ্ব বিরাজতে।"

সরসরূপ মহার্ণব যখন তরঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখন ধী শক্তিতে জগৎ বিরাজ করে। প্রতিভাসনই মনের স্বভাব এবং ইহার প্রতিভাসনই দেহাদিরূপে প্রতিভাত হয়। মন নিত্য বিদ্যমান। মন আছে বলিয়াই দেহাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। সমাধি অবস্থায় মন যখন অভীষ্ট বিষয়ে গাঢ় নিবিষ্ট হয় তখন আর কোন বাহ্যবস্তুর সত্তা প্রতীতি হয় না। তখন জগৎ বিলুপ্ত। মন কাম ও কর্ম্মাদি বাসনার অনুসরণ হেতু আত্মাকে বহুরূপে বিস্তার করে। এই কারণ হেতু ও তদ্‌বিহীন হইলে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই কারণ হেতু মন ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। উহাই আমি, তুমি নাম রূপাদি স্বরূপ। পরমার্থ রূপিণী বিশুদ্ধ চিৎই জীবরূপী মন হইয়া দেহাদি ভাব অনুভব করে। এই হেতু মন জড় ও অজড় দ্বিবিধ স্বরূপ। উহা ব্রহ্ম রূপ, এইজন্য অজড় ও দৃশ্যরূপ এইজন্য জড়। ব্রহ্ম সকলের আত্মা এই জন্য জগৎ জড় ও চিন্ময় স্বরূপ।

নার আশ্রিত যিনি তিনি নারায়ণ। অর্থাৎ এই মনোরূপ নার আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিত তিনি অন্তর্যামী নারায়ণ। এই নারায়ণ একবার কারণশায়ী, একবার গর্ভোদকশায়ী ও একবার ক্ষীরোদকশায়ী। পরা সম্বিদ যখন অবিদ্যা হেতু কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কারণশায়ী। যখন সূক্ষ্ম অঙ্কুররূপে পল্লব বিশিষ্ট দেহরূপ বৃক্ষের সমুদ্ভাবন করেন তখন গর্ভোদকশায়ী এবং যখন সেই পল্লবিত দেহের জগতের সার গ্রহণে পুষ্টি ও আনন্দ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি ক্ষীরোদকশায়ী।

জীব যখন জননী জঠরে সূক্ষ্ম অঙ্কুররূপে প্রবেশ করে তখন কারণশায়ী এবং যখন পল্লববিশিষ্ট দেহ ধারণ করে তখন গর্ভোদকশায়ী এবং যখন ক্ষীরোদক মাতৃরসের দ্বারা সেই দেহের পুষ্টিসাধন করেন তখন তিনি ক্ষীরোদকশায়ী। ক্ষীর কথাটী ঘস্ (ভোজন করা)+ঈরণ র্প্র প্রত্যয়ে সিদ্ধ। যখন অবস্তুকে বস্তুরূপে রূপায়িত করা হয় তখন ঈরণ্ প্রত্যয়। ঈরণ্ অর্থে উষর, অনুর্ব্বর ইত্যাদি। এইরূপ অবস্তুকে যখন বস্তুরূপে রূপায়িত করিবার প্রয়োজন হয় তখন ঈরণ প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ যাহা অভোজ্য তাহা ভোজ্যরূপে রূপায়িত। সর্ব্ব অবস্থাতেই তিনি অবিদ্যা বহন করেন বলিয়া "শ্রী" তাঁহার বক্ষ-সংলগ্না।

সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন যে পঞ্চাননের সদ্যোজাত মুখ হইতে "শ্রী" রাগের আবির্ভাব। এই সদ্যোজাত মূর্ত্তি সম্বন্ধে পুরাণ বলে ব্রহ্মা শ্বেতলোহিত-কল্পে সৃষ্টি মানসে ধ্যান নিরত হইলে তাঁহার সম্মুখে এক শ্বেত লোহিত বর্ণ, শ্বেত উষ্ণীষ ও শ্বেতাম্বরধারী অগ্নিসম তেজ যুক্ত এক কুমার আবির্ভাব হন। ব্রহ্মা ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে ইনিই যোগেশ্বর মহাদেবের সদ্যোজাত মূর্ত্তি। ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করাতে সুনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ ও নন্দন নামক চার কুমারের আবির্ভাব। অপর পুরাণে ইঁহারাই, সনৎ, সনাতন, সনক ও সনন্দ। যাঁহার আবির্ভাব হেতু কন্দর্পকে কুৎসিত বলিয়া বোধ হয় তিনিই কুমার।

ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে সদ্যোপ্রসূত সুত শ্বেত লোহিত বর্ণ এবং তাহার আবির্ভাবেই চতুর্দ্দিক আনন্দিত ও কন্দর্প কুৎসিত বলিয়া প্রতিপালিত। শ্রী এই নারায়ণরূপী শিশুর বক্ষ সংলগ্না হেতু দিন দিন তাহার শোভা বৃদ্ধি। এই হেতু সদ্যোজাত মূর্ত্তি হইতে "শ্রী" রাগের আবির্ভাব।

সঙ্গীতশাস্ত্র বলে—

"ষড়জে ষাড়জী সমুদ্ভূত শ্রীরাগঃ।
সম্পূর্ণ রিষভাদিঃ স্যাদারোহে ধপ বর্জ্জিতঃ॥

"শ্রীরাগস্তীব্র গান্ধার আরোহে ধগ বর্জ্জিত।"

—সঙ্গীত পারিজাত—

শ্রীরাগ সম্পূর্ণ জাতীয়,কিন্তু স্বরাদির আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত এবং অবরোহণে তীব্র গান্ধার ব্যবহার্য্য। ইহাতে ষাড়জী গ্রাম ব্যবহার্য্য, ইহা ষড়জ স্বর হইতে উৎপন্ন।

আর্য্য সঙ্গীত শ্রুতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শ্রুতির বন্টন যথা—৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২। ইহাই হইল ষাড়জী গ্রাম। অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক, ঋষভ ওধৈবত ত্রিশ্রুতিক এবং গান্ধার ও নিষাদ দ্বিশ্রুতিক। শ্রীরাগে কোন শ্রুতিতে কোন স্বর অধিষ্ঠিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কি কারণ হেতু আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জ্জিত ও অবরোহণে গান্ধারকে তীব্র করিবার তাৎপর্য্য দেখান প্রয়োজন।

যেহেতু ষড়জ স্বর ইহাতে প্রধান ও ষাড়জী গ্রাম।সম্ভূত সেই হেতু ষড়জ স্বর ছন্দোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত। ধ্বনি ছন্দযুক্ত না হইলে তাহাতে মধুরতা আসে না। মধুরতা না থাকিলে তাহার শোভা বা শ্রী আসে না। এই কারণ হেতু ছন্দোবতী শ্রুতিতে ষড়জ অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে শ্রী নিজেই রতি। এই হেতু রতিকা নামক সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ। গান্ধার সাধারণতঃ ক্রোধা নামক নবম শ্রুতিতে অবস্থিত। যেখানে ক্রোধা সেখানে শ্রী অন্তর্হিত। পুরাণে উক্ত আছে যে দেবাসুর সংগ্রামের পর যখন বলি রাজা পাতাল প্রবেশ করিলেন তখন শ্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেব রাজের নিকট আসিলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবী, আপনি কি কারণে বলি রাজাকে ত্যাগ করিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন—যেখানে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অনাচার ইত্যাদি অবস্থিত সেখানে আমি থাকি না। তখন দেবরাজ কহিলেন—কি উপায়ে আপনাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইব। দেবী কহিলেন—আমাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া চতুর্স্থানে সংস্থাপিত কর। তাহাতে দেবরাজ অনুরোধ করাতে তিনি নিজেকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া প্রথমাংশ পৃথিবীতে; দ্বিতীয়াংশ সলিলে, তৃতীয়াংশ হুতাশনে ও চতুর্থাংশ যোগীদিগের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন। এই কারণবশতঃ আরোহণে ক্রোধশক্তি জ্ঞাপক গান্ধার বর্জ্জিত। আরোহণেই রাগের রূপ প্রকটিত হয়। অবরোহণে গান্ধারকে তীব্র করিয়া প্রসারিণী নামক একাদশ শ্রুতিতে স্থাপিত করা হইয়াছে। কারণ শ্রী হেতুই জীবের প্রসার। তরঙ্গের প্রপাত হেতু প্রসার। মধ্যম মার্জ্জনী নামক ত্রয়োদশ শ্রুতিতে অবস্থিত। মার্জ্জন অর্থে শোধন। যেখানে শুদ্ধতা সেইখানেই শ্রীর আবাস। আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম। যেখানে শ্রী সেইখানেই সমাগম। সাধারণতঃ ধৈবত স্বর রম্যা নামক বিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত। আরোহণে রাগের রূপ। উন্নতির পথ রমণ ক্রিয়া বর্জ্জিত। সেই হেতু আরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত। নিষাদ ক্ষোভিণী নামক দ্বাবিংশ শ্রুতিতে অবস্থিত। ক্ষোভিত অর্থে চালিত, ধর্ষিত, আন্দোলিত। ইহার শক্তিতেই ভাবের আলোড়ন হয়। চালন অর্থে শ্রম বা তপস্যা। শ্রম বা তপস্যা ভিন্ন শ্রীর আগমন নাই। এতদ্ব্যতীত ক্ষোভিনী হইল দ্বাবিংশ শ্রুতি। কালচক্রে দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা যাহা তপরাশিতে।অবস্থিত। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাঁহার বক্ষসংলগ্না শ্রী।

এই বিশ্লেষণ হেতু দেখা যায় যে ইহাতে ষাড়জী গ্রামের মূর্চ্ছনা প্রবল। এই হেতু ইহা রাগ।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে ইহা বিষ্ণুশক্তি সম্পন্ন, ত্রিলোক ব্যাপ্ত; বিশুদ্ধ শ্বেত বর্ণ, সলিলোত্থিত এবং ইহাতে মধুর রস নিবদ্ধ ও ইনি পর্ব্ব পর্ব্ব করিয়া বৃদ্ধি পান। এই ছয় প্রকার ভাব থাকা হেতু ইহা হইতে ছয় রাগিণীর উদ্ভব। তাহারা যথা—

বিষ্ণুশক্তি হইতে—মালশ্রী
ত্রিলোক ব্যাপ্তিকারণ—ত্রিবণী
বিশুদ্ধ শ্বেত হেতু—গৌরী
সলিলোত্থিত বলিয়া—কেদারী
মধুর রস বশতঃ—মধু মাধবী
পর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি হেতু—পাহাড়ী

ইহাদের আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল।

সকল আর্য্য শাস্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কারণ তাহা না হইলে সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। যাহারা শক্তি মানেন না তাহাদের পক্ষেই শোভা পায় বলা যে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু বৈদান্তিক মতবাদীরাও মায়ায় কার্য্য স্বীকার করেন। যাহারা সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন তাহারা বলিতে পারিবেন না যে রাগিণী বলিয়া কিছুই নাই।

—শিবম্—

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

[১]

[ঠাকুরমার ঝুলির মতন সংবাদপত্রের রিপোর্টারের ঝুলিটিও কম আকর্ষণীয় নয়। এর মধ্যে নানান বিচিত্র বৈচিত্র্য-কাহিনী পাওয়া যাবে। এক তরুণ রিপোর্টার তাঁর 'রিপোর্টারের ডায়েরী'তে ধারাবাহিকভাবে এই সব মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। লেখকের ইচ্ছায় লেখাটি ছদ্মনামে বেরুবে এবং অনিবার্য্য কারণবশতঃ মূল কাহিনী অটুট রেখে দুই একটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের নামের পরিবর্ত্তন করা হবে।—সম্পাদক ভারতবর্ষ]

এক

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই টেলিপ্রিণ্টারে এক 'ফ্লাশ মেসেজ' এলো।

...Pakistans newly appointed Prime Minister, Mr. Mohammad Ali will pass through Calcutta early this morning on his way from Karachi to Dacca.

ইংরেজি মতে তখন ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলেছে। আর্লি দিস মর্ণিং বলতে রাত একটা না দুটো, তিনটা না চারটে, তার কোন ইঙ্গিত নেই ফ্লাস মেসেজে। কোন্ বিমানে তাঁর আগমন, তারও কোন হদিশ নেই এই সংক্ষিপ্ত খবরে। মাত্র কদিন আগে নিতান্ত নাটকীয়ভাবে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছেন। লিয়াকত আলি খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর ঢাকার মসনদ ত্যাগ করে করাচীর তৎ-এ-তাউস অলঙ্কৃত করে জনাব নাজিমুদ্দীন একদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, সেটা অচিন্তনীয় কিছু হয়নি। কিন্তু প্রৌঢ় বয়স্ক নবীন রাজনীতিবিদ মহম্মদ আলির পক্ষে মার্কিনী মুল্লুকে দূত হওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগে সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং দমদম বিমান বন্দরে সেই সৌভাগ্য চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লোভ কলকাতার সাংবাদিকরা কর্ত্তব্য ও আগ্রহের আতিশয্যে সম্বরণ করতে পারেননি। নাইট্ ডিউটির সব রিপোর্টাররা এখানে-ওখানে-সেখানে টেলিফোন করলেন। নানান মহলে খোঁজ খবর করে জানলেন, প্রত্যুষে পাঁচটা নাগাদ বি-ও-এ-সি-বিমানে তাঁর আগমন হচ্ছে দমদমে। বিমান ও বিমানযাত্রীরা প্রাতরাশ শেষ করে যাবেন ঢাকা।

এখনও এক সপ্তাহ হয়নি। করাচী রেলষ্টেশনে নিয়মিত যাত্রীদের আগমন-নির্গমন সেদিনের মত শেষ হয়েছে। ভোরের আগে আর কোন বাষ্পীয় শকটের আবির্ভাব হবার কথা নয় করাচী ষ্টেশনে। হঠাৎ মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে হুঁস হুঁস শব্দে একটা ট্রেন ষ্টেশন প্লাটফর্ম প্রবেশ করল। কুলিরা সব ঘুম থেকে চট করে উঠে বসল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝতে পারল, এটা কোন সাধারণ যাত্রী গাড়ী নয়। আবার তারা সব গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্লাটফর্মে গাড়ী থামল। কর্ত্তাব্যক্তিদের ত্বরিত গতিতে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি। সান্ত্রীদের উপস্থিতি। প্লাটফর্ম লাল কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যাবেন লাহোর না রাওয়ালপিণ্ডি। তাঁরই শুভাগমন প্রত্যাশায় ষ্টেশন প্লাটফর্মে রেল আর পুলিশের কর্ত্তারা সব 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' করে অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক মিনিট বাদেই টেলিফোনের আওয়াজ। তারপর আবার কর্ত্তাদের মন্থর গতিতে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা। সামনের লাল আলো নীল হলো। নির্দিষ্ট যাত্রীকে না নিয়েই ট্রেনটা ষ্টেশন পরিত্যাগ করল। যাত্রীরা তাদের অস্ত্রাদি ঘাড়ে করে শিথিল পদক্ষেপে ফিরে গেল। পোর্টারের দল এগিয়ে এলো। লাল কার্পেট গুটিয়ে রাখা হলো। করাচী ষ্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

সারা শহরটাও তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু আরব সাগর পারের করাচী বন্দর থেকে

আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রমত্ত নাবিকদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় তরণীর নাবিকদেরও সে রাত্রে ঘুম হয়নি। সারা রাত্রি চলেছিল শলা-পরামর্শ আর মন্ত্রণা। ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মুক্তি দিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবকে। আর সেই সোনালী সিংহাসনে বসালেন মহম্মদ আলিকে এই রাত্রিতেই।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কিছুকালের জন্য মহম্মদ আলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দীর ঐতিহাসিক রাজত্বকালে সাময়িকভাবে অর্থমন্ত্রীর পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে কারণে কলকাতার রিপোর্টার মহলের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্যরাত্রির অনেক পরে খবর পেয়েও ভোর পাঁচটায় দমদম বিমান-বন্দরে কার্পণ্য হয়নি রিপোর্টারদের উপস্থিতিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী, আর পাকিস্থান ডেপুটি হাইকমিশনের জনকয়েক কর্তাব্যক্তি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য হাজির ছিলেন। আর বিশেষ কেউ ছিলেন না। ভোরের আলো তখন সবে ছড়িয়ে পড়লেও, সূর্য্যরশ্মি তখনও ঠিকরে পড়েনি দমদমের লম্বা রানওয়েতে। ঠিক সময় বি-ও-এ-সি বিমানটি এসে পৌছাল। বিমানের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে 'এয়ার হোষ্টেস্' ইঙ্গিত করে জানালেন, বিমানে ভি, আই, পি (Very Important Person) রয়েছেন। নিম্নকর্মচারীর পরিবর্ত্তে পদস্থ কর্মচারীরাই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বিমানে সিঁড়ি লাগালেন। সহাস্য বদনে নেহরুজীর মতন এক 'ব্যাটন' হাতে বেরিয়ে এলেন মিঃ আলি।

বিমান থেকে নেমে আলি সাহেব দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে ভি-আই-পি রুমে প্রবেশ করলেন। পিছন পিছন এলেন প্রধানমন্ত্রীর একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। তরুণ বাঙ্গালী যুবক। আগে রাইটার্স বিলডিঙ্-এ ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর এলেন খাকি প্যাণ্ট ও মোটা শোলার হ্যাট পরে পাকিস্থান সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। মিঃ মীর্জা আর ঘরে ঢুকলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। উপস্থিত অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। ঘরের ভিতর মিঃ আলির সোফার চারদিকে বসে দাঁড়িয়ে রইলাম রিপোর্টারের দল। একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পেয়ে রিপোর্টারদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। প্রধানমন্ত্রী হয়েও মহম্মদ আলির মুখের হাসিকে অহেতুক গাম্ভীর্য্য গ্রাস করেনি। দেখে সবাই আনন্দিত। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার চীফ্ রিপোর্টারের দিকে ফিরে বল্লেন, 'হাউ আর ইউ, মিঃ দাশগুপ্ত ?' পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অমৃতবাজারের যতীনদার (মুখার্জী) দিকে লক্ষ্য করে তাঁর কুশলবার্ত্তা জানতে চাইলেন। কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করে জিজ্ঞেস করলেন, এর-ওর কথা। কাগজের অফিসের নানানজনের কথা। রাইটার্স বিল্ডিংস'এর টুকি টাকি। ডাঃ রায়ের সংবাদ। তারপর সুরু হল কাজের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পাকিস্থানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানালেন ভারত-পাকিস্থানের মৈত্রী বন্ধন কোনদিন কোন কারণেই শিথিল হতে পারে না ; বরং সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। নেহরুজীকে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতন শ্রদ্ধা করেন জানিয়ে নিকট-ভবিষ্যতে কাশ্মীর ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায়ও মিঃ আলি জানান।

আমেরিকায় পাকরাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ আলি। রাষ্ট্রদূত পদ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী। ঘোড়ার থেকে সহিস না হলেও, অনুরূপ একটা কিছু বটে। আইসেনহাওয়ার প্রভুদের কোন হাত নেই তো এই পরিবর্ত্তনে ! আমেরিকা মহম্মদ আলিকে দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবে নাতো ? সেদিন আরো পাঁচজনের সাথে সাথে কলকাতার রিপোর্টারদের কাছেও এ সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে খবরের কাগজের রিপোর্টার হওয়াও অসম্ভব। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই প্রশ্ন করা হলো :

…'Is it not but natural that the United States would enjoy some special favour during your Prime Ministership ?'…সব সন্দেহ ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। সরাসরি এ আশঙ্কা অমূলক

বল্লেন। এমন দরদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লেন যে, তা অবিশ্বাস্য মনে হলো।

সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বপাকিস্থানে কলকাতার সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যুগান্তরের চীফ্ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্য্যই প্রথম সেকথা পাড়লেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ আলি, ঢাকা যেয়েই এই সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন। দমদম ত্যাগ করে ঢাকা যাবার জন্য আবার বিমানের দিকে রওনা হলেন। বিমানে চড়বার আগে সব রিপোর্টারদের সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠে গিয়ে অনুরোধ করলেন, দমদমে গৃহীত ফটোগুলির কপিগুলো যেন তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্মতি জানালেন তারক দাস ও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের দল।

পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির প্রথম ও প্রধান সংবাদরূপে দমদমে মহম্মদ আলির সঙ্গে সংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী ছাপা হলো। রিপোর্টারদের সঙ্গে তাঁর ছবিও বেরুল। ঢাকা সফরের খবরও নিত্য বেশ ভালভাবেই বেরুতে লাগল। ঢাকা থেকে করাচী উড়ে যাবার পথে আবার দমদম আসবেন বলেও খবর ছাপা হলো। এবার একটু বেলাতেই মিঃ আলির প্লেন দমদম এলো। দমদমে কিছু উৎসাহী লোকেরও জমায়েত হয়েছিল। 'প্রটেক্‌টেড্ এরিয়া' থেকে বেরিয়ে ভি-আই-পি রুমে যাচ্ছেন মিঃ আলি। পাশে ভীড়ের মধ্য থেকে একটা আধা ময়লা হাফ্ সার্ট পায়জামা পরা এক ছোকরা এগিয়ে এলো।

—'কাকা,' কাকাবাবু,—ছেলেটি ডাকল।

মিঃ আলি পিছন ফিরলেন। ছেলেটি সোজাসুজি সামনে এলো। চিনতে পারেননি মিঃ আলি। ছেলেটিই উৎসাহী হয়ে নিজের কাকার নাম করল। বগুড়ার বাসিন্দা। হৃদ্যতা ছিল এই দুজনের মধ্যে। ফেলে আসা দিনের বন্ধুর খোঁজখবর করলেন। জানলেন, বন্ধু এখন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসিন্দা। ত্রুটি করলেন না সংসারের আরো পাঁচজনের কুশলবার্তা নিতে। ছেলেটিকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন। করাচীতে চিঠি লিখতেও বল্লেন। গদীর গুণে সারল্য বিসর্জ্জন দেননি মহম্মদ আলি। দেখে সবাই খুশি।

দলবল দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ...

সরকারের অতিথেয়তা রক্ষার জন্য। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস' হাতে নিয়ে সেই চেনা মোটা শোলার হ্যাট পরে ডিফেন্স সেক্রেটারী ইস্কান্দার মীর্জা বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেশ বিভাগের আগে থেকেই দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদে বহাল ছিলেন মিঃ মীর্জা। লম্বা চওড়া চেহারা। মুখখানা বিশালকায়। স্যার আশুতোষকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলা হতো। মীর্জাকে বল্লেও অন্যায় বা অত্যুক্তি হবে না কোন দিকে থেকেই। বারান্দার একপাশে সরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য আলাপ আলোচনা করলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝতে দেরী হলো না, মিঃ মীর্জা একজন জাঁদরেল অফিসার। এর কাছে কেন জানি না মহম্মদ আলিকে কেমন যেন অসহায় মনে হলো। পশুরাজ সিংহের সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের খেলা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প আছে। আশঙ্কা হলো ভবিষ্যতে পাকিস্থানের ইতিহাসে মীর্জা-আলি নিয়েও বোধ হয় এমনি গল্প আবার লেখা হবে।

আমাদের কৃষ্ণমেননের মতন স্বদেশী সাংবাদিক দেখলে ভ্রু কুঞ্চিত করেন না মিঃ আলি। প্রেস সাইনেসের' বালাই মহম্মদ আলির নেই। এবারও রিপোর্টারদের কাছে এক লম্বা-চওড়া বিবৃতি দিলেন আগের দিনের সুরে। নির্দ্দিষ্ট সময় বিশ্রাম করে হাতের ছাতিটাকে স্পোর্টস্ ষ্টিকের মতন ঘুরাতে ঘুরাতে প্লেনের দিকে চল্লেন। সিঁড়ি দিয়ে দু' এক ধাপ উপরে উঠতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আমরা সব কাছেই ছিলাম। আমাদের আগের দিনের আশঙ্কার মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য হাতের ছাতিটাকে দেখিয়ে বল্লেন :

'জেণ্টলম্যান অফ্ দি প্রেস! নেভার মাইণ্ড, দিস ইজ নট এ্যান আমেরিকান রাইফেল, যাষ্ট এ্যান অর্ডিনারী আমব্রেলা।' উপস্থিত সকলের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে নিজে হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন মহম্মদ আলি।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে করতোয়া নদী বয়ে গেছে। করতোয়ার পশ্চিমে শেলবর্ষ পরগণার কুন্দগ্রামের জমিদার ছিলেন নবাব আবদুল সোহবান চৌধুরী। নবাব নন্দিনী আলতাফান্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নবাব আলি চৌধুরীর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের

আলি চৌধুরী। এদেরই পুত্র হলেন মহম্মদ আলির পিতৃদেব নবাবজাদা আলতাফ আলি চৌধুরী। এক ময়মনসিংহ দুহিতার সঙ্গে আলতাফ আলির প্রথম বিয়ে হয়। তাঁরই গর্ভের পাঁচটি পুত্রের প্রথমটি হলেন মহম্মদ আলি। আলতাফ আলি মহম্মদ আলির গর্ভধারিণীকে তালাক দিয়ে পরে সাগর পারের এক কটা সুন্দরীর পানি-গ্রহণ করেন। পূর্ব্বতন আলতাফ বেগমও মালা জপ করে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাননি। তিনিও এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে নিকায় বসেছিলেন। এখন সে মহিলা ধরালোক ত্যাগ করেছেন। সাধারণভাবে ভদ্র বিনয়ী থাকলেও, আলতাফ আলি শনিবারের বারবেলায় বা রবিবারের প্রাক গোধূলিতে খিদিরপুরের ঘোড় দৌড়ের মাঠের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে থাকতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোড়ার খুরের ধূলায় উড়িয়েছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে হস্তান্তরের দলিলে দস্তখতের সাথে সাথে কলকাতার বহু বাড়ী চৌধুরী পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে। 'স্লো হর্স এ্যাণ্ড ফাষ্ট উওমেনের' কৃপায় মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবতঃ আরো পাঁচজন ধনীর মত সে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

আলতাফ আলির ফিরিঙ্গি পত্নীর গর্ভের প্রথম সন্তান হলেন ওমর আলি। লেস বসানো জরি আঁটা পাঞ্জাবী পরে কানে আতর গুঁজে সন্ধ্যার তানপুরা হাতে নিয়ে বসতেন ওমর আলি। পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিছুকাল। আরো পরে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ আলি যখন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী, তখন সুরাবর্দ্দীর পক্ষে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ প্রচার করে পাক-রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মহম্মদ আলি করাচী থেকে দীর্ঘ পথ উড়ে নয়া দিল্লী এসেছিলেন। আনন্দভবন-নন্দনকে দাদা বলে ডেকে-ছিলেন; এক সোফায় পাশাপাশি বসে ভূস্বর্গ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্থানী নরক সৃষ্টির এক ফয়সালা করার চেষ্টাও করে-ছিলেন। শুধু মুখের হাসি দিয়েই আবার করাচী উড়ে গিয়েছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়েছিল বলে মনে হয় না। মহম্মদ আলির নিয়োগকালীন আশঙ্কার বুদবুদ শুধু মধুমাখা বিবৃতিতেই তিরোহিত হয়নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে যেমন একদিন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, মহম্মদ আলির প্রধানমন্ত্রিত্ব-কালেও তেমনি করাচীতে মার্কিনী প্রভুত্বের বীজ বপন ও তাকে পল্লবিত করার দুর্নিবার প্রচেষ্টায় 'সিয়াটো' প্যাক্টে পাকিস্থান দস্তখত করেছিল। অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা 'গান এ্যাণ্ড গোল্ডে'র দেশ আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্থানের মৈত্রীকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তা সবার অজ্ঞাত হলেও, মহম্মদ আলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। এরই রাজত্বকালে পাকিস্থানের উর্ব্বরা ভূমিতে 'সিভিলিয়ান' পলিটিসিয়ানদের জন্ম হয়। খাকি পোষাক, মেজর জেনারেল উপাধি, মোটা শোলার হ্যাট আর ডিফেন্স সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করে মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা পলিটিসিয়ানের তিলক পরে পূর্ব্ব বাংলাকে সায়েস্তা করবার জন্য লাট সাহেব হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের অজুহাতে অতীতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতন গোলাম মহম্মদকে কায়েদী আজম পদে আসান দিতে হয়েছিল। মহম্মদ আলিও বেশী দিন সুখে কাল কাটাতে পারেন নি। মীর্জার ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য ও মুসলিম লীগের অন্তর্কলহ ঈশান কোণের মেঘের মতন মহম্মদ আলির সারা অন্তর নিত্য আশঙ্কিত করে তুলেছিল। পাকিস্থানী রাজনীতি সম্পর্কে আরো আশঙ্কাগুলির মতন এ আশঙ্কাও সহজে চলে যায়নি। মীর্জা গভর্ণর-জেনারেল হলেন। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মধুর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে 'সিয়াটো' প্যাক্টের প্রিমিয়াম দিলেন। মহম্মদ আলি 'বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া'র মতন প্রথমা বেগমকে তালাক দিলেন। এক বিদেশিনীকে গাউন ছাড়িয়ে শাড়ী পরিয়ে হৃদয় সঁপে দিলেন। জীবন যৌবন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। জীবনের পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাড়ীরও নতুন চেহারা সৃষ্টিতে মন দিলেন। সারা বাড়ী লাইমক্রুদ কলারে ডিস্টেম্পার করা হলো। ভিতরের লনে সুইমিং পুল তৈরী আরম্ভ হলো। রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ হতে না হতেই রাজত্বের পরিবর্ত্তন ঘটলো। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিত্বের ধ্বজা আর একবার নড়ে উঠল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন সুট-টাই আঁটা চৌধুরী মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি আবার পাক রাষ্ট্রদূত হয়ে ডালেস-তীর্থে ফিরে গেলেন।

গ্রাম-চর্চা গবেষণা-কেন্দ্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতবর্ষে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া ভারতবাসীকে নূতন জীবন ও কর্মপদ্ধতি দান করেন, তখন তাঁহার প্রথম কথা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া চলো। সে কথাও একেবারে নূতন নহে—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর প্রথমে সারা বাংলায় ও পরে সারা ভারতে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহাতেও নেতারা জনগণকে গ্রাম-মুখী করার কথা বলেন। রাজনীতিক নেতাদেরই নির্দেশ মত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে গ্রাম সংগঠনের উপায় লইয়া এক কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন—কিন্তু জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করেন নাই—মাত্র একদল লোক নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রাম সংস্কারে মন দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজও করিয়াছিলেন; তাই বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকট ভুবনডাঙ্গার মাঠে প্রথমে শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। ৫০ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের রূপ কি রকমের ছিল, তাহা আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। স্বদেশী যুগের বহু কর্মী যেমন গ্রামে আশ্রম, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষির প্রতি দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও তেমনই আরও বৃহত্তর একটি দল গ্রামে যাইয়া কাজ আরম্ভ করেন। আজ আর তাঁহাদের কার্য্যের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বাংলাদেশের খবর রাখেন, তাঁহারা সেরূপ বহু কর্মকেন্দ্রের সহিত পরিচিত। তাহার সংখ্যা হয় ত বেশী নহে, কিন্তু কর্মীদের আন্তরিকতা কম নহে।

তাহার পর প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলেই এ দেশে অসম্ভব সম্ভব হইল। ১৯২০ সালে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কঠিন ছিল, ১৯৪৭ সালে সেই স্বাধীনতা আমরা লাভ করিলাম। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের নেতারা ও দেশের সর্ববৃহৎ রাজনীতিক দল হিসাবে স্বাধীন ভারতের শাসনের ভার লাভ করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা, গান্ধীজি নেতাদের শাসনকার্য্যে পরামর্শ দানের জন্য অধিক দিন আর আমাদের মধ্যে রহিলেন না। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি চলিয়া গেলেন—কিন্তু তাহার ১০ বৎসর পরেও আজ আমরা—যাহারা তাঁহার কাছে নূতন দেশাত্মবোধের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম—জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই স্মরণের মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে তাহা—শ্রীহনুমানের মত বুক চিরিয়া রামচন্দ্রকে দেখাইবার মত শক্তি আমাদের নাই—প্রশ্ন করিব না। তবে বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়া তাহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি। তাই ঘরে ঘরে আজও গান্ধীজির চিত্র শুধু গৃহের শোভাবর্দ্ধন করে না—বৎসরের সকল দিনে না হইলেও উৎসব অনুষ্ঠানের দিন—বিশেষ করিয়া ৩ দিন—২রা অক্টোবর, ৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগষ্ট তাহা পুজিত হইয়া থাকে। কর্মজীবনেও যে তাঁহার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতবাসীর কয়েক কোটী লোককে খদ্দর ব্যবহার করিতে দেখিয়া বুঝিতে পারি। সরকারী ব্যবস্থাতেও চরকা ও তাঁতকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাহা কেন, গান্ধীজির আদর্শের অনুসরণ করিয়াই আমরা সরকারী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সহরের উন্নতির কথা চিন্তা করি নাই—গ্রামগুলিকে সর্বাগ্রে উন্নত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। সে জন্য গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পল্লী কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামে যাতায়াতের সুবিধার জন্য গ্রামাঞ্চলেই প্রথমে বড় বড় পীচ-ঢালা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে, রাস্তার জন্য খাল ও নদীর উপর পুল নির্মিত হইয়াছে—নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র, জনগণের আনন্দদায়ক ব্যবস্থা, গ্রামে কথকতা ও অভিনয়কে উৎসাহ দান প্রভৃতি কার্য্য চলিতেছে। সারা ভারতের সকল গ্রাম শীঘ্রই একদিন কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট বা ন্যাশানাল এক্সটেনসেন সার্ভিসের মধ্যে আসিয়া নূতন রূপ ধারণ করিবে—বহু স্থানে সে কার্য্য আংশিক সাফল্যমণ্ডিত যে হইয়াছে, তাহা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলেই বুঝিতে পারা যায়।

তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, সেগুলি মূলতঃ গ্রামের অধিবাসীদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই করা হইতেছে, ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার ফলে কত পতিত জমী উদ্ধার হইয়া আজ সোনার ফসলে ভরিয়া যাইতেছে, তাহা আর ঐতিহাসিক গবেষণার বা হিসাবরক্ষকের লেখার মধ্যে নাই—সর্বত্র তাহা আমরা চক্ষে দেখিয়া থাকি। দামোদর পরিকল্পনা আমাদের কি করিয়াছে, তাহা একবার তিলায়া, বোখারো, কোনার, দুর্গাপুর, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গ্রাম সংগঠনের কাজে শুধু সরকারী চেষ্টাই দেখা যায় না, বেসরকারীভাবে শিক্ষিত তরুণের দল সে বিষয়ে কম আগ্রহ দেখাইতেছেন না। সম্প্রতি সেরূপ একদল তরুণের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচমন্ত্রী ও আজীবন দেশসেবক শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পদ্মশ্রী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, শ্রীইউ-পি-মল্লিক, ডাক্তার সোরাবজী গজ্জার প্রভৃতিকে অগ্রণী করিয়া শ্রীনীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীসুশান্তকুমার পাঠক নামক দুই

তরুণ কর্মী গ্রামচর্চা গবেষণার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছেন। গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার নদীয়া জেলার মুড়াগাছার নিকটস্থ সাধনপাড়া গ্রামে প্রথম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

১৭ই নভেম্বর সকালে ২খানি মোটরে একদল কর্মী ঐ গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দলে ছিলেন মন্ত্রী অজয়কুমার, ডাক্তার গঙ্গাধার, খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার সিঙ্গুর-হুগলীবাসী শ্রীইউ-পি-মল্লিক, লেখক স্বয়ং, নীরেন্দ্রনারায়ণ, সুশান্তকুমার প্রভৃতি। পূর্ব হইতেই ট্রেণে ৪জন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং আর একখানি মোটরে সুলেখা কালীর কারখানার অন্যতম পরিচালক শ্রীননীগোপাল মৈত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাদুড়ী তথায় গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সাধনপাড়া প্রায় ১০০ মাইল—তথায় যাইতে ৪ ঘণ্টারও অধিক সময় আমাদের লাগিয়াছিল। গ্রামবাসী তরুণ দেশসেবক শ্রীশান্তিময় গাঙ্গুলী পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সুশান্তকুমার ঐ গ্রামেরই অধিবাসী হইলেও বর্তমানে কলিকাতাপ্রবাসী—তিনি ত প্রবল উৎসাহের সহিত গ্রামের তথ্য বলিতে বলিতে সঙ্গে যাইতেছিলেন। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর এক দৌড়ে যাওয়া যায়—কিন্তু তাহার পরই জলঙ্গীতে এখনও পুল নির্মিত হয় নাই—কাজেই নৌকায় করিয়া সেখানে মোটর গাড়ী পারাপার করিতে হয়। সেখান হইতে সাধনপাড়া গ্রাম ১২।১৪ মাইল হইলেও কতকটা বহরমপুর রোডের পীচের রাস্তায় যাইয়া অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতে হইল। মুড়াগাছা হাইস্কুলের কাছে গাড়ী রাখিয়া 'গুড়গুড়ে' নামক ছোট নদী বা খাল নৌকায় পার হইয়া সাধনপাড়ায় যাওয়াই সুবিধাজনক—কিন্তু সুশান্তকুমার ও শান্তিময়ের উৎসাহে আমাদের ৩ মাইল মাঠ-পথে ঘুরাইয়া মোটরেই গ্রামে লইয়া যাওয়া হইল। সুশান্তকুমারের গৃহে সকলের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল—সেখান হইতে প্রায় আধ মাইল দূর পর্য্যন্ত পথে কয়েকটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্রী-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম তোরণেই শতাধিক গ্রামবাসী অভ্যর্থনা জানাইলেন ও সেখান হইতে কয়েকশত লোকের অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী অজয়কুমার নদীয়ার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ-স্পর্শ পূত ধূলা মাখিতে মাখিতে পদব্রজে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথের দুইধারে গ্রামবাসী তাঁহাকে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া আগাইয়া লইল। গৃহস্বামী সুশান্তকুমারের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পাঠক ও খুল্লতাত শ্রীপ্রভাতকুসুম পাঠক গৃহ-দ্বারে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিনয়বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান লীলাময় কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, তিনি তরুণ, কাজেই সোৎসাহে সকলের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে কয়েকশত গ্রামবাসী আসিয়া, সকলকে পাঠক-বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। শ্রীমান সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পাঠকবাড়ীর সম্মুখে—তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে সর্বজনপরিচিত এবং সোমনাথের ভাগিনের হিসাবে লেখকের অন্তরঙ্গ। কাজেই সোমনাথ ও সর্বদা সকলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সোমনাথ আবার স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণনগরবাসী শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রায়ের ভাগিনেয়। কাজেই সে পরমাত্মীয় জ্ঞানে লেখকের আদর আপ্যায়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। প্রথম দফায় চা ও জলখাবার, তাহার পর ভূরি-ভোজ। কাজেই কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন হইল।

বেলা ৩টায় গুড়গুড়ে নদীর ধারে সাধনপাড়া স্কুলের মাঠে জনসভা হইল। ঐ বিদ্যালয় স্বর্গত খ্যাতনামা দেশসেবক গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (এম-এল-এ) কয়েক বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মুড়াগাছানিবাসী শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিলেন, তথায় নীরেন্দ্রনারায়ণ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে সোমনাথ কয়েক বিঘা জমী ও একটি পাকাবাড়ী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য দানপত্র করিয়া নীরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে দানপত্র প্রদান করিলেন। তাহার পর মন্ত্রী অজয়কুমার সুদীর্ঘ প্রায় ২ ঘণ্টা কাল সুচিন্তিত ও সুমধুর ভাষণ দ্বারা দেশের বর্তমান অবস্থা ও তাহাতে জনগণের কর্তব্য কি—তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাষণ এমন হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে—আরও অধিককাল চলিলেও তাহা কাহারও বিরাগ উৎপাদন করিত না। যাহা হউক, পল্লীগ্রাম, অন্ধকার রাত্রি, শীত পড়িয়াছে—কাজেই প্রায় সাড়ে ৬টায় তিনি ভাষণ শেষ করিলেন। সভাপতি চণ্ডীপ্রসাদবাবুকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে বলিয়া তিনি পূর্বেই চলিয়া গেলেন—তাঁহার স্থানে মুড়াগাছার অন্যতম দেশসেবক শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ছোট) কে সভাপতি করা হইল। মন্ত্রী মহাশয়ের পর লেখককে গবেষণা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল ও শেষে সভাপতি গোপেন্দ্রবাবুর ভাষণের সহিত সন্ধ্যা ৭টার পর সভার কার্য্য শেষ হইল। বহু দূরের গ্রামসমূহ হইতে কয়েকশত গ্রামবাসী সে দিন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সাধনপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি রাখালগাছি গ্রামের অধিবাসী শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়, সাধনপাড়ার উৎসাহী কর্মী শ্রীহরিগোপাল গাঙ্গুলী (শান্তিময়ের অগ্রজ), মুড়াগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুরজিৎ গাঙ্গুলী, শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐকান্তিকতায় সেদিনের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন এবং সভায় লোকসমাগম দেখিয়া বুঝা গেল, ঐ গ্রামের লোক প্রাণহীন নহেন—যাঁহারা সাদরে ও সাগ্রহে গবেষণা কেন্দ্রের জন্য জমী ও বাড়ী দান করিলেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই।

গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী ঐ গ্রামগুলি প্রাচীন—এক সময়ে সেগুলি যে সমৃদ্ধ ছিল, তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। মুড়াগাছায় বহু বড় বড় দ্বিতল গৃহ আজিও বিদ্যমান। সাধনপাড়ায় ও পাকা বড়

কাঁসার বাসন তৈয়ারীর কাজ করিয়া থাকেন। প্রায় ৭ হাজার লোক ঐ বাসন ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। কাচের, চীনা-মাটীর, এলুমিনিয়মের, কলাই করা অর্থাৎ এনামেলের ও সর্বশেষে ষ্টেনলেস্ ষ্টীলের যুগে আমরা এই কাঁসার বাসনের ব্যবসাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব কি না জানি না--কিন্তু সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের এক বিরাট কর্তব্য পড়িয়া আছে। ঐ পরিবারের শ্রীমান রেণুপদ দাস এম-এ পাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে ও গ্রামের অন্যান্য শিক্ষিত তরুণগণকে আমরা এ বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনে আহ্বান জানাই। স্থানীয় ইউনিয়ন কৃষি-কর্মী শ্রীসত্য মজুমদার তাঁহার উৎসাহ ও কর্মপ্রবণতার দ্বারা ঐ অঞ্চলের জনগণকে কৃষি বিষয়ে অধিকতর অবহিত করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সত্যবাবু সু-অভিনেতা, রাত্রিতে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার অভিনয় দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করি। কৃষ্ণনগর হইতে সদর এস-ডি-ও এবং সার্কেল অফিসার মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকালে সাধনপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন—অন্য কাজ থাকায় তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

রাত্রি ৮টায় স্থানীয় পাঠাগারে আমাদের লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যে এবং যুগদেবতা নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনয়ের দ্বারা আমাদের আনন্দদানের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে প্রভাত-কুসুম পাঠক মহাশয়ের বাজনা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সত্য মজুমদারের অভিনয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অধিক রাত্রি পর্যন্ত অভিনয় দেখিয়া আমরা নৈশ ভোজনের পর যখন বিশ্রাম করিতে গেলাম —তখন ইংরাজি মতে নূতন দিন আরম্ভ হইয়াছে।

পরদিন সোমবার ভোর ৬টায় উঠিয়া প্রাতকৃত্যাদি সারিয়া আমরা ৫টায় রওনা হইলাম। এবার পদব্রজে স্কুলের নিকট আসিয়া নৌকায় নদী পার হইলাম ও কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার প্রতুলপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে মোটরে চড়িয়া ৪ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে শান্তিপুর ষ্টেশনের নিকট বন্ধুবর শ্রীহরিদাস দে এম্-এল-এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ডাক্তার প্রতুলপতির পুত্র ডাক্তার উমাপতি গাঙ্গুলী বেঙ্গল এনামেল লিমিটেডের ম্যা ডিরেক্টার হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত হইয়াছেন।

একটা পল্লীগ্রামে—সহর হইতে বহুদূরে—যাইয়া, দেখিয়া আ হইলাম যে উপযুক্ত উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া গ্রামগুলিকে সহজে আবার প্রাণবন্ত করা যায়। কৃষি ত ঐ অঞ্চলের প্রধান — গঙ্গার চরে যেমন তরি তরকারী, বিশেষ করিয়া পটোল প্রচুর প জন্মে, তেমনই ছোলা, মুগ, মুসুর প্রভৃতি কলাইও ভালই হইয়া ঐ অঞ্চলে প্রচুর খেজুর ও তালগাছ—কাজেই গুড় উৎপাদন ভাল হইতে পারে। আখ ও প্রচুর উৎপাদন হইতে পারে। যুড়া হাই স্কুল সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে—সেখানে অভাব নাই—আবাসিক বিদ্যালয় ও আবাসিক কলেজ চলিতে কৃষি বিদ্যালয় ঐ অঞ্চলে আছে কি না জানি না, তাহা ও দরকার। গ্রাম চর্চ্চা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নানাদিক গ্রামের অবস্থার উন্নতি বিধান করা যাইবে।

স্থানটি বর্তমানে নবদ্বীপ নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত—ঐ সকল উৎসাহী কর্মীকে আমরা গবেষণা কেন্দ্রের কার্যে যোগিতা করিতে অনুরোধ জানাই। গ্রামবাসী তরুণগণে দিন যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহা স্থায়ী হইলে সত্বর গ্রাম পথে অগ্রসর হইবে। সাধনপাড়ার আজ সর্বপ্রধান সমস্যা— নদীর পুল—তাহা করা কষ্টকর হইলেও অসম্ভব হইবে না। এ সভা সমিতি করিয়া, নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, তরুণগণকে বা গ্রামে একত্র করার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের উন্নতিকর কার্যসমূহে হইতে হইবে। মন্ত্রী অজয়কুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ তিনি নানাভাবে গ্রামবাসীদিগকে সরকারী সাহায্য প্রদান করিতে করিবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া, ত মধ্যে দীর্ঘকাল-সঞ্চিত যে নিরুৎসাহের ভাব আছে তাহা দূর দেওয়াই আজিকার প্রধান কাম্য। আমাদের বিশ্বাস, নীরেন্দ্রন সুশান্তকুমার, সোমনাথ প্রভৃতির মত কর্মীরা তৎপর হইলে সাধন গ্রাম-চর্চ্চা গবেষণাকেন্দ্র সাফল্যমণ্ডিত করা আদৌ কষ্টকর হইবে

রিক্তা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সপ্তদশ বসন্তের যৌবন তোমার
বুনেছিল কত স্বপ্নজাল,—
কঠিন কুলিশে করি, ভাঙিল সে ঘুম,
হেরিলে কি মূর্ত্তি ভয়াল ?
স্নেহ, প্রেম, হাসি কান্না, কে করিল চুরি ?
কে দিল জীবন তব বেদনাতে ভরি ?
জীবনের দীর্ঘ পথে,—অশ্রু শুধু পাথেয় তোমার ?

প্রীতির পরশ, সখি ! আজি হ'তে পাবি নাক
কিংশুক পলাশে হেরি, একি অগ্নি জ্বালা,
কে জানিত এত ব্যথাভরা কুসুমের মালা ?
ফাগুন আজ, আগুন হ'য়ে, তোমার বুকে বাজে,
সর্বহারা হ'য়ে তুমি কাঁদিতেছ দুঃখে, লাজে ;
প্রাণপুষ্প শুষ্ক তার, চারিদিকে জ্বলে মরুভূর জ্বালা,
প্রেম নাই, প্রীতি নাই, বহে যায় দীর্ঘশ্বাস বেদনাতে ঢা

দুই বন্ধু

অনুবাদঃ শ্রীকানু রায়

তারা দুই বন্ধু। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল স্কুলে থাকতেই।

জাঁনতের বাবা ছিলেন নামজাদা ব্যক্তি। স্বচ্ছল অবস্থা—ঘোড়ার ব্যবসা আরো অন্যান্য কারবার থেকে প্রচুর আয় হত তাঁর।

কলিনের বাবা থাকতেন শহরতলীতে। সামান্য কিছু ক্ষেতখামার তাঁর ছিল, নিজেই চাষবাস করতেন। কিন্তু তাহলেও বেশ কষ্টেই দিন কাটত। কারণ হরেক রকম খাজনা কর ইত্যাদি দিয়ে দিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তেন। আর প্রত্যেকবার বছরের শেষে যখন জমা-খরচের খাতা খুলে বসতেন তখন হিসাবের প্রাণান্তকর অস্বস্তি, চোখের সামনে ভয়াবহ অন্ধ ভবিষ্যৎ।

জাঁনৎ আর কলিন দুজনেই দেখতে খুব সুন্দর। সেই ক্ষুদে শহরটিতে এমনটি আর কখনো দেখা যায়নি। তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ট হতে অন্তরংগতায় রূপ পেল। তাদের মধ্যে গোপনীয় বলতে কিছু ছিলনা—একে অন্যেকে নিজের মনের কথা অকপটে খুলে বলতে পারত। লোকে বলত তারা হরিহরআত্মা, স্কুলের ছেলেরা ডাকত মাণিকজোড় বলে।

এখন, এমনি যখন অবস্থা—সামান্য একটা কোটের জন্য সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। স্কুলের পড়া প্রায় শেষ হব হব করছে এরকম দিনে জাঁনতের বাড়া থেকে তার জন্য দামী ভেল-ভেটের একটা কোট এল, আর সেই সংগে একটা চিঠি। কলিন তার বন্ধুর কোটটার খুবই প্রশংসা করল—সরল মনেই সে তা করেছে। কেননা তার মনে হিংসা দ্বেষের এতটুকু ছায়াও ছিল না। কিন্তু এর ফলাফল জাঁনতের উপরে অন্য রকম প্রভাব বিস্তার করল। দামী কোট পেয়ে সে এমন একটা অহংকেরে ভাব দেখাতে থাকে—যে কলি মনে বড় ব্যথা পায়। বন্ধুর কাছ থেকে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি। জাঁনত ওসব থোড়াই কেয়ার করে সে আজকাল আর লেখাপড়া করবার মত সময় পায়না নিজেকে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত থাকে, আর আয়নার সাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত যে পরিচর্যা করে। নিজেকে বে করে জাহির করতে লাগল সে। সে যে ধনীর সন্তান এ সবাই বুঝুক, জানুক, টের পাক্‌। তাকে সমীহ করুক কিছুদিন পরে জাঁনতের বাবা আর একটি চিঠি পাঠালেন—তাতে লেখা ছিল সে যেন তাড়াতাড়ি প্যারিসে চ আসে। যাত্রার আয়োজন ঠিকঠাক। সেজেগুজে গাড়ী গিয়ে উঠল সে—তার মুখে প্রচণ্ড ভারিক্কী ভাব, ঠোঁটে কোণে আত্ম অহংকার। কেমন যেন নিরাসক্ত, নিষ্করুণ ভাবে শীতল হাতটা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেয়।

বেচারা কলিন! জাঁনতকে সে প্রকৃত বন্ধুর মত ভালবেসেছিল। অর্থের অহমিকা যে এমন ভয়াব আঘাতের প্রবৃত্তি দেয় সে ধারণাও করতে পারেনি নিজেকে তার আরো গরীব আরো রিক্ত বলে মনে হল।

সে আর থাকতে পারল না। কেঁদে ফেলল।

জাঁনতের এত সব দেখবার সময় নেই। ভুরু দু কুঁচকে গাড়োয়ানের দিকে মুখ বাড়িয়ে সে বলল, চলো।

গল্পের আগে থাকে ভূমিকা। সেটা প্রধান না হলে সব সময় একেবারে অনাবশ্যকও নয়। জাঁনতের বাব মঁসিয়ে জাঁনতের কথা তাই জানা দরকার। আগেই বলেছি ব্যবসায় খুব লাভ হতো, তবু কী করে যেন রাতা-রাতি আরো বড়লোক হয়ে গেলেন। এটা কী ক সম্ভব হল? ব্যাপারটা, বলতে গেলে ভাগ্য ছাড়া কিছুই

নয়। মঁসিয়ে এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই সুশ্রী। একটা মামলার তদ্‌বির করতে তাঁরা প্যারিসে এসেছিলেন। নিয়তির কী ইচ্ছা কে জানে, এখানে ক্রমেই তাঁদের সংগে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়ে গেল—লোকটা যুদ্ধ-হাসপাতালের একজন বড় কণ্ট্রাক্টার। পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হতে না হতেই মঁসিয়ে জাঁনত ভদ্রলোকটির ব্যবসাতে অংশীদার হয়ে গেলেন। তৎপর হয়ে উঠলেন আরো নানা ব্যাপারে। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন মানুষকে আর বেশী ভাবতে হয়না। শুধু সুবিধে বুঝে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই যথেষ্ট টাকা আসতে থাকে। মঁসিয়ের প্রতিপত্তি ক্রমে এত বাড়তে লাগল আর তাঁর ধনসমুদ্রও এমন স্তরে এসে পৌছোয় যা অনেকের মনেই ঈর্ষা জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। ছ'মাসের মধ্যেই তিনি জমিদারী কিনলেন এবং ছেলেকে প্যারিসের অভিজাত সমাজে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন।

জাঁনতের পিতামাতা উভয়েই যথেষ্ট করিৎকর্মা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। প্রথমেই তাঁরা ছেলের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই শিক্ষকটির আদব-কায়দা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর সেই সংগে অপরিসীম মূর্খতা। কাজেই ছাত্রকে শেখাবার মত তার কিছু ছিল না।

মঁসিয়ে চেয়েছিলেন ছেলে ল্যাটিন শিখবে। কিন্তু মাদামের তা ইচ্ছে নয়। এই সময় জনৈক ভদ্রলোক কয়েকটি বই লিখে প্যারিসে খুব নাম করেছিলেন। জাঁনত দম্পতী ঠিক করলেন এই লেখকের অভিমত জানা দরকার। কাজেই কোন এক ডিনারে তাঁকে নেমন্তন্ন করা হ'লো।

মঁসিয়ে প্রথম শুরু করলেন, আপনার তো ল্যাটিন ভাষা ভালো করে জানা আছে। তা ছাড়া রাজসভার আদব কায়দা—

আমি? সেই লেখক বললেন, আজ্ঞে না ল্যাটিন ভাষার একটা শব্দও আমার জানা নেই। অবশ্য এটা আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ একটা লোক যখন মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে তখন তার পক্ষে মাতৃভাষাও ভালো করে শেখা সম্ভব হয় না।

ডিনার টেবিলের চারদিক দেখে নিয়ে তিনি আবার সুরু করেন, সমবেত ভদ্রমহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা কী চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী পারদর্শিনী। তার একমাত্র কারণ হ'ল তাঁরা ল্যাটিন জানেন না।

মঁসিয়ে জাঁনতের স্ত্রী খুব খুশী হলেন।

এবার হ'ল তো? আমি আগেই বলেছিলাম—ল্যাটিন শিখে কিছু হবে না। আমি চাই আমার ছেলে বেশ রসিক হয়ে উঠুক এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ল্যাটিন শিখে চৌদ্দপুরুষ কী উদ্ধার করবে শুনি? আর তাছাড়া কোর্টে যখন মামলা হয় তখন কি ল্যাটিন ভাষায় শুনানী চলে? লোকে কি ল্যাটিন ভাষায় প্রেম করে?

মঁসিয়ে এতগুলি যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না—খড়কুটোর মত ভেসে গেলেন তিনি। অবশেষে ভেবে-চিন্তে তাঁকে অভিমত জানাতে হ'ল যে ল্যাটিন ভাষায় সিসেরো হোরেস বা ভার্জিল পড়ে ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি করতে তিনি সত্যই দেবেন না।

কিন্তু তাহলে শিখবে কী? কিছু পড়াশুনা করার প্রয়োজন আছে—আচ্ছা, ভূগোল শেখালে কেমন হয়?

ভূগোল! এবারে অবাক হওয়ার পালা শিক্ষকটির—তিনি ঠোঁট নাড়েন, তাতে কী লাভ? ভূগোল শিখে কী আর হবে! মঁসিয়ে, আপনি যখন কোথাও বেড়াতে যান তখন তো আপনার অনুচরেরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, পথ হারাবার কোন ভয়ই থাকেনা। তাছাড়া কেউ বেড়াতে গেলে সেক্সট্যান্টও নিয়ে যায়না, এমন কি অক্ষাংশ দ্রাঘিমা ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও আপনি অনায়াসে প্যারিস থেকে ফরাসীদেশের যে কোন অঞ্চলে ঘুরে আসতে পারেন।

ঠিক কথা, মঁসিয়ে সায় দেন—কিন্তু আমি শুনেছি লোকেরা প্রায়ই একটা গভীর তত্ত্ববিদ্যার কথা বলে থাকে। নামটা যতদূর মনে পড়ে বোধহয় জ্যোতির্বিদ্যা। এটা নাকি বিজ্ঞান শাস্ত্রের খুব দামী শাখা।

হায় ভগবান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শিক্ষকটি বললেন, গ্রহনক্ষত্রের কাণ্ডকারখানা দেখে পৃথিবীতে বেঁচে আছি নাকি আমরা? মঁসিয়ে আপনি কি অংক কষে... [illegible]

কোথায় কখন গ্রহণ লাগবে তা' বার করতে যাবেন? কেন একটা অ্যালমানাক খুললেই তো সব মুস্কিল আসান। তাতে সব লেখা আছে—মিনিট সেকেণ্ডের সঠিক হিসাব পর্যন্ত। তাছাড়া এতে আপনি পাবেন ধূমকেতুর গতিবেগ কত, চন্দ্রের বয়স এবং সৌরজগতের অনেক খবরাখবর—এমনকি ইউরোপের সমস্ত রাণীদের খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্যও।

মাদাম শিক্ষকের সংগে একমত। কিন্তু মঁসিয়ে নিজে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। জঁানতের খুবই মজা লাগছিল। চুপ করে খাবার খেতে খেতে সে মা-বাবার কথা শুনছিল।

মঁসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ওকে কি শেখানো উচিত?

নিমন্ত্রিত লেখক বললেন, যদি আপনার ছেলেকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে চান তবে সব বিষয়েই কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হবে। আর আমি মনে করি এব্যাপারে মাদামই সবচেয়ে কৃতকার্য্য হবেন।

মঁসিয়ের স্ত্রী মুচকি হেসে উত্তর দেন, কী যে বলেন। আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর সববিষয়ে পারদর্শী কে আছে। আমার মনে হয় ছেলেকে অল্পবিস্তর ইতিহাস পড়ালে মন্দ হবেনা। আপনার কি মত?

: কিন্তু মাদাম তাতে কোনই লাভ হবেনা! সত্যি কথা বলতে কি আমাদের প্রচীন ইতিহাস মানেই রূপকথা উপকথা আর কিছু গাঁজাখুরি গল্প। বার্নার্ড ফণ্টেলের মত বিখ্যাত ঐতিহাসিকও তা' স্বীকার করেছেন। আধুনিককালে এসব নিতান্তই অর্থহীন। কোন্ শতাব্দীতে কে রাজপ্রাসাদ গড়েছিল, কিংবা তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে কে খুব ভাল বক্তা ছিল এ সব জেনে আপনার ছেলের কী উপকারে আসবে? তাতে কার কী এসে যায়?

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, শিক্ষকটি উল্লসিত হয়ে ওঠেন, শিশুদের কচি কচি মনগুলি এই সমস্ত অর্থহীন জ্ঞানের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে অকালেই শুকিয়ে যায়। আমার মনে হয় বিজ্ঞানের যতগুলি বিভাগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিরর্থক, নীরস আর বিরক্তিকর হ'ল জ্যামিতি। জ্যামিতি প্রতিভার শেষ রসবিন্দু পর্যন্ত শুষে নেয়। বাস্তব জগতে যার কোন অস্তিত্বই নেই যথা রেখা, তল, বিন্দু ইত্যাদি নিয়ে এই হাস্যকর বিজ্ঞানের কারবার। বৃত্তস্পর্শকারী একটি সরলরেখার মধ্যবর্তী বিন্দু দিয়ে হাজার হাজার বক্ররেখার গমনপথ কল্পনা করা চলে, কিন্তু বাস্তব জগতে সামান্য একগাছি খড় পর্যন্ত তার মধ্যে দিয়ে ঢোকাতে পারবেন না।

শিক্ষকটি যা বলছিলেন তা মঁসিয়ে বা তাঁর স্ত্রী বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেন নি। তবু তাঁদের মনে হল কথাগুলি খুবই সারগর্ভ। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শিক্ষকটি আবার শুরু করেন—

: মঁসিয়ে জঁানতের মত এমন একজন মাননীয় ভদ্রলোকের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়। আপনার ছেলেকে কষ্ট দিয়ে জ্যামিতি শিখিয়ে কী লাভ? যদি কোনদিন সে তার বিষয় সম্পত্তির জন্য নক্সার প্রয়োজন বোধ করে তবে অনায়াসেই কিছু টাকা দিয়ে একজন কর্মচারী রাখবে। অন্যান্য ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। টাকা থাকলে আবার অভাব কীসের? ধনীর ছেলে, ভাগ্য যার সুপ্রসন্ন সে কোনদিনই গায়ক, শিল্পী, স্থপতি বা ভাস্কর কিছুই হয়না। অত্যন্ত মহানুভবতার সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেয় মাত্র। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই সমস্ত ব্যাপারে চর্চা করার চেয়ে পৃষ্ঠপোষক হওয়া অনেক ভালো—অনেক বেশী সম্মানজনক। আপনার ছেলের যদি রুচি থাকে তবে তা-ই যথেষ্ট, গায়ক শিল্পীরা তার ইচ্ছানুযায়ী হুকুম পালন করবে। লোকে তাই বলে টাকা থাকা মানেই প্রতিভাবানের লক্ষণ, কেননা অর্থও যা প্রতিভাও তাই।

উৎসাহের আধিক্যে তিনি আরো বলেন, মাদাম আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হওয়াই মানুষের চূড়ান্ত সফলতা। কাজেই ভেবেচিন্তে এমন কোন বিজ্ঞান আপনার ছেলেকে শেখাতে হবে যাতে তার ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত হয়। সত্যিকারের ভদ্রলোককে কি কখনো জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? কিংবা কোন শিক্ষিত লোক সূর্যের আশে-পাশে ক'টা গ্রহনক্ষত্র আছে এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে? ভোজের আসরে বসে ইতিহাসের বৃত্তান্তের কথা কেউ কি জানতে চায়?

: না না কিছুতেই নয়।

মাদাম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। শিক্ষকটির কথা-বার্তা তাঁর চিন্তাধারার সংগে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি জানালেন, না এই সমস্ত বাজে জিনিষ পড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়না। কিন্তু আসল কথা হল সে শিখবে কী? সমাজে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কিছুত জানা চাই?

এইভাবে একে একে সব কিছুই অমনোনীত হ'ল। অংকশাস্ত্র জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যাও বাদ গেল। অবশেষে বিস্তর গবেষণার পর স্থির হয় যে জাঁনতকে নাচ শেখানো হবে। কারণ প্যারিসের সৌখিন সমাজে মিশতে হলে নাচ জানা একান্তই দরকার।

তার শিক্ষা সুরু হয়ে গেল। মাদাম তাঁর নিজের খুশীমত ছেলেকে শিক্ষা দিয়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দক্ষ করে তুললেন। নাচ এবং গান উভয়দিকে তার পারদর্শিতা। দেখতে সে সুন্দর ছিল, তার উপর এই গুণ জাঁনতকে করে তুলল আকর্ষণীয়। ফলে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের কাছে তার কদর বেড়ে গেল। মাদাম মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন একজন প্রতিভাবানের মা হওয়া কত গর্বের। তাঁর মনে প্রবল একটা আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। প্যারিসের নামজাদা অভিজাত লোকদের তিনি ডিনার দিতে লাগলেন। কিন্তু বেচারা জাঁনত একটু মুস্কিলে পড়ল। কোন কিছু না জেনে কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজেকে সে তৈরী করেছিল, তাই কাজের সময় দেখা গেল সে সব কাজেই অক্ষম। মঁসিয়ে পুত্রের 'বাগ্মিতাপূর্ণ' কথাবার্তা শুনে মনে মনে বড় আপশোষ করলেন, হায়, যদি তাকে ল্যাটিন শেখাতেন! সে তাহলে অনায়াসেই বিচারালয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। মাদামের আরো উচ্চাশা। তিনি ভাবলেন, ছেলেকে একটা সৈন্যদলের অধিনায়ক করে দিলেই ভালো হত।

সে যাই হোক, যুবক জাঁনত শীঘ্রই প্রেমে পড়ে গেল। একটা গোটা সৈন্যদল পুষতে যা লাগে প্রেমিকার খরচ তার চেয়ে কম নয়। অকাতরে সে টাকা উড়িয়ে চলে। মঁসিয়ে এবং মাদাম তাতে বাধা দেননা। এমন কি তলে তলে ঋণগ্রস্ত হয়েও বাইরের ঠাট, জাঁকজমক বজায় রাখলেন। ছেলেকে টাকার জন্য কখনই নিরাশ করলেন না।

জাঁনতদের বাড়ীর কাছাকাছি কোন বাড়ীতে একটি তরুণী বিধবা ছিল। তার অবস্থা সুবিধের নয়। সে ভাবল, জাঁনতের সংগে যদি তার বিয়ে হয় তবে ভাবনার কোন কারণ থাকবেনা। পরিবারের অর্থকষ্টও দূর হবে। কাজেই জাঁনতকে সে ভালো করে অভ্যর্থনা জানালো এবং প্রেমে পড়ার সুযোগ দিল। নানা কলাকৌশলে তরুণীটি নিজেকে একান্ত একনিষ্ঠ প্রেমিকা বলে জাঁনতের কাছে তুলে ধরল—ফলে, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, জাঁনত তার অনুগত হয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরে জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। জাঁনতের মা-বাবা এতে খুব খুশী হয়েই সম্মতি দিলেন, কারণ এতে দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে উঠবে। বিয়ের সব বন্দোবস্ত একরকম ঠিকঠাক। দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা অভিনন্দন জানালেন। বিয়ের চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল। পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ইত্যাদিও কেনার বন্দোবস্ত হতে থাকে। একদিন সকালে জাঁনত আর সেই তরুণীটি একসাথে বসে ভবিষ্যতের সুখস্বচ্ছল জীবনের কথা কল্পনা করছে, আলোচনা করছে এমন সময় একটা লোক জাঁনতের জন্য পরম দুঃসংবাদ বহন করে আনল।

লোকটা বলল, আপনি খুবই দুঃখ পাবেন তবু আপনাকে বলতে হচ্ছে। পাওনাদারেরা আপনাদের বাড়ী দখল করেছে। শেরিফের কর্মচারারা সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলেছে। এমন কি তারা গ্রেফ-তারের কথাও বলছে।

আর্তনাদের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল জাঁনতের মুখ দিয়ে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। এর মানে কি? আমাকে আসল ব্যাপারটা জানতে হবে।

প্রেমিকাটি বললে: হ্যাঁ তাই ভালো। তোমার এখন সেখানে যাওয়া খুবই দরকার। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে এস ব্যাপারটা কি।

বাড়ীর দিকে ছুটল জাঁনত। সেখানে গিয়ে দ্যাখে সব ওলটপালট। মঁসিয়েকে আগেই কয়েদখানায় আটক

করা হয়েছে। চাকরবাকরেরা হাতের সামনে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে পালিয়েছে। তার মা একা একপাশে চুপ করে বসে আছেন। তাঁকে বড়ই নিরাশ আর অশ্রুময়ী লাগে। অতীত ঐশ্বর্যের অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া যাঁর আর কিছু বাকি রইলনা, জঁানত তার মা-কে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, বলল: ভেঙে পড়লে চলবেনা মা। সেই মেয়েটি আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ঐশ্বর্য তার না থাক, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে অনেক বড়। আমি এখনই যাচ্ছি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে। তাকে দেখে তুমি মনে শান্তি পাবে।

সুতরাং জঁানত আবার তার প্রেমিকার কাছে ফিরে এল। সেখানে গিয়ে দেখে মেয়েটি আরেকজন যুবক অফিসারের সংগে বসে খুব হেসে হেসে আলাপ করছে। জঁানতকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

: আশ্চর্য: জঁানত তুমি? আমার কাছে হঠাৎ কী দরকার পড়ল? আর তাছাড়া তোমার মাকে এমন অবস্থায় ফেলে তুমি কী করে এখানে আসতে পারলে! যাও, এখনই যাও—তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। তোমার উচিত মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া। তোমার মা-কে বলো আমি সব সময়েই তাঁর মংগল কামনা করি।

মেয়েটির কথা শেষ হলে সেই অফিসারটি গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন, ওহে ছোকরা—শোন। তোমার চেহারাটা দেখছি দিব্যি কার্তিকঠাকুরের মত। আমার সৈন্যদলে ঢুকবে? যদি রাজী থাকো তবে—

জঁানত কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাইরে বেরিয়ে আসে। এবার সে যায় তার শিক্ষকের কাছে। সরল বিশ্বাসে তাঁকে সব কথা খুলে বলে। শিক্ষকটি প্রস্তাব করলেন জঁানত যেন একটা মাষ্টারী নেয়।

: মাস্টারি, হায় ভগবান!

আমি যে কিছুই জানিনা, ভাঙা গলায় প্রায় কাঁদতে কাঁদতে জঁানত বলে, আপনি আমাকে কিছুই শেখান নি। আমার দুঃখকষ্টের জন্ম আপনি দায়ী।

সেখানে একজন রসিক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন, তাহলে বাপু তুমি উপন্যাস লিখতে শুরু কর। প্যারিসের মত শহরে উপন্যাস লিখতে জানলে কোন ভাবনাই নেই।

তারপর জঁানত গেল তার মায়ের পরিচিত এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে। তিনি একটা আশ্রমের পরিচালক।

: কি জঁানত? তোমার মা কেমন আছেন? গাড়ীটা কোথায় রেখে এলে?

সেই হতভাগ্য যুবক একে একে তাদের পরিবারের এই আকস্মিক পতনের সব কাহিনীই খুলে বললো।

হুঁ, তিনি ঘাড় নাড়লেন, সবই তাঁর ইচ্ছে। এই নিয়তির খেলা। তবে ঈশ্বর যা করেন সবই মংগলের জন্য। তোমার মাকে যে তিনি সর্বহারা করেছেন এর মধ্যেও আমি ভগবানের অসীম করুণা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আর ভাবনার কিছু নেই—ত্যাগেই শান্তি। মৃত্যুর পর তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করবেন।

জঁানত কাতর স্বরে বলল: কিন্তু পৃথিবীতে আপাতত বাঁচবার কোন উপায়ই কি নেই?

ধার্মিক বৃদ্ধটি তাঁর কথায় কান দিলেন না। পরম করুণায় ভগবানের কথা স্মরণ করতে করতে তিনি জানান, আচ্ছা আজ তাহলে আসি। আশ্রমে কয়েকজন মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জঁানত আর সহ্য করতে পারেনা। সে যেন তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। তার অন্যান্য সব বন্ধুবাও ঠিক একই ব্যবহার করল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যা সে এর আগে কখনো পায়নি। এই সময় রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ী যাচ্ছিল তাতে একজন আরোহী আর তার স্ত্রী। গাড়ীটির পেছনে মালপত্র বোঝাই আরো কয়েকটা গাড়ী ধীর বেগে চলছিল। আরোহীটি মুখ বাড়িয়েই ছিল। জঁানতকে দেখে সে চিনতে পারল। জঁানতের বিবর্ণ পোষাক, ক্লান্ত শরীর। দুঃখে বেদনায় আরোহিটির অন্তঃকরণ ভরে ওঠে।

: হে ভগবান! জঁানত তুমি?

তার নিজের নাম উচ্চারিত হতে দেখে জঁানত মুখ তুলে তাকাল। ইতিমধ্যে গাড়ীটা থেমে গেছে। আরোহী তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এল। প্রবল আবেগের সংগে জঁানতকে জড়িয়ে ধরল। জঁানত বন্ধুকে চিনতে পেরে লজ্জায় মুখ নীচু করে রাখে।

কলিন। তার ইস্কুল জীবনের সেই পুরণো বন্ধু!

তুমি আমাকে ভুলে গেছ, কলিন বললে, আমি কিন্তু ভুলিনি। যত বড়লোকই তুমি হও, যত দূরেই সরে থাক আমি তোমাকে চিরদিন ভালবেসে এসেছি।

জঁানতের বলবার কিছু নেই। সত্যিই কী সে বলতে পারে! তবু একই ইতিহাসের অনিচ্ছুক পুনরাবৃত্তি করল।

: আমি যে হোটেলে উঠব সেখানে চল। বাকী সব ঘটনা শুনব।

কলিন তার স্ত্রীকে দেখিয়ে বলে, এ হ'ল আমার স্ত্রী। জঁানত আমার বন্ধু। চল আমরা এক সংগে খাবো।

তারা তিনজন হেঁটেই হোটেলে গেল। মালপত্র নিয়ে গাড়ীগুলি পেছন পেছন আসছিল। জঁানত জিজ্ঞেস ক'রল, এত সব আসবাবপত্র কার? তোমার নাকি?

কলিন মৃদু হাসে।

: হ্যাঁ এগুলি আমাদেরই।

তারপর কলিন নিজের কাহিনা বলে যায়, আমরা এখন গ্রাম থেকে আসছি। আমি বর্তমানে বড় একটা কারখানার মালিক, বিয়ে করেছি ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে। ঈশ্বর আমার প্রতি সহায় আছেন। তাঁর আশীর্বাদে দিনগুলি সুখেই কাটছে।

জঁানত আমি তোমাকে সাহায্য করবো। অর্থের অহংকার একটা অর্থহীন—এসব তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করে তুমি এস। আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবেই পেতে চাই। তুমি আমাদের সংগে গ্রামে চল। সেখানে তোমাকে ব্যবসা শেখাবো। ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়—তুমি একটু চেষ্টা করলেই বুঝে নিতে পারবে। আর আমরা কখনোই আলাদা হবোনা।

কলিনের এই সদয় ব্যবহারে জঁানত যেন দুঃখ আর আনন্দ, বেদনা আর তৃপ্তিতে দ্বিধান্বিত হতে থাকে। সে মনে মনে বলে, আমার সম্পদকালের বন্ধুরা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। শুধু কলিন—যাকে আমি অবজ্ঞা দেখিয়েছিলাম সে-ই শেষকালে এল আমাকে সাহায্য করতে। আমি এ কী শিখলাম!

কলিন বললে, তোমার মায়ের প্রতি এখন বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আর তোমার বাবা মঁসিয়ে জঁানত যাতে অবিলম্বে মুক্তি পান সেদিকেও চেষ্টা করছি। ব্যবসাতে অনেক কল-কৌশল জানা আছে আমার। পাওনাদাররা তোমার বাবাকে মুক্তি দিতে নিশ্চয়ই রাজী হবে।

পরের ইতিহাস সহজ। স্বচ্ছন্দ।

কলিনের চেষ্টায় মঁসিয়ে জঁানত-পরিবার প্যারিস ছেড়ে গ্রামে চলে আসে এবং আগের ব্যবসাতে মন দেয়। অর্থের অহমিকা, একটা মিথ্যে প্রহেলিকা থেকে তারা মুক্ত হয়েছে। সহজ প্রীতি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই যে মানুষ অনেক বেশী সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, পেতে পারে অনেক বেশী শান্তি একথা ক্রমে তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

হ্যাঁ আরো একটা খবর বাকি আছে। কলিনের বোনটি দেখতে যেমন লাবণ্যময়ী স্বভাবেও তাই। সে তার ভাইয়ের মতই সহনশীল শান্ত-স্বভাবা। তারপর? সংস্কৃত শ্লোক বৃথাই লেখা হয়নি—ভোজের শেষে মধুও আছে। মঁসিয়ে আর মাদাম পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

[জগৎবিখ্যাত মনীষী ফরাসী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ভলটেয়ার। এটি তাঁর 'Jeannot and colin' নামক অপরূপ গল্পটির বাংলা অনুবাদ। মূল গল্পের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকলেও স্থানে স্থানে কিছু পরিমান স্বাধীনতা নিয়েছি—অনুবাদক]

সুন্দরবনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুন্দরবনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এই অঞ্চলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে। বর্তমানে সুন্দরবনের বেশীর ভাগ এবং অপেক্ষাকৃত অরণ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল পড়েছে পাকিস্থানের দিকে, ভারতসীমায় পড়েছে তার তুলনায় অনেক নিরেস অঞ্চল।

ধর্মপালের খালিমপুরলিপি, দেবপালের নালন্দালিপি এবং লক্ষণ-সেনের আনুলিয়া লিপিতে "ব্যাঘ্রতটী" মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল কথাটির অর্থ করলে মনে হয় যে সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত। খুব সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশালের নীচের অংশ বোঝান হয়েছে। এর থেকে মনে হয় আশপাশে বসতি থাকলেও নবম-দ্বাদশ শতকে এই অঞ্চলের কিছু অংশ গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে অনেকাংশে ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়—এ সম্বন্ধে এখনও অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। ডায়মণ্ডহার-বারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে বকুলতলা গ্রামে লক্ষণসেনের পট্টোলী দ্বাদশ শতকে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়, পনের মাইল দক্ষিণপূর্বে মলয়ে পাওয়া গেছে জয়নাগের তাম্রলিপি, এর প্রচার কাল সপ্তম শতক, রাক্ষসখালি দ্বীপে পাওয়া গেছে ডোম্মনপালের পট্টোলী এবং প্রচুর মাটির শীলমোহর। এগুলো অনুমানিক দ্বাদশ-একাদশ শতকের বলে ধরা হয়।

সুন্দরবন জঙ্গলাকৃত থাকলেও—তার অনেক অঞ্চল যে সমৃদ্ধশালী ছিল একথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। গোসাবা আবাদ থেকে প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে ঘন অরণ্যের মধ্যেও আজ ও দেখা যায় ভগ্নপ্রায় মন্দির, নীচে কয়েকটা ঘরের অস্তিত্ব, সেখানে আজও লোকে পুজো দেয় বনে যাবার সময়; বিরিঞ্চি বাড়ী বলে পরিচিত এই ধ্বংস স্তূপ, এক-কালে সমৃদ্ধিশালী কোন সামন্ত রাজের বাসস্থান ছিল বলে মনে হয়।

মুসলমান সুলতানরা এই অঞ্চলে কিছু কিছু আবাদ করে বসতি-পত্তন করেন। আকবরের সময় মুসলমানরা এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন তার পরিচয় ইতিহাসে পাই। বারো ভূঁইয়ার মধ্যে ঈশাখার আধিপত্য এই অঞ্চলে ছিল, পঞ্চদশ শতকে য়ুসুফসাহ—সৈয়দ হোসেন সাহ—নসরৎ সাহ প্রভৃতি সুলতানেরাও এই অরণ্যের কিছু কিছু আবাদ করিয়েছিলেন। বর্তমানেও এই অঞ্চলের অনেক গ্রাম-সহরের নাম খুঁজলে তাদের নামের ছিটে-ফোঁটা দেখা যায়, এর জন্য ইতিহাস বার করা ঐতিহাসিকের ব্যাপার; কিন্তু 'বসিরহাট'—হোসেনাবাদ নামগুলোও অনেক প্রশ্নের অবকাশ রাখে।

তারপর দেখি প্রতাপাদিত্যের সুন্দরবন অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে); বর্তমানে ওই এলাকা পাকিস্থানের সীমায় পড়েছে।

কিন্তু চব্বিশ পরগণার বন অঞ্চলের নিম্নভূমি কোনও অজ্ঞাত কারণে জনবসতিহীন—পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে। হয়তো—প্রবল বন্যা—প্লাবন কিছু ঘটেছিল; তারপর থেকে নোনা মাটিতে আর ফসল ফলেনি। এছাড়া অন্য একটা কারণ দেখা যায়—সেটা হচ্ছে মগ এবং পর্তুগীজ জল-দস্যুদের উন্মত্ত হত্যা এবং লুণ্ঠন লীলা। গ্রামকে গ্রাম তার জ্বালায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল, লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে ধন-প্রাণ মানটুকু পর্যন্ত। এর কোন প্রতিকার হয়নি, প্রতিরোধ করতে পারেনি জন-সাধারণ; প্রাণ ভয়ে তারা ওই ভূমি পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসে। কালক্রমে যে বন কেটে মানুষ ওই গ্রাম গড়ে তুলেছিল, সেই বনই আবার গ্রাস করে নিল গ্রামকে। ওর ইতিহাস পরিণত হল অন্ধকার রহস্যে।

আজ বাসভূমি নাই, কিন্তু আছে সেই জলদস্যুদের বংশধর। আজও তারা বিনাবাধায় অপ্রতিহত গতিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি খাটিয়ে চলেছে।

সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ-জলের বুক থেকে শেষ আভাটুকু মুছে যায়নি এখনও।

এমন স্বর্ণ সন্ধ্যা কালো করে তুলেছে ওরা। পাশেই নৌকা বাঁধাছিল কয়েকটা জেলের, সুসংবাদটা তাদের মুখেই পেলাম। দু'দিন আগে বিহারীখালের কাছে ডাকাতির পর আরও নীচে সমুদ্রের মুখে একটা চরে তারা জেলেদের একটা দলকে আক্রমণ করেছিল। কোথায় ওই পথে মাছ বওয়া লঞ্চের উপরও হামলা হয়েছে। এককথায় আমাদের সামনের পথ একেবারে বন এবং উপদ্রুত অঞ্চল। কাছাকাছি খান তিনেক নৌকা নিয়ে গোলপাতা কাটাই হচ্ছিল, তারাও প্রাণ ভয়ে সরে গেছে সেখান থেকে।

এখন আমাদের অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করছে কে জানে। নীরবতা ভেদ করে বার হয়ে গেল একটা স্পিড ডিঙ্গি, কয়েকজন পুলিশের লোক চলেছেন চারদিন আগে খালের ভেতর যে ডাকাতি হয়েছিল তার সরেজমিন তদন্ত করতে। ডাকাতের দল আজও সেখানে যেন বসে প্রতীক্ষা করছে তাঁদের জন্য, রাইফেল উঁচিয়ে খালে ঢুকলেন তারা। জনমানবহীন খাল ডাকাত এবং যাদের উপর ডাকাতি হয়েছে তাদের কেউই সেখানে নাই, তবু ও চাকরী বজায় রাখতে হবে তো।

আবছা অন্ধকার হয়ে এসেছে। জোয়ার আসতে জেলের দল কে কোথায় চলে গেল উজোনে, সেই গভীর বনের ধারে পড়ে রইল আমাদের

নৌকা ; ঢেউএর দোলায় দুলছে, দূরে চেকপোষ্টে জ্বলছে আলো, দুএকটা ষ্টীমার এসে দাঁড়িয়েছে—কে জানে কি চেক হচ্ছে সেখানে, অন্ধকারে বসে আছি ক'টি প্রাণী। পুলিশবোট ফিরছে সবেগে তদন্ত সেরে—আমরা ডাকাডাকি করি—টর্চের আলোজ্বেলে সঙ্কেত জানালাম অন্ততঃ রক্ষাকর্তাদিগকে একটু চোখের দেখা দেখলে, দুটো কথা শুনলেও কলজের ভরসা পাবো, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, রেঞ্জ অফিসারের লঞ্চ আমাদিগকে যে ভাবে কাকমারীর হাটখোলায় ফেলে গিয়েছিল, এই 'স্যারের' দলও ঠিক তেমনি করে অকূলে ভাসিয়ে রেখে গেলেন। বঁধু ডিঙ্গা ঘাটে লাগিয়ে পান খেয়েও গেলো না—চোখ ইসারা করতে ও দাঁড়ালো না।

বড়দার সঙ্গে অনেক মালপত্র চাল ডাল চলেছে। বনের মধ্যে কাঠ কাটাই হচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশজন লোকের এক মাসের খাবার দাবার সব কিছু, তাছাড়া সজীব লগেজ একটি সঙ্গে রয়েছে, সে এই অধম। যদি কিছু হয় পথে। নিজের জন্য কিছু ভাবেন না—ভাববার মত প্রবৃত্তি তার নাই দেখলাম।

যদি কোন নিরাপদ নির্ভর পাওয়া যায়, তারই জন্য একবার থানা থেকে পুলিশ অফিসার এসেছেন তাঁর কাছে এবং বনবিভাগের পেট্রল অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

বড় নৌকাটা রইলো মালপত্রও একজন মাঝি সমেত খোদার জিম্মায়। ছোট টাপুরি খানায় দুজন দাঁড়ি আর মাঝিকে নিয়ে বড়দা চললেন কর্তা-দের সঙ্গে দেখা করতে চেকপোষ্টের ওদিকে। ষ্টীমারগুলো চলাফেরা করছে, উঠছে বড় বড় ঢেউ, তারই বুকে অতল গাংএ পাড়ি জমিয়ে চলেছি। দেখা যাক কি হয়!

পেট্রল বোট এগিয়ে গেল দেখলাম—পুলিশ অফিসার এখানে নাই, তিনি গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন গাংএর মধ্যে চেকপোষ্টের দোতালা জাহাজে। পেট্রল ইন চার্জ—অসময়ে আমাদিগকে দেখে একটু মনে মনে অসন্তুষ্টই হলেন। ভদ্রলোকরা যে জ্বালাতনই করতে ওস্তাদ সেই কথাটাই প্রকারান্তে পাড়লেন। আমরা নাচার, যখন আসল কথাটা পাড়লাম—ভদ্রলোক তো শুনে টুনে হতভম্ব। আশ্বাস দেন তিনি,—মশাই, অদৃষ্টে যা আছে কে আর খণ্ডাবে বলুন। ভগবানের নাম নিয়ে চোখ বুজে চলে যান—ব্যস্'

ব্যস্! কিচ্ছা খতম। একেই বলে 'জলপুলিশ'। পুলিশের সব কর্তব্য জল করে বসে আছেন। ভদ্রলোকের নাম সাকিম জিজ্ঞাসা করলাম না। কে জানে, হয়তো তার কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাসের জন্য বোধ হয় 'প্রমোশন' ও পেয়ে গেছেন এতদিনে! এরপর আর এক মাইল পথ টেনে গাংএর বুকে পুলিশ ভদ্রলোকের বিশ্রামে বাধা দিতে ইচ্ছা হোল না, সত্যিই তাঁরা তো আমাদের আসতে বলেননি এই বনে, তবে তাঁরা কোন সুবাদে আমাদের জানমালের জন্য তকলিফ্ ওঠাবেন খুটমুট। তাঁরা কি আমার খাসতালুকের প্রজা?

নীরবে ফিরে এলাম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। বনের থমথমে অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে হরিণের ডাক। আমরা ছাড়া এপাশে আর মানুষ নাই।

কি নিরাপদ আশ্রয়?...বহুদূরে নদীর মধ্যে একটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্যও পাবো না। সামনেই খালের বুক থেকে ডিঙ্গি নিয়ে এসে ডাকাতের দল এক একটি শেষ করে গেলেও—কেউ টের পাবে না, জিনিষপত্র নি'ক না যা ইচ্ছে। তবে কিসের ভরসায়, একে নিরাপদ আশ্রয় বলে নিশ্চিন্তে বসে সামনের ভাঁটা নষ্ট করে দিচ্ছি?

একদিন এক রাজা ঘোষণা করলেন—মাঘ মাসের শীতে সারা রাত যে লোক তাঁর রাজপ্রাসাদের নীচে পচা ডোবাতে থাকতে পারবে তিনি তাকে একশো মোহর পুরস্কার দেবেন।

এক বুড়ো ব্রাহ্মণ অনাহারে মরছিল, এমনিতেও মৃত্যু—ওমনিতেও মৃত্যু, তার চেয়ে জলে থেকে যদি বেঁচে ওঠে—বেশ কিছু জুটে যাবে। এসে নামলো জলে, রইলোও সারা রাত। পুরস্কার নিতে গেছে, রাজার উজীর সাহেব বুঝিয়ে দেন রাজাকে—'মহারাজ, আপনার তিন মহলায় সারা রাত আলো জ্বলছিল, তার গরম যাবে কোথায়, সেই তাপে ডোবার জলও গরম হয়ে উঠেছিল। বেশ আরামসেই ছিল ওই চালাক বামুন। ওকে আবার পুরস্কার দেবেন কেন?

...রাজার বাড়ীর তেমহলায় আলো জ্বললে নীচে ডোবার জল গরম হয়ে যায় মাঘের শীতে, সুতরাং চেকপোষ্টের আলোর নিশানা যতদূর যায় সেই জায়গা নিরাপদ কেন হবেনা?

...শীতের রাত্রি, সন্ধ্যা থেকে আঁধার জুড়ে বসেছে, আগামীকাল অমাবস্যা, তারই ভূমিকা সুরু হয়েছে আকাশজোড়া আঁধারের আসন পেতে, জ্বলছে দু'একটা তারা। চুপ করে বসে আছি। সব সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অকূল গাং—নিবিড় বনে আজ এই অন্ধকারে বসে আছি পরম সত্যের মুখোমুখি।

নিজেকে আজও চিনতে পারিনি, বিশাল বিস্তৃত তারাজ্বলা আকাশের নীচে অন্তহীন পৃথিবীর সুন্দরবনানীর গভীরে—জীবনের নগ্নসত্য—আদিম বিভীষিকার দৈত্যের সামনে এসেও আমার মুখোষ খুলে পড়েনি। এখনও আজন্মের স্বার্থসন্ধানী মন খোঁজে নিজের নিরাপত্তা,...বনের রীতিনীতিকে মানতে পারিনি, চাপা ঘৃণা করি ভয়ে ভয়ে, ওর বিশাল সৌন্দর্য্যকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছে আমার পদে পদে, তাই এখানের জীবনযাত্রায় আমি অচল ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

তোমার বুকে সূর্যের প্রণাম দেখবার চোখ আমার নাই, আকাশের প্রশস্ত আঙ্গিনায় রাতের পৃথিবী তোমার বরণডালায় সাজায় তারার হাজারো ফুল—সাগর পরায় তোমার ললাটে সিতচন্দন পঙ্ক, দিক-অঙ্গনার চঞ্চল উড়ানী উড়িয়ে বাতাস নেচে যায় তোমার অঙ্গে; স্তব্ধ গভীর মহাদেবতার যে নীরব পূজা চলেছে প্রতিটী দিন রাত্রে, আমি তার সুর খুঁজে পাইনি, কানে আসেনি তোমার বন্দনার সামমন্ত্র। আমি অন্ধ-মূক! তাই নিজেকেই ঘিরে উর্ননাভের মত স্বার্থ ভয় বাঁচবার জাল বুনবার বৃথা চেষ্টা করেছি। তুমি হেসেছো খলখল করে; সেই অট্টহাসি দেখেছি দিকহীন গাং এর বুকে বুকে।...ভয়! ভয়! ভয়! মানুষকে সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত

করে রেখেছে। জীবনের সত্যের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ব্যর্থ করেছে আমার এই যাত্রার মাধুর্য্য।

...ঘুমের জড়তা এসেছিল বোধ হয়...কানে আসে একটা ডুম ডুম শব্দ, নৈশ নীরবতা ভেদ করে উঠছে একটা বিচিত্র সুরের কলরব, ওই একটানা শব্দ দূরে গাং-এর ওপারে গভীর বনতলে মুখর হয়ে উঠেছে, জ্বলছে কয়েকটা মশাল, লালচে বীভৎস একটা ছায়া পড়েছে বনের গাছগুলোতে।...

—'জেলেরা বনবিবির পূজো দিচ্ছে।'

ভোলামাঝি বললো।...ওই দূরের দিকে চেয়ে থাকি, সভ্যজগতের কোন সুর-তাল-ছন্দ ওতে নাই। বনের মর্মরের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে ওই বিচিত্র শব্দ,...আলোটা পরিণত হয়েছে বনের একটি অংশ হয়েই।...কি ওর অর্থ—কি সে ব্যঞ্জনা—কারা ওই লোক জানিনা—বনের জীবনে ওরা মিশিয়ে গেছে নিঃশেষে।

—"এই ভাটাতেই নৌকা ছাড়বো আমরা!"

বড়দার আপত্তি নাই, আমার সম্মতিই যেন চাইছিলেন। এখানেও সেই অনিশ্চয়তা—পথেও তাই। এগিয়ে যাওয়া যাক—যা থাকে বরাতে। দুঃখ যদি থাকে তবে তাড়াতাড়িই আসুক—তারজন্য নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষা করে দিনের পর দিন কাটানো অসহ্য।

—"বেশ, তোল নোঙর।"

—যদি আসেই কেউ, বলবো যা ইচ্ছে নিয়ে যা বাবা; বেঁচে থাকলে আবার আসবো, আবার পাবি তোরা। প্রাণে মারলে আর পাবি না, এই শেষ পাওয়া। বনেদী ডাকাত যদি হয় ঠিক বুঝবে।"

হাসতে থাকেন বড়দা—"এতক্ষণ ভেবে চিন্তে ওই ঠিক করলে নাকি!"

...নৌকা ছাড়লো, পিছনে পড়ে রইল বিহারীখাল, আমাদের নৌকা এগোচ্ছে গোসাবা নদীর দিকে। এর পর ছোট গাং আর নাই—গোসাবা নদী ধরে একেবারে সমুদ্রে নামবো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঙ্করাচার্য ও ভক্তি

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অনেকেই মনে করেন যে শঙ্করাচার্য্য কেবল জ্ঞানবাদীই ছিলেন। কারণ তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বৈতবাদ দর্শনের জ্ঞান ক্ষেত্রের চরমতার পরিচায়ক। কিন্তু তিনি কেবল জ্ঞানবাদীই ছিলেন না, মূর্ত্তিমান জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিবাদী ছিলেন। যখন যেরূপে লীলা করিয়াছেন তখনই মনে হইয়াছে তিনি একমাত্র সেই মতবাদী। শুধু যে ধর্ম্মক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা যায় তাহা নহে, সাহিত্যেও ঈদৃশ দৃষ্টের অভাব হয় না। ভানুসিংহের পদাবলীর লেখক রবীন্দ্রনাথই, নাট্যকার, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। তথাপি সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবে পূর্ণের প্রচারের পরিবর্ত্তে অংশের প্রকাশ হয়। আর পরিণামে হয় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভক্ত শঙ্করাচার্য্য।

যাহার জীবন দর্শনে, কর্ম্মে, ভক্তির লীলাবিলাস দৃষ্ট হয়—সেই হয় ভক্তপদ বাচ্য। শঙ্কর আধার ও ভক্তি আধেয়। ভক্ত শঙ্করের আলোচনা করিলেই শঙ্করাচার্য্য ও ভক্তির সম্পর্ক নির্ণীত হইবে। এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—জীবনী, সাধনা ও রচনা।

শঙ্করাচার্য্য পরম পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহা সুধীগণের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কাহিনী জানা যায়। তিনি মানিতেন পিতামাতা পরমগুরু। তাঁহাদের অসন্তুষ্ট করিয়া কোন ধর্ম্ম-কার্য্য হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি মায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস-[illegible]
নহে অর্থাৎ সন্ন্যাসীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিয়াও মাতার অনুরোধে বৎসরে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুকালে তিনি আসিয়া স্বয়ং মাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মাতৃভক্তির চরম ও পরম আদর্শ করিয়াছেন। —'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাই'—মাতা পিতা পরম দেবতা জ্ঞানে, তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রশ্নোত্তর মালিকাতে ইহাদের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—'প্রত্যক্ষ কা মাতা, পূজ্যগুরুশ্চ কস্তাতঃ'।

তাঁহার সাধন জীবনের বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার গুরুভক্তি সুবিদিত, তাঁহার প্রতিভা আজ প্রদীপ্ত। তাঁহার কুলদেবতা শ্রীবল্লভ (অদ্বৈতানুভূতিঃ শ্লোক ক) পরবর্ত্তী শ্লোকে তাঁহার ভক্তি বিনম্র ভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যস্য প্রসাদাদহমেব বিষ্ণুর্ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ।

ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং তস্যাংঘ্রি যুগ্মং প্রণতোঽস্মিনিত্যম্॥

যাঁহার প্রসাদে—আমি বিষ্ণু এবং আমাতেই সমস্ত বিশ্ব পরিকল্পিত'—এই জ্ঞান আমার হইয়াছে, নিত্য ও পরমাত্মা স্বরূপ তাঁহার চরণ যুগলে নিত্য প্রণাম করি। ভক্তই নিত্য প্রসাদ পায়, ইঁহা ভিন্ন তাঁহার বহু গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দৃষ্ট হয়, গ্রন্থের দেব বন্দনা প্রথা সুপ্রচলিত। এই বন্দনা ভক্তিরই প্রকাশক। সাধন জীবনে ভক্তির গুরুত্ব যথেষ্ট [illegible] স্বীকার। তিনি ভক্তিকে বৈরাগ্যের সাধন বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য মাত্মবাধো ভক্তিশ্চেতি ত্রয়ং গদিতম্।

মুক্তে সাধনমাদৌতত্র বিরাগো বিতৃষ্ণতা প্রোক্তা। ৫ ॥

"বৈরাগ্য আত্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনটি মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বৈরাগ্যের নামান্তর বিতৃষ্ণা" অন্যত্রও ইন্দ্রিয়-নিরোধক উপায়রূপে শ্রীহরিচরণ ভক্তিযোগ কথিত হইয়াছে—'হরিচরণ ভক্তি যোগাত্মনঃ স্বরেণং জহাতি শনৈঃ'। ভক্তি জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা অথবা ভক্তিই পরবর্ত্তী কালে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে ভক্তি ব্যতীত অন্তরাত্মা অর্থাৎ মনশুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব বা স্থায়িত্ব অসম্ভব। [দ্বিধাভক্তিপ্রকরণ ১৬৬-১৬৭]

ভক্তির জয়গানে পঞ্চমুখ আচার্য্য শঙ্করের 'মণিরত্নমালার' অন্যতম রত্ন ভক্তি। আত্মজিজ্ঞাসার ছলে জনগণকে উপদেশ দান কালে, শিব বিষ্ণু ভক্তিকে মাত্র প্রিয় করিবার জন্যই উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। নিজ অনুভূত সত্যের প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে—

অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং

সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্ম তত্ত্বম্॥

কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ

ক্বাস্থা ন কার্য্যা সততং ভবব্ধৌ ॥৩১॥ঐ

"অহর্নিশ ধ্যেয় কি? সংসারের অনিত্যতা ও আত্মস্বরূপ শিবতত্ব। কর্ম্ম কাহাকে বলে? যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। কিসের প্রতি আস্থা রাখা উচিত? ভবসমুদ্রে"। এই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি দ্বারা মানুষের সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—

"ফলমপি ভগবদ্ভক্তেঃ কিং তল্লোক স্বরূপ সাক্ষাত্বম্"।

(প্রশ্নোত্তরমালিকা ৬৭)

ভক্তির প্রয়োজন ও ফলাদি বলিয়াও শঙ্করাচার্য্য তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অথবা পরবর্ত্তী কালে নানা পণ্ডিত নানা ব্যাখ্যা করিবেন ভাবিয়া ভক্তির সংজ্ঞা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিলেন এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তি সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী

স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥৩১॥ [বিবেক চূড়ামণি]

'যত কিছু মুক্তির কারণ আছে ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি।

শঙ্করাচার্য্য নিজের চরম মত প্রকাশ করিয়াও মনে করিলেন যে ভক্তির এই সংজ্ঞা সকলের অনুভূতির মধ্যে না আসিতে পারে। সেইজন্য অপর মতেরও প্রকাশ করিলেন।

'স্বাত্মতত্বানু সন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ'।

অপরে বলেন—স্বস্ত আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার ও ঈশ্বরের তত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি।

তাঁহার জীবনে আচরণে সর্ব্বত্রই ভক্তির প্রভাব দৃষ্টহয়। ভক্তি আত্মতত্ত্বের বিকাশক বা পরিপূরক ইহা তিনি উপদেশে আদেশে সর্ব্বত্রই সমভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

ভাব পরিপ্লুত না হইলে কেহই ভাবময় রচনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তিভাব যাঁহার হৃদয়ে নাই, সে কখন ভক্তিমূলক রচনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। রচনার সিদ্ধি কালের নিকটে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। সহজে সিদ্ধি বিষয়ে জানিতে হইলে, জানিতে হইবে জনমনে রচয়িতার ভাব কতখানি সংক্রামিত হইয়াছে। যত অধিক সেই ভাব সংক্রামিত হয় তত অধিক সিদ্ধি সূচিত হয়। ভক্ত শঙ্করের স্তোত্রাবলী সঙ্কলন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ভগবৎ গীতা কিঞ্চিদধীতা

গঙ্গাজল লবকণিকাপিতা।

সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চ্চা

তস্য যমঃ কিংকুরুতে চর্চ্চাম্॥

ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং

ভজগোবিন্দং মূঢ় মতে।

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে

নহি নহি রক্ষতি ডু-কৃঞ্ করণে॥

(চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রম্)

ভক্তি শব্দের মূল ধাতুরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভজনা ও ভক্তি পর্য্যায় শব্দ বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। তিনি যখনই যাঁহার স্তব করিয়াছেন তখনই মনে হইয়াছে যে তিনি তাঁহারই পরম ভক্ত। যখন যে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তখন তাঁহাকে সেই মত বাদী মনে হয়। কৃষ্ণভক্ত শঙ্কর বলিতেছেন—

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং গীষ্পতিরপি

বিনা যস্য জ্ঞানং জনি মৃতিভয়ং যাতি:জনতা।

বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমি শতজনিং যাতি স বিভুঃ।

শরণ্যো লোকেশো মম ভরত কৃষ্ণোঽক্ষি বিষয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্'

অনেকে মনে করিতে পারেন যে কৃষ্ণ তাঁহার কুলদেবতা। সেইজন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তব করিয়াছেন। তিনি মাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্তব রচনা করেন নাই, বহুদেব দেবী স্তব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্য একটি স্তব উদ্ধৃত করা হইতেছে—

অলকানন্দে পরমানন্দে

কুরু ময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে।

তবতট নিকটে যস্য নিবাসঃ

খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস॥ গঙ্গাস্তোত্রম।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভক্তি সম্বন্ধে বহুপ্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততা রক্ষার জন্য অধিক উদ্ধৃতি হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলাম।

শিব জ্ঞানের মূর্তি কিন্তু তিনি ভক্তির ও মূর্ত্ত স্বরূপ। শিব অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত কেহ নাই এবং শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা শিবের ভক্ত কে আছে? শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য যে ভক্তিবাদী হইবেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রজগোপালের বাসায় পৌঁছিয়া চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের স্ত্রীকে মা বলিয়া এবং তাহার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর-দা সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিলেন তিনি। ব্রজগোপাল যে ছাত্র-জীবনে কতপ্রকার দুষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circumnavigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাক্‌সেণ্ট-সম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, তাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরু, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের স্ত্রী শিপ্রা।

চন্দ্রসুন্দর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল খাব মা। আমিও স্কুল-মাস্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান টান করুন। ছানার ডালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপনাকে"

"ছানার ডালনা হচ্ছে না কি! বাঃ"

চন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু সুখাদ্যের দিকে বেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে—"

"কি তেল মাখেন"

"গায়ে সরষের তেলই মাখি। মাথায় মাখি একটা কবরেজি তেল, সেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোণের দিকে আছে"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজি তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহার পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্ষপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাখিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রসুন্দর বামহাতের তালুতে খানিকটা কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সেটি মাথায় ঘসিতে লাগিলেন। ঘসিতে ঘসিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি আধ-বোজা হইয়া আসিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আসিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে' তেল মাখুন। আমি রান্নাঘরে যাই; ঘি-টা চড়িয়ে এসেছি—"

"যাও"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পায়ে তেল মালিশ করিতে লাগিল। মটরু একধারে দাঁড়াইয়া নূতন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে' এস দাদু। লিখতে শিখে গেছ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিখিয়াছে।

"আচ্ছা। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটরু ঘাড়টি কাৎ করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জ্জনীটি পুরিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বাস, ওই পর্য্যন্ত? ঈ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ছিঃ মুখে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওর তিনটে আগে লিখে দেখাও দিকি আমাকে"

মটরু একছুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরে শ্লেটে আঁকা-বাঁকা করিয়া অ-আ-ই লিখিয়া আনিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি। হ্রস্ব-ইটার ল্যাজটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে' দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি ভাল করে' লিখতে পার, তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা"

"কি ?"

"চুরণ"

"চুরণ কি ? লবেনচুস ?"

"না। তার চেয়েও ভালো"

চন্দ্রসুন্দরের কাছে সুলোমনি লবণ, লেবুর রস এবং অন্যান্য জারক মশলা-যুক্ত একপ্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কৌটা ভরতি সর্ব্বদা থাকে। বিহারীরা ইহাকে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিহারী কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন। ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমৎকার। চন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার শক্তিও ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রসুন্দর তাই প্রায়ই ইহাকে টোপ-স্বরূপ ব্যবহার করেন।...ছোঁড়া চাকরটি পা দুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মালিশ করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রসুন্দর বাধা দিলেন।

"পিটে দুটো ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। বৌমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়"

"আছে"

"আর গোল-মরিচ ?"

"তা-ও আছে"

"তাহলে খাওয়ার পর আমার একটা ওষুধ করে' দিও মা। চন্দন পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-আমার পিঠের ফোড়া দুটোতে লাগিয়ে দেব। গে গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে' দেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "A Stitch in ti Saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো-

"কিছু আছে—"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। খবরটা বলিল না। সে বি. এ. পাশ।

আহারাদির পর পিঠের ব্রণ দুইটিতে গোলমরি মলম লাগাইয়া চন্দ্রসুন্দর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলে ঘুমাইবার পূর্ব্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিখিবার কৌশ শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"ম কোথা"

"পাড়ায় খেলতে গেছে"

"খুব ব্রাইট্ বয়—"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটি বা করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্রজ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হ যায়।

"এত দেরি হয় কেন"

"স্কুলের কাছেই বোসবাবুর ছেলেকে প্রাই পড়ান। আপনাকে চা করে' দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব"

চন্দ্রসুন্দর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয় ছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস. ডি. সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার ছোট ছেলে একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারে না ? ছেলেটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগ ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কাছে-পিটে কোন ডাক্তার পর্য্য নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং দুএকজন পুলিশ কনেষ্টবলে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবে বাংলোর [illegible]

বারান্দা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে সুদৃশ্য একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী না কি? চন্দ্রসুন্দর চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রসুন্দর আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চন্দ্রসুন্দরের দিকে আগাইয়া আসিল।

"কাকাবাবু, আসুন—"

চন্দ্রসুন্দর যাহাকে এস. ডি. ওর স্ত্রী ভাবিয়াছিলেন সে সন্ধ্যা। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং রুমেই আছেন?"

চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাসাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—?"

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব"

"তুমি এখানে একা কেন"

সন্ধ্যার মুখমণ্ডলে একটা লজ্জার আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"আমি প্রুফ দেখছি"

"কিসের প্রুফ"

"দৃশদ্বতী বলে' আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তারই প্রুফ—"

"তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না"

"বসুন"

চন্দ্রসুন্দরকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিল সে, তাহার হাতে দুইখানি দৃশদ্বতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর যদিও খুশী হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশদ্বতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—"তথা-কথিত সতীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি।" তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাশ তিনি এফ. এ. ফেল।

"পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস?"

"না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্ লোক খুব ভালো"

"তোদের খাতির করে খুব। না?"

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধুত্ব"

"গণেশটা বাঁকড়ো জেলার এক অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে' আছে। রহমন সাহেবকে বলে' ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস—"

"বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে—"

"ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। উপর্য্যুপরি অসুখ, দু'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না"—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার"।

"টাইপ করতে পারে—"

"না। শেখবার সুযোগই পায় নি"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বলিস একটু, বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে খুব ভাব"

"তা যা ভাল বুঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হ'লে দেখবেন খুব ভালো লোক—"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে' বসে' আছে আমার জন্তে। আমি যাই এবার—"

"শিপ্রা কে"

"আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি"

চন্দ্রসুন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

"স্টেশনে দেখা হবে আবার। এখন চলি—"

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রসুন্দর নানা কথা ভাবিতে

ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর ষ্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফল-ওয়ালা কমলালেবু, বেদনা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্য এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাঁহার পিঠটা দেখিতে পাইতেছিলেন, মুখটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইতেই চিনিতে পারিলেন।

"আরে, হাবুল মামা যে—"

হাবুল মামা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "চন্দর! সকালের ট্রেণে এসেছ বুঝি"

"হ্যাঁ। দাঁতটা খুললে কেন—"

"নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা কইতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বুঝি—"

"তুমি কোন ট্রেনে এলে"

"এখনি এলাম একটা মালগাড়িতে"

"মালগাড়িতে?"

"হ্যাঁ, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেন-বাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে—"

"দাদার অসুখের খবর তুমি পেলে কি করে।' কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল?"

"না। ওরা তো আমার ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পেলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড়ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে' এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো—"

"টেলিগ্রামে অসুখের খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানি না"

হাবুলমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি দুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাধালে কবে"

"মাসখানেক হল। মাড়ির ঘা এখনও শুকোয় নি"

"কৌটায় পুরছ কেন"

"অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—গল্প করতে হবে তো। বললুম তো, দাঁত পরলে কথা বলতে পারি না মনে হয় এখুনি পড়ে' যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক—"

"অনর্থক কেন। ভালো করে' চিবিয়ে খেতে পারবে ভালো হজম হবে"

"আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজমও খুব হয়। আমার মাড়ির জোর খুব আছে। তোমার আঙুলটা আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে' কেটে নেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিলেন।

"এখনও মাংস টাংস চালাচ্ছ না কি"

"খুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। পুজোতেও আজকাল লাউ কুমড়ো বলি দিচ্ছে"

"লেবু কিনলে না কি"

"হ্যাঁ, অসুখের বাড়িতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম"

"দুজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছি, তাহলে আমার আর আলাদা করে' নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয় তো—"

হাবুলমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশব্দে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

"দাদার মেয়ে জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ওর ওখানে আছে"

"হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। এক ক্লাসের ইয়ার নিশ্চয়।"

হাবুলমামা মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইলেন।

"তুমি আজকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা"

"না। হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন তোমার? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা বললে তুমি এই কোটটা পরে' থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বুঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরিটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—"

"কোথা যাবে তুমি"

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি"

"চল তাহলে"

উভয়ে কুলিপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন।

৫

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্য্যসুন্দরের অসুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ বিশ ক্রোশ দূরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেহ খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ গোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনরা এখনও সকলে আসিয়া পৌছায় নাই। সূর্য্যসুন্দরের মেজ এবং সেজ ছেলেই আসে নাই এখনও। মেজছেলে পৃথ্বীশ আসিবেন কিনা তাহা অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কণ্ট্রাক্টরি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সব সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাসখানেক পূর্ব্বে নাগপুর হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পৌছিবেন, হয়তো একটু দেখি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি বিরাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তখন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্য্যসুন্দর তাঁহার সম্বন্ধে বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার বুঝিতে পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমারের নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকানাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। সেজদা সপরিবারে আসিবেন। গগনের শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও আসিবেন খবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয় স্বজন আসিবে। কিন্তু বাড়িতে আর স্থান কই? ইহার উপর আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সূর্য্যসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বৌয়ের সাধ দিতে হইবে। সুতরাং আরও জনসমাগম অনিবার্য্য। কুমার অগ্রসর হইয়া দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জনমজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড়-গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাততঃ আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাবে। বাঁশ খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল! কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ খড় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্ব্বে পুরসুন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরসুন্দরী পোলাও-মাংসের আয়োজন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল—"

"এখানে যা কিসমিস রয়েছে তাতে চলবে না। জাফরান আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। যুগলের দোকান কি একটা দোকান। ভালো লবেঞ্চুস পর্য্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উষার ছেলেদের জন্য আনব কিছু—"

"কি হবে তাহলে—"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেণে চলে যাই। সাধের জন্যে কি কি লাগবে সে ফর্দ্দটাও পেলে এক সঙ্গে সব কিনে আনতাম"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন—"

"বাঃ, বৌমার সাধ দেবেন না, বলিস কি তুই। হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বৌদি একা কতদিক সামলাবেন। উর্ম্মিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন বসে' আছে, আর থাকতেই হবে। হাঁা আর একটা সুখবর আছে—"

"কি—"

"নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেণে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন, তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না"

"আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো"

"নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তো যেতে দেখলাম। একটু খোসামোদ করতে গেছেন আর কি—"

"যাঃ। উনি শুধু শুধু নিখিলবাবুর খোসামোদ করবেন কেন"

"কেন আর, স্বভাব—"

মুচকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কুমারও তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সূর্য্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকা-বাবু গীতা পাঠ করিতেছেন। চন্দ্রসুন্দরের ধারণা হইয়াছে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ইহাই একমাত্র পাথেয়। সূর্য্যসুন্দর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চন্দ্রসুন্দরের আত্মতৃপ্তির জন্যই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ত্ত করিয়াছেন, একবারে যেন পাঁচটি শ্লোকের বেশী পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশী পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তাছাড়া সকলের হয়তো ভালও লাগিবে না। উর্ম্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বসিয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল সে। মেজেতে কম্বলের উপর চন্দ্র-সুন্দরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল কিরণ। একটু দূরে উষা পান সাজিতেছিল। সন্ধ্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল সেদিনকার খবরের কাগজটা। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দিগন্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প চেয়ার, তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে-ছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন। গ্রামের নাপিত লোচন (তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গল-গণ্ডের উপর একটি তুলসীর মালা) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল জামাইবাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দ্দেশ। বিরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়ে-জামাইরা কেহই আসিয়া পৌঁছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেণের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিতে পারে এই সব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। উষার ছেলে তিনটি, এক-দুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পার্ব্বতী পুরসুন্দরার সহকারিণীরূপে রান্নামহলের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তম্বী করিতেছে। তাহার ধমকে সন্ত্রস্ত হইয়া একটি চাকর ঊর্দ্ধশ্বাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড় কাচিতেছে এবং আর একটি ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছে। উর্ম্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্ব্বতী যে এই বোকা-অথচ-পাজি চাকরগুলাকে দুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশীও হইয়াছে। হাবুলমামা বাহির-বাড়িতে নূতন কম্পাউণ্ডারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউণ্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবুলমামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই। গঙ্গা একনজরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রসুন্দর আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে পড়িতেছিলেন—

যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংযত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা, সর্ব্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তিনি কুর্ব্বন্ অপি মানে কাজ করেও, না লিপ্যতে, কাজে লিপ্ত হন না।

চন্দ্রসুন্দর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,

"বউমা, বুঝতে পারছ তো? আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি—"

চম্পা সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল ছিল।

দিগন্ত নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন গেলবার। ফার্স্টক্লাস পেয়েছেন—"

"ও তাই না কি। তাতো জানতুম না—"

চন্দ্রসুন্দর চুপ করিয়া গেলেন।

পুনরায় তিনি গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্য্যসুন্দর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি"

চন্দ্রসুন্দর ইহাতে একটু মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা সেরে নিই গে। ওবেলা আবার হবে"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন ও নয়া বীমা পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম. এ

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বর্তমানে প্রায় আটত্রিশ কোটি লোক ভারতে বসবাস করছেন। প্রশ্ন হল, এঁদের মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যা কত। অবশ্য সঠিকভাবে এই সংখ্যা নির্ণয় করা—সম্ভবপর নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে, ভারতে বীমাকারীর মোট সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। ভারতের লোক সংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যাটি মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

যাঁরা ভারতীয় বীমাব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, ভারতে জীবনবীমার প্রসারের জন্য বেশ কিছুটা কৃতিত্ব বেসরকারী পরিচালকরা দাবী করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ যাঁরা সহরে বসবাস করেন কিম্বা যাঁদের আমরা মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি কিম্বা যাঁরা শিক্ষার আলোক পেয়েছেন তারাই বেসরকারী পরিচালনার আমলে বীমার সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন। যাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কিম্বা সাধারণ ভাষায় যাঁদের গরীব বলা হয়—যেমন চাষী, শ্রমিক, গ্রামের অন্যান্য কারিকর ইত্যাদি তাঁরা এই ধরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। তাছাড়া তখন জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এঁদের কোন জ্ঞান কিম্বা ধারণা ছিল না। এর প্রধান কারণ হল, এঁরা যা'তে বুঝতে পারেন সেভাবে জীবনবীমার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালান হয়নি। অথচ যে ঋণ এরা পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জ্জন করে যাচ্ছেন সে ঋণের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য এঁদের পক্ষে জীবনবীমা খুব প্রয়োজনীয়।

বেসরকারী পরিচালনার আমলে একদিকে যেরকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বয়স ও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক খবর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল সেরকম অন্যদিকে নির্দ্দিষ্ট সময় মত নিজের খরচে বীমার চাঁদা কোম্পানীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে অনমনীয় বাধ্যবাধকতা দেখা গেছে। এই সব ব্যাপারে যদি কোন ত্রুটি দেখা দিত তাহলে জীবনবীমা সম্পর্কীয় সুবিধা লাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়ত এবং নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির উদ্ভব হত। নির্দ্দিষ্ট সময়মত প্রিমিয়ম জমা না দেবার দরুণ যদি কখনও বীমাপত্র বাতিল হয়ে যেত তাহলে প্রত্যেক নিয়ম পালন করে সে বীমাপত্র আবার চালু করা গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বীমাকারীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্প্রতি যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সে পরিকল্পনা যদি যথাযথভাবে কার্য্যকরী করা হয় তাহলে একদিকে যেরকম গরীব চাষী ও শ্রমিক, সেরকম অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত চাকুরীজীবীরা উপকৃত হবেন, কারণ তাঁরা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের শেষে একটি থোক টাকা পাবেন। এই টাকার সাহায্যে এঁদের পক্ষে যে কোন এককালীন ব্যয় মেটান অনেকটা সম্ভবপর হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বীমাকারী যদি বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই মারা যান তাহলে তাঁর বীমার টাকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁর পোষ্যগণ এক সঙ্গে বীমার টাকা পাবেন। যেহেতু পোষ্যগণ বীমাকারীর টাকার সাহায্যে সাময়িকভাবে খরচ মেটাতে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে সেহেতু এঁদের পক্ষে ঋণগ্রস্ত হবার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে।

পূর্ব্বাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত জীবনবীমার উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যারাকপুরে স্যার বীরেন মিত্রের সভাপতিত্বে সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন, "The Life Insurance Corporation Janata policy will benefit industrial workers. Their small savings under the policy will also contribute towards the success of the second Five Year Plan." পরিকল্পনাটি আলোচনা করলে দেখা যাবে, স্বাস্থ্যপরীক্ষা সম্পর্কীয় আইনকানুনের কঠোরতা হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

কয়েকটা ক্ষেত্রে একেবারে স্বাস্থ্যপরীক্ষা না করেই এক একজনের উপর সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমার ঝুঁকি নেওয়া যাবে! অবশ্য এইপ্রকার ক্ষেত্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঝুঁকি নেবার গুরুত্ব অনেকখানি। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার হাজার ৮টাকা পর্য্যন্ত বীমার ঝুঁকি নেবার আগে সংক্ষেপে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা হল, পরিকল্পনার রচয়িতারা হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমাকারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর তেমন জোর দিতে চাননি। বলা হয়েছে, এমন কোন বীমার আবেদন বিবেচিত হবেনা যেটা আড়াই শত টাকার কম। তা ছাড়া অন্ততঃ বার টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ম হওয়া চাই।

বর্তমানে পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব এই পাঁচটি অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশনের পরিকল্পনাটি প্রবর্তিত হয়েছে। অবশ্য এই সব অঞ্চলের সর্ব্বত্র আপাততঃ পরিকল্পনাটি প্রবর্তন করা হবে না। যে সব স্থানে পরিকল্পনাটি চালু করার আয়োজন চলছে সে সব স্থানকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পল্লী নির্ব্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাচন করা হয়েছে—শ্রমিক মহল্লা। অবশ্য সমস্ত শ্রমিক মহল্লা নির্ব্বাচিত হয় নি। কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সহরের শ্রমিক মহল্লায় প্রস্তাবিত বীমা চালু করার জন্য আয়োজন চলছে। জানা গেছে, আপাততঃ যে সব স্থানে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হয়েছে সে সব স্থানে যদি আশানুরূপ ফলাফল দেখা যায় তাহলে আরো ব্যাপকভাবে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হবে।

পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছে, যাঁরা বীমা করবেন তাঁদের প্রত্যেকের গৃহে গিয়ে এজেন্ট এবং অর্থ সংগ্রহকারীরা নির্দ্দিষ্ট সময়মত প্রিমিয়াম আদায় করবেন। অবশ্য যে কোন এজেন্ট এবং অর্থসংগ্রহকারী প্রিমিয়াম আদায় করতে পারবেন না। কেবলমাত্র সেই সব এজেন্ট এবং অর্থ-সংগ্রহকারী প্রিমিয়াম আদায় করতে পারবেন যাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত। প্রশ্ন হতে পারে, কেন বীমাকারীর গৃহে গিয়ে প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে যাঁদের দিনের পর দিন জর্জ্জরিত হতে হচ্ছে তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি কতটুকু সেটা বিশদভাবে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এঁরা থোক বার্ষিক অথবা ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম জমা দিতে অসমর্থ। তাই বীমা কর্পোরেশন এজেন্ট এবং অর্থসংগ্রহকারীর মারফৎ প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর কিম্বা পঁয়ত্রিশ বছরের কম তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বীমার আবেদন স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করেই বিবেচিত হবে বলে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের অনেক বেশী তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বীমার আবেদন বিবেচনা করার আগে সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এঁদের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

রাষ্ট্রিয় ও বীমাকর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত যে সব এজেন্ট এবং অর্থ সংগ্রহকারী বীমাকারীর কাছ থেকে প্রিমিয়ম আদায় করবেন তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল বীমাকারীর সাথে নিয়মিতভাবে সংযোগ রক্ষা করা এবং বীমা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। এজেন্ট এবং অর্থ-সংগ্রহকারীরা যদি যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্যপালন করেন তাহলে দুটো সুফল আশা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দপ্তরে মণি-অর্ডারযোগে প্রিমিয়ম পাঠাতে যে অতিরিক্ত খরচ পড়ে সে খরচ সাশ্রয় হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুফল হচ্ছে, প্রিমিয়ম বাকী পড়ার আশঙ্কা দূরীভূত হবে। তাছাড়া গোটা পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার জন্য যদি ঐকান্তিক-ভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে জাতীয় মূলধন এবং লগ্নীর পরিমাণও বেশ কিছুটা বর্দ্ধিত হবার আশা আছে।

জীবন ঃ ভালবাসা

শ্রীউমাপদ নাথ

জীবনের ঘুম নেই, জীবনের সিঁড়ি ভাঙা কাজ ;
জীবনই জিয়ায়ে রাখে প্রেমময় মর্মরীয় তাজ।
এ স্বাদে অরুচি নেই, আমি তো জেনেছি তাকে তাই ;
পৃথিবীর প্রেম ছেড়ে পালাবে সে ? ঠাঁই নাই নাই।
চোখে চোখে ঘুম ভাঙে, পিছু পিছু পা পড়ে তাহার ;
নরম ধূলোয় রাখে মালা গাঁথা পায়ের বাহার।
তুমি-আমি ঘুম দিই : সে উঠে নীরবে চলে যায়—
শীতল আকাশে গিয়ে মিশে থাকে তারায় তারায়।
জীবন সহিষ্ণুতম। পিঠ গড়া গণ্ডারীয় ত্বকে।
কামারের কর্মশালে হাতুড়ির নীচে চকচকে
কী অগ্নি ছিটায়, হাসে! মৃত্যু কি সেখানে কাছে যায়
জীবন নিয়ত হাঁটে, প্রেমের নূপুর বাজে পায়।
এখানে বালির চরে জাহাজ ঠেকুক, নেই ভয়।
জীবন খেলার ঘরে পুতুল পুতুল শুধু নয়॥

সুর—মিশ্র অরুণ মল্লার ॥ তাল—দাদ্‌রা

তোমার রঙে রঙিয়েছি আজ আমার হিয়া খানি
আসবে তুমি গোপন পথে এই কথাটি জানি।
অভিসারের মালাটি মোর গেঁথেছিলাম ভোরে,
সন্ধ্যা বেলায় শুকিয়ে এলো ফুল যে গেল ঝরে।
বল প্রিয় আসবে কবে আমার আঙিনাতে,
জীবন আমার স'পে দেবো মিলন মধুর রাতে।

কথা—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রিয়নাথ দাস

II { গা মা রা | রসা ণ্া ধ্ | ণ্া সা া | া া া | সা ধা ধা | পা পমা পা |
তো মা র র০ ঙে ০ র ঙি য়ে ছি আ জ আ মা র ০ হি০ য়া

পা ধা া | ণধা ধপা মা : |
খা নি ০ ০০০০ ০

গা মা মরা | রসা ণ্া ধ্া | সা পা পা | ধপা মা মা | র্সা র্সা র্রসা | র্সণা ণধা পমা
আ স বে০ তু০ মি ০ গো প ন প০ থে ০ এ ই ক০ থা টি০ ০০

পধা া ণধা | ধপা মা মা II
জানি০ ০০ ০০০০

II মা ধা মা | ধণা সর্ঁরা র্রা | নর্সা ধণা পধা | মা া া | মা ণা ণা | ণা ণধপা মা | পা ধা া |
অ ভি সা রে০ ০০ র মা০ লা০ টি০ মো ০ র গেঁ থে ছি লা ০০০ ম ভো রে ০

ধা ণা ধপা | পমা গা গা | গা মা মরা | সা া া | সা পা পা | পা ধপা ধপমা |
স ০ ন্ধ্যা০ বে০ লা য় শু কি য়ে০ এ লো০ ফু ল যে গে ল০ ০০০

গমা া া | া া া II
ঝ রে০ ০ ০ ০ ০

II ধা ধপা পমমা | গা া া | মা ধা ণা | র্সা া া | ধা ণা র্সা | র্রা র্মর্গা র্মর্সা |
ব ল০ প্রি০০ য় ০ ০ আ স বে ক বে ০ আ মা ০ র ০ ০ ০ ০

র্সা র্রর্গর্রা ণা | র্সা া া | ধা ণা পা | মা গা া | গা মা মরা | সা া া |
আ ঙি০০ না তে ০ ০ জী ব ন আ মা র স ঁপে ০০ দে বো ০

সা গা া | মা পা ধপা | গমা মা া | া া া II
মি ল ন ম ধু র০ রা তে০ ০ ০০০

নীলোৎপল

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা যথার্থই জাতীয় উৎসব। বহুবলধারিণী মাতৃমূর্তির সামনে বাঙ্গালী আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানায়, কামনা করে তার বহুবাঞ্ছিত ফললাভের আশায়ঃ রূপং দেহি, জয়ং দেহি, দ্বিষো জহি নমস্তুতে। দেবপূজা উপলক্ষ করে বাসনা-কামনার চরিতার্থতার জন্য জাতীয়ভাবে এমন একনিষ্ঠ আবেদন বাঙালী হিন্দুর আর কোনও ধর্মানুষ্ঠানে দেখা যায় না। তাই বাঙালীর দুর্গাপূজা বহুকাল ধরে পবিত্র জাতীয় অনুষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে গণ-অভ্যুত্থানের নানা ক্ষেত্রে শারদীয় উৎসবের অবদান অসাধারণ। ইতিহাসের নজীর থেকে দেখা যায় গত এক হাজার বছর কাল ধরে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করে আসছে। তারও পূর্বে দুর্গাপূজা শুধুমাত্র সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণদের মধ্যে মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কি না তার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেলেও, দুর্গাপূজা সেকালে যে ব্যাপকভাবে গণ-উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে নি, একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। শরৎকালে ভগবতীর পূজা দেবীর অকালবোধন বলে সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত হ'য়ে এসেছে। দেবীর অকালবোধন করেন শ্রীরামচন্দ্র। রাবণকে বধ করতে পারার আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে বিশ্বের সকল শক্তির আধারভূতা দেবী মহামায়ার কৃপা লাভ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা ক'রে দেবীকে অকালে বোধন করেন। বস্তুত রামায়ণে বর্ণিত সেই অপূর্ব কাহিনীর ধারা অনুসরণ করেই শরৎকালে দেবীকে আবাহন করার মহালগ্ন যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

হয়েছিল দেবীকে তুষ্ট করার জন্য একশত আটটি নীলপদ্ম বা নীলোৎপলে বিশ্বের সৃষ্টি-সংস্থিতি-লয় কর্ত্রী দেবী মহামায়ার আরাধনা করতে হবে। রামভক্ত হনুমান নীলপদ্মের সন্ধানে বেরুলেন, কত দুর্গম পাহাড় পর্বত, গিরিকন্দর পেরিয়ে তিনি সংগ্রহ করে আনলেন একশত আটটি নীলপদ্ম। শ্রীরামচন্দ্র দেবী মহামায়ার পূজা আরম্ভ করলেন। নীলপদ্ম দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার সময় হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একশত আটটির মধ্যে একটি নীলপদ্ম তো নেই, মাত্র একশত সাতটি আছে। আর একটি নীলপদ্ম কি হ'ল? হতাশ হয়ে দশরথ-তনয় তখন সমুদ্রতীরের পূজা প্রাঙ্গণে সব কিছু খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পদ্ম খুঁজে পেলেন না। তখন পূজার লগ্ন সুরু হয়ে গিয়েছে, আর একটি নীলপদ্ম সংগ্রহ করে আনার সময়ও নেই। কি করা যায়? এদিকে রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একশত আটটী নীলপদ্ম দিয়ে মায়ের পূজা করবেন। তখন রামচন্দ্র ভাবলেন, জনসাধারণের বিশ্বাস আমারও নাকি পদ্মের মতো চোখ: আমার আর এক নাম, পদ্মপলাশলোচন :", আমি তো অনায়াসেই আমার একটি চোখ উৎপাটিত করে সেই চোখ দিয়ে একটি পদ্মের অভাব মেটাতে পারি। তখনই রামচন্দ্র ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলেন তাঁর একটি চোখ উৎপাটন করতে। ঠিক এমনি সময়ে দেবী দশভুজা সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বৎস, বিরত হও। আমি তোমার একনিষ্ঠতায় তৃপ্ত হয়েছি।' মহামায়া তাঁর অনন্ত মায়ার বলে একটি নীলপদ্ম হরণ করে নিয়ে রামচন্দ্রকে এতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র পরীক্ষা করছিলেন।

অকালবোধনের যথার্থ তাৎপর্যটুকু একটি নীলপদ্মকে অবলম্বন করে বিদ্যমান। হারিয়ে যাওয়া নীলপদ্মের অভাব পূরণ করতে ভক্ত তাঁর নিজের চোখ উৎপাটিত করে তা দিয়ে দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। যুগ যুগ ধরে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনায় দেবতার প্রতি ভক্তের এমনি একনিষ্ঠ আকুতি, সর্বস্ব সমর্পণের এমনি অকুণ্ঠ প্রয়াস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নীলোৎপল বা নীলপদ্ম তাই শারদীয় পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাংলাদেশে এখনকার পূজার উপচারে নীলপদ্ম বিরল, কারণ এ দেশের জল মাটিতে নীলপদ্ম জন্মায় না। নীলপদ্মের অভাবে সাধারণ পদ্মফুল দিয়েই দেবীর পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু নীলপদ্ম এখনো ভারতের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে, ভারতীয় কাব্যে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিকলায় নীলপদ্মের অসংখ্য উল্লেখ রয়েছে, নীলপদ্মকে উপজীব্য করে কত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য পরিকল্পনাই না করা হয়েছে! এমনিতে পদ্মফুলকে নিয়ে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে যে কত অপূর্ব সুন্দর কাহিনী লেখা হয়েছে তার অন্ত নেই। সংস্কৃত মহাকাব্যে বীর নায়কের চোখকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে তার গৌরব ও মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। পদ্মের মতো আঁখি এই উপমা আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের আঙ্গিনায় অতি পরিচিত আর অতি প্রাচীন।

ঋগ্‌বেদে এবং পরবর্তী যুগের সকল বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান প্রভৃতিতে দুই প্রকার পদ্মের উল্লেখ রয়েছে। একপ্রকার পদ্মের নাম হ'ল পুণ্ডরীক; ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে মনুষ্য-হৃদয়কে ও পদ্মের সহিত (হৃদয়-কমল) তুলনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদে নারায়ণের বর্ণনায় দেখা যায়—ক্ষীর সমুদ্রে তিনি যোগনিদ্রায় (শাশ্বত ধ্যানে) শয়ন করে আছেন, তাঁর কণ্ঠে পদ্ম মৃণাল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত আর এক ধরণের পদ্ম হল "পুষ্কর" অর্থাৎ নীলপদ্ম। নীলপদ্মের কথা ঋগ্বেদে নানা প্রসঙ্গে এবং পরবর্তীকালের বেদপুরাণাদিতে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। সেই উল্লেখ থেকেই বোধ হয় 'নীলোৎপল' নামটি প্রচলিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে 'নীলোৎপল হ্রদে জন্মে এবং যে হ্রদে 'নীলোৎপল' জন্মে না, তাকে হ্রদ বলে বিবেচনা করা হয় না। সেইজন্য বোধহয় হ্রদকে বলা হয় পুষ্কর (পদ্ম) যুক্ত।

'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় প্রজাপতি সংসার সৃষ্টির কামনায় জলের ধারে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি পদ্মপত্র তরঙ্গময় জলে সোজা হয়ে ভেসে রয়েছে। পদ্মপত্রটি নিশ্চয়ই কোন রকম অবলম্বনের উপর রয়েছে মনে করে তিনি বরাহবেশে জলে প্রবেশ করলেন এবং নীচে মাটি দেখতে পেয়ে তার এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলেন। তারপর তিনি এ' মাটির টুকরো পদ্মপত্রের উপর মেলে ধরলেন। এইভাবেই নাকি পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' এক বিচিত্র বর্ণনায় রয়েছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শুধু জল। সেই জলের আবর্জনা থেকে একটি মাত্র পদ্মপত্র জন্মে জলের উপরে দেখা দেয়। আর তা থেকেই প্রজাপতি সৃষ্ট হন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করতে অগ্রসর হন। মহাভারতে দেখা যায়—যখন বিষ্ণু নারায়ণরূপে যোগনিদ্রায় ক্ষীর-সমুদ্রে শায়িত ছিলেন, সেই সময় তাঁর নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সৃষ্ট হন। সেইজন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় অব্‌জ বা অব্‌জযোনি এবং বিষ্ণুকে বলা হয় পদ্মনাভ।

মহাভারতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, বিষ্ণুর কপাল থেকে একটি পদ্ম জন্মে এবং তা থেকে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী সৃষ্ট হল। সেইজন্য লক্ষ্মীকে বলা হয় পদ্মা বা কমলা। মহাভারত পাঠ করে আরও জানা যায় যে, মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী নলিনী হ্রদ আর মন্দাকিনী নদী সুবর্ণ পদ্মে পরিপূর্ণ। পদ্মের অন্য এক নাম নলিনী। মানস সরোবরের সম্পর্কে পদ্মের আরও অন্য নাম হল সরোজ ও সরোজিনী।

হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, অগ্নি, গণেশ, রাম ও সূর্য প্রভৃতি সকল দেবতার হাতেই রয়েছে পদ্ম ফুল। এই সব দেবতাদের আবার পদ্মাসনে আসীন অবস্থায়ও বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে যেমন পদ্ম ফুলের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে, ঠিক বৌদ্ধ ও জৈনদের সাহিত্যেও পদ্মফুলের কথা পরম ভক্তি ভরে বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধ চরিত ও সদ্ধর্মপুণ্ডরিক নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় রয়েছে যে লক্ষ্মী পদ্মাসনে বসে রয়েছেন, আর তার প্রত্যেক হাতে রয়েছে একটি করে পদ্মফুল। আর দুইটি হাতী

শুড় দিয়ে কলস ধরে তা থেকে ঐ হস্ত ধৃত পদ্মে জল ঢালছে। উদয়গিরি, ভারত, সাঁচী ও পোলান্নারুকার ভাস্কর্য শিল্পে এই দৃশ্য অঙ্কিত করা যায়। বুদ্ধদেবের বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি পদ্মের উপর বসে আছেন অথবা পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এইরূপ চিত্র রাজগির, কানেরি, কালি, গান্ধার, নেপাল, ব্রহ্ম চীন ও তিব্বতে দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব পদ্মাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন এমন অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি তো ভারতবর্ষের সর্বত্র রয়েছে।

জৈন তীর্থঙ্করগণও পদ্মাসনে বসে আছেন এবং তাঁদেরও হাতে পদ্ম রয়েছে, এমন অনেক প্রাচীন চিত্র রয়েছে।

ভারতীয় ভাবাদর্শে পদ্মফুল অতিশয় পবিত্র ও শুভ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশুদ্ধতা ও অমরতার প্রতীক—এই ফুলের সংস্পর্শেও কোন পাপ বা মালিন্য আসতে পারে না। পদ্ম ময়লা জলকাদায় জন্মে, কিন্তু তবু এই ফুল কত সুন্দর, কত নির্মল, ভারতীয় আদর্শে মানুষকেও পদ্মের মত হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যেন সংসারে থেকে সংসারের কাজ করে যায়, কিন্তু সংসারের প্রতি মনুষ্য-হৃদয় কখনো আসক্ত না হয়। তার দেহ যেন সংসারের মালিন্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে।

পদ্মফুলের সঙ্গে একটি অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যানুভূতি যেন বিদ্যমান্ রয়েছে; ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিকুল অনেক সময় তাঁদের নায়িকাকে পদ্মমুখী, কমলাক্ষী ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছেন।

শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরেও বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের প্রসঙ্গে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করার জন্য একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরুদেবের পদ, পিতৃদেবের পদ, মাতৃদেবীর পদ প্রভৃতির প্রসঙ্গে পাদ পদ্ম বলে উল্লেখ করা হয়। পদ্মফুলই মনুষ্য-জীবনের উৎস বলে গর্ভকে বলা হয় গর্ভপদ্ম। যোগ সাধনায় শ্বাস, প্রাণায়াম প্রভৃতির নানাবিধ আসন ও করাঙ্গুলির মুদ্রা সৃষ্টিতে পদ্মের মতো আকার পরিকল্পিত হয়। পদ্মের ন্যায় বা প্রণবের ন্যায় আকার ধ্যানযোগীদের নিকট সুপরিচিত।

শারদীয়া পূজার বিচিত্র উপচার এবং বর্ণসম্ভারের মধ্যে পদ্মফুল যেন একটি অনিন্দ্যসুন্দর উপকরণ। শরতের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোয় পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ভক্ত সাধকের হৃদয়ও যেন উন্মোচিত হ'য়ে ওঠে। ঋক্-বেদের বর্ণনায় মানুষের হৃদয়কে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে হৃদয়-কমল বলা হয়েছে, আর তারই সূত্র ধরে পদ্মকে শতদল বা সহস্রদল বলেও বেদের ঋসি-কবি তাঁর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন। বাংলার জাতীয় উৎসবের ও একটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল পদ্মফুল।

স্মৃতির পাহারা

প্রতীপ দাশগুপ্ত

আমার নির্জ্জন মনের ভাবনাগুলো
ডানা মেলে শুধু ওড়ে
ধীরে ধীরে নিঃসীম স্মরণের
চেনা-অচেনার তীরে,
তবুও মন পায় না সেই হারিয়ে-যাওয়া
দিনগুলি আর ফিরে,
তাই তো মনে সকরুণ-অকরুণ
নানা সুরে ওঠে ভ'রে।
সে-সব স্মৃতি সূর্য্যমুখী ফুলের মত
তাকিয়ে থাকে আমার পানে,
তারা, আমার প্রাণে পুলক এনে
ভরে দেয় গানে গানে।
কিন্তু ভাল-না-লাগা বিদেহী স্মৃতি
ভাঙে আমার শুভ মনোরথ,
তাই মানসের গোপন পায়ে দ'লে দ'লে
রুদ্ধ করি তাদের পথ—
তবু তারা নিঃসাড়ে এসে বিতাংসিক সুরে
মায়াময় চোখে ডাকে,
এরই ভেতর মনে আসে ভীরু লজ্জার মত
ভাল-লাগা স্মৃতি কোন ফাঁকে।
মনের শিয়রে আলো-আঁধারীর এই দ্বন্দ্ব নিয়ে
মোদের জীবন-যাত্রা,
এদের ভারে বেসামাল হ'য়ে কখনো কখনো
হারাই মনের মাত্রা;
এদের আবার ফেনিয়ে রাঙিয়ে রচি কত
ছন্দ ও সুর, গল্প আর কাব্য—
পারি নাকো ছাড়তে এদের, তাই
এদের কথা ভাবি এবং ভাববো।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কান্না

ফটো : রতন দাশগুপ্ত

তিন সিঁড়ি

অর্ণব সেন

সম্পর্কটা খুব কাছের নয়। অনেক ডালপালা লতাপাতা বেয়ে হয়ত কোন একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা ঠাট্টা মনে হতে পারে। কিন্তু সম্পর্কটাই সব সময়ে বড়ো নয়। তাই এ বাড়িতে সাত বছরের যাতায়াতে সুনীল আজ অনেক কাছে এসে পড়েছে। অন্ততঃ পরিমলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী নালিমা দেবী সুনীলকে এই ক'বছরে অনেক কাছে টেনে নিতে পেরেছেন। পরিমল-বাবু ছাড়া বাড়িতে আর পুরুষমানুষও ছিল না। তাই হয়ত কিছু বাড়তি দায়িত্বও সুনীলের ওপর এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনা, বাজার করে দেওয়া, অসুখের সময় ডাক্তারের কাছে ছোটা, ইত্যাদি অনেক কিছুই সুনীলকে করতে হয়েছে এই দূর সম্পর্কের মাসিমা মেসোমশায়ের জন্যে। আর অন্য কে করবে? তিন মেয়ে আছে বটে। কিন্তু তাদের দিয়ে তো আর বাইরের কাজ হয় না। আরতি, প্রীতি, বীথি।

সাত বছর আগে ওঁরা যখন প্রথম এলেন তখন আরতি সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর প্রীতি বীথি তখন অনেক ছোট। সুনীল তখন চাকরিতে ঢুকেছে বছরখানেক হলো।

সেই সময় থেকেই সুনীলের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিজের বাড়ীতে ওর থাকার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। তাই সময়ে অসময়ে এদের বাড়ীতেই ও থেকেছে। তখন থেকেই এ বাড়ীর সব কিছুই ওকে টেনে ধরে রেখেছে। মাসিমা মেসোমশায়ের স্নেহও আরো বেশী টেনেছে। প্রীতি বীথি তো সুনীলদাকে ছাড়া থাকতেই পারতো না। ওদের পড়া দেখিয়ে দিতে হলে সুনীলকে চাই। স্কুলের ম্যাপ এঁকে দিতে হলে সুনীলকে চাই। আবার বেড়াতে বের হলেও সেই সুনীল। সুনীল ওদের দু-বোনকে যতো সহজে কাছে পেয়েছিল বড়ো বোন আরতিকে কিন্তু এতো সহজে পায়নি। প্রথম প্রথম কিছুদিন আরতি ওকে এড়িয়েই চলতো। ওকে অবশ্য সুনীলদা বলেই ডাকতো। ওর সঙ্গে গল্পও করতো। কিন্তু প্রীতি বা বীথির মতো আপন করে নিতে পারেনি আরতি। কেমন যেন একটা সংকোচ আরতিকে দূরে সরিয়ে রাখতো। তবে সে সংকোচটুকুও কিছুদিন পরে কেটে গিয়েছিল।

একদিন পরিমলবাবু বললেন, 'দেখো সুনীল, আরতির পরীক্ষা এসে গেছে। তুমি মাঝে মাঝে যদি ওকে একটু সাহায্য করো পড়া-শুনায়, তাহলে মেয়েটার একটু সুবিধে হয়। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে দরকার নেই।'

সুনীল বলল, 'অসুবিধে আর কি! আমি তো সন্ধ্যের দিকে বসেই থাকি। ওকে একটু দেখিয়ে দিতে আর কি অসুবিধে আছে বলুন।'

তারপর থেকে সুনীল আরতির পড়ার ভার নিল। আরতি ইণ্টারমিডিয়েট পাস করল ভালভাবেই। তারপর বি-এতে ভর্তি হলো। এদিকে প্রীতিও সে বছর প্রথম কলেজে ভর্তি হলো। এর পর থেকে আরতি যেন কতকটা ইচ্ছে করেই সুনীলের সাহায্য উপেক্ষা করে চলতো। অন্তত নিজের পড়ানোতে সুনীলের সাহায্যও আর চাইতো না। বাড়ীর উত্তরদিকের ছোট্ট ঘরখানায় একলা পড়া-শুনা করে সময় কাটাতেই ওর ভাল লাগতো। বেশি হৈ-চৈ আরতির কোনদিনই ভাল লাগতো না। প্রীতি বা বীথির মতো হৈ-চৈ করতে ও কোনদিনই পারতো না। কিন্তু থার্ড ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পর থেকে ওর নির্জনতা-প্রীতি যেন আরো একটু বাড়লো।

সুনীল একদিন ওদের তিন বোনকে নিয়ে একটা ইংরেজী সিনেমা দেখতে যাবে ভেবেছিল। প্রীতি আর

বীথি অনেকদিন থেকেই ওকে ধরেছিল। তাই শনিবার দিন ও চারখানা টিকিট এনেছিল। হঠাৎ আরতি বলল, 'সুনীলদা, আমার ভাল লাগে না ইংরেজী সিনেমা, আমি যাবো না। প্রীতি বীথি যাক্।'

সুনীল বলল, 'সে কি আরতি। আমি টিকিট কেটে আনলাম, আর তুমি যাবে না।'

বীথি বলল, 'চলুন, চলুন সুনীলদা। দিদি যাবে না তো ভারি বয়ে গেল। আমরা দুজন তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

প্রীতি বলল, 'যাবে না কেন, যেতেই হবে। খালি বই খুলে বসে থাকা ঘরের মধ্যে। দিনরাত কি এত ভাবিস্ রে দিদি ?'

আরতি বলল, 'তুমি চুপ্ করো। অসভ্য মেয়ে। আমার ভাল লাগে না, আমি যাবো না।'

আরতি চলে গেল ওর ঘরের দিকে। একটু পরেই সুনীল ওর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলো আরতি জানলার পাশে বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

সুনীল ডাকল, 'আরতি, তুমি যদি সিনেমা না যাও তাহলে আমরাও কেউ যাবো না।'

আরতি সুনীলের দিকে মুখ ফিরিয়েই হেসে ফেলল। 'আপনি ভীষণ চালাক সুনীলদা। আচ্ছা, আমি যাবো।'

সুনীল বলল, 'তুমিও কম চালাক নও। নিজের দর নিজেই বাড়িয়ে নিতে জানো দেখছি।'

সুনীল মাঝে কয়েকদিন ওদের বাড়ী যেতে পারেনি। সেদিন বিকেলে আরতিদের বাড়ী ঢুকতেই বীথি ছুটে এল।

'এই যে আসুন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? কতদিন আমাদের বাড়ি আসেন নি বলুন তো! দিদি, মেজদি তো আপনার জন্যে ভেবেই অস্থির।'

সুনীল বলল, 'তাই নাকি !'

বীথি বলল, 'শুনুন সুনীলদা, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি। কাউকে বলবেন না কিন্তু! দিদির বিয়ে হবে শিগ্‌গিরি—দু'এক মাসের মধ্যে। একজনরা এসে পছন্দ করে গেছে ওকে!'

সুনীল বলল, 'নতুন খবর তো। তোমার দিদি কি করছে এখন ?'

ভাবছে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে। আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না বেশি।'

আরতির বিয়ের সময় সুনীলের ওপরই প্রায় সমস্ত কিছুর ভার পড়েছিল। বিয়ের জিনিষপত্র কেনা, লোক-জন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, ছাতে সামিয়ানা খাটানো, মেয়েদের পছন্দ মতো শাড়ি-ব্লাউস্ কিনে আনা, সমস্ত কিছুই সুনীলকে করতে হয়েছিল। অবশ্য সে জন্যে পরিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দিক থেকে সুনীলের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

পরিমলবাবু বিয়ের দিন রাতেই ওঁর পরিচিতদের বলেছিলেন, 'সুনীল, আরতির বিয়েতে যা করল, নিজের বোনের বিয়েতে লোকে তা করে না। সুনীল না থাকলে আমি এখানে কি যে করতাম।'

সুনীল সেই সময়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল লুচির ঝুড়ি হাতে নিয়ে। ও বলল, 'কি মেসোমশায়, আমি যে আপনাদের কাছের আত্মীয় নই তাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন বুঝি।'

পরিমলবাবু বললেন, 'না, না, সুনীল, তুমি আমাদের সবচেয়ে কাছের লোক। শুধু কি সম্পর্ক দিয়েই আত্মীয়তা হয়।'

সকালবেলা সুনীল আরতির ছোট্ট ঘরখানায় বসে বসে হিসেব লিখছিল। কাল সারারাত খাটুনি গেছে ভীষণ। সেই রাত সাড়ে তিনটার পর ঘুমোবার একটু সময় পেয়েছিল। কিন্তু আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে ছটার মধ্যে। এখনো দায়িত্ব শেষ হয়নি। সকালের ট্রেণে বর-কনে যাবে। তাদের যাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিতে হয়েছে সুনীলকে। এখন ওদিককার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। এইবার বোধহয় ওদের যাওয়ার সময় হয়েছে। মোটর তো অনেকক্ষণ থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রীতি বীথি ও আরো অনেক পরিচিত অপরিচিত মেয়েদের ছুটোছুটি করতে দেখছে ও সামনের বারান্দা দিয়ে। না, এখন আর ওদিকে ও যাবে না। যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। আরতি যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে আসবে না ? নিশ্চয় আসবে।

সত্যিই আরতি এল প্রীতির সঙ্গে একটু পরে। ফিকে চাঁপা রঙের শাড়ি পরেছে ও। চেহারা একটু শুকনো

সিঁথির সিঁদুরের রক্তিমা ওর স্বচ্ছ শাড়ির ঘোমটার নিচে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ও দাঁড়িয়েছিল দরজার চৌকাঠের কাছে।

সুনীল বলল, 'এসো আরতি, তোমার নিজের ঘরে ঢুকতেও লজ্জা পাচ্ছো, আশ্চর্য! একেবারে বধূ হয়ে পড়েছো দেখছি।'

আরতি ঘরে ঢুকলো লজ্জাকুণ্ঠিত পায়ে। ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

'আমি এবার যাই সুনীলদা?' আরতি চলে যেতে চাইল।

'সেকি প্রণাম করলে না যে! প্রণাম না করলে আশীর্বাদ করবো না আমি।'

আরতি নিচু হয়ে সুনীলকে প্রণাম করল। ওর চোখে-মুখে একটু বিরক্তির ছায়া নামলো।

সুনীল আরতির হাত ধরল।

'দেখো আরতি আমাদের একেবারে ভুলে যেও না। আমি কিন্তু একবার তোমাদের ওখানে বেড়াতে যাবো। তোমাদের বাড়িতে থাকতে দেবে তো দু'একদিন?'

আরতি ঘোমটার ফাঁকে হাসল।

আরতি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। প্রীতি-বীথি দুই বোন কিছুদিন একটু মনমরা হয়েছিল। তারপর আবার সব কিছু সহজ হয়ে এল। আরতি চলে যাওয়ার পর সুনীল ওদের বাড়ি যাওয়া কমিয়েছিল। কিন্তু একদিন প্রীতি অভিমান করে বলল, 'কি সুনীলদা, দিদি চলে গেছে বলে কি আমাদেরও ভুলে গেলেন?'

সুনীল বলল, 'দূর বোকা মেয়ে। দিদি গেছে তো গেছে, তোমরা রয়েছো তো। আসল কথা কি জানো, আজকাল সময় পাই না।'

প্রীতি বলল, 'আমার কলেজের পড়াটা একটু দেখিয়ে দিলে বুঝি ক্ষতি হয় আপনার। দিদিকে তো নোট লিখে দিতেন নিজের ইচ্ছেতে, আর আমি মুখ ফুটে বলছি তাও আপনি দিচ্ছেন না। একে কি বলব?'

সুনীল বলল, 'বেশ কথা দিচ্ছি, কাল থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমাকে পড়াবো।'

প্রীতি সেবার বি-এ পাশ করার পর পরিমলবাবু একটা ছোটখাট অনুষ্ঠান করেছিলেন। খুব বেশি লোকজনকে অবশ্য বলা হয়নি। প্রীতির পরিচিত বন্ধুরা এসেছিল। আর এসেছিলেন পরিমলবাবুর দু'একজন বন্ধু। সুনীলকেও নেমতন্ন করা হয়েছিল।

সুনীল প্রীতিকে বলল, 'প্রীতি, এটা তোমার ভারি অন্যায়। আমি তোমাকে এতদিন পড়ালাম, অথচ আমাকে তুমি একটা প্রাইজও দিলে না।'

প্রীতি হাসল। 'কি আর দেবো বলুন?'

বীথি বলল, 'সুনীলদাকে গোটা দুই রুমাল প্রেজেন্ট করিস দিদি। আর তা ছাড়া কি করবি বল্?'

ঠিক সেই সময়ে প্রীতির দুজন বান্ধবী এল।

বীথি বলল, 'চলুন সুনীলদা আমরা ওপরে যাই, দিদি ওদের সঙ্গে গল্প করবে এ ঘরে।'

বীথি সুনীলকে নিয়ে ওপরের ঘরে এল।

'সুনীলদা এবার পুজোর ছুটিতে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চলুন না। খুব ঘুরবো আমরা।'

সুনীল বলল, 'এবার পুজোতে অনেক কাজ আছে। তোমাদের সঙ্গে ঘুরলে আমার চলবে না।'

বীথি বলল, 'যতো বাজে কথা। আপনি ভীষণ মিথ্যে কথা বলতে পারেন। আগের বারও এমনি একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। না কিচ্ছু শুনবো না, আপনাকে যেতেই হবে।'

'সত্যি বল্‌ছি আমার ভীষণ কাজ আছে এবার।'

'আচ্ছা আমি মেজদিকে বলছি। তারপর দেখি কি হয়।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পুজোর ছুটিতে প্রীতি-বীথিরা রাজগীর গেল বেড়াতে পরিমলবাবুর সঙ্গে। সুনীল গেল না ওদের সঙ্গে। একে অফিসের ছুটি বেশি দিন ছিল না, তার ওপর আরো নানা অসুবিধে ছিল। ও ষ্টেশনে ওদের ট্রেণে তুলে দিতে গিয়েছিল। প্রীতি বীথি দুজনেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

বীথি বলল, 'শেষ পর্যন্ত আপনি গেলেন না আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা মনে থাকবে।'

প্রীতি বলল, 'আপনাকে ভাল করে চিনলাম। এত করে বললাম তবু গেলেন না। ক'দিনের জন্যে বেড়িয়ে

এলে কি এমন ক্ষতি হতো আপনার! সোজাসুজি বললেই পারতেন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আপনার ভাল লাগে না। অতো ঘুরিয়ে বলার কি দরকার ছিল।'

সুনীল হেসে বলল, 'আমার বলবার কিছু নেই। এখন দয়া করে ওখানে গিয়ে তোমরা দুবোন অভিমান না করে চিঠিপত্র দিও।'

মাসখানেক পরে ফিরে এল ওরা। সুনীল ওদের ফেরার খবর চিঠিতেই জানতে পেরেছিল। বিকেলবেলা দেখা করতে গেল ও। সুনীল দেখল ওখান থেকে ঘুরে এসে প্রীতি বীথি দুজনের চেহারাই আর একটু ভাল হয়েছে। তবে প্রীতিকেই বেশি ভাল লাগল ওর।

বীথি বলল, 'শুনুন সুনীলদা, ওখানে একটা ভীষণ মজার কাণ্ড হয়েছে। আপনাকে বলবো, কিন্তু মেজদির সামনে নয়।'

প্রীতি হেসে ফেলল। তারপর বীথিকে বলল, 'কেবল ফাজলামি। যা এখান থেকে। না, সুনীলদা ও আপনার সঙ্গে ইয়ারকি করছে।'

বীথি ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা ইয়ারকি কিনা দু'মাস পরেই বুঝতে পারবেন।'

সুনীল কিন্তু পরের দিনই পুরো কাহিনীটা শুনলো বীথির কাছে। যদিও বীথি সেটাকে অনেক মিথ্যে দিয়ে রঙ চড়িয়ে সুনীলের কাছে বলেছিল তবু মূল কাহিনীটা সত্যি। রাজগীরে প্রীতির সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হয়েছে। এমন কি তার সঙ্গে বিয়েরও ঠিক হয়ে গেছে ওর। ছেলেটি এঞ্জিনীয়ার। বয়েসও বেশি নয়। রাজগীরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে দুজনের আলাপ ক্রমে গভীর হয়েছে। বিয়েতেও আপত্তি ওঠার কিছু ছিল না।

প্রীতির বিয়েতেও আবার সুনীলের ওপর সমস্ত কিছুর দায়িত্ব এসে পড়ল। মাসিমা বলেছিলেন, 'কি সুনীল, অন্যের বিয়ে দিয়েই কি তোমার জীবন কাটাবে? এবার নিজের কিছু একটা করো। তোমার মা কবে থেকে বলেছেন, অথচ তাঁর কথা গ্রাহ্যই করো না।'

সুনীল উত্তর দিয়েছিল, 'মাসিমা নিজের ভারই বইতে পারিনা। অন্যের বোঝা বইবো কি করে?'

বর শ্যামলের সঙ্গে সুনীলের আলাপ হলো। শ্যামল ছেলেটিকে সুনীলের বেশ ভাল লাগল। প্রীতির সঙ্গে ওর মনের মিল নিশ্চয় হবে। শ্যামল ছেলেটি গম্ভীর নয়, নিজে হাসতে পারে, অন্যকে হাসাতেও পারে। বেশ কথা বলে।

বিয়ের পরই শ্যামল প্রীতিকে নিয়ে একেবারে পাটনা চলে যাবে। তিন মাসের আগে আর আসতে পারবে না কলকাতার দিকে।

মোটরে ওঠবার আগে প্রীতি অল্প কাঁদছিল বীথিকে জড়িয়ে ধরে। তারপর প্রীতি সুনীলকে প্রণাম করতে গেল। সুনীল তখন ছাদের সামিয়ানার দড়িগুলো খুলছিল। প্রীতি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুনীল হাতটা ধরে ফেলল নিজের মুঠোর মধ্যে।

'ওকি কাঁদছো কেন? ছি, ছি, এত বড়ো মেয়ে বিয়ের পর কাঁদে নাকি! শ্যামলের সঙ্গে আলাপ হলো। ভারি সুন্দর ছেলে।'

প্রীতি ম্লান হাসল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'সুনীলদা আপনি আমাদের চিঠি দেবেন, কেমন? আর আমি চলে যাওয়ার পর এখানে আসবেন তো?

সুনীল বলল, 'কেন আসবো না? নিশ্চয় আসবো।"

প্রীতি বলল, 'আচ্ছা আমি যাই তাহলে।' প্রীতি কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সুনীলকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি চলে যাচ্ছি বলে আপনার মন কেমন করছে না, সুনীলদা?

সুনীল হাসল। কোন উত্তর দিল না। হঠাৎ আরতি এসে বলল, 'চল্ চল্ প্রীতি, তোর জন্যে আমরা কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। প্রীতিকে নিয়ে চলে গেল আরতি। সুনীল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই তো ওরা যাবে। একদিন আরতি চলে গেছে, প্রীতিও আজ চলে যাচ্ছে, বীথিও একদিন যাবে। তারপর বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে। এখনো কি ও এই শূন্য বাড়িটায় আসবো?

বীথির জন্যে সুনীলকে এখানে আসতেই হতো। বাড়িটা আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্জন মনে হয়। তবু তো বীথি আছে। এর পর?

সুনীল সেদিন বীথির সঙ্গে গল্প করছিল। হঠাৎ বীথি উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান্ সুনীলদা, আপনার মাথায় পাকা চুল।'

বীথি সুনীলের চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিল। পর পর দুটো পাকা চুল তুলল।

একি, এর মধ্যে আপনার মাথার চুল পেকে গেল!

সুনীল হেসে বলল, 'বয়েসও তো কম হয়নি। তিরিশ বছর অনেকদিন পেরিয়ে গেছি।'

বীথি বলল, 'আবার মিথ্যে কথা আরম্ভ হলো। যাক্ ওসব কথা। এখন একটা কথার জবাব দিন তো। আপনি আজকাল সুবিধে পেলেই আমাদের বাড়ি আসেন না, কেন বলুন তো?

সুনীল বলল, 'কই আসি তো।'

'হ্যাঁ, তাই আজ তিন দিন পর একবার এসেছেন। আজকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে—চলুন।

সেদিন বীথিকে বেড়িয়ে নিয়ে সুনীল অনেক রাতে বাড়ি ফিরল। বীথিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

সুনীল বাড়ি পৌঁছে দেখল ওর মা তখনো জেগে আছেন।

'এত দেরি হলো! আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। কোথায় গিয়েছিলি?'

সুনীল বলল, 'তোমাকে তো বলেই দিয়েছি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো না। আমি বীথিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম একটু। তারপর ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হলো।'

সুনীলের মা বললে, 'আশ্চর্য, ওদের বাড়ির জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা, অথচ নিজের মার কথা চিন্তাই করো না!"

সুনীল খেয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘুম এল না। আরতি, প্রীতি, বীথি সকলেই চলে যাবে। তারপর ও একলা। আর ভালো লাগে না। কিন্তু বীথির জন্যে ওকে যেতেই হয়। তাছাড়া সাত বছরের যাতায়াতকে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া যায় না। মাসিমা মেসোমশায় কি ভাববেন? বীথিও কতো বড়ো হয়ে উঠলো এই ক'বছরে। এই তো সেদিন ফ্রক পরে দুষ্টুমি করতো মেয়েটা। অথচ সন্ধ্যেবেলা ওকে দেখে কি মনে পড়ছিল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে? বীথিও যেন আজকাল আর আগের মতো চঞ্চল নেই। কেমন একটা ধীর-স্থির ভাব ওর মধ্যে এসেছে। তবে হ্যাঁ, ওর হাসিটি এখনো সেই ছোটবেলার মতো। মিষ্টি সুরে মন মুগ্ধ করে।

পরিমলবাবু সেদিন আবার সুনীলকে ডেকে পাঠালেন। বীথির বিয়ের ঠিক হয়েছে। বরের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিতে হবে সুনীলকে। সুনীল খবর নেওয়ার ব্যবস্থা করল। ছেলেটি ভালই কাজ করে। স্বভাব-চরিত্রের ক্রটিও নেই। সুতরাং আপত্তির কিছু নেই। বরপক্ষ থেকে বীথিকে আগেই দেখে গিয়েছিল। তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছিল।

বীথির বিয়েতে অনেকেই এসেছিল। আরতি, প্রীতিও এসেছিল। আরতির ছোট্ট মেয়েটিকে সুনীলের খুব ভাল লাগল। কুমুও সুনীলমামাকে ভীষণ পছন্দ করল। বীথির বিয়েতে হৈ চৈটা একটু বেশি মাত্রাতেই হলো। এই তো শেষ মেয়ের বিয়ে। এর পর নিশ্চিন্ত একেবারে। তাই পরিমলবাবুও আয়োজনটা কিছু বেশিই করেছিলেন।

বিয়ের পরের দিন বরকনের যাওয়ার কথা। সন্ধ্যের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হয়েছিল। বীথিকে আরতি, প্রীতি ও অন্যান্য মেয়েরা বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেই সাজিয়ে দিল। ট্রেণ ছ'টায়। তারপর ফটো তোলার পালা শেষ হলো। বীথির বর শোভন আধুনিক ছেলে। মেয়েদের অযথা অত্যাচারে সে বিরক্তিবোধ করে না! এমন কি প্রীতি যখন শোভনকে ধরে চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে দিল তখনো সে আপত্তি করল না। বরং প্রীতির সঙ্গে সুযোগ-মতো দু'একটা ঠাট্টা করল।

সুনীল ওসব গণ্ডগোলের মধ্যে ছিল না। দোতলার কোণের দিকের নিরিবিলি ঘরটায় ও তখন ঘুমোচ্ছিল। কাল সারারাত ঘুমোনোর সময় পায়নি। সকালেও কাজ করতে হয়েছে। ওকে ডেকে তুলল আরতি।

সুনীলদা উঠুন। বিকেলবেলা ঘুমোবেন না, শরীর খারাপ হবে। তাছাড়া এবার বীথি যাবে। আপনাকে ডাকছে।

'ও, তাই নাকি।' সুনীল বিছানার ওপর উঠে বসল। আরতি ওর কাজে চলে গেল।

গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছিল। শোভন সেকথা

মেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিল। বীথি ভেবেছিল সুনীল নিশ্চয় আসবে। কিন্তু কই এখনো তো এল না। অথচ আরতিকে দিয়ে ও সুনীলদাকে বলে পাঠিয়েছিল। মোটরে ওঠবার আগে প্রীতিকে আর একবার বলল সুনীলের কথা। প্রীতি সমস্ত বাড়িটা খুঁজে এল। না, কোথাও নেই। কোথাও না। চলে গেছে সে।

প্রীতি ফিরে বীথির কানে কানে বলল, 'সুনীলদা নেই, চলে গেছেন বোধহয়।'

বীথি তখন শোভনের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। প্রীতির দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'নেই? ও আচ্ছা।'

বীথি শোভনের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল। একবার ওদের বাড়ির দিকে ফিরে চাইল মোটরের জানালা দিয়ে। ওই শেষ জন। এর পর বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। শুধু মা, আর বাবা থাকবে। তখন নিশ্চয় সুনীলদা আর আসবে না।

বীথি তবু ভেবেছিল সুনীল অন্তত শেষ মুহূর্তে একবার আসবে। কিন্তু এল না। ও পালিয়েছে। ভয়ে? যে পালিয়ে যায়, সে কি নিজে থেকে ফেরে?

মোটর ষ্টার্ট নিল। বীথি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভীরু, কাপুরুষ!'

শোভন বীথির দিকে মুখ ফেরালো।

'কিছু বলছো আমায়?' শোভন হাসল।

'না।' বীথি ঘোমটা একটু টেনে মাথা নিচু করল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমসৌন্দর্যে চিত্রা ও জীবনদেবতা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম. এ

রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটি ক্রমান্বয়ী ধারাবাহিকতার ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেস্বাক্ষরগুলি পড়েছে, তাতে কখনো আছে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের আনুভূতিক ঔজ্জ্বল্য, কখনো আছে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে শান্ত ভাবনার লোকাতীত মাধুর্য। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের পথটি বেয়েই যেন তাঁর কবি-মানস জগৎ ও জীবনকে সর্বপ্রথম নূতন দৃষ্টিতে চিনে' নিয়েছিল, জীবন-আকুতির গভীর আবেদনে বিশ্বজগৎ তাঁর সম্মুখে রূপ-সৌন্দর্যের দ্বারপানি খুলে' দিয়েছিল। প্রথম যৌবনের দিনে এই দ্বার দিয়েই কবি প্রবেশাধিকার পেয়ে এক চিরন্তন সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে প্রত্যক্ষ করলেন। মানবীয় চেতনা দিয়ে অরূপ-চেতনাকে গ্রহণ ক'রে একটি অপূর্ব আনন্দরসে অন্তরকে পূর্ণ ক'রে নিলেন। তারপরের যে-অনুভূতি, সে হচ্ছে দিব্যানুভূতি-আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্বলয়ে অন্তরকে মিশিয়ে দেওয়ার মৌন প্রস্তুতি। কিন্তু এই দিব্যানুভূতিকে বুঝবার পূর্বে আমাদের বুঝে নিতে হ'বে কবির প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিষ্ট্যকে।

সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-কবি-মানস প্রেম-সৌন্দর্যের জগতে এমন একটি রূপময়ীকে দেখতে এবং বুঝতে চেয়েছেন, যার 'মৃণাল স্পর্শে মর্মান্ত পুলকে রোমাঞ্চ অংকুরিত' হ'য়ে ওঠে, অন্তর কেবল উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে 'অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে'। সীমার মধ্য থেকে অসীমের অভিব্যঞ্জনাকে তিনি অন্তরের গভীরে গ্রহণ ক'রে প্রেমের এক অনন্ত স্বরূপকে অনুভব করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-কবি-মানস প্রেমের সীমাবন্ধনকে কোনদিন স্বীকৃতি দেয় নি। দেহকে ছাপিয়ে দেহাতীত একটি সৌন্দর্য ও প্রেম-চেতনা হৃদয়ের মূলদেশে যখন জাগ্রত হ'য়ে নূতন একটি মুখরতা সৃষ্টি করেছে, তখনই তিনি মানসসুন্দরীকে কল্পনা করেছেন। এটুকু না ক'রে যেন তাঁর কবি-মানসের উপায় ছিল না। দেহ তাঁর কামনার রাজ্যে রূপাকুলতাকেই ঠাঁই দেয় সব চেয়ে বেশি। যৌবন-মুগ্ধতার মায়াভরা দিনগুলিতে সে-দেহকামনা তাঁর কবি-অন্তরকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল, এবং যে-নারীর বাহু, চরণ ও বিভিন্ন অঙ্গের রূপ-বন্দনার সঙ্গে প্রাণের কামনাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—তাকে বিশেষ একটি আবেশময় মুহূর্তলগ্নে হৃদয়ের নেপথ্যে রেখে দিয়ে মানস সুন্দরীর ধ্যান-কল্পনায় আত্মমগ্ন হ'য়ে রইলেন। বস্তু নিরপেক্ষ একটি ধ্যানজগৎ তাঁর কবি-হৃদয়ের সম্মুখে যেন অন্তরের অনুভূতিকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে গেল। তাই বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রমূল থেকে একটি নারী মূর্তিকে যেন তিনি আহরণ ক'রে নিলেন, সে-নারীর কোন রূপ সম্বন্ধ নেই এই বিশ্ব পৃথিবীর কোন বস্তু বন্ধনের সঙ্গে; অসীমের স্বপ্ন আর ব্যাকুলতা দিয়ে প্রতিটি অঙ্গ তার গড়া এবং সে শুধু—

নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছে দুগ্ধ-শুভ্র বিরহ শয়ন।

(মানসসুন্দরী—সোনার তরী)

কবি দৃষ্টিতে সে কেবল বিরহ শয্যাই বিছিয়ে দেয়, কারণ তার জন্ম অনন্তকালের ধ্যান আছে ; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে কোনদিনই সে ধরা দেয় না। কবিমনের কাছে সৌন্দর্যের বিগ্রহরূপিণী সে, কিন্তু অ-ধরা মায়ার স্বপ্নাচ্ছন্নতাও সে কবির ধ্যানের চোখে চিরদিন বিছিয়ে দিয়ে যায়। কবি তাই তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন অন্তরের সুগোপন দেশে। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজ, এর পিছনে যেন বহু জন্মের, বহু পরিচয়ের মর্ম-আলাপন নিগূঢ় ভাবে লুকিয়ে আছে, কবি তা' ভুলেন নি, ভুলতে দেন নি তাঁর মানসী প্রিয়াকেও। কবি-হৃদয়ের ভাবরস সেই 'মানসসুন্দরীর' মধ্যে আছে বলেই সে হ'য়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কখনো পূর্বজন্মের কুয়াশাময় সুদূরলোকে তাঁর কবিকল্পনাকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই রহস্যময়ীর ঠিকানা সন্ধান করতে চেয়েছেন, এবং সেই সন্ধান-প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় পরজন্মের ভাবনালোকে চিরপ্রেয়সী ক'রে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন তাঁর আদর্শগত মানস-প্রেরণাকে। এই রহস্যময়া নারীর রূপকে অবলম্বন করেই তাঁর কবিপ্রাণের জাগরণ ও তন্ময়তা—কিন্তু চিরকাল যেন একটি রহস্যের কুয়াশা এই সৌন্দর্যলোককে আবৃত ক'রে রেখে দিয়েছে। 'সোনারতরী' কাব্যের প্রারম্ভিক যাত্রার সোপানে সোনার তরীর যিনি অধীশ্বর তিনিও রহস্যময়—বিশ্ব-প্রকৃতির নিগূঢ় সত্যকে অনুভব করতে গিয়েই কবি সেই রহস্যময়ের পরিচয় লাভ করেছেন—আর কাব্যের শেষে 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' 'সোনারতরী'র রহস্যময়ীর দেহসৌরভ কবি লাভ করেছেন বিশ্বসৌন্দর্যের রহস্যের অনুভূতিতে। একটিতে প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সম্বন্ধেও সত্য নির্ণয়ের প্রয়াস,আর একটিতে বিশ্বসৌন্দর্যের রহস্যময়তায় অবগাহন। এই রহস্যময়ীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে কবি তাঁর সত্যরূপকে বারবার চিনে নিতে চেয়েছেন। সৌন্দর্য ও প্রেমের সে-সত্য তাঁর ভাবজগৎটিকে ধ্যানময় ক'রে রেখে' দিয়েছিল, তাই রূপ ধ'রে দেখা দিল 'মানস সুন্দরী-রূপে। মানস-জগতের রূপ-উৎসবে জেগে ওঠে সে কবি-মনের আদর্শগত বাসনারূপিণী, সেই তো মানসী। এই বিশ্বের রূপরসগন্ধগীতিময় প্রতিটি তরঙ্গাভিঘাতে কবিহৃদয়ে সে অপূর্ব অনুভূতির আবেগ জন্ম লাভ করছে, মানসী প্রতিমা তারই স্নিগ্ধ-সুন্দর বাণীরূপ। এই নারীরূপিণী মানসীর মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বসৌন্দর্যের মূলগত ভাবটিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছেন আর সেইজন্যই সেই মানসী বা মানস সুন্দরী একটি ভাবময়ী অনুপ্রেরণার মতো তাঁর কবি-মানসটিকে স্বপ্নময় ক'রে রেখে দিয়েছিল,—সে-স্বপ্নের মধ্যে—

> শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
> লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
> মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
> নয়ন কূলে।
> তুমি যে ভুলেছ ভুলে' গেছি, তাই
> এসেছি ভুলে। [ভুলে—মানসী]

কবি মনে করেন তাঁর ধ্যানলোকের সৌন্দর্যময়ী মানসীর দ্বারে তিনি অকস্মাৎ ভুল ক'রে এসে পড়েছেন, কিন্তু না এসেও তো উপায় ছিল না! তিনি যে চিরজীবনের 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে' মানসী-প্রতিমাটিকে গ'ড়ে তুলেছেন! সেইজন্যই তো তাঁর বহুদিনকার স্মৃতির জগতে লাজে-বাধো-বাধো সোহাগের বাণভরা হাসিমুখখানি জেগে উঠেছে। যে-প্রেমের সৌন্দর্যস্বপ্ন ধরণীর কোন নারীর মধ্যে তার আদর্শ-গত রূপের সন্ধান পেল না, তার এক অপরূপ রূপময়ী মানসী-প্রতিমা গঠন ক'রে নিতেই হবে, আর তার দ্বারে ভুল ক'রেই হোক, বা যা' ক'রেই হোক আসতেই হবে। কবি এসেছেন এবং তাকেই অবলম্বন ক'রে সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের মধ্যে অনন্তের মায়াঘেরা একটি উপলব্ধিতে অন্তরকে ভ'রে তুলেছেন। কবির মানসলোক বা ধ্যানলোক তার স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই মানসী নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁকে এত অধিক আকৃষ্ট করেছে। কারণ বিশ্ব-সৌন্দর্যের নারীরূপ ও প্রেম কবির মানসলোকে অসীমতার একটি আনন্দস্বপ্ন সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি 'সোনার তরীর' যুগে 'মানস সুন্দরীর উপলব্ধিতে এসে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে তাকে দেখতে চেয়েছেন। কবিদৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে মর্তের বহুবাঞ্ছিতা বাসনা-কামনাময়ী প্রিয়া বিরাজ করছিল কিনা, তা' জানি নে,—কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যায় ; তাঁর প্রেমবোধের উপর অতীন্দ্রিয়তার এক স্নিগ্ধ উত্তরীয় বিস্তার করবার জন্য তিনি মানবীয় প্রেমকে এক উদ্ধস্তরে এনে স্থাপন করেছেন। বিশ্বসৌন্দর্যের পটভূমিকায় একটি মনোময়ী নারী সৌন্দর্যের স্বপ্ন প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, আর এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রেমসৌন্দর্যবোধ চিরদিন এক সৌন্দর্যময়াকে সন্ধান ক'রে ফিরেছে।

'জ্যোৎস্নারাত্রে' জ্যোতির্লোকের শুভ্র সিংহাসনে যেখানে 'বিশ্ব-সোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা' বসে আছেন, সেইখান থেকে লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে ভেসে এসেছে কবির কাছে নূতন রূপলোকের সংবাদ—আর শান্ত করুণ জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ কবি সৌন্দর্যের মূলীভূত শাশ্বত সৌন্দর্যময়াকে খুঁজে নিতে উৎসুক হ'য়ে ওঠেন। তার জন্য গেঁথে আনেন একখানি মালা, তার ধ্যানে হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে তুলে' 'বাসনার তীরে একা বসে আপন হৃদয় ভেঙে' অসংখ্য প্রতিমা গ'ড়ে তোলেন। ভাবসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে চান রূপময়াকে। জ্যোৎস্নার বাতায়ন-পথে যার অঙ্গদ্যুতি এই বস্তু-পৃথিবীতে রজনীর নিভৃত মুহূর্তে ঝ'রে পড়ছে—তাকেই ডেকে বলেন—

> আলিঙ্গন স্মৃতি
> অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
> বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
> ভূমানন্দে। [জ্যোৎস্নারাত্রে-চিত্রা]

ভূমানন্দের ব্যাকুলতায় অন্তরকে ভ'রে তুলে' অনুভব করতে চান সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নীরব পদচারণাকে। সীমা থেকে অসীমের দিকে, খণ্ড থেকে অখণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর কবিমানস, নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলে যে-শাশ্বত সৌন্দর্যলক্ষ্মী রয়েছে, তারই বন্দনা গান করেছে। এই বন্দনাগানের মধ্যেই ফুটে উঠেছে কবির

প্রবল সৌন্দর্য-পিপাসার অপরিসীম ব্যাকুলতা এবং প্রেমের এক সুগভীর উপলব্ধি। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সে-রস বা আনন্দ-চেতনা মনকে প্রতিমুহূর্তে আপ্লুত ক'রে রাখে, সেই রসবোধই প্রেমের উপলব্ধিতে হৃদয়কে ভ'রে তোলে। এইজন্যই মনে হয়, সৌন্দর্য-বোধের তারে প্রেম যেন একটি সুর। এই সুরের সঙ্গে যেন একটি ধ্যানের যোগবন্ধনও আছে। নিজ হৃদয়ের রস-চেতনার সঙ্গে প্রেমের গভীরতাকে যুক্ত ক'রে দিয়ে নিখিল সৌন্দর্যের আদি ভাবটিকে বিশ্ব-জগতের বুকে বিচিত্র সজ্জায় প্রত্যক্ষ করেছেন, আর 'চিত্রা' বলে তা'র নাম দিয়ে আবেগ-বিভোর কণ্ঠে বলে উঠেছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলাসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী। [চিত্রা]

রবীন্দ্রনাথের এই চঞ্চলগামিনী 'চিত্রা'কে যখন বুঝতে যাই, তখনই বুঝি—প্রেম এবং সৌন্দর্যবোধ চিরদিন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রেমের মধ্যে ধ্যানময়তা আছে বলেই তাকে এমন বিচিত্ররূপে দেখা চলে ও অনুভব করা চলে। এই দেখায় দেহকামনার ঊর্ধ্বগত একটি প্রেম-আবেদন আছে বলেই ইন্দ্রিয়ভোগের অতীত একটি ভাবময়তায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর অপার্থিব প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সুদূর আকাশে শোনা যায় তার মুখর নূপুর ধ্বনি, মন্দ বাতাসের তরঙ্গে ভেসে আসে তার অলকগন্ধ, মধুর নৃত্যচ্ছন্দের মঞ্জুল রাগিনীতে নিখিল চিত্ত বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সৌন্দর্যবোধের অন্তঃপ্রেরণায় বহিঃপ্রকৃতির দিকে চেয়ে এ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বহুবিচিত্র বাইরের রূপকে দেখা। সেখানে বিচিত্ররূপিণী আন্তর প্রেমের উদ্বেলতায় যে-রূপের উপলব্ধি তিনি করেছেন, সে-রূপের প্রকাশ সীমাহীন নীলগগনের অযুত আলোকে, পুলকের আকুলতায় ফুলকাননে তার বিচরণ; সে-সৌন্দর্য স্বপ্ন হ'য়ে মিশে' আছে নয়নের মুগ্ধতায়, পদ্ম হ'য়ে ফুটে আছে হৃদয়বৃন্তের মাঝখানে, চির যামিনীর নিঃসীমতায় একক চন্দ্রের আলোক নিয়ে চিত্তগগনকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। আর অকূল শান্তি, বিপুল বিরতির স্তব্ধতায় একটি শুভ্র হৃদয়ে নিত্য আরতির দীপশিখাটিকে জাগিয়ে রেখেছে। সেইখানে চিত্রা কবির অন্তরবাসিনী। যাঁর গম্ভীর মৌন মহিমায়, উষালোকের প্রশান্ত হাসিতে একদিকে তার আলোক-বিচ্ছুরণ, অন্যদিকে কবির অন্তর গহনে তার নীরব সঞ্চরণ! চিত্রা রবীন্দ্র-কবি-মানসে এমনি করেই মুগ্ধতার সঞ্চার করেছে, আর অসীমের অভিমুখে চিত্তের ব্যাকুলতাকে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। কবি-মানসের স্বপ্নলোকে শাশ্বত সত্যের এই নারী-প্রতিমাটি একদিকে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছে, অন্যদিকে কবির চিত্তকে সুগভীর আনন্দ-আস্বাদে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। চিত্রা তাই রবীন্দ্র কাব্য জগতে বহুবিচিত্রা, সৌন্দর্য-উপলব্ধির সমন্বয়ী রূপ।

চিত্রার সাক্ষাৎ পেয়েও কবি মাঝে মাঝে অখণ্ড বিশ্বসৌন্দর্যকে খণ্ড রূপে ও রসে অনুভব করতে চেয়েছেন, কারণ লোকাতীত সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্নতায় তাঁর কবিমানস যেন বৈচিত্র্যবোধের আনন্দকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই Abstract এবং Absolute সৌন্দর্য-স্বর্গ থেকে তিনি মানবী-প্রিয়ার জন্য সুখদুঃখপূর্ণ মর্ত্যভূমিতে নেমে আসতে চেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আবার মানবী-প্রতিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নয়ন ভ'রে দেখতে চেয়েছেন। 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' সুখদুঃখভরা প্রেমাশ্রুতে চিরশ্যামায়িত হ'য়ে উঠেছে। বিশ্বপৃথিবীর বহুদিনকার 'স্নেহস্মৃতি'-ভরা চাঁপা ও বেলফুলগুলি, কবি-হৃদয়ের উপকূলে নূতন ভালোবাসার রস-আবেদন নিয়ে ফিরে এসেছে। স্নেহের হাতে গাঁথা বকুলফুলের মালাগাছিকেও স্বীকৃত সম্মান দিয়ে বস্তু-জগতের প্রেমকে ও মহীয়ান করতে চেয়েছেন। আত্মার প্রেম জগতে, নবজাগরণের স্বপ্ন-ছোঁয়ানো লগ্নটিতে—আনন্দমধুর কণ্ঠে কবি যাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

দুটি বাহু দিয়ে বলো,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? [মানস সুন্দরী]

তাকেই সীমার বেদীভূমিতে মাঝে মাঝে স্থাপন ক'রে খণ্ড রূপ প্রতিমাকে দেখতে চেয়েছেন, আর কবিকণ্ঠে সমস্ত আবেগ মিশিয়ে বলে' উঠেছেন—

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হ'তে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি? [মানসসুন্দরী]

আবার বলেছেন—

কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি।

সৌন্দর্যের স্বপ্নরসায়িত ছায়ামণ্ডপে ভাবের আবেগে গ'ড়ে তোলা প্রতিমাকে এমনি খণ্ডিত রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে না দেখলেও বুঝি শান্তি পাওয়া যায় না।

তাই চিত্রার যুগে রবীন্দ্র-কবি-মানস এমনি অখণ্ড ও খণ্ডের সাধনায়, সীমা এবং অসীমের ভাবপর্যায়ের দোলায় দ্বন্দ্বময় হ'য়ে উঠেছে। 'সোনার তরীর' 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' সৌন্দর্যের যে-নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবির মনে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, চিত্রার 'দিন শেষে' এসে পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে কবি আর একটি চির সুন্দরের রাজ্য গ'ড়ে নিয়ে মাথা রাখবার মতো ঠাঁই ক'রে নিতে চান। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে বারবার আসা যাওয়া কবির আর ভালো লাগছে না! চির তারুণ্যময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর হাতের ছোঁওয়ায় ধরিত্রী যেন 'দিনশেষের' গোধূলি আলোকে স্বপ্নময়ী হ'য়ে উঠেছে,—বহুদূরের দুরাশায় প্রবাস এই বিশ্বপৃথিবীর বুকে যেন এক হ'য়ে মিশে যেতে চাইছে। দূরের দেউলে সেখানে দেউটি জ্বলছে, ছায়াঘেরা পথখানি শ্বেতপাথরেতে গড়ে উঠছে, কাননে প্রাসাদ চূড়ে' নেমে আসা রজনী সেখানে আঁধারের আবরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে, বেড়া দেওয়া উপবনের কাছে সেখানে সারি সারি [illegible]

সেইখানে বাসা বাঁধতে চান ; কারণ এখানকার পথের চিরতরুণী সৌন্দর্যময়ী তার প্রেমভরা ঘটের ছল ছল রব তুলে কবিকে দেখা দিয়ে যান। তাই 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়' কবি যখন প্রশ্ন করেছিলেন—'বলো, কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী'—তখন সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানে নিরুদ্দেশ যাত্রার স্বপ্ন রঙীন এক আকুলতা কবি-প্রাণকে উচ্ছল ক'রে তুলেছিল ; কিন্তু কবি বুঝতে পারেন নি,—

বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী ; কোথা চলে' যায় ;—

শুধু কেবল বুঝেছিলেন, সামনে আছে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রসারিত কর-পদ্ম, আর আছে পশ্চিম দিগন্তব্যাপী ফেনোচ্ছাসিত অসীম সাগর। সূর্য তখন অস্তাচলে, আশার রশ্মির মতো চঞ্চল আলো সেখানে কেবল কাঁপ্ছে! আর 'চিত্রা'র 'দিনশেষে' কবি পার্থিব সৌন্দর্যের মায়া ঘেরা সৌন্দর্যলোকে ফিরে ক্রমেই ছন্দমধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।' কবি হৃদয়ের ব্যগ্র ব্যাকুল সমস্ত অনুভব অখণ্ড ভাবনার স্রোতধারায় ভেসে ভেসে খণ্ডের সীমিত সৌন্দর্যের রূপবলয়ে বাঁধা পড়ে মাঝে মাঝে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। এই আবর্তসংকুল দ্বন্দ্ব ছিল বলেই রবীন্দ্র মানস পরবর্তী যুগে অতীত ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাঙ্গণে মানস ভ্রমণ করতে পেয়েছেন। সেই যুগে তাঁর দৃষ্টি যতটা অন্তর্মুখী ; তার চেয়ে অনেক বেশি বহির্মুখী। অনন্ত অগাধ রূপ সমুদ্রের তল থেকে দৃষ্টিকে তুলে নিয়ে বহির্বিশ্বের ঐতিহ্য গৌরব ও নিজ হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার নৃত্যলীলায় মগ্ন থাকতে পেরেছিলেন।

আমার মনে হয়, 'চিত্রার' বিচিত্ররূপের অনুভাবনাই রবীন্দ্র কবি মানসে নারীর ভাবাদর্শটিকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। সীমা অসীমের পটভূমিতে প্রেম সৌন্দর্যের এরূপ গভীর অনুধ্যান না থাকলে নারীরূপের দুইটি দিককে প্রত্যক্ষ করা চলে না। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে নারীর আছে একটি প্রেয়সীরূপ, আর একটি কল্যাণীরূপ। কবিমানসে 'সুখ দুঃখ বিরহমিলন পূর্ণ ভালোবাসা'র মধ্যে যে-লৌকিক প্রেমবোধ, আর 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আশঙ্কার' মধ্যে যে-সৌন্দর্যবোধ, এই দুইটি অনুভূতিই রবীন্দ্র-মানসে একদিকে নারীর প্রেয়সী-রূপ, আর একদিকে কল্যাণীরূপ গঠন করতে সাহায্য করেছে। প্রেমে যখন খণ্ড ভাবের প্রাধান্য এসেছে, তখনই নারীর প্রেয়সী-রূপকে কল্পনা করেছেন—আর অসীমতা ব্যঞ্জনায় সীমা অসীমের দুইটি দিকেই তাঁর মনোবাতায়ন খুলে' দিয়ে নারীর উর্বশী আর কল্যাণীরূপকে, ভোগময়ী ও ধ্যানময়ী রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তিনি বলে' উঠেছেন—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে। [রাত্রে ও প্রভাতে—চিত্রা]

একজন 'বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী, স্বর্গের অপসরী', অন্যজন—'লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের জননী তারে জানি।' একজন শুধু পুরুষের তপস্যার জগতে যবনিকা টেনে দিয়ে, সংগীত-সুরভি দিয়ে প্রাণ-মন হরণ করে,—পৃথিবীর অন্য কোন সম্বন্ধ সে স্বীকার করে না। অন্যজনের স্নিগ্ধ-মাধুর্যময় পরিবেশে মাতৃত্বসুধার শুভ্রোজ্জ্বলরূপ। জগতের সমস্ত সম্বন্ধই তাঁর কল্যাণময় মাতৃত্ব ভাতির আনন্দময়তার দ্বারাই হয় স্বীকৃত। যৌবনের মোহমদিরা একদিকে, অন্যদিকে সৌম্য সৌন্দর্যময় বিশ্বজননীত্বের সমন্বয়। সৌন্দর্যের ভিতর যে-উদ্দামতা আছে, তাকে প্রকাশ করে উর্বশী, আর একে মঙ্গল স্পর্শে স্নিগ্ধ সুন্দর ক'রে তোলে কল্যাণময়ী নারী। কল্যাণের শুভ স্পর্শে সমস্ত কিছু অমঙ্গল ধুয়ে মুছে যায় বলেই সে কল্যাণী! সৌন্দর্যের শ্রেয়বোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীভাবাদর্শের কল্যাণীরূপকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন,—শুভ্রতার গঙ্গাধারাকে পবিত্রতার একটি মালিকা রচনা ক'রে অঙ্গাঙ্গী মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানসদৃষ্টির কান্তি এসে চোখের দৃষ্টির রূপকে কল্যাণ শ্রীতে মণ্ডিত করেছে।

নারীরূপের অনিন্দনীয় পূর্ণতাকে খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবময়তার স্বর্গলোকে তাঁর সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ আদর্শকে 'উর্বশী'রূপে ধ্যান করেছেন,—আবার প্রেমের অভিষেকে 'মহিয়সী মহারাণী ক'রে তুলেছেন মানবী প্রিয়াকে। রবীন্দ্র-কবিদৃষ্টিতে এভাবে মানসলোকের সমস্ত বাসনা কামনা, জীবন সত্যের সমস্ত রূপশ্রী নারীরূপের মাধ্যমে ধরা দিয়েছে—যেমন ক'রে সূর্যের আলোক দৃষ্টিতে ধরা দেয় শতদল পদ্মের বিভিন্ন পাপড়ির রূপমাধুরী। রবীন্দ্রনাথ প্রেমসৌন্দর্যের মোহানায় দাঁড়িয়ে নারীর কল্যাণীরূপ ও উর্বশীরূপে জীবন ও সৃষ্টি সত্যকে ধরতে চেয়েছেন।

তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'বিজয়িনী' হয়েছে সেইখানেই, যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে পুরুষের রূপধ্যান। একটি নিরাবরণ নারী-বিগ্রহের প্রতি অঙ্গে যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে বন্দী হয়ে আছে, প্রকৃতির রৌদ্রলেখা তার প্রতিটি অঙ্গেই উজ্জ্বল স্পর্শ দিয়ে আরো মোহময় করে তুলেছে ; নবীন বসন্ত প্রথম প্রেমস্পন্দনের মতো তার চারিদিকে একটি সৌন্দর্যের শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছে। আকাশ বাতাস সেবকের মতো তার সিক্ত তনুকে সেবা দিয়ে স্নিগ্ধ ক'রে রাখছে। প্রকৃতির এই সেবা সেই তনুদেহে জাগিয়ে দিয়েছে এমনি একটি গম্ভীর প্রশান্তি, যাতে পুরুষের রূপধ্যান একটি কল্যাণশ্রয়ী পরিণতিতে সার্থকতা লাভ করেছে। প্রকৃতি এখানে এসে সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য একটি শান্ত মধুর পরিবেশ রচনা করেছে, যেখানে দেহলালসা নিশ্চিহ্নভাবে মুছে যায়, পুরুষের ধ্যান প্রশান্তি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে শুচিতার স্নিগ্ধ বলয়ে বেঁধে রাখে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের জগতে প্রকৃতি এসে সৌন্দর্যের পুষ্পরূপিণী নারীকে ফুটিয়ে তুলেছে এক লোকাতীত ব্যঞ্জনা দিয়ে, সেই সঙ্গে

প্রেমের ও জাগৃতি ঘটিয়ে কবিপুরুষের চিত্তকে অসীমের উদার মুক্তিতে এনে ধ্যানশান্তির পরিতৃপ্তিতে ভ'রে দিয়েছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে প্রকৃতি ও একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে; প্রকৃতি ও সৌন্দর্যময়ী নারী যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছে। প্রকৃতিই যেন এই 'বিজয়িনী' নারীরূপকে সমস্ত সৌন্দর্য পিপাসার স্থির অনুভূতির প্রশান্তিতে এনে ঠাঁই ক'রে দিয়েছে। পুরুষের প্রাণের লালসাকে জয় ক'রে নিয়ে অন্তরের শিব বা মঙ্গলকে জাগিয়ে দেওয়ার উপাদান জুগিয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রেম একদিকে সৌন্দর্যস্বপ্ন দিয়ে মানসীকে গড়েছে, আর একদিকে পার্থিবতার আবেশ মিশিয়ে প্রিয়কে দেবতা ক'রে দিয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই অনন্তকে দেখার ধ্যান আছে। প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপকতাকে গ্রহণ ক'রে সেই ব্যপকতর সত্তার সঙ্গে নিজের ধ্যান কল্পনাকে যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই মনে হয়, প্রকৃতির গহন গভীর উৎস থেকেই তাঁর সমস্ত ভাবনা—কল্পনার উদ্ভব। তাই নিজেকে ভুলে' গিয়ে তাঁর হৃদয় ধ্যানকল্পনার মূর্তিগুলিকে নিয়ে 'একটি জগৎব্যাপী গানে'র মধ্যে অবগাহন করতে চেয়েছে।

এর সঙ্গে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের গভীরতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির জন্ম। প্রেমের বস্তু নিরপেক্ষ দিকটিকে কেবল অবলম্বন ক'রে তাঁর কবি-আত্মা বেশিদিন তৃপ্ত থাকতে পারে নি; বিরহের স্বর্গলোক লাভ ক'রে এবং অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে চির জন্মের এবং সৌন্দর্যধ্যানের বিরহিণী প্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করেও তিনি পরিতৃপ্তি খুঁজে পাননি। বৃহত্তর পৃথিবীর সুখ-দুঃখের কষ্টের সংসারে সংঘাতময় জীবনের আবর্তে নেমে আসতে হয়েছে,—বিশ্বলোকের মানব-মানবীর জীবনের দুঃখের ইতিহাসকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন; দূর প্রান্তের আগুন-লাগা শিখাটিকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। সমগ্র বিশ্বের বিপুলতম পটভূমিকায় সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে দেখতে দেখতে নিখিল বিশ্বের মানব মানবীকে না ভালোবেসে যেন পারা যায় না। তাদের সুখ-দুঃখের অংশভাগী না হ'তে পারলে লোকাতীত সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতার মধ্যেও কোথায় যেন একটি ফাঁক থেকে যায়। মনের তৃপ্তি যেন পরিপূর্ণতার আনন্দে স্থির প্রশান্তিতে গভীর হ'তে পারে না। কবি যখন বলেন,—

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে। [মানসসুন্দরী]

তখন বিরহের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন মানসসুন্দরী-রূপিণী বিশ্ব সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে পাচ্ছেন, তেমনি সৌন্দর্য-জগতের কল্পনাকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন।

হে কল্পনে রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদ ঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। [এবার ফিরাও মোরে—চিত্রা]

নিজের সুখ দুঃখকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে, একমাত্র সত্যকে ধ্রুবতারা ক'রে নিয়ে, 'মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গে নাচতে নাচতে তিনি নির্ভয়ে ছুটতে চান সমগ্র বিশ্বের বেদনাভরা অন্তরের ডাক তাঁকে আজ যেন পাগল ক'রে দিয়েছে; প্রাণ-সমুদ্রের তটে কোন্ এক বিপুল প্লাবনের কল্লোলধ্বনি জেগে' উঠেছে। কিন্তু এই দুর্দিনের অশ্রুধারাকে মস্তকে বহন ক'রেও কবি তারি অভিসারে যেতে চান, যাকে তিনি তাঁর 'জীবন সর্বস্বধন' জন্ম জন্ম ধ'রে অর্পণ করেছেন। তিনি কে? কবির এই 'জীবন সর্বস্ব' অর্পণ করা ধন যিনি, তিনি হচ্ছেন সত্য। এই সত্যকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে দুর্যোগ-শংকিত দিনে জীবনের পথে চল্‌তে চেয়েছেন, এবং নিঃশঙ্ক চিত্তের নির্বিচার বিশ্বানুভূতিতে মৃত্যুকেও বরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সত্যও কবির কাছে 'নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমা' হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। এই সৌন্দর্য-প্রতিমার পায়ের তলায় মানী তার মান সমর্পণ করেছে, বীর বিসর্জন দিয়েছে নিজের প্রাণকে, দিগন্তবিসারী নীলাম্বর ঘিরে' তার অঞ্চল প্রান্ত পড়ছে লুটিয়ে। শুধু তাই নয়, বহু বাঞ্ছিত একটি পরম লগ্নে প্রিয়জন-সুখে সেই প্রেমমূর্তিখানি ভেসে ওঠে। তখন সে বিশ্ববিজয়িনী, এবং তার পরের যে-রূপ, সে-রূপ বিশ্বপ্রিয়ার। সমগ্র বিশ্বমানবকে আপন করার মধ্যে দিয়েই এই বিশ্বপ্রিয়ার উপলব্ধি ঘটেচে কবির মনে। একান্তভাবে কবির অন্তর বাসিনী বিশ্বব্যাপিনী হয়ে কবিদৃষ্টির দিগন্তে ভেসে' উঠেছেন। নয়নে তার আনন্দ জ্যোতি, রূপে তার উজ্জ্বল মহিমা। তখন যেন জ্যোতির্নীহারিকার অন্তশ্চারিনী দেবী বিশ্বানুভাবনার প্রমূর্তি। এই বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমেই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যায় ঘুচে, জীবনের সর্ব অসম্মান যায় নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছে। ব্যক্তি-হৃদয়ের সৌন্দর্য-প্রতিমা এমনি করেই 'দুঃখহীন নিকেতনের মহিমালক্ষ্মী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। কবি মনে করেন, এই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যপ্রিয়ার প্রেমেই কবি জীবনের সর্বপ্রেম তৃষা যেন মিটে যাবে, তেমনি তিমিরান্ধ দুঃখনিশারও অবসান ঘটবে। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর এক ধ্যানে চিরসুন্দরের বস্তুসীমাতিক্রমী রূপচ্ছবির পরিস্ফুটন, আর এক ধ্যানে বিশ্ববেদনার রক্তপদ্মে বুক রেখে' সত্যরূপিণী বিশ্বপ্রিয়ার রূপ অংকন। প্রেম ও সত্যবোধ একই সৌন্দর্যময়ীর ভিন্নরূপকে গড়ে তুলেছে। অসীমতার পূজারী রবীন্দ্র-মানসের এ-ছাড়া উপায় ছিল না।

রবীন্দ্র-কবি-মানসে 'চিত্রা'র হাতে-গড়া একটি রূপলোক ও একটি ভাবলোক আছে। রূপলোকে একটি অপরূপা সৌন্দর্যময়ী, ভাবলোকে লোকাতীত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদচারণা ও জীবন দেবতার আবির্ভাব। সৌন্দর্যানুভূতির ডোরে বাঁধা-পড়া মানসীকে নিয়ে চিত্রার সাক্ষাৎ, এবং চিত্রাকে অন্তরবাসিনী ক'রে জীবনদেবতার অভিনন্দন রচনা। এই সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের গভীরতাকে বুকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—'যে কোন জিনিস আমার প্রিয়, তার মধ্যে আমি আপনা-কেই সত্য করে পাই বলেই তো প্রিয় তাই সুন্দর।' রবীন্দ্রনাথ চিত্রার মধ্যে নিজ হৃদয়বোধের নিবিড়তায় নিজেকেই গভীরতমভাবে পেয়েছেন,—তাই চিত্রায় ফুটে উঠেছে আত্মভাবনায় সমৃদ্ধ সৌন্দর্যবোধ। এই ভাবাদর্শের মধ্যেই নিজ অন্তরের গভীরতম চাওয়াকে বুঝে নেওয়ার

বাসনা জেগেছে। রবীন্দ্র-কবি-মানস সেই আত্মিক উপলব্ধির তটভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের যে-জীবনদেবতা, তিনি হচ্ছেন জীবনের গভীরতর স্তরের একটি চেতন সত্তা, আর জীবনদেবতার যে রবীন্দ্রনাথ তিনি হচ্ছেন খণ্ডরাজ্যের বন্ধন থেকে অখণ্ড সামগ্রিকতার আলোকরাজ্যের পানে চিরন্তন অভিযাত্রী। তাঁর অভিযাত্রার পাথেয় হচ্ছে সেই চেতনসত্তার প্রেরণা বা আদর্শ। তাঁরই প্রেরণাতে জীবন ও মৃত্যু এক হ'য়ে মিশে গিয়েছে; কেননা, জন্ম জন্মান্তরের বহু সুদীর্ঘ পথ বেয়ে তার সঙ্গে কবির অন্তর-জগতে পরিচয় ঘটেছে। কবির অন্তরের গভীরে সেই জীবনদেবতা বসে থেকে কবির মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে প্রাণের সুর দিয়ে নিজেই যেন কথা বলেন। তাই কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—

> কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
> কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
> আমারে শুধায় বৃথা বারবার—
> দেখি তুমি হাস বুঝি।
> কে গো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে,
> আমি মরিতেছি খুঁজি॥ [অন্তর্যামী]

শুধু তাই নয়, কবির 'সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ' নিয়ে সেই জীবন-দেবতা কবির জীবনকে রচনা ক'রে চলেছেন। জীবনের সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে ঐক্যদান ক'রে সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে বর্তমান অভিব্যক্তির মধ্যে তিনি কবিকে উপস্থিত করেছেন; তাই সৃষ্টির প্রবহমানতার পথটি ধ'রে বর্তমান জীবনে এসে পৌঁছিলেও নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি কবির মন থেকে মুছে যায়নি। অন্তর্গূঢ় একটি সৃজনীশক্তির মতো তিনি কবির অন্তরে বসে' আছেন—কবির সমস্ত কাব্যসাধনার মধ্যেও তিনি যেন একটি প্রেরণা। তার প্রতি কবির প্রেমও তাই অসীম। এইজন্যই কবি সমস্ত প্রাণ দিয়ে জেনে নিতে চান—

> লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
> আমার রজনী, আমার প্রভাত,
> আমার ধর্ম আমার কর্ম
> তোমার বিজনবাসে।

যদি এ-জন্মের আর সব কিছুকে ভালো না লাগে, তবে কবি আজকের এই সত্তাটিকে ভেঙে দিতে চান, তিনি নূতন রূপে, নূতন পোষাক নিয়ে আবার সেই জীবনদেবতার সঙ্গে নূতন বিবাহ ডোরে বাঁধা পড়তে চান। জন্ম-জন্মান্তরের সুগভীর প্রেমবন্ধনে যে দু'জনের হৃদয় বাঁধা! তাই কবির আত্মা মৃত্যুকেও এতটুকু ভয় করে না। মৃত্যুর দ্বারপথ বেয়ে যে তিনি চিরপ্রার্থিত জীবন দেবতার কাছে পৌঁছিবেন,—যিনি জন্মে জন্মে কি যেন আশায় কবিকে নিজেই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন! কবির জীবনের উপর সেই অনিমেষ আনন্দ দৃষ্টির কোনদিনই অবসান ঘটে না। তাই জীবনদেবতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা এসে মিশে গিয়েছে,—মৃত্যুও এসেছে কবির কাছে প্রসন্ন সুন্দর এক বরমূর্তি নিয়ে। মৃত্যু-মাধুর্যের মধ্যেই যেন কবি প্রাণের অন্তঃপুরকে খুঁজে পেয়েছেন। কারণ জীবনদেবতাই মৃত্যুর দ্বারপথ দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধ'রে কবিকে পরিপূর্ণতার স্বর্গলোকে নিয়ে চলেছেন,—নিয়ে চলেছেন রাত্রি যেখানে এসে চির আলোকের দিনের পারাবারে মিশে যায়। কবির জীবনে জীবনদেবতার ভূমিকা যদি আনন্দের হয়, মৃত্যুর ভূমিকাও পরমতম পরিতৃপ্তির।

আত্মভাবের প্রাধান্য নিয়েই রবীন্দ্র-মানস জীবনদেবতার আরাধনা আরম্ভ করেছিল, এবং জীবনদেবতা-বোধের মধ্যেই নিজেকে গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছে। জীবনদেবতার প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে জীবনসৌন্দর্যও অফুরন্ত হ'য়ে ধরা দিয়েছে; জীবনদেবতা তাই কবির কাছে মাঝে মাঝে নারীমূর্তিতে এসে দেখা দিয়েছেন। কারণ, রবীন্দ্র-নাথের মতে, রমণী পুরুষের কাছে শুধু কেবল রমণী নয়, তার মধ্যে রয়েছে বিধাতার তপস্যার আদিম ধ্যানমূর্তি। এই আদিম ধ্যানমূর্তিটিই যুগে যুগে কাব্য ও শিল্পের প্রেরণা জুগিয়েছে। জীবনদেবতাও কবির কাছে তেমনি প্রেরণা রূপিণী। তাই জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নয়। জীবনদেবতার যদি কোন আসন থাকে, তবে তা' কবির অন্তরতম প্রদেশে! চিত্রা তাই রবীন্দ্র-কবি-মানসে প্রেম সৌন্দর্যের পথটি ধ'রে জীবনদেবতার জন্য সেই আসনটি গ'ড়ে দিয়েছে, যে-আসনটির কাছে মৃত্যুও সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

চিত্রা রবীন্দ্র-কবি-মানসের রূপময়ী সৌন্দর্যপ্রতিমা, আর জীবনদেবতা তাঁর ভাবতত্ত্বের বরমূর্তি। চিত্রা অন্তর বাসিনী, জীবনদেবতা কবির অন্তর জীবনে চিরদিনকার বরণীয়।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—

গত ২৯শে নভেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় মৈমনসিংহ গৌরীপুরের জমীদার, খ্যাতনামা স্বদেশ-ভক্ত, দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৫৫ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতভক্ত শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী তাঁহার একমাত্র পুত্র। ব্রজেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত ও নাট্যকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পরিণত বয়সে বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কুচবিহারের মহারাজার সহযোগে বেঙ্গল জিমখানা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের তরুণগণের নিকট তিনি হয় ত অপরিচিত—কিন্তু গত ৬০ বৎসরের বাংলার সকল সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে ও বিপ্লব আন্দোলনে তিনি যে ভাবে অকাতরে অর্থদান করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অসাধারণ। তিনি নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করিয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে রাজসাহীর এক গ্রামে তাঁহার জন্ম—তিনি ৫।৬ বৎসর বয়সে গৌরীপুরের রাজা রাজেন্দ্রকিশোরের দত্তকপুত্র হন। মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের চেষ্টায় তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংশ্রবে আসেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের সময় ৫ লক্ষ টাকা দান করেন—তাহার ফলে আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলে ব্রজেন্দ্রবাবুই সর্বপ্রথম একলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বৃটীশ সরকার দুইবার ব্রজেন্দ্রবাবুকে মহারাজা উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন—স্বাধীনচেতা ব্রজেন্দ্রবাবু দুইবারই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শুধু [illegible]

ছিল। 'ভারতবর্ষে' তাঁহার লিখিত বহু সঙ্গীত বিষয় প্রবন্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যকল পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুম ভাদুড়ীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ক্রীড়া জগতে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। ব্রজেন্দ্রবাবু বিরাট ধনী হইয়া সাধারণের জীবন যাপন করিতেন এবং সাধারণের সহি মিশিবার সময় তাঁহার অমায়িক, সহজ, সরল ও স্নেহ ব্যবহারে সকলে বিস্মিত হইত। ব্রজেন্দ্রবাবু সহৃদয় ধনী এক বিশিষ্ট প্রতীক ছিলেন, তাঁহার মত ব্যক্তির সং দেশে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

আসামে নূতন রাজ্য—

আসামের নাগাপাহাড় ও তুয়েন সাং অঞ্চল লইয়া ১লা ডিসেম্বর এক নূতন রাজ্য গঠন করা হইয়াছে রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলির অধীনে একজন কমিশন উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন ও উহাকে তিন জেলায় ভাগ করিয়া এক একটি জেলা একজন করি ডেপুটী কমিশনারের অধীন করা হইয়াছে। নাগা পাহাড়ে মোট আয়তন ৪২৯৮ বর্গ মাইল ও তুয়েনসাংএর মে আয়তন ২০০০ বর্গ মাইল। নাগা পাহাড়ের জন সং ২০৫৯৫০ এবং তুয়েনসাংএর জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ তিনটি নূতন জেলার নাম (১) নাগা পাহাড়—সদর পাটলিয়—কোহিমা (২) মকোচুত—সদর মকোচুত ও (তুয়েনসাং—সদর তুয়েনসাং। ঐ অঞ্চলে ১৯টি প্রধ জাতি বাস করে—প্রত্যেকের ভাষা ও সামাজিক রীতি নীতি স্বতন্ত্র। বহু বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের বিদ্রোহী শাসন কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিয়াছে—এখন তাহাদে উপরই প্রকৃতপক্ষে শাসন কার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হইল ঐ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করিতে পারিলে ভারতের বহু খনি সম্পদ ও নানা বাণিজ্যিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে—রেল, রা [illegible]

অধিবাসীরাও উপকৃত হইবে। যে দল শুধু অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা ক্রমে সভ্য জীবন যাপন করিবে।

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ—

গত ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা—হাওড়া হইতে সেওড়াফুলী পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ঐ ব্যবস্থা একদিকে তারকেশ্বর ও অন্যদিকে ব্যাণ্ডেল হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত চালু করা হইবে। কলিকাতা সহরে আসা যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—নূতন ব্যবস্থা চারিদিকে চালু হইলে লোকের বহু অসুবিধা ও কষ্ট দূর হইবে। ক্রমে শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, বনগাঁ, লক্ষ্মীকান্তপুর, বজবজ, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি লাইনেও বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা—

গত ২রা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে পশ্চিম-বঙ্গের শ্রম মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার জানাইয়াছেন—কলিকাতায় হাজার করা ৫৯ জন ম্যাট্রিকুলেট, ১৭·৪ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ১৫·৪ জন গ্র্যাজুয়েট বেকার আছেন। রাজ্যের সহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা: হাজার করা ম্যাট্রিকুলেট ১০৫·৭ জন, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ২৮·৩ জন ও গ্র্যাজুয়েট ২১·৮ জন। গ্রামাঞ্চলের হিসাব জানার জন্য ২টি জেলায় তদন্ত করিয়া জানা যায় সেখানে বেকারের সংখ্যা হাজার করা ম্যাট্রিক—৭ জন, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—১·২ জন ও গ্র্যাজুয়েট—৩·৫ জন। কি করিয়া এই সব শিক্ষিত বেকারকে কাজ দেওয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়া সকলে আকুল হইয়াছেন। বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার সহিত ছোট শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষি, গোপালন, পশুপালন প্রভৃতিতে শিক্ষিত বেকারগণকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলিতেছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা সত্বর সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারত রাজ্যে চাউলের অভাব—

গত ২৬শে নভেম্বর দিল্লীতে লোকসভায় ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন যাহা জানাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তিত করিয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ মাইল স্থানে ধান নষ্ট হইয়াছে—তাহাতে ৮ কোটি লোকের খাদ্যাভাব হইবে। বিহার, উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ, পশ্চিম বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বোম্বায়ে বৃষ্টির খুব বেশী অভাব ছিল। শ্রীজৈন সকলকে জানাইয়াছেন—কোন রকমে খাদ্য আমদানী করিয়া সকলকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে বটে, কিন্তু সর্বত্র প্রয়োজন অনুসারে চাল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে গম পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু বিদেশী মুদ্রার অভাবে বিদেশ হইতে বেশী চাল আমদানী করা যাইবে না। দুইটি কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য গভর্ণমেণ্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) ভারতের ঋতু পরিবর্তনের অবস্থা (২) ছোট সেচ ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত না হওয়া। সংবাদটি পশ্চিম বাংলার পক্ষে সত্যই ভয়াবহ—এ প্রদেশে লোক ভাত না খাইয়া থাকিতে পারে না। ভাতের অভাব ১৯৫৮ সালে পশ্চিম বাংলার কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

শ্রীনেহরু ও যৌগিক ব্যায়াম—

গত ১লা ডিসেম্বর পুনায় এক ব্যায়ামাগারে বক্তৃতা কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—নিয়মিত যৌগিক ব্যায়াম চর্চাই আমাকে কার্য্যক্ষম ও সুস্থ রাখিয়াছে—আমি সামান্য মাত্রায় এই ব্যায়াম করিয়া থাকি—তাহাতে আমার দেহ রোগমুক্ত আছে।" তথা শ্রীনেহরুকে একখানি তরবারী উপহার দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার লোক খুব কম ব্যায়াম চর্চা করে। তাহাদের পক্ষে শ্রীনেহরুর এই উক্তি অনুধাবন যোগ্য।

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মিলন—

গত ২৮শে নভেম্বর হইতে কয়েকদিন বিহার রাজ্যে মজঃফরপুর জেলার সদর হইতে ৮ মাইল দূরে তুর্কি নামক স্থানে দ্বাদশ নিখিল ভারত বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানী নয়ী তালিমী সংঘের সভাপতি শ্রীআর্য্যনায়কম্ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন—বিহারের রাজ্যপাল শ্রীজাকির হোসেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন-ধেবর সম্মিলনে বক্তৃতা করেন গান্ধীজির প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রণালী সমগ্র ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও এবং সরকার ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও কেন সর্বত্র মানুষ বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে না, তাহা

আজ সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবিবার বিষয়। এ বিষয়ে কাজ করিবার জন্য এখনও দেশে একদল স্বার্থত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থায় সেরূপ কর্মী প্রস্তুত হয় না—সে জন্য শ্রীআর্য্যনায়কমের মত কর্মীরা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। ভূদান বা সর্বোদয়ের মত বুনিয়াদি শিক্ষাও ভারতের মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত করিবে।

শিবাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা—

তিন শত বৎসরের পুরাতন প্রতাপগড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের এক অশ্বারূঢ় মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে—গত ৩০শে নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তথায় যাইয়া মূর্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব করিয়াছেন। শিবাজী মহারাজ ঐ দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি বিজাপুরের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎসবে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী শিবাজী মহারাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

কবি বিদ্যাপতির স্মৃতি সৌধ—

খ্যাতনামা ভক্ত কবি বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও সমগ্র পূর্বভারতের লোক তাঁহাকে আপন জন বলিয়া মনে করে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে তাঁহাকে বিশিষ্ট স্থানই দান করা হইয়াছে। আজও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহার রচিত পদ ও গান গীত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্মস্থান দ্বারভাঙ্গা জেলার বিনাফী গ্রামে ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সৌধ নির্মাণ করিতেছেন—তাহাতে একটি পাঠাগার ও সভাগৃহ থাকিবে। বিদ্যাপতি ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতকে জীবিত ছিলেন। বহু শত বৎসর পরেও যে তাঁহার কথা লোক স্মরণ করিতেছে—ইহাই জাতীয়তা-ব্যঞ্জক মনোভাবের লক্ষণ।

ভারতের রাজ্যসমূহ—

গত ১লা ডিসেম্বর দিল্লীতে সাম্প্রতিক লোক গণনার এক সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়। বোম্বাই বর্তমানে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ—তাহা পাকিস্তানের অর্দ্ধেকেরও বড়। তবে লোক সংখ্যা হিসাবে বোম্বাই দ্বিতীয়—[illegible] প্রদেশের লোক সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ—বোম্বায়ের লোক সংখ্যা তাহা অপেক্ষা দেড় কোটি কম। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর অর্থাৎ রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে মধ্যপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য ছিল—এখন তাহা দ্বিতীয়—তাহার এলাকা ১ লক্ষ ৭১ হাজার বর্গ মাইল—জাপান অপেক্ষা সামান্য বেশী। কেরল পূর্বেও সর্বাপেক্ষা আকারে ছোট রাজ্য ছিল—নূতন ব্যবস্থায় ৫ হাজার বর্গ মাইল এলাকা বেশী পাইয়াও কেরল সর্বাপেক্ষা ছোট রাজ্যই আছে। পশ্চিম বাংলা কেরল অপেক্ষা সামান্য বড়—কেরল ১৪৯৩৭ বর্গ মাইল ও পশ্চিম বাংলা ৩৩৮৮৫ বর্গ মাইল। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রত্যেকের এলাকা ১ লক্ষ বর্গ মাইল। আসাম, বিহার, মাদ্রাজ, মহীশূর ও উড়িষ্যার এলাকা ৫০ হইতে ১ লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যে। জনসংখ্যা হিসাবে আসামের লোক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম—মাত্র ৯০ লক্ষ। অন্যান্য রাজ্যগুলির নূতন গণনার ফলে লোক সংখ্যা এইরূপ—পশ্চিমবঙ্গ—২ কোটি ৬০ লক্ষ, অন্ধ্র—৩ কোটি ১॥০ লক্ষ, বিহার ৩ কোটি ৮০ লক্ষ, কেরল ১ কোটি ৩০ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ—২ কোটি ৬০ লক্ষ, মহীশূর ১ কোটি ৯০ লক্ষ, উড়িষ্যা—১ কোটি ৪০ লক্ষ, পাঞ্জাব—১ কোটি ৬০ লক্ষ, রাজস্থান—১ কোটি ৬০ লক্ষ। দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ করিয়া এবং ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রত্যেকের লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ করিয়া। বর্তমানে সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩ শত ৯৪—ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৮টি—তন্মধ্যে শুধু উত্তর প্রদেশে ১১ হাজার গ্রাম। সমগ্র ভারতে ৩০১৮ সহর—তন্মধ্যে বোম্বায়ে ৬২৫টি সহর আছে। অন্য কোন রাজ্যে এত অধিক সহর নাই। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থার পর নূতন করিয়া সংখ্যা গণনার প্রয়োজন হইয়াছিল—নূতন গণনার ফল উপরে প্রদত্ত হইল। এ সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তকে আরও অধিক তথ্য পাওয়া যাইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা—

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার অর্থের অভাব হইয়াছে। সে জন্য ভারত সরকারের পক্ষ

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। আপাতত ৩০০ কোটি টাকা প্রয়োজন—ঐ অর্থ দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করা হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমেরিকা বা ইংলণ্ড কেহই টাকা দিতে সম্মত হন নাই। আমেরিকা পাকিস্তানকে বহু পরিমাণ অর্থ দান করিতেছেন; শুধু উন্নয়ণের জন্য নহে, পাকিস্তান যাহাতে সামরিক শক্তি বাড়াইয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে, সেজন্যও প্রচুর অর্থ আমেরিকার নিকট হইতে পাইতেছে। ইংলণ্ডের পক্ষেও মাত্র ২০ কোটি পাউণ্ড ভারতকে প্রদান করা কষ্টসাধ্য ছিল না। এ অবস্থায় ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট নীতিতে বিশ্বাসী নহে, সেজন্য ঐ টাকা পাওয়া ও লওয়া, উভয় কার্য্যই কষ্টকর। চীন বা জাপান ধনী দেশ নহে, তথাপি ভারতকে তাহাদের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইতেছে। জগতের গতি কোন দিকে বা ইংলণ্ড-আমেরিকা সত্যই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধাইতে আগ্রহশীল কি না—তাহা আজ বুঝা কঠিন হইয়াছে।

স্কুলের পরীক্ষার সময়—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার সময় ডিসেম্বরে না করিয়া মার্চ-মাসে করার আদেশ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীজে-বি-মিত্র এক সাংবাদিক সম্মিলনে সরকারের ঐ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী এই ৪ মাস ভাল করিয়া পড়ার সময়—গরম থাকে না—উৎসবাদিও কম। ঐ ৪ মাসে ছাত্রদের ভাল করিয়া পড়াইবার সুযোগ পাইয়া প্রধান শিক্ষকগণ আনন্দিত হইয়াছেন। পূজার ছুটীর বড় উৎসবে ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পায় না—কাজেই ছুটীর পরই বার্ষিক পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হয়। গরমের ছুটী পরীক্ষার অব্যবহিত পরে করিলে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে করিলে ছাত্ররা এক টানা বহু মাস ভাল করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইবে। অবিলম্বে যাহাতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় ও বিনা-মূল্যে স্কুলে জল খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সেজন্য প্রধান শিক্ষক সমিতি সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, আগামী এপ্রিল মাস হইতে সরকার এ ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ করিবেন।

বুনিয়াদি শিক্ষা অপরিহার্য্য—

গুজরাট বিদ্যাপীঠের আচার্য্যরূপে তথায় সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন—গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত সরকার সে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করার ফলেই দেশ দিন দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপতি ত একথা বলিলেন—কিন্তু গ্রহণ করিবে কে? সরকারী কর্মকর্তারা বুনিয়াদি শিক্ষার তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করেন না, বুঝেন না। আমরা বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুনিয়াদি-শিক্ষণপ্রাপ্ত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বুনিয়াদির নীতিতে বিশ্বাস করেন না। মাত্র চাকরী হিসাবে তথায় কাজ করেন—কার্য্যে আন্তরিকতা নাই। এ অবস্থার পরিবর্তন কবে হইবে?

গম আমদানী—

ভারতের খাদ্যাবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। একদিকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা জনগণের আগ্রহের অভাবে আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে না, অপর দিকে দৈব-দুর্বিপাকে বহু শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সে জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া চাল ও গম আমদানী করিতে হইতেছে। কানাডার মন্ত্রী মিঃ ব্রাউন দিল্লীতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা অবিলম্বে ভারতকে ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যে কানাডিয়ান গম সরবরাহ করিবে। কিন্তু এইভাবে কতদিন ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র বৃদ্ধি—

ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গত কয় বৎসরে নূতন বি-টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ বৎসর সরকার ২টি নূতন কলেজ খুলিবেন—একটি বেলুড়ে ও অপরটি কল্যাণীতে। দুইটিতে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। সেজন্য এককালীন ২১ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ২টি কলেজ হইতে প্রতি

বৎসর ১২০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে। ফলে বৎসরে ১২৫০ জন উচ্চ-বিদ্যালয় শিক্ষকের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল।

ভারত সাধু সমাজ—

২ বৎসর পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় ভারতবাসী সন্ন্যাসীদের লইয়া ভারত সাধু সমাজ গঠিত হইয়াছে। গত ২রা নভেম্বর আমেদাবাদে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত সাধু সমাজের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় এক হাজার সাধু, সন্ত ও মণ্ডলেশ্বর সন্ন্যাসী তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু বলেন—ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় এবং বাঁধ নির্মাণে এঞ্জিনিয়ারগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঐরূপ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সকল রাষ্ট্রে সাধু সমাজ গঠিত হউক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। জাতিগঠন কার্য্যে আজ ভারতের প্রত্যেক মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে। সন্ন্যাসী সমাজকে এ কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়া রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। কি ভাবে সন্ন্যাসীরা কাজ করিবেন, তাহা তাঁহারাই স্থির করিয়া লইবেন।

নেতাজীর মৃত্যুরহস্য—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু পূজার সময় ২ সপ্তাহের জন্য জাপানে যাইয়া নেতাজীর মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। নেতাজী সম্বন্ধে সরকারী কমিটীর তদন্ত-বিবরণ তিনি ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ব্যারিষ্টার বসুর ধারণা উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই। নেতাজী এখনও জীবিত আছেন কি না, সে বিষয়ে অমিয়নাথ কোন মন্তব্য করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন—জাপানীরা সেখানে নেতাজীর নামে একটি বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান করিতে চাহে। বর্তমান সময়ে এক দিকে চীন ও জাপান এবং অপর দিকে ভারত—এই দেশগুলির মধ্যে যাহাতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনটি দেশের লোকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান যাহাতে বাড়ে সে জন্য সকলের বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য। নেতাজীর স্মৃতিতে সেইরূপ কার্য্যের জন্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তিনটি দেশের লোকই উপকৃত হইবে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

দার্জিলিংয়ে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিদের এক সম্মিলনের ফলে ভারতের সর্বত্র পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমী পাওয়া গিয়াছে। সে সকল জমী দেখিবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহীশূরে সফর করিবেন। বিহারে ১১ হাজার একর জমী দখলে আসিয়াছে ও আরও ১১ হাজার একর দখলে আসিবে। বোম্বায়ে ৬ শত একর জমী পাওয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশে ৫০০ কৃষি পরিবারের বাসের ব্যবস্থা হইবে। রাজস্থানে ৫ হাজার একর জমী পাওয়া গিয়াছে, আরও ৫ হাজার একর পাওয়া যাইবে। মহীশূরে ৮ হাজার একর পাওয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার মালকান গিরিতেও হাজার একর ও কালাহাণ্ডিতে ২০ হাজার একর জমী পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরায়ও নূতন ৮০ হাজার একর জমী পাওয়া যাইবে। পশ্চিম বঙ্গে জমীর অভাব অত্যন্ত বেশী। উদ্বাস্তু ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গবাসী কেহ যদি অন্য প্রদেশে জমী লইতে ও বাস করিতে সম্মত হন সরকারের তাহাতেও সম্মত হওয়া উচিত। পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ী অধিবাসীদেরও আজ পুনর্বাসন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

উদ্বাস্তু সমস্যার কথা—

হাওড়া মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর এক সাধারণ সভায় উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করিয়া উহার পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদের উদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য না করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সভায় বলা হইয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। পরদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারিত এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের বা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ বা চাকরীতে নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহাদের নগদ অর্থসাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল পরিবারের পুনর্বাসন হইয়াছে বা যাহারা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী,

তাহাদেরও আর আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে না। যে সকল উদ্বাস্ত সরকারের পুনর্বাসনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে তাহাদের আর উদ্বাস্ত শিবিরে থাকিতে দেওয়া হইবে না ও তাহাদের নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে না। এই আদেশ অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে দেশের শাসন কার্য্যে বাধা উৎপন্ন হইতেছে।

দরকার। আই-এতে ১৫ টাকা, আই-এস-সি ২০ টাকা, বি-এতে ২০ টাকা ও বি-এস-সিতে ২৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা বহু দরিদ্র ছাত্রকে উপকৃত করিবে সন্দেহ নাই।

কালনায় স্মারক স্তম্ভ—

বুদ্ধ জয়ন্তীর স্মারক হিসাবে বর্দ্ধমান জেলার কালনা সহরে স্থানীয় অঘোরনাথ পার্কে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের বিজয়া সম্মিলনে (মহেশ-তলায়) সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ

পাকিস্তানে বাংলা ভাষা শিক্ষা—

করাচীতে পাকিস্তানের নূতন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী লুতফর রহমন নির্দেশ দিয়েছেন যে অতঃপর পাকিস্তানের রাজধানী করাচীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উর্দু ও বাংলা উভয় রাষ্ট্রভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত শুধু উর্দু ভাষায় বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। করাচীতে ২ হাজার বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী আছে—সেজন্য অবিলম্বে মন্ত্রীর নির্দেশ কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী—

স্কুল ফাইনাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসর বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বৎসর ঐ সংখ্যা বাড়াইয়া ১১০০ করা হইবে। যোগ্যতা ও দারিদ্র্য—দুইটি বিষয় সর্বত্র বিবেচিত হইবে। পারিবারিক আয় মাসিক ৪ শত টাকার অনধিক হওয়া

করা হইয়াছে। অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় মহাবোধী সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ ঐ উৎসবের উদ্বোধন করেন। বাংলার মফঃস্বল সহরে এইভাবে বুদ্ধ-জয়ন্তীর স্মারক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া কালনাবাসীরা নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালনাবাসী শ্রীরাসবিহারী সেনের নেতৃত্বে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় জমীর সন্ধান—

পশ্চিম বাংলায় কয়েকটা জেলায় তদন্ত করিয়া প্রায় ২ লক্ষ একর অনাবাদী ও পতিত জমীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ জমীর উন্নতি বিধান করা হইলে বহুসংখ্যক উদ্বাস্ত তথায় বাস করিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। জমীগুলি সংস্কার করিতে কিছু বেশী টাকা ব্যয়

হইবে। উহার এক লক্ষ একর জমীতে তাল ও নারিকেল চাষ করা যাইবে। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ঐ জমী অবস্থিত।

ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণমেনন বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—১৯৫৬ সালের ৪ঠা মে তুরস্ক ও ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুন ইরাক ভারতবর্ষকে জানাইয়াছে যে,

জাতীয় বধির সম্মেলন

বাম হইতে—৮ম—শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, ৯ম—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় সভাপতি জাতীয় বধির সম্মেলন। ১ম শ্রীমদনমোহন পাল সাধারণ সম্পাদক জাতীয় বধির সম্মেলন

ভারতীয় মহিলার সম্মান—

পশ্চিমবঙ্গ বাটানগর নিবাসী ভারতীয় মহিলা শ্রীমতী লায়লা শেঠের বয়স ২৮ বৎসর—তাঁহার ২ সন্তান। তিনি ২৬শে অক্টোবর বিলাতে ব্যারিষ্টার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এবারের ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম লক্ষ্ণৌ সহরে। এই ভারতীয় মহিলার অসাধারণ সম্মানভাবে ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

ইরাক ও তুরস্ক ভারত-বিরোধী—

কাশ্মীর সমস্যায় উভয় দেশের স্বার্থ আছে—কারণ ঐ সমস্যা বাগদাদ চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ 'পাকিস্তানে'র উদ্বেগ ঘটাইতেছে। উহা ভারতবর্ষ 'সামরিক ফতোয়া' বলিয়া মনে করে। বৃটেন বাগদাদ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ সদস্য ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ চুক্তির সামরিক কমিটির সদস্য। কাজেই ইরাক ও তুরস্ক ভারতের বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করিয়াছে, তাহার পিছনে মার্কিণ ও বৃটেনের সমর্থন আছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীজহরলাল নেহরুর শত চেষ্টা সত্বেও তলে তলে বহু দেশ যে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ বাধাইবার জন্য সচেষ্ট, এই সংবাদে তাহাই প্রমাণিত

বসিরহাটে গোবিন্দ মন্দির—

মহারাজা প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়া যশোহরের নিকট গোপালপুরে তাহা

বসিরহাটের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ

প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান হইবার পর ঐ মূর্ত্তি বসির-হাটে আনিয়া টাকী রোড ও সার রাজেন্দ্র রোডের

চৌমাথার নিকট পূজিত হইতেছেন। গত ১লা অগ্র-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক উৎ ঐ মূর্ত্তির জন্য মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উৎসব হইয়া প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উৎসবে অতিথি হইয়া মূর্ত্তির ইতিহাস বিবৃত করেন। বর্ত্ত রাজা শ্রীলালমোহন রায় ও শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বিগ্র সেবাইত। তাঁহারা উদ্বাস্তু ও অর্থহীন। যাহাতে ম নির্ম্মাণ সুসম্পন্ন হয়, সে জন্য বসিরহাটের নেতৃ জনসাধারণকে অর্থ সাহায্য করিতে আবেদন জানাই ছেন। সেবাইতগণ অর্থগ্রহণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ ক সম্মত হইয়াছেন।
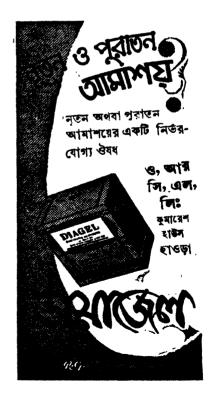
শ্রমদান

ভারতের প্রাণ ভারতের গ্রাম। এই বিশাল দেশের সর্ব্বত্র যে বিপুলসংখ্যক গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে ; সহর ও সহরতলীর বাইরে গেলেই যাদের চোখে পড়ে—সেই সমস্ত অনাদৃত, অবহেলিত, অপরিষ্কৃত গ্রামগুলির সর্ব্ববিধ উন্নতি হওয়া উচিতই শুধু নয়, অতি আবশ্যকীয়ও বটে। সুখের বিষয় আজকাল গ্রামবাসীরাও এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছেন, আর শ্রমদানের মাধ্যমে বাল-বৃদ্ধ সকলেই গ্রামোন্নয়নে সাহায্যও করছেন। এখানে উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের এক বৃদ্ধ চাষীকে হাস্যমুখে গ্রামোন্নয়নের কাজে মাথায় ভার বইতে দেখা যাচ্ছে।

মরু স্বপ্ন

নৃপেন সরকার

"ইয়া হাবিবতি, এগ্রি, এগ্রি, এগ্রি ই ই" (ওগো প্রিয়া, জাগো, জাগো, জাগো)—মরুভূমির বুক চিরে বাঁশীটা উঠলো বেজে দূর "ওয়েসিস"টার মাঝ থেকে। জ্যোৎস্না রাত—রাত তখন দুটো। শেষ রাতের প্রহরী বদল হচ্ছিল বুটের খট্ খট্ আওয়াজের ভিতর। তাঁবুর ভেতরের স্তব্ধ বাতাস যেন উতলা হয়ে উঠেছে। জানিনা কখন উঠে বসেছি। আস্তে আস্তে ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে রিভলবারটা গাউনের পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়লুম ওয়েসিস্টার দিকে।

ধপধপে জ্যোৎস্না রাত। মরুর বালুগুলোর ওপর আজ কে যেন নোতুন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। দূরের বেদুইনদের তাঁবু থেকে মাঝে মাঝে হল্লার রেশ ভেসে আসছে রাতের হাওয়ায় ভর করে। ওরা বোধ হয় বড় রকম কিছু লুঠ করেছে—তারই উৎসব; সব কিছু ছাড়িয়ে কিন্তু বেজে চলেছে বাঁশী করুণ সুরে সেই ওয়েসিস্টার মাঝ থেকে।

জলের ধারে খেজুর গাছের সারি। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে চব্বিশ কি পঁচিশ বছরের এক বেদুইন—সেই বাঁশী বাজাচ্ছিল। পরণেকাল লম্বা ঝুলের জামা—মাথায় সাদা চাদরের ওপর কাল কাল দড়ির প্যাচ। অজানা শিল্পী যেন বছরের পর বছর ধরে পাথর খুদে তাকে মূর্ত্তি দিয়েছে। অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। আমার সম্বোধনের উত্তরে "আলে কুম সালাম"—তোমার শান্তি হোক—বলে তারই পাশে বসতে ইসারা করলো, আরবী ভাষাটা বেশ ভাল করেই জানা ছিলো—চার বছর লড়াই করতে এসে থাকতে হয়েছে মরুর বুকে এই বেদুইনদের মধ্যেই। তাই আলাপ জমে উঠতে সময় লাগলো না বেশীক্ষণ। এ কথা সে কথার পর যখন বাঁশীর কথা উঠলো, দেখি উজ্জল হয়ে উঠেছে তার মুখ। চাঁদটা হঠাৎ যেন আরো বেশী জ্যোৎস্না ঢেলে দিল, তার ঠোঁটের একটু বাঁকা হাসি সেই আলোতে মনের মধ্যে অজানা ভয় ও আনন্দের একটা মেশানো ভাবই যেন তুললো জাগিয়ে।

"জান, রফিক্ (বন্ধু)"—বলতে সুরু করলো সে, বাঁশীটাকে তার সবল হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে—"তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো আমেদ শেখের দল থেকে। আমেদ শেখ তো লড়াইতে হেরে গেল, আর মেয়েদের ফেলে পালিয়ে বাঁচালো জান্। যখন ভাগাভাগি আরম্ভ হলো—সর্দ্দার আবদাল্লার প্রিয় ছিলুম খুবই, তার সব চাইতে খুব্‌সুরুৎ বলে তাকে দিলো আমার ভাগে। সব সময় চুপ করে মুখ বুজে থাকতো পড়ে সে। বন থেকে দল ছাড়িয়ে ধরে আনা গ্যাজেল হরিণীর মতন —পুরানো দলের কথা ভাবতো তাঁবুর কোণে বসে। যখন কিছুতেই তার মন পেলুম না, তখন শেষ শরণ নিলুম এই বাঁশীর। ছোট বেলায় উট্ চড়বার সময় সখ করে শিখেছিলুম, আজ তা কাজে লাগলো। তার মনের সঙ্কোচ আস্তে আস্তে গেল কেটে, বাঁশীতেই তার যত লোভ বিশেষ করে এই চাঁদনী রাতে।

ঠিক এই গাছের নীচে বসে আমি বাজাতুম—আর সে—সে আমার কোলে মাথা রেখে তার ভাসা ভাসা চোখ দুটোতে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে শুনতো। দূরের ওই তারাটা অমনি করেই জল জল করে উঠতো—খানিক বাদে আশমানে যখন লাল্‌চে রোশনাই উঁকিঝুঁকি মারতো, নমাজের আজানের আওয়াজ পেতুম, দুজনে ফিরে যেতুম তাঁবুতে। বছর গেল কেটে। দমকা ঝড়ের মতন আচমকা শেখ আমেদ হাম্‌লা (আক্রমণ) করলো একরাতে বদলী নিতে। কেউ ছিলুম না তৈরী। তাকে পিছনে রেখে লাগতুম লড়তে।

কোথেকে একটা সড়্‌কি এসে লাগলো তার বুকে, ফিরে যেই বাঁচাতে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমারো বুকে পড়লো একটা সড়্‌কি। দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে পড়লুম। আর এই দুনিয়ার ভোরের আলোয় নমাজের আজান শোনেনি। বাঁশীটা কিন্তু সে হাত থেকে ছাড়েনি। সেই রাতই হল আমাদের মিলনের শেষ রাত; এইখানে, ঠিক এই গাছের নীচে। তাই জ্যোৎস্না রাতে এখনো তাকে জাগিয়ে দিতে আসি—এখনো বলি জাগে জাগো, জাগো প্রিয়া, আমাদের পুরানো সেই দুনিয়ায়—"

গাছের পাতাগুলো হঠাৎ যেন বিশ্রীভাবে মড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠলো। মরু ঝড় হয়েচে সুরু। দূর থেকে ঘূর্ণি বালু চার ধার অন্ধকার করে আমাদের দিকে ছুটে আসছিলো। ঃাৎ দেখি বেদুইন ছেলেটা নেই—খেজুর গাছের নিচে ঃস আছি আমি একা। সে গেল কোথায়? রফিক, রফিক বলে ডাকলুম কতো—কেউ কোথাও নেই, খালি দূর থেকে মরু ঝড়ের সোঁ সোঁ আওয়াজ। তারপর—যখন চোখ খুললুম, দেখি আমি মিলিটারী হাসপাতালে। রাতের মরু পেট্রলপার্টি ওই ওয়েসিসের মধ্যে নাকি আমায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে—তারাই তাড়াতাড়ি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিল হাসপাতালে।

তারপর কতদিন গেছে কেটে—কিন্তু এখনও চাঁদনি রাতে যখনই আকাশের দিকে তাকাই মনে পড়ে আরব-মরুর সেই রাতের কথা—এখনো শুনি সেই বেদুইনের বাঁশী বেজে চলেছে "ই আবিবাতি, এগ্রি, এগ্রি, এগ্রি ই ই (ওগো প্রিয়া, জাগো, জাগো, জাগো)।"

[লেখক তাঁর ১৯৪১-১৯৪৩ সালের সৈনিক জীবনের কালে ইরাকের মরুভূমিতে এই গল্পটি লিখেছিলেন]

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

বিজ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য সত্যের সন্ধান। এই সাধনার ক্ষেত্রে জাতি-ভেদ নাই; জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মনুষ্য সমাজের পক্ষ হইতে সাধকবৃন্দ প্রকৃতির গোপন তত্ত্বের সন্ধান করেন। সে সন্ধানে কোনও বিশেষ জাতির বিজ্ঞানী সাফল্য অর্জ্জন করিলে কাহারও উদ্বেগের বা ঈর্ষার সঞ্চার হইবার কথা নহে। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্থান সেখানে নাই; জাতীয় জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। কিন্তু মনুষ্য-জাতির চরিত্র আজ বিকৃত: স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস মানুষ হারাইয়াছে, দলবদ্ধভাবে এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতেছে। স্বভাবতঃ, এই সমাজে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিচার হয় সর্ব্বাঙ্গীণ সমরায়োজনের উপর—সে সাফল্যের প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিতে,—সত্যের প্রতিষ্ঠা সেখানে আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। গত অক্টোবর মাসে রুশিয়া যখন রকেটের সাহায্যে আকাশে প্রথম উপগ্রহ (রুশ নাম স্পুটনিক) নিক্ষেপ করে, তখন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিচার হইয়াছিল সমরায়োজনের দৃষ্টিতেই। নভেম্বর মাসের প্রথমে রুশিয়া একটি বৃহত্তর উপগ্রহ (বা স্পুটনিক) শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া সমরায়োজনে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের আরও বেশী বিস্ময় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয় "স্পুটনিক"—

গত ৩রা নভেম্বর মস্কো রেডিওয় ঘোষিত হয় যে, সোভিয়েট রুশিয়া আধ টন ওজনের একটি স্পুটনিক শূন্যে নিক্ষেপ করিয়াছে; জীবদেহে মহাশূন্যের প্রতিক্রিয়া জানিবার জন্য উহাতে একটি কুকুরও পাঠান হইয়াছে। দ্বিতীয় স্পুটনিকের গতিবেগ প্রথমটির মত ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল; উহা ৯৩০ মাইল উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রথম স্পুটনিক ৫৬০ মাইল উপর দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতি ৯৫ মিনিটে উহার একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইতেছিল। দ্বিতীয়টি আরও বেশী উপর দিয়া ঘুরিতে থাকায় উহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সময় ১০২ মিনিট। প্রথম স্পুটনিক নিক্ষিপ্ত হইবার পর মার্কিণ বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহার প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক হাজার পাউণ্ড করিয়া রকেট প্রয়োজন হইয়াছে। এই [illegible]

রকেট আকাশে নিক্ষেপ করা একরূপ অসম্ভব। এখন নিশ্চিত জানা গিয়াছে যে, রুশিয়া এক নূতন শক্তির সাহায্যে আকাশে স্পুটনিক নিক্ষেপ করিতেছে—সে শক্তির সন্ধান অন্য কোনও দেশের বৈজ্ঞানিকের জানা নাই।

রুশ বিপ্লবের ৪০শ বার্ষিক অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে রুশিয়া এই অনুষ্ঠান-সপ্তাহেই দ্বিতীয় স্পুটনিক নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক বক্তৃতায় মঃ ক্রুশ্চেভ স্পুটনিক নিক্ষেপে "রুশিয়ার বিজয়ের" জন্য আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিলেও যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য আগ্রহ জানান; আপোষ-আলোচনার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক আহ্বানের সুস্পষ্ট প্রস্তাবও করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কোনও গুরুত্ব দেন নাই; উহা নাকি আন্তরিকতাবিহীন প্রচার মাত্র। রকেট নির্ম্মাণে ও উহার ক্ষেপণ-পদ্ধতিতে রুশিয়ার বিরাট সাফল্য অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় তাহার যে প্রাধান্যের সূচনা করে, তাহাতে আমেরিকায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য পক্ষ কম্যুনিষ্ট দেশগুলি অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে অধিকতর শক্তিশালী—আণবিক অস্ত্রের পরিমাণ তাহাদের এত বেশী এবং এত দ্রুত তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহার পর তিনি জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আণবিক অস্ত্রসজ্জার এক ভয়াবহ বিবরণ শুনাইয়াছেন। এই বিবরণ শুনিয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আতঙ্কিত হউক, আর না-ই হউক, আমেরিকার মিত্ররাষ্ট্রগুলি উহাতে আশ্বস্ত বোধ করিবে না। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি হয়, তাহা হইলে আণবিক অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার আজ সুনিশ্চিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আণবিক অস্ত্রের আঘাতে আক্রমণ-ঘাঁটীগুলি চূর্ণ করাই হইবে প্রতি-পক্ষের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররাষ্ট্র-গুলির পক্ষে চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন একেবারেই গৌণ; যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র আণবিক অস্ত্রের আঘাতে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হইবার সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা।

কবি গোল্ডস্মিথের গ্রাম্য শিক্ষক যেমন তর্কে হারিয়া গেলেও তর্ক করিতে পারিতেন, তেমনি পাশ্চাত্য কূটনীতিকদের Position of strengthএর নীতি ব্যর্থ হইলেও সেই নীতিতে অবিচলিত থাকিবার যোগ্যতা তাঁহারা দেখাইতেছেন। বর্ত্তমানে আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে গোপন তথ্য আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে, এবং অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থাকে হাইড্রোজেন অস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ সজ্জিত সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিবিরের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটী দেশগুলির বিপদ ইহাতে কমিবে না; এই ব্যবস্থার পরও কম্যুনিষ্ট [illegible] ঘাঁটী নিষ্ক্রিয় হইবার আশঙ্কা

থাকিবে। ইউরোপের যে সব দেশ সামরিক শক্তির দ্বারা কম্যুনিজমের প্রসার নিবারণে মার্কিণ নীতির (position of strength) সমর্থক, তাহাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি—অস্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য শিবির যে অত্যন্ত প্রবল, ইহা নিশ্চিত জানিলে সোভিয়েট রুশিয়া কখনও আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনে সাহসী হইবে না। তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তি—যদি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ঘাঁটী হইতে দ্রুত আঘাত করিয়া রুশিয়ার আক্রমণ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করা সম্ভব হইবে। এই দুইটি যুক্তিই আজ সম্পূর্ণ অসার অস্ত্রশক্তির সুস্পষ্ট প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং সেই প্রতিষ্ঠার দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়াকে নতি স্বীকার করাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র দ্রুত আঘাতের দ্বারা তাহাকে পঙ্গু করিবার আশাও বৃথা প্রতিপন্ন হইয়াছে—রকেটবাহী হাইড্রোজেন্ অস্ত্রের যুগে এই আশা নিতান্তই অলীক।

নূতন ফরাসী মন্ত্রিসভা—

গত অক্টোবর মাসে বুর্জ্জোয়া ম্যানরী মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের পর মাসাধিক কালের চেষ্টায় নভেম্বর মাসের প্রথমে ফেলিক্স-গাইয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। আলজেরিয়ান অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রবল গণ-বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী এবং শেষ পর্য্যন্ত বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট ও কমুনিষ্টদের (আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল) মিলনে পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারে। মঃ গাইয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীরা একত্রে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মত হইয়াছেন এই আশঙ্কাতেই It is the spectre of a popular front that has brought the followers of M. Pinay and those of M. Mollet together into a new co-alition.—(London Economist') স্বভাবতঃ, কোন রকমে টিকিয়া থাকা ছাড়া এই গভর্ণমেন্টের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি নাই—সম্মিলিত দলগুলির উদ্দেশ্য পরস্পর-বিরোধী। মঃ ফেলিক্স গাইয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডলের অর্থসচিব ছিলেন। বয়সে তিনি খুবই তরুণ (৩৮ বৎসর বয়স); ইতিমধ্যেই তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কট সামলাইতে দক্ষ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বাম ও দক্ষিণ-পন্থীরা তাঁহার নেতৃত্বে একত্র হইবার ইহা অন্যতম কারণ।

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কট এখন খুবই প্রবল; মঃ গাইয়ারের পক্ষে ইহার সমাধান সাধ্যাতীত। আলজেরিয়ার যুদ্ধের জন্য এখন ফ্রান্সের বাৎসরিক ৭০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে; মার্কিণ সাহায্যে ইহার কিছুই পূরণ হইতেছে না। ফলে আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেনে ও বাজেটে ঘাঁটতি দেখা দিয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। মঃ গাইয়ার আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ৪০ কোটী ডলারের মত ঋণ পাইতে পারেন; পশ্চিম জার্ম্মানীর নিকট হইতেও কিছু ঋণ লইতে চেষ্টা করিবেন। কিছু জাতীয় ঋণ এবং কিছু কর বৃদ্ধির দ্বারা তিনি বাজেট ঘাঁটতি নিবারণে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু ইহা হাতুড়ি দাওয়াই মাত্র। ইহার দ্বারা সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়; কারণ আলজেরিয়ার যুদ্ধজনিত বিরাট অপব্যয় তাঁহাকে করিয়া যাইতেই হইবে। এই যুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্কট অবসান হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই।

ন্যাটোর অভ্যন্তরে বিরোধ—

গাইয়ার গভর্ণমেন্ট ক্ষমতালাভ করিয়াই "ন্যাটোর" অভ্যন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের পুরাতন জমিদারী টিউনিসিয়ায় বৃটেন্ তিন শত ছোট মেসিন্ গান এবং সত্তরটি ব্রেণ গান পাঠাইয়াছিল; আমেরিকা পাঠাইয়াছিল পাঁচ শত রাইফেল। ইহাদের এই আচরণে "অতলান্তিক সংহতি" নষ্ট হইয়াছে বলিয়া গাইয়ার মন্ত্রিমণ্ডল অভিযোগ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্যারিসে 'ন্যাটোর" পার্লামেণ্টারী সম্মেলনের সময় ফরাসী প্রতিনিধিরা এই জন্য ক্ষুব্ধ চিত্তে সম্মেলন ত্যাগ করেন। টিউনিসিয়া স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভের পর হইতে ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেন্ট এই যুক্তিতে টিউনিসিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করেন যে, এই সব অস্ত্র আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের হাতে পড়িবে। এই যুক্তির উত্তরে টিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারগুবা বলিয়াছেন যে, আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহীরা টিউনিসিয়ার দেশরক্ষী বাহিনী অপেক্ষা ভালভাবে অস্ত্র সজ্জিত; টিউনিসিয়া হইতে অস্ত্র লওয়ার প্রয়োজন তাহাদের নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৃটেন্ ও আমেরিকা হইতে টিউনিসিয়া যে অস্ত্র পাইয়াছে, তাহার দ্বারা শুধু অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করাই সম্ভব। এই ধরণের অস্ত্রের অভাব ঘটিলে রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং, প্রেসিডেণ্ট বারগুবা সঙ্গতভাবেই বলিয়াছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র যদি তিনি নাই পান, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তিনি কম্যুনিষ্ট শিবিরের শরণাপন্ন হইবেন। তাঁহার এই কথায় কাজ হইয়াছে। আরব জগতের মিশরে ও সীরিয়ায় কম্যুনিস্ট অস্ত্র প্রবেশ করায় এই রাষ্ট্র দুইটি ক্রমে পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাবের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। টিউনিসিয়াও যাহাতে সিরিয়া ও মিশরের দলে ভিড়িয়া না যায়, যে জন্য বৃটেন্ ও আমেরিকা তাহাকে নামমাত্র কিছু রাইফেল-বন্দুক পাঠাইয়া জানাইয়াছে যে, তাহারা টিউনিসিয়ার পক্ষে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, টিউনিসিয়ার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিত যে চুক্তি হয়, তাহাতে এমন কোনও কথা নাই যে, টিউনিসিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র শুধু ফ্রান্সের নিকট হইতেই ক্রয় করিবে।

ফ্রান্স অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) একটি স্তম্ভ। বৃটেন্ ও আমেরিকা তাহার সহিত বিরোধ বাড়াইয়া তুলিবে না। ফ্রান্সেরও এই অভিমানে প্রশ্রয় দিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, ন্যাটোর অভ্যন্তরের এই বিরোধ মিটিতে দেরী হইবে না। কিন্তু এই বিরোধে "ন্যাটোর" অভ্যন্তরে যে আদর্শগত অনৈক্য এবং স্বার্থের সঙ্ঘাত সূচিত হইয়াছে,

তাহা উপেক্ষণীয় নহে। "স্বাধীন দুনিয়ার" স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক সংস্থা এই "ন্যাটো"। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীন দুনিয়ার এই প্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিস্ত এক-নায়ক শাসিত স্পেন ও পর্ত্তুগালকে গ্রহণ করিতে বৃটেন্ ও আমেরিকা ইতস্তত করে নাই। আমেরিকা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করিয়া থাকে। অথচ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স "ন্যাটোর" বিশিষ্ট সভ্য। ইহা ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ যথেষ্ট। সাইপ্রাস লইয়া গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ বৃটেন্ বেশ ভালভাবেই পাকাইয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সাইপ্রাস-সমস্যা অচল অবস্থায় পৌছিয়াছে; গ্রীক্,-তুর্কি বিরোধ প্রায় অচল অবস্থায় পৌছিয়াছে। সর্ব্বোপরি তৈল-প্রধান মধ্যে প্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রাধান্য লইয়া বৃটেন্ ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চাপা বিরোধ।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ ও সোভিয়েট রুশিয়া—

গত নভেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়ার "ভিটোর" হুম্‌কীতে কাশ্মীর সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নূতন চাল ব্যর্থ হয়। পাকিস্থান যে কাশ্মীর আক্রমণকারী—এই মূল কথাটা চাপা দিয়া তথাকথিত গণ-ভোটের নামে পাকিস্থানকে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলিতে দিবার চক্রান্ত দশ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। বৃটেন, আমেরিকা ও তাহাদের তিনটি অনুগত রাষ্ট্র এবারও এই চক্রান্ত সিদ্ধির আয়োজন করিয়াছিল; তথাকথিত গণ-ভোটের প্রাথমিক পর্ব্বরূপে কাশ্মীর হইতে সৈন্য সরাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা আর একবার ডাঃ গ্রাহামকে ভারতীয় উপ-মহাদেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। পাকিস্থানের দস্যুবৃত্তিকে চাপা দিবার এই সুকৌশলী প্রয়াসের বিরুদ্ধে ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। কিন্তু "Four of the permanent members of the Security Council (Britain, U. S. A., France and Nationalist China) support Pakistan for political reasons while Iraq, the Phillipines, Columbia and Cuba are politically in Washington's pocket" (New Statesman) সুতরাং, ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব অনায়াসে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার "ভিটোর" হুম্‌কীতে হইতে পারে নাই। (নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা বার: পাঁচটি স্থায়ী; ছয়টি অস্থায়ী। জাতি-সঙ্ঘের সনদের বিধান অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য একমত না হইলে কোনও কার্য্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না, অর্থাৎ একটি সদস্য বিরোধিতা করিলে দশটি ভোটে সমর্থিত কার্য্যকরী প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। স্থায়ী সদস্যদের এই প্রস্তাব বাতিল করিবার অধিকারই "ভিটোর" অধিকার

এই মর্ম্মে সংশোধন হয় যে, ডাঃ গ্রাহাম ভারতীয় উপমহাদে আসিয়া জাতি-সঙ্ঘের পূর্ব্ববর্তী দুইটি প্রস্তাব কার্য্যকরী করা সম্প ভারত ও পাকিস্থানের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। সোভিয়ে রুশিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নাই—উহা সমর্থনও ক নাই। কাজেই, উহা পাস হইয়াছে। ভারত এই প্রস্তাব গ্রহণ ক নাই; কারণ পাকিস্থানকে আক্রমণকারী বলিয়া প্রস্তাবে স্বীকার কর হয় নাই। তবে, ভারতের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, ভার তাহার অভ্যস্ত আতিথিপরায়ণতা অনুযায়ী ডাঃ গ্রাহামকে যথোচি সম্বর্দ্ধনা জানাইবে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনার সময় রুশ-প্রতিনি যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার বৃহত্ত এবং বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের জনমতকে প্রভাবি করিবার জন্যই যে শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের কাশ্মীর নী সমর্থন করে না, এই সমর্থনের পশ্চাতে যে তাহার নিজস্ব গভী স্বার্থ রহিয়াছে, ইহা সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ সুবোলেভের বক্তৃতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি শুধু গ্রাহাম মিশন সংক্রা প্রথম প্রস্তাবেরই বিরোধিতা করেন নাই—পাকিস্থানকে মার্কি সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করিবার দাবীও তিনি জানাইয়াছেন গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেন এই কারণে "Britain and the U. S. A. had tried to Keep ope the door for strategic penetration of Kashmir... The large-scale military assistance given by th west had exposed the true nature of thei intentions which was to turn Kashmir into fortified military bulwork.

কাশ্মীর প্রশ্ন প্রথম হইতেই আন্তর্জ্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বের সহি জড়াইয়া গেলেও পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়া এই সম্পর্কে সক্রিয় আগ্র প্রকাশ করে নাই, কারণ এই সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ভারত পাকিস্থানের আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক তখন খুব স্পষ্ট ছিল না। কি আজ পাকিস্থান সুনির্দ্দিষ্টভাবে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোটে সভ্য, এবং ভারত সুনির্দ্দিষ্টভাবেই সমস্ত সামরিক জোটের বাহিরে পাকিস্থানে যদি এখনও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটী নির্ম্মিত না হই থাকে, তাহা হইলেও অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে ইহা নিশ্চিত প্রয়োজন হইলে তখনই পাকিস্থানের প্রত্যেকটি বন্দর, রেল ষ্টেশন ও বিমান-ঘাঁটী যে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃ হইতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পক্ষান্তরে, ভারতে বর্ত্তমা যেমন কোনও বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি নাই, তেমনি ভবিষ্যতে কোনও ঘাঁটী স্থাপিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই; আজ কাল—কোনও দিনই ভারতের বন্দর, রেল-ষ্টেশন ও বিমানঘাঁ অন্যের সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না। পাক-মার্কিণ সামরি

বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া আমেরিকা আশ্বাস দিয়াছে। অবশ্য, কাশ্মীরের ভারতভুক্ত অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইলে তাহারা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইবে কি না, সে কথাটা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নাই যে, আমেরিকা পাকিস্থানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে তাহাকে সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটী হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে ভারত কাহারও সামরিক সাহায্যের (নগদ মূল্য অস্ত্র বিক্রয় করা সামরিক সাহায্য নয়) প্রত্যাশী নয়, অন্যের প্রয়োজনে সামরিক ঘাঁটী হিসাবে ভারত কখনও ব্যবহৃতও হইবে না। এই অবস্থায় কাশ্মীর যদি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটী নির্ম্মাণের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইবে; পক্ষান্তরে, এই রাজ্যটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রের তাহাতে কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। অতএব, কাশ্মীরের ব্যাপারে পক্ষ নির্ব্বাচনে এখন সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের মনে আর কোনও দ্বিধা নাই। আত্মরক্ষার সুস্পষ্ট প্রয়োজনেই তাহারা এই প্রশ্নে পাকিস্থানের বিরোধী। কাশ্মীরকে সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যে চেষ্টা প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে চেষ্টার বিরোধিতা করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়া আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেই যে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সে সম্পর্কে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এখন নিঃসন্দেহ।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘ এখন সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। পক্ষপাতমূলক কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের আর নাই,—কি ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক স্বার্থ-বিরোধী প্রস্তাব, কি সোভিয়েট-বিরোধী প্রস্তাব—কোনপ্রকার প্রস্তাবই এই প্রতিষ্ঠানে আর গৃহীত হইতে পারবে না। নিরাপত্তা পরিষদে গ্রাহাম মিশন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব সোভিয়েট "ভিটো" বাতিল হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রস্তাবটি জাতিসঙ্ঘ পরিষদে উত্থাপনের কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত না। প্রথমতঃ, পরিষদে প্রস্তাব-গ্রহণের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। কোনও দলেরই এখানে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহা ছাড়া, সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশমূলক—বাধ্যতামূলক নহে। কাজেই পরিষদের প্রস্তাবের শুধু নিন্দাসূচক গুরুত্ব আছে—ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই উহা নহে। নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যদের "ভিটোর" অধিকার এই প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হয় না। বর্ত্তমান অবস্থায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব একমাত্র ভারত ও পাকিস্থানের আপোষ মীমাংসায়। এই আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনা যখন আপাততঃ দেখা যাইতেছে না, তখন কাশ্মীরের বর্ত্তমান ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন আর সম্ভব নয়: ভারতভুক্ত অঞ্চল হইতে ভারতকে যেমন অপসারণ করা যাইবে না, তেমনি পাকিস্থানভুক্ত অঞ্চলে সোভিয়েট বিরোধী সমরায়োজন নিবারণ করাও অসম্ভব। কাশ্মীরের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আপোষ মীমাংসার একমাত্র বিকল্প এখন যুদ্ধ। যেহেতু সে যুদ্ধের ফলাফলের সহিত আন্তর্জ্জাতিক শক্তিবৃন্দের সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর, সে জন্য কাশ্মীর সম্পর্কে যুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকিবে না,—উহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ৪।১২।৫৭

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তবু মন ভার হয় বৈ কি অভয়ের। সকলের স্নেহ ভালোবাসা নিরঙ্কুশ ভোগ করার কোনো উপায় নেই। বোধহয়, সেটা সংসারেরই আইন। শৈলবালার সঙ্গে ভামিনীর বিবাদ, এর যতো দায়, যতো অশান্তি, সবই যেন অভয়ের।

ভামিনীর পাল্লার বাইরে পেলে, শৈলবালাও অভয়কে অনেক কথা বলে। শৈলবালা মনে করে, কথাগুলি সে ফিস্‌ফিস্ করেই বুঝি বলে, কেন, শৈলী ওর বাড়া-ভাতে কবে ছাই দিতে গেছে? শৈলীর হবু-জামাই কি ভামি'র খায় না পরে। সুরীনদাদা বলে, 'ছেলের একটা কাজকম্মো না হলে, বে' দেওয়া চলে না শৈল-দিদি, তাতে আমার মানে লাগে।' হ্যাঁ, সুরীনদাদার মত-ই কথা। নইলে কি বসে থাকতুম? দিনধ্যান দেখে, কবেই দু'হাত এক ক'রে দিতুম। ব'লে শৈলবালার মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে, চোখ দু'খানি বড় ক'রে সত্যি সত্যি ফিসফিসিয়ে বলে, বুঝি বাবা, বুঝি, মাগীর বুকে কেউ নেই। সে জ্বালা বড় জ্বালা। তা' ব'লে তুই শৈলীর খোঁয়াড় করিস্ কেন? তুই না আমার বেয়ান হ'তে যাচ্ছিস্?

ভামিনীর সন্তানহীনতার কথা বলতে গিয়ে শৈল-বালার গলায় স্নেহের আভাস ফোটে। তবে এ বিবাদের জন্যে, অভয়ের মনের ভাব প্রাণান্তকর হয়। মানুষ সবাই একরকম হয় না। ভামিনী-খুড়ির স্নেহ একটু জটিল, কিন্তু দুজনের ভালোবাসা অভয়ের মনের এক-ই স্থানে, এক-ই সুরে বাজে। কাউকে স্নেহের দ্বন্দ্বে লড়িয়ে দিয়ে, তলায় ভালোবাসা কুড়িয়ে বেড়ায় না সে। জীবনে এই মানুষগুলিকে পাওয়া, সে-ই যে তার অনেকখানি।

অভয়ের তত্ত্ব আছে, ভাব আছে। যে বসে আছে তার ভিতরে, সে গুনগুন ক'রে উঠতে চায়। গান গাইতে ইচ্ছে করে, মনে মনে কথাও বেঁধে ফেলে। কিন্তু সেই অপমান আর অভিমানের ভারটুকু কাটে নি এখনো।

আরো লোক আসে সন্ধ্যার পরে, সুরীনের কাছে। বাড়িতে ব'সে দশ রকম কথাবার্তা হয়। যারা আসে, তারা সকলেই কোনো না কোনো মিলের মিস্তিরি। তাদের মধ্যে নানারকম আলোচনা হয়। মিল সংক্রান্ত বিষয় তার মধ্যে বেশী। তা' ছাড়া শহরের কথা, এ পাড়া সে পাড়ার বিষয়, কোথায় কি ঘটেছে কিছু বাদ যায় না। এদের মধ্যে গোঁদলপাড়া কারখানার মিস্তিরি অনাথ সবচেয়ে বেশী মন কেড়েছে অভয়ের। এ শহর আর কারখানার বাইরে, দূরের সংবাদ বলে সে। কলকাতার কথা বলে, আরো দূর দুরান্তে, হিল্লীদিল্লীর সংবাদ আনে। অভয়ের কাছে সে সব রাজা রাজড়ার সংবাদ। সে যখন কথা বলে, বাকী সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। সুরীন খুড়োর বড় ভক্তি এই অনাথের উপর।

লোকটির বয়স অনুমান করা যায় না। সব সময়েই মাথায় রাশিখানেক রুক্ষ আধপাকা চুল, গোঁফ দাড়ি খোঁচা খোঁচা। এমনিতে আছে বেশ গম্ভীর মানুষ, মনের ভাবসাব বোঝা যায় না। যেমনি হাসে, অমনি সামনের দুটি দাঁতহীন সেই হাসিতে, একেবারে শিশু ব'লে মনে হয়। বড় মানুষের হাসিটুকু শিশুর মতো দেখতে হলে,

মানুষের শুধু আনন্দ হয়। কিন্তু অনাথের পেশীবহুল শক্ত মুখখানিতে দুটি দাঁতহীন অনাবিল হাসি দেখে, নিজে হাসতে গিয়ে অভয়ের বুকের মধ্যে কেন যেন টনটন করে। ওই দুটি শূন্য দাঁতের অন্ধকারে কী যেন লুকিয়ে রেখেছে, দেখে বড় মায়া লাগে শক্ত সমর্থ মানুষটার জন্যে। পনর বছর আগে নাকি জেল খেটেছিল। চুরি ডাকাতি নয়, কারখানার কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে। এমন আসামী অভয় তার জন্মে দেখে নি। জেল থেকে বেরিয়ে, দশ বছর কোনো চাকরি পায়নি মানুষটি। বছর পাঁচেক হল, আবার কাজ পেয়েছে গোঁদলপাড়ায়।

অনাথেরও নাকি বড় ভালো লেগে গেছে অভয়কে। শুধু সুরীন হেসেছিল মনে। ভামিনীকে ঘরে গিয়ে বলেছিল, ত্যাথ্ গো ভামিনী, দুটো পাগলকে কেমন এক গারদে পুরে দিয়েছি।

ভামিনী অবাক হ'য়ে বলেছিল, সে আবার কি?

বিস্ময় কাটতে দেরী হয়নি ভামিনীর। কথাটা মিথ্যে বলে নি সুরীন। অনাথকে কী বলেছিল সুরীন অভয়ের বিষয়, কে জানে। সে প্রথমদিনেই অভয়কে খানিকক্ষণ দেখে শুনে বলেছিল, তোমাকে বেশ লাগল বাবা।

বলা মাত্র অভয় অনাথের পায়ে হাত দিয়ে বলেছে, সে এঁজ্ঞে আপনি ভাল ব'লে।

অনাথ তাড়াতাড়ি অভয়ের হাত চেপে ধরে বলেছে, আ হা হা, পায়ে হাত দিও না, ছি।

—এঁজ্ঞে কেন?

—মানুষ হ'য়ে মানুষের পায়ে হাত দেবে কেন?

—মানুষের মত মানুষ হ'লে তার পায়ে যে পড়ে থাকতে হয়।

অনাথ একটু মিট্‌মিট্ করে হেসে বলেছিল, নইলে, সাঁতরা কবির মত বুঝি ঘাড়ে রদ্দা মারতে হয়? ব'লে অনাথ হা হা ক'রে হেসে উঠেছে। কিন্তু অভয় আর লজ্জায় বাঁচি নি। মাথাটি নীচু ক'রে বলেছে, সে এজ্ঞে আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে।

অনাথ তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলেছে, না, কোনো অন্যায় করনি বাবা, অন্যায়কে কখনো মানতে নেই। তার জন্যে প্রাণ যায়, সেও ভি আচ্ছা। তবে একটা কথা কি, যা করবে, তা মোক্ষম করবে। দেখ, সংসারে কত অন্যায় ঘটছে, কত পাপ ঘটছে তোমার চোখের সামনে, সবকিছুর কি তুমি শোধ নিতে পার?

—একটু বুঝিয়ে বলেন।

—এই ধর না কেন, সংসারে একজন খায়, আর এক জন উপোস যায়।

—সে তো মানুষের ভাগ্য?

—তবে সাঁতরাকে তুমি মারলে কেন? ভাগ্য বলে মানলেই পারতে।

অভয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে, অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছে অনাথের দিকে।

অনাথ আবার বলেছে, গাল দিলে মানে লাগে, খিদে কি বাবা তার চেয়ে বড় মান নয়? অভাবে যে মরে, সেই অভাবীর অপমান তার চেয়ে বড় নয়, বল? তবে তারা সইছে কেন? না, দায়ে প'ড়ে সইছি। তোমাকেও দায়ে প'ড়ে সইতে হবে বাবা, সাঁতরাকে তোমার শোধ দিতে হবে অন্য ভাবে।

—কেমন ক'রে?

—সাঁতরার চেয়ে বড় কবিয়াল হ'য়ে।

অভয়ের চোখ ফেটে বুঝি জলই এসেছিল। বলেছে, কিন্তু আমি যে অন্য কাজ করব?

—করবে করবে, তাতে কি আছে? রাস্তা ছাড়বে কেন?

অভয় অমনি দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছে, আপনি আমার গুরু।

অনাথ চেঁচিয়ে উঠেছে, না না, গুরু টুরু নয়—

—হ্যাঁ গুরু। গুরু, শোন আমি বড় মুখ্‌খু।

গুরু, ঢেঁকিকে বোঝাবে কতো
কথায় বলে লাথির ঢেঁকি
চাপড়েতে ওঠে না তো?

অনাথ বলেছে, নিজেকে যে ঢেঁকি বলে, সে কখনো ঢেঁকি হয়? গুরু টুরু নয়, তুমি আমার বন্ধু! তুমি একটা পোয়েট মানুষ, শৈলদিদির জামাই।

—এঁজ্ঞে 'পোট' কী?

—হুঁ হুঁ, ইংরেজী বলেছি, বুঝলে। পোট নয়,

পোয়েট পোয়েট, মানে কবি। তুমি আমাদের পোয়েট জামাই। কিন্তু গান শোনাতে হবে যে?

আবার অভয় থম্‌কে গিয়েছে। অনাথ বলেছে, না না, তোমাকে আমি হুকুম করব না। যে-দিন তোমার মন চাইবে, সেদিনে।

অভয়ের মুখখানি থম্ থম্ করেছে। বলেছে, এঁজ্ঞে, সে সোঁত বন্ধ হয়ে গেছে।

অনাথ কথার কারবার করে না বটে, মানুষ নিয়ে কারবার করে। বলেছে, স্রোত পাক খাচ্ছে বাবা। পথ পেলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ওইটি নিয়ম যে? সে যে তখন মরা গাঙে বাণ ডাকিয়ে ছাড়ে।

কথাটি শুনে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছে অভয়ের। সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে সাজানো মিঠে পদ, তার ঠোঁটের কূলে এসে সত্যি পাক খেয়েছে। তার বোবা স্বর যেন টনটনিয়ে উঠেছে বড় ব্যথায়। পারেনি গাইতে। মনে মনে ভয় হয়েছিল, মনের মধ্যেই ঘোর পাক খেয়ে গিয়েছে।

এমনি করে ভাব হয়েছে দু'জনের। একজন অনাথ খুড়ো, আর একজন পোয়েট জামাই। অভয় আরো শুনেছে, অনাথ নাকি কিছু লেখাপড়াও জানে।

সুরীন হেসে বলে, আমি জানতুম, দুটিতে দেখা হলে হয়, কেমন জমে একবার সবাই দেখবে।

অনাথ ছাড়াও সন্ধ্যায় আসরে আরো কয়েকজন আসে। তাদের সকলের সঙ্গেই অভয়ের বড় ভাব। কম বেশী সকলেরই মন কেড়েছে সে। অনাথ বলে, পোয়েটের জন্যে আমাদেরও ধান্দা করতে হয়, একটা চাকরিবাকরি দরকার।

তা ঠিক। সুরীন মুখ গম্ভীর ক'রে বলে, হ্যাঁ। এক মাস হয়ে গেল, হাঁটাহাঁটি সার হ'চ্ছে। টর্ণ ঘরের সায়েব একটা আশা দিয়ে রেখেছে। সহজে যে হ'য়ে উঠবে, মনে হয় না।

অনাথ বলে, চাকরির বাজার বড় মন্দ। তা দেখা যাক। সবাই মিলে দেখ। জগদ্দলে শ্যামনগরেও দেখ, আমিও দেখি। বন্ধুকে আমি কাজে লাগাতে পারলেই ভাল হয়।

সবদিক থেকেই অভয়ের মন জবা...

কথাটি সে ভুলতে পারে না। বসে খাওয়ার রীতি তা অজানা ছিল। জীবনের পালে যে তার নতুন বাতাস লেগেছে, কখন না জানি বাতাস ঢিল পড়ে যায়। আশ বড় মারাত্মক বস্তু। কাজে না সার্থক হলে, মরণের সামিল মনে হয় তখন। হাঁটতে না শিখতে যে মানুষ খুঁটে খেতে শিখেছে, একমাস ধরে তার নিজেকে গলগ্রহ ঠেকেছে। এক এক সময় হাসতে গিয়েও যে বুকের মধ্যে খচ্ ক'রে লাগে। সন্ধ্যাবেলার এই আসরে ভামিনাও যোগ দেয় তার কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে। সবাইকে চা দেয়, পান থাকলে খাওয়ায়। সে ঠোঁট টিপে হেসে বলে হ্যাঁ, তা ছাড়া ছেলের আমার মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে তো।

সহসা সবাই ধরতে পারে না ভামিনীর মনের কথা।

ভামিনী বলে, তোমরা যেন সব হাবা হ'য়ে গেলে। একজনের জন্যে তো মনটাও খালি খালি লাগতে পারে। আশার মানুষ, তাকে পাবার জন্যেও—

ও, ভামিনী শৈলবালার মেয়ে নিমির কথা বলে।

অভয় লজ্জা পায়। ভামিনা হাসে, সুরীন গম্ভীর হ'য়ে বলে, সত্যি।

অনাথ বলে, তাই তো বটে, বউ না হলে কখনো বন্ধুর চলে?

ব'লে ভামিনীর দিকে চেয়ে ফোগলা দাঁতে হেসে জিজ্ঞেস করে, শৈলদিদির মেয়েরও বুঝি তর সইছে না।

তখন একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে ভামিনী বলে, কী জানি! উঁকি ঝুঁকি কি আর না মারছে।

অভয় অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হ'য়ে বলে, মন টন আবার কী। কাজ নেই, কম্মো নেই, বউ একটা হলেই তো হল না।

তার কথা শুনে সবাই হাসে হো হো ক'রে।

তারপর একলা শুয়ে ভাবে অভয়। ভাবে, সত্যি তার মন কেমন কেমন করে নাকি? একটু দেখতে ইচ্ছে করে?

কবে একদিন সে যাচ্ছিল পাড়ার জলকলের পাশ দিয়ে। মেয়েরা ভিড় করেছিল সেখানে। অভয় দূরে থাকতেই মেয়েরা চাপা গলায় ব'লে উঠেছিল, ওই রে, সে আসছে, এই নিমি, ভাখ ভাখ। আ' ম'লো মুখপুড়ি,

জল কলের ভিড়ে একটা ধরাধরি টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। একজন পালিয়েছিল আঁচল ছিনিয়ে নিয়ে। চোখের পলকে কত কী যে চোখে পড়েছিল, যা কথনো চোখের পলকে চোখে পড়ে না। তার গোরা রং গায়ে, তার বন্ধু শুলার বউয়ের মত বড় বড় চোখ, ভেঙে পড়া খোঁপা, খসে পড়া আঁচল। তারপর মেয়েদের ভিড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময়, সকলের কী হাসি! কে একজন বলে উঠেছিল, আহা, ফস্‌কে গেল। আর একজন বলেছিল, ছুঁড়ি ভয় পেয়েছে।

হ্যাঁ, ভয়ে ঘুম হয় না রাতে।

অভয়কে দাঁড় করিয়েছিল তারা, ও জামাই, শোন শোন।

অমন জোয়ান মানুষ অভয়, তারো বুকের মধ্যে কেমন থরথরিয়ে উঠেছিল। সে মাথা নীচু ক'রে বলেছিল, এঁজ্ঞে বলেন।

তার গ্রাম্য বিনয় দেখে সবাই আর হেসে বাঁচেনি। বলেছিল, দেখতে পেলে না তো?

মাথা নীচু ক'রে হেসেছিল অভয়। বলেছিল, এঁজ্ঞে, দেখা না দিলে কি কাউকে দেখা যায়!

ওমা, ওমা—শব্দের সঙ্গে আবার একটি হাসির ঝড় উঠেছিল।

আরো কয়েকদিন এমনি ঘটেছে। যাবার পথে শুনতে পেয়েছে মেয়ে-গলায়, এই নিমি, এই যে যাচ্ছে রে।

গত বছরেই কবে যেন একদিন গাঁয়ে, এক বিয়ে বাড়িতে কাজ পড়েছিল অভয়ের। বর আসতে সেও চেঁচিয়ে বলেছিল, দেখি দেখি, একটু দেখে নিই। কে যেন পিছন থেকে বলে উঠেছিল, হ্যাঁ, দেখে নে। তোর জীবনে তো আর ওসব কোনদিন হবে না।

সুরীন খুড়ো কোথায় টেনে নিয়ে এল, ধন্দের ঘোর লেগে গেল মনে। ধন্দ কাটতে চায় না, সন্দেহ হয়, শুলার মত সেও একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে। তার এত বড় শরীর দিয়ে অনেকের অনেক কাজ মিটেছে, সেটা প্রয়োজনীয় ছিল। মন নিয়ে কেউ নাড়াচাড়া করে নি, সেটা অপ্রয়োজনীয় ছিল। মন নিয়ে অভয় একলা ছিল। মিথ্যে নয়। এখন সেই মনে অপরের ভাগ পড়েছে। একটি বিস্ময়কর ছায়া পড়েছে সেখানে। যে-ছায়া হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে তার রক্তের টানা স্রোতে হঠাৎ ঘূর্ণী লাগিয়ে দেয়। তখন গান গাইতে ইচ্ছে করে অভয়ের।

সব মিলিয়ে, মনের দিগন্ত জুড়ে, নতুন জীবনের স্বাদ নেশা ধরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাজের কথা মনে হ'লে, তখন বড় বিস্বাদ লাগে অভয়ের।

কয়েকদিনের পর সুরীনদের কারখানায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ফিরে, অভয় ঘরে ফিরে গেল না। এদিক ওদিকে ঘুরে গঙ্গার ধারে খেয়াঘাটের কাছে গিয়ে দেখল, ঘরামিরা নতুন ঘর তুলছে। মস্তবড় ঘর, বোধহয় মালখানা হবে।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে, একজনকে জিজ্ঞেস করল অভয়, লোকের দরকার আছে আর?

কাজ করতে করতে কয়েক মুহূর্ত অভয়কে দেখে, আর একজনকে ডাকল।

সে এসে জিজ্ঞেস করল, ঘরামির কাজ জান?

নিজের না হোক, পরের ঘর অনেক তৈরী করেছে অভয়। বলল, বাজিয়ে দেখুন।

বাজিয়ে দেখা গেল, ভালোই বাজে। দু'টাকা রোজে সারাদিন কাজ ক'রে যখন ফিরল, তখন সুরীনের বাড়ীতে একরাশ মেয়ে-পুরুষ। সন্ধ্যা উৎরে গেছে তখন, বাতি জ্বলেছে। সুরীনও ফিরে এসেছে অনেকক্ষণ। সারাদিনে অভয় ফিরে না আসায় সোরগোল প'ড়ে গেছে।

শৈলবালাই প্রথম চীৎকার ক'রে উঠল, অই গো, অই এসেছে। কোথায় ছিলে?

অভয় বলল, এই একটু এদিক ওদিক করছিলুম।

ভামিনী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, তা রাতটুকুও বাপু এদিক ওদিক ক'রে এলেই পারতে?

অভয় হাসল, সবাই চলে যাবার পর অভয় সুরীনের দিকে টাকা দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাজ করেছি খুড়ো আজ।

সুরীন অবাক হ'য়ে বলল, কী কাজ, কোথায়?

সব বলল অভয়। শুনে সুরীনের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। শৈলদিদি শুনলে তার মান যাবে। জামাইকে দিয়ে শেষে ঘরামির কাজ করালে সে।

অনাথ খুব খুশি। অভয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, বেশ করেছ বন্ধু, বাপের ব্যাটার মত কাজ করেছ। কাজ না করলে মানুষ বাঁচে কখনো!

তিনদিন পর পর কাজ পেল অভয়।

চতুর্থ দিনে আবার বেকার হয়ে বসেছিল অভয়। ভামিনী পাড়ার কোথায় গিয়েছে দুপুরের পাট মিটিয়ে। অভয়কে বলে গেছে দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোতে। ঘুম আসে নি। অভয় বসেছিল দাওয়ায়। কিন্তু কয়েকবারই চমকে উঠেছে, ফিসফাস্ শব্দ শুনে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চুপি চুপি কথা, চুড়ির রিনিঠিনি কোথা থেকে যেন বেজে উঠেছে কয়েকবার।

তারপর নিমিকে চেপে ধরে, দুটি মেয়ে ঢুকল বাড়ির পিছন থেকে। দাপাদাপি করছিল নিমি, চুল এলো ক'রে, শাড়ি বিস্রস্ত ক'রে। সামনেই অভয়কে দেখে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু মুখখানি যেন ভার, যদিও ফর্সা মুখে একটু রক্ত ছড়িয়ে গেছে। ঘাড় না ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল অন্যদিকে। অভয় দেখল—শুলার বউয়ের চেয়েও চোখ দুটি ভালো, কালো মণি দুটি বড় বেশী দপ্‌দপে, কিন্তু স্থির। ঠোঁটের কোণ দুটি টিপে রয়েছে নিমি, মুখখানি তাতে কঠিন হয়ে উঠেছে।

বিমূঢ় অভয় হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। উঠে দাঁড়াল শুধু।

এক সঙ্গিনী বলল, নে, কি বলবি বল্, খুব তো তড়পাচ্ছিলি।

ব'লে আঁচল টেনে দিল।

আর একজন বলল অভয়কে, কেমন?

অভয়ের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল। নিমিকে সে এতদিন ভাল করে দেখে নি। আজ দেখে তার তীব্র আনন্দের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ সংশয় খেলে গেল। কোথায় যেন একটু দুরত্ব রয়েছে অভয়ের সঙ্গে, কাছের মেয়ে নয়। এ যেন নিটুট শরীরে, ছেয়ালো ছেয়ালো স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। জোয়ার এসেছে যেন উজান ঠেলে, তাই প্রথম মুখপাতে একটু যেন বেশী দামাল মনে হয়। এবং ফর্সা, শৈলবালার মত। শুলার বউয়ের চেয়ে চোখ দুটি ছোট, কিন্তু চাউনিটি ভাল।

সঙ্গিনী বলল, কি হল, বাক্যি হরে গেল যে!

অভয় হেসে বলল, হাঁ, কথায় যে কুলায় না।

—তবে গান দিয়ে হোক।

হাঁ, গান গাইতে ইচ্ছে করে, কিন্তু লজ্জা করে। বলল, সেই গান শুনেছিলুম, গোরো-চনা গোরী নবীনা কিশোরি সেইরকম।

সঙ্গিনী দুটি হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি। বলল, কিন্তু রাগ করেছে।

অভয় হাত জোড় করে বলল, কেন ঠাকরুণ?

—জিজ্ঞেস কর।

দাওয়া থেকে নেমে এল অভয়। সামনে এসে বলল সঙ্গিনীদের, আমি অতি অভাজন, রাগ কেন ভাই?

মেয়ে দুটি হেসে উঠে ধাক্কা দিল নিমিকে। নিমি ততক্ষণে মুখে আঁচল চেপে, হেসে উঠেছে।

একজন বলল, তোমাকে বলেছে, গেঁয়ো, গেঁয়ো মিন্‌সে।

অভয় ছড়া কেটে বলল,

> গাঁয়ে আমার জম্মো কম্মো,
> শহর আমি চিনি না যে।
> সে আমাকে ডাক দিয়েছে
> যে আছে এই শহর গঞ্জে॥

এবার নিমি পালাবার জন্যে দৌড় দিতে গেল। ধরে রাখল সঙ্গিনীরা। বলল, ওমা, সত্যি সত্যি কবিয়াল রে।

আর একজন বলল অভয়কে, আরো বলেছে। বলেছে, বড্ডো কালো।

বুঝি সত্যি কালো কি না দেখে নেবার জন্য নিমি চোখ তুলতেই, চোখাচোখি হল অভয়ের সঙ্গে। অভয় বলল, হ্যাঁ ভাই ঠাকরুণ,

> 'কালো, খুব কালো আমার বরণ'
> যে বলে তার চোখের মণির মতন।'

—আরো বলেছে। বলেছে, আর কতদিন, চাকরি কেন হয় না?

এবার নিমি জোর ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়ে দুটিও গেল হাসতে হাসতে। কিন্তু অভয়ের মুখখানি ভার হ'য়ে উঠল।

কিন্তু ভার ক'রে তাকে বেশীক্ষণ থাকতে হল না। নিমি এসে তার ভরা জোয়ার দিয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা অনাথ এল চীৎকার করতে করতে, পোয়েট, এই পোয়েট জামাই, বন্ধু আমার কোথায় গেলিরে।

অনাথের তুই তোকারি শুনে একটু অবাক হ'লেও একটু বেশী খুশি টের পেয়ে অভয় বলল কী বলছ?

অনাথ বলল, কি বলছি? কী না বলছি, তাই বল্। আসছে হপ্তা থেকে তোর কাজ হয়েছে আমাদের মিলে।

—সত্যি, সত্যি?

—তবে কি মিথ্যে?

অভয়, পায়ে হাত দেবে ভেবেছিল। কিন্তু জড়িয়ে ধরল অনাথকে দু'হাতে।

সুরীন তখনো আসে নি। কেবল রান্নাঘরে ভামিনীর মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। ক্রমশঃ

সৎপ্রসঙ্গ

উপানন্দ

সৎ এবং অসৎ দু'রকমের চিন্তাই মানুষের অন্তরে ওঠে। দয়াদাক্ষিণ্য, সেবা, ভগবৎ চিন্তা, নামকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি উচ্চ-চিন্তাগুলিই গ্রহণ করা উচিত—কেননা এগুলি আমাদের পরম বান্ধব; আর পরহিংসা, অসৎ প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, আত্মম্ভরিতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা প্রভৃতি বর্জ্জন করা আবশ্যক,—এরাই মানুষের প্রকৃত শত্রু। এইগুলিকে দমন করতে পারলে বহিঃশত্রুও দমন করা যায়। মানুষ বহিঃশত্রুর পিছনে ছুটেই, হৃদয়ের শত্রুগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। তার ফলে তাকে জীবনে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। তোমরা অসৎ চিন্তাকে কখনো হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করো না।

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরপ্রত্যাশা এগুলি পরিত্যাজ্য অভ্যাস। যাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নেই, তারাই পরমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করতে যায়, আর অপদস্থ হয়। জীবনের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করতে বাসনা থাকলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর সাহসের আবশ্যক। সাহসী বীর ব্যতীত কেউ ভবিষ্যতের অন্ধকার দূর করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। ভবিষ্যৎ দুর অন্ধকারময় ভেবে ভগ্নোৎসাহী হোলে সিদ্ধিলাভ হয় না। জীবনের দৈনিক ঘটনাবলী নিয়ে তার বিচার করা দরকার—যদি গলদ থাকে, তা হোলে সংশোধিত হোতে পারে। যে লোকের শত্রু বেশী, তার সৎ ও ভদ্র হওয়া আবশ্যক।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগত দোষ সংশোধিত করবার চেষ্টা না করলে মানুষ হওয়া যায় না। যে জাতি উন্নত হোতে পেরেছে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানই সে জাতির উন্নতির ভিত্তি। আলস্যই অভাবের জনক—এই রোগ এদেশের অস্থিতে মজ্জায় রয়েছে, তাই দেশে এত অভাব, এত দৈন্য। অভাব দৈন্য দূর করতে হোলে কিছু কাজ করতে হবে। সাগরপারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজ করে—যা থেকে তাদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব হয়। সেই অর্থ দিয়ে তারা লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করে, মাতাপিতার গলগ্রহ হয় না।

বাল্যকাল থেকে স্বাবলম্বী হোলে সংসারের পথে চলবার সময়ে বারে বারে হোঁচট খেয়ে পড়তে হয় না। নিশ্চিত বিষয়কে হঠাৎ আশার প্রলোভনে পরিত্যাগ করতে নেই, তা হোলে ঠকতে হবে। ক্ষণভঙ্গুর জীবন কেবল কর্ম্মের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করে। জ্ঞানী যুক্তিতেই সতর্ক হয়, কিন্তু অজ্ঞানী ঠেকে শিক্ষালাভ করে। অতি বড় মূর্খ অভাবে পড়লে শিক্ষালাভ করে, কিন্তু পশু প্রকৃতির দ্বারা অভিজ্ঞ হয়। অত্যাচারের প্রকৃত প্রতিশোধ ভালবাসা। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ, প্রতিহিংসা নীচতার পরিচায়ক। দেশের এবং সংসারের গৌরবের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবাক্য মনে রাখতে চেষ্টা রাখবে। এইসব মহাবাক্য পালন করলে জগতে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

স্নেহপ্রীতি, সৎসাহস এবং সাধু অভিপ্রায় যেন তোমাদের অন্তরে স্থান পায়। সৎচরিত্র ব্যক্তি লোকসমাজে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র হোয়ে থাকে। সেই পথে যাতে অগ্রসর হোতে পারো, তার জন্যে চেষ্টা করবে। ধর্ম্মভাব পারলৌকিক সুখসম্পদের উৎকৃষ্ট সহায়। যে পরিবারে ধর্ম্মভাব নেই, তা কেবল প্রয়োজন সাধন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উপায়স্বরূপ, আর পাপবৃত্তিগুলির লীলাক্ষেত্র।

ঋণ ও অগ্নির শেষ রাখবে না, কেননা সামান্য ঋণ যেমন সুদে সুদে বেড়ে ওঠে, অগ্নিকণাও সেইরকম দাহ্য পদার্থ পেলেই বৃদ্ধি পেয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। একজন গুণবান পুত্র নিজের সাধনায় বংশ উজ্জ্বল করে—আর একটি মূর্খ পুত্র পদে পদে পিতামাতাকে দুঃখ যন্ত্রণা দেয়। এজন্যে তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবার চেষ্টা করবে। দুর্জ্জনের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা করবে না, কেননা দুর্জ্জনের ক্রোধে নিজের সর্ব্বনাশ আর মিত্রতায় কলঙ্ক হয়। যেমন অঙ্গার উষ্ণ হোলে তার সংস্পর্শে হাত পুড়ে যায়, আর শীতল অঙ্গার

তাতে নিজে সেই ভাবে কালো দাগ পড়ে। যে সাপের মাথায় মণি আছে সেই সাপ যেমন অধিকতর ক্রুর, তেমনই যে দুর্জ্জন বিদ্বান ও শিক্ষিত সে সব চেয়ে বেশী ক্রুর হয়ে থাকে। একটা গল্প শোন :—

একদা একটা ইঁদুর নদী তীরে এসে ভাবছিল কেমন করে সে নদী পার হবে, এমন সময়ে একটা দুর্ত্ত ব্যাঙ সেখানে এসে বল্লে—ভাই! তুমি কি ভাবো?

ইঁদুর মনের ভাব প্রকাশ করে বল্লে—'ভাব্‌ছি, কেমন করে নদী পার হবো—'

ব্যাঙ হেসে বল্লে—'এর জন্যে আবার ভাবনা, এসো, তোমাকে পার করে দিচ্ছি—'

এই বলে ঐ ব্যাং ইঁদুরের লেজে এক দড়ি বেঁধে অপর প্রান্ত দিয়ে নিজের কোমর বাঁধলো। এই ভাবে ইঁদুরকে বেঁধে আর পিঠে চড়িয়ে ব্যাঙ জলে নামলো আর সাঁতার কাটতে লাগলো। নদীর মাঝখানে এসে পৌঁছুতেই ব্যাঙ জলে ডুব দেবার উপক্রম করতেই ইঁদুর ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। বল্লে—'কর কি? এম্নি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে মেরে ফেল্‌তে চাও?'

ব্যাঙ খুব হেসে বল্লে—'সবাই অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউই কথা রাখে না—বুঝলে ভায়া!—'

ব্যাঙের কথা শুনে ইঁদুর জীবনের আশা ত্যাগ করলো। এমন সময়ে আকাশ থেকে একটা পাখী ছোঁ মেরে দুটোকে নিয়ে গেল; আর ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙটাকে উদরসাৎ করলো। জেনে রেখো চতুর লোকই ফতুর হয়। পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়—তোমরা কখন পরের মন্দ করবার চেষ্টা করো না।

অভিযাত্রী

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম. এ.
পি এইচ ডি, পি আর এস

এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে প্রায় কুড়ি বছর আগে। জার্মান ভাষায় রচিত বিখ্যাত একটি জীব-বিদ্যার বইএর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। বৈজ্ঞানিকের নিজের নতুন নতুন অনেক গবেষণা পেলুম—সেগুলি যেমন বিস্ময়কর আর তেমনই তার রচনা-ভঙ্গী। জীব-বিদ্যা যে এতো আকর্ষণীয় হ'তে পারে তা আগে বুঝিনি। ঐ লেখকের পরবর্তী অন্যান্য রচনার জন্য মনটা সহপাঠী বিশেষ বন্ধু যতীশ ছিলো—তাকে পরদিনই বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলুম এ বিষয়ে খোঁজ কোরতে। যতীশ যদিও তখন বার্লিনে তার রসায়ন-শাস্ত্রের গবেষণা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত—তবু পত্রপাঠই আমায় জবাবে লিখলে যে ঐ বইয়ের লেখক বৈজ্ঞানিক ফন ওয়াইমার বহুদিন হলো বিজ্ঞান-চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। অনেকে বলে, তিনি নাকি ভারতে গিয়ে সাধু হয়েছেন। এই খবর পেয়ে আমি তো একেবারে অবাক—কৌতূহল যেন আরও শতগুণ হয়ে উঠলো ঐ বিদেশী জ্ঞানীর সম্বন্ধে। ঐ য়ুরোপীয়ান গুণীর জন্য পরম শ্রদ্ধা অনুভব কোরতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গেই আবার যতীশকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়ে দিলুম যেন সে এই রহস্যভরা মহান জীবন-কাহিনীর আবরণ উন্মোচনের একটু চেষ্টা করে—একবার যেন সে বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের বাসস্থানেতে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পরিবারবর্গের কাছ হতে সব খবর নিয়ে আমায় জানায়।

—বেশ কিছুদিন পরে যতীশ লিখলে যে সে আমার অনুরোধে কোলোনের যে বিদ্যালয়ে ওয়াইমার শিক্ষকতা কোরতেন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসস্থানের গৃহে যেখানে বৈজ্ঞানিকের শৈশব কেটেছিলো—এই দুই জায়গাতেই গিয়েছিলো—কিন্তু বিশেষ কোনো খবর পায়নি। অনেক অনুসন্ধানে যতীশ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে যে দুটি কাহিনী শুনেছিলো তাও তার পাঠানো সেই রেজিস্ট্রী প্যাকেটটায় ছিলো। প্রথমটি যতীশ কোলোনের সেই বিদ্যালয়ে ফন-ওয়াইমারের এক পুরাণো সহকর্মীর কাছে শোনে—সহকর্মীটি বলেন—তিনি প্রথম থেকেই কেমন একটু খেয়ালী গোছের মানুষ ছিলেন—কোনো দিকে একবার ঝোঁক হলে সেই নিয়েই ওয়াইমার আহার-নিদ্রা ভুলে যেতেন। যেমন তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে জীব-বিদ্যার চর্চা শুরু কোরে দিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র এবং তাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে অধ্যাপনা করতেন। ঐ সময়েই তিনি বিয়ে করেন ও একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে তাঁরা খুব সুখে শান্তিতে ছিলেন। ছেলেটিও তার বাবার মতোই মেধাবী হয়েছিলো—নানা রকম বই পড়তো ঐ বয়সেই, আর বেশীর

বেড়িয়ে আর গল্প কোরে। সাত বছর বয়সে ছেলেটি স্কুলে ভর্তি হলো—কিন্তু বছরখানেক যেতেই সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো—এক রকমের পেটব্যথা তার বার বার হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। ওয়াইমার তার কাছে-কাছেই থাকতেন। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবা! ব্যথা কেন হয়? এ কি কোরে ভালো হবে?' ব্যস ওয়াইমার লেগে গেলেন শরীর-বিদ্যার বই পড়তে এবং তারই গোড়া ধরবার জন্য লেগে গেলেন জীব-বিদ্যা নিয়ে। তিনি যদিও এ বিষয়ে কোনও ডিগ্রী নেননি—তবু তাঁর মৌলিক গবেষণা এবং বিশেষতঃ ঐ বইখানির জন্য জার্মানীর নানা জায়গা হ'তে ভালো ভালো পদে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। একটা খুব ভালো জায়গায় ওয়াইমার যাবেনও স্থির কোরেছিলেন। এমন সময় কি হ'তে কি হোল কে জানে—তিনি উঠে পড়ে লাগলেন যতো রাজ্যের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। তাঁর গবেষণার টেবিলে খরগোশ আর ইঁদুরের পাশে জড়ো হলো স্তূপাকার পুরোণো পুরাণো ধর্মগ্রন্থের রাশি। তারপর শুনলুম যে ওয়াইমার সংস্কৃত শিখছেন। আমার বাড়ী হ'তে তাঁর বাড়ী ছিলো অনেকটা দূরে—তবু একদিন তাঁর বাড়ীতে যাই তাঁর ছেলের অসুখটা খুব বেড়েছে শুনে। ধর্ম-চর্চা সম্বন্ধে বলতে জবাব দিলেন—'খোকনের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর জোগাবার জন্য এতো পড়তে হচ্ছে আমায় ধর্ম সম্বন্ধে।' কদিন পরেই হঠাৎ শুনি—ওয়াইমার নিরুদ্দেশ হয়েছেন স্ত্রী আর অতো আদরের রোগ-শয্যাশায়ী ছেলেকে ফেলে। আশ্চর্য—বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি একখানি চিঠি দিয়েছিলেন—: বন্ধুগণ! আমায় ক্ষমা কোরবেন। অনেকগুলি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েচি—যা আমার জীব-বিদ্যার সমস্যাগুলির চেয়ে অনেক জরুরী—এবং হয় তো সেগুলির জবাব পেলেই ঐ সমস্যা-গুলিরও উত্তর আপনিই পাবো। তাই আমি চললেম সেই উত্তরের খোঁজে। অবশ্য সে উত্তর আমি পাবো নিজের কাছ হ'তেই—তবু তার জন্য চাই সাধনা, আর বিশেষ ধরণের জীবন-যাপন। তাই আমার এখন এমন পারি-পার্শ্বিক চাই—যেখানে এই দুইটি সম্ভব হয়। সে স্থান আছে পূর্বে। আমার জন্য ভাববেন না—ভালোই থাকবো আমি সেখানে। (ঐ চিঠিটা বৈজ্ঞানিকের বৃদ্ধ সহকর্মী যতীশের হাতে দিয়েছিলেন এবং যতীশ সেখানাও ঐ প্যাকেটে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো।—সহকর্মীটি আরও বলেন যতীশকে : আপনার বন্ধুকে লিখবেন হিমালয়ে ওয়াইমারকে খুঁজতে—সেখানেই হয়তো তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। বৃদ্ধ এই সব আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরে মন্তব্য কোরে আক্ষেপ জানালেন : ওঃ কি ভাবেই তিনি নিজের অমন জ্ঞান আর শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় কোরলেন—জার্মানীতে থেকে কাজ চালিয়ে গেলে জীব-বিদ্যার কি উৎকর্ষই না ঘটাতে পারতেন ওয়াইমার—সঙ্গে সঙ্গে কি নির্মমভাবেই না নিরুদ্দেশ হলেন স্ত্রী-পুত্রের কাছ হতে—অমন সোনার সংসার ভেঙ্গে—ওঃ!

যতীশ ওয়াইমারের দেশের বাড়ীতে গিয়ে দ্বিতীয় কাহিনীটি পেয়েছিলো। বৈজ্ঞানিকের পিতৃপুরুষের বাসস্থান গ্রামটি কোলোন হ'তে পাঁচ সাত মাইল দূরে। মস্ত বাগানওলা সেকেলে বাড়ী। গোলাপের বনে পরীর মাথার কেশের চূড়া হতে ঝিরঝির করে ফোয়ারা ঝরছে—সবখানে কেমন এক রিক্ততা। সেখানে ওয়াইমারের এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নের সঙ্গে যতীশের দেখা হয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবিবাহিত—একাই থাকেন অতো বড়ো বাড়ীতে দুটি চাকর নিয়ে। অতো বড়ো বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলায় খুব বিরক্ত। তিনি যতীশকে অনেক কথাই বলেন : ওয়াইমার লোকটাই ছিলেন খাম-খেয়ালী।—তাঁর ছেলেটি অনেকদিন ধরে ভুগছিলো। ওয়াইমার তার চিকিৎসা এক রকম নিজেই কোরছিলেন—অবশ্য তাঁর বন্ধু একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন। অসুখ ভালোর দিকেই যাচ্ছিলো—এমন সময় হঠাৎ একদিন ওয়াইমার আর কলেজ হ'তে ফিরলেন না। বৈজ্ঞানিকের ভাগ্নে দুঃখ কোরে বললেন : ওয়াইমার এই রকমই একটু দায়িত্বহীন ও খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর চলে যাবার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার পর তাঁর স্ত্রী ছেলের চিকিৎসার জন্য বার্লিন চলে যান। সেখানে যে কি হোলো—কোনো খবরই আজ পাঁচ বছর ধরে খোঁজ কোরে কিছু জানতে পারিনি। কিছু টাকা তাঁর ছিলো—গুজব শুনি ছেলেটির নাকি অসুখ বেড়ে যায়, আর তার মা তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে একটি খবর নেই, চিঠি নেই—কিছু না। এমনই সব দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক!

যতীশ ভদ্রলোকের অনুরোধে সমস্ত বাড়ীটি ঘুরে দেখে এসেছিলো। লাইব্রেরী-ঘর, ল্যাবোরেটরী, ড্রইংরুম, শোবার ঘর—একটু প্রাচীনভাবে সাজানো—সব জায়গাতেই রাশি রাশি বই। ভদ্রলোক বললেন: অনেক বেচে দিয়েছি—কি হবে ওগুলি এখানে ফেলে রেখে পোকায় কাটিয়ে? যতীশ শোবার ঘরের দেওয়ালে একখানি বিরাট আলোক-চিত্র দেখলো—হাসিমুখ সুন্দরী মায়ের গলা জড়িয়ে একটি ৬।৭ বছরের ফুটফুটে ছেলে—নীচে ওয়াইমারের হাতে লেখা—'কাল-সমুদ্রে দুটি ঢেউ।' ভদ্র-লোক বললেন: ছবিটি মামার তোলা, আর ঐ নামকরণটিও তাঁরই হাতের লেখা—বুঝতে পারছেন তো ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান একটু কমই ছিলো।

ভদ্রলোক ওয়াইমারের দুই তিনটি বিভিন্ন বয়সের ফটো ও কতকগুলি হাতে লেখা কাগজ-পত্র (সেগুলি ইংরাজীতে লিখেছিলেন) যতীশকে দিয়েছিলেন। যতীশ সে সবই আমায় ঐ রেজিস্টী প্যাকেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। আমি পরম যত্নে সেগুলি রেখে দিলুম। বৈজ্ঞানিকের একখানি সাম্প্রতিক ফটো ও দুই তিনটি চিঠি আমার নিজস্ব ডায়েরীর সঙ্গে সর্বদাই ভেতর পকেটে ঠাঁই নিতো। আমার অতৃপ্ত কৌতূহল ঐ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে নানা ভাবনায় কেবলই গুঞ্জরণ কোরে ফিরতো। ভাবতুম এই অদ্ভুত মানুষটি নিশ্চয়ই সাধারণ একজন খামখেয়ালী লোক নয়। তাঁর পরবর্তী জীবন ও ধ্যান-ধারণা যে কি রূপ গ্রহণ করলো কিছুই জানতে পারলুম না—কেবল নানা কল্পনাতে চিন্তার জাল বোনা চলে। তারপর এই বিশ বছর ধরে নিজের নানা ভাবনা ও কাজকর্ম এবং সাংসারিক ব্যাপারে 'ওয়াইমার প্রহেলিকা'ও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এলো—যদিও ওয়াইমার নামটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিকৃতির সেই দীপ্ত প্রশান্ত মুখ আর সরল টানাটানা হস্তাক্ষর মেঘ-রৌদ্রভরা আকাশে ক্ষণিক-দেখা রামধনুর মতো ভেসে উঠতো।

···কিন্তু জগতে মানব-বুদ্ধির অগম্য সব বিস্ময়কর ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দেয়—তাই বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের পরবর্তী জীবনের রহস্যপুরীর দুয়ারও আমার সমুখে হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে উন্মুক্ত হলো। গত বছর অফিসের কাজে হঠাৎ শ্রীনগর যেতে হলো। কাজ-কর্ম যদিও ভালভাবেই মিটে গেলো—হঠাৎ রওনা হবার দুদিন আগে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লুম। কোন মতে টাঙ্গায় কোরে কাছের ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হলুম। ডাক্তারসাহেব চেম্ব আমায় পরীক্ষা কোরছেন, এমন সময়ে ওপাশে ওষুধ নে জায়গায় কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে একজন কাশ্মীরী বৃদ্ধের ক স্বরে খুব কথা কাটাকাটি ও বচসা শুনলুম। সব ক মর্ম না বুঝলেও বুঝলুম কম্পাউণ্ডার বলছে: এ ওষুধ পা না—ডাক্তারের সই নেই প্রেসক্রিপসনে। তাছাড়া কয়েকটা ওষুধের নামই শুনিনি। কিসে কি হবে—শে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের। অপরদিকে শুন : গরীব মানুষ হুজুর—মেহেরবানি কোরে ওষুধ দিয়ে দিন-আট নয় মাইল পথ ভেঙ্গে আমরা পাহাড়-জঙ্গলভরা গ্র হ'তে এসেচি—সেখানে লোকালয়ও নেই—ডাক্তার নেই। দুই মাস ধরে দুবছরের ছোট্ট নাতিটি ভুগচে হুজুর মা-মরা ছেলে। ওষুধ-পথ্য কিছুই দিতে পারি ভালো কোরে—ছেলে যায় যায়—হঠাৎ দুদিন আগে গভী রাত্রে আমার কুঁড়ের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলেন এক মহাদেবে মতো সন্ন্যাসী (এইখানে বৃদ্ধের গলা আবেগে বুজে গেলো শিশুর মাথায় হাত রেখে তার শিয়রে দাঁড়ালেন তিনি·· সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ যেন অর্দ্ধেক কমে গেলো হুজুর! এই চিরকুট তাঁরই হাতের লেখা—এ কখনো মিথ্যা হতে পারে? ওষুধ দিয়ে দিন হুজুর—গরীবকে বাঁচান।

—ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা শেষ হয়েছিলো—ওদিকে কোনও মীমাংসা তখনও হয়নি, অতএব আমরা দুজনেই এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলুম। কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপসনটি ডাক্তারের হাতে দিলে—আমিও সেইদিকে চেয়েই যেন এক প্রচণ্ড বিস্ময়ের নাড়া খেলুম—অভিভূতভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম: একি ওয়াইমারের হাতের লেখা? ডাক্তার সাহেব, আপনি শীঘ্র এ ওষুধ দিয়ে দিন যদি থাকে—এ একজন বিরাট মানুষের দেওয়া প্রেসক্রিপসন! বলতে বলতে প্রত্যাশা-পূর্ণতার আনন্দে কেমন উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারের হাত হ'তে প্রেসক্রিপসনটি হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে সেই দরিদ্র পাহাড়িয়া বৃদ্ধের হাত ধরে ব্যাকুল প্রশ্ন সুরু কোরে দিলুম: কোথায় তিনি? তাঁর দেখা পাবো তো আমি?······

: বাবুসাহেব! তিনি কাল ভোরেই চলে যাবেন অমরনাথের পথে। আপনি কি তাঁকে চেনেন?

: কেমন দেখতে তিনি বলো তো—সাহেবের মতো ?

: তিনি দেবতার মতো দেখতে— তুষারশুভ্র তাঁর দেহের রং, ধবধবে শাদা জটাশ্মশ্রু। মৌনী কিন্তু সর্বজ্ঞ, এই সাধু-বাবার দেখা যে কোন পুণ্যে পেলুম জানিনে! তিনি দিনান্তে একবার সামান্য ফল-দুধ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না—কারো গৃহে রাত্রিবাস করেন না!

: এখন তিনি কোথায় আছেন? বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি।

: আমার কুড়ের পাশেই একটি চিনার গাছের তলটি পরিষ্কার কোরে আমার ছেলে ডালপালা লতাপাতা দিয়ে একটি ছোট্ট কুঁড়ে কোরে দিয়েছে। ইশারায় আমাকে কাগজ আনতে বলে এই চিরকুটটুকু লিখে দিলেন, আর ইঙ্গিতে জানালেন যে তিনি নিঃস্ব সন্ন্যাসী—এ অসুখে যে গাছ-গাছড়ার প্রয়োজন, ওষুধ কোরতে তা' দেখতে পাচ্ছেন না—শহর হতে ওষুধ আনতে হবে। আমি তাঁর পায়ে ধরে আমি ফেরা পর্যন্ত দয়া কোরে থাকতে বলেছি—তিনিও শিবের মতো প্রসন্ন হাসিতে আশ্বাস দিয়েছেন আমায়।... হুজুর! মনে হয় অমরনাথের যাত্রাপথে আমার নাতির শক্ত অসুখের বিষয় জানতে পেরে করুণাবশে তাকে প্রাণ-দান দিতে এসেছেন! ওষুধ দিন হুজুর—আমি গ্রামে পৌছতেই তো ভোর হয়ে যাবে—রাতে তো পথ হাটতে পারবো না—চোখে কম দেখি! ডাক্তারবাবু ও কম্পাউণ্ডার দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। ডাক্তারবাবু এবার নিজেই তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপসনে যে কটি ওষুধ তাঁর ছিলো ঠিক করে দিয়ে দিলেন বৃদ্ধের হাতে। আমি বৃদ্ধকে বললুম: তুমি শীঘ্র একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো! বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে বললুম—

: আমিও যাবো তোমার সঙ্গে সাধু দর্শন করতে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ট্যাক্সি চিনার গাছের তলে সাধুর কুটীরের কাছে থামলো। কুটীরের অপরিসর পথে হাঁটুমুড়ে ঢুকে তাঁকে দর্শন কোরে সত্যই ধন্য হলুম। ইনিই কি ওয়াইমার? সাদা জটাজুটভরা সেই গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্য মূর্তি তখন ধ্যানমগ্ন—হিমালয়ের শিখরের মতো ঋজু দৃঢ় সুগম্ভীর আর তেজোদৃপ্ত। শ্রদ্ধানত মনে—যুক্তকরে কতোক্ষণ তাঁর পানে চেয়েছিলুম জানিনা—হঠাৎ তিনি তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি হেনে আমার পানে চেয়ে ইঙ্গিতে কাছে বসতে বললেন। মনে হলো তিনি আমার মনের কথা সবই জানেন।

প্রণাম করতেই তিনি মৃদু হেসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। আমি সাহস পেয়ে আমার ডায়েরী ও কলমটি তাঁর সামনে রেখে বললুম: আপনি কি বৈজ্ঞানিক ফন ওয়াইমার? আমি আপনার লেখা একখানি জীব-বিজ্ঞান বইর ইংরাজী অনুবাদ পড়ে অবধি আপনার সম্বন্ধে সব কথা জানতে আজ বিশ বছর ধরে পরম আগ্রহান্বিত। আপনার দেশ জার্মানীতে কোলোনের সেই গ্রামেও খোঁজ করেচি এজন্য···!

একবার কৌতুক-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি লিখলেন: হ্যাঁ আমিই ওয়াইমার—কিন্তু তুমি আবও বড়ো বিষয় কৌতুহলী হও না কেন?

সাগ্রহে বললুম: আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই হবো, ঈশ্বরকে জানবার আকাঙ্খাও আমার কম নয়—তবে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অভিমুখে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার এই বর্তমান কৌতুহলের নিবৃত্তি করুন দয়া কোরে।—আপনি কেন বিজ্ঞান-সাধনা আর আপনার প্রিয় স্ত্রীপুত্র ছেড়ে এলেন?

ঈষৎ গাম্ভীর্যের ছায়া পড়লো সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখে—লিখলেন: সে জিনিস ঈশ্বরকে জানলে তবেই বুঝতে পারবে—নইলে আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে কি হবে তোমার?—পাগলামী মনে হবে। তবে তাই তুমি জানতে চাইছ মনে হয়। আমার গবেষণাগারের দেরাজে একটি ডায়েরী রেখে এসেছিলেম—সেটি হয়তো আমার সহকর্মী লেম্যানের কাছে পেতে পারো—তাতে আমার মানসিক পরিণতি ও অভিজ্ঞতার আলো কিছু ছিলো।·····জানো! আমার খোকনই এ পথের দিশারী আমার।

—দুজনেই তারপর অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলুম—মনে হলো যেন একই অনুভূতির ছায়া পড়েছে আমাদের মনে। একসময় ধীরে জিজ্ঞাসা করলুম: সে কি বেঁচে আছে?

: হ্যাঁ—আর সে অতি শীঘ্র আমায় খুঁজে আসবে আমার কাছে।

আমি আশ্চর্যভাবে বললুম: তবে কি আপনার সঙ্গে তাঁদের পত্রালাপ আছে? কাগজে ফুটে উঠলো—

: না।

ক্রমশঃ

কাতুকুতু

নগেন্দ্র কুমার মিত্র মজুমদার

বাবা ডাকে কাতু, মা ডাকে কুতু,
জন্ম দিনে মামা নাম
রেখেছিলেন ভুতু।
সে দিন ছিল বিস্যুৎবারের দিন,
বৃষ্টি পড়ে কেবল বিরামহীন।
বর্ষা জলে মাঠ ঘাট যায় ভেসে,
সর্দি কাশির মড়ক লাগে দেশে।
লোকগুলো সব ঠাণ্ডা লেগে
হাঁচতে সুরু করে,
শিশুবয়স হলেও আমার
সর্দি কাশি ধরে।
সর্দি কাশে নাক গলা যায় বুজে,
মরা বাঁচা দুয়ের মাঝে
চলেছি আমি যুঝে।
বক্ষে ব্যথা, মুখ করে ছল্ ছল্,
বদ্যি বলে, খাওয়াও বাসক জল।
হাসাও সবাই যেমন করে পারো,
সুড়সুড়ি দাও, কাতু-কুতু আরও।
সুড়সুড়ি দেয় সবাই জুটে
আমার নাকে, কানে,
বাঁচাতে মোরে প্রাণে।
সুড়সুড়ি আর কাতু-কুতু খেয়ে,
খুশীর দোলা জাগলো মোর
গোমড়া মুখ ছেয়ে।
তখনি আমি হাসতে থাকি হিহি,
ঘোটক যেমন চেঁচায় চিঁহি চিঁহি।

বদ্যি বলে, বাঁচলে ছেলে জোর,
কাটল এর সকল বিপদ ঘোর।
সেই থেকে সব কাতু-কুতু
ডাকতে আমায় থাকে,
মামার দেওয়া ভুতু নাম
পড়ল দুর্বিপাকে!

মাদুলি

শ্রীসুধীরকুমার রায়

আমার পিতৃদেবকে নিয়ে সেবারে যে মুস্কিলে পড়েছিলাম তা আর জনসমাজে বলবার মত নয়। সে রকম দায়ে না ঠেকলে কেউই সে কথা যে বিশ্বাস করবে না তাও জানি। তবুও আজ আমাকে একথা লিখতে হচ্ছে শুধু মুস্কিলের চাইতেও তার আসানটা আরও চমকপ্রদ হয়েছিল বলে।

শুনুন তবে—

আমার পিতৃদেব সেকেলে মানুষ। অর্থাৎ কিনা পুরো

বাহাত্তর বছর বয়েসেও তাঁর বাহাত্তুরে ধরেনি আজও। এখনও রোজ ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে উঠে পুরো পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে প্রাতভ্রমণ সমাধা করে থাকেন। আজকালকার অজস্রধরণের মাজন কিংবা হরেক রকমের টুথপেস্টের ধার ধারেন না তিনি। পথ হাটতে হাটতে কাঁচা নিমের দাঁতনে দন্ত ধাবনের কাজটুকু বেশ নিখুঁত-ভাবেই নিত্যি সেরে নিয়ে থাকেন। এখনও বেশীর ভাগ দাঁত তাঁর অটুট আছে। দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি কোন দিনই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাঁর চোখে এতটুকু ধুলো দেবার উপায় নেই—এমনই তাঁর চোখের দীপ্তি। তাইতো সেবারে বিজয়ার দিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু বেশী মাত্রায় সিদ্ধি খেয়ে যখন আরও একটু বেশী মাত্রায় বেসামাল হয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম, তখন বেশ সেয়ানা হওয়া সত্বেও পিতৃদেবের হাতের একটা বিরাশী ওজনের চড়ও সিদ্ধির সাথে আমাকে বেমালুম হজম করতে হয়েছিল। এখনও আমার বেশ মনে আছে, মা আমাকে বলেছিলেন—ওরে বোকা ছেলে, একি তোদের চশমা আঁটা চোখ—তোর বাপের চোখ হচ্ছে নিজের পুকুরের মাছের বড় বড় মুড়ো খাওয়া চোখ, ও চোখকে ফাঁকি দেওয়া চাড্ডিখানি কথা নয়।

আহ্নিক না করে পিতৃদেব আমার জলগ্রহণ করেন না। দেবদ্বিজে তাঁর অগাধ ভক্তি।

এ হেন পিতৃদেবও আমার হঠাৎ একদিন অসম্ভব রকম কাহিল হয়ে পড়লেন। তাঁর নিত্যকার্যে বাধা পড়তে লাগলো, আর তিনি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনও তাঁর বন্ধ হয়ে যায়। নিমের ডাল ভেঙে দাঁত ঘসাও আর হয় না। আহ্নিক করতে বসে অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই মুখ সিঁটকে সেখানে মাগো বলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েন। ডাক্তার বদ্যি চিকিৎসার আর অন্ত নেই। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হয় না। একবাক্যে সকলে তখন বলতে থাকে, এ হলো আসল অম্লশূল। কোন ওষুধেই এ রোগ সারবার নয়। মহাপাপ না করলে এ রোগ কখনও হয় না। যদি সারে তো দৈবক্রেই সারতে পারে।

এসব মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে হাসি। কারণ সত্যি কথা বলতে কি—মহাপাপ তো দূরের কথা, সামান্য পাপের কাজও কোনদিন জ্ঞান হয়ে আমি পিতৃদেবকে করতে দেখিনি। বরং পাপের কথা ধরলে অম্লশূল আমারই হওয়ার কথা। কেননা প্রতিদিন আমি লোককে কতভাবে ফাঁকি দিচ্ছি তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার ঘরে যে দু' আলমারি মোটা মোটা বই ঠাসা দেখেছেন, তার একখানিও আমি নগদ পয়সা দিয়ে কোনদিনই খরিদ করিনি। সবগুলোই পড়তে নিয়ে ফেরৎ দিতে ভুলে যাওয়ার মুনাফা। তাছাড়া আমি নিজে তো বটতলার উকিল। বুঝতেই পারছেন, সারাদিন ভোর আমাকে কত পাপের কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করতে হয়।

যা হোক কিছুতেই যখন কিছু হলো না, তখন পাড়ার বামনদিদি এসে পিতৃদেবের কাণে এক মন্ত্রণা দিয়ে গেলেন যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের দীরানন্দ স্বামীর মাদুলি নাকি অম্লশূলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ধারণের তৃতীয় দিনেই রোগের পরিসমাপ্তি।

পিতৃদেব তো নাছোড়বান্দা। সেই মাদুলি নাকি আমার এনে দিতে হবে। যে ব্যক্তি সেই মাদুলি আনতে যাবে, তাকে নাকি সারাটা দিন উপোসী থাকতে হবে। মাদুলি এনে রোগীর হাতে না পরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করতে পারবে না সে। তার মানে—যাকে বলে একেবারে শিবরাত্রির উপোস আর কি। অথচ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে বাসিমুখে চা না খেলে আমার কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় না। কিন্তু সে কথা তো আর প্রবীণ পিতৃ-দেবকে মুখ ফুটে বলা যায় না—তাহলে নির্ঘাৎ হাতের যষ্টিটির ওপর শরীরের সমস্ত ভর আরোপ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুর্বাসা মুনির মত রোষকষায়িত নেত্রে ফরমান জারি করবেন—অপদার্থ কুলাঙ্গার, তোমাকে আমি অদ্য হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম।

দরকার কি আমার ওসব ছেঁড়া ঝামেলায়। সে জন্যে পিতৃদেব প্রস্তাব করা মাত্র আমি অতি বাধ্য ছেলের মত বললাম—তথাস্তু।

কিন্তু তারপরে কি করলাম?—কিচ্ছু না। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রবিবারটি উপভোগ করলাম বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তাস পিটে। শুধু কি তাই—বন্ধু পত্নীর পেলব হস্তের ঘন ঘন ধূমায়িত চায়ের সদ্ব্যবহার, দুপুরে পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে বেরাল ডিঙোতে পারেনা এমন এক থালা ভাত গলাধঃ-

করণ। সর্বশেষে বঙ্গ-কন্যা গঙ্গশ্রী গীতালীর ভজন ও খেয়ালে নিজেরই আমার খেয়াল থাকে না যে কখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

বাড়ী ফিরলাম বেশ রাত করে। এসেই পিতৃদেবের হাতে ভক্তিভরে পৈতের সুতো দিয়ে মাদুলি পরিয়ে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম টান টান হয়ে। মা ছুটে এলেন—আহা বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। উপোস করা তো সাত-জন্মে অব্যেস নেই। নে আয়, হাত-মুখে জল দিয়ে আগে দুটি খেয়ে নে।

আড়চোখে দেখলাম পিতৃদেবের মুখখানিতে গভীর পরিতৃপ্তি। ভাবখানা যেন এই—কোথায় লাগে এর কাছে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি।

কী আশ্চর্য মাদুলী ধারণের ঠিক তিনদিনের পর থেকেই পিতৃদেবের অমন যে যন্ত্রণাদায়ক অম্লশূল, সত্যিই তার আর চিহ্নমাত্র রইলো না। রোগমুক্ত হয়ে তিনি আবার আগের মতই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। বামনদিদিও বেশ জো পেয়ে খুব বড়াই করে বলতে থাকেন—দেখলে তো পেরফুল্ল, আমি বলিনি অমন দৈবি ওষুধ আর কখনও হয় না। যাকে বলে একেবারে হাতে হাতে ফল।

বামুনদিদির এহেন কথা শুনে পেরফুল্ল অর্থাৎ কিনা আমার বয়োবৃদ্ধ পিতৃদেব মাথায় হাত ঠেকালেন। বোধহয় অমন গুণের দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন।

আমি মনে মনে আর একবার একটু হাসলাম। মাদুলি ধীবানন্দ স্বামীর কাছ থেকে আনা নয়—ওটি আমারই স্বকপোল-কল্পিত। হরের দোকানের দু'পয়সা দামের তামার একটা মাদুলি এবং আমার বন্ধুবর গজানন পাকড়াশীর সিমেন্টচটা উঠনের এক চিমটে মাটি—তাতেই এই আশ্চর্য ফল! তাইতো ভাবছি আমার পেশাই যখন মিথ্যে নিয়ে—তখন ওকালতি ছেড়ে দিয়ে এবারে মাদুলির এই নতুন ব্যবসায়ে নামবো কিনা· · ·

খাই খাই

শ্রীপার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

গাধা খাও শোন এসে খাইবার ফন্দ,
ভ্যাবাচাকা খায় যত বেয়াকুব হন্দ।
কলা খায় হনুমানে বুড়ো খায় ভিরমি,
লাট খায় ডাক ঘুড়ি—চিনি খায় কিরমি।
টোল খায় ঘটিবাটি লাগে যদি ধাক্কা,
বোকা ছেলে ঘোল খায় পেট ভরে পাক্কা।

ঘুস খায় দারোগারা, ঘাস খায় ছাগলে,
পাক খায় গুলি সুতা—কি না খায় ছাগলে ?
হাওয়া খান বড়বাবু সন্ধ্যা ও সকালে,
'লস' খায় ব্যবসায়ী তার পোড়া কপালে।
ভয় খায় ভীতু যারা টাকা খায় দালালে,
গুলি খায় জনতারা—সরকারে জ্বালালে।

খাই খাই চারিদিকে যেথা চলে দৃষ্টি,
খেতে হয় সব শেষে দধি আর মিষ্টি।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও ফার্সি-শব্দের বাহুল্য, এই দুই শক্তির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে দ্বন্দ্ব চলে তার মধ্যে থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলা গদ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে উদ্ভব হয় উনিশ শতকের প্রথম পাদে—প্রথমত মনস্বী রামমোহনের প্রচেষ্টায়; দ্বিতীয়ত মনীষীপ্রবর বিদ্যাসাগরের সাধনার জোরে ঐ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলা গদ্যসাহিত্য সুষ্ঠু কলেবর ধারণ করে। শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সেই গদ্যভাষা সৌন্দর্যসুষমায় ভূষিত হয়ে লীলাচঞ্চল রূপ লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকে এই সুগঠিত গদ্যের মধ্যে থেকে আবার দুটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব হয়; একটি হচ্ছে লেখ্য কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার গদ্য, অপরটি শিষ্ট সমাজের কথ্যভাষার গদ্য যা বলায় ও লেখায় সমান কাজের। এই দুই ধারা পরস্পরবিরোধী শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। তাদের নতুন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রথম প্রস্তুত করলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের অভিমতও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারার বিশেষ অনুকূল ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরিণত হল প্রথম চৌধুরীর সযত্ন প্রয়াসে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কথ্যভাষার গদ্যের শক্তিই জয়লাভ করেছে। তবে তার জন্যে চলতি ভাষার গদ্য লেখ্যভাষার গদ্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে নবীভূত হয়েছে। বিংশ শতকের পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল-পরবর্তী যুগে কথ্যভাষার গদ্যের প্রাধান্যলাভ সুনিশ্চিত। তার সমস্ত লক্ষণ এখন সুপরিস্ফুট। পরে সে-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সংস্কৃত ও ফার্সি, দুই ভাষার বিরুদ্ধ চাপে ১৮৭৮ সালের অব্যবহিত আগে বাংলা গদ্য বেশ মন্দগতি হয়ে পড়েছিল। তখন চিঠিপত্রে চলতি ফার্সির অবাধ প্রতিপত্তি আর সমস্ত নিবন্ধ-প্রবন্ধে ছিল নীরস সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা গদ্যের আধিপত্য। দুই প্রভাবের মধ্যে বাংলা ভাষার ধাতুপ্রকৃতির পক্ষে বরং সংস্কৃত প্রভাব বেশি অনুকূল ও বাঞ্ছনীয় ছিল। ইতিহাসের গতিও সংস্কৃত প্রভাবের এমন আনুকূল্য করল যে, সাধারণভাবে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এবং বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজ থেকে ফার্সি প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। ১৭৭৮ সাল থেকে বিদেশি সরকারের আনুকূল্য বাংলা ও সংস্কৃতের পক্ষে এবং বিশেষভাবে ফার্সির বিপক্ষে পরিচালিত হল। তার অনিবার্য পরিণামে বাংলা গদ্যভাষা থেকে ফার্সির প্রতাপ ক্রমে ক্রমে উবে গেল। বিদেশি ইংরেজ সরকার বাংলাদেশে মুসলমান শাসক শক্তি ও তার রাজ দরবারের ভাষা ফার্সিকে প্রথমে সুনজরে দেখেনি কেন, তা সহজেই বোঝা যায়।

ফার্সি প্রভাবের শ্বাসরোধক পরিবেষ্টন থেকে বহুদিন পরে মুক্তি পেয়ে বাংলা গদ্য সহজেই বহুদিনসঞ্চিত আবর্জনা দূর করতে পারল তার নবীন প্রাণোচ্ছলতার সাহায্যে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কয়েকজন শক্তিশালী জাতি-সংগঠক বাঙালিদের মধ্যে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইংরেজদের বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার প্রতি অনুকূল মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নবলব্ধ ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতিজাত নব উদ্দীপনার সাহায্যে স্বজাতি ও স্বভাষার সমৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হন। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা বর্জনমূলক মনোভাব গ্রহণ না করে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পোর্তুগীজ ভাষার সান্নিধ্যে এসে বাংলা গদ্যভাষা যতটা উপকৃত হয়েছিল, ইংরেজির সাহচর্যে এসে তার চেয়ে ঢের বেশি সুফল পেয়েছিল। নবগঠিত বাংলা গদ্য প্রথমে অতি-উৎসাহী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে একটু জখম্ হয়ে গেলেও শীঘ্রই দ্বন্দ্বসমন্বয়ের ফলে জাত একটি সুললিত গদ্যভাষা গড়ে উঠল। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে, এমন এক উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের সূচনা হল যার তুলনা সারা এশিয়ায় দেখা গেল না। জগতের শ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্যগুলির সঙ্গে সে এক পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

দীর্ঘকাল ধরে একমাত্র অতিললিত ভক্তিপ্রাণ কাব্যসাহিত্যের চর্চা করে বাঙালির অন্তরাত্মা অষ্টাদশ শতকে নিতান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল, সে যে গদ্যের সাহায্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে প্রাগ্-আধুনিক গদ্য নিবন্ধ-প্রবন্ধ পুস্তক গুলিতে। শুধু গদ্যের প্রতি রচনাশৈলীগত অনুরাগই নয়, এই সময়ে বাঙালির অন্তর যুক্তিতর্ক সংশয়ের তাড়নায় নতুন ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশের জন্যে উন্মুখ হয়েছিল। যুক্তিতর্ক সংশয়ের সবচেয়ে ভালো বিকাশ-মাধ্যম হচ্ছে গদ্যভাষা। সেইজন্যেও এই সময় গদ্যরচনার চাহিদা ও চেষ্টা বেড়ে যায়। ধর্মসম্পর্কিত বিতর্কমূলক রচনায় গদ্য প্রায় অপরিহার্য।

কিন্তু অবাধে গদ্যরচনার প্রধান বাধা রয়ে গেল মুদ্রাযন্ত্রের অভাব।

তার জন্যেই ভারতচন্দ্রের শাণিত ভাষা গদ্যের বাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করতে পারল না। তাঁর পদ্যরচনার উজ্জ্বল দীপ্তি গদ্যভাষায় প্রতিফলিত হলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আমরা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক গদ্য দেখার সুযোগ লাভ করতাম। ভারতচন্দ্রও তাঁর প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতার সন্ধান গদ্যরচনাতে খুঁজে পেতেন। হয়ত উপযুক্ত সময়ে মুদ্রাযন্ত্র এদেশে প্রবর্তিত হলে কবিকঙ্কণ কবি না হয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হতেন। যাই হোক, ইংরেজ-আমলে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সাহিত্যিকের অভীপ্সা বাস্তবে প্রমূর্ত হওয়ার সুযোগ পেল। অচিরে অন্য প্রগতিশীল দেশগুলির মতো এদেশেও গদ্যরচনাই মুখ্য স্থান অধিকার করল।

যদি ভারতচন্দ্রের পদ্যের ভাষাকে সোজাসুজি গদ্যের রূপ দেওয়া যেত, তাহলে হয়ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের এত কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হত না। ভারতচন্দ্রের ভাষার গদ্য রূপান্তরের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেত সামঞ্জস্যময় ললিত মোহন ভাষাসৌন্দর্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হল না। সাময়িকভাবে প্রচুরতম তৎসম শব্দের পাষাণভার বাংলা গদ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। তার একটা সুফল অবশ্য ফলেছিল। বাংলা গদ্যের গঠন হল প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় এবং ভাবী আক্রমণের মুখে অটল ও দুর্ভেদ্য। এইজন্যে পরের যুগে বাংলা গদ্যভাষায় প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গি প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু ইংরেজি শব্দাবলীর আক্রমণে বাংলাভাষা তেমনভাবে জর্জরিত হয়নি যেমন হয়েছিল ফার্সি-ভাষার দ্বারা।

ভারতচন্দ্রের পদ্যরচনাকে গদ্যরূপ দিলে কেমন হত, তার একটু নিদর্শন দেখা যাক :—

"প্রসাদগুণ রবে না, রসাল হবে না। অতএব যাবনী-মিশাল ভাষা বলি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কয়ে গিয়েছেন, ভাষা যে হোক সে হোক, কাব্য রস নিয়ে।"

এই ধরণের ভাষার পরিবর্তে আমরা দীর্ঘকাল কৃত্রিম সাধুভাষায় কাজ চালাতে বাধ্য হয়েছি। ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টায় ও বৈদেশিক সহায়তায় মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আগে বাংলা গদ্যের যে দুই ধারার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তাদের মধ্যে সংস্কৃতপ্রভাবিত ধারার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যা ১৭৭৮ সালের আগে লেখা, নিচে তুলে দেওয়া হল :—

গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়, তাহা কৃপা করিয়া বলহ।" তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন, তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়," তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদার্থ কত?" তাহাতে গৌতম কহিতেছেন, "পদার্থ সপ্ত প্রকার ; দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব।"

"ভাষা পরিচ্ছেদ"—এর ঐ উদ্ধৃত অনুবাদের ভাষা থেকে একথা বোঝা যায় যে, ১৭৭৪-৭৫ সালের ঐ গদ্যে ইচ্ছা করলে সাহিত্য সৃষ্টি করা যেত। যখন স্বয়ং ভারতচন্দ্র বলছেন, "যে হোক সে হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে," তখন কোন যোগ্য রসস্রষ্টা সাহিত্যিক তাঁর অভিমত অনুসারে চেষ্টা করলে যে ঐ গদ্যভাষা নিয়েই বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়াপত্তন করতে পারতেন, তাতে আর কোন ভুল নেই। কিন্তু নানা কারণে কোন সাহিত্যিক সে-কাজে উৎসাহ বোধ করেননি। অথচ উনিশ শতকে ওর চেয়ে খারাপ ভাষায়ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফার্সিপ্রভাবিত ধারার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আলোচনা করা যাক। এই ভাষার উদ্ভব ১৭৫৭ সালে :—

"আমার সন্তান রহিত। তুমি কন্যা ; আর কেহ ক্রিয়া আদি আমার করে, এমত নাই এই ক্ষণ। ক্রিয়াকর্তা তুমি। একারণ, আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আপন ভদ্রাসন ও জমি ও পুষ্করিণি সাকিম তপশীল মবলগে আঠান্ন বিঘা—ব্রহ্মোত্তর পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত—ও শিষ্যসেবক যেখানে যে আছে তাহা সমস্ত নিত্যকৃত্য তোমাকে দিলাম। যে তক জীবিত থাকিব, তদবধি আমার ও আমার স্ত্রীর সেবা ও শুশ্রূষা আদি করিতেছ, করিয়া ধর্মকর্ম যথাযোগ্য করাইবা। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আদি করিয়া, সাকিম তপশীল জমি আবাদ তবদুদ করিয়া ও শিষ্যসেবক বহাল রাখিয়া, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিয়া ইহার দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকার তোমার। আমি কিম্বা আর কেহ দাওয়া করে, সে ঝুটা ও বাতিল। এতদর্থে দানপত্র দিল।"

এই ভাষার সাহায্যেও সাহিত্যসৃষ্টি করা যায়।

ভারতচন্দ্র গদ্যরচনায় নদীয়া জেলার ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার করতেন যদি তাঁর গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করার ইচ্ছা হত, এমন অনুমান করলে দোষ হবে না। কেন-না, তাঁর কাব্যে ঐ ভাষার প্রভাব প্রবল। ১৩৫৯ সালের ভাদ্র মাসের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় রাজা নবকৃষ্ণ দেবের নামে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তা প্রায় ঘরোয়া ভাষায় লেখা। সে-ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি উপভোগ্য হতে পারত। সেটি ১৭৭০ সালের আগেই লেখা ; কারণ, তাতে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আছে।

১৬৭৫ থেকে ১৭৭৮ সালের বাংলা গদ্যভাষার বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই সময়ে বাংলা গদ্য প্রথম প্রবন্ধ রচনার উপযোগী হয়ে উঠল। আগের যুগের গদ্যভাষায় প্রাঞ্জলতা ছিল। কিন্তু একটা বক্তব্যবিষয়ের বর্ণনায় ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে বিষয়টির সম্পূর্ণ বিবরণ রচনা করবার সামর্থ্য ছিল না। অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যে সাহিত্যের কোন লক্ষণ বা রীতি দেখা না গেলেও তা সুসংবদ্ধভাবে মনোভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছিল। আগে উদ্ধৃত নানা দৃষ্টান্ত থেকে একথা বোঝা যায় যে, এ যুগে বাঙালির গদ্য রচনায় প্রবণতা এবং গদ্যে মনোভাব পরিস্ফুরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য তখনও তার গদ্যরচনার পেয়ালায় সাহিত্যের রস উপচে পড়ে নি। কিন্তু দুর্বোধ্য ফার্সি শব্দের আধিক্য এবং সংস্কৃতানুগ আড়ষ্টতা সত্ত্বেও এযুগের গদ্যে সাহিত্যরচনার উপযুক্ত গুণ অন্তর্নিহিত ছিল। এমনকি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের অনেকের গদ্যভাষার তুলনায় এযুগের গদ্য বেশি এগিয়ে গিয়েছিল।

কেবল ছাপাখানা ও উপযুক্ত সাহিত্য-সাধকের অভাবে তখন গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনি। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক ফার্সিবহুল বাংলা চিঠির ভাষার চেয়ে এ সময়ের দুশো বছর আছের বাংলা গদ্যভাষা বেশি উন্নত ছিল।

সাধারণত দেখা যায় যে, রাজধানীর প্রগতিশীলতা মফঃস্বলে পৌঁছতে দেরি হয়। এইজন্যে সমাজের উচ্চতম স্তরের শিক্ষাদীক্ষার সারনির্যাস সাধারণ লোক অনেক দেরিতে লাভ করে। পরবর্ত্তীকালে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি হয় বিশেষত ইংরেজি গদ্যভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার দরুণ। কিন্তু তার প্রভাব সাধারণ বাঙালির চিঠি লেখার ভাষায় অনেক দেরিতে এসে পড়ে। এই জন্যে, শিক্ষিত নাগরিকের পরিত্যক্ত পোষাক অজ্ঞ গ্রামবাসীর যার পরিহিত হওয়ার মতো, সাধারণ বাঙালি লোক-ব্যবহারে ফার্সির ভেজাল-মেশানো বাংলা গদ্য প্রয়োগ করেছিল বহুদিন পর্যন্ত। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন-এর ছত্রে ছত্রে তার বহু নিদর্শন আছে।

১৭৭৮ সালে যে-যুগ সুরু হল তা ফার্সি বর্জন ও সংস্কৃত বরণের যুগ। ১৮৩৫ সালে ফার্সি প্রয়োগের প্রবণতা শান্ত হয়ে এল রাজদরবার থেকে ফার্সি চূড়ান্তরূপে বিতাড়িত হল দেখে। কিন্তু তার আগে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষাসরস্বতী প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় "কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন।"

ক্রমশঃ

সহচরী

পুলক আঢ্য

বিগত-যৌবনা কোন কুমারীর মত—
দিনগুলি যবে মোর অনাস্বাদিত কামনায়—
জ্বলে জ্বলে ওঠে, আর সে জ্বালায় জ্বলে সারা মন,
সেই সব বন্ধ্যা দিনে—তোমারে প্রসব-বেদনায়—
বিধুর হইয়া ওঠে—সারা মর্ম মোর,
সেই সব বন্ধ্যা দিনে তুমি আসো বন্ধুর মতন।
আবার যখন কোন অভিসারিকার প্রীতি সম—
সুগোপনে মনে মনে বয়ে যায় প্রেম ফল্গুধারা,
জীবনের সে বসন্তে—সেই সে ফাল্গুনে—
তোমারে নিকটে পাই। নিবিড় করিয়া বক্ষ'পরে
ধরিয়া রাখিতে চাই—অয়ি প্রিয়তমে।
তবুও সেদিন তুমি চলে যাও লীলা অবসানে,
পরকীয়া প্রেমসম সে পাওয়াও সামান্য ক্ষণিক,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে মোহ রহেনাক মাধবীর গানে।
কিন্তু সেই গান, আহা সেই সব গানগুলি কভু—
মরিতে জানে না, মনে পাতা থাকে আসন তাহার,
যাহারা আসিয়া ছিল বন্ধ্যা দিনে বান্ধবের মত।
হৃদয় হারায় তাই—নয়নের সারে,
হাসিতে হারাই তারে—হারাতে যে চেয়েছে আমারে।
তাই যত বন্ধ্যা দিন—গানে গানে বন্ধু হ'য়ে আছে!

তিব্বতী লোক-সংগীত

জীবনকৃষ্ণ দাশ

পারস্পরিক

হিজল গাছের ছায়ার কাছে ঠাঁই পেয়েছে পাখি,
সেখান থেকে পালানো তার সাধ্য আছে নাকি?
স্নেহ-কৃতজ্ঞতায় ওরা জড়িয়ে পরস্পরে
আসবে আসুক ঈগলপাখি ভয় ওরা না করে।

চপলা নারী

মায়ের গর্ভে জন্মেছে অই নারী!
না, না জন্মেছে সে পীচ গাছের ডালে
তাই বুঝি ওর প্রেমটুকু হায়!
চোখের পলক ফেললে শুকায়
পিচ ফুলেরে ও—ছি! ছি! হার মানালে।

উৎস, যার হিয়ার অতল তল
কালি দিয়ে লিখ যে কথা তুমি কাগজ'পরে
মুছে যায় পেলে জল,
কিন্তু সে কথা মুছিবে কে বল উৎস যার
হিয়ার অতল তল,
মুছিতে তাহারে চাওনা যতই দেখগো শুধু
হয় সে আরো উজল।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা ঝরঝরে বোধ করবেন। **প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।**

L. 265-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে, কর্ত্তৃক প্রস্তুত
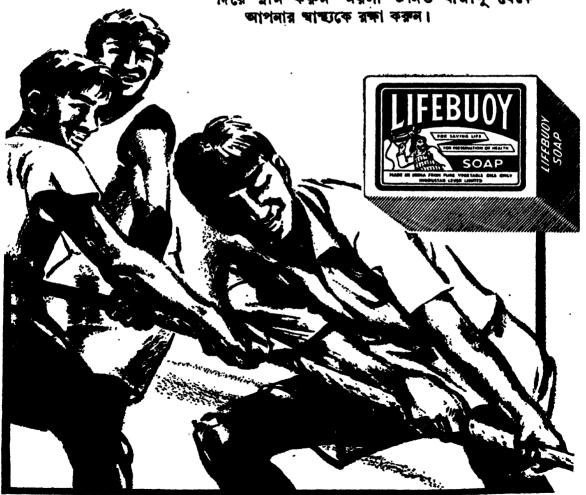
একটু উঁকি দিয়েই কাঞ্চী বেড়ার ধারে সরে এল।

সিলভার-ওক আর পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে সর্পিল গতিতে রাস্তা উঠে এসেছে। হালকা কুয়াশায় সব অস্পষ্ট। কিন্তু কাঞ্চী ঠিক দেখতে পেল। বটল-গ্রীন সোয়েটার, মাথায় কালো টুপি, ছাই-রঙা প্যান্ট। দীর্ঘ একটি দেহ দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে।

প্রথম প্রথম খুব হাসি পেত কাঞ্চীর। কোথায় শীত, তার ঠিক নেই। এখনও ফালুটেও এক চিলতে বরফের রেখা নেই, কিন্তু সমতল দেশের মানুষগুলো সোয়েটার, কম্ফর্টার, আলষ্টার, লংকোট সব জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে ঘোরা-ফেরা করে। সর্বাংগ মুড়ে। কোথা দিয়ে যেন একটু শীতের ঝলক না গায়ে লাগে। নিজেরা তো এমনভাবে সাজেই, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত উলের পুঁটলি ক'রে তোলে।

এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু-হাত প্যান্টের পকেটে, মাথার টুপিটা একটু হেলানো। পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁফ নিচ্ছে।

কাঞ্চী আরো একটু সরে দাঁড়াল। বুনো গোলাপের ঝাড়টা ডালপালা বিস্তার করে সামনের সব কিছু ঢেকে রেখেছে। দেখবার উপায় নেই।

লোকটি পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতো ঘাড় আর কপাল মুছে নিল। ঘাম নয়, পাতলা কুয়াশা জমেছে। হালকা রুপোলী পাতের মতন। তারপর রুমাল পকেটে পুরে হন হন করে এগিয়ে গেল।

সিমেন্টের সাঁকোটা পার হয়ে যেতেই লোকটিকে আর দেখা গেল না। জোড়া পপলার গাছটার আড়ালে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলে কাঞ্চী বাড়ীর ভিতর চলে গেল। সারাটা বিকেল পার হয়ে যাবে, সারাটা রাত, আবার সেই সকালে এই পথ দিয়ে যাবে। এমনি ভাবে হনহন করে। ঠিক এমনিভাবেই কাঞ্চীর দিকে না ফিরে সোজা চলে যাবে।

কিন্তু তবু কাঞ্চী এসে দাঁড়াবে বেড়ার ধারে। এক-

দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখবে যতক্ষণ না লোকটা পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবে।

মনকে কাঞ্চী অনেক বুঝিয়েছে। কি লাভ এতে। অতটুকু দেখায় মনের আর কতটুকু ভরে। তাছাড়া পাহাড়ী একটা মেয়ের অত লোভই বা কেন! মাঝে মাঝে মনকে শক্ত করে কাঞ্চী। না, আর নয়, আর কোনদিন নয়। কিছুতেই বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে না। মার কাছে বসে উলের টুপি বুনবে কিংবা উলের মোজা, তবু হাটে বিক্রী করলে কিছু পয়সা আসবে।

কিন্তু ম্লান রোদের রেখা সরতে সরতে বুনো গোলাপ গাছের কাছ বরাবর গেলেই কাঞ্চী চমকে উঠে বসে। দ্রুত স্পন্দন বুকের মাঝখানে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। কাঁটা আর উলের গোছা সরিয়ে রেখে কাঞ্চী ছুটে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিসপিল পথের দিকে। একটু পরেই তাকে দেখা যাবে। আর একটু পরেই।

লোকটা বাঙালী এটুকু কাঞ্চী জেনেছে। ম্যালে দাঁড়িয়ে আরো দু একজনের সঙ্গে কথা বলতে হাট-ফেরত কাঞ্চী দেখেছে। শুনেছে বাঙলা কথা। অবশ্য লোকটা সাধারণ বাঙালীর তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ, অনেক গৌরাভ। কিন্তু দুটো চোখ দেখলে ঠিক বোঝা যায় যে বাঙালী। এমন কটাক্ষ, এমন চঞ্চল চোখ বুঝি আর কোন জাতের দেখা যায় না।

ঠিক তাই। ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কাঞ্চী দেখেছে। দীর্ঘ পক্ষ্ম, রহস্যময় চোখ, পাহাড়ের চুড়োর মতন খাড়া নাক।

মার বেতের বাক্স থেকে খুব সাবধানে কাঞ্চী ফটোটা বের করেছিল। মা জানতে পারলে, আর কিছু নয়, হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মুখোমুখি হতে হবে অজস্র প্রশ্নের।

কাঞ্চীর ভালো মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। মার কাছে শুনেছে, দিদির কাছেও।

কার্সিয়ংয়ের স্যানাটরিয়ম। নামকরা ডাক্তার বিজন বসাক। অপারেশনে সিদ্ধহস্ত। যমের কবল থেকে রোগীকে ছিনিয়ে আনে। সেখানকার ছোট্ট নার্স কাঞ্চীর মা। কোন পরীক্ষায় কোন দিন পাশ করেনি, না সার্টিফিকেট, না ডিপ্লোমা, কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকে ছিল ওই স্যানাটরিয়মে। হাতে কলমে সব কিছু শিখেছে।

বিজন ডাক্তারের প্রিয়পাত্রী। কঠিন রোগী কিংবা গোলমেলে অপারেশনের কেস এলেই ডাক্তার বসাক কাঞ্চীর মার খোঁজ করেন। হাতের গ্লাভস থেকে সুরু করে ফোরসেপ, ডিসেকশন নাইফ—সব কিছু এগিয়ে না দিলে ডাক্তার বসাকের মন খুঁতখুঁত করে। কাজে গা লাগে না।

আশ্চর্য কাণ্ড। ছুরি, কাঁচি দেওয়া নেওয়ার ফাঁকে কোন এক মুহূর্তে মন দেওয়া নেওয়ার পালাও সাঙ্গ হ'ল। সহপাঠিদের বিদ্রূপ, কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি—সব উপেক্ষা করে বিজন বসাক কাঞ্চীর মাকে কাছে টেনে নিয়েছিল।

বাধা শুধু বিজন বসাককেই পার হ'তে হয়নি, কাঞ্চীর মাকেও হ'য়েছিল। পর্বতপ্রমাণ বাধা পার হয়ে তবে পর্বত-দুহিতা মনের মানুষের নাগাল পেয়েছিল।

তারপর একটানা সুখের স্রোত। কাঞ্চীর দিদি আর কাঞ্চী সেই স্রোতেরই ভেসে আসা দুটি ফুল। নিজের সমাজে, গাঁয়ের মোড়লদের কাছে কাঞ্চীর মাকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তা আর স্থৈর্য দিয়ে কাঞ্চীর মা সব কিছু জয় করেছিল। শত আঘাতেও ভেঙে পড়েনি।

শত আঘাতে ভেঙে পড়েনি, কিন্তু আচমকা এক আঘাতেই যেন কাঞ্চীর মাকে মাটিতে ফেলে দিল। শীত-শীর্ণ হৃতপত্র লতার মতন বর্ণ, দীপ্তি, তেজ সব হারাল।

মাত্র দুদিনের জ্বর। প্রথম প্রথম সামান্য একটু গলা ব্যথা। দুটো চোখের রংয়ে ডালিম ফুলের ছোঁয়াচ। তারপর যমে মানুষে টানাটানি। দার্জিলিং থেকে সিভিল সার্জন, শিলিগুড়ি থেকে কবিরাজ। কাঞ্চীর মা কিছু আর বাদ রাখল না। সারাদিন রাত শিয়রে বসে রইল। এক সাধুর দেওয়া রুদ্রাক্ষ বালিশের তলায় রেখে। তিব্বতী গুম্ফা থেকে যোগাড় করা।

কিন্তু মানুষ হার মানল। কাঞ্চীর মার একটা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে বিজন বসাক শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

কাঞ্চীর মা স্যানাটোরিয়ম ছাড়ল। কার্সিয়াংও। দার্জিলিংয়ে এসে বাসা বাঁধল। কার্সিয়াংয়ের কথা মনে নেই কাঞ্চীর। তার জীবন শুরু দার্জিলিং থেকে।

দিদির বিয়ের কথা তার বেশ মনে আছে। বাহাদুর শের-পা কাছাকাছি গাঁয়ের ছেলে। হাটে আসত হাঁস আর মুরগির পাল নিয়ে। দিদির সঙ্গে হাটেই দেখা—কিছু-দিন পর দুজন উধাও। অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর নেই, তারপর এক বরফ-ঝরা অন্ধকার রাতে দুজনেই এসে হাজির।

বাহাদুরের উন্নতি হয়েছে। অনেক দূর থেকে এক সাহেবের দল এসেছে পাহাড়ে চড়তে, তাদের দোভাষীর কাজ পেয়েছে। তাকে বেশী ওপরে উঠতে হবে না। নিচের তাঁবুতে সাহেবদের জিনিসপত্র আগলাতে হবে।

বাহাদুর অনেকবার বলেছে। এ রকম আলাদা থেকে লাভ কি। কাঞ্চী আর তার মা এখানকার বাস উঠিয়ে এক সঙ্গে থাকলেই পারে।

কিন্তু কাঞ্চীর মা রাজী হয়নি। কাঞ্চীরও ইচ্ছা নয়। কি জানি কেন পাহাড়ী ছেলেগুলোকে কাঞ্চীর আদৌ ভাল লাগে না। পেন্তাচেরা চোখ, বোকা বোকা চেহারা। মানুষ বলে যেন মনেই হয় না।

কথাটা কাঞ্চী ওর মার কাছেই শুনেছে। বাপের মুখের সঙ্গে কাঞ্চীর মুখের অদ্ভুত মিল। টানা চোখ, নাকও উঁচু, মুখেও তেমনি পেলবতার পরশ। শুধু মুখচোখই নয়, তার মনটাও কেমন বাঙালী ঘেঁষা। বাঙালী ছেলেদের দেখলেই বুকের মধ্যে টনটন করে। মনে হয় কোথায় একটা মিল রয়েছে এদের সঙ্গে। সুপ্ত রক্তকণিকায় তীব্র একটা আকর্ষণ। কাছে যেতে ইচ্ছা করে, কথা বলতে ইচ্ছা করে। ভাষা জানে না, তবু মনে হয়, আকারে ভঙ্গিতে নিজের মনের কথা ঠিক এদের বোঝাতে পারবে।

কিন্তু এবারের ব্যাপার একেবারে আলাদা। বেড়ার ধারে কাঞ্চী দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দ্রুতপায়ে একটি লোক এসে সামনে থামলো। চলতে চলতে জুতোর ফিতে খুলে গিয়েছিল। বেড়ার গায়ে পা রেখে হেঁট হ'য়ে ফিতেটা বেঁধে নিল।

সব মিলিয়ে বড় জোর মিনিট কয়েক। কিন্তু সেটুকু সময়ের মধ্যেই শরীরের সমস্ত রক্ত কাঞ্চীর মুখে এসে জমা হ'ল। থরথরিয়ে উঠল লালচে ঠোঁট দুটো। মনে হ'ল [illegible]

কিছু। সামনের হেঁট হ'য়ে থাকা লোকটা সব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর থেকে রোজ সকাল-বিকাল কাঞ্চী বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ায়। শুধু একটু চোখের দেখা। কিন্তু সেইটুকু সম্বল ক'রেই তার সারাটা দিনরাত কাটে, হয়তো সারাটা জীবনই কাটবে।

ব্যাপারটা কাঞ্চীর মায়েরও চোখে পড়েছে। কিন্তু মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই থেমে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে পারে নি। বোধ হয় নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে গেছে। অতীত কাহিনীর স্মৃতি। তা ছাড়া মেয়েকে সাবধান করে দেবার মতনও কিছু ঘটে নি। বাঙালীবাবু এসেছে দার্জিলিং বেড়াতে। শীত পড়লেই নেমে যাবে। কাঞ্চীরও চোখের নেশার অবসান হবে।

কিন্তু একদিন অঘটন ঘটল। হাট থেকে কাঞ্চী ফিরছিল। হাতে শাকসব্জীর সাজি। হঠাৎ গোলমালে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখল।

একটা ঘোড়া লাফাতে শুরু করেছে। পিঠে সওয়ার। ঘোড়াটা পাশে আসতেই কাঞ্চী থমকে দাঁড়াল। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। ঘোড়ার পিঠে সেই ভদ্রলোক। সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ঘাড়ের চুল ধরে। হাতের লাগাম খসে দুপাশে ঝুলছে।

একটু ছুটতেই কাঞ্চী লাগামের নাগাল পেল, তারপর পাহাড়ী মেয়ের পক্ষে ঘোড়াকে থামান খুব শক্ত ব্যাপার নয়। ঘোড়াটা থামবার আগেই লোকটি লাফিয়ে নেমে পড়ল।

শীতের মধ্যেও ঘামের বিন্দু জমেছে কপালে। ভিজে মাথার চুল। ভয়-পাওয়া চোখ দুটো আরো আয়ত। উত্তেজনায় বুকটা ওঠা নামা করছে।

অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই বলল, হঠাৎ লাগামটা ফসকে গিয়েছিল হাত থেকে।

ভাবটা যেন লাগামটা না ফসকালে সে যে কত বড় ঘোড়সওয়ার সেটা আশপাশের লোকজন টের পেয়ে যেত। তারপরই বোধ হয় কথাটা মনে পড়ে গেল। একটু হেসে কাঞ্চীকে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি না ধরে ফেললে বিপদ হ'তে পারত।

সমতলের বাবুদের চড়বার জন্য মজুত করে রাখা। পেটে আগুনের ছোঁয়া লাগলেও এসব ঘোড়া দৌড়বার কল্পনা করে না। গুটি গুটি হাঁটে জলাপাহাড়ের দিকে, কিংবা লাডেন লা রোড ধরে সোজা খানিকটা। পিঠে মোটা-সোটা সওয়ার।

আজ হঠাৎ এ ঘোড়াটার মনে পক্ষীরাজ হওয়ার বাসনা কেন হ'ল বলা মুস্কিল। বোধ হয় ভয় পেয়ে থাকবে, কিংবা পিঠের ওপর জোয়ান মদ্দ একটা লোক ওই ভাবে ঘাড়ের চুল আঁকড়ে পড়ে আছে ভেবেই বোধ হয় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তা হ'লেও মারাত্মক কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল না। একটু ছুটেই আবার ঘোড়াটা শান্ত হ'য়ে আসত। আচমকা বেপরোয়াভাব দেখাবার জন্য লজ্জিত হ'য়ে ঘাড় হেঁট করে ফিরে আসত সহিসের কাছে। একটু ভয় পেয়ে যাওয়া ছাড়া সওয়ারের আর কোন ক্ষতি হ'ত না।

তাই কাঞ্চী ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিল, আমায় লজ্জায় ফেলবেন না। এমন কিছু বড় কাজ আমি করি নি।

লোকটি কিছু বলার আগেই সহিসের দল এসে হাজির হ'ল। পিছন পিছন বোধ হয় সওয়ারের গোটা কয়েক বন্ধু।

কাছে এসেই সহিস সজোরে চাপড় মারল ঘোড়ার মুখে। চিৎকার করে বলল, জানোয়ার কাঁহাকা। এতদিনের শিক্ষা সহবত সব ভুলে এমনি করে আমার মুখ পোড়ালি ?

বন্ধুরা লোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। চোটটোট তো লাগে নি। কোনরকম শক।

—হয়তো লাগত, এ মেয়েটি ঠিক সময়ে ধরে না ফেললে। ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়েই লোকটা অবাক। পায়ে পায়ে কাঞ্চী সরে পড়েছে। ধারে কাছে কোথাও নেই।

বাড়ী ফিরে সব্জীর ঝুড়িটা মার জিম্মায় দিয়ে কাঞ্চী সোজা বিছানায় গিয়ে ঢুকল। বালিশটা বুকে চেপে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল। অসম্ভব জ্বালা দুটো চোখে। দুটো হাত দিয়ে বুক চেপেও দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারল না। কেন এমন হ'ল। কেন এমন হয়।

সেদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে কাঞ্চীর বেশ বেলা হ'য়ে গেল।

প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করেছে। ঘুম আসে নি।

ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়াতেই লোকটা লাফিয়ে নেমে পড়েছিল। টাল সামলাতে পারে নি। ঢালু জমিতে প্রায় কাঞ্চীর পায়ের ওপর এসে পড়েছিল। একটু ছোঁয়া। কাঞ্চীর কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শ। কিন্তু তাতেই কাঞ্চীর শিরা-উপশিরায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

কাঞ্চীর মনে হয়েছিল এ যেন শুধু দেহ দিয়ে দেহ ছোঁয়া নয়, হৃদয় দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করা।

অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পরে একটু তন্দ্রার ভাব আসতেই স্বপ্ন দেখেছে! পাঁজর-সর্বস্ব ঘোড়া নয়, বিরাট এক পক্ষীরাজ। কাঞ্চী আর ভদ্রলোক দুজনেই তার পিঠে। মাটি ছেড়ে, মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছে পক্ষীরাজ। পাহাড় পর্বত হিমেল কুয়াশা সব পিছনে ফেলে। শস্যশ্যামল সমতল ভূমিতে।

তারপর পরিপাটি এক গৃহ। শান্ত নিরুত্তেজ জীবন দুজনকে ঘিরে। বাঙালীরাই পারে ও ভাবে ঘর বাঁধতে। নিজেকে ছাপিয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় ঢেকে দিতে মনের মানুষকে।

কাল কাঞ্চীর দিদির চিঠি এসেছে। দুখানা চিঠি। অবশ্য মার চিঠিতে কাঞ্চীর দিদি লিখেছে খুব ভাল আছে দুজনে। কোলের বাচ্চাটা কি দুষ্টুই হ'য়েছে। আপনমনে অনর্গল কত কথাই বলে। কিন্তু কাঞ্চীকে লেখা চিঠির সুর আলাদা।

নিজের ঘরের মানুষের কথা লিখেছে। কিছুদিন আগে থেকেই কাঞ্চীর দিদির একটু সন্দেহ হয়েছিল। একটা উগ্র গন্ধ। চোখ দুটোও লালচে, অবশ্য কথাবার্তা চলাফেরা খুব স্বাভাবিক। আজকাল আর সন্দেহ নয়। স্পষ্টই বোঝা গেছে। মাঝরাতে টলতে টলতে এসে সারা পাড়া চিৎকারে মাতিয়ে তোলে। কাঞ্চীর দিদির নাম ধরে কুৎসিত গালিগালাজ। ইদানীং মারধোরও শুরু করেছে। বাচ্চাটার দিকে ফিরেও একবার চায় না।

শুধু সুরা নয়, জীবনে সুরেরও সন্ধান পেয়েছে। কোন চা বাগানের ম্যানেজারের আয়া। এ তল্লাটে খুব নাম। বছর বছর নাগর বদলায়। এ বছর বোধ হয় কাঞ্চীর দিদির ঘরের মানুষের পালা পড়েছে।

শেষ লাইনে কাঞ্চীর দিদি আপসোস করে লিখেছে, আমি কি করব তুই আমায় বলে দে কাঞ্চা! ঘরের মানুষই যদি আমার ঠিক না রইল, তবে কি হবে আমার ঘর আঁকড়ে পড়ে থেকে।

এর উত্তর কাঞ্চী দিতে পারে নি। এর উত্তর তার জানা নেই। কিংবা বুঝি যে উত্তর জানা আছে, সেটা কাউকে বলা চলে না। নিভৃতে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাকে শুধু পালন করা যায়।

কাঞ্চীর মার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এ জিনিস অজানা ছিল। একদিনের জন্য মতান্তর নয়, মনান্তর তো নয়ই। যখন বাঙালীরা ভালবাসে, তখন পৃথিবী ভুলে যায়। কোন বাধাকেই বাধা বলে মানে না।

মার কাছেই কাঞ্চী শুনেছে। কোনদিন যদি শরীর খারাপ হ'ত কাঞ্চীর মার। মাথা ধরা কিংবা জ্বরভাব, কাঞ্চীর বাবা সমস্তদিন বসে থাকত তার শিয়রে। অডিকলোনের ফোঁটা দিত কপালে, আস্তে আস্তে মাথা টিপে দিত। প্রতি মিনিটে ছবার করে কাঞ্চীর মাকে প্রশ্ন করত, তার শরীর সম্বন্ধে। আতঙ্কে, উদ্বেগে, এত বড় ডাক্তার যেন নীল হ'য়ে যেত।

জানলার ধারে বসে এসব কথা বলতে বলতে কাঞ্চীর মা উদাস দুটি চোখ তুলে বাইরের দিকে দেখত। শুধু দূরের পাহাড় নয়, যেন বহুদূরে ফেলে আসা দিনগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছে।

মার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে মার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কাঞ্চী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ঘর যদি বাঁধতেই হয় তো বাঙালীর সঙ্গে।

ম্যালে কতবার দেখেছে। বাঙালা স্ত্রী আর স্বামী। পাশাপাশি চলেছে। স্ত্রীর হাতে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ। স্বামীর হাতে বাকি সব জিনিসপত্র। মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েও।

এমন দৃশ্যও কাঞ্চীর চোখে পড়েছে। স্ত্রী একদৃষ্টে স্বামীর মুখ দৃষ্টি কিন্তু স্ত্রীর মুখের ওপর। কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়েও রহস্যময় কিছু যেন নজরে পড়েছে।

ভাঙা হিন্দিতে কথা কানে যেতেই কাঞ্চা চমকে মুখ ফেরাল। সেই লোকটি বেড়ার ওধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমায় কিছু বললেন? কাঞ্চীও ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিল। তার ভাষাজ্ঞানও পরিমিত।

লোকটি মুচকি হাসল।

—ওখানে দাঁড়িয়ে আর কি করব? কাঞ্চী গলার স্বর আর একটু তুলে বলল, আজকেও ঘোড়ার পিঠে চাপতে যাচ্ছেন নাকি? কাঞ্চীর দু চোখে কৌতুকের রোশনাই। গলার স্বরে তরল পরিহাসের ছিটে।

—তার মানে, লোকটি পকেটে হাত দিয়ে বেড়ার আরো কাছে এগিয়ে এল, তোমার কথায় মনে হচ্ছে কালকের ঘটনার পরে আমার যেন গাধার পিঠেই চড়া উচিত।

কাঞ্চী হাসিতে ভেঙে পড়ল। ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, সে কথা বলছি না। দু একটা পাজি ঘোড়া থাকে কিনা। আর তা ছাড়া উঁচু নীচু রাস্তা। দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায়।

—বেশ, চলতে চলতে লোকটি বলল, একদিন তুমি এইখানে ঠিক এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তোমার সামনে দিয়ে যাব।

লোকটি আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হ'য়ে গেল।

পথের দিকে চেয়ে কাঞ্চী বিড় বিড় করে বলল, বাবু তুমি যাবে এই পথ দিয়ে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে। একটু থেমে আমাকে তুলে নেবে তোমার পাশে। তারপর দুজনে চলে যাব অনেক দূরে। তাল নারিকেল ভরা শান্ত পল্লীপ্রান্তে।

দিন দুয়েক পরে। বিকেল হ'তেই কাঞ্চী সেজেগুজে বের হ'য়ে পড়ল। মাকে বলল, একটু ঘুরে আসি মা। বাড়ীতে বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

ম্যাল ছাড়িয়ে কাঞ্চী আরো এগিয়ে গেল। নির্জন পথ। দু পাশে পাইনের ঘন সারি। একদিকে গভীর

এর আগে দুদিন কাঞ্চী দেখেছে। এই পথ দিয়েই লোকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। রহস্য কলরবে জনবিরল পথ মাতিয়ে।

অনেকটা পথ কাঞ্চী এগিয়ে গেল কিন্তু লোকটির পাত্তা পেল না। হয়তো আজ আসেই নি এ পথে। ক্লান্ত পায়ে সে আবার ফিরে এল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। ষ্টেশনের কাছ বরাবর এসেই থেমে গেল।

পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। তবু দেখা গেল। পথের ধারে এক বেঞ্চে লোকটি বসে আছে।

কাঞ্চী কাছে আসতেই লোকটি দাঁড়িয়ে উঠল, আরে আশ্চর্য কাণ্ড তো, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম বসে বসে।

—আমার কথা! কাঞ্চীর দু গালে গোলাপের আভা।

—হ্যাঁ। দুবার তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে গিয়েছি, তুমি নেই। তোমার নামও ছাই জানি না, যে খোঁজ করব। নাম কি তোমার?

—আমার নাম কাঞ্চী।

—কাঞ্চী! বেশ নাম তো। কাঞ্চী মানে তো খুকু, তাই না?

মাথা নিচু করে কাঞ্চী হাসল।

লোকটি আর একটা কি বলতে যাবার মুখেই থেমে গেল।

হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হ'ল। শাণিত বর্ষার ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। সঙ্গে বরফের গুঁড়ো।

কোটের কলারটা উল্টে দিয়ে লোকটি চলতে শুরু করল। যেতে যেতেই বলল, কাল সকালে আমি কার্শিয়ং যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি রাত সাতটা আটটার সময় দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে? জুবিলি স্যানাটরিয়ম। তিন নম্বর কটেজ। বিশেষ দরকার। যে কথাটা তোমায় দেখা অবধি আমার মনে হয়েছে, সে কথাটাই তোমাকে বলব। আসবে তো?

মন্ত্রমুগ্ধের মতন কাঞ্চী ঘাড় নাড়ল।

লোকটি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঞ্চী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। চুলের ফাঁকে, পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে পেঁজা তুলোর মতন বরফের গুঁড়ো।

চেতনা হ'ল পথচলতি একটা বুড়ো লোকের চিৎকারে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা ভিজছে কেন? ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লেই তো পারে।

কাঞ্চী জোর পায়ে ষ্টেশনের ছাউনির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

বৃষ্টি কমতেই কাঞ্চী বেরিয়ে পড়ল। সারাটা রাত অপেক্ষা করতে হবে, কাল সারাটা দিন। তারপর দেখা হ'বে লোকটার সঙ্গে। কি কথা যে বলবে তাও কাঞ্চীর জানা! এমন সুযোগ এর আগে তার জীবনে আসে নি, তবু সে অনুভব করতে পারছে এমন একটা কথা শোনার পর তার মনের কি অবস্থা হবে। লজ্জায় মুখই তুলতে পারবে না অনেকক্ষণ, কিংবা বলিষ্ঠ দুটি বাহুর চাপে এগিয়ে গিয়ে মাথা রাখবে স্পন্দমান একটি বুকের ওপর। সারা জীবন ধরে কথা বলেও যা কোনদিন কাঞ্চী বোঝাতে পারবে না, তারই আভাস দেবে লজ্জামেদুর ভীরু দৃষ্টির মাধ্যমে। নিজেকে সমর্পণ করবে।

হয়তো লোকটি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে। বলবে কাল সকালেই চল আমার সঙ্গে। তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কাঞ্চী শুধু একটু সময় নেবে। মার কাছে অনুমতি নিয়ে আসার সময়টুকু।

কাঞ্চীর মা বাধা দেবে না। নিজের অতীতকে স্মরণ করে কিছুতেই কাঞ্চার ভবিষ্যত সে ভেঙে দিতে পারে না। শুধু কাছে ডেকে আদর করবে মেয়েকে। বেতের বাক্স থেকে ফটোটা বের করে মাথায় ছোঁয়াবে। বিড় বিড় করে বলবে অর্ধোচ্চারিত মন্ত্রের সুরে, কাঞ্চীকে সুখী কর। ওপর থেকে আশীর্বাদ কর তুমি, যেন কাঞ্চীর জীবন সুন্দর হয়, মধুর হয়।

মার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঞ্চা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দেবে, তারপর সোজা ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

বাড়ী ঢুকতেই কাঞ্চীর মা চেঁচিয়ে উঠল, কি আক্কেল রে তোর? এমনি করে ভিজে আসতে হয়? কেন সারা দার্জিলিং শহরে কি দাঁড়াবার স্থান পেলি না।

মনে মনে কাঞ্চা হাসল, সারা দার্জিলিং শহরে কোথায়

আর স্থান পেলাম। পেলাম না বলেই তো সরে যাচ্ছি অনেক দূরে।

মুখে কিছু বলল না। মুচকি হেসে পাশ কাটাল।

সে রাত্রে কাঞ্চী বাপের ফটোটা বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। মাথায় ঠেকাল। নতুন জীবনের শুরুতে আশীর্বাদ ভিক্ষা করল।

ভোরবেলা উঠেই নিজের জামাকাপড়ের বাক্সটা গোছাতে শুরু করল।

কাণ্ড দেখে মা অবাক।

—কিরে জিনিষপত্র গোছাচ্ছিস যে? শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ মা। কাঞ্চী হাসল।

মাও হেসে বাজারের সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কতকগুলো জামা কাঞ্চী বাতিল করল। এসব পোষাক পরে গরম জায়গায় ঘোরাফেরা করা চলবে না। যে দু একটা বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে তাদের কাছেই শুনেছে। এত গরম যে গায়ে ব্লাউজ রাখাই দায়। দুপুর বেলা অনেকেই গায়ে শুধু পাতলা কাপড় জড়িয়ে থাকে। সে অবশ্য কাঞ্চী মরে গেলেও পারবে না। আঁটা ব্লাউজ অন্ততঃ গায়ে জড়াবে।

খুব বড় শহর। জমজমাট। আলো, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন। হৈ হল্লা-চিৎকার। এখানকার মতন একটু রাত নামলেই ঝিঁঝিঁর ডাক আর বুনো জন্তুদের আওয়াজ শুনে সময় কাটাতে হয় না।

সারাটা দিন কাঞ্চী মার কাছে কাছে কাটাল। ফাই ফরমাজ খাটল। অকারণ গলা জড়িয়ে আদর করল।

কাঞ্চার মা অবাক।

—কি ব্যাপার বল তো তোর কাঞ্চী। আজ যে এত খুশী খুশী ভাব?

—আহা মা যেন কি, কাঞ্চী ভ্রূ কোঁচকাল, খুশী আবার কিসের। কি সুন্দর ঝলমলে রোদ বলত। এমন সময়ে এরকম রোদ দেখা যায়?

কাঞ্চীর মা মেয়ের মুখটা দু হাতে তুলে ধরল। হেসে বলল, তাই বুঝি রোদের ছিটে মেয়ের মুখে লেগেছে।

সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কাঞ্চী তৈরী হয়ে নিল। রাখা মার সোনার হারটা গলায় ঝোলাল। আয়নার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখল।

এ দেখায় আশ মিটল না। যতক্ষণ না আর একজনের মুগ্ধচোখের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে, ততক্ষণ যেন মন ভরবে না।

বেরবার মুখেই মা ডাকল, এত রাত্রে কোথায় রে কাঞ্চী?

—রাত আবার কোথায়। জুবিলি স্যানাটোরিয়মে একটা বাঙালী-বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে মা। সেই দেখা করতে বলেছে। কাল চলে যাবে।

মার দিকে না ফিরেই কাঞ্চী তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

স্যানাটোরিয়মের সামনে যখন পৌঁছল তখন প্রায় পৌনে আট। তিন নম্বর কটেজের কাছে যেতেই নজরে পড়ল পেতলের বড় তালা।

কাঞ্চার বুকটা কেঁপে উঠল। ঠিক সময়েই তো এসেছে। তবে দরজা বন্ধ যে।

পাহাড়ী এক ছোকরা কাঁধে তোয়ালে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিল, কাঞ্চী তাকে ডাকল।

—এ বাবু কোথায়?

—সেনবাবু? ডাইনিংরুমে আছেন বোধ হয়।

ছোকরা আর দাঁড়াল না। হন হন করে এগিয়ে গেল।

কাঞ্চী একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা আকাশের নিচে বেশ একটু ঠাণ্ডাভাব। গায়ের কাপড়টা ভাল করে জড়াল।

আধ ঘণ্টারও ওপর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঞ্চার পা দুটো টনটন করে উঠল। সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দূরে একটু গোলমাল। অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাঞ্চী আরো একটু সরে দাঁড়াল।

মাত্র দুজন লোক এদিকে এগিয়ে এল। আর সকলে বাঁ দিকে মোড় নিল।

একটু কাছে আসতেই কাঞ্চী চিনতে পারল। গাঢ় নীল কোট আর প্যাণ্ট। কোটের ল্যাপেলে পাহাড়ী গোলাপ।

. একেবারে কাঞ্চীর সামনাসামনি এসে দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

সঙ্গের লোকটি ইংরাজীতে কি একটা টিপ্পনী কাটল।

সেই লোকটি কিন্তু একটু ঝুঁকেই ঠিক চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়িটা দেখে বলল, আরে এসেছ! আমি প্রায় পৌনে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য।

—আমি ঠিক পৌনে আটটাতেই এসে পৌচেছি।

কাঞ্চী আস্তে আস্তে বলল।

—এস, এই সামনেই আমার কামরা।

লোকটি নিচু হ'য়ে তালাটা খুলে ফেলল। সঙ্গের লোকটি আরো এগিয়ে গেল।

ছোট্ট চৌকো ঘর। পরিপাটি সাজান। নীল বাতির মোলায়েম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লোকটি সামনের কৌচের ওপর গিয়ে বসল। কাঞ্চা ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে।

—তোমাকে দেখে পর্যন্ত আমার খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তোমাকে একলা পাচ্ছি না বলে কথাটা কিছুতেই বলতে পারছি না।

কাঞ্চার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। জানত কাঞ্চা, এইভাবে নিভৃতে ডেকে এনে এমনি সুরেই একদিন ওকে এই কথা বলবে। লোকটির চোখের তারায় এমনি কথারই আভাস ছিল।

—তুমি দার্জিলিং ছেড়ে যেতে পারবে আমার সঙ্গে? এখানে তোমার আর কে আছে?

কাঞ্চী অনেক চেষ্টা করে কথা বলল, আমার মা আছে শুধু।

—যেতে পারবে তাকে ফেলে?

—হ্যাঁ পারব। সব ছেড়ে যেতে পারব তোমার সঙ্গে। যখন বলবে।

কাঞ্চী আর সামলাতে পারল না নিজেকে। এমন একটা মুহূর্ত মানুষের জীবনে বার বার বুঝি আসেও না। নিজেকে নিবেদন করার শুভলগ্ন।

—তোমার মতন একটা মেয়ে পেলে আমার খুবই উপকার হয়। তোমার কোন রকম কষ্ট হবে না সেখানে। কাজও এমন কিছু বেশী নয়। শুধু একটি বছর দেড়েকের বাচ্চাকে আগলানো। তোমরা তো এ কাজ ভালই পার। যদি রাজী থাকো তো, কাল ভোরেই চলে এস। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। কালকেই রওনা হতে হবে।

প্রথমে খুব আস্তে আস্তে তারপর দ্রুত দুলে উঠল জানলা, দরজা, রঙীণ পর্দা, মেঝের পাতা জাজিম, কৌচ, টিপয় আর ফুলদানী। নীল বাতিটা ম্লান হ'য়ে যেন নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের কঠিন দেয়ালে কঠোর আঘাত খেয়ে কাঞ্চীর সমস্ত সত্তা অবশ হ'য়ে গেল। এ অন্ধকার থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, কোন আশা নেই এ অন্ধকার পার হবার।

কাঞ্চার সারা জীবনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে।

খুব সাবধানে দরজা ধরে টলতে টলতে কাঞ্চী বাইরে বেরিয়ে এল। দেয়াল ধরে একটু বিশ্রাম করবে, সে উপায় নেই। এখনি লোকটা বেরিয়ে আসবে। প্রতিশ্রুতি চাইবে কাঞ্চার কাছে। দয়ামায়া স্নেহ মমতা দিয়ে তার আত্মজকে তিল তিল করে গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি।

দ্রুত পায়ে কাঞ্চী স্যানাটোরিয়মের গেট পার হ'য়ে এল। বরফের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। কিন্তু সে জন্য সামনের পথ অস্পষ্ট নয়। এমনভাবে কাঞ্চীর পথ চলার খুব অভ্যাস আছে। বাদ সাধছে পোড়া চোখের জল। মুছেও কাঞ্চী শেষ করতে পারছে না।

কিছুতেই তাকে সামনের পথ চিনে উঠতে দেবে না।

—

মেয়েদের কথা
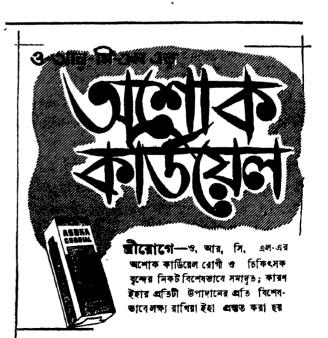
শিশু-পালন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

মীরা দাস

শিশু আমাদের স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ। এরাই আমাদের জাতীয় জীবনের বল ও আশা। এই শিশু ছাড়া আমাদের বংশ রক্ষা, জাতি রক্ষা বা দেশ রক্ষা কিছুই সম্ভব না। কিন্তু এই শিশু যদি স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হয় তাহা হইলে সমাজের কি দুরবস্থা হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং আমরা মায়েদের শিশুর স্বাস্থ্য ও চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। তাহাকে এ সম্বন্ধে কর্তব্য যথারীতি পালন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল তাহার আহার ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই—'পালন' করা হয় না। বাল্যে মায়ের কোলে শিশুর—যে শিক্ষা অলক্ষে ক্রমে ক্রমে লাভ হয় তাহাই কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার সমগ্র জীবন জুড়িয়া থাকে। স্কুল কলেজে পরে যে শিক্ষা হয়, তাহাতে সে কৃতবিদ্য হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

শিশু স্বভাবতঃই আবদার করিতে ভালবাসে। কিন্তু তখন যদি ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া অন্ধ স্নেহবশতঃ সকল রকম আবদারই নির্বিচারে পূর্ণ করা হয় তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী জীবন খুবই দুঃখ-ময় হইবে। শিশুকাল হইতেই তাহাকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে। জীবনের প্রথম দিন হইতেই সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সুশৃঙ্খলতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সদ্‌গুণ-রাজি যাহাতে তাহার কোমল অন্তঃকরণে স্থান পায় তাহার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। শিশুর সবকিছুর জন্যই মা যতদায়ী তত আর কেহ নয়। তাহাকে মানুষ' করিয়া তুলিতে হইলে মায়ের কোমল, অথচ দৃঢ় হওয়া চাই। কেবল স্নেহ-কোমল অথবা শুধু কর্ত্তব্য-কঠোর হইলে চলিবে না।

শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপর [illegible]। আহার, নিদ্রা, স্নান, পোষাকপরিচ্ছদ এবং খেলাধুলা ইত্যাদি সবগুলির উপরেই কিন্তু শিশুর সু-স্বাস্থ্য লাভ করা নির্ভর করে।

প্রথমতঃ দেখা যাক শিশুর খাদ্যের বিষয়। মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। যে শিশু দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত (৮।৯ মাস) কেবল মায়ের দুধই খায়, তার শরীর আজীবন সুস্থ থাকে। কিন্তু মায়ের দুধের অভাব হইলেই সমস্যা। তখন তাহাকে গোরুর দুধ বা ছাগলের দুধ খাওয়ানো যাইতে পারে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া। কিন্তু এই দুধ নিজ গৃহপালিত গোরুর কিংবা ছাগলের হইতে হইবে। এই জন্য আমার মনে হয় গোরু অপেক্ষা ছাগল পালন করাই অধিক সুবিধাজনক। ছাগলের দুধ খুব পুষ্টিকর। ছাগলের দুধে ঘৃতের পরিমাণ গোরুর দুধ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য যতটুকু দুধ তার তিনগুণ জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হইবে। চামচ বা ঝিনুক দিয়া খাওয়ানো অভ্যাস করাই ভাল। কিছু বড় হইলে চুমুক দিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। দুধ ছাড়া—রোজই একটু একটু ফলের রস (যেমন কমলা, বেদানা) ও পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল পান করাইলে শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কোন অবস্থাতেই "পেটেণ্ট ফুড," বাজারে যা খুব পাওয়া যায়, শিশুকে দেওয়া উচিৎ নয়। ইহাতে শিশুর 'রিকেটস' নামক রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। দাঁত উঠা সুরু হইলে মায়ের দুধ একবারেই না দেওয়া ভাল। না হইলে দাঁত খারাপ হয়। তখন শিশুকে সাগু, বার্লি, ডালের জুস্, খুব নরম পুরানো চালের ভাত ২।১ চামচ খাইতে দিতে হয়। শরীরের পুষ্টির জন্য দুধ ছাড়া এ সবেরও দরকার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দাঁত উঠার আগে সাগু বার্লি ইত্যাদি শিশুর পক্ষে অহিতকারী।

শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। শরীর সুস্থ রাখিতে

হইলে নিত্য স্নানের প্রয়োজন। স্নানে মন প্রফুল্ল হয়। শিশুকে প্রথমে অল্প গরম জলে স্নান করাইলে ভাল হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা জলে অভ্যাস করাইতে হইবে। স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই।

তারপর আসে ঘুমের কথা। এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রোজ ৮ হইতে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো শিশুর একান্ত প্রয়োজন।

—রোজ নিয়মিতভাবে মলমূত্র ত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে এবং স্বভাব খিটখিটে হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহাকে এই অভ্যাস করাইতে হইবে।

শিশুর পোষাক কখনও জাঁকজমকপূর্ণ করা উচিত নয়। যথাসম্ভব 'সাদাসিদে' এবং ঢিলে হওয়া চাই। কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার।

আহার ও নিদ্রার ন্যায় খেলা ধুলাও শিশুর দরকার। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই জন্য সব সময় কোলে না রাখিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলে ছেলে নিজের ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে।

এই ত গেল শিশু পালনের মোটামুটী কয়েকটি কথা। কিন্তু সবার উপর হইল শিশুর নৈতিক শিক্ষা। শিশু মায়ের পোষা পাখী। মা তাহার সম্মুখে যে আচরণ করিবেন বা যা বলিবেন সে তাহাই শিখিবে। তখন হইতে যা অভ্যাস হইবে তাহাই মজ্জাগত হইয়া যাইবে। শিশু অনুকরণ-প্রিয়। কাজেই মায়েদের খুব সাবধান হইতে হইবে।

সবার শেষে বিখ্যাত ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিয়া শেষ করিব। তিনি আমাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মা, যদি তুমি সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব স্বরূপ দেখিতে চাও, তবেতাহার জীবনের প্রথমদিন হইতেই তাহার সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও! সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির—প্রতি গৃহ সুস্থ বলিষ্ঠ চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

টোট্‌কা-টুট্‌কি

শ্রীমতী ইরা ভট্টাচার্য্য

মেছেতার ঔষধ—গালে মেছেতা পড়্‌লে মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যায়; যাতে মেছেতা না পড়ে, তার জন্যে নানা প্রকার ঔষধ বেরিয়েছে; কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে গ্লিসারিন মেছেতার প্রধান ঔষধ। রৌদ্রে ঘুরে এসে যে জলে মুখ ও হাত ধু'তে হবে, সে জলে ৬।৭ ফোঁটা গ্লিসারিণ দিয়ে মুখ ধুলে মেছেতা পড়্‌বে না, কিম্বা ৩।৪ ফোঁটা গ্লিসারিণ হাতের তালুতে নিয়ে ফোঁটা কতক জল দিয়ে মুখে মেখে তার পর মুখ জল দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌লে এ রোগ হবে না।

গাঁদাফুলের উপকারিতা—মূত্র পরিষ্কার না হোলে ৪।৫টী-গাঁদা ফুল (বিশেষতঃ লাল ছোট) পাঁচনের মত জলে সিদ্ধ করে সেবন কর্‌লে প্রস্রাব পরিস্কার হয় এবং যন্ত্রণা দূর হয়। একটি গাঁদাফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সঙ্গে সেবন কর্‌লে শুক্রমেহের আশ্চর্য্য উপকার হয়। পৃষ্ঠ ব্রণ ও অন্যান্য দুষ্টক্ষতে গাঁদা পাতা বেটে অল্পময়দা বা সুজির সঙ্গে একত্র করে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করে পুলটিস দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস দিতে দিতে পৃষ্ঠ ব্রণ ক্রমশঃ নরম হয়ে আসে, পরে তা থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়ে গিয়ে শীঘ্র আরাম হয়। ছোট-গোয়ালে পাতার প্রলেপে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে ব্রণ স্থান চুলকায়, গাঁদা পাতায় তা হয় না।

মুখের ব্রণ—অনেকে মুখের ব্রণ নষ্ট করবার জন্যে ফেস পাউডার, মিল্ক অব রোজ প্রভৃতি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। গ্লিসারিণ আড়াই তোলা, উৎকৃষ্ট গোলাপ জল পাঁচ ছটাক, আর পাঁচ আনা ওজনের গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশিয়ে একটি পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। যখন ব্যবহার কর্‌তে হবে, তখন শিশি নেড়ে তুলি বা পালক দিয়ে ব্যবহার করা আবশ্যক,

তা হোলে মুখের ব্রণ নষ্ট হয়ে গিয়ে সুন্দর মুখশ্রী দেখা দেবে।

সাপের কামড়ের ঔষধ—কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়ালে তাকে যদি কলা গাছের রস পান করিয়ে দেওয়া হয়, তা হোলে অনেকসময় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

মৃগীর অসুখ—ফিট হলেই রোগীর হাতের তালুতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে সহজেই জ্ঞান হ'য়ে যাবে।

নাকদিয়ে রক্তপাতে—নাকে রক্ত পড়লে রোগীর হাত দুটি সোজাকরে মস্তকের দিকে উঁচুকরে ধর্‌লে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

মাছি তাড়াবার উপায়—গরম জলে অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে ঘরে ছড়িয়ে দিলে ঘরের ভেতর পোকা ও মাছি কয়েক দিন ধরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। যে স্থানে মাছির উপদ্রব খুব বেশী, সে স্থানের লোকেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সর্দ্দি প্রতীকার—গলা বসে গেলে বা কফ অতিশক্ত ও আঠাল হোলে সন্ধ্যার সময়ে একটা ন্যাকড়ায় আধপোয়া আন্দাজ মিছরি বেঁধে এক পোয়া আন্দাজ পানীয় জলে টাঙিয়ে রেখে দিতে হবে, তারপর প্রাতে সেই মিছরির সরবত গরম করে খালি পেটে পান কর্‌লে কফের উপশম হবে, আর গয়ের বা কফ নরম হবে। এই ভাবে ৬।৭ দিন কর্‌লেই সাধারণ সর্দ্দি নির্ব্বিবাদে আরোগ্য লাভ কর্‌বে।

মেয়েদের রক্তস্রাব—আতা গাছের ছাল উল্টো দিকে কেটে তা জলের সঙ্গে বেটে একটি বড়ি প্রস্তুত করে রোগীকে সেবন করালে প্রচুর রজঃস্রাব বন্ধ হয়।

বসন্তের ঔষধ—লালচে রঙের একটি নারিকেল (যার খোলা পুরু হয় নি) নিয়ে তার জল বসন্ত রোগীর শরীরে বহুবার লেপন কর্‌তে হবে। উক্ত নারিকেলের জল অন্য কোন পাত্রে ঢালা চল্‌বে না। এই ঔষধে বহু হতাশ রোগীকে নিরাময় করা হয়েছে। ঘা শুকিয়ে গেলেও এই ঔষধ নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

বিষ ফোড়া—বিষ ফোড়া হয়ে জ্বালা যন্ত্রণা হোলে, তার চারিদিকে কেরোসিন তৈল মালিস কর্‌লে অতি অল্পসময়ের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

একজিমার ঔষধ—গোয়ালে লতার পা... গোয়ালের মধ্যে যে গরুর চোনা মিশ্রিত মাটী থা... তার সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিলে একজিমা ভালো হয়।

রোগীর উপযুক্ত যূষ বা ব্রথ—এক পো... আন্দাজ চর্ব্বিশূন্য মাংস চারি সের জলের সঙ্গে জ্বা... চড়িয়ে দু সের থাক্‌তে নামাতে হ'বে। শীতল হো... মাংস গুলি সেই জলে বেশ করে চটকে নিয়ে পুনরা... জ্বালে চড়াতে হবে এবং যখন অর্দ্ধসের মাত্র জ... অবশিষ্ট থাকবে, তখন ওটা নামিয়ে পরিষ্কার কাপ... ছেঁকে নিতে হবে। একটি আলাদা পাত্রে ৪।... ফোঁটা ঘৃত দিয়ে তাতে দু'টি গোলমরিচ ও কয়েকটি ছোট এলাচের দানা দিয়ে সাঁৎলাতে হবে, তা হোলেই রোগীর উপযুক্ত যূষ তৈয়ারী হবে।

দাঁতের নালি ঘা—রশুন, হিং ও আকন্দের আঠা একত্র করে দাঁতের গোড়ার নালিতে লাগালে আরোগ্য এবং পোকা থাকলে মরে পড়ে যায়।

ঘায়ের ঔষধ—শামুকে চুণ ও গব্যঘৃত সম পরিমাণে একসঙ্গে রগ্‌ড়ালে যে মলম হয়, তা ব্যবহারে সকল প্রকার ঘা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করে।

অগ্নিদগ্ধের ঔষধ—কোন স্থান পুড়ে গেলে মধু ও লবণ একত্র ফেটিয়ে লাগালে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়।

শীর্ণতার ঔষধ—বটগাছের শাখা ও পাতা ভাঙলে যে শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়, তাকেই বটক্ষীর বলে। এই বটক্ষীর দশ হতে ত্রিশ ফোঁটা পর্য্যন্ত নিয়ে বিশুদ্ধ জলে চিনির সঙ্গে মিশিয়ে অথবা চিনির সরবতের সঙ্গে পান কর্‌লে শরীরের পুষ্টি হয়ে শীর্ণতা দূর হয়।

টাক রোগে—হরিতাল, বহেড়া, বৃহতীমূল সমভাগে নিয়ে মধুর সঙ্গে টাকে প্রলেপ দিলে চুল হয়।

টুন্‌কো—বাব্‌লা কিম্বা ডালিমের ছাল সিদ্ধজলে অল্প পরিমাণে ফটকিরি মিশিয়ে টুন্‌কো স্থানে প্রলেপ দিলে ৪।৫ দিনে ভালো হয়।

উলের প্যাটার্ণ

গীতারাণী মিত্র

পাতা—১২ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হইবে। শেষে ২ ঘর বেশী।

১ম—২ উল্টা ১ সোজা ২ উল্টা ৭ সোজা ২ উল্টা।

২য়—২ সোজা, ৭ উল্টা ২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা।

৩য়—২ উল্টা সামনে সুতা ১ সোজা পিছনে সুতা ২ উল্টা, ১ তোলা ১ সোজা তোলা ঘর ফেলিয়া দাও। ৩ সোজা ১ সোজা জোড়া ২ উল্টা।

৪র্থ—২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা।

৫ম—২ উল্টা ১ সোজা (সামনে সুতা ১ সোজা) ২ বার, ২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা তোলাঘর ফেলিয়া দাও, ১ সোজা ১ সোজা জোড়া ২ উল্টা।

৬ষ্ঠ—২ সোজা, ৩ উল্টা ২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা।

৭ম—২ উল্টা, ২ সোজা (সামনে সুতা ১ সোজা) ২ বার, ২ সোজা, ২ উল্টা ১ তোলা, ১ সোজা জোড়া, তো ঘর ফেলিয়া দাও, ২ উল্টা।

৮ম—২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা।

৯ম—২ উল্টা ৭ সোজা ২ উল্টা ১ সোজা ২ উল্টা।

১০ম—২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা।

১১শ—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা, তোলা ঘর ফে দাও, ৩ সোজা ১ সোজা জোড়া, ২ উল্টা সা সুতা ১ সোজা, পিছনে সুতা ২ উল্টা।

১২শ—২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা।

১৩শ—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা, তোলাঘর ফে দাও, ১ সোজা, ১ সোজা জোড়া, ২ উল্টা ১ সো (সামনে সুতা ১ সোজা) ২ বার, ১ সো ২ উল্টা।

১৪শ—২ সোজা ৫ উল্টা ২ সোজা ৩ উল্টা ২ সোজা।

১৫—২ উল্টা ১ তোলা ১ সোজা জোড়া, তোলা ফেলিয়া দাও, ২ উল্টা ২ সোজা (সামনে সুতা সোজা) ২ বার, ২ সোজা ২ উল্টা।

১৬শ—২ সোজা ৭ উল্টা ২ সোজা ১ উল্টা ২ সোজা।

শরৎচন্দ্রের প্রতি

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী এম-এ

হে শরৎ, তব দরদী হিয়ার খর-সন্ধানী আলো
নর-নারীদের গহন মনের যবনিকা ঘন কালো
একে একে সব ভেদি'
সকল তর্ক, সব সংশয় ছেদি ;
প্রকাশিল সেই অজানা দেশের কত না রত্ন-ধন
দুর্লভ সুগোপন !
কত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, কত সেথা ব্যাকুলতা,
বলি-বলি ক'রে-না-বলা কত না কথা,
নিভৃতে দুয়ার-আঁটা
তরুণ কোমল বুকে-বেঁধা হায় ! কত না তীক্ষ্ণ কাঁটা,
কত অভিমান, কত না চাতুরী ছল,
কত না মদির কলহাসি, কত তপ্ত অশ্রুজল,
কত ঘৃণা-দ্বেষ-ঈর্ষা, কত না মায়া-মোহ-মরীচিকা
গায়ে গায়ে সব লিখা
ক্ষুধিত প্রেতের নানা অপরূপ ছায়াময় তনু ধরি"
কাঁদিয়া ফিরিছে অস্ফুট গুঞ্জরি,
আকাশ-বাতাস ব্যথিয়া দীর্ঘশ্বাসে,
বুক ফাটা হা-হুতাশে !
তব সন্ধানী আলোর সমুখে চকিতে পড়ে যে ধরা
রঙ-বেরঙের কত না মুখোস-পরা
সারা দুনিয়ার নানা সমস্যা-প্রশ্নের কত মূল
সূক্ষ্ম, মাঝারি, স্থূল !
আদি বর্বর নর ও নারীর বৃত্তিরা দলে দলে,
প্রাসাদ-লগ্ন যত্নে-লালিত পুষ্পিত তরুতলে
অন্ধ বিবরে সরীসৃপের মতো
ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া উঠিতেছে সেথা কত !
দীন অসহায় মূক
আর্ত ক্লিষ্ট নর-নারীদের সুখ-দুঃখ, ভুল-চুক,
ভাব-অনুভূতি, আবেগ-আকুতি, আকাঙ্ক্ষা আর আশা
লভিল তোমার ক্ষমা-সুন্দর অশ্রু-সজল ভাষা।
অমর শিল্পী ! তাই তো তারাও তোমারে আপন করি,
বসালো হৃদয়ে—চির-অক্ষয় প্রেমের আসনে বরি' ॥

—পনেরো—

বনশ্রী 'কপি' পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে একটা একশো টাকার চেক। কথা রেখেছে। ব্যবসার ব্যাপার যখন, ব্যবসায়ীভাবে হওয়াই ভালো।

দু'দিন একেবারে সময় পায়নি সত্যজিৎ। ইন্দ্রজিৎ বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল—বাড়ীতে এক লাইন লেখাপড়া করবার জো ছিল না। কাটা আঙুল নিয়েও রঘুকে কড়া নজর রাখতে হয়েছে ওর ওপর। আজ সকাল থেকে ইন্দ্রজিৎ নিঝুম মেরেছে। ওর নিয়মই এই। দিন কয়েক অবিশ্রান্ত ক্ষ্যাপামির পরে আবার তিন চারদিনের জন্যে একেবারে শান্ত হয়ে যায়—সতেরো আঠারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, জোর করে নাওয়াতে খাওয়াতে হয়। যেন অসহ্য শ্রান্তির পরে ওইটুকু তার বিশ্রাম।

বাবার অবস্থাও খুব স্বাভাবিক ছিল না। দিন দুই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছেন। শরীরের এই রকম অবস্থায় এ ভাবে মদ খাওয়া যে ঠিক নয়—সেকথা সত্যজিৎ তাঁকে বোঝাতে পারেনি। জীবনে কেউ-ই কোনোদিন বোঝাতে পারেনি শিবশঙ্করকে। পারলে মুখার্জি-ভিলার ইতিহাস অন্যরকম হত।

কিছুই করবার নেই—সত্যজিৎ জানে। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুখার্জি ভিলা। কেবল তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। বাবার সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা মুখার্জি ভিলা দখল করবে—সত্যজিতের অধ্যাপনার সামান্য টাকা আর দুখানা ভাড়াটে বাড়ির সাধ্য নেই চারটে মর্টগেজের হাত থেকে একে বাঁচায়। শুধু মুখার্জি ভিলাই নয়—ওই বাড়িদুটো বেচেও দেনাশোধ হবে কিনা সন্দেহ। তারপর—তারপর কলকাতার অসংখ্য মধ্যবিত্তের সঙ্গে একই ইতিহাসের পথ দিয়ে যাত্রা করতে হবে।

কিন্তু ভেনাস আর অ্যাডোনিসের ছবিটা? কী গতি হবে ওটার? একটা অর্থহীন কৌতূহলে ভাবতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ।

বারান্দার অর্কিড কাঁপিয়ে এক ঝলক পুবের হাওয়া ঘরে এল—বনশ্রীর পাণ্ডুলিপি খস খস করে উঠে সত্যজিৎকে কাজের কথা মনে করিয়ে দিলে। অনর্থক দুর্ভাবনা ছেড়ে সত্যজিৎ চোখ নামালো লেখার ওপর। গালিভার্স্ ট্রাভেল্স্-এর নোট লিখেছে বনশ্রী। 'গ্যালিভার্স্ ট্রাভেল্স্!' নিতান্ত শিশুভোলানো গল্পের আড়ালে মানুষের সম্পর্কে কী ঘৃণাই ঘোষণা করে গেছেন জোনাথান সুইফ্ট্! কী যন্ত্রণা—কী ক্রোধ! লোকটা না পারল ভালোবাসতে—না পারল ভালোবাসা নিতে। ভ্যানেসার চোখের জলের দাম দিতে পারলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এমনভাবে পাগল হয়ে যেতনা। কে জানে!

"He gave the little wealth he had
To build a house for foods and mad
And show'd by one satiric touch—"

নাঃ—জোনাথান সুইফ্ট্ থাকুক। বনশ্রী কী লিখেছে তাই দেখা যাক।

মিনিট কয়েকের জন্যে ডুবে রইল সত্যজিৎ। দু-একটা লাইন এদিক ওদিক করে দেওয়া, এক আধটা শব্দের সামান্য অদল-বদল করা। বনশ্রী সত্যিই বিনয় করেছিল। বিশেষ কিছু তার করবার নেই।

বীথি এল।

—খুব ব্যস্ত আছেন স্যার ?

সত্যজিৎ চোখ তুলল।

—ইয়ারকি হচ্ছে ?

—বাঃ, ইয়ার্কি কেন ? ক্লাসে তো স্যার বলতেই হয়। কোন্ দিন ফস্ করে কলেজেও ছোড়দা বলে ডেকে ফেলি তাই বাড়িতেও অভ্যাস রাখছি। বীথি হেসে উঠল, চক্‌চক্ করে উঠল চোখ।

—খুব হয়েছে, তোকে আর পাকামো করতে হবেনা। তোদের কেস্ কবে ? বারোই ?

—তাই তো শুনেছি। কী আর হবে। দিন কয়েক জেল খাটতে হবে।—সামনের চেয়ারটায় বীথি বসে পড়ল, আর তখনই চোখ পড়ল সত্যজিতের।

—বাঁ হাতটা ও-ভাবে রেখেছিস কেন রে ?

বীথি মৃদু রেখায় হাসল।

—ও কিছু না। একটু চোট লেগেছিল।

—কী করে লাগল ?

—ভ্যানে তোলবার সময়।

—ওঃ !—সত্যজিৎ চুপ করল। কিছু নয়, সত্যিই ও কিছু নয়। এখনো অনেক দাম দিতে হবে। অনন্ত সেনগুপ্তকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে সেই মানুষটাকে—রোদে যাঁর মাথার শাদা চুলগুলো ঝিকমিক করছে—

আর নিকেলের ফ্রেমের চশমা দুটো জলন্ত অগ্নিনেত্রের মতো তাকিয়ে আছে ড্যাল্‌হাউসি স্কোয়ারের দিকে।

—আচ্ছা ছোড়দা ?—বীথি প্রশ্ন করল।

—কী বলছিস ?

—তোমরা কিছু করবে না ? তোমাদের প্রফেসার অ্যাসোসিয়েশন ?

অস্বস্তিতে নড়ে উঠল সত্যজিৎ।

—আমরা আবার কী করব ?

—বাঃ, তোমরাও তো এডুকেশনিস্ট্। তোমাদের কোনো কর্তব্য নেই ?

সত্যজিৎ তিক্তভাবে হাসল: আমরা এডুকেশনিস্ট্ বটে—কিন্তু অনেক ওপরতলায় আমাদের বাস। আমরা জনকয়েক সামান্য টীচারের জন্যে মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারি, তার বেশি আর কিছু করতে পারি না।

নিজেদের ভ্যানিটি নিয়ে তোমরা কী করে বাঁচবে ছোড়দা ? —বীথির গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে এল, ঝকঝক করে জ্বলে উঠল চোখ: সত্যি ঠাট্টা নয়। তোমরাও টোকেন স্ট্রাইক করো না একদিন। অনেক জোরদার হবে আন্দোলন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। টোকেন স্ট্রাইক! দু বছর আগেও হয়তো চেষ্টা করা যেত। কিন্তু আপাতত সে-কথা আর ভাবাই চলেনা। অনেক ঝড় বয়ে গেছে এর ভেতর—অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। বছরে একটা কনফারেন্স—গোটা কয়েক সাধু প্রস্তাব—দু তিনটে সুদীর্ঘ বক্তৃতা, তারপরেই সব শেষ। মাঝখানে যে শক্তি নিয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় মাথা তুলেছিল অ্যাসোসিয়েশন, বুদ্ধিজীবীর অহমিকায়, ভ্রান্তির পাপচক্রে, স্বার্থের তুচ্ছতায়, আর শ্রেণীসুলভ নির্বিকার ঔদাসীন্যে তার সমাধি রচিত হয়ে গেছে অনেকদিন।

—সত্যি, তোমরা একদিন টোকেন স্ট্রাইক করলে—

—থাম থাম, খুব হয়েছে।—আলগাভাবে একটা ধমক দিলে সত্যজিৎ: নিজেরা তো পড়াশুনো চুলোয় দিয়েছিস, আমরা স্ট্রাইক করলে আরো সুবিধে হয়—না ?

বীথি এবার উচ্ছলিতভাবে হেসে উঠল।

—এ একেবারে হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্—প্রিন্সিপ্যালের প্রতিধ্বনি—স্যারের মতো কথা। আমি কিন্তু স্যারের মতামত চাইনি—ছোটদার কথা শুনতে চেয়েছিলুম।

সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে বললে, ছোড়দা এবার তোমার কান টেনে ধরবে। যা, এখন পালা এখান থেকে। বিরক্ত করিসনি। বীথি হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালো।

—কথাটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে।

—পালা বলছি। সারাটা বিকেল আড্ডা দিয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা ফাজলামো করতে এসেছে। পড়াশুনো নেই ?

—যাচ্ছি পড়তে। গিয়ে বসছি তপস্যায়। পার্সিভ্যালের এই মার্চেন্ট-অব-ভেনিস্‌টা নিলুম তোমার টেবিল থেকে।

—পার্সিভ্যালের সৌভাগ্য।

—আর ইউনিভার্সিটিরও—বলে বই নিয়ে ঘর থেকে

মুখার্জি ভিলায় এই একটি আলো। একটি মাত্র আলো। কতক্ষণ জ্বলবে। হঠাৎ নিবে যাবে একদিন? না জ্বালিয়ে তুলতে পারবে সকলকে?

'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স'-এ আবার মন দিতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছেনা। তারও ছাত্রজীবন ছিল, ইউনিয়ন ছিল, উত্তেজনা ছিল, কলকাতার পথে পথে অনেক ঝড়ের ডাকে সে-ও সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সে-ও কি কোনোদিন ভেবেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই এখন একটা মানসিক শূন্যতায় সে পৌঁছুবে—কোনো কিছু করবার উদ্যম থাকবেনা—যেমন চলছে তাকে মেনে নিয়ে কাটিয়ে যাবে দিনের পর দিন? কেবল স্টাফ্‌রুমের বদ্ধ আবহাওয়ায়, হাজিরা বই, ডাস্টার, ভাঙা খড়ির টুকরো, চায়ের পেয়ালা, সিগার আর সিগারেটের গন্ধের ভেতরে কথার বুদ্বুদ তৈরি করে মানসিক আভিজাত্যকে ঘোষণা করতে হবে?

সত্যজিৎ একটা চুরুট ধরালো। কেন এমন হয়? আজকের অগ্নিগর্ভ ছাত্র কাল অধ্যাপকের চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে মিইয়ে যায় কী করে? কেন তার মনে হতে থাকে—তাদের যুগটাই ছিল ভালো, এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার?

যাঁদের চুলে পাক ধরেছে, তাঁরা অনেকে আরো নিশ্চিন্ত। স্টাফরুমের কোণায় ডেক চেয়ারে ঘুমোতে ঘুমোতে তাঁদের কেউ কেউ তর্কের আওয়াজে চমকে জেগে ওঠেন। বিরক্ত হয়ে হাই তুলে পাশের প্রৌঢ়কে বলেন, খাওয়াটা আজ বড্ড বেশি হয়ে গেছে—বুঝলেন। সস্তায় একটা বড় ইলিশ এনেছিলুম—

আরো একটু বয়েস বাড়লে হাঁপানি আর ডায়াবেটিস তত্ত্ব। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলীর রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী।

'For Thine is the Kingdom—'

ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবু এই হচ্ছে মহাজনপন্থা! সত্যজিৎও সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকেই চলেছে। তান্ত্রিক সাধু। তাবিজ। বাত। 'এরা গোল্লায় গেছে—এদের কিচ্ছু হবেনা।' হেড্‌ একজামিনারশিপ্‌। বড়বাজারের শাঁসালো প্রাইভেট টিউশন। কলেজ কমিটি। ভবিষ্যৎ ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা। পোর্ট-কমিশনার জানাশোনা কেউ আছে মশাই? আমার ছেলেটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করছি—'

একটা অঙ্কের যোগফল। সত্যজিৎ আপাতত ধাপে ধাপে সেই অঙ্কটাকেই সাজিয়ে চলেছে। নিজের জন্যেই।

বীথি ফিরে এল।

—ছোড়দা?

—আবার কী চাই?

বীথি একটু ইতস্তত করল।

—কী বলছিলি?

—দিদিকে বোধ হয় রীতেনবাবুর সঙ্গে ছেড়ে না দেওয়াই উচিত। একে ক্লাউনের মতো চেহারা—দেখে মনে হয় যেন সার্কাসের দল থেকে পালিয়ে এসেছে। লোকটাও বোধ হয় ভালো টাইপের নয়।

রীতেন? হ্যাঁ—ঠিক কথা। রীতেন দি গ্রেট! সত্যজিৎ আশ্চর্য হয়ে বললে, রীতেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল নাকি প্রীতি?

—হ্যাঁ রেডিয়োতে গেছে। সন্ধ্যায় দুটো প্রোগ্রাম আছে ওর।

—হঠাৎ রীতেন কেন? রঘুই তো যায় বরাবর।

—রীতেনবাবু কাল বিকেলে এসেও তো গল্প করে গেছে অনেকক্ষণ। বাবার কাছে গিয়ে খুব জমিয়ে গিয়েছিল। কী, থার্ডক্লাস রসিকতা আর হাউ হাউ করে হাসবার কী বিকট ভঙ্গি! বাবাকে দারুণ ইম্‌প্রেস্‌ করেছে।

চুরুটের গোড়াটা কামড়ে ধরল সত্যজিৎ।

—ও:!

—আমার কাছে বিশেষ পাত্তা পায়নি। বীথি বলে চলল: কিন্তু বাবা দেখলুম খুব হাসছেন ওর কথায়। আর দিদি তো একেবারে মুগ্ধ! বাবাই নিশ্চয় দিদিকে ওর সঙ্গে রেডিয়োতে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছেন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল।

—তোমার কিন্তু দিদিকে বারণ করা উচিত ছোড়দা। রীতেনবাবু লোক ভালো নয়।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।—ক্লান্ত গলায় জবাব দিলে সত্যজিৎ। তার আর ভালো লাগছেনা। মুখার্জি-ভিলা নিজের হাতে নিজের ইতিহাস রচনা করে চলেছে। সেখানে কারো আর কিছু করবার নেই।

বাবার ঘরে রেডিয়ো বেজে উঠল। প্রীতির প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না—" (ক্রমশঃ)

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহরতলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম

তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে ?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা ?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন ! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি— কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

HVM. 314B-X52 BG

হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে কর্ত্তৃক প্রস্তুত

পাট ও পীঠ

শ্রী 'শ'—

সঙ্গীত নাটক একাডামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে—ফিল্ম সেমিনার। মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি ডাঃ রাজা মন্নার সঙ্গীত-নাটক একাডামী চেয়ারম্যান। শ্রী বি. এন সরকার ফিল্ম সেমিনারের চেয়ারম্যান, আর চিত্রজগতে স্বনামধন্যা শ্রীমতী দেবিকারাণী রোরিক ও পৃথ্বীরাজ কাপুর দুজনেই সেমিনারের ডাইরেক্টার।

ও শিক্ষা-প্রদ। শুধু তাই নয়, সেমিনারের বিভিন্ন অধিবেশনে সর্ব্বশ্রী ডাঃ পি. ভি. রাজা মন্নার, বি. এন. সরকার, এস. এস. ভাসানি, ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, এস ভাবনানী, পরলোকগতা সুপ্রভা মুখার্জি, ভি. শান্তনম, কিশোর সাহু, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মার্কাস বর্টলী, এম. এ. ফজলভাই, অনিল বিশ্বাস, দুর্গা খোটে, কে. এম. মোদী, ডেভিড আব্রাহাম, কে. এ. আব্বাস প্রভৃতি ফিল্ম বিশেষজ্ঞের শিল্পীর বক্তৃতা চিন্তা জাগায়, বুঝিয়ে দেয়, ফিল্ম সম্বন্ধে কত কি জানবার আছে ভাববার আছে। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আলোচনাও। আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী ও শিল্পবিশারদগণ। যথা সর্বশ্রী রাজকাপুর, নার্গিস, দিলীপকুমার, উদয়সংকর,

শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "শ্রীকান্ত"র অংশবিশেষ অবলম্বনে শ্রীমতী পিকচার্সের নির্ম্মীয়মান চিত্র "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত"র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

বাংলা অঞ্চলের অনারারী জোন-সেক্রেটারী ডাঃ আর. এম, রায় এই রিপোর্ট সংকলন করেছেন। সেমিনারের সংগঠনের পর থেকে ১৯৫৫ সালের ঘটিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফিল্ম সেমিনারের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তৃতা সত্যি বড় কৌতুকোদ্দীপক

আর. রঞ্জন, দেবকী বোস, সৌরেন সেন, মধু শীল, পঙ্কজ মল্লিক, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। আলোচনা হৃদয়-গ্রাহী ও শিক্ষণীয় যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং ফিল্ম সেমিনার সৃষ্টির সার্থকতাও প্রমাণ করে। ফিল্ম সেমিনারের মাধ্যমে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প নিশ্চিত পদক্ষেপে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে, জাগ্রত

ভারত-গঠনে করবে সহযোগিতা—এ আমরা আশা করতে পারি।

* * *

"রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" চিত্রের একটিদৃশ্যে শ্রীকান্তের রূপসজ্জায় উত্তমকুমার

॥ পথে হল দেরী ॥

অগ্রদূত প্রডাকসন্সের 'পথে হল দেরী' চিত্রটি সম্প্রতি কলিকাতায় বিশেষ আকর্ষণীয় চিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু চিত্রটিতে রঙের খেলা ছাড়া নতুনত্ব আর কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। বাংলা রঙীণ চিত্ররূপে "পথে হল দেরী"ই সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এই দিক থেকে চিত্রটির বিশেষত্ব আছে, তা ছাড়া আর সব কিছুই মামুলী।

বাংলা চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পীযুগল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন এই ছবিটির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হলেও অভিনয়ের দিক থেকে তাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি বললে ভুল বলা হবে না। তবে শেষের দিকে সুচিত্রা সেনের অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে একথা বলা চলে। উত্তমকুমারের অভিনয়ের মধ্যে সেই গতানুগতিক গম্ভীর অভিনয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। গোড়ার দিকে সুচিত্রা সেনের হিন্দী ফিল্মের মতন চোখ-মুখ ঘোরান গান ও অভিনয় বিরক্তি উৎপাদন করে। গানগুলিও শোনবার মতন এমন কিছু নয়। তা ছাড়া ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় নায়িকার শাড়ীর বাহার ও দার্জ্জীলিং-এর মনোরম বহির্দৃশ্য দেখানই এই ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্পের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও বলতে হয় গল্পটির বাঁধন অত্যন্ত দুর্ব্বল। নায়িকার দাদুরূপী ছবি বিশ্বাসকে অত্যন্ত কঠোর বলেই মনে হয়। নিজের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী নাতনীর প্রতি এতটা কঠোর ব্যবহার মনকে আহত করে।

যাই হোক, বাংলা রঙীণ চিত্রের অগ্রদূত হিসাবে "পথে হল দেরী"কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর অগ্রদূত প্রডাকসন্সের শিল্পী ও পরিচালকদেরও জানাচ্ছি আমাদের শুভেচ্ছা—তাঁরা যেন আরও সুন্দরতর রঙীণ চিত্র নির্ম্মাণে উদ্যোগী হন।

ভারতীয় অভিনেতা শ্রী আই, এস, জোহার একটি ব্রিটিশ চিত্রে অভিনয় করবার চুক্তিতে বদ্ধ হয়েছেন। ছবিটিতে তিনি একটি শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চিত্রটির নাম "Harry Black" এবং লেখকের নাম David Walker। এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ মাইশোরে করা হবে। ছবিটিতে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা Stewart Granger ও Barbara Rush এবং খ্যাতনামা ব্রিটিশ অভিনেতা Anthony Steel অভিনয় করবেন। এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীকে এই ছবিতে কাজ দেওয়া হবে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে মাইশোরে ছবিটির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন বোম্বের প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের পুত্র লর্ড জন্ ব্রাবোর্ণ।

* * *

অখিল চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় "কলঙ্কী চাঁদ" চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্যে আশিষ কুমার ও তপতী ঘোষ
চিত্রখানি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক শিব ভট্টাচার্য্য

গীত, বাদ্য ও নৃত্যকলায় বালিকার কৃতিত্ব

অতি অল্প বয়সেই কুমারী ইরা বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার বাদ্যে অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিগত ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে ইরা সকল গ্রুপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং জীপ্সী নৃত্যে গৌরীশংকর স্বর্ণ পদক লাভ করে। মনিপুরী নৃত্যেও অনুরূপ পারদর্শিতা দেখিয়ে সুধীজনের অভিনন্দন অর্জন করে। ১৯৫৭ সালে মহাজাতিসদনে দুই-দিনের অনুষ্ঠানে ইলেক্‌ট্রিক গীটারে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। ইতিপূর্বে বেনারস এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বহু অনুষ্ঠানে কুমারী ইরা গীত-বাদ্যে ও নৃত্যে অসামান্য প্রশংসা অর্জন করে। ইরার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। সে বর্তমানে একজন বিশিষ্ট বেতার-শিল্পী। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।
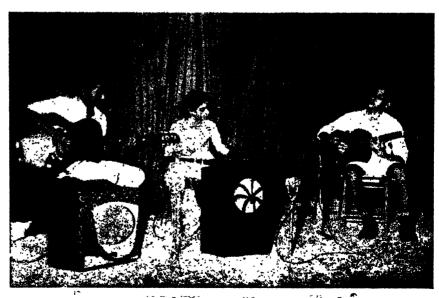
নীহারিকা নদী

শ্রীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

নানকিঙ থেকে বেরিয়ে ওরা ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো। সুলেখা চলে গেল চোপরার গাড়ীতে। কিন্তু শিপ্রা গেল না।

পড়ন্ত বিকেল। এক পশলা বৃষ্টির পর আবার চকাস করেছে। কিন্তু মেঘের চলাচল থামে নি। আকাশটা যেন অভিমানিনীর মত আলুথালু বেশে হেঁটমুখে মাটির দিকে চেয়ে আছে। কান্না থেমেছে, কিন্তু চোখের পাতা এখনও ভিজে।

এতক্ষণ বেশ লাগছিল অজিতকে। হঠাৎ মনটা কেমন ভেসে উঠলো। অজিতের হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে শিপ্রা বললে, ফিরে যেতে পারবে তো একলা?··· ডালহৌসি বা এস্প্লানেডে গেলেই সাউথের ট্রাম পাবে।

জানি: অজিত ঘাড়টা হেলিয়ে শিপ্রার মুখপানে চেয়ে হাসে। আমেজের ডিক্যান্টারটা গড়িয়ে যেন একটুখানি শ্যাম্পেন ঢেলে দিতে চায় ওর মনের পেয়ালায়।

শিপ্রা হাসে না। কাজল-ছোঁয়ানো চোখদুটো শুধু একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঝুল-বটুয়াটা এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বলে—গুড নাইট, অজিত!··· কাল রবিবার।···বিকেল চারটেয় দেখা হবে হোস্টেলে।

হাত তুলে শিপ্রা ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যায় ফুটপাথের কিনারায়। হঠাৎ উত্তরগামী বাসটায় উঠে বসে। অজিতকে দ্বিতীয় কোন কথা বলবার সুযোগ দেয় না। বাসের জানালায় শুধু একবার ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখখানা তুলে ধরে অজিতের দৃষ্টিপথে।

এক ঝলক ক্রুড-অয়েলের কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসখানা গন্তব্য পথে ছুটে চললো। ধোঁয়ার গন্ধে বাতাসটা ঝাঁজালো হয়ে ওঠে। তবুও অজিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাসখানার দিকে। বাসের স্পীড বাড়লো, কিন্তু ওর মনের গতিটাকে যেন শিপ্রা হঠাৎ মন্থর করে দিয়ে গেল বাঁ-হাতে ব্রেকটা টেনে।

ক্ষণকাল নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে থেকে অজিত ধীরপদে এগিয়ে চললো এস্প্লানেডের পথে।···বাসখানা তখন দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বটুয়াটা খুলে শিপ্রা ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা বের করে আর-একবার দেখে নিলে জয়ন্তর ঠিকানাটা।···বেনেটোলা লেনের মেস ছেড়ে জয়ন্ত উঠে গিয়েছে বরানগরের একটা বাগান বাড়ীতে। হয়তো বিনা পয়সায় থাকবার জায়গা পেয়েছে। কুকারে রান্না করে খায়। বাগানে মালী নিশ্চয়ই আছে, তবুও একজন বিশ্বাসী লোক থাকলে দেখাশোনার সুবিধা হয়, তাই বোধহয় প্রশান্ত জোয়ারদার বিনা-পয়সায় দোতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন জয়ন্তকে। নিরিবিলি জায়গাই সে খুঁজেছিল এতদিন। কিন্তু মেসের চার্জ মিটিয়ে নতুন জায়গায় উঠে যেতে হলে যে টাকার দরকার, তার ব্যবস্থা করতে পারে নি বলেই উঠে যাওয়া ওর হয় নি।

শিপ্রা চেয়েছিল টাকা দিতে। কিন্তু জয়ন্ত নেয় নি। ওর প্রস্তাবে সে শুধু একটু হেসেছিল। নিতান্ত নিষ্প্রভ একটুকরো হাসি। জয়ন্তর সেই হাসিটুকুই যথেষ্ট হয়েছিল শিপ্রাকে নিরস্ত করতে। তারপর প্রায় তিনমাস শিপ্রা আর জয়ন্তর মেসে পা বাড়ায় নি।

এই তিন মাসের ভিতরেই হয়েছে অজিতের সঙ্গে তার পরিচয়। মনটা আবার নতুন উদ্যমে ভরে উঠেছে। স্পোর্ট না হলে ও থাকতে পারে না। একটা স্পোর্ট ছেড়ে আর একটার জন্যে নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেবার আনন্দে

ও মশগুল হয়ে থাকে। সেই আনন্দ যখন কমে আসে, শিপ্রার মনটা কেমন মন্থর হয়ে পড়ে।

জানা-চেনা বন্ধুবান্ধব যত ছিল সব যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল। একই জিনিস রোজ রোজ ওর ভাল লাগে না। উপরো-উপরি সাতদিন ভাত খেতে হলেও যেন সে হাঁপিয়ে ওঠে। হয়, হঠাৎ বাড়ীর খাওয়া বন্ধ করে হোটেলে গিয়ে ডিনার করে আসে, না-হয় নিরম্বু উপবাস করে কাটায় সারাটা দিন।...তাই বেশ লাগলো অজিতকে। অজিত আর কুলদীপ ওরা দুই বন্ধু। দুজনেই লক্ষ্ণৌ য়ুনিভার্সিটী থেকে এম-এ পাশ করে প্রথমশ্রেণীর সরকারী চাকরি নিয়ে এসেছে কলকাতায়।

মহারাষ্ট্র ভবনে ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অনুপম ভটচাযি্য আর সমর সেন। সেদিন ওদের সঙ্গে ছিল এঞ্জিনিয়র বালকৃষ্ণণ। বালকৃষ্ণণকে শিপ্রার আরও ভাল লেগেছিল। ভারি মিষ্টি চেহারা। চোখেমুখে যেন বুদ্ধির দীপ্তি মাখানো! কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ। মুখপানে চেয়ে মনের তলায় কোথায় যেন একটু স্নেহের দাগ লাগে! তাই শিপ্রা আলগোছে পাশ কাটিয়েছে। অনুপম টের না-পেলেও সমর সেন টের পেয়েছিল শিপ্রার চোখদুটোর দিকে চেয়ে।

মিষ্টার আ-জিৎ!

শিপ্রার দৃষ্টি ছিল বালকৃষ্ণণের মুখপানে। কিন্তু হাতখানা বাড়িয়েছিল অজিতের দিকে।...পরিচয় বিস্তৃত হবার আগেই প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্রভবনে সেদিন ছিল পূবালি সঙ্ঘের 'বিসর্জন' অভিনয়।

হঠাৎ জয়ন্তর কথা মনে হতে শিপ্রা অনেকদিন পরে আবার বেনেটোলার মেসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা হয় নি। জয়ন্ত তার দুমাস আগে মেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। আলো জ্বালতে গিয়ে আঙুলটা যেন হঠাৎ ইলেকট্রিকের ভাঙা সুইচে পড়েছিল। আকস্মিক বৈদ্যুতিক প্রবাহে শিরা-উপশিরাগুলো মুহূর্তে ঝিন্ ঝিন্ করে উঠেছিল।...টাকা ও পেয়েছে। হয়তো সুরেখাদির কাছে। খাণ্ডেলওয়ালের টাকার অভাব নাই। তার ওপর সোনার ফসলে লেগেছে মরশুমি বাতাস: জুটেছে নতুন বন্ধু চোপরা।

একটু ইতস্তত করে পাশের ঘরের ভদ্রলোকটিকে শিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিল—বলতে পারেন, কোথায় উঠে গেছেন উনি—[illegible]

জানি না: ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর মুখপানে চেয়েছিলেন। একটু থেমে, কি ভেবে বলেছিলেন—নীচের তলায় উত্তর দিকের ঘরটায় ম্যানেজার থাকে।

ও! ধন্যবাদ।

শিপ্রা আর অপেক্ষা করে নি। ক্ষিপ্র পদে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে এসেছিল। ভদ্রলোকের মুখে যে চোরা হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল, সেটুকু তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বিব্রত সে হয়নি। তবুও দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি তার ছিল না সেদিন।...ধার হিসেবে জয়ন্ত যে টাকা ওর কাছে নিতে পারে নি, সে-টাকা কেমন করে হাত পেতে নিয়েছে সুরেখাদির কাছে! একথা ভাবতে ওর সারামন পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে উঠেছিল।

সিঁড়ির সামনেই ম্যানেজারের ঘর। কালো মোটা-সোটা লোকটি খয়েরি রঙের একখানা লুঙ্গি পরে বসেছিলেন চৌকীর ওপর। সারা গায়ে বড় বড় লোম। অদ্ভুত চেহারা! মনে হয়, ঘাড়ের নীচে কালো ভাঁজটার ভিতর থেকে গায়ের রঙ গলেগলে পড়ছে ঘামের সঙ্গে।

দরজার সাম্‌নে গিয়ে শিপ্রা একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল, চলে আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে দু'পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে জয়ন্ত চ্যাটার্জী ছিলেন। জানেন তাঁর ঠিকানাটা?

চেনা মুখ। ভদ্রলোক আগেও অনেকবার দেখেছেন শিপ্রাকে এই মেসে আসা-যাওয়া করতে। তবুও যেন চোখ দুটো কেমন বড় হয়ে উঠেছিল ওর মুখ পানে চেয়ে। বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—আজ্ঞে না। ভুল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করা হয়নি। টাকা-পয়সা সব মিটিয়ে সিট ছেড়ে দিয়ে গেছেন কিনা।...তা, আসেন মাঝে মাঝে ডাকের চিঠি-টিঠি আছে কিনা, খোঁজ নিতে।...বলতে হবে কিছু?

না।...শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিল। ভদ্রলোকের কথা বলবার আগ্রহ যেন উপচে পড়ছিল। যা জানবার, তার বেশি জানতে সে চাইনি কিছু। নতুন করে কিছু বলবারও ছিল না তার।

বেনেটোলা থেকে ম্যানডেভিলা পর্যন্ত সারাটা পথ শিপ্রা যে কি-মন নিয়ে ফিরেছিল, তা শুধু সে-ই জানে।...বেনেটোলার মেস ছেড়ে জয়ন্ত চলে গিয়েছে। উঠে গিয়েছে অন্য কোন মেস না-হয় বোর্ডিং-এ। কিন্তু ওরা কেউ জানে না কোথায় উঠে গেল সে। যাবার আগে

পর্যন্ত রেখে যায় নি কারো কাছে। টাকা তার ছিল না, সে-কথা শিপ্রা ভালো করেই জানতো, এখনও জানে। হঠাৎ কেমন করে এত টাকা সে হাতে পেয়েছে, যাতে মেসের দেনা শোধ করেও নতুন আস্তানায় উঠে গেল, সে-কথা শিপ্রা ভাবতে পারে না। নিশ্চয়ই সুরেখাদি দিয়েছে টাকা। যে-টাকা একদিন ওর কাছে ধার বলেও নিতে পারে নি, সে-টাকা সুরেখাদির কাছে কেমন করে হাত পেতে নিয়েছে জয়ন্ত? তাতে কি পরাজয় ঘটে নি তার!

জয়ন্তকে ও ডাকে জায়াণ্ট বলে। পুরুষের এত অহঙ্কার ও দেখেনি জীবনে। তাই প্রথম-প্রথম শিপ্রার ভালো লাগে নি ওকে। কিন্তু সে অনুভূতি মিলিয়ে যেতে দেরী লাগে নি। জয়ন্তর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিপ্রা যেন জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল নিজের নারীত্ব। অজ্ঞাত-সারে মনটা নরম হয়ে নুয়ে পড়েছিল। মনে মনে জয়ন্তকে স্বীকার করতে তার তিলমাত্র বাধেনি। নারীর মূল্য যে জয়ন্ত বোঝে না, তা নয়। হয়তো অন্যের চেয়ে অনেক বেশী বোঝে। নারীর মর্যাদা দিতেও সে কারো চেয়ে কম জানে না। দরদ-ভরা অদ্ভুত একটা শিল্পী মন। তবুও পোষ মানতে চায় না অন্য কোন দরদী মনের কাছে। সাড়া দিতে জানে না, তা নয়। কিন্তু সাড়া সে দেয় না। কেন দেয় না, সে-কথা শিপ্রা অনেক করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুঁজে পায় নি কোন উত্তর।···দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। সারা দেহে কোথাও এতটুকু মেদ নেই। চওড়া বুকখানা দেখে মনে হয়, পলিমাটির ওপর চিউনি দিয়ে কোন কারিগর যেন নিখুঁত ভাবে প্রত্যেকটী ভাঁজ এঁকে দিয়েছে। লম্বা-লম্বা হাতদুটো যেন আফ্রিদী ইস্পাতের গান-ব্যারেল। লেমনেডের বোতল খুলতে চাবি লাগে না। চোখের নিমেষে মোচড় দিয়ে টিনের ছিপিটা তর্জনীর বেষ্টনী দিয়ে অবলীলাক্রমে খুলে ফেলে। তাই দেখে, কতদিন শিপ্রা অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকেছে মুখ-পানে।···অদ্ভুত! সত্যি অদ্ভুত! বিজ্ঞানের ছাত্র অথচ কাব্য-সাহিত্য দর্শন ফাইন আর্টস্—সবকিছুতেই সমান অধিকার। বোঝে সব, জানে সব। জানে না শুধু পরাজয় স্বীকার করতে। এতটুকু কম্‌প্রোমাইজ করতে হলে, ছিটকে ওঠে স্প্রীংএর মত। বাজপাখীর ধৈর্য নিয়ে ওকে শিকার করা চলে না। অথচ শিপ্রাও জানে না হার মানতে। তাই যেন নিজেকে সরিয়ে আনতে সে হিমসিম খেয়ে যায়। যে-শিকারকে অস্বীকার করা চলে না, তাকে জায়াণ্ট ছাড়া আর কি বলবে সে!

অনেক চেষ্টা করেও শিপ্রা যোগাড় করতে পারেনি জয়ন্তর ঠিকানা। মঞ্জরী, রেবা সোম, লীলা হালদার, কারকর্মা, জগৎ চক্রবর্তী—কেউ পারেনি ওর সন্ধান দিতে। জগতের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব যে, তাকে জগা ছাড়া ভুলেও কোনদিন সে জগৎ বলে না। বোটানির নাম-করা স্কলার জগৎ। চক্রবর্তী কিন্তু জয়ন্ত তাকে বলে গ্রাস্-হপার: ক্রম বিবর্তনের স্রোতে বোটানিষ্টের পর্যায়ে উঠেছে। শুধু ডারউইনের থিওরিতে সংজ্ঞা নিরূপণ করলে চলবে না, ওয়ায়েস্‌মান বা লামার্ক স্পষ্টই এ ইঙ্গিত রেখে গিয়াছেন যে, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দুটোই ক্রমবিবর্তনের পথে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

জগতের কাছেও যখন জয়ন্তর সন্ধান মেলেনি, শিপ্রা হতাশ হয়েছিল, কিন্তু নিরস্ত হয় নি। ওর জমাট-বাঁধা চিন্তা মগ্নচৈতন্যের ফাঁকে ফাঁকে পাক খেয়ে দাঁড়িয়েছিল মনের অন্তরালে। সেই স্পাইরাল সিঁড়ির ধাপে ধাপে বারবার সুরেখা চঞ্চল পদে ওঠা-নামা করেছে।

সন্দেহ ওর ঘোচে নি, তাই হাল ছাড়ে নি শিপ্রা। মনের দরিয়ায় দাঁড় টেনে টেনে যখন শিপ্রা ক্লান্ত হয়ে এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ, নিতান্ত হঠাৎ, কলম্বাসের মত সে আবিষ্কার করেছে নোঙর ফেলবার মাটি।··· নিউ আলিপুরের বাড়ীতে। থাণ্ডেলওয়াল তখন ছিল না। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে সুরেখা ড্রেসিং-রুমে ঢুকেছিল প্রসাধন করতে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছিল চুলের গোছা শুকিয়ে ব্লো করে নিতে। মেসিনের শব্দটা মৌমাছির ঝাঁকের মত হানা দিচ্ছিল ড্রেসিং রুমের জানালায়।

শিপ্রার অপেক্ষমান মন স্নায়ুতন্ত্রী বয়ে দ্রুত চলাফেরা করে। প্রতীক্ষা করবার ধৈর্য ওর কোনদিনই ছিল না, আজও নাই। তবুও বসে থাকে। চোখদুটো ড্রেসিং রুমের জানালা থেকে ফিরে আসে ছোট সেক্রেটারিয়াট টেবিল-টার ওপর: সঞ্চয়িতা, তার গায়ে কাৎ হয়ে আছে মমের ট্রেম্‌ব্লিং অব দি লীফ, লাক্সনেসের সাল্‌কা ভালগা, স্টীফেন জাইগের গল্প সমষ্টি—আর! মরোক্কো-লেদারের গিল্‌ট-এজেড একখানা ছোট ডায়েরি।

আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে শিপ্রা জানালাটার দিকে চেয়ে নিয়েছিল। সরু লম্বা আঙুল দিয়ে ক্লিপ করে টেনে এনেছিল ডায়েরিটা। তারপর দ্রুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনে উল্টে গিয়েছিল পাতাগুলো: দিন-তারিখ, এন্‌গেজমেণ্ট, মেমোরান্‌ডাম্, ঠিকানা!···জয়ন্তর ঠিকানা! মুহূর্তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছিল ওর দেহের রক্তস্রোত। টুকে নেবার মত ধৈর্য তখন ছিল না। পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বটুয়ায় ভরেছিল। এক মিনিটও আর অপেক্ষা করে নি। সুরেখা ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ও-যখন দরজাটা পার হয়ে এসেছে, প্যানট্রী থেকে বয় বেরুছিল দুহাতে দু' প্লেট খাবার সাজিয়ে নিয়ে। ওকে চলে আসতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শিপ্রা দৃক্‌পাত করে নি।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৭ সালের রোভার্স কাপ ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ৩-০ গোলে ক'লকাতার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং গত বছরের রোভার্স বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের ইহা ষষ্ঠ জয়লাভ। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়-ক্রমে পাঁচবার রোভার্স কাপ জয়লাভ ক'রে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়লাভের রেকর্ড স্থাপন করে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র হায়দ্রাবাদ দলই ছয়বার রোভার্স কাপ জয়লাভ ক'রে সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়লাভেরও রেকর্ড করেছে।

ফাইনাল খেলায় হায়দ্রাবাদ দলেরই প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল, বিশেষ ক'রে প্রথমার্দ্ধের খেলায়। খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই হায়দ্রাবাদ দলের জুলফিকার প্রথম গোলটি করেন। ২য় গোলটি দেন ইউসুফ। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৫৭ মিনিটে ৩য় গোলটি দেন জুলফিকার।

হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ফাইনালে ওঠে আই সি এলকে ৪-০ গোলে, মোহনবাগানকে ২-১ গোলে এবং ক্যাল-টেক্সকে ০-০, ২-১ গোলে হারিয়ে।

মহমেডান স্পোর্টি ফাইনালে ওঠে ভিজাগাপত্তমের স্পোর্টসমেন্স ক্লাবকে ৪-০ গোলে, সেকেন্দ্রাবাদের ই, এম, ইকে ৩-০ গোলে এবং রাজস্থানকে (কলকাতা) ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে।

সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-১ গোলে ক্যাল-টেক্স স্পোর্টস ক্লাবকে এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে ক'লকাতার রাজস্থান ক্লাবকে পরাজিত করে।

গতবছরের রোভার্স কাপের রাণার্স-আপ মোহনবাগান কোয়ার্টার-ফাইনালে ১-২ গোলে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের কাছে পরাজিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গত বছরের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান হায়দ্রাবাদ পুলিশদলকে পরাজিত করেছিল।

২য় রাউণ্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১-৩ গোলে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৭ সালের ৪র্থ বার্ষিক 'ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়ান-সীপ' প্রতিযোগিতার ফাইনালে সার্ভিসেস দল মোট ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টিতে জয়লাভ ক'রে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে। রেলদল বাকি তিনটিতে খেতাব লাভ ক'রে রানার্স-আপ হয়েছে। এ বছর সার্ভিসেস দল ৪৪-৩১ পয়েণ্টে রেলদলকে পরাজিত করে। গত বছরও সার্ভিসেস দল চ্যাম্পিয়ান এবং রেলদল রাণার্স-আপ হয়েছিল।

ফাইনাল ফলাফল :

ফ্লাইওয়েট : নায়ক দেবদানম (সার্ভিসেস); ব্যাণ্টমওয়েট : এস থাটাউ (রেলওয়ে); ফেদারওয়েট : সারওয়ান সিং (সার্ভিসেস); লাইটওয়েট : নায়ক সুন্দর রাও (সার্ভিসেস): লাইট ওয়েল্টারওয়েট : নায়ক

শ্যামরাজ (সার্ভিসেস); লাইট-মিডলওয়েট : বি ডি' সুজা (রেলওয়ে). মিডলওয়েট : হরি সিং (সার্ভিসেস); লাইট হেভীওয়েট : এস বসু (রেলওয়ে); হেভীওয়েট : ম্যাঙ্গে রাম (সার্ভিসেস); ওয়েল্টারওয়েট : রঙ্গনাথন (সার্ভিসেস)।

বিজ্ঞানসম্মত লড়ায়ের জন্য শ্যামী খাটাউ (রেলওয়ে) বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-১৪, ১৮-২১, ১৪-২১, ২১-৭, ২১-১০ পয়েণ্টে জ্যোতির্ম্ময় ব্যানার্জীকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জ্যোতির্ম্ময় ব্যানার্জী এবং সমীর মুখার্জী ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-১৩, ২১-১১ পয়েণ্টে দীপক ঘোষ এবং পি মিত্রকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস উষা আয়েঙ্গার ২১-১০, ২১-১৬, ২২-২০ পয়েণ্টে মিসেস সি কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-৮, ২১-৯, ২৮-২৬ পয়েণ্টে হ্যারী অ'কে পরাজিত করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে ইস্টার্ণ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ৫-০ খেলায় বি বি এ সি দলকে পরাজিত করে।

পেশাদার টেনিস প্রদর্শনী ঃ

জ্যাক ক্রেমারের দলের পেশাদার খেলোয়াড়রা ক'লকাতার সাউথ ক্লাব লন্ টেনিস মাঠে দু'দিনের প্রদর্শনী টেনিস খেলায় যোগদান করেন। খেলায় যোগদান করেছিলেন জ্যাক ক্রেমার (যুক্তরাষ্ট্র), লুই হোড, এবং কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া), এবং পাঞ্চো সেগুরা (ইকোয়েডর)। এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাক ক্রেমার হ'লেন ১৯৪৭ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ; অষ্ট্রেলিয়ার লুই হোড গত দু বছরের (১৯৫৬ ও ৫৭) উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ; অষ্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল ১৯৫৬ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে লুই হোডের কাছে পরাজিত হ'ন। কিন্তু ঐ বছরই আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় লুই হোডকে পরাজিত করেন। বর্ত্তমানে তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ষ্টোক খেলোয়াড় বলা হয়। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা লণ্ডন পেশাদার লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় রোজওয়াল ফাইনালে সেগুরাকে পরাজিত ক'রে খেতাব লাভ করেন। এক কথায় এঁরা চার জনই হ'লেন বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়।

প্রথমদিনের প্রদর্শনী খেলা দেখে দর্শকরা হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মাঠের অবস্থাকে চারজন খেলোয়াড়ই আয়ত্বের মধ্যে আনতে সক্ষম হন নি। তাছাড়া তাঁদের খেলায় এমন সমস্ত ভুল ত্রুটি চোখে পড়েছিল যে, কোন সময়ই মনে হয়নি চোখের সামনে বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়দের খেলা দেখছি। এক এক সময় খেলা এমন একঘেঁয়ে হচ্ছিল যে, দর্শকদের আসন ছেড়ে চলেযেতে হচ্ছিল অথবা আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতে হয়েছিল। খেলার মধ্যে কোন প্রেরণা ছিলনা ; ফলে প্রথম দিনের খেলাগুলি মোটেই উপভোগ্য হয়নি। কেবল জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে বলা চলে। দ্বিতীয় দিনের খেলা যা কিছুটা উপভোগ্য হয়েছিল। এবং এই দিন রোজওয়ালের খেলাই দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। কিন্তু ত' দু'বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান লুই হোডের খেলা দর্শকদের নিরাশ করে।

প্রথমদিনের সিঙ্গলস খেলায় কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩ ও ৬-৩ সেটে লিউ হোডকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। পাঞ্চো সেগুরা (ইকোয়েডার) ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে জ্যাক ক্রেমারকে (যুক্তরাষ্ট্র) পরাজিত করেন। ডাবলস খেলায় জ্যাক ক্রেমার ও সেগুরা ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লিউ হোড ও কোন রোজওয়ালকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের সিঙ্গলস খেলায় রোজওয়াল ৭-৫ ও ৭-৫ সেটে সেগুরাকে এবং জ্যাক ক্রেমার ৬-৩, ২-৬, ৬-৩ সেটে লুইহোডকে পরাজিত করেন। ডাবলস খেলায় লুইহোড এবং কেনরোজওয়াল ৬-২, ১-৬, ও ৬-৩ সেটে সেগুরা ও ক্রেমারকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইষ্টজোন টেবল টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস : কে নাগরাজ (রেলওয়ে) ১১-২১, ২১-১৫, ২১-৯ ও ২১-২ পয়েণ্টে থিরুভেঙ্কেডামকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : থিরুভেঙ্কেডাম এবং নাগরাজ (রেলওয়ে) ২১-১০, ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েণ্টে জে ব্যানার্জি এবং এস মুখার্জিকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সরোজ ঘোষ এবং মিস উষা আয়েঙ্গার ২০-২২, ২১-১৫, ২১-১৩, ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে দীপক ঘোষ এবং মিসেস কাপুরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : উষা আয়েঙ্গার ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৩ ও [illegible] পয়েণ্টে মিসেস কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৫ পয়েণ্টে হ্যারী অ'কে পরাজিত করেন।
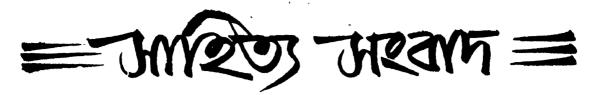
ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ : বিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টরেটের জন্যে যে প্রবন্ধ রচনা করে সম্মানের সঙ্গে ডি, ফিল্‌ উপাধি লাভ করেন, এ-গ্রন্থ তারই মুদ্রিত রূপ। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছে মুক্তি—দেহের বন্ধন থেকে, জরা মরণ থেকে মুক্তি। এ মুক্তির জন্যে এ ভারতে পথ ও মতের অন্ত নেই। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদ, মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, তন্ত্র, পুরাণ, তারপর বৌদ্ধ-মত, জৈন-মত, প্রত্যেক মতানুযায়ী মুক্তির ব্যাখ্যা সুপণ্ডিত অধ্যাপকের রচনা গুণে সর্বসাধারণের বুদ্ধি-গ্রাহ্য হয়েছে। গ্রন্থ-ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ বলেছেন, "কি জাতীয় পরিশ্রমের ফলে এই প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাহা প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারবেন এবং পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে।" এ গ্রন্থ পাঠে যদি পাঠকপাঠিকা মুক্তি-লাভ প্রয়াসী হন তবেই গ্রন্থকারের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হবে। পণ্ডিত-সমাজে এ গ্রন্থের বহুল সমাদর হবে এ-কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

প্রকাশক—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।
১১৮, চিত্তরঞ্জন কলোনী। যাদবপুর কলিকাতা—৩২

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টিমন (কাব্যগ্রন্থ) : শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত

আলোচ্য গ্রন্থে 'আটাশটী কবিতা আছে'। কবিতাগুলির র[illegible] কাল বলা হয়েছে ১৩৫৯ থেকে ১৩৬৩ আষাঢ়। সবগুলি বাং[illegible] নানা পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার বাং[illegible] কাব্যক্ষেত্রে নবাগত ন'ন, সুতরাং এঁর সম্বন্ধে বিশেষ পরিচ[illegible] আবশ্যক হয় না। রোমান্টিকধর্ম্মী কবিতাগুলির ব্যঞ্জনায় আধুনিক[illegible] লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। নূতন প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে নব ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা গ্রন্থকার দেখিয়েছেন তাঁর 'মিষ্টিমনে' বিশিষ্ট বাকভঙ্গিমায় ও শব্দ প্রয়োগে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রভাবমুক্ত হ[illegible] প্রচেষ্টাও দেখা গেছে অনেকগুলি কবিতায়। সাম্প্রতিক কবি[illegible] ক্ষেত্রে স্বকীয় ভাবকল্পনায় গ্রন্থকার যেভাবে রসসৃষ্টি করছেন তা' আশা করা যায়—তাঁর কাব্যসাধনা একদা সাফল্য-গৌরব লাভ কর[illegible] 'মিষ্টিমনে' গ্রন্থকারের লিখন-শৈলী ও ভাবের অভিব্যক্তি প্রশংসনী[illegible] কাব্যরসিক পাঠকপাঠিকারা এই গ্রন্থ পাঠ করে আনন্দলাভ করে[illegible] লাইনো টাইপে ছাপা গ্রন্থখানি আকর্ষণীয়, চিত্রিত প্রচ্ছদপট ও রম্য।

প্রকাশক—মল্লিক সাহিত্যতীর্থ ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬ ৭২ পৃষ্ঠা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নতুন রেকর্ড

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

P 11932—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী কুমার শচীনদেব বর্মণ গেয়েছেন "ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে" ও "ও জানি ভোমরা কেন কথা কয় না"। দুখানা গানই সবদিক দিয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

N 76059—'ওগো শুনছো' বাণীচিত্রের "আকাশে গোধূলির কুমকুম্‌" ও "চৈতী চাঁদের চোখে" গান দুখানা আলপনা ব্যানার্জীর কণ্ঠে অপূর্ব সুর-ঝংকারে সত্যিই সুন্দর হয়েছে।

N 80124—উৎপলা সেন ও সতীনাথ যুগ্মকণ্ঠে গেয়েছেন দুখানা গীত "হায়রে বিদেশিয়া" ও "পিয়ারোয়া ঘরোয়া নাহি মোর"।

N 76060—দুখানা আধুনিক গান "মন যে বলে যাইগো" ও "ফাগুন দেয় দোল" গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। শিল্পী শ্রোতাদের মনেও আনন্দের দোলা দিতে পারবেন আশা করি।

"কলম্বিয়া"

GE 30372—'হারাণসুর' বাণীচিত্রের দুখানা প্রিয় গান "তুমি যে আমার" ও "আজ দুজনার দুটী পথ"—গেয়েছেন সুগায়িকা গীতা দত্ত (রায়) দুখানা গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

GE 30373—'অভয়ের বিয়ে' বাণীচিত্রের দুখানা গান "মনে মনে গাঁথা মালা" ও "বাঁশী বলে ওগো পাপিয়া" গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান দুখানা চমৎকার হয়েছে।

GE 30374—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় "অভয়ের বিয়ে" বাণীচিত্রের আর দুখানা গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। গান দুখানা "কোন অচিন মধুকর" ও "দীপ নেভা রাতে"।

GE 30379—'চন্দ্রনাথ' বাণীচিত্রের দুখানা গান "আকাশ পৃথিবী শোনে" ও "ঐ রাজার দুলালী সীতা" গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভাবে-ভাষায়, ছন্দ ও সুর মাধুর্যে গান দুখানা মর্মস্পর্শী হয়েছে।

GE 30380—'চন্দ্রনাথ' সবাক চিত্রের আর দুখানা গান "মোর ভীরু সে কুঞ্জকলি" ও "স্মৃতির বাঁশরী কার" গেয়েছেন যথাক্রমে বাংলার দুইজন অতি জনপ্রিয় শিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। গান দুখানায় মাদকতা আছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহা এম. এ. প্রথম পাঠ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মাঘ—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সহজ-ধর্ম্ম

ডাঃ বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন যোগাচার্য

১

"সহজ-ধর্ম্মে"র কথা মনে হইলেই আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ অথবা তন্ত্রের লতাসাধনের কথাই মনে আসে, আর মনটাও কেমন বিরস হইয়া যায়। সত্যই উহার বহিরঙ্গ সাধন জ্ঞানী সাধকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর এবং অনেক সময় লজ্জাজনকও বটে। কিন্তু ইহার একটা ভিতরের দিকও আছে এবং তাহাই সত্যিকার সত্যান্বেষীর পক্ষে সাধনীয়। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রই দ্ব্যর্থভাবব্যঞ্জক। প্রবৃত্তিমার্গা বা অজ্ঞানী সাধকের জন্য বহিরার্থ এবং জ্ঞানীদের জন্য অন্তর বা পারমার্থিক অর্থ। তাই পারমার্থিক সাধক বা মহাজন বাক্যে আছে—

"সরম না জানে ধরম বাখানে,
এমন আছয়ে যারা—
কাজ নাই সই তাদের কথাতে
বাহিরে রহুক তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা—

তোরা নিসারঃ * হইয়ে আয়লো সজনী,
আঁধার পেরিলে আলা।
সেই আলার মাঝারে কালাটি † আছয়ে,
চৌকী ‡ আছয়ে তথা,—
সেদেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগয়ে পরাণে ব্যথা।

অর্থাৎ সে কথা কাহাকে বলিব? আর তাহা শুনিবেই বা কে? সাধক ছাড়া সে কথা বুঝিবেই বা কয়জন? হয়তো বিদ্রূপ ও রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিবে। ইহাতে সাধকের প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে। তাই তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—"গোপয়েৎ কুলবধূবৎ," "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।"

আজকাল অনেকেই পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক নাম শুনিলেই নাক সিটকান; বলেন যে, যাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে—সেই অর্থই লইতে হইবে; ঐ সব কটমট অর্থ লইবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সাধক নহেন এবং জীবনে সাধনার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। মাত্র আধ্যাত্মিক মার্গের সাধকেরাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন যে, আধ্যাত্মিক অর্থেরই পরম প্রয়োজনীয়তা আছে। বহিরার্থ মাত্র "পশুজন বঞ্চনায়ঃ" লিখিত। তন্ত্রের সাধনীয় অংশের অন্তরার্থ লইতেই হইবে, নচেৎ সাধনায় সার্থকতার স্থলে নিরর্থকতারই হা হুতাশ লইয়া পশুবৎ বিচরণ করিতে হইবে। মালাজপের ব্যবস্থায় তন্ত্র বচন আছে—"মাতৃযোনী পরিত্যজ্য সর্ব্বযোনী বিহারেচ।" মাতৃযোনী বলে মালার মেরুটিকে, যেটি লাল ফুল দিয়া উপরে থাকে; আর বাকী মালার এক একটি দানাকে যোনী বলা হয়। অন্য বচনে—"সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবা-রাত্র ন পূজয়েৎ।" অর্থাৎ যে সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বদাই অতীব অনুভবনীয় ভাবে চলিতেছে, তাহা ক্রিয়া দ্বারা বেশ প্রকাশমান হইলে তখনই দেবী পূজা করিবে। দিবা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায়, রাত্রি অর্থাৎ বাম নাসিকায় যখন শ্বাস বহে, তখন দেবীপূজা করিবে না; করিলে তাহা আদর্শ বজায় রাখা ছাড়া লক্ষ্যানুরূপ ফলপ্রদ হইবে না।

এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহার বিজ্ঞান বা যুক্তি কি—তাহা বুঝা (গুরু উপদেশে) তারপর সাধন করিয়া তাহার জ্ঞান বা অনুভূতি লাভ করা। নচেৎ বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়নে লাভ কি? মাত্র সময়ের অপব্যয়।

আমাদের শাস্ত্র-বুঝা, মানে আমাদের বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে যে মাপ পাইলাম, সেইটুকুই স্বীকার করা; আর বাকীটুকু নানান যুক্তি-তর্ক দিয়া অস্বীকার করা; অথবা তাহা সেকালের অল্পবুদ্ধি মুনি-ঋষিগণের গাঁজাখুরী কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া। যাক্ ওসব অন্য কথা। এখন যে কথা বলিব বলিয়া এই প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়া-ছিলাম, তাহাই কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি। সাধারণতঃ "সহজ" মানে যাহা অনায়াস-সাধ্য বা সুখ-সাধ্য; আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—(সহ+জন+ড), জন্মের সহিত যে ধর্ম্ম আসিয়াছে বা পাওয়া গিয়াছে এবং যে ধর্ম্ম সাধন করিতে সংসার বা ইহ-জগতের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ছাড়িতে হয় না, পুত্র-দারাদি ত্যাগ করিতে হয়না; সংসারে ও সমাজে থাকিয়াই অতি সহজেই যে কর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, যাহা সার্ব্বজনীন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিই করিতে পারে, যাহাতে কোনও রকম সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী নাই—আমি তাহাকেই 'সহজ-ধর্ম্ম' বলিতে চাই। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে তাই এই সহজ-কর্ম্মই করিতে আদেশ দিতেছেন।—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ,
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।"

—হে অর্জ্জুন, তুমি সহজ-কর্ম্ম করো। প্রথম প্রথম ঠিক-ভাবে করিতে না পারিলেও অর্থাৎ দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিও না; কারণ, সকল কাজের আরম্ভে দোষ হইবেই। অগ্নি জ্বালিবার পূর্ব্বে যেমন ধূম উদ্গীরণ হয়। এখানে তিনি সহজ "কর্ম্মের" কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "ধর্ম্মের" কথা বলেন নাই। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু "কর্ম্ম"ই ধর্ম্ম, আর "ধর্ম্ম"ই কর্ম্ম—কেননা, যাহা ধরিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম

---

* নিঃশব্দ, প্রাণ সংযম না হইলে নিসারঃ হওয়া যায় না।

† ব্রহ্মবিন্দু।

‡ জ্যোতিঃ, যাহার প্রভায় চোখ ধাঁধিয়া যায়।

(ধৃ+মন); এবং যাঁহাকে ধারণ করিয়া আমি, তুমি, তিনি এমন কি সারাবিশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং যিনি এই সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই অব্যয়-অক্ষয়-শাশ্বত ও প্রকৃত ধর্ম্ম এবং এই সৃষ্ট্যাদি কার্য করিতেছেন বলিয়া কর্ম্ম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, এই ধর্ম্মটি কি ?—ইহার উত্তরে যোগ-শাস্ত্র বলিতেছেন—তাহা একমাত্র প্রাণ।

"প্রাণোহি ভগবানীশ, প্রাণং বিষ্ণু পিতামহ,
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।"

সুতরাং প্রাণ বা শ্বাস-প্রশ্বাসই ধর্ম্ম এবং প্রাণ-ক্রিয়াই সর্ব্বকর্ম্মের মূল; সুতরাং কর্ম্ম। ইহাই জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাই সহজধর্ম্মও কর্ম্ম অর্থাৎ ইহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারই আচরণ করিতে হয়, আর ইহাকেই ধর্ম্মাচরণ বলে। এই প্রাণ নির্গুণ-নির্ব্বিকার; যাঁহাকে ঋষিরা ভগবান বলিয়াছেন তাঁহাকে প্রমাণ করা দুরূহ (প্রমাণাভাবাৎ [সাংখ্য]); কিন্তু এই প্রাণ, এই ভাগবতীধারা চিরপ্রামাণ্য, অর্থাৎ ইনিই আমার প্রকৃত আমি। ইনি না থাকিলে আমি কে বা কোথায় ? সৃষ্টিই বা কি ? যাক সে অনেক কথা। তবে সকলেরই ভাবিবার বিষয় কে, পূজা হয় কাহার ? প্রতিমার না প্রাণের ? প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই তো 'মূর্ত্তি' পূজার যোগ্যা হন। মৃণ্ময়ীকে প্রাণময়ী বা চিণ্ময়ী না ভাবিয়া পূজার সার্থকতা কি ? তাহাতো সংস্কারান্ধ বালকের পূজা! তাহাতো মাত্র গতানুগতিকতা! তবে তাহাতে একটা পুরুষানুক্রমিক চলমান ধারা বজায় রাখা যায় মাত্র। আজ যে পূজারী, সে না বুঝিলেও তাহার পরবর্ত্তী পুরুষ হয়তো এই করিয়াই সত্যের সন্ধানে উন্মুখ ও উদ্যোগী হইতে পারে। সুতরাং ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু এই মন্দের ভাল—এই গতানুগতিকতা—এই অন্ধ-সংস্কারের দাস হইয়া আর কতদিন চলিব ? যে মানব আত্ম-পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী বলিয়া জীব-শ্রেষ্ঠ, সেকি সেই শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য চেষ্টিত না হইয়া চিরকালই কি প্রকৃতির, ভাগ্যের ও কালের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবে ? না ভগবানের পক্ষপাতিত্বের দোষ দিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে ? যে মানব বিজ্ঞান-বুদ্ধিবলে ও পুরুষকারের শক্তিতে আজ কতশত অজানা, অচিন্ত্য বস্তুর উদ্ভাবক ও আবিষ্কর্ত্তা হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর-রূপে পরিচিত, সেকি না আজ নিজ পরিচয়ে অপরিচিত! যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া যায়—সেই প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি নিজ হৃদয়াস্থিত দেবতাকে জানিল না, জানিবার আকুতিও জাগিল না! যিনি হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে মুহূর্ত্তে সে "নাই" হইয়া যাইবে—সেই প্রাণদেবতার উপাসনা কি এতই কঠিন ? মোহিনী-মায়ার কি মহীয়সী শক্তি! মানব! তুমি এত জানিয়াও কিছুই জান না! কিন্তু কেন ? মায়া ? মায়া কি ? তোমার মন। মন কি ? কতকগুলি বাসনার সমষ্টি। বাসনা ত্যাগেই তো মনোনাশ! বাসনা ত্যাগ কিসে হয় ? অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। অভ্যাস কি ? যোগ অভ্যাস। যোগ কি ? প্রাণ কর্ম্মের কতকগুলি কৌশল (গুরুমুখী) মুখ্যতঃ প্রাণায়ামে। কেননা, "চলে বতে চলে চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।" সুতরাং বাসনা থাকিতে যেমন মনরূপ চিত্তপ্রবাহ থামে না, তেমনি বায়ু বা প্রাণসংযম না হইলে মনরূপ মহাশত্রু নিপাত হয় না। অতএব জীবনে শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ের প্রয়াসী যে কেহ হউক, প্রত্যেকেরই যোগ-জীবন লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বন্ধু

(নাটিকা)

প্রশান্ত চৌধুরী

দিল্লীর কুতুবমিনারের ঘোরানো সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে কথা কইতে কইতে উঠছিল দুই বন্ধু,—বিজয় এবং রমেশ

বিজয় : রমেশ ?—এই ?

রমেশ : (হাঁপাচ্ছে) কি বলছিস ?

বিজয় : এরিমধ্যে হাঁপিয়ে উঠলি ?—একটু পা চালিয়ে ওঠ্। এমন করে উঠলে কুতুবমিনারের চূড়োয় উঠতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

রমেশ : পা ভেরে গেছে ভাই বিজয়। আমি একটু আস্তে আস্তে চলি, তুই বরং····

বিজয় : এরই মধ্যে পা ভেরে গেল তোর ?

রমেশ : কদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে···

বিজয় : ইনফ্লুয়েঞ্জায় তো দুজনে একই সঙ্গে ভুগেছি। তুই তো আর বাড়তি কিছু ভুগিস্‌নি আমার চেয়ে।

রমেশ : সকলের শরীর তো আর সমান নয় ভাই।

বিজয় : শরীর বলিসনি ; বল্ শরীরের প্রতি মায়া। ওরে, শরীরকে অত তোয়াজ করিস্‌নি, পেয়ে বসবে।

রমেশ : কারা যেন ওপরে আসছেন।

বিজয় : দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়া।

উঠছেন একটি বয়স্কা ভদ্রমহিলা এবং এক যুবক, মাসী এবং বোন্‌পো

মাসী : (হাঁপাচ্ছেন) বাপ ! আর কতক্ষণ উঠতে হবে রে বাপু এমন করে ?

অবিনাশ : এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে মাসী ? এখনো তো আদ্দেক উঠিনি আমরা।

মাসী : কি ছাইয়ের স্তম্ভ যে গড়েছিল তোদের কুতুবুদ্দিন বাদ্‌শা !

অবিনাশ : মিনারটা যে সত্যি কার তৈরী, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু মাসী। কেউ বলে, এটা পৃথ্বিরাজের তৈরী—কুতুবুদ্দিন তারই ওপর দাগরাজি কোরে···

মাসী : তা' সে যেই করুক বাপু, এমন সরু উঁচু আর ঘোরানো সিঁড়ি করা বাপু মোটেই উচিত হয়নি। আর দেয়ালের মাঝে মাঝে আরো খানকতক ফোঁকর করলে ক্ষতিটা কি ছিল ছাই ? একটু আলো বাতাস লাগত প্রাণে।

অবিনাশ : কিন্তু মাসী···(বিজয় ও রমেশকে সিঁড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) আপনারা এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে ? নামছেন বুঝি ?

বিজয় : না। উঠছি। বন্ধুটির পা ভেরে গেছে তাই একটু···

অবিনাশ : আচ্ছা, ওপরে দেখা হবে তাহলে আবার।

বিজয় : নিশ্চয়ই।

অবিনাশ : এসো মাসী।

মাসী বোন্‌পো ওদের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন

রমেশ : বিজয়, আমি বলি কি, তুই বরং এগো। মিছি মিছি আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে গিয়ে তুই কেন কষ্ট পাস ? আমার সঙ্গে থেকে তুই কেন শুধু শুধু পিছিয়ে পড়বি ?

বিজয় : পিছিয়ে তো সবেতেই পড়ছি তোর কাছে। কুতুবে ওঠার ব্যাপারেই বা এগিয়ে গিয়ে লাভ কি ?

রমেশ : কাল থেকে তোর কথাগুলোর কেমন যেন দুটো করে অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে। কি হয়েছে বল্ তো তোর ?

বিজয় : কৈ ?

রমেশ : তবে পিছোনোর কথায় অমন হেঁয়ালী করলি কেন ?

বিজয় : পিছিয়ে কি সত্যিই পড়ছি না ?

রমেশ : বুঝলুম না।

বিজয় : সত্যিই বুঝলি না ?

রমেশ : তোর কথা কাল থেকে এমন ধারা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন বল্ তো ?

বিজয় : বাঁকা ?—(মৃদু হাসে) কুতুবের সিঁড়িটাই ঘোরানো কিনা, তাই বোধহয় আমার কথাগুলো

ঘোরালো হয়ে উঠছে। নৈলে কথাগুলো আমার নিতান্তই সোজা এবং স্পষ্ট। বুঝতে একটুও কষ্ট হবার নয়।

রমেশ : হয়তো। কিন্তু তবু বুঝতে পারছি না।

বিজয় : কাল সন্ধ্যেয় অঞ্জলিদের বাড়ী গেছলুম। শুনলুম, আমার আগেই তুই গিয়ে তাকে নতুন গান শুনিয়ে এসেছিস। কথাটা সত্যি নয় কি ?

রমেশ : হ্যাঁ।

বিজয় : কিন্তু কাল ফিরে এসে তোকে যখন জিজ্ঞেস করলুম, তুই সে কথাটা বলতে পারলি না আমাকে।

রমেশ : বলতে পারলুম না নয়—তোর শোনবার মত ধৈর্য্য ছিল না কাল। কিন্তু, তুই কি ঝগড়া করবার জন্যে কুতুবমিনারে ডেকে নিয়ে এলি আমায় ?

বিজয় : ঝগড়া ? পাগল হলি তুই ? ছেলেমানুষ নাকি যে, দুই বন্ধুতে ঝগড়া করব দাঁড়িয়ে ? তাহলে তুই আস্তে আস্তেই আয়, আমি ওপরে অপেক্ষা করছি তোর জন্যে।

সেই মাসি-বোনপো দু'তলার বারান্দায় এসে উঠলেন

অবিনাশ : এই—এই—এই, আর একটা সিঁড়ি—ব্যাস্। এই তো কেমন এসে পড়লে মাসী দু'তলার বারান্দায়।

মাসী : (ভীষণ হাঁপাচ্ছেন) হ্যাঁ, কেমন বৈকি !—আলাসনে বাপু, ডিবেটা থেকে পান দে দুটো—একটু বসি।

অবিনাশ : পান ? এই নাও মাসী।

মাসী : তোদের ঐ কুতুবুদ্দিনই বল্ আর পৃথ্বিরাজই বল্, মাংস ছিল না কারুর গায়ে এক ফোঁটা।

অবিনাশ : কেন গো মাসী ?

মাসী : আরে বাপু, আমার মতন গতর যদি হত, তাহলে কি আর এমন মাথা-ঘোরা সরকুট্টে সগ্‌গের সিঁড়ি করবার সাধ জাগত প্রাণে ?

অবিনাশ : তা' যা বলেছ মাসী। আরে! এই যে মশাই, এতক্ষণে উঠলেন ?

বিজয় এসে উঠেছে

বিজয় : আপনি ?

অবিনাশ : বাঃ! সেই যে আপনি আর একজন ভদ্রলোক সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি আর আমার ঐ মাসিমা···

মাসী : অবিনাশ, পান দে বাপু আর দুটো। আর জর্দার কৌটোটা।

অবিনাশ : এই নাও মাসী।—আপনার সঙ্গের সেই ভদ্রলোকটি ?

বিজয় : আমার বন্ধু।

অবিনাশ : তাঁর যে এখনো দেখা নেই ?

বিজয় : ও একটু ধীরস্থির মানুষ।

অবিনাশ : আপনারা থাকেন কোথায় ?—পান ?

বিজয় : না, পান খাই না, ধন্যবাদ। দিল্লীতেই থাকি। একই মেস্-এ একই ঘরে থাকি দুজনে। চাকরি করি। বুঝতেই পারছেন।

অবিনাশ : ছুটির দিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

বিজয় : হ্যাঁ—একটু সময় কাটানো আর কি।

অবিনাশ : আপনার নাম জিজ্ঞেস করতে পারি ?

বিজয় : স্বচ্ছন্দে।—বিজয় দাশগুপ্ত।—আপনার ?

মাসী : ও অবিনাশ, চুনের কৌটোটা কি তোর ব্যাগে আছে ?

অবিনাশ : এই নাও, ছুঁড়ে দিচ্ছি।—নাম তো শুনলেনই। পদবী সেনগুপ্ত। আপনার বন্ধুটির নাম ?

বিজয় : রমেশ। রমেশ সেন।

অবিনাশ : এখনো উঠলেন না উনি ?

বিজয় : বড্ড শরীর-শরীর বাতিক। একটু ঠাণ্ডা লাগল কি হজমের গোল হল—অমনি ডাক্তারের বাড়ী ছোটে। একটানা উঠলে পাছে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় একটু, পাছে ঘাম হয়—তাই জিরিয়ে জিরিয়ে উঠছে আর কি।

অবিনাশ : এক একজন অমন থাকেন। শরীরের ওপর ভীষণ মায়া। হাতের কাছে একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখবেন ? ঐ যে, আমার মাসীটি।

বিজয় : বন্ধুটি আমার ছুটির দিনগুলো স্রেফ্ গান লিখবে, না হয় সুর দেবে, না হয় ছবি আঁকবে। মানে ঘর থেকে আর বেরুবে না।—আসুন একটু বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়াই।

(দুজনে পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়)

অবিনাশ : পাঁচিলগুলো এমন বিপজ্জনক নিচু করেছিল কেন বলুন তো সে যুগের মিস্ত্রিরা ?

বিজয় : সত্যি, বড্ড নিচু।

গাইড্। এ-মাইজী, বারান্দাসে হাট্‌কে খাড়া হো যাইয়ে।

মাসী : কেন রে বাপু ? একটু হাওয়া খাচ্ছি…

গাইড্ : এ বারান্দা বহোৎ কম্‌জোরি মাঈজী। জাদা চাপ দেনে সে গির্ যা সেক্‌তা…

মাসী : ও বাবা! বলিস কি রে! ওরে, ও অবিনাশ, এ গাইড্‌টা বলে কি রে!

গাইড্ : সাচ্ বোলা মাঈ। পরশুরোজ এক জওয়ান আদ্‌মি ঐ উপর্ তল্লাসে একদম উলট্‌কে……

অবিনাশ : শুনছেন বিজয়বাবু ?

মাসী : কী যে অনাছিষ্টির স্তম্ভ গড়েছিল বাপু তোদের কুতুবুদ্দিন না পৃথ্বিরাজ! উঠতে দম বেরোয়—আবার বারান্দার ধারে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সরে দাঁড়া বাপু অবিনাশ। শুনছিস ?

অবিনাশ : সত্যি। সরে দাঁড়ান বিজয়বাবু।

বিজয় : দাঁড়াই।

অবিনাশ : সত্যি ডেন্‌জারাস্ জায়গা মশাই। একটু ঝুঁকে গেলেই…

বিজয় : হুঁ।

অবিনাশ : য়্যাক্‌সিডেন্ট্ তো যে কোন মুহূর্ত্তেই হতে পারে।

বিজয় : হুঁ।

অবিনাশ : গাইডের কথাটা শুনে নিচের দিকে তাকাতেই যেন ভয় করছে। কি বলেন ?

বিজয় : হুঁ—ভারী বিপজ্জনক! একটু অসতর্ক হলেই……

(এতক্ষণে রমেশ এসে ওঠে)

অবিনাশ : আরে, এই যে বিজয়বাবু, আপনার বন্ধু এসে গেছেন।

বিজয় : উঁহু হু,—রমেশ, বারান্দার অত কাছে নয়,—

অবিনাশ : পরশু একজন এখান থেকে উল্টে প(একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। জানেন না তো ?

মাসী : (কাছে এসে) আজকেই তো আর একট হতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ : সে কী মাসী ? কখন ?

মাসী : বাঃ, গাইড্‌টা না চেঁচালে আমিই তো ঐ জাফরি-কাটা পাঁচিলে যাচ্ছিলুম একটু ঠেস্ দিতে! নারায়ণ বাঁচিয়েছেন বাবা। আঃ! আর একটু সরে দাঁড়া না বাপু,—কাজ কি অত বাহাদুরীতে ? তোমরাও বাছা একটু সরে দাঁড়াতে পারছ না ? ও ছেলে ? ও ওধারের ছেলে ? কি নাম তোমার ?

রমেশ : আজ্ঞে রমেশ।

মাসী : একটু সরে দাঁড়াও না বাছা।

রমেশ : দাঁড়াই মাসীমা।

অবিনাশ : আবার দেখছেন কি মশাই ঝুঁকে ?—সরে দাড়ান।

রমেশ : দেখছি, নিচেটা কত নিচুতে।

বিজয় : খুব হয়েছে! দয়া করে একটু সরে দাড়াও। এখনি আবার মাথা ঘুরবে—আর ছুটবে ডাক্তারবাড়ী।

রমেশ : ঠাট্টা করছিস ?

বিজয় : ঠাট্টা মানে ? জানেন অবিনাশবাবু, সেবার আমাদের মেস্ থেকে তিনখানা বাড়ী তফাতে একটা মেসে লাগল কলেরা। ব্যাস্,—বন্ধুটি আমার চাকরিতে রিজাইন্ দিয়ে দেশে পালাবার জন্তে একেবারে…

রমেশ : (ম্লান হেসে) একটু বাড়িয়ে বলছিস বিজয়। রিজাইন্ নয়—ছুটি নিয়ে। জানেন আপনজন কেউ নেই তো আমার ছোটবেলা থেকে,—চিরকাল নিজেই নিজেকে সামলেছি—তাই শরীরের দিকে একটু—

মাসী। বেশ করেছ বাছা।—নিজের শরীরের যত্ন নিজে কর—তাতে কার কি ? সমোস্কিতে একটা কথা আছে না ? 'শরীরো 'বাদ্যম্; খেলে ধম্ম সাধনম্।'—খাবে, আর দামী বাদ্যি-বাজনার মতন শরীরটাকে সদা-সর্ব্বদা ঝেড়েপুঁছে যত্ন করে রাখবে। তাইতেই ধর্ম্মকর্ম্ম হবে। ঋষিদের কথা।—এস বাছা, জর্দ্দা দিয়ে একটা

রমেশ : মাসীমা, পান তো খাইনা—জর্দ্দাও নয়।

বিজয় : ওরে বাবা ; কাকে কি বলছেন মাসীমা ? জর্দ্দা খেলে মাথা ঘোরে, আর পান খেলে দাঁত নষ্ট হয়। দাঁত থেকে শরীর খারাপ হতে কতক্ষণ ?

রমেশ : আপনি যখন বলছেন মাসীমা—দিন একটা পান।

মাসী : না বাছা, খেওনা তুমি। কিন্তু এমন সন্দেশ-রসগোল্লা নয় যে, খেতে হবে।—হ্যাঁ বাছা,—কেউ নেই তোমার বলছিলে ?

রমেশ : কেউ নেই মাসীমা—শুধু ঐ বিজয় আছে। ও' আমাকে কথায় কথায় ঠাট্টা করে, খোঁচা দেয়, কিন্তু ভালবাসে ভীষণ। আমরা দুজনে দিল্লীর মেস্-এ একসঙ্গে এক রুমে আছি পাঁচবছর।

মাসী : এসো না বাবা এক দিন আমার বড়দির কোয়ার্টারে। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি আমি। আরো দিন সাতেক আছি। তুরুকমান রোডের ন-নম্বর কোয়াটার। যাবে তো বাবা এর মধ্যে এক দিন ?

রমেশ : নিশ্চয় যাব মাসীমা।

মাসী : তুমিও সঙ্গে যেও বাবা বিজয়, কেমন ?—অবিনাশ, এবার আমরা উঠি চ'।

অবিনাশ : উঠবে ?—এই তো, এই তো আমার মাসীর মতন কথা ! আর কতটুকু ? একটু কষ্ট করলেই একেবারে top.

মাসী : রেখে দে তোর top ;—এখন টপ্ করে নিচে চল দিকিন্।

অবিনাশ : নিচে !—আর এইটুকুর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত উঠবে না মাসিমা ?

মাসী : উঠে কি দুটো বাড়তি হাত গজাবে বাপু ? এই তো দেখলুম যথেষ্ট। নিচের মানুষগুলো সব এই এখান থেকে দেখাচ্ছে আরসোলার মতন ; ঐ ওপর থেকে না হয় পিঁপড়ের মতন দেখাবে ; এই তো ? গাইড্, বাবা আগে আগে চল তো, একটু জিরায়কে জিরায়কে নামি।

অবিনাশ : (অনুরোধ জানায়) মাসী—

মাসী : চল্ চল্।—তোমরাও বাছা নেমে এলেই ভাল করতে। এ সব্বনেশে জায়গায় থাকা কেন বাপু ? পরশুদিন যেখানে একটা অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে, মানুষ থাকে সে-জায়গায় ? সাতদিন না কাটলে এ-জায়গার দোষ কাটবে ভেবেছ ?—এ গাইড্, খাড়া হোকে কিয়া শুন্‌তা ? নাবো, নাবো।

অবিনাশ : চলি দাদারা। ভেবেছিলুম একসঙ্গে ওপরে উঠব, তা আর বরাতে হল না। আমরা নিচে চললুম—নিচেই থাকব কিন্তু আপনাদের জন্যে। এক-সঙ্গে ফেরা যাবে। চলো মাসী—

মাসী : রমেশ, যেও বাছা।

রমেশ : নিশ্চয়ই যাব মাসীমা।

(ওঁরা নেমে গেলেন।)

বিজয় : রমেশ ?

রমেশ : য়্যাঁ ?

বিজয় : ওঠবার সময় সিঁড়িতে যদি তখন তোকে আঘাত দিয়ে কিছু বলে ফেলে থাকি, ক্ষমা করিস ভাই।

রমেশ : আরে দুর্—ঐ নিয়ে আবার তুই এখনো ভাবছিস ?

বিজয় : ওপরে উঠবি নাকি ? না, এখান থেকেই নেমে যাবি নিচে ?

রমেশ : ভাবছি উঠব।

বিজয় : (হেসে) শরীরকে কিন্তু একটু কষ্ট দেওয়া হবে।

রমেশ : আবার ঠাট্টা ?

বিজয় : পাগল !

রমেশ : আকাশে কি রকম মেঘ করেছে দেখেছিস বিজয় ? এখনি বোধহয় ঝড় উঠবে।

বিজয় : (হাল্কা সুরে) তাতে আর যাই হোক্, কুতুবমিনারটা নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়বে না। অনেক দিন থেকে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে ও। ভয় নেই, ওপরে উঠলে আমরা কেউ উল্টে পড়ে মরব না। আমি চল্লুম। তুই আয় আস্তে আস্তে।

ওরা দুজনে উঠে গেল। মাসী-বোন্‌পো তখন নামছেন নিচের দিকে।

মাসী : অবিনাশ ?

অবিনাশ : কি মাসী ? হাত ধরব ?

মাসী : উঁহু।

অবিনাশ : পান দেব ডিবে থেকে ?

মাসী : ছেলেটি বেশ ; না রে ? ঐ যে ঐ রমেশ ?

অবিনাশ : হ্যাঁ। দুই বন্ধু ওঁরা। ভাল চাকরি করেন এখানে, এক মেস্-এ থাকেন। খুব বন্ধু।

মাসী : পদবী কি যেন ?

অবিনাশ : দাশগুপ্ত আর সেন। কেন ?

মাসী : মুখশ্রী বড় পরিষ্কার কিন্তু বাপু।

অবিনাশ : কার ?

মাসী : দুজনেরই। ওর মধ্যে ঐ রমেশের মুখটি আরো ভাল। কেমন যেন মায়া হয় দেখলে ; না রে ? আমাদের সুবালার মেয়েটার জন্যে দেখলে হয় ; কি বল্ ?

অবিনাশ : হ্যাঃ, তোমারও যেমন ! কুতুবে এসেও ঘটকালী।

মাসী : বাপের নাম ঠিকানাগুলোও তো কথার সাঁটে জেনে নিতে হয় বাপু।

অবিনাশ : চলো চলো, ভাল করে নিচের দিকে দেখে দেখে নামো। অন্ধকারে পড়ে-টড়ে যাবে। ঘটকালী করতে হয়, নিচে গিয়ে বসবে চল, ওঁরা নামলে চায়ের নেমন্তন্ন কোরো বরং বড়মাসীর ওখানে।

মাসী : তাই চ, নিচে গিয়ে বসি। তারপর ওরা নামলে আজই ওদের নেমন্তন্ন করা যাবে।

গাইড। হুঁশিয়ারীসে মাঈজী। ইধারকা এক সিঁড়িকা পাথর টুটা হ্যায়।

কুতুব মিনারের চুড়ো। বিজয় বেশ কিছুক্ষণ আগেই উঠেছে। আকাশের মেঘ আরো কুণ্ডলীকৃত হয়েছে। ঝড়ের হাওয়া সুরু হল বলে। বেশ খানিকটা পর রমেশ এসে উঠল।

বিজয় : এই যে রমেশ, আয় আয়, জলের বোতলটা দে আগে। জলের জন্যে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

রমেশ : এই নে। কতক্ষণ উঠেছিস রে ?

বিজয় : মিনিট পনোরোর কাছাকাছি।

রমেশ : আহা !—চমৎকার ! আকাশ একেবারে কালো হয়ে উঠেছে ! ওঃ ওপর থেকে কী চমৎকার দেখতে !—নিচে অশোকস্তম্ভটা ছাখ্, যেন ক্রিকেটের উইকেট্।

বিজয় : হুঁ।

রমেশ : এদিকে আয় না বিজয়,—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। পুরোনো ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ ওপর থেকে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ছাখ্।

বিজয় : তুমি ঐ ইন্দ্রপ্রস্থই ছাখো।—আমাকে দয় করে বাইনোকুলরটা দাওতো,—ওদিকে দাঁড়িয়ে নয় দিল্লীর চেহারাটা দেখি।

রমেশ : আমাদের পেছনে-ফেলে-আসা অতীত ঐশ্বর্য্যের চেয়ে তোর কাছে—

বিজয় : আজ্ঞে হ্যাঁ। অতীতের চেয়ে আমার কাছে বর্ত্তমানটাই বড়। দূরবীণ দে।

রমেশ : (হেসে) কিন্তু বর্ত্তমানটা তো কাছের জিনিষ। তার জন্যে দূরবীণ কি হবে ? অতীতটা দূরের তো অনেক, তাই দূরবীণটা আমারই বেশি দরকার নয় কি ?

বিজয় : অতীতটা যেমন দূরের, তেমনি অপ্রয়োজনেরও। বর্ত্তমানটা তো শুধু কাছের নয়, প্রয়োজনের। তার সঙ্গে দুবেলা ঘর করতে হয়। তাই তার চেহারাটা যথাসাধ্য স্পষ্ট করে দেখাই দরকার। অতীতটা একটু ধোঁয়া থাকলেও ক্ষতি হবে না ; বরং রহস্যময় হবে আরো। দূরবীণটা দে।

রমেশ : অগত্যা। (দূরবীণ প্রদান)

বিজয় : (দূরবীণ নিয়ে) ব্যাস্।—এবার তুমি দাঁড়াও ঐ ওদিকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে মুখ করে, আর আমি দাঁড়াই এই এদিকে নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া গেট্-এর দিকে দূরবীণ্ বাগিয়ে।—কেউ যদি এই কুতুবমিনারের ওপরে ওঠে, তাহলে আমাদের দেখে ভাবতেই পারবে না যে, আমরা দুই বন্ধু।

রমেশ : তবে কি শত্রু ভাববে ?

বিজয় : শত্রু না হোক্ :—বন্ধু তো নয়ই।

ঝড়ের হাওয়া উঠেছে। গায়ে লাগছে। হঠাৎ সেই হাওয়ায় কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল শুধু বিজয়েরই কানে,—"শত্রু নয়ই বা কেন ?"

বিজয় : (অস্ফুটে) কে ?

মন : আমি।—তোমার মন।

মন : ওদিকের ঐ প্রায়-অদৃশ্য দিক্‌চক্রে বিলীন মাঠের দিকে দুরবীণ ধরে কি দেখছ ?

বিজয় : এই···

মন : বাইনোকুলরে শুধু দূরের 'দৃশ্য'ই কাছে আসে ; চলে-যাওয়া দূরের ঘটনা তো কাছে আসে না।—তুমি চাইছ, এক বছর আগে লোদীপার্কের ধারে বারোয়ারী দুর্গাপূজার মেলার সেই ঘটনাটা দূরবীণের ভেতর দিয়ে যদি কাছে আসত······

ঝড়ের হাওয়ার শব্দ যেন মিলিয়ে গেল বিজয়ের কান থেকে। বর্তমান যেন ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গেই উড়ে গেল কোথায়। ভেসে এল অতীত। ভেসে এল ছমাস আগেকার ঢাক-ঢোলের শব্দ, ভেসে এল জন-কোলাহলের শব্দ।

ছ'মাস আগে। লোদীপার্কের দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেল। নাগরদোলা, খাবারের দোকান, স্টলের সারি, লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি অচেনা তরুণীকে পিছন থেকে ডাকলে বিজয়।

বিজয় : শুনুন ?—শুনছেন ?

অঞ্জলি : কে ?

বিজয় : আমি।

অঞ্জলি : আমাকে ?

বিজয় : যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আপনাকেই।

অঞ্জলি : কিন্তু—

বিজয় : আপনার ছোটভাইকে হারিয়েছেন কি মেলায় ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে—

বিজয় : ব্যস্ত হবেন না ;—তাকে পাওয়া গেছে।

অঞ্জলি : পাওয়া গেছে ?—ওঃ, আপনি বুঝি ভলান্‌টিয়ার ?

বিজয় : আজ্ঞে না, আগন্তুক দর্শক। আপনার ভাইটিকে কিন্তু ঐ ভলান্টিয়ারদের সামিয়ানার নিচেই রেখে এসেছি। চলুন।

অঞ্জলি : চলুন। কেমন করে জানলেন যে—

বিজয় : যে আপনারই ভাই হারিয়েছে ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ ?

বিজয় : আপনার ভাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে।

অঞ্জলি : ও, বুন্টু বলেছে বুঝি যে দিদি মুর্শিদাবাদী সিল্কের চাঁপা শাড়ী পরেছে—আর ভেলভেটের লাল ব্লাউজ ?

বিজয় : আরো কিছু বেশি।

অঞ্জলি : ও,—তাও বলেছে বুঝি যে, পায়ে বড়দির জরির চটি, আর খোঁপায় মার সোনার ফুলটা লাগিয়ে এসেছি ?

বিজয় : আরো কিছু।

অঞ্জলি : কি ছেলে মাগো !—বুন্টুরই নীলরং-এর ফুলকাটা রুমালটা আমার হাতে আছে, তাও বলেছে ?

বিজয় : আরো কিছু। অভয় দেন তো বলি।

অঞ্জলি : কি ?

বিজয়। বলেছে—দিদির মাথার চুল রেশমের মতন নরম, অমন চুল কারুর নেই। বলেছে—দিদির বড় বড় টানা টানা চোখের তারাগুলো সোনালী ; দিদি চোখে কখ্‌খনো কাজল দেয় না, তবু মনে হয় কাজল টেনেছে ; গায়ের রং চাঁপার মতন। বলেছে,—

অঞ্জলি : (কিঞ্চিৎ কঠিন কণ্ঠে) ধন্যবাদ।

বিজয় : ওঃ !—আচ্ছা—নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

অঞ্জলি : নমস্কার। (কিছুক্ষণ পর) শুনছেন শুনুন।

বিজয় : আমাকে ?

অঞ্জলি : হ্যাঁ।

বিজয় : কেন বলুন তো ?

অঞ্জলি : বাঃ, আমাদের বাড়ী যাবেন না ?—আমার ভাইকে খুঁজে দিলেন আপনি—বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে না দিলে ভীষণ বকুনি খেতে হবে যে বাবার কাছে।

বিজয় : কিন্তু—

অঞ্জলি : বাঃ রে !—সম্পূর্ণ ভুল বর্ণনা মিলিয়ে একেবারে ঠিক লোককে খুজে বের করতে পারেন যিনি—এমন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে না দিলে কখনো চলে ?

কথা কইতে কইতে ভলান্টিয়ার্স-ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে পড়ে ওরা। বুন্টু দেখতে পায় ওদের

বুন্টু : এই যে দিদি, এসেছো ?—আপনিই খুঁজে আনলেন তো দিদিকে ?

বিজয় : যে নিখুৎ বর্ণনা দিয়েছিলে 'তুমি—খুঁজে বের করতে কি আর অসুবিধে হয় ?

বুণ্টু : তবে ?—বলুন !

অঞ্জলি। তুই থাম বুণ্টু।

বুণ্টু : থাম মানে ? উনি কি শুধু তোমাকে খুঁজে এনেছেন ভেবেছ ? আমাকে পুরো এক প্যাকেট্ চকোলেট্ খাইয়েছেন।

অঞ্জলি : তাই নাকি ?—ওরে বাবা !—তবে তো আর কথাই নেই—আপনাকে তো তাহলে যেতেই হবে আমাদের বাড়ীতে। বুণ্টুকে আপনার চকোলেটের বদ্‌লা দেবার সুযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত আপনার। কি বল্ বুণ্টু ?

বুণ্টু : সিওর !

ওরা তিনজনে অঞ্জলিদের বাড়ীতে এসে পৌছয়। অঞ্জলির পিতা তখন ড্রইংরুমে বসে বই পড়ছিলেন এক মনে

অঞ্জলি : বাবা ?

পিতা : উঁ ?—ও: অঞ্জলি, এরই মধ্যে…ইনি ?

বিজয় : আমার নাম বিজয় দাশগুপ্ত।

অঞ্জলি : বুণ্টুটা হারিয়ে গিয়েছিল বাবা ভিড়ের মধ্যে—আমি তো ভেবেই সারা, এই ভদ্রলোকই খুঁজে বের করলেন ওকে।

বুণ্টু : আমাকে ? না তোকে ? তোকেই তো খুঁজে বের করলেন আমার বর্ণনা মিলিয়ে।

অঞ্জলি : চুপ কর্।

বুণ্টু : চুপ কর্ মানে ? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো ? কাকে খুঁজে বের করেছিলেন আপনি ভিড়ের ভেতর থেকে—আমাকে, না দিদিকে ?

পিতা : (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। আপনি বসুন।

বিজয় : আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। অনেক ছোট আমি।

বুণ্টু : বাবা, উনি না,আমাকে দু-প্যাকেট চকোলেট্ খাইয়েছেন।

পিতা : তা' তুমি তার বদলে এঁকে কফি খাওয়াও

বিজয় : আজ্ঞে, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ?

পিতা : (হেসে) তোমার খাতিরে আমিও পাব এক কাপ। নৈলে এরা দেয় না।

অঞ্জলি : আমি করে নিয়ে আসছি বাবা কফি।

বুণ্টু : তা বলে শুধুই কফি আনিসনি যেন দিদি।

মাস দেড়েক কেটে গেছে। অঞ্জলিদের বাড়ীর দরজায় একাকী দাঁড়িয়েছিল বুণ্টু। পিতা ক্লাব থেকে ফিরলেন

পিতা : বুণ্টুবাবু এমন একা একা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ? বিজয় কোথায় ? অঞ্জলি ?

বুণ্টু : জানি না।

পিতা : আজো বুঝি ওরা তোমাকে নিয়ে যায়নি বেড়াতে ?

বুণ্টু : গেলে তো নিয়ে যাবে। আমি যদি ওদের পিছু পিছু যেতুম, কী করতে পারত ওরা ? ইচ্ছে করেই যাইনি।

পিতা : (হেসে) তবে একা একা ওদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে কেন ?

বুণ্টু : এমনি।

পিতা : তাহলে এস ভেতরে, গল্প করি তোমাতে আমাতে।

বুণ্টু : তুমি পোশাক্ বদলে ফিরোও বাবা, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

পিতা চলিয়া গেলেন

কিছুক্ষণ পর—বেড়িয়ে ফিরল অঞ্জলি ও বিজয়

বুণ্টু : এই যে—এতক্ষণে ফেরা হল বুঝি তোমাদের দিদি ? বিজয়দা, বলে গেলেন সকাল সকাল ফিরে আজ ক্যারম খেলবেন আমার সঙ্গে ? খু-উ-উ-ব !

বিজয় : বেশ তো, চলোই না, এখনই সুরু হোক্ খেলা। আজ না হয় তোমার জন্যে রাত নটায় না ফিরে দশটায় ফিরব।

বুণ্টু : ভেরী গুড্ ! আসুন তাহলে আপনি। আমি সাজাতে চললুম বোর্ড।

বুণ্টু দৌড়ল

বিজয় : কী না ?

অঞ্জলি : তোমার আজ আর আমাদের বাড়ীর ভেতর যাওয়া চলবে না।

বিজয় : কেন ?

অঞ্জলি : তুমি এত ঘন ঘন এস না আর আমাদের বাড়ীতে।

বিজয় : কোন্ অপরাধে এ নিদারুণ নির্বাসন দণ্ড দেবী ?

অঞ্জলি : কাল, তুমি চলে যাবার পর, বাবা আর মা তোমার আর আমার—

বিজয় : ইজ্ ইট্ ? আন্দাজ কবে নাগাদ ? শুনলে নাকি কিছু ?

অঞ্জলি : জানি না, যাও। মোট কথা এবার একটু এ-বাড়ীতে তোমার আসাটা কমানো উচিত ; নৈলে দেখতে বড় কেমন কেমন হয়।

বিজয় : কমানো মানে ?

অঞ্জলি : সপ্তাহে দুদিন! বাকি ক'দিন—

বিজয় : শুধু তোমারি মিলন লাগিয়া, রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া ?

অঞ্জলি : না গো না—দশেরার মাঠে দেখা হবে।

মেসের ঘর। রমেশ একমনে কবিতা লিখছে। বিজয় ঢুকল

বিজয় : রমেশ, রমেশ, কি খাবি বল্ ?

রমেশ : (একমনে লিখতে লিখতে) একটু—

'দেখিনি তোমায় কোন দিন ওগো কন্যে
তবুও তোমার জন্যে
গান যে আমার গাঁথা হল সুরে সুরে।
তোমার চোখের···'

বিজয় : তোমার চোখের তারা দুটি কবিতা লেখার খাতা থেকে তুলে আমার দিকে ফেরাবে কি ?

রমেশ : (তেমনি তন্ময়) একটু—'দেখিনি তোমায় কোন দিন ওগো কন্যে—'

বিজয় : এদিকে আমি যে হলেম হন্যে ! কবিতা লেখা বন্ধ করে কথাটা আমার শুনবি রমেশ ?

রমেশ : (এতক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গে) ও বিজয় তুই ! বল্ বল্।

বিজয় : কোন ওজর আপত্তি চলবে না—কাল তোমাকে আমার সঙ্গে বিকেলে দশেরার মাঠে যেতেই হবে।

রমেশ : বেশ তো।

বিজয় : আর, সেখানে অঞ্জলির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করতেই হবে।

রমেশ : দ্যাখ্ বলছিলুম কি—

বিজয় : আচ্ছা, কী বলত তুই ? এত কিসের লজ্জা তোর বল্ তো ? অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ করতে কিসের লজ্জা তোর ? কবে থেকে বলছি—কেবলি এড়িয়ে যাচ্ছিস। কোন কথা নয়, কাল তুমি আমার সঙ্গে দশেরার মাঠে যাবেই—এবং অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ করবেই।

রমেশ : কাল ?

বিজয় : হ্যাঁ, কাল।—জানিস, তোর কত কথা বলেছি তার কাছে ?—তুই আমার, বলতে গেলে একমাত্র বন্ধু এই দিল্লীশহরে, অথচ যে-অঞ্জলি দুদিন বাদে আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে, আজো তোর সঙ্গে তার চাক্ষুষ আলাপটাও করিয়ে দিতে পারলুম না ! কী লজ্জার কথা বল্ তো আমার পক্ষে ?

রমেশ : বেশ—তুই যখন বলছিস—তাই হবে। কিন্তু—

বিজয় : কোন কিন্তু নেই।

দশেরার মাঠ

বিজয় : (কানে কানে) রমেশ, ঐ যে লাল শাড়ী, হলদে ব্লাউজ, এলোচুল হাওয়ায় উড়ছে—আসছে এদিকে ঘাড় নিচু করে ?—ঐ অঞ্জলি।

রমেশ : আহা, পেছনের ঐ বাঁকা দেবদারু গাছ—তার ওপর সাদা মেঘের টুকরো—নিচে সবুজ ঘাস—মাঝখানে টকটকে লাল শাড়ী—চমৎকার 'ছবি' হয়েছে !—চমৎকার !

বিজয় : অঞ্জলি-ই।—এই যে, আমরা এখানে।

রমেশ : (কানে কানে) এই বিজয়, শোন্। দ্যাখ্—রাগ করিসনি—বলছিলুম কি—আমার এখানে থাকাটা ঠিক।···

বিজয় : এই যে অঞ্জলি, আলাপ করিয়ে দিই আগে। এই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু রমেশ সেন, যার কথা তোমাকে কতবার বলেছি।

অঞ্জলি : নমস্কার।

রমেশ : নমস্কার।

বিজয়। আর ইনি হলেন শ্রীপ্রসাদরায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অঞ্জলি রায়, যাঁর কথা আমি তোকে কোনদিন বলিনি।

রমেশ : নমস্কার।

অঞ্জলি : নমস্কার।—আপনিই তো চমৎকার কবিতা লেখেন, সুন্দর ছবি আঁকেন, আর অদ্ভুত ঠুংরী গাইতে পারেন? বিজয় রোজ একবার করে বলে আপনার গানের কথা। শোনাবেন এক দিন? চলুন না, আজই? এই একটু এগিয়েই তো আমাদের বাড়ী। চলুন না, একটা ভাল গান শোনাবেন বেশ। গানের যে আমার কী ভীষণ শখ।—যাবেন?

রমেশ : (নার্ভাস) এ আর বেশি কথা কি?

বিজয় : (কানে কানে হেসে) কি রে?—অবাক করলি যে! তোর কান লাল হল না—ঘাড় চুলকোলি না···

অঞ্জলি : আবার ফিস্‌ফিস্ কি হচ্ছে?—রমেশবাবু তো রাজি হয়েছেন। বিজয় চলো। চলুন রমেশবাবু।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

এলওয়ালের মর্মবাণী

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে এক মহত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হল—এক নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে গেল মহিশূর থেকে নয় মাইল দূরবর্তী এলওয়াল নামক ক্ষুদ্র জনপদে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দশ বৎসর পর আবার এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা এক ছত্রছায়ায় সম্মিলিত হলেন, এক কর্মসূচি অনুসরণ করা সম্বন্ধে পূর্ণ সহমত জ্ঞাপন করলেন তাঁরা। বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এ অভিনব। আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মত জটিল ও বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে আর বোধ হয় কখনও দল, মত ও পথ নির্বিশেষে কোন দেশের জননায়করা এমনভাবে একমত হয়নি। হয়ত ভারতের ঐতিহ্যে এই অভিনব ঘটনার বীজ সুপ্ত ছিল—সমন্বয় দর্শন এদেশে এক জীবিত সত্য।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তেলেঙ্গানার এক গ্রামে গান্ধীশিষ্য বিনোবার মাধ্যমে ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছিল। ভূমিহীনদের যৎকিঞ্চিৎ ভূমি দান থেকে আরম্ভ করে কর্তব্যবোধে ভূমিহীনদের অধিকার—ষষ্ঠাংশ ভূমিদান এবং তারপর সম্পত্তিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান—অহিংসা সমাজ বিপ্লব বা আরোহণ ধাপে বিকশিত হতে লাগল। "সমাজায় ইদম্, ন মম", এই মন্ত্রের আধুনিক রূপকার বিনোবাজীর যাত্রাপথে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক ও সংশয়বাদীদের কণ্ঠ মুখর হতে থাকলেও গ্রামদান বা গ্রামের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি, শ্রম ও বুদ্ধিসম্পদের গ্রামীকরণের প্রেমময় প্রক্রিয়ার অদ্ভুত সাফল্য দৃষ্টে অবশেষে বিরোধীরাও ক্রমশ কাবু হলেন। গ্রামদানের ভিতর সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত ওয়ালে গত ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর বিনোবাজীর উপস্থিতিতে গ্রামদান পরিষদ আহ্বান করা হ'ল। দল ও মত নির্বিশেষে দেশের প্রায় চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় জনসেবক এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন। তখন পর্যন্ত সমগ্র ভারতে তিন হাজারেরও অধিক গ্রাম স্বেচ্ছায় ভূ-সম্পত্তি বিসর্জন করে প্রেমের পথে সাম্যযোগী সমাজ বা গ্রাম স্বরাজ স্থাপনা করার শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করে নিজ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার নবীন যাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমন্ত্রণ যাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর ভাই, প্রজাসমাজবাদী দলের চেয়ারম্যান শ্রীগঙ্গানারায়ণ সিংহ, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ডাঃ জেড. এ. আহমদ, গান্ধী-স্মারক নিধির সভাপতি শ্রীদিবাকর, গান্ধীজীর একান্ত সচিব শ্রীপ্যারেলাল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্নারায়ণজী, ভারত সরকারের কমিউনিটি প্রজেক্ট দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এস. কে. দে, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনী এবং বোম্বাই, মহিশূর, কেরল, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী যথাক্রমে সর্বশ্রী চ্যবন, নিজলিঙ্গাপ্পা, নাম্বুদ্রিপাদ, কামরাজ নাদার, ও হরেকৃষ্ণ মহতাব উপস্থিত ছিলেন। এঁদের ছাড়া আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং সর্বশ্রী ধীরেন্দ্র মজুমদার, আপ্পা সাহেব সহস্রবুদ্ধে, বল্লভ স্বামী, সিদ্ধরাজ চড্ডা, দাদা ধর্মাধিকারী, শঙ্কর রাও দেও ও আশা দেবী প্রমুখ

কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজয় ঘোষ সম্মেলনে যোগদান করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। বিমানের গোল-যোগের কারণে প্রজাসমাজবাদী দলের নেতা শ্রী অশোক মেহতা শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারেন নি।

আশা দেবীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর ২১শে দ্বিপ্রহরে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সর্ব সেবা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপস্থিত জননায়কবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতৃবৃন্দ যেমন জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনরূপী আদর্শাভিমুখে চালিত করিতেন, তেমনি গ্রামদানের মাধ্যমে সত্যকার স্বরাজ প্রাপ্তির লক্ষ্য-পথে দেশের সর্ব সাধারণকে নিয়ে এগিয়ে চলার কাজেও যেন তাঁরা অগ্রণী হন।

এর পর বিনোবাজী স্বভাবসিদ্ধ, সুললিত ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, "গান্ধীজী জীবিত থাকা কালীন আমি কোনদিন আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাইনি। ত্রিশ বৎসর কাতাই, বুনাই, গ্রাম শাফাই ইত্যাদি কার্য করেছি। কিন্তু গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেশের অবস্থা দেখে মনে হ'ল যে ভারতের এই পরিস্থিতিতে আর বসে থাকলে চলবে না, গান্ধীজপ্রদর্শিত পন্থা ভারতের জনজীবনে সফল করে তুলতে হবে। বাপুজীর মার্গের রূপায়ণ প্রসঙ্গে পাঞ্জাব, দিল্লী ইত্যাদি ঘুরে আমি উদ্বাস্তুদের সেবা করেছি এবং এই অন্বেষণা আমাকে তেলেঙ্গায় নিয়ে যায় ও পোচমপল্লী গ্রামে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এরই ইঙ্গিত আমি পেয়েছিলাম। এই মৌলিক বিশ্বাস আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে আপাত পরিদৃশ্যমান শতবিধ দোষ ত্রুটিসত্ত্বেও মানুষ মূলতঃ সৎ এবং তার অন্তঃস্থিত অন্তর্যামীকে জাগাবার কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করাই প্রধান কর্তব্য, পোচমপল্লীতে ভূমিহীনদের জন্য জমি চাওয়া মাত্র তা পেলাম এবং সেই দিনই স্থির করলাম যে দেশের ভূমি-হীনদের সমস্যার সমাধানের জন্য এইভাবে পাঁচ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ করব। আমি উপলব্ধি করলাম যে সকলের কাছে প্রেমের এই বাণী নিয়ে উপস্থিত না হলে তা অত্যন্ত কাপুরুষতার কাজ হবে। আমি জানি যিনি শিশুর জঠরে ক্ষুধা দিয়েছেন, তিনিই আবার মাতৃস্তন্যে দুগ্ধেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে আমি ভূমিহীনদের দুঃসহ ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজে প্রবৃত্ত হলাম। আমি প্রচার করা আরম্ভ করলাম যে বায়ু, জল ও সূর্য কিরণের মত ভূমিও ঈশ্বরের দান এবং তাই ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা ধর্মবিরুদ্ধ প্রথা। দেশবাসী একটু করে দেওয়া শুরু করলেন এবং অতঃপর ষষ্ঠাংশ চাইতে লাগলাম। আমার যুক্তি ছিল অতীব সরল। ঘরে যদি পাঁচটি ভাই থাকে, তবে দরিদ্র-নারায়ণের প্রতিনিধি স্বরূপ আমাকে আপনারা ষষ্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করে আমার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ দান করুন। আমি দেখলাম ভারতের মোট কৃষি-যোগ্য ভূমি ৩০ কোটি একরের ছয় ভাগের এক ভাগ ৫ কোটি একর ভূমি পেলে ভূমিহীনদের সমস্যার সমাধান হবে। আমার এই সহজ সরল আবেদন জনমানসে সাড়া জাগাতে লাগল। দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে এসে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে যেতে লাগলেন। এই পদযাত্রা দ্বারা ভূমিহীনদের সমস্যার যে খুব একটা সমাধান হয়েছিল, তা নয়। হিংসাপ্রপীড়িত এবং নিত্য বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে দিনাতিপাতকারী বিশ্বে গান্ধীজী প্রদর্শিত প্রেম ও অহিংসার বাণী বিমূর্তীকরণের এই অভিনব প্রক্রিয়াই সকলকে এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ছয় ভাগের একভাগ নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ কথাও প্রচার করতে লাগলাম যে ভূমির বর্তমান মালিক বাকী অংশের অছি হবেন। অছি দুইপ্রকারের—যাঁরা পিতা মাতার মত অছি তাঁরা নিজেরা কষ্টে থেকেও সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের অছিরা নাবালকদের শীঘ্রাতিশীঘ্র মানুষ করে তাদের হাতে সম্পত্তির অধিকার তুলে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমি দ্বিতীয় প্রকারের অছি হবার জন্য সকলকে আবেদন জানিয়ে বলতাম যে শেষ পর্যন্ত গ্রামদান বা গ্রাম থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার বিলোপই আমার লক্ষ্য। অবশেষে উত্তর-প্রদেশের হামিরপুর জেলায় মংরোথ গ্রাম সর্বপ্রথম এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ন করল।"

অতঃপর ভূদান আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "এক বৎসর তো আমি একাই কাজ করছিলাম এবং তারপর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্রবর্তিত গঠনমূলক কাজের সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অখিলভারত সর্বসেবাসঙ্ঘ এই আন্দোলনকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন। প্রত্যেক প্রদেশে প্রায় প্রতিটি জেলায় ভূদান সমিতি গঠিত হ'ল এবং গান্ধী স্মারক নিধির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে স্থানে স্থানে সর্বক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হ'ল। এর ফলে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও গান্ধীনিধির কাছ থেকে অর্থ নেওয়া আমার খুব মনোমত ছিল না। আমি অবশ্য মনে করি যে ভূদানের কাজে অর্থ দিয়ে গান্ধীনিধি তাঁদের অর্থের সদ্ব্যয়ই করেছেন। তবু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের ও নৈতিক অভ্যুত্থানের আন্দোলনে কোন রকম সংগঠন রচনা করা লক্ষ্যপূর্তির পথে বাধক হয় বলে আমি মনে করি। এ বিশ্বাস আমার আজকের নয়, গান্ধীজীর জীবিতাবস্থায় গান্ধী সেবা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমার এই অভিমত। যাই হোক, চার বৎসর এই ভাবে কাজ চলার পর এবং প্রায় ৪২ লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত ও প্রায় দুই হাজারের মত গ্রামদান পাবার পর আমার সহকর্মীরাও গান্ধীনিধির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনের মারফত আন্দোলন চালানর পরিবর্তে আন্দোলনকে জন-আধারিত করা অধিকতর কাম্য বলে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তদনুযায়ী আন্দোলন নিধি ও তন্ত্রমুক্ত হ'ল। এর ফলে কোন কোন প্রদেশে আন্দোলনের গতি মন্দ হলেও অন্য কোন কোন প্রদেশে আবার এ তীব্র রূপ ধারণ করল এবং সব মিলিয়ে আন্দোলনের নৈতিক স্তর ঊর্ধ্বগামী হ'ল ও কর্মীদের ভিতর দায়িত্ব, চেতনা এবং আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পেল।"

ভূদান থেকে গ্রামদান আরোহণের বিকাশ ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "ভূদানের মূল প্রেরণা ছিল করুণা এবং গ্রামদানের

প্রেরক শক্তি হচ্ছে করুণা-আধারিত সহযোগীতাবৃত্তি ও সমত্ববোধ। কারুণ্যরহিত কৃত্রিম সমতা কদাচ কল্যাণকারী হয়না। গান্ধীজীকে আমরা যেমন মহাত্মা আখ্যা দিয়েছি, মার্কসকেও আমি তেমনি "মহামুনি" বলে থাকি। আমার মতে বুদ্ধের পর এত বড় করুণাবতার আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তবে বুদ্ধের ভিতর গভীর বিধায়ক (Positive) করুণা ও আধ্যাত্মিকতা ছিল বলে আড়াই হাজার বৎসর পরও তাঁর বিচারধারা চির-নবীন এবং এমন কি এক অর্থে এতদিন পর আদর্শ যথাযথ বিমূর্ত হবার পথে চলেছে। কিন্তু ইউরোপের সমসাময়িক আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মার্কসের বিচারধারার উদ্ভব হয় বলে এর ভিতর আধ্যাত্মিকতার অভাব আছে; তবুও আমার মতে উভয়ের বিচারধারার মূল প্রেরণা অভিন্ন এবং এ হচ্ছে করুণা। এই জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট বন্ধুদের আমি বলি যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট ঐতিহ্যের কারণ—তাঁদের ইউরোপীয় কমিউনিস্টদের হুবহু নকল হলে চলবেনা, এ দেশে তাঁদের বিশিষ্ট চারিত্র্য-ধর্ম বিকশিত করতে হবে। এই সভায় উপস্থিত শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন আমি তাঁর জীবনী জানতে চেয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত প্রেমভরে উল্লেখ করেছিলেন যে বাল্যকালে তিনি বেদাধ্যয়ন করেন। তাহলে এই বেদ, উপনিষদ এবং দেশের জল-বায়ু ইত্যাদির প্রভাব কোথায় যাবে? কেবল কমিউনিস্ট নয়, এ দেশের খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সকলকেই তা প্রভাবিত করবে।"

ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, "বহুর মধ্যে এককে দেখা, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সম্প্রতি এই ভারতীয় সাধনার গতিপথে বিকারের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং তাই ধর্ম, জাতি, ভাষা এবং প্রদেশের পার্থক্য নিয়ে ভারত ভূমিতে বিভেদ ও হানাহানি মাথা তুলছে। এর উপর স্বাধীনতার পর নির্বাচনের ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতভেদের কারণে ভেদাসুরের বিকট ও মারাত্মক রূপের আবির্ভাব হয়েছে। এ দেশ থেকে ভেদভাব মিটাতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। তাই দেশে এমন কোন ন্যূনতম কার্যক্রম থাকা চাই, যার আধারে কংগ্রেস, প্রজাসমাজবাদী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি সকলে মিলিত হতে পারেন। আমার বিনম্র নিবেদন এই যে গ্রামদান সেই কার্যক্রম। তাই আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে আপনারা সম্মিলিতভাবে দেশবাসীকে এই কার্যে ভাগ নেবার জন্য অনুরোধ করুন। সকলের সহযোগীতায় এই ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর ভারতের মোট পাঁচলক্ষ গ্রামের ভিতর দুই লাখ গ্রামদান স্বরূপ পাওয়া বিশেষ কঠিন হবেনা। কারণ যেখানে গ্রামদান পাওয়া গেছে, সেখানকার লোকেরা দেবতা, গন্ধর্ব বা কিন্নর নয়, বা অন্যত্র যেখানে গ্রামদান হয়নি সেখানে দানব বা রাক্ষস নেই—সর্বত্র নরনারায়ণ বিরাজমান। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমি গ্রামদানের আবশ্যকতার উপর জোর দিই। প্রথমতঃ এর ভিতর যীশু-কথিত প্রতিবেশী সকল ধর্মের সার হচ্ছে এই শিক্ষা। আধুনিক ভাষায় এরই নাম "কো-অপারেশন" বা সহযোগীতা। দ্বিতীয়তঃ আজ যদি কোন বিশ্ব-যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ বানচাল হয়ে যাবে। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য আধারিত আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ভীষণ সঙ্কটে পড়বে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীদের মূল্যবৃদ্ধি-জনিত মহা দুর্দৈবের হাত থেকে কে বাঁচাবে? ১৫ বৎসর পূর্বে বাঙলায় দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী হিসাব মতে ত্রিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধের করাল ছত্রছায়ায় যে মহা-মন্বন্তর হবে, তার বলি আরও কতগুণ হবে? তাই বলছি যে এই বিপদা-শঙ্কার হাত থেকে প্রাণ পাবার পূর্বপ্রস্তুতি হচ্ছে গ্রামদান। আমার কাছে গ্রামদান তাই 'ডিফেন্স মেজার।'

অতঃপর গ্রামদানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, "গ্রামদানের অর্থ কেবল যাবতীয় ভূসম্পত্তির গ্রামীকরণ নয়। লোকে মনে করে যে এই পৃথিবীতে কিছুসংখ্যক হচ্ছে বিত্তবান (Haves), আর বাকী সকলে সর্বহারা (Have-nots)। এই শ্রেণী-বিভাজন ভ্রান্ত। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই জাতীয় ভ্রমাত্মক শ্রেণী-বিভাজন থাকতে পারেনা। কারণ কারও কাছে রয়েছে শ্রম-শক্তি এবং অপরের আছে বুদ্ধি। এ ছাড়া প্রেম তো সকলের হৃদয়েই আছে। নিঃস্ব বা সর্বহারা এ দুনিয়ায় কেউ নয়। এই সব সম্পদকে আমরা এখন কেবল আমাদের পরিবারের গণ্ডির মধ্যে কয়েদ করে রেখেছি। ডিফেন্স মেজারের অর্থ হচ্ছে এই যে ভূমি, সম্পত্তি, বুদ্ধি, শ্রম, ও প্রেম—অর্থাৎ সব কিছুকে গ্রাম সমাজের সেবায় উৎসর্গ করে দেওয়া। কিছু লোক দেবে এবং বাকী সকলে নেবে—এই একাঙ্গী আচরণ সর্বোদয়ের মত বিশ্বজনীন ধর্মনীতিতে খাপ খায় না। তাই সর্বোদয়ের বাণী হচ্ছে—সকলের সব কিছু গ্রাম-সমাজের কাছে সমর্পণ করা। এর পর গ্রামের কাঁচা মাল গ্রামেই উপভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য গ্রামে কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। গান্ধীবাদী বা বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী চালিত হয়ে আমি এ কথা বলছিনা। নিছক বাস্তববাদীর চোখ নিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় গ্রাম-স্বাবলম্বন ছাড়া নান্য পন্থা। অবশ্য কোন সঙ্কুচিত অর্থে স্বাবলম্বনের কথা ব্যবহার করা হচ্ছেনা। গ্রামে গ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে এবং প্রয়োজন হলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সমাজকে রাহু ও কেতুর মত দুই স্থায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে। এক দল কেবল মস্তিষ্ক চালনা করেন এবং অপর দলের দুই হাত ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ব্যতিরেকে পূর্ণ মানব সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই শিক্ষাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজ কৃষক বা শ্রমিকও উপবাসী থেকে নিজ সন্তানকে স্কুল কলেজে পাঠায়। এ জ্ঞানতৃষ্ণার লক্ষণ নয়—শ্রম থেকে বাঁচার আগ্রহ। এ ভাবে শ্রম পরিহার করে শান্তি টিকে থাকতে পারেনা।

জ্ঞান কাপড়ের টানা-পোড়েনের মত একরূপ হয়ে গেছে। অতএব গ্রামদানের ভিতর তিনটি বিষয় অন্তর্নিহিত—যাবতীয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ, কুটীর শিল্পের বিকাশ এবং বর্তমান শিক্ষার পরিবর্তে নঈ-তালিম প্রবর্তন।"

গ্রামদানী গ্রামের পুনর্গঠন কোন্ পদ্ধতিতে হবে? এই বিতর্ক বিষয়ে সকলের আশঙ্কা নিরসন করে বিনোবাজী বলেছেন, "উপনিষদে বলেছে 'অন্নং বহুকুর্বীত'—অর্থাৎ অন্নের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি কর। জমি ছোট ছোট টুকরায় চাষ হবে কি না, কোন্ ধরণের সার ব্যবহার করা হবে, কৃষি কার্যের জন্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে কি না—এ সব নিয়ে মতভেদ হবার কোন কারণ নেই। এ সমস্তার সমাধান প্রসঙ্গে উপনিষদ বলেছেন যে, যে পদ্ধতিতে অধিকতম শস্ত উৎপাদিত হবে, তা-ই অনুসরণ করতে হবে। অতএব গ্রামদানী গ্রামে অন্ন ও অন্যবিধ সম্পদ বৃদ্ধি করার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে বলে আমি মনে করিনা। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের অভিজ্ঞতার ফলে সমৃদ্ধ হবে। সর্বোদয়ে কোন রকম গোঁড়ামীর স্থান নেই। আমি বার বার বলেছি যে আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় না ঘটলে পৃথিবীর উদ্ধার নেই। আত্মজ্ঞান অহিংসা শিক্ষা দেবে এবং বিজ্ঞান ভৌতিক শক্তির সদ্ব্যবহার শেখাবে। বিজ্ঞানের অধিকতর বিকাশের জন্তই একে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। নচেৎ হিংসার সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করলে তার পরিণাম যে কী ভীষণ হবে, তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। সর্বোদয় মোটেই বিজ্ঞান-বিরোধী নয়, বরং সর্বোদয় অত্যধিক মাত্রায় বিজ্ঞানপ্রেমী বলে বিজ্ঞানের সংরক্ষণার্থ অহিংসার উপর জোর দেয়। তাই আমরা কোন রকম যন্ত্র বিরোধী নই। তবে এ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে যন্ত্র যেন সকলের কল্যাণকর হয় এবং জনগণের কোন অনিচ্ছুক অংশের প্রতি তা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়।"

বিনোবাজী তাঁর বক্তৃতার উপসংহার করলেন এক মর্মস্পর্শী আবেদন দিয়ে। এই সম্মেলনের প্রতি দেশবাসী কত আশা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তার উল্লেখ করে তিনি বললেন—"এই বহুধা-বিভক্ত দেশ এক সূত্রে গ্রথিত হোক—এই আমার জীবনের একমাত্র কামনা। কিছু দিন পূর্বে কমিউনিটি প্রজেক্ট বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি দুঃখ করে বললেন যে দেশে আজ কমিউনিটিই নেই, তো তার প্রজেক্ট সফল হবে কি করে? শ্রীযুক্ত দের মন্তব্য নগ্ন সত্য। উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে আমি বিনম্রভাবে নিবেদন করতে চাই যে গ্রামদানের ফলে এই কমিউনিটি বা সমাজ চেতনার সূত্রপাত হয় এবং তাই দেশকে দৃঢ় সংবদ্ধভাবে একরূপ করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গ্রামদান। আজ থেকে আটাশ বৎসর পূর্বে রাবী নদীর তীরে সমগ্র রাষ্ট্র যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে, তার অটুট শক্তিতেই দেশ আরও আঠার বৎসর তপশ্চর্যা করে স্বাধীনতা অর্জন করে। আজ আবার আপনারা এইখানে গ্রামদানের জাতীয় সঙ্কল্প গ্রহণ করুন এবং দেশবাসীকে নূতন ভারত গড়ার পথ নির্দেশ করুন, এই আমার ঐকান্তিক মিনতি।"

এর পর জহরলালজী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে উঠলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিনোবাজীর বক্তৃতায় তাঁর ভিতর গান্ধীজীর প্রভাব জাগরিত হয়ে উঠেছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে গ্রামদানে তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে এবং একে সফল করার জন্ত সর্ব-প্রকারে সহায়তা করতে হবে। তারপর সরকারের কর্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, "সরকার বা সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে গ্রামদান সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বা এ রকম করা উচিতও হবেনা। কারণ তাতে জনসাধারণের উপর চাপ পড়বে এবং এটা এ আন্দোলনের আদর্শের প্রতিকূল। তবে সরকার তার নিজের পদ্ধতিতে এ কার্যে সহায়তা করতে পারেন। অনুকূল আইন করে এবং গ্রামদানী গ্রামের পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা দিয়ে সরকার নিজ কর্তব্য পালন করবে। ভারতের সমস্যা পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে পৃথক। এখানে জমির উপর চাপ খুব বেশী। মাথা পিছু এক একরের ও কম জমি। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে কৃষি করলে এক একরে দশ বার ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করলেও দু মুঠা অন্নের সংস্থান করা দুরূহ ব্যাপার। সমস্যার সমাধান হচ্ছে সমবায়মূলক কৃষি এবং গ্রামদানে এরই সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে সমবায়ের ইউনিট যেন এত বড় না হয়, যার ফলে তা ব্যক্তিগত সম্পর্ক রহিত ইম্‌পার্সোনাল ব্যাপারে পরিণত হয়। একটি বা দুটি গ্রাম নিয়ে একটি বড় পরিবারের মত সমবায়ভিত্তিক কৃষি ফার্ম করা যেতে পারে। এতে প্রত্যেকের ভিতর পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বজায় থাকবে। তা ছাড়া সমবায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এ সব গ্রামদানের ভিতর দিয়ে হওয়া সম্ভব। এর পর জমির উপর থেকে চাপ কমাবার জন্ম কুটিরশিল্প, ছোট ছোট কারখানা এবং প্রয়োজন মত বৃহৎ যন্ত্রোদ্যোগও চালাতে হবে। আগামী সাত বৎসরের মধ্যে ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামকে কমিউনিটি প্রজেক্টের আওতায় আনা হবে। তাই গ্রামদানের সঙ্গে কমিউনিটি প্রজেক্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত।"

জহরলালজীর পর কংগ্রেস সভাপতি ধেবর ভাই গ্রামদানের কার্যক্রমের প্রতি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বললেন, "গ্রামদানের ফলে দেশে এক অতীব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর দেশের পুনর্গঠনের জন্ত উচ্চ শ্রেণীর কর্মী সৃষ্টি করার উপর আমাদের সকলকে জোর দিতে হবে। কারণ নূতন মানুষ ছাড়া নব সমাজ নির্মাণ সম্ভবপর নয়।" কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্ত ডাঃ জেড, এ, আহমদ বললেন, "এক মাত্র গ্রামদানেই সকল সমস্তার সমাধান হবে বলে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস না করলেও আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এর ফলে জনসাধারণের নৈতিক উত্থান হবে এবং যে কোন প্রগতিশীল কর্মসূচির রূপায়নের জন্ম এ অত্যাবশ্যক। কমিউনিস্ট হয়েও আমি এ কথা বলছি বলে আপনারা যেন বিস্মিত না হন। যাই হোক যদি গ্রামদানের স্বেচ্ছামূলক ও হৃদয় পরিবর্তন আধারিত পদ্ধতি দ্বারা দেশের ভূমি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে কমিউনিস্টরা এ আন্দোলনকে সাধুবাদ দেবে। আমি তাই এ আন্দোলনের সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি

ছে। আমি বিশেষতঃ এই কারণে সন্তুষ্ট যে, জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধানের পন্থা আবিষ্কারের জন্য সর্বসেবাসঙ্ঘ বিভিন্ন বিচারধারার লোকদের এক প্ল্যাটফর্মে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আশা করি যে ভবিষ্যতেও এ রকম সুযোগ পাওয়া যাবে।" প্রজা সমাজবাদী দলের চেয়ারম্যান শ্রীগঙ্গাশরণ সিংহও গ্রামদানের কর্মসূচিকে আন্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা দেন। অতঃপর এই কর্মসূচিকে কিভাবে রূপায়িত করার পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং গুলজারিলাল নন্দ, পণ্ডিত পন্থ, শ্রী দে ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পরদিবস আলোচনার শেষে পরিষদের তরফ থেকে এক সর্বসম্মত বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতবাসীদের গ্রামদান আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে আহ্বান জানান হয়। উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই জাতীয় কার্য্য সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়:

"সর্ব সেবা সঙ্ঘের আমন্ত্রণক্রমে মহিশূর রাজ্যের এলওয়াল নামক জনপদে ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর গ্রামদান পরিষদের বৈঠক হয়। রাষ্ট্রপতিও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এতে যোগদান করেন।

সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাবলী এবং বিশেষতঃ ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য আচার্য বিনোবা কি ভাবে এই অহিংস পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা তিনি পরিষদের নিকট জ্ঞাপন করেন। ভূমিদানে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এর বিকাশ হতে হতে আজ গ্রামদানের স্থিতি অর্থাৎ সমগ্র গ্রামকে গ্রাম পরিবারের হাতে সমর্পণ করার অবস্থা এসে পড়ে। তিন হাজারেরও অধিক গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ নিজেদের সকল ভূ-সম্পত্তি স্বেচ্ছায় গ্রাম-পরিবারের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

পরিষদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ গ্রামদান আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেন এবং এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রশংসা করেন। গ্রামদানের ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহে সমবায়-মূলক জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টার পূর্ণ বিকাশ হবে এবং তত্রস্থ জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বহুমুখী বিকাশ সংসাধিত হবে। এতদ্ব্যতিরেকে এর পরিণামে সমগ্র ভারতে ভূমি সমস্যা সমাধানের অনুকূল মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়মূলক জীবনযাত্রা বিকশিত হবে। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অহিংসাত্মক পদ্ধতি এবং ঐচ্ছিক স্বরূপ। এই ভাবে নৈতিক মার্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আর্থিক উন্নতির সমন্বয় ঘটেছে এবং সহযোগীতা ও স্বাবলম্বী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের সূত্রপাত হয়ে গেছে। তাই এই আন্দোলন সর্ব প্রকারের সহায়তা ও প্রোৎসাহ পাবার অধিকারী।

পরিষদে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীবর্গ গ্রামদান আন্দোলনের প্রশংসা করেন ও একে সহায়তা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন যে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহকে নিজ নিজ ভূমি সংস্কার সম্বন্ধীয় পরি- [illegible] সর্ব স্তরে সমবায়মূলক পদ্ধতির প্রবর্তন হবে তাঁদের ভূমি সংস্কার নীতির মূল সূত্র। সরকারের এই সব পরিকল্পনা গ্রামদানের বিরোধী নয়, পক্ষান্তরে এর সহায়ক বলে সিদ্ধ হবে। তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে সরকারের কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট পরিকল্পনা ও গ্রামদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগীতা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিষদ তার দুই দিবসব্যাপী অধিবেশনের শেষে বিনোবাজীর আন্দোলন এবং অহিংসাত্মক ও সমবায়মূলক উপায় দ্বারা জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে তাঁর প্রযত্নের ভূরি ভূরি প্রশংসাকরতঃ ভারতের সর্ব শ্রেণীর জনতাকে সোৎসাহে এই আন্দোলনকে সমর্থন করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।"

পরিষদের সমাপ্তি লগ্নে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশীর্বাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে বলেন, যে গ্রামদান এক নবীন সমাজ রচনার আদর্শাভিমুখে দেশকে নিয়ে যাবে এবং তাই তিনি একে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দেন। তিনি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দেন যে আন্দোলন সরকারী সাহায্য নিলেও যেন তার স্বাবলম্বী চরিত্র-ধর্ম বজায় রাখে। কারণ অস্বদল-নিরপেক্ষতাই এ আন্দোলনের প্রাণ। সর্বশেষে দুই মিনিট মৌন প্রার্থনা করে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

গ্রামদান পরিষদের ফলশ্রুতি কি? এ আন্দোলনের প্রবর্তক বিনোবাজীর ভাষায় "পরিষদ দেশের সম্মুখে যুক্ত বিবৃতিরূপী এক সংহিতা উপস্থাপিত করেছে। সংহিতার দুটি শব্দ আমাদের কাছে দ্বিবিধ আশীর্বাদ স্বরূপ। এতে বলা হয়েছে যে বিনোবা সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যে অহিংসাত্মক এবং সমবায়মূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।......অহিংসাত্মক পদ্ধতি আত্মার একতার অনুভূতির উপর আধারিত। তাই এ এক আধ্যাত্মিক বিচারধারা। আর সমবায়মূলক পদ্ধতি বিজ্ঞান-নির্ভর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নেতৃবৃন্দ এ কথা উপলব্ধি করেছেন যে সর্বোদয়ে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক—এই উভয়বিধ বিচার ধারার সংযোগ সাধিত হয়েছে।......সর্বোদয়ের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিলনা; কিন্তু এর ভিতর বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এবার উভয়বিধ বিষয় সম্বন্ধেই সকলে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, আর আমরা তাই দ্বিবিধ আশীর্বাদ লাভ করেছি।" পরিষদের পরদিবস মহিশূর সহরে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে "গ্রামদানকে তাঁরা তাঁদের পার্টির ভূমি সংস্কার পরিকল্পনার এক সুসঙ্গত বিকল্প যোজন বলে স্বীকার করেন।" মার্কসবাদীদের মনে ও আর গ্রামদান সম্বন্ধে কোন বিরোধীতা নেই, বা এর সার্থকতা সম্বন্ধে কোন রকম দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ নেই।

আপাত প্রাপ্তির হিসাব খতিয়ে গ্রামদান পরিষদের সাফল্য পরিমাপ করা সঙ্গত হলেও ক্রমশঃ যত দিন যাবে এলওয়ালের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই ভারতীয় জন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিমূর্ত হয়ে নব ভারত গঠনের কঠিন [illegible] পারস্পরিক সহযোগীতা ও সম্মিলিত

প্রভাবে ভারত আবার জগত সভায় এক গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত হবে। বিপ্লব রূপায়নের পন্থায় বিপ্লব সংশোধিত করে, 'এক মানবীয় ক্রান্তির রূপায়ন করে বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ভারত হিংসাজর্জরিত বিশ্বকে আবার নূতন করে প্রেম ও অহিংসার পথ দেখাবে। নিপীড়িত মানবাত্মা ভারতের এই প্রয়োগের ভিতর আবার শান্তির মার্গ খুঁজে পাবে। বস্তুতঃ জওহরলালজীর কণ্ঠে গত ২৩শে সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদের এক জন সভায় যেন ভারতাত্মার এই শাশ্বত বাণীই মুখরিত হয়ে উঠেছিল। গ্রামদান ও বিনোবাজী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "বিনোবাজীর কর্ম পদ্ধতিকে আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা বিদ্রূপ করতে পারেন এবং অর্থশাস্ত্রীরা এর নানাবিধ বিরূপ সমালোচনা করতে পারেন; কিন্তু চেতনাত্মার মূর্ত প্রতীক ভারতীয় জনগণের ভিতর পরিভ্রমণকারী এই কৃশকায় মানুষটি দেশে এক অভূতপূর্ব এবং কার্যকরী পরিবর্তন সংশাধন করছেন। গ্রামদান আর এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এক দল কর্মীর আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—ভারতীয় পটভূমিকায় এর মূল দৃঢ়সংবদ্ধ। গ্রামদান বিনোবাজীরই মত ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট সাধনার অভিব্যক্তি। আমি আশা করি যে জনজীবনের সুউচ্চ কলরব ও শতবিধ ধুয়ার মধ্যেও বিনোবাজীর শান্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অধিক থেকে অধিকতর লোকের কর্ণে প্রবেশ করবে এবং তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে রাজনীতিকদের মাপকাঠি ছাড়াও অন্যবিধ মানদণ্ড এই পৃথিবীতে আছে। বিনোবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে বুঝতে পারা যায় যে ক্ষীণ দেহের ভিতরও আত্মার বিজয় বার্তা কেমন প্রকট রূপে ঘোষিত হচ্ছে! চারিত্র শক্তি ও আত্মিক বলের সুদৃঢ় বনিয়াদ ব্যতিরেকে কোন জাতির বিকাশ অচিন্তনীয় ব্যাপার। এই দ্বিবিধ শক্তির আকর বিনোবাজী অতীব প্রশংসনীয় নম্রতা এবং সেবাপরায়ণতা চালিত হয়ে তাঁর রোগজীর্ণ শরীর সত্ত্বেও ভারতীয় জনসাধারণের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহাত্মা গান্ধীর ভিতর ও আমরা আত্মিক শক্তির এই জয় প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর মহান এবং সর্বব্যাপী আত্মশক্তি পরমাণবিক বোমার চেয়ে বহুগুণ বলশালী ছিল। আমি আশা করি যে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে অন্যান্য দেশেও বিনোবাজীর মত সাধু সন্তের আবির্ভাব হবে; কারণ এক মাত্র এই জাতীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান সভ্যতার জটিল ব্যাধিসমূহের নিরাকরণে ও সুসঙ্গত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। আজ যে সভ্যতার বাহ্য রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান, বিনোবাজীর চৈতন্যশক্তি এবং তাঁর কর্মধারা এ সকলের বহু উর্ধ্বে। এই জাতীয় চেতনার অভাবে যুদ্ধ ও ধ্বংসের সম্ভাবনা বর্তমান। যুগের এই সভ্যতার মারাত্মক ব্যাধিকে এই জাতীয় চৈতন্য ও আত্মিক শক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে হবে।"

দেবভূমি খাজুরাহো

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে
জনশূন্য পুণ্যবীথি, উর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য'পরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা॥

সন্ধ্যার রক্তিম আলোকে খাজুরাহোর মহাদেব-মন্দিরের চত্বরে বসে স্বপ্ন দেখছিলাম। অস্তগামী সূর্যের ম্লান অঙ্গুলীগুলি তখন দূরের ও নিকটের মন্দিরগুলির চূড়ায় চূড়ায় পুরবী রাগিণী বাজিয়ে চলেছে। শিবসাগরের পদ্মগুলির উপর ধূসর ছায়া ঘনিয়ে এলো। মন্দিরে মন্দিরে শত শত শঙ্খ-ঘন্টা বেজে উঠলো। সহস্রদীপের আলোকে মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণ জ্বলে উঠলো। পূজার অর্ঘ্য হাতে নরনারীর দল এসে ভিড় করলো মন্দির প্রাঙ্গণে। ধূপের ধোঁয়ায় ও পুষ্পগন্ধে সন্ধ্যার-বাতাস উতলা হ'য়ে উঠলো। দেবতার জয়ধ্বনি অন্ধকার ভেদ ক'রে উর্ধ্বে আকাশকে স্পর্শ করলো। কিন্তু এ হলো স্বপ্ন! এক হাজার বছর আগে এ স্বপ্ন সত্য ছিল। আজ মহাদেব-জগদম্বা-চিত্রগুপ্ত-বিশ্বনাথ সব মন্দির নিঃসীম নীরবতার মধ্যে দণ্ডায়মান। চিরমৌন পাষাণের মধ্যে আজ দেবতার জাগ্রত মহিমা সমাহিত হ'য়ে রয়েছে। বনের পাখী এখন তাঁদের আরতি জানায়। ম্লান জোনাকীর আলো এখন প্রদীপ হ'য়ে জ্বলতে থাকে। শিবসাগরে এখন পদ্মগুলি ফুটে উঠে দেবতার চরণে আর স্থান পায় না, তাদের ব্যর্থ পাপড়িগুলি ম্লান হ'য়ে ঝ'রে পড়তে থাকে। এমনি ভাবে মহাকালের অমোঘ বিধানে সব কর্ম, সব ভাবনার পাপড়ি বুঝি ঝ'রে পড়ে। কিন্তু তবুও মন্দিরগুলি হাজার বছর ধ'রে মহাকালের বিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে বেঁচে রয়েছে। তারা বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে।

আগ্রা থেকে খাজুরাহোর পথে যাবার সময় মানুষের এই চিরন্তন স্বপ্ন ও সাধনার কথাই ভাবছিলাম। আগ্রায় মোগল আমলের স্থাপত্য ও চিত্রকলার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে বিলাস-ব্যসন ও স্বমহিমা ঘোষণার উদ্দেশ্যই যেন পরিস্ফুট। কিন্তু যে সৌন্দর্যের মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি ও কল্যাণের আদর্শই জাগ্রত তার সন্ধান পেয়েছিলেন বোধ হয় প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ। সেজন্য হিন্দুর প্রাচীন কীর্তিকলার যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাই ছড়ানো রয়েছে মন্দির, দেবস্থান ও তীর্থক্ষেত্রে। খাজুরাহোর মন্দিরের খ্যাতি

শুনেছিলাম, অনেকদিন থেকে সেখানে যাবারও ইচ্ছা ছিল। এবার সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হলো।

মাদ্রাজ এক্সপ্রেস যখন ঝাঁসি ষ্টেশনে পৌঁছল তখন রাত প্রায় বারটা। সেকেণ্ডক্লাস ওয়েটিং রুমে মালপত্র রেখে কিছু খাবার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরলাম, কিন্তু অত রাত্রে কি মিলবে? অতি কষ্টে শুকনো পাঁউরুটি একখানি চিবিয়ে রাতের খাওয়া সমাধা করলাম। ওয়েটিং রুমে খাজুরাহোর মন্দিরের কয়েকখানি ছবি ছিল, সেজন্য মশা ও ছারপোকার উৎপাত থাকলেও মন তখন খাজুরাহোর স্বপ্নে বিভোর। পরদিন ভোরে মাণিকপুরগামী ট্রেণে আবার রওনা হলাম। বন্ধুর রাঙামাটির প্রান্তরের উপর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলল। চারদিকে শস্যহীন, লোকালয়হীন শূন্যতা। দূরে আকাশের গায়ে উঁচু নীচু পাহাড়ের তরঙ্গ। মাঝে মাঝে দু'একটি নদী পড়ছে। কিন্তু সেগুলি নিরবচ্ছিন্ন নদী নয়, তাদের মাঝে নানা রকমের গাছ ও বৃহৎ শিলাখণ্ডও রয়েছে। আশে পাশে প্রকৃতির এক অসচরাচর দৃষ্ট নয়নাভিরাম রূপ চোখে পড়লো। ট্রেণ লাইনের পাশে ছোট ছোট গাছের ঝোপে কয়েকটি

শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ মন্দির—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

ময়ূরও এক জায়গায় দেখতে পেলাম। হরপালপুরে গাড়ি যখন পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দশটা। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ যেতে হবে মোটর বাসে। নওগাঁ, ছতরপুর প্রভৃতি হয়ে যখন খাজুরাহোর এলাকায় বাস পৌঁছল তখন—

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

খাজুরাহোতে ঢুকতেই শিবসাগরের এক রাশ পদ্মফুলের রঙীন হাসিতে পথের ক্লান্তি ও অবসাদ সব জুড়িয়ে গেল। মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় তখন অস্তরাগের সোনালী স্বপ্ন লেগেছে। গাছে গাছে পাখীর মিলিত কাকলী অপরাহ্নের নিস্তব্ধ পরিবেশকে মুখরিত ক'রে তুলছে। মুগ্ধ মন থেকে বেরিয়ে এল—'এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।'

খাজুরাহোতে থাকবার একমাত্র জায়গা হলো সার্কিট হাউসটি। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মধ্যপ্রদেশ সরকার একে একটি মনোরম আবাস-ভবনে রূপান্তরিত করেছেন। এর থাকবার ঘরগুলি যেমন সুসজ্জিত, তেমনি আরামদায়ক। খাবার বন্দোবস্তও অত সহজে ও সুচারুরূপে করা যায়। খানসামাকে বললেই সব রকম খানাই পাওয়া যাবে, তার দামও খুব বেশি নয়। সার্কিট হাউসের চারদিকে সযত্নপালিত সুন্দর ফুলের উদ্যান। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পরে উদ্যানের পাশ দিয়ে বন্ধু নির্মলের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। শরৎ আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদ জ্যোৎস্নার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সেই বাঁশীর রাগরাগিণী নিস্পন্দ অরণ্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। দূরে বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়ায় যেন কোন্ অতীতের স্বপ্নাবেশ। এমনি চাঁদের আলোক এক হাজার বছর আগে নেমে আসত এই মাটিতে। তখন চন্দেল্ল বংশের কীর্তি ও মহিমাই সেই আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। যশোবর্মণ, ধঙ্গ, বিদ্যাধর—এঁদের ঐশ্বর্য ও শিল্পানুরাগের ফলে খাজুরাহোর কত গৌরব ও প্রতিষ্ঠাই না সেদিন ছিল! তারপর এক এক কালো ঝড়ের দাপটে এই চাঁদিনী রাতের সব আলো, সব সুরই একসঙ্গে নিভে গেল। সুলতান মাহমুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চন্দেল্লগণ মাহোবা, অজয়গড় আর কালিঞ্জর দুর্গে শক্তি সংহত করতে লাগলেন। শিল্প, সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ শিথিল হয়ে পড়লো, দেশরক্ষাই প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠলো। এমনি ভাবে ইতিহাসে উদ্ধত শক্তির কালো ছায়া সুন্দরের শুভ্র বেদীকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু তবুও তো সুন্দর মরে না। চন্দেল্লগণ বিলুপ্ত হলো, কিন্তু খাজুরাহো বেঁচে রইল তার মন্দিরগুলির অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তির মধ্যে। চতুর্দিকের নিঃশব্দ বনানীর মধ্যে জ্যোৎস্নার বাণী যেন ফিস ফিস করে কি ব'লে চলেছে। অনেক কথা তারা জানে, ভাঙ্গাগড়ার অনেক লীলাই তারা দেখেছে। যুগ যুগ ধ'রে নিরন্তর সেই সব কথাই তারা সুপ্ত অরণ্য ও নিস্তব্ধ চরাচরকে জানিয়ে চলে।

পরদিন সকালে মন্দিরগুলি দেখতে গেলাম। খাজুরাহোর মন্দিরগুলি তিনটি শ্রেণীভুক্ত। বাস রাস্তার পশ্চিম দিকে যে মন্দিরগুলি রয়েছে সেগুলিই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সেগুলি পশ্চিমাশ্রেণীভুক্ত। ঐ মন্দিরগুলিও আবার দুইটি পঙ্‌ক্তিতে স্থাপিত। পিছনের অর্থাৎ পশ্চিম পঙ্‌ক্তিতে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে চৌষট্টি যোগিনী, মহাদেব, জগদম্বা ও চিত্রগুপ্ত অথবা ভারতীজীর মন্দিরগুলি স্থাপিত। সম্মুখের অর্থাৎ পূর্ব পঙ্‌ক্তিতে জার্ডিন যাদুশালার উত্তরে পর পর মাতঙ্গেশ্বর, লক্ষ্মণ, পার্বতী, বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত। বাস রাস্তার পূর্ব দিকে কিছু দূর গেলে পূর্বশ্রেণীর মন্দিরগুলি দেখা যায়। বামনজী, জাবেরী, ব্রহ্মা এবং শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথের মন্দিরগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে দুলাদেব ও চতুর্ভুজ মন্দির দুইটি। এগুলি জৈনমন্দিরগুলির দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলির আকৃতি ও গঠনপ্রণালী অনেকটা একই

মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরগুলির কোন বহিঃপ্রাচীর-বেষ্টনী নেই, উন্মুক্ত ও অবারিত স্থানেই এগুলি দাঁড়িয়ে আছে। মাটি থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। সেই চত্বর থেকে আরও কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রধান মন্দিরগুলির মধ্যে ছয়টি অংশ আছে, যথা, অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল, গর্ভগৃহ ও প্রদক্ষিণ পথ। ছোট মন্দিরগুলির মধ্যে শুধু মাত্র অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ ও গর্ভগৃহই থাকে। এই বিভিন্ন অংশের বহির্ভাগ আলাদা আলাদা দেখালেও আসলে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটি অখণ্ড স্থাপত্য-সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলে। মন্দিরের প্রবেশ-পথে পাথরে খোদাই করা বিচিত্র কারুকার্য চোখে পড়ে। মন্দিরের ছাদ কয়েকটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপরে অদ্ভুত আকৃতির বামন-মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। গোলাকার সিলিঙের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য ও নয়নাভিরাম ছন্দ দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। আধুনিক কোন স্বর্ণশিল্পী গলানো সোনার উপরে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর শিল্পসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন ব'লে মনে হয় না।

মন্দিরগুলির বহির্ভাগে দুইটি কিংবা তিনটি স্তরে অনবদ্য ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি শিল্পীর সুগভীর জীবনচেতনা ও সূক্ষ্মতম শিল্পচাতুর্যের অবিনশ্বর সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে। ভারতের সব মন্দির দেখিনি, কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরগুলির প্রাচীর-গাত্রে নর-নারীর দেহছন্দ ও ভাববিলাসের যে সব চিত্র দেখতে পেলাম তাদের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও জীবন্ত চিত্র হ'তে পারে কিনা জানি না। চিত্রগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু মানবজীবনের বহু বিচিত্র ও বলিষ্ঠতম রূপ তাদের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মূর্তিগুলির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা-মহেশ্বর, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেবতা রয়েছেন ; আবার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট-দিকপাল, অপ্সরা, সুরসুন্দরী, বিদ্যাধর ইত্যাদি মূর্তিও যথেষ্ট আছে। কোথাও কোথাও নাগমূর্তি এবং শার্দূল মূর্তিও দেখা যায়। একটি রমণী মূর্তির সহিত বিশেষ ধরণের একটি হিংস্র শার্দূল মূর্তি অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়।

খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি দেখলে মনে হয়, এক হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দেবতার পুণ্যস্থান থেকে সুখদুঃখময়, কামনা-বাসনা-পূর্ণ মানব সংসারকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। ইন্দ্রিয় স্পর্শহীন, বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা দেবতার মহিমাকে উপলব্ধি করেন নি। ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রস্তর-চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তা' মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধুলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতি-মূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।' খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখবার সময় আমার ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। এই সব মন্দিরের শিল্পী মানবজীবনের সমস্ত তুচ্ছ ও ধূলিমলিন বিষয়গুলিই যেন অকপট আগ্রহের সঙ্গেই মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-রেখায় গেঁথে রাখলেন। এমন কি দেব ও দেবযোনিমূর্তিগুলির মধ্যে মানবীয় আবেগ অনুভূতির রূপায়নও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সেজন্য শিব ও পার্বতীর বিবাহ এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মিলনের চিত্র শিল্পীর সুনিপুণ হাতে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে, পুরুষ ও নারীমূর্তিগুলির মধ্যে স্বভাবতই নারীমূর্তিরই বহুলত্ব চোখে পড়ে। যে সব শিল্পী নারীমূর্তিগুলি অঙ্কন করেছিলেন তাঁরা নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি যে কত সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এক একটি নারীমূর্তি এক একটি ছন্দময়ী কবিতার মতই মন্দিরের গায়ে ফুটে রয়েছে। তার সুঠাম লীলায়িত দেহলতার প্রতিটি রেখার মধ্যে ভাবের এক একটি মূর্ত বাণীরূপই যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে লাস্যময় কটিদেশ, কামনা-বিলোল কটাক্ষ, চাপা ওষ্ঠাধর, সূক্ষ্মাগ্র নাসা ও সুস্মিত চিবুক-রেখা নিতান্ত অরসিকেরও মনকে মোহমুগ্ধ ক'রে তোলে। দেহসজ্জা ও আভরণেরও বা কত চমৎকারিত্ব ! হার, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা ইত্যাদি অলঙ্কারের সুশোভন পারিপাট্য চোখের দৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। কোন কোন চিত্রে রমণীদের দেহবিলাস ও প্রসাধনের রূপ ধরা পড়েছে। কোথাও হাতে দর্পণ ও লীলাকমল রয়েছে, কোথাও বা কোন রমণী অঞ্জনরেখায় নয়নযুগলকে আরও সুশোভিত ক'রে তুলছে।

চিত্রগুপ্ত মন্দিরের প্রাচীর চিত্র—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

পুরীর মন্দিরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রেও নরনারীর দেহসম্ভোগের নানা চিত্র খোদিত রয়েছে। দেবমন্দিরে অনাবৃত দেহলীলার চিত্র-স্থাপনাকে হয়তো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বোঝান যেতে পারে। বস্তুত, অনেকেই তো বলে থাকেন, এই সব কামকলার চিত্র দেখে চিত্তকে শুদ্ধ ও সংযত রাখতে পারলেই দেবদর্শন সার্থক হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয়, এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন লোকদের নর-নারীর মিলন সম্বন্ধে একটি সহজ ও নির্মুক্ত দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। দেহের সঙ্গে দেহের মিলনের মধ্যে বিশ্ববিধানের আদিম ও পরম সত্যটিই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই হয়তো শিল্পিগণ এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। বাৎস্যায়ন কথিত দেহমিলনের বহু ভঙ্গিই চিত্রগুলির মধ্যে

রূপায়িত হয়েছে। সেগুলির বাস্তব রূপরেখা ইন্দ্রিয়-কামনাকে উত্তেজিত করে না, সহজাত জীবনভোগের দিকে এক অবিকৃত শ্রদ্ধাই জাগ্রত ক'রে তোলে।

মন্দিরগুলির মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মন্দিরটির অনেকখানিই ভেঙেচুরে গেছে এবং চতুর্দিকে তৃণ ও আগাছাতেও দুর্গম ও অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। সবচেয়ে বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির হলো কাণ্ডারিয় মহাদেব মন্দির। চিত্রগুপ্ত ও বিশ্বনাথ মন্দির দুইটিও বিশেষ সুদৃশ্য ও মনোহর চিত্র সজ্জিত। চন্দেল্লবংশের রাজাগণ প্রধানত শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন, সেজন্যে খাজুরাহোতে শিবমন্দিরেরই বহুলত্ব লক্ষ্য করা যায়। মহাদেব, বিশ্বনাথ, মাতঙ্গেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু কেবল মাতঙ্গেশ্বর

প্রসাধনরতা নারী—পার্শ্বনাথ মন্দিরের চিত্র—খাজুরাহো

ফটো—অজিত ঘোষ

মন্দিরেই বর্তমানে নিয়মিত পূজা হ'য়ে থাকে। অন্যান্য মন্দিরের মূর্তিগুলির মধ্যে বরাহ মন্দিরের বিরাট বরাহ মূর্তিটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরাট বরাহ-মূর্তিটির শরীরে বহু চিত্র খোদিত এবং তার পায়ের তলায় কুণ্ডলীকৃত একটি প্রকাণ্ড সাপ প'ড়ে রয়েছে।

মহাদেব মন্দিরের চত্বরে বসেছিলাম। চারদিকে ছোট বড় মন্দিরের শিখর সূর্যের প্রখর আলোকে ঝলমল করছে। চতুর্দিক দীর্ঘ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত। অদূরবর্তী মহুয়া বৃক্ষ থেকে পাখীর সঙ্গীত ভেসে আসছে। মাঠে গোরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। তাদের গলায় এক দেবতা মৌনী হ'য়ে রয়েছেন। হাজার বছর কেটে গেল। চারদিকে মানুষ ও প্রকৃতির নিত্য-সচল জীবন প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। নিত্য নোতুন প্রাণের স্পর্শ জাগছে মন্দিরের চারদিকে, কিন্তু দেবতার মৌনতা ভাঙলো না। হাজার বছরের কথা তাঁর পাষাণভিত্তিতে প্রস্তরীভূত হ'য়ে রইল। চারদিকের সচলতার মধ্যে এই রহস্যমৌন নীরবতা মনের মধ্যে একটি শুব্ধ গাম্ভীর্যের ভাব জাগিয়ে তোলে।

বিকেল বেলায় জৈন মন্দিরগুলি দেখতে যাচ্ছিলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো রাস্তার ধারে একটি বিরাট হনুমানমূর্তি। কিন্তু মূর্তিটিকে আর চেনা যায় না, সর্বাঙ্গ তার সিঁদুরে লেপিত। খাজুরাহো গ্রামের মধ্য দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ। গ্রামের বসতি কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা নয়, শহরের মত পরস্পর-সংলগ্ন ঘর। ঘরে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থালী জীবনযাত্রা। আমাদের দেখে একদল ছেলেমেয়ে ছুটে এল, বলতে লাগল, 'বাবু প্যায়সে, পয়সা চাইতে লাগল বটে। কিন্তু চাওয়ার মালিন্য তাদের মুখে নেই, বেশ হাসিখুশি ভাব। বস্তি ছাড়িয়ে শস্যক্ষেতের আলের উপর দিয়ে কিছুদূর হাঁটতে হলো। লাল অথবা খয়েরী রঙের কাপড়-পরা মেয়েরা ক্ষেতের কাজে নিরত। এখানে এসে ঐ দুই রঙের কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙের কাপড়-পরা মেয়ে তো চোখে পড়লো না। জৈনমন্দিরগুলির প্রাঙ্গণে যখন গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন বিকেলের আলো তির্যক ভাবে মন্দিরের গায়ে এসে পড়েছে। প্রথমেই শান্তিনাথ মন্দির। মন্দিরটি আধুনিক, কিন্তু তার ভিতরে শান্তিনাথের বিরাট নগ্ন মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটির অসাধারণ বিরাটত্ব বিস্ময় উদ্রেক করে। জৈন মন্দির গুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ হলো পার্শ্বনাথ মন্দির। মন্দিরটির ভিতরের সিলিঙের সূক্ষ্ম কাজ এবং প্রাচীর চিত্রগুলির মনোহর বৈচিত্র্য বিশেষ আকর্ষণীয়। ঐ মন্দিরের পাশেই আদিনাথ মন্দিরটি আকারে অনেক ছোট। মন্দির-চত্বরের চারপাশে অনেক ছোট বড় মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অদূরে উত্তর দিকে বামনজী ও জাবেরী মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে দূরে দুলাদেব মন্দির প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বহুদূরে চতুর্ভুজ মন্দিরটির বৃক্ষাচ্ছাদিত চূড়াটির অস্পষ্ট রূপ চোখে পড়ছে। শান্তিনাথ মন্দিরের সামনের বাড়িটির ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলাম। মাথার উপরে উন্মুক্ত নীলাকাশের সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ, আকাশের দিগন্ত সীমানায় পাহাড়ের প্রাচীর। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে নানা বৃক্ষের চিত্রাপিত রূপ, মাঝে মাঝে সবুজের সমাবেশের মধ্যে দুই একটি মন্দিরের উত্থান, প্রকৃতির খোলা খাতায় যেন স্থানে স্থানে দেবতার স্বাক্ষর।

খাজুরাহোর পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহশালাটির মধ্যে অনেকগুলি মূর্তি ও মন্দির-চিত্র সংগৃহীত হয়েছে ব'লে শুনেছিলাম। একদিন সেই সংগ্রহশালাটি দেখতে গেলাম। সংগ্রহশালায় রক্ষিত শিল্পনিদর্শনগুলির কয়েকখানি আলোকচিত্র নেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে

কয়েকটি বৃহদাকার বুদ্ধমূর্তি ও জৈনমূর্তি একদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিশিষ্ট মূর্তিগুলির মধ্যে উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু, সূর্য, বীণাপাণি, অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী, নবগ্রহ ও সপ্তমাতৃকা মূর্তিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিস্ময়াপন্ন বিষ্ণুর একটি মূর্তির মধ্যে ভাবের যে বাস্তব রূপায়ন দেখলাম তা' ভোলা যায় না। প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় চিত্রও চোখে পড়লো। একটি শিকারদৃশ্য দেখলাম, সেখানে গতিশীল ভাবের যে অপরূপ অভিব্যক্তি চোখে পড়লো তার তুলনা মেলে না। পাথর কাটা ও ব'য়ে নিয়ে যাবার একটি সুন্দর চিত্রও দেখতে পেলাম। বিভিন্ন ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরীদের যে বিলোল ও সুছন্দিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা দেখে চোখ ফেরান অসম্ভব। মিথুন মূর্তিগুলির ভাববিলাসও চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে।

সংগ্রহশালা দেখে আমরা দু'জনে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিই। চা-ওয়ালার আদরযত্নের ত্রুটি নেই। গর্ব ক'রে আবার বলে, তার চা একবার যে খেয়েছে সে নাকি কোনদিন ভুলতে পারে না। আমাদের প্রতি একটু অত্যধিক পক্ষপাতিত্বের ফলেই বোধ হয় সে চা তৈরী করবার সময় চায়ের অংশ অপেক্ষা দুধের অংশ বেশিই দিত। খুশি হ'য়ে আমাদের স্বীকার করতে হত, এরকম দেবভোগ্য চা একমাত্র এই দেবস্থানেই সম্ভব। কিন্তু হায়, তবুও বন্ধু নির্মল এই চা আস্বাদন করত না! চা-ওয়ালা চা বানাত আর তার বৌ বানাত পুরী। চা-ওয়ালা যতই তর্জন গর্জন করুক না কেন, তার বৌয়ের বুন্দেলী বকুনি খেয়ে একেবারে চুপ। এই চায়ের দোকানকে কেন্দ্র ক'রে এই জনবিরল স্থানের কয়েকটি মানুষকে নিত্য দেখতাম। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ'ড়ে উঠলো। সেখানে আসতেন সংগ্রহশালার সহকারী অধ্যক্ষ বনারসী লাল। ভারী সহৃদয় ও পরোপকারী লোকটি। খাজুরাহো সম্বন্ধে কয়েকখানি বই পড়তে দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার তিনি করেছিলেন। আর আসতেন পোষ্টমাষ্টারটি। চিঠির খোঁজে পোষ্টাফিসে যেতাম, আদর আপ্যায়ন ক'রে বসাতেন, গল্প করতেন। চা খেতে এসে জুটত টাঙ্গাওয়ালাটি। বোধ হয় খাজুরাহোর একমাত্র টাঙ্গার মালিক সে। খুব রসিক ও চটাপটে ছেলেটি। কয়েকজন চাষীগোছের লোকও এসে সেখানে বসত। অবাক হ'য়ে আমাদের দেখত, সসম্ভ্রমে আমাদের কোন সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসত। বিলম্বিত লয়ে তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন ব'য়ে চলে। বাইরের জগতের কোন খবর তারা রাখে না। ব্যস্ততা ও বিক্ষোভ তাদের নেই, ঐ মন্দিরগুলির মত তাদের জীবন ধ্রুব ও প্রশান্ত।

সার্কিট হাউসের খানসামার রন্ধন-নৈপুণ্যে দু'বেলা খাওয়া হচ্ছে বেশ ভালো ভাবেই। উত্তম আহার ও বাসস্থান, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অতীতের স্বপ্নজগতে বিচরণ—এ জায়গা ছেড়ে কেউ যা যেতে চায়! সার্কিট হাউসে দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক আসেন। তাদের কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। অবশ্য সখের ভ্রমণকারী যে আসেন,না তা' নয়। কেউ কেউ এসে একঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরগুলি একবার পরিক্রমা ক'রে চ'লে যান। খাজুরাহো দেখেছেন, এ গল্প অবশ্য তাঁরা করতে পারেন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তবে অনেকেই আসেন নিষ্ঠা নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে, পুরাতত্ত্বের আগ্রহ নিয়ে। কলকাতার আর্ট স্কুলের দু'জন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁরা সারাদিন মন্দিরে ব'সে একনিষ্ঠ তন্ময়তার সঙ্গে চিত্র এঁকে যান। খাবার ঘরে হংকঙে নিযুক্ত আমেরিকার ভাইস-কনসালের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা সস্ত্রীক বেরিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেবদেউলগুলি পরিদর্শন করবার জন্যে। নির্মল ভারতের বহু স্থানে বেড়িয়েছে জেনে তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক তথ্য ও সংবাদ তাঁরা জেনে নিলেন। ভারত সম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীর এতখানি কৌতুহল ও শ্রদ্ধা দেখে গর্বে আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। রাত্রে খাবার পরে সার্কিট হাউসের সামনে বৃক্ষকুঞ্জের নীচেয় গিয়ে বসি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি, আলো ও আঁধারের কি রহস্যময় মিতালী! শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে আলোর ঢেউ ব'য়ে চলেছে, মনের মধ্যে অতীত ও বর্তমান মিলে এক বিচিত্র ঐকতান সুরু হলো বুঝি।

খাজুরাহো থেকে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। কয়েকদিন কাটলো স্বপ্নের মত। যাবার সময় এই জায়গাটির মিনতি-ভরা আহ্বান মনের মর্মতলে অনুভব করলাম। হাজার বছর ধ'রে এ কত পথযাত্রীকে এভাবে আহ্বান ক'রে ফেরাতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ ফেরেনি। তবে তারা না ফিরলেও তাদের পরশটুকু এখানে রেখে গেছে। আমরাও আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা মেশানো পরশটুকু এখানে রেখে গেলাম। বাস রওনা হলো পান্নার দিকে। শিবসাগরের পদ্মগুলি তখনও ভালো ক'রে অবগুণ্ঠন মোচন করে নি। এক একটি ক'রে মন্দিরের বিষণ্ণ চূড়া মিলিয়ে গেল। মহুয়া ও আম্রবীথির ভিতর দিয়ে আমাদের বাস দ্রুত এগিয়ে চলল।

আচরণ-বিভ্রম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এখনও মোহমুক্ত হননি অর্জ্জুন। শুনছেন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উপদেশ—ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা, মনুষ্য জীবনের প্রকৃষ্ট ন্যায়ার পথের সমাচার। মানুষকে কাজ করতে হবে অনাসক্ত হয়ে। পালন করতে হবে স্বধর্ম্ম। ক্ষাত্রধর্ম্ম ন্যায়যুদ্ধ। সে ধর্ম্ম বর্জ্জন করলে সমাজ তিষ্ঠতে পারবেনা।

মনে মনে কথাগুলা বিচার করছেন অর্জ্জুন। সবই উপাদেয় নীতি কথা। সত্য কিন্তু শুভ সংকল্প তা সর্ব্বদা মানুষকে কল্যাণ কর্ম্ম-পথে নিয়ে যেতে পারেনা। জীবনের এ কঠোর অভিজ্ঞতা। কে যেন টানে প্রাণকে অন্যায়ের দিকে অশুভের মন্দপথে। মনের ধারণাকে পাল্টে দেয় যে আকর্ষণ। উপেক্ষা করে কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের মাঝে প্রতিষ্টিত সে সুষ্টু ভাব, তার ক্রিয়াকে। টান বেশ প্রবল। মন বোঝে সে টান পাপের পথের আকর্ষণ। ফল ভোগ করে দিনের পর দিন জীব এমন আচরণের। তবু তাকে পরাজয় করতে পারেনা সাধারণ জীবন স্রোত। কেন? এর মূল রহস্যটি কি? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন পাণ্ডব সারথি-সখা উপদেষ্টাকে। বল্লেন—হে বার্ষ্ণেয়। তবে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে কেন মানুষ, অনিচ্ছা থাকলেও যেন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হ'য়ে পাপাচরণ করে?*

শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন—সে উত্তরে পুঞ্জীভূত ভারতের বিশেষ সংস্কৃতি। উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন সকল কৃষ্টির এক সবিশেষ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এই উত্তরে। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ শিক্ষা ধীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে লুপ্ত হয় আমাদের চরিত্রের বিচিত্রতা সম্বন্ধে মনের বিভ্রম। মনোবিজ্ঞানে হিন্দু-দর্শনের ত্রিগুণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব। সংশয় অপনোদন করে বহু, প্রকৃতির ত্রিগুণ তত্ত্ব। সাংখ্য-দর্শনের এ অধ্যায় শিক্ষাপ্রদ।

বলছিলাম অর্জ্জুনের বিভ্রান্তির কথা। প্রত্যুত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—রজোগুণ হতে সমুদ্ভব দুষ্পূরণীয় অতিশয় উগ্র এই কাম এবং তজ্জনিত ক্রোধকে মোক্ষমার্গে শত্রু বলে জেনো।*

পরে ভগবান প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন যথাকালে—যখন অর্জ্জুনের বুদ্ধি-শক্তি ক্রমশঃ আবার মোহ-বিমুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। বিবিধ বেদে বিভিন্নরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ গীত হয়েছে। সংশয়রহিত যুক্তি-যুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদ সমূহে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে।†

প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করেন। পুরুষ মাত্র দর্শক। যেমন সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্ম। তার একান্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ সর্ব্বত্র তাকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। আকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান কিন্তু নির্লিপ্ত। তেমনি পুরুষ বা আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ নির্লিপ্ত।

তাই প্রকৃতির উপলব্ধি হ'লে দেখি তার লীলা—নানা রূপে, নানা আচরণে, কত অভিনব বিকাশে। মানুষের মাঝে আত্মা বিরাজিত—নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, দর্শক। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণে প্রকৃতির সচঞ্চল ক্রিয়াশীলতা বৈষ্ণবীমায়া সৃষ্টি করে জীবে—নিজের স্বরূপে। তাই প্রকৃতির গুণ বিদ্যমান জীবে। প্রকৃতির ধর্ম্ম জীবধর্ম্ম। জীবের শক্তি বিচারে মানুষ মহাশক্তির ক্ষীণ ধারণা করতে পারে—যদিও মহামায়ার আসল অনন্ত স্বরূপ অব্যক্ত—বাক্যও মনের অতীত।

সেই অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য প্রকৃতির ক্ষীণ পরিচয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যে ভাবে জীবে বিকসিত সে শক্তি, দিলেন তার আভাষ। কাম হতে ক্রোধ হয়। কাম মানুষের বৈরী। কেন?

জীবন রহস্যের একটা বিকাশ তার আচরণ বিভ্রম। অনবদ্য কর্ম্ম তো সবাই করেনা সদাই। কোনো মানুষ

---

* গীতা ৩।৩৬

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিনম্‌। ৩।৩৭

† গীতা ১৩।৫।

সর্ব্বদাই সুষ্ঠু কর্ম্ম করেনা। আবার এমন দুষ্ট ও কেহ দেখেনি মানুষের সমাজে, যে প্রতি মূহূর্ত্ত মাত্র অন্যায় আচরণ করে। মানুষের কাজ দেখেও তার মনোভাবের নির্ভুল বিচার সম্ভবপর নয়। দেব-মন্দিরের মাঝে মালা চন্দন তিলক আন্তরিক দর্প-দম্ভ-অহঙ্কারের ঘূর্ণীপাক পণ্ড করে সাধকের পূজা ও যজ্ঞ। আবার কত দস্যু লুটের সময় অনুভব করে তীব্র মনোবেদনা—যার প্রভাবে তার লুণ্ঠন-লব্ধ ধন দান করে দরিদ্র নারায়ণকে। দানও তো পরিচয় দেয়না আন্তরিক মনোভাবের। দানে উপকৃত হয় পর। কিন্তু দাতা কোথাও দান করে যশের লোভে, কভু দেয় ভয়ে, কভু অর্থ ছুঁড়ে ফেলে ভিক্ষুকের প্রতি বিরক্ত হয়ে, তার সান্নিধ্য হতে মুক্ত হবার তাড়নায়। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ যে দানের উপদেশ দিয়েছেন, তা দুঃস্থের উপকারের জন্য। শ্রদ্ধয়া দেয়ম—শ্রদ্ধায় দান করবে। এ নির্দ্দেশ দাতাকে সম্পন্ন করে। কিন্তু অশ্রদ্ধয়া দেয়ম—অশ্রদ্ধায় দান করবে, শ্রিয়া দেয়ম—শোভন ভাবে দান করবে—হ্রিয়া দেয়ম—লজ্জায় দান করবে—ভিয়া দেয়ম—ভয়ে দান করবে—সংবিদা দেয়ম, চুক্তি অনুসারে দান করবে—এ ব্যবস্থাগুলি হয়ে ছিল গ্রহীতার উপকারার্থে। এমন দান দাতাকে বিশেষ উন্নত করেনা।

আমরা ভাব ব্যবচ্ছেদ করলে স্পষ্ট বুঝি প্রতিকর্মের মূলে থাকে নানা মনোভাব—কতকগুলি কর্ম্মফলের বিপরীত, কতকগুলি সুষ্ঠু ও সমীচীন। সত্যই মনোবিজ্ঞানের এ অধ্যায় বিভ্রান্ত করে অনুসন্ধিৎসুকে।

প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ সূচনা করলেন আচরণবিভ্রমনিরাকরণের। প্রকৃতি ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আমি অন্যত্র। আপাততঃ বোঝবার চেষ্টা করব ত্রি-গুণের বিকাশ। আর্য্য-দর্শন বিদ্যা-অবিদ্যা, শ্রেয়-প্রেয় সম্বন্ধে প্রভৃত বিচার করেছে। পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, ঐ শিক্ষায় কেহ যেন না ভুল বোঝে ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়। সে বিষয় ব্যাখ্যায় সাবধান করেছেন শঙ্করাচার্য্য। সর্ব্ব-ক্ষেত্রে বিরাজমান কিন্তু সে কারণে ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানের সংসারিত্বের গন্ধমাত্রও আশঙ্কার কারণ নাই।*

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বল্লেন—কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন।* সুতরাং সাংসারিক ক্রিয়ার কারণ প্রকৃতি।

জীবের স্বভাব—কার্য্য কারণ। কর্ম্ম করে জীব প্রকৃতিবশে। সুতরাং প্রকৃতির বিষয় সম্যক জ্ঞান হলে আচরণের জ্ঞানের পাওয়া যাবে সন্ধান। কারণ প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং আত্মাকে অকর্ত্তারূপে যিনি দেখেন তিনি সম্যকদর্শী। †

এরপর তিনি সুস্পষ্টভাবে বোঝালেন প্রকৃতি-সম্ভব তিনটি গুণের কথা। যে তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝলে আচরণ-বিভ্রমের সংশয় নাশ হয়। তিনি বল্লেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম। ১৪।৫

হে মহাবাহু প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ তিনটি দেহ মধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন ক'রে রাখে।

মানুষ-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেনা আত্মার মুক্ত ভাব। আমাদের এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণ সদাই ক্রিয়মান। এক অন্যকে নিবৃত্ত করে আপনি প্রতীয়মান হ'তে। এ তিনটি গুণ বাঁধে মানুষকে, রজ্জু যেমন বন্ধন করে। এদের কোনটিকে বাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ তিনটিই প্রকৃতিগত। এদের সাম্য-অবস্থা হ'লে তবে মুক্তি। সাম্য-অবস্থা এদের কর্ম্ম নিরোধ। তখন স্বপ্রকাশ হয় আত্মা। প্রকৃতির গুণ তার পূর্ণ পরিচয় হ'তে বঞ্চিত করে জীবকে।

মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায় সাত্ত্বিক প্রকৃতির ফলে। তখন অপর দুই প্রকৃতির টানের উপরে ওঠে সত্ত্বগুণ। বাকী দুটি লোপ পায় না। আবার যখন তার রাজসিক প্রকৃতি হয় বিজয়ী—তখন অনুরক্ত হয় মানুষ কর্ম্মে—উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা এবং আসক্তি। মানুষ কর্ম্ম করে যার ফলে কর্ম্ম পিপাসা বাড়ে যদি তার মূলে থাকে সংসার পিপাসা। সাত্ত্বিক কর্ম্ম করে মানুষ। সে প্রবৃত্তি কার্য্যকরী হয় রাজসিক গুণে। প্রকাশের আলো সমুন্নত ও উজ্জ্বল করে পথকে। কিন্তু রাজসিক প্রবৃত্তি আবার তৃষ্ণাসঙ্গকে জাগায়—সাত্ত্বিক ভাবকে পিছনে

"এবং চ সতি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম।"

* গীতা—১৩।২১

† গীতা—১৩।৩০

আচরণ-বিভ্রম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তখনও মোহমুক্ত হননি অর্জ্জুন। শুনছেন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উপদেশ—ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা, মনুষ্য জীবনের প্রকৃষ্ট চলার পথের সমাচার। মানুষকে কাজ করতে হবে অনাসক্ত হয়ে। পালন করতে হবে স্বধর্ম্ম। ক্ষাত্রধর্ম্ম ন্যায়যুদ্ধ। সে ধর্ম্ম বর্জ্জন করলে সমাজ তিষ্ঠতে পারবেনা।

মনে মনে কথাগুলো বিচার করছেন অর্জ্জুন। সবই উপাদেয় নীতি কথা। সত্য কিন্তু শুভ সংকল্প তা সর্ব্বদা মানুষকে কল্যাণ কর্ম্ম-পথে নিয়ে যেতে পারেনা। জীবনের এ কঠোর অভিজ্ঞতা। কে যেন টানে প্রাণকে অন্যায়ের দিকে অশুভের মন্দপথে। মনের ধারণাকে পাল্‌টে দেয় যে আকর্ষণ। উপেক্ষা করে কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের মাঝে প্রতিষ্টিত সে সুষ্টু ভাব, তার ক্রিয়াকে। টান বেশ প্রবল। মন বোঝে সে টান পাপের পথের আকর্ষণ। ফল ভোগ করে দিনের পর দিন জীব এমন আচরণের। তবু তাকে পরাজয় করতে পারেনা সাধারণ জীবন স্রোত। কেন? এর মূল রহস্যটি কি? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন পাণ্ডব সারথি-সখা উপদেষ্টাকে। বল্লেন—হে বার্ষ্ণেয়। তবে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে কেন মানুষ, অনিচ্ছা থাকলেও যেন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হ'য়ে পাপাচরণ করে?*

শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন—সে উত্তরে পুঞ্জীভূত ভারতের বিশেষ সংস্কৃতি। উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, দর্শন সকল কৃষ্টির এক সবিশেষ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এই উত্তরে। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ শিক্ষা ধীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে লুপ্ত হয় আমাদের চরিত্রের বিচিত্রতা সম্বন্ধে মনের বিভ্রম। মনোবিজ্ঞানে হিন্দু-দর্শনের ত্রিগুণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব। সংশয় অপনোদন করে বহু, প্রকৃতির ত্রিগুণ তত্ত্ব। সাংখ্য-দর্শনের এ অধ্যায় শিক্ষাপ্রদ।

বলছিলাম অর্জ্জুনের বিভ্রান্তির কথা। প্রত্যুত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—রজোগুণ হতে সমুদ্ভব দুষ্পূরণীয় অতিশয় উগ্র এই কাম এবং তজ্জনিত ক্রোধকে মোক্ষমার্গে শত্রু বলে জেনো।*

পরে ভগবান প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন যথাকালে—যখন অর্জ্জুনের বুদ্ধি-শক্তি ক্রমশঃ আবার মোহ-বিমুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। বিবিধ বেদে বিভিন্নরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ গীত হয়েছে। সংশয়রহিত যুক্তি-যুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদ সমূহে এ বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে।†

প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করেন। পুরুষ মাত্র দর্শক। যেমন সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্ম। তার একান্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ সর্ব্বত্র তাকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। আকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান কিন্তু নির্লিপ্ত। তেমনি পুরুষ বা আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ নির্লিপ্ত।

তাই প্রকৃতির উপলব্ধি হ'লে দেখি তার লীলা—নানা রূপে, নানা আচরণে, কত অভিনব বিকাশে। মানুষের মাঝে আত্মা বিরাজিত--নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, দর্শক। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণে প্রকৃতির সচঞ্চল ক্রিয়াশীলতা বৈষ্ণবীমায়া সৃষ্টি করে জীবে—নিজের স্বরূপে। তাই প্রকৃতির গুণ বিদ্যমান জীবে। প্রকৃতির ধর্ম্ম জীবধর্ম্ম। জীবের শক্তি বিচারে মানুষ মহাশক্তির ক্ষীণ ধারণা করতে পারে—যদিও মহামায়ার আসল অনন্ত স্বরূপ অব্যক্ত—বাক্যও মনের অতীত।

সেই অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য প্রকৃতির ক্ষীণ পরিচয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। যে ভাবে জীবে বিকসিত সে শক্তি, দিলেন তার আভাষ। কাম হতে ক্রোধ হয়। কাম মানুষের বৈরী। কেন?

জীবন রহস্যের একটা বিকাশ তার আচরণ বিভ্রম। অনবদ্য কর্ম্ম তো সবাই করেনা সদাই। কোনো মানুষ

* গীতা ৩।৩৬

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিনম্‌। ৩।৩৭

† গীতা ১৩।৫।

সর্বদাই সুষ্ঠু কর্ম করেনা। আবার এমন দুষ্ট ও কেহ দেখেনি মানুষের সমাজে, যে প্রতি মুহূর্ত মাত্র অন্যায় আচরণ করে। মানুষের কাজ দেখেও তার মনোভাবের নির্ভুল বিচার সম্ভবপর নয়। দেব-মন্দিরের মাঝে মালা চন্দন তিলক আন্তরিক দর্প-দম্ভ-অহঙ্কারের ঘূর্ণীপাক পণ্ড করে সাধকের পূজা ও যজ্ঞ। আবার কত দস্যু লুটের সময় অনুভব করে তীব্র মনোবেদনা—যার প্রভাবে তার লুণ্ঠন-লব্ধ ধন দান করে দরিদ্র নারায়ণকে। দানও তো পরিচয় দেয়না আন্তরিক মনোভাবের। দানে উপকৃত হয় পর। কিন্তু দাতা কোথাও দান করে যশের লোভে, কভু দেয় ভয়ে, কভু অর্থ ছুঁড়ে ফেলে ভিক্ষুকের প্রতি বিরক্ত হয়ে, তার সান্নিধ্য হতে মুক্ত হবার তাড়নায়। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ যে দানের উপদেশ দিয়েছেন, তা দুঃস্থের উপকারের জন্য। শ্রদ্ধয়া দেয়ম—শ্রদ্ধায় দান করবে। এ নির্দেশ দাতাকে সম্পন্ন করে। কিন্তু অশ্রদ্ধয়া দেয়ম—অশ্রদ্ধায় দান করবে, শ্রিয়া দেয়ম—শোভন ভাবে দান করবে—হ্রিয়া দেয়ম—লজ্জায় দান করবে—ভিয়া দেয়ম—ভয়ে দান করবে—সংবিদা দেয়ম, চুক্তি অনুসারে দান করবে—এ ব্যবস্থাগুলি হয়ে ছিল গ্রহীতার উপকারার্থে। এমন দান দাতাকে বিশেষ উন্নত করেনা।

আমরা ভাব ব্যবচ্ছেদ করলে স্পষ্ট বুঝি প্রতিকর্মের মূলে থাকে নানা মনোভাব—কতকগুলি কর্মফলের বিপরীত, কতকগুলি সুষ্ঠু ও সমীচীন। সত্যই মনো-বিজ্ঞানের এ অধ্যায় বিভ্রান্ত করে অনুসন্ধিৎসুকে।

প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ সূচনা করলেন আচরণবিভ্রমনিরাকরণের। প্রকৃতি ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছি আমি অন্যত্র। আপাততঃ বোঝবার চেষ্টা করব ত্রি-গুণের বিকাশ। আর্য্য-দর্শন বিদ্যা-অবিদ্যা, শ্রেয়-প্রেয় সম্বন্ধে প্রভূত বিচার করেছে। পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, ঐ শিক্ষায় কেহ যেন না ভুল বোঝে ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয়। সে বিষয় ব্যাখ্যায় সাবধান করেছেন শঙ্করাচার্য্য। সর্ব্ব-ক্ষেত্রে বিরাজমান কিন্তু সে কারণে ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানের সংসারিত্বের গন্ধমাত্রও আশঙ্কার কারণ নাই।*

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বল্লেন—কার্য্য ও কারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন।* সুতরাং সাংসারিক ক্রিয়ার কারণ প্রকৃতি।

জীবের স্বভাব—কার্য্য কারণ। কর্ম করে জীব প্রকৃতিবশে। সুতরাং প্রকৃতির বিষয় সম্যক জ্ঞান হলে আচরণের জ্ঞানের পাওয়া যাবে সন্ধান। কারণ প্রকৃতি কর্তৃকই সর্বপ্রকারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং আত্মাকে অকর্ত্তারূপে যিনি দেখেন তিনি সম্যকদর্শী।†

এরপর তিনি সুস্পষ্টভাবে বোঝালেন প্রকৃতি-সম্ভব তিনটি গুণের কথা। যে তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝলে আচরণ-বিভ্রমের সংশয় নাশ হয়। তিনি বল্লেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম। ১৪।৫

হে মহাবাহু প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ তিনটি দেহ মধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন ক'রে রাখে।

মানুষ-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেনা আত্মার মুক্ত ভাব। আমাদের এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণ সদাই ক্রিয়মান। এক অন্যকে নিবৃত্ত করে আপনি প্রতীয়মান হ'তে। এ তিনটি গুণ বাঁধে মানুষকে, রজ্জু যেমন বন্ধন করে। এদের কোনটিকে বাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ তিনটিই প্রকৃতিগত। এদের সাম্য-অবস্থা হ'লে তবে মুক্তি। সাম্য-অবস্থা এদের কর্ম নিরোধ। তখন স্বপ্রকাশ হয় আত্মা। প্রকৃতির গুণ তার পূর্ণ পরিচয় হ'তে বঞ্চিত করে জীবকে।

মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায় সাত্বিক প্রকৃতির ফলে। তখন অপর দুই প্রকৃতির টানের উপরে ওঠে সত্বগুণ। বাকী দুটি লোপ পায় না। আবার যখন তার রাজসিক প্রকৃতি হয় বিজয়ী—তখন অনুরক্ত হয় মানুষ কর্মে—উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা এবং আসক্তি। মানুষ কর্ম করে যার ফলে কর্ম পিপাসা বাড়ে যদি তার মূলে থাকে সংসার পিপাসা। সাত্বিক কর্ম করে মানুষ। সে প্রবৃত্তি কার্য্যকরী হয় রাজসিক গুণে। প্রকাশের আলো সমুন্নত ও উজ্জ্বল করে পথকে। কিন্তু রাজসিক প্রবৃত্তি আবার তৃষ্ণাসঙ্গকে জাগায়—সাত্বিক ভাবকে পিছনে

* এবং চ সতি সর্বক্ষেত্রজ্ঞত্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম।"

* গীতা—১৩,২১

† গীতা—১৩,৩০

ফেলে। তামসিক প্রবৃত্তি মোহ প্রসূত—প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রভৃতির জনক।

মানুষ সদাই জ্ঞানের আলোর সন্ধান পায়না, পারেনা সদাই কর্ম্ম করতে। মোহ আসে শ্রান্তি আসে। মোহ আচ্ছন্ন করে অন্তরের অন্তভাব। আবার আলস্যের শত মোহেরও মাঝে জাগে কর্ম্মের ইচ্ছা, খদ্যোতের আলোর রূপে আসে প্রকাশ।

এই তিন গুণে মানুষ বাঁধা—এই হ'ল তার স্বভাবের মূল নির্দেশ। এই বাঁধন তিন পাক দড়ির বাঁধন। কেহ বাকী দুটি হতে মুক্ত নয়—যখন একটি প্রাধান্য লাভ করে। যখন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ কাজ করে সে মগ্ন হয় সুখে। রজোগুণ প্রবৃত্ত করে তাকে কর্ম্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে প্রমাদ সৃষ্টি করে।

মানুষকে কর্ম্ম করতেই হয়। অথচ এই তিনগুণে সে বাঁধা। কাজেই একই প্রকারের কর্ম্মে হয়তো নিযুক্ত হয় মানুষ বিভিন্ন মনোভাবে—বিভিন্ন গুণের প্রেরণায়।

শিক্ষায়তন কুরুক্ষেত্রের কথা ভাবলে বড় আনন্দ আসে এই ত্রিগুণ তত্ত্বের বিচারে। জ্ঞানী ও কর্মী অর্জ্জুন। তখন তাঁর তামসিক গুণ প্রাবল্য লাভ করেছে অন্য দুটিকে পিছনে ফেলে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। কিন্তু নরের রূপ ধারণ করেন যখন তিনি, তখন ভগবান নরের মত আচরণ করেন। যাদুবলে সংসারের নিজের গড়া নিয়মকে ধ্বংশ করেন না। তাঁর মধ্যে বিকাশ দেখতে পাই তখন সত্ত্বগুণ, যার ফলে জ্ঞানের আলোক প্রোজ্জ্বল। সেই দীপের শিখায় জ্বালাচ্ছেন তিনি সখা পাণ্ডবের নির্বাপিত জ্ঞান প্রদীপ। তিনি সারথী—রথ-চালক—কর্মী—রাজসিক গুণের সচঞ্চল ভাবে দেহ মন স্পন্দিত। সাত্ত্বিক উপদেশ দিচ্ছেন অথচ রাজসিক গুণে—বক্তৃতা, বিশ্বরূপ প্রদর্শন, শঙ্খবাদন প্রভৃতি। তাই সে শিক্ষায়তনে পরিচয় পাই তিন গুণের ক্রিয়ার। এ বড় শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের।

সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্বগুণকে বলেছেন লঘু এবং প্রকাশক। লঘু কারণ সহজে উপরে ওঠে, সংসারের জাল জঞ্জালের ভারমুক্ত হ'য়ে। রজঃ গুণ স্বয়ং চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের উপষ্টম্ভক বা চালক। তমঃ গুণ গুরু এবং আবরক [illegible]। এরা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হ'লেও প্রদীপের মতো বৃত্তিতে মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের জনক। বাতি, তেল, অনল পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু তিনে মিলে আলোক বিস্তার করে। অনল প্রবল হ'লে আলো হয় দীপ্তিময়। তেল বা ইন্ধন তাকে সচল রাখে। সলিতা একেবারে স্থূল। কিন্তু তিনে মিলে আলো। তাই সাংখ্য-কারিকা (১৩ শ্লোক) বল্লে—

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

কর্ম্মযোগ গীতার শিক্ষা। মনস্থির হ'লে মুমুক্ষু দেখে কর্ম্মের ব্যর্থতা। তখন দেহের কর্ম্মত্যাগ করা হয় সহজ এবং প্রয়োজন। ত্যাগ প্রশংসনীয়। কিন্তু মানব প্রকৃতি সকল কর্ম্মকে রূপ দেয়। সকল কর্ম্মে আবার সেই তিনটি প্রকৃতির প্রেরণা হয় উপলব্ধ। অবশ্য যজ্ঞ, দান বা তপস্যা ত্যাজ্য নয়। কিন্তু নিরাসক্ত হ'য়ে সে সকল কর্ম করা কর্ত্তব্য। অন্য কর্ম্ম ত্যাগ কাম্য—হেতু হিসাবে। অথচ দেখি লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

সে সন্ন্যাস বিচারেরও ত্রিগুণের লক্ষণ মান। কর্ম্মের ফলত্যাগই ত্যাগ—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ভগবান বল্লেন—কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে, কর্মে আসক্তি এবং কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ। দুঃখের ভয়ে কায়িক পরিশ্রমের ফলে নিত্যকর্ম ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ। রাজসিক, কারণ মনের কাজ ফলের কামনা প্রভৃতিতে মন সক্রিয়। আর মোহবশতঃ কর্ম ত্যাগ হয় তামসিক ত্যাগ। আলস্যে কাজ না করা কর্ম্ম সন্ন্যাস নয়—তামসের প্রমাণ।

এই ত্রিগুণের কষ্টি-পাথরে যাচাই ক'রে কোন্ প্রকার কর্ম্ম সাত্ত্বিক, কোন্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হ'লে সেই কর্ম রাজসিক বা তামসিক গুণ প্রসূত, যে বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাই শ্রীমদ্ভগবতায়। সংসারের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কর্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে পারি সেই মানে।

জ্ঞান লাভে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কোন্ জ্ঞান সত্ত্বগুণ প্রসূত? রাজসিক জ্ঞানই বা কি আর তামসিক প্রবৃত্তির বশেই বা মানুষ কী জ্ঞান লাভ করে?

যে জ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন ভূত সর্ব্বত্র বিভক্ত হ'য়েও অবিভক্তরূপ প্রত্যয় হয়, সকল ভূতের এক অব্যয় স্বরূপ উপলব্ধি হয় সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক [illegible]। শাস্ত্রের

এও এক অপূর্ব্ব উপদেশ। আত্মবিস্তারে মুক্তি, সংকোচনে অবনতি। পরকে নিজের মধ্যে দেখা, নিজের উপমায় তার সুখদুঃখ, অভিরুচির সন্ধান করলে, অহিংসা দ্বেষহীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি সদগুণ দিন দিন বাড়ে। মানুষের সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়, সন্ধান পায় সে মহত্ত্বের। তাই সর্ব্বভূতের একতা দেখার জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান।

কিন্তু মানুষ প্রকৃতির অন্য গুণের বশে লাভ করে ভিন্নরূপ জ্ঞান। যাদের অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয়েছে তাদেরও সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিষয়ে পরিচয় পাই মূর্খতার। বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সৃষ্টি ও সংহার প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছে আজ। কিন্তু সে জ্ঞানে ধ্বংসের লীলার প্রেরণা পায়। সে জ্ঞান রাজসিক। গীতা বল্লেন—পৃথক পৃথক দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থের অনুভব হয়, সে জ্ঞান রাজস জ্ঞান।*

সত্যই বাহির হ'তে দেখলে রাশি রাশি পার্থক্য বোধ হয় জীবে জীবে। কিন্তু তারা যে একই আত্মা-শক্তির বিভিন্ন বিকাশ—দাম্ভিক পরিশ্রমী জ্ঞান-চর্চ্চার অধিকারী সে কথা ভাবেনা। আজ বিজ্ঞান বলে পৃথিবীতে একটা শব্দ করলে সারা বিশ্বে তার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই বিজ্ঞান বিশ্বাস করেনা, সমস্ত বিশ্বের নিবিড় একতা। মূল বিভিন্নতার জ্ঞান রাজসিক। এ হ'তে আরও শুভ ও সূক্ষ্মজ্ঞান সাত্ত্বিক।

আর তামসিক গুণে অভিভূত ব্যক্তি জীবে জীবে কোনো সম্বন্ধই মানেনা দেখে প্রত্যেক পদার্থ স্বতন্ত্র। কেহ কারও সম্পর্ক রাখে না।

জ্ঞানের পর কর্ম্ম।

কোন্ কর্ম্ম সাত্ত্বিক? যে পুরুষ রাগ দ্বেষ শূন্য হয়ে কাজ করে, যে আসক্তি রাখে না কর্ম্মফলে, কর্ত্তব্য ভেবে করে কাজ, ফলাফল না ভেবে শ্রীভগবানের কর্ম্ম অর্ঘ্য দেয় শ্রীচরণে, এমন পুরুষের কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

আবার বলি—একই পুরুষ সকল সময় সকল কাজ একই মনোভাব নিয়ে করেনা। সাত্ত্বিক ভাবে এক কর্ম সম্পাদন করে তখনই সে কাজ করে হয়তো রাজসিক প্রবৃত্তির প্রেরণায়।

রাজসিক কর্মের কী রূপ?

কামেপ্সু কর্ম্ম, কোনো কর্ম্ম অহঙ্কারের দ্বারা কৃত, অতি ক্লেশপ্রদ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—রাজসিক। এমন কর্ম্মের মূল প্রেরণা কামনা। কর্ম্মী কর্ত্তৃত্বাভিমানে স্ফীত শির।

পৃথিবীতে এই শ্রেণীর কর্ম্ম আমরা প্রত্যক্ষ করি চারিদিকে। তাতে জগতের উপকার হয় না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কর্ত্তার উপর তার কী ফল—সে কথা আলোচনা করলে নিশ্চয় বোঝা যায় যে সকল কার্য্যে হরির শরণ নিয়ে, তাঁরই কর্ম্ম করছি এই বিশ্বাসে কাজ করলে চিত্ত হ'ত প্রশস্ত—কর্ত্তার স্বভাব হতে স্ফুরণ হত সাত্ত্বিক প্রভা।

তামসিক গুণ মানুষকে যে কর্ম্ম করায়, তারও পরিচয় দিলেন নারায়ণ।

যার ফল শুভ কি ভবিষ্যতে অশুভ, যে কার্য্য ক্ষয়, হিংসা, পারুষ্য হতে সম্ভূত, মোহবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত সে কাজ তামসিক।

কাজেই সেই কর্ত্তা সাত্ত্বিক যে ফলকামনা বর্জ্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার চিত্ত।

রাজস কর্ত্তা সেই ব্যক্তি যে বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচহীন, হর্ষ ও শোকযুক্ত।

বলা বাহুল্য সংসারে সমৃদ্ধিলাভ করতে গেলে এই সব রাজসিক গুণের আবশ্যক বিবেচনা করে লোক। হয়তো হিংসাপরায়ণতা তার মাঝে কদর্য্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না। প্রতিযোগিতায় ঈর্ষাবাদ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু লোভ বাড়ায় লোভ, কৃতকার্য্য হলে নিজের ব্যবসায়ে বা বৃত্তিতে আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পায়। আমিত্ব যত বিরাট আকার ধারণ করে, উদারতা সাফল্য অনুসারে ততো ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আবার কৃতকার্য্য, যশস্বীলোক যদি ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে হতমান বা হৃতধন হয়, হিংসা ধারণ করে কদাকার রূপ। তাই মানুষের পক্ষে আবশ্যক নির্লোভ হওয়া। কারণ ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরদিন প্রসন্ন থাকেন না। দুঃখ অনিবার্য্য লোভীর পক্ষে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মী লাভালাভ জয়াজয়ে সমান উদারতা দেখিয়ে ক্লেশ ভোগের দহন হ'তে মুক্ত হয়।

আর তামস কর্ত্তা?

* গীতা ১৮।২১

সে অসাবধানী, বিবেকশূন্য, অনম্র, বঞ্চক, পরাপকারী, অলস, বিবাদী এবং দীর্ঘসূত্রী।

বলা বাহুল্য রাজসিকের সাফল্যের মূলে থাকে তার শ্রম, অবশ্য যার মূলে থাকে লোভ। তামসিক ব্যক্তির কর্ম্মমূলে লোভ থাকে, অথচ থাকে আলস্য কর্ম্ম-বিমুখতা এবং মোহ।

মানুষ বুদ্ধিজীবী। পশুর সঙ্গে তার পার্থক্যের মূলে বিদ্যমান জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান তো সবার সমান নয়, আর এক মানুষের চিত্তে সব সময় জ্ঞানের প্রদীপ সমান দীপ্তিময় নয়। তাই মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য জ্ঞানকে শুদ্ধ করা। বহুবার দেখেছি গীতার শিক্ষার মূলে বর্ণিত কর্ম্ম জ্ঞান এবং ভক্তির শুদ্ধি সাধনার উপায়। কর্ম্মীকে তিনগুণের মাপকাটিতে বিচার করে যে ফল হল, তার অন্তরে প্রবেশ করলে নিশ্চয় বোঝা যায়, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির বশে কাজ করলে দুঃখভোগ হয় অনিবার্য্য—কারণ লোভ এবং কামনা বুদ্ধিকে করে নির্ব্বাসিত অন্ততঃ ম্লান। বুদ্ধি স্পষ্ট হলে কর্ম্মের মূল হয় পবিত্র তার ফল হয় কল্যাণকর।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের এক মসলাকে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—সম্যক দৃষ্টি। এ জ্ঞানের চরম সম্যক ভাবে প্রত্যেক কর্ম্মের সকল ভাবের প্রতি শব্দের আদ্যন্ত দেখে জীবন যাপন না করলে দুঃখনিবৃত্তির পথ মেলে না কোনো দিন। তাই জ্ঞান ও বৃত্তি যখন সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে প্রকৃত মঙ্গল আসে কর্ম্মের অন্তে। মানুষের যশ, মানব ঐশ্বর্য্যের ভাতি হয়তো বিদ্যুৎবেগে জীবনের আকাশে ছুটাছুটি করেনা কিন্তু যার দৃষ্টি সম্যক তার জীবন রসকে তিক্ত করবার অবকাশ পায়না সংসারিক ক্লেশতাপের অভিযান।

তাই শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকার বুদ্ধির বিবরণ দিলেন। বল্লেন—হে পার্থ। যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তির রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক।*

রাজসিক বুদ্ধি অযথারূপে দেখে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভেদাভেদ, কার্য্য অপকার্য্যের পার্থক্য।

নিজের সুবিধার জন্য রাজসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অধর্ম্মের কার্য্যকে ধর্ম্ম ভাবে, এ সত্য আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি সমাজের সকল স্তরে। কর্ত্তব্যকে ভাবে অকর্ত্তব্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকে ভাবে কর্ত্তব্য সুবিধাবাদী রাজসিক বুদ্ধি।

আর তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ স্পষ্ট অধর্ম্মকে ধর্ম্মভাবে। ধর্ম্মকে ভাবে অধর্ম্ম। তামসিক বুদ্ধি সর্ব্ববিষয়ে বিপরীত বুদ্ধি। (ক্রমশঃ)

* গীতা—১৮।৩০

আমার যৌবন দিয়ে আরতি হোলো না তব

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রু-সিন্ধু-উদ্বেলিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত আমি
এ ভগ্ন জীবন বহি।
জমে ওঠে দিনে-দিনে সহস্র বেদনা—কারে কহি!
অনাদি বিরহ কাঁদে অনন্ত তৃষ্ণায় দিবাযামী।

প্রতিটি নিমেষ ধরি যত কথা জাগে
ঘুমন্ত বাসনা মোর জাগায়ে জাগায়ে—তারা সব
স্বপ্নের তরঙ্গ দলে যায় মিশে। প্রাণের বৈভব
আবর্ত্তে আবর্ত্তে পড়ি বিদায়তরীতে দুলে আর্ত্ত হয়ে ডাকে।

জীবন মৃত্যুর সাথে আলোক ছায়ার খেলা চলিতেছে নিতি,
করুণা মমতা শূন্য হৃদয়ের কূলে কূলে আসে ঢেউ;
প্রণয় শিখাটী জেলে নৈশক্ষণে এলো না তো কেউ
হাসি অশ্রু কোলাহলে এ পৃথিবীতে দুঃখে সুখে

ঋতুতে ঋতুতে আর অয়নে অয়নে আমি সকরুণ সুরে
তোমারে আহ্বান করি। বিষাদের ছায়া আসে নেমে,
ফুল ফোটে আর ঝরে যায়, সুরগুলি যায় থেমে।

বর্ত্তমান দুনিয়া ও যুদ্ধের অনিবার্য্যতা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দুনিয়া আজ সুস্পষ্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে—আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক শিবির ও রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক বিরোধিতা এত তীব্র ও প্রকট যে আশঙ্কা হয়, হয়ত বা আবার পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে যুদ্ধের কালো ছায়া। আবার সারা দুনিয়ার কোটি কোটি নরনারীকে ভোগ কর্ত্তে হবে যুদ্ধের অপরিহার্য্য পরিণামজনিত অশেষ দুঃখ ও ক্লেশ—সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অগ্রগতির উপরে আসবে প্রচণ্ড আঘাত—বৈজ্ঞানিক ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নতির ফলে এমন কি মানুষের অস্তিত্ব ও হয়ত বা হবে বিলুপ্ত। এই দ্বিধাবিভক্ত দুই শিবিরের তীব্র বিরোধিতায় আতঙ্কিত হয়ে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ আজ আওয়াজ তুলেছে শান্তির—জোরদার করে তুলেছে শান্তির আন্দোলন। শান্তিকামী মানুষের মুখপাত্র হিসাবে শ্রীনেহেরু ঘোষণা কর্লেন তাঁর "পঞ্চশীল" নীতি, গোটা পৃথিবীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করল শ্রীনেহেরুর পঞ্চশীল নীতি। তবু ও মানুষ যুদ্ধের অনিবার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দুই শিবিরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈপরীত্য (contradictions) যতদিন বজায় থাকবে যুদ্ধের আশঙ্কাও ততদিন দূর হবেনা বলেই মানুষের বিশ্বাস। এর দরুণই আমরা ঠাণ্ডা লড়াই বা অনুরূপ অনেক কথাই শুনতে পাই। এই সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার না করে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দ্বিধাবিভক্ত বিবদমান উপরিউক্ত দুই শিবিরের যুদ্ধের সম্ভাবনার চেয়ে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যেই লড়াইএর সম্ভাবনা অধিকতর অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্ববিরোধিতাই রচনা করে নিজ শিবিরেই যুদ্ধের সম্ভাবনা।

একথা ঠিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ব্ব বর্ণিত পরিবর্ত্তনের দরুণ আমাদের অনেকের মনেই এই ধারণার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। তার কারণ ধনতান্ত্রিক শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার তীব্রতার জন্য। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা বর্ত্তমান, তার তীব্রতা বিবদমান দ্বিধাবিভক্ত দুই শিবিরের তীব্রতার চেয়ে অধিকতর নহে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেতা আমেরিকা তার শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সতর্ক করে দিচ্ছে ও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত কচ্ছে, যারই অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই—বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের মধ্যে পরস্পর কতকগুলি সামরিক চুক্তি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আমেরিকা এই শিক্ষা লাভ করেছে যে নিজেদের ভিতর লড়াই করে নিজেদেরই শুধু ক্ষতি সাধন করা হয়না—নিজেরাই শুধু দুর্ব্বল হয়ে পড়েনা—পরন্তু বিপরীত শিবির তাদ্বারা লাভবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যথেষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশবলে বিবেচিত হত, যুদ্ধোত্তরে তা প্রায় আজ গোটা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে।

কাজেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত এসে যায় যে বর্ত্তমান অবস্থা থাকাকালীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই বিপরীত শিবিরের (opposite camp) মধ্যে। মহামতি লেনিনের বক্তব্যও আমাদের সিদ্ধান্তের আপাত-যৌক্তিকতার স্বপক্ষে সায় দেয়,—যখন তিনি বলেন "The existence of the Soviet Republic side by side with the Imperialit states for long time is unthinkable. One or the other must triumph in the end etc. [Lenin—Selected works- Vol VIII P. 33] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি অনেকদিন ধরে বেঁচে থাকা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে অচিন্তনীয়। পরিণামে যে কোন একটা প্রাধান্য লাভ করবে। বাস্তবতঃ তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নেতা আমেরিকা আজ পশ্চিম জার্ম্মাণী, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক প্রভাবে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে যে এই সকল দেশগুলি বিনা প্রতিবাদে নির্ব্বিচারে আমেরিকার নির্দ্দেশ মেনে চলছে। তাছাড়া যে কথা প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যেহেতু ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার তীব্রতা ধনতান্ত্রিক শিবিরের নিজেদের স্ববিরোধিতার তীব্রতার চেয়ে অধিকতর, ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যুদ্ধ অনিবার্য্য। শান্তি আন্দোলন বা অনুরূপ কোন আন্দোলনে তাকে সাময়িকভাবে রুখে রাখা গেলেও তার সম্ভাবনা ও অনিবার্য্যতাকে একেবারে রোধ করা যাবে না।

কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও অর্থনীতির দূরদৃষ্টি দিয়ে যদি বিষয়টি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে ঘটনা আমাদের কাছে অন্যরূপ প্রতিভাত হবে—অর্থাৎ যুদ্ধের অনিবার্য্যতা ধনতান্ত্রিক শিবিরের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে প্রকটতর, যতটা না রয়েছে বিপরীত শিবিরের সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কথাই ধরা যাক্। ধনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে (লক্ষণীয় আমি আপাততঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলছি না) সস্তা দামে কাঁচা মাল ক্রয় ও উৎপাদনী পণ্য বিক্রয়ের

জন্য তাদের বাজারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই "মার্শাল পরিকল্পনা সাহায্যের" আবরণে আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সের অর্থনীতিকে কবলিত করে তাদের বাজারগুলির কোথাও বা অংশীদার হচ্ছে, আবার কোথাও বা দখল করে নিচ্ছে। ইংরেজ এবং ফরাসী উপনিবেশগুলি থেকে সস্তাদামে কাঁচা মাল কিনে সেইখানেই আবার তাদের উৎপাদনী পণ্যের বাজার তৈরী কচ্ছে। বৃটেন এবং ফ্রান্সের ধনিক গোষ্ঠীর মুনাফালাভে এমনি করে বাদ সাধছে আমেরিকা। তখনই প্রশ্ন জাগে মনে, ইঙ্গফরাসী অর্থনৈতিক বাজারে মার্কিনী হস্তক্ষেপ কি তারা চিরদিন বরদাস্ত করবে,—মার্কিনী অর্থনীতির কবলমুক্ত হয়ে আবার তারা উচ্চহারে মুনাফালাভের প্রচেষ্টা স্বাধীনভাবে করবে—যে প্রচেষ্টার অনিবার্য্য পরিণতি হবে ইঙ্গফরাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কিনী গোষ্ঠীর সংঘাত। তাছাড়া আমরা যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকাই, আমরা ইতিহাসের শিক্ষা থেকে অনুরূপ ছবিই দেখতে পাই। গত যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাপান এবং জার্ম্মানীই ছিল প্রধান, একদা অর্থনৈতিক উৎকর্ষতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রাষ্ট্রদ্বয় আজকে মার্কিনী অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। তাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বৈদেশিক নীতি এবং এমনকি স্বরাষ্ট্রনীতি পর্য্যন্ত আমেরিকার নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়েছে। দ্বিতীয়যুদ্ধ-পূর্ব্বে এই রাষ্ট্রদ্বয় ছিল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয়, যাদের প্রভাব ছিল ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অসীম এবং যাদের প্রতাপে ইঙ্গমার্কিনফরাসী অর্থনীতির ভিত্ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছিল—শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তারা অধিকতর শক্তিশালী রগোষ্ঠীর রাষ্ট্র জাপান এবং জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক একাধিপত্যের Economic monopoly) ভয়ে। এই রাষ্ট্রদ্বয় কি আবার চেষ্টা করবে না—তাদের অর্থনীতিকে মার্কিনী প্রভাব মুক্ত করে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবার? চিরদিন আমেরিকার তাঁবেদারী না করে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা আবার তারা অবশ্যই করবে—যার অনিবার্য্য পরিণতি হবে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাত। ইতিহাসের শিক্ষা সেই সাক্ষ্যই বহন কচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাভবের পর অনেকের মনে এমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে জার্ম্মানী চিরতরে পদানত হয়ে পড়ল। তার কোনরূপ উত্থানেরই—কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কোন সম্ভাবনাই নাই। জার্ম্মানী আর কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেনা। এমনি করে সেদিনও মনে হয়েছিল ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যে আর বোধহয় কোন লড়াই হবে না। ধনতান্ত্রিক শিবিরে স্ববিরোধিতার লড়াইএর পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ প্রমাণ করল। জার্ম্মানী তার পরাজয়ের ১৫।২০ বছরের মধ্যেই সমস্ত নাগপাশ মুক্ত হয়ে আবার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলীশক্তি হিসাবে দাঁড়াল। সেদিনের বিজিত জার্ম্মানীর প্রতাপে ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল বিজয়ী ইঙ্গমার্কিণ শক্তিগোষ্ঠী। তার (জার্ম্মানীর) যুদ্ধের দাবানল প্রথমে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যেই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও লক্ষণীয় এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ যে জার্ম্মানীর অর্থ-নৈতিক পুনরুদ্ধারে বৃটেন এবং আমেরিকা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অবশ্য তারা যে আশা নিয়ে জার্ম্মানীর অর্থ-নৈতিক পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিল তাদের সেই আশা ফলবতী হয় নাই। বরঞ্চ ফল হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঙ্গমার্কিণ ফরাসী শক্তিবর্গ চেয়েছিল জার্ম্মানীকে ব্যবহার কর্ত্তে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পুরোধা সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রবাহ প্রবাহিত হল সম্পূর্ণ অন্যদিকে, জার্ম্মানী প্রথমেই তার সমস্ত শক্তি ও বল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করল প্রতিযোগী ধনতান্ত্রিক শিবির তথা ইঙ্গমার্কিণ ফরাসীর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই। অবশেষে বিজয় নেশায় মত্ত হয়ে জার্ম্মানী যখন সেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখনকার কৌতুকোদ্দীপক ঘটনা হল যে—সেই ইঙ্গমার্কিণ ফরাসী যারা নাকি জার্ম্মানীকে ব্যবহার কর্ত্তে চেয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারাই তখন হাত মেলাল বা হাত মেলাতে বাধ্য হল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে—যুদ্ধ করবার জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এমনই স্ববিরোধিতা বর্ত্তমান রয়েছে। এই থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রাজার দখলের লড়াই এবং সেই লড়াই যে তাদের প্রতিযোগী অপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঘায়েল করার ইচ্ছা, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতার চেয়ে প্রবলতর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের কাছে ইহাই প্রমাণ করেছে যে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের লড়াইএর সম্ভাবনার চেয়ে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাই অধিকতর, তার আরও একটি কারণ রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করার পূর্ব্বে ধনতান্ত্রিক শিবিরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে এবং সুনির্দ্দিষ্ট হতে হবে যে তার সামরিক ও অন্যান্য শক্তি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চেয়ে যথেষ্ট বেশী এবং নিজের উৎকর্ষতায় সুনিশ্চিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার পক্ষে বিপরীত শিবিরের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, কারণ সেই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরে নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্ব বা সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের ভিতর যুদ্ধের জয়পরাজয়ে ধনতন্ত্রের বিলুপ্তির প্রশ্ন সূচিত হয় বিশেষ এক গোষ্ঠীর অপর এক প্রতিযোগী গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য। কাজেই আজকে যখন দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দ্বিধাবিভক্ত দুই শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কথা শুনতে শুনতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ও দুনিয়ার অন্যান্য যায়গায় ধনতান্ত্রিক শিবিরে তেলের বাজার বা অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপার নিয়ে দু একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই তখন স্বভাবতঃই অতীতের কথা স্মরণ করে মনে প্রশ্ন জাগে—এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ধনতান্ত্রিক শিবিরে দাবানলের সৃষ্টি করবে না ত আবার।

অবশ্য আমার এই বক্তব্য থেকে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংঘাতের সম্ভাবনাকে আমি একেবারে অস্বীকার কচ্ছি, তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা

ততদিন সেই সম্ভাবনাও বর্তমান থাকবে। একথা অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করার সমতুল। প্রসঙ্গতঃ মহামতি লেনিনের বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন,—"We must remember that we are surrounded by people, classes & Governments who openly express their intense hatred for us. We must remember that we are at all times but a hairs breadth, from every manner of invasion" Lenin—Collection works. Russian edition, Vol. XXVII, P. 117) অর্থাৎ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে আমাদের চতুর্দ্দিকে এমন সব লোক ও সরকার রয়েছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। আরও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের উপরে যে-কোনও সময়ে আক্রমণ আসতে পারে।" কাজেই বিবাদমান দুই শিবিরের যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার না করে এবং সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়ার সাধারণ শান্তিকামী মানুষের শান্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেই, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে ধনতান্ত্রিক শিবিরে নিজেদের ভিতরে লড়াইএর সম্ভাবনাই অধিকতর এবং যার কারণ আমি পূর্ব্বেই [মহামতি ষ্টালিনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে] বর্ণনা করেছি। তাই আজকে শান্তি আন্দোলনকারীদের সেই বিষয়েও অবহিত ও সচেতন হতে হবে। আজকে যুদ্ধের অনিবার্য্যতা একেবারে রোধ কর্ত্তে হলে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তাহল ধনতন্ত্রবাদের চরম পরিণতি, সে সাম্রাজ্যবাদিতার উচ্ছেদ সাধন। ষ্টালিনের ভাষায়,—"To eliminate the inevitability of war, it is necessary to abolish imperialism. [J. Stalin—Economic Problems of socialism in the U. S. S. R, P. 41]. বর্ত্তমান শান্তি আন্দোলন সাময়িকভাবে যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহ—যেমন মিশরেও অন্যান্য যায়গায় এবং সেই দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন কর্ত্তে হলে আজকে শান্তির আন্দোলনকে রূপায়িত কর্ত্তে হবে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ আন্দোলনে—তবেই হবে পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধ-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। বেদের তিন কাণ্ড— কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। শেষ কাণ্ড উপনিষদ্, তাহাই বেদান্ত। উপনিষদেই বেদের শেষ-সিদ্ধান্ত বা সারভাগ নিহিত আছে। এই অর্থেও উপনিষদ্ বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা বহু। সকল উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সু-সম্বদ্ধ দর্শনের আকারে বিবৃত হয় নাই। বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্ম-তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যও প্রতীত হয় না। মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদ্দিগের মর্ম্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া বিভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্রের নাম ব্রহ্ম-সূত্র। "ব্রহ্ম-সূত্র্যতে (সূচ্যতে) এভিঃ ইতি ব্রহ্ম সূত্রাণি (শ্রীধর)। ইহাদের দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন বলিয়া ইহাদিগকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ব্রহ্মসূত্রসমূহের সংখ্যা কোন মতে ৫৫৫, কোন কোনও মতে ৫৫৮। সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল—এই চারি অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্র বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া "পাদ" আছে। প্রত্যেক পাদে একাধিক অধিকরণ আছে।

ব্রহ্ম-সূত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে বহুশাখার উদ্ভব হইয়াছে। বহু-ভাষ্য-সমন্বিত বেদান্ত সূত্রেই বহুশাখা-সমন্বিত বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি।

বেদান্ত সূত্রের এক নাম শারীরক-সূত্র, শরীরে অধিষ্ঠিত জীব বা শরীরে অনুভূত সুখ ও দুঃখের নাম শারীক। তৎসম্বন্ধীয় সূত্রসমূহ শারীরিক সূত্র। যে সকল সূত্রে জীবের অধিষ্ঠান শরীরের অথবা শরীরে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহার নাম শারীরক মীমাংসা সূত্র।

জৈমিনের কর্ম্ম মীমাংসায় বেদোক্ত ধর্ম্মের ও তাহার অনুষ্ঠান হইতে যে ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বেদের প্রথম কাণ্ড ইহার বিষয় বলিয়া জৈমিনির দর্শনের নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা। বেদের শেষ বা উত্তর কাণ্ড বাদরায়ণের দর্শনের বিষয় বলিয়া তাহার নাম উত্তর-মীমাংসা। চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রমে অবলম্বনীয় বলিয়াও উত্তর মীমাংসা নাম অন্বর্থ।

বেদান্ত-সূত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনের আকারে রচিত হয় নাই। উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাই তাহার উদ্দেশ্য। খৃষ্টীয় ধর্ম্মব্যাখ্যাতাগণের (Dogmalists) সহিত নিউ টেষ্টামেণ্টের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মসূত্রের সহিত উপনিষদের সম্বন্ধও সেইরূপ। ইহাতে ঈশ্বর ও জগৎ এবং জীবাত্মার সংসার-ভ্রমণও মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে সু-সংবদ্ধ করা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সূত্রেই দুইটি বা তিনটির অধিক শব্দ নাই। তাহাদের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। ইহার ফলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার উপর

সগুণ ঈশ্বর-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথবা নির্গুণ নির্বিশেষ অসঙ্গ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

রচনাকাল

ব্রহ্মসূত্র মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। (১৩।৫) ব্রহ্মসূত্রেও "স্মর্যতে" (স্মৃতিতে উক্ত আছে। বলিয়া গীতার উল্লেখ আছে। উভয় গ্রন্থ একজনের লিখিত হওয়া—অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে জৈনও বৌদ্ধ মতেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ ইহাকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলেন। ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম এগারো বার উল্লিখিত হইয়াছে। জৈমিনিও পূর্ব্ব মীমাংসায় বহুস্থলে—কোনস্থলে পূর্ব্বপক্ষরূপে কোনও স্থলে স্বীয় মতের সমর্থকরূপে বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। ইহা হইতে ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ এবং জৈমিনির গুরু বেদব্যাস একব্যক্তি কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ব্রহ্ম-সূত্রেই সূত্রকারের মত-সমর্থনে বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেও বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা কিনা তাহাতেই সন্দেহ হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এ প্রথা বিরল ছিল না, ইহাও কেহ বলিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতের উল্লেখ আছে। গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মনুসংহিতায় বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ আছে। হরিবংশেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ২০০ অব্দ ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মাক্সমূলারের মতে বেদান্তসূত্র গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী। পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদব্যাসের নাম পারাশর্য্য। পাণিনি "ভিক্ষু-সূত্রের রচয়িতা বলিয়া এক পারাশর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই ভিক্ষুসূত্র ও বেদান্ত সূত্র অভিন্ন। মাক্সমূলর বলেন, ইহার উপর নির্ভর করা গেলে বেদান্তসূত্রকে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়।

অন্যান্য দর্শনের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ

ব্রহ্মসূত্রে ন্যায় দর্শনের উল্লেখ নাই। কিন্তু বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ পূর্ব্ব মীমাংসা, কয়েকটি বৌদ্ধ দর্শন, লোকায়ত দর্শন এবং ভাগবত মতের সমালোচনা আছে। রামানুজ বলেন পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এক সময়ে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শঙ্কর ইহা স্বীকার না করিলেও উভয় দর্শনই বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদের ব্যাখ্যা উভয়েরই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে, যে উহারা এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধ মত, লোকায়ত মত এবং ভাগবত মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকিলেও, তাহাদের কতকগুলি মত বেদান্তসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। ভাগবত মতের সমালোচনা থাকিলেও গীতা ও ভাগবত মতের বিশিষ্ট প্রভাব ব্রহ্মসূত্রের উপর দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য ও টীকা

ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে বেদান্ত দর্শন প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে বাদরি, জৈমিনি আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণা জৈমিনি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্যকার ছিলেন বোধায়ন। আচার্য্য রামানুজ বোধায়নের ভাষ্যই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বোধায়নের ভাষ্যই বেদান্তের শঙ্করপূর্ব্ব যুগের ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু বোধায়নের ভাষ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বোধায়নের পূর্ব্বে উপবর্ষ নামে এক বৃত্তিকারের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর ভাষ্যে তাঁহার উল্লেখ আছে। পাণিনির গুরু উপবর্ষ এবং বৃত্তিকার উপবর্ষ এক ব্যক্তি কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে (৭৮০) গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য মাণ্ডুক্যকারিকায় উক্ত উপনিষদের অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করেন। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের শিষ্য শঙ্কর (৭৮৮-৮২০)। ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। শঙ্কর ভাষ্যরূপ মূল হইতে বহুসংখ্যক টীকা গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছে। শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরি "ন্যায় নির্ণয় এবং গোবিন্দানন্দ "রত্নপ্রভা" এবং বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খৃঃ অঃ) "ভামতী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ "কল্পতরু" নামে টীকা, এবং অপপয় দীক্ষিত (১৫৫০) "কল্পতরু-পরিমল" নামে কল্পতরুর টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদ (সনন্দন) রচিত পঞ্চপাদিকায় ব্রহ্মসূত্রের কেবল প্রথম চারিসূত্রের টীকা আছে। প্রসিদ্ধ মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র শঙ্কর কর্ত্তৃক তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে তাঁহার শিষ্যত্ব এবং সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া শঙ্করের অনুমতি অনুসারে শঙ্কর ভাষ্যের এক বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। কিন্তু শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যগণ বলেন যে তিনি যখন মীমাংসক ছিলেন তখন তিনি শঙ্করভাষ্যের—টীকা রচনার অধিকারী নহেন। ইহার পরে সুরেশ্বর "নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পদ্মপাদ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, কিন্তু এই টীকা গৃহদাহে ভস্মসাৎ হয়। এই গ্রন্থ শঙ্কর পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি হইতে তাহার উদ্ধার করেন, এবং পদ্মপাদ তাহা আবার লেখেন। প্রকাশাত্মন্ (১২০০) পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার "পঞ্চপাদিকা বিবরণ" নামে টীকা রচনা করেন। অখণ্ডানন্দ এবং নরসিংহাশ্রম মুণি এই শেষোক্ত গ্রন্থের "তত্ত্বদীপন" এবং "বিবরণ ভাব প্রকাশিকা" নামক দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অমলানন্দ এবং বিদ্যাসাগর ও পঞ্চপাদিকার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম "পঞ্চপাদিকা-দর্পণ" ও "পঞ্চপাদিকা-টীকা" বিদ্যারণ্যের (১৩৫০) "বিবরণ প্রমের সংগ্রহ গ্রন্থে "পঞ্চপাদিকা বিবরণের" ব্যাখ্যা আছে। বেদান্তের মুক্তি সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যের "জীবন মুক্তি বিবেক' গ্রন্থ বিখ্যাত।

বিদ্যারণ্যের "পঞ্চদশী" বেদান্ত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সুরেশ্বরের "নিষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি" ও বিখ্যাত গ্রন্থ। সর্ব্বজ্ঞাত্মা মুণির (৯০০ খৃঃ) "সংক্ষেপ-

শারীরক", এবং শ্রীহর্ষের (১১৯০) "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য", চিৎসুখের "তত্ত্বদীপিকা", প্রত্যক্রূপের "নয়ন প্রসাদিনী" ও সুপরিচিত গ্রন্থ। ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রণীত (১৫৫০) "বেদান্ত পরিভাষা" বেদান্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহার ছাত্র রামকৃষ্ণ এবং অমরদাস নামে এক পণ্ডিত ·"শিক্ষামণি" ও "মণিপ্রভা" নামে বেদান্ত পরিভাষার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈত সিদ্ধি" বেদান্ত সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। "গৌড় ব্রহ্মানান্দী" "বিটঠলেশোপাধ্যায়ী" এবং "সিদ্ধিব্যাখ্যা নামে ইহার তিনখানি টীকা আছে। "অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্ত সার" নামে ইহার এক সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়াছিলেন সদানন্দ ব্যাস। সদানন্দের "বেদান্তসারের" "সুবোধিনী" এবং "বিদ্বান্ মনোরঞ্জিনী" নামে দুইখানা টীকা আছে। সদানন্দ যতির "অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি" ও একখানা মূল্যবান্ গ্রন্থ। আনন্দ বোধ ভট্টারকের "ন্যায়-মকরন্দ" মায়াবাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকাশানন্দের "বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে চিত্তের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ. দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপ্পয় দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তলেশ" এবং নরসিংহাশ্রমের "ভেদাধিকার" এবং "বেদান্ত তত্ত্ব দীপিকা" এবং "সিদ্ধান্ত তত্ত্ব" নামে অন্য দুইখানি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। আরও বহু গ্রন্থ বেদান্ত সম্বন্ধে আছে।

ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত সার

ব্রহ্ম-সূত্রে চারি অধ্যায় ও ষোলপাদে বিভক্ত। গ্রন্থারম্ভেই আছে (১।১।১) "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" অথ অর্থাৎ ইহার পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। কিসের পরে? শঙ্কর বলেন নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহ ও অমুত্র ফলভোগবিরাগ, শম্য, দম, উপরক্তিত, তিতিক্ষা, সমাধান (মনের স্থৈর্য্য) ও শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে বিশ্বাস), এই সকল লাভ ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা এই সকল হইলে তাহার পরে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। রামানুজ বলেন—বেদপাঠ ও পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের আলোচনা শেষ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই প্রথমপাদের প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্রে আছে—যাহা হইতে জন্ম-স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তৃতীয় সূত্রে আছে—ব্রহ্ম-তত্ত্ব শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। তাহার অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রেই আছে ব্রহ্ম ভূতদিগের জন্ম স্থিতি ও লয়ের কারণ। চতুর্থ সূত্র আছে "তৎতুসমন্বয়াৎ" —ব্রহ্মই সকল বেদান্তে প্রতিপাদিত। বেদান্ত বাক্য সকলের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ।

এই চারিসূত্রের ভূরি ভূরি ব্যাখ্যা ভাষ্য ও টীকাকারগণ দিয়াছেন। এই চারিসূত্রকে চতুঃসূত্রী বলে। পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার কেবল চতুঃসূত্রীরই টীকা আছে।

পঞ্চম সূত্র হইতে পাদ শেষ পর্য্যন্ত (১।১।৩২) ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, এই মতের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথমত উপনিষদের "সৎ" সাংখ্যের প্রধান নহেন; প্রধান অচেতন, কিন্তু বেদের "সৎ" "ঐক্ষাত" (অর্থাৎ আলোচনা করিলেন) সুতরাং চেতন। শ্রুতিতে বহুস্থলে ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। (আনন্দময়—প্রচুর আনন্দের আধার) উপনিষদে ব্রহ্মকে বুঝাইতে আকাশ" প্রাণ ও জ্যোতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।
দ্বিতীয় পাদেক তকগুলি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তৃতীয়পাদের প্রথমে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।' ব্রহ্মই তাহাদের লক্ষ্য ইহা বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে যে "দহরে"র কথা বলা হইয়াছে। তাহাও ব্রহ্মবাচক ইহা বলা হইয়াছে। তাহার পরে দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কিনা তাহার বিচার করিয়া দেবতাদিগের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। পরে শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার নাই বলা হইয়াছে।

চতুর্থ পাদের প্রথমে বলা হইয়াছে যে কঠোপনিষদে সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। উক্ত উপনিষদের ১।৩।১১ শ্লোকে যে অব্যক্তের কথা আছে (মহতঃ পরং অব্যক্তং) তাহার অর্থ শরীর, শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা। উক্ত উপনিষদের "মহৎ" শব্দের অর্থ বুদ্ধি নহে। "অজাম্ একাং ইত্যাদি শ্লোকে (শ্বেতাশ্বতর উপ) প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর রূপ। পরমেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিন সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাই অজা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাহাতে "পঞ্চ পঞ্চজন" প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই "পঞ্চ পঞ্চজন" সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ, তাহাদিগকে পাঁচটি করিয়া একত্রিত করিবার কারণ নাই। আবার উপনিষদে তত্ত্ব সংখ্যা ২৭টি, কেননা আকাশ ও আত্মা উপরিউক্ত পঞ্চ পঞ্চজনের অতিরিক্ত "সমাকর্ষাৎ" (১।৪।১৫) সূত্রে তৈত্তীয় উপনিষদের "অসৎ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ এই শ্লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই বাক্যে অসৎকেই আদি কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও আছে "তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব এবং তৎ সত্যং ইতি আচক্ষতে তাহাকে সত্য বলা হয়। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ তখন তিনি নাম-রূপ ধারণ করিয়া রূপ গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অবিরোধ) বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তির খণ্ডন এবং বিরুদ্ধ মত সকলের সমালোচনা ব্যতীত ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতে লয়ের বর্ণনা আছে। আত্মার স্বরূপ ও তাহার ধর্ম্ম, এবং দেহের সহিত সংকৃত কর্ম্মের সহিত এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের বর্ণনায়ও আছে।

প্রথম পাদের প্রথমে সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সাংখ্য ও যোগ স্মৃতি হইলেও মনু ও ব্যাস প্রণীত স্মৃতির সহিত তাহাদের বিরোধ আছে। সাংখ্য প্রধান ব্যতীত অন্য যে সকল তত্ত্বের

উল্লেখ আছে, তাহাদের অনেকগুলি উল্লেখ বেদে নাই। সুতরাং সাংখ্য মত গ্রহনীয় নহে।

ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন. উভয়ের স্বভাব ভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। এ আপত্তির মূল্য নাই, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উদ্ভব দেখা যায়।

জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যদি হয়, তবে প্রলয়ে ব্রহ্মে বিলীন হইবে এবং এই বিলয়ে জগতের দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইবে, এই আপত্তি মূল্য হীন। ঘটের যখন ধ্বংস হয়, তখন ঘটের গুণ (বা দোষ) উপাদান মাটিতে সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না। (২।১।৯)

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। তাহার প্রয়োজন থাকিলেও, তাহার দোষ নিরস্ত হয় না। প্রকৃত সত্য কেবল বেদ হইতেই জানা যায়। (২।১।১১)

উপনিষদে আছে যাহাকে মৃত্তিকার বিকার বলা যায়, তাহা 'বাচারম্ভণ' মাত্র—নাম মাত্র, মৃত্তিকা হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তেমনি জগৎও নামমাত্র, ব্রহ্ম হইতে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শ্রুতিতে যে আছে, জগৎ অগ্রে অসৎ ছিল, তাহার অর্থ জগৎ তখন নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, এইমাত্র, যাহা কার্য্য তাহা কারণের মধ্যে পূর্ব্বেই থাকে। সুতরাং কার্য্য জগৎ কারণ ব্রহ্মার মধ্যে অব্যক্ত ছিল।

শ্রুতি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক।

জগৎ সৃষ্টিতে কোনও উপকরণ পূর্ব্ব হইতে ছিল না। দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগতে পরিণত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, তবে সমগ্র ব্রহ্ম অথবা তাহার অংশই এইরূপ হইয়াছেন? সমগ্র ব্রহ্ম যদি জগতে পরিণত হইয়া থাকেন, (কৃৎস্ন প্রসক্তি) তাহা হইলে এখন আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। যদি অংশমাত্র জগতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম যে নিরবয়ব, বেদের এই কথার সহিত বিরোধ (নিরবয়বত্ব শব্দ কোপঃ) হয়। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও, নির্বিকারই আছেন। সুতরাং উপরিউক্ত আপত্তি মূল্যহীন। স্বপ্নকালে নিজের মধ্যে বিচিত্র রথ আদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহাতে আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। জগৎ সৃষ্টিও সেইরূপ।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত এই কথশ্রুতিতে আছে। তাঁহার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও সকল ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার আছে। জগৎ সৃষ্টিতে তাহার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। তিনি আপ্তকাম। সৃষ্টি তাহার লীলা। "লোকবৎ লীলা কবল্যম্।" (২।১।৩৩) তাহাতে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই। জীব নিজ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছু ছিল না। সুতরাং কর্ম্মেও কর্ম্মকাল ভোগ অনাদি।

এক পথ

শান্তশীল দাশ

আর কোন পথ নেই :
আর পথ খুঁজে পাই নাকো—
ভালবাস, সকলেরে ডাকো।
সবাই আসুক কাছে, সকলের কাছে ছুটে যাও :
দ্বার খোলো, দ্বার ভেঙে দাও।
দ্বার-খোলো, দ্বার-ভাঙা ঘরের ভেতর
আসুক মানুষ সব : শুনোনাকো কে আপন পর।
ওপারের লোকজন এপারেতে এসে
এপারের মানুষকে ডেকে নিয়ে যাক্ ভালবেসে।
এপার ওপার হোক ;
ওপার সে হোক না এপার :
এ পার ওপার মিলে হয়ে যাক সব একাকার।

বসন্ত

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দেবী, ভারতী

বসন্ত জাগে যদি মনে
মানস নিকুঞ্জে ওঠে বিহগ কূজন,
কুসুমে কুসুমে ভ্রমি গুঞ্জরে ভ্রমর
সাথে সাথে শোভে
নব কচি কিশলয়,
বনের বসন্ত তখন দূরে সে কি রয় ?
শুধু অকারণ পুলকে পরাণ
বেজে ওঠে সুরে সুরে
বনের বসন্ত আর রয়না দূরে।
পরাণে দক্ষিণ বায়ু আপনি রহিয়া যায়
উতলা করিয়া হিয়া দোলা দিয়া ধীরে,
বসন্ত এসেছে বলি, চলে কত কানাকানি,
ভুবন ভরিয়া সাড়া পড়ে বনে বনে—
বসন্ত জাগে যদি মনে।

বিশ্বনিন্দুক

দেবাচার্য

গণেশ বটব্যাল ও ব্রাউনিং

[যাঁরা কবি ব্রাউনিংএর "এক সঙ্গে শেষবারের মতো ঘোড়ায় চড়া" (Last Ride together) পড়েন নি তাঁদের জন্যে হেড্-নোট : একটি ছেলেকে একটি মেয়ে প্রত্যাখ্যান করে। ছেলেটি বললে, একটা অনুরোধ, শেষবারের মতো চলো—তোমাতে আমাতে একসঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বেড়িয়ে আসি। মেয়েটি রাজী হ'ল এবং মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির মাথা এলিয়ে পড়েছিল ছেলেটির বুকে—সম্পাদকের পক্ষে লেঃ]

বিশ্ব-নিন্দুক গণেশ বটব্যাল বলেন :…

দাঁড়ান, ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি। স্থান, গ্যারেজ দিয়ে ঢুকে মাঝারী সাইজের একটি ঘর।—বৈঠকখানা, আড্ডাখানা, সম্পাদকের দপ্তরখানা। —অল্ কম্বাইন্ড। একটা টেবিল ; দুটো চেয়ার। একটা খাটও আছে। ইচ্ছে ক'রলে কাৎ হওয়াও যায়। জানালা খুললে লোনাধরা একটি বা দুটি একতালা বাড়ীর ফাঁক দিয়ে আকাশ নজরে পড়ে।

জনা দশেক আড্ডাধারী নিয়মিত আসেন। আড্ডা জমে রবিবারে। সকাল ৮॥০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। আড্ডাটার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। এখানকার মধ্যমণি যিনি, তিনি আবার যমরাজ ও বাংলার পল্লীগীতির ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছেন, স্বয়ং যমদেব এসে নাকি একদিন রাত্রিবেলার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছেন, ধন্যবাদ, তোমাকে ও তোমার পার্শ্বচরদের মৃত্যুভয় থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিলাম।

এত সহজে অমরত্ব পাওয়া যাবে যেখানে, সেখানকার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাবে, সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

যাই হোক, গণেশবাবু—নাকটা ঠিক দেবতার মতো না হলেও পরিপাকযন্ত্রের বিশালত্বে তিনি দর্শনযোগ্য পুরুষ। বয়েস পঞ্চাশ। রং—না কালো, না ফর্সা।—চুল এখনও মিশমিশে কালো, দাঁত একটাও পড়ে নি, চামড়া এখনও ঝোলে নি, তবে মুখে আসল বসন্তের দাগ।…

গণেশবাবু বলেন :

…শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রধান দোষ, চিন্তাশক্তির দুর্বলতা। তাই আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় অবতার ও মহাপুরুষ।…

আরে ছি ছি…আজকাল বাঙ্গালারা কোনো মহৎ সাহিত্যই সৃষ্টি ক'রছে না।—কেবল অন্ধ অনুকরণ!… আঙ্গিকের দোহাই দিয়ে যত রাবিশ চালিয়ে দিচ্ছে।… পয়সার জোর আছে এমন সব সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের সম্পাদককে…ছানার জিলিপি খাওয়াও-…হলাহলা ডান্স দেখাও, ফিরপো চাংওয়ায়—নিতান্তপক্ষে কফি-হাউসে নিয়ে যাও—রেগুলারলি ফর্ থ্রি মান্থস্—দেখে নিও, তুমিও বছর তিন চারেকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বনে গিয়েছ। তোমারও জন্মদিনে অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্কলন বের হচ্ছে।

—না না, কি যে বলেন। আমি প্রতিবাদ জানাই ক্ষীণস্বরে।

—কি বল্লেন, না না—আচ্ছা, কাম্ টু আরগুমেণ্ট। আমি প্রমাণ করে দেব, আমি যা বলেছি তার মধ্যে কোথাও অতিশয়োক্তি নেই।…আচ্ছা…বলুন সাহিত্য বোঝেন ?…এঃ, শেষে লরেন্সের নাম ক'রলেন—আপনি দেখছি সমালোচনায় রামখোকা—

আমি উত্তেজিতভাবে লরেন্সের গুণাবলী বর্ণনা করি। গণেশবাবু ধীরভাবে শোনেন, তারপর বলেন—আপনি কিছু জানেন না, লরেন্স ছিলেন কনসামটিভ, মরেছেনও বোধ হয় যক্ষ্মায়, তাই যতটা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল—মানে সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না, তাই লেডী চ্যাটারলীকে দিয়ে

মেণ্টাল স্যাটিস্‌ফ্যাকশন মিটিয়েছেন। একটা জমিদারণীর বুঝি আর স্বাস্থ্যবান লোক জুটতো না ?…

আমরা সবাই হাঁ করে শুনি।

আমি ভদ্রলোকের রসনার প্রখরতায় একটু ভয় পেয়ে এবার নাম ক'রলাম—আচ্ছা ধরুন, ব্রাউনিং—তাঁকে তো উঁচু দরের সাহিত্যিক মানেন ?

—ব্রাউনিং ! ইংরেজরা অবশ্য ব্রাউনিং ব্রাউনিং করে চেঁচায়, আর এখানকার কালো চামড়ার প্রফেসরেরা নোট লেখেন—হাউ ওয়ানডারফুল। কিন্তু, বিচার করে দেখলে বলতেই হবে ব্রাউনিং-এর সাহিত্যের অমরত্ব নেই। বড়জোর আর পঞ্চাশ বছর। তারপরে তাঁর জনপ্রিয়তা কমবেই। এক সেঞ্চুরী পরে মাইনর পোয়েটদের দলে যাবে না, কে বলতে পারে ?

আমরা সবাই হাহা করে উঠি।

—হা হা ক'রলেই কি মহাকাল শুনবে ?

—কেন, ব্রাউনিংএর কি দোষ ?

—কেন, কি দোষ !—এখনও তা বুঝতে পারেন নি ! বুঝবেন কি করে ! আপনারা তো ঐ নোট-মেকারদের উচ্ছ্বাস পড়ে মানুষ। পড়েছেন "লাস্ট রাইড টুগেথার ?"

আমি সরবে বলি—পড়েছি কি মশায়, ক্লাশে পড়াই। ওটা যে বি-এর পাঠ্য এবার।

—তবেই হয়েছে। ওসব লাস্ট রাইডের অসঙ্গতি বোঝবার বুদ্ধি যদি থাকতো আপনার, তাহলে মাস্টারি ক'রতেন না ! কি বুঝেছেন বলুন—ঐ লাস্ট রাইড টুগেদারে কি এমন চিরন্তন সত্য আছে, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

…আমি অধ্যাপকের বাগ্মিতায় বল্লাম অনেক কিছু। র‍্যালে, বিনিয়ন, মর্লে, মিণ্টো, এডমণ্ড গসে, ফ্রেঞ্চ ফসে, হেনরী জেম্‌স, ভারজিনিয়া উলভ—এমন কি রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলাম। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রলাম—পৃথিবীর সাহিত্যে এটি হ'ল একটি অনবদ্য নৈবেদ্য। কী পোয়েটিক ইমাজিনেশন্ !—ওয়েস্টার্ণ ক্লাউড…বিলোঙ্গী বুজম্‌ড…কী ন্যাচুর্যাল্ ডেসক্রিপশন্—হতাশার মাঝে ভরসা—সিলভার লাইনিংস—বেনেডিক্‌শন্ অব দি ফেডিং সান্—অর্থাৎ অস্তগামীন সূর্যের আলো, উদয়াচলের সুধাংশু কিরণ—আর…আর…সন্ধ্যাতারার হাতছানি…তাছাড়া, কী সাইকলজিক্যাল্ এ্যাপ্রিসিয়েশন্ ! —মানে, ক্ল্যাম্পড্‌ স্ক্রোল্ !—নতুন লেখকের প্রেমের কবিতা ভালভাবে না পড়ে যেমন সম্পাদকেরা দলিয়ে মুচড়িয়ে হাতের মুঠোয় চিপে, তারপর, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেন—হঠাৎ আসেন কবি, কণ্ঠে তার অনুনয়—সম্পাদকের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুবিচার সম্বন্ধে এমন অসীম উৎসাহ প্রকাশ করে বসেন, যে সম্পাদক আবার সেই ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে কাগজটা (কবির অলক্ষে) কুড়িয়ে নেন,—ইতস্ততঃ করেন—পিটি ও প্রাইডের মাঝখানে হেসিটেশন্—যেমন সেই মেয়েটি ব্রাউনিংএর হতাশ-প্রেমিকের লাস্ট অনুরোধ মেনে নিয়েছিল—সম্পাদক ছেপে দেন একটি কবিতা—প্রথম ও শেষ বারের জন্যে। হাউ ফরচুনেটলি রীজনেবল !

হাউ পোয়েটিক্যালি সুইট ! সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তাও শেষে রাজী হল মানিনী, বল্‌লে—বেশ, যাব আমি তোমার সঙ্গে। শুধু কি তাই, ঝুঁকে পড়লো মেয়েটি, মুহূর্তের জন্যে মাথাটি নুইয়ে দিলো ছেলেটির বুকে ! এ গ্লোরিয়াস পিস্ অব একস্টাটিক্ পোয়েট্রী—মহীয়সী কবিতা একেই বলে—এ মোমেণ্ট মেড্‌ এ্যান্ ইটারনিটী ! ক্ষণ-মুহূর্ত অনন্ত আনন্দের আশীর্বাদ পেলো !

তা ছাড়া দেখুন, এই কবিতার কাহিনীটা ফিল্‌ম হবার যোগ্যও বটে। ঘোড়ায় বসেছে প্রেমিক। সামনেই বসেছে মেয়েটি। জোড়াভুরু। টানা টানা চোখ। ঝাঁকুনিতে ঝাঁকুনিতে এলিয়ে পড়েছে শিথিল কবরী। আর—

—কবরী কি করে হবে ? মেম্ যে।—পতিতপাবনবাবু হঠাৎ অত্যন্ত বেরসিকভাবে বাধা দিলেন।

বক্তৃতায় বাধা পড়লে আমি—আমি কেন, সকল প্রফেসরেরাই তো-তো করেন। গণেশ বটব্যাল পকেট থেকে কোটো বের ক'রলেন—আর একটা পান, একটু দোক্তা ও জর্দা মুখে পুরে বল্লেন—

—ঠিক আছে, আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যদিও প্রফেসরি করি না, করি কণ্ট্রাক্টরি—তাহলেও এককালে ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম—ব্রাউনিং আমার পড়া আছে।

কুমারেশবাবু টিপ্পনি করেন—গণেশদা এম-এ, বি-এল। ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট ছিলেন—ইংলিশে ফার্স্টক্লাশ।

আমি এইবার একটু অপ্রতিভ হই।

গণেশবাবু উদাসীনভাবে আমার দিকে তাকান—দোষ নেবেন না প্রফেসর চক্রবর্তী—আপনি পণ্ডিত লোক, তবে আসল বসন্তের জ্বালা কি, তা বোধ হয় আপনি জানেন না। মুখে তো দাগ দেখছি না।

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকি।

—আপনাদের ব্রাউনিং কবি ছিলেন, তা অস্বীকার করা বাতুলতা। কিন্তু তার সাইকলজিক্যাল্ ইনসাইট্ ছিল না, থাকলেও গভীরতম স্থলে যে সব লুকোনো রহস্য আছে, তার সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলে তো মনে হয়না।

—কেন, কেন?

—আরে মশায়, তাহলে কি এমন গাঁজাখুরী কবিতা লিখতেন, আর ভাবতেন মোমেণ্টকে ইটারনিটি করেছেন! সেই স্বীকৃতি দেবে বিংশ শতাব্দীর যুবক যুবতী? শুধু ইংলণ্ডের জন্যে অথবা নাইনটিন্থ সেনচুরীর জন্যে কবিতা লিখলে তো চলবে না। ইউনিভারস্যালিটি—যাকে বলে বিশ্বজনীনতা দাবী করতে হ'লে সকল দেশ ও সকল শতাব্দীর জন্যে লেখা দরকার।

—বুঝলাম না কথাটা।

—বুঝলেন না, আর কবে বুঝবেন। ও সব ভিক্টোরীয় যুগের উচ্ছ্বাস। প্রথমতঃ, যে মেয়েটি ছেলেটিকে প্রত্যাখ্যান ক'রল, সে কখনই এক ঘোড়ায় চেপে যেতে রাজী হবে না। সুতরাং টুগেদারের অর্থ অস্পষ্ট। ধরে নিলুম, আর একটা ঘোড়াও ছিল। পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়াতেও আনন্দ থাকতে পারে। মানলুম, কিন্তু ভুলে যাবেন না, সময়টা ছিল সন্ধ্যেবেলা—সন্ধ্যেবেলায় কোনো মেয়েই শুধু কাব্যের প্রয়োজনে বের হতে রাজী হবে না।

—কেন?

—কারণ আছে বৈ কি। কারণ সন্ধ্যেবেলায় আর একজন হয়তো এসে ফিরে যাবে। নতুন পাখী হাতে না পেলে, কোন মেয়েই বলুন, পুরনো পাখীকে উড়িয়ে দিয়েছে? সেফ্‌লি ধরে নিতে পারেন, দুই নম্বর ইতিমধ্যে মেয়েটির সান্ধ্য-সাহচর্যের আকর্ষণে আসা যাওয়া শুরু করেছে। বুঝুন, তলিয়ে বুঝুন। এতদিন উৎসাহ দিয়ে হঠাৎ বেঁকে বসবার কি কারণ থাকতে পারে? কোনো কারণই যখন কবি দেননি, তখন আমাদের সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে হবে সবটা।

—এ্যাঁঃ, এসব কথা কি বলছেন আপনি! আমরা তো এসব ভাবি নি।

—ছেলে পড়ান, খাতা দেখেন, শুনতে পাই আজকাল আবার তিন শিফটেও কাজ করেন অনেকে—ভাববার সময় কোথায় আপনাদের। যা বলছি শুনুন, বাড়ী গিয়ে ভাববেন পরে! বলছিলাম, দুটো পাখাকে দু'হাতে আদর জানানো কঠিন। এক হাতে ঠ্যাং, আর এক হাতে লেজ না ধরলে পাখা পোষা কঠিন। তাই হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চিতই ধরতে পারেন, ব্রাউনিংএর লাভারটি ছিল একটি ছিন্ন-পকেট ভাবালু-কম্পোজার। তার সকল কবিতা বিক্রী করলেও মেয়েটির জন্যে ব্রাইড্যাল্ ড্রেস্ কেনা যাবে না—মেয়েটি যখন পরিষ্কার বুঝে নিল ব্যাপারটা, যুবকটি একেবারে ওয়ার্থলেস, গুড্ ফর্ নাথিং—মাইণ্ড, আমি মেয়েটির সাইকলজিক্যাল্ স্টেটের বর্ণনা দিচ্ছি, কবিতার নিন্দে ক'রছি না কিন্তু…

—বলুন, শোনা যাক থিসিসটা। ঘোষবাবুর কণ্ঠস্বরে এইবার যেন উৎসাহের উষ্ণতা অনুভব করি। গণেশ বটব্যাল গম্ভীরভাবে বলে যান—

…তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করি, মেয়েটির দুই নম্বর সেদিন আসবে না, মেয়েটি আগে থেকেই জানতো—আর মেয়েটি যে চারকোটি বছর আগে মার্জারী ছিল, সে তো কবি নিজেই ইঙ্গিতে পাঠককে জানিয়েছেন।

—সে কি মশায়!!

—পড়েন নি? প্রত্যাখ্যাত প্রেমিককে—ঠিক মার্জারী যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে—সেইরকম খেলিয়ে নেবার মতলবে গুম্ হয়ে, ওৎ পেতে, খানিকক্ষণ বসে থাকলো? যেই দেখলে ছেলেটি আধমরা হয়ে এসেছে, নরম হয়ে বলেছিল নিশ্চয়ই, বেশ তাই যাবো, একসঙ্গে ঘোড়ায় চাপলেই যদি তোমার কোনো উপকার হয়, না হয় ক'রলাম উপকার। কিন্তু মনে থাকে যেন, এই শেষবার।—আরে মশায়, গল্পিকা আর কাকে বলে!

—বুঝলাম না আপনার হেঁয়ালী।

—বুঝলেন না, তবুও বুঝলেন না!! যান, বাড়ী

গিয়ে রাত্রিবেলায় সহধর্মিণীদের জিগ্যেস করুন—মাইণ্ড, কৌশলে দিব্যি দিয়ে নেবেন—

—দিব্যি কিসের ?

—সত্যি কথা বলতে হবে। হাঁ, অথবা না—আর কিছুই বলতে পাবে না। এই কড়ার করিয়ে নেবেন।

—নিলাম। তারপর? মুখুজ্জে মশায় মন্তব্য সহ প্রশ্ন করেন।

—ঐ লাস্টরাইড্ কবিতাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন, আর বুদ্ধিমতীদের জিগ্যেস করবেন—ঐ যে জায়গায় মেয়েটি মাথা রাখলো ছেলেটির বুকে—মাত্র এক মুহূর্তের জন্য—মাত্র একবার—এটাকি সত্যি—হাঁ বা না বলতে হবে, আর কোন কথাই বলা চলবে না—জানিনা' বলাই মেয়েদের স্বভাব কিনা, তাই এই দিব্যির প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছেন ?

—না, এখনও বুঝতে পারলাম না ঠিক।

—দেখবেন, সতীসাধ্বীরাও বলবেন, ব্রাউনিং ভুল লিখেছেন, একবার পুরুষের বুকে মাথা রাখলে আর রক্ষা নেই। বারবার মাথা রাখতেই হবে। তাছাড়া—'যাকগে, অলমতি বিস্তারেন—বুঝে দেখুন কতটা ল্যাক্ অব্ ডীপ্ ইনসাইট্, মানে, গভীর দৃষ্টির অভাব থাকলে ঘোড়ায় চড়া যবনী ও যবনের কাছে এতটা প্রাণহীন ব্যবহার আশা করা যায় !!

গণেশ বটব্যাল আর একটা সিগারেট ধরান। আমরা হতভম্ব হয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাই।

আনুষ্ঠানিক গান

শ্রীজয়দেব রায়

বিভিন্ন যুগের গানের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ, শিল্প, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়। প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট সঙ্গীত সে আমলের জনগণের মনের যেন প্রতিচ্ছবি। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে, কালের রূপান্তরের সঙ্গে গানের রূপ বদল হইতেছে। এককালের বিশিষ্ট চাহিদা মিটাইতে যে গান রচিত হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মূল্যহীন নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এক শ্রেণীর দেশ-প্রেমোদ্দীপক গান এক সময়ে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, আজ সে গানগুলি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; আজকের গণসংগ্রামে সে গানগুলি গাহিবার অবকাশ আর নাই।

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া গান লিখিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। সেকালের ঐ শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়া যে ভাবে দেশপ্রীতি এবং ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্র রচিত নিম্নের গানটি রীতিমত বৈঠকী ঢঙে রচিত—

> হে নিরদয় নীলকরগণ।
> আর সহে না সহে না প্রাণে এ নীলদাহন॥
> দাহনের সুকৌশলে, শ্বেতসমাজের বলে,
> লুটেছে সকল ধন কি আর আছে এখন॥
> দীনজনে দুঃখ দিতে কাহার না লাগে চিতে,
> কেবল নীলের হেরি, পাষাণ সমান মন॥
> বৃটন-স্বভাবে শেষে কালী দিলে বঙ্গে এসে,
> তরিলে জলধিজল পোড়াতে স্বর্ণভবন॥

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া দীনবন্ধুর ন্যায় আরও বহু অজ্ঞাতনামা অখ্যাত পল্লীকবিও গীত রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—

> নীলদর্পণে লঙসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
> নীমল নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে॥
> কারো কার, তাদের উপর অত্যাচার,
> তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে॥
> ইডন, গ্রান্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
> করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড লঙসাহেবের কারাবাস ঘটিয়াছিল। হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রচার করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।

পাকিস্তানে ইদানীং যে হিন্দুনিধন যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্কটের মধ্যেও পল্লীকবিরা তাহার বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। এই সকল গানে হয়ত বেশ কিছুটা বিদ্বেষ, বহু দুঃখলাঞ্ছনাজনিত ঘৃণামিশ্রিত অনুরাগ প্রকটিত, তাহা সত্ত্বেও দেশের ঐতিহাসিক গানের মধ্যে সেগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বরিশাল জেলার রাজাপুরে সম্প্রতি হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার বর্ণনা আছে নিম্নের গানে—

শোনেন এক নতুন লীলা বরিশালের জিলা
ঘটিল কি দুর্ঘটনা প্রাণে সহেনা।
৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাজাপুরের এলাকা
লুটপাট মারামারি নাই লেখাজোখা॥
তখন যারে পায় তারে কাটে ঘরবাড়ী নেয় লুটে
টাকার মাল বলতে কিছু বাকি রাখে না।
যখন 'আল্লা হোগ্গাকবর' ডাকশুনি সব হিন্দু হয় পাগলিনী
যেমন গুলিখোর বাঘিনী তেমনি ঘটনা॥
তখন ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে
জঙ্গল মাঝারে গিয়ে করে ভাবনা।

বরিশাল জেলায় মুলাদি নামক স্থানে জনৈক পুলিস দারোগার বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতায় কয়েক হাজার হিন্দু একদিনেই নিহত হয়। সেই ঘটনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে পল্লীকবির গান—

তখন দারোগা নিয়ে গুণ্ডাগণে বসে গুদামের মাঝে
চারজন গুণ্ডা খাড়া করে, দাঁও চার খানা।
এক একজন বের করে এক কোপে দুই খণ্ড করে
ছোটবড় উত্তমাদি চার হাজার কম হবে না।
তখন মদের বোতল হাতে রয় নূপুর দিইছে পায়
রুনুঝুনু বাজনা বাজায়—প্রাণে সহেনা।
যে ভাবেতে অত্যাচার কি ভাবে করি প্রচার
কিছু কিছু সংভাবে করি বর্ণনা।
দ্বিজ বলরাম তাই করে মানা মুলাদিতে গেল জানা।
পাকিস্তানে হিন্দুগণ ভাই কেউ যেওনা॥

তবে এই অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্য এ যুগে কোন দীনবন্ধুই আর নূতন কোন 'নীলদর্পণ' রচনা করিতে সাহস করেন নাই, নূতন কোন লঙ্‌ সাহেব আর এদেশে পদধূলি দেন না!

সমাজে বিজাতীয় প্রভাবের দৃষ্টিকটুতা সর্বপ্রথম বিদ্রূপের যোগান দিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানে। এই শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গীয় চালচলন আজও পল্লীকবিদের রঙ্গরসাত্মক গানের উপকরণ হইয়া আছে। বলরাম অধিকারী নামক এক অখ্যাতনামা পল্লীকবি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া গান ধরিলেন—

দেশের উল্টে গেছে হাওয়া
শীঘ্রই ভারতে দেখি গান্ধীরাজার।আসাযাওয়া।
যত সব বাংলার ছেলে ইংরেজি শিক্ষার ফলে
দশ বৎসর বয়স হইলে চোখে চশমা দেওয়া।
তারা শিখতে চায় পেণ্টুলের দলে খেয়ে মুর্গি খাওয়া।
এখন শিক্ষা কর বঙ্গবাসী মোটা পরা মোটা খাওয়া॥

সংবাদ-বৈচিত্র্য লইয়া আনুষ্ঠানিক গান পাঁচালী—কবির দলের গায়করাও রচনা করিতেন। তারকেশ্বরের জনৈক মোহান্ত কুৎসিত মকদ্দমায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বিখ্যাত পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত গান বাঁধিয়াছিলেন—

মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে, টাক ধরে না চুলে
কানায় চোখে দেখতে পায়॥
বিলাতি খানি নূতন আমদানি
শিবের ষাঁড় জুড়েছে, তেলে তোলে কামিনী—
হয়েছে ল্যাজে গোবরে বৃষ, কখন কি দায় ঘটায়॥

আর এক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক গান রচিত হয় নানা পর্ব উপলক্ষে। সেকালেও রচিত হইত। বাংলার নবযুগের গীত-প্রবর্তক নিধুবাবুই সর্বপ্রথম বাণী বন্দনায় আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের সূত্রপাত করেন—

জয় জয় বাগ্‌বাণী নিখিল প্রদায়িনী
পদ মধ্যে মুখাম্ভোজ, বক্ষে কর সরসিজ,
পঞ্চাসতো বর্ণময় মানি॥
সদা-সরসিজোদ্ভব, সরোজাক্ষ সদাশিব প্রভৃতি অমরবন্দিনী।
অক্ষ গুণ আর বিজ্ঞা, অমৃত ফল সমুদ্রা, দেহিপদ, চতুষ্টয় পানি॥
সদাশীনোন্নতস্তনি ঈষদাভা ত্রিনয়নি, সর্ব ইন্দু শিরোধারিণি
জগন্মোহন দীনে, আশ্রয় স্বকীয় গুণে,
দেহি পদ অম্বুজে ভবানি॥

অনেকে বলেন গানটি তাঁহার স্বরচিত নয়, তাঁহার কোন এক বন্ধুর রচনা, তবে গানটি তিনি নিজে সুরযোজন করিয়া পূজার দিনে গাহিতেন।

যাত্রা-পাঁচালী-কবির গানের আসরেও প্রথানুসারে বাণী বন্দনার ধারা চলিত ছিল। এ সকল গানে গায়কদের কণ্ঠে ভক্তির আকুলতা না থাকিলেও সুরের চাতুর্য থাকিত। ইহাও এক শ্রেণীর বন্দনপূজা।

ব্রজমোহন রায় রচিত তাঁহার যাত্রা দলে গীত একটি বাণী বন্দনা উদ্ধৃত করা হইল—

বীণাপাণি বাক্‌বাদিণি, ব্রহ্মরূপিণি, মা,
ব্রহ্মসুতা বেদমাতা, বেদবিধি-বিধারিনি,
বিমল বদনি বরদে বাণি,
কি কব মহিমা, কোথা মা বাণী,
বর্ণনা করিতে বর্ণনা জানি,
যা বলাও বলি, যা শুনাও শুনি॥

প্রাচীন ভারতের শ্রমনীতি

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু

সুদূর অতীতেও ভারতের শ্রমনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তখন সভ্যতার আলোকপাত হয় নাই—এমন সময় খৃষ্টজন্মের প্রায় তিনশত বছর আগে ভারতের শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানা প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনেও সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী উপেক্ষিত হয় নাই। সামাজিক কল্যাণের জন্য, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে বৈষম্য দেখা না যায়, তার মূলসূত্র ও বিধিবদ্ধ হয়েছিল স্মরণাতীত কালে। এই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র নায়কেরা কর্মচারীদের মঙ্গল সাধনের দিকে অধিকতর নজর দিয়েছিলেন।

যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কথা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারাবিশ্বের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই প্রচেষ্টার নির্দেশ প্রাচীন ভারতেও পাওয়া যায় না—তা নয়। আজ হ'তে বাইশ শো বছর আগে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনীতি-বিদ ও রাজনীতিবিদ—যিনি কূটনীতিজ্ঞ বলে সমধিক সমাদৃত—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধানমন্ত্রী চানক্য তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। জগতের সে যুগে চানক্যের সমতুল্য মণীষা বিরল বলিলে অত্যুক্তি হবে না। কল্যাণ-কামী রাষ্ট্র-বাদ ও সমাজতন্ত্রের যে প্লাবন বর্ত্তমান যুগে এসেছে—চানক্যকে তার উৎস বলে অভিহিত করা যায়। তাঁর মতে প্রজার হিত ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই উদ্দেশ্যেই সে যুগে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের হয়েছিল সুব্যবস্থা। ধন-বণ্টন ব্যাপারে যাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তাদের প্রাপ্য অংশ পায় ও যাতে সমাজের মুষ্টিমেয় জন সংখ্যার হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত না হয়—সে দিকে লক্ষ্য রেখে ধনোৎ-পাদনের বিশিষ্ট উপায়গুলি রাষ্ট্রের হাতে ছিল ন্যস্ত। কৌটিল্য (এ নামেও চানক্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন) সর্ব-সাধারণের হিতার্থে কতকগুলি কাজ—যেমন দুঃস্থ, অভি-ভাবকহীন ও ভরণ-পোষণে অসমর্থ প্রজাদের জীবিকানির্বাহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এগুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় বলে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রের এবম্বিধ কার্যকলাপেই বর্ত্তমান যুগের সামাজিক নিরাপত্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-ভাগে বিভক্ত করেছেন ও প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার ভার একজন রাষ্ট্র-নিযুক্ত অধ্যক্ষের (Superintendent) উপর ন্যস্ত করেছেন। রাষ্ট্রের কতকগুলি বিভাগের অধ্যক্ষ—কোষাধ্যক্ষ, স্বর্ণাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, ইত্যাদি। অধিকতর কল্যাণমূলক নীতির উপর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠার দরুণ সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রনায়কদের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা বর্ত্তমান কালের ন্যায় অধিকতর জটিল আকার ধারণ না করার ফলে সমাজ-কল্যাণ সহজ-সাধ্য ছিল।

যদিও কৌটিল্য শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রমাধ্যক্ষ অথবা বর্ত্তমান কালের শ্রম-মহাধ্যক্ষের পদের সৃষ্টি করেন নাই, তথাপি তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের নিয়োগ প্রণালী, ন্যূনতম বেতন, কার্য্যকাল ও শ্রমিক কল্যাণমূলক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এই সব বিষয়ে, কৌটিল্য যা বিধিবদ্ধ করে গিয়েছেন—প্রকৃতপক্ষে সেই নীতিই অষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প বিদ্রোহের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় তৈরী হয়েছে। এ দিক দি'য়ে বিচার করলে দেখা যায়, জগতের শ্রমনীতির আদি স্রষ্টা চানক্য।

সে যুগে তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সৃষ্টি ও রাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল, কিন্তু পুরাপুরি ধনতন্ত্রের আমদানী হয় নাই। কাজেই তখনকার বেশীর ভাগ লোকের শোষিত হবার সম্ভাবনা কমই ছিল। ছোটখাটো শিল্পে দেশ ছিল ভরপুর। ফলে শ্রম বিরোধের বালাই কম ছিল। কৌটিল্য শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদির অবতারণা করেছেন, তা থেকে সে কালের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। তিনি অর্থশাস্ত্রে শ্রমিক,

চাকর, মজুর প্রভৃতি শব্দকে একই অর্থে সর্বত্র প্রয়োগ করেছেন। গায়ক, শিল্পী, চিকিৎসক, পাচক, পুরোহিত প্রভৃতি যারা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে শ্রমদান করতো—তাহাদিগকে ও শ্রমিক আখ্যা দিয়েছেন। উচ্চশ্রেণীর মাস মাহিনার কর্মী ও দৈহিক পরিশ্রমকারী সাধারণ মজুরের মধ্যে তিনি বিশেষ কোন প্রভেদ করেন নাই। বর্তমান কালের শ্রম-আইন সম্বন্ধে মাহিনার মানদণ্ডে ও কর্মের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে শ্রমিকের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। উচ্চ-শ্রেণীর চাকুরিয়া, অবশ্যই আজকালকার আইনের আওতার বাহিরে। এই দৃষ্টিভঙ্গী কালের অগ্রগতির পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নাই।

যদিও কৌটিল্যের নিকট তৎকালীন শ্রমিক শ্রেণী ন্যায় বিচার হ'তে বঞ্চিত হয় নাই, তথাপি তিনি শ্রমজীবী-দের শাসনের জন্য নানা দণ্ডবিধির পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কৌটিল্য নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রচলিত প্রথা বা চুক্তির দ্বারা মজুরী স্থিরীকৃত হবে। আজকালকার দিনেও মজুরী নির্দ্ধারণ কাজে এ পন্থাও অবলম্বিত হ'য়ে থাকে। মজুরী-সংক্রান্ত বিরোধের সালিসীর সাহায্যে নিষ্পত্তি হতো। বর্তমান যুগে সালিসীর মাধ্যমে শ্রমবিরোধের অবসান একটি সুপরিচিত পন্থা। অর্থশাস্ত্রে 'সঙ্ঘভ্রাৎ' শব্দ হ'তে তখনকার দিনের শ্রমিক সংস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকের মতে এর দ্বারা শিল্প-সঙ্ঘ বুঝায়। শ্রমিক সঙ্ঘ হিসাবে ইহাই জগতের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত।

সে যুগে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু বুঝাপড়া থাকার দরুণ একজোটে কাজ বন্ধ করা অর্থাৎ ধর্মঘটের (Strike এর) হিড়িক ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থা থাকার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভালই ছিল। সমাজকে শ্রমিকদের খেয়াল-খুসীর হাত হতে রক্ষা করায় জন্য কৌটিল্য কর্মীদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও কম কাজকরার (negligence and go-slow) প্রথাকে দণ্ডনীয় বলে অভিহিত করেছেন! আবার এখনকার দিনের মালিকের ইচ্ছা মতো কারবার বন্ধ করার (Lock-out) হাত হতে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য মালিককে তাঁর ইচ্ছাকৃত বন্ধ দিনের মজুরী দিতে বাধ্য করা হতো। অসঙ্গতভাবে লক্-আউট করার জন্য একালে মালিককে লক্-আউট কালীন যাবতীয় মজুরী দেবার ফল ভোগ করতে হয়। কৌটিল্যের যুগে কর্মীকে সময়মতো মজুরী না দিলে মালিক আইন মাফিক দণ্ডনীয় ছিল। এ প্রথা ও শ্রমিকদের অন্যান্য দমনবিধি বর্তমান কালের মজুরী দেওয়ার আইনের (Payment of wages Act-এর) পুরাতন দৃষ্টান্ত। ন্যূনতম বেতন (Minimum wages) হিসাবে সে কালের মজুর যা উপায় করতো, তাতে তার মোটাভাত কাপড়ের খরচ কুলিয়ে যেতো। মালিকের কারবারে অংশীদার হবার জন্য, কিংবা তাঁর মুনাফায় ভাগ বসাবার জন্য শ্রমিক কোনদিন আন্দোলন করে নাই। উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পে শান্তি চিরবিরাজমান ছিল। অধুনা জগতে শিল্পে গণতন্ত্রের আমদানী হয়েছে; ফলে শ্রমিক কারবার পরিচালনা করার ভার পাচ্ছে, আর তার মিলছে মালিকের মুনাফার অংশ। এত সব অগ্রগতির ফলেও শিল্পে শান্তি কই?

অন্তরঙ্গ

দিব্যেন্দু পালিত

আমার দু'চোখে তবু শ্রাবণের জল;—
প্রার্থনায় পরাজিত বৈরাগীর মতো:
ধু ধু মাঠ, শ্যাম-শূন্য পৃথিবী, উপল
পথ ভেঙে রাত্রি দিন হাঁটি অবিরত।
দিন যায়, রাত্রি যায় শূন্যতার মাঝে;—
হাঁপায় না, হারায় না আমার এ-মন

বিচিত্র ঐশী সুরে বাজে শুধু বাজে
কাহার প্রত্যাশা কাঁপে অন্তরে তখন!
কেই বা সে, জানিনা তা, সুদূর সময়ে
কাহার ব্যাপ্তি তবু আমাকে জড়ায়!
জীবনের সুখে দুঃখে যন্ত্রণা ও ভয়ে
আমার হৃদয়ে তার সুষমা ছড়ায়!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অসিত কোথায় হারিয়ে গেছিল। এতক্ষণে দেখি শ্রীমান হাতে একগাদা শেকড়, গাছ, লতাপাতা নিয়ে হাজির। প্যাণ্ট মুড়ে মুড়ে হাঁটু অবধি তুলেছে। অন্য হাতে চওড়া ফলার জগজ্জল এক ছোরা এবং একজোড়া কাঁচি। অপরূপ হয়েছে কাদা মেখে। মুখভরা আনন্দের ঢেউ।

"ওঃ অনেক স্পেসিমেন! দেখে এসেছি সব জায়গা। নামার পথে আরও নেবো। ঘোড়াওলাকে বখশিস্ কবুল করতেই এমন সব জায়গায় নিয়ে গেল, কি বলবো দাদা! ওরা যে সাহেবদের নিয়ে ঘুরতো। সুলুক-সন্ধান জানা আছে। কৈ বেণুদি, কি আছে বার করো, আমার খিদের জ্বালায় নাড়ী চুঁই চুঁই করছে।"

বেণু একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্পের রাবিশগুলোকে যতটা সম্ভব মনোহর করে সাজাচ্ছিল। অসিতের মন দাদার মনকে দেখে হাসছে। শয়তানের অগ্রগণ্য ছেলেটা।

এবার অসিত জোর গলায় ওর প্রসিদ্ধ হাসি হাঁকড়ালে একেবারে চিৎ হয়ে শুয়ে, ঘাসে গড়িয়ে পড়ে।

বেণুর জিজ্ঞাসার উত্তরে অসিত বললে—"দাদা করছেন ইকনমিক্যাল্ সংযম। তাই মজা দেখছিলাম বেণু-দি জানো। ঐ যে ছোটো ছোটো তাঁবুগুলো দেখছো না, ওর ভেতর গরম জল, চা, ডিম, মাংস ইত্যাদি আছে। আর এখানে এই আলুর ঘেঁট আর পুরীর 'খবেড়া'। দাদার ইচ্ছে—"

আমি ধমকে বলি, "যাঃ, অমনি দাদার ইচ্ছে। তোর বুঝি মোটেই ইচ্ছে নয়?"

হাসতে হাসতে বলছে, "আরে আমি কি আর বলছি আমার ইচ্ছে নয়? আমি তো খাদ্যলোলুপ সবার জানা; আপনারা যে সংযমের ভড়ং করেন—"

বেণু ব্যাগটা অসিতের হাতে দিয়ে বলে,—"আমারও তো বাপু ইচ্ছে করছে। যাওনা অসিত, দেখো না কি পাও।"

দু' চারটে ছোটো ছোটো ছাওলদারী। শ্রান্ত পথিকদের 'চা-মাখন-রুটী ইত্যাদি বিক্রয় করে। একটার মধ্যে গরীবদের চায়ের আড্ডা। কাশ্মীরী সবুজ পাতা চা, নুন দিয়ে সেদ্ধ করে খাচ্ছে 'সইস্'গুলো। আমাদের 'সইস্'রা এসে বল্লে "চা খাবার জন্য কিছু দাও।" চার আনা করে দেওয়া গেল। পরে জেনেছিলাম কাশ্মীরে ভাড়া ইত্যাদি যা করার করতে হয়, তদুপরি এই বখশিসের বালাই গায়ে মাখতে হয়। পদে পদে পানটা, সিগারেটটা, দু-আনা, চার-আনা খুচরো, এ আছেই।

উত্তর দিকটায় মস্ত একটা খোলা জায়গা। মেঘে খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খালি জায়গাটা বিস্তৃত বলেই নজরে পড়ে। তারপরে বিরাট পর্বত শ্রেণীর মধ্যে পিরামিডের মতো তীক্ষ্ণ, উচ্চ এক গগনস্পর্শী শৃঙ্গ। এই বিস্তৃত সমতল কিছুই নয় উলার হ্রদ। তার ওপারে ঐ গিরিরাজটী আর কেউ নন্ নাঙ্গা পর্বত। বেশ চোখে পড়ে, বেশ দেখা যায়। উলারের জলরাশি ৭৮ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ এবং নাঙ্গা পর্বত ২৬,৬২০ ফুট উঁচু।

অসিত ফিরে এলো শুধু হাতে। "কণামাত্র নেই। আছে কচু। যে সব পঙ্গপাল নিয়ে আসা গেছে।"

বেণুর ব্যাগ বেণুর কোলে ফিরে এলো। আচারের টাক্না আর সেদ্ধ ডিমের গুঁতো দিয়ে সেই রাবিশগুলো পেটে পুরলাম। ঝরণার জল নিয়ে খেলাম। এতো ঠাণ্ডা যে খেতে কষ্ট হোলো।

আজ খেতে খেতে সন্দেহ হোলো—খাবারটায় যেন পচা চর্ব্বির গন্ধ! এই খাবার জন্য এতো জঘন্য লাগছে।

খাবার দিকে আর মন নেই। মন এখন ঐ ছেলেদের আনন্দ আর খেলার দিকে। দলে দলে ছেলে আর মেয়ে উঠে গেছে খিলানমার্গের চূড়ায়। সেখান থেকে গড়িয়ে নামছে বরফের ঢালের গায়ে গা এলিয়ে। এমন বরফ নিয়ে খেলা তো ওদের ভাগ্যে এর আগে জোটেনি। যেন কি পেয়েছে ওরা। মাঝে মাঝে এই সবুজ ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করছে। প্রকৃতির এই শান্ত-গম্ভীর চেহারার আওতায় পড়ে ওদের সেই তখৎ-ই-সুলেমানের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস নেই যেন। আমি আর কিছুতে মন দিতে পারছিলাম না। সারা রাস্তায় নামার পথে, গুলমার্গের প্রান্তরে, আমাদের বাচ্চারা যেন পরিয়ে দিয়েছিলো উৎসবের দিনে পরিয়ে-দেওয়া রঙীণ কাগজের শিকল। খিলানমার্গের চূড়া থেকে গুলমার্গের গোড়ায় সেই হোটেলটি পর্য্যন্ত এই কিশোর কিশোরীর রঙীণ শিকল পরম উল্লাসে দুলছে।

গুলমার্গে এসে আবার পেলাম বারিপাত। এর আগেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেল বেণু; পড়ে যাওয়া নয় তো, সেটা যেন একটা শয্যা বিলাস। সবাই হাসলো, যেন আনন্দে অবগাহন সেটা। ছোটো ছোটো ছেলেরা ফূর্ত্তির সঙ্গে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে ঘোড়ায়। চা খেলাম আর গান শুনলাম আমার ঘোড়ার সইসটার কাছ থেকে। কিছুতেই গাইতে চায়না, এমন লজ্জা ওর। চমৎকার ইংরাজী বলছে। বল্লে, ইংরাজী

আসলে ক্রমাগত ইংরেজদের খিদমৎ করে ভাষাটা জেনে নিয়েছে প্রাণের দায়ে। গুলমার্গের বেশীর ভাগ সইস্ই ইংরাজী জানে। গুলমার্গ যে ইংরেজদের কলোনী হবার উপক্রম হয়েছিল, কে-না বলবে ?

"তোরই ঘোড়া ?"

"কোত্থেকে হবে বাবু ?"

"কার তবে ?"

"মালিকের। সেও কাশ্মীরী আর আমারই মতো মুসলমান।"

"কত ঘোড়া আছে তার ?"

"এক এক জনার ত্রিশটা চল্লিশটা ঘোড়া। আমরা যা পাই তার ওপর টাকায় চার আনা পাই। বাকী আপনারা যা বখশিস দেন !"

অবাক্ মানি। এরা ওঠানামা করবে। অথচ পাবে টাকায় চার আনা। বারো আনা ওর সেই প্রভুর। প্রচুর ঘাস পায় গুলমার্গে, তাই খাস্ত বেশী লাগে না। লোকটার লাল হয়ে যাবার কথা !

"কিছু হয় না বাবু ?

"কেন ?"

"মদ আর জুয়া। একটাও মালিক বড়লোক নয়।"

"বড়লোক কাকে বলিস তুই ?"

"দুবেলা খায়, ভালো জামা কাপড় জুতো পরে, মাংস খায়, খানা খায়, বিস্কুট খায়, টিনের খাবার খায়......"

খাবার ফর্দ্দ ধরে ধনের বিচার ! কতই বুভুক্ষু ওরা। গৃহ নয়, জমী নয়। বিলাস নয়—কেবল খাওয়া।

"গান গা তো, তোদের দেশের গান !"

লজ্জায় মরে যায় ! গান গাইতে চায় না। অতি কষ্টে বখশিস্ কবুল করতে গান গাইতে লাগলো ;—

কেন বলো প্রিয়া ফেলে চলে গেছে ফিরবেনা
কেন বলো তার আঁখি ছলো ছলো মুছবেনা।
কাঁদেনি কখনো যাবার বেলায়
হাসি আছে তার ফুলের মেলায়,
আছে কমলের বনের রঙেতে—ঘুচবেনা
ভুলে গেছে সব কেন বলো শুধু ? ভুলবেনা।
ঐ তার শাড়ী বিছানো বনের কোলে,
পায়ের ঘুঙুর বাজে শোনো নদী জলে,
নার্গিশে তার চোখের ইশারা হরচেনায় মন,—ভুলবেনা।
কেন বলো তবু সে আমার নেই—ফিরবেনা ?

অনেক কষ্টে গানের মানে বুঝিয়ে দিলো। ধরে রেখেছি মানে অনেক কষ্টে। কার গান ? কার গান ? সেই হাব্বা। "আচ্ছা হাব্বা ছাড়া আর গান জানিস ?"

গাইতে লাগলো—

মন্দিরে যে পাষাণ পেলি দেবতাতে সেই পাষাণ ওরে
পাষাণে তোর বুক বাঁধা কি ? দেনা সকল পাষাণ করে
বোকার মতো কারে পুজিস্
কোন্ পাষাণে কারে খুঁজিস্
সকল পাষাণ এক-করা সেই পুজিস পরম দেবতারে
বেদীতে যে পাষাণ দেখিস্ সেই পাষাণই বক্ষ পেতে
পথের পরে শুয়ে চরণধ্বনি শোনে নীরবেতে
যাঁতার কলে পাষাণ পেষে
বিগ্রহে সেই পাষাণ শেষে
এক হয়ে যায়, জানিস্ কি তুই, শুধাস গোপন অহঙ্কারে
মনের কাছে গুরুর খবর কারে খুঁজিস্ বারে বারে।"

এ আবার কার গান ?

"লাল দীদ" (ক্রমশঃ)

নদী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাত্রির রঙীণ-ছাঁচের গান ঝরা নদী
নাম লেখে যদি,
কথার করুণ আঁচের আলপনা দিয়ে :
জানো সে থামবে কোথায়, কোন দেশে গিয়ে ?
কি যেন, কি যেন তার নাম ভুলে গেছি,
হয়ত বা হৃদয়ের আরো কাছাকাছি
কোন নীল নির্জনে, পাতার শিশিরে,
সব রঙ মিশে আছে রূপের গভীরে।
প্রবাল দ্বীপের রাণী ধর তার নাম,
সিকিম ভুটান কিংবা ভাবের আসাম
পার হ'য়ে এসেছিল স্নেহ-স্মৃতি নিয়ে ;
জানো কোথা চলে গেছে, কোন পথ দিয়ে ?
আজ নয়, কাল নয়, চেতনার ভোরে—
ক্যানারী হিলের লাল আলো জ্বালা ঘরে,
রেংগুণে বার্মায়, সিংহলে এসে
কুমারিকা, জাভা, বালি আরো দূর দেশে
ম্যাপের ছবির মত—কবিতার রথে,
নদী বেয়ে চলে গেছে সিঁড়ি-ছায়া পথে।
তোমায়, আমায় ডাকা অভিমানী প্রিয়ে,
জানো, কোন্ দেশে আছে, কোন আশা নিয়ে ?

এক

সঙ্কর্ষণ রায়

বা/গানে জিনিয়া, আইপোমিয়া, পিটুনিয়া ও কসমসের সমারোহ। হলদে, লাল ও বেগনি রঙ সন্ধ্যার রোদে জ্বল-জ্বল করছে। ফুলের বেড়গুলির চার পাশে সবুজ লন। বেতের চেয়ার টেনে বাগানের এক কোণে ব'সে আছে বীথিকা ক্যালকুলাসের বই নিয়ে।

ইন্টিগ্রেশনের একটি প্রবলেম কষবার চেষ্টা করছিল বীথিকা। সংখ্যাতত্ত্বের জটিল সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি সে ভাবছে। 'জিরো' থেকে 'ইনফিনিটি'—সংখ্যার বিপুল সমুদ্রের অতলে সে তলিয়ে আছে। সংখ্যাগুলোর পারম্পর্য কৃত্রিম কি না-ভেবে সে দিশেহারা। সংখ্যায় সংখ্যায় ক্ষুদ্রতম পার্থক্য কী? ক্ষুদ্রতম সংখ্যাই বা কোনটি?

সামে বাগানে সবুজ, লাল, বেগনি ও হলদে রঙে মিলে মিশে যে রঙের ঐকতান শুরু হয়েছে, ক্যালকুলাসের পাতা ডিঙিয়ে তার খবর নিতে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে না বীথিকার চোখ দুটি।

বীথিকার পাশে ব'সে আছে তাপস। স্ট্যাটিস্টিক্সের সেরা ছাত্র ছিল—এখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটে রিসার্চ করছে। গালে হাত দিয়ে সে ফুলের বেড়গুলির দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভাবছিল, ফুল ফোটে কেন? ক্যালকুলাসের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলার পাশে ফোটা ফুলের বৈচিত্র্যের স্থান আছে কী?

বাতাসে অল্প অল্প কাঁপে জিনিয়া ও কসমসের পাপড়িগুলি। লাল ও হলদে রঙ স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। পশ্চিম আকাশের আবীর রঙের ছোঁয়া এসে লাগছে বর্ষাপুষ্ট সবুজ পাতাগুলোতে। তাপসের মনে হ'ল, এমন রঙিণ সন্ধ্যা আর বুঝি সে কখনো দেখে নি।

তার জীবনের এমি রঙিণ মুহূর্তগুলি সংখ্যাতত্ত্বের দেয়ালে আর কতকাল নিষ্ফল মাথা কুটবে? আর কত দিন ফর্মুলা-নিবিষ্ট শীতল সান্নিধ্যের পাশে তার ব্যর্থ প্রতীক্ষার কঠিন পরীক্ষা চলবে।

এক ঝলক সোনালি রোদ বীথিকার মুখে এসে পড়েছে। ফুলের পাপড়ির চেয়েও কোমল মুখশ্রীতে সন্ধ্যার মেঘের লাবণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকক্ষণ অনিমেষ চোখে চেয়ে দেখল তাপস। তারপর ঈষৎ কাঁপা গলায় ডাকল, বীথি!

ক্যালকুলাস থেকে মুখ তুলে তাকাল বীথিকা। আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটিতে সমুদ্রের গভীরতা—অথচ কী হিম-শীতল চাউনি!

বীথিকা বললে, কী বলছ?

তাপস বললে, বলছিলাম—মানে বলতে চাই আর কি যে, কী সুন্দর সন্ধ্যাটি!

ও।—ব'লে বীথিকা আবার ক্যালকুলাসে মন দেয়।

দিনরাত তো অঙ্ক কষছ। ঐ ক্যালকুলাসে যতটা মন দিচ্ছ তার শতকরা এক ভাগ অনুগ্রহও যদি আমাকে করতে! তোমার ঐ ক্যালকুলাসের বইয়ের একটি পাতা হ'লেও যেন বর্তে যেতুম।

বাজে কী সব বকছ!—বীথিকা বই থেকে মুখ না তুলেই বলে।

বাজে বকছি! আমার প্রাণের আসল কথাটি বললুম—আর তুমি বলছ কিনা বাজে বকছি।

ব্যাপার কী বলো তো? প্রোপোজ করবে না কি!—মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বলে বীথিকা।

যদি করি!

নিরুত্তাপ কঠিন স্বরে বীথিকা বললে, কোরো না। দেখো তাপস, তুমি আমার বন্ধু—তোমার সাহচর্য আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আমাদের এতদিনের সহজ

সৌহার্দের সীমানা লঙ্ঘন করতে যেয়ো না। বেশি লোভ করতে গেলে সবই হারাবে।

কতটুকু পেয়েছি যে হারাবো!—কাতর স্বরে তাপস বললে। তোমার অঙ্ক কষার সঙ্গী আমি—আমাদের সম্পর্কটা—

তাপসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বীথিকা বললে, পুরোপুরি ম্যাথমেটিক্যাল। এ ছাড়া আর কী সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে বলো তো? তুমি তো জান, আমার মন-প্রাণ সব ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফিতে সমর্পণ করেছি। আমার জীবনে আমার রিসার্চ ছাড়া আর কিছুরই ঠাঁই হ'বে না। তোমায় তো কতবার বলেছি যে আমার জীবনের ভাগ আমি কাউকেই পারবো না দিতে—আমি একা থাকতে চাই।

একা থাকতে চাও! কিন্তু একদিন যখন অতল নিঃসঙ্গতাবোধ তিলে তিলে তোমাকে গ্রাস করবে—

আমি তা'ই চাই তাপস। চরম নিঃসঙ্গতাবোধের মধ্যেই আমার জীবনের পরম সার্থকতা। পুরোপুরি অহং-বোধ অর্জন করাই হ'ল আমার লক্ষ্য। 'থিয়োরী অব্ নাম্বার্সে'র মধ্যে সবচেয়ে প্রবলেম কোনটা জান? 'নাম্বার' গুলোর ডেফিনিশন। পুরোপুরি ডিফাইন্ড্ এমন কিছুই নেই যা দিয়ে ডেফিনেশন শুরু করতে পার। 'একের' ডেফিনিশন কী হ'তে পারে ভেবেছ কখনো?

তাপস খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললে—না। ম্যাথমেটিক্যালি সঠিক ডিফাইন করা যায় ব'লে শুনিনি। কিন্তু বীথি, তুমি যা বলতে শুরু করেছিলে—তার সঙ্গে একের ডেফিনিশনের সম্পর্কটা ঠিক—

বীথিকা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, সম্পর্ক রয়েছে ব'লেই বলছি। আমার রিসার্চ প্রবলেম আমার জীবনের প্রবলেম। থিয়োরী অব্ নাম্বার্সে'র চুলচেরা বিচার আমি করব। সংখ্যাগুলোর সংজ্ঞা খুঁজব। গাণিতিক সংজ্ঞার দার্শনিক ব্যাখ্যা করব। শুরু করব 'এক' থেকে। প্রথমেই আমাকে জানতে হ'বে 'এক' কী? ফিলজফিক্যাল ম্যাথমেটিক্সের বিচার—কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। আমার অস্তিত্বের মধ্যে চরম আত্মকেন্দ্রীভূত সত্তাকে আবিষ্কার করতে হবে। ভেবো না, এ আমার তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা। যাকে ডিফাইন করতে চাই তাকে জীবন দিয়ে অনুভব করব। 'ওয়ান্‌নেস্' এর বোধ থাকলে 'ওয়ানের' ডেফিনিশন উপলব্ধি করব কী ক'রে? আমাকে অনুভব করতে হ'বে যে আমি একা—চরম একা।

হেঁয়ালি ছড়াচ্ছ বীথি—কিছুই বুঝতে পারছি না—কী বলতে চাও তুমি।

বীথিকা রাগ ক'রে বলে, কাজ নেই বুঝে। শুধু এইটুকু বুঝে রাখো যে ইউ শুড্ লিভ্ মি এলোন।

উঠে দাঁড়াল তাপস। মুখে কষ্টকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে সে বললে, তাই হোক। তোমার একাকীত্বের মধ্যে আর নাক গলাতে আসবো না। কিন্তু আমার সাহচর্য তোমার কাছে খুব মূল্যবান বলেছিলে কেন বলো তো? আমার সঙ্গ তোমার ওয়াননেসের উপলব্ধিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, তা' কী জানো না?

বীথিকা ব্যস্ত হ'য়ে বলে, ম্যাথমেটিক্যালি তোমাকে আমি চাই। সত্যি তাপস, অনেক প্রবলেম্ আছে যা' তোমার কাছ থেকে বুঝে নিতে হ'বে। না, না, তুমি যেও না।

তোমার থিয়োরী অব্ নাম্বার্স আমার বোধের অগম্য। প্রবলেমগুলো নিজে নিজে সল্‌ভ্ ক'রে নাও—আর কেউ ক'রে দিলে তোমার ঐ চরম ওয়াননেসে কদাপি পৌঁছুতে পারবে না—একের সংজ্ঞাও খুঁজে পাবে না। চলি আমি।

তাপস চ'লে গেল। তার গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ক্যালকুলাসে মন দিল বীথিকা।

দিন কয়েক বাদে য়ুনিভার্সিটির প্রফেসার নিয়োগী বীথিকাকে ডেকে বললেন, চিরদিন পিওর ফিলজফির চর্চা ক'রে এসেছি। ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি বুঝি না। তুমি যে বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাও, ওটা হাইয়ার ম্যাথমেটিক্সের ব্যাপার। তুমি বরং ম্যাথমেটিক্সের রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা কর।

বীথিকা বলে, কিন্তু আমার সাবজেক্টটা তো ফিলজফিই। ওটা তো ফিলজফিক্যাল ম্যাথমেটিক্স নয়, ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি।

ও সব আমি বুঝি নে মা। শুধু এইটুকু জানি

যে তোমার ঐ থিয়োরী অব্ নাম্বার্স বেদান্ত, ন্যায় বা বৈশেষিকের সঙ্গে খাপ খাবে না। আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্যই তুমি পাবে না। এ হেন অবস্থায় কী ক'রে তোমাকে কাজ করতে দিই বলো? সিণ্ডিকেট যদি টের পায় স্কলারশিপটাই দেবে বাতিল ক'রে।

কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বীথিকা বলে, তা হ'লে কী হ'বে স্যার! আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করব ব'লেই ফিলজফির পরই ম্যাথমেটিক্সে এম-এ পড়লাম। আপনিই তো আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন—বলেছিলেন, হাইয়ার ফিলজফি বুঝতে হ'লে ম্যাথমেটিক্স পড়া দরকার।

ডক্টর নিয়োগী বিব্রত হ'য়ে বলেন, তা' না হয় বলেছিলাম। কিন্তু যে সাবজেক্ট তোমাকে আমি গাইড করতে পারবো না, 'সে' সাবজেক্ট নিয়ে তোমাকে রিসার্চ করতে দিই কী ক'রে?

জলভরা চোখে নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত ডক্টর নিয়োগীর মুখের পানে চেয়ে থেকে বীথিকা বললে, আপনার কী আমার ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই স্যার? আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি কারুর সাহায্য চাই নে।

কিন্তু পুরোপুরি তোমার ওপর ছেড়ে দিই কী ক'রে? স্কলারশিপটা তো আমারই আণ্ডারে কাজ করার জন্য।

বীথিকা জলভরা চোখে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল—কিছু বললে না।

অবশেষে ডক্টর নিয়োগী কিছুটা নরম হ'য়ে বললেন, ডক্টর রূপক মিত্রকে চেন? সম্প্রতি রিডার হ'য়ে এসেছেন। বন য়ুনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছিলেন তিনি—ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি নিয়ে কাজ করছিলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা কর। উনি যদি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হন তা' হ'লে স্কলারশিপটা তোমাকে আমি দিয়ে দিতে পারি।

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে বীথিকার মুখ। ডক্টর রূপক মিত্রের কথা সে শুনেছে। বন্ য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে তিনি যে বিশেষ নাম করেছিলেন তা সে জানে। শুধু সে জানত না যে ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি নিয়ে তিনিও কাজ করছেন।

সে তৎক্ষণাৎ গেল রূপক মিত্রের ঘরে।

ঘরের মাঝখানে মস্ত টেবিল—তার ওপর স্তূপীকৃত অসংখ্য বই। বইগুলো প্রায় দেওয়ালের মত আড়াল ক'রে রেখেছে রূপককে।

টাইপ-করা একরাশ কাগজ সামনে নিয়ে ব'সে আছে রূপক। নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ছে—বীথিকার পায়ের শব্দ তার কানেও যায় নি।

বীথিকা অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখল রূপককে দেখল, ইস্পাতের বলিষ্ঠতার ওপর অগ্নিশিখার স্বাক্ষর—ধ্যানমৌন আত্মভোলা মুখখানিতে গলা সোনার দীপ্তি। দেখে গা শিউরে ওঠে। এমনটি কখনো দেখেনি—বুঝি কল্পনাও করে নি।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বীথিকা—ডেকে কথা বলবে সে সাহস হ'ল না তার।

প্রায় মিনিট পনের বাদে রূপক মুখ তুলে তাকাল—ইস্পাত-শীতল ধারালো চোখের দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়তে বীথিকার বুক কেঁপে ওঠে।

কী চাই?—রূপক ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে—

আপনার কাছে এসেছিলাম।—বীথিকা মাথা নিচু করে বলে—গলার স্বর রীতিমত কাঁপে তার।

তা তো দেখতে পাচ্ছি।

মানে এই—থিয়োরী অব্ নাম্বার্সের ওপর রিসার্চ ক'রব ভেবেছি। একটা রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ডক্টর নিয়োগী বলেছেন যে যদি আপনি আমাকে গাইড করেন তিনি স্কলারশিপটা আমাকে দিতে পারেন।—কথা কটি ব'লে বীথিকা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রূপক বললে, রিসার্চের ব্যাপারে কাউকে গাইড্ করি না আমি। তা' ছাড়া গাইডেন্সের দরকার কী? সত্যিকারের তাগিদ থাকলে নিজে নিজেই রিসার্চ করতে পারবেন। আমি নিজে কারুর কাছে গিয়ে গাইডেন্স ভিক্ষা করি নি—আই হেট্ ইণ্টারফিয়ারেন্স!

কিন্তু ডক্টর নিয়োগী বললেন যে কেউ যদি গাইড না করেন তিনি আমাকে স্কলারশিপটা দেবেন না!

দি ওল্ড ফুল!

কী বললেন স্যার!—বীথিকা চমকে উঠে বলে।

বলছিলাম যে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।—ব'লে রূপক তার কাজে মন দিল।

কিন্তু আমি কী করব স্যার!—বীথিকা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে।

মুখ না তুলেই রূপক বললে, কাজ করুন গে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন। কারুর কাছে যেতে হ'বে না।

কিন্তু ডক্টর নিয়োগী যে আমাকে স্কলারশিপ দেবেন না!

রূপক মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বীথিকার মুখের ওপর। তারপর বললে, আমাকে কী করতে বল্লেন আপনি?

মাথা নীচু ক'রে বীথিকা বললে, অনুগ্রহ করে ডক্টর নিয়োগীকে একবার আপনি বলুন যে আপনি আমাকে গাইড্ করবেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনাকে কখনো আমি বিরক্ত করতে আসবো না। আমি নিজে নিজেই কাজ করব।

খানিকটা ভেবে রূপক বললে, বেশ বলব আমি ডক্টর নিয়োগীকে। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবেন না আপনি। কখনো কোন সময়েই কোন বিষয়েই আলোচনা করতে আসবেন না। আই—ওয়াণ্ট টু-বি লেফ্‌ট্ এলোন—এ্যাব্‌সোল্যুট্‌লি এলোন। বাই দি ওয়ে—আপনার নামটা কী?

বীথিকা রায়।

নোট ক'রে নিলাম। ভাল কথা—কী প্রবলেম নিয়ে আপনি কাজ করবেন?

ডেফিনিশন অব্ নাম্বার্স।

রূপকের ঠোঁটের কোণে ক্ষুরধার হাসি ঝিলিক দেয়—সে বললে, ঐ নিয়ে তো আমিও কাজ করছি। তাতে অবশ্য কিছু যাবে আসবে না। আপনি স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে যান।

নিমেষে বীথিকার সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে গেল। নিষ্প্রভ মুখে সে বললে, আপনার থাসিসের পাশে আমারটা যে একেবারে—

রূপক বীথিকার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিদ্রূপ ছিটিয়ে বললে, গোড়াতেই থাসিসের কথা ভাবছেন! ভয় নেই—ডক্টরেট পেয়ে যাবেন।

বীথিকা অধীর হ'য়ে বলে, আপনি কী লাইনে এ্যাপ্রোচ্ করছেন সেটা না জানলে হয়তো আমার কাজটা আপনার কাজের সঙ্গে ক্ল্যাশ করবে।

রূপকের চোখ দুটি জ্ব'লে উঠে। সে বললে, আমার কাজ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। সত্যিকারের মৌলিকতা থাকলে ওরিজিন্যাল কিছু অনায়াসে দাঁড় করাতে পারবেন। তা' যদি না থাকে, এ কাজে হাত না দিলেই ভাল।

মাথা নীচু ক'রে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বীথিকা।

রূপক বললে, এখন আসুন আপনি। আর মনে থাকে যেন, আই হেট্ ইণ্টারফিয়ারেন্স—আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না কখনো।

বীথিকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

স্কলারশিপ পেয়ে যায় বীথিকা। ডক্টর নিয়োগী বললেন, রূপক যে তোমাকে গাইড্ করতে রাজি হ'বে তা' আমি' আদৌ ভাবি নি। রণেন ও জয়শ্রীকে তো সে হটিয়েই দিয়েছিল। মনে হ'চ্ছে, সে তোমার ওপর ইম্প্রেস্‌ড্ হ'য়েছে।—ব'লে ডক্টর নিয়োগী হাসলেন।

উদ্দাম হ'য়ে ওঠে বীথিকার বুকের রক্তস্রোত। ইম্প্রেস্‌ড্ হয়েছেন! অথচ ইস্পাত-শীতল চোখ দুটিতে তার কোন আভাসই তো ছিল না। অতলান্ত সমুদ্র-গভীর দৃষ্টিতে আত্মকেন্দ্রিক সত্তা যেন বিশ্ব-সংসারের সকলের প্রতি অবজ্ঞা হানছে—শুধু বিদ্রূপের বক্রতা—আত্মসর্বস্ব অসহিষ্ণুতা!

স্কলারশিপ পেয়ে যতটা খুশি হওয়া উচিত ছিল—হ'তে পারল না বীথিকা। যে কাজ তার সমস্ত জীবনকে অধিকার করবে ভেবেছিল—তা' যেন তার অধিকারের সীমানার বাইরে চলে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের সূক্ষ্ম পথে বিচরণ তার অগোচরে অনেক আগেই শুরু করেছে রূপক—হয়তো সে তার লক্ষ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তার নিঃসঙ্গ বিচরণের পথ সে কল্পনাও করতে পারছে না। সে কী ক'রে জানবে—কোন উপলব্ধির আলোয় আলোয় আর সকলের দুর্বল প্রয়াসের ওপর ভাস্বর উঠেছে তার অবজ্ঞা। সেই একক আত্মকেন্দ্রীভূত সত্তা কোন সুদূর স্বর্গের আলোর প্রদীপ জালিয়ে রেখেছে!

লাইব্রেরীতে রেফারেন্স বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাথিকা

বুঝল যে এক অতি অসাধ্য সাধ সে তার অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্য মনের মধ্যে পুষে এসেছে এতদিন।

বীথিকা অস্থির হ'য়ে উঠে। কী করবে সে? কোথা থেকে শুরু করবে তার কাজ? এতদিন যা স্পষ্ট ছিল তা' যেন ক্রমশঃ কুয়াশায় ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে। মোটা মোটা বইগুলোর অক্ষরের কালিমার সমুদ্রে কোথাও যেন আলোর স্ফুলিঙ্গটুকুও নেই—শুধু আঁধার।

কান্না পেল বীথিকার। রূপক যদি সাহায্য না করে, কী ক'রে কোথা থেকে শুরু করবে সে তার কাজ?

আবার এল সে রূপকের ঘরে। রূপক ইজিচেয়ারে—আধশোয়া হ'য়ে বিলিতী একটি জার্ণালের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বীথিকা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ তুলে তাকাল। বীথিকার আর্ত্ত-করুণ চোখের চাহনির সম্মুখে শীতল মর্মভেদী দৃষ্টি তলোয়ারের মত ঝলসে ওঠে। থর থর ক'রে কাঁপে বীথিকা।

রূপকের চোখ দুটি থেকে নিষ্করুণ অবজ্ঞা নির্মম জ্বালা ছিটিয়ে বীথিকার অস্তিত্ববোধকে যেন পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে চায়।

রূপক বললে, স্কলারশিপ তো পেয়েছেন—আবার এসেছেন কেন? আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে আমার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার প্রত্যাশা রাখবেন না আপনি?

বীথিকা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখ দুটিতে অনেক কান্না-জমাট-বাঁধা ছায়া সঙ্কেত। আত্মসংবরণ ক'রে সে বললে, বলেছিলেন। কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি না কোথা থেকে আমার কাজ শুরু করব!

অবশেষে!- রূপক হেসে ফেললে। সে হাসি যেন হাজার হাজার ছুঁচের মত তার সর্বাঙ্গ বিঁধে ফেলে।

রূপক বলে চলল, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন তো যে সাধ থাকলেও সব সময় সাধ্য থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে খুব একটা কঠিন বিষয় নিয়ে কাজ করবেন ভেবেছিলেন। বুঝতে পারছি না কী ধরণের মনোবিলাস এটা আপনার!

দুঃসহ অপমানের বৃশ্চিক জ্বালা নীরবে হজম করল বীথিকা। চরম অবমাননার জন্য যেন প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে সে।

বীথিকা বললে, মনোবিলাস নয়, সত্যিসত্যিই রিসার্চ করতে চেয়েছিলাম। ফিলজফির সঙ্গে ম্যাথমেটিক্সের চর্চা আন্তরিকভাবেই করেছিলাম। থিয়োরী অব্ নাম্বার্স সম্বন্ধে আমার উপলব্ধির স্বচ্ছতা সম্পর্কে এতদিন কোন সন্দেহের অবকাশ হয় নি। নাম্বার্সের চুল চেরা-ডেফিনিশন কি ভাবে সম্ভব তা'-ও যেন জানতুম। কিন্তু এখন হঠাৎ সব কিছু যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছি না কোথা থেকে আমার কাজ শুরু করব।

দেখুন মিস রায়, অজ্ঞাতকে জানবার জন্যই রিসার্চ। সামনের আঁধারের পানে আলোর পথ তৈরী ক'রে এগুতে হ'বে। আঁধারে আলোক সম্পাতই হ'ল রিসার্চ। কিন্তু অন্ধকারকে দেখে ভয় পেলে মুশকিল। আপনার ভেতরকার আলো হয়তো এই ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে যাবে।

বীথিকা ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, তাই হ'য়েছে ডক্টর মিত্র—আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই হ'য়েছে! আমার আঁধারের মধ্যে আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি। দয়া ক'রে আপনার আলো দিয়ে আমাকে পথ দেখান।

রূপক গম্ভীর গলায় বললে, সে হয় না। রিসার্চ স্পুন-ফিডিং নয়। আপনাকে আপনার নিজের আলোয় পথ দেখে নিতে হ'বে। আমি নিজে কারুর কাছ থেকে পথের হদিস নিই নি। নিলে সে আমার পথ হ'ত না। গতিশীল মন আপনার পথ আপনি ক'রে নেয়। মনটা জড়বৎ হ'য়ে গেলে হাজার পথ দেখালেও সে পথের সন্ধান পাবে না। তা' ছাড়া প্রত্যেকের নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্রে তাকে একলা চলতে হ'বে—সেখানে আর কারুর স্থান নেই—হ'তে পারে না। যে একা চলতে ভয় পায়, তার পক্ষে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। আমার নিঃসঙ্গ বিচরণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে বা কাউকেই আমি সাহায্য করতে পারবো।

রূপকের জলদ-গম্ভীর গলার স্বর ঘরের ভেতরে গম্ গম্ করে। কথা তো নয়, যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। রূপকের সমস্ত মুখখানা অগ্নিস্নাত ইস্পাতের মত ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। বীথিকা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে—তার মুগ্ধ চোখে জলে আলোর বন্দনা।

বীথিকার চোখে চোখ পড়তে চমকে উঠল রূপক। হঠাৎ যেন একটা অনস্থভূত আবেগ তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংবরণ ক'রে সে বললে, রিসার্চ আপনি করতে পারবেন না মিস রায়।

কেন ?—বীথিকা চমকে উঠে বলে।

নিঃসঙ্গ পথচলা আপনার পক্ষে কঠিন।

বীথিকা আহতকণ্ঠে বলে, আমার অনেক দিনের সাধ ডক্টর মিত্র !

রূপক তিক্তস্বরে বলে, দুধের সাধ মেটাতে দুধ সব সময় আয়ত্তের মধ্যে আসে না মিস রায়। ঘোল দিয়ে সে সাধ মেটান। যে কোনও একটা মাইল্ড টপিক্সের ওপর থীসিস খাড়া করুন—সহজেই পেয়ে যাবেন ডক্টরেট।

ডক্টর মিত্র !—কান্নার উচ্ছ্বাসে বীথিকার গলার স্বর অবরুদ্ধ হ'য়ে আসে।

রূপক দেখল অশ্রু-আকুল চোখ দুটির মৌন আবেদন যেন সজল মেঘের মায়াকে ফুটিয়ে তুলেছে।

কিছুটা নরম হ'য়ে রূপক বললে, ডিস্‌কারেজ করব না আপনাকে। চেষ্টা করুন—হয়তো পেয়ে যাবেন পথের হদিস। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবেন না।

পাংশু মুখে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে রূপকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বীথিকা।

রেফারেন্স বই স্তূপীকৃত হ'ল বীথিকার টেবিলে। পড়াশুনা ও অঙ্ককষার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সে। মস্তিষ্ককে সূক্ষ্মতম চুলচেরা উপলব্ধির পথে সজাগ করবার চেষ্টা করে সে। জটিল সব ফর্মুলার প্রতিটি ধাপ মেপে এগুতে চায়—সে জানে যে সামান্যতম ভুলও তাকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করবে।

নিত্য সজাগ নীরস পথ চলা—বর্ণহীন এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে জীবনটাকে পিষে ফেলা—বীথিকার মনে হ'ল এর চেয়ে নির্মমতর আত্মশাসন বুঝি কল্পনা করা যায় না।

রূপক নিষ্ঠুর! সে কী বোঝে না এ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তার ধাপে ধাপে কী যন্ত্রণা। এতটুকু সমবেদনা নেই ওর মনে!

নিরালম্ব শূন্যতাবোধ বীথিকাকে ঘিরে ফেলে। রিসার্চ তো নয়—দুরাশার পাষাণ স্তূপে নিষ্ফল মাথাকোটা।

শেষ পর্যন্ত বীথিকা বুঝল যে সে পারবে না—সাম্নের অতলস্পর্শী আঁধারকে আলোক চিহ্নিত করতে সে অক্ষম। সংখ্যাতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিজেকে দিশে-হারা বোধ করে সে।

রূপকের কাছে এসে বীথিকা বললে, আমি পারবো না স্যার। থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চ করার ক্ষমতা যে আমার নেই, তা' এখন বুঝতে পেরেছি।

বীথিকার শুকনো বিবর্ণ মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে রইল রূপক। তারপর সে হেসে বললে, কী ক'রে বুঝলেন যে আপনার ক্ষমতা নেই? না আমার ওপর রাগ ক'রে বলছেন?

বীথিকা সবিস্ময়ে দেখল—অবজ্ঞামুক্ত চোখের দৃষ্টিতে আকাশের নীলিমা—তার অবাক চোখে রূপকের নিবিড় দৃষ্টি স্বর্গের আলো বিকীর্ণ করে।

রূপক তার পাশের শেল্‌ফ্ থেকে অনেকগুলো পুস্তিকা তুলে এনে বীথিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, এগুলো পড়লে হয়তো বুঝতে পারবেন আমার লাইন অব্ এ্যাপ্রোচ। কিন্তু আমি চাই না, একই লাইনে আপনিও অগ্রসর হন।

বীথিকা কম্পিত স্বরে বললে, বুঝতে পারবো কিনা জানি নে।

কেন পারবেন না? বুদ্ধির দরজা নিশ্চয়ই কুলুপ এঁটে বন্ধ ক'রে রাখেন নি। অবশ্য নিজের ওপর আস্থা যদি হারিয়ে থাকেন, যান ডক্টর নিয়োগীর কাছে—দর্শনের ইতিহাসের ওপর আপনার জন্য কিছু একটা থীসিস দাঁড় করিয়ে দেবেন তিনি—ছেড়ে দিন থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চের দুরাশা।

বীথিকা মাথা নীচু ক'রে বললে, আপনার পেপারগুলো প'ড়ে দেখি—তারপর হয়তো দুরাশামুক্ত হ'ব।

দরকার নেই পড়ে!—হঠাৎ রেগে উঠে প্যাম্ফ্‌লেট ও কাগজগুলো আবার শেল্‌ফে তুলে রেখে রূপক বললে।

বীথিকা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে, যাই তা হ'লে?

রূপক তার চেয়ার থেকে উঠে এল। বীথিকার চোখ দুটির ওপর নিষ্পলক মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সে বললে, কোথায় যাবেন? ঐ ওল্ড ফুল ডক্টর নিয়োগীর কাছে?

আপনিই তো যেতে বলছেন!—বীথিকা অবরুদ্ধকণ্ঠে ব'লে।

আমি বললেই আপনি যাবেন! থিয়োরী অব্ নাম্বার্স নিয়ে রিসার্চের এতদিনের পরিকল্পনা আমার কথাতেই বিসর্জন দেবেন?

অভূতপূর্ব রূপকের এ উত্তেজনা। বীথিকার কাছে রীতিমত হেঁয়ালির মত মনে হ'ল।

খুব কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে রূপক। তার উত্তেজিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বীথিকার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে।

নির্বাক বীথিকার কাতর বেদনাবিদ্ধ চাইনি রূপকের মুখের ওপর এসে স্থির হ'য়ে থাকে।

রূপক বললে, দিন কয়েক ধ'রে আমার মনে হচ্ছিল, এতদিন ভুল পথে চলেছি আমি। 'এক-কে' জানতে চেয়েছি 'শূন্য' দিয়ে—কিন্তু 'শূন্য' দিয়ে শুরু করা যায় কী? আর সব সংখ্যাকে না জানলে শূন্যের উপলব্ধি কী সম্ভব? শূন্যকে সুস্পষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে সীমিত করা যায় কী? সংজ্ঞানির্দিষ্ট শূন্যের শূন্যতা কী সঙ্কুচিত হ'বে না?

রূপকের গলার স্বর কাঁপে। বীথিকা বিমূঢ়। রূপকের প্রশ্নগুলি সংখ্যাতত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসাই শুধু নয়—তারা যেন তার জীবনের চরম প্রশ্নের মত তার অন্তরের গভীরতম অন্তস্তল মথিত করে।

রূপক ব'লে চলে, বহু বৎসর ধ'রে জীবনে চরম নৈঃসঙ্গকে উপলব্ধি করতে একা থেকেছি—আমার জীবন-দর্শন আমার একক সত্তায় কেন্দ্রীভূত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপর আপনি এলেন।

ব'লে রূপক থামল। রূপকের চোখের দৃষ্টির স্বাভাবিক তীব্রতা স্নিগ্ধ বিষাদে উধাও হয়েছে। বীথিকা মন্ত্রমুগ্ধ। রূপকের বিষণ্ণ চোখের অব্যক্ত বেদনা তার মনকে দোলা দেয়।

বীথিকার হাতে হাত রাখল রূপক। তার অন্তরের আবেগ হাতের কাঁপনে স্পন্দিত। বীথিকা শিউরে ওঠে। তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবে নেমে এসেছে যেন স্বর্গীয় পারিজাত-স্পর্শ।

অনেকক্ষণ ধ'রে কোন কথা বলে না রূপক। তবু কত কথা বলা হ'য়ে যায়।

রূপক বললে, তুমি এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছ। আজ আমি বুঝতে পেরেছি 'শূন্যের' আগে আর সব সংখ্যাকে জানতে হ'বে। আরও বুঝেছি যে 'এক পুরোপুরি 'এক' নয়। 'একের' মধ্যে 'দুই' আছে—'দুই এর মধ্যে এক। 'একের' সত্য উপলব্ধি করতে 'দুইকে জানতে হ'বে। 'দুই'য়ের সমন্বয়ে যে 'এক'—সেই 'একে সত্য। এতদিন আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম—তুমি আমা আমার মধ্য থেকে বের ক'রে এনেছ। তুমি যেমন আম সাহায্য চেয়েছ—আমিও তেম্নি তোমার সাহায্য ভি করছি।

রূপকের গলার স্বর কাঁপে।

বীথিকার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামে। স্বরে সে বলে, আমি তো জানি নে কী সাহায্য আপনাকে করতে পারবো। শুধু জানি, আপনার সা আমার চাই। নইলে আমি ব্যর্থ।

রূপক হেসে বললে, তোমাকে বাদ দিলে আ অসার্থক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা যে যুগে ছাত্র ছিলাম, তাহা ছিল নবজাগরণের যুগ। তখন পুরাতন ভারত ভাঙ্গিয়া নূতন ভারত গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সময়েই কলিকাতায় প্রথম বেলগেছিয়া বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—একদল সহপাঠী তাহাতে যোগদান করিতে চলিয়া যান। পুরুষশ্রেষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস' বিষয়ে এম-এ ক্লাস খোলা হইয়াছে—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য এম-এ ক্লাসে ৯টি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত পড়ানো হইতেছে। আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত অনার্স পাঠ করি—তাহা ছাড়া স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পাঠ করি। আর্থিক অভাবের মধ্যে লেখা পড়ার সুযোগ হইত না—পরীক্ষা দিবার পূর্বে অনার্স ছাড়িয়া দিয়া পাস কোর্সে ১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিলাম। তখন ১৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বর্গত পণ্ডিত কুলদা-প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের কাছে থাকি। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ দেখা-শুনা করি। তাঁহার গৃহে নিজস্ব ভাল পাঠাগার ছিল—দর্শন, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের বই বেশী ছিল। সকল বইই নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতাম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, লোচন ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীমন মহাপ্রভু সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় লিখিত বহুগ্রন্থ সে সময়ে দেখিবার সুযোগ হয়।

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ পল্লীরই অধিবাসী। তিনি আমাদের পরিচিত, কারণ আগড়পাড়ায় আমার প্রতিবেশী পূজনীয় ডাক্তার সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল—সুনীতিবাবু আমাকে সংস্কৃত অনার্সের কয়খানি বই কিনিয়া দিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার খবর তখনও প্রকাশিত হয় নাই—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্নেহ ও কৃপার পাত্র ছিলাম—তিনি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পূর্বে আমাকে জানাইয়া দেন যে আমি পাশ করিয়াছি। পথে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা—তাঁহাকে পাশের খবর বলিলাম ও জানাইলাম, সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পড়িব। তিনি হাসিয়া বলিলেন—তাহা করিও না—আজই সকালে আমি সুশীল-বাবুর বাড়ীতে (আচার্য্য শ্রীসুশীলকুমার দে) কলিকাতা গেজেট দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে নূতন বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দান সম্বন্ধে সকল খবর প্রকাশিত হইয়াছে—বলিয়াই একটুকরা কাগজে সুশীলবাবুকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন এবং আমাকে সুশীলবাবুর বীডন রো'স্থ বাড়ীতে যাইতে বলিলেন। সুশীলবাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত হইয়াছিলাম—তিনি পূজনীয় কুলদাপ্রসাদবাবুর বন্ধু ও কুলদাপ্রসাদবাবুর গৃহে প্রায়ই যাইতেন। গেজেট দেখিলাম ও পরে জানিলাম, প্রতি অতিরিক্ত ভাষা গ্রহণকারী একজন করিয়া ছাত্রের এম-এ ক্লাসের বেতন লাগিবে না—অধিকন্তু মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাওয়া যাইবে। প্রথম যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাঁহাদের তালিকায় সুনীতিবাবু ও সুশীলবাবু উভয়েরই নাম ছিল। তবে তাঁহারা উভয়েই সে সময়ে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত চলিয়া যান—তাঁহারা মাত্র ২১ দিন ক্লাসে আসিয়াছিলেন। সুনীতিবাবুর স্থলে স্বর্গত কোবিদ আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার (অন্ধ) এবং সুশীলবাবুর স্থানে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজির খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমাদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রফুল্লবাবু ইংরাজি সাহিত্যের লোক হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আচার্য্য মজুমদারের যে কত গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা বলার ক্ষমতা নাই। তিনি বহুদিন পূর্বে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু ভগবত কৃপায় তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধি-কারী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহা এত মধুর ও সরস করিয়া বলিতেন যে ক্লাসে ছাত্র-ধারণের স্থান থাকিত না। সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ক্লাসের ছাত্ররা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর ছিল—তিনি যখন সংস্কৃত কাব্য বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত হইয়া তাহা শুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হইতাম।

আমরা এম-এ ক্লাসে বহু সুধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শিবাজী ও পৃথ্বিরাজ মহাকাব্য এবং মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত লেখক আচার্য্য যোগীন্দ্রনাথ বসু আমাদের মধুসূদনের মেঘনাদবধ পড়াইতেন। শৈশবে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম—কৈশোরে সেই প্রিয়-কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুসূদনকে তিনি কত ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এম-এ ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন ও বোধ হয় বয়সে প্রবীণ হইলেও তরুণ অধ্যাপকদের মত যতটা সম্ভব নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন। আমাদের দলে ভাল ছেলেও ছিল—উত্তরকালে তাহারা খ্যাতনামা অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাজেই অধ্যাপকগণকেও সেজন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সে সময়ে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রের

সহ-সম্পাদকের কাজ করিতেন ও শিবনারায়ণ দাস লেনে বাস করিতেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক উপন্যাস তাঁহাকে কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি আমাদের কবিকঙ্কণ লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পড়াইতেন। তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের পড়াইবার জন্যই তাঁহাকে ঐ সুবৃহৎ টীকা-পুস্তক রচনা করিতে হইয়াছিল। লোক চিনিয়া রাখার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রথম দিন নাম ডাকিয়া তিনি রোল-কল করিবার সময় সকলকে চিনিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দিন ক্লাসে আসিয়া রোল-কল করিলেন না। তৃতীয় দিন তিনি আসিতেই আমরা বলিলাম, স্যার, কাল আপনি রোল-কল করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের সকলকে চিনিয়া লইয়াছি। আর রোল-কল করার প্রয়োজন নাই। তোমরা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারো। ৩৪ জন সহপাঠী পর পর দাঁড়াইয়া উঠিতেই তিনি তাহাদের পুর্ণ নাম বলিয়া দিলেন, আমরা সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বহু প্রকার রন্ধনের বর্ণনা আছে। আমাদের সকলকে একদিন তিনি স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ সকল রান্না তরকারী দিয়া ভুরিভোজে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল দুর্লভ জিনিষ সংগ্রহ করিতে এবং 'ঘৃত দিয়া ললিতার পাতা ভাজা' প্রভৃতি করিতে তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি কত ছাত্রবৎসল ছিলেন, তাহা আজ স্মরণ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। আমাদের চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়াইতেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির পাঠোদ্ধার ও টীকা রচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা—তাঁহার ছাত্রগণ—পরিষদ প্রকাশিত ৫০ টাকা মূল্যের গ্রন্থ মাত্র ১০ টাকায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনিও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ছাত্রদের পড়াইবার জন্য নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। সার আশুতোষ সারা বাংলাদেশ হইতে আমাদের অধ্যাপক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন—এই সকল অধ্যাপককে তিনি বৎসরে মাত্র তিনশত টাকা গাড়ীভাড়া দিতেন—কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব ছিল না। আমাদের পালী ও প্রাকৃত পড়াইতেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলেন্দ্রবাবু তখনও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী হন নাই—তিনি তখন বৌবাজার শাঁকারীটোলায় বাস করিতেন। তিনি আমার বাসগ্রাম সন্নিহিত আরিয়াদহের অধিবাসী—পরে টালা পার্কে নিজস্ব বাড়ী করেন। অধ্যক্ষ মুরলীধর আমার পূর্ব-পরিচিত, তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও শেষে অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার নিকট শিশুপাল বধ—(সাধারণ সংস্কৃত বিভাগে) নীতিশাস্ত্র (দর্শন বিভাগে) ও কিছুকাল সংস্কৃত অনার্সের ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার নিকট যে উৎসাহ ও স্নেহ লাভ করিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। বাহিরে তাঁহাকে গম্ভীর বলিয়া মনে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা সরস ও ব্যবহার অতীব কোমল ও মধুর ছিল। আমাদের সময়ে স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্যগণের সহিত স্যাড্‌লার সাহেব নিজে সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন। মুরলীধরবাবু তখন আমাদের শিশুপালবধ পড়াইতেছিলেন। শ্লোকের প্রথমাংশ ছিল 'উদাসিতারং নিগৃহীত মানসৈ'—তিনি এমন সুন্দর করিয়া তাহা ছাত্রদের বুঝাইলেন যে, স্যাডলার তাহা শুনিয়া মুরলীধরবাবুর অধ্যাপনার উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুরলীধরবাবুর পিতা আচার্য্য ধরণীধর খ্যাতনামা কথক ছিলেন এবং মুরলীধরবাবুর পুত্র শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস শুধু তাঁহার সহৃদয়তার সহিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নহেন, গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছেন। এম-এ ক্লাসে অধ্যাপক অভয়কুমার গুহ আমাদের কিছুদিন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব পড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কথা পুর্বেই বলিয়াছি। বন্ধুবর হেমন্তকুমার সরকার তখন গবেষক-ছাত্র—বিজয়চন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনি মধ্যে মধ্যে ভাষাতত্ত্ব পড়াইতে আসিতেন। চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্কমোহন সেনও অল্প কিছুদিন আমাদের অধ্যাপক হইয়াছিলেন ও সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন। তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন সে সময়ে আমাদের বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইলেন। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় সার আশুতোষ অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হন—অর্থাৎ বিমাতার (ইংরাজি) গৃহে মাতার (বাংলা) স্থান দেন। দীনেশবাবু বাংলা এম-এ ক্লাসের শুধু প্রবর্তক ছিলেন না—প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করিয়া সার আশুতোষের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। লেখক এম-এ ক্লাসে গুজরাটী ভাষা পাঠ করিয়াছিল—তখন হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, তামিল, অসমিয়া, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালাম, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভাষার একটি বাংলার এম-এ পরীক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল—অবশ্য পালি ও প্রাকৃত মূল-ভাষা হিসাবে সকলকেই শিক্ষা করিতে হইত। গুজরাটীর অধ্যাপক ডক্টর আই-জে-এস-তারাপুরওয়ালা পার্শী, বোম্বাইবাসী ছিলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন—পুরা নাম ছিল ইরাক জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা। তাঁহার নিজের নাম ইরাক, পিতার নাম জাহাঙ্গীর, পিতামহের নাম সোরাবজী ও তারাপুরগ্রামের লোক বলিয়া তারাপুরওয়ালা। আমরা ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, ঐ সঙ্গে ডাকঘরের নামটি যোগ করিয়া দিলে পুরা ঠিকানা হইয়া যাইবে। তিনি বয়সে তরুণ, উৎসাহী ও সহৃদয় লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই সন্ধ্যার তাঁহার ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাটবাড়ীর বাসায় যাইয়া পড়িতাম ও তাঁহাদের সহিত একত্র আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইতাম। পার্শী হইলেও তাঁহারা নিরামিষভোজী—কাজেই কোন অসুবিধা ছিল না। ৪০ বৎসর পরেও তাঁহার সুমধুর, স্নেহময় ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারি নাই।

বাংলায় এম-এ নূতন খোলা হইল, আমরা প্রথমবর্ষের ছাত্র—তখনও বেশী ছাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা ১৫জন ছাত্র ছিলাম। পরে সুখলতা ও সুধালতা দোয়ারা নাম্নী দুইটি অসমীয়া ছাত্রী আমাদের সঙ্গে পড়িতে আসিয়াছিল। সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর কলেজ (তখন নাম মেট্রোপলিটান), শ্রীবিভূতিভূষণ কাঁঠাল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (তখন নাম রিপণ), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বর্দ্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপক হইয়াছেন। স্বর্গত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত আমাদের সহপাঠী ছিলেন বটে, কিন্তু ১৯২১ সালে আমাদের সহিত পরীক্ষা না দিয়া পরে এম-এ পাশ করেন ও কলিকাতা স্কটীশচার্চ কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বপতি একাধারে কবি, গল্প লেখক, উপন্যাস-লেখক, সমালোচক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বহুগুণের অধিকারী, কিন্তু আলস্য তাঁহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রাপ্তির পথে বাধাদান করিয়াছে। ৺যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া সাবডেপুটী ও পরে ডেপুটী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিতেন। শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া চট্টগ্রামে চলিয়া যান। তিনি চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ডাঃ বেণীমোহন দাস ও কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাসের ছোট ভাই—নিজেও কংগ্রেস-নেতা। চট্টগ্রাম হইতে দৈনিক পাঞ্চজন্য সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে শচীনন্দন পাল রাজসাহী-নাটোরে ফিরিয়া গিয়া কয়লার ব্যবসা করিতেন, পরবর্তীকালে একবার নাটোরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অধ্যাপক ও সহপাঠীরূপে আরও কয়েকজনকে পাইয়াছিলাম, আজ দীর্ঘকাল পরে আর তাঁহাদের সকলের কথা মনে পড়ে না। যতীন্দ্রকুমার, অম্বিকাচরণ ও লেখক এক বৎসর কাল ৫০।৩ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেসে বাস করিয়াছিলাম। সে সময়ে তথায় বহু এম-এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও কর্ম-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, অনেকে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া ও তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছি—তাঁহার কথা সংক্ষেপে বলা যায়না। আমি ১৯২০ সালের প্রথমেই শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহকারী রূপে দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করি। কাজেই এম-এ পড়া ও পুরাপুরি সাংবাদিকের কাজ করা একই সঙ্গে চলিয়াছিল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্রীমতী এনি বেসান্টের সভানেত্রীত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগদান করি—রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং তখনকার দিনে তরুণ ব্যারিষ্টার যুগল—বসন্তকুমার লাহিড়ী ও ইন্দুভূষণ সেন প্রধান কর্মকর্তা। তাহার পর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল—সভাপতি পাঞ্জাব কেশরী লালালাজপৎরায় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। এবার সাংবাদিক রূপেই কংগ্রেসে যোগদান করি এবং প্রায় সর্বক্ষণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। এই ভাবে কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়—গান্ধীজি সে আন্দোলনের নেতা ও স্রষ্টা। সমগ্র ভারতকে তাহা অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে ইতিহাসের কথা। তাহার ফলে আমাদেরও পাঠ্য জীবন কিছুকাল বন্ধ রহিল—আন্দোলনের তীব্রতা কাটিয়া গেলে বা আমাদের মন ভিন্নমুখী থাকায় ১৯২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ দিন এম-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করিয়াছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের জ্ঞান, বিদ্যা, মনুষ্যত্ব, জীবনে সাফল্য প্রভৃতির কথা যতই লেখা যাউক না কেন, তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবে না। আচার্য্য দীনেশচন্দ্র, আচার্য্য চারুচন্দ্র, আচার্য্য খগেন্দ্রচন্দ্র, আচার্য্য তারাপুরওয়ালা, সুপণ্ডিত বিধুশেখর, কোবিদ-প্রধান মুরলীধর প্রভৃতির কথা পৃথক পৃথক ভাবে লিখিবার বাসনা রহিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহারা ছিলেন দিক্‌পাল। যে দেবতার নিত্যপূজা করি তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য কোন দিন হইবে কি না জানি না—কিন্তু আচার্য্যগণের মধ্যে যে দেবত্ব দেখিয়াছি, আজও সেই আদর্শই জীবন পথের সম্বল হইয়া আছে। সেই সকল দেবতার কথা যে দিন স্মরণ করি, সেই দিনই জীবনের সুদিন বলিয়া মনে করি।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

—'তুমি কত দেশে
নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।'

...এ আর এক নোতুন রূপ দেখলাম। ভোরবেলাতে ঘুম ভাঙ্গলো—ছইএর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রশস্ত নদী, শান্ত-স্তিমিত স্থির। ওপারে ক্ষীণ ছায়ার মত বনসীমা দেখা যায়, অরণ্যের ঘনকালো ছায়া-মূর্তি চোখ পড়েনা, নদীর জলের উপর এসে দাঁড়ালো কুয়াসার ঘোমটা ঢাকা একটি নারী, কপালে সিন্দুরের টিপ...রাতের অভিসার শেষে ভীরু নারী কোন অভিসারিনী ঘুম ভাঙ্গিয়ে এসেছে আমার আঙ্গিনায় ভুল পথে।

...মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, চুমোয় চুমোয় ভরে তুললো সে আমার কপোল,...ওর সিন্দুরের আভা লাগলো আমার সারা ললাটে, অনুভব করি একটি অতীন্দ্রিয় স্পর্শ, আমার দেহমন পূর্ণতায় কানায় কানায় উপছে উঠেছে। অনুভব করি সমস্ত শরীরে কি অনাস্বাদিত-পূর্ব প্রশান্তি; গাংএর জলে কে লাল মেজেন্টা রংএর পিপে উপুড় করে দিয়েছে, কোন না দেখা তুলির রং লাল ছোপ ধরিয়েছে গাছের মাথায়—উড়ন্ত গাংচিলের পাখায়। কি এক মহাকাব্য—কি এ অপূর্ব ছবি। কাছে আছে তবু দেখা যায় না, ধরা দেয়না। এ সেই দেবতার মহাকাব্য, এর জরা নাই—মৃত্যু নাই—এ অবিনশ্বর।

...নৌকার মাঝিরা, বড়দা সবাই ঘুমে অচেতন। একা বসে আছি পাটাতনে—মুক্ত আকাশের নীচে। যেদিকে দুচোখ যায় দূরে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই; অন্তহীন আকাশের নীচে আমি একা—প্রথম আলোর পূতপরশ আমার দেহমনে; হে মহাদেবতা আমার শতপাপের সব কলুষ তুমি তোমার পুণ্য করুণাধারায় দূর করে দাও; যে মহাঅঙ্গনে নীরবে চলেছে তোমার ভাঙ্গাগড়া—সেই মহাজীবনে আমাকে মিলিয়ে দাও। কৃপণ তুমি! শত মাথাখুঁড়েও তোমার কণামাত্র পায়না মানুষ। শুধু ইসারা করো, অধরাই থেকে যাও। স্বার্থ ভয় আর সংশয়ের দোলায় নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছি। কি ত্যাগ করতে পেরেছি যে মহান কিছু পাবার দাবী আমার জন্মেছে?

প্রথম লোকালয় ছেড়ে যখন বনে প্রবেশ করি তখন মন ছেয়েছিল একটা আতঙ্কে। স্বভাবজাত মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া মন নিরাপদ মাটিকে ছেড়ে আসতে চায় নি। যে মন আঁকড়ে ধরেছিল সেই গ্রামীন জীবনকে, সেই পুরোনো মন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তার জায়গায় যে চাপাপড়া মন মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে সে বুনো-যাযাবর। কোন বন্ধন মানেনি সে, কোন প্রীতি-সম্পর্ক আকর্ষণে তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারেনি। বিশাল উন্মুক্ত দিগন্তের বুকে যে বাধাবন্ধনহীন মনটিকে আবিষ্কার করলাম ক্ষণিকের জন্য সে আমার অজানাই ছিল, ধরা তাকে যায় না। আবার হয়তো তাকে হারিয়ে ফেলবো। অন্যমনে যে এসেছিল আপন খেয়ালেই সে চলে যাবে। মাঝিরা বলে—সুন্দরবনে এলে মানুষ সব ভুলে যায়; অন্য কোন জিন ভর করে তার ঘাড়ে, তাই রাতের আঁধারে এ বনে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না, ...অন্ধকার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়—তাদের দুহাতে ঢাকা মুখ থেকে তীক্ষ্ণস্বরের চীৎকারে।

—ছু—"কু—উ উ উ"

পিছনের নৌকা থেকে সাড়া আসে—'কু-উ-উ'

দিনের বেলাতে উঠলো উত্তরে হাওয়া, জোয়ারের টান আর বিপরীত হাওয়া, দিগন্তপ্রসারী নদী উঠলো মেতে, বাদাম তুলে দিলাম, পিঠেন হাওয়া,...দেখতে দেখতে সাড়ে তিনশমণি বেতনাই নৌকা নেচে উঠলো ঢেউএর মাথায়, একটার পর একটা ঢেউ টপকে চলেছে নৌকা। হালে বসেছে ছোকরা মাঝি কালাচাঁদ। এ গাং তার চেনা—হাল ধরেছে সেইই। বড়দা বসেছেন চায়ের জল সামনে নিয়ে; এদানি তাঁর চায়ের সঙ্গে অন্য একটা কাজ বেড়েছে, পাউডার মিল্ক গুলতে হয়, একটি দানাও থাকলে চলবে না, তারপর চাএর 'স্পেশাল বস্তর' আছেই।

হঠাৎ লাগে ভোলা মাঝির সঙ্গে কালাচাঁদের ঝগড়া। ভোলা নীচে থেকে চীৎকার করে।

—'হাল ধরতে শিখিসনি সোজা করে—সঙ্গে আবার হুঁকো।'

—'পড়ে গেল তা কি করবো। দেখনা পালে কেমন টান ধরেছে। এখন হাতছাড়া যায়, নৌকা বেকায়দা হয়ে যাবে।'

'রাগ হবারই কথা, হাল ধরেছে সেই সঙ্গে কালাচাঁদ খাচ্ছিল হুঁকো। মাঝিদের দেখলাম রাজপুতদের সঙ্গে একজায়গায় মিল আছে। কথায় বলে—'বারো রাজপুত তেরো হাড়ি, তবু করে হাঁড়ি হাঁড়ি।'

এদেরও তাই, এক একজনের একটা করে হুকো। হুকো গেলে ভোলার তত দুঃখ ছিলনা, কালাচাঁদ গাংএ পড়লেও যো সো করে উঠতো, কিন্তু যে গেছে সে আর উঠবেনা। সদ্য তামাক সাজা গরম আমেজি কলকেটা হুকোর মাথা থেকে খুলে পড়ে গেছে গাংএর জলে।

বড়দা থামিয়ে দেন—'এই ভোলা, নিয়ে যা নোতুন কলকে, ওই আছে তামাক, সকাল বেলাতেই চেঁচাসনা।'

তোকে আর তামুক বদি খেতে দিই? গজগজ করে ভোলা কালাচাঁদের উদ্দেশ্যে।

কুপে পৌঁছুতে আর দেড় ভাটি লাগবে। যদি পালে ভালো হাওয়া থাকে তবে এই ভাটিতে পৌঁছুতে পারবো। লোকের মুখ দেখবো একটু

নিরাপদ আশ্রয় পাবো, হোক সমুদ্রের চরে তবু ত ক'দিন নিরুদ্বেগ কাটাতে পারবো।

—'বেয়ে চল বাবা।'

প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে নদী, জোয়ার চলেছে, এখনও ভাটা সামনে। দেখা যাক কতদূরে গিয়ে ঠেকে নৌকা।

এতদিন পর্য্যন্ত নদীর বাঁকগুলো চোখে পড়তো, দূরে বাঁ'হাতে কি ডানহাতে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু এবার আর সেটা হলো না, নদী গিয়ে পড়ছে মোহনার মুখে, শুনেছে সমুদ্রের ডাক, দীঘল নীল আঁচল মেলে দিয়ে সে ছুটেছে, এতদিনের প্রতীক্ষার পর পেয়েছে প্রিয়ার সন্ধান। এই মিলনের আশায় কেটেছে তার কতকাল, কুলে কুলে ধ্বনিত হয়েছে কত ব্যাকুলতা, বাধা পেয়ে দুধারব্যাপে ফুঁসে ফেঁপে উঠেছে মত্ত আক্রোশে। নৌকা চলেছে, সোজা বাঁক এড়িয়ে নদীর মাঝ বরাবর, দুদিকে বহুদূরে দেখা যায় অস্পষ্ট বনছায়া;

—'বাবু। পিছনে দুটো নৌকা আসছে।'

—'দেখা যায় বহুদূরে নদীর বুকে চলিষ্ণু কালোবিন্দুর মত এগিয়ে আসছে দুটো খোলা ডিঙ্গি; ছিপ কি অন্য কিছু বোঝাগেল না;... দুপুরের শুষ্ক রোদ—জলের বুকে লুটিয়ে পড়েছে, বাতাসও নাই যে পালতুলে এগিয়ে যাবো; সামনে ব্যাঁকের মাথায় সমুদ্রের মোহনা; কিন্তু সেই দূরত্বও পাঁচ মাইলের কম নয়।

মোহনার মুখ থেকে আর চার পাঁচ মাইল ওদিকে পাড়িদিতে পারলেই সমুদ্রের বুকে কেদোর চরে পৌঁছে যাবো' একশো মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে এসে কুলের কাছে যদি লুটে-পুটে নিয়ে যায় সব, এর চেয়ে আর আপশোষের কি হতে পারে। যদি সেই অনাহার, শীতের কাপড়, বিছানা অভাবে কষ্টই ঘটবে—সেটা পথের প্রথমে ঘটলেই তো হতো; অকুলসমুদ্রের ধারে ওকাণ্ড ঘটলে সভ্যজগতে ফিরতে পাঁচদিন; পাঁচদিন নাখেয়ে এই ঠাণ্ডায় রাতের হিমে কাঁপতে কাঁপতে আসলে ফিরতেই পারবো কিনা—কে জানে।

দাঁড় নৌকা দুটো এগিয়ে আসছে। এক ছোট ছুট জাতীয় নৌকা, গতিবেগ ওদের বেশী, চারটে দাঁড়ের বেগে আসছে, দূর থেকে চলমান দাঁড় দুটো যেন সূর্য্যের আলো পড়ে শাণিত তরবারির মত ঝকমক-করে কি এক পৈশাচিক নৃশংসতায়।

আমাদের দাঁড়িরাও বাইছে, কিন্তু বেশ অনুভব করি ওদের গতিবেগও মন্দীভূত হয়ে এসেছে। দুপাশে তীর ভূমি অনেক দূরে আবছা দেখা যায় মাত্র। শুনেছি নৌকা চড়াও হলে অনেকমাঝি প্রাণভয়ে লাফ দিয়েই পড়ে গাংএর বুকে, ধারে কাছে হলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়; কামট কুমীর বাঘের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে ওঠে প্রাণের ভয়ের কাছে। নৌকা ভেসে যায় অকুলে বনামাঝিদাঁড়িতে। এখানে বোধহয় সেটা ঘটবেনা, কারণ কোন হুসিয়ার মাঝিই এই অকূল গাংএ লাফদিয়ে পড়তে যাবে না। দূর থেকে কাছেই এগিয়ে আসছে নৌকা দুটো।

...ব্যাগ থেকে সিগারেটের কয়েকটা টিন নৌকার খোলে এদিক ওদিকে ফেলে দিলাম; খাদ্য বিহনে দুটো দিন কাটবে, কিন্তু এই উত্তেজনা—আতঙ্ক আর শীতের দিন রাত্রি কাটাতে ওর সাহায্য চাই।

...আর কিছু নগদটাকা একটা বইএর ভিতর রেখে দিলাম; ডাকাতের দল একগাদা বই রয়েছে, ওই গুলোনিয়ে যাবেনা বা ওতে হাত দেবেনা নিশ্চয়ই।

বড়দা স্থির হয়ে বসে আছেন; গলুইএর ফাঁক দিয়ে ওই নৌকা দুটির দিকে চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চার জন দাঁড়ি একজন মাঝি রয়েছে হালধরে। খালি গা, মাথায় গামছা বাঁধা, দাঁড়ের টানেটানে আন্দোলিত হচ্ছে পেশীবহুল দেহটা, একখানা নৌকা বাঁকাতে চলে গেল দূরে খালের দিকে, এগিয়ে আসছে একখানা।

—'কোথাকার নৌকা!'

ছই থেকে বার হয়ে দাঁড়ালাম, হাফপ্যান্টএর উপর মাথায় হ্যাট, কণ্ঠস্বরে যতদূর সম্ভব ভয়ের উপর সাহসের গিল্টী ধরিয়েছি।...

এগিয়ে এল নৌকাটা; চেয়ে দেখি ওদের খোলে বন্দুক বা অন্য কি অস্ত্র-শস্ত্র আছে। বড়দা কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে—

—'জবাব দিচ্ছনা যে? কোথাকার নৌকা—যাবে কোথায় তোমরা?"

নৌকাটা এগিয়ে আসে,...

'—মাছের ডিঙ্গি, খোলের ভিতর জাল স্তুপকরা রয়েছে।

চলে গেল নৌকাটা; ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো—তাহলে চোর ডাকাত নয়, জেলেরা আছে এখানে ওখানে এই সমুদ্রের চরে, কিন্তু এতদূরে যে নজর চলেনা, দূরে দেখা যায় একটা সাদা পালকের মত কি—জেলেডিঙ্গি চলেছে বালামতুলে। এর বেশী কোন অস্তিত্ব চোখে পড়েনি।

শরিফ বলে—'জাল ফাল মিছে কথা বাবু, ওরা তলাস নিতে বার হয়েছিল...

—'তুই খোলের ভিতর কি করছিস? বাইরে আয়—

ডাক শুনে বার হয়ে এলো সে। সঙ্গে রয়েছে সেই মুরগীটা। ওটা ও চুরি করে নিয়ে যাবার মত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে কিনা—তাই শরীফ এত সাবধানী'।

"—উই...দূরে...বহুদূরে দেখা যায় কেদোর চর। আমাদের যাত্রার শেষ হবে ওখানে। মিলবে ক'দিনের জন্য নিশ্চিন্ত নির্ভর একটু আশ্রয়, লোকজনের মুখ দেখতে পাবো, বড় বড় নৌকা জমে আছে ওখানে কদিনের জন্য, বন মুখর হয়ে উঠেছে বাওয়ালিদের।...

চরে থাকি, সামান্য একটু কালোদাগ দিগন্তের বুকে কে টেনে রেখেছে, চারিদিকে নীলসমুদ্র, ঢেউএর মাথায় মাথায় সাদা সফেন স্পর্শ, ...মধ্যে ওই স্থির দাগটুকু,...জলের উপর মনে হয় কি যেন ভাসছে... মাটির বুকে কোন অস্তিত্ব ওর নাই...ভাসমান একটা অচল পদার্থ। সমুদ্র ওই মাটিটুকুকে তার রস-শাণিত জিহ্বার আগে এনে হাজির করেছে,—এক মুহূর্তের মধ্যেই গ্রাসকরে ফেলবে ওই সর্বনাশা মহাকাল-ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ডটুকুকে।

—'কোন দিকে চলেছিস রে?"

কালাচাঁদ জবাব দেয়—তিনপো ভাঁটা হয়ে গেছে বাবু, আর টান নাই, গাং থমথম করছে, জোয়ারের মুখে 'পাউড়ি' দিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়বো এই সমুদ্রে ?"

নীচের দিকে যেতে হবে আমাদিগকে, ভাঁটা ছাড়া এগোনো যাবেনা, সুতরাং আবার নোঙর করে বসে থাকতে হবে। রাত্রি এগারোটায় আসবে ভাটা। আকাশের অবস্থা ভাল থাকলে—গাং ঠাণ্ডা থাকলে তবেই জমবে পাউড়ি, নাহলে কাল দিনভাঁটায় অর্থাৎ আগামীকাল বেলা ১১টায়। নিকটে এসে এই দুস্তর বিপদের সামনে মানুষকে পড়ে থাকতে হবে—এ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কি ? ওই ডিঙ্গিওয়ালা তল্লাস নিয়ে গেছে কাছাকাছিই আছে কোথায়, রাত্রির গভীরে এসে হানা দেবে। না হলে এত পথ এসে শেষ মাথায় ঠেকে পড়ে থাকতে বাধ্য হবো কেন ? এও কোন নিষ্ঠুর ভাগ্যের পরিহাস।

…নৌকা মাঝ গাং থেকে তীরমুখো করে আনলো ; বাঁপাশের চরে না গিয়ে এলো দূরে ডাইনের চরে।

—"এপারের দিকে রইলি না কেন ?"

…ঝাঁঝিয়ে ওঠে ভোলা—'হ্যাঁ—সেদিন শুনিসনি ? দুটো জেলেকে ধরেছে এই বড় শিয়ালে। সে ব্যাটা রক্তের স্বোয়াদ পেয়ে ছোঁ ছোঁ করে ঘুরছে। পেরায়ই দেখা যায় চরের বাইরে, জেনে শুনে ওই খানে বাঁধবো নৌকা ?…চল ওপারে—"

…এপার থেকে ওপারে। ওপারেই বা কোন মহানগর গড়ে লোক লস্কর আছে যে ওই পারই নিরাপদ ! সেখানেও তো ওদেরই রাজত্ব ; যে বাঘ—সেতো এগাং ইয়াকি মারতে মারতে পার হয়ে যাবে। তার পর মানুষ-বাঘের পঞ্জরেতো পড়েই রয়েছি, দয়া করে এখনও কেন গ্রাস করেনি ভগবানই জানেন।

…বৈকাল গেছে। জোয়ার আসছে ; বিস্তৃততর ভূমির একপ্রান্তে সমুদ্রের সফেন ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ে—অন্যদিকে সুরু হয়েছে সুন্দরী গাছের বনসীমা ; সোনাঘাস জন্মেছে তীরে ; নৌকা থামতে দেখি গাছের ফাঁকে কয়েকটা হরিণ, সিঙ্গেল ও রয়েছে একটা। আমাদিগকে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল, একটা বাচ্চা তখনও দূর থেকে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে, একটা চীৎকার ! নীরবতাভেদ করে বনের ভিতর থেকে ডাকদেয় বড়ো হরিণ…বাচ্চাটা চলেগেল ভিতরে।

…শক্ত মাটি, জল কাদা জমে আছে ঠাঁই ঠাঁই। নামলাম বিস্তৃত চরে, মাটিতে নামছি দুদিন দুরাত্রি পর ! বাংলার শেষ সীমান্ত…এই পুণ্যমৃত্তিকার পা ধুইয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ !…ঠাঁই ঠাঁই জমে আছে বড় বড় জেলিফিসের তেলতেলে দেহাবশেষ, ঝিনুক-আছড়ে পড়ে এসে ঢেউয়ে…আকাশে বাতাসে মন্দ্রগর্জন,…

শোঁ শোঁ শোঁ।

প্রতিধ্বনিতোলে বনভূমি।

কালাচাঁদ জাল নিয়ে নেমে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে চললাম আমরাও দূর বনের দিকে নজর রেখে, কে জানে যদি কেউ বার হয়ে আসে হালুম করে। বড়দা বলে ওঠে—

—'না—না, এত সহজে বেরুবেনা ওরা।"

…ভাঙড়—পারসী—শিলেট মাছ আসছে জালে। দেখতে দেখতে একবালতী মাছ হয়ে গেল।…সন্ধ্যায় জমবে ভালো।…সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে গাছের মাথায়, বিশাল সীমাহীন দিগন্তের এক কোণে পড়ে আছি আমরা কয়েকটি প্রাণী, অন্তহীন অতল তমসা এসে গ্রাস করল আমাদিকে। চরভূমি সব ডুবে গেছে জোয়ারের জলে, কেবল জল আর জল : আকাশে বাতাসে সমুদ্রর ক্রুদ্ধ গর্জন…আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো তীরে।

…রাত্রি নেমে এসেছে,…তীরে তীরে আঘাত করে ফিরছে জলস্রোত 'ছপ—ছপাৎ…ছলকে উঠছে জল।

ওই বুঝি দাঁড় ফেলে ছিপ বেয়ে কারা আসছে।…অধীর প্রতীক্ষায় কাটে রাত্রি,…নৌকার আলো নিভিয়ে দিলাম,…রান্না খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরেই। কথা বলিনা, নীরবে মুখবুজে বসে আছি। রাত্রির বুকে অশরীরীর দল ছায়ামূর্তি ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের স্পর্শ আসে বাতাসে বাতাসে, কানাকানিতে ওঠে তাদের চাপা ষড়যন্ত্রের গুঞ্জরণ।…কি এক অজানা আতঙ্ক ;…কত বিরাট এই প্রকৃতির দুস্তর বুকে কী নিদারুণ অসহায়ের মত পড়ে আছি !…তখনও নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজেকেই বাহবা দিচ্ছি, সাবাস আমি ! এত বিপদের মধ্যেই ঠিক বাঁচিয়ে রেখেছি নিজেকে কৌশল করে, কিন্তু মানুষ কেন কিসের জোরে কার ভরসায় বেঁচে আছে—সে সত্য উপলব্ধি করবার মত শিক্ষার অভাব আমার ছিল।

…রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে : নৌকার মুখ নোঙর করা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো ; কালাচাঁদ বার হয়ে আসে ছই থেকে —নৌকা 'বাইল' দিছে বাবু !'

অর্থাৎ ভাঁটার টান সুরু হয়েছে ! বিশাল আকাশ হাজারো তারার আলোর ঝিকমিক করছে,—নিথর গাং-এর বুক পড়ে আছে আয়নার মত স্থির হয়ে, একটি ঢেউও নাই। কোন দুরন্ত শিশু যেন তার দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে বিছানায় স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—"পাউড়ি দিবি ?"

আকাশের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়েথাকে কালাচাঁদ। নিরীক্ষণ করছে মধ্য গগনের ধ্রুবতারার ! ছায়াপথের ম্লান দ্যুতি একদিক থেকে অন্যদিকে অকূল সমুদ্রে নেমে গেছে, তার কোণে জ্বল জ্বল করছে নীলাভ তারাটা, ওপাশে নীচে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল ! মনে মনে হিসাব করছে।

পার-কূল দেখা যায় না, বঙ্গোপসাগরের বুকে পাড়ি দিতে হবে কোন দ্বীপের সন্ধানে, একটু পথ ভুল হলেই বার হয়ে যাবো উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে, তারপর ? কিছুদিন আগেই সংবাদপত্রে বার হয়েছিল খবরটা পাকিস্থানের নীচে বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে এমনি কোন দ্বীপে পাড়ি জমাতে গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল নৌকা—প্রায় আঠারো দিন পর মাত্র কয়েকটি জীবন্ত কঙ্কাল সমেত সেই নৌকা পৌচেছিল ভাসতে ভাসতে বিশাখা-পত্তনের কূলে। তারাতো তবু কূল পেয়েছিল—সে জীবিত ·

মৃত যে অবস্থাতেই হোক, কিন্তু অকূলে ভেসে যায় কতো নৌকো তার হিসাব কে রাখে ?

বড়দা বলে ওঠেন—"তোল নোঙর, এখানে এভাবে বসে থাকা যায় না। ধর পাড়ি।"

উঠলো নোঙর ! হালের মোচড়ে নৌকা একটা আর্তনাদ করে তীরের সীমা থেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। কালাচাঁদ মাচায় বসে কোনাকুনি হাল ধরেছে,—ছায়াপথ ধ্রুবতারা এবং কালপুরুষ এই কোণের ঠিক সোজা জমবে পাউড়ি।

লেখাপড়া জানেনা, তবু ওদের চোখে আকাশ ধরা দেয় অসীম হয়ে, গাংএর জলধারা-কলকল শব্দে ওদিকে পথ বাৎলে দেয়, বুক টানা নিশ্বাস নিয়ে বাতাসে আগামী ঝড়ের ইঙ্গিত শুনতে পায়। প্রকৃতির সন্তান—কত তারাজ্বলা রাতে দেখেছে পৃথিবীর নিঃশব্দ সাধনা, ভালবেসেছে এই গাং-বনানীকে, তাই আকাশ বাতাস নদী এসে ধরা দিয়েছে ওদের হাতে, কানে কানে শুনিয়ে যায় কত সুখ দুঃখের কথা।

—"ভোরে ভাই—ঝিঁকের মার"—

দাঁড় পড়ছে। দাঁড়িরা দাঁড় টেনে চলেছে প্রাণপণে সবশক্তি একত্রিত করে। তাদেরও প্রাণের ভয় আছে, যত তাড়াতাড়ি পাউড়ি ওঠে, ততই মঙ্গল, কে জানে কোন মুহূর্তে এই শান্ত সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠবে। রূপোর সায়রে কে যেন দাঁড় ফেলছে,—ঝলকে উঠছে রাতের আঁধারে রূপোলি জল। অসংখ্য ঝকঝকে জলকণা ছিটকে পড়ছে, দূরে ঢেউএর মাথায় ফস্‌ফরাসের ঝলকানি। এ কোন এক রূপ কথার রাজ্যে এসেছি; জীবনকৌটায় বন্ধ আছে জীবন ভ্রমর, অতল রহস্য গুপ্ত রয়েছে ওর বুকে।

পাড় জমতে লাগবে আড়াই ঘণ্টা; গোসাবা, হলদি এবং ভাঙ্গাদুয়ানী নদী এসে সমুদ্রে মিশেছে এই পানে, আর আছে নারাণতলার খাল। ভাঁটার সময় চারটে স্রোত এই এলাকায় যাতায়াত করে, তারার আলোয় স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কালাচাঁদ। জলের ধারা লক্ষ্য করছে, আর মোচড় মারছে হালে। কট কট আর্তনাদ করে ওঠে হাল।

ছইএর ভিতর শুয়ে চোখ বোজবার চেষ্টা করি। টাপুরে নৌকটা ধারে বাঁধা রয়েছে, সেটাতে ঘুমুচ্ছে শরীফ; সারাদিন দাঁড়টানার পর বেচারাকে আর তোলা হয়নি, ওর বাকী ক'জন টানছে দাঁড়।

হঠাৎ একটা ঝাঁকানিতে তন্দ্রা ছুটে গেল। আবছা অন্ধকারে কানে আসে ভোলা মাঝির অস্ফুট আর্তনাদ—'ইয়া আল্লা !'

কালাচাঁদ উপর থেকে বিড় বিড় করছে। টাপুরে নৌকাটা এসে বড় নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ে, প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে ওঠে নৌকাটা, যেন ওর তক্তাগুলো খুলেই যাবে এখুনি।

আবার একটা ঝাঁকুনি,...কে যেন নৌকাটাকে আসমানে তুলে ফেলে দিল অতলে,...ঝাঁকানির বেগে ছিটকে পড়লো জলের কুঁজোটা; ছইএর ভিতর গড়িয়ে পড়ছে জল।...বিছানা বালিস ভিজে গেল।

বড়দা তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলেন পাটাতনে। আমিও।

পাঁচ সেলের টর্চের আলো সামনের দিকে ফেলতেই দেখি...জোয়ালো আলোর সামনে বিষধর হিংস্র অজগরের মত অবর্ণনীয় লালসায় কুণ্ডলি পাকাচ্ছে চাপ চাপ সাদা কুয়াসা। আকাশের তারা গেছে মিলিয়ে, ঘন কুয়াসার আস্তরণ গ্রাস করেছে সমুদ্র—আকাশ-বাতাস—সমস্ত ধরিত্রীকে। ফেঁপে ফুলে উঠেছে সমুদ্রের বুক, কিছুমাত্র দেখা যায় না, শোনা যায় হাজারো দৈত্যের দল উন্মাদ কলরবে ছুটে আসছে। বাতাসে বাতাসে তাদের বাঁধনছেঁড়া মাতামাতি—উন্মাদ কলরোল।

আমরা স্তব্ধ, হতবাক্‌। নিঃশব্দে অপেক্ষা করছি নিশ্চিত মৃত্যুর !

—"কোথায় এসেছি ?"

—"কি করে বলবো, কিছুই মালুম পাই না। আসমানের তারাও ঢেকে গেছে।"

"কি করবি ?"

একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো টাপুরে নৌকার গলুইএ, মোচার খোলার মত দুলছে নৌকাটা, যে কোন মুহূর্তে ওর কাছি ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে তলিয়ে যাবে অতলে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে শরিফ টাপুরের চাল বেয়ে লাফ দিয়ে এসে পড়ল বড় নৌকার খোলে, বগলে একটা রংচটা সুটকেশ, হাতে সেই মুরগীর বাচ্চা। সভয়ে সেটাও আর্তনাদ করছে। ভিজে নেয়ে উঠেছে শরীফ। ভয়ে—শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে।

"নোঙর ফেল। বেয়ে কাজ নাই। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বি।"

সেইটাই নিরাপদ পন্থা, আর এগোন উচিত নয়, কে জানে একবার যদি পথ ভুল হয়, তাহলেই নিশ্চিত মৃত্যু, আর পথ ভুল যে করি নাই—তাই বা কে জানে। তারার নিশানায় চলেছিলাম—সেও তো মুছে গেছে অনেক আগে।

নোঙরের কাছি খুলেই চলেছে, মুখব্যাদান করে রয়েছে কোন দুর্বার রাক্ষস, তার ক্ষুধা আর মেটে না। সভয়ে মোটা অপস্রিয়মান কাছিটার দিকে চেয়ে থাকি, তল মেলে না। নব্বুই হাত নীচে জলের মাঝে ঝুলছে কাছি,—অন্য একটা কাছি জুড়ে নামলো নোঙর প্রায় একশো কুড়ি হাত জলের নীচে। একশো কুড়ি হাত জলের উপর ভাসছি, যেকোন মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঢেউ আসবে—ছিটকে ফেলবে নৌকাকে তারপর ? আমার প্রাণহীন দেহটাও ওই জলের নীচে পাতালপুরীতে পৌঁছবে, অবশ্য আমি তার খোঁজ পাবো না এই যা সান্ত্বনা !...

ঘুম ছুটে গেছে। সেতারের তারে যখন সুর ওঠে, তখন প্রতি মিনিটে তার নির্দিষ্ট একটা কম্পনবেগ থাকে, কিন্তু সেই কম্পনবেগ যদি কোনকারণে বেশী হয়ে পড়ে সেই তারে কণিকাগুলো সহ্য করতে পারেনা সেই আলোড়ন, ছিঁড়ে যায় তখনই। আমার মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বোধহয় নিঃশেষ হয়ে আসছে। এতদিন বিপদ—দুর্ভোগের টোকার সাড়া দিয়ে দিয়ে আজ সীমারেখার প্রান্তে এসে পৌঁচেছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে। কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বসে—দুলছি সংসারের দোলায়। মনে হয় চীৎকার করে বলি ওদিকে—খুলেদে নৌকা, যদি মৃত্যু আসে এখুনিই আসুক, এমনি করে মৃত্যুর মুখোমুখি বসে তার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পথচেয়ে থাকতে পারি না।

ভীরুমন আঁকড়ে ধরে নিজের স্মৃতিভরা অতীতকে। নিষ্ঠুর বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের কোটরে ঢুকতে চায়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার সন্তান—স্ত্রীর মুখ। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তারা শান্ত গৃহকোণে; হয়তো ছেলের ছোট্ট হাতখানা বেষ্টন করে ধরেছে তার মায়ের গলা, কপালে গালে লুটিয়ে পড়েছে একরাশ চুল,… তারা জানবেও না—এমনি রাত্রিতে কোথায় বঙ্গোপসাগরের বুকে বসে আমি জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাদের কথা স্মরণ করে গেছি।

নিষ্ঠুর প্রকৃতি—নিষ্ঠুর ভগবান! তিলে তিলে মানুষকে বেঁধেছো কঠিন মায়ার বন্ধনে, মা-ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, সংসার-বন্ধু-বান্ধব। ভালবাসতে শিখিয়েছো, শিখিয়েছে পৃথিবীকে ভালবাসতে। মুহূর্তের প্রথম আলোর ঝলকানি তাকে নেশা লাগায়, বহুদিনের দেখা ধরণী তার কাছে নববিবাহিতা বধুর মত মধুর হয়ে ওঠে,—এ তোমার নিষ্ঠুর পরিহাস। মৃত্যুর ভয় দিয়ে তুমি সেই সঙ্কল্পী মনকে পঙ্গু করে তোল। যদি সে পৃথিবীকে, মানুষকে না ভালবাসে, তবে এই দুনিয়ায় তার বন্ধন থাকবে কি?

তোমার মৃত্যুর চোখরাঙ্গানীকে সে তো পরোয়া করবে না। মানুষের এতদিনের ভালবাসা একদিকে, অন্যদিকে রেখেছো তুমি মৃত্যুকে। তাকে করেছে পরম সত্য। সত্যই যদি হয় তবে তার সৌন্দর্য্য কোনখানে? কে জানে? হয়তো এই চোখ তাকে পরশ করতে পারেনা,…তারজন্য প্রয়োজন অন্য চোখ—অন্য মন, অন্য জন্ম।

একটি স্মরণীয় রাত্রি! প্রতিটি পল—মুহূর্ত তার প্রগাঢ় ছাপ রেখে গেছে আমার জীবনে। বিবেক চেতনাহীন, নিষ্ক্রিয় আমি, প্রকৃতি আপনমনে আমার অসার মনের পাতায় নিজের আখরে রচনাকরে গেছে সেই রাত্রির মহাকাব্য। বর্ণনা করতে পারিনা—অনুভব করতে পারি।

কখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে জানিনা, চোখমেলে দেখি ছই এর বাইরে পালের নীচে গুঁড়ি মেরে বসে আছি। কুয়াসায় ভিজে গেছে গায়ের চাদর। সমুদ্রের ফোঁপানি থেমে গেছে, পুবদিকে আবীরের রং জমে উঠেছে। বাঁপাশে চেয়ে চমকে উঠি—মনে পড়ে রাত্রির জমাট আতঙ্কের স্মৃতি। মাটি বনভূমি জেগে উঠেছে; আমাদের নৌকা থেকে হাজার গজের মধ্যে। ঠিকই এসেছিলাম আমরা কাল রাত্রিতে।…দাঁড়ি-মাঝিরা পালের নীচে গুঁড়িমেরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক ওরা—সারারাত কাটিয়েছে কি এক দুশ্চিন্তায়, একটু বিশ্রাম করুক। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি আমরা।

আকাশে ভিড় জমিয়েছে গাংচিল। বাটাম পাখার দল' নৌকার উপর ঘুরে বেড়ায়—চীৎকার করে। ওদের দিকে চেয়ে থাকি। সমুদ্রের বুকে রং এর তুফান তুলে সূর্য্য উঠছে? ক্রমশঃ

হেমন্ত

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের অপূর্ব্ব বৈকাল!
সোনালি গাঁদারা এসে ভরিয়া দিতেছে শূন্য ডাল।
দোপাটীরা চলে গেছে কবে!
স্থল-পদ্ম সেই পথে একে একে মিলায় নীরবে!
খর্জ্জুররসের লোভে গাছে গাছে পাখীদের ভীড়;
শালিখের কিচির-মিচির,
ছাতারের অশ্রান্ত বকুনি,
ঘুঘুর করুণকণ্ঠে বৈরাগ্যের একতারা শুনি;
বুলবুলিদের কণ্ঠে বাজে জলতরঙ্গের সুর;
অস্তসূর্য্য বনানীরে পরায় সিঁদুর!
কী সুন্দর আজিকার অপরাহ্ণ বেলা!
কাঠবিড়ালীরা করে খেলা।
চারিদিকে বসুধার সবুজ সুষমা।
তোমরা করিও মোরে ক্ষমা—
যারা বলে, রজনীর স্বপ্ন এ সংসার,
আজিকার এই যে বিকাল,
খর্জ্জুরের রসে যত বুনো পাখী হয়েছে মাতাল,
ওদের বাঁধন-হারা কণ্ঠের কাকলি দিয়ে ভরা
মিথ্যা হোলো এই বসুন্ধরা?
মিথ্যা হোলো এই রবিরশ্মির আবীর?
মৃত্যুই একান্ত সত্য? আর সবই কল্পনা কবির?

মেঠো পথ

শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়

এতো শুধু মেঠো পথ তবে কেন এতো আলো
রাত জাগা ঝরা পাতা কংকাল প্রাংগণে
প্রাণের বিচিত্র পথে কতো আবির ছড়ালো
ক্ষণিক পরশ লাগে এ নিষ্পেষিত মনে।

এতো শুধু মেঠো পথ কাল পথের ওধারে
হলুদ বিদেহী চোখে উত্তপ্ত নিশ্বাসে
চলমান ইতিহাস বারে বারে উঁকি মারে
করুণ ব্যর্থ সুরে এই আকাশে বাতাসে।

ভয়াল প্রকৃতি ফেরে তন্দ্রায় তন্দ্রায়
জাগা পথে আসা আলো মনের গোপন কোনে
প্রাণের আকুতি জাগে কত আবেগ জাগায়
প্রসারিত আশাপথে সুনিবিড় আলাপনে।

তাই আজ ভাল লাগে আলো আর মেঠো পথ
লাল কনিকায় জাগে শুধু বাঁচার শপথ।

ফটো : হারাণচন্দ্র ঘোষ

গান

ওগো শ্রীপঞ্চমী—
(তুমি) লহ প্রণাম, লহ প্রণাম।
জনম জনম ধরি হে দেবী বাগীশ্বরী
আশিস করগো অবিরাম ॥
বেদ-বেদান্ত গণিত-কবিতা
জ্ঞানদায়িনী বীণা-শোভিতা
ওগো পূতা, ওগো পবিতা
(দেবী) লহ প্রণাম লহ প্রণাম ॥

বীণায় মধুর তানে, ভরাও কণ্ঠ গানে
জ্ঞানের উজ্জল-শিখা কর বিতরণ
হে মোর পরম, হে মহাস্মরণ

কুসুম কোরকে গাঁথা মালাটি পরাহু
নবীনা, প্রবীণা-অভিরাম

লহ প্রণাম, লহ প্রণাম ॥

কথা—শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

II সা সঋা ণ্া | সা ঋা পধপা I মা া া | গমগা ঋগঋা সা I
ও গো শ্রী প ন্ চ৹৹ মী ০ ০ ০ ০ ০

সা সঋা ণ্া | সা ঋা পধপা I মা া া | া া া I
ও গো শ্রী প ন্ চ৹৹ মী ০ ০ ০ তু মি

মা পা দা | র্সা র্া র্া I না র্সা দা | পা া মা I
ল হ প্র ণা ০ ম্ ল হ প্র ণা ম ০

গা মা ঋা | সা া া I
ল হ প্র ণা ০ ম্

মা মর্সা র্সা | র্সা র্সঋ্ণা ঋর্সণা I ণা দণা দণদা | পা া া I
নং নং মং ধ ০০ ০০০ রি

সা পা া | া া া I পা মা মপা | পদা দা া I
হে ০ দে বী ০ বা গী ০ শ্বং রীং ০ ০

সা ঋা গা | মা পা দা I মা পা দা | র্সা া া I
আ শি স ক র গো অ ০ বি রা রা ম্

না র্সা দা | পা া মা I গা মা ঋা | সা া া II
ল হ প্র ণা ম্ ০ ল হ প্র ণা ০ ম্

II র্সা া া | ণা ঋ্ণা র্সা I ণা ণদা ণপা | মা মজ্ঞা জ্ঞা I
বে দ বে দা ন্ ত গ নি ত ক বিং তা

পা া া | া া া I মা দা া | দা া া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ জ্ঞা ০ ন দা য়ি না

মা মণা দা | মদা ণর্সা দণা I ণা র্সা া | া া া I
বী ণাং ০ শোং ০০ ভিং তা ০ ০ ০ ০ ০

দা ণা র্সা | র্রা র্সর্রা র্মজ্ঞা I র্সা া দা | ণা ঋ্ণা া I
ও গো পু ০ তাং ০০ ও গো প বি ০ তা

ঋ্ণা র্সা না | র্সা া া I না র্সা দা | পা া মা I
দে ০ ০ বী ০ ০ ল হ প্র ণা ম্ ০

গা মা ঋা | সা া া II
ল হ প্র ণা ০ ম্

II দা দপা মা | মা া া I া া মপা | গম া া I
বী ণা য় ম ধু র তা ০ নেং ০০ ০ ০

গা গা পা | গা গা পা I গঋা গা ঋা | সা া া I
ভ রা ও ক ন্ ঠ গাং ০ নে ০ ০ ০

সা সা মা | মা া া I া া া | া া া
[illegible] উ জ ল শি খা ০ ০ ০

মা । মগা | গপা মা । I । । । | । । । I
ক র বিং তং র ণ্ ০ ০ ০

সা মা । | মা গা মা I মা পা । | । । । I
হে মো র্ প ০ ০ র ম্ ০ ০ ০ ০

পা । । | পদা মপা পণা I দা । । | । । । I
হে ম হা স্বং ০০ ০ র ণ্ ০ ০ ০ ০

দা ণা র্সা | র্সজ্জা জ্জা । I র্রজ্জ র্রা সর্রর্সা ণা | দা । । I
কু সু ম কোং র কে গা ০ থা ০ ০ ০

পা দপা পা | মা সা ঋা I মা । । | । । । I
মা লাং টি প ০ রা ম ০ ০ ০ ০ ০

সা । ঋা | মা । । I মা গা মা | পা । । I
ন ০ বী না ০ ০ প্র ০ বী না ০ ০

দা মা পা | দা । র্সা II লহ প্রণাম, লহ প্রণাম্।

ভি রা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঊষা একসঙ্গে দুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে পুরিয়া গল্প করিবার জন্য সূর্য্যসুন্দরের বিছানায় আসিয়া বসিল। বসিয়াই বুঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তখনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ঊষা বলিল, "তুইও ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'স্ না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয় বাপু"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে"

কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্মৃতিকথা'টি লইয়া গেল।

"তোমার শরীর দুর্ব্বল লাগছে না তো বাবা"—ঊষা জিজ্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভাল আছি। তোদের সবাইকে দেখে আমার অর্দ্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে সবাইকে একসঙ্গে এমনভাবে একসঙ্গে পেতাম কি—

সূর্য্যসুন্দর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে ঊষার বিলম্ব হইল না।

"মেজদা সেজদার কোন খবর এখনও আসে নি, নয়?"

"না। উশন্ আসবে। পৃথ্বী কি করবে কে জানে"

"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"

"কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে"

"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক"

সূর্য্যসুন্দর চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্য্যসুন্দরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ-চোখের স্বাভাবিক রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বাম হাত এবং বাম পায়ের অবশ্য তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

ঊষার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুই ডায়েট কন্‌ট্রোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাস নি, দুর্ব্বল হ'য়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মন। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না"

"তোমাদের সে যুগই আলাদা ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান? ফ্যাট ফ্যাক্‌টারি। এফ্ এফ্ বলে' ডাকে। ওদের গুষ্টির সব ফড়িংয়ের মতো চেহারা। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকো মধ্যে হংস যথা। প্রত্যেকটি জায়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। আর জান বাবা, সব্বাই আমার চেয়ে বেশী খায়। সেজ-জা তো তিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা লিক্‌লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইয়া তাহা দিগন্তকে দেখাইল। দিগন্ত তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে তাহার কানে কানে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না।

সূর্য্যসুন্দর উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ভাসুর-পোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হ'য়ে বসে' আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িতে, আর প্রত্যেকটি ছেলে বায়নাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। কুটুমের ছেলেদের বকা-ঝকাও যায় না। ওরি মধ্যে আবার শ্বশুরের মামা-শ্বশুরের আলাদা তত্ব। শ্বশুর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় খাবেন, চার পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি চাই—ভাজাভুজি, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শ্বশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত রুটি খাবেন না। কখনও একটু হরলিক্‌স্। কখনও দু' স্লাইস পাঁউরুটি, কখনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে পুরোনো ঝি চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিক মতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন তিনিই এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝক্কি আমার উপর—"

"বউ কেমন হ'ল—"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয় নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকায়, সরু সরু হাত, মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেন্টের উপরই আছে—। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্য্যন্ত—"

সূর্য্যসুন্দর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ কন্যাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলে-বেলায় নিজের পুতুলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল,-"উর্ম্মিলা, তুমি উঠে চান টান করে' এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি"

উর্ম্মিলা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল।

"আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস খাবেন"

"সে আমি করে' দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না"

উষা নিজে তখনও স্নান করে নাই। উর্ম্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্ব্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথরুমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথরুমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, উর্ম্মিলার হইয়া গেলেই সে বাথরুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে তাহার একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিসশাশুড়ির কাছে শিখিয়াছে। তাহা অনুসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে ছুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চট্‌চটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা শুকাইতে দেয়। তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার উক্ত চর্ম্মরোগটি হইয়াছিল।

উর্ম্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। উর্ম্মিলা চলিয়া গেলে সন্ধ্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একটু, হাসিয়া দিগন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

"সন্ধ্যা কি বলছে রে দিগন্ত—"

দিগন্ত নিরীহ মুখভাব করিয়া বলিল, "হিন্দু কোডবিল নিয়ে আলোচনা করছি আমরা—"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচকি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগন্তর সঙ্গে যেমন নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। উষা হয় তো আরও কিছু বলিত কিন্তু মিস বোস প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। মিস বোসের পুরা নাম অনুপমা বসু। সকলে তাহাকে অনু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্য আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

অনু আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বৌদি, আসুন একটু আমার সঙ্গে এবার—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন থাক—"

অনু দিগন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আগেই জানতাম, বৌদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আজও ইউরিণ রাখেন নি—"

চম্পার নত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

"চলুন ব্লাড প্রেসারটা নিয়ে নি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয় নি, আজও হবে না কি। চলুন—"

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

উষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে দারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভালই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিচ্ছু হ'ত না"

"ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমাদের রোজ ব্লাড প্রেসারও কেউ মাপে নি, পেচ্ছাপও কেউ দেখে নি, অথচ তিন তিনটে সুস্থ ছেলে বেশ নির্ব্বিঘ্নেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা—"

দিগন্তর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। তাহার ভয় হইল দুই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। সে সন্ধ্যাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে। যতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নিবে না—"

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্য্যক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে বিজয়িনীর মতো আর একবার উষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—শুনলে তো!

উষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, "বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝিনা, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বশুর একটি আধলা দেবে না, দেখে নিও"

এ আলোচনা কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে' দেখি"

"দেখ—"

সূর্য্যসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাম্প চেয়ারে তিন জামাই বসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন, রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার পর তাহারাও একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও তিনি কিছু শুনাইবেন। কিন্তু সদানন্দ এবং রঞ্জনাথের সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-ফেরত এই ভায়রাভাই দুইটির সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। বিলাত-ফেরত বলিয়া ইহাঁদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কৌতূহলও ছিল। তাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কখনও জ্ঞাতসারে—কখনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি স্বদেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে বা শহরে

কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করেনা, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের। তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন আসল, মৎস্যটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন শিকারী, শিকারীসুলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের। সাহেব মানুষ তোমরা, অসুবিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—"

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামুলি বিনয়-বচন নহে। তাহাতে একটা আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, মেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, "পাড়া গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন কতকের জন্যে গিয়ে ছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। যে ক'দিন ছিলাম অতি কষ্টেই ছিলাম। বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওরা যত কেতা-দুরস্তই হোক না, ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখন আপন বলে' ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি বল হে রঙ্গনাথ।"

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোখে ওরা ফিরিঙ্গি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘৃণা করি তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ডাকাতদের সম্বন্ধে কারও সম্ভ্রম থাকতে পারে না"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দস্যুরাও আমাদের দেশকে এই কিছুদিন আগেই তছনচ্ করিয়াছিল, বর্গীদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্ব্বে উচ্চারণ করি না কি? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সত্যই ভালো তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার বুঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশী। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল। তাছাড়া পুরো-পুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পরের দ্বারে হাত পেতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্যে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন—এ ছোকরা বেশ চতুর। চিতা-বাঘের মতো প্রকৃতি। সদানন্দের কথা শুনিয়া কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত স্বদেশী বক্তৃতায় ভুলিবার লোক নন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে আমাদের দেশে স্বদেশীর ধুয়া প্রধানত বিলাত-ফেরতরাই তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও তাঁহার ধারণা যে ওটা তাহাদের আহত অহঙ্কারের আস্ফালন মাত্র। ওটা মুখোশ, আর ওই মুখোশের তলায় আছে নানাজাতের লোভ এবং মোহ। তাই তাঁহাদের মুখের বুলি সহজে কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না। এদেশের লোক অধঃপতিত বটে, কিন্তু আসল নকলের প্রভেদ তাহারা বোঝে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে চিনিতে তাহারা ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের মতে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক এবং একমাত্র স্বদেশী নেতা। সদানন্দের কথার সুরে তিনি কিন্তু বিস্মিত হইলেন, সুরটা মেকি মনে হইল না।

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে বারবার ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবী-কেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাম রাখিয়াছিলেন 'চ্যাটো ইন্‌ডাস্‌'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারত-বর্ষীয়, ফার্মের নামে ইহাই তিনি বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফার্মের নাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের ঋতু-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরাপুরি স্বদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্ভ্রম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি সুখ পাইতেছেন এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বৎসর ফার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাদারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে এবং প্যারিতে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি বিলাতী-ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভতার প্রশ্রয় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিকহলে, ক্যাবারেতে যে সব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন সে সব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে রসে তাহাতে স্বদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশী দিন থাকিবে না, আবার নূতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে নূতন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিস্মিত হইলেন। তবু একটু টিপ্‌পনি কাটিতে ছাড়িলেন না।

"তোমার ওই কৃচ্ছ্রসাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে

"কিছুমাত্র না। খুব ভাল লাগছে আমার এখানে। আর কিছু না হোক, কান আর চোখ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের মাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গনাথেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হচ্ছে—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্ত্তনই আমার ভাল লাগে"

হাস্যদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে একনজর চাহিয় আবার চীনা-গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তে পুনরায় চিতাবাঘের কথা মনে হইল। তিনি পুনরা প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা ভাবিতেছিলে কিন্তু বাধা পড়িল। দাদুর পরীক্ষা শেষ করিয়া গগ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাদুকে ছোট ডাক্তারবাবু"

"ভালই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরী করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় চলে যাক কে

"কুমারকে বল—"

"ছোটকাকা কোথা"

"মাঠে গেছে শুনলাম"

"আচ্ছা আসুক"

সূর্য্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক উর্ম্মিলা আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। উর্ম্মিলা করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ ঢুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের যে জায়গাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্য্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয় মনে তিনি অদ্ভুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন। একটা পথ যেন পূর্ব্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্ত কিছু নাই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পি হইতে মাঝে মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা যা

মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজেশ্বরীর, বাবার, পৃথ্বীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদূর হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকেও কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, সর্পিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমদিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। দুইদিকে ধূ ধূ করিতেছে প্রান্তর, প্রান্তরও দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর সহসা চিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু? নিষ্পলকনয়নে সূর্য্যসুন্দর সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে···।

৬

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে সূর্য্যসুন্দরের জীবন-স্মৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবিফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্তূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অসুখের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু সূর্য্যসুন্দর এবং বৃদ্ধ সূর্য্যসুন্দর যেন এক বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

"সাহেবগঞ্জে আমাদের রাখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পৌঁছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন; খাইবার সময় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। দিদিমার অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন। ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে খুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠিটি ছিল মামীমার হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জ্জন করে স্বভাবত তাহার স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভাবেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভব্যতার একটা আবরণ থাকিত। আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ, আমিও তাহা অনুভব করিতাম নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যে ভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলেনা। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানও শক্ত। নিজের জন্য বা আমার জন্য মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপড়-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো? মা কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে

অপূর্ব্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কখনও ভুলিবনা। দুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দেখিবেও না। তাঁহার কোনও ছবি নাই। তখন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বাবার ফোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোথাও বেশীদিন থাকিতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অন্য-প্রকার ছিল। তিনি সুরূপ শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোনপ্রকার আস্ফালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়ের ফোটো-তোলানো হয় নাই, কারণ তখন মামার বাড়িতে পরদা-প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সম্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভি-নেত্রীর বা কুলটার সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। তখন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তখন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফোটোগ্রাফাররা কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

ক্রমশ

ষটপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

কবরে গোলাপ ফোটে, গোবরে কমল,
ফণী মনসারও ডালে ধরে স্বাদু ফল,
হেরেছি হিংসারও কোলে করুণা ও ক্ষমা
মনসার গর্ভে নব জন্ম লভে রমা,
বিষের মন্থনে হয় অমৃত উদ্ভব
দেখেছি এ দুনিয়ায় সকলি সম্ভব,

(২)

অপূর্ব সুন্দরী জায়া, কর্ম্মব্যস্ত ইনজিনিয়ার
অবসর পায় নাক তার সাথে কথা বলিবার।
তরুণী সুন্দরী বধূ কলাবতী ; পশারী উকিল
তার সাথে প্রেমালাপে পায় না সময় একতিল
মডেল কুরূপা জায়া তারে লয়ে শিল্পী আঁকে ছবি,
বিগতযৌবনা তবু দয়িতার স্তব রচে কবি।

(৩)

নদীজলে মিশি নাই আত্মরক্ষা আশে
তরঙ্গের অঙ্গীভূত হয়ে নৃত্য করি নি উল্লাসে।
ক্ষুদ্র বারিবিন্দু আমি রবিরে ধেয়াই
নিজের হৃদয়ে তার প্রতিবিম্ব পাই।
দু-দণ্ডে শুকায়ে লবে দিবসের আলো,
জনতায় ডুবে মরা চেয়ে মোর এ মরণ ভালো।

(৪)

শ্যাম সুচিক্কণ পত্র একান্ত দুর্লভ
শুষ্ক পত্রে শুনি শুধু মর্মরের রব।
পাইনা কাহারো পত্রে মর্মের পরশ,
কুন্ঠিত-গুন্ঠিত পত্র হৃদি মোর করে না সরস,
স্থান তার ছিন্ন পত্রধানী
স্মরণে রয় না তার বাণী।

(৫)

একটি একটি দিন চলে যায়
ভুলায় তারে রাতের গভীরতা।
জীবনতরুর পত্র খসে
একে একে, বুঝতে না দেয় ব্যথা।
কমছে ছায়া, দোয়েল গেছে শীর্ণ শাখা ছেড়ে,
শুক্‌না পাতার মরমরানি যাচ্ছে শুধু বেড়ে।

(৬)

ধূলিধূমে সমাচ্ছন্ন কর্মবন কোলাহলে ভরা
দিবালোক সাথে যাক বর্ত্তমান লয়ে তপ্ত ত্বরা।
দিনান্তে আকাশে চাহি ছায়াপথে নক্ষত্র-পংক্তিতে
শান্ত-চিত্তে হের নিত্য স্মৃতিবন তোমার অতীতে।
নিশান্তে দিগন্তভরা রাগরক্তে অরুণের রথে,
জেগে উঠে হের নিত্য আশাবন তব ভবিষ্যতে।

(৭)

দ্বন্দ্বেরি মাঝে আপনারে মোরা চিনি
বিরোধীরে জিনে নিজেরেও মোরা জিনি।
সুপ্ত শক্তি তাহাতেই পায় প্রাণ
তাহা যে কতটা জানি তারও পরিমাণ।
দ্বন্দ্ব বিরোধে যে জন এড়ায়ে চলে,
লভি জড়ত্ব মরে সেই পলে পলে।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরে বাংলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনারী অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলিতেছে, অসামরিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারী অবহিতির একান্ত অভাব ছিল। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে গঠিত "দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন" সুস্পষ্টভাবে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই মন্বন্তর সৃষ্টিতে প্রকৃতি যতখানি দায়ী, মানুষ দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি জীবনের বিনিময়ে ইহাতে খাদ্যশস্যের কারবারীদের লাভ হইয়াছিল গড়ে ১৫০ টাকা।

এই দুর্ভিক্ষের পর হইতে বাংলার তথা ভারতের খাদ্যসচ্ছলতা কখনই আসে নাই, তবে কৃষিকেন্দ্রিক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আপেক্ষিক সাফল্যে খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা অবশ্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যে অসচ্ছল ভারতের বার্ষিক ঘাটতি দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ টনের মত। ইহার উপর প্রায় এক কোটি শরণার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসেন। সর্বোপরি আছে ভারতের স্বাভাবিক জন্মহারের বাহুল্য। সব লইয়া অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, ভারত সরকার কর্তৃক স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে গঠিত "খাদ্যশস্য নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি" ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতের বার্ষিক খাদ্যশস্য ঘাটতির পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টন বলিয়া অনুমান করেন।

বলা বাহুল্য, এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে বিদেশ হইতে আমদানী যেমন বাড়াইবার প্রয়োজন, তাহার চেয়ে বেশি প্রয়োজন এদেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির। ভারতে নানা ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতির প্রচণ্ড অভাব এবং বিদেশী মুদ্রার অপ্রাচুর্য্যের জন্য সে অভাব মিটানো কঠিন। এ অবস্থায় খাদ্য আমদানী কমাইতে না পারিলে ভারতে পুনর্গঠন পরিকল্পনা কেমন করিয়া সম্ভব? যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছিল, একমাত্র ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে ভারতকে ২১৬ কোটি টাকার সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

ভারতে শিল্পের জন্যই কৃষি-সচ্ছলতার প্রয়োজন এবং খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভাবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী চলিতে থাকিলে বিদেশী মুদ্রার অভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী অসম্ভব। এই জন্যই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া রচিত হয় এবং ইহাতে শিল্প খাতে যখন ধরা হয় ১৭৯ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৭·৬ ভাগ, কৃষিখাতে তখন ধরা হয় ৩৫৭ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১৫·১ ভাগ। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, কৃষি ব্যবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার ঘটিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে বার্ষিক খাদ্য-শস্যের ফলন ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, শেষপর্য্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতে কৃষিব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হইয়াছে এবং লক্ষীভূত ৭৬ লক্ষ টনের স্থলে খাদ্যশস্যের প্রকৃত বার্ষিক ফলনবৃদ্ধি ১ কোটি ১৬ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা খাদ্যাভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে খুবই আশ্বাসের কথা। অতঃপর কৃষির উপর আরোপিত গুরুত্ব কিছুটা কমাইয়া পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৌলিক (Basic) শিল্পের উপর জোর দেন এবং আশা করেন যে, এ-হিসাবে সাফল্যলাভ হইলে তৃতীয় বা পরবর্ত্তী পরিকল্পনার আমলে ভোগ্যপণ্য-শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া ভারতকে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা সহজ হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে মোট ব্যয়বরাদ্দের (৪,৮০০ কোটি টাকা) শতকরা ১১·৮ ভাগ কৃষি-খাতে এবং ১৮·৫ ভাগ শিল্পখাতে ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

প্রথমে কৃষির উপর আপেক্ষিক জোর কম হইলেও পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এক কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করেন (৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন হইতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন)। ক্রমে কৃষিজীবী এই দেশে কৃষির অব্যাহত গুরুত্বরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের মুসৌরী সম্মেলনে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পুনর্বিবেচিত হইয়া দেড় কোটি টন (মোট ৮ কোটি ৪ লক্ষ টন) হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী মাদ্রাজে সহকারী খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এম্ ভি কৃষ্ণাপ্পার এক ঘোষণা হইতে জানা যায় যে, ভারতে খাদ্য-পরিস্থিতির অবনতি প্রতিরোধকল্পে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেই ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের একটি স্থায়ী মজুত ভাণ্ডার গঠন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস নাগাদ ভারত সরকার এই ভাণ্ডারে ১০ লক্ষ টনের কিছু বেশি খাদ্যশস্য মজুতও করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের খাদ্যপরিস্থিতির সম্প্রতি অপ্রত্যাশিত অবনতি ঘটিয়াছে। এই অবনতি লক্ষ্য করা যায় মাত্র অল্পদিন আগে অর্থাৎ এদেশে আমন ধান ফলিবার সময়। সমগ্রভাবে ভারতে এ বৎসর ভাল বৃষ্টি হয় নাই, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে অনাবৃষ্টির জন্য কৃষির প্রভূত ক্ষতি হয়। বিহারে বৃষ্টির অভাবে চাষের ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, সরকারী হিসাবেই এ বৎসর বিহারকে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে প্রায় ২২,৫০০ বর্গমাইল জমি এবং পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসর ১২

লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে বলিয়া স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসচিবই আশঙ্কা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও মনে করেন, এই রাজ্যকে এ বৎসর ৮ লক্ষ টন সাহায্য না করিলে চলিবে না। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার এইরূপ অবনতির বিপরীত দিকে যদি ভারতে অন্যান্য রাজ্যের খাদ্যাবস্থা ভাল হইত, তাহা হইলে আশঙ্কার তেমন কিছু থাকিত না, কিন্তু এবার অনাবৃষ্টি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশকেই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ এই দুইটিই বাড়তি রাজ্য এবং গড়ে বৎসরে এই দুই রাজ্য হইতে ১০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। এ বৎসর কিন্তু রাজ্য দুইটির উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন অনুমান করিয়াছেন, এবৎসর খাদ্যাভাব হইতে মোটামুটি রেহাই পাইতে হইলে বিদেশ হইতে কমপক্ষে ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে এবং এজন্য ৯০ কোটি টাকার মত দরকার। বলা নিষ্প্রয়োজন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকারিতার সময় অপ্রত্যাশিত খাদ্য আমদানী খাতে এই ৯০ কোটি টাকা ব্যয় সরকারী অর্থ ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবেই। ইহার চেয়ে বড় কথা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবগ্রস্ত ভারতের পক্ষে মৌলিক শিল্পোন্নয়নের সহিত খাদ্য আমদানীখাতে এত টাকা ব্যয় বিপজ্জনক এবং যদিও উপস্থিত বিদেশী আমদানীর দায় মিটাইতে ভারত সরকার অর্ডিনান্সের সাহায্যে টাকার বিপরীতে বৈদেশিক তহবিল বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করিয়াছেন, তথাপি এই সাময়িক ব্যবস্থা মুদ্রানীতির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই স্থায়ী করা উচিত নহে বলিয়া বিশিষ্ট বহু অর্থনীতিবিদ্ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

তাছাড়া ৩০ লক্ষ টন বা ততোধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে গমের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা এমনি আসিয়া পড়ে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশের উপর ভারতের বিশেষ ভরসা, সেগুলি মূলতঃ গম-উৎপাদনকারী এবং গম রপ্তানীই তাহাদের পক্ষে সম্ভব। চাউল আমদানীর হিসাবে ভারতের সবচেয়ে বড় ভরসা ব্রহ্মদেশ, কিন্তু ব্রহ্মদেশে এবার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় প্রায় ⅙ ভাগ চাউল উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এ অবস্থায় ভারতকে খাদ্যের হিসাবে আগামী বৎসর বাঁচিতে হইলে খাদ্যশস্যের ব্যবহার সমগ্রভাবে এবং চাউলের ব্যবহার বিশেষভাবে কমাইতে হইবে। এ সম্পর্কে সরকারী আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে, চিন্তাশীল কেহ কেহ দেশবাসীকে অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দেশবাসী এই সাংঘাতিক অবস্থা যথাযথভাবে এখনো উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। খাদ্য মানুষের সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্য পরিস্থিতি অবনত হইলে তাহা সারা বাজারের অবনতি ঘটাইবে। এখন সবে আমন ধান উঠিয়াছে, এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক ব্যবস্থা যদি এখন হইতেই অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে আগামী আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশী মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

চাষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যই সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী পথ। শ্রীঅশোক মেটা পরিচালিত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Food Grains Enquiry Committee) তাঁহাদের রিপোর্টের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে বৎসরে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমত শতকরা ১¼ ভাগ হারে জনবৃদ্ধি না ঘটিয়া শতকরা ২ ভাগ হিসাবে বাড়িতেছে; লোকবৃদ্ধির হারের সমান্তরালভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হইলে বিপদ অনিবার্য্য। কাজেই কৃষির সাধারণ উন্নতির সহিত জনবৃদ্ধির সমস্যাটিকেও বিবেচনা করিতে হইবে।

উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে খাদ্যশস্যের বিকল্প আহার ব্যবহার প্রসার একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সেজন্য শাকসব্জির ফসল যতটা সম্ভব বাড়ানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দামোদর ও ময়ুরাক্ষীর সেচের জলের সাহায্যে ধানের জমিকে দো-ফসলা করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার কার্য্যকারিতার উপরও সমস্যার সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করে। অবস্থা যতই আয়ত্তে আসুক, অন্নভোজী ভারতবাসী যদি অবিলম্বে চাউলের ব্যবহার কমাইয়া গম ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলেও চাউলের তীব্র অভাবে বাজারে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে ত্রস্ত ক্রয়নীতির চাপে দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত হইবে। তাছাড়া সময় থাকিতে অভ্যাস না করিলে শেষ সময়ে গমের ব্যবহার শরীরও সহ্য করিতে পারিবে না।

লোকসভার বিগত শরৎকালীন অধিবেশনে খাদ্য সম্পর্কে বিতর্ককালে প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীএন্ সি ভারুচার মত কয়েকজন সদস্য ভারতের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির নিরিখে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুন-প্রবর্ত্তন দাবী করিয়াছিলেন। ভারত সরকার কিন্তু অশোক মেটা কমিটির অভিমত গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে রাজী হন নাই। নিয়ন্ত্রণ সারাদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া সকলের সুবিধা বিধায়ক না হইলে ইহার সার্থকতা নাই। কিন্তু এজন্য সরকারকে সবসময় হাতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন। ইহার পরিবর্ত্তে সরকার স্থির করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের বাজারে যাহাতে দুর্নীতি না চলে তজ্জন্য তাঁহারা খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবেন।*

---

* খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজৈন বলিয়াছেন: The Mehta committee report has recommended that controls in the sense as they existed during the war and afterwards should not be revived. They have said that the trade should be controlled in the various activites and some regulation at the end of producers and consumers may also be exercised. But over all

একথা না বলিলেও চলিবে যে জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটক্ষণে দেশকে বাঁচাইতে সকলেরই সক্রিয় হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলিয়াছেন, বর্ত্তমান শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমগ্রভাবে না হইলেও শতকরা ৭৫ ভাগ দায়ী, বাকী ২৫ ভাগ দায়ী প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। সত্যভাষণের শ্লাঘা অপেক্ষা বিরোধী সুলভ সরকার-সমালোচনার আগ্রহ এই মন্তব্যে অধিক হইলেও ইহার মূলতথ্য সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে অবিলম্বে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আত্মত্রুটি স্খালনে অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যুদ্ধের অগ্রাধিকারে খাদ্য-সঙ্কট প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করিয়া দেশবাসীকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও তলার স্তরে খাদ্য পরামর্শদাতা কমিটি (Food Advisory Committees) গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সর্ব্বদলীয় ভিত্তিতে গঠিত এইরূপ কমিটি সঙ্কট সমাধানে লক্ষণীয় সহায়তা করিবে আশা করা যায়। লোকসভার গত ৩রা ডিসেম্বরের অধিবেশনে সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীজগদীশ আবস্থি দেশের খাদ্য পরিস্থিতির সম্ভাব্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ১০ হাজার স্থল-সেনা (Land army) গঠনের যে পরামর্শ দেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্যও এই স্থলসেনাবাহিনী গঠনের কথা বলিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্য হইতে একটু বাছাই করিয়া এই সেনাবাহিনী গঠিত হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা কাজ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

---

control of the nature which existed during the war and afterwards may not be revived because of the inherent difficulties in these controls and the huge requirements of food that these controls entailed with ever increasing demand and general aversion of the country to controls'……The Policy of the Government is that trade should be controlled. We must know how and where stocks are, how they are being disposed of, a what prices they are being disposed of, and where we find that trade is indulging in speculative activity trying to push up prices, we shall not hesitate to lay hands on them.

সোমপুরী মহাবিহার

শ্রীঅপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে গুপ্তযুগের যতখানি, বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের পক্ষে পালযুগেরও ততখানি মূল্য ও মর্য্যাদা। সমগ্র বাঙ্গলাদেশ না হইলেও উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এবং এই স্বর্ণযুগেই বাঙ্গলার প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পালযুগে আসিয়া বাঙ্গলাদেশ আত্মস্থ হইল। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ধর্মে, শিল্পে ও স্থাপত্য-সৌন্দর্যে সে তখনকার ভারতে অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল। এই বিকাশের মূলে ছিল পাল সম্রাটদের অকুণ্ঠ দান। রাজা হিসাবে তাঁহাদের দৃষ্টি সকল শ্রেণীর প্রজার সর্বাঙ্গীণ কুশলের প্রতি নিবদ্ধ থাকিলেও পরমসৌগত এই রাজারা নিজেদের ধর্মের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোমপুরী, জগদ্দল ইত্যাদি প্রখ্যাত মহাবিহারগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। সেকালের বাঙ্গলাদেশে সোমপুরী বিহারই ছিল সর্বপ্রধান। ধর্মপালের সময় হইতে রামপালের জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর ধরিয়া এই সোমপুরী মহাবিহারটি উত্তর বাঙ্গলায় এক বিপুলশ্রী প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজ করিতেছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে বাঙ্গলাদেশে বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রায় সমকক্ষতা দাবী করিত। এত বড় সংঘারাম তখনকার বাঙ্গলাদেশে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু দুঃখ এই, তাহার সেই পরম দিনের বিতত যশ ও ঐশ্বর্যের সব সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। কাল তাহার সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অনেকখানিই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর নামে পরিচিত এই ধ্বংস স্তূপটি কতগুলি মাটির স্তূপের বা টিলার সমষ্টিমাত্র। ইহার মধ্যস্থলের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ঢিপিটি ছিল সর্বাপেক্ষা উঁচু ও ধ্বংসস্তূপেরই একটি অনবচ্ছিন্ন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়ের অনুরূপ আকার হওয়ার জন্যই বোধ হয় স্থানটি 'পাহাড়পুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত ইহার প্রকৃত পরিচয় কাহারও জানা ছিল না। বিশাল এক বটবৃক্ষের দ্বারা মণ্ডিত, ঘন জঙ্গল বেষ্টিত ও হিংস্র প্রাণী অধ্যুষিত এই স্থানটি বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে আগত ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টি ইহার প্রতি নিয়তই আকর্ষিত হইতে থাকে। রাজকর্মচারী, সৈনিক, পর্যটক যাহাই হোন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অনুসন্ধিৎসু হৃদয় ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক অতীত স্মৃতি নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছে—এই সম্ভাবনা বারে বারে তাঁহাদের মনে আঘাত হানিতে থাকে। ইঁহাদের মধ্যে বুকানন হ্যামিলটন ও ওয়েষ্টম্যাকট হইলেন প্রথম পথদর্শীদের অন্যতম। অধ্যবিস্তর খনন করিয়া বুকাননই সর্বপ্রথম বলিলেন ইহা একটি বৌদ্ধ মন্দির, কারণ যতটুকু

বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সাদৃশ্য দেখা যায়। বুকানন আরও বলিলেন যে মন্দিরটি পাল সাম্রাজ্যের সময়কালীন।

তৃতীয় দর্শক হইলেন জেনারেল কানিংহাম এবং ইঁহারই উদ্যমে প্রকৃত খনন কার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু বাধা আসিল স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে—তাঁহার জমিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ চলিবে না। কানিংহামকে কেবলমাত্র মধ্যস্থলের স্তূপটির খনন ও নীচের জঙ্গলের কিছু অংশ পরিষ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। একটি মৃন্ময়ফলকে হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখিয়া তিনি কিন্তু মন্দিরটি হিন্দু মন্দির বলিয়া স্থির করিলেন। প্রকৃত পরিচয়টি কিন্তু জানা যায় এক অপূর্ব উপায়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা নিজ নিজ প্রয়োজনে এই স্থান হইতে ইট সংগ্রহ করিতে আসিত। এই ঢিপিগুলির নীচে যে অফুরন্ত ইটের সঞ্চয় আছে তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। একদিন সমীর সোনার নামে একজন স্থানীয় অধিবাসী—ইট সংগ্রহ করিতে আসিয়া একটি অষ্টকোণ প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ একটি লিপি আবিষ্কার করে। ইহাই হইল শ্রীদশবলগর্ভের বিখ্যাত লেখ। উৎকীর্ণ লিপি একাদশ দ্বাদশ শতকের বাঙ্গলা লিপির নিদর্শন বলিয়া নির্ধারিত হইল। লিপির অর্থ হইল, "এই অপূর্ব স্তম্ভ শ্রীদশবলগর্ভ কর্তৃক ত্রিরত্নের (ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ) সন্তোষের ও সমস্ত জীবিত প্রাণীর হিতার্থে নির্মিত হইল।"

বুকানন হ্যামিলটনের মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল—মন্দিরটি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের এবং পাল সাম্রাজ্যের সময়কালীনও বটে। বিদ্বদ্জন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং অনেক চেষ্টার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্থানটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মমত খনন কায আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিস্মৃত বস্তুর পরিচয় উদ্ধার সহজ কায নয়। মন্দিরটির প্রথম নির্মাতা কে, প্রথম হইতেই কি ইহা বৌদ্ধ মন্দির ছিল—ইত্যাদি বিষয় লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের অবতারণা হইতে লাগিল। প্রাচীন বাঙ্গলার সংঘারাম ও মন্দির শিল্পের এই পরমাশ্চর্য নিদর্শনটি কাহার নিকট হইতে সর্বপ্রথম আপন রূপটি পাইয়াছিল?

প্রথম দিকে প্রায় সকল পণ্ডিতগণের ধারণা হইল যে প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে জৈনদের, পরে হিন্দুদের ছিল ও তৎপরে বৌদ্ধ সংঘারামে পরিণত হইয়াছিল। একটি প্রতিষ্ঠানের উপর তিনটি বিভিন্ন ধর্মের দাবীর কারণও ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। প্রথম একটি জৈন তাম্রশাসন, দ্বিতীয় মন্দির গাত্রে মৃন্ময় ফলকে উৎকীর্ণ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও কতিপয় হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি এবং তৃতীয়তঃ একটি মোহরে (sealing) উৎকীর্ণ ধর্মপাল ও সোমপুরী মহাবিহারের নাম। জৈন তাম্রশাসনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রস্তর মূর্তিগুলির কয়েকটিকে ইহার পরের যুগে ফেলা যায় এবং বয়সে সর্বাপেক্ষা নবীন হইল ধর্মপালদেবের মোহরটি।

তাম্রশাসনটির তারিখ (গুপ্তাব্দের) ১৫৯=৪৭৯ খৃষ্টাব্দ (১)।

ইহাতে লিখিত আছে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বটগোহালি গ্রামে অবস্থিত জৈন-শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর নামে উৎসর্গীকৃত বিহারটির পূজা অর্চনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নাথশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী রামী চারিটি বিভিন্ন গ্রামে ভূমি ক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলেন। পাহাড়পুর স্তূপের সংলগ্ন গোয়ালভিটা গ্রামটিকে এই বটগোহালি বলিয়া নির্দেশ করা হইল।

মন্দির গাত্রের মৃন্ময় মূর্তি ফলকগুলিকে পাল যুগের বলিয়া নির্দেশ করা গেলেও সমস্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। অধুনা ইহাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও ভারসাম্য দেখা যায় অন্য দুইটি শ্রেণীতে তাহা নাই। এই শ্রেণীর মূর্তি সংখ্যাও কম এবং ইহাদের গুপ্তশিল্পের পূর্ব-দেশীয় রূপ বলা হইয়াছে (২)।

মোহরটিতে উৎকীর্ণ আছে, "শ্রীসোমপুর শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার আর্যভিক্ষুসংঘস্য।" অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রতিষ্ঠানটি যে বৌদ্ধদের অধীনে ছিল তাহাও প্রমাণিত হইল। সীলে উৎকীর্ণ এই সোমপুরের নামের সহিত সাদৃশ্য আছে বর্তমান ওমপুর গ্রামের, যাহা এই ধ্বংসস্তূপের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বোধ হয় এই পরম্পরাক্রমে মন্দিরটি প্রথমে জৈনদের, তাহার পর হিন্দুদের এবং সর্বশেষে বৌদ্ধদের অধিকারে আসার মতটি সৃষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিষ্ঠানটির উপর হিন্দুদের দাবী অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কারণ মূর্তিগুলি সম্বন্ধে তাহাদের সংস্থান দেখিয়া এ কথা বলা গেল যে—ঐগুলি ঠিক ঐ মন্দিরগাত্রে স্থাপিত করিবার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত হয় নাই। কাছাকাছি কোন স্থান হইতে ঐগুলি মন্দিরটিকে সুশোভিত করিবার জন্য খুব সম্ভব সংগৃহীত হইয়াছিল।

পরলোকগত কে, এন, দীক্ষিত মহাশয় মন্দিরটি পূর্বে জৈনদের ছিল এরূপ ইঙ্গিত করিলেন এবং প্রমাণ স্বরূপ জৈনদের সর্বতোভদ্র বা চতুর্মুখ নামক মন্দিরের সহিত পাহাড়পুর মন্দিরের সাদৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার মতে মন্দিরটির প্রথম নির্মাণ কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই নিবদ্ধ,—যদিও পরবর্তীকালের সংযোজন চিহ্নও ইহাতে বর্তমান এবং তাহা সাধিত হইয়াছিল নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু সংঘারাম প্রথম নির্মিত হইয়াছিল অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে—যখন পাল নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম আবার বাঙ্গলাদেশে শ্রীমন্ত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু জৈন মন্দিরের উপর বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের কথাটা ভাল লাগে না। সেই যুগের বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে পরধর্মমত অসহিষ্ণুতার এরূপ কোন দৃষ্টান্ত একটিও জানা যায় না। সম্ভবতঃ জৈন মন্দিরের এই বিশেষ পরিকল্পনাটি বৌদ্ধরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মতের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী ব্রহ্মদেশের পেগানে বৌদ্ধ মন্দিরগুলির সহিত জৈনদের চতুর্মুখ মন্দিরের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন (৩)।

(১) Archeological Survey of India, Annual Report, 1927-28, p. 107.

(২) Early Sculpture of Bengal, S. K. Saraswati.

(৩) History of Bengal, (Dacca University), Vol. I, Temple architecture—S. K. Saraswati.

ইহার দ্বারা কিন্তু পাহাড়পুরে জৈন বিহারের অবস্থিতির কথা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে এই একটিমাত্র তাম্রশাসনের কথা ভিন্ন জৈনধর্মের আর কোনও চিহ্ন সেখানে পাওয়া যায় নাই।

এইবার বিহারটির নাম ও নির্মাতার নামের প্রসঙ্গ আসে। বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধদের অনেকগুলি বিখ্যাত বিহার ছিল এবং তাহার মধ্যে সোমপুরী বিহার অন্যতম। উপরে উল্লিখিত মৃত্তিকানির্মিত মোহরটির সাহায্যে জানা যায় যে পাহাড়পুরের এই ধ্বংসস্তূপটিই সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বাঙ্গলার এই বিখ্যাত বিহারটির উল্লেখ বোধগয়ায় ও নালন্দায় প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপিতেও আছে। "সোমপুরের অন্তেবাসী মহাযান-যাত্রী বিনয়ে পারদর্শী বীর্যেন্দ্র নামক এক স্থবিরবৃদ্ধ তাঁহার আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা ও সমগ্র জীব-জগতের পুণ্য অভিবৃদ্ধির কামনায় খৃষ্টীয় দশম শতকে বোধগয়ায় এক মনুষ্যাকার স্থানক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন" (৪)। নালান্দায় বিপুলশ্রীমিত্রের লিপিতে বঙ্গাল সৈন্যদের দ্বারা সোমপুরী বিহারের বিধ্বস্ত হওয়া ও বিপুলশ্রী কর্তৃক তাহার সংস্কারের কথা জানা যায় (৫)। তারনাথের গ্রন্থে, পগ্-সম্ জোন্-জঙ্গ এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদেও সোমপুরী বিহারের নাম পাওয়া যায়।

কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন কে? পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সীলে স্পষ্টই লেখা আছে যে ইহা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত। কিন্তু তারনাথের সহিত পগ্-সম্-জোন-জঙ্গের গ্রন্থকর্তা একমত হইয়া দেবপালকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই দুই আপাতবিরোধী তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এই বলিয়া যে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ধর্মপালের সময় এবং সমাপ্ত হইয়াছিল তাঁহার পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে (৬)।

মন্দির ও সংঘারামের সংস্কার যে অনেকবার সাধিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপুলশ্রীমিত্রের লেখটিতেও সেই কথা আছে। হয়ত প্রথম মহীপালের সময়েও একবার সংস্কার হইয়াছিল। মহীপালদেব সদ্ধর্মের পরম অনুগত ছিলেন এবং বাঙ্গলার বাহিরেও তাঁহার রাজত্বকালে যে কোনও কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার সাধন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমপুরীর সহিত বোধহয় মহীপালদেবের নামটিও সংযুক্ত আছে। সমস্ত পাহাড়পুর এলাকাটি চারিপাশের স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট মহীদলন নামে পরিচিত। নিকটবর্তী একটি স্থানকে এখনও তাহারা মহীদলনের কন্যা সন্ধ্যাবতীর স্নানের ঘাট বলিয়া নির্দেশ করে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় স্তূপের দক্ষিণপূর্ব কোণের কিছু দূরে একটি ইষ্টকনির্মিত স্নানের ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (৭)। পালযুগের বিখ্যাত এই বিহারের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত উপাখ্যানের এই মহীদলন রাজা মহীপালদেব হওয়াই সম্ভব। এই সন্ধ্যাবতী ও তাহার অসিদ্ধ সন্তান সত্যপীরকে লইয়া অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে এবং মূলস্তূপের পূর্বদিকে কিছুদূরে অবস্থিত একটি স্তূপ সত্যপীরের ভিটা নামে পরিচিত। স্বর্গীয় অধ্যাপক ডি, আর, ভাণ্ডারকরের মতে, দেবপালের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী দুর্বল পালনরপতিদের সময় প্রতিষ্ঠানটি বোধহয় পরিত্যক্ত হইয়াছিল; (রাজানুগ্রহ ব্যতীত এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখা সম্ভবপর ছিল না, কারণ ইহার অবস্থান জনবহুল নগর হইতে দূরে), এবং প্রথম মহীপালের সময় ইহার সংস্কার সাধন করা হয়। কিন্তু বিপুলশ্রীমিত্রের লিপিতে উল্লিখিত বঙ্গাল সৈন্যরা কাহারা? কাহারও কাহারও মতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বরেন্দ্রে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ হইয়াছিল সেই বিদ্রোহীদের দ্বারাই সোমপুরী বিহার আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং এই লেখটিতে তাহারাই বঙ্গাল নামে অভিহিত (৮)। আর একটি মত অনুসারে বঙ্গাল নামে একটি জাতি ছিল, যাহাদের মধ্যে বঙ্গাল-বড় এবং বঙ্গাল-ছোটা বলিয়া এক শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল, তাহারাই বোধ হয় ইহার জন্য দায়ী। এই জাতির চিহ্ন এখনও তিব্বতের কুলুপ্রদেশে পাওয়া যায়, এবং খুব সম্ভব ভূতাত্ত্বিক টলেমি তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের পূর্ব-ভারতের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৯)। সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় অনুমান করেন, ইহারা হয়ত সৈন্ধব-শ্রাবক নামে সিংহল-দেশীয় হীনযান ভিক্ষুর দল, যাহারা ধর্মপালের জীবদ্দশাতেই বিক্রমশীল বিহার আক্রমণ করিয়া হেরুকের মূর্তি এবং কতগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ নষ্ট করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতে ইহাদের অধিষ্ঠান ছিল সিন্ধু প্রদেশে। বোধ হয় ইহারা গুর্জর-প্রতীহার নরপতিদের সাহায্য ও পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেন রাজাদের সময়েও ইহাদের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল (১০)। কিন্তু এখন ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গাল এবং এই ভূখণ্ড হইতেই এক সেনাদল, সম্ভবতঃ কোনও অ-বৌদ্ধ রাজার অধীনে, গিয়া একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সোমপুরী বিহারকে অগ্নিদাহে বিনষ্ট করিয়াছিল। গুরুপরম্পরায় তিন পুরুষ পরে ভিক্ষু বিপুলশ্রীমিত্র উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহারের আয়তন ছিল বিশাল, বিরাট। স্বর্গীয় কে, এন, দীক্ষিতের ভাষায়, "এরূপ বিরাট সংঘারাম ভারতে আজ পর্যন্ত

(৪) বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২০৯

(৫) Ep. Ind. Vol. XXI, pp. 97 ff.

(৬) Indian Culture, Vol., p. 231; বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ২০৮

(৭) Arch. S. I. Ann. Report, 1922-23, Dr. D. R. Bhandarkar.

(৮) Memoir of the Arch. Surv. India, No 55, K. N. Dikshit, p. 6.

(৯) Indian Culture, Vol. II, p. 755.

(১০) The Age of Imperial Kanauj, pp. 272 ff

আশাকরি তোমরা ভেবে দেখ্বে

উপানন্দ

যেমন কেউ মুকুটে কাচ আর নূপুরে মণি ধারণ করলেও মণির সম্মান নষ্ট হয় না, বরং প্রয়োগ কর্তার মূর্খতা প্রকাশ পায়, সেই রকম মূর্খকে উচ্চপদে ও বিজ্ঞকে নিম্নপদে স্থাপন করলেও বিজ্ঞের সমাদর নষ্ট হয় না, বরং নিয়োগকর্ত্তারই মূর্খতা জানা যায়। যেমন কোন বনে একটি সুগন্ধি পুষ্পিত বৃক্ষ থাকলে সমস্ত বন সুবাসিত করে, সেইরূপ কোন হীন বংশে একটি সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করলে, তার সৎকার্য্যের সৌরভে সেই হীন বংশও সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত হয়।

বিদ্যার আদর কোন দিনই নষ্ট হয় না। ক্ষমাবান তাপসগণ যেমন কুরূপ হোলেও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র, সাধ্বী স্ত্রী কুৎসিতা হোলেও যেমন সকলের ভক্তির পাত্রী, কোকিল কালো হোলেও যেমন সুস্বরের গুণে সকলের আদরণীয়, বিদ্বান ব্যক্তি কুরূপ হোলেও সেই রকম জনসাধারণের প্রীতিভাজন হোয়ে থাকে। পূর্ণবিকশিত পলাশ ফুল বড় গাছেই জন্মায়, আর দেখ্‌তেও সুন্দর, কিন্তু পলাশ ফুলের গন্ধ নেই বলেই যেমন তাকে কেউ নেয় না, তেমনই বিদ্যাহীন ব্যক্তি রূপযৌবনসম্পন্ন আর কুলীন হোলেও বিজ্ঞলোকে তার সমাদর করে না। তাই বাল্যে সময় নষ্ট না করে যাতে প্রকৃত বিদ্বান ও জ্ঞানী হওয়া যায় সেদিকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক—চিন্তাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্যে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর চেষ্টা করা উচিত।

পাঠ্যপুস্তকগুলির পঠনের উদ্দেশ্য না জানা থাকলে কোন ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক উৎকর্ষতা লাভ হয় না। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অনেক প্রয়োজনীয় সদ্‌গ্রন্থ পড়ার দিকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী আগ্রহশীল না হোলে, প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হওয়া দুরূহ। যে সকল গ্রন্থপাঠে অন্তঃকরণে জ্ঞান-তৃষ্ণা, ভক্তি, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানুরাগ, ভগবৎপ্রেম প্রভৃতি মহান্ ভাব উদ্দীপিত হয়, সেগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ না করতে পারলে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, কিভাবে জীবনের ভবিষ্যৎ পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হোতে পারে।

এজন্যে সময়ের ব্যবহার সম্যক্‌ভাবে জানা আবশ্যক। সময়ের প্রকৃত মূল্য না জানাতেই অনেকে বৃথা সময় নষ্ট করে। যেমন সূক্ষ্ম অণুদের সংযোগে সমস্ত স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিমেষ নিয়ে দিন, মাস, বৎসরাদির উৎপত্তি হয়েছে ;—এই রকম কতকগুলি বৎসরের সমষ্টিই জীবনের পরিমাণ, অথচ এমন নিঃশব্দে এরা চলে যাচ্ছে যে সহজে বুঝ্‌তে পারা যায় না। ছাত্রজীবনে সময়ের সদ্ব্যবহারই পার্থিব জীবনের উন্নতির নিদান, এটা ভুললে চল্‌বে না। লেখা পড়ায় অবহেলা করলে ভবিষ্যৎ জীবনে বহু কষ্টই পেতে হয়, এজন্যেই পূর্ব্বহোতে সতর্ক হওয়া উচিত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও চরিত্র সংগঠন। শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার প্রণালী অনুন্নত হোলে কোন জাতির ভবিষ্যৎ উন্নত হোতে পারে না। অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞানার্জ্জনই তার প্রকৃত লক্ষ্য, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি।

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় কলেজে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অধ্যাপকগণ লেকচার বা বক্তৃতা দিয়েই দায়মুক্ত হয়ে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র নেই বললেই চলে। যে সব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনাবিষ্টতা দোষ আছে, তাদের সে দোষ সংশোধনের কোন চেষ্টাও তাঁরা করেন না। আজ্‌কের দিনে অসচ্চরিত্র শিক্ষকের সংখ্যা বড় কম নয়, এসব শিক্ষকের দ্বারা কখনও প্রকৃত শিক্ষার কাজ নির্ব্বাহ হয় না। শিক্ষকমাত্রেই ছাত্র-ছাত্রীকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন, এইটাই প্রত্যেক জাতি আশা করে। শিক্ষকের পক্ষে অতি

কঠোরতা বা অতিমৃদুতা উভয়ই বর্জ্জনীয়। আধুনিক শিক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শিনী। এধরণের শিক্ষায় স্মৃতিশক্তির অনুশীলন হোতে পারে, চিন্তাশক্তির সাম্যক্ বিকাশ হয় না। বর্ত্তমানে সহজমুলভ পন্থা অনুসরণ করে সামান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কি ভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাই খুঁজে বের করার দিকেই সাম্প্রতিক ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য। আজ্কের দিনে দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব রয়ে গেছে। এদের অনেকেই বেশভূষার আড়ম্বর ও অঙ্গপ্রসাধনের দিকে যেরূপ দৃষ্টি দেয়, লেখাপড়ার দিকে সেরূপ দৃষ্টি দেয় না। দেহ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক বটে, কিন্তু বিলাসিতার দিকে জোর দেওয়া উচিত নয়। যারা উন্নতি-লিপ্সু, তারা ছাত্রজীবন কখন আমোদে প্রমোদে অতিবাহিত করে আত্মশক্তি নষ্ট করেনা। তারা সাংসারিক ঘটনাস্রোতে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায় না,—তারা বদ্ধপরিকর হয়ে স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ বা ঝটিকামুখে দণ্ডায়মান হয়ে নিজেদের আত্মশক্তি প্রয়োগ করে উন্নত হয়।

আজকের দিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের কোন মূল্য নেই,—ব্রহ্মচর্য্য পালন, নৈতিক আদর্শ অবলম্বন, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি রীতি অনেকেই অনুসরণ করে না। ধর্ম্মসম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অপব্যাখ্যার জন্তে ছেলেমেয়েদের মনে যে সব ভ্রান্ত ধারণা এসেছে, তার পরিণাম যে শুভ নয়, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। যোগ্য জীবন যাপন না করলে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি ঘট্তে পারে এরূপ আশঙ্কা করা যায়। দেশের সকল শিক্ষার ভার রাষ্ট্রশক্তির হাতে থাকা দরকার,—ঘরোয়া শিক্ষা সব সময়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে না। কুশিক্ষা মানুষকে অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলে, আর তাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হোতে পারে।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। স্রোতোবিহীন সলিল যেমন কৃমি-সঙ্কুল ও দূষিত হয়, অলস ও বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির চিত্ত ও সেই রকম নানা-বিধ কুচিন্তায় কলুষিত হয়। অনেকে মনে করে থাকে যে পরিশ্রম-শীলতা ও প্রতিভা প্রায় এক সঙ্গে দেখ্তে পাওয়া যায়না। যাদের প্রতিভা আছে; তাদের পরিশ্রম করতে হয় না, এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপই মানুষ উৎকর্ষ লাভ করে থাকে। যার প্রখর বুদ্ধিশক্তি আছে, পরিশ্রম করলে তার উন্নতি সাধিত হবে—আর যার বুদ্ধিশক্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, পরিশ্রমই তার অভাব পূর্ণ করবে। সুপরিকল্পিত পরিশ্রমের কাছে কিছুই অপ্রাপ্য নেই। নিশ্চেষ্টতা গুণের আদর্শ নয়, অধ্যবসায়ই উন্নতির মূল।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যাঁদের বিজ্ঞানের স্থূলজ্ঞান মাত্র জন্মেছে, তাঁরা উদ্ধত, নির্ম্মম ও অবিশ্বাসী হোতে পারেন, কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকে জেনেছেন, তাঁরাই সেই একমাত্র অচিন্ত্যশক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য দেখে বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছেন। জীবের প্রতি প্রেম আর ভগবানের প্রতি অনুরাগ এই দুইটাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। আত্মাভিমান ও লালসায় পূর্ণ কঠোর মানবহৃদয় দুঃখবিদারিত না হোলে ভগবৎ প্রেম গ্রহণ করতে পারে না। যার জীবনে কোন উচ্চ লক্ষ্য নেই, তার চরিত্রে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি সদ্গুণ স্ফুরিত হয়না।

কর্ত্তব্যপথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিভীষিকাময়। কর্ত্তব্যসাধনে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়, অনেক লোকের বিরাগভাজন হোতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নির্ভীক হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। স্বার্থশূন্য কর্ত্তব্যসাধনই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা। বিনয় আত্মমর্য্যাদার প্রতিকূল নয়, কিন্তু বিনয়ের আতিশয্য চাটুকারিতাই প্রকাশ করে। চাটুকারের বাহ্যনম্রতাকে বিনয় বলা যায় না, এটা তার অসারতা ও কপটতার পরিচায়ক মাত্র। অত্যধিক বিনয়বশতঃ অসত্য বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কাপুরুষের কাজ।

ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভবিষ্যতে কি হবে তার কিছুই স্থিরতা নেই। বর্ত্তমানকালকেই আশ্রয় করে বুদ্ধিমান লোক কাজ করে থাকেন। যে কাজ করতে হবে, তা এখনই করা উচিত, নতুবা তা সম্পাদিত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের আশায় থাকা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।

ইচ্ছে থাকলে পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, তজ্জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করে কৈশোর অবস্থায় লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হওয়া দরকার। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলা, আড্ডা, কুৎসিত আমোদপ্রমোদ আর আলস্য ছাত্রজীবন গঠনে প্রতিবন্ধক। আশা করি এ বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখ্বে।

অভিযাত্রী

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম. এ.,
পি এইচ ডি, পি আর এস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময় বৃদ্ধ মেহেরচাঁদ শুদ্ধাচারে ভক্তিভাবে সাধুর জন্ত কিছু দুধ ও ফল নিয়ে এলো ও আমায় তার কুটীরে নিয়ে গেলো কিছু খাওয়াতে। তার নাতিটি খুব ভালো আছে—হাসচে খেলচে দেখলুম। আমি নিজের মনে আমার জীবনের এই ওয়াইমার-দর্শনের আশ্চর্য অধ্যায়টি নাড়াচাড়া করছি—জানিনা তখনও আরও অপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনায় আমার মন চিরদিনের মতো ভরে উঠবে। মেহেরচাঁদের আন্তরিক আপ্যায়নে তৃপ্ত মনে তার কুটীর হতে সাধুর কুটীরের দিকে পা বাড়িয়েছি হঠাৎ শুনলুম ভারী বুটের শব্দ—চেয়ে দেখি অনেক দূরে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর

একটি যুবক সাহেব একজন দেশী লোকের সঙ্গে দ্রুত পায়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। পলকের মধ্যে যুবকটি আমার সম্মুখে এসে বললে: সুপ্রভাত স্যর। তিনি কই, সাধু ওয়াইমার?—যুবকের মুখ পরিশ্রমে ও উত্তেজনার আবেগে অরুণ-রাঙা—তার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জার্মান টান শুনে আমি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলুম। তারপর সযত্নে তার হাতখানি ধরে তারই মতো আবেগে দুলতে দুলতে সাধুর কুটীরের মধ্যে ঢুকলুম। সাধুর চোখ তখন ধ্যানে নিমীলিত। : বাবা—বাবা। বলে যুবক সন্ন্যাসীর হাতদুটি দুই হাতে টেনে নিয়ে চুম্বন দিতেই সাধু দুই চোখে অতি কোমল শান্ত দৃষ্টিতে অসীম স্নেহকরুণা ঢেলে ছেলের পানে নিথর হয়ে চেয়ে রইলেন—মুখে ফুটে উঠলো স্বর্গের হাসি।—সেই মুহূর্তেই আমি পিতাপুত্রের এই অপূর্ব মিলনের মধ্য হতে সরে এলুম বাইরে।

সে রাতে মেহেরচাঁদের ওখানেই রইলুম—কিছুতেই ছাড়লে না সে। পিতাপুত্রে সেই চিনার গাছের তলের ছোট্ট কুটীরেই রইলেন। সকালে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে গেলুম কুটীরে। সন্ন্যাসীর আসন শূন্য—পুত্র বসে আছে চোথ দুটি বন্ধ করে। আমায় দেখে বললে: আসুন! বাবা চলে গেছেন খুব ভোরেই অমরনাথের পথে। : আপনি কেমন কোরে খোঁজ পেলেন ওঁর? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে বললে: খুব সহজেই—হিমালয়ের দু তিনজন তপস্যা-মগ্ন সাধুর কৃপালাভ করলুম—তাঁরাই সব বলে দিলেন—সকলেই চেনেন বাবাকে। অমরনাথের পথে তাঁকে পাবো—এও তাঁরাই বলেছেন। তাছাড়া শ্রীনগরের এক ডাক্তারের কাছে বাকী খবরটাও পেয়েছি।

যুবক ওয়াইমারের সঙ্গে অনেক গল্প হলো। বিদায় নেবার সময়ে সে ব্যাগ হ'তে একটি ছোট পুরানো ডায়েরী আমার হাতে দিয়ে বললে: বাবা এটি আপনাকে দিতে বলেছেন—পড়া হয়ে গেলে আবার আমায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

: ঠিকানা? কোলোনে দোবো তো?—আমার এ প্রশ্নের জবাবে সে হেসে বললে: না। তিনমাস আগে মা কোলোনের বাড়ীতে মারা যান—আমিও চলে আসি ভারতে। এখন আমি হিমালয়ের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবো। আপনি আলমোড়ার রামকৃষ্ণ মঠে পাঠিয়ে দেবেন ডায়েরীটি।

* * * *

ফিরতি পথে কলকাতার ট্রেণে ডায়েরী খুলে পেলুম আমার প্রশ্নের উত্তর।—

: আজ এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েচি। খোকন বিছানায় পড়ে—স্কুলে যেতে পারে না। শুয়ে শুয়ে কেবল গল্পের বই পড়ে, আর ভাবে ওর সঙ্গী-সাথীরা না জানি কতো কি শিখে নিলো। আমায় আজ বলছিলো—'অসুখটা সারে না কেন বাবা?' আমি গল্প কোরে ওর পাঠ্য জিনিষগুলির কতক শেখালেম—সান্ত্বনা দিয়ে বললেম—'এ সব সোজা জিনিষ তো' তুই দুদিনেই শিখে নিবি খোকন সেরে উঠে। তারপর ওর মনে উৎসাহ দেবার জন্য ওকে রসায়ন-শাস্ত্রের দুই একটি পরীক্ষা দেখাই—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে কেমন করে জল হয়, আবার জলকে বিদ্যুৎ দিয়ে কেমন কোরে এই দুইটি গ্যাসে পরিণত করা যায়। খোকন চোখ বড়ো বড়ো কোরে সব দেখলো—তারপর এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।···এই রকম আরও আট দশটি পাতা। তারপর—

: আজ সকালে ওর ঘরে আরও দু একটি পরীক্ষা দেখাবো বলে যেই গিয়েছি ও বললে—'ওসব আর দেখে কি হবে—আমি কাল রাতে জেগে-জেগে আপন মনে অনেক ভাবচি বাবা!' ওর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে হেসে বললেম—'কি ভাবলি খোকন?'

'তুমি কাল বললে যে পৃথিবীতে এই রকম একশোটি মৌলিক পদার্থ আছে, আর তাদের মিশ্রণে নানা বস্তুর উৎপত্তি।—আর তুমি তো বলতেই পারলে না যে কেন এতোগুলি মৌলিক পদার্থ হলো—আর কেন এরা এই নিয়মে অন্যান্য যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে?'

'খোকন। বৈজ্ঞানিক সে কথা কোনদিনই বলতে পারবে না, কারণ এসব তো আর চোখে দেখা বা পরীক্ষার ব্যাপার নয়। ধরে নে—আমরা যেন এই ঘরের পিঁপড়ে—কেবল দেখতে পাই কি-কি আসবাব-পত্র বাসন-কোসন—আর কেমন নিয়মে তারা আসে যায়। কিন্তু যেহেতু তারা আমাদের মনের কথা জানে না—তারা এদের পেছনের কারণও জানতে পারে না। 'তাহলে কি আমরা

চিরকাল পিঁপড়ে হয়েই থাকবো? কি হবে বাবা—এ সব ওপর ওপর বৃত্তান্ত সংগ্রহ কোরে? এতো পরীক্ষা কোরে? এতো বই পড়ে? আসল কারণই তো জানতে পারবো না। আর এমনি একজন লোক কতোটুকুই বা জানতে পারে?"

খোকনের আন্তরিক বিশ্বাস ও বুদ্ধিমাখা গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বোললেম—'তাহলে তোমার বক্তব্যটা কি? বিজ্ঞান ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের?'—খোকন সেই রকম ভাবেই বললে—'ভগবান এই সব সৃষ্টি কোরেছেন আর এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মে পৃথিবী চালাচ্ছেন তো? তাহলে আমরা তাঁকে না জেনে—তাঁকে না জিজ্ঞেস কোরে বাইরে হ'তে দেখে-দেখে কতোটা শিখতে পারি? আর সে শিখেই বা কি হবে?...জানো বাবা! আমার অসুখের কথাও ভেবে দেখচি। যখন তিনিই কয়েকটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে আমার এই শরীরটি তৈরী কোরেছেন আর তাঁরই ইচ্ছা বা নিয়মে এর সমস্ত কাজকর্ম চলছে—তখন তিনি যদি আমার এই শরীরটিকে সারাতে না চান আমরা কেন বোকার মতো নানা ওষুধ দিয়ে সে চেষ্টা করবো?...তাই ভাবচি বাবা, আমি আর কোনও ওষুধই খাবো না। দেখি না কি হয়।'

আমি ওর কাছে বসে বুঝিয়ে বললেম যে মানুষকে ভগবান এমন কোরেছেন যে তাকে এমনি দেখে-দেখেই শিখতে হবে—উপায় নেই। খোকন মাথা নেড়ে বললো—'মানুষ শুধু শুধু তার অমন সহজ পথ ছেড়ে এই উলটো পথে চলতে শিখছে। ভগবান যদি আমাদের পিতা হন তো আমরা তাঁকেই তাঁর ঘর-বাড়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবো—আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় কোরে। তা না কোরে—চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে কিংবা গোয়েন্দা পুলিশের মতো তন্ন তন্ন কোরে সমস্ত পরীক্ষা কোরে দেখার কোনো মানে হয়? এর কি শেষ আছে? তুমি আমায় কতো পরীক্ষা দেখাবে বলো? আমি এমন জনকে জানতে চাই—যাকে জানলে সবই জানা যায়।'

আমি বললেম—'খোকন এসব তোর আজগুবী কথা। তোর শরীর ভালো হয়ে যাক—তখন দেখবি বিজ্ঞান কতো ভালো—কতো সুন্দর।' ও ওর ছোট ঢলঢলে সুন্দর মুখখানি তুলে তুলতুলে দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—'তুমি আমায় ওভাবে না শিখিয়ে যদি একেবারে গল্পকোরে সমস্ত জিনিষের কারণ বলতে পারো—তবেই আমার ভালো লাগবে, আর আমার সব অসুখ সেরে যাবে, ভালো হয়ে যাবো বাবা।'

আমি তো অবাক। খোকন ঐভাবেই বলতে লাগলো—'বইতে পড়েচি যে আমাদের দেশে আর পূর্বদেশে বিশেষ কোরে এমন সব সাধুপুরুষ আছেন যে তাঁরা মনশ্চক্ষে কতো-কি দেখতে পান—কতো কি জ্ঞান তাঁদের এমনিই হয়। ভগবানের কাছ হ'তে সরাসরি তাঁরা এসব পান।...তাছাড়া জানো বাবা। তাঁকে পেলে নাকি এতো আনন্দ হয় যে এতোসব খুঁটিনাটির জ্ঞান—যা বিজ্ঞানে তোমরা খুঁজে সারা হও—তার দরকারই থাকে না। ঐ বইটা কাল পড়ে অবধি আমার আর এই অসুখে পড়ে থাকতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে বেঁচে না থাকলেও ভগবানের রাজ্যে কোথাও না কোথাও আমি নিশ্চয়ই থাকবো। ভগবান নিশ্চয় আমার জন্য কিছু না কিছু ভেবে রেখেছেন—আর তা' আমার ভালোর জন্যই—কারণ তাঁর ইচ্ছায় যেভাবে থাকবো তাই আমার ভালো লাগবে—যেমন সেই যে স্কুলে যে নাটক কেরোছিলেম তাতে যা পার্ট পেয়েছি তাই ভালো লেগেছে।'

আমি খোকনের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেম—ওর কচিমুখ রাঙা—নীল চোখ দুটি জলজল কোরছিল। মনে হলো ওর অনুভূতিতে হয়তো এমন একটি সত্যের প্রকাশ ঘটেছে—যা আমি পেয়েও হারাচ্ছি। হয়তো আমার এ পথ ভুল—অনাবশ্যক সময় আর শক্তির অপচয় মাত্র। হয় তো আজকের সমস্ত মানুষের সভ্যতাই ভুলপথে চলেছে। বিজ্ঞানের অভিযান হয়তো আমাদের আসল ছেড়ে বহিরাবরণের দিকেই চিৎ-শক্তিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি তলে আজ হয়তো খোকনের মতো দুএকজনের সতর্কবাণী কোন অতলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু আমি নিজেও কি এ বাণী কাণে তুলবো না? একবার পরীক্ষা কোরে দেখবো না অন্য পথটা? হয়তো ওটা খুবই সহজ হবে। ভারতে শুনেছি অনেকেই এপথে দ্বিধাহীন হয়ে যান হন ও তাঁদের লক্ষ্যেও

পৌছান। আমিও কি-বার হবো? তবে খোকন আর তার মা? তাদের কি হবে?…কি করবো—ভগবানের হাতেই সব কিছুর সঙ্গে নিজেকেও করবো সমর্পণ?… তিনিই নিন সব কিছুর ভার—আমি আত্মনিবেদন করলেম।" * * * *

পারুল

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

ঝক্‌মকে জোছনায়
কেন মা'গো বকো মোরে
জ্যোছনার আলো আসে
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে—
চারিদিক ঝল্‌সায়
বলো, 'চোখে ঘুম নাই।'
বাতায়ন পথে ওই—
আকাশের বুকে রই'।

চারিদিক আলো-করা
আকাশের চাঁদ দেখো,
সাত ভাই চম্পারা
আমি যে তাদের বোন
আজ রাত ত্পুরে—
ভাসে তালপুকুরে।
জাগে ঐ আকাশে
চোখে কি মা ঘুম আসে!

চুপ ক'রে শোন মা'গো
গাছে গাছে শাখে শাখে
নিশীথের ফুল-বীথি
কেন মা'গো চোখ্ তোর
কিচিমিচি কলরব
ডাকে যত পাখী সব।
ভরে' গেছে ফুলে ফুলে
মরে' ঘুমে ঢুলে ঢুলে।

আজকের মত মা'গো,
হাই তোল, তুড়ি দাও,
নিভিয়ে ঘরের আলো
আমি যে 'পারুল' বোন
'মেয়ে হও তুমি মোর,'
বকে ভাঙি' ঘুম তোর।
বসি এসো আঙিনায়,
চোখে তাই ঘুম নাই।

জ্যোতিষী

শ্রীহরিপদ গুহ

পুরোনো বই কেনা আমার মস্ত বাতিক। ম্যাট্রিক পাশের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনো মাস বাদ পড়েছে বলে আমার মনে হয় না যে, অন্ততঃ একখানা বইও কিনি নি। বইপড়া আমার একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসে সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর লোকে ঘরে ফিরে মনের সুখে বিশ্রাম উপভোগ করে। আমিও যে বিশ্রাম করি না তা' নয়, তবে হাতে একখানা বই নিয়ে। তাতে মনে পাই প্রচুর আনন্দ! এজন্য গৃহিণীর অনেক মৃদু ভৎ'সনাও শুনতে হয়। অবশ্য সেটা এখন খুব গা-সহা হয়ে গেছে—মনে আর কোন ব্যথা পাই না।

ছাত্রজীবনেও বই পড়া নিয়ে অভিভাবকের কাছে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তাঁদের কড়া শাসনও আমার এ' নেশা দূর করতে পারে নি। আজ মাঝে মাঝে হাসিও পায়—তাঁদের চোখে কি ধুলোই না দিয়েছি!

বছর কয়েক আগেকার কথা বলছি। সেদিন শনিবার। আফিস ফেরৎ কলেজ ষ্ট্রীটে নেমে পড়্‌লুম। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাম্‌নে ফুটপাতে পুরোনো বই বেচ্‌ছে। মাঝে মাঝে চীৎকার কর্‌ছে—'যা' লেবে তা' চার আনা, তোলো বাছো চার আনা।'

ইংরেজী, বাংলা একখানা বই বেছে নিলুম। পাতা-গুলো সব একেবারে লাল হয়ে গেছে। খানিকটা পড়ে দেখ্‌লুম—জ্যোতিষ সম্বন্ধে লেখা। চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে বইখানা নিয়ে আমি চলে এলুম।

বাড়ী এসে জামাটা খুলে বিছানায় শুয়ে বইখানা নিয়ে গো-গ্রাসে পড়্‌তে আরম্ভ করে দিলুম।

একটু পরে গৃহিণী চা ও জলখাবার দিয়ে গেলেন। আমি পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগ্‌লুম।

একটু পরে কি একটা কাজে তিনি ঘরে এলেন। চা-খাবার তেম্‌নি পড়ে আছে দেখে তিনি অবাক হয়ে

প্রশ্ন কর্‌লেন—কি হলো? চা খেলে না? কাপে হাত দিয়ে দেখি—চা একেবারে জল হয়ে গেছে। তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থেকে—গম্ভীরভাবে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই চা গরম করে ফিরে এসে কাপটা আমার সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—আগে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো বাপু। এক কাজ আমাকে দুবার করে করাবে। আমি সুবোধ বালকের মত তপ্ত কাপে চুমুক দিতে লাগ্‌লুম। সঙ্গে সঙ্গে খাবারও খেতে লাগ্‌লুম। খাওয়া শেষ হতেই সে কাপ্‌ ডিস্‌ নিয়ে চলে গেল। আমিও পাঠে মনোনিবেশ কর্‌লুম। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারেই বইখানার প্রায় অর্দ্ধেক পড়ে ফেললুম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গা' ধুয়ে গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়্‌লুম। বাসায় যখন ফির্‌লুম, তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

রাত্রের রান্না তখনো শেষ হয় নি। আমার হাতেও বিশেষ কাজ ছিল না, তাই সেই বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগ্‌লুম। তখন রাত দশটা বেজে গেছে। গৃহিণী খেতে ডাক্‌লেন। আমি বই বন্ধ করে তাঁর পেছন পেছন রান্না ঘরে গেলুম। দশ মিনিটের মধ্যেই আমার খাওয়া হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। বইটা খুবই ভাল লাগ্‌ছিল।

বইটা পড়্‌তে পড়্‌তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ইতিমধ্যে গৃহিণী সব কাজ শেষ করে কপাট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শোয়া মাত্র তারও দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছে।

অকস্মাৎ আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল এক বিরাট কাপালিকের মূর্ত্তি। মাথায় তার বড় বড় চুল, কপালে রক্তচন্দন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বড় বড় চোখ মেলে সে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্‌লে—অনেক সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছি। সেই সাধনার ফলেই এই বই লিখ্‌তে পেরেছি। আজ আমি কি-না হতে পার্‌তুম, একটা ভুলের জন্ত সব খুইয়েছি।

তাঁর কাছে কত কি চাইব ভেবেছিলুম, কিন্তু কিছুই চাওয়া হলো না। ছলনাময়ীর ছলনায় সব কেমন তাল-গোল পাকিয়ে গেল, আমার জীবন হলো একেবারে ব্যর্থ! অন্নপূর্ণা যখন ঈশ্বরী পাটুনীকে বর দিতে চাইলেন, সে বলে-ছিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' এই নিয়ে তখন কত হেসেছি, শেষে আমারই হলো কি না সেই মতিভ্রম! তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সে আমায় ডাক্‌লে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চল্‌লুম।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। চারদিক্‌ নিঃঝুম, মধ্যে মধ্যে দু' একটা পেচক কর্কশস্বরে ডেকে উঠ্‌ছে। নিবিড় বনের মধ্যে যেখানে অন্ধকার বেশী, সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাক্‌ জ্বল্‌ছে। সেই ক্ষীণ আলোয় আমরা পথ চলেছি। চল্‌তে চল্‌তে আমরা একটা নদীতীরে এসে উপস্থিত হলুম। সাম্‌নেই মহা-শ্মশান। সেখানে তখন একটা চিতাও জ্বল্‌ছিল না।

কাপালিক নদীর ঘাটে নেমে গিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা শবকে শ্মশানে টেনে নিয়ে এলো। তারপর সেই মৃত দেহটার বুকের ওপর আসন করে বসে নানা মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ পর সেই শবটা একটু একটু 'হাঁ' কর্‌তে আরম্ভ করছে। কাপালিক তখন তার মুখে মন্ত্রপূত কারণ বারি একটু একটু করে দিতে লাগ্‌লো। কিছুক্ষণ পর শবটা চোখ মেলে চাইলো। কী ভীষণ সেই চোখের দৃষ্টি! আমার সমস্ত দেহ ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হলো—আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবো। সহসা কাপালিক 'মাভৈঃ' বলে বিকট চীৎকার করে উঠে ইঙ্গিতে আমায় বস্‌তে বল্‌লে। ভয়ে ভয়ে আমি তার আদেশ পালন কর্‌লুম।

একটু পরেই দেখি—কতকগুলি কঙ্কাল কাপালিকের চারদিকে চক্রাকারে নেচে চলেছে। তাদের নাচের তালে তালে শব্দ উঠ্‌ছে খট্‌ খট্‌ খট্‌। আতঙ্কে আমার চোখ বুজে এলো। প্রাণপণ চীৎকার কর্‌তে গেলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। সহসা কঙ্কাল গুলো ভোজবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গেল। কাপালি-কের মন্ত্র পাঠও আরো স্পষ্ট ও দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা গোখ্‌রো সাপ তার কোমর জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে গর্জ্জাতে লাগ্‌ল। সে কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। তার মন্ত্রপাঠ সমানেই

চলেছে। সাপটা বুকের প্যাঁচ খুলে ফেলে ভয়ে ভয়ে যেন পালিয়ে গেল! তার মন্ত্র আরো তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। তারপরই শুনতে পেলুম—যেন শত শত ঢাক একসঙ্গে বেজে উঠ্‌ল। কী ভয়ঙ্কর সে শব্দ! মনে হলো—বুঝি কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেল! তার মন্ত্রপাঠ সমানেই চলেছে। একটু পরেই সব শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। দেখা গেল—পরম রূপসী কয়েকটি নর্ত্তকী-বেশী রমণী তাকে ঘিরে নেচে চলেছে। কাপালিকের কোন ভ্রূক্ষেপও নেই! আপন মনেই সে শব-সাধনা করে চলেছে। এই নর্ত্তকীর দল যেমন সহসা এসেছিলো, তেমন হঠাৎই কোথায় মিলিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটা বায়োস্কোপের ছবির মতই চোখের সাম্‌নে ভেসে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফুটে উঠ্‌ল—ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এমন পরিষ্কার দিনের মত আলো সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কী স্নিগ্ধ সেই আলোক-ধারা! মনটা যেন কেন খুসীতে ভরে উঠ্‌ল। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা উজ্জ্বল আলোকশিখা ফুটে উঠল। সেই আলোর ভেতর থেকে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে কাপালিকের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—বৎস, তোমার সাধনায় আমি পরম তৃপ্ত হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো। ইহলোকে তোমার যা বাসনা বলো। যশ, ঐশ্বর্য্য, দেবকন্যা, কিন্নরী, কি চাও তুমি? যা তোমার আকাঙ্ক্ষা তাই পাবে। বলো কি চাও?

কাপালিক সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চরণে মস্তক স্পর্শ করে বল্‌লে—তুমি যদি খুসী হয়ে থাকো, তবে আমাকে এই বর দাও মা—আমি যেন জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশারদ হতে পারি, আমার মুখের বাক্য যেন কখনো মিথ্যা না হয়!

'তথাস্তু' বলে সেই দেবীমূর্ত্তি সহাস্য মুখে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হা—হা শব্দে কাপালিক বিকট শব্দে হেসে উঠল। বট্‌গাছ থেকে কয়েকটা নিশাচর পাখী ভয় পেয়ে উড়ে গেল। সমস্ত স্থানটা আবার ঘন ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল। কাপালিককে কোথাও আর দেখ্‌তে পেলুম না, সে গেল কোথা? দারুণ ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠ্‌লুম।

সহসা গৃহিণীর ঠেলায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখ্‌লুম—আমার বিছানায় শুয়ে আছি, চাদর ও বালিশ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। সমস্ত ঘটনাটাই তখন আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হলো!

গৃহিণী গজরাতে লাগ্‌লেন—যা' তা বাজে বই পড়ে এই সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখ্‌ছ। যাও, চোখে মুখে জল দিয়ে একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে শোও!

অনেকদিন হয়ে গেছে। বই খানার নাম এখন আমার মনে নেই। দু' একবার বাসা বদল হয়েছে, তাতে হারিয়েই যাক্‌ কিম্বা কেউ পড়্‌তে নিয়ে গিয়ে দয়া করে ফেরৎ দিতে ভুলে যাক্‌, এই রকম একটা কিছু হয়েছে। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও বইখানি পাই নি। ভালই হয়েছে। সেখানি যতদিন আমার কাছে ছিল, এমন একটি রাতও যায় নি, যখন আমি এমনি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠি নি। সেদিন থেকে বইখানি গেছে, সেদিন থেকে আমার এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়েছে।

ছোটদের ম্যাজিক

যাদুকর রতনকুমার দাস

আজ তোমাদের যে খেলাটির কথা বোলব সেটি তাসের খেলা। তাসের খেলাই হ'ল ম্যাজিকের প্রথম ধাপ (Step)। তাসে যদি তোমাদের হাত ভালো হয়ে যায়, তাহলে ঐ এক প্যাকেট তাস নিয়ে দু এক ঘণ্টা দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখতে পারবে। তাসের খেলা দু রকম তাস নিয়ে করা যায়। এক হ'ল বিশেষ ভাবে প্রস্তুত তাস নিয়ে, আর এক হ'ল সাধারণ তাসের প্যাক নিয়ে। আমি সাধারণ তাসের প্যাক নিয়েই খেলা দেখিয়ে থাকি। সাধারণ তাসের প্যাক নিয়ে খেলা দেখাতে হলে খুব একটা অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। বিশেষ ভাবে তৈরী তাস নিয়ে সাত বছরের ছেলেও খেলা দেখাতে পারে। এবার শোন খেলাটি কি!

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের অভিনন্দন

[ত]াদিয়ে বললেন, "দর্শকগণ আপনারা আমার হাতে একটা [সা]হেব আর একটা বিবি দেখছেন।" এই বলে যাদুকর [হা]তের তাস দুটো টেবিলের উপর রেখে দুটো সাদা খাম [হা]তে নিয়ে একজন দর্শককে দিয়ে একটা খামের উপর [']বিবি' আর একটার উপর 'সাহেব' লিখিয়ে নেন। [ত]ারপর খাম দুটো দুজন দর্শকের হাতে উঁচু করে ধরতে [দ]িয়ে বলেন, "আমার কাছে প্রথমে দুটো তাস দেখে-ছিলেন। তাস দুটি হ'ল 'বিবি' আর 'সাহেব'। আর দুটো খামের উপর আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে একটা খামের উপর 'সাহেব' আর একটা খামের উপর 'বিবি' লিখিয়ে নিয়েছি। পরে যাতে ভুল না হয় সেই জন্ম এই রকম করা। এবার আমি বিবি লেখা খামটায় বিবি—আর সাহেব-লেখা খামটায় সাহেব রেখে দিচ্ছি।" যে দর্শকটির হাতে 'সাহেব'-লেখা খাম ছিল তাঁকে সাহেব দেখিয়ে পুরে দিলেন খামের ভেতর। বিবি লেখা খামটায় বিবিটাকেও পুরে দিলেন। তারপর বিড় বিড় করে কিছুক্ষণ মন্ত্র বলে সাহেব-লেখা খাম থেকে বিবি, আর বিবি-লেখা খাম থেকে সাহেব বের করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন।

প্রথমেই তোমাদের বলেছি যে তৈরী তাস নিয়ে একটা সাত বছরের ছেলেও খেলা দেখাতে পারে। এটা হ'ল সেই তৈরী তাসের খেলা। আগে একটা 'সাহেব' ও আর একটা 'বিবি' সংগ্রহ করে নাও। তারপর সাহেবটার একদিককার 'ইনডেকস' (K) ধারাল ব্লেড দিয়ে ঘষে তুলে দাও। বিবিটারও ঠিক সাহেবের মত একদিককার 'ইনডেকস' (Q) তুলে দেবে। এবার সাহেবের যে দিককার 'ইনডেকস' তুলে দিয়েছো সেই দিকটা একজন আর্টিষ্টকে দিয়ে বিবির মত একটা 'ইনডেকস' আঁকিয়ে নেবে। বিবির যে দিককার 'ইনডেকস' তুলে দিয়েছো সেই দিকটায় সাহেবের মত একটা 'ইনডেকস' আঁকিয়ে নেবে। তারপর খুবই সহজ। এবার বুঝতে পারছো যে তৈরী-করা তাস নিয়ে ম্যাজিক দেখান কত সুবিধা। আজ তাহলে আসি কেমন?

শিশু-শিল্পী

প্রফুল্লকুমার দত্ত

কাগজে দাগ্ কেটে মলিন করা শেষ,
খোকন তবু ভাবে : এই তো হ'ল বেশ!
অর্থ এর যা' তা' বোঝেনা বুড়ো-বুড়ি—
আল্‌তো রেখা ঘিরে ভাবের-ই লুকোচুরি!

এ-রেখা-ব্যঞ্জনা খোকন-ই একা বোঝে—
অসীম উৎসাহে তাকিয়ে চোখ বোজে!
শিল্পী খোকনের এটাই সান্ত্বনা—
আমরা কভু এর মূল্য জানব না!

বয়েস হ'ল ঢের : আমরা বুড়োখোকা
ওসব দেখে ভাবি, খোকন ভারি বোকা!
যখন ও বড় হবে, ও-খেলা যাবে ভুলে—
চম্‌কে উঠ্‌বেই অনিয়ম এক চুলে!

তবু এ-শিল্পীর জ্যান্ত আল্‌পনা
ভুলালো আজ আমাকে মৃত্যু-কাল গোণা॥

ব্যস্ত-বসন্ত
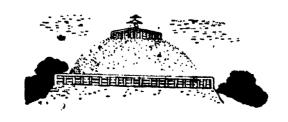
গোপাল দাস

এখন সকাল সাড়ে ন'টা। হার্ভে ম্যাক্‌সওয়েল এক-প্রকার হন্তদন্ত হয়েই প্রবেশ করল তার নিজের অফিসে। সঙ্গে রয়েছে তরুণী ষ্টেনোগ্রাফার। "গুড্ মর্ণিং, পিচার," সংক্ষেপে সম্ভাষণ জানিয়ে ছুটে গেল নিজের ডেস্কের দিকে। ডেস্কের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারলেই যেন হ'ত ভাল। অনেকটা সময়ই বাঁচত তা'হলে। মুহূর্তের ভেতর স্তূপীকৃত চিঠি ও টেলিগ্রামের মধ্যে ডুবে গেল ম্যাক্‌সওয়েল, নিউইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল হার্ভে ম্যাক্‌সওয়েল।

পিচার এই ফার্মের কনফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক। বহু দিনের পুরানো কর্মচারি। তার ভাবলেশহীন মুখেও আজ পড়েছে কিঞ্চিৎ বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ।

তরুণীটি ম্যাক্‌সওয়েলের অফিসে ষ্টেনোর কাজ করছে আজ একবছর। তরুণীটি সুন্দরী। আর তার কমনীয় তনুশ্রীতে এমন কিছু ছিল, যা তার ষ্টেনোগ্রাফীর সঙ্গে খাপ খায় না মোটেই। প্রসাধন আর পরিচ্ছদ—দুইই তার সংযত। নিজেকে দর্শনীয় করবার প্রয়াস নেই কোথাও। তার গলায় ছিল না কোন সোনার চেন বা লকেট। হাতেও পরেনি ব্রেসলেট। কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার মতো ঝলমলে পোষাকও তার নয়। তার পরণে ছিল ধুসর রঙের সাদা-সিধে একটা গাউন। ওটাতে তার আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল চমৎকার। তার মাথায় পরিচ্ছন্ন কাল টুপিটার গোঁজা ছিল ম্যাক' পাখীর সোনালী সবুজ পালক।

ওই দিনের সকাল বেলায় ওকে দেখাচ্ছিল শান্ত আর লজ্জারুণ। স্বপ্ন-রঙিণ দুটি চোখ। আর পিচ্‌ফলের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছিল তার দুটি নরম কপোলে। একটা খুশীর হাওয়া হালকা রেশমী ওড়নার মতো ঘিরে রেখেছিল তার নিটোল দেহবল্লরী! আর তা' ছিল স্মৃতির সুবাসে স্নিগ্ধ। সুখের স্মৃতি।

তরুণীর এই ভাব পরিবর্তন পিচারের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কৌতূহলের সঙ্গে সে লক্ষ্য করছে ওর চলা-ফেরা।

তরুণী তার নিজের ঘরে না গিয়ে বাইরের অফিস ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। অনিশ্চিত তার চালচলন। কতকটা অস্থিরও মনে হচ্ছিল তাকে। একটু পরে সে ম্যাক্‌সওয়েলের ডেস্কের দিকে গেল এগিয়ে। ম্যাক্‌স-ওয়েলের নজরে আসার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু নিউইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল তো আর মানুষ নয়, একটি যন্ত্র। যন্ত্রের ন্যায়ই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে কাজ করে চলেছে ম্যাক্‌সওয়েল। কাজ ভিন্ন অপর কিছু সহজে তার নজরে পড়েনা, চিন্তায় আসে না।

"কি ব্যাপার?" হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করে ম্যাক্‌সওয়েল। "কিছু দরকার আছে?"

ডেস্কের ওপর সেদিনকার ডাকের চিঠির পাহাড় জমে উঠেছে। ম্যাক্‌সওয়েলের মুখে চোখে অধৈর্যের ছাপ।

"না, কিছু না," স্মিত হেসে সেখান থেকে চলে আসে তরুণী ষ্টেনো।

"আচ্ছা, মিঃ পিচার," কনফিডেন্সিয়েল ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলে তরুণী ষ্টেনো, "মিঃ ম্যাক্‌সওয়েল কি নতুন ষ্টেনো রাখার সম্বন্ধে কাল কিছু বলেছেন আপনাকে?"

"হ্যাঁ," উত্তর করলে পিচার। "আর একজন ষ্টেনো রাখার কথাই বলেছেন তিনি। আমি কালই ষ্টেনো

সরবরাহকারী একটা সংস্থাকে বলে দিয়েছি—আজ সকালেই কয়েকটি ভাল নমুনা পাঠাতে। কই, এখনও তো দেখছি একটুকরো চিউইংগাম্ কি চকোলেটের আবির্ভাবও ঘটল না।"

"তা'হলে যতক্ষণ না নতুন লোক আসছে, ততক্ষণ অন্তত কাজ চালিয়ে যাই।" কতকটা স্বগতোক্তির ধরণে বললে মেয়েটি। তারপর সে প্রতিদিনকার অভ্যস্ত স্থানে ম্যাক' পাখীর সবুজ সোনালী পালক বসানো টুপিটি ঝুলিয়ে রেখে বসল গিয়ে নিজের ডেস্কে।

ম্যাক্সওয়েল তখন ভয়ানক ব্যস্ত। সার্কাসে যাঁরা দলবদ্ধ ঘোড়ার খেলা দেখেছেন কেবল তাঁরাই কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারবেন এখানকার কাজের ধরণ। ডেস্কের ওপর উঁচু হয়ে উঠেছে ফাইলের পাহাড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের নোটিং হয়ে গিয়ে ফিতে বাঁধা পর্যন্ত শেষ। অমনি একরাশ বিল এসে হাজির। তা'ও সই হয়ে গেল। সংবাদ-বাহকেরা নিয়ে আসছে সব জরুরী সংবাদ। টেলিগ্রামও আসছে হরদম। অধৈর্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর দল ঝুঁকে পড়েছে রেলিঙের ওপর। অনর্গল ব'কে যাচ্ছে তারা। করণিকের দল দ্রুত পায়ে ছোটাছুটি করছে ডেস্ক থেকে ডেস্কে। দমকা ঝড়ে বেসামাল জাহাজের নাবিকঁদের মতোই তাদের অবস্থা।

ম্যাক্সওয়েল অফিসের সেদিনের কর্মচাঞ্চল্য পিচারের ক্যাকাসে মুখেও এনে দিয়েছিল একটা রক্তিম সজীবতা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং। টেলিফোনের কল আসছে অনবরত। ফোনের ওপারে যেন বয়ে যাচ্ছিল ঝড়, তুষার-ঝঞ্ঝা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। আর এপারে সকলের মানসিক উদ্বেগ আর চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল তারই প্রতিক্রিয়া। ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে ম্যাক্সওয়েল একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে—আবার পরমুহূর্তেই সামনে ঝুঁকে পড়ে কাজ করে যাচ্ছিল।

ঠিক এমনি সময় তার সামনে এসে হাজির হ'ল নতুন ষ্টেনো, পেছনে পিচার। ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল নতুন ষ্টেনো। মাথায় তার উটপাখীর পালক গোঁজা ভেলভেটের টুপি। সোনালী চুলের দুটি পাকানো গোছা দু'কানের ধার ঘেঁসে ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। নকল সীলের চামড়ার গাউন পরণে। তার কণ্ঠদেশ জুড়ে ছিল হিকরি বাদামের ন্যায় বড় বড় কৃত্রিম মুক্তোর মালা।

"ষ্টেনো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন ইনি, পরিচয় করিয়ে দেয় পিচার। একটা পোষ্ট খালি হয়েছে আমাদের অফিসে।"

"কিসের পোষ্ট?" ভ্রূকুঁচকে জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সওয়েল।

"ষ্টেনোগ্রাফারের," উত্তরে বললে পিচার। "গতকাল এঁদের প্রতিষ্ঠানেই খবর পাঠাবার জন্যে বলেছিলেন আমাকে। ওঁরা যেন অন্তত একজনকে আজ সকালেই পাঠিয়ে দেয়।"

"তুমি দিন দিন বড্ড ভুলোমন হয়ে যাচ্ছ পিচার," বিরক্ত হ'য়ে বললে ম্যাক্সওয়েল। "তোমাকে কেন আমি ওরকম বলতে যাব! মিস্ লেস্‌লি একবছর থেকে কাজ করছে এখানে। তার কাজ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। যতদিন সে এখানে কাজ করতে চাইবে, ততদিন অন্য ষ্টেনোগ্রাফার নেবার কথাই উঠতে পারে না। বড়ই দুঃখিত, ম্যাডাম। বর্তমানে কোন পোষ্টই খালি নেই। পিচার, দেখো আবার কোন নতুন ক্যানডিডেট্ এনে হাজির ক'রো না যেন।"

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে রেখে ডেস্কের ওপর টোকা মারতে মারতে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় অসন্তুষ্ট তরুণী কর্মপ্রার্থিনী।

"এই অভিজ্ঞ ভদ্রলোক দিন দিন কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন," এক ফাঁকে বুক-কীপারের কাছে মন্তব্য প্রকাশ করে পিচার।

ম্যাক্সওয়েলের ডেস্কের ওপর জমে উঠেছে সব বন্ধকী দলিল দস্তাবেজ,তমসুক আর শেয়ারের কাগজপত্র। কখন সে তলিয়ে গেছে কাজের ঘূর্ণির মধ্যে। ঘড়ির কাঁটার মতোই নিখুত যান্ত্রিক নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে সে প্রতিটি কাজ। সে বাস করছে তার নিজের সৃষ্ট জগতে। সে জগতে আছে শুধু অর্থনীতি। সে জগতে স্থান নেই মানুষের, স্থান নেই রম্য প্রকৃতির।

লাঞ্চের সময় স্তিমিত হ'য়ে এল কাজের হুল্লোড়।

ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়েছিল ম্যাক্সওয়েল। দু'হাত ভর্তি তার টেলিগ্রাম আর মেমোরেণ্ডাম। ডান কানে আটকানো রয়েছে একটা ফাউণ্টেন পেন। তার প্রশস্ত

ললাটের ওপর বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছিল বিশৃঙ্খল অলকের গুচ্ছ।

বাতায়ন পথ ছিল উন্মুক্ত। কারণ পৃথিবী তখন তার দয়িত বসন্তের উষ্ণ স্পর্শে সদ্য জেগে উঠেছে।

ওই বাতায়ন পথেই ভেসে এল এক উদ্‌ভ্রান্ত, হয়তো বা পথভ্রষ্ট লাইল্যাকের কোমল মিষ্টি সুরভি। এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল নিউ ইয়র্কের কর্মব্যস্ত দালাল ম্যাক্‌সওয়েল। এই সুঘ্রাণের মালিক মিস্ লেস্‌লি। অন্য কেউ নয়, আর কেউ হ'তে পারে না!

নেশার মতো ওই চিন্তাটা মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল তার সমগ্র অনুভূতি। লাইল্যাকের সুরভি রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে জীবন্ত জাগ্রত হয়ে দেখা দিলে তার সামনে। সেই জীবন্ত প্রতিমা মিস্ লেস্‌লির।

অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল তার কর্মের জগৎ, অর্থনীতির জগৎ। পাশের ঘরেই রয়েছে মিস্ লেস্‌লি। মাত্র দশ গজের ব্যবধান।

"এক্ষুণি কাজটা সেরে ফেলব আমি," অনুচ্চস্বরে বললে ম্যাক্‌সওয়েল। "এখনই, এই মুহূর্তেই জিজ্ঞেস করব ওকে। অনেক পূর্বেই কেন কাজটা সেরে ফেলিনি —সেকথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

দ্রুতপায়ে সে ছুটে গেল ষ্টেনোগ্রাফারের ঘরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ডেস্কের ওপর।

মুখ তুলে তাকাল মিস্ লেস্‌লি। একটা নরম লালচে আভা ফুটল তার মুখে। চোখের দৃষ্টি তার শান্ত আর সরল। ও'র ডেস্কের ওপর একটা কনুই রাখল ম্যাক্‌স-ওয়েল। তখনও তার দু'হাত ভর্তি কাগজপত্র। কানে গোঁজা রয়েছে কলম।

"মিস্ লেস্‌লি," হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলে ম্যাক্‌স-ওয়েল, "আমার হাতে রয়েছে এক মুহূর্তের সময়। এই সময়টুকুর ভেতরই কিছু বলতে চাই তোমাকে। তুমি কি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ? এর আগে তোমাকে আমার ভালবাসা জানাতে পারিনি। নেহাত সময়ের অভাবের জন্যেই সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি। তাড়াতাড়ি উত্তর দাও। ওদিকে যে রেলওয়ে কোম্পানীর লোকেরা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।"

"কি বলছেন আপনি?" উত্তর করলে তরুণী ষ্টেনো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়।

"তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না?" অধীরভাবে বলে উঠল ম্যাক্‌সওয়েল। "আমি চাই যে তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি তোমাকে ভালবাসি, মিস্ লেস্‌লি। কাজের চাপটা একটু কমতেই একমিনিট সময় করে নিয়ে একথা বলতে ছুটে এসেছি তোমার কাছে। ওরা আমাকে ডাকছে ফোনে। পিচার, ওদের বলে দাও একমিনিট অপেক্ষা করতে। তুমি কি রাজী হবে না, মিস্ লেস্‌লি?"

এর পরে তরুণীর ব্যবহারগুলো বড়ই বিচিত্র বলে মনে হ'ল। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন সে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেছে। একটু পরেই ওই বিস্ময়-বিমূঢ় চোখ থেকে নামল অশ্রুর প্লাবন। কিন্তু তারপরই আবার ওই অশ্রুসিক্ত চোখেই চিকমিক করে উঠল একটুকরো স্নিগ্ধ-করুণ হাসির ঝিলিক। আর দেখা গেল তার একখানা সুগোল বাহু ম্যাক্‌সওয়েলের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে আছে পরম আশ্লেষে।

"আমি এখন ঠিক বুঝতে পেরেছি," শান্তকণ্ঠে বললে তরুণী! "এই বিশ্রী কাজের বন্যাটেই সব কিছু ভুলে গেছ তুমি। আচ্ছা, হার্ভে, তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? লিটল চার্চে আমাদের যে বিয়ে হয়ে গেছে কাল রাত আটটায়।*

---

* ও, হেনরী রচিত Ramance of a busy broker গল্প অবলম্বনে।

স্মৃতি

(পি, বি, শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ)

শ্রীভবতোষ পতি বি-এ

থেমে যায় গান—তবু তার সুকোমল ভাষা
স্মৃতির আকাশ পথে করে যাওয়া আসা।
ঝরে যায় ফুল, তবু তার গন্ধ নিবেদন
ভরে রস বহুক্ষণ মানুষের ইন্দ্রিয় ও মন।

ছিন্নদল গোলাপ, সেও তার মূল্য খুঁজে পায়
মিলনের মধুরাতে দম্পতির বাসক শয্যায়।
তেমনি তোমার স্মৃতি বিস্মরণ বৃন্তে রবে ফুটে
মোর প্রেম নিদ্রা যাবে সুকোমল তারই পত্রপুটে।

মেয়েদের কথা

আধুনিক রন্ধন প্রণালী

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত রন্ধন ক্রিয়া উত্তরোত্তর উন্নত হোতে আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক গতিশীল জীবনযাত্রার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই মেলামেশা আর আহার-বিহার অবাধগতিতে চলেছে, পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষণশীলতা নেই। আজ বিশ্বজনীন সামাজিক বোধ আমাদের মধ্যে নবচেতনা এনেছে, এটা অবশ্য সুলক্ষণ বল্‌তে হবে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালেই প্রথম সভ্যতার আলোকে জীবনযাত্রা সুরু করেছিল। আর্য্যঋষিরা পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু নিয়ে সম্যক্‌ভাবে সাধনা করে জাতিকে কিভাবে চল্‌তে হবে তার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন—ভোজনের দিকটাও তাঁরা বর্জ্জন করেন নি। জলবায়ু, গ্রহনক্ষত্র, বারতিথি হিসাব করে খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও ব্যবস্থা করে গেছেন খাদ্য-গবেষণায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। ঋষিরা নিরামিষ খাদ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন—কেন না ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশে শরীরের পক্ষে আমিষ খাদ্য হিতকর নয়। আমিষ খাদ্যের বহুল প্রচলন মুসলমান আমল থেকে সুরু হয়, আর ইংরাজ আমলে চরমে উঠেছে। ফলে আমাদের খাদ্য তালিকায় রকমারি খাদ্য স্থান পেয়েছে।

আমরা বাঙালী। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের যেরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, আহারবিহার, চাল-চলনেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রন্ধনে বাংলার মহিলারা বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। গৃহকে কেন্দ্র করেই সমাজ-সংসার গড়ে ওঠে। সুতরাং গৃহিণীর কাজ আদৌ সহজ নয়। রন্ধন বিদ্যায় পটু গৃহিণী গরীবের সংসারেও আনন্দ এনে দেন। মেয়েলি কর্ত্তব্যের শৈথিল্য যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানেই আসে অশান্তি, অনাচার আর ব্যাধি। গৃহিণীকে একদিকে যেমন প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে খাদ্য প্রস্তুত ও বণ্টনের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্টভাবে রন্ধন করে পরিজনদের পরিবেশন করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। বর্ত্তমানে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবন-যাত্রার জন্যে ঘর ছেড়ে চলেছে বাইরে—দশটাপাঁচটা অফিসে চাকুরী কর্‌ছে, তাই হোটেলের রান্নাই হয়ে পড়্‌ছে একমাত্র অবলম্বন। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে রান্নার দিকে অনেকেরই ঔদাস্যভাব। যা হোক নিয়ে কতকগুলি রন্ধনের প্রণালী দেওয়া গেল—যাঁদের পক্ষে কিছুমাত্র অবসর আছে, তাঁরা রন্ধন করে পরীক্ষা করতে পারেন।

মাছের কোপ্তা—পাকা মাছ ভিন্ন মাছের কোপ্তা ভালো হয় না। সর্ব্বাগ্রে সাইজ মত মাছটাকে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়, আর তার আঁশটে গন্ধ যাতে না থাকে তার জন্যে খানিকটা নুন আর হলুদ মাখিয়ে একটি পাত্রে মাছের খণ্ডগুলি ঢেকে রাখ্‌তে হবে। এর পর আবার উত্তমরূপে পরিষ্কার জলে সেগুলি ধুয়ে নিয়ে কিছুটা নুন, হলুদ ও আদার রস মাখিয়ে তারপর ঘিতে সাঁৎলাতে হবে। এই সময়ে আদা, ধনে, মরিচ, পিঁয়াজ, নুন, কালো-জিরে, সামান্য চিনি প্রভৃতি সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে জলটা একেবারে মরে এলে পুনরায় ঘি গরম মসলা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। যাতে ভেঙ্গে না যায় এজন্যে সতর্ক হোতে হবে, তারপর ঘি ও গরম মশলা মাছের সঙ্গে মিশে গেলে নামিয়ে ফেলতে হবে।

এদিকে ধার উঁচু বড় থালাখানা নিয়ে মাছগুলি সাজিয়ে রেখে তারপর যখন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,

তখন আস্তে আস্তে কাঁটাগুলি বের করে ফেলতে হবে। যে রসটা মাছের সঙ্গে আর থালায় লেগে থাকবে, সেই রসের সঙ্গে মাছগুলি পোস্ত, ডাল, ডিমের তরল সাদা অংশ, মৌরির গুঁড়ো, খানিকটা দই একত্র করে চটকে ডিম বা নৈনিতালের আলুর আকারে এক একটি গুলি পাকাতে হবে।

এবং পূর্ব্বোক্ত রকমের একটি প্রশস্ত পাত্রে ঘি দিয়ে পর পর এই গোলকগুলি সাজিয়ে অল্প আগুনের আঁচে চাপিয়ে দিতে হবে, তারপর আর একটি পাত্র দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। অল্প কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে নিলে সুন্দর মাছের কোপ্তা হয়ে যাবে।

আধ সের মাছের পরিমাণ নিয়ে উপকরণের ভাগগুলি দেওয়া গেল। এক পোয়া ঘি, আধ ছটাক কাঁচা মুগডাল বাটা, আধপোয়া দই, আধছটাক ছোলার ছাতু, আধপোয়া পেঁয়াজ, সওয়া তোলা আদা বাটা, তিন আনার গরম মশলার গুঁড়ো, চার আনার মৌরির গুঁড়ো, চার আনার মরিচ আর চারি আনার কালোজিরা বাটা।

মাছের সাধারণ রান্না বলতে আমরা বুঝি মাছের ঝোল, ঝাল, চচ্চড়ি প্রভৃতি। মাছের অবস্থা ভেদে তরকারী না দিলেও চলে, তবে সে সব ক্ষেত্রে মাছের পরিমাণ বেশী হওয়া দরকার। যে কোন মাছের ঝোল হোতে পারে—কিন্তু সব মাছের ঝাল বা চচ্চড়ি হয় না, আর এ ক্ষেত্রে এদের মসলাও এক রকমের নয়। ঝোলের মশলা হচ্ছে আদা, জিরা, লঙ্কা হলুদ, ধনে প্রভৃতি বাটা; কিন্তু ঝাল বা চচ্চড়ির মশলা ভিন্ন—লঙ্কা, সর্ষে আর হলুদ বাটা। ঘির চেয়ে তেলই প্রশস্ত। অনেকে পেঁয়াজ অপরিহার্য্য বলে মনে করেন, কিন্তু টাটকা মাছের ঝোলে পেঁয়াজ দিলে সম্যক্‌ভাবে আস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটে। মাছ রান্নায় উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ভালো করে মাছ আর আনুসঙ্গিক তরকারী কষে নেওয়া। পাকা মাছ কষে না নিলে আঁসটে গন্ধ থেকে যায়, ফলে ব্যঞ্জন ভালো হয় না। সব মাছ বেশী কষা উচিত নয়—বিশেষতঃ ইলিশ, চিতল, বাটা, কৈ, সিঙ্গী, মাগুর, পুঁটি, মৌরলা, খল্‌সে, ট্যাংরা, কলুই প্রভৃতি। মাছ তেলের ওপরে নুন হলুদ দিয়ে সামান্য এপিঠ ওপিঠ করে নেওয়া ভালো। এভাবে খানিকটা রান্না করলেই উক্ত মাছের ঝোল খেতে সুস্বাদু হবে। ঝোলের চেয়ে ঝাল বা চচ্চড়িতে লঙ্কার ঝাল ও তেলের পরিমাণ একটু বেশী দেওয়া দরকার। ঝোলের মাছ কড়া ভাজা করলে আস্বাদ নষ্ট হয়।

ইংলিস কারি—রুই মাছের ইংলিস কারি অতি উপাদেয়। একসের মাছ বাজার থেকে কিনে এনে তাকে সাধারণ ভাবে কেটে নুন ও জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, তারপর মাছের টুক্‌রোগুলিকে মেখে রাখ্‌তে হবে হলুদ ও নুন দিয়ে। তারপর কড়াতে দেড়ছটাক আন্দাজ তেল ঢেলে তা পেকে এলে মাছগুলি ভাজতে আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু কড়া ভাজা করা চল্‌বে না। মাছ ভাজার পর তেলটা কড়াতে দিয়ে মশলাটা কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করে ভেজে নিতে হবে, মসলার গন্ধ ছাড়লে জল ঢেলে দিয়ে কড়ার মুখটা ঢেকে দিতে হয়। জল ফুটে উঠলে মাছগুলি ছেড়ে দিয়ে আবার মুখটা এঁটে দিয়ে খানিকক্ষণ পরে লঙ্কা বাটা ও নুন ফেলে খুব সাবধানে দু চারবার নাড়া দরকার, তারপর জলটা মরে মাখা-মাখা অবস্থায় এলেই নামিয়ে নিলে সুন্দর রুই মাছের ইংলিস কারি হয়ে উঠবে। এই কারি রাঁধতে তিন ছটাক তেল, দু' তোলা পেঁয়াজ বাটা, এক তোলা হলুদ বাটা, দু আনার রসুন, আর চার কাঁচ্চা পরিমাণ লঙ্কাবাটা ও নুন দরকার।

গলদা চিংড়ির চোকা—বড় বড় গলদা চিংড়ি মাছ দশটি এনে সেগুলোর মাথা থেকে খোলা ছাড়িয়ে নিতে হবে আর উত্তমরূপে ধুয়ে নিয়ে মাছের অংশ মিহি করে কাটতে হবে। পরে আন্দাজ মত নুন, মরিচ, মাছের মাথায় তেল, বিস্কুটের গুঁড়ো আর খানিকটা দুধ দিয়ে ঐ মাছগুলো বেশ করে মেখে আবার একটা কি দুটো ডিম ফাটিয়ে মাছে মাখতে হবে; আর বড়ার মত গোল পাকিয়ে তা'তে বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে একটি পাতে রাখতে হবে। তারপর উনুনে কড়ায় তেল বা ঘি চাপিয়ে দিতে হবে, তেল বা ঘি পেকে এলে, কেটে-রাখা মাছের মাথা ও শির দাঁড়াগুলোর ভিতরের অংশের সঙ্গে খানিকটা কাঁচা ধনে বাটা মিশিয়ে ঐ সব গোল বড় লাল টকটকে করে ভাজতে হবে। তারপর তেজপাত

আর জিরে ফোড়ন দিয়ে পরিমিত নুন ও জল দিয়ে বড়াগুলি সিদ্ধ করা দরকার। খানিকক্ষণ পরে ঝোলটা মরে এলে অল্প পরিমাণে গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে ফেল্‌লে গলদা চিংড়ির ধোকা হবে। এই ধোকা তৈরী করতে হোলে আড়াই ছটাক তেল, এক কাঁচ্চা লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে ও মরিচের গুঁড়ো বারো আনা, টেবিল চামচের চার চামচ বিস্কুটের গুঁড়ো, আর দুটো ডিম লাগবে।

মাছের উপকারিতা অনেক। এটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। কই, সিঙ্গি, মাগুর, রুই, খলসে প্রভৃতি মাছে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস আর লোহার পরিমাণ খুব বেশী। সিঙ্গি মাছে খাদ্যগুণ খুব বেশী, এর পরেই হচ্ছে মাগুর। ছোট বড় প্রত্যেক মাছেই অ্যালবুমেন থাকে, তাতে শরীর পুষ্টিকর হয়। চোখের দৃষ্টিশক্তি ও মেদবৃদ্ধির পক্ষে রুই মাছের উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। ছোট ছোট মাছগুলি বিশেষতঃ পুঁটি, মৌরলা, দেহের রক্ত ও জীবনীশক্তি বাড়াতে বিশেষ সাহায্য করে। আজ মাছের অভাবে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, আর শরীরও পড়ছে ভেঙ্গে, তাই নানা দিকে সে হটে আস্‌ছে। বাত রোগে কই, সিঙ্গি, মাগুর, রুই প্রভৃতি উত্তম পথ্য।

যাঁরা সহরে বাস করেন, তাঁরা ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রান্না করে খেতে পারেন, তা'তে কয়লার জন্য বাজারে দৌড়াতে হয়না, কয়লা ভেঙে আঁচ দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়না, —ইলেক্‌ট্রিক সাব্‌ট্রাকসান মিটার নিয়ে রান্নার কাজ চল্‌তে পারে—কয়লার অনুপাতে যে খরচ হয়, ইলেক্‌ট্রিক উনুনের সাহায্যে রন্ধনাদি করলে অনেকটা ব্যয় হ্রাস হোতে পারে। দেড় হাজার দু-হাজার ওয়াটের উনুন নিয়ে দিব্যি রান্না চল্‌তে পারে, ইচ্ছানুযায়ী যখন তখন গরম গরম তরি-তরকারী খাওয়া যায়, মাঝে মাঝে তার বা স্পাইরাল ওয়্যার খারাপ হোলে কিনে নিলেই চল্‌বে, আর এ তার দেড় টাকা দু-টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। আমি ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রান্না করে বিশেষ সুবিধা বোধ করছি; ধোঁয়ার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি, আর রান্না ঘরও বেশ ঝকঝকে তকতকে হয়ে আছে। বর্ত্তমানে যন্ত্র সভ্যতার আনুকূল্যে সব দিকেই যখন আমরা এগিয়ে চলেছি তখন এদিকটায় পিছিয়ে থাকার কোন কারণ তো দেখিনে! যাঁরা মনে করেন ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রাঁধলে খুব খরচ হবে তাঁদের ভুল ধারণা—ঘুঁটে কয়লা আর কেরোসিন তেলের হিসেব একত্র করে এর সঙ্গে খতিয়ে দেখ্‌লেই আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি হবে।

হাতের কাজ

উলের ব্লাউজ

মানী চট্টোপাধ্যায়

ঝিমপাতা প্যাটার্ণ

এই প্যাটার্ণটিতে ১৬ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়। বয়েস অনুপাতে ঘর কম বেশী লইতে পারেন। ১৪নং কাঁটা দ্বারা ৩ ইঞ্চি ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টো বুনিয়া; ১১নং কাঁটা দ্বারা প্যাটার্ণ আরম্ভ করিতে হয়।

১ম—উল্টো ২ সামনে সুতা সোজা ১ ঘর, সোজা ৪ জোড়া ২ বার সোজা ৪ সামনে সুতা সোজা ১।

২য়—উল্টো এক কাঁটা।

৩য়—উল্টো ২ সোজা ১ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ৩ জোড়া ২ বার সোজা ৩ সামনে সুতা।

৪র্থ—উল্টো এক কাঁটা।

৫ম—উল্টো ২ সোজা ২ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ২ জোড়া ২ বার সোজা ২ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ২।

৬ষ্ঠ—উল্টো এক কাঁটা।

৭ম—উল্টো ২ সোজা ৩ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ১ জোড়া ২ বার সোজা ১ সামনে সুতা সোজা ১ সোজা ৩।

৮ম—উল্টো এক কাঁটা।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাসটা যখন সীঁথির মোড়ে এসে থামলো, তখন আবার বৃষ্টি নেমেছে। রোদ আর বৃষ্টি! পাশাপাশি হাসি কান্নার মত গাছগুলোর মাথায় মাথায় ঝিলমিল-ঝিরঝির করে : বৈকালী সূর্যের সোনালি রোদ আর অভিমানিনী প্রকৃতির বিনত-দৃষ্টি চোখের জল। একটু ইতস্ততঃ করে শিপ্রা নেমে পড়ল। বাসখানা আবার গরম নিঃশ্বাসের ঝাঁজ ছড়িয়ে ছুটে চললো গন্তব্য পথে।

পথের পাশে কোথাও দাঁড়াবার মত একটু জায়গা নাই। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বড় বাদাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে শিপ্রা একবার ঘাড় ফিরিয়ে শাড়ির আঁচলটা দেখে নেয়। পাতাগুলোর গা বয়ে টসটস করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।···পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াতে ওর সম্ভ্রমে বাধে। মুহূর্তে শক্ত মুঠোয় মনের লাগামটা ধরে আবার পথে নামে। হনহন করে এগিয়ে চলে বরানগরের দিকে।

গায়ের রঙ ওর ফর্সা নয়। ফর্সা হলে হয়তো এত সুন্দর হতো না শিপ্রা। শিপার···মিস্ শিপারিন্! অদ্ভুত চোখ দুটো ওর। তন্বী—লম্বা। কাঁচ-কাঁচ রঙের সঙ্গে নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন মানান-সই সমন্বয় খুব কম মেয়েরই আছে। আগে ও পরতো না বাঙালী মেয়েদের মত সর্বাঙ্গ মুড়ে শাড়ি। বাস্‌কিন আর পেটিকোটের ওপর জড়িয়ে নিত একখানা ভিনিসিয়ান ওড়না, না-হয় সিল্ক ফেব্রিকের ঝালর-দেওয়া স্কার্ফ। বাতাসের মুখে হিলে ভর দিয়ে যখন মোড় ফিরতো, ফাল্গুনী প্রজাপতির ডানার মত ছড়িয়ে পড়তো ওর ওড়নার আঁচল।

কিন্তু এখন!···এখন শিপ্রা শাড়ি পরে। পেটিকোট আর বানারসী ভয়েলের জ্যাকেটের ওপর হাল্‌কা রঙের জর্জেট, টিস্যু বা নাইলনের শাড়িখানা নিপুণভাবে জড়িয়ে নেয় ব্রাসিয়ারের ফিতেগুলো সযত্নে ঢেকে। দ্রুত পায়ে চলতে চলতে পিঠের ওপর শাড়ির আঁচলটা দুলে দুলে ওঠে। চুলগুলো কখনো এলো খোঁপা ক'রে ঢলিয়ে দেয়, কখনো বা শিঙল করে। না হয়, এপার-ওপার সমান দুভাগ করে ঘাড়ের পাশ দিয়ে দুলিয়ে দেয়। আগেও ব্যবহার করতো বিলিতি যেকেন রঙের ছাতা। কিন্তু এখন আর ছাতা ব্যবহার করে না। পথ চলতে ক্ষিপ্রতায় বাধা দেয় বলে ছাতা আর ওড়না সে ছেড়ে দিয়েছে।

শিপ্রা যখন জোয়ারদার-ভিলায় এসে পৌঁছলো তখন সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে ঝরণা-ঝরা বৃষ্টির জলে। ফিনফিনে শাড়ির আঁচলটা বারবার পিঠে জড়িয়ে আসে। বিরক্ত হলেও শিপ্রা বিরত হয় না। মনটা যেন ওর হঠাৎ মাতাল হয়ে উঠেছে আজ।

জয়ন্ত বসে ছিল দোতলার বারান্দার একখানা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে। নিবিষ্ট মনে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। তাই শিপ্রাকে সে দেখেনি। কিন্তু শিপ্রা দেখেছে তাকে, ফটকটা পার হবার আগেই। মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল, নিমেষে কেটে গিয়েছে।

রকমারি বিলিতি ফুলের কেয়ারির মাঝখান দিয়ে সুরকি-ঢালা লাল রাস্তা। সবুজ গাছপালার অন্তরালে ঘোমটা-ঘেরা সুন্দরী তরুণীর নিদ্রালু চোখের মত জোয়ারদারের মার্বেল হাউস নিঃশব্দে চেয়ে আছে ফটকের পথে অনাগত অতিথির আশায়।

সিঁড়ির এ-পাশে একজন আধা-বয়েসী লোক ছুরি দিয়ে আলু পটোলের খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত। হয়তো মালী বা দারোয়ান। শিপ্রার জুতোর শব্দে সজাগ হয়ে লোকটা একবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

কাকে চান? প্রশ্নটা মনে এলেও হয়তো তার মুখে এলো না। ঘাড় গুঁজে সে আবার মনোনিবেশ করে তার কাজে।

হলঘরটা পার হয়ে শিপ্রা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো জয়ন্তর পিছনে:

আশ্চর্য!

কথাটা জয়ন্তর কানে যায় নি। তন্ময় দৃষ্টিতে সে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। বৃষ্টিটা তখন থেমে এসেছে। ছোট ছোট মুক্তার গুঁড়ি বাতাসে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।

...রামধনু! রামধনু উঠেছে বায়ুকোণের কিনারা ঘেঁসে। অদ্ভুত বর্ণ-বৈচিত্র্যে তন্ময় হয়ে আছে জয়ন্ত।

জায়াণ্ট!

জায়াণ্ট!...শিপ্রা?...জয়ন্ত চমকে ওঠে। পিছন ফিরে চেয়ে দেখে। শিপ্রা হাসে। হাত বাড়িয়ে নতমুখে বলে: চাবিটা দেখি, স্যুটকেসের।

খোলাই আছে।

মুহূর্তে জয়ন্তর মনটা কেমন বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শিপ্রা এসে হাজির হয়েছে ওর এই নির্জনবাসের আস্তানায়। কিন্তু কেমন করে পেয়েছে সে ওর ঠিকানা! আর কেনই বা এলো হঠাৎ!

রামধনু দেখুন। এদিকে চাইবেন না এখন। কাপড়টা বদলাতে হবে।

ত্রস্তপদে শিপ্রা ঘরের ভিতর চলে গেল। জয়ন্ত বিমূঢ়-ভাবে বসে রইল কোনোদিকে না চেয়ে। রামধনুর সাতটা রঙ যেন নিমেষে গায়ে গায়ে জড়িয়ে হলদে হয়ে গেল।... এতদিন পরে শিপ্রা আবার হয়তো এসেছে তার ঐশ্বর্য দেখাতে। না হয়, জানাতে এসেছে তার নতুন কোন গৌরবের কথা—সাফল্যের নতুন ইতিহাস।

প্রায় দশ মিনিট পরে শিপ্রা বারান্দায় বেরিয়ে এলো। টুলটা টেনে নিয়ে এসে বসলো জয়ন্তর সামনে।

জয়ন্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। ভিজে কাপড় বদলে শিপ্রা স্যুটকেস থেকে ওর একখানা ধুতি বের করে নিয়ে পরেছে। চেহারাটা নিমেষে শুচিশুভ্রা তপস্বিনীর মত হয়ে উঠেছে।

শিপ্রা হাসে। তীরের ফলার মত ধারাল এক ফালি হাসি ছিটকে আসে ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

ব্যাপারটা কি শুনি?

কিসের? জয়ন্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

নিমেষে শিপ্রার হাসিটুকু মুছে গেল: চুপি চুপি এমন গা ঢাকা দিয়েছেন যে!

গা ঢাকা?

হাঁ। তা ছাড়া আর কি!...টাকাটা শেষ পর্যন্ত সুরেখাদির কাছেই নিলেন বুঝি?

না।

তবে?

সে কথা জেনে লাভ কি?

লাভ আছে বৈ কি। অন্ততঃ লোকসানের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। মোতিবিবির তো টাকার অভাব নেই। আগে ছিল সত্যেন সেন। তারপর জুটলো খাণ্ডেলওয়াল। এখন আবার খেলার মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছেন নতুন হীরের আংটি—মিস্টার চোপরাকে। অগাধ টাকার মালিক চোপরা। টাকাই তো সে চায়। দু-হাতে টাকা ছড়াতে সুরেখাদি ভালবাসে। আর ওঁরা ভালবাসেন টাকার গোছায় নরম হাতের মুঠো ভরে দিতে।

কে কার হাতের মুঠো টাকার গোছায় ভরে দিতে ভালবাসে, সে কথা জানবার কোন কৌতূহল নেই, প্রয়োজনও নেই আমার। খাণ্ডেলওয়াল, চোপরা বা ইব্রাহিম লোদী—যেই হোক, তাদের টাকার সঙ্গে জয়ন্ত চ্যাটার্জীর কোন সম্পর্ক নেই।...জয়ন্ত সিধে হয়ে বসে।

একটু ইতস্তত করে শিপ্রা বলে: তাহলে মেসের চার্জ মেটালেন কেমন ক'রে?

ভিক্ষে করে নয়, নিশ্চয়ই।

শিপ্রা যেন হঠাৎ হোঁচট খায়। একটু থেমে বলে—ধার করেছেন বুঝি?

অদূর ভবিষ্যতে শোধ করবার সম্ভাবনা যেখানে খুব কম, সেখানে ধার করা আর ভিক্ষে করাতে বিশেষ তফাৎ আছে কি?...জয়ন্ত শিপ্রার মুখপানে এক নজর তাকিয়ে চোখ দুটো আকাশের দিকে ফিরিয়ে নেয়।

তবে?

জানবার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

না: শিপ্রা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

ওকে বিব্রত করবার ইচ্ছা জয়ন্তর ছিল না। পরক্ষণেই কথাটা তরল করে দিয়ে হেসে বললে—টাকা আপনি এসে গিয়েছে হাতের কাছে। দু'দিন ব্লাডডোনেট করে যা পেয়েছিলাম তাই যথেষ্ট হয়েছিল প্রয়োজনের তুলনায়।

শিপ্রা শিউরে ওঠে। স্বচ্ছ চোখদুটো নিমেষে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আত্মগতভাবে বলে—রক্ত-বিক্রি করে টাকা যোগাড় করেছেন! .

জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে মুখোমুখি বসে থাকে।

মালী দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে বাঁশের টিপয়টার ওপর নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন সূর্য নেমে পড়েছে দৃষ্টির অন্তরালে।

শিপ্রার থমথমে ভাবটা কাটিয়ে দিয়ে জয়ন্ত উচ্ছল হাসির সঙ্গে বলে—যা যায়, তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। কি বলে তোমার জগৎ?

ইডিয়টের নামান্তর।

অজিৎ?

গ্রীন হর্ণ। এখনও গেঁয়ো গন্ধ কাটে নি। স্পোর্টিং চলে, কিন্তু আবোড়ের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা চলে না। মনের লাগাম ঢিল হয়ে আসে। মেয়েরা খেলতে ভাল-বাসে। কিন্তু ছ্যাকরা গাড়ীর চাকায় পা বাড়ায় না।

জানি।

জানেন?…যদি জানেন,তা হলে মর্যাদা দেন না কেন? মেয়েদের প্রতি আপনার এত উপেক্ষা কেন, বলতে পারেন?

পারি। কিন্তু এখন নয়। অনেক দূর পথ যাবে তুমি। সন্ধ্যে হয়ে এলো। দেরী করো না আর।

এই সন্ধ্যেবেলা ভিজে শাড়ি প'রে বরানগর থেকে ম্যানর্ভেভিলা গেলে, কাল আর দেখতে হবে না। নিউমোনিয়ায় পড়বো।

কিন্তু তা ছাড়া তো উপায় নেই: জয়ন্ত হঠাৎ কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে।

শিপ্রা তার কথায় কর্ণপাত করে না। ধুতির আঁচলটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসে:

জোয়ারদার না-হয় থাকতেই দিয়েছেন তাঁর এই বাগান বাড়িতে, কিন্তু অন্যান্য খরচ চলে কেমন ক'রে? য়ুনিভার্সিটী তো দিয়েছে রিসার্চ স্কলারশিপ বন্ধ ক'রে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়। অস্থির পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বলে—আর-একদিন বলবো সে কথা। আজ নয়।

বেশ তাই বলবেন। কিন্তু আজ আর আমি ফিরবো না ম্যানর্ভেভিলায়। শাড়িখানা ওপাশের জানালায় শুকোতে দিয়েছি। শপ-শপে হয়ে আছে বৃষ্টিতে ভিজে।… যেটা আর একদিন বলবেন, সেটা আজই বলুন না, শুনি।

তুমি কি পাগল হয়েছ, শিপ্রা?

না হলেও, হতে আর খুব বেশী বাকী নেই। শিপ্রা দুর্নাম সইতে পারে। কিন্তু পরাজয় সইতে পারে না।

শিপ্রা!

বলুন।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমায় উঠিয়ে দিয়ে আসি বাসে।

যেতে আমি একাই পারবো। কিন্তু আপনি কি জোর করে তাড়িয়ে দিতে চান জয়ন্তবাবু? এত দুর্বল আপনি! শুনলেন তো, কাপড়-চোপড় আমার ভিজে গোবর হয়ে আছে। এ অবস্থায় একটা রাত্রি আপনি পারেন না আমায় এখানে থাকতে দিতে?

না। এ বাড়ীতে তোমার থাকা চলে না। থাকবার কোন ব্যবস্থাও নেই। মালী আর দারোয়ানও থাকে ওই আউট হাউসে। ওপরে থাকি শুধু আমি, আর পাশের ঘরে থাকেন মিস্টার জোয়ারদারের ভাইপো: টি বি প্যেসেন্ট।

টি বি প্যেসেন্ট!…শিপ্রা চমকে ওঠে।

জয়ন্ত হাসে। চাপা হাসির জের টেনে বলে—হাঁ! তাঁর শুশ্রূষা আর সাহচর্যের জন্যেই তো মিস্টার জোয়ারদার আমায় রেখেছেন এখানে। থাকা-খাওয়া ছাড়া মাসিক একশো টাকা হাত-খরচা দেন।

টাকা রোজগারের কি এ-ছাড়া আর কোন পথ ছিল না জয়ন্তবাবু?…শিপ্রার কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে।

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে—পথ হয়তো ছিল, কিন্তু মতটাও তো থাকা চাই। যাক, তাই নিয়ে অকারণ মাথা ঘামাতে রাজী নই।

রক্তও বোধহয় ওই রুগীর জন্যেই দিয়েছিলেন?

হাঁ। নইলে অত টাকা দেবে কে? গ্রুপিং-এ ভালো মিলেছে।

জয়ন্তবাবু!…শিপ্রা যেন ধক্ করে জ্বলে উঠলো—এখানে আপনার থাকা চলবে না। চলুন, আজই চলুন আমার সঙ্গে। নইলে আমি এক পাও নড়বো না।

তখনও আলো জ্বলেনি। শিপ্রার মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। তবুও যেন মনে হলো সে অটল হয়ে বসে আছে টুলটার ওপর।

ক্রমশঃ

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—

গত কয় বৎসর হইতে নূতন নূতন জমীতে ধান্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সারা ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় ধান্ত কম উৎপন্ন হইতেছে। ১৩৬৩ সালে নানা দুর্যোগের ফলে শুধু বাংলায় নহে—সারা পূর্ব-ভারতে কম ধান হইয়াছিল—সে জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচুর গম আমদানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হইয়াছে। ১৩৬৩ সালে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ—সর্বত্র অনাবৃষ্টির ফলে শতকরা ৫০ ভাগ ধানও হয় নাই। কাজেই এখন হইতে হাহাকার রব শোনা যাইতেছে। পৌষ মাসে চালের মণ ৩০ টাকায় উঠিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তারা বার বার ঘোষণা করিতেছেন, এবার অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে আর প্রয়োজনীয় চাল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না—সকলে চালের পরিবর্তে এখন হইতে গম খাইতে আরম্ভ কর। বাংলাদেশের লোক আটা খাইতে অভ্যস্ত নহে—বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তরা আদৌ আটা খাইতে পারে না—কি যে ব্যবস্থা হইবে, তাহার জন্ত চিন্তাশীলব্যক্তি মাত্রই বিচলিত হইয়াছেন। ইহার উপর মুনাফা-খোর ও চোরা-কারবারীদের রাজত্ব আরও বাড়িতেছে—যত অভাব হউক বা না হউক, একদল ব্যবসায়ী গুদামে মাল তুলিয়া বাজারে জিনিষের দর বাড়াইয়া দেয়। পুলিস বা রাজশক্তি তাহার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হয় না—অর্থাৎ দুর্নীতি দেশকে এমন ভাবে গ্রাস করিয়াছে যে দরিদ্রের দুঃখ দুর করিবার জন্ত কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সকলে অধিক বেতন দাবী করিতেছে—অন্তান্ত সকল প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও বাড়িয়া গিয়াছে। সরিষার তৈলের দর ৮০ টাকা মণ, চিনি ৪০ টাকা মণের কমে পাওয়া যায় না—অথচ সরকার সচেষ্ট হইলে অনায়াসে চিনি বা সরিষার তৈলের দর কমাইয়া দিতে পারেন। কাপড়ের কলওয়ালারা জোট বাঁধিয়া কাপড়ের দাম অন্তায়ভাবে বাড়াইয়া রাখিয়াছেন। কোন জিনিষের কথা বাদ দিব—সবই দুর্লভ, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। গমও এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয় না—বিদেশ হইতে গম আমদানী করিতে হয়। আমেরিকা হইতে এক অদ্ভুত চাল আনিয়া এদেশে ৯ আনা সের দরে বিক্রয় করা হইতেছে—সাধারণ লোক তাহা আদৌ পছন্দ করে না—কিন্তু তাহা না লইয়াও উপায় নাই। চাকীওয়ালাদের হাতে সব গম দিবার ব্যবস্থা করায় বাজারে আটার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। শীতের ২।৩ মাস তরকারী সুলভ থাকিলেও পরে তাহার মূল্য বর্দ্ধিত হইবে। এদেশে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়—কিন্তু ১২ মাস ১০ টাকা মণ দরেও আলু পাওয়া যায় না—বৎসরে ৪।৫ মাস ২০।২২ টাকা মণ দরে আলু কিনিতে হয়। সুলভে মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা আজও হইল না। জাপানী জাহাজ ভারত মহাসাগর হইতে মাছ ধরিয়া লইয়া গিয়া টোকিও সহরে তাহা ১২ আনা সের দরে বিক্রয় করে—আর আমরা কলিকাতায় সমুদ্রের মাছ আড়াই টাকা সের দরে কিনিতে বাধ্য হই। দুধ, ডিম, ফল প্রভৃতির উৎপাদন সম্বন্ধে পরিকল্পনার কথা শুনা যায়, কিন্তু বাজারে ঐসব জিনিষের দাম কমে না। সাধারণ নিম্নবিত্ত দরিদ্রগণের দুঃখের শেষ নাই। এই 'দরিদ্রের ক্রন্দন' কে শুনিবে। মুখে যতই সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলা হউক না কেন, দেশে এখনও ধনীতন্ত্রবাদই চলিতেছে। শুধু বিষয়ে—কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্যসরকার—সকল ধনীর সুখ সুবিধা বিধানে সচেষ্ট। যাহারা সামান্তমাত্র ভাত-কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। আর কত দিন মানুষ এই ভাবে দুঃসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে?

কলিকাতায় ভারতীয় লেখক সম্মিলন—

গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা মহাজাতিসদন হলে নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন

হইয়া গেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রথম দিনে শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা সভানেত্রী হন। খ্যাতনামা লেখক ডক্টর মূলুক রাজ আনন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের এক অধিবেশনে ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিনে উড়িষ্যার শ্রীযুত কালিন্দিচরণ পানিগ্রাহীর সভাপতিত্বে অধিবেশনের সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু সম্মিলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—হিন্দী ভাষা জোর করিয়া অপর কোন ভারতীয় ভাষা-ভাষীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না—তবে যাহারা কেন্দ্রের অধীনে চাকরী করিবেন, তাঁহাদের চাকরী লাভের পর কাজের সুবিধার জন্য হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। তিনি সাহিত্য রক্ষা অপেক্ষা দেশ রক্ষাকে ও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে আজ অধিক প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করেন। প্রবীণ রাজনীতিক ও সাহিত্যিক শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মিলনে এক বাণী প্রেরণ করেন এবং তাহাতে তিনি সাহিত্যিকগণকে সরকারী সাহায্যের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং সর্বভারতের সুবিধার জন্য ও বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার জন্য ইংরাজি শিক্ষা বজায় রাখিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—সর্বভারতীয় ভাষারূপে বর্ত্তমানে প্রচলিত ইংরাজিকে বাদ দিয়া কোন নূতন ভাষা চালাইবার চেষ্টা ক্ষতিকর হইবে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিথিলার ডক্টর এল-ঝা, উড়িষ্যার শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী কে-এল-জর্জ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে সম্মিলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা গুজরাটী কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী সম্মিলনের একটি অধিবেশনে সভাপতি হইয়া বলেন—বর্ত্তমান ভারতীয় সাহিত্য ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের নিকট বিশেষ ঋণী—কাজেই তিনি ইংরাজি শিক্ষা বর্জন করিতে নিষেধ করেন। শেষ দিনের অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যোগদান করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনিও হিন্দীর পরিবর্তে ইংরাজি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে রক্ষা করিতে সকলকে অনুরোধ জানান। শেষ দিনে খ্যাতনামা মারাঠী লেখক শ্রীবি-ভি ওয়ারেরকর সভাপতিত্ব করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী লেখকের সকল গ্রন্থই মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সারা ভারতের প্রায় একশত লেখক ও বাংলার প্রায় সকল খ্যাতনামা লেখক সম্মিলনে যোগদান করেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশিয়া, হাঙ্গারী, পূর্ব জার্মাণী, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের কয়েকজন লেখকও সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একদিন রাজভবনে ও কলিকাতা কর্পোরেশন তাহাদের গৃহে একদিন সম্মিলনে সমবেত লেখকবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভাষা সমস্যাই সম্মিলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এবং প্রায় সকল ভারতীয় লেখকই—শুধু নিজ নিজ রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কথা বলেন নাই, ইংরাজিকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে চালাইবার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। কলিকাতায় নিখিল ভারত লেখক সম্মিলনের প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে তাহা গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

ইংরাজি ভারতের জাতীয় ভাষা—

৩০শে ডিসেম্বর আমেদাবাদে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিনের সভায় এক প্রস্তাবে ইংরাজি ভাষাকে ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা রূপে গণ্য করিবার দাবী জানানো হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষাকেই ভারতের জাতীয়ভাষারূপে স্বীকার করিবার জন্যও ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শুধু একমাত্র হিন্দীকে যাহাতে ভারতের অহিন্দীভাষী জনগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া না হয়, সে জন্য সর্বত্র সকল রকম চেষ্টা হইতেছে—ইহা আনন্দের সংবাদ।

তিন মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি—

অন্ধ্ররাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএন সঞ্জীব রেড্ডী, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকে-কামরাজ ও মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস-নিজলিঙ্গাপ্পা মহাবলীপুরম নামক স্থানে মিলিত হইয়া গত ১লা জানুয়ারী এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—১৯৬৫ সালে ভারতরাষ্ট্রে জাতীয় ভাষারূপে ইংরাজির ব্যবহার বন্ধ করা অসম্ভব। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনম্বুদ্রিপাদেরও ঐ দিন তথায় আসার কথা ছিল—অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসিতে পারেন নাই। সরকারী ভাষা কমিশন হিন্দীকে জাতীয় ভাষা

করার প্রস্তাব করার এই বিবৃতি প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে। মহাবলীপুরম শুধু ঐতিহাসিক স্থান নহে—দর্শনীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান। সে জন্য সকলে তথায় সমবেত হন। তিনটি রাজ্যের বহুসংখ্যক মন্ত্রীও ঐ বিবৃতির আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। দেখা যায়, ইংরাজিকে সর্বভারতীয় জাতীয়-ভাষারূপে ব্যবহারের জন্য দাবী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা—

গত ১২ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ হইতে এক বিবরণ বিতরিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়—পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২ লক্ষ পরিবার এখনও পুনর্বাসন পায় নাই—তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ৬১ কোটি টাকা প্রয়োজন। ৫৬ হাজার ৫ শত পরিবার আংশিক পুনর্বাসন পাইয়াছে—তাহাদের জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। ৪৩ হাজার ৭ শত কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ১৩ কোটি টাকা, ২৮ হাজার ২ শত সহরবাসী অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য সাড়ে ৮ কোটি টাকা ও ৭৫ হাজার ৬ শত গ্রামবাসী অকৃষিজীবী পরিবারের জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার। সরকার পক্ষ সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন—অতঃপর পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিবে, তাহাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশে কোন বাধা দেওয়া হইবে না বটে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ সাহায্য দান করা সরকারের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। গত ১০ বৎসরে যে সকল উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১০।১২ লক্ষ লোক এখনও উপযুক্ত পুনর্বাসন লাভ করে নাই—তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যয় ৬০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে বর্তমানে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আর কোন নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। গত ১০ বৎসর যাহারা নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বাস করিতেছেন, দশ বৎসর পরে এখন তাহাদের পক্ষে এ দেশে আসা কখনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ১৪ই ডিসেম্বর বিধান সভায় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—পশ্চিম বাংলায় আর পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের স্থান বা অবকাশ নাই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম ৯০, ৬৪, ১৪ ও ১০ হাজার বিঘা পতিত জমী আছে বটে, কিন্তু সেখানে এক ব্যক্তিকে ৩০ বিঘা জমী দিলেও সে তাহা দ্বারা সংসার চালাইতে পারে না। সে সকল পতিত জমীকে আবাদের যোগ্য করা বহুব্যয়-সাপেক্ষ। পশ্চিম বাংলায় মোট জমীর শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ বনভূমি—এই বনভূমি নষ্ট করিলে দেশের অকল্যাণ হইবে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যবসা-ঋণ হিসাবে ৩ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে। বাংলায় ২ লক্ষ বেকার আছে বটে, কিন্তু বাংলার কারখানাসমূহে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪ লক্ষ অবাঙ্গালী। কলিকাতায় এক শত পান বিড়ির দোকানের মধ্যে ৯৩টি অবাঙ্গালী পরিচালিত। উদ্বাস্তু সমস্যা আজ আমাদের সকলকে বিব্রত করিলেও তাহার সমাধানের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদল উদ্বাস্তুকে কারখানায় কাজ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা কাজ না করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন-প্লাটফরমে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতিতে যে সকল বাঙ্গালী উদ্বাস্তু প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা কোন না কোন অছিলায় বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সরকারী অর্থে বসিয়া খাওয়াই তাহারা পছন্দ করে, কেহ পরিশ্রম করিতে চাহে না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়ী হইবার সঙ্কল্প তাহাদের মধ্যে নাই। এই সকল কারণে বর্তমান পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা হয়ত অনেকের কাছে কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু আজ সকলকে এই সকল কথা ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে।

রাজগীর ও সোহানায় স্বাস্থ্যনিবাস—

পাটনা হইতে ৬০ মাইল দূরে রাজগীরে ও দিল্লী হইতে ৩৫ মাইল দূরে সোহানায়—দুইটি স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে। সোভিয়েট দেশের বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া ঐ সকল স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণের জল পরীক্ষা করিয়া তাহার রোগ নিবারণ ও প্রতীকারের শক্তি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজগীর মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল—তথায় ১৩টি প্রস্রবণ আছে—কিন্তু ভালভাবে সেখানে থাকার বা জলব্যবহারের

কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে পরিষ্কার ভাবে জল রাখাও হয় না। চারিদিকে পাহাড়-বেষ্টিত, নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত রাজগীরে স্বাস্থ্যনিবাস নির্মিত হইলে বহু লোক তথায় যাইয়া বাস করিবার সুযোগ পাইবে। কলিকাতা বা দিল্লী হইতেও মোটরে তথায় যাওয়া যায়। রাজগীর হইতে ১৩ মাইল দূরে তপোবন নামক স্থানেও গরম জলের ফোয়ারা আছে। সোহানাতেও ৬।৭ শত রোগীর চিকিৎসা ব্যাবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে। বাংলা দেশের বীরভূম জেলায় বহু উষ্ণপ্রস্রবণ আছে—সেখানেও স্বাস্থ্য-নিবাস নির্মাণের ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের মনোযোগী হওয়া উচিত।—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস—

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ-সম্পাদক পদে শ্রীবিজয়সিং নাহার ও কোষাধ্যক্ষ পদে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআভা মাইতি ও শ্রীনির্মলেন্দু দে সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে বিজয়ানন্দবাবু ও শ্রীমতী মাইতি পূর্বেও সম্পাদক ছিলেন। সহ-সভাপতি হইয়াছেন—ডাঃ জীবনরতন ধর, শ্রীকালোবরণ ঘোষ ও শ্রীমতীলাবণ্যপ্রভা দত্ত।

ডাঃ সি-ভি-রামণ—

বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ়তর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর মস্কো হইতে যে ৭জনকে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সি-ভি-রামণ তাঁহাদের একজন। সিংহলের একজন বৌদ্ধ পুরোহিত এই দলে আছেন। সোভিয়েট কবি টিখানোভ এবং ইতালীয় গ্রন্থকার নালিনো দলসিও এই দলের অন্যতম। ডাঃ রামণের এই সম্মান-লাভে ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত।

বুদ্ধ-শিষ্যদ্বয়ের অস্থি রক্ষা—

গত ২৯শে ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভূপালস্থ সাঁচী শৈলশীর্ষের উপর নবনির্মিত বিহারের নিম্নদেশস্থিত একটি ঘরে বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগগলায়নের পূত অস্থি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় ৫ দিন ব্যাপী উৎসব হইয়াছে ও বহু সম্ভ্রান্ত লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বারুইপুরে নুতন উপনগরী—

গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে বারুইপুরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক নুতন উপনগরীর উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রায় ১৫০ বিঘা জমির উপর উপনগরী নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানের অধিকাংশই জলমগ্ন ছিল। ডাঃ রায় সাত দিন দিঘাতে বিশ্রামের পর পূর্বদিন শনিবার কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় তিনি পূর্ণোদ্যমে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভারতে মার্কিণ সাহায্য—

ওয়াসিংটন হইতে খবর আসিয়াছে যে মার্কিণ-সরকার ভারতবর্ষকে ৩০ কোটি ডলার সাহায্য দিবার সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানাইয়া দিবেন। নিম্নলিখিত তিন খাতে উহা পাওয়া যাইবে—(১) আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ (২) নবগঠিত উন্নয়ন ভাণ্ডার হইতে ঋণ ও (৩) টাকার মূল্য পরিশোধের সর্তে ভারতের নিকট মার্কিণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়। কোন খাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। শ্রী টি-টি-কৃষ্ণমাচারী আমেরিকায় যাইয়া ৫০।৬০ কোটি ডলার ঋণ চাহিয়াছিলেন—কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে মোট দেড়শত কোটি ডলার সাহায্য প্রয়োজন হইবে! পৃথিবীর সকল দেশ ভারতের পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে। সোভিয়েট রুসিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতেও ভারত ঋণলাভ করিবে। আমাদের কথা—এই সব অর্থ যাহাতে অপব্যয়িত না হইয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতি—

পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত সি-সি-দেশাই গত ১৫ই ডিসেম্বর বোম্বায়ে আসিয়া বলিয়াছেন —পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এখানে-সেখানে ছোট-খাটো সংঘর্ষ হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ যে হইবে না, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না। পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতির

উদ্দেশ্য ভারত উপেক্ষা করিতে পারে না। সে জন্য বাধ্য হইয়া ভারতকে তাহার অর্থ-নীতি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষতি করিয়াও প্রতি বৎসর বহু অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ইতিহাস এক, সংস্কৃতি এক ও ঐতিহ্য এক—কাজেই যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। মার্কিণ সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তান তাহার সমর সম্ভার বাড়াইয়াছে। যদিও ইহা শুধু কম্যুনিষ্ট দমনে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত, উহা দ্বারা ভারত আক্রমণ করা চলিবে না—তথাপি পাকিস্তানের এক-দল লোক তাহা দ্বারা ভারতকে ভয় দেখাইয়া থাকে। ইহা সত্যই অতীব পরিতাপের বিষয়।

ভিলাই ইস্পাত কারখানা—

১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ভিলাই নামক স্থানে যে নূতন ইস্পাত কারখানা নির্মিত হইয়াছে, গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভারতের তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানার এটি একটি। ২৩ বর্গমাইলেরও অধিক স্থান জুড়িয়া কারখানা নির্মিত হইয়াছে। ঐ স্থানে যে লৌহ প্রস্তর পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা ৬২ হইতে ৬৮ ভাগ লৌহ আছে—সে জন্য কম ব্যয়ে তথায় ভাল ইস্পাত নির্মিত হইবে। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ইউ-নু শ্রীনেহরুর সহিত কারখানা দেখিতে গিয়াছিলেন।

রৌরকেল্লায় শ্রীনেহরু—

১৫ ডিসেম্বর শ্রীজহরলাল নেহরু ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ইউ-নু কলিকাতা হইতে ঝাড়সুগুড়ায় যাইয়া নিকটস্থ রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানা পরিদর্শন করেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুখথঙ্কর, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং প্রভৃতি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। রৌরকেল্লা কারখানা নির্মাণের জন্য জার্মানীর সঙ্গে, ভিলাই কারখানার জন্য রুসিয়ার সঙ্গে ও দুর্গাপুর কারখানার জন্য বৃটীশের সঙ্গে ভারত সরকার চুক্তি করিয়াছেন। রৌরকেল্লা কারখানা নির্মাণে ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে।

পাকিস্তানে নূতন মন্ত্রিসভা—

পাকিস্তানে চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা পতনের পর ১৬ই ডিসেম্বর মালিক ফিরোজ খাঁ নুন করাচীতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। ৬টি দলের সদস্য ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরে পাকিস্তানে এই সপ্তমবার মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। মন্ত্রিসভায় আছেন—রিপাবলিকান দলের (১) আমজেদ আলি (২) মিয়া জাফর সাহ (৩) মুজাফর আলি কিজিল সাহ (৪) গোলাম আলি তালপুর (৫) আবদুল হামিদ, (৬) কামিনীকুমার দত্ত ও (৭) মৌলাবক্স সুমরো। স্বতন্ত্র তপশিলী (৮) এ-কে-দাস ও কৃষক শ্রমিক দলের (৯) রমিজুদ্দীন। দাস ও সুমরো রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দত্ত ও রমিজুদ্দীন ছাড়া সকলেই পূর্বমন্ত্রি-সভার সদস্য। আওয়ামী লীগের কোন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নাই। শ্রী এচ-এস-সুরাবর্দ্দী ও শ্রীহামিদুল হক চৌধুরী হয়ত পরে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ২৪শে ডিসেম্বর নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতি কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-রূপে ইহার সূচনা হইয়াছিল। সরকার আইন করিয়া ২ বৎসর পূর্বে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণাচরণ সেন বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর। এবার সমাবর্তনে খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, বিহারের রাজ্যপাল ডক্টর জাকির হোসেন ভাষণ দিতে আসিয়াছিলেন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুও সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তথায় বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে এক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বঙ্গীয় সাময়িক পত্র সংঘ—

বর্তমান বৎসরে মহাপূজার পর বঙ্গীয় সাময়িক পত্র সংঘের কর্মীরা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন। বালীগঞ্জ অশ্বিনীদত্ত রোডে সহ-সম্পাদক শ্রীসুনীল গুহের গৃহে বিজয়া সম্মিলন, হাওড়ায় 'হাওড়া বার্তা' কার্য্যালয়ে এক প্রীতি সম্মিলনে সদস্য শ্রীকুমারেশ ঘোষের রুশিয়া ভ্রমণের আলোচনা, বালীগঞ্জে বিশ্ববার্তা কার্য্যালয়ে ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ বসু কর্তৃক তাঁহার সাম্প্রতিক জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আলোচনা, কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটায় মন্মথ মল্লিক স্মৃতি মন্দিরে

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা ও ডালহৌসি স্কোয়ারে নীতি কার্য্যালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংঘের সদস্য-গণকে অভিনন্দনের উৎসব হইয়াছে। তাহাছাড়া সংঘের ৬ জন বিশিষ্ট সদস্য একদিন পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সাময়িক পত্র-গুলির ভবিষ্যৎ ও সে বিষয়ে সরকারী সহযোগিতার কথাও দীর্ঘসময় ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। দৈনিক পত্রগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি কাগজগুলিও যাহাতে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল নেতার সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

সিকিম রাজ্যে শ্রীনেহরু—

ভারতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ডিসেম্বর মাসে কয় দিন দার্জিলিংয়ে থাকার সময় ২৮শে ডিসেম্বর সিকিম রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটক দর্শনে গিয়াছিলেন। সকাল ৮ টায় একখানি খোলা গাড়ীতে সিকিমের যুব-রাজের সহিত যাত্রা করিয়া তিনি দার্জিলিং রাজভবন হইতে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পথে রংপো নামক স্থানে তামার খনি আবিষ্কারের কাজ তিনি দর্শন করেন। উহা ভারত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সিংটামে ভারত কর্ত্তৃক সিকিমকে প্রদত্ত ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যে জল-সংরক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে শ্রীনেহরু তাহার উদ্বোধন করেন। গ্যাংটকে তিনি মহারাজার প্রাসাদে এক সভায় বক্তৃতা করেন। পথের দুধারে মানুষ সমবেত হইয়া 'সিকিম-ভারত ভাই-ভাই' ধ্বনি করিয়া শ্রীনেহরুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী শারীরিক অক্ষমতার জন্য পদত্যাগ করায় শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা নূতন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং শ্রীদেবেশ্বর বর্মা, শ্রীকামাখ্যা-প্রসাদ ত্রিপাঠি, শ্রীহরেশ্বর দাস, শ্রীমইনুলহক চৌধুরী, শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ হাজারিকা মন্ত্রিসভার সদস্য হইয়াছেন। শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় নূতন ইলেকট্রিক রেল—

গত ১৪ই ডিসেম্বর এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতা হইতে সেওড়াফুলী পর্য্যন্ত নূতন ইলেকট্রীক রেল চলাচলের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ দিন দুপুরে তিনি কলিকাতার বণিক সভা সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করেন ও সন্ধ্যার পর রাজভবনে এক বিদেশী ছাত্রসভার ভাষণ দেন। কলিকাতাপ্রবাসী বিদেশী ছাত্ররা তথায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরদিন শ্রীনেহরু ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ-নু-কে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে নূতন লোহার কারখানাগুলি দেখিতে গিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব সততা—

হাওড়া দেওয়ানী আদালতের শমনজারীকারক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাওড়ার পথে একটি কাগজের প্যাকেট কুড়াইয়া পান। তাহার মধ্যে ৫ হাজার টাকার নোট ছিল। তিনি উহা আত্মসাৎ না করিয়া থানায় গিয়া জমা দেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গুণানুসারে তাঁহাকে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমানে ৫০ টাকা মাসিক বেতনে অস্থায়ীপদে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান যুগে এই আদর্শ দুর্লভ। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট—

গত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডি-কেটের ১৩ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর শ্রীপ্রমথ-নাথ ব্যানার্জি, ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ ও অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু একাডেমিক কাউন্সিল হইতে নির্বাচিত হন। শিক্ষক নহেন এমন ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত ৮ জন নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ (২) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক (৩) শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ (৪) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৫) শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় (৬) শ্রীকালাচাঁদ বন্দ্যো-পাধ্যায় (৭) ডাঃ বিনোদবিহারী বসু (৮) কলিকাতার সেরিফ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়। আমরা সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

অবৈতনিক স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চল এলাকায় (মিউনিসিপ্যাল এলাকায় নহে) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অষ্টম শ্রেণী

পর্য্যন্ত বালিকাদের শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী আর্থিক বৎসরের গোড়া হইতে এই নিয়ম চালু হইবে। সেজন্য বৎসরে এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক; তাহার পরবর্ত্তী আর ৪টি শ্রেণীতে স্ত্রী শিক্ষা অবৈতনিক করা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

নূতন কংগ্রেস সভাপতি—

শ্রীইউ-এন-ধেবর গত কয় বৎসর নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির কাজ করিতেছেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর নূতন কংগ্রেস-সভাপতির নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীধেবর পুনরায় ২ বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আর কেহ ঐ পদের প্রার্থী ছিলেন না। শ্রীধেবর তাঁহার ত্যাগ, নৈপুণ্য, ধীরতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের দ্বারা এই পদের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

দিল্লীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত—

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থা সম্পর্কে ভারত, সুইডেন ও যুগোশ্লোভিয়া রাষ্ট্রসংঘের রাজনীতিক কমিটীতে যে প্রস্তাব দিয়াছিল তাহা ১৪ই ডিসেম্বর গৃহীত হইয়াছে। আলোচনা কালে প্রকাশ পায়—উনবিংশ শতাব্দীতে লণ্ডন জগতের শ্রেষ্ঠ সহর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন, মস্কো ও লণ্ডন—তিনটি সহরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ জগতে ৫টি সহরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়—তন্মধ্যে দিল্লী অন্যতম—বাকী ৪টি হইল—ওয়াসিংটন, মস্কো, লণ্ডন ও পিকিং। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—এই কবি বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছে।

ভারতে প্রচুর কয়লার সন্ধান—

গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কয়লা ক্রেতা সমিতির বার্ষিক সভায় খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রী ডি-সি ড্রাইভার বলিয়াছেন—সম্প্রতি গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে ভারতের ভূগর্ভে কোক কয়লা সম্পদ বর্ত্তমান অপেক্ষা ৫ গুণ ও ভাল জাতের অন্যান্য কয়লা আরও বেশী পাওয়া যাইবে। তৃতীয় বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে বেসরকারী প্রচেষ্টার কয়লাখনি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ বৃদ্ধি করিতে হইলে দুর্গাপুরের কোক-ওভেন প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। তাহাতে দুর্গাপুরে প্রতিদিন ১৮ শত টন উৎকৃষ্ট কোক উৎপন্ন হইবে ও তন্মধ্যে হাজার টন কোক-কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইবে। শ্রীযুত ড্রাইভার যে আশার কথা শুনাইয়াছেন, সে জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন—

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদিগের বেতনের হার সম্বন্ধে বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ হার স্থির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কমিশন গঠন করিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি হইলেন সুপ্রীমকোর্টের জজ শ্রীজগন্নাথ দাস। সদস্য হইলেন—(১) শ্রীভি-আর-গান্ধী (২) শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (৩) শ্রীএম-এল-দাঁতওয়ালা (শ্রীমতী মায়াগাথাম চন্দ্রশেখর (৫) শ্রীএল-পি-সিংহ আই-সি-এস—সদস্য ও সেক্রেটারী (৬) শ্রীএচ-এক-বি-পাইস্—সহযোগী সেক্রেটারী। যত শীঘ্র সম্ভব কমিশন তাঁহাদের নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবেন। যদি কোথাও এখনই কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, কমিশন তাহা জানাইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কমিশনের কথা শুনিলেই লোক ভীত হয়—যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন দেশে কমিশন সত্বর কাজ করিবেন ও তাহার ফলে দরিদ্র কর্মীদিগের দুঃখের অবসান হইবে।

শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—

কলিকাতা বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ ফ্যাকালটির সদস্য কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কবিরাজ ছিলেন—শচীন্দ্রনাথ কিছুকাল মেডিকেল কলেজে পড়িয়া পিতার আদেশে কবিরাজী ব্যবসা গ্রহণ করেন। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্রও আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী।

ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ রক্ষা—

২৪ পরগণা পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে যে ঘাটে প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নৌকা হইতে নামিয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ঘাটের উপর প্রায় ৭ শত বৎসরের পুরাতন একটি বটবৃক্ষ

আছে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে গাছটি আর ৫০ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকিবে না। ঐ স্থান বৈষ্ণব জগতের তীর্থস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি তথায় গমন করিয়াছেন। বটবৃক্ষকে রক্ষা করার জন্য গত গুরু-পূর্ণিমার দিন পুরাতন বৃক্ষের মূলের নিকট নূতন দুইটি বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া বৃক্ষ রোপণ উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবে পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর পরিচালক শ্রীঅমিয়চন্দ্র মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং খ্যাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী ভাষণে মহাপ্রভুর কথা বিবৃত করেন এবং বৃক্ষ রোপণের পর ভক্তগণের সহিত কীর্তনসহ নৃত্য করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদর অভ্যর্থনাদি করিয়া পানিহাটীর ঐতিহ্য বিবৃত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটি সরকারী পুরাতত্ব রক্ষা আইনে গৃহীত হইলে উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে—গঙ্গার ভাঙনে কবে যে উহা বিপন্ন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

হুগলী জেলা সাংবাদিক সংঘ—

গত ১লা ডিসেম্বর হুগলী জেলার সেওড়াফুলী উদয়ন সিনেমা হলে জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও অধ্যাপক কবি শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সংঘের সভাপতি শ্রীঅবনীমোহন মজুমদার, শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভা শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ 'নেতাজী' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এই ভাবে সম্মিলন করিয়া মফঃস্বলবাসী সাংবাদিকদের অধিকার-রক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

হুগলী জেলা সাংবাদিক সম্মিলনে সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ

বরোদার মহারাজা—

লোকসভার সদস্য বরোদার মহারাজা ফতেসিং রাও গায়কোয়াড় গত ৩১শে জুলাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশীয় রাজাদের মধ্যে তিনি প্রথম চাকরী গ্রহণ করিলেন। বরোদার মহারাজা বার্ষিক ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

সমবায় সমিতির সংগঠন—

সমগ্র পৃথিবীর লোক বর্তমানে সমবায় প্রথায় সকল কাজ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছে। বহু সভ্য দেশের মানুষ সমবায় প্রথায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া দেশের জনসাধারণকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুও প্রায়ই দেশ-বাসীকে সমবায় পদ্ধতি দ্বারা সকল কাজ করিতে আহ্বান করিতেছেন। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সরকার পক্ষও অর্থ সাহায্য করিয়া কর্মীদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষায়তনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার 'সমবায় সমিতির সংগঠন ও ব্যবস্থাপন' নাম দিয়া এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা—৬, ১৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীলেন-নিবাসী খ্যাতনামা সমবায় কর্মী শ্রীপ্রশান্তকুমার গুপ্ত উহা প্রকাশ করিয়া জন সাধারণের উপকার করিয়াছেন। বই খানির মূল্য মাত্র এক টাকা।

যাঁহারা নূতন সমবায় সমিতি গঠন করিবেন, বইখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। ইহাতে সমবায় আইন বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আইনটি যদিও বহু ত্রুটিপূর্ণ এবং সত্বর ইহার সংশোধন করা প্রয়োজন, তথাপি এই পুস্তকখানি সমবায় কর্মী মাত্রেরই বিশেষ সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষায় এইরূপ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত সমবায় বিষয়ক গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

নোবেল পুরস্কার—

বৃটীশ বৈজ্ঞানিক আলেকজাণ্ডার টড উচ্চ-রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৫৬ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর, তিনি গ্লাসগো সহরের লোক। ডাঃ সুং দাওলী ও চেন লিং ইয়াং নামক আমেরিকাবাসী দুই জন চীনা বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে পরমাণু বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের বয়স যথাক্রমে ৩১ ও ৩৫ বৎসর। এত কম বয়সে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ নোবেল পুরস্কার পান নাই।

নৃত্যগোপাল রায়—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সমাজ-সেবী কর্মি নৃত্যগোপাল রায় মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে সাধনা ছিল এবং বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। ১৯২০ সালে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—নৃত্যগোপাল মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। তিনি বিবেকানন্দ কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতেন।

১ কোটি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ—

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৬৫০০ একর জমীতে নারিকেল চাষ আছে। নূতন একলক্ষ একর জমীতে নারিকেল চাষ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই এক কোটি নূতন নারিকেল গাছ বসাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। হাওড়া, হুগলী, ২৪পরগণা, মেদিনীপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ী জেলায় নূতন নারিকেল গাছ বসানো হইবে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বৎসরে রাজ্যের বাহির হইতে সাড়ে ৩ কোটি টাকার নারিকেল ও তৎ-জাত দ্রব্য আমদানী করে। নারিকেল গাছ বসাইবার ৭ বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয়। এক কোটি গাছ বসাইলে পরবর্ত্তী ৮০ বৎসর বার্ষিক ১০ কোটি টাকা আয় বাড়িবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কেরালা রাজ্যে সর্বাধিক নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমীতে ২০ ফিট অন্তর নারিকেল গাছ বসাইলে তাহার মধ্যে কলা, আনারস, হলুদ, আদা, এরারুট প্রভৃতি চাষ হইতে পারে। নারিকেল একটি স্বাস্থ্যপ্রদ, সুখাদ্য। তাহার চাষ বাড়িলে দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দূর হইবে। এ বিষয়ে নানাভাবে প্রচার কার্য্য পরিচালন করিয়া দেশে নারিকেল গাছ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত হইবেন।

হরিদাস কর—

২৪পরগণা সোদপুর (বিলকান্দা) নিবাসী, কলিকাতা ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউসনের প্রাক্তন্ প্রধান শিক্ষক হরিদাস কর ৭৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা কালীঘাটে পরলোকগমন করিয়াছেন। ৪২ বৎসর শিক্ষকতার পর তিনি ১৯৪৯ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানা ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—

দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী বাংলা, হিন্দী, মালায়ালম ও তেলেগু ভাষায় লিখিত ৪টি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের রচয়িতাকে ৫ হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। গত ৩ বৎসরের মধ্যে (১৯৫৪-৫৬) প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত বই গুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে—(১) বাংলা—সাগর থেকে ফেরা—কবিতা, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (২) হিন্দী—বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন—৺আচার্য্যনরেন্দ্র দেব (২) মালায়ালম চেম্মিন উপন্যাস—থাকজি শিবশঙ্কর পিলাই (৪) তেলেগু শ্রীরামকৃষ্ণাজি জীবিত রচিত—রামকৃষ্ণপরমহংসের জীবন চরিত—চিরন্তনানন্দী স্বামী। আমরা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে এ জন্য অভিনন্দিত করি।

বিপিনচন্দ্র পাল—

স্বর্গত খ্যাতনামা দেশ প্রেমিক, পণ্ডিত ও বাগ্মী বিপিন-চন্দ্র পালের ৯৯তমজন্মদিবসে কলিকাতা মিলন-সভা (ফেডা-রেশন) হলে এক জনসভা হইয়াছিল। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সভাপতিত্ব করেন এবং ৮৫ বৎসর বয়স্ক স্বদেশীযুগের গায়ক শ্রীহেমচন্দ্র সেন বন্দেমাতরম্ গান করেন। আগামী বৎসর যাহাতে বিপিনচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিক উৎসব উপযুক্ত-রূপে পালিত হয়, সে জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত জড়িত ও সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার জীবনী জাতির একটা যুগের ইতিহাস হইবে। তাহাদের মত আদর্শবাদীর জীবন আজ বিরল হইয়াছে। কাজেই এ যুগের তরুণগণের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের জীবন কথা প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় রচনাই পাঠককে মুগ্ধ করে। তাহার রচনাবলী এই উপলক্ষে প্রচারিত হইলে দেশের ভাব সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।

নূতন কারিগরী বিদ্যালয়—

কলিকাতায় টেকনিকাল শিক্ষার নিখিল ভারত কমিটীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া খ্যাতনামা শিল্পপতি সার জাহাঙ্গীর গান্ধী জানাইয়াছেন—সমগ্র ভারতে টেকনিকাল শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ পূর্বাঞ্চলে ব্যয়িত হয়। নূতন ৫টি কলেজে ও ১২টি পলিটেকনিক স্কুলে সম্প্রতি ৭২৮ জন ছাত্র ডিগ্রী কোর্সে ও ১৪৩০ জন ছাত্র ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইয়াছে। সেজন্য এককালীন ২৬৬ লক্ষ টাকা ভারত সরকার ব্যয় করিয়াছেন। আরও ২টি নূতন কলেজ ও ৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠাতা হইবে; তাহাতে ৪০০ ছাত্র ডিগ্রী কোর্স ও ১৪৪০ জন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হইবে। বর্তমানে এদেশে শিক্ষিত কারিগরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিক্ষিত, ভদ্র ও পরীশ্রমী যুবকগণ যাহাতে কারখানায় কাজ করার সুবিধা পায়, সে জন্য এতগুলি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু চাকুরী করিবে না, নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে।

পরলোকে অমরেন্দ্রনাথ রায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অমরেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার কলিকাতার বাটীতে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নায়ক, প্রবাহিনী প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক প্রচার বিভাগের সম্পাদক ছিলেন ও ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমালোচক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

পরলোকে নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান আসানসোল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বঙ্গবাণীর সম্পাদক ও স্থানীয় খ্যাতনামা অধিবাসী নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা বর্তমান। তিনি আসানসোলের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সহৃদয়, অমায়িক ও সরল ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্টাছিলেন।

পরলোকে শৈলেশচন্দ্র মিত্র—

অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মী ও পরবর্তীকালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম সংগঠন ও খেলোয়াড় শৈলেশচন্দ্র মিত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে রাজবন্দী হইয়া তিনি বহু বৎসর আটক ছিলেন। দেশবন্ধু ও নেতাজী প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাণী' দৈনিক পত্রেও কিছুকাল তিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন। সদাহাস্যময় উৎসাহী শৈলেশচন্দ্র সকলের প্রীতি অর্জন করিতে সমর্থ হইতেন।

আসামে নূতন শাসন অঞ্চল—

১লা ডিসেম্বর হইতে আসামের নাগা পাহাড় ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ভিলও জসাং অঞ্চল লইয়া নূতন প্রশাসনিক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। জব্বলপুরের কমিশনার শ্রীনোরনহা ঐ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আসামে অবস্থান কালে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।
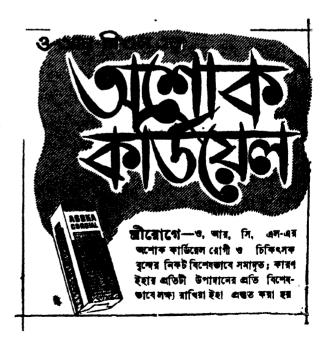
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অভয়ের চাকরি পাওয়ার দিনটি সুরীনের কাছে একটি উৎসবের দিন হিসেবে অপেক্ষা করছিল। অনাথও অভয়কে সাক্ষী রেখে ভামিনীকে বলেছিল, জানলি গো ভামিনী—অভয়ের যেদিনে কাজ হবে, সেদিনে আমি তাজা মদ খাব, তুই খাবি, অনাথ ভায়াকে খেতে হবে, অভয় বাবাজীকেও ছুঁতে হবে এট্টুসখানি। আর বে'র দিনে আমি ধিতাং ধিতাং নাচব।

কাজ হওয়ার কথা শুনে সুরীন লাফাল, ঝাঁজালো মদ আনল। মদ যে সুরীন বাড়িতে খায় না, তা নয়। হপ্তার দিনে বাড়িতে বসে মদ খায় প্রায়ই। অনাথ নাকি আগে খেত না। বড় বেশী নিটপিটে ছিল, ঘেন্নাও করত। তা' ছাড়া স্বদেশী করত—লেখাপড়াজানা ভদ্রলোকদের সঙ্গে। তাঁরা মদের নাম শুনলে মুর্চ্ছা যেতেন। অনাথও খেত না। এখন সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আর নেই। মাঝে মাঝে খায়। তবে নেশাখোর নয়, মাতালও নয়। ভামিনীও খায়। বরাবরই খেয়ে এসেছে। সুরীনের পাল্লায় প'ড়ে এখন রাশ টেনে চলে। সুরীন যেদিন বাড়িতে বসে খায়, সেইদিন ভামিনীরও একটু আধটু হয়। পুরনো জীবনের অভ্যাস। তখনকার জীবনে না খেলে ধকল সইত না। এখনো একবারে না জুটলে কষ্ট হয় বৈ কি!

এ এমন কিছু ঘটনা নয়, বলার মতো বিষয়ও নয়। বিকারহীন স্বাভাবিক জীবনযাত্রারই অঙ্গ। সুরীনদের কাছে এটা ভালো মন্দ বিচারের মাপ কাঠি নয়। কেউ বেশী বেলেল্লাপনা করলে নিজেরাই বিরক্ত হয়। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মারধোরও করে।

মদ আনল সুরীন আজ। অনাথ নিজেই বলে উঠল, নিয়ে এস, ভাল করে নেশা করা যাক আজ একটু—পোয়েটের কাজের জন্যে।

আরো দু'একজন যারা আসে প্রতিদিনই—তারা খেল। সুরীন খেল। ভামিনীকে ডাকল। ভামিনীর যেন একটু বিরাগ বিরাগ ভাব। মুখ ভার ক'রে বলল, না থাক্। রান্না বান্না সব প'ড়ে আছে। বেসামাল হ'লে কে দেখবে সে-সব।

সুরীন বলল, আরে নে নে, বেসামাল তোকে হ'তে দিচ্ছে কে? আর হোস্ তো হবি, বাজারের কেনা খাবার দিয়ে চালিয়ে নোব।

মুখ ভার ছিলই ভামিনীর। তবে পান ভোজনের ব্যাপারে আসলে তেমন বিরাগ ছিল না। পুরুষদের কাছ থেকে একটু ফারাকে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুমুক দিল গেলাসে। কিন্তু সে একটু অবাক হচ্ছিল সুরীনের দিকে চেয়ে। মানুষটাকে একটু অন্যরকম লাগছে। অনাথ দিল অভয়কে, নাও হে পোয়েট, মেজাজ খোল।

অভয়ের গাঁয়ের গুরু নিতাই ভট্টচাজের মতো মাতাল এরা নয়। তা' ছাড়া, এখানে ঘরে বসে ভাত খাওয়ার মতো সকলে মিলে এমন ভাবে খায়, যেন ঘরোয়া ব্যাপার কিছু। তা' ছাড়া অনাথও খায়। তবু বলল, এঁজ্ঞে, চলে না।

অনাথ বলল, একদিন চালাও। রোজ চালালে কি আর তোমার মুখ দেখব ভেবেছ? ওই মাঝে মধ্যে এক আধ দিন, একটু মন চাঙ্গা-করা। দশজনের সঙ্গে একটু মুখ বদল হয়। শৈলবালাও হাজির হ'ল এসে। সে আজকাল যথেষ্ট সামলে চলে। মাতাল দেখে দেখে আর মাতালের খোয়ার সয়ে সয়ে, বেন্না বলে সাড়টুকুও ভোঁতা

হয়ে গেছে। নিজে কোনদিনই নেশাখোর হ'তে পারেনি। দশজনের মধ্যে না খেয়ে পারে না, বোধ হয় ইচ্ছেও করে। মেয়ে বড় হওয়ায় সেটুকুও কালেভদ্রে। ভামিনীদের মতো প্রায়ই খায় না। আজ একবার সাধতেই, ভামিনীর পাশে বসে পড়ল শৈলবালা। অভয়ের কাজ হয়েছে, সেই আনন্দে।

অভয়ও খেল। জীবনে এই প্রথম ইচ্ছে ক'রে খেল।

সবই হল, সকলেরই চোখ মুখের চেহারা বদলাল, স্বর বদলাল গলার। হাসাহাসি বকবকানি কম হলনা। কিন্তু ওই সেই একই কথা, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। বস্তুটির গতিবিধি অন্ধিসন্ধি নিজেরো কি পুরোপুরি জানা থাকে? নইলে এই আনন্দের দিনে সুরীনের মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল কেন? না, সে নিজের হাতে কাজ যোগাড় করে দিতে পারে নি অভয়কে।

তারপর কখন তাদের সবাইকে ঘিরে এখানে নেমে এল এক নিশি-পাওয়া ঘোর। যেন তারা পৃথিবীর বাইরে, অন্য কোনো জগতের অন্ধকারে বসে আছে প্রেতের দল। মেয়ে পুরুষের গলা চেনা যায় না।

কবে একদিন হরেকেষ্ট ব'লে একটি ছেলে এসেছিল, তিলকবালার মেয়েকে বিয়ে করেছিল এখানে। কবে আবার একদিন হরেকেষ্ট বলে গিয়েছিল, তিলকবালার মেয়ে যে-কে-সেই বারো ঘরের আঁস্তাকুড়ে। আগুনের মতো মেয়ে রম্ভা, বামুনের ছেলেকে বিয়ে করল, ভদ্র-লোকেরা এসেছিল সেই বিয়েতে, কত ঢাক ঢোল পেটানো হয়েছিল। খবরের কাগজেও উঠেছিল নাকি। তারপর কবে আবার সে সব ভেঙে গিয়েছিল।

মালীপাড়ার বিচিত্র ভাঙা গড়ার কাহিনী রূপকথার মতো আওড়াতে লাগল তারা, কেন না, আজকে তারা তাদের আর একটি মেয়ের বিয়ে দেবে। ভয় তাদের, তাদের বড় সংশয়, নদীর কূলে মাটি, সে যে জলে ধুয়ে যায়। শক্ত মাটির ঠিকানা নিয়ে যুগ যুগ ধরে তারা রওনা হয়েছে। ঘুরে ফিরে আবার এসে পৌঁচেছে সেখানে।

অনাথ উঠে পড়ল। তার পিছনে পিছনে গেল অভয়। বলল, চলে যাচ্ছ গুরু?

অনাথ বলল, হ্যাঁ।

—ঘরে বুঝিন আমার গুরুমা বসে আছেন?

অনাথ নিঃশব্দে হেসে উঠল। সামনের সেই দুটি দাঁত হীন অন্ধকারের ভিতর থেকে হেসে বলল, মরে গেছে অনেকদিন।

—ছেলেপুলে?

—ছিল। এক মেয়ে, দুই ছেলে। মরে গেছে।

—তবে ঘরে কে আর আছে গুরু?

—আমি, আর একটা ভূত।

—ভূত?

—হ্যাঁ, ওই শালা আমাকে বড় জ্বালাতন করে।

—কেমন করে?

—আবার একটা গুরুমা আনতে বলে ঘরে। বলে, আবার একটা মেয়ে দুটো ছেলে না হ'লে সে ব্যাটা ভাগবে না।

ব'লে অনাথ আবার হাসল। বলল, আঠারো বছর বয়সে কুড়ি বছরের মেয়েকে ঘরে এনেছিলুম। বড় সাধ ক'রে, অনেক লড়াই করে এনেছিলুম। জেলে গেছলুম, শুনলুম, একে একে মরেছে। ভূতটা ভূত, শালা বোঝে না, ওঘরে আর কোনোদিন ফাঁক ভরাট হবেনা।

হাসতে হাসতেই চলে গেল অনাথ।

অভয় আজ আর সামলাতে পারল না। উঠোনে ফিরে এসে বলল, খুড়ো, এ্যাট্টা গান গাইব, কথা এসেছে মনে।

সবাই একযোগে সায় দিল। অভয় গালে হাত দিয়ে, টেনে টেনে গাইল,

> জগতের একটি বড় কল
> শুনি, তার তিনভাগ জল, একভাগ থল
> বল কে করল হে এই কল?
> এই কল করেছি তুমি আমি।
> দেখেছেন জগত স্বামী,
> মানুষের চোখের জলে ভাসে সোম্‌সার
> হাসি হ'য়ে রয়েছে থল,
> জগতের একটি বড় কল।

সুরীন ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, যথার্থ বলেছ বাবা, তিন দুখ, এক সুখ, এইটি বিধি।

অভয় আবার গাইল,

তবে কাঁদাকাটি কেন ?
ভাঙা যেমন আঁকড়ে থাক
হাসি তেমন ধরে রাখ
দুখের মনে দুখ বয়ে যাক
হাসতে মানা কর না যেন।

মদের ঝোঁকে কি গানের আবেশে, কে জানে, শৈল ফোঁপাতে লাগল। সুরীন বলল, ঠিক বলেছ বাবা, ফুর্তি করতে গিয়ে দুখের ধন্দ লেগে গেল। হাসা বড় কঠিন কি না।

কিন্তু ভামিনীর ভার ঘুচল না। তার মনের সেই বিড়ম্বনা না-ছোড়বান্দা হয়ে বুঝি লেগেই রইল।

পরদিন দুপুরবেলা, না না ক'রেও মনকে বোঝাতে পারল না ভামিনী। অভয়কে বলল, চল একটু ঘুরে আসি।

দুপুরবেলা পাড়ায় যায় ভামিনী। কোনোদিন ডাকে না অভয়কে। অভয় বলল, কোথায় খুড়ি ?

কোথায়, কোনো সর্বনাশের মধ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি ভামিনী ? থাক্, পা' বাড়িয়ে কাজ নেই। তবু ভামিনী সামলাতে পারলনা। বলল, চল, কাছে পিঠেই।

কয়েকটা বাড়ি ছাড়ালেই খাসমেয়ে-পাড়া। সেই পাড়ার মধ্য দিয়ে। বড় রাস্তার কাছাকাছি একটি দোতলা বড় বাড়িতে ঢুকল ভামিনী। অভয়কে বলল, এস, একটু বেড়িয়ে যাই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই, দালানে মেয়েদের আড্ডা চোখে পড়ল। একটি বর্ষীয়সী মেয়েমানুষ মোটা গলায় ব'লে উঠল ভামিনীকে, কী ভাগ্যি, ভামি এসেছিস্, আয় আয়। ওইটি কে ?

ভামিনী মুখ টিপে হেসে বলল, আমার ভাসুরপো।

বর্ষীয়সী একমুহূর্ত তাকিয়ে কি ভাবল কে জানে। বলল, এস বাবা, বস।

অভয় গোড়াতেই থমকে গিয়েছিল। গুটি চার পাঁচেক মেয়ে, বয়স সকলেরই ত্রিশের মধ্যে, বর্ষীয়সী ছাড়া। কেউ শুয়ে, কেউ আধশোয়া, বসে আছে কেউ। সকলেই অগোছালো, এলোমেলো বিস্রস্ত। বিশেষ নড়াচড়া করল না কেউ অভয়কে দেখে। পায়ের দিকে আর বুকের ওপরে কাপড় টেনে দিল দু'একজন। অভয় কয়েক-মুহূর্ত বিমূঢ় মত মুখে দাঁড়িয়ে, একটু দূরে বসল।

ভামিনী বলল, কই রাজুমাসী, তোমার গানের বাড়ি এমন চুপচাপ কেন ?

বর্ষীয়সী রাজুমাসী পানের ছিবড়ে হাতে নিয়ে বলল, ঝাঁটা মারো। গান শুনতে আজকাল আর কোন শালা আসে নাকি ? রেডিও, কলের গান, সিনামাতেই সে সব সাধ মিটে যায়। গান শোনার ভান করে আসে, আসলে মেয়েগুলোর জন্তেই আসে, কাজ মিটিয়ে চলে যায়। গানের বাড়ি আর নেই, যে-মেয়ে-সে-মেয়ে-বাড়িই আছে।

ভামিনী বলল, আমি যে সে-জন্তেই ভাসুরপোকে নিয়ে এলুম। গান বাজনার বড় ভক্ত, তাই। রাজুমাসী তার ঢুলঢুলু রক্তাভ চোখে সস্নেহ হেসে বলল, তাই বুঝি ?

ভামিনী অভয়ের দিকে ফিরে বলল, জানলে, খুব বড় গাইয়ে ছিল আমাদের রাজুমাসী। বয়সকালে এ তল্লাটের সবচেয়ে নাম করা কীর্তন-গাইয়ে ছিল। এখেনকার উপীন কবিয়ালের সঙ্গে গাইত।

রাজুমাসী হেসে মুখ ঝামটা দিল, নে বাপু, আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটিস্ নে।

কিন্তু অভয়, মুখে কিছু না বলতে পারলেও, দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করেছে তৎক্ষণে। রাজুমাসী অবাক হ'লেও সলজ্জ হেসে বলল, না না বাবা, ওসব কিছু নয়। কোন্‌কালের কথা সব। আজকাল আর ওসব আছে নাকি ? বেবুশ্যে বেবুশ্যেই। সেইজন্তে আসে, তাই না কত। আবার গান শুনে টাকা দেবে ?

বাকী মেয়েরা অভয়কে দেখে দেখে নিজেদের মধ্যে টিপে টিপে হাসছিল। একজন বলল, তোমার ভাসুরপো'রই গান একখানি শোনাও না ভামিনীদি।

ভামিনী বলল, গাইবে, তোরা গা।

হেসে উঠে একজন বলল, আমরা আবার কবে গান করলুম।

—কেন, নাদু গা' না।

বছর ত্রিশের নাদু, কাজল ধোঁয়া ঘুম জড়ানো চোখে হেসে বলল, ওসব পাট অনেকদিন চুকিয়েছি ভামিনীদি।

হারমোনিয়া নিয়ে গান ধরলেই মিনসেরা ঘাড়ের ওপর পড়ে বলে, গান থাক।

সকলেই হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে।

নাছু আবার বলল, তবে, সেদিন একটা রিক্সাওয়ালা দু'টাকা দিয়ে দুটো গান শুনে গেছে আমার, মাইরি। দুটো কেত্তন শুনেই চলে যাচ্ছে দেখে ব্যাটাকে হাত ধরে টানলুম, বললে, না, খালি গান শুনতেই নাকি এসেছিল।

কথা শেষ হবার আগেই আবার হেসে কুটিপাটি হল সবাই।

রাজুমাসী বলল, পারবি নাছু? পারলে গা না, বলছে ভামিনী।

নাছু নিশ্বাস ফেলে বলল, না মাসী, সত্যি পারব না, গাইতে গেলেই হাঁপ লাগে। জান তো সবাই।

এবার আর কেউ হাসল না, সকলেই গম্ভীর হ'য়ে গেল। নাছু মুখ গুঁজে রইল।

রাজুমাসীও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা বটে, সত্যি, রাতের ধকল কাটিয়ে গান আর আসে না।

ভামিনী বলল, আর সে কোথায়, তোমার মহারাণী? শুনলুম, তাকে নিয়ে গোটা শহর জমে আছে।

রাজুমাসী বলল, সুবালা? সে এক হয়েছে আমার ঐশিয্যি। গান জানে, গলা ভাল, গায়ও। বয়সও কাঁচা, দেখতেও ভাল, তবে ওই, বড় মেজাজ। ছোট দারোগাকে খেপিয়েছে।

—কী করে?

—কী করে আবার? বলেছে, গান শুনতে চান তো বসুন, নইলে পথ দেখুন। সে দারোগা মানুষ, শুনবে কেন? টানাটানি, জেদাজেদি, সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

—ওমা! তা'পর?

—তা'পর আবার কি, শাসিয়ে যাচ্ছে এসে রোজ রোজ। তা' বাপু, শরীল বেচতে বসেছি, আমাদের কি চলে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ? এখন জেদাজেদির ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। সুবালারও জেদ, ওর সঙ্গে ঘরে থাকব না।

নাছু ব'লে উঠল, তবে বেশীদিন আর নয়, সুবলির জেদও ভাঙবে। আইন তো নেই খুশি মত চলবে। খদ্দের কড়ি ফেলবে, খেয়াল মেটাবে।

কথা শেষ হবার আগেই সুবালা ঢুকল হাই তুলতে তুলতে। আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে, খোলা চুল ছড়ানো ঘাড়ে পিঠে। বয়স বোধ হয় বাইশ চব্বিশের ওপরে নয়। রং কটা-ই, তার ওপরেও পাউডার বুলানো আছে। পান খাওয়া ঠোঁট একটু বাড়াবাড়ি রকমের লাল। বলতে বলতেই ঢুকল, সুবলির আবার কী খোয়ার হচ্ছে শুনি?

নাছু বলল, তোমার গুণকেত্তন হচ্ছে।

ততক্ষণে ভামিনীকে পেরিয়ে সুবালার নজর পড়েছে অভয়ের ওপর। আঁচল তুলতে তুলতে বলল, এ আবার কে গো?

জবাব দিল ভামিনী, আমার ভাসুরপো।

—অ! ঠোঁট বাঁকিয়ে, অপাঙ্গে তাকিয়ে একবার দেখল সুবালা অভয়কে। অভয়ও তাকিয়েছিল, চোখ নামিয়ে নিয়েছে। রূপ আছে সুবালার, চাউনিটি খর, একটু যেন অ-ভক্তির আভাস, কথায়ও ধার। অভয় যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। খুড়ি আর জায়গা পেল না, এখানে এল।

ভামিনী বলল, অ আ নয়, একখানি গান শোনাতে হবে আমার ভাসুরপোকে।

সুবালা বলল, তোমার ভাসুরপোর সখ আছে তা'লে খুব?

নাছুরা হেসে উঠল সবাই। ভামিনী বলল, সখ নয়, গুণী মানুষ, কবিয়াল, বুঝেছ? সেই জন্যে নিয়ে এসেছি।

অভয় তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, না না, ছি ছি, কী যে বল তুমি খুড়ি।

অর্বাচীন ভঙ্গিটুকু দেখে বোধ হয় সুবালার আবার একটু ঠোঁট কোঁচকালো। হারমোনিয়ম নিয়ে এল গিয়ে একটি সেবক।

রাজুমাসী বলল, তবলা বাজাবার লোক নেই, নইলে—

গানের নামে সঙ্কোচ কখন কেটে গিয়েছে অভয়ের। গাঁয়ে নিতাই ভটচাযের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে বিদ্যেটি একটু আরম্ভ করেছে অভয়। তার চেয়েও পাখোয়াজ ভাল আসে তার হাতে। বলে উঠল, থাকলে আনেন, এট্টু ঠ্যাকা দিতে পারব।

রাজুমাসী বলল, খুব ভাল। যা' নিয়ে আয় পুতুল বাঁয়া তবলাটা।

ভাব-ভঙ্গিতে বাঁকাচোরা বলে মনে হয় সুবালাকে, হারমোনিয়ম নিয়ে বসতে সাধাসাধি করতে হল না। রীডের ওপর তার আঙুল চালানো দেখে অভয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। ওই বস্তুটি সে সুবিধে করতে পারে না।

কয়েক ফেরতা আঙুল চালিয়ে বলল সুবালা, বিদ্যেধরী নই বাপু ভামিনীদি, ফরমায়েস মত গাইতে পারিনে। পারলে নাকি কলকাতার ভাল জায়গায় পাত্তা পাওয়া যেত।

নাদু বলল, মুখপুড়ি!

বাকীরা হেসে উঠল। রাজুমাসী বলল, যা খুশি গা না একখানা।

অভয় বাঁয়া-তবলায় এক আধটি ঠোকা দিয়ে মাথা নীচু করে আছে।

সুবালা গজলের ঢংএ গান ধরল,

হাসতে পার, হাসো বঁধু
মানা কিছু নাই গো
বিনা প্রেমে হাসির মধু
প্রাণে পরশ নাই গো।

নাদু-ই তুড়ি মেরে বলল, খাসা।

খাসা-ই। গলাটি সুবালার চাঁছাছোলা, চড়ানো, কিন্তু মিষ্টি।

গান শেষ হ'তে অভয়ই আগে বলল, বাঃ, সোন্দর, চমৎকার!

নাদুই আবার বলল চোখ ঘুরিয়ে, দিব্যি গেলে বলছ তো?

ভামিনী ধমকে উঠল, দূর ছুঁড়ি, বকিস্‌নে।

সুবালা বলল অভয়কে, তোমার হাতটিও ভাল চলে দেখছি। এবার গানের পরখ হ'য়ে যাক্।

অভয় হাত জোড় করে বলল, এঁজ্ঞে আপনাদের সামনে কী গাইব?

বোধ হয় 'আপনি' শুনেই সুবালা একটু অবাক হয়ে তাকাল ভামিনীর দিকে। আশ্চর্য, ভামিনীও তার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই ইশারা করল, গাইতে বল।

সুবালা বলল, তা' বললে শুনব না, শোধবোধ হোক।

—কিন্তু ওসব ঢংএর গান যে জানি নে। হারমোনিয়া বাজাতে পারিনে।

রাজুমাসী বলল, যেমন ঢংএর তোমার আসে, তেমনই গাও। হারমোনিয়ার দরকারই বা কী?

অভয় মাটিতে আঙুলের আঁক কেটে বলল, পদাবলী শুনবেন?

—তাই হোক।

অভয় গলা নামিয়ে গাইল,

সখি একি এ পীরিতী
নাহি জানি রীতি
পরাণ রাখিতে নারি।
আসে যদি কালা
তুষিবে অবলা
পরাণ ধরিতে পারি।

এবারেও নাদু-ই প্রথম অবাক হ'য়ে বলল, ওমা, এ যে খুকড়ির মধ্যে খাসা চাল গো!

রাজুমাসী বলল, বেশ, বেশ বাবা, ভাব আছে খুব, গলাটিও মোলায়েম।

ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজু। এককালে ওই সব গানেই তার খ্যাতি ছিল। তখন প্রতি বছর মাঘ মাসে ধুলোটের সময় যেত নবদ্বীপ। এই নাদুকেও কতবার নিয়ে গেছে। বড় বড় লেখাপড়া-জানা মহাজনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কত। বেবুশ্যে ছিল ব'লে তাঁরা গুণের অনাদর করেননি কোনোদিন। কত কথা মনে পড়ছে।

সুবালাও অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল অভয়ের দিকে। কাছে উঠে এসে বলল, মাইরি, চমৎকার হয়েছে, এমন কেত্তন আমিও গাইতে পারিনে। আর একখানা হোক।

ইতিমধ্যে একটি লোক এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে। মুখে হাসি, ভাবে ভঙ্গিতে বিশেষ ব্যস্ত। বলল, কই গো নাদুমণি, তাড়াতাড়ি এস, আমাকে আবার সাড়ে চারটের খেয়া ধরতে হবে। বাড়ি ফিরে যাবার পথে যেন বিশেষ কাজে এসেছে। নাদু বলল—মুখ ঝামটা দিয়ে, রোজ রোজ এক ক্যাচাং। সময় মত বৌয়ের কাছে ফিরতে হবে, আবার এখেনেও পাক দিয়ে যেতে হবে, এতটা না হলেই নয়? সময় অসময় আছে তো। হাত মুখ ধোবার সময়—

লোকটা বলল, এই দেখ, এক মিনিট কাটিয়ে দিলে,

আর মাত্র সত্তর মিনিট সময় আছে, আমাকে আবার ঘাট অবধি যেতে হবে, এস এস।

রাজুমাসী বলল, বিরক্ত চাঁপা গলায়, যা বাপু যা, সন্ধ্যের মুখে আর খদ্দের ফেরাস্‌নি, মুখে হাসি রাখ্‌।

অভয় অবাক হয়ে তাকিয়েছিল লোকটির দিকে। নাড়ু উঠে গেল। ভামিনী বলল, চল, যাই।

সুবালা ছাড়ল না। বলল, ইস্‌, আর একটা গান শুনব বললুম যে?

ভামিনী যেন একটু কেমন ক'রে হাসে সুবালার দিকে চেয়ে। বলল, ভাল লাগল?

সুবালা বলল, তবে?

—তবে আজ আর নয়, বেলা প'ড়ে এল। ভাব ক'রে দিয়ে গেলুম, পাঠিয়ে দেব, ঘরে বসে গান শুনো।

অভয় নীরব। ভামিনীর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল নীচে। সুবালা আর পুতুলও এল পিছনে পিছনে। ভামিনী বলল, দারোগার সঙ্গে ভাব করে ফেলিস সুবলি।

সুবালা বলল, তা করব। কিন্তু তুমি আসছ তো আবার ভাসুরপো'কে নিয়ে।

—আসব।

অভয়ের বড় অস্বস্তি। তার মনে হল, যেন সুবালার নজর খোঁচার মত বিঁধে আছে তার গায়ে।

হঠাৎ আবার বলল ভামিনী, তবে কথা দিতে পারিনে। ভাসুরপো আমার শৈলদির মেয়ে নিমিকে বে' করছে শীগ্‌গিরিই। তখন কি আর আসতে চাইবে?

সুবালা অভয়ের দিকে ফিরে বলল, জবাবটা তা'হলে শুনেই রাখি।

অভয় হেসে বলল, আসব বৈ কি ঠাকরুণ, নিচ্চয় আসব।

পুতুল হেসে বলল, মনে থাকে যেন। ক্রমশঃ

রিক্ত দিনের

সন্তোষকুমার অধিকারী

আমি ত' তোমায় দিয়েছি আমার
হৃদয়ের থেকে সকল আলো
দিয়েছি মনের উচ্ছল মধু, মুগ্ধ প্রেমের ভরা জীবন;
অনুরাগে ভরা উজ্জ্বল আশা—
যে আশা নিত্য নয়নে জ্বালো,
আমি ত' তোমায় দিয়েছি আমার কামনায় রাঙা মুকুল মন!

দিয়েছি তোমায় মর্ম্মজুড়ানো হৃদয়ের প্রেমশতাভীক,
আমি ত' দিয়েছি বাসনায় রাঙা অর্ঘ্য—আকুল মর্ম্ম মোর;
রয়েছে নীরব হাহাকারে জ্বলা, বেদনায় ঝরা রক্ত শুধু,
বহু দিবসের বহু বেদনায়
যন্ত্রণাভরা অশ্রুলোর।

আমি ত' তোমায় দিয়েছি বন্ধু,
আশা ও প্রেমের মুগ্ধ গান,
পড়ে আছে শুধু দুঃখ জড়ানো নিবিড় হতাশা অপূর্ণতা;
তুমি কি আমার দুঃখ ল'বে না,
আমার কালিমা—বেদনা ম্লান,
তুমি কি আমার রিক্তদিনের অর্ঘ্য নেবেনা—
এ ব্যর্থতা!!
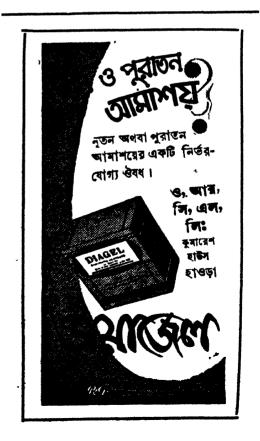
অতুল দত্ত

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয় প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে; পশ্চিম ইরিয়াণ (ওলন্দাজ নিউগিনি) সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার দাবীর প্রতি জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের ঔদাসীন্য ইন্দোনেশীয়দিগকে এক নূতন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে প্যারিসে "ন্যাটো" শক্তিগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মতবিরোধ ও স্বার্থ-সঙ্ঘাত কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কায়রোয় এশিয়া-আফ্রিকা গণ-সম্মেলন প্রত্যেক শান্তিকামী ও স্বাধীনতাকামীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ইন্দোনেশিয়া ও পশ্চিম ইরিয়াণ—

ইন্দোনেশীয় দ্বীপমালার পূর্ব্বতম প্রান্তে পশ্চিম ইরিয়াণ বা ওলন্দাজ নিউগিনি অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্ঘাতে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বৈপায়ন দেশটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে; কিন্তু এই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশা সে ছাড়ে নাই। সে স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার একটি পাদভূমি প্রয়োজন। পশ্চিম ইরিয়াণ সেই পাদভূমি; ইহা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে পশ্চিম ইরিয়াণ সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়,—জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ডের মধ্যস্থতায় ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ ও ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা হউক। প্রস্তাবটি জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের কোনও প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিতে হইলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে এই প্রয়োজনীয়-সংখ্যক ভোট না হওয়ায় উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় জিদের প্রতি জাতি-সঙ্ঘ সমর্থন কত ব্যাপক, সাম্প্রতিক আলোচনায় তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পশ্চিম ইরিয়াণ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ: এই অঞ্চল এখনই ইন্দোনেশিয়ার হাতে অর্পণের কোনও কথা প্রস্তাবে ছিল না; এই সম্পর্কে দুই পক্ষে আলোচনার ব্যবস্থা করিবার কথাই শুধু হইয়াছিল। এই নির্দ্দোষ এবং সম্পূর্ণ আপোষকামী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় শুধু এই কারণে যে, ওলন্দাজ প্রতিনিধি ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তিতে প্রস্তাবটির পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট জোটে নাই; যে সব বৃহৎ শক্তির ইঙ্গিতে বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভোট-বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত আসে নাই। ইহার কারণ—ওলন্দাজ নিউগিনি স্বাধীনতা লাভ করিলে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ নিউগিনি সম্পর্কেও দাবী উঠিবে বলিয়া দুশ্চিন্তা বৃটেনের; টিমোর সম্পর্কে আশঙ্কা পর্ত্তুগালের; অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাহাদের রাজ্যের প্রবেশদ্বারে স্বজাতীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য একেবারে মরিয়া। জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সিদ্ধান্ত শুনিয়া ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি গভীর আক্ষেপে বলিয়াছিলেন, "ইন্দোনেশিয়া উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসা চাহিয়াছিল···কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের ভোটের জোরে সে চেষ্টা সফল হইতে পারিল না।" তিনি পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, অতঃপর, জাতি-সঙ্ঘের বাহিরে "অন্য পন্থা" অবলম্বন করা ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার আর গত্যন্তর রহিল না।

বিচিত্র সংগ্রাম—

এই 'অন্য পন্থা' কি তাহা গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দোনেশীয় জাতি এবং ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ-ভাবে এক বিচিত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্যে ওলন্দাজদের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন। রাজ্যের ৫০ হাজার ওলন্দাজ অধিবাসীকে অন্যত্র যাইবার আদেশ দিয়াছেন। আন্তর্দ্বৈপায়ন ওলন্দাজ জাহাজ কোম্পানীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কে-এল-এম্ নামক ওলন্দাজ বিমান কোম্পানীর বিমানগুলির পক্ষে জাকার্ত্তা বিমানবন্দর ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে; সমগ্র দেশের ওলন্দাজ কন্‌-সালেটগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সমগ্র ইন্দো-নেশিয়ায় ওলন্দাজদের যত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার ইন্দোনেশীয় কর্ম্মচারীরা প্রতিষ্ঠানগুলি শান্তিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যে বাধা দেন নাই; তাহাদিগকে নিরুৎসাহও করেন নাই। কেবল পূর্ব্ব জাভায় কয়েকটি ওলন্দাজ গুদাম পুড়াইয়া দেওয়ায় ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, এই ধরণের কার্য্য তাঁহারা সহ্য করিবেন না। তবে, ইন্দোনেশীয় শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের শান্তিপূর্ণভাবে ওলন্দাজ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অধিকারে তাহাদের আপত্তি নাই। এইভাবে অধিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। তবে, নেদারল্যাণ্ডসের সহিত ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই; অর্থাৎ আপোষের দ্বার সম্পূর্ণরূপে অর্গলবদ্ধ হয় নাই। পশ্চিম ইরিয়াণের হস্তান্তর সম্পর্কে ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টকে আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যেই ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট এবং

ইন্দোনেশীয় জনগণের এই সংগ্রাম। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেন্ট কোনও ওলন্দাজ সম্পত্তি আইন করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন নাই ; বৈদেশিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কোনও সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে গৃহীত হয় নাই।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমস্যা—

ইন্দোনেশীয়দের এই ওলন্দাজ-বিরোধী তৎপরতায় সাম্রাজ্যবাদী মহলে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া আন্তর্জ্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিয়াছে, স্বাভাবিক শিষ্টতা বর্জ্জন করিয়াছে প্রভৃতি নানা কথা বলা হইয়াছিল। ওলন্দাজ গভর্ণমেন্ট "ন্যাটোর" মুরুব্বিদের নিকট কাঁদুনি গাহিয়াছেন, জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত করিবেন বলিয়াও শাসাইয়াছেন। কিন্তু মাসাধিক কাল ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করিবার পর দাপাদাপি এখন কিছু কমিয়াছে ; এখন দেখা দিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী মহলে দারুণ দুশ্চিন্তা। ইন্দোনেশিয়া তাহার বিচিত্র সংগ্রাম-পদ্ধতির দ্বারা যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রভাব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অত্যন্ত পরিপন্থী। অথচ, করিবার কিছুই নাই ; ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র তৎপরতা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত। এমন কি বহিষ্কৃত ওলন্দাজরা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা হয় নাই, কোথাও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা দেখেন নাই। সুতরাং, এই অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও সামরিক তৎপরতা চলে না। সামরিক তৎপরতা অবলম্বন করিতে হইলে খোঁচাইয়া একটা অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়া লওয়া দরকার। সে সুযোগ এই ক্ষেত্রে নাই। ইহা ছাড়া, সামরিক তৎপরতা অবলম্বনের অর্থ বিশ্ব-যুদ্ধের ঝুঁকি লওয়া। ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে মিলিতভাবে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সহজ নয়। অবশ্য, হুম্‌কী শোনা গিয়াছে যে, এই অভিজ্ঞতার পর কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় আর লগ্নী করিতে আসিবে না ; অথচ, তাহার পক্ষে বৈদেশিক পুঁজি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই হুমকী আজিকার দিনে গুরুত্বহীন। অর্থ-নৈতিক চাপ দিয়া অন্য রাষ্ট্রকে জব্দ করিবার চেষ্টায় মধ্য-প্রাচ্যে যে ফল ফলিয়াছে, তাহার পর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অন্যত্র সে চেষ্টা করিতে আর সাহসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। সিরিয়া ও মিশরের প্রতি আজ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্রোধ যত, তাহা অপেক্ষা বেশী তাহাদের প্রতি পূর্ব্বের আচরণের জন্য নিজেদের অনুশোচনা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা অত্যন্ত শক্তিশালী। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই রাজ্যে বাহিরের কম্যুনিষ্ট শক্তির অনুপ্রবেশের উপযোগী অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বার বার চিন্তা করিবেন।

ন্যাটোর সিদ্ধান্ত—

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে প্যারিসে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়াছে। এই অধিবেশনে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধানগণ মিলিত হইয়াছিলেন। "ন্যাটোর" উচ্চতম পর্য্যায়ে এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল এই কারণে যে, সম্প্রতি মার্কিণ সেনেটের সাব কমিটির সমক্ষে কয়েক জন বিজ্ঞানী আতঙ্কজনক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন—আন্ত র্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মাণে সোভিয়েট রুশিয়া শুধু আমেরিকার অগ্রবর্ত্তী নহে—সে ইতিমধ্যে আমেরিকার অধিকাংশ ঘাঁটী লক্ষ্য করিয়া তাহার মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে ; সাবমেরিণের সাহায্য খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ পরিচালনের ব্যবস্থাও করিয়াছে। অর্থাৎ সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজনের মূলে আঘাত করিবার এবং সে আয়োজনের মধ্যমণি যে আমেরিকা, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাতের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ। অতলান্তিকের দুই পারে এতদিন যাহারা শুধু সমরায়োজনের প্রাধান্যের দ্বারা কম্যুনিষ্ট আক্রমণ অসম্ভব করিবার কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা মার্কিণ বৈজ্ঞানিকদের এই সাক্ষ্য শ্রবণ করিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। তাহাদের আত্মসন্তোষে যে অকস্মাৎ এইরূপ আঘাত লাগিতে পারে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ইহার পাল্টা ব্যবস্থারূপে ইউরোপের মার্কিণ ঘাঁটী-গুলিতে আণবিক অস্ত্র সাজাইবার এবং 'ন্যাটোর' অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাজ্যে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। এই পরিকল্পনা লইয়া মার্কিণ-পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ প্যারিসে উপস্থিত হন ; প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্যারিসে আসিয়াছিলেন উচ্চতম পর্য্যায়ে আলোচনার দ্বারা "ন্যাটো" রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক সংহতি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আমেরিকায় এখনও ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই,—আগামী ১৯৬০ সালের মধ্যে নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

'ন্যাটোর' অভ্যন্তরে বিরোধিতা—

এতদিন পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ "ন্যাটোয়" যোগ দিয়াছিল কম্যুনিষ্ট আক্রমণের প্রকৃত অথবা কল্পিত আশঙ্কায় ; কম্যুনিষ্ট আক্রমণ-বিরোধী সমরায়োজনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব তাহারা নির্ব্বিবাদে মানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী বসাইবার প্রশ্ন ওঠে খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে। "It is···necessary to station the means to deliver the nuclear deterrent in Europe. This is no longer primarily for the purpose of defending the territories of W. Europe ; it is to save the United States (and thus to fortiofy, its allies in all parts of the world) from being left helpless in the face of the threat of Moscow's intercontinental missiles (Economist) আমেরিকার প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হইবার এই বাস্তব আশঙ্কা সত্ত্বেও প্যারিস বৈঠকে দেখা গেল যে, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ মার্কিণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। বৈঠক আরম্ভ হইবামাত্র নরওয়ে ও ডেন্‌মার্ক দৃঢ়তার সহিত জানাইল যে, তাহারা কোনও অবস্থাতেই তাহাদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী নির্ম্মাণ করিতে দিবে না। ওলন্দাজ প্রতিনিধি জানাইলেন যে, ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োজন

আছে বটে, তবে ফ্রান্স ও ইতালীই ঐ অস্ত্রের ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত স্থান। বেল্‌জিয়াম্ ওলন্দাজ প্রতিনিধিকে সমর্থন করিল। ইতালী বলিল যে, সে এখনও মনস্থির করে নাই, গ্রীস তুলিল সাইপ্রাস প্রসঙ্গ। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জানান হইল যে, আণবিক অস্ত্রের প্রতি ফ্রান্সের পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। এ আবদার আমেরিকার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়; কারণ আণবিক অস্ত্রের কর্ত্তৃত্ব অন্যের হাতে দেওয়া আমেরিকায় আইনতঃ নিষিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, আমেরিকার সমর্থনে ও প্রশ্রয়ে যে আডেনয়ার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হইয়াছেন, সে-ই ডাঃ আডেনয়ারও মার্কিণ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। পশ্চিম জার্ম্মানীর সমরনায়করা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, পশ্চিম জার্ম্মানীর অবস্থিতি বিবদমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের ফ্রণ্ট লাইনে; এখানে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপন নির্ব্বুদ্ধিতা, বরং পশ্চিম জার্ম্মানীর প্রয়োজন ট্যাক্‌টিক্যাল্ অস্ত্র বা কাছাকাছি যুদ্ধের অস্ত্র। ডালেসের প্রস্তাব নির্ব্বিবাদে গলধঃকরণ করিয়াছিল কেবল বৃটেন ও তুরস্ক। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ প্যারিস বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেপণাস্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিল; বৃটেনের ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপনের স্থানগুলি নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছিল। ডালেসের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের এই আপত্তির সঙ্গেই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আর একবার আলোচনার আগ্রহ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই আগ্রহ উপেক্ষা করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আর একবার আলোচনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তবে ইউরোপে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপনের প্রস্তাবটি মূলনীতি হিসাবে ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যদিগকে গ্রহণ করানো সম্ভব হইয়াছিল।......The U. S. has been obliged to accept a hard bargain : in exchange for an agreement in principle—but only in principle—to bring her missiles across the Atlantic, she has been forced to undertake a definite commitment for further talks with Russia. (Paul Johnson).

রুশিয়ার পাল্টা প্রস্তাব—

প্যারিসে ন্যাটোর রাষ্ট্রপ্রধানগণ পররাষ্ট্র সচিবের পর্য্যায়ে রুশিয়ার সহিত আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মস্কোর কর্ত্তৃপক্ষ ইহার উত্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্য্যায়ে আলোচনার দাবী জানাইয়াছেন। এই পাল্টা প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া মস্কোর কর্ত্তৃপক্ষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। পররাষ্ট্র সচিবের পর্য্যায়ে আলোচনায় সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি দুইটি কারণে—প্রথমতঃ নীতিগত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে আলোচনা করিতে আগ্রহী; পররাষ্ট্র সচিবের পর্য্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে দর-কষা-কষি চলিতে পারে, নীতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সমরোত্তেজনা হ্রাস করিতে হইলে আমেরিকার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বুঝাপড়া সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। অথচ আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ উগ্র সোভিয়েট-বিরোধী। প্যারিসে "ন্যাটো" সম্মেলনে রুশিয়ার সহিত আলোচনার আগ্রহ প্রকাশিত হওয়াটা মিঃ ডালেসের সুস্পষ্ট পরাজয় বলিয়া মার্কিণ কংগ্রেস মহলেও মন্তব্য করা হইয়াছে। সেই মিঃ ডালেস্ রুশ পররাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা সফল করিয়া তাঁহার নিজের পরাজয়কে স্থায়ী করিতে ঐকান্তিকতা দেখাইবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না। সে যাহা হউক, ইউরোপের জনমত রুশিয়ার সহিত আপোষ-আলোচনার পক্ষে। সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্য্যায়ে আলোচনার ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ সর্ব্বতোভাবে আমেরিকার নিকট নতি স্বীকার করিলেও তাঁহার পক্ষেও বৃটিশ জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। প্যারিসের বৈঠক শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পরই তিনি রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। অথচ, ইতিপূর্ব্বে রুশিয়ার পক্ষ হইতে উত্থাপিত এই ধরণের প্রস্তাব আমেরিকা যখন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন বৃটেন সে প্রত্যাখ্যান সমর্থন করিয়াছে। হঠাৎ মিঃ ম্যাক্‌মিল্যানের এই ভাববৈলক্ষণ্য আমেরিকার দারুণ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে।

এশিয়া-আফ্রিকা গণ-সম্মেলন—

ডিসেম্বর মাসের শেষে কায়রোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার চল্লিশটি দেশের একশত প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন নাই—প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন দুইটি মহাদেশের রাজনৈতিক ভাবধারায়। এই সম্মেলনে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার জন্য আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট আবেদন জানান হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের নিকট এই মর্ম্মে অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং সঞ্চিত আণবিক অস্ত্রগুলি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজ নিজ দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর যথাশক্তি চাপ দেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নিন্দা-মূলক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে: (১) সাম্রাজ্যবাদ (২) কোনও দেশের বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ; (৩) সামরিক ও রাজনৈতিক জোট; (৪) সামরিক সাহায্য দান; (৫) সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে জাতির শোষণ; (৬) সর্ত্তাধীন অর্থনৈতিক সাহায্য; (৭) বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটী স্থাপন; (৮) দক্ষিণ আফ্রিকার এবং অন্যান্য দেশের বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি। সম্মেলনে পঞ্চশীল এবং বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত দশটি নীতির প্রতি সমর্থন জানান হয়। বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত দশটি মূলনীতি এইরূপ—(১) মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি এবং জাতি-সঙ্ঘের সনদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধা; (২) সর্ব্ব জাতির সার্ব্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা; (৩) সমস্ত জাতির সমানাধিকার স্বীকৃতি; (৪) অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বিরতি; (৫) জাতি-সঙ্ঘের সনদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রত্যেক দেশের এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রতিরক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা; (৬) ক-সমষ্টিগতভাবে প্রতিরক্ষায় ব্যবস্থাকে বৃহৎ শক্তি-বৃন্দের বিশেষ স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়া; খ—একদেশ কর্ত্তৃক অন্যদেশকে চাপ না দেওয়া; (৭) কোনও দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজ্যগত অখণ্ডতা কোনরূপে লঙ্ঘন না করা; (৮) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের মীমাংসায় প্রয়াসী হওয়া; (৯) পারস্পরিক সহযোগিতার প্রসার; (১০) ন্যায় ও আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা।

কায়রোর এশিয়া আফ্রিকা সংহতি সম্মেলন ১৯৫৩ সালের বান্দুং সম্মেলনের আদর্শেই আহূত। কিন্তু সরকারী পর্য্যায়ের সম্মেলন ইহা নহে; সুতরাং, ইহার গুরুত্বও বান্দুং সম্মেলনের সমান নহে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তির দিক হইতে এই সম্মেলনের গুরুত্ব নূতন ধরণের; সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থের ধ্বজাধারী কোনও সরকারের প্রতিনিধি শুধু ভৌগোলিক অবস্থিতির অধিকারে এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নাই; কোনও প্রতিনিধির কণ্ঠ কূট-নৈতিক বাধ্যবাধকতায় সংযত হয় নাই। নব উদ্ভূত আরব জাতীয়তা-বাদ, আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-বিরোধী ও উপনিবেশিকতা-বিরোধী ভাবধারা এবং এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য এখানে অবাধে স্বাভাবিকভাবে মিলিত হইয়াছিল। ৭।১।৫৮

পূর্ব্বপরিচয়

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বম্বেতে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা কদাচিৎ কানে আসে। বাংলা ভাষা শোনবার জন্ম মন যদি আপনার উতলা হয়ে ওঠে তবে আসুন বম্বের বিখ্যাত সিনেমা "নাজে"। রবিবার সকাল দশটার "শোতে"। বাংলার যে ছবিই থাকুক না কেন, দেখবেন প্রবাসী বাঙ্গালীর ভিড়!

"নাজে" রবিবার সকাল দশটার 'শো'তে "ব্রতচারিণী" দেখতে গিয়েছিলাম। একাই গিয়েছিলাম। ইলেকট্রীক ট্রেণে করে "গ্রাণ্ট রোড" ষ্টেশনে যখন পৌছালাম, তখনই দশটা বেজে গিয়েছে। হেঁটে 'নাজে' পৌছতে আরও দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহ তখন অন্ধকার। গেটকিপারের টর্চের আলোয় অন্ত দর্শকদের বিব্রত করে নিজের সিট খুঁজে নেওয়ার বিড়ম্বনা বড় কম নয়। লজ্জাই হল একটু। যাঁদের বিরক্ত করলাম, তাঁদের কাছে মাপ চাইলাম। আমার বাংলা ভাষা শুনে তাঁরা হয়তো আমাকে ক্ষমা করলেন। অন্ধকারে হাতড়ে নিয়ে নিজের নির্দ্দিষ্ট সিটে কোন রকমে বসে পড়লাম। আমার ডাইনে বামে পিছনে দর্শকদের জনতা। আমার সিটটি এরা যেন যত্ন করে আগলে রেখেছিলেন এতক্ষণ! দেরী করার জন্ত আমার একটু কৈফিয়ৎ আছে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণটি পথে বিগড়ে না গেলে দেরী হয়তো আমার হোতো না। কিন্তু আমি নিমন্ত্রিত নই এই প্রেক্ষাগৃহে। আমার কৈফিয়ৎ শোনবার শ্রোতা তাই এখানে নেই। প্রয়োজনও নেই

"নিয়ুজ রিল" শেষ হবার পর, ছবি শুরু হয়ে গেল। তন্ময় হয়ে ছবিখানা দেখতে লাগলাম। ভাবপ্রবণ আমি, ব্রতচারিণীর কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্ট দেখে অনেক সময়ই চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। লুকিয়ে রুমাল বার করে চোখ মুছলাম। ছবি শেষে চোখ আমার ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছে। কোন'রকমে নিজেকে সংযত করে নিলাম। প্রেক্ষাগৃহের আলো জলে উঠতেই লজ্জিত হয়ে রুমালে মুখ ঢাকলাম। কিন্তু লুকোবো কা'কে? আমার পাশেই ছিল আমার পুরানো বন্ধু শ্রীশ মজুমদার। সস্ত্রীক!

শ্রীশ আমার হাত ধরে বল্‌লো—"আরে প্রশান্ত যে!"

আমি শ্রীশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—"এ কি, আপনি কাঁদছিলেন বুঝি?"

লজ্জিত হয়ে উত্তর করলেন তিনি—"কৈ না তো!" চশমাটা খুলে তিনি তাঁর ছোট্ট সিল্কের রুমালটি দিয়ে তাঁর সজল চক্ষু মুছতে লাগলেন।

শ্রীশ ঠাট্টা করে বল্‌লো—পয়সা খরচ করে কেন যে সিনেমা দেখতে এসে কাঁদো বুঝি না আমি!

বহুদিন পরে শ্রীশের সঙ্গে দেখা হল। ভিড়ের মধ্যে আলাপ হল সামান্তই। এ পরিবেশে বেশী আলাপ করা শোভনও নয়। পিছন থেকে জনতা বাইরে যেতে চাইছে আমাদের সঙ্গে নিয়ে। আলাপ করার সুযোগই বা কৈ? জনতার স্রোতে আমরাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম।···

শ্রীশ ও আমি একসঙ্গে বি-এস্, সি পড়তাম। আই-এস্, সি ও পড়েছিলাম একই কলেজে। একই ক্লাসে। শ্রীশ ছিল ধনীর সন্তান। আমি ছিলাম কৃতি। আমার অর্থ-সঙ্গতি না থাকলেও আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার কারণ আমি শ্রীশের টিউটার ছিলাম বলা যায়। পরে প্রবাসী হয়ে সে মস্ত ব্যবসাদার হয়েছিল শুনেছিলাম। তার যথাযথ প্রমাণ পেলাম তার সাজসজ্জায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে। কলিকাতার একটি কাগজের বম্বের সংবাদদাতা হয়ে আমি এখন প্রবাসী।

আমার এবং শ্রীশের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ এখন অনেক। শ্রীশের সঙ্গে প্রায় দশবছর পরে এভাবে দেখা হয়ে যাবে কোনদিন কল্পনাও করিনি।…

শ্রীশ ছাড়বে না কিছুতেই। বললে—চলো আজ তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতেই হবে। প্রায় ১টা বাজে—আমাদের ওখানেই খাওয়া সেরে নেবে। ওঃ কতদিন পরে দেখা বলো তো! কোথায় থাকো? তুমি যে বম্বেতে আছো—খবর দাওনি তো?

খবর কি করে দেবো! আমি কি ছাই জানি শ্রীশের ঠিকানা—সে যে বম্বেতে আছে তাই আমার জানা ছিল না! যাই হোক্ এত কথা না বলে বললাম—"আমি থাকি আন্ধেরীতে—সে এখান থেকে অনেক দূর। ঠিকানা বলো, সুবিধামত নিশ্চয়ই একদিন আসবো।"

—"না না, আর একদিন নয়। আজই। আমি থাকি জুহুতে, আন্ধেরী সেখান থেকে দূর পড়বে না। গাড়ী করে আমি পৌছে দিয়ে আসবো—কেমন?"

বাধ্য হয়ে রাজি হতে হলো। কৃতার্থ হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলাম!

কথা বলতে বলতে দরজার কাছে এসে গেলাম আমরা। হঠাৎ গেটকিপার এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললো—

—"কি রে চিনতে পারিস? ওঃ কতকাল পরে দেখা বলতো! আমার কিন্তু চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি। তোর ওই চোখ…

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই শ্রীশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনিও আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছেন।

থতমত খেয়ে গেটকিপারকে বলে ফেললাম—"একটু ভুল করেছেন আপনি!"

কোন রকমে দরজাটা পার হয়ে বাইরে চলে এলাম। শুনতে পেলাম গেটকিপার বলছে—"ভুল! ওঃ মাপ্ করবেন।"

শ্রীশের ঝক্‌ঝকে মস্ত বুইক্ গাড়ীখানায় আমরা উঠে বসতেই, ড্রাইভার গাড়ীর দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে গিয়ে বসলো। গাড়ী চলতে সুরু করলো।

শ্রীশ ও তাঁর স্ত্রী গেটকিপারের আশ্চর্য্য আচরণে তখনও হাসছে।

আর আমি?

আমি ভাবছি গেটকিপার কাঙ্গালীচরণের কথা। আমার গ্রামের স্কুলের এক ক্লাসের বন্ধু। একই ক্লাসে যার সঙ্গে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসে পাঠ নিয়েছি। 'ও'ই বোধ হয় অন্ধকারে আমার পথপ্রদর্শক হয়ে আমাকে আমার নির্দিষ্ট সিটে নিয়ে গিয়ে আজ বসিয়ে দিয়েছিল।

আমার আশ্চর্য্য আচরণের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না!

অস্থির নদীর মতো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

অস্থির নদীর মতো ছুঁয়ে গেল চিন্তার উপল,
এর আগে বুঝিনি তো, এ দুরন্ত তটিনীর জল,
আমার শৈবালদামে নাড়া দিয়ে ভেসে যাবে স্রোতে,
তারপর চুপি চুপি মিশে যাবে নীল সাগরেতে।

কবে যে দুর্দম তার চলা হবে শান্ত আর ধীর,
ঘন চুলে বিলি দেবে ফাল্গুনের উদাস সমীর,
তারা-জ্বলা আকাশের মুখ আঁকা হবে তার বুকে,
নিদ্রা যাবে আকাংখার স্বপ্ন-শিশু দ্বিধানম্র সুখে?

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

(১৭৭৮—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

১৭৭৮ সাল থেকে বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসে যে যুগের সূচনা, সে-যুগে বাংলা গদ্যে প্রথম সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু ঐ প্রয়াস সত্ত্বেও এই যুগে প্রকৃত সাহিত্য খুব কমই রচিত হয়েছে। ভাষায় মনোভাব প্রকাশের সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে গদ্যভাষাও এই যুগে খুব বেশি যে এগিয়ে গেছে সে-কথা অসঙ্কোচে বলা যায় না। এই যুগে বাংলাগদ্যের জগতে সংস্কৃত ও ফার্সি প্রভাব চূড়ান্তভাবে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত প্রভাবেরই জয়লাভ হয়েছিল। অতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দের প্রভাবে গদ্যভাষা কোথাও কোথাও পূর্ব যুগেরও তুলনায় পিছিয়ে পড়লেও নবপ্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এই যুগে গদ্যভাষায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার প্রবণতা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রবন্ধাদি রচনায় ভাষা পূর্ব যুগেই গঠিত হলেও সেই ভাষার প্রকৃত অনুশীলন এই যুগেই সম্ভবপর হয়; অবশ্য, তার কারণ, প্রধানত বৈদেশিক সরকারের নিজ প্রয়োজনে গদ্য রচনার কাজে উৎসাহ প্রদান এবং গৌণত মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের ফলে গদ্যলেখকদের মনে স্মৃতিশক্তি ও অনুলিপি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের রচনার প্রসার ও প্রচার বিষয়ে আস্থা লাভ। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হলেও সে-যুগে বই ছাপানো খুব সহজসাধ্য ছিল না। বৈদেশিক সরকার নিজ গরজে পণ্ডিতদের দিয়ে বই লিখিয়ে নিয়ে সেই বই না ছাপালে বাংলাভাষায় গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হতে আরও বহু দেরি হত। ঐ ভাবে ছাপানো সুরু হল দেখে গদ্যরচনায় সমর্থ অনেক লোক সরকারি সাহায্য-নিরপেক্ষ ভাবে বই ছাপানোর কাজে উৎসাহ পেয়েছিল এবং তার ফলে মুখ্যত অসাহিত্যিক আর গৌণত সাহিত্যিক গদ্যসৃষ্টির কাজ এগিয়ে চলেছিল, একথা নির্ভয়ে বলা যায়।

পরবর্তীকালে মুদ্রাযন্ত্রই বাংলা গদ্যের প্রসারলাভে প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক সরকারের আনুকূল্য তেমন কিছু ছিল না। এই যুগে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণত যতটা মনে করা হয়, তাঁদের প্রয়াস ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬) মুদ্রণের উপযোগী বাংলা হরফ প্রথম তৈরি করেন। শ্রীরামপুর-নিবাসী পঞ্চানন কর্মকার উইলকিন্সের কাছে বাংলা অক্ষর তৈরি করা শিখে নিয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রগুলির প্রয়োজনীয় অক্ষরমালা ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি করে দিতেন। কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে প্রথম 'বাংলা অক্ষর মুদ্রণের যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সব মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম মুদ্রাকর ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। কোম্পানির আর একজন ইংরেজ কর্মচারী ন্যাথানিএল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহার করলেন কয়েকটি বাংলা শব্দ দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করার জন্যে। এর পর ১৭৮৫ সালে জোনাথান ডানকান একটি আইনের বইএর অনুবাদ-কার্যে বাংলা অক্ষরে ছাপা বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহার করেন। ১৭৯১ সালে আর একটি আইনগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তার সংকলয়িতা ছিলেন নিল বেঞ্জামিন এড্‌মনষ্টোন। এই সঙ্গে ১৮০০ সালে প্রকাশিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদের অংশবিশেষের কথা ধরা যেতে পারে। তবে, সম্পূর্ণ অনুবাদটি অষ্টাদশ শতকে শেষ হয় নি। ইচ্ছা করলে রামমোহন রায়-বিরচিত একেশ্বরবাদ-সমর্থক হস্তলিখিত অমুদ্রিত বইখানির কথা বিবেচনা করা যায়। সেটি ১৭৯৮ সালে লেখা হয়েছিল। এই রচনাগুলি একসঙ্গে আলোচনা করলে উনিশ শতকের আগে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে বাংলা গদ্যভাষার অবস্থা কেমন হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়।

ঐ রচনাবলীর ভাষা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিপত্রের ভাষার মতোই দুর্বোধ্য। "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসংকলন"—এ উদ্ধৃত ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত পত্রের আগে-দেখানো ভাষার সঙ্গে ১৭৯৩ সালে রচিত ফর্ষ্টারের ভাষার বেশ মিল আছে। ফর্ষ্টারের ভাষা এই রকম :—

"এদেশে অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে। তাহারদিগ্যের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য অর্থাৎ দিন পাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য সামিগ্রতেই বর্তে এবং হিন্দু ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও

দেশাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনার নির্ধের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্ত্যের উপরেই রাখে, এমত দর্শন হইতেছে।"

এই ভাষায় বর্ণাশুদ্ধি ও যতিচিহ্নের অভাব আগের চিঠির ভাষার মতোই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের আগে ইংরেজ লেখকের গদ্য রচনাতেও উপযুক্ত বিরামচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। উপরে উদ্ধৃত রচনায় আদৌ কোন বিরামচিহ্ন ছিল না। আধুনিক পাঠকের সুবিধার জন্যে আমরা দু একটি চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছি। পূর্বোক্ত পত্রের সঙ্গে এই রচনার ভাষাগত তারতম্য দেখা যায় শব্দ উপাদানের ক্ষেত্রে। চিঠিপত্রের ভাষায় এই যুগে ফার্সির বাহুল্য সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু সমস্ত গদ্যরচনার মতোই ফর্স্টারের অনুবাদেও দেখা যায় তৎসম শব্দের আধিক্য। ভাষার বর্ণাশুদ্ধি দূর করে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসিয়ে দিলে এই ভাষা কেমন হয়, তার একটু নিদর্শন দেখানো হচ্ছে :—

"যদিস্যাৎ এমত উদ্যোগ করিলেও দৈবযোগে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু এককালীন সর্বত্রে আপদ উপস্থিত না হইলে স্থান বিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কল্যাণদর্শনে তৎকালে যে স্থানে সুন্দর শস্য জন্মে, তথাকার আমদানিতে আপদগ্রস্ত স্থানের উৎপাত মোচন হইতে পারে। অতএব, যে চাষকর্মের আধিক্যে সর্বত্রে সকল সামগ্রী যথেষ্ট জন্মিতে পারে, তাহার কুশলচেষ্টা সকল কর্মের অগ্রে সরকারের কর্তব্য হইয়াছে। এতদভীষ্ট সিদ্ধার্থে অর্থাৎ চাষক্রিয়ার আধিক্যাধীন দেশের আবাদ সে নিমিত্ত যাবন্ত উদযোগের মূল এই উদ্যোগ।"

এই ভাষা দুরান্বয়দোষে একটু দুরূহ হলেও বিদেশি অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ফার্সি শব্দ বর্জনও লক্ষণীয়।

এই ১৭৭৮-১৮১৫ যুগের বৈদেশিক-লিখিত সমগ্র রচনাবলীতে সংস্কৃত শব্দসমূহের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রাজশক্তির সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে ফার্সিকে ক্রমশ দূরীভূত করে ইংরেজিকে শাসনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নবগঠিত বৈদেশিক সরকারের নীতি। ১৭৭৩ সালে "নিয়ামক আইন" বা Regulating act প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে ইংরেজ জাতি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের নীতি দৃঢ়-ভাবে অনুসরণ করে। প্রথমে দেশজ ভাষাগুলিকে উৎসাহ দিয়ে ফার্সি প্রভাবের উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নতুন ভাষা ইংরেজির পথ সুগম করার জন্যেই ফার্সিকে অপসারণের সংকল্প নিয়ে ইংরেজ সরকার, বিদেশি খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ও পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষাবিদরা বাংলাভাষার প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত ও দেশি শব্দের ব্যবহার আরম্ভ করেন। উনিশ শতকে রচিত কেরি ও অন্যান্য ধর্মযাজকের লেখায় ফার্সির বিজাতীয় প্রভাব দূর করার ঐ ইচ্ছার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালের চিঠিপত্রের ভাষাকে কেরি ও ধর্মযাজকেরা বাংলা গদ্যের আদর্শরূপে মোটেই গ্রহণ করেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য এই পর্যন্ত সফলও হল যে; বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে পুনর্গঠিত হল, ফার্সি ভাষার প্রভাব ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হল এবং ১৮৩৫ সাল থেকে রাজদরবারের ভাষারূপে ইংরেজির প্রচলন শুরু হল। দেশীয় ভাষাসমূহের উপর অন্তত শব্দ উপাদানের দিক থেকে ফার্সির যে প্রভাব ছিল, ইংরেজির সে-প্রভাব কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং তেমন কোন প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছাও ইংরেজ বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের কোনদিন ছিল না। তবে, ইংরেজি বাক্য গঠন রীতির প্রভাব পরে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল। সে-আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন ও তার নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮০০ সালেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। বিলাত থেকে নবাগত কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে ১৮০০ সালের মে মাসে স্থাপিত এই কলেজের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন উইলিয়ম কেরি (১৭৬১—১৮৩৪)। ১৮০১ সালের মে মাসে এ কলেজের বাংলা বিভাগ খোলা হয়। ১৮০১-১৫ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের মধ্যে দুজন পণ্ডিত ও ছজন সহকারী নিয়ে কেরি সাহেব বিভিন্ন জনকে দিয়ে লিখিয়ে মোট ১৩খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত দুজন হলেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি; সহকারী ছজনের নাম, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু, কাশীনাথ ও আনন্দ চন্দ্র। কলেজের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকবর্গ এবং বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ কেরিকে সাহায্য করেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা নানা জন নানা সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম রচনার প্রকাশ-কাল সমেত পরে দেওয়া হয়। ১৮১৫ সালের পরেও ঐ কলেজের পণ্ডিতদের কারও কারও কোন কোন রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই বলা না গেলেও এই প্রসঙ্গে সেগুলিরও আলোচনা করা চলে। কারণ, যুগপ্রভাবের বিচারে সেগুলিও ১৮১৫ সনে অবসিত যুগের অন্তর্গত।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশ-কাল
(১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	... রামরাম বসু	... ১৮০১
(২) কথোপকথন	... উইলিয়ম কেরি	... ১৮০১
(৩) হিতোপদেশ	... গোলোকনাথ শর্মা	... ১৮০২
(৪) লিপিমালা	... রামরাম বসু	... ১৮০২
(৫) বত্রিশ সিংহাসন	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০২
(৬) ঈসপের গল্প	... তারিণীচরণ মিত্র	... ১৮০৩
(৭) তোতা ইতিহাস	... চণ্ডীচরণ মুন্সি	... ১৮০৫
(৮) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র	... রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৫
(৯) হিতোপদেশ	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০৮
(১০) রাজাবলি	... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... ১৮০৮
(১১) ইতিহাসমালা	... উইলিয়ম কেরি	... ১৮১২
(১২) পুরুষ পরীক্ষা	... হরপ্রসাদ রায়	... ১৮১৫

প্রয়োজন গ্রন্থ রামকিশোর তর্কালঙ্কার-প্রণীত "হিতোপদেশ"

বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই বইটির রচনাকাল ঠিকভাবে বলা শক্ত। সম্ভবত "ইতিহাসমালা" রচনার আগেই এটি লেখা হয়। আচার্য মনোমোহন ঘোষের মতে, এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়; আবার তাঁরই মতে এটি "ইতিহাসমালা"-র আগে লেখা। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, পনেরো বছরের মধ্যে তেরোখানি গদ্যপুস্তক রচনার কথা।

"পুরুষপরীক্ষা" গ্রন্থটি হরপ্রসাদ রায়ের নামে প্রচলিত বটে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামে ১৯০৪ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ঐ একই বই প্রকাশিত হয়। সে-বইটি আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তা হরপ্রসাদ রায়ের বইএর অনুরূপ। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়েরও ধারণা, বইটি মৃত্যুঞ্জয়েরই লেখা। সুতরাং বিদ্যাপতির মূল রচনা থেকে ভাষান্তরিত বাংলা "পুরুষপরীক্ষা" বইটি কার দ্বারা বাস্তবিক অনূদিত, সে নিয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে।

১৮১৭ সালে "বেদান্তচন্দ্রিকা" এবং ১৮৩৩ সালে "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত আর দুটি বই প্রকাশিত হয়। বই দুখানি ১৮১৯ সালের মধ্যেই লেখা। কারণ তিনি মারা যান ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং রচনাকালের বিচারে দুটি বইকেই আলোচ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত গ্রন্থমালার পরবর্তী প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ্যে ঐসব বইএর খুব বেশি প্রচার হয়নি। সে-যুগে তা হবার উপায়ও ছিল না। প্রথম প্রকাশ-কালে বইগুলির অতিরিক্ত উচ্চ মূল্য সাধারণের ক্রয়সামর্থ্যের অতীত ছিল। বইগুলি কেবল ইংরেজ কর্মচারীরা এবং ধনী ও শিক্ষিত বাঙালি ভদ্র সম্প্রদায় কিনে পড়বে, হয়ত সেই উদ্দেশ্যই প্রকাশকদের ছিল। অনেক পরে যখন ঐসব বই অপেক্ষাকৃত অল্প দামে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হল তখন বাংলা সাহিত্যের প্রগতি বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে; আর কোন লোকেরই ঐসব বই পড়তে ভালো লাগার কোনই কারণ অবশিষ্ট ছিল না। সেই জন্যে সাধারণ লোকদের রচনার উপর সমসাময়িক কালে এই গ্রন্থমালার তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। তখনকার ধনী ও শিক্ষিত বাঙালিরা ঐসব বই কিছু কিছু কিনেছিলেন। কার্য উপলক্ষে কিম্বা অনুসন্ধানী মনের উৎসাহের বশে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের যশোধন্য দিক্‌পালবৃন্দ ঐ বইগুলি পড়েছিলেন। তাঁদের কারো কারো রচনায় হয়ত এই গ্রন্থমালার সামান্য প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু সাধারণের লেখা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ শিক্ষিত সমাজের লেখার ভাষায় তার কোন প্রভাব নেই।

কেরি সাহেব ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা গদ্য শিক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন, শেখাবার উপকরণ গদ্যগ্রন্থের একান্ত অভাব। সেই অভাব যে কত তীব্র, তা বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, পাঠযোগ্য সমস্ত বাংলা বই দু তিন দিনে শেষ করা যায় এবং বর্ষকাল অপেক্ষা না করলে নতুন পাঠযোগ্য বই পাওয়া যায় না। একথা ১৮৭২ সালের—যখনকার তুলনায় কেরি সাহেবের সময়ের অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ ছিল।

উইলিয়ম কেরির দ্বারা যে সব বই ছাপানো হল সেগুলির সাহায্যে ভাষা শিক্ষার উপায় বা উপকরণের অভাব খানিকটা দূর হল বটে, কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার বেশি কিছু উন্নতি তাতে হল না। সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগে তাঁর মহান্ প্রয়াস দেশব্যাপী নিরুদ্যম ও অবসাদ দূর করে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি করতে পারত কিনা সন্দেহ, যদি একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রিদের সঙ্গে রামমোহনের ধর্মবিষয়ক লেখনী-যুদ্ধ শুরু না হত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থমালার সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে মহামনীষী রামমোহনের মনোযোগ বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি যুক্তিপূর্ণ সুসংবদ্ধ গদ্যে ধর্মবিষয়ক নিবন্ধ রচনা আরম্ভ করে প্রথম মৃতপ্রায় বাঙালী জাতির অন্তরে নব উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দিলেন। তার ফলে বাঙালি প্রথম নিজের গদ্যভাষার উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বই-লেখকদের মধ্যে কেরি, মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম সবচেয়ে বেশি নাম-করা। কেরির রচনাবলীর ভাষা তাঁর নিজস্ব হলে একজন বিদেশি লেখকের পক্ষে মহা গৌরবের বিষয়। কেরির বই দুখানি এমন ধরণের যে, তাদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের লেখা হতে বাধা নেই। নানা আখ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ফার্সিনবিশ মুন্সির রচনা কেরির দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়ে তাঁর নামে "কথোপকথন" ও "ইতিহাসমালা," এই দুটি বইএর আকারে প্রকাশিত হয়েছে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। অন্য প্রমাণের অভাবে আমরা অবশ্য কেরি-নামাঙ্কিত রচনাগুলির লেখক বলে একমাত্র কেরি সাহেবকেই ধরব।

কেরির রচনায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর তৎসম শব্দপ্রীতি তথা সংস্কৃত প্রভাব। অনেক সহজ ও বহু-প্রচলিত ফার্সি শব্দ ও প্রত্যয়ের জায়গায় তিনি ইচ্ছা করেই দুরূহ ও অল্পপ্রচলিত তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। দেশি শব্দের বদলে সংস্কৃত শব্দের এমনকি ভুল প্রয়োগও দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দের প্রতি এই পক্ষপাতের কারণ আগেই বলা হয়েছে। কেরির রচিত বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ। একথা খেয়াল রাখা দরকার যে, কেরি মোটেই কথ্যভাষার প্রধান সমর্থক ছিলেন না। কথ্যভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তিনি চলিত ভাষায় গদ্য রচনায় পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। তিনি কথ্যভাষাকেও তথাকথিত সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যে ধরে বেঁধে রূপ দিয়েছেন। উপভাষাসমূহের নিদর্শনগুলির প্রতি তাঁর যে বিশেষ কোন প্রীতি-পক্ষপাত ছিল, তাও নয়। বাংলাভাষা শিক্ষার পথ সুগম করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বৈদেশিক শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলাভাষার নানা নমুনা, আঞ্চলিক প্রভেদব্যঞ্জক দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপিত করেন। কেরিকে চলতি ভাষার সমর্থক বলে না ধরে—ফার্সির বিরুদ্ধে সংস্কৃতের সমর্থক ইংরেজ রাজপুরুষ বলে মনে করলেই ঠিক

হবে। কেরির উপর সংস্কৃতবিশারদ পণ্ডিতদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁর আটজন সহকর্মীর মধ্যে দুএকজন বাদে সকলেই ছিলেন সংস্কৃত-অনুরাগী। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রচনাবলীর দ্বারা এই গ্রন্থমালার ভাষার মূল ধারাটি নির্দেশ করে গেছেন। কেরির রচনার বহুলাংশ তাঁর লেখা হতে পারে। মুশ্‌কিল এই যে, কেরি প্রভৃতির রচনার সুনির্দিষ্ট ধারা বা স্বকীয়তা বলে এমন কিছু ছিল না যাকে রচনাশৈলী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেই রচনারীতির পার্থক্য বিচার করে কোন্ রচনায় কার প্রভাব কতখানি, তা অসংশয়ে আজ আর বলা যায় না। সমসাময়িককালে লেখকদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহল হয়ত এ বিষয়ে কিছু আভাস দিতে পারতেন। এখন সাধারণ অসাধারণ যে কোন পাঠকের চোখেই মৃত্যুঞ্জয়, হরপ্রসাদ ও কেরির রচনা এক ধরণের বলে মনে হবে। বিশেষত "ইতিহাসমালা" বইটির গল্পগুলি কেরি শুধু যে নানা জায়গা থেকে শুনেছিলেন তা নয়, নানা লোককে দিয়ে সেগুলি লিখিয়ে নিয়েছিলেন, এমনও মনে করা যায়, যদি পাশাপাশি "পুরুষ পরীক্ষা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকা"-র ভাষার সঙ্গে ঐ বইটির ভাষা মিলিয়ে দেখা হয়। স্পষ্টত, তিনটির ভাষা এক রকমের।

এই গ্রন্থমালার লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কতক পরিমাণে প্রতিভাবান্। মাত্র তাঁর রচনাতেই আমরা জায়গায় জায়গায় চলতি ভাষা প্রয়োগের সজীব প্রয়াস দেখতে পাই। অবশ্য তখনও কথ্যভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে নিন্দিত ছিল; মৃত্যুঞ্জয়ও দুঃসাহসী পথপ্রদর্শক ছিলেন না। সুতরাং সংলাপ বা কথাবার্তার ভাষায় ছাড়া অন্য জায়গায় তিনি সেকেলে কথ্যভাষার পূর্বাভাষ প্রদানের চেষ্টা করেননি। সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য পথিকৃৎ গদ্যস্রষ্টারা মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর রচনা এযুগের বাংলা গদ্যে প্রগতির আভাস দেয়। এই পর্বে বিবর্তনের তরঙ্গে তরঙ্গে সংস্কৃত শব্দের উপলখণ্ড বাংলা গদ্যভাষার বেলাভূমি বিপ্লবন্ধুর করে তুলেছে। তার একপ্রান্তে ১৮১৫ সালের কাছাকাছি সময়ে লেখা এই রচনাংশ পরিকীর্ণ বনান্তবীথির মতোই আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে :—

"রে রে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! স্ববংশপাংশুল রণকাতর যুদ্ধপরাঙ্মুখ নির্লজ্জ খট্টারূঢ় ব্যলীক নিঃসাহস সহিস কুড়িয়া বেটা! তোর নিমিত্তে আমারদের ভীম, মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠা, জ্যেঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাহুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহাঈ, বেহানী, শালা, শালী, ভাইজ, ভাইবহু, ভাএরাভাই, তাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাগত-প্রতিপালন-ধর্ম-প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতা-ত্যাগে অপারক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্! ছি, ছি, ধিক তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন? ওরে পোড়ামুখ, পোড়াকপালে, কুলকলঙ্ক! তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোল্লায় যা, চুলায় যা, মারুতে বাঁ-পাতে, নাতিমার্, ঝাঁটা মার্, জুতা মার্, বেত মার্, তোর জন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ!"

আলোচ্য অংশের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রচনাটির মধ্যে বহু গুরুগম্ভীর জটিল সংস্কৃত শব্দ থাকলেও মাঝে মাঝে লেখক স্বেচ্ছায় খাঁটি কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। অনবধানতাবশত এমন হয়েছে বলার উপায় নেই। ভাষা রচনার কৌশল দেখে বোঝা যায়, লেখক ইচ্ছা করেই কটূক্তির ভাষায় প্রাণসঞ্চার করার জন্যে মাঝে মাঝে কথ্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। যেখানেই সজীবতা আনার চেষ্টা করা হয়, বাংলা গদ্যে সেখানেই আপনা থেকেই মুখের ভাষা, চিন্তার ভাষা প্রশ্রয় পায়, যেখানেই চলতি ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে সেখানেই আপন হতেই একটু সরসতা এসে পড়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে-গড়া বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা করলে এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তিনি নিজে চলতিভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি তো করেন নি বরং জটিল সমাসবদ্ধ পদ যে বাংলা গদ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রুতিকটু বলেই বর্জনীয়, এই সত্যটি বহুপরীক্ষিত হলেও তাঁর নিতান্ত অজানা ছিল। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত, দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন বলে ভাষা রচনার কলাকৌশল সমস্তই আয়ত্ত করে ফেলেও, সাধারণত সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞের এক দোষ, শব্দাড়ম্বর একেবারে দূষনীয় মনে করেননি, নইলে একথা তিনি মোটেই লিখতে পারতেন না যে এমন সব বাক্যও "বৈষম্যদোষ রহিত সাম্যগুণবৎ বাক্য" :—

"কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে!"

এবং এমন সব অনুপ্রাসও বাঞ্ছনীয় :—

"কুন্দকুসুমস্তবকস্তোমসঙ্কাশ শরন্নিশাবতংস শশীতে ইন্দ্রনীলমণি-নিভলক্ষণ অলি লক্ষ্মীর সন্ধান করে!"

এই যুগটাই ছিল শব্দাড়ম্বরপ্রীতির যুগ। কথ্যভাষায় গদ্যের চকিত স্ফুরণ আমাদের মাঝে মাঝে বিস্মিত করে, এই মাত্র। তখনও ভাষাদেবীর মর্মরপ্রতিমার গঠনকার্য অসমাপ্ত, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে অনেক দেরি, তখনও জীবনশিল্পীর আবির্ভাব হয়নি। তখনকার সব পণ্ডিতের মতোই মৃত্যুঞ্জয়ও মনে করতেন যে, ভাষাসরস্বতীর চারু অঙ্গে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের জড়োয়া গয়না পরানো তাঁর সজ্জার অপরিহার্য অংশ। "প্রবোধচন্দ্রিকা"-র প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন :—

"সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা, এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্বোত্তমা সংস্কৃতভাষাবাহুল্যহেতুক।"

অর্থাৎ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মনে করতেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠির তুলনায় বাংলা ভাষা যে অনেক বেশি উন্নত, তার কারণ এই ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। আমরা আগেই দেখেছি যে, গোড়ার ও মধ্যমি সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য বাংলা ভাষাকে পাশের অঞ্চলের ভাষাগুলি থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ দিয়েছে। বাংলা ভাষার ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে মনোভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ গঠন করতে হলে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সাহায্য অপরিহার্য। অবশ্য সাবধানে শব্দ নির্বাচন করতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এই সত্যটি উপলব্ধি করে যে, সংস্কৃত ভাষার সুবিখ্যাত গৌড়ী রীতি যেমন শব্দ- ও অর্থ-অলঙ্কারবহুলতার জন্যে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সম্ভবত সেই গৌড়ী রীতির সংস্কৃত ভাষার বংশোদ্ভবা বলে গৌড়দেশীয় ভাষা বা বাংলা ভাষাও তেমনি এখনকার দিনেও সংস্কৃত শব্দবহুল এবং সেখানেই তদ্ভব ও দেশি শব্দপ্রধান অন্যান্য দেশীয় ভাষার তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য নিহিত। হিন্দি ভাষার লেখকদের তুলনায় প্রায় দেড়শো বছর আগে বাঙালি লেখক বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্ হচ্ছে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার।

মৃত্যুঞ্জয় যেমন একদিকে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আপেক্ষিক বাহুল্য ও তার যৌক্তিকতা অনুমোদন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে লিখে গেছেন :—

"সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।"

কেরিও নানা আঞ্চলিক উপভাষায় ঐ "অভিনব যুবক সাহেব জাত"-কে পারদর্শী করে তুলবার জন্যেই বিভিন্ন উপভাষায় রচিত গল্পগুলি সঙ্কলিত করেন। কোন কথ্যভাষার প্রতি কোনরকম সমর্থনের ভাব দেখানো তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণে তাঁর অধীন লেখকেরা তাঁদের রচনায় কথ্যভাষাকে বেশি আমল না দিয়ে সংস্কৃতের প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকা সর্বপ্রধান ; তাই মার্শম্যান বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :—

"The student should be occasionally interrupted in the perusal of it by words and phrases of unusual occurence,...Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language."

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় দুর্বোধ্যতা স্থানে স্থানে মার্শম্যানের মন্তব্য যে কত নির্ভুল তা প্রমাণ করে। কিন্তু ঐ ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের আসন যে রামমোহনেরও ঊর্ধ্বে সে-কথা শুনে অনেকে চমকে উঠতে পারেন বটে, তবু তা অত্যুক্তি নয়। মনীষী হিসাবে রামমোহনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন তুলনা চলতে পারে না। কিন্তু বাংলা গদ্যের মনোযোগী পাঠক একথা ঘোষণা করতে বাধ্য যে, মৃত্যুঞ্জয় গদ্য রচনায় ঢের বেশি পাকা হাতের পরিচয় দিয়ে গেছেন। গদ্য রচনায় প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করার জন্যে রামমোহনই যুগস্রষ্টা বলে বন্দিত হবার যোগ্য। কিন্তু ভালো গদ্য রচনা মৃত্যুঞ্জয়ের, রামমোহনের নয়। কাল হিসাবে তিনি রামমোহনের পূর্ববর্তী এবং রামমোহনের রচনারীতি তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিল। বস্তুত বাংলা গদ্য রচনার ক্রমবিকাশের পথে তিনি একটি সুষ্ঠু দিগ্‌দর্শন ; তাঁর রচনার ধারাই ক্রমবিবর্তিত হয়ে বিদ্যাসাগরের রীতিতে পরিণত হয়েছে। রামমোহনের প্রভাব বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর বা অক্ষয়কুমারের উপর যতটা, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব তার চেয়ে কম নয়। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা সমর্থনীয়।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীতে মুদ্রণ-শিল্পের প্রদর্শনী

শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের প্রচেষ্টায় মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষতার জন্য অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং এই উপলক্ষে একটি চমৎকার প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা আহ্বান করার ভিত্তিতে মুদ্রণ শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য কারু-শিল্পসমূহের উৎকর্ষতার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ভারত সরকার প্রথম করেন ১৯৫৫ সালে, গত ২১শে নভেম্বর তারিখের অনুষ্ঠানে এই জাতীয় কর্মোদ্যমের তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। এখনকার কালে মুদ্রণ শিল্পের মান অনেক উঁচু স্তরে এসে উপনীত হয়েছে ; ভারতবর্ষের মুদ্রণ শিল্প পৃথিবীর যে-কোন অগ্রসর দেশের বর্ণাঢ্য মুদ্রণ-পারিপাট্যের তুলনায় কোন ক্রমেই নিকৃষ্টতর নয়। আমাদের দেশে অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতির মতোই মুদ্রণ-শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছে বেশ দ্রুতগতিতে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদের দেশের মুদ্রণ-পারিপাট্যের নির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কোন মান ছিল না ; মুদ্রণের যে স্বতন্ত্র একটা সৌষ্ঠব থাকা উচিত সেই বিষয়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যেত না। তৎপূর্ব কালের মতো তখনকার কালেও কোন প্রকারে ছাপাখানা থেকে ছেপে বের করাটাই ছিল মুদ্রণের আসল উদ্দেশ্য। সেই ছাপা সাদামাটাভাবে কাজ চালানো গোছের হ'লেই হ'ত। মুদ্রণের সুষ্ঠুতা ও নিপুণতার দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হ'ত না, মুদ্রিত বিষয়বস্তুর গুণাগুণের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো। সেই সময়েও আমাদের দেশে রঙীণ মুদ্রণ, একাধিক রংয়ের মিশ্রণে বই, মাসিকপত্র বা চিত্রবহুল পত্র-পত্রিকায় মুদ্রণের রেওয়াজ চালু হয় নি। ছবির ব্লক ক'রে, হাফ-টোন ও লাইন ব্লকের উপর মুদ্রণ পদ্ধতি অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল। সেই সময়কার সচিত্র "আরব্যোপন্যাস," "লয়লা-মজনু", "পারস্যের উপকথা", প্রভৃতি বইয়ে বিচিত্র সব ছবির

মুদ্রণ, বটতলার বই, বিবাহের উপহারের বই, গোয়েন্দা কাহিনী, পঞ্জিকা, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণ, মনসা মঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি নানা গ্রন্থে লাল-নীল-হলুদ রং মিশিয়ে নানা জাতের ছবির মুদ্রণ যে স্তরে ছিল, তা এখনকার কালের তুলনায় প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের বলে মনে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ব্লক নির্মাণে হাফ্-টোন ও লাইন পদ্ধতির সহজ ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হওয়ার পরে আর সেই সঙ্গে মনোরম চিত্রকলার সরস অভিব্যক্তি কি ভাবে হতে পারে তা'তে বহু-ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় মুদ্রণ শিল্পেরও অতি দ্রুত ভোল পাল্টাতে লাগ্‌লো। এই পরিবর্তনের যুগে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কতকগুলো সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ ক'রে লংম্যান্স্-গ্রীণ এ্যাণ্ড কোং, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ম্যাক্‌মিলন কোং, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস, থ্যাকার্স স্পিঙ্ক এ্যাণ্ড কোং প্রভৃতি ইয়োরোপীয় প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মুদ্রণ-অভিজ্ঞ অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আশ্চর্য অবদান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই ধীরে ধীরে আমাদের দেশে মুদ্রণ শিল্পের একটি উঁচু মান গড়ে তোলেন, ভারতের সংবাদপত্র ও প্রকাশনা ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্টু মুদ্রণের সার্থকতা সম্পর্কে এঁরাই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতন ও উৎসাহী ক'রে তোলেন। এদিকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্যাপকভাবে বহুবিধ শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে, দেশীয় ব্যবসায় প্রসার মহানগরী থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে—আর তখন প্রচার-কার্যের প্রয়োজন খুব বেশী ক'রে অনুভূত হতে থাকে। প্রচারের সব চেয়ে কার্যকরী বাহন হ'ল বিজ্ঞাপন। সংবাদ-পত্রে ও নানা জাতের পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের প্রকাশ আর সেই সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে প্রচারের সুবিধার জন্ত সচিত্র প্রচার-পুস্তিকা, প্রসিডিং, লীফ্‌লেট, বুক্‌লেট, ক্যাটালগ, ফোল্ডার ও ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির অজস্র মুদ্রণ আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় মুদ্রণ-কার্যের সুন্দরতা, পরিচ্ছন্নতা ও সুষ্টুতার উপরে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও টাকা খাটানোর যাঁরা মালিক, তাঁরা সবাই অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়ে উঠেন। একমাত্র মুদ্রণের সৌষ্ঠবই যে বিজ্ঞাপনটিকে সাফল্যযুক্ত ক'রে তুলতে পারে, আর স্বভাবতঃই প্রচার কার্যকে সার্থক করতে পারে তা পরীক্ষিত সত্য হিসেবে সবাই মেনে নেন। কাজেই মুদ্রণ-নৈপুণ্যের জন্ত রীতিমতো একটা আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেল, মুদ্রণ-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের লোকের মনে একটা সাড়া জেগে উঠলো। তৃতীয় দশকের প্রথম থেকেই এই আন্দোলন একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ-শিল্পও অনেকটা উন্নত স্তরে এসে উপনীত হয়। ইতিমধ্যে দেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। ব্যবসাক্ষেত্রে ও কাজের ব্যাপকতা বেড়ে যায়, ফলে প্রচার কার্যের বহুমুখিতা নিশ্চিতভাবেই মুদ্রণশিল্পের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে উঠে। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন ও প্রসার হতে থাকে—আর তখন সকল শ্রেণীর পণ্যের চাহিদা নিদারুণ গতিতে বেড়ে যায়। দেশী, বিদেশী পুঁজি-পতিরা এমনিতে প্রচার কার্য করা ছাড়াও আয়কর বাবদ বরাদ্দ অর্থের বৃহৎ একটা অংশ প্রচারের জন্ত অতিরিক্তভাবে খরচ করতে থাকেন। সেই অবস্থায় বিজ্ঞাপন এজেন্সীগুলো ও অবিরাম গতিতে প্রচার কার্য চালানোর জন্ত সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থের বরাদ্দ পেতে থাকেন, ক্রমান্বয়ে তাঁদের কাজ বাড়তে থাকে আর লক্ষ লক্ষ টাকা মুদ্রণশিল্পের জন্ত ব্যয়িত হয়। এই অবস্থায় মুদ্রণ শিল্পের আদর্শ, উৎকর্ষতা ও নিপুণতার উপরে সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এইভাবে মুদ্রণ শিল্পের যে উচ্চ মান গড়ে উঠতে থাকে, আজো পর্যন্ত তার ক্রমবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রয়েছে আর তার ফলেই আমাদের দেশের মুদ্রণ শিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষতা আজ একটা গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভারত সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ডাইরক্টরেট অব্ এ্যাডভার্টাইজিং এ্যাণ্ড ভিজুয়েল পাবলিসিটি আমাদের দেশের সকল ধরণের মুদ্রণ কার্যের নিদর্শনগুলোকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকদের গোচরীভূত করার জন্ত ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার গ্রহণ করছেন। ইংরাজিতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার জন্ত স্টেট্‌সম্যান ও ট্রিবিউন এই দুটি দৈনিকই একসঙ্গে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন

আর সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎকৃষ্টতম মুদ্রণ কর্মের জন্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষতার জন্ত প্রদর্শনী ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বছরের ২১শে নভেম্বর তারিখেও অনুরূপভাবে তৃতীয়বারের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় এবং মুদ্রণের উৎকৃষ্ট সব নিদর্শনের জন্ত অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। গত দুই বারের মতো এইবারকার প্রদর্শনীতেও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার ও মুদ্রণের উৎকর্ষতা অনুযায়ী সার্টিফিকেট অব্ মেরিট—এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। মুদ্রণের বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উনিশটি পর্যায়ের সব চেয়ে সেরা কাজের জন্ত এইবারে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সেই উনিশটি পর্যায় হ'ল, দশ বছরের কম বয়স্কদের জন্ত মুদ্রিত বই, দশ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্ত মুদ্রিত বই, চিত্রবহুল পুস্তক-পুস্তিকা, চারুকলা বিষয়ক পুস্তক, ইংরেজী ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা ও ভারতীয় ভাষাসমূহে পুস্তক প্রকাশনা, ভারতে প্রস্তুত কাগজে মুদ্রিত বই, ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত দৈনিক সংবাদপত্র ও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত দৈনিক সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপনের প্রকাশভঙ্গী, চারুকলা বিষয়ক সাময়িকপত্র, প্রতিষ্ঠান-মুখপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পোষ্টার, অফসেট ফোল্ডার ও লেটার-প্রেস ফোল্ডার, অফসেট ক্যালেণ্ডার ও লেটারপ্রেস ক্যালেণ্ডার, দিনপঞ্জী, দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত, প্রচার-পুস্তিকা, লেবেলও সব চেয়ে সুষ্ঠু পন্থায় বাঁধানো বই।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুদ্রণ প্রদর্শনী নিরীক্ষণ করছেন। রাষ্ট্রপতির বামপার্শ্বে প্রচার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ বি-ভি-কেশকার

এই বছরের মুদ্রণ শিল্পের প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠতম কাজের নিদর্শন ও নক্শা প্রণয়নের জন্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম খোদিত একটি মূল্যবান্ "তাম্রপত্র" বা অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। মুদ্রণের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনের জন্ত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট অব্ মেরিট সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও উক্ত কাজের উদ্যোগকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশককে এবং উক্ত কাজের নক্শা অঙ্কনকারী শিল্পী ষ্টুডিয়ো বা বিজ্ঞাপন এজেন্সীকেও দেওয়া হয়। বিগত দুই বছরের অনুষ্ঠানে যে যে পর্যায়ের কাজের জন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সেই সব পর্যায়ের কাজ ছাড়াও এইবারে একটি নতুন বিষয়ের জন্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বিষয়টি হ'ল বিজ্ঞাপনের প্রকাশভঙ্গী অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের লে-আউট। গত দুইবারের তুলনায় এইবারেই সব চেয়ে বেশীসংখ্যক প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ শিল্পের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে এইবারে সবশুদ্ধ দশ হাজার প্রতিযোগী তাদের কাজের বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন। এই প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় বড় শহরের প্রকাশক, মুদ্রাকর, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপন এজেন্সী, বাণিজ্যিক কলাকার সংস্থা, আর্ট ষ্টুডিয়ো, দেবনাগরী হরফ প্রতিষ্ঠান, বই বাঁধাইয়ের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগ।

ভারতের সকল অঞ্চল থেকে যে প্রায় দশ হাজার প্রতিযোগী তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের নমুনা পাঠিয়েছিলেন, পুরস্কার দেওয়ার জন্ত তা থেকে সেরা কাজগুলো নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি নির্বাচক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিঃ অর্মান এলিস, শ্রী এন, বি, চোপরা, মিঃ পোথেন ফিলিপ ও দিল্লী পলিটেকনিকের শ্রী বি, সি, সান্যাল ; ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রী বি, এন, কৃপালের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটি ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর, এই দুই দিন ধরে সমস্ত ধরণের মুদ্রণ নিদর্শনগুলো নিপুণভাবে পরীক্ষা করেন—আর পুরস্কার দেওয়ার জন্ত চূড়ান্ত নির্বাচনও তাঁরাই করেন।

এবারকার মুদ্রণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে পুস্তক প্রকাশনা, সংবাদপত্র ও মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে

তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ক্রমপরিবর্ধনশীল এই মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আন্তরিক অনুরাগ তাঁর ভাষণে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে ; তিনি বলেন, "মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য প্রচার ও তথ্য দপ্তর যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য আমি উক্ত মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই ধরণের আয়োজন মুদ্রণ ও আনুসঙ্গিক কলার উন্নতি বিধানের জন্য প্রেরণার সৃষ্টি করবে।
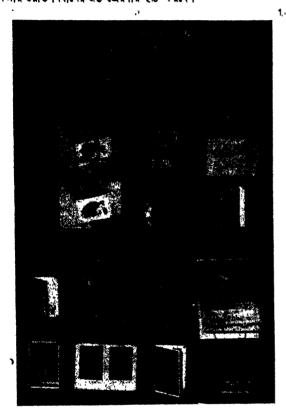
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুদ্রণ শিল্পের প্রদর্শনীর একাংশ

"এখনকার কালে মুদ্রণশিল্পের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তা দেখে আমার সেই অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যখন আমি পাটনা শহরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেকালে ছাপাখানার হাতে কম্পোজ করা হত, আর মুদ্রিত বিষয়বস্তু কোন রকমে বুঝতে পারলেই তা উৎকর্ষের নিদর্শন বলে বিবেচিত হত। সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তাও এত ছিল না। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র পত্রিকার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। এখনকার কালে শুধু যে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে তাই নয়, প্রকাশভঙ্গীরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মুদ্রণের জন্য অনেক নতুন ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মুদ্রণ শিল্পের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বহুবিধ বিষয়কে অবলম্বন ক'রে বর্তমান সময়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আর তাদের প্রচার সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আমাদের সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মুদ্রণ কলার উন্নয়নের উপর নির্ভর করছে। উন্নতিশীল জাতি হিসেবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা বিদূরিত করতে চাই, মুদ্রাকরদের সহযোগিতা ভিন্ন এই কাজ সমাধা করা কখনো সম্ভব নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণের জন্যই হোক, অথবা তথ্য ও জ্ঞান বিতরণের জন্য বিবিধ পত্র-পুস্তিকার প্রকাশনাই হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুদ্রণকলাকে কাজে লাগাতে হবে। তাই মুদ্রিত অক্ষরই বর্তমান সময়ে জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। প্রচার ও তথ্য দপ্তর বহু সরকারী পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ ক'রে থাকেন; তা ছাড়া এই দপ্তর নানা ভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদপত্র ও পত্রিকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মুদ্রণ শিল্পের এই প্রতিযোগিতায় বহু বিষয়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে, বিশেষ ক'রে পুস্তক প্রকাশ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ-নৈপুণ্যের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় আমি খুবই প্রীতি লাভ করেছি। গত দুই বছর ধরে মুদ্রণ শিল্পের এই জাতীয় কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গত দুই বারের তুলনায় এই বছরে অনেক বেশী প্রতিযোগী তাঁদের মুদ্রণ নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছেন ; এই বারের প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত মুদ্রণ নিদর্শনগুলোর সংখ্যা ১৯৫৫ সালের তুলনায় দ্বিগুণ এবং গত বৎসরের সংখ্যার তুলনায় দেড় গুণ। এতেই বুঝা যায় যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্ছে। দেশের সংবাদপত্রশিল্প ও মুদ্রণ শিল্পকে সরকারী প্রচেষ্টায় উন্নততর ক'রে তোলার ব্যবস্থা এই ভাবে সুরু হয়েছে। দেশীয় মুদ্রণ শিল্পের মান উন্নয়ন করার পক্ষেও এই জাতীয় উদ্যম প্রকৃতই সংগঠন মূলক পন্থা বলে বিবেচিত হবে। যদিও মুদ্রণ শিল্পে এখনো আমরা পাশ্চাত্যের ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় এবং প্রাচ্যের জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি, তবু অগ্রগতির পথে ভারতবর্ষ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, তা'তে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আমরা ঐ সব দেশের সমকক্ষ হ'য়ে উঠ্তে পারবো।"

ভাষণ শেষ করার পরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-সমূহকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন পর্যায়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজের জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁদের নাম ইতিপূর্বেই দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে আর ঐ সব নামের তালিকা দেওয়া হ'ল না।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারা*

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচডি

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের সাম্য বা বৈষম্য দেখা যায়? অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শনে একটিমাত্র চিন্তাধারা আছে এবং পাশ্চাত্য দর্শনে আর একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে তাহা নহে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উভয় দর্শনেই একাধিক চিন্তাধারা প্রবহমান এবং একটিতে যে সব চিন্তাধারা আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই অপরটিতে বিদ্যমান। তথাপি একথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান চিন্তাধারার মূলগত এবং প্রায় সর্বগত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য দর্শনেরও প্রধান এবং বহুমত চিন্তাধারার অন্যপ্রকার বিশেষ লক্ষণ আছে। এই বিশেষ লক্ষণগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারাকে এক একপ্রকার বিশিষ্টরূপ দিয়াছে। উহাদের উৎপত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতি, প্রমাণপদ্ধতি ও চরমলক্ষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

ইতর প্রাণী হইতে মানুষের মূলগত ভেদ এই যে, ইতর প্রাণীরা তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা বলিয়া একটি প্রবল পিপাসা আছে, এ পিপাসা মানুষের চিরসাথী। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসার শান্তি করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। মানুষের জ্ঞান-লাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। ইহাতে মানুষ জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

যদিও মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিতেই দার্শনিক চিন্তাধারার সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে তাহার প্রেরণা ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা-ধারার প্রেরণা প্রাচীন গ্রীকদের বিস্ময়ানুভূতি ও প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে গভীর বিস্ময়বোধ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনা নিচয়ের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য দর্শনে বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর আলোচনাও করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনের মূল ও প্রবল চিন্তাধারার মধ্যে বহির্জগৎ এবং মানুষের বাহ্য প্রকৃতি ও তাহার কল্যাণসাধনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রেরণার উৎস হইতেছে প্রাচীন আর্য ঋষিদের দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মানুষ জীবনে যে সুখ ভোগ করে তাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে সকল মানুষকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার দুঃখ অনিবার্যভাবে ভোগ করিতে হয়। অন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, জরা ও মরণের হাত হইতে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নাই। জীবনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব দেখিয়া প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে জীব ও জগতের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইলেও, তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা সকল শোক, দুঃখ ও মোহের অতীত, চির শান্তি ও আনন্দের অধিকারী। মানুষ তাহার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরাশান্তি ও আনন্দানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ভারতীয় দর্শনে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে এবং দর্শনকে আত্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও উহাতে প্রসঙ্গক্রমে জড়প্রকৃতি ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণাস্থল।

দুঃখানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ এবং জীবনে দুঃখের অনিবার্য প্রভাব স্বীকার করায় কোন কোন সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণের সম্ভাব্যতা ও অমোঘ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে মানুষ সুখদুঃখের অতীত, পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতির অবস্থাও লাভ করিতে পারেন; এবং এই

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

অবস্থা লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শন শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিত্য আনন্দানুভূতি সে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে দুঃখবাদ বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত নহে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জড়বাদী চার্বাক দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের মতে মানুষ দেহমাত্র নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বা মন মাত্রও নহে। মানুষ দেহমনবিশিষ্ট, কিন্তু তদতিরিক্ত চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যময় আত্মা এবং তাহার দেহমন জন্মমরণের অধীন হইলেও আত্মা অজর, অমর, নিত্য-শুদ্ধ ও বুদ্ধ। সেইরূপ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এক আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ও উহা হইতে উদ্ভূত; ইহা জড়প্রকৃতি হইতে যদৃচ্ছাভাবে উৎপন্ন নহে। ঐহিক ভোগবিলাস মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং অমরত্ব লাভই তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সমগ্র জীবজগৎ এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বা নৈতিক নিয়মের বশবর্ত্তী ও তাহার দ্বারা পরিচালিত। এই নৈতিক অনুশাসনের ফলেই জীবনে আমাদের সুখদুঃখ ভোগ হয় এবং একদেহ হইতে দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন জীবই চিরকাল এই জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া থাকিবে না। সকল জীবেরই চরমগতি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। আধ্যাত্মিক অনুশাসনের বশে জন্ম মৃত্যুর মধ্যদিয়াই জীবের এই চরম উৎকর্ষলাভ হইবে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাহার সহিত ধর্ম্মের নিকটতম সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ধর্ম্মের সহিত দর্শনের কোন বিরোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনেকস্থলে দর্শন ধর্মানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং ধর্মানুভূতিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ও ব্যাপক। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনেও কোন কোন স্থলে একপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু তাহা ঠিক ভারতীয় দর্শনের মত নহে এবং সেরূপ প্রবল ও ব্যাপকও নহে। বরং পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাকৃতিক (Naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়প্রকৃতিকে অথবা প্রাণ বা মন শক্তিকে মূলতত্ত্ব ধরিয়া তাহা হইতেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাখ্যা এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলিরও সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে ধর্ম্মের সহিত দর্শনের বিরোধ এবং অপরদিকে জড় বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের অবিরোধ ও ঐক্যভাব প্রায়শঃ দেখা যায়। পশ্চাত্য দর্শনের প্রগতি প্রধানতঃ বিজ্ঞানমূলক, উহা বৈজ্ঞানিক সত্যনিচয়ের আলোকে ও সাহায্যে পরিচালিত ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-সিদ্ধ না হইলে অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন না পাইলে দার্শনিক মতের কোন মূল্য থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকস্থলে দর্শনকে বিজ্ঞানের সহিত একীভূত বা একপ্রকার বিজ্ঞানে পর্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে, দর্শন বিজ্ঞানেরই একপ্রকার উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্র।

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা শব্দ ও আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইয়াছে এবং অধিকাংশস্থলে তাহারই ভিত্তিতে দর্শনশাখাগুলির প্রগতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। অবশ্য জড়বাদী চার্বাক-দর্শনে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চার্বাকমতে বেদ বা শ্রুতির কোন প্রামাণ্য নাই এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণগ্রাহ্য নহে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাখায় শ্রুতি বা আপ্তবাক্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। আস্তিক-দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেদানুগ। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ দর্শন স্বতন্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; বরং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সহিত যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও শব্দ বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার উপরই উহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী নিহিত আছে, তাহাই বৌদ্ধদর্শনের মূলগ্রন্থ এবং পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধদর্শনের শাখাগুলির মতবাদ রচনায় প্রধান উপাদান ও তাহাদের বিচারের মানদণ্ড। সেইরূপ জৈনদর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি মহাবীর ও তাঁহার পরবর্তী তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে সবিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে শ্রুতি বা আপ্তবাক্যমূলে যে সব দার্শনিক মত প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের এক একটিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায়গত দার্শনিকগণ তাহাদের মূল শাস্ত্র বা গ্রন্থগুলির ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া নিজ নিজ দর্শনশাখার প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই নিজেকে নূতন দর্শনের প্রণেতা বলেন নাই, কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দর্শনের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে ঐরূপ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে একপ্রকার নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামানুজাচার্য-কৃত শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্থাপনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে অথবা উহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মমতের কিছু প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাহার ভিত্তিতে এক-প্রকার দর্শনমত গড়িয়া উঠে, উহাকে ধর্মযাজকদের দর্শন (Patristic Philosophy) বলা হয়। কিন্তু ইহা অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়, এবং কখনও উহা সর্বজনস্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু উহাকে সব সময়েই প্রবল বাধা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিক স্বতন্ত্র—যুক্তি বলেই নিজ নিজ দার্শনিক মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতবাদের পরস্পরিক আলোচনা বা, সমালোচ-

ধার ফলে উহার প্রগতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থলে কোন দার্শনিকের মতবাদকে অবলম্বন করিয়া কোন দর্শনশাখারও উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার অনুগামী দার্শনিকদের ঐশাধীন দার্শনিক বলা হয়। কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদকে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের সম্মান দেওয়া হয় নাই, কেবল তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুকূলে যুক্তিতর্ক দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করা হইয়াছে।

দার্শনিক প্রমাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ আছে। ভারতীয় দর্শনে সাধারণ লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে একাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল জড়বাদী চার্বাক দর্শনেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনশাখার মধ্যে কোথায়ও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকে, কোথায়ও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে এবং কোথায়ও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটিকে, স্বতন্ত্র ও যথার্থ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে তাহাদের সঙ্গে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক আরও দুইটি প্রমাণ যুক্ত হইয়াছে এবং এই ছয়টিকেই অপরিহার্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন দর্শনশাখায় এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন দর্শনশাখায় বিভিন্ন প্রকারক ও বিভিন্নসংখ্যক প্রমাণের উল্লেখ থাকিলেও পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বা উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শন শাখার মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। তাহাদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ অপরোক্ষানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (intuition)। অতীন্দ্রিয় সত্তা বা পারমার্থিক সত্যের জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রামাণ বা মানুষের বিচারবুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। এজন্য আমাদিগকে যৌগিক সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে যম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রতপালন করিতে হইবে। পরে পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে অনুক্ষণ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার হইবে। এই জন্যই চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই তত্ত্বদর্শনের জন্য যোগ বা তদনুরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যোগোপদিষ্ট সাধন মার্গের নির্দেশ আছে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইহাই একমাত্র উপায়; বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের সৌকর্যার্থে এবং উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির জন্য বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপরদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে কেবল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানকেই (inductive and deductive inference) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আধুনিককালে শব্দ বা আপ্তবাক্যকেও (testimony) কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক আর একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক প্রমাণগুলির কোন স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যও পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (sense-experience and reason) উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ প্রজ্ঞাই (reason) সব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবৃত্তি (thought and reasoning) ব্যতীত অন্যপ্রকার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় নাই। অবশ্য কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনে একপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (intuition-এর) আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মনন বা বিচার বুদ্ধিরই একরূপ প্রকর্ষ বা একরূপ বৌদ্ধিক সহানুভূতি (intellectual sympathy)। উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনসম্মত তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি নহে। উহাতে চিত্তশুদ্ধি ও যোগজ প্রত্যক্ষের কোন আভাস নাই।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে যে পার্থক্য—উপসংহারে তাহার আলোচনা করা যায়। জড়বাদী চার্বাক-দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবাত্মার বা মানবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। এ দর্শনের মতে মানুষ দেহেন্দ্রিয়-মনবিশিষ্ট আত্মা। তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নশ্বর ও অল্পকাল-স্থায়ী। কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় না। পরন্তু জীবাত্মা কর্মানুসারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে এবং তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করে। আত্মার কোন দেহের সহিত সংযোগের নাম জন্ম এবং সেই দেহ-বিয়োগের নাম মৃত্যু। জীবাত্মা অজ্ঞানবশে এবং কর্মানুসারে জীবনে নানাপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করে এবং শেষে মৃত্যুরূপ মহাকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। সুখদুঃখবিজড়িত জন্ম-মরণের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতেছে অজ্ঞান-নিরোধক তত্ত্বজ্ঞান। এরূপ তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে দুঃখনিবৃত্তি বা পরম শান্তি ও আনন্দলাভ করাই জীবাত্মার মুক্তি। ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুক্তি বা মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ হইলেও ভারতীয় দর্শনে কাম, অর্থ ও ধর্মকেও পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং জীবনে সেগুলি লাভ করিবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এসব পুরুষার্থ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং উহাদের সন্ধান ও ভোগ এরূপভাবে করতে হইবে যে তাহারা মোক্ষমার্গের পরিপন্থী না হইয়া তাহারই সহায়ক হয়। অতএব ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য মানুষের মুক্তি

হইলেও উহাতে মানবজীবনের অন্যান্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অস্বীকৃত বা অবহেলিত হয় নাই।

মানবের মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া ভারতবর্ষে দর্শনের সহিত জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ দেখা যায়। জীবমাত্রেই দুঃখ পরিহার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করতে সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং অবিমিশ্র ও অপরিচ্ছিন্ন সুখ, মানুষের অধিগম্য অন্য উপায়ে লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় ও অপরিহার্য সাধন। অতএব মানুষের পক্ষে দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখলাভের চেষ্টা যেমন অপরিহার্য, তেমনি দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাও অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান মানবের মুক্তির সাধন তাহা মাত্র বৌদ্ধিক বোধ (intellectual understanding) বা যুক্তি-তর্ক-লভ্য পরোক্ষ জ্ঞান নহে। উহা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎকার। মানুষ তাহার বদ্ধাবস্থায় যেরূপ জড়জগতের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ করে, জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আবার ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন যেমন পরিচালিত হয়, সেইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। দর্শনে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়াই তাহাকে ভারতীয় সাহিত্যে "দর্শন" বলা হয়। দার্শনিক জ্ঞান শুধু বিচারের বস্তু নহে; উহা জীবনে অনুভূতির বিষয়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

পাশ্চাত্য দর্শনের চরমলক্ষ্য কিন্তু জীবাত্মার বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ নহে। ইহাতে জীবাত্মা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার জন্মমরণ নিবৃত্তিরূপ বা অন্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠেনা। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন শাখায় জীবাত্মার আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলেও তাহার দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা এবং দেহবিনাশের পর উর্দ্ধদৈহিক অস্তিত্ব ও দেহান্তর প্রাপ্তির কথা মহামতি প্লেটোর দর্শন ব্যতীত অন্যত্র স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এ জন্য এসব দর্শন শাখায় এই দেহে এবং এই জীবনে জীবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের চরম উদ্দেশ্য, দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং উহা জীবাত্মার ঐহিক কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। তারপর জীবজগৎ সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য উহা বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিতর্কলভ্য একরূপ পরোক্ষ জ্ঞান, উহাতে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের বা তাহার অপরোক্ষানুভূতির কথা বিশেষভাবে দেখা যায় না। ফলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সকলের জীবনে সম্যক্ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের জীবন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সম্যকরূপে প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে তাঁহাদের দর্শন জীব-জগতের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং অনেকপ্রকার দার্শনিক মতবাদই সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা যেন বিচারবুদ্ধি দ্বারা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়েন, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের বা সত্যের প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান নহেন। অতএব আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার মুক্তি, আর পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা মানবের ঐহিক জীবনের উন্নতি; ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক, আর পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ জীবজগতের বিচারসঙ্গত জ্ঞানপ্রদায়ক। অন্যভাবে আমরা একথাও বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য দর্শন প্রবৃত্তিমার্গের সহায়ক, আর ভারতীয় দর্শন নিবৃত্তি মার্গের নির্দেশক, পাশ্চাত্য দর্শন প্রেয়াভিমুখী, ভারতীয় দর্শন শ্রেয়াভিমুখী।

কাছাকাছি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কখন হঠাৎ এলো ছায়া।
পশ্চিম দিগন্ত ঘিরে রঙ্
সূর্য কাঁপে থর থর
নক্ষত্রের মিটি মিটি চাওয়া,
এইবারে বুঝি কাছে পাওয়া,
বুঝি কাছে ফিরে পাওয়া দু'জনাতে মিল,
তোমার চোখের তারা তাই এত নীল।
সুললিতা ছিলে নাক তুমি,
উদগ্র দেহের মাঝে কামনার রোদ—
আমারো চোখের ক্ষুধা, জঠরের জ্বালা!
ক্লান্তিহীন দিবসের যত দাবি-দাওয়া।
মেঘ নেই, নেই মেঘ-ছায়া।
অতন্দ্র নয়নে কোথা আলো ঝিল্‌মিল্?
ছিনু শুধু পাশাপাশি, ছিল নাক মিল।
তুমি-আমি একাকার
এ-ধার ও-ধার,
জনতা মিছিলে এক লাইনের সারি;
তারই মাঝে দুপুর গড়ায়।
সুললিতা, তুমি-আমি সেখানে কোথায়?
কখন হঠাৎ এল ছায়া
মধ্যাহ্নের দীপ্ত রোদ টিলের পাথায়
এখন ঝিমায়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ক্রিকেট ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৪৭০ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জে ওয়েট ১১৫, ডি ম্যাকগ্লু ১০৮, গডার্ড ৯০, এন্‌ডেন ৫০, ম্যাক্‌লীন ৫০) ও ২০১ (এন্‌ডেন ৭৭, ওয়েট ৫৯। ডেভিডসন ৩৪ রানে ৬ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৬২ (আর বেনড ১২২, ম্যাক্‌ডোনাল্ড ৭৫, সিম্পসন ৬০) ও ১৭২ (৩ উইকেটে। ম্যাক্‌কে ৬৫ নট আউট)

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডবলউ গ্রাউট দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংসে ৬টা ক্যাচ লুফে এক ইনিংসে সর্বাধিক ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রাউট এই প্রথম টেস্ট খেলছেন।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৪৯ (বার্ক ১৮৯, ম্যাকডোনাল্ড ৯৯, ম্যাককে ৬৩। টেফিল্ড ১২ রানে ৫ উইকেট)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২০৯ ও ৯৯ (বেনড ৪৯ রানে ৫, ক্লিনি ১৮ রানে ৩ উইকেট)

কেপটাউনে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৪১ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার লিন্ডসে ক্লিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংসের খেলার শেষ তিনটে উইকেট পান পর পর তিনটে বল করে।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৭ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিস ২-১ গোলে গত বছরের ডুরাণ্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে। এই জয়লাভের ফলে হায়দরাবাদ পুলিস একই বছরে রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপ জয়লাভের কৃতিত্বলাভ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বছরেও এই দুটি দল ফাইনালে খেলেছিলো।

হায়দরাবাদ পুলিস সেমি-ফাইনালের ২য় দিনের খেলার শেষ সময়ে পেনাল্টি গোলে ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডদলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল প্রথমদিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে ২য় দিনের খেলায় শেষ মুহূর্ত্তে গোল দিয়ে ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ যেন অকাল বোধন! ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-০ গোলে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত ক'রে একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ জয়ী হ'ল। এই নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৪ বার আই এফ এ শীল্ড পেল এবং ৩ বার একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল কাপ পেল।

পোলো ঃ

রতনদা পোলো ক্লাব ১৯৫৭ সালের ইণ্ডিয়ান পোলো এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

ডেভিস কাপ টেনিস ঃ

১৯৫৭ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৩ বার ডেভিস কাপ জয় লাভ করেছে। অষ্ট্রেলিয়া একক দেশ হিসাবে ১৯২৩ সাল থেকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে। ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে তারা অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। অষ্ট্রেলিয়া এ পর্য্যন্ত ১৫ বার (অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার) ডেভিস কাপ পেয়েছে। আমেরিকা ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৮ বার।

এ পর্য্যন্ত (১৯২৩-৫৭) অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকার সঙ্গে ১৬ বার খেলেছে এবং উভয় দেশই ৮ বার ক'রে জয়ী হয়েছে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ১৪ বার ডেভিস কাপ খেলা হয়েছে। বিশ্ব যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি। এই ১৪ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ। জয়ী হয়েছে আমেরিকা ৬ বার এবং অষ্ট্রেলিয়া ৭ বার। বিশ্ব লন্ টেনিস খেলায় ১৯৩৮ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা আধিপত্য বজায় রেখেছে।

১৯৫৭ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় প্রথম দিন অষ্ট্রেলিয়া ২টি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়। ২য় দিন ডাবলস খেলায় জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ জয় লাভ করে। ৩য় দিনের বাকি ২টি সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকা জয়ী হয়। মোট ৫টি খেলায় ফলাফল দাঁড়ায়—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৩ এবং আমেরিকার ২।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের লীগ খেলায় বাংলা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ৩টি খেলায় বাংলা দল পুরো ২৬ পয়েন্ট পেয়েছে। পূর্ব্বাঞ্চলের লীগ প্রতিযোগিতায় ৪টি প্রদেশ যোগদান করেছিল—বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা।

বাংলা এক ইনিংস ও ৪৭ রানে আসামকে, এক ইনিংস ও ৯৯ রানে উড়িষ্যাকে এবং এক ইনিংস ও ২৬ রানে বিহারকে পরাজিত করে।

পূর্ব্বাঞ্চলের লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েন্ট
বাংলা	৩	৩	০	০	২৬
বিহার	৩	২	০	১	১৮
আসাম	৩	০	১	২	৫
উড়িষ্যা	৩	০	১	২	৩

জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ঃ

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের দলগত বিভাগ (বার্ণবেলাক ট্রফি) : বোম্বাই ফাইনালে বাংলাকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৫বার জয়ী হয়েছে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : ফাইনালে বোম্বাই ৩-১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বছর জয়ী হয়েছে।

জুনিয়ার বিভাগ (রামনুজম ট্রফি) : ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী দিল্লী ৩-২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে।

পুরুষদের সিঙ্গলস : জি, আর দিভন (বোম্বাই) ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৭ পয়েন্টে বি এস কাম্বা-টাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : আর জন (মাদ্রাজ) ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-১৫, ১৭-১৬ পয়েন্টে মীনা পারাণ্ডেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস : দীপক ঘোষ (বাংলা) ২১-১৮, ২১-১৬, ২১-১৫ পয়েন্টে জে সি ভোরাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হ'ন বোম্বাইয়ের থ্যাকার্সে এবং জি আর দিভন।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য ও জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

অন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা : উত্তর প্রদেশ ৩-০ খেলায় বাঙলাকে পরাজিত ক'রে এই প্রথম খেতাব লাভ করে।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

পি এস চাওলা (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

কুমারী মীনা সাহা (উত্তর প্রদেশ) ১১-১ ও ১১-৪ পয়েণ্টে মিসেস নীলিমা ভিক্মকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

ফাইনাল খেলার সংক্ষিত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৭ ও ১৫-৩ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী প্রেম পরাশর (বোম্বাই) ১১-৬ ও ১১-৭ পয়েণ্টে শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আর ডি ভিমরালা এবং ডি এন ডোঙ্গাডে ১০-১৫, ১৮-১৩, ১৫-১১ পয়েণ্টে পি এস চাওলা এবং এ এল দেওয়ানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বাই) কুমারী মীনা সাহা এবং কুমারী ভোসলেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী সুশীলা কাপাদিয়া এবং সি ডি দেওরাস ১৫-৭ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং ডি এন ডোঙ্গাডেকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১৫-১১, ৯-১৫ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে ডি কে খানকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস : কুমারী বাসন্তী (দিল্লী) ১২-৯ ও ১১-৮ পয়েণ্টে কুমারী সুনীলা আপ্তেকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

সাউথ—ইষ্ট এশিয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত প্রথম সাউথ-ইষ্ট এশিয়া বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ মোট ৯টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৫টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভারতবর্ষ ৩টিতে জয়লাভ করে এবং দুটিতে হেরে যায়। মোট ৯টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ভারতবর্ষ পায় ৩টি, অষ্ট্রেলিয়া ২টি, ব্রহ্মদেশ ২টি, ফিলিপাইন ১টি এবং জাপান ১টি।

ভারতবর্ষের জয়লাভ

লাইট ওয়েট বিভাগ : সুন্দর রাও পয়েণ্টে টি সুগী-মোরীকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিডল ওয়েট বিভাগ : হরি সিং প্রথম রাউণ্ডে টিনোকে (ব্রহ্মদেশ) নক্ আউট করেন।

হেভী ওয়েট বিভাগ : মাঙ্গে রাম পয়েণ্টে এস এস গুইকে (ব্রহ্মদেশ) পরাজিত করেন।

ফ্লাই ওয়েট বিভাগের ফাইনালে দেবদানম এবং লাইট মিডল ওয়েট বিভাগের ফাইনালে বি ডি' সুজা পরাজিত হ'ন।

জাতীয় লন্ টেনিস ঃ

জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : উল্ফ্ স্মিড (সুইডেন) ৬-৩, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬, ৬-৩, গেমে আর কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী জে বি সিং ৬-২, ৬-৩, গেমে কুমারী এল পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নরেশকুমার এবং শ্রীমতী কে সিং ৫-৭, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবল্উ নাইট এবং শ্রীমতী জে বি সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নরেশকুমার এবং আর কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবলউ নাইট এবং জে পিকার্ডকে পরাজিত করেন।

রাজ্য এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপস : পুরুষবিভাগ—১ম ইস্টবেঙ্গল (৪৮ পয়েণ্ট), ২য় ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৪৬ পয়েণ্ট), ৩য় সিটি এ. সি (৪০ পয়েণ্ট)।

মহিলা বিভাগ—১ম রেঞ্জার্স (৪৯ পয়েণ্ট), ২য় সিটি এ সি (৪৫ পয়েণ্ট), ৩য় ২৪ পরগণা (১২ পয়েণ্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপস : পুরুষ বিভাগ—গুলজার সিং (ইস্টার্ণ রেলওয়ে)। মহিলা বিভাগ—বারবারা এখনি (রেঞ্জার্স)।

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত, সম্পাদনা : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁর হাতে যে বিষ্ণু-অবতার নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অমর্যাদা ঘটবে না এটা আশা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ তিনি বাল্মীকি রামায়ণ নিয়ে ঘাঁটেননি। কৃত্তিবাসের কীর্তিতেই কীর্তিমান হয়েছেন এবার। এক সময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ঘরে ঘরে পড়া হ'ত। সে বই খেলো কাগজে ছাপা। দামও সস্তা। ধনী, দরিদ্র, সবার গৃহেই তার স্থান হ'ত। আজ আর সেদিন নেই। আমাদের রুচি বদলেছে। বটতলার ছাপা বইয়ে এখন আর মন ওঠে না। আমরা সৌখীন হয়ে উঠেছি। কাজেই প্রকাশকেরা যুগোপযোগী সুমুদ্রিত একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের শোভন সংস্করণ প্রকাশ করে রুচিবান পাঠকদের খুশী করেছেন। হরেকৃষ্ণবাবু গ্রন্থখানিতে কৃত্তিবাসের যথাসম্ভব-আত্ম-পরিচয় দিয়ে কবির সঙ্গে পাঠকদের অন্তরঙ্গতা স্থাপনে সাহায্য করেছেন। এই মৃগজিনানুকৃতি রঙীন প্রচ্ছদপটে আচ্ছাদিত রামায়ণখানি প্রথম দর্শনেই সকলকে মুগ্ধ করে। উপরন্তু ভাষাচার্য পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থে বিদগ্ধজনোচিত সুদীর্ঘ ভূমিকায় ভারত ও বৃহত্তর ভারতে রামায়ণের বিভিন্ন রূপ ও তার প্রভাব নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেটিও এর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। রামায়ণ-প্রবেশের সোনার চাবীটি তুলে দিয়েছেন তিনি আমাদের হাতে। বইখানিতে এক বর্ণ ও বহুবর্ণ মিলিয়ে মোট তেইশখানি ছবি আছে। ছবিগুলি দক্ষশিল্পী শ্রীপূর্ণ রায়ের আঁকা। সবগুলিই সুঅঙ্কিত হয়েছে বলতে পারলে সুখী হতুম, কিন্তু তা হয়নি। প্রথম চিত্রেই মহর্ষি বাল্মীকির মধ্যে দেখা গেল দস্যু রত্নাকর ছদ্মবেশে উঁকি মারছেন। শিল্পী এই তেইশখানি ছবির মধ্যে নানা অঙ্কন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। রাজপুত, কাংড়া, অজন্তা অবনীন্দ্রনাথ এমন কি পাশ্চাত্য অঙ্কন পদ্ধতিও চোখে পড়লো। এর ফলে রামায়ণের রূপের সঙ্গতি—ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। 'কৈকেয়ীকে কুব্জার কুমন্ত্রণা' ছবিখানি চমৎকার বলা যেতে পারে। এর মধ্যে গঙ্গা যমুনার মতো বাস্তব ও কল্পনার দু'টি বিভিন্ন রূপ এসে সংমিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু আর না। চিত্র সমালোচনা করতে বসলে পুঁথি বেড়ে যাবে।

[প্রকাশনা : সাহিত্য সংসদ, ৩২এ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা ৫০৭, দক্ষিণা ৯৲ টাকা]

নরেন্দ্র দেব

কর্মবীর রাসবিহারী : অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী বসু

লেখক খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ছোট ভাই। প্রবর্তক সংঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। রাসবিহারীবাবুর জীবন—বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ভারত হইতে পলাইয়া জাপানে চলিয়া যান—সেখানে বিবাহ করেন ও সারাজীবন বাস করেন—শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে আজাদহিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহার জীবনেতিহাস জাপানের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস। বিরাট পুস্তক, সে হিসাবে মূল্য সুলভ। রাসবিহারীর বন্ধু ও সহকর্মী উত্তরপাড়ানিবাসী সম্প্রতি-স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা সত্যই মূল্যবান। বাংলা দেশে এখনও রাসবিহারী বসুর কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয় নাই—তাঁহার দান লোক জানুক এবং তাহা জানিয়া একজন মহাপ্রাণ বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক—তবেই জাতিকে প্রকৃত স্বাধীন জাতি বলিয়া লোক মনে করিবে।

[প্রকাশিকা : শ্রীমতী ইলা বসু, গোমো, মানভূম। মূল্য ৫ টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার প্রধাবন : মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও ভক্ত। তাঁর লেখাতে যে অনেক নূতন কথা, ভাববার কথা পাওয়া যাবে তা বলা বাহুল্য। "প্রধাবন" অর্থাৎ প্রগতি। মহেন্দ্রবাবু বাংলা ভাষার প্রগতি অর্থাৎ উন্নতির কথা নানা দিক দিয়া চিন্তা করিয়াছেন।

টোলে যে ভাবে পড়ান হয় মহেন্দ্রবাবুর তাহার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন। তিনি মনে করেন, টোলের ছাত্রগণের তুলনামূলক আলোচনা করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। মৌলিক গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে উদ্বোধিত করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় অনেক সময় নূতন পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিতে হয়। যদি উপযুক্ত সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ না পাওয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময় ইংরাজী শব্দ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। ইংরাজী শব্দ আত্মসাৎ করিবার মত বলিষ্ঠতা বাংলা ভাষায় আছে। বৈজ্ঞানিক ও

কারিগরী বিদ্যার ইংরাজী বহি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার বিস্তৃত কার্য্য পড়িয়া আছে। এই কার্য্যে শৃঙ্খলার জন্ত একটি অনুবাদ-সংস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলে বাংলা ব্যাকরণ প্রচলন করিবার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা আয়ত্ত করিয়া পড়িলে ব্যাকরণের প্রয়োজন সাধিত হইবে। সকল ছাত্রদের একটু সংস্কৃত জানা প্রয়োজন। নচেৎ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বাংলা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু আরও অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইবে।

গ্রন্থ-লিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সম্পাদক একটি দীপিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এইরূপ দীপিকায় গবেষণার পথ সুগম হয়। সম্পাদক মানসবাবুর প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। এইজন্ত বিতর্কমূলক বিষয় কি এবং পণ্ডিতগণের মতের বিভিন্নতার কারণ কি তাহা বুঝিতে সাধারণ পাঠকের কোনও অসুবিধা হইবে না। গবেষণাগুলি স্বীয় মতামতের দ্বারা ভারাক্রান্ত না করিয়া মানসবাবু ভালই করিয়াছেন।

প্রকাশক: শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক মহেন্দ্র পাবলিসিং কমিটি, মূল্য—২৲ টাকা ৩নং গোরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রত্নম্: জগদীশ সেন প্রণীত

স্মরণাতীত কাল থেকে মানব সমাজে রত্নধারণ প্রচলিত হয়ে আসছে। নির্ব্বাচন নির্দ্দোষ না হোলে রত্ন ধারণে বিপত্তিও ঘটে। গ্রহরত্ন ভিন্ন প্রসাধনিক ব্যাপারেও নির্ব্বাচন সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। গ্রহ কুপিত হোলে শান্তি কর্বার জন্তে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট রত্ন ধারণ করলে ফল শুভ হয় কিন্তু সে রত্ন দোষযুক্ত হোলে বা সুনির্ব্বাচিত না হোলে দৈহিক মানসিক এমন কি বৈষয়িক বিপর্য্যয় পর্য্যন্ত ঘটে থাকে শেষ পর্য্যন্ত জীবন নাশও হয়। কতকগুলি ধাতু সমষ্টি দ্বারা আমাদের জৈব দেহ গঠিত, রত্নের উপাদানও ধাতব বস্তু। এজন্তে দেহের সঙ্গে রত্নের যোগসূত্র আছে। এর রশ্মিময় বিশেষ ক্রিয়া যখন ধারণকারীর দেহে প্রবেশ করে রাসায়নিক সক্রিয়তা আনে, তখন তার দৈহিক বিকার প্রশমিত হয়। রত্নবিজ্ঞান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বহু গবেষণা হয়ে গেছে, বাংলাভাষায় দু'চারখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে নবরত্ন, উপরত্ন, রত্নধারণ-বিধি প্রভৃতি প্রসঙ্গে যেভাবে বিশদ আলোচনা আছে, তা প্রশংসার্হ। রত্ন সম্পর্কে বিলাতী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দুর্লভ নয় কিন্তু বাংলাভাষায় একান্ত দুর্লভ। গ্রন্থকার সেই অভাব দূর করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত মতবাদ গবেষণামূলকভাবে অভিব্যক্ত হওয়ায় বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রত্ন-ক্রেতা, ব্যবসায়ী ও জ্যোতিষীরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। আমরা গ্রন্থখানির প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স—৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩।০।]

উপানন্দ

আর এক দিন: আশাপূর্ণা দেবী

তেরটি গল্পের সংকলন 'আর এক দিন'। ছোট গল্প রচনায় বাঙলার লেখিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। প্রখ্যাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তার ব্যতিক্রম। ছোট গল্প রচনায় তিনি কি রকম অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে তাঁর গল্প পড়ে নি তাঁকে বোঝান দুষ্কর। নারীর অন্তর এক রহস্যঘন কুয়াশা জালে আচ্ছন্ন। তার পরিচয় কিছু প্রকাশ করেছেন লেখিকা। আদিম, অসতর্ক, আমায় ক্ষমা করো, কংকাবতীর ইতিকথা, প্রগল্‌ভা, উৎসব, পাখীর বাসা, অনাচার, এই কয়টি গল্পে নারী-হৃদয়ের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখিকা পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যই অসাধারণ। নারী মনো বিশ্লেষণে লেখিকা মোপাসার মত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ-গল্প সংকলনের বিশেষ আদর হবে আশা করি।

[প্রকাশক: কে গুপ্ত, ১১ বেলতলা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য ৩৲।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বহুরূপী: শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত (কৌতুক কাহিনী সংগ্রহ, কেবলমাত্র সাবালকদের জন্ত)

আলোচ্য গ্রন্থে চৌদ্দটি কৌতুক-কাহিনী আছে। প্রত্যেকটি কাহিনী পড়তে পড়তে শুধু মন রসালো হয়ে ওঠে না, হাস্য সংবরণ করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। কৌতুক সাহিত্য রচনায় ইতিপূর্ব্বেই গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মৌলিক রস-ব্যঞ্জনাময় কাহিনী সম্বলিত 'বহুরূপী'র ভিতর গ্রন্থকারের লিখনশৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর্বার বিষয়। এরূপ অনাবিল আনন্দের মানসিক ভোজ্য চিত্তের গ্লানি দূর করার পক্ষে সহায়ক। শুধু শিশু সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রন্থকারের প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ। তাঁর মসী অক্লান্তভাবেই চলেছে।

ছত্রকথার নায়ক শাল্মলীর ছাতা হারিয়ে গিয়ে কেমন করে রঙ-বেরঙের একখানা ঘুড়ি হাতে রয়ে গেল, সিনেমা দেখতে গিয়ে চিত্রতারকা হবার কল্পনায় বিভোর নিধিরাম ভৃত্য শেষে কেমন করে এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে একদিনের জন্তেও অতুল সম্মানের অধিকারী হোলো, গালে পানভর্ত্তি নির্ঝরিণী চৌধুরী গিন্নীর আদেশে কিভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বল্লেন পকেটকাটা সমিতিতে, পাড়ার গুলফ খুড়ো গিন্নীকে ইলিস মাছ খাওয়ানোর জন্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বাগবাজার ঘাট থেকে ফেরার পথে কিভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন, সিনেমার

...ওয়াটা কেন সর্ব্বরোগের মহৌষধি হয়েছে, এসব তথ্য গ্রন্থকার সরসভাবেই উদ্‌ঘাটন করে হাস্যরসের উৎস-বিশুষ্ক দেশে আবার অনাবিল হাস্যোচ্ছ্বল রসের উৎসকে শতধা উৎসারিত করেছেন। রসরচনার জন্যও গ্রন্থকার সর্ব্বজন সমাদৃত হয়ে থাকবেন অনাগতকালেও। উদ্ধবের উদ্বাহবন্ধন, তেজস্ক্রিয়, ভাগের মা, কাৎনা, বাজি, প্রতিবেশিনী, মনোজয়ের মর্ম্মকথা, টোপ প্রভৃতি গল্প কৌতুহলোদ্দীপক। অবকাশের অবসরে, কর্ম্মক্লান্তক্ষণে, দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের পরবর্ত্তী নিক্রিয় মুহূর্ত্তে, দাম্পত্য কলহের অবসন্নতায় দেহ ও মন যখন ভেঙে পড়ে, তখন অখিলবাবুর 'বহুরূপী' যে মৃতসঞ্জীবনী বা টনিকের কাজ করবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। নাবালক ও সাবালকদের জন্যে রচিত তাঁর বহু গ্রন্থ রসোত্তীর্ণ কাব্যও সাহিত্যের নিদর্শন বহন করছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার; শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

...রায় প্রণীত নাটক "মরা হাতী লাখ টাকা"—১৲, "মীরকাশিম—মমতাময়ী হাসপাতাল—রঘুডাকাত" (৬ষ্ঠ সং)—৩৲
...নাথ মৈত্র প্রণীত নাটক 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল" (১০ম সং)—১'৫০
আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত গল্পগ্রন্থ "পূর্ণপাত্র"—৩৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩২শ সং)—২'৫০
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত বাংলা "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ"—১৩৲,
...মোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রবীন্দ্র-স্মৃতি"—৩'৫০
...পেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "টয়লার্স অফ দি সী"—১'৫০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস ...—৩
শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত "শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত"—৪'৫০
রণজিৎকুমার সেন প্রণীত "নানা ফুলের সাজি"—৩'৫০
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য "সুখা রাজপুত্র"—১'২৫, "স্বার্থপর দৈত্য"—১'২৫
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত শিশুপাঠ্য "দুই দৈত্য"—১'২৫, "প্যাগোডার দেশে"—১'২৫, "আসামের জঙ্গলে"—১'৫০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : প্রভাতইন্দু সরকার মজুমদার

শেষ মিনতি

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

অরবিন্দ-কাব্যে প্রেম

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কিন্তু বেশীভাগ লোকের কাছেই সেই পুরুষ—সত্তম, যোগী ও দার্শনিক অরবিন্দ, কর্মী ও তাপস অরবিন্দ। এর পিছনে ও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে যে এক আদি ও অকৃত্রিম কবি-অরবিন্দও বসে আছেন সে কথা আমাদের অনেকেরই মনে থাকেনা, কারণ তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের অপূর্ব কাব্যগুলির কথা আমরা ভুলতে বসেছি এবং ইদানীং কালের মহাকাব্য "সাবিত্রী"র নাম শুনলেও এবং কিছু কিছু উল্টেপাল্টে দেখলেও সে বিষয়ে আমাদের কোন সুষ্ঠু ধারণা নেই। অনেককেই ডিক্রী ডিসমিস্ করতে দেখেছি যে "সাবিত্রী" কাব্য নয়, সাহিত্য নয়, রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি নয়, রক্তমাংস কামকামনার বাইরে শ্যামকান্তিময়ী স্বপন-মায়ার ঊর্দ্ধে এ এক ঘনীভূত দর্শননির্য্যাস, গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক মননের অতিকথন্। রূপ রস রং রেখার পূজারী, 'প্যাশন'-বিলাসী—সৌন্দর্য্যপিপাসু রসবেত্তা মানুষের পক্ষে এই ধরণের অতীন্দ্রিয়ধর্মী কাব্য দুর্বোধ্য, অনধিগম্য, দুরতিক্রমনীয়।

শ্রীঅরবিন্দের নিজের জীবনই (যেটুকু বাহিরে দেখা যায়) একটি মহাকাব্য। জন্ম হয়েছিল তাঁর [illegible]

গেছে, উৎকট ইংরাজী হাবভাব শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশে—যদিও আর এক ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারের (পূজনীয় মাতামহের) স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল তাঁর মনের উপরে। বাল্য ও কৈশোর কাটলো বিদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল মোহে, যৌবন কাটলো বরোদায় বাণীর সাধনায় অন্তরের ধ্যানের নির্দেশে। যৌবনোত্তর দিনে সেই ধ্যানের ভাষা নিবিড় হয়ে নামলো মনে, হলেন তিনি কর্মযোগী, ভাব-সমাহিত, ব্রহ্মবান্ধবের মানসসরোবরের অরবিন্দ, বজ্রের মত বহ্নিগর্ভ। কবির ভাষায় বলতে গেলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের রণক্ষেত্রে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে সংগ্রামের সংঘাত দিকে দিকে জেগে উঠেছিল। সেদিনের খর মধ্যাহ্নের তাপে তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরী নিতে হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রের ধর্মক্ষেত্রে সারথির মত রথ ছুটিয়ে যেতে হয়েছিল আলোড়িত তপ্তবাষ্প নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে জয়পরাজয়ের আবর্তে। সেদিনের বহ্নিমান যৌবনের অরবিন্দকেই প্রৌঢ়প্রহরের রবীন্দ্রনাথ 'লহ নমস্কার' বলে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন, চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন এই সেই মানুষ—যাঁর কথা লোকে বলবে যুগযুগ পরেও। তারপর নামলো আরো গভীরতর ছায়া, কারাগারে দর্শন পেলেন তিনি তাঁর, যাঁর আবির্ভাবই হয়েছিল আর এক কারাগারে। বৃহত্তম পরিণতির জন্ম তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন, গভীরতম অনুভূতির জন্ম এবং সেই পর্বই তাঁর মর্ত্য জীবনের শেষ চল্লিশ বছরের পর্ব। এই সত্যসন্ধ মানুষই কিছুদিন আগে বলেছিলেন—The agnostic was in me, the atheist was in me, the sceptic was in me···সংশয়ী মন, বিরোধী মন, অবিশ্বাসী মন আমাকে তাড়া করে, কিন্তু আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল—এই যে বেদ বেদান্ত গীতা, এই যে অপরূপ যোগ—এর মধ্যে কোথাও একটা প্রকাণ্ড সত্য আছে. তাই আমি ভগবানকে বললুম—হে আমার পরম দেবতা, যদি তুমি থাকো, আমার মনের কথা জানতেও তোমার বাকী নেই—আমি ত নিজের জন্ম কিছু চাইছি না—ধন মান পুত্র পরিজন—যশ ঐশ্বর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি—আমায় তুমি শক্তি দাও—এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার শক্তি—এদের আমি ভালবাসি, এদের মধ্যেই কাজ করতে চাই।···

এই মহাজীবনের মহাশরণের একটি দিক হচ্ছে তাঁর কাব্য। সাধারণ পাঠকপাঠিকার পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ-কাব্য বোঝার যে কয়েকটি বিশেষ বাধা আছে তার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি শারদীয়া 'সংহতিতে' সম্প্রতি প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজিজ্ঞাসার রূপ" নামক প্রবন্ধে। সেইগুলির পুনরালোচনা না করেও একথা বলা যায় যে—প্রথম বাধাই হচ্ছে যে সেগুলি ইংরাজীতে লেখা এবং সেই ক্লাসিকাল রচনাশৈলী ও বাচনভঙ্গী আজকের দিনে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে গ্রীকো-লাতিন সাহিত্যের পরিবেশ. পরিচয় ও পরিভাষা দ্বারা অরবিন্দ-সাহিত্য প্রভাবিত। সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর কাব্যের যতটুকু প্রকাশ বাইরে, তার চেয়েও গভীরতা ভিতরে। উর্দ্ধতর ভাস্বর মানসের স্তরে যে কবি আসীন, তিনি জীবন সমস্যার প্রতি যেরূপে দৃষ্টিপাত করবেন সে দৃষ্টিপাত জৈবস্তর থেকে জীবনকে যিনি দেখছেন—সে কবির মূল্যবিচারে বিভিন্ন হবেই। তাই অধিকারী ভেদে যে কবি যে স্তর থেকে এই রূপবান জগৎ ও তার ঘটনাপঞ্জীকে দেখেন, তারই মূল্য তিনি দেন তার প্রকাশে। একদিকে সংখ্যা-গণনার জীবন (Quantitative), আর একদিকে মানসলোকের অন্তরঙ্গ রূপ (Qualitative)—এরই মাঝে কবির হৃদয় মনের বীণা যন্ত্রটি গান গেয়ে যাচ্ছে—এ যন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জড়যন্ত্র নয়, প্রাণবান। এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে—একে নিয়ে প্রত্যেক কবি তাঁর দর্শন ও অনুভূতি ভেদে নিজের-জগৎ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন—সেই জগৎ স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামে না—সে এগিয়ে যায়—সে ক্ষণে ক্ষণে নূতন জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করে, নব বিশ্বামিত্রের মত নূতন ভাবস্বর্গ।

সব যুগে সব দেশে সৃষ্টির আদিমতম দিন হতে নরনারীকে ঘিরেই তার প্রাণ-জিজ্ঞাসা, কাব্য-জিজ্ঞাসার রূপে ঝঙ্কার দিয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে যিনি এক, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, তিনি বসলেন তপস্যায়—যুগযুগ ধরে কালকে অতিক্রম করে, সীমাকে লঙ্ঘন করে রূপ ও অরূপের বিরাম সমুদ্রতটে—মহাকালের সে তপস্যা; এই যে সর্বানুভূ—তাঁরও মনে একদিন ইচ্ছা জাগে আমি দুই হবো, খেলার সহচর চাই, লীলার

সঙ্গিনী চাই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর যে শক্তি কাজ করে যাচ্ছে, নিঃশব্দে অলক্ষ্যে তাঁর যে কল্পনা রূপ নিচ্ছে, ছন্দায়িত হচ্ছে, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি লীলায় বসবেন—যা ছিল অসীম তাকে মূর্তি দেবেন সীমায়—রূপ ও নামের বন্ধনে, যা ছিল মহৎ, বৃহৎ, ভূমা —তাকে তিনি একদিকে গুটিয়ে নেবেন অণুতে, আবার ছড়িয়ে দেবেন বিশ্বাতীতে। এই লীলাভিরাম এক থেকে হলো দুই, দুই থেকে হলো বহু। যা ছিল নিখিল বিশ্বের মাঝে সবিশেষ, অজাতভুবন ভ্রূণ মাঝে লুপ্ত, সকল চেতনায় সুপ্ত, তাই বিশেষ হয়ে রূপ নিলে মাতৃ-জঠরের অন্ধকারে, পিতৃবীর্য্যে সিক্ত হয়ে, কামনায় বহ্নি-স্নাত হয়ে। ভূমিস্পর্শে সেই অণুর মধ্যে জেগে উঠলো বিশেষ দরদ, স্নেহ, প্রীতি-ভালবাসা। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় দাঁড়ায়। প্রেম কাকে বলে, তার সংজ্ঞা কি, সে শুধু দেহজ এণ্ডোক্রাইনের উচ্ছ্বাস, না Imbalance, না ব্যক্তিস্বরূপের এক অভাবনীয় রহস্য, না শঙ্কর-বেদান্তে'র ভাষায় 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত' ভাব ও ভাবনার জোড়াতালি, না মানসিক বৈকল্য—সে বিচার মুলতুবী রেখে এই কথাই বলা যায় যে কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। রক্তে যখন প্রথম কোটালের বান ডাকে, কবির হৃদয়ের প্রথম তারুণ্যের বিস্ময়ে আধোচেনার আলোয় ভালোবাসার মাধুরী কাঁচাজীবনের পেলব রূপটি ধরিয়ে দেয়—তারপর প্রতিদিনের সংঘাতে সে আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তার ঘোমটা ঘুচিয়ে শক্ত ধরণীকে দেখে—তার স্বপ্ন হয়তো ছুটে যায়—অতি সৌভাগ্যবান কয়েকজন কবির কাছেই দেহের সীমানা পার হয়ে প্রেম হয়ে ওঠে প্রণাম। একেই আমরা সাধারণতঃ নামকরণ করেছি Platonic Love—অর্থাৎ প্লেটোর Eros তত্ত্ব যে প্রেমতীর্থের পরিক্রমার ছয়টি স্তরের কথা বলেছিলেন সেই বেদনাবিধুর আবেগ-মধুর স্তর পেরিয়ে যারা দেহ সৌন্দর্য্যকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতীক রূপে গণ্য করে লীন হয়ে প্রেমের দিব্য অনু-ভূতিতে পৌঁচেছেন। পরমসুধী শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের মানস-লক্ষ্মীকেও বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের যে প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার যে প্রেম, ত্রুবাদুর প্রেম প্রভৃতির সহিত তুলনা করেছেন। প্লেটোর সিম্পোসিয়ামে অবশ্য এই অতিমানুষী প্রেমকে "Union with the eternal and Supercosmic beauty" বলা হয়েছে। এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীই কীটসে পেয়েছে সমবেদনা, শেলীতে উচ্ছ্বাস, বাইরনে কামুকতা, ওয়ার্ডসওয়ার্থে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য, রবীন্দ্রনাথে স্পর্শও স্পর্শাতীতের মাঝের রূপ, অরবিন্দে রূপান্তর। তাই অরবিন্দ কাব্যে এই প্রশ্নই ওঠে—

> Many boons the new years make us
> But the old world's gifts were three
> Dove of Cypris, wine of Bacchus
> Pan's sweet pipe in Sicily
> Love, wine, song, the core of living
> Sweetest, oldest, musicalest
> If at end of forward Striving
> These life's first also proved best.

সেই সুন্দরী সুরা, আর সুর, প্রেম, মদিরা আর গান জীবনের উধ্বর্ অভ্যুদয়ে এই প্রথমগুলিই যদি শ্রেষ্ঠ হোত। তার পরের প্রশ্নই হচ্ছে—এইগুলিকে বদলে নেওয়া যায় কিনা—মায়াময়ের যাদুদণ্ড স্পর্শে রূপান্তরিত সত্তায়। Platonic Loveএ আছে না পাওয়ার বেদনা এবং সেই বেদনাকে মানসলোকে ভোগ করা। কিন্তু অরবিন্দ প্রেম-কল্পনা বেদনাবোধের উর্ধে রূপান্তরিত প্রেম।

> তুমি যে তুমিই ওগো
> সেই তব ঋণ
> আমি মোর প্রেম দিয়ে
> শুধি চিরদিন

এই ঋণ-শোধের দাবী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি প্রেমের কাব্য রচনা করে যাচ্ছেন, তাই বাস্তব জীবনে তাঁর প্রেমের কবিতা সংশয়ের দোলায় দুলছে—কখনো ঝুঁকছে অবাস্তবের দিকে—কখনো বাস্তবে। এর পরিপূর্ণ রূপ মহুয়ায়—রবীন্দ্র প্রেমের কাব্যে রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা—এই 'মায়া'কেই কবি নিবিড়-ভাবেই উপলব্ধি করেছেন—যে প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের alchemyতে বিশ্বাসী 'মূল্যহীনেরে

সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তার'—এও রূপান্তর, কিন্তু এ রূপান্তর objectএর। অরবিন্দ কাব্যে প্রেমের যে রূপান্তর সেটি object ও subject দুইএর মিলিত রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের যে পাওয়া সেটা Emotionএর পাওয়া—স্থিতধী মানসপ্রতীকে পাওয়া নয়—অর্থাৎ বিশুদ্ধীকৃত ভাব (purified emotion) সেখানে অস্পষ্ট। দাড়িম্ববনের প্রচুর পরাগে, মাধবিকার সুরভিসোহাগে, নবজীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যামাসুন্দরী জাগছেন। প্রেমের এই উন্মীলনের মাঝে উন্মুখী মর্ত্যমন চঞ্চল থেকে অচঞ্চলের দিকে ছুটেছে—এর মধ্যে রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসি আছে, বিস্ময়ের জাগরণ আছে, শুব্ধতার তপোভঙ্গ আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কাব্য-কুহেলির এক অস্পষ্টতা, পাওয়া না পাওয়ার এক বেদনা

> বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
> অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি

মাধবের জন্য মাধবীর দ্বিধা ঘুচছেনা, আমরা দেখছি

> এখানে অতিথি আসে ভয়ে ভয়ে
> ছায়ারূপে
> এসেছে কম্পিত মোর দ্বারে
> কতো রাত্রে চৈত্রমাসে
> প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
> স্পন্দিত করেছে জানি আমার গুণ্ঠনখানি
> কাঁদায়েছে সেতারের তার

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, অপরূপ কবি—নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত তাকে তিনি বাণীতে ধরছেন—তাই তার মধ্যে নৃত্যছন্দ আছে, বিচিত্র-ভঙ্গী আছে, আলোছায়া আছে, জোয়ার ভাঁটা আছে, পাওয়া না পাওয়ার দোলা আছে—প্রেমের ব্রাহ্মী-স্থিতিতে মিলন নেই। অরবিন্দের প্রজ্ঞামানসে প্রেমের যে প্রত্যয় উদ্ভাসিত সে প্রত্যয় স্থির—তিনি অসংশয়িত চিত্তে বলছেন—তুমি আছ, আমি আছি। তাঁর দৃষ্টি কবি ও সাধকের পিছনে পূর্ণযোগীর মিলিত দৃষ্টি। এখানে 'হয়তো' নেই

> বিস্মৃত প্রদোষে হয়তো দিবে সে জ্যোতি
> হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপনের মুরতি

রবীন্দ্রপ্রেম-কাব্যেও যে প্রেমের অশঙ্কিনী প্রতীতি নেই তা নয়—ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেচে তিনি নির্ভয়ের গান গাইছেন, পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসররাত্রি রচনার কল্পনা ত্যাগ করছেন—কিন্তু ভাষার অপূর্ব মাধুর্য্য ভাবের চাকচিক্যময় সম্মোহের মধ্যে কল্পনাশ্রয়ী মন একটা অবাস্তব আধার (content) খুঁজে নিচ্চে—তাকে জীবন-দেবতা বলি, বা মানসলক্ষ্মী বলি, বা গ্যয়টের ভাষায় The Eternal Faminine lead us on and upwords বলি তাতে কিছু যায় আসে না। প্রথম যুগে যখন তিনি 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' 'অচ্ছোদ সরসী-তীরে রমণী যেদিন"... এ সব কবিতা লিখলেন তখন তাঁর প্রেমকে দেহগত বলে তিরস্কৃত করা হোল, কিন্তু সে প্রেম বলিষ্ঠ, প্রকৃতির অনুগত। কিন্তু পরের যুগে এই বলিষ্ঠতা মাধুর্য্যের মধ্যে হারিয়ে গেলো। অরবিন্দ প্রেমকাব্য ভাব ও ভাষার বাহন হিসাবে অতো কারুকার্য্যময় না হলেও তার বলিষ্ঠরূপ হারায়নি—যা বলতে চেয়েছে স্পষ্ট করেই বলেছে। স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে যে রূপরেখা টানা হয়েছে সে ভেদ মূল্যায়নে ও রূপায়নে, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যবাদ দিয়ে নয়। তার মন্ত্র হচ্চে—সর্বং খলু ইদং—সব নিয়েই মানসের প্রকাশ—তার মূল্য প্রয়োগ নৈপুণ্যে, কারণ পরিপূর্ণ জীবনই যোগ—আর যোগ কর্মের কৌশল। সত্তার আবরণ হিসাবে দেহ নিন্দনীয় নয়, লজ্জার ত নয়ই। দেহের কৃত কর্তব্য কর্মগুলিও নিন্দনীয় হতে পারেনা—শুধু কর্মকে নিবেদন করে দিতে হয়, সত্তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি দিব্যের আধার এই বোধের জন্য সংযমের নিয়মের নিষ্ঠার প্রয়োজন—কিন্তু নারী নরকের দ্বার নয়, মোহের নয়, শ্রী ও হ্রীর প্রতীক্। নারী পুরুষের কাছে যা, নারীর কাছেও যে পুরুষ তাই—দুইএর মিলিত জীবনই যে প্রেমের পরিপূর্ণ মূর্তি, এখানে কামী ও কামিনী অবান্তর। তপঃপ্রেত সাধনার দ্বারা, সংযমিত মনের দ্বারা, আত্মনিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা তুমি নিজেকে বদলে নাও—তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তোমাদের মিলিত জীবনে প্রত্যেক কর্মে ভাগবত জীবনের ছন্দ প্রকাশিত হোক্, ব্যাপ্ত হোক। আর সেই মিলিত জীবনের রূপ কি হবে, তার প্রকাশ তোমার নিজের সত্তা দৃষ্টিতে, নিজের বোধিদীপ্ত জীবনের অখণ্ড অনুভূতিতে।

আমাদের দেশে বিবাহের মন্ত্রে আছে তোমার জীবন আমার হোক, আমার জীবন তোমার হোক। সুধীজনেরা তাতে যোগ দিয়েছেন—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের হোক্। অরবিন্দ প্রেমতত্ব এই সবশেষের প্রশ্ন নিয়েই আরম্ভ করলে—উভয়ের মিলিত জীবন ভগবানের —তার পরে, আমার ও তোমার—এটা হচ্চে সোহং থেকে অহং এ আসা—এবং সে আমি বড় আমি। অয়মহং ভোঃ যিনি তিনিই ভূতে ভূতে বিভক্ত—কাকে বলবো, মায়া, স্বপ্ন, মরীচিকা, মিথ্যা, মতিভ্রম। মানুষের মন সব সময়েই অনঙ্গবাণ ব্রণ খিন্ন—শুধু মুখ ফেরালেই দেখা যায় যে যিনি মদন মোহিত তিনিই মদনমোহন, যিনি সবিশেষ তিনিই অবিশেষ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্ত এই প্রেমা হইতে
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভগবতে

অরবিন্দ প্রেম-কাব্য প্রথম যুগে গতানুগতিক ভাবে দেহগত হলেও ঠিক দেহাতীত কাব্য নয়, তথাকথিত Platonic ও নয় বা রবীন্দ্রনাথের মত নাগরী, ঝামরী, পিয়ালী, দিয়ালীর রূপবর্ণনাও নয়। এ হচ্চে প্রেমের মুক্ত রূপ, দেহকে সর্বস্ব করে নয়, ছেড়ে দিয়েও নয়, রূপান্তরিত করে, যেখানে রক্ত তরঙ্গের মত্ত কলরবে বাণী ভেসে যাবে না, আবার আসল জিনিষকে আড়াল করে আসলের বিকৃত স্বপন আকাঙ্ক্ষা মেটাবে না। ললিতগীতকলিত-কল্লোলে শিবশিবানী অর্দ্ধনারীশ্বররূপে দুর্বাসার রক্ত-চক্ষুকটাক্ষকে হেসে উড়িয়া দেবেন। অরবিন্দের প্রেমের কবিতায় বৈষ্ণব কবির সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সখী কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই' পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়

এই তিলে তিলে নূতন হওয়াই রূপান্তরিত প্রেম সাধনার তাৎপর্য্য। রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা যতদিন না সত্তাকে রূপান্তরিত করে ততদিনই বিরহ। তাই অরবিন্দ-কাব্যে প্রথম যুগে প্রেমের কবিতাকে কৈশোরের শ্যামল রসে বেগ আর আবেগের মধ্যে যে ভাবে দেখি, যে রূপান্তরের বীজ তার মধ্যে সুপ্ত দেখি, পরিণত বয়সে সাবিত্রীর প্রেমে, মহামৌনের মিলন মন্দিরে তারই পরম প্রকাশ।

প্রথম যৌবনে তিনি যে প্রেমের কবিতা লিখলেন তার মধ্যে আছে Life's joy, warmth, Sensuousness—কিন্তু তিনি একদিকে যেমন স্থূল দেহবিলাসী কবি নন, তেমনি দেহাতীত অতীন্দ্রিয় আরোপও নেই; কারণ তাঁর কাছে Even the body shall remember God এবং every feeling a celestial thrill—ব্যক্তিগত কামনা নেই, ইন্দ্রিয়গত লালসা নেই, আছে সেখানে সর্বানুভূর অনুভূতি। তাঁর বিখ্যাত Songs to Myrtilla কাব্যে Night by the sea এবং Estelle কবিতা দুটি প্রথম প্রণয় পরশমুগ্ধ কবি মনের উচ্ছ্বাস।

তিনি তরুণী এডিথকে ডেকে বলছেন

Kiss me Edith……
In thy bosom's Snow while walls
Softly and Supremely housed
Shut my heart up.

তোমার ঐ তুষারধবল বক্ষে, সুন্দর কক্ষে আমার মনকে বন্দী করে রাখো।

আবার এস্তেলকে বলছেন·

why do thy lucid eyes Survey
Estelle, their sisters in the milky way
Turn hither for felicity……
My body's Earth thy vernal power
declares

কি দেখছে তোমার চোখ, ঐ আকাশের সহোদরা তারাদের যদি তোমার পুষ্পিত যৌবনকে ফুটন্ত করতে চাও এসো এইখানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে body's earth এর পিছনে

My spirit is a heaven of thousand stars

মন উর্দ্ধে উধাও। এইখানেই তার ভবিষৎ জীবনের ইঙ্গিত, কাব্য জিজ্ঞাসার রূপ—আমার হৃদয়কে তুমি নাও কিন্তু রাখবে কোথায়—close to all that life applauds. এই সময়েরই অন্য কবিতায় পড়ি

With the wind and the weather beating
round me
up to the hill and the moorland I go
Who will come with me ? who will
climb with me
Wade through the brook and tramp
through the snow.

ঝড়জলের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমি উঠছি পাহাড়ে, কে আসবে আমার সাথে, কে করবে আরোহণ

Not in the petty circle of cities
Cramped by your doors and your walls,
dwell
Over me god is blue in the welkin
Against me the wind and the storm rebel

আমি ঐ তোমাদের ছোট্ট গণ্ডীঘেরা সহরে থাকি না, আমার দুই পাশে ঝড় ও ঝঞ্ঝার প্রলয়
এ যেন কবির মনে

জাগে মহা ব্যাকুলতা
মোর সর্বব্যাপী হিয়া
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়

কে চাও বাঁচবার মত বাঁচতে—who would live largely, who would live freely—এই অনন্ত আহ্বানে কে দিবে সাড়া—তার প্রেমের কাব্যেরও এই আহ্বান—। তখনি

My soul arose at dawn

রাত্রি প্রভাতে রবিচ্ছবি উদিত—আমার আত্মারও ঘুম ভেঙেছে একটি solitary bird আমার কানের কাছে গুঞ্জন করলে, তার সুর কি।

A song not master of its note, a cry that preserved into eternity.

সে সুর অন্তলোকের সুর, সে কান্না অনন্তের কান্না। তাঁর কাছে জীবন মৃত্যু, মৃত্যু জীবন—

Life only is or death is life disguised
Life, a short death, until we are by
life surprised.

এই মর্ত্য জীবন হচ্ছে ক্ষণিক মৃত্যু—কারণ বৃহত্তম জীবনের সে দ্বার, সেই জন্যই 'Man the lover'কে God the Goal'এর স্তরে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু এইখানেই, এই দেহকে ছাড়িয়ে নয়, এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়।

কবি বলেছেন—

O Basaba Dutta
When thy heart awakes
Thou shall obey the
Sovereign heart
Nor yield allegiance
To the clean eyed
Selfish gods.

যখন তোমার চিত্ত জেগে উঠবে সে চিত্ত যেন লোভী আত্মপরায়ণ দেবতাদের ভোগে না লাগে, তোমার অন্তরের দেবতাকেই যেন মানে। প্রেমের এই যে একমুখীব্যাপকতা, অরবিন্দ প্রেমকাব্যের এও একটা বৈশিষ্ট্য।

এই যে আস্পৃহা, এই সে সমঞ্জসা রতি, এই যে গভীরতম ব্যাকুলতা yearning of the One for the One তার কাব্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে—সে কথা আমি পূর্বেই বলেছি। রুরু ও প্রিয়ম্বদার উপাখ্যানে, উর্বশীর কাহিনীতে, রাধার স্বপ্নে, সাবিত্রীর অভীপ্সায় প্রেমের এই মহতী বাণী ঝঙ্কৃত হয়েছে কবির কাব্যে। Urvasie, (উর্বশী) The Hero and the Nymph (কালিদাসের বিক্রমোর্বশী), Love and death (মৃত্যু ও প্রেম) Vasavadutta (বাসবদত্তা) প্রভৃতি কাব্য ও নাটকের বিচার পূর্বেই করেছি সেই জন্য তার বিশদ ব্যাখ্যা না করে প্রেমের কাব্য হিসাবে বলা যায় যে উর্বশী কবিতায় প্রেম প্রথমে অসার্থক হলো, বিচ্ছেদের বাধা হল দুস্তর। সে বাধা কাটিয়ে মনোময় প্রেম শেষে বিজয়ী হল। প্রেম ও মৃত্যু কবিতায় প্রেম সার্থকতার সন্ধান পাবার আগেই মৃত্যু টেনে দিলে ছেদ। নায়ক রুরুর প্রেম সে ছেদ মানেনি—সে চলে গেলো মৃত্যুর পুরীতে। পরিশেষে জীবনের অর্দ্ধ

দিয়ে সে জয়ী হলো, ফিরে পেলে তার প্রিয়াকে। শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ কালিদাসের উর্বশীকেই গ্রহণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কল্পনার সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ—সে মানুষী, সে প্রেমিকা, সে দুর্বৃত্ত হরণ করলে মূর্চ্ছা যায়, সে প্রিয়া, সে জায়া, সে জননী, সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের নেত্রী নয়, সে অপ্সরা নয় "অনপ্সরেব মে প্রতিভাসি"। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন আর এক উর্বশীকে যে বিশ্বের প্রেয়সী, যে কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়। আমি অন্যত্র বলেছি—অরবিন্দের কাছে উর্বশী সূর্য্যালোকের দীপ্তির মত, বিদ্যুতচমকের মত, অর্থাৎ যা কিছু অপূর্ব সুন্দর মনোমুগ্ধকর সে তাই। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ফেরে না—অস্তাচলবাসিনী উর্বশী। কালিদাসের ও অরবিন্দের উর্বশী ফেরে।

So was a goddess won to mortal arms
He of her beauty world desired took joy

উর্বশী পুরুরবার মিলনের কথা কবি গাঢ়ভাবে রং দিয়েই বললেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—

And all Earth's silent subime
spaces passed
Into his blood and grew a part of thought.

বিশ্বের নীরব মহিমান্বিত চেতনা তার রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেলো এবং সেই প্রেম মানসমহিমার অঙ্গ হয়ে উঠলো। এই তো রূপান্তরের কথা। রুরুও

"With his young bride Priyambada
Opened her budded heart of crimson bloom
To love to Ruru সেখানে ছিল—a happy flood of passion. রুরুকে প্রেমের অনির্বচনীয়তায় ওঠবার জন্য দাম দিতে হয়েছিল—

A sole thing the Gods demand from all men living, sacrifice.

চাহে শুধু এক বস্তু দেবগণ জীবিত মানব কাছে—আত্মদান—মৃত্যু পরাস্ত হলো—রুরুর কাছে, নচিকেতার কাছে, সাবিত্রীর কাছে। সাবিত্রীতে এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম-সাধনা অপরূপ রূপ নিলে। পঞ্চম পর্বের তৃতীয় সর্গে সাবিত্রী আর সত্যবানের মিলনে যার উদ্যোগ দেখি Epilogueএ তারই পূর্ণ প্রকাশ।

সাবিত্রী বলছেন—দেহ মোর মুক্ত হবে আত্মার সমান—মৃত্যু আর অজ্ঞানকে অতিক্রম করে।

শেষে যখন সেই অতিক্রম হলো—যখন পরম দিব্য বললেন—All that thou art, shall to my hands belong তুমি যাহা, সবই আমার—

I will pour delight from thee as from a jar
I will whirl thee as my chariot through the ways
I will use thee as my sword, as my lyre.

তুমি আমার অমিয়সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা। তুমি হবে a channel for my timeless force.

কাল সীমায় অচিহ্নিত যে শক্তি তারই ধারক সত্যবান আর সাবিত্রী—তাই "a dual power of God in an ignorant world."—যিনি নিজেকে দুইএ ভাগ করেছিলেন তারই বিকাশ—এই যুক্ত প্রেমময় জীবনে—

You shall reveal to them the hidden eternities
The truth of infinitudes not yet revealed
Some rapture of the bliss that made the world
Some rush of the force of God's Omnipetence
Some beam of the Omniscient mystery.

তোমাদের সম্মিলিত জীবনে জানাবে সেই পরম সত্য, সেই চরম ঋত, সেই অপূর্ব গান, সেই অচিন্ত্যনীয়ের সুর, কারণ

God be born into the human clay.

স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটি-মায়ের কোলে—প্রেম হচ্ছে তারই দুয়ার।

সাবিত্রীর যখন যোগনিদ্রা ভাঙলো, যখন তিনি এই পৃথিবীতেই ফিরে পেলেন সত্যবানকে—

She pressed the living body of Satyavan

এই যে অপূর্ব মিলন—দুহুঁ মিলি এক রসাভিসার তাকে কবি চিত্রিত করেছেন এইখানে—

She bore the blissful burden of his head
Between her breasts warm labour of delight
The waking gladness of her members felt
The weight of heaven in his limbs, a touch

Summing the whole felicity of things,
And all her life was conscious of his life.

তাঁর পীনোন্নত আনন্দচঞ্চল বুকের উপর প্রিয়তমের মাথার ভার এলিয়ে পড়েছে। তাঁর সত্তার সুখজাগরিত প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটি অঙ্গ ভরে মিলনোৎসুক—প্রিয়তমের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের ভার—কেবল রসনিরমাণ—একের জীবনে আর এক জীবনের যে অনুভূতি—এই মূল্যায়ন নিরূপণ এই ত বিশুদ্ধ প্রেম, এখানে কামনার তাগিদ নেই, বাসনার রিরংসা নেই, লালসার ক্লেদ নেই। কিন্তু দেহ আছে।

সত্যবান উঠলেন জেগে, নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে

When hast thou brought me Captive back,
Love chained to thee and Sun Light's wall,
O ! Golden beam and Casket of all
Sweetness, Savitri

কোথা থেকে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে সাবিত্রী, প্রেমের শিকলে বেঁধে সূর্য করোজ্জ্বল ধরিত্রীতে—আমি কি ঘুমিয়েছিলাম—মনে হচ্চে দূরে বহুদূরে, অনন্তের পথে আমি চলেছিলাম—সেই মহাশূন্যের মাঝে তুমি পিছনে পিছনে চলেছো আমার।

সাবিত্রী বললেন—Our parting was the dream. We are together. আমাদের বিচ্ছেদই স্বপ্ন—আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না—মৃত্যুর রাত্রিকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা—রূপান্তরিত হয়েছি।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলো হাতে হাত, মুখে মুখ—এই আমি আর তুমি—

Hung on each other in a silent look

তারপর সত্যবান বললে—তুমি বদলেছো

সাবিত্রী বললে—হ্যাঁ বদলেছি বটে, কিন্তু সব ঠিক আছে—

All now is Changed, Yet all is the Same
All that I was before, I am to thee still
Close comrade of thy thoughts and hopes
and toils.

আমি তোমার, তুমি আমার—এই বোধ রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমের সর্বগ্রাসীরূপে

কবি তাই বলছেন অপূর্ব ভাষায়—

I am thy Kingdom even as thou art mine
The soverign and the slave of my desire
The prone possessor, the sister of thy soul
The mother of thy wants ; thou art my world
The earth I need, the heaven my thoughts
desire
The world I inhabit and the God I adore.

সব কিছুই তুমি—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে, চিন্তায়, বেদনায় তুমিই আমার পৃথিবী, আমার স্বর্গ, আমার দেবতা।

They body is my body's counterpart
Whose every limb my answering limb
desire
Whose heart is the key to all my heart beats
This I am and thou to me.

প্রেমের এই সর্ব্বময় রূপই কবি অরবিন্দের কল্পনায় ভেসেছে—দেহ বা দেহাতীত এ প্রশ্নই নেই—রূপান্তরিত সত্তা মাধুর্য্যে সিক্ত হয়ে চলেছে অনন্তের পথে—অগ্নিরথে তারা যাত্রী

Two powers from original ecstasy born
Pace near but parted in the life of man,
One leans to earth, the other yearns to the
Skies
Heaven in its rapture dreams of perfect Earth
Earth in its Sorrow dreams of perfect
Heaven.
Receive him into boundless Savitri
Lose thy self into Infinite Satyavan.

সেই এক অনাদি আনন্দের অনন্ত হিল্লোলে জেগে উঠলো দুই। একদিকে এই মাটির পৃথিবী, আর একদিকে অনন্ত-যৌবন আকাশ, এই দুই মিলিয়ে দুই নিয়েই দ্যাবাপৃথিবী আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই দ্বৈত, এই অর্দ্ধনারীশ্বর, স্বর্গ ফিরে ফিরে চায় ধরণীর দিকে—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্ণের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে—জরা মৃত্যু বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানব চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আর সেই আলো দেখে স্বর্গের দেবতা নামবেন মাটির পথে। কোন পাহাড়ের পারে কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুয়ের হবে মিলন—তার অধীর প্রতীক্ষায় মানব মানবী দাঁড়িয়ে। শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সেই প্রেম কিশলয়েরই বারতা, আর পরিচয় দিয়ে আসছে, যে প্রেম ফুলে ফলে পল্লবে উর্দ্ধশিখ হয়ে উন্মোচিত সত্তার প্রতিটি অনুভূতিতে Inscribe the long romance of Thee and Me.

অগ্নি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। কিছু দেরী হ'য়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় ব্যাচের জন্যে অপেক্ষা করছি। বিপিনবাবু পান চিবোতে চিবোতে এসে বললেন—কি মশায়? আপনার এত দেরী হ'ল যে?

বিপিনবাবু আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবু আমাদের খুব মিল। আমার সঙ্গে সমাজনীতি, রাজনীতি আলোচনা না করলে তাঁর চলেনা।

যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ল। ভোজন শেষ করে এসে দেখি বিপিনবাবু তখনও বসে। বললাম—এখনও যান নি যে?

—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। চলুন কথা আছে।

বলে উঠে দাঁড়ালেন। দেখি বিপিনবাবুর চোখ দুটো কৌতুকে নাচছে। বুঝলাম সরস কিছু আছে।

নির্জ্জন পথ। চারদিক চাঁদের আলোয় উজ্জল। পৃথিবীর বুকে একটা স্নিগ্ধ শান্তি। আমাদেরও মন প্রফুল্ল। সরস আলাপের উপযুক্ত সময় বটে। বিপিনবাবু বললেন—আপনার কথাই ঠিক মশায়। নরেনের কাণ্ডটা প্রবোধবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেই।

—তাই নাকি? কি করে জানলেন?

—শুনলাম যে সবই আজ। ওঁদেরই পাশের বাড়ীতে থাকেন—নামটা আর করব না—তাঁর কাছেই শুনলাম যে। ওঁরা জানতেন সবই। দেখেওছেন অনেক কিছু।

—বটে? তারপর?

—তারপর আর কি? কিন্তু আপনি ধরেছিলেন কি করে বলুন দেখি? সবাই যখন বললে—মেয়ে, আপনি বল্লেন—না। কি করে জানলেন বলুন দেখি?

—ও কিছু নয়। বলে উড়িয়ে দিলাম। তারপর চুপ করে রইলাম। সত্যিই চুপ করে থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল পদস্খলন, ব্যভিচার ওসব জগতে কিছু নতুন নয়। কিন্তু এর ভেতর যেন আরো কিছু বেশী ছিল। বিশ বৎসর নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনযাপনের পর যে পতন, তাতে মনে হয়—মানে কিছু আছে। কাউকে দোষ দিতে যাবার আগে আর একবার ভাল করে ভেবে দেখা উচিত।

মনে পড়ল একটি ক্ষুদ্র পরিবারের চিত্র। স্বামী, স্ত্রী ও একটি কন্যা। কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। প্রবোধবাবু আপিসে কাজ করেন। আজ পর্য্যন্ত কখন তাঁকে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুনিনি। এত বিশ্রী স্বাস্থ্য তাঁর। সদাই ধুঁকছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য এই রকম। তাঁর গৃহলক্ষ্মীটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। একেবারে উদ্দাম প্রকৃতির। স্বাস্থ্য অটুট। রূপ ঝলসে পড়ছে। মুখে হাসি লেগেই আছে। আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়েছিল। মেয়ে নিয়ে মা স্বয়ং এসেছিলেন আমাদেব বাড়ী। মেয়ের হয়ে ওকালতীও করেছিলেন। বিয়ে হ'ল না অন্য কারণে, কিন্তু মহিলাটি রেখাপাত করেছিলেন মনের মধ্যে যথেষ্ট। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এত রূপ, এত বুদ্ধি, এত প্রাণচাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া দৈবাতের কথা। প্রবোধবাবুকে জানতাম। তখনই কেমন মনে হয়েছিল—এতদিন যে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে না—সে বোধ করি সুযোগেরই অভাবে।

একদিন এঁরই এখানে চাকরী করতে এসে উঠল আমাদের বন্ধু নরেন। নরেন ২৫।২৬ বছরের অবিবাহিত যুবক। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ চেহারা, সব বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব। যেন কঠিনতার প্রতিমূর্ত্তি। চাকরীও ভাল। উপরি-পাওনাও আছে। তারপর এক বৎসর হয়ে গেছে। নরেন আলাদা বাসা করে নি।

বিপিনবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে এই সব কথাই মনে পড়তে লাগল। আশ্চর্য্য!

বিপিনবাবু বলতে লাগলেন—এর ফল কিন্তু ভাল হবে না—দেখবেন। এও সেই অডিটারের মত হবে আর কি! সেই যে, যে ভদ্রলোক স্ত্রীকে খুন করেছিলেন। প্রবোধ-বাবু আছেন বটে চুপচাপ, কিন্তু একদিন হঠাৎ হয়ত খুনই করে ফেলবেন। কি বলেন?

—হ্যাঁ আশ্চর্য্য কি! বললাম অন্যমনস্কভাবে।

বিপিনবাবুর বাড়ী এসে পড়েছিলেন। তবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হতে লাগল। বিপিনবাবু বিশেষ উত্তেজিত। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। এতবড় একটা চমকপ্রদ সংবাদ নিঃশব্দে হজম করতে পারছিলেন না। নেশার সঙ্গীর মত এরও সঙ্গী চাই।

চোখে পড়তে লাগল তাঁর শোবার ঘর। জানলার পরদা ভেদ করে আসছে আলো আর নারীকণ্ঠের স্বর। শিশুদের কাকলি। তাঁর স্ত্রী ছেলেদের ঘুম পাড়াচ্ছেন। বিপিনবাবুর ছটি পুত্র কন্যা। সুখী পরিবার। সুখী চিত্র। বিপিনবাবু রাগ করতে পারেন বটে।

তিনি বলেই চললেন—জানেন, আমাদের আত্মীয় এক ব্যারিষ্টারের এমনিই অবস্থা হয়েছিল। শেষে ও সুই-সাইডই করলে। কে জানে হয়ত প্রবোধবাবু একদিন সুই-সাইডই করতে পারেন। কি বলেন?

—হ্যাঁ আশ্চর্য্য কি?

—আর এক মজা জানেন। সেদিন এক ভদ্রলোক আমার এখানে এসে হাজির। মেয়ের বাপ। এসেছেন পাত্রের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। পাত্র কে জানেন? নরেন-চন্দর? আমি দিলাম সব বলে। তবু তখন এতটা জানতাম না। বিয়ে গেল ভেঙ্গে। তা নয়ত কি? কিন্তু আশ্চর্য্য, শুনলাম ঠাকরুণই নাকি বিয়ে দেওয়াচ্ছিলেন। ভাবছিলেন আর কেন? সব জিনিষেরই ত শেষ আছে। কি বলেন?

—হ্যাঁ তাত বটেই।

বিপিনবাবু একটু লক্ষ্য করে দেখলেন—তারপর বললেন—কিন্তু আপনার হল কি? ফ্রয়েডও আওড়াচ্ছেন না, সাইকো-অ্যানালিসিসও—করছেন না। হল কি?

—ও কিছু নয়—তারপর?

—তারপর আর কি! যাই বলুন—প্রবোধবাবুর জন্যে ভারী দুঃখ হয় কিন্তু। অবিশ্যি অভিভাবকদের ওঁর বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল না—তবু। যে ভদ্রলোকের কাছে সব শুনলাম—তিনি বলছিলেন—তিনি নাকি প্রবোধবাবুকে একদিন খুলে জিজ্ঞেসই করেছিলেন—কি মশায়, নরেনবাবু আপনার আত্মীয়ও নন একজাতও নন, উনি কেন আপনার বাসায় থাকেন?

—তারপর?

—তারপর আর কি! শুনে প্রবোধবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি? শুনুন কথা। ওঁর শুধু ভয়, কেউ কিছু বলল কিনা। যেন আর কিছু দেখবার নেই। কি বলেন? এরকম না হলে এমন হয়? কিন্তু সে যাহোক। যেজন্যে আপনাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছি। শুনুন। কাল থেকে আমি উঠে পড়ে লাগব। ভীষণ গোলমাল করব। নরেনকে ও বাড়ী ছাড়াব, তবে ছাড়ব। এতদিন ভাল করে জানতাম না একরকম ছিল, কিন্তু এখন? এযে ব্যভিচার ছি ছি ছি। কাল থেকে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ করব। আপনাকেও করতে হবে কিন্তু।

চোখে পড়তে লাগল বিপিনবাবুর শোবার ঘর। ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়েছে। এখুনি বিপিনবাবুও গিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোবেন।

বিপিনবাবু বললেন—কি ভাবছেন মশায়? করবেন ত আপনিও গোলমাল?

—আপনি পাগল হলেন নাকি?

—কেন? পাগল কিসের? সমাজের আপনিও একজন। রয়েছেন যখন এখানেই এতদিন। সমাজেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

—না—নেই। এখন আর নেই। এখন কর্ত্তব্য শুধু চুপ করে থাকা। এ আগুনকে জ্বলে শেষ হয়ে যেতে দেওয়া।

বিপিনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। বললেন—কি জানি মশায়—কি রকম আধুনিক আপনারা। আপনাদের মতিগতি দেখছি

বোঝাই শক্ত। আচ্ছা যাওয়া যাক রাত হল—বলে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

২

পৃথিবী পূর্ব্ববৎ চলছে। প্রবোধবাবুকে একদিন ক্লাবেও দেখলাম। কে বলবে তাঁর ওপর দিয়ে কিছু বয়ে যাচ্ছে। তেমনি নির্জীব, তেমনি নিরীহ, তেমনি স্বল্পভাষী। কাকে একটা ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন—ঠিক করে দিয়েছি দাদা—আর লেট হবে না। নিন।

ভদ্রলোক খুসী হয়ে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ঘড়িটা নিলেন। প্রবোধবাবু চলে গেলে সেই ভদ্রলোকই চোখ টিপে বললেন—প্রবোধবাবু আজকাল ভারী সুন্দর ঘড়ি সারাতে পারেন—তা আপনারা জানেন কি? বলে সজোরে হেসে উঠলেন। সকলেই হেসে উঠল। রসিকতাটা সকলেই উপভোগ করল।

কি মনে হল, ক্লাব থেকে ফেরবার পথে একবার প্রবোধবাবুর বাসা না হয়ে কিছুতেই আসতে পারলাম না।

রাত প্রায় সাড়েনটা। বৈঠকখানা অন্ধকার। সমস্ত বাড়ী নিঝুম। এ পরিত্যক্ত বাড়ীতে লোক থাকে নাকি? সদর রাস্তা ছেড়ে পাশের গলিটায় এগিয়ে গেলাম। সামনেই শোবার ঘর। জানালা খোলা। ভেতর থেকে অস্ফুট কথাবার্ত্তা আসছে। ওর মধ্যে একটা স্বর প্রবোধবাবুর। আর একটা রমণীকণ্ঠ, বোঝা গেল পিতা ও কন্যার মধ্যে আলাপ হচ্ছে। কন্যা বিরক্ত হয়ে বলছে—মা এখনো এলোনা, দেখছ ত বাবা!

পিতা রাগতস্বরে বলল—অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে আজকাল। মেয়ে এসেছে দু'দিনের জন্যে, তাকে ফেলে সিনেমা দেখতে গেছেন।

সিনেমা না দেখলে কি যেন হয়—অভিমান করে বললে কন্যা।

—অসভ্য—অসভ্য হয়ে উঠেছে একেবারে।

—আর আমার বাপের বাড়ী আসা চলবে না দেখছি। এরকম হতে থাকলে কি করে আসব? আসারও ত একটা—

চলে আসছি এমন সময় সদর রাস্তায় একটা গাড়ী আসার শব্দ হল। পশ্চিমদেশের ভাড়াটে গাড়ী। গাড়ী থামলে দু'জন আরোহী ধীরে নেমে এলেন। একটু সরে দাঁড়ালাম, একজন মহিলা। অপরটি যুবক। মহিলাটি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলছেন—মেয়েটা কি করছে কে জানে! উনি হয়ত খাননি এখনও। মোটে ইচ্ছে ছিল না আমার। মিছিমিছি জোর করে—

যুবকটি কোন কথা বললে না। সে যে অত্যন্ত চিন্তিত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। মহিলাটি সন্তর্পণে দরজায় আঘাত করলেন। এক মিনিট পরে দরজা খুলে গেল। যিনি খুলে দিলেন, তিনি খুলে দিয়েই চলে গেলেন। মহিলাটি প্রবেশ করলেন। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই রইল। তার গম্ভীর ভারাক্রান্ত মুখ অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দেখা যেতে লাগল।

নিঃশব্দে চলে এলাম।

কিছুদিন পরে শোনা গেল—নরেন অন্য বাসায় উঠে গেছে। সকলেই বাঁচল। বিপিনবাবু সবচেয়ে বেশী। আমার কাছে এসে আস্ফালন করে বলতে লাগলেন—দেখলেন ত মশায়। তাড়ালাম কিনা! আপনারা শুধু মুখেই। কাজেরবেলা কিছু নন।

মরা-রূপকথা

দিলীপ দাশগুপ্ত

একটি পূর্বাশা-ভাঙা জেগে ওঠা মিঠে রূপকথা
মনে পড়ে। মনে পড়ে শুভ্রম্লান সেই ব্যাকুলতা
চটুল চপল হ'য়ে ঘাম-ছোঁয়া আকাশের ঠোঁটে
চুমু দিয়ে ঝুরঝুরি ফুল হ'য়ে চোখেমুখে ফোটে।
আহা সেই রূপকথা! আহা সেই হৃদয়চারিণী!!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিলো আজো তারে ভুলিতে পারিনি।

রাত জেগে পড়ে পড়ে ক্লান্ত হ'য়ে রবীন্দ্র-কবিতা
মরা-মন তবু একা। ঘুমভাঙা ভোরের সবিতা
আরতির প্রাক্‌লগ্নে দাগ দিয়ে গেল অকস্মাৎ।
রূপকথা মুছে গেল। শিশির বুকেতে যে আঘাত
লেগেছে তা মনে পড়ে চেয়ে দেখি ফাগুনের দিনে
যদি মেঘমুক্ত হ'য়ে আসে এই পথখানি চিনে!

মাণ্ডুক্য উপনিষদ[1]

শ্রীনলিনীকান্ত সেন

১। ওঁ, এই অক্ষর অবিনাশী, ওঁই বিশ্বভুবন, এই তার ব্যাখ্যা-ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই ওঙ্কার এবং তা ছাড়া ত্রিকালের অতীত (২) যা আছে তাও ওঙ্কার।

২। এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্ম বই নয়। এই আত্মাও ব্রহ্ম, তার চার বিভাগ।

৩। জাগ্রত চেতনায় যাঁর স্থান, বাহ্য বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ ও উনিশ দ্বার, যিনি স্থূল বিষয় অনুভব ও ভোগ করেন, সেই বিশ্বময় পুরুষ (বৈশ্বানর), প্রথম।(৩)

৪। স্বপ্ন যাঁর স্থান যিনি আন্তর বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ ও উনিশ দ্বার, যিনি সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব ও ভোগ করেন, সেই দীপ্ত মনের অধিবাসী, তৈজস পুরুষ, দ্বিতীয়।(৪)

৫। যে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলে লোকে কোন কামনা করে না বা স্বপ্ন দেখে না, সেই হল সুষুপ্তি। আর সেই সুষুপ্তিতে যাঁর স্থান, যিনি পরম একত্বে পরিণত হয়েছেন, যিনি ঘনীভূত প্রজ্ঞা, কেবলমাত্র আনন্দে যিনি গঠিত, কেবল আনন্দ যিনি আস্বাদন করেন, সজ্ঞান চিত্ত যাঁর দ্বার, সেই প্রাজ্ঞ পুরুষ, তৃতীয়।(৫)

৬। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সবার অন্তর্যামী, তিনি বিশ্বযোনি, সর্বভূতের তাঁর থেকে উদ্ভব হয়—তাঁতেই লয় হয়।

৭। যিনি আন্তর বিষয়ে অভিজ্ঞ নন বা বাহ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ নন, আন্তর-বাহ্য উভয়তঃ অভিজ্ঞও নন, যিনি ঘনীভূত প্রজ্ঞারূপী নন, যিনি প্রাজ্ঞও নন অপ্রাজ্ঞও নন, যাঁকে কেহ দেখে নি, যাঁর সঙ্গে কোন আদান প্রদান চলে না, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, যার কোন লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না, যিনি অচিন্তনীয়, যাঁর কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যাঁর স্বরূপ হল একমাত্র আত্মার অস্তিত্ববোধ, যাঁর মধ্যে সমস্ত বাহ্যপ্রপঞ্চ বিলীন হয়, যিনি শান্ত-শিব—অদ্বৈত—তাঁকেই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলে মনে করা হয়। সেই পরমাত্মা—তাঁকে জানতে হবে।

৮। সেই আত্মাই অক্ষরের মধ্যে ওঁ; মাত্রার মধ্যে—তাঁরই অংশ হল অ-উ-ম এই তিন মাত্রা, এই তিন মাত্রাই হল তাঁর অংশ।

৯। জাগরিত চেতনায় অধিষ্ঠিত বিশ্বময় পুরুষ হলেন অকার, প্রথম মাত্রা—আদিত্ব ও সর্বব্যাপিত্বের জন্য; এই বিভাগে যে তাঁকে জানে সে ব্যাপ্তি লাভ করে, তার সব কামনা পূর্ণ হয়, সে আদি, সর্ব প্রথম ও সর্ব-মূল হয়।

১০। স্বপ্নে অধিষ্ঠিত তৈজস পুরুষ উকার, দ্বিতীয় মাত্রা—উৎকর্ষ ও উভয়ত্বের জন্য, উৎকর্ষলাভ করেছে ও স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়ের কেন্দ্রস্থিত বলে; এভাবে যে তাঁকে জানে তার জ্ঞানের প্রসার উৎকর্ষলাভ করে, ও পৃথগ্-বোধ অতিক্রম করে(৬), তার কুলে কেউ জন্মে না যে ব্রহ্মবিৎ নয়।

১১। সুষুপ্তিতে অধিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ মকার তৃতীয় মাত্রা—পরিমাপ ও চরমত্বের জন্য; এভাবে যে তাঁকে জানে সে নিজেকে দিয়ে এই সব মাপে, ব্রহ্মে চরম গতিতে পরিণত হয়।(৭)

১২। মাত্রাহীন চতুর্থ (তুরীয়) সম্বন্ধাতীত, প্রাতিভাসিক জগতের নিবৃত্তি স্থান, শিব, অদ্বৈত—এই হল ওঙ্কারের স্বরূপ; যে তাঁকে এভাবে জানে সে পরমাত্মাই, আত্মার দ্বারা সে পরমাত্মাতে প্রবেশ করে।

---

(১) শ্রীঅরবিন্দের Eight Upanisads-এর অন্তর্গত ইংরাজী অবলম্বনে।

(২) ত্রিকালাতীত অর্থ অভিব্যক্তির উর্দ্ধে অবস্থিত। শ্বেতাশ্বতরে ও আছে, (৬।৫) "পরস্ত্রিকালাৎ অকলোপি দৃষ্টঃ।"

(৩) জাগ্রত অর্থে আমাদের স্বাভাবিক চেতনা। মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।৪) বিরাটের সাত অঙ্গ বলা হয়েছে—অগ্নি মূর্ধা, চন্দ্রসূর্য চক্ষুদ্বয়, দিক্‌শ্রোত্র, বিবৃতবেদ বাক্‌, বায়ু প্রাণ, বিশ্বহৃদয়, পৃথিবীপাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভিন্নভাবের বর্ণনা আছে, তার সংখ্যা হয়। শঙ্কর তাই নিয়েছেন। তবে মুণ্ডক মাণ্ডুক্য উভয়ই অথর্ববেদ অন্তর্গত, সুতরাং মুণ্ডকের সংখ্যা গ্রহণ করাই বিধেয়।

তার উনিশ মুখ বা প্রবেশের দ্বার হল দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত।

(৪) স্বপ্ন বা মগ্ন চেতনা Subliminal Consciousness, মনঃ-প্রাণময় লোকের সূক্ষ্ম চেতনা। তারই বাহ্যতম প্রকাশ হল জাগতচেতনা। তৈজস ও বিরাট পুরুষের অঙ্গ ও মুখ একই প্রকার, স্থূল-সূক্ষ্ম এইমাত্র প্রভেদ।

(৫) অতি মানস চেতনা, Super consciousness।

(৬) মূলে আছে 'সমান।' শঙ্কর অর্থ করেছেন শত্রু মিত্রে সমদর্শী। অন্যান্য টীকাকারের ব্যাখ্যাতীত, বিশ্বের সমপরিমাণ, ব্রহ্মের সমধর্মী ইত্যাদি অর্থ ও ধরেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, rises above differences—নানাত্ব সে দেখে না। তৈজস উপলব্ধির সেই কলাই ঠিক।

(৭) মি (মা) ধাতুর ইয়ত্তা ও বিনাশ দুই অর্থই নেওয়া হয়েছে। একাত্মতায় দ্বারা বিশ্বকে জানে—কারণ তার সত্তা বিশ্বপ্রসারী হয়। আবার 'অপীতি', লয়প্রাপ্তি বা ব্রহ্মে বিশ্ব-সংহরণও হয়,—অভিব্যক্ত সব বস্তুর সঙ্গে যেমন একাত্ম হয় তেমনি যে মূল সত্তা প্রত্যেকটি বস্তুতে প্রকাশিত হয় তার সঙ্গেও একাত্ম হয়।

মন্তব্য

জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি চেতনার তিন স্তর। চতুর্থ স্তর বিশ্বাতীত অব্যক্ত চেতনা। এই চারিটি হল ব্রহ্মের অংশ। এই দৃশ্যমান বিশ্ব ও ব্রহ্ম, মিথ্যা নয়। সবই উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্ববর্জন বেদান্তের শিক্ষা নয়।

বেদেও চেতনার এই তিন স্তরের উল্লেখ আছে বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপের প্রতীক দিয়ে। প্রশ্নোপনিষদ, চতুর্থ প্রশ্নে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে রূপকের ভাষায়। এখানে পাই তার সুস্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য বর্ণনা। বর্তমান মনোবিজ্ঞান তার নিজস্ব বিশ্লেষণের ফলে এ সত্য সবে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভারতীয় মনোবিদ্যাতে এ সত্য চিরদিনই জানা ছিল।

সমাধিতে এই সব সূক্ষ্মতর চেতনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ On Yoga গ্রন্থে সমাধি প্রসঙ্গে এবিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। তার সারমর্ম এখানে দেওয়া হল।

বিশ্বের ও আমাদের নিজের অতি অল্প অংশই আমরা জানি বা কাজে লাগাই। বাকিটা মগ্ন চেতনার সব স্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। অবচেতনার গভীরতম গহন থেকে অতিচেতনের তুঙ্গতম শিখর অবধি তা বিস্তৃত, আবার আমাদের ক্ষুদ্র সংজ্ঞার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে তার ব্যাপক পারিপার্শ্বিক অস্তিত্ব। তবে তার অল্পে নির্দেশই আমরা ধরতে পারি। প্রাচীন ভারতের মনস্তত্ত্বে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে চেতনাকে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন ক্ষেত্রে ভাগ করে। প্রত্যেক মানবেরই জাগ্রত-আত্মা, স্বপ্ন-আত্মা, সুষুপ্তি-আত্মা এই ত্রিবিধ সত্তা আছে। আর সবার উপরে পরম কেবল-সত্তাময় আত্মা চতুর্থ বা তুরীয়। তা থেকেই নিম্নতর ত্রিবিধ সত্তা উদ্ভূত হয়েছে জগতে আপেক্ষিক সম্বন্ধের রস গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে।

আমাদের দৈহিক জীবনের স্বাভাবিক বহিশ্চর চেতনাকে জাগ্রত বলা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুল বিশ্বকেই তা জানে, তাকে চালায় জড়ামুগ মন, জড়ের বাস্তবতাই যার কাছে সত্যের একমাত্র প্রমাণ। স্বপ্ন হল প্রাণ-মনের লোকের উপযোগী সূক্ষ্ম চেতনা। আমরা তার সন্ধান পাই বটে, কিন্তু তার অস্তিত্ব স্থুল জগতের মত দৃঢ় বাস্তব মনে হয় না। সুষুপ্ত হল অতিমানস লোকের বিজ্ঞানময় চেতনা। তা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, কেননা আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ বা কারণ দেহ এখনও যথেষ্ট পুষ্ট হয় নাই। সে লোকের স্পন্দন গ্রহণক্ষম বৃত্তি এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে বলে তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বপ্নহীন নিদ্রার মত। পরে তুরীয়, শুদ্ধ-সৎ-এর, আমাদের কেবল অস্তিত্বের চেতনা। তার সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কচিৎ কখনও স্বপ্ন বা জাগ্রত মনের উপর তার ছবি পড়ে। আর সুষুপ্তি অবস্থায় কি হয় আমরা মনে রাখতে পারি না। সত্তার এই চার ধাপ ধরে আমরা ভগবানের সান্নিধ্যে অধিরোহণ করি। আমাদের অভ্যস্ত বহিশ্চর চেতনা ছেড়ে, বাহ্যবিশ্বের অনুভব বর্জন ক'রে, তার পশ্চাতে ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারলে এই সব উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। জড়ামুগ মনের ও জড়প্রকৃতির বেষ্টন অতিক্রম করবার জন্য সমাধির প্রয়োজন।

সমাধি ক্রমশঃ গাঢ়তর হয়; ক্রমশঃ জীব জাগ্রতের আবাহন থেকে দূরে উচ্চতর গভীরতর অবস্থাতে যায়। সমাধির লঘুতর অবস্থাতে বাহ্য অনুভব সাময়িকভাবে বর্জিত হ'লেও সহজেই অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু গভীর সমাধিতে অন্তর্লীন মনের নিস্তব্ধতা কোন বাহ্য অভিঘাতে বিচলিত হয় না। প্রথম স্বপ্নাবস্থা-তারও অসংখ্য পর্যায় আছে। কিন্তু সাধারণ মনের স্বপ্ন ও নিদ্রা এবং যোগের স্বপ্ন ও সমাধির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটা হল প্রাকৃত মনের ব্যাপার, আর একটা হল প্রাকৃত মনের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত সূক্ষ্ম মনের কাজ। ঘুমের মধ্যে বুদ্ধির শাসন থাকে না। তাই, মগ্নচৈতন্যে যে সব বোধের ছাপ থাকে—বাস্তব অনুভূতি, কল্পনা, বইএ পড়া শোনা কথা—সেই সব পাঁচমেশালি স্মৃতির টুকরো নিয়ে অবচেতন মন নানা অসংলগ্ন ছবি গড়ে। সেই হল সাধারণ স্বপ্ন। কিন্তু যোগের স্বপ্নে কোন অসঙ্গতি থাকে না, সাধারণ মনের শক্তি বেশী একাগ্র হয়ে কাজ করে, কিংবা উচ্চতর স্তরের বুদ্ধি জেগে ওঠে। বাহ্য অনুভব থেকে তা দূরে সরে যায় বটে, কিন্তু দর্শন-বিচার-মনন প্রভৃতি মনের নিজস্ব ক্রিয়া চলে বিশুদ্ধতর, পূর্ণতর ভাবে। এমন কি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে বাহ্য পরিবেশেও নৈতিক, মানসিক শারীরিক পরিবর্তন অবধি স্থায়ীভাবে ঘটান যায়। উত্তর মানসের সঙ্গেও সে আভ্যন্তরীণ জাগরণের অবস্থাতে সংযোগ স্থাপন করা যায়, হৃদয় গুহাতে বা চিদাকাশে ও প্রবেশ করা যায়। তার ফলে দূরদর্শন দূরশ্রবণ প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিলাভ হয়। তবে, সমাধির প্রধান উপযোগিতা হল যে তাতে-মনন, ভাবাবেগ ও ইচ্ছা শক্তির সব উচ্চতর স্তর খুলে যায়, আত্মার প্রসার গভীরতা ও ঈশিতা বেড়ে যায় এবং মানব আধার ভাগবত স্পর্শের জন্য প্রস্তুত হয়। অবশ্য সমাধিতে বাহ্য স্পর্শের উপদ্রব থাকে না বলেই এসব সাধিত হয়, সমাধি ভঙ্গে আবার সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়ে বিব্রত হতে হয়। কিন্তু বাহ্য সংস্রব ছেদও অবশ্য-প্রয়োজন নয়। চৈত্য সত্তা সুপরিণত হলে জাগ্রত অবস্থাতেও সমাধিলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতি-সঞ্জীবিত রাখা যায়। আর ক্রমে বহিশ্চর চেতনাতেও সে সব সম্পদ-সুলভ হয় এবং সে সব শক্তি সাধারণ জীবনেও স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

সুষুপ্তি উপনীত হয় সত্তার আরও উচ্চতর বিভাবে—মনন অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ চেতনাতে যায়, ভাবাবেগ অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ আনন্দে যায়, সংকল্প অতিক্রম ক'রে শুদ্ধ ঈশিতাতে যায়। "জন্মাদি অস্য যতঃ"—জগদ্ব্যাপারের উদ্ভব-লয় হয় সচ্চিদানন্দের যে পরম ভাব থেকে, তার—সঙ্গে মিলনের এই হল দ্বার। বাহ্য চেতনার অতীত বলে তার কাছে এ গভীর নিদ্রা, কিন্তু আন্তর চেতনার পক্ষে তা মহত্তর জাগরণ। সুষুপ্তির নাম হল প্রাজ্ঞ; তার বিশেষণ হল সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বভূতের উদ্ভব ও বিলয়ের কারণ, বিজ্ঞানময় পরমাত্মা। সাধারণ মনের গ্রহণ-সীমার বাইরে থেকে যা আসে তাই মনে হয় স্বপ্ন। আর তার প্রকৃতি যদি এত ভিন্ন হয়, এত অপরিচিত হয় যে তার কোন ধারণাই করা যায় না, তা মনে হয় যেন স্বপ্নহীন নিদ্রা। কিন্তু গ্রহণ ক্ষমতার পরিধি ক্রমশঃ প্রসারিত করা যায়, এ স্তরেও জাগ্রত থাকতে পারা যায়, আর তাতে অতিমানস জ্ঞান ও শক্তিলাভ হয়। আরও ঊর্ধ্বে, আনন্দময় সত্তাতেও প্রবেশ করা যায়, প্রবুদ্ধ আত্মা সমাধিতে তথা জাগতিক বোধে আনন্দময় সত্তাকে লাভ করতে পারে। আরও ঊর্ধ্বের সব স্তরেও যাওয়া যায়, সেখান থেকে "একটা অনির্বচনীয় আনন্দে মগ্ন ছিলাম"—এ ছাড়া আর কোন বোধ নিয়ে ফেরা যায় না। সত্তারও যেন কোন অস্তিত্ব থাকে না; বৌদ্ধ সাংকেতিক সংজ্ঞা "নির্বাণ" ছাড়া সে অবস্থা সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না।

সমাধিলব্ধ সম্পদের অনেক অংশই সমাধি বিনাও অর্জন করা যায়, তবে সবটা নয় বা এত সম্পূর্ণভাবে ও নয়। সমাধিতে সে সব পাওয়াও সহজ হয় এই হয় পূর্ণযোগে সমাধির উপযোগিতা। তবে, সে আলোক ও শক্তি বাহ্য চেতনাতেও নামিয়ে আনতে হবে, সে সবকে ব্যষ্টি-মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও অভিজ্ঞতাতে পরিণত করতে হবে। তবেই দেহধারী আত্মার স্ব-স্বরূপে জাগরণ সম্পূর্ণ হবে, পৃথিবীতে দিব্য চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ প্রস্তুত হবে। এই হল শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র যোগের উদ্দেশ্য।

বন্ধু

প্রশান্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিন অঞ্জলিদের বাড়ীতে গান শুনিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল বিজয় এবং রমেশের। নির্জ্জন পথে ওরা টাঙ্গায় ফিরছে মেস্-এ।

বিজয়: এই টাঙ্গা, জোরসে চলো।—অনেক রাত হয়ে গেল, কি বল্ রমেশ ?

রমেশ: হুঁ।

বিজয়: অঞ্জলিদের বাড়ীটাই অমনি। গেলে আর ছাড়তেই চায় না। তুই তো সম্পূর্ণ নতুন লোক; অথচ দেখলি তো—প্রথম দিনেই আজ তোর সঙ্গে কেমন আড্ডা জমিয়ে তুললেন অঞ্জলির বাবা আর মা ?

রমেশ: হ্যাঁ। বেশ লোক ওঁরা। চমৎকার মানুষ।

বিজয়: আর ঐ ছেলেটা ? ঐ বুন্টু ? বেশ জলি, আর বেশ শার্প; কি বল্ ?

রমেশ: হ্যাঁ—বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান।

বিজয়: (গলা চেপে অন্তরঙ্গতার সুরে) আর অঞ্জলি ?—অঞ্জলিকে কেমন লাগল ?—অত বড় বড় টানা চোখে সোনালী তারা দেখা যায় না; কি বল্ ? আর দেখেছিস, ঠিক যেন মনে হয়, চোখে কাজল দিয়েছে; তাই না ?

রমেশ: হ্যাঁ।—(গুণগুণ্ করে ওঠে)

'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কভু
তবুও তোমারি জন্যে
গান যে আমার গাঁথা হয় সুরে সুরে।
তোমার চোখের তারা দুটি যেন হাতছানি দেয় দুরে।"

বিজয়: তোর ঐ হিন্দী ঠুংরী গানটা কিন্তু আজ চমৎকার খুলেছিল অঞ্জলিদের বাড়ীতে। অঞ্জলির গলাটাও মন্দ নয়; কি বল্ ?

রমেশ: ভাল।—খুব ভাল।—তোমার চোখের তারাদুটি যেন হাতছানি দেয় দুরে।'

কদিন পর। মেস্। বিজয়দের রুম।

জনৈক বোর্ডার: আরে বিজয়বাবু, সেজেগুজে চললেন কোথায় মশাই ?

বিজয়: এই একটু···

বোর্ডার: শরীর আজ কেমন ?

বিজয়: আজকে সুস্থ লাগছে বেশ।

বোর্ডার: ওফ্! ধন্য মশাই আপনাদের বন্ধুত্ব। এমন খাঁটি ফ্রেণ্ডশিপ্ মশাই কল্পনাও করা যায় না। একসঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া-শোওয়ার বন্ধুত্ব দেখা যায়; কিন্তু একসঙ্গে রাত্তিরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একসঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিছানা নেওয়া সত্যিই অকল্পনীয়! এ-রকম বন্ধুত্ব ভূভারতে কেউ ছাখেনি কোনদিন।—আপনারা কর্সিকান্ ব্রাদার্স‌কেও ছুয়ো দিলেন মশাই!

বিজয়: একসঙ্গে ফিরলুম কিনা সেদিন দুজনে খোলা টাঙ্গায়—রাতও হয়েছিল বেশি—গরম জামাও ছিল না তেমন গায়ে—তাই ঠাণ্ডা লেগে—

বোর্ডার: তা লাগুক্; ঠাণ্ডাটা ঠিক একই রকম ওজনে দুজনকে ধাক্কা দিয়ে দুজনকেই ঠিক গুণেগুণে তিনদিন বিছানায় শুইয়ে রাখলে কি না—তাই বলছি। যাক্, আপনার সেই অভিন্নহৃদয়টিকে দেখছি না যে ?

বিজয়: রমেশ গেছে ডাক্তার দত্তর ডিস্পেন্সরীতে; একটা টনিক কিনতে। জানেনই তো—

বোর্ডার: খুব জানি—শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। শরীরের মায়া ওঁর ভয়ানক। তা' আপনি যাবেন কোন্‌দিকে ?

বিজয়: লোদী রোডের দিকে।

বোর্ডার: ওঃ, আমি যাব করোলবাগের দিকে। তাহলে আমি এগোই।

বিজয়: আচ্ছা।

(বোর্ডারের প্রস্থান)

কিছুক্ষণ পর

বিজয়: আরে! অঞ্জলি তুমি!—এখানে!

অঞ্জলি: বলতে লজ্জা করছে না? সেই সেদিন রমেশবাবুকে নিয়ে গেছলে, তারপর তিনদিন আর পাত্তাই নেই বাবুর।

বিজয় : বাঃ! অসুখ করেছিল যে।

অঞ্জলি : সাফাই হচ্ছে!

বিজয় : সত্যি বলছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেখছ না, চুলে তেল নেই।

অঞ্জলি : সাবান দিলেও চুলে তেল থাকে না।

বিজয় : এই ভাখো, বিশ্বাস করে না।

অঞ্জলি : সেজেগুজে যাওয়া হচ্ছিল কোথায়?

বিজয় : তোমাদের বাড়ীতেই তো যাচ্ছিলুম। তার আগেই তুমি এখানে ছুটে এসে আমাকে কী আশ্বাসই যে দিলে অঞ্জলি!

অঞ্জলি : আশ্বাস?—কিসের?

বিজয় : তোমার মনে আমার জায়গাটা যে কায়েমী হয়ে উঠেছে—তার প্রমাণটা আজ হাতে-নাতে পেয়ে গেলাম।

অঞ্জলি : আহা—যে-মানুষ রোজ আসে, সে তিন-দিন না এলে বুঝি খোঁজ নেয় না কেউ?

বিজয় : হ্যাঁ।—প্রসাদ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অঞ্জলি রায় খোঁজ নেন অখ্যাত বিজয় দাশগুপ্তের।

অঞ্জলি : আচ্ছা, রমেশবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না?

বিজয় : সে বেরিয়েছে ডাক্তারখানার দিকে। চল অঞ্জলি, বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের বাড়ীর দিকেই যাওয়া যাক্।

অঞ্জলি : আমাকে তোমাদের ঘর থেকে তাড়াতে চাও বুঝি?

বিজয় : তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বেড়াতে যাব বললুম; তার মানে বুঝি তাড়ানো?

অঞ্জলি : রসোই না বাপু একটু—দেখি তোমার ঘরটা একটু ঘুরে ফিরে।

বিজয় : কি আর দেখবে? এই ত একটা নেয়ারের খাট, আর একটা টেবিল।

অঞ্জলি : আর আলমারীর কথাটা যে বাদ দিলে? কিছু গোপনীয় আছে বুঝি ওর মধ্যে?

বিজয় : হ্যাঁ, আছে বৈকি। একটি আইবুড়ো মেয়ের আঠারোখানা আঠারো রকমের ছবি আছে ওর মধ্যে। তার নাম অঞ্জলি।—বসবেই যখন, তখন ভাল করেই বোস—আমি নিচের চাকরটাকে বলে আসি গোটাকতক কাট্‌লেট্ আনাতে। কদিনের জ্বরে মুখটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে আছে।

অঞ্জলি : আচ্ছা, ওদিকের টেবলটা কার?

বিজয় : ওটা রমেশের।

অঞ্জলি : ঠিক আছে।—তুমি এস। আমি ঠিক আছি।—

চলে গেল বিজয়। অঞ্জলি রমেশের টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অঞ্জলি : বাঃ খাতার ওপরকার আঁকাটা তো ভারী সুন্দর।......রমেশ সেন...গানের খাতা...'বলাকা আসে ফিরে গগন ছেয়ে'......'মেঘলা দিনের গানের মালা'... 'ভোরের আকাশ রাঙালো আজ'...'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কল্পে'—(পড়তে লাগলো)

দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কল্পে,
তবু তোমারই জন্যে
গান যে আমার গাঁথা হত সুরে সুরে।
তোমার চোখের তারা দুটি যেন
হাতছানি দেয় দূরে
গানের আমার অঞ্জলি তাই
তোমারেই স্মরি.........'
গানের আমার অঞ্জলি...আমার অঞ্জলি...?

রমেশ প্রবেশ করল

রমেশ : অঞ্জলি দেবী!

অঞ্জলি : ওঃ! রমেশবাবু!—এই এলেন বুঝি? বিজয় একা বসিয়ে নিচে নেমে গেল কি না, তাই বসে বসে... আপনার গানের খাতাটা...শরীর ভাল আছে?...বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

রমেশ : আ-আমি বরং নিচে গিয়ে দেখি বিজয়টা গেল কোথায়?

অঞ্জলি : বসুন তো আপনি। আসছে ও' এখনি। আমি আজ গেস্ট্ কি না, তাই খাতির করে আমার জন্যে কাট্‌লেট আনাতে গেছে।

রমেশ : ওঃ।

অঞ্জলি : কই, বসুন?

রমেশ : হ্যাঁ। এই যে।

অঞ্জলি : সেই যে বন্ধুর সঙ্গে একদিন গেলেন আমাদের বাড়ীতে, আর তো ও-মুখোই হলেন না।

রমেশ: বিজয়ের মুখে শোনেন নি? সেদিন রাত্রে ফিরে দুজনেরই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা।

অঞ্জলি: শুনেছি।—বিজয়ের মুখটা শুকনো দেখলুম। আপনাকেও কাহিল লাগছে একটু।

রমেশ: ও কিছু না।

অঞ্জলি: কবে যাবেন বলুন আমাদের বাড়ী?

রমেশ: বিজয়ের সঙ্গে যাব এক দিন।

অঞ্জলি: কেন? বিজয় সঙ্গে না থাকলে বুঝি ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবে?

রমেশ: বিজয়টা যে কী করছে এতক্ষণ···

অঞ্জলি: আপনার খাতাটা দেখছিলুম। শেষের কবিতাটা—ঐ যে—'দেখিনি তোমায় আগে কোনদিন কণ্ঠে,'—ওটার মাথায় অমন ক্রশ্ দিয়েছেন কেন?

রমেশ: আমার কবিতায় বড্ড কাটাকুটি হয়। বদলাতে বদলাতে এক-একটা কবিতার একেবারে অন্য চেহারাই দাঁড়িয়ে যায়। ওটাও বদলে ফেলেছি কি না, তাই।

অঞ্জলি: যা ছিল, তা তো বেশ ছিল।

রমেশ: ঐ আমার বদরোগ। দিনের সঙ্গে আমার কোন কোন কবিতাও বদলে যায়।

অঞ্জলি: কোন্‌খানে বদল হল?

রমেশ: সামান্য একটু।—লিখেছি—

'দেখেছি তোমায় ওগো স্বপ্নের কন্যা
আমার গানের বন্যা
তোমারে ভাসায়ে নিয়ে যাক্ সেই কূলে।
যেথা ফাগুনের হাসি ফুটে ওঠে
বিকশিত ফুলে ফুলে॥

অঞ্জলি: অদেখার দেখা পাবার পর তো কাব্য ভেঙ্গে যায় শুনেছি। ইয়্যারো আন্‌ভিজিটেড্, আর ইয়্যারো ভিজিটেড্-এর কথা মনে নেই?

রমেশ: আমার জীবনে ফলটা উলটো হয়ে গেল। দেখার পর অদেখা আরো গভীরতর ভাবে···

বিজয় ঢুকল

বিজয়: অঞ্জলি, নিজেই চলে গেলুম শেষ পর্যন্ত হোটেলে। এই ভাখো—আরে! রমেশ এসে গেছিস! ভেরী গুড্। ভাবছিলাম, তোর কাটলেটটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বুঝি। ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস। নে, টিপয়টা সরিয়ে আন্,—এগুলো রাখি। রামভরসাকে চা করতে বলেছি।

দিন যায়। রমেশ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যায়, আসে, গান শোনায় অঞ্জলিকে। দিন যায়।

অঞ্জলির জন্মদিন। কিন্তু কারই বা মনে আছে সে কথা? মনে রেখেছে কিন্তু বিজয়। একা এসেছে আজ তাই সে। নিভৃতে ডেকে নিয়েছে অঞ্জলিকে দক্ষিণের চাতালে। তখন সন্ধ্যা। চাঁদ উঠেছে আকাশে।

বিজয়: অঞ্জলি—তোমার জন্মদিন এমনি নিভৃতে চুপিচুপি আসুক বারবার। হট্টগোল নয়—এমনি অনাবিল শান্তির মধ্যে। এই একটি দিন আমি স্বার্থপর হতে চাই অঞ্জলি। এ দিনটি শুধু থাক তোমার আর আমার। তার মাঝে আর কেউ নয়—কিছু নয়। তাই, রমেশকে জানাইও নি যে তোমার জন্মদিন আজ। ওকে না জানিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে একা। তোমার জন্মদিনের তারিখটি শুধু তোমার আমার ছাড়া আর কারুর না হয় নাই বা পড়ল মনে; পৃথিবীর আর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে না হয় নাই হল জানানো।

বুণ্টু এসে ঢোকে

বুণ্টু: দিদি, দিদি,—আরে, তোমরা এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আর আমি সব ঘর খুঁজছি।—এই নাও, রমেশবাবুর কাছ থেকে কে একজন সাইকেল কোরে তোমার একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

বিজয়: রমেশের? কই কি লিখেছে দেখি?

বুণ্টু: এই নিন।—আমি চললুম দিদি।

বুণ্টু চলে যায়

অঞ্জলি: চিঠিটা কিন্তু আমার।

বিজয়: (হেসে) লেখক কিন্তু রমেশ। কাজেই, আমার পড়তে বাধা থাকবার মত চিঠি এ নিশ্চয়ই নয়। চেঁচিয়েই পড়ি—"প্রিয় অঞ্জলি দেবী, আপনার জন্মদিনে নতুন গান শোনাতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু···" ওঃ! লেখক রমেশ হলেও এ-চিঠিটা সত্যি একান্তই তোমারই

অঞ্জলি। আমার চিঠিটা খোলা নিতান্তই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি যে···

চিঠিটা অঞ্জলির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বিজয় চুপ করে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা যেন অনুভব করবার চেষ্টা করে। অঞ্জলি নীরব। এক সময় কম্পিতকণ্ঠে বিজয় বলে—

বিজয়: অঞ্জলি—একটা আংটি এনেছিলুম ছোট—ভেবেছিলুম তোমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে যাব। কিছু না—জন্মদিনের উপহার। দেব কি পরিয়ে?

অঞ্জলি: দাও।

পরদিন সকালবেলাতেই বিজয় এসে হাজির অঞ্জলিদের বাড়ীতে

অঞ্জলি: তুমি!—সকালে! ব্যাপার কি? আপিস নেই?

বিজয়: আছে।—শোন অঞ্জলি, আজ একটা ভাল 'ছবি' এসেছে 'অডিয়ন্' সিনেমায়। যাবে আমার সঙ্গে?

অঞ্জলি: নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু—

বিজয়: তাহলে কথা রইল—আমি আপিস থেকে সোজা যাব সিনেমা হাউসে। তুমি ঠিক সময়ে যেয়ো কিন্তু।

অঞ্জলি: নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

বিজয়: আর অঞ্জলি—একটা কথা।—তোমার সেই মুর্শিদাবাদী সিল্কের চাঁপা শাড়ীটা পরে যেও আজ। সেই আমাদের প্রথম-দেখার দিনে যে-শাড়ীটা ছিল তোমার গায়ে—সেইটে। আর সেই লাল ভেল্‌ভেটের ব্লাউজ।

অঞ্জলি: (হেসে) আবার কি প্রথম থেকে সুরু করতে চাও নাকি?

বিজয়: না।—সেই প্রথম দিনের মতন করেই তোমাকে আবার আবিষ্কার করতে ইচ্ছে হচ্ছে নতুন করে।

অঞ্জলি: তাই হবে।

বিজয়: তাহলে সাড়ে পাঁচটার সময় সিনেমা হাউসের সামনে।

সিনেমার লবী। ওয়ার্নিং-এর ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে গেছে। বিজয় তখনো একা দাঁড়িয়ে

জনৈক ব্যক্তি: কারুর আসবার কথা বুঝি?

বিজয়: কেন বলুন তো?

ব্যক্তি: শো আরম্ভ হয়ে গেল, অথচ দাঁড়িয়ে আছেন—তাই—

বিজয়: ওঃ, হ্যাঁ।

ব্যক্তি: কিছু যদি মনে না করেন—আপনার টিকিট দুটো কাউণ্টারে ফেরৎ না দিয়ে যদি আমাকে বিক্রি করেন তাহলে···মানে হাউস ফুল হয়ে গেছে কি না।—মেয়েদের নিয়ে এসেছি, মানে—

বিজয়: এই নিন।

ব্যক্তি: ওমশাই—আরে ও মশাই—দামটা? টিকিটের দামটা?

বিজয় ততক্ষণে টাঙ্গায় উঠে বসেছে

বিজয়: এই টাঙ্গা জোরসে চালাও।

বাইরের ঘরটায় বসে বুণ্টু 'মেকানো'র সেট্ নিয়ে লোহার ব্রীজ তৈরী করছিল। ঝড়ের মত ঢুকল বিজয়

বিজয়: বুণ্টু শোনো।

বুণ্টু: (তন্ময়) একটু বিজয়দা—এই নাটটা লাগিয়ে নেই আগে—নৈলে—

বিজয়: দিদি কোথায়?

বুণ্টু: বাবা-মা-দিদি সবাই কোথায় চা-পার্টিতে··· না না দিদি নয়, শুধু বাবা আর মা গেছেন। দিদি বোধহয় ভেতরেই আছে।

বিজয়: ওঃ।

বিজয় ভিতরে ঢুকে অঞ্জলির ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কান পাতল দরজায়। ঘরের ভিতর তখন অর্গ্যানটা টুংটাং করে বাজতে বাজতে থেমে গেল। শোনা গেল অঞ্জলির কণ্ঠস্বর—

অঞ্জলি: অপূর্ব্ব হয়েছে আপনার এ-গানটা।

রমেশ: আপনার জন্মদিনে নতুন গান শোনাতে পারিনি—তাই আজ নতুন গান তৈরী হতেই—

অঞ্জলি: কাল আরো একটা নতুন গান চাই কিন্তু। ওঃ, লাস্ট্ গানটা আপনার সত্যি অপূর্ব্ব হয়েছে—(গুণ গুণ করে)—'ঝরাফুলে গাঁথা মালাখানি মোর পর গো গলে, ভিজায়ে এনেছি চোখের জলে'।—আচ্ছা, এসব গান কখন্ লেখেন? কখন্ সুর দেন?

রমেশ : আপিসের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত দিন।—এই নিয়েই তো কাটে দিন। কোনদিন গান বাঁধি, ছবি আঁকি বা কোনদিন।

অঞ্জলি : এমন গান লেখেন, এমন সুর দেন—প্রচার করেন না কেন?

রমেশ : গান আমার খাতায় থাকে, সুর আমার মনে। শোনাব, এমন লোক পাইনি।

অঞ্জলি : যে লাজুক আর যে কুনো আপনি! পাবেন কোথায় শ্রোতা?

রমেশ : আজ সকালে আপিস কামাই করে তিন-খানা গান বেঁধে ফেললুম। গান নিজের খেয়ালেই বেঁধেছি এতদিন, শ্রোতার কথা ভাবিনি। আজ কি জানি, গান বেঁধেই মনে হল, কাউকে না শোনালে যেন চলছে না। হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ে গেল তাই—

অঞ্জলি : এবার থেকে নতুন কোন গান বাঁধলেই আমাকে মনে পড়ে যাওয়া চাই কিন্তু। গান যে আমি কী ভালবাসি তা জানেন না তো।

দেয়াল ঘড়িতে সাড়ে ছটার ঘণ্টা বাজে

অঞ্জলি : (চম্‌কে) ইস্! সাড়ে ছটা!—দেখেছেন—আপনার গানের ঝোঁকে এক জায়গায় যাবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যাব, কথা দেওয়া ছিল।

রমেশ : ছিছি—দেখুন তো—গান শোনাতে এসে আপনার কত ক্ষতি করে ফেললুম। আজ আমি উঠি।

অঞ্জলি : উঠবেন?—আচ্ছা।—কিন্তু মনে থাকে যেন, এবার থেকে আপনার প্রত্যেকটি নতুন গানের প্রথম শ্রোতা আমি।

রমেশ : নিশ্চয়ই মনে থাকবে। আচ্ছা—নমস্কার অঞ্জলি দেবী।

অঞ্জলি : নমস্কার।

চলে গেল রমেশ। অঞ্জলি চুপচাপ বসে রইল ঘরে।
বিজয় এসে ঢুকল খানিকটা পরে

বিজয় : অঞ্জলি!

অঞ্জলি : (চম্‌কে) বিজয়!—রাগ কোর না বিজয়, প্লীজ্! বাঃ রে, কথা বলছ না কেন? প্লীজ্ প্লীজ্ বিজয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে সিনেমায়? খুব রাগ হচ্ছিল তো?—আইস্‌ক্রীম্ আনব? মা দুপুরে তৈরী করেছেন কমলালেবু দিয়ে।—আমার দোষ কি বলো? কাপড়জামা বদলে তৈরীই তো ছিলুম, হঠাৎ…হঠাৎ…হঠাৎ তুরুকমান রোডের বোসগিন্নীর মেয়েরা এসে পড়লেন…কাল অবধি আছে নিশ্চয়ই ছবিটা? কাল ঠিক যেতে হবে। কালকের টিকিট আমি কাটবো কিন্তু; য়্যাঁ?—দাঁড়াও আইস্‌ক্রীমটা আগে আনি।

বিজয় : আইস্‌ক্রীমের দরকার নেই।

অঞ্জলি : না। আইস্‌ক্রিম তোমায় খেতেই হবে নৈলে বুঝব তুমি আমাকে ক্ষমা করনি।—বল তাহলে রাগ করনি?

বিজয় : বোসো অঞ্জলি, কথা আছে।

অঞ্জলি : তোমার গলার স্বর আজ যেন কেমন কেমন…কি কথা?

বিজয় : আমাদের বিয়ের তারিখটা আর ফেলে রাখা উচিত নয় অঞ্জলি। এবার—

অঞ্জলি : হাসালে তুমি! এত ব্যস্ত কেন? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? না, তুমিই পালিয়ে যাচ্ছ? পাগল কোথাকার! প্রোপোজ্যালটা আমাদের মুখ থেকে না বেরিয়ে বাবা-মার মুখ থেকে বেরুলেই ভাল হয় না কি?—বোসো, আইস্‌ক্রীমটা আনি।

অঞ্জলিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিজয় একা পথে পথে ঘুরল অনেকক্ষণ। তারপর, একটু রাত করেই ফিরল মেসে। রমেশ তখন তার নেয়ারের খাটিয়ায় মাথার তলায় দুটো হাত জড়ো করে শুয়ে আছে।

রমেশ : এই যে বিজয়, কোথায় গেছলি রে?

বিজয় : 'অডিয়নে' সিনেমা দেখতে।—তুই?

রমেশ : আমি…ঐ…

বিজয় : আচ্ছা রমেশ তোর প্রত্যেকটি নতুন গানের প্রথম শ্রোতা এতদিন আমিই ছিলুম, তাই না?

রমেশ : একথা কেন বলছিস?

বিজয় : এমনি।…খাওয়া হয়ে গেছে তোর?

রমেশ : তার মানে? দুজনে একসঙ্গে ছাড়া খেয়েছি কোনদিন?

বিজয় : একসঙ্গে?—আচ্ছা তাই হোক্।

রমেশ : কথাগুলো আজ যেন তোর কেমন···

বিজয় : রমেশ ?

রমেশ : বল্।

বিজয় : আমরা দুজনে কেমন যেন ক্রমেই তফাৎ হয়ে যাচ্ছি।

রমেশ : একথা কেন বলছিস বিজয় ?

বিজয় : কি জানি কেন, মনে হচ্ছে, দুজনে যেন দুজনকে কেবলই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছি।—রমেশ ?

রমেশ : বল্।

বিজয় : অনেকদিন দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। তাই না ?

রমেশ : সত্যি।—অনেকদিন।

বিজয় : কাল তো ছুটি ; চ'না দুজনে বেড়িয়ে আসি কোথাও।

রমেশ : অঞ্জলি দেবীকে বলবিনা ?

বিজয় : না। আগেকার মত শুধু তুই আর আমি। আর কেউ নয়।

রমেশ : বেশ তো। কোথায় যাবি বল্ ?

বিজয় : চ' কুতুবে যাই। ও-ধারটায় যাওয়া হয়নি বহুদিন।

রমেশ : কুতুব ?

বিজয় : ভয় নেই। তুই নাহয় নাই উঠবি উপরে। তাহলে তো আর আপত্তি নেই তোর।

রমেশ : সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর থেকে শরীরটা জখম হয়ে আছে কি না···

বিজয় : ঠিক আছে।—তোকে উঠতে হবে না। তুই নিচেই থাকিস্।

কুতুবমিনারের শেষতলার বারান্দা। উড়ে যাওয়া ঝড় ফিরে এল আবার। তার সঙ্গে অতীত উড়ে গিয়ে ফিরে এল আবার। বিজয়ের চোখের ওপর থেকে ছ'মাস আগেকার ঘটনাগুলো মিলিয়ে গেল। আকাশ অন্ধকার। ঝড়ের হাওয়ার প্রথম সারির পদাতিক সৈন্যদলের পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে তখন। বিজয় বাইনো-কুলারটা নামিয়ে নিল চোখ থেকে। আবার কে যেন ডেকে উঠল কানের কাছে—

মন : বিজয় ?

বিজয় : কে ?

মন : তোমারিই মন।—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

বিজয় : কি চাও ? কি বলতে চাও তুমি ?

মন : ঐ যে ওধারে রেলিঙ্-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরোনো ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে রমেশ বলে যুবকটি—ও তোমার কে ?

বিজয় : বন্ধু।

মন : যদি বলি শত্রু ?

বিজয় : না।

মন : আজ যদি রমেশ সেন বলে কেউ না থাকত দিল্লীতে—অঞ্জলি রায় তাহলে আজ একান্তই শুধু বিজয় দাশগুপ্তের হতে পারত না কি ?

বিজয় : তুমি যাও, যাও, যাও।

মন : আজ অঞ্জলির জীবনে এসে গেছে দু-দুটি পুরুষ—রমেশ আর বিজয়। ছ' মাস আগেকার এঞ্জিনীয়ার বিজয় দাশগুপ্তর পাশে এসে দাড়িয়েছে আজ শিল্পী রমেশ সেন। কাকে বঞ্চিত করে কার গলায় মালা দেবে—আজ আর অঞ্জলি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছে না।

বিজয় : কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলতে পারে ?—কতদিন আর অপেক্ষা করা চলে ?

মন : রমেশের সঙ্গে যদি তোমার বন্ধুত্ব না হোত কোনদিন, বেশ হোত তাহলে ;—তাই না ? তাহলে অঞ্জলির জীবনে তুমিই হতে পারতে একমাত্র পুরুষ। সত্যি,—রমেশ সেন বলে কেউ যদি না থাকত পৃথিবীতে !

বিজয় : সত্যি, রমেশ কেন এল পৃথিবীতে ?—এল যদি, দিল্লী ছাড়া আর কোথাও কি চাকরি পেল না ও' ?—উফ্ ! রমেশ বলে যদি কেউ না থাকত এই এই পৃথিবীতে !

মন : উঁহু-হু-হু ! বিজয়, উত্তেজনার বশে পাঁচিলের বড্ড ধারে এগিয়ে গেছ তুমি। মনে নেই নিচে গাইডের কথা ?—সরে দাঁড়াও ! পরশুদিনই তো একজন বারান্দা থেকে হঠাৎ আচমকা···

বিজয় : আচমকা !—সত্যি, আচমকা পড়ে যেতেই তো পারে মানুষ। পরশুদিন গেছেও তো একজন পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শেষও হয়ে গেছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ! এখান থেকে আচমকা পড়ে যাওয়াটা কি খুবই অস্বাভাবিক কিছু ?

মন: মোটেই না।

বিজয়: কিন্তু…

মন: বিজয়, পিছন ফিরে তাকাও একবার রমেশের দিকে। একমনে কি ভাবছে ও' বলত? অঞ্জলির কথা? নতুন কোন গানের সুর? রমেশের ঘাড়ের ওপরকার আঁচিলটা ফর্সা রঙের ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—না?

বিজয়: হ্যাঁ।

মন: আচ্ছা, ঐ যে রমেশ দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিলের ধারে অন্যমনস্ক হয়ে—যদি আচম্‌কা পড়ে যায়? এমনও তো হতে পারে—টাল সামলাতে না পেরে রমেশ পড়ে গেল এই উঁচু থেকে! খুব কি অস্বাভাবিক ব্যাপার রমেশের পড়ে যাওয়াটা?

বিজয়: না।

মন: তাহলে?—ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে রমেশ অন্যমনস্কভাবে পাঁচিলে ঠেস্ দিয়ে। হঠাৎ যদি কারুর ছোট্ট একটু ধাক্কা লাগেই ওর পিঠে!…

বিজয়: না।—ও আমার বন্ধু।

মন: পৃথিবীর কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারবে না সেকথা। জানতেও পারবে না, কুতুবমিনারের চুড়ো থেকে যে পড়ে গেল—তার গায়ে ধাক্কা দিয়েছিল কি না কেউ।

বিজয়: তারপর?

মন: অঞ্জলির জীবনে থাকবে শুধু একজন…শুধু একজন!…থাকতেই হবে…শুধু ছোট্ট একটা ধাক্কা… পারবে না তুমি ধাক্কা দিতে?…কেন পারবে না?… পারবে…পারবে…পারতেই হবে তোমাকে বিজয়…না পারলে তোমার চলবে না, তোমার চলবে না!!!…হ্যাঁ, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও…এইবার…হ্যাঁ…এইবার রমেশের পিঠের ওপর ছোট্ট একটু…

রমেশ: (চম্‌কে) কে?—বিজয়?

বিজয়: না।—হ্যাঁ। আ—আ আমি।…একটু জল একটু জল দিবি রমেশ তোর জলের বোতলটা থেকে? …তোকে ডাকতে যাচ্ছিলুম পিঠে হাত দিয়ে—ডাকতে যাচ্ছিলুম…তুই চমকে উঠেছিস বুঝি?

কোন কথা না বলে রমেশ জলের গেলাস এগিয়ে দেয় বিজয়ের দিকে

মন: বিজয়?

বিজয়: উঁ?

মন: রমেশ কি টের পেয়েছে কিছু? নৈলে ও' অমন করে তাকিয়ে আছে কেন তোমার দিকে? —ও' কি বুঝতে পেরেছে?—না, না, তা কেমন করে টের পাবে? এ কি ভাবা যায়? এতখানি সন্দেহ বন্ধু বন্ধুকে করবে কেমন করে?—কিন্তু তাহলে ও' কথা বলছে না কেন?—কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তোমার দিকে। ওর চোখ দুটোতে তাহলে কিসের ঐ অপার বিস্ময়ের চিহ্ন! বিজয়, দেখো না, দেখো না ওর দিকে, ওর চোখে চোখ পড়লে পাগল হয়ে যাবে তুমি! বড্ড হাঁপাচ্ছ তুমি বিজয়—জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও। পারছ না জল খেতে?—আচ্ছা রমেশ কি হাসছে? ওর মুখে ও-কিসের চিহ্ন ফুটে উঠছে তবে? হাসির না কান্নার? কি একটা লিখছে রমেশ কাগজে?—কি লিখছে? গান? —কাগজটা ও' দূরবীক্ষণের খালি-বাক্সে রেখে দিলে। আবার ও' সেই শব্দহীন অদ্ভুত হাসি হাসছে তোমার দিকে চেয়ে।—অসহ্য! অসহ্য! —এ হাসি অসহ্য! —কিন্তু রমেশ পাঁচিলে অমন ঠেস দিয়ে দাঁড়াচ্ছে কেন? অত ঝুঁকে কি দেখছে ও' নিচের দিকে!……

বিজয়: (আর্তনাদ কোরে ওঠে) রমে-এ-এ-এ-এ-শ॥

দারোগা এসেছেন

দারোগা: মৃতব্যক্তির নাম?

বিজয়: রমেশ সেন।

দারোগা: ওঁকে চিনতেন?

অবিনাশ: ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না।—পরম বন্ধু ছিলেন ওঁরা দুজনে।

দারোগা: আপনি?

অবিনাশ: আমার নাম অবিনাশ সেনগুপ্ত। আজই ঐ কুতুবের উপরেই ওঁদের সঙ্গে আলাপ।

দারোগা: উনি কি করে পড়ে গেলেন আপনি কিছু বলতে পারেন?

মাসী: (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠ) আমি জানি।—পরশু-দিনের সেই অপঘাত মৃত্যুর আত্মা বাছাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

দারোগা: মৃতব্যক্তি কি আপনার কেউ হতেন?

অবিনাশ : আজ্ঞে না। উনি আমার মাসিমা।

মাসী : ওরে 'না' কি বলছিস ?—ও যে আমায় মাসীমা বলে ডাকলে—বড়দির কোয়ার্টারের ঠিকানা নিলে —আমি যে ওকে—

দারোগা : ওঁকে একটু তফাতে নিয়ে যান।

অবিনাশ : মাসী—এসো এসো—একটু এদিকে এসে বোসো তো।

দারোগা : এবার বলুন তো আপনি বিজয়বাবু, উনি কেমন করে পড়ে গেলেন ?

বিজয় : এই নিন।

দারোগা : দুরবীণের বাক্স ?—কি হবে ?

বিজয় : ওর ভেতরে কাগজ আছে—রমেশের হাতের লেখা। ওর শেষ হস্তাক্ষর। শেষমুহূর্তেও ওর হাতের লেখা কেমন মুক্তোর মতন পরিষ্কার দেখেছেন !

দারোগা : (কাগজ পড়ছেন) "আমি আত্মহত্যা করলাম। আমার মৃত্যুর জন্ত কেউ দায়ী নয় পৃথিবীতে। শরীরটা সত্যিই সামান্ত জিনিষ ; তার ওপর বেশি মায়া করা উচিত নয়। বিজয় ও অঞ্জলি সুখী হোক, সুখী হোক্ ওরা। রমেশ সেন।"

বিজয় : (কেঁদে উঠল) মিথ্যে কথা ! মিথ্যে কথা !! যাবার সময় প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা লিখে গেছে ও'। ও' আত্মহত্যা করেনি ইন্‌স্‌পেক্টর—আমি বলছি ও আত্মহত্যা করেনি। শরীরকে ও' বড্ড ভালবাসতো, জীবনে ওর বড় মায়া ! ও' আত্মহত্যা করেনি, ও' আত্মহত্যা করতে পারে না ইন্‌স্‌পেক্টর—আমি···আমি··· আমিই ওকে মেরে ফেলেছি সার্জ্জেণ্ট্‌! তুমি আমাকে ছেড়ো না—আমাকে ছেড়ো না—আমাকে ছেড়ো না !·····

শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের স্বরূপ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

অপাঠ্য সব পাঠ্য কিতাব সামনে আছে খোলা

কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।

একটি বারো বৎসরের বালক অতি নিবিষ্ট মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়িতেছে। পড়িতেছে না যেন গোগ্রাসে গিলিতেছে ! তার চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত আগ্রহ উত্তেজনার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানা সে একটু সংগোপনেই পড়িতেছে, কারণ ইহা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ বই। কর্তৃজনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াই তাহাকে এই দুষ্কর্ম সমাধা করিতে হইতেছে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও একান্ত তদগতচিত্তে বালক এক অপরূপ রোমাঞ্চ-ঘন অনুভূতির আনন্দটুকু আকণ্ঠ পান করিতেছিল। এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নতুন জগতের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিতেছিল এই কাহিনীর মাধ্যমে। বালকটি নিঃশব্দেই পড়িতেছিল, যদিও নিঃশব্দ পঠনের বয়স তখন পুরোপুরি তাহার হয় নাই।

এক অপূর্ব ভাষার ঝঙ্কার ও ভাব-ব্যঞ্জনায় বালকের মন অভিভূত। যাহা পড়িতেছিল তাহার বেশীর ভাগ কথার অর্থই সে জানে না। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে গঠিত অংশটি একটি মনোহর কল্পলোকের আভাস আনিয়া দিতেছিল :

"× × × সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া × × আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে ; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।"

সেই সমুদ্রগামী জাহাজটির সঙ্গে সঙ্গে বালকের কৌতূহলোদ্দীপ্ত মনটিও এক অজ্ঞাত মহাদেশের অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক পড়া বালকের পক্ষে মানা। যে কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবকই এই নীতির সমর্থক—অতি সতর্কতার সঙ্গেই নাটক-নভেলের দুষ্ট ছোঁয়াচ হইতে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এই ঢাক-ঢাক-নীতির অবাধ প্রয়োগের ফলেই আজ ছোটদের বঙ্কিম, ছোটদের শরৎচন্দ্র, ছোটদের সেক্সপীয়র জাতীয় দুধের-স্বাদ-খোলে-মেটানো সাহিত্যের এত ছড়াছড়ি। যে কোন সাহিত্যেই ক্লাসিক-পর্য্যায়ভুক্ত রচনা—যার মূল্য কালের নিকষে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, যে রচনা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ, সে জাতীয় রচনাকে নিছক

বয়সের অজুহাতে বা নীতির দোহাই দিয়া কিশোরপাঠকের পক্ষে "অনধিকার প্রবেশ" বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলে হিত অপেক্ষা অহিতের সম্ভাবনাই বেশী।

গ্রন্থজগতে বিচরণ অনেকটা অজ্ঞাত মহাদেশ পর্যটনের মতোই বিস্ময়প্রদ এবং নব নব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। কৃত্রিম বাধা-নিষেধে এই ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও সীমায়িত করিয়া রাখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। বাংলা সাহিত্যে যেমন মাইকেল, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি দিকপালগণকে বাদ দিয়া কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থাগার সংগঠন সম্ভব নহে, তেমনি ইংরাজীতে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট, জেন অস্টেন এবং পরবর্তী কিপ্লিং, টমাস-হার্ডি, অস্কার ওয়াইল্ড, গলস্ওয়ার্দী প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাগণ অপরিহার্য। কিপ্লিং সাম্রাজ্যবাদী, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন লেখক—এই অজুহাতে অনেকে কিপ্লিং-পাঠের বিরোধী। দেখা যায় কোন একটা সময়ে ইংরাজ ছেলে-মেয়েরাই পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রতিকূল মানোভাব পোষণ করিতে শিখিল। সুতরাং কিপ্লিং পাঠ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী বৃদ্ধি পাইয়াছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না!

যে কোন একখানা বিশেষ ধরণের গ্রন্থ একজন সাধারণ প্রবীণ ও প্রাপ্তবয়স্কের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অনেক ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোর পাঠকের মনে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে। প্রাজ্ঞ ও প্রবীণের ভাবাবেগের মাপকাঠিতে শিশুচিত্তের পরিমাপ সঠিক হয় না। প্রবীণ যে আশঙ্কায় বই বিশেষের সংস্পর্শ হইতে শিশুকে দূরে নিরাপদ রাখিতে চান, বাস্তবিক পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সেই আশঙ্কা অমূলক। স্যর ওয়ালটার স্কটকৃত "আইভ্যান হো", "লেডী অফ দি লেক", ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কৃত "রবরয়েজ গ্রেভ," ম্যাক্স পেমবারটন কৃত "আয়রণ পাইরেট" ইত্যাদি বই হাজারে হাজারে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরিতেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এই জাতীয় দুঃসাহসিক অভিযান অথবা মহদাশয় দুর্বৃত্তের (Noble Bandit) রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িয়াই দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিবে এরূপ ভয় সত্যই অমূলক। কিন্তু এই আশঙ্কায় যদি শিশুকে গ্রন্থ-জগতের বিচিত্র ও বিপুল ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যায় তবে তাহার একটা অপূরণীয় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। শিশু বড় হইয়া উঠিবে, কিন্তু গ্রন্থপাঠের প্রতি তাহার রুচি বা আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না। গ্রন্থপাঠে কতো সংখ্যক শিশু বা কিশোর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—ইহার কোন সঠিক হিসাব নাই বটে, কিন্তু একথা ধ্রুব যে গ্রন্থপাঠ না করিয়া, অথবা গ্রন্থপাঠের সুযোগলাভে বঞ্চিত থাকিয়া যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদের তুলনায় প্রথমোক্তের সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য।

শিশুচিত্তকে গ্রন্থমুখী করিয়া তুলিবার প্রধান উপায় শিশুকে গ্রন্থা-গারের অবাধ স্বাধীনতা (Freedom of the library) দান। নেতিবাচক বাধানিষেধ প্রয়োগে সেই স্বাধীনতা খর্ব করিলে তাহার অনিষ্টই সাধন করা হয়। শিশুর বেলাতেই হউক আর প্রাপ্তবয়স্কের বেলাতেই হউক—পাঠানুরাগ উদ্দীপিত করিবার বড় কৌশল পাঠককে বইয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া এবং পাঠককে বইয়ের সান্নিধ্যে লইয়া আসা। অবাঞ্ছিত বইগুলি শিশু-পাঠক বা বয়স্ক-পাঠকের হাতে তুলিয়া না দিলেও কিছু কিছু অবাঞ্ছিত বই আপনা আপনিই তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাঠক নিজেই নিখুঁতভাবে উত্তম-অধমের বিচার সাধন করিয়া লয়। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন এক্ষেত্রেও স্বতঃসিদ্ধ।

যে সাহায্য শিশু-কিশোর পাঠককে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইল মূলতঃ শিশু-পাঠককে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার সহিত পরিচিত করিয়া তোলা।

কোন লেখকের পর কোন লেখকের লেখা বই পড়া সমীচীন, অথবা লেখক বিশেষের কোন বইখানা প্রথমে শুরু করা উচিত, কোন বইখানার পর কোন বই পড়িলে সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় এবং এলোমেলোভাবে কতকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে অধিকতর সুফল অর্জন করা যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়েও শিশু ও কিশোর পাঠককে নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক।

শিশু-পাঠককে তথাকথিত 'শিশু-সাহিত্যের' চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখা একান্ত অসমীচীন। 'শিশু-সাহিত্যের' রচয়িতা শিশুরা নহে। 'শিশু-সাহিত্য' রচনা করেন বড়োরা। এ যেন অনেকটা শিশুরাজ্যে অনধিকার প্রবেশের মতো। শিশু কি চায় তাহা শিশুই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে জানে। শিশুর কাছে এই জগত এক অতি বৈচিত্র্যময় রূপেই প্রকটিত হয়। শিশু মন নিত্য নব নব অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

আর সৌভাগ্যক্রমে জগতের বহু সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও শাশ্বত সৃষ্টির সম্পদে এতো সমৃদ্ধ, যে উত্তমের সাথে কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট উপাদানের অনু-প্রবেশ অপরিহার্য হইলেও তাহাতে আশঙ্কার হেতু বিশেষ নাই। আর সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ভিতর দিয়াই শিশুর কাছে বিশ্বরহস্যের গুণ্ঠনমোচন ঘটে।

শিশুরা কি চায়? শিশুরা কি ভালবাসে? এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—শিশুরা চায় মজা, শিশুরা ভালবাসে তামাসা-কৌতুক। শিশুর কল্পনারাজ্যে যতো উদ্ভট, আজগুবি, অসম্ভব ও অমিলের ছড়াছড়ি। খেয়াল-রসের ভিয়েনে জগতের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকেরা শিশুমনের উপযোগী নানা অপূর্ব আহার্য তৈরি করিয়াছেন। খেয়াল-রসই শিশু-চিত্তের শ্রেষ্ঠ জারক রস।

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল-তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

স্বপ্নলোকের রঙীণ আকাশে উপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতোই শিশু-কল্পনা অবাধে বিচরণ করে। কল্পনার সাহায্যেই শিশু তার চতুর্দিকে এক সীমাহীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া লয়—যার প্রকৃত খোঁজ-খবর প্রাজ্ঞও প্রবীণের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে। সেই অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষকেই একদিন ইতস্তত বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কঠোর বাস্তব জীবনের নানা রূঢ় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে সেই শৈশবদিনের কল্পনা রঙীণ মুহূর্তগুলি কোথায় যেন হারাইয়া যায়। শিশু-দরদী ও সংবেদনশীল কবি ও শিল্পী ছাড়া বাস্তবধর্মী হাট-বাজারের পক্ষে শিশুমনের বিচিত্র খেয়ালগুলির খোঁজ খবর রাখা সম্ভব নহে। সেই কল্পনা-জগতের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির হিসাব রাখা আর-কাহারো সাধ্য নহে। সেই কল্পনা জগতেরই একটি চিত্র :

হেথায় রঙীণ আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙীয়ে আকাশ রঙীয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।

উর্বর কল্পনায় কতো অদ্ভুত, কতো উদ্ভট, কতো চমকপ্রদ, কতো খাপছাড়া কথাই না দানা বাঁধিয়া উঠে! আর সেই সৃষ্টি ছাড়া, অর্থহীন কথাগুলিই সুনিপুণ শিল্পীর হাতের গুণে এক অনবদ্য শিশু-সাহিত্যে পরিণত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে বিখ্যাত শিশু-গ্রন্থ "এ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" "(Alice in wonderland by Lewis Carroll)" এবং জে, এম্ ব্যারীর পিটার প্যান এণ্ড ওয়েণ্ডি (Piter Pan and Wendy by J. M. Barric) এই জাতীয় সাহিত্য।

অর্থহীন আবোল-তাবোল কথার ছড়া শিশু, আর কেবল শিশু কেন, শিশুর বাবা-মা, কাকা-দাদা প্রভৃতির কাছেও কতো প্রিয়—সেকথা সুকুমার রায়ের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই জানেন।

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্কা,
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্কা !
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?
ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিন্ তা !

অথবা ইংরাজী ছড়া :—

Hey diddle diddle
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the Moon ;
The little dog laughed
To see such sport,
And the dish ran away with the spoon.

নিছক কথার সমষ্টি, শব্দের অনুকৃতি! কিন্তু তাই কতো সুন্দর। অর্থ নাই—না থাকুক! অনর্থক কথাগুলিই কি অনবদ্য!

জগতের সব সেরা সাহিত্যেই ননসেন্স ভার্স (Nonsense Verse) একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আবার এই ননসেন্স ভার্সের ভিতর দিয়া কোন সমসাময়িক ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও বর্ষিত হইয়া থাকে।

'What Pitt is to Addington,
London is to Paddington.'

আঠারো শতকের প্রতিভাবান বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের সহিত তুলনায় তাঁহার উত্তরবর্তী এ্যাডিংটনের নগণ্যতা বুঝাইয়া দিতেছে উপরোধৃত ছড়াটি। তৎকালীন লণ্ডনের পথে ঘাটে চ্যাংড়া ছেলেরা মুখে মুখে এই ছড়া কাটিত।

বছর ত্রিশেক পূর্বে প্রেসিডেণ্ট হুভারের (Hoover) আমলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাদক-বর্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মত্ত-পিপাসী ইয়ঙ্কীদের মনোভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নোক্ত ছড়ার ছন্দে। তৎকালীন বৃটিশ-রাজ পঞ্চম জর্জ নাকি এই ছড়াটি শুনিয়া ভারী আমোদ পাইতেন। পাইবার কথাই, কারণ পঞ্চম জর্জ ছিলেন সুরা-রসের একজন অকৃত্রিম সমঝদার।

"Four and twenty Yankees, feeling rather dry.
Slipped across to Canada to have a drop of ray.
When the rye was opened
The yanks began to sing
"Who the hell is Hoover ?
God save the King !"

এম্নি ধরণের ছড়া বাংলাতেও বিস্তর আছে। একটা নমুনা—

পুঁটুরাণীর বর

"শোলার টুপি মাথায় দিয়ে
চারটি ঝোলা কাঁধে নিয়ে
বর এসেছে পোষাক পরে সবুজ-শাদা-কালো—
তা যাই বলো, পুঁটুরাণী বর পেয়েছে ভালো।
বলের মতো মুখখানা গোল, হোক্ না থ্যাঁদা নাক,
হোক্ না টারা চোখদুটি তার হোক্না মাথায় টাক
চার-চারটে পাশ দিয়েছে,
তার উপরে বিলেত গেছে,
বিলেত থেকে এনেছে এক মস্ত বড়ো ঢাক,
নিজেই বাজায় সকল সময়—টাক্-ডুমাডুম-টাক্ ॥"

বিলাত-প্রত্যাগত গর্বস্ফীত উন্নাসিকদের কাছে এ বিদ্রূপ একেবারেই অসহ্য।

শিশুর মন সহজে লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট হইতে চায় না

ছন্দের দোলায় শিশুর মনকে দোলাইয়া দাও, অশান্ত অবাধ্য মন হয়তো খানিকটা পোষ মানিবে। এদিক দিয়া দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্রনাথ, মনোমোহন, সুকুমার, সুনির্মল, সুখলতা এবং আরও অনেকে বাংলা সাহিত্যকে অশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তব, মনস্তত্ত্ব অনেক কিছুই ছন্দোমধুর অর্থনিরীহ ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এমনি একটি সুখপাঠ্য ছড়া:

হাতে-খড়ি

"আজ সকালে সানাই বাজে খোকার হাতে-খড়ি
সবাই বলে, চল্‌না ছুটে পড়ি কি ভাই মরি!
যতো কালি লাগবে দেবো বলে কালো হাতি
কালিন্দীরই কালো জলে আমার মাতামাতি!
ফিস্‌ফিসিয়ে খোকার কানে বলে সাদা মেঘ
আমি দেবো সাদা কাগজ পবন দেবে বেগ!
লাখো কাগজ জড়ো করে আন্‌বো তোমার ঠাঁই
লেখো খোকা অ-আ-ক-খ চিন্তা কিছুই নাই!
রাজহাঁস কয় আমি দেবো কলম যতো লাগে
দোয়েল বলে, গাইবো যে গান সুয্যি উঠার আগে!
বলছে উষা পরিয়ে দেবো খোকার ভালে টিপ্‌
জোনাকিরা জ্বালতে চাহে মঙ্গলেরই দীপ।
খোকা বলে, চুপ করো সব কিসের হাতে-খড়ি?
মহাকাব্য লিখ্‌ছি বসে আগে তা শেষ করি।"

কিছুদিন পূর্বেও শিশুসাহিত্যের বাজারে ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ কাহিনীর বেশ ছড়াছড়ি ছিল। কল্পনাপ্রসূত এক ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হইত গল্পের নায়ককে। নানা বিপদ-আপদ হয় চাতুর্য্যে, নয় অসমসাহসিকতায় কাটাইয়া উঠিয়া সেই নায়ক-পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে—ইহাই এ জাতীয় গল্পের রীতি। আফ্রিকা অথবা মালয় অথবা বোর্ণিওর অথবা অন্য কোন দেশের গভীর ও অগম্য জঙ্গলে নানা হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতির জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে মানুষের লোমহর্ষক অভিযান কাহিনী? ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানার নানা আজগুবি গল্পই এই জাতীয় শিশু-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যকে Horror Comics আখ্যা দেওয়া হয়।

রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের জঙ্গল-কাহিনী (Jungle-Stories) আর বাঙালী প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' এই শ্রেণীর সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না; তার কারণ, এগুলি লেখকের স্বকপোলকল্পিত একেবারে আজগুবি কাহিনী নহে, তার সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়াও ইহাদের মূল্য অনস্বীকার্য। তথাকথিত হরর-কমিক্‌স্ (Horror Comcis) বা ভয়-কাহিনীর বাজার এখন মন্দা। এই শ্রেণীর বইয়ের কু-প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কিশোর পাঠকের মনে একটা অহেতুক ভীতি-সঞ্চার ভিন্ন আর কোন প্রভাবই ইহা দ্বারা সঞ্চারিত হয় না। সস্তা গোয়েন্দা-উপন্যাস আর রোমাঞ্চ-রহস্য যেমন সাহিত্যপদবাচ্য নহে, তেমনি এই ভয়-কাহিনীগুলিও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞালাভের অযোগ্য। দুঃখের বিষয় বাংলায় এই শ্রেণীর গল্প-কাহিনীর প্রচলন উপেক্ষা করিবার মতো নহে। অনেক প্রকাশক ও লেখক এই শ্রেণীর বইয়ের ব্যবসা করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। বহু সাধারণ পাঠাগারে এবং স্কুল-লাইব্রেরীতে এই শ্রেণীর বই-ই শিশু-পাঠ্য বই হিসাবে সংগৃহীত এবং পঠিত হইতেছে।

হরর-কমিক্‌স্ হইতে স্বতন্ত্র ধরণের আর এক শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে বলা হয় সচিত্র ক্লাসিক (Illustrated classics)। বাংলা দেশেও কয়েকটি বহুলপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের উদ্যমে এই শ্রেণীর রচনার প্রচলন হইতেছে। ইহাতে পুরাণ কাহিনী, বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, নাটক বা নভেলের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া কতকগুলি বর্ণাঢ্য ছবির সাহায্যে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সেই সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে মূল আখ্যানের সহিত পাঠকের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। পাঠ্যাংশ অপেক্ষা রঙচঙা ছবিগুলির দিকেই দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয় এবং ছবিগুলির তাৎপর্য বুঝিবার জন্যই পাঠ্যাংশ পড়িবার কিছুটা গরজ জন্মায়।

রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকাটি টেবিলের উপর রাখা মাত্রই বাড়ির ছোটছেলেমেয়েরা লাল-কালো রঙে আঁকা মহাভারত বা রামায়ণ কাহিনীর ছবিগুলি দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়ে। ছবিগুলির পরিচায়ক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যাংশটুকু না পড়া পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। ছবিগুলি যে জনপ্রিয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু-এখন প্রশ্ন হইল যে—এই শ্রেণীর রচনার মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মিঃ ওয়েলস্‌কোট বলেন যে এই শ্রেণীর ছবি-বই শিশু-পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করে, কিন্তু তাহার কল্পনার উদ্দীপনে খুব বেশী সাহায্য করেনা। সে দিক দিয়া এই শ্রেণীর ছবি-সাহিত্যের (Illustrated Comics) উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ মূল গ্রন্থ-পাঠে আগ্রহ-দৃষ্টি—বহুলাংশেই ব্যর্থ হইয়া যায়। চার্লস ল্যাম্ব Charles-Lamb প্রণীত "টেল্‌স্ ফ্রম্ সেক্সপীয়র" Tales from Shakespeare যে পরিমাণে মূল সেক্সপীয়র পাঠে আগ্রহ জন্মায়, ছবি-সাহিত্য তাহার শতাংশের একাংশ আগ্রহও সৃষ্টি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। যে সকল কালজয়ী সাহিত্য-গ্রন্থ ছবি-বই (Illustrated classics) সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার মধ্যে "বাইবেল", সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট", ডিকেন্সের "ক্রিস্‌মাস ক্যারল," লুই ক্যারলের "এলিস ইন্ ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড", 'দি ইলিয়াড' ও "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট" প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ছবি-বইয়ের বহুল প্রচার সত্ত্বেও মূল গ্রন্থগুলির চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। মূলগ্রন্থ পাঠে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি দূরে থাকুক, বরঞ্চ সহজে 'বাজীমাৎ করিয়াছি' এইরূপ একটা আত্মতুষ্টির ভাবই বৃদ্ধি পায়। এই আত্মতুষ্টি আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। ইহা শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুঞ্জয় লিখিত "বত্রিশ সিংহাসন", "হিতোপদেশ" ও "রাজাবলি" বই তিনটি ফোর্ট-উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তক প্রত্যক্ষভাবে। "বেদান্তচন্দ্রিকা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকা" বই দুটিও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লেখা। পরোক্ষভাবে এদুটিও ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সাহিত্য প্রচেষ্টার অন্তর্গত। মৃত্যুঞ্জয়ের সব কটি বই-ই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লেখা। "বত্রিশ-সিংহাসন" বইটির একটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি পারি নগর থেকে Leon Feer কর্তৃক প্রচারিত হয়। লণ্ডন ও শ্রীরামপুর থেকেও এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তা থেকে বোঝা যায়, বৈদেশিকদের কাছে লেখকরূপে মৃত্যুঞ্জয় শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অথচ একথাও সত্য যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাবলী মৌলিক সাহিত্য তো নয়ই, এমনকি প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্যও নয়। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই অনুবাদ; অনূদিত গ্রন্থও পাঠ্যপুস্তকের পর্যায় ছাড়িয়ে কদাচিৎ অনুবাদ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর রচনার নমুনা থেকে বোঝা যাবে যে, তাঁর রচনার ভাষার জটিলতা, শব্দাড়ম্বরের আধিক্য এবং দুরান্বয়-দোস অতি প্রবল ছিল। তবু তাঁকেই ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য-রচয়িতা বলা ছাড়া উপায় নেই।

মৃত্যুঞ্জয় যেমন সংস্কৃতানুগ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, রামরাম বসু তেমনি ফার্সিবহুল ভাষার অনুরাগী ছিলেন, এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু রামরাম বসু-র রচনা ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় তাঁর রচনায় ফার্সি শব্দ সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও মোটের উপর যুগ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর লেখাও সংস্কৃতপ্রধান বাংলা গদ্যরীতির ধারা অনুসরণ করেছে। এই যুগে একমাত্র তাঁর লেখায় সংস্কৃত ও ফার্সি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। অনুমান করা চলে যে, এই প্রচেষ্টা/ সজ্ঞানে হয়েছিল এবং রামরাম মুন্সি ভারতচন্দ্রের আদর্শে "যাবনীমিশাল" ভাষা সৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্যের যুগে রামরামের ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও একথা মনে করলে ভুল হবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় যে-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দবাহুল্য দেখা যায়, রামরামের লেখাতেও সেই পরিমাণে ফার্সি বুলির আধিক্য আছে। কোথাও রামরাম এমন সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে, বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করবার জন্যেই বাধ্য হয়ে তাঁকে ফার্সি শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে-ব্যাপারেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত সেই মহান্ পন্থার অনুসরণ করেছেন এবং করে ঠিকই করেছেন যে, বক্তব্য বিষয় বোঝাবার জন্যে যে-ভাষা সবচেয়ে বেশি উপযোগী, সে-ভাষাই ব্যবহার করা উচিত।

রামরাম ফার্সি শব্দের ব্যবহার যেভাবে করেছেন তাতে কেউ কেউ তাঁকে এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মনে করতে উৎসাহিত হয়েছেন। আলোচনা করে দেখা যাক, তাঁর সাহিত্যিক যোগ্যতা এবং ভাষাসৃষ্টির কৃতিত্ব কতখানি।

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" বাংলা গদ্যে লেখা ,প্রথম জীবনীগ্রন্থ; তাছাড়া, এটি প্রথম বাঙালির লিখিত, বাংলায় রচিত ও বাংলা হরফে ছাপা বই; এই দুই কারণে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। "লিপিমালা" রচনার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হচ্ছে, আদর্শ চিঠিপত্র লিখতে শেখানোর উদ্দেশ্যে চিঠিপত্রের উপযুক্ত অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রায় কথ্যভাষার ব্যবহার। এই দুখানি বই থেকে রামরামের সাহিত্যিক যোগ্যতার যে পরিচয় পাই, তা অসামান্য নয়। বরং তাঁর গদ্যভাষাগত কৃতিত্ব প্রশংসনীয় বলা যায়। ফার্সি শব্দাবলীর প্রয়োগ কোথায় কতখানি সঙ্গত বা অসঙ্গত হয়েছে, মোটামুটি তার বিচারই রামরামের গদ্যভাষার উৎকর্ষ নির্ণয়ের সেরা উপায়।

রামমোহনের প্রভাবে রামরামের ভাষা সংশোধিত হয়েছিল, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের অভিমত এই রকম। কিন্তু রামমোহন কোথায় কতখানি প্রভাব রামরামের উপর বিস্তার করেছিলেন, তা জানবার কোন উপায় নেই। তবে রামমোহন ও রামরামের ভাষার নিদর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করে একথা সহজে বোঝা যায় যে, রামমোহনের রচনায় যখন ফার্সি শব্দের বিরলতা এবং রামরামের লেখায় তার প্রাচুর্য দেখা যায় তখন রামমোহনের প্রভাবে রামরামের রচনা বেশি সংস্কৃতপন্থী হবার কথা। মোটের উপর, মুন্সি মহোদয়ের ভাষা সংস্কৃতানুগই বটে,

এখনকার জনপ্রিয় অনেক লেখকের তুলনায় তাঁর ভাষায় ফার্সি শব্দ কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

"রাজা প্রতাপদিত্য চরিত্র" রচনার সময় রামরাম নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রের বিরাট কাব্যের শেষাংশে প্রদত্ত প্রতাপাদিত্য-বৃত্তান্তের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; সে-যুগে জাত-ফার্সি-পক্ষপাতী রামরামের পক্ষে ভারতচন্দ্রের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতি সম্পন্ন লেখকের অনুরূপ বিষয়ে পূর্ববর্তী রচনার প্রভাব একেবারে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবুও, রামরামের ভাষায় তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখে মনে হয়, ভারতচন্দ্র ও রামমোহন, দুজনেরই প্রভাব, তাঁর লেখায় যথাক্রমে ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য এনে দিয়েছে। ঐ বই থেকে দুরকমের দুটি নজির দেখা যাক। প্রথমে ফার্সি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত :—

"তাহাই সকলের পছন্দ হইল। সে-স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদীনালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন।……সদর মফসল ক্রমে তিন চারি বেহদ্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল।"

এই উক্তিতে যে-সব ফার্সি শব্দ আছে সে-সব ব্যবহারের কারণ, প্রথমত, সে-যুগে লোকের কথাবার্তায় এখনকার চেয়ে বেশি ফার্সি ব্যবহৃত হত; দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়ে ফার্সির প্রয়োগ কিছু বেশি হবার কথা; তৃতীয়ত, রামরাম নিজে ফার্সিনবিশ মুন্সি ছিলেন। চতুর্থত, ভারতচন্দ্রের রচনায় মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় একই রকমের ফার্সিবাহুল্য দেখা যায়—যার প্রভাব রামরামের লেখায় পড়েছে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন :—

এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারিদিকে মুরচা করিয়া॥
শিষ্টাচারমত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ি তলবার॥

কিম্বা

হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥

রামরামের রচনায় ফার্সির ব্যবহার ভারতচন্দ্রের চেয়ে খুব বেশি নয়। তাঁর রচনা ভারতচন্দ্রের কাব্যের তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষা বেশি দুর্বোধ্যও নয়। তবে, মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে তাঁর গদ্য উন্নত কিম্বা বেশি সরল, সেকথা বললে পক্ষপাতের পরিচয় দেওয়া হবে। রামরামের রচনায় সংস্কৃত প্রধান অংশের আড়ষ্ট দুর্বোধ্যতা এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় :—

"তোমার এমত এমত আচরণে আমাদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না। এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত, তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ, কোন কার্যে আমদ নাই, ইহার পূর্বমত আহার নিদ্রা নাই, তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিণ্ণমান, আমি তোমাকে যত্নপূর্বক পাঠাইয়াছিলাম, ইহাতে ইনি হৃষিব মনে আমার সহিত আলাপ করেন না, এই পর্যন্ত শোকিত।"

এই অংশে "সীমাহ" শব্দটি রামরামের মনোজগতে ফার্সির প্রভাব নির্দেশ করে। রচনার ভাষায় দূরান্বয়-দোষ দেখা যায়। ভাষায় সে যুগের বাংলা গদ্যের সাধারণ রীতিই দেখা যাচ্ছে যা সংস্কৃত গদ্যের রীতি-অনুসরণে গঠিত। ঐ সংস্কৃত প্রভাবের কারণ, প্রথমত, তৎসম শব্দপ্রিয় কলেজের পণ্ডিতদের সাহচর্য, সান্নিধ্য ও যুগপ্রভাব; দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সরকারের ফার্সির বদলে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষাপ্রীতি; তৃতীয়ত, রামমোহনের প্রভাব এবং সংশোধন। সংস্কৃতে জ্ঞান কম থাকায় তাঁর রচনায় বিদ্যালঙ্কারের রচনার শুদ্ধতা ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের অনুকরণে লেখা না হলেও একই ধরণের রচনাশৈলী রামরামের লেখাতেও দেখা যায় :—

"শুভক্ষণানুসারে যশোহর পুরীর সমস্ত রানিগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্লান বস্ত্র, কেহ বা পট্ট বস্ত্র, কেহ বা কামতাই, কেহ বা লক্ষ্মীবিলাস, কেহ বা পীতাম্বর, কেহ বা নীলাম্বর, নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহু-বিধ সুগন্ধি আতর প্রভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দোলে আরোহণে ধুমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় ফার্সি শব্দ খুব কম; কিন্তু তৎসম শব্দ ব্যবহারে রামরাম কার্পণ্য করেন নি। তাঁর "লিপিমালা"-র ভাষা নানাদোষদুষ্ট হলেও তাতে ফার্সির তুলনায় সংস্কৃত শব্দের প্রভাব অনেক বেশি দেখা যায়। "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন-এ সঙ্কলিত বাংলা পত্রাবলীর ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, রামরামের ভাষায় সে যুগের সাধারণ শিক্ষিতদের তুলনায় খুব বেশি ফার্সি প্রভাব ছিল না। তবে অন্ধ সংস্কৃতবিশারদ পণ্ডিতদের মনোভাব ফার্সি শব্দাবলীর উপর যেমন বিতৃষ্ণ ছিল, তাঁর ঠিক তেমন ছিল না।

রামরাম বসুও মৃত্যুঞ্জয়ের মতোই তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন :—

"এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্যক্ষমতা পন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

কারও কারও মতে, রামরাম কথ্যভাষার প্রয়োগ তাঁর রচিত গদ্যে করেগেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কথ্যভাষা বলতে যা বুঝেছেন তার অনুরূপ কিছুই আমরা এ যুগে কারও লেখায় পাই না। মধুসূদন বা দীনবন্ধুর নাটকে ব্যবহৃত কথ্যভাষাও রামরামের অজ্ঞাত ছিল। বস্তুত কেরি বা রামরামের ব্যবহৃত বস্তুত বহুল রচনাংশও মোটেই চলতি ভাষার নয়। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের লোকদের মুখের ভাষা তাঁদের দুষ্ট গদ্যের অনুরূপ নয়। বাঙালির মুখের ভাষাকে অবিকৃতভাবে সাহিত্যে রূপদানের প্রয়াস উনিশ শতকের প্রথম পাদে আদৌ দেখা যায় না। সেদিক থেকে কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা

সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস। কারণ, এই যুগের সর্ববাণীই ছিল একেবারে অন্তরঙ্গ। সংস্কৃত গদ্যের আদর্শে মজবুত করে ঢালাই করা তৎসম শব্দের উপাদানে ভরা বাংলা গদ্যভাষাই ছিল এই সময়ের লক্ষ্য। ফার্সি প্রভাব দূর করে পণ্ডিতজনের অনুমোদিত সাধু গদ্যভাষা রচনার কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে, তার আলোচনাই এই যুগে রচিত বাংলা গদ্যের প্রকৃত বিচার।

কেরি, বিদ্যালঙ্কার ও রামরামের পর গোলোকনাথ, তারিণীচরণ, চণ্ডীচরণ, রাজীব লোচন ও হরপ্রসাদের রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তাঁরা বাংলা গদ্যকে পূর্বোক্ত ত্রয়ীর মতো এগিয়ে দিতে পারেন নি। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তাঁদের উদ্ভবের সার্থকতা শুধু ঐ তিনজনের ধারা অনুসরণে এবং কখনও কখনও সেই ধারা সংরক্ষণে। ভাষা, রীতি, শৈলী বা অভিনব সংযোজনা বলতে তাঁদের নিজস্ব কিছু ছিল না। গোলোকনাথের রচনা থেকে বোঝা যায়, সেযুগের লেখকেরা একটা তত্ত্ব বেশ বুঝতে পেরেছিলেন: সেটা এই যে, কথোপকথনের ভাষায় লোকের মুখের জবানিই প্রযুক্ত হওয়া দরকার। রচিত সাহিত্যে অন্যত্র আদ্যোপান্ত দুরূহ ভাষা ব্যবহার করে এই সব পণ্ডিতেরা কথোপকথনের বর্ণনা দেবার সময় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে অপেক্ষাকৃত লঘু ও প্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন। এই বৈশিষ্ট্য মৃত্যুঞ্জয়, কেরি প্রভৃতি প্রায় সকলের লেখাতেই দেখা যায়। বাস্তব জগতে দুটি লোকের মধ্যে যেভাবে কথাবার্তা হয়, গদ্যভাষাতে কথোপকথন বর্ণনার সময় সেইভাবে নিছক মুখের ভাষায় মিললে ভালো হয়, সেটাই স্বাভাবিক, সজীব ও চিত্তাকর্ষক হয়, এই সত্য সেযুগের গদ্যস্রষ্টাদের মনেও জাগরূক ছিল। কিন্তু যথেষ্ট সৎসাহসের অভাবে তাঁরা তখনও উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি।

কলিকাতা তখনও সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের একমাত্র প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলের শিষ্ট সমাজের ব্যবহৃত কথ্যভাষা তখনই আদর্শ কথ্যভাষা বলে স্বীকৃত হয়েছে। চব্বিশপরগণা জেলার বৈশিষ্ট্য অভিশ্রুতি যুক্ত হয়ে সেই কথ্যভাষা খাঁটি ‘কলকেত্তিয়া” কথ্যভাষা-রূপে সর্বজনপরিচিত হয়। কলিকাতার সেই শিষ্ট চলতি-ভাষাই বর্তমানকালের আদর্শ চলতি ভাষার গদ্য গঠন করেছে। বাইরের প্রভাব সামান্য পরিমাণে এসে পড়লেও সাহিত্যের চলতিভাষা মোটামুটি কলিকাতার ভদ্রসমাজের মৌখিক ভাষার উপর নির্ভরশীল। আর সেই ভাষা উনিশ শতকের প্রথম পাদেও সংগঠিত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। তবুও অতিরিক্ত সাধুভাষাপ্রিয় পণ্ডিতবর্গ সে-সময়ে ঐভাষায় সাহিত্য বা পাঠ্য-পুস্তক রচনার চেষ্টা করতে বিরত থাকেন। তার ফলে ভারতচন্দ্র পদ্যের ভাষায় যা করেছিলেন, গদ্যে তার অনুরূপ অগ্রগতি তাঁর পর এক শতাব্দীর মধ্যেও হয় নি।

পূর্ববর্তী কোন কোন আচার্য যেখানেই একটু তৎসম শব্দবিরলতা দেখেছেন, সেখানেই কথ্যভাষা ও কথ্যরীতির অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের ঐ ধারণা নিতান্ত যুক্তিহীন। সহজ বা কম তৎসম শব্দ ব্যবহার করলেই কথ্যভাষার প্রয়োগ হল, এমন বলা যায় না। ক্রিয়াপদ, সর্বনাম এবং তদ্ভব শব্দ বাহুল্যের যে অনায়াস, স্বচ্ছন্দ ও সর্বত্রচারী রীতিকে চলতি ভাষা বলা যায় তার প্রয়োগ কৌশল অবগত হওয়া শিক্ষা ও সাধনা-সাপেক্ষ। সাহিত্যের চলতি ভাষা সাধু বা গ্রাম্য, কোন ভাষাই নয়। উপযুক্ত শিক্ষা সে যুগের পণ্ডিতদের ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তেমন কোন সাধনা তাঁদের চেতনায় দূর দিগন্তেই ছিল। সর্বজনবোধ্য সুসমঞ্জস রচনারীতির আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের লেখায়, তাঁহারা—তাঁরা, করিলাম—করলুম, বা করলাম হৃদয়ঙ্গম—স্পষ্ট বোঝা, এমন প্রয়োগ তাঁরা কখনও ভাবতেও পারেন নি। মৃত্যুঞ্জয় যে-ভাষাকে “নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা” বলে গেছেন, সেই রামমোহন-বিরচিত ভাষাও আধুনিক কথ্য ভাষার গদ্য থেকে বহু দূরে। “শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত” গ্রন্থের অতিচমৎকার গদ্যভাষাকে মৃত্যুঞ্জয় নিশ্চয় বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু তাঁকেও রঙ্গচ্ছলে দাসীর মুখের ভাষায় প্রায় আধুনিক চলতি ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে না হোক, তার দ্বারা পরোক্ষ ভাবে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, রচনায় উল্লিখিত চরিত্রের মুখের ভাষা, সে যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোকের বাস্তব জগতে ব্যবহৃত ভাষার অনুরূপ হওয়া উচিত।

এখন বাংলা গদ্যের ক্রমিক রূপান্তরের ধারায় ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রত্যেক বইএর দান কতটুকু, সেবিষয়ে বই-ওয়ারি আলোচনা করা যেতে পারে। বলা দরকার যে, কোন বই মৌলিক রচনা না হলেও ভালো এথএর ভালো অনুবাদ হিসাবে সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে কিন্তু কোন কোন বই মৌলিক রচনা হলেও রসস্ফুরণের অভাবে প্রায়ই সাহিত্যস্বীকৃতি না পেতে। সুতরাং রামরাম মৌলিক গদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন বলেই যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে যাবেন এবং অনুবাদক বলেই মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সাহিত্যমূলক হ্রাস পাবে, তা নয়, গদ্যভাষা সৃষ্টিতে কার দক্ষতা বেশি তার বিচারই আমাদের কাছে আসল বিবেচনার বিষয়। আমরা সাধারণ ভাবে আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র” থেকে “প্রবোধচন্দ্রিকা” পর্যন্ত ১৮০০—২৫ সালের মধ্যে লেখা সমস্ত গদ্যরচনার সাহিত্যমূল্য সামান্য। গ্রন্থাবলীর লেখকদের মধ্যে কে বড় সাহিত্যিক সে-আলোচনা এখনকার পাঠকের কাছে হাস্যকর ও অবান্তর বলে মনে হবে। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে সে-আলোচনা সেরে বেশি মনোযোগ দেব, গদ্যভাষার অগ্রগমনে, তা সে উন্নতির বা অবনতির যে পথেই হোক না কেন, কে কত খানি সাহায্য করেছেন তাঁর রচনার দ্বারা, তার বিশ্লেষণে।

প্রথম বই “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র” ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার এই সব কারণে তারকাচিহ্নিত হবার যোগ্য:—

(১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম বই;

(২) উনিশ শতকের প্রথম বাংলা ছাপানো বই;

(৩) বাংলাভাষার প্রথম জীবন-রচিত;

(৪) প্রথম বাঙালির ভাষায় লেখা ও বাংলা হরফে ছাপানো বই;

(৫) এই বইটিতে সর্বপ্রথম বাঙালি গ্রন্থকার বাংলা গদ্যভাষার

সংস্কৃত ও ফার্সি প্রভাবের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করে ভারতচন্দ্রের "যাবনী মিশাল" পদ্যভাষার অনুরূপ উপাদানে গদ্যভাষা গঠনের কাজ সুরু করে দিয়েছেন;

(৩) বইটির ভাষা রামমোহন কর্তৃক সংশোধিত বলে জানা গেছে যা বোঝা যায়, রামমোহন তরুণ বয়সেই বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ বিধানে ব্রতী ছিলেন।

বইটি পড়লে বোঝা যায়, সাহিত্য গুণে বইটি যেমনই হোক, বাংলা গদ্যভাষার সামঞ্জস্য-সূত্রটি এতেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে—যে-সূত্র ধরে চলতে থাকলে একদিন বাংলা গদ্যের ঠিকভাবে নিজের কাজে দেশি ও বিদেশি শব্দাবলীকে ব্যবহার করার কথা। রামরাম মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় নিকৃষ্ট গদ্য নিয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর ভাষার মহৎ কৃতিত্ব এই যে, গদ্যে তিনিই প্রথম আন্তরিক যত্নের সঙ্গে ভাবকে সুস্ফুটকরার কাজে দেশীয় ও বৈদেশিক শব্দ সম্ভার অপক্ষপাতে ব্যবহার করেছেন। যে-নীতি এক্ষেত্রে অনুসরণীয়, রাম রাম তা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফার্সি শব্দাবলী একেবারে ছেটে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তবে বাংলা গদ্য আত্মবিকাশের শ্রেষ্ঠ পথ খুঁজে পাবে, এই মূলনীতি খুজে বার করার মতো দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। স্রষ্টা রূপে না হলেও দ্রষ্টা হিসাবে তিনি এই কারণে মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন।

ভাষার শব্দসম্ভার প্রয়োগের মূলনীতি আবিষ্কার করলে কি হবে, সেই নীতিকে ভাষায় রূপ দিয়ে ভালো গদ্য রচনায় ক্ষমতা কেরি সাহেবের মুন্সির ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় প্রকৃতিতে রক্ষণশীল হলেও বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতবহুল একটা দৃঢ় ও ঋজু রূপ দান করে গেছেন। মোটের উপর স্থাপত্যধর্মী সেই গদ্য বেশি শুদ্ধ, সুসম্বদ্ধ ও ভাবপ্রকাশসমর্থ। রামরামের দৃষ্টি প্রগতিশীল, সৃষ্টি অপকৃষ্ট; মৃত্যুঞ্জয়ের দৃষ্টি পশ্চাৎপন্থী, সৃষ্টি সুসংহত। মৃত্যুঞ্জয়ের "বত্রিশ সিংহাসন"-এ বিদ্যাসাগরের "বেতাল পঞ্চবিংশতি-র স্পষ্ট পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। রামরামের গদ্যভাষার তেমন কোন মহৎ পরিণতি লাভ হয় নি। তার কারণ, পরবর্তী কালে ফার্সি প্রভাব একেবারে বর্জন করে মোটের উপর মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের ধারাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়। ছোট-বড় প্রায় সমস্ত লেখক সজ্ঞানে মৃত্যুঞ্জয়কেই মেনে নিয়েছিলেন রামরামকে উপেক্ষা করে। এইভাবে পথিকৃৎ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় জয়লাভ করেছেন, উদারতর মনোবৃত্তি ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়েও রামরাম পথপ্রদর্শকরূপে তখনকার লেখক সমাজে পরিগৃহীত হন নি। অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র কতকাংশে এবং আরো অনেক পরে প্রমথ চৌধুরী সর্বাংশে রামরামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করেন। রামরামের অব্যবহিত কাল পরে তাঁর ধারাটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য যেমন বিদ্যাসাগরের গদ্যে সার্থকতম উদ্বর্তন লাভ করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত রামরামের গদ্য তেমন কোন শক্তিশালী পরবর্তী লেখকের সমর্থন পায় নি। এই জন্যে তিনি বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তীকালে যখন কথ্যভাষায় গদ্য রচিত হল তখন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং প্রমথ চৌধুরী তাঁর কাছে কোন ভাষাগত সহায়তা পাননি কিম্বা রামরামের গদ্যভাষা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার কোন কারণও তখন আর বিদ্যমান ছিল না।

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" গ্রন্থেই রামরামের প্রধান দুর্বলতা পরিস্ফুট: তিনি সংস্কৃত ভালো না জানার জন্যে শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে পারতেন না। এই বইটিতে আরবি-ফার্সির বহুল প্রয়োগে সংস্কৃত ভাষানুরাগী পাঠক বিরক্ত হবেই। তাঁকে কেবল ঐ কারণে কোন কোন সমালোচকের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। বৈদেশিক ভাষায় বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা করার অজুহাতেও তাঁর সেই যুগে অত বেশি ফার্সি ব্যবহার সমর্থন করা চলে না। যুদ্ধ, রাস্তার কাজ, রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ে তখনকার সমাজে ফার্সি শব্দের ব্যবহার উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। ঐ সব ব্যাপারে সংস্কৃত না হোক, তদ্ভব ও দেশজ শব্দ আরো বেশি ব্যবহার করলে রামরাম সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। যাঁর ফার্সি ব্যবহারের সাহস ছিল তাঁর আরও বেশি প্রচলিত বাংলাভাষার নিজস্ব শব্দাবলী ব্যবহারে পরাঙ্মুখতার কারণ দুর্বোধ্য। মনে হয়, ফার্সির দিকে তাঁর একটু বেশি টান ছিল। সে-যুগে শিক্ষিত কায়স্থ মুন্সির পক্ষে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও সে যুগের যুগবাণী ছিল ঠিক বিপরীত। সুতরাং ক্ষীয়মাণ ফার্সি প্রভাবকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে একদিক থেকে তিনি যেন প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই তাঁর উদার মনোভাব প্রশংসনীয় হলেও নবাবি শাসনে বীতশ্রদ্ধ বাঙালির মন তখন সর্বতোভাবে ফার্সি প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। উনিশ শতকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলিম লেখকের লেখাতেও তাই ফার্সির প্রভাব ক্ষীণতর দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল হারানো মানস—তথা ভারতীয়-সত্তা ফিরে পাওয়া। সংস্কৃতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা তাই অনিবার্য পরিণাম হয়ে দেখা দিল। ইংরেজ নিজ প্রয়োজনে ঐ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করে। রামরামও পরেও বই লেখার সময় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থাকবেন। কেন-না, তাঁর পরের বই-এ ফার্সির প্রয়োগ খুব কমে গেছে।

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বই কেরি-র "কথোপকথন" আদৌ উপেক্ষনীয় নয়। তিনি সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যে ধরে-বেঁধে হলেও অন্তত চলতি ভাষাকে প্রথম বাংলাগদ্যে স্থান লাভের সুযোগ দেন। এই প্রয়াস কথ্যভাষার সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেবার জন্যে নয়। বইটির ইংরেজি নামেই প্রকাশ যে, তার উদ্দেশ্য অসাহিত্যিক: "Dialogues intended to Facilitate the acquiring of the Bengali Language।" তবু, যে-যুগে বাঙালি বিদগ্ধ সমাজ গ্রন্থে কথ্যভাষার স্থানলাভ অমার্জনীয় ত্রুটি বলে গণ্য করতেন সে-যুগে কেরি যে খানিকটা চলতি বাংলাভাষাকে গদ্যের পদবীতে উন্নীত করে পাঠ্যপুস্তকে আসন দিয়েছিলেন তাতে গণভাষাসরস্বতী আশাতীত সম্মানলাভ করেছিলেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থের তুলনায় "কথোপকথন" এর এই সব নিদর্শনের ভাষা বৈপ্লবিক ভাবে উন্নত:—

"সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত; দেখ দিকি, তাঁহারা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন? আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। তাঁহারদের পূর্ব বিবরণ আমরা সমস্তই জানি, মাতাপিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না। যতক্ষণে বড় ভট্টাচার্য কিছু দিতেন, তবেই সেদিন নির্বাহ হইত, নতুবা হরিমটুক!"

এই অংশে দু একটি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সামান্য পরিবর্তন করলেই আধুনিক চলতি ভাষার গদ্য গড়ে উঠবে।

(ক্রমশঃ)

আচরণ-বিভ্রম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এর পর ত্রিবিধ ধৃতির বর্ণনা দিলেন নারায়ণ। বল্লেন—

"হে পার্থ, যে একাগ্রতায় ঐকান্তিক ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদয় এক বিষয়ে নিবদ্ধ করা যায় সেই ধৃতি সাত্বিক।

বলা বাহুল্য একাগ্রতার ফলেই মানুষের মনে প্রকৃত ভক্তি এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়। তন্ময়তা লাভ হয়—জ্ঞান-প্রদীপ শিখার সকল বিক্ষেপ বন্ধ রাখলে। ইতস্তত ধাবমান মতিকে এক স্রোতে না বহালে ধৃতি হয় নিরর্থক।

রাজসিক ধৃতি ধর্ম্ম, অর্থ, কামকে ধারণ করে সত্য, কিন্তু তার প্রত্যাশা সাফল্য লাভের। প্রত্যেক বিষয়ে মন সংযোগ করে রাজসিক প্রবৃত্তি কেবল ফলের আকাঙ্ক্ষায়। সে ধৃতির মূলে থাকে লোভ। সে ধৃতি লোভের রূপকে ধারণার বাইরে রাখতে পারে না।

দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করেনা, তার নাম তামসী ধৃতি।

মানুষ ছোটে সুখের পশ্চাতে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম-পথে না বিচরণ করলে সে কি চরম সুখ লাভ করতে পারে? একই মনোবৃত্তির প্রেরণা এবং উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার ফলে প্রায় শক্তি নিয়োজিত হয় বিভিন্ন পথে। পরমহংসদেব বলেছিলেন, ব্যাকুলতা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর নয়। এ কথাও সত্য যে মান, যশ, অর্থ, সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল সাফল্যের মূলে থাকে ব্যাকুলতা। তাই পরমহংসদেব বলেছিলেন, সাংসারিক সাফল্যের জন্য যেমন চেষ্টা করে মানুষ, ঈশ্বর লাভের জন্য তেমন চেষ্টা করলে, তার শ্রম ও আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়না।

মানুষ ছোটে সুখের সন্ধানে। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, কোথায় তার বসতি, কোন্ কর্মে প্রকৃত সুখ লভ্য, সে বিষয়ে মানব-সমাজ তো একমতি নয়। আলেয়ার আলোককেই ভাবে সুখের জ্যোতি। কারও সুখ কামিনী-কাঞ্চনে। কেহ হয় স্ফীত-শির, সুখের অনুসন্ধান করে পরের উৎসাদনে, অন্যের নিগ্রহে আপনার প্রাধান্য প্রমাণের উদ্দেশে।

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ সুখেরও বর্ণনা দিলেন। তিনি বল্লেন—সাত্বিক সুখ কথিত হয় সেই সুখ, যে প্রথমে বিষের মত, পরিণামে অমৃততুল্য। সে সুখে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে।

আত্ম-বুদ্ধিতে মানব প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয়। আত্ম-জ্ঞানে তত্বজ্ঞান। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর, পরব্রহ্মের সূত্র বিদ্যমান জীবে। সুতরাং মায়াময় এই পৃথিবীর অন্তরালে রয়েছে যে প্রকৃত শাশ্বত অমৃতময় জীবন—সে আনন্দময়। সে আনন্দধামের চিরানন্দের অনুভূতি সম্ভবপর কি এই মায়াময় জগতের ক্ষণিক সুখে? লোভ হতে মুক্ত করতে না পারলে প্রবৃত্তিকে, সে সুখের সন্ধান নিরর্থক। অথচ সে সন্ধানে আচরণকে প্রতি পদে করতে হয় সাত্বিক। নিষ্কাম কর্ম, পরে কর্ম্মসন্ন্যাস। সে অবস্থায় যোগের অনুষ্ঠান—শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য—এ-সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে ক্লেশ। কিন্তু অন্তে সুখ। সেই সুখই আনন্দ। সে আনন্দ তুচ্ছ স্বার্থঘেরা ক্ষণিক তুষ্টি নয়। সে সুখ ভূমায়—বিস্তারে। তাই সাত্বিক সুখকে অগ্রে মনে হয় বিষের ন্যায়, অন্তে আত্মপ্রসাদ জন্মে সে সুখে।

রাজসিক সুখের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

যে সুখের উৎপত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হ'তে, যে সুখ অগ্রে অমৃতের মত কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, সে সুখ রাজসিক।*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আচরণের। বড় বড় সাম্রাজ্য জয়েও আকাঙ্ক্ষার প্রসমন হয়না। বীর যোদ্ধারা নীত-

---

* গীতা—১৮।৩৮

শ্রদ্ধ হয় পার্থিব সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে। তাদের অসন্তোষ বিস্ময়। বলা বাহুল্য মনও একটি ইন্দ্রিয়। মনের বিষয় সংযোগ—ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ। ভাণ্ডারজয়, রাজ্যজয়, কীর্ত্তিজয় সবই মনে সন্তোষ আনে ক্ষণিক। উৎসাহ, উদ্যম, পরিশ্রম এবং উদ্দীপনা সকলই মনে হয় বৃথা যখন সাফল্যের সুখ তৃষ্ণা বাড়ায় এবং পরিণামকে করে তিক্ত। রাজসিক লোভের লাভের সন্তোষ তো সে সন্তোষ নয়, যার বিষয় কবি বলেছেন—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাম্ যৎসুখং শান্তচেতষাম।

কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম।

শান্ত-চিত্ত সন্তোষামৃত তৃপ্তজনের যে সুখ—সে সুখ কোথায় তার যে ধনের লোভে সদাই ইতস্ততঃ ধাবমান।

দৃশ্যে, ঘ্রাণে, ছন্দে, রসে ও স্পর্শে সুখ পায় জীব। সে সুখ নশ্বর। তাই ইন্দ্রিয় সুখ আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়—নিবৃত্তির তৃপ্তি দান করতে পারেনা। কিন্তু তারা উপভোগ্য হয় অধিক যখন মন বোঝে সে এরা এক অনন্ত-সুখের আভাষ। তখন চিত্ত ধায় প্রকৃত সুখের উৎসের সন্ধানে। রাজসিক সুখ নিজের ব্যর্থত্যা বোঝে। কর্ম্মীর প্রাণে জাগায় প্রেরণা সুধামৃত সন্ধানের। কিন্তু নিদ্রাতুর, অলস, দীর্ঘসূত্রীর অবসর নাই চিন্তার। মোহে আবৃত তার জ্ঞানবুদ্ধি। তার আন্তোপান্ত সুখ মূঢ়তার অনুপলব্ধিতে। তামসিক সুখের বর্ণনা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাই কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে।—

যে সুখ অন্তে পরিণামে বুদ্ধির মোহ জনক, নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ হতে উত্থিত, সেই সুখের নাম তামস সুখ।

প্রমাদ মনুষত্বকে নষ্ট করে, তাই ভগবান বুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে ছিলেন জগৎকে অপ্রমাদ হ'তে।

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।

অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

অপ্রমাদ অমৃতপদ, প্রমাদ মৃত্যুর পদ। অপ্রমত্তের মৃত্যু নাই। কিন্তু প্রমত্ত মৃতের মতো।

ত্রিগুণের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ আহারেরও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য শরীর ধারণের প্রধান প্রয়োজন আহার। কিন্তু মাত্র কি শরীর-ধারণের উদ্দেশ্যে জীব আহার্য্য গ্রহণ করে? ভোজনের তৃপ্তির কথা আলোচনা করলে বোঝা যায় আহারের বাসনা এবং তার পূরণের রূপ। ভোজন কেবল জিহ্বার প্রয়োজক নয়—তার সাথে মিশে থাকে গন্ধ ও স্পর্শের অনুভূতি। সুতরাং কোন্ খাদ্য কার প্রিয়, সে সমাচার লাভ করলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝতে পারে ভোজনকর্ত্তার মানসিক অভিরুচি। তাই আমরা শুনেছি—

সাত্ত্বিক আহার্য্য—আয়ুঃসত্ত বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, স্থির, হৃদ্য।*

রাজসিক লোকের ইষ্ট ভক্ষ্যবস্তু—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতিশয় প্রবাহকারী। এরা দুঃখ, শোক এবং রোগের জনক।

তামসপ্রিয় খাদ্য—বহুপূর্ব্বে পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনের রাঁধা উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র।

তুলনা করলে দেখা যায় এ শ্রেণীর ভোক্ষ্য পূর্ব্ব দুই প্রকার আহার্যের বিরোধী। এবং রাজসিক ও তামসিক আহার হতে বিভিন্ন। সাত্ত্বিক আহার সরস। রাজসিক—অতিকটু, তামসিক গত রস। অতি উগ্র, স্থিরতার-বিরোধী। অতি উষ্ণ—হৃদ্যত্বের বিরোধী, সাত্ত্বিক আহার সুখপ্রীতিবর্দ্ধক—রাজসিক দুঃখ শোকপ্রদ।

সাত্ত্বিক—আয়ুঃ সত্ত বলবর্দ্ধক—রাজসিক আময়প্রদ, রোগের জনক। তামস আহারের তো কথাই নাই।

বিশ্বশক্তি মুগ্ধ করে জীবকে। তার হৃদ্দেশে নারায়ণের বাস কিন্তু জীব আত্মগুপ্ত। মায়ার খেলায় জগত তাঁকে সহজে চেনে না। সকল মানুষ বোঝে অস্তিত্ব এক শক্তির যার শক্তি অস্বীকার করবার উপায় নাই। প্রকৃত শক্তি-কেন্দ্রের স্থির অনুভূতি মোক্ষ পথ। কিন্তু মায়ার মোহে মানুষ দোলে সংশয়ের দোলায়। তার ফলে সে শ্রদ্ধা হারায়, যে শ্রদ্ধা তার সংস্কার, শ্রদ্ধা তাই ত্রিবিধ।

শ্রদ্ধানুরূপ উপলব্ধি মানুষের শক্তি সম্বন্ধে। এ সত্যও আমরা নিজ ও পরের অন্তঃকরণ বিচার করলে বুঝতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন সে যার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক সে দেবতাদের পূজা করেন। সেই দিব্য-জ্যোতিতে ক্রমশঃ মানুষ জানতে পারে সেই অনন্ত একে—যাঁর বিশ্বরূপের প্রথম ঝলকে অর্জ্জুন দেখেছিলেন তাঁর দেব দেহে সকল

* গীতা—১৭।৮

দেবতাকে, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতকে, কমলাসনস্থ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ব্রহ্মাকে সকল ঋষি এবং বাসুকি প্রভৃতি সকল সর্পকে।

রাজসিক ভাবাপন্ন লোক যজনা করে যক্ষ ও রাক্ষসদের। কুবের যক্ষ। ধনপতি কুবের তাই যক্ষের পূজা করে ধনরত্নাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায়। নৈঋতাদি রাক্ষস পার্থিব শক্তির কেন্দ্র, তাই রাক্ষস পূজা।

আর তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পূজা করে ভূতপ্রেতাদি।

তামসিক প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষের তপস্যাও ভাবণরূপ ধারণ করে। এরা দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে তপস্যা করে। অবিবেকী লোকের তপস্যায় শরীরের মধ্যে যে সব করণ আছে তাদের কৃশ করে। আত্মাকেও তারা কৃশ করে, কারণ প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ও ধারণা ক্রমশঃ হয় দুর্ব্বল। সত্যই তেমন পূজা পূজা নয়। তাদের তপস্যা আসুরিক।

পূজা ও যজ্ঞাদি সকল শাস্ত্রে বিহিত। যজ্ঞের দ্বারা মন হয় স্থির, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ কর্ম্ম-অর্ঘ্যে প্রকৃত পক্ষে উন্নত হয় মন। ভগবান বলেছেন—সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য—যখন প্রকৃত সন্ন্যাসের প্রবৃত্তিতে অনু-প্রাণিত হয় সাধক। কিন্তু যাগ যজ্ঞ, যজন, পূজন ত্যাগ না করাই কর্ত্তব্য। পূজা বা যজ্ঞের দ্বারা মনের বেগ প্রশমিত করলে ধ্যান ও সমাধির পথ হয় পরিষ্কার। পরম-হংসদেব বলতেন, ভোজনে বসবার পূর্ব্বে যেমন হাততালি দিয়ে ঘরের পায়রা তাড়াতে হয়, তেমনি ধ্যানের পূর্ব্বে পূজার অনুষ্ঠান।

ভগবান বল্লেন—ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত-ব্যক্তি যজ্ঞ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম এই ধারণায় মন সমাধান করে, শাস্ত্রবিহিত উপায়ে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ হয় সাত্ত্বিক।

ফল কামনা পূর্ব্বক এবং নিজের মহত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তেমন যজ্ঞকে জেনো রাজসিক যজ্ঞ।

শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, দক্ষিণা নাই, শ্রদ্ধা নাই—তেমন যজ্ঞকে বলা হয় তামস।*

* গীতা—১৭।১১।১২।১৩

যাগ যজ্ঞের আজ অভাব নাই। কিন্তু বড়ই পরি-তাপের বিষয় আমরা পূজামণ্ডপে, মন্দিরে ও দেবগৃহে প্রকৃত-সাত্ত্বিক পূজা দেখি না। দেখি অবিধি, দম্ভ এবং রেষারেষির প্রতিযোগিতা। জপ, তপ, সকল অনুষ্ঠানে প্রতীয়মান হয়—ত্রিগুণময়ী মায়া দেবীর এক একটি গুণ। কেহ তপ করে সাত্ত্বিকভাবে—শ্রদ্ধার সহিত, অফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে। রাজসিকের তপে—দেখি দম্ভের বিকাশ। আর তামসিক-প্রকৃতি লোকের তপে স্পষ্ট উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান —পরের উৎসাদনের জন্য নিজের দেহের পীড়া এবং মূঢ়তা।

দানের ও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন নারায়ণ গীতায়। যে দান কেবল কর্ত্তব্যবোধে দেশ, কাল ও পাত্রের যোগ্যতা, বিচার করে দেওয়া হয়, যে দান প্রত্যাশা করে না প্রত্যুপ-কারের—সে দান সাত্ত্বিক।

ফল উদ্দেশ্যে বা প্রত্যুপকারের লোভে, খেদক্লিষ্ট হয়ে যে দান করা হয় সে দান রাজসিক।

অনুপযুক্ত দেশে ও কালে, অপাত্রে সৎকার না করে অবজ্ঞা ক'রে সে দান প্রদত্ত হয় সে দান তামসিক।

অথচ আমরা প্রত্যেকে জানি যে দান চরিত্রকে করে উন্নত, পরকে করে আপন। বেদ হতে সকল শাস্ত্র হিন্দুর, বৌদ্ধনীতির বিশেষ শিক্ষা, প্রভু যীশু এবং হজরত মোহম্মদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ—দান। কিন্তু এর প্রকার-ভেদও স্পষ্ট। দান পরকে করতে পারে আপনার জন—যদি অন্তর হতে উদ্‌ভূত হয় প্রবৃত্তি। পরকে যে আপন করতে না পারে তার পক্ষে জগদীশ্বরের উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। কারণ মণিমালার তিনি সূত্র। প্রত্যেক জীব এক একটি মণি সে বিরাট মাল্যের।

লীলাময়ী প্রকৃতির খেলায় আমাদের নিত্যই বিস্মিত করে তাঁর ত্রিগুণ। ধীর শান্ত আকাশে ফুটে ওঠে চন্দ্র, সুষমা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। জ্যোৎস্না ধুইয়ে দেয় জল স্থল, মলিনতা হয় দূর পৃথিবীর দেহ হ'তে। সে আনন্দের লহরে সাড়া দেয় মানুষের মন। কে যেন হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায় প্রকৃতির মাধুরীময় লীলাকাননে। সৃষ্টিতে দেখে লোক শান্ত জগৎ। মানুষের চিত্তে প্রকৃতির লীলা-রঙ্গের প্রতিক্রিয়া সামান্য নয়। আবার ঝঞ্ঝা ওঠে, বায়ু বহে প্রচণ্ড মত্ততার তালে, কানন ভাঙ্গে—গাছ পালা,

শাক্ সবজী হয় উৎক্ষিপ্ত। বন্ধ হয় পাখার গান, প্রাণ বিহ্বল হয়, আত্মরক্ষার চিন্তা ওঠে, প্রাণ করে ত্রাহি ত্রাহি! প্রকৃতির এ রাজসিক চাঞ্চল্য চঞ্চল করে মানুষের চিত্ত। হয়তো সে ভগবানকে ডাকে, বলে—ত্রাণ কর হরি, প্রশমন কর তাণ্ডবলীলা, রক্ষা কর তোমার সৃষ্টি। সে প্রার্থনা রাজসিক। আবার যেদিন গ্রীষ্মে, তাপে পুড়িয়ে মারে প্রকৃত জীবনের সকল প্রেরণা, উদ্যম এবং কর্ম্ম-শক্তি—দারুণ তামসিক ভাব আসে প্রাণে। জড়তা ভুলিয়ে দেয় আমাদের জন্মগত সমৃদ্ধি, আমাদের ক্রীড়ার কর্ম্মকেন্দ্র হয় বন্ধ।

সারা গীতার ঐতিহাসিক কাণ্ড কি ত্রিগুণের লীলার চমৎকার দৃষ্টান্ত নয়? তামসিক ভাব এসেছে। অর্জ্জুনের হাতের গাণ্ডীব পড়ছে খসে। শুকাচ্ছে ত্বক। দারুণ জড়তা, কিসের যুদ্ধ, কেন পরিশ্রম? প্রকৃত তামসিক সেভাব।

তখন তাঁর আচরণকে করতে হবে রাজসিক। চাপ্‌তে হবে তমো। জাগাতে হবে কর্ম্মক্ষমতা। বল্লেন কৃষ্ণ—ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ ন তৈতত্ত্বদুপপদ্যতে। ছিঃ ছিঃ বীরচূড়ামণির ক্লীবতা! বল্লেন—ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। ওঠ, জাগো, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কর পরিহার।

এ শিক্ষা প্রতিদিনের, প্রতি জীবের জন্য, যে মনের একটা আচরণ তামসিক, তারই অন্য ব্যবহার রাজসিক। মনের শাসনে তার তিন দিকের যেদিক ইচ্ছা ভোগ করা যায়, তাকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দিলে তার আচরণের সীমা থাকে না।

গীতায় দেখি প্রথমে তামসিক ভাবের চূড়ান্ত, তার পর রাজসিক ভাবের উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজসিক বৃত্তিকে বেগ দিয়ে তার মাধ্যমে দিচ্ছেন উপদেশ। বোঝালেন তিন প্রকার গুণের কথা। বিশ্বরূপ দেখালেন। সাত্ত্বিক আচরণের পরিচয় দিলেন। জীবকে শেখালেন—জীবই শিব। পরকে আপনার না করলে শান্তি নাই। অলস ভাবে যা হয় হক, এ আচরণে দুঃখসাগর পার হবার ভেলাটি অবধি পাওয়া অসম্ভব। কেবল ফল প্রত্যাশায় কার্য্য করলে মুক্তি নাই। আনন্দ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিতে। কিন্তু সেই প্রবৃত্তি অপর দুটির সাথে বাঁধা। কে জানে কখন পট হয় পরিবর্ত্তন। তাই চরম শিক্ষা—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈ বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।*

দেহোৎপত্তির কারণ এই তিন গুণ। দেহী এই তিন গুণকে অতিক্রম করলে জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখ হতে বিমুক্ত হতে পারে। তখন সে লাভ করে অমৃত।

বড় রহস্যময় তত্ত্ব। তিন গুণ প্রকৃতি সম্ভব। এরা দেহীকে বাঁধে দেহে। সত্ত্ব নির্ম্মল, প্রকাশক, আনন্দদান করে এবং উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান। একেও করতে হবে অতিক্রম। এর দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব রাজসিক প্রবৃত্তিকে সে উৎপন্ন করে তৃষ্ণা এবং আশক্তি। সে কর্ম্মে বাঁধে জীবকে। সত্ত্বকে জাগাতে পারলে পারা যায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে। রাজসিক গুণ উদ্বুদ্ধ ক'রে নষ্ট করা যায় সেই আচরণ যে অজ্ঞানজাত তাই সৃষ্টি করে ভ্রান্তি। সে বাঁধে জীবকে প্রমাদে, আলস্যে, নিদ্রায় মূঢ়তায়।

কিন্তু আসল মুক্তি এই তিন গুণের অতীত হলে, তার কী লক্ষণ? কিরূপ আচরণ কবলে গুণাতীত হওয়া যায়। কী প্রকারেই বা তিন গুণ অতিক্রম করা যায়।

কেন হবে না? তবে শোন, বল্লেন সারথী গুরু।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে
গুণা বর্ত্তন্ত-ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥†

জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা মোহ উৎপন্ন হ'লে যিনি দ্বেষ করেন না এবং সেগুলি নিবৃত্ত থাকলেও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীন ভাবে স্থির থাকেন ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, যিনি গুণ তিনটি তো বিদ্যমান আছেই এ ভাব আয়ত্ত করে শান্তভাবে অবস্থান করেন তিনিই বিচলিত হন না।

এ অবস্থা গুণাতীত অবস্থা। পূর্ব্বে ভগবান বলেছেন চিত্তের সাত্ত্বিক অবস্থায় উদ্ভব হয় জ্ঞান। সে অবস্থায় মন বিচলিত হলে জগতের ভ্রান্তি তাণ্ডবের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়।

---

* গীতা—১৪।২০
† গীতা—১৪।২২।২৩।

তখন দ্বেষ হয় দুঃখ হয়। অমনি জ্ঞান পরিণত হয় রাজসিক জ্ঞানে—ক্ষোভ আসে, এমন কি জগতকে শিক্ষাদেবার লোভ আসে। কাজেই গুণ পাল্‌টে যায়, জাগে রাজসিক বৃত্তি।

রজো গুণ হ'তে জন্মে লোভ। সেই লোভের স্বপ্ন, লাভের আশা প্রমাদ আনে। সেই প্রমাদই মোহ। তাই রাজসিক প্রবৃত্তি ধরে তামসিক ভাব। এরা তিনটি পরিবর্ত্তনশীল। সত্ত্বের সুখ তো চিরস্থায়ী নয়। জ্ঞানীরও মনে আসে কর্ম্মপ্রবৃত্তি। কর্ম্মীরও মনে আসে অবসাদ।

তাই গুণাতীত হবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য. সংযম ও সুচিন্তার সাধনা আবশ্যক ; এ অবস্থা অভ্যাস করতে স্থির বিবেচনার ফলে বোঝা যায়, গীতার শিক্ষা কোনটি অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন নয়। কর্ম্ম জীবধর্ম্ম, কিন্তু দুঃখ এড়াতে হলে নিষ্কাম ধর্ম্ম আবশ্যক। নিষ্কাম কর্ম্ম হ'তে বোঝা যায় জগতের কর্ম্মের মূল—বৃথা আপনাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থিতে জড়ানো সে চিন্তায় আসে সন্ন্যাস। কিন্তু শরণ ও ভক্তি না থাকলে সব বিড়ম্বনা। ধ্যানে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়। অথচ সকল কর্ম্ম, সব চিন্তা, সব ধ্যান করতে হবে জীবকে যে তিনগুণে বাঁধা। এই প্রত্যেক অবস্থা একটি অন্যের সহায়ক, অভ্যাসে সবগুলি আয়ত্ত করলে হবে জীব—গুণাতীত। জ্ঞান, লোভ বা প্রমাদ তাকে বিচলিত করবে না—ঈশ্বরে শরণ তাকে দেখাবে চরম ও পরম পদ।

সংসারে গুণাতীত হবার মত চরিত্র অনুশীলনের স্পষ্ট উপায় দেখিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাদের আলোচনা করলে ঐ কথাই স্পষ্ট হবে প্রতীয়মান যে তাঁর বর্ণিত পতাকার তিন ভাগের একভাগ বাদ দিলে জয়যাত্রার নিশান উঠ্‌বেনা সাধকের হস্তে। ত্রিবেণীস্নানে মুক্তি—তিনটি স্রোত এক প্রবাহে মিললে ভাগীরথী। গুণাতীত হ'তে হ'লে সুখদুঃখে হতে হবে সমজ্ঞান। নিজের যে প্রকৃত ভাব, আত্মা জীবন রথের রথী সে ভাবে বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে। মনোরথের এলোমেলো ক্ষিপ্রমন্দ গতি আনতে পারেনা সে অবস্থা। মাটি, পাথর বা সোনাকে দেখতে হবে সমদৃষ্টিতে। এরা কেহ পারবেনা যখন মলিনতা, কঠোরতা বা লোভের উদ্রেক করতে প্রাণে, তখন জীব হবে গুণাতীত। তেমন অবস্থায় থাকবেনা কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয়। সে মানুষ হবে ধীর—মন তো হারাবে বিক্ষেপ। নিন্দাস্তুতির উচ্চে উঠবে তখন চিত্ত। মানই তার কি, কী বা অপমান, কে তার মিত্র, কে তার অরি—যার সমদৃষ্টি সকল জীবে। এ অবস্থায় উঠলে তো আর কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকবেনা। সে সন্ন্যাস কর্ম্মত্যাগ হবে প্রকৃত সন্ন্যাস। এই ত গুণাতীত অবস্থা।*

কিন্তু এ অবস্থা আসতে পারেনা আত্মসমর্পণ ভিন্ন ভগবানে। তিনি নাহি দিলে দেখা—কেহ কী দেখিতে পায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ চরম বাণী শোনালেন এ প্রসঙ্গে।

"এবং যিনি অবিচলিত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি এই ত্রিগুণ অতিক্রমের ফলে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।†

তিনগুণ প্রকৃতিগত। জীবন সমৃদ্ধ হয় সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ করলে সকল কর্ম্মে সকল ভাবে, জীবনের সকল অবস্থায়। কিন্তু তাতেও মুক্তি নাই, কারণ গুণ প্রকৃতিগত। তিনটির প্রত্যেকটির পাকে আবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই গুণাতীত হ'তে হবে সেই সাধককে—যে জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখের পেষণ হ'তে অমৃতধামে যাবার প্রয়াসী।

গীতার এই ত্রিগুণ তত্ত্ব পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। সেথা ব্রহ্মার স্তবে শুনি—

প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী
কালরাত্রি মহারাত্রির্মো'হরাত্রিশ্চ দারুণা।

তুমি সবার প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা তোমার স্বরূপ বিভাবিত হয়। সেই ত্রিগুণ লয়ের পক্ষেও তুমি ভয়ঙ্করী। তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি।

সেই গীতার কথা। প্রকৃতির অনুভব হয় সৃষ্টিতে ও জীবে তিনগুণে। কিন্তু মাত্র সেই তিনগুণেই তো প্রকৃতি বিশ্বকে বেঁধে রাখেন। তিনি এই নিজের সৃষ্টি বৈষ্ণবী-মায়ার লোপ করতেও পারেন। সেই তো সাধনা জীবনের। তিনি সৃষ্ট করেছেন গুণ। তিনি রেখেছেন তাদের প্রভাব বিশ্বসংসারে। আবার তাঁরই শরণে পরিত্রাণ—তিনি গুণাশ্রয় এবং গুণময়।

গুণাতীত হওয়ার কথা বল্লেন ব্রহ্মা। তুমি মোহা-

---

* গীতা—১৪।২৪।২৫

† মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৪,২৬

মোহ। প্রকৃতি মুক্ত করতে পারেন মোহ—তিনি মোহ-রাত্রি। মোহের প্রকাশ বন্ধ হয় রাত্রের দারুণ আঁধারে মোহ হারালে। সে রাত্রি প্রকৃতি স্বয়ং। তাঁর আশ্রয়ে তমোগুণাতীত হওয়া যায়। তাই তিনি মোহের জনয়িত্রী, আবার মোহের লোপসাধন করেন।

তিনি মহারাত্রি—মহত্তের বিকাশে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ। বিষয় সংযোগ ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় হয়। সেই মহত্তের প্রকাশ বন্ধ হয় মোহরাত্রে অর্থাৎ তার আলোক বর্ত্তিকার নির্ব্বাণে।

আর কালরাত্রি। কালের বিভাগ অনন্তের অনুভূতিকে করে খণ্ডিত। বিশ্বানুভূতি, অনন্তানুভূতি, শাশ্বত, নিত্যের জ্ঞান। সে জ্ঞান খণ্ডিত কালজ্ঞানে সম্ভব নয়। তাই কালকে নিমজ্জিত করতে হবে রাত্রের দারুণ আঁধারে। সে অনুভূতি গুণাতীত জ্ঞান। কালীর কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ভেদাভেদ হয় লুপ্ত।

তাই ব্রহ্মা বল্লেন—তুমি প্রকৃতি গুণত্রয় বিভাবিনী। আবার তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি। পূর্ব্বে তাকে স্তবে বলেছেন তিনি মহাদেবী, মহা—আসুরী। গীতা বলেছেন—জীবের দৈব এবং আসুর স্বভাব সম্পদ।

ব্রহ্মা বল্লেন—প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ব্বস্য—সারা বিশ্ব-প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

সত্যইতো ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের বিভাগ—কাল-প্রতীতি অতি শুভমুহূর্ত্তেও ত্যাগ করতে পারেনা জীব। কিন্তু তার রাত্রি না এলে কি প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত হওয়া সম্ভবপর। মহত্ব বিলুপ্ত না হ'লে রাজসিক ভাব কখনই দূর হ'তে পারেনা কারণ কর্ম্মই জীবের প্রকৃতি। জগতমোহ অনিত্য। সংসার সুখের মোহ এক অতি প্রবল বন্ধন। এ আচরণ উন্মুক্ত হলে তবে কর্ম্মক্ষমতা আসে, সম্যক দৃষ্টি লাভ হয়।

যদি স্থিরমতি হ'য়ে মানুষ নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তা হ'লে সন্দেহ থাকবেনা স্বভাব আমাদের মোহ আনে, কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং আবার কল্যাণ করে সাত্ত্বিক-ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে। কিন্তু মানুষ তো প্রকৃতির খেলা সে দৃষ্টিতে দেখে না। স্পষ্টই ভগবান বলেছেন—

"প্রকৃতির গুণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে—আমিই স্বয়ং কর্ত্তা।"*

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ৩,২৭

অহঙ্কারবোধই মানুষকে পৃথক করে রাখে জগতে। তাই গুণাতীত হতে গেলে স্থিরবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত আবশ্যক যে গুণসমূহ গুণেতেই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের কথা—

হে মহাবাহু, গুণকর্ম্ম বিভাগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ গুণসমূহ গুণেতেই বিদ্যমান—এই কথা বুঝে কর্ত্তৃত্বা-ভিমান করেন না। প্রকৃতির গুণে বিমোহিত পুরুষ গুণ কর্মে আসক্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা আশার বাণী জাগে প্রাণের মাঝে। একটা মন্দ কাজ করে লোক, তার পর ভাবে আর তার উপায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ। স্থির-ভাবে, আত্মদর্শন করে যদি সে ভ্রমী, নিশ্চয় সে বুঝবে মোহের বশে, ভ্রান্ত রজোগুণের উদ্দীপনায় কৃত কর্ম্মের ফল সংশোধন সম্ভব, সাবধানে ঐ দুটি গুণের প্ররোচনা অতিক্রম করলে। সতর্কতায় কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর। সে ভাবশুদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করলে, পরিতৃপ্ত হয়ে সাত্ত্বিক ভাবে চিত্তকে প্রবুদ্ধ করলে এবং তাঁর শরণ নিলে, এড়ানো যায় বৃথা চিন্তা যে—মানুষ চিরদুঃখী, চিরপাপী, চিরঅনুতাপী। গুণময়ী গুণাশ্রয়কে উদ্বুদ্ধ করবার স্তোত্র দেবতারা শিখিয়েছেন চণ্ডী পুরাণে—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্ততে।

শরণাগত আর্ত্তজনের তুমি পরিত্রাণ-পরায়ণা। তুমি যে গুণাশ্রয়ে, গুণময়ে, নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার করি।

পরাপ্রকৃতি পরব্রহ্মের স্বভাব। প্রকৃতি অবিকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় লয়ে। কিন্তু গুণের বিকার বৈষ্ণবী মায়া—মায়ার জগতের সৃষ্টি। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন।

এ বিষয় বিশদ আলোচনা অন্যত্র আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ এবং সম্বন্ধ বিচার করেছে। গীতা পুরুষও প্রকৃতিকে বলেছেন অনাদি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রকৃতিকে বন্দনা করেছে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাঃ
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।

বিবিধ প্রজা (মহদাদিকার্য্য-প্রসূ) জনয়িত্রী লোহিত-শুক্ল কৃষ্ণা (রজঃ-সত্ব-তমঃ স্বরূপা) অদ্বিতীয় অজাকে (উৎপত্তি-রহিতা মূল প্রকৃতিকে) নমস্কার করি।

সমাজ-সংস্কারক রমেশ

শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল

শরৎ-সাহিত্যে ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর সমাজ-শাসিত দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের যে চিত্র সুপরিস্ফুট, পাক্-শরৎচন্দ্রীয় যুগের কোন কথা-সাহিত্যেই তাহার তুলনা মেলে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছোট গল্পে "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা নিতান্তই সহজ সরল" কাহিনীর মধ্য দিয়া পল্লীজীবনের সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের ভাষা দিয়াছেন। তবুও তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে আসিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার সাহিত্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের কথাই মুখ্য। এক শরৎচন্দ্রেই দেখি সাধারণ মানুষের ভিড়। বাংলার পল্লীজীবনকে ঘেরিয়া যে অচলায়তন সমাজ জীবনকে ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রস্তরকাঠিন্য এই সমাজের নিপীড়িত মানবাত্মার বিকাশে বাধা জন্মাইতেছে, শরৎচন্দ্র তাহার নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন 'পল্লী-সমাজে'। পল্লীর যে সমস্ত সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অনাচার আমাদের সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের ন্যায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্বে সমাজ-জীবন ছারখার হইয়া পড়িতেছে, সেই সমস্তর উপরই তিনি নির্মমভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন।

পল্লীসমাজের নায়ক রমেশ শিক্ষিত হৃদয়বান আদর্শ যুবক। তিনি জাতিভেদ মানেননা, প্রাচীন হিন্দুর ন্যায় বিভিন্ন সংস্কারেও আস্থাশীল নহেন। আবাল্য সহরে মানুষ। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে ফিরিয়াছেন। পিতৃশ্রাদ্ধ কেন্দ্র করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়যন্ত্রপরায়ণতা ও নীচাশয়তার যে-পরিচয় তিনি পাইলেন তাহাতে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল আজিকার পল্লী-বাংলার স্বরূপ। কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধপণ্ড, মিথ্যা সাক্ষী, মামলা-মোকর্দ্দমা, জাল-জুয়াচুরি—এই সমস্তই যেন গ্রামগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। দূরে শহরে বসিয়া পল্লীর নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নিঃস্বার্থ-পর, নিরুদ্বিগ্ন, শান্তি-স্বচ্ছন্দময়তার রঙিণ স্বপ্নে রমেশ এতদিন মশগুল ছিলেন। আকস্মিক পল্লীজীবনের রূঢ়তার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। বুঝিলেন "একি ভ্রান্তি! তাঁহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এত পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই। তাই আমাদের জীর্ণপ্রায় পল্লীসমাজের দৈন্য দূর করিয়া তাহার সংস্কারের জন্য সমস্ত নীচতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের ব্রত হইল স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরী, খানাডোবা পরিষ্কার। এই সমস্ত সৎকার্যও যখন গ্রামবাসীরা সন্দেহের চোখে দেখে, তাঁহার গরজ ঠাওরায়, উহাতে স্বার্থসিদ্ধির গন্ধ পায়, তখন তিনি তাহাদের উপর অভিমান করিয়া জন্মভূমি ত্যাগের সংকল্প করেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর মৃদু ভর্ৎসনায় তাহার চৈতন্যোদয় হয়। বলেন, যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে যথার্থ মঙ্গল কোথায় চোখ মেলিয়া দেখিতে পায় না, শিক্ষার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বলসঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না।"

তাই অপগতভ্রম পরহিতব্রতী রমেশ আবার পল্লী উন্নয়নে সচেষ্ট হন। পরের জন্য প্রাণ যাহার কাঁদিয়া আকুল হইতেছে তিনি কি কখনও পরের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তাই দেখি, মৃত দ্বারিক চক্রবর্তীর দশ এগার বছরের ছেলে যখন তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা চায় তখন তিনি তাহার পিতার সৎকারের ব্যবস্থা করেন। যেখানে অন্যায় অবিচার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রজারা উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে, সেখানেই তিনি চলিয়াছেন অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া। গ্রামের গরীব মুসলমান প্রজারা বেণী ঘোষাল ও 'রমা'দের দরবারে জলমগ্ন জমির জলনিষ্কাষণের পথ করিয়া দিবার আবেদনে ব্যর্থ হইলে রমেশের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে। রমেশের আবেদনেও যখন তাহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না, তখন তিনি নিজে গিয়া তাহাদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাহারও হৃদয় থাকিলে অনুভব করুক—কী মহতী প্রেরণায় তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সামাজিক নীচতা, হীনতা, কাপুরুষতা ও কৃতঘ্নতার একাধিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 'পল্লী-সমাজে'। এই নীচতার দৃশ্যে বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নাম সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে জাগে। চুরি, জুয়াচুরি, জাল, মিথ্যাকুৎসা রটনা, রমণীর সর্ব্বনাশ—কোন রকম দুষ্কর্ম্মেই তাহাদের বাধে না। বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী ষড়যন্ত্র করিয়া সত্য সাক্ষ্যদানের অপরাধে নিরপরাধ ভৈরব আচার্যের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহারাই বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনৎ মুখুজ্জে ভৈরবের নামে সুদে আসলে এগারশ ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রী করিয়াছে এবং তাহার বাস্তুভিটাটা ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একতরফা ডিক্রী নহে। যথারীতি শমন বাহির হইয়াছে। কে তাহা ভৈরবের নামে দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুল জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্ব্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে। কী জঘন্য মনোবৃত্তির অব্যাহত যথেচ্ছা-চারিতা, নির্লজ্জ স্বার্থসিদ্ধি ও হৃদয়হীনতা, কী পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ও

নৈতিক হীনতা! কিন্তু ইহাই শেষ নহে, সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ও মর্ম্মান্তিক পরিতাপের বিষয় এই যে এই সমাজপতিদের হাত হইতে রমেশ যে ভৈরব আচার্যকে রক্ষা করিল সেই ভৈরব আচার্যই আবার সমাজপতিদের দলে যোগ দিল। এই ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তির ফলে আজও বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী সমাজপতি, আর রমেশরা একঘরে। কৃতঘ্নতার উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ ইহা অপেক্ষা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু ইহা বাহ্যঃ। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বেণী বিস্মিত হই যখন দেখি আমাদের সমাজের নাগপাশ আমাদের জাতীয় জীবনকে শতপাকে জড়াইয়া এমনভাবে পঙ্গু করিয়াছে যে, রমাও শুধুমাত্র সমাজশক্তির ভয়ে আর তাহার মিথ্যা কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইল। আবার যে রমা তাহার প্রেমাস্পদের এতবড় শত্রুতা সাধন করিল শুধু সমাজের ভয়ে, সেই রমাই আবার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছে "যে সমাজের ভয়ে এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিল সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার বাহিরে কোথাও কী তাহার অস্তিত্ব আছে?" আমরা জানি যদিও বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতি ক্রুর স্বার্থান্বেষীর বাহিরে এই সমাজের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ইহারাই ত এখনও আমাদের সমাজের কর্ণধার। ভাঙনের মুখে উপনীত বাংলার পল্লীসমাজের এতদিন হয়ত অবলুপ্তি ঘটিত যদি না ইহাদের পাশে থাকিত বাংলার কল্যাণময়ী জননী বিশ্বেশ্বরীরা। বেণী ঘোষাল আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী যেমন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গুপ্ত বিষ ছড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, তেমনি বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি জননীরা তাহাদের স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতির কল্যাণ-কিরণ বিচ্ছুরণে সেই সমাজকেই সুমধুর করিয়াছে।

মাভৈঃ। সমাজের এই গ্লানি মোচনের জন্যই ত রমেশরা যুগে যুগে আবির্ভূত হন। আমাদের এই স্থবির থুরথুরে অচল অনড় সমাজ জীবনের অস্তিত্বের ভিত্তি নড়াবার জন্য, তাহার অন্তরে প্রাণ সচেতনতা সঞ্চার করিবার জন্য রমেশ কারাবরণ করিয়া যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। হয়ত কোন অর্থ পূর্ণ মঙ্গলের জন্যই তাঁহার এই কারাবরণের প্রয়োজন ছিল। কেননা আপাত ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই তিনি সফলতার সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। তাই কবি হুইটম্যানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও গাহিব—

"Have you heard that it is good to gain the day?
I also say it is good to fall!"

কারাবরণ করিয়া যে আদর্শ তিনি দেখাইলেন, সেই আদর্শ ক্রমশঃ আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। রমেশের অনির্ব্বাণ জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ তাহাদের জড়বুদ্ধিকে আঘাত করিয়া চিত্তের দীনতা ও সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। এখন তাহারা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়াছে, উদার আকাশে মাথা তুলিয়াছে, ছা-পোষা জীবনের নিত্য নৈমিত্তিকতার উর্দ্ধে উঠিয়াছে, পিছু-হঠা, ঝিমাইয়া পড়া সস্তা ছাড়িয়া নূতন জীবনের স্বপ্নে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। তাই এখন আর তাহারা অবক্ষয়ের রুদ্ধশ্বাস অস্তিত্বে নিঃশেষিত-প্রায় পল্লী-সমাজের বৈপ্লবিক সংস্কারের রঙ্গমঞ্চের নীরব দর্শকমাত্র নহে—ইহারাই এখন এই আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কবি-সঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ঔপনিষদিক অর্থে 'কবি' বলিতে সর্ব্বজ্ঞ বুঝায়। গীতায় সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীস্ দেশে stoicরা যে অর্থে 'The wise man' ব্যবহার করিতেন। স্টোয়িকরা এই সর্ব্বজ্ঞকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনকার কবি সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও তাঁহারা যে দূরদর্শী ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত।

যে সকল মনস্বী বিদগ্ধ কবিজনের সংস্পর্শ জীবনে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি তাঁহাদের কথা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, আজ আবার যে সকল কবিজনের কথা বলিব, তাঁহারা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা বাদ দিলেও তিনি তাঁহার কবিতায় এমন এক অমর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "সাগর সঙ্গীত" ও "মালঞ্চ" কবিতা সংগ্রহে তিনি তাঁহার অক্ষয় কবিপ্রতিভা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। 'নারায়ণ' নামে যে মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন তিনি করেন তাহাতে একজন লেখক হিসাবেও আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম। ১৯১৯ সালে আমাদের দেশ ঝটিকাবর্ত্তে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঝটিকাবর্ত্ত যশোর জেলার উপর দিয়া বহিয়া যায় ও আমাদের অঞ্চল একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। এই ঝটিকাবর্ত্তে দুর্দ্দশা-

গ্রস্ত নরনারীর সাহায্যার্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও এইচ, ডি, বোস প্রভৃতি এক সাইক্লোন-রিলিফ-ফাণ্ড (fund) স্থাপন করেন। আমি আমার অঞ্চলে কতকগুলি গ্রাম লইয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করি। সেই সূত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে।

আমি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইয়া আসি; ঠিক সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে (ঠিক মনে নাই) মিঃ এম, ঘোষের সহিত আমার হৃদ্যতা হয়। তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতেন এবং পাশ্চাত্য দেশেও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু ১৯৩৯ সালে পণ্ডিচেরীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহাদের এক ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারও একজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী। এখন তিনি 'দৈনিক বসুমতীর' সম্পাদক। তাঁহাদের পিতা ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ খুলনার একজন নামকরা সিভিল-সার্জন ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যকাল হইতেই বিলাতে ছিলেন। সেই জন্য তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতেই বেশী অভ্যস্ত ছিলেন এবং ইংরাজীতেই কবিতা লিখিতেন। আমরাও তাঁহার সহিত ইংরাজীতেই কথা কহিতাম। একবার তিনি পুরীধামে গমন করেন, আমিও সে সময়ে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে পুরীতে বাস করিতেছিলাম। এমন সময়ে ফরিদপুরের পিতামহস্বরূপ অম্বিকাচরণ মজুমদারও পুরী গিয়াছিলেন। আমি ও মিঃ ঘোষ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সমুদ্র তীরের বেলাভূমিতে। আমি মিঃ ঘোষকে ইংরাজী কথায় পরিচয় করিয়া দিলাম। কিন্তু, মজার কথা এই যে, মিঃ ঘোষ সেই দিন প্রথম বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং সেও যা'তা' বিষয় নহে —রাজনীতি বিষয়ের চর্চ্চা! আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম যে মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ রাজনীতিকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিঃ ঘোষের মিল ছিল। তখন মিঃ ঘোষের Love songs and Elegies এবং Songs of Love and Death নামক কবিতা বাহির হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে কবি ও বাগ্মী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম করিতে পারি। বিলাতে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়া তিনিও ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার যে সব বক্তৃতা শুনিয়াছি, সেগুলি কবিতার মতই সরস ও সজীব। ১৯২৭ সালে যখন তিনি বোম্বাই তাজমহল হোটেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের মূল সভাপতি (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ) এবং আমরা বিভাগীয় সভাপতি কয়েকজন সেখানে চায়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানেও পরদিন উইলিংডন ক্লাবে আহুত হইয়া আমরা তাঁহার সৌজন্যে ও আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। নির্ঝরিণীর ধারার মতই তাহা সহজ ও সুন্দর ভাবে অনর্গল প্রবাহিত হইয়া যাইত। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতাও আমি একাধিকবার শুনিয়াছি। কিন্তু সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা আরো সরস ও কবিত্বপূর্ণ। শ্রীমতী নাইডুর পিতা ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কেও আমি দেখিয়াছি। শিক্ষার জন্য তিনি অল্প বয়সেই শ্রীমতী নাইডুকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজীতে তিনি কয়েকখানি কবিতার বই রচনা করিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন। তাহার মধ্যে "The Broken wing" ও "Golden Threshold" বিখ্যাত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই দুই বিষয়ের চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার কালেই তাঁহার সহিত পরিচিত হই। সে সময়ে হেমেন্দ্র-প্রসাদের বাসভবন সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" পত্রের কার্য্যালয়ের মতই ছিল এবং তাঁহার বৈঠকখানা সাহিত্যিকদের আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক সাহিত্যসেবী ঐ বাড়ীতে গিয়া জুটিতেন। আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই 'সাহিত্যে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই হিসাবে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি 'অধঃপতন', 'বিপত্নীক' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া অল্প বয়সেই যশস্বী হইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে অধিক পরিচিত।

রমণীমোহন ঘোষ কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিও হেমেন্দ্রপ্রসাদের বৈঠকে যোগ-দান করিতেন। তিনি পোষ্ট অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে

বাস করিতেন। তাঁহার স্বভাব যেমন মিষ্ট ছিল, তেমনি তাঁহার কবিতাগুলি সরস ও প্রফুল্লতাগুণে বিভূষিত থাকিত। "জীবজন্তু" প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বসুকে ঐ আড্ডায় দেখিয়াছি। ইহারা কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত সামাজিক ও কবিতা-রসপ্রিয় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে কেহ কেহ বলিত, ইহার এক ভাই জীব ও অপরজন জন্তু। নরেন্দ্রনাথ অমনি উত্তর করিতেন, বেশী চালাকি করবেন না। দাদাকে বলে দেব, তাঁ'র বইএ (জীবজন্তু) আপনার ছবি ছাপিয়ে দেবেন। সে বইএ অনেক বানরের ছবি ছিল।

আর একজন কবির কথা মনে পড়িতেছে যাঁহার নাম বোধ হয় অনেকেই এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্নর বাড়ী ছিল রাণাঘাটে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। তাঁহার "মা" ও "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা" প্রভৃতি কবিতা এখনও লোকে ভোলে নাই। "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা" বলিয়া কলিকাতায় বলরাম দে ষ্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড স্কুল ছিল। তাহাতে প্রায় দুই হাজার ছেলে পড়িত। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং ঐ প্রসঙ্গেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Minto Professor) ও আমাকে এই স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। সম্পাদকরূপে আমরা বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই; কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের বিনয় ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

গিরিজাপ্রসন্ন বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী তমাললতা উভয়েই সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। গিরিজা-প্রসন্নের সরল ব্যবহার ও কবিতামাধুর্য্য আমার চিত্তে এখনও অঙ্কিত হইয়া আছে।

এখন এমন একজন কবির নাম করিব, যিনি হয়ত অনেকের নিকট তেমন সুপরিচিত নহেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইণ্টারমিডিয়েটের বাংলার পরীক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। Tenneysonএর In memoıium ও Enoch Arden কবিতাদ্বয় তিনি অতি সুমিষ্ট ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন। এরূপ সুন্দর ও সরল বঙ্গানুবাদ আমি ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আমি যখন চুঁচুড়ায় ইন্সপেক্টর ছিলাম, সেই সময়ে তিনি চন্দননগর হইতে আসিয়া তাঁহার ঐ দুইখানি বই আমাকে উপহার দিয়া গেলেন।

বিশ্বরূপ গোস্বামী একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার বৈষ্ণব কবিতা বর্ত্তমান যুগে যুগান্তর আনয়ন করে। হাওড়াসমাজ (নদের নিমাই) সম্পর্কে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। গোস্বামী মহাশয় গৌরচন্দ্রের প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার 'গৌরলীলা' ও অন্যান্য সঙ্গীতগুলি বহুলোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল।

"কাঁচা সোনার বরণ ধরেছে।

হলকরা তার রূপের বাহার চিনলি না তারে।"

প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে তিনি পূর্ণযৌবনে হঠাৎ দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিশ্বরূপ গোস্বামী "নদের নিমাই"কে অনেকগুলি গান দিয়াছিলেন। সেগুলি সুরে তালে অপূর্ব্ব।

ভারতে শিল্পের জাতীয়করণ

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশক্তির উপর নির্ভরতা দেশভক্তির নিদর্শন, সহৃদয় ভারতবাসী বিদেশী সরকারকেও সে সম্মান হইতে বঞ্চিত করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস ছিল সরকারের হাতে শাসন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা অবশ্যই সুপরিচালিত হইবে, সেইজন্ত বৃটিশ আমলেই ভারতের বেশীর ভাগ রেলপথের জাতীয়করণ করা হয়—কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রচেষ্টা সে যুগে দেখা যায় নাই।

স্বাধীনতার অল্পদিন পরই ভারত নূতন শিল্পনীতি গ্রহণ করে আপন শিল্পের উন্নতির জন্ত—ইহার সাহায্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত ও অন্তান্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার একাধিকার গ্রহণ করে এবং Basic industry গুলি দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে ইহা স্থির করা হয়। ১৯৫১ সালে শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় ও ১৯৫৩ সালে তাহা সংশোধিত হয়। এই আইনে সরকারের শিল্প নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধিপায়। এই আইনের বলে সরকার জাতীয়স্বার্থে কোনও শিল্প আপন হাতে লইতে পারেন এবং ইহার জন্ত শিল্পপতিকে কোন কারণ প্রদর্শনের সময় নাও দেওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর আসিল ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সঙ্গে আনিল সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা (socialistic pattern sector), ইহার ফলে সরকারি উদ্যোগ ক্ষেত্র (public sector) প্রসার লাভ করে। তাহার পর আসিল ১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি, যাহার দ্বারা সরকার ১৭টি শিল্প বিকাশের সমগ্র দায়িত্ব নিজহাতে গ্রহণ করেন। এই সকলনীতি জাতীয়করণের পথকে প্রশস্ত করে।

১৯৫৩ সালে ভারতের বিমান কম্পানীগুলি (Airlines) জাতীয়করণ করা হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক ও কোলার স্বর্ণখনি আসে সরকারের পরিচালনাধীনে। সর্ব্বশেষে ১৯৫৭ সালে জাতীয়করণ করা হয় ভারতের বীমাকম্পানীগুলি। বীমাকম্পানীগুলি জাতীয়করণের সময় সরকার এক নূতন নীতি অবলম্বন করেন—প্রথমে এই জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত থাকে সংগোপনে এবং তাহা রাষ্ট্রপতির বিশেষ অর্ডিন্যান্স দ্বারা সহসা গ্রহণ করা হয়।

এখন প্রশ্ন জাতীয়করণ আমরা সমর্থন করিতে পারি কিনা? জাতীয়করণ তখনই সমর্থন-যোগ্য যখন তাহা দেশের স্বার্থের অনুকূলে আসে ও তাহার সহিত আসে কুশলতা। জাতীয়করণ আর একটি ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য, যদি তাহা নিজস্ব শিল্পপতি অপেক্ষা মূল্য হ্রাস করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়করণের পক্ষে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে পারি। প্রথমত জাতীয়করণ অসমান ধনবণ্টন কিছুটা কমায়। বড় বড় শিল্পগুলি যদি শিল্পপতিদের হাতে থাকে, ফলে হয় ধনীর ধনবৃদ্ধি। সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা সন্নিবেশিত হয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কবলে। দ্বিতীয়ত জাতীয় স্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রয়োজন, যেমন উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কয়লাখনিগুলি—প্রথমত জাতির ভবিষ্যতের জন্ত আমাদের উচ্চশ্রেণীর কয়লা সংরক্ষণ করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত উহারা সুপরিচালিত নহে—অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় বহু। জাতীয়করণের তৃতীয় কারণ বলা যাইতে পারে ভারতে কয়েকটি শিল্প সম্পূর্ণ বিদেশী মূলধনে ও পরিচালনায় আছে যেমন পাটশিল্প—ফলে প্রচুর লাভ বিদেশে চলিয়া যায়। চতুর্থ কথা ভারতের বর্ত্তমান নীতি অনুসারে প্রধান প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়করণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা জনসাধারণের মনে সঞ্চার করিয়াছে হতাশা। সরকারি বাসের আরোহীরা ইহা অবশ্যই সমর্থন করিবেন। প্রথমত সরকারি পরিচালনা আনে অযথা বিলম্ব ও অফিস ফাইল মনোবৃত্তি (red-tapism)। কর্ম্মকুশলতাও হ্রাস পাইতে দেখা যাইতেছে। কোনও ব্যক্তিগত লাভের আশা না থাকায় কর্ম্মপ্রেরণার অভাব দেখা যাইতেছে।

আবার জাতীয়করণ সফল করিতে হইলে যেরূপ কম্পানীর 'টেকনিকাল স্টাফ' প্রয়োজন তাহার একান্ত অভাব বর্ত্তমান ভারতবর্ষে। বিশেষ করিয়া যাঁহাকে সর্ব্বময়কর্ত্তা (administrator) করা হইল তাঁহার হয়তো কোন ব্যবসা জ্ঞানই নাই। অনেকের মতে জাতীয়করণে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা যদি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে শিল্প বিকাশের সহায়তা হইবে। নিজস্ব শিল্পপতির (private enterpriser) এর সে সকল দোষত্রুটি আছে তাহা করনীতি ও আইনদ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে যেমন অতিরিক্ত আয়কর ও শ্রমিক আইন।

এইবিষয়ে জনমাথাইএর অভিমত প্রণিধান যোগ্য, তাঁহার মতে অতিদ্রুত জাতীয়করণ বিপদের কারণ হইতে পারে। তিনি বীমাকম্পানীগুলি ও কোলার স্বর্ণখনি জাতীয়করণের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, সরকারি পরিচালনায় যে দুর্নীতি ও কর্ম্মকুশলতার অভাব দেখা গিয়াছে তাহাতে অধিক জাতীয়করণ দেশের স্বার্থবিরুদ্ধ। তিনি বিশেষক্ষেত্রে জাতীয়করণের discriminatory nationalisation এর পক্ষপাতী।

বীমাকম্পানীগুলির জাতীয়করণ সম্বন্ধে অল্প আলোচনা প্রয়োজন। বীমাকম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় ১২ কোটি টাকা লাভ করিত এবং জাতীয়করণের ফলে সেই অর্থ জাতীয় তহবিলে আসিল। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক সুবিধা হইবে। অবশ্য বীমাকম্পানী জাতীয়করণের অন্যকারণও ছিলো। বিগত ১০ বৎসরে প্রায় ২৫টি

বীমাকম্পানী উঠিয়া যায় ও আরো ২৫টির অবস্থা শোচনীয় হয়। সরকার মনে করেন জাতীয়করণের ফলে বীমাকম্পানীগুলি প্রসার করিবে ও গ্রামবাসীরাও বীমা করিবে এবং এইজন্য 'জনতা নীতি' janata policy গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এক বৎসর জাতীয়করণের ফলে দেখা যাইতেছে যে লাভের পরিমাণ গিয়াছে কমিয়া, তবে আশাকরা যায় আগামী বৎসর অবস্থার উন্নতি হইবে।

জীবনবীমার কার্য্যে কয়েকটি এমন ধরণের প্রয়োজন যাহা সরকারি কর্ম্মচারীর মধ্যে সাধারণত দেখা যায়না। যেমন অন্যকে প্ররোচিত করা—তাহাকে আর্থিক উপদেশ দেওয়া এবং যাহাতে শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হয় সেই চেষ্টা করা। ভারতবাসী বীমা করিতে অভ্যস্ত নহে তাহাদের মনের প্রস্তুতিও প্রয়োজন। ইহাব্যতীত যাঁহাদের উপর পরিচালন ভার তাঁহারা মনে করেন ক্ষতি হইলে সরকারের হইবে তাঁহার নহে—ফলে কর্ম্মপ্রেরণা ও উৎসাহের অভাব হয়।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে জাতীয়করণ ভারতের জনতার মনে আস্থা আনিতে পারে নাই এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে জাতীয়করণের পথ অপ্রশস্ত ও কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে।

সার্থক প্রেম

শ্রীঅজয়কুমার

ওই ওরা যারা
রিক্ততার পাত্র হস্তে তৃষিত মরুতে
রাহুগ্রাসে পথহারা।
ছিল অনন্ত স্পর্দ্ধা
একদা তরুণের প্রেমের মন্দিরে
নিয়ম মাফিকের গণ্ডী ভেদি।
প্রেম তাদের করেছিল মহীয়ান
এঁকেছিল জয়টীকা প্রশস্ত ললাটে,
স্বপন-কোষে তড়িত—সৃষ্টির টানে!

প্রেম দিয়েছিল কাছে কাছে
কত রাত কেটে গেছে তলে তলে
অতল পিয়ালা ভরিয়ে মিছে।
সহসা মেঘের আছাড়ে
মনাকাশ ঢাকি প্রলয়ের সাড়া
বসন্ত বিদায় নিল দ্বারে।
অগ্নি সাগরের ক্ষুব্ধতা,
প্রাণে দেয় ভাঙনের দোলা
জমে উঠে ব্যথা।
আকাশ মাটির আড়াআড়ি মাঝে
প্রেমিকের জীবনে শান্তি এক
সার্থক ইহা প্রেমের কাজে।

বিষ্টি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মাথা কুটে মরে এলোমেলো হাওয়া, ছেঁড়াচুল মেঘে উড়ে,
চিমনীরা সব ডাকিনীর মত, ট্রেণ ডেকে উঠে দূরে,
বেলা পাচটার আঁচের ধোঁয়ায়, নগরীর মুখ ঢাকা
পথে পথে ছুটে বিশ্রামহীন অন্ধ আবেগে চাকা।
শ্রমেনুয়েপড়া আধমরা বাঁকা মেরুদণ্ডের পরে
সারা শূন্যের কান্নায় ভরি বিষ্টি-খোকারা মরে।
মিষ্টি গানের খোরাক তো নেই, দুষ্টুমি চাওয়া চোখে
ট্রাম টিকিটের দাম জুটেনাকো, ভিজে জামাটার শোকে
ঘন ঘন মুছি কপালের ঘাম; তবু তো রুমাল নীল!
রোদের নেশায় কেঁদেছে কখনও মাছ-ভুলে মেটে চিল?
মাতিছে তুফান মনের অতলে, খুলিছে খাঁচাটী বন্ধ
রুমালের বুকে লেগে আছে সেই সুর স্বপনিয়া গন্ধ।
ঝরা বকুলের বোবা সে বেদনা, ফোটা বেলীটির হর্ষ
কোন সন্ধ্যার নিরালা আঁধারে বুলুর নীরব স্পর্শ।
টাল টলমল মাতাল বাতাস, দোলে পার্কের বৃক্ষ
খুসীতে ভিজিছে মাছরাঙ্গা ঘাসে, করিনু সহসা লক্ষ্য।
দিনের শেষের কালো-মেয়ে ছায়া আবেশে পড়েছে ঝুঁকে
ঘুম ঘুম ঐ মাঠের সবুজে রুমু ঝুম ঝুম মুখে।
হেরি বুলুয়ার মাধুরী মেশানো এই বরিষন সন্ধ্যা
বন্ধন ছিল তাইতো ভুবন আঁধারে এমন বন্ধ্যা।
চেতনা কখন হারালো আমার চুপ চুপ ভেজা ঘাসে,
আগে তো দেখিনি কাঁচের কারায় রজনীগন্ধা হাসে।

দুর্ব্বল-দুপুর

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাঁ-চ্-সি-স্-স্—যদি কোনো ভাঙা ষ্টেটবাসের ব্রেক কষার শব্দ শুনতে পাও, ওমনি শুনতে পাবে এপাশের দোতালা বাড়ীটার ওপরের ঘরটায় দুকানে আঙুল চেপে আর্ত্তনাদ করে উঠছে সুমালা। না—না—না।

সি-আই-টি রোডের পিচ গালিয়ে দুপুর এগিয়ে চলে। যতবার ষ্টপেজে তেত্রিশ নম্বরের ভাঙা বাস ব্রেক করে, ততবারই পাগলের মত আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করে ওঠে সুমালা। পাগল?

হ্যাঁ পাগলই তো। ডাঃ সান্যাল নাকি ওঁকে বলেছেন—এমনি করে বেশ কিছুদিন একা থাকলে ও পাগল হয়ে যাবেই। কিন্তু একা থাকা ছাড়া উপায়ই বা কী! প্রশান্ত সরকারী অফিসের কেরাণী। অবশ্য সিনিয়র ডিভিশন। তাতে কী, অফিস তো সেই রোজকার দশটা-পাঁচটা। প্রশান্ত আর কতটুকু থাকতে পায় তার কাছে! বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে। তেমনি প্রায় নিঃসঙ্গ ঘর থেকেই মামার-বাড়ী-কাটোয়ায় মানুষ সুমালাকে ঘরে নিয়ে এসেছে। সুশ্রী, উজ্জল শ্যামবর্ণ, আর সবচেয়ে সুন্দর দুটি চোখের রূপে প্রশান্ত উচ্ছল হয়েছে। সে-বিয়ে প্রায় গৌরীদান-ই বলা যেতে পারে—বিয়ের পর আর মামারা তার খোঁজ নেয়নি; না নিক, সুখে কেটেছে কয়েকটা বছর। তারপর শাশুড়ী মারা গেছেন, ঠিক সেই সময়েই এ বাড়ীতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেছে প্রশান্তর মামার বাড়ীর দূরসম্পর্কীয় ভাই, অবিনাশ।

'ক্যাঁ-চ্-সি-স্-স্।'

আবার ষ্টেটবাস। ওই—ওই! উঃ, কী বিশ্রী শব্দ ওই ভাঙা বাসের ব্রেকগুলোর। অল্পক্ষণের মধ্যেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল প্রশান্তর। কখন বিকেল হয়ে গেছে, অফিসের ছুটি হয়ে গেছে প্রশান্তর। এবার ফিরল। দরজা খুলে হাতের ফোলিওটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশান্ত জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলে, আজ কেমন আছো? ওষুধগুলো সব ঠিক-ঠিক খেয়েছিলে!

—হ্যাঁ! কিন্তু কতকগুলো বাসের অমন বিশ্রী আওয়াজ কেন বলতো! সারাতে পারেনা কেন! কাগজে এতো লেখা-লেখী হয়—

প্রশান্ত গলার টাইটা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করে—কেন?

—কেন কি! আমার ঘুম হয়না দুপুরে, বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—দুপুরে মোতির মাকে আজ ঘরে শুতে দিয়েছিলে? প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চায় প্রশান্ত।

—নাঃ। ওকে বাইরে শুতে বলেছি। আমার ঘরে আমি একাই ভালো।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু বলে গেছেন তোমার দুপুরে একা-থাকা উচিত নয়!

—তবে তুমি থাকো। দরকার নেই চাকরীর। লক্ষ্মীটি দুপুরে তুমি যদি থাকো তো দেখবে সারাদুপুর আমি ঘুমোচ্ছি। ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফোলায় সুমালা।

প্রশান্ত বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলে ফেলে, তোমার সঙ্গে দেখছি আমাকেও পাগল হয়ে যেতে হবে।

—পাগল! না, না, বিশ্বাস করো। মোতির মায়ের কেমন বিশ্রী নাক ডাকে, মনে হয় যেন সাপের নিঃশ্বাস। আমি সহ্য করতে পারিনা, বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে।

হাঁফাতে থাকে সুমালা উত্তেজনায়।

বিকেল থেকে রাতটা ও ভালোই থাকে। পথের কোলাহলে ভাঙা বাসগুলোর ব্রেক কষার শব্দ চাপা পড়ে যায়। সুমালা উল বোনে। সেদিনও বুনছিল, প্রশান্তকে বুনতে বুনতেই বললে, দেখো, এটা আর তোমার মাপের

হোলোনা। এ পশমটা বাচ্চাদেরই মানায়। তাই বাচ্চার মাপেই করলাম। মোতির মাকে দিয়ে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেবো। বেশ ফর্সা মোটা-সোটা গোল-গাল ছেলের গায়ে বেশ মানাবে, তাই না?

প্রশান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে হাসে।—হ্যাঁ, তাই দিও। অথচ সে এও জানে ওই অসুখের পর থেকে সুমালা তার জন্তে একটা সোয়েটারও শেষ করতে পারেনি, আর কোনোদিনও পারবেনা। এ উলটাও সুমালার গোড়ায় পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু অনেক উলের মতই সে পছন্দ শেষ পর্য্যন্ত টেঁকেনি। ডাঃ সান্যাল বলেছেন তার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাধা না দিতে। কোনোদিনই দেয়নি প্রশান্ত—এখন তো সে আরও উদার।

রাতেও সুমালা মাঝে মাঝে কেমন করে ওঠে। প্রশান্তর বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ভয়পাওয়া পাখীর মত কাঁপতে থাকে! —ওগো আমার ভয় করছে—ভীষণ ভয় করছে।

—কী হল? সন্ত ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে প্রশান্ত।

—ওই পুলিশটা কেমন বিশ্রী হুইস্ল্ দিল।

অথচ এমন ছিলনা সুমালা। কিন্তু যেদিন থেকে শোনা গেল সে মা হবে। সেই অসহ্য আনন্দের দিনে হঠাৎ প্রশান্তকে বলে বসলো, তোমার আর কী। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, কিছুই খোঁজ রাখবেনা।

প্রশান্ত তার নরম গালটা টিপে দিয়ে উত্তর করলে, প্রত্যেক পুরুষকেই সারাদিন টো-টো করে ঘুরতে হয়, আর মেয়েদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারটিতে সব সময় খোঁজ রাখা একটা সামাজিক অপরাধ।

প্রশান্তর স্পষ্ট মনে আছে সেদিনটা ছিল দেওয়ালীর দিন। মা মারা যাবার ঠিক দুমাস বাদেই। সেদিনই প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেল সুমালার। রাস্তায় একটা ছেলে হুইস্ল বাজী ছুঁড়েছিল, "হু-ই-স্-স্-স্" শব্দ করে বাজী আকাশে উড়ে গিয়েছিল, আর দারুণ ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে সুমালা হঠাৎ প্রশান্তর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলেছিল।

তারপর আর একটা অভিশপ্ত দিন। সেদিন অফিসে মোতিরমা'র ফোন পেয়েই ট্যাক্সী নিয়ে ছুটে এসে দেখে অজ্ঞান অচৈতন্ত সুমালা মেঝেতে পড়ে আছে। পূর্ণ গর্ভবতী তখন সে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বল্লেন, ভয়ের কিছু নেই। পড়ে গিয়ে দারুণ শক্ পেয়েছেন। পেসেণ্ট ভালো হয়ে যাবেন, তবে যে-সব নিউরটিক বিহেভিয়ার বল্লেন সেগুলো একটু কেয়ারফুলি ওয়াচ করে যাবেন, কারণ বাচ্চাটাকে তো বাঁচানো গেলনা। খানিক থেমে ডাক্তার গলার স্বর নামিয়ে বল্লেন, আই এ্যাম সরি মিঃ বোস্। ওঁর মা হবার আর কোনো সম্ভাবনাই রইল না জীবনে। প্রশান্তর জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাও যেন সেই মুহূর্ত্তেই মিইয়ে এসেছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে গভীর ভালবাসার ছায়া দিয়ে সব সময়েই স্ত্রীকে ঢেকে রাখতে, সব সময়েই চোখে চোখে রাখতে সুরু করলে সে। কেবল ওই দুপুরের অফিস টাইমটি ছাড়া।

কেউ বললে মাইগ্রেন, কেউ ইনসোমিয়া, কেউ এক কথায় সেরে দিলে হিষ্টিরিয়া।

অবশেষে ডাঃ সান্যাল। প্রশান্তর কাছে কেসের হিষ্ট্রি শুনেই পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে বল্লেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—ওই হুইস্ল্ শুনেই উনি ভয় পান। আচ্ছা আপনি ওঁকে এখানে নিয়ে আসুন, আমি একা ওঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।

এলো সুমালা—ছিমছাম চেহারা, সুন্দর ফিগার, তার চেয়ে সুন্দর চোখ। কিন্তু সে চোখে—ডাঃ সান্যাল এক নিমেষ তাকিয়ে বুঝে নিলেন সে-দৃষ্টির ভাষা।

সুতীব্র কয়েকটা আলোর সামনে বসল সুমালা, সে আলোর দিকে চেয়েই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। ডাঃ সান্যালের গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে শুনতে পাওয়া লাউড-স্পিকারের প্রতিধ্বনি। পাইপের ধোঁয়া উড়িয়ে সান্যাল প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সুমালা দেবী, আপনি স্বপ্ন দেখেন?

—ঘুমোই কখন?

—ধরুণ যেদিন ঘুমোন, সেদিন?

—দেখি।

—কী দেখেন?

—দেখি—

সোজা হয়ে বসল সুমালা, সুন্দর চোখ দুটার বহুরূপীর মত বর্ণচ্ছটা বদলে গেল।

দেখি একই স্বপ্ন রোজ। একটা বেলুনওলা লাল রঙের একটা বেলুন ফোলাতে চাইছে,কিন্তু সেটা ফুলছেনা। শেষে একটা সাইকেলের পাম্প দিয়ে সে সেটাকে ফুলোতে গেল, আর অমনি দুম্ করে সেটা ফেটে গেল।

—পাম্পটার শব্দ ছিলনা?

—ছিল, হঠাৎ আতঙ্কে হাঁফাতে লাগলো। উঃ কী বিশ্রী শব্দ—উঃ।

—থাক, থাক্। আচ্ছা আপনি কী ফুল ভালবাসেন?

—আমি? বেল কুঁড়ি।—মৃদু হেসে কেমন যেন সলজ্জ-ভাবেই উত্তর করলে সুমালা।

—কুঁড়ি। ওঃ। সান্যাল পাইপটা খুঁচিয়ে অগ্নি-সংযোগ করলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পাশের কলিং বেলটা টিপলেন। নার্স এসে সুমালাকে বাইরে নিয়ে গেল।

প্রশান্ত সেদিন সুমালাকে ডাঃ সান্যালের মেণ্টাল হোমে ভর্তি করে এলো, তার ঠিক সাতদিন বাদেই এক সন্ধ্যায় ডাঃ সান্যাল আবার পাইপের ধোঁয়া উড়োলেন। সে ধোঁয়ার কটু গন্ধে বিষম খেলে প্রশান্ত। সান্যাল পাইপটা দাঁতে কামড়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা প্রশান্তবাবু, আপনি কি আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ!

—তার মানে?

—আমি চরিত্র কথাটা কী অর্থে ব্যবহার করছি নিশ্চয়ই বুঝছেন!

—কী বলছেন ডাক্তার বাবু?

—উত্তেজিত হবেন না। আমার কাছে আপনাকে ফ্র্যাঙ্ক হতে হবে। যা প্রশ্ন করবো তার যথাযথ উত্তরই আশা করবো। মিথ্যা দিয়ে ঢাকলে সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

—বলুন। স্থির হয়ে বসলো প্রশান্ত।

—আচ্ছা কোন বন্ধু বা আপনার স্ত্রীর অনুরাগী কেউ কি আসতেন আপনার বাড়ী?

—কেউ না। আমরা আগে ছিলাম হাওড়ায়। তারপর অফিস লোনে সি, আই, টি রোডের বাড়ীটা করতে পেরে চলে এসেছি। হাওড়ায় এ্যাদ্দিন ছিলাম—তা তখনই কেউ বন্ধু ছিলনা, এখানেতো নতুন।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনার স্ত্রীর বয় ফ্রেণ্ড কেউ ছিল কি না।

প্রশান্ত গলায় জোর দিয়ে বললে, আপনি ভুল করছেন ডাঃ সান্যাল, আমি বা আমার স্ত্রীর কেউই সে রকম আবহাওয়ার মানুষ হইনি।

—ও আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে আর কে-কে থাকেন?

—মা মারা যাবার পর থেকে আমি আর আমার স্ত্রী।

—ক' জন চাকর বাকর।

—একজন মাত্র ঝি। মোতির মা।

—কোনো আত্মীয়ও কি কখনও আসতেন না!

—কেউ-ই তেমন আত্মীয় আমাদের নেই ডাঃ সান্যাল। তবে অবিনাশ এসে মায়ের অসুখ থেকে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ এখানে কাটিয়ে গেছে।

—অবিনাশবাবু কে হন আপনার!

—আমার মামার বাড়ীর খুব দূর সম্পর্কের ভাই। বাগানের এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের চাকরী করে। কোলকাতায় ছুটিতে বেড়াতে এসে হঠাৎ বহুদিন বাদে দেখা করতে এসেছিল, তখন মায়ের বাড়াবাড়ি। তাই ওকে থাকতে বলেছিলাম। থেকে গিয়েছিল কয়েকটা দিন।

—ও। ডাঃ সান্যাল হাতের বেল টিপলেন।

সেদিন মেণ্টাল হোমে রাত আটটাতেই যেন বড় বেশী অন্ধকার নেমে এসেছে। সান্যালের ঘর থেকে এইমাত্র মোতির মা বেরিয়ে গেল। তারপর প্রশান্তর সঙ্গে বাগানের গেট দিয়ে সদর রাস্তায় এগিয়ে গেল। ডাঃ সান্যাল জানলার ফাঁক দিয়ে ওদের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলেন নির্লিপ্ত ভাবে। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাইপটা জ্বালিয়ে নিলেন।

সুমালাকে ঘরে নিয়ে এলো নার্স। ছিমছাম চেহারা, সুন্দর ফিগার, তার চেয়ে সুন্দর চোখ, কিন্তু সে চোখে—

ডাঃ সান্যাল স্বাগত জানালেন: বসুন সুমালা দেবী।

সুমালা বসলে তাঁর হাতের ইসারায় ঘরের দরজাটা বন্ধ করে নার্স চলে গেল বাইরে। ঘরে একটা মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে। এক কোণে ফ্লাওয়ার ভাসে একথোকা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধে সারা ঘরটা নেশাতুর স্বপ্নিল করে তুলেছে।

ডাঃ সান্যাল এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। চারদিক নিশ্চুপ নিস্তব্ধ।

সান্যাল আবার পাইপটা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে সেটা নতুন করে সাজিয়ে জ্বালালেন। বহুক্ষণ বাদে আবার সেই রহস্যময় গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সুমালা দেবী অবিনাশ—

—কে? চমকে উঠলো সুমালা। অমনি একটা টিকটিকি কোত্থেকে ডেকে উঠলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবিনাশ ঘোষ। তার চা বাগানের গল্প আপনার কাছে করতো নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, দুপুরে মা তখন একটু ভালো, উনি আবার অফিস যাওয়া সুরু করেছেন। আচ্ছা, ডাক্তার—অফিসের কী এতো আকর্ষণ? কেন [illegible] না?

—খুব সুন্দর গল্প করতো, নয়? সান্যাল আবার [illegible] ধরিয়ে নিলেন।

—হ্যাঁ। কত মজার মজার, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করতো ঠাকুরপো।

—আচ্ছা গল্প করতো—মা যখন রোগের যন্ত্রণায় কাতর তাঁর সামনেই।

—না উনি হয়তো একটু ঘুমোচ্ছেন। তখন এপাশের ঘরে চা খেতে খেতে আমি আর ঠাকুরপো—

—মানে আপনি আর অবিনাশ?

—হ্যাঁ ঠাকুরপো। আবার অস্বাভাবিক হাঁফাতে সুরু করলে সুমালা।

—ওই হোলো। অবিনাশ-স্-স্ এবার 'শ'টা 'স'-এর মত টেনে উচ্চারণ করলেন ডাঃ সান্যাল।

—উঃ। আর্তনাদ করে উঠলো সুমালা।

—হ্যাঁ, অবিনাশ-স্-স আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার সবকিছু মানে—

লাফিয়ে উঠে ডাক্তার সান্যাল ক্ষিপ্র হাতে আলমারী খুলে একটা লাল বেলুন সাইকেলের পাম্প দিয়ে ফোলাতে লাগলেন। সেটা ফুলতে লাগলো।

—ও কী করছেন?

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকৃতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সুমালা। তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে সান্যাল বলে চললেন, হ্যাঁ এমনি করেই সে আপনার সাজানো সংসার, আপনার কামনা-বাসনা-কল্পনা, আপনার মান সম্ভ্রম, বোধ হয় আপনার সবকিছু, এমনকি আপনার সতীত্বও—দুম্ করে প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে গেল বেলুনটা।

—ওঃ না, না, না। আর্তনাদ করে ককিয়ে কেঁদে উঠলো সুমালা। ডাঃ সান্যালের হাতের পাম্পটা তখন সি-স্-স্ আওয়াজ করতে লাগলো, বলুন অবিনাশ আপনার কী করেছে? মনে পড়ছে—পাম্পের সি-স্-স্ শব্দটা যেন কার সুতীব্র শিশ হয়ে কানে লাগলো সুমালার।

—থামান, থামান। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে অবিনাশ শিশ দিয়ে—

আচ্ছন্নের মত চেয়ারে বসে পড়লো সুমালা। যেন অন্য সুমালা কথা কয়ে উঠলো—সেই দুপুরেই তখন দরজা জানলা বন্ধ করে আগের দিন রাত জেগে একটু শুয়েছি। হঠাৎ দরজায় শিশ দিয়ে উঠলো অবিনাশ।

—কী দিল, শিশ? এই পাম্পটার মতই শব্দ তার, না?

—হ্যাঁ, দোহাই আপনার আমায় বলতে দিন। তা না হলে দম আটকে যাবে—আমি মরে যাবো—দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকেই আবার একটা শিশ দিল সে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম করতে লাগলো। তারপর সেই পশুটা—একটু দম নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে সুমালা, কী যেন হল, চীৎকার করতে ভুলে গেলাম, বাধা দিতে ভুলে গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে ওই শিশটা তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মত বিঁধতে লাগলো। উঃ কী যন্ত্রণা। তারপর আমার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে শিশ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল পশুটা।

ডাঃ সান্যাল মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, তারপর আপনি বুঝতে পারলেন আপনি মা হতে চলেছেন।

—হ্যাঁ বুঝলাম, আমি মা হতে চলেছি। এ খবরটা পেয়ে উনি খুব খুশী হয়ে আমায় নতুন একটা পেণ্ডেণ্ট উপহার দিলেন। কিন্তু উনি জানলেন না যে সে ছেলে—

—হ্যাঁ সেইজন্যই আপনি প্রশান্তবাবুর উল্লাস দেখে বলেছিলেন, তোমার আর কী সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াবে কিছুই খোঁজ রাখবে না।

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, সত্যি কথাটা তাঁকে কিছুতেই বলতে পারলাম না। অথচ নিজের ওপর অনুশোচনায় নিজেই অহরহ জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

—আর সেই জন্যেই—

—হ্যাঁ সেই জন্যেই, বলুন ডাক্তারবাবু এটা আমার অপরাধ, না অপরাধের শাস্তি? সেইজন্যেই তখন পূর্ণ-গর্ভবতী অবস্থায় ইচ্ছে করেই লাফিয়ে পড়লুম বাথরুমের কঠিন মেঝেতে।

—কিন্তু তখন ভাবেন নি—মা হওয়ার সম্ভাবনা চির-দিনের জন্যে লোপ পাবে?

—সেই তো আমার পাপ। ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমানকে অস্বীকার করেছিলাম।

—কিন্তু ভবিষ্যত আপনার ওই লাল বেলুনটার মতই নিয়তির পাম্পে চুরমার হয়ে ফেটে গেল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুমালা।

ডাঃ সান্যাল তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

* * *

সেদিন ডাইরীতে ডাঃ সান্যাল লিখে রাখলেন—অবিনাশ চা বাগানে মানুষ, স্বভাবতঃই চরিত্রগত দুর্ব্বল। কেসের সম্পূর্ণ বিবরণী শেষ করে পাইপটা জ্বালালেন সান্যাল! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে আনমনে ভাবতে লাগলেন, সুমালাকে ভালো করে তিনি ভালো করেন নি। না ভালো হলেও আর কিছু না হোক, বোধ হয় সত্যিকারের শাস্তি পেতো!

এ কথাটা অনেক কেসেতেই ডাঃ সান্যালকে ভাবতে হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সাধনা

আয়রণম্যান শ্রীনীরদ সরকার

স্বাস্থ্য মানবজীবনের উন্নতির মূলাধার। যে যেরূপ কাজই করুক না কেন স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কর্ম জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বপ্রকার উন্নতি ও সফলতার মূলেও হয় কুঠারাঘাত। অনেকে হয়ত প্রথম জীবনে লেখা-পড়ায়, কাজ-কর্মে খুবই উন্নত ও কর্মতৎপর থাকে; কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় ও যত্ন না নেওয়ায় কর্মজীবনে স্বাস্থ্যহীনতার জন্যই বিফলতা লাভ করে থাকে বেশী। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে দৈহিক কর্ম-পটুতা তো নষ্ট হয়ই, মানসিক উন্নত হওয়াও হয় সুদূরপরাহত। নীরোগ, কর্মঠ, কষ্ট-সহিষ্ণু ও দীর্ঘজীবী ব্যক্তিকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলা হয়। কিন্তু থলথলে নাদুসনুদুস হলেই যেমন স্বাস্থ্যবান হয় না, তেমন অতি উগ্র-ব্যায়ামে-গঠিত বিকৃত পেশী-যুক্ত আয়াসী দেহীও যে স্বাস্থ্যবান—তা-ও কিন্তু নয়। পুষ্টিকর স্নেহ পদার্থ-যুক্ত খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করলে যেমন কম-বেশী নাদুস-নুদুস-দেহী হতে পারে, তেমনি অধিক পরিমাণে উগ্রব্যায়াম করলেও কম-বেশী বিকৃত পেশীবহুল দেহ তৈরী হতে পারে। এইরূপ উভয় প্রকার দেহীই যৌবনান্তে অকেজো হয়ে থাকে। অধিক ভোজীরা যেমন বয়স, ক্ষুধা ও শ্রম অনুযায়ী না খেয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য গ্রহণ ক'রে দেহে অপ্রয়োজনীয় মেদ জমিয়ে অকেজো হয় এবং একটু বয়সে সাধারণ খাদ্য হতেও বঞ্চিত হয়; তেমনি অনেকে বয়স, দেহের সহনশীলতা না বুঝে দ্রুত উন্নতির জন্যে নিজেদের জল বায়ু প্রতিকূল উগ্রব্যায়াম ক'রে বিকৃত পেশীযুক্ত দেহ গঠন ক'রে যৌবনান্তে দেহের বাহারতো হারায়ই, আয়াসী এবং অকেজোও হয়ে থাকে বেশী। ব্যায়াম ক'রে দেহ যদি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী কর্ম-তৎপর, কষ্ট-সহিষ্ণু ও নীরোগ না থাকে, তাহলে ব্যায়াম ক'রে লাভ কী? আহার্য্য গ্রহণ করা হয় ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টি-সাধন করার জন্য—আর ব্যায়াম করা হয় দেহের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা-বৃদ্ধি, ক্ষিপ্রতা, কর্ম-তৎপরতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে। কিন্তু উগ্রব্যায়ামে স্নায়ু ও পেশীর ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ও অধিক খাটুনীর জন্য উহারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে স্নায়ুর ক্ষমতা ক'মে যায়, যার জন্যে মগজ চালনার ক্ষমতাও হ্রাস পায়—স্নায়ু-গ্রন্থি সবল না থাকলে কর্ম-তৎপর থাকা অসম্ভব।

স্নায়ু ও গ্রন্থি যার সুস্থ নয় তার দৈহিক সুস্থতা, কর্ম-তৎপরতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও মগজ চালনার ক্ষমতা কিছুতেই পূর্ণভাবে থাকতে পারেনা। আমাদের জলবায়ুর প্রতিকূল উগ্রব্যায়াম পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে

রলে স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়বেই। এতে যৌবনে বা যৌবনান্তে পেশীগুলো বিভক্ত হয়ে বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি এর দ্বারা সম্ভব নয়। পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে উগ্রব্যায়াম করলে তার জন্তে বিশ্রামও যেমন বেশী প্রয়োজন—বাছাই বাছাই খাদ্যও তেমন বেশী গ্রহণ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এইরূপ হলে পেশীতে অধিক চাপ দিয়ে ব্যায়ামকারীর দেহ শুধু যে আয়াসী হয় তা নয়, দেহের ওপর একটা অত্যন্ত মায়া আসে, নিজের দেহ নিয়েই নিজে বেশী ব্যস্ত থাকে, আর অন্যদিকে তেমন উন্নত হতে পারেনা। তবে যারা শুধু দেহগঠন করে উহাদ্বারাই জীবিকার্জন করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। সুদর্শন দেহযুক্ত শক্তিধর ব্যক্তিও যৌবনান্তে দেহের তৎপরতা হারায়, যদি সে স্নায়ুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু পেশী বৃদ্ধি ও বিভক্ত করার জন্তে অধিক উগ্রব্যায়াম ক'রে থাকে। উগ্রব্যায়ামে দেহ বেশ পেশী বহুল হয়

বিভিন্ন প্রকার শক্তিপূর্ণ কৌশল আবিষ্কারক ও অভিনব ক্রীড়া-প্রদর্শক - লেখক

সন্দেহ নেই এবং দেহটি যৌবনান্তেও কর্ম-তৎপর থাকতে পারে, যদি বয়স ও দেহের গঠন বুঝে আমাদের দেশীয় ব্যায়াম দ্বারা দেহের ভিত স্থাপন ক'রে নিয়ে তারপর আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের সংগে সঙ্গমত অল্প উগ্রব্যায়াম করা যায়। দেহে ভিতস্থাপন না ক'রে পেশী বাড়াবার জন্ত অধিক পরিমাণ উগ্রব্যায়াম করলে সকলেরই দেহ উন্নত হবে বা সকলেই সুস্থ হবে তা নয়। বছর মধ্যে দু'চার জনেরই উন্নতি হতে পারে। যে দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বাস্থ্যহীন, সে দেশে দু'চার জন খুব উন্নত ও সুস্থ ব্যক্তি থাকায় লাভ কী? দু'একজন খুব সুন্দর দেহী থাক—আনন্দেরই কথা। কিন্তু বাকী স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিরা যাতে মোটামুটি সুস্থ কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু হয় সেটা দেশের পক্ষে বেশী কল্যাণকর নয়? সুন্দর, সুদর্শন, পেশীযুক্ত, কর্ম-তৎপর, কষ্টসহিষ্ণু, নমনীয় ও কমনীয় ক্ষিপ্র দেহীই হল আদর্শ দেহী। এইরূপ দেহ গঠন করতে হলে দেহের ভিত স্থাপন ক'রে বয়স বুঝে ব্যায়ামের গুরুত্ব বাড়াতে হয়। আর ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা বৃদ্ধি ব্যায়ামের সংগে স্নায়ু গ্রন্থি ও হজমশক্তির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। নইলে সেদেহ দর্শনধারীই হতে পারে—সংসারের অন্য কোন কাজে তেমন ভাবে লাগেনা। আমাদের জলবায়ুর অনুকূল খাদ্য পরিমিতভাবে বয়স বুঝে গ্রহণ করলেই যেমন দীর্ঘদিন সুস্থ থাকার এবং ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়, তেমনি আমাদের জলবায়ুর অনুকূল ব্যায়ামই দেহ তৈরী, সুস্থ, কর্মঠ, কর্ম-তৎপর হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। সাধারণ সহজপাচ্য খাদ্যগ্রহণের সংগে যেমন মাঝে মাঝে অতি পুষ্টিকর উগ্রখাদ্য যৌবনে কিছু কিছু গ্রহণ করা যায়, তেমন আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের সংগেও যৌবনে সঙ্গমত উগ্রব্যায়ামও করা যেতে পারে—তবে স্নায়ুতে ও পেশীতে যেন অধিক চাপ না পড়ে। পেশীতে অধিক চাপ পড়লে স্নায়ুতেও অধিক চাপ পড়বে। ফলে একটু বয়সে ঐ স্নায়ুর দুর্বলতা আসবেই। আমাদের স্নায়ুগ্রন্থি ও হজমশক্তি যদি সক্রিয়, সবল ও প্রবল থাকে তাহলে তার যৌবনও দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। মনে রাখতে হবে যৌবন বয়সে নয়, যৌবন কর্ম-তৎপরতায়। আরেকটি কথা, উগ্রব্যায়ামে দেহাভ্যন্তরস্থ রোগ বা ক্রটি দূর হয়না। মোটামুটি সুস্থ, গঠিত দেহীর পক্ষে ইহা প্রযোজ্য হলেও এর কুফল বেশী হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যেরূপ ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তাতে অধিকাংশ ব্যক্তিই কম-বেশী রোগাক্রান্ত। তা বলতে কিন্তু শুধু জ্বর, পেট-খারাপ প্রভৃতিই নয়। যা খাই তা সুচারু রূপে হজম না হওয়া একটা মস্ত রোগ। খাদ্যবস্তু ঠিক ভাবে হজম না হলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না, সুষ্ঠু ভাবে রক্তও তৈরী হতে পারে না। যৌবনে উগ্রব্যায়াম করলে অভ্যাস বশতঃ হয়তো আহার্য্য গ্রহণ করা হয়, আভ্যন্তরীণ ক্রটি চাপা প'ড়ে দেহবৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু যৌবনান্তে বা কোন সময় ঐ রোগ প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামে যে কোন প্রকার রোগ তো নিরাময় হয়ই, দেহের ভিতও চমৎকার রূপে স্থাপিত হয়—স্নায়ু গ্রন্থিও সক্রিয়, সবল ও প্রবল হয় এবং হজমশক্তি স্বাভাবিক থাকে।

ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বৈদেশিক ধারায় উগ্রব্যায়াম মোটেই আমাদের দেশে কার্যকরী নয়। ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতি কর্মতৎপর দীর্ঘস্থায়ী দেহ গঠনে আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের মত কার্যকরী আর কোন ব্যায়াম আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামের মধ্যে আর্য ঋষি প্রবর্তিত বিজ্ঞান-সম্মত যোগব্যায়ামই ব্যাপক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্তে সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতকর ও ফল-প্রসূ। পুরাকালে আর্য ঋষিগণ দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম, নীরোগ রাখার ও করার জন্তে কতকগুলো বিজ্ঞান-সম্মত অংগ-ভংগির প্রচলন করেন। ঐ সমস্ত ভংগি অভ্যাসে শুধু দেহটাই যে মজবুত হয় তা নয়, দেহ এত সুন্দরভাবে তৈরী হয় যে দীর্ঘদিন যোগ সাধনায় লিপ্ত হয়ে নানা কৃচ্ছ সাধনে দেহকে অটুট রাখা

সম্ভব। তাছাড়া দীর্ঘদিন সাধনায় লিপ্ত থেকে নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতাও অর্জন করতে পারা যায়। যে সমস্ত ভংগি অভ্যাসে ঋষিরা দেহকে যোগ-সাধনের উপযোগী করতেন ও দেহাভ্যন্তরস্থ মনকে বৃহৎশক্তির সংগে যোগ করতেন, ঐ সমস্ত ভংগিকেই বলা হয় যোগ-ব্যায়াম। এই যোগ-ব্যায়ামই আসন নামে অভিহিত। যে সমস্ত ভংগি বা আসন অভ্যাস ক'রে সেযুগের আর্যঋষিগণ দেহকে মজবুত করে কৃচ্ছ-সাধনের উপযোগী ক'রে যোগ সাধনায় লিপ্ত হতেন সেই সমস্ত ভংগি বর্তমান স্বাস্থ্যহীনতার যুগে আমাদের যে কত হিতকর তা বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত ভংগি বা আসন দেহকে শুধু নীরোগ, কর্মঠই করেনা, নানাবিধ জটিল ব্যাধি তো দূর করেই—উপরন্ত যথেষ্ট পরিমাণে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা, হজম-শক্তি প্রভৃতিকে বিশেষভাবে সক্রিয়, সবল ও প্রবল রাখে ও করে। দেহকে দীর্ঘদিন কর্ম-তৎপর ও কষ্ট-সহিষ্ণু রাখতেও এই যোগ-ব্যায়াম অদ্বিতীয়।

ছোট-বড়, কিশোর-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই অল্প সময় ব্যয়ে সকাল-সন্ধ্যা নানা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও ইহা অভ্যাস করতে পারেন এবং এর অভ্যাসে সুস্থ, সবল, কর্ম-ক্ষম, কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে দীর্ঘদিন সুখে কালাতি-পাত করতে পারেন। এতে দেহ বাহ্যিক উন্নত, পেশীবহুল না হতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কলকব্জা, স্নায়ু প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুস্থ মজবুত স্বাভাবিক রাখে।

এই আসনের উপকারিতা বর্তমানে সর্বদেশের দেহ-বিজ্ঞানীগণ অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছেন। এই কর্ম-ব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যহীনতার যুগে বিনা ব্যয়ে, স্বল্প সময় ব্যয়ে দেহকে নীরোগ, সুস্থ, কর্মঠ, বলিষ্ঠ—স্নায়ু গ্রন্থিকে সক্রিয়, সবল করার জন্যে আসনের মত আর অন্য কোন ব্যায়াম আছে বলে বিজ্ঞ দেহ-বিজ্ঞানীগণ মনে করেন না। ডাল-ভাত, তরী-তরকারী, শাক-সব্জী, ঘি-দুধ-দই, ফল-মূল, মাছ-মাংস, চিড়া-মুড়ি যেমন কমবেশী প্রত্যেকের পক্ষেই ক্ষয়-পূরণ ও পুষ্টি-সাধনের পক্ষে অনুকূল, আসনও ঠিক তাই। যারা উগ্র-ব্যায়াম করে তাদেরও ব্যায়ামের পর মোটামুটি বিশ্রাম ক'রে স্নায়ু গ্রন্থিকে সুস্থ-সবল রাখার জন্যে দু'চারটি আসন অবশ্য করণীয়। তবে বয়স, দেহের গঠন, রোগ-ত্রুটি, প্রভৃতি বুঝে যোগ্য গুরুর নিকট হতে নির্দেশ নিয়ে অথবা উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পুস্তক দেখে নিজ নিজ প্রয়োজনমত আসন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, যে-ব্যায়ামে একের উন্নতি হয় সে-ব্যায়ামে অপরের উন্নতি নাও হ'তে পারে। তবে আসন যে যে-ভাবেই করুক অপকার হবেনা। তবে আসন করার সময় শ্বাস থাকবে স্বাভাবিক। এমন কোন পোষাক পরা থাকবেনা যাতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হতে পারে। একটি আসনে সহজ-সাধ্যভাবে যে যতক্ষণ পারবে ততক্ষণ থেকে প্রতি আসনের পরই সুষ্ঠু ভাবে রক্ত চলাচলের জন্যে শবাসন অবশ্যই করতে হবে। পুরাকালে আর্য-ঋষিগণ যে আসন যতক্ষণ করতেন বর্তমানে সে আসন ততক্ষণ করতে নেই। কারণ সেযুগের মানুষের যেরূপ সহ্যশক্তি ও দেহের গঠন ছিল এখন কিন্তু তা নেই। আর গৃহত্যাগীরা যে আসন যে ভাবে যতক্ষণ করে, গৃহীদের কিন্তু সেভাবে সে ধারায় করতে নেই। কারণ উভয়েরই জীবনযাত্রা প্রণালী তফাৎ। আবার সুস্থ ব্যক্তি যে আসন যে ভাবে যতক্ষণ করবে রোগীদের সে ভাবে সে আসন ততক্ষণ করতে নেই। তেমনি কিশোর-যুবা, বৃদ্ধ ও ছোটদের মধ্যেও তারতম্য আছে। এছাড়া কতকগুলো আসন—ধ্যানাসন ধ্যানধারণার জন্যে—আর বাকীগুলো স্বাস্থ্যাসন—স্বাস্থ্যের জন্যে। স্বাস্থ্যাসন স্থিতিতে করলেই হয় আসন, আর গতিতে করলেই হয় খালি হাতে ব্যায়াম।

আজকের দিনে এই আসনের উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রে অনেকেই অভ্যাস করছেন। আবার অনেকে যারা আসন সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান রাখেননা, তারা এর বিরুদ্ধে নানারূপ অভিমত ক'রে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে থাকেন। তেমনি আবার আসনের জনপ্রিয়তা দেখে অনেকে যারা কোনদিন আসন করেন নাই বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নাই তাদেরও অনেক শিক্ষক সেজে ভুল শিক্ষা দিয়ে জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার ক'রে থাকেন। উভয়ই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধু যে আসনের বেলাই এরূপ তা নয়—সত্যিকারের শক্তি

লেখকের বালক পুত্র—যোগ-ব্যায়ামের একটি ভঙ্গিতে
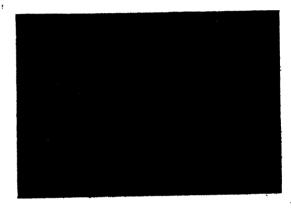
চর্চার বেলায়ও তাই। অনেকে সত্যিকারের শক্তি চর্চার কৌশল অপকৌশলের সাহায্যে প্রদর্শন ক'রে সরলমতি জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে প্রকৃত শক্তিচর্চা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে থাকেন। এ-ও সমাজের পক্ষে সমান ক্ষতিকর।

একটা দেশ ও জাতি কতটুকু উন্নত তা বোঝা যায় সে দেশবাসীর স্বাস্থ্য দেখলে। আমাদের দেশ আজ যে স্বাস্থ্যহীনতার চরমে, তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। ছাত্র সমাজের আজ শিক্ষার মান পর্যন্ত নিম্ন হতে নিম্নস্তরে চলে যাচ্ছে। আজ ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা। যে দেশে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীনতা সে দেশে দু'চার জন খুব সুন্দর দেহী থাকার চেয়ে কি গড়ে প্রত্যেকের সুস্থ, সবল হওয়া সমীচীন নয়? এই স্বাস্থ্যহীনতার যুগে আজ বিনাব্যয়ে দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি করতে হলে আমাদের দেশীয় ব্যায়াম, আসন ও খেলা ধূলা যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা বোধহয় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। এই যোগব্যায়াম বা আসনে শুধু দেহটিই মজবুত হয়না দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতশক্তি অর্জিত হয়। মনটি হয় ঝরঝরে। একথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার অভাব হলেই হিংসা-দ্বেষ, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া এরোগ দূর হওয়া সম্ভব নয়। দেশবাসী দৈহিক ও মানসিক সুস্থ হলে দেশের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। এই মনীষীর দেশ, আদর্শদেশ আজ বৈদেশিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্যে যে কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে তা বোধহয় আর বলতে হবেনা। সুস্থ দেহে সুস্থ মন গ'ড়ে উঠলেই—"আবার ফুটিবে পারিজাত কুসুমে মোদের মাতৃভূমে।

উন্নত সারের কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রীরের পুষ্টির জন্যে উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন আছে। ফসল ফলানোর ন্যে জমিকেও উপযুক্ত আহার দেবারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। জমির াহারকে আমরা সার বলে থাকি।

এক সময়ে আমাদের দেশে জমিতে যে-পরিমাণ ফসল ফলতো এখন ার সেই পরিমাণ ফসল ফলে না। এর অবশ্যই একটা কারণ আছে। খন জমিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর জৈব এবং অজৈব সার মিলতো। ছরে বছরে ফসল নেবার ফলে জমিতে সারের পরিমাণ যাচ্ছে ক্রমাগত মে। সে কারণে আগের মতো ফসল আর পাইনে। ধরুন পোষ্টাপিসে ামার একশো টাকা জমা আছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গচ্ছিত না রেখে ঐ সঞ্চয় থেকে যদি আমি মাসে মাসে দু'দশ টাকা তুলে নিই, তবে াষ পর্য্যন্ত জমার খাতে যা থাকবে তা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড শূন্য। জমির ম্পর্কেও একই কথা। যদি তাকে নিয়মিতভাবে আহার না দিই অথচ ার কাছ থেকে বছরে বছরে ফসল আদায় ক'রে নিই, তবে জমির বস্থাও নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়ে উঠবে। সেই দেউলে জমি শেষ পর্য্যন্ত মাকে ভালো ফসল দিতে অস্বীকার করবে। সে রীতিমতো বেঁকে াড়াবে।

এই জন্যেই জমি থেকে প্রচুর ফসল পেতে হ'লে তাকে উৎকৃষ্ট সার তে হবে প্রচুর। আর সারের রাজা হচ্ছে পচা গোবর আর চোনা। ামাদের দেশে গোবরের কী নিদারুণ অপচয়! গোবর আমরা জ্বালানি 'রে পুড়িয়ে ফেলি। মাঠের গোবর মাঠে আর প'ড়ে থাকতে পায় না। গোবর অবশিষ্ট থাকে অজ্ঞতায় এবং অযত্নে তারও সারের গুণ নষ্ট য়ে যায়। গোবরকে ঘুঁটে করে পুড়িয়ে ফেললে জমিকে তার খোরাক কেই বঞ্চিত করা হয়, আর জমিকে যে উপোসী রেখে তার কাছ থেকে লো ফসল আশা করে দুনিয়ায় তার মতো নির্ব্বোধ আর কে আছে? ডালে বসে আছি তাকে কাটলে মাটিতে পড়তেই হবে।

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। সমস্ত গোবর জমিতে চলে গেলে াকে জ্বালানি পাবে কোথা থেকে? এর সদুত্তর হচ্ছে জ্বালানির জন্যে বৎসর বাবলা ইত্যাদি গাছ লাগানো—যা সহজে জন্মায় এবং সহজেই ড়ে।

গোবরকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করার সহজ উপায় হচ্ছে, একটা গভীর গর্ত কেটে তার উপরে এমন একটা আচ্ছাদন ক'রে দেওয়া যাতে াবর রৌদ্রে শুকিয়ে অথবা বৃষ্টিতে ধুয়ে না যায়। গোয়ালের চোনাকে র রাখার ব্যবস্থা থাকাও উচিত।

মানুষের মলমূত্রও জমির একটা উৎকৃষ্ট খাদ্য। জাপানী চাষীর ড়পড়তা জমির পরিমাণ তিন বিঘার কিছু বেশী। তবুও এই স্বল্প-রিমাণ জমিকে আশ্রয় ক'রেই জাপানী চাষীরা খাওয়াপরার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে। আমাদের দেশে তিন বিঘা জমির মালিকের কথা দূরে থাক, যারা তিন তিরিকে নয় বিঘা জমির মালিক তাদেরও ভাত-কাপড় জোটেনা। জাপানে বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ আমাদের দেশের ফলনের অনুপাতে অনেক বেশী। এর কারণ হচ্ছে, জাপানী চাষীরা মানুষের মলমূত্রের একটুও অপচয় হতে দেয় না। সব জমিতে চলে যায় এবং সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে জমির ফলন বাড়ায়। একজন জাপানী চাষী তার ক্ষেত থেকে বছরে তিন বার ফসল আদায় করে নেয়।

আমাদের দেশে মলমূত্রের আত্মঘাতী অপচয় দেখলে দুঃখে কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করে। লোকে গ্রামের রাস্তাঘাটে, এমন কি নদীর পারে পর্য্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ করে এবং তার জন্যে কোন লজ্জা অনুভব করে না। এই মলমূত্রের দুর্গন্ধে বাতাস দূষিত হ'য়ে যায়। বাতাস দূষিত হ'লে গ্রামে রোগ ছড়াতে বাধ্য। জাপানী চাষীদের অনুসরণ ক'রে এই মলমূত্র সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা'হলে আমাদের জমির উর্ব্বরশক্তি নিশ্চয়ই বাড়বে এবং সেই সঙ্গে ফলনও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের দেশে অন্নকষ্ট এত বেশী যে এযুগে আমাদের জীবনের একটা মূলমন্ত্র হওয়া উচিত; অন্নং বহু কুর্ব্বীত, ফসল ফলাও প্রচুর। আর প্রচুর ফসল ফলাতে হলে বিজ্ঞানের আশ্রয় আমাদিগকে নিতেই হবে। বুদ্ধি মানুষের একটা পরম সম্পদ। বুদ্ধিকে যদি আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারি তবে আমাদের আশপাশের অনেক সহজলভ্য বস্তু উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়ে জমির ফলন বাড়াতে পারে।

যে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ গোবরের সঙ্গে মিশে গিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরী করার ক্ষমতা রাখে। জলের কচুরিপানা, মাঠের আগাছা, বনভূমির ঝরাপাতা—সবই সারের উৎকৃষ্ট উপাদান। এ ছাড়া যেখানে পাট বা ম্যাস্তা জাগ দেওয়া হয় সেখানকার মাটিও খুব জোরালো। যেখানে জমি বহুল সেখানে পুকুরের পচা পাঁকও উৎকৃষ্ট সার। আমার জমিতে বালির পরিমাণ বেশী হওয়ায় আম গাছগুলো বাড়তে পারছিলো না। তাদের চারদিকে পরিখা কেটে দিলাম—আধ হাত গভীর। পাট জাগ দেওয়া হয়েছে এমন জায়গার মাটি এনে সেই মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলাম পরিখাগুলি। গাছগুলি পুষ্টিকর খাদ্য পেয়ে চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিলো। এখন তাদের চেহারা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

জৈব সারের ভিতর সবুজ সারের মূল্যও বড়ো কম নয়। ধঞ্চে, শোন, কলাই, বরবটি প্রভৃতি ফসলকে ঠিক ফুল ধরবার সময় হ'লেই লাঙল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সেগুলি পচে কিছুদিন বাদে উৎকৃষ্ট সারে

পরিণত হয়। কেবলমাত্র এই রকমের সবুজ সারের প্রয়োগেই জমির ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সার হিসাবে এ্যামোনিয়াম-সালফেট, সুপার-সালফেট প্রভৃতি কৃত্রিম সারও যথেষ্ট উপকার দেয়। গো মহিষের অস্থিচূর্ণও কি সার হিসাবে কম উপকারী? গ্রামে গ্রামে এই সব হাড় সংগ্রহ ক'রে যদি সহজলভ্য যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে চূর্ণ ক'রে গ্রামেই ব্যবহার করা যায় তবে সারের অভাব অনেকাংশে মিটতে পারে এবং বেকারসমস্যাও কিছুটা সমাধান হয়।

আমাদের দেশে যত রকমের সমস্যা আছে তাদের মধ্যে অন্নসমস্যাই যে মূলসমস্যা—এতে কি কোন সন্দেহ আছে? দেশে ব্যাপক আকারে অন্নাভাব থাকতে আর কোন উন্নতির কথা ভাবা সম্ভব নয়। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: 'খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।' খালি পেটে কি শুধু ধর্ম্মই হয় না? পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলতে থাকলে সাহিত্য দর্শন কিছুই হয় না। তাই সর্ব্বাগ্রে অন্নের ফলন আমাদিগকে বাড়াতেই হবে। আর অন্নের ফলন বাড়াতে গেলে সারই আমাদের প্রধান সহায়। জমি তো রবার নয় যে টেনে-টুনে তাকে বাড়ানো যাবে। কিন্তু জমির ফলন বাড়ানো অবশ্যই সম্ভব, যদি বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে আমরা তার পরিচর্য্যা করি।

ইংরেজশাসন থেকে মুক্তি যেমন সহজ ছিল না, দেশ থেকে দারিদ্র্য-রাক্ষসীকে তাড়ানোও তেমনি সহজ হবার নয়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি আসবে আমাদের নিজেদের মিলিত প্রচেষ্টার রাস্তায়। চালাকির দ্বারা যেমন কোন মহৎ কার্য্যই সম্ভব নয় তেমনি প্রচুর পরিমাণে অন্ন ফলানোও সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে। সেই জ্ঞান-তপস্যাকে আশ্রয় ক'রে যখন তাহা কার্য্যে পরিণত হবে তখনই গড়ে উঠ্‌বে স্বরাজের সেই স্বর্গভূমি সেখানে মানুষ মুক্তি পেয়েছে দারিদ্র্যের নিদারুণ দুঃখ থেকে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ও কুটীর শিল্প

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

বর্ত্তমান যুগ শিল্প-বিজ্ঞানের প্রগতির যুগ। পৃথিবী আজ শিল্প-বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। দুর্গম ও দুরধিগম্য গ্রহও আজ শিল্পবিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আয়ত্ত করতে চলেছে। সেই শিল্প বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে, সেই স্পুটনিকের যুগে কুটীর শিল্পের কথা বলতে গেলেই হয়ত বা তথাকথিত প্রগতিবাদীর দল চীৎকার করে উঠবেন, সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে—বিমান ও রকেটের যুগকে গো-যানের যুগে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে। বর্ত্তমান এই যন্ত্র সভ্যতার অচিন্ত্যনীয় উন্নতির যুগে কুটীর শিল্পের প্রচলন ও বিকাশের আলোচনাকে আপাতদৃষ্টিতে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়ার সামিল বলেই মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অধুনা ভারতের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও পটভূমিকায় সমস্যাটা একটু গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখতে পাব—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য—বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সফল রূপায়নে কুটীর শিল্পের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটা কোনও ভাবাবেগের কথা নয়—গাণীতিক বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সত্য। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন নারায়ণও "Our small scale Industries—Their important role" শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন—"Small Scale Industries are not a matter of sentiment but of pure arithmetic and reality aud the earlier this point is understood and appreciated by our economists and politicians, the better for them and the nation." [Major Industries in India—Annual 1955-56 (Vol. S)], বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের অর্থনীতি, শিল্প ও বেকার সমস্যার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে—দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কুটীর শিল্পের অবদান নেহাৎ তুচ্ছ নয়, বিশেষ করে ভারী বা মূল-শিল্পের পরিপূরক হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিহার্য্য॥

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন ও শোষণের পূর্ব্বে এই উপমহাদেশ শিল্পোৎকর্ষে পৃথিবীর উন্নতদেশগুলির প্রথম সারিতে ছিল। তারপরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন ভারতকে নিঃস্ব ও রিক্ত ক'রে নিয়ে দাঁড় করাল জগতের অনুন্নত দেশগুলির প্রায় পেছনের সারিতে। ১৯০৮ সালে "ধাতুসম্পদ" সম্পর্কে সেরা বিশেষজ্ঞ Sir Thomas Holland বলেছেন,—"এ দেশের তৈয়ারী লৌহের উৎকর্ষ, উঁচুদরের ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য ইওরোপে অধুনা ব্যবহৃত রীতির পূর্ব্বাভাষ, তামা ও পিতলের জিনিষের শিল্পোৎকর্ষ ভারতকে ধাতব শিল্প জগতে এক সময়ে এক বিশিষ্ট আসন দান করেছিল।" ["ভারতের ধাতু সম্পদ"—T. H. Holland's Report, 1908] ১৯১৮ সালের ভারতের শিল্প কমিশনের রিপোর্টেও ভারতের অতীত উৎকর্ষতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেই রিপোর্টের একাংশে বলা হয়েছে—"আধুনিক শিল্পব্যবস্থার জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপ যখন অসভ্যদের বাস-ভূমি, তখন ভারতের শাসকদের ঐশ্বর্য্য এবং তার শিল্পীদের শিল্প কৌশলের জন্য ভারত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার অনেক পরে পাশ্চাত্যের বণিক [illegible] দল যখন প্রথম ভারতে এসে [illegible] ক'রে [illegible]

এদেশের শিল্প প্রগতি অন্তত: ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে নীচু স্তরে ছিল না। [ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্ট—পৃ: ৬] কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের দু'শ বছরের নির্বিবেক শোষণ ও অপরিসীম অবহেলার দরুণ সেই ভারত সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজ অর্থনীতির দিক দিয়ে আছে অনেক পিছিয়ে। ১৯৩৩ সালে "Royal Empire Society"তে Sir Alfred Watsonএর বক্তৃতাও এই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেছেন—"শিল্পের দিক দিয়ে ধরতে গেলে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে সুযোগ হারানো হয়েছে।...ইহার জন্ত দোষ বেশীর ভাগ বৃটিশদেরই।...শিল্প সমৃদ্ধির দিক দিয়ে যে ক্ষমতা ভারতের নিঃসন্দেহে রয়েছে, তার অপ্রগতির সমস্যাটা আমরা কোন কালেই তেমন করে মেটাবার চেষ্টা করি নাই।" [The Times—4th June 1933].

পরাধীনতার অভিশাপে শিল্প সমৃদ্ধিতে একদা অনুকরণীয় সেই ভারতের দুরবস্থা এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছিল যে,—"গড়ে একজন ভারতীয়ের যাহা আয় তাহাতে প্রতি তিন জন লোকের মধ্যে দুই জনের কোনও মতে খাওয়া চলতে পারে...তাহাও আবার নিকৃষ্টতমও সর্বাপেক্ষা কম পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত তাহারা আর কিছুই চাহিবে না। [Shah and Khambata—"The wealth and taxable capacity of India" 1924, P-253].

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক জন-জাগরণের প্লাবনে ভারত পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেল, পেল রাজনৈতিক স্বাধীনতা; কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আজও তার সম্ভব হয়নি। খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, দেশ বিভাগজনিত নানা সমস্যায় তার অর্থনৈতিক জীবন ভারাক্রান্ত। কিন্তু সেই কালো মেঘের ভিতরও রৌদ্রের রূপালী আলো দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজ সুরু করেছেন আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, জাতীয় সরকারের দায়িত্বশীল আসনে অধিষ্ঠিত আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফৎ। রাজনৈতিক জীবনে ভারত আজ জগৎ সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনেও যাহাতে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারই জন্ত চলেছে আজ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তাই রচিত হল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কৃষিকে প্রাধান্ত দিয়ে। কিন্তু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপায়নের পরে দেখা গেল—উৎপাদন বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু জীবিকা প্রসারের বা বেকার সমস্যার সুরাহা তাহাতে কিছুই হ'ল না, পরন্তু বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিই হ'ল। দায়িত্বশীল জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীবিকার প্রসারও প্রয়োজন—অন্যথায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। তাছাড়া জনগণ তাহ'লে সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়নকল্পে কোন অনুপ্রেরণা পাবে না। কমিশন ও বলেন,—"The employment position worsened to some extent during the period of the Plan (Ist. five year plan), the number on the live registers of employment exchanges rising from 3.37 lakhs in March 51, to 5.22 lakhs in December 53 and further to 6.92 lakhs in December 55......If plans of economic development are to evoke sufficient response, employment must be one of the central objectives." [A draft outline of 2nd. five year plan by Planning Commission, Govt. of India, 1956, P. 40.]

তাই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় রচিত হল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা মূল বা ভারী শিল্পকে প্রাধান্ত দিয়ে; অবশ্য কৃষিকে উপেক্ষা করে নয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে কোনও অনগ্রসর দেশকে বর্ত্তমান দুনিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে চলতে হলে তার শিল্পোন্নয়নের অগ্রাধিকার প্রয়োজন এবং তার জন্ত প্রথমেই তাকে ভারী বা মূল শিল্পের উপরে নজর দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর ক'রে। মূল বা ভারী শিল্পের উন্নতি না হলে—কি কৃষি কি শিল্প কিছুরই আকাঙ্খিত উন্নতি সম্ভব নয়। চিরদিন মূলশিল্পের জন্ত অন্ত দেশের উপর নির্ভর করা আর্থিক উন্নতিরও পরিপন্থী। তাছাড়া ভারী বা মূল শিল্প গড়ে না উঠলে কখনও কোনও দেশের শিল্পের বনিয়াদ পাকা হতে পারে না, তাই আমরা তুলনামূলকভাবে দেখতে পাই যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমস্ত উন্নয়ন খাতে ৭·৬ শতাংশ শিল্পের জন্ত ব্যয়িত হয়েছিল, সেইখানে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পের জন্ত ব্যয়ের হার স্থিরীকৃত হয়েছে ১৮'৫ শতাংশ। (অবশ্য এখানে শিল্প বলতে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্প উভয়কেই ধরা হয়েছে)। প্রত্যেক অনগ্রসর দেশের উন্নতির ধারা লক্ষ্য করলে একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক প্রগতির জন্ত ভারী বা মূল শিল্পকে প্রাধান্ত দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চীনের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাই এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"The guiding principle of the plan, as is generally known is to concentrate our main efforts on the development of heavy industry as a foundation of the industrialisation of the country..." [Documents of the first session of the first National Peoples' Congress P. 78]. শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র রাশিয়াও একই সাক্ষ্য বহন করে। সেখানকার উন্নতির ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই, ভারী শিল্প বা মূল শিল্পের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাদের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। অবশ্য মূল শিল্পের প্রসারের প্রথমাবস্থায় দেশবাসীর কিছুটা কষ্ট স্বীকারের জন্ত প্রস্তুত থাকা দরকার, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির স্থায়ী বুনিয়াদ তৈয়ারীর জন্ত। মূল বা ভারীশিল্পপ্রধান পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নের গোড়ার দিকে ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা প্রয়োজন অনুসারে মেটানো সম্ভবপর নয়। পরিকল্পনা কমিশন ও বলেছেন—

"Investment in basic industries creates demand for consumer goods, but it does not enlarge the supply for consumer goods in the short run." [Draft outline of 2nd. five year plan—by Planning Commission, Govt. of India, 1956, P, 8]. কাজেই প্রয়োজন হয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদার সঙ্কোচন। অন্তথায় দেশের পুঁজির একটি মস্ত বড় অংশ ব্যয়িত হয়ে যায় ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্ত এবং তাহা ভারী বা মূলশিল্প গড়ে তোলবার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বর্ত্তমান অবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের মজুত বৈদেশিক মুদ্রা ১৯৫৬ সালের গোড়ায় ৭৩৫ কোটি টাকা ছিল, ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের শেষে তাহা ৩৯৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। এই সব দিক বিচার করে আমাদের ভোগ্যপণ্যের আমদানীর উপর কড়াকড়ি খুব সুচিন্তিত এবং যুক্তিপূর্ণ হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তবে এই সমস্তার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সমাধান সম্ভব কুটীর শিল্পের বিকাশের দ্বারা; অর্থাৎ ভারী শিল্পের পরিপূরক হিসাবে পাশাপাশি কুটীর-শিল্প গড়ে তুলে। অন্তান্ত দিক বজায় রেখে জীবিকার প্রসারের পথেও কুটীর-শিল্পের প্রসার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সব দিক বিবেচনা করেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটীর-শিল্পের জন্ত ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ হয়েছে ২০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার চেয়ে ১৭০ কোটি টাকা বেশী। [অবশ্য কমিশন নিযুক্ত "Village & Small Scale Industries Committee." সুপারিশ করেছিলেন ২৬০ কোটি টাকা]। তাছাড়া কুটীর-শিল্প প্রসারের আরও একটা অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে—কুটীর শিল্প প্রসারের দ্বারা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনও কিছুটা সম্ভব—কুটীর শিল্পজ পণ্যের বিদেশে রপ্তানীর বন্দোবস্ত করে। এই প্রকারে আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থার খানিকটা উন্নতি করতে পারি।

বেকার সমস্তা সমাধান কল্পে "কুটীর শিল্পের অবদান" প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত "ষ্টাডি গ প" (Study Group) এর রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে,— "The existing programme would provide employment opportunities for about 14.4 lakhs of persons, whereas complete eradication of educated unemployment would require the creation of 2 million job opportunities during the second plan period." [Draft outline of 2nd five year plan, by Planning Commission, Govt of India, 1956. P-45] এই বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ত সেই "ষ্টাডি গ্ পৃ" ও কুটীর শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের সুপারিশ করেছেন। এখন অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—"বেকার সমস্তা সমাধানে বা জীবিকা প্রসারে কুটীর শিল্প কি উপায়ে সাহায্য করতে পারে?" কুটীর শিল্পে মূলধনের তুলনায় লোক লাগে অনেক বেশী। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে দেখা গেছে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটীর শিল্প ও অন্তান্ত ছোট শিল্পে আরও সাড়ে চার লক্ষ লোকের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হবে। [Draft outline of 2nd five year plan, by Planning Commission, Govt, of India, 1956. P-43]. কাজেই দেখা যায় কুটীর শিল্পের মাধ্যমে অন্তান্ত উদ্দেশুকে ব্যাহত না করে জীবিকা সংস্থানের প্রসার সম্ভব। "Our Second Five year Plan—Diffusion of benefits of Industrialisation" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র, এম. পি., Deputy Minister for Planning (কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা উপমন্ত্রী) ঠিকই বলেছেন,—"In Indian conditions there perhaps could be no better device for raising the incomes of the unemployed and under-employed masses than through the role designed to the Village and Small Scale Industries" ["Major Industries in India"—Annual 1955-56 (Vol. 5)]. "The Karve Committee" এর রিপোর্টও এই সমস্তার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে কুটীর শিল্পের প্রসারের জন্ত সুপারিশ করেছেন।

কুটীর শিল্পের প্রসার ও বিকাশ যে আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, এই মতবাদটা শুধু আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই পোষণ করেন না, শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের বিশেষজ্ঞগণেরও অনুরূপ অভিমত। "Ford Foundation Team" এর রিপোর্ট থেকেই তাহা প্রমাণিত হয়। ভারত সরকার, জাতীয়-পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকা সংস্থানের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত। সেই আন্তর্জাতিক দলটি "Ford Foundation Team" নামে পরিচিত কারণ, "Ford Foundation "এর সৌজন্তে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সেই আন্তর্জ্জাতিক দলে ছিলেন—

(১) Mr. Sven Hagbesg, Vice—Principal and acting Principal of the Swedish Govt. Institute for Higher Education in Trades and Handicrafts.

(২) Mr. Grunstrom, Managing Director of Swedish federation of Small Industries and Crafts.

(৩) Mr. Ramy Alexander, a Consultant in the Development of Handicrafts and Specialised Small Industries.

(৪) Raymond W. Miller, a Leading authority of Co-operatives. এবং

(৫) Mr. C, Leigh Stevens, an expert on Industrial Management Engineering.

এই পাঁচজনের ভিতর প্রথম দুইজন সুইডেনবাসী, আর বাকী তিনজন শিল্পোন্নত আমেরিকাবাসী। তাঁহারা সকলেই আমাদের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্তা সমাধানে কুটীর-শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে গেছেন। প্রসঙ্গতঃ জাপান, জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশগুলিতেও বেকার সমস্তা সমাধান কল্পে কুটীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পরিশেষে কুটীর-শিল্প-বিরোধী তথাকথিত প্রগতিবাদীদের আমি বলতে চাই যে, কুটীর শিল্প দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে অন্তরায় ত' সৃষ্টি করেই না, পরন্ত মূল-শিল্প, বিকাশের পথকে সুগম করে দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কারণ,

প্রথমতঃ, ভারী বা মূল শিল্পের জন্ত সঞ্চিত পুঁজিতে হাত না দিয়ে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে কুটীর শিল্প;

দ্বিতীয়তঃ, বেকার সমস্তারও আংশিক সমাধান সম্ভব কুটীর শিল্প দ্বারা; এবং,

তৃতীয়তঃ, কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জ্জন করা যায় কুটীর-শিল্পজ পণ্যের রপ্তানির ব্যবস্থা দ্বারা।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেদার চরের আয়তন প্রায় সাত হাজার একর—অনুমান একুশ হাজার বিঘা। বড়খাল বলতে একটা, তার থেকে আশে পাশে অনেক ছোট খাল বয়ে গেছে। তাদের অনেকেই ভিতর দিকে কিছু দূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাত্র বড় খালটি এদিকের সমুদ্র থেকে বার হয়ে অপর দিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং কাঠ বোঝাই খালি নৌকা সবই খালেই থাকে।

আমরাও ঢুকলাম এই খালে। বড়দার নৌবহর অর্থাৎ অন্যান্য বড় ছোট নৌকাগুলোর কাছাকাছি গিয়ে নোঙর ফেললাম। পাশেই বনবিভাগের কর্মীদের বোট, অপিস—থাকা খাওয়া সবই এই বোটে। ডাঙ্গাতে কেউই থাকে না, সন্ধ্যার আগে যে যেখানে থাকে এসে নিজের নিজের বোটে বা নৌকায় আশ্রয় নেয়।

আগেই বলেছি—এবার ফেয়ার ওয়েদার ক্যাপ এইখানেই, যত কাঠ কাটাই হবে এই সময় সমস্ত কাঠই এই বন থেকে যাবে। কুড়ি বৎসর পর আবার এখানে কাটা হচ্ছে। রেঞ্জ অপিস থেকে নৌকা পাশ করিয়ে এনে খালি নৌকা জমা হল এই খালে। বন বিভাগের লোক নৌকার পাশ দেখে—তারাই সেই জাতীয় গাছে 'মার্কা' দিয়ে আসবেন বনের ভিতর, নৌকার কাঠুরেরা সেই সব গাছ কেটে ফেলবে। বনবিভাগ আবার সেই সব গাছগুলো ঠিক কাটা হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হলে, তবে নৌকা বোঝাই করতে পারবে মহাজন। বোঝাই নৌকা ছেড়ে আসবার আগে 'ফাইনাল চেক' করিয়ে পাশ নিয়ে তবে জমাবে পাড়ি। এককথায় অনেক গেরো। তবে বজ্র আঁটুনি ফস্কাগেরো। এখানে আইনের যত কড়াকড়ি, তাতে আখেরে বনবিভাগ কতটুকু লাভবান হয়েছে তা গবেষণার ব্যাপার, কিন্তু চর্মচক্ষে দেখে মনে হ'ল ওখানের কর্মচারীদের অনেকেই বেশ তোফা আছেন। আইনের অজুহাতে দুর্গম বনের মধ্যে··· অসহায় মহাজন, কাঠুরে—বন ব্যবসায়ীদের যেরকমভাবে রক্তশোষণ করেন—তাদিকে তার জন্য যদি কেউ সুন্দরবনের 'Bug' বলেন—অন্যায় করবেন না। বাওলিয়াদের মুখে খোঁজ নিয়ে জানলাম—তাঁদের প্রণামীর রেটও প্রায় অদৃশ্য কালির আখরে বাঁধা আছে। যেমন একশো মণ গেঁও কাঠের কবলার—সরকারী রেভিনিউ ছাড়া, ওদের প্রণামী বাঁধা আছে। গরাণ খুঁটির বেলায় সরকারী রেভিনিউ ছাড়া ওঁদের প্রণামী। মণ প্রতি প্রত্যেক কাঠের বেলাতেই অমনি বাঁধা দর আছে।

না দিতে চান—দেবেন না। কিন্তু আপনার হাজার মণ নৌকা বোঝাই করতে এক মাস দুমাস তিন মাস কাঁদিয়ে ছাড়বে। আপনি তাঁদের হাতে, কোন অভিযোগ করতে গেলে চারদিন চার রাত পথেই কাটবে আসতে। যেতেও তাই। মাঝি-মাল্লার মজুরী আছে, তারপর কি হবে আপনার অভিযোগের ফলাফল, তা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। ওদিকে বনের মধ্যে আপনার লোকজন বসে আছে কাজ নাই; তাদিকে খোরাকী, মাইনে দিতে হবে। যদিও আইন মাফিক আপনার কাটবার মত গাছ বাতলে দিতে হবে বনবিভাগকে, দেবার বেলায় সুরু করবেন।তারা গড়িমসি, পেলেন, বাঁকা খারাপ গাছ। গাছ কাঠার পর এমনি তুলে আনতে পারবেন না, বন বিভাগের শেষ মার্কা নাহলে, তার জন্য হাঁ করে বসে থাকুন কবে সেই শুভক্ষণ আসবে। অর্থাৎ আপনার হাজার মণ কাঠ বোঝাই হতে তিন মাস কেটে যাবে, কেঁদে কূল পাবেন না, তাও সুন্দর-অরণ্যে রোদন। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের খুশী করে কাজ করতে হয়। তাঁরাও বন বিভাগে বনবাসের চাকরীর মূল্য সাধারণের ঘাড় দিয়ে মায় সুদ সমেত উশুল করে নেন। এ সম্বন্ধে আইনতঃ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—তাই শাস্তির প্রশ্নও ওঠে না।

বনের রহস্য—বনেই সীমাবদ্ধ থাক। আমরা আপাততঃ এসে পৌঁচেছি, দিনকয়েক নিরাপদেই কাটবে, পথের দুশ্চিন্তা থেকে আপাততঃ মুক্তি পেলাম। ভাববো—আবার ফিরবার সময়।

বড়দার 'ফুলস্টাফ' অর্থাৎ মাঝি-কাঠুরে সবাই রয়েছে। তিনখানা নৌকা বাইরে ছিল তাদের দলবলও গিয়ে জুটেছে। এককথায় 'নরক গুলজার'। তার উপরে গিয়ে হাজির হয়েছে আমার মত একটি গোলা লোক।

বাবু—পথের মধ্যে চরমারা দ্বীপের জঙ্গলে বাঘের ডাক না শুনি—কেমন হ'য়েল, ভয়ে যেন কাঠ। ছোট টাপুরী নৌকাতে উঠতি বাবুর পরাণডায় কাঁটা দিই ওঠে।

এ হেন লোক যে কেমন করে কোন সাহসে এই সমুদ্রের চরে এল তাই নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা ও হয়ে গেছে।

সেদিন শুক্রবার। ওই দিন জঙ্গলের বাওলিয়াদের ছুটি, কেউ বনেও নামে না। হৈ চৈ করে; বিশ্রামের, সাতদিনের ময়লা কাপড় নোনাজলে সাবানটুকরো দিয়ে কেচে ফর্সা করবার বৃথা চেষ্টা করে। জায়গাটায় লোকজনের দেখা মেলে।

কে অনুমান করবে, মাস তিনেক আগেও এখানে কোন মানুষের ছোঁয়া পড়েনি। বিশ বৎসর ধরে এই বনভূমি নিঃশব্দে যে রহস্যজাল গড়ে তুলেছিল মানুষের কলরবে আজ তা ছিন্ন হয়ে গেছে, আবার ছায়াবাজীর মতই মিলিয়ে যাবে এই কোলাহল কয়েকদিন পরই। দক্ষিণে বাতাস হাঁকলেই সমুদ্র ক্ষেপে উঠবে, কেদ্রোর চর হবে পরিত্যক্ত জনহীন। কুড়ি বৎসর ধরে এর কোন জায়গাতেও পড়বেনা কুড়ুলের আঘাত, উঠবে না মানুষের কণ্ঠস্বর, পড়বে পায়ের ছাপ। এর সকাল সন্ধ্যা মুখর

হয়ে উঠবে হরিণের ডাকে, মাঝে মাঝে খালের ধারে এসে হাঁটু গেড়ে জোয়ারের শেষে বসে থাকবে রয়েল টাইগার, মাছের আশায়। উর্দ্ধ ডালের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকবে কোন মৌচাকের দিকে। বনমুর্গীর দল হলুদগোলা পড়ন্ত আলোয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে ডাক শুনিয়ে কোন কোন ঘরছাড়া বাওয়ালির মনে ঘরের নেশা জাগিয়ে তুলবে। আদিম বনভূমি কুমারীর মত শুচি-পবিত্র অধীরা হয়ে উঠেবে।

নেতাই, ও নেতাই

ডাক শুনে চমকে উঠলাম। তুব খালের সেই নিতাই নাকি!—মাটির ইসারা আনে সেই নামটা। সেখান থেকে লঞ্চে হাসনাবাদ, নদীর উপরই দাঁড়িয়ে আছে সবুজ আর সাদা এনামেল বডির বাসগুলো, পাঞ্জাবী কনডাকটার চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে লম্বা হাঁটুঝুল পাঞ্জাবী পরে, কাঁধে ব্যাগটা। হাঁকছে থেকে থেকে—"স্ স্ সাম বাজা, স্ সামবাজা।"

কোলাহলমুখর কোলকাতা, একটু এগিয়েই সংস্কৃতি পরিষদের আড্ডা. কালীশবাবু—বিভূতিদা, আরও অনেক পরিচিত মুখ।

"খবরদার ওনামে ডাকবি না।"

চেয়ে দেখি শরীফ একজন বাউলিয়া ছোকরাকে শাসাচ্ছে। অর্থাৎ নিতাইএর চাকরীটা নিতে হয়েছে তাকে, তাই ওরাই বহাল করেছে ওই নাম।

জলিল নিজেদের নৌকায় বসে স্নান সেরে কয়েক গাছি দাড়িতে জট ছাড়াচ্ছিল ছোট্ট আয়নাটা সামনে রেখে। শরিফের কথায় ধমক দিয়ে ওঠে।

ভারি তেজ হয়েছে তোর না, বাবুদের নৌকায় রয়েছিস কিনা তাই দেমাক, যেতে হবে না 'কোপে'?

কোপ অর্থাৎ বনের মধ্যে কাঠ কাটতে। এখানে মাঝি কাঠুরেতে কোন তফাৎ নাই। সকলকেই ওই কাজ করতে হয়। শরিফ বলে ওঠে—'আমি বেইমান নই, চুরি করে নৌকার কাঠও বেচি না, ধর্মের নামে মিছি কথাও বলি না। কাজে ফাঁকি দোব কেন?"

ছই মধ্য থেকে কথাগুলো শুনছি ওদের, কবে কে কি করেছে তারই ফিরিস্তি বার হয়ে পড়ে ওদের কথায়। বড়দা ডিঙ্গি নিয়ে কাঠের গাদার কাছে গেছেন। হঠাৎ দেখি জলিলও নৌকা থেকে লাফ দিয়ে এসে আমাদের পাটাতনে নেমে শরিফের টুটি টিপে ধরেছে। শরিফও ছাড়বার পাত্র নয়, ওর মাংসল দেহে বেধড়ক কিল ঘুসি বৃষ্টি করছে।

বার হয়ে এলাম, দুটোতে খুনোখুনিই হবে বোধ হয়। আমাকে দেখে সরে দাঁড়ালো তারা দুজনে দুদিকে, হাঁফাচ্ছে জলিল।—তুমি না রোজ সন্ধ্যে বেলায় পীরের নাম-নাও, বলো দরবেশ হয়ে যাবে, এই তোমার কাজ!

শরীফ রাগে ফুলছে।

—যাও নিজের নৌকায় যাও জলিল, বয়স হয়েছে এখনও রাগ যায় নি। বাবু নাই, থাকলে দেখতে ব্যাপারখানা।"

জলিল চলে গেল। সর্দার মাঝি আলি সাহেব এখানকার হেড আর কি। যাকে বলা যেতে পারে মেস কমিটির সেক্রেটারী, দরকারী ওষুধ পত্র কিছু কিছু আছে তার জিম্মায়-মেপাক্রিণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট, সিবাজল, আইডিন ইত্যাদি। আলিসাহেব অনেক সময় বিনা ওষুধেই ডাক্তারি করে দেখলাম। একটি স্যুটকেশে তার তবিল, খিড়ি, তামাক। চাল-ডাল-মশলার হিসেব তার কাছে। একটু লিখতে পড়তে ও পারে। আলিসাহেব দূরের নৌকায় ছিল, ছইএর বাইরে এসে গালাগাল পাড়তে থাকে দুজনের উদ্দেশ্যে। এক হাতে তালিবাজে না, দুজনেই দোষী। যাহোক ব্যাপারটা চাপা পড়লো তখনকার মত।

কয়েকজন বাওয়ালি ছোট্ট ডিঙ্গি বেয়ে খেপলা জাল দিয়ে মাছ ধরতে সুরু করেছে ভাঁটার সময়। আহা কি মাছ!

—তবু মাছের কদর বাঙ্গালীর কাছে গুরুর চেয়েও বেশী, মাছের প্রতি লোভ বাঙ্গালীর মজ্জাগত! এমন মাছ কলকাতাতেও দেখিনি। ছোট খালের জল গেছে মরে, কাদার উপর লাফ মারছে রূপোর মত ঝকঝকে পারশে মাছ, এক একটা আধ হাত পরিমাণ হবে। আর চাওড়াও বেশ। এক হাঁটু কাদাতে হাবু ডুবু খেতে খেতে ওরা প্রায় আধ টিন পারশে মাছ তুলে ফেল্ল।

এরা জাল ফেলেছে ডিঙ্গি থেকে, খোলে জমা হচ্ছে ছোট ছোট ভেটকি, ভাঙন মাছ, পায়রাতেলি উঠেছে এক একটা মাঝারি রুটির আকার।

কলকাতার কথা মনে পড়ে, শিয়ালদহ বাজারে, বরফের তলা থেকে এরাই এদেরই জাতভাইরা-যখন বার হয় তখন কি এমনি জৌলুষ বা স্বাদ থাকে?

—থাক, ছেড়ে দে, এতেই হবে। সেদিনকার মত মাছধরা থামলো। ওদিকে ছোট ডিঙ্গি নিয়ে ইসুফ গিয়েছিল সমুদ্রের ধারে জেলেডিঙ্গির সন্ধানে। ইলিশমাছ উঠছে এই কোটালের ভাঁটিতে। এসেছে জেলেরা। ইসুফ ফিরলো—সঙ্গে এনেছে প্রায় পনেরোটা ইলিশ।

—"কত দাম নিলো?"

আমার কথায় হাসে ইসুফ—"দাম কি বাবু, চাইলাম, ওরা খাতি দিয়েলো।" চাইলেই—পনেরোটা ইলিশ প্রায় দশবারো সের মাছ-এখানে খাতি পাওয়া যায় দেখলাম। জেলেডিঙ্গিওয়ালাদের সংস্কার আছে—কেউ চাইলে তারা 'না' বলেনা। শুধু হাতে প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলে নাকি মাছও আর পাওয়া যায়না। অবশ্য প্রার্থীর দেখা সেখানে মেলেনা বলেই এত সমাদর মনে হ'ল।

তিরিশজন লোক, প্রায় পঁচিশসের মাছ। এত খাবে কে? ইসুফ হুকুম করে 'পাকানি'কে' "একটা মাছ আমাকে ভাজি দিওতো, খাবো।"

বলেকি? একটা গোটা ইলিশ প্রায় সেরখানেক কি পাঁচপো হবে—একাই খাবে?

—বাবু, দু'খানা হ'লে কুনমতে পেডটা ভরতি হয়, জিবে 'তার' আসে।

পাকানির পদটা একটু গৌরবের, সেও মাঝি-কাঠুরে বাওলিরা সবাই, উপরন্তু ওই তিরিশজন লোকের রান্না করতে হয় তাকে। তারজন্য অবশ্য সে কয়েকটাকা বেশী পায়; বলিষ্ঠ জোয়ান চেহারা, চিবুকের নীচে ছবিতে আঁকা 'সুলতান অব গজনী'র মত এক চিমটে নুর, কালো কুঁদকুঁদে শরীর, আগুনের তাপে পেশীগুলো চকচক করছে, গলাটাও বেশ পালিশকরা। একে দিয়ে রান্নার কাজ একেবারেই বেমানান, কুড়ুল-হালই এর হাতিয়ার। মাঝিদের অনেকেই বলে— 'চুরি করে খেয়ে পাকানির' গুনি শরীর।

অবশ্য চুরি করবার মত খাদ্য বিশেষ কিছুই দেখলাম না, অনেক-দিন সেখানে দেখেছি ভাতের উপর তরকারী বলতে ঐ ভাতই। আজ ইসুফের কথায় বলে পাকানি।

—'তোমারে ভাজি দিব, আমি খাবনি?'

—'দে,' আর একটা ইলিশমাছ তুলে দেয় ইসুফ। নিজেই কাটতে বসলো। ছুটো নয়—স্রেফ ভাজাই খেতে খেতে উবে গেল পনেরোটা ইলিশের মধ্যে দশটা। আমাদের জন্য একটা মাছ আগেই তুলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের নৌকাতে, নাহলে তাও বোধ হয় জুটতো না।

কাল কি খাবি রে? আলীসাহেবের কথায় ইসুফ জবাব দেয়— কালের কথা কাল দেখা যাবে মামু, আজ ত' খাই লই।

বৈকালে বনবিভাগের বোটে গেলাম, ডিঙি লাগিয়ে ঢুকলাম ওঁদের বোটে। সেগুনকাঠের চমৎকার হাউস বোট, একপাশে দুখানা ঘর করা, পিছনে পায়খানা; অন্যদিকে মাঝি বোটম্যানদের থাকবার কাঠের ঘর, বন্দোবস্তের কোন ত্রুটি নাই। আগাগোড়া সেগুনকাঠের তৈরী।

—ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। একজন বাইরে গেছেন, অন্যজন রয়েছে বোটে। আমাকে দেখে একটু চেয়ে থাকেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। পরণে আমার ধুতি পাঞ্জাবী, একটা লংকোট। ক্যামেরাটা রয়েছে সঙ্গে। দেখে শুনে বেশ খুসী হলেন বলে বোধ হ'ল না। তাদের রাজত্বে আমি যেন নেহাৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। আগে থেকেই বড়দাকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম—আমার আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত না করতে, পরিচয়টুকুও মাত্র না দিতে। কারণ বনের মধ্যে বাস করে করে ওদের অনেকেই এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেচেন, যেখানে মানুষের সুকোমল বৃত্তির কোন প্রয়োজন বোধ থাকে না।

—"সিগারেট?"

—"আমি খাই না।" মুখখানাতে অসীম অন্ধকার যেন পাকাপাকি ভাবে লেগে আছে। হাসতে দেখলাম না।

একটা কাজের ব্যাপারে গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক বিনাদ্বিধায় তার ক্ষমতার মধ্যে হওয়া সত্বেও ঠেকিয়ে দিলেন

—'কূপ অফিসার নাহলে হবেনা।'

—আপনি ত এখন চার্জে?

ভদ্রলোক জবাব দেন না কথার।

কূপ অফিসার গেছেন নোতুন কূপ খোলা হবে সেইখানে, সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে বড় নদীধার ঘণ্টাচারেক দূরের পথ, অর্থাৎ এক-জোয়ার—এক ভাঁটাতে যাতায়াত করা যাবে কিনা সন্দেহ, মধ্যে সমুদ্র এবং বড় গাং।

সাধারণের প্রাণের, সময়ের কোন দামই নাই তাদের কাছে। তুচ্ছ একটা ব্যাপারের জন্যও 'কূপ'ইন চার্জ ঠেকিয়ে দেন তার উপরওয়ালাকে;

—"কাল ভোরের জোয়ারেই চলে যান।"

কথাটা এমনভাবে বললেন ভদ্রলোক—যেন শ্যামবাজার থেকে কলেজ ষ্ট্রীট যেতে বলছেন কাউকে। বার হয়ে এলাম, দেখি বাইরে একজন চৌধুরি নৌকার মালিক অপেক্ষা করছে। তার বোঝাই নৌকা পাশ করাতে হবে। সেই ভদ্রলোক বেশ ধমকের সুরেই বলেন— 'আট টাকা নাহলে ছাড়বো না।'

কথাটা তখন বুঝিনি, ভাবলাম সরকারী টাকা বোধ হয়, কিন্তু রহস্যভেদ করেছিলাম পরে—আট টাকা, অর্থাৎ প্রতি একশো মণে ওঁদের প্রণামী। সেইটার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি চৌধুরী নৌকার মালিককে। শেষ রফা অবধি ছিলাম না।

বনের কাজে প্রায় সকলেই ওই বিহারী চৌধুরী, উড়িয়া শ্রেণীর, না হয় বাঙালী মুসলমান, বা মাহিষ্য। নিরক্ষর ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে ভাল করে কোপ মারেন। যাদিকে কোপ মারা যায় না, তাদিকে সামান্য আইনের ফেরে ফেলে ঘোড়দৌড় করিয়ে নেন। আগেই বলেছি সেখানে কোন খুঁত বাধলে এই ছাড়াবার মালিক তারাই এবং তারা এই ছাড়িয়ে সাহায্য করবার পরিবর্তে ভাল করিয়ে জড়িয়ে দেয়। কারণ হাত পেতে তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে ভয় হয়—এবং এঁদের তরফ থেকে টাকা দিতেও বিবেকে বাধে।

যাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে টাকা আসে তারাও ছেড়ে কথা কয় না। কানে আসে একজন উড়িয়াবাসী এসে সুরু করেছে টকা দিইছি বঙ্কা গাছ কাটিমু কাঁই? মোর টকা কি বঙ্কা অছি? সাহেব মোর গোড় ধরি পাশ করিব।

বোধহয় বনবিভাগ ন্যায্য প্রাপ্য নিয়েও ওর গাছ কাটবার জন্য মার্কা দিয়ে এসেছিল যে সব গাছে তার অনেকগুলোই বাঁকা এবং খারাপ। তাই এসে সে জেরা করছে—টাকা দিয়েছি, বাঁকা গাছ কেন কাটবো, আমার টাকা বাঁকা ছিল? তুমি না দাও তোমার সাহেব আমার পা ধরে নৌকা পাশ করে দেবে।

ফিরে এলাম। কাল ভোরেই বড়দা একদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন।

—"যাবে নাকি?"

ওই অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবেন উনি দেড়শমণি ডিঙিতে। আমার ধাতে সইবে না। বড় ঢেউ ছলকে উঠবে নৌকার উপরে, লাফাবে ছোট্ট নৌকা। ও আমার মাথার থাক।

আলি সাহেবের নৌকায় উঠলাম। দেখি একটা ছেলে অনুমান কুড়ি বছর হবে বয়স, ঠায় বসে আছে। মুখ চোখ শীর্ণ, কাঁদছে দু' হাঁটুতে মাথা গুঁজে।

—"খাবিনা কেন?"

—"খাতি মন চায় না। পরাণডা হু হু করতিছে।"

আবার দুচোখে নামে তুফান। আমাকে দেখে আলিসাহেব ওর বিছানাটা পেতে দেয়—'বসুন, বাবু।

—তিন দিন ধরে খায়নি দায়নি। ঠায় বসে আছে। বিপদ আপদ কার না হয়, তাই বলে জোয়ান ছেলে এমনি করে কাঁদবি তুই? এই নৌকাতেই বাড়ী চলে যাবি, সে কদিন ভাল করে মন ঠাণ্ডা করে থাক। সান্ত্বনা দেয় আলি সাহেব।

—"কি হয়েছে তোমার?"

আমার কথায় মুখ তুলে চাইল ছেলেটি। ডাগর দুটো চোখে থম থম করছে অশ্রু। ভেজা গলায় বলে।

—'ছোট্ট এ'হান ডিঙ্গি দিয়া বা'জান সমুদ্দে গেয়েলো জেলে ডিঙ্গি থনে মাছ আনতি, আর ফিরে এয়োলানা। কে জানে এহনও মাছ খাতিছে!

তিন দিন তিন রাত্রি উধাও হয়েছে সমুদ্রে ছোট্ট একটা ডিঙ্গি নিয়ে, জল নাই খাবার নাই, শীতের আবরণও নাই। ওই তুফানের মধ্যে অকূল সমুদ্রে সে যে আর বেঁচে নাই—একথাটা আলোর মত সত্য। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি ছেলেটার দিকে, বাপ বেটায় এক সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল, ফিরবে সে একা, কোথায় রেখে গেল তার বাবাকে জানে না। কাঁদছে সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে।

(ক্রমশঃ)

সাংবাদিকতার সূচনা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ সালে আই-এ পাশ করি। ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করিয়া উত্তরপাড়া কলেজে প্রবিষ্ট হই ও তিনমাস বাড়ী হইতে হাঁটিয়া আরিয়াদহ খেয়াঘাটে গঙ্গাপার হইয়া উত্তরপাড়া কলেজে যাতায়াত করিতাম। নানাকারণে শরীর খারাপ হয়—১৯১৫ সালেই প্রথম আগড়পাড়া প্যারীবৈষ্ণব ঘাটের নিকট ভট্টাচার্য্য গৃহে বারোয়ারী দুর্গোৎসব হয়। সপরিজনে তাহাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হই। পূজার পরই আমি নিজে অসুস্থ হইলাম—মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন। চারিদিক অন্ধকার—এমন সময়ে উত্তরপাড়ার জমীদার বংশের বিজয়কৃষ্ণবাবুর পৌত্র কালিদাসের গৃহে তাহার দুইটি ছোট ছোট বোন ও একটি ভাইকে পড়াইবার ভার পাইলাম। যিনি সকল দুঃখের কাণ্ডারী, তিনি পথ দেখাইলেন। আহার ও বাসস্থান জুটিল—জমীদার-বাড়ীর ছেলেমেয়ে, বেশী সময় পড়িত না—আমি নিজে পড়ার যথেষ্ট সময় পাইতাম। ১৯১৭ সালে পরীক্ষা দিবার পর কালিদাস-বাবুদের বাড়ী ত্যাগ করিলাম। বি-এ পড়ার সঙ্গতি নাই। কাঙ্গালের কাণ্ডারী এবারও উপায় করিয়া দিলেন। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে মাত্র ২৲ টাকা বেতন দিয়া বি-এ পড়ার ব্যবস্থা হইল। তৎসঙ্গে স্বর্গত পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার কলিকাতা ১৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনস্থ বাসাবাড়ীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। কুলদাবাবু ধর্মবক্তা ছিলেন—বীরভূমি নামক মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেন—থিওসফিক্যাল সোসাইটীর কর্মী ছিলেন—থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মাসিক মুখপত্র ব্রহ্মবিদ্যার দেখাশুনাও করিতেন। তখন তাঁহার 'ভাগবৎধর্ম' পুস্তক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি বহুগ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁহার বাসাবাটীতে বেশ বড় পাঠাগার ছিল—ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শনের বহু পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কুলদাবাবুর কাছে থাকি—তাঁহার সকল কাজে সহায়তা করার চেষ্টা করি। প্রেসে যাতায়াত করিতে হয়—৫নং ছিদামমুদীর লেনস্থ শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে তাঁহার বই ছাপা হইত। ক্রমে প্রুফ দেখিতে শিখিলাম। মাসিক কাগজের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ—প্রেসে দিবার পূর্বে তাঁহার নির্দেশমত পড়িয়া দেখি। ভুল পাইলে সংশোধন করি—অসঙ্গতি দেখিলে কুলদাবাবুকে দেখাইয়া লই। স্কুলের জীবন হইতে কবিতা পাঠ করিতে ভালবাসি—কবি না হইলেও কবিতা পড়িলেই তাহার দোষ চোখে ধরা পড়ে—সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করি। এইভাবে ধীরে ধীরে সাংবাদিকতা শিক্ষার মহড়া চলিতে থাকে। খিদিরপুর-নিবাসী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ পালের এক বন্ধু দৈনিক বসুমতীতে কাজ করিতেন—তিনি মধ্যস্থ হইয়া শ্রীযুতহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সেই সূত্রে দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিকতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করিলাম। সংস্কৃত অনার্স পড়িয়াছিলাম, পরীক্ষার সময় নানা সাংসারিক গণ্ডগোলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না—১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিলাম। সেই বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়ানোর ব্যবস্থা হইল। তাহাতে ঢুকিয়া গেলাম। কলেজের বেতন লাগিবে না—অধিকন্তু মাসিক ১৫টাকা বৃত্তি পাইব। আমার মত সহায়সম্বলহীন দরিদ্রের পক্ষে কম সুযোগ নহে।

দেশে তখন রাজনীতিক আন্দোলন প্রখর—বর্দ্ধমান বন্যায় সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশের প্রায় তিনহাজার যুবক বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন। সর্বত্র তাহার প্রতিবাদ চলিতেছে। স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিমাসের প্রবাসীতে সরকারী অনাচারের নিন্দা করিতেছেন। ১৯১৭ সালে মাদ্রাজে শ্রীমতী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই সহকর্মী শ্রীযুত জি-এস-আরাণ্ডেল ও শ্রীবি-পি-ওয়াদিয়াকে বিনা-বিচারে আটক করা হইয়াছিল—দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীমতী বেসাণ্টকে সভানেত্রী করা হইল।

দেশে নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দল রাজনীতিকের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কে হইবেন, তাহা লইয়া গণ্ড-গোল ও মারামারি হইল। স্বর্গত সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মত লোকও তাহাতে যোগদান করিলেন—একদলের জিদে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না হইয়া মডারেট-নেতা বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস চরমপন্থীদের দ্বারা অধিকৃত হইল। তাহার পরবর্তী কয় বৎসরের কংগ্রেস-ইতিহাস স্মরণীয়। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড (তৎকালীন বড়লাট) শাসন সংস্কার ব্যবস্থা স্থির হইল—মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হইল—সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন (তখনও দেশবন্ধু হন নাই) নূতন কথা—বাংলার কথা—বলিলেন।

সে যুগে প্রতিদিন কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা হইত। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বক্তৃতা করিতেন। যে দিন মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট (ভবিষ্যৎ ভারত শাসন আইনের খসড়া) প্রকাশিত হইল, সেইদিনই বিপিনচন্দ্র তাহা in-adequate, unsatisfactory ও disappointing বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দৈনিক বেঙ্গলীপত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরি-চালিত হয়—তাহা ক্রমে ক্রমে নরমপন্থী হইয়া দেশের লোকের বিশ্বাস হারাইল—অমৃতবাজার পত্রিকা অপেক্ষাকৃত গরম, কাজেই তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িতে লাগিল। তখনও কোন বাংলা দৈনিক সকালে বাহির হইত না—নায়ক, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি সবই বিকালের কাগজ—খবর না কিনিয়া সকালের খবরের কাগজ দেখিয়া খবর প্রকাশ করা হইত। ১৯১৯ সাল হইতেই বসুমতী কার্য্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলাম—১৯২০ সালের প্রথমে পাকা চাকরীতে বহাল হইলাম। তখন সবেমাত্র প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে—দৈনিক বসুমতী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সরকারী অতিথি হইয়া ইউরোপের ও ইরাকের যুদ্ধ স্থল দেখিয়া আসিয়াছেন—লণ্ডনে বাকিংহাম-প্রাসাদে সম্রাট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাটের সহিত করমর্দন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত বহু গুণ-সম্পন্ন সম্পাদক ভারতে খুবই কম। তিনি বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারেন। তিনি ১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা ও যশ অর্জন করিয়াছেন। তিনি ধনীর সন্তান, তাঁহার গৃহে বিরাট গ্রন্থাগার—এ সকল কারণে যেমন সকালে তাঁহার বাড়ীতে, তেমনই বিকালে তাঁহার অফিসে বহু বিদ্বজ্জনসমাগম হইত। সে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা—কাজেই আমার মত লোক তাঁহার পদতলে বসিয়া সাংবাদিকতা শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিলাম। তাঁহার মত স্মৃতিশক্তিও এ যুগে অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে প্রখর রাখার জন্য প্রত্যহ সংবাদপত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ সংগ্রহ করিয়া খাতায় আঁটিয়া রাখিতেন এবং একটা খাতা পূর্ণ হইলে তাহার সূচি প্রস্তুত করিতেন। এইভাবে তাঁহাকে সূচির সূচিও প্রস্তুত করিতে হইত। তিনি প্রতি মাসে বহু টাকার নূতন বই কিনিতেন, তাহা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্য যে সকল পুস্তক প্রেরিত হইত, তিনি সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিতেন। দৈনিক বসুমতীতে কাজ করার সময় ১৯২১ সালে কয়মাস ছুটী লইয়া বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা পাশ করিলাম। হেমেন্দ্রবাবুর বিরাট পাঠাগার হইতে পড়িবার জন্য বই লইয়া আসিতাম—বই ফেরত দেওয়ার সময় তাহা পড়িয়াছি কি না, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কাজেই বই না পড়িয়া ফেরত দিবার উপায় ছিল না। সে সময়ে বসুমতী কার্য্যালয়ে যাঁহাদের সহকর্মীরূপে পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত সুধী, সাহিত্য মাসিকপত্রের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমি যাওয়ার পর সুরেশবাবুকে মাত্র কয়েকমাস বসুমতীতে কাজ করিতে দেখিয়াছি—তাঁহার স্বাস্থ্য তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন এবং ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তা ও সাংবাদিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন—তাঁহার তীব্র সমালোচনার জন্য সে যুগের সকল লেখক তাঁহাকে ভয় করিত। স্বর্গত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সাংবাদিক জগতে খ্যাতিমান ও সুপরিচিত ছিলেন—তিনি বহু বৎসর বসু-মতীর সহিত যুক্ত ছিলেন—এবং অবসর গ্রহণের পর পেন্সন লইয়া নিজ বাসগ্রাম ২৪পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সেকালে লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। সে যুগে, আমার পরে, সত্যেন্দ্রকুমার বসু বসুমতীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু বৌবাজারের ডাঃ জগবন্ধু বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং যৌবনে বি-এ পাশ করিয়া দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে ইংরাজি টেলিগ্রাফ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া-ছিলেন এবং কয়েক বৎসর সারা ভারতে ভ্রমণের পর 'ভারত ভ্রমণ' গ্রন্থ কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবনে বহু বৎসর

দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। তখনকার বসুমতী কার্য্যালয়ে এমন একজন ছিলেন, যিনি শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নন, নানা সদ্‌গুণের জন্য অফিসের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ২৪পরগণা হালিসহরের অধিবাসী স্বর্গত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র ৺শচীন্দ্রনাথও তাঁহারই সময়ে সাংবাদিকরূপে যশ অর্জন করেন ও দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। প্রাক্তন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মন্নিনাথ এবং খ্যাতনামা কম্যুনিষ্ট নেতা ও এম-পি হীরেন্দ্রনাথ তিনকড়িবাবুর পৌত্র। তিনকড়িবাবু বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, সে জন্য অফিসের সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত জেঠামহাশয় সম্বোধন করিত। তিনি শুধু সুলেখক ছিলেন না, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি শিখিবার বিষয় ছিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সকল ঋতুতে তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট হইতে যথাসময়ে বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ বসুমতী কার্য্যালয়ে আগমন করিতেন। তাঁহার উপর যে কর্তব্যভার প্রদত্ত হইত, তিনি নিজে শুধু তাহা পালন করিতেন না, অপর সকলে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতেছেন কিনা, তিনি তাহা সর্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমরা তাঁহাকে খুবই বৃদ্ধ অবস্থায় দেখিয়াছি—শুনিয়াছি, তিনি সারাজীবন ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। বসুমতী কার্য্যালয়ে অন্য সকলে যখন গল্পগুজবে সময় কাটাইত, শ্রদ্ধেয় তিনকড়িবাবু সে সময়ে নিজের বা অপরের কাজ করিয়া যাইতেন। ৺সতীশচন্দ্র সেন নামক একজন বৃদ্ধও সে সময়ে দৈনিক বসুমতীতে লেখক ছিলেন। আমার সে যুগের সহকর্মী শ্রদ্ধেয় দুর্গাচরণ ঘোষাল কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সে যুগে বহু তরুণ বন্ধু দৈনিক বসুমতীতে কিছুকাল কাজ করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে কাটোয়া কড়ুই নিবাসী, বর্তমানে উকীল শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী এবং বর্তমানে ঢাকুরিয়া নিবাসী যুগবার্তা সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের নাম নানা কারণে সর্বদা মনে পড়ে। তাহারা উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনি তাহার পিতা উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকে বর্ত্তমান রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকে তাঁহাকে তাঁহার আহিরীটোলা নিমুগোস্বামীর লেনস্থ বাড়ী হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে দিনে দুবার বসুমতী কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। সকাল ৮টায় আসিয়া বেলা ১২টায় চলিয়া যাইতেন, আবার বিকাল ৪টায় আসিয়া রাত্রি ১১টায় ফিরিতেন। তাহার পর যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তিনি পুরাতন বসুমতী বাড়ীর ত্রিতলে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা বৌবাজার ষ্ট্রীটের ১৬৬নং বাড়ীটি ক্রয় করিয়াছিলেন, সতীশবাবু পরে ১৬৪ ও ১৬৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের দুটি পুরাতন বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করেন। ১৬৬ নম্বরের পুরাতন বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড টিনের সেড ছিল, সেখানে ও এক নূতন গৃহ নির্মিত হয়। বাংলাদেশে বসুমতীর কর্তৃপক্ষই প্রথম বহু অর্থব্যয়ে রোটারী মুদ্রণ যন্ত্র ক্রয় করেন—প্রতি ঘণ্টায় তাহাতে ১৬ পৃষ্ঠা কাগজ ৪০ হাজার ছাপা হইত। তাহার পর ক্রমে সকল সংবাদপত্রই রোটারী যন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। সতীশবাবুর অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সাহস ছিল। মাসিক বসুমতী প্রকাশের পূর্বে তিনি তাহার বিজ্ঞাপন বাবদ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ফলে ৫ হাজার মাসিক বসুমতী (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রীত হইয়া যায়—প্রথম সংখ্যা আবার ৫ হাজার ছাপিতে হয় ও দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে ১০ হাজার করিয়া মাসিক বসুমতী ছাপা হইত; সে সময়ে বসুমতীর গ্রন্থাবলী ও অসংখ্য বিক্রীত হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অর্থ সুলভ হওয়ায় গ্রামের লোক যেমন হারিকেন লণ্ঠন (তাহার পূর্বে অন্য রকমের লণ্ঠন প্রচলিত ছিল), ঘরের টিন প্রভৃতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তেমনই লোকের বই, কাগজ প্রভৃতি কেনায় প্রবৃত্তি ও বাড়িয়া যায়। আমি আগড়পাড়া হইতে রেলে ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিলাম—দেখিতাম, ট্রেণের প্রত্যেক গোয়ালা বাড়ী ফিরিবার পথে দৈনিক বসুমতী কিনিয়া পড়িতেছে। অনেক সময় রাত্রিতেও কাজ করিতে হইত—সকালে বাড়ী ফেরার সময় ঐ দৃশ্য দেখিয়া মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

বসুমতীর পুস্তক প্রকাশ বিভাগও ঐ সময়ে বিরাট ভাবে বিস্তার লাভ করে। রাজভাষা, হাজার জিনিষ প্রভৃতি পুস্তক প্রতি সংস্করণে ১০ হাজার করিয়া ছাপা হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৭।৮ খণ্ডে বিভক্ত হইলে ও প্রত্যেক খণ্ড ৫ হাজার করিয়া ছাপিতে হইত। সে সময়ে মাইকেল, দীনবন্ধু, দামোদর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাবলীও অতি সুলভ মূল্যে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বিক্রীত হইত—এবং সুলভ বলিয়াই হাজার হাজার ছাপিতে হইত। ঐ সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলীও সতীশ বাবু খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শরৎচন্দ্র তখন এত জনপ্রিয় হইয়াছেন, যে কোন খণ্ড প্রকাশের পর কয়েক দিনের মধ্যেই নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যাইত। সতীশ বাবুর কর্ম শক্তিও যেমন অসাধারণ ছিল, অদৃষ্ট ও তেমনই সুপ্রসন্ন ছিল। তাঁহার ব্যবসা ঐ সময়ে সকল দিক দিয়া অসামান্য সাফল্য আনয়ন করিয়াছিল। ফলে তাঁহার পক্ষে আহিরীটোলা হইতে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া পড়ে।

দৈনিক বসুমতীর অপূর্ব সাফল্যের যুগেই ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৺প্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীমাখনলাল সেন—৩জন কর্মী মিলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ পত্রের সম্পাদক হন। আনন্দবাজার পত্রিকা যখন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইল, তখনই দৈনিক বসুমতীর প্রভাব ও প্রচার ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের পৌত্র ৺সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত ও স্কটলেন নিবাসী খ্যাতনামা লেখক ৺ফনীন্দ্রনাথ পাল ঐ যুগে প্রথমে মুর্গীহাটা হইতে প্রভাকর নামে ও পরে বৌবাজারস্থ চেরী প্রেস হইতে দেশবন্ধু নামে ২খানা দৈনিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেগুলি অল্পকাল স্থায়ী ছিল এবং সেগুলির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইয়াছিল। কয়েক মাস বসুমতীর কাজ ছাড়িয়া আমি প্রভাকরে

কাজ করিতে গিয়াছিলাম। পরে হেমেন্দ্রবাবুর অনুরোধে সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসি। সন্ধ্যায় বসুমতীর কাজ করিয়া কয়েক মাস দেশবন্ধুর কাজ ও করিয়াছিলাম। অর্থাভাবে সে সকল কাগজ টিকে নাই। মৌলবী এ কে-ফজলুল হক টার্ণার ষ্ট্রীট হইতে যে সময়ে নবযুগ নামক বাংলা দৈনিক প্রকাশ করেন, তখন হক সাহেবের অনুরোধেও হেমেন্দ্রবাবুর নির্দেশে আমি কয়েক মাস সেখানে ও কাজ করিয়াছিলাম। সে সময়ে ললিত গুপ্ত মহাশয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ আর্ট প্রেস হইতে হিন্দুস্থান নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতেন—সে কাগজখানি দীর্ঘ কয়েক বৎসর চলার পর বন্ধ হইয়া যায়। দৈনিক বসুমতী যখন বৈকালিক সংবাদপত্র, তখন কলিকাতার নায়ক ও বাঙ্গালীর বেশ প্রভাব হইয়াছিল। স্বর্গত সুধী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল নায়কের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মত অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব লিখনভঙ্গী খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তিনি গঠন অপেক্ষা ভাঙ্গনের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত কাগজ শুধু গালাগালির মুখপত্রেই পর্য্যবসিত হয় এবং পাঠক সমাজে আদর বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সুন্দর বনের মাঝি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মুখর কর্মের স্রোত ব্যস্ত বিশ্ব ব্যাপি হাহাকার
এখানে আসিয়া গেছে চতুর্দ্দিকে অথৈ পাথার।
নিঃসঙ্গতা ভয়ঙ্কর পরিক্রমা শূন্য প্রান্তরের
এখানে হয়েছে শেষ; অভিশপ্ত এই অরণ্যের
উদাসীন উপেক্ষার গ্লানি আজ তরঙ্গে গভীর
অতলে কোথায় যেন প্রাণমন উদ্বিগ্ন অস্থির।
দ্বীপে দ্বীপে লতা গুল্ম শাখা-প্রশাখায়
স্তিমিত জীবন যেন দিবস রাত্রির সীমানায়
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে প্রগলভ কল্লোলে,
জীবধাত্রী ধরিত্রীর কোলে
জীবন-মৃত্যুর দোলা অবিরাম দোলে
সমুদ্র-উৎক্ষিপ্ত-স্রোত নিয়মিত জোয়ার ভাটায়,
এ কূলের কৌতূহল অবিশ্রান্ত অকূলে জাগায়।
নামহীন চিহ্নহীন কোনো এক দিগন্তের সনে
হয়ত রয়েছে কোনো গভীর রহস্য সুগোপনে।
কোনো দিন কোনো রাত্রি দিবেনাক সন্ধান তাহার
হয়ে আছে একাকার
জল-স্রোতে—অরণ্যে ও দ্বীপে।
তাহার সমীপে
ছোট ছোট নৌকাগুলি উর্ধ্বকাশে তারার মতন
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, সহসা যখন
দক্ষিণ সমুদ্র হতে হাওয়া আর ঢেউ এসে লাগে
হয়ত তাদের মনে জাগে
অতীতের সুখস্মৃতি আবর্তিত ফেনপুঞ্জময়
মুহূর্তে উদ্ভব তার মুহূর্তে বিলয়।

ছোট সেই গ্রামখানি, ছোট ছোট কুটির প্রাঙ্গণ
তারি কাছে লেগেছে ভাঙন,
হয়ত বা সারাদিন গৃহকর্মে ক্লান্ত মুখখানি
ভেসে ওঠে চিত্তপটে; বিদায়ের বাণী—
ছিল না কিছুই তার সেদিন প্রভাতে
শুধু দুটি অশ্রুকণা ছিল আঁখিপাতে।
ছোট ছোট শিশুদের মলিন মুখের ছায়া পড়ে
তাদের নয়নে মনে: কত আশা ভাঙে আর গড়ে।
সুন্দর বনের মাঝি বাঘের বাসার কাছ দিয়ে
উদয়াস্ত হাল টানে, ছোট তার নৌকাখানি নিয়ে।
জানেনাক ভয় কারে বলে
আসন্ন সন্ধ্যার পানে নৌকা তার হেলে-দুলে চলে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাহেবগঞ্জে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক রোগী তাঁহার ডিস্‌পেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যহ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপৈঁতিতে, কখনও সকরিগলিতে। গঙ্গার ওপরেও তাঁহার নাম ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও তাঁহাকে ডাকিতে আসিত! নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ওঅঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নূতন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়ীতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল। সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত। মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠীও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরথবাবুও সে উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিতেছিলেন। বস্তুত, তাঁহারই আনুকূল্যে মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নূতন বাড়িটিও তিনি চেষ্টা করিয়া শস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কর্ম্মচারীরা, পোস্টমাস্টার-বাবু, থানার দারোগা ও কনেষ্টবলগণ, মামার রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীনুপণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ও রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। তিনি বারন্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্য লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরণে থান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কালো সুতা দিয়া একটি মাদুলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল কদম ছাঁট। দীনু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি। তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে শাদা পিচুটি জমিয়া থাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিষ্কার করিতেন না, জানি না। সেকালে অনেকে দাড়ি কামাইত, কিন্তু যুগপৎ গোঁফ-দাড়ি কামানো প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য শ্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার

চুলের সহিত গোঁফ-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড্ হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিলনা; দীনু পণ্ডিতের মুখে গোঁফ-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম—সম্ভবত উঁহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি মাকুন্দ এবং জাতিতে কৈবর্ত্ত। দীনু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে জলজ্বল করিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি; যদিও দিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেইদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সেই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীনু পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ওই লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর খপ্পরে পড়তে হবে তোমাকে"

"উনি কে—"

"দীনু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন"

"শালা মাকুন্দ, জাতে কৈবর্ত্ত"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে। দীনু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরও অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই শিক্ষকেরা শাস্তি দেন। দীনু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্য; কথাটা অদ্ভুত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড় গভর্ণমেণ্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বাবু মুকুন্দবাবুকেও এবং থানার দারোগা কার্ত্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আপিসের বড়বাবু ছিলেন জগন্ময় রায়। দীনু পণ্ডিত ইঁহাদের গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীনু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড় অফিসারদের শত্রু দীনু পণ্ডিতেরও শত্রু স্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীনু পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্য্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবাবু মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান. ছিলেন বলিয়া দীনু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। সুতরাং মন্মথ এবং বসন্ত তাঁহার বেত্রাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্মথ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিনিত, কারণ চেয়ারম্যান হইবার পূর্ব্বে বরদাবাবুর সহিত কার্ত্তিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজস্বী লোক ছিলেন। কার্ত্তিক-বাবু একটি লোককে অন্যায়ভাবে গ্রেফ্‌তার করাতে বরদাবাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বরদাবাবু সেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকোর্দ্দমা পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মকোর্দ্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য বেচারা মন্মথকে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীনু পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাহার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অপোগণ্ড পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিলনা, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার। পরবর্ত্তী জীবনে এই সব করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সমবয়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুন্ন ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমার স্মৃতি-পথে এখনও জাগরূক আছে। আমার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেবগঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন

ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁরই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইহাঁর বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চরিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরণের। পরণে হাতকাটা লংক্লথের ফতুয়া এবং শাদা থান। কানে খড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘননিবদ্ধ নয়, যে গুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্যস্ত। পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, চোখের তারা নীল, চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্ম্মভেদী। মুখটিও ছোট, কিন্তু মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন, দুনিয়াটাকে সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মথই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মশাই। লোক খুব সাঁচ্চা, কিন্তু বড় তিরিক্ষে। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁসি না। দেখা হলেই পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্ত—"।

একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রান্না বান্না কি সব রাঁধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন দুই আছে। উমেশ আর দুনিয়ালাল"

"এত হৈ হৈ না করলেই পারতে। বৌমা চারটি শাকান্ন রেঁধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে' খেতাম। আচ্ছা, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব"

"আপনি খেয়ে যাবেন না?"

"না, আমি রাঁধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে—"

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বৌমাকে একটু আলাদা করে' চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই হইল। উৎসবের দিন মামীমা শৌখীন কাপড় গহনা পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সে সব ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে হইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাজল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই সাঁতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্য নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইল। আমার মা অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন মামীমাকেই রাঁধিতে হইল। রান্না তত ভাল হয় নাই, কিন্তু ঘটক মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভালো ছিলেন। নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে স্বমতের বিরুদ্ধে লওয়া যাইত না।

সেদিন আরও দুইটি অদ্ভুত ধরণের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। দুইজনেই স্ত্রীলোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন, অনেকেই। সে চেহারার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্‌টকে গৌরবর্ণ মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ। সম্ভবত পূর্ব্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিদ্র ছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কোনরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহে-

লিকার মতো রহস্যপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙুল বাঁকা ছিল, শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি ঢাকা বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রীষ্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন, শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জ্বালাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও রান্না জিনিস খাইতেন না। সাধারণত ফল মূল কাঁচা দুধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটি আমার ভাগ্‌না"

"ও, কেদারের ছেলে ?'

"হ্যাঁ"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্যে ফল আনা হয়েছে কি না"

তাঁহার জন্য নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্য্যন্ত লেখেন নি"

ভৈরবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবে আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী মায়ের সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী মা বাবাকে যখন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগূঢ় কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাকরুণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল। মন্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাকরুণ। জানিস, ও মেয়ে-মানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তাই না কি"

"হ্যাঁ, লুকিয়ে পুলিশে কাজ করত, ধরা পড়ে' গেছে"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমানুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোষাকও পুরুষের পোষাক, ঢিলা-হাতা গেরুয়া-রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায় হলুদরঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতো পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল, ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উরুতে গুলি' লাগিয়া সিপাহী ঠাকরুণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। স্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি স্ত্রীলোক। তাঁহার বীরত্বে সাহেব-জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন, তাঁহার একটা মোটা রকম পেন্‌সন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাকরুণ এখানকার থানার জমাদার পাঁড়েজির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ কনেষ্টবলদের সঙ্গে রাত্রে রেঁাদও দেন। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন।

বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথাও বলেন। ড্যাম, স্টুপিড, ভেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্য্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়া ছিল।

"ওই দীনু পণ্ডিতও ওঁকে ভয় খায়। যদু বলে' একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীনু পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না।

বদু বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাকরুণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাকরুণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কাল রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দীনু পণ্ডিতের বাসায়। দীনু পণ্ডিতকে কান ধরে পঁচিশবার উঠবোস করিয়ে ছিলেন।"

মন্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে। কিন্তু দীনু পণ্ডিত যে সিপাহী-ঠাকরুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজিটও করিতেন, অর্থাৎ সহসা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকরুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীনু পাণ্ডতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়-ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড় কর বাবারা, আখেরে তোমাদেরই ভাল হবে।' বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহীঠাকরুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখনও ভুলি নাই। প্রথম লোকটি ফেলু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড়, চোখ দুটি ঈষৎ কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা-ফোলা। দুই গালে এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্য উত্তেজনাতেই সেগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে সেগুলির ভিতরে জীবন্ত যেন কিছু আছে। তিনি ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অনুরোধে অঘোরবাবু ফেলু পুরোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া ফেলু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মাথার এক জেলে রোগী অনেক চিতল মাছ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিন চার মণ। ফেলু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানি চিতলমাছের পেটি উদরস্থ করিলেন! যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', 'আরও খান' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।... পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা ফেলু পুরুতকে পুড়াইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই ফেলুর ভেদ-বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শম্ভু-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কসকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বসিয়া 'উঃ' 'উঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারন্ধ্র হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শঁকো। তুই এমনভাবে এখানে বসে' কোঁতাচ্ছিস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শম্ভুমামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার দুই 'উঁ' 'উঁ' শব্দ করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শম্ভুমামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ঔ বৌদি দাঁদা শুঁতে বঁললে আমাকে। খেঁতে দাঁও, খেঁয়ে শুঁয়ে পঁড়ি"। একটু পরেই মামীমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথা-ধরার জন্য তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শম্ভুমামাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরণ। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায়

পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ।' শব্দ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে সকলে দালাল মশায়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য্য। মধু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল, তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘ ঋজু-দেহ, গৌরবর্ণ। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও সূচ্যগ্র, চক্ষু বুদ্ধি-দীপ্ত, পাতলা ঠোটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল।. কে একজন বলিল, 'বংশীবাবু আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশীবাবু একজন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি' কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাবুকে খুশী রাখিলে তাঁহারই সুবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে'। উনি যে বদ্যি—"বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "শিক্ষিত সমাজে বদ্যিরা আজকাল ব্রাহ্মণ বলে' স্বীকৃত হয়েছেন, বংশীবাবু আচারে ব্যবহারে প্রকৃত ব্রাহ্মণও, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আজকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্যাকরাকে দিয়ে একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে' বেড়ান, আপনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দেবে?"

হরিহর দে লোকটি কুৎসিৎ-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব।

সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ"

হরিহর দে-কে মৃদুকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—"এই জন্তেই তো দলে দলে ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে সব"

পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরণের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিয়া চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল তখন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙ্‌ক্তিতে বসে, এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্‌ক্তির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্নেহের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাদুরি বা চালিয়াতির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নিজের গ্রামে তিনি এই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তখন ট্যাঁক-ঘড়ি নামে এক প্রকার ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল। ছোট-ঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একটু চাপ দিলেই ডালাটা লাফাইয়া ওঠে। ঘড়িটি সাধারণত ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখা হইত। দালাল মশাই নিজের গ্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঋপু আসিয়া উপস্থিত হইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জমিজমা কিছু ছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঋপু কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চাকরিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গলায় ফুলদার কম্‌র্ফর্টার, পায়ে মোজা ও বুট জুতা।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই"

"বেলা কত হল তাই ঠিক করছি"

"এই যে দেখে নিন"

ঋপু ট্যাঁক হইতে ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। স্প্রিং টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই

চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশয়কে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দালাল মশাইও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন এবং কান মলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন…

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিল।

"দাদুকে পরীক্ষা করে' দেখলুম। দাদুর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু"

"বলা উচিত ছিল"

"কাটিহারে বাবার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। ব্লাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো ?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার"

কুমার অবাক হইয়া গেল।

"সিফিলিসের বিষ ? পাগল না কি তুই"

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম বার করে' দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে' যাক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ ?"

"লোক আছে। চল দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো"

কথাটা শুনিয়া সূর্য্যসুন্দর কিন্তু খুব খুশী হইলেন।

'গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউবো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোনে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাদু আমার বুদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

কবিকঙ্কণে বৈষ্ণববাদ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যযুগের পরে বাংলাকাব্যের যে যুগ আসে, ঐতিহাসিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'সংস্কার-যুগ' ; কিন্তু, মনে হয় এই যুগকে প্রাচীন হিন্দু ভাবধারার পুনরুত্থান যুগ বলাই সঙ্গত।…

চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব প্রাণ-শক্তির সঞ্চার হয়েছিল।—মনসা, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবীগণের মঙ্গল বা পাঁচালী, রামায়ণ ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ-কাব্য, অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বৈচিত্র্য অবলম্বনে পদাবলী রচনা করা ছাড়াও যে আধুনিক কালের মনুষ্যগণের প্রত্যক্ষ জীবন-চরিতও বিশাল কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হতে পারে—এ জিনিষটা তার আগে কারো ধারণা বা বিশ্বাসের যোগ্য না থাকলেও, চৈতন্যদেবের চরণ স্পর্শে বঙ্গসাহিত্যের সেই নিরুদ্ধস্রোত নবজীবনের স্ফূর্ত্তিসহ প্রবাহিত হয়—যার ফলে, গতযুগের লৌকিক ধর্ম-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য যেন ভেসে যায় ! এবং, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি কেবলমাত্র চৈতন্যদেবের জীবনালেখ্যই নয়, নরোত্তম প্রভৃতি তাঁর বহু শিষ্যউপশিষ্যের জীবনাখ্যানও এই সময় বঙ্গসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করে দেয় ! বস্তুত, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীতও যে মহৎ মনুষ্য-চরিত্র গঠিত হতে পারে এই সত্য জাতীয় জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত হয় ! ..

কিন্তু, এ'র অব্যবহিত পরবর্ত্তী-যুগেই হল আবার তার প্রতিক্রিয়া। কারণ, নতুনের প্রতিষ্ঠা হ'লেও প্রাচীন একেবারে বিলুপ্ত হবার জিনিষ নয়। যে-টুকু ভাল, সমাজে বা সাহিত্যে সাময়িকভাবে তা বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হলেও, তা লুপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ তা'র সৌন্দর্য্য ও সত্য

প্রকটিত হবার সুযোগ গ্রহণ করে।...বৈষ্ণবযুগের অবসানে বঙ্গসাহিত্যে আবার রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতির নতুন সংস্করণ লিখিত হ'ল। গ্রাম্য শক্তিদেবতার মঙ্গলগুলি কাব্যে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হল। আর, এই উপলক্ষে বাংলা-কাব্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের এমন কতকগুলি খাঁটি ছবি—সুন্দর ও বিশ্বকালীন ছবিও অঙ্কিত হ'ল, যা' বৈষ্ণব চরিত-কাব্যেও প্রতিফলিত দেখা যায় না।—কোন মহৎ বা আদর্শ চরিত্র নয়,—অতি-সাধারণ, পরিচিত সরল ও স্বাভাবিক জীবনই হচ্ছে তা'দের উপাদান।...

এই 'সংস্কার' বা 'পুনরুত্থান'-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামরচিত চণ্ডীমঙ্গলই সর্ব্বোত্তম।—কবিকে দেবী চণ্ডিকা স্বপ্নে এই কাব্য রচনা করতে আদেশ দেন এবং ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আনুকূল্যে কবি এই কাব্য সমাধা করেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়—বৈষ্ণববাদের যে প্রতিক্রিয়া প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজ কর্ত্তৃক সূচিত হয়েছিল, সেই নব-জাগ্রত শক্তিপূজার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করবার জন্যই কবিকঙ্কণ লেখনী ধারণ করেছিলেন;—কিন্তু যে অপূর্ব্ব মানুষটিকে দেখে বঙ্গের জাতীয়-জীবনে গভীর বিস্ময় ও ব্যাকুলতা জন্মেছিল,—যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকারী ব্রাহ্মণে ও সর্ব্বনিম্ন অবহেলিত চণ্ডালে সমভাবে সমবেদনার প্রীতি জাগিয়ে দিয়েছিলেন,—যাঁর গৌর-কান্তিতে দেব-প্রতিভার বিকাশ ও সজল-চক্ষে আশ্চর্য্য ভক্তির প্রভা,—সেই বাঙ্গালীর হৃদয়-অমৃত-মন্থন-জাত, অলৌকিক, উচ্ছ্বাসময়, ভাব-দেহ অমৃতান্ত নরদেবতার প্রভাব অতিক্রম করা অতি নিকটবর্ত্তী সময়ের—মাত্র কয়েক দশক অন্তরের কোনও কবির পক্ষেই অসম্ভব। মুকুন্দ-রামের মত মহাকবির হৃদয়ে সে-ছবি তো বিশেষ উজ্জ্বল থাকবেই! তাই আমরা দেখি—একটু অসম্ভব বা আশ্চর্য্য মনে হ'লেও—শক্তিপূজা-প্রচার-কারণে কাব্য রচনা করলেও, দেবী মাহাত্ম্য-বর্ণনা উদ্দেশ্য হলেও, —মুকুন্দরামের কাব্যে বৈষ্ণবত্ব অর্থাৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের প্রভাব, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁর গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা—তাঁর জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক—বিজড়িত হ'য়ে রয়েছে! কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যখানি তাঁর অন্তরের সেই গোপন আকুলতার কথাটি মনে রেখে, সযত্নে পাঠ করলেই এতে এমন অনেক ছত্র পাওয়া যাবে—কবি-মানসের ভাব-বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে নি!...

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে দুটি উপাখ্যান আছে,—প্রথমটি কালকেতু নামক ব্যাধের উপাখ্যান—অপরটি শ্রীমন্ত সদাগরের। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র কালকেতুর উপাখ্যানটি অনুসরণ ক'রেই কবিকঙ্কণের চৈতন্য-ভক্তির তথা বৈষ্ণব-প্রীতির পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।—

তৎকালীন প্রথামত কবি কাব্যারম্ভের প্রথমে গণেশ দেবতার বন্দনা ক'রেছেন। এই গণেশ-বন্দনাতেই কবি লিখছেন—

...গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।...

সুতরাং, একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই এখানে লক্ষ্য করতে হয় যে চণ্ডীর মহিমা-কীর্ত্তনের উপক্রমে কবি গোবিন্দ-ভক্তি প্রার্থনা করছেন!

গণেশ-বন্দনার পর কবি করেছেন শ্রীচৈতন্য-বন্দনা। কিন্তু চণ্ডীকাব্য রচনার সংকল্প করে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করবার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, তা' বুঝতে পারা যায় না; তবে সেই কদমফুলের মত প্রেম-রোমাঞ্চিত-দেহ নবদ্বীপের যে গৌরবরণ ছেলেটির রূপে গুণে কবি মোহিত, তাঁর প্রশস্তি না গেয়ে কবি হয়ত তাঁর কাব্য রচনাই করতে পারেন না! তাই লিখছেন—

...অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি—
বন্দিব সন্ন্যাসী চূড়ামণি,
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন্দ
পতিতেরে লওয়াও শরণি ;...

কাব্যের সর্ব্বত্রই দেখা যায়—চণ্ডীর স্তব লিখতে গেলেই কবির কৃষ্ণের মহিমা মনে এসে যায় এবং দুর্গা অপেক্ষা কৃষ্ণ-কথাই বেশী বলে ফেলেন। কাব্যের ৩১ পৃষ্ঠায় কলিঙ্গরাজ ভগবতীর আদেশ পেয়ে দেবীকে করজোড়ে স্তব করছেন—

নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু-সহায়িনী
দুরিত-হারিনী মাতা দুর্গতি-নাশিনী

অর্থাৎ চণ্ডীর সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য এই যে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিষ্ণুকে সাহায্য করেছিলেন!—কবি নিজের বৈষ্ণবত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন এই স্তবের নিচের দুটি সংক্তিতে—

যেই জন নাহি করে তোমার সেবন,
সে জন কি হয় হরি-সেবার ভাজন ;

—যে তোমার পূজা করে না, সে হরিকে পূজা করবার উপযুক্ত গুণ-লাভ করে না। চণ্ডী-পূজা যেন হরি-পূজার অধিকারী হবার প্রাথমিক সাধনা!...

কালকেতু রাজা হওয়ার পর বিশ্বকর্ম্মা এবং হনুমান দু'জনে মিলে তার জন্য গুজরাট-নগর নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। গুজরাট-নগর-নির্ম্মাণ বর্ণনায় (৭৪ পৃষ্ঠায়) কবি বলছেন—

...আওয়াসের পূর্ব্বদিশে বিচিত্র কলস বৈসে
বিরচিল বিষ্ণুর দেউল।
দিয়া হীরা নীলখণ্ড বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড
অনল বিজলী সমতুল।...

—ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, চণ্ডীর অনুগ্রহেই কালকেতু ব্যাধের ঐশ্বর্য-সম্পদ হ'লেও, সে তার নব-নির্ম্মিত রাজধানীতে আগে চণ্ডীর দেউল না তুলে 'বিরচিল বিষ্ণুর দেউল'। কারণ আর কিছুই নয়—কবির অন্তর যে বৈষ্ণবভাবে পূর্ণ!—এই নগর বর্ণনায় কবি আরও লিখেছেন—

কাষ্ঠ আনে তার বোঝা   কুমারে পোড়ায় পাঁজা
নানা স্থান করায় নির্ম্মাণ ।
দিয়া হীরা নীলখড়ি   নির্ম্মাইল দোলা পিঁড়ি
কদম্ব-কানন সন্নিধান ।...

—অর্থাৎ চণ্ডীর কৃপায় অনুগৃহীত ব্যাধ কৃষ্ণের প্রিয় কদম্বকাননের নিকটে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করালে ।—শেষ অবধি বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান সেই 'দ্বারকা-সমান' পুরীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করলেন, তখন 'পুরী দেখি বীরের পূরিল অভিলাষ" ; এবং ব্যাধের প্রতিষ্ঠিত সেই নগর যে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার ঠিক সমানই হ'ল—এতে কবিও হয়ত অতিশয় আনন্দ পেলেন !...এরপর রাজধানীর অধিবাসীদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সপ্রশংস-ভাবে লিখেছেন—

...প্রতি বাড়ী দেবস্থল   বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরি-সঙ্কীর্ত্তন ।......

—চণ্ডীর দয়ায় চণ্ডীর সেবক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুজরাট সহরের প্রায় সবাই বৈষ্ণব,—'মাধব', 'মুকুন্দ' প্রভৃতি বৈষ্ণব নামই তা'রা গ্রহণ ক'রেছে, এবং সেখানকার নাগরিকগণের 'চন্দনে চর্চ্চিত তনু' !—এ'র কারণ, চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ।

তারপর, কালকেতু যখন 'খ্যাত' রাজা হ'য়ে গুজরাটে রাজত্ব করছেন, তখন তিনি—

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ ।
শুনেন কৃষ্ণের গুণ হ'য়ে সাবধান ॥ (পৃ, ১০৫)

—তা' তিনি শুনুন, কিন্তু চণ্ডীদেবীর কথা মনে পড়লে আমাদের দুঃখ হয় এই ভেবে যে নিজের পূজা প্রচারের জন্য এত কাণ্ড করবার পরও,—ব্যাধনন্দনকে সামান্য অবস্থা থেকে, নানাবিধ অনুগ্রহ-প্রচেষ্টায়, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেও,—কবির কাব্যনায়ক কালকেতু চণ্ডীকে পূজা না ক'রে সকাল সন্ধ্যায় অবহিতচিত্তে কৃষ্ণ-মহিমা-কীর্ত্তন-ই শ্রবণ করছে !—এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য যে শক্তিদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচার, হরি-ভক্তি প্রদান করা নয়,—চৈতন্য-প্রভাব-মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত কবি সে কথা যেন একেবারেই ভুলে গেছেন !

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী-চৌধুরাণী প্রচারধর্মী ও শিল্পধর্মী কি না

শ্রীমঞ্জুলা মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" একটি সর্বজনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলা-দেশের শিক্ষিত সুধী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে অক্ষর-পরিচয়জ্ঞান-সম্পন্না গৃহবধূ—সকলের কাছেই এর সমাদর ঘটেছে। গুরুভার তত্ত্বের সংগে সুমধুর মাধুর্য এই উপন্যাসখানিকে এক আশ্চর্য সুষমা দান করেছে।

"দেবী চৌধুরাণী"র সর্বজনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে এর মধ্যে কোনো শিল্প উপাদান এবং প্রচারধর্মিতা বিদ্যমান আছে কিনা। এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হলে এর জনপ্রিয়তার কারণ সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সাহিত্যে শিল্পের স্থান অত্যুচ্চে। কোনো রচনার বর্ণনাভংগী তথা রচনাশৈলী যদি মনোজ্ঞ হয়, তাহলেই তা যথার্থ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। অবশ্য রচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচনেরও একটি বড় স্থান আছে। এ সম্বন্ধে ইংরাজ রসজ্ঞের উক্তি, 'There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all."—অর্থাৎ স্টাইলই সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উপাদান একথা সর্বত্র স্বীকার্য নয়। এই স্টাইল আর কাহিনীর সৌন্দর্য যখন একাঙ্গীভূত হয়, তখনই মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি।

সাহিত্যের শিল্পসত্তাকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হচ্ছে, বর্ণনার সৌন্দর্য, অপরটি কাহিনীর সৌন্দর্য।

মনোরম বর্ণনা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং "দেবী চৌধুরাণী"র অধিকাংশ বর্ণনা সৌন্দর্যপূর্ণ। তাঁর বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রেই সুপরিস্ফুট ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ প্রফুল্লের বর্ণনায় মাধ্যমেই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্লের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপ বর্ণনার সময়ে তিনি নিপুণ শিল্পীর মত মাত্র কয়েকটি রেখার মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ও অসহায় অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন—

"এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দরদর ধারা বহিতেছে।"

একটুখানি মাত্র আভাস দিয়েই লেখক এখানে চুপ করে গিয়ে পাঠককে কল্পনা করে নেবার অবকাশ দিয়েছেন।

প্রফুল্লের বর্ণনার সময়ে যেমন অনাড়ম্বর ভংগী তিনি গ্রহণ করেছেন, দেবীর নৌকা ও তার বর্ণনার সময়ে তিনি তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। আর এই বর্ণনার পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য রাত্রির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও অতুলনীয় :—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত।"

এরপর ভাষার মহিমামণ্ডিত রাজকীয় গাম্ভীর্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। নৌকার বর্ণনার পর তিনি লিখছেন, "গালিচার উপর বসিয়া এক স্ত্রীলোক।

হার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নিচে তেমন পূর্ণায়ত হ দেখা যায় না, পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও ওয়া যায় না।……বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র যোলকলা সম্পূর্ণ—াজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে ইহার শরীরও তেমনি কূলে লে পুরিয়াছে।……কিন্তু জল কূলে কূলে ভরিয়া টল টল করিতেছে—স্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে—নিস্তরঙ্গ। াবণ্য চঞ্চল, কিন্তু লাবণ্যময়ী চঞ্চল নহে—নির্বিকার। সে শান্ত গম্ভীর ধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিণী।"

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে দেবী চৌধুরাণীর শুধু দৈহিক নয়, তার ানসিক রূপেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে। সে শুধু লাবণ্যময়ী-ই নয়, সে র্বিকার গম্ভীর-ও। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র grandeur and grace এর সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন।

নিছক সৌন্দর্য বর্ণনার কথা ছেড়ে দিয়ে কাহিনীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

"দেবী চৌধুরাণী"র কাহিনীর মধ্যে দুটি রসের অবতারণা ঘটেছে—করুণ ও মধুর। দেবী হওয়ার পূর্বে প্রফুল্লের কাহিনী করুণ আবেদনে—ভরা। প্রফুল্ল তখন নিতান্ত সমাজনিপীড়িতা দরিদ্রা গ্রাম্যবালিকা মাত্র; তাকে অনাশনে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়, তার স্বামীর ধনজন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে বঞ্চিতা। তার দুরবস্থা দেখে তার শাশুড়ী অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের মাতারও চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছিল।

সাগরের সংগে ব্রজেশ্বরের কলহ ও তার সমাধানের কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র রহস্য মাধুর্যের অবতারণা করেছেন। এই লঘু আখ্যানটিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরই পরিণতি হোলো ব্রজেশ্বরের সংগে দেবীর পুনর্মিলন। তাছাড়া এই আখ্যানভাগের পরবর্তী অংশে দেবীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সংগে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যেও এর দরকার ছিল।

সাহিত্যের দৃষ্টিভংগীতে এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আছে সেই অধ্যায়ে—যেখানে দেবীর মনের ভাবান্তর ঘটলো। দেবী উপলব্ধি করলে—রাণী হওয়াই জীবনের চরম কাম্য ও লক্ষ্য নয়—তার বাহিরেও জগৎ আছে তারজন্যে। সে নিজের স্বরূপকে আবিষ্কার করলে জ্ঞান বা মুক্তির মধ্যে নয়,—বেদনার মধ্যে।

কাহিনীর শেষভাগে যদিও দেবীকে এবং তার সম্প্রদায়কে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে, তবু এর পরিণতি ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয়নি—কমেডিই হয়েছে। যদিও এই কমেডির পথে অনেক ত্যাগ, অনেক বেদনার অবকাশ ঘটেছে তবু এর পরিণাম হয়েছে সকলের আনন্দ ও সন্তোষবিধান। দেবী নিজের রাজকীয় জীবনের সমস্ত উপকরণ এক মুহূর্তে ফেলে দিয়ে সংকীর্ণ গৃহাংগনে ফিরে এসেছে; এখানে তার সান্নিধ্যে সকলে আনন্দ পেয়েছে, পরিতৃপ্তি পেয়েছে, সকলের ক্ষোভ দূর হয়েছে—রাণীর জীবনের একমাত্র আদর্শ নিষ্কাম কর্মবাদ এখানে তার সম্পূর্ণ রূপপ্রকাশ করেছে,তাই এখানে কমেডির মধ্যে দিয়েই লেখক উপসংহার টেনেছেন। লেখক তত্ত্বকেই শুধু বড় করেননি শিল্পকেও উঁচু করেন নি—দুয়েরই সুসংগত সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কাহিনীর পরিণতির মধ্যে "সারপ্রাইজে"র অবকাশ ঘটিয়ে কেবলমাত্র তত্ত্ব বা শিল্পকে বড় করতে গিয়ে লেখক সমগ্র উপন্যাসখানিকে ছোট করেননি—এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব।

কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা বঙ্কিম সাহিত্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সুসংগত সমন্বয়রূপে কৃষ্ণচরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই মতবাদকে আরও আর্টিষ্টিকভাবে "দেবী-চৌধুরাণীর" মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের নীরস গুরুগম্ভীর আলোচনা বিশ্লেষণ-ভংগীর বদলে আলোচ্য কাহিনীতে পাঠক পেলেন এক সুমধুর কাহিনীর অবতারণা, অথচ এর অন্তরালে ফুলের মালার আড়ালে থাকা সূত্রটির মত লেখক তাঁর যে তত্ত্বটি প্রকাশ করলেন তা সন্ধানী পাঠক ব্যতীত অন্যদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তত্ত্বের গুরুভারে কাহিনীর স্রোত এখানে একবারও ব্যাহত হয়নি; এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক শিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে Mill এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীক্ষেত্রে Comteএর Poritine Philosophyর সমাজ কল্যাণবাদ গ্রহণ করেছিলেন। "দেবী চৌধুরাণী"তে তাঁর জীবনের এই উল্লেখযোগ্য পর্বগুলির ছায়াপাত ঘটেছে।

পরবর্তী জীবনে দেবী চৌধুরাণী সমাজবাদ ছেড়ে ব্যক্তিবাদেই ফিরে এসেছে।

দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমের মানসকন্যা। তার চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জীবনাদর্শকেই প্রচার করেছেন। গ্রাম্য প্রফুল্ল প্রথমে ছিল ভক্তিবাদী; ভবানী পাঠকের সংস্পর্শে এসে সে জ্ঞান ও কর্মযোগ শিক্ষা করে এই তিনযোগের সমন্বয় ঘটালে।

দেবী চৌধুরাণীতে চরিত্র অঙ্কন করবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবন-দর্শনের মধ্যকার Ethicsকেও বড় স্থান দিয়েছেন। সত্যানন্দের চেয়ে দেবীর চরিত্র আরও পরিমার্জিত। তাই সত্যানন্দ Ethical code এর Ways and means are Correlative-এ তত্ত্ব ভুলে গিয়েছিলেন বলে ডাকাতির মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন। অপরপক্ষে দেবী চৌধুরাণী তার নিজস্ব সম্পত্তি কৃষ্ণেরপায়ে অর্পণ করে দরিদ্রজন-সেবার মধ্যে জীবনের পরিণতির পথ খুঁজে পেলে।

কাহিনীর শেষভাগে দেবী চৌধুরাণী তার তত্ত্বের বা আদর্শবাদের সংগে জীবনের সুসংগত সমন্বয় ঘটাতে পারলে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম-যোগের সংগে সে নিজের আত্মোপলব্ধির দ্বারা গীতার নিষ্কাম কর্ম-যোগ ও মিলনের ব্যক্তিনির্ভর মানবকল্যাণবাদের Synthesisএর প্রতীক হয়ে রইল।

আলোচ্য উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এর মধ্যে শিল্প ও তত্ত্ব দুয়েরই ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে। শিল্পের জন্যে তত্ত্ব চাপা পড়েনি এবং তত্ত্বের তলায় শিল্পও ডুবে মরেনি। এই জন্যেই এখানে বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস সার্থক হয়ে উঠেছে।

(পূর্বানুবৃত্ত)

লালদেদ ও কাশ্মীরের ঋষিসম্প্রদায়

ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশের যোগিনী কবি লাল দেদ্। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ব্রাহ্মণের মেয়ে; ছেলেবেলা থেকেই নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক পিতার শিবপূজা মন দিয়ে লক্ষ্য করেছে; শিবমহিম্ন গান গেয়েছে। দেখেছে পিতার ভিক্ষার পাত্র মাতা কত সমাদরে গ্রহণ করে শিবের ভোগ বেড়ে দিয়েছেন। সঞ্চয় নেই, বিলাসিতা নেই। শিবশম্ভুর সংসারের মতো শূন্যে পরিপূর্ণ সংসার। বৈরাগ্য বিলাসেই বিলাস।

শিবের ধ্যান করে কিশোরী লাল দেদ্; শিবের গান, শিবের স্তব। মাকে দেখে, বাপের সেবা করেন সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে। মনে মনে ভাবে—লালদেদ যদি শিবকে স্বামীরূপে পান্ এমনি করে সেবা করবেন, ভিক্ষার অন্নে সন্তোষ, বিভূতিতে ঐশ্বর্য্য, রিক্ততার প্রাচুর্য্যে স্ফীত হবেন অনায়াসে।

কিন্তু মা মারা গেল লালদেদের। বাপের আর বন্ধন নেই সংসারে; কাজেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে ধরে বিবাহ দিলেন তার ছেলের সঙ্গে।

কিন্তু সে তো লৌকিক বিবাহ। লালদেদের বিবাহ তো হয়ে গিয়েছে তার আগেই। সেই স্বামীর কথা বলে লালদেদ, পিনাকী, ত্রিশূলী, দিগম্বরের সেই নীললোহিত মূর্ত্তি। তার গান গায়। তবু শাশুড়ী মানিয়ে নিয়েছিলো এই প্রতিমার মতো বৌটীকে। কিন্তু বিপদ ঘটালেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সেই শ্বশুর। লালদেদের অচলা নিষ্ঠা তো কৈ তিনি এতকালের পূজার্চনায় পান্ নি। কথায় কথায় স্ত্রীকে পুত্রকে অনুশাসন দিতেন,—"সাধারণী নয় ও মেয়ে। গিরিশের পাণি-প্রার্থিনী কন্যাকুমারিকা ও!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লালদেদকে দেবীজ্ঞানে প্রায় পূজা করতে লাগলেন।

এ সহ্য হবে কেন ব্রাহ্মণীর? পুত্রবধূ পূজা? কবে কে এই অনাচার সয়েছে ভূভারতে? আরও বেশী কাজ চাপাতে লাগলেন তিনি, আরও অনাস্থা, আরও অপমান। দৈহিক নিপীড়ন, নিগ্রহ, অত্যাচার।

বিরাগিণী লালদেদ 'শিব' 'শিব' বলে গৃহত্যাগ করে গেলো। লালদেদ হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে গুরুর সন্ধানে ফেরেন। অবশেষে দেখা পান শৈব সন্ন্যাসী সিদ্ধবাগাচার্য্যের। তিনি ত্রিক্-দর্শনের পথে যোগাভ্যাস করে ষটচক্রভেদ করেছিলেন। অতোবড় যোগীর সাহচর্য্য মেলা সহজ কথা নয়। লালদেদ তাঁর বাঞ্ছিত পথ পেলেন। বৎসরের পর বৎসর চললো কঠিন যোগাভ্যাস। কঠিন, কঠিনতর, কঠিনতম। অবশেষে বুঝি লালদেদ তার যৌবনপারে দেখা পেলো দয়িতের। লালদেদ গান গাইলো—

বনের পরে বনের বেড়া পেরুই হেসে হেসে
ছয়টী বনের পারে তারে পেলাম অবশেষে।
সেথায় কিছু নেইকো কালো
ছড়িয়ে আছে চাঁদের আলো
গিরিচূড়ায় ধবল হিমের তরঙ্গহীন দেশে
শান্ত শিব সুন্দরেরে মিললো অবশেষে।
হৃদয় বীণা স্তব্ধ এখন, শান্ত দেহের শ্বাস,
আমার প্রেমের হোমানলে জ্বলন্ত আকাশ।
সেই আলোতে দেখি তারে
যাহার লাগি বারে বারে,
ফেলেছি দুই নানতারা অধীর নির্ণিমেষে,
শান্ত আমার শিবের দেখা মিললো অবশেষে।

লালদেদ দেহ তত্ত্বের রহস্য ভেদ করে তাঁর ঈপ্সিতকে পেলেন। অধীর আনন্দে দেহতত্ত্বের নানা কথা দিয়ে ভরাট গান গেয়েছেন তিনি। কিন্তু দিন যায়, জরা আসে; কোথায় সেই শ্মশানশয্যায় যেন একটা নিষ্করুণ রুক্ষতা দেখেন তিনি। শ্মশানের বৈরাগ্য, চিতার সমীকরণ তাঁর চিত্তকে উষর করে তোলে। তাঁর শিবং সুন্দরং তো অমলধবল রজত গিরিনিভ চিদাকাশের অভিরাম ঈশ্বর। এত রুক্ষ, এতো কঠোর কেন তাঁর স্বরূপ? আবার লালদেদ গান ধরেন। এবার আর তত্ত্ব নয়, প্রচার নয়, নীতি নয়। এবার ভক্তি আর প্রেম। প্রেমিকা মাতোয়ারা দয়িতের প্রেমে। অক্ষয় হয়ে আছে কাশ্মীরের প্রান্তরে, গিরিতে, জলে, আকাশে লালদেদের এই প্রেমসিক্ত গীতিমাল্য। পাঁচশো বছর কেটে গেছে, তবু লালদেদের এইসব গান বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আত্মনিগ্রহের ইতিহাস এই গানে। শুধু ফুল হয়ে ফুটে অহঙ্কার হোলো; কিন্তু সকল সফল করার দেবতা আমায় ছিঁড়লেন, ধুনলেন, পাকে পাকে মাড়ালেন, কাঁচি দিয়ে কাটলেন;—বীণা করলেন। তবে হোলো তাঁর মাথার উষ্ণীষ।

'লাল' বাগিচায় ফুটলো কাপাশ ফুল
তারই গর্বে সমাকুল।
ধুনরীরা ধুনে দিলো ঝাড়লো পাটে পাটে
চরখা বুড়ীর পাকে পাকে আমায় সুতো কাটে

ধোবার পাটে আছড়ে যতো ময়লা হোলো দূর
মাটী সাবান নোংরা মেখে গর্ব হোলো চুর
শেষ হোলো কি এবার প্রভু, হোলো কি এইবারে ?
কাঁচী দিয়ে টুকরো করে কাটলে বারে বারে ?
এতোর পরে ঘুচলো মনের ভুল
লাল বাগিচায় ফুটেছিলো অহঙ্কারের ফুল।

লালদেদের কথা ভাবতে ভাবতে অসিতের কথা ভুলেছিলাম। সমস্ত পথটা সে নেই। সারা পায়ে কাদামাটী মেখে একগাদা গাছ-পালা, শেকড়-বাকড় বয়ে এনেছে থলিতে করে। মুখখানা খুশীতে উদ্ভাসিত। গালভরা পান, চোখ আর ভ্রূ নাচছে,—"ওঃ আসতে ইচ্ছে করে না। বহুৎ স্পেসিমেন, বহুৎ। গ্রাণ্ড জায়গা।"

ঢেঁকীর কাজ ধান ভানা, স্বর্গে গেলেও ভানবে। আমি সহিসের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করবো; মৌকা পেলেই বক্তৃতা করবো; অসিত যখন যেখানে যাবে—স্থানের উৎকর্ষ, কালের ব্যবহার, পাত্রের উপযোগিতা বিচার করবে স্পেসিমেন নিয়ে; বেণু দেখবে সাবান কাচার ক'টা আইটেম বাড়লো, চায়ের সময় বয়ে গেলো কিনা, তার দাদার শয়ন, ভোজনের কোনও বাধা বিঘ্ন হচ্ছে কি না,—এরই ওপর যাত্রার সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করছে।

"নোংরা করলে তো চমৎকার শার্টটা" ! বললে বেণু।

"আচ্ছা বেণুদি আপনি নিতান্তই বেরসিক। দেখুন দেখুন, দেখছেন এটা কি? ইউফোরবিয়া—ডমসোনিয়ানা, চুল ধুতে কাজে লাগবে। এটা ওষুধ, হায়োসিয়ামস্, এটা বার্বারিস্, এটা ভিন্না, পিপার-মিন্টের মতো খেতে। এটা দেখুন উটকা, এটা ইউফ্লাস্—কতো ওষুধ এই বনে।"

ওর আনন্দে ও মগ্ন।

আমার চিন্তায় আমি।

লালদিদের কথা...। সুফীদের সঙ্গে শৈব সমন্বয়ের কথা। কাশ্মীরের 'ঋষি' সম্প্রদায় আর হিন্দু-মোস্লেমের মিলিত তীর্থের কথা। এই লালদিদের সাধনার প্রত্যক্ষ ফল কাশ্মীরের 'ঋষি' সম্প্রদায়। 'ঋষি'দের কথা বলার অবসরে এই তত্ত্বটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

সুফীদের নিয়ে কাশ্মীরে একটা নব পর্য্যায় আরম্ভ হয়। সারা ভারতের ইতিহাসে এর নজীর নেই আর। আর কাশ্মীরে ঠিক পৌরাণিক প্রথায় নানা পূজার ভিত্‌টা গভীর হয়ে বসতে পায়নি। তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকায় শৈব ধর্ম্মটাই একটা বিশিষ্ট-রূপ নিয়ে এখানে বাসা বাঁধলো। মাঝে মাঝে তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান অভিচার ইত্যাদি যোগ দিয়েছে, তবে বীরাচারের বিশেষ পরিচয় নেই। ফলে প্রথম যখন ইসলাম এলো তখনই মীর সৈয়দ আলি হমদানীর মতো একজন সুফীর মাধ্যমে এলো। তিনি এসেই এদেশের নাড়ীর খবর ধরতে পারলেন। শৈব ধর্ম্ম আর সুফী ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য দেখতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা লালদিদের। শুনে তিনি অবাক। উলঙ্গ নারী পথ দিয়ে হাঁটে, অথচ সকলে তার পূজা করে। শুনে তিনি অবাক—যে লোকে যখন তাঁকে বলে "লাল্লা, পুরুষের সামনে উলঙ্গ হও, লজ্জা, ভয়, ডর—কিছু কি নেই তোমার?" লাল্লা নাকি জবাব দিয়েছে,—"পুরুষ? কাশ্মীরে পুরুষ কই? তোরা যদি পুরুষ হোস তবে জানোয়ার কারা?" এই লাল্লাকেই একদিন দেখা গেল পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলেছে। "দেখছি, আজ পুরুষ দেখছি!"

সকলে অবাক্! কে এই পুরুষ? আর কেউ নয়। ঐ মীর সৈয়দ আলি! লাল্লাকে দেখে তিনি বলেন,—"না, না, উলঙ্গ মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আমি নারাজ।"

সামনে মস্তবড় উনুনে কি গরম হচ্ছিল। সেই সময়ে কে বিরাট ডেক্‌চিটা নামিয়েছে। লাল্লা টপ্ করে উঠে সেই উনুনে ঢুকে গেলেন। উনুনের চার ধারে দেয়াল। তাঁর নগ্নতা ঢাকা হোলো। চারধার থেকে আগুনের শিখা। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির সামনে সেই যে মীর সৈয়দ আলি মাথা নোয়ালেন, সেই থেকে লাল্লা তাঁর গুরু। সেই থেকে দুজনের কতো দিনের তত্ত্ব আলোচনা। আজও তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—"লাল্লা বাক্যাণি" সংগ্রহে।

বিজবিহারের সন্নিকট জামামসজিদের কাছে এক সমাধি আছে। লোকে বলে লালদিদের মর্ত্ত্য-পিণ্ড এইখানেই আছে। শত শত ভক্ত এখানেই এই যোগিনীর উদ্দেশ্যে মালা দিয়ে থাকে। লালদিদের গান মাঝিরা গায়—

কাঁচা সুতো, পাক পড়েনি, তাই দিয়ে এই গুণ টানা!
প্রভু তুমি শুনবে কি ডাক, পার কি আমার করবে না?
কাঁচা মাটীর পাত্রে রাখা জলের মতো শুকিয়ে যাই
পরাণ আমার অধীর হোলো, শেষে যেন তোমায় পাই।

গায়—

যে পথে এসেছি সে পথ ভুলেছি
ফিরতে না পারি হায় রে
বাঁধের জলেতে আটক পড়েছি
বেলা হোলো আঁধিয়ার রে
পারানির কড়ি একটীও নেই
ভেবে সারা মাঝি যায় রে।

এই লাল্লার উত্তরসাধক এলেন নুরুদ্দীন। বাল্যে গৃহত্যাগ করে আসেন তিনি। বহুসাধনার পর সিদ্ধিলাভ করে খ্যাত হন। তখন তাঁর মা তাঁকে নিতে এসে বলেন "এতো দুধ খাইয়েছি, সে শোধ করবি কিসে?" নুরুদ্দীন মার দিকে চেয়ে হেসে বলেন—নাও দুধ যতো চাই। পাহাড় কেটে দুধের ঝরণা বেরুলো। মা ছেলের পথের পথিক হলেন।

লাল্লার সঙ্গে নুরুদ্দীনের দেখা। দেখতেই লাল্লার স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকলো। নুরুদ্দীন সাক্ষাৎ জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করলেন লাল্লার মধ্যে। এই নুরুদ্দীন পেলেন ঋষি আখ্যা। কাশ্মীরে বিখ্যাত

ঋষি সম্প্রদায়ের পত্তন হোলো। নুরুদ্দীনের সুযোগ্য শিষ্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হোলো—নাসিরুদ্দীন, বাম্‌উদ্দীন, জয়নুদ্দীন, লতিফুদ্দীন। একেশ্বরবাদের সমন্বয়ে মিশিয়ে মিলো ইসলামের সুফীবাদ, আর হিন্দুর শৈববাদকে। এই অপরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ে কাশ্মীরে প্রখ্যাত মসজিদ আর সমাধিমন্দিরগুলি হিন্দুর তীর্থ হয়ে যেমন আজও জীবন্ত, ঠিক তেমনি হিন্দুর তীর্থগুলিতে মুসলমানের পূজা অনবরতই বর্ষিত হচ্ছে।

নুরুদ্দীনকে কাশ্মীরের আত্মার প্রতীক বলা যায়। সুফী আর শৈব মতের এমন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গত আচরণের নিদর্শন ভারতবর্ষে আর নেই।

নুরুদ্দীন বা নন্দ ঋষির শিষ্যদের মধ্যে প্রখ্যাত ঋষি পীর পাদশা। পরমজ্ঞানী ও সিদ্ধপুরুষ! এই সন্ন্যাসী নিতান্তই একা একা থাকতেন। ঘাঁটাতেনও না কারুকে, কাউকে ঘাঁটাতে দিতেনও না। অথচ এর সম্বন্ধেই কয়েকটী বিস্ময়কর বিভূতির কাহিনী আছে। ইনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক। মুসলমান হিন্দু সকলের চিত্তে অখণ্ড অধিকার। লোকে জানতো মুস্কিল আসান বলে। ঐ ছিলো জনগণের চিত্তে, আশ্রয়ে তাঁর অভিধান। উনি বিভূতি দেখাতেন আর অন্য এক সিদ্ধ রমণী রূপাভবানী বিভূতি প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করতেন। লালদিদেরও বিভূতির প্রতি অনাস্থা ও বিরক্তি ছিল। রূপাভবানী লালদিদের নজীর দেখিয়ে পীর পাদশার বিভূতি প্রদর্শনের নিন্দাই করতেন। কিন্তু পীর পাদশা বিভূতি দেখাতেন অনেক দায়ে। আওরঙ্গজেবের প্রশ্রয়ে মৌলবীরা জবরদস্তি মুসলমানী করণের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। পীর পাদশা ধর্মের নামে জুলুমবাজী অত্যন্ত হেয় বলে মনে করতেন। এই মুসলমানী-করণের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন এবং এই সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে বিভূতি দেখান। ফলে ঋষি পীর কাশ্মীরের জনসাধারণের চোখে দেবতার মূর্ত্ত বিগ্রহ। বাদশাহ ঋষি পীরকে দমন করতে কৃতসংকল্প। হুকুম দেন পীরকে বেঁধে হাজির করা হোক দিল্লিতে। রাতে আওরঙ্গজেব ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখে অন্ধ হ'ন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা তো বাতিল করলেনই, সনন্দ পাঠালেন স্বীকার করে যে পীর ঋষি ত্রিজগতেরই পাতশাহ্‌। দারা শুকোর গুরু আনন্দমুল্লা সাহেব, সুফী-ঋষি পীরকে নিমন্ত্রণ করেন ভোজে। বিরাট ভোজ। গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন ভোজে। আনন্দ মুল্লাকে খুশী করবার জন্য ঋষি পীর গেছেন ভোজে। অঙ্গে জীর্ণ পরিচ্ছদ। দুয়ারী এই জীর্ণ কন্থা পরিহিত ভিখারীকে ভোজ সভায় প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। পীর ফিরে গেলেন। চমৎকার বেশভূষা পরে এলেন। দ্বারপাল এবার বাধা দিলে না। ভোজে বসে তিনি পোষাকের ওপর খাদ্য রেখে বলেন, "পোষাক তুই খা!" আনন্দমুল্লা স্তম্ভিত। "এ আবার কি বিভূতি?" ঠাট্টা করে মোল্লা। "যেমন ব্যবস্থা তোমাদের। আমি এলাম; আমায় প্রবেশ করতে দাওনি। পোষাক এলো তাকে দিলে। কাজেই পোষাকী নিমন্ত্রণের ভোজ পোষাক-ই খাবে। খাও পোষাক, খাও।" মোল্লার মাথা নীচু। উনি মাংস খেতেন না। একবার মুল্লা ওঁকে নিমন্ত্রণ করেন। গামলায় ঢাকা মূর্গমুসল্লম্—আস্ত মুর্গী। পীরের সামনে গামলা নিয়ে হাজির। নির্বিবাদে পীর ঢাকা খুললেন। একটা জীবন্ত মুর্গী ডানা
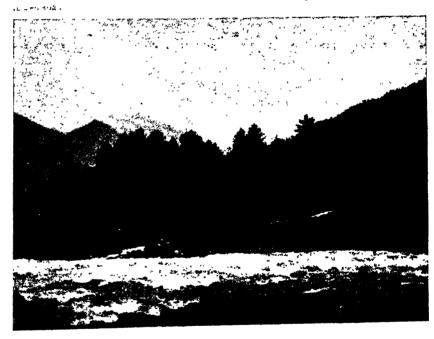
ফিরোজপুর নালা

ঝাড়তে ঝাড়তে গামলা থেকে নেমে গেল। গামলা খালি। পীর হাসলেন। মুল্লা মাথা হেঁট করলেন। পীর 'তত্ত্বমসি' আর 'সোহহং', জ্ঞানে আস্থা রাখেন শুনে মোল্লা একদিন আলোচনায় অবতীর্ণ হন। পীরের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁকে ফিরতে হয়েছিলো। পীর বলতেন, ধর্মের প্রথম সোপান পরিপূর্ণ জীবন। তাঁর একটী বাক্য আজকাল মনে রাখবার মতো—

'নিঃস্ব যারা পথের পরে,
ধর্ম কি তার? গুরু কি তার? স্বর্গ নয়কো তাদের তরে।
তাদের মুখের খাদ্য কেড়ে
কেড়ে বসন, বাসের কুটীর, সাধুর ভুঁড়ি শুধুই বাড়ে।'

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের প্রখ্যাত মুস্লিম তীর্থগুলির বর্ণনা দেওয়া ভালো।

এদের ঐতিহ্যও প্রাচীন এবং এদের আবেদন আজও কাশ্মীর জনগণ-মনের সুগভীরে। একথা এতো কলাও করে বলার দরকার আজ যখন সাম্প্রদায়িক বিষকন্যার মোহিনী নৃত্যে সংঘাত থেকে সংঘাতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তেজনা সংগ্রহ করছি। কাশ্মীরেই, একমাত্র কাশ্মীরেই ধর্মসমন্বয়ের এমন অপরূপ নিদর্শন পাই। মানুষ যদি মানুষের মনের দরবারে মানুষকে সহজে যেতে দিতো। এই সমন্বয় সুন্দর থেকে সুন্দরতর হোতো। কিন্তু বাধা দিলো হাঙ্গরধর্মী রাজনীতিবাদী স্বার্থলিপ্সুরা।

সে কথা যাক। মুস্লিম তীর্থের কথা বলি।

"কাশ্মীরের নরপতি রিঞ্চন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। বুলবুল শা ছিলেন রিঞ্চনের গুরু। এর প্রকৃত নাম সৈয়দ বিলাল শা। সুহাদেবের রাজত্বের সময়ে (১৩০০—১৩২০ খ্রী: অ:) ইনি কাশ্মীরে আসেন। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীনগরে বিতস্তার তীরে বুলবুল-লঙ্কার নামক মসজিদ নির্মাণ করান রিঞ্চন ১৩২৪এ। কাশ্মীরের প্রথম মসজিদ। চীনা পদ্ধতির এই দারুময় মসজিদ পরে কাশ্মীরী মসজিদের স্থাপত্যরীতি প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু হিন্দুপদ্ধতিতে এর মাথায় থাকে কলস ও ছত্র। ঐস্লামিক ধারার পরিচয় মাত্র এর ভিতরের জ্যামিতিক পদ্ধতিতে নির্মিত জালি ও কারুর মধ্যেই পাওয়া যায়। খঙ্কাই-মৌলা শেখ হামাদানের মসজিদের নাম। এরও বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে আছে। শ্রীনগরের পাঁচ মাইল পূর্বে দালের কিনারায় আছে হজরতবল মসজিদ। এ মসজিদে রক্ষিত হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ নির্বিশেষ হিন্দু-মুসলমান জনতার পরম আরাধ্য বস্তু। এই কেশ কি করে কাশ্মীরে এলো তার কাহিনীটা চিত্তাকর্ষক।

বংশ পরম্পরায় এই কেশ মদিনার সৈয়দ আবদুল্লার কাছে আসে। দেশের সুলতানকে এই কেশের জন্য সৈয়দ আবদুল্লাকে তলব করায় কেশ নিয়ে তিনি ১০৪৬ হিজরিতে বিজাপুরে পালিয়ে এসে ২৩ বৎসর বাস করেন। কেশ পান তার ছেলে সৈয়দ হামিদ। কেশ ছাড়া আরও দুটী মূল্যবান জিনিস ছিল তাঁর কাছে। হজরত আলির ঘোড়ার রেকাব এবং তাঁরই পাগড়ী। ১১০৪ হিজরিতে আওরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করার পর হামিদ পালিয়ে যান জাহানাবাদে। সেই দুঃখ দৈন্যের [illegible] *এক ধনী ব্যবসায়ী খাজা নুরুদ্দীন অশওয়ারি তাঁকে প্রভূত* [illegible] করেন। একদিন নুরুদ্দীন হামিদের কাছে ভিক্ষা করেন ঐ [illegible]টী পূত-স্মৃতির একটী। ভিক্ষা তিনি পাননা। স্বপ্ন দেখেন [illegible]। স্বয়ং পয়গম্বর তাঁকে বলেন নুরুদ্দীনের ইষ্ট পূরণ করতে। [illegible] দিনই হামিদ নুরুদ্দীনকে বলেন তিনটী স্মৃতির মধ্যে যে কোনও [illegible]টী তিনি বেছে নিতে পারেন। নুরুদ্দীন ঐ কেশটী নেন। কেশ [illegible] নুরুদ্দীন কাশ্মীরে চলেন। পথে আওরঙ্গজেবের চরেরা তাঁকে [illegible] ফেলে ও আওরঙ্গজেব ঐ কেশ জুলুম করে কেড়ে রাখেন আজমীঢ় শরিফে রাখার অভিলাষে। কেশ আজমীঢ়ে চলে যায়। দুঃখে শোকে নুরুদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অভিলাষ জানালেন যেন তাঁর কবর ঐ কেশের নিকটে দেওয়া হয়। আওরঙ্গজেব কেশ রাখতে চান আজমীঢ়ে, নুরুদ্দীন মারা যান লাহোরে। এই ভাবে লাহোরের জনসাধারণ চাইলো নুরুদ্দীনের কবরের কাছে কেশ রাখতে, আজমীঢ়ের জনসাধারণ চাইলো সম্রাটের ইচ্ছা পূরণ করতে, আর খাজা নুরুদ্দীনের ছেলে খাজা মদানীশ প্রার্থনা করেন খোদাতালার কাছে। হঠাৎ আওরঙ্গজেব তলব করেন মদানীশকে। বলেন যে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট, কেশ মদানীশকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। কেশ ও নুরুদ্দীনের শব কাশ্মীরে প্রেরিত হোলো। নকশবন্দের খঙ্কায় কেশ সংরক্ষিত হোলো। এতো ভীড় হোতো এই কেশ দেখার জন্য যে ভীড়ে বহুলোক মারা যেতো। ফলে বড় মসজিদের তল্লাস হোতে লাগলো। হজরতবল শাজাহানের নির্মিত বিরাট সৌধ। এই সৌধে কেশ ও নুরুদ্দীনের সমাধি স্থানান্তরিত হোলো। সেই থেকে হজরতবল তীর্থ হয়ে গেল।

কাশ্মীরে আরও চারটী তীর্থে পয়গম্বরের কেশ আছে বলে শোনা যায়। মেলাও হয় প্রতিবৎসর। সেগুলোর নাম—কলসপুরা, অন্দর-ওয়ালা, গৌরা ও ডাঙ্গরপুরা। নবী পয়গম্বরের জিয়ারাতে যে চুল দেখান হয় সেটা নাকি সত্যই পয়গম্বরের চুল। হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে মানৎ করে, ভেট চড়ায় এসব তীর্থে।

হরিপর্বতের নিকটস্থ জামি মসজিদ কাশ্মীরের বৃহত্তম উপাসনাগার। সুলতান সিকন্দর (১৩৯০—১৪১৪ খৃ: অ:) এই মসজিদ তৈরী করার পর বহুবার এটা ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে, বারবার রাজার পর রাজার সাহায্যে পুনর্নির্মিত হতে হতে বর্ত্তমান আকার পেয়েছে। এ মসজিদে বহু হিন্দুর অজস্র দান আছে।

শ্রীনগরের মদিনসাহেব মসজিদ, আলি মসজিদ, পাথর মসজিদ, অপও মুল্লা মসজিদ এগুলোও দেখবার মতো।

এই যে পীরদের বা ঋষিদের সমভাবে কাশ্মীরীরা পূজা করে এসেছে এজন্য বিদেশে ইসলাম সমাজে কাশ্মীরীদের 'পীর-পরস্ত' বলে উপহাস করা হয়। গোঁড়া মুসলমান কাশ্মীরী মুসলমানকে একশো পার্সেণ্ট মুসলমান মনে করতে সঙ্কুচিত হয়। ওরা মাথা নীচু করে প্রণাম করে, খালি পায়ে তীর্থ যাত্রা করে, তীর্থ ধূলি মাথায় অঙ্গে মাখে! ওরা কোনও তীর্থভূমির সামনে দিয়েও কোনও যানে চড়ে এমনকি ঘোড়ায় চড়েও যায়না। Walter Lawrance এর Valley of Kashmirএ এ সম্বন্ধে চাক্ষুষ দেখা একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। এক বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল এক তীর্থস্থানের সামনে দিয়ে। সবাই যান থেকে নেমে পথ চলতে লাগলো। বর আর তার বাপ গেলনা। ঘোড়ায় চড়ে রইল। ওরা সব সেতু পার হচ্ছিল। সেতুর অপর তীরে সেই মসজিদ। যারা নেমে চলছিল পার হয়ে গেল। বর আর তার বাপ সেতু পার হবার সময়ে সেতু ভেঙে জলে পড়ে যায়। কেউ ওদের বাঁচাবার চেষ্টা অবধি করেনা।' লরেন্স নিজে ওদের বাঁচান।

এই ঋষিদের মধ্যে ৯৯ জন কেবল নুরুদ্দীনেরই শিষ্য-প্রশিষ্য। এদের শুদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে আইন-ই আকবরিতে লিখিত আছে—

"The most respectable people of this country

are the Rishis who, although they do not suffer themselves to be fettered by traditions, are doubtless true worshippers of God. They revile not any other sect and ask nothing of any one; they plant the roads with fruit trees to furnish the travellers with refreshments; they abstain from flesh and have no intercourse with the other sex. There are near two thousand of this sect in Kashmir."…Ain-I-Akbari.

চারার শকিরের দুর্গম স্থানে নুরুদ্দীনের সমাধিতে বৎসরে একবার লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে তুমার গুণকীর্ত্তন করে থাকে। লীদারের মুখে, পহালগামের পথে আয়েসমকান তীর্থও এই ঋষিদের তীর্থ। এই সঙ্ঘের অনুচররা মাথায় অদ্ভুত পাগড়ী পরে। তাতে নানা চিত্র বিচিত্র। এরূপ শিরস্ত্রাণের ব্যবহার সম্বন্ধে কাহিনী আছে। কাশ্মীরের এক মহারাজার একবার বাঁধ নির্ম্মাণ করার কাজে শ্রমিক দরকার হোলো। জোর করে শ্রমিক ধরতে গিয়ে এই সঙ্ঘের কয়েকজনকে ধরে খাটানো হোতে লাগলো। নির্ব্বিরোধী এই মহাত্মারা কাজ করতে লাগলেন। এদিকে রুদ্র কুপিত হলেন। লীদারের জল শুকিয়ে গল। হাহাকার উঠলো। রাজা খোঁজ নিয়ে ব্যাপার শুনে সাধুদের মুক্তি তো দিলেনই; অনুরোধ করলেন, এখন থেকে তারা যেন বিশিষ্ট টোকা মস্তকে ধারণ করেন, যাতে অনুরূপ ভ্রম আর না হয়।

এ সব তীর্থের মেলা কাশ্মীর জন জীবনে এক পুণ্যলগ্ন। এ সময়ে তারা প্রাণ খুলে মেলামেশা করে। অচ্ছা বলে এমনি একটা মেলা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম।

খালীয়ারে সৈয়দ দস্তগীরের নামে জিয়ারাত আছে। কাশ্মীরী মাঝিদের কাছে দস্তগীর এক প্রসিদ্ধ পীর। তারা বিপদে পড়ে 'বদর' 'বদর' না বলে—বলে "ইয়া পীর দস্তগীর!"

গুলমার্গ থেকে তনমার্গ! একটা বাঁকের পর সামনে পাওয়া যায় সুখগজার বিস্তার—গভীর তলা দিয়ে বয়ে গিয়ে সমতল ভেদ করে দিগন্তে মিশেছে। এই বিখ্যাত একয়োজপুর নালার দৃশ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন দেখে শেষ হয়না, পুরোনো হয় না, ফুরিয়ে যায় না।

গুলমার্গ থেকে নেমে এসেছি।

নীচে নেমে চায়ের দোকানে বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে চা খেতে গেলাম। প্রমাদ গণলো অসিত—পান নেই এ বাজারে। প্রতি দোকানীর কাছে কি কাতর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু কলং ঢু-ঢু। আমি সিগারেট ফুঁকছি দেখে অসিত আরও বিরক্ত।

বাইরে আসতেই এক বিভ্রাট।

একটা বছর আঠারোর ছেলে হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে আমায় চালের মাথায় জিজ্ঞাসা করলো—"এ দলটার নায়ক কে?" বেশ পুলিশ-সুলভ কণ্ঠস্বর।

"কেন বলোতো?—আমি। কোনও অপরাধ করেছি কি?"

"অপরাধ?…অনেক বেশী তার চেয়ে। দিল্লীতে গিয়ে এর জন্য আপনাকে জবাব দিহি করতে হবে।"

ছেলেটার রকমসকম আর উৎকট ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিই। কিন্তু ঐ কর্ম্মটি শিক্ষক-জীবনে সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য, তাই পরিপাক করছিলাম। অল্প কিছু কৌতুক-বোধও জাগ্রত ছিল।

"আপনাদের দলের কয়েকটি ছেলে আমাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে এই গুলমার্গ ও খিলানমার্গের পথে আগাগোড়া অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি এদের শাস্তি দিতে চাই। এখানে না পারি, দিল্লীতে হবে।

"অতি চমৎকার পরিকল্পনা আ-পরিতোষাদ্—ন সাধু মন্তে;—শাস্তির দিনটার যেন খবর পাই।"

"কিন্তু আপনি মনে রাখবেন—"

ইতিমধ্যে ভগবান দাসজী এসে ছোঁ মেরে ছেলেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

সকলে হেসে উঠলো জোরে। আমি নিশ্চিন্ত মনে বাসে বসে সইসদের জীবন আর লালদিদের গানের কথা ভাবছি।

একটা ছেলে বল্লে— ওরা দিল্লীর সি, সি, পি, এর কেউ। ভীষণ ক্ষমতাশালী কেউ। ভগবানদাসজী ভাগ্যিস জানতেন ওর দাদাকে—ওঁর ছাত্র কিনা, তাই রক্ষে। নৈলে—

"ব্যাপারটা কি হয়েছিল ধনেশ? তোমার নামও জড়িয়েছে ছেলেটার"

ধনেশ বল্লে,—"কিছুই হয়নি। আমরা সব ঘোড়া নিয়ে নিয়েছি এই ওদের রাগ। ওরা সব কজন ঘোড়া পায়নি, তাই পালাপালি করে ওদের চড়তে হচ্ছিল। দাদারা যেই পেছিয়ে পড়ছিলো, মেয়েরা তখন আমাদের সঙ্গে আর আমাদের দলের মেয়েদের সঙ্গেও ঘোড়দৌড়ের রেস খেলছিলো পাহাড়ি পথে। আমাদের মেয়েরা যেই কখনও হারবার মতো হয়েছে, আমরা ঘোড়া নিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছি। কেবল খেলা করতে করতেই গিয়েছি, আর কিছু নয়।"

আমি দ্বিরুক্তি না করে ভগবানদাসজীর বাসে গেলাম। আসবার সময় ঐ বাসেই এসেছি। যাবার সময় বাস বদলাবার ইচ্ছা ছিল। তা হোলো না। গিয়ে কথাটা পাড়তেই ভগবানদাসজী বললেন—অত্যন্ত বদমেজাজী এবং ক্ষমতাপন্ন লোকের দল। বুঝিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে।

"কি বুঝিয়েছেন শুনি?"

"যেতে দিন। ওর দাদা আমার ছাত্র। মানিয়ে নিয়েছি।"

চটে গেলাম। "মানিয়েছেন, কি মানিয়েছেন? আমাদের ছেলেদের কি দোষ হয়েছে যে ওদের মানিয়েছেন? এটা কাশ্মীরে বেড়াতে আসা, স্কুলের দেয়াল নয়। ছেলেরা কোনও অভদ্রতা করেনি। স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছে। যাঁদের এসব সহ্য হয় না তাঁদের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে এতটা পথ রেস খেলেন কেন?"

ইতিমধ্যে ওঁরা এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট মেয়ের দল, ওদেরি বোনেরা

হবে, ছোটটী বছর আট, বড়টী বছর আঠারো, মাঝে চারটি আরও, দাঁড়িয়ে হাসছে। ছেলেরাও হাসছে।

বল্লাম—"কেউ কোথাও বড় পদস্থ আছেন এই সুবাদে যত্র তত্র যথেচ্ছাচার আর চোখ রাঙানি চলবে না, আমি স্বীকার করি না ওই দাপট। যদি ছেলেরা অপরাধ করে থাকে পুলিশ তার ব্যবস্থা করুক, কোর্টে যাক্ মামলা, খবরের কাগজে উঠুক এই ছেলেদের সঙ্গে অমুকদের মেয়েদের শুভমার্গের পথে গণ্ডগোল হয়েছে। তা বলে এই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ কেন করলেন আপনি? কেন ছেলেদের মাথা হেঁট করলেন?

"আর ছাড়ুন মশাই, যেতে দিন। আপনিও আচ্ছা মাথা পাগলা।"

"ঠিক বলেছেন, আমি একটু পাগল আছি। তাই আমি দেখেছি আমাদের দলের বাইরের কয়েকটি মেয়ে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে কষ্টিনষ্টি করার তালে ছিল। সুযোগ সুবিধা হয়নি বলে উল্টো চাপ দিয়ে আপনার কাছ থেকে আপোষের ফতোয়া নিয়ে চলে গিয়ে ঐ দেখুন কেমন হাসছে।"

বড়মেয়ে তিনটী মুখে রুমাল দিয়ে হাসছে। দেখে ভগবানজী চটে গিয়ে বাসওলাকে বললেন—"বাস ছাড়ো।"

(ক্রমশঃ)

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

—দুই—

দমদমের হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটিতে হাওয়াই বাজীর মত কত জনেরই না আগমন হয়। টাঙ্গা-টমটম্ মোটর রেলের চাইতে গতিবাদের এই যুগে বিমানের কৌলিন্য যথেষ্ট বেশী। তাই কুলীন বিমানের সামান্য মানভঞ্জনেও খেসারত দিতে হয় অনেক বেশী। মধ্যবিত্ত ঘরে ধনীর দুলালীকে বধূরূপে এনে স্বামীটিকে বেচারা হতে হয়, শ্বশুরশাশুড়ীকে তাঁবেদারী করতে হয়, ঝি-চাকরদের তটস্থ থাকতে হয়। এক বৌ'এর চিন্তায় সবার মাথাব্যথা। কয়েক হাজার যাত্রী বোঝাই দশ পনেরখানা বগীর একখানা ট্রেণ চালাতে দু' চারজন লোক যথেষ্ট হ'লেও বিমানের বেলায় তা নয়। ধনীর দুলালীর মতন বিমানের তাঁবেদারী ও মানভঞ্জনে অসংখ্য লোকবল ও অখণ্ড সময়ের প্রয়োজন।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির এক সরকারী প্রতিনিধিদল মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলীর নেতৃত্বে ক্রেমলিনের আতিথ্য উপভোগ করলেন প্রায় এক পক্ষকাল। লেবার পার্টি ডেলিগেশন্ পরে এলেন পিকিঙ্। মাও সেতুঙ্-চৌএন্ লাই—মার্শাল চো-তুঙ্কে পাশে নিয়ে এট্লী-বিভান্ মরিসনরা অপেরার বিখ্যাত লোটাস্ ডান্স্ দেখলেন; ঘুরলেন সাংহাই, নান্কিঙ্। আরো কত জায়গা। নয়া চীনে লেবার পার্টি ডেলিগেশনের সফর উপলক্ষে পৃথিবীর প্রায় সব সংবাদ-পত্রই যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। কলকাতার পথে তাঁদের দেশ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। তাই কলকাতার সাংবাদিককুল চাতকের মতন লেবার পার্টি ডেলিগেশনের আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। নিকষ কুলীন বিমান প্রতিষ্ঠান বি-ও-এ-সি'র তুল্য কুলীন ও অভিমানী বিমান-পোতটি হংকংএর যান্ত্রিক গোলযোগের ছলে ধর্ম্মঘট ক'রে ব'সল। দমদমে যে সব সাংবাদিক হা হুতাশ ক'রে বসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু 'অধর্ম্মঘট' ক'রতে পারেন নি। অপরাহ্ণ থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাউৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করেছিলেন।

বসে বসে নানান কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ব্রিটিশ জাতটাই বিচিত্র। এশিয়া, আফ্রিকা বা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কলোনীতে কলোনীতে ইংরেজ এক-হাতে স্টেন্গান, আর একহাতে সেক্স্পিয়ার-জনসন্—জি-বি-এস নিয়ে শাসন ও শোষণ চালায়। নিজের দেশের পুণ্যতীর্থ কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডে শোষিত জনগণের মুক্তিমন্ত্রের বাণী প্রচার করে। পৃথিবীর নানান দেশের মুক্তিকামী গণ-দেবতার বিজয় অভিযান সাফল্যলাভ ক'রেছে সার্থক ইংরেজীশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের দৌলতে। ব্যারিষ্টার গান্ধী, হ্যারো'র নেহরু ও আই-সি-এস সুভাষ বোস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ অধ্যুষিত দেশের নেতারা ইংরেজ

রাজত্বের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতির সমর্থন কামনায় বিলাত সফর করেন। হাউড পার্কে এমনি কত জনসভা হয় ইংরেজ-শ্রোতা নিয়ে। শুধু তাই নয়, আন্দোলন চালাবার জন্ম কৃপণ ইংরেজ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য ক'রতে কার্পণ্য দেখাবে না। এক কথায় ইংরেজ হচ্ছে ব্রাহ্মণের জাত। তার রাগও আছে, ঔদার্য্যও আছে; শিক্ষাও আছে, সহানুভূতিও রয়েছে। ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা ক'রছে বেদ-উপনিষদের অনুশাসন। বিলাতে ইংরেজের রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করছে লেবার পার্টি। সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন লেবার পাটির ধুরন্ধর নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট দেশ ও চীন মুলুক ঘুরে এসে কি মন্তব্য করেন, তারই জন্ম আমরা রিপোর্টারের দল নোট্‌বই পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত।

মিঃ এটলী অসুস্থা স্ত্রী সন্দর্শনের জন্ম হংকং থেকে সিঙ্গাপুর গেলেন। দমদমে প্লেন থেকে প্রথম বেরিয়ে এলেন মিঃ অ্যাহুরিন্ বিভান। দুটি হাত প্যান্টের পকেটে গুঁজে হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দু' কদম এগিয়ে এলেন। সারা চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ। সমুদ্রের মত গভীরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দুইই বিভানের ভূষণ। এককালের দিন-মজুর ও নিকট ভবিষ্যতের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। মিঃ বিভান, মিঃ মরিসন ও দলের অন্যান্ত সদস্তরা ট্রানসিট্ লাউঞ্জে আসতেই আমরা তাঁদের ঘিরে ধরলাম। প্রায় সকলেই সমস্বরে উদ্দেশ্য জানালাম। ডেলিগেশনের সবাই ঘরের দরজা আটকে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। বিবেচ্য বিষয়, সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেওয়া হবে কি না। এক মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন সবাই। লেবার-পার্টি-সেক্রেটারী ডেলিগেশনের মুখপাত্র হয়ে সাংবাদিকদের কাছে কিছু বলতে না পারার জন্ম দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন; 'এনি থিং উই সে হিয়ার টুডে, ইট্ উইল্ ষ্ট্রাইক্ দি হেড লাইন্‌স্ অফ্ দি ব্রিটিশ প্রেস টুমরো। সো, প্লিজ্ এক্‌স্‌কিউজ।'

বিভান মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেই খালাস। একটি কথাও ব'ললেন না। তারপর ওঁরা সবাই হুইস্কির গেলাস নিয়ে আমাদের সাথে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। হংকং'এ প্লেনের যান্ত্রিক গোলাযোগের কথা, আকাশ থেকে রাতের দমদমের দৃশ্য, কলকাতার চেহারা, এমনি আরো কত নিস্প্রয়োজনীয় বিষয়। বিভান আমার কাছে জানতে চাইলেন, কলকাতার ঋতু পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। অতি দুঃখেও হেসে উঠলাম। নোট-বই পেন্‌সিল্‌কে বেকার করে যত আজে-বাজে বিষয়ের আলোচনা। বিভান আমার মনঃকষ্টের কারণ উপলব্ধি করলেন। কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন; 'কাম্ টু মাই হোম্ মাই বয়, আই উইল্ স্যাটিস্‌ফাই ইউ।'

বলা বাহুল্য, বিভান গৃহে আমার যাওয়া হয় নি। এককালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নবীন দলের কর্ণধার ছিলেন সুভাষ—নেহরু। আজকের দিনে ব্রিটিশ লেবার পাটির প্রবীণত্বে নবীনের ছোঁয়াচ দিয়ে রেখেছেন এ্যাহুরিন বিভান। দুরদর্শিতার অভাব আছে ব'লে অনেক সমালোচক বিভান-বিরোধী সমালোচনা ক'রে আত্মসন্তোষ লাভ করেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ব্যক্তিগত মাধুর্য্যে ও স্বকীয়তায় বিভান চিরস্মরণীয় হয়ে রইবেন। এদিকে আমাদের রামমনোহর লোহিয়া বিভানের সমগোত্রীয়। আজকে নয়, জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামশীল দিনগুলির ঐতিহাসিক ক্ষণে নবাযুবক রামমনোহরকে জাতীয় কংগ্রেসের সত্তসৃষ্ট পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ ক'রতে আহ্বান জানান হয়েছিল। জুলিয়াস সিজারের মতন তিনবার ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, পরে গ্রহণ করেন। লোহিয়াকে 'সেটিংষ্টার' ব'লে ধ'রে নেওয়া হলেও তাঁর স্বকীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা আজও নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়।

আর একদিন খর রৌদ্রের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে এয়ার পোর্টে এক বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রত্যাশা করছিলাম এক কূটনীতিবিদের শুভাগমন। আই-সি-এস রত্ন-গোষ্ঠীর এক উজ্জ্বল মণি হলেন রাজন নেহরু। আর, কে, নেহরু নামেই খ্যাতি। দূর থেকেই প্লেনের নামা-ওঠা দেখছিলাম। আমার প্রত্যাশিত বিমানটি পৌঁছতে তখনও সামান্য বিলম্ব। আশেপাশেই আরো কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ বা সত্ত-আগত, কেউ বা অভীপ্সিত ব্যক্তির প্রতীক্ষায় আমারই মত অপেক্ষমান। দৃষ্টিটা সুদূরপ্রসারী ছিল। এক বিমানের ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ঠিক পাশের ভদ্রলোককে বললেন; 'ইওর এক্‌সেলেন্‌সি, হিয়ার ইজ্ ইওর চাইনীজ্

ক্যাপ্।' 'ইওর এক্সেলেন্সি' শুন্তেই একটু চমক লাগল। লক্ষ্য করে দেখি, নেহরু সাহেব পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাঁর প্লেন পৌঁচেছে। ভুল করে প্লেনের মধ্যে নিজের চাইনীজ্ ক্যাপটি ফেলে এসেছিলেন, ক্যাপ্টেন তাই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিতেই হাসিমুখে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণভাবে করমর্দ্দন করলেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ নেহরু। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত-চীনের সম্পর্ক দিনে দিনে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন হচ্ছে, তাই পররাষ্ট্র দপ্তরের একটু অসুবিধা হলেও রাজন নেহরুকে পিকিঙে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করা হয়। নয়াদিল্লী থেকে পিকিঙ যাবার পথেই তাঁর কলকাতা আগমন। যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে জৌলুসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে বোধ করি জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাই নেহরু-ভ্রাতা প্রৌঢ়ত্বের বিদায় বেলায় সম্প্রতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন এক হাকসার নাতনীর সঙ্গে। কলকাতায় মাত্র কয়েকঘণ্টা রইবেন। এখানেও তাঁর এক নিকট-আত্মীয় আছেন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপি, এন হাকসারও শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার। রাজভবনের পরিবর্ত্তে হাকসার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রকে অগ্রাহ্য ক'রে দমদম্ এসেছি কিছু সংবাদ সংগ্রহের আশায়। মিঃ নেহরু নানান কথার জালে আমার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিলেন। তবে ভদ্রতার কার্পণ্য ক'রলেন না। গাড়ীতে লিফ্ট্ দিলেন। সিগারেট অফার করে নিজের হাতে লাইটার জেলে দিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে নানান কথা জানতে চাইলেন। স্বল্প বয়সে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানালেন। এস্প্ল্যানেডের মোড়ে নেমে গেলাম। গাড়ী থেকে নামার পূর্ব্বে অপরাহ্নে হাকসার গৃহে চায়ের মজলিশে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন। ব'ললেন: 'প্লিজ্ ডোণ্ট্ ফেল্, মাই ফ্রেণ্ড!'

হাক্সার্ গৃহের দ্বারদেশে যখন উপস্থিত হলাম, চারটে বাজতে তখনও মিনিট চারেক। একটু পায়চারী ক'রে মিনিট তিনেক কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। দরজা নক্ ক'রতেই একটি মেয়ে হাজির হলেন। নেহরু সাহেবের কথা বলতেই ড্রয়িংরুমে নিয়ে এক সোফায় বসিয়ে দিলেন। সুবিস্তীর্ণ ঘর। চরণযুগলের তলে মূল্যবান কার্পেট। তিনদিকে পাঁচটি সোফা। অপর একদিকে বেঁটেখাটো ভক্তাপোষের উপর রুচি ও আভিজাত্যসম্মত একটি সতরঞ্চি ও তাকিয়া। তার উপর হেমিংওয়ের কি যেন একখানা বই ও এ্যালান ব্লেয়ার অনূদিত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত 'ব্যারাব্বাস।' ঘরের চারদিকে মূল্যবান কয়েকখানা অয়েল ও ওয়াটার কলার পেণ্টিং। তার অন্যতমটি হ'ল যামিনী রায়ের অতি পরিচিত গণেশ চিত্রটি। নানান সেল্ফে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল্যবান রত্নাবলী। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সুভেনির। দু'এক মিনিটের মধ্যেই ভিতর ঘর থেকে ভারী পর্দ্দা সরিয়ে মিঃ নেহরু ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন। 'যাষ্ট্ ইন্ টাইম্! স্তাট্স্ লাইক্ এ ট্রু জার্নালিষ্ট!' আদর করে কি যেন একটা নাম ধরে ডাক দিলেন। পূর্ব্বতন মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাক্সার-নন্দিনী ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ নেহরু।

জোড়হাতে শ্রীমতী বলে উঠলেন: 'নমস্তে, ভাই সাব।'

সামাজিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য্য থাকলে হৃদয়-প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটে। এতদিন এই কথাই বিশ্বাস করে এসেছি। শ্রীমতীর মাতামহ ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্জু। পিতামহ ছিলেন কাশ্মীরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট এবং পরবর্ত্তীকালের কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী। পিতা ব্যবসা-বাণিজ্যে দুনিয়ার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। মাতাঠাকুরাণী সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করেছেন সমাজ-সেবিকারূপে। তাই প্রারম্ভিক পরিচয়ে এর কাছ থেকে এমন ভ্রাতৃ সম্বোধন প্রত্যাশা করিনি। নিজেকে একটু সাম্লে নিয়ে বল্লাম: 'নমস্তে, দিদিভাই।'

হাকসার দম্পতি গৃহে ছিলেন না। একমাত্র পুত্র ফরেন্ সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। অপর এক কন্যা নয়াদিল্লীতে মাতামহ সন্দর্শনে। অতিথি আপ্যায়নের ভার তাই 'দিদিভাই'এর উপরই ন্যস্ত হয়েছিল।

বাক্-চাতুর্য্যে রাজন নেহরুর খ্যাতি আছে নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী মহলে। অতিথি আপ্যায়নের আসর-বাসরে তাঁর উপস্থিতি সর্ব্বজনকাম্য, সর্ব্বজনধন্যও ঘটে। সৌভাগ্যের চূড়ায় চূড়ায় তাঁর নিত্য চলাফেরা।

তবুও মুখের হাসির অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনে দ্বিধা নেই বিন্দুমাত্রও। হাক্‌সার্‌-বিহীন হাকসার গৃহও তাই একটুও ম্লান লাগল না। ঘণ্টাধিককাল নেহরু-সঙ্গ উপভোগ করলাম সর্ব্বান্তঃকরণে।

মধ্যরাত্রির বিমানেই পিকিঙের পথে হংকং রওনা হবার স্থির ছিল মিঃ নেহরুর। দমদমের লাউঞ্জের এক-পাশে দেখলাম 'দি হাকসার' পরিবৃত নেহরুকে। কাছে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন মিঃ নেহরু। পরিচয় করিয়ে দিলেন হাকসার দম্পতির সাথে।

'রাজন ভাই ইজ প্রাউড টু প্রেজেন্ট হিজ ইয়ং প্রেস্‌-ফ্রেণ্ড্‌।'

হাসিমুখে আদর ক'রে পাশে বসালেন হাকসার-জায়া। এলাহাবাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা শুনে উল্লসিত হলেন। আমন্ত্রণ জানালেন পরদিন অপরাহ্ন-কালীন চায়ের আসরে। লজ্জা পেয়েছিলাম এমন অকস্মাৎ স্নেহস্পর্শে। কথা না ব'লে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের গুরুত্ব স্বীকার ক'রেছেন বীরযোদ্ধা নেপোলিয়ন, গণতন্ত্রের অমরসাধক এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। Lords Spiritual, Lords Temporal ও Commons-এর পরেই 'ফোর্থ এষ্টেট্‌' হিসাবে সংবাদপত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বার্ক। সাংবাদিকদের 'True kings and clergy' বলেছিলেন দার্শনিকপ্রবর কার্লাইল্‌। ভারতবর্ষে 'প্রফেশনাল্‌' পলিটিশিয়নরা কিছুটা প্রাণের টানে, কিছুটা স্বার্থের খাতিরে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সমাদর ক'রলেও, বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় ছিলেন সাংবাদিকরা দীর্ঘকাল। কৌলীন্য ও কৃতিত্ব প্রচারেই এ দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ব্যবহার ছিল সর্ব্বাধিক। সমাজের সঙ্গে পাড়ার মুদি বা বীমা-প্রতিষ্ঠানের দালালদের চাইতে সাংবাদিকদের যোগাযোগটা একটু বেশী ক্ষীণ। বিশেষতঃ সমাজের যে অংশ পেচক-বাহিতার আশীর্ব্বাদধন্য, তাদের সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাংবা-দিকদের কোন যোগসূত্র নেই বললেই চলে। হাকসার পরিবারের খ্যাতি উভয়তঃ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর যৌথ আশীর্ব্বাদপুত পরিবার এটি। সে জন্য হাকসার গৃহিণীর স্নেহ-প্রীতি স্পর্শ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মুগ্ধ হ'য়ে যে অন্যায় করি নি, তার প্রমাণ পেলাম পরদিন অপরাহ্নে। আদর আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ক'রলেন না। শুধু তাই নয়। স্বেচ্ছায় মাতৃত্বের অধিকার দান করলেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বল্‌লেন; 'তুমি আমাকে মা বল্‌বে, কেমন!'

কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম। প্রণাম ক'রে সেদিনের মতন বিদায় নিলাম। আই-সি-এস্‌ সন্দর্শনে এসে মাতৃলাভ। আই-সি-এস্‌ সান্নিধ্যে আর একটা সুখকর অভিজ্ঞতাও হয়েছিল।

আই-সি-এস্‌ তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানেরাও যে মানুষ, বা তাঁদের সুখ-দুঃখের অনুভূতিটা যে আমাদেরই মতন, এ কথা অসংখ্য খদ্দরধারী মাত্র সেদিন পর্য্যন্তও বিশ্বাস ক'রতেন না। এদের সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের একটা অদৃশ্য-আত্মীয়তা কল্পনা করতেন অনেকেই। আই-সি-এস্‌দের সম্পর্কে আমার এমন কোনো গোঁড়ামি কোনো কালেই ছিলনা, বোধকরি সম্ভবও নয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টা-রের দায়িত্ব পালন ক'রতে গিয়ে যে দু-চারজন আই-সি-এস এর সান্নিধ্যে এসে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়েছি, মিঃ বি-আর-সেন তাঁদের অন্যতম। দেশ স্বাধীন হবার পর যে ক'জন বঙ্গজ সন্তান তাঁদের প্রশস্ত ললাটে আই-সি-এস্‌ এর জয়তিলক ধারণ ক'রে জনচিত্ত ও অদৃষ্ট সোপানে সোপানে জয় করেছেন, বিনয়রঞ্জন তাদেরই একজন।

অগ্নিঝরা ১৯৪২ সাল! আগষ্ট মাসের বোম্বাই কংগ্রেসে মহাত্মাজী স্বয়ং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে চারদিক থেকে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি উঠেছিল। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কচ্ছ থেকে কামরূপ, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা বিস্তৃত ভারতবর্ষের দিকে দিকে সুরু হ'ল ইংরেজ-বিতাড়ন যজ্ঞ। ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। বাংলা দেশের মেদিনীপুরে স্বদেশী-রাজই গ'ড়ে উঠ্‌ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এন্‌, এম খান নিজের বাংলোয় শুধু পায়চারী ক'রে কাটিয়েছিলেন রাতের পর রাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন শেষ রাত্রিতে 'তেরঙা' আর 'বন্দেমাতরম্‌' এর দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় ক'রে উঠতেন। 'শয়তান'দের শায়েস্তা করবার নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছিলেন এই খাঁ সাহেব।

অক্টোবরে হ'ল এক মহা 'সাইক্লোন্‌'। সারা মেদিনী-পুরই প্রায় এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। মাঠের ধান,

ঘরের চাল উড়ে গেল। প'ড়ে রইল নারী-পুরুষ গরু-ছাগলের মৃতদেহ। প্রকৃতির খেয়ালে মেদিনীপুরবাসীদের এই নির্ম্মম নিগ্রহে চারিদিকে উঠেছিল কান্নার রোল। রোম-সম্রাট নীরোর মতন এন-এম-খান দেশবাসীর এমনি দুঃখের দিনে বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সারা দেশে হাহাকার রব উঠলেও, খাঁ সাহেবের হৃদয়ে তার বিন্দুমাত্র ঢেউ লাগেনি। তিনদিন বাদে বাংলা সরকারের হেড কোয়াটার্স রাইটার্স বিল্ডিংসে সে খবর ভেসেছিলেন। খবর পাঠিয়ে তলায় একটু ছোট্ট মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন খাঁ সাহেব। লিখেছিলেন: মেদিনীপুরের লোকজনকে জব্দ করার এই মহত্তম সুযোগ। সুতরাং সাইক্লোন্ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীদের কোনো সাহায্য না দেওয়াই একান্ত সমীচীন হবে।

তদানীন্তন লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলালের ঘরের দুলাল ছিলেন খাঁ সাহেব। এর গায়ের রং ছিল দুধে-আল্তায়। মাথায় ছিল না চুলের বালাই, চোখেও লজ্জার বালাই ছিল না। তাই তিনি একথা লিখেছিলেন।

বি-আর-সেন তখন বাংলা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারী; সাহায্য দপ্তরও তাঁরই অধীনে ছিল। তিনদিন বাদে সাইক্লোনের খবর পেয়ে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। খবরে শেষে খাঁ সাহেবের মন্তব্য দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। খাঁ সাহেবের যথেচ্ছাচারে অনেকেরই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছিল। বি-আর-সেনও অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছিলেন। এর ঔদাসীন্য বাংলা দেশের বহু নরনারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হ'য়েছিল। বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর প্রতি এমন নির্ম্মম ঔদাসীন্য বরদাস্ত করতে পারেন নি সেন সাহেব। 'বাজার' বাজিয়ে পার্সোনাল এ্যাসিস্‌টেণ্ট অমর মুখার্জীকে ডাক দিয়েছিলেন। ব'লেছিলেন: নোট্ ডাউন!…"Crown is above all. Crown can not differenciate between one citizen and another, specially in their distress'…আরো কত কি! সে তো কোনো আমলাতান্ত্রিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নোট নয়, অনাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনসেবকের বিজয় অভিযান। ফাইলের স্তূপ নিয়ে লীগ মন্ত্রীপুঙ্গবদের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরেননি মিঃ সেন, সরাসরি লাটসাহেবের বাড়ী হানা দিয়েছিলেন। লাটসাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুরে সাহায্য পাঠাবার আদেশ লিখিয়েই রাইটার্স বিল্ডিংস্ ফিরেছিলেন।

লীগ মন্ত্রিসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্গত মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল সরকারী সাহায্য।

সাহায্য দানের ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচালিত করবার জন্য সেন সাহেব মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরলেন। প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ নিত্যই পাঠাচ্ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে। লীগ-পুঙ্গবদের বলে বলীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট সে সব প্রায় উপেক্ষাই ক'রছিলেন। এন-এম-খানকে সাহায্য-কার্য্য ঠিক মতন পরিচালিত করতে বাধ্য করবার জন্য সেন সাহেব লাট সাহেবকে দিয়ে 'অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী'র এক পদসৃষ্টি ক'রলেন। নিজেই সে পদে হ'লেন বহাল; বাংলা দেশের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত অন্য কেউ অতিরিক্ত চীফ্ সেক্রেটারী হ'ন নি। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। এবার দিতে লাগলেন অর্ডারের পর অর্ডার। খাঁ সাহেব নিঃশব্দে পিতৃনাম স্মরণ ক'রে সেন সাহেবের অর্ডার পালন ক'রতে লাগলেন। ধুতি-পাঞ্জাবী না প'রে, চরকা না কেটে, বাংলা কথা না বলেও যে দেশের সেবা করা যায় এবং দেশবাসীকে ভালোবাসা যায়, বি-আর-সেন তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। বোধকরি সরকারী নথিপত্রে আজও এই সব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

সেন সাহেব বাহ্যিক আচরণে যতটা সাহেবীয়ানা দেখান, ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটাই তিনি বাঙ্গালী, ভারতবাসী। নিজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম উর্ম্মিলা রেখেও তা প্রমাণ করেছেন।

স্যার জন হার্ব্বার্ট—তখন বাংলা দেশের লাটসাহেব। দেহটা লম্বা-চওড়ায় বিরাট হ'লেও হৃৎপিণ্ডটা বোধকরি তত বড় ছিল না। তাই বি-আর-সেনের প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। মিঃ সেনও সে কথা জানতেন। লীগ মন্ত্রিসভা ও ইংরেজ লাটসাহেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দিল্লীর মসনদে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলেন বি-আর-সেন।

দেশটা দু'টুকরা হবার পর এন-এম-খানেরও অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলেছিল। অতীত জীবনে সৃষ্ট কঙ্কালস্তূপের উপর ব'সে খাঁ সাহেব পূর্ব্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারী হয়ে-

ছিলেন। পূর্ব্ব বাংলাকে রসাতলে দেবার জন্য ষোড়শোপচারে যাগ-যজ্ঞ ক'রেছিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত ও ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকাই নবাবী পদে নিয়োগ ক'রতে খাঁ সাহেব অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ব'লেও তাঁর সুনাম আছে। কবর খুঁড়ে জিন্নাই বোধহয় খাঁ সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথবা খাঁ সাহেবের প্রতি সুবিচার করবার জন্য জিন্না করাচীর কর্ত্তাদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ, খাঁ সাহেব প্যানচেটে জিন্নাকে টেনে এনে নিজের দরখাস্তের উপর 'strongly recommended' লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মিথ্যা কথা ব'ল্‌ব না, দয়ার্দ্রচিত্ত করাচীর মহাপ্রভুরাও খাঁ সাহেবের প্রতি অবিচার করেন নি, বরং একটু অতিরিক্ত সুবিচারই ক'রেছেন।

জওহরলালজী পাকা জহরী। বুঝতে পেরেছিলেন, বিনয়রঞ্জন একটি রক্তমুখী নীলা। সে জন্য তাঁকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেও কার্পণ্য করেন নি। ওয়াশিংটনে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ক'রেছিলেন। খাদ্যসঙ্কটের মহাদুর্দ্দিনে স্বদেশে টেনে এনে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার অর্পণ করেছিলেন। পরে আবার রাষ্ট্রদূতের গুরুদায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন রোমে, টোকিওতে। মিঃ সেন টোকিও থেকে আবার গিয়েছেন রোমে। তবে এবার আর রাষ্ট্রদূত হ'য়ে নয়; সারা বিশ্বের কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারীর নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদনের মহান ও পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে। ইউনাইটেড নেশনস্'এর অন্যতম প্রধান সংস্থা হ'চ্ছে—আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। প্রতিটি দেশের প্রতিটি নরনারীর অন্ন যোগাবার গুরুদায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। আমাদের সৌভাগ্য, বি-আর-সেন এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সর্ব্বময় প্রধান। ডাইরেক্টর জেনারেল। এশিয়াবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদ অলঙ্কৃত ক'রলেন। মাদাম বিজয়লক্ষ্মী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী হ'য়ে নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন। এফ-এ-ও'র ডাইরেক্টর জেনারেল হ'য়ে বি-আর-সেন ভারতবাসীর মর্য্যাদা আর একবার বিশ্ব-সভায় প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, একথাও সর্ব্বজনস্বীকৃত। এ ছাড়া বাঙ্গালীর কাছে আর একটা কথা স্মরণযোগ্য। বিদেশে যত বাঙ্গালী আছেন, বি-আর-সেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি।

রোম থেকে চ'লেছেন টোকিও। দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার এক আভিজাত্য পল্লীর ভ্রাতৃনিবাসে রইবেন ক'দিন। একটা টেলিফোন ক'রলাম। মহিলাকণ্ঠে শুনলাম—'ইয়েস্, ইয়েস্, আর ইউ এ রিপোর্টার?' আপনি একজন রিপোর্টার? চোস্ত ইংরেজি। আমি কিন্তু বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণ ক'রে নিতান্ত শুদ্ধ বাংলায়ই ব'ল্‌লাম: হ্যাঁ, আমি একজন রিপোর্টার।

—যাষ্ট্ এ মিনিট, প্লিজ্ হোল্ড-অন্—একটু ধরুন।

অনুমান ক'রলাম রাষ্ট্রদূত-কন্যা বা তদীয় ভ্রাতৃনন্দিনী আবার রাষ্ট্রদূত সেন সাহেবের অনুমতি নিতে গেলেন। একটা মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এলেন।

—ক্যান্ ইউ কাম্ রাইট নাউ? এক্ষুণি আসতে পারেন?

—নিশ্চয়ই।

—মাইণ্ড্ ভ্যাট। সাতটার সময় একটা পার্টি আছে, প্লিজ রিমেমবার!

কালক্ষেপ না ক'রেই রওনা হ'লাম। সেন কুঠীতে যখন হাজির হলাম, তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু। শীতকাল। পাম গাছের চূড়ায় চূড়ায় বিদায়ী সূর্য্যরশ্মির শেষ আভা। দরজার সামনে ছোট্ট একটি মোটর। আকারে ছোট হ'লেও অগৌরবের নয়; গৌরবময় ডিপ্লোমাটিকে নাম্বার প্লেটের তিলক তার ললাটে। বাইরে থেকে বাটাম প্রেস করলাম, অভ্যাগতের আগমনবার্ত্তার সঙ্কেত বাজ্‌ল ভিতরে। একটি 'তন্বী শ্যামা অধরা বসনা' দরজা খুললেন। শ্যাম্পু করা স্ফীতকায় ও খর্ব্বাকৃতি কুন্তলরাশি তার সারা মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত। সযত্নে দুটি আঙুলের সাহায্যে অবাধ্য কুন্তলরাশিকে একটু মৃদু ভৎর্সনা করলেন। টানা টানা চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে প্রসারিত করতেই, আমি মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই জানালাম। ঝড়ের বেগে বাঁক ফিরে ঘরে ঢুকতে যেয়ে হঠাৎ পিছন ফিরলেন।

—আপনার নাম?

আমি শুধু হিন্দুই নই, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পিতৃপুরুষ যজন যাজন করতেন। বন্ধুমহলে এখনও চাল-কলার সাথে অকারণ আমার নাম একত্রে উচ্চারিত হয়। পূর্ব্ব পুরুষকে যজন-যাজন করতে আমি দেখিনি। তবে তার প্রমাণ সংসারের সর্ব্বত্র পেয়েছি। আমার নামকরণেও তার

প্রমাণ আছে। যখন আমার জন্ম হ'য়েছে, অথচ আমার মনের জন্ম হয় নি, বিবেচনা শক্তির উদ্বোধন হয় নি—তখন পিতৃব্যগণ আমার সারা জীবনের পরিচয় পত্রে একটি দেবতার নাম—লিখে দিয়েছিলেন। কণ্ঠস্বরে জড়তা আসলেও, সে নামটি জানালাম। নাম শুনে মেয়েটি হেসেই আটখান।

নক্সা করা মাইশোর সিল্কের শাড়ীর প্রলম্বিত আঁচল উড়িয়ে এসে ভিতরে ডাক দিলেন। আমি ভিতরে গেলে মিঃ সেন এক্ষুণি উপর থেকে নীচে আসছেন জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী পাশের ঘরের মজলিশে যোগ দিলেন।

মিঃ সেন ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। একটা ঘর পেরিয়ে পাশের এক বারান্দায় আমরা বসলাম। সামনে লন। আশে পাশে পেরুভিয়ান লিলি, ক্রিসানথিমাম্ আরো কি কি যেন ফুলের বর্ণাঢ্য সম্ভার—কথায় কথায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানান খবর জানালেন। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা ব'ললাম। তিনিও তাই। অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা হ'ল। ' সাতটার পার্টির সময় উতরে গেল। কাজের কথার ফাঁকে ফাঁকে গুটিকতক ব্যক্তিগত প্রশ্নও জানাতে চাইলেন। সানন্দে আমিও জানাই। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর দরদী মনের স্পর্শ পেয়ে তৃপ্তি পাই। বিদায় নেবার জন্ত দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, নমস্কার জানিয়ে বাইরের দিকে এক পা বাড়িয়েছি, এমন সময় মিঃ সেন হঠাৎ আমার হাতটাকে চেপে ধরলেন। ব'ললেন: 'শরীরটা ভালো কর। হেল্থ ইজ্ ইয়োর বেষ্ট ফ্রেণ্ড্। তা ছাড়া—হোয়াই নট এনি ওয়ার্ম ক্লোদিং-গরম জামা-কাপড় কিছু গায়ে নেই কেন?'

আমাদের দু'জনকে ঘিরে বাড়ীর কয়েক জন নারী-পুরুষের জমায়েত। তার মধ্যে 'তিনিও' আছেন। সলজ্জভাবে জানালাম, স্বাস্থ্য আর ভালো ক'রব কেমন ক'রে বলুন। আর গরম জামা কাপড় আমার বিশেষ নেই।'

'—বাট্ ইউ মাষ্ট হ্যাভ্ সামথিং: ইউ মাষ্ট প্রটেক্ট ইওর বডি এগেন্‌ষ্ট কোল্ড—'

—সে তো নিশ্চয়ই।

আমার পিঠে দুটি চাপড় মারলেন। ব'ললেন: সি মি এগেন।

হাত এগিয়ে দিলেন, হ্যাণ্ড্ সেক করলেন—অভিভূত মনে ফিরে এলাম।

ইণ্টারভিউ-এর খবরটি টেলিপ্রিণ্টার-এ সব কাগজের অফিসে ছড়িয়ে পড়েছিল। যথারীতি ছাপাও হ'য়েছিল। আমিও ক'দিন পর আবার গিয়েছিলাম। এবার আর একতলার বারান্দায় নয়। দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। অভিজাত জাপানী পরিবারের ঘরের মত এ ঘরের গৃহসজ্জা। বেয়ারা চা দিল, খাবার দিল, মিঠাই দিল। মিঃ সেনও নিলেন। একটু দূরে পরিবারের আরো ক'জন অপরাহ্ন-কালীন চায়ের টেবিলে। সঙ্কোচে একটি দু'টি খাবার খেলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। অতিথি সৎকারক তাতেও সন্তুষ্ট নন'। ফরম্যালিটিতে আস্থা নেই মিঃ সেনের।

—গো অন্ মাই বয়, লজ্জা কি?

তারপর কতবার গিয়েছি দেখা ক'রতে। কত কথা বলেছি, কত গল্পকাহিনী শুনেছি। জাপান বা রোম থেকে কলকাতা এলেই দেখা হ'য়েছে। সঙ্কোচে দু' একবার প্রয়োজনের সহযোগিতা বা পরামর্শ কামনা ক'রেছি। ব্যর্থ হইনি।

পারিবারিক জীবনেও দেখেছি কত না আনন্দ ক'রতে। ফটো তোলা মিঃ সেনের 'হবি'। রীলের পর রীল নাতনীর ছবি তোলেন। নাতনীকে কোলে নিয়ে প্রজেক্টারে ফেলে সেই ছবি দেখে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। মনে হয়েছে, এই হাসিরই কাঙাল উনি। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলাই ওঁর জীবনের সাধনা। আর এই কথা ভেবে ভেবে আমিও কতই না তৃপ্তি পেয়েছি, পেয়েছি ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা!

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

রাতের প্রহরী

ফটো : সুনীল ঘোষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কুতবের স্বপ্ন ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
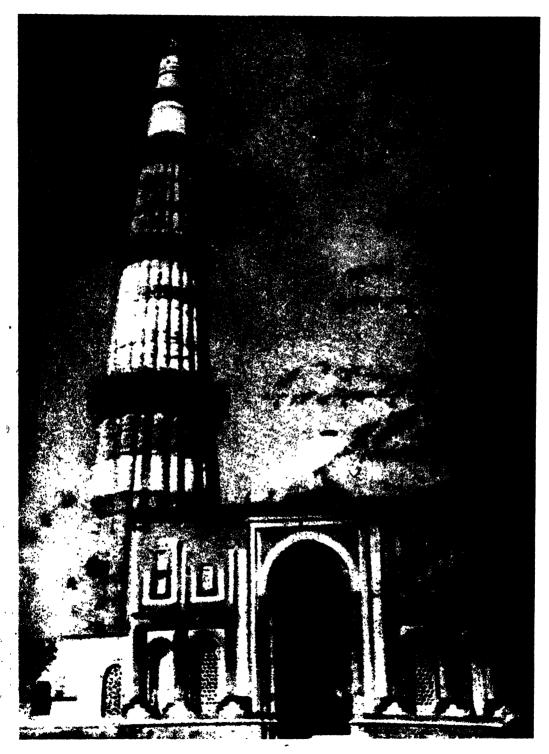
ফাগুন দিনের কথা

উপানন্দ

ফাল্গুন মাস। আবার এসেছে বসন্ত। গন্ধ বিধুর সমীরণে জেগে উঠেছে প্রান্তর বন। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উদ্ভিদ শিশু। হোলি উৎসব সমারোহে আবর্ত্তিত হচ্ছে অন্তরের আনন্দ। মনে আর বনে চলেছে নানা রঙের খেলা। কবিগুরু বলেছেন—'আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো, আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো, এই সংগীত মুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।' আজ যে ফুলটি ফুটে উঠ্‌ছে তার অমর জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চিত ছিল, তার অণুতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার জীবনোচ্ছ্বাস। রঙে বাউল সেজে কবি প্রাকৃতিক শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিভোর হয়ে বলে উঠ্‌লেন—'মন-রাখা ওগো মনের রাখাল! এসু কি তোমারি দেশে? চান্দা নদীর কিনারে কিনারে ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে?'

প্রকৃতির রাজ্যে নূতন চেতনা হয়েছে সঞ্চারিত। চূত-মুকুলের সৌরভে ছুটে আস্‌ছে অলিদল—বিহঙ্গের বিচিত্র কলকাকলী, কোকিলের কুহুধ্বনি,নদীর কল্লোল বাঙ্গালীর ভাবজীবনের পটভূমিকায় এনেছে প্রাণের কেদার বাহিনী ধারা—পুষ্পপত্রের নবীনতায় যে অপূর্ব্ব রূপ প্রত্যক্ষ হচ্ছে তা'তে আমাদের নয়ন মন বিমুগ্ধ—বিভিন্নরূপের বিচিত্র পরিবেশ মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন দিনেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হ'য়েছিল চারিশত একাত্তর বছর আগে। তিনি ভগবানের অবতার। দৈব বলে বলীয়ান্ ক্ষণজন্মা বালক চৈতন্য পঠদ্দশায় যা একবার শুনতেন, তা আর ভুলতেন না। ছেলেবেলাতেই তিনি একজন মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন। আপনার অলৌকিক প্রতিভাগুণে চৈতন্যদেব সাহিত্য, কাব্য, শ্রুতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁর করুণার ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে অসাধারণ ভাগবত ও সারস্বত শক্তিলাভ করেছিলেন। ছেলে বেলা থেকেই তিনি সর্ব্বজীবের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন—আর যথাসাধ্য গরিব দুঃখী প্রতিপালন, সাধু সন্ন্যাসী ফকির ও উদাসীকে সেবা করেছিলেন, অতিথিসৎকারেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। চৈতন্য দেবের দুই বিবাহ। কথিত আছে, তাঁর ধর্ম্মপরায়ণা প্রথমা পত্নী লক্ষ্মী দেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে। যতদিন তিনি গৃহী ছিলেন ততদিন সংসার থেকেও আসক্তিশূন্য বৈরাগী ছিলেন। গয়াক্ষেত্রে ঈশ্বরপুরী নামক একজন ব্রহ্মচারীর কাছে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন, তদবধি তাঁর হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় কেবল হরিধ্বনি, হরিজ্ঞান, রাধাকৃষ্ণের ভজনই ছিল তাঁর প্রধান কর্ম্ম। নবদ্বীপে ফিরে এসে আর সংসারে তিনি মনোনিবেশ করতে পারতেন না, কোন কাজ কর্ম্মও তাঁর ভালো লাগ্‌তো না।

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সভ্যতাও সংস্কৃতি তাঁর দাক্ষিণ্যে সমগ্রভারতের আদর্শস্থল হয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পকলা সমস্তই তাঁর আবির্ভাবে উন্নত স্তরে উঠেছিল। ধর্ম্মজগতে তিনি নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন, বাঙ্গালীর কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীতের ওপর তিনি নূতন আলোক সম্পাত করে গেছেন—তাঁরই আনুকূল্যে আমাদের সমাজবোধ হয়েছে, গণচেতনা সঞ্চারিত হয়েছে. আর সঙ্ঘ-উপাসনা করার পদ্ধতি পাওয়া গেছে। পতিতপাবন ভগবানই যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নানাভাবে এই সত্য উপলব্ধি হয়েছে। ন্যূনাধিক পঁচিশবর্ষ বয়সে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন, সেই থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত হ'ন। আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব হয়। তিনি হিন্দুজাতির সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করে গেছেন। হরিজনদের তিনি পরিজন করে নিয়েছিলেন।

তিনি যে ভগবান স্বয়ং, একথা শুধু অবধূত নিত্যানন্দই জানতে পারেননি, উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী রায় রামানন্দও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যাঁর নামে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠ্‌তো সেই উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তাঁর শরণ নিয়ে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হয়েছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে হাজার বছর

আগে উল্লিখিত হয়েছে। এই ফাল্গুনে গৌর পূর্ণিমায় তাঁর উদ্দেশ্যে তোমরা প্রণতি-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর মহাজীবন অনুধ্যান করবে। তাঁরই লীলা-সহচর অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে এ যুগে শ্রীশ্রীমৎ রামদাস বাবাজীরূপে এই ফাল্গুনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য রামদাস বাবাজী নামকীর্ত্তনের মাধ্যমে জাতির অন্তরে ভাগবতশক্তি সঞ্চারিত করে গেছেন। এস, আমরা তাঁরও উদ্দেশ্যে আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।

যুগাবতার ভগবান পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষুদিরাম ও তাঁর পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান ছিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে। একবার সেখানকার জমিদার এক দরিদ্র প্রজার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করে ক্ষুদিরামকে তাঁর পক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। জমিদার জানতেন, ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের এমনই গভীর শ্রদ্ধা যে, তিনি মুখ দিয়ে যা বলবেন, তাই সকলে বিশ্বাস করবে। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ক্ষুদিরাম দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করলেন। জমিদার নিরস্ত না হয়ে তাঁকে স্বার্থের প্রলোভন দেখালেন, অবশেষে ভীতি প্রদর্শনও করলেন; তেজস্বী ব্রাহ্মণ এতেও ধর্ম্মপথ ত্যাগ করলেন না। পরিণামে এই হোলো যে, দুর্দ্দান্ত জমিদারের কোপে পৈতৃক বাস্তুভিটা, প্রায় দেড়শত বিঘা ভূমি ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়ে ক্ষুদিরামকে সপরিবারে পথে এসে দাঁড়াতে হোলো—নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন অবস্থায়। তবুও সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন না। ভগবান সহায় হোলেন, কামারপুকুরনিবাসী জনৈক বন্ধু ক্ষুদিরামের এইরূপ বিপদে বিচলিত হয়ে তাঁকে ভূমি ও অর্থদানে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এইরকম আদর্শ পরিবারেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর মাও আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম গদাধর।

গয়াধামে ক্ষুদিরামের অবস্থানকালে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন,—শঙ্খচক্র-গদা পদ্মধারী নারায়ণ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বলেছিলেন—'আমি পুত্ররূপে তোমার ঘরে যাবো।'

রামকৃষ্ণ দেখতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। ছেলে-বেলা থেকেই—তাঁর ঠাকুর দেবতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। তিনি নিজের হাতে মাটির ঠাকুর গড়িয়ে পূজা করতেন এবং সময়ে সময়ে ভাবে অচেতন হয়ে পড়তেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁর জ্যেষ্ঠের স্কন্ধের ওপর পড়লো। মেধাবী রামকুমার যৌবনের প্রারম্ভেই ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হোলেন, তাঁর উপার্জ্জন সংসারের অভাব অনেকাংশে মোচন করলো। এই রামকুমার দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর প্রথম পূজক হ'য়েছিলেন। প্রভু গদাধর এখানে বেশকারূপে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

তাঁকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণেশ্বর তপোভূমিতে নবযুগ অভ্যুদয়ের 'জাগৃহি' মন্ত্র উষার আলোকে উদীরিত হয়েছিল—তারই বার্ত্তাবহ হয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে আগত প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে সত্যানুভূতির বাণী শুনিয়ে গেছেন। পরমপুরুষ পরমহংসদেব সর্ব্বধর্ম্মের সাধনা করে বলে গেছেন—'যত মত তত পথ।' দক্ষিণেশ্বরকে তিনি করে গেছেন চিরতীর্থ, বিশ্বমানবের মিলন মন্দির। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা বহু মত ও বহু পথ সকল দ্বন্দ্ব দ্বেষ বিভেদ ভুলে এই তীর্থে এসে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলনের মহাভাবসমুদ্র ঠাকুর স্বয়ং।

তিনি বলেছেন—'ভগবান লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।' মত—পথ, সকল ধর্ম্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। নদী সব নানাদিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।' ...তিনি জগজ্জননী মহাশক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে দেখিয়ে গেছেন। ভগবানকে যে প্রত্যক্ষ করা যায় একথা তিনিই আমাদের কাছে প্রথম শুনিয়ে গেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঝাড়ুদারকে পর্য্যন্ত ভগবৎ দর্শন করিয়েছেন এমনই ছিল তাঁর অসাধারণশক্তি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট গভীর নিশীথে তিনি মর্ত্ত্যকায়া ত্যাগ করেন। তাঁর জন্মোৎসবে তোমরা সকলে মিলিত হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করো। তাঁর পূজায় আত্মসমাহিত হও।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

(ধর্ম্মঘট)

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এখানকার একটি বড় প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মঘট নিয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছিল।

গড়গড়ায় শেষ টান দিয়ে গড়গড়া গাঙ্গুলী-মশায় বললেন:

তাঁর বক্তব্য শোনবার পূর্বে তাঁকেই আগে জানা প্রয়োজন। পিতৃদত্ত নাম তাঁর একটা নিশ্চয়ই ছিল এবং এখনও আছে একথা ঠিক, তবে সে নাম লোকে বেমালুম ভুলে গেছে। আজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঐ গড়গড়া গাঙ্গুলী নামেই জানে, এ নামটি কে বা কারা প্রথমে রেখেছিল সেটা ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। তবে তাঁর অত্যধিক গড়গড়া-প্রিয়তাই যে এ নামের আদি উৎস, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ভীষণ তামাকপ্রিয়। যেখানেই তিনি যাবেন, নলহীন একটি [illegible] গড়গড়া তাঁর

বাঁহাতে থাকবেই। গড়গড়াহীন গাঙ্গুলী মশায়কে কল্পনা করা যায় না, তা কলকেতে আগুন থাকুক, চাই নাই থাকুক। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবচেয়ে বড়কথা তিনি সর্বজ্ঞ, অন্তত নিজেকে তাই তিনি মনে করেন। আধুনিক পৌরাণিক যে কোন আলোচনা করো না কেন, তিনি ঠিক তাতে ফোঁড়ন দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার (?) ঝুলি থেকে কিছু না কিছু শোনাবেনই। বাধা দিতে গেলে প্রচণ্ড রেগে যাবেন। কথা বলেন খই ফোটার মত অতি দ্রুত লয়ে। কণ্ঠ থেকে সাতটা পর্দাই সমস্বরে বাজে—এক কথায় স্বরভঙ্গ।

এ হেন গাঙ্গুলী মশায় বললেন :

—তবে শোন্ আমাদের সময়কার এক ধর্মঘটের কাহিনী। অবশ্য আজকের সংজ্ঞায় তাকে যদি আদৌ ধর্মবটরূপে অভিহিত করা যায়। কেননা তাতে কোন ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল ছিলনা, হয়নি কোন মিটিং মনুমেণ্টের তলায়, কিংবা কোন ফেষ্টুন বা আবেদন নিবেদনের কোন কোন পোষ্টারও দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েনি।

'ধর্মঘটি' বলতে ছিল মাত্র দুটি প্রাণী।

আমার পিশেমশাই ছিলেন মেজর। প্রথম মহাযুদ্ধে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করে মেসোপটামিয়া প্রভৃতি স্থান ঘুরে অবশেষে অক্ষত শরীরে ফিরে এলেন দেশে। তারপর পুরুলিয়ায় একটি বাংলো কিনে সেখানেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করলেন। বয়েস তখন তাঁর অনেক, প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে—বাড়ীর বাগানে ফুল ও ফলের, গাছও আগাছার বিচিত্র সব চাষ করে দিন কাটাতেন।

বাড়ীতে ছিল মাত্র চারটি প্রাণী।

পিশিমা, পিশেমশায়। আর রান্না ও বাসন মাজার জন্যে পিসিমার পেয়ারের ঝি খেন্তিদাসী। আর বাগানের মালী + চাকর + দরোয়ান + ঘোড়ার গাড়ির চালক ও সহীসরূপী প্রৌঢ় রামদাস কুর্মী। এই রামদাস যুদ্ধের সময় পিশেমশায়ের ব্যক্তিগত সেপাই বা আরদালী ছিল। সৈন্য বিভাগ ছাড়বার পর পিশেমশায় ওকে এনে নিজের কাজে বহাল করেছেন। পিশেমশায়ের উদ্ভট উদ্ভট সব পাগলামী ও কার্য্যকলাপের ও ছিল্ নিত্য সঙ্গী ও নিত্যসহচর। সর্বোপরি ছিল কুকুরের চেয়েও বেশী প্রভুভক্ত।

সোজা কথায় বাড়ীতে দুটি দল বিরাজিত ছিল।

পিসিমা ও তাঁর খেন্তিদাসী এবং পিশেমশায় ও তাঁর রামদাস।

মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়তো পুরুলিয়ায়। কয়েক-দিন সেখানে থেকে পিসিমার আদর যত্ন, আর পিশেমশায়ের পাগলামি অসহ্য হবার দাখিল হলেই কেটে পড়তাম।

একবার গেছি। সেবারেই ঘটনা। বেশ কাট্‌ছিল দিন গুলো। সহসা একদিন কথা নয় বার্তা নয়, দুম্ করে দুজনেই নোটিশ দিয়ে বসলো।

প্রথমে এলো খেন্তিদাসী।

সকালে ডিমের আধ ডজন করে পোচ্ এবং মাখন রুটি আর কয়েকটা সিঙ্গাপুরী কলা দিয়ে চা সহযোগে আমরা প্রাতরাশ সারছি, পিসিমা পাশে বসে তদারকি করছেন, এমন সময় ধীরপদক্ষেপে সেখানে খেন্তিদাসীর আগমন হল। সজল চক্ষে সে এগিয়ে এল। খেন্তিদাসীর অবশ্য সর্বদাই চোখ সজল থাকতো। চোখে কি একটা রোগ যেন ছিল। এসে শাড়ির আঁচলটা নাকে লাগিয়ে অকারণে ফ্যাচ' করে নাক ঝাড়তেই পত্রিকা পাঠরত পিশে মশাই চমকে চাইলেন, তারপর বিরক্তিতে তাঁর পাকা ভ্রুযুগল কুঁচকে এলো, সর্দি-বসাকণ্ঠে খিচিয়ে উঠলেন তিনি, —যতসব নোংরা স্ত্রীলোকের কাণ্ডে বাড়ীতে টেকা যাবে না দেখছি।

অবশ্য স্বগতভাবেই বললেন কথাটা। স্বগতভাবে বললেন এই জন্যে যে—পিসিমার কানে যদি ঐলাইনটি যেত তাহলে তুল কালাম কিছু একটা হবার আশঙ্কা ছিল। পিসিমাকে পিশেমশায় একটু সমীহ করেই চলতেন। তাঁর পেয়ারের ঝি সম্বন্ধে তিনি কোন কটূক্তি বরদাস্ত করতে কখনোই রাজী ছিলেন না।

পুরো এক মিনিট, বিনাকাজে, নাক চাপা দেওয়া অবস্থায় খেন্তিদাসীকে দণ্ডায়মান দেখে অবশেষে পিসিমাই কোমল কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কিছু বলবি খেন্তু ?

খেন্তিদাসী যে কণ্ঠে এর প্রত্যুত্তরে বললে, আমায় বিদায় দিন মা। আমি আজই আমার দেশে চলে যাব। আমার—

ওরকম কাঁপানো রুদ্ধ কণ্ঠ সিনেমা থিয়েটারের করুণ দৃশ্যেই শোনা যায়।

পিসিমা ওর কথা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, বলিস

কি খেন্তু। এই তো গত মাসে তিনদিন ছুটি নিয়েছিস। তা ছাড়া কাল চোত সংক্রান্তি, ঘরদোর ঝাড় পোঁছ করতে হবে। এসময় তুই গেলে চলবে কি করে ?

খেন্তিদাসী তেমনি করুণ 'পোজ'এ ও তেমনি করুণ কাঁপানো কণ্ঠে বললে, আমি যাবই মা। আপনারা জানেন আমার মত 'সহ্যিমানী' মনিষ্যি পিরথীমিতে কমই পাবেন। কিন্তুক মা সে 'সহ্যির ও একটা সীমে আছে জেনে রাখবেন।

পিসিমা কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। মুখভাবটা অনেকটা করে রইলেন 'তুমি যা বলেছ তা যথার্থ। সহ্যের নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে'—গোছের।

—কিন্তু, খেন্তিদাসী বলে চলে, সে সহ্যির সীমা ও লোকটা ছাড়িয়ে গেছে মা।

এবার পিসিমা নড়ে-চড়ে বসলেন, বললেন, দোহাই তোর খেন্তু, খুলে বল্। আমি তো কিছুই মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছিনে। কে লোকটা কোন্ লোকটা—কার কথা বলছিস।

—ঐ লোকটা আমায় যাচ্ছেতাই বলে অপমান করেছে। খেন্তি দাসী তেমনি রহস্যময় রেখেই কথাটা চলে চলে।

পিসেমশায় পত্রিকা পাঠে মগ্ন থাকলেও দু'একবার বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূ উঁচিয়ে চাওয়াতে পিসিমা উঠে খেন্তিকে নিয়ে বারান্দায় গেলেন।

আমি দরজার পাশে বসেছিলাম, তাই ওদের কথাবার্ত্তা যা কানে এল তা বলছি।

খেন্তিদাসী এবার রহস্য উদ্ঘাটন করলে, বললে, আপনাদের মেনিমুখো, রামদাস্ আমায় অপমান করেছে।

—রামদাস, পিসিমার বিস্মিতকণ্ঠ শুনলাম, কারণটা কি ? থামোকা সে তোকে অপমানইবা করতে গেল কেন ? খুলে বল্ খেন্তি, আর আমায় জ্বালাস্ নে।

—সে আমি বলতে পারবো না মা, খেন্তিদাসী রুদ্ধ-কণ্ঠে বললে, ওর মত বজ্জাত লোক যে বাড়ীতে থাকে তার চৌহদ্দির মধ্যে খেন্তিদাসী থাকবে না। দয়া করে আমায় বিদায় দিন। আমি আর কাজ করব নি। আমার যা পাওনা তা মিটিয়ে দিন।

—কি গেরোয় পড়লাম বল দিকি। পোড়ারমুখী খুলে বল্ কি হয়েছে।

তদুত্তরে খেন্তিদাসী কি বললে শুনতে পেলাম না, সেই মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড শব্দ করে কেসে উঠলেন পিশেমশায়। তারপর কাশির দমক কমলে আমাকে বললেন, বৎস, চল একবার বাগানটা দেখে আসি। ঢেঁড়স গাছগুলো কি রকম হল দেখা যাক। ওহো—আজ তো গ্যাঁদাল চারা লাগাবার কথা ছিল। আগে গিয়ে তুমি দেখ তো রেমো ব্যাটা কি করছে। তাকে বাগানে যেতে বল। আমি কাগজে শেয়ারের দরগুলো দেখেই যাচ্ছি।

উঠে গেলাম। বাগান পেরিয়ে বাড়ীর উত্তর সীমান্তে একটা টালির ঘরে রামদাসের কোয়ার্টার।

গিয়ে দেখি সে দরজার দিকে পেছন ফিরে একটা চটের থলে দিয়ে কি একটা বস্তুকে বাঁধতে ব্যস্ত। পাশে পড়ে রয়েছে রং-চটা তোবড়ানো, কিম্ভুত কিমাকার এক সুটকেস। তার পাশে পেতলের কানা উঁচু ছাতু মাখবার থালা, একটা খালি ছিলিমের কলকে ও ত্রিভঙ্গ এক গড়গড়া।

বললাম, রামদাস, পিশেমশায় তোমায় বাগানে যেতে বলেছেন, তিনি এক্ষুণি আসছেন।

না দিল কথার উত্তর, না চাইল মুখ ফিরে, তেমনি-ভাবেই সে বস্তা বাঁধতে ব্যস্ত রইল। একটা জিনিষ দেখে অবাক হলাম। সেটা ওর রাজবেশ। পোষাকী পোষাক পরণে ওর। চিরকাল দেখে এসেছি হ্যাফপ্যাণ্ট, আর নীলচে গেঞ্জি পরতে। আজ দেখলাম একটা হলহলে প্যাণ্ট পরণে (পিশেমশায়ের যৌবনে পরিত্যক্ত), খাকী বুশ সার্ট (তাও বোধ করি মেসোপটামিয়ায় পিশেমশায়ের ছোট হয়ে যাওয়া মিলিটারী কুর্ত্তা), মাথায় বিরাট এক পাগড়ি (পিসিমার পরিত্যক্ত বহুদিনকার রঙিণ শান্তিপুরী শাড়ির ছিন্নাবশেষ), কাঁধে যথারীতি তেলচিটে এক গামছা, পায়ে কাদা মাথা তালি দেওয়া বুট (বোধ করি লড়াইএর সময়কার)। এ যে অপরূপ দরবারি পোষাক। ব্যাপার-খানা কী ?

এমন সময় বাঁধা-ছাদা শেষ হল এবং ফিরে তাকালো।

এবং তখনই দেখলাম—দেখলাম আর বুঝলাম বিরাট পাগড়ি কেন বাঁধা হয়েছে। ডান চোখের ওপরটির যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে তুলনা দিতে গেলে বলতে হয় ঠিক যেন একটি কয়েৎ বেলের সাইজের কালো জাম

যেন উঁচু হয়ে উঠেছে। সমস্ত চোখটি ফুলে-ফেঁপে ঢাকা পড়ে গেছে। নাকটা যেন চ্যাপ্টা মেরে গেছে। কাল-শিরে ও আঘাতের চিহ্নে মুখের ডান দিকটা লোমহর্ষক।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছিনা, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং পিশেমশায়। এসে বাইফোকাল চশমা ও ভুরুর ফাঁক দিয়ে প্রথমে নিরীক্ষণ করলেন রাম-দাসের পোষাক—তারপর চাইলেন স্যুটকেস, থালা, গড়গড়া ও রাস্তার দিকে—পুনরায় পোষাকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাণী ছাড়লেন—কি ব্যাপার হে হাবিলদার রামদাস (ওকে তিনি ক্রুদ্ধ হলে মিলিটারী পদবীতেই সম্বোধন করেন), পোষাকটি দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন বিদেশ বিভুঁয়ে যাচ্ছ ?

তারপর বুঝি সহসা দৃষ্টি পড়লো রামদাসের চোখের দিকে।

—এ্যা—ওকি—ওকি করেছ চোখের। হাবিলদার রামদাস, মারপিট করেছ নাকি ?

—না হুজুর। আমি মারিনি, আমায় মেরেছে।

—মেরেছে! তোমায় ? পিশেমশায়ের ক্ষীণ চেহারা যেন ত্রিং করে খাড়া হয়ে উঠলো—কে ? কোন্ ব্যাটার এত সাহস যে আমার অর্ডারলির ওপর হামলা চালিয়েছে। বল, বল—

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভগ্ন কণ্ঠে রামদাস বললে, হুজুর, আমি আর এক মিনিট এখানে থাকবো না। আমার তলবটা আজই মিটিয়ে দিন মেহেরবাণী করে।

—ননসেন্স! পিশেমশায়ের পাকা ভ্রূ ক্রোধে কেঁপে গেল; পালাবে, পেছু হটবে, সাকসেসফুল রিট্রিট আমি জীবিত থাকতে হবে না। আসল কথা খুলে বল হাবিলদার রামদাস। কে মেরেছে জানাও। তারপর আমি দেখবো সে ব্যাটার ধড়ে কটা মাথা—শুধু নামটা বল।

—ব্যাটা নয়, হুজুর, বেটি।

—বেটি, পিশেমশায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন, কে বেটি ?

—যদি বলতেই হয় মেজরসাব তাহলে শুনুন, ঐ ডাইনীটা যে বাড়ীতে থাকবে তার শ' মাইলের মধ্যে হামি রামদাস থাকবো না—একদিন ভি নেহি, এক রাতভি নেহি)

—আরে আহাম্মক ডাইনীটা কে ?

—ঐ খেস্তিদাসী হুজুর!

—খেস্তি!! প্রথমে বিরক্তিতে পিশেমশায়ের মুখ যেন নিম্‌বেগুন ভাজার মত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ক্রোধে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো তাঁর। গোঁফটা পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল, খে—খেস্তি মেরেছে তোমাকে। কালে কালে হল কি ? মেয়েছেলে হয়ে পুরুষ মানুষকে মারলে। এত বড় পালোয়ান হয়ে উঠেছে আজকাল খেস্তি। একটা নিরীহ ভাল মানুষের গায়ে হাত তোলা। আচ্ছা দেখছি। কিন্তু হাবিলদার রামদাস আগে তো আমার মারবার কারণটা জানা দরকার।

—খেস্তি হর-রোজ মাছভাজি চুরি করে নিয়ে যেত হুজুর। আমি একদিন ধরে ফেলে বলেছিলাম একথা মেজর সাবকে বলেদেবো—তাই—

অহ, শুধু ডাকাত নয় চোরও বটে। শোন হাবিলদার রামদাস, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে এক পা-ও নড়বেনা। মালুম।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, চল বৎস, এর একটা হেস্ত নেস্ত করা দরকার। বিচার করে আসি।

আমরা প্রায় মার্চকরে দুজন গিয়ে উপস্থিত হলাম রান্নাঘরে।

গিয়ে দেখি খেস্তিদাসী মেঝেতে হাত বালিশ করে শুয়ে আছে। কোলের কাছে বসে তার হোদল কুৎকুৎ মার্কা বেড়ালটা কি যেন খাচ্ছে। ঘরে এঁটো বাসন পত্র যেমন কে তেমন ছড়ানো পড়ে আছে, ছোঁয় নি কিছু।

পিশেমশাই আর আমি ঘরে ঢুকতেই খেস্তিদাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলো।

হাতের ছোট ছড়িটাকে সাঁই সাঁই করে শূন্যে আস্ফালন করে পিশেমশায় মারমুখী কণ্ঠে বলে উঠলেন, কী ভেবেছ খ্যাস্তমণি। কাজকম্ম না করে এ ভাবে শুয়ে থাকবার জন্যে কি মাইনে গোনা হয়। উত্তর দাও, শুয়ে ছিলে কেন ?

—আজ্ঞে মা ঠাকরুণের মুখে তো শুনেছেন বোধ হয়, কি রকম অপমান আমার করেছে চাড়হাবাতে লোকটা। সেই অপমানে মনটা খারাপ হওয়ায় শরীলটেও খারাপ হয়েছিল, তাই একটু—

—অপমান। প্রায় ভেংচে উঠলেন পিশেমশায়, শুনছ বৎস, একটা নিরীহ, নির্বিরোধী, নিরস্ত্র ভালমানুষের ওপর অযথা আক্রমণ চালিয়ে এখন কি রকম ভিজে বেড়ালের মত বলছে—অপমানে শরীর খারাপ হয়েছে—ন্যাকা!

খেন্তিদাসীর সজল চোখ আরো সজল হয়ে এলো।

বজ্রকণ্ঠে পিশেমশাই জিগ্যেস করলেন, কী এমন ব্যাপার হয়েছিল যে রামদাসের চোখটাকে ওরকম তালের মত ফুলিয়ে দিয়েছ?

আত্মরক্ষার জন্যে আজ্ঞে। ও লোকটা আমাকে মারবে বলেছিল।

—আর সে জন্যে তুমি এমন ভাবে মারলে যে একটা সুশ্রী-মুখ (রামদাসের অতিবড় মিত্রও তার মুখকে সুশ্রী-ভাবতে পাববে না—কিন্তু পিশেমশায় অনায়াসে বলে গেলেন সুশ্রীমুখ') চিরকালের জন্যে কদাকার হয়ে গেল। ভাল কথা, তুমি নাকি মাছ চুরি কর?

—ভগমানের দিব্বিদিয়ে বলছি আজ্ঞে, খেন্তিদাসী হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, ওটা মিছে কথা আজ্ঞে। ই মিন্সেই বরং রোজ রোজ আমাকে বলে—'খেন্তি আমায় রোজ তিন চারটে করে মাছ দিতে হবে। মেজরসাব ও মিলিটারী আমিও মিলিটারী'—একথায় আজ্ঞে আমি রাজী হইনি। তাইতে আমায় ভয় দেখালে যে আমি নাকি মাছ চুরি করি। তার জবাবে আমি দুটো কটু কথা শোনাতে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে—তখন আজ্ঞে প্রাণ বাঁচাতে এই বেলুন চাকিটা দিয়ে—

—শুনছ শুনছ বৎস, এদের নষ্টামির কথা, পিশেমশায় শূন্যের ওপর ছড়িটা আবার সাঁই সাঁই করে ঘোরালেন, অগ্নিদৃষ্টি সহ খেন্তিদাসীকে বললেন, দ্যাখো, কে কি জাতের মানুষ তা আমার নখ দর্পণে। তুমি আর সাধু সেজনা। তোমার ব্যাপার নিয়ে হুলুস্থুলু বাধানোই তোমার চিরকেলে স্বভাব। ফের যদি মাছ চুরি-টুরির কথা আমি শুনি—জানো তো আমি মেজর, শুধু মেজর নয়, মেসোপটামিয়া ফেরৎ মেজর, কলমের একটি খোঁচায় থানা, দ্বিতীয় খোঁচায় আদালত এবং সর্বশেষ খোঁচায় জেলে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয়ই রামদাসকে বাপমা তুলে গালাগাল দিয়েছিলে—নইলে অমন ধর্ম্মভীরু, দেবতুল্য, মাটির মানুষ তোমার মত এ-ধরে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে যেতনা। ছিছি অমন একটা নিরীহ ভাললোকের ওপর কি জঘন্য বর্বর আক্রমণ। মুখটা একেবারে ফুলেফেঁপে সাঁতরাগাছির ওল-এর মত হয়ে গেছে। যাও—ওঠ—এই মুহূর্তে বাসন মাজতে যাও। ফের যদি ওরকম কিছু শুনি তাহলে তোমায় তৎক্ষণাৎ মাইনে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব।

এতেই কাজ হল। মাথা নিচু করে খেন্তিদাসী বাসনের পাঁজা তুলে নিজে কুয়োতলার দিকে চলে গেল।

আবার আমরা মার্চকরে টালির ঘরের দিকে এলাম। সেখানে রামদাস তখনও গালে হাতদিয়ে বস্তাটার ওপরে বসেছিল। মুখের ডান দিকটা আরো ফুলে যেন বাতাবী লেবুর আকার ধারণ করেছে।

তৃতীয় বারের মত পিশেমশায়ের লাঠি শূন্যে আস্ফালিত হল।

—রাইটলি সার্ভড্। ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল, পিশেমশায় সগর্জ্জনে বললেন, সত্যি কথা বল হাবিলদার রামদাস। তুমি নাকি আমার মত তিন চারটে করে মাছখেতে চেয়েছিলে?

—নেহি হুজুর। কভি নেহি মেজর সাব।

—চোপরাও! ফের মিছে কথা, পিশেমশায় হুঙ্কার ছাড়লেন, খেন্তির মত ঠাণ্ডা ভালমানুষ মেয়ে দুটি হয় না। তার মত নিরীহ শান্ত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিলে—গুণ্ডা কোথাকার—বদতমিজ! তুমি তোমার রেজিমেণ্টের নাম ডুবিয়েছ।

বিশবছর আগে রেজিমেণ্ট ছেড়ে আসা রামদাস অধোবদনে রইল।

পিশেমশায়ের শিরদাঁড়া উঁচু হয়ে উঠলো, মনে হল মেসোপটামিয়ার কোন রণক্ষেত্রে সৈন্যদলকে যেন তিনি আদেশ দিচ্ছেন।

—হাবিলদার রামদাস! এ্যাটেন্সন্!!

বিদ্যুৎগতিতে রামদাস উঠে দাঁড়ালো। তারপর কাঠের মত ছুটে পা তালিমারা জুতোয় সঙ্কুচিত করে এনে খটাস্ খট্ শব্দে 'এ্যাটেনসন' হল।

—প্রথমে তোমার ঐ যাত্রাদলের ভাঁড়ের পোষাক খুলে এস। এক্ষুণি।

—জি সাব।

—তারপর হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে গিয়ে বাগানে গ্যাঁদাল চারা পোত।

—জি মেজর সাব।

—আজ থেকে বারদিনের কোয়াটার গার্ড শাস্তি দিলাম তোমাকে। নিজের ঘরে বন্দী থাকবে। ঘর আর বাগান—বাগান আর ঘর—এই তোমার এলাকা। রান্না-ঘরের দিকে কদাচ যাবে না। খেস্তি গিয়ে তোমার খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর—আর, পিশেমশায় ছড়িটাকে ওর নাকের ডগায় ঘুরিয়ে বললেন, বলি বুড়ো বয়সে খুব নোলা বেড়েছে, না? মাছ—মছলি। বেশ, তাই হবে, হাবিলদার রামদাস, কত মাছ তুমি খেতে পার তাই আমি দেখব। যাও—এ্যাবাউট টার্ণ, ডবল আপ।

রামদাস খটাখট ঘুরলো, তারপর দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল।

আমরা আবার মার্চ করে বাংলোর দিকে এলাম।

এ পর্য্যন্ত বলে গাঙ্গুলীমশাই গড়গড়ায় টান দিতে থাকলেন গুড়ুক-গুড়ুক।

আমাদের তরুণ আমার কানে কানে ফিস ফিসিয়ে বল্লে, আরেকটি বিদেশী-গল্প নিজের বলে চালালে।

আমি সভয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম, পাছে একথা গাঙ্গুলী মশায়ের কানে যায়।

ফাল্গুন

শ্রীমঞ্জুষ দাসগুপ্ত

এলো মধু ফাল্গুন
পলাশেরা হেসে খুন,
মৌমাছি গুণ গুণ ; গান ঐ গায় ;
মুকুল আকুল শাখে
কোকিল কেবল ডাকে—
প্রজাপতি রঙ মাখে রঙীণ পাখায়।
বক ঐ ছুটে চলে—
মরালেরা দলে দলে
কর্ণফুলীর জলে আনন্দে ধায় ;
মলয় বাতাস বয়,
টিয়া শুধু কথা কয়,
জাগে নব কিশলয় রিক্ত শাখায়॥
শিমুলের ফুলে ফুলে
কে দিয়েছে রঙ গুলে!
ওঠে আজ মন দুলে মধুর আশায় ;
নীলাকাশে চেয়ে চেয়ে
রাঙা চিল যায় ধেয়ে,
পিউ কাঁহা চলে গেয়ে খুশীর নেশায়।

বাগ্‌দি রাজা

অশোককুমার গুপ্ত

প্রায় বারশ বছর আগেকার কথা। হয়ত আরও কিছু বেশীও হোতে পারে। একদিন একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক পাশাপাশি চলেছে তীর্থযাত্রী হয়ে পদব্রজে। গন্তব্য স্থল তাঁদের পুরীধাম। কি তাদের নাম, কি জাত সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তবে তারা দু'টিতে স্বামীস্ত্রী সে কথা জানা গেছে। স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। পথ-শ্রমে ক্লান্ত, পা আর চলে না। বাঁকুড়ার আট কোশ দূরে আউগ্রামে এসে পথিমধ্যেই প্রসব করলেন তিনি একটি পুত্র সন্তান। তীর্থ লোভাতুর স্বামী সন্নিকটেই একটি বাগ্‌দি বাড়িতে শিশুসহ স্ত্রীকে তুলে দিয়ে চলে গেলেন পুরীর পথে, আর কোনো দিন ফিরে এলেন না। হয়ত মরে গেছেন কিম্বা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেছেন চিরতরে, এই অনেকের ধারণা।

বাগদি বাড়িতে একটু একটু করে বড় হতে লাগল শিশুটি। বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে। যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। রাজপুত্র বলে ভ্রম হয়। নিজের কুল হারিয়ে বাগদি বলেই পরিচিত হোলো সে সকলের কাছে। বাগদি-বাড়ির কর্ত্তা একদিন তাকে রেখে এলো এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ তাকে নিয়োগ করলেন গরু চরাবার কাজে। একদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত গরু নিয়ে ফিরছে না দেখে ব্রাহ্মণ নিজেই মাঠে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন—ছেলেটি একটি গাছের নীচে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে আর একটি সাপ ফণা তুলে রোদ আড়াল করে আছে। ব্রাহ্মণ তো দেখে একেবারে হতবাক্। ব্রাহ্মণকে দেখে সাপ আস্তে আস্তে চলে গেলে ব্রাহ্মণ ছেলেটির ঘুম ভাঙিয়ে বাসায় নিয়ে এলেন। কোনো কথাই তাকে বল্লেন না, কেবল স্ত্রীর

কাছে ঘটনাটা চুপি চুপি প্রকাশ করলেন। তারপর থেকে ছেলেটিকে আর গরু চরাবার কাজ করতে দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর লাউগ্রামের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ হোলো ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছেলেটিও গেল রাজবাড়িতে ভোজ খেতে। উপস্থিত ব্রাহ্মণ সকলে দাওয়ায় বসেছেন, আর ছেলেটি বসেছে উঠানে। হঠাৎ বৃষ্টি এলো সেই সময়ে। ছেলেটি ভিজতে লাগল। কেউ তার দিকে দৃক্‌পাতও কোরল না। সাহস করে ছেলেটিও উঠে আসতে পারল না দাওয়ার ওপরে। এমন সময়ে রাজা এলেন স্বয়ং, তাল পাতার ছাতা ধরলেন ছেলেটির মাথায়। আহা! ছেলেটি যে ভিজে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেরা চেঁচিয়ে উঠলেন। একি করলেন মহারাজ! রাজা যার মাথায় ছাতা ধরে সেও যে রাজা হয়। রাজা মৃদুহেসে উত্তর কোরলেন; রাজা না হোক সেনাপতি হতে দোষ কি? স্বাস্থ্য আর রূপে ও যে সেনাপতি হবারই যোগ্য। সেইদিন থেকে রাজা ছেলেটিকে রাজ সেনাপতি পদে বহাল করলেন। এই ছেলেটির নাম হোলো রঘুনাথ। ঐতিহাসিক মল্লবংশের আদি মল্ল, মল্লভূমের স্রষ্টা।

তখনকার দিনে প্রায় প্রতিগ্রামেই বিত্তশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রাজা বলা হোতো। লাউগ্রামের আশে পাশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে রঘু-সেনাপতি তাদের লাউ-গ্রামের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করেছিল। ফলে লাউগ্রামের আয়তন বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। সেনাপতি পদ থেকেই লাউগ্রামের রাজসিংহাসনে উন্নীত হয়েছিল একদিন রঘুনাথ। তাঁর এই রাজা হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ, প্রাচীন বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন—লাউগ্রামের শেষ রাজা ছিলেন অপুত্রক। তাঁর পাট হাতি রঘুনাথকে মাথায় করে এনে মৃত রাজার শূন্য সিংহাসনে বসায়। আবার কেউ কেউ বলেন—রঘুনাথ রাজকন্যাকে বিয়ে করে সিংহাসন লাভ করে। যাঁরা এর কোনটাই মানেন না তাঁরা বলেন, রঘুনাথ বিশ্বাসঘাতকতা করে সিংহাসনে বসে। প্রমাণাভাবে এর কোন্‌টা সত্যি সেটা বলা শক্ত। সে যাই হোক্ না কেন, রঘুনাথ যে রাজা হয়েছিল সেটা সুনিশ্চিত, আর রঘুনাথের সিংহাসন লাভের অন্তরালেই সে সুসমৃদ্ধ বিষ্ণুপুরের ভাবী ঐতিহাসিকতা অন্তর্নিহিত ছিল এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। মল্লবংশের স্রষ্টা এই রঘুনাথ বাংলার ইতিহাসকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করতে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, মল্লবংশের বংশধররা তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন বিষ্ণুপুরের মাধ্যমে।

বহু কীর্ত্তিবিজড়িত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই বিষ্ণুপুরের নামটির উৎপত্তির মূল কারণ জানবার স্বাভাবিক একটা কৌতূহল পাঠক মাত্রেরই থাকা সম্ভব। বাংলার সংস্কৃতির দিক থেকে বিষ্ণুপুর যে একটি সুমহান আসন দখল করে বসে আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যারা একটু নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই হয়ত জানেন শিল্পে, সাহিত্যে ও সংগীতে বিষ্ণুপুরের অবদান কত গভীর, কত ব্যাপক।

রঘুনাথের পর মল্লবংশধরদের ক'একজন রাজা লাউগ্রামেই রাজত্ব করেছিলেন। আনুমানিক ৯৯৪ খৃঃ। জগৎমল্লের সময় রাজধানী লাউ-গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। এর একটি সুন্দর কারণও আছে। একদিন রাজা জগৎমল্ল শিকার করতে বেরিয়ে লাউগ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন একটি বক্ একটি বাজপাখীকে তাড়া করছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ বাজপাখীই বক্‌কে তাড়া করে থাকে। জগৎ মল্লের দৃঢ় ধারণা হোলো, স্থানটির নিশ্চয়ই কোনো মাহাত্ম্য আছে। তাই তিনি পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী লাউগ্রাম থেকে স্থানান্তরিত করে আনলেন সেই জঙ্গলে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে শহর বসালেন। লাউগ্রামের রাজাদের কুলদেবতা বাসুদেব বা বিষ্ণুর নামেই রাজধানীর নামকরণ করা হোলো বিষ্ণুপুর।

লাউগ্রামের নাম আজ আর জনসাধারণের জানবার কথা নয়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় সে লুকিয়ে আছে। রঘুনাথের রক্তপ্রবাহে পুষ্ট অতীত বিষ্ণুপুর কিন্তু আজও বেঁচে আছে তাঁর বংশধরদের খণ্ডবিখণ্ড স্মৃতি নিয়ে বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে।
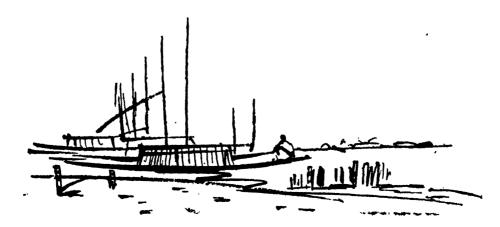
রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হোন

অনুবাদক ঃ শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[মেরি এলিজাবেথ কোলরিজ (Mary Eligabeth Coleridge) ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যগগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই পার্থিব জগতের বন্ধন কাটিয়ে পরপারের দেশে চলে যান। এই স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তিনি সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করে তোলেন। এঁর প্রথম উপন্যাস "The Seven Sleepers of Ephesus'' তদানীন্তনকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী R. L. Stevenson কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। এঁর রচনার মধ্যে "The King with Two Faces,'' "Poems, Old and New" এবং "The Gathered Leanes" সমধিক প্রসিদ্ধ। রচনার সাবলীলত্ব, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এঁর প্রত্যেকটী লেখাই মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে।

বর্ত্তমান গল্পটি তাঁর একটী বিশিষ্ট গল্প "The King is dead, long live the King" এর অনুবাদ। লেখিকার নিপুণ হাতের তুলিকায় স্বার্থপর মানুষ ও আত্মকেন্দ্রিক জগতের বিচিত্র ইতিহাসের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।]

মৃত্যু তার কালো পাখ্না মেলে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে রাজাকে, ঘরের আবহাওয়া শান্তির প্রতিকূল। লোকজন অতি সাবধানে যাওয়া আসা করছে, চুপি চুপি কথা বলার শব্দ আসছে। সকলেই যথাসম্ভব কম গোলমাল করবার চেষ্টা করছে এবং তার ফলে এমন একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে, যা রুগ্ন রোগীর পক্ষে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু এতে কি কিছু আসে যায়? কারণ ডাক্তারেরা জানিয়ে দিয়েছেন যে রাজার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল। প্রকৃতপক্ষেই তার আর কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই। যদি থাকতো তাহলে তাঁর পরমাসুন্দরী যুবতী পত্নীর চাপা ক্রন্দন শুনে তিনি কিছুতেই অবিচলিত থাকতে পারতেন না।

কয়েকদিন ধরে আলোগুলিতে ঢাকনা পরানো হয়েছিল, কিন্তু এখন নানারূপ ব্যস্ততার মধ্যে জানালার পর্দাগুলো পর্য্যন্ত টেনে রাখবার কথা কারও মনে হয়নি। কিন্তু এতেই বা কি আসে যায়? কারণ ডাক্তার জানিয়েছেন যে দেখবার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বেও রাজার পরিচারকেরা ছাড়া অন্য কাউকেও তাঁর কাছে আসতে দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন সেখানে সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার। কিন্তু তাতে কি আর আসে যায়? ডাক্তার বলেছেন যে তিনি আর কাউকে চিনতে পারবেন না।

রাজা এইভাবে অনেকক্ষণ পড়ে আছেন। তাঁর একখানা হাত লেপের উপর ফেলা রয়েছে, মনে হচ্ছে তিনি যেন কাউকে চাইছেন। রাণী ধীরে ধীরে তাঁর হাতখানা নিজের কাছে টেনে নিলেন, কিন্তু রাজার দিক হতে কোন প্রত্যুত্তর নেই। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ, মুখ বন্ধ হয়ে এলো এবং ক্রমে হৃদ্স্পন্দনও গেল থেমে। লোকজনের ভিতর হতে একজন চুপি চুপি বলে উঠলো—"রাজাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে।"

যখন আবার তাঁর চেতনা ফিরে এলো, দেখলেন চারদিক নিঃঝুম। এই নীরবতা যেমন আকাঙ্ক্ষিত, তেমনি আনন্দদায়ক।

চারদিকের কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার তাঁর খুব শান্তিপূর্ণ মনে হলো। এই সুন্দর, স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে মনে হলো তিনি স্বর্গে এসেছেন। ফুলের সৌরভে সারা ঘর মাতোয়ারা, প্রাণ-মাতানো সুমধুর বাতাস প্রবেশ করছে ঘরে। তিনি একাকী শয্যায় শুয়ে আছেন, একটা ভেলভেটের আবরণে তাঁর সারা শরীর আবৃত। পায়ের কাছে জ্বল্ছে দুটো মোমবাতি, তার স্নিগ্ধ আলোয় সারা ঘর পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। চার পাঁচজন প্রহরী তাঁর চারপাশে বসে রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ঘুমে অচেতন।

সারা শরীরে আমোদের এক অপূর্ব্ব শিহরণ খেলে গেলো রাজার। এপাশ ওপাশ করতেও তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না। রাজবাড়ীর বড় ঘড়িটাতে এগারোটা না বাজা পর্য্যন্ত তিনি একটুও নড়লেন না। পরে একটু হেসে তিনি উঠে বসলেন। জ্ঞান হারাবার আগেকার কথা তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। যে অন্যায় ও অবিচারের ফলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে তাঁকে এই পৃথিবী হতে সরানো হচ্ছিলো, তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই সময় কে যেন তাঁকে বললো, "মৃত্যুর পর একঘণ্টা সময় তুমি পাবে। তার মধ্যে তোমার জীবন আকাঙ্ক্ষা করে এমন তিনজন লোক যদি খুঁজে পাও, তাহলে তোমার জীবন আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"

এবার এসেছে সেই একঘণ্টা অবকাশ। কতকটা সময় এর মধ্যেই নষ্ট হয়েছে। তিনি আদর্শ রাজা, প্রজার মঙ্গল-সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। অতএব তিনি এখন নির্ভয়। জীবন তাঁর কাছে এখন আনন্দপূর্ণ মনে হলো। স্বার্থপরতা মোটেই দানা বাঁধতে পারে নি তাঁর মধ্যে। নিয়তির বিধানে যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন তা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে হচ্ছে বলেই তাঁর দুঃখ। ঘুমে আচ্ছন্ন প্রহরীরা ঘুম থেকে উঠে যখন বেরিয়ে গেলো তখন তিনি কতকটা পরিবর্ত্তন বোধ করলেন। অন্যায়ের মালিন্য তিনি ভুলে গেলেন। চিন্তা করে দেখলেন, যা তিনি করেছেন তা অতি তুচ্ছ। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বটে,কিন্তু তাঁর চেয়েও যোগ্য লোক এই পৃথিবীতে আছে। সমস্ত পৃথিবী তাঁর কাছে অতি বিস্তৃত মনে হলো। সবই যেন বড় হয়ে গেছে। নিজের দেশকে তিনি প্রকৃতই ভালবাসতেন। মনে হয়েছিলো মরণের সঙ্গে সবই হবে বিলুপ্ত। এখন তাঁর মনে হলো, পৃথিবী ঠিকই আছে।

ঘর হতে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ভেবে নিলেন —কোথায় তিনি আগে যাবেন। রাণীর কাছে নিশ্চয়ই নয়, কেননা রাণীর এখন সেই বিষাদগ্রস্ত মুখ মনে করতেও তিনি অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করলেন। সবশেষে তিনি যাবেন রাণীর কাছে। তখন রাণী তাঁকে ফিরে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। আর তো মাত্র একঘণ্টা। কেল্লার ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে পাবেন তাঁর জীবন। সবই স্বপ্নের মত মনে হয়। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর। খানিকটা কি চিন্তা করলেন।

মরণের সময়ের কথা মনে হতেই তাঁর মনে হলো আবার এই যন্ত্রণা তাঁকে একদিন ভোগ করতে হবে। তাঁর আবার মনে হলো ফিরে যেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। আবার ভাবলেন, "আমি তো কখনও ভয়ে কাপুরুষের মতো পিছাইনি।" সর্ত্তের কথা মনে পড়তেই তাঁর হাসি এলো। জ্যোৎস্নায় সারা সহরটা ধব্ধব্ করছে সেখান হতে।

রাজা আপন মনে বলে উঠলেন—"তিনজন লোক কেন, তিন হাজার লোক খুঁজতেও বেশী দেরী হবে না। এ রাজ্যে সবাই তো আমার বন্ধু।" রাজবাড়ীর ফটক পেরিয়ে যাবার সময় দেখলেন একটি শিশু সিঁড়িতে বসে কাঁদছে। প্রহরী যাচ্ছিলো পেরিয়ে। সে জিজ্ঞাসা করলো—"কি বাপু, কাঁদছো কেন?" শিশুটী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো—"রাজা মারা যাচ্ছেন শুনে আমার মা, বাবা, দুজনেই গেছেন রাজবাড়ী। তাঁরা এখনও ফিরে আসেন নি। খিদে-তেষ্টায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। এর ওপর আমার খেলার পুতুলটাও গেছে ভেঙে। এ সময় রাজা বেঁচে উঠলে কি আনন্দই না হতো।"

কথা শেষ হতেই শিশুটা আবার কেঁদে উঠলো। রাজা বেশ কৌতুকবোধ করলেন। তিনি বললেন—"আমাকে চায় এরকম প্রজা তো এখনই মিললো।" তাঁর নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। মনে হলো শিশুকে একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্বাস দেন, কিন্তু এখন অনেক জায়গা যেতে হবে। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। বন্ধুর সেই দুঃখক্লিষ্ট চেহারার কথা কল্পনা করতেও রাজার মনে একটা কৌতুকের ও দুষ্টামির ভাব হলো।

বন্ধুর দুরবস্থার কথা ভেবে রাজা বলে উঠলেন, "হায় হতভাগ্য বন্ধু অমিয়াস্! এমন অবস্থায় পড়লে আমি কি করতুম। ভাগ্যিস্ তোমার বিয়োগ-ব্যথা আমাকে উপলব্ধি করতে হয়নি। সে কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হতো।"

বন্ধুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে রাজা দেখলেন—সেখানে মহা ব্যস্ততার ভাব। লোকজন ছুটাছুটি করছে আলো নিয়ে, ঘোড়াগুলোর জিন পরানো হচ্ছে। কিন্তুপ্রিয় বন্ধুটির

ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেনার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে, পক্ষে হিন্দুস্তান লীভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

দেখা তিনি পেলেন না। খোলা দরজা দিয়ে রাজা ভিতরে ঢুকলেন। মনে করলেন বড় ঘরটিতে বন্ধু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে সেখানেও নেই। বৃথাই তিনি ঘরের পর ঘর খুঁজতে লাগলেন। সব ঘরই খালি। হঠাৎ রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তাঁর মৃত্যুর শোকে বন্ধুটি মারা যায়নি তো? রাজা অতঃপর একটি নিরালা কক্ষে ঢুকলেন। এই জায়গায় তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কতদিন কত আমোদপূর্ণ মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন। বন্ধুটি এ ঘরেও নেই। সমস্ত দেখে শুনে মনে হয়, সে কিছুক্ষণ আগে এখান হতে বেরিয়ে গেছে। চারদিকে বই, কাগজপত্র অগোছালো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। মেঝের উপর ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে ভাঙা কাচের খণ্ড। মেঝের উপর হতে একখানা ছবি কুড়িয়ে রাজা দেখলেন সেটা তাঁর নিজেরই ছবি। ছবিটির ফ্রেম ভেঙ্গে গিয়েছে মেঝের পড়ে। আগুন স্পর্শ করলে যেমন জালাবোধ হয়, রাজার মনে তেমনি জ্বালা হতে লাগলো। ছবিটাকে তিনি মেঝের উপর ছুঁড়ে দিলেন। উনুনে দাউ দাউ করে জলছিলো আগুন, পাশেই পড়ে রয়েছে একটা অর্দ্ধ দগ্ধ চিঠি। চিঠিটা তাঁরই লেখা—বন্ধুকে এই চিঠিটি তিনি শেষে লিখেছিলেন। বিস্তৃত পরিকল্পনার সমস্ত তথ্য এই চিঠিতে ছিল। রাজা চিঠিটাকে দিলেন আগুনে ফেলে। সেই সময় এক ভদ্রলোক একটা মহিলাকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। সাজ-পোষাক দেখে মনে হয় ভদ্রলোক আসছেন বহুদূর হতে!

ভদ্রলোক বললেন—"অমিয়াস্ কোথায়?"

মহিলাটী উত্তর দিলেন—"আর কোথায়? আমাদের নূতন রাজার দরবারে। বড়ই মুস্কিলে পড়া গেছে। নূতন রাজার মাথায় পুরানো রাজার মত অলীক খেয়াল, উদ্ভট কল্পনা নেই। একজন আর একজনকে দেখতে পারতেন না। পুরানো রাজা অমিয়াসকে খুবই স্নেহ করতেন। সেজন্য নূতন রাজার রাজসভায় প্রতিপত্তি বাড়াতে একটু বেগ পেতে হবে। তবে নূতন রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতেও অমিয়াস্কে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। পুরানো রাজার সেই—খামখেয়ালীপনা সে মোটেই পছন্দ করতো না। নিরুপায় হয়ে তাকে সায় দিতে হতো। পুরানো রাজা সত্যিই ওকে ভালবাসতো, কিন্তু কি করা যাবে? নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। আমাদের মত লোকের ভাব-প্রবণতা থাকলে তো চলবে না। পুরানো রাজার অন্তিমসময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও নূতন রাজার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। আমি ওর অনুচরদের পাঠাচ্ছি।"

ভদ্রলোক (রাজা দেখে বুঝলেন তাঁরই একজন রাজদূত) উত্তর দিলেন—"যথার্থই বলেছেন। আমিও ঐ একই পথ অনুসরণ করবো। সত্যি বলতে কি, পুরানো রাজার অভাবে দেশের কোনই ক্ষতি হবে না। কূটনীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিলো না। তিনি আমাকে দিয়ে জোর করে এমন একটা সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিলেন যার পরিণাম দেশের পক্ষে হোত অত্যন্ত অশুভ। আমার কপাল ভালো, যুদ্ধ এখন অনিবার্য্য। পুরানো রাজা থাকলে সৈন্যবিভাগে উন্নতির আশাও আকাশ-কুসুমে পরিণত হোত।"

রাজার আর এরপর শুনবার কোন আগ্রহ রইলো না। তিনি ওখান হতে চলে এলেন।

এবার স্থির করলেন তিনি প্রজাদের কাছে যাবেন। তারা নিশ্চয়ই নূতন রাজাকে ভালবাসবে না। কেন না, তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য যে সব কাজ করেছেন, নূতন রাজা তা করবেন না।

ঘড়ির শব্দে রাজা বুঝলেন, পনেরো মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বাস্তবিকই আদর্শ রাজা ছিলেন। রাজ্যের গরীবদুঃখীদের খুটিনাটি খবর তিনি রাখতেন। অনেকবার ছদ্মবেশে তিনি নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রজাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য। গরীবদুঃখীদের অবস্থা দেখে তিনি এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে তাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর কোন লোকই ঘুণাক্ষরে জানেনি কি করে তিনি ভয়ানক রোগের হাতে পড়লেন। এই রোগের ফলেই তাঁর মৃত্যু। সন্দেহ নিরসনের জন্য সেদিকে পা বাড়ালেন।

রাজা আপনমনে হেসে বললেন, "রোগ এখন আর আমার কিছু করতে পারবে না।" ঘরবাড়ীর যেমন ভগ্ন চেহারা, লোকজনের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকগুলো এখানে ওখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইছে। তাঁর কথাই সবার মুখে। তাঁর রোগের ব্যাপার, কবে হবে তাঁর সমাধি, এসব বিষয়ে আলোচনা চলছে।

পাঁচ ছয় জন লোক একটা নোংরা শুঁড়ীখানায় বসে জটলা করছিল। রাজা তাদের আলোচনা শুনবার জন্য এসে দাঁড়ালেন।

একজন জানাশোনা লোক বলছে—"গেছে আপদ গেছে। যে রাজার হাত হতে একটা পয়সা বেশী বেরোয় না, সে রাজার কি প্রয়োজন? ও রকম রাজার আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কি সম্ভব? নূতন রাজাটী অতি ভালো। দেখবে কত-মঙ্গলজনক কাজে উনি হাত দেবেন।"

অন্য একটী লোক বলে উঠলো—"ঠিক বলেছ। তাঁর সবেতেই বাহাদুরী আর মুরুব্বিয়ানা দেখানোই ছিল অভ্যাস। ঘরদোর পরিষ্কার রাখার জন্য কি কম নাজে হাল করতেন? তাঁর কি অধিকার ছিল এসকল করবার?"

অপর একটী লোক বললো—"আমার মতে সব রাজাই উচ্ছন্ন যাক্। তবে এমন একটা রাজা দরকার যিনি স্ত্রীর ভয়ে মূর্চ্ছা যাবেন না, আর পোর্ট প্রভৃতির কি প্রভেদ বুঝতে পারেন।"

চতুর্থ লোকটী আরম্ভ করলো "পুরানো রাজা বন্দীদের প্রাণদণ্ড রহিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার কি ব্যাপার জানো? কয়েদীদের বেশী পরিশ্রম করিয়ে বেশী কাজ আদায় করা। ঐ রকম কোন দুরভিসন্ধি তার মধ্যে ছিল। প্রজাদের জন্য চিন্তা করে তার আর ঘুম আসছিলো না।"

সকলেই এ কথায় সম্মতি দিলো। রাজা চলে এলেন সেখান হতে। ঘড়িটা থেকে আবার শব্দ হলো। রাজার মনে হলো তাঁর সব চেয়ে ঘৃণ্য শত্রুও যদি তাঁকে যথেচ্ছা কটূক্তি করতো, তাও এর চেয়ে সুখকর হতো! যেখানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীরা আছে তিনি সেখানে এলেন। কয়েদীদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হয়নি বলে তিনি আনন্দ বোধ করলেন।

ঘরের মধ্যে ছিল কদাকার এক বন্দী। অতি তৎপরতার সঙ্গে সে হাঁটুর উপর কি সব লিখছে। লোকটার সঙ্গে রাজা পরিচিত ছিলেন। আগ্রহভরে রাজা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কারাগারের মালিক ঘরে ঢুকলেন সেই সময়। সঙ্গে ছিলেন একজন মন্ত্রী, যে মন্ত্রীকে তিনি প্রাণভরে ভালবাসতেন। বন্দী তাঁদের দিকে তাকালো।

বন্দী বলে উঠলো—"কালকের আগে আমার নিশ্চয়ই ফাঁসী হবে না।" কথাটা বলে ভীরুতা প্রকাশ হোল মনে করে বললো—"অবশ্য সর্ব্বদাই আমি তৈরী। দয়া করে আমার এই চিঠিটা আমার প্রিয় পত্নীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

মন্ত্রী গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"রাজা মারা গেছেন! নূতন রাজার মতামত সবই শুভ। আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আগামী কালই আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

আকাশ থেকে পড়ার মত অতি বিস্মিতভাবে বন্দী বলে উঠলো—"রাজা মারা গেছেন।"

মন্ত্রী বললেন—"হাঁ, তিনি মারা গেছেন।"

লোকটী তখন বিষাদক্লিষ্ট মুখে কপালে করাঘাত করে বললো—"আজ্ঞে, আমি পুরানো রাজাকে খুব ভক্তি করতাম। কেননা, তিনি অতবড় রাজা হয়েও আমাকে ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মান দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। তাঁরও তো পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে। তিনি বেঁচে থাকলে খুবই সুখকর হোত।" বলেই লোকটি চোখের জল মুছলে।

জেলখানা হতে বেরিয়ে আসবার সময় ঘড়ি শব্দ করে জানিয়ে দিলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। নিজেকে অতি অপমানিত বোধ করলেন রাজা। বন্ধুর ঘৃণা যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু শত্রুর দয়া সহ্য করা অসম্ভব। তিনি সহস্রবার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত, তবু এ রকম লোকের কাছে ঋণী থাকতে প্রস্তুত নন সামান্য জীবনের জন্য। তিনি নিজে মহৎ তাই অন্যের মহত্ব দেখে আনন্দ অনুভব না করে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, যা কিছু করেছেন সবই বৃথা। অতৃপ্ত মনে নিজের কাজগুলো যাচাই করে দেখতে লাগলেন। যাদিকে ভালবেসে তিনি নিজের মত মনে করেছেন তাদের সবাইকে আজ মিথ্যা স্বপ্নের মত মনে হলো। যাদের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তারা কেউ তার যোগ্য হতে পারে নি। একটী নির্ব্বোধ শিশু আর স-হৃদয় শত্রু—এরাই হলো তার যথার্থ বন্ধু। বেঁচে থাকার আর কি প্রয়োজনীয়তা আছে? এখন নিরিবিলি মৃত্যুর কোলে ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। চরম শিক্ষা তিনি আজ লাভ করেছেন। সুতরাং চিরবাঞ্ছিত

শান্তিপূর্ণ মরণের কোলে আশ্রয় নেওয়া যাক। শাশ্বত সনাতন শক্তির বিধানকেই আজ চরম ও পরম সত্য বলে মনে হলো। প্রতিটি মানুষই অমানুষ হলেও কি আসে যায়? সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে সরল দৃষ্টি নিয়ে তিনি সব কিছু দেখতে লাগলেন।

ঘন কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেলো। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত বোধ হতে লাগলো। সহসা এক নিঃসঙ্গতার উপলব্ধিতে তাঁর মন নিরুৎসাহ হয়ে এলো। তাঁর জন্ত ব্যথিত হয়, চিন্তা করে, দুঃখ অনুভব করে এমন কি কেউ নেই? একটু ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি কিংবা সমবেদনা-পূর্ণ কথার জন্ত তিনি সব কিছু দিতে রাজী। সত্যিকারের একটুখানি স্নেহের জন্ত তাঁর প্রাণ ছটফট করতে লাগলো। আর অতি সামান্ত সময় বাকী আছে। তিনি এতটা সময় অধীর অপেক্ষায় কি করে কাটালেন? এই তার একমাত্র আশা, পৃথিবীতে এই তার আশ্বাসভরা জায়গা। মনে হতেই মনে একটু সান্ত্বনা, একটু প্রফুল্লতা ফিরে এলো। সব কিছুকে তিনি ক্ষমা করেছেন, সব কিছু তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু পত্নীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াতে তাঁর মনটা দমে গেল। তিনি ভাবলেন, যদি এখানেও সবই অলীক হয়ে দাঁড়ায়? সেই মিথ্যা, সেই অলীকতার রূপ দেখবার আগে ফিরে যাওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়? কিন্তু তার পরেই মনে মনে বলে উঠলেন—"আমি তো কখনও ভয়ে পিছাইনি।"

চুল্লীর কাছে বসে আছে রাণী। মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সুন্দর লম্বা চুলগুলো মুখটাকে আবৃত করে রেখেছে। স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই রাজা অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করলেন। এমন স্ত্রীকে কি সন্দেহ করতে পারা যায়? যে আংটিটি রাজা তাকে দিয়েছিলেন সেইটাই পরে আছে রাণী। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আংটিটি চক্ চক্ করছে।

রাজার মনে হলো রাণীকে একটু আশ্বাস দিলে ভাল হয়। রাণীর সঙ্গিনীরা কোথায় গেল তাকে একলা ফেলে? দুঃখের এই প্রথম রাত্রে তাদের রাণীর কাছে থাকা খুবই উচিত ছিল। রাণীকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রাজার মনে হলো হয়তো রাণীর মুখ হতে কোন দুঃখভরা কথা, রাজার নাম কিছু শোনা যাবে। কিন্তু নাঃ, রাণী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

একটু শব্দে রাজা চম্‌কে উঠলেন। দেওয়ালের ভিতর বসানো একটা দরজা খুলে গেলো। এ দরজাটা তিনি আর রাণী ছাড়া কেউ জানতো না। একজন লোক দরজাটার ভিতর দিয়ে এসে রাণীর সামনে উপস্থিত হলো। রাণী তাকে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে কোন শব্দ করতে মানা করলো। বললো—"যাক, তুমি এসেছ। বাঁচলাম, মরবার সময় তার হাতটা ধরেছিলাম তাই খুব ভয় লাগছিল। ভেবেছিলাম তার প্রেতাত্মা বোধ হয় আমার সামনে উপস্থিত হবে। এখন আর সে ভয় নেই। আমরা দুজনে এখন বেশ সুখে থাকতে পারবো।" কথাটা বলে রাণী হাত হতে আংটিটা খুলে একবার চুমো খেলো, তারপর সেটা পরিয়ে দিলো লোকটার হাতে।

মধ্যরাত্রের ঘণ্টাটা পড়তেই প্রহরীরা ছুটে এসে দেখলো রাজা তেমনি শক্তভাবে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। তবে তাঁর মুখ-চোখের চেহারা অনেক বদলে গেছে। মরবার সময় যে আনন্দময় প্রশান্ত মুখ ছিলো এখন আর তা নেই। মুখের চেহারা হয়ে গেছে শুকনো, কদাকার ও বিশ্রী। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "এই চেহারা আর রাণীকে দেখানো হবে না।" •

—

॥ শিকার ॥

নাগপুর কেন্দ্রীয় যাদুঘরে রক্ষিত প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ বরাহ শিকারের একটি সুপ্রাচীন দৃশ্য

নাগপুরের এই কেন্দ্রীয় যাদুঘরটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৮৬৩ সালে এটি সংস্থাপিত হয়। এই যাদুঘরটি চারিটি শাখায় বিভক্ত :—কলা, নৃতত্ত্ব, প্রাকৃতিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। কলা বিভাগে আছে ভারতীয় চারু ও কারুশিল্পের বিশেষ নিদর্শন। নৃতত্ত্ব শাখাটিতে নৃতত্ত্ব এবং আদিবাসীদের গাথা এবং গোন্দ ও করকুদের মত স্থানীয় আদিবাসীদের হাতের কাজ সংরক্ষিত আছে। এগুলি ছাড়াও এই যাদুঘরে দেখা যায় নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি। আর আছে বহু বিচিত্র স্মৃতিপ্রস্তর। এই সব প্রস্তরে রাজার শোভাযাত্রা, শূকর শিকার, বিজয় অভিযান প্রভৃতি চিত্র খোদাই করা আছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের শাখাটিতে পাখী, সাপ, পশু ও কীটপতঙ্গগুলি সুন্দরভাবে সাজান আছে। পুরাতত্ত্বের শাখায় বালাঘাট জেলার গুঙ্গোরিয়াতে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের তামার যন্ত্রপাতি ও রূপার গহনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা এই সংগ্রহশালাটিকে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত করেছে।

খাদ্যাভাব—

দেশে খাদ্যাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পৌষ মাঘ মাসে নূতন ধান কাটার পর সাধারণত চাউলের দাম কমিয়া যাইত—১৩৬৪ সালে তাহা হইল না। কলিকাতায় ৩০ টাকা মণের কমে ভাল চাল পাওয়া যায় না। ১৭৷৷০ মণের যে চাল রেশন দোকানে পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ স্থলে অখাদ্য—তাহার পরিমাণ এত কম যে লাইনে দাঁড়াইয়াও শতকরা ৬০ জনকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়—কাজেই বাজারে ৩০ টাকা মণের চাল কেনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিছু কাল ৯ আনা সেরের আমেরিকান আতপ চাল পাওয়া যাইতেছিল—লোক তাহা স্বাদহীন জানিয়াও কিনিয়া খাইত, তাহাও আর রেশনের দোকানে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সকল দেশনায়কই অধিক খাদ্য উৎপাদনের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় কৃষক সরকারের নিকট কোন সাহায্য বা সহযোগিতা পায় না। এখনও সার বিলির ভাল ব্যবস্থা হয় নাই, চাষের সময় চলিয়া যাওয়ার পর সরকারী বীজ যাইয়া পৌছে, সেচের ব্যবস্থা ভাল নহে—যে সময় জল দরকার সে সময়ে জল না দিয়া অসময়ে প্রচুর জল দিবার ব্যবস্থা করা হয়—মোটের উপর কৃষি বিভাগে ছোট বড় নূতন নূতন বহু রকমের বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে বটে, তাহাদের অধিকাংশই বেতন লইয়া সন্তুষ্ট, কাজ হইল কি না, সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন না। ফলে কোথাও অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় না। যে পরিমাণে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন, তাহার চেষ্টা দেখা যায় না। শিক্ষিত, অর্থবান ব্যক্তিরা এখনও কৃষিকার্য্যকে অন্যতম পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সরকারী মৎস্যচাষ বিভাগ কৃষি বিভাগ অপেক্ষা অধিক নিষ্ক্রিয়—কাজেই বাজারে মাছের দর কমে না—একদল অসাধু ব্যবসায়ী এখনও মাছের বাজারে আধিপত্য করিতেছে—মাছের দর কমাইবার জন্য সরকারী কোন চেষ্টা দেখা যায় না। কয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় সমুদ্রের মাছ আসার কথা শুনা যায়—কিন্তু তাহা আসে কি না বা কি পরিমাণ আসে, তাহা বাজারে যাইয়া কেহ বুঝিতে পারে না। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ফলের চাষে কাহারও কোন উৎসাহ দেখা যায় না। আম, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, চীনাবাদাম, কাজুবাদাম প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হইলে তাহা খাইয়া সাধারণ মানুষ উদর পূর্ণ করিতে পারে। একবার শুনা গিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল চাষ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক সরকারী চেষ্টা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখা যায় না। মানুষ অতি সহজে ও বিনা পরিশ্রমে ধনী হইবার জন্য ব্যস্ত, দীর্ঘ-মেয়াদী ফলের চাষ করিয়া ধীরে ধীরে অর্থবৃদ্ধির কথা চিন্তাও করে না। তরিতরকারীর চাষে সাধারণ মানুষের আগ্রহ নাই—যতদিন না প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার প্রয়োজনীয় তরিতরকারী বা ফল নিজে উৎপাদনে মনোযোগী হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিষের মূল্য কমিবে না। এ বৎসর কয়েক দিনের জন্য মূলা, বেগুন, পালম-শাক প্রভৃতির দাম কমিয়াছিল, কিন্তু বাজারে মুনাফা-খোরদের আবির্ভাবে তাহা স্থায়ী হয় নাই। হয় ত উৎপাদনকারী সুলভ মূল্যে তরকারী বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ তাহা সুলভ মূল্যে পায় নাই—মধ্যপথে একদল ফড়িয়া তাহা সুলভে কিনিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছে। পুলিস বা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। যতদিন না কঠোর হস্তে এই সকল মুনাফা-খোরদিগকে বাজার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের বাঁচিবার কোন উপায় হইবে না। চালের বদলে সকলকে বেশী করিয়া গম ব্যবহার করিতে বলা হইতেছে—কিন্তু পশ্চিমবাঙ্গলার অধিকাংশ মানুষই গম খাইতে

অভ্যস্ত নহে—না খাইয়া বা কম খাইয়া থাকিবে, সে ও ভাল—তবু গম খাইবে না। অন্ন ও বস্ত্র সুলভ করিতে না পারিলে দেশবাসীকে স্বাধীনতার কথা বুঝানো যাইবে না। কেন যে সরকার-পক্ষ এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন না, তাহা বুঝা যায় না। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ১৯৫৮ সালে যাহাতে ভারতের আবার দুর্ভিক্ষ না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের এখন হইতে কঠোরভাবে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

রামদাস স্মৃতি মন্দির—

খ্যাতনামা নাম-প্রচারক ও বৈষ্ণবভক্ত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সারা জীবন ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া হরি-নাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা সহরের উত্তরাংশে কাশীপুর এলাকায় অবস্থিত সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্মীরা গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে ঐ অঞ্চলে শ্রীরামদাস স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রবীণ ভক্ত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভাগীরথী মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উৎসবে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। সিঁথিতেই বাবাজী মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য স্বর্গত বিপিনবিহারী দাসকে দীক্ষাদান উপলক্ষে বিরাট নামযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং বিপিনবাবুর পুত্র, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাসের চেষ্টায় সেখানে শ্রীরামদাস স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। বর্তমান ধর্মহীন দেশে ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বাবাজী মহাশয় যাহা করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য তিনি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি ছিল—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের স্মৃতিবিজড়িত ধর্মস্থানগুলির সংস্কার, সগুলিকে পুনর্জীবন দান ও বৈষ্ণবতীর্থগুলির স্থায়ী ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা! তিনি শুধু বরাহনগর পাট-বাড়ীর উন্নতি বিধান করেন নাই বা ললিতাসখীর সহযোগিতায় নবদ্বীপে সমাজবাড়ীকে নূতন রূপ দান করেন নাই—বাংলার গ্রামে গ্রামে লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবতীর্থগুলির উদ্ধার করিয়াছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নূতন বিভাগ খুলিয়া দেশের ধর্মস্থানগুলির সংস্কার ও সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন, শুনা যাইতেছে বাবাজী মহাশয় একাই অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়া সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, সিঁথির ন্যায় আরও বহু স্থানে তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কার্য্যকে দেশবাসীর মনে সদা জাগরূক রাখার ব্যবস্থা হইবে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের দুরবস্থা—

সমগ্র পূর্ববঙ্গে ডাকাতি লুঠতরাজ, নারীহরণ, অন্যায় ভাবে আটক রাখা প্রভৃতি অনাচার ব্যাপক হওয়ায় সেখানে হিন্দুদের পক্ষে বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—অথচ বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসাও সহজসাধ্য নাই। সে জন্য সারা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে মানসম্ভ্রম ও টাকাকড়ি লইয়া বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হইয়াছে। কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যত অধিক বিফল হইতেছে, পাকিস্তান-বাসী হিন্দুদের উপর অত্যাচার ততই বাড়িয়া যাইতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে একদল পাকিস্থানী ভারতীয় এলাকায় গোপনে প্রবেশ করিয়া সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। আমেরিকার অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বহু অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহা লইয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আটক অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের পর কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখ আবদুল্লার কথাবার্তা হইতেও তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। তিনি ভারতের সহিত পাকিস্থানের যুদ্ধ বাধাইবার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। এ অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা কখনই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রতি-আক্রমণের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোথায় প্রতি-আক্রমণের কথা—এমন কি আক্রমণে বাধা দেওয়ার কথা শুনা যায় নাই। ভারতবাসী অস্ত্রসম্ভারও সেভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নাই। পাকিস্থান-ভারত বিরোধ শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসী নিজেকে বিব্রত বোধ করিতেছে।

আসামের ২ জননায়কের মৃত্যু—

আসামের খ্যাতনামা চিকিৎসক ও গৌহাটী মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হেম বড়ুয়া গত ২৭শে জানুয়ারী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কাছাড়ের ১১০ বৎসর বয়স্ক ধর্মনেতা মৌলানা মহম্মদ ইয়াকুব জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরলোক গমন করিয়াছেন—তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি—

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতার মেয়র কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল প্রকার দুর্নীতি ও গলদ দূর করিয়া ভাল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৪টি ছোট ছোট কমিটী গঠন করিয়াছেন—কমিটীগুলি তদন্তের পর তাহাদের সিদ্ধান্ত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে মেয়রকে জানাইবেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তা এই কমিটীতে আছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন বিরাট প্রতিষ্ঠান—তাহার শাসন ব্যাপারে বর্তমানে বহু ক্রটিবিচ্যুতি হইতেছে। মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন আজীবন শিক্ষাব্রতী—বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার—তাঁহার এই সাধু চেষ্টা ফলবতী হউক—সকলে ইহাই কামনা করেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা লইয়া কাজ করিলে অবশ্যই এ চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—

গত ২৮শে জানুয়ারী সকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ১২৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভাপতিত্ব করেন এবং কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার সুধীরচন্দ্র বসু ভাষণে বলেন —কলেজে রোগী ও ছাত্র দুই কমানো দরকার হইয়াছে। নির্দিষ্ট রোগীর সংখ্যা ৮১৩—কিন্তু ১৬০০ রোগী কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়। বৎসরে কলেজে নূতন ১৩৭ ছাত্র না লইয়া ১০০ ছাত্র লইলে পড়ার উন্নতি হইতে পারে। যদি এই ভাবে রোগী ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে চিকিৎসকগণকে অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় বলিয়া চিকিৎসার মান কমিয়া গিয়াছে। রাজ্যপালও তাঁহার ভাষণে কলেজ ও হাসপাতালের উন্নতি বিধানে সকলকে যত্নবান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মত শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গলদে পূর্ণ হইয়াছে। যাহাতে গলদগুলি দূর করা যায়, তাহার ব্যবস্থায় সকলে মনোযোগী হইলেই প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব করা সার্থক হইবে।

ইতিহাস সংকলন সমিতি—

গত ২৭শে জানুয়ারী সোমবার ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস সংকলনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মজিলপুর গ্রামে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয়ের বাস গৃহ সুরেন্দ্র-ভবনের দ্বিতলস্থ হলঘরে এক সম্মিলন হইয়াছিল। সম্মিলনে প্রবীণ ও খ্যাতিমান ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম পি, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম-পি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক প্রথিতযশা শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া ইতিহাস সংকলন সমিতির সদস্যগণকে ইতিহাস রচনার প্রণালী ও কৌশল সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের প্রবীণ ব্যবহারাজীবী শ্রীরজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্কলন সমিতির সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করার পর কালিদাসবাবু এক মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন ও পরে তিনজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। সাপ্তাহিক ২৪ পরগণা পত্রের সম্পাদক খ্যাতিমান কর্মী শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় সম্মিলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় শতাধিক গুণী ব্যক্তি সম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। কালিদাসবাবু ও তাঁহার কৃতী পুত্রগণ অতিথিগণকে সাদর অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। সম্মিলনে সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য করা হইয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে এক বা ততোধিক কর্মী গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের উপর সেই সেই গ্রামের বর্তমান অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত ২৪-পরগণা জেলার কোন পূর্ণ ইতিহাস সংকলিত হয় নাই। এখন কর্মীরা উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে অচিরে ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের গৃহে রবিবাসরের এক সভায় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, খ্যাতনামা লেখক শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা না করিলে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া যায় না, এ কথা লোক আজ ভুলিয়া যাইতেছে। এমন কি, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত এখন আর সংস্কৃতকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্য্যন্ত অবশ্য পাঠ্য বিষয় করিয়া রাখেন নাই। তাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন আর সংস্কৃত শিক্ষা করে না এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্যকভাবে তাহাদের পরিচয় লাভও ঘটে না। ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলে অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, সুপণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা অতি সহজ, সরল ও সুললিত সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ ভাষণ দিয়া বিষয়টি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজি ও হিন্দী কোন ভাষা বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইবে—এ সমস্যা যখন ভারতবাসী সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির বিচারের বিষয়, সে সময়ে সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা যায় কিনা—তাহাও সভায় আলোচিত হইয়াছিল। সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতের লোক অতি সহজেই শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন। যখন ১৪টি প্রাদেশিক ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে ঐ সকল আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা ও রাজকার্য্যের বাহন করা হইতেছে, তখন সকল ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা অবশ্যই অসম্ভব বা অযৌক্তিক হইবে না। কি উত্তর ভারত, কি দক্ষিণ ভারত—সর্বত্রই সংস্কৃত ভাষার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আছে এবং অল্পসংখ্যক হইলেও একদল শিক্ষিত মানুষ সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। ইতিপূর্বেও ভারতের বর্তমান যুগের বহু মনীষী সংস্কৃত ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবও করিয়াছেন। এমন কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বহু মনীষীও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল এবং আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে বহু লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। সভায় পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় যেরূপ সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়াছিলেন, নানা স্থানে ঐ ভাবে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেওয়া হইলে সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে সাধারণের ভয় দূরীভূত হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যাহাতে অধিকসংখ্যক লোক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, আমরা দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে প্রার্থনা জানাই।

উদ্বাস্তু সমস্যার উপায়—

গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে ৬টি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এক সম্মিলনে সমবেত হন—তথায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মহিশূর, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুত মেহের চাঁদ খান্না ছাড়াও বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিম-বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন এবং কেন্দ্রের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নস্কর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আর স্থান না থাকায় বিভিন্ন রাজ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য এক লক্ষ একর জমী পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ক্যাম্পে বাসকারী উদ্বাস্তদের বাংলার বাহিরে অন্য রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইবে। বর্তমানে সাড়ে ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বাস করে—তাহাদের দুই তৃতীয়াংশ কৃষিজীবী ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসনের ব্যয় ভার বহন করিবেন। উদ্বাস্তরা ক্যাম্পে যে ভাবে আছে, ঐ ভাবে আর ও কিছু কাল থাকিলে সকলেই মারা যাইবে, সে জন্য নূতন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনমাস কাজ করার পর মে মাসে মন্ত্রীরা আবার মিলিত হইয়া কাজের হিসাব পর্যালোচনা করিবেন।

ছোট শিল্প উন্নতির ব্যবস্থা—

জাপান গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ও জাপানী প্রথায় ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতির জন্য কলিকাতায় একটি 'ছোটশিল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করা হইবে। গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ছোট শিল্প বোর্ডের এক সভায় কেন্দ্রিয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই সাহা এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বোর্ডের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, পশ্চিম জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় দিল্লীর নিকট ওখলা শিল্প কেন্দ্রে একটি কারখানায় যন্ত্রের অংশ প্রস্তুতের আয়োজন হইতেছে। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় ছোট শিল্পের উন্নতির জন্য মাত্র ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে—দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ পর্য্যন্ত ৭৫০টি স্থানে ছোটশিল্প উন্নয়নের জন্য সাড়ে ৪ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ধারে যন্ত্র ক্রয় করার জন্য ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাড়ে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট শিল্প অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইবে। বেকার সমস্যা আজ সমাজকে ও দেশকে ধ্বংস করিতেছে। কতদিনে এ সমস্যার সমাধান হইবে তাহা সকলকে চিন্তিত করিয়াছে।

একাডেমী পুরস্কার—

সঙ্গীত নাটক একাডেমী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তদিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে নাটকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও সঙ্গীতে শ্রীশচীন দেববর্মন পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা উভয়কেই এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পাশপোর্ট লইয়া জুয়াচুরি—

পাকিস্থানী মুসলমানরা মিথ্যা করিয়া নিজেদের ভারতীয় অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া পাশপোর্ট লইয়া পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছে—গত ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় পুলিস ঐরূপ ৭ হাজার পাশপোর্ট ধরিয়া ফেলিয়াছে। সেই সঙ্গে হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানে এ জন্য খানাতল্লাস চলিয়াছিল। ৬জন পুলিস অফিসার, হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিজস্ব কেরাণী, অন্যান্য ৩জন কেরাণী, ৬জন মোক্তার ও দালাল সমেত ১৬জনকে এ জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কলিকাতা ওয়াটগঞ্জে একটি আড্ডা খুলিয়া এই সকল ব্যাপারে সাহায্য করা হইত; গত ১৮ই জানুয়ারী হুগলী আদালতে এ বিষয়ে এক মামলা আরম্ভ হইয়াছে। মামলার তদন্তে আরও বহু তথ্য প্রকাশ পাইবে।

রাষ্ট্রপতির সম্মান দান—

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবার (১৯৫৮) ভারতের ৩৬জন গুণী ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়াছেন। একজন ভারতরত্ন, ১৬জন পদ্মভূষণ ও ১৯জন পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—পদ্মবিভূষণ উপাধি (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পুণা নিবাসী ৯৯ বৎসর-বয়স্ক সমাজ-সেবক ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ডাঃ ডি-কে-কার্ভে 'ভারতরত্ন' হইয়াছেন। ইতিপূর্বে রাজা-গোপাচারী, রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ রামন, ভগবান দাস, বিশ্বেশ্বরায়া, প্রধান মন্ত্রী নেহরু ও পণ্ডিত পন্থ—৭ জন ভারতরত্ন হইয়াছেন। ৫ জন নারী এবার উপাধি পাইয়াছেন—তন্মধ্যে কুমারী নার্গিস ও শ্রীমতী দেবিকারাণী পদ্মশ্রী হইয়াছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় ও চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীদেবকীকুমার বসু পদ্মশ্রী হইয়াছেন। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, ভারতবর্ষের সহিত দীর্ঘ-কালের সংশ্লিষ্ট শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা ৩ জন বাঙ্গালীর সম্মান লাভে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বাঙ্গালী লেখক সম্মানিত—

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য পুস্তক রচনা প্রতিযোগিতায় এবার বাংলা ভাষায় 'ফোবার নয়া' নামক পুস্তক লিখিয়া শ্রীঅমরনাথ রায় ভারত সরকারের প্রদত্ত ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জনপ্রিয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সাল হইতে এই পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১০টি বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের জন্য ৫০০ টাকা করিয়া ও ১৫টি পুস্তকের জন্য হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি পুস্তকের হাজার কপি সরকার ক্রয় করিয়াছেন। আমরা লেখককে এই গৌরব লাভের জন্য সাধুবাদ জানাই।

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত—

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত গত ৯ই মাঘ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। তিনি কিছুকাল দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ও পরে দীর্ঘকাল কলিকাতায় কবিরাজী চিকিৎসা করিয়াও খ্যাতিলাভ করেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে তিনি নিজেকে সারাজীবন নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং ধর্মবক্তা হিসাবেও জনপ্রিয় ছিলেন।

মেদিনীপুরে অষ্ট-শহীদ স্মৃতি সৌধ—

মেদিনীপুর সহরে অষ্ট সহীদ (১) ক্ষুদিরাম (২) সত্যেন (৩) প্রত্যোৎ (৪) অনাথ (৫) মৃগেন (৬) ব্রজকিশোর (৭) রামকৃষ্ণ (৮) নির্মলজীবন—মুক্তি সংগ্রামে জীবনদান করেন। তাঁহাদের ৮ জনের স্মৃতিতে একটি সৌধ নির্মাণ করা হইবে। গত ২৬শে জানুয়ারী সহরের নিমতলার চকে স্মৃতি সৌধের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বিপ্লবাদের সর্বত্র এই ভাবে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

২০শে জানুয়ারী আসাম কংগ্রেসের ৬৩ তম অধিবেশনের পর নূতন সভাপতি শ্রীইউ-এন-ধেবর নিম্নলিখিতরূপে নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—উচ্চতম সমিতি-গঠন করিয়াছেন—(১) শ্রীজহরলাল নেহরু (২) মৌলানা আবুল-কালাম আজাদ (৩) পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (৪) শ্রীমোরারজী দেশাই (৫) ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (৬) শ্রীজগজীবন রাম (৭) শ্রীকামরাজ নাদার (৮) শ্রীখান্দুভাই দেশাই (৯) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (১০) সরদার প্রতাপ সিংহ কৈরন (১১) শেঠ গোবিন্দ দাস (১২) শ্রীওয়াই-বি-চ্যবন (১৩) শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণ (১৪) শ্রীকে-পি-মাধবন নায়ার (১৫) শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী। পরে (১৬) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদস্য হইতে সম্মত হইয়াছেন—প্রথমে তিনি অসুস্থতা বশতঃ সদস্য হইতে চান নাই। (১৭) শ্রীসত্যনারায়ণ রাজু ও (১৮) সভাপতি শ্রীধেবর। উড়িষ্যা হইতে একজনকে ও একজন খ্যাতনামা মহিলাকে পরে গ্রহণ করা হইবে। শ্রীমন্ নারায়ণ ও শ্রীরাজু সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীরাজু অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেন। পরে আরও একজনকে সাধারণ সম্পাদক করা হইবে। পূর্ব ওয়ার্কিং কমিটীর ৭ জন সদস্যকে বাদ দিয়া নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। সভাপতিকে লইয়া পূর্বের কমিটীতেও ২০ জন সদস্য ছিলেন।

পরলোকে নির্মলচন্দ্র ঘোষ—

খ্যাতনামা সাংবাদিক, অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ঘোষ গত ২৩শে জানুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় তাঁহার দমদমস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যায় থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন ও ৬ ঘণ্টার পর মারা যান। মৃত্যু কালে তাহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এক সময়ে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটীর সভাপতি হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

আমেরিকার ঋণ দান—

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৪ মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিবেন। ঐ অর্থ বন্দর উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্ত নির্দিষ্ট থাকিবে। চলতি বৎসরে ঐ টাকায় কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের উন্নয়ন করা হইবে। ইতিপূর্বে মার্কিণ সরকার ভারতবর্ষকে ২৯ কোটি ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারত ৬০ কোটি ডলার ঋণ চাহিয়াছিল—তন্মধ্যে ৪০ কোটি ডলার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাদ্রাজে নূতন রাজ্যপাল—

আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিষ্ণু রাম মেধী গত ২৪শে জানুয়ারী মাদ্রাজের নূতন রাজ্যপালরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজের পঞ্চম রাজ্যপাল। শ্রীমেধী শারীরিক অসামর্থ্যের জন্ত কিছুদিন পূর্বে আসামের প্রধান মন্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন—

গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার ও শনিবার কলিকাতা বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বা বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শেষ দিনে দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ বিশেষ বক্তা হিসাবে সমাবর্তন ভাষণ দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও

LUX
TOILET SOAP

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও দ্বিতীয় দিনে তাঁহার ভাষণ দেন। উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত উভয় দিনই উৎসবে ভাষণ দেন, দ্বিতীয় দিনে ৩ জন ডি-এস্‌সি, ৪ জন এম-ডি, ৩ জন এম-এস, ২ জন এম-ও, ১৫ জন আর্টসে ডি-ফিল, ৪৬ জন বিজ্ঞানে ডি-ফিল ও ৭ জন চিকিৎসা বিদ্যায় ডি-ফিল উপাধি পান। বর্তমান যুগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক, অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী স্যার আশুতোষ মুখার্জি স্বর্ণপদক, কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক', কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক', ডাঃ পি-সি-সেনগুপ্ত 'কোটস্ স্বর্ণপদক', আবদুস সোভান খান 'জয় নাল আবেদিন স্বর্ণপদক', ও প্রাণগোবিন্দ ঘোষ 'মহারাজা জে-এম-ঠাকুর স্বর্ণপদক' লাভ করেন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ২৩ জন ছাত্রী সমেত মোট ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়। শ্রীফুলচাঁদ ও শ্রীশ্রীকুমার ভট্টাচার্য্য স্বর্ণাঙ্কিত রৌপ্যপদক লাভ করেন। পূর্বদিন শুক্রবার ৬৫টি কলেজ হইতে পাসকোর্সে বি-এ, বি-এসসি ও বি-কম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (দ্বিতীয় বিভাগে) ৫১৭৮ জন ছাত্রছাত্রীকে স্নাতক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ দিন উপাচার্য্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত বক্তৃতা করেন।

॥ শিক্ষিতের ভবিষ্যৎ ॥

—পাশ করে ডিগ্রী পেলে…এবার সামনে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র !… দেখছো, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল…

—আজ্ঞে, এতকাল উজ্জ্বল দেখছিলুম…কিন্তু এখন…দেখছি, সামনে ভীষণ অন্ধকার !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

—ষোলো—

াশের বাড়ীতে নতুন রেডিয়ো কেনা হয়েছে একটা। ায় চব্বিশ ঘণ্টাই সেটা বাজে। গান-বাজনা-বক্তৃতা-ংরেজি-বাংলা-হিন্দী-তামিল। ভল্যুম একেবারে শেষ র্দায় তোলা। নতুন রেডিয়ো কেনবার আনন্দে বাড়ীশুদ্ধু বাই ভুলে গেছে—ওটা কেবল নিজেদেরই শোনবার জন্যে, মস্ত পাড়াকে শোনাবার জন্যে নয়।

পূরবীর যন্ত্রণাই হয়েছে সব চাইতে বেশি। রেডিয়োটা াখা হয়েছে একতলার ঘরে—প্রায় তার জানালাটার মুখো-খি। দিনরাত ওই ধ্বনি-তরঙ্গ এসে সোজাসুজি তাকেই াক্রমণ করে। জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই।

আজও বই খুলে চুপ করে বসেছিল পূরবী। সামনে ইয়ের পাতা খোলা—একটা লাইনও পড়া যাচ্ছে না। রোনো বাল্‌বটার আলোর রঙ হলদে হয়ে গেছে—ছোট াট হরফ পড়তে এম্‌নিতেই কষ্ট হয়, মাথা নিচু করে াকিয়ে থাকতে থাকতে জড়িয়ে যেতে চায় অক্ষরগুলো। ার ওপরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তরঙ্গ—নাঃ, অসম্ভব।

সুরটা বসন্ত—পরজ-বসন্ত। অসীম বিরক্তি সত্ত্বেও রে ধীরে গানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল মনটা। আঃ—আর কটু কমিয়ে দেয় না কেন—আরো ভালো লাগত। বেশ াইছে মেয়েটি—চমৎকার সঙ্গত হচ্ছে তবলায়। বাবার ক সময়ে তবলা বাজিয়ে হিসেবে বেশ নাম ছিল, ছেলে-লা থেকেই তবলার ভালো-মন্দ অল্প-বিস্তর সে বোঝে। ানের চর্চাও কিছু কিছু সে শুরু করেছিল, কিন্তু পড়ার াগিদে তানপুরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বাবা সংসার াতে পারেন না, দাদার কাছ থেকেও বিশেষ কোনো ভরসা নেই। সে যদি পাশ করে একটা চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে, তা হলে সবাই অন্তত দু'বেলার দু'মুঠোর জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

মনে গান ছিল—গলাও খুব খারাপ ছিলনা। তবু গানকে তার বিদায় দিতে হয়েছে। এই জন্যেই কখনো কোনো ভাল গান শুনলে কেমন যন্ত্রণা বোধ করে সে—যেন সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, তারই জিনিস কেড়ে নিয়ে কারা যেন সেইটে তার চোখের সামনে এনে ধরছে বার বার।

তার ক্লাসের হাসি দুখানা রেকর্ড করেছে—রেডিয়োতে গানও করে মধ্যে মধ্যে। হাসির বাবা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে চাকরি করেন—অনেক টাকা মাইনে পান। বাইরে থেকে বড় বড় ওস্তাদেরা কলকাতায় এলে অনেক সময় বাড়ীতে জলসা বসান। হাসি সগর্বে নিমন্ত্রণ করে তার বন্ধুদের। অবশ্য পূরবীকে কখনও বলে না—আর বললেও সে যেত না।

পরজ-বসন্ত জমে উঠেছে। তবলার সঙ্গে সঙ্গে পূরবীর আঙুলগুলো নিজের অজ্ঞাতেই বেজে চলেছে তবলার ওপর। হঠাৎ কে মাঝখানে রেডিয়োটাকে বন্ধ করে দিলে। চমকে উঠল পূরবী। ঠিক যেন কে একটি সুন্দরী মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলল।

পয়সা আছে—দামি রেডিও কিনেছে। ইচ্ছে মতো যখন খুসি বাজাবে। তাই বলে গান বুঝতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। পূরবী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

এখন শান্তি। এবার পড়ায় মন দেওয়া যেতে পারে। তবু মন বসল না। বাল্‌বটার হলদে আলো আরো

বিবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন। বইয়ের হরফগুলো গায়ে-গায়ে এসে মিশেছে, প্রত্যেকটা লাইন যেন এক-একটা সরল রেখায় পরিণত হয়ে গেছে। আবার নিঃশ্বাস ফেলল পূরবী। চশমা খুলে শাড়ীর আঁচলে পরিস্কার করতে লাগল কাচ দুটো।

মা এলেন।

—পাশের বাড়ীর মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ডালটা চাপিয়ে দিয়েছি, যদি আসতে দেরী হয় একটু দেখিস।

—আচ্ছা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মা আবার থেমে দাঁড়ালেন।

—সন্তুর তো এই সপ্তাহে একবার আসবার কথা ছিল। এলো না তো।

—ব্যস্ত লোক মা—বোধ হয় সময় পাননি। তা ছাড়া ওঁকেও হয়তো টিউশন করতে হয়।

—টিউশন করতে হবে কেন? অত বড় বাড়ীর ছেলে—ওদের টাকার অভাব কী?—মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

পূরবী জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই। তা ছাড়া এ-কথা কোনোদিন সে ভাবেও নি।

মা চলে গেলেন।

সত্যজিৎ। ওই আর একটা অস্বস্তিকর চিন্তা। সেই একা ক্লাশ করতে যাওয়া। ক্লাসের—শুধু ক্লাসেরই নয়, গোটা কলেজেরই সব মেয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। বীথি বক্তৃতা দিচ্ছে পুবদিকের সিঁড়ির তলায়।

: একটা দিন ক্লাসে না গেলে আপনাদের পড়া-শুনোর কোনো মারাত্মক ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর ফলে শিক্ষকেরা তাঁদের সংগ্রামে জোর পাবেন, তাঁদের দাবি আরো জোরালো হয়ে উঠবে—তাঁরা···

তবু ক্লাসে গিয়েছিল পূরবী।

কলেজ-স্টাইপেণ্ড পায় বলে? কিন্তু তার মতো আরো অনেকেই তো স্টাইপেণ্ড পায়। তারা তো আসেনি। তবু একা সে ক্লাসে কেন গিয়েছিল?

ক্লাসের জন্যে নয়—সত্যজিতের জন্যে?

পূরবীর হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। এ কী হচ্ছে তার—কেন এমন হচ্ছে? এমন অসম্ভব কল্পনা তার কেন আসে—কোথা থেকেই বা আসে? জাতে মেলেনা, অবস্থায় মেলে না, বয়েসের দূরত্বও কম নয়। তা ছাড়া সে নিজে যা খুশি ভাবুক—এমন অসম্ভব কথা শুনলে সত্যজিৎ—

লজ্জায় মরে গেল পূরবী। কেন এমন হল? এ-সব চিন্তাকে সে নিজেও তো কখনো প্রশ্রয় দিতে চায়নি। অথচ এরা কখন নিঃশব্দে এসেছে—অসহায় হরিণের শরীরে যেমন করে পাকে পাকে জড়ায় অজগর, তেমনি করে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে তাকে। যখন সজাগ হয়ে উঠেছে, তখন আর মুক্তির উপায় নেই।

ক্লাসের মেয়েরা বোধ হয় সবাই বোঝে। তাই যত রাগ করেছে, ঠাট্টা করেছে তার চাইতে বেশি।

একজন তো স্পষ্টই বলেছে. ওর কথা ছেড়ে দাও। প্রোফেসার মুখার্জির ক্লাসের জন্যে ওর আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে।

পূরবী কোনো জবাব দেয়নি। এম্‌নিতেই সে বেশি কথা বলতে জানে না, শুধু মুখ লাল করে উঠে গেছে সামনে থেকে।

তারপর বীথি যখন জামিন নিয়ে কলেজে এল—সেদিন কমন-রুমে তার কী অভ্যর্থনা! একজন আবার প্রস্তাব করেছিল, এই উপলক্ষে থার্ড ইয়ারের পূরবী দত্তের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আমরা।

বীথিই রক্ষা করেছিল অবশ্য। বলেছিল, এ-সব তোমাদের ভারি অন্যায়। কেন মিথ্যে ডিস্টার্ব করছ ওকে?

কিন্তু অপমান নিশ্চয়ই করতে পারে ওরা—সে অধিকার ওদের আছে। কিন্তু পূরবী কী করে অস্বীকার করবে—অধ্যাপক সত্যজিৎ সম্পর্কে যে-কথা সে ভাবে, সে-সব ভাবা উচিত নয়? তার নিজের চাইতে কে আর বেশি করে জানে, সত্যজিতের পড়োনোর চাইতেও সে তার গলার আওয়াজ বেশি করে শোনে—চোখ তুললেই দেখতে পায়, সত্যজিতের হাতে লাল পাথরের আংটিটা একটা আশ্চর্য সংকেতের মতো জলজ্বল করছে?

একটা কান্নার মতো কী যেন উঠে আসতে চাইল তার বুকের ভেতর। এ ভাবে চললে হয়তো আসছে পরীক্ষায় সে ফেল করবে। হয়তো সত্যজিতের পেপারেই ফেল করবে।

পাশের বাড়িতে আবার রেডিয়োটা খুলে দিয়েছে।

ভংস মোটা গলায় কে যেন বক্তৃতা শুরু করেছে। স্বাধীন
[ভা]রতের শিক্ষা-সম্বন্ধে কতগুলো কটমটে কথা এক একটা
[পাথ]রে হাতুড়ির ঘায়ের মতো লাগছে।

সত্যজিৎ এ-সপ্তাহে আসবে বলেছিল, আসেনি।
[সে]দিন সে একা ক্লাসে গিয়েছিল বলেই কি ঘৃণা হয়েছে
[তা]র ওপর? ভেবেছে, মেয়েটা কী নির্লজ্জ হৃদয়হীন।

পূরবী নিষ্ঠুরভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সব কেমন
[এ]লোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যেমন করে হোক—থার্ড ইয়ার
[পা]ব হলেই এ কলেজ থেকে সে ট্রান্‌স্‌ফার নেবে। এখানে
[আ]র তার পড়া চলেনা।

রান্নাঘর থেকে একটা তীব্র পোড়া গন্ধ ভেসে এল।
[ডা]লের জল উথ্‌লে বোধ হয় উনুনে পড়েছে। চমকে
[উ]ঠে পড়ল পূরবী। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেও
[তা]র মনে হল, সত্যজিৎ আসতে পারে। আজ, এখনই
[এ]সে পড়তে পারে হয়তো।

সত্যজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল কার্জন পার্কের পাশে। রেলিঙে
[হে]লান দিয়ে।

দূরে ধর্মঘটী শিক্ষকেরা বসে আছেন পথের ওপর।
[স্থি]র, শান্ত, নির্বিকার কয়েকটি মানুষ। স্পষ্ট করে কাউকে
[চে]না যাচ্ছেনা। হয়তো অনন্ত সেনগুপ্ত আছেন—সেই
[মা]নুষটিও আছেন: আধপেটা খেয়ে যিনি এই সত্তর বছর
[ব]য়েস পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়ে চলেছেন। এখান থেকে কাউকে
[চি]নতে পারছেনা সত্যজিৎ—মনে হচ্ছে কয়েকটা পাথরের
[মূ]র্তিকে পথের ওপর কেউ সাজিয়ে রেখেছে। পূজো-
[পা]র্বণের মুখে যেমন ভাবে কুমারটুলীর দাওয়ায় শাদা
[র]ঙের এক-মেটে মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে উদ্দীপনা
[যে]ন আর নেই। ধর্মঘটীদের সংখ্যা কমে আসছে।
[সা]ধারণ মানুষের মনেও আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে—
[স]ব মিলে একটা অত্যন্ত ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে যেন।
[বি]ষণ্ণ ব্যথিত চোখ মেলে সত্যজিৎ তাকিয়ে রইল। একটা
[মী]মাংসার কথাবার্তা চলছে বলেই কি? অথবা—

—হ্যালো মুখার্জি!

পরিতোষ মৈত্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একদা
[স]হকর্মী ছিল। বছর খানেক আগে বড় গোছের একটা
সরকারী চাকরি পেয়েছে। চুলের খাঁচ থেকে পায়ের
জুতোর পালিশ পর্যন্ত বদলে গেছে পরিতোষের। যে
কাজের যা ধরণ। সত্যজিতের একটা আকস্মিক খেয়ালের
মতো মনে হল, পরিতোষের হাতে টার্কিশ সিগারেটের
একটা টিন নেই কেন।

পরিতোষ বললে, কী মনে হচ্ছে স্ট্রাইকের অবস্থা?

—দেখতেই পাচ্ছ।—সত্যজিৎ মৃদু হাসল।

—র‍্যাদার ডিজ্‌অ্যাপয়েন্টিং—এ?—কলেজ জীবনে
একটা-ছাত্র আন্দোলনের পাণ্ডা পরিতোষ বললে, এরকম
হেষ্টি স্ট্রাইক-ডিশিসন নেওয়া খুব অন্যায়। একটা অল্‌-
আউট কিছু করবার আগে নিজেদের শক্তি—স্ট্যামিনা—
সব ভালো করে যাচাই করা দরকার। নইলে শেষ পর্যন্ত
এই রকমই দাঁড়ায়।

—কত অসহ্য হলে এ মানুষগুলোকে এমন করে পথে
নামতে হয়, সে-কথা ভেবে দেখো পরিতোষ।

—এগ্‌জাক্‌ট্‌লি। কিন্তু মোরেল্‌' যদি ঠিক না
থাকে—তা হলে কী মানে হয় এ-সবের—পরিতোষ
বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল: আরে—সবাই কি
লেবার যে কথায়-কথায় অল্‌ আউট স্ট্রাইক চালিয়ে যেতে
পারে? মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট—সেন্স অব প্রেস্‌টিজ—এ-
সব যাবে কোথায়? খাঁটি হ্যাভ্‌-নট্‌ না হতে পারলে
মরীয়া হওয়া যায়না। আমার কী মনে হয়, জানো?
মিড্‌ল-ক্লাসের পক্ষে একটা পীস্‌ফুল সেটলমেন্টই হচ্ছে সব
চাইতে ভালো উপায়। সংগ্রামে নামবার আগে আমাদের
অন্ততঃ দশবার ভেবে দেখা উচিত।

—কিন্তু তুমি তো জানো, পীস্‌ফুল সেট্‌লমেন্টের জন্যে
চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

—বাট্‌ ইউ শুড্‌ ট্রাই এগেন। তা ছাড়া—এইবার
বড় দরের সরকারী চাকুরে পরিতোষ মৈত্র কথা কইল:
প্রেসার দেওয়ার আগে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে
গবর্ণমেন্টের হাতে এখন অনেক বড় বড় প্ল্যান—বিস্তর
টাকা সে জন্যে খরচ করতে হবে। টীচারদের যখন এত-
দিন সহ্য হচ্ছিল, তখন আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরলে কোনো
ক্ষতি ছিল না।

সত্যজিৎ হাসল। তর্ক করা যায়। কিন্তু কার সঙ্গে?
পরিতোষ বদলে গেছে—মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো

র্যন্ত তার অন্য রকম হয়ে গেছে। একেবারে আলাদা দৃষ্টি, আলাদা মন নিয়ে সব কিছু দেখছে সে।

পরিতোষ বললে, আচ্ছা, আসি তবে। অনেকদিন পরে দেখা হল। সো গ্ল্যাড্ টু মীট্ ইউ।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল। এগিয়ে গেল পরিতোষ।

হয়তো কিছু সত্যি থাকতে পারে ওর কথায়। হয়তো নিজেদের শক্তিকে ঠিক মতো যাচাই করে দেখা হয়নি। কিন্তু কেবল তত্ত্ব আর তর্কটাই কি আসল কথা? অভাবটা তো মিথ্যে নয়। প্রতিদিনের ক্ষুধাকে তো তর্ক দিয়ে মিথ্যে করা চলে না। এই দুঃসময়ের বাজারে যখন অন্তত তিনশো টাকার কমে একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার চলতে চায় না—তখন এই সব নিচের তলার শিক্ষকেরা কেমন করে বেঁচে আছেন—কী করে যে তাঁদের দু-বেলার সংস্থান হচ্ছে—সে রহস্যের কোনো মীমাংসা তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

একেবারে সর্বনাশের মুখে পা না দিলে কি এঁরা এমন ভাবে এসে এই পথের ওপর আশ্রয় নিতেন? আধ-পেটা খেয়েও যাঁরা এতদিন নিজেদের মনকে আঁকড়ে রেখেছিলেন—একেবারে অনাহারের বিভীষিকা না দেখলে তাঁরা কি আসন পাততেন ধুলোর ওপর?

হায় বুনো রামনাথ। তাঁকে সম্ভবত পঁয়ত্রিশ টাকা মণের চাল কিনতে হত না। আর এ-কথাও তিনি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিলেন, তেঁতুল পাতা কিনতেও পয়সা খরচ করতে হয়?

ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সত্যজিৎ। বনশ্রীর বইটা দেখে রাখতে হবে। কালকেই অন্তত তার কিছুটা অংশ নেবার জন্যে লোক এসে হানা দেবে।

শ্রান্ত গতিতে দক্ষিণের দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ সত্যজিৎ থমকে গেল। একটু দূরেই একটা ট্যাক্সি বাঁক নিচ্ছে ময়দানের দিকে। সেই গাড়িতে রীতেন দি গ্রেট্। সেই বিচিত্র দাড়ি—বিচিত্র হাওয়াই সার্ট।

আর রীতেনের পাশে যে বসে আছে সে প্রীতি। প্রীতি ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রীতির সন্ধ্যায় রেডিয়ো প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু গার্স্টিন্ প্লেস্ থেকে মুখার্জি ভিলায় ফিরে যাওয়ার রাস্তাটা ময়দানের ভেতর দিয়ে নয়।

মাঠের অন্ধকারে গাড়ির পেছনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনো। সত্যজিৎ ভুরু কুঁচকে ওই আলোটার দিকেই তাকিয়ে রইল। রাত্রির ময়দান থেকে এক ঝলক অন্ধকার এসে তারও মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। বীথির জন্যে তার কোনোদিন কোনো দুর্ভাবনা হয়না—কিন্তু প্রীতিকে বিশ্বাস নেই।

মুখার্জি ভিলাকে এখনো অনেক ঋণ শোধ করতে হবে। এখনো তার অনেক দেনা বাকি। কিন্তু তাই বলে রীতেন?

অন্ধকারমাখা মন নিয়ে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সত্যজিৎ। তারপর নিয়নের কুশ্রী আত্ম-ঘোষণাগুলো যখন তার চোখে পিনের মতো খোঁচা দিতে লাগল, তখন সামনে যে বাসটা সে পেলো, লাফিয়ে উঠল তারই ওপরে।

ক্রমশঃ

বৈদেশিকী
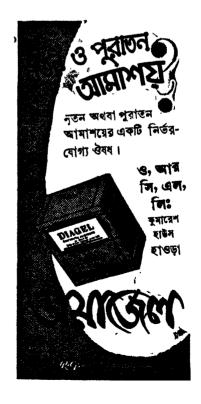
অতুল দত্ত

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে একটা থম্‌থমে ভাব চলিতেছে। এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন্ বোমার পর এখন এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সে অস্ত্র নিক্ষেপের প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং পরিস্থিতি এখন নূতনতর। এই নূতন পরিস্থিতিতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য আর একবার সচেষ্ট হইবার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ বিশেষভাবে বোধ করিতেছে। এই মনোভাব গত ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "ন্যাটো" সম্মেলনে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শিবিরের রাষ্ট্রনায়কগণ রাষ্ট্রপ্রধানের পর্য্যায়ে আলোচনা করিতে সম্মত নন; প্রথমে পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে আলোচনার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে এই আলোচনা অর্থহীন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কিন্তু জনগণের এই আপোষকামী মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাবসম্বলিত পত্র মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনায়কগণ এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইতেছেন না।

সোভিয়েট প্রস্তাব ও মার্কিণ উত্তর—

গত ৯ই জানুয়ারী বৃটেনে, আমেরিকায় এবং আরও সতরটি রাষ্ট্রের নিকট চিঠি লিখিয়া মার্শাল বুলগ্যানিন্ জানান যে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের জন্য পরবর্ত্তী দুই দিন মাসের মধ্যে তাঁহারা রাষ্ট্রপ্রধানদের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে চান। এই চিঠিতে রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের আলোচ্য রূপে দুই পক্ষের সমরায়োজনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের দুই পাশে বিমানের সাহায্যে পাঁচ শত মাইল পর্য্যন্ত স্থানের ফটো লইবার, এবং রেল জংসনে, বৃহৎ বন্দরে ও বড় বড় রাস্তায় পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, ইহা ছাড়া আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার, মধ্য ইউরোপকে আণবিক অস্ত্র হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য পোলিস পরিকল্পনার (র‍্যাপাটাস্কি পরিকল্পনার) এবং মধ্য প্রাচ্যের প্রতিরক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলিকে চুক্তিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে আমেরিকা, বৃটেন্ ও রুশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির এবং আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার এক প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই।

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে সর্ত্তাবলী উত্থাপন করেন, তাহা ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ আলোচনার পথ শীঘ্র সুগম হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনাক্রমণ চুক্তি এবং আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জাতি-সঙ্ঘের সনদের স্বাক্ষরকারী হিসাবে সকলেই যখন আক্রমণে বিরত থাকিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তখন এই ধরণের চুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু, প্রশ্ন হইতে পারে, জাতি-সঙ্ঘের সনদে স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের গলা টিপিবার জন্য যদি এই বিপুল আয়োজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে সনদের মর্য্যাদা কী এমন ক্ষুণ্ণ হইত? অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা যে আক্রমণ নিবারিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে আছে সত্য। তবে, অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে সমরোত্তেজনা হ্রাস হইতে পারে। এই সম্পর্কে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"One of the chief reasons for the present state of tention in international relations, and for all that is meant by 'cold war' is the abnormal character of the relations between the Soviet Union and the United States of America. অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা এই abnormal relation কতকটা normal হইলে শান্ত অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা অগ্রসর হইতে পারে। আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দুই তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখিবার সোভিয়েট প্রস্তাব সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ারের উত্তর—আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করাই প্রকৃত সমস্যা। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিয়া আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করিয়া যাইবার স্বাধীনতা লাভই কি সোভিয়েট প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা অস্ত্র-নির্ম্মাণ বন্ধ রাখিবার প্রথম সোপান। বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিলে নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টায় তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। দুই তিন বৎসরের জন্য বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিয়া অস্ত্র নির্ম্মাণ বন্ধ রাখিবার প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার উত্তরে এমন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, যাহার আপাততঃ সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার ব্যতীত অন্য কোনও গুরুত্ব নাই। তিনি জাতি-সঙ্ঘের স্থায়ী সদস্যদের "ভিটো" অধিকার ত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভিটো অধিকার যে মূলতঃ গণতন্ত্রবিরোধী, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু জাতি-সঙ্ঘে দক্ষিণ আমেরিকার বাইশটি ভোট যত দিন মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের পকেটে, "ন্যাটো" পনরটি শক্তির এবং বাগদাদ চুক্তির ও "সিয়াটো" শক্তিগুলির রাজনৈতিক টিকি আমেরিকার হাতে, এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ জাতি-সঙ্ঘে শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ,

ততদিন সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে "ভিটোর" অধিকার ত্যাগের অর্থ রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ, যাহা সে কখনই করিতে পারে না। জাতি-সঙ্ঘে বর্ত্তমানে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সত্য। কিন্তু যতদিন এই প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইবে, জাতি-সঙ্ঘের মারফৎ অর্থ-নৈতিক সাহায্য বণ্টনের ব্যবস্থা না হইবে, এবং আন্তর্জ্জাতিক সমর জোটগুলি না ভাঙ্গিবে, ততদিন "ভিটোর" অধিকারের প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় "ভিটোর" অধিকার বর্জ্জিত হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে না,—জাতি-সঙ্ঘে আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। বস্তুতঃ, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্শাল বুলগ্যানিনের প্রস্তাবের উত্তরে যে সব পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে রাষ্ট্রপ্রধানের পর্য্যায়ে আপোষ-আলোচনার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং, বলা চলে—সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন অস্ত্রসজ্জায় আমেরিকা যে ভীত নহে, এবং তাহার পূর্ব নীতি বর্জ্জন করিতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের লিপিতে। সেই সঙ্গে আর আছে—বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থার জন্ম সোভিয়েট রুশিয়াকে দায়ী করিবার প্রয়াস।

বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

জানুয়ারীর শেষের দিকে আঙ্কারায় বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে "ন্যাটোর" রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের এই বৈঠক। "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশে আণবিক অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা করা এবং তিন বৎসর পরে (আমেরিকার মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ারী হইলে) ঐ সব দেশে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপন করা প্যারিস সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। "ন্যাটো" এবং বাগদাদ চুক্তি—উভয়ের সভ্যরূপে তুরস্ক পশ্চিম ও পূর্ব্বের এই দুই সামরিক প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র। প্যারিস বৈঠকে বৃটেনের পরে একমাত্র তুরস্কই তাহার রাজ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী স্থাপনের প্রস্তাব নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছিল। ইহার পর বাগদাদ্ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যেও এইরূপ ঘাঁটী স্থাপনের চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। রুশিয়ার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে আমেরিকাকে রক্ষা করিবার জন্ম কম্যুনিষ্ট রাজ্যগুলির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে আণবিক অস্ত্র উদ্যত রাখিবার এবং মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজনের দিক হইতে মধ্য-প্রাচ্যের ইরাক-ইরাণ, এমন কি পাকিস্থানের ভৌগোলিক গুরুত্ব পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি অপেক্ষা কম নহে। তুরস্কের ন্যায় ইহারাও সোভিয়েট ইউনিয়নের একেবারে নিকটে। অবশ্য, আঙ্কারায় মার্কিণ প্রতিনিধিমণ্ডলের মুখপাত্র বলেন যে, বাগদাদ্ চুক্তির সভ্যরাষ্ট্রগুলিকে "এখনই" ক্ষেপণাস্ত্র দিবার ইচ্ছা আমেরিকার নাই; কারণ "ন্যাটোর" রাজ্যগুলিকে সর্ব্বাগ্রে এই অস্ত্র প্রদান করিতে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "এখনই" বাগদাদ চুক্তির রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রদানের প্রশ্ন কোনক্রমেই ওঠে না: ইহার প্রথম কারণ—এখনও আমেরিকায় এই অস্ত্র তৈয়ারী হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—দূরবর্ত্তী অঞ্চলে নিক্ষেপের প্রক্রিয়া হইতে যে অস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হইবে' তাহা আণবিক অস্ত্র; আমেরিকার "ম্যাক্কারাণ" আইন অনুসারে এই অস্ত্র অন্য শক্তির হাতে দেওয়া নিষিদ্ধ। আমেরিকা যদি বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভ্য হয়, এবং এই চুক্তি সংস্থার সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠিত হইবার পর সর্ব্বাধিনায়কের পদে এক জন মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারী যদি নিযুক্ত হন, এক মাত্র তাহা হইলেই সেই সামরিক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের রাজ্যসমূহে মার্কিণ আণবিক অস্ত্র প্রদান করা আইনানুগ হইতে পারে। এইভাবেই "ম্যাক্কারাণ আইন" বাঁচাইয়া "ন্যাটোর" সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল নর্ট্যাডের তত্ত্বাবধানে ঐ সংস্থার রাজ্যগুলিকে আণবিক অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে আঙ্কারায় কোনও সিদ্ধান্ত না হইলেও এই সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা সেখানে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জনমত প্রস্তুত করিবার নির্দ্দেশ হয়ত সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকা বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সভ্য না হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ডালেসের আঙ্কারায় ছুটিয়া আসিবার কারণ হয়ত ইহাই।

বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও স্বার্থবুদ্ধির বিভিন্নতা যথেষ্ট। ইহাদের মধ্যে তুরস্ক ও ইরাণের সোভিয়েট-ভীতি কতকটা প্রকৃত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালীন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটি রাষ্ট্রের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দের মনে আন্তর্জ্জাতিক কমুনিজম্ তথা সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্তে—সীরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তুরস্ক আরও বেশী অস্বস্তি বোধ করিতেছে। সুতরাং, সোভিয়েট-বিরোধী ও কমুনিষ্ট-বিরোধী সকল প্রকার ব্যবস্থায় তুরস্কের উৎসাহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সম্পর্কে ইরাণের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দও নিরুৎসাহ নহেন। কিন্তু ইরাক্ ও পাকিস্থানের ব্যাপার আলাদা। বাগদাদ্ চুক্তির চারিটি মুসলীম রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র আরব রাষ্ট্র হইল ইরাক। কমুনিষ্ট আখ্যা দিয়া দেশের বামপন্থী শক্তিকে দমন করিবার জন্ম এবং নিজেদের বাহু শক্তিশালী করিবার প্রয়োজনে ইরাকের বর্ত্তমান শাসকবৃন্দের কমুনিষ্ট-বিরোধী শিবিরে যাইবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার কোনরূপ আচরণে প্রত্যক্ষভাবে আতঙ্কিত হইবার বাস্তব কারণ তাহার নাই; কমুনিষ্ট-বিরোধী নীতি ইরাকী জনসাধারণের মনে রেখা পাত করে কম। বিশেষতঃ কমুনিষ্ট-বিরোধী প্রচারের সহিত আরব রাষ্ট্র সীরিয়া ও মিশরের বিরুদ্ধে প্রচার একত্রিত হওয়ায় তাহাদের মনে সন্দেহ জাগে। আরব জগতের বুকের উপর জোর করিয়া ইস্রাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে অন্যান্য আরবদের মত ইরাকীরাও বিক্ষুব্ধ। সেই ইস্রাইলের পৃষ্ঠপোষক পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সহিত এক সঙ্গে কমুনিষ্ট বিরোধী শিবিরে মিলিত হইতে তাহাদের অনিচ্ছা খুবই। ইরাকী জনসাধারণের এই মনোভাবের জন্যই আঙ্কারা বৈঠকে ইরাকের প্রতিনিধি, সীরিয়ায় কমুনিষ্ট প্রভাব অপেক্ষা ইস্রাইল সম্পর্কে বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাহার পর পাকিস্থান। কমুনিষ্ট আক্রমণের

আশঙ্কা, অথবা ইস্রাইল ইহার সমস্যা নহে। এই রাষ্ট্রটি একমাত্র তাহার প্রতিবেশী ভারতকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিয়াছে; সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ভারত শঙ্কিত হইবে, পাশ্চাত্য শিবিরে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিলে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার সমর্থক জুটিবে—ইহাই তাহার আশা। ইহা ছাড়া, প্রগতিশীল ঐতিহ্যবিহীন পাকিস্থানী রাষ্ট্রনায়কগণ নিরপেক্ষ নীতির মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; আন্তর্জাতিক সময়-জোটে ভিড়িয়া গেলেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে ক্ষীর ও মধুর দরিয়া বহিয়া চলিবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিলে ভারতের নেতৃত্ব মানিতে হইতে পারে বলিয়াও তাঁহাদের আশঙ্কা। আঙ্কারায় কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের সমর্থক জুটিয়াছিল ইরাক, কারণ এই প্রশ্নের সহিত আরব জগতের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা কূটনৈতিক কারণে কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও পক্ষ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় এই প্রসঙ্গ আঙ্কারা সম্মেলনের প্রস্তাবে স্থান পায় নাই। ইহার জন্য বৃটেন ও তুরস্ককে সাইপ্রাস সম্পর্কিত দাবী ছাড়িতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আপত্তিতে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গও বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের প্রস্তাবে বাদ পড়িয়াছে। সীরিয়ার প্রতি আমেরিকা অত্যন্ত বিরূপ। তাই, হয়ত ইরাকের আপত্তি সত্বেও, সীরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইঙ্গিত প্রস্তাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইঙ্গিতটি এইরূপ—কেবল "কমুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ" নহে, "কমুনিষ্ট প্ররোচিত সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্বের" বিরুদ্ধেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। "ন্যাটো" এবং বাগদাদ চুক্তির মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। "ন্যাটোর" অধিকাংশ সভ্য রাষ্ট্র-গুলিতে কমুনিষ্ট আতঙ্ক প্রকৃত। যেভাবেই হউক, এই সব দেশে এই আতঙ্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের সাধারণ মিলনের ক্ষেত্র সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির এই স্বাভাবিক মিলনের ক্ষেত্র নাই। এখানে কয়েকটি রাষ্ট্রের কমুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিরক্ষার কথা বাহিরের মুখোস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির সাহায্যে তাহারা নিজেদের অন্য স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চায়। সুতরাং, বাগদাদ চুক্তিকে ন্যাটোর আদর্শে গড়িয়া তোলা সহজ নয়।

২।২।৫৮

ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উঠে দাঁড়াতে পা দুটো এখনও টলে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। তবুও অতসী দুপুর-ফাঁকে কখন চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, নিবারণ টেরও পায় না। এখন আর সে ঘরে তালা দিয়ে যায় না। কানেস্তারার কপাটটা আস্তে আস্তে টেনে, নিঃশব্দে মরচে-ধরা সুর্সোয় শিকলটা আটকে দেয়।

কি-ই বা আছে ওর, যে চোরে চুরি করবে! দু'খানা ভাঙা শান্‌কি, একটা মেটে হাঁড়ি, জলের কলসী, ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর, আর তেলচিট-ধরা বালিশটা। যায়—যাবে। ...কিন্তু দীনু যদি এসে ফিরে যায়!...ঘর খোলা না পেলে, সে নিশ্চয়ই যাবে চলে। একতিলও সবুর সইবে না তার। সে হয়তো কোনদিনই জানতে চায়নি অতসীর মনটাকে। কিন্তু অতসী যে চিনেছে তাকে। দিনের পর দিন না খেয়ে যে মানুষ কোম্পানী-বাগানের একটা কোণে পড়ে থাকে, মনের খেয়ালে আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দত্যির মতন দোতলা বাস গাড়ীর সামনে—অপঘাত মরবে ব'লে, তাকে চিনতে কি অতসীর আজও বাকী আছে!...হয়তো সে আবার তেমনি করে ঝাঁপ দিয়েছে গাড়ীর তলায়, না-হয় হাবড়ার পুল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা-গঙ্গার জলে। মরেছে! হয়তো মনের ঘেন্নায় জীবনটাকে তলিয়ে দিয়েছে গাড়ীর চাকায়, না-হয় জলের তলায়।

দোষ তার নাই। দোষ অতসীর অদৃষ্টের।...কপাল ওর পোড়া। অমনি পোড়া কপাল নিয়েই সে জন্মেছে। নইলে, অমন জল-জ্যান্ত মা-ভাই-বাপ দিনের পর দিন উপোস করে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে কেন! অন্ধ বাপও যখন গেল, তখন আর অতসীর কোন সম্বলই ছিল না। তবুও সে বেঁচে ছিল খোকা আর দীনুর মুখ তাকিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দু-মুঠো চাল আর দু-গণ্ডা পয়সা সেধে এনে কোন রকমে দিন গুজরাণ করেছে। ওর বুকের দুধ খেয়েই খোকা এতকাল বেঁচে ছিল। কিন্তু দীনু! দীনু পারতো না গিলতে পাঁচ-মিশালি চালের দলা-পাকানো ভাতগুলো। সে-অভ্যেস তো ছিল না কোনদিন। ভালো ঘরেই জন্মেছিল। অদৃষ্টের বিপাকে এসে জুটেছিল ওদের ওই আস্তানায়। আস্তানা তো নয়, জ্যান্ত মানুষের ভাগাড়। তাও কি সে এসে জুটতো? না-খেয়ে না-দেয়ে মাঠে-ঘাটে ফুটপাতে কোম্পানীর বাগানেই কাটাতো দিন-রাত। অতসী জোর করে তাকে টেনে এনেছিল ওই একটুখানি খাপরা-চালার ছাউনির তলায়।

কিন্তু তাও ওই গন্নাকাটি সইতে পারে নি। হিংসেয় বিষিয়ে উঠেছিল। কাটা ঠোঁটখানা বাঁকিয়ে, চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিল: গাঁটছড়া দিয়ে এ-আবার কাকে বেঁধে আনলি লো?... কপাল ভা-লো।

শুনে গা-টা গিস্‌গিস্ করে উঠেছিল। তবুও মুখে-ফুটে সে কোন কথা বলেনি, পাছে গন্নাকাটি খিস্তি-খেউড়ে সারা বস্তি মাথায় করে বসে।

ওর চুপ করে থাকাটাও যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল—কুড়নো সোনা ছেঁড়া কাপড়ের খোঁটে গাঁট-বেঁধে শুধু আনলেই হয় না, পথভিকিরীর কপালে সইলে হয়!

অতসী চমকে উঠেছিল: ভিকিরী! সত্যি ওরা ভিকিরী আজ। কিন্তু এমনি পথ-ভিকিরী যে ছিল না ওরা, সে কথা কি পদ্মদিদি জানে না!...জানে, নিশ্চয়ই জানে। কতবার শুনেছে ওর কাছে। কিন্তু বিশ্বাস হয়তো করে না সে।...করবেই বা কেন!

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছিল। বুকের ভিতরটা শিউরে উঠেছিল আতঙ্কে, অজ্ঞাত আশঙ্কায়। বারবার শুধু আপন

করে বলেছিল : কপালে সইবে বলে তো
[?]নি নি ডেকে।…কেন যে ডেকে এনেছিলাম, তা পদ্ম-
[দি]দি বুঝবে না। ওদের মত গরীব তো সে নয়। দু-বেলা
[দু]মুঠো পেটের ভাতের জন্যে হাত পাতে না কারো কাছে।
[?]পে একখানা কাপড়ও জোটে।…দিনে যেমন গতর
[খা]টায়, রাতে তেমনি আদরও খায়।
ছিঃ!…পর মুহূর্তেই মনটা ধিকারে ভরে উঠেছিল :
[?]র ভাবতে গেল সে ওর কথা! নিজের ভাতেই যার
[?], পরের কথা ভেবে তার লাভ কি? অতসী যেন
[নিজে]র কাছেই সংকোচে জড়সড় হয়ে পড়েছিল।

ফলেছে। পদ্মদিদি যা বলেছিল, তার সবই তো
[ফ]লেছে ওর কপাল গুণে। দীনু আবার ছিটকে পালিয়েছে!
[জ্ব]রের ধাক্কায় মুখে রক্ত উঠে ও যখন বিছানায় পড়েছিল,
[?]দিন সেই যে রাতের বেলায় হাতড়ে হাতড়ে কেরোসিনের
[ডি]বটা জ্বেলে, মাথার কাছে খানিকক্ষণ বসে থেকে দীনু
[চো]রের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আজও গেল— কালও
[গে]ল। আর ফিরলো না।

একরত্তি চিহ্ন ছিল খোকা। কাঙালের কুড়িয়ে
[পা]ওয়া মাণিক! সেও কোল থেকে ছিটকে পড়েছিল সেই
[লরী]র ধাক্কায়। তুলতুলে নরম শরীর, শান বাঁধানো পথে
[আছা]ড় খেয়ে পড়ে খোকা চীৎকার করে উঠেছিল ভয়ে।
[?] নয়, হয়তো চোট লেগেছিল মাথায়। মুখে তো তার
[বুলি] ফোটে নি তখনও, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে নি
[?]। কিন্তু ব্যথা তার লেগেছিল। মা হয়ে অতসী কি
[?] বোঝেনি সে কথা।…বুকে তুলে নিয়ে কেমন করে
[অ]তসী বস্তিতে ফিরে এসেছিল, সে কথা আজ সে
[ভাব]তেও পারে না।

নিবারণবাবু বলেছে, খোকাকে হাসপাতালে দিয়েছে।
[?] কথা। অতসী ঠিক জানে হাসপাতালে নেয়নি
[?]ক।…মরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে সে। দিনের পর দিন
[?] ও বেঘোরে পড়েছিল বিছানায়, বুকে একফোঁটা দুধও
[?]না, খোকা মরেছে তিল তিল করে শুকিয়ে। চীৎকার
[?] হয়তো কেঁদেছে সারাটা দিন-রাত।…শেষে! শেষে
ছেলেটাকে নিবারণবাবু বুকের ভিতর থেকে ছিনিয়ে
[?] গিয়ে, জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে নিমতলার ঘাটে।

চোখ দুটো ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। ওর পাথর-
[?] বুকের রুদ্ধ ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে। মনে হয়
[?]র আবেগে কপালের শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে যাবে।
শিরা-উপশিরায় স্বল্প-প্রবাহিত ক্ষীণ রক্তস্রোত যেন
[?] জোয়ারের চাপে ফুলে ফুলে ওঠে।

চোখে জল ঝরে। কিন্তু ঠোঁট দুটো ওর কাঁপে না।
[?] দাঁত চেপে অতসী কান্নার বেগ সামলে নেয়।
কি সই, আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ!
অতসীর চিন্তায় বাধা পড়ে। চমকে পিছন ফিরে চায়।
মুহূর্তে এলোমেলো মনটা উত্তাপে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু
মুখে কিছু বলে না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় সামনের পথে।

…বিড়ির দোকানের সেই ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা যে
কখন ওর পিছু নিয়েছে, অতসী তা বুঝতেও পারে নি।

সিস দিয়ে ছোঁড়াটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। দু-পা
এগিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে তাকায় ওর মুখপানে। একটু
পিছিয়ে, গলাটা লম্বা করে সুর টেনে বলে—কাঁচা বাঁশে
ঘুন ধরিয়ে ফেললে যে! আম্‌সি হয়ে গেল সব।

অতসী বিব্রত হয়ে পড়ে। ইচ্ছে করে, ছুটে পালায়।
কিন্তু পারে না। একটু ইতস্তত করে বলে—পথ ছাড়ো।

তা তো ছাড়বোই। কিন্তু দেহটাকে যে মেটিয়ে
ফেলেছ। পেটের দায়ে বাছ-বিচার আর করনি বুঝি?

না : অতসী আর অপেক্ষা করে না। ফুটপাত ছেড়ে
রাস্তায় নেমে পড়ে। পথটা পার হয়ে, হন্‌হন্ করে গিয়ে
ওঠে ও-পাশের ফুটপাতে।

ছোঁড়াটা সিস দিতে-দিতে সামনের পথে এগিয়ে চলে,
আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে।

অতসী মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবুও যেন নিষ্কৃতি পায়
না।—ছোঁড়াটা মাথায় ফুলেল তেল মেখেছে। তার
উৎকট গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, নাকের সামনে ঘুরঘুর
করে। মগজে জ্বালা ধরে যায়।

ছোঁড়াটা সমান তালে পা ফেলে চলেছে।

অতসী মোড় ফিরলো।

অনেক দিন পরে আজ সে পথে বেরিয়েছে। মাসের
পর মাস না হেঁটে, পায়ের পেশিগুলো যেন নির্জীব হয়ে
পড়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হাঁটু-দুটোয় খিল ধরে।
তবুও থামে না, ঝিমিয়ে-পড়া দেহটাকে অতসী মনের
জোরে টেনে নিয়ে যায় পথের স্রোতে। অবসন্ন নিষ্প্রভ
চোখ দুটো চঞ্চল গতিতে কি খুঁজে মরে পথের আনাচে-
কানাচে।

চলে। আরও এগিয়ে চলে।

ধর্মতলার কোণে, পুরানো বই-এর দোকানটার ওপাশে
চীনেবাদাম-আলা যেখানে ঝালনুন আর বাদাম ভাজা নিয়ে
বসে থাকে, সেইখানে ভাঙা রাধাচূড়া গাছটার তলায়, ফুট-
পাতের কোণটিতে বসে আছে সেই কানা পাগলিটা।
আগেও ঠিক এই জায়গাটাতেই বসে থাকতো সে। আপন-
মনে পিকপিক করে হাসতো আর মাথা চুলকাতো। তেল-
জল না-পেয়ে মাথার চুলগুলো গাঙশালিকের বাসার মত
জট পাকিয়ে উঠেছে। সাতপুরু চামড়ায় ময়লার রঙ
ধরেছে। সারাগায়ে জড়ুলের মত চাকাচাকা ময়লার দাগে
ভরে উঠেছে, দিনের পর দিন ধুলো আর ঘাম ব'সে।
চোখ নাই, তবু বেঁচেছে ঘেন্নার হাত থেকে।

লজ্জা ওর সেদিনও ছিল না, আজও নাই। খালি

গায়ে বসে থাকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম—সমানে ঠাঁই বসে থাকে এই থানটিতে। কোমরে শতছিন্ন একফালি নেকড়া জড়ানো। সরমের মাথা খেলেও যৌবনের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এঁ্যা!

অতসী হঠাৎ চমকে ওঠে। ভ্রূদুটো কুঁচকে, চোখের দৃষ্টিটা ধারাল করে নিয়ে, দু'পা এগিয়ে যায় অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায়: খোকা!···

থমকে দাঁড়ায়। পাদুটো চলে না। আকস্মিক আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে ওর সর্বশরীর। মনে হয়, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে পাথরের ধাপে।

খোকা?···ওর খোকাকে চুরি করে এনেছে কানা পাগলিটা?

হৃৎপিণ্ডের গতি যেন রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মত দ্রুত হয়ে ওঠে। মগজটা টনটন করে ক্ষিপ্ত রক্তপ্রবাহে।··· খোকা!···খোকা!

না—না—না। আচম্বিতে চোখে পড়লো ছেলেটার চেপ্টা নাক আর গুলগুলে চোখদুটো।

অতসী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ওর রুদ্ধপ্রায় শ্বাসযন্ত্র যেন এতক্ষণে সক্রিয় হয়ে আসে।···খোকা নয়। খোকার চোখ-মুখ-নাক! সে কি যে-সে ছেলের আছে?···চুরি কেউ করে নি। সে মরেছে। মটর গাড়ীর ধাক্কায় শান-বাঁধানো পথে ছিটকে পড়েছিল। হয়তো ভেঙে গিয়েছিল পাঁজরার কচি হাড়-ক'খানা। তারপর, দিনের পর দিন এক ফোঁটাও দুধ পায় নি। শুকনো চামড়ার বোঁটাটা টেনে টেনে চোয়াল-দুটোয় খিল ধরে গিয়েছিল। নইলে, কে নেবে ভিকিরীর ছেলে চুরি করে! নিয়ে কি লাভই বা হবে তার!

অবসন্ন শরীরটা টেনে নিয়ে গিয়ে অতসী রাধাচূড়া গাছটায় ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়ায়।

তবে?

এই কানা পাগলিটাও ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আবর্জনার স্তূপের মত বসে থাকে তার যৌবনের বালাই নিয়ে। গায়ের বোট্‌কা গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। সর্বাঙ্গে থিকথিক করে ঘামের ওপর জমাট-বাঁধা পলিমাটি। তাও পেয়েছে কোলে একটা ছেলে!··· হয় কোন ঝাঁকামুটে, না-হয় ফুটপাত-গড়ানো নুলো ভিকিরী কেউ করেছে এই অসীম দয়া।···হায় ওর অদৃষ্ট! ছেলেটা যে কি-কপাল নিয়ে জন্মেছে, তা বিধাতাপুরুষই জানে। কেন মরলো না পেটে!

অতসী চোখদুটো বন্ধ করে কাদামাটির পিণ্ডের মত শিথিল দেহে দাঁড়িয়ে থাকে গাছটার পিঠ দিয়ে। মাথার ভিতর কতকগুলো পোকা যেন পিলপিল করে। মস্তিষ্কে হয়তো ঝড় বইতে সুরু করেছে।

ছেলেটা চুকচুক্ করে মায়ের দুধ টানে। ওর কানে সেই অস্পষ্ট শব্দটা ভেসে আসে। উদগ্র শিরা-উপশিরায় অবসাদের স্রোত বয়ে যায়। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে অতসী প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

মহানগরীর শ্রান্ত দুপুর। খর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করে। পথে লোকচলাচল কমে এসেছে। এখন আর গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় নাই। পায়ের নীচে উত্তপ্ত ফুটপাত। গরম বাতাসে ঝলসানো পিচের গন্ধ।

অতসী চোখতুলে আকাশের দিকে চায়। কলকব্জার ধোঁয়ায় পূবের আকাশটা তামাটে হয়ে উঠেছে। দূরে কবারবস্তিগুলোর ওপর অসংখ্য চিল ডানামেলে গা ঢেলে দিয়েছে আকাশে। কোনটা বা ঝাঁকের কোল কাটিয়ে কাৎ হয়ে নামবার চেষ্টা করে ছোঁ মারবার চেষ্টায়। তাজা মাংসের গন্ধে হয়তো টনক নড়েছে।

অনেকদিন পর অতসী আজ পথে বেরিয়েছে। তাই পথ চলতে পায়ে-পায়ে কেমন বাধা ঠেকে। এই ক'মাসে যেন অনেক বদলে গিয়েছে পথগুলো। কেমন নিরিবিলি নিঃসঙ্গ!

কি হলো হঠাৎ? একদিন এইসব পথে কাতারে-কাত্যারে ভিকিরী গড়িয়ে বেড়াতো। কানা-খোঁড়া, নুলো, অন্ধ-কুঠে! কোথায় গেল তারা? এ-পথে অতসী তো আজ নতুন আসছে না। দিনের পর দিন ওর অন্ধ বাপের হাত ধরে ঘুরেছে এই পথে। কিন্তু—এমন ফাঁকা পথ তো ছিল না কোনদিন!

ফাঁকা! সত্যি ফাঁকা। সবই যেন ফাঁকা মনে হয় আজ। ওর হাত ফাঁকা, কোল ফাঁকা, মন ফাঁকা। তবুও অতসী এগিয়ে চলে। ফাগুনের ঝড়ো বাতাসের মত গলির মোড়ে-মোড়ে ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে যায় নিরালম্ব উদাস মনে। পথের টানেই পা বাড়ায়। কেন যে আজ বেরিয়েছে পথে, সে-কথা ও নিজেও জানে না।

পথের দক্ষিণ পাশ ঘেঁসে দৈত্যের মত একখানা দোতলা বাস মাটি কাঁপিয়ে ছুটে গেল। ফুটপাতটা কাঁপে। পায়ের তলার শানটাও যেন ঝিন্‌ঝিন্ করে কেঁপে ওঠে।

আচম্বিতে মাথায় কেমন একটা দোলা লাগে চঞ্চল রক্তস্রোতের।···গাড়ী তো নয়, মানুষ মারবার যাঁতা কল।

মাথাটা ঘুরে ওঠে। হঠাৎ অতসী থমকে দাঁড়ায়। চোখদুটো রগড়ে ভালো করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

হাঁ।···ঠিক।···ঠিক সেই জায়গাটা।···ফুটপাতের কিনারায় পাথর থামার গায়ে যেন এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে! এই পাথরটার ওপরেই নীচু হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বাসচাপা সে পড়েনি। কিন্তু পাথরে চোট লেগে, কপালটা কি কম কেটেছিল! চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত পড়েছিল সারাটা রাত।

অতসী যখন নেকড়া পুড়িয়ে গরম গরম পলস্তারা দিয়ে দিয়েছিল, দীন শুধু একটুখানি হেসেছিল। ক্লান্ত চোখদুটো তুলে একবার তাকিয়েছিল অতসীর মুখপানে।

কতক্ষণই বা! সে কিন্তু সেই এক নিমিষের একটুখানি অতসীর বুকের তলা পর্যন্ত পৌঁচেছিল।…পথ ভিকিরী, পথের কাঙাল মেয়ে। হাতের কাছে যেন স্বর্গ নেমে এসেছিল।

হায় অদৃষ্ট!…বুকের ভিতর সেই চোখদুটো আজও জ্বল করে। সেই চোখই তো পেয়েছিল খোকা।

কখন ওর স্তিমিত সংবিৎ আবার ফিরে এসেছে, কখন আবার সামনের পথে এগিয়ে অতখানি পথ ছাড়িয়ে ময়দানের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে-খেয়ালও ল না অতসীর।

রাস্তা পার হতে গিয়ে আচম্‌কা একখানা মটর গাড়ীর শুনে ওর চমক ভাঙলো। সামনে, একবার নিতান্ত মনে এসে পড়েছে ট্যাক্সিখানা। তাড়াতাড়ি আগে বাড়ানো টা পিছিয়ে নিয়ে, হকচকিয়ে থেমে গেল মাঝ রাস্তায়।

গাড়ীখানা তখন ব্রেক করেছে।

ড্রাইভারটা ধমক দিয়ে ওঠে: আঁখ নেই হ্যায়?

আঁখ! আঁখ!…না।…দেখিনি: অতসী কেমন পিয়ে ওঠে। কথা সরে না মুখে।

না, ছিল না। সত্যি আঁখ ওর ছিল না এতক্ষণ। আপনমনে চলেছিল দম-দেওয়া কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে পা ফেলে। ড্রাইভারটার ধমক খেয়ে চোখ তুলে র: ম্লান, নিষ্প্রভ, বিহ্বল দৃষ্টি।

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো: কে!…নন্দা!…হাঁ, হাঁ, নন্দাই তো বটে।

নিবারণবাবুকে ফেলে অমন করে পালিয়ে গেলে?

ভ্রূদুটো কুঁচকে চোখের নিমিষে আরোহিণী মুখখানা ফিরিয়ে নেয়। পাশের ভদ্রলোকটীর আঙুলগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে: চলো।…মাথা খারাপ।

সহযাত্রীর বিস্ময় কাটবার আগেই গাড়ীখানা টপ গিয়ারে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে অতসী এগিয়ে যায় সামনের ফুটপাতের দিকে। মনটা ভারি হয়ে ওঠে। কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে ওর অন্তরের সব অনুভূতিগুলো।

আবার! আবার দম্‌কা ঝড়ের ঝাপটা লাগে মগজে। সিমসিম করে ওঠে সারা গা: বিড়ির দোকানের সেই ছোঁড়াটা তখনও ওর সঙ্গ ছাড়ে নি। কোমরে একখানা নীল রঙের নতুন লুঙ্গি জড়িয়ে, ফুটপাতের কোনে দাঁড়িয়ে সিস দেয়, আর ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে!

অতসী তাকায় না। পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। ওর পাশ কাটিয়ে রাস্তার বাঁক ফেরে।

ছোঁড়াটা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। লোকজন মানামানি নাই। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে সুর টানে:

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে বঁধু পান খেয়ে যেও—

অতসী কর্ণপাত করে না। তবুও কান ওর ঝিন্‌ঝিন্ করে ছোঁড়াটার কচ-কাটা গানের ইঙ্গিতে। (ক্রমশঃ)

শ্রী'শ'—

আজকাল দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরা বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন—এটা অত্যন্ত আশার কথা। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই বহির্দৃশ্যের চিত্র গ্রহণের অপটুতা এবং সেজন্য বহির্দৃশ্য যথাসম্ভব বাদ দিয়ে শুধু গৃহাভ্যন্তরের চিত্র গ্রহণের উপর দিয়েই ছবি শেষ করার দিকে সাধারণতঃ পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানদের ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের এই আধুনিক যুগে সব চিত্রকেই শুধু গৃহাভ্যন্তরের কথোপকথনের উপর নির্ভরশীল করে রাখা আর চলে না। বিশেষ বিশেষ চিত্রের সাফল্য শুধু বহির্দৃশ্যের ক্যামেরার কাজের উপরই নির্ভর করে এবং এর জন্য কুশলী ক্যামেরাম্যান, যথোপযোগী সাজসরঞ্জাম ও উপযুক্ত পরিচালকের এবং বিশেষ করে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। আশা করি বাংলার চিত্রনির্ম্মাতারা ও ক্যামেরার কাজে পারদর্শিতা দেখাতে ইচ্ছুক তরুণ ক্যামেরা-শিল্পীরা এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বাংলার চিত্র জগতের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবেন।

* * * *

'অবধূত' রচিত রোমান্টিক ভ্রমণ-কাহিনী "মরুতীর্থ হিংলাজ"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক শ্রীবিকাশ রায়। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন। দীঘার বালুময় প্রান্তরে ও সমুদ্র সৈকতে এখন এর চিত্রগ্রহণ চলছে। আশা করি পরিচালক শ্রীরায় ছবিটির বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চিত্রটিকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করবেন।

* * * *

'প্রেস্ পিক্চার্স'-এর প্রথম চিত্র "শশীবাবুর সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালক শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই বিহার প্রদেশের কয়েকটি স্থানের চিত্রগ্রহণের জন্য তাঁর দলবল নিয়ে যাত্রা করবেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস "যৌতুক" সম্প্রতি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। "চন্দ্রনাথ"-এর বিশেষ সাফল্যের পর 'স্ক্রীন্ ক্লাসিক্স্' তাঁদের এই দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্যের কাজ সুরু করেছেন। পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীবিমল মিত্র এবং প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও সুমিত্রা দেবী। অন্যান্য ভূমিকাতেও বহু নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন, আর চিত্রগ্রহণও দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে।

* * * *

গত ডিসেম্বর মাসে তিন দিন ব্যাপী হাওড়া "নৃত্যম"-এর তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হাওড়া ই, আর, রঙ্গমঞ্চে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ রমেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গবাসী কলেজের জনপ্রিয় অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু। শ্রীশুকদেবকুমার, শ্রীচন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং দাশরথি ঘোষের সুষ্ঠু পরিচালনায় শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়; বিশেষ করে মণিপুরী এবং নাগা নৃত্যটি দর্শকদের কাছে খুবই সমাদর লাভ করে।

* * * *

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ২৩, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর ভবনে কুমার শচীনদেব বর্মণকে গ্রামোফোন কোম্পানি এক সভায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ই, জর্জ শ্রীযুত বর্মণকে একটি সুন্দর "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" টেবল্ রেডিওগ্রাম্ উপহার দেন। মিঃ জর্জ শ্রীযুত বর্মণের ভূয়সী ফিল্মের সংগীত-পরিচালকরূপে সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এবৎসর সংগীত নাটক একাডেমী তাঁকে ১৯৫৭ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করেছেন।

শিল্পী শচীন গুপ্ত শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুত বর্মণকে অভিনন্দন জানান।

শ্রীশচীনদেব বর্মণের সম্বর্ধনা সভায় গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জর্জ, মিসেস্ জর্জ, সহকারী অধিকর্তা শ্রী কে, চ্যাটার্জী, শ্রীশচীনদেব বর্মন এবং রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী পি, কে, সেন প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

প্রশংসাও করেন। রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রীযুত পি-কে সেন কুমার শচীনদেব বর্মণের শিল্পী-জীবনের অসামান্য সাফল্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন—লোক সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতেই তিনি প্রথম জনপ্রিয় হন। পরে

উত্তর দান কালে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শ্রীযুত বর্মণ বলেন—গ্রামোফন্ রেকর্ড বহু নতুন শিল্পীকে লোক-লোচনের সম্মুখে আনে। তাঁর গানও জনপ্রিয় হয়েছে গ্রামোফোন্ রেকর্ডের সহায়তায়।

একটি খুনের কাহিনী

প্রফুল্ল রায়

সন্ধ্যা নামছে। এখন পশ্চিম আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যতদূর দেখা যায়, সব আবছা, অস্পষ্ট।

ওপরে ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে এক ঝাঁক জলপিপি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীচে মেঘনা সমানে ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার একটানা গর্জনের বিরাম নেই।

ইলসা ডিঙিগুলি মুলপলাশীর বন্দরের দিকে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। এখন চতুর্দিকে নিঃসীম, অথৈ মেঘনা। মাতলা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আজমের দু-মাল্লাই ডিঙিটা শুধু দোল খায়।

সামনের গলুইতে বসে রয়েছে মেঘনাদ। হাতের মুঠিতে ইলসা জালের দড়ি। মেঘনার পাঁচ বাঁও জলের নীচে জালের মুখ হাঁ হয়ে আছে। মেঘনাদের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান এখন হাতের দড়িতে। চল্লিশ হাত জলতল থেকে একটি মাত্র ইঙ্গিত; অভ্যস্ত হাতের মুঠিতে দড়িটা নড়ে উঠবে; বোঝা যাবে জালের গ্রাসের ভেতর ইলিসের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাত্র টানে মেঘনার রূপালী ফসল নৌকায় উঠে আসবে।

পা দুটো পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে আজম। পেছনের গলুইতে বসে হালের বৈঠাটা কঠিন থাবায় চেপে ধরেছে। চারদিকে চনমন করে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল একবার। নিঃসন্দেহ হল। কোথাও একটা ডিঙির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু পাহাড়-প্রমাণ ঢেউগুলি তাদের ছোট নৌকাটাকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকাচ্ছে।

ডিঙিটার মাঝখানে সামান্য একটু ছই। পিছনের গলুই থেকে মেঘনাদের চওড়া পেশল পিঠটা দেখা যাচ্ছে।

দুদিন ধরে ঠিক এই সময়টা দৃষ্টিটাকে পাটাতনের নীচে সরিয়ে আনে আজম। আজও আনলো। কোঁচের ধারাল ফলাগুলো ঝকমক করছে। একবার চোখ বুঁজল আজম। দাঁতে দাঁত চাপল। চোয়াল কঠিন হল। রক্তের কণায় কণায় শির শির করে কি যেন ছোটাছুটি শুরু করল। বুকটা দুরু দুরু কাঁপল। একটু ক্ষণ কাটল। তারপরেই ডান হাতটা কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল আজম। ভাবল, একটি মাত্র নির্ভুল আঘাত। সঙ্গে সঙ্গেই ডিঙিটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। মেঘনার রাশি রাশি ঢেউয়ের ঘা খেয়ে খেয়ে মেঘনাদের দেহটা কোথায় কোন দিকে ভেসে যাবে, তার হদিসই মিলবে না। মেঘনার জলে সে রক্তাক্ত অপরাধের কোন চিহ্নই লেগে থাকবে না। ভাবল, কিন্তু হাত সরল না। শরীরটা অবশ, অসাড় হয়েই রইল।

একটু পর কোঁচের বাজুতে ডান হাতটা রেখে চোখ বুঁজে বড় পাইকার সোনা মিঞার কথাগুলি ভাববার চেষ্টা করল আজম। কানের ভেতর মুখটা গুঁজে বিশ্বস্ত গলায় সোনা মিঞা বলেছিল—'হাঁ, হঁ, একটা কোঁচের ঘা মারবি। তা হইলেই হইয়া যাইব। আমি নিজের চোখে দেখছি, মেঘনাদ তোর বউর লগে জবর মাখামাখি করে, রসরঙ্গের কথা কয়। তলে তলে কত কি হইছে, মালুম পাই।'

আসার সময় পঞ্চাশটা কাঁচা টাকাও দিয়েছিল সোনা মিঞা। কোমরের সৌখীন চৌখুপি গেঁজেতে সেই টাকাগুলি বাঁধা রয়েছে। নৌকার দোলানির সঙ্গে ঝম ঝম করে বাজছে।

মাছের পাইকার সোনামিঞা আরো বলেছিল, 'কাফেরের লগে কোন পিরীত! যে শয়তান ঘরের জরুর দিকে খারাপ নজর দেয়, তারে শেষ কইর‍্যা ফেলাই ভাল। পঞ্চাশটা টাকা, এই ডিঙি আর জাল তোরে আমি দিয়া দিমু। একমাস চরমেঘনায় লুকাইয়া থাকবি। তা না হইলে চৌকিদার পুলিশের ঝামেলা আছে। আজ সন্ধ্যায় কাজ কিন্তু খতম করবি।'

তার নতুন বিবির দিকে মেঘনাদের কুনজর—চোখের তারা দুটো উপড়ে ফেলবে না আজম! জগতে ভাল সৎ মানুষের বড় অভাব। নিরীহ বোকা বোকা চেহারার মেঘনাদকে দেখে কোন সন্দেহই জাগে না। এতকাল নিপাট গয়গম্বর সেজে লোকটা তাকে নিদারুণ ঠকিয়েছে। প্রতিহিংসাও আজম সাজ্যাতিক ভাবেই নেবে।

খোদা বড় মেহেরবান। তা নইলে কি সোনা মিঞার মত দোস্ত জুটত! সত্যিই তো দিক রাত্তিরে ইলসাডিঙি নিয়ে মেঘনায় পাড়ি জমাতে হয়। একা একা ঘরে থাকে কুলসম। সেই সুযোগে মেঘনাদ—। ভাবল, কিন্তু

কোঁচটাকে যে কিছুতেই বাগিয়ে ধরতে পারছে না আজম। হাতের থর থর ভাবটাই যে কাটে না।

কুলসমের সঙ্গে মেঘনাদ পিরীত জমিয়েছে। ভাবতে ভাবতে একঝলক রক্ত সরাসরি তালুতে এসে চড়ল আজমের। নাঃ, কাফেরের কিছুতেই বিশ্বাস নেই।

এর মধ্যে ইলসা জালটা শেষ বারের মত দশ বাঁও জলতল থেকে ডোরায় তুলে এনেছে মেঘনাদ। ঘুরে মুখোমুখি বসেছে। রূপালী ইলিশের দাপাদাপিতে ছোট ডিঙিটা দুলছে।

কি আশ্চর্য! ঠিক এই সময়টা যখন সব ডিঙি বন্দরে ফেরে, মেঘনা ফাঁকা হয়ে যায়—ঘুরে মুখোমুখি বসে মেঘনাদ। তার মতলব টের পায় নাকি!

ছইয়ের এপাশ থেকে খুশি খুশি গলায় মেঘনাদ বলল, 'আজ জবর মাছ পড়ছে আজম। এইবার চল্; গঞ্জে ফিরি। কাইল সকালে আবার আসা যাইব। বাদাম তোল।'

চমকে উঠল আজম। ডান হাতের থাবা থেকে কোঁচটা পড়ে গেল। সমস্ত দেহটা কেমন যেন থর থর করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সে। চতুষ্কোণ মুখখানায় একটা কঠিন ভঙ্গি ফুটে রইল।

দুদিন ধরে সমানে কোঁচের ঘা মারবার চেষ্টা করছে আজম। পারছে না। বুকের কাঁপনই যে থামতে চায় না। হাতেই জোর পায় না। কঠিন-পেশী বিরাট শরীরটা এত থর থর করে কেন, কে জানে?

শেষ ক্ষেপের মাছগুলো নৌকার ডোরায় রেখে পাটাতন টেনে দিল মেঘনাদ। তারপর ইলসা জালটা গোছাতে গোছাতে বলল, 'কি রে আজম, কথা কইস না ক্যান? নয়া বিবির জন্যে মনটা বুঝি উথাল পাথাল হয়। তা তো হওনের কথাই। কোন আন্ধার রাইতে বাইর হইয়া আসিস মেঘনায়, ঘরে ফিরতে ফিরতে আর এক আন্ধার রাইত আইস্যা পড়ে।'

আজম জবাব দেয় না। আশ্চর্য! এই দুদিনে মেঘনায় সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গে যখনই সে কোঁচের ঘা মারার চেষ্টা করেছে, ঠিক তখনই ঘুরে বসেছে মেঘনাদ। সে কি মনের কথা পড়তে পারে না কি?

আজ অজস্র মাছ পাওয়া গিয়েছে। মেঘনা অকৃপণ ভাবে তার জাল ভরে দিয়েছে। খুশিতে মনটা টইটম্বুর। সে বলল, 'একটা গীত গাই, শোন আজম।'

আজম এবারও কথা বলল না।

মেঘনাদ গান ধরল।

'মেঘনা গাঙের মাঝি আমি
ময়ূরপঙ্খি নাইয়া,
তোমার ঘাটে যামু বন্ধু
উজানী সোত বাইয়া।
তোমার জন্যে আনুম বন্ধু, আসমানের ঐ তারা,
রঙীণ ফিতা আইন্যা দিমু, চুড়ি আরসীর পারা।
মেঘনা গাঙের মাঝি...'

এর মধ্যে আজম বাদাম টাঙিয়ে দিয়েছে। উজানী বাতাসের খেয়ালে ঢেউ কেটে কেটে ছোট ডিঙিটা ফুলপলাশীর বন্দরের দিকে ছুটেছে।

ইলসা হাটায় অসংখ্য জেলেডিঙি এসে ভিড়েছে। নৌকায় নৌকায় হারিকেন জ্বলছে। দূর থেকে আলোর বিন্দুগুলিকে বড় খুবসুরৎ দেখায়।

এইমাত্র আজমদের নৌকাটা এসে 'পারা' পুঁতল।

ওপরে নরম মাটিতে সারি সারি হোগলার চালা। এটা পাইকারদের এলাকা। সামনে মাছ টাল দিয়ে রাখা হয়েছে। হারিকেনের আলোতে ইলিসের সাদা আঁশগুলি, চোখের নীল মণিগুলি চকচক করে। আঁশটে উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

পাইকারের গোমস্তারা মাছ গুণে গুণে স্তূপাকার করে রাখছে।

'এই যে রমজান মাঝি, তোমার হইল সাত কুড়ি।'

'ভাই জলধর, তোমার তের কুড়ি পাঁচ।'

দরাদরি, হিসাব, টাকার লেনদেন—নানা জাতের শব্দ মিলে মাছ হাটাটা মৌচাকের মত ভন ভন করছে।

সোনা মিঞা বড় পাইকার। কানে সুগন্ধি আতর দেয়; চুলে কি রঙ যেন মাখে, চোখে সুর্মা টানে। জরিদার তাজ, রেশমী কুর্তা আর লুঙ্গি থেকে উগ্র খুসবু বেরোয়।

সোনা মিঞার মাছ চালান যায় বড় বড় শহরে বন্দরে। পরলের পর পরল বরফের মধ্যে শুয়ে মেঘনার ইলিশ চাটগাঁয় কলকাতায় গিয়ে ওঠে। জেলেদের কাছ থেকে নগদ দামে অজস্র মাছ কেনে সোনা মিঞা। অন্য সব পাইকারদের তুলনায় দর অনেক ভাল দেয় সে।

মাছ চালান দিয়ে না কি লাল হয়ে গিয়েছে সোনা মিঞা। সিন্দুকে নাকি টাকা ধরে না। এ সব ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহল নেই আজমের। মাঝে মাঝে সোনা মিঞা তাকে ডিঙি জাল টাকা ধার দেয়। সেটাই নগদ লাভ।

সোনা মিঞা আজমের ডিঙিটার সামনে এসে দাঁড়াল। হারিকেন হাতে দুটো গোমস্তা এল পিছন পিছন।

পাটাতনের তলা থেকে মাছের বড় বড় দুটো চাঙাড়ি বের করল মেঘনাদ।

মেঘনাদকে দেখতে দেখতে কুটিল সন্দেহে সোনা মিঞার মনটা আচ্ছন্ন হ'ল, রোমশ ভুরু দুটো কুঁকড়ে গেল।

ছোকরা গোমস্তা দুটো মাছ গুণতে শুরু করল।

মেঘনাদের মুখখানা টসটস করছে; চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ যে জ্বরটা এসে হঠাৎই আবার ছেড়ে যায়; সেটাই যেন আসছে। অল্প অল্প কাঁপুনি ধরছে।

মাছ গুণে গুণে টাল সাজাচ্ছে গোমস্তা ছুটো। আর হাঁ হাঁ করে উঠছে মেঘনাদ, এই 'এই এতিম, ছুটো মাছ বেশি নিলি যে গোনায় ?'

গোমস্তাটা গ্রাহ্যই করল না। নির্বিকার গলায় বলল, 'গুণতে অমন ছু একটা যায়ই।'

'মাছ মারতে তো তেল লাগে না! ছুইখান মাছ মাগনা নিবা। আরে আমার রসের নাগর! দে, মাছ ছুখান দে এইদিকে।' মেঘনাদ খিঁচিয়ে উঠে।

অল্প ক্ষণের মধ্যে শরীরের তাপ বাড়ল, হি-হি কাঁপুনি ধরল, হাঁটু ছুটো ঠক ঠক ক'রতে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা গলায় মেঘনাদ বলল, 'শরীরটা জবর কাতর করছে। জরটা আবার বুঝি আইলই রে আজম, আর খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) থাকতে পারি না। আমি যাই।'

বন্দরের পশ্চিমে সমতল জমিটার দিকে চলে গেল মেঘনাদ। ওখান থেকে জেলা বোর্ডের সড়ক শুরু। পাকা মাইল খানেক পথ ভাঙলে তাদের সোনারগু গ্রাম মিলবে।

মেঘনাদ সড়কের দিকে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আজমের কানে মুখ গুঁজল সোনা মিঞা। শাসানি, গর্জন এবং বিদ্রূপে তার গলাটা অদ্ভুত শোনায়, কি কইছিলাম তোরে! পঞ্চাশটা টাকা আগামও দিলাম। এই ডিঙি এই জাল সব দিছি তোরে। কাফেরের লগে অত পিরীত ক্যান? মোল্লারা এই খবর জানলে তোরে গেরাম ছাড়া করবে। একটা কোঁচের ঘা দিতে পারলি না? একটু ছেদ। তারপর মোলায়েম স্বরে সোনা মিঞা বলল 'তুই একটা মাস চরমেঘনায় লুকাইয়া থাকবি। আমি চৌকিদার পুলিশ সামাল দিমু। তোর ভালর জন্যেই বলি আজম। তোরে আমি কি চোখে যে দেখি, খোদা-তাল্লাই জানে।'

ভীরু, ভাঙা গলায় আজম বলল, 'কোঁচটা হাতে নিছিলাম মিঞা সায়েব, কিন্তুক পারলাম না।'

তীব্র গলায় চেপে চেপে সোনা মিঞা বলল, 'পারতেই হইব।'

এ অঞ্চলে সোনা মিঞার অবাধ প্রতাপ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তাগদ অনেক। তার হুকুম অগ্রাহ্য করার সাধ্য সামান্য 'ইলসা' জেলের নেই।

আজম বলে, 'কিন্তুক মেঘুরে মারুম ক্যামনে? ও আর আমি এক মায়ের ছুধ ভাগাভাগি কইরা খাইছি। সুখছুখ ভাগ কইরা ভোগ করছি। এক সাথে এতগুলি বছর কাটাইছি।'

সোনা মিঞা গর্জে উঠল, 'এক সাথে এতগুলি বছর কাটাইছিস! সুখছুখ, মায়ের ছুধ ভাগাভাগি কইরা নিছিস। বেশ তো, জবর খুশের কথা। এইবার বউটারে ভাগ কইরা নে!'

'এই সব কি কথা কইতে আছেন মিঞা সায়েব! এগুলি গুণাহের কথা।' আজমের গলা বড় কাহিল শোনায়।

'গুণাহের কথা, একশ বার গুণাহের কথা। কিন্তুক খোদার নামে কসম খাইয়া বলি, একেবারে সাচা কথা। ইট্টুও মিছা না। আমি নিজের চোখে দেখছি, তোর বিবির লগে মেঘুর বড় মাখামাখি। মেঘু হইল কাফের, ইবলিশ। ওরে নিয়া ঘর করা, আর সাপ নিয়া ঘর করা এক কথা। ইলাম সোজা জিনিস না! খুব সাবধান আজম।'

উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফালাফি শুরু করেছে। একহাতে বুক চেপে আজম বলল, 'সত্য কয়েন, আপনি নিজের চোখে দেখছেন?'

'তবে কি আর মিছা বলি না কি? নিজের চোখে দেখেই কইছি। তোরে ভালবাসি, তাই সইতে পারি নাই। তা না হইলে আমার কি লাভ? হে—হে—'

বড় নির্লিপ্ত, বড় নিরাসক্ত দেখাল সোনা মিঞাকে। মুখটাকে আজমের কানের মধ্যে আরো একটু গুঁজে দিল সে। ফিস ফিস, ভয়ানক অথচ নরম গলায় বলল, 'আরো পঞ্চাশটা টাকা দিমু; তুই আজ রাতেই কাফেরটাকে নিকাশ করবি।'

শরীরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা কাঁটা-পায়ে শিরায় শিরায় হাঁটতে লাগল। আলো আলো বন্দরটা দেখতে পাচ্ছে না আজম। জমজমে মাছহাটার শোরগোল শুনতে পাচ্ছে না। সামনের মেঘনা, ফুলপলাশীর বন্দর, সোনা মিঞা—সব, সব কিছু যেন নিরাকার হয়ে যাচ্ছে।

সোনা মিঞা আবার বলল, 'আরো পঞ্চাশটা টাকা, ডিঙি জাল—বেবাক তোরে দিমু।' বুঝলি? কথাটা মনে আছে তো? আজ রাতেই—

আপনা থেকেই মাথাটা ছুলল আজমের। এখন দেহমনের ওপর নিজের কোন ইচ্ছাই ক্রিয়া করছে না।

কখন যে সোনা মিঞা মাছের হিসাব মিটিয়ে দিয়েছিল, আর কখন যে একটা ঘোরের মধ্যে জেলা বোর্ডের সড়কটা ধরে সোজা মেঘনাদের দোচালা ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে খেয়াল নেই আজমের।

শ্বাস চেপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আজম। পাশের আবছা কচুবনে নীল নীল জোনাকি জ্বলে। ত্রিভঙ্গ কুরূপ চেহারার নিমগাছটায় পেঁচা ডেকে ওঠে।

আজম ডাকল, 'মেঘু, অই মেঘু—'

নিরালোক ঘুরঘুট্টি ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা ছুর্বল গলার উত্তর ভেসে এল, 'কে, আজম? আয় ভাই। টাকা আনছিস তো হিসাব কইরা?'

চাপা বীভৎস গলায় আজম বলল, 'আনছি। হিসাব করাই আনছি।'

কঁ্যাচা বাঁশের ঝাঁপ খুলল মেঘনাদ। কুপী জ্বালল। বলল, 'আয় ভাই, ভিতরে আয়। জবর জ্বর আইছে।'

'সোহাগের কাম নাই।' আজম বলল, 'জ্বর আইছে; রাইতে মাছ মারতে যাবি না ?'

'শরীলটা বড় কাহিল লাগে আজম। আজ যামু না। তুই ওসমানরে নিয়া যা।'

'তোর মতলব আমি বুঝি মেঘু। কিন্তুক যা ভাবছিস, তা হইব না। আমার লগে মেঘনায় যাবি। লিচ্চয় যাবি।' আজমের গলা কঠিন শোনায়।

'কি কইতে আছিস ?'

'যা কইতে আছি, তুই তো বেবাকই বুঝিস। তোরে আপন ভাইয়ের লাখান (মত) ভালবাসছি মেঘু, আর তুই কিনা আমার লগে বিশ্বাসঘাতী কাম করলি!' একটু থেমে শ্বাস টেনে টেনে আজম বলতে থাকে, 'তুই আমার মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচছিস; আর কি না—'

অদ্ভুত শব্দ করে হাসল মেঘনাদ। কথা বলল না। আজম আবার বলল, 'রাতে ক্যান মেঘনায় যাইতে চাস না ? তোর বেবাক মতলব আমি বুঝি।'

ঠাণ্ডা গলায় মেঘনাদ বলল, 'বুঝিস ?'

'লিচ্চয় বুঝি। আমি মেঘনায় গেলে তোর তো সুবিধা হয়।' আজম সমানে ফুঁসতে থাকে, 'তুই আমার লগে যাবি মেঘু। আমি খাইয়া অখনই আসতে আছি।'

'দুইজনে একলগে গেলে ল্যাঠা আছে। রাইতে একজনের বাড়িতে থাকন দরকার। বড় শিয়াল আসে, জানিস ? তোর বউ বড় ডরায়।' অদ্ভুত গলায় বলে মেঘনাদ, 'আর শরীলটা জবর খারাপ। আজ আর জাল বাইতে পারুম না।'

'তবে কবে পারবি ?'

'এট্টু দেইখ্যা শুইন্যা নেই।'

'আইচ্ছা।'

দাঁতে দাঁতে ঘষে আজম। রাত্রে বাড়িতে থেকে কি ফয়দা হাঁসিল করতে চায় মেঘনাদ, তা বোঝার মত বুদ্ধি টুকু ধরে সে। মাস দুই আগে কফিলদ্দি মিঞার ছোট বোনটাকে সাদী করে এনেছে। মাজা শ্যামল রঙ, নরম দেহ; চিকণ কোমরের ওপর সুন্দর দেহ কুলসমের। রক্তে রক্তে, দিবারাত্রির খুমারে নেশা ধরায় কুলসম; তাকে গুলজার করে রাখে। আর সেই কুলসমের দিকেই কিনা থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘনাদ! উচিত শাস্তিই সে পাবে।

পাশের চৌচালাখানা আজমের। মাঝখানে কটিকারীর বেড়া। সেটা পেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরল আজম। আশ্চর্য নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমারে ভাতছালুন দে কুলসম।'

বাঁশের মাচায় কাঁথাকানির স্তূপ। তার মধ্য থেকে উঠে বসল কুলসম। বলল, 'আগে এট্টু জিরাও মাঝি। এত রাত হইল ক্যান ? আমি ভেবে ভেবে মরি।'

'থাউক, অমন আলগা পিরিতে কাম নাই।' আজম খেঁকিয়ে ওঠে, 'তোর মিঠা মিঠা কথায় বিষ আছে হারামজাদীর ছাও।'

কেরাসিনের কুপীটা আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বিতরণ করছে বেশী। আজমকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

কুলসম ভাবল, দুটো দিন ধরে কি যেন হয়েছে মাঝির! চড়া মেজাজটার মহিমা বোঝা ভার। আগে নদী থেকে ফিরে বিশাল চওড়া বুকে তার নধর নরম শরীরটা দলে পিষে সোহাগে সোহাগে মাতিয়ে তুলত। রসের কথায় মন মজাত। তার সর্বাঙ্গ আঁশটে গন্ধ মাখিয়ে মেছো আজম অদ্ভুত পিরিত জমাত। আবার সেই গন্ধ ঘোচাবার জন্য ফুলপলাকুীর বন্দর থেকে গন্ধসাবান এনে দিত। দুটো দিন ধরে সেই মানুষটার যে কি হল, ভেবে দিশাহারা হয়ে যায় কুলসম।

আজম বিড় বিড় করে বকে, 'মাগী কুচরিত্তির।'

ভয়াতুর গলায় কুলসম বলে, 'এই সব কি কইতে আছ মাঝি!'

'চুপ মাগী। বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর করবি তো ঠ্যাং দু'খান ধইরা ফাইড়া ফেলুম। মনে করিস, ডুব দিয়া জল খাবি, আর আর আমি টের পামু না।' বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এল আজম।

মাটির সানকিতে ভাত এবং ছালুন সাজিয়ে দিয়েছে কুলসম। হঠাৎ সানকিটা তুলে কুলসমের মুখে ছুঁড়ে মারল আজম। তার গলায় সাপের হিসানির মত শব্দ হ'ল, 'ইবলিশের বাচ্চা, বেজাত মাগী, আমারে দিয়া হয় না! শরীলের জ্বালা আরো মরদ না হইলে নিবে না! তোর রসের নাগররে আমি শেষ করুম।'

কোন জবাব দিল না কুলসম। দুহাতের পাতায় মুখখানা গুঁজে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

দিন দুই পর মেঘনাদকে নিয়ে এ'ল আজম। আসতে বলা মাত্র রাজী হয়ে গেল মেঘনাদ। গরজটা যেন তারই বড় বেশী। বলল, 'সব দেখাশুনা হইছে, এইবার আমার নদীতে যাইতে আপত্ত (আপত্তি) নাই।'

এখন ইলিশ মাছের মরশুম। কাছে দূরে, যত দূরে নজর যায় ছোট ছোট ইলসাডিঙিগুলি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খায়। গাঙচিলগুলি ছোঁ দিয়ে পড়ে।

সারা দিন অবিরাম জাল বেয়েছে মেঘনাদ। আর হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে নিষ্পলক কঠিন চোখে

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আজম। ভাববার চেষ্টা করেছে, মেঘনাদের মা মেঘনাদকে জন্ম দিয়েই মরেছিল। সূতিকাঘরের মরণ-হিম থেকে তুলে এনে নিজের বুকের উষ্ণ মমতায় তাকে আশ্রয় দিয়েছিল আজমের মা। সম্পর্কটা তাদের একই মায়ের জঠরের নয়, কিন্তু একই বুকের সুধার।

একটু একটু করে আজমের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে মেঘনাদ।

তারপর কত দিন যে চলে গেল, তার কি হিসাব আছে? সেই বড় কাইতানের (ঝড়) বার আজমের মা মরল। তা-ও পাঁচ বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

আজকাল মাছের পাইকার সোনা মিঞার কাছ থেকে ডিঙি-জাল কর্জ নিয়ে ভাগে মাছের কারবার করে আজম। ইলসা জেলে ওসমান রায়েবালি কি জলধরকে 'ভাগিন্দার' নেয়। মেঘনাদ কামলা খাটে। ফুরসত মত মাঝে মাঝে আজমের সঙ্গে জাল বাইতে যায়।

আশ্চর্য! যে মেঘনাদ তার মায়ের বুক শুষে বাঁচল, একসঙ্গে পাশাপাশি বাড়ল, সে-ই কি না তার বুকে ছোবল হানে?

পিছনের গলুইতে চুপচাপ বসে থাকে আজম। এতটুকু শব্দ করে না। শুধু চোখদুটো ধক ধক জ্বলতে থাকে।

নিয়মের দুনিয়ায় ব্যতিক্রম ঘটে না। যথারীতি সন্ধ্যা নামে। জেলেডিঙিগুলি একে একে ফুলপলাশীর বন্দরের দিকে অদৃশ্য হতে থাকে। বিপুলা নদী শূন্য হয়ে যায়। নিরালোক আবছা আঁধারে মেঘনাকে নিরানন্দ, শ্রীহীন মনে হয়।

চারদিকে তাকায় আজম। তার বুক কাঁপে। রক্তে রক্তে শির শির করে কি যেন ছোটাছুটি করে। পাটাতনের নীচে কোঁচের ধারাল ফলাগুলো আবছা অন্ধকারেও ঝকমক করতে থাকে। ডান হাতের হিংস্র থাবাটা সেদিকে বাড়িয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে জাল তুলে আগের গলুইতে ঘুরে বসে মেঘনাদ।

আজম চমকে ওঠে। এই নিয়ে তিনদিন। আজ আসার সময় সোনা মিঞার সঙ্গে কথা হয়েছিল। মেঘনার জলে মেঘনাদের লাসটা ভাসিয়ে সে চরমেঘনায় পাড়ি জমাবে। যে কটা দিন এখানে থাকবে না, সে কটা দিন কুলসমকে দেখাশুনা করার ভার নিয়েছে সোনা মিঞা স্বয়ং। রাত্রে তার কাছে শোবার জন্ত ওসমানের নানীকে পাঠিয়ে দেবে। চৌকিদার পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে সোনা মিঞাই তাকে খবর দেবে। যে কাফের সাদী-করা জরুর দিকে কুনজর দেয়, তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়াই নাকি ইসলামের বিধান। সোনা মিঞার এতে কি-ই বা লাভ? নেহাতই সে আজমের হিত চায়!

ইসলাম-কাফের-জরু—সহজ সরল আজমের মাথায় শব্দগুলি একাকার হয়ে সমানে গোল পাকায়।

আশ্চর্য! তিনটে দিন ঠিক এই সময়টা জাল গুটিয়ে মুখোমুখি বসে মেঘনাদ। তবে কি সব টের পায়? বুকের থরথরানি থামে না আজমের।

হঠাৎ মেঘনাদ বলল, 'আমি আর এখানে থাকুম না আজম। ভাটির দেশে চইল্যা যামু।'

আজম জবাব দেয় না।

মেঘনাদ আবার বলে, 'কালই চইল্যা যামু আজম।'

ঘোর ঘোর গলায় কস করে আজম বলে বসে, 'ক্যান যাবি?'

'মন যেখানে ভাঙে, যেখানে খালি সন্দ আর সন্দ, সেখানে থাকতে নাই আজম ভাই।' মেঘনাদের গলা কেমন যেন শোনায়। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। চোখে পলক পড়ে না।

অনেকটা সময় কাটে। অন্ধকার আরো ঘন হয়। উথল পাথল নদী অবিরাম ফুলতে থাকে। আসমান ছোঁয়া বিরাট বিরাট ঢেউগুলি ছোট ডিঙিটাকে নিজের খেয়ালে দোলায়।

মেঘনাদ আবার বলে, 'মনে গোঁসা রাখিস না আজম। আর কোনদিন তোর লগে আমার দেখা না হওয়াই ভাল; ভগমানের এই বোধ হয় মর্জি।'

স্নায়ুগুলো ঝিম ঝিম করে। তালুটা শুকিয়ে এক রাশ কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। বিচিত্র এক ভয় এই রাত্রির মত চারপাশ থেকে আজমকে ঘিরে ধরে। তবে কি সব বুঝতে পেরেছে মেঘনাদ? আজম চেঁচিয়ে উঠতে যায়। কিন্তু স্বর ফোটে না। একটা মোটা রোমশ থাবা যেন গলাটাকে চেপে ধরেছে। শরীরটা অবশ অবশ লাগে। হাতের মুঠি থেকে হালের বৈঠাটা আলগা হয়ে খসে পড়ে। নৌকাটা পাক খেয়ে উজানের দিকে ঘুরে যায়।

লাফিয়ে পিছনের গলুইতে এসে আজমকে ঠেলে পাটাতনে সরিয়ে দেয় মেঘনাদ। বৈঠার কারসাজিতে নৌকাটাকে আবার ভাটির দিকে ঘোরায়। বলে, 'এই কি রে আজম, পাকা মাঝি তুই। তোর হাত থিকা হালের বৈঠা কেমনে খসে?'

আজম বড় বড় শ্বাস টানে। কথা বলে না। একটু আগেও ঝকমকে কোঁচের ফলাগুলো দেখতে দেখতে যে প্রতিজ্ঞাটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল, এই মুহূর্তে মনের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাট দেহটা শুধু কাঁপে। নিজের ওপর নিজের কোন ইচ্ছাই ক্রিয়া করে না।

একসময় ফুলপলাশীর বন্দর পাশে রেখে আঁকাবাঁকা
ারঙের খালে ছোট নৌকাটা নিয়ে আসে মেঘনাদ।
নিশি পাওয়া আচ্ছন্ন গলায় আজম বলে, 'নাও
ায় নিয়া যাইস মেঘু?'
'গেরামে।'
'মাছ বেচবি না?'
'বেচুম। গেরাম থিকা মাছ-হাটায় ফিরা আমুম।'
'গেরামে যাবি ক্যান?'
'কাম আছে।'
খানিকটা পর কেয়াবনের পাশে নৌকা ভিড়িয়ে
াদ বলে, 'রাইতে বড় শিয়াল আসে; তোর ঘরের
াশে ঘোরে। তুই তো জানিস না। আমি তারে
ছি। তুই আমি কেউ নাই বাড়িতে, এই কিন্তুক
শিয়াল আসার সময়।' একটু ছেদ, আবার, 'আমি
নৌকায় বসতে আছি। তুই একবার তোর ঘর
্যা আয়। বড় শিয়াল আসলেও আসতে পারে।'
কি যেন ভাববার চেষ্টা করে আজম। তারপর
াবে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ায়।
মেঘনাদ বলে, 'যা যা, ঘরে গিয়া যা দেখবি, আমারে
সা বলিস।'

পাকের ঘরের পাশে থনথনে মানকচুর ঝোপ।
ানে এসে থমকে দাঁড়াল আজম। দুটি গলা পরিষ্কার
া যায়। কান দুটো শিউরে ওঠে আজমের।
ভয়ার্ত গলায় কুলসম বলে, 'না না, এই সব কি
া ক'ন মিঞা সায়েব! মাঝি আসলে সব কইয়া
।'
সোনা মিঞা খুক খুক করে হাসে। শয়তানী গলায়
'তোমার মাঝি আর কোনদিন আসব না। শুনলাম,
ঘনায় এক ডানাকাটা হুরীর খোঁজ পাইয়া সে গেছে
। তারেই নাকি নিকা করব।'
'না না, এ হয় না।' কুলসম চিৎকার করে ওঠে।
'হয় না? তা হইলে বোধ হয় মেঘুরে খুন কইরাই
কদারের ডরে পলাইছে।'
'না না—'
'তোমার সব কিছুতেই খালি না। হাঁ-টা কিসে?'
ই দম নিয়ে সোনা মিঞা আবার বলে, 'তোমারে
ন পয়লা দেখছি, সেইদিন থিকা দিনে রাইতে
ে তোমার খুয়াব দেখছি। মিছা না, খোদার
কসম খাইয়া সাচা কথাই কই।'
'এমুন গুণাহের কথা কইতে নাই মিঞা সায়েব। আপনে
ার ছেলের বাজান।' দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে
কুলসম।

'আমি কি তোমার বাজান হইতে চাই ডানাকাটা
হুরী, তোমার ছেলের বাজান হইতে চাই।'
'না না।' প্রবলভাবে মাথা নাড়ে কুলসম।
'আবার না না! মেয়েমানুষের দিলের কথা সব বুঝি।
মুখে যখন না কও, মনে তখন হ কও। হে হে—সারা
জনমে কম মেয়েমানুষ তো দেখলাম না?'
মেয়েমানুষের দিলের কথা বোঝার কৃতিত্বে ধূর্ত চোখে
হাসল সোনা মিঞা। বলল, 'কাল সকালে
মুছুল্লি পাঠাইয়া দিমু। মোহারানার কাগজ নিয়া আসব
একেবারে। পরশু তোমারে নিকাহ্ করুম।'
'না না এ গুণাহ্, এ পাপ—'
সোনা মিঞা জবাব দিল না। বাইরে বেরিয়ে সামনের
ঘন অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।
আর বাঁশের মাচানে মুখ গুঁজে আলুথালু হয়ে
কাঁদতে লাগল কুলসম। 'তুমি কোথায় গেলা মাঝি?'
এতক্ষণ নিথর নিঝুম দাঁড়িয়েছিল আজম। দেহে
যেন সাড় ছিল না, বোধ ছিল না। বিস্ময়, আতঙ্ক,
রাগ—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সে কাঁপছিল।
ধীর পায়ে ঘরে এ'ল আজম। শান্ত আবেগময়
গলায় ডাকল, 'বউ—'
'কে, মাঝি!' বাঁশের মাচান থেকে উঠে আজমের
চওড়া বিশাল বুকে পড়ল কুলসম। বলল, বড় ডর লাগে;
আমারে অন্য কোনখানে নিয়া যাও। না হইলে গলায়
রশি দিমু।'
অনেকগুলি নিঃশব্দ মুহূর্ত কাটল। একটু পর আজম
বলল, 'হ বউ, তোরে নিতেই তো আসলাম। নে,
কাঁথাকানি বাক্সগুলি গোছগাছ কইরা নে। আজ অখনই
আমরা মেঘুর লগে ভাটির দেশে পাড়ি জমামু। এই
দোজখে (নরকে) আর কোনদিন ফিরুম না।
মাটির সানকি, ডেগ আর ফুলকাটা টিনের তোরঙ্গ,
কাঁথাকানি—সমস্ত কিছু নিয়ে বাইরে এ'ল দু'জনে।

কেয়াবনটার কাছে এসে আজম ডাকল, 'মেঘু—'
ডিঙি থেকে মেঘনাদ বলল, 'কিরে আজম, ঘরে গিয়া
কি দেখলি?'
'বড় শিয়াল দেখলাম।' ছুটে এসে মেঘনাদের দুটো
হাত চেপে ধরল আজম। কাঁদ কাঁদ ভাঙা গলায় বলল,
'জবর গুণাহ্ করছি তোর কাছে। আমারে মাপ কর
মেঘু।'
'আমার কাছে আবার কি গুণাহ্ করলি?'
'সে কথা জিগাইস (জিজ্ঞাসা করিস) না। খালি
বল—তুই আমারে মাফ করলি।'
'হাত ছাড়!' সস্নেহ গলায় মেঘনাদ বলল, 'তোর
দোষই আমি ধরি নাই। তা মাফের কথা আসে কিসে?'

আজম হাত ছাড়ল না। তার হাতের মধ্য দিয়ে মেঘনাদের হাতে কান্না এবং বেদনাজর্জর একটি হৃদয়ের অনুতাপ পৌঁছে গেল।

অনেকটা সময় কাটল।

গাঢ় গলায় আজম বলল, 'বউরে নিয়া আসছি মেঘু ভাই।'

'ভাল করছিস।'

'তোর লগে ভাটির দেশেই চইলা যামু।'

এক সময় সোনারঙের আঁকা-বাঁকা খাল ধরে ছোট নৌকাটা ফুলপলাশীর বন্দরে এসে পড়ল। সামনেই মেঘনা।

আজম বলল, 'নৌকা ভিড়া মেঘু'

'ক্যান?'

'সোনামিঞার লগে শেষ মুলাকাতটা কইরা আসি। এই জনমে তো এমুন দোস্তের দেখা আর পামু না।'

নৌকা ভিড়ল। পায়ের মাটিতে নামল আজম।

ফুলপলাশীর বন্দরের পাশেই সোনামিঞার টিনের দোতলা।

আজম ডাকল, 'মিঞা সাহেব—'

বাইরের ঘরেই বসে ছিল সোনা মিঞা। চালানী মাছের হিসাব করছিল। বলল, 'কে?'

'আমি আজম।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল সোনা মিঞা। চতুর্দিকে চনমন চোখে তাকিয়ে ফিস ফিস ব্যস্ত গলায় বলল, 'আয়, ঘরে আয়—'

ধীর শান্ত পায়ে ঘরে ঢুকল আজম।

অনেকক্ষণ আজমের দিকে তাকিয়ে রইল সোনা মিঞা। যেন ভূত দেখল। এমন জবরদস্ত সোনা মিঞা, যার দাপটে সমস্ত এলাকাটা তটস্থ, তার গলাও কাঁপল, 'কি রে, শয়তানটারে নিকা করছিস?'

আজম হাসল। বলল, 'মিঞাসায়েব, এই কয় দিন আমার দিলের মধ্যে একটা শয়তান ঢুকছিল, তারে নিকাশ করছি।' একটু ছেদ, আবার, 'অখনই মেঘু বউ আর আমি ভাটির দেশে যামু গিয়া। নৌকা ভিড়াইয়া আপনের লগে শেষ মুলাকাত করতে আসলাম।'

সোনা মিঞা জবাব দিল না।

গেঁজে থেকে একশ'টা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল আজম। আবার বলল, 'আপনের টাকা ফিরত দিলাম। পাপের দাম কাছে রাইখা দুনিয়ার কোনখানে গিয়া শান্তি পামু না।'

একটু থামল আজম। অদ্ভুত গলায় বলল, 'খোদার মর্জিতে দিলের শয়তানটারেই খুন করলাম মিঞাসায়েব; মেঘুরে খুন করতে পারলাম কই?'

আজম বেরিয়ে গেল।

স্মৃতি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

বহে মৃদু গন্ধবহ; ভেসে আসে হারানো সে বাণী,
কুসুমের গন্ধ সাথে প্রিয়ার অলক গন্ধখানি।
ফাল্গুনে অলস দিনে কল্পনার প্রিয়মুখগুলি,
রৌদ্র-দীপ্ত সমুজ্জল স্মৃতিপটে তুলিছে আকুলি।

পাশে রহে, নিত্য দ্বন্দ্ব সংসারের শত প্রয়োজনে,
তিক্ত হয়ে উঠে চিত্ত, ক্ষুব্ধ হয় প্রিয়া অকারণে।
দূরে রহি স্মৃতিপটে, সজল নয়ন ম্লান মুখ,
অনন্ত মাধুর্য্য লয়ে দুরু দুরু করে স্মরি বুক।

নিকটে সুদূরে রহে, সুদূরে নিকটে টানে নিতি
নিত্য দ্বন্দ্ব-কলহের বৃন্তে ফোটা প্রীতিময়ী স্মৃতি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫৭৯ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। [হা]ণ্ট ১৪২, উইকস ১৯৭, স্মিথ ৭৮। মামুদ হোসেন [১]৫৩ রানে ৪, ফজল ১৪৫ রানে ৩ উইকেট) ও ২৮ (কোন উইকেট না পড়ে)

পাকিস্তান ঃ ১০৬ (গিলক্রায়েষ্ট ৩২ রানে ৪, স্মিথ [১]৩ রানে ৩ উইকেট) ও ৬৫৭ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। [হা]নিফ মহম্মদ ৩৩৭, ইমতাজ আমেদ ৯১, সৈয়দ [আ]মেদ ৬৫)

ব্রিজ টাউনে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিন ২ উইকেট পড়ে ২৬৬ রান ওঠে। হাণ্ট সেঞ্চুরী (১৪২) করেন।

২য় দিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৯ উইকেটে ৫৭৯ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। উইকস [১]৯৭ রান করেন। কোন উইকেট না পড়ে পাকিস্তানের [...]৭ রান ওঠে।

৩য় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস মাত্র ১০৬ রানে শেষ হয়। প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৮ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। ৪৭৩ রান পেছনে পড়ে পাকিস্তান ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দিনের শেষে এক উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ২ ইনিংসে ১৬২ রান ওঠে—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৩১১ রান কম।

৪র্থ দিনে দেখা গেল পাকিস্তানের রান দাঁড়িয়েছে ৩৩৯, ২টো উইকেট পড়ে। হানিফ মহম্মদ নট আউট ১৬১ রান ক'রে দলকে লড়াইয়ের জন্যে জিইয়ে রাখলেন। পাকিস্তান অত্যন্ত মন্থর গতিতে রান করে। ৪র্থ দিনের ৫ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ১১৭ রান ওঠে।

৫ম দিনে রান দাঁড়াল ৫২৫, ৩ উইকেটে। হানিফ মহম্মদ ২৭০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। পঞ্চম দিনের খেলার পর দেখা গেল পাকিস্তান ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ৫৭৯ রানের থেকে ৫২ রান এগিয়ে গেছে। পাকিস্তানের হাতে তখনও ৭টা উইকেট, খেলা শেষ হতে একদিন বাকি। পাকিস্তানের সৈয়দ আমেদ সুদীর্ঘ ২৬৩ মিনিট কাল খেলে ৬৫ রান ক'রে মন্থর গতিতে রান করার বিশ্ব রেকর্ড করেন।

টেষ্ট খেলার ৬ষ্ঠ দিনে পাকিস্তান ৮ উইকেটে ৬৫৭ ক'রে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ২৮ রান করে। খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

পতনের মুখ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি ড্র করার কৃতিত্ব হানিফ মহম্মদের। হানিফ মহম্মদ ৩৩৭ রান করেন। লেন হাটনের বিশ্ব রেকর্ডের থেকে তিনি মাত্র ২৮ রান কম করেন। লেন হাটনের ৩৬৪ রান করতে সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট। হানিফ ৩৩৭ তুলতে সময় নিয়েছিলেন ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। ফলে হানিফ উইকেটে সর্ব্বাধিক সময় থাকায় বিশ্বরেকর্ড করেন।

১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের লেন হাটন

৬৪ রান ক'রে টেষ্টের এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ন করার বিশ্ব রেকর্ড করেন। লেন হাটনের ৩৬৪ নের পরই হানিফের ৩৩৭ রান ২য় স্থান পেল। ৩য় নে আছে ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের ৩৩৬ (১৯৩৩ লে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষ্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্য্যন্ত এই পাঁচ জন টেষ্ট খেলোয়াড় ন শতাধিক রান করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

৩৬৪ রান—লেন হাটন (ইংলণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বপক্ষে ওভালে (১৯৩৮ সাল)—সময় ১৩ ঘণ্টা ৭ মিনিট। (রান সংখ্যার দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড)

৩৩৭ রান—হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েষ্ট ণ্ডিজের বিপক্ষে, ব্রিজ টাউনে (১৯৫৮)—সময় ১৬ ঘণ্টা ৩ মিনিট (সময়ের দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড)

৩৩৬ রান—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড), নিউজি-ল্যাণ্ডের বিপক্ষে অকল্যাণ্ডে (১৯৩২—৩৩)

৩৩৪ রান—ডন্ ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিডসে (১৯৩০ সাল)

৩২৫ রান—এ, স্যাণ্ডহ্যাম (ইংলণ্ড), ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, কিংস্টোনে (১৯২৯—৩০)

৩০৪ রান—ডন্ ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), ইংলণ্ডের বিপক্ষে, লিডসে (১৯৩৪ সাল)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ম টেষ্টের ১ম ইনিংসের খেলায় পাকিস্তানের ৪টি জুটিতে শতাধিক রান ওঠে। এবং এই ৪টি জুটিতেই হানিফের সহযোগিতা ছিল। পতনের মুখে পাকিস্তান যে ধৈর্য্যের প্রমাণ দিয়েছে তা টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বহুকাল লোকের স্মরণ থাকবে।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

অষ্ট্রেলিয়া: ১৬৩ (ক্রেগ ৫২ এডক ৪৩ রানে ৬ উইকেট) ও **২৯৭** (৭ উইকেটে বার্ক ৮৩, হার্ভে ৬৮, ম্যাক্কে ৫২)।

দক্ষিণ আফ্রিকা: **৩৮৪** (ম্যাকগ্লু ১০৫, ওয়েট ১৩৪। বেনড ১১৪ রানে ৫ উইকেটে)

ডার্বানে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৩য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে। ১ম দিন ৬ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ১৫৫ রান ওঠে। ২য় দিনে ১৬৩ রানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ২ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে। ৩য় দিন দক্ষিণ আফ্রিকার রান দাঁড়ায় ৩১৮, ৫টা উইকেট পড়ে। ৪র্থ দিনে ৩৮৪ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার ১ম ইনিংস শেষ হয়। ঐ দিন অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের খেলায় ১ উইকেট পড়ে ১১৭ রান ওঠে। ৫দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ২৯২ রান ওঠে ৭ উইকেটে।

চতুর্থ টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া: ৪০১ (বেনড ১০০, বার্ক ৮১, ম্যাককে নট আউট ৮৩, ডেভিডসন ৬২। হিনি ৯৬ রানে ৬ উইকেট) ও ১ (কোন উইকেট না পড়ে)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০৩ (ফানস্টোন ৭০) ও **১৯৮** (ম্যাকগ্লু ৭০, ফানস্টোন ৬৪। বেনড ৮৪ রানে ৫ উই)

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৪র্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: **৩২৫** (কানহাই ৯৬, উইকস ৭৮, সোবার্স ৫২) ও **৩১২** (সোবার্স ৮০, আলেকজাণ্ডার ৫৭, স্মিথ ৫১)

পাকিস্তান: **২৮২** (ম্যাথিয়াজ ৭২, ফজল মামুদ ৬০) ও **২৩৫** (হানিফ মহম্মদ ৮১, সৈয়দ আমেদ ৬৪)

পোর্ট অফ্ স্পেনে অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১২০ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

অষ্টাদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান:

কটকের বারো বাটি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি প্রদেশ যোগদান করে।

নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ

ডিসকাস থ্রো: প্রদ্যুম্ন সিং (সার্ভিসেস)—দূরত্ব ১৫৩ ফিট ৬½ (এশিয়ান এবং ভারতীয় রেকর্ড)

পোলভল্ট: এ রামচন্দ্রন (মাদ্রাজ)—উচ্চতা ১২ ফিট ৫ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

৫০০০ মিটার দৌড় : নায়েক অর্জুন সিং (সার্ভিসেস) —সময় ১৪মিঃ ৫৭.২ সেঃ (এশিয়া ও ভারতীয় রেকর্ড)

হ্যামার থ্রো : হাভিলদার দেবী দয়াল (সার্ভিসেস) দূরত্ব—১৬৬ ফিট ৯ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

২০,০০০ মিটার ভ্রমণ : নায়েক জোরা সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১ ঘণ্টা ৩৮মিঃ ৪২.২ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

২০০ মিটার দৌড় : নায়েক মিলখা সিং (সার্ভিসেস) —সময় ২১.২ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার দৌড় : হাভিলদার মিলখা সিং (সার্ভিসেস) সময় ৪৬.৬ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার হার্ডলস : জগদেব সিং (পাঞ্জাব) সময় ৫২.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড ও এশিয়ান রেকর্ড)

১১০ হার্ডলস : শ্রীচাঁদ (সার্ভিসেস) সময় ১৪.৫ সেঃ (এশিয়া ও ভারতীয় রেকর্ড)

ম্যারাথন রেস : গুলজারা সিং (পশ্চিম বাংলা) সময় ২ ঘণ্টা ২৩ মিঃ ৫৮.৪ সেঃ (ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড)

৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ : পানসিংহ (সার্ভিসেস) সময় ৯ মিঃ ১২.৪ সেঃ (ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড)

৪ × ১০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল—সময় ৪২.৬ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

৪ × ৪০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল, সময় ৩মিঃ ১৫.১ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : বস্নি সিং (পাঞ্জাব) ১৯৯ ফিট ৪ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

মহিলা বিভাগ

৮০ মিটার হার্ডলস : মেরী লীলারাও (বোম্বাই) ১১.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো : মিস সি ও' কোনেল (মাদ্রাজ) দূরত্ব ১১৪ ফিট (ভারতীয় রেকর্ড)

৪ × ৪০০ মিটার রীলে : বোম্বাই দল ; সময় ৪৯.৫ সেঃ (ভারতীয় রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : মিস ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান) দূরত্ব ১২৯ ফিট ৭½ ইঞ্চি (ভারতীয় রেকর্ড)

জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা :

পুরুষ বিভাগ : ফাইনালে বাংলা ৩৮—১১ পয়েন্টে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : বোম্বাই ৪৯—৭ পয়েন্টে কোলাপুরকে পরাজিত করে।

সংক্ষিপ্ত খবর

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পুণা বিশ্ববিদ্যালয় ২—০ গোলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

*　*　*

জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে চন্দ্র হিরজী (বাংলা) গতবারের বিজয়ী উইলসন জোন্সকে (বোম্বাই) পরাজিত ক'রে ৪র্থবার খেতাব লাভ করেছেন। জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের উইলসন জোন্স বাংলার চন্দ্র হিরজীকে ৬—৫ ফ্রেমে পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গতবছরের যুগ্ম বিজয়ী বোম্বাই দল ১১ পয়েন্ট পেয়ে এবছরও চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি—১৯৫৭

কালিফোর্ণিয়ার 'হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি বোর্ড' নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ১৯৫৭ সালের খ্যাতনামা অপেশাদার স্পোর্টসম্যান হিসাবে হেলমস ওয়ার্ল্ড ট্রফি দান করেছে। (১) সাঁতারের জন্য টাকাসি ইশিমোতো (জাপান), (২) রোয়িংয়ের জন্য স্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জি (অষ্ট্রেলিয়া) ; ট্র্যাক এ্যাণ্ড ফিল্ডের জন্য রণ ডিলেনে (আয়ারল্যাণ্ড) এবং রবার্ট গুটোস্কি (আমেরিকা) এবং টেনিসের জন্য লুই আয়ালা (চিলি)।
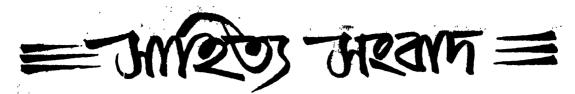
গান্ধী ও মার্কস : কিশোরলাল মশরুওয়ালা রচিত ও শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত

গান্ধীবাদের সুপণ্ডিত ভাষ্যকার ছিলেন স্বর্গত কিশোরলাল মশরুওয়ালা, আর মার্কসবাদেরও যে তিনি একজন সংস্কারমুক্ত পণ্ডিত ছিলেন এ গ্রন্থই তার পরিচায়ক। গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই, আর পশ্চিমাগত মতবাদের প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করেন বেশির ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ; কিন্তু এই গ্রন্থে গান্ধীবাদ গ্রন্থকার কর্তৃক যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে অনেকেরই অনেক ভুল ধারণা দূরীভূত হবে বলেই আশা করি। তাছাড়া শৈলেনবাবুর অনুবাদও হয়েছে চমৎকার। এরূপ গ্রন্থ ভারতের অন্য সকল ভাষাতেও অনুদিত হয়ে সারা দেশময় প্রচারিত হলে জনগণের মনকে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট করা হবে এবং তাতে দেশেরও মঙ্গল হবে।

[প্রকাশক : ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২ মূল্য ৩৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি : শ্রীহৃষীকেশ হালদার

শেক্সপীয়ারের মৃত্যুর পর প্রায় সাড়ে তিন শো বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু আজও তাঁর খ্যাতি এতটুকু ম্লান হয়নি। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজও তিনি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর নাটকগুলির আবেদন দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের পাঠকই তাঁর রচনা পাঠে পরম তৃপ্তি লাভ করবে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শেক্সপীয়ারের কয়খানি প্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত নাটকের আখ্যান বস্তু কিশোর মনের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। লেখকের বর্ণনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক এবং তাঁর ভাষাও সহজ ও মার্জ্জিত। নাটকগুলির কাহিনী অনুসরণে এদেশের ছেলে মেয়েদের যাতে কোন অসুবিধা না ঘটে সেদিকে লেখকের সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়। জুলিয়াস সীজারের কাহিনী বর্ণন প্রসঙ্গে তৎকালীন রোমক সমাজের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তা ঘটনাবলীর অনুধাবনে কিশোর পাঠকের সহায়তা করবে। এ গ্রন্থ পাঠের পর শেক্সপীয়ারের রচনার প্রতি এদেশের কিশোরদের যে আগ্রহ জাগবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। গ্রন্থের পুরোভাগে সংযোজিত শেক্সপীয়ারের জীবনের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর। গ্রন্থের মধ্যে দু'এক স্থানে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তবে তা মার্জ্জনীয়। কিন্তু একটি ত্রুটির উল্লেখ না করে পারছি না। শেক্সপীয়ারের নামের বানানে 'শ'র পরিবর্ত্তে 'স' কেন ব্যবহার করা হল তা দুর্ব্বোধ্য। এ ছাড়া শেক্সপীয়ারের নাটকের পাত্র-পাত্রীর নামের অনুলেখনে ত্রুটি দেখা যায়। জুলিয়াস সীজার নাটকে 'ক্যাসিয়াস'এর স্থলে 'ক্যাসাস' অসঙ্গত।

[প্রকাশক : আর, এন, চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২।০]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

ভ্রষ্ট কুসুম : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

গল্পগুলি ভালই লাগল। আমাদের আটপৌরে জীবনের অতি-পরিচিত ঘটনাগুলি কয়েকটি গল্পে বেশ রসিয়ে উঠেছে। ফেলে-আসা জীবনের ছোটখাটো স্মৃতিঘেরা দিনগুলির প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে পাঠকচিত্তে বেশ একটি বৈরাগ্যমিশ্রিত-ভোগানন্দের সৃষ্টি করে।

[প্রকাশক : ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ২৲ টাকা]

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "বিপ্রদাস"—১৲৫০
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দত্তা" (১৮শ সং)—৩৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু রায় প্রণীত নাটক "দেবলাদেবী" (২২শ সং)—২৲৫০
পূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "ভালবাসা এলো জীবনে"—২৲
শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত "জাপান"—১৲২৫
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "কালিদাসের কুমার-সম্ভব"—৲৬২
শ্রীসুষমা সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "এ যুগের দুঃশাসন"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মনের মতো বউ"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শুভা সেন

বিষ্ণুপ্রিয়া

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বেদ ও উপনিষদ্

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

াচীন যুগে পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন সভ্যতা বিকশিত য়াছিল। তন্মধ্যে বৈদিক সভ্যতা ভিন্ন অপর সকল সভ্যতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, শিরিয়া, গ্রাস, রোমের ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি এখন বিদ্যমান ই। তাহারা যে সকল দেবদেবীর পূজা করিত এখন সে কল দেবদেবী পূজিত হন না। অধিকাংশ ভাষাই লোকে স্মৃত হইয়াছে। কেবল গ্রীক ও রোমান ভাষার চর্চ্চা তকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও হয়। গ্রাস ও রোমের তকগুলি কাব্য অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা পঠিত হয়। স্তু বাস্তবজীবনে তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। অপর-পক্ষে বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবন্ত। বেদ্ এখনও অনেকের কণ্ঠস্থ, প্রত্যহ বহু সহস্র ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করেন। মন্দিরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করা হয়। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে গৃহে গৃহে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোক বেদকেই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া থাকে। বেদের আলোচনা পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, ভারতের বাহিরেও বহু বিদ্বান বেদের চর্চ্চাতেই তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বলা যায়। ইহা সত্য ভারতে

বর্ত্তমানকালে প্রচলিত ধর্ম্মে পুরাণের প্রভাব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু সকল পুরাণেই বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাও বহু ধর্ম্মগ্রন্থে বলা হইয়াছে এবং সকল আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে বেদের ব্যাখ্যা করিবার জন্যই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকস্থলে মনে হইতে পারে যে পুরাণের সহিত বেদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ এরূপ বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও পুরাণ ও বেদের মধ্যে একটা অন্তর্নিগূঢ় ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। অন্ততঃপক্ষে আচার্য্যগণের ইহাই মত। বীজের সহিত বৃক্ষের ফলফুলের সাদৃশ্য বাহিরে দেখিতে না পাওয়া গেলেও জ্ঞানী-ব্যক্তিগণ জানেন যে বীজ ও বৃক্ষ একই বস্তু। সেইরূপ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বেদের সাদৃশ্য বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রতীত না হইলেও উহাদের মধ্যে নিগূঢ় ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান, ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন ও আধুনিক সকল আচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল কারণে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবন্ত।. বৈদিক সভ্যতার যে আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি আছে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন।

বৈদিক সভ্যতা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদের শ্রেষ্ঠ অংশের নাম উপনিষদ্। ইহা বেদের শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়া ইহার আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্য অংশ বিভিন্ন দেবতার স্তবস্তুতি এবং যজ্ঞের কথায় পরিপূর্ণ। বেদের এই সকল অংশে পরমেশ্বরের কথাও আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে। উপনিষদ পরমেশ্বর বা পরব্রহ্মের কথায় পরিপূর্ণ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাঁহাকে কি ভাবে পাওয়া যায়, জীবের স্বরূপ কি, ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইল, এই সকল কথা উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে এবং সে আলোচনা এত সুন্দরভাবে করা হইয়াছে যে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ উচ্ছ্বসিতভাবে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক শোপনহোয়ার উপনিষদকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। এই গ্রন্থ সর্ব্বদা তাঁহার টেবিলের উপর থাকিত, রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রত্যহ ইহাকে প্রণাম করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"উপনিষদ পাঠ করিয়া যে উপকার লাভ করা যায়, ইহা যে প্রকার মানসিক উন্নতি বিধান করে, সমগ্র জগতে আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেরূপ উপকার বা উন্নতি পাওয়া যায় না, ইহা আমার জীবনে শান্তি প্রদান করিবে।" (১) শোপনহোয়ার মূল উপনিষদ পড়েন নাই। সাজাহানের পুত্র দারা শাকো যে পার্শি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার ফরাসী অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। মোক্ষমূলর শোপনহোয়ারের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "শোপনহোয়ারের এই উক্তির যদি কোনও সমর্থন করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে স্বেচ্ছায় ইহা সমর্থন করিব।(২)

পুনশ্চ শোপানহোয়ার উপনিষদে উল্লিখিত তত্ত্বসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে এই ধারণাগুলিকে "অতিমানুষিক ধারণা বলা যায়। যাঁহারা এরূপ ধারণা করিয়াছিলেন তাঁহারা যে মানুষ ছিলেন ইহা মনে করা যায় না।"(৩)

ডয়সেন লিখিয়াছেন যে বহুকাল পরে কাণ্ট এবং শোপনহোয়ার যাহা বলিয়াছেন বহু পূর্ব্বে উপনিষদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। "আত্ম-জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ করা যায় এই কথা উপনিষদে যেরূপ চরমভাবে ও চমৎকারভাবে বলা হইয়াছে শাশ্বত দার্শনিক সত্য আর কোথাও সেভাবে বলা হয় নাই।"(৪) পুনশ্চ তিনি বলিয়াছেন, যে উপনিষদের মধ্যে এরূপ দার্শনিক ধারণা পাওয়া যায়, "যাহার তুলনা শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।(৫)

ম্যাকডোনেল লিখিয়াছেন, "মানব-চিন্তার ইতিহাসে

---

(১) "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the upanishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death."

(২) "If these words of Schopenhauer required any endorsement I should willingly give it as the result of my own experience."

"Origin of the Vedanta."

(৩) Almost superhuman conceptions whose originators can hardly be regarded as mere men."

(৪) "Eternal Philosophical truth has seldom found more decisive and striking expression than in the doctrine of the emancipating knowledge of the Atman."

(Philosophy of the Upanishads)

(৫) "......There are Philosophical conceptions unequalled in India, or perhaps any where else in the world."

প্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেশকালাতীত বস্তুর (ব্রহ্মের) ধারণা সঠিক ভাবে করা হইয়াছে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।" (৬)

ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজো লিখিয়াছেন, "যখন আমরা প্রাচ্যের এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কবিত্বপূর্ণ এবং দার্শনিক কীর্ত্তিসমূহ পাঠ করি, আমরা সেখানে এরূপ গভীর সত্যসমূহ আবিষ্কার করি এবং য়ুরোপীয় প্রতিভা যে স্থলে উপনীত হইয়াছে তাহার সহিত এরূপ পার্থক্য দেখিতে পাই যে প্রাচ্যের দর্শনের নিকট আমরা নতজানু হইতে বাধ্য হই।" (৭)

জার্মান লেখক এবং পণ্ডিত ফ্রেডারিক শ্লেগেল লিখিয়াছেন, "য়ুরোপের উচ্চতম দর্শনকে যদি প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে য়ুরোপীয় দর্শনকে সমগ্র জগদুদ্ভাসক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে নির্বাণোন্মুখ ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে হয়।" (৮)

বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ স্থায়ী হইয়াছে। বেদের শ্রেষ্ঠ অংশ উপনিষদ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণ স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা রচিত বা প্রচারিত হইয়াছেন এবং বিদেশী পণ্ডিতগণও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। এজন্য আমাদের দেশের এই অমূল্যনিধি উপনিষদ সম্পর্কে আমাদের যত্নপূর্বক আলোচনা করা উচিত। হিন্দুর ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সকলই বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদের চরম সত্যসকল উপনিষদে পাওয়া যায়। এজন্য বলা যায় যে হিন্দু সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে উপনিষদের আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। ইহা সত্য যে বেদ-বিশ্বাসী ঋষিগণ ছয়টি দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। ইহাও সত্য যে এই সকল দর্শনে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ আছে। আচার্য্যগণ ইহার মীমাংসা এইভাবে করিয়াছেন। চরম-সিদ্ধান্ত সকল উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রধানতঃ উপনিষদের বাক্যসকল আলোচনা করিয়া এই উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন রচিত হইয়াছে। যদি অন্য দর্শনের কোন সিদ্ধান্ত বেদান্তের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। যাহা বেদান্তবিরোধী নহে, তাহা গ্রহণীয়। ঋষিগণ অন্য যে পাঁচটি দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা বিষয়সুখে আসক্ত, যাহাদিগকে একেবারে বিষয়-ভোগহীন ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়া আকৃষ্ট করিতে পারা যাইবে না, তাহাদিগকে ঐহিক বিষয়-ভোগের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ক্রমশঃ বেদান্তের চরম সত্যের পথ দেখাইয়া দেওয়া। এজন্য এই সকল দর্শনে এমন কথা মধ্যে মধ্যে বলা হইয়াছে যাহা বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্যহীন। ঐ সকল বাক্যের দ্বারা ইহজীবনের সুখভোগাকাংক্ষা হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। ইহজীবনের সুখ-ভোগাকাংক্ষা হইতে নিবৃত্ত না হইলে বেদান্তের সত্য সকল উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হয় না।

"নহিতে মুনয়োভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাৎ তেষাম্।
কিন্তু বহির্বিষয় প্রবণানাম্ আপাততঃ পরমপুরুষার্থ প্রবেশো ন ভবতি ইতি নাস্তিক্য নিবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। (মধুসূদন সরস্বতী)।"

অনুবাদ—এই সকল মুনিগণ (যাঁহারা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ ও পূর্বমীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন) তাঁহারা ভ্রান্ত নহেন। কারণ তাঁহারা সর্বজ্ঞ। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বাহ্যবিষয় ভোগে আকৃষ্ট থাকে তাহারা সেই অবস্থায় পরমার্থ (ব্রহ্ম) বিষয়ে ধারণা করিতে পারে না, এজন্য তাহাদের নাস্তিক্যবুদ্ধি দূর করিবার জন্য তাঁহারা অন্য কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পূর্বমীমাংসা দর্শনে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করা উচিত, কারণ যজ্ঞ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায় এবং সেখানে প্রচুর বিষয় সুখভোগ করা যায়। এই বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহলোকের বিষয় ভোগের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করা। পরলোকের সুখ-ভোগের আকাংক্ষাকে জীবনের উদ্দেশ্য করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। পরলোকের সুখভোগের আকাংক্ষা দ্বারা ইহলোকের সুখ ভোগের আকাংক্ষা নিবৃত্ত করা যায় বলিয়া পরলোকের সুখ ভোগের কথা বেশী বলা হইয়াছে। ইহ-লোকের সুখ ভোগের আকাংক্ষা নিবৃত্ত হইলে তাহার পর স্বর্গ সুখের আকাংক্ষাও নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্ম উপলব্ধির আকাংক্ষা জাগ্রত করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

---

(৬) "Brahman or the absolute is grasped and finitely expressed for the first time in the history of human thought, in the Brihadaranyaka Upanishad" India's past p—46.

(৭) "When we read the poetical and philosophical monuments of the east, above all those of India, we discover there many truths so profound and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East. (Quoted by Maxmuller in his "Origin of the Vedanta."

(৮) "Even the loftiest philosophy of the Europeans appears in comparison with the abundant light of the oriental idealism life a feeble prometheans spark in the full flood of the heavenly glory of the noon day sun, faltering and feeble, and ever ready to be extinguished." (Quoted by Maxmuller in his origin of the Vedanta.)

সামান্য একটা খবর

সুভাষ সমাজদার

নিশি রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে ঝরছে দুর্লভপুরের সীমান্ত এলাকায়। সীমান্ত-রক্ষীদের ত্রিকালের তাঁবুগুলোকে দূর থেকে মনে হয় যেন এক একটা হিংস্র জন্তু থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। সাঁ সাঁ করে বাতাসের কান্না বাজছে রেলের টেলিগ্রাফের তারে তারে। রেললাইনের ওপারে হাওয়ায় ওড়ে পাকিস্তানের পতাকা। আর এপারে দুর্লভপুর গ্রামের সীমানায় উঁচু বাঁশের মাথায় দোলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। সুখে দুঃখে একই জলে হাওয়ায় বেড়ে ওঠা পাশাপাশি দুটো গ্রামের লোকরা রেললাইনটার দিকে অপলক দুটো বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে বেদনার নিশ্বাস ফেলে। চকচকে ঐ লোহার রেললাইনটা যেন একটা ছোরার মত বিঁধে গেছে তাদের পাঁজরে। ওপারের ঝলঝলিয়াগঞ্জের বৃহস্পতিবারের হাটে যেতে পারবে না দুর্লভপুরের মানুষ।

দুর্লভপুরের রাসের মেলায়, পৌষসংক্রান্তির মেলায় পুরানো দিনের মত বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে আর আসতে পারবে না ঝলঝলিয়ার লোক। রেললাইনের দুধারে বসে দুটো দেশের মানুষ বিরহকাতর ডাহুক-ডাহুকীর মত চিরকাল বিচ্ছেদের কান্না কাঁদবে, আর কোনদিন তারা মিলবে না···সীমান্তরক্ষী গোকুলের পাঁজরের ভেতর থেকে ভাঙা ভাঙা একটা বেদনার নিশ্বাস রাতের বাতাসে মিলিয়ে যায়। হিন্দুস্থানী রক্ষী জগমোহন বিড়িতে একটা টান দিয়ে গোকুলের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এত ভাবতেছিস কেয়া রে গোকলা ?

—যা কিছু নয়। এমনি মন মেজাজ ভাল না—হো হো করে হেসে উঠল জগমোহন। তার তীক্ষ্ণ হাসি অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে বয়ে গেল লহরে লহরে। বলল—তিরিশ বরষকা জোয়ান আদমী তুই গোকুল, তোর মন মেজাজ কেমে, আচ্ছা নেই ; ও হাম সমঝাতে পারি—স্নিগ্ধ কৌতুকে তার ছোট ছোট চোখদুটো জোনাকীর মত জ্বলে উঠল। গোকুলের চোখে ঝিঁকিয়ে উঠল আগুন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—তুই কি বলতে চাস সরস্বতীর জন্ত আমার মন খারাপ হয়েছে ?

—জরুর। ওই ইস্কুল-পড়া লেড়কী তোর আঁখমে রঙ ধরিয়েছে—বলল বর্ডার-হাবিলদার শিউচরণ। থমকে দাঁড়াল গোকুলের হৃদস্পন্দন। তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল মাথার ভেতরটা। তাহলে কি হাবিলদার সাহেবও জানে ব্যাপারটা! সে রেললাইনের এপাশে দুর্লভপুরের সীমানায় ঘন থক্‌থকে অন্ধকারে ঢাকা পাটের ক্ষেতের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিল। আলোধরা চিন্তার বুদ্বুদ ফুটল তার মনে: শেষরাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেলেই ঐ পাটক্ষেতের পাশে মরা শকুনীর খালের পাড়ে ঝুরিনামা বট গাছের নীচে অসংখ্য ছায়ামূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠবে। ফিস ফাস, চাপা গলার কথার গুঞ্জন উঠবে। তারপর সবাই ঐ চকচকে রেললাইনটা ডিঙ্গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে। কারো কাঁধে বিড়ির পাতার বস্তা, কেউ নিয়েছে চিনি, কেউ লবণ, কেউ মশলাপাতি। ওপারে নিয়ে যেতে পারলেই তিনগুণ বেশী দাম হবে এসব জিনিসের। ওখানে ঝলঝলিয়ার ঝাপড়া তেঁতুলগাছের নীচে শিকারী জন্তুর মত দুচোখের দৃষ্টি জ্বালিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে পাকিস্থানের মহাজন। ওপারের দুর্লভপুর, বক্সীগঞ্জ, কি হিলির মহাজনরা তখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমে অচেতন, কিম্বা গীতাপাঠে বিভোর। তারা জানে, সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে কুলীরা ঠিক ওপারে তাদের জিনিস পৌঁছে দেবে। এই সীমান্ত এলাকায় ওদের কুলী বলে না। ওরা 'চোলাইদার'। এপারে নিরাপদে ফিরে এসে চকচকে কয়েকটা রূপালী মুদ্রার মজুরীতে ওদের শীর্ণ মুখে হাসির ঝিকিমিকি

কোটে। । হিংস্র দারিদ্র্যের জ্বালায় মরিয়া হয়ে একাজে নেমেছে বাস্তত্যাগীদের দল। সাত থেকে সাতাত্ত বছরের মেয়েপুরুষ আছে এই চোলাইদারদের দলে। শুধু পদ্মা-মেঘনার ওপার থেকে সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আসা বাস্তু-হারারা নয়। দুর্লভপুর, হালিয়াদীঘি, বক্সীগঞ্জ, হিলির বিড়ির দোকানদার, মোটর বাসের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ড্রাইভার, দারিদ্র্যজীর্ণ স্থানীয় সাধারণ গৃহস্থের দল থেকে সুরু করে এপারের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পর্য্যন্ত নেমেছে এই চোলাই-দারের কাজে! আশ্চর্য! এ অঞ্চলে মিল নেই, ফ্যাক্টরী নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও খুব খারাপ। তাই অন্নসংস্থানের চেষ্টায়, অভাবের দায়ে একটা গোটা জাত 'স্মাগলার' হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক-পাস সীমান্তরক্ষী গোকুলের চোখে ব্যাথার ছায়া নামে। ভারী হয়ে ওঠে তার বুকটা। কী দুর্গ্রহের অভিশাপ যে নিয়ে এসেছে এই দেশভাগ! চোখের সামনে ভেসে উঠল টুকরো টুকরো সোনা-মোড়া স্মৃতি। বগুড়ার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মহাদেব-পুরে ভুতকুঁড়ির পুকুরের পাড়ে হয়তো এই গাঢ় অন্ধকারে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাটির দোতালা বাড়ী। নক্ষত্রের আলো আর এই অন্ধকার বুকে নিয়ে ভুতকুঁড়ির জল ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে। আছে—আছে, সব আছে! শুধু মানুষগুলোই নেই! সব হারিয়ে এখানে এসে রাত-চরা জন্তুর মত এই জীবিকার অর্থে বুড়ী-মা ভাই-বোন নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু দেশটা ভাগ না হলে কি মহাদেবপুর হাইস্কুলের কৃতী ছাত্রকে কখনো নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের জ্বালায় বর্ডার গার্ড হতে হতো! মনের মধ্যে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা শতমুখ দিয়ে যেন বিদীর্ণ করতে লাগল তাকে। কতবার তার মনে হয়েছে—সে ছেড়ে দেবে এই চাকরী। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরে যেন আর্তনাদ করে ওঠে বুড়ীমা, ছোট ছোট ভাইবোনদের অসহায় করুণ দৃষ্টি, অর্দ্ধাহার···অনাহার—না; আর ভাবতে পারে না সে। নিশিরাতের অন্ধকারে দুই দেশের সীমানায় পাহারা-রত সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষী, গোকুলের চোখ ফেটে জল আসে। জগমোহন বলে, গোকলা বিড়ি খাওগে কি নেই!

নিস্পৃহ গলায় গোকুল বলল—দাও একটা—হঠাৎ দুর্লভপুরের দিকে কালো অন্ধকার দিগন্তে একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেজে উঠল। সতর্ক হয়ে উঠল প্রতিটি রক্ষী চোখের দৃষ্টি। বুকে ভয়ের ধকুপুকু শব্দ। হেঁকে উঠল হাবিলদার শিউচরণ—সব এ্যাটেনশন হো যাও। অন্ধকারে চকচক করে রক্ষীদের বন্দুকের সঙীণগুলো। চারিদিকের নিথর স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে বুটের শব্দ উঠল—ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌। দূরে হিলি বক্সীগঞ্জের পীচ-বাঁধানো রাস্তার ওপর ফিরে হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে আসছে একটা জীপ। বর্ডার মিলিটারী পেট্রোলিং পার্টি। হাবিলদারের শরীরের ভেতরটা শির শির করছে। সারপ্রাইজ ভিজিট! অর্থাৎ হঠাৎ পরিদর্শন করতে আসছেন বর্ডার মিলিটারী অফিসার নিখিলেশ সেন। দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় চোরাই মালের ব্যবসা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এত বেশী যে দুর্লভপুর হিলি অঞ্চলেই অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে চিনি, লবণ, কাপড়। তাই সরকার বর্ডার-মিলিটারী অফিসারকে পাঠিয়েছেন এই অঞ্চলে। অল্পদিন হলো এসেছেন। মাঝে মাঝে তিনি আসেন; সীমান্ত এলাকায় আসেন রাতের প্রথম প্রহরে। আজ এই শেষ রাতের তরল অন্ধকারে কেন! পাংশু হয়ে গেল গোকুলের মুখ। হৃদপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। রক্তে রক্তে তীব্র একটা ভয় চমকে উঠল। তবে কি—তবে কি তিনি জানতে পেরেছেন, শেষরাতের অন্ধকারেই···ক্যাচ শব্দ করে ব্রেক কষে যেন একটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল জীপ। না। বর্ডার-মিলিটারী-অফিসার নিখিলেশ সেন আসেন নি। সদর থানা থেকে খবর নিয়ে এসেছেন একজন জমাদার—মিঃ সেন আসবেন, নতুন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সঙ্গে। তাঁরা রওনা হয়েছেন। এখুনি তাঁরা এসে পড়লেন বলে। সীমান্ত এলাকার চোরাই ব্যবসা শক্ত হাতে তিনি থামিয়ে দেবেন। এটা তাঁর প্রাথমিক কাজ। অতএব সাবধান।

সাবধান! গোকুলের নিদারুণ আশঙ্কাটা যেন তীব্র একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। আজও যদি সরস্বতী আসে, তাহলে সে কেমন করে তাকে সাবধান করবে! কেমন করে তাকে—

সরস্বতী গোকুলের সীমান্ত রক্ষীর পাঁচ বছরের চাকরীর জীবনে একটা অতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ। সেদিনও ঐ মরা শকুনীর খালের পাড়ে অশথ্ গাছের মাথায় শেষ

রাতের আবছায়া অন্ধকার দুলছিল। গাছের ডালে ডালে খড়কুটোর বাসার ভেতরে কাকের কলরব জেগে উঠেছিল। পাকড়া—পাকড়া উস্কে—চেঁচিয়ে উঠেছিল হঠাৎ জগমোহন। চোখের পলকে ছায়ামূর্তির মত পাটক্ষেতের নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল চোলাইদারদের সবাই। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিল গোকুল, ছুটেছিল জগমোহন। যেমন করে হোক অন্তত একটাকে ধরতে হবে। তারা সীমান্ত এলাকার রক্ষী বলে দুর্নাম আর প্রচলিত কুখ্যাতি সেদিন তাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তীর বেগে ছুটে যেয়ে ঠিক ঐ মরা-শকুনীর খালের পাড়ে লোহার গেটের মত কঠোর দুটো হাতের বেড় দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছিল—একটা জীর্ণ মলিন শাড়ির উড়ন্ত আঁচল। খরোখরো রোগা একটা মেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল তার পায়ের কাছে। জলে উঠে গোকুল বলেছিল—দেখে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের মেয়ে! তুমি 'স্মাগল' করছো! আশ্চর্য্য!

জলভরা চোখের করুণ দৃষ্টিটা সে গোকুলের দিকে তুলে ধরে বলেছিল—হ্যাঁ। ভদ্রলোকের মেয়ে বলেই করছি। আমার বাবার 'প্যারালিসিস' রোগ। সাত-সাতটা ভাইবোন। আমি লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে—

—ঐ চিনি আর লবণের পুঁটলী কোমরের কাপড়ে বেঁধে নিয়ে পাকিস্থানে বিক্রী করে বুঝি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ?

—না।—কান্না-ভরা গলায় আকুলিত আবেদন ঝরে পড়ল। বলল—দেখুন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা পাস করতে পারলে একটা চাকরী পেয়ে যাবো। না হলে বাবা মা—ভাইবোন সমস্ত সংসার—

—বাজে কথা বলো না। থানায় চলো—সীমান্ত-রক্ষী গোকুলের গলায় আদেশের কঠিন সুর ঝনঝন করে বেজে উঠল—স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে তোমার এই 'স্মাগল' করার সম্বন্ধ কি?

—বিশ্বাস করুন। আমি টেস্ট পরীক্ষায় পাস করেছি—চারিদিকের তরল অন্ধকারে তার কথাগুলোকে কাতরকান্নার মত মনে হল। বলল—আজ দুই সপ্তাহ হলো চোলাইদারের কাজ করে আমি পঁচিশ টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচটাকা বড় দরকার—

—কেন? রোগা বাপের জন্য ওষুধ?

—না।

—তবে? যেন একটা কুয়াশার ধাঁধায় পড়ে ছটফট করতে থাকে গোকুলের চোখদুটো। কি—কি বলতে চায় লেখাপড়াজানা এই ভদ্রলোকের মেয়ে চোলাইদারটা। চীৎকার করে বলল—কোন খাতির নেই। তোমাকে থানায় যেতে হবে। চল—

—বিশ্বাস করুন। আরও পাঁচটাকা হলে আমি স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি দিতে পারবো। টাকা দেওয়ার মত কেউ নেই আমার—

হিম হয়ে যায় গোকুলের বুকের রক্ত। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি! তার জন্য স্মাগলিং? তার রাইফেল-ধরা শক্ত হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল। চিন চিন করে জলে যেতে লাগল তার দেহটা। হঠাৎ অসহ্য একটা যন্ত্রণায় যেন পাগলের মত চীৎকার করে উঠল—যাও—যাও—চলে যাও তুমি? দাঁড়িয়ে কি দেখছো! চোখের পলকে হাওয়ার মত মিলিয়ে গিয়েছিল সরস্বতী। হায়েনার মত টেনে টেনে হেসে উঠেছিল জগমোহন, হাবিলদার শিউচরণ, সবাই। জগমোহন কপাল চাপড়ে বলেছিল—কেয়া তাজ্জব কি বাত! পরীক্ষাকা ফি:কে লিয়ে স্মাগলিং! বাঙ্গালা ডেশ কি লেড়কী সব কুছ পারে—

অতলান্ত অন্ধকারে যেন তলিয়ে গিয়েছিল গোকুলের চেতনা। কেমন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রিয়গুলো। কে কি বলছে, কিছুই তার কানে আসছে না। তারপরে একে একে তিনটি দিন কেটেছে। মাঝরাতের প্রহর পার হয়ে, এসেছে শেষরাতের পাখী ডাকা, শুকতারার স্নিগ্ধ আলোর শেষপ্রহর। সীমান্ত-রক্ষী গোকুল, জগমোহন কাঠের পুতুলের মত রেল লাইনের তারের এপারে দাঁড়িয়ে থেকেছে নিষ্প্রাণ, শিলীভূত মূর্ত্তির মত। আর তাদের চোখের সামনে ছবির পর ছবি ফুটেছে—

ঐ যে অস্তমান চাঁদের আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে মরা শকুনীর খালের ঘোলা জলে, সেই খালেরই পাড়ে নিঃশব্দ পায়ে এসে এতক্ষণ নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে সরস্বতী। তার কৃশকরুণ মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছে। উত্তেজনায় উদ্বেগে নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছে দ্রুততম। ও জানে মা—

গোকুল যাবে না, জগমোহন যাবে না—হাবিলদারও যাবে না—বিশেষ করে ঐ একটি ঢোলাইদারকে ধরতে। ওপার থেকে মজুরী নিয়ে আঁচলে বেঁধে ফেরার সময় সরস্বতী যখন দেখে অন্ত ঢোলাইদারের ওপরে সিংহের মত বিক্রম নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিশ্চয়ই তখন তীব্র খুসীর একটা বিস্ময়ে চমকে চমকে ওঠে সরস্বতীর বুকের নিশ্বাসগুলো। হয়তো গাঢ় কৃতজ্ঞতায় ভরা অগাধ ছুটো চোখের কোমল দৃষ্টি সে ভাসিয়ে দেয় দূরে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষীদের দিকে। কিন্তু তারা তখন ব্যস্ত। পূবের আকাশে রক্তপলাশের রঙ ধরে। অন্ধকার খুঁজতে গিয়ে জোনাকীরা ঐ ঝাওড়াগাছের ওপরে স্বর্ণলতার ঝোপে ঝিক্‌ঝিক্ করে। হাবিলদার চেঁচিয়ে ওঠে—আজ কয়ঠো পাখা জালমে গিরেছে রে জগমোহন?

—বাইশঠো হুজুর।

—লে চল গারদমে—

রেললাইনের পাশেই 'চেকপোষ্টে'র ঘরের গা ঘেঁসে 'স্মাগলারদে'র জন্ম অস্থায়ী গারদ ঘরের দিকে ঢোলাইদারদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে যেতে চাপাগলায় বলেছে গোকুল সরস্বতীকে—সেই প্রথম ধরার দিন থেকে আজ কয়দিন হলো রে জগমোহন?

—তিন রোজ। তিন রূপেয়া কামায় লিয়েছে সরস্বতীয়া—

—হ্যাঁ। আরো ছুটাকা বাকী—আরো ছুই দিন!

আরো দুইদিন—আরও ছুই টাকা। সুচীমুখ যন্ত্রণায় জলে যাচ্ছে গোকুলের মাথার ভেতরটা। গায়ে পিঠে, রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। আজ সে কেমন করে সরস্বতীকে—

আসছে—আসছে রে! চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল জমাদার। কৃষ্ণারাত্রির হৃদপিণ্ডের ধ্বনির মতই যেন আবার চাপা গোঁ গোঁ শব্দ উঠল হিলি-বজীগঞ্জের পীচ-বাঁধানো রাস্তায়। তীব্র হেডলাইটের আলোয় দুপাশের দিগবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত ঝলসে দিয়ে তীরবেগে আসছে মিলিটারী ভ্যান। ফিসফিসিয়ে জগমোহন বলল—আজ খুব সামাল হো বা গোকলা!

—হাঁ, গোকলা—তর্জনী তুলে রক্তাভ দুটো চোখ পাকিয়ে বলল হাবিলদার শিউরেণ—সরস্বতীয়া-উরস্বতীয়া কো—কিসিকো মাত ছোড়ো। নোকরী খতম হো যায়গা। গোকুলের চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে মরা-শকুনীর পাড়ে। ঐ অশ্বত্থগাছের আড়ালে কোন ছায়া শরীর কি দুলছে! চারিদিকের ঝিঁঝিঁগুলো যেন তার রক্তের ভেতরে বাজছে। হা ভগবান! আজ যেন সরস্বতী না আসে। না—ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে! গতকাল কি পরশুদিন যখন সে তাকে বলেছিল—বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসতে ভয় করে না তোমার?

ভয়! ক্ষীণ তনু ফুলিয়ে ফুলিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল সরস্বতী। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টি। বলেছিল—আত্মীয় স্বজন বন্ধু সকলের কাছেই হাত পেতেছিলাম। সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে। গরীব মানুষের ভয় থাকলে চলে না—

—বাদবাকী অল্প কয়েকটা টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি নাও। পরীক্ষা দাও। পাস কর—বলতে চেয়েছিল গোকুল। কিন্তু কে যেন সাঁড়াশী দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছিল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বংশানুক্রম সংস্কার। যদি ও কিছু মনে করে! কিন্তু সেদিনই জোর করে, নিজের মর্য্যাদাকে অগ্রাহ্য করেও ওকে কয়েকটা টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কে জানে, নতুন ডি-এম এসেই—শেষরাতের অন্ধকার-ঢাকা সীমান্ত এলাকার ছায়া মূর্তিদের রোমাঞ্চকর বাণিজ্যের খেলা দেখতে আসবেন নিজের চোখে?

এ্যাটেনশান! নিথর স্তব্ধতা কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল হাবিলদার শিউচরণ। মুহূর্তে প্রতিটি সীমান্তরক্ষীর রাইফেল ঘাড়ের ওপরে উঠে এল, রাইফেলের চকচকে সঙ্গীণের ফলায় ঝকমক করে উঠল নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরোয়ানা, রক্ষীদের পাথুরে মুখে কঠিন নির্লিপ্ততা, মরা শকুনীর খালের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখের মণিগুলো বাঘের মত কপিশ আলোয় জল জল করছে। আজ তাদের জলন্ত দৃষ্টির সীমানায় কেউ পড়লে আর রক্ষে নেই। আগুন ঝলসে উঠবে রাইফেলের মুখে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে জগমোহনের কপালে। তারও মনের ভেতরে একটা আকুল আবেদন মাথা কুটছে—সরস্বতী যেন না আসে। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সেই অতিকায়

ভ্যানে'র শব্দ। হিলির যমুনা নদীর ব্রীজের ওপর ফিরে যাঁ করে ছুটে চলে আসবে এখুনি। হঠাৎ চমকে উঠল গোকুলের চোখের দৃষ্টি। প্রচণ্ড একটা আশঙ্কায় শিথিল হয়ে এল জগমোহনের বুকের পেশীগুলো। ছায়া-ছায়া অন্ধকার নড়াচড়া করছে মরা শকুনীর খালের পাড়ে ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে। এসে পড়েছে চোলাইদারদের দল।

খস্—ব্রেক্ কসে ভ্যান থেকে লাফিয়ে নামলেন মিঃ সেন, নতুন ডি-এম মিঃ ব্যানার্জি, হাবিলদার জমাদার প্রতিটি রক্ষী তাঁদের অভিবাদন জানাল। শিউচরণ বট-গাছটার দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল—হল্ট! হু গোজ দেয়ার—উত্তেজিত হয়ে মিলিটারী অফিসার বললেন ডি-এমকে—জাষ্ট সি! হোয়াট ইজ গোয়িং অন এ্যাকচুয়েলি ইন্ দিস বর্ডার—দাঁতের কোনায় চুরুট চেপে ধরে রক্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে অর্ডার দিলেন ডি-এম সেন্ট্রি—এ্যারেষ্ট—এ্যারেষ্ট দেম—যাও-যাও পাকড়ো—বিদ্যুতবেগে ছুটল প্রতিটি সীমান্তরক্ষী ঐ ছায়া-ছায়া শরীরগুলোকে লক্ষ্য করে:

চোলাইদারদের দলের ভেতরে তীব্র হাহাকার পড়ে গেল—ধরতে আসছে রে—ধরতে আসছে—পালা-পালা—

গাঢ় নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে গেল তাদের আর্ত-কলরব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের হাল্কা শরীর নিয়ে ছুটে ওপারে ঝলঝলিয়াগঞ্জের আবছায়া অন্ধকারে মিশে গেল। বুড়োবুড়ীরা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল এপারের সীমানায়। ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তাদের কারো বিড়ির পাতা, কারো মসলার মোড়ক—রক্ষীদের বলিষ্ঠ হাতের থাবা এগিয়ে এল তাদের গলার কাছে। আর জোয়ান ছেলে-মেয়েরা যে যে দিকে পারল ছুটল, কেউ ঘন নিবিড় পাটের জঙ্গলে, কেউ সাঁইঘাসের ঝোপের ভেতরে। কিন্তু আজ রক্ষীরা মরিয়া। তারা মত্ত হস্তীর আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাটক্ষেতের ভেতরে, সাঁইঘাসের জঙ্গলে, বনতুলসীর আর কন্টিকারী-ধুতরার ঝোঁপের ভেতরে। টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে এল এক একটা চোলাইদারকে। উত্তেজনায় গোকুলেরও মাথার ব্রহ্মতালুটা দপ দপ করছে। লুব্ধ মত্ত একটা বিশাল অতিকায় জন্তুর মত এক একটা শিকারের টুঁটি চেপে ধরে নিয়ে এসে ফেলছে ডি-এম এর পায়ের কাছে। আর মনের ভেতরে বিপুল একটা আনন্দ স্তম্ভিত হয়ে গলে গলে পড়ছে—সরস্বতী আসে নি! লেখা-পড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে! ঠিক রাতের অন্ধকারে হয়তো এদিকে কয়েক পা এসেই আবার দুর্লভপুরের দিকেই ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে—তার ঠোঁটের কোনায় কোনায় গরবী হাসির রেখা ফুটল। যেন সরস্বতীর না আসাটা তারই কৃতিত্ব! বর্ডার মিলিটারী অফিসার মিঃ সেন আর ডি-এম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আসামীদের নিয়ে। ডি-এম বিরক্ত হয়ে বললেন—মাত্র এই কয়জন ধরা পড়ল! একটু থেমে আবার হেঁকে বললেন—সেন্ট্রি, ঠিকসে পাকড়ো—পাটকা ক্ষেতমে দেখ—জরুর আউর হ্যায়—হঠাৎ মিঃ সেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। চমকে উঠলেন মিঃ সেন। বললেন—আপনার সন্দেহ হয়? বেশ তো সার্চ করা যাবে—হাবিলদার শিউচরণ পাগলের মত চোলাইদারদের ধরছে। হঠাৎ দূরে পাটক্ষেতের পাশে আল-পথের ওপর দিয়ে বাতাসের বেগে ছুটে যাওয়া একটা মূর্তির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জগমোহন—পাকড়ো—আউর একঠো ভাগতা হ্যায়—ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মত ছুটল জগমোহন। তবে কি সরস্বতী! থমকে দাঁড়াল গোকুলের হৃদস্পন্দন। সেও ছুটল সেইদিকে। শিউচরণ আবার নতুন উদ্যমে চোলাই-দার শিকার করতে লাগল। আর জগমোহন শক্ত হাত বাড়িয়ে সরস্বতীর সরু গলাটা চেপে ধরে ফেলল। চাপা যন্ত্রণায় ককিয়ে উটল—আঃ তু সরস্বতীয়া! হা ভগমান! সরস্বতীর বেণী ভেঙে, ছড়িয়ে পড়েছে চুল। কাঁটায় কাপড় ছিঁড়েছে। মরা সাপের মত দুলছে তার আঁচল। ভয়ে উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আজ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে! বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি। মাতলা একটা ঝড়ের মত ছুটে এসে গোকুল বলল—জগমোহন ওকে ছেড়ে দে—কৈ কৈ—কি মাল আছে দেখি! বলেই সরস্বতীর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে মশলার ঠোঙাটা নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলল।

জগমোহন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—উহুঁ—উহুঁ চোরাই মাল পকেটমে রাখিস না—বর্ডার গার্ডকে কেউ সন্দেহ করবে না—গোকুলের ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে

চলেছে। ধবক ধবক করছে হৃদপিণ্ডটা। ফিরে এসে জগমোহন, গোকুল দুইজনই বলল—শালাকে ধরতে পারা গেল না—কার কথা কে শোনে! সীমান্ত এলাকা জুড়ে যেন আর্ত্ত চীৎকার, হাহাকার আর কান্নার প্রলয় নেমেছে। প্রাণের ভয়ে সরস্বতী তখন হিন্দুর নিরাপদ এলাকার দিকে ছুটে চলেছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে আবার উঠে ছুটছে। কিন্তু—

কিন্তু হাবিলদার আচমকা হেঁকে উঠল—এ্যাটেনশান! মিঃ সেন বললেন ডি-এমকে—তাহলে কি ওদের—

ডেফিনিটলি! আমার 'কনফিডেনশিয়াল' রিপোর্ট যা, তাতে মনে হয় কোথাও ফাঁকি আছে।

—হ্যাঁ। দৈনিক কাগজগুলো লিখছে, কনষ্টেবলরাও ওদের এজেন্ট।

—ইয়েস্। সার্চ দেম!

তারপরের কথা খুব সংক্ষিপ্ত। খবরের কাগজের মফঃস্বল সংবাদের ভেতরে ছোট একটা খবর ছাপা হয়েছিল, "সীমান্ত এলাকায় এক বাঙালী সীমান্ত-রক্ষীর পকেটে কয়েকটি মসলার ঠোঙা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, রক্ষীদের ভেতরেও কী ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে।" রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিকের আকাশ অভিযান আরো হাজারো আন্তর্জাতিক সংবাদের ভীড়ে কত তুচ্ছ আর সামান্য একটা খবর।

আমেরিকার একটি কৃষক পরিবারে কয়েকদিন

শ্রীহিরণ্ময় গুপ্ত

গত বৎসরে মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময়ে আমাকে নেব্রাস্কা রাজ্যের একটি কৃষক পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার কৃষকেরা যন্ত্র সাহায্যে কিভাবে কৃষিকার্য করিয়া থাকে তাহার বহু বিবরণ ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলাম। এই সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। শুধু তাহা নহে, মার্কিণ কৃষকের জীবনযাত্রাপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার একটি চমৎকার সুযোগও আমার ঘটিয়াছিল।

নেব্রাস্কার যে গ্রামে আমি গিয়াছিলাম তাহার নাম ডরচেষ্টার। নেব্রাস্কা কৃষিপ্রধান রাজ্য। ডরচেষ্টার গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। আমি যে কৃষকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহার নাম ডেলমার ফিকেন। ফিকেন একটি কৃষি-খামারের মালিক।

নবেম্বর মাসের এক সকালে আমি ডরচেষ্টারে আসিয়া পৌঁছিলাম পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ফিকেন-বাস ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। আমি পৌঁছিবামাত্রই আমাকে লইয়া তাহার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। দুই পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। কিন্তু রাস্তায় কাদা একরকম ছিলই না। বেশীর ভাগ রাস্তাই পীচের। একটি কাষ্ঠনির্মিত দ্বিতল বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। ফিকেন-গৃহিণী স্মিতহাস্যে আসিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া বিকালের দিকে ফিকেন-পরিবারের ড্রয়িং রুমে আসিয়া বসিলাম। নানারকম আলাপ আলোচনা সুরু হইল।

ডরচেষ্টার গ্রামে যে সকল কৃষক বাস করে তাহাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ হয় জার্মান, না হয় চেক। বৃদ্ধদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ জার্মান ভাষা জানেন। ফিকেনের পূর্বপুরুষও ছিলেন জার্মান। তাহার পিতার ১৪৬ একর জমি ছিল। ২০,০০০ ডলার মূল্য দিয়া পিতার নিকট হইতে ফিকেন তাহা ক্রয় করে। ফিকেন পিতার জমি ভাগে চাষ করিত; ফসলের দুই-পঞ্চমাংশ পিতাকে দিতে হইত, তিন-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখিত। এই ভাবে কয়েক বৎসর ধরিয়া ফিকেন ১০০০০ ডলার পরিশোধ করিয়া দেয়। পিতার মৃত্যু হইয়াছে ১০ বৎসর, এখনও তাহাকে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিতে হইতেছে।

ফিকেনের আরও ২ ভাই এক বোন আছে। ফিকেন পিতাকে জমির মূল্য বাবদ যাহা দেন তাহা হইতে ফিকেনের পিতা নিজের জন্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অন্যান্য সন্তানেরা পিতার যে সকল জমি ক্রয় করে তাহার মূল্যের একটা অংশ ফিকেনও ভাগে পায়। ছেলেদের কাছে জমিজমা বিক্রয় করিয়া ফিকেনের পিতামাতা নগদ অর্থ লইয়া নিকটবর্তী ক্রীট নামক সহরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং ফিকেনের পিতা আসিয়া ফিকেনের সঙ্গেই বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বে ৫ বৎসর ফিকেনের পিতা তাঁহার কাছেই ছিলেন।

ফিকেনের মোট জমির পরিমাণ ১৪৬ একর (প্রায় ৪৩৮ বিঘা)। নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে একলাই এই জমি চাষ করিয়া থাকে, তবে চাষের মরশুমে তাহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র টেরেন্স অনেক সময়ে তাহার সঙ্গে কাজ করে, সময়ে সময়ে তাহার স্ত্রীও তাহাকে সাহায্য করে। আমেরিকায় মজুরী বেশী, কৃষিকার্যে দিনমজুর নিয়োগ

করিলে ব্যয় অত্যন্ত বেশী পড়ে, কাজেই পারতপক্ষে কেহ মজুর নিয়োগ করিতে চেষ্টা করেনা। তবে সময়ে সময়ে পারস্পরিক সাহায্য হিসাবে একে অন্যের ক্ষেতে গিয়া কাজ করিয়া দিয়া আসে।

১৪৬ একরের মধ্যে ফিকেন একসঙ্গে সব জমি চাষ করে না। গোচর হিসাবে ১৫ একর জমি ফেলিয়া রাখে এবং অবশিষ্ট জমির প্রায় সবটাই প্রতি বছর চাষে লাগায়। প্রায় ৪৫ একর জমিতে সে ভুট্টা লাগায়। তাহা ছাড়া ৩১ একর জমিতে গম, ১৬ একর জমিতে যই, ৪ একর জমিতে যব, ১০ একরে মাইলো, ৪ একরে রাই ও ৮ একরে আলফালফা ঘাস (পশুখাদ্যের জন্য) চাষ করিয়া থাকে। কিছুটা জমিতে বাগানও করিয়াছে।

ডেলমার ফিকেন পশুপালনও করিয়া থাকে। তাহার ৮টি গরু, ৫০টি শূয়ার ও প্রায় ২০০টি মুরগী আছে। ৮টি গরুর মধ্যে ৭টি গরু দুধ দেয় দিন প্রতি প্রায় ১০ গ্যালন—প্রায় ১ মণ দুধ হয়, ডিম পাওয়া যায় দৈনিক প্রায় ১০০টি।

জমি হইতে ফিকেন প্রতি বৎসর প্রায় ৬৫০ বুশেল গম (১ বুশেল প্রায় ৯॥ সের), ৫০০ বুশেল যই, ৪০০ বুশেল মাইলো, ২৭০০ বুশেল ভুট্টা, ১০০ বুশেল যব, ও ৫০ বুশেল রাই পাইয়া থাকে ; ভুট্টা, মাইলো, রাই যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেকটা এবং যই ও যবের সবটা পশুখাদ্যের জন্য রাখিয়া উৎপন্ন শস্যের অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। দুধ হইতে যন্ত্রে ক্রিম তোলা হয় এবং ঐ ক্রিম বিক্রয় করা হয়। ক্রিম তোলার পরে যে পাতলা দুধ পড়িয়া থাকে তাহা শূকরকে খাওয়ান হয়। উৎপন্ন শস্য, দুধ, ডিম, শূকর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বৎসরে ফিকেনের প্রায় ৬০০০ ডলার আয় হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি বেশীর ভাগ সামবায়িক বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের মারফত বিক্রয় করা হয়, সুবিধামত কখনও কখনও পৃথকভাবেও বিক্রয় করা হয়। সার, বীজ প্রভৃতির জন্য বৎসরে তাহার ব্যয় হইয়া থাকে প্রায় ৫০০ ডলার।

আমেরিকার কৃষি প্রধানতঃ যন্ত্রনির্ভর। ফিকেন তাহার কৃষিকার্যে সাধারণতঃ ট্রাকটর, কম্বাইন, কর্ণপিকার, কর্ণ প্ল্যাণ্টার, কাল্টিভেটর, হ্যারো, গ্রেণ ড্রিল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। উহার মধ্যে ট্রাকটরই মূল যন্ত্র, উহাই অন্য যন্ত্রগুলিকে চালাইয়া নেয়। উহার সহিত অন্যান্য যন্ত্রাদি জুড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজ করা হয়। ট্রাকটরের সঙ্গে লাঙ্গল জুড়িয়া জমি চাষ করা হয়, কালটিভেটার জুড়িয়া জমি নিড়ান হয়, হ্যারো জুড়িয়া জমি পাট করা হয়, ম্যানিওর স্প্রেয়ার জুড়িয়া জমিতে সার দেওয়া হয়, কর্ণ প্ল্যাণ্টার, গ্রেণ ড্রিল জুড়িয়া বীজ বপন করা হয়। ফসল কাটিবার সময় হইলে পুনরায় ট্রাকটরের সঙ্গে মোয়ার প্রভৃতি যন্ত্র জুড়িয়া দেওয়া হয়। কর্ণ-পিকার জুড়িয়া দিলে ভুট্টা গাছ হইতে ভুট্টা ছাড়াইয়া লওয়া যায়। আর গম, যব প্রভৃতি শস্য ঝাড়াইবার জন্য কম্বাইন যন্ত্রটি ব্যবহার হয়।

ইহার পর খড় আঁটি করিয়া বাঁধিয়া গাদা করিয়া রাখিবার জন্য হে-... এলিভেটার যন্ত্র দুইটির ব্যবহার হয়।

ফিকেন তাহার চাষের কার্যে এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সকল যন্ত্রাদির মোট মূল্য কত হইতে পারে। সে বলিল, নতুন কিনিতে গেলে প্রায় ৮০০০ ডলার লাগিবে। তবে সে বেশীর ভাগ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড যন্ত্রপাতি কিনিয়াছে, উহাতে দাম অনেক কম পড়ে ; অনেক সময়ে প্রায় নতুনের এক-তৃতীয়াংশ দামে কেনা যায়, কাজও খারাপ হয় না। বর্তমানে তাহার চাষের যন্ত্রপাতির মোট মূল্য হইবে (ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়া)—প্রায় ১৫০০ ডলার।

ইহা ছাড়া জমিতে জল দিবার জন্য ফিকেনের একটি পাম্প ও কতকগুলি এলুমিনিয়ামের পাইপ আছে। পাইপগুলি খুব হালকা, ইচ্ছামত একটার গায়ে আর একটা লাগাইয়া যতদূরে খুশী জল লইয়া যাওয়া যায়।

প্রয়োজনমত উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার জন্য ফিকেনের একটি ট্রাক ও দুটি ওয়াগন আছে।

ট্রাকটর প্রভৃতি চালাইবার জন্য ফিকেন প্রোপেন নামক এক প্রকার পেট্রোলের উপজাত ব্যবহার করিয়া থাকে। উহা পেট্রোল হইতে দামে সস্তা। ট্যাঙ্কে এই তরল পদার্থটি জমা করা থাকে। প্রোপেন-বিক্রেতা মাঝে মাঝে আসিয়া ট্যাঙ্কটি ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যায়।

কিছুক্ষণ আলাপ চলিবার পর ফিকেন-পত্নী আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ। এতক্ষণ তিনি তাঁহার রান্নাঘরে ব্যস্তছিলেন।

মিসেস ফিকেনের রান্নাঘরটি সাজান গোছান, সুন্দর! একটু উঁচু লম্বা টেবিলের উপর কয়েকটি গ্যাসের উনুন—একপাশে বাসনপত্র ধোয়ার জায়গা ও কল।

আর এক পাশে রেফ্রিজারেটর। টেবিলের তলার তাকে নানারকম খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য তৈজসাদি সাজান। টেবিলের উপর গ্যাস-উনুনে মিটার বসানো—উপরের একটি তাকে ছোট একটি রেডিও বসানো। মিসেস ফিকেনের দুইটি ছোট ছেলে আছে। স্বামী ও তিনটি ছেলে লই তাঁহার সংসার। তাঁহাকে নিজের হাতেই সংসারের যাবতীয় ক করিতে হয়। তাঁহার একটি ওয়াশিং মেশিন আছে। তাহার সাহাযে তিনি সকলের জামাকাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন। সংসারের ক হইতে অবসর পাইলে তিনি ছোট ছেলেদের জন্য জামা তৈরী কর কখনও বা তাহাদের পড়ান। মাঝে মাঝে স্বামীর চাষের কা তাহাকে সাহায্য করিতে হয়, বিশেষ করিয়া কৃষি-মরশুমে। তখন তি সাধারণতঃ ট্রাকটর চালান। তিনি অনেক দিন স্কুলে শিক্ষিকার ক করিয়াছেন, এখনও ইচ্ছা করিলে স্কুল-মাষ্টারী করিয়া কিছু উপা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করেন স্বামীর পাশেই তাঁহার তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সংসারের সব কাজ একা করিয়া আপনার বিশেষ সময় থাকে? উত্তরে ফিকেন-পত্নী বলিলেন—অনেক সময় থা

স্বামী ও বড় ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তাছাড়া অনেক সময়ে এরাও আমাকে সাহায্য করে।

মিসেস ফিকেনের পূর্ব্বপুরুষ চেক। পাশের গ্রামেই তাঁহার পিত্রালয়। তাঁহার পিতার ১২০ একর জমি ছিল, তাঁহার ভাই সেই জমি চাষ করে, ফসলের তিন-পঞ্চমাংশ নিজে রাখে, দুই-পঞ্চমাংশ তাঁহার পিতাকে দেয়। তাঁহার পিতা ও মাতা প্রধানতঃ সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে পৃথকভাবে বাস করেন। স্বামী, স্ত্রী ও তিন চারিটি সন্তানসহ একটি কৃষক পরিবারের ২২০ একর জমির কমে চলে না, মিসেস ফিকেন জানাইলেন।

কথায় কথায় মিসেস ফিকেন তাঁহার শিক্ষিকা-জীবন সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ২০ বৎসর পূর্বে হাই স্কুল হইতে পাশ করিয়া তিনি যখন এই গ্রামেই শিক্ষিকা হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসে ৬৫ ডলার। তাঁহার পিতার মোটরে করিয়া তিনি স্কুলে আসিতেন এজন্য তাঁহাকে মাসে ৫ ডলার করিয়া ভাড়া দিতে হইত। বর্ত্তমানে গ্রামের ছোট এক কামরা-ওয়ালা স্কুলটিতে যে শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁহার বেতন মাসে ২৬৫ ডলার, বছরে ৯ মাস তিনি ঐ বেতন পান। আর তিন মাস ছুটি, ঐ সময়ের জন্য কোনও বেতন দেওয়া হয় না।

এই কথার মধ্যে ফিকেন বলিয়া উঠিলেন—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, কিন্তু মনে হয় যেন সেদিনের ব্যাপার। একদিন শুনিলাম আমাদের গ্রামে এক নূতন শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন, শুনিয়া কয়েক বন্ধু মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। সেইখানেই মিসেস ফিকেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ফিকেনের কথায় মিসেস ফিকেনের মুখে একটু মধুর হাসি দেখা দিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল।

পূর্ব্বের কথার সূত্র ধরিয়া মিসেস ফিকেন বলিতে লাগিলেন—কুড়ি বৎসরে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তখন সব খামারে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইত না। টেলিভিসনটি দেখাইয়া বলিলেন, ইহার কথাও আমরা তখন ভাবিতে পারিতাম না। সিনেমা দেখিতে গেলে নিকটবর্ত্তী সহরে যাইতে হইত। এখন ঘরে বসিয়াই টেলিভিসনের পর্দ্দায় অনেক কিছু দেখা যায়।

ক্রমে খাবার সময় হইল। মিসেস ফিকেন তাহারই বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেলেন।

আমাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল দ্বিতলের একটি ঘরে। তাহার কাঁচের জানালা দিয়া দেখিলাম—বাহিরে তুষার বর্ষণ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে সে রকম ঠাণ্ডা বোধ করিলাম না।

ফিকেনের বাড়ীটি কাঠের। উপরে নীচে মিলাইয়া আট নয়খানি ঘর। নীচে বৈঠকখানা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম ও শয়নঘর। উপরে আরও কয়েকখানি শয়নঘর ও ভাঁড়ার। যদিও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কৃষি-এলাকায় বাড়ীখানি অবস্থিত এবং অন্ততঃ আধ মাইলের মধ্যে আর কোনও বাড়ী নাই—তবুও বাড়ীতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের বিশেষ কোনও অভাব নাই। হীটারে বাড়ীটি গরম হইয়া থাকে। সোফা, সেটি, টেলিভিসনে বৈঠকখানাটি সজ্জিত। মেজেতে কার্পেট পাতা। শীতের রাত্রে সেখানে বসিয়া গল্প করিতে করিতে আমার বহুবার প্রশ্ন জাগিয়াছে, আমি সত্য সত্যই নেব্রাস্কার একটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে বাস করিতেছি কিনা। ফিকেন গিন্নীর রান্নাঘরটি আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত, বাথরুমে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে গরম জলও পাওয়া যায়। সেখানে কোন রকম মিউনিসিপ্যালিটি নাই, যে গ্রামের অধিবাসী-সংখ্যা নিতান্তই অল্প—সেখানে বাথরুমে কি করিয়া গরমজল পাওয়া যায় তাহা আমার পক্ষে বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল। ফিকেনের পুত্র টেরেন্সের কাছে একথা বলিলে সে আমাকে বেসমেণ্টে, একতলার নীচে মাটীর তলার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিলাম প্রোপেনের সাহায্যে জল গরম হইতেছে, সেই জলই বাথরুমে চালান করা হইতেছে। আর ঠাণ্ডা জল আসিতেছে বাড়ীর উপরের ট্যাঙ্ক হইতে।

পরদিন ফিকেনের খামার দেখিতে বাহির হইলাম। দূর হইতে ফিকেনের বাড়ীটি দেখিয়া সেটিকে বেশ বড়ই মনে হইল, আমাদের দেশের কৃষকের কুটীরের সঙ্গে তাহাকে কোনও মতে তুলনা করা চলে না। আশেপাশে আরো কয়েকটি কাঠের ঘর, কোনটিতে চাষের যন্ত্রপাতি থাকে, কোনটিতে গরুবাছুর মুরগীর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঘর আছে। তার পাশে একটি পবন-চক্র (windmill), হাওয়ায় চাকা ঘুরিতেছে, আর তাহারই সাহায্যে নীচের কুয়ার জল উঠিয়া বাড়ীর উপরের ট্যাঙ্কে জমিতেছে। সেখান হইতে পাইপ যোগে যাইতেছে রান্নাঘরে, বাথরুমে। কুয়াটি আবৃত। তাহার জলই খাওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কুয়ার জল ভাল কি খারাপ কি করিয়া জানা যায়। আমার সঙ্গী টেরেন্স উত্তর করিল, মাঝে মাঝে জলের নমুনা আমরা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাই, বিনা ব্যয়ে জল পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হয়।

তুষার বর্ষণের ফলে রাস্তার কিছু কিছু কাদা হইয়াছিল। তাহার মধ্য দিয়াই আমরা সন্তর্পণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। গরু ও শূয়রের খোঁয়াড়ের নিকট গিয়া টেরেন্স মুখে একটি অদ্ভুত শব্দ করিল, চারিপাশ হইতে বাকশক্তিহীন পশুগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। সঙ্গের কুকুরটিকে ইসারা করা মাত্র সেটি আবার সেগুলিকে তাড়াইয়া মাঠে লইয়া গেল। আমাকে দেখাইবার জন্য টেরেন্স আবার মুখে আর একটা আওয়াজ করিল। কুকুরটি আবার সেগুলিকে তাড়াইয়া আনিয়া খোঁয়াড়ে পুরিল।

চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মাঝে মাঝে এক একখানি বাড়ী। মনে হইল যেন সমুদ্রের মধ্যে এক একটি দ্বীপ। ফিকেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার নিকটতম প্রতিবেশী কতদূরে থাকে। উত্তর দিয়াছিল, আধ মাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে অসুবিধা হয় না? উত্তরে বলিল, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেই টেলিফোনে কথা বলি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কনেকসন পাওয়া যায়। আর গাড়ীতে আধমাইল যাইতে আর কত সময় লাগে।

তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই টেলিফোন আছে, গাড়ীও আছে সকলের। আরাম বিলাসের নানা উপকরণ থাকিলেও চাষের জন্ম ফিকেনকে কম পরিশ্রম করিতে হয় না। সেই সময়ে টেরেন্সও তাঁহার সঙ্গে খাটে। সকাল ৬টায় উঠিয়া তাহারা কাজে বাহির হয়, কখনও কখনও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কাজ করে।

যে লোকটি কার্পেট-মোড়া ড্রয়িংরুমে শোফায় বসিয়া গল্প করিতেছে ও মাঝে মাঝে টেলিভিসনের ছবি দেখিতেছে, মাঠে গিয়া সে কিভাবে কাজ করে তাহা একবার দেখিবার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। সে সুযোগ বিশেষ না পাইলেও কাজ হইতে ফেরার পর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, ওভার-অল ও ওভার-সু পরা, সারা গায়ে কাদা মাখা। তাহার পর বাথরুম হইতে যখন বাহির হইল তখন তাহার বেশ একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে।

ফিকেন সাধারণতঃ বৃষ্টির মধ্যে কাজ করে না।

ফিকেনের পিতা চাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাইদের মধ্যে সকলেই চাষী নহে, এক ভাই অধ্যাপক। ফিকেনের বড় ছেলে সামনের বৎসর পাশ করিয়া বাহির হইবে, তারপর তাহার ইচ্ছা সে ডেন্টিস্ট হইবে। তবে ফিকেনের ধারণা—তাহার তিন ছেলের মধ্যে অন্ততঃ একজন চাষবাস লইয়া থাকিবে।

গ্রামে একটি ছোট স্কুল আছে, ছাত্রসংখ্যা ২০।২৫ জন। সকলে এক ক্লাসে পড়ে না। স্কুলে একটি মাত্র ঘর ও একজন শিক্ষয়িত্রী। প্রত্যেক ছাত্রের জন্ম পৃথক পৃথক ডেস্ক আছে, সেখানেই তাহাদের বইখাতা থাকে। একটি ঘরে বিভিন্ন ডেস্কে বিভিন্ন মানের ছাত্রেরা বসিয়া পড়াশুনা করে—অনেকটা আমাদের দেশের পাঠশালার মত। ফিকেনের ছোট ছেলে দুইটি এই স্কুলে পড়ে, স্কুলটি প্রায় দুই মাইল দূরে, রোজ গাড়ী করিয়া ছেলে দুটিকে দিয়া আসিতে হয় ও লইয়া আসিতে হয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই এইভাবে স্কুলে আসে। ফিকেন নিজেও স্কুল কমিটির একজন সদস্য।

ডরচেস্টার গ্রামের পার্শ্ববর্তী সহরের নাম ক্রীট। ডরচেস্টার হইতে প্রায় ৭.৮ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন ফিকেনের সঙ্গে সহরটি দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে রাস্তাঘাট চমৎকার। বড় বড় দোকান, স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সবই আছে। একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও এখান হইতে প্রকাশিত হয়। দেখিলাম ক্রীটের বহু লোকের সঙ্গে ফিকেনের পরিচয় ও হৃদ্যতা; ফিরিবার সময়ে প্রশ্ন করিলাম, সহরের লোকসংখ্যা কত, ফিকেন বলিল ৩৫০০—সাড়ে তিন হাজার? মাত্র সাড়ে তিন হাজার? ফিকেন বলিল, হাঁ সাড়ে তিন হাজার। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। পরে বুঝিলাম সাড়ে তিন হাজার লোকবিশিষ্ট গ্রামটিই একটি ছোট সুন্দর সহরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ফিকেন বলিল, এইরূপ সহর অসংখ্য আছে।

এরকম সহর যে অসংখ্য আছে সেকথা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলাম ডরচেস্টার গ্রামটি ঘুরিয়া দেখিয়া। ডরচেস্টার একটি ছোট গ্রাম, মাত্র পাঁচশত লোকের বাস, তাও আবার একটি বাড়ী আর একটি বাড়ী হইতে অনেক দূর। কিন্তু গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বাড়ীঘর, দোকান পসার দেখিয়া মনে হয়, ইহা বুঝি একটি ছোট সহরেরই একটি অংশ।

কিন্তু আমার জন্ম আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। গ্রামের লোক গ্রামের হাইস্কুলে আমাদের জন্ম একটি সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করিয়াছিল। সম্বর্দ্ধনার শেষে আমাদের স্কুলটি ঘুরাইয়া দেখান হইল। স্কুলটি বেশ বড়, দ্বিতল। ক্লাস রুম, লাইব্রেরী প্রভৃতি। ক্লাসরুমগুলি নানা প্রকার পুস্তক, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। আমাদের দেশের যে কোনও বড় স্কুলের সঙ্গে উহাকে তুলনা করা চলে। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত, উত্তর হইল ৫৬। মনে হইল ভুল শুনিয়াছি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া সেই একই উত্তর পাইলাম। হেডমাস্টারকে ভাল করিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, স্কুলে নবম হইতে দ্বাদশ গ্রেড এই উপরের চারি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী পড়ে মাত্র। এই চারি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৬'র অধিক নহে। আশে পাশে যে সকল ছোট ছোট স্কুল আছে সেখান হইতে পাশ করিয়া ছেলে মেয়েরা এখানে পড়িতে আসে।

এই স্কুলের হেড মাস্টার একজন এম-এড।

আমি যেমন স্থানীয় কৃষক ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতাম, ফিকেন দম্পতীও ভারতীয় কৃষকদের সম্বন্ধে সেইরূপ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত। একদিন রাত্রে ড্রয়িংরুমে বসিয়া এইরূপ নানা কথা হইতেছে, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। খানিক পরে ফিকেন আসিয়া বলিল, তাহার ছোট বোন ফোন করিয়াছে, ক্রীটের হাসপাতালে তাহার শ্বশুর বিশেষ অসুস্থ, ফিকেন যেন আজই একবার তাহাকে দেখিয়া আসে। এই বলিয়া ফিকেন ও তাঁহার স্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে বাহির হইয়া গেল। ফিকেনের বোন এখান হইতে প্রায় হাজার মাইল দূরে থাকে। আগে এখানেই থাকিত।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল। শ্বশুরের অবস্থা প্রকৃতই আশঙ্কাজনক। ফিকেন সেকথা আবার ফোন করিয়া বোনকে জানাইয়া দিল। টেলিফোন মার্কিন কৃষকদের জীবনে যে কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলাম।

কয়েকদিন এই কৃষি পরিবারের সঙ্গে কাটাইয়া ডরচেস্টার পরিত্যাগ করিলাম; যাত্রার সময়ে হঠাৎ খেয়াল হইল—আমি যে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে বাস করিতেছি এই কয়দিন তাহা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতে লাগিল ফিকেনের ছোট ছেলে দুইটির কথা। এই কয়দিনেই তাহারা আমাকে তাহাদেরই একজন করিয়া লইয়াছিল।

ডরচেস্টার ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। দূরে দূরে এক একটি বাড়ী। আমি ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি এই কয়দিন আমি একটি কৃষক পরিবারে কাটাইয়া আসিলাম? এই যে ক্রীট সহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে অটোমেটিক ট্র্যাফিক সিগন্যাল বসান, তার লোকসংখ্যা সত্যই কি সাড়ে তিন হাজার?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনাথের সঙ্গে কারখানায় গেল অভয়। আগেই নিশ্চয় অনাথ আসর তৈরী ক'রে রেখেছিল। কারখানার মতো একটি অপরিচিত জায়গায় এসেও কোনো অসুবিধা হ'ল না তার। প্রথম দিনই আলাপ হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে।

মেশিন ঘরে ঢুকে বলল অনাথ, কেমন লাগছে ?

কথা শুনতে পেল না অভয়। মেশিনের তীব্র শব্দে কানে তালা লেগে যায়। এখানে ইসারায় কথা হয়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল অনাথ, কেমন বুঝছ ?

হেসে ঘাড় নাড়ল অভয়। এখনো কিছুই বোঝেনি সে।

অভয়ের নাকে যেন কেরোসিন তেলের গন্ধ লাগছে। মেঝেতেও পড়েছে তেল আর ফেঁসোর আস্তরণ। হাজিরা-বাবুর কাছ থেকে কাগজ নিয়ে লেবার অফিস ঘুরে এল অনাথ অভয়কে নিয়ে। হরি মিস্তিরির 'বয়' হিসেবে কাজ পেল অভয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে, কালে পাকা মিস্তিরি হ'য়ে উঠতে পারবে।

বুড়ো হরি মিস্তিরি অভয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ঘুষ দিতে হবে কিন্তু।

অনাথ বলল, কী রকম ঘুষ, সেটা ব'লে দাও।

হরি বলল, গান। গান শোনাতে হবে কিন্তু আমাকে।

আরো কয়েকজন এল এদিক ওদিক থেকে। সভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দু' তিনজন মেয়েমানুষও এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে একজনই বাঙালী মেয়ে। মুখে পান, বয়স প্রায় ভামিনীর মতোই।

হরি তাকে উদ্দেশ করে বলল, নে, দেখে রাখ। এখনো ভাল আছে, চেষ্টা চরিত্তির ক'রে ত্যাখ্, খারাপ করা যায় কিনা।

তারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করল। সে-সব ঠাট্টা তামাসার কথা শুনলে, কান ঝাঁ ঝাঁ করে। একজন তো সেই মেয়েমানুষটির গায়ে চিমটি কেটেই দিল। অনাথ ব'লে উঠল, এই দেখ, এখুনি সায়েব আসবে কি ওভারসিয়ার এসে পড়বে, এরা সব মেলা লাগিয়ে দিল। যা যা, সব কাজে যা। হরিদা, তা' হ'লে রইল তোমার সাকরেদ। নিজের মতনটি ক'রে নিও।

নিজের মতনটিই করে নিল হরি। ভাল ক'রে হাতে খড়ি দিল প্রথম কাজের। এটাকে কি বলে ? রেঞ্চ। এটা ? হাম্বর। ওটা ? শাপটু। (শ্যাফ্ট) মাপবে কি দিয়ে ? গজ দিয়ে। গজ চেনায় হরি অভয়কে। অর্থাৎ স্কেল। নইলে কোনোদিন পাকা মিস্তিরি হ'তে পারবে না। গান বাঁধতে হ'লে, কথার মিল চাই, মাত্রা চাই সুরের, নয় ? এও সেইরকম। গোঁজামিলের ঠাঁই নেই এখানে। গানে গোঁজামিল দিলে কী হয় ? ফাঁকি হয়।

রোজ বোঝায় হরি। দুয়ে দুয়ে কত হয় ?

চার।

উঁহু। চার নয়। ছেলেবয়সে যখন কড় গুণবে, তখন চার, তারপরে পাঁচ। কেন ? না, এত মাপ-জোক নিক্তির ওজন ক'রে, কী করলে ? পয়দা করলে। অর্থাৎ কি না, পাঁচ নম্বর এল তোমার হাতে। মাপ-জোক গোণাগাঁথা কি আর মিছিমিছি হয় ? তা নয়, কলের জন্যে হয়। নইলে বুঝতে হবে, গোঁজামিল

আছে। যন্তরের ওইটি কাজ, মানুষের মত। মানুষের একে আর একে কত হয়? তিন হয়। তবে, সেটা হল তত্ত্বের কথা। চেপে যাও সে কথা। দুয়ে আর দুয়ের মিলটা খাঁটি কর আগে, তবে তুমি পাকা মিস্তিরি। করতে পারলে, পাঁচ নম্বরের ফল আপনি হাতে এসে পড়বে। তাই রাগ ক'রে বলতে হয়, হাতের পাঁচ বুঝি? মানে কথা হল গিয়ে, হাতের পাঁচ হাতেই আছে বটে, কিন্তু পাওয়া কি সহজ কথা?

অভয় অবাক মানে। যন্ত্রের কথা, শুনে মনে হয়, এখানে গান শোনাবে ঠাট্টার মত। কিন্তু হরি মিস্তিরি যা বলে, সেও জীবনের তত্ত্ব। গানের মতই তার ছাঁদ ছন্দ আছে। গান বাঁধলেই হয়।

হরি মিস্তিরিও বোঝে, ছেলে চুম্বক। ঠিক জিনিষটি দিলেই টেনে নিতে পারে। হরি গজ মেপে দেখিয়ে বলে, একে বলে ডাইমেটার (ডায়ামেটার), ওকে বলে, ডাইমেন (ডাইমেনশন)। এক ইঞ্চিকে একশো ভাগে ভাগ বোঝায়। হাজার ভাগও বোঝায়। বোঝায় নক্শা দেখিয়ে দেখিয়ে। বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেমন বুঝলে?

অভয় বলে, বুঝলুম, বে-হিসেবী মরে।

বুড়ো হরি মিস্তিরির মুখের ভাজে ভাজে চাপা হাসি দেখা যায়। বলে, কী রকম?

অভয় বলে, কানি কাপড়ে কোঁচা হয় না। করতে গেলে, শরীলে বেড় পায়না, দিগম্বর হ'তে হয়।

—আচ্ছা?

—নিয়মের লাজলজ্জা নেই। একটুখানি এদিক ওদিক হলে সব ভণ্ডুল ক'রে দেয়।

—হাঁ।

—ইঞ্চির যখন হাজার ভাগ হয়, তখন—

ভুবনের কোথাও ফাঁক নাই গো
যারে বলে শূন্য
তার মধ্যেও আছেন গণ্য
'বিন্দু' মহাশয় গো।

হরি মিস্তিরি বলে মাথা দুলিয়ে, বহুত আচ্ছা ব্যাটা।

অভয় আবার গায়,

অভয় যেন সমঝে চলে।
ভাল মন্দ যা আছে তার
কিছুতে কিছু পাবে না পার
ফেলা কিছুই যাবে না গো।

হরি তার মেশিন-ঘাঁটা থাবায় অভয়কে চাপড়ে বলে, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্!

তাদের চীৎকার শুনে এদিক ওদিকের লোকেরাও ছুটে আসে। আসে মেয়ে পুরুষ, দুই-ই। ডিপার্টমেণ্টের সর্দারও আসে খেঁকিয়ে, এই শালারা কাজে ফাঁকি দিচ্ছিস্।

কিন্তু সেও নেমে যায়। অভয় তাদের নতুন আকর্ষণ হয়েছে।

অভয় ভেবে খুশি, সংসারে সব ভাল, সবাই ভাল। একদল মিস্তিরি ধরে বসে, তাদের আখড়ায় নিয়ে যাবে। যাত্রার দলের আখড়া। বিবেকের পার্টটা নিতে হবে অভয়কে। কেউ বলে এসে, কবি গানের আসর করবে। অভয়কে গাইতে হবে।

জবাব দেয় হরি, নয় তো অনাথ; এখন নয়। দু'দিন যাক।

ভোরবেলা আসে অভয়। বেলা এগারোটায় খেতে যায়। আবার আসে একটায়।

ওদিকে শৈলবালা আর সুরীন দিন ক্ষণ নিয়ে বড় ব্যস্ত। বিয়ের দিন। তবে পাকা মানুষ সুরীন। শৈলবালাকে বলেছে, বিয়ের আগেই শৈলদিদি মিনির নামে বাড়ি-ঘর লিখে পড়ে দিক। কেন না, মানুষের মন। কখন কোন্‌দিকে যায়, বলা যায় না।

আপত্তি করে নি শৈল। মেয়েকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে, অভয়কে এসে বলেছে, বাবা, সব তোমাদের জন্যে রেখে গেলুম। ম'লে দুটি কাঠ দিয়ে আমাকে একটু পুড়িও, আর কিছু চাই নে।

ভামিনী শুধু দেখছে। তার হ্যাঁ নেই, নাও নেই। সুবালার কাছে অভয়কে নিয়ে যাওয়ার বড় সাধ তার। কিন্তু সুযোগ পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা যখন অভয় ফিরে আসে, তখন সুরীনেরো ফিরে আসার সময়। সুরীনের কারখানা দূরে, আসতে তার দেরী হয়। দেরীটুকু বড় অল্প সময়। ভামিনী বলে অভয়কে, 'সুবালাদের ওখেনে একটু যেও, অনেক ক'রে বলেছে। তোমার গান শুনবে একটু।'

কথা একেবারে মিথ্যে নয়, সুবালা বলেছে। এমনি, ভাল মনে বলেছে। ভামিনী তাকে তার মনের কথা বলতে পারে নি। কোন্‌খান দিয়ে কী কথা বেরিয়ে পড়বে, সুরীন আর আস্ত রাখবে না। তবে এ সংসারের কোথায় ফাঁক, তার খবর একটু-আধটু জানা আছে ভামিনীর। তাই সুবালাকে গিয়ে বলেছে, আমার ভাসুর-পো'কে নিয়ে হয়েছে জ্বালা।

কেন ?

না, সুবালাকে দেখে গিয়ে অবধি, ছেলেটার নাকি মন কস্‌কস্‌ করছে। বলে, খুড়ি, মেয়েটি দেখতে খাসা, গলাটি আরো খাসা।

অকপটে মিথ্যে ব'লে, খিলখিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ার ফাঁকে সুবালার মুখ দেখে নেয়। বেশ্যা হলেও, মেয়েমানুষের মন। যোয়ান পুরুষের প্রশংসায় মনে একটু ছোপ লাগে বৈকি।

সুবালা চোখ ঘুরিয়ে বলে, পছন্দ যখন হয়েছে, আসতে ব'লো একদিন।

ভামিনী আরো রং চড়ায়, বলে, তোর সঙ্গে বসে নাকি তবলা সঙ্গত করতে ইচ্ছে করে। আর খালি বলে, তোমাদের সুবালা নিমির চেয়ে দেখতে ভাল, কী বল খুড়ি ?

হাসতে হাসতে আবার বলে, বুঝেছ তো, ছেলের আমার কোথায় ঘুন্ ধরেছে ?

নিমির নিন্দে সুবালার কতখানি ভাল লেগেছে, বোঝা যায় না। হেসে বলে, নিমিরটা নিমিরই থাক্, মেয়েটা ভাল।

ভামিনী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তুই আর ঘেন্না ধরাস নি বাপু। পাড়ার কোন্ ছোঁড়াকে বাকী রেখেছে, তা তো জানি নে।

সুবালা বলে, তা' হোক্‌গে দিদি, ও-কথায় কাজ কী ?

—না, এমনি। তুই বললি। আর ছোঁড়া দিন-রাত তোর কথা বলে।

সুবালা বলে, তা এখেনে দরজা আগলে তো বসে নেই কেউ, এলেই তো পারে। লোকটার গলা কিন্তু ভালই।

ভামিনী মনে মনে হেসেছে। বিনা পয়সায় রঙ্গ করা যাদের ধাতে নেই, সেই মেয়েও যখন সরাসরি আসতে বলে, তখন কিছু না হোক, খেলা করবার ইচ্ছে একটু আছে। বলে, মুখপোড়া বলেই খালাস, সময় পেলে তো আসবে। কাজ হয়েছে যে।

সুবালা বলে, রাতে তো আর কাজ করে না।

—তোর যে তখন কাজের সময় ? মাসী বিরক্ত হবে।

ঠোঁট কুঁচকে বলে সুবালা, তবে এসে কাজ নেই বাপু।

ভামিনী ভয় পেয়ে হেসে বলে, তাই না বটে। উঠি আজ।

উঠে পড়ে। একদিনের কথা তো নয়। প্রায়ই বলে থেকে থেকে। যে জ্বালা ভামিনীর জুড়োবার নয়, সিদ্ধি-লাভের আশা নেই, অনর্থক পুড়ে মরে সেই আগুনে। সর্বনাশের মতো, তার ঝাঁপি থেকে ছেড়ে দেওয়া সাপ যে কোনখান দিয়ে কোথায় হাজির হতে পারে, নিজেও জানে না।

তারপর কথায় কথায় সুবালাকে বলেই ফেলে, একদিন গেলেও তো পারিস ঠাকুরের ঘোরে। ওই ছোঁড়ার জন্যে বলছি নে তা' বলে। এমনি। এই তো ক'পা।

সুবালা বলে, ঠোঁট উল্টে, ঘেন্না করে বড্‌ডো, কিছু মনে ক'রো না। গেরস্থদের সহ্য হয়, তারা গেরস্থ, তোমাদের পাড়ার হাফ-গেরস্থদের অত নজর কটকটানি সহ্য হয় না।

ভামিনী বলে, ঝাঁটা মারো অমন নজরের মুখে। নজর করবে তো করবে, ইয়ে দেখিয়ে চলে যাবি।

একদিন আসে সত্যি সত্যি সুবালা। কিন্তু তখন অভয় বেরিয়ে গেছে কারখানায়। ভামিনী যেন আশা পায়।

সুবালা বলে, কই, আমার পছন্দ করা নাগর কোথায় গো ?

—আ পোড়াকপাল, সে যে বেরিয়ে গেল।

সুবালা বলে, ভালই হয়েছে। সন্‌জেবেলায় যেতে ব'লো। ফু'ফেরতা না হয় বাঁয়া তবলায় হাত চালিয়ে আসবে। তাতে তো আর মাসীর ক্ষতি নেই ?

কারখানা থেকে ফিরে এসে অভয়ের মন কেমন করে, শৈলবালার বাড়ী যায়, নিমিকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লজ্জা হয়, হট্ ক'রে গিয়ে উঠতে পারে না।

ভামিনী খুড়ির অনুরোধে পা' বাড়ায় মাঝে মাঝে

বালাদের বাড়ির দিকে। নিজের মনকে তো ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই। সুবালার গান শোনার বড় ইচ্ছে হয়।

কিন্তু মনটা আনচান করে নিমির জন্তেই বেশী। কিছু না হোক, বাড়ির কাছ দিয়ে একটু ঘুরে আসতেও যেন ভাল লাগে। ওই বাড়ির কাছেই, পাড়ার পুরুষদের যাত্রাগানের মহড়া দেবার ঘর। সেখানেও উঁকিঝুঁকি মারে অভয়। দু'একজন বাদ দিলে, সবাই হেঁকে ডেকে ওঠে, আরে এস এস, জামাই এস।

দু' একজনের মধ্যে বিশু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। ঘরে ঢুকলেও, বিশু কথা বলে না। বরং ধমকে ওঠে সবাইকে, নাও, এখন হবুজামাইকে নিয়ে র‍্যালা কর, এদিকে সব প'ড়ে থাক। যত সব উট্‌কো ঝামেলা এসে হাজির।

বিশুর ওজন আছে আখড়ায়। গলা কাঁপিয়ে পার্টও বলতে পারে ভাল, আর বড় বড় পার্ট করে। কিন্তু অভয়কে আমল দেয় না একেবারে। শৈলবালার বাড়িতে লোকটির অবাধ গতি। নিমির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাও বলতে দেখেছে।

ওখানে গেলে সবাই গান গাইতে বলে। ইচ্ছে থাকলেও গায় না। বিশুর সামনে গলা খুলতে চায়না তার। যে-আশায় তবু যায় উঁকিঝুঁকি মারতে, তার উদ্দেশ্য আলাদা। মনে বেজায় রং লেগে গেছে, নিমিকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখা যে না হয় একেবারে, তা নয়। কিন্তু নিমি যেন তেমন নজর করে না।

কিন্তু নজর না করার দিনও শেষ হ'য়ে এল। আর দেরী নেই।

তার আগেই, ভামিনীর কাছে সুবালার আসার খবর পেয়ে অভয় গেল দেখা করতে। সন্ধ্যার ঝোঁক তখন, সবে সাজাগোজা শেষ হয়েছে। ক্রমশঃ

দাশু রায়

রামেন্দ্রনাথ মল্লিক

আজকে আমার মন, ছোঁয় শুধু ছোঁয়
কথাকলি নাচে নাচে যেখানে আলোয়
মেতে ওঠে মন আর হৃদয়ে হৃদয়
একটু সুখের কুঁড়ি ফুল যদি হয়।

চঞ্চল ছায়ার ছবি রূপালী রঙিন,
সেখানে জীবন দেখি আমরা গ্রামীণ,
প্রাচীন বটের নীচে পাঁচালীর গান
গায় দাশরথি সুরে বুদ্ধেরই প্রাণ।
কত না বিগত দিন সে সুরে হারানো
কত না জীবন আর কামনা ভরানো
বাংলার মাটিই ছুঁয়ে ভাব সমরায়
কথকের শ্যাম আর শ্যামা মিলে যায়।

আমরা এসেছি দিনে সোনালী রোদের,
কত কথা চাপা পড়ে শরীরে বীজের
সবটুকু বলা নয় ঘোমটা আড়ালে
ভাবের কাকলি শুনি ভোরের নাগালে!

পাঁচালী চামরে তবে যে কথা মধুর
ধ্বনির লাবণ্য নিয়ে হৃদয়ে সুদূর
সুরের আবেশ রসে মন করে ভার,
সে ভার আমার হাতে আজকে অপার।

আজকে অনেক সুর জটলা পাকায়,
একটি সুরের রেশে দাশরথি রায়
অজস্র ভাবের ভাবি রোয় বীজ রোয়,
তাইতো আমার মন ছোঁয় তবু ছোঁয়।

আলবেয়ার কামু ও আঁদ্রে জাইড

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুইডিস আকাদামীর ঘোষণায় গত বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আলবেয়ার কামু। কামুর বর্তমান বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর; এত অল্প বয়সে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকই এমন বিশ্ববিশ্রুত সম্মানের অধিকারী হন নি। কামুর সাহিত্যসৃষ্টি আশ্চর্য মানবতাবোধের অনন্ত দৃষ্টান্ত; মানুষের মনের নানাদিক, বিচিত্র সব অনুভূতি তিনি অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার কারণ এমন নিখুঁতভাবে জীবনকে তাঁর মতো আর কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ! অ্যালজিরিয়ার এক অতি দরিদ্র পরিবারে কামুর জন্ম হয়, তাঁর বাবা ছিলেন সামান্য কৃষক—অন্যের খামারে কাজ করতেন। মা ছিলেন স্পেন দেশীয়। শৈশব থেকেই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তিনি মানুষ হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সকল দিক থেকে নিতান্ত অসহায় হ'য়ে পড়েন। তারপর স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে কামু পড়াশুনা করতে থাকেন, ১৯৩৬ সালে অ্যালজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর আবার সুরু হয় তাঁর জীবন সংগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে দর্শন-শাস্ত্র ছিল তাঁর অতি প্রিয় বিষয়, পরবর্তী কালের রচনায় দর্শনবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে বেরিয়ে কামু কিছুদিন অ্যালজিয়ার্স শহরের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিশেষ ক'রে নাট্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একটি থিয়েটার সেণ্টারের পরিচালনা ভার পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক বিখ্যাত নাট্যকারের নাটক ফরাসীতে অনুবাদ করেন, ফরাসী ভাষায় অনুদিত তাঁর নাটকের মধ্যে ঈস্কাইলাসের প্রমিথিউসের ফরাসী অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয় শিল্পে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুদক্ষ অভিনেতা, যদিও তিনি নিজে কখনো মঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে অভিনয় করেন নি। এর পর কামু সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন, বহু পত্র পত্রিকার সঙ্গে তিনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতাও করেন। পরে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ নেন, সেখানেও তাঁর কাজ ছিল মূলতঃ সাংবাদিকতা ঘেঁসা। প্রথম জীবনেই কামু একবার কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ডাক্তার এসে অভিমত দিলেন যে, তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়েছে। অত্যন্ত মুসড়ে পড়লেন তিনি, আর জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হ'য়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে। বহুদিন ধরে চিকিৎসার পরে তিনি অবশ্য বেঁচে উঠলেন, কিন্তু নতুন ক'রে আবার জীবনে আর এক বীভৎস ও করুণ দিকের পরিচয় পেলেন। প্রথম জীবনে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ও পরবর্তী জীবনে নানাভাবে হতাশা, ব্যর্থতা ও মৃত্যুতুল্য ব্যাধির নিপীড়ন কামুকে পুরোপুরিভাবে দুঃখবাদী ক'রে তোলে। জীবনের প্রতি তাঁর এই বিতৃষ্ণা ও গ্লানিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় কামুর লেখা 'দী মিথ্ অব্ সিসিফাস' গ্রন্থে। গ্রীক পুরাণের পটভূমিকায় লেখা তাঁর এই বই। করিন্থের রাজা সিসিফাসের উপরে দেবতা রুষ্ট হ'য়ে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত সিসিফাস একটি বিরাট আকারের পাথর পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে থাকে, চূড়ার কাছাকাছিতে গিয়ে পাথরটা আবার গড়িয়ে পড়ে যায়। সিসিফাস তখন পাথরটি টেনে তোলার জন্য পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। পাথরটিকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা, পাথরটি গড়িয়ে পড়ার সময় আবার তার পেছন পেছন ছোটা, এই রকম ছুটোছুটি ও বার বার বৃথা চেষ্টায় সিসিফাস ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কামু দেখাতে চেয়েছেন মানুষের জীবনও তো এমনি ব্যর্থ চেষ্টার দ্বারা বিড়ম্বিত। কয়জন মানুষ তার অভীষ্ট ফল লাভ করতে সক্ষম হয়? কামুর জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখা বহুসংখ্যক উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের সংকলনে। প্রথম যুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপের সমাজ জীবনের অপরূপ চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনেক রচনায়, আর এই দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী পর্যায়ের রাজনৈতিক ভাবধারা ও প্রগতিশীল মতবাদ তিনি এমন নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী, রাষ্ট্রের বিরাট কর্মযজ্ঞশালায় মানুষ কত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর তা তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা সমস্ত পৃথিবীর সকল ধরণের সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে একেবারেই দ্বিতীয় রহিত। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি বই-ও এই কারণেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কামুর উপন্যাসগুলোর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা বলতে গেলে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর "দি প্লেগ" নামক উপন্যাসের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালে "দি প্লেগ" উপন্যাস প্রকাশিত হয়, আর একমাত্র ফরাসী দেশেই এ বই সওয়া লক্ষ কপি বিক্রী হয়। যুদ্ধপরবর্তী ইয়োরোপের সাহিত্যে "দি প্লেগ" একটি বিশিষ্টধরণের প্রতীক উপন্যাস, ইয়োরোপের সকল অঞ্চলেই প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে এই উপন্যাস সমাদৃত হয়েছে। এক ডাক্তার এই উপন্যাসের নায়ক। অ্যালজিরিয়ার ওঁরা বন্দরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দলে দলে সবাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে কি ক'রে রোগের প্রকোপকে তারা ধ্বংস ক'রে দিল, দারুণ বিপদের দিনেও মানুষ তার স্বীয় শক্তিকে জাগ্রত ক'রে, কঠিন সংকটের মধ্যে ও দৃঢ়প্রত্যয়ের বলে মানুষ কি

ক'রে সব রকম দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে আবার নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তারই আশ্চর্য বর্ণনা রয়েছে কামুর এ বইয়ের। কামু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর সর্বশেষ সাহিত্য-কীর্তী "দি ফল" নামক উপন্যাস ও তাঁর গল্প সংকলন "দি এক্জাইল এ্যাণ্ড দি কিংডম" এই দুইখানা বইয়ের জন্য। কামুর "দি ফল" উপন্যাসও মানব-মনের আশ্চর্য সংবেদনশীলতা ও অনুভূতির এক অবর্ণনীয় প্রতিফলনে উদ্দীপ্ত। এক উদারহৃদয়, পরোপকারী ও আদর্শ নাগরিক পর পর দুইটি ঘটনার ফলে হঠাৎ একদিন এক আকস্মিক মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন যে এতদিন তিনি বৃথাই আদর্শবাদের নামে ভাঁওতা দিয়ে এসেছেন, তাঁর জীবনের সব কিছুই নিতান্ত মেকী, সবটাই ফাঁকীতে ঠাসা। নিজের কাছে নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে করতে লাগলেন, প্রতি মুহূর্তে বিবেক-দংশনের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলেন। কোথায় শান্তি পাওয়া যায়? কি ক'রে তার অবিবেকী মনের সংশোধন হতে পারে? পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানো-ক্ষ্যাপার মতো তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন; এক দেশ থেকে আর এক দেশে যান, কোথাও তৃপ্তি পান না। যেখানেই তিনি যান—যে কোনো লোককে ধরে ধরে তাঁর দুঃখের কাহিনী শোনাতে থাকেন। কিন্তু তবু কি মন সান্ত্বনা পায়? এমনি-ভাবেই অবিবেকী মনের অনুতাপ আর গ্লানিতে আমরাও কি জ্বলে মরছি না? কামুর রচনায় আশ্চর্য বর্ণনভঙ্গীর গুণে এই উপন্যাসের নায়কের অতৃপ্তি, তাঁর দুঃখবোধ ও বিচিত্র ভাবানুষঙ্গ যেন পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়। যেন আমরা এ কাহিনী পড়তে পড়তে এই উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করে যাই: নিজেদের লেখকের কল্পনার মূর্ত প্রতীক বলে ভাবতে বাধ্য হই, আর আমরা সত্যিসত্যিই স্বীকার করতে বাধ্য হই যে "দি ফল" হ'ল এমন জাতীয় এক কথাশিল্প—যা সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যের মোড় ফিরিয়েছে, যা মানুষের মনের দিগন্তে এতদিনকার এক রুদ্ধ দ্বার নতুন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। এই উপন্যাসের জন্যই কামু ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু আলবেয়ার কামু এখনো বয়সে নবীন, তাঁর অনুপম সাহিত্যসৃষ্টি পরিণত স্তরে এসে উন্নীত হ'লেও পরিণতির মাঝামাঝি পর্যায়েও হয়তো এখনো তা আসে নি। তাঁর নিকট থেকে সারা পৃথিবীর সাহিত্য রসিক পাঠক সমাজ আরোও অনেক কিছু আশা করেন। এখনো তিনি আরো অনেক নতুন জিনিস সৃষ্টি করবেন, সাহিত্য-জগতে অনেক স্বর্গের ঠিকানা তিনি হয়তো আরো জানিয়ে দেবেন।

আলবেয়ার কামুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আর একজন প্রখ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিকের কথা মনে আসে, তিনি হলেন আঁদ্রে জাইড। বস্তুতঃ আঁদ্রে জাইডকে না জানলে আলবেয়ার কামুর যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় না, আর আলবেয়ার কামুকে বুঝতে হ'লে, কামুর সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করতে হ'লে, আঁদ্রে জাইডের রচনা অবশ্যই পড়তে হবে। এই দুইজনের সাহিত্য-কৃতীর মধ্যে আশ্চর্য সংগতি বিদ্যমান্। জীবনবোধের মর্মানুভূতিতে দুইজনই [illegible] যেন আর একজনের সার্থক পরিপূরক। ফরাসী সাহিত্যে আঁদ্রে জাইডের দান অসামান্য। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যেও তিনি অনেক নতুন সৃষ্টি সংযোজন করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে আঁদ্রে জাইড অন্যতম।

আঁদ্রে জাইড আর ইহলোকে নেই। গত ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আঁদ্রে জাইড ১৮৬৯ সালে জন্মেছিলেন। তাঁর পিত[া] ছিলেন আইনজ্ঞ, বাড়ি ইউজেস, তাঁর মা ছিলেন নরম্যান্ডির মহিল[া] প্রথমে রোমান ক্যাথলিক পরে প্রোটাষ্টান্ট হন। চিরদিনের সংস্কা[র]পন্থী মরিস ব্যারেস, জাইডকে তাঁর ডেরাসিনে পুস্তকে অভিযু[ক্ত] করেছিলেন। ব্যারেসকে জাইড এরপর যা জবাব দিয়েছিলেন, তা [...] জাইডের আত্ম-বিশ্লেষণই মাত্র নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের বি[...] প্রকাশও বটে।

জাইড তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে তাঁর স্বীয় বাল্যকালের ক[...] বলেছেন। তাঁর আত্মজীবনী—সীলে গ্রেন মেমের্ট—ডরথী [...] সে-বইয়ের অনুবাদ করেছেন। জাইড তাঁর 'জর্ণাল'এর বিভিন্ন অং[শে] তাঁর প্রথম বই আঁদ্রে ওয়াল্টার-এর ডায়েরীতে ও তাঁর কয়ে[কটি] গল্পে, বিশেষ ক'রে 'ইম্মরেলিষ্ট' কাহিনীতে নিজের কথা আ[...] নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন—জাই[ড] পরিকল্পিত অনেক নায়কের চরিত্র-চিত্রণই স্বয়ং লেখকের বি[...] রূপান্তর। কথাটার অর্থ উল্টো শোনালেও বলা চলে, যতই আ[মরা] তাঁর সম্পর্কে পড়ি, ততই তাঁর বিষয়ে কম উপলব্ধি করা যায়। [...] দিক থেকে তাঁর সমসাময়িক মারসেল প্রাউষ্টের সঙ্গে জাইডের [...] আশ্চর্য রকম বৈষম্য। প্রাউষ্টের 'রিমেমব্রেন্স অব থিংস্ পাষ্ট' প[...] দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে প্রাউষ্ট তাঁর জীবনের জটিলতাকে উন্মোচিত [...] দেখাতে প্রকৃত চেষ্টা করেছিলেন, জাইডের পুস্তকসমূহ আমাদের অন্যরকম ধারণা এনে দেয়। তিনি আমাদের যত নিকটে এ[...] বলে মনে হয়, আসলে তিনি যেন ততই দূরে চলে গিয়েছেন। মা[...] প্রাউষ্টের ষ্টিল হচ্ছে প্রকাশব্যঞ্জক, আর আঁদ্রে জাইডের ষ্টিল কা[...] অন্তরালে নিহিত।

জাইড ছাত্র হিসেবে মোটেই ভালো ছিলেন না, প্রায় বরাবরই ক্লাশে সকলের শেষে থাকতেন, অথবা তিনি কোন না কোন সা[হিত্য] গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট থাকতেন। তাঁর জীবনের বাইরের ঘটনাবলী, শু[ধু] তাঁর ভ্রমণের ব্যাপার ছাড়া, খুব বেশি উল্লেখযোগ্য নয়। জা[ইডের] ব্যক্তিত্ব কোনও প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি।

জাইডকে বুঝতে চাইলে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান যুগের [...] ব্যক্তিবিশেষকে উপলব্ধির কথা মনে হচ্ছে এবং সেই ব্যক্তিত্ব প্রবল যে তিনি আসলে যা, তাই তাঁর সার্থক স্বরূপ এবং তিনি যা চান না—সীলে গ্রেণমেমেট—গ্রন্থে জাইড নিজেই তাঁর নীতি[...] ব্যক্ত করেছেন।

'আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবীতে এমন কো[ন] করতে হয়, যে কাজ আর কারও কাজের মত নয়। সুতরাং [...] নিয়মে আবদ্ধ থাকার সকল প্রচেষ্টাই আমার মতে আত্ম[...]

আমাজন, হাঁ, আর প্রতারণা এবং যে আত্মা কখনো মানুষকে ক্ষমা করে না আর বা ব্যক্তিত্বের প্রতি মহাপাপ তুল্য।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্থায়ী মূল্য আছে—এ নীতিতে যিনি আস্থাশীল, তাঁর মতে কোনো মানুষকে স্বীয় ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অন্যান্য লোকের সংগে তাঁকে কোন এক গোষ্ঠীতে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টার সামিল এবং সেই ব্যক্তি বিশেষ যে একমত বা সে মতের পরিপোষক, তা প্রমাণ করা শুধুমাত্র সময়ের অপচয় নয়, তা সকল প্রকার বিচার বিবেচনার মিথ্যা নিরূপণ। সংযম ও ধর্মমত থেকে বন্ধনহীনতা জাইড সম্পর্কে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয়। তাঁর একজন সমালোচক যেমন একদা মন্তব্য করেছিলেন :

'জাইডের সকল প্রচেষ্টা হ'ল মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া—আত্মকেন্দ্র থেকে মুক্তি, নিয়মানুবর্তিতা, সংস্কার, স্বভাব ও রীতি নীতি, সকল কিছুর বন্ধন থেকে মুক্তি; চিরতরে মুক্তি—অনির্দিষ্ট নাম-না-জানা পথে রোমাঞ্চকর যাত্রা। সময়কে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হবে, প্রতি মুহূর্তেই মন যেন থাকে আনন্দের উল্লাসে ভরপুর। বিনা দ্বিধায় ও বিনা সংকোচে ঘুরে বেড়াতে হবে পৃথিবীর পথে। ফলের কথা মনে না করে, কাজ ক'রে যেতে হবে। শুধু কাজের উপলক্ষেই, শুধু আনন্দের উদ্দেশ্যেই কাজ ক'রে যেতে হবে। এই হ'ল আঁদ্রে জাইডের নীতির মুখ্য কথা।'

জাইডের মতবাদ ও নীতি সম্পর্কে অনেক ভুল আলোচনা, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার সাধু প্রচেষ্টা, তাঁর আত্মপ্রকাশের সততা এ যুগের পক্ষে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে, যে যুগে এলিয়টের কথায় বলতে গেলে—আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে পলায়নীবৃত্তিই প্রবল।

জাইডের প্রথম গ্রন্থ হ'ল 'দি ডায়েরীস্ অব্ আঁদ্রে-ওয়ালটার।' গ্রন্থকারের অতৃপ্তির কাহিনী প্রায় উপন্যাসের মত করে বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, লেনো রীটারস্ টেরেসট্রেস্ (দি ফ্রুটস্ অব্ দি আর্থ) কে বলা চলে তাঁর সমস্ত গ্রন্থমালার প্রাথমিক ভূমিকা হিসেবে। এই গ্রন্থে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে বিস্ময়কর সম্ভাবনা রয়েছে তারই প্রকাশ ব্যক্ত করেছেন। সকল নিয়মকে তিনি এখানে অস্বীকার করেছেন, যৌন আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আবেগ ও উচ্ছ্বাস যার ভিত্তি নয়, সে সকলকে অনায়াসে নিঃশেষিত হওয়ার কথা বলেছেন।

আবেগের উদ্দেশ্যে এই যে আবেগের প্রেরণা' তাও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ইমমরেলিষ্ট-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাইডের মতে এ যেন মরুভূমি অঞ্চলের আপেল, যা তিক্ত, আর যা তৃষিতকে পীড়া দেয় কঠিনভাবে। 'সোনালী বালুচরে তারা নয় সুষমাবিহীন।'

১৯০৭ সালে লেরেটুর দ্যঁ এল-এনফেন্ট্ প্রডীজ (দি রিটার্ণ অব প্রডিগ্যাল সান) প্রকাশিত হয়, এ পুস্তককে বলা চলে 'ফ্রুটস্ অব দি আর্থ' গ্রন্থেরই পরিপূরক অংশ। জাইডের মতে, 'প্রথম আরম্ভেই এ সকলকে উপলক্ষ ক'রে আমি যা ব্যক্ত করতে চেয়েছি তাও আমার আদর্শের অনুপাতে যথেষ্ট নয়।

জীবন ও ধর্মের মধ্যে যে সংঘর্ষ তা ব্যক্ত হয়েছে 'প্যাস্-টোরেল সিম্ফনী' গ্রন্থে। 'দি কেভস্ অব্ দি ভ্যাটিকান' অধিকতর ভাবগম্ভীর। বৈরাগ্যের আতিশয্যে নৈতিক ব্যাখ্যা এতে ব্যক্ত হয়েছে। জাইডের পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, 'দি কয়নারস্' ও 'দি জর্ণালস্'। নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে পূর্বটি সম্ভবতঃ বর্তমান শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। গেটের কমভারসেসন্ উইথ একারম্যান ও মনটেগের রচনার জাষ্টিন ও' ব্রাইয়েন কৃত ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে জর্ণালস্ এর তুলনা করা হয়েছে। এগুলো হ'ল জাইডের সর্বশেষ অভীপ্সা ও মতবাদের পরিচায়ক।

ফরাসী দেশের সাধারণ শিল্পীকুল দেয়াল-ঘেরা নগরে বসবাস করতেন। মলিয়ের, রেসিন, ভলতেয়ার, দিদেরো প্রভৃতি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তা কার্যকরীভাবে মনোজগত থেকে বেরিয়ে আসার ও সেই জগতে প্রবেশ করার উভয় পথই বন্ধ রেখেছিল। এমন কি আনাতোল ফ্রাসের শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেও বাইরের জগতের ছায়াপাত স্বল্প। আঁদ্রে জাইডই প্রথম অতীতের ব্যাপক পরিসরে রেখাপাত করেন। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর সব বই, তাঁর সৃষ্ট গ্রীক কাহিনীর পুনরুজ্জীবন, নীটশে সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় পাঠ, তাঁর কৃত ব্লেক, কনরাড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবিধ রচনার অনুবাদ ফরাসী সাহিত্যের ধরাবাঁধা, চিরাচরিত পথ থেকে নতুনতর বিষয়ের সূত্রপাত করেছে।

প্রায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তিনি অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক মর্যাদা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে নানা আলাময়ী নিবন্ধ রচনা না ক'রে, নানাভাবে প্রচারকার্য না চালিয়ে, আধুনিক সভ্যতার মূল ভাবগত বিষয় সম্বন্ধে সহজে উপলব্ধি করে আঁদ্রে জাইড মানুষের সার্বজনীনতা বিষয়ে মূলগত তথ্যাদির সন্ধান জেনেছিলেন। বিশ্বরার আরবজাতি, কঙ্গোর নীগ্রো সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের হিন্দু, আমেরিকাবাসী, ইংরেজ, গ্রীক, জার্মান এঁরা সকলেই আঁদ্রের দৃষ্টিতে ছিলেন সারা বিশ্বের ব্যাপক পরিবেশে একসূত্রে গ্রথিত। এই ব্যাপকতা থেকে কেউ একজন বাতিল হ'লে সমস্ত সমন্বয়টিই হবে ব্যাহত, এই ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা।

বর্তমানে ফরাসী সাহিত্য, ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়ে যা ছিল, তার তুলনায়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জাইডই সর্বপ্রথম বিভেদের প্রাচীর ধূলিসাত্ করে দিয়েছেন।

'কয়নারস' গ্রন্থে জাইড বলেছেন—উপন্যাসকে একটি সার্থক সংগীতের মতো ক'রে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাসমূহের বিন্যাস করতে হবে নিপুণভাবে সকল দিকের সংগতি অক্ষুণ্ণ রেখে। জাইড-সম্পর্কে বলতে গেলে না ভেবে আমি পারি না যে তিনি নিজেই যেন ছিলেন একটি পরিপূর্ণ শিল্পের প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনি সব বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আকস্মিকতা থেকে সহসা কখনো উদ্ভূত হয় না। তাঁর চিন্তাধারায় ছিল সুসমঞ্জস সংগতি, যা মনগড়া নয়, সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত। কিন্তু তাঁর ধর্মমতের জন্য তাঁকে হয়তো অন্য কিছু বলা যেতে পারে; তাঁর ব্যাপকতা, তাঁর তীব্রতা, তাঁর প্রবল চিন্তাধারার প্রসাদগুণে তিনি চিরদিন শক্তিমান্ ও অপরূপ কাব্যধারার সার্থক বাহক।

ছন্দ-চতুর্দ্দশীর কবি মোহিতলাল

প্রশান্তকুমার রায়

'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' মোহিতলাল মজুমদারের বিভিন্ন সময়ে বিরচিত সনেটগুলির একটি সংকলন গ্রন্থ। কবির প্রথম জীবনের প্রথমতম কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'ও গুটি কয়েক সনেটের সংকলন। সে গ্রন্থ বিশেষ প্রচারিত হয়নি বলে সাধারণ পাঠকদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই প্রবন্ধে কবি মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' গ্রন্থের আলোচনা করবার আগে সনেটের রূপ ও প্রকার ভেদ সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ করে নেওয়া দরকার।

বাংলাভাষায় সনেটের প্রথম রূপকার কবি শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের ইংরেজী-কাব্য প্রীতিই অমৃতাক্ষরের মত সনেট রচনাতেও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—এ অতি পরিচিত কথা। কেবলমাত্র একটা নতুন কিছু আমদানী করবার মোহেই নয়, সনেটের প্রাণ-ধর্ম্মের সঙ্গে মধুসূদনের কবি-মানসের একটা গহন-গূঢ় সম্বন্ধ ছিল। তা যেমন লিরিক উচ্ছ্বাসকে শাসন করে এবং ভাব ও ভাবনাকে সংযত, দাঢ্যশ্রীসম্পন্ন করে গড়ে তুলবার সহায়ক হয়, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত গঠন-কৌশলের ভঙ্গীটিও কম আকর্ষণীয় নয়। 'A sonnet is a moments' monument'। সেই moments monument' গড়বার দুরূহ কবি-কর্ম্মের পেছনে চিন্তাভাবনার কারী-গরী বিশেষটা মধুসূদনকে সনেট রচনায় আকৃষ্ট করেছে বটে, কিন্তু বিচিত্র ভাব ও কল্পনার উপাদান হাতে নিয়েও তিনি সার্থক সনেট-কবি হতে পারেননি; পথিকৃৎ হিসাবে এদেশে নমস্য হ'য়ে রইলেন। সনেটের নিখুঁত আদর্শ রচনা করা তখন সম্ভবও ছিল না। মধুসূদনের সামনে বাংলা সনেট বলতেও যেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি সনেট রচনার প্রাথমিক লক্ষণ যে পদবন্ধ রচনা—স্থূল অর্থে স্তবক গঠন—তারও কোন যথার্থ নিদর্শন ছিল না। পয়ার ছন্দে ঢালাও বর্ণনায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যই সে যুগের কবি-কর্ম্মের লক্ষণ। মধুসূদন ঐ উচ্ছ্বাসকে সংযত করলেন বটে, কিন্তু সনেট রচনায় আরেকটি যে বিশেষ প্রেরণা প্রয়োজন, সেই আবেগের প্রচণ্ডতা, তাঁর রচনাকে রসসমৃদ্ধ করে তুলতে পারেনি। আবেগহীনতার ফাঁক কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা যায় না। মধুসূদনের প্রচণ্ড আবেগের সেই তীব্রতা যেন মেঘনাদবধ কাব্যেই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। 'বীরাঙ্গনা'তে অবশ্যই তীব্রতা আছে, কিন্তু সেখানে সংগীতগুণাশ্রিত আবেগের রসরূপ—যা সনেটে প্রাণসঞ্চার করে তার নিদর্শন নেই; নাটকীয় কাহিনীর চমৎকারিত্বই সেখানে পরিস্ফুট। সনেট রচনার ব্যাপারে মধুসূদনকে এক রকম পাথরভাঙা থেকে ইমারৎ তৈরীর সব কাজগুলিই একাকী করতে হয়েছে; ফলে ইতালিয়ান বা সেকস্‌পীরীয় সনেট বা উভয়ের মিশ্ররূপের কোনটিই তাঁর সনেটে পূর্ণাঙ্গ রস-রূপ পায়নি। কেবল বহিরঙ্গগত সনেটের একটা আদল বা স্থূলরূপ তিনি বাঙালী পাঠকের চোখের সামনে খাড়া করলেন এবং ওরই সাহায্যে বাঙালীর কানে একজাতীয় অশ্রুতপূর্ব নতুন ধ্বনি বাজিয়ে শোনালেন। মধুসূদন বাংলা কাব্যে সনেটের রূপ-বৈভবের সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সুর ও স্বরের বিশিষ্ট ধ্বনিটি জাগাবার দিকে তেমন উৎসুক ছিলেন না; ফলে আদি বা ইতালিয়ান সনেটের অন্তর-ব্যঞ্জনার রহস্যটি তুলে ধরা সম্ভব হলনা। মধুসূদন তাঁর সনেটগুলির নামকরণ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশ পদাবলী'; এই নাম নির্ব্বাচনের মধ্যেই আপাততঃ যে অর্থ প্রকাশমান, সেই অর্থেই অর্থাৎ ঐ চৌদ্দ অক্ষর ও চৌদ্দটি লাইনের কথা-ব্যূহের মধ্যেই তাঁর কবিতার জন্ম ও পরিণতির পরিচয় আছে কিন্তু ভাববিকাশের তেমন কোন অবকাশ নেই।

সনেটের আত্মা স্বতন্ত্র। গঠন কাঠামোটি ঐ চৌদ্দ অক্ষর ও চৌদ্দ লাইনেরই বটে কিন্তু এটা রীতি মাত্র। এই রীতিকেই বড় করে দেখায় ফলে সনেটের বাংলা নাম 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' করা হয়েছে। সে দিক থেকে এই পরিচয়—এই নাম নির্ব্বাচন—অসঙ্গত নয়। কিন্তু রীতিও আত্মা এক জিনিস নয়; রীতিকে বাদ দিলেও সনেটের আত্মার রস-বিকাশ পরিপূর্ণ হয় না; এই জন্যে ঐ জাতীয় কবিতার ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ব্যাপারে যে সংগীতধর্ম্ম প্রধান হ'য়ে ওঠে 'সনেট' নামটি—তার যথার্থ পরিচয় বহন করে বলেই আধুনিক কালে ঐ নামটিই বাংলাভাষায় শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু সনেটের ঐ আত্মাটি কি পদার্থ? এবং সেই আত্মার বিকাশের ব্যাপারটাই বা কেমন? যে রীতির কথা বলা হইয়াছে সেই রীতির সঙ্গে আত্মার মিলন প্রক্রিয়ার স্বরূপটিই বা কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই খাঁটি সনেটের গঠনধর্ম্ম ও প্রাণধর্ম্মের পরিচয় নিহিত।

যে-কোন বস্তু বা ভাবই সনেটের উপাদান হতে পারে। এ জাতীয় কবিতায় সুখদুঃখ আনন্দব্যথার যে-কোন ভাববস্তুই স্থান পেতে পারে। তেমন রচনা অর্থাৎ যে-কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে সনেট রচনার নিদর্শন যথেষ্টই আছে। বিষয়কে বিশেষ দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গভাবে দেখার উপরেই রচনার গুরুত্ব নির্ভর করে। তবে একথা প্রায় নিঃসংশয় করে বলা যেতে পারে যে ঘটনা প্রধান বিষয়বস্তু সনেটের গুরুত্বকে লঘু ক'রে তোলে; অন্ততঃ সে আশংকা প্রায় ক্ষেত্রেই সত্য হয়ে দেখা দেবার সম্ভাবনাই প্রবল। ঘটনার সংঘাতে ভাব বিচ্ছিন্ন হতে পারে, অথবা ঘটনার নিজস্ব চমৎকারিত্বে ভাব ম্লান হতে পারে। ভাবের গাঢ়ত্বই সনেটের প্রাণধর্ম্মের পরিচায়ক। এই জন্যে সনেটে কাহিনীর স্থান গৌণ। কাহিনী যেখানে উপজীব্য সেখানে কাহিনীর রসও স্বতন্ত্র, সঙ্গীত রস থেকে তা আলাদা; অথচ সনেটের মধ্যে ঐ সঙ্গীত গুণধর্ম্মটি বজায় না রাখলে চলে না। সনেটের আদি উৎস সঙ্গীতই বটে—প্রেম সঙ্গীত। এমন কিছু ভাব মানুষের কল্পনায় আসে না যা বস্তু-নিরপেক্ষ। নিরালম্ব ভাব বলে কোন

কিছু ধারণায় আসে না। কিন্তু বস্তুকে বা ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে সনেট-কারের মূল উদ্দেশ্য যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, তা ই অসম্ভব হয়ে ওঠে; এমন কি কখনো কখনো অতি উৎকৃষ্ট ভাব সমৃদ্ধ সনেট ব্যর্থ হয়ে যায়। কবিতা হিসাবে তা যতই মনোরম হোক, সনেট হিসাবে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবেই। বিশেষ একটি ভাবকে গভীর করে তুলতে গেলে অন্যান্য সঞ্চারীভাবেরও উপস্থিতি প্রয়োজন অর্থাৎ ভাবের দিক থেকে একটা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রয়োজন আছেই। তা না হলে কোন ব্যঞ্জনাই গাঢ়তর হয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা ইত্যাদি ভাবগুলির মধ্যে কবি যেটিকে বেছে নেবেন তার হৃদযন্ত্রের সেইটি হবে মূল তার। অন্যান্য ভাবগুলির কোনটিকেই স্বতন্ত্র করে চেনা যাবেনা। তারা কেবল মূল ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। ভাবের এই বিকাশের এ পর্যন্ত মোট দুটি প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে—ইতালিয়ান ও সেকস্‌পীরীয় এবং এই দুয়ের কতগুলি মিশ্ররূপ।

সনেটের প্রথম আটটি চরণে যে কোন ভাবের উদ্বোধন, শেষ ছটি চরণে ঐ ভাবের পরিণাম। কেহ কেহ এই দুই পদবন্ধকে যথাক্রমে আসক্তি ও মুক্তি নামে পরিচিত করাবার চেষ্টা করছেন। এই নাম ভাবের অর্থজ্ঞাপক মাত্র। এই ভাবপ্রকাশের রকম ফের অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে। কখনো তা একটা বর্ণনা মাত্র, কখনো সংবাদ, কখনো মন্তব্য মাত্র, কখনো বা একটা কিছু সম্পর্কে গভীর প্রতিতি মাত্র হ'তে পারে। মোহিতলালের একটি সনেটের প্রথম লাইন এই রকম :—

'হৃদয় আবেগে যদি কিছু কয় জীবনের কোন পরম ক্ষণে
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্যদিনের সহজ মনে।'

নিছক ব্যঞ্জনার দিক থেকেও ভাবের আসক্তি ও মুক্তি এই রকম ভাগ করা কঠিন। বরং বলা যেতে পারে ভাবের উত্থাপন ও ভাবের উপসংহার। সে উত্থাপনের সঙ্গে আসক্তির যোগ থাকলেও পারে, নাও থাকতে পারে এবং ভাবের আকাঙ্ক্ষার মুক্তি বা নিবৃত্তির লক্ষণও যেমন থাকতে পারে, অতৃপ্তি বা হতাশা বেদনাও মধুরতর গভীরতর রসের সৃষ্টি করতে পারে। আসক্তি ও মুক্তির তত্ত্বটি সনেটের কোন মূল প্রকৃতির পরিচয় বহন করে না।

এই যে অষ্টক ও ষট্‌কের কথা বলা হল এর মধ্যেও সূক্ষ্ম ভাগ আছে —অষ্টকের দুটি চতুষ্ক, ষট্‌কের তিন লাইনের দুটি ভাগ। এই ভাগগুলির প্রতি পর্য্যায়ে যথাক্রমে ভাবের উত্থাপন, বিস্তার, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার ধারা আছে। মোট কথা, এই ভাগগুলির প্রয়োজন ভাবকে বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যাওয়া, আদি পেত্রার্কীয় সনেটের রীতিই এই। সেকস্‌পীয়র সনেটের এই কাঠামোটি গ্রহণ করেননি। আট ছয়ের ভাগও মানেন নি। অবশ্য তিনিও দুটো প্রধান ভাগ স্বীকার করেছেন,—প্রথম ভাগে বারো ও শেষ ভাগে বাকী দুটি মসিল চরণ। পেত্রার্কা ও সেকস্‌পীয়রের কতগুলি মিশ্ররূপ পাওয়া যাবে ইংলণ্ডের বহু প্রসিদ্ধ সনেটকারের রচনায়। মিল-বিন্যাসের রীতিও বিভিন্ন। সনেট রচনার পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য একই— ঐ বিশিষ্ট ভাবের গভীরতা সঞ্চার সংগীত রসের অভিব্যক্তি।

কবিতার ক্ষেত্রে সনেটের যে স্থান, গদ্য কথা-সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের কলশ্রুতিও অনেকটা তাই; তফাৎ শুধু এই যে ছোটগল্পের গল্পবিশেষের তারল্য বা লঘুতা, চাপল্য বা দ্রুততা সনেটে অনুপস্থিত। কিন্তু ছোটগল্পের সেই চারুত্ব, সংক্ষিপ্ত পরিবেশে পূর্ণতার স্বাদ, moments monument সৃষ্টির মহিমা, ভাবসঙ্গতি ও পরিণামে ব্যঞ্জনার অনুরঞ্জন সনেটধর্ম্মীই বটে।

মাইকেল বাংলা পয়ার ছন্দকেই সনেটের উপযুক্ত বাহন মনে করেছিলেন। এই নির্বাচন অতি সুসঙ্গত হয়েছে। চৌদ্দ মাত্রার এই ছন্দে একদিকে যেমন সঙ্গীতগুণ বর্ত্তমান, অন্যদিকে ধ্বনি-গাম্ভীর্যের স্বাভাবিকতায় ভাবের গুরুত্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম। বাংলা বাক্‌বিধিতে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, সেই অভাব পূরণ করেছে সুরের মাধুর্য। বস্তুতই প্রাচীন পয়ারের বাংলা কাব্য সুরাশ্রিত গেয়-কাব্য বলেই পরিচিত। পয়ার ছন্দের সঙ্গীতগুণ এমনিই যে চৌদ্দমাত্রার পয়ারকে ১৬, ১৮ কিম্বা আরো বেশী মাত্রায় বাড়িয়ে তুললেও পয়ারের প্রাণহানি ঘটেনা। তা না ঘটুক, অন্যসব মাত্রাধিক্যের মত সনেটে পয়ারের মাত্রাধিক্যও অনেক সময়ই ভাবকে উচ্ছ্বাসমুখর করে তোলে। সে অবস্থায় সনেটের গাঢ়বদ্ধতা লিরিক উচ্ছ্বাসে শিথিল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

মধুসূদনের পরবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যে সনেট-কবি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল, প্রমথ চৌধুরী এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের কেহই খাঁটি সনেট-কবি নন। কেউ সনেটের কাঠামোটি যথাযথ রেখেছেন, কেউ ভাবধর্ম্মকে বজায় রাখতে গিয়ে রীতিকে বিস্মৃত হয়েছেন। ফলে, সনেট নামে কথিত তাঁদের অধিকাংশ রচনাই লিরিকগুণসম্বলিত উৎকৃষ্ট কবিতা হিসাবে সার্থক হয়েছে। অবশ্য অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন অন্ততঃ কয়েকটি যথার্থ সনেট রচনা করে থাকবেন। রীতির দিক থেকে যেমনই হোক, প্রমথ চৌধুরীর সনেটে ভাব অপেক্ষা বুদ্ধির মারপ্যাঁচই সমধিক আকর্ষণীয়। সেখানে ব্যঞ্জনার কোন বালাই নাই। রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলিকে সনেট না বলে সনেটকল্প বলাই ঠিক। তিনি চৌদ্দ লাইন ও প্রতি লাইনে চৌদ্দ অক্ষর সাজিয়ে যে কবিতাগুলি রচনা করেছেন তাতে ভাবের চারুত্ব আছে এবং তা অনিন্দ্যসুন্দর হলেও তাতে সনেটের কারিগরিও যেমন নেই, ভাবের দ্বন্দ্ব এবং ভাবের ঐক্য বা প্রতিষ্ঠা অপ্রমাণিতই থেকে গেছে। বাংলার আদি সনেটের সার্থক রূপকার মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র সনেট-গুলি এমন একটা পরিচ্ছন্নতার, মর্য্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠ যা তাঁর পূর্ব্ব-সূরীদের সনেটে পাওয়া যাবেনা। সনেট রচনার ব্যাপারে মোহিত-লাল তাঁর আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেটগুলি থেকে সাক্ষাৎ প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। মোহিতলালের সনেট সংখ্যায়ও যেমন বহু, বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যও বিপুল। প্রকৃতি ও প্রেমের ভাববস্তু, প্রসিদ্ধ কোন

বা জীবিত কি মৃত প্রতিভাধর মানুষ তাঁর সনেটের উপাদান ; র কখনো ধর্ম্ম ইতিহাস পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেছেন, না আত্মগত বেদনা বা ক্ষোভের যন্ত্রণাকে জীবন্ত করে তুলছেন। দ্ধ বিদেশী সনেট-কবিদের বহু সনেটের তিনি এমন সুপরিকল্পিত স্মিত মার্জিত ভাষান্তর ঘটিয়েছেন যে অনুবাদ অপেক্ষা রচনার র্ষ সেখানে মৌলিক বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুবাদের া একটা বড় কাজ হ'য়েছে এই যে, বিদেশী সনেটের উন্নত আসনের আমাদের দৃষ্টিকে বাংলা সনেটের মধ্যবর্ত্তীতায় পৌঁছে নিয়ে ত সহায়তা করেছে এবং বাংলা ও বিদেশী সনেটের গুণাগুণের টা বিচার বোধও আমাদের জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সনেট রচনায় ত্র মোহিতলাল ' আরেকটি কাজ করলেন—ইংরেজীতে যাকে onnet sequence বলে, বাংলায় 'সনেট-পরম্পরা' নামে সেই দেশী রীতির আমদানী করলেন। মূল চেতনা একটিই এবং সেই তনাকে একাধিক সনেটের সহায়তায় ভাবের একটা সুডৌল র্ত্তি দেবার কৌশল এই জাতীয় সনেটে লক্ষ্য করবার বিষয়। আলাদা-াবে পাঠ করলে এক একটি সনেট এককভাবেই পূর্ণ ; আবার নেট-পরম্পরাগুলি অনুসরণ করলেও সবগুলির মধ্যে দিয়ে একটি াত্র ভাবের দ্যোতনাই বড় হয়ে বাজবে। এই সনেট-পরম্পরা রচনায় কবিকে সংযম ও নিষ্ঠার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। ভাবের কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটলেই বা একাধিক ভাব প্রধান হয়ে উঠলেই সনেট তার বধর্ম হারাতে বাধ্য এবং বলা বাহুল্য সে অবস্থায় পাঠকের মনেও কোন রসবোধ উদ্দীপ্ত হতে পারেনা। অতি সন্তর্পণে হিসাবমাফিক যথার্থ বাণী যোজনা না করলে রচনা প্রায় ক্ষেত্রেই স্পষ্টতা হারিয়ে ব্যর্থ হতে পারে। এই সনেট-পরম্পরা রচনায় মোহিতলাল দক্ষতার দৃষ্টান্তও রেখেছেন। ছন্দ-চতুর্দ্দশীর দশটি রচনা সনেট-পরম্পরার ভঙ্গীতে বিরচিত—দ্রৌপদী, দুর্গোৎসব, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্কিমচন্দ্র, রুপার্ট ব্রুক, কবি-ধাত্রী, এক আশা, স্বপ্ন-সঙ্গিনী, নির্ব্বেদ ও যাত্রাশেষে। দ্রৌপদী নামীয় সনেটের বিশ্লেষণ এই আলোচনায় সহায়ক হতে পারে।

দ্রৌপদী মহাভারতের বহু আলোচিত চরিত্র—পঞ্চসতীর একজন। নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পৌরাণিক একটি সংস্কার পাঠকের মনে জেগে ওঠে। কবি প্রথমেই সে সংস্কারের মূলে নাড়া দিলেন :

> তোমার স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি !
> পঞ্চস্বামী-গর্ব্ব যার সে কি আর সতী !
> সবা 'পরে সম চিত্ত—সকলেই পতি,
> নির্ব্বিকার—সমভাব—সতীত্বের ডালি !—

এ এক বিস্ময়। যে একনিষ্ঠতার আদর্শ সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ভজনায় সে আদর্শ প্রহেলিকার মতই মূল্যহীন :

> তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরুষ প্রজ্জ্বালি'
> উদ্বোধিলে বীরবৃন্দে নায়িকা-মূরতি।'—

দ্রৌপদীর পক্ষে যে কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল, কবি মনোমত তার একটা ব্যাখ্যাও উপস্থিত করেছেন :

> বহু-নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
> দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জ্জনী সঞ্চালি'
> করেছ বিদায়। বীরের সহধর্ম্মিণী
> তুমি শুধু—নারী-ধর্ম্ম প্রেম সে কোথায় ?

যে সংশয় কবিতায় প্রথমেই দেখা দিয়েছিল, ক্রমেই তা যুক্তি ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ভজনার মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব যেহেতু নারী-ধর্ম্ম যে-প্রেমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে দ্রৌপদীতে তা ছিলনা। কিন্তু দ্রৌপদীর রক্তে মাংসে চেতনায় ভালবাসার জোয়ার যদি আসতো, সাধ্য ছিল কি তা হলে—:

> তা' হলে পারিতে কভু হে বরবর্ণিনি,
> লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—কুখ্যাতির প্রায় ?—

কবি এবারে নিঃসংশয় হয়েছেন—দ্রৌপদী প্রকৃতপক্ষে কাউকেই ভালবাসেনি :

> কারে বাসনি ভালো হে পঞ্চবল্লিনী,
> তোমার সতীত্ব সে যে কেবলি বৃথায় ;

এর পরে সনেটের দ্বিতীয় পর্য্যায়। দ্রৌপদী যে মূলে নারী এবং পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁর দুর্ব্বলতা যে কিছু বেশী ছিল কবি মাত্র সেই সূত্রটুকু অবলম্বন করেই দ্রৌপদী চরিত্রের সত্য ও সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেছেন :

> তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
> ব্যাস সে বিশালবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহার—
> একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভার
> করিলা তোমারে তবে মানস মোহিনী ;—

এই ভাবনাটিকে প্রশ্রয় দেবার পেছনে নিশ্চয়ই কবির প্রমাণ আছে :

> বেদনা কামনাময়ী মানব-গেহিনী।
> অর্জ্জুনেরে ভালবাসা—পাপ-পসরায়
> টানিতে চরণ টলে স্বরগ-সীমায়—
> সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।—

কিন্তু এই প্রমাণ জীবন সত্যের এক পিঠ, অন্ত পিঠে—

> পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
> মৃত্যু শরাহত সেও, মমতা দুর্ব্বল !
> কৃষ্ণ-সখা ! গীতা মন্ত্র ভুলি' একেবারে
> লভিলে এ কি এ গতি ?—সকলি বিফল।
> এ কি চিত্র—ধন্য কবি ! স্বর্গের দুয়ারে
> দেবতা মুছিল অশ্রু !—মানব বিহ্বল।

সনেট পরম্পরার দুটি পর্য্যায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল। নারী ও প্রেম এবং নারী প্রেমের সৌন্দর্য্য সনেটের ভাববস্তু। মিল বিন্যাসের কৌশলটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে ই ও ঈ-কারও শব্দ ছাড়া আর মাত্র একটি মিল আছে 'আর' ভাগান্ত। দ্বিতীয় ভাগে সে ছাড়া আরও একটি মিল—

দুর্ব্বল, বিকল এবং বিহ্বল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সনেটের মিলে সমস্বরান্ত বা হলন্ত মিল যেমন ধরণে মর্য্যাদা হারায় তেমনি দুরান্তিক মিলে মিলগুলি খুব স্পষ্ট ও যথার্থ না হলে প্রয়োগের সার্থকতা নষ্ট হয়। অবস্থায়—যুক্ত ব্যঞ্জনের মিলে—ভাবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতে পারে। সে যা হোক উদ্ধৃত সনেটে বক্তব্যের স্পষ্টতা যেমন আছে, ভাবানুযায়ী আবেগের ছন্দ রীতিটিও সঙ্গীতগুণে মণ্ডিত। চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে আট ছয়ের পর্ব ভাগটি স্পষ্ট, কেবল অষ্টম লাইনে আট ছয়ের বদলে ছয় আটের ব্যতিক্রম দেখা যায়—'করেছ বিদায়। বীরের সহধর্ম্মিণী'। মোহিতলালের সনেটে কোন কোন স্থানে এই ব্যতিক্রম দেখা যাবে। এর উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। ভাব, অর্থ ও ধ্বনিকে কানে ও প্রাণে বাজিয়ে তুলবার জন্য এও একটি কৌশল বিশেষ। বিরাম চিহ্নগুলি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সনেটের ঐ সব অংশ পাঠ করলেই ব্যতিক্রমের উপযোগিতা বোঝা যাবে। সনেট ও লিরিকের গোত্র আলাদা, সুতরাং সনেট পাঠের সময় দম্‌কা উচ্ছ্বাসকে সংযত রাখার শিক্ষা চাই। অনেকে, এমন কি যারা কবিতা রচনা করেন তাদেরও শতকরা নব্বুই জন, কবিতা পাঠ করবার উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন না। 'স্বপ্ন-সঙ্গিনী' সনেট থেকে অষ্টকের অন্তর্গত ঐ জাতীয় আরেকটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> হে অপ্সরী! একদিন ছন্দের টঙ্কারে
> স্মর-ধনু ভঙ্গ করি,' দেবগণে জিনি'
> লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
> স্বয়ংবর-মালা ; কি রহস্য কব কারে ?—
> স্বর্গ নটী হল বধু! আকুল ঝঙ্কারে—
> সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
> না ফুরাতে সপ্তপদী কেন কেন বুঝিনি—
> কার লাগি পুষ্পসম ভরিলে ভৃঙ্গারে!—প্রতি লাইনে

আট ও ছয়ের পদ ভাগ, কেবল চতুর্থ লাইনে ব্যতিক্রম—ছয় ও আট। এই চকিত ব্যতিক্রম ছন্দের গাঢ়ত্ব ও সৌন্দর্য্য সঞ্চারের সহায়ক। পয়ারে এই জাতীয় ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথে দুর্লভ নয়।

> গিয়াছে আশ্বিন। পূজার ছুটির শেষে
> ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
> সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
> বাঁধিছে জিনিস-পত্র দড়াদড়ি লয়ে—
> হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে, ও ঘরে। (যেতে নাহি দিব)

'দিদি' সনেটে :...ভরা ঘট লয়ে মাথে,

> বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
> ধরি শিশুকচ। জননীর প্রতিনিধি,
> কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

'কাব্য' সনেটে : তবু কি ছিলনা তব সুখ দুঃখ যত

> আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরি মত
> হে অমর কবি? ছিল না কি অনুক্ষণ
> রাজসভা-ষড়চক্র, আঘাত গোপন?—উদাহরণের

উদ্দেশ্য এই যে পয়ারে পদভাগটিই আসল কথা এবং সে ভাগও ছন্দ-স্পন্দ রচনা (গীতি কবিতায় নিয়মিত পর্বভাগে যেমনটি হয়) না করে অর্থানুসারী ছেদের সীমা নির্দ্দেশ করে মাত্র।

মোহিতলালের সনেটের বাক্‌বিধির মধ্যে এক জাতীয় নাটকীয়তা চোখে পড়বে। এই ভঙ্গী তার অন্যান্য ছোট বা বড় কবিতাতেও আছে। প্রকৃতপক্ষে মোহিতলাল ক্লাসিক-ধর্ম্মী কবি—সনেটের রচনাতেই হোক, গীতিকবিতা রচনাতেই হোক—তাঁর সে পরিচয় অতি স্পষ্ট। সর্বত্র ঘটনা ও ভাবের সংঘাত যেমন প্রবল তেমনি একটি সুকুমার পেলব ব্যথাঘন ব্যাকুলতা কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন করে আছে অথচ দৃষ্টি সজাগ। লক্ষণ মন্ময়ী ভাবের এবং বিশেষ করে মোহিতলালের সনেটে সেই মন্ময়তা তীব্র, অথচ সংযম-বলয়িত আবেগে কাব্য প্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। কবি-আত্মা সনেটে যেমন বিশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হয় লিরিকের বিলাস-কলা-কুতূহলে ততটা সম্ভব নয়। কিন্তু অতিরিক্ত মন্ময়তায় বিপদও আছে। কবির মুগ্ধ ব্যথিত আত্মা সংযত সংহত ঘনীভূত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভাবকে একটা তত্ত্বমাত্র উপস্থিত করতে পারে এবং পাঠকের ভাবনার উপরে সে তত্ত্বের স্বরূপ বোঝার মত ভারী হ'য়ে রস প্রস্ফুটনে বাধা সঞ্চার করতে পারে। এই অবস্থায় অনেক সনেটের শেষ দুটি লাইন বর্ণনার ও ভাবের স্বাভাবিক বিস্তারকে পরিহার করে নীতিকথা বা দর্শনের তত্ত্বে সিদ্ধান্ত-কৌমুদী হয়ে ওঠে। মোহিতলালের কাণ এত সজাগ যে সে রকম কোন বিপদপাত তাঁর কবিকণ্ঠে ঘটেনি। তিনি সনেটের গুরুগম্ভীর মূল ধর্ম্মটি ভাল করে ধরতে পেরেছিলেন।

এবারে তাঁর সনেটের কাব্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। অংশ বিশেষ তুলে কাব্য সৌন্দর্য্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়, কারণ সনেটের কোন অংশই যেমন পৃথক নয়, শব্দে শব্দে চরণে চরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ তেমনি মিল বিন্যাসের ক্রিয়া কাণ্ডটি সমগ্র চৌদ্দলাইনের মধ্যে এমন ভাবেই পরস্পর নির্ভরশীল যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে কাণে কিছুতেই সঙ্গীতগুণ ধ্বনিত হতে পারেনা, ভাবও প্রাণকে স্বভাবতই ফাঁকী দেবে। তবুও অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে ভাবের ও মিলবিন্যাসের ব্যবধান থাকায় যে কোন একটি ভাগকে অর্থগত সৌন্দর্য্যের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা সম্ভব।

সনেটের মধ্যে কবি মোহিতলালের প্রাণপুরুষের যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা যেমন খাঁটি ও অকৃত্রিক—তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ ব্যর্থতার একান্ত পরিচায়ক অন্যান্য কবিতায় তেমন নয়। আত্মগত ভাবাবেগ ছন্দের কঠিনতম রীতি-নিগড়ে—সনেটে—এমনই দৃঢ়বদ্ধ যে কবি-আত্মার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত পাঠক শুনতে পান। লিরিকে আবেগের উচ্ছ্বাসে ছন্দধ্বনির তরঙ্গায়িত ছন্দ স্পন্দের গমকে ঠমকে অনেকাংশেই সেই আত্মগত পরিচয়টি মধুময় বা মনোরম হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক সত্য

রূপ পায়না, সত্যের মত শোনায়না। প্রেমকে অবলম্বন করেই আদি সনেটের জন্ম; মোহিতলালের সনেট প্রেরণার মূলেও ঐ প্রেম, ভালবাসাই প্রধান। তাঁর সমগ্র কবি জীবনের মূল চেতনা ঐ প্রেমের সাধনা: ভালবাসি ভালবাসা—তোমারে ত নয়!

তোমারে বাসিলে ভাল হইত অক্ষয়
জীবনের সুধাভাণ্ড, মৃত্যুস্মিত মুখে
মূর্তিমান পুণ্য যেন পরাইত বুকে

মোহিতলালের কবিতায় একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় আছে। যে কোন সচেতন কবির কাব্য প্রেরণার পেছনেই বিশিষ্ট দর্শন বর্তমান। ঐ দর্শন রস রূপের মধ্য দিয়ে পাঠকের উপলব্ধিতে পৌঁছয়। মোহিতলালের অন্যান্য কাব্যে যৌবন, নারী সৌন্দর্যও ভালবাসার সমন্বয়ে কবিমানসের যে বৃত্ত গড়ে উঠেছে সনেটে তার অনেক খানি স্পর্শ থাকাই স্বাভাবিক। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে নারী তার রূপ-রস-রঙ্গনিয়ে একদিকে যেমন মানব মোহিনী মূর্তিতে উপস্থিত অন্যদিকে সে-নারী যে মানবের দেহ প্রসবিনীও তার পরিচয়ও স্পষ্ট। সনেটে নারী সত্তা ভাবৈকময়ী। দেহ রূপ ও প্রেম কবিমানসের যে পরিমণ্ডল গঠন করেছে সনেটে তার প্রকাশ কেমন?—

জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হয়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে! (এক আশা—২)

মোহিতলাল একথা বলেছেন—দেহই অমৃত-ঘট আত্মা তার কেন অভিমান। কিন্তু সে আত্মার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নিছক দেহ-কেন্দ্রিক নয়:

শয়ন-শিয়রে মোর নিশি-কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপ লক্ষ্মী! নয়ন-গণ্ডূষে
সে লাবণ্য সিন্ধু লব এক কালে শুষে!
যে-অমৃত পিপাসায় করিনি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি'!

* * *

এবং, আমার কামনা-ধূমে হয়নি ত' ম্লান
তোমার অলক শোভী মন্দার-মঞ্জুরী
তবু তব ওঠে নাই আবেশে শিহরী'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী! (ঐ—৬)

সৌন্দর্যকে স্থায়ী দেখবার আকাঙ্ক্ষা যৌবনের ধর্ম, কিন্তু অস্থির বিদ্যুতের মতই যৌবন বেশীক্ষণের নয় এবং বলেই তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। মোহিতলাল যৌবন-বাদী রূপতান্ত্রিক কবি। অন্যান্য কবিতায় তার সে পরিচয় উগ্র মধুর কিন্তু সনেটে কোমলতায় স্নিগ্ধতায় গম্ভীর:

হায় নর! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন!
উর্বশী চাহেনা প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে তপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন!

উদ্ধৃতিগুলি থেকে কবির রূপমুগ্ধতা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য ছাড়াও জীবন জিজ্ঞাসার অন্য দিক আছে। মোহিতলালের সনেটে সে সবের সমারোহও কিছু কম নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে তার রূপতান্ত্রিকতার মানস রঙটি উজ্জ্বলতম হয়ে পাঠকের অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়। নির্বেদ সনেটটি উপসংহারের কাজে লাগানো যেতে পারে। এই সনেট পরম্পরাটির পর্যায় ক্রম তিন। প্রথম পর্যায়টি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে তৃতীয় ক্রমের ষট্ক মাত্র উপহার দেওয়া হচ্ছে। কবির প্রেমে যে দেহ আত্মার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর তার পরিণাম জিজ্ঞাসার উত্তর এখানেই পাওয়া যাবে। মোহিতলালের কবি-মানস পরিক্রমায় এই 'নির্বেদ সনেট-পরম্পরাটি অন্যতম প্রধান অবলম্বন বলে ধরে নেওয়া যায়। সনেটটির আংশিক উদ্ধৃতি এই—

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর; কুসুম কুন্তলা
পুনর্ণবা বনবীথি করেনা উতলা
সে দিনের মত। নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও—
ভোরের কোকিল সাথে; ইঙ্গিত-কুশলা
মাধব-সখার জায়া জানে যত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয়?
তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তা'রি সাথে!
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আছে!—অন্ধ অমা রাতে
বিরহ-রাতুল রহে স্বপ্নে অবগাহি'!
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া যেথা—কি আছে আমাতে?

এবার সেই তৃতীয় ক্রমের ষট্ক:

একদা হরিনু তোমা যৌবনের রথে—
আর করি ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্র বেগে তার;
চুম্বন করেছি লঙ্ঘি' মৃত্যুর প্রাকার
তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, স্বপ্ন-অবসথে!
হোক দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্রে পূত সে অঙ্গার!

যৌবনবাদী কবির কাব্যচেতনার মূল নির্য্যাস এই বাণীমন্ত্রে বিধৃত। এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

সাহিত্য-সাধক অমরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত

সকলেই জানেন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক ১৯১৩ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রটির সৃষ্টিসম্ভাবনা পরিকল্পিত হয়। কিন্তু দুর্দৈববশতঃ ইহার প্রথম সংখ্যাটিও দেখিয়া যাইবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। তবে 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যাটি কবি-লিখিত যে সূচনার বাণী লইয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ছিল এই কয়েকছত্র অমূল্য কথা—

"আমরা যেন আত্মসম্মানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া পৌঁছিবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল পরিকল্পিত সেই 'ভারতবর্ষে'ই অমরেন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গের জন্য আমরা এককালে অতি আগ্রহের সহিত উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতাম। আজ মনে হইতেছে দ্বিজেন্দ্রলালের উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি বাস্তবিকই যেন অমরেন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যজীবনে সর্ব্বতোভাবে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

সাহিত্যকে কেহ বা পেটের জন্য পেশা হিসাবে, কেহ বা সখের জন্য নেশা হিসাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহিত্যকে জীবনের ব্রত হিসাবে ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে বাস্তবে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ একালের সুবিধাবাদী কর্ম্মকুশল চতুরগণের চোখে তো 'ব্রত' বা 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দগুলি উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যেমন রাজনীতিকে তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গরূপেই অবলম্বন করিয়া দেশের হিসাবী মানুষদের কাছে 'ভাবপ্রবণ' আখ্যা পাইয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাতেও কতকটা ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবপ্রবণতা যদি তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আজ যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়া উঠিতে পারিতেন ও সাহিত্যের একজন ধুরন্ধর কর্ণধার বলিয়া গণ্য হইতেন। কারণ, নিজেরা দরিদ্র হইলেও ধনের মাপকাঠিতেই আমরা গুণের মর্য্যাদা দিয়া থাকি।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 'ভারতবর্ষে'র সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর', রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন,' দ্বিজেন্দ্রনাথের 'ভারতী,' রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা,' সমাজপতির 'সাহিত্য' ও চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' প্রভৃতি—ইহাদের প্রত্যেকের জন্ম ইতিহাসের মূলে একই উদ্দেশ্যের উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'যামিনী,' 'সারথি,' 'প্রবাহিনী,' 'বঙ্গদর্শন,' ও 'সুদর্শন,' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং সমালোচনা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই কথাই দেশকে বারংবার স্মরণ করাইয়া গিয়াছেন। 'বাঙ্গালী,' 'নায়ক' ও 'হিন্দুস্থান' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনেও ঐ আদর্শই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। যেখানেই কোন অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধিতা, অসামঞ্জস্য, দুর্নীতি বা আদর্শচ্যুতি তাঁহার নজরে পড়িয়াছে, তা সে সাহিত্যেই হোক বা সমাজেই হোক, সেখানেই দেখিতে পাই তিনি যেন নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—এ নীতি তিনি কোন দিনই মানিয়া চলিতে পারেন নাই।

বাঙ্গলার দুর্ভাগ্যক্রমে জীবদ্দশায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পুরুষসিংহ আশুতোষকে একসময়ে কারণে-অকারণে দেশের কোন কোন শক্তিশালী দলবিশেষের হস্তে কম নিগ্রাহিত হইতে হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের কোন এক সুবিখ্যাত অভিভাষণ লইয়া বাঙ্গলার কোন কোন সাময়িকপত্র এমন কি তাঁহাকে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। সেদিন এই 'ভারতবর্ষের'ই পৃষ্ঠায় অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের কোষাগার হইতে বাছা বাছা কতকগুলি একই জাতীয় সুভাষিত-সংগ্রহ যদি লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়া না ধরিতেন, তাহা হইলে মনে হয় চিত্তরঞ্জন বিনাদোষেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি ও চিন্তানায়কদের রচনার সহিত অমরেন্দ্রনাথের যতবেশী পরিচয় ছিল, সাহিত্য-আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ততখানি পরিচয় আর কাহারও লেখায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সেই কারণেই 'বাঙ্গালীর পূজাপার্ব্বণ,' 'সমালোচনাসংগ্রহ,' 'বাঙ্গালা রচনাভিধান,' 'বিচিত্র চিত্রসংগ্রহ,' প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সেই জন্যই অনেক বিশিষ্ট মনীষাসম্পন্ন লেখকেরও ভ্রমাত্মক উক্তির ভুল ত্রুটি তিনি সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশ সমাজপতির গোষ্ঠিভুক্ত হইলেও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি যেভাবে 'বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও ভাষাপ্রীতি' অথবা 'গিরিশ নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' লিখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সমালোচন-সাহিত্যে বাস্তবিকই তাহার তুলনা মিলিবে না। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দেশীয় মনীষীগণের বিভিন্ন মনন ধারা অনুসরণ করিয়া, সেগুলির ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইয়া সেগুলির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে করিতে তাঁহার স্বকীয় বিচারভঙ্গী অতি সরল ও সহজভাবে সত্য-নির্দ্ধারণের পথে অগ্রসর হইত।

বাঙ্গলা ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহাই যে বাঙ্গলা সাহিত্য—একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। আর সাহিত্যে যদি দেশীয় বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বিশ্বসাহিত্যে

তাহার যে স্থান থাকিবে না—এমন অদ্ভুত ধারণাও তিনি পোষণ করিতেন না। কাব্য দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইলে যে উচ্চাঙ্গের হইতে হইবে—একথা তিনি স্বতঃসিদ্ধবৎ মানিতেন না। বস্তুতন্ত্রের নামে বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অজুহাতে কুভাব-উদ্দীপক কাব্যকে, যতই তাহার বহিঃসৌষ্ঠব নিখুঁত হোক না কেন, তিনি কুকাব্য ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিতেন না। মানব-জীবনের নিবৃত্তিমূলক আদর্শের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ ছিল বেশী। তাই এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজগত অধ্যাত্ম আদর্শের যাহা কিছু বিপরীত, তাহার প্রতি তাঁহার ঘৃণাও ছিল অত্যন্ত প্রবল।

আমাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, আমাদের পৈতামহ ধারাবাহিকতা যাহাতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনায় ইহাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। অনেক 'লুপ্ত রত্ন' সমুদ্ধারে, 'জয়দেব', 'চণ্ডীদাস' 'নিধুবাবু' ও "ঈশ্বর গুপ্তে'র সমালোচনায়, 'শাক্তপদাবলী'র সম্পাদনায় ঐ লক্ষ্যই ছিল তাঁহার মূল প্রেরণা। অনুরূপ প্রেরণার বশেই তিনি বর্ত্তমান যুগের বহু কবি ও মনীষী এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের জীবন কথা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিকভাবে 'মনীষা মন্দিরে' নামক প্রশস্তিমূলক সন্দর্ভগুলি 'সচিত্রশিশিরে' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অমরেন্দ্রনাথ প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন সমালোচক। তাঁহার রচনায় উচ্ছ্বাস-অপেক্ষা বিচার-বিশ্লেষণের মাত্রাই থাকিত বেশী। অথচ তাহাতে শুষ্কতা, জটিলতা, দাম্ভিকতা, মুরুব্বিয়ানা বা সাহিত্য-প্রকাশের চেষ্টা কোথাও থাকিতনা। সুস্পষ্ট-চিন্তা পরিমিত ও সুনির্ব্বাচিত শব্দের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়া অপরূপ প্রসাদগুণে তাঁহার রচনাকে সাহিত্য-রসসিক্ত করিয়া তুলিত। তাঁহার রচনায় তাঁহার প্রকৃতিই প্রতিফলিত হইত।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে 'অর্চ্চনা' বলিয়া একটি মাসিক সাহিত্যপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ ৺কবি কণীন্দ্রনাথ রায় 'অর্চনা'র লেখকমণ্ডলীর অন্যতম নিষ্ঠাশীল সদস্য ছিলেন। মনে পড়ে এক উদ্দীপনাময় সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্য দিয়াই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূচনা। বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের বহু প্রথিতযশা লেখকদের সমাগমে তাঁহাদের বাসার বৈঠকখানা একদা মুখরিত হইয়া থাকিত। তাঁহার সাহিত্যসাধনা ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হইয়া উঠিলেও, এবং চিরচঞ্চল জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে আবাহন ও বিসর্জ্জনের বহু সুখদুঃখময় পালা অভিনীত হইয়া থাকিলেও, তাঁহার সাহিত্য জীবনের আদিকাণ্ডের সেই স্মৃতিকথা বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রাচীন লেখকগণের মধ্যে মনে হয় কাহারও কাহারও মন হইতে আজো মুছিয়া যায় নাই।

আর কিছু নয় অনামিকা মোর

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

নীলমায়া-ঘেরা দূর দিগন্ত, সোনালী রোদ,
শিশির-মেশানো গুড়গুড়ি-দেওয়া উত্তুরে লঘু হাওয়া ;
শান্ত, উদাত্ত, সুনীল আকাশ—কী অনুরোধ,
চেয়ে থাকা শুধু, কাঙাল নয়ন—শুধু চাওয়া, শুধু চাওয়া।

হেমন্তিকার কনকাঞ্চল রয়েছে পাতা,
দিকহারা মাঠ নীরব, নিথর, সুপ্ত, স্বপনাতুর ;
সূর্য্য-কিরণে আশিস্-স্নাতা বসুধা মাতা,
আকাশে-বাতাসে দিগ্ দিগন্তে শান্তি ইমন-সুর।

ভালো লাগে এই সোনালীর মায়া একাকী বসি,
শ্যামা জননীর শ্যামল স্নেহটি সোনার দানাতে বাঁধে ;
রাখালিয়া বেণু পুলক আনিছে শ্রবণে পশি',
নব পউষের পটের লিখাতে বিগত অতীত কাঁদে।

জীবনে আমার নব রূপায়ণ হঠাৎ একি !
আমার স্বপন সোনার ফলে যে মাটির ছেলের মত,
জীবনের এই নতুন লেখাটি আজিকে দেখি,
সোনার পউষ, নতুন জীবন—শতদল শত শত।

নতুন ছবিটি প্রকৃতির পটে, আমারো তাই,
সোনার ফসলে ভরিল যে আশা, অপরূপ—অভিনব ;
এই আনন্দ, কাঙালের ধন—আর কি চাই,
আর কিছু নয় অনামিকা মোর, মধুর হাসিটি তব।

যুদ্ধোত্তর জাপান

শ্রীঅমলকুমার ঘোষ

সূর্য্যোদয়ের দেশ জাপান। এই দেশ শিক্ষাদীক্ষায় শিল্প-বাণিজ্যে ও সামরিক শক্তিতে প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলে পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও জাপানের নৌশক্তি পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রেছিল। পূর্ব্ব-এশিয়ার হক্কাইডো, হনসু, শিকোকু ও কিউসু এই প্রধান চারিটি দ্বীপ সমেত মোট ১০৮৯টি দ্বীপ নিয়ে জাপান সাম্রাজ্য। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে জাপানের লোকসংখ্যা হয় ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ; একই মহাদেশের অধিবাসী হ'য়ে তাই জাপানকে জানবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সুযোগ এলো। আমন্ত্রণ পেলাম, নিখিল বঙ্গ সামরিক পত্র সঙ্ঘ, জাপান প্রত্যাগত শ্রীঅমিয়কুমার বসু, বার-এট্-ল, মহাশয়ের সাম্প্রতিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্ব ভারতে নেতাজীর প্রভাব সম্পর্কে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন।

বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের সভার বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পক্ষে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোক্তা "সাপ্তাহিক বিশ্ববার্ত্তা" কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কলিকাতার এ, টি, মিত্র ইনষ্টিটিউশন ভবনের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে সভার আয়োজন করেছিলেন।

শান্ত পরিবেশ। প্রত্যেকেই বেশ মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনেছেন। বক্তা সুপণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাবান আইনজ্ঞ। সুপুরুষ, সৌম্যমূর্ত্তি, চোখে মুখে ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্ব ফুটে রয়েছে—যেন পারিবারিক ধারাকে পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বড় সমস্যা। স্বাধীনতা-উত্তরযুগে ভারতবাসী যেখানে অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বহুলাংশে সমাধান করতে সমর্থ হয়নি, সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও চরম আঘাত খেয়েও এই স্বল্পকালের মধ্যে জাপানবাসীরা তাদের অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে। শ্রীবসু বলেন, আমি অন্ততঃ স্বচক্ষে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত সবার জোটে না, এমন কি সপ্তাহে একদিন মাছ খাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না আদৌ মাছের স্বাদ উপলব্ধি করেনি, এরূপ শিশুর সংখ্যা যেখানে বহুল—সেক্ষেত্রে জাপানের প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে আনুমানিক চার আউন্সের মত মাছ আহার করে। কারণ জাপানীরা পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় মাংস আহার করে না, ঐ মাছ থেকেই তারা তাদের প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জাপানীরা আমাদেরই মত ভাত খায় এবং জাপানে খাদ্য উৎপাদন প্রচুর হ'য়ে থাকে। জাপানের উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এবং জাপানের প্রায় ২০ লক্ষ লোক মৎস্য ব্যবসার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। তারা সমুদ্র হ'তে মাছ ধ'রে এনে জাপানের বাজারে মাত্র আট আনা সের দরে ঐ মাছ বিক্রয় করে।

জাপানে পোষাকের প্রাচুর্য্য আছে। জাপানের রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে—এককথায় পারিবারিক জীবনের বাহিরে প্রায় সব পাশ্চাত্য রীতির চূড়ান্ত প্রচলন। পথে ঘাটে কোন জাপানী মহিলা বা পুরুষের বেশভূষার পারিপাট্য দেখে পশ্চিমের কোন দেশ বলে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে। বলতে গেলে টোকিও শহর একটি "কস্‌মোপলিটন্ সিটি"। কিন্তু এই বহিঃপ্রকাশ জাপানীদের সত্যকারের রূপ নহে। গার্হস্থ্য জীবনে জাপানীরা জাতীয় রীতি পুরোপুরী রক্ষা করেছে। আজও প্রত্যেক জাপানী গৃহে প্রবেশ করতে গেলে, জুতো খুলে নগ্নপদে, বড় জোর একজোড়া চটী পরে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যেক জাপানীরা আজও ভূমিতেই শয্যা গ্রহণ করে থাকে। চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্কের প্রচলন নেই বল্লেই হয়। এখানে একটা কথা না বলে পারছি না. সেদিনের সভায় কিন্তু মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা হ'য়েছিল এবং অনেকেই মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সেটা যে চেয়ার-টেবিলে বসে অধিকাংশ সময় কাজ করার অভ্যাসে—একথা অবশ্য সভার শেষে দু-একজন প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর জাপানী বাসস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীবসু বল্লেন, এই দিকটায় ওদের একটা সমস্যা রয়েছে। জাপানী বাড়ীগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট, এগুলি ভূকম্পনের হাত হ'তে রক্ষার জন্য কাঠ বা পিচ্‌বোর্ড দিয়ে তৈরী হয়। আমাদের যে ঘরে সভানুষ্ঠান হ'য়েছিল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সেটি ১৬´× ১২´ ফুট (অনুমানিক) হবে। ঐ ঘরটি চারিটি জাপানী ঘরের সমান। সুতরাং এই উপমা থেকেই জাপানের স্থান সমস্যা উপলব্ধি করা যায়।

প্রকৃত জাপানকে জানতে হ'লে, জাপানের "কিয়োটা" শহর পরিদর্শন করা দরকার। "কিয়োটা" শহরের সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক শোভার জন্য ইহাকে প্রাচ্যের "রোম" বলা হয়। তিনি বলেন, এখানে একশত দশটি দেব মন্দির আছে, এবং প্রত্যেকটি দেবমন্দির সংলগ্ন একটি করিয়া সুন্দর পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। জাপানীদের সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও রুচিবোধ কতখানি তা এখানে বোঝা যায়।

জাপানীরা মঙ্গোল জাতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাপানবাসীই স্বীকার করে যে, তাহারা ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে ভারতের নিকট হইতে এবং কৃষ্টি লইয়াছে চীন হইতে—সুতরাং এই দুই দেশবাসীর সহিত জাপানবাসীর অন্তরের যোগ রহিয়াছে।

জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত জাপানী ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের মত ইংরাজী-প্রীতি উহাদের নাই, জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রটী

—জাপানী ভাষাতেই প্রচারিত হইয়া থাকে এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশীল পত্রিকা। উহারই একটা ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় মুখ্যত বিদেশী:দের জন্ত এবং উহার প্রচার সংখ্যা মাত্র ৩০ হাজার।

অধিকাংশ জাপানবাসী তিনজন ভারতবাসীর নামের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তাঁহারা হ'চ্ছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ও চন্দর বোস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জাপানবাসীদের নিকট শ্রীচন্দর বোস নামেই অধিক পরিচিত)। তবে পণ্ডিত নেহেরুর জাপান-ভ্রমণের পর কিছু জাপানবাসীর মুখে তাঁর নামও শোনা যায়।

এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'নোবেল প্রাইজে' পুরস্কৃত হওয়ায় এবং কবিগুরুর দু-দুবার জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অন্যতম বিচারকরূপে জাপানীদের পক্ষে রায় দেওয়ায় ও ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত "হিরোসিমা" ও নাগাসাকির নিহত শহরবাসীদের আত্মার শান্তি কামনায় ও ভবিষ্যতে ঐরূপ নৃশংসতার প্রতিবাদে প্রতিবৎসর যে শান্তি সম্মেলন আহূত হয় তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর রাধাবিনোদ পাল কয়েকবার যোগদান করায় তাঁহাকে জাপানবাসীরা অন্তরে আসীন করিয়াছে। আজাদহিন্দ ফৌজ এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের নেতা নেতাজী সুভাষকে তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। জাপানে সামরিক বিভাগও নেতাজীকে দেশপ্রেম এবং দৈনিক জীবনের আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে বরণ করে। ভারতবাসীদের পক্ষে এখন পর্য্যন্তও নেতাজীর যেখানে উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই সেক্ষেত্রে জাপানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। ইহা আমাদের লজ্জার কথা। আমরা যতই শান্তির বাণী প্রচার করিনা কেন, জাপানীরা যে এশিয়ার সংহতি রক্ষায় আমাদের চেয়ে কর্ম্মতৎপর এরূপ বহু প্রচেষ্টা "শ্রীবসু" লক্ষ্য করিয়াছেন।

আজকের জাপান শিল্পেবাণিজ্যে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে জাপানে কুটীর শিল্প এত সমৃদ্ধ ও প্রসার লাভ ক'রেছে যে, তাতে জাপান—যদি শীঘ্র ঐ সকল উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে জাপানে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় আসতে পারে। আশার কথা, ভারত, জাপানের সহিত শিল্প ও বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়েছে এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কয়েকটি "লোকোমটিভ্" ইঞ্জিন এবং টাটা ষ্টীল কোম্পানীতে একটি ওভারহেড্ ক্রেণ জাপান থেকে সরবরাহ করা হ'য়েছে।

জাপানে টুরিষ্ট অফিসের কার্য্যের তিনি খুব প্রশংসা করেন। জাপান সরকার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কয়েকটি জনসভার বক্তৃতার টেপ-রেকর্ড "শ্রীবসু"কে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জাপানে, মার্চ্চ মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান হবে। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সমাজতান্ত্রিকদল ঐ নির্ব্বাচনে জয়ী হ'তে পারে বলে আশা করা যায়। জাপানে ছাত্র আন্দোলন খুব সুসংগঠিত এবং তার প্রভাবও খুব। জাপান প্রতিবেশী লালচীনকে সমর্থন করে।

নেতাজী জীবিত আছেন কি? এ প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিতে "শ্রীবসু" অস্বীকার করেন। তবে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত "নেতাজী অনুসন্ধান কমিশন" ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, যে কারণেই হোক—বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করেন নাই।

পরিশেষে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই এশিয়ার সংহতি ও ঐক্য শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাই আজকে এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার দিন এসেছে।

এর পর অন্যান্য নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বক্তার সঙ্গে। বক্তার এইরূপ নিরপেক্ষ ভাষণে সকলেই প্রীত হইয়া উচ্চ প্রশংসা করেন। বিশ্ববার্ত্তার কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক নমস্কার জানিয়ে আমরা খুশী মনে সেদিনকার মত বিদায় নিলাম। মনে মনে বললাম—রণজয়ী জাপান তোমাদের সাথে গলায় গলা মিলিয়ে আমরাও আওয়াজ তুলি, এশিয়া শুধু "এশিয়াবাসীর জন্ত।"

গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনা

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই বিষয় তিনটি হইল কর্মপন্থা, অর্থ সংগতি ও পরিকল্পনাকে রূপ দান করিবার জন্ত সরকারের ও জনসাধারণের সহায়তা।

আমাদের নানা পল্লীর মধ্যে কতক বৈশাদৃশ্য থাকাতে কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনাকে কার্য্যকারি করিয়া তোলা সম্ভব না হইলেও গ্রাম উন্নয়নের জন্ত একটি সাধারণ কর্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই সঙ্গে কোন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা কোন গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে তথায় সমালোচনা করিয়া সে সম্পর্কে তথায় সমাজ ব্যবস্থায় কি কি গলদ বর্ত্তমান, তাহাদের কারণ নির্দ্ধারণ ও প্রতিকারের উপায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

কৃষিকার্য্য সকল শিল্পের মূল, এবং জীবিকা রূপেও ইহা আদিম ও

লাভজনক। কৃষি শুধু আমাদের আহার্য্যই যোগায় না, পথ্য বা শিল্পদ্রব্যও যোগায়। খাদ্য উৎপাদনের উপকারিতা সম্পর্কে কোনও অত্যুক্তি খাটে না—কারণ আমরা প্রথমে বাঁচিব পরে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিতে শিখিব। যখন আমরা খাদ্য অপরিযাপ্ত উৎপাদন করিব, তখন আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমে চোখে পড়ে ধনী সম্প্রদায়ের নগরে বসতি এবং পল্লীবাসীর দারিদ্র্য। পল্লীর দুর্দশা যে এই দুই-এরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং বাংলাদেশের পল্লীকে পুনগঠিত করিতে হইলে পল্লীর মরাগাঙে জীবনের সমৃদ্ধির স্রোত বহাইতে হইবে ও জনসাধারণকে পল্লীর মাঝে মাটীর বুকে ফিরিবারে মহামন্ত্রেই দীক্ষিত করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতি কল্পের নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের কৃষক সাধারণের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সামান্য কতকগুলি উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল। যেগুলি স্বল্প প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগীতাতে সফল হইতে পারে।

উৎকৃষ্ট বীজ

উৎকৃষ্ট বীজ বপনের সুফল সম্বন্ধে কৃষকমাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু অন্যদেশেও কৃষিজীবীদের ন্যায় আমাদের কৃষকেরা ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে যথারীতি যত্নবান নহেন। উৎকৃষ্ট বীজে অন্যান্য সকল অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও সাধারণ বীজ অপেক্ষা বিঘাপ্রতি ফসল অধিক হয়। অন্যান্য দেশে এই প্রকার গুণ সম্পন্ন বীজের দর ও চাহিদা অধিক।

তথায় এই বীজ বিশেষ যত্নের সহিত উৎপন্ন করা হয়, যাহাতে মিশ্রণের ফলে হীন গুণ না হইয়া পড়ে এবং বিক্রয়কালে এই বীজ নির্ভেজাল বপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলন পাওয়া যাইবে। এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়। আমাদের দেশের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পৃথকভাবে খামারের জন্য যথেষ্ট জমি পাওয়া না গেলে বীজ ক্রয় বিক্রয় এক সমিতির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ইহার সভ্যেরা তাঁহাদের জমির একাংশে যে সর্বোৎকৃষ্ট ফসল তথায় জন্মায় তাহার বীজই উৎপন্ন করিতে পারেন, এইভাবে স্থানীয় বীজ সহজেই সকলে পাইতে পারিবে। তাহাতে একদিকে যেমন খরচ কমিবে অন্যদিকে চাষের সুবিধাও থাকিবে।

সার

কৃষির উন্নতির পক্ষে উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার যেমন একটি উপায় তেমনই অপর একটি উপায় উন্নততর সার প্রয়োগ। ইহা ছাড়া বর্তমান গো-মহিষাদির গোবরের নানাপ্রকার অব্যবস্থায় কৃষি কার্য্যে প্রয়োগের জন্য অল্পই পাওয়া যায়। সুতরাং ফসলের খাদ্য বা ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে না। ফলে যে সকল ফসল আমরা নিতান্তই প্রয়োজনীয় মনে করি, যেমন ধান, পাট সরিষা ইত্যাদি শুধু তাহাদের ক্ষেত্রেই কিছুমাত্র সার প্রযুক্ত হয়। এইভাবে বহু জমিতে কেবল সারের অভাবে ফলন নিম্নতম অঙ্কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতএব ক্রমান্বয়ে ফসল উৎপাদন করিয়া যে সকল জমির খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া ফলন কমিয়া গিয়াছে তাহাদের পুনরুজ্জীবিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সার প্রয়োগ করিয়া যে তাহা করিবে এমন স্বচ্ছলতা আমাদের কৃষকের নাই। সুতরাং একত্রে কাজে নামিতে হইবে—এবং তাহা হ'তে পারে সমবায় কৃষক সমিতির মাধ্যমে।

অজ্ঞতা আমাদের একটি প্রধান অন্তরায়। জমিতে যাহা কিছু জন্মায় তাহাই জমি হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে এবং ক্রমেই জমির খাদ্যভাণ্ডার সার না পাইয়া নষ্ট হইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাতে সর্বত্র পাম্প প্রভৃতি যন্ত্রাদির বহুল ব্যবহার প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলসেচনের জন্য জলাশয় খনন ইত্যাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে। এ বিষয়ে পল্লী অঞ্চলের জলসরবরাহের সম্পর্কীয় কর্মিদের নিকট হইতে আমরা সহায়তা লাভ করিতে পারি। এই জলাশয় সকল হইতে পানীয় ও সেচনের জল গ্রহণ করা যাইবে। এমনকি ইহাতে লাভজনক মৎস্য ব্যবসায়েরও সূচনা হইতে পারিবে।

আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষিত হলচালনী ইত্যাদি কার্য্যে প্রধানত, বলদই ব্যবহৃত হয়, ইহাদের চালনা বা আকর্ষণ শক্তির বৃদ্ধির জন্য গো-মহিষাদির উন্নতি করা প্রয়োজন। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্যও গো জাতির উন্নতি কর্তব্য। দুগ্ধদান শক্তি পৈতৃক পরম্পরায় গাভী লাভ করে সুতরাং গোজাতির উন্নতির জন্য জনক বৃষের প্রয়োজন।

গ্রামে প্রজনন কার্য্যের জন্য দক্ষিণা যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জনক বৃষের পরিপোষণ চলেনা কিন্তু ইহারা যে কত মূল্যবান ও ইহাদের প্রভাব যে সুদূর প্রসারী তাহা নিঃসন্দেহ।

অবাঞ্ছিত আগাছাগুলি নিবারণ করিয়া অন্য কোথায় বিনষ্ট করা অপেক্ষা সুবিধাজনক ভাবে কম্পোষ্ট সাররূপে জমিকেই ফিরাইয়া দেওয়া লাভজনক। ইহা এক পক্ষে যেমন বিশেষ শ্রমসাপেক্ষ নহে অন্যদিকে তেমন ব্যয়াধিক্যের আশঙ্কাও বিশেষ নাই। বরঞ্চ ইহাতে ম্যালেরিয়া নিবারনী সমিতি, সমাজ সেবা সমিতি প্রভৃতির কর্মীদিগের সহায়তাই হইবে। বৃহদাকার ও কঠিনকাণ্ড বৃক্ষগুলি বাদে গাছ, গাছড়া ও উদ্ভিদ আবর্জনা পাতা সারে পরিণত করিয়া লাভজনক ভাবে কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই প্রথায় অর্থনীতি এবং কৃষি উভয়ই রক্ষিত হয় ইহা চীন জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বহুল প্রচলিত। তথায় ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অত্যাধিক হইলেও বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয় না। তাহারা শুধু যে এইভাবে সার প্রয়োগ করে তাহাই নহে উপরন্তু একই জমিতে একাধিক বার ফসল উৎপাদন করে।

যে কোনও উপায়েই হউক ভূমির উর্বরতা যত দূর সম্ভব বাড়াইয়া সর্বাধিক ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহার জন্য কোথাও জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোথাও জলনিকাশের, কোথাও বা উভয়েরই।

আমাদের সুবিবেচিত অভিমত এই যে প্রত্যেক কৃষকের উচিত তাঁহাদের কৃষিলব্ধ আয়কে অন্য কোনও শিল্প বা বৃত্তির সাহায্যে বর্দ্ধিত করা। ইহাতে একাদিকে যেমন তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে তেমন গ্রাম উন্নয়নের পথও প্রসারিত হইবে। এইরূপে তাহারা সূতা কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি আরম্ভ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া সম্মিলিত ভাবে অন্যান্য সহায়তায় ময়দার কল, তেলের কল ইত্যাদি স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে যুক্তি দ্বারা সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবত মত খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রথম হইতে ১৫ সূত্রে সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পঞ্চভূত হইতে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নির পূর্ব্বে আকাশ সৃষ্টির কথা না থাকিলেও এবং বৃহৎ-আরণ্যকে আকাশকে অমৃত (সুতরাং অজ) বলা হইলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছিল ইহা আছে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু যদি না থাকে, তবেই ছান্দোগ্য, বৃহৎ-আরণ্যক ও মুণ্ডকের "ব্রহ্মকে জানিলে সকলই জানা হয়", এই উক্তি সার্থক হয়। আকাশ যখন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ হইতে ভিন্ন প্রতীত হয়, তখন তাহাকে অন্য বস্তুর বিকার বলিতে হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মাও তো আকাশ হইতে পৃথক। তথাপি আত্মা কোনও বস্তুর বিকার নহে। আত্মাকে বিকার বলিলে তাহাকে বৌদ্ধদিগের মত শূন্যের বিকার বলিতে হয়। কিন্তু 'সৎ' আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ক্রমের বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়।

১৬ সূত্রে জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু নাই বলা হইয়াছে। আত্মা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আত্মা নিত্য। জীবাত্মাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ (২।৩।১৭-১৮)। ১৯ হইতে ২৯ শ্লোকে আত্মা অণু-পরিমাণ, ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে। বেদে জীবাত্মার উৎক্রান্তি (শরীর হইতে গমন) এবং আগতির (আগমন) কথা আছে। অনন্তের উৎক্রান্তি ও আগতি অসম্ভব। জীবের পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন এবং দেহের সমান, ইহাও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং জীব অণুপরিমাণ। শ্রুতিতে যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। মুণ্ডকে (৩।১।৯) আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে জীবকে "বালাগ্র-শত ভাগের শত ভাগ" (৫।৯) বলা হইয়াছে। এক বিন্দু চন্দন দেহের এক ভাগে লিপ্ত হইলে যেমন সকল দেহে তৃপ্তির অনুভব হয়, তেমনি অণু-পরিমাণ আত্মার অস্তিত্ব সকল দেহে অনুভূত হয়। আত্মার অবস্থিতি হৃদয়ে। আত্মার অংশ নাই বটে, কিন্তু তাহার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়, যেমন আলোক প্রসারিত হইয়া সকল গৃহ আলোকিত করে। আত্মা সকল দেহে ব্যাপ্ত না হইলেও তাহার গুণ চৈতন্যের সকল দেহে থাকিবার বাধা নাই। যেমন পুষ্পের গন্ধ যেখানে পুষ্প নাই, সেখানেও থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে হৃদয়ে আশ্রিত অণু-পরিমাণ আত্মা লোম এবং নখ পর্য্যন্ত সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। আত্মা এবং চৈতন্য যে পৃথক, তাহা কৌষীতকি উপনিষদের "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (৩।৬) এই উক্তি হইতে (জীবাত্মা প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরোহণ করে) বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (শঙ্করের মতে) জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের মতই অনন্ত। আত্মা সংসারী হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ তাহার সার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা বুদ্ধির গুণ। বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে আছে বালাগ্র শতভাগের শত ভাগ জীব মোক্ষে অনন্ত হইয়া যায়। প্রকৃত-পক্ষে অণু-পরিমাণ হইল জীব মোক্ষে অনন্তত্ব পাইতে পারিত না। বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাই অণু-পরিমাণ। প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকেও "ব্রীহে র্বা, যবাৎ বা অনীয়ান্ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) বলা হইয়াছে। ইহা উপাসনার জন্য।

৩০ হইতে ৪২ সূত্রে জীবের কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুদ্ধি-রূপ উপাধি যোগে ব্রহ্ম জীবে পরিণত হন। যতদিন জীবত্ব থাকে, ততদিন এই সংযোগ থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন জীব আর থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়। (২।৩।৩০) সুষুপ্তির সময়ও বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু বালকের পুংস্বভাবের ন্যায় তাহা অনভিব্যক্ত থাকে। বুদ্ধির অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-যোগে হয় সর্ব্বদাই বিষয়ের উপলব্ধি হইত, অথবা কখনও হইত না। বুদ্ধি আছে, এবং কখনও তাহা বিষয়ে সংযুক্ত হয়, কখনও বা হয় না। তাই কখনও উপলব্ধি কখনো অনুপলব্ধি হয়। অন্তঃকরণই বুদ্ধি বা মন। যখন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম মন। যখন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। জীবই কর্তা। শরীরের মধ্যে আত্মা যথেচ্ছ বিচরণ করে (বৃ, আর, ২।১।১৮) জীব ইন্দ্রিয়দিগকে উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ করে (বৃঃ আ ২।১ ১৮) তৈত্তিরীয়ে (২।৫।১) আছে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে)" বিজ্ঞান (জীব) যজ্ঞ করে, "বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে" বিজ্ঞান দ্বারা যজ্ঞ করে, ইহা নাই। জীব কর্তা হইলেও সকল সময়ে নিজের হিতকর কর্ম্ম করে না। ইহার কারণ এমন কোনও নিয়ম নাই যে জীবকে হিতকর কর্ম্ম করিতেই হইবে। প্রতিকূল অবস্থায় জীব অহিতকর কর্ম্ম করে। জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্তা হইলেও যেমন তাহার দুঃখের জ্ঞানও হয় সেইরূপ। জীব কর্তা না হইয়া বুদ্ধি যদি কর্তা হইত, তাহা হইলে শক্তি-বিপর্য্যয় হইত অর্থাৎ বুদ্ধির করণ শক্তি থাকিত না। বুদ্ধি তাহা হইলে ভোক্তা হইত। জীব যদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে সমাধি হইতে পারিত না। "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন", এই প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অবলম্বন। তাহার

এই প্রত্যয় হইতে পারে না। তক্ষা বা সূত্রধরের মত জীব কখনও কাজ করে, কখনও করে না। জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে। উপাধি-জাত। স্বাভাবিক হইলে এই কর্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত। কৌষীতকিতে (৩।৮) আছে ইনি যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম, এবং যাহাকে নীচে নামাইতে চাহেন তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম করান। ঈশ্বর জীবের "কৃতম্ প্রযত্নের" (সমুদয় চেষ্টা) অপেক্ষা করেন। অর্থাৎ তাহার অর্জিত ধর্মাধর্মের অনুরূপ কর্ম তাহাদ্বারা করান। শাস্ত্রে কতকগুলি কর্ম বিহিত এবং কতকগুলি প্রতিবিদ্ধ আছে। এই বিধান যাহাতে অর্থহীন না হয়, সেজন্য এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

৪৩ সূত্র হইতে ৪৭ সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপনিষদে কোথাও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কোথাও বলা হইয়াছে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। বেদের মন্ত্র ভাগ হইতেও জানা যায় যে জীব ব্রহ্মের অংশ (পুরুষসূক্ত)। গীতাতেও জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সূর্য্যের আলোকে অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যালোক বক্র বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ সেই বক্রতা যেমন আলোককে স্পর্শ করে না, তেমনি জীবের দুঃখ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না।

৪৯ সূত্র হইতে ৫৩ সূত্রে (পাদশেষ) জীবাত্মার কর্মফল ভোগের কথা আছে। এক জীবাত্মার একাধিক দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া একজনের কর্মফল অপরকে ভোগ করিতে হয় না। এক জলাশয়ে সূর্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলাশয়ের প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেই রূপ এক জীবাত্মা নিজ কর্মফল ভোগ করিলে অপর জীবাত্মা তাহা ভোগ করে না। কিন্তু সাংখ্য-মতে যখন জীবাত্মা বহু এবং তাহাদের প্রত্যেকেই সর্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মাই সমভাবে সংবদ্ধ। সুতরাং এক দেহের অর্জিত পাপপুণ্য সকল আত্মাই ভোগ করিবে না কেন, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আত্মার সংকল্প বিভিন্ন বলা যায় না। কারণ সকল আত্মাই যখন সর্বব্যাপী, তখন সকল সংকল্পই প্রত্যেক আত্মার। আত্মা যখন সর্বব্যাপী তখন প্রত্যেক দেহ কর্তৃক আত্মার যে প্রদেশ অবচ্ছিন্ন, তদনুসারে বিভিন্ন জীবের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ সকল প্রদেশেই সকল আত্মার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্যের ব্যাখ্যা আছে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে উপনিষদে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথাও ইহাদিগের উৎপত্তির কথা আছে, আবার কোথাও বা সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি লোকের ন্যায় প্রাণদিগেরও উৎপত্তি হইয়াছিল (ব্র-সূ তথাপ্রাণাঃ ২।৪।১) অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্টির পরে বাক্এর (বাক্যের) সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাণ সাতটি। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলা হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ও প্রাণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কামেন্দ্রিয় ও মনকে ধরিয়া প্রাণের সংখ্যা এগারো। প্রাণগুলি অণু-পরিমাণ, মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ বাহির হয়, কেহ দেখিতে পায় না। প্রাণ (মুখ্য প্রাণ) প্রথমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া প্রাণ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরে জন্মে। প্রাণ বায়ু নহে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও নহে। (প্রাণের) বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পৃথক ভাবে উপদেশ আছে। চক্ষুরাদি যেমন জীবের অধীন এবং ভোগ-সম্পাদক, প্রাণও তেমনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আলোচনা উপনিষদে আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়দিগকে ধারণ করে। জীবের স্থিতি ও উৎপত্তি প্রাণের কাজ। চক্ষু-কর্ণাদির ন্যায় প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না; কিন্তু তাই বলিয়া নিষ্ক্রিয় নহে। মনের ন্যায় (দর্শন শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদন মনের বৃত্তি) প্রাণেরও পাঁচ বৃত্তি—নিশ্বাস গ্রহণ (প্রাণ), নিশ্বাস ত্যাগ (অপান), প্রশ্বাস বন্ধ রাখিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্য করা (ব্যান), ঊর্দ্ধগমন (উদান) ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক (সমান)। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভু নহে) ও সূক্ষ্ম। শ্রুতি বলেন জ্যোতিঃ (অগ্নি) আদি দেবতাগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নিজ কার্য্য করে। যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তথাপি জীবের সহিতই প্রাণের সম্বন্ধ; দেবতাদের সহিত নহে। কেননা পাপপুণ্যের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য, জীবকেই পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়—দেবতাদিগকে নহে। মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয়; প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়দিগের ভেদ উক্ত হইয়াছে। মুখ্যপ্রাণের সহিত অন্যান্য প্রাণের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ ও রূপকরণ, যিনি ত্রিবৃৎ করিয়াছেন, তাহারই কৃত। উপনিষদে আছে, যে পরমাত্মা অগ্নি, বায়ু ও জল এই তিনটি পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া নানা বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিবিৎ করণ। বেদে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ মাংসাদি ভূমি হইতে, রক্ত জল হইতে এবং অস্থি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে যেমন, তেমনি জল ও অগ্নির মধ্যেও পৃথিবী, জল ও অগ্নি, তিনটিই আছে। পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবী অংশ বেশী, জলের মধ্যে জলের অংশ বেশী এবং অগ্নির মধ্যে অগ্নির অংশ বেশী।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩) প্রবাহণ শ্বেতকেতু সংবাদে এই বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবাহণ বলিয়াছিলেন অগ্নি-হোত্রাদি কর্মে শ্রদ্ধার সহিত যে জল ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বর্গরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া দিব্যদেহে পরিণত হয়, মানুষ মৃত্যুর পরে সেই দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গবাস শেষ হইলে সেই দেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টি পৃথিবীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া অন্নে পরিণত হয়। অন্ন পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র রমণীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া গর্ভে পরিণত হয়। এইরূপে

পঞ্চম আহুতি পুরুষরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ ও তেজ আছে। এই সূক্ষ্মভূত প্রাণের আশ্রয়। প্রাণের সহিত তাহারা পরলোকে গমন করে। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সহিত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সহ ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান সূক্ষ্মভূতও পরলোক গমন করে। শ্রুতিতে আছে যাহারা গ্রামে থাকিয়া যজ্ঞ, পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা ও দান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমের সহিত গমন করে, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রালোকে গমন করিয়া উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে উপভোগের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অনুশয়ের (কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্মের) সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, অবতরণের সময় তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যবিধ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অবতরণের সময় জীবে সংশ্লিষ্ট থাকে। শুভ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি এবং অশুভ কর্ম্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনিপ্রাপ্তি ঘটে। "রমণীয়-চরণাঃ রমণীয়াং যোনিং, কপূয় চরণাঃ কপূয়াং যোনিং আপদ্যন্তে" এখানে চরণ শব্দের অর্থ শীল বা আচরণ নহে, কর্ম্ম (বৈদিক কর্ম্ম)। শীলের মূল্য এই যে যাহাদের শীল উৎকৃষ্ট, তাহারাই কর্ম্মে অধিকারী, এবং যাহাদের শীল যত উৎকৃষ্ট, তাহাদের কর্ম্মের ফলও তত উৎকৃষ্ট হয়। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহারা চন্দ্রালোকে গমন করে না। বেদে সংযমনের (যমলোকে যাতনার) উল্লেখ আছে। স্মৃতিতেও পাপীর নরক গমনের উল্লেখ আছে। যাহাদের চন্দ্রলোকে গমনের অধিকার হইয়াছে, তাহারাই তথায় গমন করে। যাহারা দেবযানে ব্রহ্মলোকে এবং পিতৃযানে পিতৃলোকে যায় না, তাহারা বার বার জন্মে ও মরে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। শস্যাবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাগুলির পরিবর্ত্তন শীঘ্র শীঘ্র হয়। কিন্তু শস্যভাব হইতে জীবের শুক্রে পরিণত হওয়া সহজ নহে। অন্য জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে শস্য হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণকারী জীব কিছু কালের জন্য সেই শস্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র। তখন কোনও ভোগ হয় না।

পাদশেষে উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ বলিয়া শস্যত্ব প্রাপ্তি তাহার ফল নহে। বৈদিক কর্ম্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম অধর্ম্ম, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। বেদে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না বলিয়াও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধের বিধি দিয়াছেন। ইহা বিশেষ নিয়ম। শাস্ত্রে যেখানে পশু-বধের বিধান আছে, সেখানে পশু বধ দোষের নহে। যে পশুকে বধ করা যায়, সে স্বর্গে গমন করে। ইহা চিকিৎসককর্ত্তৃক রোগীর অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় উৎকৃষ্ট কর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ অথবা সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয়ই, এই বিষয়ে আলোচনা আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ইহাই মীমাংসা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বীজিঘৎস, অপিপাস, আবার তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সকল কল্যাণ গুণের আধার, ইহাই বেদান্তের মীমাংসা।

সেখানে রথ নাই, রথযোগ নাই, রথের পথ নাই, অথচ রথ রথযোগ ও পথের সৃষ্টি স্বপ্নে হয় দেখিয়া মনে হইতে পারে ঈশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহারা জাগ্রৎ কালে দৃষ্ট বস্তুর মতই সত্য। কিন্তু তাহারা মায়ামাত্র—সত্য নহে। সত্যবস্তুতে দেশ, কাল, নিমিত্ত এবং বাধার অভাব, এই সকল ধর্ম্ম থাকে। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে এইসকল থাকে না। স্বপ্নে রথ চলিতে দেখা যায়; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার কক্ষে রথের স্থান ও পথ নাই। স্বপ্ন দ্রষ্টা নানা বস্তু দেখে আর তাহার চক্ষু মুদিত থাকে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, নিদ্রাভঙ্গে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্বপ্ন মায়ামাত্র। কিন্তু বেদে আছে এবং স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যতের শুভাশুভের সূচক। জীব ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান তাহার থাকা উচিত, এবং জীব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ, ইহা বলা যায় না, কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান তিরোহিত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাহার বন্ধ ও মোক্ষ হয়। দেহের সহিত জীবের যোগবশতঃ এবং দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে বলিয়া তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়। সুষুপ্তি কালে জীব নাড়ীতে অথবা পুরীততে (হৃদয়বেষ্টন চর্ম্মের মধ্যে) অথবা হৃদয়াকাশে অথবা ব্রহ্মে থাকে, ইহা উপনিষদে আছে। জীব হৃৎ-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, সেই জন্য তখন স্বপ্ন দর্শন হয় না। যখন সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়। একথা বেদে আছে। তাহার অনুস্মৃতি ও কর্ম্ম দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে অসমাপ্ত কর্ম্ম সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া জীবে করে। ইহা দ্বারা অসমাপ্ত কর্ম্ম সেই যে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা প্রতীত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বে দৃষ্ট বস্তু সুষুপ্তির পরে স্মরণ পথে আসে। এই অনুস্মৃতিও এক প্রমাণ। শাস্ত্রে আছে জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। সুষুপ্তির পরে যদি সুষুপ্তি-পূর্ব্ব জীবের আবির্ভাব না হইত, তবে এই শাস্ত্রবচন ব্যর্থ হইত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু অবস্থা হইতে মূর্চ্ছা ভিন্ন। ইন্দ্রিয় সকল মূর্চ্ছাবস্থায় আংশিক ভাবে বিলীন হয়।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং অবিশেষ - উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু উপাধিযোগেও ব্রহ্মের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। নির্বিশেষতাই ব্রহ্মের রূপ, উপাধিযোগে তাহাকে সবিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা। যে সকল বাক্যে তাহাকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা প্রণালী প্রদর্শন করা। সূর্য্যালোক সমগ্র আকাশ ব্যাপী হইলেও, যখন অঙ্গুলি বক্র হয়, তখন সেই আলোক বক্র বলিয়া প্রতীত হয়। সেই রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিযোগে সেই সেইরূপ আকারযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র—চৈতন্যমাত্র। স্মৃতিও তাহাই বলেন। বিভিন্ন জলাশয়ে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধিযোগে ভিন্ন প্রতীত হন। অবশ্য জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মের তুলনা সর্ব্বাংশে সংগত হয় না, কেননা

জল মূর্ত্ত, আর জীবাত্মা অমূর্ত্ত। কিন্তু জলের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলগত প্রতিবিম্বের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, জল কম্পিত হইলে বিম্ব কম্পিত হয়, বাস্তবিক সূর্য্যের বৃদ্ধি হ্রাস বা কম্পন হয় না ; জলের ধর্ম্ম সূর্য্যে আরোপিত হয় ; সেইরূপ উপাধির ধর্ম্ম ব্রহ্মে আরোপিত হওয়ায় ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই সাদৃশ্য আছে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম দেহাদি উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব জলমধ্যগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সহিত তুলনা হইতে পারে। শ্রুতিতে ইহাও আছে যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিৰ্বিশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় লিঙ্গযুত হইতে পারেন না।

উপনিষদে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, স্থির ও গতিমান্, স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ রূপের কথা বলিলেও "নেতি নেতি" বলিয়া তাহার প্রতিষেধও করিয়াছেন। "নেতি" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের দুই রূপ সত্য নহে। ব্রহ্মকে শ্রুতি অব্যক্ত বলিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন সংরাধনে (ধ্যানের সময়) ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোকের কোনও রূপ না থাকিলেও যেমন আলোক আলোকে স্থিত রূপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উপাসনার সময় ব্রহ্ম রূপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হন। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই বলিয়া মোক্ষে জীব অনন্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় ইহা উপনিষদে আছে। এইজন্য একই সর্প যেমন কখনও কুণ্ডলাকারে দৃষ্ট হয়, কখনও ঋজু আকারে দৃষ্ট হয়—সেইরূপ ব্রহ্মও কখন জগৎরূপ, কখনও জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা বলা যায়। অথবা সূর্য্যের প্রকাশ এবং সূর্য্য উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। অথবা রূপহীন আলোক যে বস্তুর উপর পড়ে, আলোকও সেই বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে সবিশেষ রূপে প্রতীত হন। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই—এইরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। কিন্তু ব্রহ্মকে সেতু (যে আত্মা স সেতুঃ বিধৃতিঃ), বলা হইয়াছে। তাহার উন্মানের (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ) সম্বন্ধ ও ভেদের কথা আছে। ইহা হইতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে ; যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তর এই যে এ সকল দৃষ্টান্ত সাদৃশ্যবাচক। ব্রহ্ম জগৎ ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তিনি সেতু বিধৃতিঃ। সেতুর অপর পার আছে বলিয়া ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু আছে, ইহা নহে। ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ, ষোড়শকলাযুক্ত বলা হইয়াছে উপাসনার সুবিধার জন্য, বাস্তবিক তাহার পাদ বা কলা নাই। যে উপাধিতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পরিমিত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, সুষুপ্তি কা'লে জীব "স্বম্ অপীত ভবতি" অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে ব্রহ্ম ও জীব যে অভিন্ন তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রুতিতে পষ্ট বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা এবং তিনি সর্ব্বগত প্রভৃতি ব্যাপিত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাহার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।

ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রুতিতে আছে। "তিনি অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃ. আ. ৬।৪।২০)

জৈমিনি বলেন বটে, যে ধর্ম্মই (কর্ম্মবিশেষ) কর্ম্মফলের দাতা ; কিন্তু বাদরায়ণের মতে কর্ম্ম নিজ হইতে ফল দান করে না, ঈশ্বরই ফলদান করেন। "যাহাকে তিনি উর্দ্ধলোকে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহা দ্বারা তিনি সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে নামাইতে চাহেন তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান" এই সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দান জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। ঈশ্বরই তাহা দান করেন।

ভুলি নাই তোমা ভগবান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলি নাই তোমা ভগবান্!—
জানি তোমা বিনা অর্থবিহান
অর্থবিত্ত যশমান!
তব সৃষ্টির লীলা-আনন্দ
ফোটায় আমার ছন্দোস্পন্দ,
চির সুষমার উৎস তুমি হে,
ভুলিতে কি তোমা পারে প্রাণ!

ভুলি নাই প্রভু, ভুলি নাই,—
দুখ-দারিদ্র্য ব্যথা-লাঞ্ছনা
করিয়াছি চিরসাথী তাই।
ভালবেসে যত করিছ মোচন
একে একে মোর সব বন্ধন—
পিঞ্জর-ভাঙা পাখার মতন
তত মন খুলে গান গাই!
ভুলি নাই তোমা দয়াময়,
ধুলো খেলা নিয়ে থাকে শিশু তবু
পিতারে কি তার ভুলিয়া রয়
ঐ মতো করি, সংসার খেলা
যদিও কাটিছে মোর সারাবেলা,
তবু তার ফাঁকে সারা প্রাণ মোর
গাহিছে কেবল তব জয়!

পুরস্কার

শ্রীপ্রভা দত্ত

অসহ্য বেদনায় আমার অন্তর জলছে অহোরাত্র। সংসারের কঠিন বেড়াজালে পড়ে আমার অন্তরের উজাড় করা ভালবাসা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'রূপ আর টাকা' —এই নিয়েই সংসার চলছে। মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথরে যাচাই করে এ দুটো জিনিস।

সুনন্দাদি, তুমি ত জান এ দুটোর কোনটাই আমার ছিল না। এক সাধারণ গরীব মোক্তারের মেয়ে আমি, পাড়ায় ছিল তোমাদের টিচার্স বোর্ডিং, ছোট্ট বেলায় তোমার সঙ্গে আলাপের পর আরম্ভ হয় আমার লেখাপড়া ও গানবাজনা শেখা। স্কুলের খরচ বহনের অবস্থা ছিল না বাবার, তা জেনেও, তুমি তখন ইচ্ছে করে এগিয়ে এসেছিলে—আমার জীবনের গ্লানিমা আর সমস্ত ব্যর্থতা তোমার স্নেহ করস্পর্শে মুছে দিতে। বলেছিলে—মানুষের ঐকান্তিক সাধনা কখনও ব্যর্থ হয়না। তোমার সাহচর্যে এসে আমার সাধনা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু তোমার দেখে পর্য্যন্ত, তোমার মত শিক্ষয়িত্রী-জীবন-যাপনের যে আশা আমি গোপন বলে মনে পোষণ করতাম তা পূর্ণ হয়নি।

হঠাৎ একদিন ভোরে ওঠে শুনলাম বড়-বৌদির মুখে—বাবার নাকি কে একজন ধনী বড় মক্কেল এসেছেন, তাই বাড়ীর সবাই ব্যস্ত। বড়-বৌদিই বাড়ীর কর্ত্রী, মা আমার জন্মের পরই মারা যান। কাজেই মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানিনা। বাড়ীতে ছিলেন বুড়ো বাবা—তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আর দাদা বৌদিরা নিজেদের ছেলে মেয়ে ও সংসার নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ীতে আমার কথা চিন্তা করার কারো অবসর নেই।

দিন কেটে যায়। আমার এই অসহায় মনটা পড়ে থাকত তোমার কাছে। তখন তুমিই ছিলে আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা।

বাড়ীতে বসে বসে সেদিন একমনে একখানা ভজন গাইছিলাম, ঘরের জানালার পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, শুনতে পেলাম—বাবাকে, কে যেন বলছেন—"করুণাবাবু, আপনার বাড়ীতে কে গান গাইছে বলুনত? ভারী মিষ্টি গলা!" বাবা তার উত্তর দিয়ে আমাকে ডাকলেন। বেরিয়ে দেখলাম—এক সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন—"কি নাম মা তোমার?" নাম বললাম এবং তাঁকে প্রণাম করলাম। তার ফল যে এমন দাঁড়াবে আগে তা বুঝতেও পারিনি!

দিনকয়েক পরে বাড়ীতে শুনতে পেলাম—বাবার সেই ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোক মক্কেলটী নাকি আমার গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।—কোন দাবী-দাওয়া নেই—অথচ এক ধনী ঘরে বিয়ে হচ্ছে। এটা একটা সাধারণ মোক্তারের মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার বই কি! এত দিনে যেন সবার আমার দিকে নজর পড়ল। বড়দা একদিন রাত্রে বললেন—'যাই বল তোমরা—যমুনার গায়ের রং উজ্জল শ্যামবর্ণ হলেও, চেহারায় লক্ষীশ্রী আছে—ইত্যাদি। যাই হউক খবরটা তোমার কাছেও গোপন না করে বলেই ফেললাম। তার উত্তরে তুমি বলেছিলে—ভগবান তোমায় সুখী করুন।"

তারপর?

তারপরে এলো আমার বিবাহের দিন। উৎসবের রাত—হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কেটে গেল। আমি আমার স্বামীকে দেখলাম প্রথম—ফুল শয্যা রাতে। উৎসবের কোলাহল থেমে গেছে। গভীর রাত—চারিদিক নিস্তব্ধ। দেখলাম স্বামী আমার আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করছেন। ভরসা করে চেয়ে দেখলাম—সুন্দর, সুঠাম চেহারা। ঠোঁটের কোনে হাসির ছাপ লেগে আছে। কি তার মিষ্টি চেহারা! —অজানা আশায় বুক আমার দুরু দুরু কাঁপছে। চিরন্তন

অধিকারের দাবী নিয়ে স্বামী আমার কাছে এসে দাঁড়াল—দু হাতে টেনে নিলো বুকের পরে, তার পর—নিবিড় অনুরাগভরে কম্পিত ওষ্ঠে এঁকে দিল প্রথম চুম্বন রেখা। কেটে গেল কয়েকটা নীরব অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! আমি আমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা উজাড় করে অর্পণ করে দিলাম হৃদয় দেবতার পদমূলে।

কোথা দিয়ে তারপর কেটে গেল তিনটী বছর—এক স্বপ্নময় অনুভূতির মধ্য দিয়ে বুঝতেও পারিনি। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যেতাম আমার প্রিয়তমকে। সে শুধু আমার স্বামী তো নয়—'সর্বস্ব'। এই পৃথিবীতে এত সুখ—এত তৃপ্তি থাকতে পারে জানা ছিল না। এই স্বপ্ন রাজ্যে এসে ভুলে গেলাম আমার অতীতকে। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, এত সুখ সইবে কেন?—সহসা একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল—শ্বশুর মারা গেলেন। আর শাশুড়ী ধরলেন রণচণ্ডী মূর্ত্তি। তিনি যে আমাকে পছন্দ করেন না তা জানা ছিল না।

সংসারে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। রূপহীন বলে শাশুড়ীর কাছে পেতে আরম্ভ করলাম বাক্যযন্ত্রণা। আর ধীরে ধীরে স্বামীও যেন আমার কাছ থেকে সরে যেতে আরম্ভ করেছে মনে হ'তে লাগল। শাশুড়ীর কথা হ'ল—পটের বিবি হয়েতো আর সংসার চলে না। কর্ত্তা দেখে এমন বৌ নিয়ে এলো—যে সংসারের না হ'ল কোন বাড়বাড়ন্ত, না হ'লো কিছু! এই রকম অনাদরে অপমানে আর বাক্যযন্ত্রণায় আমার কেটে গেল আরও তিনটী বছর। ক্রমশঃ দিনান্তে স্বামীর দর্শন পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল। কিন্তু কেন এ পরিবর্ত্তন? কিছুই বুঝতে পারিনা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কেটে যায়, আর নীরব লাঞ্ছনায় ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। কচিৎ দেখা হয়ে গেলে জমিদারীর কাজের অজুহাতে সে বেরিয়ে যায়। বুঝতে পারি—তার মনেও শাশুড়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার এ ব্যথা কে বুঝবে বল! কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম—এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি?

সুনন্দাদি, দয়া মায়া সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে শাশুড়ীর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছে। যাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তার প্রতিদান বৈ কী? এত বিষয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী চাইনা! আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী এক জমিদারের একমাত্র মেয়েকে বৌ করে আনার সাধ শাশুড়ীর অনেক দিনের ছিল—শুধু শ্বশুর বাধা ছিলেন, আজ সে বাধা সরে গেছে। এবার নতুন বৌ হয়ে সে আসছে—রূপের সঙ্গে রূপোও আনছে। যারা এতদিন আমাদের বিয়ের পর হিংসার চোখে দেখে এসেছে, এখন তারাই আমাকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। এ আমার অদৃষ্টের লিখন! এ নীরব লাঞ্ছনা সহ্য করে যাচ্ছিলাম যার মুখ চেয়ে, দেখলাম তার কোন বিবেকের বালাই নেই। তুমিই বল। সুনন্দাদি, কেউ যদি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে সহজে কি তার ঘুম ভাঙ্গান যায়? এ বাড়ীর প্রতি লোকের মধ্যে সেই বিষ ছড়িয়ে গেছে। তাদের ঘুম ভাঙ্গান সহজসাধ্য নয়। নতুন বৌ নিয়ে যেদিন ফিরেও এল, আমি কি করলাম জান সুনন্দাদি। যে ঘর বেঁধেছিলাম তিল তিল যত্নে—সে ঘর নিজের হাতে ভেঙ্গে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এক অনির্দ্দিষ্ট পথে। ইচ্ছে করলে অনেক কিছু আনতে পারতাম সঙ্গে, পারিনি—বিশ্বাস কর—তা পারলাম না। বড় ঘৃণা হল।

তোমার স্নেহের ছায়ায় আমার আশ্রয় মিলবে। ভুলে যাওয়া অতীতকে আবার নতুন করে মনে করছি। বাবা গত হয়েছেন। দাদারা—যে যার কর্ম্মস্থলে। সমাজ সংসার ঠাঁই না দিলেও—তুমি দেবে আমায় আশ্রয়, এ আমি জানতাম।

তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তাই সেই গভীর রাতে একটুও লজ্জা হয়নি। তুমি আমায় বুকে টেনে নিলে, শুধু তাই নয়, চোখের কোণ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর বল্লে—"এ রকম হবে তুমি জানতে—অসম্ভব কি সম্ভব হয়?" জিজ্ঞেস করলাম—কেন সুনন্দাদি? উত্তর দিয়েছিলে 'বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, সব হয় সমানে, কাজেই এখানে মিশতে পারেনা।'

বললাম সুনন্দাদি—একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দাও, না হলে খাব কি? তুমি বলেছিলে কোথাও টিচারী করতে গেলে চাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ। কাজেই ওরাস্তা আমার বন্ধ। এক রাস্তা আমার খোলা আছে—সেলাই ফোঁড়াই করে দিন গুজরান করা। তুমি আনবে অর্ডার—আর আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কঠোর পরিশ্রম করে

গ্রাসাচ্ছাদনের খোরাক জোগাড় করব। শেষ পর্য্যন্ত তাই আরম্ভ হ'ল। উদারান্নের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম। তুমি কত বকেছ, কত বলেছ—এ ভাবে শরীর ভেঙে যাবে। কিন্তু সুনন্দাদি এ ভাবে বেঁচে থাকারই বা সার্থকতা কি! যার জীবন ছেয়ে গেছে নিরাশায়—সেকি এই অভিশপ্ত জীবনের ভার বইতে চায়? চায় না। চায় কি জান! তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে।

একদিন তুমিই আমার শীর্ণ, শ্রীহীন চেহারা দেখে জোর করে ডাক্তার দেখালে। চেষ্টা তোমাদের ব্যর্থ করে-দিয়ে জ্বর এক ভাবেই বেড়ে যেতে লাগলো। তুমি নিয়ে এলে কলকাতায়, তারপর ভর্ত্তি করে দিয়ে গেলে—হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডে। জলের মত অর্থব্যয় করেছ আমার জন্যে; কিন্তু সুনন্দাদি—কি পেলে আমার কাছ থেকে তুমি?

এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন আমি অনেক দূরে চলে যাব। আমার হয়ে ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা জানিও—যেন পরজন্মে নারী জীবন আমার এমনি করে ব্যর্থ না হয়ে যায়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে, এই আমার জীবনের শেষ বর্ষা। আজ কয়দিন ধরে চেষ্টা করে তোমার প্রশ্নের জবাব, সাধ্যমত লিখতে পেরেছি বলে মনে হয়। এখনি নার্শ দেখতে পেলে রাগারাগি করবে। তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে। আর তোমার সুনন্দাদি, শনিবার হলেই ট্রেণধরার তাগিদ থাকবে না। যে কটা দিন তোমার স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলাম—আমার জীবন মধুময় হয়ে উঠেছিল। কর্ম্মময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তে আমার কথা তোমার মনে উঁকি দেবে কি? এবার বিদায়। আজ যাবার দিনে আর একজনকে মনে পড়ছে। যে আমার জীবনে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল—চিরন্তনের দাবী নিয়ে। যে তোমার যমুনাকে দিয়েছে চরম পুরস্কার।

মেয়েটি

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি। আকাশ-নীল শাড়ি। ট্রাম স্টপ। দেখা হয় প্রায়।
কখনো কখনো একট্রাম। চোখেচোখ।—বাঁকা চোখে চায়,
যখন দুষ্টামি বুদ্ধি কা'রো পিছনে লুকিয়ে প্রতীক্ষায়।
হয়ত জিতেও হার হয়। তবু সুখ।—আমাকেই চায়
দু'টি সন্ধ্যাতারা আহা আহা!—এখানে অনেক দামী দামী
রত্ন আর মন। তার মাঝে আমি শুধু, আমি শুধু—আমি॥

বিস্ময়। আকাশ। মাটি। ফুল। শরতে কাশের বনে ঢেউ।
এখানে দাঁড়িয়ে একা আমি। এ'কথা জানেনা আর কেউ।
কাকে বলি? আহা কাকে বলি। হে পৃথিবী শোনো
আছে বেলা।
যদিও আকাশে পথে ঘরে: সেই এক, এক সেই খেলা:
ফাগুন-সকাল: সোনা রোদ। শ্রবণ-আকাশ
ছলো ছলো।
তবু এ' দীঘির দিকে ভাখো: দু'টি পদ্মকুঁড়ি টলোমলো॥

ভ্রষ্ট লগ্ন

সুনীল বসু

আমার হৃদয় আর আলেয়ার আঁচলের টানে
মরে না যন্ত্রণা-দগ্ধ কামনার মরুভূমি মাঝে।
সহস্র বিস্মৃতি দিয়ে আবৃত এ অভিশপ্ত প্রাণে
আকাঙ্ক্ষারা ব্যতিব্যস্ত সংসারের তুচ্ছতম কাজে।
প্রেমের কস্তুরী বাস, স্বপ্নঘন বাসনা অপার,
মুগ্ধ প্রতীক্ষার দীপ নিভৃতির রাত্রিকক্ষ কোণ
অর্থহীন মনে হয়। ছায়াচ্ছন্ন নামে অন্ধকার
গ্লানির পুঞ্জীত পটে বেদনার তীব্র সম্মোহন।

আজ আর কিছু নেই। রিক্ত—শূন্য—তির্যক গতায়ু
সর্পিল স্বার্থের গর্ত্ত প্রতিটি মুহূর্ত্তে খুঁড়ে চলি।
হিংসার চোয়াল ছেঁড়ে নগ্ন শব। বিষাক্ত উদ্বায়ু
জীবনের চতুষ্কোণে সমাবৃত প্রৌঢ় নামাবলী।
শেষ যবনিকা টানি। লক্ষভ্রষ্ট প্রণয়ের পাপ,—
অশ্রুর সমুদ্রে ভেসে মোছে শুধু দেহের উত্তাপ॥

রিপোর্টারের ডায়েরী

চৈতন্য

—তিন—

রাজনীতিজ্ঞ হয়েও রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হওয়া সাংবাদিকদের শোভন হয় না। তবু দিবা-রাত্রি রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাংবাদিকদের কারবার চালাতে হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের একটা অদৃশ্য আত্মীয়তার বন্ধনও তাই থেকে গড়ে ওঠে। সে আত্মীয়তা কোথাও স্বার্থের খাতিরে, কোথাও হৃদয়-মাধুর্য্য অবলম্বন করে। সত্যানন্দদার পাল্লায় পড়ে দু'একবার লোহিয়ার আড্ডায় গেছি। আলাপে-ব্যবহারে তাঁর প্রতি কেমন একটা দুর্ব্বলতাও অনুভব করেছি। সে দুর্ব্বলতার অবশ্য কারণ—গান্ধীজির 'কুইট ইণ্ডিয়া'র উদাত্ত আহ্বান জয়প্রকাশ-লোহিয়াকে উন্মাদ করেছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। বিয়াল্লিশের সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় লোহিয়ার প্রতি দুর্ব্বলতা থাকা অকৃতজ্ঞ না হলে বোধকরি নিতান্তই স্বাভাবিক।

বয়সে তরুণ হয়েও কর্মক্ষেত্রে প্রবীণতা দেখিয়েছেন লোহিয়া। জন্ম তাঁর ১৯১০ সালে। মাত্র ১২ বছর বয়সে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৫ বছর বয়সে বোম্বাই থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন; বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে আই-এ পাশ করেন মদনমোহন মালব্যের কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯২৯ সালে ১৯ বছর বয়সে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে 'অনার্স' নিয়ে বি-এ পাশ করেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মৌলিক গবেষণা করে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় ইতিহাসে যারা ডক্টরেট পেয়ে আজকের দিনে আসর মাৎ করছেন, রামমনোহর তেমনি ফাটকাবাজির 'ডক্টরেট' পাননি। স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি স্বরূপই বার্লিনের ডক্টরেট পাওয়া যায়, অন্যথায় নয়। গান্ধীজি তাই রামমনোহরকে 'লার্ণেড ডক্টর' বলতেন। বার্লিনে পাঠরত অবস্থাতেই জেনেভাতে লীগ অফ্ নেশনস্'এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তিনি এক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। সেবার বিকানীরের মহারাজাকে ভারত সরকার ভারতের প্রতিনিধিরূপে লীগ অফ্ নেশনস্'এ পাঠান। ভারতবাসী বিকানীরের মহারাজাকে তাদের মুখপাত্র হবার অধিকার দেয়নি এবং দিতে পারেনা, লোহিয়া একথা মুক্তকণ্ঠে লীগ অফ্ নেশনস্‌কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গ্যালারী থেকে চীৎকার করে বক্তৃতা করেন, পুস্তিকা ছাপিয়ে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনও করেন। রামমনোহরের সে উদ্যম সার্থক না হলেও, সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাঁর সুপ্ত চৈতন্যের প্রথম প্রকাশে আশঙ্কিত হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে হের হিটলার জার্মানীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সে বছরই লোহিয়া দেশে ফিরে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই এক মিথ্যা অছিলায় তাঁকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। আই-সি-এস রুণু গুপ্ত তখন ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁরই আদালতে লোহিয়ার বিচার হয়। কৃতবিদ্য সরকারী আইনজ্ঞের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করেন লোহিয়া ও মুক্তি পান। মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে রুণু গুপ্ত লোহিয়ার আইনজ্ঞানের তারিফ করেছিলেন, সাধুবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর যৌক্তিকতাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের জন্য। শেষে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ব্যারিষ্টার হলেও লোহিয়া যশস্বী হতেন।

১৯৩৪ সালে পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির জন্ম হয়। লোহিয়ার বয়স তখন মাত্র ২৪। তাছাড়া বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন মাত্র বছর খানেক আগে। তবুও এরই মধ্যে তিনি সর্বভারতীয় নেতারূপে পরিচিতি লাভ করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ, মীনু মাসানী প্রভৃতির সঙ্গে লোহিয়াও

ছিলেন কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্ততম উদ্যোক্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরের গুরুভারও যুবা লোহিয়াই বহন করেন। জয়প্রকাশ-লোহিয়া ছিলেন ৪২'এর আন্দোলনের নায়ক। গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাণী তাঁর প্রাণে আগুন জ্বেলেছিল। জাঁদরেল বৃটিশ রাজভক্তদের তুড়ি মেরে কলকাতা ও বোম্বাইতে বেআইনী রেডিও ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সে বেতারে আন্দোলনের গতিপথ নির্দেশ করা হতো। সেই সঙ্গে প্রকাশ করলেন Do and die' পত্রিকা। আন্দোলনের এক পরম লগ্নে পুলিশ জয়প্রকাশকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে হাজারিবাগ জেলে রাখা হয়। বন্ধুদের সহায়তায় জয়প্রকাশ জেল কর্তৃপক্ষের রক্ত-চক্ষু ও শান্ত্রীদের শাণিত অস্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে একদিন গহন রাত্রে কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের হনুমান নগরে লোহিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দুজনে মিলে গড়ে তুললেন এক অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষায়তন। আন্দোলনের সৈনিকরা এখানে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন নেপাল সরকার জয়প্রকাশ, লোহিয়া ও আরো অনেককে গ্রেপ্তার করেন। ইংরেজ সরকারের অনুরোধে তাঁদের সবাইকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়। কদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন নিশুতি রাতে মৌনী হিমালয়ের প্রশান্ত পরি-বেশকে বিস্মিত করে বেজে ওঠল জেলখানার পাগলা ঘণ্টা। কারাশালার লৌহ কপাট খুলে গেল, পাষাণ গাঁথা পাথরের দেওয়াল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। মুক্তিযজ্ঞের অনন্ত যোদ্ধারা আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে জয়প্রকাশ গ্রেপ্তার হন। লোহিয়ার হাতে হাতকড়া পড়ল ৪৪'র জানুয়ারী মাসে বোম্বাই'এর এক বেতার কেন্দ্রে। লোহিয়া সম্পর্কে ইংরেজের আতঙ্কের সীমা ছিল না। লোহিয়াকে জেলখানায় রাখতে তারা ভরসা পাননি। হাতে হাতকড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে লাহোর ও আগ্রা ফোর্টের অন্ধকার কক্ষে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর নানা অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। দীর্ঘ ছ'মাসকালের মধ্যে তাঁকে একটি মুহূর্ত্তের জন্তও ঘুমুতে দেওয়া হয়নি। এসব সত্বেও ৪৬ সালের গোড়াতেই হাসিমুখে লোহিয়া জেলখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ক্যাবিনেট মিশনের আগমন প্রাক্কালে এই সময় প্রায় সব নেতৃবৃন্দকেই ইংরেজ মুক্তি দেয়।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের পাঁচতলা বাড়ীর তিন তলায় সোজা উঠে গেলাম। আস্তানাটির মালিক বালকৃষ্ণ গুপ্ত—ডাক্তার সাহেবের ছাত্রজীবনের বন্ধু, রাজনৈতিক জীবনের সহচর এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত জীবনের পরম হিতৈষী। নাতিবিস্তীর্ণ ঘরখানির অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে ডজন খানেক তাকিয়া বিধ্বস্ত গদী। বাঙ্গালীর ঘরে এমন গদী-তাকিয়ার সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। তবু ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙ্গালীর বিবাহ বাসরের সঙ্গে এই দৃশ্যের সাদৃশ্য অনেকখানি। বৃহদাকার তাকিয়া হেলান দিয়ে সভার মধ্যমণি ডাক্তার সাহেব বসে রয়েছেন। ঘরের দরজাতে উপস্থিত হতেই অভ্যর্থনা জানালেন। কাছে ডাক দিলেন। বল্লেন: আও আও, আরাম-সে বৈঠ্ যাও।

সত্যানন্দদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। নমস্কার বিনিময় হলো। ডাক্তার সাহেব সামনের এক বৃদ্ধা মহিলাকে বল্লেন: কিউ মাইজি, আভি তক্ খাড়া রয়া। রিপোর্টারকে লিয়ে কফি ভেজো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুপ্ত পরিবারের একজন 'লেবার মিনিষ্টার' ট্রে ভর্ত্তি আট-দশ কাপ কফি নিয়ে এলো। পাশে এক তাকিয়া জড়িয়ে লতার মতন লুটিয়ে ছিলেন গৃহকর্ত্তা। তাঁকে এক খোঁচা মেরে ডাক্তার বল্লেন: দেখো ভাই, কফি বোলা তো শ্রেফ কফি ভেজা। কফিকো সাথ সাথ কুচ্ কুড়মুড় তো চাইয়ে।

প্লেট ভর্ত্তি কুড়মুড় অর্থাৎ চানাচুর এলো, এলো সেই সাথে রকমারী বিস্কুট। সেকেণ্ডের কাঁটা তখনও পুরো এক পাক ঘোরেনি। আবার আদেশ হলো: আরে ভাই, সিগ্রেট ছোড়ো। নিজে না খেলেও বালকৃষ্ণজীর সিগরেটের প্যাকেট জনে জনের সামনে ধরলেন ডাক্তার।

কথায় কথায় আমার কর্ম ও গৃহজীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনলেন। বাংলা দেশের রাজনীতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হলো। বুঝলাম, যারা নিজের স্ত্রীকে 'মোবাইল জুয়েলারী সপ' করে কমিউনিজমের বুলি

ছড়ান, যাঁরা মনুমেণ্টের পাদদেশের সভায় সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অন্ধকারে পরিণত হন এবং কয়েক হাজার শ্রমিকের স্বার্থকে জবাই করে নিজের মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করেন, তাদের ডাক্তার সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে এরাই দেশের বড় শত্রু।

লোহিয়ার 'এ্যাসিড টাঙ্' কেউ কেউ পছন্দ করেন না, অনেকেই সহ্য করেন না। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই; দৃষ্টিভঙ্গীর দূরদর্শিতা সম্পর্কেও বহুজনের মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোহিয়ার অপবাদ আজ পর্যন্ত শুনিনি। তাঁর মা নেই বাবা নেই, ভাই-বোন নেই, নিজস্ব জমি-জমা ঘরবাড়ী নেই; সহায় থাকলেও সম্পদ বলে কিছু নেই। ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে জনপদে যেসব বালকৃষ্ণ গুপ্ত ছড়িয়ে রয়েছেন,তাঁরাই ডাক্তারের নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদন ও লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থা করেন।

নিদারুণ অসুখ ভোগের পর ডাক্তার একবার কলকাতা এলেন। শীতকাল। নিজের অসুস্থ শরীর উপেক্ষা করে আসবার পথে একজন কর্মীকে সব গরম জামাকাপড় দিয়ে এসেছিলেন। গুপ্ত পরিবার তাঁর জামা-কাপড় দিলেন, সেবা যত্নে শরীরটাকেও ঠিক করে দিলেন। যাবার দিন ঠিক বিদায় প্রাককালে বালকৃষ্ণ-জননী তাঁর 'অবাধ্য ও আদুরে' সন্তান ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন: বেটা, যখন যেখানেই থাক না কেন, ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া করবে। শরীরটাকে ঠিক রাখবে।

ডাক্তার কোনমতে বৃদ্ধার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি নিলেন। ঠিক পাশের দরজায় বালকৃষ্ণজীর সদ্য-বিবাহিতা কন্যা দাঁড়িয়েছিল। দুটি চোখ দিয়ে তার অবিশ্রান্ত ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বল্লো: বাবুজি, তুমি এই সোয়েটারটা পরবে। বাবুজি, তুম্ ঠিকসে খানা-পিনা করনা। মেয়েটির চোখের জল ডাক্তারকে বিচলিত করল। চোখের জল মুছিয়ে দিলেন, মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ডাক্তার আমাদের বল্লেন: আচ্ছা ভাই বল ত, এরা সব আমার মতন অপদার্থের জন্য কাঁদে কেন?

ভাবছিলাম কাঁদে কেন, তা তুমি বুঝবে কি! যারা ভালবাসার ফাঁদে পা বাড়িয়েছে, তারাই জানে এর কি যন্ত্রণা, কি অসহ্য বেদনা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ডাক্তারের বিচলিত ভাব কেটে গেল। ষ্টেশনে পৌছতেই সে সব তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করুক, লোহিয়া সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করেন। সংসার ও সাংসারিকদের প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই, কিন্তু নেই আসক্তি। আরো অনেক রাজনৈতিক নেতাকে দেখেছি, ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাঁদের প্রতি মাথা নত হয়। কিন্তু এমন বিবাগী বিশেষ কাউকে দেখিনি।

মনে হয়, লোহিয়ার স্বভাবের এই মাধুর্যই গান্ধীজি ও জওহরলালকে মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দিনগুলির অধিকাংশই লোহিয়া এলাহাবাদে নেহরু পরিবারের আনন্দ ভবনে কাটিয়েছেন। জওহর-লালজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুজনে বিপরীতধর্মী হয়েও সে সম্পর্ক তিক্ত হয়নি।

জওহরলাল তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করেছেন। তাঁর সে কাজে লোহিয়ার সমর্থন ছিল না। তবু জওহরলাল তাঁকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যুক্তি-তর্ক দিয়ে। পাঁচতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে নেহরুজী দিল্লীর 'জনতা' পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলেন। লোহিয়াকে পাকড়াও করে সোজা আর-কে-নেহরুর বাড়ী এনেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলেছিল যুক্তি-তর্ক আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনা ব্যর্থ হয়। লোহিয়া সরে দাঁড়িয়েছিলেন, নেহরুজীও 'ক্ষেত্র কর্ম বিধিয়তে, নীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর পর আর দুই বন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। গান্ধীজি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন দুজনের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তারপর আর হয়নি।

ইন্দিরার সঙ্গেও লোহিয়ার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লোহিয়ার জীবনের বহু স্মরণীয় দিনের সাক্ষী ইন্দিরা। 'আজ পিতার সঙ্গে লোহিয়ার মতবিরোধ থাকলেও, কন্যা ইন্দিরা সে প্রীতির সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করেন না। জওহরলালজী তখন স্বাধীন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী হয়েছেন। নেপালের রাণা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে লোহিয়া

া-দিল্লীর নেপালের দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন রলেন। নেপাল—ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে ।াহিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দিরা নেহরুজীর াইভেট সেক্রেটারী ও, এম, মথাইকে দিয়ে লোহি- র উদ্দেশ্যে জেলখানায় আম পাঠিয়েছিলেন। সারা ারতবর্ষের সংবাদপত্র দুনিয়ায় এই খবর ছাপা হয়েছিল। ার একবার মণিপুর সফরকালে লোহিয়া রকমারী পঢৌকন পান। ডাক্তার সে সব উপঢৌকন এক বন্ধু ারফত নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে পাঠিয়েছিলেন ন্দিরার উদ্দেশ্যে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজেও লোহিয়া গান্ধীজি ও ওহরলালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র ছিলেন। ভারত সর- ারের অতিথিরূপে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতে এসে নেহরুজীর সঙ্গে বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করেন। নেহরুজী চেয়েছিলেন গান্ধীজির সঙ্গেও চিয়াং-এর আলাপ আলোচনা হোক। গান্ধীজি তখন তাঁর ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে ছিলেন; চিয়াং'কে সেখানেই তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো চিয়াং'কে ওয়ার্দ্ধা যেতে দিতে নারাজ ছিলেন। গান্ধীজি লর্ড লিনলিথগোর মত পরিবর্তন করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বড়লাটের এক গুঁয়েমিতে গান্ধীজি বড় বিরক্ত হয়েছিলেন। নেহরুজী ভারত-চীনের ভবিষ্যত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য কায়মনবাক্যে চিয়াং-গান্ধীর একটা বৈঠক হোক চাইছিলেন! লোহিয়ার হাতে নেহরুজী এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দিয়ে তাঁকে ওয়ার্দ্ধায় পাঠাইলেন। লোহিয়ার দৌত্য সফল হয়। গান্ধীজি কলকাতা আসতে স্বীকৃত হলেন। গুরুসদয় দত্ত রোডের বিড়লা পার্কে গান্ধী-চিয়াং কাইশেকের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয়।

গান্ধীজির নীতিকে গ্রহণ না করলেও, লোহিয়া তাঁকে ভক্তি করতেন, ভালবাসতেন। ৪৬ সালের দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার অবস্থা লোহিয়ার প্রচেষ্টাতেই শান্ত হয় এবং গান্ধীজি তাঁর অনশন ত্যাগ করেন।

নাচে-গানে কাব্যে-সাহিত্যে ডাক্তারের অসীম অনুরাগ। বই পড়াতে কোন বাচ-বিচার নেই। কখনও হাতে দেখেছি উইল ডুরান্টের The Story of Philozophy, কখনও বার্ণাড শ'র Plays Plasant, কখনও বা জেমস জীনস্'এর The stars and their courses' বা রবীন্দ্রনাথের পোষ্ট অফিস (ডাকঘর)। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলির নিয়মিত পাঠক তিনি। নেশা বলতে, কফি খাওয়া আর জেলে যাওয়া। হিন্দি, উর্দ্দু, বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় উপর তাঁর অধিকার যথেষ্ট। জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণে গেছেন কয়েকবার। বিদেশেও তাঁর বহু বন্ধু আছেন। টিউনিসিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাবিব বুগাবা লোহিয়ার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বুগীবা লোহিয়ার ব্যক্তিগত অতিথিরূপেই কলকাতায় কদিন কাটান। পরে ডাঃ কাটজু দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল পেয়ে রাজভবনে নিয়ে যান। বার্মার উপ-প্রধান-মন্ত্রী উ বা সোয়েও যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তণ উপ-প্রধান-মন্ত্রী মিলো ওয়ান জিলাসও তাঁর বিশেষ বন্ধু।

লোহিয়া সহ্য করতে পারেন সবাইকে। পারেন না শুধু মৃদু ও প্রিয়ভাষিণীদের। এদের এড়িয়ে চলেছেন সারা জীবন। একবার অরুণা আসফ আলির সহোদরা পূর্ণিমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের উপক্রম হয়েছিল। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর প্রায় সমকক্ষ ও সমকালীন আইনজীবী প্যারীলাল ব্যানার্জীর পুত্রের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তারপর ইনি রামমনোহরকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। লোহিয়ার ঔদাসীন্যে তা সম্ভব হয়নি। পূর্ণিমা ব্যানার্জী উত্তর প্রদেশের একজন অন্যতম খ্যাতিমান মহিলা-কংগ্রেসী ছিলেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও সরোজিনী নাইডুর মতন যশস্বিনী না হলেও, ইনি স্বনামধন্যা ছিলেন। পূর্ণিমা ব্যানার্জী এম, এল, এ এবং এম, পি'ও হয়েছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি পরলোকগমন করেছেন।

আজকে লোহিয়ার অনুচরের সংখ্যা যত নগণ্যই হোক না কেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্ত যোদ্ধা বলে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় জলন্ত অক্ষরে লেখা রইবে। সেই বিগত দিনের চিরস্মরণীয় কাহিনীর অন্যতম নেতা-রূপেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং সাংবাদিক জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে এসে সে জন্যই আনন্দ পেয়েছি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড্ডা জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর আটচালায় জুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইঁহারা অনেকেই সূর্য্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী। শুধু ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সূর্য্যসুন্দর জড়িত হইয়া আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বুঝায় ইঁহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-মাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইঁহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম্ম বাংলাতেই ব্যক্ত করিব।

প্রবীণ সুবাতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশীয় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও নাই। লাগামের বদলে আছে রঙীণ পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধারণ সতরঞ্চি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি ছিটের কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে। সেই গদিতে বসিয়া সুবাতালী তহশিলদার সারাজীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, সুবাতালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্লথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতা এবং মাথায় পাতলা-কাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি দড়ির খাটে বসিয়া জমাইয়াছেন। সূর্য্যসুন্দরের বিষয়েই গল্প হইতেছে।

সুবাতালী বলিতেছেন, "আমাদের ডাক্তারবাবু মানুষ নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরণের চিঁড়িয়া যে ওঁর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশ মশাইকে মনে আছে রমেশ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খুব আছে। কেশ মশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে' দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে সুবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাইকে চাকরি দিয়া সুবাতালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর খাতিরে? কিন্তু সে কি চাকরি করত? আফিং খেত তিনবার করে'—সকালে, দুপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে'। তবু ডাক্তারবাবুর খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মন্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। ঘুমের ব্যাঘাত হ'ত"

একটা হাসির হল্লোড় পড়িয়া গেল।

"না, না, হাসির কথা নয়। কেউ খাদ্য-রসিক থাকে,

কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুম-রসিক"

চোখ বড় বড় করিয়া সুবাতালী বলিলেন, "লোকটা গুণী ছিল কিন্তু। আমার আস্‌গরের বিয়ের সময় নেচে গেয়ে বাজিয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্তেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তার-বাবু। আর একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল—এর প্রথম ভিৎ পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। দুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হল লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশ-মশাই—"

সুবাতালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তারাপদ পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন"

"সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর হাতখরচের মতো যাতে দু'চার টাকা হয়ে যায় তার জন্তেই ওই পাঠশালাটা বসিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু এক ইনেস্‌-পেক্‌টার সাহেবকে ধরে'। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসররা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উঠিতেন, ডাক-বাংলা তো ছিল না। একবার এক ইনেস্‌পেক্‌টার অতিথি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে' দেব। আজ আমি পাঠশালাটা দেখি একবার। তারপর আপনারা দরখাস্ত দিলেই হয়ে যাবে। ইনেস্‌পেক্‌টার নাম-মাত্র দেখলেন একবার গিয়ে, পাঠশালাটার সামনে মিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তারবাবু গ্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে' পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশ মশাই প্রথমে এতে রাজি হন নি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনি ভুল করলেন ডাক্তার-বাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে' যাচ্ছিল। এখন এই ইনেস্‌পেক্‌টার টিনেস্‌পেক্‌টার এসে রোজই একটা না একটা বখেড়া বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলো আঠারো ঘা। ওরা বাঘ'। ডাক্তার-বাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে' যান না। কি করবে আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। যদি করে তখন দেখা যাবে। ভাল করে' কাজ করলে এইটেই পরে আবার প্রাইমারি স্কুল হ'য়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তখন।' কেশমশাই কিছু বললেন না, চুপ করে' রইলেন।

সুবাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঁড়ি ছিল লোকটা"

কোঁড়ি মানে কুঁড়ে।

"তারপর কি হল?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হল মজার কাণ্ড একটি। সেই ইনেস্‌পেক্‌টরটি বদলি হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নূতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আসেন নি কখনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন তুমুল বর্ষা। ট্রেণ থেকে নেবেই বুঝতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না। আর তখন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্‌-পেক্‌টার কি করবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব হলে স্কুলের পণ্ডিতকে খবর দিতে। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিঙের নেশায় মশগুল হ'য়ে স্কুল ঘরেই। তিনিও বেরুতে পারেন নি ইস্কুল থেকে। খানিকক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিগ্যেস করতে করতে হাজির হ'ল এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলেন—"কে—"

"আমি ইনেস্‌পেক্‌টারের চাপরাশি—"

"এখানে কি চাই"

"আপনিই কি পণ্ডিতজী"

"হ্যাঁ, কেন"

"ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব এসেছেন, স্টেশনে বসে' আছেন"

"তা আমি কি করব"

"তিনি আপনার ইস্কুল দেখতে এসেছেন"

"কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করে নি।

অবাক হ'য়ে চলে' গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত্রে থাকবেন কোথা। ডাক-বাংলা নেই, স্টেশনে ওয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু ছিলেন তখন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে চলে' যান, সেখানে খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব ছপ ছপ করে' ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মজলিশ বসত। সাহেবগঞ্জ থেকে মন্মথবাবু যেদিন আসতেন সেদিন খুব জমত। অন্য রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি সুদ্ধ গান গাইতাম তখন। তবলা বাজাত কানা কার্তিক। তবলা বাজাতে তার কানা চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্‌পেক্‌টার আসতেই ডাক্তারবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবও গানের মজলিশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পৌঁছন নি। তিনি না আসাতে মজলিশটা জমেও যেন জমছিল না তেমন। তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেয়ালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমৎকার। ওঁর এই সব গুণের জন্যই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দলই ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি ফিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে—"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হ'য়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘ্যে।

বল্‌লেন, "আগে বঢ়ো না ভাই। পহলে গপ্‌ খতম্‌ করো—"

"হ্যাঁ। তারপর গান-বাজনা যখন জমে' উঠেছে, তখন কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, "বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্‌পেক্‌টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি—বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। অচেনা জায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়ে-ছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন'। ইনেস্‌-পেক্‌টার মৃদু মৃদু হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে' করজোড়ে বললেন, ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে ককৃখনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা আপনাকে বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজুরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে। এমনভাবে মুখ কাচুমাচু করে' বললেন কথাগুলো যে সবাই হেসে উঠিল।

ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিছু মনে করি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বসুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাবু তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন "ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন"। তারপর কেশমশাই নেচে গেয়ে আর বেয়ালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্‌পেক্‌টার তাঁর বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—

সুবাতালী বললেন, "বেশক্‌। আব্‌ উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিস্‌-পিট্টরও হোবে না।"

নবাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম, সীয়া রাম—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাখিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। প্রশ্ন করিয়াছিল, 'কোথায় রেখে দেব

'পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি

হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে' ফেলি—"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। খুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্যেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারিদিকে—"

কুমার অবশেষে টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তখন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীয়ারাম, সীয়ারাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন। চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড পাকানো গোঁফ এবং জুলফি, দুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চক্ষু দুইটি বেশ টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে স্থানীয় গোলাদার মহাজন ওঝাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওঝাজির চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাণ্ড টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা, গলায় পৈতা, বুক ও পিঠ-ভরা লোম, আজানুলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাগত চেঁচামেচি করিতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চীৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কন্‌ট্র্যাক্‌টারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওঝাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্য। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বৌয়ের সাধ-উপলক্ষে বধূকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওঝাজিকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওঝাজির মুনিমজি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওঝাজির রেলের পাশ আছে, ওঝাজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওঝাজি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন। টি-আই আসিলে মুনিমজিকে এখানেই থাকিতে হইবে। তখন তিনি অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে সুবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন—

নিখিলবাবুও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোট-খাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জ্জিত-রুচি। এখানেও কার্য্যত তিনি জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতা-বাসী। সবাই নিখিলবাবুকে খাতির করেন। সুবাতালী বয়োবৃদ্ধ বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। সুবাতালীও স্নেহ করেন তাঁহাকে। নিখিলবাবুর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোন ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্য্যন্ত সাজবে মহাদেব বারুই। দুনিয়ালাল মাংস রান্না করবে কুঠিতে। এ বাড়ীতে মাংস এলে চন্দ্রবাবু খুঁত খুঁত করবেন। মুষণকে বলে' দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাবু একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সমঝা। অংরেজি পড়তে পারি না"

নিখিলবাবু মৃদু হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন। বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার

নেই। আপনার বাথানে ক'টার সময় দুধ দোয়া হবে বলুন"

"ভোর তিন্ বাজে। দু'মণ দুধ এখানে আসবে আমি বলে' দিয়েছি"

"আমি রামটহলকে দুধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিষ্কার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে' দেবেন তারা যেন দুধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয়, কারণ ওদের কেঁড়েতে দুইলে এমন ধোঁয়া-গন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাভালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে।

আমার উপর আর কোনও ফরমায়েস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে' থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীয়ারাম সীয়ারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাৎ সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিজের গোঁফে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই? নিখিলবাবু তাঁহার দৃষ্টির ভাবার্থ বুঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না বল—"

"হুকুম করুন"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে, মশলাগুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। গোটা দশেক জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, তোমার পক্ষে দশটা লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সন্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে' দিও"

"হাঁ হাঁ—ই কোন্ বড়ি বাত্ হ্যয়"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল"

নিখিলবাবু তারপর ওস্তাজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওস্তাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। ঝাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো, জল-তোলা—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আপনার কাছে কটা আছে—"

"দশঠো—"

"আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই ভারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জোড় করিয়া ওস্তাজি বলিলেন, "লেঙ্গে—"

"আর রমেশ—"

নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—"

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আর নিরামিষ তিন্টে ব্যাচ্ তিনজায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামিষ তারা একঘরে, যারা মাছ আর নিরামিষ তারা একঘরে, আর যারা সব খাবে তারা আর এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা চোয়ারিতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ্ ছোকরা চাই—"

"ছ' ব্যাচ্ চাই। তিন ব্যাচ পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে"

রমেশবাবু একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা-মোটা, মুখখানিও গোল-গাল। নিখিলবাবুর কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবেন না?"

"পারব না বললে চলবে কেন, পারতেই হবে। আমি

ভাবছি ছোঁড়াগুলোর কথা জানেনই তো, আজকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পূবে যাবে পশ্চিমে যাবে, কিন্তু উত্তর দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি সুদো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—"

"আজ্ঞে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির আঁটিতে টক। সেদিন জ্ঞানচাঁদের ছেলে রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিঁড়িটি ফেলে দিলে অবশ্য, এ খাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাড়ি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপন্ এয়ারে শরীর ভাল থাকে। তখন আমাকে বলতে হল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুসিংয়ের নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই তো, তার নাক দিয়ে পাম্প্ করে' ঠাণ্ডা ঢোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কথাটা আমার—"

একটু থামিয়া চোখ বড় বড় করিয়া তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ডেঁপো—"

গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিলেন—"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সায়ারাম—"

নিখিলবাবু স্মিত মুখে বলিলেন, "তোমাদেরই বংশধর তো সব"

সুবাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা জোয়ানি ইয়াদ করো ভাই"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্যাসুন্দরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুর বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাবুর খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবুকে বাঁচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবুর ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের সৃষ্টি করিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "অনেক ভাল আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীর-বাবার কৃপায়। সুবাতালী তশিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই"

"খুব মনে আছে। ব্যবস্থাও করেছি। এতো আমাদেরই নাত-বোয়ের সাধ। এ কথা মনে থাকবে না? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উষার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাদুর চান খাওয়া সব হ'য়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে' আসি আগে। এক সঙ্গে গিয়ে ভীড় করা ঠিক হবে না"

"তাই যান"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" আর "কথোপকথন"-এর প্রকাশ-কালের মধ্যে মাত্র মাসখানেকের পার্থক্য, কিন্তু তার মধ্যেই ইংরেজ ধর্মযাজক ও সরকারী কর্মচারী বিদেশবাসী কেরি সাহেবের হস্তক্ষেপের ফলে বাংলা গদ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে। রামরামের জীবনী পুস্তকটির সাহিত্য হিসাবে সামান্য কিছু মূল্য আছে—যা কেরির বইএর নেই। কিন্তু রামরামের অশুদ্ধ সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা গদ্য ফার্সির মিশ্রণে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা সত্ত্বেও সৃষ্টি হিসাবে যতখানি উৎকর্ষ দাবি করতে পারে, কেরির ভাষা তার চেয়ে ঢের বেশি সম্ভাবনাময় এবং মনোভাব প্রকাশের বেশি উপযোগী।

সাহিত্য হিসাবেও প্রতাপ-জীবনী ঠিক রসপ্রাণ প্রবন্ধ বা রচনা-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এটিকে পাঠ্যপুস্তক তথা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধবিশেষ বলাই শোভন। "লিপিমালা" একেবারেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সুতরাং রামরাম মৌলিক গ্রন্থের লেখক হলেও প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন না। মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষাকৃত মার্জিত গদ্যে সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং অনুবাদে মূল সাহিত্যের রস কিছু পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাই অনুবাদক হলেও যখন তাঁর রচনায় সাহিত্য রস বিশেষত পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত গল্প পড়ার আনন্দ পাওয়া যায় তখন তাঁকেই বড় সাহিত্যিক বলতে হবে।

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় বই গোলোকনাথের "হিতোপদেশ"—লেখকের শোচনীয় ব্যর্থতার নিদর্শন। তিনি সংস্কৃত ভালো জানতেন কিনা সন্দেহ; "ভার্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু", এই অংশের বঙ্গানুবাদ তিনি করেছেন, "ভার্যা ক্ষীণে ও সম্পত্তিতে!" তাঁর ভাষাও অসম্বদ্ধ, পদান্বয়জ্ঞান-বিরহিত এবং ভ্রান্তির নিদর্শনে পরিপূর্ণ। ছেদ চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার বিদ্যাসাগরের আগে কেউই ঠিকভাবে করতে পারেন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে গোলোকনাথের অজ্ঞতা বা অসতর্কতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো তিনিও গালাগালির ভাষা রচনা করেছেন এবং সেই ভাষায় মাঝে মাঝে কথ্যভঙ্গি সঞ্চারিত করেছেন। সেই ভঙ্গিমার মধ্যে মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় প্রত্যয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। সম্ভাষণ ও সম্বোধনের ভাষায় "তুই, তুমি ও আপনি"-র প্রয়োগে বারবার বিপর্যয় দেখা যায়। ঐ সর্বনামত্রয়ের প্রয়োগবিধি সম্ভবত তিনি জানতেন না। সম্মানবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের পারস্পরিক সম্বন্ধও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বিবর্তনের ধারায় তাঁর বই একটি অপসৃষ্ট বলে গণ্য করা চলে। ছেদ চিহ্ন দিয়ে ও বানান ভুল বাদ দিয়ে তাঁর রচনার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :—

"সেখানে সর্বগামী গুণোপেত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন। তাহার অর্থ এই। শাস্ত্র সকলের লোচন। অতএব, যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেক—ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ; সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়।

দোম্ আন্তোনিও-র বইএ ফার্সি কম হলেও মাত্র সত্তর বছর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় ফার্সির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আসুসুম্প্‌ সাউ'-র রচনায় তার প্রাবল্য দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ঔরংজেবের প্রয়াসে সমগ্র ভারতে ইস্লামি আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তার অনিবার্য পরিণামে উত্তর ভারতের দেশীয় ভাষাগুলিতে ফার্সি উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ঐ আধিক্য যে কতখানি ক্ষীণ হয়েছে তার সেরা নজির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় গ্রন্থমালার চতুর্থ বই "লিপিমালা।" এই বইটি হচ্ছে বাংলায় Letter writing বা চিঠি লেখা শিখবার বই। কিন্তু এতে সমসাময়িককালের চিঠিপত্রের ভাষার উৎকট ফার্সিবাহুল্য সযত্নে বর্জন করা হয়েছে। রামরামের মতো ফার্সিপ্রিয় মানুষ ইংরেজ কর্মচারীদের জন্যে লেখাপড়া শিখবার বই লিখতে বসে রাতারাতি প্রতাপ-জীবনীর ভাষা থেকে "লিপিমালা"-র ভাষায় পৌঁছে গেলেন কি করে, সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে সেকালের ইংরেজ শাসকদের ফার্সি ভাষার বিরুদ্ধে পোষণ-করা গভীর বিতৃষ্ণার মধ্যে। বাঙালির চিঠিপত্র, হিসাব নিকাশ, সামাজিক সংস্কার ও ধারণার উৎসস্বরূপ কাহিনীগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে যে বই লেখা, তা থেকে ফার্সি শব্দাবলী ও জনপ্রিয় ইস্লামি কেচ্ছা-কাহিনী একেবারে বাদ দেওয়া উচিত হয়নি। রামরাম যে নির্মমভাবে সে-কাজ করেছেন, তার কারণ, প্রথম বইটি লেখার অব্যবহিত পরেই তাঁকে প্রভুদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে

হয়েছিল। বিশেষত, কেরির সংস্কৃতানুরাগ তাঁকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল।

"লিপিমালা"-র মাঝে মাঝে দু'চারটি লোকপ্রিয় গল্প বা পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ পেলেও আমরা একে সাহিত্য-গ্রন্থ বলব না। ইংরেজি essays and letters যেমন সাহিত্য-গ্রন্থ নয়, মাত্র পড়ার বই, এও তাই। "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন"-এর সঙ্গে "লিপিমালা"-র ভাষার তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে, প্রবল ফার্সি প্রভাবকে কি বিদ্যুৎ-গতি ক্ষিপ্রতায় বিতাড়িত করা হয়েছিল। আমরা রামরামের বিস্ময়কর পরিবর্তনের রহস্য অনুধাবন করলে দেখতে পাই যে, প্রভুবর্গের প্রয়োজনে কৃত্রিম ও অনাবশ্যক ফার্সির কুর্তাখানি খুলে ফেলতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ফার্সি যদি অপরিহার্য হত, তাহলে তার প্রভাবের সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার সম্পর্ক হত দেহের সঙ্গে ত্বকের মতো।

হঠাৎ ফার্সির শব্দভাণ্ডার একেবারে পরিত্যাগ করলেও রামরামের রচনায় ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি। তার প্রমাণ "লিপিমালা"-র এই ধরণের সব চিঠির ভাষায় :—

"তাহার কুলমর্যাদা এক শত টাকা দিতে হইবেক। এ সম্বন্ধ ভালো বটে কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহৎ ব্যাপার। এক্ষণে তাহার সংস্থান কি? এক শত টাকা পণ দিতে হইবেক, তদ্ভিন্ন আপনাদের ব্যয় তিন চারি শত টাকা ন্যূনে হইতে পারিবেক না। তাহার সকল সঙ্গতি এই ক্ষণে হইতে পারিবেক না। আমার এখান হইতে এক শত টাকার সুসার হইতে পারিবেক। ইহার অধিক কপর্দক হইবে না।"

এখানে ভাষার যে সজীবতা এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির যে দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে তা অনুরূপ বিষয়ে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাষা রামরাম-কথিত "চলন ভাষা" না হোক, একেবারে ফার্সিবিহীন। অর্থাৎ, আসূহ্ প্‌সাউ-র পর আরো সত্তর বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যভাষায় আবার শাব্দ উপাদানের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম বই "বত্রিশ সিংহাসন"-এর ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও তৎসম শব্দাবলীর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। ঐ প্রভাব অচিরে আতিশয্যে পরিণত হয়। "বত্রিশ সিংহাসন"-এর ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের অন্য বইগুলির ভাষার মতো একই ধরণের দোষ ও গুণ-সম্পন্ন। এর গল্পগুলির সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যথা-রীতি বানান-সংশোধন ও ছেদচিহ্ন স্থাপনের পর এর ভাষার নিদর্শন এইরকম :—

"পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া, পণ্ডিতলোকের-দিগকে আনাইয়া, শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া, ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া, দধি, দূর্বা, চন্দন, পুষ্প, অগোর, কুঙ্কুম, গোরোচনা, ছত্র, ভৃঙ্গার, চামর, ময়ূরপুচ্ছ, আম্রপত্র, পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাস সামগ্রী, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্রচর্ম, এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপর শ্রীভোজরাজা গুরু-পুরোহিত-প্রভৃতি-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ-মন্ত্রিসামন্ত-সৈন্যসেনাপতি পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।"

এই ভাষা, রামরামের ভাষার তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি থাকলেও দৃঢ়তা সম্পাদনের ক্ষমতা বেশি হওয়ায়, একটা সুসম্বদ্ধ ভাব-প্রকাশের বেশি উপযোগী হয়ে উঠেছে। একটু দুরান্বয়দোষ থাকলেও বাক্যরচনার শৃঙ্খলাবিধান-কৌশল মৃত্যুঞ্জয় সবচেয়ে বেশি জানতেন। তাঁর ভাষার অর্থ বোঝা অন্যের ভাষার তুলনায় সহজসাধ্য।

গ্রন্থমালার নবম গ্রন্থ "রাজাবলি"-তে কিছু ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে। উপযুক্ত প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনিও ফার্সি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। মুসলিম শাসনের বর্ণনাকালে তিনিও "মনসবেতে সরফরাজ করিলেন" ধরণের ফার্সিমিশ্র বাক্য রচনা করেছেন। সুতরাং এই বইএ বাংলা কথ্যভাষার অনুকূল শব্দাবলীর সঙ্গে ফার্সি ও সংস্কৃত, দুই ভাষার শব্দসমূহের সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছে। এটা বোঝা যায় যে, প্রসঙ্গানুরূপ ভাষাবিধানের আবশ্যকতা তিনিও জানতেন। কিন্তু তা হলেও "রাজাবলি" কোন লালিত্য বা সামঞ্জস্যের সন্ধান এনে দিতে পারেনি।

"বত্রিশ সিংহাসন"-এর পরে প্রকাশিত তারিণীচরণের "ঈশপের গল্প" বইটিতে ইংরেজি ধরণে বাংলা বাক্য গঠনের নমুনা প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। দোম্ আন্তোনিও আর আসূহ্ প্‌সাউ-র পরে তারিণীচরণ ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব বাংলাভাষায় এনেছেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষার বাক্য গঠন প্রণালী আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করায় তাঁর নিয়ে-আসা বিদেশি প্রভাব কিছুমাত্র কাজের হয়নি। পরবর্তীকালে বহু গদ্যলেখক বাংলাভাষায় ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গদ্যে ছেদচিহ্ন স্থাপনের রীতি, উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রয়োগের কৌশল, সংলাপ বর্ণনাকালে বক্তার দুই বাক্যাংশের মাঝখানে লেখকের বক্তাসম্পর্কিত বর্ণনা দেওয়ার বৈচিত্র্যময় প্রণালী, সবই পাশ্চাত্যভাষার প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু তারিণীচরণ পরবর্তীদের মতো পাশ্চাত্য প্রভাব সুকৌশলে মিশিয়ে ভাষার সহজাত বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ করে দেবার নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই ইংরেজি, ফার্সি আর উর্দু ভাষায় ওয়াকিবহাল হলেও তিনি বাংলা গদ্যে কোন অভিনব রীতি প্রবর্তন করতে পারেন নি। মাতৃভাষা ভালো করে জানা না থাকায় তাঁর বিদেশি ভাষায় জ্ঞান কোন কাজে আসে নি। বিদেশি ভাষায় অভিজ্ঞতার জন্যেই তাঁকে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে থাকবেন। "A bit of cheese,"এর অনুবাদ যে "একটুকরা পনীরের" নয়, তা না জানার জন্যে বেচারা তারিণীচরণ আচার্য সুকুমার সেনের দ্বারা উপহসিত হয়েছেন। ঐ রকম দু একটি ভুলের কথা বাদ দিলে তারিণীচরণের ভাষা মোটামুটি সন্তোষজনক। লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি অপেক্ষাকৃত সরল ও কথ্যভঙ্গির গদ্য রচনা করেছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ কম ব্যবহার করেছেন। হয়ত তিনি ভালো সংস্কৃত জানতেন না। কিন্তু কারণ যাই হোক, তৎসম শব্দের আধিক্যবিহীন তাঁর রচনা মোটের উপর মন্দ নয়। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র

ধারায় গদ্য রচনা করেছেন। এক জায়গায় তাঁর সহজবোধ্য ভাষা ইংরেজি রচনাশৈলীকে বেমালুম আত্মস্থ করেছে :—

"তোমার সুন্দর মূর্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি। যদি অনুগ্রহক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে, তবে নিঃসন্দেহে জানিতাম যে, তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। * * * দাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা গরিমার খেদ করিতে রাখিয়া গেল।"

এখানে শেষ বাক্যটি ইংরেজি রচনারীতির হুবহু অনুবাদ বটে, কিন্তু সার্থক অনুবাদ। অন্যত্র তাঁর রচনায় কর্তৃপদবিহীন বাক্য দেখা গেছে। তাতে মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। সংস্কৃত বা ইংরেজি-ভঙ্গিম বাক্যে এ ধরণের প্রয়োগ অকল্পনীয় :—

কহিলেক, "হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

এইভাবে কর্তৃপদের ব্যবহার না করে বাক্যরচনা করা কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য। ইতালীয় ভাষাতেও ঐভাবে কর্তৃপদ অনুক্ত রেখে বাক্য গঠন করা হয়। বোঝা যায় যে, চলতি ভাষায় কথা বলার সময় আমরা যেভাবে মাঝে মাঝে কর্তা-র উল্লেখ করি না, মিত্র মহাশয়ও সেই ধারা গ্রহণ করেছেন। মৌলিক গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলে তিনি সম্ভবত অভিনব রীতি খুঁজে পেতেন। তাঁর আর কোন রচনা পাওয়া যায় না।

সপ্তম গ্রন্থ চণ্ডীচরণের লেখা, ফার্সিনবিশের বাংলার নিদর্শন হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য বই। রামরাম বসুর ভাষার চেয়ে তারিণীচরণ ও চণ্ডীচরণের তৈরি গদ্যভাষা কোন অংশে খারাপ নয়। সংস্কৃত "শুকসপ্ততি" বা শুকপাখির মুখ দিয়ে বলানো সত্তরটি গল্পের এক সংকলনের ফার্সি অনুবাদ "তুতিনামা"-র হিন্দি অনুবাদ "তোতা কহানী"-র বাংলা অনুবাদ "তোত ইতিহাস" বা "তোতা ইতিহাস"-এর ভাষা রামরাম ও কেরির রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত। চণ্ডীচরণ ছিলেন মুন্সি অর্থাৎ ফার্সিতে পারদর্শী; কিন্তু তাঁর রচনায় ফার্সির উপদ্রব নেই। তাঁর ভাষাও সংস্কৃত-ভঙ্গিম দৃঢ় কাঠামোয় স্থাপিত। গোলোকনাথ ও মৃত্যুঞ্জয়ের মতো জায়গায় জায়গায় কথ্যভঙ্গির অসমঞ্জস প্রয়োগ না থাকায় তারিণীচরণ, রাজীব-লোচন ও হরপ্রসাদের মতো তাঁর লেখাতেও একটা স্থিরতার ভাব আছে। এই গুণে সে-যুগে হটন ও ইয়েট্স্ সাহেবদের বাংলা রচনাসংগ্রহে তাঁর রচনাংশ বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান লাভ করে। চণ্ডীচরণের রচনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির অনুসৃত বাংলা গদ্যের ধারা অতিক্রমের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কি ফার্সি কি তৎসম, কোনরকম শব্দাড়ম্বরকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। বহুপরিচিত ভিন্ন অন্ত ধরণের সংস্কৃত শব্দ তাঁর রচনায় কমই দেখা যায়। তাঁর ভাষার নিদর্শনে দেখা যায়, দুরান্বয় বা দুর্বোধ্যতা খুব সামান্য :—

"অতএব, আমি তাঁহার চাকুরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ ভেবরতামের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকুরি করিতে আসিয়াছি। মহারাজ ভেবর-তাম এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্মে নিযুক্ত কর, পরে কর্মকর্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকুরিতে নিযুক্ত করিলেন।"

এই অংশ কিংবা পূর্বোদ্ধৃত তারিণীচরণের ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা ঐ গদ্যভাষা এখনকার সাধু ভাষার মতো হয়ে উঠতে পারে। আজকের দিনের "আনন্দবাজার" "যুগান্তর" প্রভৃতি সংবাদপত্রে ব্যবহৃত গদ্যভাষার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত অংশের কোন মৌল প্রভেদ নেই। উনিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা গদ্যের অবস্থা, বিশেষ করে ফার্সি ও সংস্কৃত প্রভাবের পারস্পরিক বিরুদ্ধতা আর পণ্ডিতি বাংলা ভাষার কথা বিবেচনা করলে চণ্ডীচরণ প্রভৃতির কৃতিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

রাজীবলোচনের বই "History of Raja Krishna Chundra Roy বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" রামরামের লেখা প্রতাপ-জীবনীর আদর্শে রচিত হলেও এর ভাষা অনেক বেশি সরল। অনেক পরিমাণে ইতিহাসাশ্রিত এই জীবনী গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখক শুধু কেরির নির্দেশ অনুযায়ী সংস্কৃতপ্রভাবিত সাধু গদ্যই রচনা করেন নি, ইংরেজ জাতিরও অনেক সুখ্যাতি করেছেন এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মতোই স্পষ্টভাষায় ইস্লামি শাসন ও শাসক সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন। এই বইটির ভাষা সম্বন্ধে আচার্যযুগল সুকুমার সেন ও মনোমোহন ঘোষ অনেক সুখ্যাতি করেছেন। এর ভাষা "বত্রিশ সিংহাসন"-এর চেয়ে বেশি এগোতে পারে নি। নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু দেখলে সে-কথা বোঝা যাবে :—

"জগৎ শেঠ প্রভৃতি কহিলেন, এমন কে, তাহা বিস্তারিয়া কহ। রাজা কহিলেন, বিলাতে নিবাস, জাত ইঙ্গরাজ, কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন। যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন, তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, তাঁহাদিগের কি কি গুণ আছে? * * * রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন, বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক, আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন।"

এই অংশে "হবেক" ক্রিয়াপদটি লক্ষণীয়; এই কথ্য রূপ নিতান্ত আকস্মিক।

এর পরে প্রকাশিত "হিতোপদেশ"-এর অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বত্রিশ-সিংহাসন ও রাজাবলি তুলনায় উন্নততর গ্রন্থ। সংস্কৃত অনুবাদেও তিনি গোলোকনাথের মতো ভুল অন্তত এক জায়গায় করেছেন, "শ্রীযুত দেবপাদানাম্"-এর অনুবাদ তিনি করেছেন, "শ্রীযুক্ত মহারাজার পায়ের!" কথ্যভাষার বিসদৃশ প্রয়োগ গোলোকনাথের মতো তাঁরও একটি দোষ। গালাগালি ও উপহাসের ভাষায় ব্যতীত কথ্যভাষার প্রয়োগ যেন দোষাবহ, দুজনেরই এই মনোভাব দেখা যায়। রাজাবলির ভাষা অবশ্য উন্নততর; সে-কথা আগে আলোচিত হয়েছে। রাজাবলির একটি শ্রেষ্ঠ অংশ মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার চরমোৎকর্ষ দেখাবার জন্যে তুলে দেওয়া হল :—

"কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবলপরাক্রম ছিলেন এবং

বড় ধনী ছিলেন। কাহাকে বলেতে, কাহাকে প্রীতিতে, এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্বসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা একদিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি, সে তোমার মনোনীত হয় না। ইহাতে তোমার মনস্থ কি, তাহা আমাকে কহ, আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করি।"

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-য় মৃত্যুঞ্জয় কথ্যভাষার ব্যবহার মাঝে মাঝে করেছেন বটে কিন্তু তার প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়; ১৮১৩ সালে রচিত এই বইটির ভাষাই উনিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা গদ্যে কথ্যভাষার স্থান নির্দেশ করে। সে-স্থান মর্যাদাব্যঞ্জক নয়।

গ্রন্থমালার একাদশ গ্রন্থ "ইতিহাসমালা" কেরির লেখা হোক বা না হোক, বেশ পরিমার্জিত ভাষায়; এটিই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মৌলিক গল্পসংগ্রহ। "বত্রিশ সিংহাসন" ও "হিতোপদেশ"-এর অনুবাদগুলিকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম অনূদিত গল্প-সংগ্রহ বলা যায়। "লিপিমালা"-তেও গল্পের আভাস আছে। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গল্পের দেখা পাই "ইতিহাসমালা" গ্রন্থে। এর গল্পগুলি অনুবাদ নয়, কেচ্ছা বা কিম্বদন্তীর নীরস গল্পরূপ নয়, আবার এর সব গল্প ইতিহাসানুসারীও নয়। প্রায় সকলেই এবিষয়ে একমত যে, এই বইটিই এই গ্রন্থমালার শ্রেষ্ঠ বই। সুকুমার সেন মনে করেন, বইটি হয়ত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা। তা যদি হয়, তাহলে মৃত্যুঞ্জয়কে এযুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলে মনে করতে আপত্তির কোন কারণ নেই। এই বইটি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের রীতিতে রচিত এবং এটিই গ্রন্থমালার শ্রেষ্ঠ বই, অন্তত এই দুটি ব্যাপারে যখন আচার্য সুকুমার সেনও একমত, তখন মৃত্যুঞ্জয়ের রচনারীতিই যে উনিশ শতকের প্রথম পাদের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনারীতি, এবিষয়ে ভিন্নমত হতে পারে না। আচার্য সেন যদিও লিখেছেন, "কেরির সংশ্লিষ্ট লেখকদিগের মধ্যে রামরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ," তবুও তিনিই আবার স্বীকার করেছেন, "ইতিহাসমালার রচনা-ভঙ্গি সংস্কৃতঘেঁষা; এগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রীতিতে রচিত; ইতিহাসমালা রচনাভঙ্গির দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ।" সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত গল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এ বইটির সাহায্যে দৃঢ়তর হচ্ছে।

"ইতিহাসমালা"-য় কেরির তথা ইংরেজি বাগভঙ্গি বা বচন-প্রয়োগের কিছু প্রভাব আছেই। কোন বাঙালি লেখক বাংলায় বই লিখতে বসে ঘটক কাকে বলে তা বোঝাতে অন্য কোন দুরূহ শব্দ ব্যবহার করবে না। অথচ এক জায়গায় লেখা হয়েছে "ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক।" এই "বিবাহের যোজক" ব্যাখ্যাটি ইংরেজি Match-maker শব্দের অনুবাদ। এটি ইংরেজের বোঝার জন্যে দরকার বটে, কিন্তু বাঙালির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাজ স্বয়ং কেরি করেছেন বা তাঁর সংশোধনে কি তত্ত্বাবধানে হয়েছে। যে ১৪৮টি গল্প এতে সংগৃহীত হয়েছে তিনি কেবল সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, এমন না হতেও পারে।

হরপ্রসাদ রায়ের "পুরুষ পরীক্ষা"-র ভাষায় দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুঞ্জয়-প্রদর্শিত রচনারীতি স্থায়ী রূপলাভ করে নির্দিষ্ট মানে উপনীত হয়েছে। হরপ্রসাদের ভাষায় চাঞ্চল্য বা অসংযম নেই; শব্দাড়ম্বর, ফার্সি বা সংস্কৃত ভাষার আতিশয্যময় প্রভাব, হাস্যরস সঞ্চারের আশায় কথ্যভাষার বিকৃত প্রয়োগ প্রভৃতি সামঞ্জস্যবোধের অভাব তাঁর লেখায় নেই। তিনি সেকেলে গদ্যভাষায় ধীর ও অপ্রমত্ত ভঙ্গিতে লিখে গেছেন, নতুন কিছু করতে না পারলেও। তাঁর রচনার একাংশ থেকে তাঁর গদ্যের উৎকর্ষ দেখানো হল :—

অনন্তর নরপতি নিবেদন করিলেন, "হে কমলে! যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর, তবে কোন্ ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে পারিবে? যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয়, সেই স্থানে যাও। কিন্তু আমি এক বর প্রার্থনা করি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সেই বর দেও।" লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, "তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর, তবে তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয়, তাহা চাহ। আমার অন্যত্র গমনের বারণ ভিন্ন যে যে বর চাহিবা, আমি তাহাই দিব।" রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "হে ভগবতি! আমার গৃহে পরিজনদের কখনও অনৈক্য না হয়, তুমি এই বর আমাকে দেও।" লক্ষ্মী রাজার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, "হে রাজন্! যদি তোমার গৃহে পরিজনদের অনৈক্য না হয়, তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে? আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবং বিদ্যুতের ন্যায় অস্থিরা; কিন্তু আমি যেমত নারায়ণের প্রিয়তমা হইয়া তাঁহার নিকটে চিরকাল আছি, সেই মত নীতিশালী রাজার অতিপ্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে দীর্ঘকাল থাকি এবং অনীতি কিম্বা কলহ, এই দুই ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে গমন করি না। অতএব, আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না।" ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐ বর দিয়া রাজার গৃহে চিরকাল স্থিরতর হইয়া থাকিলেন।"

এই গদ্যের শালীনতা ও সৌষ্ঠব মৃত্যুঞ্জয়েরও ঈর্ষ্যার যোগ্য হওয়া উচিত ছিল। তাঁর গড়া রচনাশৈলীর চরমোৎকর্ষ দেখা গেছে উপরের উদ্ধৃতিতে। সমস্ত বইটির ভাষাই একই রকম অবাধ, সরল ও প্রয়াসশূন্য লিপিকুশলতার সুখপাঠ্য নিদর্শন। পরে স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই ধরণের গদ্য রচনা করেছেন। অক্ষয়কুমারও এর চেয়ে খুব বেশি উন্নত গদ্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আর রামমোহনের পক্ষে এত ভালো গদ্য লেখা অকল্পনীয় ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অনুবৃত্তি হিসাবে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা "বেদান্ত চন্দ্রিকা" এবং "প্রবোধ চন্দ্রিকা"-র আলোচনা করতে পারি। এই বই দুখানি প্রকাশিত হবার আগেই বাংলা গদ্যরচনা জগতে ভাষা ও সাহিত্য দুদিক থেকে অভিনবত্বের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল। "বেদান্ত চন্দ্রিকা" ১৮১৭ সালে প্রকাশিত

হয় রামমোহনের ১৮১৫ সালে প্রকাশিত বৈদান্তিক রচনার প্রতিবাদে। বেদান্ত চন্দ্রিকার ভাষার কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। বাংলা গদ্যে রামমোহনের প্রধান দান যুক্তিরচনা ও বিতর্ক পরিচালনার কাজে যুক্তিপ্রাণ প্রবন্ধের সাহায্যে গদ্যভাষার ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধন। তাঁর সেই প্রয়াসের সঙ্গে প্রকাশ্যে অসহযোগিতা ঘোষণা করল "বেদান্ত চন্দ্রিকা"। এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় লৌকিক ভাষায় বেদান্তচর্চার নিন্দা করেন। বইটি যে তাঁর লেখা, তার কোন অকাট্য প্রমাণ সে-যুগে ছিল না। সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে তাঁকেই লেখক বলে ধরা হয়। প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১৩ সালের রচনা হলেও তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। মার্শম্যানের লিখিত ভূমিকা-সংযুক্ত এই বইটিই অনেকের মতে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-র চলতি ভাষা যে কেবল তিরস্কার, উপহাস ও কটূক্তির কাজে লাগানো হয়েছে এটা সুবুদ্ধি বা সুবিচারের অভাব নির্দেশ করে। মার্শম্যানও এতে একটু বিচলিত হয়ে বলেছেন :—

"The writer, anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders."

ঐ নিকৃষ্ট চলতি ভাষার বেশি নমুনা দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। সেদিক থেকে গোলোকনাথের অপকৃষ্ট রুচির অনুগমনই করা হয়েছিল। সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণে গঠিত বইটির গদ্যভাষা ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্যের অগ্রগতির পরিমাণ নির্দেশ করে। এর ভাষা নিঃসংশয় সংস্কৃত প্রাধান্য সূচিত করে। নানা শাস্ত্র ও বিদ্যার আলোচনা এবং মূল্যবান্ ব্যাখ্যার জন্যে বইটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ; তেমন কোন সাহিত্যগুণ এর নেই।

এই যুগে লেখা বইগুলির মধ্যে মৌলিক গদ্যসাহিত্য হিসাবে একমাত্র "ইতিহাসমালা" এবং অনূদিত গদ্যসাহিত্য হিসাবে "পুরুষপরীক্ষা" উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র সামান্য সাহিত্যগুণ আছে, প্রকৃত সাহিত্যরস একেবারে নেই। "বত্রিশ সিংহাসন" এবং "প্রবোধচন্দ্রিকা"-য় মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রচনাভঙ্গির চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন যদিও "পুরুষ পরীক্ষা"-র সংযত রচনাশৈলী হরপ্রসাদ রায়ের হাতে তাঁর ভঙ্গির অধিকতর উন্নতি প্রমাণিত করে।

১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন ও তার মুদ্রাযন্ত্রের কীর্তিকাহিনীও স্মরণীয়। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার পর শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকদের প্রয়াস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও প্রধান কর্মচাঞ্চল্য ১৮১৮ সালে দেখা গেল : সমাচার-দর্পণ। কিন্তু তার আগেও তাঁরা অনেক কাজ করেছেন। সে-প্রসঙ্গে সতর্ক আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষত, কারো কারো ধারণা এই যে, শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা বাংলা গদ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন যা না হলে বাংলা গদ্যের কিছুই হত না ; আবার অনেকের মতে, যা করার সব রামমোহন একাই করে গিয়েছিলেন, মিশনারিরা একটা উত্তেজক কারণ মাত্র। দুটি ধারণাই একদেশদর্শী।

প্রথমে একথা বলে রাখা ভালো যে, শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকেরা এমন কোন আহা-মরি গদ্য রচনা করে যাননি যার জন্যে পুলকিত হবার কোন কারণ আছে। তাঁরা গদ্যভাষা রচনা ও সংগঠনের কাজে যেটুকু উপকারে লেগেছিলেন তার পরিমাণ ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের চেয়ে অনেক বেশি। পোর্তুগীজ পাদ্রিদের তুলনায় প্রোটেস্টান্ট পাদ্রিদের দান অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের রচিত গদ্য মোটের উপর অপকৃষ্ট, একথা বলতেই হবে। তাঁদের রচনাভঙ্গি বাঙালি গদ্যলেখক কোনদিন অনুসরণ করেনি। অন্যদিকে একথাও ঠিক যে, মিশনের মুদ্রাযন্ত্র বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রণের যুগে যে অতুলনীয় সাহায্য করেছিল, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয়। গদ্য রচনার তুলনায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার কাজের দাম অনেক বেশি। ১৮১৫ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্যে নতুন যুগ প্রবর্তন ও সেই যুগকে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াস অসামান্য কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁরা চিরদিন বাঙালি জাতির ধন্যবাদের পাত্র হয়ে থাকবেন। ১৮১৫ সালের মধ্যে তাঁরা বাংলা গদ্যের জগতে কি করেছিলেন, এবার তার হিসেব দেওয়া যেতে পারে।

১৮০০ সালে কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি কয়েকজনের উদ্যোগে বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম প্রায় সমস্ত বাংলা বই এই মুদ্রাযন্ত্র থেকে ছাপা হয়েছিল। খালি বাংলা গদ্যের জগতে নয়, ঐ ছাপাখানার দান বাংলাদেশের সমগ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দিক থেকে খুব বেশি। শ্রীরামপুরের ধর্মযাজকগণ এর পর বাইবেলের বঙ্গানুবাদ বার করতে উদ্যোগী হলেন। নয় বছরের চেষ্টায় ১৮০৯ সালে সমস্ত বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮০০ সালেই সামান্য অংশ প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়।

ক্রমশ

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৈকালে হয়ে গেছে। সূর্য্যাস্তের আগে সমুদ্রের তীরে পৌছাতে না পারলে একটা দৃশ্য দেখতে পাবো না, সমুদ্রের বুকে সূর্য্যাস্ত। দ্বীপের পুব-পশ্চিম দুইদিকেই সমুদ্র, সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত দুটোই বেশ দেখা যায়।

বড় ডিঙ্গিতে চারখানা দাঁড় একটা হাল খাটিয়ে উঠলাম। আলী সাহেব, ইয়সুফ, শরিফ—আরও দুজন দাঁড়ি, আমরা দুজন, মাইল দেড়েক টেনে গিয়ে পড়লাম খাল ছাড়িয়ে সমুদ্রের চরে। ভাঁটা চলেছে তখনও। প্রশস্ত বালিয়াড়ির বুক উঠেছে জেগে, ঢেউএর আলপনার দাগ আঁকা তার সর্ব্বাঙ্গ। দূরে সেঁও-গাছের কালোপাতার বুকে সাদা দাগের মত শুঁড়িগুলো সোজা হয়ে উঠেছে। বড় বড় গাছ গুলো অনেকে ভেঙ্গে চুরে হুমড়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে, তীরভূমি বিধ্বস্ত, মনে হয় শত শত মত্তহাতী যেন তছ নছ করে দিয়েছে ওই বনভূমিকে,...সমুদ্রের তুফান—ঝড়ের চিহ্ন আঁকা আছে ওদের বুকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে দুর্দ্দমবেগে হাঁকে হাওয়া, খ্যাপা ঝড় মাথায় করে ঢেউগুলো ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে, তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে ভাঙ্গা গাছগুলোকে ঝড়ের বেগে।

আজ সমুদ্র শান্ত—স্থির। দূরে বনভূমির প্রান্তদেশে লুটিয়ে পড়ছে একটার পর একটা ঢেউ ; আদর করে গান শোনাচ্ছে। আবার ওই সমুদ্রই একদিন মাতাল হয়ে তাণ্ডব তোলে ওর বুকে। নির্জ্জন পৃথিবীর কোণে সমুদ্র বনানীর এই ভালোবাসা—অভিমানের পালা দেখতে মানুষ সেদিন আসে না। নিভৃত আকাশের নীচে চলে ওদের দিনরাত্রির আলাপন।

ঘুরে বেড়াচ্ছি বেলাভূমিতে, ঝিনুক, ছোট্ট শঙ্খজাতীয় জীব, সমুদ্রের ফেণা কুড়াচ্ছি। সঙ্গে মাঝিরা সকলেই নেমেছে, কারুর হাতে বৈঠে, কুড়ুল, দা ইত্যাদি। কাছেই বন, চরের মাথায় মিষ্টি জলের চুয়ো আছে, সুতরাং বন থেকে জন্তু জন্তু তো আসেই, বাঘের পায়ের ছাপও দেখা যায় ; পোষাক—অর্থাৎ সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা ছেড়ে দিয়েছি। ইস্ত্রির পাঠ তুলে দিয়েছি। সাদা পাটভাঙ্গা জামা কাপড় পরে বেরুলে মাঝিরা চেয়ে দেখে, দূরে দূরে থাকে। বহু দৃষ্টির সামনে নিজেকে সঙ্কুচিত মনে করি। পোষাকের সাম্যতা রক্ষা করা সভ্যসমাজের কিছুটা প্রয়োজন, কিন্তু এখানেও পোষাক পরা দেখবার কেউ নাই। পরেছি একখানা লুঙ্গি, গেঞ্জি, ময়লা একটা পাঞ্জাবীর উপর একটা পুরোহাতা সোয়েটার।

জায়গাটা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বালিয়াড়ির বুকে জন্মেছে আকন্দগাছের বন, কাশঘাসের জঙ্গল ; যেন অজয় ময়ূরাক্ষী তীরের চরের উপর জঙ্গল। এইখানে বাওয়ালিরা চুঁয়ো খুঁড়ে মিঠে জল নিয়ে যায়। জোয়ারের জল ওঠে না এখানে, উঠলে সব নোনা হয়ে যেত। সুন্দরবনের প্রায় সব অংশেই জোয়ারের জলে ডুবে যায়। ভাঁটায় জেগে ওঠে কাদা ভর্ত্তি হয়ে।

সমস্ত সুন্দর বনভূমি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দশ থেকে পনেরো ফিট নীচে ; জোয়ারের সময় নোনা জল প্রায় সমস্ত বনভূমিকে ঢেকে ফেলে, উঁচু ঠাঁই দু'চারটা ছাড়া বনের বাঘ—হরিণ প্রভৃতি জন্তুরা এই সময় জলেই দাঁড়িয়ে থাকে, হরিণ-পাল গাছের ডালে মাথা আটকে ভাঁটার অপেক্ষা করে ; এই জায়গাটুকু দেখলাম বেশ উঁচু, আলিসাহেবও সাবধান করে দেয়।

সন্ধ্যার আগেই নেমে আসুন বাবু ওখান থেকে, জোয়ার সুরু হয়েছে। জন্তু জানোয়ারের কথা বলা যায় না।

পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা ডোরাকাটা কি! খুব ছোট মত। লাফ দিয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসেছি। দৌড় মারবো কিনা ভাবছি।

একজন মাঝি বৈঠার আঘাতে শেষ করে দেয় ওটাকে। একটা বনবিড়ালের বাচ্চা—বড়দা বলে ওঠেন।

"কক্খনো পালাবার চেষ্টা করোনা, বাঘই যদি হয় দৌড়বার চেষ্টা করা মাত্র আক্রমণ করবে। সামনে পড়েই যদি যাও—মৃত্যুতো নিশ্চিত, তবু দাঁড়িয়ে পড়াই ভালো। আর যে বাঘ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে, তাকে তুমি দেখতে পাবে না। সামনে থেকে নয়—বেশীর ভাগ চোট হয় এখানে পিছন থেকে, না হয় পাশ থেকে।"

কাশবন হতে বার হয়ে এলাম চরে। জোয়ার এসেছে। পশ্চিমে আকাশ—সমুদ্র লাল হয়ে উঠেছে, দুরন্ত শিশু যেন মায়ের কপালের সিন্দুর টিপটা তার সারা মুখে চোখে লেপে দিয়েছে। জলের নীচে মিলিয়ে গেছে আধখানা সূর্য্য, আধখানা যাই যাই করেও রয়ে গেছে, যেন সাচী স্তূপের উপরিভাগ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে লাল আবীরের রংএ। শোঁ শোঁ গর্জন শোনা যায়, সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে আসছে এক একটা ঢেউ, আছড়ে পড়ছে বালির বুকে—ফেণায় ভরে উঠছে বালির বুকে, ফিরে গিয়ে আবার এসে পড়ছে। তালে তালে—ছন্দবদ্ধগতিতে।

সব রঙ্‌টুকু মিলিয়ে গেল, কেমন সবুজ একটা আভা তখনও ওর সমাধির উপর ঘিরে রয়েছে, ধীরে ধীরে বেগুনে থেকে ঘন কালো রংএ চড়াল পড়লো।...

নৌকা বালিতে ঠেকে গেছে। একজন দাঁড়ি অপেক্ষা করছে একটা ঢেউ আসছে—কেঁপে ফুলে মত্ত আক্রোশে আসছে ঢেউটা, ঠিক,

তার মাথার উপর ডিঙ্গিটাকে ঠেলে দিয়ে লাফ মেরে চড়ে বসল। ধারাল ফলার মত ডিঙ্গিটা একটা ঢেউ থেকে আর একটা ঢেউএর উপর লাফ দিয়ে চললো। বাঁ হাতে আমাদের খাল ;···জোয়ারের টানে নৌকা গিয়ে ঢুকলো ভরা খালে,।

দুপাশে বনভূমিতে নেমেছে কালো আঁধার। রাতের স্তব্ধ অন্ধকার ভরে ওঠে হরিণের ডাকে। এমন চমৎকার প্রাণীর এমন উদ্ভট ডাক যেন বিশ্রী লাগে। টর্চের আলোয় দেখা যায়—দু'একটা দাঁড়িয়ে আছে খালের ধারে—কালো চোখে ঠিকরে পড়ে নীল আলো ; শয়তানের হাতের তীরের মত লাফ দিয়ে সেঁ। করে বনের গভীরে চলে যায়। ইসুফ এক-সের পাঁচপো ইলিশ খেয়েও খুশী হয় নি। আপশোষ করে—একটা যদি পেতাম আলিসাহেব, তিরিশ পঁয়ত্রিশ সের গোশত নির্ঘাৎ। 'ইস্—মওকা মিলে গেল। খালের মধ্যে আর একমহাজন ভদ্রলোকের নৌকা রয়েছে ; মালিকদের দেখা পেলাম না, তাঁরা নাকি বার হয়েছেন। পেলে তবু একটু আলাপ সালাপ করা যেত, কাটতো সন্ধ্যাটা।

নৌকায় গিয়ে দেখি—ভদ্রলোক দুজন আমাদের জন্তেই বসে রয়েছেন। একজন ব্যবসায়ী, অন্তজন আমারই মত এসেছেন সুন্দরবন দেখতে, মিলে যায় তো শিকারও করবেন। আমি বৈষ্ণব—ভদ্রলোক দেখলাম শাক্ত।···ইতিপুর্বে অনেক বিগগেম শীকার করেছেন। ডাক নাম শুনলাম রাঙ্গাবাবু—বেশ মিশুক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নামলাম 'রাঙ্গাদা' ডাকে। চা—চিঁড়ে ভাজা সিগারেট আর আড্ডা। নাগপুরের জঙ্গলে ভদ্রলোক একবার একটা 'ম্যানইটার' মেরেছিলেন—তারই লোমহর্ষক গল্প সুরু করলেন ; রাঙ্গাদার গল্প বলবার অভ্যাস আছে ; চারিদিকে নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার,···খালের ধারে বসে শোনা যায় হরিণের ডাক, দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন।

রাঙ্গাদা বলে চলেছেন,—বাম্নিওদার ওপাশে গহন জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপর বসে আছি, সামনে পড়ে আছে একটা আধ খাওয়া মোষের দেহ। সকালে ধরে এনেছিল, সেইটাকে 'কিল' রেখে বসে আছি বাঘের আশায়। রাত্রি গভীরতর হয়ে ওঠে। ঝরাপাতায় জেগে ওঠে চাপা শব্দ। রাত্রির অন্ধকারে দুটো ভাঁটা জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

একটি মুহূর্ত !···ওই জলন্ত দুটো ভাঁটার মাথ বরাবর ফায়ার করলাম। একটা গর্জন—তারপরেই পতন। বিটুইন দি টু আই, এক বুলেটেই শেষ! প্রায় এগারো ফিট লম্বা একটা বাঘ।

সিগারেট ধরিয়ে আবার সুরু করেন—কুশী নদীর ওপারে তরাইএর বনে এক ম্যানইটার'কে নিয়ে।

ইসুফ সামনে বসেছিল, বাঘ ভালুকের গল্প তার ভালো লাগে না, বাঘতো অনেক দেখেছে বাওয়ালির কাজে এসে। বাধা দেয়—'বাবু ভালো হাত আপনার, চলুন হরিণ শিকারে, মধুখালির বনে চরে বেড়ায় গরুর পালের মত। যত পারেন মারতি।'

হরিণ মারার কথা শুনে রাঙ্গাদার—পুরুষকারে একটু যেন বাধে।—'ধ্যাৎ, হরিণ মারা ওতো 'লেডিস গেম'। আমি এসেছি যদি 'বিগ গেম, মানে ধরো বাঘ টাঘ মেলে।

কথাটা ইসুফের মনঃপুত হলো না—'উ হলো জানোয়ার মারি কি করবেন? খাতি পারবেন? খামোকাই—তার চেয়ে চলেন হরিণ মারবেন, টাটকা গোশত। উঃ অনেকদিন জোটেনি বাবু।

ইসুফের নোলায় জল এসে পড়েছে। একটা হরিণের চামড়া বা শিঙ্গল যদি হয়—শিং জোড়াটার উপর আমার লোভ আছে, যদি এই নৌকায় জুটে যায়—তাই বলে উঠি—'চেষ্টা করে দেখুন না রাঙ্গাদা, আপনি বসলে নির্ঘাৎ।

—তা হয় সত্যি ! আচ্ছা আপনি বলছেন যখন বসবো কাল ভোরে। তবে ছোট শিকার করে বড় শিকার ফসকাতে বাধে কিনা। হোকগে খাওয়াযো হরিণের মাংস।

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল ইসুফের সঙ্গে। কাল ভোরে ইসুফ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ছোট ডিঙ্গিতে, সূর্য্য উঠবার আগে মধুখালির বনে গাছে উঠে বসে থাকবেন। হরিণের দল ওই সময় বার হয়।

বড়দাকেও ওপারে যেতে হবে কাল ভোরে, খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি শুয়ে পড়েছেন। রাঙ্গাদা বিদায় নিয়ে গেলেন, দেখছি ইসুফ তখনও ওর সঙ্গ ছাড়েনি।

ভোর বেলাতেই বার হয়ে গেছেন বড়দা। ডিঙ্গিতে চারখানা দাঁড়—একটা হাল, কিছু খাবার জল—চিঁড়ে। মাঝিরা নিয়েছে পান্তা ভাত, হুকা তামাক—এক মালসা আগুন, তামাক খেতে হবে ঘন ঘন। ইসুফ তার অনেক আগে বার হয়ে গেছে রাঙ্গাদার সন্ধানে। বড়দা নিষেধ করে যান—' তুমি যাচ্ছ নাকি ?

···"না, কাল চরে দুটো বাটাম মেরে এনেছি, তাই শেষ হয়নি, ও গাছে চড়ে হাপিত্যেশ করে বসে থাকবার ধৈর্য্য আর নাই।

তাছাড়া আছে খুদে খুদে মশার মত একরকম পোকা, কামড়ালে জায়গাটা ফুলে ওঠে আমবাতের মত, তেমনি জ্বালাও করে। বড় বিশ্রী লাগে। বড়দা সাবধান করে দেন,—'কোন্ডিসিজন, এ সময় হরিণ মারলে ওরা গোলমাল বাধাবে।

···নৌকাতে রইলাম একা।

সকাল বেলায় বাওয়ালিদের কাম সুরু হচ্ছে। প্রত্যেকেই দেখলাম স্নান করে বনের মধ্যে ঢোকে।

আলিসাহেব বলে 'বনবিবির আস্তানা বাবু···দেবস্থানে শুচি হয়ে না ঢুকলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? কাঠ কাটি, নৌকা বাই, দিনরাত তো পাপ করছি তার মাটিতে, তবু সিনান করে বনবিবিকে সালাম করলে সব 'গোনা' মকুব হয়ে যায়।

ভোর চারটে থেকে 'পাকানি' সেই 'সুলতান অব গজনী' উঠে চুলো ধরিয়েছে। বিরাট একটা হাঁড়িতে তিরিশ জনের ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। সকালে বার হবার আগে ভাত খেয়ে—সঙ্গে দুপুরের জন্ত ভাত নিয়ে যাবে। হেঁসেল তুলে 'পাকানি'ও যাবে কুড়ুল কাঁধে ; খেতে বসেছে সবাই, ইসুফ তখনও ফেরেনি, রাঙ্গাদাকে নিয়ে শিকারে বসেছে। নৌকার বাওয়ালিরা তার আশায় বসে আছে—যদি জুটে যায় শিকার, আজ রাত্রে তাহলে জমবে ভালো।

সেই স্বাদ কল্পনা করেই ভাত খাচ্ছে ওরা। সানকি সবার ভাগ্যে জোটেনি, মাটির বড় বড় সরা, তাতেই গোটা গোটা ভাত আর একহাতা করে পিঁয়াজ—দু'একটা আলুর চিহ্ন, আর লঙ্কা দিয়ে ঝোল; ব্যস পরমানন্দে খেয়ে চলেছে। মানুষের বাঁচবার পক্ষে এর চেয়ে সামান্যতম প্রয়োজন আর কি হতে পারে? দেশে বোধহয় এও জোটেনা; জুটলে স্ত্রী পুত্র পরিবার, নিজের বাড়ী ছেড়ে অকূল সমুদ্রে, এই গহন অরণ্যে প্রাণ হাতে করে কেউ আসতো বলে মনে হয় না।

একজন বুড়ো লোককে দেখি আমাদের নৌকার পাটাতনে—ওদের দলের মধ্য থেকে বার হয়ে এসে একলা খাচ্ছে। পাশে ছোট একটা এনামেলের ঘটিতে রয়েছে জল। আমাকে দেখে আধ-খাওয়া করেই উঠছে, বাধা দিই—"খাও—খাও—ঠিক আছে।"

আলিসাহেব হেডমাঝি, পদস্থ লোক। তার খাওয়ার বোধহয় স্পেশাল ব্যবস্থা আছে। সে বলে ওঠে—"সর্দার;—ছ্যামড়াদের মধ্যি বসেনা।"

—নীরবে খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে এগিয়ে আসে সর্দার আমার দিকে, কি যেন বলতে চায়! বুঝতে পারি প্রয়োজনটা। আরও কয়েকজন বাওয়ালিও ছিল। এক প্যাকেট বিড়ি বার করে দিলাম—"নাও, ভাগ করে নাও তোমরা।"

দেখলাম একজন একটার বেশী নিল না, ঠিক ভাগ করেই নিল তারা; কাজে বার হয়ে গেছে সকলেই। নৌকায় শুধু আলিসাহেব, সরিফ আর আমি। পাকানি হাড়িকুড়ি মেজে তবে যাবে। এমন সময় দেখা দিল ইসুফের ডিঙ্গি খালের মাথায়। রাঙ্গাদা বসে আছেন গুম হয়ে; হয়তো ডিঙ্গির খোলে পড়ে আছে হরিণের দেহটা—কতবড় কে জানে?

এগিয়ে আসতে দেখি রাঙ্গাদার কাপড় জামা ভিজে, ইসুফের অবস্থাও তাই। একটু আশ্চর্য্য হই,—"কি হলো রাঙ্গাদা।"

রাঙ্গাদা জবাব দিলেন না, ইসুফ তাঁদের নৌকায় রাঙ্গাদাকে তুলে দিয়ে এসে ডিঙ্গিতে বসেই বালতি বালতি জল ঢালতে থাকে হড় হড় করে।

—'কি হল ইসুফ মিঞা, হরিণ কোথায়?'

—"তোওবা, তোওবা' ইসুফ তখনও জল ঢালছে। ঘটনাটা শুনেছিলাম পরে ইসুফের মুখেই।

—কেওড়া গাছের উপর ডালে বসে রাঙ্গাদা, নীচের ডালে ইসুফ। হরিণের পথ চেয়ে আছে দুজনে। নীরব বনের বুকে খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়, এগিয়ে আসছে শব্দটা। হঠাৎ অনুভব করে ইসুফ তার টাক মাথার উপর টোপ টোপ করে কি পড়ছে! উপরের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে—হঠাৎ কপালে এসে পড়লো খানিকটা দুর্গন্ধময় পদার্থ—তার পর আরও খানিকটা। চীৎকার করে ওঠে ইসুফ চোখ মুখ বন্ধ অবস্থাতেই। রাঙ্গাদার বন্দুক হাত থেকে পড়ে গেছে নীচে, দুহাতে গাছের ডাল ধরে অব্যক্ত ভাষায় চীৎকার সুরু করেছে—আঁ-আঁ-ও—"

কোন কিছুর ঠিক নাই। ইসুফ ওই অবস্থাতেই পড়ি কি মরি গোছের অবস্থায় গিয়ে নেমেছে খালের জলে, মুখ চোখ ধুয়েও দুর্গন্ধ যায়না। রাঙ্গাবাবু তখনও চীৎকার করে চলেছেন।

—"ভাবলাম বীর পুরুষিরে গাছের আগায় 'থুরি'ই চলি যাই, সকালবেলাতেই একেবারে মুখেই ও কম্ম শেষ করি দিয়লো। ভাব ম্যাশ গাছির উপর থাকি নামালাম, বন্দুক খুঁজি বার করি টানি তোললাম ডিঙ্গিতে। খুব হরিণ খাতি চেয়েলাম। তোওবা-তোওবা।"

—"কি দেখেছিলে? হরিণ না বাঘ?"

—"ঘোড়ার ডিম। কয়ডা বুড়া বাঁদর—মাটিতে 'দিয়ালো' কর্‌ছিল।"

রাঙ্গাদাকে আর সেদিন এমুখো হতে দেখলাম না। হয়তো লজ্জা পেয়েছিলেন।

বড়দা এ ভাঁটায় ফিরতে পারলেন না, সেই রাত্রি শেষে পাড়ি জমাবেন, নাহয় কাল দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর নামলাম বনের মধ্যে, আলিসাহেব, ইসুফ, আর দু' জন মাঝির সঙ্গে। ডিঙ্গি খাড়ে বেঁধে তীরে উঠলাম। সুন্দরি গাছের ঘের পার হয়ে ঢুকলাম গভীর বনে, আশে পাশে দুচারটে গোলপাতার গাছ, কাণ্ড বলতে বিশেষ নাই—গোড়া থেকেই উঠেছে লম্বা লম্বা নারকেল পাতার মত পাতা। খেজুরের কাঁদির মত ফুল ধরেছে, ওর থেকে ফল হয় ছোট ছোট তালের মত। দীর্ঘ বিস্তৃত সুন্দর বনে কেউ যদি কোনদিন হারিয়ে যায়, বাঁচবার মত খাদ্য সে কোন গাছ থেকেই পাবেনা। মানভুম—বাঁকুড়া—সিংভুমের বন অঞ্চলে ঘুরেছি, সেখানে বনজ ফল কিছু কিছু হয়, যেমন বনকুল, বেল, আতা, আমলকী, পিয়াল, ভুড়ুর, বঁইচি, ভালাই-মহুয়া কেঁদ, ইত্যাদি। ঝরণা মাঝে মাঝে আছে। দু'একটা দিন সে অনায়াসেই কাটাতে পারে, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনে একটা ফলও নাই যা মানুষে খেতে পারে, জল চারিদিকে, কিন্তু অসম্ভব নোনা, মুখে দিলে জিব জ্বালা করে। একমাত্র গোলে গাছের ফলের মধ্যেই একটু শাঁস থাকে—যা ভক্ষণ-যোগ্য। কিন্তু তাও সবসময় পাওয়া যায় না। আর আছে কেওড়া ফল; এতো টক যে কোন বাঘ যদি ভুল করে চেটে ফেলে—বনময় ছুটে বেড়াবে সে। মানুষকে তার নিভৃত লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দিতে প্রকৃতি নারাজ, তাই এমনি বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে সে পদে পদে।

নিবিড় অরণ্য, নীচে পায়ের তলে মাটি কাদায় গরাণের শুলো খাড়া হয়ে আছে। সন্তর্পণে চলেছি। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে চলতে হয়, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল আলীসাহেব থমকে। সামনে একটু ফাঁকা জায়গাতে চরছিল কয়েকটা হরিণ, আলপনা আঁকা গা, একফালি রোদ পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে, কিসের যেন গন্ধ পেয়েছে ওরা, চকিতের মধ্যে লাফ দিয়ে হলুদ পাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল. দাঁড়িয়ে রয়েছে স্তব্ধ হয়ে একটা হরিণের বাচ্চা, কালো ডাগর দুটো চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে ভয়লেশহীন চাহনিতে। অপরূপ মাধুরীভরা সে চোখ। কত যেন পরিচিত—নীরব প্রশ্নে ভরা রয়েছে। বন্দুক তুলেছিলাম,

কেন জালিখা নামিয়ে নিলাম! এইটুকু বাচ্চা—ওকে মারতে মন চায় না। কি ভেবে ছোট একটা লাফ দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

—'ফায়ার' করলেই নির্ঘাৎ পড়তো বাবু, ছেড়ে দিলেন?

ইসুফের জিবে লালা পড়ছে যেন। সকালের ক্ষোভ আবার মনে পড়ে।

—"আপনাদের দ্বারা শিকার হবে না।"

…"কুউ…উ…উ।"

দূর বনের মধ্য থেকে আসছে ডাকটা।…উৎকর্ণ হয়ে শুনে ইসুফ দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে—বিকট শব্দে, "কু উ উ"

বাঁ পাশের বন থেকে ভেসে আসে আর একটা শব্দ। কি যেন আতঙ্ক ফুটে ওঠে ওদের বিচিত্র স্বরে। আলি সাহেব বলে ওঠে—মৌখালির দিক থেকে আসছে শব্দটা, ডিঙ্গিতে উঠে চল একবার তলাস নিয়ে আসি।

মিনিট পনের ধরে খাল বেয়ে গিয়ে পড়লাম সমুদ্রের কাছাকাছি ছোট একটা খালে। সূর্য্য পশ্চিম গগন সীমায় পৌঁছতে আর দেরী নাই।…গাছের প্রহরায় স্তিমিত হয়ে গেছে তার ম্লান আলো। খালের ধারে গোটাকতক ডিঙি এসে হাজির হয়েছে। এসে উপস্থিত হয়েছে সেই ছেলেটা, বাবার শোকে মুহ্যমান হয়েছিল, আজ সেই শব্দ পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসেছে লতিফ হাতে একটা ল্যাজা। চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে, যেন অন্য মানুষ। কান্নাকাটি হৈ চৈ করছে কয়েকজন লোক। রাঙ্গাদাও দেখি গিয়ে জুটেছেন। হাতে ঝকঝক করছে আই-ভ্যান জোনসের ডবল ব্যারেল রিভালভার।

…একজন কাঠুরেকে বাঘে চোট করেছে।

আমরা গিয়ে জুটতে দলে বেশ কয়েকজনই হ'ল। আলী সাহেব ইসুফ দুজনেই অসীমসাহসী। বলে ওঠে—"লাশ আনতে হবে, বেশীদূর নিয়ে যেতে পারেনি। ওদিকেই খাল, জোয়ারের জলে লাশ নিয়ে পার হতে পারবে না।"

কিন্তু কে যাবে রক্তপিপাসী বাঘের সামনে, রক্তের স্বাদ পেয়ে সে মেতে উঠেছে, সামনে যে যাবে সে আর ফিরে আসবে না।—"সঙ্গে চারটে বন্দুক আছে, এতগুলো লোক আমরা—দেখাই যাক না চেষ্টা করে।"

চমকে উঠি, কি দুর্ভোগ! হাতে বন্দুক নিয়ে কি পাকাশিকারী হয়ে গেছি।…দেখতে দেখতে গোটা বিশেক মশাল তৈরী হয়ে গেল; আগুনের কাছে আসবে না। তারপর আছে বন্দুক! রাঙ্গাদার মত অবস্থা কি শেষকালে আমার হবে? লোকজনগুলো চীৎকার করছে! তৈরী হয়ে ঢুকলাম বনে। চারটে বন্দুক চারদিকে নজর রাখবে এবং মাঝে মাঝে ফায়ার করবে। বৈকালের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে, নেমে আসছে বনভূমিতে হালকা অন্ধকারের আভাস, কি এক নিথর রহস্য বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বনভূমি। একটা জায়গায় পড়ে আছে কাপড়খানা, রক্তের দাগ ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে! বড় বড় থাবার দাগ নরম কাদায় তখনও মিলিয়ে যায় নি।

সুরু হ'ল চীৎকার, হৈ হৈ! জ্বলে উঠলো মশালগুলো, বনভূমির গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে আলো, একসঙ্গে গর্জ্জে উঠল চারটে বন্দুক।

—খবরদার কেউ পিছবে না, পিছলেই বিপদ। হুঁসিয়ার

—হা রা রা রা রা দুম গুড়ুম গুড়ুম! বনভূমি কেঁপে ওঠে বীভৎস চীৎকার। একটি মুহূর্ত্ত! সমস্ত চীৎকার ছাপিয়ে ওঠে…একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন! হাত কাঁপছে। বন্দুকটা চেপে ধরে ট্রিগার টানলাম। বাঘ মারতে আসিনি, তাড়াতে এসেছি! একসঙ্গে চারটে বন্দুকের গর্জনে লাফ দিয়ে কি যেন ছায়ার মত সরে গেল সামনে থেকে। অদূরে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা। ঘাড় ভেঙ্গে ফেলেছে তার, দেহের নরম মাংসগুলো প্রায় খুবলে তোলা হয়েছে, চেয়ে দেখা যায় না। কি এক নারকীয় বিভীষিকা আঁকা রয়েছে হতভাগ্যের দেহে!

…কেঁপে ওঠে বনভূমি! কাঁপছে গাছের পাতা! ভীত মানুষের দল প্রাণপণে চীৎকার করে হা রা রা রা। গর্জে ওঠে বন্দুকগুলো।

মৃতদেহ নিয়ে ফিরছি। অন্ধকার জমবার আগেই বার হয়ে আসতে হবে বনের ভিতর থেকে। অনুভব করি আশে পাশেই রয়েছে ওই হিংস্র নরখাদকের অস্তিত্ব। মশালগুলো নিভে আসছে। চীৎকার করে ওরা, বন্দুকগুলোও তাদের চীৎকারে সাড়া দেয়।

খালের ধারে এসে দেখা যায় খালের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। মুখে গোঁফে তার রক্ত রেখা, চোখ দুটো মুখের ছিনিয়ে নেওয়া গ্রাসটার দিকে শেষ চাওয়া চেয়ে আছে। রাঙ্গাদার বন্দুকের দুটো ব্যারেল থেকে গর্জে ওঠে—লাফ দিয়ে সরে গেল সে ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমি কাঁপিয়ে। (ক্রমশঃ)

চৌপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

চরণের তলে উপল-খণ্ড অনেকই রয়েছে পড়ি,
তোরণের তলে রত্ন কখনো যায়নাক গড়াগড়ি।
উপলের মতো রত্ন চরণ করেনাক সন্ধান।
অনেক খুঁজিয়া কচিৎ কখনো পায় তা ভাগ্যবান।

(২)

ক্ষীরসর লুচি-চিনি পলান্নের সাথে যিনি
দিয়াছেন অরুচি জিহ্বায়,
দিয়াছেন তিনি সুধা শাকান্নের সাথে ক্ষুধা।
অবিচারী বলো না তাঁহায়।

(৩)

যে বুঝে স্বাস্থ্যের মর্ম সুখাদ্যও খায় না সে
অনিবার্য না হইলে ক্ষুধা,
যে বুঝে সত্যের মর্ম সুবচনও বলে না সে
না রহিলে তার সত্য-সুধা।

(৪)

মাধুর্য হইয়া যাহা জাগে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে
আবেশ হইয়া তাই চায় রূপ কবিদের চিতে।
আবেগ হইয়া তাই জাগে রসে, রূপে, ছন্দে, গানে,
আনন্দ হইয়া তাই উচ্ছলিত রসজ্ঞের প্রাণে।

(৫)

আলোর তরঙ্গ দেখে একদিকে হিংসা করে লোকে,
তিন দিকে অন্ধকার পারাবার পড়েনাক চোখে।
দেখিত তাকায়ে যদি স্থলে জলে সব দিক পানে
পাইত হিংসার ক্ষতে অনায়াসে প্রলেপ পরাণে।

(৬)

ধনীরে কেন হিংসা করো, তাহার মতো অভাগা কে ?
চলিয়া যাবে, পড়িয়া র'বে সকলি তার পিছুতে।
তোমাকে যবে যাইতে হবে, চলিয়া যাবে এক ডাকে,
চাবে না পিছে, হবে না ক্ষোভ রবে না মায়া কিছুতে।

(৭)

দারা-পুত্র পরিবার লয়ে করে যে সংসার
দুঃখী দেশে স্বাধীনতা ভোগ্য নয় তার।
নাই যার পিছু টান সে স্বাধীন ভাগ্যবান
রজকের দিগম্বর ধারে কভু ধার ?

(৮)

শূন্য পেলেই ভরি মোরা যত কল্প-সৃষ্টি দিয়া,
মৃত্যু হলেই সকল মানুষে সেইখানে দিই ঠাঁই।
অসীম শূন্য কি দিয়া ভরিব ? স্বপ্নেরে সাজাইয়া
কত না স্বরগ, কত না নরক, মায়ালোক রচি তাই।

(৯)

দিনে আমি ফসল ফলাই রাতে ফুটাই ফুল।
ধুলায় ভরা দিবস, রাতি সুবাসে মশগুল।
লক্ষ্মী আসেন দিনের বেলায় মর্মরিয়া রথে,
সরস্বতী রাতের বেলায় নামেন ছায়াপথে।

(১০)

একালের মেঘদূত ও দেশের বার্তা বহে
এ দেশের কানে
সে কালের মেঘদূত যুগ হতে যুগান্তরে
বার্তা বহি আনে।

(১১)

বৃথা এ রচনা জানি, জানি এর আয়ুটুকু কত,
নিশান্তে ঝরিয়া যাবে নিতান্তই শেফালির মত।
মিথ্যা এর অভিমান বাঁচিবার আশা এ ধরায়,
মিথ্যা নয়, এক পলও যে আনন্দ দিয়াছে আমায়।

(১২)

পল্লবই বাড়িয়া যায় অবিশ্রান্ত রসের যোগানে,
কুসুম ফুটে না সেই পর্ণোৎসবে মনের বাগানে।
প্রাচুর্যের অবসানে পত্রসজ্জা হয় অপ্রতুল।
সে রস সঞ্চিত রয় মূলে যবে, তাই ফুটে ফুল।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা শতবার্ষিকী জয়ন্তী

উপানন্দ

সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হোলো—ঋতুদের বর্ষপরিক্রমার স্তরে স্তরে পরমপুরুষ যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই মানস-দুহিতা ও দীক্ষিতা শিষ্যা বৈদিক যুগের নৈষ্ঠিক চিরব্রহ্মচারিণী মন্ত্রসিদ্ধা তপস্বিনী জননীর আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে যেরূপভাবে স্মৃতি-পূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হোলো, বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলাময় পূত চরিত্রের কথা যেরূপভাবে আলোচিত হোলো, তা'তে আজ বর্ষ বিদায়ের দিনে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যে, জাতি তার ব্রহ্মবাদিনী জননীকে আজও ধ্যানের বিগ্রহ করে রেখেছে'—আজও ভোলেনি তার আরাধ্যা মাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে দেশের পথে প্রান্তরে অরণ্যে কান্তারে গাঙ্গেয় উপকূলে সন্ধান করেছিলেন, যে মায়ের উদ্দেশ্যে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র রচনা করেছিলেন, সেই দেশমাতৃকার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার আবির্ভাব হয়েছিল আজি হোতে শতবর্ষ আগে। সমগ্র বৎসর ধরে যে শতবার্ষিকী উৎসব হোলো, সেটি মাত্র অনুষ্ঠান নয়—শরণাগতি। এই অনুষ্ঠানের মর্ম্মকাহিনী—'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" যন্ত্র-সভ্যতার আসুরিক জড়ভাবাপন্ন প্রেয় বুদ্ধিকে পরিহার করে আজ স্বদেশ ও সমাজ শ্রীশ্রীগৌরীমার অবতরণ মাহাত্ম্য অনুধ্যান করতে করতে শ্রেয় পন্থাকে আশ্রয় ও অঙ্গীকার করতে চেয়েছে—এই শুভবুদ্ধি, এই সঙ্কল্পই আত্মসৃজন, যাতে করে আত্মোপলব্ধি হয়, আর ভাগবতজীবন গঠিত হয়ে ভাবী ভারতে আবার মহত্তম আদর্শের উদয় ভারতীর আলোক পরিকীর্ণ হয়—অতিমানবের উপনিবেশ গঠিত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরীমার জীবনী পর্য্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই মহাকবি ভবভূতির সেই কথাটি মনে পড়ে—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি' মায়ের চরিত্রে যে লোকোত্তর কোমলতা ও কঠিনতার সমন্বয় ঘটেছিল, তা থেকে প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে গেছেন মাতৃজাতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশে দৈবীসম্পদ বিতরণ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পণ্যতরী এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে সময়ে প্রথমে এসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপর্য্যয় আনলো, আর পশ্বাচারী বিজাতির পরাধীনতার প্রগাঢ় পঙ্কে পতিত হয়ে দেশ জননী ও তাঁর সন্তানেরা বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় নারীসমাজ ধর্ষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও বিপন্ন হোলো, সে সময়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসীদের যে গুপ্ত সম্মেলন হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তারই কর্ম্মধারার বিভিন্ন অভিব্যক্তি আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাসে সেই সব কর্ম্মধারার কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ আমরা অনুধাবন করেছি। সেদিনের সন্ন্যাসীদের পুঞ্জীভূত অধ্যাত্মশক্তি, যা ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে, দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা থেকেই ভগবানের অবতরণ হয়েছিল কামারপুকুরে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁরই তপস্যার যজ্ঞশালায় যাঁরা হোতা ও হোত্রী হয়ে তাঁর ঋত্বিক্ মন্ত্রে আহুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরীমাতা সর্ব্বোত্তম। সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকে আজ পর্য্যন্ত যুগে যুগে পৃথিবীতে যত ধর্ম্মাচার্য্য মুনিঋষি সাধুসন্ত, অবতার ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সাধনার যত বাণী শুনিয়ে গেছেন, যত পথ দেখিয়ে গেছেন, যত মত ব্যক্ত করে গেছেন, তার প্রত্যেকটি নিজের জীবনে অনুশীলন করে ভগবান পরমহংস অল্পসময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা স্তরের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ব্যক্ত করে গেছেন—প্রত্যেকটা ঠিক, কোনটার ভেতরই ভ্রান্তি নেই—আছে চরম সত্য। তিনি বলে গেলেন—'যত মত তত পথ—'

এই পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীশ্রীগৌরীমাতা সাধনার অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে অধ্যাত্মজগতের মানস-সরোবরে অবগাহন করেছিলেন আর বলেছিলেন—'দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন

করা যায়, সেই প্রকার নিজের হৃদয় দর্পণে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা সকল সাধনার সার।...তাঁকে পেতে হোলে সাধন ভজন চাই। মানুষ চায় ফাঁকি দিয়ে 'বেয়ারিং পোষ্টে' পার হোতে—তা কি কখনো হয়? সবটা মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসলে, একেবারে মানুষের মতই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়।' শ্রীশ্রীগৌরীমার মধ্যে ছিল অসাধারণ বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য ও সংগঠন শক্তি।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৬৪ সালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ জন্মতিথি মাঘী-শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, গৌরী মা মহানগরী কলিকাতার বুকে ভবানীপুর পল্লীতে এক সাধনসমৃদ্ধ আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম মৃড়ানী, অন্য নাম রুদ্রাণী। তাঁর পিতা পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় তেজস্বী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। মাতা বিদুষী সাধিকা গিরিবালা দেবী ছিলেন সুগায়িকা ও কবি এবং বাংলা, সংস্কৃত, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচলন ছিল না, অথচ এই অন্তঃপুরচারিণী এতগুলি ভাষায় কি ভাবে বুৎপত্তিলাভ করেছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হোতে হয়। তাঁর রচিত 'নামসার' এবং 'বৈরাগ্য সঙ্গীতমালা' বহুকাল পূর্ব্বে, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি উচ্চস্তরের সাধিকা ও পরমহংসদেবের কৃপাধন্যা ছিলেন।

এই পবিত্র পরিবারের উর্ব্বরক্ষেত্রেই মহাশক্তির বীজ পতিত হয়েছিল, যার ফলে ভগবানের মর্ত্ত্য লীলাকে প্রকট করবার জন্যে তাঁর বিশিষ্ট বিভূতি শ্রীশ্রীগৌরীমার আবির্ভাব কালিকাক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল। পার্ব্বতী-চরণের নিবাস হাওড়া জেলায় শিবপুরে। গিরিবালা দেবীর মাতামহ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপুত্রক হওয়ায়, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরা-ধিকারিণী হয়েছিলেন শ্রীশ্রীগৌরীমাতার জননী। এইসূত্রে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ভবানীপুরে বাস করতেন, আর মৃড়ানী (ওরফে গৌরীমাতা) বাল্যাবধি সেখানে বর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে কলিকাতার বিশপ রবার্ট মিলম্যান ও তাঁর ভগ্নী কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিলম্যানের চেষ্টায় উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকাদের জন্য ভবানীপুরে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধানা-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন একজন ইংরাজ মহিলা—কুমারী হারফোর্ড। এখানে মৃড়ানী প্রথম বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোত্তম ছাত্রী হওয়ার জন্যে তদানীন্তন লাটসাহেবের পত্নী তাঁকে একটি সুবর্ণখচিত পেটিকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল উত্তমভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্য, কিন্তু সেকালের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

কিছুদিনের মধ্যে মিশনারীদের সঙ্গে মৃড়ানীর ধর্ম্ম বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এর পর আর তাঁর পক্ষে বেশি-দিন বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় নি। তাঁর প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের বিধিনিষেধ—প্রথমতঃ এই দুই কারণে তাঁর বিদ্যা-লয়ে যাওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু এই বয়সের মধ্যেই [illegible] দেব [illegible] স্তোত্র, চণ্ডী, গীতা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের বহু অংশ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ছেলে বেলা থেকে তিনি দেখিয়েছেন—চিত্তের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও বাহ্যিক বস্তুতে অনাসক্তি। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি ছিল ভগবৎমুখী। কালীর প্রতি যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের প্রতিও তেমনই, তাঁর ভক্তি ছিল। কনক চাঁপার মত তাঁর গায়ের রঙ, দেখতেও অপূর্ব্ব সুন্দরী,—ছেলেবেলায় যখন পূজার্চ্চনায় যোগ দিতেন, তখন মনে হতো সাক্ষাৎ গৌরী। উত্তরকালে হিমালয়ে অবস্থানকালে পাহাড়িয়ারা তাঁকে গৌরী মায়ী বলে ডাকতো—তারা দেখেছে তাঁকে সাক্ষাৎ গৌরীরূপে।

শরৎকাল। ভবানীপুরের এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত বালক-বালিকাদের অদূরে ভাব-বিভোরা বালিকা আনমনে বসেছিলেন। দৈবা-লক্ষণযুক্ত পথিক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে সস্নেহে বললেন—'সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটী চুপচাপ করে বসে আছ?'

'—ও সব খেলা আমার ভালো লাগে না—'

প্রণাম করতেই ব্রাহ্মণ মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন—'কৃষ্ণে ভক্তি হোক—'

কিছুদিন পরে রাস পুর্ণিমার দিনে দক্ষিণেশ্বরের কাছে নিমুতে-ঘোলার বাগানে সাধকের নিভৃত সাধন কুটীরে মৃড়ানীর দীক্ষালাভ হোলো। এই ব্রাহ্মণই ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

বৃন্দাবন থেকে ভবানীপুরে মৃড়ানীদের বাড়ী একজন ব্রজরমণী আসেন। ইনি একটী সুদর্শন নারায়ণ শিলা মৃড়ানীকে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এই সিদ্ধ নারায়ণশিলা 'রাধা দামোদর'কে মৃড়ানী আজীবন পরম নিষ্ঠা, ভক্তি, ও প্রেমের সঙ্গে সেবাপূজা করেছেন। সংসারের খেলা-ঘরে এই শিলাই কায়ারূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে রাত্রিদিন খেলা করেছেন। তেরো বছর বয়স। বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত। মৃড়ানী রুদ্রাণী মূর্ত্তি ধারণ করে বললেন—'তেমন বরকেই বিয়ে করবো যে কখন মরে না।' গিরিবালা বললেন—'মা', তোর যদি বৈরাগ্যের ফুল সত্যিই ফুটে থাকে, আমি বাধা দেবো না'—বর ফিরে গেল, মৃড়ানী বিয়ের রাত্রে মায়ের সঙ্গে 'পালিয়ে গেলেন। এরপর অমৃতের সন্ধান পেলেন আঠারো বছর বয়সে। গঙ্গাসাগর তীর্থ দর্শনে গিয়ে আত্মীয় পরিজনের অজ্ঞাতে, একদিন মৃড়ানী সংসার বন্ধন ছিন্ন করে একদল পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে হরিদ্বারের দিকে চলে গেলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের সকল তীর্থস্থানে তিনি গেলেন। হিমালয় সাধকের সাধনভূমি, দেবতার লীলাভূমি, আর গৌরীর তপোভূমি, একথা তিনি বাল্যকাল থেকে তাঁর চণ্ডীমামার কাছে শুনে এসেছেন। এই হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে কঠোর তপস্যা সুরু করলেন, পরমাসুন্দরী মেয়ে—চেহারা বিকৃত করে গেরুয়া পরলেন, আর ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি হিংস্র জীব জানোয়ারের ভেতর গহন-প্রদেশে তপস্যায় আত্মসমাহিত হোলেন। এই সব খাপদই হোলো তাঁর পরিচর। গাঙ্গোত্রীর পথে গৌরীমা যে সময়ে উত্তরকাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে অর্চ্চনরতা, সে সময়ে ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর দাদা তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

—"এরকম দুর্গম স্থানে (বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে) একাকিনী এক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণীকে দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। গৌরীমা তখন 'মন্দির মধ্যে নিবিষ্টমনে স্তব কীর্ত্তন কচ্ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কঠোরভাব পালন করতেন। যেন তেজস্বিতা, পবিত্রতা, ও সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি।" তিনি হিমালয়ের বহু দুর্গম প্রদেশে বসে দুর্লভের কৃপা পেয়েছিলেন। মীরার মতই তিনি ভাবোন্মাদিনী হয়েছিলেন। অবশেষে গৌরীমা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়ে বৃন্দাবনে এসে রইলেন। তাঁর শ্যামাচরণকাকা হঠাৎ বৃন্দাবনে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁকে বাড়ী নিয়ে এলেন, কিন্তু সে সময়ে পিতা ও মাতামহীর লোকান্তর ঘটেছে। অল্পকাল মায়ের কাছে থেকে তিনি চলে গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। এখানেই তাঁর পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত জমিদার রাধামোহন বসু ও তাঁর ছেলে বলরাম বসুর সঙ্গে দেখা হয়। ১২৮৯ সাল। গৌরীমার বয়স তখন পঁচিশ। বলরাম বসুদের সঙ্গে কল্‌কাতায় এসে বসু ভবনে তাঁর ভাবাবেশ হয়। এরপরই যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁকে আনা হোলে তাঁর পূর্ব্ব স্মৃতি সব মনে পড়ে গেল। এখানে এসে তিনি ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সেবা আরম্ভ করলেন। শ্রীমাকে ঠাকুর বল্লেন—ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো'—ঠাকুর বল্‌তেন—'গৌরী মহাতপস্বিনী, মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী।' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দও গৌরীমাকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং জগদম্বাজ্ঞানে নারী সেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। গৌরীমাকে একদিন ঠাকুর বললেন—'দেখ গৌরী! আমি জল ঢাল্‌ছি, তুই কাদা চটকা।··· সাধনভজন ঢের হয়েছে এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগ্‌বে। ওদের বড় কষ্ট।' গৌরীমা হিমালয়ে কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্য জানালে ঠাকুর বললেন—'না গো না, এ টাউনে বসে কাজ করতে হবে'—এরপর ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় গৌরীমা উপস্থিত ছিলেন না। বৃন্দাবনের গহন প্রদেশে তপস্যা করছিলেন। পরে সংবাদ পেয়ে তিনি দেহত্যাগ করতে উদ্যত হোলে ঠাকুর সশরীরে এসে বাধা দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করে গৌরীমা মাতৃজাতির কল্যাণে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে হোলো প্রতিষ্ঠা। তারপর স্থায়ীভাবে ১৩৩১ সালে হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে নিজস্ব ত্রিতল বাটিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হোলো। এই মহানগরীতে সুরু হোলো 'জ্যান্তো জগদম্বাদের' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মহাশক্তিতে পরিণত করতে। বর্ত্তমানে এরই আশ্রমশক্তি চিরব্রহ্মচারিণী শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী। মাতৃসঙ্ঘের ইনিই পরিচালিকা। এঁরও অধ্যাত্ম জীবনের বহু রহস্য একদিন তোমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে—সেদিন তোমরাও বিস্মিত হবে এই ভেবে, কাছে যে প্রদীপ জ্বলছে তার শিখা নিয়ে আমাদের দীপ জ্বালানো হোলো না—দূরের আলো দেখে আমরা ছুটেছি বৃথা সময় অপচয় করে। গৌরী মা বলে গেছেন—'বাবা সকল, মানুষ হয়ে জন্মেছ, এমনভাবে চলো না—যাতে প্রকৃত মানুষ হবার পথে বাধা পড়ে। সংযম শিক্ষা করবার এই তো সময়? তোমরা সংযমী হও। সংযম না থাকলে, অন্য কোন সুশিক্ষা দাঁড়াবে না। দেশের আশাস্থল তোমরা, তোমরা যদি মানুষ না হও, তবে দেশের 'আশা' কোথায়?"—১৭ই ফাল্গুন সন ১৩৪৪ সাল মঙ্গলবার তিনি মর্ত্ত্যকায়া ত্যাগ করে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হ'ন। আমরা এবার কাশীপুরের শ্মশানে তাঁর সমাধি সমীপে অর্চ্চনা করে প্রাণের প্রণাম জানিয়ে এলাম। শাশ্বত আনন্দময় লোকে চলেছে তাঁর নিত্যলীলা। তিনি দেশের সন্তানদের কৃপা করুন।

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥ ওঁ

অহঙ্কারী রাজা

(মালব দেশের উপকথা)

শ্রীমতী ঊষাবতী দেবী

অনেক অনেক দিন আগে মালব দেশে, অবন্তী নগরে এক রাজা রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন এবং তাঁহার এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য প্রজারা কষ্ট পাইত। তাঁহার রাজ্যে কোনও প্রজার গৌরব বা সম্মান থাকিত না। ধার্মিক লোক সাধু-সন্তরাও ভয়ে ভয়ে থাকিত, রাজদ্বারে অপমানের ভয়ে সকলে সশঙ্কিত থাকিত।

রাজার এইরূপও বিশ্বাস ছিল—তিনিই একমাত্র বুদ্ধিমান ও সকলের সম্মানের পাত্র। তাঁহার আর একটি দোষ ছিল—তিনি কাহারও কোনও ভালো জিনিষ দেখিলে, তাহা লইয়া গিয়া নিজ ভাণ্ডারে রাখিতেন। কাহারও একটি সুন্দর ফুলের গাছ বা একটি চমৎকার শিস-দেওয়া পাখী—সবই রাজা কাড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিতেন। এইজন্য প্রজারাও অসুখী হইয়া রাজার নানাবিধ সমালোচনা করিত আড়ালে।

সেদিন কি এক পুণ্যতিথি ছিলো। খুব ভোরবেলা সূর্য যখন আকাশে উঠিতে চাহিতেছেন, আর পূর্বাকাশ সিন্দুর বর্ণ হইয়া ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, তখন অবন্তী-বাসী একটি গরীব ব্রাহ্মণ অবন্তী দেশ-বাহিনী পুণ্যতোয়া শিপ্রানদীতে স্নান সারিয়া নবউদিত সূর্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান

করিতেছেন ; এমন সময়ে পাশ দিয়া স্রোতের টানে একখানি বৃহদাকার শুক্তি ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন। ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া শুক্তি খানিকে সংগ্রহ করিলেন। তাহার ভিতর উজ্জলবর্ণ সুন্দর একটি মুক্তা ছিল। মুক্তাটির নিটোল গঠন ও অতি সুন্দর উজ্জল বর্ণ-সমাবেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহা ভগবানের দান বলিয়া ভগবানকে প্রণাম জানাইলেন।'

শিপ্রাতটে সেদিন পুণ্যার্থী স্নানার্থীর ভিড়। সকলেই ব্রাহ্মণের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া একবার করিয়া সেই মুক্তাটিকে দেখিতে চাহিতেছিল। ক্রমে এই সংবাদ রাজার নিকটেও পৌঁছিয়া গেল। তিনি তখনই সিপাহী পাঠাইলেন—মুক্তাসহ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া যাইতে। ব্রাহ্মণ তখনও নিজ কুটিরে ফিরিতে পারেন নাই। স্নানান্তে তিনি গণেশজীকে দর্শন ও পূজা করিয়া তবে আপন কুটিরে ফিরিতেন। আজও গণেশজীর পূজা ও দর্শন সমাপনান্তে নিজ ছিন্ন গামছা খানিতে সযত্নেবাঁধা শুক্তিসহ মুক্তাটি লইয়া এক ঘটি জল হাতে, সবে গণেশজীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া, ভগবানের স্তব-গান করিতে করিতে আপন পর্ণ-কুটিরের পানে চলিয়াছেন এমন সময়ে রাজার পাইক আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া কহিল—"ঠাকুর মশাই! রাজার হুকুম এখনই আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।" নিরুপায় ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল মনে পাইকের সঙ্গে রাজ-দরবারে পঁহুছিলেন।

রাজা কহিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি নাকি আজ সুন্দর একটি মুক্তা পেয়েছ—কই দেখি?" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ছেঁড়া গামছা খুলিয়া শুক্তিসহ মুক্তাটি রাজার হাতে সমর্পণ করিলেন। রাজা মুক্তাটি দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর তো! ওহে বৃদ্ধ! আমার রাজ কোষে এমন জিনিষ নেই।—আর তুমি তো বেশ লোক! আমায় না জানিয়ে জিনিষটি লুকিয়ে নিজের বলে নিয়ে চলেছ। এ আর তুমি পাবে না—যাও—এখন বাড়ী যেতে পারো—তুমি কি জানো না যে সব ভালো জিনিষ শুধু রাজার জন্য?" ব্রাহ্মণ নতশিরে—"মহারাজের মঙ্গল হউক" বলিয়া দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মুক্তাটি অন্ততঃ ব্রাহ্মণীকে দেখাইবেন বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন—মনে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ গৃহে না ফিরিয়া আবার গণেশজীর মন্দির চত্বরের পাশে ফুল বাগানের একধারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এখন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন ঠিক চাঁপাগাছটিরই তলে এবং একজোড়া দোয়েল-দোয়েলী ঐ গাছের ঘন পত্র-পল্লবের মাঝখানে কিছুদিন হইতে একটি সুন্দর নীড় তৈয়ারী করিয়া বাস করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতেন, স্তব পাঠের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন—দোয়েল-দম্পতি ঐ ভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে খুবই ভক্তি করিত। তখনকার দিনে সারা জীব-জগতেই ছিল প্রাণের ঐক্য এবং পরস্পর প্রীতির অটুট ডোর। এমন কি তখনকার দিনে পাখীরাও মানুষের ভাষা বলিতে এবং বুঝিতে পারিত। বলাবাহুল্য, আমাদের এই দোয়েল-দম্পতিও সে শক্তি রাখিত। তাহারা দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ভারী সুন্দর ও অতি চমৎকার শিস্ দিয়ে গান গাহিতে পারিত।

ব্রাহ্মণের ঐ রূপ মনোকষ্টের অবস্থা দেখিয়া পাখী দুইটিও বিষণ্ন হইয়া পড়িল। কাতর ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া গেলে দোয়েল-দোয়েলীকে ডাকিয়া বলিল—"ছাখ্, দোয়েলি। রাজাকে আর কেউ কিছু বলতে সাহস না করলেও আমি এক উপায় স্থির করেছি রাজাকে জব্দ করবার—তোরও সাহায্য চাই কিন্তু।"

পরের দিন রাজা সমারোহে তাঁহার মণিমুক্তার কারুকার্যকরা সোনার অপরূপ চতুর্দোলায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ষোলো জন বেহারা ধীরে ধীরে রাজাকে বহন করিয়া চলিতেছে। দশজন অতি সুন্দর কিশোর পরিচারক তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে। সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ-পদ্ম ও রজনীগন্ধার মালা থরে থরে দুলিতেছে—তার সাথে সুরভি ধুপের ধোঁয়া ও মহামূল্য আতরের সুবাস মিশিয়া চতুর্দিকের বাতাস ভারী করিয়াছে। পাইকেরা পথ ঘিরিয়া চলিয়াছে। প্রজা-পরিজন দলে-দলে জয়ধ্বনি দিতেছে রাজ-দর্শনের আনন্দে। মহারাজা বড়ই আনন্দে প্রসন্ন মুখে রত্নময় সুখাসনে বসিয়া আছেন।

এমন সময়ে দোয়েল পাখী দুইটি মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজার শিবিকার উভয় পাশে উড়িতে

লাগিল। রাজা বিস্ময়-ভরে তাহাদের পানে চাহিতেই উভয়ে সমস্বরে শিস্ দিয়া গাহিয়া, উঠিল—

"হায় হায়! রাজ ভণ্ডারমে দম্ড়ি নেহী
নেহী রাজ ভণ্ডারমে মোতী
গরীব কা ধন লেকর বন্তা
রাজা কি দুধ-রোটী!—হায়রে…।"

[হায়! রাজ ভাণ্ডারে নেই কানাকড়ি
নেই কো মণি রতন-হার
গরীবের ধন কেড়ে হয়
রাজার ক্ষীর-সর।]

পাখীর গান ও তার অর্থ রাজার কানে বেশ স্পষ্টভাবেই পৌঁছিল এবং তৎক্ষণাৎ মহারাগে বিচলিত হইয়া বলিলেন—"এই কে আছিস—শীঘ্র ঐ লক্ষ্মীছাড়া পাখী দুটোকে ধরে কেটে ফ্যাল।" চারদিকে "ধরধর" শব্দ শুরু হইল। কিন্তু দোয়েলরা এজন্য প্রস্তুত ছিল—তাহারা একবার বহু উচ্চে উড়িয়া যায়, আবার ক্ষিপ্রবেগে নামিয়া আসিয়াই সমস্বরে গান গাহিতে থাকে। পথে জনতার ভিড়ে চাপা হাসি শোনা যায়। রাজার প্রমোদ-ভ্রমণ একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া একেবারে শয়ন-মহলে দ্বার রুদ্ধ করিলেন

পরদিন রাজা ভ্রমণে বাহির হইলেন অন্য পথে। রাজ-হস্তীর পিঠে রাজা মুক্তার ঝালর-দোলানো হাওদার বসিয়াছেন—মাথার উপর সোনার সূক্ষ্ম কাজ-করা শুভ্র চন্দ্রাতপ। বেশ অনেকটা পথ চলিয়াছেন—পাখীর কথা আর মনেই নাই। এমনসময় শোনা গেলো তীক্ষ্ণ শিসের সহিত গান—

"হায় হায়! রাজ ভণ্ডারমে দম্ড়ী নেহী
নেহী রাজ ভণ্ডারমে মোতী
গরীব কা ধন লে কর্ বন্তা
রাজা কি দুধ-রোটী!—হায়রে…!"

রাজাও আজ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। মনেমনে আগুন হইয়া রাজা পাশে-রাখা ধনুর্বাণ হাতে তুলিলেন—পাখী দুইটিও সে সময় রাজার খুব কাছে। দেখিলেন খুবই ছোট পাখী দুইটি, এখনই প্রাণ হারাইবে। মনেমনে হাসিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে একটি পাখীর ঠোঁট হইতে রাজার কোলে পড়িল একটি ছোট দামড়ী মুদ্রা। দোয়েলী ঐটি মন্দির অঙ্গনে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। রাজার আর তীর ছোড়া হইল না। ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন কোন প্রকারে বিকল হইয়া গেল। রাজা মানুষ—সোনার মোহরই সর্বদা দেখেন—বাস্তবিক দামড়ি পয়সা হাতে লইলেন এই প্রথম। পাখীর গান আর রাজার কাণে গেলনা—তিনি মাহুতকে প্রাসাদে ফিরিবার ইঙ্গিত করিলেন। শয়ন-মহলে একাকী রাজা বহু চিন্তা করিতে লাগিলেন—"ছি ছি। প্রকাশ্য স্থানে ছোট্ট পাখী দুটি এমন ব্যঙ্গ করছে, প্রজাদেরও কি এইটী মনের কথা? দূর ছাই—ব্রাহ্মণের মুক্তাটি না হয় ফিরিয়ে দিই—।" রাজা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে মুক্তাটি লইয়া অনেক ক্ষণ দেখিলেন—"দিয়ে দেবো—না না এমন জিনিষ হাতছাড়া করবো? দিনের পর দিন পাখীর বিদ্রূপ—প্রজারা আড়ালে হাসচে।…" এইসব চিন্তায় রাজার রাত্রি ভোর হইল।

…ভোরের তন্দ্রাটুকু রাজার ভাঙ্গিল দোয়েলের মধুর শিসে—সেই গান আবার তাহারা গাহিতেছে। প্রাসাদের বিস্তৃত গবাক্ষে বসিয়া তাহাদের সুন্দর ক্ষুদ্র কিশলয়-দেহে পূর্বাচল হইতে অরুণ আলোর স্রোত ঝলমল করিতেছে। রাজার মনে এতোটুকু রাগ অভিমান অহঙ্কার আর নাই—বিমল শান্তি ও আনন্দভরা মনে উঠিলেন।

…অল্পসময় পরেই বিরাট রাজসভায় দলে দলে প্রজা-সাধারণ আসিতে লাগিল। প্রত্যেকের যাহা রাজভাণ্ডারে গিয়াছিল, দশগুণ রাজা ফিরাইয়া দিলেন—তাহা ছাড়া সদাব্রত দান করিলেন। ব্রাহ্মণকে মহাসম্মানে আনিয়া মুক্তাটি তো দিলেনই এবং তাঁহার যাবজ্জীবন পরম সুখে থাকার ব্যবস্থাও করিতে ভুলিলেন না। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতায় মুক্তা আবার রাজাকে দান করায় তিনি সেইটী গণেশজীর গলার হারে পরাইয়া দিলেন। আজও সেই মুক্তা গণেশজীর বক্ষস্থানে পরম গৌরবে বিরাজমান। সেই দোয়েল দম্পতিকে রাজা আপন রাজোদ্যানে নীড় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেদিনের সেই বিপুল আনন্দময় মহারাজের জয়ধ্বনির মধ্যে দোয়েল-দম্পতির মধুর ধ্বনি সবার উপরে বাজিয়াছিল।

—

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

মরুময় ভূমি ধূধূ বালু মাটী পাদপাদপহীন,
শুধু কাঁটাবন চীনা বাদামের সারিতে বাবুল গাছ।
কথা বলে শুধু, কথা বলে আর, রাত্রি-আঁধারে লীন
কাঁদে শুধু কাঁদে কাঁটায় বালুতে দেখেছি জলের আঁচ।
তারই মস্তকে পর্বত চূড়ে পান্নার উষ্ণীষ,
শ্যাম বনময় মধুরমা-ভরা গির-অরণ্য রাজে
সিংহের দেশ, শস্তের দেশ, মাটীতে ধানের শীষ
হরিণীর চোখে ময়ূরের নাচে মন ছুটে যায় কাছে।
দূর বিস্তৃত চলেছে গিরের আরণ্য অভিসার,
নীল গুণ্ঠনে কি যে রহস্য আকাশে সুবিস্তার!
সিংহের দেশ মরালের দেশ গির-অরণ্য দেখে
মনে হয় তার আছে কি মমতা? মরু বুকে মুখ রেখে!

প্রতিধ্বনি

অশোক মুখোপাধ্যায়

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"
(রবীন্দ্রনাথ)

কবির এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য। কায়া ছাড়া যেমন ছায়া হয় না, ফুল ছাড়া যেমন পাওয়া যায় না ফুলের সুবাস, তেমনি ধ্বনি না হলে প্রতিধ্বনির অস্তিত্বই সম্ভব হত না। প্রতিধ্বনি তো ধ্বনিরই রকমফের মাত্র। দুইয়ের সামান্য যা তফাৎ, তা মানুষ এবং মানুষের ছায়ার মধ্যেকার তফাৎ থেকে একটুও বেশী নয়।

শব্দ কেমন করে শুনি—

আমরা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অদৃশ্য হাওয়ার সমুদ্রে উঠে ঢেউ। এই ঢেউ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যায় সামনে থেকে দূরে। পুকুরের আয়নার মত শান্ত জলের মধ্যে একটা ঢিল ফেললে যেমন ঢিলকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—অনেকটা তেমনি।

ব্যাপারটা আরও সহজ করে বুঝিয়ে বলি। মনে করা যাক, আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করলুম। আমাকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে বাতাসের অদৃশ্য কণিকারা। শব্দটা বলা মাত্র মুখের সামনের হাওয়ার একস্তর তালুর ওপর তা করবে আঘাত। ফলে এখানকার অণুগুলো একটু এগিয়ে যাবে এবং ঘেষাঘেষি হয়ে আসবে। অবশ্য নিজেদের জায়গা ছেড়ে বেশী দূর যাবে না তারা। শব্দের যে কম্পন তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে, সেটা তারা পাশের অণুস্তরকে পৌঁছে দিয়েই আবার ফিরে আসবে নিজ নিজ জায়গায়। তখন কি হবে? তখন প্রথম অণুস্তরের অণুরা হয়ে যাবে ফাঁক ফাঁক, আর দ্বিতীয় অণুস্তরের অণুরা ঘেষাঘেষি। এইভাবে এক অণুস্তর থেকে পাশের অণুস্তরে, সেখান থেকে তার পাশেরটায়—এমনি করে করে কম্পন পৌঁছে যাবে কাছ থেকে দূরে। তারপর শ্রোতার কাণের পর্দায় তা গিয়ে করবে আঘাত। সেই আঘাতই সৃষ্টি করবে শব্দের ঝঙ্কার।

তাহলে দেখলুম, শব্দ যে পথ অতিক্রম করে চলে, সে পথের হাওয়ার অণুস্তরগুলো একবার ঘনীভূত এবং তার অব্যবহিত পরের বার প্রসারিত হয়। প্রত্যেক অণুস্তরের এমনি ঘনীভবন এবং প্রসারণ ঘটে সেকেণ্ডে সহস্রাধিক বার। কিন্তু অণুকণাগুলো আলাদা আলাদা ভাবে কখনোই বেশী দূর এগয়ে যায় না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তারা নিজ নিজ স্থানের এদিক ওদিক সামান্য নড়াচড়া করে মাত্র।

এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমি যত জোরে বা যত আস্তে কথা বলব, হাওয়ার কাঁপন ও উঠবে তত আস্তে। চিকণ গলা এবং মোটা গলা হিসেবেও তার রকমভেদ হবে। তাই শ্রোতা বক্তার কথাগুলো শুনতে পাবে অবিকল—ঠিকঠিক।

প্রতিধ্বনির সৃষ্টি—

এখন কাছাকাছি যদি-কোন নিরেট দেয়াল বা পাহাড় থাকে, তবে আমার চেঁচিয়ে বলা কথা হাওয়ায় ভর করে সেখানে পৌঁছে থেমে যাবে বাধা পেয়ে। কিন্তু থেমে স্থির হয়ে থাকবে না। ফিরে আসবে আমারই দিকে। ক্যারাম খেলায় রিবাউণ্ড মারলে ঘুঁটি বা ষ্ট্রাইকার যেভাবে বোর্ডের কিনারের দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসে—সেভাবে।

ফল কি হবে? আমার কওয়া কথা কিছুক্ষণ পর আবার সেখানে দাঁড়িয়েই শোনা যাবে। একেই বলা হয় প্রতিধ্বনি। আস্তে কথা বললে সে শব্দ গিয়ে ফিরে আসতে আসতে অনেক মৃদু হয়ে যায় বলে প্রতিধ্বনি ভালো বোঝা যায় না। কিন্তু জোরে চিৎকার করলে তা প্রতিধ্বনিত হবে বেশ বোধগম্য ভাবেই।

একটা জিনিষ সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, খোলা জায়গায় দিনের পর দিন ধরে চেঁচিয়ে মরলেও প্রতিধ্বনি শুনতে পাব না। কারণ ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি হতে হলে কোন কিছুর গায়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসতেই হবে। সেজন্যেই সাধারণতঃ কোন পাহাড়ী জায়গায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে দেখা যায় সে চীৎকার অন্য পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসে এবং সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। আর বন্ধ

হলঘর বা পাহাড়ের গুহার অভ্যন্তরে চিৎকার করলে চারদিক থেকে তা প্রতিধ্বনিত হয় এবং ফলে ভেতরে গমগম আওয়াজের সূচনা করে।

অবাক কাণ্ড—

অনেক সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটে। মজাটা কি, বুঝিয়ে বলছি।

শব্দের গতিবেগ বাতাসে সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। অর্থাৎ শ্রোতা বক্তার কাছ থেকে ১১২০ ফুট দূরে থাকলে প্রতিটি কথা বলার ঠিক ১ সেকেণ্ড পর সে শুনতে পাবে। আবার দুটি শব্দ যদি ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়, তাহলে তাদের আমরা আলাদা আলাদা করে শুনতে পাব না। তারা একত্র মিলে যাবে এবং ফলে একটা গোলমেলে আওয়াজ শুনতে পাব শুধু। এখন ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডে শব্দ যেতে পারে ১১২ ফুট। আবার শব্দ

খানিকটা দূর গিয়ে কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঠিক ততটা পথ ফিরে এলেই তবে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, যাতে বাধা পাবে সেই বস্তুট যদি হয় ৫৬ ফুটেরও বেশী দূরে, একমাত্র তবেই শব্দ মুখ থেকে বেরুবার ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের বেশী সময় পর প্রতিধ্বনিরূপে ফিরে আসবে। সে অবস্থায় দেখা যাবে বক্তা এককথা শেষ করে অন্য কথা বলতে গিয়ে আগেকার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে নিজেই চমকে উঠছে। এমনিতে ঘরে বসে আমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতিধ্বনি সর্বদাই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু তারা ধ্বনির ১০ ভাগের ১ সেকেণ্ডের সময়ের মধ্যেই আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, সেজন্য তাদের আলাদা করে ধরতে পারিনে।

একটি গল্প—

এ গেল প্রতিধ্বনির সত্যিকার জন্ম কথা। এবার বলি একটি গল্প। গল্পটি গ্রীক উপকথার। কেমন করে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হল, তাই এর বিষয়বস্তু।

অনেক—অনেকদিন আগে গ্রীসদেশে ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল 'ইকো' (যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'প্রতিধ্বনি')। ইকো বনের সবুজ গাছপালার শ্যামল ছায়ায় সখীদের সঙ্গে ফুল তুলে, গান গেয়ে দিন কাটাত। একটি গুণ ছিল তার। বড় সুন্দর গল্প বলতে পারত সে।

কোনকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রীকদেবতা 'জুনো' তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিলেন। বেচারা ইকো'র আর দুঃখের সীমা রইল না। সে শুধু তখন অন্যের বলা কথার শেষ অংশটাই পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারত মাত্র।

একদিন হয়েছে কি, 'নার্সিসাস' নামে একটি ফুলের মত সুন্দর কিশোর সেই বনে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। নার্সিসাসের মনটা ছিল বড্ড নিষ্ঠুর। পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে সইতে পারত না। ইকো তো সেকথা জানত না! তাকে দেখামাত্র বড় ভালবেসে ফেলল সে। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলার শক্তি যে তার হারিয়ে গেছে। তাই ক্ষতবিক্ষত চরণে সে নার্সিসাসের পিছু পিছু যেতে লাগল নীরবে।

হঠাৎ নার্সিসাস্ বুঝতে পারল সে পথ হারিয়েছে। ভীতকণ্ঠে চীৎকার করে বললে সে, এখানে কেউ আছে?

তার শেষ শব্দটির পুনরাবৃত্তি করে ইকো উত্তর দিল,—আছে।

নার্সিসাস্ চমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। তখন সে আবার বললে; তাহলে আমার কাছে এস।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর শুনতে পেল,—এস।

ইকো গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল নিজেকে, পাছে তাকে দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই নার্সিসাস তাকে দেখতে না পেয়ে

রাবণ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠল,—চল, আমরা মিলিত হই। তখন ইকো খুশী মনে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। কিন্তু সে তো কথা বলতে পারে না। নিজের ভালবাসা জানবার জন্য সে তাই দু'হাতে নার্সিসাসের গলা জড়িয়ে ধরল।

নিষ্ঠুর নার্সিসাস তাকে ঘৃণাভরে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। একবারও ফিরে চাইল না এই রূপসী মেয়েটির দিকে।

ইকো মনে বড় ব্যথা পেল এর ব্যবহারে। দুঃখে সে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করল। দিনরাত শুধু কাঁদে আর চুপ করে বসে বসে ভাবে। দিন দিন সে মলিন আর বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল তার সারা দেহ। অবশেষে একদিন সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে গেল তার কায়া। জেগে রইল একমাত্র তার গলার স্বরটি।

তারপর থেকেই সে বনে, পাহাড়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কেউ তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু সকলের ডাকে আজও সে সাড়া দিয়ে তুলে যায় প্রতিধ্বনি।

গল্পটি শোনালুম। এই 'জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানের যুগে' আমি তোমাদের এটি আদৌ বিশ্বাস করতে বলিনে। তবু একটি বিদেশী উপকথা জেনে রাখবে তার জন্যই এটি বললুম। অন্ততঃ কাহিনীটি গল্প হিসেবে মনকে নাড়া দেয়—তাই নয় কি?

১, ২, ৩,…৮, ৯—এই সব সংখ্যা দিয়ে যদি সমান সমান দূরত্বে থাকা কতগুলো বায়ুকণিকাকে বোঝানো হয়, তাহলে শব্দ যাবার সময় তারা ওপরের ছবিতে দেখানো বিন্দুগুলোর মত স্থান পরিবর্তন করবে। প্রতিটি কণিকার মাঝের ফাঁকে এমনি আরও সহস্র সহস্র কণিকা রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকটি অনুরূপ আচরণ করবে। ১ সেকেণ্ডের হাজার বা তারও কম সময়ের মধ্যে প্রতিটি অণু এক নম্বর। বিন্দুর মত একবার

১ক ছবি

বাঁয়ে আর একবার ডানে ঘুরে আসবে, আর পুরোপুরি ১ সেকেণ্ডে এ ব্যাপার ঘটবে অসংখ্যবার।
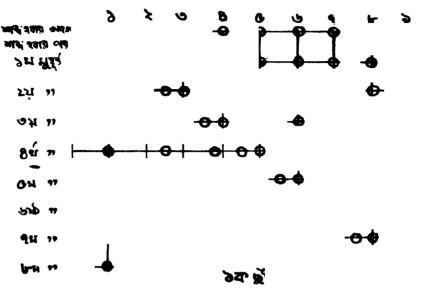
শব্দের গতিপথস্থ অদৃশ্য হাওয়াকে যদি কতগুলো ছোট ছোট স্তরে বিভক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তারা ওপরের ছবির মত একান্তর ভাবে ঘনীভূত (Compressed) এবং প্রসারিত (rarefied) হবে। এইভাবে কম্পনটা যেতে যেতে কাণের পর্দার মধ্যে গিয়ে একবার চাপ এবং আর একবার টানের সৃষ্টি করবে। প্রত্যেকটি অণুস্তর ১ সেকেণ্ডের মধ্যে অসংখ্যবার এমনি ঘনীভূত এবং প্রসারিত হবে। ছবিতে একটি ক্ষণিক অবস্থা দেখানো হয়েছে মাত্র। শব্দ জোরে হলে বেশী এবং আস্তে হলে কম হবে ঘনীভবন বা প্রসারণের মাত্রা। দুটি করে উল্লম্ব সরল রেখার মধ্যে বিন্দুর সাহায্যে এক একটি অণুস্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এদের বিস্তৃতি ছবির চাইতে অনেক গুণ কম।

. দিব্যেন্দু পালিত

বন্ধুদের চোখের তারাগুলো ছটফট করছিল। একে একে এগিয়ে এল তারা; কাছে, আরো কাছে। তারপর কানে কানে গোপন কথা বলার মতন ভিজে ভিজে রুদ্ধ-প্রায় গলায় তাদের মনের কথাগুলি বলল তাকে।

কান পেতে সবটা শুনল সে। নিথর ঠোঁট দুটো মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু কথা ফুটল না। আরো খানিকটা সময় তখনো ছিল। স স ক'রে অদ্ভুত একটা শব্দ করছিল ইঞ্জিনটা, পুরণো ব্যথার মত ককিয়ে ককিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল চিমনির কালো ধোঁয়াগুলো। শূন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল সে, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা মনে পড়ছিল তার।

বন্ধুদের একজন তার হাতটা তীব্র আবেগে আঁকড়ে ধরেছিল। তার মনে হচ্ছিল, হাতের আঙুলগুলো এবার ছিঁড়ে খ'সে পড়বে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিলনা।

তার চোখের পাতায় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত নতুন এক রোমাঞ্চে সেই রাত্রিটা নেমে আসছিল। মালয়ের রবার বনের মাথায় হঠাৎ কলকব্জা অকেজো হয়ে ভেঙে পড়েছে প্লেনটা! তারা ছিল তিনজন। কানের পাশে খুব কাছেই কোথাও মৃত্যুর প্রচণ্ড অট্টহাসি শুনতে পেল যেন। কুড়ি ফুট পঁচিশ ফুট কী তার চেয়ে আরো দীর্ঘ, কদর্য্য হয়ে কতগুলি উলঙ্গ অস্থির বিভীষিকার ছায়া নাচানাচি করছিল চোখের সম্মুখে। সেই চরম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তার মস্তিষ্কে একটি ধ্রুবনক্ষত্র তখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। স্পষ্ট জানত সে যে, সে আর বাঁচবেনা। কয়েক শো গজ নিচের নিতল শূন্যের অঙ্ক স্পর্শ করতে না করতেই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হাত পা অঙ্গ-অবয়বের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে নিয়ে কালো গভীর হয়ে নিষ্করুণ রাত্রি নামবে। আর তারও অনেক বছর প'র—

কিন্তু সে মরল না। মরেও বেঁচে গেল। তার মনে হল, সে যেন সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে নতুন ক'রে জন্ম নিয়েছে। আনন্দে চীৎকার করতে গেল সে; গলা চিরে রক্ত বেরুবার মত হল, তবু একটি শব্দ বেরুল না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চোখের সামনে বীভৎস একটা বিদ্রূপের মত পড়ে রয়েছে তার সহকর্মীর থেঁতলে ঝলসে যাওয়া ভয়ঙ্কর মুখ! দাঁতের মাড়ি আর দাঁতগুলো সব আলগা আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে বাইরে; চোখের মণি দুটো কেটে গিয়ে ঘিয়ের মত কেমন একটা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে!

আর সহ্য হল না। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে গিয়ে সহসা যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠল সে। বাঁ হাতটা তার ভোজবাজির মত কব্জির কাছ থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভেসে গিয়েছে। ডান চোখটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন ক'রে জ্বালা ক'রে উঠল; মাথার সমস্ত শিরাগুলো যেন এক সঙ্গে পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। অবশ অবসাদে সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে পড়ছিল তার। অন্ধকারে সে আর কিছুই দেখতে পেল না।

কিন্তু তার ভাগ্য ভাল। কারণ, এবারও সে বেঁচে গেল। সে শুনেছে, তিন দিন আর আর তিন রাত্রির পর তার ঘুম ভেঙেছিল। ঘনবদ্ধ রবার বনানীর পাতা-জালের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে প্রসন্ন সূর্য্যের ক্ষীণ আলো এসে লুটিয়ে পড়েছিল তার মুখের উপর। সবুজ রঙের ছোট্ট একটা প্রজাপতি ফরফর করছিল তার চোখের সম্মুখে। অবাক বিস্ময়ে চার পাশে তাকাল সে এবং আরো চারটে রুগ্ন, শুষ্ক করুণ অসহায় মুখ তার চোখে পড়ল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' প্রায় নিঃশব্দ স্বরে তারা বলল, 'তোমার জ্ঞান ফিরেছে। এই তিন দিন আমরা আহার নিদ্রা ছেড়ে শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।'

সে চোখ বন্ধ করল, আবার খুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কে ?'

তারা হাসল নীরবে। মধুর মুগ্ধ আনন্দের হাসি। আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা বন্ধু।' আজ প্রায় একমাস এইভাবে এই বনের মধ্যে পড়ে আছি। সে এক মহাভারতের কাহিনী। যাক্‌। তোমাকে সুস্থ দেখে আমরা নিশ্চিন্ত। এই তিনদিন আমরা ঘুমাতে পারিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি, আর প্রার্থনা করেছি।

'তোমরা মহৎ' কষ্ট ক'রে সে বলল, 'তোমরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। তোমাদের ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।' তারা বলল, তারপর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে একটু সরব আর একটু সতর্ক হয়ে বললো, 'আজ থেকে আমরা বন্ধু। উই আর ফ্রেণ্ডস।'

রবার বনের ঘনগভীর দুর্ভেদ্য পাতার অরণ্যে সূর্য্যের হাসিটা তখন একটু একটু ক'রে অনেকখানি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। উষ্ণ কোমল একটা স্পর্শের অনুভূতি ছিল সর্বাঙ্গে। আর বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝে একটা পাখী ডাকছিল। তারা চারজন এবং আরো একজন, পাঁচজনে সেই দুর্বোধ্য ডাকের একটা অর্থ খুঁজে বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

তারপর সে তার কাহিনী বলে গিয়েছিল।

সে বলেছিল, সে একজন সৈনিক হলেও মৃত্যুকে তার অমানুষিক ভয়। মরতে সে চায়না, বাঁচতে চায়। সুস্থ সহজ সুন্দর ও মনোরম জীবনের ছোঁয়ায় মধুর হয়ে যেতে চায়। শুধু মাত্র দিয়ে দিয়ে আর নিয়ে নিয়েই যে জীবনের আনন্দ, সেই আনন্দের জীবনের স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে বেঁচে থাকবার আশ্বাসটুকুই সে শুধু চায়। চেয়েছে।

তার মনে পড়েছে, এই পৃথিবীর অনেক অসংখ্য সুন্দর দিনের মত একটি দিনে তার জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্নের সেই শুভ মুহূর্তে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়নি, বাতাসও কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু সেদিনও আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ছিল। সে শুনেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় আচ্ছন্ন সেই অপরূপ রাতে গাছের পাতারা হীরের সাজ পরেছিল; নদীর জলে রূপো ঝরে পড়েছিল; নীল একখণ্ড মেঘ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকাশের মাঝখানে। যেন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একটা নতুন রহস্যের দুরন্ত খেলা দেখছিল। আর জোনাকিরা লুকোচুরির মায়ায় মিশে গিয়ে জোড়া পায়ে তালি বাজিয়ে বিশ্বচরাচরের আরো এক সুন্দরের জন্ম ঘোষণা করছিল।

তারপর সে বড় হল। তরুলতার মত একেকে জড়িয়ে, অন্যকে নির্ভর ক'রে। ভালবাসার মধ্যে ছড়িয়ে দিল, হারিয়ে দিল—আর মেলে ধরল নিজেকে। ভালবাসতে শিখল।

জীবনের রূপ তখন তার চোখে একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে। আরো সুন্দর হয়েছে সব; সুন্দর হয়ে ঝ'রে যাচ্ছে ক্রমশ। তার বাবা তাকে পৃথিবীর নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'সত্যকে গ্রহণ করো, ভালবাসো। তবেই প্রতিদানে ভালবাসা পাবে। তার চেয়ে মহৎ উজ্জ্বল ও পবিত্র আর কিছুই নেই।'

'ভালবাসা কী ?'

বাবা বললেন, 'অন্যকে ভালবাসলেই তা ভালবাসা হয় না! সে হল অখণ্ড, অপূর্ব। কারুর মুখে যদি খুশির হাসি ফোটাতে পার, তৃপ্তির সুষমা—সেখানেই তুমি সার্থক, তোমার ভালবাসা সার্থক।

তারপর দেখতে দেখতে একটা শকুনের ডানায় ভর ক'রে যেন অন্ধকার নেমে এল। গহন গাঢ় অন্ধকারে সত্যের পথ-চিহ্ন গেল মুছে। যুদ্ধ শুরু হল। বাবা যুদ্ধে গেলেন, আর ফিরলেন না।

তাদের সেই ছোট অনটনের সংসার আরো স্ফীত হয়েছে তখন। গুটি গুটি ক'রে আরো পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। তাদের চোখে স্বপ্ন, মুখে ক্ষুধা এবং বুকে জ্বালা। হ্যাঁ, সেই সবুজ অবুঝ বয়সেই তাদের ফুল-কোমল বুকগুলিতে একটা গভীর সন্দেহের জ্বালা ধুকপুক করছিল। বিশ্বাসের বাঁধন গিয়েছিল আল্‌গা হয়ে।

সে তবু বিশ্বাস হারায়নি। দুর্যোগের কালো মেঘ তার সম্মুখে, শকুনের বীভৎস ডানার ছায়া তার মাথার উপর। সে তবু নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, নিটুট।

'মা, আমি যুদ্ধে যাবো।' মাকে বলল সে।

বাবার মৃত্যু-সংবাদ তখনো মা'র কানে যায়নি। অশুভ আশঙ্কায় ব্যাকুল বিহ্বল মা শুধালেন, 'কেন ?'

'বাঁচার জন্যে।' সে বলল, 'আমাদের বাঁচতে হবে,

মা ; বাঁচার জন্তে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি।' ভবিষ্যতের রামধনু কল্পনায় ঝক্‌ঝক্ করছিল তার চোখের দৃষ্টি, থরথর করছিল গলা। সে বলল, 'আমি বড়লোক হয়ে ফিরে আসব! কিছুদিন তো মাত্র। আমাকে যেতে দাও, মা।'

'কিন্তু সেখানে গেলে যে আর ফেরে না!' বাবার কথাটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন মা।

'অনেকে ফেরে', সে বলল, 'আমরা ফিরব, আমি নিশ্চয় ফিরব।' উত্তেজনায় ফাঁক-ফাঁক নিঃশ্বাস পড়ছিল তার, গলা কাঁপছিল, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তারা কোনদিন পরাজিত হয় না, মা। আমাদের জয় অনিবার্য্য।'

সে যা শুনেছিল, তাই বলল। এর বেশি অন্য কিছু, নতুন কোন কথা তার জানা ছিল না।

যাবার আগে সে তার বোন দু'টিকে আদর করল, ভাই দু'টিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। মাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ অথচ শান্ত স্নিগ্ধ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গালে গাল চেপে সমস্ত উষ্ণতার উত্তাপটুকু মেখে নিয়ে, অবোধ শিশুর মত মার বুকে মুখ গুঁজল, গলায় কপালে চুমু খেল। পথভ্রষ্ট অন্ধ হরিণশিশু গন্ধের আকর্ষণে হঠাৎ যেন তার মা'কে খুঁজে পেয়েছে।

'মা, আমি আবার ফিরে আসব।' সে বলল।

মা অশ্রু-সিক্ত রুদ্ধ গলায় বললেন, 'আসবি, আসবি। আমার মাতৃত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে তুই অক্ষত দেহে আবার আমার বুকে ফিরে আসবি।'

'মা!' সে চীৎকার ক'রে উঠল, কাঁদল; তারপর আস্তে আস্তে পুরনো নোনা-ধরা জীর্ণ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ঝাপ্‌সা চোখে বাড়ীটাকে দেখল একবার। ভাবল, এই জীর্ণ ঘরের মরা সৌন্দর্য্যে আবার যৌবন ডাকবে। উদ্দাম অস্থির অতি চপল এবং অতি দুরন্ত হবে সেই যৌবনের চেহারা। দরজার বাইরে ফণিমনসার কাঁটা-গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল সে। কাঁটা ফুটে রক্ত বেরুল। টকটকে, লাল, উজ্জ্বল। সে ভাবছিল, এই কাঁটাও একদিন ফুল হবে; রক্তের মত লাল ফুলের রাশি রাশি স্তবক সুন্দরের স্বপ্ন হয়ে ফুটবে, হাসবে।

এইসব ভেবে পথে পা দিল সে।

'তারপর, দেখছো, আজও আমার ঘরে ফেরা হয়নি।'

বন্ধুরা এতক্ষণ অপলক চোখে স্ফুরিত অধরে সব শুনছিল। রৌদ্রের আভায় তাদের তামাটে শ্মশ্রুতে কেমন এক ধরণের হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে; কপালের রেখাগুলো আরো ঘন ও পুরু হয়ে জড়াজড়ি করছে, ভ্রূরেখা কাঁপছে, সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হচ্ছে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারা বলল, 'ঠিক এই রকম না হলেও, অনেকটা এই ধরণের, হ্যাঁ, অদ্ভুত জীবন্ত এক জীবনের প্রবল আকর্ষণে আমরা যুদ্ধে সৈনিক হয়েছি। শুনেছি, এ-যুদ্ধ মৈত্রীর যুদ্ধ, সাম্যের যুদ্ধ, ভবিষ্যতের স্বচ্ছন্দ সাবলীল সম্ভাবনার স্বপক্ষে, বর্ত্তমানের অনিশ্চিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে আগামী দিনের যুদ্ধ। কিন্তু, আমরা কী পেলাম!

তাদের নিঃশ্বাসের শব্দগুলি একসঙ্গে কোলাহল ক'রে বেজে উঠল। তাদের বুকের বেদনাগুলি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল না; কিন্তু নিটোল অশ্রুতে বায়ুর আর ধ্বনিময় হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমারও সেই কথা মনে হচ্ছে আজ। আমাদের আশা ছিল অনেক, কিন্তু সেই আশার পাওনার কতটুকু আমরা পেলাম! তবু, তবু আমি বিশ্বাস হারাইনি।' নিজের বিকলাঙ্গ জ্বর-তপ্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে সে বলল, 'বন্ধু, তোমরা দেখ, আমার এই পঙ্গু, ভগ্ন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার বাস্তবিক কোন অর্থ হয়না। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল। কিন্তু আমি মরিনি, মরেও বেঁচে গেছি। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমাকে বাঁচিয়েছে; আমার ছোট ছোট ভাই-গুলি আর বোনগুলির শুভেচ্ছা আমাকে রক্ষা করেছে। তারা আমার পথ চেয়ে আছে, দিনের পর দিন আমার প্রতীক্ষা করছে। তাদের কাছে ফিরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু হবেনা।'

মাথার উপর ভ্রমর গুঞ্জনের মত অদৃশ্য বোমারু গুঞ্জন ক'রে গেল। ভয়চকিত বিবর্ণ হয়ে তারা শুনল, তারপর ফিসফিস প্রায় বাতাসের মত নিঃশব্দ গলায় বলল, 'শত্রু শত্রু। আমাদের চারিদিকে শত্রু। হা ঈশ্বর!'

'তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।' সে বলল, 'আমরা আবার ফিরে যাব। নিশ্চয় যাব। সুযোগ

আমি আজও পেয়েছিলাম, কিন্তু যাইনি। নিঃসম্বল হয়ে শূন্য হাতে শুধুমাত্র একটা বিকলাঙ্গ অক্ষম দেহের মৃত অস্তিত্ব নিয়ে তাদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারব না। তাদের জন্ত আমি বাঁচার আশ্বাস নিয়ে যাব, সুন্দর ফুলের স্বপ্ন তাদের আমি উপহার দেব। উঃ, তখন তাদের, এবং আমারও, কী আনন্দ যে হবে, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না!'

মালয় থেকে টেনাসেরিম। সেখান থেকে মার্গুই, মৌলমিন হয়ে রেঙ্গুন। তারপর—

এইবার তার চোখ ফেটে অশ্রু নামল। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। ইঞ্জিনের মলিন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আজ এতদিন পরে এইসব ঘটনার স্মৃতিগুলো তার মনে ভিড় ক'রে আসছিল। বুকের চাপ-চাপ জমাট বেদনা-গুলো গ'লে জল হয়ে গলার কাছে কাঁপছিল। বন্ধুদের দিকে সে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। সে বেশ বুঝছে, তার এখন জোরে চেঁচিয়ে কাঁদা উচিত; কাঁদতে পারলে অন্তত খানিকটা শান্তি পেত সে। কিন্তু ট্রেনের যাত্রীরা আর আশে পাশে আনাচে কানাচে যারা ছিল, তারা নেহাত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে আর হাসছে।

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছেনা, তোমাদের কাছ থেকে আমি আলাদা হয়ে যাব। আচ্ছা, তোমরা ভাবতে পার! সে আস্তে আস্তে, মৃদু ভগ্ন রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'প্রায় তিনবছর কী তারও কিছু বেশি দিন আমরা একসঙ্গে একাত্ম ও একপ্রাণ হয়ে ছিলাম। সুখেই ছিলাম, আনন্দে সুখে এবং শান্তিতে। কোন কোন সময় আমার মনে হয়েছে, সেই ভীষণ ভয়সঙ্কুল অরণ্যের নির্জনতায় আমাদের নতুন ক'রে জন্ম হয়েছিল। কিন্তু—'

সত্যিসত্যিই এবার সে কেঁদে ফেলল এবং ঠোঁট কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেলল। ডানদিকের ছানি-পড়া নিষ্প্রভ চোখে আর পুড়ে-যাওয়া কদাকার উঁচু-নিচু মাংসল গালে তাকে কেমন অদ্ভুত আরণ্যক, হিংস্র অথচ মিষ্টি মমতায় আশ্চর্য্য করুণ দেখাচ্ছিল।

বন্ধুরা তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল, 'তুমি তোমার মায়ের কাছে, ভাইয়ের কাছে আর বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছ; এর চেয়ে শান্তির কথা আমাদের কাছে আর কী হ'তে পারে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। কামরার দরজার হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে রইল পিছনের দিকে। তারাও তাকে দেখছিল, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল। বাঁ হাতটা পঙ্গু না হলে সেও বন্ধুদের শেষ সম্ভাষণ জানাতে পারত! কালো নিশ্চল কতগুলি বিন্দুর মত হয়ে ক্রমশ তারা দৃষ্টির নেপথ্যে হারিয়ে গেল।

ফিরে এসে সে তার নিজের আসনে বসল। কেমন নিঃসঙ্গ নিরায়ু মনে হচ্ছে নিজেকে। এমন কি, স্বদেশে স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটুকুও হঠাৎ স্বাদ হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হল, তার শরীরের আরো কয়েকটা হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অন্ত কোথাও ফেলে রেখে এসেছে!

অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিল সে। একটি শিশু তাকে দেখে হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠে তার মা'র বুকে মুখ লুকালো। তিন বছর, দুর্ভেদ্য গহন অরণ্যে সেই আকস্মিক প্লেন দুর্ঘটনার পর আজ পর্য্যন্ত, আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি সে। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের বিবরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। বুঝতে পারে না সে, ধারণাও করতে পারে না, তার মুখের চেহারা একটা পিশাচের চেয়েও রূঢ় আর বীভৎস হয়েছে। অনুভবও করতে পারে, কিন্তু মুখোমুখি হ'তে পারেনা। মনে হয়, সেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে তার মৃত্যু ভাল। অথচ সে মৃত্যু চায়না এবং একদিন সত্যিই সে সুন্দর সহজ ও প্রিয় ছিল, ভালবাসার মানুষ ছিল! যুদ্ধ তাকে একটা ভয়ের মানুষ তৈরী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে!

মা কী আমায় চিনতে পারবে? আজ আটবছর পরে আমি দেশে ফিরছি!

জানালার বাইরে তাকিয়ে সে ভাবছিল। ঠিক চিন্তা নয়; ভয়, একধরণের ভয়ও ছিল তার মনে। যাদের কাছে সে যাচ্ছে, তার নিজের এতদিনের আশা ভরসা, দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং জ্বালার বেদনা নিয়ে, তারা যদি তাকে, না চেনে, কিংবা চিনেও ভুল করে! না, তা হয় না। তা হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। মা অন্তত তাকে চিনবেন, ছোট ছোট ভাই বোনগুলিও নিশ্চয় তাকে

চিনতে পারবে। তাদের মুখগুলি সে কল্পনা করতে পারছে। আজ তারা অনেক বড় হয়েছে ; ছোট বয়সের সেই চপলতা আর চঞ্চলতার হাল্কা নিঃশ্বাসগুলো হারিয়ে বয়সের ভারে বেশ গম্ভীর হয়েছে! তারা ভাল হোক, বড় হোক, মহৎ হোক্, মনে মনে সে প্রার্থনা জানালো।

হঠাৎ গিয়ে সে নিশ্চয় সকলকে খুব অবাক ক'রে দেবে। জীর্ণ বাড়ীটা এখন আরো জীর্ণ হয়েছে, ফনি-মনসার জঙ্গল আরো ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। চতুর্দিকে কেমন একটা থমথমে নিস্তব্ধ ভাব। ধীরে ধীরে গিয়ে সে দরজার কড়া নাড়বে। তার ছোটবোন, যাকে সে খুব ভালবাসত, এসে দরজা খুলে দেবে এবং তার বিকৃত মুখ ও চেহারার রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে পালাবে। সে তবু হাসবে ; হাসতে হাসতেই ঘরের ভিতরে ঢুকবে। ভয়ে সঙ্কোচে দ্বিধায় তারপর একে একে সকলেই আসবে, আর ভিড় করবে তাকে ঘিরে।

'আমাকে চিনতে পারছ না! আমি—' পরিচয় দিতে গিয়েও সে চুপ ক'রে যাবে। কারণ, ততক্ষণে তার মা এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। অপলকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মা-কে দেখবে সে। তারপর ডাকবে, 'মা!' মা একটু কেঁপে উঠবেন, তার বিশ্বাসের সিংহাসন-টাই সহসা দুলে উঠেছে যেন। সে আবার ডাকবে, 'মা, আমাকে চিনতে পারছ না!'

এক মুহূর্তে থম্‌কে থেমে মা ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন তাকে। 'সত্যিই তুই ফিরে এসেছিস, বাবা! আমি ভেবেছিলাম—'

'তুমি যে আমায় আশীর্বাদ করেছিলে, মা। তোমার আশীর্বাদ আমাকে সব সময় ঘিরে ছিল।'

সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠবেন, 'কিন্তু, এ তুই কী রূপ নিয়ে ফিরে এলি, বাবা!' মা'র বুকের পাঁজর আর পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

'আমি যে আবার তোমার বুকে ফিরে এসেছি, তাই কী যথেষ্ট নয়, মা।' অনর্থক হলেও মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইবে সে।

এতক্ষণ যারা দূরে দূরে ছিল, তারা এবার কাছে আসবে ; চোখের কোণে ব্যথার বিন্দুগুলিকে হাসিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। মা, ক্লান্ত খুশির হাসি হেসে বলবেন, 'ওরে, শাঁখটা কেউ বাজা, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।'

সে আর ভাবতে পারছিল না। আনন্দে তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। ফ্লাস্কে বন্ধুরা জল ভ'রে দিয়েছিল, ইচ্ছা করলেই সে খেতে পারত। কিন্তু সে স্পর্শ করল না পর্য্যন্ত। ঘরে পা দিয়েই সে তার পিপাসা মেটাবে। মা বুঝবেন, বেচারা ছেলেটার কত তেষ্টাই না পেয়েছিল। কিন্তু সে জানবে, জলের পিপাসা নয়, এ অন্য কিছু, নতুন কিছু। এ হল অমৃতের তৃষা, বাসনার রাজ্যে জীবনের তৃষ্ণা। যে তৃষ্ণার জ্বালা নীলকণ্ঠ হলেও বুঝি মেটেনা।

কতগুলি স্টেশন এল আর গেল, তার খেয়াল হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত মনের গুহায় ক্রমাগত আঁচড় কাটছিল সে। তবে অনেকটা সময় যে সে ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দিল, অনায়াসে এখন তা বুঝতে পারা যায়। এরপর কী করবে ভাবতে ভাবতে সে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোক প্রথমে তাকে আমল দিলেন না। তাঁর মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হল, এই ধরণের কুদর্শন বিভীষিকার মুখগুলির জন্য তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর আতঙ্ক রয়েছে। কিন্তু নেহাত শিশুর মতন যখন সে তার করুণ কাহিনী বলে গেল, ভদ্রলোক নির্বাক হয়ে শুনলেন, শুনে করুণা হল তাঁর।

শূন্য কামরায় তারা দু'জনই শুধু যাত্রী। ভদ্রলোক বললেন, 'আট বছরে তো সমস্ত পৃথিবীটাই ওলট-পালট হয়ে গিয়ে নতুন ক'রে সেজেছে। আপনি কী সব চিনতে পারবেন?'

'কী বলছেন!' সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'আমার নিজের দেশ, নিজের বাড়ী আমি চিনতে পারব না! কোথায় কোন গাছটি আছে। তা পর্য্যন্ত আমি বলে দিতে পারি।

ভদ্রলোক নীরবে হাসলেন।

পাগলের মত সহসা বাঙ্কের উপর থেকে সে তার পুরনো স্যুটকেশটা টেনে নামাল। তারপর ভদ্রলোকের সম্মুখে খুলে ধ'রে একে একে জিনিস গুলো বার করতে করতে বলল, 'দেখুন, এই জিনিসগুলো আমি তাদের

জন্তে নিয়ে যাচ্ছি। এগুলি আমার মায়ের জন্তে, আর ওগুলি আমার ভাইবোনের জন্তে। অবশ্য মূল্যের অনুপাতে এগুলি কিছুই নয়। তবু, এই সামান্ত জিনিস-গুলো জোগাড় করতেই আমাকে পুরো দু'বছর প্রাণ-পণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, আমার এই পঙ্গু শরীরে এর বেশি আর সামর্থ্য ছিলনা, সাধ্যও ছিল না। কিন্তু তারা কী আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেনা? আপনি বলুন ?'

ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে তার চোখ দু'টি আচ্ছন্ন হয়ে ছলছল করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি অত বিচলিত হচ্ছেন কেন! আসলে আপনার ওইসব ভাবনার কোন অর্থই হয় না।

আমারও তাই মনে হয়।' সে একটু হেসে বলল, আমার ছোট বোনটির কথা তো আপনাকে বলিনি। একবার কী হয়েছিল জানেন—'

সন্ধ্যার সময় সে ট্রেন থেকে নামল। নেমেই একটু হতভম্ব হল। এ কোথায় এল সে! স্টেশনের নামে অবশ্য সেই নামই চিহ্নিত আছে; কিন্তু সেই পুরনো নামের কাঁচা অক্ষরগুলো সবই নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। কাঁচা মাটির প্ল্যাটফর্ম আর নেই। যেন এই আটবছরের মধ্যেই একটা বিরাট পরিবর্তন এসে মাটির মমতাকে ভেঙেচুরে কংক্রীটের কঠিন সাজ পরিয়ে দিয়েছে! দু'টি প্ল্যাটফর্মের যোগসূত্র হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে ইস্পাতের সুদীর্ঘ সেতু। অসংখ্য যাত্রীর কোলাহলে আর ফ্লুরোসেণ্ট লাইটের উজ্জল ধাঁধায় চোখ আর মন ঝলসে গেল তার। অনেকেই তার দিকে তাকালো; কেউ হাসে, কেউ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তীব্র, অস্বস্তি জানায়। কাটা হাতটাকে আস্তিনে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে কেঁচোর মতন একটা তীক্ষ্ণ দেহের সভয় স্বল্পতা নিয়ে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে। হুড়োহুড়ি ক'রে ভিড়ের কোলাহলটা ক্লান্ত হয়ে শান্ত হয়ে গেলে মন্থর পায়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

এতটা আশা করেনি সে। কেমন যেন অচেনা অজানা মনে হয়। একটাও পরিচিত মুখ অনেক খুঁজেও তার চোখে পড়ল না। বহুপরিচিত পুরনো দিনের সেইসব নয়নরম্য দৃশ্যগুলিও ছদ্ম সাজের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! এবার সত্যি সত্যিই তার ভয় করছিল; এবং বিস্ময় ও সন্দেহ। একজন পুলিশের লোককে তারই দিকে আসতে দেখে অকারণেই সে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

হঠাৎ একটা মিষ্টির দোকানে চোখ পড়তেই সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেশনে ঢোকবার মুখে বটগাছের ছায়ায় ব'সে যে লোকটা বরফ বিক্রী করত, সেই লোক-টাকে সে দেখেছে এবং দেখেই নির্ভুল চিনে ফেলেছে। তার চোখের বিস্মিত তারা দুটো একটু নরম হয়ে হেসে ফেলল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গিয়ে দোকানটার সম্মুখে দাঁড়াল। বিমূঢ়ভাবে, টেরিয়ে টেরিয়ে লোকটা তাকে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর দুর দুর করে তাড়িয়ে দিল। কয়েকটা কুকুর পিছু পিছু চেঁচাতে চেঁচাতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। কাটা হাতটা তুলেই সে একবার বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে একটা তীব্র জ্বালার ঘোরে সোজা এগিয়ে চলল।

ধাঁ ক'রে একটা চকচকে মোটর ছুটে বেরিয়ে গেল তার পাশ দিয়ে। পড়তে পড়তে সে সামলে নিল নিজেকে। অনেকদিন পরে আবার তার চোখদুটো ব্যথায় করকর করছিল।

আচ্ছন্নের মত পথের দু' পাশে তাকাতে তাকাতে চলছিল সে। অচেনা মানুষ, অচেনা পরিবেশের চিহ্ন-গুলোও বড়ই অচেনা! যুদ্ধের সেই উদ্দাম অস্থির কল-রোলের ঢেউগুলি যেন এখানেও আছড়ে পড়ছে!

আবার একটা বাঁক ঘুরল এবং চমকে উঠল সে। আরো একজন চেনা মানুষকে চিনতে পেরেছে। অন্তত এই দ্বিতীয় জন; মন্মথ, যে তার একান্ত অন্তরঙ্গ আর মধুর হৃদয়ের বন্ধু ছিল, নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে এই বিশ্বাসে একেবারে তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমায় চিনতে পার, মন্মথ ?'

'কে!' সভয়ে পিছনে স'রে যায় মন্মথ।

'আমি, তোমার বন্ধু। সেই আট বছর আগে এক-দিন যুদ্ধে গিয়েছিলাম, মনে নেই? যাবার আগে তুমি কত মানা করেছিলে, কত অনুনয় করেছিলে, ভুলে গিয়েছ!' মন্মথ, আজ এইমাত্র আমি দেশে ফিরছি।'

'ও, হ্যাঁ, কিন্তু'—আপাদ-মস্তক তাকে নিরীক্ষণ ক'রে

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মন্মথ বলল, 'ও, মনে পড়েছে। বেশ, এইমাত্র এলে বুঝি! আচ্ছা, পরে দেখা হবে।'

পিছন দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে নির্বাক পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য্য! কেউ তাকে চিনতে পারছে না! অথবা, চিনেও ভুলে যেতে চাইছে! তার বিশ্বাসের গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছিল ক্রমশ।

তবু সে শান্ত হল, ঋজু হয়ে দাঁড়াল আবার। দূরের মন্দিরটা আর মন্দিরের পাশের সেই খয়ের গাছটা দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে, তার বড় আদরের পুরনো জীর্ণ বাড়ীটাও আর বেশী দূরে নেই। ওই তো বাঁকের পাশ দিয়ে যে পথটা ঘুরছে, সেই পথের উপরেই তার বাড়ী।

কিন্তু বাঁকের পথ ঘুরেই তার চোখের দৃষ্টি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। স্পষ্ট দেখছে সে, তার চোখের সম্মুখে সেই বাড়ী আর নেই, বাড়ীর বাইরে সেই ফণি মনসার জঙ্গলও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে! অথচ, বাড়ীর পাশে সেই দেবদারুর গাছটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু বাড়ীটাই বদলে গিয়েছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখল, জীর্ণ পুরানো চেহারার বাড়ীটার কঙ্কালটাকে পায়ের নিচে থেঁতলে মাড়িয়ে দোতলা সুদৃশ্য ও সুবিশাল হর্ম্য উঠেছে সেখানে। কাঁটার খোসা ছাড়িয়ে অজস্র ফুলে ফুলে বাগান ভ'রে গিয়েছে। বিরাট লোহার ফটকের বাইরে অপেক্ষমান ঝকঝকে মোটর গাড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সে এইসব দেখতে লাগল। দেখতে তার ভালই লাগছিল। সেও এই রকম ছবির মতন যৌবন-পুষ্ট আনন্দের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল! সে-স্বপ্ন তার আগেই সার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে! এবং আট বছর পরে সে ফিরে এসেছে, সেই আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়িগুলি এবার ফুল হয়ে ফুটবে, গন্ধ ছড়াবে। সে ভাবল।

ভাবতে ভাবতে সে এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছিল। সহসা তার মুগ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে এল, পথের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এই তো আমার বোন! আমার সেই ছোট্ট এতটুকু বোনটি আজ কত বড় হয়েছে! সে ভাবল। আর এমন ফুলের মতন রূপ, দুধের মতন রঙ, ঝলমলে পোষাকে পরীর মতন আশ্চর্য্য সুন্দর! সে ঠিক চিনেছে। তার ইচ্ছা করছিল, তার ছোট আদরের বোনটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। তবু সেই অচেনা পুরুষটিকে দেখে সংকোচে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ফটকের বাইরে এসে যুবক-যুবতী মোটরে উঠতে যাচ্ছিল। সে বেশ বুঝতে পারল, এখুনি স্টার্ট নিয়ে মোটরটা তাকে না চিনেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়াটাই তার কেমন অসহ্য মনে হল; তার মস্তিষ্কের সমস্ত বুদ্ধি আর বোধগুলি অচেতন হবার আগে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে সে দেখল—তার গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। আড়ষ্ট অস্ফুট কণ্ঠে সে তবু ডাকল, 'যূথি, যূথি!'

শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মেয়েটি। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছেন আপনি। কার নাম ডাকলেন!'

অসহিষ্ণু গলায় ব্যস্ত ভাবে সে বলল, 'সে কী! তুমিও আমাকে—' এই পর্য্যন্ত ব'লে সে থেমে গেল। তারপর অস্থায় ভাবে তার পরিচয় দিতে চাইল।

'তোমার মনে পড়ে, আট বছর আগে তোমার এক দাদা যুদ্ধে গিয়েছিল, তারপর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'হ্যাঁ', অবিচল কণ্ঠে মেয়েটি বলল, 'তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' কাতর অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল সে।

মেয়েটি অল্প একটু হেসে, যেন তার মুখের উপর একটা করুণার স্পর্শ বুলিয়ে মোটরে গিয়ে বসল এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল।

সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশাল বাড়ীটার ভিতর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, তার মাকে সে দেখতে পেয়েছে। মা, মা! মনে মনে চেঁচিয়ে উঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সে দেখল, তার চোখের সম্মুখে কখন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরপর সাজানো অনেকগুলি দরজার কোনটি দিয়ে গেলে সে তার লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে, তা বুঝতে পারল না।

তার ভয়ঙ্কর মুখটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ফেটে পড়ল, কঠিন চোখ দুটো গ'লে গিয়ে অশ্রু হয়ে ঝ'রে পড়ল।

মাথার চুলগুলো এক হাতেই টেনে টেনে ছিঁড়তে চাইল সে। তারপর আস্তে আস্তে স্খলিত পায়ে পথে বেরিয়ে কাছেই পথের পাশে মন্দিরটার দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পাঁজর ভেঙে ব'সে পড়ল।

মন্দিরের আরতি কখন শেষ হল, আকাশে চাঁদ উঠল; সুন্দর ধবল অপরূপ চাঁদ এবং তারা; জ্যোৎস্নার বিভায় আচ্ছন্ন হল চতুর্দিক; সে খেয়াল করল না। স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে সে শুধু তার সম্মুখের সুবিশাল হর্ম্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, তার চোখের সম্মুখে বাড়ীটা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে, এবং দীর্ঘ হয়ে আকাশের দিকে স্পর্দ্ধিত হাত বাড়িয়েছে! বাড়ীটার ছায়ার আড়ালে ক্রমশ সব হারিয়ে যাচ্ছে! জ্যোৎস্নার মাধুর্য্যটুকুও অবশেষে তার চোখের সম্মুখে অন্ধ হয়ে হারিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হল।

অর্থনীতির দুচার কথা

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

বাহিরের ঘটনার চাপে প্রয়োজনের তাগিদে, অথবা ভিতরে আদর্শের পরিবর্তনে ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যেমন বদলায়, জাতির চরিত্রেও তেমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে। মৎস্যমাংসাসক্ত শাক্তকে নিরামিষাশী পরম বৈষ্ণব হইতে দেখা গিয়াছে। নবদ্বীপের টোল চতুষ্পাঠীতে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চায় নিরত থাকিতেন, সেই গুরুগম্ভীর পণ্ডিতগণই নগর-কীর্তনে খোল-করতাল লইয়া নাচিয়া কাঁদিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বীর-প্রসবিনী রাজপুতানার সন্তানগণ অসির ঝনঝনা ভুলিয়া আজ মুদ্রার ঝনঝনায় মুগ্ধ। ইংলণ্ডের প্রথমা এলিজাবেথের ও দ্বিতীয়া এলিজাবেথের প্রজাদের মধ্যে কত না প্রভেদ! এমন কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যবধানে ইংরাজ-চরিত্রে গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। জাতীয় চরিত্র কিছু গণিতের অপরিবর্তনীয় চিরস্থির K নয়। বাহিরের ঘটনার চাপে এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে।

বাঙ্গালীর ধাতে ধন-বিজ্ঞান যেন সয় না, মিশ খায় না এমন মনে হইতে পারে। বাঙ্গালী-প্রকৃতির নমনীয়তা, কমনীয়তা, কল্পনা-প্রবণতা, ভাবালুতা, আবেগাতিরেক ও উচ্ছ্বাস-পরায়ণতা এবং তৎসঙ্গে শ্রমকুণ্ঠা ও বাস্তব-নিষ্ঠার অভাব আমাদিগকে ধন-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দিতেছে না এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, মননশক্তি ও কল্পনা-কুশলতাকে দীর্ঘকাল অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে ও বারংবার সংহতভাবে ধন-বিজ্ঞান-অনুশীলনের খাতে প্রবাহিত করিতে পারিলে অভীষ্ট ফললাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী চরিত্র পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। দেশ-বিভাগের ফলে বাঙ্গালীর এক অংশের মধ্যে যে চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যায়। কুমার-নদের তীরে যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু তালুকদার অবসর-প্রাচুর্যের মধ্যে 'নৈমিত্তিক' দোল-দুর্গোৎসব এবং 'নিত্য' বৈঠকখানার মজলিস লইয়া কাল কাটাইতেন, তাঁহার পুত্রকন্যারা এখন কলিকাতার কল-কারখানায় উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। বারমাসে তের পার্বণ, যে কোন উপলক্ষে ও অজুহাতে ভোজের আয়োজন, লোক-লৌকিকতা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সকালে গড়িমসি, দুপুরে নিদ্রা, অপরাহ্নে তাসপাশা, রাত্রে গল্প-গুজব বা গান-বাজনা—এই দিনকৃত্যের পুনরাবৃত্তি আর পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। বিরূপ জীবন-সংগ্রামে জীবিকার্জনের জন্য প্রত্যেকটি মুহূর্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত—দৌড়াদৌড়ি, ব্যথা ব্যগ্রতায়, সামাজিকতার অবকাশ নাই। এইভাবে কিছুদিন চলিলে ক্রমশঃ বাঙ্গালী চরিত্রের রূপ বদলাইয়া যাইবে। বাক্‌পটু, বাক্‌-বিলাসী, বাচাল বাঙ্গালী ক্রমশঃ বাক্‌-যত, বাক্‌-কুণ্ঠ কর্মকুশল বস্তু-নিষ্ঠ "কাজের মানুষ" হইয়া উঠিবে। জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন অবশ্যই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে। আর শাস্ত্র-রচনার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রক্রিয়া চলিতে পারে। কবিতা-গল্প-উপন্যাস ও হাল্‌কা রচনায় প্লাবিত বাংলা সাহিত্যে বস্তু-নিষ্ঠ 'কাঠ-খোট্টা' মাপা-জোখা ধন-বিজ্ঞানের পত্তন হইতে থাকিবে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে Economics বা ধন-বিজ্ঞান একান্তই পাশ্চাত্য বিদ্যা যাহার উৎসমূলে আছেন ইউরোপের যবন পণ্ডিত আরিস্ততল। Economics বলিতে যাহা বোঝায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঠিক তাহা নয়, যদিও Political Economy র উপাদান আছে "অর্থশাস্ত্রে"। ধন-বিজ্ঞানের তেমন মালমশলা কিছু কিছু মহাভারতের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো নাই কি? তবে সেগুলি দানা বাঁধিয়া তাত্ত্বিক রূপ গ্রহণ করিতে বা বিজ্ঞানের সমগ্রতা লাভ করিতে পারে নাই।

অর্থ-তত্ত্বের ধারাকে যদি গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে পাশ্চাত্য ধন-বিজ্ঞানের গঙ্গোত্রীতে বা গোমুখীতে আদি-বিরাজ আরিস্ততলের দর্শন মিলে। অর্থতত্ত্ব-ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিয়া আমরা উৎস-মূলে ক্ষুদ্র ক্ষীণ শীর্ণ রজতসূত্রের মত যে জলধারা দেখি তাহার মধ্যে, অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে আরিস্ততলের রাজস্ব-তত্ত্ব, কুসীদ-তত্ত্ব ইত্যাদি। তারপর ক্রমশঃ মন্দাকিনীর ধারা বহিয়া আমরা গঙ্গোত্তরে বা হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছি এবং সাক্ষাৎ পাই য়্যাডামস্মিথের যাহাকে বলা হইয়াছে 'অর্থশাস্ত্রের জনক'। এখন আর রজতসূত্রবৎ ক্ষীণধারা নয়, নীল স্নিগ্ধ প্রাণপদ প্রসন্ন সলিল-প্রবাহ—পানে ও অবগাহনে পরমা তৃপ্তি। বলাই বাহুল্য যে য়্যাডাম্‌স্মিথই অর্থ-শাস্ত্রের একটা মজবুত কাঠামো ও পরিচ্ছন্ন রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার মানসপটে শাস্ত্রের একটা সমগ্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—উহা ছিন্নপত্র বা বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত সন্দর্ভ নয়। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম সংক্ষেপে Wealth of Nations (দুনিয়ার ধন-দৌলত)—পুরা নাম An Enquiry into the Nature and causes of wealth of nations. নামের মধ্যে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গীর এবং উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর পরিচয় পরে যথাস্থানে দেওয়া হইবে। হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া বহু নগরনগরী দেখিতে দেখিতে প্রয়াগের পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া উপনীত হই। তারপর পরমতীর্থ কাশী—সেখানে কত পবিত্র মঠ-মন্দির, দশাশ্বমেধ ও মণি-কর্ণিকার ঘাট, কত সাধু সন্ত যোগী সন্ন্যাসীর সমাবেশ! এমনভাবে পাটনা কলিকাতার মত জনাকীর্ণ শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ কেন্দ্র অতিক্রম

করিয়া অবশেষে বিংশশতাব্দীর সাগর-সঙ্গমে—অতল অনন্ত জলরাশির সম্মুখীন হইলাম। সেখানে কত মতবাদের কল-গর্জ্জন, কত ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন, কত সূত্র, সংহিতা ও পরিকল্পনার ঘাত-প্রতিঘাত! মতের ও পথের বিভিন্নতায়, বৈচিত্র্যে ও বৈষম্যে একেবারে দিশাহারা হইতে হয়।

অর্থ-শাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতেছে এবং ধন-বিজ্ঞান নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস আছে। আরিস্ততলের Politics গ্রন্থে এই বিদ্যাকে ভ্রূণ-অবস্থায় দেখিতে পাই। তারপরে ইউরোপের বুকের উপর নামে মধ্যযুগের গাঢ় তমিস্রা। সেই অমানিশার মধ্যে অর্থনীতির কোন আলোকরশ্মি দেখা যায় নাই। মধ্যযুগীয় দীর্ঘ-রাত্রির অবসানের পরে উষার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় Mercantilist (ব্যবসায়ি-পন্থী) এবং Physiocrat (প্রকৃতি-তন্ত্রবাদী) দের আলোচনায় ও রচনায়।

পাশ্চাত্য 'আর্থিক চিন্তা'র ইতিহাসে Political Economy র নামান্তর গ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেমন করিয়া Economics অভিধা political Economy-র স্থান গ্রহণ করিল? ইহা শুধু নামান্তর নয়, ইহার দ্বারা শাস্ত্র যেন গোত্রান্তরিত বা ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে। এ যেন ব্যাঙাচি তাহার ব্যাঙাচিত্ব মোচন করিয়া ব্যাঙ হইল। শুঁয়া-পোকা হইল রঙীণ প্রজাপতি, শূদ্র দ্বিজত্বলাভ করিল। এক কথায় দর্শনের খোলস এবং নীতির মুখোস ছাড়িয়া অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানের রূপ ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এ সম্পর্কে জেভন্‌সের কথা মনে পড়িবেই। পূর্ব্ব-সূরিগণ যাহা পারেন নাই জেভন্‌স তাহা সম্পন্ন করিলেন। ধন-বিজ্ঞান-চিন্তাধারায় তিনি বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের ভাব ও নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি না ছিলেন নীতি-বাগীশ দার্শনিক, না অবসর প্রাপ্ত ব্যবসায়ী, না কর্ম্মব্যস্ত ব্যবহারাজীব, না অত্যুৎসাহী সমাজ-সংস্কারক। তিনি ছিলেন 'সমাজ-বিজ্ঞানী'। আর্থিক ব্যাপার ও ঘটনাবলীকে সযত্নে পর্ষ্যালোচনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। খোলাখুলিভাবেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তাত্ত্বিক। মূলগত নীতির অন্বেষণে বাহির হইয়া তিনি সোজা সরল পথে যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন (তাহা স্বর্গই হউক আর নরকই হউক) সেখানেই আশ্রয় লইয়াছেন। অনুসন্ধানের ফল তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর যাহাই হউক না কেন, তিনি অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তত্ত্বান্বেষণের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন ও যে প্রক্রিয়া তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। বিজ্ঞানের যে কোনক্ষেত্রে যে কোন বৈজ্ঞানিক উন্নততর প্রণালী বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বিলাতে জেভন্‌স ধন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর পরিচয় দিয়াছেন ভারতে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে আদি-বিদ্বান্ কপিল মুনির মধ্যে ও তেমনটী দেখিতে পাওয়া যায়। জেভন্‌স ভোগকে উৎপাদন ও বণ্টনের অগ্রে স্থান দিয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি মিল ও ক্লাসিকাল (Classical) অর্থশাস্ত্রীদের অনুসৃত পথ হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। তত্ত্ব-রচনায় তিনি অবরোহ ও গাণিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানের বেদীতে উঠিতে পারে এবং সেই বেদীতেই তাহার অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলিতে হইলে গাণিতিক পদ্ধতি অপরিহার্য্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ধন-বিজ্ঞান এখনও একটী স্বাধীন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইতে পারে নাই। দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ব-বিদ্যার সঙ্গে অর্থনীতির যে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল তাহা খুলিতে বহুযুগ কাটিয়াছে। অর্থ-বিদ্যার জনক অ্যাডাম্ স্মিথের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যার স্থান কোথায় ছিল তাহা শুনিলে কৌতুক বোধ হইবে। স্মিথ ছিলেন গ্রাকলাতিন ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। প্রথম তাঁহাকে অলঙ্কার-শাস্ত্র ও 'রম্য-রচনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। তারপর তিনি গ্লাসগো'তে ন্যায়ের ও দর্শনের অধ্যাপক হ'ন। চতুর্দ্দশ বৎসরের কিশোর স্মিথ্ যখন ছাত্ররূপে গ্লাসগো'তে যা'ন, তখন হাচেসন দর্শনের এক শাখা-বিশেষের অধীনে অর্থ-নৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—কি ধন-বিজ্ঞান কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের সকল শাখাই অল্পাধিক পরিমাণে দর্শনের সঙ্গে যুক্ত ও তাহার কাছে ঋণী। অর্থশাস্ত্রের আদিবিদ্বান্ আরিস্ততল মূলতঃ দার্শনিক। তাঁহার মধ্যে বহু বিদ্যার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখারই মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—তাঁহার সকল চিন্তাতেই দার্শনিকতার ছাপ মুস্পষ্ট। অগস্ত কোঁতের মতে অর্থনীতি সমাজ-বিজ্ঞানেরই শাখামাত্র—বিদ্যা হিসাবে তাহার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তখনকার দিনে সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তত্ত্ব-বিদ্যা, মনো-বিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে অর্থনীতির যোগ ছিল এবং এখনও কিছুটা আছে। দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরই যে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থনীতি—অতীতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সাধারণভাবে বোধ হয় একথা বলা চলে যে অর্থশাস্ত্রীর চিন্তা-ভাবনা, ঝোঁক ও প্রবণতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাঁহার দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অনুরঞ্জিত অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রী মূলতঃ দার্শনিক (ইহার ব্যতিক্রম যে থাকিতে পারে না বা নাই এমন কথা বলা হইতেছে না)। অ্যাডাম স্মিথের বেলায় একথা যেমন খাটে, কার্লমার্ক্সের সম্বন্ধেও ইহা তেমনই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ, যাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব লইয়াই তৃপ্ত নহেন, পরন্তু সমাজের রূপান্তরে বিশ্বাসী এবং রূপান্তর ঘটাইতে আগ্রহান্বিত তাঁহাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অর্থনীতির পটভূমিতে আছে যে দর্শন তাহার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কি? অর্থনীতির সূত্র-গুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার ও গ্রহণ করিতে গিয়া মুস্কিল হয় এই যে, সমগ্রতার রস আর পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক তত্ত্বের পশ্চাতে আছে যে দার্শনিক মতবাদ মন সেই-ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া সেখান হইতে নীচেকার সূত্রগুলির উপর দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিলে তাহাদের প্রত্যেকটার মর্ম্ম পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের মধ্যে মূল্য সঠিক বোঝা যায়। এই সম্যক দর্শন বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশিত। মূল্য, প্রতিযোগিতা, ভারসাম্য, অবধি (margin), নিরপেক্ষ রেখা (indifference curve) প্রভৃতির স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ধারণা করার জন্যই তত্ত্ব সূত্র-প্রণেতা অর্থশাস্ত্রীর দার্শনিক মতবাদ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করা চাই। প্রত্যেকটা বৃক্ষ তাহার ব্যষ্টি-সত্তা দ্বারা যেন বনানীকে আড়াল করিয়া না দেয়। সিজউইক মূলতঃ দার্শনিক এবং অর্থনীতিতে তাঁহার প্রধান দান হইল তাঁর নীতি-শাস্ত্র। কেম্ব্রিজের অর্থশাস্ত্রী-গোষ্ঠীর, বিশেষতঃ পিগুর উপর তাঁহার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মার্শালের কথাই ধরুন না কেন? মার্শাল ছিলেন দর্শনের ও গণিতের ছাত্র। তাঁহার বিশ্লেষণ ও সূত্র-রচনায়, বিশেষতঃ তদঙ্কিত চক্রগুলিতে, গণিতের প্রভাব লক্ষণীয় এবং চিন্তার পটভূমিতে দার্শনিক মনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মার্ক্সের অর্থনীতি ভালরূপে বুঝিতে গেলে হেগেলের দর্শন বুঝিতে হয়। দ্বান্দ্বিক (Dialectic) পদ্ধতির সুস্পষ্ট ধারণা না লইয়া মার্ক্সীয় তত্ত্বের গহণ-অরণ্য বা গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। ডাস' ক্যাপিটালের (Das Capital) মধ্যে গ্রন্থকারের দার্শনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা শ্রেণী-সংগ্রাম, মূলধনের বিবর্ত্তন, উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানের এক অভিনব ব্যাখ্যা মিলে। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহাকে বলা যায় হেগেলের শিষ্য। অর্জ্জুন যেমন দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখিয়া সেই বিদ্যার সাহায্যেই গুরুকে নিপাত করিয়াছিলেন মার্ক্সও তেমনই হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সহায়তায় হেগেলের মতবাদকে পর্য্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পিরামিডের শীর্ষকে ঘুরাইয়া অধোমুখ করিয়া দিলে ভিত্তিভূমি আকাশের দিকে উঠিয়া যায়। এরূপ উল্টানোর ফলে উপর যায় নীচে, নীচটা যায় উপরে। গুরুশিষ্যের মধ্যে তাত্ত্বিক দৃষ্টির এই বৈপরীত্য প্রাকৃত জনের চোখে প্রকারান্তরে 'গুরুমারা' বিদ্যা বই আর কিছু নয়।

এইভাবে আমরা দেখাইতে পারি যে অতীতে ধন-বিজ্ঞানের মূল উৎস ছিল দর্শন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনার ও অনুসন্ধানের পদ্ধতিও ছিল দার্শনিক পদ্ধতি। সে সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমানা সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয় নাই—এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে আনাগোনা তখন ছিল অব্যাহত। দর্শনের শাখা হিসাবেই ধন-বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত ধন-বিজ্ঞানকে নীতির পরিচারিকা (hand-maid of Ethics) রূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

দর্শন ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির বন্ধতা কাটাইয়া উঠিতে ধন-বিজ্ঞানের অনেক সময় লাগিয়াছে। এখনও ইহা একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইতে পারিয়াছে কিনা বলা কঠিন। দর্শন ও নীতির বন্ধন খুলিয়া এখন ইহা গণিতের ও পরিসংখ্যানের (Statistics) দিকে ঝুঁকিয়াছে। অর্থনীতির অনেক তত্ত্বই এখন গণিতের টেবিলে পরিবেশিত হইতেছে। আর্থিক সূত্রগুলি গাণিতিক ফরমুলায় গাঁথা হইতেছে। অর্থনীতির ছাত্রের পক্ষে গণিতের জ্ঞান এখন অত্যাবশ্যক। এমন অনেক বই ও বিষয় আছে যাহা গণিতজ্ঞ ছাড়া অপরে ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে অর্থ-নৈতিক তত্ত্বকে বা সূত্রকে গাণিতিক সমীকরণে পরিণত করা মানেই নূতন জ্ঞানদান নয়। ইহা একহিসাবে পুনরুক্তি বা ভাষান্তর। জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত কোন আর্থিক তত্ত্ব ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইলে যেমন আমরা বলিতে পারি না ধন-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন রত্ন সঞ্চিত হইল, তেমন কোন সূত্র বা তত্ত্ব যদি গাণিতিক চিহ্নে প্রকাশিত হয় তাহাকে নূতন অর্জ্জন বলা যায় না। আর অর্থনীতি কখনও একান্ত-ভাবে গাণিতিক বিদ্যা হইতে পারে না। মানবিক সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানবিক সম্পর্কের বাহিরে এবং মানবিক মূল্যমানের ঊর্দ্ধে তাহাকে বিচার করা যায় না। সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক মূল্যমান বর্জ্জন করিয়া একটা নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ব্বস্তুক ভাবমাত্রে (Abstraction) পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে এই অতিরিক্ত পরিসংখ্যানানুরাগ এবং গাণিতিক প্রবণতার মধ্যে—অতীতে যেমন দার্শনিকতার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় বস্তু-নিরপেক্ষ নিরালম্ব বায়বীয় ভাবুকতার উদ্ভব হইয়াছিল। এই দুই প্রান্তের আতিশয্যই বর্জ্জনীয়। মানব-সমাজ লইয়া ধন-বিজ্ঞান—সুতরাং তাহাতে মানবিক মূল্যমান অতএব তাত্ত্বি-কতার প্রশ্ন থাকিবেই। তবে সে তাত্ত্বিকতা বাস্তবানুগ ও বস্তুনির্ভর হওয়া চাই। ধন-বিজ্ঞানে এমন কল্পনা-বিলাস বা স্বপ্নবিলাস চলিবে না যাহার সঙ্গে বস্তু জগতের যোগ বা মিল নাই। পক্ষান্তরে রক্তমাংসে গঠিত সুখ দুঃখে সংবেদনশীল সদসদ্‌বিবেকসম্পন্ন মানুষকে নিছক একটা গাণিতিক চিহ্ন (যেমন রক্ত-করবীর "ক") বা মানব-সমাজকে পরিসংখ্যানের একটা যোগফল মাত্র বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অর্থনীতি ক্রমশঃ বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিতেছে এবং হয়ত কিছুকাল পরে ইহা কলা-গোষ্ঠীর বাহিরে গিয়া বিজ্ঞান-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অর্থশাস্ত্রের মধ্যে আছে দুইটী অংশ, (১) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও (২) ফলিত বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষায় বলা যায় জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা তত্ত্ব উচ্চস্তরের জিনিষ—সেই স্তরে আরোহণ করা সকলের পক্ষে সহজ বা সম্ভব নয়। সু-উচ্চ তত্ত্বলোক হইতে ধন-বিজ্ঞান লোক-সেবার ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। সোভিয়েৎ রাশিয়ায়, মহাচীনে, ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে এবং কল্যাণব্রতী যুক্তরাজ্যে ধন-বিজ্ঞান 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' আত্ম-নিয়োগ করিতেছে।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

—'সবারে করি আহ্বান······

···আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান,
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান॥

কল্যাণদীপ জ্বালা পুণ্যতোয়া সবরমতীর পবিত্র তীরে সে গানের আহ্বানে সাড়া দিল সবাকার মন, মহাগুর্জ্জরের অতি-প্রাচীন সেই সমৃদ্ধ নগরীর বুকে সুন্দরের পাদপীঠতলে মিলনতীর্থ রচিত হ'ল পূর্ব্ব ও পশ্চিমের···ভারতের দুই প্রান্তিক ভাষার অতি পুরাতন সংযোগের নতুনতর ভাব-বিনিময়ের সুযোগ সূচিত হ'ল।

বিস্মৃতপ্রায় এক অতীত যুগের পট-যবনিকা উত্তোলিত হ'ল এক অপূর্ব্ব সুরমূর্চ্ছনায়।

আমেদাবাদ! একপ্রান্তে তার শিল্পকেন্দ্র বোম্বাই, বরোদা ও সুরাট, অন্যপ্রান্তে মহাতীর্থ দ্বারকা ও সোমনাথ। গান্ধীজীর স্মৃতিপূত ও রবীন্দ্রনাথের ধন্যধন্য এই শিল্পনগরী। কর্ম্মসাধনা ও মর্ম্মপ্রেরণার এক অতি আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গতা!

মহাগুজরাটের প্রধান শহর এই আমেদাবাদ। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগের বহু মনীষীর জন্মধন্য এই গুজরাট। দধীচি, ভৃগু থেকে সর্দ্দার প্যাটেল ও গান্ধীজী পর্য্যন্ত এই গুজরাটেরই সন্তান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা ও বৈদিক যুগের অতি পবিত্র শিবতীর্থ প্রভাস—এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-বণিকের কর্ম্মচঞ্চল প্রসিদ্ধ বন্দর সোমনাথ—কাম্বে ও যন্ত্রশিল্প সভ্যতার অভ্যুত্থান-নগরী এই গুজরাট।

এই আমেদাবাদেরই বুকে জাতির জনক গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আশ্রম জীবনযাপন সুরু করেন, এখানেই তিনি উপলব্ধি করেন অহিংসার মহামন্ত্র! আবার এখানেই সুদূর বঙ্গদেশ থেকে বিশ্বকবি আসেন তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের প্রেরণা নিতে, মেজদা জজ সত্যেন্দ্রনাথের বাসায় থেকে বহু গান রচনা করে তিনি এখানে বসেই তাতে সুরযোজনা করেন।

বাংলা ও গুজরাটের আত্মিক সংযোগ তাই বহু প্রাচীন। বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মপ্রেরণায় এই দুই প্রান্ত-উপদেশ অতি নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা। তাই স্বভাবতঃই এখানের সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যের গভীর যোগাযোগ ঘটেছে। এখানের প্রসিদ্ধ কবি নরসিংদাস মেহেতার মধ্যে উদ্ভূত হ'য়েছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পুণ্যবাণী, বাংলার বৈষ্ণব কবিদের রসমূর্চ্ছনার আবেশ পাই ভক্তকবি ভালনের কণ্ঠে, ভক্তিময়ী মীরাবাঈয়ের ভজন গানে।

সেই পুরাতন প্রেমে তাই আর একবার উজ্জীবিত হ'য়ে উঠল নব-প্রেমছন্দে।

উনিশশো সাতান্নর আটাশে ডিসেম্বরের পুণ্য প্রভাত! শুধু বঙ্গদেশ থেকে নয়, আসাম-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-উড়িষ্যা-মাদ্রাজ-দিল্লী-রাজস্থান—ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে বাঙালী এসেছে এই সবরমতীর পূত-বারি-ধৌত ঐতিহাসিক নগরীতে এখানকার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে, নিবিড় সাহচর্য্যে ও অন্তরের আদানপ্রদান করতে এখানকার মানুষদের মধ্যে, সুযোগ পেতে কিছু অন্তরঙ্গ ভাব-বিনিময়ের।

নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবক-যুবতী-বাঙালী ও গুজরাটিতে জমজমাট 'অখণ্ড-আনন্দ হল'। সেখানেই—সেই নির্লিপ্ত নীল আকাশের রৌদ্র-করোজ্জ্বল পৌষালী প্রভাতে নারী-পুরুষের দ্বৈতকণ্ঠের আহ্বান-বাণী প্রচারিত হল! প্রকৃত শিল্পীর দরদ-ভরা সুরে কবিগুরুর সেই অনবদ্য সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় আবিষ্ট হ'ল প্রতিদিগ্‌দিগন্ত—

'আকাশে আকাশে বনে বনে, তোমাদের মনে,
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।

সেই গানেই এবারের নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রি-ত্রিংশৎ অধিবেশনের সুরু।

আসল গ্রন্থের মূল কাহিনী আরম্ভের পূর্ব্বে ভূমিকার মত সম্মেলনেও হয় অধিবেশনের পূর্ব্বে শিল্প ও কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন। তবে এবারের এ প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সবখানিই ঘিরে আছে শুধু আমেদাবাদবাসীদেরই বিভিন্নমুখী শিল্প প্রতিভা-নৈপুণ্যের বিকাশ! বলিষ্ঠ নিপুণ হাতের সেই প্রদর্শনীর বাঙালী, গুজরাটি ও রাজস্থানী রেখাচিত্র ও ফটোগ্রাফীর সমাবেশ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিশেষ করে কয়েকটি তিন-চারি শতাব্দী পূর্ব্বেকার প্রাচীন পুঁথির মধ্যে পাতায় পাতায় যে লিপিকুশলতা ও চিত্র-বৈচিত্র্যের মধ্যে রঙের সমারোহ চোখে পড়েছিল, সত্যিই তা অপূর্ব্ব!

গুজরাট যে এক অতিপ্রাচীন স্থপতিবিদ্যার ধারাবাহক ও শিল্প-প্রতিভার ঐতিহ্যসম্পন্ন—তার যেন নতুন করে পরিচয় মিলল। শিল্পীদের মধ্যে রবিশঙ্কর রাওল, রসিকলাল পারেখ, বিদ্যাবেন পারেখ, শিবকুমার পাণ্ডা, পূর্ণেন্দু পাল, ত্রিপুরেশ মুখার্জ্জী ও দেবনাথ মুখার্জ্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। সরাফৎ হোসেন, টি-এফ-গেটি, খোপকার প্রভৃতির ফটোচিত্রগুলিও প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি শেঠ মদনমোহন মঙ্গলদাস। তাঁর অন্য যে পরিচয়ই থাক, অতি সুঠাম, সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন দেহসুষমার অধিকারী তিনি—শিল্প-কলা প্রদর্শনীরই যোগ্য

বোধক বটে! তিনিও বাংলার সঙ্গে গুজরাটের আত্মিক যোগাযোগের কথাই বললেন। বললেন, শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না। এই ধরণের সম্মেলনের মধ্য দিয়েই প্রাদেশিক মালিন্য মুছে যায়। বাংলার মত গুজরাটও নানা ভাষা থেকে রসসম্পদ আহরণ করে আজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে গুজরাটি সাহিত্যে বাংলার দানও কম নয়!

তাই তিনি জানালেন, শুধু রাজনীতিক বিষয়ে নয়, সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ভারতের পথিকৃৎ!

—'সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নাই এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার অগ্রগতি দেশবাসীকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতে হইবে!'—বাংলা ভাষার প্রতি আর একবার অভিনন্দন বাণী উচ্চারিত হল মূল অধিবেশনের উদ্বোধক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সুপণ্ডিত শ্রীকে, এম, মুন্সীর ভাষণে।

শহর প্রান্তে সুসজ্জিত টাউন হলে অধিবেশনের আয়োজন হ'য়েছে। সুচারু শিল্পসজ্জিত মঞ্চ ও বর্ণাঢ্য প্রেক্ষাগৃহে সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সুরু। বিভিন্ন স্থান থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ, তৎসহ স্থানীয় গুজরাটি কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। বেশ জমজমাট অধিবেশন!

মুন্সীজীর উদ্বোধনী ভাষণের পর মেয়র শ্রীবিনুভাই চিমনলাল স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন সমাগত অতিথিবৃন্দকে। তিনিও ঐ একই সুরে ঘোষণা করেন গুজরাটি সাহিত্যে বাংলার প্রভাবের কথা। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিবাদ ও বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুজরাটি জনসাধারণের সঙ্গে নবচেতনা সঞ্চারের কথা!

এটা এবার আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলা সাহিত্য যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে গুজরাটিদের মধ্যে, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই ভূরি ভূরি বাংলা উপন্যাস ও নাটকের গুজরাটি ভাষায় অনুবাদে। জনপ্রিয়তায় সেই বইগুলির নাকি তুলনা নেই। একজনের কাছে শুনলাম, যে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বইখানিরই নাকি আঠারবার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ একটা ঘটনার কথা জানাই। সম্মেলনের শেষে আমরা নানা জায়গা ঘুরে যাই আবুপাহাড়ে। সেখানে এক পাহাড়ে সূর্য্যাস্ত দেখতে গিয়ে আলাপ হয় এক গুজরাটি-দম্পতির সাথে। কথায় কথায় সাহিত্যের কথা উঠল। ভদ্রমহিলা জানালেন, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের কথা, আরো কত বাঙালী লেখকলেখিকার কথা—যাঁদের সমস্ত বই তিনি শেষ করেছেন।

সম্মেলনে-সমাগত গুজরাটি বন্ধুদের কাছেও এর পরিচয় পেলাম। আলাপ হ'ল তরুণ সাহিত্যিক শ্রীকান্ত ত্রিপাটির সঙ্গে। অদ্ভুত অনুরাগ তাঁর বঙ্গসাহিত্যের প্রতি। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসেছি তার প্রমাণ। নূতন ও পুরাতন সমস্ত প্রকাশিত বাংলা বই তাঁর ঘরে আছে। অনেক বাংলা বই—আমরাও যার খোঁজ রাখিনি—তিনি তাও সংগ্রহ ক'রে আমাদের লজ্জা দিয়েছেন। বহু বাংলা বই ইতিমধ্যে অনুবাদও করেছেন তিনি।

সেই পূর্ণ সভাগৃহে মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমঝদারী ভাষায় এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-বিশ্লেষণ ও যথার্থ অনুরাগী সমালোচকের দৃষ্টিতে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পর্য্যালোচন হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সবচেয়ে প্রশংসার কথা, তিনি যে বাস্তব সমস্যার সমালোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ এক অভিজ্ঞ রসিকের দৃষ্টিতে, অতি প্রিয়জনসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গীতে, ভাববিলাসিতার আচ্ছন্ন দৃষ্টি অথবা বিজ্ঞজনের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে তিনি কাকেও অবজ্ঞা করেননি। পরিচ্ছন্ন ও সুদৃঢ় সাহিত্য-সৃষ্টির পথে যে সমস্যায় অন্তরায় আজ মাথা চাড়া দিয়েছে, অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি তার প্রতিই সকলের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সবশেষে সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তার কবিসুলভ সুললিত ভাষায় বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করে গুজরাটবাসীর প্রতি তাঁর অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁর অভিভাষণের সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় তার বাহুল্যবর্জ্জিত সংক্ষিপ্ত রূপ;—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি ব্যবহার করেননি। অথচ তার মধ্যেই বঙ্গ ও গুর্জ্জরের সামগ্রিক সম্বন্ধের অনুশীলন করেছেন। ভারী মিঠে সুরে উদাহরণ সহযোগে তিনি শ্রদ্ধা জানালেন দুই প্রান্তিক ঋষিযুগলের চরণকমলে—সাধনা এবং সংগ্রামের আত্মিক বেদীমূলে। আর একবার ঘোষিত হ'ল, শান্তিনিকেতন আর সবরমতি—দুইয়েরই সাধনা এক, স্বপ্ন এক।

তারপর 'কবি-সম্মেলন'—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতি। উদ্বোধক গুজরাটি কবি নিরঞ্জন ভগৎ। বাঙালী ও গুজরাটি কবিদের এই অন্তরঙ্গ সম্মেলনে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের বেশ একটা পরিচ্ছন্ন সুযোগ ছিল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টেনে-টুনে তবু বাঙালী কবিদের সংখ্যাটা একটু ভদ্রগোছের দাঁড় করানো গিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া কবিদের মধ্যে ছিলেন দীনেশ দাশ, হাসিরাশি দেবী, নীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি। প্রবন্ধলেখক স্বয়ংও সে গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল বাংলাসাহিত্য, গুজরাটি সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং কলাশাখার অধিবেশন।

বাংলাসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ হাস্যরসের ভাণ্ডারী। বিশেষ করে তাঁর কাছে আমরা কিছু সরস সম্ভাষণ আশা করেছিলাম; কিন্তু ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করলেন, তার মধ্যে আর যাই থাক, হাস্য-কৌতুক রসের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। তিনি আমাদের নিতান্তই হতাশ করেছেন।

এ কথা আগেও বহুবার বলেছি, পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হলেও আবার বলি যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলতে গেলে অভিভাষণ বড় পাণ্ডিত্য-

মীনাকুমারী তাঁর ত্বকের যত্ন নেন
লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে "এটি এত সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!" তিনি বলেন
বিয়োগান্ত করুণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জন-প্রিয় চিত্র তারকাদের অন্যতম। তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন, তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের সময় গরম আর্কল্যাম্পের তাতেও তাঁর ত্বক থাকে মসৃন ও লাবণ্যময়! অবশ্য লাবণ্যের যত্ন নেওয়ার একটি গোপন উপায় তাঁর জানা আছে। "আমি সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।" নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার ত্বক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে উঠছে!
কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের তারকা
LUX TOILET SOAP
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 544-X52 BG
হিন্দুস্তান লীবার লিমিটেড, বম্বে, কর্তৃক প্রস্তুত

পূর্ণই হ'ক না কেন তা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন, যদি না তার মধ্যে থাকে রসের কোনকিছু আয়োজন।

এ বিষয়ে সঙ্গীত ও কলাশাখার সভাপতি শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র কিছু সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তাঁর ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে স্বকণ্ঠে প্রচারিত কিছু সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা ছিল, তাই তার আবেদন এত সহজ হ'য়ে সকলের হৃদয় জয় করেছে।

কিন্তু সেদিনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল মেয়রপ্রদত্ত সমাগত প্রতিনিধিদের নাগরিক সম্বর্দ্ধনা। এ একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব। আর কোথাও কোন সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছে ব'লে শুনিনি। অবশ্য এই সম্বর্দ্ধনার কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ার পর অপর এক সম্মেলনে এর ব্যবস্থা হওয়ার কথা শুনেছি, কিন্তু আয়োজনের দিক থেকে এখানেই এর সূচনা।

যাই হোক, সবরমতীর তীরবর্ত্তী এক অতি মনোহর উদ্যানে বৈকালিক চা-পানসহ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন। পৌরসভার সমস্ত সদস্য সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত বাগান ঘিরে পুষ্পলতা ও কুঞ্জবীথির আশেপাশে ছোট ছোট টেবিল। প্রতি টেবিলেই কিছু স্থানীয় সভ্য ও কিছু সম্মেলনের প্রতিনিধি। পারস্পরিক আলাপ-আলাপনের মধ্য দিয়ে ভাব-বিনিময়ের নিবিড় সুযোগ। গুজরাটি মানুষের কিছু পরিচয় এরা বয়ে নিয়ে যাক্ সুদূর বাংলায়, কিছু দিয়ে যাক্ বাঙালীর মর্ম্ম কথা। সখ্যতা নিবিড় হ'য়ে উঠুক।

আর তা নিবিড়তর করায় প্রয়াসী হ'লেন দেবেশ দাশ মশাই। মেয়রের স্বাগত সম্ভাষণের জবাবে যে ভাবে তিনি সম্মেলনে সমাগত উল্লেখযোগ্য বাঙালী প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন গুজরাটি বন্ধুদের সাথে, তা সত্যিই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটিকেও অতি সরস করে তুলেছিল।

এই সরসতার জবাবে মেয়র মশাইও যে মধুরস পরিবেশন করলেন তাও অপূর্ব্ব। চা-এর সহযোগটুকুর মত তাঁর কথাগুলিও উপাদেয়।

শেষ দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল দুটি শাখা-অধিবেশন। ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিদের 'গা-ঢাকা' সুরু হ'য়ে গেছে। কেউ পাড়ি জমিয়েছেন আবু পাহাড়ে, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যা কিছু দেখা সারা যায়, আবার কেউ আগামীকালের শহর-পরিদর্শনের অপেক্ষা না রেখেই বেরিয়ে পড়েছেন। আমেদাবাদের মিল-এলাকা ছিল মোটা একটা দলের লক্ষ্য।

সেই ভাঙা হাটেই সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। অনেকের কাছেই এই শাখা অধিবেশনটি সম্বন্ধে অভিযোগ শুনলুম। এটির আদৌ যৌক্তিকতা আছে কিনা সেটাই তর্কের বিষয়।

শেষ অধিবেশন শিশু-সাহিত্য শাখায়। তখন একটু বেলা হয়েছে, ভাঙা হাটে আরো কিছু সমাবেশ হয়েছে প্রতিনিধির। অনেকেই আবার এই শাখা-অধিবেশনটিতেই বিশেষ ভাবে যোগ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরেছেন।

তবু ভাল! সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের চেয়ে তাঁরা যে শিশু-মন-গঠনের কথা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা ভেবেছেন, এতেও কিছু আশ্বস্ত হওয়া যায়! অন্ততঃ যার ত দেখেছি এই শাখাটির প্রতি সকলের আকর্ষণের দৌড়!

এই শাখায় সুভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। তাঁর ভাষণ অত্যন্ত মামুলী হ'লেও সর্ব্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য! শিশু-সাহিত্যের যে সমস্যার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা পুরাতন হ'লেও চির-সত্য! শিশুদের জন্যে তাঁর দরদী চিন্তার আভাস এই ভাষণে মেলে।

তবু বলব, অভিভাষণের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ নামোল্লেখের ব্যাপারে আরো কিছু সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন ছিল। প্রতিষ্ঠাবানদের বাদ দিয়ে কিছু অখ্যাতনামার উল্লেখ সত্যিই বড় বিসদৃশ ঠেকে।

শিশুশাখায় উপস্থিত শিশুদের মনোরঞ্জনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। প্রবন্ধ-লেখক তাদের জন্যে কয়েকটি সুছন্দের ছড়া পরিবেশন করলেন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ।

বৈকালিক সাধারণ সভা গতানুগতিক। মামুলী ধন্যবাদ প্রদান ও কার্য্যকরী সমিতি গঠন।

ধন্যবাদ প্রদানের ব্যবস্থাটা মামুলী হলেও ধন্যবাদটা দেওয়া হয়েছে আন্তরিকভাবেই। সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তাদের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ, তবু তাঁরা যেভাবে আমাদের সুখ-সুবিধার জন্যে প্রাণপাত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়!

আরও একটা ব্যবস্থা অভিনব এবং আনন্দজনক। বাইরে যাঁরা ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনে ব্রতী আছেন, তাঁদেরই পুত্র-কন্যা করছেন আমাদের সেবা, আর অন্তরালে তাঁদেরই সহধর্ম্মিণীগণ আমাদের এই বিরাট দলটির জন্যে প্রস্তুত করছেন আহার্য্য।

সুতরাং বাড়ী থেকে দেড় হাজার মাইল দূরেও যে আমরা অনাথ হয়ে পড়িনি, ঘর ছেড়েও যে ঘরোয়া পরিবেশে বাস করতে পেরেছি এর জন্যে প্রত্যেকেই খুব খুশী। তাই আনুষঙ্গিক অনেক ত্রুটিই সকলে হাসি-মুখে সয়েছেন।

নারী-শিশু মিলিয়ে যেখানে মাত্র হাজার খানেক বাঙালীর বাস, সেখানে এ ধরণের বিরাট ব্যবস্থার অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব হ'ত না যদি না তাঁরা পেতেন স্থানীয় গুজরাটিদের সাহায্য! এক এক সময় কোথাও ভেদ মনে হয়নি বাঙালী ও গুজরাটির মধ্যে।

ব্যবস্থার আরো কিছু অভিনবত্ব ছিল। তা এই যে, সম্মেলনের অধিবেশনের মধ্যেও এ ধরণের একীভূত হওয়া বিস্ময়কর। গুজরাটি সাহিত্য শাখার অধিবেশনটাত নিতান্তই ছিল আনুষ্ঠানিক। গুজরাটী সাহিত্যরস প্রতিদিনই আমরা পেয়েছি প্রতিটি অধিবেশনে। সমস্ত শাখা অধিবেশনেরই উদ্বোধক ছিলেন স্থানীয় সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কবি শ্রীউমাশঙ্কর যোশী, রবিশঙ্কর রাওল, রসিকলাল পারেখ, নিরঞ্জন ভগৎ, রসিকলাল পারেখ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলাভাষায়

সুপণ্ডিত। তন্মধ্যে নগিনদাস পারেখ মশাই বহু বাংলা বই গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বহু গুজরাটি কবিতা বা বক্তৃতা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যে বাংলায় তর্জ্জমা করে শুনিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি শান্তিনিকেতনেই শিক্ষাপ্রাপ্ত।

প্রতিনিধিদের আনন্দ বিতরণের জন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও কম আকর্ষণীয় ছিল না। বিশেষ করে স্থানীয় গরবা ও রাসনৃত্যের অনুষ্ঠানটি অপূর্ব্ব মনে হয়েছে। যেমন বিরাট দল, তেমনি সাজপোষাকের অভিনবত্ব, সঙ্গীতেরও তেমনি ছন্দ, তেমনি সুন্দর পরিকল্পনা। সকলেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করেছে এই অনুষ্ঠানটি।

আরো একটি অনুষ্ঠান সকলকে রীতিমত বিস্মিত করেছে, তা হ'ল শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকের গুজরাটি অভিনয়। অনুবাদ কেমন হ'য়েছে তা ঠিক বলার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু অভিনয় ও ভাবাবেগ প্রকাশে যে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখেছি, তা সহজে ভোলার নয়। সম্পূর্ণ বাঙালী ব্যবস্থাটুকু যে কিরকম সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিবেশন করেছেন—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বলতে দ্বিধা নেই কোন সৌখীন বাঙালী নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই নাটকের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখিনি।

শেষ দিন ছিল নগরপরিক্রমার ব্যবস্থা। প্রাচীন দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখবার আয়োজন।

তারপরই সুরু হ'ল গাড়ি দেওয়া। অল্পসংখ্যকই ফিরলেন বাড়ীর পথে, ভারী দলটাই পাড়ি জমালেন দ্বারকা-সোমনাথ-দিলওয়ারা!' এত কাছে এসেও চতুর্ধামের অন্যতম ধামে না গেলে যে জীবন ব্যর্থ!—সুতরাং দ্বারকাতীর্থে যেতেই হবে?

দল তৈরীই ছিল, সেই রাতেই আমরা পাড়ি জমালুম পশ্চিমের শেষ প্রান্তিক সীমানার উদ্দেশ্যে।

জীবে প্রেম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

জীব শিব—এ কৃষ্টি ভারতের। জীবকে উপেক্ষা ক'রে শিবত্বলাভ হয় না। জীবে প্রেম বিরাটের সাগরসৈকতের মাত্র ক্ষুদ্র বালুকণার প্রতি শ্রদ্ধা। সম্যকের উপলব্ধিতে সত্যের সন্ধান লাভ হয়। কিন্তু অনিত্যকে না বুঝলে নিত্যের বোধ অসম্ভব। তাই কোনো বালুকণা উপেক্ষণীয় নয়—সমজ্ঞানের অনুসন্ধানে। বজ্রকণ্ঠে কহেছিলেন ঠাকুরের পরম-প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ ···

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এ ধ্বনি উপদেশের নির্দেশ নয়। স্বামীজির মন-প্রাণ ভরপুর ছিল পূর্ণত্বের রসে। সে অমৃতধারা বর্ষিত হয়েছিল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কে জানে কত যুগ পূর্ব্বে। জনসেবা, মাত্র চিত্তের করুণার বিকাশ নয়—আপনার গুরুত্বের উপলব্ধিতে। এ সাধনার কারণ দিয়েছেন স্বামীজি। হিন্দু শাস্ত্রের এক মূল কথা সে বিবৃতিতে শোনা যায়।

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ-সবার পায়।

কবি রামপ্রসাদের স্পষ্ট ভাষা—মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে।

কবি রবীন্দ্রনাথও হ'তেন কঠিন, যখন ব্যথিত হ'তেন তিনি মূঢ়তার মন-ভোলানো প্রলোভনে। বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—

ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

সমদর্শীর বিজিত বিশ্বের এক স্তর তো এই প্রাণ-বহুল সংসার ধাম। দেব-লোকে বাস করার লোভে সত্যই তো ইহলোককে নরক হীনধাম ভাবা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নয়। তাই কবি বলেছিলেন—

"দেবলোক নিজেকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে। সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙ্গে গঙ্গার ধারার মত মলিন মর্ত্ত্যের মধ্যে তাকে প্রবাহিত ক'রে দিলে তবে তার বন্ধন মোচন হবে। মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।"

মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র—জীবে দয়া, নামে রুচি। এ-দয়া ও রুচি এক অন্যের সাপেক্ষ। জীবে দয়া না হ'লে কী নামে রুচি হয়? কারণ নামীর কৃপা যে জগত ব্যাপ্ত। আবার নামে রুচি হ'লে নামীর পাওয়া

যার সন্ধান—তখন ঐ সত্যই হয় দেদীপ্যমান। জীব যে তাঁর গড়া। বিদ্যা, অবিদ্যা কেহ তো স্বাধীন নয়—নামীর বিরাট সৃষ্টিতে।

মনকে অনাসক্ত করা জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু জীব বাদ দিয়ে কঠোর তপস্যায় মন জয় করবার আয়োজন কি সম্ভবপর? সংসারের ভালো-মন্দ মলিন-অমলিনের ওত-প্রেত মিলনের রহস্যকথার সম্যক জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। সে রহস্যের সমাধান দেখায় শুদ্ধি মার্গ। কারণ পরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দান, পরের সেবা। জীব মাত্রেই সেই বিরাটের এক টুকরা। পূর্ণের সন্ধানে প্রতি টুকরার প্রতি আত্মীয়তা-বোধ অপরিহার্য্য। মনকে শুদ্ধ করতে গেলে—পরের মনের কাতরতা দূর করতে হয়—যেমন দেহের এক অঙ্গের অসুস্থতায় সারা দেহের নিরাময়তা লভ্য নয়।

অন্তর শুদ্ধির প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছিলেন—

কিং তে জটাহি দুম্মেদ কিং তে অজিন সাটিয়া
অন্তম্ভরং তে গহনং বাহিরং পরিমজ্জসি।

—হে নির্ব্বোধ, তোমার জটাই বা কি করবে আর মৃগচর্ম্ম সজ্জাই বা করবে কী? অভ্যন্তর গহন। তুমি বাহির পরিমার্জ্জিত করছ।

তাই ব্রাহ্মণের এক বিশিষ্টতা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,—যিনি দুর্ব্বল এবং সবল উভয়বিধ প্রাণীর প্রতি অহিংস, যিনি প্রাণবধে বিরত, যিনি কাহাকেও আঘাত করেন না তিনিই ব্রাহ্মণ।

মোট কথা—পরকে উপেক্ষা ক'রে, আপনাকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়—স্বার্থান্বেষণ। তাতে মুক্তি নাই।

হিন্দু ঘরের প্রত্যেক প্রার্থনা প্রত্যহ শেখায় সর্ব্বভূতের হিতে রতি। জগন্মাতা—সর্ব্বমঙ্গলা, সবার মঙ্গল করেন তিনি। তিনি সর্ব্বার্থসাধিকা—সকলের মনোবাঞ্ছা পুরণ করেন তিনি।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শত্রু বধের শিক্ষার মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়েছেন প্রেম-ধর্ম্ম। তিনি জীবকে অবজ্ঞা করতে শিক্ষা দেননি কোনো দিন। কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগের শেষেও তিনি উপদেশ দিয়েছেন—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যাঁর সংযত, যাঁর ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিগত, তেমন মোক্ষপরায়ণ মুনি সদা মুক্ত। যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর সর্ব্ব-ভূতের সুহৃদরূপে আমাকে তিনি জেনে শান্তি পান। *

সর্ব্বভূতে তাঁর মিত্রতার জ্ঞানকে বাদ দিলে মানুষের মুক্তি নাই, শান্তি নাই। কারণ মুনিকে বিশিষ্টরূপে জানতে হয় যে ঈশ্বর সকল ভূতের সুহৃদ। সে সন্ধান শান্তির এক দৃঢ় ভূমি। এ শিক্ষা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সর্ব্বত্র।

তাঁর আত্ম-পরিচয়ে তিনি অবতরণের কারণ দিয়েছেন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ। এর অর্থ নয় কি—সাধুভাবের পোষণ, দুষ্কৃত ভাবের অপনোদন? জগাই মাধাইয়ের অসাধুতা বিনাশ করেছিলেন মহাপ্রভু প্রেমে। আঘাতের বিনিময়ে প্রেম বিতরণে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন সাধুর পরিত্রাণের আয়োজনে ঐশ-শক্তি নিয়োগ করে-ছিলেন মানুষের কী কর্ত্তব্য নয় পরোপকার?

মানুষের এ সম্পর্কে কী কর্ত্তব্য সে কথা স্পষ্ট বুঝিয়েছেন অবতার বহু স্থলে। সেগুলি একত্র ক'রে সংশ্লিষ্ট ভাবে বুঝলে সন্দেহ থাকে না যে—পৃথিবীর সকল জীবকে উপেক্ষা ক'রে মাত্র নিজের মোক্ষের অভিলাষে বৈরাগ্য সাধন কোনো সাধককে মুক্ত করতে পারে না। সাধনায় ব্রাহ্মী-স্থিতি ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ হয়। সে স্থিতি আপনাকে মুছে ফেলা, অহংকারের লোপ। নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারের আত্মভাব নাই, পর-ভাব থাকবে কেমন ক'রে। তার পক্ষে আত্মপর সব সমান। সে শান্তি পরকে ভুলে আসে না। আসে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-বাসনা ভুলে—সকল কামনা-নদীকে আত্মা-সমুদ্রে প্রবাহিত ক'রে।

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি নলিপ্যতে ।৫।৭।

সর্ব্বভূতের আত্মায় নিজের আত্মা দর্শন করেন যিনি, তিনি কর্ম্ম করলেও নির্লিপ্ত। তিনি সম্যক দর্শী। সমদর্শন বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের এক মার্গ। পরকে পর না ভাবাই কর্মত্যাগের উপায়, কর্মের ঘূর্ণপাকে বিপর্য্যস্ত না হবার কৌশল।

সম-দৃষ্টিতে প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী কর্মী বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর সকলে-তেই সমদর্শী হন। তেমন ব্যক্তিই পণ্ডিত। এমন মানুষই সংসার সমর ক্ষেত্রে হন বিজয়ী। এমন বিজয়ী বীরে

* গীতা

লক্ষ্য থাকে অনাদি নির্গুণ ব্রহ্মে। কারণ ব্রহ্মে ভেদাভেদ নাই।

নিষ্পাপ, সংশয়বর্জ্জিত, একাগ্রচিত্ত সর্ব্বভূতহিতেরত ঋষিরা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যিনি সম্যকদর্শী তিনি ঋষি। তাই সর্ব্বভূতহিতেরত তিনি।*

এ নির্দেশ স্পষ্ট যে সর্ব্বভূতের কল্যাণ-কামীর লভ্য নির্ব্বাণ, অবশ্য অন্যান্য গুণও যাঁর অর্জ্জিত। সর্ব্বভূতহিতে রতি না থাকলে সাধক পেতে পারেনা নির্ব্বাণ।

ঈশোপনিষদের শিক্ষা ঐ ভাবই প্রকাশ করেছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।৬।

যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা আপনার আত্মার মাঝে দর্শন করেন এবং সকল আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।৭।

যিনি একাত্মদর্শী সকল ভূতকে (একই) আত্মা বলে জানেন—তাঁর মোহই বা কোথা, আর শোকই বা কোথা? কারণ মোহ এবং শোক আসে অন্যের বিরূপ কর্ম হতে।

গীতামৃত উপনিষদ নির্য্যাস। এই ভাব গীতার এক উপাদেয় উপদেশ। তাই শান্তি লাভের শিক্ষায় গীতা বললেন—

"মনুষ্যগণ আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকল লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ জেনে শান্তি-লাভ করে।"†

সর্ব্বজীবের যিনি সুহৃদ তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ এবং তপস্যার মাঝে কি শান্তিকামী সাধক কোনো জীবের বৈরিতা করতে পারে? জগদীশ্বরে ভক্তি থাকলেই তিনি যাদের সুহৃদ, তাদের সাথে সৌহৃদ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভগবান ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রকারে সাধনার উপদেশ দিয়েছেন, কার্যে পর-সেবা, জ্ঞানে পরসৌহৃদ্য। যোগের ফল তো সাধনার পরম লাভ। কিন্তু তার পূর্ব্বে আবশ্যক চরিত্র গঠন। আবশ্যক সমবুদ্ধি হওয়া। পরকে ভালবাসা। মাত্র নিরপরাধ পরের সাথে কুটুম্বিতা নয়। যে হিংসা করবে তার প্রতি প্রেম। বললেন—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য সাধু পাপী প্রত্যেকের প্রতি যিনি সমজ্ঞান—তিনি শ্রেষ্ঠ।*

তারপর যোগের শিক্ষা দিলেন—কিরূপে অত্যন্ত সুখে মানুষ ব্রহ্ম-সংস্পর্শ লাভ করতে পারে, সে যোগের শিক্ষা দিয়ে বুঝি বা বুঝলেন নারায়ণ—মানুষ সেই সুখের কল্পনায় সাংসারিক কর্ত্তব্য-পথ ভ্রষ্ট হতে পারে। আর সে ব্রাহ্মী-স্থিতিও তো বিশ্বের কোনও আংশিক তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখ নয়। ব্রহ্মস্থিতি যে শাশ্বত অনন্তের আনন্দে স্থিতি। তাই সাধককে সাবধান ক'রে দিয়ে সেই সনাতন নীতি বিবৃত করলেন, যা ভারতের ভাবধারাকে করেছিল শুদ্ধ, সমারূঢ় করেছিল তাকে উচ্চাসনে। আবার দিলেন তিনি সেই সমদর্শনের উপদেশ। বললেন—"সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগনিরত পুরুষ, আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত এবং সর্ব্বভূতকে নিজের আত্মায় দর্শন করেন।†

সেই মঙ্গলময় শিক্ষা ঈশোপনিষদের। আপন-পরে ভেদাভেদ নাই। আরও বুঝিয়ে বললেন—ভক্ত তুমি, জ্ঞানী তুমি, যোগী তুমি। তুমি তো চাও আমি যেন সদা থাকি তোমার আঁখির মাঝে, তুমি যেন না থাক আমার দৃষ্টির অন্তরালে। শুভ সংকল্প। শোন উপায়, যে আমায় দেখে সর্ব্বত্র, আর সবাইকে দেখে আমার মাঝে, সে তো হয়না আমার পরোক্ষ, আমিও যাই না তার দৃষ্টির বাহিরে।‡

আরও বললেন—সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে উপলব্ধি ক'রে সেই যোগীপুরুষ সকল প্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থেকেও আমাতেই অবস্থিতি করেন। হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে নিজের উপমায় সুখ দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।§

---

* গীতা—৫।২৫

† গীতা ৫।২৯

* গীতা ৬।৯

† গীতা ৬।২৯

‡ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।৬।৩০

§ সর্ব্বভূতস্থিত যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। ৬।৩১।৩২

যে অবস্থায়ই দেখি পরকে হতশ্রদ্ধা ক'রে কেহ পারে না পরমও চরম সুখ লাভ করতে। যোগী দিনরাত ঈশ্বরের উপাধিতে মিলে থাকতে পারে না। "সুখমত্যন্তিকং" উপভোগ করতে পারে পূর্ণলয়ে দেহ ধ্বংস না হ'লে। যতদিন দেহ বিদ্যমান যোগীর মনকে সংসারে নামতেই হয়। চিত্তকে বিশুদ্ধ রেখে চিত্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টায় যোগীকে তপস্যাচরণ করতে হয়। তার একটা উপায় চিত্তের সম্প্রসারণ। অয়ং নিজ পরাবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম—বলেছেন কবি। এ আপনার, এ পর—এ গণনা লঘুচিত্ত ব্যক্তির। উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম। যে উদার-চরিত সারা বিশ্ব তার কুটুম্বে পূর্ণ। পরের কষ্টে যোগীর মনে কষ্ট হয়, পরের সুখে সুখ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—কুল-কুণ্ডলিনী জাগিয়ে ব্রহ্ম সংস্পর্শমাত্র যোগীর করণীয় নয়। তাকে অভ্যাস করতে হবে দিবারাত্র শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আত্ম-সম্প্রসারণের ফলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। শীতকাতরের কাঁপুনিতে কাঁপতে হবে আপনাকে, বভুক্ষুর ক্ষুধার অগ্নির প্রদাহ সহ্য করতে হবে জঠরে। যদি পরব্রহ্মে লীন হতে চায় মানুষ, তা'হলে বিশ্বের কোনো টুকরাকে তো ব্রহ্ম-ছাড়া ভাবলে চলবে না।

সত্যইতো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা উপলব্ধি করি আত্ম-প্রসারের প্রকৃষ্ট ফল। পরকে আপন করলে বেড়ে যায় জীব। কূপ-মণ্ডুক তো কূপের বাহিরে যে জগত বিদ্যমান, তার উপলব্ধি করতে পারে না।

পুনঃ পুনঃ ভগবান বলেছেন তিনি সর্ব্বব্যাপী। সকলই তাঁহাতে, তিনি সর্ব্বত্র। তাই তিনি বোঝালেন ভক্তকে—হে ধনঞ্জয়, আমা হ'তে অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ তো জগতের নাই। আমি তো মাত্র কারণ নই। জগত আমাতে স্থিত। মণিমালার মণিগুলি যেমন গাঁথা থাকে সূত্রে, তেমনি সমগ্র জগত তো গাঁথা আমাতে। জগতের কিছু ঘৃণ্য নয়, সবই মণি। যা' ভগবান-সূত্রে গাঁথা, তা কি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য হতে পারে? সকল জীবই মণি। তিনিই কারণ সৃষ্টির। সবারই ভগবানে স্থিতি—তাই সবই পবিত্র। অবিদ্যার ফলে জীব দেখে ভেদ। বিদ্যায় সব অলীক—মাত্র দৃষ্ট হবে—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

জগৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে আচ্ছন্ন। এই ত্রিভাবে জগৎ মোহিত। তাই যাঁর সৃষ্টি এই ত্রিগুণ, তাঁকে চিনতে পারে না বিশ্ব। অথচ তিনি বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু অবিদ্যার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কি একভক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানীরই সহজে হয়? বল্লেন ভগবান—বহুজন্মের অন্তে জ্ঞানবান আমাকে লাভ করে। জ্ঞানবান উপলব্ধি করে সমস্ত জগৎ বাসুদেবময়। অবশ্য তেমন মহাত্মা সুদুর্লভ।*

সেই বীজমন্ত্র—বাসুদেব সর্ব্বমিতি—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে তাঁর সূত্র।

তিনি ভগবানের স্বরূপ বহুবার বর্ণনা করেছেন গীতায়। মহাবায়ু সর্ব্বত্র গমনশীল অথচ আকাশে তাঁর স্থিতি তেমনি ভূত সকল তাঁর মাঝেই অবস্থিত।

যথাকাশস্থিতঃ নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।৯।৬

এ ধারণা না হ'লে প্রকৃত ধারণা হ'বে না ভগবানের। আর এ ধারণার মূল নির্দ্দেশ যে সকল ভূতের অবস্থিতি তাঁর অনন্ত পূর্ণতায়। সমগ্রে মতি সম্ভবপর নয়, কোনো অংশকে হীন বিবেচনা করলে।

এখন কথা উঠতে পারে—সবই তো অনিত্য। জগৎ যখন মায়াময়, তখন এ জগতের কোনও জীব বা পদার্থকে সপ্রেম দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজন কোথা। সত্য কথা। কিন্তু এ প্রশ্ন তখন ওঠে যখন দ্রষ্টা অবহিত হয় যে দৃষ্টিও অলীক, দর্শনও অন্তহীন এবং দ্রষ্টারও অস্তিত্ব নাই। যতক্ষণ এ বোধ না আসে, জীবকে সাধনা করতে হয় পরম জ্ঞান লাভ করবার জন্য। সে জ্ঞান আসে প্রেমে। স্রষ্টাকে বুঝতে গেলে—বিদ্বেষ বৈরিতা ঈর্ষা ঘৃণা ও ভয় হয় পরিপন্থী দিব্য-ধ্যানের। অথচ এ লীলা তাঁর। সৃষ্টি স্রষ্টার এক লীলার বিকাশ, এ প্রতীতি উন্নত করে জীবকে, প্রসার করে তার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই বুঝিয়ে দেয় অবিদ্যার রূপ বিদ্যার বলে। সুতরাং জীবে দয়া, বিশ্ব-প্রেম নির্ব্বৈরিতা সর্ব্ব-ভূতে, বিশিষ্ট সোপান কল্যাণপথের। মা মা হিংসী—তাই বৈদিক শিক্ষা।

শেষ উপলব্ধি তো সহজে আসে না। তাই দেখি

---

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।৭।১৯

প্রত্যেক উচ্চ সোপানের কথা বিবৃত ক'রে আবার ভগবান সেই জীব-প্রেম নীতির আবশ্যকতার কথা বুঝিয়েছেন। তাই মনে হয় জীবে প্রেম গীতার এক মূল উপদেশ।

আমি এ বিষয় যতই আলোচনা করি, ততই চমৎকৃত হই। শ্রীহরির দয়ার কথা আমাদের মত দীনহীন সংসারীর প্রীতিকর। বিশ্বরূপ দর্শন এক বিরাট সৌভাগ্য ঘটেছিল পার্থের মত গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত যোগীর পক্ষে। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল হতে উত্থিত হয়েছিল স্তুতিগান—যা বিশ্ব-প্রেমে ব্যাসদেব বিশ্বকে শুনিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং অর্জ্জুনও সে উচ্চ ভূমিতে থাকতে পারলেন না চিরতরে। এ-ভব ভবনে তাঁর তখন কর্ম্মের অবসান হয়নি। অর্জ্জুনের মত মহা-পুরুষও সে উচ্চ ভূমিতে তখন আপনাকে উপযোগী ভাবতে পারলেন না। মায়ার বাঁধন টুট্‌ল না। তিনি ভক্ত। তিনি চতুর্ভুজের ভজনা করেন। সেই রূপেই তাঁর সুখ। চতুর্ভুজ নারায়ণের বিমোহন রূপই তাঁর মনপ্রাণ নিঙড়ে আনন্দের রস বার করে। সহস্রবাহু তাঁর প্রাণে ভীতি-সঞ্চার করলেন। তিনি বলেন - যা পূর্ব্বে দেখিনি এমন তোমার রূপ দেখে হর্ষ হচ্চে সত্য। কিন্তু প্রভু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সে হর্ষের ভার সহ্য হচ্চে না। সত্য কথা বলি। যেমন হর্ষ হচ্চে তেমনি ভয়েতেও আমার মন ব্যাকুল হচ্চে। তুমি দেবেশ, কিন্তু তুমি জগন্নিবাস। তুমি সে পুরাণো রূপ দেখাও প্রসন্ন হয়ে।

মানতে হ'ল বীরচূড়ামণিকে—ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে। বল্‌তে হ'ল—গুরু অনন্ত দেবেশ হ'লেও জগন্নিবাস। জগতের লোক চতুর্ভুজ নারায়ণ পূজা ক'রে ধন্য হয়।

ভগবান ভক্ত-বৎসল। ভক্তের ভূমিতে নামলেন। জগতে বোঝা যায় এমন রূপ দেখালেন। কিন্তু বোঝালেন যে জগতে বাস করতে হলে যে সব গুণ আবশ্যক তাদের ত্যাগ করতে পারবে না। সংসারীর আদর্শ কর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করলেন।

বললেন—কর্ম্ম কর কিন্তু আমার অনুমোদিত দর্শিত পথে কর্ম্ম কর নিরাসক্ত ভাবে। আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হও। হও আমার ভক্ত।

তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে কেমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে—এ নির্দ্দেশ হ'ল সে প্রসঙ্গে।

কিন্তু তিনি ভুললেন না সেই কথা—জীবে জীবে কেমন ব্যবহার আদর্শ আচরণ, সে কথার পুনরুক্তি করলেন। বললেন—হ'তে হবে নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতে।

তারপর ফল বর্ণনা করলেন। বল্লেন—এমন হ'লে আমায় পাবে!

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ১১।৫৫

একটু স্থির হ'য়ে ভাবলে সন্দেহ থাকে না যে "নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু" এক উচ্চাঙ্গের আচরণের নির্দ্দেশ। এ আচরণ অবশ্য আচরণীয় কর্ত্তব্য। মৎকর্ম্মকৃত, মদ্‌পরমো, মদ্ভক্ত হবার নির্দ্দেশের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের সমতুল্য নির্ব্বৈর হবার ব্যবস্থা। একটি প্রত্যাহার করলে সাফল্য লাভ হবে না পবিত্র পথের যাত্রায়। যেমন নিরাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করতে হবে তেমনি নির্ব্বৈর হতে হবে। মাত্র অনাসক্তি বা মাত্র অহিংসা এগিয়ে দেবেনা সাধন মার্গে। পথকে আলোকিত করবে ভক্তি। পথকে বুঝিয়ে দেবে সেই জ্ঞান যে উপলব্ধি করিয়ে দেবে যে বিশ্ববিধাতা পরম। কিন্তু সৃষ্টির অবহেলায় স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দেখি বার বার একই সতর্কতা। এর কারণও স্পষ্ট। ঊর্দ্ধদৃষ্টি শেখায় মানুষকে নিম্নস্তরের অবহেলা। কারণ প্রেম ও ঈর্ষা মনুষ্য জীবনের সংস্কার। ইচ্ছা এবং দ্বেষকে অপসারিত না করলে উন্নতি অসম্ভব। প্রেমকেও শেষে পরিত্যাগ করতে হবে, যদি প্রেম বাঁধে প্রাণকে ক্ষুদ্র স্বার্থে। কিন্তু হিংসাকে সমূলে চিত্ত হ'তে নিবৃত্ত না করলে, কোনো সম্ভাবনা নাই উচ্চভূমিতে আরোহণের। এ কথা গৃহস্থ মাত্রেই জানে। কিন্তু তার স্বার্থ এবং আত্মম্ভরিতা মানুষকে হিংসার পথ দিয়ে টেনে জাল-জঞ্জালের মাঝে নিয়ে যায়।

বিশ্বরূপদর্শনের পর অর্জ্জুনকে বোঝালেন নারায়ণ বিভিন্ন পথের বিশেষত্ব। তাঁর বর্ণিত সকল পথই উন্নতির মার্গ। তিনি তারপর স্পষ্ট ক'রে মানুষের এক একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ ক'রে বোঝালেন। যে সব আচরণের সাধনায় চরিত্র গঠন করলে তাঁর প্রিয়ত্ব লাভ করা যায়—সে সব সাধনার কথা বিবৃত করলেন। আমি অন্যত্র এ বিষয় আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে মাত্র সেই কয়েকটি গুণের উল্লেখ করব—যেগুলি অবশ্য আচরণীয় সবার পক্ষে। কারণ সকল বিকাশের সাথে তারা ওতপ্রোত-

ভাবে জড়িত তার চরিত্রে বার প্রাণের উচ্ছ্বসিত ভক্তি শ্রীহরির চরণে নিবেদিত।

তিনি এ সম্পর্কে বল্লেন—এই সব ভক্ত আমার প্রিয়।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতেষু—যিনি সকল ভূতের প্রতি বিদ্বেষ-রহিত। দ্বেষ করে মানুষ তার প্রতি যাকে কোনো বিষয়ে আপনা হতে উত্তম বলে মনে করে—বুদ্ধিতে, ভোগে, সৌভাগ্যে। ভগবান বল্লেন—কোনো লোকের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়োনা। আর মৈত্র। মানুষ নিজের সমান অবস্থার লোকের সঙ্গে মিত্রতা করে। তিনি বোঝালেন, বেশ যদি সমান রুচি, সমান ভাগ্য, সমান সুখী বা সমান দুঃখী কোনো লোক বিবেচিত হয়, তাকে উপেক্ষা ক'রনা। সবার সাথে মিত্রতা করবে। হিংসা বা ঘৃণা তো কাকেও করবে না এমন কি উপেক্ষাও নয়। মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করবে। আর করবে করুণা। যদি কাকেও ভাব দুর্ভাগা, যদি বোঝ তার অবস্থা হীন, তার প্রতি করবে দয়া। এ সাধনা প্রতিদিনের, এ আচরণ ভুললে চলবে না। আর হ'বে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমী।

বলা বাহুল্য এ নির্দ্দেশ প্রত্যেকটিই পরের সহিত ব্যবহার করবার সম্বন্ধে প্রদত্ত। কূপমণ্ডুক হলে বিস্তার নাই। বিস্তার না থাকলেও নিস্তার নাই।

আবার স্পষ্ট ক'রে বল্লেন—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।*

যাঁর দ্বারা কোনো লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়না এবং যে লোকও অন্য কাহারও দ্বারা উদ্বেজিত হননা, যিনি হর্ষ অসহিষ্ণুতা ভয় ও উদ্বেগ হ'তে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

বলা বাহুল্য—যে কেহ ঈশ্বর মানে, সে ভগবানের প্রীতি লাভ করতে চায়, কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়না পরকে বেগ দিয়ে বা পরকে ভয় করে কিম্বা কারও সান্নিধ্য অসহনীয় ভাবলে।

অন্যান্য আরও গুণের মধ্যে তিনি বল্লেন—আমার প্রিয়তা অর্জ্জন করতে হ'লে এসব গুণগুলিও চাই। যথা শত্রু এবং মিত্রে সমজ্ঞান। বলেছেন তুমি সবার সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থেকো। তবু কেহ যদি তোমার শত্রুতা করে, তাকে মিত্রের সমান জ্ঞান করবে। তুমি সব জীবে শিব দেখবে, তোমার তো মান নাই। যদি কেহ তোমায় অপমান করে তাহ'লে তাকে মানের সঙ্গে সমান মানে গ্রহণ করবে। আর মানুষের বা অন্য জীবেরই বা কথা কেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশে শীত বা উষ্ণতার যন্ত্রণায় উদ্বেলিত হলে চরিত্র চর্চ্চা আহত হবে। নিন্দাতে ব্যথিত হলে প্রিয়তা অর্জ্জন করতে পারবে না আমার। আবার স্তুতিতে স্থিতশির হ'লেও চলবে না।

এইরূপ শিক্ষা গীতায় প্রচুর। এ হ'তে এক কথাই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষকে ভাবতে হবে বিশ্ব-মিতালীর কথা!

আমি সাত্ত্বিক গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে সে ভাবের পরিচয় দিয়েছি, সেই শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।* ১৮।২০

যিনি সর্ব্বভূতে একই অব্যয়ের বিকাশ দর্শন করেন, যিনি বহুভাবে বিভক্ত জগতে একত্বের সন্ধান পান, তাঁরই জ্ঞান সাত্ত্বিক।

এ বিষয়ে ভারতের সকল অবতার মহাপুরুষ ও পরম-পুরুষের অভিমত এক। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, পরেশনাথ, মহাপ্রভু, গুরু নানক, তুকারাম, পরমহংসদেব প্রভৃতি সবাই শিক্ষা দিয়েছেন পরকে আপন করতে—হৃদয় হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশ করতে।

প্রভু যীশু 'সরমন অন দি মাউণ্টে' অতি জ্বলন্ত ভাষায় বলেছেন—জীবে দয়া, অহিংসা ও প্রেমের কথা। তিনি বলেন—তারাই ধন্য এবং করুণা লাভ করবে যারা করুণাময়। Blessed are the merciful for they shall obtain mercy তিনি বলেছেন পূজার অর্ঘ নিয়ে বেদীতে গমন কর না—প্রাণ হ'তে বিদ্বেষ দমন না ক'রে।

সেকালে কেহ অপরের চোখ উপড়ে নিলে বা কোনো অঙ্গহানি করলে, আহতের অধিকার ছিল আততায়ীর চক্ষু উপড়াবার বা অঙ্গহানি করবার। করুণাময় প্রভু যীশু বল্লেন—এমন মন্দের প্রতিরোধ ক'রনা। বরং যে তোমার দক্ষিণ গালে প্রহার করবে তাকে পেতে দাও অন্য গাল।

তিনি বলেছেন—যে তোমাকে এক মাইল জোর করে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে দু'মাইল যাও।

* গীতা ১২।১৫

খৃষ্টের প্রসিদ্ধ উপদেশ—তোমরা এ কথা শুনেছ যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে এবং তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাকে অভিসম্পাত দেয় তাদের আশীর্ব্বাদ কর, তাদের মঙ্গল কর যারা তোমাকে ঘৃণা করে এবং প্রার্থনা কর তার জন্য যার ব্যবহার তোমার প্রতি ঈর্ষাময় এবং যে তোমাকে উৎপীড়ন করে।

এই প্রেমের তিনি যে কারণ দেখালেন সে কারণ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনার সঙ্গে মূলে এক—কিন্তু ভারতের ও খৃষ্টীয় জগতের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের জন্য মনে হয় পৃথক। ভারতের মতে ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান, প্রভু যীশুর মতে সকল মানব একই ঈশ্বরের সন্তান। তাই এই মানব-প্রেম-সাধনার কারণ বিবৃত ক'রে বল্লেন তিনি—এমন ব্যবহারে তুমি সন্তান হবে (সন্তানের মত আচরণ করবে) তোমার পিতার—যিনি বিরাজ করেন স্বর্গে। কারণ তিনি তাঁর সূর্য্যকে উদিত করেন মন্দের উপর এবং উত্তমের উপর, এবং বৃষ্টির বারি বর্ষণ করেন ন্যায়-নিষ্ঠের উপর এবং অন্যায় কর্ম্মীর উপর। যে তোমাকে ভালবাসে, তাকে ভালবেসে কী উপহার পাবে তুমি? পাব্লিকানরাও কি তেমন আচরণ করে না? তুমি যদি তোমার ভাইদের অভিবাদন কর মাত্র, অন্যের অপেক্ষা তুমি অধিক কী করলে? এমন কি পাব্লিকানেরাও কি তেমন করে না?

পাব্লিকান বলা হ'ত সেই রোমক কর্ম্মচারীদের যারা য়িহুদীর নিকট হতে কর আদায় করত। নিশ্চয়ই তাদের কর্ম্ম পদ্ধতি অপ্রিয় ছিল দেশে।

তারপর প্রভু যে কারণ দিলেন জীব প্রেমের, তা' শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত কারণের সমতুল। তিনি বল্লেন—অতএব তোমরা হও পূর্ণ perfect, সেই ভাবে, যে ভাবে তোমাদের স্বর্গে বিরাজিত পিতা পূর্ণ।

মানুষের পূর্ণতা লাভ হয়না প্রেম বিনা।

বুদ্ধদেবের কথা আবার স্মরণ হয়—

অক্কোধেন জিনে কোধং সচ্চেন অলীকবাদিনা

জিনে কদরীয়ং দানেন, অসাধুং সাধুনা জিনে।

অক্রোধের দ্বারা জয় কর ক্রোধ, সত্যের দ্বারা বিজিত হয় মিথ্যাভাষী, কদর্য্য (কৃপণ) পরাজিত হয় দানের দ্বারা এবং অসাধু সাধু উপায়ে।

শরীরচর্চা-শিক্ষা পরিকল্পনা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী শক্তিহীন, যে কাজে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন বাঙ্গালী সে কাজ করিতে ভয় পায়—এই সাধারণ অপবাদের কথা আমরা সারা জীবন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সে জন্য বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে শরীরচর্চার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। অধিকাংশ স্থলেই বিপ্লববাদী দেশ-সেবকের দল ঐ সকল শরীরচর্চা কেন্দ্রের পরিচালক হইতেন এবং ঐ সকল কেন্দ্র হইতে বিপ্লববাদী সংগ্রহ করা হইত। অবশ্য তাহার যে ব্যতিক্রম ছিল না—এমন নহে। বহুস্থানে নীতি ও ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে শরীর-চর্চা শিক্ষাদান করা হইত। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। স্বামীজির উপদেশপাঠে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের তরুণের দল ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। শরীরচর্চা কেন্দ্র ও খেলার মাঠগুলিতেও সে প্রভাব কম দেখা যাইত না। নানা ভাবে, নানা দিক দিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইলেও ইংরাজ শাসকসম্প্রদায় ও তাহাদের পুলিস মনে করিত, ভারত হইতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বা এ-দেশস্থ বৃটিশ কর্মচারীদিগকে হত্যা করার জন্যই ঐ সকল শরীরচর্চা কেন্দ্র কাজ করিয়া থাকে। কাজেই দমন নীতি প্রবল হইলে ঐ সকল কেন্দ্রের উপর কড়া নজর দেওয়া হইত এবং কেন্দ্রগুলির পরিচালকদিগকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত। আমরা আমাদের গ্রামে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। যে কেন্দ্র হইতে অর্দ্ধোদয় যোগের স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছিল বা যে কেন্দ্রের যুবকগণ বর্দ্ধমান বন্যায় ত্রাণ কার্য্য করিতে গিয়াছিল, তাহার উপরই সর্বপ্রথম পুলিসের কোপ দৃষ্টি পতিত হইল ও ক্রমে তাহা বিনষ্ট করা হইল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলন শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলিকে প্রথমে উৎসাহ দান করে নাই। কিন্তু গান্ধীজি যখন বলিলেন যে, শক্তিহীনের পক্ষে অহিংস হওয়া সম্ভব নহে—তখন আবার যুবকের দল নূতন করিয়া

শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইল। তাহার পরও বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারে দেশবাসী আংশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিয়াছিল—সেই অধিকারে যেমন সাধারণ শিক্ষার সহিত কারিগরী শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়িয়াছিল, তেমনই স্কুল কলেজে শরীরচর্চা শিক্ষায় ব্যবস্থাও বর্দ্ধিত হইল। স্কাউট, ব্রাব, ব্রতচারী প্রভৃতি আন্দোলন সরকারী সাহায্যে আরম্ভ হওয়ায় মানুষের মন ক্রমে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। স্কুলে বা কলেজে শরীরচর্চার জন্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। সর্বত্র—কোথাও প্রকৃত আগ্রহশীল ব্যক্তি, কোথাও বা নামমাত্র শরীরচর্চা-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ২০।২৫ বৎসর অতীত হইলে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১০ বৎসর অতীত হইয়াছে। শরীরচর্চা বিষয়ে স্কুল-কলেজে যতটা কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সৈন্ত-বিভাগের নানা ক্ষেত্রে, রাইফেল প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে সামান্ত মাত্র চেষ্টা আরম্ভ হইলেও শরীরচর্চা ব্যবস্থার কোন ব্যাপক কার্য্য-পদ্ধতি স্থির হয় নাই বা দেখা যায় নাই।

বারাকপুর-মণিরামপুরনিবাসী, বর্তমানে কলিকাতা ৩৮ মলঙ্গা লেনের অধিবাসী শ্রীমান তারাচরণ মুখোপাধ্যায় বাল্যকাল হইতে নিজে শরীরচর্চা করিয়াছেন এবং যখন যেখানে থাকিয়াছেন, সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে শরীরচর্চা বিষয়ে মনোযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কলেজের শরীরচর্চা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্তমানে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (প্রাক্তন রিপণ কলেজ) শরীর চর্চার অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিতেছেন। তিনি গত প্রায় ৩০ বৎসর কাল নিজ ব্যক্তিগত শরীরচর্চার অভিজ্ঞতা ও ছাত্রগণকে এ বিষয়ে শিক্ষাদানের সময়ে অর্জিত জ্ঞান লইয়া সর্বত্র ব্যাপকভাবে শরীরচর্চা শিক্ষাদান সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা সরকারী ও বেসরকারী সকল নেতার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীনে একটি নামেমাত্র শরীর-চর্চা বিভাগ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কর্মীর সংখ্যা বা প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ এত কম যে—সে বিভাগে প্রায় কোন কাজ হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু শরীরচর্চা বিষয়ের প্রয়োজনের কথা কেহই কোন সময়ে অস্বীকার করেন না। শ্রীমান তারাচরণের পরিকল্পনায় শুধু স্কুলকলেজে শরীরচর্চাশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার কথা নাই—সকল অফিস, কারখানা, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতিতেও কর্মীরা যাহাতে প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে কিছু সময়ের জন্ত শরীরচর্চা করে, তাহার ব্যবস্থা আছে। শরীরচর্চার অর্থে তিনি শুধু দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করেন নাই। দৈহিক শক্তির সহিত মানুষের যাহাতে নৈতিক শক্তিও বর্দ্ধিত হয়, সে জন্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দানের কথাও বলিয়াছেন। আমাদের মধ্যে নৈতিকশক্তি কমিয়া গিয়াছে—বিদ্যালয় সমূহে নীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে কোন শিক্ষা প্রদান করা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচর্য রক্ষার কথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন—স্বামীজির ছবি পূজা করিলে বা বৎসরে একবার স্বামীজির জন্মদিনে উৎসব করিলেও আমরা স্বামীজির সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য শিক্ষার কথা একবারও চিন্তা করি না। মন তৈয়ারী না হইলে শরীর কখনও কার্য্যক্ষম হইতে পারে না—একথা চিন্তা করিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সেজন্ত শ্রীমান তারাচরণ শরীরচর্চার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া সকলের মন তৈয়ারীর কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

কি সরকারী, কি বেসরকারী সকল মহলে তারাচরণের প্রণীত পরিকল্পনা আলোচিত হউক ও তাহার ফলে জনগণের পক্ষ হইতে বিষয়টি সরকার যাহাতে সত্বর গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করেন, সে জন্ত সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হউক, আমরা সকলের নিকট এই প্রার্থনা জানাইব। এদেশে সর্বার্থসাধক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে—কাজেই তাহার সঙ্গে যদি ব্যাপক শরীরচর্চা ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অন্ত শিক্ষা দ্বারা কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হইবে না।

বাংলাদেশে বহু শক্তিশালী যুবক তাহাদের শক্তি নানা অন্যায় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। শরীরচর্চা ক্ষেত্রে তাহাদের একত্র করিয়া

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় (১৬ বৎসর বয়সে)

উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করিলে তাহারা উপযুক্ত শরীরচর্চা-শিক্ষকে পরিণত হইবে এবং তাহাদের দৈহিক শক্তি সুপ্রযুক্ত হইয়া দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিবে।

শ্রীমান তারাচরণ যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ করিলে পরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে পরিকল্পনার ছোটখাট দোষত্রুটিগুলি সংশোধিত হইয়া উহা দেশবাসীর সকলপ্রকার মঙ্গল উৎপাদন করিবে। তিনি তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে দেশপ্রেম শিক্ষা, পরোপকার-প্রবৃত্তির অনুশীলন, মানবতা-বোধের উদ্বোধন, নাগরিকের কর্তব্যপালন প্রভৃতি বহু সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষার কথা অবতারণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ আমরা ব্যক্তিগত জীবনে, সাংসারিক জীবনে বা নাগরিক জীবনে যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, শরীরচর্চার মাধ্যমে সেগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে সম্পূর্ণতাদান করাই তাঁহার পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস, চিন্তাশীল দেশবাসীরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া—

কি ভাবে উহা কার্য্যকরী করা যায়, সে বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতে অগ্রসর হইবেন। আমরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং শুনিয়াছি, শিক্ষামন্ত্রী, কলিকাতার মেয়র, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির মত বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনা পাঠ করিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিভালয় আছে—সেখানে অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা বিনামূল্যে শিক্ষালাভ করে। সে সকল বিভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধু কৃতবিভ নহে, শিক্ষক হইবার যোগ্যতা লাভের জন্ত শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শরীরচর্চার উপায় ও তাহার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দান করিলে কলিকাতার বহু সহস্র বালকবালিকা প্রথম জীবন হইতে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির সহিত শরীরচর্চা শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যত জীবন উপযুক্তভাবে গঠন করিতে সমর্থ হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল প্রাক্-বুনিয়াদি বা নিম্ন বুনিয়াদি বিভালয় খোলা হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শিক্ষকের যোগ্যতা লাভের জন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে—সে সকল শিক্ষণ-বিভালয়েও শরীরচর্চা অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন। মোটের উপর পুঁথিগত বিভাশিক্ষা করা আজ যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়াছে, একদল ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি বিভা শিক্ষা দান যেমন আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তেমনই শরীরচর্চা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করাও একান্ত প্রয়োজন। তাহার ফলে বাঙ্গালীর দেহে বল সঞ্চার হইবে ও বাঙ্গালীর শ্রম-বিমুখতার অপবাদ ক্রমশ কমিয়া যাইবে। কৃষক ও শ্রমিকের কাজে ভবিষ্যতে আমরা অধিকতর সংখ্যায় বাঙ্গালী লাভ করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইব। সে জন্ত শ্রীমান তারাচরণের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্ত দেশবাসী সকল মানুষকে আমরা বার বার আমাদের বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করি।

উদ্বোধন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জন্ম যে তব মহাগর্বের নন্দনভূমি স্বর্গে,
তেজেতে তোমরা ছিলে যে দীপ্ত সূর্য্যের মহাভর্গে।
আভিজাত্যে সবারি উর্দ্ধে ব্রহ্মের মহা অংশ।
উন্নতশির তোমরা মহীর দেবতার মহাবংশ।
তোমরাই যে গো করেছ গঠন প্রথম মানব-কৃষ্টি,
মহাস্রষ্টার তোমরাই আদি সর্বোত্তম সৃষ্টি।
তেজে ও ধৈর্য্যে তোমাদের নারী ধন্যা,
দুর্গতিহরা স্বয়ং দুর্গা সে যে তোমাদেরি কন্যা।
মহারুদ্রের ডমরুর মহাসঙ্গীত যে গো তোমরা,
শ্রীহরিচরণ-পদ্মের তুমি নররূপী ওরে ভোম্‌রা।
বাজালেন বাঁশী কৃষ্ণ তোদেরি সঙ্গে,
তোদেরি মহান শ্রীরামচন্দ্র সাগর বাঁধিলা রঙ্গে?
সেই সিন্ধুকে তোমরা একদা শৌর্য্যে করেছ মন্থন,
আজো এ মর্ত্তে উঠিতেছে তারি গৌরবে অভিনন্দন।
কেন তবে হলে আজ ভাই কোন্ হতাশায় তুমি মগ্ন,
কোন শংকায় কোন্ অবসাদে হলে আজ মনোভগ্ন?
মাতা যাহাদের স্বয়ং দুর্গা পিতা যাহাদের রুদ্র,
কোন্ শংকায় হতাশায় তারা কেন হবে ওরে ক্ষুদ্র?
ঝেড়ে ফেলো সব দৈন্যের ধূলা মনে রেখ তুমি ঝঞ্ঝা,
যাহা খুসী পার করিতে এখনি চাহিবে তোমার মন্ যা।
বিদ্যুৎসম তেজ তব আজ চম্‌কাক্,
পাপ-তাপ গ্লানি ধ্বংসের লাগি মৃত্যুর মত ধম্‌কাক্।
গর্জিয়া ওঠো সব দুর্দশা করিতে আবার ধ্বংস,
চিত্তের তেজে হও দুর্বার দেবতার মহাবংশ।
প্রলয়াগ্নিতে জ্বলে ওঠো দেখি ধক্‌ধক্,
সয়তানদের উদ্ধতফণা করে যাহা বিষে লক্‌লক্—
সেই সব ফণা মুচড়িয়ে দিয়ে করো তারে শতছিন্ন,
মর্ত্ত হইতে সব দুর্নীতি করে দাও নিশ্চিহ্ন।
জাতিরে আবার করো পবিত্র মর্ত্তে আসুক শান্তি,
দুঃখময়ী এ রুক্ষ ধরণী ফিরে পাক পুনঃ কান্তি।
তব তেজ দেখি ওগো দেবতার সন্তান,
সারা পৃথ্বীর আসুরি শক্তি গাক্ পুনঃ তব জয়গান।

ওঠো দুর্জয় পায়ে দলো সব শংকা,
সর্ব ধরায় বাজুক আবার তোমার বিজয় ডংকা।

একটি ঘটনা

(রাশিয়ান লেখক : আন্তন্ শেখভের একটি গল্পের অনুবাদ)

অনুবাদক—শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

সকাল হয়েছে। সূর্য্যের আলো জানালার শার্শির তুষার জাল ফুঁড়ে নার্সারি ঘরে এসে ঢুকেছে।

ভানা হচ্ছে একটা ছ-বছরের ছেলে। তার মাথার চুল ছোট করে কাটা, আর বোতামের মত নাক। তার বোন নিনার বয়স চার বছর। সে বেঁটে, মাথার চুল কোঁকড়ান। আর বোবা গোছের। তারা ঘুম থেকে জেগে উঠল। বিছানার রেলিংএর ফাঁক দিয়ে আড় চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

তাদের নার্স এলো গজগজ করতে করতে। যারা ভাল লোক তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল এতক্ষণে। আর তোমরা এখনও চোখই খুলতে পারলে না। দুষ্টু কোথাকার!

প্রফুল্ল সূর্য্যালোক কম্বলের উপর এসে পড়েছে। আর এসে পড়েছে দেয়ালের গায়ে, দাইদের পোষাকের প্রান্তে। মনে হচ্ছে যে সূর্য্যের আলো ছেলেদের ডাকছে, তাদের খেলায় যোগ দিতে। কিন্তু ছেলেদের সেদিকে নজরই নেই। তারা বদ্ মেজাজে বিছানা থেকে উঠেছে। নিনা গাল ফুলিয়ে এবং মুখ ভঙ্গি করে বায়না জুড়ে দিয়েছে—"জল-খা-আ-বার, আমার জল-খাবার।"

এদিকে ভানা ভ্রূ কুঁচকিয়ে চিন্তা করছে, কোন ওজর দেখিয়ে চেঁচামেচি শুরু করা যায়। সে ইতিমধ্যেই চোখ ডলতে শুরু করেছে এবং হাঁ করে ফেলেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বৈঠকখানা থেকে মায়ের গলা শোনা গেল। মা বলছিলেন, "বেড়ালটাকে দুধ দিতে ভুলো না যেন, তার আবার বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে কিনা।

শিশুদের কোঁচকান মুখ আবার সমান হয়ে এল। কেননা তারা আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা তক্ষুণি চ্যাঁচাতে শুরু করে দিল, আর খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তাদের ভীষণ চীৎকারে চারদিক ভরে উঠল। তারা খালি পায়ে আর বাসি কাপড় গায়েই রান্নাঘরের দিকে ছুট দিল—

—বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে, বেড়ালটার বাচ্চা হ'য়েছে।

রান্নাঘরের বেঞ্চের নিচে ছিল একটা বাক্স, ষ্টিপান উনান জ্বালানর সময় এই বাক্সতে কয়লা এনে রাখত। এই বাক্স থেকে বেড়ালটা উঁকি দিচ্ছিল। তার পাণ্ডুর মুখে ছিল একটা ভয়ের আভাস। আর তার নীল চোখে ও ছোট্ট ছুটো কাল তারায় মাখান ক্লান্ত আর করুণ দৃষ্টি।

তার মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তার একটা মাত্রই অসুবিধে আছে এবং এটার জন্যই সে পুরোপুরি খুশি হ'তে পারছে না। সেটা হচ্ছে বাচ্চা বেড়ালগুলোর বাবা সেই মদ্দা বেড়ালটার উপস্থিতি। আর সেই মদ্দাটার কাছেই সে বেচারা অসতর্ক অবস্থায় ধরা দিয়েছিল। সে মিউ মিউ করে ডাকবার জন্যে তার মুখও খুলেছিল। কিন্তু একটু হিস্ হিস্ শব্দ ছাড়া সে মুখ থেকে আর কিছুই বের করতে পারল না। বেড়ালছানাগুলো কিন্তু চীৎকার ক'রে যাচ্ছিল।

তখন ভাই-বোনে হাঁটু গেড়ে বাক্সটার সামনে এসে বসল। তারা নড়া-চড়া না করে রুদ্ধ নিশ্বাসে বেড়াল দেখতে লাগল। তারা খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল, আর ভালও লাগছিল খুব। এদিকে গজ গজ করে দাই তাদের

ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সেদিকে তারা কানই দিচ্ছিল না। অত্যন্ত আনন্দে তাদের দুজনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গৃহপালিত পশুরা যখন খেলাধুলো করে তখন খুব কম সময়েই তাদের লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিশুদের জীবনে কিংবা তাদের লেখাপড়ায়, এদের একটা প্রভাব আছে। আমাদের মধ্যে কে না জানে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের কর্ম্মক্ষম কুকুরের কথা, ক্ষুদে ক্ষুদে অকেজো কুকুরগুলোর কথা। খাঁচার মধ্যে যায় যেসব পাখী, নির্বোধ অথচ বেশ চালিয়াৎ গোছের মেক পাখী, কিংবা ধর বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের বড় সড় নাদুস-নুদুস বেড়ালের কথাই বা আমরা কেনা জানি—

যখন মজা করবার জন্তে আমরা এদের ল্যাজ ধরে টানাটানি করি কিংবা যন্ত্রণা দি, তখন তো এরা আমাদের ক্ষমা করে। এরা যেমন চট্ করে ভুলে যায়, তেমনই ধৈর্য্য-শীল, বিশ্বস্ত আর অনুগত। এগুলো গৃহপালিত প্রাণীদের গুণ। এবং একটা শিশু মনে এই সমস্ত গুণের একটা প্রবল ও সুনির্দিষ্ট প্রভাব আছে। কার্ল কার্লভিচ্ কালো মুখ করে কাটখোট্টা উপদেশ দেয়, কিংবা কোন শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা করে হয়তো বোঝান যে জল জিনিষটা অম্লজান আর উদজান গ্যাসে তৈরী। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে, এদের চেয়ে গৃহপালিত পশুর প্রভাব শিশু মনের উপর অনেক বেশি।

নিনা বড় বড় চোখ করে আর হাসিতে ফেটে পড়ে বলে উঠল, "ইস্ বাচ্চাগুলো কি ছোট, ঠিক ইঁদুরের মত দেখতে।"

ডানা এদিকে গুণতে শুরু করেছে—এক, দুই, তিন—তিনটে বাচ্চা মোটমাট। কাজেই একটা তোমার, একটা আমার, আর একটা অন্ত কারুর হবে।

মিঁউ-মিঁউ-মিঁউ—মা বেড়ালটা তাদের দেখে খোসা-মুদে হয়ে উঠ্ল।

বাচ্চাগুলোকে এইভাবে লক্ষ্য করার পর ভাই-বোনে তাদের মায়ের বুকের তলা থেকে তুলে নিল। তারপর তাদের হাতে ডলতে লাগল এবং তাতেও খুশি না হয়ে রাত্রের পোষাকের প্রান্তে বাচ্চাগুলোকে তুলে নিল। তারপর আর একটা ঘরের দিকে ছুট লাগাল।—চ্যাঁচাতে লাগল—মা বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে।

মা তখন একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সাথে বৈঠক-খানায় বসে। তিনি দেখলেন যে ছেলেরা হাত মুখ ধোয়নি, জামা কাপড় ছাড়েনি, আর বাসি জামা তুলে ধরে আছে। তিনি রেগে গেলেন এবং ঘন ঘন ছেলে-মেয়ের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শিগ্‌গির তোমাদের বাসি জামা নামাও—অসভ্য ছেলে কোথাকার? আর এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নৈলে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে—তিনি বলে উঠলেন।

কিন্তু শিশুরা মায়ের বকুনি কানেই নিল না। আর সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির উপস্থিতিও বুঝল না। তারা বাচ্চাগুলোকে কার্পেটের উপর ফেলে একাগ্রভাবে ডলতে লাগল। মা-বেড়ালটা তাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল, আর মিনতির সুরে মিঁউ মিঁউ করতে লাগল।

এর একটু পরেই শিশুদের নার্সারিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হোল। তাদের পোষাক পরান হোল, প্রার্থনা করান হোল। আর জলখাবার দেওয়া হোল। কিন্তু তাদের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এই সব এক ঘেয়ে কাজ থেকে ছাড়া পেতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রান্না ঘরের দিকে দৌড় লাগাতে।

তাদের অভ্যস্ত চাল-চলনের প্রবৃত্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যেন।

বেড়াল ছানাগুলো পৃথিবীতে এসে সব কিছুই অলীক প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। তারাই ছিল সারাদিনের সব থেকে বড় আকর্ষণ। যদি প্রতিটি বাচ্চার বদলে চল্লিশ পাউণ্ড মিষ্টি কিংবা দশ হাজার মুদ্রা ডানা কিংবা নিনাকে দেওয়া হোত, তবে তারা একটুও ইতস্ততঃ না করে এ হেন প্রস্তাব বাতিল করে দিত। দাই এবং রাঁধুনির তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও ভাই-বোনে রান্না-ঘরে বেড়াল ছানার বাক্সের কাছে ঠায় বসে রইল। আর দুপুরে খাবার সময় পর্য্যন্ত বেড়াল ছানাগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইল। তাদের মুখে আগ্রহ, ভাবনা এবং উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল। তারা বর্ত্তমান নিয়ে তত মাথা ঘামাচ্ছিল না। বেড়াল ছানা-গুলোর ভবিষ্যৎ পরিণাম কি সেটাই ছিল তাদের চিন্তার বিষয়। তারা ঠিক করল একটা বাচ্চা এখানেই মায়ের কাছে থাকবে। মা'কে সান্ত্বনা দেবার জন্তে। আর

একটা যাবে তাদের গ্রীষ্মকালীন বাগান বাড়ীতে। তৃতীয়টাকে রাখা হবে মাটির নীচের ঘরে। সেখানে সব সময়েই অনেক ইঁদুর থাকে।

—কিন্তু বেড়াল ছানাগুলো আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না কেন, ওদের চোখ কি ভিখিরীদের মত অন্ধ? নিনা অনুযোগ করে।

বিষয়টা ডানাকেও ভাবিত করে তুলল। সে একটা বাচ্চার চোখ খোলবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে কঠোর চেষ্টায় সে গলদ ঘর্ম্ম হয়ে উঠল। কিন্তু পেরে উঠল না। তা ছাড়া বাচ্চাগুলোকে যে সব দুধ আর মাংস দেওয়া হোল তার কিছুই তারা খেল না। এতে তারা ভারি মনক্ষুণ্ণ হোল। তাদের মুখের সামনে যাই-ই দেওয়া হোক্ না কেন—সব তাদের ধাড়ী মা'টা খেয়ে নেয়।

ডানা প্রস্তাব করল—আমরা এখন ওদের জন্যে ছোট ছোট ঘর তৈরী করব। ওরা সব আলাদা বাড়ীতে থাকবে, আর ওদের মা ওদের কাছে বেড়াতে আসবে। পিচবোর্ডের তৈরী টুপি রাখার বাক্সগুলো রান্নাঘরের এক এক জায়গায় পাতা হোল। তারপর বেড়াল ছানাগুলোকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোল। মা বেড়ালটার মুখে তখনও একটা কাতর আর আর্দ্র ভাব ছিল। সে সব কটা বাক্সর কাছে গিয়ে তার ছানাগুলোকে আবার আগের মত জড় করল। তাই এই ভাবে আলাদা আলাদা করে কোনই লাভ হোল না।

ডানা বল্ল, "আচ্ছা, এই বেড়ালটা না হয় ওদের মা, কিন্তু বাবা কে?

—"সত্যিই তো, বাবা কে হবে?" নিনাও সমর্থন করে।

—"ওদের একটা বাবা তো থাকা উচিত।"

ডানা এবং নিনা অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল যে কাকে বাচ্চা গুলোর বাবা করা যায়। অবশেষে তারা নির্ব্বাচন করল একটা ঘন লাল রঙের ঘোড়াকে। ঘোড়াটার ল্যাজ নেই, আর সেটা পড়েছিল সিঁড়ির নীচে ভাঁড়ার ঘরে। ঘোড়াটার সাথে আরো অনেক পরিত্যক্ত খেলনা পড়েছিল। পরমায়ু শেষ হয়ে যাওয়ায় খেলনাগুলো এই ভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। তারা ঘোড়াটাকে টেনে এনে বাক্সটার গায়ে দাঁড় করাল—"এখন শোন"—তারা ঘোড়াটাকে হুশিয়ার করে দিল, "এখানে ঠিক হয়ে দাঁড়াও—আর লক্ষ্য রাখ ওদের ব্যবহারটা ঠিক মত হচ্ছে কিনা।"

এই সমস্ত বলা এবং করা তারা শেষ করল গাম্ভীর্য্য সহকারে। তাদের মুখে চিন্তার ছাপ। ওদের কাছে এখন এই বেড়াল-ছানা আর বাক্সটা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই জানা নেই। আর ওদের আনন্দেরও কোন সামা-পরিসীমা নেই। কিন্তু খুব খারাপ এবং বিশ্রী সময়ও আসছিল ওদের বরাতে। এই রকম সময়ও ওদের কাটাতে হবে।

ঠিক খাবারের সময়ের আগের ব্যাপার। ডানা তার বাবার পড়ার জায়গায় বসেছিল টেবিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। একটা বেড়াল-ছানা কতকগুলো মার্কা দেওয়া কাগজের উপর আলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডানা ওর ঘোরাফেরা লক্ষ্য করছিল। আর একটা পেন্সিল, তারপর একটা দেশলাই তার ছোট্ট মুখে গুজে দিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে তার বাবা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে মেঝে থেকে ছিট্‌কে উঠে পড়ল।

ডানা তার ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনতে পেল—কি হচ্ছে এসব?

—এটা, মানে—মানে—এটা একটা বেড়াল ছানা, বাবা।

—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা, বাঁদর ছেলে কোথাকার! দেখেছিস্ কি করেছিস্ তুই। সমস্ত কাগজ-পত্র নোংরা করে দিয়েছিস্।

ডানা ভয়ংকর অবাক হয়ে গেল। তার বাবা তার মত বেড়ালটার প্রতি পক্ষপাত দেখালেন না। তার খুব একটা কিছু আনন্দও হোল না।

উপরন্তু তিনি ডানার কান ধরে চীৎকার করে উঠলেন,—ষ্টেপান এই হতভাগা বাচ্চাটাকে নিয়ে যা তো।

খাবার সময়েও এমনি একটা কাজ ঘটল। যখন দ্বিতীয়বার পরিবেশন করা হচ্ছে তখন হঠাৎ একটা তীব্র মিঁউ মিঁউ শব্দ শোনা গেল। সকলে আসল ব্যাপারটার সন্ধান করতে লাগল। তারপর নিনার জামার তলে একটা বেড়াল বাচ্চাকে পাওয়া গেল।

—নিনা টেবিল ছেড়ে চলে যাও—তার বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"বেড়াল বাচ্চাগুলোকে ভাগাড়ে

ফেলে দাও। আমি এই হতভাগা জানোয়ারগুলোকে বাড়ীতে থাকতে দেব না।"

ডানা এবং নিনা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। শেষে নিষ্ঠুর-ভাবে ভাগাড়ে মেরে ফেলা হবে বাচ্চাগুলোকে। তা ছাড়া আরো ভয় দেখান হোল যে বেড়ালটাকে আর কাঠের ঘোড়াটাকে জোর করে সরিয়ে নেওয়া হবে বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে। তারপর বেড়ালের বাক্সটা নষ্ট করে ফেলা হবে।

অদূর ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কত পরিকল্পনা ছিল। একটা বাচ্চা থাকবে মায়ের কাছে, বুড়ো মাকে সান্ত্বনা দিতে। আর একটা থাকবে বাগানে, আর তৃতীয়টা মাটির নীচের ঘরে ইঁদুর ধরবে। কিন্তু তাদের এ সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করে দেওয়া হবে। তারা বেড়াল ছানা-গুলোকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, আর কান্না জুড়ে দিল। তাদের বাবা শেষে রাজী হলেন। কিন্তু এক সর্ত্তে, সেটা হচ্ছে তারা কেউ রান্না ঘরে যেতে পাবেনা, আর বেড়াল ছানার গায়েও হাত দিতে পাবে না।

খাওয়া দাওয়ার পর ক্ষুব্ধ হয়ে ডানা ও নিনা ঘর দুটোর চারদিকে হেট মাথায় ঘুরতে লাগল। রান্না ঘরে যাওয়া নিষেধ হয়ে যাওয়ায় তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ল। তারা মিষ্টি-টিষ্টি কিছু খেল না। আর দুষ্টুমি করে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করল। সন্ধ্যাবেলায় যখন তাদের কাকা পেট্রসা এল, তাকে তারা এক পাশে টেনে নিয়ে গেল। তার কাছে তারা বাবার নামে নালিশ করে দিল। বাবাই তো বেড়ালছানাগুলোকে ভাগাড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।

—"কাকা মা'কে একটু বল না, বেড়ালছানাগুলোকে যেন নার্সারিতে নিয়ে যাওয়া হয়"—কাকার কাছে তারা মিনতি করল—বলই না একটুখানি।

—কাকা তাদের সরিয়ে দিয়ে বল্ল—"ওঃ, এই ব্যাপার। ঠিক আছে—ঠিক আছে সব।"

কাকা পেট্রসা সাধারণতঃ একা আসেন না, একটা মস্ত বড় কাল কুকুর নীরো তার সঙ্গে আসে। সে দিনেমার জাতীয় কুকুর। কানগুলো ঝোলা-ঝোলা, আর তার ল্যাজটা লাঠির মতন শক্ত। কুকুরটা চুপ-চাপ থাকে। তার ভারিক্কি চাল চলন। আর সে বদ মেজাজী।

ভাই-বোনের দৃষ্টির প্রতি কোন নজরই সে দেয় না। আর যখন সে ভাই-বোনের পাশ দিয়ে যায় সে তাদের গায়ে ল্যাজের ঝাপ্টা মারে, যেন তারা সব চেয়ার আর কি। ভাই-বোনে তাই তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা তাদের সে অনুভূতি সরিয়ে দিল।

—ডানা চোখ বড় বড় করে বল্ল—শোন্ নিনা, আমি বলি কি ঘোড়াটার বদলে নীরোকেই ওদের বাবা বানান যাক্। ঘোড়াটা তো মরে গেছে, কিন্তু দেখছিস্ নীরো কি রকম জ্যান্ত।

তারা সারাটা সন্ধ্যা অপেক্ষা করতে লাগল—কখন তাদের বাবা তাস নিয়ে বসেন। তখন বেশ নীরোকে নিয়ে রান্না ঘরে ঢোকা যাবে। কেউ দেখতে পাবে না। অবশেষে বাবা তাস নিয়ে বসলেন। মা চায়েরকেটলি (samover) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশুদের উপর কেউ নজর রাখছিল না।

তাদের মজার সময় এসে গেল শেষকালে।

—"এই শিগ্‌গির আয়"—ডানা ফিস্ ফিস্ করে তার বোনকে বল্ল। কিন্তু ঠিক সেই সময় ষ্টিপান এসে হাজির। সে হাসি-খুশির সাথে বল্ল—নীরো বেড়াল ছানাগুলোকে মেরে ফেলেছে মা। ডানা আর নিনার মুখ শুকিয়ে গেল। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে ষ্টিপানের দিকে তাকাল।

—সত্যি, কুকুরটা সত্যিই মেরে ফেলেছে মা—ষ্টিপান হাসতে হাসতে বল্‌লো—"কুকুরটা বাক্সটার কাছে গিয়ে সবটাকে গোগ্রাসে—"

শিশুরা আশা করল যে এইবারে বাড়ীশুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং দুরাত্মা নীরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু সকলে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই যে যার জায়গায় বসে রইল। কেবল অতবড় কুকুরটার ভোজন-প্রবৃত্তির ব্যাপারে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করল। বাবা আর মা হাসতে লাগলেন। নীরো টেবিলের ধারে ঘুর ঘুর করতে লাগল, ল্যাজ নাড়াতে লাগল। আর বেশ আরামের সাথে ঠোঁট চাটতে লাগল। কেবলমাত্র মা বেড়ালটাকেই অসুবিধায় পড়তে দেখা গেল। সে বেচারা তার ল্যাজ খাড়া করে ঘরের চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঘরের লোকদের দিকে

ঠুগে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল এবং অত্যন্ত করুণ-ভাবে মিঁউ মিঁউ করতে লাগল।

মা বল্লেন—"ন'টা বেজে গেছে, এখন তোমাদের ঘুমুবার সময় হয়েছে।"

ডানা আর মিনা শুতে গেল, তারা কাঁদতে লাগল। আর অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল আহত বেড়ালটার কথা, আর সেই নির্দয়, দুরাত্মা, শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া নীরোর কথা।

॥ অভিযান ॥

শিল্পী—পৃথী দেবশর্ম্মা

মেয়েদের কথা

আদর্শের রূপান্তর

আশাবরী দেবী বি-এ

দিনরাত্রির আবর্তনের মতোই এ জগৎ ও জীবনের আলোক ও অন্ধকার দুই দিকই অস্বীকার করার উপায় নেই। একদিকে জীবন, একদিকে মৃত্যু—একদিকে ঐশ্বর্য, একদিকে দারিদ্র্য—বিশুদ্ধ জ্ঞান আর চরম অজ্ঞানতা—পুণ্যের জ্যোতি আর পাপের বীভৎসতার অসংখ্য জটিল গ্রন্থি দিয়েই রচিত হয়েছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বিরাট প্রহেলিকা। উপনিষদের শুদ্ধসত্ত্ব ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত—'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'—এই বাণীই মানব-চৈতন্যের পরম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-রূপে চিরকাল ধাবিত হয়েছে এবং হবে স্বর্গের অভিমুখে।

যুগে যুগে ঘটে আদর্শের রূপান্তর সমাজ ও সংসারে। কালের রথের অমোঘ গতিতে নিয়ম ও নীতির নিগড় কেবলই ভেঙে পড়ে সমাজ সংসারের। কিন্তু মানবাত্মার চিরসাধনার ধন 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' চিরদিনই তার অন্তরে আদর্শ-রূপে বিরাজ করবে। বিশাল বিশ্ব-সংসারে কতো বিচিত্র দেশ সমাজ ও জাতির জীবন-কল্লোল তরঙ্গ তুলছে—কে তার হিসাব রাখে। দেশ-বিদেশের কথা বা সাত সাগরের ঢেউ-গোনার কথা বাদ দিয়ে সারা ভারতের অলি-গলিরই কি খবর কেউ রাখে? নাগা-পাহাড়ে, রাঁচি-পাহাড়ে আর ভারতের আরও, কতো বিচিত্র জাতির জীবন ও সমাজের কতোটুকু সভ্য-জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে পৌঁছায়? বাস্তবিক আমাদের এই আজন্ম-পরিচিত বাঙ্গালী-সমাজেরই নীচুতলার খবর কতোটুকুই বা জানতে পারি? ঐ বস্তী-সমাজের জীবন ও সমাজকে অহরহই নিষ্পেষিত করছে যে দারিদ্র্য, পঙ্কিলতা, অশিক্ষা আর আর মূঢ় পাপ ও ক্রোধ-নিষ্ঠুরতার অজগর—তার চিত্র, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত বা অন্য কোনও সূক্ষ্ম কলার সাধ্য নেই ফোটাবার। যদিও সেখানেও প্রীতি, স্নেহ, দয়া-মায়া সবই আছে এবং উঁচুতলার চাইতে ঢের বেশী জীবন্ত ভাবেই তার প্রকাশ। পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল যে ভগবানেরই লীলা। আলোক অন্ধকার তো সৃষ্টিরই দুই দিক। তাই ব'লে মানুষ চায় না অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে। জীব-জগতের অপর প্রাণী হ'তে এই খানেই তার তফাৎ—এইখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। বিধিদত্ত অপূর্ব চেতনা-শক্তির বলে মানবাত্মা আপনাকে কতোবার চিনেছে পরমাত্মার অংশ বলে—সৌর-সম্রাটকে আপন জেনে বলেছে—'হে আদিত্য—ঐ আলোর আবরণ উন্মোচন করে দেখাও তোমার স্বরূপ।'

আদর্শের রূপান্তর ঘটতে পারে তবে তার স্বরূপ চিরন্তন। আর্য-সভ্যতা কিংবা গ্রীক্-সভ্যতায় ঘটেছিলো মানুষের মহৎ গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ—তাই আজও আধুনিক জগৎ-সাহিত্যে শিল্পে সেই রসাস্বাদনে তৃপ্ত।

দুই মহাযুদ্ধের পর নিয়ম-নীতির শেকল ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ছে প্রত্যহ। চাকা ও পাখার গতিবেগ বিশ্ব-জীবনে এনেছে অদ্ভুত চাঞ্চল্য। স্পুটনিকের আবর্তনে সারা জগতে লেগেছে দোলা। কিন্তু বিশ্ব-সভ্য-সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র ছিটমহল বাঙ্গালী সমাজে এই প্রচণ্ড দোলা কি কেবল ভাঙনেরই সৃষ্টি করবে?—'সত্য সেলুকাস্। কি বিচিত্র এই দেশ!' বিদেশীর এ উক্তি আজও সত্য আমাদের দেশে। এমন ভিক্ষুকের দেশে এমন রাজভাই কাণ্ড ক'টা কোথায় দেখেছে চিরস্বাধীন দেশের স্বাধিকার স্বকীয়তায় বলিষ্ঠ মানুষ? হিউয়েনসাং সম্রাট হর্ষবর্ধনের অতুলনীয় দানের পরিমাণে অথবা ভিক্ষুকের অগণ্যতায় বিস্মিত হ'য়েছিলেন তা ইতিহাসের দেবতাই জানেন।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায়—নদীমাতৃক সুফলা বাংলার মানুষ অতীতে ক্ষুধার অন্ন, পরণের বস্ত্রের সঙ্গে মনের সাংস্কৃতিক আনন্দের অভাবও বোধ করেনি। আজ খণ্ডিত বাংলা হয়েছে ভিক্ষুকের দেশ। এই অবরুদ্ধ জীবনের তলানিটুকু কেবলই বাঁচার ক্ষেত্র হ'তে সরে আসছে। তার বিকীর্ণ স্থির জলে কোথায় সেই প্রাণ ও কর্মের চাঞ্চল্য—যা চাকা ও পাখার সঙ্গে তাল দিয়ে এগিয়ে চলেছে সারা বিশ্বে। কই সেই জীবনী-শক্তির প্রজ্জ্বলিত স্ফুলিঙ্গ—যা চাঁদ তৈরী করে আকাশে ছোটে। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'ওরা বিশাল বট-বৃক্ষের মতো—ত্রুটির সঙ্গে আছে পুতি।' আমাদের জন্ম জন্ম পরাধীনতার দুরারোগ্য রোগে পাণ্ডুর দেশকে কে দেবে উপযুক্ত পথ্য এই সঙ্কট রোগ-মুক্তির সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে? বাংলাকে আজ বর্জন করতে হবে তুলনা ও অনুকরণের মিথ্যা আত্মপ্রসঙ্গ। গরুড় জননীর দাসীত্বমোচনের জন্য ছুটে-ছিলেন অমৃতের সন্ধানে। সেই অমৃতময়-নবসমাজ গড়বার দায়িত্ব ভারতের বিশেষতঃ বাংলার মেয়েদেরই। ভারতীয় আলোকপ্রাপ্তা নারী আজ আত্মবিস্মৃত—রুজ্-'লিপ্‌ষ্টিক শিফন নাইলন আর পার্টি ডিনারের মোহে আজন্ম অন্ধ। বাঙ্গালী মেয়েও কি নেমে আসবে তাদের অনু-সরণে? বাংলা আজ 'সুজলা কাঙালিনী মেয়ের' দেশ—সেখানে কি ম্যাক্স-ফ্যাক্টর বা এলিজাবেথ আর্ডেনের চর্চা দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের মতোই নয়? গভীর মননশীলতা আর আত্মানুশীলনের দেশ ভারতবর্ষ—তার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল বাংলার সংস্কৃতি। এর উত্তরাধিকার ছাড়বে

কোন বাংলার মেয়ে? সেই প্রাচীন সংস্কৃতির তরঙ্গ আজও বাঙ্গালী সমাজের নীচ হতে ওপর পর্যন্ত ফল্গুর মতো বইছে। লক্ষ ভাঙা-কুঁড়ের ঘরণী ঘর আগলে আজও রাখে শত দুঃখে। কে ভুলবে বাঙ্গালী কবির সেই গভীর আত্মধিক্কারের বাণী—'আশায় ছলনে ভুলি…!' আর তাঁর সেই শেষ নিবেদন—'রেখো মা দাসেরে মনে!' এর পেছনে রয়েছে যুগ-সঞ্চিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। বাংলার মেয়েরা যদি স্বাধিকারের সেই চেতনা স্বকীয়তার বিপুল বলে আবার জাগিয়ে না তুলতে পারে তো বাঙ্গালীকে কে বাঁচাবে?

সমাজ ও সংসার চায় নারী—কেবল নায়িকাকে নয়। চৌষট্টি কলা প্রাণশক্তিতে ভরা জীবন-তরুতেই ফুল হয়ে ফোটে। কর্মের মধ্যেই যেমন অবসর মূল্যবান—তেমনই স্বাস্থ্য ছাড়া সৌন্দর্য ফোটে না—মঙ্গল ছাড়া সৌন্দর্যে মেশে না স্বর্গের সুষমা। প্রাণময়, কর্মময়, স্বকীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতি গড়তে চায় অনুরূপ সমাজ। সংসারই সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূল ভিত্তি, আর সমাজ-বন্ধনের প্রথম কাজটি হলো মেয়েদের।

আজ এই সীমানা-ভাঙার যুগে আদর্শেরও রূপান্তর ঘটবে, এ স্বাভাবিক। বাহিরের দিকে আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন অন্তর-প্রকৃতিকেও স্পর্শ করে। মেয়েদের যে-প্রকৃতি বদ্ধ সংসারের উপযোগী ছিলো এতোদিন—সে তো আর জড়পদার্থ নয়। মুক্ত সংসারে তা অচল হয়ে থাকতে পারে না। জীবনের বিস্তৃততর ভূমিকায় আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য তার বিশেষ বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও রুচি-চর্চার একান্ত আবশ্যক। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাঙালী মেয়ে বহু দিন হলো এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—বিশ্বনারী জগতের পাশে। এখানে কোলাহল আছে—উন্মাদনা আছে—কিন্তু এই বৃহৎ বিশ্ব সংসারের [illegible] আদর্শের দীপটি [illegible]। [illegible] দৈন্য—[illegible], জ্ঞানের [illegible] আর [illegible] জেগে উঠুক অন্তরের আলো। সেই দীপ হ'তেই ভারতের সকল ঘরে জ্বলে উঠবে দীপাবলী উৎসব। ঐ উৎসবের আলোয় দিশা জাগবে বিশ্বসংসারে। বাংলার মেয়ের পথ নয় বিশ্বের আধুনিকার বাহ্যিক প্রগতির প্রদর্শন পথ—তার যাত্রা শুরু হোক প্রাণের আত্মপ্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধির পথে।

সৌন্দর্য্যানুশীলনে মেয়েরা

শ্রীসুলোচনা দত্ত

"ভারতবর্ষের ১৩৭২র গত মাঘ সংখ্যায় শ্রীমতী অনামিকা দেবীর "সাজসজ্জায় শালীনতা" প্রবন্ধটি পড়লাম—তাঁর কথাগুলি ভাল, কিন্তু সব বিষয়ে আমি এক মত হতে পারলাম না। পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, নিঃসন্দেহে তা মূল্যবান।

তিনি বর্ত্তমানের যে অন্তর্বাসের লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা বলেছেন তা পরিমার্জিত রুচিসম্পন্না মেয়েদের কাছে সত্যিই বেদনাদায়ক, তারপর ব্লাউজের সম্মুখ ভাগের সব-টুকু অংশ আঁচল দিয়ে না ঢাকার উগ্র আধুনিকতাও অসহ্য। কিন্তু তিনি কাজল বা সূর্মা, নখ ও ওষ্ঠাধর-রঞ্জিকা ইত্যাদি বস্তুগুলিকে উক্ত আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কেন করেছেন তা বুঝলাম না; আর আপাতদৃষ্টিতে এটি পাশ্চাত্যানুকরণ বলে মনে হলেও আসলে অন্যান্য জিনিষের মতো পুরাতনের প্রত্যাবর্ত্তনও হতে পারে—কারণ প্রাচীন বঙ্গললনাদেরও অধর অলক্তক-রঞ্জিত হতো এবং তা জানতে পারা যায় সাহিত্যের শ্লোক থেকে। যাই হোক, নিজের দেহকেই বলুন, আর গৃহ ও পরিবেশকেই বলুন—সুন্দর করে তোলা কি অপরাধ?

নারীর নিজ দেহ প্রদর্শনের ঘৃণ্য প্রয়াসের মতো এ-গুলি তো বিসদৃশ নয়, শুধু সুন্দর হওয়ার বা সুরুচির প্রকাশ মাত্র।

এ-গুলি, যেমন:—ওষ্ঠাধর ও নখরঞ্জিকা, সূর্মা বা কাজল ইত্যাদি ব্যবহারে যদি পুরুষের লালসায় ইন্ধন যোগানো হয়, তাহলে আমি বলবো, আমাদের এতদিনের সভ্যতা ও শ্রমসাধ্য শিক্ষা ব্যর্থ, এতে শুধু মুখোসটি হয়েছে সুকঠিন, ভেতর রয়েছে যথাপূর্ব্বং তথা পরং।

বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাও সৌন্দর্য্যসাধক, তাই তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতিকে দেখে জাগ্রত হয়েছে আমাদের সুশ্রীতাবোধ; সেই জন্য, সৌন্দর্য্যসাধনা নিন্দনীয় নয়; আর এর পেছনে কোনো কদর্য্যতা ও কোনো কুৎসিত উদ্দেশ্যও থাকে না।

লাউ ব্যাস্‌রা

উপকরণ—লাউ, মৌরি, সরিষা, তেজপাতা, পরিমাণ মত লবণ, সামান্য চিনি বা গুড়, সরিষার তৈল, অল্প ঘি, লঙ্কা (রুচি মত) ও মটরডালের বড়ি অভাবে মটরডালের বড়া হলেও চল্‌বে।

প্রথমে পেঁপের চাটনির পেঁপে-কুচির মত সরু সরু করে লাউটিকে কুটে নিতে হবে। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে বড়ি বা বড়াগুলি ভেজে তুলে রাখুন। তারপর সেই তেলে লঙ্কা তেজপাতা সরিষা মৌরি ফোড়ন দিয়ে লাউগুলি ঢেলে দিয়ে বেশ করে নাড়্‌তে থাকুন, লাউগুলি খানিকটা কমে গেলে অল্প হলুদ-মৌরি-সরিষা বাটা এবং নুন, মিষ্টি ও ভাজা বড়িগুলি ঢেলে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। হয়ে গেলে সামান্য আটা ছড়িয়ে দিয়ে ও একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে নেবেন। লাউ ব্যাসরা যেন শুক্‌নো শুক্‌নো না হয়, একটু বেশ গা-মাখা মাখা থাকিতে নামিয়ে নেবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্ত্তী

প্যাটার্ণ—

শিল্পী : কানাইলাল চক্রবর্ত্তী

বৈদেশিকী
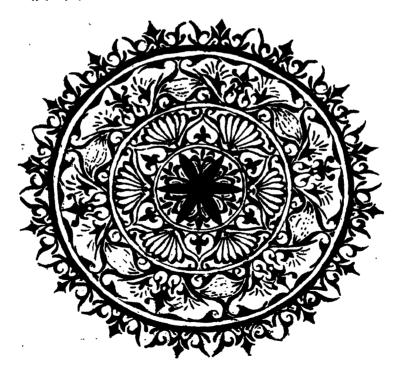
অতুল দত্ত

মধ্যপ্রাচ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এখন আন্তর্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বে দাবার বড়ের মত কাজ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই সীমান্ত কৃত্রিম। ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এবং সে অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়া আসিতেছে সাম্রাজ্যবাদীর প্রয়োজনে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বউপকূলবর্ত্তী আরবরা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহারা স্বাধীনতা লাভের পরিবর্ত্তে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বুটের নীচে নিষ্পিষ্ট হইল, এবং ঐক্যবদ্ধ আরব জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিবর্ত্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। "...virtually all Arabs...believe that Britain and France double-crossed them after the First World War, when instead of the united empire of their dreams they were given a set of arbitrary frontiers and—for the most part—not even independence.—(Manchester Guardian. 4-1-58) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরব জগতে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরব জনগণের মনে স্বজাতীয়দের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার আগ্রহ স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসকশ্রেণী এবং তাহাদের পাশ্চাত্য অনুগ্রাহকরা আরবদের এই আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। গত বৎসর এপ্রিল মাসে জর্ডানের রাজা হুসেন্ তাঁহার জনপ্রিয় মন্ত্রি-মণ্ডলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যে আরব ঐক্যের আন্দোলন উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে; গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার এই স্বৈরাচারী আঘাত আমেরিকা সমর্থন করিয়াছিল।...The slogan of the Nebulsi Government—the first in Jordan to be elected by popular vote—was 'Jordan's destiny is to disappear', and Nebulsi's proposals for educational union with Syria were one of the main causes of the royal conp d' etat last April. (New Statesman. 8-2-58).

মিশর-সিরিয়া মিলন—

ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আরব জনগণের এই আগ্রহ গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাজনৈতিক রূপ লইয়াছে সিরিয়া ও মিশরের মিলনে। সমগ্র আরব জগতে এই দুইটি সাধারণতন্ত্র অত্যন্ত প্রগতিশীল। বস্তুতঃ, সাম্প্রতিক কালে মিশরের রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন বুদ্ধিজীবী আরব যুবকদিগকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। সিরিয়াতে সম্প্রতি ঐক্যবদ্ধ বামপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিশর ও সিরিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক লৌকিক সংযুক্ত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে; নূতন বৃহত্তর রাষ্ট্রের নামকরণ হইয়াছে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। গত ১৯৫৬ সালে মিশর যখন বৃটিশ, ফরাসী ও ইস্রাইল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সিরিয়ার ও মিশরের সেনাবাহিনীর সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠিত হইয়াছিল। এখন দুইটি রাজ্যের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত হইল। সম্প্রতি ইয়েমেন্ সংযুক্ত-আরবরাষ্ট্রে যোগ দিয়াছে; প্রগতিশীল সাধারণতন্ত্র দুইটির মিলনে উদ্ভূত সংযুক্ত রাষ্ট্রটির সহিত সামন্ত-তান্ত্রিক ইয়েমেনের মিলন কোন্ ভিত্তিতে হইবে, তাহা এখনও অস্পষ্ট।

সিরিয়া ও মিশর সম-সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্র নহে, ইয়েমেন্ আরও দূরবর্ত্তী। সুতরাং, বাস্তব রাজনীতির বিচারে এই মিলন কৃত্রিম মনে হইবে। কিন্তু আরবদের রাজনৈতিক চেতনার সহিত ইহার নৈতিক যোগ প্রগাঢ়, এবং ইহা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী বিশাল আরব সংযুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সূচনা। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আরব জনগণের অচ্ছেদ্য একতা-বোধ এবং নবোদ্ভূত আরব বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা। সিরিয়া ও মিশরের মিলনকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে দেখিলে ইহার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না,—ইহা সমগ্র আরব জাতির স্বাভাবিক প্রবণতার প্রথম অভিব্যক্তি, কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলির প্রতিক্রিয়া চক্র-সমূহের বিরুদ্ধে ইহা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ।

এই চ্যালেঞ্জের উত্তরেই প্রতিক্রিয়াশীল জর্ডান্ নৃপতি তৎপরতার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী ইরাকের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সচেষ্ট হন এবং ইতিমধ্যে ইরাক ও জর্ডানের আনুষ্ঠানিক মিলন সাধিত হইয়াছে। আরব জাতির মিলিত হইবার স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অধীনে এইভাবে রাজনৈতিক রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। জাগ্রত আরব জনগণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্তি চায়, সামন্ততান্ত্রিকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চায়, এবং বিভেদের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া আরব জাতির রাজনৈতিক মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। বাগদাদ্ চুক্তির সভ্য ইরাকের সহিত আইসেনহাওয়ার নীতির দ্বারা অনুগৃহীত জর্ডানের মিলনে আরব জনগণের ঐই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা জনশক্তির মিলন নহে,—জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য প্রতিক্রিয়া শক্তির মিলন। তবে, আরব জনগণের ঐক্যবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল, তাহা রাজা হুসেনের উদ্বেগে এবং তাঁহার তৎপরতায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন কি সুদূরবর্ত্তী মরক্কোর নৃপতিও ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী আরব রাজ্যগুলির মিলনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৌদী—আরবের সহিত নিকটবর্ত্তী শেখ-রাজ্যগুলির মিলনের কথাও উঠিয়াছে, বস্তুতঃ, ভবিষ্যতে জিব্রলটরের দক্ষিণ হইতে পারস্যোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আরব-

সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য, তাহার পূর্ব্বে বিভিন্ন আরব রাজ্যের অভ্যন্তরে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে।

ফরাসী বর্ব্বরতা—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে টিউনিসিয়ার সীমান্তে সাকিয়েৎ-সিদি-ইউসুফ্ নামক সম্পূর্ণ অরক্ষিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এক হাটবারে সমবেত জনতার উপর পৈশাচিক ভাবে বোমা বর্ষণ করে। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' এই বোমা বর্ষণের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "Three waves of French aircraft bombed and strafed this little Tunisian town. The crowds were an easy target...The school building was hit and the roof fell in on a class room. There were still books and little brief cases there tonight...outside were blood-stained doors that had been used as stretchers. এই আকস্মিক আক্রমণে নারী ও শিশুসহ শতাধিক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে অথবা ঘটনার অব্যবহিত পরেই মারা গিয়াছে। এই বর্ব্বরোচিত আচরণের পর টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বরগুইবা বলিয়াছেন যে, অতঃপর টিউনিসিয়ার ফরাসী সৈন্যের অবস্থান তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। ১৯৫৫-৫৬ সালের ফ্রাঙ্কো-টিউনিসিয়া চুক্তি অনুসারে এই রাজ্যে ত্রিশ হাজার ফরাসী সৈন্য অবস্থান করিতে পারে, এবং বির্জাটার নৌঘাঁটী ফ্রান্সের হাতে রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বরগুইবা বলেন, "It is no longer possible for an army which allows itself to tread on our dignity to remain in Tunisia. The struggle to have that army withdrawal has begun. We demand that this withdrawal be complete. including the area of Bizerta. We can no longer trust a army which has given us bloody lesson." ফ্রান্স কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে, সাকিয়েৎ-সিদি আল্‌জিরিয়ান্ বিদ্রোহীদের ঘাঁটী ছিল; সুতরাং, এই গ্রামে বোমা বর্ষণে কোনও অপরাধ হয় নাই। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ গাইয়ার্ শাসাইয়াছেন যে, টিউনিসিয়া যদি (আল্‌জেরিয়ান্ বিদ্রোহীদের সহিত) এই "সহযোগিতার" নীতি ত্যাগ না করে, তাহা হইলে ফ্রান্সে তাহার "প্রতিক্রিয়া" হইতেই থাকিবে। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় এই যে, টিউনিসিয়া-আল্‌জেরিয়া সীমান্তে জাতিসঙ্ঘের সেনাবাহিনীর পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার যে প্রস্তাব বরগুইবা করিয়াছিলেন, ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। এমন কি এম্-আর-পি (ক্ষুদ্র-দলের দল) কংগ্রেস সীমান্ত অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে ফরাসী ও টিউনিসিয়ার সৈন্যের পেট্রলের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহীরা যে সময় সময় টিউনিসিয়ার অভ্যন্তরে আসিয়া তাহাদের স্বজাতীয়দের নিকট আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্ত উন্মুক্ত থাকিলে মুক্তিকামী আল্‌জেরিয়ানদের প্রতি টিউনিসিয়ানদের সহানুভূতির এই সক্রিয় অভিব্যক্তি রোধ করা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনে ফরাসী গভর্ণমেন্টের অনিচ্ছার কারণ বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষকরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, আল্‌জেরিয়ান্ বিদ্রোহীরা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সাকিয়েৎ-সিদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পরিত্যক্ত আশ্রয়স্থলগুলিতে ফরাসী বিমান একটি বোমাও নিক্ষেপ করে নাই। টিউনিসিয়া সীমান্তের বেসামরিক অধিবাসীদিগের মনে ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই বাছিয়া বাছিয়া হাটবারে সমবেত জনতার উপর বোমা বর্ষণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এই অত্যাচারকে ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের সহিত তুলনা করা চলে।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সভ্যরূপে ফ্রান্স যে সামরিক সাহায্য পায়, তাহা সে তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার্থ ব্যয় করে বলিয়া বহু অভিযোগ হইয়াছে। কিন্তু তাহার সামরিক অভিভাবকরা তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সাকিয়েৎ-সিদিতে যে বিমানগুলি বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সত্তর-খানিই মার্কিণ বিমান। এ সম্পর্কে 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যানের' নিম্নলিখিত মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত: "The majority of the aircraft used were supplied by America under N A. T. O....What is worse, the attack was launched less than a week after Washington accorded France a further loan of $650 Million, which both parties were fully aware would be used to prolong the war. Must we be surprised, then, if the uncommitted nations regard the western alliance—and especially N. A. T. O.—as a system of outdoor relief for indigent imperialists?

ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেন্ট—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্য সুমাত্রার বিদ্রোহী নেতা কর্ণেল হুসেন্ ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা মধ্য সুমাত্রায় ইন্দোনেশিয়ার নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে তিনি জাকার্ত্তার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে সর্ত্ত দিয়াছিলেন যে, জুয়াণ্ডা মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে হইবে, প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো এই মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি তাঁহার সমর্থন প্রত্যাহার করিবেন, এবং ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাত্তা ও জোগ্‌জাকার্ত্তার সুলতানকে লইয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে নূতন জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে। এই সর্ত্ত অগ্রাহ্য হওয়াতেই কর্ণেল হুসেনের এই ঘোষণা।

কর্ণেল হুসেন, মধ্য সুমাত্রার ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি কর্ণেল সিম্বোলন প্রভৃতি সামরিক নেতারা ব্যতীত বিদ্রোহী দলে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মাসজুমি দলের অন্যতম নেতা ডাঃ নাট্‌সির ও ডাঃ সুমিত্রোর নাম উল্লেখযোগ্য। দুইজনই অর্থনীতিবিদ্; ডাঃ সফ্রুদ্দীন ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের

প্রাক্তন গভর্ণর, এবং ডাঃ সুমিত্রো প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। ডাঃ সফরুদ্দীন বিদ্রোহী গভর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। গত ১৯৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে সুমাত্রায় যে সামরিক বিদ্রোহ দেখা দেয়, বিদ্রোহীদের প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেন্ট তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি। ডাঃ সোয়েকার্ণোর নীতির বিরোধী রাজনীতিকদের সমর্থনে গত এক বৎসরে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬ সালের বিদ্রোহের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে দায়ী করিয়া মাসজুমি নামক সাম্প্রদায়িক দলটি মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করেন, ইহার ফলে মন্ত্রিসঙ্কট দেখা দেয়। ডাঃ সোয়েকার্ণো তখন শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার এক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনায় দেশের প্রধান দলগুলিকে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলা হয় এবং দেশের কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী শ্রেণী, ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ডাঃ সোয়েকার্ণো বলেন যে, গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদের জন্য বিরোধী পক্ষের যে সমালোচনা তাহা ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃতিবিরুদ্ধ... "Indonesia should be governed in a spirit of 'gotong-rojong', mutual assistance : the essence of family life and the purest reflection of the Indonesian soul". সমস্ত বৃহৎ দলকে (কম্যুনিষ্ট দল সহ) এক মন্ত্রিমণ্ডলে সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, "I ask you in the calmest possible manner : Can we afford to continue to ignore a group which in the general elections won six million votes (communists) ?... to me there is no such words as 'left' and 'right.' I only warn the Indonesian nation to become united." রাজনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িক দলগুলি ; কম্যুনিষ্টদের সহিত একাসনে বসিতে তাহারা কিছুতেই সম্মত হয় না। সাম্প্রদায়িক দলগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও ডাঃ সোয়েকার্ণো তাহার পরিকল্পনা অনুসারে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি শাস্ত্রমিদজোজোর মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া দিয়া সাময়িকভাবে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। তাহার পর, গত বৎসর এপ্রিল মাসে ডাঃ জুয়াণ্ডার নেতৃত্বে "বিশেষজ্ঞদের" লইয়া নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। এই মন্ত্রিমণ্ডল পার্লামেন্টের আওতার বাহিরে,—শাসনতন্ত্রের সহিতও সঙ্গতিবিহীন। মাসজুমি, নাহাতাদুল-উলেমা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলি জুয়াণ্ডা-মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন করে নাই। বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের সহিত সাম্প্রদায়িকতাপন্থী কম্যুনিষ্ট-বিরোধী রাজনীতিকদের এক অংশের মিলনেই ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেন্টের উদ্ভব।

ডাঃ সোয়েকার্ণো শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। দেড় মাস পরে তিনি এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে দেশে ফিরিয়াছেন জাকার্তায় ডাঃ জুয়াণ্ডার মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বৈদেশিক শক্তি ইন্দোনেশিয়াকে অথবা তাহার কতকাংশকে "শক্তি জোটের" অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য চাপ দিতেছে। ডাঃ সোয়েকার্ণোর উক্তির সমর্থনে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। তবে, শোনা যায়, গত বৎসর যে মাসে ফরমোজার মার্কিণ-বিরোধী হাঙ্গামার সময় প্রাপ্ত একখানি গোপন দলিলে জানা গিয়াছিল যে, সুমাত্রায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। সম্প্রতি সুমাত্রায় পাল্টা গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বিদ্রোহী নেতা মেজর পাণ্টুয়ের গতিবিধি গোপন রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও জানা গিয়াছে যে, তিনি এখন ফরমোজার রাজধানী তেইপেতে অবস্থান করিতেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—ফরমোজার চিয়াং চক্র আমেরিকার আশ্রিত ; এই দ্বীপটি একটি মার্কিণ ঘাঁটী। দ্বিতীয়তঃ, যোগজাকার্ত্তার যে সুলতানকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী কর্ণেল হুসেন্ জানাইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন—ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক বিস্তার করিয়া জাতীয়তাবাদী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একত্র করা এবং ক্রমে সে মিলনকে বৈদেশিক শক্তিজোটের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। "কম্যুনিষ্ট"রা এখানে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীদের সহিত ঐক্যবদ্ধ ; ডাঃ সোয়েকার্ণোর ন্যায় সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বিরোধী। কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক ছড়াইয়া বিভেদ সৃষ্টি করা যে সব বৈদেশিক শক্তির স্বার্থ, তাহাদের নৈতিক যোগ ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রদায়িক দলগুলির সহিত। প্রধান জাতীয় নেতাদের মধ্যে ডাঃ হাত্তা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। তাহার নেতৃত্বাধীনে সাম্প্রদায়িক দল এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দল যদি ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলেই এই রাজ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক শক্তির অভীপ্সিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার (সিয়াটো) অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া তাহারা সঙ্গতভাবেই আশা করিতে পারে। ৭।৩।৫৮

(১৮)

—শিকারা—

আমাদের দলটা বেশ বড়ো। যখন যেখানে যাচ্ছি, তাই পুরো দলটা যাচ্ছিনা। কাশ্মীরে দিকে দিকে যাওয়াটা আমরা চারটে দলে ভাগ হয়ে করছি। এক এক দল এক একটা জায়গায় যাচ্ছে এক একদিন। এমনি চারদিনে সব দলেরই শ্রীনগরের আশে পাশের সব জায়গা দেখা হয়ে যাবে, অথচ একটা জায়গায় এককালে বেশী ভীড় হবে না।

কিন্তু বারো তারিখে প্রোগ্রাম ছিল সকলে মিলে। পুরো দলটা প্রায় দুশো শিকারা নিয়ে একসঙ্গে মীরাকদল থেকে ছেড়ে সাত-পুল পরিক্রমা করে ফিরবে। এই আগে এই পরিক্রমা আমরা করেছি। কাজেই পরিক্রমা করার কোনও ঔৎসুক্য ছিল না। আগ্রহ ছিল সমগ্র দলের সঙ্গে যোগ দেবার। দুশো নৌকা লতায় পাতায়, নিশানে, রঙ্গীন বেলুনে সাজিয়ে গান বাজনার ব্যবস্থা নিয়ে একসঙ্গে ঝিলমের বুক ছেয়ে ফেলবে। ছেলে মেয়ে, তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী একেবারে গা ঢেলে দেবে প্রকৃতির পরিবেশ মধুর মিতালীর সুরে, কল্পনা করবে একরকম, তাই চোখে দেখবো; পিউরিটানদের মজ্জাগত থিওরিকে চোখের ওপরে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করা হবে; একটা অভিনব উত্তেজনা।

সকাল বেলায় সেই যে নাইতে গেলাম রাম মন্দিরে, তারপর আর শিকারা ছাড়িনি। জানতাম দেরী হবে আমাদের। ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে সকলে, হেঁটে মীরাকদল যাবে, সেখান থেকে শিকারায় চড়বে। বেশ দেরী হবে। আমরা তিনজন আলাদা শিকারায় ঝিলমের খাল দিয়ে, চিনার বাগের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়বো মীরাকদলের পাশে কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েটের ঠিক উল্টো দিকে। অপর তীরে সারি সারি শিকারা সাজানো আছে। ছোটো ছোটো শিকারাগুলো আরও ছোটো দেখাচ্ছে। সাজানোর ফলে একটা ঝলক লেগেছে ওপারে। এপার থেকে অসিত ছবি নিচ্ছে। পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ হতেই একসঙ্গে সব শিকারা ছেড়েদিল। দেখতে দেখতে ঝিলমের বুক ভরে গেল শিকারায়। সে এক অদ্ভুত উৎসব লেগে গেল। কাশ্মীরে কেউ কখনও এই ধরণের উৎসব দেখেনি। কোনও শিকারায় গান, কোনও টাতে বাজনা, কল-কল্লোল উঠলো ঝিলমের বক্ষভরে। ভারতের নবনাগরিক আজ মাল্যে পল্লবে আরতি করলো ঝিলমকে, কাশ্মীরকে। "বাতায়ন খুলে যায় ঘরে" ঘরে ঝিলমের দুই তীরে সুউচ্চ বাসগৃহগুলির বাতায়ন খুলে যায়। শত শত সহস্র সহস্র চক্ষু পরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই দৃশ্যের পানে। ঘাটে ঘাটে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, নারী, সবার ভীড়। কী অপরূপ সজ্জায় শত শত কিশোর-কিশোরী চলেছে ঝিলমের বুকে।

কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েটে আমাদের শিকারা

ওরা ভাবছে রাজধানীর ছেলেমেয়েরা নিয়ে এসেছে প্রাণের বন্যা; জীবনের তুফান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক-বোধ ও দারিদ্র-বোধ একত্রে সন্নিবেশিত হলে কি অঘটন ঘটাতে পারে, কি শোভায় সুষমামণ্ডিত করতে পারে জাতির জী[illegible]

ফুলের মত
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে, পক্ষে হিন্দুস্থান লীভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

ধারাকে এ যেন ওরা বিস্ময়ের দ্বার পথে রক্তচেতনায় প্রবিষ্ট করে দিচ্ছিল।

আমি দেখেছি এই জুলুসের দুধারের ঘাটে ঘাটে ঘোমটা তোলা রমণীর সলিপ্ত নয়নের দৃষ্টি; আমি দেখেছি প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক গোঁড়া কাশ্মীরী ব্রাহ্মণীর অবগুণ্ঠনবসা জিজ্ঞাসা চোখের আলোয় ঠিকরে পড়ছে। আমি দেখেছি উলঙ্গ কাশ্মীরী শিশু স্নান ভুলে চেয়ে আছে সজ্জিত নৌকার দিকে। আর দেখেছি ক্ষুধা, ঈর্ষ্যা, জ্বালা সেই চোখে। এতো আলো, এতো হাসি, এতো প্রাচুর্য্য, এতো স্ফূর্ত্তি নিয়ে যারা আজ এসেছে তারা কি এই দেশেরই ছেলে মেয়ে? যুগ যুগ ধরে অত্যাচার, শোষণ আর অবহেলার মধ্যে থেকে কাশ্মীরের জনসাধারণ আজ হতাশা, দারিদ্র্য, আর শিক্ষাহীনতার শেষসীমায় উপস্থিত। কাশ্মীরে শৈশব দেখেছি

সম্রাট কণিষ্ক

স্ফূর্ত্তি দেখিনি, তারুণ্য দেখেছি উজ্জ্বলতা দেখিনি, যৌবন দেখেছি লাস্য দেখিনি, বার্দ্ধক্য দেখেছি বিশ্রাম দেখিনি। সাধারণ চোখ দিয়ে সাধারণ ভাবে কথা এ সব, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে এবং থাকবেও। কিন্তু পল্লীর মধ্য দিয়ে হেঁটেছি যাতে সহজ একটা খেলা, সহজ আনন্দের এক টুকরো ছবি, একটু অবসর বিলাস, একটু কৌতুক কলহ এমন কি একটা জোয়ালো ঝগড়া মারামারি চোখে পড়ে। তা পড়েনি, ব্যর্থ হয়েছি। কোথায় যেন একটা অপ্রাকৃত জীবন ছন্দের মধ্যে বিচ্যুতি। যেন ঘাস ঠেলে উঠেছে একটা চাপা পাথরের আশ পাশ দিয়ে জোরে; সভা-স্বাভাবিক পথের বিকাশ নেই।

একটি বিকাশ দেখেছি; সেটি ভিক্ষা। বৃন্দাবনের পথে ভিক্ষ একটা বৈষয়িক রূপ দেখেছি; সেখানে ভিক্ষা উপজীবিকা; জীবনধং কাশীর বিশ্বনাথ গলিতে ভিক্ষা দেখেছি যেন সামাজিক একটা স্তর, :ভি কাশ্মীরে ভিক্ষুকের ভিক্ষার রূপ অনুধাবন ও গলাধঃকরণ করতে আম সময় লেগেছিল। এরা যেন ভিক্ষাকে পেয়েছে ওদের জীবনধর্মের প পাষাণ বিন্দুকে স্বীকার করে। যেমন পাষাণ স্বীকার করা হ কাশ্মীরের ঝরণা হয়ে কাশ্মীরের জীবনকে একটা রূপ দিয়েছে, তেম যেন শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের ঘুঁটি খেলার দানে দা হেরে এদের রক্তের মধ্যে "দাও গো দাও" ধ্বনি বেরিয়ে এসে কাশ্মী সমাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষা দাও বলতে পা না এরা, বলে "বকশিস দাও।" দীর্ঘপথ উলঙ্গ কিশোর দৌড়ুচ্ছে মু বুলি 'বখশিস দাও।' চলে যাচ্ছে গোয়ালিনী মাথায় করে দুধের ঘট

নাগার্জুন—তাসি লাম্পো গুম্ফায় রক্ষিত আলেখ্যের প্রতিলিপি

তার হাতে ধরা ছেলেটাকে সে ছেড়ে দেয়, বলে 'বখশিস্।' এ চাওয়ার মধ্যে কেমন একটা বিনয়, একটা অসভ্যস্ত হীনতা, তার রূপ আমি বোঝাতে পারবো না, কারণ কখনও কোথাও দেখিনি। এদে professional beggars বলবো না, বলবো cultural হ sociological beggars. ইংরেজরা কাশ্মীরী ভিক্ষুকদের প্রসঙ্গে কাশ্মীরীদের লোভ ও দুর্নীতি সম্পর্কে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় লিখেছে ওরা কখনও কোনও দিন হৃদয় দিয়ে তো আমাদের কথা বোঝার চেষ্ট করেনি। তাই ওদের সুখ শান্তি পুরোপুরি না হলেই ওরা চিড়বিড়ি উঠেছে। সাহেব সিগারেট টানছে, যেন ব্রীচেস্ পরে ঘোড়ায় চলেছে পথ ছায়া নিবিড়, হুপ করে জঙ্গলের মধ্যে থেকে যদি ন্যেংড়া ছেলেট এসে বলে 'বখশিস্'—সাহেব বিরক্ত হবেনই। সৈন্যে এদের এই দুঃ

দুর্দশার কথায় এতোটুকু সহানুভূতি না দেখিয়ে এ কথা লেখে কি করে? "The people of Kashmir are described as good looking, easy and fickle in manner, effiminate and cowardly in disposition, and naturaliy prone to artifice and deceit. This character they still bear; and to it I may add that they are the dartiest and most immoral race in India.

যে সে লোকের কথা নয়; জেনারেল ক্যানিংহামের উক্তি।" কাশ্মীরী সুন্দর; সহজে হাতে আসে, আর নীতি সম্বন্ধে বেশী খুঁৎখুঁৎ করার ধার ধারে না। কাশ্মীরীদের মধ্যে পুরুষ থাকলেও নামেই, কাপুরুষই বেশী—আর তারী খুশী হল জোচ্চোরী করে কিছু দাঁও মারায়। আজও তারা যেই-কে-সেই, অধিকন্তু বলা যায় অমন নোংরা আর ছিনাল জাত ভূভারতে দ্বিতীয়টি নেই। সুন্দর ওরা, নীতি নেই, ছিনাল চরম—সাহেব লিখলেন। কিন্তু কাশ্মীরে সাহেবরা যুগ যুগ গেছেন। তাদের প্রাচুর্য্যের বিনিময়ে ওদের ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছেন, ওদের সৌন্দর্য্য আর কাপুরুষতার মাধ্যমে। মূলধন-বিহীন একটা এই ব্যবসায় কাশ্মীরী করেছে কতো ধিক্কার স্বরকে স্বীকার করে তা সাহেব জানতে চাননি. আমার ইচ্ছা করে, জানতে ইচ্ছা করে Angle, Goths, Vikings আর রোম্যানদের আমলের ইংলণ্ডের নৈতিক পরিপুষ্টি কতটা ছিল।

অথচ বেশীদিনের কথা নয়। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন—"They do not loosen their tongue of calumny against those not of their faith, nor beg, nor importune. They employ themselves". কাশ্মীরীরা বিধর্মীদের সম্বন্ধে কটূক্তি করেনি কখনও, ভিক্ষা জানতোনা, অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিল না। খাটতো খেতো—এই তাদের জীবন। স্বয়ং সম্রাট এই কথা লিখেছেন। অথচ জাহাঙ্গীর থেকে ক্যানিংহামের মধ্যে কী প্রভেদ! হবে না কেন? আফগানরা লুঠের পর লুঠ করেছে, শিখেরা লুঠ করেছে, ডোগ্‌রারা লুঠ করেছে, মোগলও গেল, কাশ্মীরও গেল চিরকালের অত্যাচারের কবলে। মানুষকে এই অত্যাচার নিকৃষ্ট জীব করে তুললো। তারপর এলো বিদ্রোহ, কাশ্মীরের জনজাগরণ। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ। নবভারত রচনায় পর্য্যায়ে কাশ্মীরের স্থান এখন অনেক উঁচুতে। কাশ্মীর অতীতকে ফেলেছে, ভবিষ্যতের পানে তার আগ্রহ।

এখন কাশ্মীর জাগছে। জনতা এখন সমাজ-সংস্কারে আগ্রহশীল, শিল্পবাণিজ্যে মনোযোগ দিচ্ছে। কাশ্মীর ভারতভুক্তির পর একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা গেছে। কিন্তু সেই উদ্দীপনা পুরানো অন্ধকারকে একদিনে, একযুগে দূর করতে পারেনা, পারেনি। আজ ঝিলমের বুকে তারুণ্যের এই চমক লাগানো উল্লাস প্রত্যক্ষ করতে ওরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছে ঝিলমের দুই তীরভূমিতে, ঘাটের দুধারে। ওদের চক্ষে যেন নতুন দেশের নতুন খবর, নতুন আশার বাণী। ছোট

হরবনত্রুদ—পর্বতের চেয়ে ছায়া মনোহর

বাচ্ছাটা মার বুক থেকে দুধ খাচ্ছে, একটা চোখ ঢাকা, একটা চোখ ঘুরিয়ে দেখছে আমাদের। মা শিশুকে বুকে যখন চেপে ধরেছে তখন কি ভাবেনি এ ছেলেও একদিন গঙ্গার বুকে, গোদাবরীর বুকে এমনি করে সেজেগুজে গান গাইতে গাইতে যাবে?'

গান গাইছিলো প্রায় প্রতি নৌকাতেই। একটা নৌকায় গান ধরেছে 'সামনে চলো মাইয়ারে, তুফান ভারী, ঢেউ দুস্তর; মাঝ দরিয়া পাড়ি এটা, অতো জোরে যেওনা।' এরা ছেলের দল। সামনে পাল্লা দিয়ে এইমাত্র মেয়েদের একটা নৌকা বেরিয়ে গেল। গান আরও জোরে চলছে। ও নৌকা থেকে গান এলো—"পাল্লা দিয়ে পিছিয়ে পড়ে কাঁদলে কি লাভ বল! ঝড় এসেছে, ঢেউ উঠেছে, দুরন্ত চঞ্চল! তীর যারা থাকবে পিছে, ঝড়ের ডরে শুধুই মিছে, ক্ষণে ক্ষণে দাঁড় বাওয়া

তোর মিথ্যা এ কৌশল। জীবন নদী হোকনা যদি মৃত্যুপথের দ্বার, এগিয়ে যাবো করবোনা ভয় দেখনা চমৎকার। ফিল্মের গান সব, হিন্দীতে গাইছে। জগজীবনের নৌকো বল্লে,—"দেখো অসিত, কারবারটা দেখো—মান ইজ্জৎ রাখলোনা। এই সব গান, গাইতে গাইতে চলার ধরণ দেখো। ভারতবর্ষের শান্ দেখো, মান দেখো। কেলেঙ্কারী, গুজব!"

অসিত মুখ চোখ পাকিয়ে বল্লে,—যখন মা বোন সকলকে নিয়ে শহরের সিনেমায় বসে এ সব শোনো তখন? কি করছে ওরা অন্যায়। নদীর বুকে গান গাইছে। অন্যায় কি?

এসে গেলো বুড়ো ভগবানজীর নৌকো, "কি দাদা কি দেখছো, কেমন দেখছো? এমনটা দেখেছো কখনও। জওহরলালজীর শোভাযাত্রাও এতো প্রাণময় হয়নি।"

"আপনারই স্বপ্ন সার্থক" বল্লাম আমি।

এসে গেলো লালজী আর পতিরামের নৌকো। "পতিরাম জয় হোক তোর! বেড়ে শোভাযাত্রা চালালি। শ্রীনগর মনে রাখবে।"

হাত পা ছুঁড়ে পতিরাম বল্লে—"বলিস না, বলিস না—মেছো বাঙ্গালী। নেতাজীর দেশের কলঙ্ক বেটা তুই। অর্গানাইজ করতে পারলিনা এমন প্রোসেসনটা। পিস্তল ছোঁড়ার আগেই সব বেরিয়ে পড়লো। সব মাটী হোলো. মাটী হোলো।"

লালজী বলে,—"ডিসর্গানাইজড্ লাইভ্লি ডিসিপ্লিন্—একটু ছত্রভঙ্গ হওয়ায় কেমন প্রাণস্ফূর্ত্তি বেড়েছে দেখনা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের এতো আনন্দ এ চোখে কখনও দেখিনি।"

সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে যাব। বেণু আর অসিত আগে গেছে। একাদশী আজ। সন্ধ্যায় ফল দুধ খাবো সারাদিন উপবাস করে। ওরা তাই আগে দারায় কষ্ট নিবারণের উপচার সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছে।

আমি কিন্তু মন্দিরের ঘাটের চাতালে বসে বসে অন্ত কিছু ভাবছি। সন্ধ্যায় আরতি আরম্ভ হোলো। ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। শাদা মার্বেল সিলভারে মোড়া মন্দির চূড়ায় চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়েছে। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। বড় কাঠবোঝাই নৌকা চলেছে লগির ঠেলায়। ছপ্ ছপ্ করে লগি ডুবছে জলে, নিস্তরঙ্গ জল। এক চাঁদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আবার টুকরো টুকরো চাঁদের দল এক জোট হয়ে একফালি চাঁদ হোলো। টুকরো টুকরো চিন্তা যখন এক হোলো তখন দেখি কান্তার সেই ম্লান মুখ। কান্তা মেয়ে নয়—আমার মনে একটা জীবন, একটা প্রাণ। ওর উপজীবিকা খুব মনোরম নয়। তাই ওর ভেতরে একটা তিরস্কার আছে, একটা দ্বন্দ্ব আছে।

হঠাৎ সামনে খালের ওপারে একটা ছায়া—দেখি গভীর চিনারের তলায় কান্তা আর একটী ছেলে। ওরা জলের ধারে বসলো। আমি চুপ করে বসে সব দেখছি। হঠাৎ কান্তার কোলে ছেলেটি মাথা গুঁজে দিলো। কান্তা মাথাটা বুকে চেপে ধরলো।

আমার একা বসার দফা গয়া। মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলাম। প্রসাদ পেলাম। ফেরার পথে আমায় মিসেস্ শর্মা বললেন—"অমরনাথের মুলুক সন্ধান করুন। আমি তো দেখছি ত্রিশজন মেয়ে যেতে রাজী!"

"তাই নাকি! আচ্ছা দেখবো।"

নিজেদের নৌকোয় এসে ঢুকলাম।

(১৯)

—বাদশাহী স্বপ্ন—

আবার সেই ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ। ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সজাগ সতেজ মন।

বেণুর এই ফুলে-পাওয়া-রোগ আমায় পাগল করবে। আমার স্নায়ুকুণ্ডলীর মধ্যে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে নানা ব্যাধি। একটু পাওয়ায় অনেক সময় উপচে পড়ে হৃদয়, মন, অঞ্জলি; আবার বিশ্বজোড়া পাওয়ার পরও শূন্যতা মেটেনা এমনটাও হয়েছে। বন্ধু হাসে রোম্যান্টিক বলে; প্রতিপক্ষ করে বিদ্রূপ 'চং-বাজী' বলে, নিজেকে নিজে করি তিরস্কার অসংযমী বলে।

একটুখানি ফুল এই ম্যাগনোলিয়া, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। ঝিলমের বুকে বাদশার চাঁদের বিরহ। পাশে বিছানায় বেণু ঘুমুচ্ছে ঝিউড়ি মেয়ের গভীর ঘুম। আসিত আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আমার পায়ের দিকে লম্বা শুয়ে আছে। ওর পাশে এক বিছানাতেই জগজীবন আর গুপ্তা। বিহারীলাল ব্যাঙ্কের হিসেব সেরে ফিরেছে অনেক রাতে। ঘুমুচ্ছিল। আমার সাড়া পেয়ে বললো, "ঘুম আসছে না নাকি? সিগারেট দেবো?"

আমি উঠে বসলাম। একটা জানালা খুলে দিতেই ঐশ্বর্য্যের মতো আলোর বন্যা এসে সমস্ত বোটটাকে স্বর্গরাজ্য করে দিলো। আমি পাঞ্জাবি চাপাচ্ছি দেখে বিহারীলাল বলে, বেরুবেন নাকি?

"ঘুম তো আছেই বিহারীলালজী। কিন্তু এই চাঁদের আলো, ঝিলাম আর চিনার পাবো কোথায়? তা ছাড়া পাচ্ছেন গন্ধ?"

বিহারীলাল বললে, "ঐ কথাই হচ্ছিল ক্যাম্পের ঘরে। পতিরাম আর লালজী বলছিলো বেণু তো শুধু ওর বোন্ নয়, সকলের বোন্। সকাল বেলায় চুপিসাড়ে সব তদারক করে। পরিচ্ছন্ন অথচ সজ্জা নেই। বাঙ্গালী মেয়ে যে কোথায় অন্ত মেয়ে থেকে আলাদা—বেণুকে দেখলে বোঝা যায়। এর মধ্যে ওর একমাত্র দুর্বলতা দেখা যায় ঐ ফুলে।"

"কিন্তু বেণু আমার বোন নয় বিহারীলাল।"

"বোন নয়? বোন নয় তো কে?"

"বেণু আমার ভাই। ভগবান ওকে মেয়ে করে পাঠিয়েছেন, সেটা ওর অভিশাপ। এমন একটা ভাই যদি আমার পাশে থাকতো বিহারীলাল, আমার বন্ধু, আমার সখা, আমার দুঃখসুখের ভাগী, আমি অন্ত কিছু হতাম। যেমন ঐ অসিত।"

"হ্যাঁ ও-ও আমাদের এক ভাবনা! কোনও অধ্যক্ষের সঙ্গে তার সার্বডিনেটের—"

"চুপ অবধবিহারী, রাত্রি কান পেতে থাকে। যদি শোনে, বড় কষ্ট পাবে।"

ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি প্রতিটী বোট ঝলমল করছে। চিনারের তলায় চেয়ার পাতা। গিয়ে বসেছি। এখনও নাকে সেই ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ। ভাবছি বসে বসে—এই চিনার-বাগে আওরঙ্গজেব হারিয়েছিল তার পরগণবরী ভওামী। উদীপুরী বেগম গুলনেয়ার বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবকে পরাজিত করে যৌবন শাহকে। এই সেই চিনার বাগ। এরই কাছাকাছি ছিল আওরঙ্গজেবের বোট। তারমধ্যে গুলনেয়ার আলমগীরকে ক্রীড়নকের মতো নিয়ে খেলা করেছে। সেদিনের চাঁদ এমনিই হেসেছিল। এই চাঁদের আলোতেই লালদেদ আর হাব্বা ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে প্রাণ প্রিয়ের সন্ধানে। চিনার তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে।

আবার ইংরেজদের আমলে এই চিনারবাগ ছিল অবিবাহিত সৈনিক আর অফিসারদের থাকার আড্ডা। তখনও এই দ্বীপ দুটোতে মেয়ের ভাড়, রিরংসার ভীড়। শত শত কাশ্মীরী বধূ জঠরানলের হোমে ইহকালকেপুড়িয়ে গেছে এই চিনার বাগে। চিনার বাগের পাতারা রাতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

পাশে এসে দাঁড়ালো রমজা।

"উদাস মনে হচ্ছে বাবুজী?"

"তোর হচ্ছে?" না ভেবে কথা বলেছি।

রমজা বলে "হয় মাঝে মাঝে। বাপ মরে গেল যখন তখন ছুটো বোট একটা ডুঙ্গা। আমার চলে যেতো বেশ। বিয়ে করলাম ছেলে বেলায়, কি সুন্দর ছিল বৌ কি বলবো। হাঙ্গামা এলো। ভয়ে ভয়ে সারা হলাম। হিন্দু-মুসলমান বলে জানতাম না, কাশ্মীরী-ডোগ্‌রা বলে জানতাম না। কেন হাঙ্গামা হোলো কে জানে। রাজার আমলে লোকজন বেড়াতে আসতো, বেশ চলে যেতো। এরা এসে সব পোড়াতো লাগলো। আমাদের মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে গেল। আর সে বছর কি বরফ বাবুজী। এই চিনার বাগের জলে ছেলেরা বল খেলেছে। যাত্রী আসা যাওয়া বন্ধ। এক বছর, দু বছর, তিন বছর। মরে যাই না খেয়ে। গেল বছর আর এ বছর লোকজন আসা আরম্ভ হয়েছে। খেতে পাচ্ছি। আমার এখন কেবল মনে হয়—ছেলে দুটোকে যদি পড়াতে পারি, যদি ওয়া তকরীর (বক্তৃতা) করতে শেখে। বাপ আমার নৌকো দিয়ে গেছে। আমি পারবোনা ওদের হাতে নৌকো দিয়ে যেতে। আমার বৌও বলে ভিক্ষে করবো তবু ছেলেদের পড়াবো।"

আমার ভাল লাগে না রমজার কথা। উঠে হাঁটতে থাকি। কনট্রাকটারদের নৌকোর কাছে গিয়ে চাপা একটা কলহ শুনি। খানিকটা পরে মনে মনে ধিক্কার হয়, কেন আমি শুনি অপরের কথা। মরুক কান্না।

কাল যাবো কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বিখ্যাত বাগিচাতলায়। নিশাত, শালামার এরা যেন দেশবিদেশপ্রখ্যাত কোহিনুর আর কুলিনান। দূরের থেকে কাশ্মীর যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের মনে এ নামগুলি যেন জপমালা। আমার খুব আকর্ষণ হয়তো নেই এই

হরবনদুদের বাগানে জলাবাঁধ ট্রাউটের চাষ

বিলাসবর্জিত উপবনের সম্বর্দ্ধনা জানাতে। এদের পশ্চাতে নেই কোনও মহিমা, কোনও জনজাগৃতি জনকল্যাণের স্পর্শ। শাসকের খেয়ালে কতো নিগ্রহ, কতো নির্য্যাতনের মূল্যে এই বিলাস সম্পদ।

তবু তাদের মূল্য দিয়েছে ইতিহাস কালের যাত্রাপথে মানুষের রুচি বিকাশের সাক্ষ্য হিসাবে। ভূগোলের মানচিত্রের সীমারেখা অচল নয়। কিন্তু এই চলমান ভাগ্যবিবর্তনের আকাশের মাঝে মাঝে এক একটা বরবুদুর, মাদুরার মন্দির, কুতবমীনার, তাজমহল—এক একটা কালের সাক্ষ্য। সে মূল্য দিতেই হয়। এইসব অবিনশ্বর ধূলিমুষ্টিই মানুষের নশ্বর ঐশ্বর্য্যকে কালের সমকক্ষ করে রেখেছে। সে হিসেবে এর মূল্য আছে।

কিন্তু অজন্তা, রোমের সেন্টপল্‌ গির্জা, সাঁচীর স্তূপ, এরা যেন শুধু

বহু মানবের বাণীর, বহুজনের চিত্তের গানের প্রতীক। তেমনটা নেই পিরামিড্, কলোসিয়াম, লালকেল্লা বা দেওয়ান্ ই-খাশের আবেদনে। একটা যেমন জাতিকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক, অন্যটা তেমনি দম্ভকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

তবু আমরা গেলাম, অর্থাৎ আমাদের ৩ নম্বর দল গেলাম, তেরই সকালে এই সব দেখতে।

প্রথমেই গেলাম হরবন হ্রদে। হরবনের কথা আগেই বলেছি। হরবন পর্বতের কোলে সেই কুশান যুগের গৌরবময় ইতিহাস। মেগাস্থিনীস্ বর্ণিত বড়ুর্হন বনের বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাসভার তীর্থস্থান। এই বড়ুর্হন বনে লুকানো আছে প্রত্নতাত্ত্বিকের Solomon Mines Captain Blood এর ডোবানো জাহাজের অতুল বৈভব; আগামেমননের শিরস্ত্রাণ, কবচ, অস্ত্রশস্ত্র; হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস্ দেশের হদিস্, এসব যেমন আজও জিজ্ঞাসুর ক্ষুধাকে জাগ্রত করে রেখেছে, তেমনি জাগ্রত করে রেখেছে বসুমিত্রের আমলের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাসভার উৎকীর্ণ তাম্রশাসনের সংগ্রহ। হিয়ুয়েন্ সাং এই তাম্রশাসনের উল্লেখ করে গেছেন। সম্রাট কনিষ্ক হীনযান, মহাযান দুই পন্থের সংগ্রাম অবসিত করার জন্য মহাবৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বান করেন এই কাশ্মীরে। নাগার্জুন তাঁর সভাপতি হন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধ অনুশাসনগুলির একটি সুসংবদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিলিপি করা হয়। সেগুলি অনেকগুলি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করে কোনও স্তূপের মধ্যে গেঁথে রক্ষা করা হয়। প্রত্নতত্ত্বের মহাক্ষুধার একটি ক্ষুধা এই তাম্রশাসনগুলিকে সংগ্রহ করা। বড়ুর্হনবনে চলেছে এখনও খোদাই। কে জানে কবে মিলবে সেই তাম্রশাসন!

বড়বন যে জায়গাটায় সেটার আশে পাশে অনেক ক্ষেত খামার। বহু চাষী বাস করতো। যথেষ্ট সমৃদ্ধ জায়গা ছিল। শালিমার বাগান এখান থেকে মাইল দুই হবে। চমৎকার এই হ্রদটির কাছেই গাঁ ছিল। এখন গাঁ নেই। জায়গাটা সংরক্ষিত। শ্রীনগরের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা এখান থেকেই। এই হ্রদের ডানধার ঘেঁষে বনানীর শোভাসমৃদ্ধ বসতি। অথচ খানিকটা জায়গায় কোনও চাষবাসও হতে পারতোনা, এমন কি গাছ পাছড়াও নয়। অনুর্বর, ঊষর। ছোটো ছোটো ঘাস হয়ে হয়েও হয়না। বন্ধ্যা জায়গা। তাই চাষারা নাম দিয়েছে "কিতুর-ঈ-দাজ্", "খোলার ক্ষেত" অর্থাৎ ক্ষেতে হয় পোড়ামাটী। কথাটা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কানে বহু অর্থপূর্ণ। মহাকালের দণ্ডহেলনে পম্পে, এথেন্স, কার্থেজ, সারনাথ, নালন্দা, বিক্রমশীলা, মাটীর তলায় চলে গিয়েছিল। সব গিয়েছিল; যায়নি পোড়ামাটীর টুকরো, খোলার কুচি। বৃষ্টির জলে গা ধুয়ে ওরা বাহিরে এসে বলে দেয় 'আমি যে রাজত্বের বাসিন্দা সে রাজত্ব ঘুমিয়ে আছে এইখানে মাটীর তলায়।' তাই পোড়া মাটীর ক্ষেতের ফসল প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মহার্ঘ। চাষীরা জানতো ওখানে লাঙল দিতে নেই। লাঙল দিলেই বংশ নাশ হবে। ঐ ক্ষেতে বড় বড় সব জীবেরা ঘোরাফেরা করে। সবই সত্য। খোঁড়ার পর দেখা গেল দেবতার মন্দির, অর্হৎদের বাসস্থান। জীন অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণদের স্থানও বটে, আর মন্দিরে লাঙল দিলে বংশনাশের ভয় করে বৈকি! এইসব কিম্বদন্তী আর নাম থেকেই বড়বনের আবিষ্কার। কুশানদের সময়ের বহু তথ্য এই বড়বন থেকে পাওয়া গেছে। এই বড়ুর্হন বনের আবিষ্কার কাহিনী মহেঞ্জদরোর আবিষ্কার কাহিনীর মতোই মনোরম।

সেকালের সেই হ্রদ আজও সেকালের পাহাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। হ্রদে পড়েছে সেই শ্যামল গম্ভীর শান্ত পর্বতের ছায়া। পর্বতের চেয়ে ছায়া মনোহর; প্রত্যক্ষের চেয়ে মায়া মনোহর। এর জল বেঁধে বেঁধে কাশ্মীরের অন্যতম সম্পদ ট্রাউট্ মাছের চাষ হচ্ছে। আট টাকা পাউণ্ডের মাছ অর্থাৎ একটাকায় একছটাক মাছ। মাছের চাষ কত যত্নে করছে কাশ্মীর সরকার এই এক জায়গায় নয়, বহুস্থানে।

ক্রমশ

কাকদ্বীপে কৃষক সম্মিলন—

গত ১লা মার্চ হইতে ৩ দিন ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার, রেল ও বাস উভয় যানের ব্যবস্থা আছে—ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত নব-নির্মিত পথে বাসে যাওয়া যায়। কাকদ্বীপ হইতে নামখানা পর্য্যন্ত পথও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, নামখানা হইতে সমুদ্র তীরস্থ ফ্রেজারগঞ্জ অধিক দূরবর্তী নহে। ১লা মার্চ সেখানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কৃষক সম্মিলনে বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানাইলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন ধেবর সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর হয় নাই। বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন সকলের অগ্রণী হইয়াছিল, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূরীকরণেও তাহাকে সেইরূপ অগ্রণী হইতে হইবে। সংগ্রামের দ্বারা দেশবাসীকে তাহাদের প্রার্থিত জিনিষ লাভ করিতে হইবে। দেশের কৃষক সম্প্রদায় আজ ভাবিতে শিখিয়াছে যে কংগ্রেসই তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। পূর্বদিন শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে অকালে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে সম্মেলনে আশানুরূপ লোক সমাগম হয় নাই। শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে—ভারতের জন সংখ্যার ৮০ জন কৃষিজীবী। ভারতে জমীরও অভাব নাই। কিন্তু কৃষকরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ দেশে পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করিতে পারে না। সকল সভ্য দেশের মত ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির ব্যবস্থা হইলে এ দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৩।১৪ গুণ বাড়িয়া যাইবে। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন—কৃষকদের চেষ্টা সত্ত্বেও এদেশে খাদ্যাভাব দূর হয় নাই। বাঙ্গালী কৃষকরা পাট চাষ করিয়া বৎসরে ৩৪ কোটি টাকা উপার্জন করে। বহু ধানের জমীতে পাট হইতেছে। ধান্য উৎপাদন বাড়িলেও চাহিদার তুলনায় তাহা কম। সে জন্য এ দেশে আরও অধিক খাদ্য উৎপাদনে সকলের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কৃষি ব্যবস্থায় সরকারী ত্রুটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সমবায় বিভাগের কর্মীরা দেশের জনগণকে সমবায়প্রথা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন না! সমবায় প্রথায় সর্বত্র চাষ করিতে বলা হয়, কিন্তু সরকার পক্ষ সে বিষয়ে কৃষকদিগকে কোন শিক্ষা বা উৎসাহ দান করেন না। পল্লীতে যে সকল কৃষি-কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাহারা না জানে কৃষি কার্য্য, না বুঝে সমবায়। সত্বর এ সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ২রা মার্চের সভায় একটি প্রস্তাবে সত্বর ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। বলা হয় যে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের উপর সমগ্র পশ্চিম বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তাহা ছাড়া সম্মিলনে কৃষি, খাদ্য, ভূমি বণ্টন, ভূদান আন্দোলন, সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেচ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে সরকার কি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া সম্মিলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জেলার ১৬ জন কৃষি-পণ্ডিতকে একখানি করিয়া খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দিয়া কৃষি-মন্ত্রী ডাক্তার আর আমেদ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এক একর জমীতে ৫৪৪ মণ আলু উৎপাদনকারী হুগলী জেলার শ্রীসুবলচন্দ্র

পাড়ুই, এক একরে ৯৫ মণ ৪ সের ধান উৎপাদনকারী শ্রীজীবন কৃষ্ণ মণ্ডল, গম, আখ প্রভৃতি উৎপাদনকারী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীশ্যামাপদ মুখার্জি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষাল, শ্রীসত্যসাধন রায়চৌধুরী, শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রকুমার সান্যাল প্রভৃতি তাঁহাদের অন্যতম। কৃষক সম্মিলনে সারা বাংলার কৃতী চাষীদের পুরস্কার দেওয়া হইল—পরে প্রতি জেলা ও প্রতি মহকুমার কৃতী চাষী দিগকে ঐ ভাবে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীধেবর সকলের অলক্ষিতে রবিবার ভোর ৪টায় সম্মিলন স্থান হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া ৪ ঘণ্টা কাল কয়েকটি গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কৃষক, মৎস্যজীবী, নৌকাচালক প্রভৃতি নানা জাতীয় অধিবাসীদের গৃহে গৃহে যাইয়া নিজে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। কৃষক সম্মিলনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণের এক সভা হইয়াছিল—তাহাতে প্রায় ৫ শত মণ্ডল-সভাপতি ও মণ্ডল-সম্পাদক সমবেত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই শত বিধান-সভা-সদস্য-নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রত্যেকটি ৫।৬টি করিয়া মণ্ডলে-বিভক্ত করা হইয়াছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল-কংগ্রেসের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। যাহাতে প্রতি মণ্ডলের কর্মকর্তারা নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন, সে জন্য এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৩রা মার্চ সোমবার কাকদ্বীপে এক বিরাট মহিলা-সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ তাহাতে সভানেত্রী হন ও শ্রীমতী মায়াদেবী ছত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মহিলা সম্মিলনে এক প্রস্তাবে গ্রামাঞ্চলে ঢেঁকী ও অম্বর চরকার প্রবর্তন দ্বারা মহিলাদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থায় সরকারকে মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। বিবাহে পণ গ্রহণকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে বলা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা অবৈতনিক করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার একটি গ্রাম—কাকদ্বীপে এই সম্মিলন হওয়ায় দেশের সর্বত্র একটা নবজাগরণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আবুল কালাম আজাদ—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও জ্ঞানী, জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৬৯ বৎসর বয়সে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ২টার পর দিল্লীর বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩ দিন তিনি রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে ইসলামের আদিভূমি মক্কায় তাঁহার জন্ম হয়—তাহার পুরা নাম ছিল আবুল কালাম মহিউদ্দীন আহম্মদ আজাদ। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের লোক—১৮৫৭ সালে সিপাই যুদ্ধের সময় মক্কায় চলিয়া যান—তাঁহার নাম খইরুদ্দীন। ১৮৭২ সালে তিনি ভারতস্থ শিষ্যগণের নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া মক্কায় জল সরবরাহের জন্য একটি খাল সংস্কার করিয়াছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম ১৫ বৎসর বয়স হইতেই সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে রাঁচীতে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। মৌলানা আজাদ অতি অল্প-বয়সে কলিকাতায় আসেন ও তাহার পর দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও খেলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা করেন। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। জীবনের ১১ বৎসর কাল তাঁহাকে জেলে কাটাইতে হয়। ১৯৩০ সালের ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১০ বৎসরেরও অধিককাল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীরূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা ভারতীয় হইলেও মাতা আরব দেশীয় মুসলমান ছিলেন—তিনি প্রথম বয়সে ভারতের বাহিরে থাকিয়া আরবী, পার্শী প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষিত হয়। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিও কর্মশক্তি সারা-জীবন তাঁহাকে সকল কার্য্যে সাফল্য দান করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া সকল সময়ে ভারতের মুখপাত্ররূপে তিনি আজাদকে সম্মুখে রাখিতেন। অসাধারণ সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান মৌলানা আজাদ সর্বদা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন—সারা জীবন তিনি ভারতে যে নেতার স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ জীবনে

মানুষের পক্ষে তাহা সহজলভ্য নহে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের অভাব হইল।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—

আমরা রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের ১৯৪৫ হইতে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত ১২ বৎসরের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। হাওড়া বেলুড়ে সারদাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষের পরিচালনায় বর্ত্তমানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে—(১) বিদ্যামন্দির বা কলেজ (২) শিল্পমন্দির বা কারিগরী শিক্ষালয় (৩) তত্ত্বমন্দির—ইহার অধীনে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হইবে (৪) জন শিক্ষামন্দির—সমাজ সেবা শিক্ষা কেন্দ্র। ৪টি প্রধান প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ফটোগ্রাফী, গোপালন, কৃষি, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি বিভাগেও কর্মীদের শিক্ষাদান করা হয়। বেলুড়ের বাহিরে মিশনের অধীনে ২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়া, মনসাদ্বীপ, রহড়া, নরেন্দ্রপুর, টাকী, সরিষা বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দেওঘরে, কলিকাতা নিবেদিতা লেনে, ১১১ রসা রোডে, আসানসোল প্রভৃতি বহু স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। বেলুড়স্থ কেন্দ্রে গত ১২ বৎসরে মোট ৪২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বেলুড় সারদাপীঠের সম্পত্তি প্রভৃতির মোট মূল্য ৪৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। সারদাপীঠকে সম্পূর্ণ করিতে আরও ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন, অর্থের অভাবে তাঁহাদের কার্য্যের অগ্রগতি বন্ধ হইবে না, সহৃদয় জন সাধারণ ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থদান করিয়া মিশনের এই বিরাট শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবেন।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়—

হাওড়া, বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সারদাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মঠের নিকট গঙ্গাতীরে এক বিস্তীর্ণ জমীর উপর একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। সে জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইবে। জমি ক্রয় বাবদ—৫ লক্ষ, কলেজ গৃহের জন্য ২ লক্ষ, কার্য্যালয় প্রভৃতির জন্য ২ লক্ষ, পাঠাগার—৩ লক্ষ, মিউজিয়াম ২ লক্ষ, একশত ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাস—৪ লক্ষ, কর্মীদের বাসগৃহ দেড় লক্ষ ও অতিথিশালার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া—আসবাব পত্রের জন্য ৫ লক্ষ, পুস্তকাদির জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী খরচের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। আচার্য্য ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি ও সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আচার্য্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি কমিটির সদস্য। প্রাচীন আদর্শে নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলার আদর্শে নূতন মহাবিদ্যালয় গঠন করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দান করা হইবে। আজ সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিবেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীদের এই শুভ প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগীতার অভাব হইবে না—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। পশ্চিমবঙ্গ এই কার্য্যে অগ্রণী হইলে সারা ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

কেন্দ্রীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন বলিয়াছেন—ভারতীয় সংস্কৃতির সম্যক্ উপলব্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য্য এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে সংস্কৃতকে সুপ্রতিষ্ঠা করার জন্য স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিতে হইবে। মধ্য বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকে মাতৃভাষা ও ইংরাজির সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য (১) প্রাইভেট ক্লাসের ব্যবস্থা (২) ষ্টাডি গ্রুপ (৩) প্রাইভেট পরীক্ষা (৪) জনপ্রিয় সংস্কৃত পুস্তক রচনা (৫) সংস্কৃত সভা সমিতি (৬) সংস্কৃত লেখক ও রচনাবলীর স্মারক দিবস উদ্‌যাপন (৭) সুলভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ (৮) সরল ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান (৯) সংস্কৃত ভাষার লেখকগণকে উৎসাহ দান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা দরকার। সংস্কৃত সঙ্গীত গান ও

সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের দ্বারা জনগণকে সংস্কৃত শিখানো সহজ হইবে। আমাদের বিশ্বাস, অধিক লোক সংস্কৃত শিখিলে সংস্কৃতই ভারতের সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হইবে।

সত্য কথা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতায় খাদ্য ও ত্রাণমন্ত্রি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি খাঁটি সত্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—বাংলাদেশের লোক যদি কাজ করিতে চাহিত, তাহা হইলে এ রাজ্যে এত বেকার সমস্যা থাকিত না। বাঙ্গালী শ্রমসাধ্য কোন কাজ করে না বলিয়াই অন্যান্য রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কাজ পাইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই কায়িক শ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। সে জন্য প্রতি মাসে প্রায় ১০ কোটি টাকা লোকাল মনি-অর্ডারে পশ্চিমবঙ্গ হইতে রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বহু বৎসর পূর্বে স্বর্গত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহা প্রাদেশিকতা বা হিংসার কথা নহে—বাঙ্গালীর শ্রম বিমুখতার কথা। দেশের সর্বত্র এই কথাটি আলোচিত হইলে, হয় ত একদল শ্রমবিমুখ মানুষ শ্রমসাধ্য কর্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের যত উপকারই করিয়া থাক না কেন, আমাদের মধ্যে শ্রমবিমুখতা আনিয়া দিয়াছে। সে জন্য গান্ধীজি প্রথম জীবন হইতেই শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা দিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যাক্রম স্থির করিয়াছিলেন। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু দেশে ব্যাপকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হইলে দেশ অবশ্যই উপকৃত হইব।

সত্য গোপন চেষ্টা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে দেশে ভবিষ্যতে খাদ্য-সংকটের সম্ভাবনা নাই; প্রাক্ স্বাধীনতা যুগেও বৎসরে এদেশে ব্রহ্ম হইতে ৩ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হইত। একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মাঘ ফাল্গুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের চাউলের দাম কমিয়া যায়, সে সময়ে এখানে লোককে ৩০ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। সরকার ৯ হাজার দোকান খুলিয়া কম মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল দোকানে প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম পরিমাণে চাউল সরবরাহ করা হয়। লোক ২।৩ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত শুধু হাতে ঘরে ফিরিতে বাধ্য হয়—এই ত দোকানগুলির অবস্থা। সাড়ে ১৭ টাকা মণের চাউল ত পাওয়া যায় না—সাড়ে ২২ টাকা মণের আমেরিকান আতপ চাউল—যাহা অধিকাংশ লোকের খাইতে কষ্ট পাইতে হয়—তাহার পরিমাণও পর্য্যাপ্ত নহে—সবদিন তাহাও পাওয়া যায় না। একে ত সপ্তাহে মাথা পিছু ১সের চাউলে লোকের অভাব মেটে না—তাহারও এইরূপ অবস্থা। কাজেই লোককে খোলা বাজারে ৩০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হয়। মানুষের অর্থনৈতিক সংকট কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা—যাঁহারা মন্ত্রীর গদীতে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে বোঝা বোধ হয়, সম্ভব হয় না। শাসকবর্গ এ দেশে কাপড়ের দাম কমাইতে সমর্থ হন নাই। শীতের সময় তরকারীর দাম কিছু কমিয়াছিল, তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাল, তেল, কয়লা, চিনি, মশলা প্রভৃতির দাম—যাহা একবার বাড়ে, তাহা আর কমে না। এ সকল সামান্য জিনিষ দেখিবার লোক নাই। সাধারণ দরিদ্র মানুষ—বড় বড় পরিকল্পনার কথা শুনিয়া শুনিয়া হায়রাণ হইয়াছে—পরিকল্পনার ফল এখনও তাহাদের কাজে আসে নাই—দারিদ্র্য তাহাদের দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—এ অবস্থায় 'দেশে খাদ্যের অবস্থা শঙ্কাজনক নহে' বলিলে লোক নিশ্চিন্ত হইবে না। কি করিলে দেশের লোক সুলভে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পায়—সে ব্যবস্থার কথা বলিলে মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারে। অধিক খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সরকারী চেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই—সে চেষ্টা আরও ব্যাপক ও আন্তরিকতাপূর্ণ করার চেষ্টায় কেহই মনোযোগী নহেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে—বিশেষ করিয়া খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমরা সে কথা চিন্তা করিয়া নূতন কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আবেদন জানাই।

দণ্ডকারণ্য সংবাদ—

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কৃষি ও লোক বসবাসের জমি না থাকায় সরকার দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠাইতে বাধ্য হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়

অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যাইয়া দণ্ডকারণ্য দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তিনি যে বিবরণ সরকারে পেশ করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুও দণ্ডকারণ্য দেখিয়া আসিতে সম্মত হইয়াছেন। তথায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল পতিত জমী আছে—তন্মধ্যে ২০ হাজার বর্গ মাইলের উন্নতি সাধন করা হইলে তথায় ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন করা সম্ভব হইবে। সেখানে অনেক ভাল নদী আছে এবং স্থানে স্থানে বৎসরে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। দণ্ডকারণ্যে যাইবার জন্য বিধান সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট এক হাজার আবেদন আসিয়াছে। এই সকল তথ্য গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সরকারী প্রচার বিভাগের ব্যাপক প্রচার কার্য্য পরিচালন করা কর্তব্য।

আনন্দপুরস্কার ১৩৬৪—

১৯৫৭ সালের ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় সাহিত্যিক-দের এক প্রীতিসম্মিলনে আনন্দবাজার পত্রিকার পরি-চালক শ্রীঅশোককুমার সরকার ঘোষণা করেন—প্রতি বৎসর বাংলা সাহিত্যসেবীদের তিনি দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত পুরস্কার দুই হাজার টাকা মূল্যের হইবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটীর উপর বিচার ভার দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমান ১৩৬৪ সালের বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি ও তরুণ কথাসাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু তাঁহার 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য অপর পুরস্কার লাভ করিবেন। উভয়েই ভারতবর্ষের লেখক—আমরা তাঁহাদের আন্তরিক অভি-নন্দন জ্ঞাপন করি। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষও এইভাবে কাজ করিয়া বাংলার লেখক-সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

[illegible]

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম-এ (ট্রিপল্) সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের দৌহিত্র ও ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এস্‌সি মহাশয়ের পুত্র শ্রীনির্মল-কুমার চট্টোপাধ্যায় এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক্লাসিক্যাল ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজেস্'-এর "কম্বাইণ্ড কোর্স"-বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহাকে 'চন্দ্রনাথ-শ্রীনাথ কুণ্ডু' স্বর্ণপদক ও 'দুর্গামণি দেবী' স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫৩ সালে তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নূতন বিষয়টি এম-এ পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার পর হইতে একমাত্র শ্রীনির্মল-কুমার চট্টোপাধ্যায়-ই এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই "কম্‌বাইণ্ড কোর্স" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-এ। ইহার পূর্বে তিনি ১৯৫৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ অনার্সে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া যথাক্রমে ইংরাজিতে এম-এ এবং এম্ এল্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শরৎ বসু একাডেমী—

১৯৫৮ নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা ৩৮২ এলগিন রোডস্থ নেতাজী ভবন হইতে ব্যারিষ্টার শ্রীএস-কে-মুখার্জির সম্পাদনায় শরৎ বসু একাডেমী নামে এক-খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গত দেশ-নেতা শরৎচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে ১৯৫২ সালে এই অ-রাজনৈতিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে—শ্রীহরেন নিয়োগী ও শ্রীঅমিয়নাথ বসু প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। এই পুস্তকে বহু সুমুদ্রিত চিত্র ও সুলিখিত প্রবন্ধ আছে। ১৯৪৭

সালে গান্ধীজি নেতাজী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রধান-মন্ত্রী উ-নুও নেতাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার কথা ইহাতে বিভিন্ন লেখকের লেখায় আলোচিত হইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজ শরৎচন্দ্রের দান দেশবাসী কখনও ভুলিবে না। তাঁহাদের কথা এই একাডেমীর আলোচনা ও তৎকর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের মধ্য দিয়া অধিক প্রচারিত হইলে দেশবাসী তদ্দ্বারা লাভবান হইবে।

আসানসোলে খনি দুর্ঘটনা—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টার সময় আসানসোল হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে চিনাকুড়ি কয়লার খনিতে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ফলে ১৮২ জন লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯ জন খনি গর্তে চাপা পড়িয়া মারা যায় ও ১৭ জনকে উপরে আনিয়া হাসপাতালে দেওয়ার পর ৩ জন মারা যায়। খনিটি, বেঙ্গল কোল কোম্পানীর—মেসার্স এণ্ড্রু ইউল কোম্পানী উহার ম্যানেজিং এজেন্ট। ঐ দিনই ধানবাদ হইতে ১২ মাইল দূরে সেণ্ট্রাল ভাওড়া কয়লা খনিতে ৫০ ফিট জলের তলায় ২৩ জন শ্রমিক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। খনির মধ্যে হঠাৎ জলের স্রোত আসে—ঐ জল তুলিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগিবে। চারিদিক নানা প্রকারের দুর্ঘটনা এখন যান্ত্রিক যুগের পরিচয় দান করিতেছে।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ—

দিল্লীস্থ ভারত সরকারের সংবাদ ও প্রচার বিভাগের প্রকাশিত ৬খানা বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। (১) শিল্প ব্যবস্থা—(২) পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ—(৩) দুঃখ থেকে সম্পদ—(৪) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—(৫) নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পথে—(৬) খাদ্য ও কৃষি। প্রত্যেকখানির মূল্য দুই আনা। পুস্তকগুলি শিক্ষাপ্রদ ও সুলিখিত, সুমুদ্রিত। বাংলা ভাষায় লিখিত হইলেও এগুলি কেন পশ্চিমবঙ্গে অধিক প্রচারিত হয় নাই—জানি না। দেখা গেল, এইরূপ আরও বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী প্রচার বিভাগ এই সকল পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে অল্প মূল্যে বিতরণ করিলে দেশবাসী সেগুলি পাঠ করিয়া লাভবান হইবে।

নূতনভাবে বর্ষ-গণনা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ষ-গণনা হয়—১লা এপ্রিল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতে যাহাতে ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর বর্ষ-গণনা করা যায়—সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বিধান সভা ও বিধান পরিষদে বার্ষিক আয় ব্যয়ের আলোচনার জন্য সদস্যদিগকে মার্চ মাসে কলিকাতায় থাকিতে হয়—সে সময়ে শীত কমিয়া যায়, পথে কাদা থাকে না—সে সময়টাই গ্রামে ঘুরিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়—সদস্যরা সে সময়ে ছুটী পাইলে নির্বাচন-কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। আগষ্ট সেপ্টেম্বরে বর্ষার সময় লোক ঘরে আটক থাকিতে বাধ্য হয়—সে সময়ে বিধান সভা বা পরিষদের অধিবেশন হইলে সদস্যদের কোন অসুবিধা হইবে না। নানা দিক দিয়া সুবিধার কথা আলোচনা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছেন।

—

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চৌরঙ্গী টেরাসে ওরা নতুন করে উদ্বোধন করেছে চেরি-ক্লাবের। নির্জাব মৃতকল্প মানস-চেরি আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে নতুন রঙে। ওদের মনের কোণে নিরালা ধূসর প্রান্তর আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। সুরেখা করেছে জল-সিঞ্চন, শিপ্রা দিয়েছে অনুকূল বাতাস।...সুরেখার টাকা, শিপ্রার অনুপ্রেরণা।

দিনের পর দিন জীবনের একঘেয়ে সুরে শিপ্রা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তাই সুরেখার হাতে কুলপি-বিয়ারের ফেনিল গেলাসটা তুলে দিয়ে বলেছিল, চকা হরিণীর মত সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে আর ভালো লাগে না, সুরেখাদি।

ঘর বাঁধো ...নির্বিকারভাবে সুরেখা উত্তর দিয়েছিল।

ঘর!...শিপ্রা হেসেছিল। ঝকঝকে দাঁতগুলোর মাথায় মাথায় লেগেছিল রূপালি হাসির রঙ।

হাসলে যে? আকাশ-ধরা চোখদুটো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেখা মেলে ধরেছিল শিপ্রার মুখপানে। শিপ্রাকে সে কম জানে না। তবুও যেন শিপারিন ঝিলমিল করে উঠেছিল হঠাৎ ওর কথা শুনে।

হাসিটুকু মুহূর্তে ঠোঁটের কোল থেকে মুছে নিয়ে শিপ্রা বলেছিল—তার চেয়ে মরফিন্ ইন্জেকশান নিয়ে শুয়ে থাকা অনেক ভালো।

মানে?...এবার সুরেখা সত্যি বিস্মিত হয়েছিল।

কিন্তু তার সে বিস্ময় কাটতে দেরী লাগে নি। পর-ক্ষণেই শিপ্রা নিতান্ত সহজ কণ্ঠে কথাটা তরল করে দিয়ে বলেছিল—ঘরে আর কারাগারে তফাৎ কি খুব বেশী সুরেখাদি? মনকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে, হা-পিত্যেস করে উদ্ধারকর্তার মুখপানে চেয়ে থাকার চেয়ে, ভাঙা নৌকায় উঠে পদ্মার স্রোতে ভেসে যাওয়াও ভালো।... মরবার আগে তিল তিল করে মরতে আমি পারবো না।

সুরেখা হেসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে মুখ টিপে-টিপে হেসে শিপ্রাকে অনুভব করেছিল মনের সবটুকু প্রসন্নতা নিয়ে। টোল-খাওয়া দুটি গালে উপচে উঠেছিল কন্দর্পের মধুপর্ক।

রেখাদি!

বলো।

হাসির রেশটুকু থামিয়ে দিয়ে শিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিল—জয়ন্ত চ্যাটার্জীকে তোমার মনে আছে?

আছে।...কেন?

সাময়িক অন্যমনস্কতাটুকু নিমেষে ঝেড়ে ফেলে সুরেখা বলেছিল—অদ্ভুত মানুষ। বুঝি না, কি সে চায় জীবনে! প্রতিভা আছে, সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হলে যে কৌশলের প্রয়োজন, সে-কৌশল সে কোনদিনও আয়ত্ত করতে পারবে না। মানুষ তো শুধু প্রতিভায় বড় হয় না। বড় হয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার কৌশলে। পাঁচসিকার ফেরিওয়ালাও শেঠজি হয়ে ওঠে। কাদের ওস্তাদ বলতেন, শুধু এক চামচের প্যাঁচেই শাহান-শা হওয়া যায়।

চামচের প্যাঁচ মানে?

মানে, সুকৌশলে কাজ হাসিল করবার কলা—নৈপুণ্য।

কলা কি সব জায়গায় খাটে রেখাদি? তা হলে জয়ন্ত চ্যাটার্জী—

সুরেখা চমকে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল শিপ্রার মুখপানে। ধারাল চোখদুটো দিয়ে ওর মর্মস্থল পর্যন্ত দেখে নেবার জন্যে যেন উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল!

রঙ বদলাতে ওর দেরী লাগে না, লাগেও নি। হেসে বলেছিল—তুমি? তুমিও তো হার মেনেছ।

ভুল, রেখাদি! ভুল। হাতের নাগালে যা পাওয়া যায় না, শিপ্রা তার পিছনে ছোটে না কোনদিন। সে জানে, মাকড়সার জালে প্রজাপতি ধরা যায়, রয়াল টাইগার আটকানো যায় না। এক্সপেরিমেণ্ট করতে শিপ্রা ছাড়ে নি।

জানি।…লুক্রেসিয়া তার নেই। সংকোচকে সে ঘৃণা করে। চিত্তজয়ের যাদু সে জানে। তবুও ভিজে শাড়ি পরে, রাতের অন্ধকারে তাকে বরানগর থেকে ম্যানডেভিলায় ফিরে যেতে হয় নিউমোনিয়ার ভয়কে উপেক্ষা ক'রে।

শিপ্রার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠেছিল। প্রয়োজন মত নিজেকে সামলে নেবার কৌশল পুরোপুরি জানলেও, আচম্‌কা ঝাঁকানিটা সামলে নিতে শিপ্রার কম সময় লাগেনি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে যেন ভূত দেখে তার স্নায়ুগুলো কেমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল।…জানে! সেকথাও গোপন নেই। সব জানে রেখাদি!

তবুও সামলে নিয়েছিল। সুরেখার অলক্ষ্যে দুটো ঢোক গিলে নীচু গলায় শিপ্রা বলেছিল—কি যে বলো সুরেখাদি! অদ্ভুত তোমার কল্পনা শক্তি! ডান্স না শিখে, উপন্যাস লিখতে শুরু করলে ভালো করতে।

তা-ই।…যাক গে, ডায়েরির ছেঁড়া পাতাটা খুঁজে পেলে, জয়ন্তকে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করতাম। সত্যিকারের একটা হিরো!

থাক।…শিপ্রা কম্পমান চোখদুটো নামিয়ে নিয়েছিল: আসবো না আর তোমার বাড়ীতে।

সুরেখা খিল খিল করে হেসে শিপ্রার হাতখানা তুলে নিয়ে চেপে ধরেছিল দুই চোখের ওপর। তারপর আলগোছে ঠোঁটের কাছে নামিয়ে এনে, আলতো চাপে কামড়ে ধরেছিল মাঝের আঙুলটা: শিপারিন!

ঘর সে বাঁধেনি। তবে জলসা-ঘর বাঁধলো চৌরঙ্গী টেরাসের নিরালা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। নতুন করে উদ্বোধন হলো চেরি ক্লাবের। টাকার তো অভাব ছিল না সুরেখার, নেইও। ওর খণ্ডেনী ছন্দে পা ফেলার নূপুর-নিক্কণ টাকার রুনুঝুন্ শব্দ ম্লান হয়ে যায়। বাণবিদ্ধ রাজহংসের মত পায়ের কাছে লুটোপুটি করে পুরুষের মন। সুরেখা হাত বাড়ায় না কোনদিন। টাকা যেন হাত বাড়িয়ে ওর হাল্‌কা শাড়ির আঁচলটা ধরবার জন্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বাইরে শিপ্রা বেশ সহজ হয়ে এলো। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন চোর-কাঁটার একটা শুক্‌নো ফুল থেকে গেল। চলতে-ফিরতে, ছোট্ট একটা কাঁটার মত বুকের তলায় খচখচ করে।

ওদের চেরি-ক্লাবের সায়ন্তনী বৈঠক নিয়মিত বসে চৌরঙ্গী টেরাসের জলসা ঘরে। আড্ডা জমে গান-গল্প-দাবা-ক্লাশের। এ পাশের ঘরে যখন ক্লাশের আসর জমে ওঠে, লীনা চৌধুরীকে নিয়ে বিভোর সেন উঠে যায় পাশের ঘরে। নিরিবিলি বসে দাবার চাল শেখায় লীনাকে। মনের অগোচরে ঘড়ির কাঁটা সন্ধ্যার ঘণ্টা ছাড়িয়ে রাতের কোঠায় পা বাড়ায়।

হঠাৎ দাবার ছকে বোড়েটা টিপে, নতুন একটা কিস্তি দিয়ে, বিভোর সেন হেসে বলে—রাত হলো যে!

তা হোক।…লীনা হাসে।

নাম ওর লীনা নয়। নাম ছিল রহিমা বেগম। বিভোর সেন আদর করে বলে লীনা।…বিয়ের আগে যে নামটা ছিল, ডিভোর্সের পর সেটা আর মানায় না। নতুন করে বার্ণিশ না করলে, দামী মেহগিনও পুরণো মনে হয়। নয় কি? কথাটা বলে বিভোর আত্মপ্রসাদের ঠাণ্ডা একটু হাসির আমেজ টেনে আনে প্রশংসমান চোখদুটোয়।

হা-ল্-লো!

ওদের আমেজটা আচম্‌কা ভেঙে দিয়ে, শিপ্রা এসে ঘরে ঢোকে বালকৃষ্ণণের হাতখানা ধরে।

আসুন শিপ্রাদি!…সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে রহিমার মুখে। বিভোরের সঙ্গে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিজে সরে বসে।

ঘরে ঢোকা হয় না। শিপ্রা পিছিয়ে আসে। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে মিঠে গলায় বলে: দাবার চেয়ে পাশা অনেক ভালো। দেয়া-নেয়ার সুবিধে বেশী।

খিল্‌খিল্ করে ভেসে যায় লীনার চোখেমুখে এক

ঝলক বিদ্যুতের মত হাসি : অদের কি আর-কিছু আছে, শিপ্রাদি ?

জানি। বিভোর কিছু চাইলে, তুমি না বলতে পারো না।

তাই : লীনার মুখখানা লালচে আভায় ভরে ওঠে।

লজ্জা পায় বিভোর সেন। ও জানে, লীনা ওর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কোনদিন। বিমুখ করতে সে জানে না, তা নয়। বিমুখ সে করবে না ওকে।

ঘন পদক্ষেপে হাই শু'র কাঠের হিলদুটো মোজাইক-করা মেঝের শব্দিত করে শিপ্রা বালকৃষ্ণকে টেনে নিয়ে যায় করিডোর পার হয়ে। বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

কৃষ্ণ!

ইয়েস।

বড় টেণ্ডার তুমি।

বালকৃষ্ণ হাসে। নরম মিষ্টি হাসি। বাঙলা সে ভালো বলতে পারে না, কিন্তু বেশ বোঝে। শিপ্রা ওর মনের প্রবাহটাকে উচ্ছল করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজী-বাঙলার ককটেইল করে কথার পেয়ালা তুলে ধরে ওর ঠোঁটের কাছে। বালকৃষ্ণ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শিপ্রার মুখপানে। ওকে টেনে নিয়ে শিপ্রা বারান্দার একটা কোণে গিয়ে দাঁড়ায় পাশাপাশি ঘনিয়ে।

বাইরে কৃষ্ণচূড়ার বড় গাছটায় এলোমেলো বাতাস দোল দিয়ে যায়। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দাটার ঝিলমিলি আর রেলিঙের গায়ে। রেলিঙের ওপর একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শিপ্রা গায়ে বুলিয়ে নেয় চাঁদের খানিকটা স্পর্শ।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় জয়ন্তর কথা। গাছপালার অন্তরালে, আলোছায়ার ঘোমটা-ঘেরা, স্বপনপুরীর রূপ-কুমারীর মত জোয়ারদার-ভিলার শাদা পাথর-মোড়া বাংলোটা!···শুধু জয়ন্তকেই যেন মানায় ওই নির্জন বাংলোতে।···কিন্তু জয়ন্ত!

জয়ন্ত কেমন করে বললে সুরেখাদির কাছে? ও যে সবার অলক্ষ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিল তার নির্জন-বাসের আস্তানায়, সে-কথা ভাববার মত বুদ্ধি যে জয়ন্তর ছিল না, তা নয়। হীরের ধারের মত ঝকঝকে বুদ্ধি তার। অনমনীয় ব্যক্তিত্ব! কিন্তু সুরেখার কাছে নিজেকে এমন ছোট করতে এতটুকুও বাধলো না তার? কেমন করে মেনে নিয়েছে এতবড় পরাজয়!···সুরেখা তাহলে জয় করেছে জয়ন্তকে!

ভাবতে ওর ভালো লাগে না। চিন্তার সূত্রগুলোয় কেমন জট পাকিয়ে যায়।···বলেছে! জয়ন্ত বলেছে সব কথা সুরেখাদির কাছে?···ভিজে শাড়ি প'রে বরানগর থেকে ম্যানডেভিলায় ফিরলে, কাল তার নিউ-মোনিয়া হবে, একথা তো জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ শোনেনি ওর মুখ থেকে!

ওর আকস্মিক মৌনতায় বালকৃষ্ণ কেমন অস্বস্তি বোধ করে। একটু ইতস্তত করে বলে—মিস্ শিপ্রা! বাইরে চলবেন?—মেমোরিয়াল ময়দানে?

চলো।

নিমেষে শিপ্রা সচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা হাসির একটু ঝিলিক ছড়িয়ে বলে—জানো? লীনা ডিভোর্স করেছে তার স্বামীকে প্রোফেসর সেনের নেশায়। ওর ধারণা, সেন নিশ্চয়ই বিয়ে করবে ওকে।

তাই? বিস্মিত দৃষ্টিতে বালকৃষ্ণ চেয়ে থাকে।

আবার শিপ্রার মুখে ফুটে ওঠে একফালি হাসি। অদ্ভুত মাধুর্যভরা হাসির দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে চোখ-দুটো। একটু থেমে, বিলম্বিত সুরে বলে—লীনা কি বলে, জানো?

না।

ওই যে শুনলে তখন। বলে—বিভোর কিছু চাইলে, না বলতে পারবে না কোনদিন।

হাউ নাইস অব হার!

তাই নাকি! তাহলে বোঝ তুমি নারীমনের রহস্য?··· কিন্তু কই, তুমি তো কোনদিন চাও না কিছু!···শিপ্রা খিলখিল করে হেসে ওঠে। বালকৃষ্ণের আকস্মিক জড়তাটুকু কাটিয়ে দিয়ে, হাতখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে, মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—চলো, পর্যাপ্ত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মেমোরিয়ালের ময়দানে।

স্পর্শমুগ্ধ আরশুলার মত কৃষ্ণ বেরিয়ে যায় কাঁচ-পোকার পিছু পিছু। তন্বী-শ্যামা-ক্ষীণকটি-সুদর্শনা শিপ্রা নাইলনের হালকা আঁচল কাঁপিয়ে আগে আগে চলে: ইউ আর রিয়ালি সুইট, কৃষ্ণ! বড় সুন্দর তুমি!

চাঁদের আলোয় রবার গাছের অন্ধকার ছায়াগুলো যেন ফিসফিস করে ডাকে।

ওরা রেসকোর্সের দিকে এগিয়ে যায়।

ওদের টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতায় সুরেখা আর শিপ্রা হয়েছে বিজয়িনী। শিপ্রা ও সুরেখার মাঝখানে যে কাঁটাতারের বেড়াটা গড়ে উঠেছিল জয়ন্তকে কেন্দ্র করে, সেটা যেন আবার অলক্ষ্যে শিথিল হয়ে গেল। সুরেখার মনে ঠাঁই না পেলেও শিপ্রার মনে যেন অনেকখানি রেখাপাত করেছিল সেদিনের সেই আকস্মিক উক্তি। অনেক চেষ্টা করেও শিপ্রা আবিষ্কার করতে পারেনি, কেমন করে সুরেখা জেনেছিল ওর নির্জন মুহূর্তের দুর্বলতার কথা!

শনিবার বিকেলে ছোটখাটো পান-ভোজনের পার্টি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো চেরিক্লাবের জলসা ঘরে। কোন-

দিন খরচ যোগাত বিভোর সেন, কোনদিন খাণ্ডেলওয়াল, কোনদিন বা সুরেখা নিজে। চোপরা অনেকবার সুযোগ খুঁজেছে ক্লাবের মৌমাছিদের খুশী করবার। কিন্তু কুইন বী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মিষ্টি একটু হেসে বলেছেন—ধন্যবাদ! সদস্য ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু নেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। চেরিক্লাবের আইন-কানুন মেনে চলতে হয় প্রত্যেক সদস্যকে।

বেশ তো। সদস্য করে নিলেই মিটে যায়! বাধা কি?

বাধা আছে বলেই তো।···চোখে চিন্তার ঘোমটা টেনে দিয়ে সুরেখা দৃষ্টিটা অবনত করেছে।

রাণী মাছির রাজনীতি চোপরা ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু শিপ্রার অসুবিধা হয়নি নিমেষে তার অর্থ অনুধাবন করে নিতে।

চোপরার দিকে তলচোখে একনজর চেয়ে, চোখ দুটো সুরেখার দিকে ফিরিয়ে সে বলেছে: বাধা আর এমন কি, সুরেখাদি?

নামটা প্রোপোজ করবে কে, শুনি?

তুমি।

আমি?···সুরেখা চমকে উঠেছে। ফিকে এক ফালি হাসি দাঁত দিয়ে কেটে বলেছে—কেমন করে সম্ভব?··· পরিচয় তো মাত্র কয়েক মাসের। ক্লাবের নিয়ম হলো—

অন্তত এক বছরের জানাশোনা হওয়া চাই, এই তো!·· কিন্তু সে আইন কি সুরেখা খাণ্ডেলওয়ালের পক্ষেও প্রযোজ্য।

কেন নয়?···সুরেখার কণ্ঠস্বর হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। পর মুহূর্তেই চোপরার দিকে চেয়ে মিষ্টিহাসির বিনুনি পাকিয়ে বলেছে—ওঁর বন্ধুর মনে যদি দাগ পড়ে?···বিচিত্র তো নয় কিছু! পুরুষের মন অরণ্যের চেয়েও দুর্জ্ঞেয়।

তাই, সত্যি তাই সুরেখাদি।

বুকের ভিতরটা চমকে উঠেছে, তবুও হাসিতে ভেঙে পড়বার নিখুঁত অভিনয় করেছে শিপ্রা।

চোপরার চোখদুটো চকচক করে উঠেছে সুরেখার দুর্গম মনের অন্তরালে পায়ে চলার পথরেখা দেখে।··· সত্যি সুরেখা সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর সুরেখার সহজ মন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোপরা দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থেকেছে।

লীলায়িত দেহভঙ্গীর সঙ্গে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে সুরেখা বলেছে—লাকি! তুমি সত্যি লাকি, মিস্টার চোপরা!

নিমেষে চোপরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গিয়েছে।

সদস্যের তালিকায় উঠলো চোপরার নাম। তবে প্রস্তাবটা সুরেখা করেনি, করেছে শিপ্রা। যদিও শিপ্রার সঙ্গে পরিচয় তার ছিল না কোনদিন। সুরেখার সান্নিধ্যে হয়েছে শুধু মুখচেনা।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চোপরা বারবার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিপ্রা তার উত্তরে একটীবার মাত্র ঘাড় হেলিয়ে হেসেছে, কথা বলে নি।

ওর অবস্থাটা চোপরা না বুঝলেও সুরেখা বুঝেছিল। চোপরার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, শিপ্রার দিকে চেয়ে সে বলেছে—দেখলে তো! এক নজরের পরিচয়ও বছরকে ছাপিয়ে যায়, যদি মনের দরজা খোলা থাকে।

মুহূর্তে শিপ্রার মৌনতা ভেঙে গিয়েছে: কি যে বলো, রেখাদি! তোমার জন্যেই তো—

থাক। চলুন মিস্টার চোপরা, শিপারিনকে পৌঁছে দিয়ে যাই ম্যানডেভিলায়।

শিপ্রা রাজী না-থাকলেও, জোর করে সুরেখা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে চোপরার গাড়ীতে। ওর ঝলকানিতে নতুন নেশার আমেজ ধরেছে চোপরার মগজে।

পথে যেতে-যেতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে চোপরা হঠাৎ টাল-খাওয়া বাঙলায় শিপ্রাকে বলে ফেলেছে—আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনি চিনেন না আমাকে।

কেমন করে চিনলেন আপনি?···শিপ্রা চমকে উঠেছে।

সুরেখা খেয়াল করেনি। হয়তো ইচ্ছা করেই অন্য-মনস্ক হয়েছিল গাড়ীখানা স্টার্ট দেওয়ার পরেই।

শিপ্রার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে অজ্ঞাত আশঙ্কায়।···না-জানি কি বলবে চোপরা!···কোথায়, কেমন করে চিনলো সে ওকে?

একটু থেমে, নিজেকে সামলে নিয়ে, অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় দেখেছেন, বলুন তো?

মুচকি হেসে চোপরা ঘাড় কাঁপিয়ে বলেছে—বরানগর বাস-স্ট্যাণ্ডে।···সঙ্গে এক ভদ্দরলোক ছিলেন: ফর্সা—লম্বা।

বরানগর বাস্-স্ট্যাণ্ডে!···আচম্বিতে শিপ্রার বুকের ওপর থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গিয়েছে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তিতে। সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলেছে—বেড়িয়ে ফিরছিলেন বুঝি?···মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল ছিলেন সঙ্গে!

ঠিক।···দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি শিপ্রা। মনের কোণেও ওর ছিল না দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন। নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসে মনটা হালকা করে নিয়ে তাকিয়ে ছিল দূর আকাশের দিকে।···তাহলে জয়ন্ত বলেনি সে-কথা। নিভৃত মুহূর্তে জয়ন্তর সঙ্গে হয়নি সুরেখার মনোবিনিময়। ওরই মুখের কথা শুনেছে সে, বাস্-স্ট্যাণ্ডের পাশ কাটিয়ে যখন ওদের গাড়ীখানা মন্থর গতিতে বেরিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ

পাট ও পীঠ

শ্রী 'প'—

"চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয়-সম্মান উৎসব কমিটি" 'পদ্মশ্রী' ও 'সঙ্গীত নাটক আকাদামী' পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালকগণের সম্মানে সপ্তাহব্যাপী এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ৭ই মার্চ্চ তারিখে সকাল বেলায় 'রাধা' চিত্রগৃহে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান্ ষ্টুডিওতে বেঙ্গল মোশান্ পিক্চার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী দেবিকারাণী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীদেবকী বসু এই চারজন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শ্রীমতী দেবিকারাণী—First lady of the Indian Screen—অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের দেশের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন। তাঁর উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু প্রাণসঞ্চারই করেনি—একে মাধুর্য্যমণ্ডিতও করে তুলেছিল। আমরা 'চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় সম্মান উৎসব' কমিটিকে এই সময়োচিত অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পিগণকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বজনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী নার্গিস উদীয়মান চিত্র তারকা শ্রীসুনীল দত্তর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "মাদার ইণ্ডিয়া" চিত্রে এঁরা দু'জনে মাতা ও সন্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অগ্রগামী পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' চিত্রের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হয়েছিলেন। শ্রীমতী নার্গিস ১৯২৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে ফতিমা রসিদ। তাঁর মাতা যদন বাই ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা। 'তালাশ-ই-হক' চিত্রে শ্রীমতী নার্গিস পাঁচ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন। শ্রীসুনীল দত্তর প্রকৃত নাম হচ্ছে বলরাজ। ইনি ১৯৩০ সালে পাঞ্জাবের ঝিলাম্ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রেডিও সিলন-এর ঘোষক রূপে ও পরে "রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম" চিত্রে অভিনয় করে ইনি খ্যাতিলাভ করেন।

* * * *

আর একটি বিবাহের খবর হচ্ছে—বিখ্যাত গায়ক শ্রীএ, কানন ও সুগায়িকা শ্রীমতী মালবিকা রায়-এর বিবাহ অনুষ্ঠান গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সঙ্গীত জগতের বহু শিল্পী সমাবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

* * * *

প্রযোজক পরিচালক শ্রীবিমল রায় তাঁর "মধুমতী" চিত্রের কাজ বেশ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একটি উৎসব নৃত্য ও একটি সাঁওতাল নৃত্যের চিত্র ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। চিত্রটিতে তিনটি নৃত্য দৃশ্য থাকবে এবং তিনজন নৃত্য পরিচালক—সচিনশঙ্কর, সত্যনারায়ণ ও সোহনলাল—এই নৃত্য দৃশ্যগুলি পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালিত করবেন, আর চিত্রটিতে গান থাকবে দশটি। কুমায়ুন পাহাড়ের দৃশ্যাবলীর মধ্যে এখন এর চিত্রগ্রহণ চলছে। এতে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, জনিওয়াকার প্রভৃতি।

* * * *

কাঁচা ফিল্ম ও ফটোগ্রাফির অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য একটি 'প্ল্যান্ট' শীঘ্রই ভারতে নির্ম্মিত হবে বলে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে একটি বৈদেশিক দল এ দেশে আসছেন এবং দক্ষিণ ভারতের শৈলনিবাস উটাকামণ্ড-এর নিকট একটি স্থান এই 'প্ল্যান্ট' নির্ম্মাণের পক্ষে উপযোগী হতে পারে বলে জানা গেছে।

* * * *

নিউইয়র্ক-এর চলচ্চিত্র সমালোচকগণ "The Bridge on the River Kwai" চিত্রটিকে ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে নির্বাচিত করেছেন। এই সমালোচকগণ অভিনেত্রী Deborah Kerrকে "Heaven Knows, Mr. Allison" এই চিত্রে Sister Angela-র ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে নির্ব্বাচিত করেছেন। আর ফরাসী ছবি "Gervaise" শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের সম্মান পেয়েছে।

* * * *

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা সিনেমা দেখার অভ্যাস ক্রমশই কমিয়ে ফেলছে বলে জানা গেছে। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা মাত্র পনের জন লোক সপ্তাহে একদিন করে সিনেমা দেখে থাকেন। ওখানকার সিনেমা সম্বন্ধে দর্শকগণকে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং তার উত্তরে বেশির ভাগ দর্শকরা জানিয়েছেন যে টেলিভিসনের আকর্ষণ তাঁদের গৃহে আটকে রাখে বলে তাঁরা আজকাল কম সিনেমা দেখে থাকেন। শতকরা মাত্র চারজন জানিয়েছেন যে তাঁরা খরচ কুলিয়ে উঠতে পারেন না বলে কম সিনেমা দেখছেন, আর শতকরা তিনজন জানিয়েছেন যে তাঁরা মনে করেন এখনকার চিত্রগুলি আগেকার তুলনায় নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং সেজন্য তাঁরা আজকাল আর তত সিনেমা দেখার পক্ষপাতি নন। চিত্র নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ওখানকার দর্শকরা জানিয়েছেন যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উপরই তারা বেশী নির্ভর করেন। তবে আগত চিত্রের 'ট্রেলার' ও টেলিভিসনে চিত্রের বিজ্ঞাপনও তাঁদের চিত্র নির্ব্বাচনে সাহায্য করে।

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে...

সন্তোষকুমার দে

বড়াল বাড়ির খ্যাতি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতে—শুধু বড়ো বাড়ি বলে নয়, বড়ো বড়ো মানুষের গতিবিধি-ও অবস্থিতির জন্যই এই ভারত জোড়া খ্যাতি। সারা ভারতের সেরা গুণী গায়ক ওস্তাদ বাদ্যী সবাই আসেন যান, কলকাতায় এসেছেন অথচ বড়াল বাড়ি আসেন নি—এমন ঘটনা ঘটে না কোনো ওস্তাদের ভাগ্যে। লালচাঁদ বড়াল নিজেই ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী গায়ক; তার চেয়েও মহৎ গুণ ছিল তাঁর—প্রকৃত গুণী ব্যক্তির সমাদরে তিনি

ছিলেন মুক্তহস্ত। আজও বড়াল বাড়ির চিত্রশালায় ভারতীয় সঙ্গীত-সাধকদের যে সব দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র আছে সমগ্র ভারতের খুব কম সংগ্রহে তা পাওয়া যায়।

এই সুপ্রাচীন সংগীত সাধক বংশের ঐতিহ্যপুষ্ট আর এক বিরাট পুরুষ—রাইচাঁদ। ভারতের সেরা চিত্র-গায়কদের শিক্ষাগুরু হিসেবে যে মানুষটি সমগ্র বাঙালীর মুখ উজ্জল করেছিলেন তিনি এই রাইচাঁদ। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ নব নব শিল্পী সৃজনে। তাঁর শিষ্য শিষ্যারা এক একজন দিকপাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি কুন্দনলাল সাইগলের নাম। সাইগলকে তিনিই জনসমাজে পরিচিত করিয়ে ছিলেন।

বড়াল বাড়ির আসরে বহু গুণী ব্যক্তির আসা যাওয়া ছিল। তাদের মধ্যে একজন সন্ধান দিলেন জলন্ধারের এক তরুণ ঠাকুরের—কলকাতার একটি টাইপরাইটার কোম্পানীর সেল্‌সম্যান সে। চমৎকার ভরাট দরাজ গলা ছেলেটির। রাইবাবু বললেন—নিয়ে আসুন, শোনা যাক্।

গান ভালোই গায় বলতে হবে, কিন্তু তালিম দরকার, ওস্তাদি গানে সহবৎ দরকার।

নিউ থিয়েটার্স নিয়ে গেলেন রাইচাঁদ, কিন্তু কোন পরিচালক পছন্দ করলেন না ছেলেটিকে। চেহারায় এমন কিছু নেই যাতে কেউ লুফে নেবে। একমাত্র সম্বল গলা। তা গলাটি মিষ্টি বটে। কিন্তু বাংলা বলতে যে পারে না, উচ্চারণে জড়তা থাকতে তাকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়াতে রাজি হয় না কেউ।

সাইড-রোলের সামান্য কাজ জোটানো গেল নেহাৎ রাইচাঁদের খাতিরে। টাইপরাইটার বিক্রি ছেড়ে সে ষ্টুডিওতে এসে ভিড়ল।

তখন বড়ুয়া 'দেবদাস' তুলছেন। গানে সুর দিচ্ছেন রাইচাঁদ। একদিন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-তে তিনি এক-মনে বসে গানে সুর দিচ্ছেন। ক্রমে রাত হয়ে এলো। পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি সহকর্মীরা যে-যার ঘরে গেলেন, রাই-বাবু তখনও উঠছেন না। তাঁর মনে তখন সুর আসছে—তিনি সুর তুলছেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি।"

চন্দ্রমুখীর আসরে দেবদাস ও তার বন্ধু গিয়েছে; সেখানে এই গানটি গাইবে দেবদাসের বন্ধু। গানটিতে সুর বসিয়ে রাইচাঁদ ভাবছেন—কাকে শোনাই, কেউ তো কাছে নেই, সবাই চলে গেছে!

যখন তিনি এমন ইতস্ততঃ কাউকে খুঁজছেন সেই মহা-মুহূর্তে সেখানে বিধিনির্বন্ধে হাজির হলেন জলান্ধারের সেই যুবকটি—কুন্দনলাল সাইগল। বাংলা বুলি তখনও তার মুখে রপ্ত হয়নি।

রাইচাঁদ বল্লেন—আমি হয়ত সুরটা ভুলে যাবো ভায়া, তুমি শিখে নাও, কাল সকালে ষ্টুডিওতে এসে তুমি শোনাবে।

সাইগল গাইলেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে…। একবার নয়, বার বার, গানটিতে তার অধিকার এলো।

পরদিন পঙ্কজবাবু রাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবদাসের' কোনও গানে সুর দেওয়া হল কিনা।

রাইচাঁদ সাইগলকে দিয়ে গাইয়ে শোনালেন "গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে…"

উচ্চারণ তখনও অশুদ্ধ, কিন্তু সুরলালিত্য তো অস্বীকার করা যায় না। পঙ্কজবাবু কানে কানে বললেন—খাসা গেয়েছে কিন্তু!

কিন্তু বড়ুয়া প্রথমে বেঁকে বসলেন—তিনি চান—পঙ্কজবাবু গাইবেন গানটা। পঙ্কজবাবু নিজে বিপরীত রায় দিয়ে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বীরেন সরকার মশাইএর মধ্যস্থতায় মিটে গেল। আরো তালিম দিয়ে সাইগলই নির্ভুলভাবে ছবিতে গানটি গাইলেন—"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে…"

"দেবদাস" ছবিটি 'হিট' করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে 'হিট' করল সাইগলের গলায় বাংলা গান, লোকে কাড়াকাড়ি করে ছবি দেখে, রেকর্ড কেনে। সোজাকথা সাইগল আর 'সাই' (Shy) রইল না, তার দরদভরা কণ্ঠে এর পর অনেক মধুবর্ষণ করেছে এবং প্রায় সর্বত্রই রাইচাঁদের সুর। রাইচাঁদের অনন্য করণীয় সুর সৃষ্টির সঙ্গে সাইগলের মোহময় কণ্ঠমাধুর্যে কত গোলাপই না ফুটে উঠেছিল!

আজ সাইগল নেই, রাইচাঁদ আছেন। বাঙালীর বহুভাগ্য—তিনি এখনও সমান উৎসাহে সৃষ্টি করে চলেছেন নিত্য নব সুরব্যঞ্জনা। ভগবান তাঁকে নীরোগ দীর্ঘজীবন দিন—যাতে তিনি আরো বহুদিন 'সুরভারতীর সাধনা করতে পারেন।

—সতের—

"I cried for madder music and for
stronger wine.
But when the feast is finished and the
lamps expire.
Then falls thy shadow. Cynara—"

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে। ভিলেঁ। নয়—ডাউসন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের জীবনে কি কোনোদিন এসেছিল সাইনারা? সত্যজিতের জানা নেই! মত্ততর সঙ্গীত আর তীব্রতর সুরার উৎসবে—ছুটি চুম্বনবিহ্বল ওষ্ঠের মাঝখানে কোনোদিন কি কারো অপচ্ছায়া নেমেছিল? আদর্শ ভালো ছেলে ইন্দ্রজিৎ যা কোনদিন পায়নি—আজকে বিকৃত বুদ্ধি আর বিশৃঙ্খল চেতনা নিয়ে সেই অবদমনেরই দরজা সে খুলে দিয়েছে। নিজের ওপরে আজ তার শাসন নেই, তাই শিবশঙ্করের রক্ত কথা কইছে তার মধ্যে।

উত্তরাধিকার!

কয়েক মিনিটের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে সত্যজিৎ আবার সামনের কাগজগুলোর মধ্যে চোখ নামালো। সকালে বনশ্রী ফোন করেছিল। একটু পরেই রীতেন আসবে—নোট বইটার যতটা লেখা হয়েছে সে যেন রীতেনের হাতে পাঠিয়ে দেয়। আরো জানতে চেয়েছিল, আজ রবিবার—বিকেলে একবার তার আসবার সময় হবে কিনা। সত্যজিৎ বলেছিল, না। বনশ্রী রাগ করল কিনা কে জানে, টেলিফোনে মুখ দেখতে পাওয়া যায়না।

ব্যবসায়িক সম্পর্কই থাক।

"And I am desolate and sick of an old passion"—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনটা বার বার আবৃত্তি করছে ইন্দ্রজিৎ—একটা 'ফিক্সেশন'-এর মতো ওটা যেন তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। কিন্তু বনশ্রী সম্বন্ধে সত্যজিতের "old passion"-এর শিখা আর জ্বলবেনা। তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো উৎসাহ আর অবশিষ্ট নেই—বনশ্রীরও কি আছে? এখন স্মৃতি কেবল খানিকটা অস্বস্তি বয়ে আনে। দেওয়ালের গায়ে সেই পুরোনো হরিণের সিং, সেই বুড়ো ওয়ালক্লকটা, হলদে হয়ে আসা সেই বহু চেনা ছবিগুলো এখন কেবল সাময়িক বিভ্রান্তি জাগায়—একটা অর্থহীন পিছুটানে মনকে ক্লান্ত করে তোলে। ওই বাড়ীটা থেকে দূরে থাকাই ভালো। এখন হীরেনের ওখানে দেখা হওয়াই সব চাইতে নিরাপদ। দেওয়ালে ছারপোকার রক্তচিহ্ন, দড়িতে ঝোলানো ময়লা গেঞ্জী আর রং-চটা লুঙ্গি, একঠোঙা জিলিপি আর ঠাণ্ডা হয়ে আসা ধুতরোর মতো গন্ধওলা কালো রঙের চা—এরই মধ্যে বসে বনশ্রীর সঙ্গে সে স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতেপারে। রেট—কর্মা—পার্সেন্টেজ রয়ালটি—

বীথি এল।

—আমার এই লেখাটা একটু দেখে দেবে ছোড়দা?

—কী লিখেছিস? সাবস্ট্যান্স না এসে?—বনশ্রীর একটা দীর্ঘ প্যারাগ্রাফকে সংক্ষিপ্ত করতে করতে চোখ না তুলেই সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করল।

—খালি মাস্টারি ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসেনা ছোড়দা?

ব্লটিং প্যাডের ওপর কলমটা ঝেড়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, কী করে মনে আসবে? বি-এ পড়ছিস, তবু লিখবি টু পেয়ারস্ অব আইজ্—

—আমরা তো আর ইংরেজির প্রোফেসার হতে যাচ্ছি না—ভাবপ্রকাশ করতে পারলেই হল। আর দিক্‌পাল প্রফেসাররাই সবাই বুঝি নির্ভুল লেখে? নামের আগে ডক্টর লিখে পরে যখন পি এইচ্-ডি লেখে তখন সেটা বুঝি শুদ্ধ ইংরেজি হয় দাদা? নাকি ওকে আর্য প্রয়োগ বলে?

পাকামো করতে হবে না তোকে—সত্যজিৎ হেসে ফেলল: এখন কাজ করছি, পরে আসিস। দেখে দেব সাবস্ট্যান্স্।

—সাবস্ট্যান্‌স্‌ নয়—একটা অ্যাপীল। ঠিক করে দাও না একটু। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

—আচ্ছা ঠিক আধঘণ্টা পরে আসিস। এটা এক্ষুণি না দেখে রাখলেই নয়। রীতেন নিতে আসবে ন'টার পর।

—ওঃ—রীতেন বাবু।—মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বনশ্রী বললে, তোমাকে ডিস্‌টার্ব করতে চাইনা ছোট্‌দা—কিন্তু একটা কথা বোধ হয় বলা দরকার। রীতেনবাবুর সঙ্গে দিদির মেলামেশা বোধ হয় একটু কনট্রোল করা দরকার।

পরশু সন্ধ্যায় রীতেনের সঙ্গে প্রীতিকে ট্যাক্সি করে গড়ের মাঠের দিকে যেতে দেখার পর থেকেই এই কথাটা সত্যজিৎকেও পীড়ন করছিল। সেদিন যখন প্রোগ্রাম হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্রীতি বাড়ীতে ফিরল, সেদিন প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে পারেনি—কেমন একটা সংকোচ এসে বাধা দিলে। আজ বীথি আবার সেইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বীথির সামনে জিনিসটা সে হালকা করে দিতে চাইল। মুখার্জি ভিলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-সাপেরা এসে বাসা বেঁধেছে তাদের কাছ থেকে বীথি দূরেই থাক। এই বাড়ীতে ও-ই সব চাইতে সতেজ, সব চেয়ে সুস্থ—ওরই কপালে সূর্যের আলো পড়েছে। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বীথি যখন বক্তৃতা করছিল, তখনই সে আলোটা দেখতে পেয়েছে সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ হাসল।

—তুই তো প্রোগ্রেসিভ। এ সব ব্যাপারে তোর এমন ছোঁয়াচে ভাব কেন?

—প্রোগ্রেসিভ্‌ কথাটার অন্য মানে আছে ছোট্‌দা। রীতেনবাবু—মানে, লোকটা এক নম্বরের বাঁদর।

—টু স্ট্রং ল্যাংগুয়েজ।—সত্যজিৎ হাসতে চেষ্টা করল: তা ছাড়া প্রীতি ছেলেমানুষ নয়। নিজের ভালোমন্দ সে বোঝে।

—না ছোট্‌দা—বোঝে না। গান ছাড়া আর কিছুই ও বুঝতে পারে না। একটু স্টেপ নেওয়া উচিত বোধ হয়।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই এখন যা দেখি, আমাকে হাতের কাজটা শেষ করতে দে।

বীথি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথা বোধ হয় তার শেষ হয়নি। খুব সম্ভব আরো কিছু বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু বীথি থাক। এ-সবের মধ্যে ওর আসবার দরকার নেই। মুখার্জি ভিলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাপেরা বাসা বেঁধেছে, কিন্তু এরই মধ্যে একটি ফুলের মত ফুটেছে বীথি। ও ওর মতো করেই থাকুক—এখানকার কোনো গ্লানি যেন ওকে স্পর্শ না করে।

সংশয় সত্যজিতের নিজের।

বাইরে আলোর খবর সেও যে জানে না তা-নয়। যখন কলেজে পড়ত, তখন অনেক শোভাযাত্রার ডাকেও আগে আগে চলতে হয়েছে, আকাশে মুঠো তুলে ধরে সে-ও গর্জন করেছে নতুন জীবনের শ্লোগ্যান। তারপর চাকরি হল কলেজে। তখন মনে হল, পুরোনো ধরনের মহাজন পথ দিয়ে সে চলবে না। নতুন কথা বলবে, নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করবে সাহিত্যকে—ম্যাথু আর্নল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নয়—রোম্যান্টিক্‌ আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য—শ্রমিকের সংগ্রামে শেলী-কীটস্‌—বায়রনের আসল ভূমিকা সে এনে ধরবে ছাত্র ছাত্রীর সামনে।

কিন্তু।

কিন্তু আশ্চর্য একটা নিয়ম আছে জীবনের। ঠিক মিবে আসে সমস্ত। আকাশ পৃথিবী-সমাজ—সব কিছু মিলে যেন একটা বিরাট পাকস্থলী। নিঃশব্দে জীর্ণ করে নিচ্ছে সব। সকলকেই। কেউ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়—কারো দেরি হয় একটু। এর বেশি কোন তফাৎ নেই।

পেসিমিজম্‌? হয়তো তাই। এই ফুলটাই পেসিমি-জমের। পৌরানিক গল্পের অভিশপ্ত আত্মা। একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলছে পাহাড়ের চূড়োয়। কিন্তু পাথরটা সেখানে দাঁড়াবেনা—গড়িয়ে নেবে আসবে আবার ঠেলে তুলতে হবে। এই চলছে, এ-ই চলবে। সব স্বপ্ন, সব চেষ্টা, সব দর্শনের এই-ই পরিণাম।

কিন্তু এ-সব কী ভাবছে সত্যজিৎ? এ তার নিজের কথা নয়। তার মধ্যে লুকোনো মুখার্জি ভিলার আত্মার কণ্ঠস্বর শুনছে সে। যে আত্মা ক্লান্ত, যে আত্মা নিজের জীর্ণতার ভার আর বইতে পারছে না, এই বাড়ীর ঘরে ঘরে জমানো ছায়ার আর বারান্দার অর্কিডের কাঁপা কাঁপা কঙ্কাল আঙুলে যে আত্মার অন্তিম আর্তি।

যে ফুরিয়ে গেছে, সে নিশ্চিন্ত; যে বাঁচতে চলেছে তার পথ পুবের দিকে। একজন নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে তিল-তিল করে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, আর এক-জনের আকাশ আশায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্য-জিতের মতো যারা দাঁড়িয়ে আছে সীমান্ত রেখায়—যাদের দিনের আকর্ষণ আছে অথচ রাত্রির মোহ কাটেনি—তারাই সব চেয়ে বিপন্ন। আজ পৃথিবীতে কেবল সত্যজিৎ নয়—তার মতো অসংখ্য মানুষ এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছে। মোহ ভেঙেছে অথচ বিশ্বাস আসেনি, অথবা বিশ্বাস করতে গিয়েও জোর পাচ্ছে না।

ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে একা সত্যজিৎ নয়—তার মতো অগণিত বুদ্ধিজীবী। এ যুগ তাদেরই।

সিঁড়ির নিচের ঘড়িটায় বিকৃত শব্দ করে ন'টা বাজল। সর্বনাশ—কী হচ্ছে সত্যজিতের। এখনই যে রীতেন আসবে!

সত্যজিৎ লেখায় চোখ নামালো। অন্তত আরো চার পাঁচটা পাতা দেখে দেওয়া দরকার।

রীতেন এল আধঘন্টা পরে।

রঘুর কাছ থেকে খবর পেয়ে সত্যজিৎ কাগজপত্র গুছিয়ে নিচে নামল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সিঁড়িতেই বীথির সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়েছিল চুপ করে।

—ভাখো গে যাও। দিদিকে মুগ্ধ করবার জন্যে রীতেনবাবু—

সত্যজিৎ ধমক দিয়ে বললে, তোকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না—নিজের কাজে যা।

বীথির মুখ লাল হয়ে উঠল।

—মিথ্যেই আমায় গাল দিলে ছোট্‌দা। ভালো কথাই বলতে চেয়েছিলুম।—বীথি সশব্দে ওপরে উঠে গেল।

নিচের ঘরে প্রীতি তেমনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে—হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে রীতেন।

—ড্যানি কে—হ্যাড্‌ন্ট ইউ সীন ড্যানি কে? আহ—হি ইজ সামৃথিং—

সত্যজিৎ ঘরে পা দিলে। রীতেন থামল।

একটা শক্ত কথা মুখে এসেছিল, সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করলে। তারপর রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, দাড়ি কামিয়েছ নাকি হে?

রীতেন লজ্জা পেলো।

—ইয়ে, মানে সত্যদা—একটু বোধ হয় কমিক্যাল দেখাচ্ছিল—

—বেটার লেট্‌ দ্যান নেভার রীতেন—সত্যজিৎ কঠিন ভঙ্গিতে হাসল: কিন্তু কেবল দাড়ি নয়, তোমার আরো অনেক কিছুই কমিক্যাল। যাই হোক—এখন আর ড্যানি কে-র মহিমা বর্ণনা করতে হবে না—এই লেখাটা নিয়ে চটপট চলে যাও। বেলা দশটার মধ্যে প্রেসে পাঠাতে হবে। বনশ্রী বলেছে, এরই জন্যে আজ প্রেস খোলা থাকবে।

রীতেনের মুখ কালো হয়ে উঠল! শুধু তাড়াতাড়ি লেখাটা নিয়ে যেতে বলাই নয়—সত্যজিতের কথার মধ্যে আরো একটা ইঙ্গিত আছে।

রীতেন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। মুখের রক্ত শাদা হয়ে আবার কালো হল। তারপর জোর করে হেসে বললে, অল্‌ রাইট সত্যদা, আমি যাচ্ছি।

লেখাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল রীতেন, যাওয়ার আগে পেছন ফিরে আর তাকালো না। মিনিট খানিকের মধ্যেই বাইরে কট্‌ কট্‌ করে আওয়াজ উঠল—মোব ট্রটার রীতেন দি গ্রেটের মোটর সাইকেলটা নেমে গেল রাস্তায়।

সত্যজিৎ আবার ফিরে চলল সিঁড়ির দিকে। প্রীতি বসে ছিল চুপ করে। সত্যজিতের কথার অর্থ বুঝেছে কি না কে জানে—কিন্তু প্রীতির মুখের দিকে একবার সে তাকিয়েও দেখল না।

মা এসে বললেন, কোথায় বেরুচ্ছিস?

দেওয়ালের পেরেক থেকে পুরোনো চামড়ার ব্যাগটা নামাচ্ছিল পূরবী। বললে, টিউশনিতে।

—আজ রবিবারে আবার কিসের টিউশনি?

—সামনে পরীক্ষা আছে মা। বিশেষ করে যেতে বলেছে।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, বিশেষ করে যেতে বললেই যেতে হবে? অত বড় লোক, হপ্তায় পাঁচদিন করে যেতে হয়, অথচ মাইনে দেবে মোটে কুড়ি টাকা। যেতে হবে না আজ।

পূরবী হাসল, জবাব দিলনা। ব্যাগটা হাতড়ে পরীক্ষা করতে লাগল, ট্রামে যাওয়ার খুচরো পয়সা আছে কিনা।

—এত কষ্ট করে এ ভাবে তোকে আর পড়তে হবে না। উনি একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছেন।—মা উল্লসিত গলায় বললেন, ছেলেটি এবার এম কম পাস করেছে। বাপের ব্যবসা আছে, অবস্থা ভালো। বলেছে মেয়ে পছন্দ হলে টাকা পয়সা—

পূরবী বিরক্তিতে জলে উঠল হঠাৎ।

—কী বকছ মা পাগলের মতো?

মা বললেন, পাগলের মতো আবার কী হল? ভালো ছেলে—

—চুলোয় যাক ভালো ছেলে। সরো, আমি বেরুব—

কিন্তু মুখ ফিরিয়েই পূরবী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দোর গোড়ায় সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বললে, ওভারহিয়ার করে ফেলেছি। কিন্তু কাকিমার প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবার মতো।

হাতের ব্যাগটা সামনের টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পূরবী পাশের ঘরে পালিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তানঃ ৩২৮ (ইমতিয়াজ আমেদ ১২২, মেথিয়াস ৭৭, সৈয়দ আমেদ ৫২। এ্যাটকিনসন ৪২ রানে ৫ উইকেট) ও ২৮৮ (ওয়াজির মহম্মদ ১০৬, কারদার ৫৭)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৭৯০ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাণ্ট ২৬০, সোবার্স নট আউট ৩৬৫, ওয়ালকট নট-আউট ৮৮)

কিংষ্টোনে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে।

খেলার ২য় দিনে লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভের কিছু পরেই পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩২৮ রানে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের খেলায় ১ উইকেটে ১৪৭ রান করে। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য ফাষ্ট বোলার মামুদ হোসন মাত্র ৫টা বল করার পরই উরুর মাংস পেশী সঙ্কোচনের দরুণ মাঠ থেকে বরাবরের জন্যে বিদায় নেন্। পাকিস্তানের অধিনায়ক এবং স্পিন ব্যাটা বোলার কারদার ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন এবং সে অবস্থাতেই ৩য় দিন ২২ ওভার বল দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রধানতঃ ফজল মামুদ, খান মহম্মদ এবং ১৬ বছরের তরুণ লেগ স্পিন বোলার নাসিমুল গণির উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল পাকিস্তানের এই দুর্বলতার যথেষ্ট সুযোগ নিয়ে মনের সুখে খেলেছিল।

খেলায় ৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপুল ৫০৪ রান ওঠে, এক উইকেট পড়ে। সি হাণ্ট এবং গারফিল্ড সোবার্স ২য় উইকেটের জুটিতে ৪১৭ ক'রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ২য় উইকেটের জুটিতে নতুন টেষ্ট রেকর্ড করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ২৯৫ রান। হাণ্ট (২৪২ রান) এবং সোবার্স (২২৮ রান) নট আউট থাকেন।

খেলার ৪র্থ দিনে ৩ উইকেটে ৭৯০ রান উঠলে পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটা খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স নট আউট ৩৬৫ রান ক'রে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক রানের বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল লেন হাটনের ৩৬৪ রান। ইংলণ্ডের লেন হাটন ১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ৩৬৪ রান করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

কোনার্ড হাণ্ট এবং গারফিল্ড সোবার্স ২য় উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রান করেন। তাঁরা প্রায় আর একটি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন।

২য় উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড হ'ল ব্রাডম্যান এবং পোন্সফোর্ডের জুটিতে ৪৫১ রান; সুতরাং বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে মাত্র ৫ রান বাকি ছিল। ওপনিং ব্যাটসম্যান হাণ্ট ২৬০ রানে রান আউট হ'লে প্রায় রগ ঘেঁসেই হাণ্ট এবং সোবার্স লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ন।

সোবার্স নিজস্ব ৩৬৪ রানের মাথায় ফজল মামুদের বলে একরান নেন এবং ৩৬৫ রান ক'রে বিশ্ব রেকর্ড করেন। শেষ পর্য্যন্ত সোবার্স নট আউট থেকে যান। এই ৩৬৫ রান তুলতে সোবার্সকে ১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট ব্যাট করতে হয়েছিল। অপর দিকে হাটন ৩৬৪ রান করতে ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন।

খেলার ৫ম দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে ৪৬২ রানের ব্যবধানে থেকে পাকিস্তান ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৭৩ করে। ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেতে তখনও তাদের ১৮৯ রানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২৮৮ রানে শেষ হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ ইনিংস ও ১৭৪ রানে জয়ী হয়। মামুদ হোসেন এবং নসীমুল গনি আহত থাকায় ব্যাট করেন নি।

পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ১ম টেষ্ট ড্র গেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ও ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়েছে। এখনও ৪র্থ ও ৫ম টেষ্ট খেলা বাকি। এ অবস্থায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেষ্ট সিরিজে হার স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং তাদের জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পোর্ট এলিজাবেথে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে পরাজিত করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে ১ম ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ২১৪ রান ওঠে। ঐ দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করার সময় ছিল না।

২য় দিন ৬ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ২০৮ রান ওঠে। ৩য় দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৯১ রানে শেষ হয়। ৪র্থ দিন চা-পানের কিছুক্ষণ পরেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংস মাত্র ১৪৪ রানে শেষ হয়। ২য় ইনিংসে ২ উইকেট পড়ে ৬৮ রান উঠলে পর অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ২১৪ (টেফিল্ড ৬৬ ; ক্লিন ৩৩ রানে ৪ এবং ডেভিডসন ৪৪ রানে ৪ উইকেট পান) ও ১৪৪ (ডেভিডসন ৩৮ রানে ৫ এবং বেনড ৮৪ রানে ৫ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়া : ২৯১ (ম্যাক্‌কে ৭৭ নট আউট ; ম্যাকডোনাল্ড ৫৮) ও ৬৮ (২ উইকেটে।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

১৯৫৭ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী হায়দ্রাবাদ ৩—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে 'সন্তোষ ট্রফি' লাভ করেছে। ১৯৫৭ সালের প্রতিযোগিতা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদ সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ২—১ গোলে বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে। সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দল সার্ভিসেস ও বাংলা দলের মধ্যে যে খেলা হয় সে খেলায় সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত ক'রে সাম্পাজী কাপ জয়ী হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল ৮ বার, বোম্বাইদল ১ বার এবং হায়দ্রাবাদদল ২ বার সন্তোষ ট্রফি জয় লাভ করেছে।

ইস্টইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন

চ্যাম্পিয়ানসীপস ঃ

রঞ্জি স্টেডিয়ামের 'ইনডোর স্টেডিয়ামে' অনুষ্ঠিত ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : তান ওয়াই হক্ (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১০, ১৫—৯ পয়েণ্টে এডিট ইসুফকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : গজানন হেমাড়া এবং বিক্রম ভাট (বাংলা) ১৫—১১, ১৫—৯ পয়েণ্টে অমৃতলাল দেওয়ান এবং শামসেদ আলীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : অমৃতলাল দেওয়ান এবং মিস এম সুইনী ১৫—৫, ১৫—৪ পয়েণ্টে বিক্রম ভাট এবং মিস এইচ সুইনীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিসেস নীলিমা ভিক্ ১১-২, ১২-১০ পয়েণ্টে মিসেস মীরা দাসকে পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইনালে বাংলা ১০ উইকেটে হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল : **বাংলা ঃ** ৩১০ (আর সান্ন্যাল ৭৩, পি রায় ৫৩) ও ৪ (কোন উইকেট না পড়ে)

হায়দ্রাবাদ ঃ ১২২ (ফাদকার ৩৩ রানে ৩ এবং কে মিত্র ১৯ রানে ৩ উইকেট পান) ও ১৮৮ (ফাদকার ৭৭ রানে ৫, এস বসু ১৯ রানে ৩ উইকেট পান)

আগা খান হকি ঃ

আগা খান হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে বোম্বাইয়ের বার্মা-শেল স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ক্লাবকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারে নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

অনিবার্য্যকারণে এই সংখ্যায় শ্রীবিমল মিত্রের পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত গল্পটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না —আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।
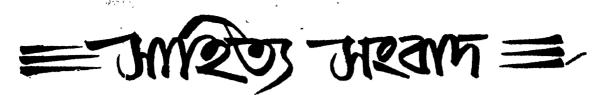
—ভাঃ সঃ

বিপ্রদাস (নাটক) : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নাট্যরূপ - বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

'বিপ্রদাস' শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ অথবা সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংঘাত আলোচ্য কাহিনীর উপজীব্য নয়। মানব মনের সূক্ষ্ম ঘাত প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংঘাত এই উপন্যাসের নাটকীয় উপাদান জুগিয়েছে। কিন্তু যে বিরোধ ঘটনাশ্রেয়ী নয়—তার প্রক্রিয়া মনের গভীরে। সেইজন্যেই 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের নাট্যরূপকর্মে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। যদিও এর কাহিনী খুবই সুসম্বদ্ধ এবং ঋজু, তবুও নাটকের 'ক্লাইমাক্স' বা চরম মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দয়াময়ীর বিচার বিবেচনাহীন রূঢ় আচরণে বিপ্রদাস যখন গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন, এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, একমাত্র শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সংলাপের সাহায্য ছাড়া নাট্যকাহিনীকে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক করে উপস্থাপিত করবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেননি নাট্যরূপদাতা। তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে উৎকৃষ্ট নাটকে পরিণত করাবার প্রয়াসে তার মূল সুর ও কাঠামোকে যে তিনি ক্ষুণ্ণ করেননি—এইজন্য নাট্যরূপদাতা বিধায়ক ভট্টাচার্য্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কারণ আলোচ্য নাটকে নাটকীয় চমৎকারিতার পরিচয় না মিললেও শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'কে চিনে নিতে কোথাও কষ্ট হয়না। মূল রচনার স্বাদকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশন করাও সামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

[প্রকাশক :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১৷৷• টাকা]

মন্মথ রায়

শিশুর জীবন ও শিক্ষা : অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য লণ্ডনের মন্টেসরি ট্রেনিং প্রাপ্ত, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষা বিষয়ে বহু গ্রন্থপ্রণেতা। আমাদের দেশে সম্প্রতি কতকগুলি নার্সারী স্কুল স্থাপিত হইলেও শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তক নাই বলিলেই হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়—কিন্তু তাহার পূর্বে প্রাক্ বুনিয়াদি শিক্ষারও প্রয়োজন আছে—সে জন্য ৩ হইতে ৫ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাক্-বুনিয়াদি বা নার্সারী বিদ্যালয় আজ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

মেরিয়া মন্তেসরীর জীবন বৈচিত্র্যময়। ইনি ইতালীর একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং এই সময়ে ক্ষীণ-মেধা শিশুদের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সম্পর্কে তাঁর গবেষণার সুযোগ জোটে। পরে সেই গবেষণা সার্থক হয়ে উঠলো এবং ক্ষীণ-মেধাদের সাহায্যের জন্য তিনি যে নীতির নির্দেশ দিলেন, তা সাধারণ শিশুদের প্রকৃষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হল। তিনি শিশুনিকেতন গড়ে তুললেন, তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে।

শিশুর প্রতি দরদী দৃষ্টি মন্তেসারী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, তাই শিশুর স্বাধীন প্রকাশ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। * * আনন্দ ও খেলার মধ্য দিয়ে নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান। শিশুকে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছেন এই মহামনীষী ও তাঁর অন্তরের প্রবৃত্তি, রুচি ও ব্যক্তিত্বকে যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে গতানুগতিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সে দিক দিয়ে মন্তেসরীর দান অসামান্য। অসহায় শিশুর পরিত্রাণ ঘটেছে, তাঁরই মত দরদী শিক্ষাব্রতীদের প্রবর্তিত নূতন শিক্ষার কল্যাণে।

লেখক এই গ্রন্থে নূতন পদ্ধতি জানাবার ব্যবস্থা করেছেন; শিক্ষিত পিতামাতা ও শিক্ষকবৃন্দ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। সে জন্য আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক :—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ৪ টাকা ১২ আনা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক বিন্দু : নিখিল সুর

ছোট একটি একষট্টি পাতার বই। গল্প উপন্যাসও নয়, নাটক কবিতার বইও নয়। শাস্ত্র তত্ত্বমূলক একখানি ছোট্ট বই। বইখানির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল এবং বিতর্কমূলক। আচার্য শংকর রচিত দশাবতার যে মানব জীবনের দশটি স্তর ভিন্ন অন্য কিছু নয়। লেখক নানা যুক্তির অবতারণা করে সেইটাই প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন। লেখক চিন্তাশীল সন্দেহ নাই। তিনি আপন চিন্তা ও জ্ঞানের ওপরে যে যুক্তির ইমারত খাড়া করেছেন তাকে এক কথায় নস্যাৎ করাও যায় না।

বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষা চমৎকার। এমন একটি জটিল বিষয়বস্তুকে যেরূপ সহজ সরল ভাষায় লেখক আপন চিন্তা ও যুক্তি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক : নিখিল সুর : ৮৮, ওল্ড ইষ্ট প্ল্যান্ট, জামসেদপুর—१। দাম—১৲]

বি. না. চ.

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্"

N 82765—"সখি মোর প্রাণধন" ও "আজ চল সখি যাই"—দুখানি সুললিত ও সুশ্রাব্য কীর্তন গেয়েছেন দিলীপকুমার রায়।

N 82766—শ্যামল মিত্রের গাওয়া "চৈতালী চাঁদ" ও "সপ্তডিঙা মধুকর" দুখানা আধুনিক গান আমাদের দিয়েছে পরিতৃপ্তি।

N 82767—শ্রীমতী অনিতা মজুমদার চমৎকার গেয়েছেন দুখনি গান "আয় আয় আমার সাথে" ও "করুণসুরে—ওকি গান গাও ?"

N 82768—"কুয়াশায় ঘেরা নীল পাহাড়ে" ও "তোমার দেওয়া এ বেদনা" দুখানা আধুনিক গান দরদদিয়ে গেয়েছেন কুমারী বাণী ঘোষাল।

N 82769—কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন "তোমার মনের রঙ লেগেছে" ও "রাতের বাসরে"। দুখানা গানই অনবদ্য হয়েছে।

N 82770—অতুলপ্রসাদ রচিত দুখানি গান "কে যেন আমারে বারে বারে চায়" ও "চাদনীরাতে কে গো আসিলে"—সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠমাধুর্যে অপূর্ব হয়েছে।

N 82771—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান "আঁখি চলছলিয়া" ও "শুক্লরাতের লক্ষ তারায়" আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

N 82772—সুধীর সেন গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান "রাত হোল নিঝুম" ও "দূর দিগন্ত ঢেকে"।

N 80126—ইণ্ডিয়ান ন্যাভাল ব্যাণ্ড কর্ত্তৃক জাতীয় সঙ্গীত "জনগন মন" মিলিটারী ব্যাণ্ড।

N 87547—ইলেট্রিক গীটার বাজিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুর দিয়েছেন—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

"কলম্বিয়া"

GE 30385—'পথে হোল দেরী' বাণীচিত্রের দুখানা গান "পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া" ও "তুমি না হয় রহিতে কাছে" গেয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30386—সন্ধ্যা মুখার্জী সুললিত কণ্ঠে আর দুখানা গান গেয়েছেন 'পথে হোল দেরী' বাণীচিত্রের—"এই সাঁঝ লগনে সাজ" ও কাকলীকূজন।

GE 30387—'পথে হোল দেরী' বাণীচিত্রের আর দুখানা গান "এ শুধু গানের দিন" গেয়েছেন কুমারী সন্ধ্যা মুখোপ্যাধায়।

GE 30388—'জীবন তৃষ্ণা 'বাণীচিত্রের "আবার নতুন সকাল হবে" ও "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" গ্যান দুখানা শ্রীমতী উৎপলা সেনের কণ্ঠে বার বার শুনেও শোনবার তৃষ্ণা মেটেনা।

GE 30389—'জীবন তৃষ্ণা' বাণীচিত্রের আর দুখানা গান "কখনো তো হই নাই ক্লান্ত" ও "কেলে আসা পথপানে"—গেয়েছেন যথাক্রমে ভূপেন হাজারিকা ও লতা মুঙ্গেশকর।

GE 24874—কুমারী গায়ত্রী বসুর গাওয়া "সুখে দুঃখে আমি" ও "হয়তো এখন তোমার চোখে"—দুখানা গান আমাদের কাছে ভালই লেগেছে।

GE 24875—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "আমার গানের স্বরলিপি" ও "ঝাউয়ের পাতা ঝির ঝিরিয়ে" দুখানা গান। গান দুখানা অপূর্ব হয়েছে।

GE 24876—"ময়না দেখ আসিয়ারে" ও "দূরের মাঠে যাইয়োরে" দুখানা পল্লীগীতি যুগ্মকণ্ঠে গেয়েছেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও সনৎ সিংহ।

GE 24877—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরদেওয়া ও অমল মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "এই পৃথিবীতে" ও "চুপ চুপ লক্ষীটী" গান দুখানা ভাল লেগেছে।

GE 24878—ইলা চক্রবর্তী গেয়েছেন দুখানা গান—"এমন ক'রে কেন সাজালে আমায়" ও "মধুবনে এলো শ্যাম"।

GE 24879-81—শ্রীপংকজকুমার প্রযোজিত ও শ্রীরেবেশ দাস রচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ নিবেদিত "নতুন খেলা" নাটিকা সত্যই শিক্ষাপ্রদ।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা